সূচীপত্র

৩৬শ বর্ষ]　১৩৬৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত　[১ম খণ্ড

GOVERNMENT LIBR
Cooch Behar

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

এর চেয়ে রুচিসম্মত
আর কিছু নাই

ভারতের সুপ্রাচীন রেশম-ঐতিহ্য আধুনিক মনুষ্য-সৃষ্ট এ্যাসিটেট তন্তুর মধ্যে নূতন প্রকাশ খুঁজে পেয়েছে। সিল্ক বস্তুর মধ্যে সব চেয়ে মনোহর সারসিল্ক, অতি পরিপাটি বুনন, বর্ণে এবং ঔজ্জ্বল্যে নয়ন-লোভন, অতি চমৎকারভাবে অঙ্গ আবৃত করে। আনুষ্ঠানিক, সমসাময়িক, ফ্যাসান-দুরস্ত অথচ সর্বদা ব্যবহার-উপযোগী।

Sirsilk
QUALITY FABRICS

কেতাদুরস্ত পুরুষদের জন্য :
শার্কস্কিন। ফান্সী স্যুটিং।
শান্টং। শার্টিং।
সুরুচিসম্পন্না মহিলাদের জন্য :
তাফেতা। সাটিন।
ক্রেপ। জর্জেট।

সারসিল্ক লিমিটেড সারপুর-কাগজনগর, অন্ধ্রপ্রদেশ
কলিকাতা অফিস :
৮, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
সোল সেলিং এজেন্টস্ :
মেসার্স তুলসীদাস কানোরিয়া এণ্ড কোং
ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং, কলিকাতা।
বোম্বাই অফিস : ২৬৪/২৬৮, কলবা দেবী রোড।
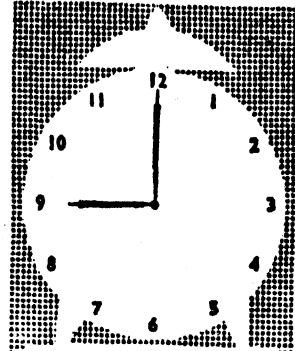
অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া ন্যায্যমূল্যে পছন্দসই চশমার জন্য নির্ভরযোগ্য স্থান :—

ঘোষের আই ক্লিনিক এণ্ড
অপটিক্যাল ইনডাষ্ট্রী
৪১০, জি, টি, রোড, শিবপুর, হাওড়া

প্যারিসের কথা
সমগ্র বিশ্বের গঃ গুরুর গল্প সংকলন
রবীন্দ্রনাথও হাসি-অশ্রুতে আপ্লুত হয়েছিলেন
নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্তঃস্থলে
দাম : ২৲
দাম : ৩'৫০
দাম : ৩৲
দাম : ৩'৫০
বিবাহিত জীবনের Dictionary.
ক্রিকেট খেলা শেখবার জন্য
হাত দেখা শেখবার জন্য
বিখ্যাত Palmist হবার জন্য
বিবাহিত প্রেম
ক্রিকেট খেলার অ,আ,ক,খ
হাতের গোপন কথা
হাতের ভাষা
কিরো
দাম : ৪৲
দাম : ৪৲
দাম : সুলভ ২'২৫ শোভন ৩৲
দাম : ৪'২৫
১৮ বছরের মেয়ের সুখ্যাত বা কুখ্যাত উপন্যাস।
ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস যাঁদের ভাল লাগে ··
রবীন্দ্রোত্তর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।
প্রেমের বিচিত্র গতি যাঁদের ভাল লাগে ··
তৃষ্ণা
দাম : ৩৲
দাম : ৩৲
দাম : ২৲ শোভন ২'৫০
দাম : ২'৭৫
আর্ট য্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
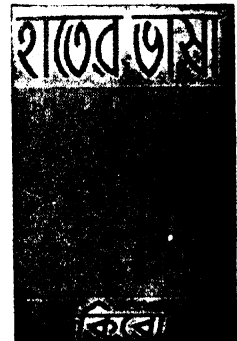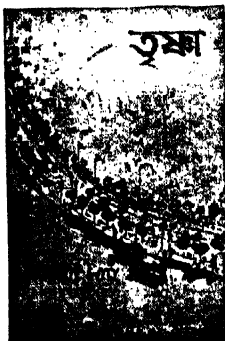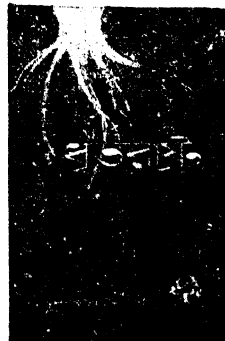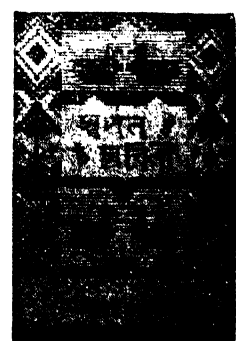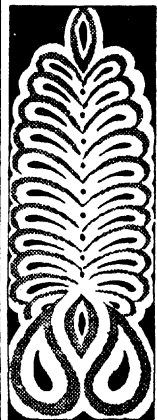
পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারত-রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত

১৯৫৪-৫৬এর সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার-প্রাপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

নূতনতম কাব্যগ্রন্থ

'সাগর থেকে ফেরা'

জীবনের মন্ত্রগাঢ় উপলব্ধি ও উল্লাস

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্-এর বই

প্রচ্ছদ সজ্জায় অভিনব প্রবর্তনা

তিন টাকা

. . . .

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কলকাতার কাছেই

৫৷৷০

এই অনন্য-সাধারণ উপন্যাসখানি সুধী সমাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ধন্য হয়েছে

"ভাষার জটিলতা নেই, কৃত্রিম ভঙ্গীর কলরবও নেই··পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কলকাতার নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের যে বিবরণ দিয়েছেন তা আধুনিক শহরবাসী পাঠকের কাছেই নূতন ও কৌতূহলজনক বোধ হবে।"—রাজশেখর বসু। "কলকাতার এত কাছে অতি সাধারণ গরীবের ঘরে যে কথাসাহিত্যের এতখানি উপকরণ লুকাইয়া ছিল কবি গজেন্দ্রকুমারের সূক্ষ্ম ও সহানুভূতিশীল লেখনী তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বিস্ময়াবিভূত করিয়াছেন। পথের পাঁচালীতে বিভূতিভূষণও এতখানি বাস্তব দুঃখ দেখান নাই। সাবাস! গজেন্দ্রকুমার সাবাস!"—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

"যে ভাবে দরদ দিয়ে আপনি ছবি এঁকেছেন তা সত্যি বিরল! বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে—মনে হয় তারা যেন পরিচিত ও জীবন্ত।"—হুমায়ুন কবির।

"এই উপন্যাসটিকে আমরা অভিনন্দন জানাই কেবল ইহার অন্তর্নিহিত উৎকর্ষের জন্যই নয়, ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্যও। সর্বান্তঃকরণে আশা করি যে গজেন্দ্রকুমার তাঁহার দরদী মন বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ লইয়া যে পথ খুলিয়া দিলেন তাহাতে চলিবার জন্য পথিকের অভাব হইবে না।"—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের

অবনীন্দ্র-চরিতম্ ৫৲

জগতের চিত্ররসিক—মনীষী সমাজে একদিন ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর অর্থই ছিল অবনীন্দ্রনাথের চিত্র। একটা বিপুল প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্য একজন মানুষের কীর্তির মধ্য দিয়ে এভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে দেখা যায়নি এর পূর্বে আর কখনো কোনো দেশে। সেই বিস্ময়কর প্রতিভা অবন ঠাকুরের রোমাঞ্চকর শিল্প-সাধনার পরিচয় তাঁরই স্বজন এবং শিষ্য প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর দিয়েছেন এই গ্রন্থে। অবনীন্দ্রনাথের দশখানি ছবি ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর অঙ্কিত তাঁর গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথের একখানি সপ্তবর্ণ-রঞ্জিত ছবি এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ।

চিত্তরঞ্জন দাশের

কবি-চিত্ত ৫৲

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মালা, মালঞ্চ, অন্তর্যামী, সাগর-সঙ্গীত, কিশোর কিশোরী—এই কাব্যগ্রন্থগুলির ও অপ্রকাশিত গীতাবলীর সংকলন। চিত্তরঞ্জন দাশের আবেগ-প্রধান মাধুর্য-ক্ষরা রসঘন কাব্য-সৃষ্টিগুলি বাংলাদেশের কাব্যামোদীগণের চিরপ্রিয়।

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি।

আমাদের বই

পেয়ে ও দিয়ে

সমান তৃপ্তি।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালচার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যান
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
HIMKALYAN
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যান ক্যাষ্টর অয়েল সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—কার্ত্তিক, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা

কথামৃত

অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারিলেই ধর্মের সত্যতা প্রমাণ হয় না—জড়ের দ্বারা আর চৈতন্যের প্রমাণ হয় না! ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ? আমি অলৌকিক ঘটনাসমূহকে সত্যলাভের পথে সর্বাপেক্ষা অধিক বিঘ্নকর বলিয়া মনে করি। বুদ্ধের শিষ্যগণ একবার তাঁহাকে তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়াকারী ব্যক্তির কথা বলিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি স্পর্শ না করিয়া খুব উচ্চস্থান হইতে একটি পাত্র লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবকে সেই পাত্রটি দেখাইবামাত্র তিনি তাহা লইয়া পদদ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, আর তাহাদিগকে অলৌকিক ক্রিয়ার উপর ধর্মের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সনাতন-তত্ত্বসমূহের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ করিতে হইবে। তিনি তাহাদিগকে যথার্থ আভ্যন্তরীণ জ্ঞানালোকের বিষয়, আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্যোতির বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন—আর ঐ আত্মজ্যোতির আলোকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র নিরাপদ পন্থা। অলৌকিক ব্যাপারগুলি ধর্মপথের কেবল প্রতিবন্ধক মাত্র। সেগুলিকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। ভগবানের নামে গণ্ডগোল, যুদ্ধ, বাদানুবাদ কেন? ভগবানের নামে যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হয় নাই; তাহার কারণ এই, কোন লোকই মূলে গমন করে নাই। সকলেই পূর্বপুরুষগণের কতকগুলি আচারের অনুমোদন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা চাহিতেন, অপরেও তাহাই করুক। যাঁহার আত্মার অনুভূতি অথবা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার না হইয়াছে, তাঁহার আত্মা বা ঈশ্বর আছেন বলিবার অধিকার কি? যদি ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে; যদি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ভিক্টর হুগোর আঁকা রহস্যময় চিত্র

সাহিত্যিক ও শিল্পী

শ্রীদিলীপ মালাকার

জগতের প্রায় সব দেশের সেরা সাহিত্যিকরাই শিল্পী। সেই সব মনীষী সাহিত্যিকদের সব রকমের সৃষ্টিই শিল্প। তা হলেও সাধারণেরা বলবেন সেটা সাহিত্য-শিল্প। শিল্প—শিল্পই। সাহিত্যও শিল্প, আর্টও শিল্প। দুই-এরই স্রষ্টা মনীষী। দুটোই আর্ট। একটা হল কাগজের বুকে কলম দিয়ে অক্ষরাকারে সৃষ্টি, অপরটা হল মোটা কাগজে বা ক্যানভাসে তুলির সৃষ্টি। দুটোই সৃষ্টি, দুটোই শিল্প।

বিশ্বের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকরাই ছিলেন আর্টিষ্ট, সাহিত্যিক তো বটেই। তার পরিচয় পাই তাঁদের আঁকা ছিন্ন পত্রের ওপর ছোটখাট স্কেচ থেকে। তবে বেশীর ভাগ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অঙ্কিত চিত্রপটই থেকে গেছে অজ্ঞাত। তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক হলে হবেন কি, কিন্তু তাঁদের আর্টিষ্ট-প্রতিভা রয়ে গেছে অজ্ঞাত। টলষ্টয় ও কবি গ্যেটের মতন শিল্পীর পরিচয় আমরা ক'জনে রাখি? এঁরা কোনো অংশে ছোট শিল্পী নন। এঁদের প্রতিভা বহুমুখী। তার পরিচয় শুধু সাহিত্যেই অনুসন্ধান করলে চলবে না। অঙ্কিত চিত্রগুলোরও অনুসন্ধান করতে হবে।

বদলেয়ার কর্তৃক অঙ্কিত

পুশকিন-এর আঁকা স্কেচ

সব বিখ্যাত সাহিত্যিকরাই অবসর সময়ে চিন্তাস্রোতকে শুধু অক্ষরেই আবদ্ধ রাখেন না সময় সময়ে তুলি কিম্বা রঙিন পেন্সিল দিয়েও কাগজের বুকে এঁকে চলেন। আমাদের দেশে তার প্রধান উদাহরণ হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলো কি অপটুতার পরিচয় দেয়? মোটেই নয়। আধুনিক চিত্র-শিল্পের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেগুলো অতি আধুনিক বা রিয়ালিষ্ট। যে কোনো চিত্র-সমালোচক এ স্বীকার করতে বাধ্য। তিনি কোনো দিন আর্ট-স্কুলের ছাত্র ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁর আর্টিষ্ট মনই আঁকিয়েছেন অতি আধুনিক ছবিগুলো। এমনি ভাবেই এঁকেছেন বিশ্বের অন্যান্য বিখ্যাত সাহিত্যিকরা।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর আঁকা ছবি সম্বন্ধে বলেছেন যে, "......তুমি বোসো, তোমার একটা ছবি আঁকা যাক। ভাগ্যিস শেষ জীবনে এই দেবী আমায় ধরা দিলেন। জীবনের একটা নতুন পর্ব রচনা হোলো। নতুন রকম ক'রে জগৎকে দেখলুম আর্টিষ্টের চোখ দিয়ে। আমার ছবি এদেশকে দেখাই নি। এখানে অধিকাংশ লোকই ছবি দেখতে জানে না, প্রথমেই দেখে এত চেহারাটা ভালো দেখতে কি না। দেখতে হয় এটা ছবি হয়েছে কি না, সে দেখা কেমন ক'রে দেখা তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। একটা নিয়ত অভ্যাস আর instinctive দৃষ্টি থাকা চাই; ছবি দেখা সকলের কাজ নয়। সে জন্যেই আমি এখানে ছবি প্রকাশ করতে চাইনে, প্যারিসে ওরা দেখেছিল আমার ছবি, দেখবার মত করে। আমার ছবি এদেশের জন্যে নয়।"

("মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"—মৈত্রেয়ী দেবী, ১৩৬৪ পৃঃ ১৩২)

রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই বোঝা যায় সাহিত্যিকদের আর্ট সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ আঁকা সুরু করেছিলেন তাঁর তেষট্টি বছর বয়সের পর থেকে। সেই আঁকা কিন্তু চলেছিল তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত।

এদিক দিয়ে জার্মাণ কবিবর গ্যেটে ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই মতন। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত আধুনিক দার্শনিক আলবেয়ার সোয়াইৎসার বলেছেন যে, গ্যেটের মতন আর্টিষ্টরাই রচনা করেছেন মহামূল্য কবিতা এবং সেই সব কবিদের আত্মাই হল আর্টিষ্টদের আত্মা। তাঁরা কখনো এঁকেছেন, কখনো বা লিখেছেন। দুই-ই সাহিত্য, দুই-ই শিল্প। আর্টিষ্ট, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ এই তিন মিলে যে আত্মার সৃষ্টি সে হল কবি।

হান্স ক্রিশ্চান এণ্ডারসন-এর কাঁচি দিয়ে কাটা কাগজ থেকে এর উৎপত্তি

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন শিল্পী তাঁরা কিন্তু রয়ে গেছেন অজ্ঞাত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, লিও টলষ্টয়, ভিক্টর হুগো, গ্যেটে, গারসিয়া লোরকা, থ্যাকারে, লিউইস্ ক্যারল, এইচ, জি, ওয়েলস্, বদলেয়ার, ভ্যালেরি, মার্ক

টয়েন, এডগার অ্যালান পো, পুসকিন, গোগোল, র‍্যাঁবো, শার্লত ব্রণ্ট, পিয়ের লোতি, হারমান্ হেস্, জর্জ স্যাণ্ড, জঁ ককতো, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, ষ্টিভেন্সন, মায়াকাভেস্কি, দান্তে, হান্স ক্রিশ্চান এণ্ডারসন ও আরও অনেকে।

ফরাসী সাহিত্যিক মনীষী ভিক্তর হুগোর আঁকা ছবিগুলো রহস্যময়। তিনি যেমন স্কেচ এঁকেছেন তেমনি প্রচুর জলরঙও ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক তাঁর আঁকা ছবিগুলোকে রেমব্রাণ্ট বা গইয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

লুইস ক্যারল এঁকেছেন তাঁরই এলিস ইন্ দি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড-এর চিত্রগুলো অতি নিপুণ ও নিখুঁত চাতুর্য্যে। হান্স ক্রিশ্চান্ এণ্ডারসন তুলি বা পেন্‌সিল দিয়ে আঁকতেন না, তিনি কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে জোড়া দিয়ে দিয়ে নতুন ছবির সৃষ্টি করতেন। সেগুলো অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ফরাসী কবি বদ্‌লেয়ার-এর আঁকা ছবি সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী চিত্রশিল্পী দিলাক্রোয়া মন্তব্য করেছিলেন যে, বদলেয়ার কবি হলে হবে কি, ঠিক যেন নিপুণ চিত্রশিল্পী।

এইচ্. জি. ওয়েলস, ডি. এইচ্ লরেন্স ও থ্যাকারে সাধারণ আর্টিষ্ট ছিলেন না। এঁদের আঁকা ছবিগুলোকে যে কোন উঁচু দরের বা পেশাদার চিত্রশিল্পীর আঁকা চিত্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। থ্যাকারের আঁকা ছবিগুলো একটু শ্লেষাত্মক।

টলষ্টয় কিন্তু আঁকতেন তাঁর সন্তানদের জন্যে। তিনি জুলে ভার্ণের লেখা 'আশী দিনে বিশ্বপ্রদক্ষিণ' পড়ে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, শীতকালের রাত্রিতে নিজে উচ্চৈঃস্বরে সে বই পড়তেন আর শোনাতেন তাঁর ছেলেমেয়েদের। আর মাঝে মাঝে ছবি এঁকে দেখাতেন ও বোঝাতেন তাঁর সন্তানদের সেই সব আঁকা ছবিগুলো সত্যি সত্যিই পাকা আর্টিষ্টের আঁকা ছবি বলে মনে হবে।

কবিবর গ্যেটে বলেছিলেন যে, আমাদের উচিত হবে কম কথা বলা, আঁকতে হবে অনেক।

আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের মধ্যে হারমান্ হেসে ও জঁ ককতো

টলষ্টয়ের আঁকা স্কেচ
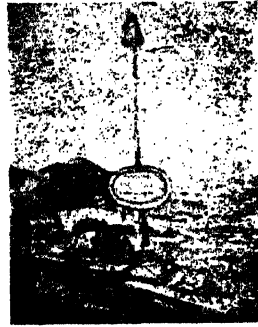
গ্যেটের আঁকা ছবি

বেশ নাম করেছেন চিত্রাঙ্কনে। ফরাসী সাহিত্যিক জঁ ককতো তো দক্ষিণ-ফ্রান্সের এক গ্রামের ছোট একটা গীর্জার অভ্যন্তরে সমস্ত দেওয়াল-চিত্র তিনি একাই এঁকেছেন সুনিপুণ হস্তে।

হিন্দুর শবদাহ

বর্ত্তমান সময়ে যন্ত্রসাহায্যে শবদাহের যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। উহা-দ্বারা মৃতের কোনরূপ কল্যাণ-সাধিত হয় না। উহাতে বিজাতীয় লোকের স্পর্শ সম্ভাবনা, মন্ত্রপাঠাদির অভাব, গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপরাহিত্য নিয়মিতভাবে শবস্থাপনের অভাব প্রভৃতি থাকায় বৈধদাহ সিদ্ধ হয় না। অতএব দাহ সিদ্ধ না হইলে, তৎপরবর্ত্তী মৃতের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াগুলিও অসিদ্ধ হয়। এই কারণ যান্ত্রিক-দাহে কাষ্ঠব্যয় ও শ্রমের লাঘব হইলেও এই সুবিধার নামে অশাস্ত্রীয় কার্য্যদ্বারা মৃতের পারত্রিক কার্য্যে বিঘ্ন সম্পাদন কখনও সনাতনধর্মাবলম্বিগণের সমর্থনীয় হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত হিন্দুমাত্রেরই যান্ত্রিক-দাহে অনাস্থা ও তীব্র প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। কিছুকাল পূর্ব্বে যন্ত্রসাহায্যে শবদাহের ব্যবস্থা হয় এবং উহার প্রতিকূলে তুমুল আন্দোলন হয়, এইরূপ জনশ্রুতি আছে তৎকালে প্রাতঃস্মরণীয় মহানুভব ৺রামগোপাল ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বর্গাদপি-গরীয়সী জননীর আদেশে উক্ত অবৈধ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন ও নিমতলা ঘাটে শবদাহের জন্য প্রচুর মুদ্রা দান করিয়া অতুলনীয়-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।—'ভারতের সাধনা' শ্রীবিধুভূষণ দত্ত সম্পাদিত দ্বিতীয় বর্ষ (১৩৩৭ কার্ত্তিক) প্রথম সংখ্যা।

রবীন্দ্র-বীক্ষায় নারীর মন

আদিত্য ওহদেদার

নারীর কাছে পুরুষচরিত্র রহস্যায়িত কি না, সে কথা জানা যায় নি। কোনো জর্জ সাণ্ড (১) অথবা ইসাডোরা ডানকানের (২) আত্মজীবনীতে তার আভাস নেই। কোনো লেখিকাও এমন পুরুষ-চরিত্র সৃষ্ট করেন নি যার দ্বারা বোঝা যায় যে পুরুষ-চরিত্র সম্বন্ধে কোনো রহস্যের ভাব মেয়েদের মনে আছে। খুব সম্ভব নারীর কাছে পুরুষের মন একান্ত স্বচ্ছ। প্রাত্যহিক জীবনে পুরুষকে নারীর কাছ থেকে প্রায়ই তো শুনতে হয়, 'তোমাদের চিনতে আমাদের কিছু বাকি নেই।' পুরুষের হাতে পড়লেই, বয়সে যতো ছোট আর বিদ্যাবুদ্ধিতে পুরুষের চেয়ে যতোই কম হোক, মেয়েরা না কি ঠিক বুঝে নিতে পারে কী রকম মানুষের সঙ্গে তাকে ঘর করতে হবে—এমন কথা একজন ভৈরবী এক তত্ত্বাভিলাষী পর্যটককে জানিয়ে দিয়েছিলেন।(৩)

কিন্তু পুরুষের কাছে নারীচরিত্র অপার রহস্য। এ রহস্য পারংগম সে হতে পারে নি বলেই তাকে এই খেদোক্তি করতে হয়েছে, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ All things in woman are a riddle—মেয়েদের সব কিছুই রহস্য—নীটশের এ কথা পুরুষের কাছে সত্য। শেকসপীয়রও তাঁর একটি নাটকে কোনো চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, Who is't can read a woman ? মেয়েদের মনের কথা কে পড়তে পারে? রহস্য বলেই নারীচরিত্র ও স্বভাব নিয়ে পুরুষকে যুগে যুগে বহুভাষণের স্তূপ জমাতে হয়েছে। যা জানা গেল না তা নিয়ে চিন্তা ও অনুমানের শেষই বা কি ক'রে হয়?

জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা নারী-মন সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এ কৌতূহল প্রবল ছিল। এক গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে নারীচরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে নারীমন সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলকে সদাজাগ্রত রাখতেই হয়েছে। তাঁর রচনায় নারীচরিত্র বিষয়ক যতো সূক্তি আছে এমন অন্য কোনো কথা-সাহিত্যিকের রচনায় নেই। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আর কোনো মূল্য না থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের এই সূক্তিগুলির আংশিক সংকলন হিসেবে কিঞ্চিৎ মূল্য দাবী করতে পারে। সূক্তিগুলি বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে বলানো হলেও তাদের মধ্যে দিয়ে নারীচরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাই প্রকাশ পেয়েছে এমন মেনে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো বলেছেন, "সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়—সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।"(৪) রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা ও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়ে বলানো কথার মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য থাকে নি তা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে। পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরীতে নারী-প্রকৃতির একটা বিশেষত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজের কথা হল এই—"নারীর প্রেম যে-পুরুষকে চায় তাকে প্রত্যক্ষ চায়, তাকে নিরন্তর নানা আকারে বেষ্টন করবার জন্যে সে ব্যাকুল। মাঝখানে ব্যবধানের শূন্যতাকে সে সইতে পারে না। মেয়েরাই যথার্থ অভিসারিকা। যেমন করেই হোক, বিচ্ছেদ পার হবার জন্যে তাদের প্রাণ ছটফট করতে থাকে।" বাঁশরী নাটকের নায়িকাও এমন কথাই বলেছে, "মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের পুরো ভালোবাসা।"

রবীন্দ্রনাথ নারীজাতিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—

> একজন ঊর্বশী সুন্দরী,
> বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী
> স্বর্গের অপ্সরী।
> অন্য জনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
> বিশ্বের জননী তারে জানি
> স্বর্গের ঈশ্বরী।

'বলাকা'য় প্রথম প্রকাশিত এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনে স্থায়িত্ব পায়; তাই বহু বৎসর পরে 'দুই বোন'-এ এই কথাকেই আরও সোজা করে বলেছেন, "মেয়েরা দুই জাতের···এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া। যে নারী মায়ের পর্যায়ে তার স্নেহ-মমতাপূর্ণ কল্যাণ-স্নিগ্ধ রূপটি স্পষ্ট, পুরুষ তাকে সম্ভ্রমের সঙ্গে শ্রদ্ধা জানায়। কিন্তু যে নারী প্রিয়া সে যেন বসন্ত ঋতু—গভীর তার রহস্য। মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।" এই প্রিয়াপ্রকৃতি নারীমনের স্বভাব ও গতিবিধি জানবার জন্যে পুরুষের কৌতূহল দুর্নিবার। বলা বাহুল্য, এই নারীমন রবীন্দ্রবীক্ষায় কী ভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তাই আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-রচনা থেকে যে দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেমিকা নারী হল অভিসারিকা। বৈষ্ণব কবিরাও রাধিকাকে দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার রাত্রে অভিসারে পাঠিয়েছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয়তা ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় শিভলরি ভাবাদর্শের কাছে ধরা পড়েনি। সেখানে নারী ছিল একান্তই নিষ্ক্রিয়; পুরুষ সর্বদা তার কাছে বারে বারে এসে তার চক্ষের করুণাপূর্ণ দৃষ্টির ভিখারী হয়েছে। কিন্তু নারীর মন যে এতো নিষ্ক্রিয় নয় সেটা ইয়োরোপে পুরুষের অভিজ্ঞতায় ও দর্শনে পরে ধরা পড়েছে। শ'তো ম্যান্ এণ্ড সুপারম্যান-এ বলেই দিলেন যে অ্যানারাই ট্যানারদের পিছু নেয়, এবং যতোক্ষণ না ধরতে পারে ততোক্ষণ হাল ছাড়ে না।

নারীমন ক্ষমতার বশ হয়, রবীন্দ্রনাথের কাছেও এটা সত্য বলে মনে হয়েছে। শক্ত পুরুষ নারীর নিজের শক্তি বিকাশের অবলম্বন। নারী নিজের শক্তি পরীক্ষা করে শক্ত পুরুষের ভালোবাসা আদায় করার মধ্য দিয়ে। এটাই তার আনন্দ ও আত্মোপলব্ধি. গল্পগুচ্ছের মণিহারা গল্পে নারী কেন কড়া স্বামী পছন্দ করে তার কারণ জানানো হয়েছে। "সাধারণত স্ত্রী জাতি কাঁচা আম, ঝাল, লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগা পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা

১। The Intimate Journal of George Sand. 1929

২। Isadora Duncan. My Life. 1932.

৩। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়: তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ, ১ম ভাগ, ১৭১ পৃঃ

৪। আত্মপরিচয়, ১৩৫০, পৃঃ ১০

হইতে বঞ্চিত সে যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।···নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার। স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালো মানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয়, তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ, এবং স্ত্রীরও ততোধিক।" এই ভাবে পুরুষের ভালোবাসা আদায় করতে গিয়ে নারীকে দুঃখও পেতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য, এতে সে মোটেই পশ্চাৎপদ নয়। বরং এই ভাবে দুঃখ পাবার দিকেই তার স্বভাবের প্রবণতা। মেয়েদের স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যকেই আধুনিক মনোবিজ্ঞান মর্ষকাম বলে। সোপেনহাওয়ার বলে গেছেন, মেয়েরা দুঃখভোগের দ্বারাই জীবনের ঋণ শোধ করে। চতুরঙ্গে শ্রীবিলাস মেয়েদের এই দিকটা তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছে! "যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে, যে-লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে, আর তা যদি না হইল তবে এমন কারও দিকে তারা লক্ষ্য করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পৌঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমনি মিলাইয়াছে যে নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ংবরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা আমাদের মতো মাঝারি পুরুষ।" এ কথাকে রবীন্দ্রনাথ শুধু পুরুষের অনুমান রূপে রাখতে দেন নি, তাকে নারীর নিজের উক্তির দ্বারা সমর্থিত করিয়ে ছেড়েছেন। বাঁশরী বলেছে, "পুরুষের উপেক্ষা তারই পরে দুর্বৃত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিম্বা দুর্লভ হবার মতো তপস্যা।"

শ্রীবিলাস যাদের মাঝারি পুরুষ বলেছে, তারা নিজেদের প্রত্যক্ষ করাতে পারে না, এবং তা পারে না বলেই মেয়েদের কাছে তাদের মূল্য বেশি নেই। "দ্বিধা করে নিজেকে যে-পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ করে না।" (শেষের কবিতা)। মেয়েদের হৃদয়ে পাকা স্থান পেতে হলে পুরুষের বেশি ভালো হওয়াও ঠিক নয়। 'ঘরে বাইরে'র বিমলা বলেছে, "আমার মনে হ'ত, ভালো হবার একটা সীমা আছে—সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। সত্যি কথা বলব? অনেক বার আমি মনে ভেবেচি, আর একটু মন্দ হবার মত তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।" এখানে মন্দ হবার মত তেজ কথাটা লক্ষ্যণীয়। যে পৌরুষ মেয়েদের কাম্য তাকে তৈরি করবার জন্যে একটু মন্দের খাদ দরকার। মন্দের এই খাদটুকু থাকে না বলেই মাঝারি পুরুষের দলে তাঁরাও পড়েন যাঁরা অতি কর্ত্তব্যপরায়ণ কিম্বা অভিভূত। মেয়েদের হৃদয়াসনে বসবার যোগ্যতা এঁদেরও নেই। "কর্ত্তব্যবোধে যারা অত্যন্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়।" (রবিবার)। "অভিভূত যে পুরুষ ওদের সমান প্লাটফর্মে নামে সেই গরীবের জন্যে থার্ডক্লাস, বড় জোর ইণ্টারমিডিয়েট। সেলুন গাড়ি তো নয়ই।" (বাঁশরী)। অথচ এই মাঝারি পুরুষই মেয়েদের প্রকৃত সহায়। তারা নিজের নিষ্ঠা, কর্ত্তব্য ও অভিভূতির দ্বারা মেয়েদের প্রয়োজন মেটায়। এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তারা যে আত্মোৎসর্গ করে তাকে কিন্তু মেয়েরা প্রেমের মূল্যে স্বীকার করে না। শ্রীবিলাস বলেছে, "আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোন দাম আছে, সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়।" (চতুরঙ্গ)।

পুরুষ সহজ হলে মেয়েদের অনুরাগ সতেজ হতে পারে না।—"যে সব দুর্দাম দুরন্তের কোন বালাই নেই, ন্যায়-অন্যায়ের মেয়েরা তাদের বাহু-বন্ধনে বাঁধে।" (রবিবার)। নারীর এই প্রকৃতির জন্যে ভালোবাসার ব্যাপারে বর্বরতার প্রয়োজন দেখা দেয়। চার অধ্যায়ে অতীন এলাকে বলেছে, "ভালোবাসা তো বর্বর। তার বর্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগলঝোরা সে, ভদ্র শহরের পোষমানা কলের জল নয়। যৌবন যখন প্রথম এসেছিল তখনও মেয়েদের চিনি নি। কল্পনায় তাদের দুর্গম দূরে রেখে দিয়েছি; প্রমাণ করবার সময় বয়ে গেল যে, তোমরা যা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম! সময় যদি না হারাতুম এখনই তোমাকে বজ্রবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টন্‌টন্ করে উঠত, তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মতো নিশ্বাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে নিয়ে যেতুম আপন কক্ষপথে।" অতীন ঠিক কথাই যে বলেছিল তা বোঝা গেল এলার উত্তরে ও কাজে। "দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও এই নাও, এই নাও।" এই বলে দু'হাত বাড়িয়ে গেল অতীনের কাছে, চোখ বুজে তার বুকের উপর পড়ে তার মুখের দিকে মুখ তুলে ধরলে। এলার মুখে 'দস্যু' কথাটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। মেয়েদের প্রেম-সম্ভোগ বোধ হয় আত্মসমর্পণ সুখের মধ্যে নিহিত। এবং আত্মসমর্পণের জন্যে নারী পুরুষের কাছে দস্যুতা, দুর্দমতা আকাঙ্ক্ষা করে। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সম্ভবতঃ নারীর অন্তর্নিহিত স্নেহ-মমতাবৃত্তির প্রেরণা আছে—দস্যু দুর্দম পুরুষকে স্নেহমমতার দ্বারা শান্ত করবে, এই হয়ত সে চায়। পুরুষ যদি উদাসীন হয়, সেক্ষেত্রে দেখা দেয় ভক্তি। সেও তার কাম্য।" "যে উদাসীন মেয়েদের মোহে হার মানল না, ভুজপাশের দিগ্‌বলয় এড়িয়ে যে উঠল মধ্য গগনে, উর্দ্ধে তুলে মেয়েরা তারই উদ্দেশে দিল শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য।" (বাঁশরী), বিমলা বলেছে, "স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়—নইলে ধিক্ তাকে ধিক্। আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে।" বিমলা আরও একটা কথা বলেছে, "আমরা মেয়েরা বাঁধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই।" বলতে পারি, দস্যু দুর্দম পুরুষকে মেয়েরা বাঁধে, আর উদাসীন পুরুষের কাছে বাঁধা পড়ে।

যে পুরুষকে নারী উপহাস করে সে পুরুষ নারীর হৃদয়-দুয়ারে যতোই মাথা খুঁড়ুক কোন ফল নেই। কারণ, "মেয়েরা যাকে গাল দেয় তাকেও বিয়ে করতে পারে, কিন্তু যাকে বিদ্রূপ করে তাকে নৈব নৈব চ।" (বাঁশরী)। প্রসঙ্গত জার্মান কবি হায়েনের কথা উল্লেখ করতে পারি, যাঁর মতে, মেয়েদের ঘৃণা প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসারই উল্টো পিঠ (their hate is, in fact, only love turned inside out)।

একটি কর্ণীয় প্রবাদ আছে, টাকা যতো পাঁক খেতে পারে তার চেয়েও বেশি পাক খায় মেয়েদের চাতুরী-কৌশল। ছলাকলা মেয়েদের চরিত্রের অঙ্গ রবীন্দ্রনাথও তা স্বীকার করেছেন। সোহিনীর মুখ দিয়ে

বলিয়েছেন, "এত যুগ ধরে মেয়েমানুষ টিঁকে আছেন কী করে। ছলা-কলার কম কৌশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কি না তাতে মধুও কিছু খরচ করতে হয়। এ হলো নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।" ফ্যান এণ্ড সুপারম্যান-এ শ'ও দেখিয়েছেন যে পুরুষকে হারাবার ভয়ে এবং তাকে ঘরে বাঁধবার জন্তে মেয়েরা পুরুষের কর্মসঙ্গিনী হবার আগ্রহ দেখায়, কিন্তু সেটা শুধু একটা ছল। সোহিনীর আর একটা কথা কিন্তু মারাত্মক। "আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল আমাদের। দ্রৌপদী-কুন্তীদের সেজে থাকতে হয় সীতা-সাবিত্রী।" এই কারণেই বোধ হয় পুরুষের দর্শনে মেয়েরা অবিশ্বাসিনী রূপে প্রতিভাত হয়েছে। সোপেনহাওয়ার বলেছেন, খাঁটি সত্যবাদিনী নারী বোধ হয় অসম্ভাব্য বস্তু—A woman who is perfectly truthful is perhaps an impossibility, ইটালীদেশের প্রবাদ বলে, কোনো স্ত্রীলোক কখনো সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেনি। আমাদের শাস্ত্রও বলেন, বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু, ইত্যাদি।

কথাসাহিত্যের মাধ্যমে মেয়েদের সম্পর্কে মন্তব্যগুলি প্রকাশিত করতে রবীন্দ্রনাথ তিনটি প্রথা অবলম্বন করেছেন দেখতে পাই। এবং এই তিন প্রকার প্রথার পরম্পরার মধ্যে আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা বিবর্তনের আভাস আছে। মণিহারা গল্প যে সময় লেখা হয় তখন নারীর মনের কথা পুরুষের মুখ দিয়ে বলানো ছাড়া উপায় ছিল না। পুরুষের কাছে নারী নিজের মনের কথা খুলে বলবে, কিম্বা নিজের কাছেই পুরুষের সম্পর্কে নিজের মনের হদিস নেবে—সেদিন মেয়েদের কাছে এমন সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা কিম্বা সাহস, কিছুই ছিল না। ক্রমে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হল, মেয়েরা বাইরে না বেরুলেও ঘরে বিদ্যাচর্চার সুযোগ পেতে লাগল। তখন নিজের কাছে নিজের মন বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করল। তাই বিমলাকে দেখা গেল স্বগতভাবে মেয়েদের মনের কথা বলছে। তারপর আমাদের মেয়েদের জীবনে এসেছে আরও পরিবর্তন। তারা পুরুষের সঙ্গে সমান শিক্ষা পেয়েছে, বাইরে বেরিয়েছে, পুরুষের সঙ্গে মিশতে পেয়েছে। তখন পুরুষের কাছেও নিজেদের মনের খবর দেওয়াতে তদের বাধা বা লজ্জা নেই। লাবণ্য বাঁশরী ও সোহিনী এই পর্যায়ের মেয়ে। এদের মধ্যে ছায়া ফেলেছে আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ Helen Deutsch(৫) বা Simone De Beauvoir(৬)—নারী হয়ে নারী-মনের শাস্ত্র লিখবে যারা।

উপরি-উক্ত দুই বিদেশী মহিলার নাম যখন উত্থাপিত হল, তাঁদের বক্তব্যও কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা উভয়েই নারীর মনের খবর দিতে গিয়ে নারীর দেহের খবর দিয়েছেন। নারী-দেহের গঠন-বৈচিত্র্য কী ভাবে নারী-মনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে, তা এঁরা বিশদ ভাবে দেখিয়েছেন। Helen Deutsch বলেছেন, নারীর মানস-গঠনে কাজ করে থাকে দুটো জিনিস—narcissism ও masochism অর্থাৎ স্বকাম ও মর্ষকাম। স্বকামের বশে নারী চায় ভালোবাসা পেতে। তা ছাড়া এরই প্রভাবে গড়ে ওঠে, নারীর আত্মপ্রীতি এবং আপন পবিত্রতা রক্ষার সতর্কতা। মর্ষকামের বশে নারী চায় ভালোবাসতে, ভালোবাসার পাত্রের জন্তে আত্মোৎসর্গ করতে। এবং মর্ষকামের আধিক্যের জন্তে নারীর মধ্যে একটা আকর্ষণ দেখা দেয় দুঃখভোগের প্রতি।—The attraction of suffering is incomparably stronger for women than for men ; এবং নারীর দেহের প্রয়োজনই এমন যে তার মন চায় পুরুষের দ্বারা বিজিত হতে।—There is a feminine need to be overpowered by men.

মেয়েদের মনের রহস্যময়তাকে স্বীকার করেছেন Simone De Beauvoire এবং এই রহস্যময়তা কী ভাবে মেয়েদের দেহের কুটিলতা থেকে উদ্ভূত, তাই দেখিয়েছেন। নারীর দেহ-প্রকৃতি বড়ই জটিল। এবং কোনো অর্থ না বুঝেই এই জটিলতার কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তার দেহ, তার অন্তরের চাহিদা অনুযায়ী সৃষ্টি হয় নি। সে তার দেহের মধ্যে বাস করে অনেকটা অপরিচিতার মতো। ফলে, এমনিতেই মানুষের মধ্যে তার দেহ ও মনের, ব্যক্তিসত্তার বন্ধন ও মুক্ত-প্রকৃতির যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, সে দ্বন্দ্ব মেয়েদের মধ্যে হয়েছে আরও অনেক তীব্র। দ্বন্দ্বের এই তীব্রতাই সৃষ্টি করেছে মেয়েদের রহস্য।

নারীর মনকে নারীর দেহধর্ম দিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথ যদিও করেন নি, তবু নারীর মনের ক্রিয়ার পেছনে যে দেহের ব্যাপার প্রচ্ছন্ন থাকে, সেদিকে দু'-এক জায়গায় ইঙ্গিত দিয়েছেন।—"অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সঙ্কোচ সরাতে চায় না।" এই অজানা বিপদের আশঙ্কাটা মেয়েদের দেহের জন্তেই।

মর্ষকাম নারীর মনকে অন্তর্মুখীন করে। এই অন্তর্মুখীনতার জন্তেই প্রেমের ব্যাপারে নারীর মন গভীর। লাবণ্য অমিতকে বলেছে, "মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্দর-মহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোন খবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।"

প্রেমই নারীর প্রকৃত সত্তা। তার অভাবে নারী নিজেকে কৃত্রিম করে। কেটির সম্বন্ধে লাবণ্য তাই অমিতকে বলেছে, "নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন? যে-কারণেই হোক, আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে। ওর মূর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি, ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো, সেটা সম্ভব হতো না, যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত।"

অবশ্য নারী লিখলে পুরুষের সুবিধা হয়। এত দিন ধরে সে যা অনুমান করেছে তার সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে পারে। কিন্তু তবু কি পুরুষ নারীর সম্বন্ধে শেষ কথা জানতে পারবে? শরৎচন্দ্রের মতো তবু হয়ত সে বলবে, "আমরাই যে শুধু তোমাদের চিনে উঠতে পারলুম না, তা নয়, তোমরা নিজেরাও বোধ হয় নিজেদের ঠিক চিনে উঠতে পার না অথবা নিজেকে চিনতে ভয় পাও। হয়ত এমনও হতে পারে, চিনেও সহজে তাকে স্বীকার করে নিতে চাও না।" মেয়েদের নিয়ে পুরুষের কল্পনা চিরদিনই হয়ত থাকবে ও কবির কথাই নারীর উদ্দেশে সে বলবে—"অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।"

৫। The Psychology of Women ; Vol. 1, 1947.

৬। The Second Sex, 1953.

বাঙালীর কালীপূজা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কালীপূজা বাঙালীর একটি মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য। দুর্গা, কালী ও সরস্বতী এই তিন দেবীর পূজা বাঙালী বিশেষ আড়ম্বরের সহিত করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কালীর পূজা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কালী বাঙালীর অতিপ্রিয় দেবতা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বাঙালী এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দেওয়ালীর দিন যে পূজা হয় তাহাই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রসিদ্ধ। ইহার নাম দীপান্বিতা কালীপূজা। রটন্তী চতুর্দশী বা মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রিতে অনেকে রটন্তী কালীপূজার অনুষ্ঠান করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় বিবিধ ফল-মূলাদির সাহায্যে ফলাহারিণী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া, বিবাহাদি শুভকর্ম উপলক্ষে কেহ কেহ কালীপূজা করিয়া থাকেন। কোন রোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে শান্তি কামনায় রক্ষাকালীর পূজা করার প্রথা কিছুদিন পূর্বেও গ্রামাঞ্চলে দেখা যাইত। সাধারণতঃ কালীকে ওলাউঠার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই গ্রামে ওলাউঠা দেখা দিলেই কালীপূজার আয়োজন করা হইত।* অনেক স্থানে নির্দিষ্ট দিনে বা বছরের যে কোন দিনে সাড়ম্বরে দেবীর বার্ষিক পূজার ব্যবস্থা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শনি ও মঙ্গলবার, অমাবস্যা তিথি এবং নিশীথ রাত্রিতে কালী বা যে কোন শক্তি দেবতার পূজার পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত।

বাংলার নানা স্থানে অগণিত কালীমন্দির, কালীবাড়ী বা কালীতলা প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক স্থলে প্রস্তর বা মৃত্তিকার কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কোন কোন মন্দির পঞ্চমুণ্ডের উপর স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোন কোন স্থানে নানা সময়ে মূর্তি তৈয়ারি করিয়া পূজা করা হয়। বাংলা দেশের নানা স্থানে নানা নামে এই দেবতা পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে স্থানের নামে ইহার নাম। যথা—ঢাকেশ্বরী, যশোরেশ্বরী প্রভৃতি। সিদ্ধেশ্বরী, করুণাময়ী, আনন্দময়ী প্রভৃতি নামেও ইনি বহু স্থলে পরিচিত। এই সমস্ত নামের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। গত শতাব্দীর সংবাদপত্রে উল্লিখিত কলিকাতার বাগবাজার, হুগলীর অন্তর্গত কালীপুর ও তারকেশ্বরের সন্নিহিত প্রান্তরে অবস্থিত তিনটি সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমার কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। পাদ্রি ওয়ার্ড সাহেব প্রণীত 'এ ভিউ অব দি হিষ্টরি—লিটরেচর অ্যাণ্ড রিলিজন অব দি হিণ্ডুজ' (২য় খণ্ড, শ্রীরামপুর, ১৮১৫) গ্রন্থেও সিদ্ধেশ্বরী ও করুণাময়ীর বিবরণ পাওয়া যায়। কলিকাতার নিমতলার আনন্দময়ী প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া, অন্যান্য যে সমস্ত স্থানের কালী প্রসিদ্ধ তাহাদের মধ্যে কালীঘাটের কালী সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধিস্থান মেহার, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিদ্ধিস্থান দক্ষিণেশ্বর ও বরিশালের অন্তর্গত পোনাবালিয়া গ্রামের কালীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন অংশে বাঙালী যে সব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও অনেক স্থানে সে কালীর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শাক্তপ্রধান বাংলা দেশে কালীর উপাসক-সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী—অধিকাংশ বাঙালী শাক্তই কালীমন্ত্রে দীক্ষিত। অন্যান্য শাক্ত দেবতার পূজা-উৎসব অনেক স্থলে প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তির উপরই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র মূর্তি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয় না। তাই দুর্গাপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি বাংলার প্রসিদ্ধ উৎসবের সময় প্রতি কালীমন্দিরে উৎসবের ঘটা পড়িয়া যায়। বর্ষের বিভিন্ন সময়ে কালীর যে রূপ আড়ম্বরপূর্ণ উৎসববহুল বিশেষ পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তারা প্রভৃতি মূর্তির সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সব উৎসবের দিনে অন্যান্য দেবতার উপাসকেরাও কালীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

দেবতা হিসাবে কালী অবাঙালীদের মধ্যেও অপরিচিত নন। মিথিলা বা উত্তর-বিহারে বাংলার মতই কালীমূর্তি ও কালীমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালেও কালীর বিশেষ করিয়া গুহ্যকালীর পূজার প্রচলন আছে। দক্ষিণ-ভারতের কেরলে কালীপূজার বহুল প্রচলন আছে। কিছুদিন পূর্বে কেরলে কালীপূজা সম্পর্কে মালয়ালম ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তবে পূর্বভারত ছাড়া অন্যত্র অবাঙালীদের মধ্যে যে কালী পরিচিত তিনি বাঙালীদের কালীর মত নহেন। শক্তির মহিষমর্দিনী প্রভৃতি রূপ নানা স্থানে কালী নামে বিখ্যাত ও পূজিত। কালীর শান্ত ও উগ্র রূপের বর্ণনা নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। গোপীনাথ রাও তাঁহার হিন্দু মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই দুই রূপেরই বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, বিষ্ণুধর্মোত্তর নামক গ্রন্থে বর্ণিত ভদ্রকালীর রূপ সুন্দর ও শান্ত—কারণাগম, চণ্ডীকল্প ও ভবিষ্য পুরাণে বর্ণিত মহাকালী বা কালী উগ্ররূপা। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর একটি প্রস্তরলিপিতে কালীর ভীষণ আকৃতির উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে কালীর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও দেবীর ভয়ানক মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বর্ণনানুসারে দেবী করালবদনা অসিপাশধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা ব্যাঘ্রচর্মবসনা শুষ্কমাংসা অতিভীষণা অতিবিস্তৃতমুখী লোলজিহ্বা আরক্ত কোটরগত নয়নবিশিষ্টা। ইহার শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত। ইনি চণ্ডমুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয়কে বধ করিয়া চামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধা হন। ইহার ধ্বংসলীলার কাহিনী দেবীমাহাত্ম্যের বিভিন্ন অংশে কীর্তিত হইয়াছে।

আমরা বাংলা দেশে যে কালীমূর্তির পূজা করিয়া থাকি তাহার সহিত এই সমস্ত বর্ণনার মিল নাই। বাংলা দেশে এই মূর্তি বিশেষ পরিচিত—বাংলা দেশে প্রচলিত গ্রন্থে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। জনপ্রবাদ এই যে, তন্ত্রসাররচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এই মূর্তি প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ প্রবাদ সত্য বলিয়া মনে হয় না—আগমবাগীশের পূর্ববর্তী গ্রন্থেও এই মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে

---

* প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন গ্রামেও কালী ওলাউঠার ত্রাণকারিণী, ভূত-প্রেত, বন্যজন্তুর আক্রমণে রক্ষাকর্ত্রী, বহিরাগত অমঙ্গল হইতে গ্রামের রক্ষাবিধাত্রী এবং বিহঙ্গ-নাশক ব্যাধকুলের পরম শ্রদ্ধাভাজন।

হইতে পারে—এ মূর্ত্তির কোন নিদর্শন প্রত্নতত্ত্বীয় সংগ্রহশালায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে একখানি অর্বাচীন লৌহমূর্ত্তি আছে—ইহা সঙ্গে লইয়া অনায়াসে চলাফেরা করা যায়। বলা হয়, এইরূপ মূর্ত্তি চোর-ডাকাতদের সঙ্গে থাকিত—তাহারা পথে-ঘাটে ইহার পূজা করিত এবং দেবতার প্রসাদ লাভ করিয়া দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইত।

বাংলা দেশে পূজিত কালীমূর্ত্তির বহু প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এ মূর্ত্তি ভয়ানক—অবশ্য এখানে সেখানে কিছু কিছু কমনীয়তার আভাসও দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাঙালী কালীর যে রূপের পূজা করিয়া থাকে তাহার নাম দক্ষিণা কালী। ইহার বর্ণনা পাওয়া যায় কালীতন্ত্র নামক মূল তন্ত্রগ্রন্থে (১।২৭—৩৩)। এই বর্ণনা বা ধ্যান পূজায় ব্যবহৃত হয় এবং ইহা সুপরিচিত। এই ধ্যানানুসারে দেবী করালবদনা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালাবিভূষিতা মহামেঘপ্রভা শ্যামা দিগম্বরী ঘোরদংষ্ট্রী পীনোন্নত-পয়োধরা শ্মশানবাসিনী শবরূপী মহাদেবের হৃদয়োপরি অবস্থিতা। তাঁহার বাম দুই করে সত্তচ্ছিন্ন নরমুণ্ড ও খড়্গ—দক্ষিণ দুই করে বরাভয়। কণ্ঠস্থিত মুণ্ড সমূহ হইতে গলিত রক্তে তাঁহার সর্বদেহ চর্চিত। দুইটি শব তাঁহার কর্ণভূষণ—সুতরাং আকৃতি ভয়ানক। শবের কর সমূহ দ্বারা তাঁহার কাঞ্চী রচিত। তাঁহার ওষ্ঠাধরের প্রান্ত ভাগ হইতে রক্তধারা বিগলিত হইতেছে। বালার্কমণ্ডলের মত তাঁহার তিন লোচন। ঘোররাবী শিবা সমূহের দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। মুখ তাঁহার প্রসন্ন পদ্মতুল্য এবং হাস্যপূর্ণ। আশ্চর্যের বিষয়, এই ধ্যানের সঙ্গেও আমাদের কালীমূর্ত্তির পূর্ণ মিল নাই। এই দেবীর নাম দক্ষিণা বা উদারা—কারণ ইনি সাধকের স্বল্প সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন।

তন্ত্রসার ও শ্যামারহস্য গ্রন্থে দেবীর পূজার নানা মন্ত্র ও ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। ধ্যানগুলির মধ্যে বর্ণনীয় দেবতার রূপের পার্থক্য খুব বেশি নাই, শব্দের পার্থক্য অবশ্যই আছে। ধ্যানগুলি কোন কোন মূল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহা সর্বত্র উল্লিখিত হয় নাই। একটি ধ্যান কালীতন্ত্রে আছে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আর দুইটি ধ্যানের আকর যথাক্রমে স্বতন্ত্র তন্ত্র ও সিদ্ধেশ্বরতন্ত্র। তবে এই দুই তন্ত্রের কোনখানিই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্যামারহস্যে উদ্ধৃত একটি ধ্যানে (৬।৫) দেবীকে উপবিষ্টারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—অপর একটি ধ্যানে (১৫।২২) দেবী নরকপালাকল্প রক্তবসনোজ্জ্বলা। একটি ধ্যানে দেবীকে মদ্যপানপ্রমত্তা বলা হইয়াছে। অপর একটি ধ্যানানুসারে দেবী নাগরূপ যজ্ঞোপবীত-ধারিণী। একটি ধ্যানে দেবী কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা এবং ব্যাঘ্রাজিন-সমন্বিতা—দেবীর বাম পদ শবহৃদয়ে এবং দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠে স্থাপিত। একটি ধ্যানে দেবীর মাথায় জটার উল্লেখ করা হইয়াছে।

সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী প্রভৃতি দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা ও পূজা প্রণালী বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। কালীতন্ত্রে (১০।৩৩) সিদ্ধকালীর যে ধ্যান দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে দেবী ত্রিনেত্রা মুক্তকেশী দিগম্বরী—নীলোৎপলবর্ণা দীপ্তজিহ্বা। দেবী আলীঢ়পদা অর্থাৎ তাঁহার বামপদ অগ্রে স্থাপিত। খড়্গদ্বারা বিদারিত চন্দ্রমণ্ডল হইতে ক্ষরিত অমৃতরসে তাঁহার দেহ প্লাবিত। তিনি বামহস্তে স্থিত কপাল হইতে গলিত অমৃত পান করিতেছেন। মণিময় মুকুটাদি অলঙ্কারে তিনি শোভিতা। এই ধ্যান শ্যামারহস্য (৬।১৫) ও তন্ত্রসারেও উল্লিখিত হইয়াছে। সেখানে দেবতার কোনও স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয় নাই।

গুহ্যকালী মহামেঘবর্ণা কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা লোলজিহ্বা ঘোরদংষ্ট্রা কোটরাক্ষী সহাস্যবদনা। নাগময় তাঁহার যজ্ঞোপবীত, নাগময় তাঁহার হার এবং নাগশয্যায় তিনি সমাসীন। তাঁহার মস্তকে আকাশস্পর্শী জটাজাল। তাঁহার গলায় পঞ্চাশ নরমুণ্ডের বনমালা। তাঁহার উদর বিশাল। সহস্র ফণাযুক্ত অনন্ত তাঁহার মস্তকে—তিনি চতুর্দিকে নাগফণার দ্বারা বেষ্টিত। সর্পরাজ তক্ষক তাঁহার বামকঙ্কণ—নাগরাজ অনন্ত তাঁহার দক্ষিণ কঙ্কণ। নাগের দ্বারা তাঁহার মেখলা রচিত। তাঁহার কর্ণে নরদেহ গঠিত কুণ্ডল। পায়ে তাঁহার রত্ননূপুর। বামে শিবস্বরূপ কল্পিত বৎস। দেবী দ্বিভুজা প্রসন্ন-বদনা সৌম্যা অথচ ভীমা অট্টহাস্যকারিণী নবরত্নবিভূষিতা শিবমোহিনী। নারদাদি মুনিগণ তাঁহার সেবা করেন। তন্ত্রসারে ইহার বর্ণনা আছে। ভদ্রকালী ক্ষুধায় কৃশাঙ্গী মুক্তকেশী। তাঁহার চক্ষু কোটরগত, মুখ মসীমলিন, দন্ত জম্বুফল সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ। তিনি এই বলিয়া রোদন করেন 'আমি তৃপ্ত নই—আমি সমগ্র জগৎ এক গ্রাসে ভক্ষণ করিব।' তাঁহার দুই হাতে জলন্ত অগ্নিশিখাতুল্য পাশযুগল। এই দেবীর পূজা করিলে শত্রুবিনাশ হয়। তন্ত্রসারে ইহার কথা আছে।

শ্মশানে নগ্ন অবস্থায় শ্মশানকালীর পূজা করণীয়। গৃহস্থের পক্ষে গৃহেও পূজা করিবার বিধান আছে—কিন্তু সেরূপ ব্যবহার প্রচলিত নাই। সাধারণতঃ নিঃসন্তান বা অপুত্রক ব্যক্তিরাই পূর্বে এই পূজা করিতেন। দেবী অঞ্জনাদ্রিতুল্য ঘনকৃষ্ণবর্ণা শ্মশানবাসিনী রক্তনেত্রা মুক্তকেশী শুষ্কমাংসা অতিভীষণা পিঙ্গাক্ষী। দেবীর বামহস্তে মদ্যপূর্ণ মাংসযুক্ত পাত্র—দক্ষিণহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড। দেবী স্মিতবদনা—সর্বদা আমমাংস চর্বণে তৎপরা। তিনি নানালঙ্কারভূষিতা নগ্না এবং সর্বদা আসবমত্তা। তন্ত্রসার ও শ্যামারহস্যে (৬।২১-২২) ইহার বিবরণ আছে।

রক্ষাকালীর নাম তন্ত্রসারে নাই। তবে যে ধ্যানে তাঁহার পূজা হয় তাহা তন্ত্রসারে উল্লিখিত হইয়াছে। দেবী চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা বিভূষিতা। দেবীর দক্ষিণ দুই হস্তে খড়্গ ও পদ্ম যুগল—বাম দুই হস্তে কর্ত্রিকা ও খর্পর। দেবীর মস্তকে দুইটি জটা—একটি গগনস্পর্শী। ইহার মস্তকে ও গ্রীবায় মুণ্ডমালা। ইহার বক্ষে নাগহার—লোচন রক্তবর্ণ। দেবীর কটিতে কৃষ্ণবস্ত্র—তিনি ব্যাঘ্রাজিন-সমন্বিতা। তিনি বামপাদ শবহৃদয়ে সংস্থাপন করিয়া দক্ষিণপাদ সিংহপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন। দেবী মদ্যপানরতা অট্টহাস্যযুক্তা ভীষণাকৃতি। তিনি ঘোর গর্জন করিয়া থাকেন।

দেবীর চামুণ্ডারূপের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। দুর্গাপূজায় সন্ধিপূজার সময় ইহার পূজা করা হয়।

দেবীর এই বিভিন্ন রূপের পূজার মধ্যে খুঁটিনাটি নানা পার্থক্য আছে। প্রত্যেক রূপের পূজার মন্ত্র আলাদা। যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন সাধারণতঃ সেই মন্ত্রানুসারে তাঁহার নির্দিষ্ট রূপের পূজা করার কথা—বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অন্য রূপের পূজাও

কখনও কখনও চলিতে পারে। পূর্বে অনেক ক্ষেত্রে পূজা উপলক্ষে প্রচুর আড়ম্বর ও অর্থব্যয় হইত। কালীর প্রীতিসম্পাদনের জন্ম অনেক পশুবলি দেওয়া হইত—মাঝে মাঝে নরবলিও হইত, এরূপ শুনা যায়। কালীঘাটে কালীর সম্মুখে একজন নিজের জিহ্বা বলি দিয়াছিল—এই সংবাদ ১৮২৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের সমাচার-দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকায় ১৮২২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় কালীঘাটের কালী মাতার এক আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়বহুল পূজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজ গোপীমোহন ঠাকুর বহু স্বর্ণালঙ্কার ও বিবিধ উপকরণের সাহায্যে এই পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব দেবীকে স্বর্ণের মুণ্ডমালা দিয়াছিলেন। ওয়ার্ডের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ হইতে জানা যায় নবকৃষ্ণ কালীঘাটের কালীমন্দিরে পূজোপলক্ষে একবার লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন আর খিদিরপুরের জয়নারায়ণ ঘোষাল ব্যয় করিয়াছিলেন পঁচিশ হাজার টাকা। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র রায় দীপান্বিতা কালীপূজা উপলক্ষে কখনও কখনও হাজার হাজার মণ মিষ্ট, হাজার হাজার সাড়ী ও অন্যান্য দ্রব্য উৎসর্গ করিতেন। ইহা ছাড়া, অন্যান্য খরচ বাবদেও তাঁহার প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র দীপান্বিতা কালীপূজা প্রচারের জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র হুকুম দিয়াছিলেন—তাঁহার প্রত্যেক প্রজাকে এই পূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অন্যথা গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। এই নির্দেশের ফলে নদীয়া জেলায় প্রতি বৎসর দেওয়ালী উপলক্ষে দশ হাজার কালী পূজা হইত। মনে হয় দীপান্বিতা কালীপূজার প্রচলন সে সময় তেমন ছিল না। তাই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এই চেষ্টা। কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ১৭৭৭ সালে রচিত তাঁহার শ্যামাসপর্য্যাবিধি গ্রন্থে যে ভাবে নানা প্রমাণ সহযোগে কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজার অবশ্যকর্তব্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তিনিও বহুপ্রচলিত এই উৎসবের প্রচার কামনায় ইহার গৌরব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার প্রাচীনতা যাহাই হউক না কেন, দীপান্বিতা কালীপূজা আজ বাংলা দেশে একটা মস্ত বড় উৎসবে পরিণত হইয়াছে—বাংলার বাইরের দেওয়ালী ও বাংলার কালীপূজা এই দুইয়ের সমন্বয়ে এই উৎসব পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। রটন্তী চতুর্দশীর পূজার উল্লেখ প্রাচীনতর গ্রন্থে আছে সত্য কিন্তু বর্তমানে ইহার তেমন প্রচলন নাই। পূজার প্রচলন যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে কালীপূজার সে গাম্ভীর্য নাই—ইহা একটা হালকা উৎসবে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে কালীপূজা লোকের মনে যে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করিত—এই পূজার অনুষ্ঠান অতি কঠিন বলিয়া লোকের মনে যে ধারণা ছিল—ইহার অনুষ্ঠানে যে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বিত হইত—ইহার মধ্যে যে গভীর সাধন রহস্য নিহিত রহিয়াছে—এখন তাহা বুঝা বা বুঝান দুঃসাধ্য ব্যাপার!

পক্ষান্তরে, কালীপূজার অঙ্গ হিসাবে আমরা যে সকল আপাতত বীভৎস আচার অনুষ্ঠানের কথা শুনিতে পাই ও শুনিয়া আতঙ্কিত হই, সেগুলি অবাস্তব না হইলেও পূজার মুখ্য বা অপরিহার্য অঙ্গ নহে—সেগুলি ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সত্য বটে, অশাস্ত্রীয় বিকৃত আচরণ অনেক স্থলে পূজানুষ্ঠানকে কলুষিত ও ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছে। তবে একটু অনুসন্ধান করিলেই ইহার অন্তরালে যে মহনীয়তা বর্তমান রহিয়াছে তাহা ধরা পড়িবে।

শ্রীশ্রীকালী

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি; যখন তিনি এই সব কার্য করেন—তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নামরূপ ভেদ। ···তিনি নানা ভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার—তখন কেবল মা—নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী; গৃহস্থ-বাড়ীতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব-শিবা ডাকিনী-যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন।···সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরিমল গোস্বামী

তৃতীয় পর্ব

৩

নটীর পূজার কথা বলছিলাম। আগাগোড়া দাঁড়িয়ে দেখলাম নাটকটি—৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়িতে। দর্শকের ভিড়ে কোথায়ও এক ইঞ্চি স্থান শূন্য নেই। কিন্তু যতক্ষণ অভিনয় হল—একটি কথা ছিল না কারো মুখে।

নটীর পূজা নাটক আমার আগে পড়া ছিল না, তাই মনোযোগ ঘনীভূত ক'রে প্রত্যেকটি কথা এবং ঘটনা অনুসরণ ক'রে চলছিলাম।

এ নাটকের স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত ও প্রযোজিত দুটি মাত্র নাটক এর আগে দেখেছি—ঋণশোধ আর বিসর্জন। সে দুটিই সাধারণ নাটকের কাঠামো। নটীর পূজা তা থেকে স্বতন্ত্র। সবই নারী চরিত্র, সেও অভিনব নয়। ক্ষণকালের জন্য রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও এ নাটকের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত নয়। এর বিস্ময়কর অংশ হচ্ছে ওর শেষ দৃশ্য। শ্রীমতীর নৃত্যটাকেই নাটকের ক্লাইম্যাক্স বানানোর মধ্যে যে অনন্যসাধারণ অভিনবত্ব আছে তা আমাকে স্তম্ভিত করেছিল বলা যায়। একটি নৃত্য যে এমন অপরূপ সম্পূর্ণ দৃশ্য হতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। এর সার্থকতা আগে উপলব্ধি করতে পারিনি। ভয় হয়েছিল নাটক দুর্বল হয়ে পড়বে, মনে রেখাপাত করবে না, কিন্তু আমার সকল অনুমানকে পরাভূত ক'রে 'আমায় ক্ষম হে ক্ষম' গানের সঙ্গে শ্রীমতীর নৃত্যদৃশ্য এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল রচনা করল আমার সম্মুখে।

এমন মন পবিত্র করা একটি দৃশ্য মঞ্চে দেখা যায় না। একটি মাত্র নাচ ও একটি মাত্র গান—এই দুইয়ে মিলে যে সম্পূর্ণ দৃশ্যটি রচিত হয়েছিল তা কত বড় এবং কত গভীর মনে হয়েছিল তখন। আজও তা মনে হলে রোমাঞ্চ জাগে। ট্র্যাজেডির এই অকল্পিতপূর্ব রূপটি আমার মনকে উদ্বেলিত ক'রে তুলেছিল সেদিন। এমন গভীর বেদনা যে এমন গভীর আনন্দ দিতে পারে, তার উপলব্ধি এই আমার প্রথম।

মনের মধ্যে এর রেশ নিয়ে ফিরলাম। সব যেন স্বপ্নবৎ মনে হতে লাগল। বহুদিন মন থেকে এ দৃশ্যটি সরাতে পারিনি।

তারপর ধীরে ধীরে একটা কথা মনের মধ্যে জেগে উঠল। কথাটি এই যে আর্ট যখন সত্য হয় তখন তার ভিতর দিয়ে শিল্পী নিজেকেই দান করেন। শিল্পীর মনে আত্মনিবেদনের যে প্রেরণা থাকে সেই প্রেরণায়, লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেই, শিল্পের উদ্দেশ্য সার্থক হয়, সিদ্ধ হয়। শিল্পের সকল রঙের বা ছন্দোঝংকারের আবরণ এক এক ক'রে খুলে ফেলতে পারলে দেখা যেত তারও অন্তরে শ্রীমতীর মতোই ঐ একই গৈরিক বাস। সেটি ঢাকা থাকে কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে তার পরিচয় ফুটে ওঠে, তার স্পর্শ এসে মনে লাগে।

"আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে।"

শ্রীমতীকে তাই আমার সকল বড় শিল্পীর প্রতীক ব'লে মনে হয়েছিল। এ ধারণা আমার অদ্যাবধি নষ্ট হয়নি। বরঞ্চ এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে যে শিল্পীর পক্ষে শিল্পই তার শ্রেষ্ঠ পূজা। এ শুধু নটীর একার পূজা নয়। নটী শুধু তার ব্যাখ্যা ক'রে গেল। পূজার জন্যই সে নাচে নি, নাচই তার পূজা হয়ে উঠল, কেননা শিল্পীরূপে সে তার সেই নাচের ভিতর নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল।

এর পরবর্তী সময় থেকে আবার নানা পরীক্ষার পথে চলেছি। দু'তিনটি বছর কেটে গেল প্রায় নিষ্ফল ভাবেই এবং এই সময়ের মধ্যে যে সব কাজ করেছি তা উল্লেখযোগ্য নয়। তার মধ্যে ফোটোগ্রাফি ছিল, বীমা অফিসের প্রচারকের কাজ ছিল। বলাইচাঁদ এই সময় কলকাতা চলে আসে ডাক্তার চারুব্রত রায়ের কাছ থেকে ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিসের আঙ্গিকগুলো জেনে নিতে। সুতরাং আরও একবার তার সঙ্গে মিলতে পেয়ে খুব ভাল লাগল। আমি তখন (১৯২৮ ডিসেম্বর) হ্যারিসন রোডের ষ্টুডিওর বাড়িতে থাকি। বলাই ইণ্টারন্যাশনাল বোর্ডিং থেকে আমার সঙ্গে চলল রাত্রিটা আমার সঙ্গে কাটাবে ব'লে। জ্ঞানরঞ্জন রাউত রায় রাত্রি ১১টার সময় আমাদের দু'জনকে একত্র বসিয়ে একখানা ফোটোগ্রাফ তুলে দিল, সেখানা আজও আছে। এর আগে ১৯২৫ সালে

বলাই আমি সমরেশ ভট্টাচার্য ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (বলাইয়ের ভাই) ও শৈলেন সান্যাল—পথে ঘুরতে ঘুরতে খেয়াল হল একত্র ফোটো তোলালে মন্দ হয় না। তখনই চারু গুহের ষ্টুডিওতে ঢুকে পড়লাম। অনেক মধুর স্মৃতি বিজড়িত বলেই ছবি দু খানার কথা না লিখে পারা গেল না। দু খানা ছবিই আমার সামনে রয়েছে আজও।

বলছিলাম ১৯২৮ সালের কথা। হ্যারিসন রোড ধ'রে চলতে চলতে সেদিন সেই রাত্রি প্রায় এগারোটায় বলাইয়ের মাথায় কিছু পাগলামি জাগল। তার পায়ে সদ্য কেনা এক জোড়া উৎকৃষ্ট জুতো ছিল, চট ক'রে জুতো জোড়া খুলে ফেলে একটা দোকানের দরজায় খাড়া ক'রে রাখল এবং বলল, দেখা যাক চুরি হয় কি না। আমি বললাম, চুরি তো হবেই। বলাই বলল, তবু দেখা যাক, সকালে উঠে এসে দেখব কি হয়েছে।

সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল। খালি পায়ে সেখানে এসে, যা ঘটবে ভাবা গিয়েছিল, তাই ঘটেছে দেখা গেল। জুতো যে চুরি হবেই এটি এত কষ্ট ক'রে পরীক্ষা করার খুব যে প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল তা আমার মনে হয় না, কিন্তু বলাইয়ের এইটি হচ্ছে চরিত্র।

এই সময় রাজবাড়ি থেকে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হত, তার নাম এখন আর মনে নেই। রাজবাড়ি হচ্ছে গোয়ালন্দ মহকুমার প্রধান শহর, এ জায়গার কথা আগে বলেছি। দুটি হাই স্কুল এবং আদালত ইত্যাদিতে মিলে জায়গাটি বেশ বড় ছিল।

রাজবাড়ির এই সাপ্তাহিক কাগজে একদিন একটি প্রবন্ধ দেখি—প্রবন্ধ লেখক রামচরণ মৈত্র এম-এ। তিনি এই প্রবন্ধে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে বলেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে কোনো এক প্রখ্যাত ব্যক্তি একটি মেয়েকে সিগারেট খেতে দেখেছেন। লেখক আমার পরিচিত ছিলেন, এখন তিনি কি অবস্থায় কোথায় আছেন জানি না।

তাঁর প্রবন্ধে যুক্তিতে যে ভুল ছিল আমি শুধু সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম পাল্টা এক প্রবন্ধ লিখে। তার পর থেকে আমাদের বাদ প্রতিবাদ প্রতি সপ্তাহে চলতে থাকে প্রায় ছ মাস ধ'রে।

আমি বলেছিলাম, শিক্ষার সঙ্গে সিগারেট খাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার, কারো সামর্থ্যে এবং প্রবৃত্তিতে যদি না আটকায়, তবে তার সেই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে এ রকম আলোচনা সঙ্গত নয়।

বলা বাহুল্য, এর প্রতিবাদে ভারতীয় আদর্শের দোহাই দিয়ে আরও খারাপ কথা শুনতে হল, শিক্ষিতা মেয়েদের সম্পর্কে। অতঃপর আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ভারতীয় আদর্শের কথা না তোলাই ভাল, কেন না প্রাচীন ভারতে মেয়েদের তৎকালোপযোগী যে সব ব্যবহার অনুমোদিত ছিল, তাই বরং বর্তমানের চোখে বেশি খারাপ লাগা উচিত। আমার এ সব কথা প্রমাণের জন্য প্রাচীন সমাজের কথা অনেক পড়তে হয়েছিল তখন। আমার বক্তব্য ছিল, সমাজ এক একটা যুগে এক একটা চেহারা পায়,—তা অনিবার্য পরিবর্তনেরই ফল, ইচ্ছে করলেই সময়ের কাঁটাটা ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। এই জাতীয় সব তত্ত্ব কথার অবতারণা করেছিলাম। তখন বয়স ছিল কম, তর্কের প্রবৃত্তি ছিল উগ্র, তাই হয়তো তর্কের ঝোঁকে মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে থাকব। তর্কের খাতিরেই তর্ক করতে গেলে যা হয়। যাই হোক, এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, আমাদের বাদ-প্রতিবাদ দিয়েই সেই ছোট কাগজখানা চলছিল তখন। তার পর মাস ছয়েক পরে যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন কাগজও উঠে গেল।

১৯৩০ খৃ কাছাকাছি সময়ে ফরাসী ভাষা শেখার জন্য প্রাথমিক বই কিছু কিনলাম।—এর ফল শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল, তা প্রকাশ ক'রে বলবার মতো নয়, কিন্তু ফরাসী ভাষা শেখার ইচ্ছেটা হয়েছিল কেন সেটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমি যখন ছোট, সে সময় রতনদিয়ায় এলে শশীভূষণ চক্রবর্তী নামক এক ভদ্রলোক বাবার কাছে আসতেন প্রতিদিন। তাঁর মাথাটি ছিল বড়, চোখ দুটিও বেশ বড়, খাটো ক'রে ছাঁটা চুল, মুখে একটা দৃঢ়তার ছাপ। সব সময়েই তাঁর হাতে একখানা "বেঙ্গলী" কাগজ থাকত।

তাঁর পরিচয়—তিনি চন্দনা নদীর ওপারে অবস্থিত হাটগ্রাম নামক গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলের পণ্ডিত। বাবার কাছে শুনেছিলাম, তিনি ইংরেজী খবরের কাগজ পড়ে পড়ে ইংরেজী শিখছেন। শুনে অবাক হয়েছিলাম। ঘটনাটি মনের উপর এমন একটি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, সম্ভবত এই কারণেই আমি স্কুলে পড়তে পড়তে লণ্ডনের 'দি বয়েস ওন পেপার' ও পরে কলকাতার দ্বি সাপ্তাহিক 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস'-এর গ্রাহক হয়েছিলাম। যাই হোক কয়েক বছর পরে শুনতে পেলাম শশীভূষণ চক্রবর্তী পাঠশালার পণ্ডিতি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে গেছেন।

আমি যখন বি-এ পড়ি তখন থেকে আবার তাঁকে মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসতে দেখতাম। শুনলাম তিনি ইংরেজীতে পাকা পণ্ডিত হয়েছেন এবং কলকাতায় এসে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছেন। আরও শুনে স্তম্ভিত হলাম তিনি কলকাতায় বি-এ ছাত্রকে প্রাইভেট পড়ান এবং কলকাতায় টিউশন ক'রে বেশ উপার্জন করেন।

খুবই আশ্চর্যজনক বোধ হল। গ্রাম্য ছাত্রবৃত্তি স্কুলের পণ্ডিত, আপন গরজে অন্যের সাহায্য না নিয়ে ইংরেজী ভাষা ভাল ভাবে আয়ত্ত করেছেন, এ কেমন ক'রে ঘটল ভেবে কূলকিনারা পেলাম না। শুধু তাই নয়, আরও চার পাঁচ বছর পরে তাঁর কাছে শুনে স্তম্ভিত হলাম তিনি ফরাসী ভাষাও নিজের চেষ্টায় খুব ভাল ভাবে আয়ত্ত করে ফেলেছেন।

বাড়ি ছিল তাঁর রতনদিয়া থেকে কিছু দূরে একটি গ্রামে। এক-দিন অন্য কোথায়ও যাবার পথে পিঠে এক বোঝা নিয়ে এসে উঠলেন আমাদের বাড়িতে। চটের থলে একটি—প্রায়

নটীর পূজা

আধমণ ভারি হবে। থলে থেকে সব বিড়ালই বেরিয়ে পড়ল একে একে—সবই ফরাসী বই।

তিনি এখন ফরাসী ভাষায় লেখা যে-কোনো বই অতি সহজে বুঝতে পারেন।

আমি প্রশ্ন করলাম উচ্চারণ শিখলেন কি ক'রে?

আমার উপর তিনি চটে গেলেন এ কথা শুনে। বললেন উচ্চারণে আমার দরকার কি? আমি কি ফরাসী দেশে যাচ্ছি, না ফরাসীদের সঙ্গে আলাপ করছি? উচ্চারণ শিখে টিউটর রেখে কি এ ভাষা শেখা আমার পোষাত? কিন্তু আমি ঠকিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী সাহিত্য দর্শন পড়া, সে উদ্দেশ্য আমার সফল হয়েছে—আমি ওদের সব বই এখন পরিষ্কার, বুঝতে পারি। তুইও শিখে ফেল ফরাসী ভাষা।

আমি বললাম আমি যদি কখনো শিখি তবে খাঁটি ফরাসী উচ্চারণ শিখে নেব আগে। এ কথাটা বললাম কারণ উচ্চারণ না শিখে ভাষা শেখার বিরোধী ছিলেন বাবা। তিনি বহু সাধনা ক'রে পারসীক ভাষা উচ্চারণ সমেত শিখেছিলেন এবং ইংরেজী পড়তেন এবং বলতেন বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণে। তাই উচ্চারণ বাদ দিয়ে ভাষা শেখার কল্পনা আমি করতে পারিনি।

শশীভূষণ বললেন, সে আশায় ব'সে থাকলে তোর কোনো দিনই শেখা হবে না।

আমার সম্পর্কে তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। যে দিন অবসর আছে মনে ক'রে বই কিনে পড়তে আরম্ভ করলাম, সেদিন দেখি শিক্ষক ভিন্ন উচ্চারণ শেখা প্রায় অসম্ভব। আর তখন শিক্ষক রেখে ভাষা শেখায় গরজও ছিল না। উপরের কোনো চাপ বা বাধ্য বাধকতা না থাকা সত্ত্বেও যাঁরা বিদেশী ভাষা আপন গরজে শিখতে উৎসাহিত হন, তাঁদের মতো মনের জোর তখন আমি খুঁজে পাইনি। আজও আমি সেই সৌম্যদর্শন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শশীভূষণ চক্রবর্তীর মূর্তিটি বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এক অখ্যাত পল্লীর এক ছাত্র-বৃত্তি স্কুলের পণ্ডিতের এই বিবর্তন সামান্য ঘটনা নয়।

গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছি ১৯৩০ থেকে। সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি থেকে প্রকাশিত বঙ্গলক্ষ্মীর সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর। সম্পাদনার কাজ দেখাশোনা করতেন কবি রাধাচরণ চক্রবর্তী। তিনি আমার লেখা খুব পছন্দ করতেন এবং তাঁরই অনুরোধে সেখানে অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখি। বঙ্গলক্ষ্মী কাগজ তখন বেশ পুষ্ট ছিল, প্রচারও ছিল ভাল। এই কাগজে 'ধর্ম গেল' 'ষত্বে রূপং', 'স্ত্রী শিক্ষার আদর্শ' 'রবীন্দ্র শিল্প' প্রভৃতি রচনা ছাপা হয়। এর অধিকাংশই রাজবাড়ির সেই সাপ্তাহিক কাগজের স্তম্ভের পরবর্তী অধ্যায়। সে কাগজে যা ছিল উত্তেজনাপূর্ণ, তা এসব রচনায় অনেকটা সংযত হয়ে এসেছে। সর্দা বিল উপলক্ষে যখন ভীষণ আন্দোলন চলেছিল তারও কিছু ছাপা পড়েছিল মনে। একটুখানি উদ্ধৃত করি ধর্ম গেল প্রবন্ধ থেকে—

'সকলেরই ভয় ধর্ম গেল। সতীদাহ নিবারণের সময় চিৎকার উঠিয়াছিল ধর্ম গেল। বিধবাবিবাহ প্রচারের সময় চিৎকার উঠিয়াছিল ধর্ম গেল। তারপর কত বৎসর অতীত হইল, আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও শিশুবিবাহ নিবারণ উপলক্ষে সেই একই চিৎকার শোনা যাইতেছে—ধর্ম গেল।

"সতীদাহ নিবারণে, বহুবিবাহ নিবারণে, বিধবাবিবাহ প্রচলনে অথবা শিশুবিবাহ উচ্ছেদে ধর্ম যায় কেন এবং ইহার বিপরীত হইলেই ধর্ম থাকে কেন, তাহা বুঝিয়া দেখা দরকার। আমরা যাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া মান্য করি, তাঁহাদের মতে যাহা স্ত্রীজাতির উন্নতি বিধায়ক দেখা যাইতেছে তাহাই আমাদের ধর্মনাশক।"

সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধের এটি আরম্ভ মাত্র। এই ছিল সাতাশ বছর আগের আমার লিখন-ভঙ্গি। আক্রমণাত্মক ভাবের কিছু কিছু আভাস এ প্রবন্ধেও আছে, রাজবাড়ি-কাগজের সেই লেখার ফলেই সন্দেহ নেই।

আমার বাবার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। ম্যালেরিয়ার মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও তাঁকে ম্যালেরিয়ায় ভুগতে দেখিনি এক দিনও। দৃষ্টি-শক্তিও অটুট ছিল, কখনো চশমা পরতে হয় নি। চীনেবাড়ির কালো চটের, স্প্রিং-সংযুক্ত জুতো পাওয়া যেত আগে, দাম সম্ভবত দেড় টাকা, তাই তাঁকে পরতে দেখেছি বরাবর। শীতকালে উলের বা ফ্ল্যানেলের কোনো কিছুই পরতে দেখিনি, অথচ সর্দি-কাসি হয়নি কখনো।

তাঁর অসুখ হল ৬০ বছর বয়সে এবং সেই শেষ অসুখ। ১৩৩৮ (১৯৩১) জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আমাদের পরিবারে এই প্রথম মৃত্যু নিজ-চোখে দেখলাম। মৃত্যু সংবাদে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে আমাকে লিখলেন—

কল্যাণীয়েষু

তোমার পিতার মৃত্যু-সংবাদে দুঃখিত হইলাম। একদা তিনি আমার সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার রচনানৈপুণ্যে আমি বিস্ময়-বোধ করিয়াছি। সাধারণের কাছে তাঁহার লেখার যথেষ্ট প্রচার হয় নাই, তিনি জনতা হইতে দূরে ছিলেন—আশা করি তাঁহার কীর্তি সাহিত্যক্ষেত্রে অগোচরে থাকিবে না।

তোমাদের জন্য আমি সান্ত্বনা ও কল্যাণ-কামনা করি। ইতি ৫ আষাঢ় ১৩৩৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাল্যকাল থেকে পিতৃস্নেহে বেশি পুষ্ট ছিলাম। আমার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি, অতএব তাঁর মতো সহৃদয় এবং শুভার্থী আমার জীবনে আর কেউ ছিলেন বলে আমি জানতাম না।

রবীন্দ্রনাথ বাবার মৃত্যুতে আমাদের জন্য সান্ত্বনা কামনা করেছিলেন এটি বড় কথা। কিন্তু তাঁর অপেক্ষিত মৃত্যু সম্পর্কে আমি আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমি জানতাম এই মৃত্যুজনিত আঘাত আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করবে, তাই কিছুদিন ধ'রে মৃত্যু কি এই কথাটি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। মৃত্যুর স্বরূপ কি, মৃত্যু কেন, প্রভৃতি অনেক কথা মনে আসছিল। মৃত্যুর স্বরূপটি মনের মধ্যে স্পষ্ট ক'রে তুলছিলাম।

মৃত্যু কি, এ প্রশ্ন এর ঠিক দশ বছর আগে একবার আমাকে বিচলিত করেছিল। শান্তিনিকেতনের যুগে একখানা খাতায় এ সম্পর্কে গোটাকত প্রশ্ন লিখেছিলাম, অনেকটা খসড়া আলোচনার আকারে। ভেবেছিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি।

আমার মনে যে সব যুক্তি দেখা দিয়েছিল তা প্রাথমিক

একককোষ-প্রাণীর স্বরূপ জানার পরের ধাপ থেকে এগিয়ে গেছে। একটি অ্যামিবা নামক একককোষ আদিম প্রাণীর মৃত্যু হয় না—তার জীবনের পরিণতি ঘটলে সে নিজেকে দুভাগে ভাগ ক'রে আবার নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করে। এ বিস্ময় আমার মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল। আমার মনে হল তা হলে মানুষেরও মৃত্যু নেই। অ্যামিবার জীবন সরল তাই ওর 'জন্ম' আর 'মৃত্যু' দুটোই খুব সরল। আসলে নতুন জন্মও নয়, মৃত্যুও নয়, একই প্রাণী পুরনো হলেই নিজেকে ভাগ ক'রে নতুন হচ্ছে। মানুষের দেহ জটিল ব'লে তার জন্মের জন্য দুটি প্রাণীর মিলন এবং তার পরিণতির জন্য দুটি দেহকে শ্মশানে যেতে হচ্ছে। ওটা তার আপাত-মৃত্যু। সে মরেনি, সে আপন উত্তর পুরুষের মধ্যে নিজেকে ভাগ ক'রে বেঁচে রইল। অ্যামিবা নামক প্রাণীতে প্রাণধারা যে রীতিতে চলছে মানুষের বেলায় সে রীতিটি যাবে কোথায়? এই যে নিজেকে ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে বিলীন করা এই রীতি শুধু অ্যামিবার বেলায় খাটবে অন্য প্রাণীর বেলায় খাটবে না এটি মন মানতে চাইল না। আমার দৃঢ় ধারণা হল মানুষের বেলাতেও ঠিক ঐ একই ব্যাপার ঘটছে, শুধু তার দেহ অত্যন্ত জটিল ব'লে পাঁচ জনের সামনে ফস্ ক'রে নিজেকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারে না, সেই জন্যই তার ক্ষেত্রে জীর্ণ দেহের 'মৃত্যু' ঘটাতে হচ্ছে। একটি খোলস যেন খুলে পড়ে গেল। কিন্তু তাতে তার সত্তার কোনো ক্ষতি হল না, কেননা সে তার উত্তর পুরুষের মধ্যে বেঁচে রইল। অ্যামিবার সরল দেহ, তাই তার আর খোলস নিক্ষেপের দরকার হয় না। মানুষের দেহ জটিল তাই তার জীবনের ছন্দে জন্ম ও মৃত্যু নামক দুটি কৌশল সৃষ্টি করতে হয়েছে, যাতে ছন্দের গতি বাধা না পায়। কোনো এক ব্যক্তি উত্তর পুরুষ বিবর্জিত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে সমগ্র মানবতার কিছু ক্ষতি হয় না। হাজার বছর আগে যে পাখী উড়েছে বাংলার আকাশে, আজও সেই পাখীই উড়ছে। হাজার বছর আগে যে মানুষ সেই পাখীর ডাক শুনেছে, আজও সেই মানুষই সেই পাখীর ডাক শুনছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফাল্গুনী নাটকে যে কথাটি বলেছিলেন তারও অর্থ যেন আমার পাওয়া জীবন মৃত্যুর অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গেল।

"বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম
বারে বারে
ভেবেছিলাম ফিরব না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।"

যুক্তিশাস্ত্র অনুযায়ী ভাবতে গেলেই এ কথাটা আমার মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মানুষের বা মনুষ্যের কোনো প্রাণীরই মৃত্যু হয় না, ও কেবল বোঝার ভুল। জীবদেহের আবির্ভাব ও তিরোধান একটি চাকার পাক মাত্র, এই চক্র তাকে ঘুরতেই হবে, এবং ঘোরা শেষ হলে দেখা যাবে, সেই ব্যক্তিদেহটি আর নেই, তার স্থানে নবীনের আবির্ভাব ঘটেছে। নবীন বেশে যে আসে তার আবর্তন শেষ ক'রে সে চলে যায়, যাবার সময় আর এক নবীনকে সে রেখে যায়।

যুক্তির পথে এই ছবিটিই মাত্র দেখা যায়—অবশ্য যুক্তির বাইরে বিরাট এক অন্ধকার জগৎ, সেখানে প্রবেশ করি এমন সাধ্য আমার নেই। তাই কোন্‌টা যে সত্য তা নিঃশেষে জানবার উপায় নেই। তবু নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যই নিজের বুদ্ধিতে একটা কিছু ধারণা ক'রে নিতে হয়েছিল। এটি হয় তো একমাত্র আমারই সত্য, তবু আমার পক্ষে যুক্তিপথে যেটুকু যেতে পারি তার বেশি যেতে মন সরে না। তাই আমি আজও বিশ্বাস করি মৃত্যুর পর তার আত্মা বা প্রেতদেহ নামক কোনো বস্তু দেহের বাইরে বেরিয়ে যায় না, কেন না ও রকম কোনো বস্তুই নেই।

জীবনমৃত্যুর এই রূপটি আরও স্পষ্ট ক'রে ভেবে দেখার জন্য চার বছর আগে (১৯৫৩) মাসিক বসুমতীতে আমি একটি বড় প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধটির নাম "জাগিল কি ঘুমালো সে।" (পরে এটি আমার 'ম্যাজিক লণ্ঠন' নামক বইতে সংকলিত হয়েছে।)

মনকে এই যুক্তিতে চালিত ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু সম্পর্কে আমার ধারণা আমার মনে এমনই দৃঢ় হয়ে উঠল যে চরম মুহূর্তে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হইনি। মনে হয়েছিল, একটা চিরকালের সত্য, যা অমোঘ, যা অন্যায় নয়, যা আমাদের কল্যাণের জন্যই ব্যবস্থিত, তার জন্য দুঃখ করব কেন। মনকে স্থির রাখবার এই মন্ত্র, এটি বার বার জপ করতে হয়, নইলে মন হঠাৎ ভেঙে পড়তে পারে। যেমন হয়েছিল আমার ১৯৪১ সালে। তখন আমি শয্যাশায়ী, কারবাংকল-এর ব্যথায় ম্রিয়মাণ, এমন সময় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হল। গুরুতর পীড়ার সংবাদ জেনেও মনকে তৈরি করতে পারিনি, তার জন্য বেগ পেতে হয়েছিল। ওঠবার ক্ষমতা নেই, রেডিওতে শুনছি, আর দুচোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

অপ্রস্তুত থাকলে প্রিয়জনের মৃত্যুতে আঘাত লাগে। মন আবেগে ভেঙে পড়ে, নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়।

আমার পিতার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারে দ্বিতীয় মৃত্যু ঘটল ১৯৫৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর। আমার স্ত্রীর মৃত্যু। এর জন্য পূর্ব প্রস্তুতি চলছিল। অনেকদিন পরে আবার একবার এই মৃত্যুতে বিশ্বের অমোঘ বিধানের পটভূমিতে অবিরাম মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হল। পরিণাম অপেক্ষিত ছিল। পূর্ব থেকেই, মৃত্যু ঘটে গেছে ধ'রে নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম। মন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তবু তার কাছে আমার উপলব্ধিকে ব্যর্থ হতে দিইনি।

পৃথিবীর সর্বত্র ঠিক এমনি বিচ্ছেদ ঘটছে প্রতি সেকেণ্ডে। সবার ক্ষেত্রেই ঐ একই ইতিহাস,

পাগলা মেহের আলির ভূমিকায় নো বলতে হবে, তফাৎ যাও, তফাৎ যাও—

বহু স্মৃতি পিছনে ফেলে, বহু আশা অপূর্ণ রেখে, প্রতি মুহূর্তে কত লোক যে ছেড়ে যাচ্ছে এ সংসার। সবার মৃত্যু থেকে আমার প্রিয়জনের মৃত্যুকে পৃথক ক'রে না দেখে সবার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি সমস্ত আবেগকে চেপে রেখে। রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করেছি, বহু মৃত্যুর অপরিসীম বেদনার মধ্যে দিয়ে তিনি স্থির ভাবে এগিয়ে গেছেন। তাঁর কথা স্মরণ করে জোর পেয়েছি তাঁর বাণী আমার মনে বল সঞ্চার করেছে।

প্রিয়বস্তুকে প্রতিদিন আমরা হারাতে হারাতে চলেছি—সর্বত্রই তার একই চেহারা। এর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হওয়া বৃথা। এই মৃত্যুর বিরাট পটে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি আমার জীবনের হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলি। স্মৃতিচিত্রণ লিখতে লিখতে কতবার মনের উপর থেকে বয়সের ভারী বোঝাটা কখন সরে গেছে, আমি আজকের হেমন্তকালের সোনালি রোদের মতোই উদাস করা রোদে পদ্মার তীরে তীরে ঘুরে বেড়িয়েছি। তারপর হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেছে, বাস্তবে ফিরে এসেছি, বেদনায় মন ভারী হয়ে উঠেছে।

কোথায় আমার সেই কৈশোর? কোথায় আমার সেই বালক আমি? সে তো আমার পৃথক একটি সত্তা, আমার জীবনের সকল মাধুর্য তাকে ঘিরে পুষ্ট হয়েছিল, অথচ তাকে এ জীবনের মতো হারিয়েছি। সেই তো আমার জীবনে সবচেয়ে মধুর এবং প্রিয় ছিল, অথচ তাকে আর ফিরে পাব না। কল্পনায় মাঝে মাঝে সে বয়সে ফিরে যাব, তার সমস্ত স্বাদ গন্ধ সমস্ত মনে প্রাণে অনুভব করব, কিন্তু কখনো আর সেই আমিকে ছুঁতে পাব না।

এও প্রিয়জনের মৃত্যু। জীবনে বার বার এ মৃত্যু ঘটেছে এবং প্রতি মুহূর্তে ঘটছে। এ মৃত্যুকেও সাধারণ মৃত্যুর সঙ্গে আমি এক করে দেখছি। সব মৃত্যুর জন্যই দুঃখ হয়, কারণ সেটি সেন্টিমেন্টের ব্যাপার, এবং সেন্টিমেন্ট মনের একটি বিশিষ্ট গুণ; কিন্তু তবু মনকে ব্যক্তিগত মৃত্যু-দুঃখ থেকে সরিয়ে তার সম্মুখে বিশ্ববিধানের স্বরূপটি মেলে ধরতে পারলে মৃত্যু-দুঃখ ব্যাপ্তির মধ্যে আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে যায়। যখনই মন দুঃখ বেদনায় ভেঙে পড়তে চাইবে, তখনই পাগলা মেহের আলির ভূমিকায় নেমে 'তফাৎ যাও' 'তফাৎ যাও' বলে চিৎকার করতে হবে। বলতে হবে "সব ঝুট হ্যায়—সব ঝুট হ্যায়।" এটি মনের একটি ব্যায়াম মাত্র। খুব শ্রমসাপেক্ষ, কিন্তু নিশ্চিত ফলপ্রসূ। এবং সম্ভবত এ ব্যায়াম পুরুষের পক্ষেই সহজ, মেয়েদের পক্ষে কঠিন।

এবারে ১৯৩১ সালে ফিরে যাই। পিতার মৃত্যুর পর আমি কলকাতা চলে আসি এবং ইন্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিং-এ বাস করতে থাকি। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন বাবার একজন ভক্ত, তিনি আমার কাছে এ সময়ে প্রায় প্রতিদিন আসতেন আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে আজকের দিনে লোকে মানময়ী গার্লস স্কুলের লেখক বলেই জানে, তাঁর অনেক ব্যঙ্গ গল্পের কথা অনেকের হয়তো জানা নেই। তাঁর 'থার্ড ক্লাস'-এ যে সব গল্প আছে তাতে বঞ্চিত মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধের পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর বড় পরিচয় তিনি নিজে ছিলেন উদ্যোগী সমাজ-সেবক। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের নিয়ে ছিল তাঁর সমাজ। তিনি তাদের দরদী বন্ধু ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে তিনি কথাসাহিত্যে বা নাট্যসাহিত্যে বা সমাজের উন্নতির জন্য যা করতে পারতেন, তা করা হল না; তবু যে বিভাগে যেটুকু দান তিনি রেখে গেছেন তার মূল্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রই আমাকে বললেন তোমার বাবার মৃত্যু সংবাদটি ছাপা হওয়া উচিত। তাঁর নির্দেশে সংক্ষিপ্ত একটি সংবাদ রচনা করলাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিখানাও জুড়ে দিলাম তার সঙ্গে। তারপর বাবার একখানি ফোটোগ্রাফ ও হাতের লেখার নমুনাসহ সংবাদটি নিয়ে রবীন্দ্র মৈত্র আমাকে বললেন চল আমার সঙ্গে।

আমরা দুজনে সোজা প্রবাসী অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রবীন্দ্র মৈত্র সে সব এক যুবকের হাতে দিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র ওটি ছাপাতে বললেন। যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন এঁর নাম সজনীকান্ত দাস। আমরা সেখানে দু'তিন মিনিট মাত্র ছিলাম। পরিচয় হল নামমাত্র। তিনি আমাকে আনন্দ-বাজারের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আনন্দবাজার অফিস ছিল তখন মির্জাপুর স্ট্রীটে। যতদূর মনে পড়ে তখন থেকেই আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম লিখি। কিছু দিন আগে উপাসনা কাগজ নতুনভাবে আরম্ভ হয়েছে সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের মালিকানায়। স্বত্ব হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সহকারী সম্পাদক কিরণকুমার ঠিকই রইলেন। উপাসনা কাগজে প্রথম লিখেছি ১৯২০ সালে। আবার প্রায় একযুগ পরে সে কাগজে লিখতে আরম্ভ করলাম নিয়মিত।

১৯৩২ সালে আমি ইন্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিং-এর বিপরীত দিকে হ্যারিসন রোডে অবস্থিত রজনী ফার্মাসির পিছনের একটি ঘর নিয়ে বাস করতে থাকি। রজনী ফার্মাসির স্বত্বাধিকারী ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ দাস এম-বি আমার বন্ধু। এই সময় অল্প দিনের জন্য আমি একটি বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রচার বিভাগে কাজ করি। এই বীমা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একটি চীফ এজেন্সি। চীফ এজেন্ট দু'জন, ফরিদপুরের জমিদার লাল মিয়া (চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন) ও রাজবাড়ীর মণীন্দ্রভূষণ দত্ত। প্রতিষ্ঠানের নাম চৌধুরী, দত্ত অ্যাণ্ড কোং।

আমার নতুন বাসস্থানও একটি বড় গুণীজনের আড্ডা। সে আড্ডার মূল কেন্দ্র ডাক্তার সত্যেন্দ্র দাস। তাঁর সহযোগী ডাক্তার ধীরেন্দ্র বসু এম-বি ভাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারতেন। এ আড্ডায় অনেক ডাক্তার এবং রোগীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ডাক্তার সত্যেন্দ্র দাস, ধীরেন্দ্র বসু, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেমিষ্ট দেবেন সেন প্রভৃতি সন্ধ্যার পরে পৃথক একটি ঘরে ব্রিজ খেলতেন। কদাচিৎ লোকাভাবে আমাকেও সে-খেলায় যোগ দিতে হয়েছে। অতগুলি ধর্মনিষ্ঠ খেলোয়াড়ের মধ্যে আমি নিষ্ঠাহীন খুব বিপন্ন বোধ করতাম। ও-খেলায় আমার আকর্ষণ হল না কখনো।

সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি আমার বাসস্থানের কাছাকাছি উঠে আসাতে (তখন মির্জাপুর স্ট্রীটে) ওখানে প্রায় যেতাম। নিজে লিখে অথবা লেখা সংগ্রহ ক'রে দিয়ে সম্পাদিকাকে সাহায্য করেছি। এই বাড়িতে আগে এসেছিলাম ১৯১২-১৩ সালে, যখন এখানে ছিল কে, ভি, সেন ব্লক-মেকার এবং বণিক প্রেস। এটি এককালে রিপন কলেজ ছিল। সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত স্কুলে কয়েক বছর আমাকেই প্রশ্নপত্র তৈরি ক'রে দিতে

হয়েছে। কথাটি সম্পূর্ণ ভুল হয়ে গিয়েছিল, একখানা পুরনো চিঠি হঠাৎ চোখে পড়ায় এখন কিছু কিছু মনে পড়ছে সে কথা। চিঠিখানা ধীরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এম-এ লিখিত। লেখার তারিখ ২৩।১১।৩৪ তিনি লিখছেন—

"প্রতি বৎসর এমনই সময় আমরা একবার আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হই। আমাদের স্কুলের পরীক্ষা নিকটবর্তী। আপনাকে একটি ক্লাসের প্রশ্ন করিবার জন্য পুস্তক পাঠাইয়াছি। কোন্ কোন্ বিষয়ে কতদূর পর্যন্ত প্রশ্ন করিতে হইবে, তাহা পুস্তকের সহিত প্রেরিত একটি স্লিপে লিখিয়া দিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রশ্নগুলি একটু শীঘ্র করিয়া দিলে বড়ই বাধিত হইব"···

ধীরেন বাবু ঐ সমিতির একজন কর্মী ছিলেন। আর একজন কর্মী ছিলেন তারাদাস মুখোপাধ্যায়। ইনি পরে "ফাল্গুনী" ছদ্মনামে সিনেমা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত হয়েছিলেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তিনি ছিলেন সবার বড়মা। ধীরেন্দ্র সিংহ এখন আর জীবিত নেই। আমার পরিচিতের মধ্যে আর বেঁচে নেই প্রতিভা সেন। বড়-মা বর্তমানে বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রমে কর্ত্রীরূপে পুরীতে বাস করেন। আর এক শিক্ষয়িত্রী ছিল হেমনলিনী মল্লিক। সে এই নারীমঙ্গল সমিতির জন্যই যেন চিহ্নিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। শুনেছি সে এখনও এর নিষ্ঠাবতী সেবিকা। এই নারীমঙ্গল সমিতিটি তখন কর্মতৎপরতায় জমজমাট ছিল। গুরুসদয় দত্তের জীবিতকালে নারীদের এটি ছিল একটি শক্তিকেন্দ্র। আজ এর কি অবস্থা হয়েছে জানি না।

হ্যারিসন রোডের সেই রজনী ফার্মাসি সংলগ্ন ঘরে থাকতে লাল মিয়া এক দিন এসে প্রস্তাব করলেন তিনি একখানি বার্ষিক পত্রিকা বের করবেন, তার ভার নিতে হবে আমাকে। বার্ষিক পত্রিকার নাম হবে রূপ ও লেখা, (না রূপ ও রেখা মনে নেই) সম্পাদিকা জাহান-আরা বেগম চৌধুরী। সে সময় লালমিয়ার সঙ্গে ওদের পরিবারের বন্ধুত্ব। আমি সম্পাদনার ভার নিলাম। প্রায় এই সময়েই উপাসনা কাগজের রূপান্তর ঘটেছে। তার নতুন নাম হয়েছে বঙ্গশ্রী। অথবা উপাসনাকে লুপ্ত ক'রে নতুন মাসিকপত্র হতে চলেছে বঙ্গশ্রী। সম্পাদকও নতুন, সজনীকান্ত দাস। সাবিত্রীপ্রসন্ন আর রইলেন না, রয়ে গেল কিরণকুমার রায়।

বঙ্গশ্রীর নতুন সাহিত্য সমাজ, আমি বাইরের লোক। এ দুয়ের মধ্যে জোড়াসাঁকো রচিত হল রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ও কিরণকুমার রায়ের মাধ্যমে। লেখা সংগ্রহের জন্য সেখানে যেতে হল কয়েকবার। বার্ষিক পত্রিকাখানিতে প্রত্যেক লেখার সঙ্গে লেখক বা লেখিকার ফোটোগ্রাফ ছাপতে হবে এই ছিল ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ও সজনীকান্ত দাসের ফোটোগ্রাফ কোনো ষ্টুডিও থেকে তুলিয়ে নেওয়া হল মনে পড়ে। বঙ্গশ্রীর বাড়ির এক পাশে কালীপদ নামক একটি ছেলের একটি ষ্টুডিও ছিল, সম্ভবত সেইখান থেকেই ফোটোগ্রাফ তোলানো হল। মোটের উপর কাগজখানা সুমুদ্রিত হয়েছিল, ভিতরের লে-আউট প্রত্যেকটি পাতায় আমি নিজে খুব যত্ন ক'রে করেছিলাম।

এই কাগজ প্রকাশিত হবার পরই ১১৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের কোনো একটা দিনে আমি বঙ্গশ্রী অফিসে উপস্থিত হলাম—সজনীকান্তের সঙ্গে তখনও ঘনিষ্ঠতা হয় নি। তিনি আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, শনিবারের চিঠির সম্পূর্ণ ভার আমি আপনাকে দিতে চাই, আপনি এর সম্পাদনা করুন। রবি মৈত্রেরই সম্পাদক হওয়ার কথা, কিন্তু তাঁকে সমাজের কাজে বাইরে বাইরে থাকতে হয়, অতএব আপনাকেই এ ভার নিতে হবে।

আমি তো এ প্রস্তাবে স্তম্ভিত। শনিবারের চিঠি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে উত্তেজনা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, তা কি আমি বজায় রাখতে পারব? এবং সম্পূর্ণ একার চেষ্টায়? সজনীকান্ত বললেন কোনো চিন্তা নেই, সবাই সাহায্য করবে।

১৩৩১ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রথম আমার নাম ছাপা হল সম্পাদক রূপে। তিনি সেই সংখ্যায় আপন স্বাক্ষরে আমাকে পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কাজের সুবিধের জন্য আমি হ্যারিসন রোড থেকে উঠে এলাম শনিবারের চিঠির অফিস বাড়িতে—৫-সি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীটে। জায়গাটা মানিকতলা ব্রিজের কাছে। আমার সহকারী রইলেন শ্রীপ্রবোধ নান।

পৌষ ১৩৩১ সংখ্যা শনিবারের চিঠি হচ্ছে পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা। তখন আশ্বিন থেকে বর্ষারম্ভ ছিল এ কাগজের। এই সংখ্যার সূচিপত্রটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

(১) নিবেদন—সজনীকান্ত দাস, (২) ডায়েরী—শ্রীমতী সত্যবাণী দেবী, (৩) বিবাহচ্ছেদ—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিপ্রিয় বসু, (৪) রূপ-জীবনী—শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তী, (৫) আর এক দিক (উপন্যাস)—শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন, (৬) মনজুয়ান—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, (৭) অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ—শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার (৮) পাঁচ পৃষ্ঠা কার্টুন ছবি—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, (৯) ঘৃতকুম্ভ (দ্বিতীয় পর্ব)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র, (১০) নৌকা-খণ্ড (ব্যঙ্গগল্প) পরিমল গোস্বামী, (১১) সংবাদ সাহিত্য—শ্রীসজনীকান্ত দাস ও পরিমল গোস্বামী।

প্রমথনাথ বিশী 'মনজুয়ান' পর্যায়ের ব্যঙ্গ কবিতায় ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন 'স্কট টমসন'। প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী 'প্রচল' ছিলেন।

তখন কাগজ ছাপতে খরচ বেশি হত না। দু' টাকা চার আনা রীমের কাগজ ব্যবহৃত হত, ঘরে কম্পোজ করা প্রতি ফর্মা চার টাকা এবং বাইরের প্রেস থেকে ছাপা খরচ প্রতি ফর্মা (১০০০) দেড় টাকা। শনিবারের চিঠি তখন ১৬ পৃষ্ঠার ফর্মার ৮ ফর্মায় সম্পূর্ণ হত।

রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট থেকে নিকটতম ট্রাম লাইন হচ্ছে পুরো

আপাত-নিরাপদ ভেসুভিয়াস নিখিলচন্দ্র

দশ মিনিট হাঁটা পথের দূরত্বে—কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে। সার্কুলার রোডে তখন ট্রাম ছিল না, বাসের যে ব্যবস্থা ছিল তা অত্যন্ত বিরক্তিকর। সে জন্য রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে বড় আড্ডা কিছু জমত না। মাঝে মাঝে জমত। আসল আড্ডা জমতে আরম্ভ করল ধর্মতলা স্ট্রীটে, বঙ্গশ্রী অফিসে। সার্কুলার রোডে বাস থাকা সত্ত্বেও আমার পক্ষে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এসে ট্রামে যাতায়াত সুবিজনক মনে হত। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট থেকে সুকিয়া স্ট্রীট ধরে সার্কুলার রোড পার হয়ে খালধারে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট পর্যন্ত রিকশ ভাড়া তখন ছিল চার পয়সা। বঙ্গশ্রী অফিস থেকে ফেরবার পথে অধিকাংশ দিনই রিকশয় যেতাম, এতে মোটের উপর খরচ বেশি হত, তবু তখনকার দিনে বাসে ওঠা আমার কাছে ভীষণ বিরক্তিকর বোধ হত।

পৌষ মাসে শনিবারের চিঠির সম্পাদনা ভার নিলাম। আমার বড় সহায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। দিন পনেরো পরে রংপুর গেলেন তিনি, তারপর পৌষ সংখ্যা প্রকাশিত হবার 'পরেই (মাসের শেষে প্রকাশিত হত), একখানা পোষ্টকার্ড তাঁর মৃত্যু সংবাদ বহন ক'রে আনল। সেটি সম্ভবত মাঘ মাস। এ রকম জলজ্যান্ত একটি মানুষ যাঁর ভবিষ্যৎ সবেমাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, তাঁর হঠাৎ এই মৃত্যু আমাদের সবারই মনে একটা গভীর বিষণ্ণতার ছায়াপাত করল।

রংপুর যাবার আগে, আমি তখন ট্রামে, তিনি নিচে থেকে চেঁচিয়ে বলছেন, কোনো চিন্তা করিস না, ঘৃতকুম্ভের কিস্তি আমি ঠিক সময়ে তোকে দেব। সে ধ্বনি এখনও কানে বাজে। 'ঘৃতকুম্ভ' নামক একটি উপন্যাস তিনি ধারাবাহিক ভাবে শনিবারের চিঠিতে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

পরবর্তী মাঘ মাসের শনিবারের চিঠিতে প্রথম পাতায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলাম, এবং প্রতিশ্রুতি দিলাম আগামী ফাল্গুন সংখ্যা রবীন্দ্রসংখ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

মৃত্যু সম্পর্কে বার বার আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। মাঘ মাসের (১৩৩৯) শনিবারের চিঠির প্রসঙ্গকথা লিখতে গিয়ে দেখি প্রসঙ্গত মৃত্যুর কথা এসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের মৃত্যুর আভাস জেগেছিল কি মনে?

আমি লিখেছিলাম—

"...মানুষ শ্রদ্ধা করিয়া যাহা বাঁচাইয়া রাখে তাহাই বাঁচে—কেন না মিউজীয়াম গড়িয়া তাহাতে যাবতীয় মৃত বস্তুকে রক্ষা করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। বিশ্বস্রষ্টা নিজেই তাঁহার সকল সৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ব্যগ্র নহেন। তাহা যদি হইত তাহা হইলে সৃষ্টির ধারা স্তব্ধ হইয়া থাকিত—নূতন সৃষ্টির প্রয়োজনই হইত না। সুতরাং মৃত্যুকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল!...কিংবা হয়তো বাস্তবিক মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই, সৃষ্টির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশকেই আমরা মৃত্যুরূপে দেখি।...সৃষ্টির দৃশ্য অংশ যেটাকে আমরা জীবন বলি, তাহারই ধারা প্রবহমান রাখিবার জন্য জীবনের আকুলতা।...(মাঘ, ১৩৩৯, পৃঃ ৫৮১)। এই সংখ্যাতেই সজনীকান্ত অত্যন্ত বিচলিত হয়ে "রবীন্দ্রনাথ মৈত্র" শিরোনামায় সাড়ে চার পৃষ্ঠাব্যাপী এক কবিতা লিখলেন। কবিতাটিতে মনের বেদনার চমৎকার প্রকাশ আছে।

ভোলানাথ গড়গড়ার নলটি এগিয়ে দিল মুখে

..."বন্ধু বন্ধু মোর—
কোথা তব মুখ, কোথা বাণী তব, বজ্রকঠিন বাণী,
থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধ আবেগে ভাব গদগদ ভাষা,
অশ্রুজড়িত চাপা কণ্ঠের স্বর—
তোমার আঁখির নীল
আয়ত চক্ষে বুকের নীলাভ জ্বালা,
কোথায় বন্ধু অবিন্যস্ত মাথার বিরল কেশ
দেখিতে যে নাহি পাই—
মৃত্যুর কালো ছায়া
এত কি নিরেট নিবিড় অন্ধকার!"...

প্রতিশ্রুত রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত হল। ফাল্গুন সংখ্যা। এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র সম্পর্কে লিখলেন—মোহিতলাল মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র), সজনীকান্ত দাস, কৃষ্ণধন দে ও আমি।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের বাড়িতে আড্ডা না জমার কারণ আগেই বলেছি বঙ্গশ্রীর অষ্টপ্রাহরিক আড্ডা। অগত্যা আমাকেই সেখানে যেতে হত প্রতিদিন বিকেলের দিকে। একটা ছুটোর সময় থেকেই ভিড় আরম্ভ হয়ে যেত।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে থাকতে একটি অদ্ভুতচরিত্রের সঙ্গে আলাপ হয় এঁর নাম নিখিলচন্দ্র দাস। পূর্ববর্ণিত কয়েকটি অদ্ভুত চরিত্রের মতো এ চরিত্রেরও অনুকরণ হয় না, এবং আমার বিশ্বাস সংসারে এর আর দ্বিতীয় নেই।

আমার বোন মঞ্জু, নিখিলচন্দ্রের মেয়ে বিজয়ার সঙ্গে একত্র পড়ত তখন ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে। মঞ্জু মাঝে মাঝে বিজয়ার সঙ্গে তাদের বাড়িতে যেত, আমি তাকে আনতে যেতাম। এই উপলক্ষে নিখিলবাবুর সার্কুলার রোডের বাড়িতে গিয়েছিলাম দু এক বার।

নিখিলবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। এমন গম্ভীর লোক সহজে দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে ব্যায়ামের জন্য দু' একটি রিং ঝুলছে। ডেস্কে কয়েকখানি ইংরেজী বই। শুনলাম কারলাইলের ভক্ত। এ রকম গম্ভীর লোকের সঙ্গে আমিও যথাসাধ্য গাম্ভীর্য বজায় রেখে কথা বলেছি। ভেসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিকে নিরাপদ মনে ক'রে পম্পেইর লোকেরা যেমন তাকে সামনে নিয়ে বাস করত, নিরাপদ মনে করে নিখিলবাবুকে সামনে নিয়ে আমিও তেমনি কয়েকদিনের কয়েকঘণ্টা

কাটিয়েছি। অবশেষে একদিন হঠাৎ আপাত নিরাপদ আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হল। কি ক'রে হল তা পরে বলছি। কারণ তার আগে আর একটি ঘটনা বলা দরকার। এটি হবে তার ভূমিকা। আসল চরিত্রটি পরবর্তী সংখ্যায় উদ্‌ঘাটিত হবে।

১৯৩৩ সালের প্রথম দিকেই আমি হঠাৎ গলার অসুখে বিব্রত হয়ে পড়লাম। গলার ভিতরে হল দানাদার ল্যারিঞ্জাইটিস, সঙ্গে জ্বর। কিছুতে তাকে দমন করা সম্ভব হল না। বলাইকে আগেই চিঠি দিয়েছিলাম, সে বলল চলে এসো ভাগলপুরে। রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট থেকে ভাগলপুর এক রাত্রির পথ। ট্রেন দেরিতে যাওয়াতে কিঞ্চিৎ বেলা হয়ে গিয়েছিল পৌঁছতে। গায়ে জ্বর ছিল ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের উপরে।

আমার সঙ্গে একখানি প্রেসক্রিপশন ছিল, সেই ওষুধই খাচ্ছিলাম। বলাই সেখানা দেখে হাসতে লাগল। বলল ওতে কিছুই হবে না, এখানে আমার মতে চলতে হবে।

বলাই তখন ওখানে নতুন ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছে, একখানা ভাড়া বাড়িতে থাকে, তারই একটি ঘরে ল্যাবরেটরি। আমার উপর আদেশ হল ওষুধ খেতে পাবে না, স্নান ক'রে প্রচুর মাংস দিয়ে ভাত খাও, আমি দায়ী রইলাম তোমার স্বাস্থ্যের জন্য।

একটা জ্বরে—আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বলাই সীরিয়াস। আমার কোনো কথা কানেই তুলল না, সে আমার চিকিৎসা সম্পর্কে অটোক্র্যাটের ভূমিকা গ্রহণ করল।

আমি তখন সিগারেট খেতাম, বলাইয়ের আদেশে সেটি সেই দিনই বন্ধ করতে হল। তারপর থেকে চলল আমার চিকিৎসা অর্থাৎ প্রচুর খাওয়া এবং রমনো। পনেরো দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য ফিরে গেল, তখন আমাকে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ইন্ট্রাভিনাস ইনজেকশন দিতে লাগল সপ্তাহে দুটো। মোট ৪টি নিয়েছিলাম। এক মাসে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। যখন কলকাতা ফিরে আসার অনুমতি পাওয়া গেল তখন বলাই বলল, "এবারে সিগারেট খাও।" আমি বললাম, "আর খাব না, খাবার ইচ্ছেও নেই আর।" বলাই বলল, "সে কি হয়—এই নাও"—বলে একটি সিগারেট এগিয়ে দিল। ছেড়ে দেওয়া স্থির করে ফেলেছিলাম মনে মনে। সুবিধে হবে বিবেচনায় বরারিতে পালিয়ে গেলাম। বরারি ভাগলপুরের মধ্যেই, গঙ্গার ধারে। সেখানে হাসপাতালে বলাইয়ের ভাই ভোলানাথ, ডাক্তার। সে সব কাহিনী শুনে উৎকৃষ্ট তামাক সেজে গড়গড়ার নলটি আমার মুখে লাগিয়ে দিল।

[ক্রমশঃ।

অস্তরাগ

শ্রীমতী বাসবী বসু

আজ বিকেলে হঠাৎ খেয়াল হ'ল
ঘরটা আমার বিষম এলোমেলো
তাকের উপর বইয়ের কাঁড়ি
ধূলো জমে জমে
আঁখরগুলো আবছা হোল ক্রমে
কোমর বেঁধে লেগে গেলাম সাফাই করার কাজে
মালিকানার মুরুব্বি মেজাজে।

পুরোন সব বইয়ের গাদা
নেইকো গোনা-গাঁথা
ছেলেবেলার ছেলেমিতে বোঝাই ছেঁড়া খাতা।
ধূলো মুছে যত্নে রাখি ভরে
তাকের উপর সাজাই থরে থরে
তারি ছোঁয়ায় অতীত স্মৃতি ধূলোর মতো ঝরে
জমলো স্তরে স্তরে
আমার বুকের পরে।

কখন চুপে চুপে
মনটা আমার হারিয়ে গেল
ছেঁড়া খাতার স্তূপে
জানি নাই তো আমি
বেলা কখন অতীত হোল সূর্য্য অস্তগামী।

হঠাৎ দেখি জানলা দিয়ে
কালবোশেখী এলো কী এ
পাগল বাতাস এলো ছুটে দামাল ছেলের মতো
ছড়িয়ে দিলো উড়িয়ে নিলো ছেঁড়া কাগজ যত।

ভেবে নানা আগু পিছু
যত কিছু
সারাজীবন ধরে
রেখেছিলাম ভরে
আজকে তারা পাল তুলেছে কালবোশেখীর মেঘে।
হঠাৎ এ কী বিষম হাওয়া লেগে
ঐ চলে যায় ছেলেবেলার হিজিবিজি আঁকা
ঐ তো গেল কিশোর বেলার প্রথম কাব্য লেখা
যৌবনেরি স্বপ্ন আমার হাওয়ায় উড়ে যায়
আজ দিনান্তে শেষের সীমানায়।

ছয়টা ঋতুর ফুলে ফলে
রেখেছিলাম বুকের তলে
ভেবেছিলাম দিনের শেষে করবো নিবেদন
আজকে বিফল বাদল-রাতে সকল আয়োজন।

ওগো আমার খেয়াপারের মাঝি
জীবন-তরীর পাল তুলে দাও আজি
কাণ্ডারী হে, রিক্ত পুঁজি আজকে আমি একা
আশা আছে, সন্ধ্যাবেলা মিলবে তোমার দেখা।

পুরাতন বাঙলা দলিলপত্র

[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নাম বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানের অধিকারে বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও নথিপত্র আছে—সাহিত্যের সম্পদ হিসাবে যার মূল্যমান নির্দ্ধারণ করা যায় না। বাঙলা সাহিত্যের গবেষক ও পাঠকদের জন্য পরিষদের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। অতীতের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ বাঙলার পুনর্গঠনের কাজে যাঁরা অগ্রণী হবেন, তাঁদের নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রয়োজনমূল্য অধিকতর হবে। পরিষদের মুখপত্রিকা আছে একটি। পত্রিকাটি অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ রচনা, গবেষণা ও সংগ্রহের সন্ধান দেয়। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যার পত্রিকায় 'লালা উদয়নারায়ণ রায়' শিরোনামায় একটি তথ্যবহুল দলিল-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। সংগ্রাহক দুর্গাদাস রায়। বঙ্গভাষার পৌরাণিক আকৃতি ও পরিচিতির ঐতিহাসিক দলিল এই কয়েকটি চিঠি পুরাতন বাঙলা গদ্যের নমুনাস্বরূপ সাদরে পত্রস্থ হয়েছে। —স]

লালা উদয়নারায়ণ রায়

কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গদেশে ইতিহাস চর্চ্চার আন্দোলন উঠিয়াছে। এবং বঙ্গদেশের নবাবী আমলের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ ও সত্য নির্দ্ধারণ জন্য অনেক কৃতবিদ্য ও উৎসাহী লেখক বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তন্মধ্যে অক্ষয় বাবু, নিখিল বাবু ও কালীপ্রসন্ন বাবু অগ্রগণ্য।

উদয়নারায়ণ রায় সম্বন্ধে উক্ত তিন ব্যক্তিই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা নিরসন করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। উদয়নারায়ণ কোন্ সময়ের লোক, কি জাতি, কিরূপে তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহার পরিণামই বা কি হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তৎসমুদয় ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণকে জানাইবার জন্যই আমি নিজ পরিচয় প্রদানেও আমাদের গৃহস্থিত প্রাচীন দলিলের প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

লালা উদয়নারায়ণ রায় কায়স্থ ছিলেন না। তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঘনশ্যাম রায় মহাশয়ের জামাতা। ঘনশ্যাম রায় রাজা দনুজেশ্বর রায় মহাশয়ের বংশসম্ভূত। তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। সুতরাং উদয়নারায়ণ রায়ও ব্রাহ্মণ। রাজা দনুজেশ্বর রায় মহাশয়ের কোন বিশেষ বিবরণ আমরা জানি না। সম্ভবতঃ জানিবার উপায়ও নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম আমাদের বাটীতে আছেন এবং তাঁহার মাতার খনিত 'রাজার মা' নামক পুষ্করিণী আমাদের বাটীর নিকটে ও আমাদের দখলে আছে। ঘনশ্যাম রায় মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে গনকর প্রভৃতি চারি পরগণার জমিদার ছিলেন। গনকর গ্রামেই তাঁহাদের বাস ছিল। আমরাও এখন ঐ গ্রামে বাস করিতেছি এবং পূর্ব্ব বসত বাটীতেই আছি। গনকর গ্রাম থানা মির্জ্জাপুরের অধীন ও অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত এবং মহকুমা জঙ্গিপুর ও জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। নলহাটী ব্রাঞ্চ রেলওয়ের বোখারা ষ্টেশন হইতে উত্তর দিকে গনকর গ্রাম প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত ও ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এক মাইল ব্যবধানে স্থিত। রেশমী বস্ত্রের জন্য মুর্শিদাবাদ বিখ্যাত। মির্জ্জাপুর গনকর ঐ বস্ত্র বয়নকারী তন্তুবায়গণের নিবাসভূমি ও অতি পুরাতন গ্রাম। ঐ স্থানে আমাদের বাস প্রায় তিন শত বৎসরের অধিক হইবে। উদয়নারায়ণ রায়ের সহিত সম্পর্ক থাকায় ঘনশ্যাম রায় মহাশয়ের জমিদারি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। এখন খানাবাড়ী গড়বাড়ী প্রভৃতি আমাদের দখলে আছে।

ঘনশ্যাম রায়ের বংশাবলী প্রদত্ত হইল। তাহাতে তাঁহার সহিত উদয়নারায়ণ রায় ও আমাদের সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বোধ হয় উদয়নারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি কায়স্থোচিত লেখাপড়ার কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া লালা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। এখনও উপাধির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গনকর গ্রামের নিকটবর্ত্তী পাঁচলপাড়া নামক গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বংশ মুন্সী নামে পরিচিত। শুনা যায়, তাঁহাদের বংশীয় একজন মুন্সীর কর্ম্ম করিতেন।

লালা উদয়নারায়ণ রায় আপন শ্বশুর ঘনশ্যাম রায় মহাশয়কে যে ভূমি দান করেন, তাহাই এখন গড়বাড়ী নামে পরিচিত ও আমাদের অধিকারভুক্ত। ঐ স্থান গনকর হইতে এক মাইল পূর্ব্বে নূতনগঞ্জ নামক গ্রামের নিকট গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ঐখানে এখন বাড়ী ঘর নাই। উচ্চ ভূমি ও গড়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গড়বাড়ী এখন ঘাসডাঙ্গার জন্য ব্যবহৃত হয়। ঘনশ্যাম রায়ের পৌত্র রাজারাম রায় ও প্রদৌহিত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এই উভয়ের মধ্যে ঐ গড়বাড়ী লইয়া ১১৬৫ সালে বিবাদ উপস্থিত হয়। ঐ সময় রাণী ভবানীর আমল। তাঁহার কাছারী চন্দকা গ্রামেও ছিল।

ঐ গ্রাম গনকরের দেড় ক্রোশ উত্তর। ঐ বিবাদসম্বন্ধীয় অনেক দলিল দস্তাবেজ আমাদের ঘরে আছে। তৎপাঠে উদয়নারায়ণ রায় প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। দলিলগুলি অতি জীর্ণ ও পুরাতন। এবং অযত্নরক্ষিত বলিয়া অনেক স্থানের অক্ষরও অস্পষ্ট ও অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। আমি তিনখানি মাত্র দলিল প্রকাশ করিলাম। ইতিহাস তত্ত্বানুসন্ধায়ী লেখক ও পাঠকগণ ঐ দলিল সকল পাঠ করিলেই আমার বক্তব্য ও তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। আমার ঐ সকল বিষয় উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল, কি ভাবে দলিল আদি লিখিত হইত, এ সকল বিষয় প্রকাশিত দলিলপাঠে জানা যাইবে। আমি ঐ দলিলগুলির ভাষার বা ভাবের কোন সংশোধন করিলাম না। বর্ণাশুদ্ধিও যথাবৎ রক্ষিত হইয়াছে।

উদয়নারায়ণ ও তৎপুত্র সাহেবরায় বন্দী ভাবে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। তাঁহার জমিদারীর সহিত ঘনশ্যাম রায়ের জমিদারীও বাজেয়াপ্ত হইয়া রঘুনন্দনের কৌশলে রামজীবনের নামে গৃহীত হয়। রঘুনন্দন উদয়নারায়ণকে বন্দী করিয়া আনেন বলিয়া ঐ সকল জমিদারী পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হন।

বাঙ্গালা ১১১৫ সালে গড়বাড়ীর উৎপত্তি। ১১২০ সালে বা ১১২১ সালে উদয়নারায়ণ সপরিবারে পলায়ন করেন। ১১২৬ সালে ঘনশ্যাম রায় প্রভৃতি প্রত্যাগত হইলে ঐ সময় ঘনশ্যামের মৃত্যু হয়। ১১৩২ সালে রাজা রামজীবন ঘনশ্যামের পুত্রদিগকে থানাবাড়ী, গড়বাড়ী প্রভৃতি ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা জমিদারী ফেরত পান নাই। দলিল পাঠে বুঝা যায়, উদয়নারায়ণ আত্মহত্যা করেন নাই। তিনি ও সাহেবরায় মুর্শিদাবাদে বন্দী ছিলেন। নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ বা চাঁদসিংহ নামে উদয়নারায়ণের কোন পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় দলিলখানিতে গড়বাড়ী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে বলিয়াই বৃহৎ হইয়াছে। আরজী, মুচলিকা ও বর্ণনাপত্র (জবাব) এই তিনটি পূর্ব্বে ভাষা, মুচলিকা ও ভাষোত্তরপত্র বলিয়া অভিহিত হইত। অন্যান্য সংবাদ দলিলপাঠে পাওয়া যাইবে।
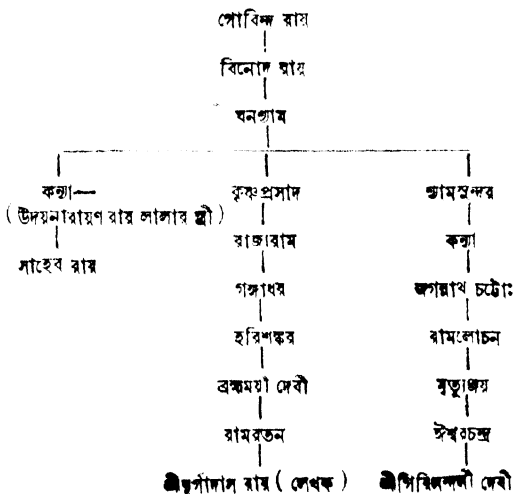
(ঘনশ্যাম রায়ের বংশাবলী)

১ নং

শ্রীশ্রীরামজী।

হকীকত শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মার নিবেদন আমার মাতামহ ৺শ্যামাসুন্দর রায়ের ব্রহ্মোত্তর গড়বাড়ী পরগণে গনকরের তরফ লস্কাহারের মধ্যে আছে। ইস্তক লাগাইদ রায় মজকুর ভোগ করিতেছিলেন। সন ১১৫৫ সালে ৺প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি অপুত্রক, আমি তাঁহার দৌহিত্র। বালককালাবধি তাঁহার নিকট তাঁহার গার্হস্থালি এবং বিত্তবিধান যে আছে, সকল দফার মালিক আমাকে করিয়া গিয়াছেন এবং মাতামহী ঠাকুরাণী অদ্যাবধি আমার নিকট আছেন। মাতামহ অবর্ত্তমানে আমি খাজনাপত্র লইতাম, পরে আমার বর্দ্ধমান যাওয়া হইল। এ মতে আমারদিগের সকলেই সেখানে গিয়াছিলেন। গড়বাড়ী শ্রীগৌরীকান্ত রায়ের জিম্মা করিয়া গিয়াছিলাম। তিন বৎসর বর্দ্ধমানে থাকা হইল। আমার মাতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজারাম রায় খামাকা জোর করিয়া রাইয়তের স্থানে খাজানা লইয়াছেন। গৌরী রায়কে দখল দেন নাই। সন ১১৬২ সন ১১৬৩ দুই সনের খাজানা লইয়াছেন, তসরুফ জে জে করিয়াছেন তাহার ফর্দ্দ দৃষ্ট করিবেন। দুই সনের খাজনা লইলে পর, গৌরী রায় আমার নিকট গেলেন, কহিলেন তুমি গড়বাড়ী আমার জিম্মা রাখিয়াছিলা। রাজারাম রায়জী জোর করিয়া খাজনা লইলেন। তোমার বিত্ত তোমাকে কহিলাম। আমি ফারগ। যে কর্ত্তব্য হয় করহ। ইহা শুনিয়া আমি বর্দ্ধমান হইতে আইলাম। আমার সহিত বিরোধ করিয়া কহেন তুমি বিত্তের কেহ নও। অতএব নিবেদন তজবীজ করিতে আজ্ঞা হইবেক। মাফিক তজবীজ জে হয় আমার এলাকা বুঝিয়া দেওয়ান নিবেদন ইতি। সন ১১৬৫ সাল তাং ১৫ আষাঢ়।

২ নং

শ্রীশ্রীরাম।

লিখিতং শ্রীরাজারাম শর্ম্মা ও জগন্নাথ শর্ম্মা মুচালিকা পত্রমিদং সন এগার পয়সত্তী আব্দে লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে আমাদিগের দুইজনে পৈতৃক খানাবাড়ী ও লস্কাহারের গড়বাড়ী ও খনিত পুষ্করণী দিগরের বিরোধ। এজন্য শ্রীশ্রী৺মহারাজ সরকারে পরগণে গনকরের কাচাহরিতে নালিশ করিয়া উভয় কোহিলা পরে শ্রীভয়চরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণরাম রায়কে মধ্যস্থ মানিয়া জাইতেছি। ইহারা তজবিজ করিয়া জে অবধি করিয়া দেন। সেই মঞ্জুর হইতে যে অন্য মত করে, সে স্বায়ভঙ্গী দাওয়া হইতে বেদাওয়া এবং সরকার হইতে গুণাগার। এতদর্থে মুচলিকাপত্র দিল ইতি ১১৬৫।২২ ভাদ্র। মোঃ চড়কা।

৩ নং

শ্রীশ্রীহরি।

লিখিতং শ্রীরাজারাম দেবশর্ম্মণঃ। ভাসোত্তরপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। পরগণে গনকরের তরফ গনকরের মধ্যে মহিধর বাটী ও তরফ লস্কাহার এই দুই তরফের আমেজে আমাদিগের পৈত্রিক নিজ খনিত গড় সমেত খানাবাড়ী ও গোহালী বাড়ী মায় আমলা আছে। পিতামহ ঠাকুর ঘনশ্যাম রায় মহাশয় পরগণে গনকর ও গয়রহ চারি পরগণার জমিদারি বহিতে বহাল দৌলতে ৺ গঙ্গাবাস কারণ করিয়াছিলা। বাড়ির চৌগিদ্দে গড় খনিত করিয়া পিতামহঠাকুর উৎসর্গ আপুরি করিয়াছেন। গড়

খোদাইতে ইমারত কচ্চা বাড়ি বাস ও গড় প্রতিষ্ঠা গএর হতে আট সহস্র টাকা খরচপত্র সকল নিজ সরকারে। বাড়ি মজকুরে থাকিয়া প্রত্যহ ৺ গঙ্গাস্নান ব্রাহ্মণভোজন পুরাণ শ্রবণ এই সকল কার্য্য পরকালের করিতেন। গড় বাড়ির জন্য লালা উদয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের দত্ত ব্রহ্মোত্তর। তাহার বিবরণ যেকালে পিতামহি ঠাকুরাণী অন্তিমকালে ৺ গঙ্গাতিরে লক্কাহারে পাঁচুমণ্ডল নামে পুড়া জাতি চাসার বাড়িতে বাস করিয়া থাকেন। তাহাতে সাহেব রায় মহাশয় আপন মাতাঠাকুরাণী সহিত বড় নগর হইতে আপন মাতামহিকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাতে অনেক লোকের জনতা স্থানাভাবে দুখ হইল। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে আপন মাতামহকে কইলেন মহাশয়ের শেষ কাল ৺ গঙ্গাতীরে একখানা বাড়ী করিতে হয় অভাব কি। তাহাতে পিতামহ ঠাকুর কইলেন আমরা সে মনস্থ আছে কীন্তু আমার নিজ তালুকের ভোম এখাতে নাই। সকল আপনকার খাস তালুক তাহাতে কইলেন আমার তালুক মহাশয়ের নয়। সকলি মহাশয়ের যে স্থান মনন্ত করেন সেইখানে দেওয়া যায়। তার পর আপনে সকল সমেতে ঘোড়ায় সওয়ার করিয়া খাড়া হইলা। ঠিকানা জঙ্গিপুর নামে বরজ ছিল উচ্চস্থান ডিহি সেই স্থান মনন্ত করিলেন ৺ গঙ্গাতীর হইতে ১৫০ দেড় শত হস্ত অন্তর। মাপ করিয়া বাড়ি চিহ্নিত করিয়া দিয়া পরদিবশ বড় নগর গেলা। তার পর তার খনিত ও বাড়ী প্রস্তুত হইলে গড় প্রতিষ্ঠার কালে ৺ ঠাকুর বড় নগর মোকামে কর্ত্তা উদয়নারায়ণ রায় মহাশয়কে সংবাদ জ্ঞাত করিলা ৺ গঙ্গাতীরে লক্কাহার গ্রাম সমিপে নাতি একখানা বাড়ী দিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে একখানি ধর্ম্ম কর্ম্মকরা উপস্থিত হইয়াছে বাড়ীর গৌণিক গড় খনিত হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হবেক। ভোম মহাশয়ের আত্মসত্ত উপাদান পরমত্ত ত্যাগ ইহা নহিলে দান উৎসর্গের অধিকার হয় না তাহা শুনিয়া কহিলেন জামাতা দৌহিত্র ইহার দ্রব্যে মহাশয়ের অধিকার নাই। ঠাকুরান আজ্ঞা হইতেছে। তাহাতে কইলেন কেবল বাস করা হইলে যে আজ্ঞা করিতেছেন সেই প্রমাণ, কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে এমত নহিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় না। অতএব বাড়ীর প্রকৃত মূল্য খরিদানি দেন। তাহাতে কইলেন এমত বিষয় মহাশয়ের সহিত অনুচিত।

সে বাড়ী মহাশয়ের খনিত গড় সমেত চতুঃসিমা সাবদে আমি আপন সত্তা ত্যাগ করিয়া দিল। মহাশয়ের সত্তা হইল। যে বাসনা হয় তাহা করুনগা। পরে নগর হইতে পিতামহঠাকুর আসিয়া গড় প্রতিষ্ঠা করিলেন। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চাটোয্যা ভাসাতে লিখিয়াছেন আমার মাতামহ শ্যামসুন্দর রায় একখানি বাড়ী করিয়া গড় খোদাইয়া ছিলা তাহা আপন পিতাকে দিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন। পিতার ধনে ঐশ্বর্য্যে এবং জমিদারী আনিতে উপষ্টম্ভ ছিল। তাহাতে পুত্র কর্ত্তা ছিলা কি পিতা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলা। পুত্রটী উপযুক্ত হইয়া তালুক চৌধুরাই ধন উপার্জ্জন করিয়া পিতার ভরণ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম করাইতেন ইহাতে বুঝায় পুত্রের উপষ্টম্ভে পিতা কর্ত্তা ছিলা। পুনশ্চ লিখিয়াছেন তখন সকলি একত্র ছিলা। আপনারা সুন্দর বিবেচনা করিবেন। তদনন্তর সমাচার কয়েক বৎসর পরে সন ১১২০ সালের আখেরি সন ১১২১। একইশ সালের প্রথম লালা উদয়নারায়ণ রায় জাফর খাঁ সুবা সহিত পাত সাইতে কমর বান্ধি করিয়া গালিব হইলা। সে জনিত তাহাদিগের রাজ্য গেল। আমার পিতামহঠাকুর তাহার শ্বশুর নিগুঢ় পুটুখিতা সে মতে কিন্তু আত্ম ভয়ে গোষ্টি সহিত তালুক ভোম গৃহ বাটী আদি সকল ছাড়িয়া সেই হঙ্গামে পলায়ন পর হইয়া মুরশিদাবাদের মহেশপুর অবধি একত্র ছিলা।

সাহেব রায় যুদ্ধে পরাজয় হইয়া গোষ্টি সহিত কয়েদ হইয়া গেল। আমরা উদয়নগর পাথরিয়া মোকাম হইতে কর্ত্তাদিগের সহিত বিচ্ছেদ হইয়া আমরা আত্ম ভয়ে পলাইয়া বনের পথে [illegible] পাঠানের অধিকারে থাকিলাম এখানে জমিদারি তালুক [illegible] আদি গোবৎস খনিত পুষ্করিণী শ্রীযুক্ত রামনন্দন রায় মহাশয়ের [illegible] রাজা রামজীবন রায় মহাশয়ের নামে উদয়নারায়ণ রায়ের [illegible] হইল। তাহার তরফ সিকদার [illegible] সনকর গএরহ পাঁচ [illegible] সিকদার রামেশ্বর রায় হইতে হিত সকল দখল করিলেন কিন্তু [illegible] বিক্রয় করিয়া রাজ সরকার দাখিল করিলেন। পুষ্করিণী সকলের মৎস্য বিক্রয় করিয়া লইলেন সেই অবধি সরকারে থাকিয়া চতুর্দ্দিগে অধিনাহ হইয়াছিল। সে কারণ গর [illegible] ভাঙ্গিয়াছিল। গড় বাড়ীতে আমল। সনকরের [illegible] সর্ব্বসাধারণ পিতামহ ভ্রাতারা পলাইয়াছিল। তাহারা [illegible] বেইনাকে সেমতে সম্বৎসর মধ্যে বাড়ি আসিয়াছিলা [illegible] থাকিল। গড়বাড়ি ও খনিত পুষ্করিণী আদিতে যে পিতামহ [illegible] নিজ দখল তাহাতে ভাই বগ [illegible] মুক্তাহিম হইল না। [illegible] বিদেশস্থ থাকিলাম। গড় বাড়ীতে সনকরা আদি [illegible] লক্কাহারের প্রজা স্থানে কর্ম্মচারিতে বিক্রয় করিয়া লইত [illegible] সকল ধারাতে কয়েক বৎসর গেল। অস্বামিক সকল থাকিলে [illegible] বাহিরেকে কে লয়। আমরা দেশে ভোম সাক্ষাত করিতে কেহ [illegible] নাই। তার পর কয়েক সন বাদে পিতামহঠাকুর ৺ গঙ্গা [illegible] করিতে গোপনিয়তে সহরের নিকট তক আইলা তাহাতে [illegible] হইলা। তথা পরামর্শ হইল রাজাবাহাদুর সহিত সাক্ষাত [illegible] এক বন্দোবস্ত করিয়া দেশে যান। গড় বাড়িতে থাকিয়া [illegible] ইচ্ছা ভোজন করাইব। তথা হইতে যাত্রা করিয়া নৌকাতে আসিয়া তাহা পরজ পৌছিলা। বন্দোবস্তের পয়গাম হইতেছিল ইতিমধ্যে তথা ৺ তিরে স্বর্গীয় হইলা এই বন্দোবস্ত থাকিল। [illegible] দিয়াড়াগ্রামে [illegible] কর্ম্ম হইল। পিতামহ ভ্রাতা [illegible] জ্যেষ্ঠ শক্তিজিত রায় ঠাকুর বাড়িতে ছিলা খরচ পত্র [illegible] দেওয়া গেল। তিহ এথা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। [illegible] কয়েক বৎসর পরে আমার পিতাঠাকুর দুই [illegible] রাজাদিগের সহিত সহিত সাক্ষাৎ করিলা গোষ্টিগনকার বাটী আনিলেন। তারপর রাজা আজ্ঞা হইয়াছিল ইহারা আপন জমিদারী লইয়া সরবরাহ করিতে পারেন দেওগা। চাকলে রাজসাহির মুৎসদ্দি তিহ কিশোর সিংহ সরকারকে কহিলেক সকল তালুকের [illegible] আমানত বন্ধ দিতে কয়েক বৎসরে কি বাকী ফদ্দ কর। তাহাতে বাকী মবলক হয়—ইহারা হালমাল গুজারী কবুল করেন। এইরূপ কোন কিনারা পরে না। ইহারা ভোম পাইবেন এই প্রত্যাশাতে বাড়ি ও পুষ্করিণী আদি অল্প চেষ্টা পান না। কয়েক বৎসর এই আশ্বাসে গেল। তার পর জাহার মুদ্দই তাহার সমকক্ষ লোক নন মহারাজা সবল। দুর্ব্বলের বিষয় যাহাদের গলিভূত তাহাদিগের

বদনামে কথ্‌ নালিশ করে জায় না। ইহারদিগের নিকটে কল কৌশল ব্যাতিরেকে আপন কার্য্য লওয়া যায় না। তার পর রাজার মা পুষ্করনী ও পিতামহী ঠাকুরাণীর পুষ্করনী ও বাগিচা বাড়ি আদি সকল মৎস্য বিক্রয় করিয়া সরকারে লইয়াছিল। সে অবধি রাজ সরকারে নিজ গ্রামের বিস্ত হালদার মৎস্য জীনাই করিত, তাহা আমার ঠাকুর রামেশ্বর রায় শিকদারকে লইয়া উদ্ধার করিয়াছেন। গড় বাড়ির দফা রামেশ্বর বাবতগীরি পথ লাভে সরকার সিকদার হইলা। তাহার আসনে তাহাকে সমাচার জ্ঞাত করিলেন। তিহ লক্ষীনারায়ণ চৌধুরী আমিন তাহাকে কইলেন রায়জীরা কি কইতেছেন। চৌধুরী কইলেন ঘনশ্যাম রায়জীর ৺ স্নানের থানা বাড়ী ইহারা দেশে না থাকাতে ফলকরা কর্ম্মচারিতে বিক্রয় করিয়া লয় এবং লস্কাহারের প্রজাতে বাড়ীর দেওয়াল বাহির খানিকওত দিয়া জমা কিঞ্চিত করিয়াছে তাহা খারিজ দিয়া বাড়ি দেন। এই চৌধুরী মজকুর সিকদারের দস্তখত সমেত লিখন করিয়া কর্ম্মচারিকে দিলেন তাহার পাঠ এই উদয় নারায়ণী ভঙ্গিয়ানে রায় মজকুরেরা পালাইয়া বিদেশে ছিলা। সে মতে লস্কাহারের প্রজাতে কথোক স্থানে জমী করিয়া কিঞ্চিত জমা করিয়াছে থানাবাড়ীতে। অতএব সদর দখলে দাখিল হয় নাই। এমতে হস্ত বুঝে কমী লেখা যায় না। যে জমার এওজ নাএক জাবত পতিত জমী অন্যত্র ঠাওরাইয়া দিবা, তাহা আবাদ করিয়া জমার মালগুজারি করেন। খনিত গড়সমেত থানা বাড়ী মায় আমলা পূর্ব্বের মত ভোগ করিবেন। এই দখল হইল তারপর পিতৃব্যঠাকুর লস্কাহারের অন্য পলাতক প্রজার ভিটি বা বাঁশ বৃক্ষ ও জমি সমেত ২০।২৫ বিশ পঁচিশ টাকার জমা লইয়া ছিলা। সেই সামিল গড় বাড়ির জমা এওজ জমী লইয়া মালগুজারি করিতেন তারপর দশ মাস পরে সে বৎসর আম্র সমূহ হইল তাহাতে দুষ্ট লোকে পুনশ্চ সিকদারকে কহিলেক বিশ পঁচিশ টাকার আম্র গড় বাড়িতে হইয়াছে। রায় মজকুরদিগরের দেশ ছাড়া অবধি কয়েক বৎসর খামারে বিক্রি হইতেছে বিনা বড় নগরের লিখনে কিরূপে ছাড়িয়া দিলা। এই সিকদার কহিলেন বড় নগরের একখানি লিখনে আনিলে ভাল হয়। আমরা চাকর একখান আশ্রয় থাকে। পুনশ্চ দুষ্ট লোকের কথাতে এই আপত্য হইল। পরে আমার ঠাকুরেরা দুই ভ্রাতাকে পরামর্শ করিলেন। আমার ঠাকুর অস্বাস্থ্য ছিলা। পিতৃব্য ঠাকুরকে কইলেন তুমি সহর গিয়া সাহেব রায়জী ফাটকে সংবাদ জ্ঞাত কর রাজা মহাশয় এতশ থানাতে আছেন। তাহার সহিত অতি সৎভাব আচরণ হইয়াছে। তাহারা কহিয়া পাঠাইলে কার্য্য হইবেক এই পিতৃব্য ঠাকুর সহর গিয়া উদয়নারায়ণ রায় মহাশয়কে (১) এবং সাহেব রায়জীকে জ্ঞাত করিলেন। সে বৎসর কালু কোঙর (২) স্বর্গীয় হইলে নবাব রাজা মহাশয়কে নাটোর হইতে আনিয়াছেন এতস থানাতে থাকেন। নজার আহমদ ও গৌরাঙ্গ সিংহের বন্দোবস্তে রাজা সাক্ষাৎ হইল। পরে রায় মজকুরের ব্রাহ্মণ সদা রাজার নিকট রুজু থাকিত কিঙ্কর শর্ম্মা (৩) নামে। তাহাকে সঙ্গে দিয়া এতস থানাতে রাজার নিকট পাঠাইলেন উক্ত রাজা কহিলেন মহারাজা ইহ সাহেব রায় ঠাকুরের মাতুল। এরা সাবেক জমীদার। কর্ত্তার দিগের ভাগিয়ানে পলাইয়া বিদেশে ছিলা সে মতে জমীদারী খাস আমল হইয়াছে ৺গঙ্গা তিরে লস্কাহার সমিপ খনিত গড় সমেত থানাবাড়ি আছে তাহা মপসলের নায়েব দখল দেয়না। জে মত আজ্ঞা হয়। শুনিয়া কইলেন জমীদারের ভোম গেলে থানাবাড়ী খনিত পুষ্করনী আদি ইহা যায়না। ভাল আমি বিষয় ওয়াকিব হই। এই গনকরের অমিনকে তলব হইল ইত মধ্যে চাকলে রাজসাহির আমিন শ্যাম সরকার দেওয়ানি কাচারিতে রুজু থাকিয়া কানুন নোই গৌরাঙ্গি সিংহ মজুমদারকে কাগজ দিতে ছিলা। তাহার নিকট পরগনা হায়ের আমিন রুজু ছিল। গনকরের আমিন চৌধুরী তথা ছিল। তাহাকে আনিতে পেয়াদা গেল। চৌধুরী মজকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিহ আবোহমান সকল সমাচার বিস্তারিত জ্ঞাত করিলেন। শুনিয়া কইলেন এই দপ্তে লিখন দেও। ইহাদিগের নিজ খনিত গড় সমেত মায় আমলা বাড়ির নিকট কেহ না যায়। এবং কইলেন উদয়নারায়ণ রায়ের দত্ত ব্রহ্মোত্তর আমিও বহাল রাখিন। এই শ্যাম সরকারের সাক্ষরে মহারাজার সহি সমেতে এই তথাকার সনন্দ হইল। লিখনের পৃষ্টে তকসিল আছে। নিজ খনিত গড় পাহার ও জলসার থানা বাড়ি ও গোহিল বাড়ী। পথ লাভ সরকার সিকদারের নামে সনন্দ তলব করিয়া দৃষ্ট করিবেন সকল দফা তাহাতেই জ্ঞাত হবেন।

প্রকৃত সনন্দ এই। পূর্ব্বে ব্রহ্মোত্তরের বাড়ী সমতে ইত্যাদি লোক জনরবে কেহ কোনমত জানেন। এবং পূর্ব্ব পিতামহ ঠাকুরের জমিদারী আদি যে উপষ্টম্ভ ছিল তাহার বিশেষ কর্ম্ম পিতৃব্য ঠাকুর করিতেন আপনাদিগের যাবতীয় অধিকার ছিল তাহাতে প্রাচীন লোক যে থাকেন সকলেই জ্ঞাত আছেন তাহাতে হবিতার আবেন জানি প্রস্তিসিন ছিল। ইহাতে ইনামনক্ষ খ্যাত ইত্যাদি লোকে নতুবা স্বকীয় পুরুষার্থে নয়। পিতা অবিদ্যমাণে কোন কর্ম্ম করিবেন। আমার পিতাঠাকুর পূর্ব্ব জমিদারী অবধি আশুতোশ ছিলা। সদাকাল স্নান আহ্নিক পরমার্থ আচরণে থাকিতা। তারপর পিতৃব্য ঠাকুর কড়ি অপব্যয় নষ্ট করিতে লাগিলা। তাহাতে পিতামহ ঠাকুর আবেশ করিয়া জেষ্ট পুত্রকে কইলেন তুমি কচহরিতে বসিয়া ব্যাপার কর সাবেক আমলা মধ্যে জয়দেব রায় খান গীর সুমার নবিস এবং প্রতিবেশী অতি প্রাচীন জীবিত আছেন সকল জ্ঞাত আছেন। তারপর গড় বাড়ী দু'এ বিভোগ একদফা দ্বিতীয় কান্ত গতাগতের এই সমাচার মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন। তদনন্তর সমাচার স্ত্রীলোকদিগের অসৌষ্টবে এবং সিতারাম শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ সেই বাড়ীর মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া অন্ন পৃথক হইল। কেবল অন্ন পৃথক মাত্র দুই ভ্রাতাতে অভিন্নভাবে। পিতৃব্য ঠাকুরের জেষ্ট ভ্রাতাকে পিতা হইতে অধিক সঙ্কোচ এই মত আচরণ ছিল। কিন্তু পিতৃব্য ঠাকুর অপুত্রক সেমতে আমরা কোন দফা অংশাঅংশ করিয়া লইয়ে নাই। অংশ করিলে নিরূপণ হয় নিরূপণ হইলে উত্তর কাল পিতৃব্য ঠাকুরের চারি কন্যার দৌহিত্রগণ আছেন যদি কদাচিত কাহকে লিখিয়া দেন। পশ্চাত ন্যায় পড়ে। সেমতে অপরের ক্ষতি হইত। তথাচ তাহার আপত্য করিবে নাই। করিলে আপত্য প্রকৃত অংশ করিয়া লইতে হয়। এক দফা অংশ করিলে নিরূপণ

---

(১) উদয়নারায়ণ ও সাহেব রায় মুর্শিদাবাদে বন্দী। মুর্শিদাবাদকে তত্রস্থ লোকে 'সহর' বলে। লেখক।

(২) কুমার কালিকাপ্রসাদ রাজা রামজীবনের পুত্র। লেখক।

(৩) কোন কোন দলিলে আত্মারাম শর্ম্মা আছে। লেখক।

হয় এইমতে সকল অবিভক্ত সাধারণ অদ্যাবধি গনকরে বাড়ীর ঘর দ্বার পিতামহ পিতামহী বর্ত্তমানে যে যে ঘরে ছিল। সেইখানে তাহারা অবিদ্যমানে ও ছিল দুই ভ্রাতাতে পৃথক হইলে ঘর দ্বার মাপ করিয়া নুতনাতিরেক তুলামূল্য সম্মতি হইয়া নিবেদন করেন নাই এবং সম্মতি পত্র হয় নাই। গৃহ বাটী সকল সাধরণ বাটোয়ারা হয় নাই। গনকরে ও অন্য গ্রামের খনিত পুষ্করিনির মৎস ও ফলকরা আদি সকল দ্রব্য ইহাও পিতৃব্য সহিত অংশ করিয়া লইতাম না। যখনকার যে দরকার হইত লইতেন তারপর গড়বাড়ী তখন করির বিষয় ছিল না। ফলকরা ও বাঁধ ঘড় ইত্যাদি যখনকার যে দরকার হইত লইতেন। এই ভোগ কোনরূপে অংশ হয় কোন অনেক মতে আখেজ করিতেন পিতৃব্য ঠাকুর আমরা আপন ক্ষতি হইত কোন দফা জ্যাদা তসরূপ করিতেন তথাচ তাহাতে পরিচ্ছেদ দিতাম। তার ১১৩১ সালে শ্রীযুক্ত ভাতুরী মহাশয় যোগ আনা জব্দ করিলেন তাহাতে আমারদিগের ঠিকা মাল গুজারির জমী জব্দ হইল তাহার জব্দ বেসী ও দর বেশী জনিত ইস্তফা দিলাম। সে জমা গনকরের রামজী মাহাতা ও দক্ষিন পাড়ার মুসলমান প্রজা মিতাব মণ্ডল ও গনি মণ্ডল গয়রহ লইলেক। ভাতুরী মহাশয়ের সাক্ষাতে। তারপর ১১৪৩ সনে ভাতুড়ী মহাশয় রাজ সহিতে তাঁর হইল শ্রীযুক্ত দয়রাম রায় মহাশয়ের আমল হইল। তাহার নিকট নালিশ করিলে পুনশ্চ ঠিকার জমি ১১৪৩ সালের শ্রাবণে বহাল হইল এবং কালিচরন বানযারার দিগের ভবানন্দ রায়ের এবং দিনেশের গোস্বামিদিগের গুজস্তা বহাল থাকিল। আমার দিগের নষ্ট চার হইয়াছিল। সে মতে জে জে লইয়াছিল তাহার দিগের মাল গুজারির মত লিখন হইল। পরে আমরা আপন দখল করিলাম। জমীর সকলকার গীদ্দ হইলে প্রস্তুত এসল লইলাম সেমতে যে যে জমী লইয়া ছিল তাহারাদিগের জিরাত খরচা পাঁচ মাহা মাসোহা আজ্ঞার প্রাণরাম চাটুর্য্য ও আত্মারাম চক্রবর্ত্তী দুইজন মানাসেক হইয়া রক্ষা করিলেন ভরত রায় দিগের ঁমন্দির দালানের পিড়াতে তাহাতে মবলগ টাকা দেয়ন হইল। টাকা দিবার সাস্থ্য হয় না সে জনিত জেষ্ঠ পিতিব্যের পুত্র জয়দেব রায়ের স্থানে বন্ধক দিলেন ৫১০ একাবর টাকাতে সাঝাতে পিতা ঠাকুর ও পিতিব্য ঠাকুর দুই ভ্রাতার দস্তখতে বাড়ীর সকলের ভাই ভগ্নের সাহির সমেত বন্ধক পত্র দিয়া টাকা লইয়া দেওয়া গেল। এই কারণ বন্ধক দেওয় গেল ফলকরা ও বাঁশ ও ডনাকইখ্যার খড় তখন এই আমলার হাল মনাফা সব বন্ধক পত্রে লিখিয়া দেওয়া গেল। তাহারাই ভোগ করিতেন। তারপর রায় মজকুরের বন্ধক আমলে ডিহি বাড়াতে বরজ পত্তন হইল। তাহাতেই কড়ি হইল। এইরূপে দশবৎসর জয়দেব রায়ের স্থানে বন্ধক থাকিল তারপর ১১৫০ সালে বানা বাই পালায়নে পদ্মাপার আয়তলপুর সকলে গিয়াছিলাম। আমরা দুই এক মাস পরে সগোষ্ঠ দেশে বাড়ী আইলাম। আমাদের নিজ পরিজন আর সাহের রাম শর্ম্মাদিগের পরিজন ইহারা তথাতে থাকিল পরে ইস্তক আষাঢ় নাগাইদ আশ্বিন তথাতে থাকিয়া মাহে কার্ত্তিক আপন নিজ পরিজন সহিত বিনোদে আপনা জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তীর অনুজ শ্রীযুক্ত রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে গিয়া থাকিলা। আমি ও গোকুলরাম দুই জন সমভ্যারেতে থাকিলা আমিও বাড়ী হইতে আতায়াত করি। পরে কয়েক মাস পরে আমাকে কইলেন আপনাদিগের বড়ই অগ্রজ জয়দেব রায় দাদা স্থানে গড়বাড়ী বন্ধক থাকিল তাহার বন্ধকে বরজ পত্তন হইয়াছে। [illegible] রায় মজকুরকে জিজ্ঞাসা বুঝাইয়া সমস্তে আমরা লিখিয়া দিয়াছি [illegible] ভোগ করেন। বরজের যে খাজনা পয়দা হয় সন সন [illegible] মজুরা দেন। [illegible] না করেন আমার বৈবাহিক [illegible] সহিত কথা হইয়াছে। স্থির করিয়াছেন রায় মজুকরকে [illegible] করিয়া তাহার নিকট হইতে লইয়া তোমার বন্ধক পত্র [illegible] ও আমি তাহার টাকা আপন জিম্মা করিয়া লইতেছি [illegible] বাড়ীর খাজনা ও [illegible] মহাজনের টাকা আদায় [illegible] বাড়ী [illegible] খালাস হইবেক। সে কুটুম্ব আমার [illegible] করিতেছে। [illegible] তাহাকে নিজে টাকা না লাগে [illegible] ছাড়িয়া দিবেক। এই পরামর্শ হইল তখন আমার [illegible] অবিদ্যমান। আমাকেও কথা কাচ হইল। পরে [illegible] আসিয়া রায় মজুরকে এই সমাচার কহিল সে কথা [illegible] করিলেন না। পরে [illegible] নগর গিয়া সরকার মজকুরের [illegible] কথায় গেল। রায় মজকুর। এ বন্দোবস্ত কবুল করিলেন না পরে সরকার মজকুর দিগের গড় বাড়ীর বন্ধক পত্র [illegible] আমার নিকট [illegible] তোমার টাকার জিম্মা করিব। [illegible] অনুসারে জয়দেব রায়ের বড় নগর পহুছিলা। [illegible] মোকাবিলা করিয়াছিলাম। আমারদিগের বন্ধকপত্র [illegible] স্থানে সরকার মজকুর লইলেন, টাকা কিছু নগদ দিয়ে [illegible] করিলেন। বাকী টাকার আদায় করিলেন। [illegible] টাকা [illegible] রায় [illegible] দিয়াছিলা। [illegible] পুত্র শ্রীযুক্ত [illegible] রায়ের [illegible] খাজনা [illegible] দিবস দখল করিলেন, এই মবলক টাকার [illegible] মজকুর যে [illegible] টাকা আবজুব লইয়াছেন, [illegible] দিয়াছেন [illegible] তাহাকে সুবাদে করক [illegible] বন্ধকদার স্থানে দূর করিলে জানিবে। বন্ধক [illegible] আমারা ঐ বন্ধক [illegible] আসিয়া প্রত্যুক্ত লইবেন। [illegible] তাহারদিগের অবশ [illegible] তাহারদিগের দুই চারি [illegible] তসরূপ করিলেন। তাহা যে জব্দ করিলেক, স্থির সকলি [illegible] আমি বিনা বন্ধকে [illegible] কাজেশ [illegible] দুই করি লইলে বন্ধকে মোটের দিয়ে [illegible] আমার [illegible] পাড়ার শ্রীযুক্ত [illegible] রায়ের স্থানে [illegible] লইয়াছি। [illegible] খাজনা লই নাই। এই পুনশ্চ [illegible] একত্রা বন্ধকদার বড়নগর মোকামে হইলা ১৫ বৎসর মধ্যে [illegible] আমল এই ১১৪৩ সাল নাগাইদ ১১৫৪ সাল এই ২০ বৎসর [illegible] বন্ধকের আমলে আছে। ইতিমধ্যে বড়নগর মোকামে [illegible] সরকারের পুত্র শ্রীযুক্ত [illegible] সরকার সহিত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ও নওয়া নগরের ঠাকুর শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] রায় কহিলাম আমাদের গড়বাড়ী [illegible] থাকিল। মুরব্বিয়াকুল সকল সদয় হইলা। [illegible] সকলে গেলা। আমি আছি। শরীর অশান্ত হইল [illegible] কে জানেন। জয়দেব রায় বাবদ বন্ধকপত্র তোমার [illegible] আছে, তাহা আমার তোমারদিগে সহিত যে করার আছে [illegible] মত কর জানই নতুবা তাল মন্দো যে রক্ষা করিয়া দেন তাহা

রক্ষা হয়। অনেক কাল গেল আমারদিগের কেবল খনাবাড়ী লইয়া বিষয় আছে। তুমি কুটুম্ব সাহাঝ্য করিবা। এ কারণ ভাই ভাদ্রস্থানে ছাড়াইয়া তোমারদিগের স্থানে রাখিয়াছি কইলেন ভাল পত্র আনাইব। তারপর পত্র আনাইলেন না। আমরা তখন পারে থাকি। তারপর সরকার মকুকর বড়নগরের প্যাদা করিয়া আপন ভগ্নীপতি শ্রীজয়চন্দ্র মুখুয্যাকে সঙ্গে নিয়া গনকর পাঠাইলেন। সে ৭।৮ দিবস গনকরে থাকিয়া গড়বাড়ীর বরঞ্জের জোতদার বারই সকলের স্থানেই ১১৫৮ সাল ১১৬১ সাল ৪ সনের খাজনা বাকী ছিল তাহা লইয়া দর্পনারায়ণ সরকারের পুত্র শ্রীরামগোপাল সরকারের নামে নির্ব্বাহ করিয়া খাজনা লইয়া গেল। তারপর আমরা পরাপার হইতে সপরিবারে গনকর আইলাম, সে অবধি এওজা বন্দকদারকে রক্ষা কারণ দখল দিয়া বন্ধকদার সাক্ষ আদাআদি করিয়াই সন ১১৬২ সন নাগাদ আমি ভসরূপ করিতেছি। একদফা বন্ধকের সমাচার এবং পিতামহি ঠাকুরাণীর পুষ্করণি ও বাগিচা বাড়ী মায় বৃক্ষ আমার পিতাঠাকুরের কর্ম্ম ১১৪৫ সনে বানয্যাদিগের স্থানে আমার দস্তখত পিতিব্যের দস্ত আছে। অংশ নিরূপণ হইয়া থাকে সে বন্ধকপত্রে মজমলে জানিবেন গরবাড়ী বন্ধকের এই বিবরণ তজবিজ অনুসারে বুঝিবেন, তারপর আমার পিতা ও পিতিব্যঠাকুরে স্ত্রিলোকের মতান্তরে কেবল অন্ন পৃথক আর নেস্তবিল এবং স্থাবরাদি সকল অবিভক্ত সাধারণে আছে। উচিত বিচার করিবেন ইতি ১১৬৫ সাল মাহ ভাদ্র।

কোনো খেদ নেই

শ্রীদীপ্তি সেনগুপ্তা

কোনো খেদ নেই,—আদিগন্ত সাহারার মরুভূমি
যদিও ইংগিত আনে ধূসর জীবনের।
সবুজ স্বপ্নিল ঘুম, মিঠে রাত ;
যদি যায় যাক্। ব্যর্থ স্বপনের
ঘুম-ভাঙা রাতে যবে—'ওয়েসিস' ডাকবে আমাকে,
বলে দেব 'সাথী' তুমি পেয়েছো যে খুঁজে—
রিক্ত রাত্রি আসে যদি সে থাকবে শুধু মোর তরে।'

স্মৃতির দেহলীতে যে স্বগীতি রয়েছে লুকানো
তার দ্বার খুলো না কো।—রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
কী দিয়েছে তোমার রাত্রিরে? তোমার মুখের হাসি,
দু'টি কথা লেগেছিল ভালো মোর জানি।

কালো হাওয়া, ধূলি-ঝড় সব গেল নিয়ে।
রিক্ত আমি, পূর্ণ তুমি ; রাত্রির শিশিরে
তোমার চলার ছন্দ পরিপূর্ণ আপনার গানে।
শূন্য করে রেখে গেলে প্রীতিঘন আমার রাত্রিরে।

তবু বলি খেদ নেই, শ্যামল প্রান্তর দেখি আমি
ঝড়ো হাওয়া বলে যায় হে পথিক একান্ত একাকী
চলে যাও তোমার সর্পিল গতিপথে।
বেদনা মিলায়ে দাও: তুলে নাও রক্তরাঙা রাখী।

চারজন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[বর্তমান বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থটি এবার গত তিন বছরের মধ্যে রচিত শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্য হিসাবে ভারত সরকারের একাডেমী পুরস্কার লাভ করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই সম্মানে বাংলার সাহিত্যামোদী জনসাধারণ আনন্দিত হবেন। বাংলা সাহিত্যে শরৎ যুগের শেষে যাঁরা একদা বিদ্রোহ করেছিলেন কল্পনাবিলাসী সাহিত্যের বিরুদ্ধে, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই বিদ্রোহীদের প্রধান। বাংলা সাহিত্যে তিনি একদা যুগান্তর এনেছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার লাভেরও গৌরব অর্জ্জন করেন।

১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে বাংলার বাইরে সুদূর কাশীতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র। আটের ঘরে পা দিয়েছেন। তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে উত্তরপ্রদেশ, বীরভূম ও কলকাতায়। কলকাতার সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন।

ছেলেবেলায় অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমেন্দ্র মিত্র মা'য়ের মুখে শুনতেন রূপকথা আর রামায়ণ মহাভারতের গল্প। তখন থেকেই বুঝি মনে মনে গল্প লেখার অস্পষ্ট আয়োজন চলছিল। খুব ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যের দিকে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল, ভাল-মন্দ সব রকম বইয়েরই তিনি একরকম পোকা ছিলেন বললেই হয়।

চৌদ্দ বছর বয়সে একদিন ডি. এল. রায়কে নকল করে হিমালয় সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখে ফেললেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়েন তিনি তখন। ক্লাসের মধ্যে বাংলার পণ্ডিত মশাই হঠাৎ কবিতাটি দেখে ফেললেন এবং পড়ে একেবারে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু কিশোর প্রেমেন্দ্রের নবার্জ্জিত কবিখ্যাতি সেইদিনই অকস্মাৎ হতাশায় পর্য্যবসিত হয়। স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবের ভিতর দিয়ে তিনটি ছাত্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। স্কুলের ছুটির পর বন্ধু তিন জন মিলে তাঁর কবিতাটিকে সমালোচনার কাঁচিতে কেটে একেবারে কুটি কুটি করে দিল। তাদের সমালোচনায় ঈর্ষ্যা ছিল না বলে কবিতাটির আসল চেহারা তখন প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছেও আর অস্পষ্ট রইল না। বন্ধু তিন জন শুধু সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হল না, ভাল কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যও চেষ্টার কোন ত্রুটি করল না। বন্ধুদের সমালোচনা ও উৎসাহে লেখার আগ্রহ সেই প্রথম তাঁর ওপর চেপে বসল। খাতার পর খাতা ভর্ত্তি হয়ে উঠতে লাগল তাঁর 'কবিতায়'। কিন্তু কাগজে লেখা ছাপতে দেবার কোন আগ্রহ তখনও তিনি অনুভব করেন নি। শুধু দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পড়িয়েই তৃপ্ত হতেন।

যথাসময়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্কুলের পড়া শেষ হল। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরী হন। কিন্তু তখনকার দিনে ষোল বছর না হলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া যেত না। কাজেই পরের বছর তিনি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন।

ঠিক এই সময়েই সারা দেশ জুড়ে এল অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা। প্রেমেন্দ্র মিত্রও এই বন্যার স্রোতে ভেসে গেলেন। এক বছর পর যদিও আবার কলেজে এসে ভর্ত্তি হলেন, কিন্তু পরীক্ষা কাছাকাছি আসতেই আবার পড়া ছেড়ে দিলেন।

কবিতার স্রোতেও ইতিমধ্যে ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। এর পর তিনি ঢাকায় আসেন এবং ডাক্তারী পড়বার উদ্দেশ্যে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আই-এস-সি পড়তে আরম্ভ করেন। সাহিত্য কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খোঁজ রাখেন বটে, কিন্তু সে শুধু পাঠকের কৌতূহল নিয়ে।

ঢাকায় পড়বার সময়েই একবার গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে প্রেমেন্দ্র মিত্র কলকাতায় এলেন। কলকাতার এক নগণ্য গলিতে বহুকালের পুরানো এক ভাড়া বাড়ীর মেসে এসে উঠলেন তিনি। মেসের অধিকাংশ বাসিন্দাই ছিল কেরাণী। সপ্তাহে ছ'দিন কলকাতায় চাকরী করে বেশির ভাগই শনিবার বিকালের ট্রেনে বাড়ী চলে যায় একদিনের ছুটি উপভোগ করতে। শনিবার রাত্রে মেস তাই একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়।

এমনি এক শনিবারের নিস্তব্ধ রাত্রিতে এই কেরাণীদের কথাই লিখবেন বলে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। আর লিখলেন এক কেরাণীর গল্প। গল্পের নাম দিলেন 'শুধু কেরাণী'। সেই রাত্রেই গল্পটা লিখে ফেলে পরের দিন সকালেই সেটা সোজা পাঠিয়ে দিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকায়।

মনে মনে অবশ্য বেশ জানতেন যে, ব্যাপারটা এখানেই শেষ। একেবারে নতুন লেখকের এরকম গল্প যে 'প্রবাসীর' মত পত্রিকায় ছাপা হতে পারে তা তিনি আশাও করেন নি। তাই বিশেষ কোন আশা বা উদ্বেগ না নিয়েই ছুটি শেষ হলে তিনি ঢাকায় ফিরে গেলেন। সেখানে যখন মাসের পর মাস কেটে গেল, তখন গল্পটির পরিণাম সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই রইল না।

কিন্তু প্রায় ছ'মাস পর একদিন 'প্রবাসী' খুলে তিনি বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর 'শুধু কেরাণী' গল্পটি প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে। তারপর বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় এলে তাঁর সেই বিস্ময় ও আনন্দ আরো বেড়ে গেল এই দেখে যে, তাঁর এই প্রথম প্রকাশিত গল্পটি নিয়ে 'কল্লোল' পত্রিকায় এক দীর্ঘ সুখ্যাতি-মূলক সমালোচনা বেরিয়েছে। সাহিত্য-জীবন সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করবেন কি না এবিষয়ে তাঁর মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল তা কেটে গেল।

অল্পকালের মধ্যেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় গল্প 'গোপনচারিণী' প্রকাশিত হল। তখনকার সাহিত্য-জগতে 'শুধু কেরানী' ও 'গোপনচারিণী' এই দুটি গল্পই গভীর কৌতূহল ও আগ্রহ জাগায়। 'কল্লোল' পত্রিকা এই 'গোপনচারিণী' গল্পটি সম্পর্কেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসাজ্ঞাপক প্রবন্ধ লিখে অভিনন্দন জানায়।

ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিদারুণ অর্থকষ্ট সুরু হয়েছিল। এমনও হয়েছে যে, টেস্ট পরীক্ষার পর পরীক্ষার ফি-র টাকা জোগাড়ের জন্য তাঁকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। গোটাত্রিশেক টাকার একটা চাকরী জোটাতে পারলেও বেঁচে যান এমনও হয়েছে তাঁর অবস্থা।

এই অবস্থায় সাহিত্য-জীবনের প্রথম দিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেন। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠায় কিছুকাল পরে তিনি শৈলজানন্দের সাহায্যে 'কালিকলম' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই তাঁকে এখান থেকে সরে দাঁড়াতে হয়, কারণ পত্রিকা চালাতে গিয়ে তাঁকে লাভ তো দূরের কথা, আর্থিক ক্ষতিই স্বীকার করতে হচ্ছিল।

পরবর্তী জীবনে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্রকে অনেক পথই পরীক্ষা করতে হয়েছে। টালিখোলা থেকে স্কুল-মাষ্টারী, ওষুধের বিজ্ঞাপন লেখা থেকে সংবাদপত্র-সম্পাদনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-গবেষণার সহকারিতা কিছুই তিনি বাদ দেন নি। জীবিকা নির্বাহের জন্য এই ভাবে নানা রকম পেশা গ্রহণ করতে হওয়ায় মানুষের জীবনকে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভালভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন, ঘুরে বেড়াতে পেরেছেন বহু বিচিত্র মানুষের মনের গহন অরণ্যে।

আর তার পরিচয়ও আমরা পাই তাঁর সাহিত্যে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য তাঁর জীবন-কাহিনীর মতই বিচিত্র। বস্তি-জীবন নিয়ে, সহরের নিম্ন-মধ্যবিত্তদের জীবনের অসহ্য গ্লানি ও কুশ্রীতা নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন তিনি। এদিক দিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার বোধ হয় তুলনা নেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'পাঁক' তাঁর মাত্র ষোল-সতের বছর বয়সে লেখা। পরবর্তী পনের বছরের মধ্যে তিনি যে-সব গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: বেনামী বন্দর, কুয়াশা, নিশীথ নগরী, উপনায়ন, মৃত্তিকা, মিছিল ও পুতুল ও প্রতিমা।

গল্প ও উপন্যাস রচনা ছাড়া, কবি হিসাবেও প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' পড়ে ভুল হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলে। 'প্রথমা', 'সম্রাট' ও 'ফেরারী ফৌজ' একদা বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করে। এছাড়া শিশু-সাহিত্য রচনায়ও তিনি তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্য সম্পূর্ণ মৌলিক ও উঁচু দরের রোমাঞ্চকর গল্প তিনিই প্রথম লিখেছেন।

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার পর প্রেমেন্দ্র মিত্র ছায়াচিত্রের দিকে আকৃষ্ট হন এবং কয়েকটি চিত্রের পরিচালক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জ্জন করেন। সিনেমার গল্প রচনায় তিনি একাধিক বার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান লাভ করেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কিন্তু ছায়াচিত্র-জগতের সংগে জড়িত থাকলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বদাই সজাগ ছিল। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার রহস্যময় পিরিমন আবার সৃষ্টির প্রেরণায় মেতে উঠতে দেরী হল না।

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

[ভারতবরেণ্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক]

যে সকল দেদীপ্যমান তারকার জ্যোতির ঔজ্জ্বল্যে ইতিহাসের আকাশ আলোকিত সেই রশ্মিধর বঙ্গ সন্তানদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের নাম। ইতিহাসের গুরুত্ব দেশ ও দশকে দিয়ে উপলব্ধি করানো, তার গরিমা সম্বন্ধে দেশ ও জাতিকে সচেতন করে তোলার মধ্যেই এঁদের জীবনের প্রধান বক্তব্যটুকু নিহিত। ইতিহাসের উপাদান দিয়েই রচিত হয়েছে এঁদের জীবনের ইতিহাস।

বঙ্গদেশে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দারপাড়া গ্রামে মজুমদারদের আদিনিবাস। পরলোকগত হলধর মজুমদার মহাশয়ের ছেলে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। আজ থেকে ঠিক সত্তর বছর আগে। জীবনের ভোরবেলাটা স্বগ্রামেই অতিবাহিত হ'ল। প্রকৃতির মধু অঙ্কে, সবুজের সমারোহে, সুনীলের সৌন্দর্যে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ দেখা দিল। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হ'ল, এল বিংশ শতাব্দী—এক শতাব্দীর পর আর এক শতাব্দী। বয়েস তখন বারো। জীবনের ভরা একটি যুগ সবে তার জয়গানের সরগম সাধছে, বালক রমেশচন্দ্র ভর্তি হলেন কলকাতার সাউথ সাবার্বান কলেজিয়েট স্কুলে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তবে এখান থেকে নয়, কটকের র‍্যাভেন্স কলেজিয়েট স্কুলে। ঐ বিদ্যালয়ে সেদিন পাঠ গ্রহণ করছেন স্বর্গীয় জানকীনাথ বসুর পুত্রেরা। তাঁদের মধ্যে অবশ্য রমেশচন্দ্রের সহাধ্যায়ী কোন জনই ছিলেন না। তাঁরা ভিন্ন শ্রেণীতে করতেন অধ্যয়ন। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে কিছু দিন পাঠ গ্রহণ করে কলিকাতার রিপণ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন রমেশচন্দ্র। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করলেন এম, এ। সহপাঠীরূপে পেয়েছিলেন সুপণ্ডিত কবি ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং প্রখ্যাত বিচারপতি কে, সি, সেনকে। নিম্ন বার্ষিক শ্রেণীতে তখন অধ্যয়ন করছেন নটগুরু শিশিরকুমার, নটশেখর নরেশচন্দ্র, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার প্রমুখ বঙ্গজননীর দিকপাল সন্তানের দল। 'করপোরেট-লাইফ ইন এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া' সম্বন্ধে গবেষণা করে পি, এইচ, ডি, উপাধি লাভ করলেন রমেশ মজুমদার, এ হ'ল আনুমানিক ১৯১৮ কি ১৯ খৃষ্টাব্দের কথা। এম, এ পাশের পর ঢাকা ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করতেন রমেশচন্দ্র (১৯১৩—১৪), ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যোগদান করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবক্তা ও সহকারী অধ্যাপকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের কর্মভার গ্রহণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে দেখা গেল রমেশচন্দ্রকে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার। এর পর বারাণসী ও নাগপুরেও অধ্যাপনা করেছেন—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত ব্যাপারে রাজধানীতেও কাটাতে হয়েছে কিছুকাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে এঁর 'হিষ্ট্রী অফ বেঙ্গল।' এঁর রচিত "হিষ্ট্রী য্যাণ্ড কালচার অফ ইণ্ডিয়ান পিপলস" গ্রন্থটির পাঁচটি খণ্ড বোম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশ করেছেন—আরও পাঁচটি খণ্ড এখন প্রকাশিতব্য। "দূর প্রাচ্যে প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ" ছিল রমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবনের বিশেষ বিষয়।

ভ্রমণে রমেশচন্দ্রের অপার আনন্দ। রাশিয়া ছাড়া ইয়োরোপের প্রায় সমগ্রাংশ পরিভ্রমণ করেছেন রমেশ মজুমদার।

কেবলমাত্র গবেষণা ও অধ্যাপনা ছাড়াও ইতিহাসকেন্দ্রিক বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি জড়িত। তন্মধ্যে ইনি কেন্দ্রীয় শিক্ষাসংস্থা ও পুরাতত্ত্ব-সংস্থার উপদেশকমণ্ডলীর সভ্য, মানবতার সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস-বিকাশের আন্তর্জাতিক সংস্থার সভ্য (বর্তমানে তার সহ-সভাপতি)। এ ছাড়া নিখিল ভারত ইতিহাস কংগ্রেস ও নিখিল ভারত প্রাচ্য মহাসম্মেলনের সভাপতিরূপে দেশবাসী তাঁকে দেখতে পেয়েছে। "সিপয় মিউটিনী য্যাণ্ড দি রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভন্"ই তাঁর সর্বজন-সমাদৃত বহু মূল্যবান গ্রন্থোপহারের সাম্প্রতিকতম নিদর্শন। কয়েক মাস মাত্র আগে মুদ্রাযন্ত্রের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে এ মুক্তিলাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও ইতিহাস প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রকে প্রশ্ন
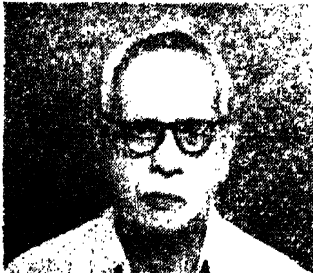
করায় উত্তর আসে—ছাত্রদের মনে ইতিহাসের বীজ বপন করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য—তাদের মধ্যে ইতিহাসবোধ জাগিয়ে তোলার। একটা সময় এসেছিল যে সময় ছাত্রদের মধ্যে ইতিহাস-সচেতনতা গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল—কিন্তু এখন নয়—এখন সেই আবেগ আবার বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। সেদিন ছাত্রদের মনে সেই যে ইতিহাসানুরক্তি দেখা দিয়েছিল তার মূলে ছিলেন একজন দেশপূজ্য পুরুষ, দেশজননীর এক কীর্তিমান সন্তান—পূজনীয় স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বাঙলার বরণীয় সন্তান রমেশচন্দ্র মজুমদার জীবনের সুদীর্ঘাংশ অংশ অতিবাহিত করেছেন ঐতিহাসিক সাধনায়। সাধনালব্ধ সিদ্ধির রশ্মিধারায় দেশ ও জাতিকে অবগাহন করিয়ে উপলব্ধি করেছেন নিজের নিরলস শ্রমযুক্ত সাধনার পূর্ণতা। ইতিহাস ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁকে অনেক প্রশ্ন করার বাসনা ছিল অন্তরে। কথোপকথন কালে লক্ষ্য করলুম তাঁর দেহযন্ত্রের উপর বৈকল্য, যা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলছিলেন শুধুমাত্র আমাদের উভয়ের আসন বহু দূরের ব্যবধানে অবস্থিত বলে (অর্থাৎ অনেক দূর থেকে তাঁর ওখানে আমি গেছি বলে)। আমিই থেমে গেলুম। নরর্ষি রমেশচন্দ্রের সহৃদয়তা, মমত্ববোধ ও নিরহঙ্কারিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দমন করলুম আমারই নিজের অদম্য কৌতূহলকে।

ডক্টর সত্যরঞ্জন চন্দ্র

[ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট সার্জেন ও অস্থিরোগ-বিশেষজ্ঞ]

অস্থিপঞ্জর, রক্ত ও মাংসে মানবদেহ গঠিত—এইটুকু সাধারণ মানুষমাত্রেই জানে। কিন্তু কত রকম ক্ষুদ্র কোমলাস্থি এবং বৃহৎ অস্থির সমন্বয়ে আমাদের দেহকাঠামো গড়ে থাকে আর উহার ব্যতিক্রমে যে দেহভার মুক্ত হয়ে যায় এবং বিকলাঙ্গ দেহকে যে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহায়তায় সুন্দর সুঠাম করিয়া পুনর্গঠিত করা যায়—তাহা অস্থিচিকিৎসা বিশারদেরাই জানেন। এই সমস্ত কথা প্রাঞ্জল ভাষায় আমায় বলছিলেন তাঁহার নিজস্ব পরিপাটী নিদানশালায় ভারতের অন্যতম অরথোপেডিক্ সার্জেন সদাকর্মব্যস্ত ডক্টর এস, আর, চন্দ্র।

স্বর্গীয় ডাঃ ফকিরচন্দ্র চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জন ১৯০৮ সালে স্বগ্রাম উলুবেড়িয়াতে (হাওড়া জিলা) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৭ সালে কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ হইতে আই, এস-সি পাশ করেন। ১৯৩৩ সালে কলিকাতা মেডিকেল হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া তথায় বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ এল, এম, ব্যানার্জির সহকারী হন। কিছুদিন পরে তথাকার বিখ্যাত কর্ণ-নাসিকা-কণ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জুডার (Juda) সহকারী হিসাবে যুক্ত হন। ইতিমধ্যে ডাঃ চন্দ্র Bone Surgery-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু পরাধীন ভারতে উহা শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকায় ১৯৩৫ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে গমন করিয়া লণ্ডন সেণ্ট বার্থোলিউম হাসপাতালে যোগদান করেন। পরবৎসর তিনি L. R. C. P. (London) M. R. C. S (England), ১৯৩৭ সালে F. R. C. S (Edinbourgh),

১৯৩৮ সালে কয়েক মাসের ব্যবধানে F. R. C. S (England) এবং Master of Surgery in Orthopaedic (লিভারপুল) পরীক্ষাগুলি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। সেই সময় ডাঃ বীরেন নিয়োগী (ডি, ভি, সি, প্রধান চিকিৎসক), ডাঃ বি কে দাশগুপ্ত (চক্ষু চিকিৎসক, ভারতের আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার শ্রীঅশোক সেন, ভূতপূর্ব্ব সিভিলিয়ন ব্যারিষ্টার শ্রীঅরুণ মুখার্জি ও সত্যরঞ্জন বিলাতে গাওয়ার ষ্ট্রীটস্থ ভারতীয় ছাত্রাবাসে একত্রে মিলামিশা করিতেন এবং বর্ত্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেনন ইঁহাদের নিয়মিত দেখাশুনা করিতেন।

১৯৩৯ সালে দেশে ফিরিয়া ডাঃ চন্দ্র ক্যাম্বেল (বর্ত্তমানে (N. R. Sarker) হাসপাতালে যোগদান করেন। এক বৎসর পরে তিনি মেডিকেল কলেজে কর্ণেল এণ্ডারসনের ডেপুটী হিসাবে চলিয়া আসেন। ১৯৪৫ সালে সরকারী পর্য্যায়ে উহাতে পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ অরথোপেডিক্ বিভাগ উদ্বোধিত হইলে সত্যরঞ্জন প্রধান চিকিৎসকরূপে উহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন যে উক্ত বিভাগ সাধারণ সার্জ্জারী হইতে পৃথকীকরণ ব্যাপারে তৎকালীন বিদেশীয় চিকিৎসকদের অসম্মতি ও লীগ মন্ত্রিসভার অনমনীয় মনোভাব অন্তরায় হয়। কিন্তু ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের তদানীন্তন সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সত্যরঞ্জনের বহুদিনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। তিনি আরও জানান যে, তাঁহার উপর প্রথম হইতেই ডাঃ রায়ের স্নেহদৃষ্টি পতিত হয় এবং অদ্যাবধি উহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

১৯৫৯ সালে মেডিক্যাল কলেজ হইতে পদত্যাগ করিয়া ডাঃ চন্দ্র অরথোপেডিক চিকিৎসা অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলনের জন্য একটি নিজস্ব ক্লিনিক খুলিতে মনস্থ করেন। শহর কলিকাতায় স্থানাভাব ও আনুষঙ্গিক অসুবিধা সত্ত্বেও নিরস্ত না হইয়া ১৯৫৫ সালে তাঁহার স্বপ্ন-সাধনা বিশ শয্যা সমন্বিত নিজস্ব নিদানশালা খুলিতে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রেসিডেন্সী জেনারেল (বর্ত্তমানে S. S. K. M.) হাসপাতালে তাঁহাকে অবৈতনিক চিকিৎসক এবং স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করেন।

ডাঃ চন্দ্র বলেন যে, অস্ত্রচিকিৎসক যদি নিয়মিত কোন হাসপাতালে সংযুক্ত না থাকেন, তবে তাঁহার খুবই অসুবিধা দেখা দেয়। নিজস্ব নিদানশালায় গত দুই বৎসরে নানা বয়সের পঙ্গুদের নিজস্ব ভঙ্গীতে চিকিৎসা মারফৎ সুস্থ করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে তিনি খুবই আনন্দিত। সেই সঙ্গে বহু পরিবারের মুখে তিনি হাসি ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, নিজ দেশ সর্ব্বদিকে দিন দিন উন্নত হোক ইহা তিনি সর্বসময়ে কামনা করেন। বিগত কয় বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসার যে সুব্যবস্থা হইয়াছে তাহা রাজ্যের কর্ণধাররূপে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে পাওয়ার জন্য সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন।

অবসর সময়ে তিনি নানারূপ পুস্তকপাঠ ও গানবাজনার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রাখেন। কলিকাতা কর্ম্মকেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও

সত্যরঞ্জন চন্দ্র

স্বগ্রাম উলুবেড়িয়ার কথা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরূক থাকে এবং সুযোগ পাইলে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সন্দর্শনে তথায় গমন করিয়া থাকেন।

শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

[শিল্পপতি সভাপতি, মিল-মালিক-সঙ্ঘ]

ঐকান্তিক আগ্রহে ও সততার গুণে যে চাকুরীজীবী বাঙ্গালী পরিবার স্বদেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়ে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতে পারেন, বঙ্গীয় মিল-মালিক-সঙ্ঘের (B. M. A) বর্ত্তমান সভাপতি বস্ত্র-শিল্প বিশেষজ্ঞ শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর বংশ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার পিতামহ স্বনামধন্য ৺মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী নদীয়া জেলার (বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের কুষ্টিয়া জেলা) কুমারখালি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ৺জলধর সেন তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মোহিনীমোহন জেলা শাসকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যখন গরাই নদীর সন্নিকটে কুষ্টিয়া সহরে বসবাস করিতে থাকেন, তখন বোম্বাই প্রত্যাগত তাঁহার পুত্র গিরিজাপ্রসন্ন গৃহে বস্ত্র উৎপাদনের জন্য পিতাকে অনুরোধ করেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মোহিনীমোহন তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সহায়তায় আটটি হস্তচালিত তাঁতে কর্ম্মারম্ভ করেন। সেই সময় অর্থাৎ ১৯০৬ সালে স্বদেশী-আন্দোলন সুরু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা স্বেচ্ছায় তাঁতজাত বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে থাকেন। চাহিদা মিটানর জন্য তিনি সত্বর তাঁতের পরিবর্ত্তে স্বল্প পরিসরে বাষ্পচালিত বয়ন যন্ত্র স্থাপিত করেন। প্রথম বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত অথাৎ ক্ষুদ্র বস্ত্র কল পরবর্ত্তী কালে "মোহিনী মিলস্" নামে উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যে ভারতখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে ক্রমে ২ নং মিলস, শ্রীঅন্নপূর্ণা মিলস, মাকু তৈয়ারীর কারখানা, ক্যালেণ্ডারিং ও ফিনিশিং মিলস, হোসিয়ারী মিলস ইত্যাদি মোহিনীমোহনের বংশধর চক্রবর্ত্তী পরিবারের তত্ত্বাবধানে গড়িয়া উঠে। শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম বিশিষ্ট কর্ণধার।

৺গিরিজাপ্রসন্নের পুত্র শ্রীতারাপ্রসাদ ১৯১০ সালে মাতুলালয় ময়মনসিংহ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা হিন্দু স্কুল হইতে

শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ হইতে আই, এস-সি পাশ করেন। ১৯২৯ সালে পিতার নির্দ্দেশে তিনি মোহিনী মিলে যোগদান করেন এবং বয়নশিল্পে হাতে-কলমে শিক্ষার জন্ম বোম্বাই ও আমেদাবাদে প্রেরিত হন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি বস্ত্র কলের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মধারা সুনিপুণ ভাবে আয়ত্ত করিয়া আসেন। কুষ্টিয়া মিলে ভালানী ও হোসিয়ারী সূতার অভাব অনুভূত হওয়ায় গিরিজাপ্রসন্ন কলিকাতার সন্নিকটে শ্যামনগরে অপর একটি বস্ত্রকল স্থাপনার জন্ম তারাপ্রসাদকে ভার দেন। তৎকালীন মুসলীম লীগ সরকারের নানা বিধিনিষেধ ও বিরূপতা সত্ত্বেও ১৫০ তাঁত ও ৯০০০ টাকু সহযোগে ১৯৪৬ সালে উক্ত মিল স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি ভ্রাতৃগণের সহায়তায় পূর্ব্বাঞ্চলে মাকু তৈয়ারীর একমাত্র কারখানা, ক্যালেণ্ডারিং মিলস, ফিনিশিং মিলস, হোসিয়ারী মিলস ও অন্যান্য বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে শ্রীচক্রবর্ত্তী জাপানে গমন করেন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি স্থানীয় যুদ্ধোত্তর বস্ত্রশিল্পের কর্ম্মপদ্ধতি সাগ্রহে লক্ষ্য করেন এবং বিশিষ্ট জাপানী শিল্পপতি ও যন্ত্র নির্ম্মাতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। অধুনা তন্মধ্যে কেহ কেহ ভারতে আসিলে তারাপ্রসাদের সহিত তাঁহাদের শিল্প সম্বন্ধীয় আলাপ-আলোচনা হইয়া থাকে।

বস্ত্রশিল্পে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতার ফলে ১৯৫৭-৫৮ সালে তাঁহাকে বঙ্গীয় মিল-মালিক-সঙ্ঘের (Bengal Millowners' Association) সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। গিরিজা-প্রসন্নও উক্ত সঙ্ঘের সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তারাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় তুলা সমিতির পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি, জাতীয় শিল্প-উন্নয়ন করপোরেশনে টেক্সটাইল প্যানেল ও জোন এডভাইসারী কমিটি, কটন এডভাইসারী বোর্ড, ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউট, টেক্সটাইল ট্রেডস মার্ক কমিটি, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ইকনমিক এফেয়ার্স ও অন্যান্য বহু শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত রহিয়াছেন। দেশবিভাগের পূর্ব্বে তিনি পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় কটন টেক্সটাইল এডভাইসারী কমিটি, সভা ও পূর্ব্ববঙ্গ মিল-মালিক সমিতির সহ সভাপতি ছিলেন।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের কথায় শ্রীচক্রবর্ত্তী মন্তব্য করেন যে, প্রকৃত দরদ, ভাতৃভাব ও মানবতা-বোধ লইয়া মালিকপক্ষ শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ করিয়া "শিল্পে শান্তি" রক্ষা করিতে পারেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বাহিরে শ্রমিক পক্ষ সুস্থ সঙ্ঘ (Trade Union) গঠন করিতে পারেন। বস্ত্রশিল্পে যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি প্রচলন (Rationalization) সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রপ্তানী বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় যুক্ত থাকিতে ও স্বদেশে সস্তায় সরবরাহের জন্ম উহার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। তজ্জনিত কর্ম্মরহিত ব্যক্তিদের শিল্প-সম্প্রসারণে পুনর্নিয়োগ করা যাইতে পারে। বৃটিশাধীন হিসাবে তাঁতবস্ত্রের প্রসারতা সম্বন্ধে তিনি জানান যে, শোভন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্ত্রাদি উৎপন্ন করিয়া স্বদেশ ও বিদেশের চাহিদা মিটাইতে তন্তুবায় সম্প্রদায় প্রকৃত উপযুক্ত হইবে, কিন্তু উহার মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় মিলজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁতশিল্পের অসুবিধা হইতেছে। আবার এইরূপ অসম প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষণার জন্ম কেন্দ্রীয় সরকার মিলগুলির উপর নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ করায় সাধারণ বস্ত্রাদির উচ্চমূল্য পড়িতেছে।

তারাপ্রসাদ মনে করেন যে, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহে জাপান ও পশ্চিম জার্ম্মাণী সক্ষম। তবে এশিয়ার অন্যতম উন্নত দেশ জাপানের সাহায্য ভারতের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে। কারণ, উক্ত দেশ অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট জিনিস রপ্তানী করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত জাপানের বেকার সমস্যা সমাধানের পথ ভারতবর্ষ গ্রহণ করিতে পারে।

সম্প্রতি "বিলম্বিত পরিশোধ প্রথায়" (Defered Payments) যন্ত্রপাতি আমদানী সম্বন্ধে ভারত-জাপান চুক্তিকে শ্রী চক্রবর্ত্তী স্বাগত জানান।

আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, সরকারী স্তরে (Public Sector) শিল্প পরিচালনা ভাল, কিন্তু ভারতে যে কয়টি শিল্প সরকারী তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই—তজ্জন্য বস্ত্রশিল্পে বর্ত্তমানে বেসরকারী পর্য্যায়ে (Private Sector) থাকা শ্রেয়ঃ।

সদালাপী, কর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ম্মদক্ষ তারাপ্রসাদ তাঁহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মীদের মধ্যে নিজগুণে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন।

• • • এ মাসের প্রচ্ছদপট • • •

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি পেখমধারী ময়ূরের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্র মধুসূদন মুখোপাধ্যায় গৃহীত।

উনত্রিশ

আজকে পিছন ফিরে তাকালে মঞ্জরীর মনে কোনও দ্বিধা থাকে না আর। সেই ক'টি দিনই তার অভিনেত্রী জীবনের অবিস্মরণীয় দিন। আজ খ্যাতি, অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এসে গেছে হাতের মুঠোয়। সেদিন হাতের মুঠো ছিলো শূন্য। তবু সেই ক'টা দিন। শ্রীকৃষ্ণ দত্তর নেতৃত্বে জীবনের প্রথম বড় ছবি কবি কালিদাস, অনসূয়ার ভূমিকায় নেবে নিজেকে পেঁচী মঞ্জরীর পঙ্কিল আবর্ত থেকে তুলে ধরে সূর্যমুখী করার স্বপ্নে আকুল করা সেই ক'টা দিন,—নানা রঙের সেই দিনগুলো সোনার খাঁচায় থাকেনি সত্যি কিন্তু তবু তারা হতাশ জীবনের ব্যর্থ ধিক্কারের সব ফাঁকি ঢেকে দিতে না পারুক, কিছু ফাঁক পূরণ করে দিয়ে গেছে বৈ কি! আজ টলিউডের রঙ্গতীর্থে অবিসম্বাদী অভিনেত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত মঞ্জরী দেবীর নিশ্চয়ই নিজের ছবির শুটিং বন্ধের সাময়িক বিরতি কালীন অবসরের মুহূর্তে মনে পড়ে সেই অলৌকিক অবিশ্বাস্য প্রথম বড় ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর রোমাঞ্চিত অধ্যায়ের কথা। যে অধ্যায় জীবন-গ্রন্থে বার বার পড়েও পুরানো হয় না। যে অধ্যায় প্রতিবার পড়বার সময় মনে হয় প্রতিবারই বুঝি এই প্রথম পড়া। অভিনেত্রী-জীবনে প্রথম ভূমিকা, নারীজীবনের প্রথম প্রেমের মত। ভয়, লজ্জা, আত্মবিশ্বাসের অভাব অথচ আঁকড়ে ধরার সুতীব্র আকুতি,—এবং সর্বোপরি জীবনে আর দ্বিতীয় বার প্রত্যাবর্তন না করার সম্ভাবনায় অদ্বিতীয় প্রথম প্রেমের মতই প্রথম ভূমিকাও মহৎ।

আজ অভিনেত্রী-জীবনের সন্ধ্যায় নূতন মানুষের নূতন গলায় গানের ঝরণাতলায় বসে কখনও কখনও তাই কর্মব্যস্ত মঞ্জরী দেবীকে হঠাৎ হারিয়ে যেতে দেখে অবাক হয় টলিউডে সদ্য-আগত তরুণ-তরুণীরা। কাজের ফাঁকে কখন মঞ্জরী নিজেও জানে না, নিজেকে হারায় সে। বিহ্বল হয়ে পড়ে। উন্মনা। সব কিছু মনে হয় অর্থহীন। অনাবশ্যক। প্রয়োজনের অতিরিক্ত। জীবনের খেলায় জাল ফেলা এবং জাল গুটানো,—দুই-ই তার শেষ হয়ে গেছে। এখন তার নতুন করে আশা অথবা নতুন করে হারাবার ভয় কিছুই আর নেই। যা যা চেয়েছিল মঞ্জরী তা-ই তা-ই পেয়েছে সে। বেশীই পেয়েছে। অর্থ, সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা। শিল্পী হিসাবে সারা ভারতে স্বনামধন্যা মঞ্জরী ছবি প্রযোজনার ক্ষেত্রেও সাফল্যের পর সাফল্যের সিঁড়ি চলেছে পেরিয়ে। ভারতবর্ষ দেখা হয়ে গেছে ত বটেই : দেশের বাইরে বিদেশেও উড়ে গেছে এবং সেখান থেকে উড়ে এসেছে। দাতব্যও করেনি কম। বাড়ী, গাড়ী, শাড়ী, গয়না,—সে সবের তালিকায় আবদ্ধ আছে; শেষ নেই। প্রযোজনার গুরুদায়িত্বও সে স্বচ্ছন্দে যে কারুর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত বসতে পারে। এখনও যে সে প্রযোজনার প্রত্যেকটি কাজ নিজের হাতে নিয়ে রেখেছে সে শুধু কাজের নেশায়। ভয় হয়। কাজ ফুরিয়ে গেলে, নেশা শেষ হলে তার পর? তার পর যে অফুরন্ত শূন্য, তাকে ভরাবে কি দিয়ে? তাই শিল্পীর জীবন শেষ হয়ে আসতে না আসতে সুরু করেছে প্রযোজনার অধ্যায়। সেই নিরলস কর্মব্যস্ত অধ্যায়েরই মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে। মঞ্জরীর ভুল হয়ে যায় কাজ। অতীত এসে দাঁড়ায় সামনে। সেই অতীত স্মৃতি রোমন্থনেই আজ তার যা কিছু রোমাঞ্চ। না হলে ভবিষ্যৎ তার জানা; বর্তমান সাফল্যে, নিশ্চিন্ততায়, নির্ভরতায় বিস্বাদ

নীলকণ্ঠ

হয়ে গেছে। সেই অতীত যখন মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ায় সামনে, তখনই মঞ্জরী যেন নিজের মধ্যে আর থাকে না। অথবা নিজেরই অনেক গভীর অন্তঃপুরে নিঃশব্দে অনুপ্রবেশ করে; আর বেরুতে চায় না সহজে। শামুক ঢোকে খোলের মধ্যে।

আজ টলিউডের রঙ্গভূমিতে সেই অতীত শুধু থেকে থেকে মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ায় না। কথা বলে; হাসে; কাঁদে; গান গায়। সে মূর্তির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মঞ্জরীর কি মনে হয়, কে বলবে তা! দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করবার পর নতুন করে পাতা সংসারে জীবন্ত বধূর চেয়ে যেমন কখনও কখনও নূতন স্ত্রী আলোকচিত্রের দিকে তাকিয়ে স্বামীর মনে স্বতঃই এ জিজ্ঞাসা না জেগে পারে না যে," কোন্‌টা বেশী সত্য, তেমনই আজকের মঞ্জরী দেবীর মনে বিদ্যুতের মত এ প্রশ্ন একবার ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেলেও তা সূর্যসত্য। সে প্রশ্ন, এই প্রশ্ন :—মঞ্জরী দেবী না মঞ্জরীবালা? কে অলীক আর কোনটা অলৌকিক? ডোরিয়ান গ্রে, না পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে? কে রিয়ল আর কোন্‌টা আনরিয়ল?

অনসূয়ার ভূমিকা পাবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা দেখা দিল শিল্পী হিসাবে অজাতশত্রু মঞ্জরীর বিচরণভূমিতে। সারা ভারতে সেদিন সর্ববৃহৎ চিত্ররঙ্গশালা ওল্ড থিয়েটার্সে প্রবেশ মাত্র বুঝতে দেরী হল না অভিমন্যুর মত শত্রুব্যূহে ঢুকে পড়েছে মঞ্জরী। ওল্ড থিয়েটার্স—লোকের মুখে তার ডাক-নাম, 'ও-টি'। সর্বভারতে সেদিন মাদ্রাজের নাম ওঠেনি চলচ্চিত্রের মানচিত্রে। বোম্বাই মার্কা ছবির মেলেনি সাক্ষাৎ। ওল্ড থিয়েটার অথবা ও-টি—বায়স্কোপ বললেই লোকে বুঝত ও-টির ছবি। ও-টির পরিচিতি-চিত্র মানে trade-মার্ক ছিল হাঁস। ও-টির সেই হাঁস সেদিন যে ডিমই পাড়ত, তা সোনার ডিম।

ও-টির কর্মিবৃন্দ, ও-টির নট-নটীর, ও-টির বিজ্ঞাপন থেকে ও-টির হেড অফিসের বেয়ারা পর্যন্ত যে খাতির পেত, ও-টির নাম উচ্চারণমাত্র ও-টি ছাড়া আর যে দু-চারটি কোম্পানীর বাতি টিম্ টিম্ করে জলত এদিক-ওদিক, সেদিন তাদের পক্ষে তা ছিল দুরাশার নামান্তর মাত্র।

কিন্তু ও-টির অন্দর মহলে যারা কাজ করত, সেদিন তারা জানত সেখানে কাজ করা বাইরে যতই সম্মানের হোক, ভেতরে কি ভয়ঙ্কর!

ত্রিশ

ও-টি, অর্থাৎ ওল্ড থিয়েটার্স। ট্রাম-লাইন থেকে বেশ দূরে বিস্তীর্ণ জমিতে আধুনিক ময়দানবের হাতে গড়ে ওঠা ওল্ড থিয়েটার্সকে কেন্দ্র করেই দিনে দিনে নিজের রূপ পরিগ্রহ করেছে টলিউড্। টলিউড্কে আশ্রয় করে নয় ওল্ড্ থিয়েটার্স, ওল্ড্ থিয়েটার্সকে কেন্দ্র করে বড় হয়েছে টলিউড্। সূর্যর চার পাশে ঘুরেছে পৃথিবী, পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে নয় সূর্য্যবর্তন! সভ্যতার অশুভ জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যত সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতন 'ইতিহাস' হয়ে গেছে, তাদের কারুর চেয়ে কম রোমাঞ্চের নয় ওল্ড্ থিয়েটার্সের উত্তেজক ইতিবৃত্ত। ওল্ড্ থিয়েটার সত্যিই সেদিন গোটা একটা সাম্রাজ্যের মতই নিজেকে ছায়া মানচিত্রে মেলে ধরেছে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। বিপুলতার বিস্তার; বিশাল তার বাহু। লোকলস্কর, সৈন্যসামন্ত, হাতি ঘোড়া, সেনাপতি দূত অথবা গুপ্তচর কোনটারই অভাব হয়নি সেই বিচিত্র রাজ্যে।

এই সাম্রাজ্যের যিনি একচ্ছত্র অধিপতি সেই গৌরবর্ণ যুবককে সবাই সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে ডাকে কর্ণেল বলে। এ-ডাকের জন্মবৃত্তান্ত কারুরই জানা নেই। ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত স্মিতহাস গৌরবর্ণ এক বাঙালীকে কর্ণেল বলে ডাকতে শুনলে অবাক হবার কথা। কিন্তু কেউ অবাক হয় না। অবাক হয় না, কারণ এই ডাক বলতে বোঝায় যে ব্যক্তিকে সে ব্যক্তি শুধু আর ব্যক্তি ছিলেন না। ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। লিজেণ্ডারি, ফিগার। যারা তাঁকে কখনও দেখে নি, তারাও তাঁর কথা শুনে শুনে তাঁর চেহারার একটা স্পষ্ট আঁচ যেন অনুভব করে নিয়েছে। সে আঁচের তাপ আছে কিন্তু তা কাউকে দগ্ধ করে না। ব্যক্তিত্ব বলতেই সে ভয়াবহ, রাশভারী ব্যক্তিত্ব বোঝে লোকে, কর্ণেলের ব্যক্তিত্ব সে-ব্যক্তিত্ব নয়। এ-ব্যক্তিত্বের জন্ম ভয় থেকে নয়; ভালোবাসা থেকে। কর্ণেলকে সবাই ভালোবাসে। শুধু অর্থ বা সামর্থ্যই এর কারণ হলে ভয় হত এ ব্যক্তিত্বের জন্মদাতা। কিন্তু অর্থ এবং সামর্থ্য ছাড়াও আরও কি অতিরিক্ত আছে কর্ণেলের জীবনপাত্রে যা থেকে উছলে পড়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব সকলকে সব সময়েই 'মাধুরী করেছে দান।'

এই মাধুরী যার ব্যক্তিত্বকে দিয়েছে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, সব মণ্ডলকে করেছে উদ্ভাসিত, পরিচয়কে মোহযুক্ত, সেই কর্ণেলের আসল নাম? না। থাক। আসল নাম বলবার যদি এখনও প্রয়োজন থাকে তাহলে 'অস্ত ও প্রত্যহ' রচনা হয়েছে পণ্ডশ্রম। ভারতবিখ্যাত ডাক্তারের পুত্র চলচ্চিত্রের জগদ্বিখ্যাত কর্ণেল,—তাঁর পরিচয় আজও কর্ণেলেই থাক পরিব্যাপ্ত। বিলাতে গিয়েছিলেন কর্ণেল ব্যারিষ্টর হবার বাসনায়। ব্যারিষ্টর হবার পর ফিরে এসে করেছেন চলচ্চিত্রের কারখানা। সেখানে শুধু খাটি নয়, বাঁচবার জন্য যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়েছেন এত লোকের যে তাদের স্বজন-পরিবারের দু-হাত তোলা আশীর্বাদে নিশ্চয়ই ছেলেন ব্যারিষ্টর হয়ে ফিরে এসেও ব্যারিষ্টর হবার জন্য ডাক্তার বাপের [illegible] জোড় এতদিনে বাষ্পের মত মিলিয়ে গেছে শূন্যে।

বিলেতে থাকতে থাকতেই একজন বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতার রজ্জুবন্ধনে পরিণত হয়। তার নাম সমর [illegible]। এখনও 'ও-টির' প্রথম দলের বিশিষ্ট পাত্র হিসাবেই চিরস্মরণীয় পরিচয়। সবাই তাঁকে চৌধুরী মশাই বলে জানে। [illegible] সদাশিব এই চৌধুরী মশাই-ই শুধু জানেন কোন্ জাদুবলে ব্যারিষ্টার হলেন চলচ্চিত্রকার। সেই বিদেশে জাত সেই বন্ধুত্বই [illegible] মাটিতে বহন করে নিয়ে এল চলচ্চিত্রের কুমারী-জমিতে [illegible] বীজ। অত্যন্ত সাধারণ ভাবে জন্ম নিলো ওল্ড্ থিয়েটার্স। মানুষের বেলাতেও যা, ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রেও তা-ই। অসাধারণ [illegible] সম্ভাবনা নিয়ে যে আসে সে-ই জন্ম নেয় সাধারণ পরিবেশে। [illegible] অলক্ষ্যে বেড়ে ওঠে সে। ফুলে ওঠে। কেঁপে ওঠে।

পৃথিবীতেই চলচ্চিত্রের জন্ম বেশী দিন আগে নয়। [illegible] তখনও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকেই নয় অবহিত। [illegible] তখন সবে মাত্র শুরু। অপটু কর্মী নিয়ে, অনভিজ্ঞ হাতে কুমারী-জমিতে যারা বীজ বুনল, তারা জানত না যে জমি ছিলো অসম্ভব উর্বর। ধুলো-মুঠি সেখানে দেখা দিল সোনামুঠি হয়ে। তার পর একদিন প্রথম দর্শক অভিনন্দনে জয়যুক্ত হল শ্রীকৃষ্ণ দত্তর পরিচালনায় কৃত্তিবাসের জীবনী অবলম্বনে তোলা ছবি। হৈ-হৈ পড়ে গেল [illegible] চিত্রজগতে। ওল্ড থিয়েটারের মাথায় উঠল সাফল্যের প্রথম মুকুট। সে হৈ-হৈ মিলোতে না মিলোতে ওল্ড থিয়েটারের কপালে [illegible] শিকে ছিঁড়লো। দ্বিতীয়বার ডার্বির টিকিটে প্রথম পুরস্কার [illegible] পরমেশচন্দ্রের প্রেমদাস চিত্র মারফৎ। কৃত্তিবাস এবং প্রেমদাস দুটি ছবিই বাংলা এবং হিন্দী দু ভাষাতেই তোলা হল। কুবেরের অর্থ এল ওল্ড থিয়েটারের এমনিতেই স্ফীতোদর তহবিলে। নিউ [illegible] এলো আরও কয়লা।

ত্রিপুরা থেকে পরমেশচন্দ্র; বাগবাজারের দু'পয়সার সাপ্তাহিক কাগজ কীর্তির সহসম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দত্ত; যোগেশ ল্যাবরেটরী থেকে ক্ষিতীশ ঘোষ; রঙ্গমঞ্চ থেকে বিষ্ণু রায়; এঁরা এলেন পরিচালক হয়ে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর তালিকায় দেখা দিল ক্রমে ক্রমে সুবালাস, রঞ্জন চৌধুরী, পরমেশচন্দ্র স্বয়ং, সিন্ধু মুখুজ্জে, [illegible] সান্যাল, চন্দ্রাবতী, রামাবলী, অমলিনা। একাদশে বৃহস্পতি সেদিন কর্ণেলের। সিনেমা বললেই ওল্ড থিয়েটার্স। আর ওল্ড থিয়েটার্স বললেই কর্ণেল। আজকের বায়স্কোপ-পাগল ছেলেমেয়েরা সেদিনকার সেই উন্মাদনাকে হেসে উড়িয়ে দিল। কিন্তু সেকাল আর একালে ফারাক আকাশ-পাতালে। সেদিন উন্মাদনা ছিল। কিন্তু বায়স্কোপের নায়ক-নায়িকারা কি খায়, কি পরে, কি করে, কোথায় থাকে, তারই ধ্যান-জ্ঞানে উন্মাদ হত না কখনও। সেদিনও ফ্যান ছিল, ছিল ফ্যান মেল; কিন্তু তবুও তার সীমারেখা, [illegible] ছিল যেন কোথায়। মায়ের চেয়ে সেদিন সিনেমার দরদ হয়নি বেশী।

সেই স্বর্ণযুগে ওল্ড থিয়েটার দরজা দিয়ে পুনঃপ্রবেশ করলেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। মাঝে কিছুদিন ওল্ড থিয়েটারের বাইরে কাটিয়েছিলেন

কাজ। কর্ণেল আবার সাদরে, সসম্মানে ফিরিয়ে আনলেন তাঁকে। অন্যরা প্রমাদ গুণলো। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত শুধু নিজে এলেন না আবার, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন প্রায় নতুন মুখ মঞ্জরীকে। ঘোষণা করলেন নতুন ছবির নাম। কবি কালিদাস; অনসূয়ার ভূমিকায় মঞ্জরীবালা। মঞ্জরী যদিও সিনেমায় তখনই নিজেকে দেবী বলে করেছে ঘোষণা, তবুও সবাই তখনও দেবী বলে করেনি স্বীকার। তাই তখনও সে মঞ্জরীবালা। সেই বালা থেকে দেবী হবার ইতিবৃত্তই 'অন্ত ও প্রত্যন্ত'র চরম অধ্যায় এখন বর্ণিত হচ্ছে।

মঞ্জরী যেদিন অনসূয়ার ভূমিকাটি পেলো সেদিন সে এতদূর বিস্মিত হয়েছিল যে, সে সত্যিও বিস্মিত হয়েছিল কি না তা পর্যন্ত বুঝবার জন্য যেটুকু চৈতন্যবুদ্ধি থাকার দরকার, তা-ও তখন তার কাছে লুপ্তপ্রায়। অগাধ অন্ধকারে অবাধ আলোর অকস্মাৎ আবির্ভাবে যেমন চোখ ধাঁধিয়ে গেলে আলোতেও কিছু দেখা যায় না। যখন আলোর অর্থ অন্ধকারই হয়ে দাঁড়ায় ঠিক তেমনই বিকৃত জন্মের কারণে যৌবন আসবার আগেই যাদের যৌবন বহুজনের পায়ে বিক্রীত হয়ে গেছে তাদেরই একজন মঞ্জরীর জীবনে যখন নরকের অন্ধকারে স্বর্গের আলো এসে পৌঁছল অনসূয়ার মূর্তি ধরে, তখন তার মনের অবস্থা বর্ণনার বহু অতীত। অভাবিত সৌভাগ্যের অযাচিত উপস্থিতি তার জন্মলাঞ্ছিত জীবনের জরাজীর্ণ ঘৃণ্য পরিবেশে তার চিন্তাকে বিকল করে দিল মুহূর্তের জন্য। সেই মুহূর্তে তাই তার অনসূয়ার ভূমিকায় অবতরণ করার গুরুদায়িত্ব হল বিস্মরণ। তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার পর অভিনয় কেমন করে করবে সেই চিন্তায় আকুল হল সে। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত দীক্ষা দিলেন অভিনয়ের মন্ত্রে। নবজন্ম হল তার।

কিন্তু ওল্ড থিয়েটারের অন্তঃপুরে পা দিয়েই সে বুঝলো জলের জীব ডাঙ্গায় উঠলে যা হয় তার অবস্থা তার চেয়েও করুণ। অভিনেত্রীরা পাত্তা দিলে না তাকে। কর্মীরা শুনিয়ে শুনিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পাগল করে তুলল তাকে। আবার কেঁদে গিয়ে পড়ল মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণ দত্তর কাছে। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত হাসলেন। আশ্বস্ত হতে পারল না এবারে মঞ্জরী। শ্রীকৃষ্ণ বললেন: যাও বাড়ী গিয়ে ভালো করে ভাবো। এ ধাক্কা সামলাতে পারবে কি না ভেবে তারপর এসে জানিয়ে যেও। মনে রেখো যত বার মাটিতে পড়ে যাবে তত বার আমি তুলে ধরতে পারবো কিন্তু দাঁড়াবার বেলায় দাঁড়াতে হবে তোমার নিজের পায়ে।

মঞ্জরী বাড়ীতে ফিরে গেল। রাতে শুয়ে ভাবতে লাগল। সে পারবে? না পারবে না? পারতেই হবে তোমাকে মঞ্জরী। নিশ্চয়ই পারবে। যতবার মনে হয় পারবে না, ততবার কে যেন ভেতর থেকে বলে ওঠে, কেন পারবে না? যে সমাজের লোক তোমার ঘরে আসে কিন্তু তোমাকে তার দরজায় পর্যন্ত যেতে দেয় না, সেই সমাজের ভেতর ঢোকবার মই তুমি কেন কাজে লাগাবে না? সাফল্য যত আসবে কাছে ততই সমাজের মাথার মণিরা আসবে হাতের মুঠোয়। কেন তুমি ছেড়ে দেবে এ সুযোগ? আর ভয়ই যদি পাবে তবে কেন স্বপ্ন দেখেছিলে জীবনে সূর্যোদয়ের। সমাজের ভেতর ঢুকে তার শাঁস বার করে নিয়ে ফেলে দেবে ছোবড়া করে,—এরই জন্যে তোমার জন্ম। তুমি হবে সমাজের মুখের ওপর সমাজ-পরিত্যক্তদের প্রথম জীবন্ত প্রতিবাদ। তুমিই পারবে মঞ্জরী। একাজ একা তুমি পারবে।

ঘুম ভেঙ্গে যায় মঞ্জরীর। শুধু ঘুম নয়। ভেঙ্গে যায় ভয়। এক সর্বনাশা হাসি ঝিলিক দিতে থাকে তার চোখে। হেলতে থাকে। দুলতে থাকে। কালনাগিনী ছোবল দেবার আগে যেমন হেলতে থাকে তেমনই। যেমন দুলতে থাকে অবিকল তেমনই। দেরী করে না আর। শ্রীকৃষ্ণ দত্তর কাছে ফিরে যায় দ্রুত। বলতে হয় না কিছু। শ্রীকৃষ্ণ তার মনের কথা বুঝতে পেরে হাসেন।

হাসতেই হাসতেই শ্রীকৃষ্ণ দত্ত আবার বললেন, আরও একটা কাজ করতে হবে যে মঞ্জরী?

কি?

তুমি জানো না বোধ হয় শ্যামচাঁদ গড়াই ওল্ড থিয়েটারে এসেছেন সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে। তাঁর কাছে তোমায় গানের তালিম নিতে হবে।

গান ত' গাইতে আমি জানি না;—মঞ্জরী কোনও রকমে বলল।

জানলে ত' গাইতেই! জান না বলেই ত' তালিম নিতে হবে। কাল রাতে শ্যাম বাবুকে নিয়ে যাব তোমার ওখানে। তৈরী থেকো।

একত্রিশ

শুধু মঞ্জরীই যে ভয় পেয়েছিল তা নয়। ভয় পেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। ভয় পেয়েছিলেন স্বয়ং কর্ণেল। অনসূয়ার মত এতবড় ভূমিকায় প্রায় নতুন মঞ্জরী কি পারবে? শ্রীকৃষ্ণ দত্ত বলেছেন পারবে। তবুও। পার্শ্বচরেরা সন্দেহকে চাগিয়ে দিল আরও। শেষ কালে একদিন ডাকলেন শ্রীকৃষ্ণকে। বললেন: দেখুন শ্রীকৃষ্ণ বাবু, আপনি জানেন আমি কখনও আপনার ক্ষেত্রে ত' নয়ই। কারুর কাজের ক্ষেত্রেই নাক গলাই না, তবুও যে আজ আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি সে আপনার ওপর বিশ্বাস কমে গেছে বলে নয়, আরেক বার আপনার মুখ থেকে শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত ভয় যাচ্ছে না বলে। মঞ্জরী বলে যাকে নিয়েছেন অনসূয়ার রোলে, সে পারবে ত?

পারবে বলেই ত' নিয়েছি। কেউ বলেছে না কি পারবে না? এই বলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণেলের পার্শ্বচরদের ওপর থেকে ঘুরিয়ে আনলেন তাঁর শ্যেনচক্ষু। তারপর একটিপ নস্যি নিয়ে নাকে দিলেন। নাকের ওপর রুমাল চাপা দিয়ে বললেন: কবি কালিদাস ছবিটা লাগবে কি না বলতে পারি না, তবে মঞ্জরী পারবে। শুধু অভিনয় করতেই পারবে বলে একথা বলছি না, এখন যারা আপনার অভিনেত্রী-কুলরাণী, তাদের সকলের গালে চুণকালিও লেপে দিতে পারবে বোধ হয়। আর কিছু বোধ হয় জানতে চান নেই কর্ণেল? আমি তাহলে আসি।

যাবার সময় পেছন ফিরে একবার তাকালেন না শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। একবারও থামলেন না। গেলেন এমন ভাবে যেন আর কোনওদিন এমন ভাবে তাঁকে আসতে না হয় তারই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে।

মঞ্জরীও হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিল না। ধাতস্থ হচ্ছিল আস্তে আস্তে। তন্দ্রাবতীর কাছে কেঁদে পড়ে। অমলিনার কাছে বামাশশীর কথা লাগিয়ে। সুরদাসকে, 'আপনিই সব', একথায় সন্তুষ্ট করে। ক্ষিতিন ঘোষকে প্রতিদিন আসবার সময়ে 'একবার;

যাবার সময় আবার নমস্কার করে আস্তে আস্তে কাজ গুছোচ্ছিল সে। সকলের পেটের কথা মুখ থেকে টেনে বার করে, সকলের দুর্বলতম জায়গায় ঘা মেরে হাতের মুঠোয় এনে ফেলছিল। কবি কালিদাস ছবির স্যুটিং আরম্ভ হবার মহরত শট থেকে ছবি বেরুতে আরম্ভ করেছিল কাগজে কাগজে মঞ্জরীর। পাবলিশিটি অফিসারকে এত দিনে যা কাহিল করতে পারেনি পুরনো ঘাগীরা তিনদিনেই তার চেয়ে ঢের বেশী ঘায়েল করল মঞ্জরী। দেখে হাসলেন শ্রীকৃষ্ণ। হিসাবে ভুল হয়নি তাহলে। বরং যতখানি ভেবেছিলেন তার চেয়েও আরও দূর যাবে মঞ্জরী ভেবে একটু চিন্তিতই হলেন যেন। অবশ্য এখনই ভয় পাবার নেই। আরও দূর যেতে আরও অনেক সময় নেবে মঞ্জরী। পেরুতে হবে আরও অনেক দুস্তর পথ। তাই এখনই ভয় পাবার নেই কিছু।

শ্রীকৃষ্ণর নেই। কিন্তু ভয় পাওয়ার আছে মঞ্জরীর। সত্যই ভয় পেল সে। শ্যামচাঁদ গড়ায়ের সামনে গাইতে বসে। বহুদিন বাদে গান গাইতে বসার সঙ্কোচ নয়। শ্যামচাঁদ গড়ায়ের সম্বন্ধে যতটুকু খবর জোগাড় করতে পেরেছে সে তাতেই হয়েছে তার ভয়। টকটকে রং, বিশাল গোঁফ, ছ ফিট লম্বা শ্যামচাঁদ গড়াই অত্যন্ত দুর্মুখ ব্যক্তি। মুখের ওপরই গান গাওয়া কাকে দিয়ে হবে না সেকথা বলতে তাঁর এতটুকু বাধে না। এবং একবার বললে, সেই না-কে আর হাঁ করানো উর্বশীর পক্ষেও সাধ্যাতীত। আর শ্যামচাঁদ গড়ায়ের 'না' মানেই অনসূয়ার ভূমিকাতেই মঞ্জরীকে 'না' বলে দেবারই কথা শ্রীকৃষ্ণর। কারণ গান ছাড়া অনসূয়ার ভূমিকা পেখম ছাড়া ময়ূরের মতই দাঁড়কাক বিসদৃশ ব্যাপার! আর যেদিনকার কথা বলছি সেদিন ছবিতে যার মুখে গান শোনা যেত নেপথ্যেও গান তাকেই গাইতে হত। ভানু বাঁড়ুজ্যের গলায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্লেব্যাকের যান্ত্রিক ধাপ্পা তখন স্বপ্নের অগোচর ছিল।

গাইতে আরম্ভ করলেই বুঝল মঞ্জরী তান লয় তাল সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তাল কেটে যাচ্ছে থেকেই থেকেই। বেসুরো হয়ে যাচ্ছে। পর্দা ঠিক থাকছে না। শেষ পর্যন্ত গানের কথাও গুলিয়ে যেতে থামতে বাধ্য হল মঞ্জরী। মুখ নীচু করে বসে রইল। মুখ না তুলেই সে শ্যামচাঁদের মুখে কি লেখা, তা পড়তে পারছিল। নিজের কানে আর সেকথা শোনার স্পৃহা রইল না তার। শুধু একবার আড়চোখে তাকাল শ্রীকৃষ্ণ দত্তর দিকে। তিনিও বোবা মেরে গেছেন। মুখ লজ্জায় বেগুনে হয়ে গেছে। তিনি শ্যামচাঁদকে জিজ্ঞেস করছেন না কিছু। ভাবছেন অনসূয়ার ভূমিকা তবে কাকে দেওয়া যায়? ভাবছেন কর্ণেলকে বলে আসা কথাগুলো। মঞ্জরী চুণকালি লেপে দিতে পারবে অভিনেত্রী-কুলরাণীদের গালে। এখন কি বলবেন তাই ভাবছেন। শ্যামচাঁদ উঠে দাঁড়ালেন। নিঃশব্দে এগুলেন দরজার দিকে। মঞ্জরী তখনও মাথা নীচু করে বসে। হঠাৎ সে নড়ে-চড়ে উঠল। নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল। তবুও নিজের কানেই শুনল।

শ্যামচাঁদ জিজ্ঞেস করছেন—কাল থেকে কখন আসব?

শ্রীকৃষ্ণ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন কোনও রকমে: হবে এর?

শ্যামচাঁদ সারা সন্ধ্যের পর এই প্রথম হাসলেন; হবে মানে? ফিল্মে যারা গান গায় তাদের সক্কলের চেয়ে ভালো হবে।

মঞ্জরী শুধু সারা রাত না ঘুমিয়ে জিজ্ঞেস করল যাতে তার খুসীতে পাগল হবার কথা, সে কথায় তার দু'চোখ ভরে বাঁধ না মানা জল আসে কেন? [ক্রমশঃ।

কাজাক প্রবাদ

১। চোখের ভয় আছে, কিন্তু হাত কাউকে ডরায় না।

২। যারা লোকজনের খুঁত ধরে বেড়ায় তারা মরলে কবরে যেতে পারে না।

৩। মিথ্যাবাদীরা স্বল্পায়ু।

৪। গাধাকে রূপোর জিন পরানো যায় না।

৫। অসৎ বন্ধু ছায়ার মতো। ভাল দিনে সে তোমার সঙ্গ ছাড়বে না, কিন্তু খারাপ দিনে তাকে খুঁজে পাবে না।

৬। ভেড়ার পাল যদি উল্টো দিকে ফিরে দাঁড়ায় তবে খোঁড়া ভেড়াটাও সামনে থাকতে পারে।

৭। তরোয়ালের আঘাত মিলিয়ে যায়, কিন্তু কথার আঘাত মিলায় না।

৮। ঘোড়ার চারটে পা থাকলেও সে হোঁচট খায় না।

৯। দান করে তবেই প্রতিদান পাবে, বীজ বুনলে তবেই ফসল তুলতে পারবে।

১০। পঙ্গপালের ভয় করলে ফসল তোলা যায় না।

১১। যার বজরা পেকেছে তার জন্য মুরগী এনো না।

১২। মোরগ ছাড়াও ভোর হয়।

১৩। মিষ্টি কথা সাপকেও গর্তের মধ্য থেকে ভুলিয়ে আনতে পারে।

ভাই —ষ্টুডিও রিনা

তাজমহল —শচীকুমার

বোন

—সুশীলা দেবী
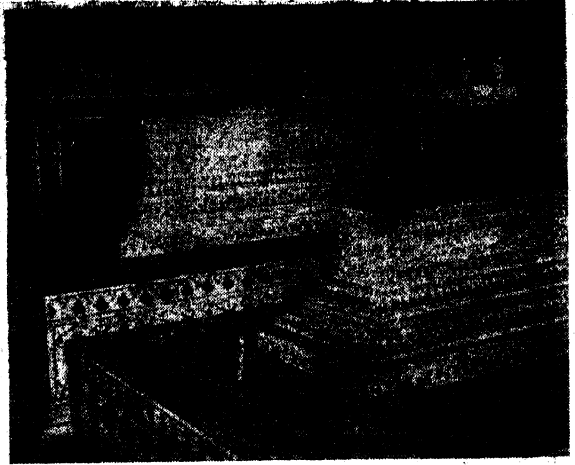
সাগর-বাঁধ (মহীশূর)

—মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অগতির গতি —ত্রিদিব রায়

তারকেশ্বরে ধর্ণা —বিমলকুমার সরকার

মৃৎশিল্পী —রমেন বাগচী

পূর্বমুহূর্ত —গোবিন্দলাল দাস

রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
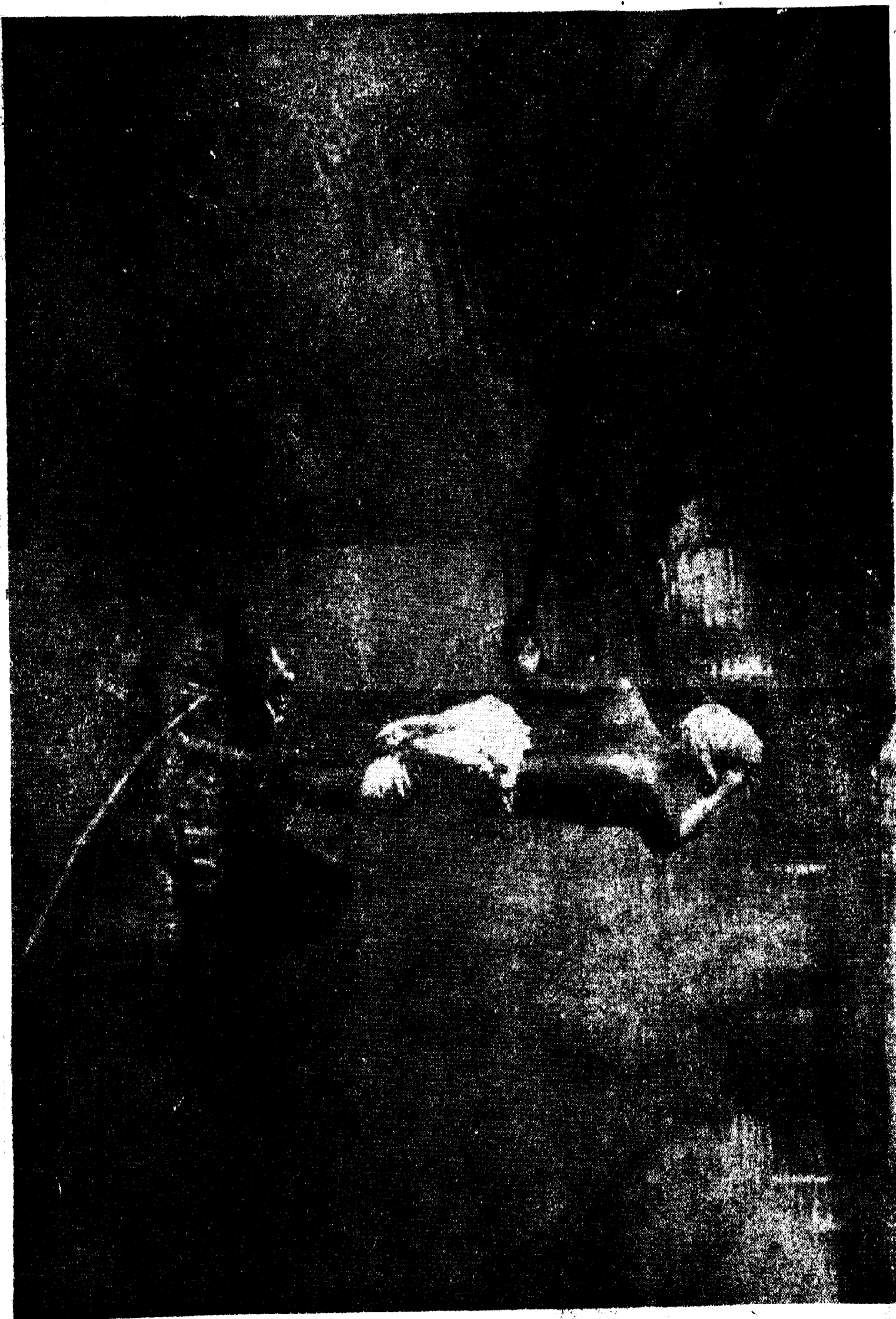
"সাধনা" ও কবি এক বৎসর সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ১৩০২ সালে সাধনা অকালে বন্ধ হইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের পর সাহিত্যগুরু হইলেন রবীন্দ্রনাথ, যাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গাথা, নাট্যরহস্য, ছোট গল্প, রঙ্গরস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সকল দিকেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয়। অন্য কোনো গ্রন্থকার সাহিত্যে এমন করিয়া ভাবসম্পদ ঢালিয়া দেন নাই। নিত্য নূতন দ্রব্যসম্ভার পাইয়া সাহিত্যে বাঙালীর যথার্থ আনন্দানুভূতি জন্মিল, নব চিন্তাধারায় অভিষিক্ত হইল। বাঙলাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া নবরসে উৎসারিত হইয়া নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহার সম্বন্ধেও সে কথা প্রযুজ্য। বঙ্গসাহিত্যের তিনি রথ ও পথ দুই-ই সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও সৃষ্টির আনন্দ পাঠকদের মধ্যে বণ্টন করিয়াছিলেন।

সাধনা বন্ধ হইবার পর কবি সম্পাদনা করেন—বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) প্রথম নয় বৎসর (১৩০৮-১৩১৬), "ভারতী" ২২ বর্ষ হইতে ২৬ বর্ষ (১৩০৫-১৩০৯), "ভাণ্ডার" (ত্রৈমাসিক, ১৩১১), "তত্ত্ববোধিনী" (১৩১৮-২১), "সমালোচনী" (১৩০৮), "শান্তিনিকেতন" Visvabharati Quarterly প্রথম সংখ্যা (১৩৩৯)। এতদ্ভিন্ন "প্রদীপ," "প্রবাসী," "সবুজপত্র" ও "সাপ্তাহিক হিতবাদী" সম্পাদনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কবি যখন বঙ্গদর্শন-সম্পাদক তখন উক্ত পত্রিকার প্রুফ দেখিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার ভার ছিল প্রভুপাদ ৺বলাইচাঁদ গোস্বামীর উপর। তাঁহার মত ছিল যে কোনো প্রবন্ধ যদি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারা যায় তবে তাহা প্রকাশ করা উচিত নয়। কাজেই কবিরও নিস্তার ছিল না! এমন অনেকবার ঘটিয়াছে, কবির সেদিন হয়তো ফিরিতে রাত্রি হইয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া। কবির লেখা সম্বন্ধে কবির সহিত আলোচনা না করিয়া মুদ্রণের অনুমতি তো দেওয়া চলে না। কবিকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তর্ক করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বুঝাইয়া এবং প্রবন্ধের লেখার সহিত fair proof এর অংশ মিলাইয়া কাজ মিটাইতে হইত। কখনো কখনো পরিবর্তন ও পরিবর্জনও চলিত। এইরূপে প্রতি রচনায় পরীক্ষা চলিত ও কবি বলিতেন যে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গগুণে রচনার সতর্কতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গ একখানি পত্র পাইলেন যাহাতে পত্রলেখক স্বয়ং "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাইতেছেন যে পরবর্তী ২৪এ অগ্রহায়ণ তারিখে তাঁহার পরমাত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ-বিবাহ এবং সেই বিবাহ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বন্ধুদের সাদর আহ্বান করিতেছেন।" এ বিবাহে তাঁহাদের কুলপ্রথামতো কন্যা আসিয়াছিলেন যশোহর হইতে। তাঁহার ভ্রাতৃজায়াদের মধ্যে বড়, মেজো যশোহরের কন্যা, সেজো ও ন হাওড়া সাঁতরাগাছির ও নতুন ছিলেন কলিকাতা বহুবাজারের গঙ্গোপাধ্যায়দের কন্যা। কবির পাত্রী "ছোট বৌ" যশোহর দক্ষিণডিহির শুকদেব রায়-চৌধুরীর বংশসম্ভূত বেণীমাধব রায়-চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী। বিবাহ-রাত্রির পূর্বেই তাঁহার নূতন নাম হয় মৃণালিনী দেবী। সেই নামেই তিনি শ্বশুরবাড়িতে আজীবন পরিচিতা ছিলেন। সম্বন্ধ কবির পিতৃদেব মহর্ষি কর্তৃক পাকা হইবার পর কবি স্বয়ং পাত্রী দেখিয়া আসিয়াছিলেন। মৃণালিনী দেবীর বিবাহের সময় বয়স ছিল ১১ আর কবির ২২। বর্ণচ্ছটায় তিনি কবির প্রতিযোগিনী ছিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীমণ্ডিতা ছিলেন। এই মিলনকে কেন্দ্র করিয়া কবির জীবনে অনেক সার্থকতা, অনেক উচ্ছ্বাস। বিবাহের পর বালিকা নববধূকে গার্হস্থ্যশিক্ষাদানের ভার লন হেমেন্দ্র-পত্নী নীপময়ী দেবী। হেমেন্দ্রনাথের কন্যাদের সহিত বধূকেও Loretto Girl স্কুলের ছাত্রী করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, সংগীত প্রভৃতির চর্চা চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষা, কলিকাতার অভিজাত পরিবারের আদব কায়দা ও সুচারু গৃহস্থালী শিক্ষা আরম্ভ হইল। যশোহরাগতা বধূদের একটা বিশেষ শিক্ষণীয় ছিল যশোহরের উচ্চারণ ভঙ্গির সংশোধন। এ বিষয়ে তাঁহাদের স্বাভাবিক আগ্রহ থাকায় তাঁহারা দ্রুত অগ্রসর হইতেন ও শীঘ্রই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতেন। গৃহস্থালী ব্যাপারে বিশেষত রন্ধনে তাঁহাদের সহজাত প্রতিভা থাকায় অচিরে যশস্বিনী হইতেন। ইহার প্রথম পাঠ যদিচ পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিতে হইত, তাঁহাদের যশোহরাগত শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিজ নিজ বাল্যাবস্থা স্মরণ করিয়া, মাছের ঝোলে নববধূর হাত পরীক্ষা করিতেন। চৈ দিয়া কৈ ডিম্ব রন্ধনের পটুতা শিক্ষা দিতেন। রবীন্দ্রগৃহিণীর শ্বশ্রূমাতা বর্তমান না থাকিলেও পরীক্ষার অভাব হয় নাই।

মহর্ষি একদিন বলিয়াছিলেন তাঁহাদের বাড়ির রোজের ব্যঞ্জন ছিল—ডাল, মাছের ঝোল, অম্বল আর ভোজের অঙ্গ ছিল—বড়ি ভাজা, পোর ভাজা, আলুভাতে। কবির বিবাহের সময় হইতে বাড়ীতে বিভিন্ন প্রকার আমিষ ও নিরামিষ রন্ধন ও নানাজাতীয় মিষ্টান্ন পাক করা কন্যা ও বধূদের শিক্ষণীয় বিষয় হইল। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী তাঁহার "আমিষ ও নিরামিষ আহার" গ্রন্থে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শুধু ঠাকুরবাড়ীর আহারে কেন, কয়েক বৎসর পূর্বে পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক শুভকার্যের আহার্যে সকল প্রকার সভ্যতার ছাপ পাওয়া যাইত। বিত্তশালীর বাড়ির ভোজের নিমন্ত্রণের একটি পাতই ভারতের সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছিল। বৈদিক যুগের আনন্দ নাড়ু, তিলের নাড়ু, বড়া, পুপ; খাঁটি বাঙলার সুক্তা সমেত যাবতীয় ব্যঞ্জন, রাজস্থানের পুরী, কচৌড়ি, পাঁপড়, বালুসাই মিঠাই, লাড্ডুকি-লাচ্ছা; বসাক শেঠেদের আচার ও রকমারি মোহনভোগ (হালুয়া), রাধাবল্লভি, জৈন জহুরীর নানাপ্রকার বরফি

ও পেঁড়া ; খাস বাঙলার ছানার মিষ্টি ; মোগলের কাবাব কোর্মা, কালিয়া ; ইংরেজের চপ, কাটলেট, ক্রোকে, আইসক্রীম ; ফরাসী সালাদ ; আইরিশ ষ্টু ; ইতালীয় গ্লেস, কেনেল প্রভৃতির সম্মেলন ধনীগৃহে দেখা যাইত। কবির এক ভ্রাতুষ্পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ তাঁহার "মুদির দোকান" পুস্তকে বৈদিক সাহিত্য হইতে লুচি, কচুরীর আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ যদি বিংশ শতাব্দীর বাঙালী ভোজের আহার্যগুলির ইতিহাস লইয়া গবেষণা করেন তাহা হইলে বাঙলার সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, উপরের তালিকার অনেকগুলি মৃণালিনী দেবীর আয়ত্ত হইয়াছিল। সর্বোপরি নারিকেলের নানাপ্রকার মিষ্টান্নে তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। তখনকার দিনে ঠাকুরপরিবারে ও তাঁহাদের আত্মীয়দের মধ্যে আমসত্ব, আচার, বড়ি, আমকাসুন্দি প্রভৃতি কেহ বাজার হইতে খরিদ করিত না। এ সকল গৃহের বধূ ও কন্যারা বাড়ীতে তৈয়ারি করিতেন। তাঁহাদের যশোহরস্থ আত্মীয়েরাও ঐ সকল দ্রব্য গৃহে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় তত্ত্ব করিতেন আর পাঠাইতেন নলেন গুড়ের পাটালি, কুলের বড়ি, ঘৃতকলম্বা লেবু, চইলতার মূল, দীর্ঘাকৃতি মানকচু। ঘৃত ও শর্করাযোগে এই মানকচুর মুড়কি ও মালপো প্রস্তুত হইয়া জলখাবারের মিষ্টান্নের রকমফের জোগাইত। এই মিষ্টান্নপাকেও কবিজায়ার যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। নূতন ঝুনি রাই-এ বা সরিষায় তৈয়ারি তরল ঝাল-কাসুন্দী, আলুভাতে ও ভাজার পারিপাট্য বিধান করিত। এটি ঠাকুরপরিবারের একটি বিশেষত্ব। সরিষা ধোওয়া, কোটা ও গরম জলে মশলামিশ্রণ ইত্যাদি ও তৎপরে নমুনাস্বরূপ কুটুম্বগণের সহিত এই ঝালকাসুন্দীর আদান-প্রদান। ইহার প্রস্তুত-প্রণালীর কৌশলেও মৃণালিনী দেবী দীক্ষিতা হন ও বাড়ীর দৈনন্দিন অনুষ্ঠান পান-সাজা ব্যাপারেও তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইত। এই পানের মশলার প্রধান অঙ্গ ছিল কেয়াখয়ের যাহা ঠাকুরপরিবারে সকল বাড়ীতেই মেয়েরা প্রস্তুত করিতেন। কেহ বলেন শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কেয়া কেয়াই থাকে, ভাদ্রে কেতকী হইয়া যায়। কেয়া ও কেতকীর এই যে অর্থভেদ তাহা কোন্ অভিধানে লেখে আমরা জানি না। মহিলাদের শিল্পচর্চার মধ্যে ছিল বেল-জুঁই ফুলের সময় মাল্য রচনা ও গড়গড়ার মুখনলের জন্য বেল ফুলের ঝুড়ি তৈয়ারি। ইহা ভিন্ন নানাবিধ উলের কাজ, বোনা, সুতার টুপি ও জুতা, পুঁতির জুতা, দশ-পঁচিশের ঘর, টাকার থলি, আলবোলার নল-ঢাকা, পুঁতির গেলাপ তাঁহারা তৈয়ারী করিতেন। মখমলের উপর সলমা-চুমকির কাজ করা টুপি ও জুতা নির্মাণে মহিলারা শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দিতেন। ঠাকুর-বাড়ীতে নূতন বধূ আসিলে এই সকল বিষয়ে তালিম দেওয়ার নিয়ম, সময় এবং ব্যবস্থা ছিল। এই নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন গঠিত হওয়ায় শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী আশ্রম-মাতারূপে বোলপুর ব্রহ্মচর্য আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় হইতে পারিয়াছিলেন। সুন্দর আকৃতিতে মৃণালিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও, হৃদয়ের ঔদার্যে ও প্রকৃতির মাধুর্যে, শ্বশুর-বাড়ির শিক্ষায় এবং রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে কবির যোগ্যা সহধর্মিণী হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজি সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন এবং ঐ ভাষার কথা-সাহিত্য পাঠ তাঁহার অবসর বিনোদনের প্রিয়বস্তু ছিল। বাঙলা সাহিত্যের যথেষ্ট সমাদর করিলেও কোনো কৃতিত্বের পরিচয় তিনি ইচ্ছা করিয়াই দেন নাই। বলিতেন, তাঁহার স্বামী যখন অত বড় সাহিত্যিক তখন তাঁহার আর কলম ধরা নিষ্প্রয়োজন। তিনি যে স্বামীর সহধর্মিণী ছিলেন তাহার প্রমাণ বিদ্যালয় আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ যখন অর্থাভাবে ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়েন তখন তিনি অম্লান-বদনে নিরাভরণা হইয়া স্বামীকে স্বীয় অলংকার দ্বারা অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। আশ্রমে তিনি ছাত্রদের স্নেহময়ী মাতারূপে আহারাদির সুব্যবস্থা ও তাহাদের সকল প্রকার তত্ত্বাবধান করিতেন। কবিও আদর্শানুযায়ী জীবনযাপনের জন্য বৃহৎ পরিবারের মধ্যে পত্নীকে মিলাইয়া যাইতে দেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান "বেলীবুড়ি" মাধুরীলতার (বেলা) জন্ম ১২৯৩ সালের ৯ই কার্তিক। এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে শিশুপালনে স্ত্রীকে সাহায্য করিয়াছেন তাহা সচরাচর দেখা যায় না। যে সকল কার্যের ভার মেয়েদের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহার অনেক অংশ তিনি সানন্দে নিজ হস্তে লন এবং পিতা রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ পিতা তাহা নিঃসন্দেহ। ক্রমে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র ও দ্বিতীয় সন্তান রথীন্দ্রনাথ ১৩ই কার্তিক ১২৯৫ (Nov. 1888), দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা (বুড়ী) ১১ মাঘ ১২৯৭, তৃতীয়া কন্যা মীরা (অতস) ২১ পৌষ ১২৯৯ এবং কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ (ভোলা) ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার সময়েই কবি স্পষ্ট অনুভব করিলেন যে কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া প্রচলিত শিক্ষার বিধানে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া উঠা শক্ত। তাই তিনি কলিকাতা হইতে সরিয়া গিয়া শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। রথীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি বালককে লইয়া তাঁহার নিজ আদর্শ মতো শিক্ষাদান শুরু হইল। কবির প্রবন্ধ "শিক্ষার হেরফের" দেখিলে তাঁহার আদর্শের যথার্থতা বুঝা যায়।

শিশুপালন ছাড়া গার্হস্থ্য অন্যান্য অনেক কাজেই কবির সাহায্যদানে মৌলিকতা ছিল। যখন কবিপ্রিয়া কোনো রন্ধনের বা মিষ্টান্ন পাকের আয়োজন করিতেন, কবি তখন তাঁহার পার্শ্বে টুল লইয়া বসিয়া প্রস্তুত করিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন ও উপকরণাদির নানারূপ যোগ-বিয়োগের পন্থার নির্দেশ দিতেন। তাহাতে যাহা উৎপন্ন হইত তাহা কখনো সুখাদ্য কখনো বা অখাদ্য। কবি বলিতেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরীক্ষা। নিজের উপরেও পরীক্ষায় কবি বিরত থাকিতেন না। কখনো শুধু ফলাহার, কখনো ভিজা কাঁচামুগের ডালের উপরে sanatogen ছড়াইয়া খাদ্যের ভিটামিন সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন, কখনো কেবল সুজির হালুয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছেন, কখনো আবার মৎস্য মাংসে রকমারি আমিষাহার, কখনো শুদ্ধ নিরামিষভোজী, কখনো একেবারে সাত্ত্বিক হবিষ্যাশী। যখন 'আহারে সাত্ত্বিকতা' লিখিতেছেন তখন তিনি আমিষত্যাগী। নিমপাতার উপকারিতা পরীক্ষার অভিপ্রায়ে কবি একদিন মনে করিলেন যে তাহা রন্ধন না করিয়া কাঁচা বাঁটিয়া শরবৎ করিয়া খাইতে হইবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। এ সকল ব্যাপারে কবিজায়া স্বামীর সহকর্মিণী হইতে পারিতেন না, কেবল তাঁহার জন্য উদ্বেগই ভোগ করিতেন।

কবির এই সকল খেয়াল থাকিলেও সময়-নিষ্ঠায় ও নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত থাকায়, তাঁহার সকল কর্মেই উহা প্রকাশমান। কী সাংবাদিকের কার্যে, কী বিদ্যালয়ের কার্যে,

কী গার্হস্থ্য জীবনে, উহার শৈথিল্য তাঁহার কোনোদিনই ছিল না। তাই বলিয়াছেন—

কাব্য যেমন, কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে,
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সরল গদ্যের অভাব হয় নাই। তিনি লঘু পথ্যের সহিত গুরু চিন্তা (Plain living and high thinking) সাদামাটা খাবারের সাথে উচ্চ চিন্তার অভ্যাস, এবং গৃহস্থালী ব্যাপারে আদর্শ (intelligent living)-এর পক্ষপাতী। কথায়ও যা কাজেও তা। ঘরে-বাহিরে সুষ্ঠু আচরণে জীবন-ছন্দে উপভোগ্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই তিনি দিয়া আসিয়াছেন এবং সকলের বেলায়ও তাহা দেখিতে পছন্দ করিতেন এবং 'কবি'-র পরিচয়ে তাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে সে—

ভালোবাসে ভদ্র সভায়
ভদ্র পোষাক পরতে অঙ্গে,
ভালোবাসে ফুল্ল মুখে
কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে,
মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাসতে হবে
একেক সময়ে দিব্যি বুঝে।
সামনে যখন অন্ন থাকে
থাকে না সে অন্য মনে ;
সঙ্গীদলের সাড়া পেলে
রয় না ব'সে ঘরের কোণে। (ক্ষণিকা)

শরীরের উপর নানাবিধ পরীক্ষা চালাইলেও কবির স্বাস্থ্য ভালোই ছিল। এক অর্শ ভিন্ন অন্য কোনো রোগ তাঁহার ছিলই না। বৃদ্ধ বয়সের কথা আলাদা। অর্শের প্রকোপ সময়ে সময়ে ভীষণ হইত কিন্তু পরে বিয়েনে (ভিয়েনায়) অস্ত্রোপচারের ফলে তাহাও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় ও তদবধি তিনি ছিলেন মৃত্যুর বৎসরাধিককাল পূর্ব পর্যন্ত নিরাময়বাসী। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বল্পাহারীও এবং ফলই তাঁহার সমধিক প্রিয়। তিনি বলিয়াছিলেন "যে দেশে প্রকৃতিদেবী আম কাঁঠাল প্রভৃতি নানাবিধ ফলের প্রচুর ভাণ্ডার রাখিয়াছেন, সে দেশীয়ের পক্ষে ষ্ট্রবেরী, রসবেরী খাইয়া ফলাহারের তৃপ্তিলাভ বিড়ম্বনা মাত্র।" পূর্বে তাঁহার দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে চাকের মধুর একটা স্থান ছিল। শরীরের পুষ্টিবিধানে ইহা তাঁহার পিতৃদেবের গব্যঘৃত অভিসিঞ্চিত পায়সান্নের স্থান অধিকার করে। তিনি দুগ্ধভক্ত ছিলেন না ও পিতার মতো গব্যরস জীর্ণ করিতেও সমর্থ ছিলেন না। পিতার ন্যায় সঘৃত অড়র ডাল ও রুটির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। বড়দাদা, মেজদাদা কখনো কখনো ধূমপান করিতেন কিন্তু কবি কোনোদিন তামাক বা সিগারেট খান নাই।

জোড়াসাঁকো ভবনের দক্ষিণদিকে সম্মুখে যে দ্বিতল লালবাড়ি (পরে বিচিত্রা ভবন) উহা কবির পরিকল্পনা অনুসারে ও তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়া মহর্ষি ঐ বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সপরিবারে বাসের ব্যবস্থা করেন। কবির রুচি অনুসারে কখনো ভারতীয় কেতায়, কখনো জাপানী ধরণে দেশী কারিগরের দ্বারা নিজের পরিকল্পনা মতো ইহার রূপ, শ্রী ও সৌন্দর্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিত। লালবাড়িতে যাইবার পূর্বে কবি তাঁহাদের পৈতৃক বাড়ীর তেতলায় সপরিবারে বাস করিতেন। মহর্ষির তিরোধানের পর তাঁহার উইল অনুসারে এই লালবাড়ীটি এবং পৈত্রিক ভদ্রাসনের পশ্চিমাংশের স্বত্বে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ মালিকত্ব পাইলেন। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সর্ববিধ উৎকর্ষসাধনে বা নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশে কোনোদিনই কবির উৎসাহদানের অন্ত ছিল না।

অধ্যয়ন রবীন্দ্রজীবনের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রতি মাসে পুস্তকালয় তাঁহাকে নব প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা ও বহু নবাগত পুস্তক পাঠাইত। তিনি সেগুলি দেখিয়া ইচ্ছামতো পুস্তক ক্রয় করিতেন, বাকি ফেরত দিতেন। এইরূপে তাঁহার ব্যক্তিগত মূল্যবান গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠে। বোলপুরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই বহুমূল্য গ্রন্থসংগ্রহ তথায় প্রেরিত হইয়া বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। পরে বিদ্যালয়ের একসময়ে দারুণ অর্থাভাবে এই গ্রন্থসম্ভারের অনেকাংশ রবীন্দ্রনাথ বিক্রয় করিতে বাধ্য হন ও পুরীর সমুদ্রতীরে যে বাড়ী তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাও বিক্রীত হয়। বিশ্বভারতীর বর্তমান বহুমূল্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থরাজি পরে সংগৃহীত হয় ধীরে ধীরে।

গতিপ্রবণ মন কবিকে এক জায়গায় বেশিদিন স্থির থাকিতে দেয় না। তাই আজ কলিকাতায়, কাল শিলাইদহে, পরদিন অন্যস্থানে, আবার তার মধ্যেই কখনো শান্তিনিকেতনে, কখনো বোম্বায়ে, কারণে অকারণে পথিক প্রায়ই চলিতেন। মেয়েদের পরিভাষায় ইহা বেদের টোল। তাঁহারা ইহা প্রীতির চক্ষে দেখেন না। স্বামীর এ অভ্যাসটিতে কবিগৃহিণীর বিশেষ উদ্বেগ, অশান্তি ও অসচ্ছন্দতার কারণ হইত। কবির এই উপসর্গ অনেকস্থলেই কিন্তু সাময়িক স্বর্গ রচনা করিয়াছে। শেষ বয়সেও সেটির প্রবলতায় ক্রমান্বয়ে 'উদিচী,' 'উদয়ন,' 'পুনশ্চ,' 'শ্যামলী'র ক্রমবিবর্তন হইয়াছে ও বিভিন্ন গৃহে বাস করিয়া আকাশপ্রিয় ও আকাশমার্গী কবি যে বিভিন্ন কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তাঁহার বৈচিত্র্যপ্রিয় মনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ক্রমাগত মন্দাক্রান্তা ছন্দ ভালো লাগে না তাই ঘরের আসবাব-পত্র—ফুলদানি, কৌচ-কেদারার বিন্যাসও তিনি পাল্টাইয়া দিতেন।

সংসারযাত্রা সুচারুভাবে নির্বাহ করিতে হইলে নিজের সকল দিক দেখিতে ও জানিতে হয়। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। ইলেকট্রো-আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ডাঃ শুস্লারের আবিষ্কৃত টিশু রেমিডিজ বা বায়োকেমিক চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শিতা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ-নৈপুণ্য অর্জন করিলেন। নিজ পরিবারে, দুঃস্থ ব্যক্তিদের, প্রজাদের ও শান্তিনিকেতনের বালকদের চিকিৎসার ফলে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিলেন, তাহা তাঁহাকে সুনিপুণ চিকিৎসকের মর্যাদা দিল। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের পরিত্যক্ত একাধিক কঠিন রোগগ্রস্তকে কবি সাহসভরে নিজ হাতে লইয়া সুচিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। তাঁহার এই খ্যাতি সাধারণে অপ্রচারিত থাকিলেও অনেকের সুবিদিত। শুধু চিকিৎসা নয়, রোগীর সেবায় কবি কখনো পশ্চাদপদ হন নাই। তাঁহার পিতা মহর্ষিদেব যখন বাক্লোবায় গুরুতর পীড়িত হন, তখন কবি কলিকাতা

হইতে সেখানে গিয়া তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করেন। পরলোকযাত্রী পিতার শেষ শয্যাতেও দেখি যে, পিতৃভক্ত রবীন্দ্রনাথ পিতার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া নিপুণ সেবা করিতেছেন ও পিতাকে উপনিষদ এবং ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। কবি-পত্নীর অন্তিম রোগের সময় কবি নিজে দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ে ব্যজনী চালনার দ্বারা পত্নীর স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে অক্লান্ত ভাবে নিযুক্ত। কারণ তখনো কলিকাতায় বৈদ্যুতিক পাখার প্রচলন হয় নাই। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার শেষ অসুখেও সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া মাতৃহারা কন্যাকে লইয়া আলমোড়া শৈলে গিয়াছেন ও রোগিণীর পরিচর্যায় সেখানে অহর্নিশি ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারই চিত্তবিনোদনের জন্য "শিশুর" অধিকাংশ কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। কলিকাতায় ডিহিশ্রীরামপুর রোডে স্বামিগৃহে কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা শেষ শয্যা গ্রহণ করিলে, কবি কিছুই করিতে না পারায় ধীরভাবে ক্রমনিমজ্জমান তরণী নিরীক্ষণে অন্তরে মর্মন্তুদ যাতনা ভোগ করিয়াছেন। সেবাকার্যে বেতনভোগী শুশ্রূষাকারিণীর সাহায্য গ্রহণের কবি বিরোধী। এরূপ সেবায় কোনো রকমে নিরস সেবাকার্যই চলিতে পারে। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের মতো স্নেহশীল স্বামী, পিতা, পিতৃব্য ও মাতুল মানুষের আদর্শস্থল।

ভ্রাতাদের সহিত তাঁহার আন্তরিক প্রীতির সংযোগ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সকলেই কুড়ি হইতে বারো বৎসর পর্যন্ত তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ কিন্তু বয়সের ব্যবধান পরস্পরের মিলনে কোনো দিনই বাধা হয় নাই। এত বড় দাদারা তাঁহার সহিত একত্রে অভিনয় করিয়াছেন। ইহা বাঙালীঘরে কচিৎ দেখা যায়।

প্রত্যেকের প্রতিই তিনি স্নেহশীল, তথাপি অনেকেই তাঁহার ব্যবহারকে আন্তরিকতাশূন্য মনে করিতেন। স্বদেশের স্বজনবৈরাগ্য কবির নমনীয় মনে যে আজীবন রেখাঙ্কিত করিয়াছিল, একখানি পত্রে তাহা জানা যায়—

শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, তোমার চিঠি প'ড়ে খুব খুসী হলুম। সাধারণে তো আমাকে অহংকৃত এবং হৃদ্যতাবিহীন ব'লেই মনে করে। সেইজন্যেই জনসমাজে আমি যত প্রশংসা পেয়েছি তত প্রীতি পাইনি। আমি যদি স্বভাবতই কঠিন-হৃদয় ও স্নেহ-সম্পদে কৃপণ হতুম তা হ'লে কবি হতেই পারতুম না। অন্তরে যার রসের অভাব সে কখনো রস-সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু যখন অনেক লোকের একই রকম ধারণা হচ্চে তখন বলতেই হবে যে আমার মধ্যে একটা কিছু অভাব আছে যাতে ক'রে আমার দেশের লোক আমার হৃদয় স্পষ্ট দেখতে পায় না। সম্ভবত: আমাদের দেশের হৃদয়াবেগ প্রকাশের যে বিশেষ রীতি সাধারণে প্রচলিত আমার তা অভ্যাস নেই। তার দুটো কারণ আছে। প্রথমত আমাদের পরিবার একঘরে, সমাজের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা ঘটতেই পারেনি। দ্বিতীয়ত: ছেলেবেলা থেকে আমি আমাদের পরিবারের কোণে কোণে অত্যন্ত লাজুক ও মুখচোরা ভাবেই কাটিয়েছি। আমাদের আত্মীয়ের পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ কেন-না আমরা সমাজের বহির্বর্তী। এই জন্যে আমাদের দেশে আত্মীয়তা প্রকাশের যে সব ধরণ আছে তাতে আমার হাত পাকেনি। এই সব কারণে দেশের জনসাধারণ যদি আমাকে ভুল বোঝে সে আমার ভাগ্যের দোষ। পূজ্যপাদ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। আমি জানি তাঁর কাছে বসতে কেউ সাহস করত না—আমরা কেউ কেউ—তাঁর কাছে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম কিন্তু তাঁর গা ঘেঁসা হবার যো ছিল না। কিন্তু আমার ঘরে চড়াও হয়ে উপদ্রব করতে না পারে এমন অপোগণ্ড ব্যক্তি তো কেউ নেই। অথচ বঙ্কিমকে কেউ উদ্ধত বা কঠিন-হৃদয় বলেনি। কেন-না যাঁর কাছে কেউ সহজে আমল পায় না তাঁর অনুগ্রহের কণা পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিন্তু যার কাছে কোন বাধা নেই তার কাছে দাবীর ষোল আনা পূর্ণ করতে না পারলে আট আনারও রসিদ পাওয়া যায় না।

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তারপরে ভারি রাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি,
বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বেড়ালের ছানা,
লোকে তারে বলে, নয়নের জলে
"দাতা বটে ষোল আনা"।

যাক্‌গে, আশা করি তোমরা ভালো আছ। ইতি—

এথেন্স, ৭ই নভেম্বর ১৯২৫।

স্নেহানুরক্ত
তোমাদেরই
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে কবি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ছাত্রাবাসের ছাত্রদের দৈনন্দিন আহারে যোগ দিতেন। কয়েক মাস পরে সেখানে কবিপত্নী পীড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কবি কলিকাতায় আসেন। সর্বপ্রকার ও নানাবিধ চিকিৎসা এবং কবির অহর্নিশি প্রাণপাত সেবায়ও কোনো ফল হইল না। ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ (১৯০২) রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিলেন। কবির বয়স তখন একচল্লিশ সবে পূর্ণ। কবিজায়া কেবলমাত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেখিয়া গিয়াছিলেন। জীবনসঙ্গিনীর তিরোভাবে এই শোক যে কিরূপ গভীরভাবে কবিকে আঘাত দিয়াছিল, পত্নীর উদ্দেশে লিখিত ঐ সময়ের ও পরবর্তীকালের কবিতাবলীতে তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ। ঐ সময়ের কবিতাগুলির সংগ্রহ "স্মরণ"এ প্রকাশিত হয় ও পরবর্তীকালের কবিতাগুলি "পূরবী" প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থে প্রকাশিত। এরূপ বিরহের কাব্য বঙ্গভাষায় কেন, পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় বিরল। অনেক কবিই নিজেদের বেদনা মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন এবং তাহা পাঠকের হৃদয়ে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের একটি শোকাবহ ঘটনার কারুণ্য সঞ্চারিত করে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ"এর কবিতাগুচ্ছ মেঘদূতের বিরহের মতো বিশেষকে নির্বিশেষ করিয়াছে। যে কোনো প্রিয়াহারা বিপত্নীক ইহাতে নিজ প্রাণের সাড়া পাইবেন ও শোক সহ্য করিবার শক্তি সঞ্চয় করিবেন। 'জীবনসঙ্গিনী' লোকান্তরে চলিয়া গেলেও প্রতিনিধিরূপে 'আত্মারসঙ্গিনী' হইয়া আমরণ জীবিতের সাথের সাথী থাকেন—

আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো
যেন আমি বুঝি মনে অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজ মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।

(স্মরণ)

আর স্মৃতির সুধায় বিদায়ের পাত্র তো চিরদিন ভরাই থাকে তাই
আজ তুমি দূর হতে গেছ অতি দূরে
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া সোনার সিন্দুরে।
সঙ্গীহীন গৃহ মোর হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি, সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন॥

(পূরবী)

ইহার পর সন্তানদের প্রতি মাতা ও পিতা উভয়ের সকল কর্তব্যই রবীন্দ্রনাথকে একা প্রাণ-পণে পালন করিতে হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃণালিনী দেবীর জীবদ্দশাতেই কবি-গুরু বিহারীলালের তৃতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ দেন। শরৎচন্দ্র তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ এবং বি, এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া মজ্ঞাফ্ফরপুরে ওকালতি করিতে ছিলেন। বিবাহের পর কবি জামাতাকে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার করাইয়া আনেন ও শরৎচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীদের অন্যতম হন। সতেরো বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা ১৩২৪ সালে লোকান্তর গমন করেন। শরৎচন্দ্র কবির মৃত্যুর পরবৎসর ১৩৪৯ সালে পরলোক গমন করেন।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা রাণীর (রেণুকার) সহিত ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিবাহ হয়। য়্যালোপাথ সত্যেন্দ্রকে হোমিওপ্যাথি বিদ্যায় কৃতবিদ্য করিবার মানসে কবি তাঁহাকে য়্যামেরিকা পাঠান ও তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই, বিবাহের কিছু দিন পরেই কবির দ্বিতীয়া বা মধ্যমা কন্যা নিঃসন্তান অবস্থায় আলমোড়া শৈলে ১৩১০ সালে অকালে পরলোক যাত্রা করেন। সত্যেন্দ্রনাথও কয়েক বৎসর পরে লোকান্তরিত হন।

১৩১৪ সালে কবির কনিষ্ঠা কন্যার সহিত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নগেন্দ্রনাথকে কবি জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের সহিত য়্যামেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিয়া আসেন ও রথীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি পরীক্ষোত্তীর্ণ হন ও নগেন্দ্রনাথ বিলাতে আসিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর নন্দিতা নামে এক কন্যা এবং নীতীন্দ্রনাথ নামে এক পুত্র হয় কিন্তু জার্মাণীতে শিক্ষার্থী অবস্থায় ১৩৩৯ সালে ২৩ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৌহিত্র নীতীন্দ্রের অকাল মৃত্যু হয়। এই "নীতু"-কেই কবির "পুনশ্চ" গ্রন্থখানি উৎসর্গীত। কবির বৃদ্ধ বয়সে এই শোক যে তাঁহার মর্মান্তিক হইয়াছিল তাহা লেখা বাহুল্যমাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কন্যাদের সর্বপ্রকারে সুখী করিবার যতই চেষ্টা করিয়াছেন, ততই বিফল মনোরথ হইয়া দারুণ বেদনাভোগ করিয়াছেন। ইহাই নিয়তির পরিহাস।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ (ভোলা) বোলপুর বিদ্যালয়ে পাঠদ্দশায় মুঙ্গেরে বেড়াইতে যান। কবি তখন কলিকাতায় কর্মব্যস্ত। অকস্মাৎ কনিষ্ঠ পুত্রের বিসূচিকা রোগ হওয়ায় 'তার' পাওয়া মাত্রই মুঙ্গের যাত্রার উদ্দেশ্যে কবি হাওড়ার স্টেশনে গিয়া পৌঁছাইলেন। স্টেশনে তখন কোনো যাত্রী গাড়ি পাওয়া গেল না, রাত্রির শেষ যাত্রীগাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। কবি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া মাল-গাড়ীতে রওনা হইলেন। কিন্তু এত করিয়াও পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হইল না। ১৩১৩ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ শমীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে য়্যামেরিকা যান ও তথাকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস-সি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরেন ও ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে বিবাহ করেন। ইহাই জোড়াসাঁকো বাড়ীর প্রথম বিধবা বিবাহ। প্রতিমা দেবী বিশ্বভারতী মহাবিদ্যালয়ের বহুদিন "প্রাণেত্রী" ছিলেন। কবির তিরোধানে ইঁহার রচিত "নির্বাণ" গ্রন্থটি বহু তথ্য সম্বলিত। বাৎসল্যরসের চর্চা না হইলে যে জীবন অসার্থক, কবি তাহা চিরদিনই উপলব্ধি করিতেন। জীবন্ত বালকের উৎপাত সহ্য দ্বারা নিজের দারিদ্র্যবোধ উপলব্ধি—ইহা কবি লিখিয়াছেন। রথীন্দ্রনাথ নিঃসন্তান থাকায় একটি মাতৃহীনা গুজরাটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে শিশুকাল হইতে লালন পালন করিয়াছেন! এই কন্যাটির ডাক নাম পুপে, পোশাকী নাম নন্দিনী। রথীন্দ্রনাথ এক্ষণে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব। পিতার সহিত সস্ত্রীক রথীন্দ্রনাথ বিশ্বের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন।

সাহিত্যিক সাধারণ মানব শ্রেণীর উচ্চস্তরে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে আবার কবি প্রতিভাযুক্ত জন কিয়ৎ পরিমাণে কেহ কেহ ভাবং-অনুভূতিবিশিষ্ট ও তৎপ্রকাশে ব্যাকুল থাকায় তাঁহাদের রচনা ঐশী প্রেরণা বলিয়া ধরা হয়। পণ্ডিতগণ মনীষীজীবনালোচনায় দ্বিধারার সৃজন করেন কিন্তু সমগ্র মানবটিকে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হন। এ যেন সুধাকর আর জ্যোৎস্নার প্রভেদ। কবির জীবনযাত্রা শুধু কাব্যজীবন নয়! তাঁহার বাক্য, চেতনা, প্রেরণা, সামাজিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাত ও বিকৃতি প্রকাশ —সমগ্রতাতেই তাঁহাকে লওয়া উচিত! তাই কবীন্দ্রের কাব্য-জীবন ছাড়াও অন্যান্য জীবনের ঘটনাবলীর এতাদৃশ আলোচনা। আমাদের অক্ষম লেখনীর এ ভাষণ অব্যক্ত-সাগরের একটি তরঙ্গ মাত্র।

কবির স্ত্রীবিয়োগ ও মধ্যমা কন্যার মৃত্যুর পর তাঁহার গার্হস্থ্য-জীবন ধারাবাহিক ভাবে লিখিতে হইয়াছে তাই এইবার তাঁহার মহাগুরুনিপাত সম্বন্ধে লিখিতেছি। উপরোক্ত দুই শোক পাইবার পরই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ জানুয়ারিতে মহর্ষির ৮৮ বৎসরে তিরোভাব। মহর্ষির পঞ্জরে বেদনার জন্য অস্ত্রোপচার হইল। মহর্ষি কবিকে ইসারা করিলেন পার্শ্বে বসিতে। কবির মুখের দিকে মহর্ষি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিলেন—রবি, তুমি পাঠ করো, শুনতে চাইছেন। মহর্ষির চতুর্দিকে ঘরে তখন পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র, প্রভৃতি সকল আত্মীয়গণ সমবেত; কবি পড়িতে লাগিলেন—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ইত্যাদি!

মহর্ষি বলিয়া উঠিলেন—আমি বাড়ি যাব। তারপর বেলা বারোটার পর মহাপ্রয়াণ। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅরবিন্দের স্বরূপ

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সকলের অলক্ষ্যে, কবে কে জানে, শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাত্ম-জগতের সর্ব্বোচ্চ আসনে উঠিয়া বসিয়াছেন! এ যুগে যোগসাধনায় তাঁহার সমকক্ষ মহাযোগী কেহ জগতে আছেন কি না সন্দেহ! প্রাচীর এই সব অমৃতের বরপুত্ররা এমনই নীরবেই আসিয়া থাকেন এবং উর্দ্ধে ঐ শান্ত ও অসীম নভোমণ্ডলের মত নিজ মহিমায় কখনও উদিত থাকেন। তাঁহাদের আবির্ভাব ও জীবন-সাধনার প্রচারের জন্য কোন জয়ঢাক বাজে না। নবোদিত ভানুর কিরণের মত নিঃশব্দেই তাহা জগৎ ছাইয়া ফেলে। দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের নাম তাঁহার তিরোভাবের পরই দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়াছিল। সত্যের যে আলো ভগবান বুদ্ধদেব জগতে আনিয়াছিলেন, তাঁহার নির্ব্বাণের পরই তাহা অর্দ্ধ পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রেমের দেবতা যীশুখৃষ্ট অর্দ্ধ জগৎ জয় করিয়াছিলেন তাঁহার জীবদ্দশায় নহে, ক্রুশবিদ্ধ হইয়া তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিবার পর। এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্য। আমাদের দেশের অমর কীর্ত্তি—অজন্তা, বাঘ, তাজমহল বা কুতবমিনারের শিল্পীর নাম কেহ প্রচার করিবার কল্পনাও করে নাই; নটরাজের নৃত্যললিত রূপ কোন অমর শিল্পী কবে প্রস্তরে কুঁদিয়া তুলিয়াছিল তাহার ইতিহাস কেহ রাখে নাই। প্রকৃতির নীরব সৃষ্টি ও রূপসম্ভারের মত প্রাচ্যের সৃজনী-প্রতিভাও অহং জ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করিয়াই ফোটে এবং চিরদিনই ফুটিয়াছে।

ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনগুরুরা তবু কিছু প্রচারে মন দিয়াছিলেন কিন্তু সত্যের সন্ধানী মহাযোগীরা চিরদিনই আত্মপ্রচারে ছিলেন অল্পবিস্তর উদাসীন। লৌকিক ধর্ম্মে, দার্শনিক ব্যাখ্যায় এবং পরাধর্ম্মে এইখানেই পার্থক্য। যে পরাতত্ত্ব ও পরাশক্তিকে লইয়া যোগধর্ম্ম বা পরাধর্ম্মের সাধনা সে শক্তি যে নিতান্তই লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রাণের অনন্ত মহাসিন্ধুরূপে এই দৃশ্য চরাচরকে নিঃশব্দে সকলের অগোচরে কোলে করিয়া আছে। তাহার বহিঃপ্রকাশ, তাহার মূর্ত্ত প্রতীক প্রকৃতিই কেবল প্রকট হইয়াই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমানা। লোকায়ত ধর্ম্মের সাধনা এই বাহ্যরূপকে লইয়া; সে ধর্ম্ম অন্তরের গুহাহিত সত্যকে জানে না।

শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার সাধনার নিগূঢ় কথা আমার পক্ষে বলা কঠিন, তাহা কেবল তিনিই বলিতে পারেন। কর্ম্ম বা চিন্তাজগতে যিনি বড় তাঁহার জীবন-কথা বলা বরঞ্চ সহজ, কিন্তু যিনি সৃষ্টির মূল সত্য ও জ্যোতিকে নিজের সাধনায় রূপ দিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা একেবারেই সহজ নয়। মনের জগতের অতি উর্দ্ধে স্বপ্রকাশ তত্ত্বের রাজ্যে যাঁহার স্থান তাহাতে মন প্রকাশ করিয়া বলিবে কিরূপে? আমার লিখিত এই শ্রীঅরবিন্দের কথা তাই এই অপূর্ব্ব অতিমানবের সাধনতত্ত্বের স্থূল মানস ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী-পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা ভারতবাসী, তাঁহাদিগকে এই কথাটি গোড়াতেই সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের নিছক রাজনীতির সাধ আকাঙ্ক্ষার ঠাকুর শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ আর নাই, তাঁহার স্থানে আজ জন্মিয়াছেন বা রূপ লইয়াছেন এক সৃষ্টিছাড়া অতিমানব। রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিক ও মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগকে এই নূতন রহস্যের শ্রীঅরবিন্দকে বুঝিতে হইবে। বাহিরের এই বিচিত্র স্থূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের হাটে তাঁহাকে না খুঁজিয়া খুঁজিতে হইবে এক নূতন চেতনা স্তরে—সেই অভিনব স্তরে আমাদের মনবীণাকে বাঁধিতে হইবে—সেই উর্দ্ধতর শক্তি ও আনন্দের স্বরে যে লোক সচ্চিল্লোকে তিনি স্বয়ং আজ অবস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের মত সাধককে মানবতার স্তর হইতে বোঝা তবু সহজ। কারণ তিনি আমাদেরই এই হাসি-ঠাট্টার হাটে আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে আমাদেরই চোখের উপর জীবন অন্তরঙ্গতায় কাটাইয়া গিয়াছেন। সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য তাঁহাকে আমাদের নিকট করিয়াছিল কতকটা সুপরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ও পূর্ণতার সঠিক মাপকাঠি না পাইলেও তাঁহার কথায় স্পর্শে ও সাহচর্য্যে তাঁহার মহত্ত্বের স্থূল হিসাব একটা যাহা হউক আমরা পাইতাম। কিন্তু রহস্যের অন্তরালে অজ্ঞাতবাসের মাঝে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের কাছে হইয়া উঠিয়াছেন উর্দ্ধের ঐ সুপরিচিত অথচ দুর্গম নীলাকাশের মত—যাহা সুদূর হইয়াও আমাদেরই সঙ্গে আপন হইয়া আছে, যাহা আয়ত্তের মাঝে থাকিয়াও ছুঁইবার বস্তু একেবারেই নহে। গভীর এক নীরবতার অন্তরালে উত্তুঙ্গ এক চূড়ার রহস্যে তিনি যেন বড়ই পরিচিত হইয়াও কতই না সুদূর হইয়া গিয়াছেন!

ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য এই দেশজোড়া যে অভিযান তাহাতে যোগ দিবার জন্য আহ্বানের পর আহ্বান শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়াছিল। লোকে বড় আশা করিয়াছিল, যে বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের প্রথম উদ্‌গাতা, খাঁটি জাতীয়তা ও অসহযোগের প্রথম ঋত্বিক, তিনি তাঁহার তপস্যালব্ধ শক্তি লইয়া আমাদিগের এই স্বরাজ সাধনায় আসিয়া যোগ দিবেন। একে একে লজপৎ রায়, দেশবন্ধু ও গান্ধী ও দেশবন্ধু গিয়াছিলেন এই অপূর্ব্ব নেতাকে মুক্তির দিশারীকে তাঁহার নির্জ্জন তপস্যা হইতে টানিয়া আনিবার জন্য জাতীয়তার মহাযুদ্ধে, তাঁহারা তিন জনেই হইয়াছিলেন সমান ব্যর্থমনোরথ। বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের বাণী কি, তাহা জানিবার জন্য পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়া (১৯২৭ সালে) সে মৌন তাপসের কাছে ব্যর্থ হইয়া চলিয়া আসেন। ধ্যানমগ্ন তুষারমৌলী হিমাচলের কাছে বাণী যাচঞাও যাহা এই ধ্যানরত মহাশিবের কাছে তাহা আশা করা সমান কথা। জীবনের হাটের সস্তা বেচাকেনার মাঝে আকাশের সূর্য্যকে নামাইয়া আনার আশাও যা, আর আমাদের স্বার্থের হানাহানির বাজারে সেই পরাশক্তির ঋষিকে ব্যবহার করার চেষ্টাও তাহাই। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর মাঝে এমন এক পরিবর্ত্তন শেষ পর্য্যায়ে আসিয়াছিল যাহা জীবনের ভিত্তি দিয়াছে একেবারে নূতন করিয়া, বস্তুতন্ত্রতার সকল মূল্য ও হিসাব দিয়াছে পাল্টাইয়া।

আমাদের সহজ পার্থিব জীবনেও এমনই ওলটপালট মাঝে মাঝে আসে, যাহাতে জীবনের ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়; কিন্তু সে পরিবর্ত্তন শনৈঃ শনৈঃ আসে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্য দিয়া, সে পরিবর্ত্তনের ফলে জীবনের পরিধি বিস্তৃত হইয়া চলে বটে কিন্তু তাহা ঘটে এমনই ধীরে ধীরে যে, তাহার পারিপার্শ্বিক অপরিবর্ত্তিত থাকায় সে নূতন জীবনকে সেই অপরিণত জীবনেরই রূপান্তর বলিয়া চিনিতে

কষ্ট হয় না। এই প্রকার সহজ গতির ও স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন এই মহাবিপ্লব—শ্রীঅরবিন্দের এই দিব্য রূপান্তর—পুরাতন চেতনা হইতে উঠিয়া তাঁহার উর্দ্ধের নব চেতনায় পুনর্জন্ম। বুদ্ধ বা রামকৃষ্ণের মত দুর্লভ মানুষের জীবনেই এই ওলটপালট করা নবজন্ম আসে যখন বহু শতাব্দীর মানব-অভিব্যক্তির বিপুল অবিরাম গতি কয়েক বৎসরের সাধনার মাঝে সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত হইয়া রূপ লয়।

এই কারণেই দেশ তাহার রাজনীতিক মুক্তির বেদনারও সংঘর্ষের মাঝে এই নূতন অরবিন্দকে চিনিতে পারে নাই, ইহা কিছুমাত্রই বিচিত্র নহে। শান্ত ত্যাগের অপূর্ব্ব মহিমায় এই মানুষটির স্বার্থের এত বড় হট্টগোলের হাটে চেনা বড় শক্ত। তাঁহার এই মুক্তি ও নির্লিপ্তকে ইহবিমুখ সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্য বলিয়া ভুল করা তাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। বাসনা-ক্ষিপ্তের পক্ষে সে ঋজু সমগ্র দৃষ্টি লাভ করা অসম্ভব, যাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সত্যগুলির প্রকৃত অর্থ ও সামঞ্জস্য ধরিতে পারে. তাই আমরা যখন শ্রীঅরবিন্দকে আমাদের স্বরাজ সাধনার সহায়রূপে পাই না তখন আমাদের ক্ষুব্ধ নিরাশ মন তাঁহার বিরুদ্ধে করে বাল্যোচিত বিদ্রোহ ঘোষণা। যাহা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না তাহাকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ব্যাপারীর পক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনাবশ্যক খেলা মনে করা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। যে শিশুর মন তাহার তুচ্ছ খেলার পুতুলের উর্দ্ধে উঠিতে পারে না সে কিরূপে বুঝিবে সোনালী উষার বুকে ব্যক্ত ঐ বর্ণসুভগ শোভা বা নীল নভের গায়ে তুষারমৌলী গিরিশৃঙ্গের মহিমা? শিশুর খেলাঘরে তাহাদের স্থান নাই বলিয়া এ কথা বলা যায় কি যে, তাহাদের কোন সার্থকতাই জগতে নাই? শিশু কিন্তু তাহাই ভাবে। সত্যকার জ্ঞানী তাহার উর্দ্ধ হইতে নিক্ষিপ্ত সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে পায় কোথায় কোন বস্তুর প্রকৃত সংস্থান, কোনটির সহিত কাহার কি এবং কতটুকু সম্পর্ক। সে স্থানে জীবনের পূর্ণ ছবির রূপ, এই রূপরস-শব্দময় মহাকাব্যের সমগ্র অর্থ ও সঙ্গতি।

বহু শতাব্দীর ঘুম ভাঙিয়া ভারত জাগিতেছে; তাহার সনাতন জীবন সত্য তাই হয়তো বর্ত্তমানের নূতন ভাবায় আবার নব-আকারে প্রকাশিত হইবে। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কৃষ্টির মিলনজ বরপুত্র এই শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ভারতের জীবন-পদ্মের আছে বহু দল, ভারতের কৃষ্টিগত মূল সত্যের আছে বহু দিক। ভারতকে বুঝিতে হইলে শুধু রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, দেশবন্ধু ও মহাত্মাকে বুঝিলেই চলিবে না, বুঝিতে হইবে বহুযুগের বহু সভ্যতার সামঞ্জস্যের কেন্দ্রীপুরুষ এই অরবিন্দকে। যে ভারত জগৎকে দিয়াছে বেদ ও উপনিষদের মত অনবদ্য পরিপূর্ণ সত্য, যে ভারতের ক্রোড়ে জন্ম লইয়াছেন বুদ্ধ, শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্য সে ভারত তাহার পর এতগুলি শতাব্দী পার হইয়া রাজনীতিক দাসত্বের মাঝেও ফুটিয়াছে অধিকতর বৈচিত্র্যে ও সম্পদে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ক্রমোন্নতির উচ্চতায় ও ব্যাপ্তিতে—সে ভারতের ইতিমধ্যে অবশ্যই হইয়াছে বিপুলতর এক নব বিকাশ। যাহা পূর্ব্বে ছিল ধ্যানমগ্ন ও অন্তর্নিহিত, পাশ্চাত্যের কৃষ্টির স্পর্শে তাহা হইতেছে সৃষ্টি-উন্মুখ ও জাগ্রত। মানব সাধনার বৈকুণ্ঠ যেন এত দিনে ধরায় রূপ লইতে নামিতেছে। সুতরাং আমরা যদি শ্রীঅরবিন্দকে বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে সত্যের বা পরম জ্যোতির এই নিম্নগামী ধরামুখী গতিকে বুঝিতে পারিব না। জগজ্জননীর নূতন বাণী যাহা তিনি মানবকৃষ্টির পত্রে পত্রে লিখিয়া চলিয়াছেন; তাহাকে আমাদের মনের বিকৃতি ও অজ্ঞান দিয়া বুঝিতে যাওয়া বৃথা। *

---

* আমার লিখিত ইংরাজিতে শ্রীঅরবিন্দ-জীবনীর (অপ্রকাশিত) প্রথম পরিচ্ছেদ বা মুখবন্ধ।

প্রাচীন পত্রিকার আদর্শ

আজ-কাল সংবাদপত্রের অপ্রতুল নাই। নানা স্থান হইতে নানা প্রকার সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে। তন্মধ্যে দুই-চারিখানি মাত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে তৎপর হইয়াছে। অপরগুলি কেবল জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যে দুই-চারিখানি ভাল বলিয়া খ্যাত, তাহাতে সংবাদের ভাগই বেশী, প্রকৃত কাজের জিনিস কম। যাহাতে সাহিত্য-সংসারের উন্নতি হয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান ও আচার-ব্যবহারাদির উদ্ভাবন হয়, বিবিধ পুরাণ, উপপুরাণ সংহিতা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সরল ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভারতের নির্ব্বাণোন্মুখ গৌরবরাশি প্রকাশমান হয়, ইত্যাদি বিষয়ের একটিও প্রস্তাব প্রায় সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান মহামহোপাধ্যায় সম্পাদকেরাও স্ব স্ব পত্রিকায় স্থান সমাবেশের অসদ্ভাব বশতঃ হউক বা এরূপ প্রস্তাব সংবাদপত্রের উপযুক্ত নয় বলিয়া হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, এ প্রকার প্রস্তাব লিখিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতে যত্ন করেন না। কেহ কেহ বৎসরান্তে কায়ক্লেশে এক-আধটি লেখেন, তাহাও তত ভাল হয় না। বস্তুতঃ, কতকগুলি অসার সংবাদ দ্বারা পত্রিকা অলঙ্কৃত করা গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই।

—বিশ্বদর্পণ (মাসিক) চৈত্র ১২৭৮ (১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা)

বিপিন দা' স্মরণে

অমর মুখোপাধ্যায়

মনে পড়ে, একবার বিপিন দা'কে প্রশ্ন করেছিলুম—'দেশের জন্ত ত' সারা জীবনটা বিলিয়ে দিলেন, প্রতিদানে কি পেলেন?' একটা অট্টহাসির সঙ্গে বিপিনদা' জবাব দিয়েছিলেন—'দেশ অনেক দিয়েছে তোমরা বুঝতে পার না।' সত্যিই, সেদিনও বুঝতে পারিনি···।

হাওড়া জেলার ভাটোরা ইউনিয়নে যুব-কংগ্রেসের এক সম্মেলনে দুদিন কাটিয়ে বিপিনদা'র সঙ্গে কলকাতায় ফিরছি। পথে 'চেঙ্গাইল' ষ্টেশনে আকস্মিক ভাবেই বিপিনদা' নেমে পড়লেন। আমরাও নামলুম। আমি আর হাওড়া জেলার আমাদের এক সহকর্মী। তখন প্রায় দুপুর। আমরা সকলেই বেশ ক্লান্ত। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে গ্রামের পথ ধরে বিপিনদা'কে অনুসরণ করছি। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটছে—কাছাকাছি একটি টিউবওয়েলও নজরে পড়ে না। পুকুরগুলি শুষ্কপ্রায়। কিছু পথ চলার পর বিপিনদা' বললেন 'কোথায় যাচ্ছি জান?' কৌতূহলী দৃষ্টি আমাদের। বিপিনদা'ই বললেন—'মাইল তিন দূরে একটি গ্রাম—সেখানেই যাব। এসেছিলুম প্রায় চব্বিশ বছর আগে পুলিশকে আড়াল দিয়ে। এখানে ভাল সংগঠনও গড়ে উঠেছিল। তারপর, কে পুলিশকে খবর দেয়। আমিও সময়মত সরে পড়েছিলুম। কিন্তু পুলিশ সমস্ত গ্রামটা প্রায় তছনছ করেছিল।' অল্প কথায় আমাদের গন্তব্য স্থানটির ইতিহাস জেনে নিলুম। কিন্তু তৃষ্ণার জ্বালা মেটাই কি করে? হঠাৎ, নজর পড়ল—একটি লোক একটি গরুর গাড়ীতে ডাব কেটে বোঝাই করছে। ছুটে গেলুম। সে জানাল, ডাব তার বিক্রি হয়ে গেছে—আর, তাছাড়া খুচরা বিক্রি সে করে না। বিপিনদা' বললেন 'কিছু পয়সা বেশী লাগে তাও দিচ্ছি, আপাততঃ আমাদের জলকষ্টর একটা কিনারা তুমি কর।' প্রায় দেড়া দাম দিয়ে তিনটি ডাব পাওয়া গেল। বাঁচলুম যেন।

আবার এগিয়ে চললুম। মাথার ওপর সূর্য্য ক্রমেই গরম হচ্ছে। দু'ধারে মাঠ—মাঝখানে মাটির রাস্তা বেয়ে চলেছি আমরা। বিপিনদা' আগে-আগে চলেছেন—কোন কষ্টই যেন তাঁর নেই। বার্দ্ধক্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি কোন দিন—যৌবনের গতি তাই তাঁর। অনেকটা পথ পার হয়ে আসার পর গ্রামের প্রান্তে তখন আমরা এসে পড়েছি প্রায়, ঠিক এমনি সময় সাইকেলের যাত্রী এক ডাক্তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিপিনদা'কে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর বিপিনদা'কে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। বিপিনদা' তাঁর কাধে হাতটি রেখে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—'কেমন আছ তোমরা দেখতে এলুম। একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েছ যে!' ভদ্রলোক সলজ্জ ভাবে একটু হেসে সাইকেলটি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—'আপনি আসুন। আমি এগিয়ে গিয়ে গ্রামে খবর দিই।' বিপিনদা' বললেন—'তুমি ত রুগী দেখতে যাচ্ছিলে হে!' উত্তর হল—'ওটা ত' প্রতি দিনের কাজ, কিন্তু আপনি ত' আর রোজ আসবেন না।' এগিয়ে গেলেন তিনি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লুম আমরা। চমকে গেলুম। সারা গ্রাম কাঁপিয়ে শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। বাড়ীর ছাদগুলি ভরে গেছে। মেয়েরা ছাদের ওপর থেকে বিপিনদা'র মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। হাসতে হাসতে বিপিনদা' চলেছেন। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। বিপিনদা'র প্রতি এত ভালবাসা, এত শ্রদ্ধা এই গ্রামে জমা হয়েছিল, কে জানত? গ্রামের স্কুল ভেঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীর দল 'বন্দে মাতরম্', 'বিপিনদা জিন্দাবাদ' ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে আসছে। সমস্ত গ্রামটিতে যেন বিদ্যুতের সাড়া পড়ে গেছে। বিপিনদা'র সহগামী আমরা দু'জন পরস্পরের দিকে মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছি—কথা সরছে না কারও। দেখতে দেখতে আমরা জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেলুম যেন। বিপিনদা' সমান গতিতে এগিয়ে চলেছেন—পিছনে কয়েক শত ছেলে-মেয়ে-যুব-বৃদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত্তের আয়োজনে গ্রাম-জোড়া এ-হেন অভিবাদন ক'জন নেতার কপালে জোটে! এ ত প্রয়োজনের আয়োজন নয়—এ যে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলন!

আমরা এসে পৌঁছলুম ডাক্তার বাবুর বাড়ী। তার পর······ কত মানুষের আনাগোণা, কত পুরান দিনের কথা, গ্রামটির উত্থান-পতনের কত ইতিহাস, কত হাসি, কত গান—সময় কাটতে লাগল। আহারাদি সারা হ'ল। বিপিনদা' আবার বার হলেন গ্রাম পর্য্যটনে। ক্লান্তি-অবসাদ যেন আর কিছুই নেই। মনে হল, কেন আর কলকাতায় যাওয়া, এখানেই থেকে যাই না। ঘণ্টা কয়েক পার হ'ল পায়ে পায়ে। সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক ভাবে বিপিনদা'কে অভিনন্দন জানান হ'ল। রাত্রিটুকুও কাটল গল্প-গুজবেই।

পরদিন ফেরার পালা। সারা গ্রামের শোভাযাত্রা নিয়ে বিপিনদা' চলেছেন ষ্টেশনের দিকে। সেই শঙ্খধ্বনি—সেই 'বন্দে মাতরম্'—সেই 'বিপিনদা জিন্দাবাদ' মুখরিত করছে আকাশ-বাতাসকে। হৈ-হৈ করে চলেছি আমরা। গ্রাম পিছনে রইল পড়ে। পার হলুম মাঠের পথ। আবার দেখা সেই ডাবওয়ালার সঙ্গে—গাড়ী বোঝাই করে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ। অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল এইখানে। সারা গ্রামের সেই আনন্দের সুর কেমন করে যেন তার কানে এসে লেগেছে। সে তার গাড়ী থেকে ডাব নিয়ে একটার পর একটা কাটতে সুরু করে দিলে এবং শোভাযাত্রাকারী প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের দিকে এগিয়ে দিতে লাগল, বিপিনদা' কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন। শেষে তার কাঁধে একটি হাত রেখে, একটি দশ টাকার নোট এগিয়ে দিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই নেবে না। বিপিনদা'র পা স্পর্শ করে সে যা বলল, তাতে আরও চমকিত হলুম। সে বলল—'আগে আপনাকে চিনতে পারি নি। আমিও এই গ্রামের মানুষ। আমার দাদার কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি—আজ দেখলুম। আপনি দেশের জন্ত সর্বস্ব দিয়েছেন আর আমি ঐ ডাব ক'টার মায়া ছাড়তে পারব না।' বিপিনদা' জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার দাদার নাম কি বল ত?' সে বলল—'নিতাই। মাছের ব্যবসা করত।' বিপিনদা' চমকে উঠে বললেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ,··· ·· মনে পড়েছে। কিন্তু সে এখন কি করছে?' নিস্প্রভ জবাব—'পাঁচ বছর হল, মারা গেছে।' বিপিনদা' একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।—শেষে তার হাতটি ধরে জোর করে সেই দশ টাকার নোটটা গুঁজে দিলেন। বললেন—'তোমার ছেলেমেয়েদের মিষ্টি কিনে দিও—আমি তোমার দাদার দাদা, এটা নিতে লজ্জা পেও না।'

আবার এগিয়ে চললুম। ষ্টেশনে এসে আমাকে কাছে ডাকলেন বিপিনদা'। হাসতে হাসতে বললেন—'এক দিন জিজ্ঞাসা করেছিলে যে, দেশ আমাকে কি দিয়েছে, না? গরীব দেশ—এর বেশী আর কি দেবে বল?' চুপ করে রইলুম। মনে মনে ভাবতে লাগলুম—রাজ-সিংহাসন আর হৃদয়-সিংহাসন·····কোনটা বেশী ভারী!

প ঞ্চ ত পা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৪

পরদিন সকাল।

দিনটাই যেন ভয়ে ভয়ে মুষড়ে আছে কেমন। নিস্তেজ মেঘাচ্ছন্ন। অবিরাম বর্ষণের ফলে মড়াইয়ে একটা বিষণ্ণ ছায়া পড়েই আছে। নিরানন্দ, নিরুৎসাহ দিনের গতি।

যেখান দিয়ে সচরাচর মড়াইয়ে নামে সকলে সে জায়গাটা ছাড়িয়ে খানিকটা তফাতে গিয়ে একেবারে ধার ঘেঁষে বসল সান্ত্বনা। প্রতীক্ষা করছিল, বাবা বেরুতে সেও বেরিয়ে পড়েছে। মড়াইয়ে প্রলয়ঙ্কর ঝড় হয়ে গেছে একটা। ওর জীবনেও তেমনি ঝড় এসেছে বা আসছে। মুখে সেই স্তব্ধতার আভাস।

থেকে থেকে দু'চোখ মড়াইয়ের ওপর ঘুরে আসছে এক চক্কর করে। সন্ধানী দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে পাশের পাহাড়ী রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা। কাছাকাছি এসে যারা ওই উৎরাই ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে তাদের দেখছে। নিধু বলেছিল সকালে সেই মেয়ে আসবে ড্যাম দেখতে। নরেনবাবুর মতে, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের এই কাজ এই নিষ্ঠা সব কিছু আজও তচনচ করে ফেলতে পারে যে, সেই মেয়ে···। আসবে কি না কে জানে। এলেই বা কি করবে ও?

জানে না। তবু এসেছে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সচকিত হয়ে ফিরে তাকালো। পায়ে পায়ে এই পথেই আসছে ওই ঝকঝকে মেয়ে।···একটাই পথ। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। খুঁজছে কাউকে বোঝা যায়।

সান্ত্বনার চোখে পলক পড়ে না। দুই চোখে তাকে টেনে নিয়ে আসতে চায় কাছে।

গত সন্ধ্যায় নিধুর শেষের কথা ক'টা ঠাস ঠাস করে কানে বেজে উঠল। বলেছিল, বাবু যত কড়া ব্যবহারই করুক, এরকম দেখা সাক্ষাৎ হলেই আবার সব ভুলে যাবে···বড় জবরদস্তি মেয়ে নীলা দিদিমণি···।

নীলাও দেখেছে ওকে। নিস্পৃহ দেখা। মুহূর্তে সান্ত্বনার সকল গাম্ভীর্য তলিয়ে গেল কোথায়। হাত তুলে ইশারায় ডাকল। কাছাকাছি হতে হেসে বলল, আপনি যাঁকে খুঁজচেন তিনি ও-ও-ই নিচে।

আঙুল দিয়ে দূরে মড়াইয়ের গহ্বরে একটা দিক দেখিয়ে দিল।

অবাক বিস্ময়ে নীলা চেয়ে রইল তার দিকে। আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ, ওই দিক দিয়ে নিচে নেমে যান, এখান দিয়ে নামতে গেলে পা হড়কে নিচে যখন পৌঁছুবেন, আর দেখতে হবে না।

আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো নীলা। দেখল ভালো করে। এরকম যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হাসতে চেষ্টা করল একটু। আপনি আমাকে চেনেন?

—খুব। ভগীরথ বাবুর টেবিলে আপনাকে দেখেছি।

—ভগীরথ বাবুর টেবিলে! বিস্ময় ঝরল নীলার কণ্ঠে।

কলহাস্যে ভেঙে পড়ল সান্ত্বনা। নিজের কাণ্ড কারখানায় নিজেই অবাক। দম নিয়ে জবাব দিল, দেশে দেশে জল পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন ওই যে ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি—তাঁর টেবিলে।

নীলা বুঝল। কিন্তু বিস্ময় কমল না একটুও। বরং বাড়ল। নিজের অগোচরে আবারও দেখল খানিক।—তুমি, মানে আপনি কে?

সেই হাসি।—আমি? আমি সান্ত্বনা।

—সান্ত্বনা কে?

—যাচ্ছেন তো ভগীরথ বাবুর কাছে, তাঁর কাছেই জেনে নেবেন সান্ত্বনা কে।

যত বিস্ময় ততো কৌতূহল। হাসতে চেষ্টা করল নীলাও।—আপনার মুখেই শুনি না সান্ত্বনা কে?

হালকা কৌতুকে তার চোখে চোখ রাখল সান্ত্বনা। খেলনাপাতি গোছের কিছু দেখছে যেন। পরে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, নীলা সকলের সয় না, কিন্তু সেই না সওয়ার দুঃখও পুরুষমানুষের সহজে যেতে চায় না। তখন সান্ত্বনার দরকার···আমি সেই সান্ত্বনা। চিনলেন?

হাসতে হাসতে অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো। লাল হয়ে উঠছে, সেটা গোপন করার জন্যেই।

সমস্ত মুখ আরক্ত নীলার। দেখছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল আমাকে তুমি কতটুকু চেনো?

বড় করে সান্ত্বনা একটা নিঃশ্বাস ফেলল প্রথম। পরে মুখের দিকে চেয়ে নিস্পৃহ জবাব দিল, যতটুকু উনি আপনাকে চেনেন।

—উনি কে?

—আপনাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। একটু থেমে তাকেও সান্ত্বনা দিতে চাইল যেন, বলল, উনি যেমনই চিনুন, আমার কিন্তু কোনো রাগ নেই আপনার ওপর। বরং রোজ আপনাকে একবার করে মনে করি। আপনার কাছে ভদ্রলোক অমন ঘা খেয়েছিলেন বলেই আজ এমন একটা কাজে মন ঢেলে দিতে পেরেছেন।

ক্রোধে অপমানে ভিন্ন মূর্তি নীলার। সবই জানে মেয়েটা···। পায়ের নিচে মাটি দুলছে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আবারও খুঁটিয়ে দেখল তাকে। সশ্লেষে বলল, আর সেই সঙ্গে সান্ত্বনাও পেয়েছেন?

সোচ্ছ্বাসে মাথা নেড়ে সায় দিল সান্ত্বনা।

যাবার জন্য পা বাড়াল নীলা। থামল আবার। চাপা ঝাঁজে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে বললে?

আঙুল দিয়ে সান্ত্বনা মড়াইয়ের গহ্বর দেখিয়ে দিল আবার। পরে আলতো প্রশ্ন করল, কিন্তু আজ আবার কেনই বা যাচ্ছেন তাঁর কাছে?

'আর' কথাটার ওপর জোর পড়তে ব্যঙ্গের মত শোনালো। স্থির দাঁড়িয়েই রইল।

সান্ত্বনা ধীরেসুস্থে বলল, কাল রাতেও গিয়েছিলেন শুনলাম কি না···তা কাল বোধ হয় সব বলা হয়নি আপনার। হেসে উঠল।—কিন্তু যেরকম রেগে আছেন, দিনে দুপুরে লোকজনের মধ্যে ওটা কি একটা কথা বলার মত জায়গা ?

অব্যক্ত রোষে নীলা বিবর্ণ। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তোমার সাহস তো কম নয় !

কি বলছে বা কি বলেছে, কি করছে বা কি করেছে হুঁস নেই সান্ত্বনার। কিন্তু এটুকু খেয়াল আছে, যে নাটকে হাত দিয়েছে তার শেষটুকু এখনো বাকি। সহাস্যে জবাব দিল, দেশে গাঁয়ে জলে জঙ্গলে মানুষ কি না···ওটুকুই আছে। ঘুরে বসল, তাকালো সোজাসুজি, হাসি মিলিয়ে গেল। বেশ স্পষ্ট মোলায়েম করে বললে, ওঁর কাছ থেকে একটা জিনিস আপনি চেয়ে নেবেন।···ওঁর টেবিলে আপনার যে ফোটোখানা আছে, সেইটে। ওটা আমি সরাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উনি সরাতে দেননি।···পাছে আপনাকে তিনি ভুলে যান, পাছে অমন একটা অবিশ্বাসের ব্যাপার মন থেকে মুছে যায়। নিজে মেয়ে বলেই চোখের সামনে অন্য কোনো মেয়েকে এভাবে ছোট করাটা মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে···লজ্জাও করে।

হয়েছে। শেষটুকু শেষ হয়েছে এবারে। পায়ে পায়ে পাথুরে রাস্তাটাকে ঘা দিতে দিতে সবেগে চলে যাচ্ছে নীলা। যতক্ষণ দেখা যায় তাকে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সান্ত্বনা। উত্তেজনা কমে আসছে। সচেতন অবসাদে ভরে উঠছে। স্থির, কঠিন, পাথর-মূর্তি।

আপিস কোয়ার্টার থেকে গাড়ি বা ট্রাক নিয়ে গেস্ট হাউসে উঠে যাবে নীলা। কিন্তু আপিস-প্রাঙ্গণে অপ্রত্যাশিত দেখা একজনের সঙ্গে। নরেন চৌধুরী। নীলা দাঁড়িয়ে গেল।

ওকে দেখে নরেনই এগিয়ে এলো। হাত তুলে নমস্কার জানালো।

নিজেকে সংযত করে প্রতি-নমস্কার করল নীলা। একে দেখে মনে মনে অবাক হয়েছে, কিন্তু প্রকাশ পেল না। বলল, আপনিও তাহলে এখানেই কাজ করছেন ?

—হ্যাঁ, এখানেই পড়ে আছি। আপনি ভালো আছেন ?

—খুব। সহজ হতে চেষ্টা করছে নীলা।

—ড্যাম দেখলেন ?

দেখলাম। নীলা লক্ষ্য করছে ওকে। কলকাতায় বাদল গাঙ্গুলি মাঝে ছিল বলেই যেটুকু আলাপ এর সঙ্গে। তবু মানুষটার ধরন ধারণ ভালই জানে। দেখা হলে অল্প-সল্প রসিকতা হত। এখনো প্রায় তেমনি করেই নীলা জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার বন্ধু না হয় এখানে এসে সান্ত্বনা পেয়েছেন, আপনি পড়ে আছেন কোন আশায় ?

নিজের অজ্ঞাতে কত বড় ধাক্কা দিয়েছে নীলা জানল না। জানলে খুশি হত। বিমূঢ় নেত্রে নরেন চেয়ে রইল তার দিকে।

—দেখছেন কী ?

—না, কিছু না। চকিতে সামলে নিতে চেষ্টা করল নরেন। কিন্তু খুব সহজ হল না সেটুকু। ওর কথাগুলো ঝিম ঝিম করছে মাথার মধ্যে। বলল, আর একটু খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করুন, এ মাথায় হেঁয়ালি ঢোকে না জানেন তো···।

নীলা চুপচাপ দেখল দু'চার মুহূর্ত। খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করল তারপর, সান্ত্বনাকে চেনেন আপনি ?

—খুব।···আপনি চিনলেন কি করে ?

—সে নিজেই চেনালে। অনেক কথা বলল আর অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল। নীলা থামল আবার, তাকালো সোজাসুজি।—মেয়েটা যা বলল সব সত্যি ?

তার বক্তব্য স্পষ্ট জানতে যা চায় সেও স্পষ্ট। তবু দুর্বোধ্য লাগছে নরেন চৌধুরীর কাছে। অনেক কথা কি বলল সান্ত্বনা, অনেক কিছু কি বুঝিয়ে দিলে !···বন্ধু সান্ত্বনা পেয়েছে, তাই ? শান্ত মুখেই জবাব দিল, কি বলল মেয়েটা আর কি বোঝালো না জানলে বলি কি করে ?

নীলার সহিষ্ণুতা গেছে। উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল না বললে বোঝেন না অমন শাদা মাথাও আপনার নয়, দয়া করে জবাবটা দিন।

তবু জবাব দিতে সময় লাগল নরেন চৌধুরীর। বন্ধু সান্ত্বনা পেয়েছে কি না সেই জবাব···। অভ্যস্ত কৌতুকের আবরণ টেনে আনতে চেষ্টা করল মুখে। হাসতে চেষ্টা করল।

প্রচ্ছন্ন ঝাঁজে নীলা আবার জিজ্ঞাসা করল সত্যি সব ?

এবারে জবাব দিল। বলল, কিছু যদি বলে থাকে সেটা সত্যি, মিছে বলাটা তার স্বভাব নয়।

দৃষ্টি বিনিময়। কয়েক মুহূর্ত।

—ধন্যবাদ। দয়া করে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন, ওপরে যাব।

অলস পায়ে ফিরে চলল নরেন। একজনকে ডেকে ট্রাক আনতে নির্দেশ দিল।

পাহাড়ী চড়াইয়ের কাছাকাছি আসার অনেক আগেই পা থেমে গেছে সান্ত্বনার। দাঁড়িয়ে দেখছে নিস্পন্দের মত।···ট্রাক এলো। আপিস কোয়ার্টারের আঙিনা পেরিয়ে, ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে নীলা এসে উঠল ট্রাকে। ট্রাক চলে গেল। আপিস কোয়ার্টারের আঙিনায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে নরেন চৌধুরী।

ট্রাক চলে যেতে ঘুরে দাঁড়াল মানুষটা।·· সান্ত্বনাকে দেখল বোধ হয়। চুপ চাপ দাঁড়িয়েই রইল।

এই পথটা পেরিয়ে সান্ত্বনা যাবে কি করে ওপরে ভেবে পাচ্ছে না। কিছুই ভাবতে পারছে না। কি করছে তাও না, কি করবে তাও না। দাঁড়িয়ে থাকা তো আরো বিসদৃশ। এগোতে লাগল।

সামনে ভুতুবাবুর দোকান। ভুতুবাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখছে। বিগলিত বদনে হাসছে, যেমন হাসে। মাথা গোঁজ করে এগিয়ে আসছে সান্ত্বনা।

গতি শিথিল হল আরো।

চকিতে এক পলক দেখে নিল। দু পা অগ্রসর হয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল নরেন চৌধুরী। দু'চোখ সোজাসুজি ওর দিকে। সান্ত্বনার মনে হল, হাসছে একটু একটু। সেদিনের সেই নির্মম স্পর্শ এতদূর থেকেও যেন ছেঁকে ধরছে ওকে।

রাস্তার একপাশ ধরে মাথা নিচু করে চলতে লাগল সান্ত্বনা। মুখ তুলে আর তাকালো না একবারও। ভুতুবাবুর প্রত্যাশিত

মুখের দিকেও না। মনে মনে একটা জ্বালা অনুভব করতে চেষ্টা করছে সান্ত্বনা। সেই পুরুষ স্পর্শ নিপীড়নের জ্বালা।

কিন্তু তাও পারছে না। সর্বাঙ্গ অবসাদে ভরা। পা আর চলে না। এত পথ পেরিয়ে বাড়ি যাবে কেমন করে!

"—নীলা হারিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছ। তোমার সান্ত্বনা আর নরেনবাবুর মুখেই শুনলাম সব। খুশির কথা। ফোটোখানা নিয়ে গেলাম। কি জন্তে সযত্নে ওটা চোখের সামনে রেখেছিলে তাও শুনেছি। তুমি বড়। কিন্তু বড়র কি ব্যঙ্গ করা সাজে? আর বোধ হয় দেখা হবে না। চলি, নীলা—।"

আপিস ফেরত এখনো জামা কাপড় বদলানো হয়নি বাদল গাঙ্গুলির। ডেক্ চেয়ারে বসে আছে সেই থেকে। মাঝে মাঝে পড়ছে চিঠিটা। কতবার পড়ল ঠিক নেই।

বেলা তিনটে নাগাদ আপিসে বসেই খবর পেয়েছে এক্সপার্ট কমিটি চলে গেলেন। নীলা এবং তার বাবাও। মস্ত এক দুঃসংবাদ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল তখন। উজানে বন্যা হয়ে গেছে যে চার পাঁচটা পাহাড়ী নদীতে, তার সর্বনাশা গতি মড়াইয়ের দিকে। চারদিক থেকে সতর্কবাণী আসছে। এরই মধ্যে নীলার এমন অপ্রত্যাশিত বিদায়ের সংবাদ। সমস্ত দিন আর অন্য কোনো চিন্তাভাবনায় মন বসল না বাদল গাঙ্গুলির। হার স্বীকার করে শ্রদ্ধার ডালি নিয়ে এলে শত্রুর উপরেও রাগ থাকে না। নীলার সঙ্গে বা তার বাবার সঙ্গে কাল বাইরের আচরণ যেমনই হোক, নিরিবিলি অবকাশে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। ভবিতব্যের চাকা যেমন করে ঘুরলে বা যতটা ঘুরলে অন্তস্তলের সেই নিবিড় জ্বালা জুড়োতে পারে, ততটাই ঘুরেছে। সকালেই একবার দেখা হবে নীলার সঙ্গে এরকম একটা সঙ্গোপন আশা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল মনে। বিকেলে কোয়ার্টারে আসবে এ একরকম ধরেই নিয়েছিল। শুধু নীলা নয়, নেশান বিলডার্স এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রীও আসবেন নিঃসংশয় ছিল।

কাজে মন দিতে চেষ্টা করল বাদল গাঙ্গুলি। সময় নষ্ট করার সময় নেই। কিন্তু খবরটা যেন কাঁটার মত বিঁধতে থাকল খচ-খচ করে। সন্ধ্যের আগে কোয়ার্টারে ফিরে ঘরে ঢুকতেই প্রথমে চোখ গেল টেবিলের ওপর। নীলার ফোটো নেই, শূন্য ফ্রেমটা আছে। আর ওই চিঠি।

বিমূঢ় বিস্ময় কাটতে নিধুর তলব পড়ল। নিধু জানালো, নীলা দিদিমণি এসেছিলেন, ফোটো নিয়ে গেছেন আর ওই চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

গম্ভীর মুখেই সংক্ষিপ্ত বারতা জ্ঞাপন করল নিধু। কিন্তু বাবুর মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভিতরটা গুরগুর করছে। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় বানান করে পড়ে চিঠির মর্ম মোটামুটি সেও উদ্ধার করে রেখেছে বইকি। পাছে সেটা ধরা পড়ে, পাছে ওর খুশি ভাব মনিবের চোখে পড়ে সেই জন্ত সতর্ক, গম্ভীর। কিন্তু এখন সমুখ থেকে সরতে পারলে বাঁচে। ঝকঝকে ফোটো ফ্রেমটা এবারে একদিন ওর ঘরে ওর টেবিলে গিয়ে উঠতে পারে, সামনে দাঁড়িয়ে সেই গোপন প্রত্যাশাও সম্প্রতি মুছে গেছে নিধুর মন থেকে।

বাদল গাঙ্গুলি চুপচাপ বসে। গত রাত্রিতে নীলা যখন এসেছিল তখন সান্ত্বনাও এসেছিল। চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা মনে হয়েছে। তারপর সেই মেয়ে দেখা করেছে নীলার সঙ্গে। দেখা করে এমন কিছু বলেছে যার অর্থ চিঠিতে অস্পষ্ট নয় একটুও। শুধু সে বলেনি, নরেন চৌধুরীও বলেছে কিছু। এমন কিছু যা নীলা বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে একবার দেখা না করেই চলে গেছে।

অসহিষ্ণু উত্তেজনায় আর বসে থাকা গেল না। ঘরময় পায়চারী করল বার কতক। থম থম করছে সমস্ত মুখ। বাদল গাঙ্গুলি নয়, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সজাগ হয়ে উঠেছে আবার।

নিধুর ডাক পড়ল আবারও। নরেন বাবুকে এখনি খবর দেবার নির্দেশ শুনে নিধু করুণ নেত্রে বাইরের দিকে তাকালো একবার। বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে তখন, পরোক্ষে সেদিকেই মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা।

চেষ্টা করে ধমক খেল একটা। অগত্যা হুকুম তামিল করতে চলল। আর মনে মনে ঠিক করল, বেরুতেই হবে যখন, নরেন বাবুকে খবর দিয়ে ওভারসিয়ার দিদিমণির কাছেও ঘুরে আসবে একবার। নিধুর নিজস্ব বিচার বুদ্ধিতে নীলা দিদিমণির চলে যাওয়ার খবরটা সেখানেও জানানো দরকার বলে মনে হল।

সকালের ধাক্কাটা নরেন চৌধুরী সামলে উঠতে পারেনি বটে, কিন্তু তার সহিষ্ণুতা অন্তরকম। ভিতরে যাই হোক, বাইরে প্রকাশ কম। নিরাসক্ত মনোযোগে কাজে ডুবে থাকতে চেষ্টা করেছে। মাঝে মাঝে শিস দিয়েছে, নয়ত কানকাঠি বার করেছে পকেট থেকে। যত বেলা বেড়েছে, সিগারেট পুড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। কামাই নেই বললেই হয়।

নীলার চলে যাওয়ার সংবাদ সেও জানে। সকলেই জানে। খবর দিয়ে নিধু চলে যাবার পরেও সে চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। সৃষ্টি কাজে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ-সম্ভাবনা রীতিমত সঙ্কটের কারণ এখন। মাটির সাময়িক অবরোধের ওধারে জল অনেকটাই ফুলে উঠেছে, ফেঁপে উঠেছে, প্রতিদিন বাড়ছে। এ নিয়ে ভাবনা চিন্তার কারণ যথেষ্ট আছে, আলাপ আলোচনার দরকার আছে। কিন্তু তবু নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করছে নরেন চৌধুরী, এই মুহূর্তের এই ডেকে পাঠানোটা কর্ম-সংশ্লিষ্ট নয়। ডাক পড়েছে ব্যক্তিগত কারণে···।

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নরেন চৌধুরী। একটু বাদে অন্যমনস্কের মত আবার একটা সিগারেট ধরালো। দু'চার টান দিয়ে সেটাও ফেলে উঠে দাঁড়াল। বন্ধু ডেকেছে। কোনদিন উপেক্ষা করেনি নরেন চৌধুরী। আজও যেতে হবে। শুনতে হবে কি বলে। পরামর্শ দিতে হবে। কিন্তু আজকের এই ডাক কাটা ঘায়ে কাঁটার মত বিঁধছে।

বাইরের ঘরেই বসেছিল বাদল গাঙ্গুলি। প্রতীক্ষা করছিল। শান্ত, গম্ভীর। ভেজা রেনকোট গা থেকে খুলতে খুলতে সহজ হালকা কণ্ঠে নরেন বলল, কি ব্যাপার! অসময়ে ওপরওলার জরুরী তলব একেবারে?

জবাব পেল না। রেনকোট একটা কাঠের চেয়ারের কাঁধে ফেলে ওয়াটার প্রুফ টুপী খুলে তার ওপর রাখল নরেন চৌধুরী। পরে মুখোমুখি বসে পকেট থেকে রুমাল বার করে জলের ছাঁট মুছতে মুছতে তাকালো তার দিকে।

বাদল গাঙ্গুলি স্থির চেয়ে আছে। এবারে কথা বলল। সংযত, নিরুত্তাপ।—অসময়ে ওপরঅলা তলব পাঠাতে পারে সেটা বোধ হয় একেবারে ভুলে গেছ, না ?

নরেন চৌধুরী হতভম্ব। এতকালের হৃদ্যতার মধ্যে এমন উক্তি আর শোনেনি কখনো। সেই মুহূর্তে বুঝে নিল, ওকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ওরই সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবে বলে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, মনে রাখতে বলছ ?

—বলতে বাধ্য হচ্ছি।

—বেশ মনে থাকবে। হেতুটা জানতে পারি ?

জবাব না দিয়ে নীলার চিঠিখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিল বাদল গাঙ্গুলি।

চিঠি নিল। পড়ল। একবার···দুবার। চিঠি রাখল টেবিলের ওপর। তাকালো। বাদল গাঙ্গুলির দু'চোখ তার মুখের ওপর সংবদ্ধ। রূঢ়, কঠিন প্রতীক্ষা। বলল, এবারে ওপরঅলা কিছু জবাব চাইতে পারে বোধ হয় ?

নিজের অজ্ঞাতে পকেটে হাত ঢোকালো নরে চৌধুরী। কানকাঠি···। না কানকাঠি চায় না। সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই। সিগারেট ঠোঁটে ঝোলালো। অগ্নিসংযোগ করল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর হালকা জবাব দিল, কাল সকালে আপিস থেকে নোট পাঠিও, জবাব দেব।

—নরেন! ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবারে।—সব কিছুরই একটা মাত্রা থাকা দরকার।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবারও তেমনি নিস্পৃহ মুখে নরেন বলল, হ্যাঁ, সামান্য একটা চিঠি পেয়ে মাত্রা ছাড়িয়েই যাচ্ছ। কিন্তু কি জন্যে ডেকেছ আমাকে ? কি জানতে চাও ?

—নীলাকে তুমি কি বলেছ ?

—এমন কিছু বলিনি যার জন্য তুমি আমায় এভাবে ডেকে এনে এত কথা বলতে পারো।

ক্রোধে, অবিশ্বাসে রুক্ষতর হয়ে উঠল বাদল গাঙ্গুলির মুখ। —বলোনি ?

—না। একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত শব্দ নরেন যেন ঠাস করে ছুঁড়ে দিল তার মুখের ওপর।

বাদল গাঙ্গুলি থমকে গেল একটু। কিন্তু দুই এক মুহূর্ত মাত্র। চেয়ে আছে। দেখছে।—নীলা হারিয়ে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি কেমন ?

সিগারেট ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরেন চৌধুরী। রেন-কোট হাতের ভাঁজে ফেলে টুপী তুলে নিল। পরে পাল্টা নিরীক্ষণ করল তাকে ক্ষণকাল। জবাব দিল, ভেবেছিলাম পেয়েছ। কিন্তু এখন দেখছি, আমারই মত ঘোলাটে বরাত তোমারও।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি তেমনি। হনহনিয়ে চলেছে নরেন চৌধুরী। সর্বাঙ্গ ভিজে জবজবে। হাতে রেনকোট আর টুপী।

প্রথম বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল মাটির সাময়িক অবরোধ প্রাচীর নিয়ে।

এর স্ফীতি বা প্রতিরোধ ক্ষমতা কম নয়। বন্যার বা বর্ষার প্রচণ্ড নিম্নমুখি গতি এইখানে এসে থেমেছে। শেকলে বাঁধা কয়েদির মত দু'চারটে কৃত্রিম পরিখার পথে এই জলস্রোত মুক্তির আস্বাদন পায় একটু আধটু। নয়ত এখানে এসে গুমরে গুমরে ফুলে ওঠে।

এই সাময়িক অবরোধ নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ কোনদিন। এতবড় সৃষ্টি সমারোহের মধ্যে ওটার ভূমিকা ছিল উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত। ওর বাইরে জল বাড়ছে দিনে দিনে। বাড়বে সকলেই জানে।

সাতমহলা বাড়ির পাশে আগাছার মত তিলে তিলে বেড়ে ওঠা পথের ছেলেটা ডাকাত হয়ে যখন ওই সাতমহল বাড়ির দিকেই দৃষ্টিপাত করে প্রথম—বিভ্রান্ত, বিমূঢ় বিস্ময়ে তখন তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে মহলবাসীরা। এও তাই যেন। সাময়িক অবরোধের ওধারে দিনে দিনে জল ফেঁপে উঠছে, ফুলে উঠছে. সকলেই দেখেছে। কিন্তু তেমন করে লক্ষ্য করেনি কেউ। একটানা দুর্যোগে ড্যামের কথা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে সবাই। কিন্তু বন্যার অঘটনে সকলের সব চোখ আর সচকিত মনোযোগ এসে পড়ল এই দিকে।

এই বিশাল মাটির অবরোধ এমনিতে টলবে না একটুও। কিন্তু জল যে ভাবে ফেঁপে উঠছে, যদি ওটা ছাড়িয়ে উঠতে পারে, ভাঙন অবধারিত। সেই সম্ভাবনা এখন। জল এখন আর ওটার কাঁধ থেকে নিচে নয় খুব।

কি করবে ? কৃত্রিম পরিখাগুলো খুলে দেবে ? যতক্ষণ সম্ভব তাই করা হয়েছে। আর সেটা সম্ভব নয়। গ্রামকে গ্রাম ভেসে যাবে তাহলে। এমনিতেও যেতে পারে, কিন্তু শ্বাস যতক্ষণ, আশা ততক্ষণ। আর বন্যার তোড় তেমন বাড়লে ওই করেই বা কি হবে! দুদিকের পাহাড়ে বাধা পেয়ে অবরুদ্ধ জল ফেঁপে উঠবেই ওপরের দিকে।

একটি মাত্র পথ আছে। একটি মাত্র চেষ্টা করা যেতে পারে। মাটির ওই বিশাল অবরোধ উঁচু করো আরো! পাথর ঢালো, বালির বস্তা ফেলো, মাটি ঢালো। যেখানে ভাঙনের সম্ভাবনা সেখানেই ঢালো মাটি, ঢালো পাথর, ফেলো বালির বস্তা। রাতারাতি উঁচু করো অবরোধ প্রাচীর। কোনো দিক দিয়ে টপকে আসতে দিও না ওই অবরুদ্ধ জল।

ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় বাদল গাঙ্গুলি ড্যামের সমস্ত জনশক্তি নিয়োগ করলে এদিকে। আরো আগেই করা উচিত ছিল। আরো আগেই করত। আকাশ বাতাসের বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয়েছে আজ নয়, অনেক—অনেকদিন ধরে। এরকম প্রবল বন্যা-সঙ্কট অভাবনীয়। কিন্তু এমন দীর্ঘকালের দুর্যোগে তাও ভাবা উচিত ছিল। বিশেষ করে পাহাড় ঘেরা অঞ্চলের প্রাকৃতিক বিঘ্ন যেখানে এরকম। প্রথম যখন বন্যার খবর আসে তখন থেকে এদিকে প্রস্তুত হলেও কটা দিন হাতে পেত। হয়নি, কারণ, এক্সপার্ট কমিটির আসন্ন সফর চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অন্তর্দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল কটা দিন। তাদের আসার দিন কতক আগের থেকেই অবিরাম একটা কল্পিত বিরোধের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে তাকে।

···আর তারপরেও দুদিন কেটেছে এক মর্মচ্ছেদী বিভ্রান্তির মধ্যে, আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতার মধ্যে। এই সঙ্কটে ছুটো দিনের

কর্ম-শৈথিল্য কম কথা নয়। প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা দুর্মূল্য এ সময়ে।

ঢালো মাটি! ঢালো পাথর! ফেলো বালির বস্তা! উঁচু করো, যত পারো উঁচু করো ওই অবরোধ। যত লোক আছে আনো এদিকে! পরিবহন যন্ত্রগুলো সব লাগাও এ কাজে!

ক্ষিপ্ত কাজের তাগিদে গোটা মড়াইসুদ্ধ লোক সচকিত হয়ে উঠল আবার। কাজ চলল সমস্ত দিন, সমস্ত রাত। বৃষ্টির মধ্যে, দুর্যোগের মধ্যে। ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল আবার একটা দুটো করে। কিন্তু তা নিয়ে শোক করার সময় নেই কারো। শোক পরে হবে। কে গেল কে থাকল তার হিসেব নিকেশ পরে হবে। ঢালো পাথর। ফেলো বালির বস্তা। ঢালো মাটি।

কিন্তু এর মধ্যেও ক্রোধে এবং দুর্বার আক্রোশে মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে বাদল গাঙ্গুলি।···এই সব কিছুর জন্যেই যেন দায়ী ওই মেয়ে···ওই ওভারসিয়ারের নগণ্য এক মেয়ে। যে ওকে বিভ্রান্ত করেছে, বিহ্বল করেছে। চক্রান্ত করে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে নীলার সঙ্গে। এত কালের বন্ধুত্বের অবসান ঘটিয়েছে নরেন চৌধুরীর সঙ্গে।

নীলা এসেছিল নত হয়ে, এসেছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ারের জয়ের আর গৌরবের স্বীকৃতি নিয়ে। এত দিন শুধু এরই প্রতীক্ষায় ছিল বাদল গাঙ্গুলি। এই জয়ের আর এই গৌরবের। এই সমর্পণের। শুধু এরই জন্য যা কিছু, সব কিছু। বাদল গাঙ্গুলির মনে হল, অপরিসীম স্পর্ধায় তার এত দিনের সব সাধনাই যেন নিষ্ফল করে দিয়েছে তারই অধীনস্থ সামান্য এক কর্মচারীর মেয়ে।

অধীনস্থ সামান্য কর্মচারীর এই মেয়েটিই দিনে দিনে অসামান্য হয়ে উঠেছিল তার চোখে, এই ক্ষোভের মুহূর্তে সেই দুর্বলতা বিস্মৃত হয়েছে সম্পূর্ণ। তার মরুব্যর্থ যান্ত্রিক জীবনে সবুজের রোমাঞ্চ নিয়ে এসেছিল এই সামান্য মেয়েই, সেও আর মনে নেই। ড্যামের প্রতি এই সামান্য মেয়ের তন্ময় আকর্ষণ আর তার সহজ উচ্ছল নারী প্রাচুর্য কতদিন আনমনা করেছে তাকে, আজকের নির্মম রোষে সেই স্মৃতি তলিয়ে গেছে। মাসির বাড়িতে এই সামান্য মেয়েটি দু' মাস গিয়ে ছিল যখন, কাজের নিবিষ্টতার মধ্যেও মড়াই তখন নীরস লাগত মাঝে মাঝে, আজ সে সত্য স্মরণাতীত। আর, নিরিবিলি অবকাশে এই সামান্য মেয়েকে ঘিরেই একদিন যে এক অবান্তর কথা মনে জেগেছিল—ভারী খুশী হত তার মা এই মেয়েটিকে দেখলে—সেই অনুভূতিও এখন নিশ্চিহ্ন।

এত বড় প্রাকৃতিক অঘটন সম্ভাবনার প্রতিরোধ ব্যস্ততা এবং দুশ্চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে এখন শুধু একটি মাত্র কঠিন প্রতীক্ষার স্তব্ধতা।

···এক নির্মম বোঝা পড়ার প্রতীক্ষা।

দিন দুই এক রকম আচ্ছন্নের মত কেটে গেল সান্ত্বনার। কিছুই ভাবল না, কিছুই ভাবতে পারল না। সারাক্ষণ একটা ঘুম ঘুম ভাব। অথচ ঘুম যে আসে খুব তাও না। ভাবনা চিন্তা সব বাতিল করে দিয়েছে। পরে ভাববে, পরে চিন্তা করবে। আজ নয়, আর একদিন। অন্য একদিন। অন্য কোন দিন।

কিন্তু দু'দিন বাদেই এ ভাব কেটে গেল। গা নাড়া দিয়ে নড়েচড়ে সজাগ হল। নিজের মধ্যে আবারও সেই দুর্গম রহস্যের সন্ধান পেল যেন। অন্তস্তলের সেই বিচিত্র রূপিণীকে সামনাসামনি দেখল যেন। মড়াইয়ে আসার পর দিনে দিনে, বহু পরিস্থিতিতে, বহু অনুকূল-প্রতিকূলতার মধ্যে, বহুজনের দৃষ্টিপথে যার চেতনার উন্মেষ। এতদিন শুধু আভাস পেয়েছে, উপলব্ধি করেছে, আর রোমাঞ্চিত হয়েছে। সাহস করে একেবারে উদ্ঘাটন করে দেখেনি নিজেকে, অনাবৃত করে দেখেনি। এবারে দেখল। আর উপলব্ধির জোয়ারে উপচে উঠতে লাগল।

কি আবার ভাববে? কি চিন্তা করবে?

যা করেছে ও-ই করেছে, ও-ই শুধু করতে পারে।

দেশবিদেশের খবর রাখে না সান্ত্বনা। ইতিহাসের নজির জানে না। বিপুল নারী মহিমা কত ইতিহাস গড়েছে আর কত ইতিহাস ভেঙেছে তার জানা নেই। কোথায় কত দেশের কত মানচিত্র বদলে দিয়েছে জানা নেই। কিন্তু ওর সমস্ত সত্তায় সেই শাশ্বত গরবিনীকেই যেন অনুভব করছে থেকে থেকে। আনন্দে, আত্মপ্রাচুর্যে ভরে ভরে উঠছে।

ভাবনার আবার কি আছে? চিন্তারই বা আছে কি? সব ভাবনা চিন্তার অবসান তো করেই ফেলেছে!

ও-ই করেছে, ও-ই পেয়েছে।

প্রাকৃতিক অঘটন সম্ভাবনার খবর কানে আসছে। সকলের ভাবনা চিন্তা আর উত্তেজনার আভাস পাচ্ছে। কিন্তু এ আর তেমন বড় করে দেখছে না সান্ত্বনা। ওর অন্তরের অনুভূতির সবল জোয়ারের বেগ ওই বন্যার থেকে কম নয়। প্রকৃতির মধ্যে বাস করছি, তার অঘটন ঠেকাব কি করে? সে আসবেই। আবার বাঁচার তাগিদে মানুষই তাকে প্রতিরোধ করবে। যেমন করে পারে ঠেকাবে তাকে। ঠেকাবেই। নইলে আজ ড্যাম হত এখানে? হত?

সান্ত্বনার গর্ব আর ধারণা, ওই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের থেকেও অনেক, অনেক বড় বিপর্যয়ের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করেছে ও নিজে। একা। সৃষ্টি-কাজের নিষ্ঠায় ফাটল ধরতে দেয়নি। একদিনের জন্যও যজ্ঞনাশ হতে দেয়নি।

থেকে থেকে উসখুশ করতে লাগল কেমন।···একবার গেলে কেমন হয়?

গেলে কেমন হয় কি! যাবেই তো। এটুকু বাকি বলেই এরকম লাগছে।···কি না জানি করছে মানুষটা। কি জানি ভাবছে।

হাসি পেয়ে গেল সান্ত্বনার। বেচারি···।

কিন্তু সত্যি দুঃখ হল না তা বলে। ভিতরে ভিতরে সেই সবল নিশ্চিন্ততা বোধ।···শেষ পর্যন্ত মানুষটার লোকসান হবে না এক কণাও। সব লোকসান পুষিয়ে দেবে ও।

এবারে হেসেই ফেলল সান্ত্বনা। নিজের উদ্দেশেই ভ্রূকুটি করে উঠল একটু।

যাবার কথা মনে হতেই চনমন করে উঠল। এতটুকু সঙ্কোচ নেই আর! পুরুষ সন্নিধানজনিত সব সঙ্কোচ আর ভয় ঘুচিয়ে দিয়েছে আর একজন। মনে হতেই বিমনা হয়ে পড়ল একটু। অনুকম্পার ছায়া নামল মুখে।

···বেচারি।

সদ্য জেগে ওঠা এই আত্মপ্রাচুর্যে ওর কাছে নরেন চৌধুরীও বেচারি পর্যায়ে গিয়ে পড়ল আজ। কিন্তু তার জন্য ভারী নিঃশ্বাস

পড়ল একটা। আর তার ওপর কোন অভিযোগ নেই সান্ত্বনার, কোন বিদ্বেষ না।

…তার লোকসান থেকেই গেল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আকাশে সেই একটানা দুর্যোগ। ক্ষণেক থামছে, ক্ষণেক ঝরছে।…মরুকগে, ও বেরুবেই আজ। জলের ভয় আবার কবে করেছে। চার চারটে দিন কেটে গেল কোথা দিয়ে। কাপড় জামা বদলে নেবার জন্য ব্যস্তসমস্ত ভাবে দাওয়া ছেড়ে ঘরে ঢুকল। বাবার বকুনির ভয় নেই আপাতত। বন্যাসঙ্কটের চাপে পড়ে কখন কত রাতে বাড়ি ফেরেন ঠিক নেই।

ঘরে এসে দু'চার মুহূর্ত ভাবল কি। আটপৌরে বেশবাসেই বেরোয় সর্বদা। বছরান্তে মাসির দেওয়া ভালো শাড়িগুলোতে মড়াইয়ের আলো বাতাস লাগেনি। কিন্তু জলে কাদায় নষ্ট হতে পারে। হোকগে। আলমারি খুলে পোষাকি শাড়িগুলো থেকে মোটামুটি সাধারণ গোছের একটা টেনে বার করল। তবু লজ্জা লজ্জা করছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত প্রসাধন সেরে নিতে লাগল। দুই ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস, চোখ দুটো চকচক করছে নিজের দিকে চেয়ে।

কিন্তু চকিতে কি মনে হতে স্তব্ধ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। মনে হল, আয়নায় ওর ওই চোখের মধ্যে যেন চাঁদমণির সেই আগের দিনের হাসি ফুটে উঠেছে, আর ওই ঠোঁটের ফাঁকে চাঁদমণির লাস্য।…আর একদিনও চাঁদমণির কণ্ঠস্বর শুনেছিল নিজের কণ্ঠে। পাহাড়ের সেই সর্বনাশা নিরিবিলিতে যেদিন নরেনকে ডেকেছিল ওর পাশে পাথরে এসে বসতে।

তাড়াতাড়ি আয়নার কাছ থেকে সরে গেল সান্ত্বনা।

অন্ধকার নির্জন পথ ধরে মেন কোয়ার্টারসএর দিকে চলেছে। চাপা হাসিটুকু চাপতে পারছে না এখনো। নরেনের একদিনের টিপ্পনী মনে পড়ে। যেদিন এই মড়াইয়ের পাহাড়ে সবই সম্ভব বলে ঠাট্টা করেছিল। কিন্তু না, ওই লোকটির কথা এখনও অন্তত একবারও ভাবতে চায় না। চলার গতি বাড়িয়ে দিলে সান্ত্বনা। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। মেঘ ডাকছে গুড়গুড় করে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রাস্তায় যদি ভিজে নেয়ে ওঠে তাহলে আর যাবে না, ভিজতে ভিজতে সটান বাড়ি ফিরবে আবার। মিটি মিটি হাসছে আবার। চাঁদমণি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আবার। আগের দিনের চাঁদমণি। মেয়েটা যেন সেই থেকে মন্ত্র জপছে কানে। যৌবনের মন্ত্র। মনকে শাসন করতে গিয়ে হার মেনে হাল ছাড়ল সান্ত্বনা।

বাংলো অন্ধকার। কারো সাড়াশব্দ নেই। বাইরের ঢাকা বারান্দায় উঠে মৃদু গলায় ডাকল, নিধু!

সাড়াশব্দ নেই ক্ষণকাল।

সান্ত্বনা চমকে উঠল। অন্ধকার সইয়ে চোখ টান করে দেখল, কোণের ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে শুয়ে আছে ভদ্রলোক। শুয়ে ঠিক নেই, ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে তাকে।

সাক্ষাৎকারটা এরকম হবে বলে প্রস্তুত ছিল না সান্ত্বনা। কিন্তু যে মেজাজে এসেছে সামলে নিতে সময় লাগল না। অস্ফুট স্বরে হেসে উঠল।—ও'মা, আপনি! এই অন্ধকারে ভূতের মত বসে যে? মন খারাপ বুঝি?

মনে মনে এই মেয়ের সঙ্গেই যে চরম সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করছিল বাদল গাঙ্গুলি সেটা আজই হবে ভাবেনি। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার রাতের কাজ পর্যবেক্ষণে বেরুবার কথা। তেমনি ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকার ঠেলে চেয়ে রইল। তারপর মৃদুগম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, তুমিই বা এ সময়ে এখানে কেন?

সহজ তরল গলার সান্ত্বনা বলল, নরেন বাবু হলে বলতেন, পেত্নীর মত এখানে কেন!

কয়েক মুহূর্ত। তোমার নরেন বাবুর সঙ্গে আমার কিছু তফাৎ আছে সেটা বুঝতে তোমার এখনো বাকি আছে?

আগে এর সামনে চেষ্টা করে তবে সহজ হয়েছে সান্ত্বনা। কিন্তু এখন চেষ্টার কোনো বালাই নেই। অন্ধকারে মুখ ভালো দেখতে পাচ্ছে না। তেমনি হালকা জবাব দিল, নেই বলেই তো ভাবনা।

এক ঝলক বিদ্যুৎ যেন গোটা বাংলোটাকে ঝলসে দিয়ে গেল একবার। কড়-কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। সান্ত্বনার উৎফুল্ল উদ্বেগ কানে এলো। বাবা রে বাবা, কি ঘটা!' গোটা আকাশটাকেই ভাঙবে যেন!

ইজিচেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল বাদল গাঙ্গুলি। বেশ কাছে এসে দেখল ওকে। পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। সান্ত্বনাও পায়ে পায়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। চাপা হাসিতে জ্বল জ্বল করছে সমস্ত মুখ।

ধীর গম্ভীর মুখে বাদল গাঙ্গুলি বেশ করে নিরীক্ষণ করে দেখল! আজকের এই অল্প সাজটুকুও চোখ এড়াল না। হঠাৎ যেন সে এক হিংস্র আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল ভিতরে ভিতরে।

—নিধুর খোঁজে এসেছিলে?

আলোয় এসে এবং মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা থমকে গেল একটু। অন্তর চেতনার গরিমা সত্ত্বেও কেমন মনে হল, নিধু বাড়ি নেই, কিন্তু থাকলেই ভালো হত। তবু জবাবে উদ্বেগ প্রকাশ পেল না একটুও। বলল, নাঃ, এসেছিলাম নিধুর মনিবের খোঁজেই—

কেন? কঠিন দৃষ্টিতে বাদল গাঙ্গুলি দেখছে চেয়ে চেয়ে।

একটু এগিয়ে খাটের বাজু ধরে বসে পড়ল সান্ত্বনা। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—বসতে তো বলবেন না, তবু বসি।…এসেছিলাম দেখতে এই মন টন খারাপ কি না আপনার, যে দুর্যোগ চারদিকে! হেসে উঠল, কিন্তু এসে ভালো করিনি দেখছি, আপনার ভাবগতিক সুবিধের লাগছে না।

নিঃসন্দেহে বুঝে নিয়েছে ও, নীলার চলে যাওয়ার হেতু যে করেই হোক জেনেছে মানুষটা। নইলে এরকম ব্যবহার করত না। আর জেনেছে বলেই সঙ্কোচের আগল আরো ভেঙে গেছে সান্ত্বনার।

ওর দিকে চেয়ে চেয়ে সেই হিংস্র আকর্ষণটা বাড়ছে বাদল গাঙ্গুলির। উদগ্র হয়ে উঠছে। কিন্তু বিস্মিতও হচ্ছে কম নয়। এই মেয়েকেই মড়াইয়ে দেখে এসেছে এতদিন! ওই চোখ ওই মুখ ওই হাসি ওই কথায় সরোবে যে পশু জাগছে ভিতরে ভিতরে তাকে দমন করে কাছে এসে দাঁড়াল।

—নীলার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

সেই হাসি আর সেই সচেতন কৌতুক মাধুর্য সান্ত্বনার চোখে মুখে। এ ছাড়া অন্য পথও নেই। জবাব দিল, শুধু দেখা!

দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে, কত কথাও হয়েছে—আপনি তো আর আলাপ করিয়ে দেন নি।

—কি বলেছ তাকে ?

—কত কি বলেছি। কেমন করে ড্যাম তৈরী হচ্ছে, কোথা দিয়ে কি ভাবে কত দেশে জল যাবে, কত জায়গার দৈন্য ঘুচবে অভাব ঘুচবে—

—সান্ত্বনা !

—হুকুম করুন।

—তোমার বাবার কাছে আর তোমার নরেন বাবুর কাছে আগে বেশ ভালো করে জেনে নিও, আমি তোমার ঠাটার পাত্র নই !

মড়াই ড্যামের ওভারসিয়ারের মেয়ে আসেনি চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। আজ এ চেনেও না সেই মেয়েকে। আজকের সান্ত্বনা স্বমহিমায় বিভ্রান্ত নিজেই। ঈষৎ শ্লেষে জবাব দিল তৎক্ষণাৎ, জানি—তাঁরা আপনার কাছে চাকরী করেন সেই জ্ঞান আপনার খুব টনটনে। উঠে দাঁড়াতে গেল।

—হ্যাঁ, খুব। একেবারে কাছে ঝুঁকে এলো বাদল গাঙ্গুলি। দুই হাতে তার কাঁধ ধরে বসিয়ে দিল আবার। তার পরেও হাত সরালো না কাঁধ থেকে।—নীলাকে কি বলেছ ?

এই রূঢ় সান্নিধ্যেও সহসা বিচলিত হল না সান্ত্বনা। রয়ে সয়ে জবাব দিল, বলেছি নীলা সকলের সয় না।

কিন্তু মানুষটার চোখের সঙ্গে ওর দুই চোখ ভালো করে সংবদ্ধ হতেই এক ফুঁয়ে নিভে গেল যেন।

···এই চোখ, এই হিংস্র পিচ্ছিল চকচকে দুই চোখ ও কোথায় দেখেছে এর আগে ! কোথায় ? কোথায় ?

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল সমস্ত মুখ ! মড়াইয়ে রণবীর ঘোষের নাকের ডগা থেকে নীল চশমা সরে যেতে ওই চোখ দেখেছিল, ওই দৃষ্টি দেখেছিল, আর ওই অজগর-লেহন দেখেছিল। আচমকা একটা ঘা খেয়ে সহসা কঠিন বাস্তবে ফিরে এলো ওভারসিয়ারের মেয়ে। নারী মহিমার এত রহস্য এত গর্ব বিলীন হয়ে গেল।

উঠতে গেল আবারও, হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, ছাড়ুন—

ছাড়াতে পারল না। দুই হাতের দশটা নির্দয় আঙুল ক্রমশ ওর কাঁধে বসে যাচ্ছে।

সংযমের বাঁধভাঙা স্পর্শ-সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি দেখছে ওকে। দেখছে না, গ্রাস করছে। বিস্মৃতি, বিস্মৃতি, বিস্মৃতি। বিস্মৃতির তিমির পিপাসা, হিংস্র পিপাসা। বন্যা কবলিত মড়াই ড্যামের সঙ্কট ভোলার বিস্মৃতি, জীবনের সকল ব্যর্থ প্রতীক্ষা অবসানের বিস্মৃতি, সব নিষ্ফলতা উজাড় করে দেবার বিস্মৃতি।

আর, এই চিত্তবিভ্রমের পথে···এই বিফল পরিণামের পথে ঠেলে দিয়েছে যে, তারই মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার নির্দয় বিস্মৃতি। ক্রুর বিনিময়ের বিস্মৃতি।

বলল, কেন ? নীলা সয়না, যাকে সয় সে-ই তো এসেছে এই রাতে, এই জলে, এই দুর্যোগে ?

এই রাতে, এই জলে, এই দুর্যোগেই এসেছিল বটে। আর, এ ভাবে ফিরে যাবার জন্যেও আসেনি। এসেছিল সগর্বে নিজেকে প্রকাশ করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে। এসেছিল আকর্ষণ করতেও। কিছু দিতে আর কিছু নিতে। কিন্তু এ কি দেখছে সান্ত্বনা ! কাকে দেখছে ! কাঁধের ওপর দু'হাতের চাপ পড়ছে। সর্বাঙ্গ কাঠ।

···এর থেকে অনেক, অনেক কঠিন স্পর্শ সহ্য করেছিল আর একদিন আর এক পুরুষের। হাড় পাঁজর সুদ্ধু টনটনিয়ে উঠেছিল তার নির্মম নিষ্পেষণে। কিন্তু সেই বেদনার মধ্যেও মুক্তির স্বাদ ছিল কিছু, যাতনার মধ্যেও ছিল এক মুক্তির শিহরণ।

কিন্তু এই দুই চোখে শুধু অপমান লেখা।

শুধু ক্রুর অভিলাষ।

এই স্পর্শ যাতনায় শুধু বিষক্রিয়া।

জোর করে দুই চোখ তুলে সান্ত্বনা একটা লোলুপ আক্রমণ যেন প্রতিরোধ করে রাখল খানিকক্ষণ। পরে আস্তে আস্তে বলল, আমার ভুল হয়েছে ছাড়ুন। আপনাকে ধরে রাখার জন্য আমাকে দরকার ছিল না, যে কেউ পারত···।

শুধু তাই নয়। এই প্রথম বোধ করি ওর মনে হল এই ড্যামের জন্যও একে ধরে রাখার দরকার ছিল না। যে কেউ পারত, যে কেউ পারে।

উগ্র উত্তেজনার মুখেও থমকে গেল বাদল গাঙ্গুলি।

ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ কথা ক'টি কানে যেতে আবার একটা ধাক্কা খেয়ে সচেতন হল। নিজের বাসনার বীভৎসতাই দেখতে পেল যেন। চোখের দৃষ্টি বদলাতে লাগল। হাতের চাপ শিথিল হতে লাগল।

কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল। মন্থর পায়ে একটা চেয়ার টেনে বসল।

দু' চার মুহূর্তের নিঃসীম স্তব্ধতা। নিজের অজ্ঞাতে সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াল। যাবে।

—বোসো।

প্রায় আদেশের মত শোনালো।

বসল যন্ত্রচালিতের মত।

খানিক নীরব থেকে আবার সেই একই প্রশ্ন করল বাদল গাঙ্গুলি, নীলাকে কি বলেছ ?

দু' চোখ মেলে তাকালো সান্ত্বনা। ধীর, শান্ত। মৃদু স্পষ্ট জবাব দিল, কি বলেছি সে তো আপনি ভালই বুঝেছেন।···তাকে আমি বলিনি কিছু, তাকে আমি তাড়িয়েছি এখান থেকে।

—কেন ?

তেমনি নিষ্পলক চেয়ে আছে সান্ত্বনা, খেয়াল নেই। আসন্ন, নিরাসক্ত, ভাবলেশহীন।—কারণ, আপনার কাজের থেকেও নীলা আপনাকেই বড় করে দেখে, তাই। কারণ, নীলা আবারও পারে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে, তাই। কারণ, আপনার পুরুষকারের ওপর আমার বিশ্বাস নেই, তাই।···কারণ, আপনার ওই শোকের মোহ ভেঙে গেলে এই কাজের মোহও ভেঙে যেতে পারে, তাই।

বাদল গাঙ্গুলি নির্বাক খানিকক্ষণ। অনুত্তেজিত কথাগুলো ঠাণ্ডা স্পর্শ হয়ে কানে বাজতে লাগল। কিন্তু একটু বাদে উষ্ণও হয়ে উঠল আবার। গম্ভীর শ্লেষে বলে উঠল, কাজের মোহ আমার !

—নয় তো কি। আপনি এত বড় একটা কাজ নিয়ে মেতে উঠেছেন লোকের দুঃখ আর দুর্দশা দেখে ?

জবাব পেল না। প্রত্যাশাও করল না। তেমনি আত্মবিস্মৃত

শান্ত কণ্ঠে একটানা বলে গেল, অনেক আশা ছিল আপনার, সে আশা মেটেনি। বড়লোকের দরজায় ঘা খেয়ে আপনি এখানে এত বড় একটা জিনিষ গড়ে তুলতে চেয়েছেন শুধু তারই জবাব দিতে। এত বড় ড্যামের কণায় কণায় শুধু তারই জবাব লিখে রাখতে চেয়েছেন। মোহ নয় তো কি···! মানুষের দুঃখ কষ্টের কতটুকু দেখেছেন আপনি···কতটুকু জেনেছেন···!

বাইরে বৃষ্টি চেপে এসেছে আবার। মেঘ ডাকছে ঘন ঘন। সান্ত্বনা মূর্তির মত বসে। কথাগুলো যেন ও বলেনি, আপনি নিঃসৃত হচ্ছে।

দু'চোখ আবারও খরখরে হয়ে উঠল বাদল গাঙ্গুলির—আমার এই কাজের মোহ যাতে না ভাঙে, শুধু সেই জন্যেই নীলাকে তুমি মিছে কথা বলে এখান থেকে তাড়িয়েছে তাহলে?

নিরুত্তর। অতিকষ্টে অতি বড় একটা ধাক্কা সামলে নিচ্ছে বোঝা গেল। বাদল গাঙ্গুলি অপেক্ষা করছে। দেখছে চেয়ে চেয়ে।—মানুষের দুঃখ কষ্টের চিন্তায় দিন রাত তোমার ঘুম নেই, কেমন?

কিন্তু এই রুক্ষতা এবারে আর স্পর্শ করল না ওকে। আস্তে আস্তে আবারও যেন সেই সমাহিত ব্যবধানে চলে গেল সান্ত্বনা। রূঢ়তা সত্ত্বেও বিস্ময়ের শেষ নেই বাদল গাঙ্গুলির। এই মেয়েকে আর দেখেনি কখনো। কেউ দেখেনি।

কিছুক্ষণ।···অনেকক্ষণ। অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল সান্ত্বনা, দিন রাত ঘুম নেই।···জলের অভাবে একটা দেশকে দেশ কি করে শ্মশান হয়ে যায় সে আপনি ভাবতেও পারবেন না। যুগ যুগ ধরে ওই মাটির নিচের আগুন বুকে টেনে তিলে তিলে যারা শেষ হয়ে গেছে তাদের সে মূর্তি আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

সেই স্মৃতির অব্যক্ত বেদনায় আরো নিষ্প্রাণ, আরো মৃদু শোনাচ্ছে। যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আসছে যেন কথাগুলো।—সময়ে একটুখানি জলের জন্য ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়েছে তারা, আর্তনাদ গলা দিয়ে রক্ত তুলেছে, শাস্ত্র মেনে সংস্কার মেনে রক্ত জল করা শেষ পুঁজি ওই মাটিতে ঢেলেছে মাটির আগুন ঠাণ্ডা করতে।···আমি দেখেছি···আমি যে তাই দেখেছি চেয়ে চেয়ে!

শোনা যায় কি যায় না। দুই চোখ জলে ভরে উঠছে। থামল একটু। ঝাপসা দৃষ্টি প্রসারিত করে তাকালো সামনের মানুষটার দিকে। বলল, আরো দেখেছি। আমার ঠাকুমার··· আর আমার মায়ের জীবন্ত প্রেতমূর্তি দেখেছি।···ওই মাটির আগুনে অষ্টপ্রহর ধিকি ধিকি জ্বলে তাদের পাগল হতে দেখেছি। কারো ওপর ওদের এতটুকু নালিশ ছিল না কোনদিন। কিন্তু আমার ছিল। তাই যেদিন আপনারা জল নিয়ে আসছেন শুনলাম, সেই দিন থেকেই ঘুম নেই আমার। আমি শুধু ভাবতাম, বাঁচার তাগিদে মানুষ আর ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবে না··· মানুষের বুক আর দাউ দাউ করে জ্বলবে না কোনদিন।

বাইরে বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা। কিন্তু ঘরে যেন বাতাস বইছে না। চিত্রার্পিতের মত বসে আছে বাদল গাঙ্গুলি। চেয়ে আছে বিমূঢ় নেত্রে। কাকে দেখছে, কার কথা শুনছে হুঁস নেই।

একটু থেমে সান্ত্বনা একটা উদ্গত অনুভূতি সামলে নিল যেন। তার পর বলল, সেদিন এলে দলে দলে লোক আসবে এখানে সেই জল দেখতে। তারা জয়জয়কার করবে আপনাদের। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি সেদিন আমি আর এখানে বসে থাকব না।···সেদিন নীলা আসুক আপনার কাছে, আমি আসব না। এখান দিয়ে শুধু জল যাক, সান্ত্বনা মুছে যাক।

···কিছুক্ষণ।

উঠল। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে জল, ঝড়ো বাতাস। বাদল গাঙ্গুলি মোহাচ্ছন্নের মত বসে। বাকশক্তি রহিত। একবার ডেকে থামাতে পারল না ওকে।

বন্যা বন্যা বন্যা।

সর্বগ্রাসী, সৃষ্টিধ্বংসী।

দুই পাহাড়ে বাধা পেয়ে পিছনের দিক ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ বন্যার চরম লক্ষ্য ওই সাময়িক অবরোধ। ওই অবরোধ উপড়ে উঠবে অমোঘ সঙ্কল্প।

পিছনের দিকে যতদূর চোখ যায় থৈ থৈ জল। গাছপালা ভেসে আসছে, ভেসে আসছে গৃহস্থের গৃহপালিত জীব—গোরু ভেড়া ছাগল মোষ—আটচালা হাঁড়িকুঁড়ি। মানুষের মৃতদেহ একটা দুটো।

গোটা মড়াই প্লাবনে ভাসছে। মড়াইয়ের জীবনযাত্রা বিকল। কিন্তু সংগ্রামী মানুষের নাড়িতে নাড়িতে জেগে উঠছে সৃষ্টি বাঁচানোর অটুট সঙ্কল্প। ছোট বড়, উঁচু নিচু, নারী পুরুষ সকলের। আর তাদের তাগিদ দিতে হয় না, তাড়া দিতে হয় না।

ঢালো মাটি! ঢালো পাথর! ফেলো বালির বস্তা!

যেখানে বিপদের সম্ভাবনা সেখানেই ছুটে যাও, ঝাঁপিয়ে পড়ো। কারো আদেশ নির্দেশের অপেক্ষা রেখো না। ঢালো মাটি, ঢালো পাথর···

সকলের সকল চেষ্টা সংহত এই সাময়িক অবরোধ কেন্দ্র করে। যার ওধারে সর্বগ্রাসী তরল মৃত্যু। পদমর্যাদার ব্যবধান ঘুচে গেছে। কে কর্মচারী, কে বা নয় সে প্রশ্ন ঘুচে গেছে। সমস্ত মড়াইয়ে একটা মিলিত ইচ্ছার বেগ একটি মাত্র প্রতিরোধ মন্ত্রে আবর্তিত।

ঢালো মাটি! ঢালো পাথর! ফেলো বালির বস্তা!

এই এক অবরোধের কোথাও ভাঙন আটকাতে না পারলে সে ভাঙনের তাণ্ডব আর ঠেকানো যাবে না সবাই বুঝেছে। বুঝে মরণ যোঝা যুঝছে। দিবারাত্র, অষ্টপ্রহর।

যুঝতে হচ্ছে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। অঘটন হাঁ করে আছে পায়ে পায়ে। প্রতিটি পা দেখে ফেলো। পায়ের নিচে পাথর না পিছলে যায়, মাটি না সরে। কিন্তু দেখার সময় নেই। জলে কাদায় পিচ্ছিল নরক হয়ে আছে সব।

মাটি সরে, পাথর নড়ে, অঘটন ঘটে।

এবারে আর একটা দুটো করে নয়, অতবড় গেস্ট হাউস হাসপাতাল হয়ে উঠেছে। ঘরে জায়গা নেই, বারান্দাও ভরে উঠল। কিন্তু কে কার শুশ্রূষা করে। শক্তি যার আছে সেই গেছে ভাঙন আটকাতে। আহত হলে তবে এখানে আসবে। কেউ নিয়ে আসবে, রাখবে, আবার ছুটবে।—ঢালো মাটি, ঢালো পাথর, ফেলো বালির বস্তা!

দিনান্তে বড় জোর একবার বাড়ি আসেন অবনীবাবু। সান্ত্বনা আর জিজ্ঞাসা করে না কিছু। তীক্ষ্ণচোখে তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে

দিনের সমাচার আঁচ করে নেয় পিতামহদের ক্ষোভের স্তব্ধতা দেখে বাবার চোখে মুখে। মুখ হাত ধোবার জল এনে দেয়, খাবার আনে সামনে, বাতাস করে বসে। কিন্তু মুখভাব ওর ক্রমেই কঠিন হতে থাকে। সজ্ঞানে ওর মায়ের অসহিষ্ণুতা যেন সংক্রামিত হতে থাকে ওর শিরায় শিরায়।

ড্যাম হবে না ?

ওর জীবনের সকল সম্বল এই এক জায়গায় গচ্ছিত এখন।

সেই ড্যাম হবে না ?

মড়াই নদীর ড্যাম হবে না ?

জল জল করে হাহাকার করেছিল বলে সেই জল এখন সব খাবে ? সব বিনাশ করবে ?

তা হবে না। হতে পারে না। সারাক্ষণ এই একটি মাত্র অসহিষ্ণু প্রতিবাদ-মন্ত্র জপছে নিজের অজ্ঞাতে। জপছে স্তব্ধ আত্মিক রোষে।···তা হবে না, হতে পারে না !

সমস্ত দিনে সেদিন আর বাড়ি ফিরলেন না অবনীবাবু। লোক এসে খবর দিয়ে গেল কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। কিন্তু খবর সেটা নয়। খবর যা সান্ত্বনা আঁচ করেছে। দিনের শুরুতে অশুভ দুর্যোগের ছায়া দেখেছে। অনেকবার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকবার এ খবরের আভাস পেয়েছে। এবারে সঠিক জেনে নিল।

···কিন্তু তা হবে না। হতে পারে না।

বড় রকমের ধ্বস নেমেছে একটা। বিনাশের স্পষ্ট সূচনা। প্রায় অমোঘ। সমস্ত শক্তি এক করেও ঠেকানো যাচ্ছে না। ঠেকানো সহজ নয়।

···কিন্তু তা হবে না ! হতে পারে না !

বেলা গড়ালো। সন্ধ্যা পেরুলো। রাত হল। বাইরে বাতাসের একটানা সাঁ সাঁ শব্দ। টিপ টিপ বৃষ্টি। ক্রমাগত ছটফট করছে করছে সান্ত্বনা, ঘর বার করছে। এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ। কি করছে তার বাবা ? কি করছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ? কি করছে নরেন বাবু ? কি করছে পাগল সর্দার ? কি করছে মড়াইয়ের সব লোকেরা ? আটকাতে পেরেছে ? ঠেকাতে পেরেছে ?

রাত বাড়ছে আর অব্যক্ত যাতনায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে।

রাত বাড়ছে আর ঘরে টেকা অসম্ভব হয়ে উঠছে।

ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল আবার।

দুর্যোগ-ঠাসা অন্ধকার। টিপ টিপ বৃষ্টি। মেঘের গুড়ুগুড়ু ডাক ! প্লাবনের চাপা কলতান। বাতাসের সোঁ সোঁ শাসানি। শিউরে উঠল। বাতাস নয়। মায়ের সেই হিস হিস আর্ত বিক্ষোভ। দূর হ' ! দূর হ' ! দূর হ' ! দূর হ' !

দরজায় শিকল তুলে দিল।

দ্রুত চলল। যেখানে মড়াইশুদ্ধু সকলে আছে।

যেখানে কেউ বসে নেই।

মড়াই নদীর ড্যাম হয়েছে।

সসমারোহে তার ঘোষণা ছড়িয়েছে কাছে, দূরে।

সরকারী নিয়মে তার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়েছে ঘটা করে।

দলে দলে লোক এসেছে তাই দেখতে। আসছে এখনও। বিজ্ঞানের সফল কারিগরী দেখতে আসছে। যুগ যুগ ধরে মাটির কণায় যেখানে আগুন ঠিকরতো, সে পথে জল যাবে কেমন করে তাই দেখতে আসছে। যে পথে মরু-নীরস শুকনো উপোস বেঁধেছিল শাশ্বত কালের বাসা, কেমন করে সৃষ্টির ধারা বইবে সেখান দিয়ে তাই দেখতে আসছে।

অলক্ষ্মীর নিশ্চিত নির্বাসন দেখতে আসছে।

ভুতুবাবুর হোটেল জমজমাট।

মাঝ পাহাড়ে উঠে তবে তো এপার-ওপার দুই পাহাড়ের কাঁধ-জোড়া ড্যাম। তার অনেক আগে ভুতুবাবুর দোকান। তাই সকাল-সন্ধ্যা আর ফুরসত নেই ভুতুবাবুর। ছেলেমেয়েদের জন্য পরদা খাটিয়ে একটা ঘরকে দু' ভাগ করে চলে না আর। সম্প্রতি দুটো ঘরই তাদের জন্য ভাগ করে দিয়েছে। ভাগ করলেও পরদার বালাই রাখেনি আর। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রাচুর্য-ভরা এক একটা মেয়েকে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে ভুতুবাবু। ইচ্ছে করে মা-লক্ষ্মী বলে ডাকতে। কিন্তু ডাক বেরোয় না মুখ দিয়ে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ভুতুবাবু।

চড়াই ধরে ওঠো। অনেকটা উঠতে হবে। তার পর ড্যাম। ড্যামের ওপর দিয়ে মড়াই পারাপার করতে পারো হেসে খেলে দৌড়ে। একশ' ফুট চওড়া কনক্রিটের নিটোল অবরোধ প্রাচীর। কালজয়ের স্পর্ধা রাখে। তার ওধারে রুদ্ধ আক্রোশে বিপুল গর্জনে অজস্র মাথা খুঁড়ছে শতেক হাত গভীর মড়াই-ভরা জল। অন্য দিক শুকনো খটখটে মড়াইয়ের অতল গহ্বর। তাকালে মাথা ঘোরে। ওই শুকনো দিকে নালা কাটা হয়েছে কয়েকটা। আরো কাটা হচ্ছে। যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এদিক থেকে জল ছাড়লে ওই পথে জল যাবে। দরকার মত জল ছাড়ো। জল বাড়লেই জল ছাড়ো। ফ্লাড-লেভেল্‌এর ওপরে উঠলেই ছেড়ে দাও জল যন্ত্র-গহ্বরের মধ্য দিয়ে এই শুকনো দিকে। আর বন্যা নয়। আর জলাভাবের হাহাকারও নয়। নিঃশঙ্ক কৌতূহলে ড্যামের ওপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের এই কেরামতি দেখছে নারী-পুরুষেরা। ভর-ভরতি দেখাচ্ছে মড়াই নদীর ড্যাম।

কিন্তু পুরনো যারা এখানকার, এই দেখায় আগ্রহ ফিরেও দেখে না তারা ! এক মেয়ের দেখার আগ্রহ তারা প্রাণ ভরে দেখেছিল ! হাজার হাজার কুলি কামিন কর্মচারীর মধ্যে সেই এক মেয়ে মড়াইয়ের অতবড় শূন্য গহ্বরটাই ভরে রেখেছিল।···মড়াইয়ে এক বন্যা হয়েছিল। এই ড্যাম হবে কি হবে না সেই ত্রাস দেখা দিয়েছিল। গোটা মড়াই ভেঙে পড়েছিল সেই বন্যা আটকাতে।

সেদিন সেই মেয়েও এসেছিল···। কিন্তু এসেছিল যে কেউ জানত না।

আরো ওঠো। যেন কোয়ার্টারস ! ঝকঝকে ! তকতকে। সোজা রাস্তা পাহাড়ের শেষে এসে থেমেছে। নিচে মড়াই। পাথরে পাথরে পা ছড়িয়ে বসে আছে মেয়ে পুরুষেরা ! পায়ের নিচে মড়াই। জীবনের আশা বইছে, আশ্বাস বইছে। অমনি একেবারে ধারের কোনো পাথরে একা বসে থাকত এক মেয়ে। দেখতো চেয়ে চেয়ে। কিন্তু ওই মড়াই কেঁপে উঠেছিল একবার। বন্যা হয়েছিল। গোটা মড়াই ভেঙে পড়েছিল সেই বন্যা আটকাতে।

সেদিন সেই মেয়েও এসেছিল···। কিন্তু এসেছিল যে কেউ জানত না।

সেই বন্যা অনেক কিছু গ্রাস করতে চেয়েছিল। অনেককে গ্রাস করতে চেয়েছিল। গ্রাস করেওছিল।

...সেই এক মেয়েকেও। কিন্তু গ্রাস যে করেছিল কেউ জানত না।

পরে জেনেছিল। পরে দেখেছিল।

অফিস কোয়ার্টারস বাঁয়ে রেখে ডাইনে জেনারাল কোয়াটারস-এর রাস্তা। রাস্তার দুদিকে পাহাড়। দুই পাহাড়ের গাছ পালায় রাস্তাটা ছায়াচ্ছন্ন বরাবর। শুকনো পাতা আর ঝরা পাহাড়ী ফুল মাড়িয়ে এই নির্জনে পা আপনি এগোবে সামনের দিকে। দুই একটা কোয়ার্টার ছাড়ালে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটা বাড়ি চোখে পড়বে। সে বাড়ি এখনকার সবাই না চিনুক আগে চিনত। মনে হবে বাড়িটা যেন স্তব্ধতার মূক-মন্ত্র জপছে। মনে হবে বাড়ির ভিতরে জনপ্রাণী নেই। কিন্তু যে কোনো স্থানীয় পথচারী ওখান দিয়ে যেতে যেতে একটু থেমে বলে দিয়ে যাবে, ওখানে থাকেন প্রায়বৃদ্ধ এক ওভারসিয়ার।

মড়াইয়ের সেই করাল বন্যা যার সব নিয়েছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হয়ত পায়ের শব্দ কানে আসবে কখনো। মৌন কৌতূহলে দেখবে ওই বাড়ির স্তব্ধতার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে কেউ। একজন নয়, দু'জন। তাদের চেনে এখানকার নতুন পুরানো সবাই। তাদের অন্তরঙ্গ নীরবতাটুকু চোখে পড়লেও পড়তে পারে।

চিফ-ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি আর ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফটসম্যান নরেন চৌধুরী।

দুপুরের ভরা নির্জনের নিটোল গুমোট চিরে কখনো বা ওই স্তব্ধতার গহ্বর থেকে এক অবসা গাম্ভীর ডাক শুনতে পাবে একটা কুটো। পরিত্যক্ত অসহায় পশুর শ্রান্ত আকুতির মত শোনাবে সে ডাক। মনে হবে ওটাকে দেখার কেউ নেই বুঝি, খেতে দেবার কেউ নেই।

কিন্তু না। ওখানেও বসে ঝিমোয় একজন। মিশ্রভ-কালো, অতিবৃদ্ধ, ঘাড়পিঠ দুমড়নো।

পাগল সর্দার।

শেষ

এক ঝাঁক পাখী

শ্রীহরিপ্রসাদ মেদ্দা

আমার আত্মাকে কেন্দ্র ক'রে—
এক ঝাঁক পাখী শুধু ওড়ে ;
ক্লান্তিহীন সবুজ-প্রহরে।
পাখায় ফসল বোনে সোনালী আলোক,
তাদের গতির ছন্দে, ঘুম-ঘুম আমার দু' চোখ।

আমার অসীম নীল নভে
তাদের এ পক্ষবিধুনন তুলেছে মূর্চ্ছনা।
মনের সকল গ্রন্থি খুলে'—
ছুঁড়ে দেয় মুঠো-মুঠো গানের তারকা।
বুঝি না কিছুই—তবু ভালো লাগে।
হৃদয়ের কাছাকাছি এসে—
কখনো বা ডানা ঝাপটায়।
স্বপ্ন-পুরীর ক্ষীণ ইসারা জানিয়ে—
জলের ঢেউয়ের মত মিশে যায় জলের ভিতরে।

এই সব জলে-লেখা নাম—
বার বার মুছে দিতে চায়, অশান্ত আষাঢ় এসে
কিছু মোছে—কিছু ওঠে আরও দীপ্ত হয়ে,
কিছু থাকে, কিছু যায় উড়ে।
তবুও তাদের গান, কানে আসে—
ইথারের ধাপ ঘুরে ঘুরে।

আসা-যাওয়া চলে অবিরাম,
এক ঝাঁক ঠিক তাই উড়ে—
ওদের পূর্ণতা দিয়ে আমার শূন্যতা ওঠে ভ'রে।
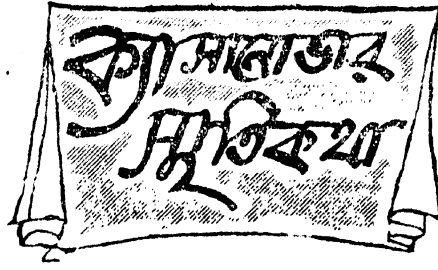
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রাশিয়া···পিটাসবুর্গ !

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মস্ত চওড়া রাস্তা মিলিয়োনা ষ্ট্রীটের উপর খুব কম ভাড়ায় দু'খানি ঘরের বাসা ঠিক করলাম। দু'টি বিছানা, দু'টি টেবিল আর চারটি চেয়ার—এই ছিলো গৃহসজ্জা। পিটাসবুর্গে জিনিষপত্র খুবই সস্তা পেয়েছিলাম, অবশ্য বেশী দিন এই অবস্থা ছিল না। কিছু পরেই লণ্ডনের মত অগ্নিমূল্য হোয়ে পড়ে সব কিছু। তাই একটা জামা-কাপড়ের দেরাজ, লেখবার টেবিল আরও কিছু আরামদায়ক গৃহসজ্জা কিনে ফেললাম। ভাষা নিয়ে ভারী বিপদে পড়লাম। জার্মান ভাষাটাও চলে এখানে আর ঐটাই একটু-আধটু জানা ছিলো আমার। বলতে পারতাম অতি কষ্টে বিকৃত উচ্চারণে আর তাই শুনে সবাই হেসে গড়াতো। পরে লক্ষ্য করলাম, বিদেশীদের দেখে হাসাটা এ দেশের রেওয়াজ।

একদিন সন্ধ্যায় আমার বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক আমাকে একটি মুখোশ-বল-নাচের আসরের পাশ দিলেন। রাজসভায় অনুষ্ঠিত হবে এই নাচের আসর—পাঁচ হাজার লোকের মত ব্যবস্থা করা হোয়েছে! ভদ্রলোকটি জানালেন, আসর চলবে পুরো বাটটি ঘণ্টা ধরে।

একটি ডোমিনোতে সজ্জিত হোয়ে রাজসভায় যাত্রা করলাম। গিয়ে দেখি বিরাট ব্যাপার! এক-একটি ঘরে এক এক দল লোক নাচছে, প্রত্যেক ঘরে স্বতন্ত্র বাদকদল বাদ্যযন্ত্র নিয়ে উপস্থিত। আহার্য্য আর পানীয়ের সমারোহ—যার যত খুশী আকণ্ঠ পান-ভোজন করে চলেছে। হাজার হাজার বাতির আলো কাচের ঝাড়ে ঝলমল ঝলমল করছে আর সে আলোর প্রতিফলন প্রতিটি মুখে আর প্রতিটি চোখে।

হঠাৎ কে যেন বললে 'ঐ জারিনা' (রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী) আসছেন। উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি, সামনেই গ্রেগরী আরলফ এর দীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্ত্তি আর তার পিছনে একটি মুখোশ-ঢাকা মূর্ত্তি অতি সাধারণ হতশ্রী পোষাকে আচ্ছাদিত। লক্ষ্য করলাম মুখোশ-ঢাকা মূর্ত্তিটি কেমন স্বচ্ছন্দ ভাবে জনতার মধ্যে মিশে গেলো। কত জায়গায় সম্রাজ্ঞীর সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা জটলা ইত্যাদি স্বাভাবিক নিয়মেই চলেছিলো। দেখলাম, সেই সব সমাবেশের এক পাশে, তাদেরই একজনের মত মূর্ত্তিটি স্থির হোয়ে রয়েছে। সম্রাজ্ঞীর সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব যা কোনো দিনই তাঁর কর্ণগোচর হোতো না, সেই সব মন্তব্য আর মতামত···এমন কত কিছু আলোচনা যা তাঁর পক্ষে একটুকুও শ্রুতিমধুর নয়, যা সম্রাজ্ঞীর গর্ব্বে সহজেই আঘাত হানে, এমন সব মন্তব্যই নিঃশব্দে জেনে চললেন সম্রাজ্ঞী। আভিজাত্যে আঘাত হানলেও অভিজ্ঞতার হোলো অমূল্য সঞ্চয়।

কিছু দিন কেটে গেলো রাশিয়াতে। তবে মস্কোতে থাকার সময় একথা বার বার মনে হয়েছিলো যে মস্কোতে না এলে রাশিয়া দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ, পিটাসবুর্গ ঠিক রাশিয়া নয় প্রকৃতপক্ষে। ওটা শুধু রাজধানী। জাতির প্রকৃত পরিচয় পাবার জন্যে মস্কো। মস্কোর অধিবাসীদের ধারণা, উচ্চাকাঙ্খা ছাড়া বেঁচে থাকা মৃত্যুরই সামিল। আর মস্কোর বাইরে বেঁচে থাকাটাও সেই একই কথা। পিটাসবুর্গের প্রতি ওদের ঈর্ষা আর সন্দেহ সদাজাগ্রত। ওদের ধারণা ওদের ধ্বংসের মূল ঐ পিটাসবুর্গ। রূপমাধুরীতেও মস্কোর ললনারা হার মানায় পিটাসবুর্গকে। মস্কোর আবহাওয়াটাও দেহে, মনে সজীবতা এনে দেয়।

আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম এই রাশিয়ান জাতিটার মধ্যে। সেটা হোলো কয়েকটা বিষয়ে এদের অসাধারণ সংযত ভদ্রতা। মস্কোতেও বেশ অভিনব উপায়ে আমার একটি সঙ্গিনী জুটেছিলো; তার নাম 'জায়েরা'—কিন্তু কখনও কোনো কৌতূহলী দৃষ্টির প্রশ্ন শুনিনি—'মেয়েটি কে? আমার কন্যা-সঙ্গিনী পরিচারিকা?' অকারণ কৌতূহলের প্রগলভতা এদের মধ্যে দেখিনি। তবে দেখেছি আহার্যের প্রাচুর্য্যতা। আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত অপরিচিত সবার জন্যে ওদের খাবার ঘরের দরজা খোলা। যখন তখন কোনো খবর না দিয়ে পাঁচ-ছয়জন, অতিথির আগমন এমন কি সারা পরিবারের আহার-পর্ব্ব শেষ হবার পরও, তাদের অভ্যস্ত। কখনোও কোন রাশিয়ানকে বলতে শোনা যাবে না—"বড্ড দেরী করে ফেলেছেন, আমাদের তো খাবার পর্ব্ব শেষ।" ওদের মধ্যে সে নীচতা নেই।

ঠিক করেছিলাম শরতের প্রথমেই পিটাসবুর্গ থেকে বিদায় নেবো। কিন্তু কয়েক জন বিশিষ্ট বন্ধু জানালেন, সম্রাজ্ঞী দি গ্রেট ক্যাথারিণের সঙ্গে পরিচয়ের আগে চলে যাবার কোনো অর্থই হয় না। আমারও তাই মনে হোলো—কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার মত কাউকে খুঁজে পেলাম না। শেষে একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, ভোরবেলা সম্রাজ্ঞীর গ্রীষ্মকুঞ্জে বেড়াতে যেতে—সেখানে সম্রাজ্ঞী প্রত্যহ আসেন। আর যদি সেখানে তাঁর দৃষ্টিপথে পড়তে পারি তবে খুব সম্ভব তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ থেকেও বঞ্চিত হবো না।

একদিন ভোরে গ্রীষ্মকুঞ্জে বেড়াচ্ছিলাম—আর পথের দু'ধারে সাজানো পাথরের মূর্ত্তিগুলিকে সকৌতুকে লক্ষ্য করছিলাম। কারণ মূর্ত্তিগুলি যেমন বিকৃত-রুচির পরিচায়ক তেমনি কুৎসিত, ভুল তাদের

ভঙ্গিমা। পাথরের বেদীগুলির উপর মূর্ত্তিগুলির পরিচিতি—তাও অপূর্ব্ব! [illegible] একটি স্থূল ক্রন্দনরত মূর্ত্তি—পরিচয় ডেমোক্রিটাস। বিরাট শ[illegible]ভিত বৃদ্ধের মূর্ত্তি—পরিচয় সাফো। এই সব অদ্ভুত মামায়গ্র[illegible] মনে মনে হাসতে হাসতে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, স[illegible] গ্রেগরী আরলফ আর তাঁর পশ্চাতে জারিনা দুই সহচরী সহ—এঁদের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর দৃষ্টি এ[illegible]তে পারলাম না। তিনি সহাস্যে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, মূর্ত্তিগুলোর সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছে কি না।

আমি উত্তর দিলাম—আমার মনে হয় মূর্তিগুলি মূর্খদের মুগ্ধ আর জ্ঞানীদের হাসির উদ্রেক করানোর জন্যেই সাজানো হোয়েছে।

সম্রাজ্ঞী জানালেন—আমার কাকীমাই এই সব মূর্তিগুলি কিনেছিলেন—তাঁকে প্রবঞ্চনা করা হোয়েছিলো ঠিকই, তবে তিনি এই সব ক্ষুদ্রতা গ্রাহ্য করতেন না। আপনি এখানে আর কোনো কিছুই অমন বিসদৃশ দেখতে পাবেন না।

আমি জানালাম গ্রীষ্মকুঞ্জটিতে এমন অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর শিল্প-সমাবেশ দেখেছি যার কাছে কয়েকটি বিকৃত মূর্তি অতি তুচ্ছ। সম্রাজ্ঞী এ কথার পর আমাকে ওঁর সঙ্গে ভ্রমণের আহ্বান জানালেন। আর প্রায় পুরো একটি ঘণ্টা আমি পিটাসবুর্গের সম্বন্ধে আমার মতামত নিয়ে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলাম। কথায় কথায় প্রুশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেটের কথাও উঠলো। আমি তাঁর সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর প্রশংসা জানালাম; তবে একথাও বলতে ভুলিনি যে ওঁর একটি খাপছাড়া অভ্যাস আছে কখনও অন্যকে কথার উত্তর দেবার সময় দেন না। অপরূপ মহিমময় ভঙ্গীতে হেসে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণ আমার সঙ্গে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের পরিচয়-পর্ব্বটি বর্ণনা করতে বললেন। তারপর তিনি আমাকে জানালেন, তাঁর প্রাসাদে প্রতি রবিবার আহারের পর গীত এবং বাদ্যের আসর অনুষ্ঠিত হয়, আমি সেখানে ইচ্ছা হোলেই যেতে পারি। ওঁর সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। উনি কনসার্ট হলের দিকে এগোতে লাগলেন সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। আমি সবিনয়ে জানিয়ে দিলাম, গান-বাজনার প্রতি আমার আকর্ষণ বিন্দুমাত্রও নেই। উনি হেসে বললেন আরও অনেককে জানেন তাদেরও ঐ একই অবস্থা। এইবার আমি বিদায় অভিবাদন জানিয়ে গ্রীষ্মকুঞ্জ থেকে চলে এলাম—সম্রাজ্ঞীর সান্নিধ্যলাভে মুগ্ধ মনে।

সম্রাজ্ঞীর সান্নিধ্যে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে, ওঁর দৃপ্ত গরিমা আর আভিজাত্যপূর্ণ ভঙ্গিমা—তার সঙ্গে সুললিত দেহমাধুর্য্য। উনি জানেন কেমন করে শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ একত্রে জাগানো যায়। অপরূপ রূপমাধুরী ওঁর নেই কিন্তু আছে শান্ত, সংযত ভদ্র ব্যবহার অতি মার্জ্জিত রুচি, প্রখর বুদ্ধি আর পরিহাসবোধ আর সমস্ত কৃত্রিমতা ত্যাগ করে সহজ অনাড়ম্বর আচরণ—তাই উনি সহজেই জন-মনোহারিণী।

কয়েক দিন পর কাউণ্ট পানিন আমাকে জানালেন যে, সম্রাজ্ঞী তাঁকে বার দুয়েক আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। যেটা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রসন্নতার পরিচায়ক। উনি আমাকে আরও উপদেশ দিলেন যে আমি যেন আর একবার সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কারণ উনি নিশ্চয়ই আমাকে ডেকে পাঠাবেন; আমি যদি রাশিয়াতেই কোনো কাজ নিয়ে থাকতে চাই তার ব্যবস্থাও উনি নিশ্চয়ই করবেন। যদিও আমি বুঝে উঠতে পারলাম না যে, এমন কি কাজ তিনি আমাকে দিতে পারবেন যার আকর্ষণে আমি এদেশেই থেকে যাবো—বিশেষ করে দেশটাকে যখন আমার এমন কিছু ভালো লাগেনি। তবুও রাজসভায় অবাধ অধিকারের আশায় উৎফুল্ল হোয়ে উঠলাম। প্রত্যহ গ্রীষ্মকুঞ্জে ভ্রমণ সুরু করলাম এবং সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতের সুযোগও জুটে গেলো। এইবারে উনি একজন অফিসারকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ডেকে আনতে। এই দিন একটা আসন্ন উৎসব সম্বন্ধে কথা বলছিলাম, খারাপ আবহাওয়ার জন্যে সেটা স্থগিত থাকে। সম্রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করলেন, ভেনিসে সচরাচর এমন উৎসব হোয়ে থাকে কি না। সবিনয় জানালাম, আবহাওয়ার কথা ধরতে গেলে আমার দেশ রাশিয়ার চেয়ে অনেক সুখী। কারণ সোনালী রোদে-ভরা ঝকমকে দিনই যে দেশের স্বাভাবিক যেখানে অমন একটি উজ্জ্বল আলোভরা দিন রাশিয়ায় ব্যতিক্রম।

এরই দিন দশেক পরে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে আমার তৃতীয় সাক্ষাৎ। সেদিনের আলোচনার বিষয় ছিলো রাশিয়ার দিনপঞ্জী নিয়ে। সেদিন তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে আর বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সত্যিই আমি বিস্মিত হোয়েছিলাম। খুব সহজ ভাবে অথচ সংযত স্বরে আলোচনা করছিলেন, প্রতিটি যুক্তির আড়ালে গভীর জ্ঞানের আর দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের পরিচয় ছিলো। ওঁর সুচিন্তিত যুক্তিগুলিই শুধু অখণ্ডনীয় নয়, ওঁর হাস্য-পরিহাসের ধারাও অমনি। ওঁর আচার-ব্যবহার ফ্রেডরিক দি গ্রেটের চেয়ে কত উন্নত কত মার্জ্জিত, তাই দেখে আশ্চর্য্য হলাম। ওঁর নম্র কোমল অথচ সংযত গম্ভীর ভাবভঙ্গী প্রতিপক্ষকেও মুগ্ধ করতো সহজেই; অথচ ফ্রেডরিক দি গ্রেটের কৃত্রিম রুক্ষ, কর্কশ ব্যবহার তাঁকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু বোকা বানাতো।

সেদিন গ্রীষ্মকুঞ্জে ভ্রমণের সময় জোরে বৃষ্টি এলো। সম্রাজ্ঞী একজন পরিচারককে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে কনসার্ট হলে নিয়ে আসার জন্য। সেখানে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সেদিনের আলোচনা সুরু হোলো ওই দিনপঞ্জী নিয়ে। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, ভেনিসে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাকে যে নির্দ্দিষ্ট ভাবে ভাগ করা হয় না শোনা যায়, সে কথা সত্যি কি না। অর্থাৎ ভেনিসে কোনো বিশেষ কাজের জন্য দিনের বিশেষ সময়কে নির্দ্দিষ্ট করা হয় না—যে কোনো সময় যে কোনো কাজ করা হয়। সম্রাজ্ঞী বলতে লাগলেন, —এটা খুবই অসুবিধার ব্যাপার নয়? তা ছাড়া বাকী দুনিয়াটার কাছে তো রীতিমত হাস্যকর ব্যাপারটা। এর পর তিনি ভেনিসের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, এমন কি, জুয়াখেলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণের উল্লেখ করলেন। জেনোয়ার সেই লটারী স্থায়ী ভাবেই চলছে কি না, তা-ও জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন,—ওরা এখানেও ওই লটারী চালু করার জন্যে আমাকে প্ররোচিত করেছিলো যাতে আমি সম্মতি দিই। যদি আমি রাজী হতাম, তাহলে শুধু মাত্র এই সর্ত্তে যে এক রুবলের কমে কেউ বাজী ধরতে পারবে না। তাইতে গরীব লোকেরা ওই জুয়াখেলার নেশা থেকে নিবৃত্ত হোতে বাধ্য হোতো।

ওঁর এই দূরদৃষ্টিকে আমি সসম্ভ্রম অভিবাদন জানালাম। মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। পঁয়ত্রিশ বছর উনি রাজত্ব চালিয়েছেন স্বচ্ছন্দ ভাবে—এই দীর্ঘ দিনের রাজ্য পরিচালনায় ঘটেনি একটি মাত্র বিশেষ ত্রুটি।

পিটাসবুর্গ আমাকে ছাড়তে হোলো ভ্রমণের নেশায়। পা বাড়ালাম ওয়ারশ'এর পথে।

পোলাণ্ডে থাকতেই পেলাম এক নিদারুণ সংবাদ। আমার পিতৃসম মঁসিয়ে দ্য ব্রাগার্দীর মৃত্যু। গত বাইশ বছর ধরে তিনিই আমার প্রকৃত পিতা ছিলেন! খবর পেলাম, নিজে অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করা সত্বেও তাঁকে দেনা করতে হোয়েছিলো। শুধু আমার জন্য—আমি যেন কখনও কোনো অভাবে না পড়ি। তাঁর মৃত্যুর নিদারুণ সংবাদের সঙ্গেও এসেছিলো এক হাজার ক্রাউন আমার নামে তাঁর শেষ দান। মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা আগে শুধু আমার কথা স্মরণ করে তিনি যোগাড় করেছিলেন ঐ টাকা। বাকী সব কিছুই যায় তাঁর ঋণ শোধে।

তখন আমার অবস্থাও শোচনীয়। দেনায় তখন আমি আকণ্ঠ নিমজ্জিত তার উপর এই মর্মান্তিক আঘাত। তিনটি দিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে একা কাটালাম—একটু প্রকৃতিস্থ হবার জন্যে। তার পর মনস্থির করলাম মাদ্রিদ যাবো প্যারিস হোয়ে।

যখন প্যারিস থেকে মাদ্রিদের পথে যাত্রা করলাম, তখন আমি সম্পূর্ণ একা। একটি ভৃত্যও সঙ্গী নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য শান্তি ভরা মনে। পকেটে একশ' লুই মুদ্রা আর আট হাজার ফ্রাঙ্কের মত প্রতিশ্রুতি পত্র। এমন এক দেশে চলেছি যেখানে আমার এমন কেউ নেই, যেখানে আমি দাবী করতে পারি—একটি 'মৃত্যু' আমাকে আজ প্রকৃত নিঃসঙ্গ করেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মাদ্রিদ!

আলকালা গেট দিয়ে মাদ্রিদ শহরে প্রবেশ করলাম। আর পরমুহূর্ত্তেই তল্লাসী সুরু হোলো আমার বাক্স-বিছানার। বইগুলি ওরা নিয়েই গেলো, অবশ্য দিন তিনেক পরে ফেরৎ পেয়েছিলাম ঠিকই। একটি বন্ধুর কাছ থেকে একটি ভালো হোটেলের ঠিকানা যোগাড় করে এনেছিলাম—সোজা গিয়ে উঠলাম সেখানে। বেশ আরামপ্রদ ঘরগুলি। কিন্তু আমার ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। অবশ্য মাদ্রিদ শহরটা সারা ইউরোপে সব চেয়ে উঁচু শহর। তার উপর পাহাড় দিয়ে ঘেরা। বিদেশীর পক্ষে আবহাওয়াটা মোটেই সুবিধার নয়। স্পেনীয়রা কখনও বাইরে বেরোয় না, মস্ত এক কালো লম্বা ভারী কোট না ঝুলিয়ে। গরীবেরাও আরবদের মত মস্ত আলখাল্লা পরে যাচ্ছে। এখানকার লোকেরা সাধারণতঃ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা আর সংস্কারাচ্ছন্ন; যদিও মেয়েরা সাধারণতঃ মূর্খ হোলেও অনেক বেশী বুদ্ধিমান। কিন্তু এদেশের নারী-পুরুষ দু'জনাই কামনা আর বাসনায় বাতাসের মত সহজ আর উদ্দাম আবেগে সূর্য্যের মতই জ্বালাভরা। পুরুষেরা বিদেশীদের ঘৃণা করে আর নারীরা প্রতিশোধ নেয় কঠিন প্রেমের ফাঁস পরিয়ে।

অন্ততঃ ফরাসীটা ভালো বলতে পারে এমন একটি ভৃত্যের প্রয়োজন ছিলো আমার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মিললো—বছর ত্রিশেক বয়স, আর চেহারাটা দেখলেই একসঙ্গে বিতৃষ্ণা আর ঘৃণার সৃষ্টি হয়। এখন মনে হয় আমার কাছে জোটার আগে ঈশ্বর ওর পা-টা ভেঙে দিলেই পারতেন।

কাউণ্ট দ্য আরান্দার কাছে আমার একটি পরিচিতি পত্র ছিলো। তিনি সে সময় মাদ্রিদে রাজার চেয়েও ক্ষমতাশীল ছিলেন। লম্বা কোর্ত্তা আর মস্ত চওড়া টুপীর প্রবর্ত্তক তিনিই। কাউন্সিল অফ ক্যাসটাইলের প্রেসিডেণ্টও উনি আর দেহরক্ষী ছাড়া একটি পাও বেরোতেন না। তাঁর মত বিরাট রাজনীতিজ্ঞ, অসীম সাহসী দৃঢ়চেতা লোক সারা স্পেনে বিরল। কিন্তু সর্ব্বদাই একটা কঠিন দৃঢ়তার আবরণে নিজেকে ঢেকে সব রকম বিধি-নিষেধই নিজে লঙ্ঘন করে চলতেন। অপরের বেলায় সে-সব নিষিদ্ধ বলে হুকুমজারী সত্বেও। ওঁর আকৃতি যেমন কদাকার তেমনি ভীষণ। চিঠিটা পরে অভ্যাস বশতঃ দুটি চোখ পিট্‌ পিট্‌ করতে করতে অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে প্রশ্ন করলেন—আপনি স্পেনে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?

—এই মহান জাতির রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার দেখে নিজের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে। আর সেই সঙ্গে যদি শাসক-সম্প্রদায়ের অধীনে কোনো কাজ পাই যা আমার সাধ্যমত, তবে সেই কাজও গ্রহণ করতে পারি।

—তার জন্য আমাকে আপনার কোনো প্রয়োজন হবে না। আপনি যদি এখানকার আইন মেনে সাধারণ ভদ্রভাবে থাকতে পারেন তবে কেউই আপনার কোনো ক্ষতি করবে না। আর আপনার কাজ সম্বন্ধে আপনাকে ভেনিসের রাষ্ট্রদূতের কাছে যেতে হবে। তিনিই আপনার সঙ্গে সেই সব লোকের পরিচয় করিয়ে দেবেন—যাঁরা আপনাকে কাজ দিতে পারবেন—

—মঁসিয়ে ভেনিসের রাষ্ট্রদূত আমার কোনো উপকারই করতে পারেন না। কারণ আমার দেশের নিরাপত্তা বিভাগের সঙ্গে আমার বিরোধ চলছে কিছুকাল ধরে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে উনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও অস্বীকার করবেন।

—সে ক্ষেত্রে রাজসভা থেকে আপনার কোনো কিছু আশা করা বৃথা। তার চেয়ে আমার মতে আপনি যে কয় দিন থাকবেন সে কয় দিন সব দেখে-শুনে আমোদ-প্রমোদ করে কাটিয়ে দিন।

মার্ক্যুইস দ্য মোরাস, ডিউক দ্য লোসাদা সবার মুখেই ঐ একই উপদেশ—শুধু ডিউক দ্য লোসাদা আরও পরামর্শ দিলেন যে কোনো উপায়ে ভেনিসের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একটা আপোষ করে ফেলতে। শেষ অবধি ভেনিসে আমার পিতৃসম মঁসিয়ে দ্য ব্রাগার্দীর বন্ধু সিনর দান্দোলোকে লিখলাম এই মর্ম্মে যে এমন একখানি পত্র দিতে, যাতে রাষ্ট্রনিরাপত্তা বিভাগের সঙ্গে আমার বিরোধ সত্বেও রাষ্ট্রদূত আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। তাছাড়া রাষ্ট্রদূতকে আমি নিজেও পত্র দিলাম তাঁর আশ্রয়-ভিক্ষা করে! যে রাষ্ট্রের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসাবে আমার বিনীত দাবী জানালাম।

পরদিন সকালে আমার ভৃত্যটি এসে জানালে, কাউণ্ট মান্নুচ্চি নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। সুন্দর চেহারা আর বিনীত ভদ্র ব্যবহার যুবকটির—আমাকে জানালেন রাষ্ট্রদূতের প্রাসাদেই তাঁর বাস। রাষ্ট্রদূতই তাঁকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে এই বার্ত্তা নিয়ে যে খোলাখুলি ভাবে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ বা আদান-প্রদান সম্ভব নয় কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি খুশীই হবেন।

মান্নুচ্চি জানালেন, তিনিও ভেনিসের অধিবাসী আর তাঁর মা-বাবার কাছে আমার সম্বন্ধে অনেক বার অনেক কথা শুনেছেন।

বুঝতে দেরী হোলো না এ সেই মাদ্রিদের ছেলে—যে রাষ্ট্রনিরাপত্তা বিভাগের গোয়েন্দা হোয়ে আমার সমস্ত যাদুবিদ্যার বইগুলি আত্মসাৎ করেছিলো আর 'দি লেডস'এ আমাকে কারারুদ্ধ করার কাজে প্রধান উদ্যোগী ছিলো। কিন্তু এই যুবকটিকে আমি সে সব কোনো কথাই বললাম না। তবে কথায় কথায় যখন ও জানতে পারলে আমিও ওর পরিবারের পরিচয় জানি, তখন খোলাখুলি ভাবেই কথাবার্ত্তা সুরু করলে। আমাকে ওর ঘরে কফি খাবার নিমন্ত্রণ জানালে; কারণ সেখানে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা। সে কথা ও রেখেছিলো আর আমার সম্বন্ধে যতদূর প্রশংসা করবার করেছিলো, এ কথা মানতেই হবে।

হোটেলের কাছেই থিয়েটার থাকাতে প্রায়ই যেতাম আর মুখোশ-বলনাচেও যোগ দিতাম প্রায়ই; সেটা মাদ্রিদে কাউন্ট অ আরান্দাই প্রতিষ্ঠা করেন। ষ্টেজের ঠিক সামনে মস্ত একটা বক্সে বসতেন রাষ্ট্রনিরাপত্তা বিভাগের কর্ম্মচারীরা—দৃষ্টি রাখতেন অভিনেতা অভিনেত্রীরা কোথাও শালীনতার সীমা অতিক্রম করছে কি না। একদিন আমি থিয়েটারে গিয়ে বসে বসে ওই সব সম্মানিত শয়তান কপটদের দিকে চেয়ে দেখছিলাম, এমন সময় প্রহরী চিৎকার করে উঠলো 'দীয়স' সঙ্গে সঙ্গে নারী, পুরুষ, শিশু নির্ব্বিশেষে যত দর্শককুল আর অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলে কলের পুতুলের মত নতজানু হোয়ে পড়লো যতক্ষণ ধরে রাস্তায় ঘণ্টার শব্দ না মিলিয়ে গেলো। ব্যাপারটা হোলো রাস্তা দিয়ে পুরোহিত চলেছেন শেষকৃত্য সমাপ্ত করতে।

প্রবল হাসির আবেগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো—বহুকষ্টে দমন করলাম স্পেনীয়দের ভক্তির গোঁড়ামি আর উচ্ছ্বাসের কথা ভেবে। এই জাতটার ধর্ম্মের সবকিছুই নির্ভর করে বাইরের আড়ম্বরের প্রতি। এমন কি ভালোবাসায় আত্মসমর্পণের মুহূর্ত্তটিতেও ওরা যিশু কিম্বা ভার্জ্জিন মেরীর ছবি ঘরে থাকলে কাপড় দিয়ে তা' ঢেকে দেয়।

মুখোশ-বল-নাচের আসরে প্রথম দিনই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। আমাকে বিদেশী দেখে প্রশ্ন করলেন আমার নাচের কোনো সঙ্গিনী আছে কি না। আমি জানালাম, কারো সাথেই এখনও আমার পরিচয় হয়নি—যাকে আমি আমার নৃত্যসঙ্গিনীরূপে আহ্বান জানাতে পারি।

—কিন্তু আপনি বিদেশী, এটাই তো আপনার সব চেয়ে বড় গুণ। এই বলনাচের জন্যে এখানে মেয়েরা পাগল হোয়ে থাকে। এখানে শ' দুয়েক নাচিয়েকে আপনি দেখছেন কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলছি না এই শহরে অন্ততঃ হাজার চারেক তরুণী এই রাতটিতে চোখের জলে ব্যর্থ প্রহর গুণছে তাদের এই নৃত্য-আসরে নিয়ে আসবার মত কেউ নেই বলে। আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, তাদের যে কোনো একজনের কাছে আপনি যদি গিয়ে দাঁড়ান নিজের নাম-ঠিকানা জানিয়ে সে মুহূর্ত্ত দ্বিধা করবে না আপনার নৃত্যসঙ্গিনী হতে—তার মা-বাবা কারো সাহস হবে না বাধা দেবার। অবশ্য তাকে একটি ডোমিনো, মুখোশ, আর দস্তানা পাঠাতে হবে আর গাড়ী করে নৃত্য-আসরে নিয়ে আসতে আর যথাসময়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

সেণ্ট এণ্টনির উৎসব দিনেতে ইচ্ছে করেই চার্চ্চে গেলাম। সেখানের তরুণী সমাবেশে যদি মনোমত কাউকে পাওয়া যায়। যাওয়াটা সার্থক হোলো যখন একটি দীর্ঘাঙ্গী লাবণ্যময়ীর দেখা পেলাম—মেয়েটির ছন্দোময় গতিভঙ্গী, সুললিত দেহবিন্যাস আর শুভ্র কোমল ক্ষুদ্র চরণ দুটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পিছু নিলাম খানিকটা দূরে একটা একতলা বাড়ীতে ওকে ঢুকতে দেখে। সেই বাড়ীর নম্বর টুকে নিয়ে চলে এলাম। ঠিক আধ ঘণ্টা বাদে সেই বাড়ীর দরজায় এসে কড়া নাড়তে লাগলাম।

দরজা খুলে গেলো। ঢুকে সামনের ঘরেই দেখি একজন ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা আর আমার মনোনীতা সেই মেয়েটি। টুপীটা হাতে নিয়ে বিনীত নমস্কার জানিয়ে যথাসম্ভব নির্ভুল স্পেনীয় ভাষায় ভদ্রলোকটিকে আমার উদ্দেশ্য জানালাম যে তাঁর কন্যাটিকে আমি বলনাচে নিয়ে যেতে চাই। অবশ্য যদি তাঁরই কন্যা হয় মেয়েটি।

—সিনর, এ আমারই মেয়ে। কিন্তু আমি জানি না ও বল-নাচে আদৌ যোগ দিতে চায় কি না। তাছাড়া আপনিও তো সম্পূর্ণ অপরিচিত।

—বাবা, তোমার অনুমতি যদি পাই তাহলে কি খুশী হবো বলতে পারি না।

—এই ভদ্রলোকটিকে তুই চিনিস?

—মোটেই না। কখনো দেখেছি বলেও মনে হয় না। উনিও আমাকে কখনও দেখেছেন কি না সন্দেহ!

ভদ্রলোকটি তখন আমার নাম-ধাম জেনে নিয়ে কথা দিলেন কিছুক্ষণ পরেই তিনি তাঁর মতামত জানাবেন। ফিরে এলাম। ঠিক সময়ই ভদ্রলোক এসে হাজির—আমার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য—কিন্তু মেয়েটির মা থাকবেন সঙ্গে আর গাড়ীতেই বসে থাকবেন, এই সর্ত্তে।

রাজী হোলাম। ভদ্রলোকটির পরিচয় জানলাম, পেশা জুতা সেলাই—অবশ্য তাঁর নিজের দোকান আছে। নাম 'দন দিয়েগো'। যথা সময়ে মাতা আর কন্যাসহ নাচের আসরে পৌঁছলাম। দেখলাম আমার সঙ্গিনীটি সত্যিই নৃত্যপটীয়সী—নাচের উদ্দাম আবেগে কখন দশটা বেজে গেছে খেয়ালও করিনি। তারপর আহার-পর্ব্ব সমাধা করে আবার এক প্রস্থ নাচ। অবশেষে অনুষ্ঠান-পর্ব্ব সমাধা হোতে দুজনে গাড়ীর কাছে এলাম—প্রতীক্ষাক্লান্ত মা তখন গভীর নিদ্রামগ্না। তাঁকে জাগিয়ে গাড়ীতে আমরা উঠে বসলাম। অন্ধকারে মেয়েটির হাতখানি সন্তর্পণে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলাম একটি চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দেবার জন্যে। কিন্তু নিঃশব্দে ও আমার হাতখানি দৃঢ়ভাবে ধরে রইলো যেন কোনো গর্হিত কাজে বাধা দিচ্ছে। আর সেই অবস্থায় মাকে সারা সন্ধ্যার বর্ণনা দিতে লাগলো। যতক্ষণ বাড়ীর দরজায় থামলাম ততক্ষণ হাতটা ও ধরে রইলো।

দন দিয়েগো আমার বাড়ীতে এলো আমাকে ধন্যবাদ জানাতে। ওর মেয়ে দোনা ইগ্নাশিয়া যে কতখানি আনন্দ পেয়েছে আমার সঙ্গে নাচের আসরে গিয়ে, বার বার সেই কথাই ভদ্রলোক জানাতে লাগলেন বিনীত কৃতজ্ঞতায়। জানালেন ওঁর বাড়ীতে মাঝে মাঝে আমার আগমন ঘটলে ওঁরা আন্তরিক খুশী হবেন।

সেদিন রাত্রেও বলনাচের আসর ছিলো। সকালে গিয়ে হাজির হোলাম ইগ্নাশিয়ার দরজায়। দেখি, ঘরের ভিতর পা মুড়ে বসে জপের মালা নিয়ে ও জপ করছে। আমাকে দেখে অকৃত্রিম আনন্দে ভরে উঠলো ওর মুখখানি। বললে, আবার আমাকে দেখবে আশা

করেনি—ভেবেছিলো এত দিনে আমি নিশ্চয়ই যোগ্যতর নৃত্যসঙ্গিনী পেয়েছি।

—তোমার স্থান পূর্ণ করতে পারে এমন নৃত্যসঙ্গিনী আমি আজও পাইনি ইগ্নাশিয়া। যদি তুমি সম্মতি দাও আজই তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে আনন্দের অবধি থাকবে না আমার।

—সত্যি? নিয়ে যাবেন আমাকে? যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।

সে রাত্রে নৃত্য-আসরের একটি নিরালা কোণে ওকে জানালাম, ওর নৃত্যছন্দ আমাকে এত মুগ্ধ করেছে যে, ও যা খুশী তাই করতে পারে—আমি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করছি ওর কাছে।

—কিন্তু কি চান আপনি আমার কাছে? আমি যে দন ফ্রান্সিস দ্য রাবোস নামে একটি যুবকের সঙ্গে গোপনে বাগ্‌দত্তা। ও রোজ আসে। আমার জানলার নীচে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে। ওই-ই তো আমার ভবিষ্যৎ স্বামী—আমার কর্ত্তব্যচ্যুত হওয়া তো চলবে না।

এই স্পেনের মেয়েদের কর্ত্তব্যজ্ঞান অতি প্রবল। আমার ইচ্ছা হোলো, ওর ওই কর্ত্তব্যজ্ঞান ভেঙে চুরমার করে দিতে। কিন্তু কোনো যুক্তি-তর্কে আর কথার জালে ওই কর্ত্তব্যের সংস্কার থেকে এক চুল নড়াতে পারলাম না ওকে।

সেদিন সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে যতদূর সম্ভব সস্নেহ কোমল ব্যবহার করলাম। ওর দুই পকেট ভর্ত্তি করে দিলাম নানারকম মিষ্টি খাবারে—আর সেই সঙ্গে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে গেলেও পিছিয়ে গেলো। কিছুতেই নেবে না। শেষে বললে, যদি সত্যিই আমি ওটা দিতে চাই তবে ওর বাগ্‌দত্ত স্বামীকেই যেন দিই। সে আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়—হয়ত শীগগিরই যাবে আমার কাছে।

দু-একদিনের মধ্যেই সে এসে হাজির আমার কাছে। নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, দোনা ইগ্নাশিয়া বিশ্বাস করে জানিয়েছে যে আমি তাকে বলনাচে নিয়ে গেছি—আর আমার ভালোবাসা অপত্যস্নেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ও সাহস করে আমার কাছে এসেছে অবশ্য একটি প্রার্থনা নিয়ে—একশ' ডাবলুন (ইতালীর মুদ্রা) যেন আমি ধার দিই তার তার বিয়ের খরচের জন্যে।

—অত্যন্ত দুঃখিত। আমার নিজেরই অবস্থা এখন শোচনীয়, এ সময় কিছু সাহায্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে একথা আমি গোপন রাখবো নিশ্চয়ই! আর মাঝে মাঝে আপনি আমার কাছে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এলে কম খুশী হবো না।

লোকটি বিমর্ষচিত্তে চলে গেলো। এরই কয়েক দিন পর আমি তখন সবে চিত্রশিল্পী বন্ধু 'মেঙ্গস' এর সঙ্গে আহারপর্ব্ব সেরে বাড়ী ফিরেছি, দেখি একজন বেশ সন্দেহজনক আকৃতির ভদ্রলোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে জানালেন একটু আড়ালে যেতে, বিশেষ গোপনীয় কথা আছে। আড়ালে যেতে বললেন, নিরাপত্তা বিভাগ থেকে আলকাও মেশা তাঁর পুলিসবাহিনী নিয়ে এখনি আসছেন আমার খোঁজে। উনি নিজেও সেই বাহিনীতে আছেন। তবে গোপনে আমাকে সাবধান করতে এসেছেন যে ওঁরা টের পেয়েছেন আমার ঘরে বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র আছে; আমি সেগুলি চিমনীর পিছনে মাদুর ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। আরও কিসের সন্ধান পেয়েছেন আমার বিষয়ে যার জন্যে আমাকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হবে। তারপর একান্ত উদ্বেগ ভরা স্বরে বললেন—আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি—কারণ আমার দৃঢ় ধারণা আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আপনার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। আমার কথা বিশ্বাস করুন—শীগগিরই কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

লোকটিকে একটি মুদ্রা দিয়ে বিদায় দিলাম। পরমুহূর্ত্তে আমার অস্ত্রগুলি কোটের ভিতর করে নিয়ে সোজা 'মেঙ্গস'এর কাছে চলে এলাম—মনে হোলো এটাই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, কারণ এটা রাজার প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে। শিল্পী আশ্রয় দিলে বটে সে রাতের জন্যে, কিন্তু জানালে পরদিনই আমাকে অন্য কোনো আশ্রয়ে চলে যেতে হবে—কারণ শুধু বে-আইনী অস্ত্রের জন্যেই 'আলকাও' গ্রেপ্তার করতে আসছে না নিশ্চয়ই আরও কোনো গভীর উদ্দেশ্য আছে। আমরা কথা বলতে বলতেই আমার গৃহকর্ত্তা স্বয়ং এসে হাজির। 'আলকাও' ত্রিশ জন রক্ষী নিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসে। দরজা ভেঙে ঢুকে কোথাও কিছু না পেয়ে আমার বাক্স-তোরঙ্গ সব 'শীল' করে দিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমার ভৃত্যটিকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। ওদের সন্দেহ যে ও হয়ত আমাকে সব বলে সাবধান করে দিয়েছে আগেই।

—আমার চাকরটা তো তাহলে আসল বদমায়েশ শয়তান! কারণ আলকাও ওকে সন্দেহ করা থেকেই বোঝা যায় তিনি জানতেন যে চাকরটা সবই জানে। এ থেকে বেশ বুঝছি, ঐ শয়তান চাকরই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

পরদিন সকালে বিদায় নিয়ে আমি সবে গাড়ীতে উঠতে যাবো ঠিক সেই সময় একজন অফিসার এসে শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ক্যাসানোভা তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে কি না।

—আমিই ক্যাসানোভা, এগিয়ে এসে বললাম।

—তাহলে আপনাকে অনুরোধ করছি আমার সঙ্গে যেতে, পুলিস ফাঁড়ীতে সেখানে আপনাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হবে। এটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে, তাই রক্ষী-বাহিনী নিয়ে জোর ফলাবার অধিকার আমার নেই; তাই জানিয়ে দিচ্ছি যদি এমনিতে চলে না আসেন তবে এক ঘণ্টার মধ্যেই শিল্পীর উপর নোটিশ আসবে আপনাকে বের করে দেবার জন্যে। তখন গ্রেপ্তার করাটা অত্যন্ত অসম্মানজনক ব্যাপার হবে।

'মেঙ্গস'কে আলিঙ্গন করে বিদায় জানালাম। ওর মুখখানা ক্ষোভে দুঃখে থমথম করছিলো। গাড়ীর ভিতর অস্ত্রগুলি নামিয়ে রেখে অফিসারের সঙ্গেই চলে এলাম কারাগারে। রীতিমত মজবুত কঠিন পাথরের প্রাসাদ। এককালে রাজবংশীয়দেরই প্রাসাদ ছিলো, এখন অর্দ্ধেকটা কারাগার আর অর্দ্ধেকটা সৈন্যদের ব্যারাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অফিসারটি আমাকে নিয়ে গিয়ে সেদিনের ভারপ্রাপ্ত এক কর্ম্মচারীর কাছে হাজির করলেন, তাঁর চেহারাটা ঠিক জল্লাদের উপযুক্ত। তার নির্দ্দেশ আমাকে প্রাসাদের ভিতর দিকে একতলায় একটি বিরাট হলে নিয়ে আসা হোলো। সেখানে আরও ত্রিশ জন কয়েদী দেখলাম। তার মধ্যে দশ জন সিপাহী। জঘন্য আবহাওয়া, মাত্র বারোটি বিছানা। এতগুলি লোকের আর কয়েকটা বেঞ্চি। চেয়ার টেবিলের কোনো বালাই নেই। একটি সিপাহীকে কিছু অর্থ

দিয়ে আমার জন্য কিছু কাগজ, কলম আর কালি আনতে বললাম। টাকা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলো। ব্যস্ তার পর তার আর কোনো পাত্তাই নেই!

জোর করে ভয়ে অভিভূত মনটাকে স্থির করে একটা বিছানার উপর বসে রইলাম। ঘণ্টা তিনেক পরে বাধ্য হোয়ে উঠে পড়তে হোলো। সারা বিছানাটায় কিলবিল করছে নানা রকম বিষাক্ত ভয়াবহ পোকা-মাকড় ইঁদুর আরশোলা ইত্যাদিতে। সমস্ত অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেলো আমার। এ কি সর্বনাশ নোঙরা যায়গা! প্রায় দ্বিপ্রহরে মারাংসিনি নামে অপর একজন বন্দী বললে, ইচ্ছা হলে আমি টাকা দিয়ে বাইরে থেকে খাবার আনাতে পারি। একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হোয়েছে। সজোরে ঘাড় নেড়ে বললাম আমার ক্ষুধা নেই, তা ছাড়া যতক্ষণ না কাগজ, কলম, কালি, কিম্বা টাকাটা ফেরৎ পাবো, ততক্ষণ একটি পয়সাও আর কাউকে দেবো না। বন্দীদের ভিতর আমার শয়তান ভৃত্যটিও ছিলো। শুনলাম, সে মারাংসিনিকে আমার কাছ থেকে কিছু অর্থ ভিক্ষার জন্য বলতে বলছে। সারাদিন কিছু খায়নি—একটি কাণাকড়িও নাকি ওর হাতে নেই। আমার ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা তখন চরমে। বললাম, একটি আধলাও দেবো না। তা ছাড়া ও এখন আর আমার চাকর নয়। কোনো দিন যদি ওর মুখ দেখতে না হোতো তো বেঁচে যেতাম।

বেলা চারটের সময় শিল্পী বন্ধুর ভৃত্য প্রচুর আহার্য্য এনে হাজির করলো আমার জন্য। নানা রকম সুস্বাদু খাদ্য আর সুপেয়—প্রায় চার জনের মত পরিমাণে। ওই শয়তান বদমায়েসগুলোকে ভাগ দেবার এতটুকু স্পৃহা আমার ছিল না। তাই বাহকটিকে অপেক্ষা করতে বলে নিজে আহার সমাপ্ত করে অবশিষ্ট ওর হাতেই ফিরিয়ে দিলাম। প্রত্যেকে ক্ষুন্ন আর রুষ্ট দুই-ই হোলো। হোক, কিছু এসে যায় না তাইতে।

বেলা পাঁচটা নাগাদ একজন অফিসারের সঙ্গে মানুচ্চি এসে হাজির। দু'-একটি কথার পর আমি অফিসারটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, বন্ধু-বান্ধবকে চিঠি লেখা আমার নিষিদ্ধ কি না। তিনি বললেন, মোটেই নয়। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, প্রয়োজনীয় কিছু কিনতে দিলে সেই টাকাটা কি কোনো সিপাহী মেরে দিতে পারে?
—কোন সিপাহী বলুন তো? আমি কথা দিচ্ছি আপনার টাকা সে ফেরৎ তো দেবেই, উপরন্তু এই চালাকির জন্য তার শাস্তিও কম হবে না। তাছাড়া আপনি কাগজ-কলম-কালি ছাড়াও একটা টেবিল আর একটা আলো এখুনি পাবেন।

আর আমিও কথা দিচ্ছি—মানুচ্চি জানালে—রাত আটটার সময় রাষ্ট্রদূতাবাসের ভৃত্য এসে আপনার চিঠিগুলি নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছবার জন্য নিতে আসবে—

আমি পকেট থেকে তিনটি ক্রাউন বার করে চীৎকার করে বললাম, যে আমাকে চোর সিপাহীটার নাম বলবে এটা তার পুরস্কার। মারাংসিনিই বললে প্রথম। অফিসারটি অত্যন্ত কৌতুক বোধ করলেন, হাসতে হাসতে নামটা লিখে নিলেন। বোধ হয় ভাবলেন যে লোক একটা ক্রাউন ফিরে পেতে তিনটি ক্রাউন ব্যয় করে সে অন্ততঃ কৃপণ নয়।

ওরা চলে গেলে চিঠি লিখতে বসলাম। অসহ্য গোলমাল, চেঁচামেচি আর কৌতূহলী প্রশ্নের ভীড়ে চিঠির ভাষা উঁচুদরের সাহিত্য না হোলেও প্রতিটি লাইনে আমার মনের জ্বালা উজাড় করে দিয়েছিলাম। লেখা হোয়ে গেলে আমার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী একটি কপি নিজের কাছে রাখলাম।

তারপর এলো রাত্রি। কি বিভীষিকাময়ী রাত্রি! কোথাও শোবার এতটুকু স্থান নেই, এক আঁটি খড়ও চেয়ে জুটলো না পেতে শুতে। শেষে একটা বেঞ্চের কোণে কাঠের মত সোজা হোয়ে বসে অসহ্য ক্লান্তি আর চরম যন্ত্রণায় প্রহর গুণতে লাগলাম। মেঝেতে অবধি নোংরা দুর্গন্ধ জলের স্রোত বইছে। চারদিকে অসংখ্য ছারপোকা আর পোকামাকড়। কখনও ঘরখানা পরিষ্কার করা হয় না, বেশ বোঝা গেল। বিভীষিকাময় রাত্রির শেষে মানুচ্চি আবার এলো আমার কাছে। সত্যিই ওই এখন আমার একমাত্র উপকারী বন্ধু আর একমাত্র ভরসা। আমাকে কিছু চকোলেট খাইয়ে গেলো আর বলে গেলো রাষ্ট্রদূতকে লেখা আমার চিঠির ভাষাটা অত্যন্ত জ্বালাভরা। কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে কোনো লেখনীই কি স্বাভাবিক হোতে পারতো? মানুচ্চি যাবার পরই দোনা ইগ্নাশিয়া এলো ওর বাবার সঙ্গে। ওদের আসাটা আমার গর্ব্বে একটু ঘা দিল বৈ কি। কিন্তু আমি যথাসম্ভব কৃতজ্ঞতা জানালাম। অতি সংলোক ইগ্নাশিয়ার বাবা। যাবার সময় আমাকে আলিঙ্গন করে একটি নোট আমার হাতে গুঁজে দিলেন। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, এখন রাখুন, যবে ইচ্ছে হবে এ টাকা শোধ করবেন। আমি স্তম্ভিত, হতবাক্! আত্মসংবরণ করে ফিস্‌ফিস্ করেই জানালাম আমার পকেটে বেশ কিছু টাকা আছে ওটা এখন আপনি নিয়ে যান। এই বলে আবার নোটটা ওঁর হাতে গুঁজে দিলাম। নিরীহ, কোমল চিত্ত প্রৌঢ়ের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো। আমি মুগ্ধ, অভিভূত। ধরা গলায় বললেন, ছাড়া পেয়েই যেন ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

দুপুরবেলা 'মেঙ্গম'এর কাছ থেকে আরও ভালো ভালো খাদ্যদ্রব্য এসে হাজির। তবে আগের চেয়ে কম পরিমাণে। এটাই আমি চেয়েছিলাম। বেলা প্রায় একটার সময় আমাকে আদালতের কাছে নিয়ে যাওয়া হোলো। কিন্তু স্পেনের ভাষায় ভালো দখল না থাকায় ওর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইলাম না। শেষ অবধি উনি বললেন, আমার নাম-ধাম পেশা আর এদেশে আমার উদ্দেশ্য সব ইতালীয় ভাষায় একটি কাগজে লিখে দিতে—তাই দিলাম।

দিনের শেষে আবার সেই বিভীষিকাময় রাত্রি। আজ রাতের অবস্থা আরও অসহ, আরও শোচনীয়। ভোরবেলা মানুচ্চি এসে আমার চেহারা দেখে স্তম্ভিত! ও থাকতে থাকতেই একজন পদস্থ কর্ম্মচারী এসে দাঁড়ালেন।

—মঁসিয়ে, কাউণ্ট দ্য আরান্দা বাইরে দরজায় অপেক্ষা করছেন। আপনার এই দুর্ভাগ্যের জন্য উনি অত্যন্ত অনুতপ্ত। আপনি যদি আরও আগে তাঁকে চিঠি দিতেন তবে আপনার এই বন্দিদশাও তাড়াতাড়ি ঘুচে যেতো।

—কর্ণেল, আমারও তাই ইচ্ছা ছিলো কিন্তু আপনার একজন সিপাহী—এই বলে সেই চুরির কাহিনীটা বর্ণনা করলাম আবার।

অফিসারটি তৎক্ষণাৎ সেই সিপাহীর দলের ক্যাপ্টেনকে ডেকে পাঠালেন। সে আসলে তাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে আমার

টাকাটা তাকেই ফিরিয়ে দিতে বললেন, আর আদেশ দিলেন ওই সিপাহীকে আমার সামনে প্রহার করা হবে।

তাঁকে আমি আমার গ্রেপ্তারের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিয়ে জানালাম, কি দুঃসহতম প্রহর আমার এই নোংরা, দুর্গন্ধ অন্ধকূপে কাটছে। আজও যদি আমি এই নরক থেকে মুক্তি না পেতাম—না পেতাম আমার অস্ত্রশস্ত্র, আমার সম্মান আমার স্বাধীনতা—তাহলে আমি হয় উন্মাদ হোয়ে যেতাম নয়তো আত্মহত্যা করতাম। অফিসারটি দুঃখিত হোলেন—বার বার নিশ্চিত আশ্বাস দিলেন, আজ রাতে আমি আমার নিজস্ব শয্যায় শুতে পাবো—আর ফিরে পাবো আমার হৃত অস্ত্রশস্ত্র। উনি বললেন, আমাকে ভুল করে গ্রেপ্তার করা হোয়েছে। আমার শয়তান-চূড়ামণি ভৃত্যটিই আলকাড মেশার কাছে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলো।

—ওই চাকরটা এখানেই রয়েছে—ওকে আমার চোখের সামনে থেকে সরাবার ব্যবস্থা করুন, না হলে আমি হয়তো খুনই করে ফেলবো ওকে—চীৎকার করে বললাম।

দু'জন সিপাহী শয়তানটাকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। এবার মানুচ্চির সঙ্গে সিপাহী-বারাকে গিয়ে চোর সিপাহীটার শাস্তি স্বচক্ষে দেখে এলাম। ফিরে এসে দেখি আমার বসবার জন্যে একটি আরাম-কেদারা আনা হোয়েছে। আঃ! তাইতে বসে তিন দিন পর প্রথম যে কী আরাম পেয়েছিলাম!

দুপুরবেলা খাবার পর আলকাড মেশা স্বয়ং হাজির হোয়ে আমার অস্ত্রগুলি আমার হাতে দিয়ে আমার পাশাপাশি চলতে লাগলেন ত্রিশ জন প্রহরী নিয়ে—একেবারে সোজা আমার হোটেল অবধি। সেখানে গিয়ে আমার বাক্স-তোরঙ্গের শীল ভেঙে দিলে প্রহরীরা। দেখলাম সব জিনিষই ঠিক আছে।

প্রসাধন আর বেশভূষা সমাপ্ত করে প্রথমেই গেলাম দন দিয়েগোর কাছে। ইয়াশিয়া তো আমাকে দেখে আনন্দে পাগল হোয়ে উঠলো। বলতে কি, এই উদার সরল পরিবারটির আন্তরিকতায় আমি শুধু মুগ্ধ নয়, রীতিমত অভিভূত হোয়ে পড়েছিলাম। ওদের কাছ থেকে গেলাম শিল্পী বন্ধুর কাছে। সে বেচারা তখন আমার জন্যে তদ্বির করার জন্যে রাজসভায় যাবার উদ্যোগ করছে। আমাকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলো। তারপর দু'খানি চিঠি আমাকে দিলে, সিনর দান্দালোর কাছ থেকে এসেছে আর তার ভিতর রাষ্ট্রদূতকে উদ্দেশ করে লেখা একখানি স্বতন্ত্র পত্র। শিল্পী আমাকে বললে স্পেনে যদি নিজের ভাগ্য ফেরাতে চাই তো এই সুযোগ। কারণ মন্ত্রীরা চেষ্টা করছেন যাতে এই অন্যায় অত্যাচারের ক্ষোভ আমি ভুলে যেতে পারি।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরে পুরো বারোটি ঘণ্টা নিশ্চিত আরামে ঘুমোলাম। ভোরবেলা এলো আর একটি সুখবর—মানুচ্চি এসে জানালে ভেনিসের রাষ্ট্রদূত ভেনিস থেকে নির্দ্দেশ পেয়েছেন আমাকে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়ে দেবার—আর রাষ্ট্রনিরাপত্তা বিভাগের অভিযোগ কোথাও কখনও আমার সম্মান ক্ষুণ্ণ করবে না। আসছে সপ্তাহেই রাষ্ট্রদূত আমাকে রাজসভায় উপস্থিত করবেন। আর আজ রাত্রে তিনি আমাকে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর প্রাসাদে—এক বিরাট ভোজসভায়। [ক্রমশঃ।

মোরা সাত জন

[*William Wordsworth*-এর "We are Seven" কবিতার অনুবাদ]

যে সরল শিশু চিরচঞ্চল আনন্দ শুধু জানে
সে বোঝে না হায়—কখনো বোঝে না মৃত্যুর কি যে মানে।
এই তো সেদিন প্রাতে
দেখা হোল মোর ছোট্ট একটি গ্রাম্য মেয়ের সাথে।
কুঞ্চিত কেশে মাথা-ভরা তার মুখখানি সুন্দর—
বয়স তাহার নয় বেশী নয় মোটে আট বৎসর।

* * *

"বল তো লক্ষ্মী মেয়েটি আমায়" বললেম আমি তাকে,—
"তোমরা ক'জন ভাই-বোন—আর কোথা তারা সবে থাকে ?"
বিস্ময়ে মোর মুখপানে চেয়ে রহিল কিছুক্ষণ
বলিল সে পরে,—"আমরা হ'লাম ভাই-বোন সাত জন।
মোদের দু'জন থাকে উত্তরে 'কনওয়ে শহরেতে
আর দুই জন নৌকা চালায় সুদূরে সমুদ্রেতে।
এক ভাই আর এক বোন মোর শুয়ে আছে মহাশয়!
ঐ তো অদূরে গীর্জ্জা-উঠানে—মোদের কুটীরে নয়।
সেই গীর্জ্জারই কাছে অতি কাছে পাতা-ঘেরা গৃহটিতে
মা ও আমি থাকি সকল সময় গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে।"
"ঐ গীর্জ্জায় শুয়ে থাকে যদি তব দুই ভাই-বোন—
তবে তো তোমরা মোটে পাঁচ জন—নও নও সাত জন।"
সম্বিল স্বরে বললো বালিকা,—"তাদের কবরগুলি—
সবুজ কোমল ঘাসে ঢাকা আছে—নেই নেই সেথা ধূলি।
আমার মায়ের দুয়ার হইতে এক মিনিটের পথ
দেখতে পারেন তাহাদের যদি থাকে আপনার মত।
ভিজে ভোরে আমি সেইখানে বসে মোজা বুনি একমনে
আবার তাদের গান গেয়ে আমি শোনাই তো ক্ষণে ক্ষণে।
যেদিন বিকেলে আবহাওয়া ভালো সেদিনও সেখানে যাই
আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে আমি সান্ধ্য-খাবার খাই।
প্রথম মরেছে মোর বোন 'জেনি' ভাই 'জন' তারপরে
তাইতো তাহারা গীর্জ্জা-আঙনে শুয়ে আছে ও' কবরে।"
"তোমাদের মাঝে দুই জন যদি সুদূরে স্বর্গে থাকে
তবে বলো মোরে তোমরা ক'জন", বললেম আমি তাকে।
তক্ষুণি সেই ছোট্ট বালিকা মধুহাসি হেসে কয়
"নই পাঁচ জন—মোরা সাত জন শুনুন হে মহাশয়।"
যত বলি আমি,—"তাহারা দু'জন নেই এই ধরাতলে"
"মোরা সাত জন—মোরা সাত জন" বালিকাটি তত বলে।

অনুবাদ : শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাত

মেয়েটি চলে গেলে, সহজেই বুঝতে পারলাম, মিসেস ব্লেকের প্রতি আমার মনের শ্রদ্ধা অনেকটা বেড়ে গেছে। আমি ভারতবর্ষের ছেলে, মেয়েটির চরিত্রের প্রতি মিসেস ব্লেকের সুস্পষ্ট ঘৃণায় ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শের গর্ব্বে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল আমার মন—অত্যন্ত সহৃদয় এবং সশ্রদ্ধ হ'ল আমার ব্যবহার মিসেস ব্লেকের প্রতি। কিন্তু ক্রমে সেখানেও পেলাম আঘাত—সেইটুকু এইবার বলি।

মেয়েটির চলে যাওয়ার দিন আট-দশ পরে চন্দ্রনাথ জিনিষ-পত্র নিয়ে এলো আমাদের বাড়ীতে বাস করবার জন্য। মিসেস ব্লেক চন্দ্রনাথকে নিজের শোবার ঘর ছেড়ে দিলেন—এ ব্যবস্থার কথা আগেই বলেছি। এবং কয়েকটা দিন এলটাম পার্কের বাড়ীতে চন্দ্রনাথকে পেয়ে মনের দিক দিয়ে আমি যেন অনেকটা বেঁচে গেলাম। চন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য এসেছিল, তাই সহরে যাওয়ার তার প্রয়োজন ছিল খুবই কম। আর আমার ডাক্তারী বিষয়ে কয়েকটা লেকচার শুনতে সহরে যেতে হত—তাও বেশীক্ষণের জন্য নয়। তাই ফুরসত আমাদের তু'জনার ছিল যথেষ্ট। এলটাম পার্কের আবহাওয়ার নানান গল্প ও আলোচনায় আমাদের সময় মোটের উপর ভালই কাটল কিছু দিন।

বুলা! আগেই তোমাকে বলেছি যে, চন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে আমি চিরদিনই আনন্দ পেয়েছি এবং তার চরিত্রের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই কিছু কিছু আভাসও দিয়েছি তোমাকে। কিন্তু তোমাকে স্পষ্ট করে বলিনি যে আমাদের তু'জনার এত সহৃদয়তা থাকা সত্ত্বেও চরিত্রগত স্বভাবের পার্থক্য ছিল প্রচুর। আমার মনের জানালা দরজা খুলে ফেলে বাইরের আবহাওয়ার তাকে ভরিয়ে তোলার জন্য আমি ছিলাম সর্ব্বদাই উৎসুক। আর চন্দ্রনাথের স্বভাব ছিল ঠিক উল্টো। বাইরের আবহাওয়া ভাল করে যাচাই না করে সহজে মনের জানালা-দরজা সে খুলতে রাজী নয়। যেন সেখানে প্রবেশ-অধিকার পাওয়ার যোগ্যতা বিশেষ পরীক্ষা-সাপেক্ষ—এইটেই ছিল তার চরিত্রের বিশেষত্ব। সে অধিকার কে পেয়েছে, না পেয়েছে জানি না, কিন্তু এ দেশীয় কেউ পেয়েছে বলে ত আমার মনে হয় না। আমার জীবনের যা কিছু ঘটেছে সবই তার কাছে সরল ভাবে বলে তার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির মাপ-কাঠিতে যাচাই করে নিতাম, কিন্তু তার কাছ থেকে কোনও দিনই কিছু ঘটেছে বলে শুনিনি। সে বেশী দিন এ দেশে ছিল না, তাই হয়ত বলবার মত কিছু ঘটেনি কিংবা হয়ত তার মনের সে রাজ্যটিতে আমার প্রবেশ-অধিকার ছিল না।

এ সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে আমাদের তু'জনার মনের মিল ছিল গভীর এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেটা সহজেই যাচাই হয়ে গিয়েছিল। আমাদের তু'জনার মনের গভীর মিলের একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল—সাহিত্য, সেটা বিশেষ করে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল রবীন্দ্র-সাহিত্যে। বুলা! তুমি ত জান, ছেলেবেলা থেকেই আমি রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী—কত রবীন্দ্রনাথের কবিতা তোমাদের পড়িয়ে শুনিয়েছি, মনে আছে ত? চন্দ্রনাথের এই অনুরাগ ছিল ষোল আনার উপর আঠারো আনা। কত দিন এলটাম পার্কের খাবার ঘরটিতে বসে রাত্রে খাওয়ার পর রবীন্দ্র আলোচনায় আমাদের সময়টা মধুর হয়ে উঠেছে—আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে—এক দিন কথায় কথায় চন্দ্রনাথকে বলেছিলাম, জান—রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি আমার অনুরাগ ছেলেবেলা থেকেই। তার সূচনাটিও বড় মধুর—কোনও দিন ভুলব না।

চন্দ্রনাথ শুধাল, কি রকম?

বললাম, আমি তখন স্কুলে পড়ি—এই তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে। এক দিন বিকেলে স্কুলের পরে কয়েকটি স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম গঙ্গার ধারে—জায়গাটি বেশ নিরিবিলি মনে আছে। বিকেলটাও ছিল মেঘাচ্ছন্ন। আমাদের মধ্যে এক জন বেশ ভাল গান গাইত। সবাই মিলে তাকে ধরলাম—গান গাইবার জন্য। সে গলা ছেড়ে গান ধরল।

চন্দ্রনাথ বলল, রবীন্দ্র-সঙ্গীত বুঝি?

বললাম, শোন। তখন আমি রবীন্দ্রনাথের কথা কিছুই জানতাম না। নামটা হয়ত বা শুনেছিলাম। যাই হোক, বন্ধুটি গাইল—

> আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী!
> তুমি থাক সিন্ধুপারে—

বাস—আমার কি হল জানি না। সামনে গঙ্গা, উন্মুক্ত মেঘলা আকাশ—কোন দূরে মহাসমুদ্রের ওপারে মহা আকাশের কিনারায় কোন সে মধুর বিদেশিনী যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে আমারই প্রতীক্ষায়—কি রকম যে হয়ে গেলাম তোমাকে বোঝাতে পারব না। বাইরের জ্ঞান যেন আমার লোপ পেয়ে গেল—খানিকক্ষণের জন্য। গানের বাকী পদগুলি কানেই গেল না।

চন্দ্রনাথ বলল, আহা—ও গানটা বড় সুন্দর! আর কি সুরই দিয়েছেন—বিদেশী সুর মিশিয়ে—সত্যিই পাগল করে দেয়।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, আজ সেই সিন্ধুপারে এসেছি।

একটু হেসে চন্দ্রনাথ বলল, এখন বিদেশিনীর দেখা পেলেই হ[illegible]

অন্য অন্য সাহিত্য, বিশেষত: ইংরেজী সাহিত্য নিয়েও অনেক আলোচনা হত। চন্দ্রনাথ ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে বিশিষ্ট এম-এ। আমি ত' ডাক্তারী কলেজে পড়ে পাশ করেছি—তাই ইংরেজী সাহিত্য আমার বেশী কিছু জানা ছিল না। চন্দ্রনাথের কাছে ইংরেজী সাহিত্যের অনেক খবর—ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ বিখ্যাত ইংরেজ কবিদের কাব্যের আলোচনা শুনে আমি সত্য সত্যই বিশেষ মুগ্ধ হতাম।

একদিন চন্দ্রনাথ বলল, তোমার মনোভাব যে রকম দেখছি, তুমি টমাস হার্ডির নভেল পড়। বিশেষ আনন্দ পাবে।

বললাম বেশ ত।

পরের দিনই চন্দ্রনাথ, মিসেস ব্রেকের সাহায্যে এলটাম পার্ক লাইব্রেরী থেকে টমাস হার্ডির 'উডল্যাণ্ডার্স' বইখানি এনে আমাকে পড়তে দিল। সে বয়সে বইখানি পড়ে যে রকম অভিভূত হয়েছিলাম, জীবনে খুব কম বই পড়ে অতটা অভিভূত হয়েছি—আজও মনে আছে। মেঘলা চাঁদের আলোয় পাহাড়ের উপর নভেলখানির পরিসমাপ্তির করুণ ছবিটি চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে আছে আমার প্রাণে।

আর একটা দিক দিয়ে দু'জনার মনের বিশেষ মিল হল এ দেশে। সেটা হচ্ছে—এ দেশের প্রতি বীতরাগ এবং তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমাদের স্বদেশের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ। দেশে থাকতে দেশের প্রতি এতটা অনুরাগ কোনও দিনই উপলব্ধি করেছি বলে মনে হয় না। এলটাম্ পার্কের ঘরে বসে বসে আমরা দু' জনে কল্পনায় দেশের কত রঙীন ছবিই না দেখতাম—সবই ভাল, সবই মধুর, দোষ-ত্রুটি যেন আমাদের সনাতন ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না।

একদিন কথায় কথায় চন্দ্রনাথ বলল, আমি আর এদেশে বেশী দিন থাকছি না। আমি প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছি।

শুধালাম, কি রকম?

বললে, আরে ছিঃ ছিঃ—এ দেশে মানুষ থাকে? একে এই দারুণ শীত, সামান্য একটু নড়াচড়ার স্বাধীনতাটুকুও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নেই, তার উপর এ দেশের মানুষগুলোকেও আমার ভাল লাগে না।

শুধালাম, কেন?

বললে মুখোস! মুখোস! সবাই একটা কৃত্রিম ভদ্রতার মুখোস পরে আছে—এই মাত্র। আসলে প্রাণের কোনও সাড়া নেই।

বললাম, সেটা বিশেষ করে আমাদের জন্যে।

বললে, তাহলে আমাদের এ দেশে থাকার কি দরকার? আমি ত মাকে লিখেছি—আমার এ দেশে থাকা পোষাবে না। দরকার নেই আমার ব্যারিষ্টারী পড়ে। দেশে ফিরে গিয়ে না হয় একটা প্রফেসারী করা যাবে।

বললাম, তোমাদের ঘরে অগাধ পয়সা—তোমাদের মুখে এ সব কথা মানায়! চন্দ্রনাথ সত্যই খুব পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে।

বললে, তা তোমারই বা কি। ডাক্তারী পাশ করে দেশে ত দু' পয়সা রোজগারও করছিলে। এ দেশের খেতাবের বাহাদুরী নিয়ে একটা বড় চাকুরীর জন্য না-ই বা অত লালায়িত হতে?

চুপ করে গেলাম। এ কথা এ দেশে এসে আমি নিজেও যে কত বার ভেবেছি তার ঠিক নেই। সত্যি। কেন যে এসেছিলাম।

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বললাম, দেখ, এ দেশের প্রাণের যে কোনও সাড়া পাই না—সেটা হয়ত কতকটা আমাদের দোষ। হয় ত আমরা সে রকম প্রাণ ঢেলে মিশতে জানি না।

চন্দ্রনাথ বলল, তেলে-জলে মিশ খায় না। এদের মনের গতির ধারা আমাদের চেয়ে একেবারে স্বতন্ত্র।

বললাম, আমিও তোমার চেয়ে কম হাঁপিয়ে উঠিনি। আমি কাল পালাতে পারলে, পরশু অবধি অপেক্ষা করতে রাজি নই। আসলে কথাটা কি জান? এ দেশে আমাদের মনের কোনও আশ্রয় নাই, তাই এমন হয়েছে।

চন্দ্রনাথ বলল, আশ্রয় কি করে হবে? আশ্রয় পাওয়া যায় স্নেহে, ভালোবাসায়, মমতায়। এ সবই ত' আমাদের রয়েছে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে। এখানে আছি নির্ব্বাসনে।

চুপ করে গেলাম। এ কথা যে আমি দিন-রাত মনে মনে উপলব্ধি করি।

চন্দ্রনাথ আবার বলল, তা ছাড়া দেখ, এ দেশের সবই কেমন ঢাকা-দেওয়া মুখোস পরা—কি এ দেশের প্রকৃতি, কি মানুষ। আমাদের দেশে সবই কেমন উন্মুক্ত খোলা উদার, সহজেই মন বিশ্রাম পায় সেখানে। আমাদের কি এ দেশে পোষায়? মন ত হাঁপিয়ে উঠবেই।

একটু ভেবে বললাম, যাও, তুমি ফিরে যাও। কিন্তু আমার পক্ষে এতগুলো টাকা বৃথা খরচ করে কিছু না করে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। দেশে লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে? যেমন করে হোক, অন্তত বছর দেড়েক আমাকে থাকতেই হবে।

চন্দ্রনাথ বললে, কি নিয়ে থাকবে? পড়া-শুনার প্রতি তোমার যা আগ্রহ—তা ত জানি। বছর দেড়েক সময়টা ত কম নয়। তত দিন এ দেশে সুস্থ মনে বেঁচে থাকতে গেলে একটা কিছু মনের অবলম্বন চাই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, তাই ত ভাবি। এ রকম একটা ভারি মন নিয়ে কত দিন আর পেরে উঠব।

একটু হেসে চন্দ্রনাথ বলল, এক কাজ করো। একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করো। তোমাকে ত আমি চিনি। দেখবে একটা নেশায় দিনগুলো হু-হু করে কেটে যাচ্ছে।

বললাম, কি যে বল!

চোখে একটা দুষ্টু হাসি মাখিয়ে চন্দ্রনাথ বলল, কেন? এ বয়সে মনের ওর চেয়ে ভাল ওষুধ আর নেই?

বললাম, তা হলে সে ওষুধটা নিজের বেলায়ই প্রয়োগ কর না কেন? তোমার ত আরও সুবিধা—বিয়ে করে আস নি।

চন্দ্রনাথ বলল, সব ওষুধ কি সকলের বেলায় খাটে?

* * * *

চন্দ্রনাথের সঙ্গে এই যে নিরিবিলি নানান কথায় মনটাকে একটু হালকা করার চেষ্টা করছিলাম—ক্রমে সেখানেও পেলাম বাধা। এবং বাধা এল মিসেস ব্রেকের দিক দিয়ে।

চন্দ্রনাথ আসার পর মিসেস ব্রেকের কি হল জানি না—তিনিও হঠাৎ বিশেষ উৎসুক হয়ে উঠলেন আমাদের সঙ্গে গল্প করার জন্য। সকাল বেলায় আমি ও চন্দ্রনাথ দু'জনেই ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বেরিয়ে যেতাম এবং যত শীঘ্র সম্ভব দু'জনেই ফিরে আসতাম খাবার ঘরটিতে বসে নিরিবিলি গল্প করার জন্য কিন্তু চন্দ্রনাথ আসার দু'-তিন দিন পর থেকেই মিসেস ব্রেকও এসে যোগ দিতে সুরু করলেন এবং সেই বিকেল থেকে রাত্রে শুতে যাওয়া পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তক্ষণই আমাদের সঙ্গে থাকতেন—যেন আমাদের ছাড়তে চান না। কাজেই আমাদের কথাবার্ত্তা হত বিশেষ সংযত এবং চন্দ্রনাথের মনের কথা কথা বলতে পারি না, আমার মন শেষ পর্য্যন্ত

রোজই একটা অবসাদে উঠত ভরে। একদিন এক ফাঁকে চন্দ্রনাথ বলল—

"আর ত পারা যায় না। সমস্তক্ষণ উনি আমাদের কাছে থাকবেন—এই বা কি রকম কথা!

মৃদু হেসে বললাম, তোমাকে যে ওঁর খুব পছন্দ—তাই তোমার সঙ্গ ছাড়তে চান না। আগে ত এ রকম দেখিনি।

বলল, একটু কম পছন্দ হলে যে বাঁচতাম।

বললাম, উপায়ই বা কি? এ ত আমাদের দেশ নয় যে বাইরে কোথাও গিয়ে বসে গল্প করব। বাইরের যে রকম আবহাওয়া এ দেশে—বাইরে কোথাও বসে গল্প করা ত অসম্ভব। কোনও হোটেলে গিয়ে বসলে ত খরচ কূল পাওয়া যাবে না।

তখন নভেম্বর মাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—অসম্ভব শীত এবং প্রায়ই বাইরে মেঘাচ্ছন্ন এবং ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এর মধ্যে একদিন বরফও পড়েছিল। জীবনে এই প্রথম বরফ-পড়া দেখেছিলাম। সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে জানালা দিয়ে অবাক হয়ে দেখেছিলাম—কে যেন সাদা ধবধবে একখানা কম্বলে সমস্ত দেশটা দিয়েছে ঢেকে।

চন্দ্রনাথ বলল, আমি একদিন স্পষ্ট বলব—সব সময় আপনি এ রকম উপস্থিত থাকলে, আমাদের প্রয়োজনীয় কথায় একটু অসুবিধা হয়।

বললাম, তা তুমি পার। তোমার ত আমার মতন চক্ষুলজ্জা নেই।

চন্দ্রনাথ সত্যই পারে—ইতিমধ্যেই তার প্রমাণ পেয়েছি। চন্দ্রনাথ আসার পরের দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর মিসেস ব্লেক তার গান-বাজনার ঘরটিতে যাওয়ার জন্য বিশেষ সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন। দু'জনেই মিসেস ব্লেকের ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ মিসেস ব্লেকের গান-বাজনা শুনেছিলাম—মনে আছে। মিসেস ব্লেক সেদিন যে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে প্রাণ ঢেলে গাইবার চেষ্টা করেছিলেন সেটুকু আমার লক্ষ্য এড়ায় নি। গান-বাজনার শেষে চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার ভাল লাগল?

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথ বলেছিল, ভাল নিশ্চয়ই গেয়েছেন। তবে কি জানেন? আপনাদের এ দেশী গান আমরা ত ঠিক বুঝি না।

পরের দিন রাত্রে খেতে বসে মিসেস ব্লেক যখন শুধালেন, আজ একটু গান-বাজনা হবে কি?

চন্দ্রনাথ বলল নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু আমরা যাব না। তাতে আপনার গান-বাজনার বাধা হবে। অরসিক লোক থাকলে রসের আসর ক্ষুণ্ণ হয়।

মিসেস ব্লেকের মুখটা লাল হয়ে গেল। তিনি আর ও বিষয়ে দ্বিতীয় কথা বলেন নি। আমি যেন লজ্জায় মরে গেলাম। ফলে মিসেস ব্লেক শীঘ্র আর গানের আসর বসান নি।

* * * *

আর একটা দিক দিয়েও মিসেস ব্লেকের প্রতি আমার মন ক্রমে তিক্ত হয়ে উঠল। সেটা চন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। ক্রমেই সেটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যে, এ বয়সে হলে হয়ত বা আমি তা উপেক্ষা করতে পারতাম, কিন্তু সে বয়সে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেইটুকু এইবার বলি।

আগেই বলেছি—নিদারুণ শীত। রাত্রে তিন-চারটে কম্বল, তার উপর লেপ, তা সত্ত্বেও বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ যে কি কষ্ট হত তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। কোনও রকমে বিছানায় লেপের নীচে গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকতাম —হাত-পা এতটুকু ছড়িয়ে গেলেই শীতের তীব্র শিহরণে সমস্ত শরীর যেন উঠত কেঁপে। অনেকক্ষণ ঐ ভাবে থেকে ক্রমে একটু একটু করে নিজেকে সইয়ে নিয়ে ভিতরটা গরম হলে সহজভাবে শোওয়া সম্ভব হত। রোজই রাত্রে এই কষ্ট দিনের পর দিন আমি মুখ বুজে সহ্য করেছি—ভাবতাম উপায়ই বা কি! সকাল বেলা মিসেস ব্লেক যখন ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করতেন—ঘুম ভাল হয়েছিল কি না—বিছানায় শুয়ে এই কষ্টটুকুর কথা তাঁকে যে দু'-এক দিন জানাইনি এমনও নয়। তিনি একটু হেসে বলতেন যে বছরের এই সময়টা ও কষ্টটা বিশেষ করে সহ্য করতেই হয়।

একদিন রাত্রে এই কষ্টটা অসম্ভব হয়েছিল—আজও মনে আছে। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, এমন কি, ঘুমিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল এই কষ্টের তীব্র তাড়নায়। পরের দিন—সেই দিনই বোধ হয় প্রথম বরফ দেখেছিলাম—সকাল বেলায় চন্দ্রনাথকে বললাম, ভাই, আর ত পারা যায় না। এ হতভাগা দেশে রাত্রে যে একটু আরাম করে শোব, তারও উপায় নেই।

চন্দ্রনাথ শুধাল, কেন? কি হল?

বললাম, উঃ। কাল রাত্রে কি অসম্ভব শীত গেল! বিছানার মধ্যেও যেন বরফ ঢালা।

চন্দ্রনাথ বলল, কটা গরম জলের ব্যাগ রেখেছিলে বিছানায়?

আশ্চর্য্য হয়ে শুধালাম, গরম জলের ব্যাগ—সে কি?

চন্দ্রনাথ বলল, ও কি! এত ঠাণ্ডায় গরম জলের ব্যাগ না হলে বিছানায় শুতে পারবে কেন? আমার বিছানায় ত তিনটে গরম-জলের ব্যাগ ছিল।

বললাম, মিসেস ব্লেককে বলে বন্দোবস্ত করেছ বুঝি?

বললে, বন্দোবস্ত আবার কি! প্রথম দিন বিছানায় শুতে গিয়েই ত আমি দু'পাশে দুটি গরম জলের ব্যাগ পেয়েছিলাম। পরের দিন মিসেস ব্লেক জিজ্ঞাসা করলেন যে দুটো যথেষ্ট কি না। ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলাম, হাঁ। কাল রাত্রে ঠাণ্ডাটা খুব বেশী ছিল কিনা—শুতে গিয়ে দেখি পায়ের কাছে আর একটা দিয়েছেন।

শুধালাম এর জন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে নিশ্চয়ই?

বললে না, না। সে সব কোনও কথাই তোলেননি। সত্যি! আশ্চর্য্য সহৃদয়তা ভদ্রমহিলার!

গম্ভীর ভাবে বললাম, শুধু আশ্চর্য্য নয়। অদ্ভুত!

* * * *

আর একটা ব্যাপার বলি। ব্যাপারটা অবশ্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপারগুলির মধ্য দিয়েই সংসারে অনেক সময় মানুষের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রনাথ ইদানীং ব্রেকফাষ্ট খেতে প্রায়ই নামত না। ব্যারিষ্টারী পাশের জন্য সহরে গিয়ে প্রফেসারদের লেকচার শোনার ব্যারিষ্টারী পড়া আইনের দিক দিয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং সে প্রায় মনটাকে ঠিক করেই ফেলেছিল যে সে এ দেশে থাকবে না—শীঘ্রই দেশে যাবে ফিরে।

তাই এই দারুণ শীতে সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠে তৈরী হওয়ার যে অসম্ভব কষ্ট, তার হাত হতে এড়িয়ে চন্দ্রনাথ মিসেস ব্লেকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল যে, তার ব্রেকফাষ্ট তার শোবার ঘরেই মিসেস ব্লেক দিয়ে আসবেন এবং মিসেস ব্লেক বেশ সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজীও হয়েছিলেন। আমার পক্ষে সহরে গিয়ে লেকচার শোনার প্রয়োজনীয়তা ছিল; তাই বেলা অবধি লেপের নীচে শুয়ে থাকার আনন্দটুকু উপভোগ করার সুযোগ আমার ছিল না—এক রবিবার ছাড়া। এবং রবিবার দিন আমার ব্রেকফাষ্ট মিসেস ব্লেক উপরেই দিয়ে আসতেন। ফলে আমাদের একসঙ্গে ব্রেকফাষ্ট খাওয়া ইদানীং প্রায় উঠেই গিয়েছিল।

বুলা! সকাল বেলা চা-এর সঙ্গে রুটি টোষ্ট ও ডিম খেতে আমি কি রকম ভালবাসতাম—তোমার মনে আছে কি না জানি না। বরাবরই দেশে আর কারও জন্যে হোক আর না হোক আমার জন্য অন্ততঃ একটা ডিমের ব্যবস্থা রোজই সকাল বেলা হত। এবং এ দেশে এসেও প্রথম প্রথম সকাল বেলা ব্রেকফাষ্টে বরাবরই ডিম পেয়েছি। কিন্তু ইদানীং লক্ষ্য করলাম মিসেস ব্লেক ডিম দেওয়া বন্ধ করলেন। দু'টুকরো কাগজের মতন করে কাটা পাৎলা রুটি ও মাখন, চা এবং ছোট এক টুকরো মাংসের মেটুলী ভাজা কিংবা মাছ ভাজা···এই হয়ে দাঁড়াল ব্রেকফাষ্ট। খেয়ে কোনও দিনই তৃপ্তি হত না—কিন্তু উপায়ই বা কি! একদিন কথায় কথায় মিসেস ব্লেক আমাকে শুনিয়েও দিয়েছিলেন যে ডিমের যে রকম দাম বেড়ে গেছে, ডিম দেওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। বেশ সস্তায় আছি, এ সব কষ্ট একটু আধটু ত সইতেই হবে—এই বলে মনকে প্রবোধ দিতাম, আজও মনে আছে।

একদিন চন্দ্রনাথকে খুব সকাল সকাল বেরুতে হল। বলেছিল সহরে গিয়ে দেশে ফেরার জাহাজের বন্দোবস্ত করবে। ফলে আমি যখন তৈরী হয়ে ব্রেকফাষ্ট খেতে নেমে এলাম, চন্দ্রনাথ তখন সবে ব্রেকফাষ্ট খাওয়া শেষ করেছে—খাওয়ার ঘরেই আছে বসে। চন্দ্রনাথের খাওয়ার প্লেটের দিকে চেয়ে স্পষ্টই দেখতে পেলাম—চন্দ্রনাথ ব্রেকফাষ্টে ডিম খেয়েছে। মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ভাবলাম—আজ তাহলে ব্রেকফাষ্টে ডিম পাওয়া যাবে। কিন্তু মিসেস ব্লেক যখন আমার ব্রেকফাষ্ট নিয়ে এলেন, দেখলাম—শুধু ছোট এক টুকরো মাছ ভাজা এবং কিছু আলু সিদ্ধ। বুলা! অস্বীকার করব না, রাগে দুঃখে মন উঠল ভরে।

চন্দ্রনাথ অবশ্য তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। কোনও কথা হল না। কথা হল রাত্রে। ডিমের কথাটা ভুলিনি—সোজা চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তোমাকে রোজ ব্রেকফাষ্টে ডিম দেন না কি?

চন্দ্রনাথ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললে, কেন? প্রায়ই ত দেন। এক আধ-দিন অবশ্য বাদ যায়।

বললাম, আমাকে দেন না। আমাকে ডিম দেওয়া বন্ধ করেছেন—অনেক দিন।

চন্দ্রনাথ বলল, তা চাও না কেন?

বললাম, প্রবৃত্তি হয় না। আমাকে শুনিয়ে দিয়েছেন—ডিমের দাম বড্ড বেড়ে গেছে, ডিম দেওয়া ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

চন্দ্রনাথ একটু চুপ করে গেল।

বললাম এ বাড়ীতে আমি আর বেশী দিন থাকছি না। এবার অন্যত্র চেষ্টা করতে হবে।

একটু ভেবে চন্দ্রনাথ বলল, দেখ, আমার মনে হয় দু'জনকে রাখা ওঁর পোষাচ্ছে না। একলা মানুষ ত—কষ্ট হচ্ছে। অথচ স্বাভাবিক ভদ্রতা ত খুব বেশী—মুখে বলতে পারছেন না কিছু।

উত্তেজিত ভাবে বললাম, তাই বুঝি ব্যবহারে অভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স্বাভাবিক ভদ্রতা বজায় রাখছেন?

চন্দ্রনাথ একটু হেসে বলল, বেজায় রেগে গিয়েছ দেখছি!

বললাম রাগারাগির কথা নয়। তোমাকে যত্ন করেন—সেটা আমার পক্ষে আনন্দের কথা। আশা করি সেটুকু তুমি ভুল বুঝবে না। কিন্তু এই রকম নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বে ওঁর মনের যে দৈন্যের পরিচয় পেলাম—সেইখানেই আঘাত লাগল প্রাণে।

একটু হেসে চন্দ্রনাথ শুধাল কি রকম? বললাম, সব-সব এক। এ দেশের মেয়েরা দেখছি সবই এক ছাঁচে ঢালা। ভিভিয়েনের সঙ্গে ওঁর তফাৎ এইটুকু—ভিভিয়েনের সবই স্পষ্ট, ওঁর সবই একটু প্রচ্ছন্ন।

চন্দ্রনাথ বলল, ছিঃ ছিঃ! কি যা-তা বলছ?

বললাম, তা ছাড়া তোমার প্রতি এই রকম অসঙ্গত আকর্ষণের আর ত কোনও কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না?

চন্দ্রনাথ বলল, মানি—ওঁর আমার প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। কিন্তু তার কারণ তুমি যা বলছ—তা না-ও হতে পারে।

বললাম, আবার কি! দেখছ না—তোমাকে ছাড়তে চান না!

চন্দ্রনাথ বলল, মেয়েদের মনের গতি কখন কোন দিক দিয়ে কি ভাবে যায়—বোঝা অত সহজ নয়।

বললাম, সে যাই হোক, এ বাড়ীতে আমি থাকব না।

চন্দ্রনাথ বলল, শোন। চট করে এ বাড়ী ছেড়ো না। এত সস্তায় এরকম থাকার জায়গা সহরে পাবে না। আমি ত আর বেশী দিন থাকছি না। কাজেই এ সব গোলমাল যাবে মিটে।

শুধালাম, তুমি কি সব ঠিক করে ফেলেছ নাকি?

চন্দ্রনাথ বলল, হ্যাঁ। আর মাস দেড়েক পরেই আমার জাহাজ ছাড়বে। আর মাত্র মাস দেড়েক আছি এ দেশে। তাও সব সময়টা এখানে থাকব না। দিন আট-দশ পরেই বেরিয়ে যাচ্ছি 'টরকি' বেড়াতে। যাওয়ার আগে এ দেশের ডেভন কর্ণওয়ালের দিকটা একবার দেখে যেতে চাই।

বললাম, হ্যাঁ। ডেভন কর্ণওয়ালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ত অসম্ভব প্রশংসা শুনি।

বলল, হ্যাঁ তাই যাওয়ার আগে অন্তত সেটুকু দেখে যাই। দিন দশ-বারো থাকব ও অঞ্চলে।

চন্দ্রনাথ চলে যাবে শুনে আমার স্বাভাবিক ভারি মনটা যেন আরও এলিয়ে পড়ল। সত্যি ও চলে গেলে এ দেশে থাকব কি নিয়ে!

মুখে বললাম, তুমি চলে গেলে ত এ বাড়ীতে থাকা আমার পক্ষে আরও অসম্ভব।

চন্দ্রনাথ শুধাল, কেন?

বললাম, ভদ্রমহিলার প্রতি আমার মনোভাব যা দাঁড়িয়েছে, ওঁর সঙ্গে একলা এ বাড়ীতে বাস করার কথা আমি ভাবতেই পারি না।

• • • •

শেষ পর্য্যন্ত এ বাড়ী ছাড়ার সুবিধাও ঘটল—সেইটুকু এইবার বলি।

চন্দ্রনাথ টমকি যাওয়ার আগে এক রবিবার দিন দুপুরবেলা দুটি বাঙ্গালী যুবককে খেতে বলল আমাদের বাড়ীতে। একজনের নাম—সুনীল রায়, চন্দ্রনাথের দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর একটির নাম নীরেন পাল, সুনীলেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং চন্দ্রনাথের পরিচিত। এদের কথা অবশ্য আগেই আমি চন্দ্রনাথের কাছে শুনেছিলাম কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ হয়নি এত দিন। শুনেছিলাম—এরা দু'জনে লণ্ডনের নর্থ কেনসিংটনে ল্যাডব্রোক গ্রোভ টিউব ষ্টেশনের কাছে পাউইস্ গার্ডেনস নামক রাস্তায় একটি ফ্লাট নিয়ে বাস করে—একটি ঝি আছে, দৈনিক সকালে এসে রান্নাবান্না করে ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়। আরও শুনেছিলাম—সুনীল নিজেও নাকি ভাল রাঁধতে পারে এবং প্রায় রোজই বাজারের টাটকা মাছ কিনে এনে মাছের ঝোল ও ভাত রাঁধে। বিশেষ করে এই কথা শুনে—ভাত মাছের ঝোলের টানেই বোধ হয়—ওদের সঙ্গে আলাপ করার বিশেষ আগ্রহ হয়েছিল আমার। আলাপ হলে হয়ত বা একদিন খেতে বলবে। কত দিন যে মাছের ঝোল ভাত খাইনি। চন্দ্রনাথকে সে কথা বলাতে সে বলেছিল, বেশ ত। চল একদিন ওদের ওখানে যাই। গেলেই খেতে বলবে। সুনীল বড় ভাল ছেলে।

কিন্তু যাই যাই করে যাওয়া হয়ে ওঠেনি এত দিন। শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথই ওদের খেতে বলে এল।

বেলা এগারটা আন্দাজ ওরা দু'জনে এল আমাদের বাড়ীতে। আলাপ হলো। শুনলাম—সুনীল লণ্ডনে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে এবং নীরেন পড়ে চারটার্ড-একাউণ্টেনসী।

দু'জনকেই আমার বেশ ভাল লাগল—বিশেষ করে সুনীলকে। লম্বা চেহারা, ছোহারা গড়ন, একটু লম্বা মুখে বেশ টিকলো নাক, চোখ এবং মুখের মধ্যে একটা ভদ্রতা এবং সহৃদয়তার ছাপ পরিস্ফুট। হো-হো করে মনখোলা হাসি ও সরল কথাবার্ত্তায় সহজেই যেন সকলকে আপনার করে নেয়। নীরেন অবশ্য একটু অন্য ধরণের। ছোটখাটো মানুষটি—দামী পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতন। কম কথা বলে কিন্তু মুখে সব সময়ই একটি মৃদু হাসি লাগান রয়েছে। গায়ের বর্ণ আমাদের মাপকাঠিতে বেশ ফর্সা এবং মঙ্গোলিয়ান ধরণের চেপ্টা। মুখে বুদ্ধির দীপ্তি যে একেবারেই নাই এমন নয়। কিন্তু মুখে-চোখে একটা রুগ্ন মালিন্যের ছাপই বেশী সুস্পষ্ট। কথারবার্ত্তায় সহজেই প্রকাশ হলো যে নীরেনের এ দেশের প্রতি একটা অত্যধিক টান—এ দেশের সবই ভালো এবং যদি সম্ভব হয় ত এ দেশ থেকে ও আর ফিরবে না।

বললে, জানেন? এ দেশ আমাকে প্রাণ দিয়েছে।

শুধালাম, কি রকম?

নীরেনের মুখের কথা টেনে নিয়ে সুনীল বলল, জানেন না বুঝি? ও ত মরতে বসেছিল—পেটে টিউমার না কি একটা হয়ে। প্রায় তিন মাস হাসপাতালে থেকে অপারেশন করিয়ে বেঁচে ফিরে এসেছে।

নীরেন বলল, যে অবস্থা হয়েছিল, আমাদের দেশের ডাক্তারদের সাধ্য ছিল না ও রকম অপারেশন করে আমাকে বাঁচায়।

বললাম, আমাদের দেশেও আজ-কাল অদ্ভুত অদ্ভুত অপারেশন হচ্ছে।

আমাদের কথা ঘুরিয়ে দিয়ে সুনীল বলল, যাই হোক, এখন অন্ততঃ মাস ছয়েক ওর খুব সাবধানে থাকা উচিত। আমি ওর খাওয়া-দাওয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখি। কোনও উত্তেজক জিনিষ খাওয়া ওর একেবারে বারণ।

বললাম অপারেশন যতই ভাল হয়ে থাকুক, খাওয়া দাওয়ার দিক দিয়ে জীবন ভোর কিন্তু আপনাকে বেশ সাবধান থাকতে হবে।

মৃদু হেসে নীরেন বলল, এ দেশে কিছু দিন থাকলেই আমার সব ঠিক হয়ে যাবে—আমি ভাবি না।

সুনীল হেসে বলল, হ্যাঁ—এ দেশ থেকে চলে গেলে ডোরাকে পাবে কোথায়? ডোরার সঙ্গে রোজ সন্ধ্যাবেলা অন্ততঃ একবার ওর দেখা হওয়া চাই-ই। নৈলেই ওর শরীর খারাপ সুরু হয়।

চন্দ্রনাথ শুধাল, ডোরাটি কে?

সুনীল বলল, ওর একটি মেয়ে-বন্ধু। দেখতে ভালই।

চন্দ্রনাথ বলল, তাহলে সেই ওঁর টনিকের কাজ করে বলুন?

নীরেন সমস্তক্ষণই মৃদু মৃদু হাসছিল—এ সব কথা বলায় কোনও আপত্তি ত নেই-ই, বরং যেন উপভোগই করছিল।

নানান কথায় গল্পে দিনটা বেশ ভালই কাটল এবং আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল দুজনারই—বিশেষ করে সুনীলের।

সন্ধ্যেবেলা ষ্টেশনে ওদের পৌঁছে দিতে রাস্তায় বেরিয়ে কথায় কথায় আমি সুনীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, রায়! আপনাদের বাড়ীতে আমার একটা জায়গা হবে?

রায় বলল, জায়গা নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু আপনি এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে যাবেন?

বললাম, চন্দ্রনাথ ত চলল। একলা এখানে থাকতে ভাল লাগবে না আমার।

রায় যেন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, তাহলে চলে আসুন আমাদের ওখানে। আমাদের একটা শোবার ঘর ও একটি বসবার ঘর। শোবার ঘরে তিনখানা খাট। আমরা দু'জনে থাকি এবং দত্ত বলে একটি ছেলেও থাকে। সে দিন কুড়ি পরে দেশে ফিরে যাবে। তখন আপনি চলে আসবেন।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, আপনাকে পেলে ত ভালই হয়। নীরেনের যে রকম শরীর—একজন ডাক্তার থাকলে ত সুবিধা।

খানিকক্ষণ চলার পরে শুধালাম, খরচ কি খুব বেশী পড়ে? আমি ত আপনাদের মতন বড়লোক নই?

রায় হেসে বলল, আমাকে বুঝি খুব বড়লোক ঠাওরালেন! নীরেনের কথা অবশ্য আলাদা। শুনুন—চেষ্টা করি সপ্তাহে দু' পাউণ্ডের মধ্যেই সংসারের সব খরচ কুলিয়ে নিতে। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু বেশী পড়ে যায়।

শুনে আমারও প্রাণ উৎসাহে উঠল ভরে। বললাম, তাহলে কথা ঠিক রইল।

সুনীল বলল, নিশ্চয়। আপনি যেন আবার মত বদলাবেন না।

বললাম, না, না।

• • • •

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চন্দ্রনাথের সঙ্গে নিরিবিলি কথা হল—চন্দ্রনাথেরই শোবার ঘরে।

চন্দ্রনাথ বলল, তুমি তাহলে সত্যি সত্যিই এ বাড়ী ছেড়ে চললে ?

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু সে ত তোমার যাওয়ার পরে।

চন্দ্রনাথ বলল, কিন্তু ভুল করলে। ওদের পাল্লায় পড়ে শেষটায় মুস্কিলে না পড়। ওরা কত দিন ফ্ল্যাট রাখবে তার কি ঠিক আছে !

বললাম, ভুলই করি আর যাই করি—তুমি চলে গেলে এ বাড়ীতে আর থাকছি না।

চন্দ্রনাথ বলল, কিন্তু আমি চলে গেলে সব ঠিক হয়ে যেত।

বললাম, হয়ত পক্ষপাতিত্ব দেখাবার পথটা হবে বন্ধ। কিন্তু ওঁর স্বভাব ত বদলাবে না।

চন্দ্রনাথ বলল, তুমি ওঁর প্রতি একটু ভুল বিচার করছ।

বললাম, ভুল বিচার ? ইদানীং আমার প্রতি ওঁর ব্যবহার কি রকম হয়েছে জান ? ভাল করে যেন কথাই বলতে চান না। যত হাসি-গল্প সব তোমার সঙ্গে।

চন্দ্রনাথ একটু হেসে বলল, ঐ ত। সেই কথাই ত বলছি। আমি যে লক্ষ্য করিনি তা ত নয়। ওঁর আমার প্রতি অনুরাগটা তোমার প্রতি রাগেরই প্রতিক্রিয়া। আসলে মুখ্য তুমি, গৌণ আমি।

বললাম তাই বুঝি চুপি চুপি তোমাকে গরম জলের ব্যাগ দেন, ডিম খাওয়ান ?

চন্দ্রনাথ হেসে উঠল। বলল, চুপি চুপি মোটেই নয়, মিসেস ব্রেক বোকা নন। তিনি বিলক্ষণ বোঝেন—এ সব কথা তোমার জানতে দেরী হবে না ?

বললাম, সে যাই হোক—কিন্তু আমার প্রতি রাগের কারণটা কি শুনি ? ওঁর প্রতি ব্যবহারে কোনও দিক দিয়ে কোনও অপরাধ করেছি বলে ত মনে হয় না ?

চন্দ্রনাথ বলল, হায় রে ! এটুকুও জান না ? মেয়েদের মনের রাগ অনুরাগ মোটেই বাইরের ব্যবহার-সাপেক্ষ নয়।

[ক্রমশঃ।

কালো রাতে

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুঠো মুঠো আবিরের মত
অন্ধকার গায়ে মুখে মাখা,
নিশুতি রাত্তিরে সে এলো,—
আমার যে ঘুম থতমত,
চিনি না···চিনেছি···চেয়ে থাকা,
কতটা বুঝেছি এলোমেলো।

শিয়রে চাঁদের আলো কিছু,
সেইখানে বসে আছে একা,
কালিমাখা সব গায়ে মুখে—
ঘন নিঃশ্বাসে উঁচু নিচু,
ঢেউগুলো এলোমেলো লেখা,
শ্রাবণের মন ভরা বুকে।

কখন যে ভেঙ্গে গেল ঘুম,
মুখে লাগে কখন নিঃশ্বাস,
কখন দেখেছি চোখ খুলে,
মনে হ'ল কিছু কুঙ্কুম,
তার বুঝি লয় অনুপ্রাশ,
ছুঁই ছুঁই করে যুঁই ফুলে।

আরো কিছু তুমি দিতে পারো,
আরো ঘন অন্ধকার কিছু,
জমানো তোমার পুঁজি থেকে ?
অমারাত্তি মরু সাহারারো,
দেখেছি তো চোখ দুটো নীচু
সবটুকু দিয়ে দিলে ঢেকে।

সুনিবিড় মসী হোক জমা,
মোছ চাঁদ ঘন কালি দিয়ে,
নিবে যাক সব চোখে দেখা—
প্রাণ হোক অন্ধকার-রমা,
শেষ ফোঁটা কালি তাই নিয়ে,
হোক আজ শেষ চিঠি লেখা।

আলোতে কি সীমানা হারায় ?
—চেনা যায় পৃথক পৃথক—
নিমজ্জন কোথায় আলোর ?
ডুব দিয়ে কালো যমুনায়,
সব যায়[illegible] থক থক,
দুটো বুক গহন কালোর।

এলোচুলে পেছনটা কালো,
কিছু কিছু মুখ দেখা যায়,
শুধু চায় আরো অন্ধকার—
শুধু বলে আরো লাগে ভালো,
আরো কালো ঘন তমসায়,
ঢেকে দাও সব তুলনায়।

অন্ধকার কোথা পাবো অত ?
দেখি খুঁজে একটু দাঁড়াও,
দেখি খুঁজে মনের তলায়—
ফেলে তো দিয়েছি কত কত,
দেখি ঐ দেশলাই দাও,
আলো জেলে যদি দেখা যায়।

অন্ধকার খুঁজি আলো জেলে,
খাট আর মনের তলায়,
আলমারি তার পেছনেতে—
আলো দেখে কালো পাখা মেলে,
সব কোথা দৌড়ে পালায়,
চমকানো পাক খেতে খেতে।

তার পর সেও গেছে চলে,
আঁধারের পিয়াসী সে মেয়ে
কালো রাত হয়ে গেছে শেষ—
সকালের আলো জলজলে,
সপ্রতিভ চোখে আছে চেয়ে—
ঘুমে প্রিয়া আলুথালু বেশ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

প্রভাত অরুণাদের বাড়ীর ছেলের মতই হয়ে গেছে। অরুণার বাবা রমেশ দত্ত পাটের দালালী করে অনেক টাকা করেছেন। তার উপর শেয়ার বাজারেও যাতায়াত ছিল। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন থাকায় বাড়ী-গাড়ী সবই করেছেন। প্রভাতকে তিনি আন্তরিক স্নেহ করেন। অরুণার মা মোটা-সোটা ভাল মানুষ, সারাক্ষণ ঠাকুর-দেবতা নিয়েই থাকেন। প্রভাত তারও মন জয় করেছে, সময় সময় ধর্মবিষয়ে আলোচনা করে, তিনি কত সময় অরুণাকে বলেন, দেখে শেখ প্রভাতকে। এম-এ পাশ, বই লিখেছে কত, কিন্তু কি ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস।

অরুণা ঠাট্টা করে বলে, ও-সব লোক দেখানো।

—তোরা লোক দেখিয়েই ভক্তি কর না।

অরুণা প্রভাতকে বলে, মা'র তো আপনার সব কিছু ভাল লাগে।

—তাই তো দেখছি।

—হবে না কেন? মা যা বলেন আপনি তাইতেই সায় দেন।

প্রভাত হাসে, আমি যে সকলের সঙ্গে ভালো করে মিশতে চাই, একলা থাকি—

অরুণা নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনার বাড়ীর সবাই—

—এলাহাবাদে।

—আপনি যান না?

—কখনো-সখনো। ওইখানেই আমাদের বাড়ী।

অরুণা পাকামী করে, আপনি এখনও বিয়ে করেন নি কেন?

প্রভাত হেসে উত্তর দেয়, কেউ করেনি বলে।

—মা কিছু বলেন না?

—দাদাদের বিয়ে দিয়ে এত ঝামেলায় আছেন যে আমার কথা আর ভাবেন না।

অরুণা চটে যায়, আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না, সব বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।

প্রভাত হেসে ফেলে, তুমি ঠিক ধরেছ, আশ্চর্য্য বুদ্ধি খুলছে দিন দিন। আমি একটা গল্পের প্লট বলছিলাম—অরুণার মুখ লাল হয়ে ওঠে, যান, আর আপনার সঙ্গে কথা বলব না।

—আহা রাগ করছো কেন, দাঁড়াও এবার সত্যি কথা বলছি।

—না আমি শুনব না, কিছুতেই না। বলে কানে আঙুল দিয়ে অরুণা বসে থাকে।

প্রভাত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। টেবিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে লিখতে বসে। অরুণার জানতে ইচ্ছে করে প্রভাত কি লিখছে কিন্তু মান খুইয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে না। প্রভাতই তার কাছে কাগজটা এগিয়ে দেয়। অরুণা দেখে বড় বড় করে লেখা রয়েছে, "কে বকেছে, কে মেরেছে, কে দিয়েছে গাল?" একবার বলতো খুকী, তাকে আমি খুব বকে দেব।

অরুণা হেসে গড়িয়ে পড়ে। বাবা আপনার সঙ্গে কেউ পারবে না; ভাগ্যি বিয়ে হয়নি, বউকে জ্বালিয়ে মারতেন তাহলে।

এই ধরণের হাল্কা হাসি ঠাট্টার মধ্যে অরুণা জিজ্ঞেস করে বসে, আচ্ছা বলুন তো, আমি কি রকম মেয়ে?

—খু—উ—ব ভাল।

—সত্যি বলুন না?

—বলছি তো, ভীষণ—ভীষণ ভালো।

অরুণা তবু প্যান প্যান করে, না, আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন।

—মোটেই না।

—কলেজের মেয়েরা কিন্তু আমায় বলে পাকা।

প্রভাত ফোড়ন কাটে, একটু বেশী।

—তবে যে বলছিলেন আমি ভালো মেয়ে?

—বাঃ, পাকা কি খারাপ? পাকা আম বুঝি ভালো হয় না?

অরুণা আবার হেসে ফেলে, আপনি বিচ্ছিরি লোক। রাগাও যায় না, যা বোকা-বোকা কথা বলেন।

অরুণার বাবা এসে ঘরে ঢোকেন, কি রে খুকী, আবার কি আবদার হচ্ছে?

প্রভাত উঠে দাঁড়ায়, না, জিজ্ঞেস করছিল, আম পাকা খেতে ভাল, না কাঁচা—

রমেশ বাবু হা-হা করে হাসেন, এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি? পাকা আম সব সময় ভালো। আমাদের ছোটবেলায় কি আমই না খেয়েছি, সে সব কথা মনে হলে এখনও জিবে জল আসে।

অরুণা হাসি চাপতে চাপতে উঠে যায়। প্রভাত রমেশ বাবুর সঙ্গে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আম-তত্ত্ব আলোচনা করতে থাকে। হঠাৎ রমেশ বাবু জিজ্ঞেস করেন, বই লিখে তোমার ভালো রোজগার হয়?

—বিশেষ আর কি, চলে যায়।

—তবে এম, এ পাশ করে শুধু ঐ নিয়ে পড়ে আছো কেন? চাকরী করলে তো পারো?

—দিচ্ছে কে বলুন?

—দিলে করবে?

—যদি কেরাণীগিরি না হয়।

রমেশ বাবু খুসী হয়ে বললেন, কেরাণী হতে তোমায় বলবো কেন? কাল আমার অফিসে এস, ক্যানিং ষ্ট্রীটে।

—আপনার অফিসে, কখন?

—সকালের দিকেই এস। আমারই জানাশোনা কাজের

একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছে। অন্ততঃ আড়াই শ' থেকে তিন শ' টাকা মাইনে আরম্ভ। আমি বলে দিলে তোমার হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতায় প্রভাতের চোখ সজল হয়ে ওঠে, তাহলে সত্যিই বড় উপকার হয়। একটা বাঁধাধরা রোজগার থাকলে ভাবনা থাকে না।

—সে তো বটেই। তাছাড়া তুমি লেখক, নাম হলে বই থেকেও টাকা পাবে।

—বেশী টাকা আমি চাই না, তবে মা'র শেষ জীবনটা যদি সুখে রাখতে পারি।

রমেশ বাবু প্রভাতের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবেন।

অরুণার বাবার সুপারিশে তিন শো টাকা মাইনের চাকরী পেয়ে অবধি প্রভাতের জীবন অনেকটা বদলে গেল। আর সে সময়-অসময় আশুদা'র দোকানে গিয়ে আড্ডা মারতে পারে না? আশুদা' বলেন, খুব ভালো কথা প্রভাত, তোমাদের উন্নতি দেখলে বড় আনন্দ লাগে। দেখো, কেষ্টর জন্যেও যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পার।

—আশুদা' যে কেষ্টর জন্যে সব সময় চিন্তা করেন তা প্রভাতের অজানা ছিল না। বলে, কেষ্টটা যে আমার চেয়েও পাগল আশুদা', ম্যাট্রিকটা পর্য্যন্ত পাশ করলো না।

—তা আর জানিনে! এত বুদ্ধি কিন্তু বড় গোঁয়ার-গোবিন্দ। আবার তেমনি একরোখা। ওর মনটা বোঝা শক্ত। আমার কাছে আসা তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, দেখো তুমি আবার ফাঁকি দিও না।

প্রভাত হাসে, কি যে বলেন, সকালের চাটি এখানে না খেলে আমার লেখাই বা'র হয় না।

চাকরী নিয়ে আর এক মুস্কিল হল প্রভাতের। ঠিক মত সে বেলারাণীর কাছে হাজিরা দিতে পারে না। আজ রবিবার, তাই সাত দিন পরে বেলারাণীর বাড়ী এলো। বেলারাণীও ছাড়ার পাত্রী নয়। জিজ্ঞেস করে, কি, পথ ভুলে নাকি?

—না কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—কি এমন কাজ শুনি, কুমারী ছাত্রী পড়ানো?

—কি যে বলেন।

বেলারাণীর জিদ্ চেপে যায়, সত্যি বলুন না মেয়েদের কি পড়ান?

—কেন, বই-এ যা লেখা থাকে।

—কি জানি, আমার মনে হয় আপনার বয়সী মাষ্টারের সঙ্গে ছাত্রীরা প্রেম করে, পড়ে না এক পাতাও।

—এ আপনি কি বলছেন?

—সত্যি করে বলুন তো অরুণাকে আপনি ভালবাসেন কি না।

প্রভাত দৃঢ় অথচ সংযত স্বরে উত্তর দেয়, বাসি।

—তবে? এতক্ষণ যে অস্বীকার করছিলেন?

—এ কথা তো জিজ্ঞেস করেন নি।

বেলারাণীর মাথায় যেন আজ ভূত চেপেছে, অরুণার বয়স কত?

—আঠারো-উনিশ।

—কি আছে তার?

প্রভাত সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে, আজ বোধ হয় আপনার মন ঠিক নেই। আমি বরং অন্য দিন আসব।

বেলারাণী চেঁচিয়ে ওঠে, না, আমার সব কথার জবাব দিয়ে যান।

—বলুন।

—অরুণার চেহারা ভালো?

—মাঝামাঝি।

—আপনাকে ভালবাসে?

—জানি না।

—আপনি মনে করেন অরুণার বাবা আপনার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন?

—না।

—তাহলে অরুণার পেছনে দৌড়চ্ছেন কেন?

—দৌড়ইনি তো।

—দিন নেই রাত নেই ওর কাছেই তো পড়ে থাকেন।

প্রভাত বিস্মিত হয়, এ কথা কে বললে?

—আমি জানি।

—ওটা সত্যি নয়। আমি একটা চাকরী পেয়েছি—

—চাকরী? কোথায়?

—বড় অফিসে। ভালো মাইনে দেয়, অরুণার বাবা রমেশ বাবুই করে দিয়েছেন।

—ও, বেলারাণী গম্ভীর হয়ে যায়। তাহলে লেখা-টেখা ছেড়ে দেবেন?

—কেন, চাকরী করলে কি লেখা যায় না?

—আমাদের গল্পের যেগুলো বদলাতে বলেছিলাম—

বদলে এনেছি, দেখবেন? প্রভাত পকেট থেকে খাতা বার করে দেয়।

—এখন সময় হবে না, আমি দেখে রাখব পরে।

—আজ তাহলে আসি। প্রভাত উঠে দাঁড়ায়।

—বসুন না, খেয়ে যাবেন।

—আজ আমার একটু তাড়া আছে।

বেলারাণী বিরক্তি চেপে বলে, কবে আসবেন?

—আজ হবে না, বলেন তো কাল আসতে পারি।

—বেশ তাই আসবেন। বেলারাণী পেছন ফিরে দাঁড়ায়।

বেলারাণীর ব্যবহারে যদিও প্রভাত খুব বেশী রকম অবাক হয়েছিল কিন্তু এর কারণ সে বুঝতে পারে নি। সারা দিন বেলারাণীর কথাগুলোই মনে মনে মনস্তত্ত্বের কষ্টিপাথরে ঘষে বিচার করার চেষ্টা করেছে, তবু যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজে পায়নি। বিকেলবেলা প্রভাত অনন্ত কেবিনে যাবে বলে দরজায় তালা দিচ্ছিল, নিজের নাম শুনে ফিরে দেখে বিনোদ। বড় গাড়ীতে বসে আছে।

প্রভাত হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, কি সৌভাগ্য আপনি নিজে?

—বিনয় করবেন না, বিশেষ দরকার আছে চলুন।

প্রভাত গাড়ীতে উঠে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

—চলুন লেকে যাই।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে বিনোদ প্রশ্ন করে, এ ক'দিন আসেন নি কেন?

—কাজ ছিল।

—বেলা রোজ আপনার খোঁজ করে।

প্রভাত অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলে, কাল ঠিক যাব।

—তা নয়। বেলার মত মেয়ে যার হাসির দাম একশ' টাকা, সে আপনার খোঁজ করছে—

—আপনি আমার বিষয় কি বললেন ?

—আপনার ছাত্রীর কথা বললাম, বোধ হয় পড়াতে ব্যস্ত আছেন।

প্রভাত এতক্ষণে বুঝতে পারে, কেন আজ বেলারাণী বার বার অরুণার কথা বলে তাকে আঘাত করার চেষ্টা করেছে। এ ঈর্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু প্রভাতের খট্‌কা লাগে, অরুণাকে বেলারাণীর ঈর্ষার কি থাকতে পারে! বেলারাণী রূপবতী, স্বনামধন্যা এবং ঐশ্বর্য্যবতী, অরুণা তো তার কাছে অতি সাধারণ।

গাড়ী এসে লেকের ধারে থামে, যে দিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। প্রভাত নামতে যাচ্ছিল, বিনোদ তার দিকে সিগারেট এগিয়ে দেয়। প্রভাত কিছু না বলে সিগারেট নেয়। বিনোদ ষ্টিয়ারিং-এ ভর দেওয়া হাতের ওপর মাথা রেখে আরাম করে বসে। হঠাৎ বিনোদ জলের দিকে তাকিয়ে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, প্রভাত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

—এখানে বেলাকে নিয়ে কত দিন এসেছি।

প্রভাত জিজ্ঞেস করে, আজ-কাল আর আসেন না ?

—না। আমার সঙ্গে বেরুতে ওর ভাল লাগে না।

—কেন ?

বিনোদ ম্লান হাসে, আমাকে যে পুরোপুরি জেনে ফেলেছে, আর তো দাম নেই। প্রভাত চুপ করে থাকে।

—জীবনে সুখ নেই প্রভাত বাবু, বড় ফাঁকা লাগে। লোকে ভাবে আমার সব আছে, গাড়ী, বাড়ী, টাকা। কিন্তু তারা জানে না আমার কিছু নেই।

প্রভাত আস্তে আস্তে বলে, আপনি বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল—

—সে যাই বলুন। আমার মত জীবন অতি বড় শত্রুরও যেন না হয়।

—কিন্তু আমার কাছে কি দরকার বললেন না তো ?

বিনোদ ম্লান হেসে প্রভাতের দিকে তাকায়, দরকার কথা বলার।

—কথা ?

—হ্যাঁ। বিশ্বাস করুন প্রভাত বাবু, প্রাণ খুলে কথা বলারও আমার একটা লোক নেই।

বিনোদ কত কি বলে যায়। প্রভাতের সব চেয়ে বড় গুণ অন্যের কথা সে মন দিয়ে শুনতে পারে। নিজের কথা বলতে সকলেই চায়, কথা শোনার লোকই কম। তাই বোধ হয় প্রভাতের আদর অনেকের কাছে।

বাড়ী ফেরার সময় বিনোদ প্রশ্ন করে, আপনার লেখা কোন নাটক আছে ?

—কেন বলুন তো ?

—আমার বাড়ীতে পাড়ার একটা ক্লাব আছে। মাঝে মাঝে তারা থিয়েটার করে। নতুন নাটক খুঁজছে, আছে না কি !

প্রভাত উৎসাহিত হয়, নিশ্চয় দেবো, নাটকটা ধারাবাহিক ভাবে ছায়ামঞ্চে বেরিয়েছিল।

—ক'টি মেয়ে চরিত্র ?

—চারটি।

বিনোদ বলে, দু'টি মেয়ে আমাদের জানা আছে।

—এ্যামেচার।

—হ্যাঁ, এ্যামেচারই। তবে টাকা নেয়, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ যে রকম খাটনী।

সে রকম মেয়ে আমিও দিতে পারি। চিন্ময়ী, আমার এক বন্ধুর স্ত্রী। এ্যামেচারে বেশ ভাল অভিনয় করে। অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, তাই টাকা নেয়।

বিনোদ খুশী হয়ে বলে, তাহলে আজই নাটকটা দিয়ে দেবেন। যত শীঘ্র হয় আবার রিহার্সেল সুরু করতে হবে কি না ?

মানুষ যে পথে নিজের জীবনকে চালাবার চেষ্টা করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয়ে ওঠে না। কেষ্ট এতদিন ভেবেছিল গৌরীকে বুঝিয়ে সে নিজের মত করে গড়ে তুলবে, ক্রমে সে আশা সুদূরপরাহত বলে মনে হতে লাগল। গৌরীর মনে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কেষ্টর না থাকলেও স্বীকার করে নিতেও সে পারেনা, দিনের পর দিন দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

কেষ্ট বলে রোজগার আমাদের করতেই হবে, যদি সংসার পাততে চাও। টাকা না হলে চলবে কি করে ?

গৌরী সরোষে উত্তর দেয়, তাই বলে মিথ্যে কথা বলে—

—সত্যি-মিথ্যে তুমি কি বোঝ, সারা দুনিয়াটাই মিথ্যে। আজকের দিনে মাষ্টার মিথ্যে, ছাত্র মিথ্যে, কেরাণী মিথ্যে, ব্যবসাদার মিথ্যে। কে মিথ্যে নয় ?

গৌরীর চোখে জল এসে যায়, কেষ্টদা আপনার পায়ে পড়ি, আমার এতদিনের বিশ্বাস ভেঙ্গে দেবেন না। কেষ্ট বিরক্তির স্বরে বলে, একঘেয়ে কান্না থামাও। চোখে ঠুলি বেঁধে অন্ধ হয়ে থাকতে চাও থাকো, কিন্তু চোখ খুললেই দেখতে হবে মানুষের সত্যিকারের চেহারা। কি বীভৎস, কি কুৎসিত! ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের জন্যে কোন জায়গা নেই এখানে, যা তোমার ন্যায্য পাওনা, তা নিতে গেলেও ঘুষ দিতে হয়—

গৌরী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, কোন কথাই তার কানে যায় না। ধরাগলায় বলে, হোক না সবাই খারাপ, আমরা কেন হব ?

কেষ্ট জ্বলে ওঠে, চোরের রাজত্বে বাস করতে হলে নিজে চোর হতে হবে—

—যদি না হই—

—মরবে। সবাই তোমার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে।

—আর আমি পারছি না।

কেষ্ট ধমকে ওঠে, পারতে হবে।

গৌরী কাপড়ে চোখ মুছে বলে, বলুন কি করবো ?

কেষ্ট গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে নেয়। তারপর সহজ গলায় বলে, মুখ ধুয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে এস। গৌরী উঠে পড়ে। যন্ত্রচালিতের মত, ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। চিনুকে বাইরে ডেকে বলে, আমার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দে।

চিনু গৌরীর ফোলা ফোলা চোখ দেখে আশ্চর্য্য হয়, কি হয়েছে গৌরী ?

স্নানের সময়
মনে
রাখবেন
একশ' বছরের
ঐতিহ্য,
বিশুদ্ধতা এবং
অপরিবর্ত্তিত
গুণগুলির জন্য
আজও সমাদৃত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

কান্নায় গৌরীর গলা ধরে আসে, এখন বলতে পারছি না, সিঁদুর পরিয়ে দে।

ঘরে পিনাকী না থাকলে চিনু জোর করে গৌরীকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে সব কথা শুনে নিত। উপায় না থাকায় তাড়াতাড়ি সিঁদুর এনে গৌরীর মাথায় দিয়ে দেয়, এ নকল সিঁদুর যেন সত্যি হয়।

বলতে গিয়ে চিনুরও চোখ ছলছল করে ওঠে।

কেষ্ট গৌরীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। ফিরে আসতেই বলে, বাঃ, এই তো বেশ বৌ-বৌ দেখাচ্ছে, চুলটা খুলে ফেল। যা শাড়ী পরে আছো, তাইতেই চলবে।

আধ ঘণ্টার ভেতরে তারা তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লো বালিগঞ্জের উদ্দেশে। কেষ্ট আগেই সব কথা গৌরীকে বলেছিল, কেমন করে ছেলেটিকে চাপা দিয়ে গাড়ী চলে যায়। কি ভাবে সে দু'বার টাকা নিয়ে এসেছে এবং এবার গৌরীকে নিয়ে সে শেষবারের মত টাকা সংগ্রহ করতে যাচ্ছে।

ট্রাম থেকে নেমে তারা রিক্সা করে বাড়ীর সামনে এসে হাজির হ'ল। ভয়ে, ঘেন্নায় বার বার গৌরীর চোখ জলে ভরে যায়। কেষ্টর সেদিকে নজর নেই, প্ল্যানটা ঠিক করে নিচ্ছে।

কর্তা-গিন্নী বেড়াতে গিয়েছিলেন, ফিরেই ঘরে এদের দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কোন কথার আগেই গৌরী কেঁদে ফেলে।

ভদ্রমহিলা কেষ্টকে বলেন, আপনার স্ত্রী বুঝি—এরই ভাই?

কেষ্ট নীরবে সম্মতি জানায়।

ছেলেটি যে মারা গেছে, তা বুঝতে এদের এতটুকু কষ্ট হয় না। বিশেষ করে গৌরীর চেহারা দেখে, রুক্ষ চুল, চোখ কান্নায় ভরা। কর্তা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কবে?

কেষ্ট শান্ত স্বরে উত্তর দেয়, চার দিন আগে।

—ডাক্তাররা কিছু করতে পারলে না?

—না।

—আহা! আপনার স্ত্রীকে দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে। কি করে ওঁকে বোঝাই—

—ও যদি বা বুঝবে, ওর মা। মানে আমার শাশুড়ী।

তরুণী গিন্নী-মা বলেন, মোটর চালানো আমি ছেড়ে দিয়েছি, এত বড় অন্যায় আমি করেছি—

গৌরী কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ বলে ওঠে, আপনার কি দোষ, সবই নিয়তি।

গৌরীকে কথা বলতে দেখে ভদ্রমহিলা সত্যি খুশী হন। আপনাদের যা ক্ষতি করেছি, তা তো মেটাতে পারবো না। তবে আমাদের ক্ষমতায় যা কুলোয়, সবই করবো।

কান্নাকাটি চললো অনেকক্ষণ। কর্তা বিচক্ষণ লোক। এক সময় কেষ্টর হাতে পাঁচশো টাকার নোটের খামটা হাতে দিয়ে দেন। কেষ্ট নিরাসক্ত ভাবে নোটগুলি গৌরীর আঁচলে বেঁধে দেয়।

তারা যখন বাইরে এসে রিক্সায় পাশাপাশি বসে, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। গৌরী কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে গেছে। কেষ্ট চুপ করেই বসে থাকে। কিছুদূর আসার পর যে মিষ্টির দোকানের সামনে ছেলেটি চাপা পড়েছিল, সেখানে কেষ্ট রিক্সা থামাতে বলে। মিষ্টিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে হয় না। নিজে থেকেই বলে, নমস্কার বাবু। ছোক্‌রা ভাল আছে, ক'দিন থেকে কাজে লেগেছে। ইঙ্গিত দেখিয়ে দেয়।

মোটা সোটা ছেলেটি সন্দেশ বিক্রী করতে ব্যস্ত।

গৌরীর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে কেষ্ট মিষ্টিওয়ালার হাতে দেয়। মিষ্টিওয়ালা নিতে চায় না—না-না, আর কেন দেবেন।

—ছেলেটিকে একটা জামা কিনে দেবেন।

—আপনার দয়ার শরীর বাবু।

আর কথা না বলে কেষ্ট রিক্সায় উঠে বসে। গৌরী জিজ্ঞেস করে, ছেলেটির কি হয়েছিল?

—ও-ই গাড়ী চাপা পড়েছিল।

রিক্সা তখন চলতে সুরু করেছে, গৌরী মুখ বাড়িয়ে ছেলেটাকে দেখে কপালে হাত ঠেকায়।

সেই দিন থেকে গৌরী অনেকখানি বদলে গেল। আর আগের মত ছেলেমানুষিতে তার মন ভরে উঠে না। সব কিছুই করাতে হয় বলে কয়ে। কেষ্টর কোন কথাই সে অমান্য করে না, কিন্তু তাতে প্রাণ নেই। সংসার-অভিজ্ঞ কেষ্ট বোঝে আস্তে আস্তে সয়ে যাবে, এ নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। তাই বেশীর ভাগ সময় বাইরে বাইরে ঘোরে।

আজ কাল গৌরীর নিজেকে নিঃস্ব মনে হয়। এতদিন মানুষের ওপর যে তার খুব বেশী আস্থা ছিল তা নয়, কিন্তু কেষ্টর উপর বিশ্বাস ছিল খুব বেশী। সেই বিশ্বাসের শেকড় কেষ্ট নিজে হাতে উপড়ে ফেলে দিলে। আর সে কিসের ভরসায় বেঁচে থাকবে। তার জীবনের দাঁড়ি পাল্লার একদিকে ছিল আত্মীয়স্বজন সকলে আর একদিকে ছিল একা কেষ্টদা'। সেই কেষ্টদাকেই সে বেছে নিয়েছিল আর কিছুর জন্যে নয়, কেষ্টদা' প্রকৃত মানুষ বলে।

কেষ্টর নিজের কথাগুলোই ঘুরে ফিরে গৌরীর মনে পড়ে। চোখ খুলে দেখ, দেখবে মানুষের সত্যি চেহারা, কি বীভৎস, কি কুৎসিত। আজ গৌরীর কাছে কেষ্টও যে তাই—সে-ও যে বীভৎস সে-ও যে কুৎসিত। সেই প্রথম দিন যে কেষ্টদা' শাড়ী কিনে দিয়েছিল, দোকানে খাইয়েছিল সে কথা মনে করে গৌরী কত দিন মিষ্টি স্বপ্ন দেখেছে। আজ যখনই মনে হয় সে সবই লোক-ঠকানো টাকায় তার মন বিষিয়ে ওঠে। তার ভাইও পুড়েছে ঐ টাকায়। গৌরীর চোখে জল ভরে আসে।

আজ বার বার তার রাজেনের কথা মনে পড়ে। রাজেন তাকে সত্যিই ভালোবেসেছিল, গাঁ থেকে কলকাতা আসা অবধি সব সময় সে কাছে কাছে থেকেছে। ভাইয়ের অসুখের সময় টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি বলে গৌরী তার প্রতি বিমুখ হয়েছিল। টাকার জন্যেই কেষ্টর কাছে আসতে হয়েছিল। এখন বোঝে রাজেন টাকা রোজগার করতে পারেনি ভালমানুষ বলে। রাজেনকে তার এতদিন মনেই পড়েনি। একথা ভেবে নিজেকে সে ধিক্কার দেয়। গৌরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এখন আর ফেরবার পথ নেই।

এই নতুন জীবনের আস্বাদ না পেলেই বোধ হয় ভালো হত, গৌরী ভাবে। বস্তি থেকে চলে এসে এখানে সংসার পাতার পর থেকেই তার জীবনের তেষ্টা বেড়ে গেছে। এত সুখ এত আনন্দের কোন খবরই সে জানত না। দিনের পর দিন নতুন নতুন স্বপ্নের জাল বুনেছে অথচ একদিনে সব ছিঁড়ে গেল। চিনুর সঙ্গে বসে বসে যুক্তি করেছে বিয়ের পর কেমন করে ঘর-কন্না করবে। বাড়ী ভাগ

হয়ে গেলে কেষ্টর নিজের জায়গায় সে গৃহিণী হয়ে ঢুকবে। তারপর ছেলে-পুলে, ভাবতেই গৌরীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

চিনু বলত, দেখিস, তখন আমায় চিনতে পারবি না।

গৌরী কপট রাগের সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, কি যে বলিস, আমি তো একটা ভিকিরী—

—হবি তো রাজরাণী—

এ সবই মিথ্যে হয়ে গেল। গৌরী মনে মনে ঠিক করে একথা সে কাউকে বলতে পারবে না, চিনুকেও নয়। এতখানি হার সে কি করে স্বীকার করবে?

চিনু এসে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বল।

—না, কিছু না।

—সত্যি কথা বল না—

গৌরী বিরক্ত হয়, বলছি তো কিছু হয় নি।

—তবে তখন কাঁদছিলি কেন?

—শরীর খারাপ।

চিনু কিছুতেই গৌরীর পেট থেকে কথা বার করতে না পেরে ধরে নেয় কেষ্টর সঙ্গে কোন রকম ঝগড়া হয়েছে।

ক'লকাতার লোক পাগল হয়ে উঠেছে। আজ বাস বন্ধ, কাল ট্রাম বন্ধ, পরদিন সাধারণ ধর্ম্মঘট। তারপর সরকারের একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি, আইন অমান্য আন্দোলন, টিয়ার গ্যাস, লাঠি চার্জ, জেল। পরদিন কাগজে আহতের সংখ্যা।

এ ধরণের খবরে কোন বৈচিত্র্য নেই, লেগেই আছে। আজ কাল আর কেউ কারণ জিজ্ঞেস করে না। ছাত্র, শিক্ষক, কর্ম্মী, শ্রমিক কিম্বা ব্যবসাদার, কারুর না কারুর অভিযোগের সুযোগ নিয়ে শহরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি।

দেবেনদা'র বাড়ীতে আজ সবাই জমা হয়েছে। দেবেনদা ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়। তাঁর চোখ মুখ উত্তেজিত, জোর গলায় বলে চলেন, এ সাধারণ ধর্ম্মঘট সফল করা চাইই। যাতে একটাও দোকান না খোলে, ট্রাম বাস না চলে। দেশের লোক বুভুক্ষু অন্যায় চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। ন্যায়কে আমরা ফিরিয়ে আনব। যে মহৎ আদর্শের জন্য হাজার হাজার ভারতবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল সেই আদর্শকে আবার মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে—

দেবেনদা' আরও হয়ত বলতেন, কালী থামিয়ে দেয়, অত কথার কি আছে দেবেন বাবু, আপনি হুকুম করুন আমরা তামিল করব।

—সেই কথাই তো বলছি।

—বেশী কথায় কাজ হয় না।

কালীর দলবল চেঁচিয়ে ওঠে, আমরা কাজ চাই।

দেবেনদা' আশ্বাস দেন, কাজ তো তোমরাই করবে। তোমরা নবীন তোমরাই তো আমাদের ভরসা—

কালী জবাব দেয়, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি সব ঠিক করে রেখেছি। কাল দেখবেন কলকাতা সহর ঘুমুচ্ছে। যে পাড়ায় যে দল আছে সকলের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে সবাই মহড়া রাখবে।

গরম গরম আলাপ আলোচনার পর কালী দলবল নিয়ে চলে গেল। চুনীলাল কিন্তু তখনও বসে ছিল। একটু বাদে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, দেবেনদা', এটা কি ঠিক হ'ল?

—কি?

—এই কালীর হাতে সব ছেড়ে দেওয়া—

—ও যে কথা শুনতে চায় না।

চুনীলাল বিরক্ত হয়, তাহলে ওকে ত্যাগ করুন।

দেবেনদা' হাসেন, ত্যাগ করা সোজা, কিন্তু কালীর মত কাজের লোক ক'টা পাবে?

—তা হতে পারে, কিন্তু আপনার আদর্শের সঙ্গে যার মিল নেই তাকে নিয়ে কি করে কাজ করবেন।

দেবেনদা' চুপ করে থাকেন। চুনীলাল দেবেনদা'কে সত্যিই শ্রদ্ধা করে তাঁকে অযথা আঘাত দিতে সে মোটেই চায় না। কিন্তু কালীর ব্যবহারে তার খটকা লাগে, ভাবে এর মধ্যে নিশ্চয় কোথাও গলদ আছে।

—তুমি অত ভেব না চুনীলাল। কালী আমার আদর্শ ঠিক বুঝতে পারবে। আজ না হয় দু'দিন পরে। তুমি দেখো, সে নিশ্চয় এমন কিছু করবে না যাতে আমার আদর্শ নীচু হয়, আমাদের মাথা হেঁট হয়।

পরদিন সাধারণ ধর্ম্মঘট হয়েছে পুরোমাত্রায়। এতখানি সফল হবে কালী নিজেও ভাবেনি। সকালের দিকে ট্রাম-বাস বেরিয়েছিল বটে, তবে দু'-তিনটে পোড়াতেই বন্ধ হয়ে গেছে। দু'-একটা দোকান লুঠ করতেই সব দুড়-দাড় বন্ধ করে দিয়েছে। দুপুরের দিকে সত্যিই কলকাতা সহর ঘুমিয়ে পড়ে।

চুনালালের সঙ্গে শ্যামলের দেখা হয়েছিল, বড় রাস্তার ওপর সে তখন অন্যদের সঙ্গে ট্রাম পোড়াতে ব্যস্ত। চুনালাল জিজ্ঞেস করে,—এ কি করছো শ্যামল?

—দেখতেই তো পাচ্ছো—

—দেখছি তো ঠিক, পাগলামী করছ, এ ত আমাদের আদর্শ নয়?

—আদর্শ-ফাদর্শ জানি না কালী দা' যা বলেছে তাই করছি।

চুনালালের চোখের সামনে ট্রামটা দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে। সেই আগুনের মধ্যে যেন দেখতে পেল চুনীলাল দেবেন-দা'র আদর্শ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

শ্যামলরা হি-হি করে হাসে, হাততালি দিয়ে লাফায়। পুলিশের গাড়ী দেখলে ভোঁ-ভা পালিয়ে যায়।

শ্যামলের সঙ্গে আর একবার কথা হয়েছিল চুনীলালের। দুপুরের পর। শ্যামলই জিজ্ঞেস করে, কি চুনী, তুমি কিছু করছো না?

—কি করবো?

—শুধু বক্তৃতা, কি বল? ওতে তো আর কোন ভয় নেই।

চুনীলাল ম্লান হাসে, শ্যামল, ট্রামগুলো যে পোড়ালে জানো ওগুলো দেশেরই জিনিষ, ক্ষতিই হ'ল, লাভ হ'ল না—

—লাভ নেই কি বলছো, প্রচুর লাভ হয়েছে।

—কি রকম?

শ্যামল গলা খাটো করে বলে, আজ সকালে একটা মনোহারীর দোকান লুঠ করেছি, কিছুতেই দোকান বন্ধ করছিল না। ব্যস

দিয়েছি ব্যাটার দফা সেরে। আমি নিজেই কত টাকার মাল সরিয়েছি জানো ?

—কত ?

—টাকা পঞ্চাশ।

—তাই নাকি ?

—ও তো কিছু না। কালী-দা' মাইরি প্রাতঃস্মরণীয় লোক, একটা স্যাকরার দোকান।

—বল কি, সত্যি ?

শ্যামল খেঁকিয়ে ওঠে, আমি কি মিথ্যে বলছি ? স্যাকরার দোকানটা অবশ্যি বন্ধই ছিল, কালী দা' নিজেই গোলমাল বাধিয়ে দরজা ভেঙ্গে লুঠ করেছে। সব রকম যন্ত্র ওর সঙ্গে আছে কি না—

চুনীলাল বিস্মিত হয়। এত কথা সে জানতো না। শ্যামল আবার বলে, তুমি একটা মেয়েছেলে, কিছু করতে পারলে না—

—কি আর পারলাম।

পকেট থেকে এক প্যাকেট দামী সিগারেট বার করে শ্যামল চুনীলালের হাতে দেয়, এই নাও একটা বিড়ি-সিগারেটের দোকানও লুঠ করেছি। মাসখানেক সিগারেট না কিনে চলে যাবে। শ্যামল আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে।

সারাদিন চুনীলাল এতটুকু শান্তি পায় না। তিন বার সে দেবেনদা'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ফিরে এসেছে, উনি বাসায় ছিলেন না। সব কথা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে চুনীলাল ছটফট করেছে। শেষে সন্ধ্যের পর দেখা হ'ল। দেবেনদা' উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করছেন, কালী নিজের বাহাদুরীর কথা বলে যাচ্ছে, যা বলেছিলাম হ'ল কি না। একটা ট্রাম বাস চলে নি, স্কুল কলেজ, অফিস, দোকানপত্র মায় বাজার পর্য্যন্ত—দেবেনদা' বলে ওঠেন, বাহাদুর কালী। আমি দেখতে পাচ্ছি দেশে জাগরণ আসছে। কত সহজে লোকে এই সব আন্দোলনে আজ সাড়া দিচ্ছে—

চুনীলাল চেঁচিয়ে বাধা দেয়, দেশের লোক তো সাড়া দেয় নি—

দেবেনদা' বিস্মিত হন, কি বলছো চুনীলাল, আজকের ধর্ম্মঘট সার্থক হয়নি ?

—না।

—কেন ?

—দোকান বন্ধ হয়েছে লুঠ করেছেন বলে। লোকে স্কুল কলেজ যায়নি মার খাবার ভয়ে। ট্রাম-বাস চলেনি, আপনারা পুড়িয়েছেন বলে।

উত্তেজনায় চুনীলালের গলা কাঁপছিল। চেঁচাতে গিয়ে চোখে জল এসে যায়, এই আপনার আদর্শ দেবেনদা', গুণ্ডামী—

চুনীলাল, দেবেনদা' ধমকে ওঠেন। চুনীলাল চোখ নামিয়ে নেয়।

দেবেনদা' বলেন, সব কাজেরই ভাল-মন্দ দুটো দিক আছে, শুধু মন্দটা দেখলেই তো হবে না।

—এর মধ্যে কি ভালো আছে আমি তো বুঝতে পারছি না। দোকান লুঠ করে, নিরীহ জনসাধারণকে মারের ভয় দেখিয়ে যদি দেশের উন্নতি করবেন ভেবে থাকেন, তা ভুল, ভয়ঙ্কর ভুল।

—তোমার কাছে আমায় রাজনীতি শিখতে হবে ?

চুনীলাল জোর গলায় বলে, মোটেই না। আমি যা বলছি তা আপনারই কাছে শেখা। সেই দেবেনদা'র কাছে শেখা যে দেবেনদা' দেশ ভালবাসতো, তার কাছে। যে আজ রাজনীতির নামে স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করছে।

দেবেনদা'র কান লাল হয়ে ওঠে, কি বাজে বকছ—

—আপনি আমায় ভালবাসতেন আমি স্পষ্ট কথা বলি বলে—

কালি ফোড়ন কাটে, কিন্তু তখন বাজে বকতে না—

চুনীলাল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, দেবেনদা' বিশ্বাস করুন আপনি গুণ্ডাদের হাতে পড়েছেন, তারা শিখণ্ডীর মত আপনাকে—

কথা শেষ হতে পারলো না, কালী বিদ্যুদ্বেগে চুনীলালের সামনে এসে দাঁড়ায়, কে গুণ্ডা ?

চুনীলাল আরও চেঁচায়, কে গুণ্ডা বুঝতে পারছো না ?

সঙ্গে সঙ্গে কালী সজোরে চড় মারে চুনীলালের গালে, বেশী ফড় ফড় করলে জানে মেরে দেব। ভাগ—

কালীর রক্তবর্ণ চোখ দেখে কেউ আর চুনীলালকে সাহায্য করতে ভরসা পায় না। চুনীলাল মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। একবার দেবেনদা'র দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। লজ্জায়, অপমানে সমস্ত শরীর তার জ্বলছে। বিশেষ করে কষ্ট পায় এই ভেবে যে দেবেনদা', কি শ্যামল কেউ তাকে সাহায্য করতেও এলো না, মুখেও একটা, সহানুভূতির কথা পর্য্যন্ত বললে না !

চুনীলাল সেই ধরণের ছেলে যারা অন্যায়কে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। কালীর আড্ডা থেকে বেরিয়ে বাড়ী না ফিরে সোজা গেল মদনের কাছে। মদন চুনীলালের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার চুনী, এত গম্ভীর কেন ?

চুনীলালের মুখ-চোখ তখনও লাল হয়ে আছে। ধীর-স্বরে বলে, শ্যামলকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

—কোথা থেকে ?

—গুণ্ডার আড্ডা থেকে।

মদন চমকে ওঠে, সে কি ?

চুনীলাল একে একে দেবেনদা', কালী, সকলের কথা বলে। মদন বিস্মিত হয়, সে কি, সেই দেবেনদা'—

—হ্যাঁ সেই দেবেনদা'। যাঁকে আমি এত ভালবাসতাম, এত শ্রদ্ধা করতাম। যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, তোদের কাছে যাঁর কথা এত বলতাম, সেই দেবেনদা'—

—গুণ্ডা ?

—তা ছাড়া আর কি। কতকগুলো অশিক্ষিত লোক, সমাজের যারা কোন উপকার করতে পারবে না, তারাই ওকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে—

—শ্যামলও তাদের দলে—

—তাই ত দেখছি। কালী যখন আমায় মারলে ও একবার এগিয়েও এল না—

মদন একটু ভেবে নিয়ে বলে, এখন কি করা যায় ?

শ্যামলকে বোঝাতে হবে। তাকে ফিরিয়ে আনা আমাদের কর্ত্তব্য। বিশেষ করে আমার, কারণ আমিই তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—বেশ, আমি শ্যামলকে নিয়ে কাল তোর বাড়ী যাব।

পরদিন কথামত মদন শ্যামলকে নিয়ে গেল চুনীলালের বাড়ী। চুনীলাল তাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলে, শ্যামল, কেন তুমি কাল আমার হয়ে কথা বললে না?

শ্যামল উত্তর দে, আমি কি বলব, কালীদা', দেবেনদা'র সঙ্গে তুমি ঝগড়া করছ—

—ঝগড়া করিনি, ঠিক কথা বলেছি।

—ঠিক-বেঠিক আমি অত বুঝি না, ওরকম ভাবে কথা বলা তোমার উচিত হয়নি।

চুনীলাল রেগে যায়, তাই বলে ন্যায়-অন্যায় দেখবে না, কেউ ভুল করলে তাকে শোধরাবে না?

—কালীদা' কোন দিন কাজে ভুল করে না—

—দুত্তোর কালীদা'! দেবেনদা'র মত একটা অত বড় মানুষ।

শ্যামল তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, দেবেনদা'কে কি এত বড় ভাবো আমি বুঝি না। ও-তো তোমার মত একটা মেয়েছেলে, শুধু লম্বা-চওড়া কথা, কাজের বেলা লবডঙ্কা—

—তোমার মতে কি কাজ মানে লুঠ করা, গুণ্ডামী করা?

—সে তুমি যাই বল, কিছু করতে হবে তো? শুধু লেকচার মেরে কি হবে? দেবেনদা' এক জন্ম আগে কি করেছেন সেই গল্প করতেই ব্যস্ত, জেল খেটেছেন, ধ্যান করেছেন, ত্যাগ করেছেন, যত সব নিকুচি করেছে।

চুনীলালের আর ধৈর্য্য থাকে না, তবে তোমার গুরু কে, কালী গুণ্ডা?

—খবদ্দার কালীদা'র নামে যা-তা বলবে না।

শ্যামল মদনকে বকে, কেন আমাকে এখানে ডেকে আনলি?

চুনীলাল উত্তর দেয়, আমি ডাকতে বলেছিলাম।

—কেন?

—তোমাকে দলছাড়া করবার জন্যে।

শ্যামল বিদ্রূপ করে হাসে।

তুমি যখন আমার কথা শুনলে না, ভেবো না আমি তোমায় ছেড়ে দেব।

শ্যামল আর কথা না বাড়িয়ে হন হন করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। মদন কিছু বুঝতে না পেরে চুনীলালের মুখের দিকে তাকায়।

চুনীলাল মৃদুস্বরে বলে, ছেলেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

অরুণার সিনেমায় যেতে ইচ্ছে হলেই বাবাকে এসে ধরে। রমেশ বাবু সব সময় বলেন, কি ভালো ছবি হচ্ছে বল। অরুণা হয়ত বলে, বাপি, নতুন হিন্দী বই এসেছে।

—খবদ্দার নয়, হিন্দী বই দেখলে আমার মাথা ধরে যায়।

যদি বলে, বাংলা বইএ যাবে? খুব ট্র্যাজিক বই এসেছে।

—পাগল না কি, পয়সা দিয়ে টিকিট করে কাঁদতে যাব?

—তাহলে যাবে কোথায়?

—ইংরিজী ছবি।

—তোমার তো ওই, মেট্রো নয় লাইট হাউস।

—নিশ্চয়, পয়সাই যদি দেবো, ঠাণ্ডা ঘরে বসব।

আজ কিন্তু অরুণা নিজে থেকেই মেট্রোয় টিকিট করার জন্যে বাবাকে ধরেছে। রমেশ বাবু কপট বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার কি, তুই বলছিস মেট্রোয় যাবি, ওখানে হিন্দী ছবি দেখাচ্ছে নাকি?

—না বাপি, সেক্সপীয়ারের একটা নাটক। ভীষণ ভাল—

—সর্ব্বনাশ! ওর তো কিছুই বোঝা যাবে না—

—না বাপি খুব ভাল। প্রভাতদা'র কাছে আমি সব গল্পটা শুনেছি।

—বেশ, তাহলে প্রভাতেরও একটা টিকিট কাটো ও আমাকে বুঝিয়ে দেবে।

প্রভাতকে নীচে বসিয়ে রেখে অরুণা রমেশ বাবুর অনুমতি নিতে ওপরে এসেছিল। মত পেয়ে, মার কাছ থেকে একটা দশ টাকার নোট চেয়ে নিয়ে প্রভাতকে দেয়।

—বাবা বললেন চারখানা টিকিট কেটে আনতে।

—চারখানা কেন?

—বাবা, মা দু'জনে, আমি আর আপনি।

—আমি গিয়ে কি করব?

—বাবাকে বুঝিয়ে দেবেন।

প্রভাত হাসে, উনি বোধ হয় ঠাট্টা করেছেন। তুমি তাই সত্যি ভেবে নিলে?

—ঠাট্টা-ফাট্টা জানি না, আপনাকে যেতেই হবে।

—কালকেই দেখেছি যে।

—দেখলেন কেন?

—বিনোদ ধরে নিয়ে গেল, ও যা খামখেয়ালী।

—বিনোদ, বেলারাণী। এদের ছাড়া আপনার মন ওঠে না।

প্রভাত থামিয়ে দেয়, ঝগড়া করতে হবে না, আমি যাব, হোল তো?

ইণ্টারভ্যালে অমলার নির্দেশ মত প্রভাত হল থেকে বেরিয়েছিল দুটো চকোলেট আনতে। দোতলার বারান্দায় অনেকেই আইসক্রীম বা পানীয় নিয়ে বসে আছে। বেশীর ভাগই বিদেশী। কোণের দিকে হাল্কা নীল রং-এর শাড়ী পরে যে মেয়েটি বসে ছিল তাকে দেখেই প্রভাত ইতস্ততঃ করে। কিন্তু বেলারাণী তখনি হাতছানি দিয়ে ডাকে, অগত্যা প্রভাতকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বেলারাণী যে পুরুষটির সঙ্গে বসে আইসক্রীম খাচ্ছিল, সে প্রভাতের পরিচিত না হলেও অচেনা নয়। অনেক ছবিতে অভিনয় করতে তাকে দেখেছে। বেলারাণী জিজ্ঞেস করে, কি খাবেন বলুন?

—কিছু না।

—তা কি হয়, অন্তত একটা কোকাকোলা। বেলারাণী সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাকে অর্ডার দেয়। ভদ্রলোকটিকে বলে, এর সঙ্গে আলাপ নেই বোধ হয়? লেখক প্রভাত গুহ আর ইনি অভিনেতা পার্থসারথি।

প্রভাত ও পার্থসারথি উভয়ে নমস্কার-বিনিময় করে। বেলারাণী জিজ্ঞেস করে, আজ আবার কার সঙ্গে এলেন?

প্রভাত না বোঝার ভাণ করে তাকায়।

—কালই তো বিনোদের সঙ্গে এসেছিলেন শুনলাম।

—অরুণারা—

বেলারাণী হাসে, অরুণারা মানে?

—মানে ওর মা-বাবা।

—তাই নাকি সবাই মিলে। বাঃ শুভদিনটি কবে?

প্রভাত ওঠবার চেষ্টা করে, কেন মিথ্যে ঠাট্টা করছেন?

—বসুন না, দরকার আছে।

শো সুরু হবার ঘণ্টা পড়ে। পার্থসারথি এতক্ষণে কথা বলে, চল বেলা, ওঠা যাক। ওয়ার্নিং দিয়েছে—

—তুমি বসগে যাও পার্থ, আমি প্রভাত বাবুর সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে যাচ্ছি।

—প্রভাত তাড়াতাড়ি বলে, আমিও উঠবো।

—অত তাড়া কিসের, কাল তো দেখেছেন।

বেলারাণীর সঙ্গে প্রভাত কিছুতেই পেরে ওঠে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও বসে পড়ে। পার্থ উঠে যেতেই বেলারাণী মন্তব্য করে, উঃ, এর জ্বালায় অস্থির! পাগল করে মারে।

—আপনি দেখছি কারুর ওপর খুসী নন।

—কি করে খুসী হব বলুন? ঠিক বিনোদের জুড়ী। আপনিই বলুন, বিনোদের মত লোককে সঙ্গ করা যায়?

প্রভাত মৃদুস্বরে বলে, বিনোদ বাবু তো খারাপ লোক নন?

—খারাপ লোক তো বলিনি, সঙ্গী হিসেবে ভাল নয়। সব সময় কি নাটুকেপণা ভাল লাগে?

প্রভাত কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। বেলারাণী কথার সুর পাল্টায়, হ্যাঁ, আমাদের এ দিকের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সামনের মাস থেকে ছবি তোলা সুরু হবে।

—খুব ভাল কথা, কাল আপনার বাড়ী গিয়ে আলোচনা করব। চলুন, বই আরম্ভ হয়ে গেছে—

বেলারাণী আলতো করে প্রভাতের হাতের উপর চাপ দেয়, আজ আমার বাড়ী পর্য্যন্ত গাড়ীতে গেলে ভাল হত, পার্থর হাত থেকে বাঁচতাম।

প্রভাত কথা বলতে গিয়ে চুপ করে যায়, দেখে, একদৃষ্টে বেলারাণী তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—প্রভাত, আমার এই একটি অনুরোধ রাখবে না?

প্রভাতের অস্বীকার করার আর শক্তি থাকে না। মাথা নীচু করে বলে, আচ্ছা, যাবো।

—চল, ভেতরে যাওয়া যাক।

—শো ভেঙ্গে গেলে আমি এখানে অপেক্ষা করবো।

অন্ধকার হলে ঢুকে দু'জনে দু'দিকে চলে যায়, নিজেদের সীটের দিকে। এতক্ষণে প্রভাতের মনে ভয় ঢোকে, তাই তো কি বলবে সে, অরুণার চকোলেটও আনা হয় নি, তার ওপর এত দেরী।

সীটে এসে বসতেই রমেশ বাবু জিজ্ঞেস করেন, অরুণার চকোলেট আনতে নিউ-মার্কেট চলে গিয়েছিলে না কি?

প্রভাত ছবির দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, না, একজনের সঙ্গে কথা বলতে দেরী হয়ে গেল।

অরুণা চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, চকোলেট পান নি?

—না।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

প্রভাত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, ঐ ছবি তোলার ব্যাপারে।

তারপর আর এ প্রশ্ন ওঠে না। ছবি দেখতে সকলে ব্যস্ত! কিন্তু মুস্কিল হল শেষ হয়ে যাবার পর।

প্রভাতকে বলতেই হয়, আমি আর আপনাদের সঙ্গে ফিরব না, এক জায়গায় যেতে হবে।

অরুণার মা বললেন, তাই নাকি, আমি ঠিক করেছিলাম আজ আমাদের বাড়ীতেই খেয়ে যাবে।

—রোজই তো খাচ্ছি মাসীমা! আজকে একটা বিশেষ দরকার আছে।

কথা বলতে বলতে তারা হলের বাইরে আসে। অরুণা বলে, প্রভাতদা', দু'-একটা জায়গা বুঝতে পারি নি, কালকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

—বেশ তো।

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই বেলারাণীর ডাক শোনা যায়, প্রভাত বাবু, আমরা এখানে।

প্রভাতকে ইঙ্গিতে জানাতে হয় আসছে বলে। অরুণা এতক্ষণ বেলারাণীকেই লক্ষ্য করছিল, মেক্ আপ্ করা মুখ, ফাঁপানো চুল আর তার চটুল চাহনী। ভারী গলায় জিজ্ঞেস করে, উনি কে?

—বেলারাণী।

—ও, ওরই সঙ্গে বুঝি ইণ্টারভ্যালে কথা হচ্ছিল?

প্রভাত মিথ্যে বলতে পারে না বলে, হ্যাঁ।

আর কোন কথা না বলে অরুণা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে রমেশ বাবুদের সঙ্গে যোগ দেয়।

প্রভাত আসতেই বেলারাণী বলে, সত্যি, অরুণাকে ভারী মিষ্টি দেখতে, কি সুন্দর চুল, ফরসা রঙ্—

প্রভাত সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে, চলুন, নামা যাক্।

পার্থসারথি যে প্রভাতের আসাটা মোটেই পছন্দ করেনি তা কাউকে বলে দিতে হয় না। জিজ্ঞেস করে—আপনি যে বললেন আজ কাজ আছে?

প্রভাত বলে, ছিল, তবে বেলা দেবী বলছেন বইটার দু'-এক জায়গায় ডায়ালগ্ চেঞ্জ করতে হবে, তাই।

—তাহলে আমি বরং এখান থেকেই বিদায় নিই।

বেলারাণী সহজ গলায় বলে, আচ্ছা, কাল তো সেটে দেখা হবেই।

কথা বলতে বলতে তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে। বেলারাণীর ড্রাইভার সিনেমার সামনেই গাড়ী এনে রেখেছিল। পার্থর কাছে বিদায় নিয়ে বেলারাণী আর প্রভাত পেছনের সীটে উঠে বসে।

গাড়ী চলতে সুরু করে। বেলারাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, উঃ, এত সহজে যে পার্থর হাত থেকে নিস্তার পাব ভাবিনি।

—তবে আর কি, আমার এখন ছুটি।

—তাড়া কিসের?

প্রভাত হাসে, পার্থর হাত থেকে যখন রেহাই পেয়েছেন, আমার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

—না প্রভাত, তোমাকে অনেকগুলো কথা বলার আছে। আজ আমায় খানিকটা সময় দাও। বেলারাণী প্রভাতের ডান হাতটা নিজের কোলের উপর টেনে নেয়, জানি তুমি অবাক হচ্ছো, ভাবছো,

এ-ও আমার একটা ঢং, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি তোমায় সত্যিকারের বন্ধু হিসাবে পেতে চাই।

—সে তো আমার সৌভাগ্য!

—দোহাই তোমার, বই-এর ভাষায় কথা বোলো না। আজ তোমায় অনেকগুলো কথা না বলে শান্তি পাচ্ছি না।

—বলুন।

—গাড়ীতে নয়, বাড়ীতে।

বাড়ীতে পৌঁছে বেলারাণী ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয়, প্রভাত বাবুকে বাড়ী ছাড়তে হবে, ঠিক থেকো! কত দিন কত বার প্রভাত বেলারাণীর বাড়ী এসেছে কিন্তু আজ সব কিছু অন্য রকম মনে হয়।

—নীচে নয়, ওপরে চল।

বেলারাণী প্রভাতকে নিয়ে ওপরে উঠে আসে। নীচের চেয়ে ওপরতলা অনেক ভালো করে সাজানো। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বৈঠকখানা, দেশী আসবাবপত্রে ভর্তি, সৌখীন ফরাস তাকিয়ার সুবন্দোবস্ত।

—বস, আমি আসছি।

প্রভাত ফরাসের ওপর গিয়ে বসে, কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। চেয়ারে বসলেই ভাল হ'ত, প্রভাত ভাবে।

বেলারাণী খুব তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে ফিরে আসে। গোলাপী রঙের সাধারণ তাঁতের শাড়ীতে ওকে আরও সুন্দর যেন দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে, আজ এখানে খেয়ে যাবে তো?

—না, একটু অসুবিধে আছে।

—তাহলে জোর করব না, কিছু পান করবে?

—ঠাণ্ডা জল।

বেলারাণী হাসে, তা বলিনি, কোন ড্রিঙ্কস্।

—না।

—পান করো না?

—পয়সা কোথায়? ও-সব দামী, অভ্যেস করতে অনেক টাকার দরকার।

—আমি কিন্তু আজ একটু শেরী খাব, তোমার আপত্তি নেই তো?

—মোটেই না।

পান করতে করতে বেলারাণী বলে, একদিন আমার জীবনের কথা শুনতে চেয়েছিলে মনে আছে, সেদিন বলিনি কিন্তু আজ বলব।

—বেশ তো, বলুন।

—আমার বাবা কে জানি না। আমার মা থিয়েটারে পার্ট করতেন, নাম ছিল না। তাই সহরের কুখ্যাত নোংরা পল্লীতে আমাদের বাসা ছিল। মা আমাকে খুব যত্নে মানুষ করে। যাতে আমায় দেখতে ভাল হয়, সেদিকে তার সব সময় নজর ছিল। কারণ মা'র নিজের চেহারা ভাল ছিল না। সেই জন্যেই থিয়েটারে নাম করতে পারেনি।

প্রভাত জিজ্ঞেস করে, আপনার মা'র নাম?

—তা জেনে লাভ নেই। মা আমাকে নাচ শেখালেন, গান শেখালেন, যাতে আমি থিয়েটারে কাজ পাই। মা'র চেষ্টায় বার তের বছরে কাজ পেলাম থিয়েটারে।

—কি পার্ট করতেন?

—সাজাহানে দারার মেয়ে। চন্দ্রগুপ্তে চাণক্যের মেয়ে, এই ধরণের ছোটখাট পার্ট আর প্রায় সব নাটকে নাচতাম, সখী সেজে।

—তারপর?

—এমনি ভাবে তিন চার বছর চলল। এর মধ্যে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। আমার বয়স কম ছিলো, তাই শো'-এর পর অনেকে দেখা করতে চাইত, কেউ কেউ বাসায় দেখা করতে আসত। রোজগার বেড়ে গেল।

প্রভাত বিস্মিত হয়, মাত্র পনের ষোল বছর বয়স থেকে? আপনার খারাপ লাগতো না?

বেলারাণীর বেশ নেশা হয়েছে। হেসে বলে, খারাপ লাগবে কেন? সেখানে তো বেশী লোক এলে আমাদের গর্ব্ব হত।

—মা বারণ করতেন না?

—মেয়ের সাফল্যে কি মা দুঃখ পান?

প্রভাত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, তারপর?

—মা মারা গেলেন।

—তখন আপনার বয়স কত?

—সতের কি আঠারো। একজন পয়সাওয়ালা ভদ্রলোক মা'র কাছে আসতেন। মা মারা গেলে আমার কাছে আসতে সুরু করলেন। কিছুদিন বাদে আমাকে তাঁর রক্ষিতা করে নিলেন।

প্রভাত সিগারেট ধরায়, সে ভাবে কত দিন!

—চার বছর। পরে জানলাম ভদ্রলোক সিনেমা লাইনের অনেককে চেনেন, উনিই আমায় ফিলমে নামার সুযোগ করে দিলেন। বরাত ভালো, প্রথম বইতে অভিনয় করেই নাম হয়ে গেল। এত দিন আমার নাম ছিল বুঁচকি, ফিলমে ঢুকে নাম হল বেলারাণী।

—কত বছর আগে প্রথম ছবিতে নামলেন?

—সাত বছর, চাঁদের দেশে।

—সাত বছরের মধ্যে খুব নাম করেছেন!

বেলারাণী আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে, তা হয়েছে। ফিল্মে ঢোকার দু'বছর বাদে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলাম তখন থেকে সে ভদ্রলোকের রক্ষিতা হয়ে না থেকে এই বাড়ী ভাড়া করে চলে এলাম।

বেলারাণী তাকিয়ার উপর গা এলিয়ে দেয়, টাকা হল। মাষ্টার রেখে লেখাপড়া শিখলাম, যাতে কথাবার্তা বলতে পারি।

—ইংরিজীও তো বেশ ভাল শিখেছেন?

—কাজ চালিয়ে নিতে পারি।

—এর পর কি করবেন?

বেলারাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এমনি করেই মরে যাব একদিন।

প্রভাত চমকে ওঠে, সে আবার কি কথা?

—সত্যি প্রভাত, আর আমার বাঁচার সখ নেই।

প্রভাত বোঝে, নেশার ঝোঁকেই চোখ জলে ভরে আসছে। তবু সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কেন এ রকম ভাবছেন?

—আমি যে মানুষের নোংরা দিকটা দেখেছি, পুরুষ মানুষ দেখলে আমার ঘেন্না করে। বেলারাণী জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে, কত রকম দেখলাম, বড় বড় পণ্ডিত লোক, সমাজের হোমরা-চোমরা নীতিবাগীশ। একজন বাড়ীতে বৌকে বলে এলো অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছে, হাতে সুটকেশ নিয়ে

আমার কাছে এসে হাজির। বুড়ো প্রৌঢ় জোয়ান, সর্ব সমান।

প্রভাত হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, বিয়ে করলেন না কেন?

—কা'কে করবো?

—তার মানে?

—একটা মানুষ যে চোখে পড়ল না! সত্যি প্রভাত, তোমায় আমার ভাল লাগে, এত ভালো লাগে, তুমি মানুষ। যাকে ভালোবাসো তাকে ছাড়া অন্য রকম ভাবতে পারে না। হয়তো অরুণার ওপর আমার হিংসা হয়, কিন্তু তবু তোমার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। একটু থেমে বলে, তোমার কাছে দুটো অনুরোধ আছে আমার, রাখবে?

—বলুন।

—মাঝে মাঝে আমার কাছে এস, বড় একা আমি।

—আসবো।

—আর, বেলারাণীর কথা যেন আটকে যায়, আর শুধু আজকের দিনটি আমার কাছটিতে এস—

বেলারাণী কথা শেষ করতে পারে না, সকরুণ মোহময় চোখে প্রভাতকে আহ্বান করে।

প্রভাত উঠে দাঁড়ায়, এখন আমি চলি, বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হবে।

বেলারাণী তখনও সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে, এসো, লক্ষ্মীটি।

প্রভাত ঘেমে ওঠে, মানুষের মন বড় দুর্ব্বল, তাকে নিয়ে খেলা করবেন না। হয়তো কি করে বসবো, তখন আর আস্থা থাকবে না আমার ওপর। আমার যে মূল্য আপনার কাছে, তা চিরন্তন হোক, এই আমার সৌভাগ্য। চলি। প্রভাত বেলারাণীর দিকে ফিরে না তাকিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, প্রভাতকে আসতে দেখে ড্রাইভার দরজা খুলে দেয়। প্রভাত নিঃশব্দে গাড়ীতে উঠে বসে।

কেষ্ট আবার তার কাজের জীবন ফিরে পেয়েছে। কোন দিন গৌরীকে নিয়ে কোন দিন বা না নিয়ে বার হয় প্রয়োজন মত। পুরোন মোটা খাতাটা বাড়ী থেকে বেহালার বাসাতেই এনে রেখেছে। খাতার এক এক পাতায় এক এক জনের নাম-ঠিকানা বর্ণনা লেখা আছে। কি বলে, কবে, কার কাছ থেকে সে কত টাকা নিয়ে এসেছে সব কিছু। পরের বার গিয়ে যাতে না ভুল কথা বলে ফেলে।

যেদিন গৌরী সঙ্গে থাকে না কেষ্ট অফিসগুলোয় যায়। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের চারটে বড় বড় বিলিতী সওদাগরী অফিসের কর্ম্মচারীদের কাছে সে বোবা কালা বলে পরিচিত। বড়বাবুর কাছে গিয়ে ছাপা কাগজ বার করে দেয়, যাতে লেখা আছে, "এই ভদ্রলোক বোবা কালা, দরিদ্র, আমাদের বিশেষ পরিচিত। সাহায্য করলে সত্যিই এক ভীষণ অভাবগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য করা হবে। নীচে অনেকের নাম সই করা।" বড়বাবুকে প্রথম দিন বোঝাতে কেষ্টর খুবই অসুবিধে হয়েছিল। হাত-পা নেড়ে বোঝাতে হয়েছে, বার বার চিঠি সার্টিফিকেট খুলে দেখাতে হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে অসুবিধে নেই। বড়বাবু সই করে চার আনা কি আট আনা দিলেই অন্য কর্ম্মচারীদের কাছে যায়। এক টেবিল থেকে আর এক টেবিল ঘুরে যখন বেরিয়ে আসে, পকেটে তার অনেক টাকার খুচরো জমা হয়। বড়বাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসতে ভোলে না। কত দিন বড়বাবুকে বলতে শুনেছে, লোকটা ভাল। ন'মাসে ছ'মাসে একবার আসে, বেশী জ্বালাতন করে না।

কেষ্ট এমনও কয়েক জন দয়ালু ভদ্রলোককে জানে যারা সত্যিকারের দুঃখের কথা শুনলে সাহায্য না করে পারে না। উস্কোখুস্কো চুল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি আর ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে কেষ্ট তাদেরই মত একজনের সঙ্গে দেখা করে বলে, দয়া করে আপনার টেলিফোনটা একবার ব্যবহার করতে দেবেন?

—করুন।

[ক্রমশঃ

আর নয়

দ্বিজেন চৌধুরী

এখন তোমাকে নিয়ে হৃদয়ের অতল গহনে
স্বপ্ন-রেণু নীরবে ছড়ানো
আর নয়।
এবার তোমাতে দেব পূর্ণচ্ছেদ টানি:
একখানা নভেলের শেষ পরিচ্ছেদে
অন্ত্যবাক্যে শেষতম দাঁড়ি—
বিরহের দীর্ঘশ্বাসে কান্না নয়
কমেডির আনন্দ-গুঞ্জনে মূর্ত্ত মন
পরিপূর্ণ অন্তরের আশা
একখানা মিল।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যাওয়া সনতের বরাবরকার নিয়ম। ইদানীং সেটা ঘন ঘন ঘটতে লাগল। এমনি একটা দীর্ঘ নিরুদ্দেশ-এর পর একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এলে, হেনা আর চুপ করে থাকতে পারলো না। চা-খাবার খাইয়ে কাপ-ডিসগুলো তুলে নিতে নিতে বলল, বড্ড যে শীগগির শীগগির ফিরলে এবার?

সনত হাসতে লাগল, জবাব দিল না। হেনা রেগে উঠল, গা জ্বালা করে বাপু, তোমার ঐ হাসি দেখলে। আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো, এবার কেমন করে বেরোও।

—কেন? বুড়ী হলি, এখনো তোকে আগলে রাখতে হবে না কি?

—রক্ষে কর। আমার জন্যে যে তোমার কত দরদ, তা জানা আছে। কিন্তু বাবার কথাটাও কি একবার ভাবতে নেই?

সনত গুছিয়ে বসে বলল, বাবার জন্যেই তো দেরি হল।

হেনা বিস্ময়ে চোখ তুলল—বাবার জন্যে!

—হ্যাঁ রে! তবে শোন, সব বলছি। আমাদের এক পিসীমা আছেন জানিস তো?

—পটুয়াখালীর পিসীমা?

—হ্যাঁ; তুই তাঁকে দেখিসনি। আমিও দেখেছি মোটে একবার, সেই ছেলেবেলায়। সেইখানে গিয়েছিলাম।

—হঠাৎ এ্যাদ্দিন পরে পিসীর কথা মনে পড়ল যে?

—মনে পড়ল কি আর সাধে? ঐ পিসীই আমাদের ভবিষ্যৎ ভরসা। বলবার ধরণ দেখে হেনা হেসে উঠল। সনত তেমনি গম্ভীর সুরে বলল, তোমার তো হাসবারই কথা। ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। তখন বাবাকে আগলাবে কে?

হেনার মুখের উপর চকিতে একটা রক্তিম আভা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বলল, কেন? তোমার বৌ।

—আমার বৌ! হো-হো করে হেসে উঠল সনত।

—হাসলে যে? বৌ কি কোনো দিন আসবে না?

—দাঁড়া, আগে তোকে পার করি, তবে তো?

—কেন, আমি কি তোমার বৌকে জলবিছুটি দেবো, যে ও আপদ বিদায় না করে নিশ্চিন্ত হতে পারছ না? বলতে বলতে গলাটা হঠাৎ ধরে গেল হেনার। চোখ দুটোও ছল-ছল করে উঠল। সনত হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, এই ছাখ, মেয়ের অমনি ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ শুরু হয়ে গেল। আরে, আমার আসল প্ল্যানটা আগে শোন।

হেনা মুখ তুলে তাকাল। সনত বলল, পিসীমা এসে বাবার দেখা-শুনার ভার নিলে আমরা দু'জনেই চলে যাবো কোলকাতায়।

হেনার সিক্ত চোখের পাতায় ফুটে উঠল হাসির ঝলক। উচ্ছ্বসিত সুরে বলে উঠল, আমিও যাবো, দাদা?

—যাবি না তো করবি কি। মাইনর পাশ করে বিদ্যাদিগ্‌গজ হয়েছ। এবার তিন হাত একটা ঘোমটা টেনে হাতা-বেড়ি নিয়ে কারো হেঁসেলে ঢুকলেই জীবন সার্থক হয়ে গেল। সেটি হচ্ছে না, বাপু। যাকে সত্যিকার লেখাপড়া বলে, তাই শিখতে হবে। বিয়ে তোমার দিচ্ছি না এত শীগগির।

—আহা, সেই ভাবনায় যেন আমার ঘুম নেই!

আরক্ত মুখে ওইটুকু বলেই কাপ-ডিসগুলো তুলে নিয়ে লঘু পায়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

বাবার সঙ্গে মোটামুটি একটা আলোচনা হল সনতের। মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে চেষ্টা না করে তাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে পড়াবার প্রস্তাবে সদাশিব বাবুর মনে মনে সমর্থন ছিল না। কিন্তু ছেলে-মেয়ের কোনো সংকল্পে তিনি কোনো দিন বাধা দেননি। আজও দিলেন না। বিশেষতঃ, সনত যখন জানাল, একটা চাকরি সে প্রায় ঠিক করে ফেলেছে এবং ওদের দু'জনের সমস্ত খরচ সে-ই চালাতে পারবে, তখন বাধা দেবার কোনো যুক্তিও তিনি খুঁজে পেলেন না। স্থির হল, দু'চার দিনের মধ্যেই সনত পটুয়াখালী গিয়ে পিসীমাকে নিয়ে আসবে, সঙ্গে আসবে তার একটি চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলে রাখাল। এখানকার ইস্কুলে তার পড়বার ব্যবস্থাও সনত ঠিক করে ফেলেছিল। তারপর কলকাতা গিয়ে চাকরি। প্রথমটা উঠতে হবে কোনো মেসে। একটা ছোটখাটো বাসা পাওয়া গেলেই নিয়ে যাবে হেনাকে। বছর তিনেক পরে সদাশিব যখন রিটায়ার করবেন, তিনিও গিয়ে থাকবেন ওদের কাছে।

অনেক দিন পরে বিকেলবেলা দাদাকে নিয়ে গঞ্জের ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিল হেনা। থানা আর পোস্ট-অফিসের মাঝখানে যে-জায়গাটা পড়ে আছে, তারই এক কোণে দু'খানা চালাঘর তৈরি হচ্ছিল। সেদিকে দেখিয়ে বলল, ওটা কি হচ্ছে, জানো দাদা?

—কী জানি ! কোনো মেজো কিংবা সেজো দারোগার কুঠী হবে, হয়তো !

—বলতে পারলে না। এখানে এসে উঠবেন একজন ইন্‌টারনী।

—ইন্‌টারনী ! খানিকটা কৌতূহল হল সনতের। তুই জানলি কি করে ?

—বাঃ, সব্বাই তো জানে। সিপাইরা কবে থেকে বলে বেড়াচ্ছে, স্বদেশী বাবু আসছে। সুরমাদি'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্বদেশী বাবু কি জিনিষ। উনি বললেন, ইন্‌টারনী। আচ্ছা দাদা, ওদের স্বদেশী বাবু বলে কেন ?

—তা জানিস না ! গোটা কয়েক স্বদেশী পট্‌কা ছুঁড়ে ওঁরা বিদেশী সরকার উড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেন, তাই ওঁদের নাম স্বদেশী বাবু।

—তোমার তো সবই ঠাট্টা। শুধু স্বপ্ন দেখেন কেন বলছ। বিদেশী কি একটাও মরেনি ওদের হাতে ?

—তা মরেছে। কিন্তু ঐ একটার বদলে তারা ক'টা মেরেছে, তার খবর রাখিস ? শুধু যদি মেরে ফেলত, আমার আফশোস ছিল না। কিন্তু রোলার চালিয়ে থেৎলে, ভেঙে, গুঁড়িয়ে দিয়েছে হাড়-পাঁজরা, পঙ্গু করে দিয়ে গেছে, যাকে আমরা বলি দেশের যুবশক্তি। আজ যদি ঐ সাদা চামড়াগুলো হঠাৎ তলপি-তলপা নিয়ে চলেও যায়, যে ক্ষতি রেখে গেল, তার পূরণ কোনো দিন হবে না। কী লাভ হল ঐ পট্‌কা ছুঁড়ে বলতে পারিস ?

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানলেও, কেমন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ছিল হেনার মনে। এই যে একদল ছন্নছাড়া মানুষ, সংসারে অন্য দশ জন যা কামনা করে, সব ফেলে কেবল মাত্র দেশকে ভালবাসে বলেই বরণ করে নিল এমন একটা পথ, যার পদে পদে ছড়িয়ে আছে শুধু দুঃখ, দৈন্য, মৃত্যু আর লাঞ্ছনা, এদের জন্যে তার শ্রদ্ধা ছিল যতখানি, তার চেয়ে বেশী ছিল মমতা। এদের কাউকে সে কোনো দিন দেখেনি। শুধু এক দিন গভীর রাত্রে সুরমাদি'র বাড়িতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে শুনেছিল, এক জনের চাপা কণ্ঠস্বর। সে রাতটি ওর জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে। দাদার কথায় হঠাৎ তাই মনে পড়ে গেল। একটু আঘাতও বোধ হয় লাগল ওর অন্তরের সেই কোমল স্থানটিতে। সেটা প্রকাশ না করে বলল, তুমি খালি লাভ-ক্ষতি দিয়েই ওদের বিচার করছ, দাদা। কিন্তু সেইটাই কি সব ? আর কিছু নেই ? ইতিহাসে পড়েছি, নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে কত লোক শত্রুর কামানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছে। হার-জিতের কথা ভেবে দেখেনি। তাদের আমরা বলি বীর। সে গৌরবটুকুও কি এদের আমরা দিতে পারি না ?

বিস্মিত হল সনত। যাকে সে নিতান্ত ছেলেমানুষ বলে জেনে এসেছে, তার মুখের এই ক'টি আশ্চর্য কথা শুনে শুধু নয়, তার চেয়েও বেশী, তার দুটি স্নেহসিক্ত স্বপ্নময় চোখের দিকে তাকিয়ে। সেইখানে দৃষ্টি রেখেই বলল, নিশ্চয়ই পারি। সে গৌরব তাদের অবশ্য পাওনা। শুধু গৌরব কেন, তাদের জন্যে আমাদের গর্বেরও শেষ নেই। কিন্তু তবু বলবো, মৃত্যুর মুখে লাফিয়ে পড়াটাই বীরত্ব নয়। ফলাফলের কথাটাও ভাবতে হয়। তা না হলে তার নাম হঠকারিতা। আমরা যাকে দেশপ্রেম বলি, তার মধ্যে আবেগের বন্যা যেমন আছে, তার চেয়ে বেশী চাই বুদ্ধির বাঁধ। তা যদি না থাকে, শেষ পর্যন্ত যা ঘটে তার নাম প্রাণ-শক্তির অপচয়।

এসব কথার উত্তর দেবার মত বিদ্যা বা বুদ্ধি হেনার অবশ্যই ছিল না। তাই সে চুপ করেই রইল। কিন্তু দাদার যুক্তিটা পুরোপুরি মেনে নিতেও তার প্রাণ সায় দিল না। প্রথম যৌবনের জোয়ারের মুখে দাঁড়িয়ে কেবলই মনে হতে লাগল, বুদ্ধির গৌরব আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু যা আমার প্রিয়, যা কিছু আমি ভালবাসি, তার জন্যে সামনে পেছনে না তাকিয়ে নিজেকে শুধু ভাসিয়ে দিয়েও যে কী সুখ, দাদা তা বুঝল না।

সনতের কাছে তার এই একান্ত স্নেহের পাত্রী ছোট বোনটির নীরব মনের বেদনাটুকু অস্পষ্ট রইল না। সস্নেহে তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে গভীর কণ্ঠে বলল, কি জানিস, হেনা, আমি এদের ঠিক বুঝতে পারি না। মানুষের মৃত্যু যে কী করুণ, কত শোচনীয়, সেটা আমি এত দেখেছি যে মরণের কথা ভাবতেই আমার ভয় হয়। মনে হয়, থাক পড়ে আমার দেশের মুক্তি। তার জন্যে প্রাণ না দিয়ে আর না নিয়ে একটি মানুষকেও যদি বাঁচিয়ে তোলা যায়, তার চেয়ে কাম্য আর কিছু নেই। তারই মধ্যে রইল আমার দেশের কল্যাণ। ওদের অনেককে আমি জানি। শ্রদ্ধাও করি। কিন্তু ওদের ঐ পথে আমার প্রাণের সাড়া পেলাম না। ছেলেবেলা থেকে মানুষের রোগ-শোক দুঃখ-দুর্দশা আর বিপদ-আপদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেই টানেই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ি। বাবার জন্যে, তোর জন্যে যতটুকু আমার করবার, করতে পারি না ! সে কি আমার কম দুঃখ ! মাঝে মাঝে প্রতিজ্ঞা করি, না, আর যাবো না। তোদের নিয়েই জড়িয়ে থাকবো। হঠাৎ আবার কোত্থেকে ডাক আসে। সব ভেস্তে যায়। বলতে বলতে হেসে ফেলল সনত। যেন একটা অপ্রতিভ হাসি ! তার মধ্যে অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুর।

দাদার অন্তরের এই গোপন কক্ষটির খবর হেনার চেয়ে কে বেশী জানে ? কিন্তু আজকার মত এমন করে তার অর্গল কোনো দিন খুলে যায় নি। দাদার কাছে যা কিছু শোনে, সবার মধ্যেই থাকে একটা তরল স্নিগ্ধ পরিহাস। এমন গভীর সুর এই প্রথম শুনতে পেল হেনা। মনটা কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বলবার কথা কিছুই খুঁজে পেল না। শুধু যে হাতখানা ছিল ওর কাঁধের উপর, তারই ক'টি আঙুল দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দাদার একান্ত কাছটিতে সরে এসে দাঁড়াল।

রাতে শোবার পর চারদিকটা যখন নিঝুম হয়ে গেছে, হেনার মনের মধ্যে ফিরে এল সেই স্মরণীয় রাত। এই তো বছর খানেক আগেকার কথা। বিকেল বেলা সুরমাদি' ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ঘণ্টা দুই পড়াশুনা আর গল্পগুজব করবার পর যখন ফিরবার সময় হল, চারদিকটা ভেঙে এল ঝড়-জল। আর থামবার নাম নেই। তার মধ্যেই এক সময়ে দু'জনে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেন। প্রায় দশটা যখন বাজে, ঝড় থামল। কিন্তু বৃষ্টি তখনো চলছে। ছাতা আর লণ্ঠন দিয়ে চাকরের সঙ্গে হেনাকে পাঠাতে গিয়ে কী ভেবে আবার থেমে গেলেন সুরমাদি'। অন্ধকার 'নির্জন রাস্তা। বললেন, থাক, আজ আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। শুয়ে পড়। তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

চাকর গেল চিঠি নিয়ে। সুরমা নিজের শোবার ঘরের ও

পাশটায় তক্তপোষের উপর তার বিছানা করে দিলেন। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল হেনা। হঠাৎ মাঝরাতে কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের দরজা খোলা। ওপাশের বিছানা খালি পড়ে আছে। সুরমাদি' নেই। কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। কিন্তু সাড়া না দিয়ে পড়ে রইল নিস্পন্দের মত। বারান্দায় একটা আলো জ্বলছে, হঠাৎ কানে গেল চাপা গলায় কে কথা বলছে। পুরুষ মানুষের স্বর। বলছে ও মেয়েটি কে দিদি ?

—ও আমার এক ছাত্রী। এখানকার পোষ্টমাষ্টারের মেয়ে।

—জেগে নেই তো ?

—না ; ও ঘুমুচ্ছে। কেন জেগে থাকলই বা ?

—বাপ রে! পোষ্টমাষ্টার মানেই সরকারের লোক। বাপকে গিয়ে বলে দিলেই হল! পুলিশ পিছু নিতে কতক্ষণ ?

—ও মোটেই সে রকম মেয়ে নয়।

—তাহলেই রক্ষে।

—তাছাড়া, এখানকার পুলিশ তো তোকে চেনে না। অত ভয় করিস কেন ?

—ভয়-টয় আমরা করি না দিদি! ভাবনা শুধু কোমরে যে বস্তুটি আছে, তার জন্যে। ওরা দূর থেকেই গন্ধ পায়। একেবারে শিকারী বেড়ালের মত।

বলে হেসে ফেলল ছেলেটি। সুরমা বললেন, এসব বিপদ মাথায় নিয়ে আসিস কেন আমার কাছে ?

—বাঃ, কত দিন দেখিনি তোমায় বল তো ? সত্যি দিদি, মাঝে মাঝে বড্ড মন কেমন করে।

সুরমার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আবার শোনা গেল ছেলেটির কথা. চোখের জল এসে গেল তো ? ঐ জন্যেই তোমাকে কিছু বলি না। এখন কান্নাকাটি রেখে ওঠো দিকিন। কিছু খেতে টেতে দাও। সেই সকাল থেকেই আজ হরিবাসর।

সুরমা ধরাগলায় বললেন, তুই একটু ব'স! চট করে দুটো চাল ফুটিয়ে দিই।

—আবার চাল ফোটাতে যাবে। তাহলেই হয়েছে। কেন, হাঁড়িতে কিছু নেই তোমার ?

—আছে দুটো পান্তাভাত। চাকরটা সকালে খাবে বলে রেখেছি। সে তুই খেতে পারবি না।

—তুমিও যেমন! মোটে মা রাঁধে না, তা তপ্ত আর পান্তা! ঐ পান্তাই আমার পোলাও কালিয়া। যাও, শীগগির নিয়ে এসো। আর সময় নেই। ভোর হয়ে এল।

এর পর আর কোনো কথা শুনতে পায়নি হেনা। আলোটাও সরে গেল। সুরমা বোধ হয় রান্নাঘরে গেলেন ভাইকে নিয়ে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখনো সুরমাদি'র বিছানা খালি। হেনা উঠে এসে দেখল. বারান্দায় একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে তিনি বসে আছেন। চোখ দুটো ফুলো ফুলো। তার নিচে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। চুলগুলো উসকো খুসকো। হেনার দিকে কেমন শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, রাত্তিরে বেশ ঘুম হয়েছিল

তো? হেনা ঘাড় নেড়ে জানাল হ্যাঁ। তারপর প্রণাম করে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ছাত্রীর সুনিদ্রার খবর নিলেন সুরমাদি'। কিন্তু একটি নিদ্রাহীন রাত্রির করুণ ইতিহাস যে ঐ মেয়েটি নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে গেল তার নিভৃত অন্তরের মধ্যে, সে খবর তিনি কোনো দিন জানতে পারেননি!

পিসীমাকে আনতে যাবার দিন এসে গেল। সকালে উঠে তাড়াতাড়ি করে ডাল ভাত আর একটা তরকারী নামিয়ে দিল হেনা। তারই এক ফাঁকে দাদার ব্যাগে তার দুটো কাপড়-জামাও গুছিয়ে রেখে এল। খেয়ে দেয়ে যাবার উদ্যোগ করছে সনত, ঠিক এমন সময়ে দুজন বন্ধু এসে হাজির। কয়েক মিনিট কী সব কথাবার্ত্তা হল তাদের সঙ্গে। তার পর হেনাকে ডেকে বলল, হঠাৎ একটা অন্য কাজ পড়ে গেল। এখনি বেরোতে হচ্ছে! বাবাকে বলিস, তিন-চার দিন পরে ফিরবো।—বলেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল বন্ধুদের সঙ্গে।

তিন-চার দিনের পর আরো তিন-চার দিন কেটে গেল। এ রকম কত বার গেছে সনত। বলেও যায়নি কবে ফিরবে। যদি বা বলে গেছে, সে কথা রাখতে পারেনি। তবু, তেমন কিছু ভাবনা হয়নি হেনার। এবার তার মনে পড়ল দুশ্চিন্তার ছায়া। বাবাও একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কেউ কিছু খবর দিয়ে গেছে কি না। সকাল হলেই হেনার কেমন যেন মনে হয়, আজ দাদা আসবে। দুপুরবেলা তার চাল নেয় না। যখনই আসুক, দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বেশী রাত্রে এসে বোনকে কিছুতেই রাঁধতে দেবে না। তাই সন্ধ্যাবেলা ভাত চড়াতে গিয়ে দাদার চালটাও নিতে হয়। সকালে সেটা বিলিয়ে দেয়, কিংবা নিজেই খেয়ে নেয়। এমনি করে দিন যখন আর কাটতে চায় না, তখন এল চিঠি।

মাইল দশেক উজানে অনেকটা জায়গা নিয়ে সুরু হয়েছিল আড়িয়ালখাঁর ভাঙন। গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে চলেছে সর্বনাশী। মানুষের অন্ন সংগ্রহের মাটিটুকু কেড়ে নিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, নিঃশেষে ভেঙে দিচ্ছিল তার মাথা গুজবার ঠাঁই। প্রলয়ঙ্করী নদার অন্ধ আক্রোশ থেকে বাঁচবার জন্যে যথাসর্বস্ব নিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে পালিয়ে যাচ্ছে অসহায় মাটির জাব। সেখানেও অন্ন নেই, মাথার উপর নেই এতটুকু আচ্ছাদন। সুযোগ বুঝে মহা উল্লাসে ছুটে এসেছে ব্যাধির পাল। চারদিকে সুরু হয়েছে মৃত্যুর তাণ্ডব।

সরকারী তদন্ত তখনো শেষ হয়নি। তথ্য-সংগ্রহের তোড়-জোড় চলছে। মাল-মসলা যোগাড় হলে চোস্ত ইংরেজিতে তৈরি হবে পাকা হাতের রিপোর্ট। উচ্চ থেকে উচ্চতর মহলে খুটিঁয়ে খুঁটিয়ে চলবে তার বিচার বিশ্লেষণ। তারপর হয়তো মঞ্জুর হবে কিঞ্চিৎ সাহায্য। ইতিমধ্যে সরকারী সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে গোটাকয়েক ছেঁড়া তাঁবু আর কিছু বাঁশ দড়ি চাটাই সংগ্রহ করে এরই কোনোখানে সনত গড়ে তুলেছিল তার রিলিফ ক্যাম্প। সম্বলের মধ্যে ছিল, দূর সহর থেকে ভিক্ষা করে আনা কয়েক বস্তা চাল আর কিছু পুরানো কাপড। অর্থবলের অভাব বাহুবল দিয়ে যতটা পূরণ করা যায়, এই ক্ষুদ্র দলটির তা-ই ছিল প্রধান লক্ষ্য।

নদী এগিয়ে আসছে। খানিকটা দূরে থাকতেই, ঘর-দুয়ার ভেঙে মালপত্র গরুবাছুর গুছিয়ে নিয়ে সরে যেতে হবে। সেইখানে হল ওদের প্রথম প্রয়োজন। ঠিক সময়টিতে না এসেই একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থ রাতারাতি ফকির হয়ে যায়। একদিন সন্ধ্যার মুখে এমনি একটা ঘর খালি করে জিনিষপত্র সরিয়ে নিচ্ছিল সনত আর তার দুজন সঙ্গী। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। কয়েক গজ তফাতে গর্জন করছে আড়িয়ালখাঁ। পাক খেয়ে খেয়ে ছুটে চলেছে তার গৈরিক স্রোত। একবার চোখ পড়লে, মাথা ঘুরে যায়। যেখানটায় ওরা কাজ করছিল তার পাশেই ফাটল। যে কোনো মুহূর্ত্তে ধ্বসে পড়বে বিশাল মাটির চাপ। কোথায় তলিয়ে যাবে, চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাবে না। অত্যন্ত সন্তর্পণে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ওরা ফাটলের এপারে এসে দাঁড়াল। বছর দেড়েকের একটি ঘুমন্ত শিশু কোলে করে দাঁড়িয়েছিল ঐ বাড়ির একটি মেয়ে। এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, ওমা, আমার খোকনের ঘোড়াটা তো আনা হয়নি! ঐ যে পড়ে আছে বারান্দার কোণে। বলে দু'পা এগিয়ে গেল।

থাম্! খেঁকিয়ে উঠলেন তার বাবা। ঘোড়া না হাতী! সর্বস্ব গেল। গুষ্ঠীশুদ্ধ কোথায় দাঁড়াবে, কী গিলবে তার ঠিক নেই, উনি ওর ছেলের খেলনা নিয়ে ব্যস্ত। সনতের দিকে চেয়ে বললেন ভদ্রলোক, চল যাই কোথায় যেতে হবে। ধমক খেয়ে নিরস্ত হল মেয়েটি। আস্তে আস্তে যেন আপন মনে বলল, আহা, ঘুম ভেঙে বড্ড কাঁদবে ঘোড়াটা না দেখলে। কথাটা সনতের কানে গেল। চোখে চোখ পড়তেই দেখল, ওরই দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। একেবারে ছেলেমানুষ। বোধ হয় মা হয়েছে এই প্রথম। কী মনে হল সনতের। বলল, দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি খোকনের ঘোড়া। সকলে না, না করে উঠল। ওর সঙ্গীরাও চেঁচিয়ে উঠল, যাবেন না সনত্‌দা। সনত শুনল না। বারান্দায় পৌঁছে ঘোড়াটা তুলতে যাবে, হঠাৎ প্রলয় শব্দে শিউরে উঠল অতগুলো মেয়েপুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পিছিয়ে গেল কয়েক হাত। পরমুহূর্তে দেখা গেল, কোথাও কিছু নেই। শুধু পায়ের নিচে উন্মত্ত আবেগে মাথা খুঁড়ে চলেছে আড়িয়ালখাঁ।

চার লাইনের চিঠি। এত সব কথা তাতে ছিল না। ছিল শুধু আসল খবরটুকু। সনতের বন্ধু গোবিন্দই সেটা জানিয়েছিল, বাকীটুকুও তার মুখ থেকে শোনা। অনেক দিন পরে। আর একটা কথা বলেছিল গোবিন্দ, সেই মেয়েটি তোমারই বয়সী হবে। দেখতেও খানিকটা যেন তোমার মত।

তার পর কত দিন কেটে গেছে। আজও কে[illegible]না কোনো দিন গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মনে [illegible]ড়ে যায় গোবিন্দর সেই শেষের কথাটা। সমস্ত বুকখানা [illegible] মুচড়ে ওঠে। সমস্ত যুক্তিতর্ক ছাপিয়ে কেবলই মনে [illegible] থাকে, দাদার এই অপঘাত মৃত্যুর সমস্ত দায়িত্ব যেন [illegible] ছোট্ট বোনটাকে এত ভাল যদি না বাসত, হয়তো এমন [illegible] জেকে বিসর্জন দিত না।

[illegible]

চিঠিখানা এসেছিল সদাশিব বাবুর নামে। [illegible] নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে তুলে দিলেন হেনার হাতে। তা[illegible]কে ডেকে অন্য দিনের মতই তামাক দিতে বললেন। [illegible] কিছুই বুঝতে পারেনি। বাজপড়া মানুষের ম[illegible]

দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। তার পর কখন ভেঙে পড়েছিল বাবার কোলের উপর, তার ঠিক মনে নেই। সদাশিব বাবু একটি কথাও বলেন নি, এক ফোঁটা জলও পড়েনি তাঁর চোখ থেকে। বাঁ হাতে ছিল গড়গড়ার নল। কম্পিত ডান হাতখানা মেয়ের মাথার উপর রেখে একটানা তামাক টেনে চলেছিলেন।

সনতের মৃত্যুর পর ছ'-সাত মাস চলে গেছে। পিসীমার আর আসা হয়নি। এসেছে শুধু রাখাল। এখানকার হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে। সেই ব্যবস্থাই করে গিয়েছিল সনত। ছেলেমানুষ। আলাদা ঘরে একা শুতে ভয় পায়। তাই হেনা তার পার্টিশন-করা কামরাটুকু ওকে ছেড়ে দিয়ে নিজে চলে এসেছে দাদার ঘরে। সনতের লাইব্রেরী তেমনি আছে। তেমনি সাজানো আছে তার নিত্য ব্যবহারের দু'-চারটি ছোটখাট জিনিষ। বস্তু হিসাবে অতি সাধারণ; কিন্তু হেনার কাছে তারা অমূল্য। সব ক'টা জিনিষ নিজের আঁচল দিয়ে ঝেড়ে-মুছে আবার ঠিক জায়গায় সযত্নে গুছিয়ে রাখা তার দৈনন্দিন কাজ। সংসারের প্রয়োজন মিটিয়ে বাকী সময়টা এইখানেই সে কাটিয়ে দেয়। বন্ধু-বান্ধব বড়-একটা কোনো দিনই ছিল না। আজ একেবারেই নেই। কখনো-সখনো সুরমাদি' যখন ডেকে পাঠান, শম্ভু কিংবা রাখালকে সঙ্গে নিয়ে দু' দণ্ড কাটিয়ে আসে। ওইটুকু বাদ দিলে তার প্রায় সর্ব সময়ের সঙ্গী দাদার বইগুলো।

ক'দিন ধরে শম্ভুর অসুখ। সব কাজ পড়েছে হেনার একার হাতে। বাবার সকালের খাবারটুকু ঠিক সময়ে করে উঠতে পারেনি। শম্ভু না থাকায় ওঁকেও সকাল সকাল যেতে হয়েছে আফিস-ঘরে। একটু বেলা হলে চা আর ডিসে খানিকটা হালুয়া নিয়ে বাবার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। সদাশিব লিখছিলেন। মুখ তুলে বললেন, এসব আবার এখানে কেন নিয়ে এলি, বল তো? ডাকলেই গিয়ে খেয়ে আসতাম।

—হুঁ; তা যেতে বৈ কি? আটটায় ডাকলে দশটায় যাবার সময় হত।

—কী করবো মা? আগের মত আর খাটতে পারি না।

আগে আগে এ-সব কথা যখনই বলতেন সদাশিব, হেনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত, কী দরকার তোমার বুড়ো বয়সে এত খাটনির? পেনসন নিয়ে নাও। দাদা আছে কী করতে। তিনটা তো মোটে মানুষ। আজ আর সে কথা বলবার মুখ রাখেননি ভগবান। তাই বাবার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে তার শীর্ণ ক্লান্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়ের কাছে অশক্তদেহের দুর্বলতা প্রকাশ করে সদাশিবও যেন একটু অপ্রস্তুত হলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, শম্ভুটা সেরে উঠলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ও কেমন আছে দেখলি?

—আজ আর জ্বর আসেনি। কাল ভাত দেবো, ভাবছি।

—তাই দিস। তুই আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি! এইখানে রেখে যা। হাতের কাজটা সারা হলেই খেয়ে নেবো।

হেনা মাথা নেড়ে বলল, না; তা হবে না। ততক্ষণে সব ঠাণ্ডা, জল হয়ে যাবে। আগে খেয়ে নিয়ে যা করবার কর। বলে থালাটা এগিয়ে দিল বাবার সামনে।

আসতে পারি?

চমকে উঠল হেনা। অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠ। জানালার ওপারে দৃষ্টি পড়তেই তার সমস্ত বুকখানা কেঁপে উঠল শুধু বিস্ময়ে নয়, তার সঙ্গে জড়ানো কিসের একটা ভয়। সাধারণ চেহারার ভদ্রবেশী যুবক। কিন্তু কী আশ্চর্য দুটি চোখ! যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি উজ্জ্বল। মনে হল ওরা শুধু বাইরেটা দেখেই থেমে যায় না, মুহূর্তের দৃষ্টিপাতে জেনে নেয়, কী আছে তোমার অন্তরের অন্তরালে। নিমেষমাত্র চোখোচোখি হবার সঙ্গে সঙ্গেই হেনা চোখ নামিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। বাইরে গিয়েও অনুভব করল সার্চ-লাইটের সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ঐ চোখ দুটো যেন সেখানেও তাকে অনুসরণ করছে।

সদাশিব চায়ে চুমুক দিয়েছিলেন। কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, কে?

—আমি বিকাশ।

—ও, আপনি? আসুন, আসুন।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন সদাশিব বাবু। ফিরে আসতে আসতে বললেন, সেদিন দারোগা সাহেবের বাড়িতে আলাপ হবার পর থেকে রোজই ভাবি আপনার ওখানে যাবো। তা' আর হয়ে ওঠেনি, তাছাড়া বলতে কি, ঠিক সাহসও হয়নি। কি জানি কর্তারা আবার—

—সে আশঙ্কা আছে বৈ কি? আমার পক্ষেও এটা রীতিমত দুঃসাহস। তবে আজকের মত দারোগা সাহেবের অনুমতি নিয়েই এসেছি।

পাশের চেয়ারটায় বিকাশকে বসিয়ে সদাশিব বললেন, একটু চা আনতে বলি?

—শুধু চা নয়, যদি আপত্তি না থাকে, তার সঙ্গে কিছু খাবার। আপনার ঐ হালুয়া দেখে আমার লোভ হচ্ছে। বলে, হেসে উঠল বিকাশ। সদাশিব স্মিতমুখে বললেন, বিলক্ষণ, আপত্তি কিসের? ওরে, রাখাল—

রাখাল আসতেই বললেন, তোর দিদিকে বলে এক ডিস হালুয়া আর চা নিয়ে আয়।

দিদি নিজেই সব শুনতে পেল। আগন্তুকের সম্বন্ধে গভীর বিস্ময় এবং তীব্র কৌতূহল নিয়ে সে ঘরের পিছনেই দাঁড়িয়েছিল।

বিকাশ বলল, আমার প্রস্তাব শুনে আপনি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে গেছেন। গৃহস্বামী খাবার জন্যে অনুরোধ করবেন, আর অতিথি 'না' 'না' করতে থাকবে, ভদ্র-সমাজে এইটাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু আমরা যে সমাজের বাইরে। তাছাড়া 'খাবার' জিনিষটা আমাদের জীবনে এত অনিশ্চিত যে, হাতের কাছে ভালো কিছু পেলে অবহেলা করতে পারি না। এইটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বলে, আরেক বার হেসে উঠল বিকাশ।

সদাশিব সে হাসিতে যোগ দিলেন না। কথাগুলো হালকা সুরে বললেও তাঁর অন্তর স্পর্শ করল। বললেন, আপনার চাকর রাঁধে কেমন?

—দেখুন, ওটা ঠিক বলতে পারবো না। খাদ্যটা শুধু পেট ভরাবার জন্যে, এই কথাই এত দিন জেনে এসেছি। তার ভাল-মন্দ বিচার করবার দরকার হয়নি। সে ক্ষমতাও বোধ হয় নেই।

রাখাল হালুয়া আর চায়ের কাপ রেখে গিয়েছিল। ডিস থেকে

খানিকটা মুখে পুরে বলল, কিন্তু এ বস্তুটি যে চমৎকার সেটুকু বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

চেঁছে মুছে সব হালুয়াটুকু নিঃশেষ করবার পর চায়ে চুমুক দিয়ে আবার বলল, এসব কে করেছেন, জানতে পারি?

—আমার মেয়ে হেনা। ও ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সদাশিব। সে জন্যে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, বিকাশ বাবু! সবই রাধামাধবের ইচ্ছা।

বিকাশ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গভীর স্বরে বলল, আমি কিছু কিছু শুনেছি, মাষ্টারমশাই! বৈষ্ণব-সাহিত্যে আপনার অনুরাগ, এবং বৈষ্ণব-দর্শনে আপনার অধিকার, তাও আমার কানে এসেছে।

সদাশিব কুণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। প্রতিবাদে একটা কী বলতেও গেলেন। সেদিকে লক্ষ্য না করে বিকাশ বলে চলল, আমার মনে হয়, কতকগুলো দিকে বঞ্চিত করলেও, এদিক দিয়ে ভগবান আপনাকে করুণাই করেছেন। জীবনের একটা বড় সম্পদ আপনি অনায়াসে পেয়ে গেছেন। আপনার কাছ থেকে আমি কিছু আশা করি। অনুমতি করেন তো মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করবো।

স্বল্পভাষী সদাশিব আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু একটা অস্পষ্ট বিনয় প্রকাশ ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না। বিকাশ বলল, আপাততঃ মিস্ মিত্রকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। তার হাতের খাবারটুকু পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে গেলাম, এবং এরই লোভে ভবিষ্যতে উৎপীড়ন করবার সম্ভাবনা রইল।

—বিলক্ষণ! ওর সম্বন্ধে অত সঙ্কোচ করে কথা বলবেন কেন? নেহাৎ ছেলেমানুষ। এই তো এখানেই ছিল, আপনি যখন এলেন। দেখলেই বুঝতেন। ওরে, ও রাখাল, তোর দিদিকে একবার ডেকে দে তো।

ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনে যাচ্ছিল হেনা। বাবার ডাক শুনে আবার নতুন করে দেখা দিল তার বুকের কম্পন। এ কিসের ভয় সে জানে না। কিন্তু এটুকু জানে, এই অবস্থায় নিজেকে টেনে নিয়ে ওর ঐ চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব। না, না; তা সে পারবে না। মামা ডাকছেন শুনে রাখাল যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে ও চলে গেছে নিজের ঘরে। সেখান থেকে গামছা-কাপড় নিয়ে কুয়োতলার দিকে যেতে যেতে বলল, বাবাকে বলিস, দিদি নাইতে গেছে।

অন্তরীণ বিকাশ ঘোষের উপর সরকারী আদেশ ছিল, মাঠঘাট গাছপালা যত খুসী দেখ, লোক চলাচল দেখতে চাও, তাতেও আপত্তি নেই। অল্পসল্প ঘোরাফেরা, তাও মঞ্জুর। কিন্তু অনুমতি না নিয়ে মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ চলবে না। জেলে যত দিন ছিল, বিকাশ চারদিকের ঐ উঁচু পাঁচিলটাকেই মনে করত এক অসহনীয় বাধা! শত ইচ্ছা হলেও নিমেষের জন্যে একবার শুধু বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো যায় না, এই অসহায় অনুভূতি মাঝে মাঝে তীব্র যন্ত্রণার মত মনটাকে অস্থির করে তুলত। আজকার এই যন্ত্রণা বুঝি আরো বড়। চারদিকে জনস্রোত। তারই মধ্যে ঘুরছি ফিরছি কতজনের সঙ্গে চোখোচোখি হচ্ছে কতবার। উভয় তরফেই জাগ্রত কৌতূহল। তবু, এগিয়ে গিয়ে কাউকে হাত ধরে বলবার উপায় নেই, কেমন আছ? মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সহজ এবং সনাতন সম্পর্ক, তার প্রথম সূত্র হয় বাক্য। সেটাকে নির্মম ভাবে ছিন্ন করে দিয়েছে যে বিধান, তার চেয়ে কঠোরতর পীড়ন যন্ত্র বোধ হয় আর আবিষ্কৃত হয়নি। নিজের ঘরের জানালায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ভারী কৌতুক লাগত তার। মনে পড়ত অনেক দিন আগে পড়া কোন্ ইংরেজ কবির দুটি লাইন—

Water water every where
Not a drop to drink.

এই সামান্য দুটি ছত্রের অসামান্য গভীর তাৎপর্য যেন এতদিনে ধরা পড়ল তার মনের কাছে। চার দিকে শুধু জল আর জল। কিন্তু তোমার কণ্ঠের তীব্র পিপাসা মেটাবার জন্যে তার একটি ফোঁটাও পাবে না।

সরকারী আদেশের প্রথম দফা হল—রোজ দুবেলা থানায় গিয়ে হাজিরা দেওয়া। দারোগা হোসেন সাহেবের সঙ্গে দুটো মামুলি কথা, তারই জন্যে যেন ছটফট করত মনটা। সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, কেমন লাগছে জায়গাটা? বিকাশ হেসে বলল, তা মন্দ বলেন নি। আপনার ঐ মুরগীগুলোকে বরং জিজ্ঞেস করবেন, কেমন লাগছে খাঁচাটা?

—কেন, সকালে বিকালে খানিকটা বেড়াবার অর্ডার তো আপনার আছে। আমার সিপাই সাহেবরা বুঝি মেহেরবানি করে যাচ্ছেন না। আচ্ছা, দাঁড়ান তো—

—না, না; ওরা ঠিক যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলে উঠল বিকাশ।

—তবে? ও, বুঝেছি। আপনাকে কি বলবো? এই আমার কথা ধরুন। সাত দিন খেতে না দেন, বিবিসাহেব, কিছু আসে যায় না। কিন্তু হঠাৎ যদি হুকুম করে বসেন, পাঁচ ঘণ্টা স্পিকটি নট, আমি মশাই, পাগল হয়ে যাবো। হয়তো ঐ আড়িয়ালখাঁর জলে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

বিকাশ হাসতে লাগল। দারোগা সাহেব বললেন, তা' এক কাজ করুন। এই আমরা সরকারী মানুষ যে ক'জন আছি, এই যেমন ডাক্তার বাবু, পোষ্টমাষ্টার বাবু, সাবরেজিষ্ট্রার, হেডমাষ্টার, এদের ওখানে যান না মাঝে মাঝে? ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে না কথা-টথা বললেই হল। আর ঐ মেয়ে-ইস্কুলের দিদিমণি সুষমা সেন। সর্বনাশ! ওমুখো যেন কোনোদিন হবেন না। মোট কথা চাকরিটি আমার নষ্ট না হয়, এইটুকু বুঝে-সুঝে চলবেন, স্যর!

তারপর থেকে এই বাড়িগুলোয় একবার করে ঢুঁ মেরে দেখেছিল বিকাশ। কিন্তু বিশেষ সাড়া পায়নি। সবাই ছাপোষা লোক। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন। কারো কারো বাড়িতে যুবক ছেলে, কারো বা বয়স্থা মেয়ে। ইন্টারনীর আনাগোনা কখন কি বিপদ ডেকে আনে, এই ভয়ে সবাই আড়ষ্ট। প্রথম দর্শনেই সেটা বুঝতে পেরে আর যায়নি। শুধু একটি জায়গায় তাকে ঘন ঘন দেখা যেতে লাগল।

সদাশিব বাবুর বৈঠকখানা অর্থাৎ ডাকঘর। মাঝে মাঝে তার পিছন দিকে, তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায়। কথাবার্তার বিষয় ছিল বৈষ্ণব-সাহিত্য। সদাশিব বক্তা আর বিকাশ শ্রোতা। কখনো কখনো বিষয় তালিকায় দেখা দিতেন রবীন্দ্রনাথ। সেদিন বক্তার আসন নিত বিকাশ এবং শ্রোতার আসনে বসতেন সকল্প সদাশিব। হেনার আর একটি কাজ ছিল। আলাপ আলোচনার

ফাঁকে ফাঁকে চা সরবরাহ এবং সেই সঙ্গে তার নিজের হাতের তৈরি কোনো খাবার।

স্বল্পভাষী সদাশিব হঠাৎ এমন মুখর হয়ে উঠবেন, সেটা বোধ হয় কোনো দিন কারো কল্পনায় আসেনি। সবাই দেখেছে, সারা জীবন তিনি শুধু সংগ্রহ করে গেছেন। তাঁরও যে কিছু দেবার আছে কে জানত? তাঁর নিজের মেয়েও কোনো দিন সে কথা ভেবে দেখেনি। যে মানুষটির স্পর্শে বাবার ভিতরে এই নতুন মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হল, তার উপরে হেনার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। নিজের পুত্র-কন্যা অত কাছে থেকেও যার নাগাল পায়নি, জীবনের সায়াহ্ন বেলায় একটি অনাত্মীয়, অপরিচিত বিপ্লবীর হাতে তিনি কত সহজে ধরা দিলেন, এর চেয়ে বিস্ময় আর কী আছে! কিন্তু পিতা যেখানে অনায়াসে নিজেকে চিনিয়ে দিলেন, কন্যা সেখানে নিজেকে মেলে ধরতে পারল না। এখনো সেই চোখের দিকে চাইলে তার বুক কেঁপে ওঠে। আজও জানে না, সেটা কিসের ভয়। প্রাণপণে তাকে চেপে রেখে সহজ হবার চেষ্টা করে। তবু অন্তরের কোন কোণ থেকে জেগে ওঠে দুরু-দুরু কম্পন।

সেদিন সদাশিব গোবিন্দ দাসের একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। এমন সময় রেকাবিতে নতুন একটা কি মিষ্টান্ন নিয়ে হেনা এসে দাঁড়াল। পদটি শেষ করে সদাশিব বললেন, আজকার মত এইখানেই থাক। এবার আমার হেনা-মায়ের মিষ্ট রস পরিবেশনের পালা।

হেনা প্রতিবাদ করল, বাঃ, তা কেন হবে? দুটো বুঝি একসঙ্গে চলতে পারে না?

—না, তা পারে না, উত্তর দিল বিকাশ। এক সঙ্গে চললে সব গুলিয়ে যাবে। কোনটা বেশী মিষ্টি বুঝতে পারবো না।

—আচ্ছা পেটুক তো আপনি?

—ওটা কিন্তু নিন্দা নয়, প্রশংসা। আমাদের মত পেটুক আছে বলেই মেয়েদের এত দাম। তা না হলে কী করতে তোমরা?

—কেন? আপনাদের পেটের দাবি মেটানোই বুঝি আমাদের কাজ? তাছাড়া আর কিছু করবার নেই?

হেনার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ উষ্মার আভাস পেয়ে সদাশিব হেসে ফেললেন, সেটা কি কম কাজ হল রে পাগলী? তোরা যে অন্নপূর্ণা, যাঁর কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং দেবাদিদেব। সুজাতার অন্ন না পেলে সিদ্ধার্থ কোনো দিন বুদ্ধদেব হতে পারতেন না।

হঠাৎ শম্ভুর আবির্ভাব হতেই সদাশিব উঠে পড়লেন। যেতে যেতে বললেন, আচ্ছা, তোমরা কথা কও। আমি অফিস-ঘরটা ঘুরে আসি। রাধামাধব!

সেই সনাতন নারী-বন্দনা। এই জাতীয় স্তুতিবাদ শুনেই যে-সব মেয়েরা বিগলিত হয়ে পড়েন, হেনাকে ঠিক সে-দলে ফেলা যায় না। তবু, এ-সব নিয়ে সত্যি সত্যি তর্ক করবার মত কোনো ইচ্ছাও তার ছিল না। তাই বিকাশের দিকে ফিরে হালকা সুরেই বলল, আপনিও কি বাবার সঙ্গে একমত? মানে, মেয়েরা শুধু হেঁসেল আগলে থাকবে, আর কোনো কাজেরই তারা যোগ্য নয়?

এর উত্তরে বিকাশের কাছ থেকেও একটা হালকা ধরণের পরিহাসই আশা করেছিল। কিন্তু অবাক হয়ে গেল তার মুখের দিকে চেয়ে। এতখানি গম্ভীর হতে তাকে কখনো দেখা যায়নি। খানিকক্ষণ সুমুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল বিকাশ, পাঁচ বছর আগে হলেও আমি তোমার মতে সায় দিতাম, হেনা! মহা উৎসাহে বলতাম, কে বললে, মেয়েরা শুধু ঘর আগলে পড়ে থাকবে? বাইরেও তাদের চাই। জীবন-সংগ্রামের প্রতি ক্ষেত্রে তারা পুরুষের সতীর্থ, শুধু মত কেন, এই আদর্শ নিয়েই আমরা কাজ করে এসেছি। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের এমন কত মেয়েকে আমাদের এই রক্তের পথে টেনে নামিয়েছি, যারা একদিন বিয়ে থা করে আদর্শ গৃহিণী হতে পারত। কতজনকে আমি এই হাতে পিস্তল ছুঁড়তে শিখিয়েছি। শিখিয়েছি, কি করে সে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে মানুষের বুকে। তার পরীক্ষাও তারা দিয়েছে। এতটুকু বুক কাঁপেনি, এতটুকু হাত টলেনি। দয়া নেই, করুণা নেই, নির্মম, কঠোর গর্ব করে বলেছি, আমাদের শাস্ত্রে নারীকে যে 'শক্তি' বলে, এই হচ্ছে তার রূপ। এই তার পরিচয়। নারীত্ব মানে কোমলতা নয়। কোমলতার আর এক নাম দুর্বলতা, তারপর—

এই পর্যন্ত এসে একবার হেনার দিকে চোখ ফেরাল বিকাশ। দেখল, সে নীরবে কিন্তু প্রদীপ্ত আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার সুরু করল, তারপর, একদিন এমন একটি মেয়ে দেখলাম, যার রূপ একেবারে আলাদা!

—আপনাদের পার্টির মেয়ে? প্রশ্ন করল হেনা।

—না, পার্টির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

—তবে?

—সেই কথাই বলবো। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল যে। হেনা বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, একটু বসুন, আমি আসছি।

যেখানটায় বসে ওরা কথা বলছিল, তার খানিকটা দূরে উঠোনের কোণে ছিল একটা তুলসী-মঞ্চ। বেদিটা পরিপাটি করে গোবর দিয়ে নিকানো। হেনা ঘরে গিয়ে চট করে কাপড়খানা বদলে ফেলল। তারপর ভাঁড়ার-ঘর থেকে একটা মাটির প্রদীপ জ্বেলে হাতের আড়াল দিয়ে সন্তর্পণে নিয়ে গেল তুলসী-তলায়। বেদির উপর রেখে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল তার নিচে। তারপর ফিরে এসে বসল আবার নিজের জায়গায়। বিকাশের দিকে চেয়ে বলল, বলুন এবার—

বিকাশের একাগ্র দৃষ্টি এতক্ষণ তাকে অনুসরণ করে ফিরছিল। এবার তার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলল, ভারী ভালো লাগল তোমার ঐ তুলসী-প্রণাম।

—ভালো লাগল! বিস্ময় প্রকাশ করল হেনা, কিন্তু আপনার তো এসব ভালো লাগা উচিত নয়।

—তা বটে! কোনটা যে কখন কার উচিত, আর কোনটা উচিত নয়, সে কথা যদি আগে জানা যেত! যাক সে সব। যা বলছিলাম শোনো—

যথেষ্ট হাতিয়ার-পত্তর না থাকায় আমাদের কাজের বড্ড অসুবিধা হচ্ছিল। এমন সময়ে মফঃস্বলের কোনো এক রাজবাড়িতে বেশ কিছু মালের খোঁজ পাওয়া গেল। গোটাচারেক রাইফেল, দুটো রিভলভার, আর দোনলা বন্দুক, তাও সাত-আটটা। জিনিষগুলো রয়েছেও একটা ঘরে। দেখবার বিশেষ কেউ নেই। ভৃত্য নিত্য ধুলো ঝাড়ে—এই পর্যন্ত। এক বুড়ো দারোয়ান ফটক আগলায়, সেও দেখতে নেহাৎ তুলসীদাস মার্কা পণ্ডিতজী। কিন্তু সময় কালে দেখা গেল, লোকটা রীতিমত বেরসিক। কাজ সেরে বেরোবার মুখে

গুলী চালিয়ে বসল। আমরাও জবাব দিলাম। ফল—ওদের একজন খতম, আমাদের একজন জখম। তাকে ঘাড়ে তুলতে হল। মাইল খানেকের মধ্যে থানা। জন দুই দারোগা দলবল নিয়ে ছুটে এল। তার আগেই আমাদের দল এবং মাল দুই-ই নিরাপদে নৌকোয় পৌঁছে গেছে। বোঝা নিয়ে পড়ে রইলাম শুধু আমি। ভাগ্যিস একটা জঙ্গল ছিল কাছাকাছি। তাও বিশেষ ঘন নয়। ঢুকে পড়লাম তারই মধ্যে। আশে-পাশে গুলীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। বন্ধুর জ্ঞান নেই, গতরটাও বেশ ভারী! তবু ছুটতে হচ্ছে। যে মুহূর্ত্তগুলো আসছে, বুঝতে পারছি, তার যে-কোনোটাই হবে আমার শেষ মুহূর্ত্ত। হঠাৎ ঠিক কানের কাছে দুম করে ফেটে পড়ল রাইফেলের গুলী। মনে হল মাথাটাই বুঝি উড়ে গেল। মিনিট খানেক পরে দেখলাম, সেটা আমার মাথা নয়, আমার বন্ধুর মাথা। আর বয়ে নিয়ে কী লাভ? রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে নামিয়ে দিলাম। শেষ বারের মত একবার তাকাতে চেষ্টা করলাম তার মুখের দিকে। অন্ধকারে কিছু ঠাহর হল না। সেই মুহূর্ত্তে গর্জে উঠল ভাঙ্গা গলা—'হ্যাণ্ডস আপ' দু'দিকে দুই যমদূত। একজনের হাতে রাইফেল, আর একজনের রিভলভার।

রাত্রের মত আশ্রয় পেলাম থানার হাজতে। দুর্গন্ধ স্যাঁৎস্যেঁতে ঘর। বিছানার ব্যবস্থাও ছিল। কোণের দিকে গোটানো একটা ছেঁড়া কম্বল। সেদিকে আর লোভ করলাম না। চিৎ হয়ে পড়লাম মেঝের ওপর। ভারী আরাম লাগল। দেখতে দেখতে ঘুমিয়েও পড়লাম।

—দিব্যি নাক ডাকিয়ে, কি বলেন? ব্যথা-তিক্ত স্বরে বলে উঠল হেনা।

তা ডেকেছিল নিশ্চয়ই, তবে আমি শুনতে পাইনি।

হেনা আর কিছু বলল না। তার মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে সুরু করল বিকাশ—

ঘুমের মধ্যেই মনে হল কে যেন ঠেলছে। চোখ মেলে দেখি কালো মত একটা লোক। দরজা খোলা। একটু একটু জ্যোৎস্না এসে পড়েছে মেঝের উপর। লোকটা চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলল, উঠে আসুন। প্রথমটায় মনে হল স্বপ্ন দেখছি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। এবার সে আমার হাত ধরে তুলবার চেষ্টা করল। তাড়া দিয়ে বলল, কী করছেন! উঠে পড়ুন। কলের পুতুলের মত উঠে এলাম। বাইরে এসে কোনো রকম শব্দ না করে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। তারপর আমাকে একটা ইসারা করে নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে। নবকুমারের মত আমিও তার পেছু নিলাম। খানিকটা এসে বলল, দাঁড়ান, চাবিটা দিয়ে আসি। বলেই, এগিয়ে গেল একটা বাড়ির পেছন দিকে। দেখলাম, কে একজন দাঁড়িয়ে আছেন খোলা জানালায়। হাতে একটা হারিকেন। তারই অস্পষ্ট আলোয় বোঝা গেল, স্ত্রীলোক। চাবিটা ওর হাত থেকে নিয়ে আলোটা তুলে ধরলেন, এবং আমার দিকে চেয়ে ডান হাতখানা নাড়তে লাগলেন। চলে যাবার ইঙ্গিত। লোকটা কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, কে উনি?

—চলুন; পরে বলছি, বলে জোর পায়ে এগিয়ে চলল নদীর দিকে। চলতে চলতে আমি একবার পেছন ফিরে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ব্যস্ত হয়ে আরো ঘন ঘন হাত নাড়তে লাগলেন।

হারিকেনের মৃদু আলোয় মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল না। সেখানে কী ছিল জানি না। কে তিনি, সে আর কেউ না, কোন দিন যাকে চোখের দেখাও দেখেনি, তার জন্যে কেন তাঁর এই ব্যাকুল উদ্বেগ, তাও ভেবে দেখবার সুযোগ পাইনি। সেই মুহূর্তে শুধু মনে পড়েছিল মাকে, সেই কোন্ ছেলেবেলায় যাঁকে হারিয়ে এসেছি, তার পর একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। আর মনে পড়েছিল অনেক দিন আগে পড়া রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা 'কল্যাণী'। কবিতাটা বোধ হয় এই রকম কাউকে দেখেই লিখেছিলেন কবিগুরু। মহাকবির সঙ্গে মনে মনে আবৃত্তি করলাম তার শেষ দুটি ছত্র—সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান, আছে তোমার তরে।

অন্ধকার ঘাটে ছোট্ট একখানা ডিঙি নৌকা অপেক্ষা করছিল। উঠে বসতেই আমার সঙ্গী প্রাণপণে বৈঠা চালিয়ে দিল। খানিকটা যাবার পর আমার সেই আগের প্রশ্নটা আবার জিজ্ঞেস করলাম, উনি কে বললে না তো

—দারোগাবাবুর পরিবার।

শুনে শুধু তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার কথা আর মনে রইল না। মাঝি নিজেই বলে গেল অনেক কথা। এক সময়ে সে ঐ দারোগাবাবুর বাড়িতেই কাজ করত। বছরখানেক আগে বানএ যখন তার ঘর-বাড়ি ভেসে যায়, ঐ মাঠানের দয়াতেই কোনো রকমে বেঁচে ছিল ছেলেপিলে নিয়ে। মাঠানের জন্যে ও প্রাণ দিতে পারে। আজ রাতে একজন 'স্বদেশী' ডাকাত ধরা পড়েছে শুনতে পেয়ে তিনি ওকে ডাকিয়ে আনেন। ও-সব খোঁজ খবর যোগাড় করে এতক্ষণ লুকিয়েছিল কাঠ-ঘুঁটের ঘরে। তারপর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে মাঠান দারোগাবাবুর বালিসের তলা থেকে চাবি বের করে ওর হাতে দিয়ে হুকুম করলেন, "বাবু যেখানে যেতে চায়, পৌঁছে দিয়ে তবে তোর ছুটি।" খানিকটা নিঃশব্দে বৈঠা চালিয়ে আবার বলল মাঝি, আপনি তো বেঁচে গেলেন, বাবু! মা-ঠানের কপালে কী আছে কে জানে? আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

—দারোগাবাবু মানুষটা বড় গোঁয়ার। তারপর মদ-টদ খায়। সে বার এক স্বদেশী বাবুর জন্যে হাজতঘরে খাবার পাঠিয়েছিলেন মাঠান। জানতে পেরে কী মারটাই না মারলে! আমার নিজের চক্ষে দেখা।

মনে আছে, আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, নৌকো ফেরাও। মাঝি কথাটা কানে তুলল না, একটু ব্যস্ত হতেও দেখলাম না, হেসে বলেছিল, তাহলে আমার অবস্থাটা কী হবে, ভেবে দেখেছেন, বাবু?

বিকাশের কাহিনী শেষ হল। তারপরও অনেকক্ষণ ওরা নিঃশব্দে বসে রইল সেই বারান্দার অন্ধকারে। একটা আলো জ্বালবার কথাও কারো মনে হল না। আফিস-ঘর থেকে সদাশিব বাবুর বেরোবার সাড়া পেয়ে বিকাশ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার যেতে হয়। আর দেরি করলে, আমার দারোগা সাহেব মনে করবেন, তার আসামী ভাগলবা। হেনাও উঠে পড়ে বলল, মহিলাটির আর কোনো খবর নেননি?

সে সুযোগ আর পেলাম কৈ? ক'দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেলাম। তারপর পাঁচ বছর জেল। ছাড়া পেয়েই ইন্টারনীর পরোয়ানা। চলে এলাম তোমাদের দেশে। [ক্রমশঃ।
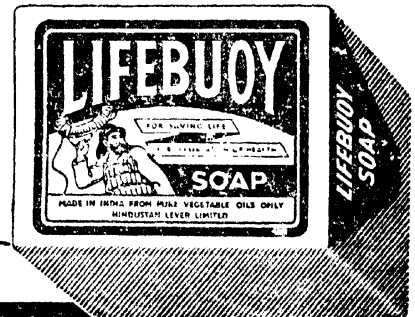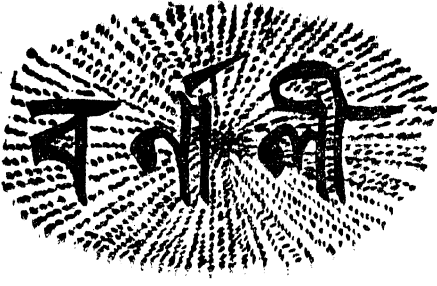
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

সুদর্শন এসে বাড়ীটাকে যে উৎসব-বাড়ীতে পরিণত করে দিয়ে গেল, সে চলে যাওয়ার পরও তা যেন মিলাতে চাইলো না। মনে হতে লাগলো বিয়ের পর মৌরী যেদিন চলে যাবে, সেদিন আর সম্ভব হবে না বাড়ীটার পক্ষে উৎসব করা। আর সেদিনই দু' চোখ ভরা বিদায়-অশ্রুর ভেতর এর রেশ মিলাবে, তার আগে নয়।

যতীন বাবু তো আনন্দে পাখা মেলে দেওয়া যাকে বলে, যেন তাই দিলেন। ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারেন না, চেষ্টাও করেন না। কেনই বা করবেন ? জীবনে চাপতে না পারার মতো আনন্দের দেখা ক'বার মেলে ! উথলে পড়ে যাওয়ার অপচয় ভয় তো আর নেই—তবে আর কি। বাজার করে, একে-তাকে আত্মীয়-বন্ধুকে ডেকে খাইয়ে, মেয়েদের নিয়ে ছবি দেখে, এখানে-ওখানে বেড়িয়ে প্রতিদিন একটা নয়তো আর একটা কিছু জুড়ে দিয়ে জাগিয়ে রাখতে লাগলেন তিনি বাড়ীটাকে। অটুট স্বাস্থ্য। গর্বের সঙ্গে চলেন, বলেন, হাঁটেন। সব চাইতে বড় কথা আশাই যদি গতি আর জীবন হয়, তবে তিনি এখনও জীবন-যৌবনে পূর্ণ। বহু আশা তার। 'ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা' ও-জাতীয় কথা তাঁর কাছে নিছক কাব্য। সব চাইতে আগে চাই ধন। আর ধনের সঙ্গে মান তো বিংশ শতাব্দীর গাঁটছড়া বাঁধা। আর ও-দুটো থাকলে—খাতির আর ভালোবাসা ? ঘরে-বাইরে, দেশে-বিদেশে কোথায় নেই ?

স্বাধীনতার পর কত কি ঘটে যাচ্ছে। আজ যে কেউ নয়, কাল সে একজন কেউকেটা। যার নাম কেউ কোন দিন শোনে নি, কাল তার নাম কাগজের কলমে-কলমে। এ, ও, সে নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থ-কর্ম। কে তারা, কি গুণ, কোথায় দক্ষতা। অদক্ষতার দক্ষযজ্ঞে লণ্ডভণ্ড হচ্ছে দেশ। শিব সতীর জন্য যে প্রলয়নৃত্য করেছিলেন, সত্য আর মনুষ্যত্বের জন্য সেই নৃত্যপ্রলয় তার শুরু হলো বলে। তার আগে কিছু গুছিয়ে নিতে হবেই। কি বা কঠিন। গুণ নয় জ্ঞান নয়, শক্তি নয়—'একজন কেউ' হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন তো শুধু 'একজন কেউ' হয়ে ওঠা ব্যক্তির পিছু ঠেলা। এমন দুটো হাত খুঁজে বের করা, যার হাতের ইঙ্গিতে চললে ঐ চেয়ারগুলোর নাগাল ধরা যায়। আর তার প্রাথমিক প্রয়োজন টাকা—প্রচুর টাকা। তারপর শতকরা একজনও শিক্ষিত নয়-এর দেশে ভোটের জয়যাত্রা।

অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেন যতীন বাবু, পত্রিকার পাতায় বাজেট আর বার্ষিকী পরিকল্পনার মোটা মোটা অঙ্ক পড়ে। সোনা-গলা স্রোত—সুবর্ণ সুযোগ সব সোনা-গলা স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। যারা পাড়ি জমাতে পারছে, পারানির কড়ি তারা নিঃশেষ করে আনন্দ বলে আর কিছু দিন বাদে দেশটায় অবশিষ্ট থাকবে শুধু এঁদের উচ্ছিষ্ট কিছু ভিক্ষাপাত্র। যদি না এখনও এ চক্রে মাথা গলাতে পারেন তবে তার হাতেও উঠবে তারই একটি। অনুপায় অধৈর্য্যে দেয়ালে মাথা ঠোকার ইচ্ছাটা কেবল কাজে পরিণত করা বাকী রাখেন তিনি।

স্ত্রীকে খুশী করতে গিয়ে তার ভাইকে করার বদনাম মানুষের থাকলেও যতীন বাবুর ভগিনীপতিকে সে অপবাদ শত্রুও দিতে পারবে না। এমন কাউকে তিনি কখনই কিছু করেন না, যাকে দিয়ে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি না হয়। ওখানে বড় আঘাত পেয়ে অভিমান বশেই চুপ করে গিয়েছিলেন যতীন বাবু। কিন্তু এবার আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন তিনি। সরকারী দপ্তরটাকে পকেটে ভরার টাকা সুদর্শনের বাবার আছে—তাই ওটা তার পকেটে। দু'বার হাতে ফোনটা তুলে নেওয়া ; সুদর্শনের মতোই শক্ত চিবুকে, চাপা ঠোঁটে দু-একটা কথা বলা, তাও পুরোটা নয়—আভাস দিয়ে ছেড়ে দেওয়া—তারপর কি না সম্ভব। সাধনায় নিষ্ঠা থাকলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য—একথা বিশ্বাস করার মতো দিন তার কাছে পায় পায় এগিয়ে আসছে।

আর এ বাড়ীর গিন্নী সম্বন্ধে সব চাইতে বড় কথা তিনি নেই। আর এ না থাকাটা দিয়েই তাকে এ উপাখ্যান থেকে দূরে রাখবো। নইলে তাকে অস্বীকার করা সম্ভব হতো না। গল্পের টানটাই বইতে চাইতো উল্টো উজানে। কিন্তু গল্পের বাইরে রাখাই তো আর মনের বাইরে ফেলে দেওয়া নয়। বাড়ীর সবার মনে তিনি বেঁচে আছেন। ছেলে-মেয়েদের মনে যেটুকু বেঁচে আছেন সেটুকুই সত্যিকারের বাঁচা—সত্য চেহারার বাঁচা। যতীন বাবুর কাছে আছেন আতঙ্ক আর অশান্তির আধার হয়ে। একের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অপরের আশা আকাঙ্ক্ষার মিল কোন দিন হয়নি। কোন দিন পছন্দ হয়নি একের কাজ একের চলা অন্যজনের কাছে। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটো মন। সংঘর্ষে সংঘর্ষে আহত হতে হতে সম্পর্কটাই তাদের গিয়েছিল মরে। মৃত মানুষ আর মৃত সম্পর্ক—দুটোর সমান ওজন ; বয়ে চলা সমান নিরর্থক। তবু যদি তাই চলতে হয় তবে তার যে ক্লান্তি, যে অবসন্নতা—মৌরী দেখেছে মার চেহারায় তা এসে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, সংসারটাকে তিনি ভালোবাসতেন—সে আশ্চর্য্য ভালোবাসা। সন্তান, সংসার, ঘরবাড়ী এমন কি আসবাব পত্র থেকে ধূলিকণা পর্য্যন্ত। একটা সুন্দর সংসার—প্রেমে, ভালোবাসায়, হৃদ্যতায় ভরা। এর চাইতে বড় কাম্য তার কিছু ছিল না। স্বামীর সঙ্গে ব্যর্থ হয়ে সে রচনায় বসেছিলেন তিনি সন্তানদের নিয়ে। এ বাসনা তার পূরতো কি পূরতো না তার সময় আসবার আগেই তাকে চলে যেতে হয়েছে। মৌরী ভাবে ভালোই হয়েছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ কালগুলো যাকে কিছুই দেয়নি, পরের জন্য এমন কি উপহার আর সে সাজিয়ে রেখেছিল ! দরকারটাই বা কি ! বাঁচবার দিনগুলো যাকে মরে থাকতে হলো, মরবার দিনগুলোর জন্য তার বসে না থাকলেও চলবে।

মঞ্জুর স্বভাবটা সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো। যে বাধা সে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে না তা যায় উছলে পার হয়ে। বাবাকেও সে পার হয়ে

যায় উচ্চলে। কিন্তু সহ্য হতে চায় না মৌরীর। সুদর্শন এসে যাওয়ার পর থেকে বাবা যা আরম্ভ করেছেন তা ওর কাছে দস্তুর মতো পীড়াদায়ক। তবু নরম থাকতে চেষ্টা করে—সব সম্পর্কই বাঁচিয়ে রাখবার পেছনে কিছু না কিছু চেষ্টা রাখতে হয়। সে চেষ্টাই করে মৌরী।

শুধু কি মেয়েই করে? বাবাও করেন। মৌরীর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা একেবারে মিলিয়ে ফেললেন তিনি। এমন কি, বাসুদেবের জন্য মেয়ে দেখে এসে ওরা যখন জানালো ঐ মেয়েই ওদের পছন্দ—এক কথায় হাসিমুখে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা এতো সহজ ছিল না তার কাছে। অবস্থার চাইতে বড় তার কাছে কিছু নেই। অমিতাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন যা অমিতারই জন্য কিন্তু যতীন বাবুর গ্রহণ করার পেছনে ছিল তার অবস্থা। সেখানটায় ছেড়ে দেওয়া তার কাছে মস্ত দেওয়া কিন্তু উপহার দেওয়া আর ভেট দেওয়া তো এক বস্তু নয়। বাবার সমস্ত ব্যবহারে যেন একটা ভেটের উগ্র গন্ধ—মুখ ফেরাতে ইচ্ছে করে মৌরীর কিন্তু ফেরায় না। বরং খুসী হয়েছে, এ ভাবটাই মুখে ছলছলিয়ে তোলে।

সে দিন এক বন্ধুর বাড়ী জন্মদিনের নেমন্তন্ন ছিল মঞ্জুর। সেখান থেকে বাড়ী ফিরলো যেন সে উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে। ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারটায় বসে পড়ে বললো—দিদি, একেবারে আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনে এলাম।

বই পড়ছিল মৌরী। চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো—কোথায়?

—বন্ধুর বাড়ী। উঠে বসল মঞ্জু। বললো—জানিস, ছোড়দার জন্য যে মেয়ে দেখেছি আমরা, সেই মেয়ে রত্নার বোন।

—তাই! আশ্চর্য্য হয় মৌরীও। তারপর বলে—কিন্তু এর ভেতর উপন্যাস কোথায়?

—ভেতরের গল্পে। আমি একটু আগেই গিয়েছিলাম। তখনও অন্য বন্ধুরা কেউ আসেনি। রত্নাকেও নানা কাজে বার বার ওঠাউঠি করেত হচ্ছে, তাই ও আমায় ওদের ফটো এ্যালবাম হাতে দিয়ে বললে, এটা একটু নাড়াচাড়া কর। আমার হয়ে গেল বলে। বসে বসে তাই করছিলাম। হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম ওদের এ্যালবামে আমাদের ভাবী বৌদির ছবি দেখে। রত্না এলে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ভদ্রমহিলা তোদের কে হন রে? ও ভাবলো কৌতূহলটা আমার সুন্দরের প্রতি। বললো, ভারি সুন্দর দেখতে নয়?

বললাম—সুন্দর তো নিঃসন্দেহে। কিন্তু কে? বন্ধু?

—না, ও আমার মাসতুতো বোন মমতা। আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—মমতা তোর মাসতুতো-বোন?

বেশ তো!

বিস্মিত হলো রত্নাও। বললো—তুই চিনিস নাকি ওকে?

বললাম—উনি যে আমাদের ছোড়দার নির্বাচিত বধূ রে রত্না! তোর বোন! বেশ মজা হলো তো—বেশ খুসী লাগছিল রত্নার বোন হয় শুনে। সেই খুসীতে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হলো, উৎসাহটা এক তরফা। ও-পক্ষ একেবারে চুপ। এমন কি চোখে পড়ার মতো গম্ভীর।

ভুরু যবিয়ে তুলে মৌরী জিজ্ঞাসা করল—এর কারণ?

—আমিও সেটাই জিজ্ঞাসা করতে যাবো, ঢুকলো এসে হৈ-চৈ করে অন্য বন্ধুরা। তখনকার মতো চুপ করে যেতে হলো। কিন্তু ব্যাপারটা কি! রত্না কথাটা শুনে অমন গম্ভীর হয়ে গেল কেন? ওর মা কত বার আসা-যাওয়া করলেন, সামনে বসে খাওয়ালেন—রত্না তাকেই বা খবরটা বললো না কেন? তবে কি এটা ওদের কাছে সুখবর নয়? কেন নয়! কি অস্বস্তি—

—গল্পটাকে আর একটু ফাঁপিয়ে করা যায় না?

মাথা নাড়লো মঞ্জু। তা যায়।

—আচ্ছা করছি। ওর এক মাসিমা থাকতেন ঢাকায়। পাকিস্থান হওয়ার পর ওর মা বোনকে ঐ বয়সী মেয়ে নিয়ে ওখানে থাকতে নিষেধ করে লিখলেন তার কাছে চলে আসতে। মেসোমশাই বড় ছেলেকে নিয়ে সেখানেই রইলেন; মাসিমা মেয়ে নিয়ে এসে উঠলেন ওদের কাছে। গল্পটার সুরু এর পর থেকে। ওর কাকা ভালোবাসলেন বৌদির বোনকে—অর্থাৎ মমতাকে।

—তারপর?

—তারপর যে কাকা বিয়ের কথা বললে 'পাগল' বলে হেসে উঠতেন, সেই কাকাই পাগল হয়ে উঠলেন মমতার জন্য। ওদের বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য বসে থাকেন, সিনেমার টিকেট আনেন, হাত ভরা উপহার দেন দু'জনকে। মমতা বেরুতে না চাইলে সেদিন তাঁরও সন্ধ্যায় বেরুনো যায় বাদ পড়ে—বুঝতে বাকী রইলো না কারু। অসম্ভব খুসী হয়ে উঠলেন মমতার মা। এমন পাত্র তাঁর কল্পনার বাইরে। একে বড় লোক তাতে বড় চাকুরে। খুসী হলেন রত্নার মা-ও। ঘর-বাড়ী সংসার ফেলে আসা দুঃখী বোনের সুখে কেনই বা তিনি বাদ সাধতে যাবেন! কিন্তু বাদ সাধলো পাত্রী নিজে। যাও বা ওদের সঙ্গে বেরুতো, গল্প করতো, কাকা উপহার টুপোহার এনে দিলে রত্নার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে নিতে —তাও দিল বন্ধ করে। বুঝলি দিদি, রত্না বলে—যেমন শান্ত তেমনি ধীর—কথা একরকম বলেই না, বেরোয় না প্রয়োজন ছাড়া ঘরের কোণ থেকে, কিন্তু আশ্চর্য্য—ওরা ওকে অনুগ্রহ করে আশ্রয় দিয়েছে না ও-ই অনুগ্রহ করে ওদের কাছে আছে, সেটা যেন এক এক সময় খটকা লাগতো রত্নারই। রাগে শরীরে জ্বালা ধরতো নাকি ওর। কিন্তু ও পক্ষ এমন বরফের মতো ঠাণ্ডা যে ওর কাছে গেলে ফ্রিজিং পয়েন্টে নেবে আসতেই হবে। সে যাই হোক—একেবারে বেঁকে বসল সে। বিয়ে এখন কিছুতেই করবে না। মাসি জেদ ধরলো করতেই হবে। জেদটা তার গিয়ে দাঁড়ালো প্রায় অত্যাচারে। মমতার মার মুখ শুকিয়ে উঠলো ভয়ে। এমনি সময় হঠাৎ একদিন আর বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া গেল না মমতাকে।

—এ্যাঁ। বিস্ময়ে শব্দ করে উঠলো মৌরী। সঙ্গে যেন আরো একটা গলা।

অমিতা যে কখন এসে কোণে বসেছে, ওরা দু'জনের কেউ তা দেখেনি। সে-ও কোন কথা বলেনি। তার বিয়ের পেছনেও গল্প আছে, লজ্জার কথা আছে, লুকোবার মতো ঘটনা আছে। নিজের জীবনের কথা ভুলে সে কখনই অপরের ঘটনার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে না—হৃদয় শূন্য মতামত প্রকাশ করে না। এই এটাও শুধু বিস্ময়ের ভ্রূকম্প। মতামত নয়!

মঞ্জু বললো—মা বিছানা নিলেন। তার করা হলো ঢাকায়

ওর বাবা দাদার কাছে। রত্নার মা রাগে ক্ষোভে উঠলেন নিষ্ঠুর হয়ে।

—ওর কাকা? কৌতূহলে ভেঙ্গে পড়ে জিজ্ঞাসা করলো অমিতা।

—খবরটা শুনে যেন জমে গেলেন। এমন জমে বসে থাকতে ও কাকাকে কখনো দেখেনি। ওর কাকা নাকি অত্যন্ত আমুদে আর চঞ্চল প্রকৃতির। বেচারীর মুখ একেবারে কালো হয়ে উঠলো। একটু হেসে ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললেন—কি করুণ অবস্থা! বিয়ে করতে বললে কনে পালায়—অদৃষ্টে এ-ও ছিল রে রত্না! নাঃ, এমন নাটকের নায়ক হতে হবে কখনো ভাবিনি।

—কিন্তু এমন জোর আপত্তির কারণটা কি—বললো না রত্না? অমিতা জিজ্ঞাসা করে।

—রত্না বলে সেটা ওর কাছেও রহস্য। এর কারণ ও নিজেও বুঝে উঠতে পারেনি। ওর কাকা অবরণীয় পাত্র নয়। এত দিন ভেবেছিল মমতা নিশ্চয়ই অন্য কাউকে ভালোবাসে। আজই বুঝলে সেটাও ঠিক বোঝা নয়।

—আচ্ছা তারপর?

—তারপর যখন কোথাও খোঁজ মিলল না, তখন শেষ পর্য্যন্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাটাই সবাই ভাবছে; এমনি এক সন্ধ্যায় চায়ের ট্রে হাতে এসে সবাইকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে ঘরে ঢুকলো মমতা। রত্না বলে তখনকার ঘরের অবস্থাটা ওর সাধ্য নয় বর্ণনা করা। মাসিমার সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে মেয়ে ফিরে পাওয়ার আনন্দ। সে আনন্দে কাঁপছেন তিনি। কাকার মুখ উঠেছে সাদা হয়ে। সাদা ঠোঁট দুটো শুধু পুরুষ মানুষ বলেই হয়তো কাঁপছে না। মা কাঁপছেন রাগে। আর আমি মাকে চিনি—কি যে ঘটিয়ে তুলবেন সেই ভয়ে। কিন্তু যার জন্য এক ঘর লোক সবার ভেতরটা কাঁপছে, এক কাঁপছে না সে। যার জন্য একঘর লোকের সবার ভেতরে ঝড় বইতে সুরু করেছে, এক শান্ত সে। যেন বরাবরের কাজ করে যাচ্ছে ঠিক নিয়মে। যেমনি ট্রে থেকে তুলে তুলে চা ধরে দিত সবার হাতে, ঠিক তেমনি দিচ্ছে আজও। নিলাম সবাই কাকা, আমি, মাসিমা। নিলেন না মা। ও জানতো ওখানেই ঝড়টা আরম্ভ হবে। তাই সব চাইতে শেষে গিয়েছিল মার কাছে। উত্তেজনায় মার তখন শরীর থেকে সুরু করে মুখের চিবুক পর্য্যন্ত কাঁপছে। নিজেকে শান্ত করতে একটু সময় নিলেন তিনি। তারপর বললেন—কোথায় গিয়েছিলে? কাকা উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। হয়তো এই অপ্রিয় ব্যাপারটা এড়াবার জন্য। মাসিমা ভীরু মিনতি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মার দিকে।

হাতের কাপটা ট্রের উপর রেখে কৌচে গিয়ে বসল মমতা। তারপর জবাব দিল—চাকরীর খোঁজে।

—পেলে?

—পেয়েছি।

—পেয়েছ? স্তম্ভিত মা, স্তম্ভিত আমরা। একটু সময় মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মা বললেন—বি, এ এম এ সব রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আর তোমার গিয়ে দাঁড়াতেই চাকরী জুটে গেল? কাজটা কে দিলো, কি কাজ দিলো? অপেক্ষা করেও উত্তর না পেয়ে চেঁচিয়ে ধমকে উঠলেন—জবাব দিচ্ছ না কেন?

—পাশ করার দরকার হয়, তেমন কাজ পাইনি।

—তোমার চাকরীটার দরকার বুঝি রূপের? ঘৃণায় তাঁর ঠোঁট বেঁকে উঠেছে।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মাসিমা। মমতা বসে রইল স্থির ভাবে কোলের ওপর হাত রেখে।

দাঁতে দাঁত ঘষে মা বললেন—এটা জান তো, রূপ দেখিয়ে কাজ নিলে ওটা দিয়েই তার মূল্য দিতে হয়।

উঠে দাঁড়ালো মমতা। আর ক্ষিপ্তর মতো মা গিয়ে দাঁড়ালেন পথ আগলে—উঠলে যে?

—যাবো।

—যাবে? আচ্ছা যাওয়াচ্ছি তোমায়। কাঁপতে কাঁপতে মমতাকে কৌচের দিকে ঠেলে এক রকম ফেলে দিয়ে আমাকে হাত ধরে টেনে বের করে এনে দরজায় তালা লাগালেন মা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—শক্তি থাকে তো যাও এবার। সবাই তোমার মা নয়। দুষ্ট ঘোড়া শায়েস্তা কি করে করতে হয়, তা আমি জানি।

আলমারীর মাথা থেকে ট্রাঙ্ক স্যুটকেশটা টেনে নামিয়ে তাতে জামা-কাপড় ঠাসছিলেন কাকা, সামনে এসে দাঁড়ালো রত্না—এ কি করছো?

—এবার আমিই পালাচ্ছি।

সবিদ্রূপে রত্না বললে—বাঃ, চমৎকার!

ওর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে কাকা মুখ তুলে ঠোঁটের একটা ধার দাঁত দিয়ে চেপে ছেলেমানুষের মতো আবেগ সামলালেন। তারপর বললেন—একটা লোককে আচমকা ঠেলে রঙ্গমঞ্চে তুলে দিয়ে পালানো ছাড়া আর কি করতে পারে সে?

তাকে থামাতে মুক্তি দিতে হলো মমতাকে। নিজেদের বর্বরতার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন কাকা হাতজোড় করে মমতার কাছে। কি যেন বলতে গিয়েছিল মমতা কিন্তু বললো না। আর এই প্রথম রত্না দেখলো মমতার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। চলে গেল মমতা। কিছু দিন বাদে মেসোমশাই এসে কলকাতায় বাসা করে নিয়ে গেলেন মাসিমাকে। তারপর থেকে আর কোন যোগাযোগ নেই ওদের সঙ্গে রত্নাদের। সম্পর্কটাই উঠে গেছে এক রকম। মা ওদের নামও উচ্চারণ করেন না। রত্নাও ক্ষমা করে নি মমতাকে। সে তার কাকাকে ভালোবাসে। এমন অহেতুক অনাদর ওকেও আঘাত করেছে।

—এসব কত দিন আগের ঘটনা? অমিতা জানতে চায়।

—দু' বছরের বেশী নয় নাকি।

—কাকা এখনও বিয়ে করেন নি?

—না। কিন্তু করবেন রাজী হয়েছেন। কিন্তু সুন্দরী মেয়ে যেন কিছুতেই না হয়—এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

—বাঃ, এ তো হবে চোরের উপর রাগ করে পাতায় ভাত খাওয়া।

—তা হয়তো হবে। কিন্তু একবার ভেবে দেখো, অমন চোরের উপর রাগ করে যদি দেশশুদ্ধ সবাই পাতায় খেতে শুরু করতো, তবে এত দিনে সব চোর সাধু হয়ে যেতে বাধ্য হতো কি না।

কথা বললো না মৌরী—একটিও না। করলো না কোন মন্তব্য। যে বইটা পড়ছিল, সেটাই আবার তুলে নিল হাতে। যেন একটা বই শেষ করে আর একটা বই হাতে তুলে নিল—তার বেশী কিছু নয়।

[ক্রমশঃ।

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে তারা ফুটছে—একটা—তুটো—তিনটে—

পশ্চিম দিগন্তের কোল থেকে এখনো মিলিয়ে যায়নি বিক্ত নিঃসঙ্গ দিনমানের দীর্ঘ ক্লান্তির রক্তিম আবেশ। হাওয়া থেমে গেছে—নীড়ে ফিরেছে পাখিরা। ছায়া নেমে আসছে পুবের আকাশ থেকে। স্তব্ধ মৌন প্রকৃতির এই অপরূপ শান্ত পরিবেশটি ধূসরায়মান সন্ধ্যার স্বপ্ন নিয়ে যেন যাত্রা করেছে রাত্রির গভীরে।

ছাদের উপরে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঐ দিকে চেয়েছিলেন ফাদার সাইমন। একটু আগেই যে এক সার বলাকা দ্রুতপক্ষের দীর্ঘছন্দে দিগন্তের পারে কোথায় মিলিয়ে গেলো, বোধ হয় সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিলো তাঁর শ্রান্ত দৃষ্টি। বসবার ভঙ্গিতে শাদা আলখাল্লার রেখায় যেন এক বিবশ ক্লান্তির নিদর্শন ফুটে উঠেছে। অলস ভাবে হাত দু'খানা বুকের উপর সংবদ্ধ রেখে আকাশে তারা ফোটা দেখছিলেন ফাদার সাইমন।

ফাদার সাইমনের বয়স হয়েছে ষাটের উপর। চুল শাদা হয়ে এসেছে অনেকখানি। দীর্ঘ ঋজু দেহে এখনো কোথাও বার্ধক্যের আক্রমণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, তবে দেরীও নেই, প্রশস্ত ললাটের কুঞ্চনরেখা সৌম্য মুখমণ্ডলের প্রশান্তিতে ঢাকা রয়েছে এখনো।

ইজিচেয়ারের পাশেই একটা তেপায়া গাঁথনির উপর বসানো রয়েছে একটা ছোট্ট দূরবীণ। ফাদার সাইমনের তরুণ জীবনের শখ—কর্মজীবনের একমাত্র বিলাস এই ছোট্ট দূরবীণটি। সারা দিনের কাজের শেষে রোজ সন্ধ্যাবেলা এই দূরবীণটি নিয়ে ছাদে এসে না বসলে তাঁর দিন কাটে না। আজো তাই এক ফাঁকে পালিয়ে এসেছেন এখানে। কিন্তু দূরবীণের কথা মনে নেই ঠিক—অস্তসন্ধ্যার দিকে আনমনে চেয়েছিলেন—আর মন চলে গিয়েছিলো বুঝি কোথায়—সাত সমুদ্দুর তেরো নদী ছাড়িয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে স্কটল্যাণ্ডের কোন এক কুল-কুল বওয়া ছোট্ট নদীর তীরে—এমনি এক ক্লান্ত বিষণ্ণ করুণ উদাস বসন্ত-সন্ধ্যার ছবি।

খুট করে ছাদের দরজাটা খুলে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণা—ফাদার সাইমনের মেয়ে। উনিশ বছরের মিষ্টি মেয়ে কৃষ্ণা। তার তন্বী দেহের রেখায় রেখায় যেন হরিণীর উদ্ধত চপলতা থমকে আছে—চোখের তারায় ধরা পড়েছে শরতের সুনীল আকাশের ছায়া—আর চুলে লেগেছে কাজলকালো বর্ষামেঘের রঙ। রক্তে তার স্কটল্যাণ্ডের নির্ঝরিণীর প্রাণোচ্ছলতা, কিন্তু ভঙ্গিমায় বাংলাদেশের শ্যামল সরস জলবায়ু স্নিগ্ধতা মেশা। জন্ম তার বাংলাদেশের মাটিতেই। 'কৃষ্ণা' নামটাও তার মায়ের দেওয়া। তার মা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত—বাংলাভাষা শিখেছিলেন যত্ন করে। মেয়ের চুলে বাংলাদেশের বর্ষামেঘের রঙ দেখে বাপের দেয়া 'ক্রিষ্টিনা'কে সংক্ষিপ্ত করে তিনি ওর নাম রাখেন 'কৃষ্ণা'।

নিঃশব্দ চরণে বাপের চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণা। সাইমনের ধ্যান ভাঙেনি তখনো। কৃষ্ণা সন্তর্পণে একখানি হাত রাখলো বাবার মাথার প'রে। ফাদার সাইমন ফিরে তাকালেন। শান্ত অনুযোগের কণ্ঠে বললো কৃষ্ণা—তুমি আজো আবার ছাদে এসে বসেছো! ডাক্তার মানা করে গেছে না ঠাণ্ডা লাগাতে!

প্রশান্ত দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ফাদার সাইমন। একটু হেসে বলেন—বিশ বছরের অভ্যেস যে রে বেটি! আচ্ছা, চল দেখি—কোথায় নিয়ে যাবি—

তিরিশ বছর বয়সে প্রটেষ্টাণ্ট চার্চের মিশনারীর কাজ নিয়ে যখন ফাদার সাইমন প্রথম এদেশে আসেন, সেদিন তাঁর মনে ছিলো অনেক আশা—চোখে ছিলো স্বপ্ন। এই বিরাট 'অর্ধসভ্য' দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে পবিত্র বাণী প্রচার করা—এদেরকে আলোকের—মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া। অনেক বড়ো অনেক উজ্জ্বল—পবিত্র দায়িত্ব সে।

বছরের পর বছর কাটলো। আশা আর স্বপ্ন—মহান আদর্শ আর দীপ্তি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এলো। অজ্ঞ, ধর্মান্ধ, সংস্কারাচ্ছন্ন হিদেনদের মানুষ করে তোলা—সে স্বপ্ন সত্য হবার নয় বুঝি! এ উপলব্ধির জন্যে সময়ের দাম দিতে হলো অনেকখানি।

ফাদার সাইমনের আপন জীবনেও অনেক স্বপ্ন এলো গেলো এত দিনের মধ্যে। এলো লুসী—লুসিতা—রেভারেণ্ড জিরোমের মেয়ে। লুসী এলো তাঁর স্বপ্নের আদর্শের অংশ নিতে, ফাদার সাইমনের জীবন-মনের স্বপনচারিণী হয়ে। লুসীকে নিয়ে ফাদার সাইমন নতুন উদ্যমে লেগেছিলেন 'পবিত্র দায়িত্ব' পালন করবার জন্যে। সেও তো আজ অনেক বছরের কথা!

লুসী ছিলো বাংলাদেশের মেয়ে। বাংলার মাটি, বাংলার জলবায়ুর সঙ্গে তার যোগ ছিলো অন্তরতম প্রাণের। বাংলা ভাষাকে দরদ দিয়ে শিখেছিলো সে ছোটকাল থেকেই—শেলী-কীটসের চেয়ে বাংলার কবিরা ছিলো তার কাছে অনেক বেশি আপন। এই হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগা মানুষদের সে ভালোবেসেছিলো মায়ের স্নেহ নিয়ে, যা পারেন নি ফাদার সাইমন।

ফাদার সাইমন পারেন নি এদের ভালোবাসতে। এদের মধ্যে অনেক গভীর ভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি যৌবনের প্রথম উৎসাহে, কিন্তু পারেননি এদেরকে আপন মনে করতে। কি জানি, কী এক অনির্দেশ্য সীমারেখা টানা ছিলো তাঁর আত্মাভিমানের চার পাশে—যাকে অতিক্রম করতে পারেনি ঐ অশিক্ষিত অসভ্য হিদেনরা।

মাঝে মাঝে কর্মহীন অলস অবকাশের উদাস মুহূর্তগুলিতে মনে পড়ে যেতো দেশের কথা। স্কটল্যাণ্ডের সেই ছোটো ছোটো রৌদ্রোজ্জ্বল পাহাড়, সবুজ উপত্যকা—শীতের সন্ধ্যায় ছোট ছোট স্তব্ধ গ্রামগুলির নিঃসঙ্গ কৃষক-কুটিরের ধোঁয়াওড়া চিমনি—চোখের সামনে ভেসে

উঠতো তাঁর। বিজন বসন্তের দুপুরে ছলছলিয়ে বওয়া ছোট্ট টুইড্ নদীটির ধারে উইলো গাছটির গায়ে হেলান দিয়ে একলা রাখাল-ছেলের বাঁশি-বাজানো—সেই সুরও যেন এসে বাজতো কানে। আনমনা হয়ে যেতেন ফাদার সাইমন।

কতো বার দেশের পানে পা বাড়িয়েছেন ফাদার সাইমন—কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। হয়ে ওঠেনি লুসীর জন্যে। সে মাথা নেড়ে বলতো না, কী হবে আমার সে দেশে গিয়ে যার সাথে আমার কোনো প্রাণের যোগ নেই! আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকতে চাই এ দেশের মাটিতেই—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই এখানকার বাতাসে। আর মরলে কবর দিও না আমায়—নদীর ধারে দাহ কোরো আমার, চন্দন-কাঠের চিতায় সাজিয়ে তুলো না সেখানে কোনো স্মৃতিস্তম্ভ—শুধু সেখানে পুঁতে দিও একটা কনক-চাঁপার গাছ।

লুসীর আর যাওয়া হয়নি দেশে। কৃষ্ণাকে পাঁচ বছরের রেখে সে যেদিন চলে গেলো জীবনের হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে—তার পর থেকে আর ফাদার সাইমন যেতে চাননি দেশে। লুসীর রেখে যাওয়া ভার—তার স্মৃতি—তাই বয়ে চলেছিলেন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে। লুসীর শেষ ইচ্ছাও রক্ষা করেছিলেন তিনি—খুব ধুমধাম করে চন্দন-কাঠের চিতায় দাহ করা হয়েছিলো তাঁকে। একটা কনক চাঁপার গাছও বসিয়ে দিয়েছিলেন সেইখানে।

পাঁচ বছরের কৃষ্ণাকে বুকে নিয়ে ফাদার সাইমন যেদিন একাই জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিলেন, বৈঠা ধরবার মতোও ছিলো না কেউ। একমাত্র ছেলে জেম্‌স—সেও নেই। ভারি সুন্দর দেখতে ছিলো জেমস। আয়ত স্বপ্নালু চোখ—হাল্কা কাঁপন-লাগা বাদামী চুল, দীর্ঘ সুগঠিত আঙুলগুলি। মা চেয়েছিলেন, জেমস হবে কবি-শিল্পী। আর বাপ চেয়েছিলেন, সে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে অনেক তর্ক মান-অভিমানের পালা হয়ে যেতো।

কিন্তু জেমস কোনোটাই বিশেষ পছন্দ করতো না। তার একমাত্র খেয়াল ছিলো হাটে-মাঠে পথে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়ানো। কী দেখতো সে—কী বা করতো, কেউ জানে না। কিন্তু এমনি করেই হয়তো সে—কখনো তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন হয়ে যেতো। তার জন্যে পরে ফাদার সাইমনের কাছে তাড়না জুটতো যথেষ্ট। ভেবে পেতেন না তিনি—তাঁর মতো শুচিমনা ধর্মযাজকের ছেলে এমন হিদেন হলো কি করে? পাদ্রীর পবিত্র জীবন কি তাকে টানে না একটুও?

টানলো না আর। একদিন বাপের সঙ্গে মনোমালিন্য করে জেমস বাড়ী ছেড়ে চলে গেলো। মা শয্যা নিলেন। বহু দিন পরে খবর এলো—জেমস সৈন্যবাহিনীতে কাজ করছে। এর পরে আর লুসী বেশি দিন বাঁচেন নি।

লুসীর মৃত্যুর বছরখানেক পরে খবর এলো—যুদ্ধে মারা গেছে জেমস।

ফাদার সাইমনের জীবনে রইলো কী? স্বপ্নে রইলো জ্যোতির্ময়ী মেরীমূর্তি আর বাস্তবে আরেক ছোট্ট মেরী। কৃষ্ণাকে নিয়ে ফাদার সাইমন এসে ঘর বাঁধলেন এক ছোট্ট নদীর ধারে—এক মফস্বল শহরের মিশনারী কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে।

অভাগিনী কৃষ্ণা! মাকে পেলো না বেশি দিন—পেলো না ভাইয়ের স্নেহ—অকালে হারালো সব-কিছু। তাই বোধ হয় ফাদার সাইমন তার সবখানি স্নেহের দাবী মেটাবার জন্যে সমস্ত হৃদয় উজাড় করে দিয়েছিলেন ওর দিকে। আর সে স্নেহের মধ্যে ছিলো উদার মুক্তি।

লুসী বলতো—ছেলেকে তো পেলাম না মনের মতো করে মানুষ করতে! তোমারি জন্যে সে—মেয়েকে আমি গড়বো আমার সবখানি স্বপ্ন আর কামনা দিয়ে—তাতে কোনো বাদ সাধতে পারবে না তুমি। ছেলে তোমাকে দিয়েছিলাম, পারলে না রাখতে! মেয়ে আমার, এদিকে হাত বাড়িয়ো না।

আর বলতো—আমি যদি মরে যাই, আমার মেয়েকে মানুষ করবে তুমি আমার স্বপ্ন নিয়ে, তোমার আদর্শ নিয়ে নয়। তাকে তুমি আলো বাতাসের স্পর্শে সজীব প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেবে—টবে সাজাতে চেয়ো না! এই প্রতিশ্রুতি যদি দাও, তবে নিশ্চিন্তে মরতে পারি—

ফাদার সাইমন হাত চাপা দিতেন তার মুখে।

সেই মেয়ে কৃষ্ণা! তার দিকে চাইলেই মনে হতো—এ তাঁর লুসীর স্বপ্ন—সঞ্চারিণী হয়ে বেড়াচ্ছে বুঝি মাতা মেরীর অসীম আশীর্বাদে। তাঁর স্নেহের পবিত্রতায়—ঐকান্তিকতায় নিষ্ঠায় যদি একটু ভ্রান্তি আসে—বিচ্যুতি ঘটে কখনো এ স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে বুঝি বুদবুদের মতো। কৃষ্ণা যেন ভোর আকাশের তারা—অম্লান দীপ্তিতে জ্বলছে—কিন্তু আশঙ্কা রয়েছে কঠিন সূর্যের আঘাতে তার দীপ্তি হারিয়ে যাবার। সূর্য হয়তো উঠছে—উঠবে এখুনি—কিন্তু তাঁর চোখে রয়েছে মায়ার ঘোর, তাই দেখতে পাচ্ছেন চোখের সমুখে তাঁর লুসীর সঞ্চারিণী স্বপ্নকে।' ভয় হয়, সামান্য ভুলেই হয়তো এ মায়ার ঘোর কাটবে···ঝলসে উঠবে সূর্য—দেখতে পাবেন না আর তারাকে!

—কৃষ্ণা বড়ো হতে লাগলো ধীরে ধীরে—লুসীর স্বপ্ন!

তিন বছর আগেকার কথা। ফাদার সাইমন তখন সেই মিশনারী কলেজের অধ্যাপক। হিদেনদের ধর্মের পথে—আলোকের পথে আনবার পবিত্র চেষ্টা করে চলেছেন তিনি শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কী দুর্বিনীত এই শিক্ষিত হিদেনরা! মিশনারী কলেজে শিক্ষালাভের পূর্ণ সুযোগটুকু তারা নেবে—শুধু ধর্মের ক্লাসে আসাই তাদের কাছে পরম পাপ যেন।

তাদের মধ্যে একটি ছেলেকে ফাদার সাইমন প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন। বেশ চেহারা ছিলো তার। চওড়া পেশল দেহ—কোঁকড়া বাবরি চুল—বড়ো বড়ো টানা চোখ। প্রথম দিন থেকেই সে নিয়মিত ধর্মোপাসনার ক্লাসে এসে বসতো ঠিক বেদীর সমুখেই—নির্বিচারে হজম করে ফেলতো অম্লমধুর কষায়-রসপক টীকাটিপ্পনী।

সপ্তাহকাল কাটবার পর একদিন ক্লাসের শেষে ফাদার সাইমন তাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন—তোমার কী নাম?

একটু লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলো সে—সুবীর মণ্ডল।

ধর্মের ক্লাসে তোমায় তো রোজই দেখি সামনে বসে থাকতে। সত্যিকার আগ্রহ নিয়ে শোনো কি, না একটা নিষ্প্রাণ নিয়মানুগতা ওটা?

—সত্যিকার আগ্রহ নিয়েই ধর্মের ক্লাসে যাই আমি—একটু থেমে বললো সে—কারণ—কারণ আছে তার অনেক। এবং এই ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি আরো ভালো করে জানবার ইচ্ছা রয়েছে আমার।

—বেশ, তুমি কলেজের শেষে আমার বাড়ীতে যাবে। সেখানে তোমার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করবো আমি, যদি তুমি চাও।

এর পর থেকে সুবীর মণ্ডল রোজ কলেজের শেষে ফাদার সাইমনের কাছে যেতে সুরু করলো ধর্মালোচনার জন্যে। সুবীর বড়লোকের ছেলে। প্রবাদ আছে, তার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা নাকি কোন্ এক জমিদারের লাঠিয়াল সর্দার ছিলো। তার পর লাঠিবাজি করে করে যখন জমিদারীতে ভাঙন ধরলো—ওদিকে কি করে কি জানি সুবীরের পূর্বপুরুষ বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় পত্তনীদার হয়ে বসলো। তার পর সুবীরের ঠাকুর্দা যুদ্ধের বাজারে সৈন্যদের রসদ জোগাবার কন্‌ট্রাক্ট পেয়ে রাতারাতি লাল হয়ে গেলো। সেই বংশের ছেলে সুবীর। এইবার তার অভিজাত সমাজে ওঠবার পালা। রৌপ্যরসের মহিমায় চেহারায় খানিক আভিজাত্য এলেও এখনো তার শিরায় শিরায় সেই বাগদী নমঃশূদ্র লাঠিয়ালদের তপ্ত রক্ত টগবগিয়ে বইছে—একথা ভাবতে অসুবিধা হয় না খুব, ওকে দেখলে আর দু' দিন ওর সঙ্গে মিশলে।

সেই সুবীর এলো ফাদার সাইমনের কাছে ধর্মের বাণী শুনতে—সাগরপারের ধর্ম। নিজের দেশের নিজের জাতের সমাজ আর ধর্ম-ব্যবস্থা—তারো অনেক গল্প শোনালো সে ফাদার সাইমনকে। বাগদী, চণ্ডাল, নমঃশূদ্র, জেলে, কাহার—এই সব নিম্ন শ্রেণীর গরীব মানুষরা কেমন করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্রাহ্মণ যাজক সম্প্রদায় এবং ক্ষত্রিয় শাসক ভূস্বামীদের দ্বারা উৎপীড়িত অত্যাচারিত আর শোষিত হয়েছে—তার অনেক ইতিহাস বলে গেলো সুবীর। সুবীরের চোখে আগুন দেখেছিলেন ফাদার সাইমন।

ফাদার সাইমন নীরবে শুনলেন সুবীরের সব গল্প। এ সমাজের জাতি-বৈষম্য আর ধর্ম-ব্যবস্থার অনেকখানিই তাঁর অজানা নেই—তবু শুনলেন সব গল্প আর দেখলেন তার চোখের আগুন। ভাবলেন—ঠিক! এত দিনে একটা শিক্ষিত হিদেনকে পাওয়া গেছে। এর চোখের আগুনই একে আলোকের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

ফাদার সাইমন আর সুবীরের ধর্মালোচনার মধ্যে আরেক জন নীরব শ্রোতাও উপস্থিত থাকতো। সে কৃষ্ণা।

এর আগে পর্যন্ত আর কোনো অনাত্মীয় পুরুষের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়নি কৃষ্ণার। সংসারে একমাত্র বাবাকেই সে ভালো করে চিনতো। তাই প্রথম দিন থেকেই সুবীরের সম্পর্কে তার একটি কৌতূহল—ভালো-লাগা মেশানো কৌতূহল জেগে ওঠাতে অস্বাভাবিক

কিছু ছিলো না। শেষটা এমনও হয়েছিলো যে কোনো দিন সুবীর অনুপস্থিত থাকলে তার মন খারাপ হয়ে যেতো।

অবশ্যি সে রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পেতো না বড়ো একটা, কারণ ধর্মবাণীর আলোচনার থেকে ঐ নীরব শ্রোতার আকর্ষণ কম ছিলো না সুবীরের কাছে। কোনো কোনোদিন ফাদার সাইমন বাড়ী ফেরার আগেই হাজির হতো সুবীর—এবং কৃষ্ণার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হতো সে সময়ে, তাকে নিছক ধর্মালোচনা বলে মনে করা যেতো না কোনো মতেই।

কিন্তু ফাদার সাইমন তাঁর নতুন শিষ্যের ধর্মকথা শুনবার আগ্রহে এবং তাঁর হিদেন বিজয়-গর্বে এতখানি আত্মগত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর চোখে ধরা পড়েনি সুবীরের এই দ্বিমুখী রূপটি। তিনি মনে করে নিয়েছিলেন—এই হতভাগ্য তার আপন সমাজ আর ধর্ম দ্বারা এতখানি অত্যাচারিত হয়েছে, এতখানি আগুন জমে আছে তার মনে—তাই সে নতুন শান্তি আর সান্ত্বনার বাণী খুঁজতে আসে তাঁর পবিত্র ধর্মের আশ্রয়ে। অতি শীঘ্র তাকে ধর্মান্তরিত করে ফেলবার স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি।

সান্ত্বনাবাণীর জন্যেই আসতো অবশ্যি সুবীর—তবে শুনতে নয়, শোনাতে। চতুর ছেলে—অল্প আলাপনেই বুঝতে পেরেছিলো কৃষ্ণার জীবনের নিঃসঙ্গতা। বাবা তার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীই ছিলেন যদিও, তবু এটা সহজেই বুঝতে পেরেছিলো সে—এই নতুন যৌবনের মুকুল ফোটার দিনে এমন অনেক কিছুরই প্রয়োজন আসে, যার অভাব মেটাতে পারেন না স্নেহময় বাবাও শুধু কেবল ধর্ম আর তত্ত্বকথা শুনিয়ে। তাই, সুকৌশলে, কৃষ্ণার মনের একান্ত কাছে এসে পৌঁছেছিলো সুবীর—অতি অল্প সময়ের মধ্যেই।

ফাঁক পেলেই কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতো সুবীর—নানান গল্প, তার দেশঘরের গল্প, জমিদারীর গল্প, বনে-জঙ্গলে শিকারের গল্প, ছোট জাতের উপর যাজক জমিদারদের উৎপীড়নের গল্প—এমনি কতো কী। বেশ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে গল্প বলতে পারতো সুবীর—রঙের রসান চড়িয়ে। শুধু এই নয়, সময় বুঝে কৃষ্ণার জীবনের ছোটখাট ঘটনা, তার মা-দাদা বাবা এঁদের কথাও তুলতো সন্তর্পণে। কৃষ্ণা জানতে পেতো না—তার নিঃসঙ্গ মনের দুর্বলতার সুযোগ ধীরে ধীরে কতোখানি কাছে সরে আসছে সুবীর। শুধু যখন দেখতো, তার ছোটখাট তুচ্ছ কথা শোনবার জন্যেও কতো আগ্রহশীল শ্রোতা আছে একজন—তার বেদনার অনুভূতিতে অংশ নেবার একজন এসে দাঁড়িয়েছে কাছে—তখনই মন ভরে উঠতো তার।

সুবীরের ধর্মালোচনা বেশ এগিয়ে চলেছিলো এমনি ক'রে। কিন্তু কখন যে তার মুখ্য উদ্দেশ্য গৌণ উপলক্ষটাকে মাত্রা ছাড়িয়ে উঠলো, তার তা খেয়াল থাকবার কথা নয়। কিন্তু এমনি প্রকট হয়ে উঠলো সেটা—সদাশিব ফাদার সাইমনেরও নজর এড়িয়ে যেতে পারলো না আর।

কিছু দিন থেকেই ফাদার সাইমন লক্ষ্য করতে সুরু করেছিলেন—ধর্মালোচনার চেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করবার আগ্রহটাই সুবীরের বেশি হয়ে উঠছে, আজকাল আলোচনায় তেমন আর উৎসাহ দেখা যায় না তার—কিন্তু এদিকে যথেষ্ট আগে থেকেই সে এসে উপস্থিত হয়। এবং তা শুধু যে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করবার জন্যেই—সেটুকু বুঝতে সরলমনা ধর্মযাজকেরও কষ্ট হয় না। এমন কি, যেদিন কৃষ্ণা কোনো কারণে উপস্থিত থাকতে পারে না—উস্‌খুস্‌ ক'রে সুবীর হাই তোলে, আড়ামোড়া ভাঙে, শেষে এক জরুরী কাজের অজুহাতে বিদায় নেয় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই।

ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে চিন্তিত হন যাজক বৃদ্ধ। যদিও তাঁর মহান্ ধর্মের বাণী প্রচারের সময় মানুষে-মানুষে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম ইত্যাদি ঝলমলে শব্দগুলো নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করে যেতে পারেন তিনি সুললিত ভাষায়, তবু প্রত্যক্ষ জীবনে তা সপ্রমাণ করা তো আর সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। অর্ধসভ্য ঔপনিবেশিক দেশের কালো মানুষের সঙ্গে তাঁর মেয়ের মাখামাখি আরো এগিয়ে শেষে একটা সমস্যার সৃষ্টি করুক—স্নেহময় শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা হিসেবে এটা স্বভাবতঃই চান না তিনি। হোক্ না সে স্বধর্মাবলম্বীও। স্বার্থ এসে দাঁড়াতেই এক মুহূর্তে সুবীরের হিদেনত্ব তাঁর মহান ও পবিত্র আদর্শকে ছাপিয়ে উঠলো!

ফাদার সাইমন এক দিন খোলাখুলি জিগ্যেস করলেন—তুমি কি ধর্মালোচনায় আজকাল কোনো উৎসাহ পাচ্ছো না সুবীর? তা যদি হয়, তবে আমরা কিছু দিনের জন্যে বন্ধ রাখতে পারি আলোচনা। তুমি না হয় মাঝে মাঝে এসো।

সুবীর ব্যস্ত হয়ে বলে—না না, সে কি কথা! ধর্মালোচনায় আমার উৎসাহ মোটেই কমে নি—বরং সর্বক্ষণ এই ঘৃণিত ধর্ম ছেড়ে ঐ পবিত্র ধর্ম গ্রহণ করবার স্বপ্ন দেখছি আমি—যোগ্য ক'রে তুলছি নিজেকে। এ কথা আপনার যে কারণে মনে হয়ে থাকতে পারে—সেজন্যে আমার ক্ষণিক অন্যমনস্কতা বা শারীরিক অসুস্থতাই হয়তো বা দায়ী—

ফাদার সাইমন আর কিছু বললেন না সেদিন।

কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা গেলো না এর পরেও। সুবীর প্রায়ই অনুপস্থিত হতে লাগলো আলোচনা-সভায়। একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারতেন তিনি—সুবীর ক্লাসেও অনুপস্থিত থাকে মাঝে মাঝে এবং সে-সময়টা সে তাঁরই বাড়ীতে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করতে যায়।

খোঁজ না নিয়েও এ কথা এক দিন কানে গেলো তাঁর।

এক দিকে যেমন আশ্চর্যও হলেন ফাদার সাইমন—আবার তার সঙ্কল্পও কঠিন হয়ে এলো। না, আর নয়, বাধা দেওয়া উচিত। একবার ভাবলেন—মেয়েকে খুব করে ধমকে দেবেন তিনি, কিন্তু আবার মনে হলো—তার কী দোষ! নিঃসঙ্গ নির্জনতায় কেটেছে ওর জীবনটা—আহা, মা-হারা মেয়ে। এর পরে আর ভাবা যায় না ওকে ধমক দেবার কথা।

এক দিন হঠাৎ ফাদার সাইমন বাড়ী ফিরলেন অসময়ে। সুবীর তখন কৃষ্ণার সঙ্গে কী একটা মজার গল্প বলছিলো আর দু'জনে হাসছিলো হো-হো করে। ফাদার সাইমন এসে পড়তেই, তার মুখ শুকিয়ে গেলো। এতেই আরো বিরক্ত হলেন ফাদার সাইমন। কিন্তু কিছু বললেন না তিনি কাউকে। খানিক পরে সে চলে গেলো। তার পর দিন সাতেক আর মাড়ালো না এ পথ। তার পর এক দিন এলো যথাসময়ে, নিজের থেকেই কৈফিয়ৎ দিলো—অসুখ করেছিলো তার।

ফাদার সাইমন তাকে কাছে ডেকে নিয়ে, ধীরে ধীরে দৃঢ়-গম্ভীর স্বরে বললেন—দেখো সুবীর, আমি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি, ধর্মালোচনায় তোমার মতি নেই। তোমার এখানে আসবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে অন্য এবং সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, আমি যে সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম তোমায়, তুমি অমর্যাদা করেছো তার। সতের আর সত্যের স্থান আছে এখানে, অসতের মিথ্যাচারীর নেই। অতএব আমার বাড়ীতে তোমার আগমন আজ থেকে আমি অবাঞ্ছিত মনে করবো। এর পরে তোমার আর কোনো কথা শুনতে চাই না আমি—তর্ক নিষ্প্রয়োজন।

সুবীর মাথা নীচু করে শুনলো—চুপ করে বসে রইল এক মিনিট। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বললো—বেশ, তাই হবে! আমি চললাম।

তার সদর্প গমনভঙ্গির দিকে তাকিয়ে ফাদার সাইমন অস্ফুটে বললেন—'এন্ ইনডোমিটেবল্ হিদেন্!' মনে হলো তাঁর, তার চোখে আজও আগুনের ফুলকি দেখেছেন তিনি। যেমনটি দেখেছিলেন তিনি প্রথম দিনে।

কয়েক দিন ধরে ফাদার সাইমন লক্ষ্য করছিলেন কৃষ্ণার ভাবভঙ্গি। কৃষ্ণা আর ঠিক আগের মতো হাসে না, কথা বলে না বেশি—বরং অনেক সময় চুপচাপ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে একলা, অস্ত-গগন-পটে আঁকা নিঃসঙ্গ তালগাছটির মতো। ফাদার সাইমনের মন টনটন করে দেখে এসব। ভাবেন—তার লুসীর স্বপ্নের প্রতি অবিচার করছেন না তো কোনো! পরক্ষণেই মনকে প্রবোধ দেন—না। জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে এ না করলেই অবিচার হতো, ব্যভিচার হতো ধর্মে!

সাত দিনের মধ্যেও যখন সুবীর এলো না আর—একদিন সাহস করে বাবার কাছে এসে জিগ্যেস করে বসলো কৃষ্ণা—আচ্ছা বাবা, তুমি কি সুবীরকে এখানে আসতে মানা করে দিয়েছো?

ফাদার সাইমন বই পড়ছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন—হ্যাঁ।

কৃষ্ণা চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে সঙ্কোচ জড়ানো অস্ফুটকণ্ঠে বললো—কেন বাবা? সে হিদেন বলে?

ফাদার সাইমন এবার চোখ তুললেন—মেয়ের দিকে তাকালেন পূর্ণ দৃষ্টিতে। না, সেখানে নেই কোন দৃপ্ত জিজ্ঞাসার ছাপ, নেই অভিনয়ের মুখোস, নেই বেপরোয়া ভঙ্গিমা, শুধু একটা ক্ষীণ ব্রীড়া-জড়িত নির্বোধ কৌতূহলে মেশা অরুণরাগের আভাস—

না। মুখ নামিয়ে উত্তর দিলেন ফাদার সাইমন প্রশান্তকণ্ঠে—সে কপটাচারী, কাপুরুষ বলে।

অসুখ থেকে সেরে উঠবার পর ফাদার সাইমন ভাবলেন—এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে কৃষ্ণার মনে আনন্দ দেওয়া যায়। হতভাগিনী মেয়ে সেই অপ্রিয় ব্যাপারটার পর থেকেই যেন মনমরা হয়ে রয়েছে—মুখে তার হাসি ফোটে না ভাল করে। ফাদার সাইমন দুঃখ পান দেখে—কিন্তু কী করবেন ভেবে পান না!

এক দিন কৃষ্ণাকে ডেকে কাছে বসিয়ে বললেন তিনি—শোন্ রে বেটি, কথা আছে। ধর্ম প্রচারের জন্যে তো অনেক চেষ্টাই করলাম এত কাল ধরে—কিন্তু কতটুকু সফল হয়েছে, তুইও জানিস্। এই হতভাগা হিদেনদের সঙ্গে ভালো করে মেশাই গেলো না—এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, দূরে দূরে রাখতে চায়। যারা সাহস করে কাছে আসেও তাদেরো আচার আচরণে এমনি বৈলক্ষণ্য ঘটে যে সৌহার্দ্য স্থায়ী হয় না বেশি দিন;—সে যাক! আমি অনেক দিন থেকেই ভাবছি, সামনের খৃষ্টমাসের সময় একটা আনন্দোৎসবের আয়োজন করে ওদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো যাক। গ্রামাঞ্চলের গরীব চাষী, ছোট জাত, যারা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না—তাদেরই। জাতগর্বী, উন্নাসিক শিক্ষিত হিদেনদের কথা নয়। তোর জন্মদিনটাও ঐ সময় পড়ছে—সেটাকেই উপলক্ষ্য করা যাবে না হয়। তুই কী বলিস?

কৃষ্ণা ছেলেমানুষের মতন হাততালি দিয়ে উঠলো—বেশ, বেশ, চমৎকার হবে বাবা! আমি কিন্তু সকলকে নিজে তদারক করে খাওয়াবো—তা আগে থেকে বলে রাখছি।

ফাদার সাইমন হেসে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে তখন, কতো খাটতে পারিস। এখন মাথা ঠাণ্ডা করে পাকা গিন্নীর মতো একটা হিসেব তৈরী করে ফেল দেখি আগে—জিনিষপত্র কেনাকাটা করতে হবে—খৃষ্টমাস তো এসেই পড়লো।

—সে আমি এক্ষুণি করে ফেলছি দেখো—কৃষ্ণা প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেলো। ফাদার সাইমন সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার গমনপথের দিকে।

একটু পরেই কৃষ্ণা আবার এসে ঢুকলো ঘরে। একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললো, আচ্ছা বাবা, এক কাজ করলে হয় না? সুবীরকে নিমন্ত্রণ করলে হয় না? তাহলে সে বোধ হয় আমাদের কাজে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে।

ফাদার সাইমনের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো। মনের ভাব গোপন করে কণ্ঠকে যথাসাধ্য সহজ রাখার চেষ্টা করে বললেন—একথা হঠাৎ তোমার মনে এলো কেন? তার ঠিকানা জানো না কি তুমি?

কৃষ্ণার মুখের আলো ততক্ষণে নিবে এসেছিলো। মুখ নত করে সে উত্তর দিলো—হ্যাঁ, একদিন বলেছিলো সে—

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শান্তস্বরে বললেন ফাদার সাইমন—না। তাকে না ডাকাই বোধ হয় ঠিক হবে!

কৃষ্ণা আঁধার মুখে বেরিয়ে গেলো ধীরে ধীরে। ফাদার সাইমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন একটা।

কৃষ্ণার জন্মদিনের উৎসব এসে পড়লো মহাসমারোহে। সাত গ্রামের গরীব দুঃখী দুঃস্থ জনসাধারণ নিমন্ত্রিত হলো। আয়োজনে কোন ত্রুটি করেন নি ফাদার সাইমন। খাওয়া দাওয়া চললো তিন দিন ধরে। রীতিমত ভোজ। শুধু তাই নয়, নিমন্ত্রিতদের আনন্দবর্ধনের জন্যে যাত্রার দল ভাড়া করেছিলেন ফাদার সাইমন। রবাহূত কথক কবিয়ালের দলও আসর জমিয়ে বসলো এক একস্থানে। নাগরদোলা থেকে সুরু করে রঙচঙে ছিটের জামা আর মণিহারী দোকানও বসে গিয়েছিলো সারি সারি। তিন দিন ধরে সে এক মেলাই সুরু হয়ে গেলো যেন গীর্জার সামনেকার মাঠটাতে।

মফঃস্বল শহরের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণ হঠাৎ একটু বেশি রকম চকচকিয়ে গেলো এই হৈ-চৈ কাণ্ডকারখানায়। তারপরে আরো যখন শুনলো—সমস্ত ব্যাপারটা নাকি বুড়ো পাদ্রীর মেয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে মাত্র—বিশ্বাস করতে চাইলো না তারা কথাটা। পাদ্রী বুড়োর নিশ্চয় কোনো মতলব আছে এর পিছনে!

মানুষের মঙ্গল করতে চাওয়ার মতো কুকর্ম নাকি আর নেই।

পরিশ্রান্তি ভালো করে না কাটতেই ফাদার সাইমনের কর্মচারীরা এসে খবর দিলো হঠাৎ ঐ উৎসবের আয়োজন করে ভালো কাজ

হয়নি। বাইরে সর্বত্র নাকি রটেছে—সোজা পথে ধর্মান্তরণের কোনো উপায় না দেখে পাদ্রী বুড়ো কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। গ্রামশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করে সবার জাত মারবার ফিকির করেছে বুড়ো। বিলেত থেকে লুকিয়ে টিনেকরা শুয়োরের মাংস আর গরুর চর্বি আনা হয়েছে। শুয়োরের মাংস দিয়ে পোলাও আর গরুর চর্বি দিয়ে পিঠে ভাজা হয়েছে। কারা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে ঐ লেবেল আঁটা টিনগুলো। ভদ্র অভদ্র সব শুদ্ধ জাত মারবার ইচ্ছে ছিল বুড়োর, ভদ্রলোকেরা নেহাৎ বুঝতে পেরে গিয়ে যায়নি। আর হতভাগা ছোটলোকগুলো খাবার লোভে ঐ সব বিজাতীয় মাংস গিলে এসেছে—এখন তাদের খৃষ্টান হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আরো রটেছে—এত দিন ধরে ধর্মান্তরণ কাজ ভালো করে না করার দরুণ বড়কর্তাদের কাছ থেকে নাকি কড়া চিঠি এসেছে পাদ্রী বুড়োর নামে। 'যেমন করে পারো ধর্মান্তরণ করা চাই'—সরকার যখন পক্ষে আছে—ভয়টা কী! ইত্যাদি নানান কথা! তা নইলে এতদিন আর মেয়ের জন্মতিথি এলো না—এলো হঠাৎ এই সময়ে! কৌশলে কাজ হাসিল করেছে পাদ্রী শয়তান।

সব শুনে প্রায় বসে পড়লেন ফাদার সাইমন। তাঁর নির্দোষ শুভেচ্ছা থেকে উৎসারিত আনন্দোৎসবের এ কি ব্যাখ্যা···এ কি রটনা! কার বা কাদের কি স্বার্থ, কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে এমন রটনার পিছনে? তাঁর বিশ বছরের অভিজ্ঞতার নাগালের বাইরে, স্বপ্নেরও অনধিগম্য এ ব্যাপার। মানুষের মঙ্গল করতে চাওয়ার কি এই প্রতিদান?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি শুধু বললেন—মাতা মেরী! ক্ষমা কোরো তুমি এই তমসাচ্ছন্নদের!

দশ দিনের মধ্যে যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে ফাদার সাইমনের। চুল সব সাদা হয়ে গেছে—কপালে চোখের কোলে শিথিল চর্মের ভাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঋজু মস্তক যেন কিসের ভারে অবনত। কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিলেন তিনি—কথা বলাও প্রায়। সারাদিন শুধু ঘরের মধ্যে বসে থাকেন বাইবেল হাতে করে, আর সন্ধ্যে হলে ছাদে গিয়ে বসেন দূরবীণ নিয়ে—দেখেন, তারা ফুটেছে।

কয়েক দিন পরে ফাদার সাইমন আরো খবর পেলেন—এই সব কুৎসা রটনার প্রধান হোতা হলো রাঘব তালুকদারের ছেলে সুবীর মণ্ডল—তাঁরই প্রাক্তন ছাত্র। যদিও এই রটনা শহরের শিক্ষিত ভদ্রমহলেই চালু হয়েছে বেশি—তথাকথিত ছোট জাত তাঁতি, জোলা, জেলে, বাগদী, ডোম, কাহার, হাড়ি, চাঁড়ালের মধ্যে দানা বাঁধতে পারেনি তেমন করে, তবু সুবীর নাকি তার আপন তালুকের বাগদী নমঃশূদ্র প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে, ধর্মনাশের ভয় ছড়িয়ে।

সুবীর! সুবীরই তবে এই যজ্ঞের পুরোহিত! ফাদার সাইমন এইবার ব্যাপারটি বুঝতে পারেন খানিকটা। কর্মচারীরা পরামর্শ দিলো, সুবীর যে ভাবে ক্ষেপিয়ে তুলছে সবাইকে লক্ষণ ভালো নয়, আপনি বরং কৃষ্ণাকে নিয়ে দিন কতক কোথাও ঘুরে আসুন। এর মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তখন ফিরে আসবেন নিশ্চিন্তে।
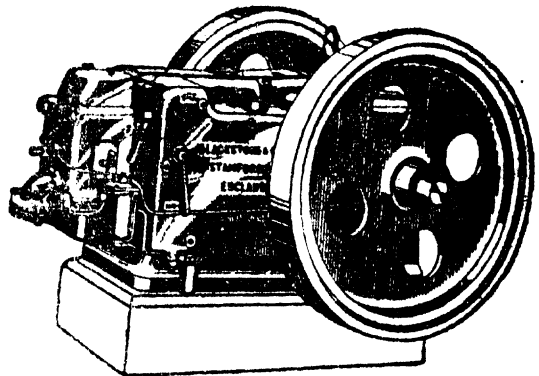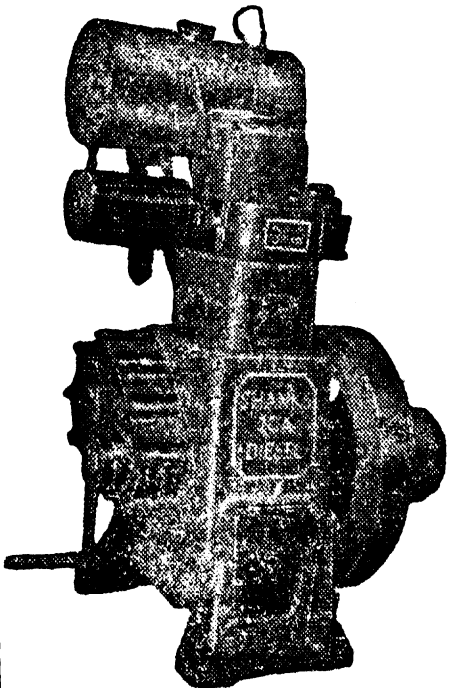
ফাদার সাইমন প্রশান্ত হাসি হেসে বললেন, একজন সামান্ত

ধর্মযাজকের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহের আয়োজন ! বেশ তো, ভয় পাবার কী আছে। দেখাই যাক না, পৃথিবীতে এখনো ন্যায়ের আর সত্যের জোর বেশি, না অধর্মেরই ! পুণ্যমাতা মেরী ক্ষমা করুন তাদেরকে !

সবখানি না জানলেও মোটামুটি রটনাটি কৃষ্ণার কানেও পৌঁছেছিলো। দুঃখটা বেজেছিলো তাকেই বেশি করে। তাকে আনন্দ দেবার জন্যেই না তার জন্মতিথিকে উপলক্ষ্য করে স্নেহময় পিতা উৎসবের আয়োজন করলেন দুঃস্থ গ্রামবাসীদেরও আনন্দবিধানের আশায়—আর তার কি না এই পুরস্কার ! এই হতভাগ্য অভিশপ্ত হিদেনদের জন্যে একটুও ভালো করতে নেই !

কয়েক দিন ধরে বাবার অবস্থা দেখে কৃষ্ণাও ভরসা পায়নি কাছে যেয়ে বসতে, কথা বলতে, সান্ত্বনা দিতে ! শুধু দূর থেকে দেখেছে আর মাকে স্মরণ করে কেঁদেছে। আজ যদি মা থাকতো ! এই অভিশপ্ত দেশ ফেলে তারা চলে যেতো স্কটল্যাণ্ডে। দরকার নেই এমন দেশে থেকে !

ফাদার সাইমনও অনুভব করতে পারছিলেন মেয়ের মনের অবস্থা। এখনো কি মোহ আছে তার মনে—সুবীরের সম্বন্ধে ? সুবীরই যে এই যজ্ঞের হোতা—এ খবর ভালো করে জানা দরকার তার। কৃষ্ণাকে কাছে ডাকলেন তিনি।

কৃষ্ণা এসে বসলো কাছে। ফুলের মতো মুখখানি, সকরুণ বিষাদের ছোঁয়ায় ছায়াম্লান, চোখের পাতা ভিজে। তার দিকে চেয়ে হঠাৎ ফাদার সাইমনের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো, একটু থেমে বললেন—সব শুনেছিস্ তো মা ?

—হ্যাঁ, বলতে গিয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো তার ঠোঁট দুটি, তাড়াতাড়ি মুখ লুকোলো বাবার কোলের মধ্যে। অম্লান শুভ্র আলখাল্লার মধ্যে কৃষ্ণার কালো চুলের রাশি যেন শেষরাতের স্বচ্ছ আকাশে আঁকা ছায়াপথের একমুঠো তরল অন্ধকারের মতো ফুটে রইলো। ফাদার সাইমন ধীরে ধীরে আঙুল বুলোতে লাগলেন তার চুলের মধ্যে—বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলেন অন্য দিকে। যে-সংবাদ দেবার জন্যে ডেকেছিলেন, তা আর দেওয়া হলো না। আর ওকে আঘাত দিতে পারলেন না তিনি।

অনেকক্ষণ কেটে গেলো। কৃষ্ণা ঘুমিয়ে পড়ার মতো নিথর হয়ে আছে। এক সময় হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন ফাদার সাইমন—জিমিকে মনে পড়ে রে কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা মুখ তুললো। সামনের দেয়ালেই জেমসের ছবি—বাবা চেয়ে রয়েছে সেদিকে। ষোলো বছর বয়েসের ছবি—এক প্রকাণ্ড বুনোশুয়োরের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে জেমস্ ; হাতে বন্দুক, চোখে-মুখে একটা দৃপ্ত শৌর্যের ভঙ্গি। কি চমৎকার আর কি দুর্দান্ত ছেলে ছিলো জেমস্ ! বাবাকে না বলে বন্দুক নিয়ে শূকর শিকারে যাবার জন্যে কি বকুনিটাই না খেতে হয়েছিলো তাকে সেবার। এখনো আবছা আবছা মনে আছে কৃষ্ণার। সেই জেমস্—আজ আর নেই। চলে গেছে মায়ের কাছে। কৃষ্ণার চোখ ভরে' এলো জলে। ধরা গলায় বললো—মনে পড়ে আবছা—

ফাদার সাইমন এবার বললেন—আর মাকে ?

জেমসের পাশেই মায়ের ছবি। ঝাপসা চোখের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় না ভাল করে। তবু, হ্যাঁ, ঐ তো মা-ই !

—কৃষ্ণার দু'চোখ ছাপিয়ে জল নামলো।

রটনাটি কতোখানি কার্যকরী হয়েছে গোপনে গোপনে, তা জানা যায়নি একেবারেই। জানা যখন গেলো, তখন আর সময় নেই—প্রস্তুত ছিলো না কেউ তার জন্যে !

এক দিন শীতের শেষ রাতে ফাদার সাইমনের ছোট বিজন বাড়ীটি হঠাৎ কেঁপে উঠলো মত্ত কণ্ঠের আসুরিক চীৎকারে রাত্রির স্নিগ্ধ ছায়াদেহী সুপ্তি আর স্বপ্ন নিমেষে খান্‌-খান্‌ হয়ে ছিটকে পড়লো জ্বলন্ত মশালের আগুনের লাল আভায়। ফাদার সাইমনের বাড়ীতে ডাকাতি পড়লো। শীত রাত্রির তপ্ত সুপ্তিভঙ্গের আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠবার আগেই ডাকাতরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়লো, বেঁধে ফেললো ঝি চাকর কর্মচারীদের, ভাঙতে সুরু করলো দরজা জানালা বাক্স পেঁটরা যা পেলো সামনে।

একহাতে জ্বলন্ত মশাল আর অন্য হাতে শাণিত শড়কি নিয়ে কয়েকজন খুঁজছিলো এঘর ওঘর আর হুঙ্কার দিচ্ছিলো—কৈ, কোথায় সে শয়তান পাদ্রী ?

শুভ্রকেশ, শুভ্রমূর্তি ফাদার সাইমন ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দাঁড়ালেন তাদের সামনে। তাঁকে দেখেই হৈ-হৈ করে উঠলো তারা—ঐ, ঐ সে শয়তান বুড়ো—মার মার ওকে—

ফাদার সাইমন দু'হাত তুলে তাদের দিকে আরো এগিয়ে গেলেন। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কী চাও তোমরা ? এত রাত্রে এখানে হল্লা করতে এসেছো কেন ? কী চাও বলো—টাকাকড়ি, কাপড় চোপড়, খাবারদাবার—

—তোমার মাথা চাই—পিছন থেকে চীৎকার করে উঠলো একজন, আর সেই সঙ্গে আরো কতো জন যোগ দিলো। '—শুয়োরের মাংস গরুর চর্বি খাইয়ে জাত নষ্ট করেছো সবার, আবার বলে খাবারের কথা—মার, ওকে, পুড়িয়ে মার—

হৈ-হৈ করে' ভীড় পাকিয়ে এগিয়ে এলো তারা।

ফাদার সাইমন কণ্ঠস্বর আর একটু চড়িয়ে হাত উঁচু করে সারমন দেবার ভঙ্গিতে বললেন—ভাই সব ! আমরা পবিত্র ধর্ম প্রচার করাব জন্যে এদেশে এসেছি। সে ধর্ম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হয়—জোর করে চাপাবার নয়। তোমাদের যদি সত্যিই বিশ্বাস হয়ে থাকে আমি তোমাদের ধর্ম নষ্ট করেছি—এই আমি বুক খুলে দাঁড়িয়েছি—এগিয়ে এসো—মারো অস্ত্র। আমার রক্ত দিয়ে এই মিথ্যারটনাকারীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাবো। ভগবান তাদের ক্ষমা করুন।

কয়েক মুহূর্ত্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে রইলো মত্ত জনতা। হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে পিছন থেকে আবার কে চেঁচিয়ে উঠলো—বুড়ো শয়তানের লম্বা বাতে ভুলো না ভাই সব, বুড়ো শয়তান যাদু জানে, তুক করবে এখুনি। মারো মারো শয়তানকে—ধর্মনাশ করেছে আমাদের—

জনতা একটু পিছিয়ে গিয়েছিলো—এই কথায় আবার হুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে এলো। দশ-বারোটা মশালের লাল আলোয় হঠাৎ পাঁচ-সাতখানা সড়কির ঝকঝকে ফলাগুলো যেন দাঁত বার করে' ঝলসে উঠলো—শিউরে উঠে চোখ বুঁজলেন ফাদার সাইমন।

কৃষ্ণাও ইতিমধ্যে কখন উঠে এসে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলো ফাদার সাইমনের পিছনে। তার যেন চেতনা ছিলো না। হঠাৎ ঐ বীভৎস হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সড়কি ফলকের ঝলক—

যেন তাকে প্রচণ্ডবেগে ঝাঁকি দিয়ে জাগিয়ে গেলো। কোনো কিছু না ভেবেই সে দুহাত মেলে দিয়ে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে 'বাবা' বলে চীৎকার করে' উঠে বিদ্যুৎগতিতে ফাদার সাইমনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

ফাদার সাইমন চোখ মেললেন সচকিত হয়ে। দেখলেন—কৃষ্ণা লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পায়ের কাছে। ধরে তুলতে গেলেন। বড়ো দেরী হয়ে গেছে। তিন তিনখানা সড়কি এসে বিঁধেছে তার কোমল দেহে—দুখানা বুকে, একখানা গলার একটু নীচে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে—তপ্ত···তাজা···লাল রক্ত—

দু' হাতে ক্রশ এঁকে ফাদার সাইমন নতজানু হয়ে' বসে পড়লেন তার পাশে—অস্ফুটে বাইবেলের বাণী আবৃত্তি করতে করতে। তাঁর শুভ্র আলখাল্লা লালে লাল হয়ে উঠলো।

উম্মত্ত জনতার স্তম্ভিত সমাবেশের পিছন থেকে কে একজন চীৎকার করে' ছুটে এলো—কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!

সে সুবীর। ডাকাতদের মতো তারও মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা—ফাঁপিয়ে-তোলা বাব্‌রি চুলে লাল কাপড়ের ফেট্টি জড়ানো। কোনো দিকে না তাকিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসলো কৃষ্ণার রক্তাক্ত দেহের পাশে—মাথা থেকে এক টানে কাপড়টা খুলে নিয়ে মুছে দিতে লাগলো টক্‌টকে লাল তাজা রক্ত। দুহাতে কৃষ্ণার নিশ্চেতন মাথাটা তুলে ধরে পাগলের মতো বলতে লাগলো আর্ত্তস্বরে—কৃষ্ণা! কৃষ্ণা! আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হলাম শেষে! কৃষ্ণা, একবারটি শোনো···কৃষ্ণা, চোখ মেলে তাকাও! আমি যে তোমায় আজ নিয়ে যাবো বলে এসেছিলাম কৃষ্ণা, আমায় ফেলে এমন করে কোথায় চলে যাচ্ছো কৃষ্ণা!—

কোনো দিকে খেয়াল ছিলো না তার। একটু পরে তার মাথায় কে হাত রাখলো। মুখ ফিরিয়ে দেখলো সুবীর—ফাদার সাইমন। ধীর অবিচলিত কণ্ঠে তিনি বললেন—তোমার শোকপ্রকাশ শেষ হয়ে থাকে তো তুমি এবার যেতে পারো। আমার মেয়ের দেহ স্পর্শ করে তার অন্তিম যাত্রার পথকে আর কলঙ্কিত কোরো না তুমি—তোমার কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা। আমায় শেষকৃত্য করতে দাও। মাতা মেরী তোমায় ক্ষমা করুন!

সে প্রশান্ত দৃষ্টির সমুখে আর দাঁড়াতে পারলো না সুবীর। ধীরে ধীরে উঠে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেলো।

শ্রান্তি-ধূসর সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে ধীরে-ধীরে। আকাশে তারা ফুটতে লেগেছে। পশ্চিম-দিগন্তে এখনো জড়িয়ে রয়েছে দিনান্তের রক্তিম অবসাদ।

কৃষ্ণার শেষকৃত্য সমাপন করে রোজকার মতো ছাদে এসে বসেছেন ফাদার সাইমন। কৃষ্ণাকে শুইয়ে দেওয়া হলো তার মায়ের সমাধিস্থানের পাশেই ঐ কনকচাঁপা গাছটার ছায়ায়। লুসীর সঞ্চারিণী স্বপ্ন এবার শান্ত হয়ে ঘুমাক্ তার কোলেই!

আজ আর নেই শ্রান্ত অসুস্থ দেহে ঠাণ্ডা লাগাবার জন্ত অনুযোগ করতে। নিজের অলক্ষ্যেই কান্নার চেয়ে করুণ একটা ম্লান পাণ্ডুর হাসি চকিতে মিলিয়ে গেলো ফাদার সাইমনের মুখে। হাত বাড়িয়ে দূরবীণটি কাছে টেনে নিলেন তিনি।

এইটিই এখনো রয়েছে তাঁর জীবনের একমাত্র শখ—কর্মক্লান্ত অবকাশের বিলাস। এটাই এখনো তাঁর সঙ্গী হয়ে রইলো—বিশ বছরের একনিষ্ঠ সঙ্গী।

দূরবীণের মধ্যে দিয়ে চোখ ফেরালেন তিনি চেনা একটা তারকা-গুচ্ছের দিকে। তারাও রয়েছে তো ঠিক। কেবল একটি তারাই যেন দেখা যাচ্ছে না, হারিয়ে গেছে বুঝি! কৈ, কালও তো দেখেছিলেন তাকে—ঐ ঐখানেই—

দৃষ্টির বিভ্রম? চোখ ঝাপসা হয়ে এলো না কি? কিন্তু কৈ, অন্য তারা তো দেখা যাচ্ছে এখনো!

তবে—তবে কি সত্যিই হারিয়ে গেছে? না, ঢাকা পড়েছে সে এককণা মেঘবাষ্পের আড়ালে ক্ষণিকের জন্তে?

কে জানে!

বিচিত্র ভ্রমণ

জ্ঞানাঞ্জন পাল

১৯৩০ সাল। ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসব হচ্ছে নানা জায়গায়। বিপিনচন্দ্র পাল এই উৎসব-উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে মহারাষ্ট্র ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে যান। আমায় নেন সঙ্গে। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ কাজের যোগ আমি জ্ঞান হয়ে বিশেষ দেখিনি। সে যোগ ছিল আমার জন্মের আগে ও শৈশবে। এ যুগে তিন জনকে দেখেছি, ব্রাহ্মসমাজ নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে একান্ত ভাবে শেষ পর্য্যন্ত বেঁধে রাখতে পারেন নি। এক সময় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এঁদের নিবিড় যোগ ছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যক্ষ ভাবে ছিন্ন করেই দেন শেষের দিকে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ব্রাহ্মসমাজের যোগ—আমরা বড় হয়ে যা দেখেছি, তাকে ঘনিষ্ঠ বলতে পারি না। ১৯০৩ সালে দেখি, বিপিনচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ১২ই মাঘ ইংরেজীতে বক্তৃতা দিচ্ছেন, বিষয় 'দি ন্যাশন্যাল্ প্রবলেম্'; ১৯০৩ ও ৪ সালে বোধ হয় কলিকাতার টাউন হলেও তিনি মাঘোৎসবের ভাষণ দেন ভবানীপুর সম্মিলন সমাজের পক্ষ থেকে ; বিষয় এখানেও ব্রাহ্মধর্ম নয়, দেশগঠনের মূল সমস্যা। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোনো বড় অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশিষ্ট অংশ নিতে দেখিনি। মতের ও আচার-অনুষ্ঠানের বন্ধন ছাড়া সমাজ গড়ে না, সম্প্রদায়ও তৈরী হয় না। স্বাভাবিক প্রয়োজনেই 'ক্রিড' বা মতের প্রাধান্য ব্রাহ্মসমাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু যাঁদের অন্তঃপ্রকৃতি নিত্য বিকশিত হয়, অন্তর্জীবনের গতি বা চলা থামে না, মতের বাঁধন তাঁদের বাঁধতে পারে না, সে মত যতই নতুন হোক না কেন। বিপিনচন্দ্রের প্রকৃতি, মনে হয়েছে এই ধরণের। তাঁর কাছে ব্রাহ্ম আদর্শ—তিনি যা বুঝতেন—তা চিরদিনই অতি প্রিয় বস্তু ছিল, প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মমত বা আচার সব সময় তাঁর মনে সায় না পেলেও। শতবার্ষিকী উৎসব-উপলক্ষে ব্রাহ্মমত প্রচারের প্রয়োজন ছিল না, দরকার ছিল জীবন্ত ব্রাহ্ম আদর্শের কথা দেশকে আবার শোনান। তাই দেখি, দীর্ঘ দিন পরে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বড় অংশ নিতে ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষ বিপিনচন্দ্রকে আহ্বান জানাচ্ছেন। এর আরও একটা কারণ ছিল। মারাঠি ও গুজরাটি ব্রাহ্ম বা প্রার্থনা-সমাজের কর্মীরা বম্বে ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে বিপিনচন্দ্রকে তাঁর জীবনের সায়াহ্নে আর একবার নিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। যতদূর মনে আছে, ঐ অঞ্চলের এক প্রাচীন বন্ধু এজন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁরই সঙ্গে আমরা বম্বে রওয়ানা হই।

বম্বেতে উঠি এক কৃতী বাঙ্গালীর বাড়ীতে। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে ঘুরে আমার মনে হয়েছে তিনি কেবল একজন প্রচারক ছিলেন না, প্রকৃতিতে পরিব্রাজকও ছিলেন। গৃহী প্রচারক হতে পারেন, সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী প্রকৃতির লোকই পরিব্রাজক হন। পরিব্রাজক নিজে কেবল চলেন না, মনও তাঁর চলে, আর মনের এই চলাতেই তাঁর আনন্দ। সেজন্য ভ্রমণে বিপিনচন্দ্রের ক্লান্তি দেখিনি। পরিব্রাজকের কাছে যেমন নিজের বাড়ী, তেমন পরের বাড়ী। এদেশে নানা জায়গায় বাবা যা গিয়েছেন, হোটেলে কখনো উঠেছেন দেখিনি। বিলাতে বা আমেরিকায় বক্তৃতার আমন্ত্রণে যখন গিয়েছেন, তখন কোথাও কোথাও হোটেলে তাঁর আতিথ্যের ব্যবস্থা হয়েছে, তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি। এদেশে এ প্রয়োজন কখনো হয়নি। বম্বেতে যাঁর বাড়ীতে আমরা উঠলাম, তিনি তখন কিন্তু বম্বেতে নেই। ব্যবসায়ী মানুষ, কাজে বাহিরে গিয়েছেন। এই পরিবারের তাতে কিছু অসুবিধা হল না দেখলাম, যদিও এদের সঙ্গে আমাদের পূর্বে কোন আত্মীয়তা বা তেমন পরিচয় ছিল না। তাঁর স্ত্রী নিলেন বিপিনচন্দ্রের আতিথ্যের ভার। বৌটি বাবার কন্যার বয়সী ; এমন অসংকোচ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি বিপিনচন্দ্রকে নিলেন, যেন তাঁর পিতৃস্থানীয় কোন নিকট-আত্মীয় অনেক দিন পরে তাঁর কাছে এসেছেন। এমন একটা সহজ প্রীতির সম্বন্ধ আসামাত্র এঁদের সঙ্গে স্থাপিত হ'ল, যার কথা মনে হলে এখনো আশ্চর্য্য লাগে।

আমাদের এদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজ, বম্বে অঞ্চলে কতকটা তেমন প্রার্থনা-সমাজ। আর ব্রাহ্মসমাজের এই সময়ের নেতৃস্থানীয় অনেকে যেমন রাজনীতিতে ধীরপন্থী ছিলেন, প্রার্থনা-সমাজেও তেমন ছিলেন। সমাজ সংস্কারের আকর্ষণে দেশের প্রতি আস্থাই এদের যেন কমে গিয়েছিল। নিজের দেশের সভ্যতা ও সাধনা যে খুব উঁচু স্তরের, এটা তাঁদের চোখে তত স্পষ্ট হয়ে মনে হয়, ফুটে উঠত না। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের নেতাদের মনোভাব কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ বা রাজনারায়ণ প্রভৃতির কাছে এদেশের সাধনার চাইতে বড় কিছু ছিল না। মহারাষ্ট্রীয় মনীষী মহাদেও গোবিন্দ রাণাড়ে সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা চলে। এঁদের সংস্কার চেষ্টায় তাই দেশের মর্য্যাদা কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। এঁদের পরেও দেশাত্মবোধের এই ধারা ব্রাহ্মসমাজে অক্ষুণ্ণ ছিল অনেক দিন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা যাঁরা ছিলেন, তাঁরাই সেদিনের রাষ্ট্র-চিন্তা ও কর্মে অগ্রণী ছিলেন। ক্রমে এ ধারা ব্রাহ্মসমাজে ক্ষীণ হয়ে পড়ে, প্রার্থনা-সমাজেও পড়ে। বস্তুতঃ, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের ঐতিহ্য প্রার্থনা-সমাজের কখনো ছিল বলে জানি না। সেজন্য আমাদের ধারণায় প্রার্থনা-সমাজ ঐ অঞ্চলের ইংরেজী-শিক্ষিত, রাজনীতিতে ধীরপন্থী সমাজ-সংস্কারকদের এক সমিতি মাত্র ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলছি (১৯৩০ সাল) তখন বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি নারায়ণ গণেশ চন্দ্রভারকর বোধ হয় পরলোকে। চন্দ্রভারকার প্রার্থনা-সমাজের একজন নেতা ছিলেন ; আর তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা রাজনীতিতে ধীরপন্থীই ছিলেন। যুবক আমরা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। ইংরেজের আশ্রয়ে ধর্মে, সমাজে বা রাষ্ট্রে সংস্কারের সকল চেষ্টাই যে ব্যর্থ হতে বাধ্য, এ ধারণা আমাদের

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট
সাবানেই এসব কাচা
হয়েছে!
অতিরিক্ত ফেণার দরুণই
এ সম্ভব হয়
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে
S. 249-X52 BG
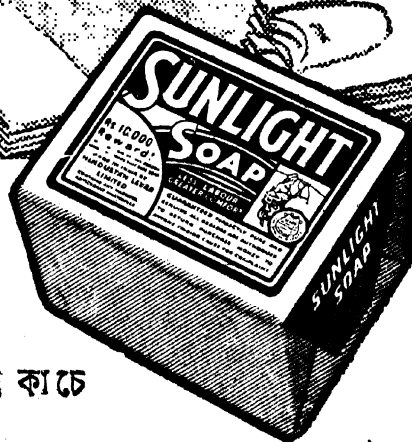
মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। বোম্বাইয়ের প্রার্থনা-সমাজের কোনো গৌরবোজ্জ্বল রূপ সেজন্য মনের মধ্যে ছিল না। প্রার্থনা-সমাজ গৃহে বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার ব্যবস্থা হ'ল। মাঝারি হল, ভরেও গিয়েছিল। কিন্তু কি প্রেরণা শ্রোতারা বক্তার কাছ থেকে পেলেন বা বক্তা দিতে পারলেন, তার কোনো ছাপ আমার মনে পড়েনি। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ বা বাণী সর্বসাধারণের জন্য, নিরপেক্ষ ইতিহাস বোধ হয় সে কথাই বলবে। বিপিনচন্দ্রের ব্রত ব্রাহ্মসমাজের এই সার্বজনীন বাণীই প্রচার করা। কিন্তু অর্থে, পদে, শিক্ষায়, আকাঙ্ক্ষায় যাঁরা দেশের সাধারণ থেকে নিজেদের পৃথক করে ফেলেছেন, তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান কি এই বাণী প্রচারের পক্ষে অনুকূল—প্রার্থনা-সমাজের সভায় সেই কথা মনে হয়েছে।

বম্বেতে অল্প ক'দিন থাকার পর পুণায় যাই। এর আগেও কয়েক বার পুণায় গিয়েছি বাবারই সঙ্গে। একবার লোকমান্য তিলকের বাড়ীতেই উঠি। সে বার বিপিনচন্দ্র একা নন, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতিও তিলকের আমন্ত্রণে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পর পুণায় এসেছিলেন। তিলকের রাষ্ট্রকর্মে সতীর্থ ও শিষ্য নরসিংহ চিন্তামণি কেলকারের বাড়ীতেও একবার উঠি। পুণা শহর যেমন পুরানো তেমন পুরানো ছিল কেলকারের বাড়ী। লোকমান্য তিলকের বাড়ীও প্রায় তাই। তিলকের বাড়ী ছিল বেশ বড়; তাঁর 'কেশরী' ও ইংরেজী 'মারাঠা' পত্রিকার আপিস ও ছাপাখানা এই বাড়ীতেই। এবারও এক মারাঠি বন্ধুর বাড়ীতে উঠি। শিক্ষিত মারাঠি পরিবারে অল্প দিন থাকারও যার সৌভাগ্য হয়েছে মারাঠি চরিত্র বোঝা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। সমস্ত বাড়ীর চেহারায় মিতাচার ফুটে ওঠে স্পষ্ট। অভাবে আমরা মিতব্যয়ী হই, মারাঠিরা প্রকৃতিতে মিতাচারী। দেশের কাজে ত্যাগের দীক্ষা যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের পরিবারে এই মিতাচার এক অনৈসর্গিক শোভাতে ফুটে ওঠে। কেবল তিলক বা কেলকারের পরিবারে নয়, তাঁদের সহকর্মী অন্য মারাঠি-পরিবারেও এরই রূপ দেখেছি। মানুষের সংযম টের পাওয়া যায় প্রধানতঃ তার খাওয়ায় ও কথায়। এঁরা কত সংযমী তা অতিথির পরিচর্য্যায় যে আহারের ব্যবস্থা করেন, তাতেও ধরা পড়ে। সাধারণতঃ ৩টা কি ৪টার বেশী তরকারী এঁদের বাড়ীতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বাংলায় এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থ একবার বাবার সঙ্গে আমাদেরকেও নিমন্ত্রণ করে আহার্য্যের যে পদ সারি সারি সাজিয়ে দিয়েছিলেন, তার সবগুলিতে হাত পৌছাতেও কষ্ট হয়েছিল। মারাঠি বন্ধুটির বাড়ীতে, মনে আছে, এক সন্ধ্যায় ঘন দুধের এক অতি সুস্বাদু বস্তু খাই, নাম বোধ হয় তার 'বাসন্তী'। মারাঠি আহার্য্যের আভিজাত্য, আমার মনে হয়েছে, 'বাসন্তী'র স্থান সবার ওপরে।

মারাঠি-চরিত্রের আর একটা দিক তাঁদের দৃঢ়তা। এই দৃঢ়তা জাতীয় জীবনের অবনতির সময় নিষ্ঠুরতায় নেমে আসে। প্রায় দু'শো বছর এই বাংলাদেশেই বর্গীর অত্যাচারে আমরা তা দেখি। আবার বড় আদর্শের প্রেরণায় এর বলিষ্ঠ রূপ আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। চরিত্রের এই দৃঢ়তা কেবল লোকমান্য তিলকের মধ্যে নয়, তাঁর সহকর্মী কেলকার প্রভৃতির মধ্যেও ফুটে ওঠে খুব বেশী পরিমাণে। সাধারণ কথাবার্তায়, আচার-আচরণেও তা বেশ বোঝা যায়। মারাঠিদের মধ্যে একটা জিনিষ দেখিনি, সেটা উচ্ছ্বাস। তিলক রাজনীতিতে চরমপন্থী ছিলেন, উচ্ছ্বাসের আবেগে নয়, নেতৃত্বের প্রয়োজনে। আর উচ্ছ্বাসী ছিলেন না বলে, আমার মনে হয়েছে, তিলক বিপ্লবী ছিলেন না। দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস বাঙ্গালীকে সহজে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

মারাঠি মহিলারা সামাজিক প্রথাতেই পুরুষের সামনে অসংকোচে চলাফেরা করেন। বাহিরের অতিথিরাও দেখতে পান ভিতরের বারান্দায় বা রান্নাঘরে মহিলারা নানা কাজে ব্যাপৃত আছেন। এর ফলে পুরুষের সঙ্গে এঁদের সমান পদ ও মর্য্যাদায় যে কোনো স্বাভাবিক সখ্য গড়ে উঠত, তা বলতে পারি না। সমাজপতিরা তার দরজা অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়ের মধ্যে সখ্যের যে স্নিগ্ধ ছবি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়, মহারাষ্ট্র প্রমুখ অঞ্চলেও মধ্যযুগের সামাজিক কাঠামোতে তা সম্ভব বলে মনে হয়নি। তা সত্ত্বেও অনেকটা মুক্ত হাওয়ায় এখানকার মেয়েরা চলাফেরা করেন দেখে কম আনন্দ হয়নি। আনন্দ খুব বেশী হয়েছিল একদিন স্কুল-বসার সময় রাস্তায় বেরিয়ে। নতুন লোক, পথ ভুল হবে ভয়ে মাঝের রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। দেখি, আশে-পাশের গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় আসছে অগণিত মেয়ে—হেঁটে ও অনেকে সাইকেলেও—যেন একটা বেগবতী নদীর প্রকাণ্ড স্রোত। সবাই স্কুল বা কলেজের ছাত্রী। আমাদের ধারণায় —আমি ২৭ বছর আগের কথা বলছি—মেয়ে স্কুলের সঙ্গে মেয়ে নেবার 'বাস' বইয়েরই মত মেয়েদের শিক্ষায় প্রয়োজন ছিল। পুণায় কিন্তু মেয়েদের স্কুলের 'বাস' একটিও দেখিনি। অথচ মেয়েদের শিক্ষায় এঁদের আগ্রহ আমাদের চাইতে কম, একথা বলতে পারি না। তখনই তাঁরা কেবল মেয়েদের স্কুল-কলেজ চালান না, শুধু মেয়েদের জন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও গঠন করেছেন।

মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল—কাজের নয় কেবল মনেরও। 'লাল-বাল-পাল' স্বদেশী যুগে যে লোক-পরিচিতি লাভ করে, তাতে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও বাংলার এই তিন জন নেতার মধ্যে আদর্শ ও কর্মের ঘনিষ্ঠ যোগের কথা জানিয়ে দেয়। কিন্তু রাষ্ট্র-কর্ম ছাড়াও, যখনই পুণা অঞ্চলে গিয়েছি তখনই শিক্ষিত মারাঠি যুব-চিত্তের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের মনের একটা যোগ দেখেছি। একবার মনে আছে, পুণায় কোনো সিনেমা বা থিয়েটার-গৃহে এক রাত্রে বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার ব্যবস্থা হয় টিকিট করে। হলের ভিতরে যত লোক, বাইরেও তত লোক দাঁড়িয়ে। দরজা সব খুলে দিতে হল শেষে, যাতে বাইরে থেকেও শ্রোতারা শুনতে পান। রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝে এ সভা হয়নি—বিষয়ও ছিল রাজনৈতিক নয়, বোধ হয় ভারতের সাধনা।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বিপিনচন্দ্র যতটা মনে আছে, ভারতের সাধনা সম্বন্ধেই পুণায় বক্তৃতা দেন। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে তিলকের পাণ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়। কেবল তিলক নন, রাণাড়ে, ভাণ্ডারকর প্রভৃতিরও এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি কম ছিল না। বিপিনচন্দ্রের এ ধরণের পাণ্ডিত্য কখনো ছিল না। কিন্তু তাঁর গভীর মননশীল একটা জাগ্রত বোধ ছিল। ভারতের সনাতন সাধনার স্বরূপটা তাই তাঁর চোখের সামনে খুলে গিয়েছিল। এই সাধনা তাঁর কাছে কেবল একটা প্রাচীন গৌরবের বস্তু ছিল না, বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে যুক্ত ছিল। বিধাতার

অভিপ্রায়ে ভারতের ভবিষ্যৎ গরিমাও গড়ে উঠবে, তিনি মনে করতেন এরই ভিত্তিতে। কিন্তু এই প্রাচীন সাধনাকে যুগোপযোগী করে নিতে হবে। এ কাজ পূর্বেও হয়েছে আমাদের ইতিহাসে, এখনো প্রয়োজন। রামমোহন এ যুগে এরও পথপ্রদর্শক। রামমোহন লোকশ্রেয়ের পথে এ কাজটা করতে চেয়েছিলেন। লোকশ্রেয় মানে লোকের বা বিশ্বমানবের কল্যাণ ও সেবা। জাতির কল্যাণ ও সেবা আপনিই এর মধ্যে পড়ে। বাংলার এ যুগের সকল মনীষীরই চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা ছিল লোকশ্রেয়ের আদর্শ। বিবেকানন্দের প্রেরণা এই লোকশ্রেয়ই ছিল। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের সাধনার মধ্যে এই বস্তুই দেখতে পাই। বিপিনচন্দ্রেরও জীবনব্যাপী সংগ্রামে শক্তি জুগিয়েছিল এই আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রও এই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ ছিলেন। তাঁর 'আনন্দমঠ' তলিয়ে পড়লে বোঝা যায় তিনি দেশমাতাকে জগজ্জননীর ক্রোড়েই স্থাপন করেছেন, জগতের হিতের অন্তর্গত করেই দেশের হিত সাধন করতে হয়। মহারাষ্ট্রীয় মনীষী রাণাডে এ বিষয়ে রামমোহনের অনুগামী ছিলেন। রাণাডে প্রমুখের চেষ্টায় মহারাষ্ট্রের যুবচিত্ত অনেকটা এর প্রেরণায় জেগে ওঠায় বাংলার সঙ্গে তার মনের একটা সহজ মিল সাধিত হয়। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে একাধিক বার পুণায় গিয়ে এর পরিচয় পাই। আর এই মৌলিক মিলের জন্যেই রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ লোকমান্য তিলকের সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শে মানুষ বিপিনচন্দ্রের এতটা ঘনিষ্ঠ কাজের যোগ সম্ভব হয়েছিল।

মিলের কথা বললাম, পুরানো কথা, অমিলটাও পরিষ্কার করে বলা ভাল। তিলকের পথ রাণাডে প্রমুখ বা বিপিনচন্দ্র থেকে কিছু ভিন্নও ছিল। তিলক ইংরেজের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে চাইতেন সর্বাগ্রে। ভারতের প্রাচীন সাধনার সঙ্গে যুগধর্মের সমন্বয় সাধন করে দেশকে জড়তা থেকে মুক্ত করার কাজ, তিনি মনে করতেন, পরে করলেও চলবে। বস্তুতঃ তাঁর ধারণা ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র-জীবন লাভ করলে এ কাজ আপনি অনেকটা হবে। বিপিনচন্দ্র প্রমুখ বাংলার প্রথম যুগের স্বাধীনতার সাধকেরা অন্য রকম মনে করতেন। সংস্কার-পীড়িত সাধারণের মনের জড়তা দূর ও স্বাধীনতার সংগ্রাম একই পথে, একই জাগরণের মধ্য দিয়ে একসঙ্গে করতে হবে। প্রথমটা ছেড়ে কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার লড়াই করতে গেলে, স্বাধীনতা কোনো পথে পেলেও তা সাধারণের জীবনে সার্থক হবে না। কেন না সেটা সাধারণের জাগ্রত শক্তিতে অর্জিত হয়নি। এই দৃষ্টি সমীচীন ছিল কি না ইতিহাস ক্রমে তার বিচার করবে। মনোবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক এই পার্থক্যের একটা কারণও হয়ত খুঁজে পাবেন ইতিহাসের পাতায়। ইংরেজ মারাঠিদের কাছ থেকেই ভারতে নতুন হিন্দুসাম্রাজ্যের সম্ভাবনা কেড়ে নেয়। বাংলায় এই ইংরেজই আবার নবাবী শাসনের অবনতির যুগে দেশবাসীকে তার উচ্ছৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করে। পরে সে অবশ্য তার শাসনের শৃঙ্খলে দেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে। ইংরেজ সম্বন্ধে নবযুগের প্রথম দিকে বাংলার যে মনোভাব তা মহারাষ্ট্র থেকে এ কারণেই স্বভাবতঃ পৃথক হতে পারে। কিন্তু এ প্রভেদ সত্ত্বেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় যেমন মহারাষ্ট্র তেমন বাংলা সমান উন্মুখ ছিল। আর এর ফলে বিপিনচন্দ্রের চিন্তার সঙ্গে শিক্ষিত মারাঠি জনতার একটা সঙ্গতি হতে দেখেছি—যেমন হয় সুর-শিল্পীর সঙ্গে সমঝদার শ্রোতার। ভারতের সাধনা সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্রের এবারেরও বক্তৃতা মারাঠি যুবকদের মধ্যে যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল, বম্বে বা সৌরাষ্ট্রে অন্য কোথাও তা দেখিনি।

পুণা থেকে বম্বে ফিরে এলাম। বম্বে থেকে পুণার পথের সৌন্দর্য্য মনকে মুগ্ধ করেছিল, বিশেষ করে এবার। বর্ষাকাল। সমস্ত রেলপথটা গিয়েছে পাহাড়ের গা দিয়ে, দরকার হ'লে পাহাড় কেটেও। সাধারণ বাঙ্গালী, পাহাড়ে বিশেষ টান হওয়ার কথা নয়। বাঙ্গালী জলের দেশের লোক, তার মন টানে নদী, হাওর ও মোহানার দিকে, যেখানে নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে। অন্ততঃ আমার মনকে পর্বতাঞ্চল তেমন প্রীতির আকর্ষণে কখনো টানে নি। মহাকবির সঙ্গে নগাধিরাজ হিমালয়ের গর্ব করেছি ভারতবাসী বলে, কিন্তু বাঙ্গালী বলে মনটা ছড়িয়ে আছে সমস্ত বাংলায়। বাঙ্গালী বলে মন এখনো কাঁদে, খুলনা ও শ্রীহট্ট প্রায় হেলায় দেশভাগের সময় বিলিয়ে দেওয়ায়। এমন কুনো বাঙ্গালীর মন কিন্তু ভরে গিয়েছিল বর্ষায়, এই পথের সৌন্দর্য্য দেখে। বিচিত্র শব্দে ছোট-বড় অসংখ্য ঝর্ণা কখনো মেঘের আড়ালে থেকে, কখনো সূর্য্যের কিরণ গায়ে মেখে, স্বচ্ছ শুভ্র জলের স্রোত অবিরত ধারায় পাহাড়ের গা দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে, দু' চোখ ভরে তা দেখেছিলাম ; আর তার স্মৃতি আজও ভুলতে পারি নি।

এবার দূরপাল্লার যাত্রী হ'তে হবে—অবশ্য থামতে হবে জায়গায় জায়গায় ; বিপিনচন্দ্রের আমন্ত্রণ বা বক্তৃতার ব্যবস্থা যেখানে হয়েছে। বরোদায় নামা হ'ল না, নামলুম তার এক তালুকে—নাম আমরেলি। একটা বড় সৌভাগ্য এখানে ঘটেছিল। লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার আমাদের এখনকার জীবনে কি প্রয়োজন, তার একটা ভাল ছবি এখানে দেখতে পাই, আঁকা নয় বাস্তবে। বোধ হয়, এখানে এক দিন মাত্র থাকি। ষ্টেশন থেকে নেমে যে রাস্তাটা বাজারের ধার দিয়ে শহরের ভিতর চলে গেছে, তাই ধরে কতকটা গিয়ে একটা বাড়ীর সামনে এসে আমাদের গাড়ী থামল। বাড়ীটা গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ। দরজায় লেখা—'গ্রন্থাগারঃ দেবো ভব।' আমরা মানুষের উপরে যাকে তুলি, তাকে বলি দেবতা। যেমন বলি—'অতিথি দেবো ভব।' অতিথির সেবায় আমাদের মনুষ্যত্ব বাড়ে। গ্রন্থাগার আমাদের ভিতরে যে দেবতা ঘুমিয়ে থাকেন, তাঁকে জাগায়। তাই গ্রন্থাগারও দেবতা। গ্রন্থাগারের এত বড় সংজ্ঞা, এর আগে জানিনি বা ভাবিনি। স্কুল-কলেজের লেখাপড়া যে গ্রন্থাগারে নিত্য জ্ঞান আহরণের দ্বারাই সার্থক হয়, আবছা ভাবে তার একটা ধারণা মনের মধ্যে ছিল, ওই দিন ওখানে তা স্পষ্ট হয়। গ্রন্থাগারের বাহিরে কালো বোর্ডে সাদা অক্ষরে সকালেই লিখে দেওয়া হয়—'দিনের খবর।' দিনের কাজের ব্যস্ততা থামলে, সন্ধ্যায় সাধারণে ভিতরে এসে সবিশেষ তা পড়তে পারেন। ভিতরেও কেবল সাজান বইয়ের তাক দেখিনি, সমস্ত দেওয়াল মানচিত্রে ও 'চার্ট' প্রভৃতিতে মোড়া, শ্রেষ্ঠীজনের ছবিও মাঝে মাঝে। মনের খিদে কি করে বাড়ান যায়, তারই খালি চেষ্টা। ভুল যদি আমার না হয়, বরোদা মিউজিয়মের কিউরেটর ছিলেন একজন বাঙ্গালী, নাম তাঁর নিউটন মোহন দত্ত। তাঁরই চেষ্টায় বরোদার সর্বত্র লাইব্রেরী আন্দোলন সংগঠিত হয় ও ক্রমে সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

এখান থেকে আমরা যাই আমেদাবাদে, উঠি প্রসিদ্ধ শেঠ আম্বালাল সারাভাইয়ের বাড়ীতে। এঁদের বাড়ী ও বাগানের মধ্যেই

কয়েকটি ঘর কেবল অতিথিদের জন্য আলাদা করা। এগুলি প্রায় কখনো শূন্য থাকে না শুনলাম। আতিথ্যের এক নতুন রূপ এখানে দেখলাম। এঁরা পরিবার-ধর্মের মত আতিথ্য ব্রত পালন করেন। অতিথি-পরিচর্য্যা এঁদের নৈমিত্তিক নয়, প্রায় নিত্যকর্ম ছিল। ধনী গৃহের আরামের সঙ্গে আন্তরিক প্রীতি এঁদের ব্যবহারে মিশে অতিথির মনকে এক দুর্লভ তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিত। বাবার কিছু বিশ্রাম হবে ভেবে এখানে প্রায় দশ দিন তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। এই গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন আম্বালাল-পত্নী শ্রীমতী সরলা সারাভাই। এঁদের বাড়ীতে ঐশ্বর্য্যের একটা বিশেষ রূপ দেখেছিলাম যা অন্যত্র দেখিনি। এঁদের নিজস্ব লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার কেবল নয়, এর জন্য স্থায়ী গ্রন্থাগারিকও একজন আছেন। ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য পৃথক ঘর কেবল নয়, একটা নতুন বাড়ীও করে দিয়েছেন এঁরা। নিজেদের ও অতি নিকট-আত্মীয়দের ছেলেমেয়েরা কেবল এখানে পড়ে। গৃহ-শিক্ষক ও শিক্ষিকারা থাকেনও এখানে, প্রত্যেকের জন্য আলাদা ব্যবস্থা তার আছে। শিশুরা পড়ে মন্তেসরি পদ্ধতিতে, বড়রা পড়ে বিভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকদের কাছে,—ইংরেজী পড়ে একজন ইংরেজ মহিলার নিকট, নাচ শেখে মণিপুরী নৃত্যকুশলী এক পরিবারের কাছে। ধনী পরিবার; বাহিরের তৈরী জিনিষ নিশ্চয়ই অনেক কেনা হয়; কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনের যা তা এই বাড়ীতেই অনেকটা তৈরী হয়। বাগানে ফলমূল, তরিতরকারিই কেবল নয়, নানারকম রবিশস্যেরও ফসল ফলান হয়। বাড়ীর গোশালা দুধের জোগান দেয়, ঘিয়েরও। দর্জি রোজ বাড়ীতে আসেন জামাকাপড় তৈরীর জন্য এবং বাড়ীতে বসেই তা তৈরী করে। গান্ধীজির কল্পনা গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তা সফল হয়েছে কি না জানি না, কিন্তু খুব বড় ধনীর গৃহে যে প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারে তা এই পরিবার দেখে মনে হয়েছে।

সারাভাই-দম্পতির দুই কন্যা তখন কিশোরী; পরে এঁরা বিখ্যাত হয়েছেন। গান্ধীজির প্রেরণায় আমেদাবাদে গুজরাট বিদ্যাপীঠ সংগঠিত হয়েছে। মেয়ে দু'টি এখানেই পড়েন; মেয়েদের জন্য পৃথক জাতীয় মহাবিদ্যালয় গঠন করা সম্ভব হয়নি। কাকা কালেলকার এই বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। বিদ্যায়, চরিত্রে তাঁর খ্যাতি গুজরাটের বাহিরেও ছড়িয়ে পড়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের গঠনমূলক কাজের মধ্যে এই বিদ্যালয় একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। বিদ্যাপীঠের একটি ছোট ঘটনা এখনো মনে আছে। বিদ্যাপীঠ মুখ্যতঃ ছেলেদের বিদ্যালয় বলে 'কমন রুম' ছেলেদেরই। মেয়ে দু'টির 'কমন রুমে'র কি হবে? মেয়ে দু'টির জন্য পৃথক 'কমন রুমে'র ব্যবস্থা হ'ল একটি ছোট ঘরে পর্দা টাঙ্গিয়ে। মেয়ে দু'টি এই কালের শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে—স্বাভাবিক ভাবেই আধুনিকা। এরকম 'কমন রুম' তাদের একেবারেই পছন্দ হয়নি, গল্পচ্ছলে আমাদের বলেছিলেন। আপত্তি পৃথক্ ঘরের জন্য নয়, পর্দার জন্য।

এই পরিবারে প্রথম আমাদের দেশের একজন বড় শিল্পপতিকে কাছে দেখতে পাই। প্রথমেই চোখে পড়ে এঁর শ্রমশীলতা। এত ধনী, কিন্তু ছুটির দিন ছাড়া দিনের খাওয়া বাড়ীতে সম্ভব না। আম্বালাল ও তাঁর বড় ছেলের দুপুরের খাবার মিলে যায়। রাত্রে আমরা একসঙ্গে খাই, গল্পও জমে তখনি। এক মজার গল্প শেঠ আম্বালাল এক সন্ধ্যায় খাবার সময় বলেন। খাবার টেবিলে বলতে পারলাম না, কেন না এঁরা টেবিলে খান না। খান নিরামিষ, কিন্তু সন্ধ্যায় বিলাতী ধরণে সব খাবার তৈরী হয়—অর্থাৎ স্যুপ প্রভৃতিতে আরম্ভ ও বিলাতী ধরণে মিষ্টি প্রভৃতিতে শেষ। একটা বড় পীড়িতে আমরা বসি, দেয়ালের দিকে থাকে আর একটা বড় পীড়ি, ঠেস দেবার জন্য; খাবারের থালা গেলাস থাকে সামনে আর একটা উঁচু পীড়ি বা চৌকিতে। খেতে মাথা নীচু করতে হয় না, খেতে খেতে বেশ গল্প করা চলে যেমন টেবিলে বসে।

আম্বালাল বললেন—'জানেন শ্রীপাল, একবার পণ্ডিত মালবীয়কে আমি একটু মুস্কিলে ফেলেছিলুম মজা করে। মালবীয়জী তখন এবাড়ীতে আমাদের অতিথি। আমি বললুম—পণ্ডিতজী, আপনি খদ্দরের একজন বড় ভক্ত, নয় কি?

পণ্ডিতজী—নিশ্চয়, দেখছ না, আমার পোষাক সব খদ্দরের।

আম্বালাল—তা'হলে পণ্ডিতজী, আপনি আমাদের অর্থাৎ মিলের নিশ্চয় বিরোধী?

পণ্ডিত মালবীয় তখন তাঁর বাহিরের খদ্দরের পোষাকের তলার পিরাণটা দেখালেন, সেটা ছিল দেশী মিলের কাপড়ের—বললেন, এই দেখ, তোমরা আমার অন্তরের আরও কাছে।

গল্পটায় হাসির রোল উঠল। এই গল্পে পণ্ডিত মালবীয়ের চরিত্রের একটা দিক দেখা যায়। মালবীয় বিরোধকে এড়িয়ে চলতেন যদি তা মর্মান্তিক না হয়। ফলে কংগ্রেসের আদিপর্বে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা দেশে গড়ে ওঠে, তা কংগ্রেসের মধ্য জীবনে যখন নতুন জাতীয়তার জন্ম হয় তখনও ক্ষুণ্ণ হয় না; আবার তাঁর জীবনের প্রায় সন্ধ্যায় কংগ্রেসের নীতি ও নেতৃত্বের যখন আমূল পরিবর্তন হয়, তখনও তার বিশেষ ক্ষয় হয়েছিল দেখিনি। আর প্রকৃতিতে এই নমনীয়তা ছিল বলেই পণ্ডিত মালবীয় বিরাট প্রতিষ্ঠান হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কাশীতে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

খদ্দর নিয়ে এই লঘু পরিহাসে মনে যেন না হয় গান্ধীজীর প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা কম ছিল। সকল বড় নেতারই অনেকগুলি গুণ থাকে, যাতে বহু লোক নানা ভাবে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সকল গুণের সমবায়ে আমরা যাকে মানুষের ব্যক্তিত্ব বলি তা গড়ে ওঠে। গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তাঁর ত্যাগ, চরিত্র ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায়। এগুলি গান্ধীজির জীবনে অসামান্য পরিমাণে বিকশিত হয়েছিল। তাঁর প্রতি সাধারণের যে অনন্যপূর্ব শ্রদ্ধা তা স্বাভাবিকই ছিল। গুজরাটে এর একটা বিশেষ কারণও হয়ত মিশে গিয়েছিল। গান্ধীজি ভারতের গৌরব, সাধারণ ভাবে গুজরাট অঞ্চলের তিনি বিশেষ গর্বের বস্তু এই অঞ্চলের লোক বলে। ভারতের মত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত মহাদেশে এরকম হওয়াটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে পশ্চিম অঞ্চল থেকে এ যুগে প্রথমে যাঁরা সামনে এসেছিলেন, তাঁদের বেশীর ভাগ পার্শী বা মারাঠি ছিলেন। দাদাভাই নৌরজীর রাষ্ট্রকর্মে নিষ্ঠা শুধু বম্বে অঞ্চলে নয়, সমস্ত ভারতে তাঁকে এক বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। নৌরজীর প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের জন্মের আগের কথা একরূপ বলতে পারি। কংগ্রেসের আশ্রয়ে যাঁরা রাষ্ট্রজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন প্রথম যুগে, তাঁদের মধ্যেও গুজরাটি লোকনায়ক বেশী ছিলেন না। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম থেকে ১৯০৭ সালে সুরাটের বিরোধ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতিদের মধ্যে (বদরুদ্দিন তায়েবজিকে বাদ দিলে) গুজরাটি লোকনায়ক কেউ ছিলেন না। ১৯০৭ থেকে অসহযোগ

আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতির পদে কোনো গুজরাটি জননেতাকে দেখি না। নব জাতীয়তার জনক যাঁরা তাঁদের জন্য কংগ্রেসের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সুরাটের পরে, ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত তা খোলে নি। সুতরাং তিলক, অরবিন্দ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি কংগ্রেসের অধিনায়কের পদে কখনো বৃত হননি। ১৯২০ সালের কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনেই লাল-বাল-পালের মধ্যে লাজপৎ রায় প্রথম কংগ্রেসের সভাপতিত্বে আহূত হন।

আমাদের রাষ্ট্রজীবনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব গুজরাটিদের কাছে সুতরাং এক অনাস্বাদিত-পূর্ব বস্তু। স্বদেশীর প্রভাব যে এঁদের উপর অন্যদের অপেক্ষা কম পড়েছিল তা নয়। এঁদের দৃষ্টি পড়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ততটা নয়, যতটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। পার্শীদের পরেই এঁরা আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেন। পার্শীরা ইংরেজের সহযোগেই শিল্পবাণিজ্য গড়তে চান প্রথম দিকে। গুজরাটিরা ইংরেজের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশের শিল্পে ও বাণিজ্যে নিজেদের পথ ক্রমশঃ করে নিতে চেষ্টা করেন। এই রকম গুজরাটি শিল্পপতিদের অন্যতমরূপেই দেখেছিলাম অতিথিপরায়ণ আম্বালাল সারাভাইকে।

এঁরা বৃহৎ শিল্পপতি; ছোট শিল্প এঁদের জীবনের ব্রত নয়। গান্ধীজির কিন্তু তাই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে এঁরা বড় সহায়ক ছিলেন। প্রথমে মনে হতে পারে, এটা বড় বিসদৃশ সংযোগ। ইংরেজের আমলে আমাদের শিল্প-জীবন নষ্ট হওয়ার কাহিনীটা স্মরণ করলে এ ধারণা সম্ভব কেটে যাবে। আমাদের শিল্প-সৃষ্টি গুণে বা ব্যাপ্তিতে কারো থেকে কম ছিল না, যখন ইংরেজ এদেশে আসে। ইংরেজ কি করে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য নষ্ট করে, তার প্রথম যুগের কাহিনী স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের বইয়ে বিবৃত আছে। তার ফলে কয়েক দশকের মধ্যে সমগ্র ভারত 'কৃষি-প্রধান' দেশে পরিণত হয়। কৃষি শিল্পের সহোদর, শিল্প গেলে কৃষি বাড়ে না। আমাদের দেশেও বাড়েনি, বার বার দুর্ভিক্ষে তা প্রমাণ করে। শিল্প যাওয়ায় সাধারণ মানুষ অসহায় হয়—আত্মনির্ভরতার স্বাভাবিক শক্তি গ্রামবাসীর নষ্ট হয়ে যায়। এত বড় দুঃখ আমাদের কপালে এর আগে কখনো এসেছে বলে জানি না। অর্থনৈতিক জীবনে এই সর্বনাশা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আর একটা বড় দুঃখ এসে যুক্ত হয়। দেশের লোক ভাগ হয়ে যায়—ইংরেজী-শিক্ষিত হয় এক দিকে, তথাকথিত অশিক্ষিত বিরাট জনতা পড়ে থাকে আর এক দিকে। এই অবস্থারই নানা রূপ ফুটে ওঠে রাষ্ট্র-জীবনে, সাহিত্যে, সমাজ-সংস্কারে। এই মর্মন্তুদ অবস্থার স্বরূপটা প্রথম বোধ হয়, স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে নব-জাতীয়তার উন্মেষে—যা বাংলায় স্বদেশীতে ক্রমে রূপ নেয় ১৯০৫-'০৬ সালে।

মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিতেও মনে হয়, এই ভয়াবহ অবস্থার সমস্ত চেহারাটা ধরা পড়ে। চরকার পুনঃপ্রবর্তনে তিনি সাধারণে ও সাধারণের উপরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যের ছেদটা মুছে ফেলতে চান। এতে বিদেশীর বিরুদ্ধে এদেশীয়ের আন্দোলনে একটা নতুন শক্তি পাবে, যা পূর্বে কখনো সম্ভব হয়নি, হয়েছিলও তাই। আর তাতেই ইংরেজের বাঁধন শিথিল হবে—রাষ্ট্র-জীবনে ত বটেই, আর্থিক জীবনের ক্ষেত্রেও। স্বাধীনতা যেমন ধনী, তেমন নির্ধনের কাম্য। সর্বহারা জনতা স্বাধীনতার সম্ভাবনায় গান্ধীজির পতাকার তলে এসে দাঁড়াল; স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ধনী শিল্পপতিদের মনকেও এই আন্দোলনে টেনে আনল। সঙ্গে আর একটা স্বপ্নও হয়ত তাঁরা দেখে থাকবেন। ইংরেজের চাপ দেশের অর্থনৈতিক জীবন থেকে যেমন সরে যাবে, তেমন এঁদের শিল্প প্রসারের সুযোগও বেড়ে যাবে। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিতে এঁদের তাই কোনো বাধাই হ'ল না। চরকা বা মিল, কুটির-শিল্প বা বৃহৎ-শিল্প—বাস্তব ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বের প্রশ্নই তখন ওঠেনি। সুতরাং স্বাদেশিকতার ভূমিতে সমান নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সাধারণ ও শিল্পপতিরা এক হয়ে দাঁড়াতে পারলেন। এই স্বাদেশিক নিষ্ঠাই আম্বালাল প্রমুখ শিল্পপতিদের মধ্যে এসময়ে দেখেছিলাম। এ অবস্থা সবটা বদলে যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। সাধারণের সঙ্গে শিল্প বা বাণিজ্যপতিদের স্বার্থের বিরোধ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। তার কথা অবশ্য এ কাহিনীর বাহিরে।

আম্বালালের বাড়ীর উদ্যানে এক সন্ধ্যায় বিপিনচন্দ্র উপনিষদ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। সভায় পণ্ডিত-সমাগম হয়েছিল কিছু বেশী। আমাদের সাধনার প্রস্থান-ত্রয় সম্বন্ধে এঁরা ছিলেন অভিজ্ঞ। সুতরাং বক্তৃতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার এঁদের অধিকার ছিল পুরোপুরি। একজনের উক্তি এখনো মনে আছে। তিনি বলেন, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা তাঁরা ভালই পড়েছেন। কিন্তু এই বক্তৃতা শোনার আগে জানতেন না, এগুলি এমন স্পষ্ট বোঝা যায় বা এত সহজ ও সরল করে বোঝান যায়।

(বঙ্কিমচন্দ্র)

নাট্যরূপ ঃ শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

চরিত্র

পুরুষ

রামসদয় মিত্র	—	প্রতিপত্তিশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি
শচীন্দ্র	—	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
রাজচন্দ্র দাস	—	রজনীর প্রতিপালক
অমরনাথ	—	ভবঘুরে যুবক
হীরালাল	—	চাঁপার ভাই

নৌকার মাঝিগণ।

স্ত্রী

রজনী	—	রাজচন্দ্র দাসের পালিতা কন্যা
রজনীর মা	—	ঐ স্ত্রী
লবঙ্গলতা	—	রামসদয়ের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী
চাঁপা	—	হীরালালের ভগিনী

প্রথম দৃশ্য

[অপরাহ্ন। রজনী ফুলের মালা গাঁথিতেছিল ও গান গাহিতেছিল।]

রজনী। "আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটলো নাকো কলি—"

রাজচন্দ্র। রজনী!

রজনী। কি বাবা!

রাজচন্দ্র। তোর মা'র জ্বরটা আজ আবার খুব বেড়েছে। মিত্তির বাড়ীতে তিনি ত আজ ফুল-যোগান দিতে যেতে পারবেন না। আমিও ত অন্দরে গিয়ে ফুল দিয়ে আসতে পারি না—তাই···

রজনী। (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) তা আমিই না হয় দিয়ে আসব বাবা!

রাজচন্দ্র। তুই কি একা যেতে পারবি মা? আমিও না হয় তোর সঙ্গে যাব। তুই ফুলগুলো দিয়ে আসবি—আমি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবো—কাজ মিটে গেলে, আমি আবার তোকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো—কেমন?

রজনী। তুমি আবার কষ্ট করে শুধু শুধু কেন যাবে বাবা? আমি একাই যেতে পারবো—

রাজচন্দ্র। তা কি হয় মা? তোকে কি একা পথে ছেড়ে দিতে পারি?

রজনী। তাতে কি হয়েছে বাবা? একা যেতে আমার কোন কষ্ট হয় না।

রাজচন্দ্র। তা হোক, গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়ে শেষে যদি কোন দিন বিভ্রাট বাধাস!

রজনী। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি কোন বিভ্রাট বাধাব না। হাতের লাঠিটা নিয়ে টুক্ টুক্ করে ঠিক আমি যেতে পারব। জান বাবা! রাস্তার লোকেরা কাণা দেখে পথ ছেড়ে দেয়। যদি কোন দিন কারুর ঘাড়ে পড়ি ত সে বড় জোর গালাগালি দিয়ে বলে—আঃ! মলো, দেখতে পাস না? কাণা নাকি? (কথা কয়টি বলিয়াই রজনী হাসিয়া ওঠে)

রাজচন্দ্র। ঐ জন্যেই তো ভাবনা মা! ঐ জন্যেই তো কষ্ট! (রাজচন্দ্র দুঃখিত মনে মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রামসদয়ের শয়নকক্ষ। দুপুরের আহারাদির পর রামসদয় পালঙ্কে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছেন। লবঙ্গলতা সারা ঘরময় মলের আওয়াজ তুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।]

রামসদয়। বলি, আমার নাক-ডাকা তো থেমে গেছে। তবুও এখনো মলের আওয়াজ কেন?

লবঙ্গলতা। ও! থেমে গেছে বুঝি? এই মল দু'গাছা পায়ে দিলেই আমার নাচতে ইচ্ছে করে।

রামসদয়। তাই বুঝি?

লবঙ্গলতা। হ্যাঁ গো!

রামসদয়। আর আমি চশমা নাকে লাগালে তোমার কি ইচ্ছে করে?

লবঙ্গলতা। চশমাটা চুরি করে, চশমার সোনাটুকু গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিতে—

রামসদয়। কিন্তু এই তেষট্টি বছর বয়সে চশমাটার যে দরকার।

লবঙ্গলতা। কিন্তু আমার এই উনিশ বছর বয়সে ওটা দেখলে গা যে আমার বিস-বিস করে। তোমাকে কেউ বুড়ো বলে—আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। তাই ত চুলে তোমার কলপ লাগিয়ে দিই—মলমলের ধুতি ছাড়িয়ে ফিতে পাড় কি কল্কা পাড়ের ধুতি পরিয়ে দিই—

রামসদয়। শুধু কি তাই? আর একটা বললে না যে বড়?

লবঙ্গলতা। কি?

রামসদয়। জামায় আতর লাগিয়ে দাও—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ? (হাসিতে লাগিলেন)

লবঙ্গলতা। হাস আর যাই কর, আমার যা সাজাতে মন চাইবে, তাই সাজাব—আমার তো বয়েস মোটে উনিশ। কিন্তু ও বাড়ীর ঐ ঘোষগিন্নি, বাষট্টি বছর বয়েসে তার চুয়াত্তর বছরের স্বামীকে কেমন সাজিয়ে গুজিয়ে পেনসনের দিন পাঠিয়ে দেয়!

রামসদয়। তাই নাকি! তা তুমি দেখলে কি করে?

লবঙ্গলতা। দেখতে যাব কেন? দিদির কাছে শুনেছি।

রামসদয়। ললিত লবঙ্গলতা পরিশী—

লবঙ্গলতা। আজ্ঞে ঠাকুরদাদা মশাই, আজ্ঞা করুন, দাসী হাজির!

রামসদয়। আজ্ঞা কিছুই করব না। আমি তোমার ভালবাসার কথা ভাবছি। ভাবছি, আমি যদি এখন হঠাৎ মরি—

লবঙ্গলতা। তাহলে আমি বিষ—

রামসদয়। এ্যাঁ!

২৫,000 মাইল পাড়ি দিতে হবে!

বনস্পতি বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় কর্মশক্তি যোগায়

আপনার খোকাবাবু রোজ যদি এক মাইল ক'রেও হাঁটে তাহলে সারা জীবনে তাকে ২৫,০০০ মাইলের ওপর হাঁটতে হবে। যাতে সে জীবনের পথে ভালোভাবে পা বাড়াতে পারে, এগিয়ে যাবার শক্তি পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার ভার আপনার।

খাদ্য থেকে কর্মশক্তি

কর্মশক্তি আসে খাদ্য থেকে, বিশেষ ক'রে স্নেহ-প্রধান খাদ্য—শক্তি যোগাতে যার জুড়ি নেই। শক্তি যোগানো ছাড়াও স্নেহপদার্থ ভিটামিন এ ও ডি হজম করতে ও রোগের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে। বাড়ীর সবার খাবারেই যাতে স্নেহজাতীয় উপাদান থাকে তার জন্যে গিন্নীরা বনস্পতি দিয়ে রান্না করেন—বনস্পতি পুষ্টিকর ও পয়সার সাশ্রয় করে।

আপনি নিজেই পরীক্ষা ক'রে দেখুন

নিজে পরখ করলেই বুঝবেন, বনস্পতি আপনার বাড়ীর কত বড় বন্ধু? আজ থেকেই বাড়ীর রান্নাবান্না বনস্পতি দিয়ে করুন। দেখবেন, বাড়ীর সবাই খেয়ে কেমন খুশি হয়, আর খাঁটি উদ্ভিজ্জ স্নেহের ব্যবহারে পয়সার কত সাশ্রয়, কত তৃপ্তির সঙ্গে সবাইকে খাওয়ানো যায়। এও মনে রাখবেন, প্রতি আউন্স বনস্পতি ৭০০ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট স্বাস্থ্যকর 'এ' ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

বনস্পতি

বাড়ীর গিন্নীদের পরমবন্ধু!

VMA 4569

প্রচারক: বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

লবঙ্গলতা। না—না, তোমার বিষয় খাব।

রামসদয়। মুখ দিয়ে আগে যা বেরুচ্ছিল তাই ঠিক। বিষয় যে তুমি ভোগ করতে চাও না, তা আমি জানি। তুমি যে ভালবাসতে জান ললিত লবঙ্গলতা—তুমি যে ভালবাসতে জান।

লবঙ্গলতা। ও কি! যাচ্ছ কোথায়?

রামসদয়। বেলা যে গড়িয়ে গেল। এখন একটু কাছারী-বাড়ী গিয়ে না বসলে লোকে বলবে কি?

লবঙ্গলতা। হাঁ হাঁ, সে তো ঠিক কথা। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা। এ কথা যদি কেউ বলে, তাও আমি সইতে পারব না।

(রামসদয় চটির আওয়াজ তুলিয়া চলিয়া গেলেন। অপর দিক দিয়া রজনীর প্রবেশ)

লবঙ্গলতা। কি লো! কাণি, আজ তুই ফুল নিয়ে মরতে এসেছিস কেন?

রজনী। মার অসুখ কি না, তাই—

লবঙ্গলতা। ও! তা দে, ফুলগুলো দে—[রজনী ফুলগুলি দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। লবঙ্গলতা তাহাকে ডাকিয়া বলিল] ও কি লো! ফুলগুলো দিয়েই চলে যাচ্ছিস যে বড়? দাম নিয়ে যা—আহা! যা মালা আজ গেঁথে এনেছিস? এই নে—

[লবঙ্গলতা রজনীকে দুইটি টাকা দিল। রজনী হাত দিয়া টাকা দুইটি অনুভব করিয়া বলিল]

রজনী। এ কি! দু-দুটো টাকা দিলে যে ছোট মা?

লবঙ্গলতা। টাকা? টাকা আবার কোথায় দিলাম? ডবল পয়সা—

রজনী। না ছোট মা! এ ডবল পয়সা নয়—চোখে না দেখলেও, হাতে নিয়ে কি আর বুঝতে পারব না; টাকা কি পয়সা?

লবঙ্গলতা। আ মর! আবার তর্ক করে? যা দিয়েছি, দিয়েছি। বেশ করেছি।

[ইতিমধ্যে রামসদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল]

শচীন্দ্র। এ কে ছোট মা?

লবঙ্গলতা। ফুলওয়ালী।

[উপরোক্ত কথার মাঝে রজনী ঘর হইতে বারান্দায় চলিয়া যায়। তাহার গমনপথের দিকে লক্ষ্য করিয়া শচীন্দ্র বলে]

শচীন্দ্র। তা ও ওরকম করে চলেছে কেন?

লবঙ্গলতা। ও যে কানা। একেবারে চোখে দেখতে পায় না।

শচীন্দ্র। তাই বুঝি? তা যাক্—চেহারা দেখে আমি মনে করেছিলাম বুঝি বা কোন ভদ্রঘরের মেয়ে।

লবঙ্গলতা। কেন? ফুলওয়ালী হ'লে কি ভদ্রঘরের মেয়ে হয় না?

শচীন্দ্র। না, না। তা হবে না কেন? তবে ভদ্রঘরের মেয়েদের ফুল বিক্রি করতে বড় একটা দেখা যায় না কি না, তা ও কাণা হোলো কি করে?

লবঙ্গলতা। কোনো রোগে নয়—জন্মান্ধ।

শচীন্দ্র। ওকে একটু ডাক না দেখি।

লবঙ্গলতা। ও যে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়িতে চলে গেছে, আচ্ছা, দেখছি—ওলো! ও রজনী—এদিকে একবার আয় ত—

[দূর হইতে রজনী উত্তর করিল]

রজনী। যাই ছোট মা!

[ধীরে ধীরে রজনী লবঙ্গলতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল]

লবঙ্গলতা। শচীন তোর চোখটা একবার দেখবে—আয় এদিকে—এই আমার কাছে এসে দাঁড়া। (শচীন্দ্রের প্রতি) দেখো বাবা!

শচীন্দ্র। আমার দিকে ফিরে দাঁড়াও তো—

লবঙ্গলতা। ও কি আর দেখতে পাচ্ছে যে, ফিরে দাঁড়াতে বললেই দাঁড়াবে? ওকে নিজের সুবিধে মত দাঁড় করিয়ে নিয়ে দেখ—

শচীন্দ্র। এই, ঠিক এই ভাবে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে চোখ চাও—উহুঁ, আমার দিকে চোখ ফেরাও—উহুঁ হোল না, হোল না। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ঠিক করে নিচ্ছি।

[শচীন্দ্র রজনীকে নিজের দিকে ফিরাইয়া লইল। পরে চিবুকে হাত দিয়া চক্ষু পরীক্ষা করিতে লাগিল। রজনী লজ্জায় জড়সড় হইল।]

লবঙ্গলতা। ও কি রজনী! লজ্জা কি? হাজার হোক, শচীন ডাক্তার। থুতনিতে হাত দিয়ে মুখটা তুলে নিয়েছে তাতে লজ্জা কি? তোল্ মুখ তোল্—

শচীন্দ্র। না ছোট মা! এর দৃষ্টি ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়—এ সারবে না—

লবঙ্গলতা। তা না সারুক। কিন্তু টাকা খরচ করলে কি এর বিয়ে হয় না?

শচীন্দ্র। কেন? এর কি বিয়ে হয়নি?

লবঙ্গলতা। না। টাকা খরচ করলে কি বিয়ে হয়?

শচীন্দ্র। তুমি কি এর বিয়ের জন্য টাকা দেবে নাকি?

লবঙ্গলতা। হাঁ, আমার তো আর টাকা খরচে না! টাকা খরচ করলে বিয়ে হয় কি না, তাই জিজ্ঞেস করছি। মেয়েমানুষ। উপায় থাকলে, বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভাল।

শচীন্দ্র। তা ত ঠিক। আচ্ছা মা, তুমি টাকার জোগাড় রেখ। আমি বরং সম্বন্ধ করব। [প্রস্থান।

[লবঙ্গলতা রজনীকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন, রজনীর চোখে তখন আনন্দাশ্রু।]

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজচন্দ্রের গৃহ। তখন রাত্রি ৯টা—১০টা। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে রজনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রজনীর মা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলেন।]

রজনীর মা। দেখ দেখি, মেয়ের কাণ্ড! মালা গাঁথতে গাঁথতে ঘুমিয়ে পড়লো!

[রাজচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন]

রাজচন্দ্র। কি গো। কি হোল?

রজনীর মা। এই দেখ না, রজনী মালা গাঁথতে গাঁথতে এই সন্ধ্যে রাত্তিরেই ঘুমিয়ে পড়লো!

রাজচন্দ্র। আহা! তোমার অসুখের পর থেকে মিত্তির বাড়ীতে রোজ ফুল জোগান দিতে যায়। এতখানি পথ! যাওয়া-আসা! কষ্ট হয় তো, তাই—

রজনীর মা। তা তো বুঝলুম। কিন্তু ও যে ঘুমুলে আর উঠে খেতে চায় না।

রাজচন্দ্র। কিছু ভেব না। আমি আজ ওকে ডেকে খাওয়াব। কাণা মেয়ে! ওকে নিয়ে নানান ভাবনা। তাই ওকে পরের

ঘরে পাঠাতেও মন চাইছে না। আবার ভাবছি মিত্তির বাবুরা যখন দয়া করে পাত্র জুটিয়ে দিয়েছেন, খরচ-পত্রও করতে চাইছেন, তখন আর হাতছাড়া করব না, কি বল?

রজনীর মা। এর আবার বলাবলি কি? এমন সুযোগ কেউ কি কখনো হাতছাড়া করে? তা হ্যাঁ গা, এক রকম পাকা কথা হয়ে গেছে তো?

রাজচন্দ্র। হাঁ হাঁ। হয়ে গেছে বৈ কি। বড়লোক। কথা দিলে কি আর তার নড়চড় হবার জো আছে? দোষের মধ্যে মেয়ে আমার চোখে দেখতে পায় না, নইলে অমন রূপ-গুণের মেয়ে লোকে যে তপস্যা করে পায় না।

রজনীর মা। তা যা বলেছ। (প্রসঙ্গ চাপা দিয়া) আচ্ছা, ওরা আমাদের পর, ওরা আমাদের জন্যে এতো করছেন কেন?

রাজচন্দ্র। পর হলেও, হাজার হোক আমরা স্বজাতি তো? অদৃষ্টের দোষে আজ না হয়, ফুল বিক্রি করে খাচ্ছি কিন্তু জাতে তো আমরা উভয়েই কায়স্থ। তাই কাণা মেয়ে দেখে, ওদের দয়া হয়েছে।

রজনীর মা। তাই হবে। নইলে কেউ কি কারুর জন্যে এতো করে?

রাজচন্দ্র। ওঁরা বড়লোক। ওঁদের টাকার অভাব কি? আমাদের মত তো আর টাকার কাঙ্গাল নয়—হাজার, দু'হাজার টাকা ওঁরা টাকার মধ্যেই ধরেন না। আর তা ছাড়া রামসদয় বাবুর ঐ ছোট বৌ, লবঙ্গলতা যেদিন রজনীর সামনে বিয়ের কথা পাড়লেন, সেই দিন থেকে রজনী ও বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করলো। রামসদয় বাবুর ছোট বৌ বুঝলেন, মেয়েটি বিয়ের কথায় রোজ আসা-যাওয়া করছে। তাই আমাকে ডেকে রামসদয় বাবু বললেন পাত্র আছে। মেয়ের বিয়ে দেবে কি? বললাম দিতে তো ইচ্ছে হয় কিন্তু—টাকা পাব কোথায়? শুনে রামসদয় বাবু বললেন—আরে টাকার জন্যে ভাবনা নেই—সে ব্যবস্থা আমি করব।

রজনীর মা। তা বিয়ের কথাটা হঠাৎ উঠলো কি করে?

রাজচন্দ্র। ঐ যে রামসদয় বাবুর ছোট ছেলে শচীন, উনি তো ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছেন। উনিই বুঝি রামসদয় বাবুর ছোট বৌয়ের সামনে রজনীর একদিন চোখ পরীক্ষা করেছিলেন। তাই থেকেই কথাটা ওঠে।

রজনীর মা। একেই বলে ভবিতব্য! নইলে, আমরা কি কোন দিন ভেবেছিলুম যে, রজনীর আবার বিয়ে হবে? তা যাক্—পাত্রটিকে দেখেছ তো? বয়েস কত?

রাজচন্দ্র। বয়েস বছর ত্রিশেক হবে।

রজনীর মা। তা রামসদয় বাবুরা ছেলেটিকে জানেন তো?

রাজচন্দ্র। বিলক্ষণ! জানেন বৈ কি। ঐ ছেলের বাবা হরনাথ বোস রামসদয় বাবুর বাড়ীর সরকার। অনেক দিন ওখানে কাজ করছে।

রজনীর মা। তা ছেলেটি কি করে ?

রাজচন্দ্র। করে না বিশেষ কিছুই। বাপ বড়লোকের বাড়ীর সরকার বুঝছ না ? আছে দু'পয়সা।

রজনীর মা। তা ছেলেটির নাম কি ?

রাজচন্দ্র। গোপাল। প্রথমপক্ষের স্ত্রী চাঁপার ছেলেপুলে কিছু হোলো না বলেই তো হরনাথ বোস আবার ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন। কাণা বলে কোন আপত্তি করলেন না। এখন রজনীর একটা ছেলেপুলে হয়। তবেই তো—

রজনীর মা। সবই ভগবানের হাত। তুমি রজনীর ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা কর। আমি ততক্ষণ খাবারটা নিয়ে আসি।

রাজচন্দ্র। আচ্ছা।

[রজনীর মা চলিয়া যান। রাজচন্দ্র মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে থাকেন। তখন তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রু টলমল করিতেছে।]

চতুর্থ দৃশ্য

(রামসদয়ের শয়নকক্ষ। লবঙ্গলতা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত, এমন সময় রজনী প্রবেশ করে।)

রজনী। ছোট মা !

লবঙ্গলতা। কি রে কাণি ! আজ আবার ফুল এনেছিস ? তোর মা'কে যে সেদিন বলেছিলাম, এখন আর মেয়েকে দিয়ে ফুল পাঠিও না।

রজনী। আমি মা'কে বলে আসিনি।

লবঙ্গলতা। সে কি লো ! সমোত্ত মেয়ে। কাণা। না বলেই চলে এসেছিস ? যা যা, তোর বাপ-মা ভাববে যে—

রজনী। ভাবুক গে।

লবঙ্গলতা। সে কি লো ! এখন কি আর এমনি একা-একা আসতে আছে ? ক'দিন বাদে তোর বিয়ে হবে ?

রজনী। ছাই হবে।

লবঙ্গলতা। ওরে ! হবে, হবে। শচীন যে তোর বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছে।

রজনী। শুনলাম বটে। কাল সন্ধ্যায় ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাবা-মা'র কথায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু ঘুম যে ভেঙ্গে গেছে, ওঁদের জানতে দিলাম না। ওঁদের কথায় জানতে পারলাম যে, তোমাদের সরকার হরনাথ বোসের ছেলে গোপালের সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ের ঠিক করেছ।

লবঙ্গলতা। হাঁ। তা তো করেছিই।

রজনী। আমি তো তোমাদের কাছে কোন দোষ করি নি ছোট মা ! তবে শুধু শুধু তোমরা কেন ?

লবঙ্গলতা। আঃ, মর, ! ভাল করলে মন্দ হয় ! কাণা ! কোন কালে হয়ত বিয়েই হোত না। বিয়ের ঠিক করা হোল। এখন আবার···

রজনী। কাণা বলেই তো বিয়েতে আমার এত ভয়, ছোট মা !

লবঙ্গলতা। ভয় আবার কি ? জানাশোনা ঘর। আর তা ছাড়া পাত্র হিসাবে গোপাল তো আর খারাপ নয় ?

রজনী। তা হয়তো নয়।. কিন্তু—

লবঙ্গলতা। কিন্তু আবার কি ? আমি জানতে চাই, তোর বিয়েতে কি মন নেই ?

রজনী। না।

লবঙ্গলতা। (সবিস্ময়ে) না ? পাপিষ্ঠা কোথাকার ! বল, কে বিয়ে করবি নে।

রজনী। খুসি।

লবঙ্গলতা। খুসি ? আঃ মলো ! আবার মুখের ওপর চোপা করে বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে। বিয়ের সব ঠিক করা হো আর এখন কি না বলে বিয়ে করব না ?

[লবঙ্গলতার তিরস্কারে রজনী কাঁদিয়া ফেলিল। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া লবঙ্গলতা বিরক্ত ভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অপর দিক দিয়া শচীন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল।]

শচীন্দ্র। ছোটমা, ছোটমা—এই যে রজনী। ছোটমা কোথায়

রজনী। (কোন রকমে আত্ম-সম্বরণ করিয়া) এই তো এখানে ছিলেন।

[শচীন্দ্র রজনীর চোখে জল দেখিয়া বিস্মিত হইল ও জিজ্ঞাসা করিল

শচীন্দ্র। এ কি ! তুমি কাঁদছিলে না কি ? কেউ কিছু তোমা বলেছে কি ?

রজনী। ছোটমা আমায় আজ খুব বকেছেন।

শচীন্দ্র। বকেছেন ? কেন ? (পরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল) ও ছোটমার কথায় কিছু মনে কর না। তিনি মুখে তোমায় যাই বলুন, কিন্তু মনে মনে তিনি তোমায় খুব ভালবাসেন তা আমি জানি। আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে এস। তোমাকে ছোটমার কাছে নিয়ে যাই—গিয়ে দেখবে, এতক্ষণ তাঁর সব রাগ পড়ে গেছে। এস—(রজনী বসিয়া রহিল) ও কি ! বসে রইলে কেন ? ও ! একা যেতে পারবে না বুঝি ? আচ্ছা আমার হাত ধর, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি—লজ্জা কি ? ধর না হাতটা, (রজনী শচীন্দ্রের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গে লবঙ্গলতা ঘরে প্রবেশ করেন। তাহাকে দেখিয়া) এই যে ছোটমা ! রজনীকে নিয়ে তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। ঘরে এসে দেখি, রজনী একা বসে বসে কাঁদছে—তুমি না কি ওকে বকেছ ?

লবঙ্গলতা। হাঁ।

শচীন্দ্র। কিন্তু অন্ধ-মানুষকে চোখের জল ফেলতে দেখলে বড় যে কষ্ট হয় ছোটমা !

লবঙ্গলতা। তা হয় বৈ কি ! কিন্তু ওর জন্যে ভাবনার কিছু নেই শচীন ! আমার বকুনিতেও যদি চোখের জল ফেলে থাকে তাহলে আমার আঁচলেই আবার তা মুছিয়ে দেব।

শচীন্দ্র। (হাসিয়া) আচ্ছা মা, আচ্ছা। আমি তাহলে আসি।

[প্রস্থান।

[শচীন্দ্র যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লবঙ্গলতা রজনীকে বুকের কাছে টানিয়া লন।]

[ক্রমশঃ।

ছোটদের আসর
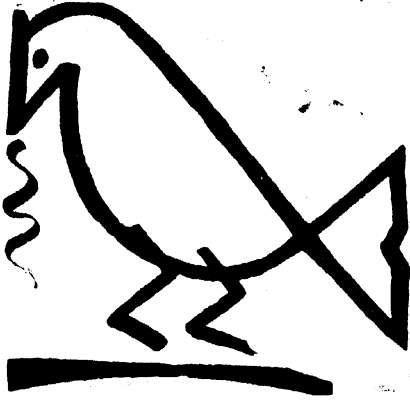
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বাবা শেষ অবধি সঙ্গে চললো। পিসিমা নেমে যাবেন গয়ায়। কিন্তু বাবার অনেক কাজ। নামলো ঝরিয়ায়। সারি সারি পাশাপাশি কয়লার খনি। একটা খনির জমি হয়তো চওড়ায় আধ মাইলও নয়, লম্বায় চলে গেছে তিন-চার মাইল।

ওর কয়লা এ কাটতে পারবে না। মাটির নীচে কুড়িতলা নীচু অন্ধকূপে খনির রাজ্যে এমন সীমানা বাঁধা আছে। ওপরের জমিতে লিফট্ আর চিম্‌নি আর ম্যানেজার—বাংলোর সাদা সাদা বাড়ী পাশাপাশি আলাদা আলাদা কোল মাইনের।

মাইলের পর মাইল আকাশ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো। এর নাম ঝরিয়া ফীল্ড। কালো কয়লা থেকে চক্‌চকে সাদা টাকা হচ্ছে, যে কয়লা থেকে আলকাতরা, নানা রকমের লাল-নীল রঙ ন্যাপথালিন স্যাকারিন এমন কি ঝকঝকে হীরে পর্য্যন্ত।

এ দেশে সবুজ ক্ষেত নেই, সবুজ গাছপালা নেই, নীল দিগন্ত নেই, আকাশে সোনালী মেঘ নেই। মাটিতে আকাশের তারার চেয়েও বেশী ইলেকট্রিক আলো জ্বলে, আর আগুনের রাঙা আভা এখানে ওখানে।

আগুন লাগে খনিতে খনিতে। দিনে দিনে বেড়ে বেড়ে চলে। সে আগুন নিবোতে পারে, এমন জল নেই, এমন বিজ্ঞান নেই। কোথাও আগুন জ্বলছে পঁচিশ বছর ধ'রে। ধিকি-ধিকি ধিকি-ধিকি ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। যেন রাবণের চিতা। দিন-রাত ধোঁয়া বেরোচ্ছে লোদনায়।

মীরা দেখলো এক জায়গায় মাটির বুকে প্রকাণ্ড গহ্বর। এ গহ্বর থাকবে না, অতল জলের পাথার হ'য়ে যাবে পাথরপুরীর দেশে। গভীর দীঘিতে কত জল থাকে, চার-মানুষ? ছ'-মানুষ? এখানে গভীরতা হাজার মানুষের। কেউ ডুবলে কেউ তোলে, এমন উপায় নেই। সেই অকূল পাথার পাশেই তো রয়েছে একেবারে পাতালপুরী পর্য্যন্ত।

কিন্তু এ গহ্বরটা কিসের? যমদূতের মতন হাঁ ক'রে রয়েছে! দেখলে ভয় করে?

গল্প শুনলো। এক মাড়োয়ারী লক্ষ টাকা দিয়ে স্বপ্নপুরী তৈরী করেছিলো এই কয়লা-খনির রাজ্যে। লক্ষ টাকা দিয়ে ঘর সাজিয়েছিলো। লক্ষ টাকা দিয়ে বাগান করেছিলো চারি ধারে।

মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার বললে, এই জমির নীচে থেকে কয়লা খুঁড়ে নিয়েছে, জমির জোর ক'মে গেছে। যে কোনো মুহূর্ত্তে ধ্বংসে যেতে পারে। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

তাই নাকি হয়?

কত আইনের অক্টোপাশে খনি বাঁধা। গ্রামের নীচে থেকে কয়লা নিতে পাবে না, বাড়ীর নীচে থেকে নয়, রেল লাইনের নীচেও নয়, রাস্তার নীচেও নয়।

তবু গ্রাণ্ড কর্ড রেল লাইনের নীচে থেকে কোন যুগে কয়লা নেওয়া হ'য়ে গেছে, রেল লাইন ব'সে ব'সে যাচ্ছে। তুফান মেল, দিল্লী মেল বম্বে মেল হাজার হাজার লোক নিয়ে যে পথ দিয়ে ঝড়ের বেগে যায়।

মানুষের লোভ মানুষের ঘুষের কাছে জয়ী হয়। মানুষই মানুষের সর্ব্বনাশ করে।

মাড়োয়ারী তো শুনলো না কোনো কথা!

বলেছে, বরাকর শহর তার বিরাট জংশন ষ্টেশন গঞ্জ বাজার বাড়ী ঘর নিয়ে একদিন পাতালে চ'লে যেতে পারে। সে তো কবে থেকে বলছে। তবু কি মানুষ শুনছে? নতুন নতুন বাড়ী উঠছে না? ওরকম লোকে বলে। সব কথা শুনতে গেলে চলে না।

মাড়োয়ারী বললে, যদিই বাড়ী ধ্বংসে যায়, আমাকে নিয়ে যেন ধ্বসে। সারা জীবনের পরিশ্রমের ধন যেখানে খরচ করেছি, সে জায়গা ছেড়ে গিয়ে আমার বাঁচারও কোনো মানে হয় না। একদিন গভীর রাত্রে সেই বাড়ী ধ্বস্‌লো, চ'লে গেল গভীর অতলে তার মোজেকের ফ্লোর, মার্বল পাথর, মেহগনির ফার্নিচার আর সাজানো বাগান নিয়ে।

দীর্ঘশ্বাস পড়ে মীরার।

লরী-বোঝাই কয়লা চলেছে দোতলার সমান মাল নিয়ে, একদিকে কাত হয়ে রাত্রের গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দিকে অসম্ভব স্পীডে। দুর্ঘটনা হয়তো হোক।

বাতাস এখানে কয়লার গুঁড়োয় ভারী, আকাশ এখানে চিমনীর ধোঁয়ায় ঢাকা, পরেশনাথ পাহাড় পর্য্যন্ত দেখতে দেয় না, যেখানকার ঝর্ণার জল এখানে বাড়ীতে বাড়ীতে পাইপে পাইপে ব'য়ে যাচ্ছে।

চোখ ক্লান্ত হয়, মন ক্লান্ত হয়। রাত্রি

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

প্রভাতে পৌঁছলো গিরিডি, উশ্রীনদীর তীরে হরীতকীবনের সবুজ ছায়ায় চোখ যেখানে জুড়িয়ে গেল।

এ হল অভ্রের দেশ।

দুনিয়ার সেরা অভ্র এখানে হয়। রাস্তায় অভ্রের গুঁড়ো চক্‌চক্‌ করে।

পরেশনাথ পাহাড় এখান থেকে অপরূপ রূপে দিগন্ত থেকে দিগন্ত আড়াল ক'রে দাঁড়ায়—কত সুদূর অথচ যেন কত কাছে!

কোল মাইন থেকে এলো মাইকা মাইনের দেশে। এত জিনিসও পৃথিবীতে জানবার আছে। কলকাতার অফিসে টেবিলে ব'সে যে বাঙালী ছেলেরা কেরাণীগিরি করে তারা খোঁজও রাখে না কোথায় কি খনিজ সম্পদ। রাখে মাড়োয়ারী, রাখে কাচ্ছি, যারা মোটেই লেখা-পড়া করেনি। যারা তথ্যের চেয়ে অর্থের খবর রাখে।

কিন্তু বাঙালী তা করে না। তারা জানতে চায়, বুঝতে চায়, কিন্তু জানা আর বোঝা কাজে লাগাতে পারে না।

ছোট একটু জমি, ছোট একটি বাড়ী, ছোট একটি পরিবার আর আনন্দহীন ভবিষ্যৎ-এর চিন্তায় তাদের জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যায়। অনেক লোকের উপকারে আসা তাদের সম্ভব হয় না।

বাবা এই কথা বলে। বাবা বলে বাঙালী জাতটা ঘুমন্ত। দিব্যি তো জেগে আছে। বাবাদা' যে কি বলে!

ডাক্তার—একটু পশার হলেই চৌষট্টি টাকা ফী নেয়। ক'জন দিতে পারে, আর কোথা থেকে দেবে, সে চিন্তা তার নয়। তার চাই। বিলেতে নাকি ষোলো টাকার বেশী ফী নেই, যত বড়োই ডাক্তার হোক।

এখানে ব্যারিষ্টার কেস বুঝতে নেবে পাঁচশো টাকা। তার মাসে রোজগার করা চাই বিশ-ত্রিশ হাজার। সে কি অনেক পরিবারকে সর্বস্বান্ত ক'রে নয়?

বাবার কথায় মীরার ড্যাডির কথা মনে পড়ে। ডিসোটো, পন্টিয়াক ক্যাডিলাক্‌, ল্যাণ্ডমাষ্টার—গাড়ীর পর গাড়ী কেনা হয়—সে কি অনেক লোকের দীর্ঘশ্বাসে?

আকাশছোঁয়া প্রাসাদ ওঠে মানুষের সাদা হাড়ের ওপর না কি? পরের দুঃখ কে বোঝে? কোনো এক শশীভূষণ দে। জীবিতাবস্থায়ই যাঁর নামে রাস্তা হয়। বিনাবেতনের স্কুল, বিনামূল্যের যক্ষ্মানিবাস—শশীভূষণ দে'কে অমর করে। অমর করে হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জীকে রাজ্যপাল হ'য়েও ভিক্ষার ঝুলি যাঁর কাঁধে—দেশের দুর্গতদের স্মরণ ক'রে।

বাবা বললে, কলকাতার এক কলেজের বেহারা—পরীক্ষার সময়ে উত্তর যুগিয়ে দিত 'নোট' চুরি ক'রে টাকার বিনিময়ে। পাশ ক'রে গিয়েও ছেলেরা তার জন্যে ঘৃণা রেখে যেত, বলে যেত চশমখোর, নীচ, ইতর। গালাগালি খেয়েও সে হাসত!

মারা গেল। মরবার পর উইল পাওয়া গেল। লিখে গেছে তার টাকা দিয়ে—সে টাকাও নিতান্ত কম নয়—যেন তার দেশে এক ইস্কুল হয়, যেখানে গরীব ছেলেমেয়েরা বিনাপয়সায় পড়তে পায়। সেই বেয়ারা স্মরণীয়।

আর সেই অন্ধ ভিখারী চিন্তামণি, যে স্বদেশী আন্দোলনে তার জীবনের সঞ্চয় উপুড় ক'রে দিয়েছিলো, কাল কি খাবে সে ভাবনা না ভেবে। বাঁকিয়া জেলার চিন্তামণি 'খড়গপুর খড়গপুর ট্রেন চলেছে' ব'লে বাঁশের বাঁশিতে চমৎকার সুর তুলত, সারা কলকাতার লোক, একদিন যে চিন্তামণিকে চিনত, যে দরজায় দাঁড়ালে কেউ তাকে ফিরিয়ে দিত না। ঝুলি ভরিয়ে দিত আলু, পটোল, বেগুন, চাল। শুনত তার মুখে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার কথা। কানাইলাল দত্তের কথা, কুড়ি বছরের ছেলে কানাইলাল শ্রীঅরবিন্দকে বাঁচাতে দেশদ্রোহী নরেন্ গোঁসাইকে গুলী ক'রে মেরে গেল, ফাঁসির মঞ্চে উঠে গেল জোরে জোরে পা ফেলে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ ক'রে। যে কানাইলালের চশমার দাম সাড়ে দশ হাজার টাকা। সে চশমা চন্দননগরকে পবিত্র ক'রে রেখেছে।

কানাইলালের চশমা অস্থি আর ভস্মাবশেষ যে চন্দননগরে আছে সেই চন্দননগরে যাবার ইচ্ছে জাগে মীরার।

কানাইলাল, যে ফাঁসির হুকুমের পরে মোটা হয়, ওজনে বাড়ে। ফাঁসির ভোরে যাকে গভীর নিদ্রা থেকে তুলতে হয়। যাদের জন্যে দেশে স্বাধীনতা এলো, তাদের দলের শহীদ কানাইলাল।

বাবা বললে—নিয়ে যাব চন্দননগর। কিন্তু আজ গিরিডিতে এত শাঁখ বাজছে কেন? এ তো বিয়ের লগনশা নয়?

জানলা দিয়ে চোখে পড়ে, পাশের বাড়ীর মেয়ে তার ভাইকে ফোঁটা দিচ্ছে।

বাংলার বাইরে বাঙালী মেয়ে তার পুণ্যদিনটা ঠিক মনে রেখেছে।

বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন
এক হউক এক হউক এক হউক
হে ভগবান্!—কবি বলেছেন ঠিক।

মীরার লজ্জা করলো। সে বাবাদা'র জন্যে কিছুই করেনি। বললে, আমার কাছে আমার নিজের টাকা আছে, তোমার খাবার আনিয়ে দিই। আনিয়ে দিয়ে ফোঁটা দিলো কপালে। থালায় দিলো গিরিডির খাবার বালুসাই, হালুয়া, জিলাপী। পাশের বাড়ীর মেয়েরা বুলবুল আর টিয়া ওকে সাহায্য করলো, চন্দনের বাটিতে চন্দন দিলে, প্রদীপ দিলে, ফোঁটা দেবার সময় শাঁখ বাজালো—ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা

যমের দুয়োরে পড়লো কাঁটা—
বললো ও প্রাণ থেকে।

পর্ব্বগুলো আমদের জীবন-সমুদ্রে যেন এক একটা চমৎকার বন্দর।

কালীপুজোর প্রদীপমালা ও দেখে এলো ঝরিয়ায়। কয়লাখনির এমনিতেই অন্ধকার আকাশ যেখানে আমবস্যার কালীর মতন কালো, সেখানে দীপান্বিতার রাঙা আলো। সারি-সারি আশ্চর্য্য প্রদীপের মতন। গিরিডিতে যেখানে ব্রাহ্মকলোনি ছিল, আজ মাড়োয়ারী পটি সেখানে।

কয়েক ঘর বাঙালী। তবু ভাইফোঁটা।

চন্দননগরে গিয়ে পেলে জগদ্ধাত্রী পুজা। ষ্টেশন-রোডেই পেলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিমা। বাগবাজারে গিয়ে অবাক হ'য়ে গেল। লক্ষ্মীগঞ্জে গিয়ে আরো অবাক।

বাজার আর হাটখোলায় শুধু অবাক হল না। নিতান্ত সাধারণ।

কিন্তু এই দেখতেই চারিধার থেকে কুড়ি পঁচিশ লাখ লোক হাজির হবে চন্দননগরে।

ভাই-ফোঁটা পার হ'য়ে গেছে, তবু মীরার ছোট দুটি ভাই

নির্ভুল সময় দানের জন্য বিগবেন জগদ্বিখ্যাত। গ্রীনউইচ সময়ের সাথে প্রতিদিন বিগবেন-এর সময়ের সমতা পরীক্ষা করে দেখা হয়। কিন্তু কোনরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। আবহাওয়া খারাপ থাকলে অবশ্য কদাচিৎ ই থেকে ১½ সেকেণ্ডের তারতম্য ঘটে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে দোলকের গতি অব্যাহত রেখে ঘড়ি "ঠিক" করা হয়। কারণ বিগবেন-এর ছয় হন্দর ওজনের দোলক থামতে প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় লাগে। কাজেই চলতি অবস্থায় সময়ের তারতম্য দূর করার জন্যে দোলকের গায়ে একটি ট্রে বসান আছে।

পেনি মুদ্রার সাহায্যে দোলকের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। "প্রতি সেকেণ্ডের মূল্য এক পেনি।" অর্থাৎ দোলকের ট্রে থেকে একটি পেনি তুলে নিলে সঙ্গে সঙ্গে দোলকের গতিও এক সেকেণ্ড কমে যায়। আবার—"Dropping a penny on the pendulum speeds up BIGBEN exactly one second a day."

ঘড়িটি সম্বন্ধে লণ্ডনের প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের মাঝে নানারূপ কুসংস্কার প্রচলিত আছে। ছিয়ানব্বই বছর আগে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট যখন মৃত্যুশয্যায়, সেই সময় হঠাৎ একদিন বিগবেন-এ একশো বার ঘণ্টা বেজেছিল। বহু অনুসন্ধান করেও বিগবেন-এর এই "রহস্যময় আচরণ"এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবার কমন্স সভায় যেদিন "হোমরুল" আইন পাশ হয় সেদিনও বিগবেন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থী লণ্ডনবাসীদের বিশ্বাস, বিগবেন-এর "রহস্যময় আচরণ" ইংরাজ জাতির জীবনে অমঙ্গলের পূর্বাভাস সূচনা করে। অবশ্য কুসংস্কার চিরদিনই কুসংস্কার। তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

বুড়ো ওকের স্বপ্ন

হান্স ক্রিশ্চিয়ান হ্যাণ্ডারসন

সমুদ্রের শরীর ছুঁয়েই গভীর বন। সেই বনের সবচেয়ে বুড়ো গাছ হ'লো এক ওক। সমস্ত গাছের মাথা ছাড়িয়ে তার মাথা উঁচু হ'য়ে উঠেছে; দেখলে মনে হয় যেন মেঘেদের ছুঁয়ে আকাশের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এতো উঁচু তার মাথা যে সমুদ্রের বহুদূর থেকে তাকে দেখা যেতো। দুর্যোগের রাত্রে, যখন আকাশ ঝ'ড়ো মেঘে কালো, ঢেউ ফুঁসছে রাগে, হাওয়া উত্তাল তুমুল ঘূর্ণি এনে,—জাহাজদের কাছে সে ছিলো ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো। ঝড়ের রাতে কতো দিন নাবিকেরা তাকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছে, 'ওই দেখা যাচ্ছে বুড়ো ওকগাছকে, এইবার আমরা ঝড় কাটিয়ে পৌঁছবো তীরে।' কতো কাল ধ'রে কতো জনকে যে সে আশ্রয় দিয়েছে, নির্ভরতা দিয়েছে, আনন্দ দিয়েছে, তার খোঁজ সে নিজেই রাখতো না। তার উঁচু ডালের উপরে বাসা বেঁধে সুখে ঘর করতো কাঠঠোকরারা, তার সবুজ পাতায় ছাওয়া নিচের ডালে দুলতে-দুলতে গানের সুর তুলতো দোয়েলরা, আর শীতের আগে দলে-দলে সারস আসতো, এসে, তার মধ্যখানের ডালে বাসা বেঁধে দিন কাটিয়ে যেতো। তার বয়েস এখন তিনশো পঁয়ষট্টি বছর, কিন্তু তার পক্ষে এটা এমন-কিছু বেশি বয়েস নয়।

কতো গ্রীষ্মের দুপুর, বসন্তের সন্ধ্যা, বর্ষার রাত বুড়ো ওক জেগে-জেগে কাটিয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই শীত যতোই কাছে এগিয়ে আসতো, ওকগাছের ততোই চোখ ঘুমে, গভীর ঘুমে—জড়িয়ে আসতে চাইতো। শীতকাল, ঠাণ্ডা কনকনে, পাঁজরায় ছুরি-চালানো শীতকাল হ'লো তার ঘুমের রাত।

শীতের হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা, এলোমেলো হাওয়া ওকের শুকনো পাতা খসিয়ে দিতে-দিতে হু-হু শব্দে চলতো, দিন ফুরলো, বন্ধু ঘুমোও, এবারে ঘুমোও। আমি তোমাকে দোলা দেবো, ঘুম পাড়াবো। আমার দোলা লেগে তোমার শাখা-প্রশাখা কাঁপছে বটে ঠকঠকিয়ে, ঝ'রে পড়ছে বটে তোমার পাতা, কিন্তু এই যে ঘুম আমি তোমায় এনে দিচ্ছি, এ তোমার কতো উপকার করবে, বলো দিকিন? সারাবছর জেগে-জেগে কাজ ক'রে যে শ্রান্তি জমেছিলো সব কেটে যাচ্ছে। আমি ডেকে এনেছি কুয়াশামাথানো মেঘদের তারা তুষারবৃষ্টি করবে। 'তোমার সারা গায়ে শাদা বরফের একখানি শুজনি বিছিয়ে দেবো। তুমি তার তলায় শুয়ে আরামে ঘুমোবে। শান্ত ঘুম তোমার চোখ জুড়ে আসুক, তোমার রাত্রিকে মধুর করুক, করুণ-রঙিন স্বপ্নেরা।

ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়ায় থরথরিয়ে শিউরোতে শিউরোতে, এমনি ঘুমপাড়ানি গান শুনতে-শুনতে ওক গাছ গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতো। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যেতো একটানা এক ঘুমের মধ্যে।

একবার বড়োদিনের পুণ্যদিনে বুড়ো ওক এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলো: এমন অপরূপ স্বপ্ন সে আর কোনো কালে দেখেনি। তার সমস্ত জীবন ভ'রে যে-সব স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে, এক-এক ক'রে ছবির মতো সে-সব ফুটে উঠতে লাগলো সেই স্বপ্নের মধ্যে।

সে দেখতে লাগলো:

একদল বীরপুরুষ,—বর্ম-আঁটা পোশাক তাদের পরনে, কোমরবন্ধে ঝুলছে বাঁকানো তলোয়ার,—টগবগিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে তার তলা দিয়ে ছুটে চলেছে। তাদের পাশে ঘোড়ার পিঠে ব'সে রয়েছে রূপসী রাজকন্যারা। শত্রুর হাত থেকে এদের উদ্ধার করেছে বীরপুরুষেরা। সূর্যের প্রখর আলোয় তাদের ইস্পাতের বর্ম উঠছে ঝকমকিয়ে, ঝিকিয়ে উঠছে কারো-কারো হাতে শাণিত তীক্ষ্ণ, রূপোলি তলোয়ার, ঝলমলিয়ে উঠছে মাথার সোনালি শিরস্ত্রাণ। রূপসী রাজকুমারীদের অপরূপ লাবণ্য হাওয়াকে মধুর আর উজ্জ্বল ক'রে তুলছে। তারপর দেখতে-দেখতে সেই ঘোড়সোয়ারেরা মিলিয়ে গেলো। এবারে এলো উটের পিঠে চ'ড়ে একদল যাযাবর বেদুইন। ওক গাছের তলায় এসে তারা নেমে পড়লো, শিবির বসালো সেখানে, অনেক তাঁবু চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো কুকুর-ছাগল, যারা বেদুইনদের সঙ্গে এসেছে। বোরখা-পরা সুন্দরী বেদুইন মেয়েরা গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কয়েকজন বেদুইন পুরুষ তীব্র-সুরে বজ্রসুরে শিঙা বাজাতে লাগলো। কী ফূর্তিতেই না তারা রাত কাটালো সেখানে! বুড়ো ওক তার সমস্ত শরীরকে টান ক'রে প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে যেন তাদের বুনো আনন্দকে নিজের ভিতর গ্রহণ করেছিলো। অল্পক্ষণ পরে এই দৃশ্যও গেলো মিলিয়ে।

তারপর বুড়ো ওকের চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো পুণ্য বড়োদিনের ছবি। বড়োদিন, অথচ ঠাণ্ডায় কাঁপছে না শরীর

ভিতর, বরোফ পড়ছে না কোথাও, কোথাও অন্ধকার নেই। আকাশ ভ'রে সোনালি আলো, এখন রোদের আভা: ঝলমলিয়ে উঠছে চারদিক। দূর-অদূরের গির্জে থেকে আসছে গম্ভীর ঘটার শব্দ। উৎসবের সাড়া দিগ্‌দিকে। গরীব-বড়োলোক, ছেলেবুড়ো, মেয়ে-পুরুষ—সবারই চোখমুখ খুশিতে ভরা, আনন্দের রেশ ঢেউ তুলছে সবারই বুকে।

এই সব সুখের দৃশ্য দেখতে-দেখতে বুড়ো ওকের মনে হ'লো সে যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে কোনো দূর ঊর্দ্ধলোকে। তার মাথা একটানা উঠে গিয়েছে মেঘের আস্তরণ ভেদ ক'রে, তার শরীরের অনেক তলা দিয়ে ভেসে চলেছে তুলোর পাঁজার মতো শাদা, হালকা, পাতলা মেঘ।

ওক গাছ দেখতে লাগলো: আচমকা ম্লান হ'য়ে গেলো দিনের আলো, তারায়-তারায় ভ'রে উঠলো আকাশ। স্নিগ্ধ, কোমল, উজ্জ্বল সেই তারাদের দিকে তাকিয়ে বুড়ো ওকের মনে হ'তে লাগলো সে যেন অনেক দিনের স্নিগ্ধকোমল কতকগুলি চোখের আলো দেখতে পাচ্ছে। চোখের এই আলো সে দেখেছে ছোটোদের চোখে, যারা কতোদিন তার তলায় ছুটোছুটি ক'রে খেলা করেছে। আর দেখেছে কবিদের উদাস-গভীর চোখ, যারা তার তলায় কতো একলা দুপুর কবিতা প'ড়ে কাটিয়েছে।

বুড়ো ওকের গায়ে এসে লাগলো যেন স্বর্গলোকের পুণ্য হাওয়া; সর্বাঙ্গে সেই হাওয়ার আঘ্রাণ মেখে বুড়ো ওক আরো কতো অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগলো বিস্ময়-গভীর চোখ মেলে। এতো আনন্দ, এতো সুখ যেন তার সইতে চাচ্ছে না, কেবলি মনে হ'চ্ছে যেন সে নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারছে না, যেন আনন্দের চোটে এক্ষুণি চুরমার হ'য়ে যাবে তার বুক।

কিন্তু একটু পরে এক ম্লান বিষাদের সুর বেজে উঠলো তার মনের ভিতরে; তার মনে এক প্রবল ইচ্ছা জাগলো, এমন তীব্র ইচ্ছা যাকে কিছুতেই দমিয়ে রাখা যায় না। সে চাইলো—তার এতো দিনের বাসভূমির প্রত্যেকটি গাছ—ছোটো-বড়ো সবাই, প্রত্যেকটি ফুল, প্রত্যেকটি ঝোপ, এমন কি পায়ের তলায় ঘাস পর্যন্ত, স্বর্গলোকের এই পবিত্র দৃশ্য দেখুক। সে যে সুখ, যে আনন্দ অনুভব করছে তার সঙ্গীরা সবাই সেই আনন্দ অনুভব করুক, নইলে আর সুখ পূর্ণতা পেলো কই?

একমনে সে প্রার্থনা করতে লাগলো, ঈশ্বর, আমাকে যে সুখ দিলে, সবাইকেই সেই সুখ দাও, নইলে আমি কোনো আনন্দ পাবো না।

একমনে চোখ বুজে বুড়ো ওক প্রার্থনা করছে, এমন সময় আচমকা দূর থেকে ভেসে এলো অসংখ্য ফুলের সৌরভ, বাতাস ভ'রে গেলো সেই গন্ধে, কানের কাছে বাজতে থাকলো কোকিলের গলার মিষ্টি গান। চমকে উঠে ওক দেখতে পেলে ঈশ্বর তার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনভূমিই পৃথিবী ছাড়িয়ে মেঘের রাজ্য পেরিয়ে স্বর্গলোকে এসে পৌঁছেছে। ছোটো-বড়ো সব গাছেরা উপরে উঠেছে, ছোটো-ছোটো ঝোপেরা পর্যন্ত বাদ যায়নি। স্নিগ্ধ ফুল, কোমল ফুল, ঝলমলে ফুল—অসংখ্য রঙিন ফুলেরা পাপড়ি মেলেছে ঊর্দ্ধ আকাশের সেই সুশ্রী, সুখী, উৎসবময় স্বর্গলোকে। শুধু গাছেরা কেন, বনের সমস্ত ঘাস-পাকা, ঘাস-ফড়িং, জোনাকি, মৌমাছি—সমস্ত কীট-পতঙ্গও উপরে উঠে এসেছে। সবুজ ফড়িং হালকা ডানা নেড়ে মধুর আলোয় উড়ে বেড়াচ্ছে। রঙিন প্রজাপতিরা উড়ে গিয়ে বসেছে ফুলে ফুলে। গুনগুনিয়ে চলেছে ভোমরারা। সকলের আনন্দ গান হ'য়ে ভরিয়ে তুলেছে সেই স্বর্গলোক।

কিন্তু ঘাসের সেই ছোটো নীল ফুলটি কোথায়? নদীর কোলে মাথা নিচু করে যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতো? আর সেই আগাছার ঝোপ, সবাই যাকে তাচ্ছিল্য করতো, ভুলেও যার দিকে ফিরে তাকাতো না একবারও? জিগেস করলে ওক গাছ।

এই যে আমরা, এইখানে—এই-যে আমরা, এইখানে। হাসতে হাসতে তারা পাশ থেকে ব'লে উঠলো।

কিন্তু গত বছর যারা ঝ'রে প'ড়ে গেছে, সেই সব শুকনো গোলাপের দল, পাইন গাছের পাতারা—তারা কি এখানে আসবে না? এমন সুন্দর দৃশ্য দেখবে না?

এই যে আমরা এসেছি—এই যে আমরা দেখছি। বলতে বলতে ঝ'রে-যাওয়া পাইন গাছের পাতারা সবুজ হ'য়ে উঠলো সেই আকাশলোকে।

বুড়ো ওক হাসিমুখে বললে, বড়ো ভালো লাগছে। সবাইকে আমি পাশে পেয়েছি। সবাই আমার সঙ্গে সুখভোগ করছে। ছোটো, বড়ো—কেউ বাদ যায়নি। এতো সুখ ভাবতেই পারা যায় না। কী ক'রে এতো সুখ সম্ভব হ'লো?

ঊর্দ্ধ আকাশ থেকে দেবদূতরা উত্তর দিলে, পৃথিবীতে এতো সুখ সম্ভব হয় না। এতো সুখ পাওয়া যায় কেবল স্বর্গে। যাদের অন্তঃকরণ পুণ্য, যারা কেবল নিজের সুখ চায় না, সকলের কল্যাণ, সকলের মঙ্গল, সকলের সুখ চায়, কেবল তারাই স্বর্গে এসে এই সুখ পায়। তুমি সকলের মঙ্গল চেয়েছিলে, তাই তুমি এতো সুখ পেলে, তাই তুমি চ'লে আসতে পারলে এই পবিত্রলোকে।

দেবদূতদের কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ো ওক অনুভব করলে তার প্রত্যেকটি শিকড় যেন মাটির বন্ধন থেকে খ'সে যাচ্ছে, মাটির কঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। তৃপ্তিতে ভ'রে উঠতে লাগলো তার মন। সে বললে, এখন আর কোনো শেকলই আমাকে মাটিতে বাঁধতে পারবে না। আলোর জগতে, আনন্দের জগতে আমি উড়ে যাবো। চ'লে যাবো ঈশ্বরের কাছে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এতো সুখ, এতো আলো, এতো আনন্দ। পাশে থাকবে আমার সব প্রিয়জন—ছোটো, বড়ো সবাই। যাদের আমি পৃথিবীতে ভালোবেসেছি—সকলেই।

—পুণ্যদিন বড়োদিনের রাত্রে এই স্বপ্ন দেখলে বুড়ো ওক গাছ। যখন সে স্বপ্ন দেখছে ঠিক সেই সময় আকাশ-মাটি কাঁপিয়ে উঠলো প্রচণ্ড ঝড়। সমুদ্রের ঢেউ উঠলো ফুলে, কাঁপলো তারা, চেহারা নিলো দুরন্ত দানবের, গর্জিয়ে রাগে ফুঁশতে-ফুঁশতে বিরাট আকার ধারণ ক'রে তীরের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। ক্রমেই ঝড়ের বেগ তীব্রতর হ'য়ে উঠতে লাগলো। তারপর আচমকা ঝড়ের এক মারাত্মক আঘাতে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো ওকগাছ; দেখতে-দেখতে তার সব শিকড়গুলি পটপট শব্দে ছিঁড়ে গেলো। বিশাল ওক মাটিতে শুয়ে পড়লো। তার তিনশো পঁয়ষট্টি বছরের জীবনের সমাপ্তি ঘটলো ঠিক সেই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে, যখন সে স্বপ্ন দেখছে যে মাটির বন্ধন ছিঁড়ে সে স্বর্গে উড়ে চলেছে।

এক সময়ে কাটলো সেই দুর্যোগের রাত। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের গর্জিয়ে-ওঠা দুরন্তপনা থেমে গেলো। বড়োদিনের শান্ত ভোরবেলায় সূর্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। প্রত্যেক গির্জে থেকে বেজে উঠলো গম্ভীর ঘণ্টার একটানা আওয়াজ। ধনী, গরিব—সকলেরই ঘর থেকে শোনা যেতে লাগলো স্তোত্রের উদাত্ত সুর।

সমুদ্রের উপর দিয়ে একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ তীরের দিকে এগিয়ে এলো, সারা রাত যে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে, তার চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। কিন্তু আজ যে-ই ভোর হয়েছে, থেমেছে প্রবল ঝড়, সে তার উঁচু মাস্তুলে উড়িয়ে দিয়েছে নতুন পতাকা। নাবিকেরা নতুন পোষাক প'রে হাসিমুখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দূর তীরের দিকে তাকিয়ে নাবিকদের একজন বললে, কই, আমাদের জমির নিশানা সেই প্রিয় ওক গাছটিকে কেন দেখতে পাচ্ছিনে ?

সবাই ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে লাগলো, কিন্তু ওক গাছকে দেখা গেলো না।

তীরে ভিড়লো জাহাজ। যাত্রীরা, নাবিকেরা লাফিয়ে নামলে,—নেমে দেখলে তাদের প্রিয় বন্ধু ওক মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে সকলেরই চোখ সজল হ'য়ে উঠলো। সবাই তারা ঘিরে দাঁড়াে ওক গাছকে। বললে, কতো দিনের প্রিয় বন্ধু তুমি। তুমুল ঝড়ে রাতে কতো নাবিক, কতো যাত্রী তোমাকে দেখে ঘরের খবর পেয়েছে ভুলেছে মৃত্যুকে। তোমার স্মৃতি আমাদের মনে অক্ষয় হ'ে থাকবে।—এসো বন্ধুরা, শুভদিন বড়োদিনের পুণ্যলগ্নে আমাদে প্রিয় বন্ধু ওকগাছের আত্মার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন করি।

তারা সবাই মিলে ওককে ঘিরে গান গাইতে লাগলো ক্রুশবিদ্ধ যিশুর সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে, নেমে দাঁড়ালেন করুণাঘ মানবপুত্র, বিশাল হাত বাড়িয়ে দিলেন আশীর্বাদের ভঙ্গিতে, কল্যা কামনা করলেন পৃথিবীর···

দূর স্বর্গলোকে সেই গানের সুর এসে পৌঁছলো বুড়ো ওকে কানে। পৃথিবীর ভালোবাসা, ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাকে বিহ্ব ক'রে তুললো।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছড়া

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

লাল ফিতেতে আজ বেঁধেছে খোঁপা
পাশের বাড়ীর ছোট মেয়ে গোপা।

গোপা বাঁধে খোঁপা লাল ফিতেতে আজ,
লাল টুকটুক জামায় দিব্যি হলো সাজ।
খোঁপায় গোলাপ ফুল
কানে দোদুল দুল—
দু'পা তুলে ছন্দে দুলে নাচে বেঁধেছে আজ খোঁপা ;
ডাকলে আসে মুচকি হেসে কাছে পাশের বাড়ীর গোপা।

গোপা বাঁধে খোঁপা লাল ফিতেতে আজ,
তার পুতুলের বিয়ে—অনেক যে তার কাজ।
শোন রে গোপা শোন
ফুলপরীদের বোন ;
আলতা-রাঙা দু' ঠোঁটে তোর হাসি
মুক্তো ঝরায় তাই যে ভালবাসি।

সুরমাতানো গান করে আজ গোপা
দুষ্টু-মেয়ে আজ বেঁধেছে খোঁপা।

ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

ব্যতিক্রম

বর্ষাদিনের অবিশ্রাম একঘেয়ে টিপটিপে বৃষ্টির মত বিরক্তিকর মন্থর গমনে গোমো-ডিহিরি-অন-শোন প্যাসেঞ্জার ট্রেন রাঁচী থেকে রাত প্রায় পৌনে দশটায় ছেড়ে ঢিগিয়ে ঢিগিয়ে সব ষ্টেশন ছুঁয়ে নিজের মনে চলেছে। সাধারণতঃ এই ট্রেনটায় ভিড় বেশি হয় না। প্রথমত সময়ের কোনও মা-বাপ নেই—কোন ষ্টেশনে কতক্ষণ থামবে কখন আবার দয়া করে ছাড়বে ভগবানও বলতে পারেন না। দ্বিতীয়, আর সবচেয়ে মারাত্মক কারণ হল, রাতে ফাঁকা গাড়িতে চোর-ডাকাত বদমায়েসের উপদ্রব। একটু ঘুমিয়ে পড়লেই হয় যথাসর্ব্বস্ব চুরি যাবে, নয়তো ওভার ক্যারেড হয়ে বিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে গিয়ে ঘুম ভেঙে বুক চাপড়াতে হবে। বেশি টাকা-কড়ি কাছে থাকলে হয়তো ঘুমই আর ভাঙবে না।

তৃতীয় শ্রেণীতে তবু কিছুটা লোকজন থাকবে এই আশায় একখানা টিকিট কিনে লেডিস কম্পার্টমেন্টে সোজা উঠে পড়ে দেখল অচলা, দুটি হিন্দুস্থানী মেয়ে ছাড়া সারা গাড়িটাই ফাঁকা। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একটা খালি বেঞ্চের ওপর ছোট সুটকেশটা রেখে চুপচাপ বসে পড়লো অচলা। মনে মনে হিসেব করে দেখলো, খুব দেরিও যদি হয়, সকাল পাঁচটার মধ্যে ডাল্টনগঞ্জ পৌঁছুতে পারবে অনায়াসে। শর্ব্বরী বলে দিয়েছে, ষ্টেশনের খুব কাছেই ওদের বাসা—তা ছাড়া ওর শ্বশুর ওখানে অনেক দিন আছেন—নাম করলেই সবাই চিনবে, কোনও অসুবিধে হবে না।

পাতলা ছাপা শাড়ীতে আবক্ষ ঘোমটা টেনে হিন্দুস্থানী মেয়ে দু'টি দেহাতি ভাষায় কি সব রসিকতা করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল অচলা। থমথমে কালো মেঘে আকাশ ঢাকা—আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির পূর্ব্বাভাস। পরের ষ্টেশনটা বোধ হয় একটু দূরে—ট্রেন বেশ স্পীডে নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে পালাচ্ছে। অচলার মনে হল, অতীতের ফেলে-আসা দিনগুলোও ঐ সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে।

বাপ-মাকে ভাল করে মনে পড়ে না। ছেলেবেলা থেকে মামা-মামীর কাছেই মানুষ। মামার একপাল ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পাঠশালায় পড়া, একটু বড় হতেই তাও বন্ধ হয়ে গেল। দশ-এগারো বছর থেকেই মামার সংসারে রান্না থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ পড়ল অচলার ঘাড়ে। পাণ থেকে চুণ খসলেই মামীর হাতে প্রহার। লোক-মুখে শোনা—ঐ গাঁয়েরই শেষ প্রান্তে অচলাদের পাকা বাড়ি, জমাজমি, পুকুর সবই ছিল। মাত্র এক দিন আগে-পাছে মা-বাবাকে কলেরায় গ্রাস করার পর, মামা অতুল চাটুয্যে চার বছরের মেয়ে অচলাকে নিজের সংসারে নিয়ে আসেন। মামা-মামীর মুখেই শুনেছে, দেনা শোধ করতে ওদের বাড়ি-ঘর সবই বিক্রি হয়ে গেছে। পাড়ার লোক কিন্তু অন্য কথা বলে। যাক সে কথায়।

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও অচলার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল—পাশের বাঁড়ুয্যে-বাড়ির মেয়ে ইতি। ইতি অচলার সমবয়সী। শত কাজের মধ্যেও দিনান্তে একবার অন্তত দু'জনে দেখা করে সুখ-দুঃখের কথা কইতো। হঠাৎ এক দিন ইতির বিয়ে হয়ে গেল—শুধু সেই দিন অচলার মনে হল, এ সংসারে সত্যিই সে বড় একা।

গাঁয়ের লোক বলত, অচলার চেহারা নাকি খুব ভাল আর এইটেই অচলার গুণ হয়েও দোষ হল। মামী যখন-তখন শুনিয়ে বলত, গরীবের ঘরে আবার রূপ কি লা? সারা দিন যাকে হেঁসেল ঠেঙিয়ে, বাসন মেজে, গোবর নিকিয়ে কাটাতে হবে, তার আবার চেহারা দিয়ে হবে কি!

অত অযত্নে অবহেলাতেও কিন্তু মামীর শাসনকে উপেক্ষা করে দিন-দিন অচলার দেহে লাবণ্য ও যৌবনের জোয়ার শুরু হয়ে গেল। অদৃষ্ট-দেবতার বক্রদৃষ্টি পড়ল সেই সময় থেকে। গাঁয়ের

কলেজে পড়া বৌ

সুনয়নী দেবীর দুঃখের অন্ত নেই। কি ভুলই মা তিনি করেছিলেন ছেলেকে কোলকাতায় লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়ে। ছেলে কিনা বিয়ে করে বসল এক কলেজে পড়া মেয়েকে! ছেলের জন্যে তিনি পাত্রী ঠিক করেছিলেন কেষ্টনগরের বনেদী চাটুজ্যে পরিবারে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি—বয়স একটু কম কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়? টাকার কথাটাও ফ্যালনা নয়। নগদ দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাটুজ্যেরা। কথাটা এখনও ভাবলে খচ্ করে লাগে সুনয়নী দেবীর বুকে।

সুতপা ঘরে এলো দুগাছি শাঁখা আর দুগাছি চুড়ী সম্বল করে। প্রথম দিন প্রণাম করতে যাওয়ার সময় সুনয়নী দেবী পেছিয়ে গিয়েছিলেন দু'পা। "থাক থাক মা,"—তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া কলেজে পড়া মেয়ে সুতপার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই প্রথম দিনটি আজ প্রায় দেড় বছর পেছনে কিন্তু আজও শ্বাশুড়ী কলেজে পড়া বৌকে আপন করে নিতে পারেন নি। রান্নাঘরের কোন কাজে সুতপা সাহায্য করতে এলেই তিনি বলেন—"থাক থাক বৌমা—এসব তো তোমাদের অভ্যাস নেই, আবার মাথা ধরবে।"

বিমল কোলকাতার এক সদাগরী আফিসে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করে। থাকে সহর-তলীতে। রোজগার সামান্যই। বিয়ের আগে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের দেড় বছর পরে আজ বুঝতে পারে যে খরচ সং-কুলান করা দরকার। দায়ীত্ব অনেক বেড়ে গেছে, কিছু সঞ্চয়ও থাকা দরকার। মায়ের হাতেই সংসার খরচের টাকা সে তুলে দেয়। ইদানিং মাকে আকারে ইঙ্গিতে দু একবার বলেছে যে খরচ কিছু কমানো দরকার। কিন্তু সুনয়নী দেবী গেছেন চটে। "তোর কলেজে পড়া বৌ বুঝি তোকে এই সব বুদ্ধি দিচ্ছে? এত দিন তো তোর এসব মনে হয়নি?" ভয়ে বিমল আর কিছু বলতে পারেনি।

সুতপা কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। "তুমি বুঝিয়ে বল মাকে। আর তিন মাস পরে আমাদের প্রথম সন্তান আসবে। এখন চারিদিক সামলে সুমলে না চললে চলবে কেন? তাছাড়াও ধর অসুখ বিসুখ আছে, সবাইয়ের সাধ আহ্লাদ আছে, কিছু তো বাঁচাতেই হবে। মায়েরই তো কতদিনকার সখ একটা গরদের থানের আর কত দিন তোমায় বলেছেন তরকারীর বাগানটা বেশ সুন্দর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে।"

মরীয়া হয়ে বিমল গেল মায়ের কাছে। খুলে বলল তাঁকে মনের কথা। কিন্তু হিতে বিপরীত হোল। সুনয়নী দেবী গেলেন ক্ষেপে। "যখনই তুই ওই কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করেছিস তখনই জানতাম পরিবারে অশান্তি আসবে। থাক তুই তোর বৌ আর সংসার নিয়ে—আমি চললাম দাদার বাড়ী।" কিছুতেই আটকানো গেল না

তাঁকে। বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন বরানগরে।

ফিরে এলেন তিনি প্রায় তিন মাস পরে। তাও এমনি নয়, বিমলের ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে তিনি অবাক। তাঁর সাধের ঝিঙে আর লাউডগার বাগানের চারপাশ দিয়ে কচি বাঁশের সুন্দর বেড়া। গেলেন সুতপার ঘরে। ফুটফুটে নাতীকে নিলেন কোলে তুলে। বিমল এসে ঢুকলো গরদের থান নিয়ে। আনন্দে সুনয়নী

দেবীর চোখের দুই কোণে জল চিকচিক করে উঠল। সুতপা বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে বলল—"মা তোমায় আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।" সুনয়নী দেবী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি ভয় নিয়েই ফিরেছিলাম মা, হয়তো দেখব বাড়ীঘর সব ছারখার হয়ে গেছে—কিন্তু কি লক্ষ্মীশ্রী সারা বাড়ী জুড়ে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—না মা কোথায় যাব এমন বৌ-নাতী ফেলে?"

এক দিন শুধু তিনি সুতপাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কি করে এত গুছিয়ে চালাও তুমি মা?" সুতপা বলল—"মা খরচ কত দিকে বাঁচাই দেখুন! উনি আগে আপিসে পয়সা খরচ করে আজে বাজে খাবার খেতেন, এখন বাড়ী থেকে টিফিন বাক্সে আমি ওঁর খাবার দিই। এতে খরচ অনেক বাঁচে, আর খাওয়াটাও ভাল হয়। ঠিকে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি—কাপড় কাচা, বাসন মাজা এসব কাজ আমি আর ঝি ভাগাভাগি করে করে নিই। আর সব চেয়ে বেশি সাশ্রয় করেছি খাবারে। আগে আপনি ঘি কিনতেন অত দামে—আর সে ঘি'ও সব সময় ভাল হোত না। আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডায় ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' চোখ আর ত্বক সুস্থ রাখে। আর থাকে ভিটামিন 'ডি' যা হাড়কে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ডালডায় রাঁধা সব খাবারই অত্যন্ত মুখরোচক হয়। এই সব কারণেই এবং স্বাস্থ্যদায়ক বলেই ডালডা আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে। ডালডা "শীল" করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে সব সময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালডায় ভেজালের কোন ভয় নেই কারণ খাঁটি ডালডা সব সময় পাওয়া যায় খেজুর গাছ মার্কা টিনে।"

সুনয়নী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর কলেজে পড়া বৌয়ের দিকে।

HVM. 314B-X52 BG

দুষ্টগ্রহ ছিল ওপাড়ার দাশু ঘটক। ছেলেরা বলত—ব্যাটার নাম করলে হাঁড়ি ফাটে, মুখ দেখলে সাপে কাটে, তেজারতি ছাড়াও জমাজমি গহনা বন্ধক রেখে প্রচুর টাকা করেছে দাশু। রোগা ডিগডিগে হাড়-বের-করা চেহারা, বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও বোঝবার উপায় নেই, দশ বছর আগেও যা এখনও তাই। বয়েস যেন দাশুর কাছে টাকা ধার করে সুদের সুদ তস্য সুদে জড়িয়ে পড়ে ওর দেহসিন্দুকে আটকে পড়ে আছে। হাড় কেপ্পণ দাশু, ক্ষেতের মোটা চালের ভাত ডাল আর মাঝে-মধ্যে চুনো মাছের ঝোল—এ ছাড়া অন্য কিছু রান্না হতে কেউ দেখেনি দাশুর বাড়িতে। পরনে আট হাত কাপড়, খালি গা, কাঁধে গামছা—ব্যস, ঘরে বাইরে দাশুর এই হল বেশভূষা। মিশমিশে কালো দেহের ওপর কাঁধের পাশ দিয়ে ঝোলান ইয়া ধবধবে সাদা মোটা পৈতের গোছা। দুষ্টু ছেলেরা বলত—ভিন গাঁয়ে সুদের তাগাদায় যেতে হয়, পাছে কেউ ছোট জাত মনে করে মার-ধোর দেয়—সেইজন্যে।

তা সে যে জন্যেই হোক—দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে জল খেত না দাশু। তিনটে বিয়ে কিন্তু একটিরও ছেলে পিলে হল না—এই ছিল দাশুর মস্ত অভিযোগ বিধাতার কাছে। গাঁয়ের লোক আড়ালে আবডালে বলাবলি করত—সকাল-সন্ধ্যে সুদের তাগাদায় এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে দাশু চতুর্থ পক্ষের জন্য একটি বয়স্থা পাত্রী খুঁজে বেড়ায়।

—কৈ রে—অতুল আছিস নাকি ?

রান্না করতে করতে চমকে উঠল অচলা। এ গলা একবার শুনলে ভোলা শক্ত। ছেঁড়া ময়লা সাড়িখানা জড়িয়ে মড়িয়ে বসল অচলা।

মামা ঘরের মধ্যে ছিলেন। তাড়াতাড়ি নেমে উঠোনে এসে দাওয়া থেকে একটা বেতের মোড়া নিয়ে পেতে দিয়ে বললেন,—বস খুড়ো! আজ এত সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছ যে ?

লোলুপ দৃষ্টিটা রান্নাঘরের অন্ধকার ভেদ করে কা'কে যেন খুঁজে বেড়ায়। বসতে বসতে দাশু বলে,—তোমাদের আর কি ভায়া, দাশু ঘটক আছে। দায়ে বেদায়ে হাত পাতলেই টাকা। এদিকে সেই টাকাটা যে আসে কোথা থেকে তা একবার ভেবে দেখো না। যাকগে, যা বলতে এসেছি, আসল পড়ে মরুক—সুদের প্রায় তিনশো টাকা হতে চললো—সেটার কি করছ ?

অতুল বললেন,—অবস্থা সবই তুমি জান খুড়ো! একপাল ছেলেপিলে, তার উপর এ বছর একপালি ধানও পাইনি জমি থেকে—ছেলেগুলোর ইস্কুলের মাইনে—

খুড়োর দৃষ্টি অনুসরণ করে মাঝ পথে থেমে যান অতুল বাবু, তারপর চেঁচিয়ে ওঠেন,—অচি, অচি। কোথায় গেলি রে ?

রান্নাঘর থেকে উত্তর দেয় অচলা—কি মামা !

—কি মামা! ভেংচি কেটে ওঠেন অতুল বাবু। অচলার উদ্দেশে তেমনি চড়া গলায় বলেন,—তোদের কি আক্কেল হবে না কোনও দিন ? তোর মামীর কাল রাত থেকে জ্বর, উঠতে পারছে না বেচারি, ছেলেগুলো একজামিনের পড়া করছে কিন্তু তুই তো রয়েছিস ?

কিছু বুঝতে পারে না অচলা। কি মামা ?

—একখানা হাতপাখা! দেখছিস লোকটা এতখানি পথ হেঁটে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে এসেছে।

নিঃশব্দে ঘর থেকে একখানা তাল পাতার পাখা এনে পিছন থেকে দাশুকে হাওয়া করতে লাগে অচলা।

গলায় প্রসন্নতার আমেজ ফুটে ওঠে দাশুর। খপ করে অচলার হাত থেকে পাখাখানা নিয়ে নিজেই হাওয়া করতে করতে বলে,—বাঃ, দিব্যি ডাগর-ডোগরটি হয়ে উঠেছিস তো ?

নির্লজ্জের মত লোভী দৃষ্টিটা অচলার সারা দেহের ওপর বুলাতে বুলাতে অতুলকে বলে,—রান্নাবান্না সব কিছু ঐ করে বুঝি ?

—গরীবের ঘরে না করলে চলবে কেন খুড়ো! কি ভাগ্যি নিয়ে জন্মেছে হতভাগী! ছেলেবেলায় মা-বাপকে খেয়েছে—বিষয়-আশয় যা ছিল—চলে যেত, কিন্তু কে জানতো যে তলে তলে সব তোমার কাছে বন্ধক দিয়ে গুণধর ভগিনীপতি আমার কলকাতায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে সব খুইয়ে বসে আছেন!

অস্বস্তি ভরে নড়ে চড়ে বসে দাশু, বলে,—থাক থাক অতুল, সে সব পুরোনো কথা ওকে বলে লাভ কি ?

—সঙের মত ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? যা না, খুড়োকে এক কলকে তামাক সেজে দে না হতভাগী!

দাওয়ার ওপর তামাক সাজার সরঞ্জাম। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে তামাক সাজতে বসে অচলা। পিছনে না চেয়েও বেশ বুঝতে পারে, সার্চ্চলাইটের মত দাশুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটা ওকে অনুসরণ করেই চলেছে।

হঠাৎ সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনও রকমে তাল সামলে নিল অচলা। ব্যাপার কী? ট্রেন ছাড়ল। অচলার মনে হল—দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত নির্জীব লৌহদানব ঘুমিয়ে পড়েছে। মানুষ ঘুমোয় নি—চুলের মুঠো ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে চলেছে ওকে ওদেরই ছকপাতা নির্দিষ্ট সীমারেখায়। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে পিট পিটে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ থেকে, অচলার খেয়ালই ছিল না। কাছে দূরের স্বল্পালোক ল্যাম্প-পোষ্টগুলোর কালি-পড়া কাচের ওপর লাল অক্ষরে ষ্টেশনের নাম লেখা,—অস্পষ্ট। অনেক কষ্টে পড়ল অচলা—ম্যাকল্‌সকিগঞ্জ—কী অদ্ভুত নাম রে বাবা! জানালায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসল অচলা। বৃষ্টির ঝাপটা এসে চোখে-মুখে মাথায় পিচকারির মত ছিটকে এসে পড়ে। খুব ভাল লাগছিল অচলার।

ছিন্ন সুতোর গ্রন্থি দিয়ে আবার শুরু হয় সেলাই···

প্রায় দু' বছর বাদে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি এসেছে ইতি। সংসারের কাজকর্ম শেষ করে অনেক রাত অবধি দু'জনে সুখ-দুঃখের কথা কইল—শেষে ইতিই এক রকম জোর করে অচলাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল, বললে—রাত অনেক হল—এবার বাড়ি যা মুখপুড়ি! ভোর না হতেই তো আবার হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলতে বসবি।

শোবার ঘর বলতে একখানি—মামা-মামী একপাল ছেলেপিলে নিয়ে সেইখানায় থাকেন। পাশে ছোট্ট এক ফালি ভাঁড়ার ঘর—সেইখানে কোনও মতে একটা মাদুর বিছিয়ে থাকে অচলা। ঘরে ঢুকতে গিয়ে মামীর কথায় থমকে দাঁড়াল অচলা, প্রথমতঃ এত রাত অবধি কোনও দিনই জেগে থাকেন না—তার উপর তার কথা নিয়ে রাত জেগে কি এমন আলোচনা হতে পারে ?

মামী—বিদেয় তো করছ অচিকে, কিন্তু তোমার এই শোরের পালকে ছুবেলা পিণ্ডি রেঁধে দেবে কে? বাসন মাজা কাপড় চোপড় কাচা এসবই বা হবে কি করে?

মামা—আ হা হা—সে সব কি না ভেবেই এ কাজে হাত দিয়েছি মনে কর? বিয়ের আগে রীতিমত দলিল রেজেষ্ট্রী করে তোমার নামে অচির বাড়ি বাগান জমি জমা যা কিছু আছে সব লিখে দেবে দাশু খুড়ো। তখন ও পাড়ার রাখুর মা—তিন কুলে কেউ নেই, ওকেই পেটভাতা রেখে দেওয়া যাবে—বড় জোর মাসে এক টাকা হাত খরচ।

মামীর নামে রেজেষ্ট্রী হবে শুনে আগুনে জল পড়ল; রুক্ষ কর্কশ গলায় কড়ি-মধ্যমের মিঠে সুর বেজে উঠল—ভাখো! তুমি যা ভাল মনে কর তাই কর। এতটুকু বয়েস থেকে মেয়েটাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি—ও চলে যাবে শুনলে তাই কেমন মায়া লাগে।

দাশুর সঙ্গে বিয়ে হবে? সমস্ত শরীর ঘেন্নায় রি-রি করে উঠল অচলার। তার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে মিত্তিরদের এঁদো পচা ডোবাটায় ডুবে মরা ঢের ভালো। ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে বাকি রাতটুকু ছটফট করে কাটাল অচলা। সম্ভব অসম্ভব নানা রকম চিন্তা করেও মামা-মামীর চক্রব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেল না। শুধু একটি পথ খোলা। পরদিন ভোরে খিড়কির পুকুরে ইতিকে একা মুখ ধুতে দেখে হাত ছুটো ধরে একরকম কেঁদে ফেললে অচলা—সই! যে ভাবে হোক খানিকটা বিষ আমায় যোগাড় করে দিতেই হবে।

অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে ইতি বললে—মাত্র এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন কি ঘটল যে—

সব বলে গেল অচলা। শুনে গম্ভীর হয়ে খানিক ভাবল ইতি, তার পর বললে,—কবে বিয়ে?

অচলা—সামনের শনিবার।

—ঠিক জানিস তুই?

—হ্যাঁ, একেবারে পাঁজিপুঁথি দেখে সব পাকা বন্দোবস্ত; এরকম একটা শুভ কাজ—ভাল দিনক্ষণ না দেখে হয় কি?

ইতি বললে,—আজ হল মঙ্গলবার, হাতে রইল শুধু তিনটে দিন, ঠিক আছে।

কিছুই বুঝতে না পেরে অচলা বলে—কি ঠিক আছে?

হেসে জবাব দেয় ইতি,—বিষ আমি দেব না তোকে, দেব গোটা দশেক টাকা।

—তোর ছু'টি পায়ে পড়ি সই—এ সময় ঠাট্টা করিসনে। সত্যি কোনও উপায় থাকে তো বল।

—উপায় নিশ্চয়ই আছে কিন্তু খুব শক্ত, সাহস হবে তোর?

হাসি পেল অচলার, বললে,—বিষ খেয়ে মরবার সাহস যার আছে তার সাহসে সন্দেহ হচ্ছে কেন তোর?

ইতি বললে, আজই আমি কলকাতায় চিঠি লিখে দিচ্ছি—কাল না হক পরশু সকালে পাবেই। এ ক'দিন কিছু করতে হবে না তোকে, লক্ষ্মী-মেয়ের মত মুখ বুজে চুপচাপ থাকবি। পাকা দেখা হয়ে যাক। বিয়ের আগের দিন একটু বেশি রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিস বলে বাড়ি থেকে বেরুবি—কেউ সন্দেহ করবে না। পথে বেরিয়ে সোজা পুব দিকে হাঁটতে শুরু করবি ষ্টেশনমুখো!

অচলা বলে—কিন্তু ষ্টেশনের পথ তো পশ্চিম দিকে।

—তা জানি রে মুখ্যু! সে ত হল আমাদের গাঁয়ের ষ্টেশন—মাত্র মাইল খানেক হাঁটলেই পৌছান যায়। তোকে যেতে হবে উল্টো পাঁচ মাইল হেঁটে নওপাড়া ষ্টেশনে। ঠিক ভোরে কলকাতার গাড়ি পাবি। একখানা টিকিট কেটে লেডিজ কামরায় উঠে বসবি, ব্যস্।

পরিষ্কার কিছুই বুঝতে পারে না অচলা—ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ইতির মুখের দিকে। বেশ একটু রেগেই বলে ইতি,—এটা বুঝতে পারলি নে বুদ্ধির ঢেঁকি—যে গাঁয়ের ষ্টেশন দিয়ে যেতে গেলে চেনা-শুনো কেউ না কেউ দেখে ফেলবেই—জানাজানি হবে, ওরা তোকে জোর করে আটকে রাখবে। নওপাড়া অনেকটা দূর—সেখান দিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।

অচলা বললে—বেশ, গাড়িতে উঠে বসলাম, তারপর?

—তার পরের ভাবনা আমার। সেই জন্যেই আজ কলকাতায় চিঠি দিচ্ছি। আমার দেওর নিখিল এবার মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ওখানেই হাউস সার্জেন হয়েছে। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই নার্সেস কোয়ার্টার। বুঝতে পারছিস কিছু?

ঘাড় নাড়ে অচলা।

হেসে ইতি বলে,—অজ পাড়াগাঁয়ে থেকে তোর বুদ্ধিসুদ্ধি সব

ভোঁতা হয়ে গেছে। মন দিয়ে শোন। শিয়ালদা ষ্টেশনে নিখিল থাকবে—তোকে চিনে নিতে তার মোটেই কষ্ট হবে না। নিয়ে একেবারে তুলবে আমাদের বাড়ি নয়, নার্সদের কোয়ার্টারে। আমার চিঠি পেলেই নিখিল সব ব্যবস্থা করে রেখে দেবে। যদি ইচ্ছে করিস ওখানে থেকে নার্সিং শিখে চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি।

অচলা চুপ করে আছে দেখে ইতি ঠাট্টা করে বললে,—কি রে, ঘাবড়ে গেলি না কি? শুধু তোর মনের বল আর সাহসের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। অন্য দিকটাও ভেবে দেখো। বদনামে দেশ ছেয়ে যাবে। ওরা তোকে খুঁজে বার করতেও চেষ্টার ত্রুটি করবে না। কিন্তু সাবধান সই, ঘুণাক্ষরেও যদি প্রকাশ হয় যে এর পিছনে আমি আছি—তাহলে সর্ব্বনাশ হবে। আমার জন্যে ভাবিনে—ভাবছি বাবার কথা।

সেদিন কথা বলে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেনি অচলা—গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় নি, চোখ ভরে উঠেছিল জলে—শুধু দু'হাত দিয়ে ইতির হাত দুটো সবলে চেপে ধরেছিল বুকের ওপর।

বিকট আর্তনাদ করে গতিবেগ কমিয়ে দিল লৌহদানব। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সোজা হয়ে বসল অচলা। জানালা দিয়ে, মুখ বাড়িয়ে দেখল দূরে অস্পষ্ট আলোর আভাস, ষ্টেশন খুব কাছেই। চুলগুলো ভিজে সপ-সপ করছে চোখে-মুখে জল। শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে ভিতরে চাইল অচলা। হিন্দুস্থানী না দেহাতি স্ত্রীলোক দুটি সরু বেঞ্চিখানায় জড়সড় হয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মুখের ঘোমটা সরে গেছে। দু'টিই প্রায় সমবয়সী। সুন্দর মুখখানা উল্কিতে বিশ্রী দেখাচ্ছে, কপালে থুতনিতে নাকে রুচিহীন ব্লু ব্ল্যাক উল্কির ছাপ। পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে শক্ত করে দুহাতে বেঞ্চির দু'পাশ চেপে ধরে প্রস্তুত হয়ে বসল অচলা। একটু পরেই ট্রেন এসে থামল, একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ট্রেনশুদ্ধ যাত্রীকে সচকিত করে আবার ঝিমিয়ে পড়ল। জনবিরল ষ্টেশন। নামতে বা উঠতে বড় একটা দেখা গেল না কাউকে। শুধু প্রকাণ্ড একটা ছাতা মাথায় রেলের ছাপ-মারা কালো কোট গায়ে একটা লোক প্লাটফরমের এধার থেকে ওধার হেঁকে বেড়াতে লাগল 'মহুয়া মিলন'। ভারি মিষ্টি নাম তো! অচলার মনে হল শর্বরীদের ষ্টেশনটা ওরকম দাঁতভাঙা ডালটনগঞ্জ না হয়ে যদি মহুয়া মিলন হত, বেশ হতো তাহলে। বেশ জোরে বৃষ্টি এল। হিন্দুস্থানী মেয়ে দু'টি জানালা বন্ধ করে মুখোমুখী বসে গল্প শুরু করল আবার। খোলা জানালায় মুখ বার করে চোখ বুজে বসল অচলা।

সে দিনও ছিল ঠিক এমনি বর্ষণমুখর দুর্য্যোগের রাত। অন্ধকার গাঁয়ের পথ বেয়ে একা পাঁচ মাইল হেঁটে ষ্টেশনে এসে গাড়িতে উঠল অচলা। কাপড়-চোপড় ভিজে গায়ে লেপ্টে গেছে আর দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। জেনানা-গাড়ীতে অধিকাংশ মেয়েই ঘুমিয়ে, দু'এক জন যারা জেগে ছিল গভীর বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল অচলাকে। বেলা এগারটায় গাড়ি এসে পৌঁছল শিয়ালদা ষ্টেশনে। কামরার সামনে এসে দাঁড়াল নিখিল। সুন্দর সুগঠিত যুবা। একে একে সব মেয়েরা নেমে গেল—অচলা তবুও বসে রইল গাড়িতে।

লজ্জা সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা এসে সারা দেহ আচ্ছন্ন করে দিল

—আপনিই তো অচলা দেবী? মৃদু সপ্রতিভ প্রশ্ন করে নিখিল।

ঘাড় নেড়ে অচলা জানায় হ্যাঁ।

—আমি নিখিল,—বৌদির কাছে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনেছেন। আপনি নির্ভয়ে আর নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আসতে পারেন? সব ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি।

এক অজানা পরিবেশে নতুন জীবনের শুরু এইখান থেকেই।

বয়স্থা মেট্রন, রাণী ভিক্টোরিয়ার মত দেখতে অনেকটা। দেখলেই ভক্তি হয়, মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। প্রথম দর্শনেই বুকে টেনে নিলেন অচলাকে, বললেন,—সব আমি শুনেছি মা, ঠিক করেছ, এই তো চাই। মেয়ে হয়ে জন্মেছ বলে সমাজের অন্যায় অত্যাচারগুলো মুখ বুজে সইতে হবে—এর কোনও মানে হয় না। সারা-জীবন তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে না মরে যে পথ আজ তুমি বেছে নিয়েছ—এর চেয়ে ভাল পথ মেয়েদের জীবনে আর হতে পারে না। মানুষের সেবা—দেশের ও দশের কল্যাণে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া এই হল এর মূলমন্ত্র। শত্রু-মিত্র নির্ব্বিচারে নিজের কর্ত্তব্য অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাওয়া—খুব শক্ত হলেও অসম্ভব নয়। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি পারবে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের নাম শুনেছ?

অচলা মাথা নেড়ে অজ্ঞতা জানায়।

মেট্রণ বললেন—আর এক দিন তোমাকে সেই মহীয়সী নারীর পুণ্য জীবনকথা শোনাব।

এর পর একটা বছর কি ভাবে কোন দিক দিয়ে কেটে গেল ভাল মনে পড়ে না অচলার। শুধু মনে আছে নিখিলের অশ্রান্ত চেষ্টা ও সহযোগিতা—মেট্রণের অদম্য উৎসাহ অনুপ্রেরণা আর নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনায় এক দিন শুনল সে ভাল ভাবেই পরীক্ষায় পাশ করে মেডিকেল কলেজেই চাকরী পেয়ে গেছে। শুধু নার্সিংই শেখেনি অচলা—কাজ চালিয়ে নেবার মত মোটামুটি ইংরাজি-বাংলাও শিখে নিয়েছে নিখিলের অদ্ভুত শিক্ষকতা গুণে।

মামা অতুল বাবু এক দিন মেডিকেল কলেজে এসে হাজির। অচলা তখন ডিউটিতে। অন্য একটি নার্স এসে জানালে—অচলাদি', দেশ থেকে তোমার মামা এসেছেন, দেখা করতে চান।

প্রথমটা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল অচলা। একটু পরেই সামলে নিয়ে বললে—বললি না কেন, এখন আমি ডিউটিতে, দেখা হবে না।

—বলেছিলাম। বললেন, বিশেষ দরকার, দেখা না করলেই নয়। আমি তোমার হয়ে ডিউটি করছি, তুমি পাঁচ মিনিটের জন্যে ঘুরে এস না অচলাদি'!

নীচে ভিজিটার্স রুমে ঢুকতেই অতুল বাবু গর্জন করে উঠলেন,—কাপড়-চোপড় ছেড়ে এখুনি তোমাকে আমার সঙ্গে দেশে রওনা হতে হবে।

বেশ ধীর স্থির কণ্ঠে অচলা বললে,—প্রথম কথা—এটা আপনার গাঁয়ের নিজের বাড়ি নয়, অত চেঁচিয়ে কথা না বললেও আমি শুনতে পাব। দ্বিতীয় কথা—গায়ের জোরে আমাকে টেনে নিয়ে যাবার বয়েস আমি পার হয়ে এসেছি—সেদিক দিয়েও কোন সুবিধে হবে না। আর একটা কথা না জিজ্ঞাসা করে পারছি না—কুমারী মেয়ে গৃহত্যাগ

করে এলে, বছরখানেক বাদে তাকে আবার ফিরিয়ে নেবার নতুন বিধান কবে থেকে আপনাদের সমাজে চালু হয়েছে, মামা ?

ব্যর্থ রোষে নিজের মনে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অতুল বাবু, আর আসেন নি।

কর্মময় স্বাধীন জীবন, বেশ লাগছিল অচলার। সময় পেলেই ইতিদের বাড়ি গিয়ে গল্প জমিয়ে তোলা। কোনও দিন সিনেমা, কোনও দিন গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া—অধিকাংশ দিন ইতিদের ওখান থেকেই ভোজনপর্ব শেষ করে হোষ্টেলে ফেরা—অচলার জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় মধুর অভিজ্ঞতা !

ইতির স্বামী অরবিন্দর সঙ্গে বিয়ের সময় গাঁয়েই আলাপ হয়েছিল, নিবিড় ও সহজ হয়ে উঠল এখানে এসে। চমৎকার নিরহঙ্কার মানুষটি। ইতির বাড়িতে আসার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল অচলার। নিখিলকে দেখা, ওর সঙ্গে গল্প করা—যতটুকু সময় হোক, ওর সান্নিধ্য কামনা করত অচলা, সমস্ত দেহ-মন দিয়ে। আর কেউ বুঝতে না পারলেও, কিছুটা আন্দাজ করে নিয়েছিল ইতি। সেদিন দুপুরে একা বসে একখানা মাসিকের পাতা ওলটাচ্ছিল ইতি। অরবিন্দ অফিসে। নিখিল এক দিনের ছুটিতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কলকাতার বাইরে গেছে পিক্‌নিক্ করতে। অচলা এসে হাজির। ইতি জানতো, এ হপ্তা অচলার ডে-ডিউটি। তাই একটু অবাক হয়ে বললে,—তুই হঠাৎ এ সময়ে ?

—কেন, তোর বাড়িতেও কি হাসপাতালের মত রুটিনবাঁধা টাইমে দেখা করতে হবে ?

—তা নয়। বলছিলাম, ডিউটি রয়েছে—এলি কি বলে ?

—বড্ড মাথা ধরেছে বলে ছুটি নিয়ে এলাম তোর সঙ্গে গল্প করতে।

—উঁহু, কেন এসেছিস আমি জানি, বলব ?

—বলো না শুনি, দৈবজ্ঞ ঠাকুর !

—ঠাকুরপোর খবর নিতে। আজ হাসপাতালে দেখতে পাসনি, তাই ভেবেছিস হয়তো কোনও অসুখ-বিসুখ করেছে, কেমন ঠিক বলিনি ?

কপট রাগে অচলা বলে—ফের যদি ঐ সব ঠাট্টা করবি তুই—তাহলে তোদের বাড়ি আসাই বন্ধ করে দেব।

হেসে ইতি বলে,—ইস্ বন্ধ করাটা অত সহজ কি না! আমি জানি তোকে বারণ করলেও ছল-ছুতোয় তুই আসবিই। কথায় আছে, দুর্জনের ছলের অভাব হয় না।

হেসে ফেলে অচলা বলে,—বটে, আমি দুর্জন, কিসে হলাম শুনি ?

পরম বিজ্ঞের ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসে গম্ভীর ভাবে বলে ইতি—তবে মন দিয়ে শোন বৎস! প্রথমতঃ মামা-মামী—যাঁরা এতটুকু বেলা থেকে তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করে এত বড়টি করেছেন, তাঁদের অত বড় আশায় তুমি ছাই নিক্ষেপ করে এসেছ। দ্বিতীয়—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মন দাশু ঘটক, তাঁর বার্দ্ধ্যক্যের সাধের তাজমহল তুমি নির্মম ফুঁয়ে তাসের ঘরের মত নিমেষে ধূলিসাৎ করে এসেছ। তৃতীয়—এবং সবচেয়ে মারাত্মক কারণ হল—ভদ্রঘরের সুন্দরী যুবতী নারী হয়ে তুমি অনায়াসে টারজন দি ফেয়ারলেসের মত এক বস্ত্রে দুর্যোগ রাত্রে একা, দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে ট্রেনে উঠে বসলে, দুর্জনের আর কি কোয়ালিফিকেসন দরকার, আমা[র] জানা নেই।

—ব্রেভো! ওয়েল হেড ইতি। হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে পড়ে অরবিন্দ।

ইতি বললে—দরজার বাইরে থেকে আড়ি পেতে আমাদের কথ[া] শুনছিলে বুঝি ?

—সব কথা শোনবার সৌভাগ্য হয়নি—শুধু দুর্জনের ডেফিনেশনট[া] সব শুনে ফেলেছি। কি করি বল—অমন সরস আলোচনাটা মাঝখানে ঢুকে পড়ে রসভঙ্গ করতে ইচ্ছে হল না—তাই।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ইতি বলে—তুমিও কি বড্ড মাথা ধরেছে ব[লে] আফিস থেকে ছুটী নিয়ে এলে ?

অবাক হয়ে অরবিন্দ বলে—মাথা? কই না, মাথা ধরে[নি] তো। বেশ লোক তুমি, কাল অত করে বলে দিলে সকাল সকা[ল] ছুটী নিয়ে বাড়ি আসতে, টালিগঞ্জে মামীমার বাড়ি যাবে, স[ব] ভুলে বসে আছ ?

ভারি লজ্জা পায় ইতি। উঠে পড়ে বলে—তোমরা দু'জনে গ[ল্প] কর, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আসছি। অচি পালাস [না] কিন্তু, আজ তোকে মামীমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—দেখবি [কি] চমৎকার লোক!

তারপর তিনজনে হৈ হৈ করে ট্যাক্সি চেপে টালিগঞ্জে যাওয়া···

রিচুঘটা। মাথায় কে যেন লাঠি মারল অচলার। কি বিদঘুটে নাম রে বাবা! অদ্ভুত লাইন। মহুয়া-মিলনের পাশে রিচুঘটা—চমৎকার মিল। মনে মনে দু'-তিনবার আউড়ে গেল নাম দুটে[া] অচলা। পাশের কামরায় কি একটা গণ্ডগোল শোনা গেল—ব্যাপা[র] কি দেখবার জন্য উঠতে গিয়েই যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে ঝুপ ক[রে] বসে পড়ল অচলা। এক ভাবে অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে হাত-প[া] ভেরে গেছে; শিরাগুলো ব্যথায় টনটন করছে। নড়ে-চড়ে হা[ত] বুলিয়ে যন্ত্রণা একটু কমলে আস্তে আস্তে বেঞ্চির হাতল ধরে দরজা[য়] গিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়াল অচলা।

দু'-তিনটে দেহাতি কুলি গোছের লোককে পাকড়াও ক[রে] সদর্পে ষ্টেশন-ঘর মুখো চলেছে টিকিট-চেকার, এক সঙ্গে হাঁউ-মাউ ক[রে] তিন জনে কি বলতে চাইছে যেন—সেদিকে কর্ণপাত না করে চেকা[র] সাহেব জোরে পা চালিয়ে দিলেন। অনুমানে ব্যাপারটা বুঝে নি[য়ে] ভিতরে এসে আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগল অচলা। আ[র] কিছু না হোক রিচুঘটায় অন্ততঃ মানুষের সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল—এও একটা সান্ত্বনা। হাত-ঘড়িটা দেখল অচলা—রাত ঠিক দুটো এখনও প্রায় ঘণ্টা তিনেকের জানি। বেঞ্চিটায় বসে সুটকেসট[া] মাথায় দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল অচলা।

আজ যেন অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চেয়ে ব্যথাভরা অতীতে[র] আকর্ষণই বেশী। চেষ্টা করেও থামতে পারে না অচলা, চুম্বকের ম[ত] পিছু টানতে থাকে···।

নাইট ডিউটিটাই বেশি পছন্দ করে অচলা। ভিজিটারের ভি[ড়] নেই, বাইরের হৈ-হল্লা নেই, বেশ নিরিবিলিতে চুপ-চাপ কাজ ক[রে] যাওয়া। তার উপর যদি নিখিলেরও নাইট-ডিউটি থা[কে] তাহলে সোনায় সোহাগা। নিখিল বিশেষ করে বলে দিয়েছে—

রোগীর অবস্থা একটু এদিক-সেদিক দেখলে তখনি কোনও দ্বিধা না করে তাকে যেন ডেকে পাঠানো হয়।

সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে অচলার। নাইট ডিউটি করছে, রাত তখন প্রায় একটা, হঠাৎ দেখলো আট নম্বর বেডের রুগী কেমন ছটফট করছে ও ভুল বকছে। নিখিলেরও ডিউটি ছিল তখন। ব্যস্ত হয়ে নিখিলের খোঁজে গিয়ে দেখে ডক্টরস রুমে চেয়ারের হাতলের ওপর মাথা রেখে অকাতরে ঘুমোচ্ছে নিখিল। দু'-বার ডেকে সাড়া না পেয়ে কাছে গিয়ে হাত ধরে একটু নাড়া দিতেই নিখিল ধড়মড় করে উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি হলে এসে রুগী দেখে হেসে বলেছিল নিখিল,—এতেই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অচলা দেবী? কিছুই নয়—জ্বরটা খুব বেড়েছে বলে ভুল বকছে। মাথায় আইস-ব্যাগ দিন আর টেম্পারেচার কমলে মিক্সচারটা এক দাগ খাইয়ে দিন—দেখবেন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

দু'জন নার্স ছুটী নিয়েছে, ভাগাভাগি করে ডিউটি করতে হচ্ছে। দু'-দিন ইতিদের বাড়ি যেতে পারেনি অচলা। নিখিলও দু-তিন দিন হাসপাতালে আসে না। অন্য ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা করে। সেদিন পাঁচটার ডিউটি শেষ হবার আধ-ঘণ্টা আগেই হেড-নার্সকে বলে ছুটী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অচলা। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ইতিদের বাড়ি—একখানা রিক্সা চেপে সোজা গিয়ে উঠল ওদের বাড়ি। বাইরের দরজা খোলা। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে চোরের মত সন্তর্পণে ডান দিকে নিখিলের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল—কেউ নেই। বারান্দার শেষপ্রান্তে পুব দিকে ইতির শোবার ঘর। দরজার বাইরে থেকে দেখল ও ভাবল, আপাদ-মস্তক লেপ ঢাকা দিয়ে শীতের বিকেল-বেলা অকাতরে ঘুমুচ্ছে ইতি। নিঃশব্দে জুতোটা বাইরে খুলে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল অচলা খাটের কাছে। একটা দুষ্টুমি হাসি ফুটে উঠল ওর চোখে-মুখে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে জাপটে ধরে বললে অচলা, তবে যে মিথ্যেবাদী, দুপুরে তুমি না ঘুমিয়ে বই পড়ে কাটাও? এদিকে বলা হয় রাতে ভাল ঘুম হয় না—ক্ষিদে···।

মুখ থেকে লেপটা সরিয়ে পাশ ফিরে হো-হো করে হেসে উঠল অরবিন্দ, বললে—ভাগ্যিস আজ শরীরটা ভাল নেই বলে আফিস কামাই করেছিলাম তাইতো মেঘ না চাইতে জল।

লেপের ভেতর থেকে হাত বার করে জড়িয়ে ধরে অরবিন্দ। লজ্জায় চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে অচলার। প্রাণপণে আলিঙ্গন-মুক্ত হতে চেষ্টা করে, পারে না। কোনও রকমে বলে—ছিঃ ছিঃ, ইতি···।

—ইতি তিনটের শোতে নিখিলকে নিয়ে সিনেমায় গেছে—ফেরবার সময়ও হয়ে এসেছে কিন্তু অত লজ্জা কিসের? স্ত্রীর অন্তরঙ্গ-বান্ধবী, তার সঙ্গে এটুকু স্বাধীনতা এযুগে নিন্দনীয় নয়।

আওয়াজ পেয়ে দুজনেই ফিরে তাকায়—দেখে দরজার সামনে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ইতি আর নিখিল।

আলিঙ্গনের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে, হাত সরিয়ে নেয় অরবিন্দ। আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে ইতির সামনে এসে দাঁড়ায় অচলা। দেখে—ক্রোধ ঘৃণা থেকে শুরু করে সব-কটা উগ্র রিপু এক সঙ্গে মিশে ইতির সুন্দর মুখখানা বিকৃত বীভৎস করে তুলেছে।

ইতি বললে—সেদিন পুকুর-ঘাটে হাত ধরে যখন কেঁদেছিলি—তখন তোকে বিষ দেওয়াই আমার উচিত ছিল, উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল ইতি। নিরুপায়ের মত শেষ আশ্রয় খোঁজে অচলা, নিখিলের মুখের দিকে চেয়ে। দেখে সেখানেও পরিষ্কার ফুটে উঠেছে বিজাতীয় ঘৃণা ও অবজ্ঞা, একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয় নিখিল। কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল অচলা ইতিদের বাড়ি থেকে।

ইতিদের সঙ্গে এইখানেই ইতি।

সোজা হোষ্টেলে গিয়ে শুয়ে পড়ল অচলা। হোষ্টেল ফাঁকা, অন্য নার্সরা কেউ ডিউটিতে, কেউ সিনেমায়, কেউ বা বেড়াতে বাইরে গেছে। নিঃশব্দে কাঁদছিল অচলা। মেট্রণ এসে মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে মা অচলা?

ভেবেছিল, এ চরম লজ্জার কথা আর কারও কাছে বলবে না—কিন্তু পারল না—একে একে সব কথাই বলে গেল অচলা। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেট্রণ বললেন,—সত্যি তোমার জন্যে দুঃখু হয় মা! এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি মা?

—আমাকে এখনই একটা ভাল হোষ্টেল ঠিক করে দিতে হবে মা, ওদের এত কাছে থাকা এর পর আর চলে না।

হ্যারিসন রোডের ওপরেই একটা নার্সিংহোম—মেট্রণের জানা—ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মেট্রণের চিঠি নিয়ে চলে গেল অচলা।

আলাদা কোনও রুম খালি নেই—আর একটি মেয়ের সঙ্গে থাকতে হবে। অগত্যা তাতেই রাজি। প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে ভাল লাগল অচলার। সব সময় হাসিখুশী—ওরই সমবয়সী। অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ ভাব হয়ে গেল দু'জনের।

মেয়েটি বললে,—সত্যি একা-একা ভাল লাগছিল না আমার

অচলাদি', কিছু না হোক দু'জনে গল্প করেও সময় কাটিয়ে দিতে পারবো। এই হল শর্বরী।

জানালার কাছে দু'জন হিন্দুস্থানী চেঁচামেচি শুরু করে দিল। ধড়মড় করে উঠে বসল অচলা। বাইরে চেয়ে দেখে চিপাসোহার ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করে যেয়ে দু'টির ঘুম ভাঙাচ্ছে বোধ হয় ওদেরই আত্মীয়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বোঁচ্‌কা বুঁচকি নিয়ে ভারি দেড়মণি রূপোর মলের আওয়াজ করতে করতে নেমে গেল মেয়ে দু'টো। গাড়ি একদম খালি। উঠে দরজা বন্ধ করে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে বেঞ্চিটায় পা ছড়িয়ে কামরার তক্তার পার্টিসনে হেলান দিয়ে বসল অচলা।

শেষ-হয়ে-যাওয়া ইতিহাসে নতুন পাতা জুড়ে লেখা শুরু হল আবার......।

দু' মাসের ওপর চলে এসেছে অচলা নার্সিং হোমে। ছোট হোটেল। সবশুদ্ধ সাতটি মেয়ে থাকে। সবাই নার্সিং পাশ করে প্রাইভেট প্রাকটিস করে—অচলাই শুধু হাসপাতালে নিয়মিত ডিউটি দেয়। অনেক সময় কলে বাইরে গিয়ে দু'-তিন দিন কাটিয়ে আসতে হয়,—শর্বরীও মাঝে-মধ্যে যায়। সেই সময়টা অচলার ভারি বিশ্রী লাগে, সময় যেন আর কাটতে চায় না। হাসপাতালেও সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়—চেষ্টা করে নিখিলের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে। দৈবাৎ সামনা-সামনি পড়ে গেলে দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—কথা হয় না।

এই অল্প দিনের মধ্যে শর্বরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেছে অনেকখানি। অচলার বেদনাময় অতীত সবটা না হলেও অনেকখানি জেনে গেছে শর্বরী। শর্বরীর ইতিহাস অতটা ব্যাপক না হলেও কিছুটা ব্যথা ও হতাশায় ভরা। ব্যাপারটা মোটামুটি এই।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর ভালবাসল শর্বরী পাড়ার একটি ছেলেকে—সে-ও মেসে থেকে বি-এ, পড়ত। বাড়ির অবস্থা ভাল। বাপ রিটায়ার্ড রেলওয়ে অফিসার। বিহারে বাড়ি, জায়গা-জমি সব আছে। অল্পদিনের মধ্যে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতেই ছেলেটি শর্বরীকে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। শর্বরীও সানন্দে সম্মতি দিল। বেঁকে বসলেন শর্বরীর বাবা। অসবর্ণ বিয়েতে তিনি কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। শর্বরীরা ব্রাহ্মণ, ছেলেটি কায়স্থ। এই ব্যাপার নিয়ে সাংসারিক অশান্তি যখন চরমে উঠেছে, সেই সময় একদিন অফিস থেকে ফেরবার পথে গাড়ি চাপা পড়ে শর্বরীর বাবা মারা গেলেন। চার দিক অন্ধকার দেখলো শর্বরী। সংসারে তিন-চারটি ছোট ভাই-বোন, মা, চলবে কি করে? লজ্জা-সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে ছুটে গেল শর্বরী মেসে ছেলেটির খোঁজে। সেখানে শুনল, দিন সাতেক আগে শর্বরীর বাবা মেসে এসে যাচ্ছেতাই অপমান করে যাবার পরদিনই ছেলেটি মেস ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। দিশেহারা হয়ে পড়ল শর্বরী। বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের হাজার তিনেক টাকা আর পোষ্ট অফিসের কয়েক শ' টাকা মাত্র সম্বল। এ দিয়ে ক'দিন চলবে? শর্বরীর এক দূর সম্পর্কের বিধবা পিসি নার্সের কাজ করেন। হঠাৎ একদিন রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা। তাঁরই পরামর্শে নার্সিং পাশ করে যা হোক করে দাঁড়িয়েছে শর্বরী। তবে বিয়ে আর জীবনে করবে না শর্বরী এটা স্থির নিশ্চয়।

দু'দিনের জন্যে আসানসোল চলে গেছে শর্বরী। হাসপাতাল থেকে ফিরে শূন্য ঘরে মন টেকে না অচলার। একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়ে আনমনে পাতা ওল্টাতে থাকে। ভেজান দরজাটা সশব্দে খুলে হুড়মুড় করে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে জড়িয়ে ধরল শর্বরী অচলাকে।

অচলা বলে, ব্যাপার কি? হঠাৎ এত উচ্ছ্বাসের কি কারণ ঘটল?

অচলার বুকে মুখ লুকিয়ে শর্বরী বলে, পেয়েছি অচলাদি'।

—কী পেয়েছিস?

—তার দেখা।

—কার?

হাসিমুখে তাকায় শর্বরী অচলার দিকে। তার পর ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলে, আমার হারানো বরের সঙ্গে দেখা হয়েছে আজ।

খুশীতে ও উত্তেজনায় উঠে বসে অচলা। শর্বরীকে জড়িয়ে ধরে বলে, সব কথা আমায় খুলে বলে দুষ্টু মেয়ে! উৎসাহে গড় গড় করে বকে যায় শর্বরী, আসানসোল ষ্টেশনে নেমে পেসেন্টের বাড়ি গিয়ে শুনি মেয়েটি ভোরবেলায় মারা গেছে। ওরা আমায় দু' দিনের ফি আর গাড়ি ভাড়া দিতে চেয়েছিল, আমি শুধু গাড়ি ভাড়া ছাড়া আর কিছুই নিইনি। ষ্টেশনে এসে দেখি কলকাতার গাড়ি ঘণ্টা দেড়েক পরে। কি করি, ওয়েটিং রুমে ঢুকে দেখি—একটা বেতের ইজিচেয়ারে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। কাছে গিয়ে একবার ডাকতেই লাফিয়ে উঠল। তার পর কথা আর শেষ হয় না আমাদের।

অসহিষ্ণু হয়ে অচলা বলে, কী কথা? এত দিন কোথায় ছিল, খোঁজ নেয়নি কেন জিজ্ঞেস করেছিলি?

—সব। দাঁড়াও বলছি, একটু দম নিতে দাও।

টেবিলের উপর রাখা মাটির কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে এক গ্লাস জল খেয়ে খাটের পাশে বসে বললে শর্বরী, মেস ছেড়ে দিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে বি-এ, পরীক্ষা দিল, পাশ করল। ওর এক কাকা অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন। তাঁর কথা মত আর না পড়ে সোজা চলে গেল বর্মা। বছর খানেক বাদে ফিরে আমাকে অনেক খুঁজেছিল, পায়নি। আর পাবেই বা কি করে, বাবা মারা যাবার এক মাস বাদেই আমরা ও বাড়ি ছেড়ে অন্য পাড়ায় উঠে গিয়েছিলাম। তার পর থেকে অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। পয়সা-কড়িও বেশ করেছে। দিন কুড়ি হল রেঙ্গুন থেকে ফিরেছে।

—আর আসল কথাটা? বিয়ে করেছে কি না তা তো বললি না?

লজ্জায় লাল হয়ে উঠে শর্বরী। মুখ নিচু করে বলে, না। এই শনিবারে কাশীতে আমাদের বিয়ে অচলাদি'। আজ রাতের গাড়িতে আমরা বেনারস চলে যাব।

একটু অবাক হয়ে অচলা বলে, কলকাতা ছেড়ে কাশীতে কেন?

—ওখানে আমার এক বিধবা পিসিমার কাছে মা, ভাই-বোনেরা রয়েছে। বিয়ের পর সোজা চলে যাব ডাল্টনগঞ্জে ওদের বাড়িতে।

অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। কলকাতায়

অচলার একমাত্র দরদী বন্ধু অবলম্বন ছিল শর্বরী—সেও শেষ বিদায় নিয়ে চললো।

যাবার সময় বার বার করে বলে গেল শর্বরী, চিঠি দিলে উত্তর দিও দিদি! ছোট বোনটাকে একেবারে পর করে দিও না যেন।

কলকাতা অসহ্য হয়ে উঠল অচলার। একদিন রাত্রে মেট্রনের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল অচলা,—মা গো—কলকাতার বাইরে, যে কোনও জায়গায় আমাকে একটা চাকরী ঠিক করে দাও—যত দূরে হয় তত ভাল।

দিন মাসেক বাদে একদিন মেট্রণ ডেকে পাঠালেন অচলাকে, বললেন,—রাঁচি থেকে একটা জরুরী চিঠি এসেছে আমার কাছে। ওরা একজন এফিসিয়েণ্ট নার্স চায় ওখানকার হাসপাতালের জন্যে। মাইনেও বেশি—তাছাড়া ফ্রি কোয়াটার্স। সত্যি কলকাতা ছেড়ে যেতে পারবে তুমি?

—এখুনি। মুক্তির আনন্দে কেঁদে ফেললে অচলা।

দু'দিন বাদে মেট্রণের চিঠি নিয়ে রাঁচি চলে এল অচলা।

নিয়মিত চিঠি দেয় শর্বরী। অচলাও উত্তর দেয়। প্রায় সব চিঠিতেই লেখে শর্বরী—দিদি, ডাল্টনগঞ্জ বড্ড ফাঁকা, এদের দেহাতি ভাষা বুঝতে পারি না, কথা কইবারও লোক নেই। উনি প্রায়ই কাজ নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান। এ যেন সোনার খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি। সব সময় তোমার কথা মনে হয় একবার যদি এখানে আসতে! কিন্তু আমার তেমন ভাগ্য কি হবে?

সেদিন হাসি পেয়েছিল অচলার। বোকা মেয়েটা তো জানে না যে অচলাকে দেখলে ভাগ্য দেশ ছেড়ে পালায়।

রাঁচি আসবার আগের দিন শর্বরীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল অচলা। আমার পর ক্রমাগত তাগিদ।—অচলা দি'—মেঘ না চাইতেই জল। এত কাছে এসে পড়েছ যখন—দু'দিনের জন্যও একবার আসতে হবে ছোট বোনের বাড়িতে।

নতুন চাকরী, এসেই ছুটি চাওয়া ভাল দেখায় না—নানা রকম যুক্তি দিয়ে দু'মাস কাটিয়ে দিল অচলা। কিন্তু আর চলে না। শর্বরী লিখল—দিদি, মাত্র কয়েক ঘণ্টার জার্নি। তাছাড়া ওঁকে তোমার সব কথা বলেছি। উনিও খুব উৎসুক তোমায় দেখবার জন্য। বললেন—আসতে লিখে দাও। এই সব মেয়েই বাংলা দেশের গৌরব। এদের আদর্শে অন্য মেয়েরা অনুপ্রাণিত হয়ে পথ খুঁজে নিতে পারবে। আরও সব বড় বড় কথা। লক্ষ্মীটি অচলাদি', তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একবার এস।

গাড়ি এসে থামল ডাল্টনগঞ্জ ষ্টেশনে। ও অঞ্চলের মধ্যে বেশ বড় ষ্টেশন। হাতঘড়িটায় রাত চারটে। স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়ল অচলা। সব শুদ্ধ পাঁচ-ছ'টি লোক নামলো। বেশির ভাগই রেলের কুলি পয়েণ্টসম্যান আর তাদের ফ্যামিলি।

বৃষ্টি থেমে গেলেও মেঘ কাটেনি। ষ্টেশনের বাইরে কোনও গাড়ি রিক্সা কিছু নেই, নির্জন রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে। অজানা অচেনা জায়গা, অন্ধকার রাতে সমস্যায় পড়ল অচলা। প্লাটফরমে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরের দিকে চলল। কোম্পানীর

কালো কোট পরে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে আধাবয়সী একটি লোক। বার কতক ডাকাডাকি করতেই চোখ মেলে তাকাল লোকটা; তার পর অচলাকে দেখে প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

অচলা বললে—রিটায়ার্ড রেলওয়ে অফিসার আর, সি দত্ত'র বাড়িটা ষ্টেশন থেকে কত দূর, দয়া করে বলবেন?

একটা ঢোঁক গিলে হাঁ বন্ধ করে লোকটি বললে—দত্ত সাবকা কোঠি হিঁয়াসে পুরো দেড় মাইল। অওর কোই হায় আপকা সাথ?

অচলা বললে,—না।

আবার হাঁ করে চেয়ে রইল লোকটা। একটু পরে বললে,—রাতমে একেলা যানা ঠিক নহি। আপ যাইয়ে ওয়েটিংরুমমে। ফজিরমে গাড়িউড়ি সব মিলেচ্ছে। টিকিট হ্যায় আপকা?

স্যুটকেস খুলে টিকিট বার করে দেয় অচলা। সেই ভাল, ঘণ্টাখানেক বই ত নয়? ওয়েটিংরুমের দরজা বন্ধ, একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকেই নাকে রুমাল দিয়ে বেরিয়ে এল অচলা। পচা ভাবসা একটা দুর্গন্ধে ঘরের আবহাওয়া বিষিয়ে রয়েছে—বমিতে পেটের নাড়ী উল্টে আসে। ওয়েটিংরুমের আশা ত্যাগ করে প্লাটফরমে ঘুরে বেড়াতে লাগল অচলা। ছোট হলেও স্যুটকেসটা ভারি, বেশীক্ষণ হাতে নিয়ে বেড়ান যায় না। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে ওটা হাত থেকে নামিয়ে বিশ্রাম করে নেয় অচলা।

বেঞ্চিগুলো খালি নেই। সবগুলোতে রেলের কুলী, নয়তো ঐ ধরণের যাত্রীরা আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বেরোবার গেটের বাঁ দিকে একখানা বড় বেঞ্চি বোধ হয় খালি। এগিয়ে কাছে এসে দেখে, একাণ্ড এক জোয়ান হাত দুখানা মাথার নীচে দিয়ে ঘুমুচ্ছে। অচলার যেন মনে হল লোকটা জেগেই আছে, ওকে দেখেই ঘুমের ভাণ করলো। মরুকগে ছাই, এর চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভাল। অপরিচিত জায়গা—অন্ধকার রাত একলা—একটু দ্বিধা আসে যেন! পরক্ষণেই মামার বাড়ী থেকে চলে আসা রাতের কথা মনে পড়ে। দৃঢ় হাতে স্যুটকেসটা উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

ষ্টেশন থেকে ছিটকে এসে মিটমিটে খানিকটা আলো, সামনের রাস্তাটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। শর্বরী লিখেছিল—ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে ডান দিকের রাস্তা যেটা বরাবর পশ্চিমমুখো চলে গেছে—সেইটে ধরে এগিয়ে গেলে রাস্তার ডান ধারেই গেটওলা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি।

খোয়া-বারকরা অসমতল রাস্তা। মাঝে মাঝে বড় বড় গর্ত্ত। বহুদিন সংস্কার অভাবে এবড়ো-খেবড়ো। সাবধানে পথ চেয়ে না চললেই বিপদের সম্ভাবনা। পথ চলতে চলতে বেশ খানিকটা দমে গেল অচলা। ষ্টেশনের সীমানা পেরিয়ে পথের দুধারে কোনও বাড়ি নজরে পড়ে না—শুধু উঁচু-নীচু পাথুরে লাল মাটি ধু ধু করছে আর কয়েকটা শাল জাতীয় বড় বড় গাছ হেলে পথের ধারে এসেছে—অন্ধকার সেইখানটায় সব চেয়ে বেশি।

সন্তর্পণে পা টিপে টিপে রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চলেছে অচলা। কানে এল—ঘট-ঘট-ঘট। প্রথমে মনে করল শোনার ভুল। একটু দাঁড়িয়ে পিছনে যত দূর দৃষ্টি চলে দেখবার চেষ্টা করে অচলা। কিছুই দেখা যায় না—শুধু ধোঁয়ার মত গাঢ় অন্ধকার। আবার চলতে শুরু করে—আবার পিছনে আওয়াজ ওঠে খট-খট-খট, নিশ্চয় কেউ নালবাঁধান ভারি জুতো পায়ে পিছনে আসছে। এক অজানা ভয়ে সারা দেহ কেঁপে ওঠে অচলার। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে—হয়ত ওরই মত কোন নিরীহ পথিক। সন্দেহ ঘোচাতে জোরে চলতে শুরু করে অচলা—পিছনের আওয়াজও দ্রুত হয়ে ওঠে। রীতিমত ভয় পেয়ে গেল অচলা। স্যুটকেসটা শক্ত করে ধরে রাস্তার গর্ত্তে পড়ে যাবার বিপদ তুচ্ছ করে ছুটতে লাগল, আওয়াজ শুনে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না—পিছনের অজ্ঞাত লোকটিও ছুটতে শুরু করেছে। হাঁপিয়ে ওঠে অচলা। দম নিতে একটুখানি থেমে দাঁড়িয়ে সভয়ে পিছনে চায়। জমাট কালো মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ অনেক চেষ্টা করে একটু উঁকি দিলেন। সেই আবছা আলোয় দেখলো অচলা—হাত পনেরো দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে ষ্টেশনের বেঞ্চে মাথার নীচে হাত দিয়ে শুয়ে থাকা সেই দশাসই হিন্দুস্থানী দৈত্যটা। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না, লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান—যেমন লম্বা তেমনি বিশাল বুকের ছাতি। সাদা আদ্দির কলিদার পাঞ্জাবীটা হাওয়ায় লটপট করছে বুকের ওপর।

দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি জড়ো করে স্যুটকেস হাতে ছুটল অচলা। লোকটাও ছুটল। পিছনে না চেয়েও বেশ বুঝতে পারলে অচলা—দুজনের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। হঠাৎ পিছনে ভারি জিনিস পড়ার আওয়াজের মতো একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অচলা। মনে হল ভূমিকম্পের মত সারা রাস্তাটা যেন কেঁপে উঠল। চাঁদ ডুবে গেলেও পিছন ফিরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে দেখল অচলা, কাছেই মাত্র হাত ছয়েক দূরে রাস্তার মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে লোকটা। ওর পায়ের কাছে একটা বড় গর্ত্ত বৃষ্টির জলে ভরে আছে দেখে, পড়ে যাবার কারণ অনুমান করতেও কষ্ট হল না।

অচলা ভাবলে এই সুযোগ। কাতরানি শুনে মনে হয় গুরুতর আঘাত পেয়েছে লোকটা—বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিয়ে পিছু নেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। বেশ জোরে পা চালিয়ে দিল অচলা। মেট্রণের কণ্ঠস্বর হাওয়ায় ভেসে এল—শত্রু-মিত্র নির্ব্বিচারে মানুষের সেবাই এ ব্রতের একমাত্র মূলমন্ত্র। শক্ত হলেও অসম্ভব নয়।

কয়েক পা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল অচলা। মনে হল, পা দুটো কে যেন জোর করে ধরে রেখেছে। দ্বিধা, সংশয়, ভয়—অন্য দিকে কর্ত্তব্য। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে টানা-পড়েন কাটিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল অচলা আহত লোকটার দিকে।

কাছে এসে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল,—কোথায় লেগেছে তোমার? কোনও উত্তর নেই। হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয়তো উত্তর দেবার বা ওঠবার সামর্থ নেই। শুধু একটা অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ থেকে বোঝা গেল, লোকটা এখনও বেঁচে আছে।

মাথার কাছে রাস্তার ওপর বসে পড়ল অচলা। উপুড় হয়ে পড়েছে লোকটি, মুখ দেখা যায় না। মাথাটার ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল অচলা,—কি কষ্ট হচ্ছে তোমার? উত্তর না দিয়ে অতি কষ্টে কনুই দুটোর ওপর ভর দিয়ে মুখ তুলে চাইল লোকটা অচলার দিকে। ভোরের নিস্তেজ মরা চাঁদ কালো মেঘের স্তরের উপরে দাঁড়িয়ে মিট্ মিট্ করে চাইছে। তারই আবছা আলোয় দেখা গেল, নাক-চোখ-মুখ রক্তে লাল হয়ে গেছে লোকটার। দেশী অথবা চোলাই মদের একটা বিকট দুর্গন্ধ ওর নিঃশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত আবহাওয়াটাই বিষাক্ত করে তুলেছে।

ভিজে শাড়ির আঁচল দিয়ে যতটা পারল, মুখের রক্ত মুছে দিল অচলা। সুন্দর টকটকে ফর্সা রং, বয়েস খুব বেশি হলেও একুশ-বাইশের মধ্যে। অনিয়মে, অত্যাচারে, দীর্ঘ টানা-টানা চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, মাথার চুল পালোয়ানি ঢং-এ ছোট করে ছাঁটা, ওপরের ঠোঁটে ছোট্ট সরু গোঁফের রেখা। চোখ-মুখের রক্ত পরিষ্কার করতে করতেই নজরে পড়ল—ওর কপালে ডান দিকে একটা কালো তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরো বিঁধে আটকে রয়েছে। তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা গাঢ় রক্ত টপ টপ করে পথের ওপর পড়ছে।

চিন্তার সময় নেই। যত্ন করে ওর মাথাটা কোলের ওপর রাখল অচলা। তার পর ক্ষিপ্র হাতে সুটকেশটা খুলে হাতড়াতে লাগল। অভ্যাসের বশেই হোক কিংবা ছেলেটির ভাগ্যগুণেই হোক, ছোট একটা টিনচার আইডিনের শিশি আর খানিকটা তুলো পাওয়া গেল সুটকেশের নীচে। বেশ খানিকটা বসে গেছে পাথরটা কপালে, আস্তে টেনে বার করা গেল না। একটু জোরে টানতেই যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে উঠল ছেলেটা—পাথরটা বেরিয়ে এল অচলার হাতে। দেখলে ভয় হয়, বেশ খানিকটা গর্ত্ত হয়ে গেছে কপালে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে অচলার শাড়ির খানিকটা ভিজে গেল। নিপুণ হাতে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তুলোয় জবজবে করে আইডিন ঢেলে চেপে ধরল অচলা কপালের ওপর। এবার চাই ব্যাণ্ডেজ। এক হাতে ওর কপালটা চেপে ধরে, অন্য হাতে সুটকেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ব্যাণ্ডেজ পাওয়া গেল না। সুটকেশ থেকে একটা চওড়া লাল পাড়, সাদা শাড়ি থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে ব্যাণ্ডেজের মত পাকিয়ে বেঁধে দিল ওর কপালে। বেশ বুঝতে পারল অচলা, অসহ্য যন্ত্রণা হলেও দাঁত-মুখ চেপে সহ্য করছে ছেলেটা।

আস্তে আস্তে মাথাটা পথের ওপর নামিয়ে দিয়ে বললে,—রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়। সকালে একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে তিনি যা বলেন, তাই করো।

শাড়িটায় নজর পড়তেই আঁতকে উঠল অচলা। রক্তে খানিকটা অংশ ভিজে জ্যাব-জ্যাব করছে। এ অবস্থায় শর্বরীদের বাড়ি গেলে কি কৈফিয়ত দেবে অচলা? কিছু দূরে রাস্তার একটা বড় গর্তে বৃষ্টির জল আটকে রয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে যতটা সম্ভব কাপড় চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করে নিল অচলা। ফিরে এসে সুটকেশটা নিয়ে যাবার আগে ছেলেটার দিকে তাকাল—দেখলে, ঠিক তেমনি ভাবে শুয়ে বিস্ফারিত চোখ দুটো দিয়ে ওরই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ছেলেটা। মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করল অচলা।

কি জানি কেন, মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে অচলার। একটা খুশীর আমেজও উঁকি দিচ্ছে যেন মনের বন্ধ দরজার পাশে। অজানা, অচেনা এই শুকনো পাথুরে দেশ—বিশ্রী রাস্তা, দূরে অস্পষ্ট ধোঁয়ায় ঢাকা সারবন্দি পাহাড়গুলো, সবাই যেন নীরবে অভিনন্দন জানাচ্ছে অচলাকে।

খট্—খট্—খট্!

রীতিমত বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল অচলা। দেখলো, টলতে টলতে ওরই দিকে এগিয়ে আসছে ছেলেটা। ভয় নয়—ঘেন্নায় সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল অচলার। কাছে এসে দাঁড়াতেই, অচলা বললে—তুমি মানুষ? না জানোয়ার?

—জানোয়ার। বললে ছেলেটা।

—তাই দেখছি। নইলে এর পরেও আমার পিছু নিতে তুমি কখনই পারতে না।

—ঠিক বলেছিস বহেন!

বহেন? নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না অচলা। অবাক হয়ে বলে,—বহিনই যদি বলছ তাহলে আবার আমার পিছু নিয়েছ কেন?

—তুই আমার জান দিয়েছিস কিন্তু বহেন, আমার তো দিবার কিছু নাই, তাই পিছু নিয়েছি তোর জান বাঁচাতে।

বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে অচলা।

ছেলেটা বুঝতে পেরে বলে,—বুঝলি না? বদমাশ গুণ্ডা এখানে শুধু আমি নই বহেন! আমার মত আরও দু-চারজন আছে। তারা তোকে একেলা পথে পেলে মুখ বন্ধ করে সোজা নিয়ে যাবে ঐ পাহাড়ের নীচে।

হাত দিয়ে দূরের অস্পষ্ট পাহাড় দেখিয়ে বলে ছেলেটা,—সেখানে গিয়ে তোর জান ইজ্জৎ সব খেয়ে লিয়ে ফেলে দেবে পাহাড়ের গর্ত্তে। আমি সঙ্গে থাকলে যমেও তোকে ছুঁতে সাহস করবে না বহেন!

দুর্ব্বল দেহে একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁফাতে থাকে ছেলেটা। রাস্তার বাঁ পাশে উঁচু শুকনো একটা জায়গায় হাত ধরে বসিয়ে তারপর সুটকেসটা পেতে নিজে পাশে ব'সে বললে অচলা,—তোমার নাম কি ভাই?

—রামদয়াল। এখানে সবাই গুণ্ডা রামু বলে ডাকে।

—বাড়ি?

—এইখানেই।

—তুমি তো বেশ বাংলা বলতে পার রামদয়াল?

ম্লান হেসে রামদয়াল বলে,—আমি চার-পাঁচ বছর কলকাতায় ছিলাম, ইস্কুলে পড়তাম বহেন!

—পড়াশুনো ছেড়ে এই সব নোংরা কাজ কেন বেছে নিলে রামদয়াল?

—কেন নিলাম শুনবি বহেন? একটু চুপ করে থেকে বলতে শুরু করে রামদয়াল—জ্ঞান হবার পর থেকে মাকে দেখিনি। বাড়িতে ছিলাম আমরা তিন জন, আমি বাবা আর আমার ফুলিয়া বহেন। ফুলিয়া ছিল আমার এক বছরের ছোট, বাবা রেলে পয়েণ্টসম্যানের কাজ করত আর আমরা দু' ভাই-বহেন খেয়ে দেয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে খেলা করে বেড়াতাম। বছরের পর বছর কেটে গেল। একদিন বাবা ডেকে বললে—বেটা রামা, রাতদিন খেলা না করে একটু লিখা-পড়া শিখে নিতিস যদি, বাবুদের ধরে রেলে একটা ভাল চাকরী করে দিতে পারতাম। মুখ্য হয়ে থাকলে সারাজীবন আমার মত কুলিগিরি করে কাটাতে হোবে। পরদিনই আমি আর ফুলিয়া পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়ে গেলাম। বাড়ি থেকে দু' মাইলের বেশি হেঁটে যেতে হয় পাঠশালায়। শরীর খারাপ বলে দুদিন আমি যাইনি—ফুলিয়া একেলা যেত-আসতো। একদিন এসে বললে আমাকে—ভেইয়া, কাল থেকে আমি আর পড়তে যাব না—পণ্ডিতটা লোক ভাল নয়! সব বুঝতে পারি, রাগে দিল জ্বালা করতে থাকে আমার। শরীর ভাল হলে এক দিন পাঠশালায় ছুটির পর পণ্ডিতটাকে আচ্ছা দু' চার ঘা দিয়ে এলাম ব্যস—পাঠশালার পড়া সেই দিন থেকে খতম।

হাঁফিয়ে ওঠে রামদয়াল। থেমে দম নেয়। কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে জেনেও ওকে থামাতে ইচ্ছে করে না অচলার। চুপ করে থাকে।

রামদয়াল বলে,—বাবার এক দেশোয়ালি ভাইয়া কলকাতায় ট্রামে ড্রাইভারের কাজ করত। কি একটা পরবে এখানে এলে বাবা ওকে ধরে বসল। সহজেই রাজি হয়ে গেল কাকা, বললে—রাম, তুই চল আমার সঙ্গে কলকাতায়, আমার কাছে থেকে ওখানে ইস্কুলে পড়বি।

বেশ বুঝতে পারলাম পড়াশুনার জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থাও বাবা করে ফেলেছে কাকার সঙ্গে। গোল বাধল ফুলিয়াকে নিয়ে। জন্ম থেকে কোনও দিন দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়নি, কেঁদে কেটে অস্থির। ধরে বসল, আমিও তোমার সাথে যাব ভেইয়া! অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে ওকে, বলি, কলকাতার ইস্কুলে অনেক ছুটি। বছরে পাঁচ ছ বার আসব আমি, তোর জন্যে বইখাতা ভাল সাড়ি কিনে আনব। ছুটিতে তোকে পড়াব আমি। শেষে রাজি হল।

তিন চার বছর বেশ কাটল। ছুটিতে এসে ওকে ইংরাজি কিছু কিছু বাংলা অঙ্ক শিখাই—কলকাতার গল্প করি। বাংলা সাড়ি কিনে আনি। ভারি খুশী বহেনটা। একদিন বাবা ডেকে বললে—বেটা রামা, ফুলিয়া তো একদম ধিঙ্গি হয়ে পড়েছে, ওর সাদির সব ঠিক করেছি আমি। যে লোকটাকে ঠিক করেছে বাবা—তাকে আমি চিনি। ষ্টেশনে মণিহারির দোকান আছে। পয়সা করেছে বেশ কিছু কিন্তু আদমীটা ভাল না। যেমন বিশ্রী দেখতে—স্বভাবও তেমনি। রাত-দিন তাড়ি-মদ গেলে আর কুলি ধাবড়া আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি মারে।

বললাম,—ও শয়তানের সাথে ফুলিয়ার সাদি কিছুতেই দিতে দিব না আমি। ওর সাদি আমি নিজে দেখে শুনে ভাল ছেলের সাথে দিব।

কপালটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। ব্যাণ্ডেজের ওপর দু'হাত দিয়ে কপালের রগ দুটো চেপে দম নেয় রামদয়াল।

অচলা বলে,—থাক থাক ভাইয়া, তোর কষ্ট হচ্ছে বলতে।

রামদয়াল বলে, কেউ জানে না, এ সব কথা, আজ তোকে সব বলে যাব আমি। কে জানে আর বলবার সময় পাব কি না। চার মাস বাদে ষ্টেশন মাষ্টারের একটি জরুরি তার পেয়ে ছুটে এলাম বাড়িতে। কি দেখলাম জানিস বহেন? খালি বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। মাথায় লাঠি মেরে বাবাকে মেরে ফেলে ফুলিয়াকে নিয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করে খবর নিয়ে জানলাম—একদিন অনেক রাতে তিন দুসমণ এসে মুখে কাপড় বেঁধে ফুলিয়াকে নিয়ে পালাচ্ছিল—বাবা বাধা দেয়, তখন লাঠি মারে। দু'দিন বাদে ফুলিয়ার লাশ পাওয়া গেল ঐ পাহাড়টার কাছে একটা গর্ত্তে। অর্দ্ধেকটা জন্তু জানোয়ারে খেয়ে নিয়েছে, বাকিটা পচে ফুলে উঠেছে। কাছেই পেলাম রক্ত-মাখা সাড়িটা, যেটা দেওয়ালিতে আমি পছন্দ করে কিনে দিয়েছিলাম। হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল রামদয়াল। সমবেদনার ভাষা নেই, নীরবে পিঠে মাথায় হাত বুলাতে লাগল অচলা।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে দূরের পাহাড়টার দিকে চেয়ে বলতে লাগল রামদয়াল, সেদিন ঐখানে বহিনটার লাশ ছুঁয়ে কসম নিয়েছিলাম, তোর এ অবস্থা যারা করেছে, নিজের হাতে তাদের আমি শেষ করবো ফুলিয়া বহেন! কলম ছেড়ে ছুরি ধরলাম। পুলিশ খবর পেয়ে এল, কিন্তু কিছুই করল না। পরে শুনলাম, টাকা দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। বেদের মত রাতদিন ঘুরে বেড়াতাম। রাতে ঘুমুতে পারতাম না, মনে হত বহেনটা আমায় ডাকছে, ভেইয়া! ভেইয়া!

গলা ধরে আসে রামদয়ালের। একটু পরে বলে, অনেক চেষ্টা করে জানতে পারলাম এর মধ্যে একটা বাঙালী বাবু আছে। কয়েক মাস আগে থেকে ফুলিয়ার ওপর নজর পড়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও যখন কিছু হল না, তখন বাইরে থেকে টাকা দিয়ে দুটো ভাড়াটে গুণ্ডা এনে এই কাজ করেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনটে দুষমণই ডাল্টনগঞ্জ ছেড়ে পালিয়েছে। একটার খোঁজ পেলাম পাটনায়, সেখানে গিয়ে সেটাকে শেষ করলাম, চার মাস বাদে আর একটার খবর পেলাম। শালা কলকাতায় পালিয়ে আছে। একদিন অনেক রাতে ভুলিয়ে নিয়ে এলাম শয়তানটাকে বালী ব্রীজের কাছে, সেইখানে তাকে শেষ করি। মরবার আগে দুষমণটা ঐ বাঙালী বাবুর কথা সব খুলে বলে। এইটেকে শেষ করতে পারলে আমার কাজ শেষ। ফুলিয়া বহেনটাও শান্তিতে ঘুমাবে। তারপর দিক না আমায় ফাঁসি-জেল-দ্বীপান্তর, কুচ পরওয়া নহি।

পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসে। সেই দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ায় রামদয়াল। বলে—ভোর হবার আগেই আমাকে ঐ পাহাড়ে-জঙ্গলে লুকোতে হবে বহেন! চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

কয়েক পা এগিয়েই জিজ্ঞাসা করে রামদয়াল, কার বাড়ি যাবি? এখানে সবই আমার চিনা। অচলা বলে, দত্ত সাহেবের বাড়ি, রিটায়ার্ড রেলওয়ে···। কথা শেষ করতে পারে না অচলা। পিছনে অস্ফুট আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়। দেখে উত্তেজনায় রামদয়ালের বিরাট দেহ থরথর করে কাঁপছে, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। সাপের মত চাপা হিংস্র গর্জনে রামদয়াল বলে, উখানে তুই কেন যাবি বহেন? উরা তোর কে?

বিস্মিত হয়ে অচলা বলে, কেউ না। দত্ত সাহেবের ছেলের সঙ্গে আমার ছোট বহিনের বিয়ে হয়েছে। ব্যাপার কি ভাইয়া?

—ঐ বুড়া দত্ত সাহেবের বেটা সুধীরই তো তিসরা দুষমণ। ওকে শেষ করবার জন্মই তো মাটি কামড়ে পড়ে আছি আমি। তুই ওখানে যাস না বহেন, ও শয়তান সাপের মত বেইমান।

জবাব দিতে পারে না। অবসন্ন দেহে পথের ধারে বসে পড়ে অচলা।

ধীরে কাছে এসে পায়ের কাছে বসে রামদয়াল বলে, এত কথা আজ তোকে কেন বলছি জানিস বহেন? ভাবলেশ শূন্য চোখে তাকায় অচলা রামদয়ালের মুখের দিকে।

—কাল রাতে তোকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে, চমকে উঠেছিলাম আমি। ঠিক যেন আমার ফুলিয়া বহেন বাঙালী মেয়ের পোষাক পরে ফিরে এসেছে আমার কাছে। ফুলিয়াও ঠিক তোরই মত দেখতে ছিল।

অচলা বলে, তবে দূর থেকে অন্ধকারে আমার পিছু নিয়েছিলি কেন?

—পাকিট একদম খালি। কাল সারা দিন পেটে একটি দানাও পড়েনি। রাত হলে পাহাড় থেকে বেরিয়ে ক্ষিদেয় আর দাঁড়াতে পারি না। ষ্টেশনে একটা জানা আদমীর কাছ থেকে একটা চোলাই মদের পাঁট ধার নিয়ে এক নিশ্বাসে সেটা শেষ করে বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে পড়লে সব ভুলে যাব। পিছু নিয়েছিলাম খানিকটা দূরে গিয়ে, তোর কাছ থেকে কিছু টাকা চাইব বলে।

—যদি না দিতাম?

—আমি জানি না দিয়ে তুই পারতিস না বহেন! একটু থেমে আবার বলে,—সবার সামনে আওরতের কাছে ভিখ মাঙতে আমার সরম লাগে দিদি!

অচলা বলে,—সুধীরের কথা কি বলছিলে?

নিমেষে চোখ-মুখ আবার কঠিন হয়ে ওঠে রামদয়ালের, বলে,—বছর দুই হল বুড়া দত্ত সাহেব চাকরী ছেড়ে এখানে বাড়ি করেছে। সুধীর কলকাতায় কলেজে পড়তো। সেই সময় থেকে ছুটিতে এখানে এসে ফুলিয়ার ওপর নজর দিত, সুবিধে করতে না পেরে টাকা দিয়ে লোক লাগিয়ে এই কাজ করেছে। শেষে ভয়ে পালিয়া যায় বর্মায়। আজ ক'মাস হল ফিরেছে। শালা ভয়ে রাতের বেলা বার হয় না। আরও কি করেছে জানিস বহেন? সদরে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমার নামে গেপ্তারি পরওয়ানা বার করেছে।

তাইতো দিনের বেলা পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকি, রাতে ষ্টেশনে এসে শুই।

অচলা বলে, ষ্টেশনের ওরা যদি ধরিয়ে দেয় ?

—সাহস করবে না। তাছাড়া ওরা সবাই আমায় ভালবাসে বহেন ! কেন যে গুণ্ডামি করি তাও জানে। কপালের ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে মুখ বেয়ে কলিদার আদ্দির পাঞ্জাবীটার ওপর পড়ে। ভয় পায় অচলা, বলে,—ভাইয়া আর কথা বলিস না। তোর সব কথাই আমি বিশ্বাস করেছি।

একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে রামদয়ালের মুখে। স্নটকেস খুলে দশ টাকার দু'খানা নোট বার করে রামদয়ালের দিকে এগিয়ে দিয়ে অচলা ধরা গলায় বলে—আমারও তিনকুলে কেউ নেই ভাইয়া, বহেন বলে ডেকেছিস, সেই দাবীতেই এটা দিচ্ছি। না নিলে মনে করবো তোর সব কিছু ঝুঠা।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হাত পেতে টাকা নেয় রামদয়াল, চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে।

অচলা বলে—আর একটা কথা তোকে রাখতে হবে ভাইয়া !

জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় রামদয়াল।

—সুধীরকে ছেড়ে দিতে হবে। ও বিয়ে করেছে আমার ছোট বোনকে। মেয়েটা বড় ভাল রে রামদয়াল, সুধীরের কিছু হলে ও প্রাণে বাঁচবে না। তোর একটা বহেনকে খুশী করতে আর দুটো বহেনকে এত বড় আঘাত তুই দিসনে ভাই !

বিমূঢ়ের মত ফ্যাল-ফ্যাল করে শুধু চেয়ে থাকে রামদয়াল।

অচলা বলে—তা ছাড়া ভেবে দেখ ভাই, মেরে ফেললে ওর শাস্তিটা কী হল ? তার চেয়ে বেঁচে থেকে তোর ছুরীর ভয়ে সারাজীবন তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরবে ও। কোনটা ভাল ?

অচলার হাত দুটো ধরে ক্ষত-বিক্ষত বিবর্ণ মুখখানা তার ওপর রেখে কেঁদে ফেলে রামদয়াল।

ভোর হয়ে আসে। দূরে অস্পষ্ট দু-একটি পথচারীকেও দেখা যায় যেন।

অচলা ডাকে—ভাইয়া ! কথা দে আমায় ভাইয়া !

—তুই ঠিক বলেছিস বহেন, জবান দিলাম তোকে। আজই ঐ পাহাড়ের নীচে ছুরি ফেলে দিয়ে ফুলিয়া বহেনের কাছে মাপ চেয়ে লিব। উঠে দাঁড়িয়ে অচলাকে বলে, তুই যা বহেন, সামনের ঐ মোড়টা পেরিয়ে গেলেই ডান দিকের সাদা বাংলো বাড়িটা, সামনে লোহার গেট।

এগুতে গিয়ে আবার দাঁড়ায় অচলা, বলে,—আজই কিছু খেয়ে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে ডাল্টনগঞ্জ থেকে চলে যা ভাইয়া !

অবসন্ন অনিচ্ছুক পা দুটো টেনে টেনে এগিয়ে চলে অচলা।

সামনে ছোট্ট লনে পায়চারি করছিলেন দত্ত সাহেব। অচলাকে দেখে তাড়াতাড়ি লোহার গেটটা খুলে ভিতরে চলে গেলেন।

গেট ভেজিয়ে দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলে অচলা, রাস্তা ছেড়ে সামনের ধূ ধূ প্রান্তর বেয়ে টলতে টলতে চলেছে সর্ব্বহারা আধমরা হিন্দুস্থানী ছেলেটা। চলতে চলতে পড়ে যাচ্ছে আবার অতিকষ্টে উঠে পা দুটো টেনে টেনে চলছে, লক্ষ্য ওর দূরের ঐ পাহাড়টা।

সদ্য ঘুম ভেঙে বাইরে এসে অচলাকে দেখে চিৎকার করে উঠল শর্ব্বরী—দিদি ! সত্যি এলে তুমি ? পরক্ষণেই অবাক হয়ে বলে—কিন্তু এত ভোরে এলে কি করে ? রাত্রে ষ্টেশনে তো গাড়ি থাকে না ? কার সঙ্গে এলে ?

তেমনি ভাবেই জবাব দেয় অচলা—একলা।

পাশ থেকে শর্ব্বরীর স্বামী বলে ওঠে,—একলা ? সত্যি সাহস আছে আপনার। শর্ব্বরীর কাছে আপনার সব কথা শুনে সত্যি বলছি বিশ্বাস হয়নি আমার। কিন্তু রাত্রে ডাল্টনগঞ্জের পথে মেয়েছেলে হয়ে একলা অক্ষত দেহে যখন আসতে পেরেছেন—আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

কাছে এসে শর্ব্বরী বলে,—এ কি, কাপড় চোপড় সব কাদাজলে মাখামাখি, পড়ে গিয়েছিলে বুঝি ? ঘরে এস দিদি !

ঘরে যাবার উৎসাহ অনেক আগেই চলে গেছে অচলার ভাবছিল—কোনও রকমে এখান থেকে এই ধুলো পায়ে বাঁচি ফিরে যাওয়া যায় না ?

সুধীর বললে,—শুধু পড়ে গিয়ে রেহাই পেয়ে গেছেন এইটে তোমার দিদির ভাগ্য বলে মনে কর। কোনো গুণ্ডা বদমাসের হাতে পড়লে বিশেষ করে রামু ব্যাটার নজরে পড়লে ফিরে আসতে হ[ত] না—পথেই পড়ে থাকতে হত। ব্যাটা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তাই রক্ষে।

দূরে উঁচু পাথরের ঢিবিটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে রামদয়াল-হয়তো পড়ে আছে উঠতে পারছে না। জল ভরা চোখে দেখা য[ায়] না তবুও চেয়ে থাকে অচলা।

সুধীর বললে,—তোমার বান্ধবীকে ভিতরে নিয়ে যাও—আ[মি] চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি। অচলা ভাবছিল, তার ঘনিষ্ঠ পরিচ[য়ের] গণ্ডির মধ্যে মামা অতুল বাবু, দাশু ঘটক, অরবিন্দ, নিখিল, শর্ব্ব[রীর] স্বামী এই সুধীর, আর ঐ পলাতক খুনে গুণ্ডা রামদয়াল,—এ[দের] সবাইকে এক সঙ্গে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে, মানু[ষের] বিচারে যাই হোক না কেন, আর একজনের বিচারে কার অপরা[ধের] বোঝা সব চেয়ে ভারি হয়ে উঠবে ?

শর্ব্বরী বললে,—চুপ চাপ ঐ দিকে চেয়ে কি দেখছ দিদি ? ভে[তরে] এস। পরক্ষণেই অচলার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলে,—ওঃ, পাহা[ড়ের] ফাঁকে সূর্য্যোদয় দেখছ বুঝি ? সত্যি দিদি এখানে আর কিছু [থাক] বা না থাক,—ভোরের সূর্য্যোদয়টা অদ্ভুত ! এখানে এসে প্র[থম] ক'দিন আমিও তোমার মত হাঁ করে চেয়ে থাকতাম।

ঊর্দ্ধে পাহাড়ের উপর দৃষ্টি পড়ল। পূর্ব্বের খানিকটা আকাশ পাহাড়টার চূড়ায় কে যেন টকটকে লাল খানিকটা আবির [ছড়িয়ে] দিয়েছে। অচলার মনে হল, ফুলিয়া আর রামদয়ালের টাটকা [রক্তে] স্নান করে উঠে ডাল্টনগঞ্জের প্রভাতী-সূর্য্য চোরের মত পাহ[াড়ের] আড়াল থেকে উঁকি মারছে !

সুমণি মিত্র

২৭

"There are...certain reformers
Who want to reform our religion,
Or
Rather turn it topsy-turvy,
With a view
To the regeneration
Of the Hindu nation.
There are, no doubt,
Some thoughtful people
Among them,
But there are also many
Who follow others blindly
And act most foolishly,
Not knowing
What they are about.
This class of reformers
Are very enthusiastic
In introducing foreign ideas
Into our religion.
They have
Taken hold of the word 'idolatry',
And aver
That
Hinduism is not true,
Because it is idolatrous."

*   *   *

"For a hundred years
They have been here.
What good has been done,
Except the creation
Of a most vituperative,
A most condemnatory literature ?"

*   *   *

"Platform speeches
Have been made by the thousand,
Denunciations
In volumes after volumes
Have been hurled
Upon the devoted head
Of the Hindu race
And its civilisation,
And yet
No good practical result
Has been achieved ;..."

*   *   *

"They have criticised,
Condemned,
Abused the orthodox,
Until the orthodox
Have caught their tone,
And paid them back
In their own coin,
And the result
Is the creation of a literature...
Which is the shame of the race,
The shame of the country.

Is this reform
Is this
Leading the nation
To glory ?"১

১। "একদল সংস্কারক আছেন, যাঁরা আমাদের ধর্মের সংস্কার চান, কিংবা হিন্দুজাতের পুনর্জীবনের জন্যে আমাদের ধর্মের আমূল পরিবর্তন চান। তাঁদের মধ্যে, অবিশ্যি কিছু চিন্তাশীল লোক আছেন, কিন্তু এমন লোকও বিস্তর আছেন, যাঁরা পরের অন্ধ অনুকরণ কোরে থাকেন এবং নিজেরা কি চান—সেটা না-জেনেই নির্বোধের মতো কাজ কোরে থাকেন। এই শ্রেণীর সংস্কারকেরা আমাদের ধর্মে বৈদেশিক ভাব চালাবার জন্যে বিশেষ উদ্‌যোগী। তাঁরা 'পৌত্তলিকতা' বোলে একটা কথা ধোরে বোসে আছেন, এবং দৃঢ় কণ্ঠে বোলছেন—হিন্দু ধর্ম সত্য নয়, কেননা হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিক।"—*What have I learnt.* (*Comp. works, Vol III, page* 450.)

"একশো বছর ধোরে তাঁদের এই সংস্কার আন্দোলন চোলছে।

২৮

তোমার বা পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম-নেতার
জানিনা ব্রহ্মজ্ঞান কতোটুকু কার,
প্রতীকের বিরুদ্ধে গালাগালি কোরে
প্রমাণ কোরতে চাও 'তিনি' নিরাকার ?

শুনেছি ব্রহ্মজ্ঞানে দোষ দ্যাখা ঘোচে,
মতুয়ার-বুদ্ধিটা মন থেকে মোছে,
যতো মত যতো পথ—সব কিছুতেই
তখনি সে বহুরূপী ব্রহ্মকে খোঁজে।

মুখ থেকে অভিশাপ বেরোয়না আর,
আশীর্বচন ছাড়া থাকেনাকো তার।
যা'কিছু দৃষ্টিদোষ দূর হোয়ে গেলে
আর কি কারুর প্রতি থাকে ধিক্কার ?

অমূর্ত্ত-উপাসক আরো তো আছেন,
তোমাদের আগে যাঁরা দেহ রেখেছেন,
সে-সব মহাত্মা কি মূর্ত্তি-পূজোকে
যুক্তির কৌশলে হেয় কোরেছেন ?

ধর্মের দিক্‌পাল কবীর নানক্
অমূর্ত্ত-সাধনার খাঁটি উপাসক,
সাধনা ও সিদ্ধির মূর্ত্ত প্রতীক,
তোমাদের মতো নন্ কথার সাধক।

শাস্ত্রকে যুক্তির জাঁতাকলে এনে,
অসীমকে বুদ্ধির সীমা দিয়ে টেনে
শান্তি ভঙ্গ এঁরা করেননি কারো,
বলেননি—মূর্ত্তিকে ফেলে দাও 'ভেনে'।

কিন্তু তার দ্বারা জঘন্যতম নিন্দা ও বিদ্বেষ পূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া আর কি কল্যাণ হোয়েছে ?"—*My plan af campaign.* (*Camp. works, Vol III, page* 215.)

"বক্তৃতামঞ্চে উঠে হাজার-হাজার বক্তৃতা করা হোয়েছে, হিন্দু জাত এবং হিন্দু সভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ এবং অভিশাপ বর্ষণ করা হোয়েছে, কিন্তু তা-সত্ত্বেও সমাজের বাস্তবিক কোনো উপকার তাতে হয়নি।"—*The mission of the Vedanta.* (*Comp. works, Vol III, page* 195.)

"তাঁরা প্রাচীন সমাজের কঠোর সমালোচনা কোরেছেন, যথাসাধ্য দোষারোপ এবং নিন্দাবাদ কোরেছেন ; শেষে প্রাচীন সমাজও তাঁদের সুর ধোরেছেন, ঢিল খেয়ে তাঁদের পাটকেল মেরেছেন আর তার ফলে এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হোয়েছে, যাতে সমস্ত জাতের সমস্ত দেশের লজ্জিত হওয়া উচিত ! এই কি সংস্কার ? এই কি জাতির গৌরবের পথ ?"—*My plan of Campaign.* (*Comp. works, Vol III, page* 215.)

ব্রহ্মকে বোধে বোধ কোরেছেন যাঁরা,
মূর্ত্তির অপমান করেন না তাঁরা ;
যাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি তারাই
অন্যের দোষ দ্যাখে নিজেরটা ছাড়া।

ভেবেছো কি এ-ব্যাপারে ব্রতী তোমরাই ?
শঙ্কর, রামানুজ—এঁরা সব্বাই
তোমাদের জন্মের বহুকাল আগে
চেয়েছেন বেদান্তে মিলুক সবাই।

তা-বোলে কি কোনোদিন তোমাদের মত
সমাজকে কোরেছেন ক্ষত-বিক্ষত ?
তাঁদের শুদ্ধ মনে আর যাই থাক্,
অশুদ্ধ অভিশাপ নেই অন্ততঃ।

ব্রহ্ম-বিশুদ্ধতা এসে গ্যাছে যার,
অপরের দোষ দ্যাখা ঘুচে গ্যাছে তার।
আমার চিত্ত যদি অশুদ্ধ হয়,
তখনি তোমার প্রতি আসে ধিক্কার।

অমূর্ত্ত-সাধনার সেরা উপাসক—
আচার্য শঙ্কর, কবীর, নানক
মূর্তিকে অবজ্ঞা করেননি তাই।
ব্রহ্ম-জ্ঞানীর তা'কি করা সম্ভব ?

আসল ব্রহ্ম-জ্ঞানে তোমাদের এই
বাক্য-বিতণ্ডার কোলাহল নেই।
যা' কিছু বিরোধ সব দূর হোয়ে যায়
ঐক্যের অনুভূতি দানা বাঁধলেই।

আসলে ধর্ম তোলো সাদা বাংলায়—
সাক্ষাৎ অনুভূতি, দেব্‌তা-হওয়ায়।
নিজের বা বিশ্বের ধর্মজীবন
কেবলি পঙ্গু হয় কথার ব্যথায়।

তোতাও তো কথা কয়—'জয় রাধে রাধে',
তা-বোলে কি কেউ তাকে ধার্মিক ভাবে ?
ধর্ম কথায় নয়, ধর্ম জীবনে ;
বেড়ালে ধরলে পরে ক্যাঁ-ক্যাঁ কোরে কাঁদে !

২৯

একটা গল্প বোলি, মনে রেখো ওটা,
বুঝে নিও ধর্মের মর্মার্থটা।
তা-বোলে ভেবোনা যেন অশুভোদ্দেশে
গল্পের ছুতো কোরে দিতে চাই খোঁটা।

বহু আগে আমাদের দেশে একবার
ধর্ম-সম্প্রদায় ছিলো যতো, তার
বক্তা ও পণ্ডিত প্রতিনিধিগণ
আয়োজন কোরেছেন ধর্মসভার।

এখন শৈব যিনি তাঁর কথা এই—
শিব ছাড়া ত্রিভুবনে ঈশ্বর নেই!
বিষ্ণুর ভক্তও বক্তৃতাকালে
বিষ্ণুকে বসালেন সেরা আসনেই!

এইভাবে এক একটি উঠে সেইখানে
ঝকঝকে যুক্তির মাত্রার টানে
অপরের আদর্শ কেটে দিয়ে স্রেফ
নিজেদের ইষ্টকে তোলে আসমানে!

হয়তো তাদেরই কোনো পুণ্যের গুণে
সেই পথে যেতে হৈ-চৈ শুনে
দাঁড়ালেন ঋষি এক সত্যান্বেষী,
ভাবলেন—কি ব্যাপার দেখিই না শুনে।

তাঁকে পেয়ে অনেকেই বুঝলেন—ইনি
রুক্ষ বালির বুকে একদানা চিনি;
অতএব সকলের ইচ্ছেটা এই—
ঝগড়ার মীমাংসা কোরে দেন তিনি।

মহর্ষি শুধোলেন শিবভক্তকে—
'বোললে যে শিব বড়ো, দেখেছো কি ওঁকে?
কথার জবাব দাও, প্রশ্নটা শোনো,
শিবকে দেখেছো তুমি কোনোদিন চোখে?'

এ কথায় শৈবটি পড়েন ফাঁপরে,
কি জবাব দেন এর হঠাৎ ঝাঁ কোরে!
যুক্তি-মুখর মুখ দাবড়ানি খেয়ে
হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে তাকায় হাঁ কোরে!

তার পর বিষ্ণুর উপাসক যিনি,
ঐ একই কথা তাঁকে শুধোলেন তিনি।
কথার ব্যব্সাদার হন্ হতবাক্,
আস্তে জবাব দ্যান্—'না তাঁকে দেখিনি!'

সবাইকে ঐ একই প্রশ্নেতে ঠেসে
নাস্তানাবুদ কোরে মহর্ষি হেসে
বোল্লেন—'কেউ যদি নাই দেখে থাকো,
কি কোরে বুঝলে তবে কে আগে কে শেষে?'

৩০

গল্পের খোঁজে খোঁজে যে-সত্য পাই,
সেটা হোলো—আত্মার অনুভূতি চাই।
ধর্মের মূলকথা—সাক্ষাৎকার;
সাক্ষাৎ নেই তাই ফালতু চাঁচাই।

মৌমাছি মধু পেলে ভোলে গুঞ্জন,
রাজভোগ মুখে পেলে কেউ কথা কন্?
রসস্বরূপ যিনি তাঁকে কাছে পেলে,
তখন নীরবে শুধু রসাস্বাদন।

ধর্ম-সভার যতো বাক্‌যোদ্ধারা
স্নিগ্ধ সরস নন, শুক্‌নো সাহারা;
শ্যামল মেঘের ছায়া পাননি যোলেই
রুক্ষবালির ঝড়ে প্রমত্ত তাঁরা

যিনি শুধু কথা কন্ খালি রাতদিন,
ধর্ম-জীবনে তাঁর দীনতা অসীম।
যার মুখ যতো বেশি যুক্তি-মুখর,
তার বুক ততো বেশি ধর্মবিহীন।

সৌম্য ও সাম্যকে বুকে পেলে কেউ
সাম্যবিহীন হোয়ে পাড়ে তোলে ঢেউ?
প্রশান্তি নেই তাই তরঙ্গাঘাত;
সাগরের মাঝখানে ওঠে ক'টা ঢেউ?

বোধাতীত ভগবান খামখেয়ালেই
ছটাকে বুদ্ধি দিয়ে আমাদের এই
পণ্ডিতগুলোদের বোকা কোরেছেন;
বুদ্ধিতে সংশয় বাড়ছে ক্রমেই।

জীবনের লক্ষ্যটা ভুলে গেছি তাই,
অনুভূতি চাইনাকো, শুধু ব'কে যাই!
হাওড়ায় যেতে গিয়ে বড়োবাজারেই
অনেক জিনস্ দেখে চলাটা থামাই!

কেউ কেউ আছে যারা সদাজাগ্রত,
হাওড়ায় ট্রেণ ধরা—ও তাদের ব্রত;
বুদ্ধির বাজারেতে যুক্তির লোভে
ভুলেও থামে না তারা আমাদের মত।

তারা সোজা চোলে যায় হাওড়ার পুলে,
জীবনের লক্ষ্যটা যায়নাকো ভুলে;
বুদ্ধি বা যুক্তির মায়াজাল কেটে
একেবারে ডুবে যায় আত্মার মূলে।

তারপর ফিরে এসে তারা যা শোনায়,
—সে-কথায় কাঁটা নেই, ভরা মমতায়।
তাদের সবার মুখে স্বস্তিবাচন,
বিরোধ বাধেনা তাতে, বিরোধ থামায়।

সে-কথায় ব্যথা নেই, নেই কোনো খোঁটা ;
সত্যকে বুকে পেয়ে গান-গেয়ে-ওঠা।
সাধনা ও সিদ্ধির গুহাতল থেকে
আত্মোপলব্ধির সঙ্গীত ওটা।

৩১

"Would it be right
For an old man to say
That
Childhood is a sin
Or
Youth is a sin ?
.. If a man
Can realise his divine nature
More easily
With the help of an image,
Would it be right
To call that a sin ?
Nor even
Whe he has passed that stage,
Should he call it an error,
...Man is not travelling
From error to truth,
But
From truth to truth,
From ower truth
To higher truth.
.. All religions.
From the lowest fetich'sm
To the highest absolutism
Mean
So many attempts of the human soul
To grasp
And realise the infinite,
Each determined
By the conditions of its births
And association.
Each of these
Marks a stage of progress ;
And every soul
Is a young eagle
Soaring higher and higher,
Gathering more and more strength,
Till it reaches the Glorious Sun.

...Every other religion
Lays down
Certain fixed dogmas,
And tries to force
The whole of the society
To adopt them.
They place before society
One coat,
Which must fit
Jack, John and Henry
All alike.
If it should happen
Not to fit John or Henry,
He must go without a coat
To cover his body.

...Absolute
Can only be realised,
Or thought of
Or stated,
Through the relative
And...images,
Crosses and crescents
Are
Simply so many symbols,
So meny pegs
To hang the spiritual idea on.
It is not
That this help
Is necessary for everyone,
But
It is so for many,
And those
Who do not need it for themselves,
Have no right to say
That it is wrong."[২]

[ক্রমশঃ।

২। "বৃদ্ধ যদি বাল্য এবং যৌবনকে পাপবোধে ঘৃণা করেন, তাহোলে কি সেটা সঙ্গত হবে ?···যদি কেউ বিগ্রহের সাহায্য নিয়ে নিজের ব্রহ্মভাব উপলব্ধি কোরতে পারেন, তাহোলে কি সেটাকে পাপ বোলে নির্দেশ করাটা সমীচিন হবে ? এমন কি ঐ অবস্থাটাকে অতিক্রম কোরে গেলেও তাঁর পক্ষে সেটাকে ভ্রমাত্মক বোলে নির্দেশ করাটা সঙ্গত নয়।···মানুষ ভুল থেকে সত্যে যাচ্ছে না, সত্য থেকেই সত্যে যাচ্ছে—নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে।···অজ্ঞানীদের তুচ্ছতম ধর্ম থেকে আরম্ভ কোরে চরম অদ্বৈতবাদ পর্য্যন্ত যাবতীয় ধর্মই অনাদি পরব্রহ্ম-উপলব্ধির সোপানস্বরূপ, জন্ম ও অবস্থাভেদে যেটা যাঁর পক্ষে উপযোগী তিনি সেইটাকে আশ্রয় কোরে ওপরে উঠতে থাকেন। অতএব প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল পাখীর শাবকের মতো ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠতে থাকে। এই ভাবে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় কোরতে কোরতে একদিন সেই মহান সূর্যের সামনে উপস্থিত হয়।···অন্যান্য ধর্ম কতকগুলো নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ কোরে সমস্ত সমাজকে জোর কোরে তাকে মানাবার চেষ্টা কোরছেন। তারা সমাজের সামনে এক মাপের কতকগুলো জামা রেখে রাম-শ্যাম-হরিদের প'রতে হুকুম কোরছেন। যদি সে জামা হরি বা শ্যামের গায়ে না হয়, তবে তাদের জামা না প'রে খালি গায়েই থাকতে হবে।···সাপেক্ষকে আশ্রয় কোরেই কেবল নিরপেক্ষ তত্ত্বের ধারণা, উপলব্ধি এবং প্রকাশ সম্ভব। অতএব হিন্দুদের দেববিগ্রহ, খৃষ্টানদের 'ক্রুশ' এবং মুসলমানদের অর্দ্ধচন্দ্র—সবই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়স্বরূপ। এই সব প্রতীকের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন সকলের নাও থাকতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই তা' দরকার। অতএব যাদের তা' দরকার নেই, তাদের 'এটাকে ভুল বা অন্যায় বলার কোনো অধিকারই নেই।"

—*The Chicago Addresses* (*page* 16 *and* 17.)

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

আলিপুর, বেলভেরিয়া রোডে ৺রঞ্জিত বাসুর সুসজ্জিত ভবনের একটি প্রশস্ত হল কামরায় অভিজাত সম্প্রদায়ের নর-নারীর আন্তর্জাতিক মিলন ক্ষেত্র রচিত হয়েছে।

নানা বর্ণের মরশুমি ফুলের মত এখানে উপস্থিত হয়েছেন বিচিত্র সুবেশধারী বাঙালী আর অবাঙালী পুরুষ ও মহিলা।

চোখ-ঝলসানো বসন ও নতুন, নতুনতর,—নতুনতম ডিজাইনের অঙ্গাভরণের যেন কম্‌পিটিসন চলেছে এখানে। পুরুষদেরও মূল্যবান বিলাতি সান্ধ্য পরিচ্ছদগুলো ওর সঙ্গে সহযোগিতা করছে। ওদের শাড়ী আর চুল থেকে ভেসে আসছে হাল্কা মিষ্টি গন্ধ। কারুর হাতে আইসক্রিমের কাপ কারুর বা চলছে চা অথবা কোকোকোলা।

৺রঞ্জিত বোসের একমাত্র পুত্র অনিরুদ্ধ বাসু সম্প্রতি ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরেছেন সাগর পাড়ী দিয়ে। আজকের উৎসব তারই জন্য। হলের একধারে, একটি ছোট ষ্টেজ ফুল, লতা-পাতা দিয়ে সুসজ্জিত করা রয়েছে, সামনে ঝুলছে চিনের ড্রাগন আঁকা একটি সবুজ ভেলভেটের পর্দা। মাসীমা তাঁর অলকাপুরীর দলকে নিয়ে প্রবেশ করেছেন গ্রীণরুমে।

—আর দেরী নয়, অনিরুদ্ধ! প্রথমে সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধন-সঙ্গীতটা সুরু করে দাও তোমরা। আমি ততক্ষণ যাদের নাচ আছে, তাদের সাজানো ব্যাপারটা শেষ করি। অসীম, তুমি ছাপা প্রোগ্রাম-গুলো বাইরে সকলকে বিলি করে এসো।—এসো মেয়েরা, যাদের নাচ আছে, এই পাশের ঘরে এসো।

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

ব্যস্তসমস্ত ভাবে মাসীমা নাচের মেয়েদের নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

কয়েক মিনিট পরেই ক্রিং-ক্রিং শব্দে বেল বেজে উঠলো। ষ্টেজের ওপর থেকে সরে গেলো যবনিকা।

অনেকগুলো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে অতিথিদের প্রণাম জানিয়ে সুরু করলো উদ্বোধন সঙ্গীত।

বন্দে মাতরম্, সুজলাং সুফলাং, উদ্বোধন সঙ্গীতের পর ষ্টেজে এসে মাসীমা দাঁড়ালেন।

—নমস্কার! এবারে ইলেকট্রিক গীটার বাজিয়ে আপনাদের শোনাচ্ছেন মারুতি মৈত্র। তারপর রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করবেন,—সেঁজুতি মৈত্র।

এর পর নৃত্য প্রদর্শন করবেন সুমিতা ত্রিবেদী। মারুতি সেঁজুতির গীটার আর গান শেষ হল। এবার সুমিতার পালা।

সুমিতার পিঠ চাপড়ে বোঝাচ্ছেন মাসীমা।—খুব ফ্রি ভাব থাকবে। সঙ্কোচের জড়তা যেন একেবারেই না আসে। চোখে-মুখে থাকবে হাসি-হাসি ভাব। ছন্দে, মুদ্রায় ফুটিয়ে তুলবে প্রাণময় আবেদন—

এমন জনতার সামনে এর আগে আর কখনও নৃত্য প্রদর্শন করেনি সুমিতা। বুকটা কেমন ঢিপ ঢিপ করছে; গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে যেন—মাসীমা ষ্টেজে এসে ঘোষণা করলেন—এবার নৃত্য প্রদর্শন করবেন,—সুমিতা ত্রিবেদী। "বসন্তের আবাহন"। সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবেন, মিসেস বম্মণ। সম্মিলিত করতালি আর হাস্যলহরী দ্বারা অভিনন্দন জানালেন মাননীয় অতিথিবৃন্দ। অর্কেষ্ট্রার ছন্দে তাল রেখে ষ্টেজে এগিয়ে এলো সুমিতা। নতমস্তকে যুক্তকরে নমস্কার জানিয়ে নৃত্য সুরু করলো।

তবলা সঙ্গত করতে লাগলেন স্বয়ং মাসীমা। দর্শকমণ্ডলীর সাধুবাদ ও উচ্ছ্বসিত করতালি। যবনিকা পতন।

পরের নাচটি আরম্ভ হলো মিনিট পনেরো পরে। এটি কাজরী নৃত্য। নৃত্যের পরিচ্ছদ, ফুলের আভরণ, সবই বিশিষ্ট রুচির পরিচয় দেয়। অপূর্ব্ব সুন্দর অজন্তার মূর্ত্তিগুলো, ফুটে উঠলো সুমিতার নৃত্য-ছন্দে, ভাবব্যঞ্জনায়, করমুদ্রায় ওর নিপুণ শিল্পীর হাতে খোদাই-করা শ্বেত পাথরের ভেনাসের মত রোমাণ্টিক মুখশ্রী সুঠাম দেহ-বল্লরী নৃত্যের সৌন্দর্য্যমান শত গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

বিমুগ্ধ দর্শকদের ভেতর মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল, বাঃ, চমৎকার! এ মেয়েটিকে কই আগে দেখা যায়নি তো?···ইত্যাদি।

নাচের পর বেশ পরিবর্ত্তন করে হলে এসে বসলো সুমিতা। এখন আধ ঘণ্টা বিশ্রাম। চারি পাশে ওর অভিনন্দনের ভিড়।

সার্থক শিক্ষা আপনার, ভারি আনন্দ দিয়েছেন আপনি। কোথায়? কার কাছে শিক্ষা আপনার? অলকাপুরীতে? ওঃ! ঠিক্ ঠিক্ আর কে আছে? শুকতারা দেবী ওতো ঐখানেই—এই ধরণের অজস্র টুকরো স্তুতিবাদের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে সুমিতা।

অনিরুদ্ধ একঝাড় রক্তগোলাপ ওর হাতে দিয়ে বলে, আপনার প্রতীক্ এটি!

একঝাঁক ঈর্ষামিশ্রিত, তির্য্যক দৃষ্টিবাণ বিদ্ধ করলো সুমিতাকে। শ্লেষভরা দু'চারটি মৃদু মন্তব্যও আশে-পাশে শোনা গেলো।

এমন আর কি? এরকম তো হামেশাই দেখছি, বঙ্কিম বাবুর সেই সার্থক বাণীর আর কি···সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়!

মাসীমার চতুর দৃষ্টিতে এড়ায় না কিছু। বলেন তিনি।—মিতাকে নিয়ে একটু লনের হাওয়ায় যাও না অনিরুদ্ধ। ওর পরিশ্রমের ক্লান্তি ভাবটাও কমবে এতে,—ঘরের হাওয়াটা যেন গরম বোধ হচ্ছে!

কৃতার্থ হল, অনিরুদ্ধ। স্বস্তি পেলো সুমিতা। ওরা দুজনে গিয়ে বসলো লনের বেঞ্চিতে। আশে-পাশে, লাল, নীল, হলদে, বেগুণি রং-এর ফুলের ছড়াছড়ি!

পায়ের তলায় দূর্বাদলের কোমল পরশ! পবন হিল্লোলে স্বর্ণচাপার মনমাতানো সুবাস! দুরন্ত মেঘশিশুরা, আকাশে, চাঁদবুড়ির সঙ্গে খেলছে লুকোচুরি! চারিধারে যেন কেমন একটা ভালোলাগা, খুসি-খুসি, ভাব জড়ানো!

মন-প্রাণ দিয়ে সে ভাবের পরশ গ্রহণ করে সুমিতা। মনের মুকুরে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে একজনের মুখ!—ওর জীবনের প্রতিটি সত্তায় জড়িয়ে রয়েছে যার অনুরাগসিক্ত মধুময় স্মৃতি!

—অত বিমনা হয়ে কি ভাবছেন সুমিতা দেবি?

ঈষৎ চমকে ওঠে সুমিতা।···সাগরে পাড়ি দেওয়া পলাতকা মনটিকে জোর করে ফিরিয়ে আনে।···মৃদু হেসে জবাব দেয়···

—না, তেমন কিছু নয়! কি চমৎকার ফুল চারি ধারে···তাই দেখছিলাম!

—আপনার চেয়েও কি ওরা চমৎকার? না সুমিতা দেবি! আচ্ছা একটা কথা বলবো? যদি অবশ্য বিরক্ত না হন, ওর দিকে ফিরে চায় সুমিতা।

না, ও মুখে তো কোনো দুরভিসন্ধির চিহ্ন নেই! সরল, পবিত্র সুন্দর মুখ—! অনেকটা যেন সুদামের মত—কোমল কণ্ঠে জবাব দেয় সে।

—বলুন, কি বলবেন?

—অভয় দিচ্ছেন তো? বলি তাহলে! মাঝে মাঝে যদি আপনার লোভনায় সঙ্গ কামনা করি, সেটা কি অন্যায় হবে?

—আমার এমন কিছু গুণ নেই তো, যা দিয়ে আপনাকে আনন্দ দিতে পারবো!

নত দৃষ্টিতে জবাব দেবার সময় গলার স্বর কেঁপে ওঠে সুমিতার।

ওর একখানি হাত, নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নেয় অনিরুদ্ধ! নরম তুলতুলে হাতখানি যেন বরফের মত ঠাণ্ডা! চমকে ওঠে অনিরুদ্ধ! উদ্বিগ্ন ভাবে বললো,—

আপনার শরীর কি অসুস্থ সুমিতা দেবি? আমি কি আপনার

কোনো অসুবিধা ঘটালাম? অকারণে কেন চোখে আসে জল? ওর মমতা ভরা আচরণ, যেন বার বার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে সুদামকে।

হাতখানা আস্তে সরিয়ে নেয় সুমিতা,—ক্লান্তস্বরে বলে—

—না, কোনো অসুবিধে হয়নি তো আমার? আপনি অমন করে বললে কিন্তু সত্যই মনে ব্যথা পাবো।

—বাঁচলাম!—উঃ যা ভয় করছিলো আপনার ভাবখানা দেখে! —হ্যাঁ যা বলছিলেন,—তার জবাবে শুধু এইটুকু জেনে রাখুন সুমিতা দেবি, কি আছে আপনার, তা হয়তো সবিস্তারে বলতে পারবো না, কারণ আমি কবি, বা সাহিত্যিক নই।···যা আছে আপনার; সারা জীবনটাকেই তা দিয়ে আনন্দসিক্ত করা যায়!

এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে আমার—তারা কাড়াকাড়ি করে লুঠে নিতে চেয়েছে আমাকে!···কিন্তু ওদের প্রতি ছিলো না আমার কোনো আকর্ষণ!

আপনাকে প্রথম যেদিন দেখলাম অলকাপুরীতে যেন মনে বোধ করলাম মৃদু আকর্ষণ। তারপর আপনার একটি সুন্দর ফুলের মত মনের পরিচয় পেলাম। আপনি আমায় ভাবিয়ে তুললেন, সুমিতা দেবি! এর আগে আমার মনে ওসব বালাই ছিলো না! জানি না, এত কথা বলা আপনাকে আমার উচিত হল কি'না!

কথার মাঝে বাধা পড়লো! ঝড়ের মত হুড়মুড়িয়ে এসে দাঁড়ালো অসীম।

তোমরা এখানে? আর আমি সারাবাড়ীটা খুঁজে বেড়াচ্ছি! ওদিকে প্রোগ্রাম যে আরম্ভ হয়ে গেছে!

উঠে দাঁড়ালো সুমিতা। জবাব দেবার দায়মুক্ত করার জন্যে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো অসীমকে। অনিরুদ্ধর দিকে একবার চাইলো ফিরে,—তারপর অসীমের সঙ্গে এগিয়ে চললো গ্রীণরুমের দিকে!

ষ্টেজে তখন, অনিরুদ্ধর দুটি বোন, অজিতা আর বিজিতার দ্বৈত সঙ্গীত চলছে। নজরুল গীতি গাইলো ওরা!

জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা!

গানের পর, অলকাপুরীর কয়েকটি মেয়ে আর ছেলে, সাঁওতালী নৃত্য দেখালো। সবশেষে সুমিতার পালা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জমবে না এখানে—সুমিতা গাইলো রবীন্দ্র সঙ্গীত।

পথে যেতে যে, ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাবো কি করে।

গান শেষ হতেই, সম্মিলিত অনুরোধে আবার গাইতে হলো সুমিতাকে···গাইলো সে।

চরণ ধরিতে দিও গো আমারে
নিও না নিও না সরায়ে!

মাসীমার প্রোগ্রাম শেষ হল। তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সগর্ব্বে এলেন হলে। চারিদিক থেকে পেলেন অজস্র অভিনন্দন!

রায়বাহাদুর অবনীনাথ মিত্র, রায়সাহেব নলিনাক্ষ কাঞ্জিলাল, মিষ্টার এস, এন মিটার, বার-এট-ল, প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মাসীমাকে ধন্যবাদ দেবার সময় জানতে চাইলেন—আচ্ছা, সুমিতা ত্রিবেদী মেয়েটি কে? নাচে, গানে, কণ্ঠস্বরে সব দিক্ দিয়েই মেয়েটি সত্যই অপূর্ব্ব!

কলকণ্ঠে হেসে উঠে বলেন তিনি। ওটি আমার নতুন আবিষ্কার।

ওর বাবার নাম সোমনাথ ত্রিবেদী। বাবার ঠাকুরদা ছিলেন রাজা রামনাথ ত্রিবেদী!

—আই সি!···তাই বলুন!

—সোমনাথ তখন কতটুকু? হয়তো বছর চার, পাঁচ!···উঃ সে কি ভয়ানক দিন গেছে, আজো ভুলতে পারিনি আমি! মানে আমি বলছি কুমার ইন্দ্রনাথের মৃত্যু দিনের কথা! খুন হয়েছিলেন তিনি কোন অজানা শত্রুর হাতে, সোমনাথের বাবা কুমার ইন্দ্রনাথ!

কথাগুলো বলছিলেন,—মহারাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ রাও!

—খুন? সে কি? প্রশ্ন করলেন দু'-চার জন।

—কারণ জানা যায়নি! তারপর থেকে ও বাড়ীর আর কোনো সংবাদ জানতে পারিনি!

কিন্তু ভুলতে পারিনি ইন্দ্রনাথকে।

যেন রাজপুত্রের মত রূপবান চেহারা ছিলো তার, তেমনি ছিলো দরাজ দিল! তখনকার দিনে অমন বাদশাহী মেজাজ খানদানী মহলে আর একটিও ছিলো কিনা সন্দেহ! প্যারিস থেকে আসতো তাঁর সিল্ক কিংখাপের চোগা চাপকান, ইটালি থেকে আসতো সেরা দামের স্যুট, বসরা থেকে আতর গোলাপ পারস্য থেকে জরির পাগড়ী, নাগরা! লাখো লাখো টাকা উড়েছে, এক একটা পার্টিতে! কি সব বাঈ আসতো নাচ দেখাতে,···আহা যেন মনে হতো,···ঐ লালকুঠিতে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সভা জমিয়ে বসে আছেন, আর মেনকা, রম্ভা তিলোত্তমার দল নৃত্য করছেন! কেউ বা তাজা রক্তের মত লাল সোমরস ভরা টলটলে বেলজিয়াম গ্লাসের ডিকেণ্টারগুলো তুলে ধরছেন তাঁর মান্যবর সভাসদ্‌দের মুখে মুখে! ওঃ, সে একদিন গেছে!

অভিজাতমণ্ডলী নিবিষ্ট চিত্তে শুনছিলেন লালকুঠির স্বর্ণযুগের কাহিনী। সুমিতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে, ওকে সস্নেহে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন রাজাবাহাদুর।—তুমিই সেই ইন্দ্রনাথের পৌত্রী? হ্যাঁ,—তাঁর রূপের ছাপ তোমার চেহারায় খানিকটা আছে দেখছি!···তোমার ঠাকুমাও শুনেছি আম্বালী বিবিদের মত রূপসী ছিলেন,···অবিশ্যি আমরা তাঁকে কখনও দেখিনি! কিন্তু আজ তোমাকে দেখে বড় আনন্দ পেলাম মা, তোমার বাবা এখন কোথায়? ভাই-বোন ক'টি?

—ভাই-বোন আর কেউ নেই, আমিই একলা! মা মারা গেছেন আট 'ন বছর হয়ে গেলো! বাবা সন্ন্যাস নিয়েছেন, এখন হৃষীকেশে আছেন। মৃদুস্বরে জবাব দেয় সুমিতা।

—আহা, হা,—সবই খতম? এই বালক বয়সে সোমনাথ সন্ন্যাস নিলো? বড় পরিতাপের কথা শোনালে মা!

যাক্ পরিচয় যখন হলো,—এসো মাঝে-মিশেলে আমার বাড়ী! খুব খুসি হবো···তোমার দাদু ছিলেন আমার একেবারে অভিন্নহৃদয় বন্ধু! ওহো···এই দেখো, একেবারে ভুলে গেছি, আমার নাতনীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি তো?

পম্পা? আমার রাণীসাহেবা!

—আঃ কি হচ্ছে রাজাসাহেব? এত লোকের ভিড়ে!

চপল নৃত্যভঙ্গিমায় ছুটে আসে পম্পিয়া। রাজাবাহাদুরের

বাড়ীর সবাইকে আনন্দ দেবার মতো উৎসবদিনের একটি উপহার...

অল-ওয়েভ **ন্যাশনাল-একো** রেডিও

দাম ২০০৲ থেকে

সামনের উৎসবমুখর দিনগুলোয় বাড়ীর সবার জন্যে একটি ন্যাশনাল-একো রেডিও সেট উপহার দিন—চমৎকার জিনিস, বাড়ীর সবাই মিলে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

এখানে ছ'টি সুন্দর সুন্দর ন্যাশনাল-একো মডেল দেওয়া হল। আরো অনেক রকম মডেল আছে — আজই ন্যাশনাল-একো ডীলারের কাছে দেখে আসুন।
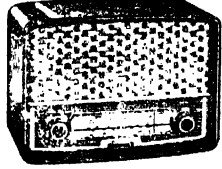
মডেল ২৪১ : ৫ ভাল্‌ব, এসি/ডিসি'র জন্য ৩ ব্যাণ্ডের সুবিধেসহ ২ ব্যাণ্ড সেট। ৫ ভাল্‌ব-এর ড্রাই ব্যাটারী সেটও আছে। দাম ২০০৲ নীট।
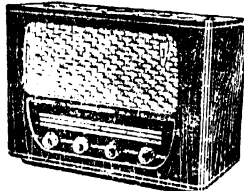
মডেল বি-১০৩ : ৫ ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ডের ড্রাই ব্যাটারী সেট। দাম ৩২৫৲ নীট।

মডেল বি-১১২ : ৬ ভাল্‌ব, ৫ ব্যাণ্ডের ব্যাণ্ডস্প্রেড ড্রাই ব্যাটারী সেট। দাম ৪৭৫৲ নীট।
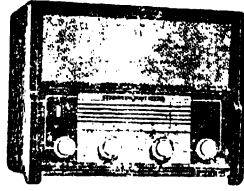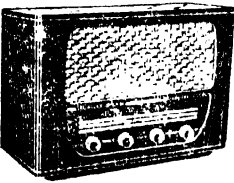
মডেল এ-১০৩ : ৫ ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ডের সেট। এসি কারেন্টে চলে। দাম ৩২৫৲ নীট।
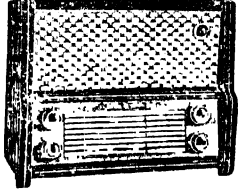
মডেল ১৮৭ : ৬ ভাল্‌ব, ৮ ব্যাণ্ডের ব্যাণ্ডস্প্রেড রিসিভার এ-১৮৭-এসিতে চলে ; ইউ ১৮৭ এসি/ডিসি'র জন্য। দাম ৫৭৫৲ নীট।
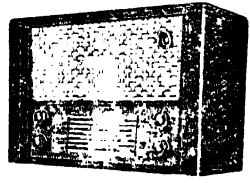
মডেল এ-৩১৭ : ৭ ভাল্‌ব, ৮ ব্যাণ্ডের ব্যাণ্ডস্প্রেড সেট, আর, এফ স্টেজ টিউন যুক্ত, এসির জন্য। দাম ৫৯৫৲ নীট।

ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা—এগুলো মনসুনাইজড
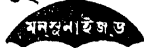
ন্যাশনাল-একো ডীলার সানন্দে আপনাকে রেডিওগুলো বাজিয়ে শোনাবে। ১২ মাসের গ্যারান্টি আছে। স্থানীয় কর আলাদা।

জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪। ১/১৮ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ। ৩৬/৭৯ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর। যোগধিয়ান কলোনী, চাদনী চক, দিল্লী।

GRA 5738

গলা জড়িয়ে ধরে অনুযোগ প্রকাশ করে আদুরি ভঙ্গিতে। সুমিতার বেশ লাগে ওকে। কার্লকরা সোনালী চুলে শাদা শাটিনের রিবনের বো বাঁধা।

শাদা সিল্ক শাটিনের ঘাঘোড়া, পাঞ্জাবী পরনে। শাদা নাইলনের ওড়না গায়ে জড়ানো। তার একপ্রান্ত লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে।

কানে হীরের ফুল, গলায় হীরের কণ্ঠি, অনামিকায় জ্বলজ্বলে লম্বা বরফি আকারের হীরের আংটি। ধপধপে ফর্শা রং-এ মুখের গড়ন কতকটা জিপসীদের মত! বেশ মিষ্টি চেহারা!

—এই যে রাণীসাহেবা, এস আলাপ করিয়ে দিই তোমার সঙ্গে। আমার যৌবনকালের প্রিয়বন্ধু কুমার ইন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর অনেক গল্প শুনেছো আমার কাছে; তাঁরই পৌত্রী ইনি সুমিতা ত্রিবেদী। আর এটি আমার পাটরাণী পম্পিয়া!

—ওঃ! কি যে ভালো লাগলো আপনার কাজরী নৃত্যটা আর তেমনি মিষ্টি আপনার গান!

আমাদের বাড়ীতে কবে যাবেন বলুন?

অবশ্য আমিই আগে যাচ্ছি আপনার কাছে! রাজী তো?

—সুমিতার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আলা। জমায় পম্পিয়া।

লজ্জার আতিশয্যে সঙ্কুচিতা সুমিতা মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়। খুব ভালো লাগবে আপনাকে পেলে, হাঁ আমিও যাবো মাসীমার সঙ্গে!

হাসিমুখে বললেন মাসীমা—তোমরা তাহলে আলাপ-পরিচয় করো, যাওয়া-আসার পর্ব্বটা আমার ওপরই রইলো, যাই মিসেস বাসুকে একটু হেলপ করিগে!

মাসীমা চলে গেলেন ডাইনিংরুমে!

এতক্ষণ লনেই বসেছিলো অনিরুদ্ধ। ধীরপদক্ষেপে এবার প্রবেশ করে হলে। চুলগুলো কেমন এলোমেলো, মুখখানি ম্লান গম্ভীর। একবার চকিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে দেখলো সুমিতা! মনটায় কেন ব্যথার কাঁটা খচ-খচ করতে থাকে!

—এতক্ষণ কোথায় পালিয়ে ছিলে অনি? বাড়ীতে ডেকে এনে বুঝি একা ফেলে সরে পড়তে হয়? চমৎকার! কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলে পম্পিয়া!

—এত চারি দিকে ভক্তের দল তোমার, একলা ফেলে গেছি এ অভিযোগটা কি ঠিক হল পম্পা দেবি? আপনিই বিচার করুন রাজাবাহাদুর!

—বটেই তো, বটেই তো। হা—হা—হা করে উচ্চহাস্য করেন রসিক বৃদ্ধ।

—বিচার চাইছো ডার্লিং, কথাটা শুনে আমারই মাথা ঘুরে যাচ্ছে যে। এমন বিরাট ঘরখানা ভর্ত্তি মানুষে, তার মাঝে থেকেও একাকীত্ব অনুভব করা; মানে বিশেষ কারুর অভাব বোধ করা। নাঃ, ব্যাপারটা বড় গোলমেলে ঠেকছে হে।

হা-হা, হি-হি, হাসির অর্কেষ্ট্রা বেজে উঠলো সমবেত কণ্ঠে। সুমিতাও যোগ দেয় ওদের হাসিতে।

পম্পিয়া, সুমিতা নয়; ও-হাসি ওর গায়েই লাগে না।

—ঘাড় বেঁকিয়ে বললো, দাদুকে।

—থ্যাঙ্ক ইউ মাই লর্ড! তোমার বুদ্ধিকে আমি কুর্ণিস করছি। নতমস্তকে লম্বা সেলাম ঠুকলো পম্পিয়া। তার পর চঞ্চলা হরিণীর মত নেচে এগিয়ে গেলো অনিরুদ্ধর দিকে।

—বড্ড গরম লাগছে, এসো একটু লনে যাই অনি; বলতে বলতে ওর একখানি হাত ধরে টানতে টানতে ছুটলো বাইরের বাগানে। কয়েক জোড়া কৌতূহলী আর ঈর্ষাকাতর চোখও অনুসরণ করলো ওদের।

—সত্যি, ঘরে বড় গুমোট হচ্ছে। আরো ক'জোড়া বেরিয়ে গেলো বাইরে।

সুমিতার পাশে এসে দাঁড়ায় রতনলাল ক্ষেত্রী, শ্রীদুর্গা কটন মিলের প্রোপ্রাইটার। অজন্তা ষ্টুডিও আর কয়েকটি সিনেমার মালিক ধনপতি ক্ষেত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র রতনলাল ক্ষেত্রী, তির্য্যক দৃষ্টিতে চাইলো পলাতকা পম্পিয়ার পানে। তাচ্ছিল্যের হাসি একটু চমকে গেলো ওর ঠোঁটের কোণে। তার পর সুমিতাকে বললো,—আপনিও আসুন না সুমিতা দেবি! একটু ঘুরে আসি গঙ্গার ধার থেকে।

—না, মাপ করবেন। একটু দাদুর সঙ্গে গল্প করতে চাইছি।

—এখন আবার বাইরে কেন? খাবার ডাক পড়লো বলে। এসো এসো, রতনভাই সাহেব, বসো আমার নতুন রাণীর পাশে।

—অনেক ধন্যবাদ! আপনার আপত্তি নেই তো সুমিতা দেবি?

—না না, আপত্তি কিসের।

ওর পাশে বসলো রতনলাল ক্ষেত্রী।

—আচ্ছা করবী দেবীকে দেখছি না তো? আসেন নি বুঝি? আপনারা এক বাড়ীতেই তো থাকেন শুনেছি!

—হ্যাঁ! না তিনি আসেন নি,—অন্য কাজ আছে তাই আসতে পারেন নি।

অসীম মাসীমার সঙ্গে ভেতরে ছিলো এতক্ষণ। হলে এসে দূর থেকে সুমিতার পাশে ক্রোড়পতি রতনলালকে দেখে, ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠলো। দাঁতে দাঁত ঘষে অস্ফুট শব্দে উচ্চারণ করলো শা—লা!

তারপর এগিয়ে এসে মহাব্যস্ত ভাবে বললো।—এ কি, ঘর যে প্রায় শূন্য, ওদিকে টেবিল সাজানো শেষ! এতক্ষণ তো সেখানেই দেখা শোনা করছিলাম কি—না!

মাসীমা একাই একশো! অমন করিতকর্ম্মা বিদুষী মহিলা সত্যই এযুগে দুর্লভ! সে জন্যেই সব জায়গায় প্রাধান্যলাভ করেন উনি! এসো মিতা। রাজাবাহাদুরকে নিয়ে আসুন মিষ্টার ক্ষেত্রী। আর সকলে বোধ হয় বাইরে আছেন, আচ্ছা, মাইকে আমি সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি। [ক্রমশঃ।

বদলেয়ার সম্পর্কে দু'টি কথা

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য

অল্প কথায় বদলেয়ার সম্পর্কে আসল কথাটা পরিষ্কার করে বলেছেন। কেমন লোক ছিলেন ফরাসী কবি শার্ল বদলেয়ার? ভীষণ ধার্ম্মিক, যাঁর ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথাবার্ত্তা শুনে গোঁড়ারা কানে আঙুল দিতেন। ছিমছাম ফুলবাবু, যিনি পোষাক পরতেন প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীর মত। প্রেমের দার্শনিক, যিনি মেয়েদের সংগে সহজ ভাবে কথা বলতে পারতেন না; বিদ্রোহী, যাঁর তীব্র ঘৃণা

ছিল জনগণের উপর। অভিজাত শ্রেণীর মানুষ, যিনি শাসক-গোষ্ঠীকে বরদাস্ত করতে পারতেন না। বদ্‌লেয়ার ছিলেন নিজেকে নিয়ে নিজেই একটি ছোট্ট গোষ্ঠী।

উনবিংশ শতকের শুরুতে কবি শার্ল বদ্‌লেয়ার। প্যারীর বিলাসী সভ্যতায় কবিতার কথা খুঁজেছেন তিনি। নিরালা বুলভারের নিভৃত আশ্রয়ে তিনি হারিয়ে যেতেন, কাফের নিশীথ গুঞ্জনে অনুভব করতেন রোমাঞ্চ। ঘরে ফিরে অপ্সরী রাত্রির কোলে বসে ডায়েরীর পাতা ভরিয়ে তুলতেন অভিজ্ঞতার অক্ষরে অক্ষরে। কখনও লিখতেন—"সংগীতের স্বর আকাশের বুক ফুঁড়ে উধাও হয়ে গেল।" আবার কখনও বা একটি মন্তব্যের মণিহারা—"ভালবাসা কারুণ্যের দোসর; আগে করুণা হল, তারপর ভালবাসলাম।" এ ছাড়া, যৌনব্যাধির তাড়নায় মাঝে মাঝে অপ্রিয় কথা লিখেছেন, আবার, মনের গোপন কোণের আপন কথা অদ্ভুত সারল্যে লিপিবদ্ধ করেছেন—"পাগলামির ডানাঝাপটানি শুনলাম আজ কানের খুব কাছাকাছি।"

আপন অশান্তি এবং মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হিসেবে বদ্‌লেয়ার তাঁর মায়ের পুনর্বিবাহকে দায়ী করেছেন। ছ'বছর বয়সে পিতাকে হারিয়েছেন তিনি; মা আবার বিয়ে করেছেন এক বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, সাহসী সৈনিককে। নতুন পিতা বদ্‌লেয়ারকে ভালই বাসতেন; কিন্তু ছেলে সাহিত্য করবে,—এ চিন্তা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। সঙ্গ-দোষ থেকে বাঁচাবার জন্যে তাই ছেলেকে পাঠালেন জাহাজে করে ভারতবর্ষের দিকে। বদ্‌লেয়ার এর আগে থেকেই সমসাময়িক কবিদের অনুকরণ ল্যাটিন-কবিতা লিখতে সুরু করেছেন। ঝড়ের মুখে পড়ে মারসিয়াসে জাহাজ গেল খারাপ হয়ে। দ্বীপে নেমে বদ্‌লেয়ার আলাপ করলেন লেখকগোষ্ঠীর সংগে, আর, প্রেম করলেন যাঁর অতিথি হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর সংগে। পরিবেশের সৌন্দর্য্যে তিনি বিভোর হয়ে গেলেন। এই সমুদ্রের স্বাদ তাঁর কবিতার কথা হয়ে উঠেছিল।

বদ্‌লেয়ার ফ্রান্সে ফিরে এলেন; আর কিছুদিন পরেই পৈত্রিক-সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেলেন। নিজের দিক থেকে তিনি জীবনে এই প্রথম শান্ত, সহজ অবসর পেয়েছেন। Fleurs de Mal-এর কিছু কিছু কবিতা লিখেছেন তখন; আর, সঙ্গিনী হিসেবে দেখা দিয়েছে জীবনে Janne Duval। খেয়ালী বদ্‌লেয়ার রীতিনীতির ধার ধারেন না, প্রথাকে আমল দেন না। লোকের মুখে মুখে তাঁর কথা; নতুন নতুন কাহিনীর তিনি নায়ক; রাশি রাশি উপকথার তিনি কেন্দ্র। অর্থব্যয় করে চলেছেন দু'হাত দিয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে। পরিবারের যখন নজর পড়ল, অর্দ্ধেক টাকা তখন উড়ে গেছে। আইন করে দেওয়া হ'ল—এখন থেকে পৈতৃক অর্থের সুদটুকু শুধু তিনি পাবেন।

এর পর থেকে দামী পোষাক পরা বদ্‌লেয়ারকে ছাড়তে হ'ল। বৈশিষ্ট্য রইল কেবল কাট-ছাঁটের মৌলিকত্বে। অর্থাভাবের চিন্তা প্রকট হ'ল চেহারায় আর কবিতায়। গাম্ভীর্য্যের প্রলেপ পড়ল চেহারায়; হতাশার প্রকাশ হ'ল কবিতায়। ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিদ্রোহে গরীব বদ্‌লেয়ার তাই যোগ না দিয়ে পারেন নি।

১৮৪৫ থেকে ১৮৪৬এর মধ্যে সাহিত্যসম্পর্কীয় ও শিল্প বিষয়ক কিছু কিছু রচনা লিখেছেন বদ্‌লেয়ার। ১৮৫২ থেকে ১৮৫৭এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বেরিয়েছে তাঁর কলমে। Fleurs de Mal—প্রকাশিত হয়েছে এ যুগে। আর তাঁর বিখ্যাত লেখা—Edgar Allan poe এর রচনার অনুবাদ এই সময়ে প্রকাশিত হয়ে ফরাসী সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। Fleurs de Mal-এর বহু কবিতার বিরুদ্ধে কুশ্রীতা এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধতার অভিযোগ নিয়ে আসা হ'ল। নব কলেবরে নতুন সংস্করণ বের করা হ'ল ১৮৬১ সালে। কিন্তু, তেমন নাম হ'ল না রচনার। দুর্ভাগ্যের দুঃস্বপ্নে ভেঙ্গে পড়লেন বদ্‌লেয়ার। শরীরের ভাঙন সুরু হল, কবিতার সুরে দুঃখের রাগিণী বাজল। অর্থ-কষ্টে বেলজিয়াম চললেন বক্তৃতা দিয়ে পয়সা রোজগার করতে। সৌভাগ্য-সূর্য্য তখন দিগন্তে অস্তমিত-প্রায়।

পক্ষাঘাতে শক্তিহীন বদ্‌লেয়ারকে নিয়ে আসা হল প্যারীতে। বাক্‌শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন চিরকালের জন্যে। তারপর ১৮৬৭ সালের গ্রীষ্মের অবকাশে আগষ্টের শেষ দিনটিতে ফরাসী কবি শার্ল বদ্‌লেয়ার রূপকথার কাহিনী শেষ করে, উপকথার কথা চুকিয়ে রূপসী প্যারীর কাছ থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিলেন। Saint-Beauve, Gautier—বন্ধুবান্ধব বড় একটা কেউ এল না কবিকে শেষবারের মত অভিনন্দন জানাতে। দু'জন বন্ধু এসেছিলেন; তাও কবি বদ্‌লেয়ারকে শ্রদ্ধা জানাতে নয়, বন্ধু বদ্‌লেয়ারকে বিদায় দিতে।

বদলেয়ারের মৃত্যুর পর অনেক বছর কেটে গেছে। তাঁর কবিতার আলোচনা হয়েছে অনেক ভাবে। কেউ তাঁকে দেখেছেন হতাশা, ক্ষয়িষ্ণুতা, দুর্নীতির কবি হিসেবে। আবার, কেউ আবিষ্কার করেছেন তাঁর লেখায় ইঙ্গিতের একান্ত সঙ্গীত, অধ্যাত্ম-সৌন্দর্য্যের রহস্য রূপ।

Journals—এর পাতায় খেয়ালী লেখায় অথবা ব্যক্তিগত জীবনে প্রথাবিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতায় বদলেয়ারের যে রূপ চোখে পড়ে, সে রূপ সমুদ্রের শান্ত-গভীরতার উপরে অশান্ত চঞ্চলতার মত। শিল্পসৌন্দর্য্যকে তিনি নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেছেন। অনুভূতির আগুনে সে উপলব্ধি কবিতার সোনা হয়ে বেরিয়েছে। তিনি নিজে লিখে গেছেন—"শিল্প চিরন্তন সৌন্দর্য্য ও ধ্রুব-সত্যের অসম্পূর্ণ ইঙ্গিত। "রূপ-সাগরে শিল্পী ডুব দেন; তাঁর অভিজ্ঞতার মুক্তা ঝলসায় শব্দে, ছন্দে, মূর্ত্তিতে।" বদলেয়ারের নিজের কথায়—"প্রকৃতিতে, পৃথিবীতে বিস্ময় লুকিয়ে আছে বিচিত্র ভাষায়। শিল্পীর কাজ সেই বিস্ময়ের ওড়না সরিয়ে দেওয়া, সেই ভাষার মর্ম্মোদ্ধার করা। শিল্প তাই, আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ।" কুশ্রীতার অভিযোগের উত্তরে বদলেয়ার বলেছেন—"সৌন্দর্য্য কোন জিনিষের নিজস্ব সম্পদ নয়। শিল্পী বস্তুতে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেন, আরোপ করেন। তাই লোকে যাকে কুশ্রী বলে, তাও সুন্দরের পাদপীঠ হতে পারে। আসল কথা, কুশ্রীকে সুন্দর বলা নয়, তার মধ্যে থেকে সৌন্দর্য্যকে নিষ্কাশণ করা। অধ্যাত্মসত্তা কবির অন্তরে জ্বেলে রেখেছে অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা; সেই আলোর ঔজ্জ্বল্যে কবি সুন্দরকে আবিষ্কার করেন, সৃষ্টি করেন।" বদলেয়ারের কবিতা এই জীবন-দর্শনের দৃষ্টিপ্রদীপ। পরবর্ত্তী কালের শিল্পে এই জীবনদর্শন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর (Le symbole) উৎস হয়েছিল। ঠিক কবির দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিভূ হিসেবে নয়, নিতান্তই কবি-পরিচিতির উদ্দেশ্যে দুটি কবিতার অনুবাদ লক্ষণীয়—

দিনান্ত

ধূসর আলোর তলায়,
মুখরিত জীবন চলে চঞ্চল বন্যায়
ছন্দিত বঙ্কিম প্রবাহে।
দিগন্তে আয়েসী রাত্রি আসে।
নিবৃত্ত করে সে সবকিছুকে, এমন কি ক্ষুধাকেও,
বিলুপ্ত করে সে সবকিছুকে- এমন কি লজ্জাকেও।
কবি তখন কথা বলে,—
আমার দেহের মতই, মনে এখন
বিশ্রামের নিবিড় আকুতি;
অন্তরে আমার শ্রান্ত-স্বপ্নের সমারোহ।
হে সঞ্জীবন অন্ধকার!
আমি এখন শুয়ে থাকি,
তোমার আস্তরণে আমাকে জড়িয়ে।

পূর্ব্বজন্ম

অনেক অনেক কাল—
আমি ঘর বেঁধেছিলেম উত্তুঙ্গ মিনারের তলায়,
—গায়ে তার সাগর-সূর্য্যের অগণ্য আগুনের দাগ;
বিশাল স্তম্ভের সার দাঁড়িয়ে থাকত,—ঋজু আর সম্বৃত,
—সন্ধ্যায় মনে হ'ত কপিশ কঠিন ব্যাসল্টের শৈলকুঞ্জ।
রঙিন আকাশ দুলত ঢেউয়ের দোলায়,
চোখে পড়ত আমার, অস্তসূর্য্যের রঙ্;
সে-রঙের সাথে বিস্ময়ে, গোপনে,
তরঙ্গ মেশাত তার ললিত-সঙ্গীতের সর্ব্বাস্তুত সুর।
আমি ছিলেম—এই আয়েসী শান্তির মাঝে,
নীলের কেন্দ্রে, ঢেউ আর রঙের দেশে।
মাতাল গন্ধ নিরাবরণ পরিচারকের দল
ঘামের পাতা বুলিয়ে তৃপ্ত করত আমার ললাট;
—বিষণ্ণ সূর্য্যাস্তে আমি শ্রান্ত হতেম।
ওরা, তাই, একাগ্র চোখে
সময় গুণত শেষ সূর্য্যের।

T. S. Eliot লিখছেন—"বদলেয়ার বর্ত্তমান যুগের কবিতার নূতনত্বের সব থেকে বড় উদাহরণ।" গতানুগতিকতা এবং রীতিবদ্ধতার যে নিয়মানুগ গতি নিরন্তর বয়ে আসছিল, তাকে পিছনে ফেলে নতুন সমাজ নতুন মূল্য-বোধ নিয়ে এগিয়ে এসেছে শোভাযাত্রা করে। আর, সেই শোভাযাত্রার আগে আগে চলেছেন খেয়ালী কবি শার্ল বদলেয়ার।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আবাহন

শ্রীপঙ্কজিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘনায়ে আসিছে বিশ্বে দুর্যোগ রজনী
ঝঞ্ঝাবেগে ঘোর রবে হানিছে অশনি।
স্বার্থ, দ্বেষ, আত্মদম্ভে উন্মত্তের প্রায়
হিংসার কুটিল চক্র ঘুরিছে ধরায়।
"শান্তির ললিত বাণী" শুনিবার আশে
আত্ম-প্রবঞ্চিত দেশ নিষ্ফল আশ্বাসে।
বিশ্বব্যাপী আজি এই দুর্যোগের দিনে
দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ হ'তে সবে মন-প্রাণে।
ভারতের ভগিনীরা আজি মিলি সবে
বীর ভ্রাতৃগণে ডাকে পাঞ্চজন্য রবে।
শৌর্যের প্রতীকরূপে জ্বালি বহ্নি-শিখা
চন্দন-তিলকে ভালে আঁকি জয়টীকা।
দ্বিতীয়ার শুভযজ্ঞে মাঙ্গলিকী রবে
অমর প্রার্থনা করি কীর্ত্তির গৌরবে।
রক্ষিতে দেশের সাথে বিশ্বের কল্যাণ
জানায় ভগিনী সবে শুভ আবাহন।

বিজ্ঞানবার্তা

পক্ষধর মিশ্র

মহাকাশ বিজয়ে মানুষের প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রথম উপগ্রহটি ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর এবং দ্বিতীয়টি ৩রা নভেম্বর রকেটের সাহায্যে মহাকাশের বুকে স্থাপন করা হয়, উপগ্রহ দুটির নামকরণ করা হয়েছে, যথাক্রমে প্রথম স্পুটনিক এবং দ্বিতীয় স্পুটনিক।

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের আকাশ পরিক্রমার সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞান সভ্যতার জয়যাত্রার এই অসাধারণ সাফল্যে বিশ্বজগৎ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। নীরব সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তাঁদের কার্য্যকলাপের কোন বিবরণই ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করেননি বরং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যানগার্ড পরিকল্পনার কথা বিজ্ঞানী মহল জানতেন, তাই সকলেই অনুমান করেছিলেন, আমেরিকাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এই অসাধারণ প্রচেষ্টায় ব্রতী হবেন। অবশ্য অনেক মার্কিণ বিজ্ঞানীই তাঁদের ভ্যানগার্ড পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানিবৃন্দের সাফল্য দেখে বোঝা যায়, তাঁরা অনেক বেশী এগিয়ে গেছেন। প্রথমেই আকাশে তুলেছেন প্রায় ১৮৩ পাউণ্ড ওজন যা রাসায়নিক জ্বালানীর সহায়তায় মহাকাশের বুকে স্থাপন করা বিজ্ঞানীদের প্রায় কল্পনার বাইরে ছিল। ১৮৩ পাউণ্ডই বা বলি কেন,—দ্বিতীয় স্পুটনিকের ওজন শোনা যাচ্ছে আধ টনেরও বেশী। যে সব রাসায়নিক জ্বালানীর কথা মোটামুটি আমাদের জানা আছে, তাদের সহায়তায় আধ টন ওজন উর্দ্ধাকাশে তোলা প্রায় এক অবাস্তব কাজ। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ বিষয়ক তাঁদের গবেষণার কোন বিস্তৃত বিবরণ এখনও প্রকাশ করেননি। ঠিক কি ধরণের জ্বালানী যে তাঁরা ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই।

৫ই অক্টোবরের সংবাদপত্রে যখন সর্ব্বপ্রথম সোভিয়েট রাশিয়া কর্ত্তৃক মহাকাশের বুকে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের কথা ঘোষিত হলো তখন হঠাৎ সকলেই এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সন্দেহ ভঞ্জন হতে বেশী দেরী হলো না, পৃথিবীর নানা অঞ্চলের গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা এর সন্ধান পেতে লাগলেন। উপগ্রহটি থেকে স্বয়ংক্রিয় বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে সঙ্কেত আসতে লাগলো ব্লিপ-ব্লিপ-ব্লিপ। জানা গেল, মানুষে গড়া এই প্রথম উপগ্রহটি পৃথিবীর বুক থেকে ৫৬০ মাইল উঁচুতে ঘণ্টায় প্রায় ১৮ হাজার মাইল গতিতে প্রতি ৯৫ মিনিটে একবার করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই উপগ্রহের ওজন প্রায় ১৮৩ পাউণ্ড, ব্যাস প্রায় ২৩ ইঞ্চি। দু'টি স্বয়ংক্রিয় বেতার সঙ্কেত প্রেরক যন্ত্র ঐ উপগ্রহটি থেকে সর্ব্বদাই ১৫ এবং ৭'৫ মিটারে পৃথিবীতে সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল। উপগ্রহটিতে শক্তি-সরবরাহ করছিল রাসায়নিক ব্যাটারী। প্রায় দিন কুড়ি বাদে রাসায়নিক ব্যাটারীর শক্তি ফুরিয়ে যাবার ফলে বেতার-সঙ্কেত আসা বন্ধ হয়ে গেছে। মহাকাশের বুকে উপগ্রহটি প্রেরণ করে, বেতার-সঙ্কেতের মাধ্যমে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা আশা করা যায়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব, মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব ও মহাকাশের অন্যান্য সংবাদসমূহ সংগ্রহ না করে, সেখানে মানুষের দৈহিক উপস্থিতি এবং অন্যান্য যে কোন অভিযান চালানো মোটেই নিরাপদ নয়।

প্রথম স্পুটনিকটি মহাকাশের বুকে একটি ত্রিস্তর রকেটের সাহায্যে স্থাপন করা হয়। পরে দেখা যায়, ত্রিস্তর রকেটের শেষ পর্য্যায়টি উপগ্রহটির আগে আগে আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহের রূপ ধরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এই রকেটটি খালি চোখে বেশ দেখা যায়। পীতবর্ণের একটি মৃদু উজ্জ্বল তারার মতো এটি আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত যায় চলে। স্পুটনিকের গতি যাচ্ছে কমে,—ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। ঠিক কতোদিন আরো মহাকাশের বুকে এটি বিরাজ করবে তা নির্ভুলভাবে বলা সম্ভব নয়।

৩রা নভেম্বর, মহাকাশের বুকে জীবন্ত প্রাণিসহ দ্বিতীয় স্পুটনিকের আবির্ভাব হলো। এই উপগ্রহটির ওজন প্রায় আধ টন, এটি পৃথিবীর ৯৩০ মাইল উর্দ্ধে প্রতি ১০২ মিনিটে প্রায় ১৮ হাজার মাইল গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই স্পুটনিকের মধ্যে অবস্থান করছে একটি কুকুর,—জীবদেহের উপর মহাকাশের পরিবেশের কি প্রভাব, তাই জানবার জন্য বিজ্ঞানীরা এই জীবন্ত প্রাণীটিকে মহাশূন্যে প্রেরণ করেছেন। কুকুরটি ছাড়াও এই উপগ্রহে মহাজাগতিক রশ্মি, উর্দ্ধাকাশের তাপ, চাপ প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রকার তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রায় আধ টন ওজনের নানাপ্রকার যন্ত্রাদিও পাঠান হয়েছে। দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহটি থেকেও ৭'৫ এবং ১৫ মিটারে অবিরাম বেতার সঙ্কেত পাঠাবার আয়োজন ছিল কিন্তু ৬—৭ দিন পরেই রাসায়নিক ব্যাটারীর শক্তি সরবরাহ শেষ হয়ে যাওয়ায় সঙ্কেত প্রেরণ বন্ধ হয়ে গেছে। কুকুরটিকে একটি বাক্সে বিশেষ ভাবে বন্ধ করে, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখা হয়েছে। কুকুরটির সঙ্গে কয়েক দিনের খাদ্যও দেওয়া হয়েছিল। শূন্যলোকে নানা পরিস্থিতিতে ঐ জীবের দেহের কার্য্যকলাপের বিবরণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মারফৎ লিপিবদ্ধ করবার আয়োজনও দ্বিতীয় স্পুটনিকটিতে আছে।

কুকুরটিকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে যে সব তথ্যাবলী সংগৃহীত হচ্ছে, তা মানুষের গ্রহে উপগ্রহে যাত্রার পথের এক প্রধান সম্বল হবে। কিছুদিন পূর্ব্বেই সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা আরও দুটি কুকুরের সঙ্গে এটিকেও বাইরের পরিবেশের সহিত সংযোগশূন্য রুদ্ধ টিউবের মধ্যে পুরে রকেটের সহায়তায় মহাকাশের বুকে প্রায় ৭০—৮০ মাইল উঁচুতে ঘুরিয়ে এনেছিলেন। আর একটি পরীক্ষায় খোলা টিউবের মধ্যে বসে এই কুকুরটি অপর দু'টি কুকুরের সঙ্গে মহাকাশের জন্য বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত পোষাক পরিধান করে ঐ উচ্চতার মধ্যেই ঘুরে এসেছে। এতে তাদের

আদর

—নরেন ভট্টাচার্য্য

চিড়িয়াখানা

—অসীমকুমার

রহস্যময়ী

—কনক দত্ত

নেশা

বাবুইয়ের বাসা —রামকিঙ্কর সিংহ

কুমোরের মূর্তি —কুসুমকুমার বাগচী
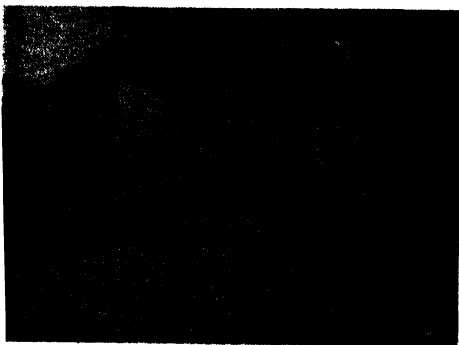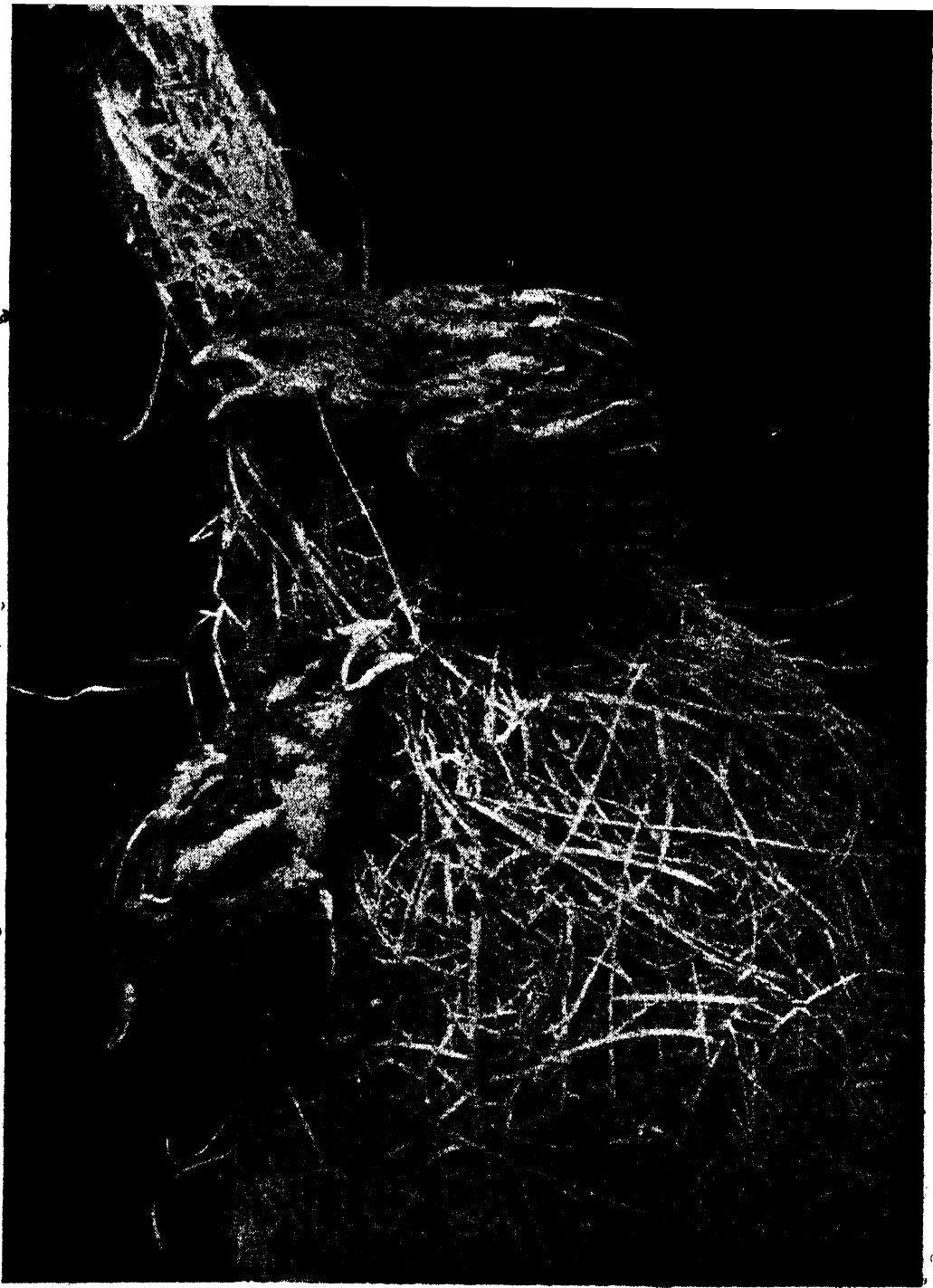
সূর্য্যোদয় (পুরী) —অরুণ রায় চৌধুরী

জাহাঙ্গীর মহল (আগ্রা) —শ্যাম চক্রবর্ত্তী

বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। এখন ৯৩০ মাইল উচ্চাকাশে ঐ জীবের দেহে কি পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় তা জানবার জন্য সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহল উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছেন।

কুকুরটি যে কি শ্রেণীর তাও এখন সঠিক ভাবে জানা যায় নি। শোনা যাচ্ছে, লায়কা শ্রেণীর লোমশ একটি কুকুরকে পাঠান হয়েছে। কুকুরটি বর্ত্তমান ভ্রমণের জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষিত—আইভান প্যাভলোক এর কনডিশনড্ রিফ্লেক্স থিওরী অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। উপগ্রহটির মধ্যে খাদ্যের রেশন বর্ত্তমান,—শিক্ষিত কুকুরটি যখন তখন ঐ খাবার খেয়ে ফেলবে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজবে, তখনই কেবল সে খাদ্য গ্রহণ করবে। কুকুরটির সঙ্গে তার ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এবং রক্তের চাপ মাপবার এবং তাকে নথীভুক্ত করবার আয়োজন আছে।

লায়কাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যাবে কি না তার আলোচনায় পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহল এখন সরগরম। কুকুরটিকে ফিরিয়ে আনতে পারলে মহাশূন্য বিজয়ের একটি বিরাট সমস্যার ঘটবে সমাধান। এর পর মানুষ তাহলে নিজে কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে মহাকাশে যাত্রা করতে পারবে। কিন্তু কুকুরটিকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হলে মহাকাশের বুকে মানুষের নিজের যাত্রার সময় যাবে পিছিয়ে। সুতরাং বিজ্ঞান সভ্যতার জয়যাত্রার ইতিহাসে কুকুরটির নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তন নিঃসন্দেহে যে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের দাবী করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় স্পাটনিক আকাশে ওঠার ১০ দিন কেটে গেছে। প্রথমে সোবিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছিলেন, লায়কা নিরাপদে পৃথিবীতে অবতরণ করবে কিন্তু এখন তাঁরা নীরব। সমস্ত দুনিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে নানা প্রকার পরস্পর-বিরোধী সংবাদ। কেউ বা জানাচ্ছেন লায়কা নিরাপদে ইতিমধ্যেই অবতরণ করেছে, আবার কারো কারো মতে মহাকাশেই তার ঘটেছে মৃত্যু। লায়কার সঠিক সংবাদ আমরা জানি না, তবে মনেপ্রাণে কামনা করি সে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসে মানব সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করুক। হতভাগ্য লায়কার নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তন না ঘটলে, মানুষের এই বিজ্ঞান গবেষণার সম্পূর্ণ সাফল্যের জন্য আবার কোন প্রভুভক্ত কুকুরকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মহাশূন্যে যাত্রা করতে হবে।

এখন পর্য্যন্ত সামান্য যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাই সংক্ষেপে পরিবেশন করলাম। দু'-একদিন আগের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ বিজ্ঞানীরা কোন একটি পদার্থকে রকেটের সহায়তায় মহাশূন্যে পাঠিয়ে, তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছেন। আজ ১২ই নভেম্বর (৫৭) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে রাশিয়ার তৃতীয় স্পাটনিকের আকাশ পরিক্রমার সময় আসন্ন। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন হবে প্রায় এক টন। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে সুরু করেছেন, আগামী ৫ বছরের মধ্যেই চন্দ্রপৃষ্ঠে টেলিভিসন সমন্বিত যন্ত্রাদি অবতরণ করাতে মানুষ সমর্থ হবে, এবং টেলিভিসনের মারফৎ পৃথিবীর সঙ্গে চন্দ্রের ঘটবে সংযোগ। অনেক বিজ্ঞানী আবার অনেক বেশী আশা মনে পোষণ করেছেন,—কিছুদিনের মধ্যে মানুষই হয়তো চন্দ্রে পৌঁছতে পারে। শোনা যাচ্ছে, কোন কোন দেশে ইতিমধ্যে নাকি চন্দ্রের এবং মঙ্গল গ্রহের জমি বিক্রয় সুরু হয়ে গেছে। অনেকে আবার মনে করেন, এখনই চন্দ্রে রকেট প্রেরণ করবার ক্ষমতা রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের আছে।

অতএব আপনারা যখন আমার এই রচনা পড়বেন তখন মানুষের মহাকাশ বিজয়ের প্রচেষ্টা আরও অনেক অগ্রগামী হয়ে যাবে। হয়ত লায়কার অথবা পরে তার যে স্বজাতি উর্দ্ধাকাশে যাবে তার ঘটবে নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তন, রাশিয়া আরো ভারী আরো বড় কৃত্রিম উপগ্রহ অনেক বেশী উঁচুতে স্থাপন করবে;—প্রকাশিত হবে মহাশূন্য বিজয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীদের নতুন কার্য্যকলাপ, আশা হয় রাশিয়া আর আমেরিকার বিজ্ঞানী দল একত্রে আগামী যুগে গ্রহে উপগ্রহে মানুষের জয়যাত্রার নিশান প্রতিষ্ঠিত করতে সঙ্ঘবদ্ধ হবেন। আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

একটি তালিকা

নাম	পৃথিবী থেকে দূরত্ব (মাইল)	ব্যাস (মাইল)	আবহাওয়া-মণ্ডলী	জীবন থাকার সম্ভাবনা
বুধ	৫০,০০০,০০০	৩,০০০	নেই	নেই
শুক্র	২৫,০০০,০০০	৭,৬০০	আছে	? ?
চন্দ্র	২৩৮ ৮৫৭	২.১৬০	নেই	নেই
মঙ্গল	৩৫,০০০,০০০	৪,২২০	আছে	আছে-
বৃহস্পতি	৩৬৭,০০০,০০০	৮৯,০০০	আছে	নেই
শনি	৭৪৪,০০০,০০০	৭৫,০০০	আছে	নেই
টিটান (শনির উপগ্রহ)	৭৪৪,৭৬০,০০০	৩৫০০,	আছে	নেই
ইউরেনাস	১,৬০৬,০০০,০০০	৩১,০০০	আছে	নেই
নেপচুন	২,৬৭৭.০০০,০০০	২৮,০০০	আছে	নেই
প্লুটো	৩,২০০,০০০,০০০	৬,৩০০ (?)	নেই	নেই

ছোটোখাটো মেয়ে, ঘর-সংসার দেখে, রান্নাবান্না করে, ছেলে সামলায়। তাকে প্রায় সকালবেলা দেখা যেতো বেতের ঝুড়ি হাতে বাজারে যাচ্ছে। দেখলে মনে হয় ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। অথচ তারই সামনে পড়লে দুর্ধর্ষ ওয়াঙ কি রকম যেন ক্যাবলা হয়ে যেতো।

এতক্ষণ বাড়ি ফেরোনি কেন? ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—ধমকাতো তার বৌ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি—বলে ওয়াঙ বাড়িমুখো ছুটলো।

কোথায় বেরোচ্ছো? ছেলে কাঁদছে, ওকে একটু দেখ, আমি চান করে আসি—হুকুম করতো তার বৌ।

আচ্ছা, আচ্ছা, দেখছি—বলে ওয়াঙ বাইরে বেরোনো স্থগিত রেখে ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতো।

আর সেই ওয়াং পথে বেরোলে পথচারীরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিতো। পথের পাশে কোনো দোকানের সামনে থেমে গেলে দোকানদার তাড়াতাড়ি সিগারেটের টিন হাতে করে বেরিয়ে আসতো।

সেই ওয়াঙ যতো অন্তরঙ্গই হোক জুলেখার সঙ্গে, তার সম্বন্ধে যে কেউ কিছু বলবে, সে সাহস কারো ছিলো না। আর সবার কি রকম একটা ধারণা ছিলো যে ওয়াঙ জুলেখার সঙ্গে যতো অন্তরঙ্গই হোক, কোনো রকম নিবিড়তর যে কিছু করতে যাবে সে সাহস ওয়াঙের নেই। কারণ কোনো কিছু ঘটলেই কাণাঘুষোয় কিছু না কিছু ছড়িয়ে পড়বে, হয়তো জানতে পারবে ওয়াঙের বৌ, আর একমাত্র তাকেই ওয়াঙ ভয় পায়।

সুতরাং এ দিক থেকে একটু নিশ্চিন্তই ছিলো জুলেখার অনুগ্রহ-প্রত্যাশী যারা, কারণ এসব ব্যাপার নিয়ে ওয়াঙ মাথা ঘামাবে না। তবে বেশী বিরক্ত করে জুলেখাকে চটিয়ে দিলেই বিপদ, কারণ তাহলে আর ওয়াঙের হাত থেকে নিস্তার নেই।

জুলেখা বাঈকে নিয়ে ওয়াঙ হয়তো মাথাও ঘামায় নি কোনো দিন। তার নির্বিকার মুখে ভাবলেশহীন ছোটো ছোটো চোখ দুটো দেখে কোনো দিন মনেও হোত না যে জুলেখার অনিন্দ্যসৌন্দর্য রূপ তার মনে কোনো রেখাপাত করে। যার জন্যে জুলেখার এত নাম, জুলেখার সেই গানের গলার সম্বন্ধেও সে ছিলো একেবারে নিস্পৃহ। কারণ ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতে তার কোনো অনুরাগ থাকবার কোনো অবকাশ ছিলো না। জুলেখার সম্বন্ধে তার যতোটুকু পেশাগত দায়িত্ব, অবাঞ্ছিত লোকের মনোনিবেশ থেকে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা, তার জুয়ার আড্ডা সামলানো আর সন্ধ্যেবেলা সে যখন ময়দানে হাওয়া খেতে যেতো তখন তার সাহচর্য দেওয়া, এর বেশী কোনো আগ্রহ দেখা যেতো না তার মধ্যে। আর তার সম্বন্ধেও জুলেখার মনোভাব ছিলো দেহরক্ষীর প্রতি বাদশাজাদীদের যেরকম থাকে সেই রকম।

এমনি ভাবেই কেটে যাচ্ছিলো এই কটা বছর—হয়তো কেটে যেতো সারাজীবন, যদি না এর মধ্যে এসে পড়তো বকুলপুরের দর্পনারায়ণ চৌধুরী।

বাংলাদেশের নামকরা জমিদার বকুলপুরের চৌধুরীরা। সে বংশের ছেলে দর্পনারায়ণ। ওদের বাবুয়ানার খ্যাতি দেশবিস্তৃত। ওদের বাড়ীর প্রত্যেকটা ঘোড়ার জন্যেই নাকি দিন এক বালতি রসগোল্লা বরাদ্দ ছিলো এককালে। সে বাড়ির ছেলে বিলেত ফেরত সখের ব্যারিষ্টার দর্পনারায়ণের দিন এক বালতি রসগোল্লা ঘোড়াকে খাওয়ানোর মেজাজ না থাকলেও যৌবনের উপভোগ্য সবকিছুই টাকা দিয়ে কেনবার নেশা ছিল অত্যন্ত তীব্র। কোনো এক মহারাজার কন্যার শ্লীলতাহানি করেছিলো বলে মামলায় তার দশ হাজার টাকা ফাইন হয়। দর্পনারায়ণ কুড়ি হাজার টাকা ছুঁড়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার সে চেষ্টা করেছিলো আদালতের মধ্যেই—এমন গল্প কলকাতার রকবাজদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সেই দর্পনারায়ণ চৌধুরী যখন এমনি একদিন গান শুনতে এলো জুলেখা বাঈয়ের বাড়িতে, তখন ওয়াঙ অত লক্ষ্য করেনি। প্রথমটা ভেবেছিলো একে কোনো রকমে কোনো ব্যাপারে ফাঁশিয়ে কিছু মোটা টাকা হস্তগত করা যায় কি না। কিন্তু পরে যখন শুনলো যে ওদের আর আগের অবস্থা নেই তখন আর বেশী মাথা ঘামায়নি তার সম্বন্ধে। তাকে জুলেখা বাঈ-এর বাড়িতে আরো দু'বার দেখেও এড়িয়েই গেছে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা জুলেখার সঙ্গে বেরোনোর জন্যে সে রুটিন মাফিক এসে হাজির হোলো তার বাড়িতে। এসে শুনলো—জুলেখা তার জন্যে আর অপেক্ষা করেনি। আগেই বেরিয়ে গেছে। সঙ্গে গেছে শুধু এক পরিচারিকা। শুনে একটু অবাক হোলো ওয়াঙ, গত কয়েক বছরের মধ্যে এ রকম কোনো দিন হয়নি।

বাইরে বেরিয়ে এসে পথের পাশের এক দোকানে ঢুকে এক পট চা নিয়ে বসলো। তখন কি রকম যেন একটা অস্বোয়াস্তি তার মনে। সে বুঝে উঠতে পারলো না কেন। একটি লোক এসে খবর দিলো ওয়াঙের বৌ তাকে ডাকছে। তাকে ধমকে তাড়ালো ওয়াঙ। রাত বারোটার আগে বাড়িই ফিরলো না। সেই প্রথম সে তার বৌয়ের অবাধ্য হোলো।

ওয়াঙ যখন বাড়ি ফিরলো, ততক্ষণে ব্ল্যাকবার্ণ লেনে এক নিরীহ দোকানদারের দাঁত ভেঙেছে তার ঘুষিতে, ছাতাওয়ালা গলিতে সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে একপ্রস্থ, নর্দমায় গড়াগড়ি দিয়েছে তিরেটোবাজারের জনি মর্গ্যান।

বাড়ি ফিরতে বৌ শুধু একবার তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। কোনো কথাই বললো না।

দ্বিতীয় দিনও সেই একই ব্যাপার।

জুলেখা বাঈ বেরিয়ে গেছে ওয়াঙ গিয়ে পৌঁছানোর আগেই।

তৃতীয় দিন ওয়াঙ একটু সকাল করেই জুলেখা বাঈ-এর বাড়ি হাজির হোলো। জুলেখা তাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেল ভেতরে। বললো, এখন থেকে তার আর আসবার দরকার নেই। জুলেখা একাই বেরোবে সন্ধ্যার পর। গাড়ির কোচম্যান আর এক পরিচারিকা থাকলেই যথেষ্ট। ওয়াঙের মূল্যবান সময় তার সঙ্গে নষ্ট করে লাভ নেই। সে সময়টা জুয়ার আড্ডায় বসে থাকলে অনেক বেশী কাজ দেবে।

বেরোনোর পথে ওয়াঙ জুলেখা বাঈ-এর পরিচারিকাকে ধরে জিজ্ঞেস করলো—কি ব্যাপার?

কিছুই না—সে উত্তর দিলো—বিবিজী এখন যথেষ্ট বড়ো হয়ে গেছে। তার সঙ্গে কেউ না থাকলেও চলে।

তা তো চলে। কিন্তু এ কথা বলতে বলতে সে যে মুখ টিপে হাসলো সেটাই ওয়াঙের ভালো লাগলো না।

সেদিন সন্ধ্যার পর ওয়াঙ নিজেই একটি ঠিকে গাড়ি ভাড়া করে বেড রোডে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একপাশের অন্ধকারে।

অনেকক্ষণ মশার কামড় খেলো চুপচাপ গাড়ির ভিতর বসে থেকে।

তারপর এক সময় শুনলো, ঘোড়ার গলার টুংটাং ঘণ্টা। আওয়াজটা খুব চেনা। জুলেখা বাঈ-এর গাড়ি আসছে ফাঁকা পথ ধরে।

কিছুক্ষণ পর গাড়িটা তাকে পেরিয়ে যেতে দেখলো জুলেখা গাড়িতে একা নয়, আরো একজন আছে তার সঙ্গে।

হঠাৎ মনে একটা সাংঘাতিক ধাক্কা খেলো সে। কি করবে ভেবে পেলো না কয়েক মুহূর্ত।

একবার ভাবলো গাড়িতে চেপে যাই জুলেখার পেছন পেছন।

তারপর ভাবলো, নাঃ, ও যার সঙ্গে যাবে যাক—আমার কি। ওতো এরকম যাবেই; ওর তো এই পেশা।

ওখানে আর সময় নষ্ট না করে ওয়াঙ ফিরে গেল চায়না টাউনে। একটি বার-এ ঢুকে মদ খেলো কয়েক গ্লাস, অকারণ ছুটো চড় মারলো বেয়ারাকে। বাড়ি ফিরতে দেখে, তার বৌ চুপচাপ বসে ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ওয়াঙ বললো সে খাবে না। বাইরে খেয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো ওয়াঙের বৌ। তার পর বললো, "খেতে ইচ্ছে না হয় খেয়ো না, কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, জুলেখা বাঈ বারবনিতার মেয়ে, নিজেও তাই।"

ওয়াঙ হঠাৎ চটে গেল। হঠাৎ ফুলে গেল তার পেশীগুলো।

ওয়াঙের বৌ হাসলো।

জিজ্ঞেস করলো, "কি হোলো? আমায়ও মারধোর করবার ইচ্ছে হচ্ছে না কি?"

ওয়াং চুপ করে রইলো। ভাবলো, সত্যিই তো। আমার কেন এরকম হবে। জুলেখার কাছে কতো জন আসে, সে টাকা নেয় ওদের কাছ থেকে। আজ না হয় সন্ধ্যায় বেরিয়েছে একজনের সঙ্গে, যে হয়তো অন্যান্য সবার চাইতে অনেক বেশী টাকা ঢেলে দিচ্ছে তার পায়ে।

তবু—ওয়াঙ ভাবলো—এই সন্ধ্যার সময়টা কেন? যে সময়টা কোটি টাকা দিলেও জুলেখা অন্য কোথাও যেতো না, যে সময়টা গত তিন চার বছর ধরে শুধু একটি রুটিন মেনে চলেছে, যে সময়টা শুধু ওয়াঙ আর তার একলা পথ চলতে চলতে গল্প করার, সে সময়টা কেন?

খুঁজে বার করি লোকটাকে—ওয়াঙ ভাবলো—তার পর লোকটাকে সরিয়ে দিতে কতক্ষণ।

অন্তিম সময়ে সে লোকটার মুখশ্রী কি রকম হবে তারই একটি মনোরম কাল্পনিক রূপ ভাবতে ভাবতে ওয়াঙ ঘুমিয়ে পড়লো।

তার পরদিন সকালবেলা ডাক এলো জুলেখা বাঈ-এর বাড়ি থেকে।

জুলেখা জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি হয়েছে ওয়াঙ?"

"কিছু না", ওয়াঙ উত্তর দিলো।

"কাল সন্ধ্যেবেলা ময়দানে কি করছিলে ?"

প্রশ্ন শুনে ওয়াঙ অবাক হোলো, কিন্তু উত্তর দিলো সহজ ভাবেই, "হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম। এই ক'বছরে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে বোধ হয়।"

জুলেখা কিছু বললো না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওয়াঙের দিকে।

ওয়াঙ অস্বোয়াস্তি বোধ করলো। একটু ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করলো, "কেন ময়দানটা কি তোমার কেনা জায়গা ? আর কারো ওখানে যেতে নেই ?"

জুলেখা একটু হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, "আমার সঙ্গে কে ছিলো জানতে চাও ?"

"আমার কি দরকার ?"

"আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে, সে কথা জানতেই তো গিয়েছিলে," জুলেখা বললো, "ও ঘরে গিয়ে দেখ কে বসে আছে।"

ওয়াঙ একবার ভাবলো আমার কি আসে যায়, সোজা বাড়ি চলে যাই। আবার কি ভেবে পাশের ঘরের বন্ধ দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরের ভিতর এক পা ঢুকে ওয়াঙ দেখলো ফরাশের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছে দর্পনারায়ণ চৌধুরী। চুরুট ফুঁকছে চুপচাপ বসে।

ওয়াঙ আর ঢুকলো না। ফিরে এলো।

জুলেখা একটু তাকিয়ে দেখলো। বললো, "দেখ ওয়াঙ, ওর যদি কোনো ক্ষতি হয়, তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে। বুঝেছো ?"

ওয়াঙ চলে যাচ্ছিলো। জুলেখা ডাকলো পেছন থেকে। "শুনে ও ওয়াঙ !"

ওয়াঙ ফিরে দাঁড়ালো।

জুলেখা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি হয়েছে ওয়াঙ ! তুমি তো এরকম ছিলে না ?"

ওয়াঙ কোনো উত্তর দিলো না।

জুলেখা আরো নিচু গলায় আরো আস্তে বললো, "ওয়াঙ আমি বুঝতে পেরেছি সবই। কিন্তু যা হবার নয়, তা নিয়ে মিছিমিছি কষ্ট পেও না ! ও আশা ছেড়ে দাও।"

ওয়াঙ কোনো কথা না বলে বেরিয়ে চলে গেল।

সেদিন থেকে ওয়াঙ জুলেখার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করলো। শুধু সন্ধ্যেবেলা যেতো জুয়ার আড্ডায়। চুপচাপ বসে থাকতো। হৈ-চৈ হট্টগোল যখন অসহ মনে হোতো সেখান থেকে বেরিয়ে চলে যেতো।

আবার এক একদিন খুব রাগ করে ঝগড়া স্নরু করে দিতো একজন না একজন কারো সঙ্গে, কিন্তু তার হাত চলা বন্ধ হয়ে গেল। সেটা সবাই লক্ষ্য করলো অবাক হয়ে। ওয়াঙ বেশী কথার লোক নয়। আগে সে দু'-চার কথার পরই কথা বন্ধ করে সোজা মারামারি করতো। কিন্তু এখন সে যতো সম্ভব মুখখিস্তি করতো, গালাগাল শুনতোও, শুনে বেরিয়ে যেতো শেষ পর্যন্ত।

ও পাড়ায় সবাই বলাবলি স্নরু করলো, কি হোলো ওয়াঙের !

আর প্রচুর মদ খেতে স্নরু করলো সে। বেশী রাত না হলে বেরোতোই না মদের বার থেকে।

ওয়াঙের বৌ শুধু চুপচাপ লক্ষ্য করতো। কিছু বলতো না।

একদিন শুধু বলেছিলো, "মদের দোকানে অতো রাত না করে বোতল কিনে বাড়ি নিয়ে এলেই পারো।"

এমনি করে কেটে গেল আরো কয়েক মাস।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা জুলেখার কোচোয়ানকে পথের ধারে একটি চায়ের দোকানে দেখে সে অবাক ! এ সময়টা তার এখানে থাকবার নয়, জুলেখা বাঈকে নিয়ে ময়দানে যাওয়ার কথা। ডেকে জিজ্ঞেস করলো তাকে।

কোচোয়ান উত্তর দিলো, "বিবিজী বলে দিয়েছে আজ আর বেরোবে না।"

"কেন ?"

"সে জানি না।"

তার পরদিনও তাকে দেখলো চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করতে জানলো সেদিনও বেরোবে না জুলেখা বাঈ।

পর পর চারদিন যখন দেখলো জুলেখা বাঈ সন্ধ্যেবেলা বেরোচ্ছে না, তখন একটু ভাবনা হোলো ওয়াঙের। জুলেখার অসুখ বিসুখ করেনি তো ? খোঁজ নিয়ে জানলো জুলেখা ইদানীং কারো সঙ্গে দেখা করছে না।

আর জানলো দর্পনারায়ণ চৌধুরীকেও আর দেখা যাচ্ছে না এ পাড়ায়।

তা হলে এই ব্যাপার—ভাবলো ওয়াঙ। মনে মনে হাসলো সে। স্থির করলো তিন-চারদিন যাক, তার পর একদিন গিয়ে দেখা করবে জুলেখার সঙ্গে। কিন্তু তার আগেই যেতে হোলো। ডেকে পাঠিয়েছিলো জুলেখা।

ওয়াঙ আসতে জুলেখা তাকে আইসক্রিম খাওয়ালো, ফল খাওয়ালো, সিগারেট খাওয়ালো। তারপর বললো, "জানো ওয়াঙ, চৌধুরী বাবুকে তাড়িয়ে দিয়েছি।"

"বেশ করেছো।"

"জানো, সে আমায় বলে কি না এসব ছেড়ে দাও, জুয়ার আড্ডা, আফিং কোকেনের চালান, মেয়েদের ব্যবসা—"

"সে কি করে জানলো," ধারালো গলায় ওয়াঙ জিজ্ঞেস করলো।

"টের পেয়ে গেছে।"

"দাঁড়াও, তাকে আমি—"

"না, না, ওয়াঙ, ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে যেও না। সে এদিকে আর আসবে না।"

ওয়াঙ আর কিছু বললো না। চুপ করে রইলো জুলেখাও।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দুজনে।

একটু পরে জুলেখা ওয়াঙের কাছে সরে এলো। খুব আস্তে আস্তে বললো, "ওয়াঙ !"

ওয়াঙ জুলেখার দিকে তাকালো।

"ওয়াঙ, আমি এখন বুঝতে পারছি, তুমি ছাড়া আর কোনো বন্ধু আমার নেই।"

ওয়াঙের বুকের স্পন্দন হঠাৎ খুব দ্রুত হয়ে উঠলো। একটা অদ্ভুত অনুভূতি তার রক্তের উত্তাপে মিশে ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে।

কখন দেখে জুলেখা তার হাত তুলে নিয়েছে নিজের হাতের মধ্যে। নরম মাখনের মতো সেই হাত।

জুলেখা, কলকাতার সেরা সুন্দরী, সেরা মুজরাওয়ালী জুলেখা—ওয়াঙ ভাবলো—রেবেকা বিবির মেয়ে, বিবি আমেলিয়ার নাতনী।

আর অনেকক্ষণ পর জুলেখা জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কাল আসছো ?"

"হ্যাঁ," উত্তর দিলো ওয়াঙ।

"একটু সকাল করেই এসো," বললে জুলেখা, "আমরা আবার ময়দানে বেড়াতে যাবো আগের মতো।"

তার পরদিন ওয়াঙ একটু সাজগোজ করলো ভালো করে। শীষ দিতে দিতে চান করলো অনেকক্ষণ ধরে, মাথায় মাখলো সুগন্ধ ক্রীম, রুমালে ঢাললো জাপানী সেন্ট। একটি সিল্কের প্যান্ট আর সিল্কের শার্ট পরে, পকেটে দামী সিগারেটের টিন নিয়ে বেরোলো বাড়ি থেকে।

ওয়াঙের বৌ চুপচাপ তাকিয়ে দেখলো। কোনো কথা বললো না। কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

এ কথা সে কথা অনেক কথা ভাবতে ভাবতে ওয়াঙ এলো জুলেখার বাড়ি। এসে শুনলো জুলেখা নেই। জুলেখা চলে গেছে। কোথায় গেছে ? কেউ জানে না।

শুধু জানে বিকেলে এসেছিলো চৌধুরী বাবু—সেই দর্পনারায়ণ চৌধুরী। জুলেখা প্রথমটা কথাই বলবে না তার সঙ্গে, তারপর দু'জনে অনেকক্ষণ কি কথা হোলো কে জানে!

তারপর দেখা গেল শুধু একটি বড়ো স্যুটকেশ নিয়ে জুলেখা চলে গেল চৌধুরীবাবুর সঙ্গে। কোথায় যাচ্ছে কিছুই বললো না কাউকে।

ওয়াঙ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনলো। তারপর বাড়ি ফিরে এলো আস্তে আস্তে।

ওয়াঙ-বৌ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো জানলায়। তাকে ফিরে আসতে দেখে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রাত্রের খাবার তৈরী। এতক্ষণ ওয়াঙও একটি কথাও বলেনি। এবার চুপচাপ খেতে বসলো। খেতে বসে দেখে নানারকম খাবার, তার সব চাইতে প্রিয় খাবার সেগুলো, সবই যত্ন করে তৈরি করেছে তার বৌ।

সে ছেলেকে কোলে নিয়ে এক পাশে বসেছিলো চুপচাপ। ওয়াঙ চোখ তুলে দেখলো তার দিকে, দেখে তার চোখে জল। ওয়াঙ তাকে কাছে ডাকলো।

তারপর এক সঙ্গে খেতে সুরু করলো দুজনে—একই প্লেট থেকে।

তারপর কেটে গেল অনেক বছর। জুলেখা বাঈ-এর কোনো খবর আর পাওয়া গেল না। লোকেও ভুলে গেল তাকে। ওয়াঙও কোনো দিন তার খোঁজ করেনি।

সে ছেড়ে দিলো তার আগের জীবনযাত্রা। একটি ছোটো হোটেল ছিলো চায়না-টাউনে।

ওয়াঙের বৌ তার শেষ কয়টা বছর সুখে কাটিয়ে যখন চোখ বুঁজলো, তখন চিয়েন চাং, সুং চাং আর জেনী বড়ো হয়ে গেছে, মিনিরও বয়েস আট কি নয়। [ক্রমশঃ।

আই-এফ-এ শীল্ডের স্থগিত সেমি-ফাইন্যাল খেলা ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং-এর প্রথম দিন অতিরিক্ত সময় খেলা হওয়ার পর অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। এবং দ্বিতীয় দিনের খেলায় ক'লকাতা ফুটবল ময়দানে আর এক কলঙ্কময় ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ক'লকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল—ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যার একটা নিজস্ব গৌরবময় ইতিহাস আছে, তার এ আচরণ কোন ক্রমেই ক্ষমার যোগ্য নয়। খেলার মাঠে যে ব্যবহার তাঁরা করেছেন, তার তুলনা নেই। বহিষ্কৃত খেলোয়াড় নারায়ণকে মাঠের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার অর্থ ফুটবল খেলার নিয়মকে অস্বীকার করা। রেফারী জ্যোতি দত্তের খেলার পরিচালনায় হয়তো ত্রুটি ছিল কিন্তু এ উন্মত্ততা কোন ক্রমেই খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়। আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ ইষ্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, অন্যায়ের গুরুত্ব অনুযায়ী যথাযথ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে দু'বার এরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।

ইষ্টবেঙ্গল দল কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ইনজাংসন জারী করে রোভার্স কাপ ও ডি, সি, এফ, প্রতিযোগিতায় খেলতে গেছে। রোভার্স কাপের খেলায় দ্বিতীয় রাউণ্ডে ক্যালটেক্সের কাছে ৩-১ গোলে পরাজিত হয়েছে।

• • • •

আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় গতবারের বিজয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবারেও বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছেন। আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয় বেরিলীতে। ফাইন্যাল খেলা হয় তিরুপাথিতে। আঞ্চলিক খেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং-কে ১১-০, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ৭-০, জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২-১ গোলে এবং ফাইন্যালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে ২-১ গোলে পরাজিত করে অঞ্চলের বিজয়ী হয়!

দক্ষিণাঞ্চলের বিজয়ী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১-০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, চুনী গোস্বামীর কৃতিত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু যে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন তা নয়, এবারে আশুতোষ ট্রফি লাভে সমর্থ হয়েছেন।

• • • •

বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আরম্ভ হওয়ার আগেই ১৯৫৮ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্য্যায়ের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। কয়েকটি দেশ ইতিপূর্বে মূল প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে।

বিশ্ব ফুটবল বা জুলেস রিমেট কাপ প্রতিযোগিতা বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড়রাও অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। ১৯৩০ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতার আরম্ভ হয়। ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ জুলেস রিমেটের নামানুসারে বিজয়ী পুরস্কারের নামকরণ হয়। ঠিক হয় অলিম্পিকের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অলিম্পিকের মত প্রতি চার বৎসর অন্তর এক একটি দেশ বিশ্ব ফুটবল কাপের পরিচালনা করবে।

এবারের বিশ্ব কাপের মূল প্রতিযোগিতায় ১৬টি দেশকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করে লীগ প্রথায় খেলা পরিচালনা করা হবে সুইডেনে। ১৬টি দেশের মধ্যে ইতিমধ্যে ৮টি দেশ মূল প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ তারিখে ১৬টি দেশকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করার দিন স্থির হয়েছে। তারপর জুনের ৮ তারিখ থেকে সুইডেনের ৪টি অঞ্চলে ৪টি গ্রুপের লীগ খেলা আরম্ভ হবে।

• • • •

রেলওয়ে স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড এশিয়ান রেলওয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উৎসব নাকচ করে দিয়েছেন। ভারতীয় রেলওয়ে ক্রীড়াসংস্থার প্রচেষ্টায় ডিসেম্বর মাসে উৎসবের আয়োজন ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। কারণ এশিয়ার বিভিন্ন রেলসংস্থা যোগদানের তেমন আগ্রহ প্রকাশ না করার জন্য এশিয়ান রেলওয়ে ক্রীড়া উৎসব বন্ধ হয়ে গেল।

• • • •

এবারে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অর্থাৎ সন্তোষ ট্রফির খেলা বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রথায় অনুষ্ঠিত হবে।

চারটি 'পুলে' লীগ প্রতিযোগিতার মত খেলা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দলের সম্মতিক্রমে খেলার স্থান নির্দ্ধারিত হবে। প্রত্যেক পুলের শ্রেষ্ঠ দুটি দল নিয়ে মূল প্রতিযোগিতা নক আউট প্রথায় অনুষ্ঠিত হবে। মূল প্রতিযোগিতার স্থান নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

• • • •

বোম্বাই রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে খেলাধুলায় উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য এক স্পোর্টস কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। খেলাধুলায় যাঁদের প্রতিভা আছে এবং খেলাধুলায় নৈপুণ্য দেখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে চান, তাঁদের মাসিক বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করাই স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্দেশ্য। যাঁরা স্কুল কলেজের ছাত্র নন অথচ খেলাধূলায় উৎসাহী তারাও ৫০ থেকে ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি পাবেন। এই পরিকল্পনা খাতে বোম্বাইয়ের শিক্ষা দপ্তর ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। বোম্বাই সরকারের এ পরিকল্পনা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। অন্যান্য রাজ্য সরকারের এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

• • • •

অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকে টীমস্ গেম বাদ দেওয়ার যে প্রশ্ন উঠেছিল, সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভায় সে প্রস্তাব পাশ হয়নি। তবে ভবিষ্যৎ অলিম্পিক খেলাধূলা থেকে ইকোয়েষ্ট্রিয়ান, জিমন্যাষ্টিক্‌স, পেণ্টাথলন ও সাইক্লিং দলগত প্রতিযোগিতা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

* * * *

সাঁতার

তিন দিনব্যাপী আজাদ হিন্দ বাগে, রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। এবং এবারের অনুষ্ঠানে মোট ১৫টি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম তিনের অনুষ্ঠানে বেণীমাধব তালুকদার ও সন্ধ্যা চন্দ্রের কৃতিত্ব সবিশেষ চোখে পড়ে। প্রথম দিনে চারটি। দ্বিতীয় দিনে পাঁচটি এবং তৃতীয় দিনে ছটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম দিনে বেণী তালুকদার ২ মি ৫৩ সেঃ ২০০ মিটার বুক সাঁতারে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় রেকর্ড ছিল ৩ মি ৪ সেঃ (সামসের খান—সার্ভিসেস)

সন্ধ্যা চন্দ্র এই দিন দুটি রেকর্ড করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। অপর দুটি রেকর্ডের সৃষ্টিকারী দুলাল কুণ্ডু এবং কানাইলাল চ্যাটার্জ্জি।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানেও বেণীমাধব তালুকদার পুনরায় মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। পূর্বদিন ২০০ মিটার বুক-সাঁতারে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করার পর আবার ১০০ মিটার বুক-সাঁতারে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ইতিপূর্ব্বে ১০০ মিটার বুক-সাঁতারে রঘুপৎ সিংএর রেকর্ড আছে ১ মিঃ ২২.৪ সেঃ বাংলার রেকর্ড ছিল বি পাঁড়ের ও পি মল্লিকের ১মিঃ ১১.৮ সেঃ নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

বুক-সাঁতার ছাড়া শনিবার সন্ধ্যায় মহিলা, জুনিয়ার ও ইণ্টারমিডিয়েট ও পুরুষ বিভাগে একটি করিয়া রেকর্ড হইয়াছে। এই রেকর্ডের অধিকারী যথাক্রমে সন্ধ্যা চন্দ্র, সত্যেন দাস, বিনোদ মজুমদার ও ৪ ১০০ মিটার রিলে রেসে ষ্টেটট্রান্সপোর্ট নতুন রেকর্ড করেন।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে জগৎজননী ক্লাবের অরুণ সাহা বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোকে রেকর্ড হইতে ২.২ সেকেণ্ডের কম সময় নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। মাত্র তিন সেকেণ্ডের জন্য তিনি ভারতীয় রেকর্ড স্পর্শ করিতে পারেন নাই।

এবারের প্রতিযোগিতায় সন্ধ্যা চন্দ্রের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মোট ৪টি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়া, তিনটি রাজ্য রেকর্ড সমেত ৪টি বিষয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে তাঁহার নিজ রেকর্ড অপেক্ষা ৪.১ সেঃ কম সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কল্যাণী বসুও পূর্ববর্তী রাজ্য রেকর্ড ভঙ্গ করেন। জুনিয়ারদের তপন দত্ত ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই এবং অনিল চন্দ্র ১০০ মিটার রেকর্ড বেষ্ট ষ্ট্রোক ইণ্টারমিডিয়েটে চাতরার দুলাল কুণ্ডু ১০০ মিটার বেষ্ট ষ্ট্রোকে ব্যক্তিগত ভাবে রেকর্ড করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন। দিনের সর্ব্বশেষ রেকর্ড হয় জুনিয়ারদের ৪ ১০০ মিটার রিলে রেসে। ন্যাশান্যাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যগণ এই রেকর্ড করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন।

ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এথেলেটিক ক্লাব গত দুই বারের মত এবারেও দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ অর্জ্জন করেন। এবারের প্রতিযোগিতায় তাঁরা ৭১ পয়েণ্ট অর্জ্জন করেন।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

একটি অলস দ্বিপ্রহরে

আজকের এই অলস মধ্যাহ্নের স্বপ্নালুতা ছড়িয়ে গেল আমার মনে,
আমি কর্মী আমি শ্রান্ত আমি শান্তির প্রত্যাশী।
স্বপ্নালুতা ভঙ্গ হোলো না হঠাৎ ষ্টার্ট-দেওয়া মোটরের ঘড়ঘড় শব্দে,
হোলো না ইট-কাঠ-পেরেকের ঠক্-ঠক্ ধম্-ধম্ শব্দে।
আমাকে শান্ত ক'রে রাখল নীলাকাশের তরুণ নীলিমা।

ঝুড়ি-ভর্তি মাটি-চুণ-সুরকি সিমেণ্ট নিয়ে চলেছে মজুর
—তৈরী হবে ত্রিতল প্রাসাদ
কিন্তু তাও ভঙ্গ করতে পারল না মনের মসৃণতাকে
যেখানে পাখীর ডাক গান হ'য়ে আসে
আর ছায়াশীতল তৃণাগ্রভাগে জ্বলতে দেখি রৌদ্রের হীরক খণ্ড।

আমি তৃপ্ত আমি মুগ্ধ।
আমার জন্য রক্ষিত হ'য়ে আছে নীলাকাশের পীতাভ সুরা,
আর পাখী ফুল-পাতার বিচিত্র-বর্ণে আছে অটুট হ'য়ে বিচিত্র আস্বাদ!

আমি মুগ্ধ—আমি ধন্য—
এই অলস মধ্যাহ্নের অনাবিল শান্তি রক্ষিত হয়েছে আমারি জন্য
আমি দৃষ্টি বিছিয়ে রাখব এই শহরেরও উপরে
যে আকাশ সমস্ত যুগকে ধারণ করে আছে সেখানে—
আর সমস্ত যুগের অগাধ শান্তি—যত জমা হয়েছে
তাও নেমে আসবে এই এখানে—আজকের এই অলস মধ্যাহ্নে।

পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ

অবিভক্ত বাংলায় পাট ছিল নিঃসন্দেহে সকল সম্পদের সেরা। এই পাট উৎপন্ন হত কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে, বাংলার যে বৃহত্তর অংশ আজ পূর্ব্ব-পাকিস্তান নামে পরিচিত সেখানটায়। পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলই না, এমন কি সেদিন অবধি।

দেশ বিভাগের পর ভারতের পাটের চাহিদা মেটান একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় সরকার এ ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষের যত উন্নতি হ'তে পারে তজ্জন্য উৎসাহ যোগাতে থাকেন। এর ভেতর পূর্ব্ববঙ্গ থেকে পাটের চাষাবাদে অভিজ্ঞ বহু কৃষক পরিবার এদিকে চলে এল বলে যথেষ্ট সুবিধা হয়ে যায়। সেই থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাটের উৎপাদন বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। ভারতের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য যেমন বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, ত্রিবাঙ্কুর কোচিন বা কেরল—এ সব অঞ্চলেও পাটের চাষ অবশ্য চলেছে কিন্তু তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে অনেকখানি।

সরকারী একটি হিসাবে দেখা যায়, দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রায় ২৬৬ হাজার একর পরিমিত জমি পাট চাষের অধীনে ছিল। তখন থেকেই খুব দ্রুত এই চাষের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে এবং বিগত বর্ষে (১৯৫৬-৫৭ সাল) এইটি এসে দাঁড়ায় ৭২০ হাজার একর। পাট উৎপাদনে কৃষক সমাজকে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকার উন্নত ধরণের পাটবীজ বিতরণ করে আসছেন। চলতি বছরে ১৬ হাজার একর জমিতে ফসল উৎপাদনের উপযোগী প্রায় ১ হাজার মণ পাটবীজ বিলি করা হয়।

আশা সহকারে আর একটি জিনিষ লক্ষ করা যায়—পাট চাষের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় মেস্তার উৎপাদনও বেড়ে চলেছে। সরকারী হিসাব থেকেই জানতে পারা গেছে, ১৯৫৬-৫৭ সালে অর্থাৎ বিগত বর্ষে যে ক্ষেত্রে পাট বপন করা হয় ৭২০ হাজার একর জমিতে, সে ক্ষেত্রে মেস্তা চাষের অধীন জমির পরিমাণ ছিল ২১৭ হাজার একর। অথচ এর ৪ বছর আগে ১৯৫২-৫৩ সালে ৮২০ একর পরিমিত জমিতে পাট চাষ হয়েছিল—অপর দিকে মেস্তা বপন করা হয়েছিল সে বছরে মাত্র ১৭ হাজার একর জমিতে। চলতি বছরেও পাটের উৎপাদন যেমন বেড়েছে, মেস্তার উৎপাদনও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়।

বহু কাল থেকেই বিশ্বে পাট একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্প হিসাবে গণ্য এবং লৌহ অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব বা প্রয়োজন কিছুমাত্র কম বলা চলবে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাট তথা পাটজাত দ্রব্য নানা কারণে অপরিহার্য্য বলা যায়। সারা বিশ্বের বাজারে এই উপ-মহাদেশের পাট কত কাল একচেটিয়া অধিকার চালিয়ে এসেছে। বছরে প্রায় ৪০ কোটি টাকা বিদেশ থেকে সেদিন অবধি ভারত সংগ্রহ করে এসেছে—এই মূল্যবান পণ্য-সম্ভার সরবরাহ করেই। দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ তথা নয়া ভারত ইউনিয়ন পাটের ব্যাপারে পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল হয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে সে অবস্থাটি আর হুবহু নেই। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি পাট-শিল্পের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আজ আর এইটি নতুন করে বলবার নয়। শুধু অবশিষ্ট ভারতই নয়, বহির্ভারতের পাটের চাহিদা মেটাবার দাবীও পশ্চিমবঙ্গ রাখবার সাহস করছে ক্রমেই। এখানে অসংখ্য পাটকল রয়েছে ভারতের অন্যত্র যা নেই, পাকিস্থানে ত' নয়ই। সরকারী প্রযত্ন ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ যে আশাতীত সাফল্য অর্জ্জন করবে, এ নিঃসন্দেহ।

শিল্প হিসাবে নারকেল ছোবড়া

সাধারণ দৃষ্টিতে নারকেলের ছোবড়া বা আঁশ একটি তুচ্ছ জিনিষ, কিন্তু এর শিল্পগত মূল্য ও ব্যবহারিক গুরুত্ব আসলে যথেষ্ট বলতে হবে। এ যুগে নারকেল ছোবড়া শিল্প মোটেই অপ্রধান বা উপেক্ষণীয় একটি শিল্প নয়। অন্ততঃ ভারত এই শিল্প থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করছে বেশ কিছু পরিমাণে।

প্রায় একশ' বছর হ'ল ভারত-ভূমিতে এই শিল্পের সূত্রপাত আমরা দেখতে পাই। বুনো নারকেলের ছোবড়া বা আঁশ দিয়ে রকমারী পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রথম কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল আলেপ্পোতে। এক্ষণে দক্ষিণ-ভারতের উপকূলবর্ত্তী অনেক জায়গায় বিশেষ করে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন বা কেরল রাজ্যে এ শিল্প প্রচার লাভ করেছে প্রচুর। ছোবড়া হতে মাদুর, রাগ, কার্পেট বা গালিচা, পা-পোষ ইত্যাদি তৈরীর জন্য স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছে বহু কারখানা এবং এগুলোতে নিযুক্ত রয়েছে হাজার হাজার কুশলী কর্ম্মী ও কারিগর।

নারকেল ছোবড়া শিল্পটি এদেশে যেভাবে গড়ে উঠছে, তাতে এইটি নিঃসংশয়ে কুটীরশিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত। এর প্রধান কারণ হ'ল, এই শিল্প সংগঠনে ভারী যন্ত্রপাতি একান্ত প্রয়োজন হয় না, ছোটখাট যন্ত্রপাতি হলেই সুষ্ঠু ভাবে কাজ চলে যায়। এ প্রসঙ্গে একটি জিনিষ অবশ্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। ছোবড়া ও ছোবড়াজাত পণ্য উৎপাদনের ব্যাপারে বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থানই সর্ব্বাগ্রে।

ভারতে বৎসরে উৎপন্ন নারকেল ছোবড়া বা আঁশের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন। এর বেশীর ভাগই দেশের অভ্যন্তরে তন্তু প্রস্তুতের কাজে লাগান হয় এবং আঁশ বা ছোবড়ার বাকী অংশটা বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে রপ্তানী হয়ে যায়।

আলোচ্য ছোবড়া শিল্পের প্রসারের জন্য নারকেল গাছের চাষ ব্যাপক আকারে চাই, এটি না বললেও চলে। এই মাত্র বলা হ'ল—এই শিল্পের অর্থাৎ ছোবড়া থেকে মানুষের প্রয়োজন উপযোগী পণ্যসৃষ্টিতে এখন অবধি ভারতেরই বোধ হয় প্রথম স্থান। সে হিসাবে কাঁচা মালের যাতে অভাব না হয়, তার জন্যে নারকেল গাছের চাষও এখানে পর্য্যাপ্ত দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১৬ কোটি একর জমিতে এই চাষাবাদ চলছে এবং এতে বছরে গড়পড়তা ফলন হয় তিন শত কোটির অধিক নারকেল। মাদ্রাজের মালাবার জেলায় এবং পশ্চিম উপকূলে বিশেষতঃ কেরলে নারকেলের চাষ সবচেয়ে বেশী। এর ভেতর একমাত্র কেরলেই নারকেল উৎপন্ন হয়ে থাকে প্রায় দেড় শত কোটি। ফলতঃ ছোবড়া কারখানার সংখ্যা এই অঞ্চলে তুলনায় অধিক গড়ে উঠেছে। সমগ্র ভারতে বছরে নারকেল আঁশের যে তন্তু উৎপাদিত হয়, তার পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন। এর শতকরা ৮০ ভাগ কাটা হয় চরকায় এবং বাকীটা হাতে বা টাকুতে। একটু নিকৃষ্ট ধরণের যে তন্তু, সেই দিয়েই সাধারণতঃ তৈরী হয়ে থাকে বহু প্রয়োজনীয় দড়ি বা কাছি। এ দেশের মোট উৎপন্ন তন্তুর মধ্যে প্রায় ২৫ হাজার টন তন্তু ব্যবহার করা হয় কার্পেট বা গৃহতল আচ্ছাদক নির্ম্মাণ কাজে। ভারত থেকে বিদেশে যে তন্তু রপ্তানী হয়ে যায়, তার পরিমাণ ৪০ হাজার টনের উপর, ভারতীয় কয়ার (নারকেল ছোবড়া) বোর্ড আভ্যন্তরীণ বিপণনের উদ্দেশ্যে যে অস্থায়ী কমিটি গঠন করেন, তাঁদের একটি রিপোর্টে প্রকাশ—ভারতে দড়ি বাদেই ছোবড়াজাত পণ্য বছরে উৎপন্ন হয়ে থাকে প্রায় ২১ হাজার টন। অপর দিকে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অনধিক ১ হাজার টন আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে লাগান হয় এবং অবশিষ্ট সমগ্র পণ্য রপ্তানী হয়ে যায় বহির্ভারতে। ছোবড়াজাত দ্রব্যাদির মান যাতে উন্নত থাকে এবং বাজারে এর চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ে বৃদ্ধি পায়, কয়ার বোর্ড সেদিকে নজর রাখছেন।

নারকেল আঁশ বা ছোবড়া উৎপাদন প্রসঙ্গে ভারতের পাশাপাশি সিংহলেরও নাম করতে হয়। যতদূর জানা যায়, সিংহল থেকেও বছরে প্রচুর পরিমিত আঁশ রপ্তানী হয় বিভিন্ন বিদেশী রাজ্যে। সিংহল ও ভারতের পরবর্তী পর্য্যায়ে নাম করা যায় অনায়াসেই মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশগুলোর। এ সকল অঞ্চলেও পর্য্যাপ্ত নারকেল ও নারকেলের ছোবড়া উৎপন্ন হয়ে থাকে। ভারত থেকে যে নারকেল আঁশ রপ্তানী হয়, তা প্রধানতঃ বৃটেন, গ্রীস, ইটালী, কানাডা—এ রাজ্যগুলোতে যায়। প্রাপ্ত একটি হিসাব—১৯৫৫-৫৬ সালে ভারত থেকে রপ্তানীকৃত নারকেল আঁশের পরিমাণ—১৩,৩২০ হন্দর, এর পূর্ব্ববর্তী বছরে বিদেশে মাল রপ্তানী হয়ে গেছে ১০,৭২০ হন্দর। অপর দিকে ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারত থেকে রপ্তানীকৃত নারকেল ছোবড়াজাত পণ্যের পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে প্রায় ৪ লক্ষ ও ৪ লক্ষ ২৫ হাজার হন্দর।

উক্ত দুই বছরে ভারতে উৎপন্ন প্রায় ২ লক্ষ হন্দর নারকেল আঁশের তন্তু রপ্তানী হয়েছে বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে। ভারতীয় তন্তু আমদানীকারক দেশগুলোর ভেতর বৃটেন, পশ্চিম-ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নেদারল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ—এ কয়টি নাম উল্লেখযোগ্য।

ম্যাংগানিজ খনিজপিণ্ড ও ক্রোমাইট

ম্যাংগানিজ উৎপাদনে ভারত বহু দিন বিশ্বের মধ্যে একটি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করছে। লৌহ ও ইস্পাত শক্ত করতে, এনামেল ব্লক নির্ম্মাণে, বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে এবং আরও কতকগুলো শিল্প ক্ষেত্রে এইটি একান্ত ভাবে চাই। কাজেই এর উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাবে বা পাচ্ছে, রাষ্ট্রের ততই ভাল।

ভারতীয় খনিপর্ষৎ-এর (ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অব মাইনস) রিপোর্ট যা পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, বর্ত্তমান আর্থিক বছরের প্রথম ৩ মাসে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুন মাস অবধি এখানে মোট ম্যাংগানিজ খনিজপিণ্ড উৎপাদিত হয়েছে ৪১৪,০০০ টন। এর ভেতর উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশে যথাক্রমে ১২২,০০০ টন এবং ৭২,২৩৬ টন ম্যাংগানিজ খনিজপিণ্ড উৎপাদন হয়েছে, এই দুইটি রাজ্যে উৎপাদনের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এইটিও লক্ষ্য করবার। পূর্ব্ববর্তী ৩ মাসের হিসাব অনুযায়ী উড়িষ্যায় খনিজপিণ্ড উৎপন্ন হয় ১১৩,০০০ টন এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে ৬৭,২৩৬ টন। ভারতের অন্যান্য যে কয়টি রাজ্যে ম্যাংগানিজ রয়েছে, সে সকল স্থানের উৎপাদনের হার নিম্নরূপ :—মধ্যপ্রদেশ ৭৬,০০০ টন, বোম্বাই ৭২,০০০ টন, মহীশূর ৫৭,০০০ টন এবং বিহার ১২,০০০ টন।

ভারতে ক্রোমাইটের উৎপাদন সম্পর্কেও আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। বলা বাহুল্য, ইস্পাত-শিল্পের সমৃদ্ধি এদেশে যত ব্যাপক হবে, ক্রোমাইটের ব্যবহারও বেড়ে যাবে সেই অনুপাতেই। এক্ষণে যেটি আবশ্যক, সে হচ্ছে ক্রোমাইট থেকে ইস্পাত-শিল্পের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রোমিয়াম ধাতু উৎপাদনের কারখানা গড়ে তোলা।

সম্প্রতি খনিপর্ষৎ ক্রোমাইট উৎপাদনের যে হিসাব প্রকাশ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে জুন অবধি সমগ্র ভারতে ক্রোমাইট উৎপন্ন হয়েছে ৪৪,৪৭৬ টন। পক্ষান্তরে লক্ষ্য করবার যে, এর পূর্ব্ববর্তী ছ'মাসে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের শেষার্দ্ধে মাত্র ২২.১১৫ টন ক্রোমাইট উৎপাদিত হয়েছিল; বর্ত্তমান বছরের (১৯৫৭) প্রথমার্দ্ধের মোট উৎপাদনের মধ্যে উড়িষ্যায় উৎপন্ন হয়েছে ৪০,৭৭,১ টন, বিহারে ১৯৮৬ টন, মহীশূরে ১৭১৩ টন।

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

সংগীতের আদি ইতিহাস ও রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি

শ্রীগৌর দাস

সঙ্গীতের মত পবিত্র শান্তিদায়ক, মনোমুগ্ধকর ও আনন্দদায়ক বস্তু পৃথিবীতে আর নাই। ইহা আমাদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সবের সঙ্গেই একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। শোক-দুঃখ নিবারণে, আনন্দে, এমন কি দেবতা-আরাধনায় সঙ্গীত একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামগ্রী। তাই সঙ্গীতের আদি ইতিহাস ও রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাই।

সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গেলে 'সঙ্গীত' বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা প্রয়োজন। গীত, বাদ্য ও নৃত্যের মিলনের নাম সঙ্গীত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে গীতের প্রভাব বেশী বলিয়া সঙ্গীত বলিতে আমরা গানকেই ধরিয়া লই।

সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। "কোন কোন মতে শিব সঙ্গীতের স্রষ্টা। এই বিশ্বের ছন্দময় গতি তাঁরই নৃত্যের প্রতীক। তবে প্রকৃতির মধ্যে যে একতানতা ও ছন্দ আছে, মানব-প্রকৃতিও যে তাঁরই অনুরূপ এবং আত্মার মধ্যেও সেই একতানতার সুরই বাজছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিখিল বিশ্বের গতিছন্দ ও সঙ্গীতের ছন্দ সেই একই সুরে বাঁধা আছে।"

"ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ও সঙ্গীতরত্নাকরেও সঙ্গীতের আদিতত্ত্ব পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে উৎপন্ন বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে বলে, বাক্ উৎপত্তি সময়ে কুণ্ডলিনী হতে উৎপন্ন সত্ত্বময়ী শক্তি রজোগুণানুবিদ্ধা হয়ে নাদরূপে অভিহিত হয়। এই নাদ থেকে সঙ্গীত। পরমেশ্বর শক্তির মিলনে এই আদি বা মহানাদ সৃজন করেন। এই হলো অব্যক্ত কারণভূত নাদ। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা যাকে বলেছেন শব্দব্রহ্ম, তার থেকেই রাগ-রগিণীদের উৎপত্তি হয়েছে।"

রাগ ও রাগিণীর ভাগ যে কবে থেকে আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছে সে কথা সঠিক ভাবে কিছু বলা যায় না।

কথিত আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক পৃথিবী সৃজন কালে আদ্যাশক্তির (কাহারও কাহারও মতে বিধাতার) আদেশে দেবাদিদেব মহাদেব শিঙ্গা-ডমরু সহযোগে ভগবান ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সমক্ষে মহানৃত্যগীত আরম্ভ করেন। পুরাণে ইহাকেই 'শিবতাণ্ডব' বা 'মহাকালনৃত্য' বলা হইয়াছে। এই নৃত্যগীতের ফলেই ভগবান নারায়ণ দ্রবীভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে দেব পঞ্চাননের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটি রাগের উদ্ভব হয়। এই পাঁচটি রাগ হইতেছে ভৈরব, শ্রী, মেঘ, বসন্ত ও পঞ্চম। গৌরীর মুখ হইতে নটনারায়ণ বা বৃহন্নট নামে একটি রাগ নিঃসৃত হয়। ইহার পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট হইতে সঙ্গীতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও উক্ত ছয়টি রাগকে ছয়টি ঋতুতে আলাপ করিবার ব্যবস্থা করেন এবং ছয়টি রাগের ছত্রিশটি রাগিনী বা ভার্য্যা গঠন করেন। পরে তিনি ভরত, নারদ, হুহু, রম্ভা ও তম্বরু—এই পঞ্চ শিষ্যকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। ভরত আবার উক্ত রাগ-রাগিণীর পুত্র-পুত্রবধূরূপে আরও আটচল্লিশটি উপরাগিণী সৃজন করেন। ইহাই সঙ্গীতের আদি ইতিহাস। কিন্তু উপরোক্ত মতগুলি ছাড়াও আরও একটি মত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা নিম্নরূপ।

"সঙ্গীত-সাধকরা তাঁদের চিন্তাধারার বিচিত্র কল্পনা দ্বারা রাগের সৃষ্টি কোরলেন এবং এক একটি দেবতা জ্ঞানেই তাদের নিজ নিজ আসনে অধিষ্ঠিত কোরলেন। রাগের রূপ বর্ণনা দ্বারা দেখা যায় বেদোক্ত দেবতার রূপের পুনরাবৃত্তি মাত্র। সঙ্গীতসাধক মুনি-ঋষিরা শিব এবং শক্তিকে কেন্দ্র করে রাগ সৃষ্টি কোরলেন। প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থকারদের মতে নাদকেই শিব ব'লে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যিনি সংহারকর্ত্তা। তাঁর পঞ্চমুখ থেকে অর্থাৎ অগ্নির পঞ্চশিখা থেকে পাঁচটি রাগের উৎপত্তি এবং নাদ-রূপিণী শক্তি থেকে একটি রাগের উৎপত্তি। এই ছয়টি রাগের উৎপত্তিস্থল শিব এবং শক্তি এই ছয়টি রাগ থেকেই ছত্রিশটি রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়।" এর ভিতরেও কয়েকটি মতান্তর আছে। একটি হইতেছে ব্রহ্মার মত এবং অপরটি হনুমন্ত মত।

ব্রহ্মার মতে আদি ছয় রাগের নাম হইতেছে—(১) শ্রী, (২) ভৈরব, (৩) পঞ্চম, (৪) মেঘ, (৫) বসন্ত ও (৬) বৃহন্নট বা নট-নারায়ণ। এবং হনুমন্ত মতানুযায়ী আদি ছয় রাগ হইতেছে—(১) ভৈরব, (২) শ্রী, (৩) মেঘ, (৪) হিন্দোল, (৫) মালকোশ ও (৬) দীপক।

ইহাদের আশ্রিতা রাগিণীগুলির বেলায়ও মতভেদ পরিলক্ষিত

হয়। ব্রহ্মার মতে আদি ছয় রাগের রাগিণী হইতেছে ছত্রিশটি। আর হনুমন্ত মতে আদি ছয় রাগের রাগিণী হইতেছে ত্রিশটি।

ব্রহ্মার মতে আদি ছয় রাগের রাগিণীগুলির নাম হইতেছে—

(১) ভৈরব রাগের রাগিণী :—ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকেলী, গুণকেলী সৈন্ধবী ও বাঙালী।

(২) শ্রী " " :—মালশ্রী, ত্রিবনী, গৌরী, কেদারী, পাহাড়ী ও মধুমাধবী।

(৩) মেঘ " " :—মল্লারী, সৌরাটি, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গার।

(৪) বসন্ত " " :—দেশী, দেবগিরি, বৈরাটি, তোড়ী, ললিতা ও হিন্দোলী।

(৫) পঞ্চম " " :—বিভাস, ভূপালী, কর্ণাটি, বড়হংসিকা, মালবী ও পটমঞ্জরী।

(৬) নটনারায়ণ বা বৃহন্নট রাগের রাগিণী :—কামোদী, কল্যাণী, অভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও হাম্বীর।

আবার হনুমন্ত মতে আদি ছয় রাগের রাগিণীগুলির নাম হইতেছে :—

(১) ভৈরব রাগের রাগিণী :—ভৈরবী, বাঙালী, সৈন্ধবী, বৈরাটি ও মধুমাধবী।

(২) শ্রী " " :—মালশ্রী, মালবী, ধনশ্রী, বাসন্তী ও আশাবরী।

(৩) মেঘ " " :—সৌরাটি, টঙ্কা, ভূপালী, গুর্জ্জরী ও দেশকারী।

(৪) হিন্দোল " " :—রামকেলী, বেলাবলী, ললিতা, পটমঞ্জরী ও দেশাক্ষী।

(৫) মালকোশ " " :—কুকুভা, খাম্বাবতী, গুণকলী, গৌরী ও তোড়ী।

(৬) দীপক " " :—দেশী, কামোদী, কেদারী, কর্ণাটি ও নাটিকা।

এইগুলি ছাড়াও হনুমন্ত মতে আরও দু'টি মতান্তর দেখা যায়। মতান্তরে ছয়টি রাগ। যথা :—

১। (ক) ভৈরব, (খ) কৌশিক, (গ) হিন্দোল, (ঘ) দীপক, (ঙ) শ্রী ও (চ) মেঘ। এবং

২। (ক) ভৈরব, (খ) পঞ্চম (গ) দেশাখ্য (ঘ) নাট (ঙ) মল্লার ও (চ) গৌড়মালব।

ইহাদেরও প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া ত্রিশটি ভার্য্যা বা রাগিণী আছে। যথা :—

১। (ক) ভৈরব রাগের রাগিণী :—ভৈরবী, মধ্যমাদী, বাঙালী, বৈরাটি ও সৈন্ধবী।

(খ) কৌশিক " " :—তোড়ী, খাম্বাবতী, গৌরী, গুণক্রী ও কুকুভা।

(গ) হিন্দোল " " :—বেলাবলী, রামকিরী, দেশাখ্য, পটমঞ্জরী ও ললিতা।

দীপক " " :—কেদারী, কানাড়া, দেশী, কামোদী ও নাটিকা।

(ঙ) শ্রী " " :—বাসন্তী, মালবী, মালশ্রী, ধনাশিকা ও আশাবরী।

(চ) মেঘ " " :—মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী, গুর্জ্জরী ও টঙ্কী।

উল্লিখিত মতান্তর অনুযায়ী দ্বিতীয়টির অশ্রিতা রাগিণীগুলির নাম হইতেছে—

২। (ক) ভৈরব রাগের রাগিণী :—বাঙালী, গুণকীরি, মধ্যমাদী, বসন্ত ও ধনাশ্রী।

(খ) পঞ্চম " " :—ললিতা, গুর্জ্জরী, দেশী, বরাড়ী ও রামকৃত।

(গ) দেশাখ্য " " :—ভূপালী, কুড়ারী, কামোদী, নাটিকা ও বেলবলী।

(ঘ) নাট " " :—নটনারায়ণ, গান্ধার, সালগ, কেদারী, ও কর্ণাটী।

(ঙ) মল্লার " " :—মেঘমল্লারী, মালকৌশিক, পটমঞ্জরী, আশাবরী ও সাবেরী।

(চ) গৌড়মালব " " :—হিন্দোল, ত্রিবণ, অন্ধারী, গৌরী ও পটহংসিকা।

উল্লিখিত রাগিণীগুলি ছাড়া আরও বহু উপরাগিণী আছে। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সময় ষোড়শ সহস্র গোপিনীরা প্রত্যেকে একটি করিয়া উপরাগিণীর সৃজন করেন। বর্ত্তমানে

গায়ক-গায়িকারা উপরাগিণীর সংমিশ্রণে বহু উপরাগিণী সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের কয়েকটির নাম হইতেছে, যোগ, মারুবেহাগ, গুজ্জিকানাড়া, মালগুঞ্জি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্রহ্মার ও হনুমন্ত মতানুযায়ী রাগগুলি কোন্ কোন্ ঋতুতে আলাপ করা উচিত তাহা নিম্নরূপ।

১। ব্রহ্মার মতানুযায়ী—(ক) গ্রীষ্মকালে—পঞ্চম, (খ) বর্ষাকালে—মেঘ, (গ) শরৎকালে—ভৈরব, (ঘ) হেমন্তকালে—শ্রীরাগ, (ঙ) শিশিরে—নটনারায়ণ বা বৃহন্নট এবং (চ) বসন্তকালে—বসন্ত।

২। হনুমন্ত মতানুযায়ী—(ক) গ্রীষ্মকালে—দীপক, (খ) বর্ষাকালে—মেঘ, (গ) শরৎকালে—ভৈরব, (ঘ) হেমন্তকালে—মালকোশ, (ঙ) শিশিরে—শ্রীরাগ, এবং (চ) বসন্তকালে—হিন্দোল।

উপসংহারে আমরা দেখিব যে, সচরাচর কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ রাগিণীগুলি আলাপ করা হয়; তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দিতেছি।

পূর্ব্বাহ্ণ—গুর্জ্জরী, পঞ্চম, ললিত, ভৈরবী, বিভাস, সোহিনী, সুভাগা, কৌমারিকা, রামকেলী, আশাবরী, পটমঞ্জরী, ভাটিয়ার, যোগিয়া, খট্, জৌনপুরী ইত্যাদি।

মধ্যাহ্নে—টোড়ী, ধানশ্রী, বৈরাগী, মায়ূরী, বড়ারী, সারঙ্গ, বেলাবলী, মারহাট্টী, মূলতান, বেলোয়ারী ইত্যাদি।

অপরাহ্নে—গৌরী, দীপিকা, ইমন, হাম্বীর, মালশ্রী, পূরবী, কানাড়া, কেদারিকা, আশোয়ারী, শ্রীগন্ধার, কল্যাণ ইত্যাদি।

নিশীথে—দেশ, বসন্ত, বেহাগ, সুরট, মল্লার, বাগেশ্রী, ঝিঁঝিট, সাহানা, মালকোশ ইত্যাদি।

গৌড়মল্লার—সর্ব্বসময়ে গাওয়ার উপযোগী।

আমার কথা (৩৪)

সুজিত নাথ

কলম্বাসের মাতৃভূমি স্পেন দেশের বুকে উদ্ভব হয়েছিল গীতার যন্ত্রের। আজ থেকে বহু বর্ষ আগে এক দুই তো নয়ই—এমন কি এক-শ, দুশোও নয়—প্রায় দু' হাজার বছর আগে। বোধ হয় খৃষ্টের সমসাময়িক সময়ে, স্পেনীয় গীতার সেতারের মত বাজে। বহুকাল পরে প্রায় আঠার শ' বছর পরে হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা দেখল যে যন্ত্রটির বুক থেকে তারগুলো যদি একটু উঁচু করে বাঁধা যায় তাহলে শ্রুতিমাধুর্যের দিক দিয়ে তাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা যায়। এই ভাবে সৃষ্ট হ'ল হাওয়াইয়ান গীতার। সুদূর ভারতবর্ষে ইংরেজের উপনিবেশ স্থাপনের পর গীতারের প্রচলনও হ'ল, তবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ভাবধারায় দেশীয় পরিবেশে তাকে পরিচিত করলেন এক খ্যাতিমান বাঙালী আজ থেকে মোটে চব্বিশ বছর আগে! প্রতীচ্যের দেহের শোভা বর্ধন করলেন তাকে প্রাচ্যের বেশভূষায় সজ্জিত করে, পশ্চিমের আবহাওয়াকে পরিপূর্ণরূপে পূর্বের আবহাওয়ার অনুকূল করে তুললেন, এক কথায় সঙ্গীতের দরবারে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের যুগান্তকারী সমন্বয় ঘটালেন বাঙালী সুজিতকুমার নাথ।

খুলনা জেলার স্বর্গীয় শিশিরকুমার নাথের পুত্র সুজিতকুমার নাথ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর পৃথিবীর আলো প্রথম দর্শন করলেন। কলকাতার এক মিশনারী স্কুলের বোর্ডিংবাসী হয়ে অধ্যয়ন সুরু হোল সুজিতকুমারের। ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করে মায়ের সঙ্গে চলে যেতে হ'ল ঢাকায়। মা স্বর্গীয়া সরলাবালা নাথ ঢাকায় ইডেন হাই স্কুল ফর গার্লস্‌এর শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে বালক সুজিতকুমার ছায়াচিত্র-গৃহগুলির আশে-পাশে ঘুরে বেড়ান। সিনেমার প্রতি আকর্ষণে নয়, সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণে। চলচ্চিত্রের তখন নির্বাক-যুগ। তখনও তার মুখে কথা ফোটেনি। ছবিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে প্রতি প্রদর্শনীতে একদল করে বাদকরা নিয়োজিত থাকতেন। সেই বাজনা শোনার আশায় সুজিতকুমার ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কলকাতার স্কুলে পিয়ানো, বেহালায় হাতে খড়ি হয়েছিল সুজিত নাথের। সঙ্গীতানুরক্তি সেই থেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল সুজিতকুমারের মনে। তা ছাড়া তার উপর সমর্থন এল পিতৃদেবের কাছে, তিনি পাঠ দিলেন সেতারে। ঢাকার প্রখ্যাত বাদক স্বর্গীয় তিনকড়ি দে তাঁকে ঐ ভাবে দেখে ফেললেন একদিন। তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রত্যেক দিন প্রথম প্রদর্শনীতে বাজাবার সুযোগ পেলেন সুজিত নাথ। তখন তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। মায়ের দিক থেকে অবশ্য প্রথমে একটু আপত্তি উঠেছিল, পরে তিনিও সম্মতা হলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সুজিত নাথ। তারপর ঢাকার জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে পাশ করলেন আই-এ। কলকাতায় ৩য় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে পরিচিত হলেন স্বনামধন্য শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গে। রাইচাঁদ বাবু তাঁকে পাঠালেন বোম্বাই। সেখানে কারওয়াল মুভিটোনে কর্ম গ্রহণ করেন সুজিতকুমার (১৯৩১) ১৯৩৩-এই ফিরে এলেন কলকাতায়, যোগদান করলেন কলকাতার বেতারকেন্দ্রে। এখানে প্রবেশে তিনি প্রভূত সহায়তা পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রলাল দাস ও ডক্টর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীর কাছে। সেই সময় সুরেশচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ও সুরেন্দ্রলালের পরিচালনায় বেতারকেন্দ্রে গড়ে উঠেছিল একটি যন্ত্রীসঙ্ঘ। সেই সঙ্ঘের সভ্য ছিলেন সুজিতকুমার এবং অন্যান্যেরা—যাঁদের মধ্যে বাঙলার আর একজন দিকপাল সঙ্গীতশিল্পী দক্ষিণামোহন ঠাকুরের নামও উল্লেখযোগ্য। এই সময় পৃথকভাবে গীতার বাজত না, অর্কেষ্ট্রার মধ্যে সে স্থান পেত। তারপর একদিন তরুণ সুজিত-কুমারের কল্যাণে সঙ্গীতামোদী বাঙালী শুনতে পেল, ভারতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে হাওয়াইয়ান গীতার স্থান লাভ করেছে শুধু তাই নয়, দলের গাদার মধ্যে থেকে তার স্বর ভেসে এল না, ভেসে এল সম্পূর্ণ এককের পরিবেশ থেকে, বিশেষ কোণ থেকে, নির্দিষ্ট আসন থেকে। তারপর আজ সঙ্গীতের দরবারে গীতার তথা হাওয়াইন গীতারের প্রভাব সর্বজন-বিদিত। ১৯৪৩ থেকে ৫০ পর্যন্ত নিউথিয়েটার্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সুজিতকুমার। প্রথম রেকর্ড করলেন ১৯৩৭ কি ৩৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণামোহনের সঙ্গে, দক্ষিণামোহনের সঙ্গে সুজিত নাথের আট-দশটি রেকর্ড আছে, কাজী অনিরুদ্ধের সঙ্গেও আছে পাঁচ-ছটি, তাছাড়া দক্ষিণামোহন ও সুজিতকুমার এবং শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের এক সঙ্গে রেকর্ডও আছে দুটি। এখনও সুজিত নাথ নিয়মিত সঙ্গীত-সাধনা করে চলেছেন, বাঙলার বরণীয় কবি কাজী নজরুলের পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ, বেতারের বটুক নন্দী, কার্তিক বসাক প্রভৃতি এঁর ছাত্রকুলের গৌরবময় নিদর্শন। আজকের দিনের বাঙলাদেশের প্রধান গীতার-বিশেষজ্ঞ সুজিতকুমার নাথ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জি, নিস তাও মোয়ি প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পাশ্চাত্য ভাবধারায়লম্বী গীতার বাদকদের।

ভিটামিন যুক্ত

যাঁরা গুনের বিচার করেন

তাঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়ে **কোলে** বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোম্পানী
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১

পুষ্টিকর খাদ্য সম্ভার

থিনএরারুট
মেরী
পেটিটব্যুরো
নাইস
কলেজ
টেস্টা
ডেল্টা
ক্রীমক্র্যাকার
কয়েন
স্পোর্ট
জিঞ্জারনাট
হাউসহোল্ড
সল্ টী
মার্ভেলক্রীম
কাস্কেনয়ের
চকোলেটক্রীম
বেবীক্রীম
সল্ট ক্র্যাকার
প্রভৃতি
আরও অনেক রকম।

র ঙ্গ প ট

অন্তরীক্ষ

প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে চিত্রনির্মাণের বিষয়ে এখন অনেকেই চিন্তা করছেন। এ অতি আনন্দেরই কথা। একঘেয়ে চিরাচরিত ষ্টুডিওর ভিতর কৃত্রিম বাড়ীর দেখে দেখে যখন বিরক্তি ধরে যায়, সেই সময় এই উদ্ভাবন যথেষ্ট নতুনত্বেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়, ছবির মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাবল্য সঞ্চার করলেই এ পরীক্ষায় পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায় না, সেই সঙ্গে ছবির অন্যান্য আনুসঙ্গিক দিকগুলিও যেন পরিবেশের সঙ্গে সমান ভাবে তাল রেখে যেতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্ত কর্তব্য। উপরোক্ত ছবিটি প্রাকৃতিক পরিবেশপূর্ণ। পরিচালক রাজেন তরফদার এই জাতীয় চিত্রনির্মাণে কৃতকার্য হলেন বটে, তবে সার্থক হতে পারেন নি। অর্থাৎ পাশমার্ক পেয়ে উত্তীর্ণের তালিকায় তাঁর নাম পড়ে গেছে ঠিকই তবে একটি মনোরম সংখ্যা পেয়ে সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করতে তিনি পারলেন না। জমিদার মহেন্দ্রপ্রতাপের পুত্র নরেন্দ্রপ্রতাপ এবং পিতৃমাতৃহীন জয়ন্ত গাঢ় বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ. জয়ন্ত মহেন্দ্রপ্রতাপেরই আশ্রিত, সকলের বিশেষ স্নেহভাজন এবং সেরেস্তার একজন দায়িত্ববান কর্মী। পুরোহিতকন্যা বাণীর সঙ্গে তার প্রণয় হয় পরে তা রূপান্তরিত হয় বিবাহে। কিছুকাল বাদে এক কুৎসিত শ্রেণীর ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। জয়ন্ত তার সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারে যে, ছেলেবেলায় বাণীর সঙ্গে তারই বিবাহ হয়, পরে সে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়—এখন সে মাঝে মাঝে টাকা পেলেই থেমে যাবে নয় তো গণ্ডগোল সুরু করবে। জয়ন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। রাজী হয় সে লোকটির প্রস্তাবে। বাণী তখন সন্তান-সম্ভবা। জমিদারী খাজনা জমা দেবার জন্যে টাকা নিয়ে বাণীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করল। উদ্দেশ্য কাজ সেরে বাণীকে নিয়ে কিছুকালের জন্যে স্থান পরিবর্তন করে মনের অশান্তি দূর করবে। সেই সময় গগনরূপী গণেশ তাদের ধরে ফেলে ও টাকার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ও নিহত হয়। গণেশকে খুন করার অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তার করল জয়ন্তকে। ফলে জয়ন্ত মুছে গেল মহেন্দ্রপ্রতাপের মন থেকে কিন্তু তাঁর স্ত্রীর স্নেহ এতটুকু ম্লান হল না। বাণীর সন্তান-প্রসবের অব্যবহিত পরেই মৃত্যু হল, নবজাত সন্তানকে তিনিই নিয়ে এলেন নিজে কোলে নিয়ে—পরে ভুল বুঝতে পেরে (অর্থাৎ ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারে জয়ন্ত পড়েছে এই সত্যটি অনুভব করে) মহেন্দ্রপ্রতাপ ছুটলেন থানা থেকে জয়ন্তকে মুক্ত করে আনতে।

প্রথমেই মনে হয় ছবিটির নামকরণের কথা—সমগ্র ছবিটি দেখে বুঝতে পারলুম না যে এ নামের তাৎপর্য কি? বিবাহ নারীর জীবনে একটি অবিস্মরণীয় লগ্ন—সাত বছর বয়েসে যে মেয়ের বিবাহ হ'ল তা তার মনে থাকবে না? অত বড় ঘটনার স্মৃতিচিত্র কখনো কি তার মন থেকে মুছে যেতে পারে? শেষ দৃশ্যে ক্যামেরা জমিদার-বাড়ীর থামের দিকে এগিয়ে গেল কেন তাও একেবারেই বোধগম্য হ'ল না। অত বড় জমিদারীর খাজনার টাকা দিতে যাচ্ছে জয়ন্ত একা—কখনো হতে পারে! জুটো পাইক বা নেহাৎ কেউ সে সঙ্গে নিলে না (আর টাকার অঙ্কটিও তো সামান্য বলে মনে হয় না) অদ্ভুত ব্যাপার! আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল যে পুরোহিত যখন কাশীর পাট চুকিয়ে দিয়েই বাণীকে নিজের কন্যার মত পালন করছেন বাঙলাদেশে এবং আসল গগন জীবিত কি মৃত—এ সংবাদ যখন তাঁর কাছে অবিদিত—তখন তিনি কি করে জানতে পারলেন যে লোকটি গগন নয় সে জাল, কেমন করে এ কথা তাঁর গোচরীভূত হ'ল? পুলিশ জয়ন্তকে গ্রেপ্তার করল কিসের জোরে—খুনের অভিযোগে না হয় করল কিন্তু জয়ন্ত যেখানে নির্বাক সেখানে পুলিশ গণেশকে দেয় ঐ টাকার লেন-দেনের ব্যাপার কেমন করে জানল, গণেশকে টাকা না দেবার জন্যেই জয়ন্ত তাকে খুন করেছে—এই টাকা দেওয়ার কথা কি করে পুলিশের কর্ণগোচর হল—এবিষয়ে ছবিতে কোন আলোকপাতই করা হয় নি।

অভিনয়াংশে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন কালীপদ চক্রবর্তী, বাঙলার ছায়াচিত্র জগৎ আর একজন শক্তিধর শিল্পীর সন্ধান পেল। তাঁর অভিনয় এই ছবিটির মর্যাদা বহুলাংশে বর্ধিত করেছে। তাঁর অভিব্যক্তি, বাচনিক ভঙ্গী, পাত্রানুযায়ী পরিচয় এক কথায় অতুলনীয়। ছবি বিশ্বাসের অভিনয় যথারীতি প্রাণবন্ত হওয়ায় তা শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। বোধ হয় এই প্রথম প্রসীতকুমারকে সুন্দর অভিনয় করতে দেখলুম। নবাগতা কাজল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় উজ্জ্বল। অল্প সংলাপের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র অভিব্যক্তির জোরে চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তিনি। অপরূপ অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয় করেছেন প্রেমাংশু বসু ও নরেন্দ্রর ভূমিকায় দিলীপ রায়। এ ছাড়া অভিনয়াংশে আছেন হরিমোহন বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, অমৃত দাশগুপ্ত, পারিজাত বসু, পদ্মা দেবী, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবা বসু, কমলা অধিকারী, কুমকুমারী প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণে শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন পরিচালক হেম গুপ্তের পুত্র নবীন চিত্রকর দীনেন গুপ্ত। পরিশেষে আবার আমরা কালীপদ চক্রবর্তী ও কাজল চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কড়ি ও কোমল

কড়ি দিয়ে যাঁরা কড়ি ও কোমল দেখতে যাচ্ছেন বেরিয়ে এসে তাঁরা কঠোর মন্তব্য করছেন ছবিটির সম্বন্ধে। ছবিটি কাহিনীর বক্তব্য অনুসারে একটি অপরাধমূলক, তথা রহস্যচিত্র। রহস্যচিত্রের হৃৎপিণ্ডই হ'ল কৌতূহল অর্থাৎ কি হয় কি হয়, তা জানবার জন্য

অসীম ব্যাকুলতা। যেখানে তার অভাব সেইখানেই ছবি ব্যর্থ। সলিল-সমীর দুই বৈমাত্রেয় ভাই, সলিল সঙ্গীতশিল্পী, সমীর বিলাসী। সমীরের মামা মহেশ বাবু উইলে সকলের জন্যেই ভালো ব্যবস্থা করে যান এবং ঠিক করে যান সলিলের সঙ্গে তাঁর শ্যালক-কন্যা সুমিতার বিয়ের। সলিল অসম্মত হয়, সমীরের ধারণা তার দাদা তার প্রণয়িনী (যে গান শেখে সলিলের কাছে) কৃষ্ণার প্রতি আসক্ত। ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয় তার পরই পুলিশ গ্রেপ্তার করে সলিলকে সমীরকে হত্যা করার অপরাধে। সুমিতার মিথ্যা স্বীকারোক্তিতে সলিল অব্যাহতি পেল। ঘটনাচক্রে রাজমহলে গিয়ে দেখা গেল যে, সমীর জীবিত তো আছেই উপরন্তু সে কৃষ্ণাকে বিবাহ করেছে। জানা গেল যে, খুন হয়েছে মদন। কৃষ্ণার দাদা। মহেশ বাবুর বাড়ীতে টাকা চুরি করতে এসে ধরা পড়ে যায় ও গুলীতে নিহত হয়, এই রহস্য ব্যক্ত করেই মহেশবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রহস্যচিত্রের বক্তব্যটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে করে দর্শকরা ছবির পরিণতি আগে থাকতেই জেনে ফেলেছেন। ফলে কৌতূহল ব্যাপকতা লাভ করতে পারছে না তাঁদের মনে। কেবল রহস্য রোমাঞ্চের স্বাদ বদলাবার জন্যে সঙ্গীত সংযোগ করা হয়েছে—কিন্তু গান এত বেশী জুড়ে দেওয়া হয়েছে—যাতে করে ছবিটির গতি অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। সমীর যে সত্যি-সত্যিই খুন হয় নি এ কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কৃষ্ণার অনুপস্থিতিতেই। হঠাৎ কৃষ্ণা উধাও হয়ে যাওয়াতেই দর্শক বুঝতে পারছেন যে এই অন্তর্ধানে সমীরেরও যোগসূত্র কম নয়। অবাক হচ্ছি, যে রাজমহল এমন কি দুর্গম স্থান যেখানে সংবাদপত্র যায় না, যে জায়গায় ব্যাঙ্ক রয়েছে সেখানে খবরের কাগজ যায় না—এ কি হতে পারে? মহেশ বাবু একজন ধনী ব্যক্তি, এক জগন্নাথ ছাড়া তাঁর বাড়ীতে আর কি কোন লোকজন নেই যাতে করে জগন্নাথের অনুপস্থিতিতে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার মত আর কাউকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না? আর একটি কথা—কৃষ্ণাকে অনুসরণ করে পুলিশ তাদের বাড়ী জানতে পারল কিন্তু সলিল, সুমিতা, লতা এরা সমীরের আস্তানা চিনল কেমন করে? পথিমধ্যে কৃষ্ণা লতাকে তাদের ঠিকানা বলে দিয়েছে বলে মনে তো হয় না।

অভিনয়াংশে অপূর্ব সংযত ও স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ী সান্যাল। প্রধান চরিত্রে রবীন মজুমদার ও বিকাশ রায় যথাযথ অভিনয় করেছেন, দর্শককে তাঁদের অভিনয় আকৃষ্ট করবে। শয়তানের ভূমিকাভিনয়ে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে। অপূর্ব প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন তরুণকুমার, স্বল্প সুযোগ, এক দিনের কাজ অথচ সেই ফাঁকেই নিজের শক্তির ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন শিল্পী। শ্রীপতি চৌধুরীর অভিনয়ও ভালো হয়েছে। এ ছাড়া প্রবীরকুমার, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, খগেন পাঠক, রাধারমণ প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। নবাগতা কমলা মুখোপাধ্যায় সুন্দর অভিনয়ই করেছেন, কেবল মাঝে মাঝে তাঁকে যেন একটু জড় বলে মনে হচ্ছিল, এই জড়তা তিনি ত্যাগ করতে পারলে বাঙলা দেশের একজন সুবাঞ্ছিতা অভিনেত্রীর আসন লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না। ভারতী দেবী দর্শকমনে সিঞ্চন করতে পেরেছেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি। সবিতা চট্টোপাধ্যায় মানিয়ে নিয়েছেন নিজেকে, এইটুকু বলতে পারি বড় জোর। শুক্লা দাস ও অজন্তা করও তাঁদের চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন।

মাধবীর জন্য

কাহিনীটি আগাগোড়া পর্দার বুকেই প্রতিফলিত হয়েছে বলে বুঝতে ভুল হল না যে, ছবি দেখছি, না হলে হয়তো ছবি দেখলুম কি যাত্রা দেখলুম এ গোলমাল থেকে যেত মনের মধ্যে। ছবি যে কতদূর নিরেশ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন বাঙলাদেশের একজন বহুকালের অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচালক নীতীন বসু। ভারতের দরবারে নীতীন বাবু বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, বাঙলাদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরূপে তিনি গণ্য। সেইজন্যেই এ ধরণের দুর্বল ও অসার ছবি তাঁর কাছ থেকে আমরা আশা করি না। নীতীন বাবুর ছবি বলেই আমরা বিশেষ ভাবে ব্যথিত হয়েছি। কলকাতায় পড়তে এল বকুল তার আশ্রয়দাত্রীর কন্যা মাধবীর প্রণয়ী অশোকের সঙ্গে হয় তার মনবিনিময়, পরে অশোকের সঙ্গে তার বিয়ে পর্য্যন্তও স্থির হয়ে যায়। বিয়ের আগের দিন মাধবী মিথ্যা কথা বলে বকুলকে দিয়েই এ বিবাহ প্রত্যাখ্যান করায়। বকুলের প্রত্যাখ্যানে অশোকের বাবা অতিরিক্ত মানসিক আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন ও অশোক দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়ে দূর বিদেশে চলে গিয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। মাধবী এদিকে নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্তা হয়ে ঘটনাচক্রে বকুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ায় সব খুলে বললে। বকুল গিয়ে দেখা করল অশোকের সঙ্গে, প্রথমে অশোক নিজের দুর্ভাগ্যের মধ্যে বকুলকে জড়াতে চায় নি পরে মিলনে গল্পের সমাপ্তি। গল্পের মধ্যে বেশীর ভাগই আমরা দেখতে পেলুম সত্যভঙ্গের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। মাধবীকে কথা দিলে বকুল, অশোকের বাবাকেও বকুল কথা দিলে কিন্তু দু'জনের কাছেই তার সত্যের অপলাপন ঘটল। টেলিফোনে অশোক কথা না রাখার জন্য বকুলকে আক্রমণ করল অথচ বকুল যাব বলে কথা দেয়নি, হোষ্টেলটিতে যে সকল মেয়ে দেখলুম তাদের মধ্যে রাণুর মত মেয়ে বেখাপ্পা লাগছে না? রাণুর বয়সী আর একটি মেয়েও তো চোখে পড়ল না। ও রকম বিচিত্র ঢিমে-তেতালা ছন্দে টেলিফোন বাজা শুনিনি কখনও। আর রোজই ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ফোন বাজছে ঠিক সোয়া সাতটার সময়, আশ্চর্য! রাস্তায় যে রকম হঠাৎ মেঘ ঘনিয়ে এল ও রকম মেঘের সম্মুখীনও আমরা জীবনে কখনো হই নি। মহাকবি কালিদাস আজ যদি বিদ্যমান থাকতেন তা হলে ঐ মেঘ দেখে তিনি হয় তো অভিনব ধরণের আর একখানি মেঘদূত রচনা করতে পারতেন। তারপর ভীষণ কানে লাগল মাধবী যখন বকুলকে বলছে "ওকে ছেড়ে দে ভাই, ওকে ছেড়ে দে" এ জাতীয় উক্তি ভদ্র সমাজে বিশেষ করে কোন শিক্ষিত সমাজে যে ব্যবহার হয় এ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না—এই ধরণের অশালীন উক্তির রূপোপজীবিনীদের মধ্যে প্রচলন আছে—মাধবীর মত শিক্ষিতা মহিলার মুখ থেকে এ জাতীয় উক্তি কোনক্রমেই সমর্থনীয় নয়। তা ছাড়া সবার উপরে ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ অত্যন্ত দুর্বল এবং অতি নাটকীয় দোষে দুষ্ট। চিত্রনাট্য ও সংলাপের নির্জীবতা ও অসারতাই ছবির বহুলাংশে ক্ষতি সাধন

করেছে। একেক সময় প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে চলে আসতে ইচ্ছে করে এত বিরক্তিকর হয়েছে মাধবীর জন্ম। অভিনয়ে প্রাণমাতানো অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন ছবি বিশ্বাস ও জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সাবলীল অভিনয়ে দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থা হয়েছেন। আশীষকুমারকে আমরা প্রশংসা করতে পারলুম না। প্রথমতঃ নায়কোচিত আকৃতি তাঁর নেই, ভয়ানক ছেলেমানুষ দেখায় তাঁকে। মনে হয়, যেন কৈশোরের শেষপ্রান্তে তিনি উপনীত, তা ছাড়া তাঁর বাচনভঙ্গীও (গোড়ার দিকের) খুব জড়তামুক্ত নয়। প্রণতি ঘোষ অভিনয় ভালো করেছেন কিন্তু আশীষকুমারের সঙ্গে তাঁকে মানায় কখনো! যখনই তাঁদের দুজনকে দেখছি তখনই যে কি দৃষ্টিকটু লাগছে তা ভাষায় বোঝাতে আমরা অক্ষম। নির্বাচকদের এখন উচিত কোন চক্ষু-বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া। তাঁদের নির্বাচনের বহর দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি যে এটা কলকাতা শহর না বিহারের কোন পার্বত্য অঞ্চল! মিসেস লাহিড়ীর অভিনয়ও (সুললিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকায়) ঠিক যাত্রার ধরণের হয়েছে। কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, চন্দ্রাবতী দেবী, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ, সুমালা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও ভাল লাগবে। এ ছাড়া অভিনয়াংশে আছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ছবি ঘোষাল, প্রীতি মজুমদার, জীবন ঘোষ, আরতি দাস প্রভৃতি।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

বাঙলা দেশের যে সকল মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তানদের অপূর্ব আত্মনিবেদনে ভারতভূমি আজ মুক্ত হয়েছে পরাধীনতার বন্ধন থেকে, সেই বঙ্গ সন্তানদের মধ্যে বিশেষ আসনের অধিকারী বাঘা যতীন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁর জীবনী অবলম্বন করে হিরণ্ময় সেন একটি চিত্র নির্মাণ করছেন। তাতে নামভূমিকায় দেখা দেবেন নবাগত রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। তাঁকে ছাড়া ধীরাজ ভট্টাচার্য, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, শিশির বটব্যাল, শ্যাম লাহা, ধীরাজ দাস, ছায়া দেবী, তপতী ঘোষ, প্রভৃতি শিল্পিগণকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাবে। এ ছাড়া আর একজন সাড়া জাগানো শিল্পীকে আবার বহু দিন বাদে দেখা যাবে অভিনয় করতে—তিনি হচ্ছেন সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী জ্যোৎস্না গুপ্তা।…"তাসের ঘর" এর পর মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায় চিত্রায়িত হচ্ছে শিকার। এরও কাহিনী রচনা, সঙ্গীত ও চিত্রগ্রহণের ভার পড়েছে যথাক্রমে রাসবিহারী লাল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুহৃদ ঘোষের উপর। রূপারোপের ভার গ্রহণ করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, অসিতবরণ, নির্মলকুমার, অরুণপ্রকাশ, মিহির ভট্টাচার্য, চন্দ্রা দেবী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, ভারতী দেবী, নমিতা সিংহ প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।…খনার জীবনী অবলম্বনে একটি ছায়াছবি গড়ে উঠছে। এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবিতে নীতীশ মুখোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, বেচু সিংহ, চন্দ্রশেখর দে, পদ্মা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ প্রভৃতি শিল্পীর অভিনয় দেখতে পাওয়া যাবে।…"প্রবেশ নিষেধ" ছবিটি পরিচালনা করছেন সুশীল ঘোষ। সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত, আলোকচিত্রের দায়িত্ব নিয়েছেন রামানন্দ সেন, অভিনয়াংশে আছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অজয়কুমার, কুশল চৌধুরী, অমর মল্লিক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, মঞ্জু দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

জন্মদিনে

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মিত্র

জয় গাও, জয় গাও, জয় গাও ভাই রে!
ওঙ্কারে হুঙ্কারে ভেদাভেদ ভুলি রে!
হয়ো না কো উন্মাদ দলাদলি করিয়া।
ব'য়ে ব'সে কাজ কর হ'য়ো না কো মরিয়া,
লাভ-ক্ষতি ভেবো না কো অবুঝের মত রে।
লক্ষ্য রাখিয়া চলো পাঁচশীল নীতি রে।
নেমে যাও যুদ্ধে, যদি দেখো অন্যায়—
হেরে যাবে, ভাবো কেন? সত্যের হবে জয়,
রুধির, রূপার লোভ ছেড়ে দাও, দাও রে—
নেহেরুর জয় গাও, জয় গাও ভাই রে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত কয়েক বছরে বাঙলার শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার আবরণে প্রচারকল্পে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন—যেজন্য পশ্চিমবাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আমরা অভিনন্দন জানাই। বর্তমানে প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রের সঙ্গে কেন্দ্রের শাসক সম্প্রদায়ের মন-কষাকষি চলেছে। সন্তানরা যেমন মাতৃস্নেহের ভাগাভাগিতে অভিমান প্রকাশ করে, তেমনই কোন কোন প্রদেশ মধ্যে মধ্যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আস্ফালন জানাচ্ছে। হাজার চাইলে পাঁচশো পেয়ে আবার খুশীও হচ্ছে। যাই হোক, কেন্দ্র যা খুশী করতে পারে স্বেচ্ছাচারের নামে—প্রদেশ কিন্তু পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। সে আপনার বিকাশের উন্নতিকল্পে ছুটে চলেছে জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে। গড্ডলিকা স্রোতে ভাল-মন্দ সবই আছে। অম্বুমধ্যে ক্ষীর যেমন, নিশাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জনগণের মধ্যে থেকে কিছু কিছু দীপ্তিমানের সন্ধান যে মিলছে না বাঙলাদেশে, তাও অস্বীকারের উপায় নেই। বাঙালী জাতি প্রতিভাবান, জ্ঞানালোচনায় শীর্ষস্থানের অধিকারী। বাঙলার লোকবল, বুদ্ধিবল ও বাহুবল যদি একত্র হয় কোন দিন—বাঙালী আবার জেগে উঠবে। হয়তো এমন দিন আসতে অধিক বিলম্ব নেই—যেদিন পৃথিবীতে 'বঙ্গদেশ' নাম শুনে মানুষ মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাবে।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র অত্যন্ত প্রগতিশীল। চরম আধুনিকতা নয়; সেযুগের সম্ভ্রান্ততার সঙ্গে এযুগের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ, উগ্র-উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, পুরাকালের ঐতিহ্যের সঙ্গে আজকালের আভিজাত্যকে মিলিয়ে মিশিয়ে বিধানচন্দ্র নিজেকে এক অনন্যসাধারণ প্রতিপন্ন ক'রেছেন। সবার উপরে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের প্রতি সমদৃষ্টি থাকায় বিধানচন্দ্রের প্রগতিশীল মনোবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু বনস্পতির আশেপাশে আগাছা আশ্রয় পায়, তাই কি পশ্চিম-বাঙলার 'শিক্ষাবিভাগের দুর্নীতি' দেখতে পাওয়া যায় সংবাদপত্রে? আমরা নিশ্চিত জানি, কেন্দ্রসরকারের মত প্রাদেশিক সরকার শিক্ষাদীক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য বহু টাকার গ্রন্থ ক্রয় করেন। আমাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য, শিক্ষাবিভাগ মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রকাশককে মাত্র কি কারণে তুষ্ট ও পুষ্ট করছেন? শিক্ষাবিভাগে সাধারণতঃ শিক্ষাপ্রাপ্তদের ঠাঁই হয়। শিক্ষিতজন দেশের প্রকাশকদের সঙ্গে যদি পক্ষপাতের ছল চাতুরী খেলেন, তবে দেশবাসীর সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সৎগ্রন্থের সংখ্যাতীত প্রকাশক আছেন আমাদের দেশে। এমন ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয়র প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিলে জ্ঞানের প্রচার-চেষ্টা বানচাল হয়ে যাবে অচিরাৎ। আমরা বিধানচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবশেষে।

* * * *

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস দু'শো বছরের হ'লে কি হয়, এই ভাষার প্রভাব অন্যান্য ভারতীয় ভাষার তুলনায় সংস্কৃতের পরেই। বাঙ্গালা ভাষার আগে-পিছে প্রাকৃতপালিত থাকলেও বাঙলা সংস্কৃতের যোগ যেন কোন মতেই ছিন্ন করতে পারলো না এখনও। আমাদের কথ্য ভাষায় যদিও বা প্রাকৃতের মিশেল হয়েছে, লেখ্যভাষায় আমরা প্রাকৃতের পরিবর্তে মূল সংস্কৃতের পক্ষপাতী। বাঙলা ভাষা তাই এত মধুর, এত সমৃদ্ধ, এত বিস্তৃত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিদ ও আমাদের পূজনীয় গুরুদেব ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একদা একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন, তাঁর স্মরণ আছে কি না জানি না। এই ব্যাকরণগ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য বললেও ভুল হয়, অপ্রাপ্য বলা যায়। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ইউরোপবাসীকে অর্থাৎ যাঁরা ইংরাজী জানেন তাঁদের বাঙলাভাষা শিক্ষা দেওয়া। গ্রন্থের নাম BENGALI SELF-TAUGHT by The Natural Method with Phonetic Pronunciation. প্রকাশকাল ইং ১৯২৭। গ্রেট ব্রিটেনে মুদ্রিত। লণ্ডনের ই মার্লব্রো এণ্ড কোং লিঃ প্রকাশক। মূল্য তিন টাকা ও চার টাকা। এই ব্যাকরণটি আমরা সংগ্রহ করেছি অতি কষ্টে। পৃষ্ঠা ১৯২ পর্যন্ত আছে, বাকী অংশ নেই। গ্রন্থটি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত। ডক্টর সুনীতিকুমার ভূমিকায় বঙ্গভাষার সম্পর্কে বহু মূল্যবান উক্তি করেছেন। তিনি প্রসঙ্গত বলছেন:

"Apart from the ancient and mediaeval literatures of India in Sanskrit, Pali, Old Tamil, and Early Hindi dialects. Bengali has the largest and most original Literature of any Modern Indian language; and it counts among its votaries numerous poets, novelists and other writers of whom one, Rabindranath Tagore, has become a world-figure in literature. As one English Professor of Bengali has remarked (there are already lectureships in Bengali in the Universities of Oxford, Cambridge and London), two languages at least belong to British Empire

possessing first-class literatures—viz English and Bengali." * * *

আমরা ধ'রে নিতে পারি, বিদেশী উক্তির সঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমার স্বয়ং একমত হয়েছেন। ইংরাজীর পরেই তবে বাঙলা ভাষার স্থানই যথাযোগ্য হয়। বাঙলা ভাষাভাষীজন জেনে হয়তো আনন্দিত হবেন, রুশ ভাষায় বাঙলা-রুশ অভিধানের কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। রুশ দেশে দেশী-বিদেশী অভিধান সঙ্কলন সমিতির প্রধান পুরোহিত Ksenia Uarteishevskyর পরিচালনায় রুশ-বাঙলা অভিধান সঙ্কলনের কাজ এখন ছাপাখানায় চলছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। তাই বলছিলাম, পৃথিবীর চোখে বাঙলা ভাষার প্রভাব কত বেশী, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার তুল্যমান দাঁড়িপাল্লায়।

• • • •

'প্রাইজ' কথাটি বোধ করি আমরা বিদ্যালয় থেকে আমদানী করেছি, পাওয়া না-পাওয়ার প্রতিযোগিতায় প্রথম কিম্বা শেষের দিকে থেকে উপলব্ধি করেছি বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসবের মাহাত্ম্য। তাই আমাদের অভিভাবকদের কাছে 'প্রাইজ' চিরদিনই সারপ্রাইজ সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যেও অধুনা এই প্রাইজ দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে কেন্দ্র এবং প্রদেশের পক্ষ থেকে। আমাদের হাইয়েষ্ট প্রাইজ 'আকাদমী' দিচ্ছেন, পাঁচ হাজার টাকা। আমাদের মনে পড়ে, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে 'নবেল' পুরস্কার পেয়েছেন জানার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "এতদিনে আমার আফ্রিকা ভ্রমণের টাকাটি তুলতে পারলাম।" সামান্য ক'টি কথায় লেখক তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন, পুরস্কারের টাকা এমন কিছু নয়। বর্তমান যুগের সত্যিকার লেখকদের জীবনধারণের ব্যয় ব্যতীত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ভ্রমণ-বিহার ইত্যাদিতে খরচ করতে হয়। হেমিংওয়ে আফ্রিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দস্তুরমত কাজে লাগিয়েছেন নানা গল্প উপন্যাসে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পুরস্কারের টাকা শান্তিনিকেতনে দান করেন, শোনা যায়। টাকার অনুপাত ধরলে দেখা যায়, কেন্দ্র কিম্বা প্রদেশ-সরকারের ভারতীয় প্রাইজ একেবারেই নগণ্য। তবুও আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, গত ক'বছরে পুরস্কার দানের ধারা দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। এ বছরে আরও বিস্মিত হয়েছি, 'আকাদমী' প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পুরস্কৃত ক'রেছেন তাই শুনে। আমাদের দেশে গুণীজন মরণাপন্ন না হ'লে কেউ ফিরেও তাকায় না, মৃত্যুর পর দেশবাসী নাচানাচি করেন শোকস্মৃতি-সভায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরস্কৃত হওয়ায় আধুনিক বাঙলা সাহিত্য স্বীকৃত হয়েছে—এমন আশা করতে পারি।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

মহাভারতের গল্প

সংস্কৃতির মাতৃভূমি ভারতের সুপ্রাচীন গৌরব ও মহিমার ধারক ও বাহক মহাভারত। সাধারণ প্রবাদ অনুসারে বলা হয়—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" অর্থাৎ সেদিনকার ভারতের পরিপূর্ণ রূপটি ধরা পড়েছিল মহাভারতের মধ্যে। বেদব্যাস এই বিরাট মহাকাব্যের স্রষ্টা। তারপর তাকে সহজ করে, জনসাধারণের বোধগম্য করে ফুটিয়ে তুলেছেন অসংখ্য সাহিত্যসেবী। পূর্বোক্ত গ্রন্থে লেখক সমগ্র মহাভারতের এক-একটি আখ্যায়িকা বেছে নিয়ে তাকে সুললিত করে তুলেছেন ভাষার সৌন্দর্যে। এক-একটি টুকরো টুকরো ঘটনা অবলম্বন করে সমগ্র মহাভারতকেই লেখক নতুন রূপ দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থের সুপ্রচার আমাদের কাম্য। লেখক—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা—৬ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র। দাম সাড়ে চার টাকা মাত্র।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন-চরিত

বাঙলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে আজ পরিপূর্ণ রশ্মিমান সূর্যের আসনে সমাসীন পৃথিবীর বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। শুধু বাঙলা কেন, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিধানচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব বিশেষরূপে সমাদৃত। বিধানচন্দ্রের গৌরবমণ্ডিত জীবনের একটি ইতিহাস রচনা করেছেন প্রাবন্ধিক শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়। এই গ্রন্থের অধিকাংশ লেখা ইতিপূর্বে দৈনিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বংশপরিচয়, পিতৃ-মাতৃ পরিচয়, তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনের তথ্যপূর্ণ বহু ঘটনার সমাবেশে গ্রন্থখানি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের কয়েকটি আলোকচিত্র ও কবিশেখর কালিদাস রায় এবং সজনীকান্ত দাসের কবিতায় ডাঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রন্থটির শোভাবর্ধন করেছে। ডাঃ রায়ের জীবনী-অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন বলে আশা রাখা যায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। দাম আট টাকা মাত্র।

বেতার-তথ্য

মানব-সমাজে বিজ্ঞানের অসংখ্য মহামূল্য উপহারের তালিকায় বেতারেরও একটি বিশেষ স্থান নির্ধারিত আছে। বেতারের সার্থকতা আমাদের জীবনে যে কতখানি, সে কথা কাউকেই আর নতুন করে বোঝাবার প্রয়োজন অন্ততঃ আজকের দিনে আর নেই। কিন্তু বেতারের অন্দরমহলের কাহিনী অনেকের কাছে অবিদিত। এই গ্রন্থে বেতারের খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। তার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক উভয় দিকেই লেখকের লেখনী যথেষ্ট পরিমাণে আলোকপাত করেছে। বাঙলা সাহিত্যের মাধ্যমে আলোচনীয় বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে একটির তিনি দ্বারোদ্ঘাটন করে গেছেন। যে কোন বেতারে আগ্রহী ব্যক্তি এই গ্রন্থ পাঠ করলে চোখের সামনে বেতারের আভ্যন্তরীণ সমগ্র রূপটি পরিষ্কার দেখতে পাবেন। লেখক কালাচাঁদ শীল মৃত। পরিতাপের বিষয়, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র তেইশ বছর বয়সে এই গবেষক যুবকের জীবননাট্যের পরিসমাপ্তি হয়।—সম্পাদক শ্রীনির্মলচাঁদ শীল। শীল রেডিও য়্যাণ্ড ইলেক্ট্রিক্যাল এম্পোরিয়াম ১৪ দুর্গা পিথুরি লেন, কলকাতা ১২ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীরূপচাঁদ শীল। মূল্য ছয় টাকা বারো আনা মাত্র।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাঙলার স্থান

(প্রথম খণ্ড)

যে সকল ভারতীয় ভাষা আজ সাহিত্যের দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাদের মধ্যে হিন্দীর নামও উল্লেখনীয়। হিন্দী সাহিত্যেও অনেক খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিকরা আবির্ভূত হয়েছেন। হিন্দী সাহিত্যে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে যেমনই সত্য, ঠিক তেমনই সত্য যে হিন্দীভাষার বুকে ছায়া পড়েছে বাঙলাভাষায় অনেকখানি। বাঙলার সাহিত্য এদের কারোর সঙ্গেই সমানভাবে তুলনীয় নয়, বাঙলা সাহিত্যের গভীরতার কাছে এদের কোন স্থানই হয় না। অবশ্য এ কথা বাঙালী নিজে যতটা জানে তার চতুর্গুণ বেশী জানে যারা বাঙালী নয় তারা। হিন্দী সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে মাখানো আছে বাঙলার প্রভাব। তরুণ গবেষক ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায় (পরম পূজ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র-পুত্র) হিন্দীভাষায় রীতিমত ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। হিন্দী-সাহিত্যের উদ্ভব থেকে তার ক্রমবিকাশ। তার যাত্রাপথের গতিধারা এবং তার বর্তমান পরিণতি সর্বোপরি তার উপর বাঙলা সাহিত্যের প্রভাবের বিস্তৃত বিবরণ লেখক এই গ্রন্থের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। ইতঃপূর্বে উপরোক্ত বিষয় কেন্দ্র করে বহু প্রবন্ধ সুধাকর বাবু বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিয়েছেন—তাঁদের এ কথা স্মরণ থাকতেও পারে, আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের প্রচুর পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর সকল শ্রম সফলতায় রূপান্তরিত হোক, এই কামনাই করি।—শরৎ পুস্তকালয়, ৩ কলেজ স্কোয়ার থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীপ্রণবকুসুম সাহা। দাম সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

দুর্গতোরণ

বাঙলা সাহিত্যে সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। সুধীরঞ্জনের দুর্গতোরণ তাঁর পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবে বলে ধারণা করা যায়। স্বাভাবিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে গল্প বলে চলেছেন সুধীরঞ্জন। সৈনিকদের আত্মরক্ষার জন্য যেমন দুর্গের প্রয়োজন তেমনই আজকের দিনের ত্রিধাবিভক্ত দিশাহারা প্রত্যেকটি মানুষ একটি করে দুর্গ খুঁজে বেড়াচ্ছে ; যেখানে তার সত্য, আদর্শ ও কামনা অক্ষত দেহে বেঁচে থাকবে, এই পটভূমিকায় আলোচ্য-গ্রন্থের কাহিনী গড়ে উঠেছে। দেবদত্ত, সুনন্দা দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিকে সমন্বয়ের জালে আবদ্ধ করেছেন লেখক। শাস্তার ভাগ্য সত্যিই দুঃখের উদ্রেক করে। ভবতোষ ও তারাময়ীর মধ্যে দিয়ে সংস্কারধর্মী বিগত সমাজের ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। দুর্গাদাস চরিত্র মুখোস খুলে দেয় আজকের দিনের তথাকথিত অতি অভিজাত সমাজের। সাহিত্য-জগৎ ২০৩।৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম তিন টাকা মাত্র।

নবনায়িকা

মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি তাঁর নবতম গ্রন্থ প্রকাশলাভ করেছে। গ্রন্থটিকে ছোট গল্পের সংকলন বললে ভুল হবে, ন'টি বিভিন্ন নারীকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা গড়ে উঠেছিল সেই কাহিনীগুলিই লেখক এখানে বিবৃত করেছেন, এখানে তাঁর দ্রষ্টার ভূমিকা। দ্রষ্টার চোখ দিয়ে তিনি যা দেখিয়েছেন তাকেই তিনি গল্পের রূপ দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকটি গল্প আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। গল্পগুলি বিশেষভাবে মনকে নাড়া দিয়ে যায় এবং পাঠকচিত্তে আনন্দ সঞ্চার করার মত যথেষ্ট উপাদান বহন করে। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ গল্পটি বিশেষ ভাবে পঠনীয়। কাহিনীগুলি বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হলেও তাদের গন্তব্য একই লক্ষ্যে অর্থাৎ কাহিনীগুলির প্রত্যেকটিই এক সুরে বাঁধা। ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্র সৃষ্টিতে এবং বিশেষভাবে কোন জটিলতার সমাধানে আশুতোষের দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীভানু রায়। দাম সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

ছায়াবিহীন

কাশিমবাজারের মহারাজ-কুমার শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর "ছায়াবিহীন" নাটকটির অভিনয় ইতিপূর্বেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমানে এটি গ্রন্থরূপ লাভ করেছে। একটি বৈপ্লবিক পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। হিরণ্য চরিত্রটি যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। নাটকটি বহুজনের প্রশংসা অর্জন করবে। দৃশ্য-সংস্থাপনে, চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং সংলাপ যোজনায় সোমেন্দ্রচন্দ্রের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সোমেন্দ্রচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা পাবার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। ৩০২, আপার সার্কুলার রোড, ক'লকাতা-৯ থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। দাম দুই টাকা মাত্র।

মহানগরীর উপাখ্যান

ডিকেন্সের "টেল অফ টু সিটিস" নামক অমর গ্রন্থের ছায়া অনুসরণ করে রচিত হয়েছে উপরোক্ত গ্রন্থের কাহিনী। তবে লক্ষণীয় বিষয় এর মধ্যে হচ্ছে এই যে, এই ছায়ানুসরণকে ঠিক নিছক ভাষান্তরের পর্যায়ে ফেলা যায় না। ডিকেন্সের কাহিনীকে এ দেশীয় ভাবধারায় রূপ দিয়েছেন লেখিকা শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্তা। রচনাটি ইতিহাসকেন্দ্রিক হলেও স্থানে স্থানে উপন্যাসের সৌষ্ঠব রক্ষার জন্য লেখিকা কল্পনার আশ্রয়ও নিয়েছেন। করুণাকণা গুপ্তার রচনায় স্নিগ্ধতার সুর পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। সহজ ভাষায় পাঠকচিত্ত জয় করতে সমর্থ হবার যোগ্যতা রাখেন শ্রীমতী গুপ্তা।—শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ, আপার সার্কুলার রোড থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

উদয়ভানু

দেওয়ালগিরির আলো সারারাত জ্বলতে থাকে আজ। সুড়ঙ্গের মত দীর্ঘ দালানে দালানে তৈলদীপের আলোকশিখা বক্ররেখায় নাচতে নাচতে কখন যে স্থির হয়ে গেছে, কারও নজরে পড়ে না। হয়তো তেল ফুরিয়েছে, সল্‌তে শেষ হয়েছে। বাইরে শেষরাত্রির নিবিড় আঁধার। আকাশে কয়েকটি নক্ষত্র, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, ম্লান ও দ্যুতিহীন। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হবে। রাজ-অন্তঃপুরে আজ আর ঘুম নামে না কারও চোখে। মহলে মহলে জাগরণের পালা চলছে। হাসাহাসি আর গুঞ্জনের অস্পষ্ট ধ্বনি শোনা যায়, কান পাতলে। তামাসা আর পরিহাসের টুকরো টুকরো কথা। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মন্তব্য।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী যেন কিছু বেশী ব্যস্ত হয়েছেন। সেই মধ্যরাত থেকে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায় অন্দরমহলে। রাজমাতা জেগে ব'সে আছেন। মাঝে মাঝে একটি কি দু'টি কথা বলছেন। বিলাসবাসিনীর দুই পাশে দুই পরিচারিকা—চামর দুলিয়ে দুলিয়ে বাতাস খেলায়। শ্বেতপ্রস্তরের একটি জল-চৌকিতে আসনপিঁড়ি রাজমাতা। পায়ের কাছে স্থান পেয়েছেন রাজবধূর দল। লাল ভেলভেটের গালিচায় আসর বসেছে যেন। গালিচার মাঝে সোনার পানদানি; মুক্তার ঝালর ঝুলছে গোলাপ-পাশে। উগ্র তাম্বুলের সুগন্ধ রাজমাতার আসরকক্ষে। দুয়োরে দুয়োরে হলুদরঙের রেশমী পর্দা ঝুলছে। ডাক পড়েছে মহাশ্বেতার, তিনিও এসে একত্র হয়েছেন।

ঘুম-ঘুম-চোখ বধূঠাকরুণদের। কেশবিন্যাস ঠিক নেই কারও। মুখে মুখে চাপা হাসির আভাস খেলছে। চোখে চোখে লাজুক চাউনি। একে একে এসে জড় হয়েছেন চার বধূ, শাশুড়ীকে ঘিরে বসেছেন। কেউ দেখতে পায় না, কখন পরিচারিকা এসে রূপার রেকাবী বসিয়ে দিয়ে গেছে গালিচার আশে-পাশে। দু'দফায় এসেছে, চারখানি রেকাবী। দেওয়ালগিরির নীলাভ কাচ, নীল আলো চিকচিক করে রৌপ্যপাত্রে। রেকাবীতে কিছু কিছু সুখাদ্য আর জলপাত্র।

রাণীদের মুখে কথা নেই, শুধু মৃদু মৃদু হাসি। মধ্যরাত অতিক্রান্ত এখন, রাজমাতার অসময়ের আতিথেয়তায় ভয়ে ভয়ে হাসেন কেউ কেউ। অধোমুখ সকলের, তাই আর হাসিমুখ বিলাসবাসিনীর তন্দ্রাতুর চোখে ধরা পড়ে না।

—কি গো, ব'সে থাকলেই চলবে না কি? রাজমাতা হঠাৎ কথা বললেন ধীরে ধীরে। বললেন,—আমার মহলে তোমরা যখন এসেছো সকলে, তখন মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়ছি না।

—এত রাতে আর খাওয়া যায় না রাজমাতা! বড়রাণী সাহস সঞ্চয়ের পর বললেন মিহি-মিষ্ট সুরে। বললেন,—অসময়ে এত সব খেতে হবে!

ঈষৎ রুষ্ট হ'লেন বিলাসবাসিনী। ঠোঁট উলটে বললেন—কি জানি বাছা, একটা কি দু'টো মিষ্টি দাঁতে কাটলে মহাভারত কি এমন অশুদ্ধ হবে? তোমাদের দরকার আছে, তাইতো ডেকে পাঠিয়েছি। শুধু কি তোমাদের রূপ দেখতে ডেকেছি? কাজ আছে, কথা আছে। তোমাদের মতামত জেনে তবে আমি কাজে হাত দেবো।

উমারাণী সহাস্যে বললেন,—আগে কাজের কথা শেষ হোক তবে।

—উঁহু। কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে এ-পাশে ও-পাশে মাথা দোলালেন বিলাসবাসিনী। বললেন,—আগে খাও-দাও, তারপর যা বক্তব্য বলছি। লোকলৌকিকতা মানতে হবে বৈ কি। একেই তোমরা সব পরের ঘরের মেয়ে! ক্ষণেক থেমে আবার বললেন,—তোমাদের রাজমাতা কি আর সে-মানুষ আছে যে তোমাদের ডেকে ডেকে আদর-সোহাগ জানাবো? মেয়ের দুঃখেই মলাম আমি জ্বলে-পুড়ে।

উমারাণী হেসে হেসে বললেন,—ঠাকুরঝিকে ফিরে পাওয়া যায় তো ভাবনা কি আর!

কৃত্রিম হাসির সঙ্গে বিলাসবাসিনী বললেন,—দেখো বড়রাণী, না আঁচালে আমার বিশ্বাস নেই। তবে আমার কাশীশঙ্কর সদলে গেছে, একটা কোন সুরাহা সে করবেই। কাশীশঙ্কর আমার যা-তা নয়। অনেক গুণের আধার সে।

মহাশ্বেতার বক্ষ গর্বে স্ফীত হয়। কিন্তু তাঁর মুখে কোন প্রকাশচিহ্ন দেখা যায় না। তবুও মুখখানি যেন মলিন, মনে যেন সুখ নেই। আলুলায়িত রুক্ষ কেশ একরাশি, পৃষ্ঠে নেমেছে। মহাশ্বেতা মনে মনে পণ করেছেন, তিনি ফিরলে তবে চুল বাঁধবেন, সাদাসিধা বস্ত্র ত্যাগ করবেন। মুখে পান-তাম্বুল দেবেন। মনের সুখে হাসবেন। মহাশ্বেতার চোখের কোলে কালিমা, রাঙা অধর যেন বিবর্ণ। গায়ে নিয়মরক্ষার জন্য নামমাত্র অলঙ্কার। পায়ে অলক্তক-চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে।

—তুমি এমন মনমরা কেন মহাশ্বেতা? রাজমাতা অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বললেন ভারী কণ্ঠে। আরও যেন কি বলতে চাইলেন রাজমাতা। বলতে গিয়ে থামলেন, কালো পাথরের বাটি মুখে তুললেন! পাতকুয়ার শীতল জল, কাগ্‌চি লেবুর সরবৎ পান করলেন খানিকটা। বিলাসবাসিনীর মুখ মুছিয়ে দিতে হয় পরিচারিকাকে। হাতে পাত্র ধ'রে রাজমাতা বললেন,—আঃ, বুকটা জুড়োলো এতক্ষণে।

হাতে সোনার কড়ায় বাঁধা চাবির গোছা। নাড়াচাড়া করেন মহাশ্বেতা। ঘরদোর ছেড়ে এসেছেন তিনি, মন ফেলে এসেছেন। কন্যাকে ঘুমন্ত রেখে এসেছেন, ধাইয়ের হেফাজতে। মহাশ্বেতা কথা বলেন না. রাজমাতার কথার উত্তর দেন না। স্মিতহাসি উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যায় মুখে।

বিলাসবাসিনী হঠাৎ ঝাঁঝালো সুরে বললেন,—মর্দ্দ ব্যাটাছেলে ঘরের বার হয়েছে তো অযথা মেজাজ খারাপ করবে কেন ?

নতমুখ মহাশ্বেতার, আরও আনত হয়। লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠে। চাবির গোছা হাতে, শিশুর মত খেলা করেন যেন। মহাশ্বেতার কানে কানে পাটরাণী উমারাণী বললেন সহাস্যে,—বলতে কি পারবে, চোখের আড়ালে গেলে কি কষ্ট হয়! বিরহ-বেদনায় অস্থির হ'তে হয়, একা রাত কাটাতে হয়। জ্বররোগের জ্বালা ধরে যেন, তাই নয় ?

মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলে মহাশ্বেতার মুখে। তিনি আরও লজ্জিত হয়েছেন। উমারাণী নকল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে নির্ব্বাক হয়ে গেলেন। কি যেন প্রয়োজনের কথা কানে কানে বলাবলি করলেন তিনি।

আবার পাথরবাটি মুখে তুলেছেন রাজমাতা। বাকীটুকু শেষ করলেন অত্যন্ত ধীরে ধীরে। পরিচারিকার হাতে পাত্র ধরিয়ে দিয়ে বললেন,—মহাশ্বেতা, কথা কও না কেন ? মৌনী নিয়েছো না কি ?

কাশীশঙ্করের সহধর্ম্মিণী সত্যিই যেন কথা বলতে ভুলে গেছেন! কিম্বা মনের কষ্টে কথা আর বলছেন না। তবুও কথা বললেন,—রাজমাতা, মেজাজ আমার ভালই আছে।

বিলাসবাসিনী।—তবে বাছা মুখে কথা নেই কেন ? হাসিখুশী নয় কেন ? ছেলে আমার দেখবে অক্ষত দেহে ফিরে আসবে।

উমারাণী আবার সহাস্যে ফিস ফিস করলেন মহাশ্বেতার কানে বললেন,—বিরহীর দুঃখ কাকে বোঝাবো বল'! কেউ বুঝবে না।

রাজমাতা বললেন,—এখন কেন তোমাদের ডাক পাঠিয়েছি, তাই বলি। কথার শেষে খানিক থেমে আবার বললেন,—শিবানীকে তো আর রাজপুরীতে রাখতে পারি না আমি। কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে কি। তার চেয়ে মানে মানে সরিয়ে দেওয়াই ভাল।

উমারাণীর চোখের পল্লব পড়ে না। বিস্ময়াবিষ্টের মত তাকিয়ে থাকেন তিনি। রাজমাতার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—কোথায় সরিয়ে দেবেন শিবানীকে, তাই শুনি ?

—যেথায় খুশী যাক না সে। বিলাসবাসিনী বললেন তাচ্ছিল্যের সুরে,—না না, তা হয় না। আমি বেঁচে থাকতে এই বেলেল্লাপণা চোখে দেখতে পারবো না। শিবানী আর শশিনাথ দু'জনেই বিদেয় হয়ে যাক। নগদা-নগদি কিছু হাতে দিয়ে দেবো আমি।

মেজরাণী বললেন,—ওদের বিয়ে যদি হয় তবে আর ভাবনা কেন ?

বিলাসবাসিনী বললেন,—যা ইচ্ছে হয় করুক, কিন্তু রাজবাড়ীতে আর ঠাঁই হবে না। শিবানী মজতে পারে, তাই ব'লে আমি আমার বাস্তু অপবিত্র করতে পারি না।

চার বধূ মাথা নত করলেন সলজ্জায়। লাল ভেলভেটের গালিচায় দৃষ্টি বদ্ধ করলেন।

বড়রাণী বললেন,—আহা, ব্যাচারী কোথায় আর যাবে! বিয়ে দিয়ে দিন শিবানীর।

রাজমাতা বললেন,—চুলোয় যাবে। সে ভাবনা তোমার আমার নয়। এমন বেহায়া মেয়ের বিয়ের কথায় আমি থাকবো না।

মহাশ্বেতা বললেন,—আপনি শিবানীকে দয়া না করলে সে কোথায় যাবে। শিবানী মেয়েতো ভালই।

—ঢের ঢের ভাল মেয়ে দেখেছি আমি। বিলাসবাসিনীর কণ্ঠকণ্ঠ কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে ঘা খায় যেন। বললেন,—পেটে যদি হঠাৎ একটা ছেলে আসে তখন কে রক্ষে করবে! না বাছা, সাবধানের মার নেই।

লজ্জারাঙা মুখ আবার নামালেন উমারাণী। নিরুপায়ের মুখভঙ্গী যেন তার। বড়রাণী মনে মনে ভাবলেন, রাজমাতা এত কঠোর আর নিষ্করুণ কেন! দয়ামায়ার লেশ নেই তাঁর বুকে। পাষাণে গঠিত যেন।

বিলাসবাসিনীর ক্রোধ যেন প্রশমিত হয় না কিছুতেই। রাজমাতা আবার বললেন, সূর্য্যোদয়ের আগেই তাকে যেতে হবে। আমি তার পোড়ামুখ আর দেখবো না; রাজবাড়ীতে ঢি-ঢি পড়ে গেছে শিবানীর কীর্ত্তিতে! লোকের কাছে মুখ দেখাবো কোন্ লজ্জায়!

মৃগীনেত্রা উমারাণীর মুখে বিষণ্ণতা নামে। চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। কণ্ঠতালু শুকিয়ে যায়। বড়রাণী বললেন,—শিবানী মেয়েটা খল-হিংসুটে নয়। তার প্রকৃতি সরল, জলের মত অন্তঃকরণ।

রাজমাতা বললেন,—যে ভাল সে ভাল আছে। আমি কারও ঝুঁকি পোহাতে পারবো না বড়রাণী!

—শিবানীর ভাই মহেশনাথ ঠাকুরপো কি বলেন ? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন উমারাণী। বললেন,—তাঁকে কি জানিয়েছেন কিছু ?

আবার ঠোঁট উলটে রাজমাতা কেমন যেন বিরক্তির সঙ্গে বললেন,—মহেশনাথ সবই শুনেছে। মহেশনাথ আর কখনও শিবানীর মুখদর্শন করবে না। সে বিকলাঙ্গ হ'তে পারে তবু তার জ্ঞানবুদ্ধির তুলনা হয় না। মহেশনাথ একটা দস্তুরমত পণ্ডিত।

কথা শুনে যেন খুশী হ'তে পারলেন না উমারাণী। রাজমাতার কাছে যুক্তি আর তর্ক চলবে না, তাই যেন নীরব হ'লেন তিনি।

মহাশ্বেতা বললেন,—শিবানীকে ক্ষমা করুন রাজমাতা !

বিলাসবাসিনী অসম্মতি জানিয়ে মাথা দোলাতে থাকেন। বলেন,—ক্ষমার যোগ্যা নয় শিবানী। সে দূর হয়ে যাক রাজপুরী থেকে। আমি কারও কথা শুনতে চাই না। তোমাদের জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য তাই বলছি।

মেজরাণী আর ছোটরাণী, সর্বমঙ্গলা আর সর্বজয়া গালিচা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মহাশ্বেতাও উঠলেন ; উমারাণী ব'সে থাকেন শুধু, যদি রাজমাতার মন কিঞ্চিৎ দ্রব হয়, সেই আশায়।

দুয়োরে একজন পরিচারিকার দেখা পাওয়া যায়। তার চোখে-মুখে যেন ব্যস্ততা। দাসী বললে,—শিবানী নিখোঁজ হয়েছে রাজমাতা। সন্ধান মিলছে না তার !

কক্ষের সকলেই পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন। বিলাসবাসিনীর দীর্ঘচোখের তারা স্থির হয়ে থাকে। তিনি বললেন, পুকুরে ডুব দিয়েছে না কি ! শশিনাথ কোথায় ?

দাসী ইতি-উতি দেখে বললে,—তেনার কোন খোঁজ নাই। তাঁকেও পাওয়া গেল না।

—তবেই হয়েছে। রাজমাতার মুখাকৃতি আরও যেন স্তব্ধ-গম্ভীর হয়। তিনি বলেন,—এখন উপায় ? রাজাবাহাদুরের কানে উঠেছে কি না কে জানে !

উমারাণী শুধু হাসলেন যৎসামান্য। ঈষৎ ব্যঙ্গ যেন তাঁর হাসিতে। তিনিও গালিচা ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

বিলাসবাসিনী থামলেন না। বললেন,—গেছে যখন চিরকালের মত যাক, আমি তো তাই চাই। একরত্তি একটা মেয়ে আমার মুখে চূণ-কালি মাখিয়েছে !

শেষ-রাত্তের ঘন আঁধার স্তিমিত এখন। পূর্বাকাশে শুভ্রতা ফুটেছে, দিগন্ত দেখা দিয়েছে বক্র আকারে। আকাশপ্রান্তে লোহিত স্পর্শ লেগেছে। রাত্রিশেষের ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে। গাছে গাছে ফুল ফুটছে হাওয়ার পরশে। আলো আর আঁধারের প্রতিযোগে সূতানুটি যেন এক বিশেষ রূপ পেয়েছে—সমস্ত মানুষের চোখে পড়ে না।

একজোড়া শঙ্খচিল কোথা থেকে শূন্যে উড়লো। উড়তে উড়তে চললো কি এক উদ্দেশে যেন !

শশিনাথ আগে আগে চলেছে। পেছনে শিবানী। যত দূর চোখ যায় তৃতীয় জনের দেখা মেলে না।

শিবানী বললে,—ডর লাগছে আমার। তোমার সঙ্গে চলতে পারছি না যে।

শশিনাথ থমকে দাঁড়ালো। বললে,—পা চালাও বৌ ! প্রথম নৌকা ধরা যাবে না যে। লোক জানাজানি হবে। তোমাতে আমাতে আবার যদি ফারাক হয় ?

—তবে আমি বাঁচবো না আর। তুমি বিনা আমি, ভাবতে পারি না যে।

ভোরের বাতাস ছাড়া আর কেউ শোনে না শিবানীর আবেগময় কথা। তৃতীয় জন নেই এখানে, জোড়া জোড়া চোখের দৃষ্টিবাণ নেই এখানে। লোক-লজ্জা নেই। সমাজ এখানে মূল্যহীন।

আনন্দের উল্লাস-হাসি ফুটলো শশিনাথের মুখে। পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা। জনহীন পথের ধারে একটি দেবদারু গাছের আড়ালে শশিনাথ হাসতে হাসতে শিবানীকে জড়িয়ে ধরলো কোমল বন্ধনপাশে। হাসির জের টেনে শশিনাথ বললে—আমি তোমার কে ?

শিবানী মুখ রাখলো শশিনাথের বুকে। বললে,—তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের। যমেরও সাধ্যি নেই আমাদের তফাৎ করবে। আমার পুণ্যির জোরে তোমাকে পেয়েছি।

—কোথায় যাবে এখন ? শিবানী ভারাক্রান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

শশিনাথ বললে,—ঘরে ফিরবো আমরা। ত্রিবেণীতে ফিরে যাবো। ঘর-সংসার পাতবো। রাজকীয় সুখ আমি চাই না। পরের ঘরেও থাকতে চাই না। তোমাকেও রাখতে চাই না।

—আমাকে ছেড়ে যাবে না তো কখনও ?

—না, কদাপি নয়।

—চিরকালের মত তুমি আমার হবে ?

—হাঁ, যত দিন জীবিত থাকবো।

—রূপ-যৌবনের আয়ুষ্কাল বেশী নয়, মনে রেখো। কথা বলতে বলতে তার সাপের মত এক জোড়া বাহুর বাঁধন যেন আরও কঠিন হয়ে ওঠে। কথার শেষে নিজের মুখ তুলে ধরলো শিবানী।

দুই দেহ যেন এক হ'য়ে যাবে, পরস্পরের প্রতি এমনই আকর্ষণ। দুই সত্তা একত্রে মিলবে। একাকার হবে।

মুসলমান গেরস্থের মুরগী মেরে খেয়েছে একটা শিয়াল। তাকে মুখের রক্ত চাটতে দেখে শশিনাথ। ধূর্ত শিয়াল চতুর্দ্দিক দেখে নেয় একবার। এক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দেয় শিয়াল। পিছু ফিরে আর তাকায় না। ভোরের ক্ষীণ আলোয় তার চোখ দু'টি জ্বলতে থাকে হীরকখণ্ডের মত।

শশিনাথ আর শিবানী আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ক্ষণেকের মধ্যে।

—মাথায় কাপড় দাও তুমি। গুণ্ঠন টেনে দাও। হনহনিয়ে পথ চলতে চলতে বললে শশিনাথ। হাসিমুখে তাকালো একবার, পিছু ফিরে। বললে,—দিনের আলো ফুটবে এখনই। চেনাশুনা মানুষ যদি দেখতে পায় !

গাছে গাছে পাখীর ডাক শুরু হয়। আকাশ আরও যেন লাল হয় পূর্বদিকে। মতিবেলফুলের গন্ধ ভেসে আসে ভোরের হাওয়ায়।

আ-কপাল ঘোমটা টানলো শিবানী। বললে,—পা যে চলে না গো আর। আর কতটা পথ ?

—আর পোয়াটাক পথ বাকী আছে। চিৎপুরের ঘাট থেকে

নৌকা পাবো। শশিনাথ ফিরে ফিরে দেখে আর কথা বলে। বললে,—একবার নৌকায় উঠতে পারলে তবে আমার নিশ্চিন্তি। পা চালাও জোরকদমে।

—বড়রাণীর তরে মনটা আমার হাঁকপাঁক করছে। শিবানী স্মৃতির ব্যথায় কথা বলে। বললে,—বড়রাণী মানুষটার খুব দরাজ দিল! যেমন প্রতিমার মত রূপ তেমন দেবীর মত প্রকৃতি।

—ওই দেখো নৌকার মাস্তল। শশিনাথ অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দেয় সমুখপানে। গঙ্গার অপর তীর দেখা যায়, পলি আর বালুময় চড়া।

শিবানী পা চালায়। বলে,—রাজমাতার কাছে আমার গয়নাগুলো আছে। তার কি হবে? কে আদায় করবে?

—ভাগ্যে যদি থাকে পাবে, না থাকে পাবে না। আমার কোন লোভ নাই সোনাদানায়। শশিনাথের পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে কথা আর থামতে চায় না যেন। সে বললে,—তুমিই আমার সোনা, আমার হীরামাণিক।

শিবানী হাসলো মিষ্টহাসি। নিজের গৌরবে অহঙ্কার আসে তার মনে। মুখে হাসি মাখিয়ে বললে,—রাজমাতা দিয়ে দেবেন আমার গয়নাগাটি। কে চাইতে যায় তাঁর কাছে।

শশিনাথ বললে,—আমি আর সুতানুটির রাজগৃহে ফিরবো না কখনও। লাখো টাকা দিলেও নয়।

—কেন? সাগ্রহে ও সহাস্যে বললে শিবানী। বললে,—রাজা যদি ডাক পাঠান?

—তথাপি নয়। শশিনাথ কথা বললে স্বর নামিয়ে। বললে, তুমি যেখানে নাই আমিও সেখানে নাই।

শিবানী বললে,—তবুও মনটা ভাল লাগছে না। রাজবাড়ী ছেড়ে যেতে হবে, ভাবতে পারি না যেন। রাজমাতার স্নেহ, তা কি কখনও ভুলতে পারি?

শশিনাথ হাসলো। হাসতে হাসতে বললে,—রাজমাতা এখন রাজকুমারীর ভাবনায় অস্থির হয়ে আছেন। তোমাকে কি তাঁর মনে পড়বে আর? মনে তো হয় না।

ঘাটে যাত্রীদের ভীড়। খেয়াপারের মাঝিরা সরবে ডাকছে যাত্রীদের। গঙ্গার বুকে প্রতিধ্বনি ভাসছে যেন।

শিবানী ভয়ে ভয়ে বললে,—লোক দেখলে আবার ভয় পাই আমি। ভীড় দেখলে যেন হাঁফ ধরে আমার। তুমি আমার কাছ থেকে যেন দূরে যেও না। কাছে কাছে থাকবে।

জীবনসঙ্গিনীকে খুঁজে পেয়েছে শশিনাথ। মনের মত একটি মেয়েকে পেয়েছে। আনন্দে দিশাহারার মত পথ চলেছে হনহনিয়ে। কে জানে কেন ভয় হয় তার! চোর যেমন চুরির পর ভয় পায় ধরা পড়ার আশঙ্কায়। শশিনাথ ঘাটের ইদিক-সিদিক দেখতে থাকে—কোন পরিচিত জন আছে কি না, দেখে নেয় যেন দৃষ্টি বুলিয়ে।

মনের সুখে ঘর বাঁধতে চলেছে শিবানী। সংসার পাততে চলেছে। দেশ থেকে দেশান্তরে চলেছে সাহসিকার মত। তবুও তার মন যেন সায় দিতে পারে না। পেছনে ফেলে-আসা রাজগৃহের অদৃশ্য আহ্বান শুনতে পায় যেন। রাজমাতার মুখখানি বারে বারে স্মৃতিপটে ভাসতে থাকে। বিলাসবাসিনী যেন তার নাম ধ'রে ডাকছেন, কানে শুনতে পায় শিবানী। বড়রাণী উমারাণী তাকে হয়তো এখন কত খোঁজাখুঁজি করছেন! সেই মিষ্টিমুখ রাজবধূকেও চোখের সামনে দেখতে পায়। উমারাণীর হাসি-ভরা মুখ, কখনও হয়তো বিস্মৃত হওয়া যাবে না।

শিবানীর আঁখির কোণে ভোরের আলোর রূপালী ছায়া নাচে থরথরিয়ে। পিছুটানের মায়া, বিয়োগের দুঃসহ ব্যথায় শিবানীর বুকে কেমন একটা দম-আটকানো কষ্ট হয় যেন। বাঁধ-না-মানা চোখের জল দেখতে পায় না শশিনাথ।

ছেলেবেলার স্মৃতি আজও চোখে স্পষ্ট হয়ে আছে। এত নিবিড় ভাবে কৈ কখনও কেন মনে পড়েনি কখনও। খেলাঘরের সাথী রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর কত ভালবাসা শিবানীর প্রতি। খাদ্যের ভাগ দিয়ে খেতেন রাজকুমারী; নিজের গাত্র-অলঙ্কার খুলে খুলে পরিয়ে দিতেন; কত সখের জিনিষ বিলিয়ে দিতেন শিবানীকে।

বিন্ধ্যবাসিনীর জীবন সুখের নয়। কুলীনকর্তার উৎপীড়ন আর অত্যাচারে রাজকন্যা শোনা যায়, মরমে ম'রে আছেন। গড়-মান্দারণে বন্দিনী আছেন। বৃথা শাস্তিভোগ করছেন।

—কৈ গো, গেলে কমনে?

যাত্রীর জনারণ্য গঙ্গার তীরে। কলকোলাহলে কান পাতা দায়। তাড়াতাড়ায় ছুটাছুটি করছে খেয়াপারের যাত্রী। একে অন্যকে ডাকাডাকি করছে। সঙ্গের লোক আর পুঁটলি-প্যাঁটরা হারানোর ভয়ে অস্থির, যাত্রীরা দল বেঁধে তীর থেকে ঘাটে নামছে। বস্তায় বস্তায় মাল বোঝাই চলেছে। ঘাটের ধাপে ধাপে দুই পিপীলিকাশ্রেণী ওঠা-নামা করছে। এক সারি ওপর থেকে নীচে নামে, আরেক দল নীচে থেকে ওপরে যায়। মূক আর বধির যেন তারা। বিমর্ষ মুখাকৃতি। ঠিকাভাড়ার মালবাহী মানুষ, বস্তা পূর্ণ করে আর খালাস করে, উদয় থেকে অস্তকাল।

ঠিকাদার মধ্যে মধ্যে লকলকে বেত চালায়। যে ধীরে চলে, তার গতি মন্থর হয়। যার গতি মন্থর, সে দ্রুত চলে।

শশিনাথ যেদিকে তাকায়, সেদিকে শুধু বিচালির দেওয়াল। রাশি রাশি খড়-বিচালি আর চালের বস্তা। নৌকার ছইয়ের ভেতরে স্থান পায় শিবানী। শশিনাথ কেন কে জানে, দূরে দূরে থাকে। চার চোখের মিলন হ'লে মৃদু-মন্দ হাসে। অন্যান্য যাত্রীরা পাছে লক্ষ্য করে, তাই শিবানী যখন-তখন ঘোমটা টানে। অনভ্যাস, তবুও মুখের হাসি লুকাতে হয় ঘোমটার আবরণে।

নৌকা ছাড়লো ঠেলা মেরে। দুলতে দুলতে জলে ভাসলো। শিবানী যেন হঠাৎ দেখতে পায় ফেলে-আসা তীরভূমি। সুতানুটি গ্রাম। চোখে ধূলিকণা পড়লো না কি! ছলছল চোখে শিবানী দেখে সুতানুটির গ্রামাঞ্চল। ছইয়ের ভেতরে একজোড়া সজল চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। শিবানী! শিবানী! কানে যেন রাজমাতার ডাক শুনতে পায় শিবানী। নাম ধ'রে ডাকছেন তিনি। ছেলেবেলার খেলার সাথী রাজকুমারীর মুখখানি মনের মুকুরে দেখতে পায় শিবানী। বিন্ধ্যবাসিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, কখনও হয়তো ভুলতে পারবে না।

যাত্রিপূর্ণ নৌকায় কে কার খোঁজ নেয়? শশিনাথ কিন্তু ঠিক চোখ রেখেছে। যখন-তখন দেখছে ছইয়ের ভেতরে একটি কাতর মুখ; বড় করুণ চাউনি যেন ঐ দুই চোখে। দুরু দুরু বুকে অজানার উদ্দেশে ব'সে আছে।

গড়-মান্দারণে ঊষার আলোর প্রথম স্পর্শ লেগেছে গাছের শিখরে শিখরে। মঠ, মন্দির আর মসজিদের চূড়ায়। যদিও রুদ্ধদ্বার ঘরে ঘরে এখনও অন্ধকার বিরাজ করছে। মুরগী ডাকাডাকি করছে মুসলমানের গেরস্থালী আঙিনায়।

রাজকুমারী ভাবছিলেন, দিনের আলো ফুটলে লজ্জার অবধি থাকবে না। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢেকে বসে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। সুখের অনুভূতির পর কি এক অনুশোচনায় স্থির হয়ে আছেন যেন! রাজকন্যার বেশবাস অবিন্যস্ত, কেশের বোঝা এলোমেলো। বিনিদ্রার জ্বালা ধরছে চোখে। দেহ যেন অবশ হয়েছে।

গবাক্ষপথে দৃষ্টি অন্য এক জনের। আমোদরের জলে রূপালী চিকণ খেলছে; সূর্য্য-আলোর প্রতিচ্ছায়া। নদীর অপর তীরে ঘন বনাঞ্চলে এখনও আঁধারের লেপন দেখা যায়। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, আলোর প্রবেশ নেই।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—কোথায় যাওয়া যায় বলতে পারেন রাজকন্যা? এমন কোথাও যেতে চাই, যেখানে সমাজ নাই, পরিচিত মানুষ নাই। শাসক সম্প্রদায় বলতে কিছু নাই।

বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত মুখ। বিন্ধ্যবাসিনীর কথা তবু শোনা যায়। রাজকুমারী স্বল্প হেসে বললেন,—হিমালয়ের পাদদেশ, নয়তো বঙ্গ-সাগরের মধ্যস্থল ব্যতীত আর কোথাও আপনার তেমন ঠাঁই দেখি না।

—পরিহাস নয় রাজকন্যা, এ আমার অন্তরের কথা। চন্দ্রকান্ত গবাক্ষ থেকে চোখ না ফিরিয়ে কথাগুলি বললেন। খানিক থেমে আবার বলেন,—আনন্দকুমারীর মা চৌধুরী-গৃহিণী আমাকে কি আর মান্দারণে বসবাসের সুযোগ দেবেন? মনে তো হয় না। চৌধুরী-গৃহিণী মেয়েকে হারিয়ে যদি প্রতিহিংসার পথ ধরেন। আমি যেন বর্তমানে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। স্থির সিদ্ধান্তে কিছুতেই উপনীত হ'তে পারি না যেন। মান্দারণ আমাকে ত্যাগ করতেই হবে।

—আমার অবস্থাও তদ্রূপ। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন ধীরকণ্ঠে। বললেন,—মুক্তির কোন উপায় দেখতে পাই না। জানি না, এই অবস্থা আরও কত কাল চলবে! অসহ্য ঠেকছে যেন আমার। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে। চিরকালের মত জ্বালা জুড়ায়।

চন্দ্রকান্ত কখন নিকটে এসেছেন, দেখতে পাওয়া যায় না। রাজকুমারীর একখানি হাত নিজ হাতে ধারণ করলেন। কোমল করপল্লব চন্দ্রকান্তর মুষ্টিমধ্যে পিষ্ট হ'তে থাকে। চন্দ্রকান্ত বললেন,—আত্মনিপীড়ন শাস্ত্র-বহির্ভূত জানবেন।

—যে সমাজচ্যুত, তার কাছে শাস্ত্রের মূল্য কি? সংসারে যার ঠাঁই হয় না, তেমন নারীর জীবনের কোন দাম নাই। মরণই তার মঙ্গলের।

বিন্ধ্যবাসিনী কথা বলেন যেন ব্যথাতুর কণ্ঠে। তাঁর কথার সুরে বেদনা পরিস্ফুট। রাজকুমারীর মুখ অদৃশ্য, শুধু কথা শোনা যায়। মুখনিঃসৃত কথা।

হাতে হাত। চন্দ্রকান্তর যুক্তি টেঁকে না। শাস্ত্রের নজীর তোলায় কোন ফলোদয় হয় না।

রাজকন্যা বলেন,—আমাকে এখন আর স্পর্শ না করেন, এই অনুরোধ। পরিচারিকা যশোদা যদি দেখে তো বিপদে পড়বো আমি। আমার দুর্নাম রটনা করবে সে। জমিদার মশায়ের কাছে খবর চলে যাবে, তখন আর রক্ষা থাকবে না।

কণ্ঠস্বর নামালেন চন্দ্রকান্ত। মৃদুকণ্ঠে বললেন,—আমি যে কোন মতেই মতি স্থির করতে পারছি না। ভোগ না ত্যাগ, কাকে আশ্রয় করি?

কথা খুঁজে মেলে না যেন। রাজকুমারী নীরব থাকেন। চন্দ্রকান্তর বজ্রমুষ্টিতে বিন্ধ্যবাসিনীর কোমল হাত বন্দী হয়ে আছে।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের অট্টহাসিতে দু'জনেই চমকে উঠলেন যেন। চন্দ্রকান্ত ইদিক-সিদিক দেখলেন, কোথায় যেন অদৃশ্য শ্বেত মূর্তি এসে হাসতে থাকলো। আঁচল নামিয়ে বিন্ধ্যবাসিনীও দেখলেন। অস্ফুটে বললেন,—কে?

অট্টহাসি থেমেও যেন থামে না। নারীকণ্ঠ হাসতে হাসতে বললে,—আমি তোমার সতীন। একা একা মজা লুটতে দেবো না তোমাকে।

চন্দ্রকান্ত আর বিন্ধ্যবাসিনী—দু'জনেই হতবাক যেন। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছেন ইতি-উতি। কিন্তু কারও দেখা মিলছে না।

রাজকন্যা স্বগত করলেন,—আনন্দকুমারীর কণ্ঠস্বর কি!

চন্দ্রকান্ত বললেন,—হাঁ তাইতো বটে। চৌধুরাণী।

কক্ষের বাহির থেকে কথা শোনা যায়। অট্টহাসি থামিয়ে কে যেন বললে,—রাত্রি শেষ হয়েছে, খেয়াল আছে কি? দিবালোকে মিলনের অবকাশ নেই রাজকন্যা!

বুকের মাঝে কম্পন লাগে বিন্ধ্যবাসিনীর। রাজকন্যা উঠে দাঁড়ালেন। কক্ষের বাহিরে এসে দেখলেন বণিককন্যা চৌধুরাণীকে। আনন্দকুমারীর পরিধানে ছুরানো শ্বেতবস্ত্র। রুক্ষকেশ। তার মুখাবয়বে কাষ্ঠের কাঠিন্য যেন। রাজকুমারীর চোখে চোখ পড়তেই চৌধুরাণী গাম্ভীর্য অবলম্বন করেন। অভিমানী দৃষ্টি তার চোখে।

—কোথা থেকে এসেছো এই অসময়ে? সাগ্রহে শুধালেন রাজকুমারী। বললেন,—সত্য না মিথ্যা! আপন চক্ষুকে বিশ্বাস হয় না আমার।

আবার খিল খিল শব্দে অট্ট হাসি ধরলো চৌধুরাণী। হাসতে হাসতে বললে,—হাতে হাতে ধরে ফেলেছি আমি, বেশ বুঝেছি। কিন্তু আমি উপায়হীনা। আমোদরে এক বজরায় সুতানুটির রাজগৃহের ছোট কুমার তোমার জন্য অপেক্ষায় আছেন। অবিলম্বে তিনি তোমার সাক্ষাৎ চাইছেন।

—কে? আমার সহোদর কালীশঙ্কর এসেছেন? ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন রাজকুমারী। বললেন,—তুমি তাঁর পরিচয় কোথা থেকে অবগত হয়েছো তাই শুনি?

খিল খিল হাসির বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। চৌধুরাণী সহসা কক্ষদ্বারের শিকলি তুলে দেয়। বলে,—চন্দ্রকান্ত, তোমার আর মুক্তি নাই জানবে। কথার শেষে রাজকুমারীকে বললে,—হাঁ, তোমার অনুমান অভ্রান্ত। তুমি নদীতীরে চল' এখন।

—পাঠান প্রহরী যদি বাধা দেয়? সভয়ে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—সুতানুটির সমাচার কিছু জানো চৌধুরাণী?

—না। আমার কোন প্রয়োজন দেখি না। হাসি থামিয়ে বললে চৌধুরাণী। বললে,—চল' এখন নদীতীরে। বেলা অধিক

চ'লে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। পাঠান এখনও তাড়ির নেশায় বিভোর।

রুদ্ধ কক্ষ থেকে চন্দ্রকান্ত বললেন,—আনন্দ, দুয়ারের শিকল মোচন কর। আমাকে মুক্তি দাও।

—দেহে প্রাণ থাকতে নয়। তোমার আর মুক্তি নাই জানবে।

—আমার অপরাধ কি, তাই শুনি?

—অপরাধের বিচার পরে হবে। আপাততঃ থাক সে প্রসঙ্গ।

—তোমার নামে অখ্যাতি ছড়াবে যে!

—তার আর বাকী আছে কি! মান্দারণে কুলত্যাগিনী আনন্দকুমারীর নাম কেউ আর উচ্চারণ করে না, একজন আমি ভীত নই। কথার শেষে রাজকন্যার একখানি হাত ধ'রে প্রায় টানতে টানতে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হয় চৌধুরাণী। বলে,—ভয় নাই রাজকন্যা, মিথ্যা বলার আমার অভ্যাস নাই। কুমার বাহাদুরের হাতে তোমাকে সঁপে না দেওয়া তক আমার আর কোন কাজ নাই।

—কুমার বাহাদুরকে কোথায় দেখলে তুমি? বড্ড ভাল লাগে না চৌধুরাণী। বিন্ধ্যবাসিনী ঈষৎ রোষের সঙ্গে বললেন। বললেন,—তুমি কোথায় ছিলে ক'দিন, ক'রাত্রি? কোথা থেকে এলে তাও জানি না।

—এত কানাকানিতে কি লাভ আছে? তুমি ত্বরায় চল। মান্দারণের মানুষ জানলে সকল কার্য বিফল হবে। পাঠান প্রহরীর বন্দুককে বড় ডরাই আমি।

—সত্য বলছো কি? না অন্য কোন' অভিসন্ধি আছে তোমার?

ক্ষণেক স্থির দাঁড়িয়ে আনন্দকুমারী বললে,—মিথ্যা আমি বলি না। অভিসন্ধি, তুমি রক্ষা পাও। তোমার মুক্তি হোক, এই ভগ্নদেউল থেকে। শৈলেশ্বরের দিব্য গালছি।

আর বাক্যব্যয় করলেন না রাজকুমারী। চৌধুরাণীকে অনুসরণ করলেন ভীতচকিত পদক্ষেপে। বিন্ধ্যবাসিনী লক্ষ্য করলেন, আনন্দকুমারীর দুই বাহুতে, কণ্ঠে ও কপোলে কালসিটার দুর্দান্ত চিহ্ন। মনে মনে ভাবলেন, ম্লেচ্ছের প্রেমালিঙ্গনে হয়তো এই দশা চৌধুরাণীর।

অনুমান ভিত্তিহীন নয়। বিন্ধ্যবাসিনী নারী, তাই হয়তো দেখেই চিনে নিয়েছেন, অনুরাগের রেখা চৌধুরাণীর দেহে। ম্যাকেঞ্জির প্রীতি—পরিচয় আঁকা রয়েছে এখনও।

নদীর তীরে বালুময় পায়ে-চলা পথ ধ'রে আনন্দকুমারী তড়িৎ গতিতে চলতে থাকে। ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করেন রাজকুমারী। কিছুদূরে পৌঁছে তিনি দেখলেন, আমোদরের অদূরে একটি বজরা অপেক্ষা করছে। বজরাগাত্রে চিত্র-বিচিত্রিত শিল্পকার্য।

—টিমেতালে নয়। তাড়াতাড়ি চল'। দিনের আলোয় ভয় আর বিপদের সম্ভাবনা আছে। কথা বলতে বলতে আনন্দকুমারী খঞ্জনা পাখীর মত ছুটতে থাকে যেন লাফ দিয়ে দিয়ে।

রাজকন্যা পা চালালেন। ফণিমনসার কাঁটা পথের এখানে সেখানে। কণ্টক উপেক্ষা ক'রে চললেন তিনি।

বজরার কাছাকাছি যেতেই চৌধুরাণী বললে,—কি গো রাজার দুলালী, বিশ্বাস হয়েছে।

বজরার পাটাতনে কুমার কালীশঙ্কর। সহোদরাকে হাত ধরে তুললেন বজরায়। তাঁর মুখে জয়ের হাসি যেন। কালীশঙ্কর বললেন,—আয় বিন্ধ্যবাসিনী!

রাজকন্যা কি স্বপ্ন দেখছেন। কেমন যেন আচ্ছন্ন তিনি। সিক্তকণ্ঠে বললেন,—কোথায় যাবো ভাই?

—রাজমাতার কাছে। সুতানুটিতে ফিরে যাবি। কালীশঙ্কর বললেন খুশী মনে। বললেন,—রাজমাতা তোর জন্য আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

—স্বামীর ঘর। বিন্ধ্যবাসিনী যেন অসহায়ের মত কথা বলেন। বললেন,—তিনি কি মনে করবেন? কথার শেষে অগ্রজকে প্রণাম করেন রাজকন্যা।

কালীশঙ্কর সহাস্যে বলেন,—চুলোয় যাক স্বামীর ঘর। কৃষ্ণরামকে ত্যাগ করতে হবে। সাতগ্রামকে ভুলতে হবে তোকে।

তখনও হাসছে আনন্দকুমারী। নদীতীরে তার খিলখিল হাসি মুক্তাবলীর মত ছড়িয়ে পড়ছে যেন।

কুমারবাহাদুর আবার বললেন,—এসো আনন্দকুমারী, তুমি এসো। বজরায় উঠ'।

হাসি থামিয়ে আনন্দকুমারী বললে,—না কুমারবাহাদুর! আমাকে মার্জনা করুন। আমি মান্দারণেই থাকি। আপনার অশেষ কৃপা, কখনও ভুলবো না জানবেন।

বজরা চঞ্চল হয়ে উঠলো যেন। তীর থেকে মধ্যজলের দিকে এগোতে থাকে ধীরে ধীরে।

কালীশঙ্কর দেখলেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে, বিদ্যুতের বেগে ছুটতে ছুটতে ফিরে চলেছে আনন্দকুমারী। তার চলার গতিতে জল পলি-বালি উড়ছে। কুমারবাহাদুরের চোখের পলক পড়ে না যেন। তিনি দেখলেন, যেন এক অভিসারিকা ছুটে চলেছে দয়িতের সন্ধানে।

জলে বজরা এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। তীরে চৌধুরাণী ছুটছে যেন কুরঙ্গীর মত। অভিসারিকা ছুটছে—কালীশঙ্করের অনুমান মিথ্যা নয়। রাজকন্যার চোখে যেন স্বপ্নঘোর নামে। [ক্রমশঃ।

প্রাচীনকালে ফরাসী-পর্য্যটকের চোখে ভারত-মহিলা

ফরাসী পর্য্যটক আঁদ্রে শেভ্রিয়োঁ ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করে এ দেশীয় স্ত্রীলোকদের গঠন সম্বন্ধে এইরূপ বলেন:—

"এই সকল স্ত্রীলোক সাদাসিধা অথচ জমকাল পরিচ্ছদ পরিধান করে। ইহারা যখন চলা-ফেরা করে তখন যেমন চক্ষের তৃপ্তি হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। মাথায় পিতলের ঘড়া লইয়া, যেরূপ তাহারা পশ্চাতে একটু হেলিয়া সটানভাবে দণ্ডায়মান হয়, তাহাতে তাহাদের সুন্দর গঠন-রেখা সকল প্রকাশ পায়। বিচিত্র রঙের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও উহাদিগকে দেখিয়া পুরাকালের গ্রীক-রমণীদিগকে মনে পড়ে। সেই একই প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দেহভঙ্গী, সেই একই অঙ্গ-ভঙ্গীর প্রশান্তভাব—সেই একই মুক্তবায়ুতে জীবনযাপন—সেই একই ছোট ছোট মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘরে বাস। এই সকল ঘর নিম্ন, ঠাণ্ডা, সাদা ধবধবে, চৌকোণা ও আসবাব বিবর্জিত এবং তাহাদের ছায়ায় বসিয়া রমণীগণ সূতাকাটা কার্য্যে নিযুক্ত।"

পরীক্ষার হালচাল

"গত কয়েক বৎসর ধরিয়া স্কুল ফাইন্যাল বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেলের সংখ্যা বাড়িয়াছে। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই হয়ত দীর্ঘ দিন কিংবা ৮।১০ বৎসর ধরিয়া শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আজ তাঁহারা হঠাৎ অযোগ্য হইয়া গেলেন কিরূপে? ইঁহাদের ছাত্র-ছাত্রীরাই তো পূর্ব্বে অধিক সংখ্যায় পাশ করিয়াছে। গত কয়েক বৎসরে শিক্ষকতা ক্ষেত্রে যাঁহারা নূতন প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের অযোগ্যতার কি প্রমাণ নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ পাইয়াছেন? তাঁহারা 'কর্ত্তাব্যক্তি' হইয়া বসিয়াছেন বলিয়াই এই ধরণের মন্তব্য তাঁহারা করিতে পারেন না। আজকাল ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের একটা ধূয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করিয়া শিক্ষাদান সম্পর্কে ট্রেণিংবিহীন শিক্ষকরা যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন তাহার মূল্য ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা অপেক্ষা কম, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষা ফেলের যাহা কারণ সে-দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না। দোষ চাপান হইতেছে শিক্ষকদের উপর। পাঠ্যক্রমকে পর্ব্বত প্রমাণ করা হইয়াছে, নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ তাহা স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয় না। এ সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে সে সম্পর্কে রাজ্য সরকার-সমূহকে তদন্ত করিতে বলা হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যতালিকা যে অত্যন্ত গুরুভার তাহা কি নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সদস্যরা জানেন না? যদি না জানেন তবে তাঁহাদের এই অজ্ঞতার কারণ কি? স্কুল ফাইন্যাল বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যতালিকা দেখিয়াও কি উহা যে অত্যন্ত গুরুভার তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না? পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুভার পরীক্ষার বেশী সংখ্যক ফেলের একটি কারণ। তাহা ছাড়া আমাদের আশঙ্কা হয়, শিক্ষা বিভাগ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ফেল করার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই নীতি অনুযায়ী প্রশ্নপত্র রচিত হয় এবং উত্তরপত্র পরীক্ষা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার দিকে যাহাতে আর না ঝুঁকে তাহার জন্যই ফেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে, এইরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

—দৈনিক বসুমতী।

সজ্জনদের বিপদ

"পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট গত বৎসর পাকিস্তানের দুই শাখার মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির অভিযোগে সীমান্ত নেতা খান আবদুল গফুর খাঁর প্রতি চৌদ্দ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দিয়াছিলেন এবং টাকা আদায় না হইলে তাঁহার ভূসম্পত্তি নীলামের নির্দেশ দিয়াছিলেন। প্রথম তাঁহার বাড়ী নীলামের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল যে, তাঁহার নামে কোন বাড়ী নাই, তখন তাঁহারা তাঁহার চাষের জমি নীলামের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি সেই জমি নীলাম হইয়া গিয়াছে এবং জানা গেল যে, তাঁহার পুত্র ওয়ালি খাঁ সর্বোচ্চ ডাকে তাঁহার পিতার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছেন। চৌদ্দ হাজার টাকা আদায়ের যে নীলাম করা হইল, তাহাতে সর্বোচ্চ ডাক কত উঠিয়াছিল তাহা অবশ্য প্রদত্ত সংবাদ হইতে জানা যাইতেছে না। উহা জানিতে পারিলে ভাল হইত। তবে ইহা স্পষ্ট যে, তাঁহার পুত্র অপেক্ষা বেশী অর্থ থাকিতে কেহ রাজী হয় নাই। ইহার কারণ কি এই যে, নীলাম ডাকিতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের উহাতে কোন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না, অথবা খান আবদুল গফুর খাঁর জমি যাহাতে তাঁহার পুত্রের হাতেই থাকে, সেজন্য অন্য লোকেরা সতর্ক ছিলেন। কারণ, যাহাই হউক, ঘটনা দাঁড়াইল এই যে, পাকিস্তানে খান আবদুল গফুর খাঁর বাড়ীও নাই, সম্পত্তিও রহিল না। ইহাতে তাঁহার কি খুব বেশী ক্ষতি করা যাইবে? পাকিস্তানের বর্তমান শাসকগণ সম্ভব হইলে হয়তো তাঁহার ধনেপ্রাণে বিনাশই কামনা করিতেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হইতেছে না বলিয়াই তাঁহাকে 'এতিম' বা 'ফকির' করিয়া ছাড়িলেন। ইহার পরে তাঁহাকে পাকিস্তানের ভোটাধিকারবঞ্চিত করিবার জন্য যদি নূতন কোন কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহাতেও আমরা বিস্মিত হইব না। কারণ, পাকিস্তানে এখন সজ্জনেরাই সর্বাধিক বিপন্ন।"

—যুগান্তর।

হঠাৎ বিস্ফোরণ?

"এবারে আর আতসবাজীর ব্যাপার নয়, খাঁটি গোলা-বারুদের বিস্ফোরণ। বিহারের সাহেবিয়াসরাই ষ্টেশনে গুলী-বারুদভরা একটি বড় আকারের বাক্স মাল-গাড়ীর এক ওয়াগান হইতে অন্য ওয়াগানে লইয়া যাইবার সময় এক বিস্ফোরণ ঘটে; তাহার ফলে একজন বাহক তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অপর দুইজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হয়। স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিপূর্বে উপর্যুপরি কয়েকবার আতসবাজি-ঘটিত বিস্ফোরণ ঘটিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক হতাহত হওয়া ছাড়াও ধন-সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। সে সব বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যেমন সরকারী তদন্ত পরিচালিত হইয়াছিল, বর্তমান দুর্ঘটনাও তেমনি বর্তমানে তদন্তাধীন। এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ ঘটিয়াছিল যে, পূর্ববর্তী বিস্ফোরণগুলি নেহাৎ দৈব দুর্ঘটনা নয়, তাহাদের পশ্চাতে দুরভিসন্ধিপরায়ণ লোকের সক্রিয় হস্তক্ষেপ থাকিলেও থাকিতে পারে। আলোচ্য বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে অলক্ষ্য হস্তের সেরূপ কোন কার্য্যকারিতা নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। জোর করিয়া এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, একদা আতসবাজীর বাক্সে যে হাত বিস্ফোরণ ঘটায়, আজ তাহাই গোলা-বারুদের বাক্সকে স্পর্শ করিয়াছে। আরব্ধ তদন্তের ফলাফল জানিবার জন্য জনসাধারণ উৎকণ্ঠিত রহিবে।"

—আনন্দবাজার।

নেতাজীর প্রতিমূর্ত্তি

"কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস দল এবং বিরোধী দল একসঙ্গে প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন যে, শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার ট্রাফিক দ্বীপে একটি ছোট ঘর করিয়া উহাতে নেতাজীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা হউক। একমাত্র শৈবাল গুপ্ত আই-সি-এস বলিয়াছেন যে, নেতাজীর মূর্ত্তি উন্মুক্ত স্থানে হওয়া উচিত। বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার বাহিনীর তরুণেরা আউট্রাম মূর্ত্তির স্থলে নেতাজীর মূর্ত্তি বসাইবার আন্দোলন করিতেছেন। বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি তাঁহাদের সঙ্গে রহিয়াছে, কিন্তু বিরোধী দলগুলি সাহায্য করিতেছে না বলিয়া এই আন্দোলন দানা বাঁধিতে পারিতেছে না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ঐ তরুণদের কাছে পূর্ত্তসচিব খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তাহারা অন্য যে কোন জায়গা বাছিয়া নিলে গভর্ণমেণ্ট লক্ষ টাকা ব্যয়ে নেতাজীর মূর্ত্তি তৈরি করিয়া সেখানে বসাইয়া দিবেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার পার্টি তাহাতে রাজী হয় নাই এবং কেন রাজী হয় নাই তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে। এই আন্দোলন ব্যর্থ করিবার জন্য শ্যামবাজারে মূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে ইহা সুস্পষ্ট। বিরোধী দলেরা একবাক্যে কংগ্রেসের চাল সমর্থন করিয়া আবারও বুঝাইয়া দিলেন—ভোটের পরে বোতল আর ফচ্ করে না, কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলায়। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন অনেক দূর ইহা ঠিক, কিন্তু ভোটদাতারা যদি অত দিন অপেক্ষা না করিয়া বিশ্বাসঘাতকদের ধরিয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে তখন কি হইবে?"

—যুগবাণী।

পৌর কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য

"কালনায় ১এর পল্লীর কোন কোন মহল্লাস্থিত ছিদ্রে গৃহের ভগ্ন, জীর্ণ, গায় পয়ঃনালা দিয়া দূষিত ময়লা জলে শান্তিপ্রিয় পথচারীদের নিত্য অশান্তি ঘটিলে প্রতিকার ব্যবস্থায় মহামান্যবর পৌরপ্রধান সমীপে লিখিত আবেদন নিবেদন করিলেও এ পর্য্যন্ত উহার স্থায়ী প্রতিকার ব্যবস্থা হয় নাই। বৈতনিক ঝাড়ুদার এবং ঝাড়ু, ব্রুশ, রোগ প্রতিষেধক চূর্ণ ক্রয়ের বার্ষিক অর্থ বরাদ্দ ব্যবস্থা থাকিলেও সহরের পীচাস্থিত পথে ও পাকা নর্দ্দমা ঝাড়ু ও নর্দ্দমা ব্রুশ প্রভৃতি দ্বারা নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করা হয় না। কালে ভদ্রে যাহা হয় তাহাও কোন কোন বিশিষ্ট অধিবাসীর গৃহ সম্মুখস্থ পথ-ঘাটেই। উক্ত কার্য্যের জন্য ভারপ্রাপ্ত বৈতনিক পরিদর্শকও আছেন। পৌরসভার মাননীয় স্বাস্থ্য-অধিকর্ত্তা মহোদয়ের কৃপাদৃষ্টিরও অভাব একান্ত অজ্ঞাত কারণেই।"

—ভাগীরথী (কালনা)।

চালবাজি!

"খাদ্যশস্য তো দূরের কথা, এমন কি অখাদ্য পর্য্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষ মন্ত্রীদের উদ্ভাবনীশক্তি পর্যন্ত ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। চালের চাইতে আটা সস্তা। অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার চালের খরচ যোগাইতে না পারিয়া, দুই বেলা আটা খাইতে বাধ্য হইতেছে। বিপদ হইয়াছে বাচ্চা ও রুগ্নদের লইয়া। রেশনে এক প্রকার আমেরিকান আতপ চাল মিলিতেছে। তাহা কোনমতে উদরস্থ করিতে পারিলেও ধাতস্থ করা নাকি অত্যন্ত কঠিন। তাহা ছাড়া নাকি দেখা যাইতেছে, এই চাল দিয়া কাপড় কাচিলে কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়। ক্ষারের ক্ষমতাবিশিষ্ট এই চাল—খাওয়ার পক্ষে আবার আর এক ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।"

—স্বস্তিকা (কলিকাতা)।

চাষীদের দুরবস্থা

"১৯৪৭ সালের আগষ্ট হইতে বিদেশী শোষণ বন্ধ হইয়াছে বলা যাইতে পারে কিন্তু প্রশ্ন, পল্লীবাসীর ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে না কমিয়াছে। প্রাইভেট মহাজনী উঠিয়া গিয়া গবর্ণমেণ্ট ঋণ দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর কৃষি ঋণ, হালের বলদ খরিদ ঋণ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ সমবায় সমিতি প্রভৃতির নিকট যত টাকা ঋণ পাইবার দরখাস্ত আসে তাহার কতটুকু পরিমাণ ঋণ গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন মঞ্জুর করেন তাহার হিসাব নিকাশ হইলে দেখা যাইবে বৎসরে বৎসরে ঋণের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়িতেছে এবং ঋণের চাহিদা বাড়িতেছে। পল্লীবাসী ক্যানেলকর বা অন্য প্রকারে গৃহীত ঋণ বৎসর বৎসর কিস্তি পরিশোধ করিতে পারে না। বৎসর বৎসর ঋণ ও খাজনা আদায় না করিবার জন্য এবং কিস্তিবন্দী করিবার আবেদন আসে। সরকারী বিবরণীতে

ঋণভারপীড়িত পল্লীবাসীর ঋণের বিবরণ থাকে না এমন নয় ; সুতরাং শ্রীনেহেরু বা অন্যান্য রাষ্ট্রনায়ক পল্লীবাসীর আর্থিক সম্পর্কে অবহিত নন একথা অতি বড় মূর্খের পক্ষেও কল্পনা করা শক্ত। প্রত্যেক পল্লী দিন দিন চরম হতশ্রী হইতেছে, দৈন্য ও দারিদ্র দিন দিন বাড়িতেছে। দুই-চারিজন বড় চাষীর ঘরে অর্থ আছে তাহারা প্রতিবেশীর অভাবের সুযোগ এবং গবর্ণমেণ্টের ঋণ দানের সঙ্গতি ও অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া শতকরা পঁচিশ টাকা সুদে টাকা খাটায়। সারা বছর দুইবেলা পেট ভরিয়া ভাত ডাল খাইতে পায় এরূপ পরিবারের সংখ্যা শতকরা ত্রিশজনেরও কম। বৃটিশ আমলে এতখানি দুরবস্থা পল্লীর ছিল কি ?" —বীরভূম বাণী।

ডি, ডি, টির অপব্যবহার

"তমলুক সহরে ম্যালেরিয়া কনট্রোল ইউনিট যে কি ডি-ডি-টি ছড়াইতেছেন লোকে তাহাতে বিরক্ত হইতেছে। একেই ত ইহাতে আসবাবপত্রাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহাতেও যদি কিছু মশা-মাছি মরিত তবু না হয় কতকটা সান্ত্বনা থাকিত। কিন্তু ইহা যে কিরূপ ডি-ডি-টি এবং ছড়াইবার ধরণই বা কেমন যে মশা-মাছি মরিবে কি, তাহাদের উপদ্রব যেন বাড়িয়াই যায়। প্রথমবার তবু টিকটিকি আরশুলা বংশ ধ্বংস হইয়াছিল, মশাও কিছুদিন দেখা যায় নাই ; এবার সেরূপ কিছু ঘটিতেছে না, কেবল জিনিষপত্র সামলাইবার হাঙ্গামা পোহানই সার। অতএব এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি আবশ্যক।" —প্রদীপ (তমলুক)।

বাকসীহাট প্রসঙ্গে

"বাগনান থানার অন্তর্গত বাকসীহাটের বর্ত্তমান পরিস্থিতি খুবই জটিল। আমরা জানি, জমিদারী দখলের ৬নং ধারা অনুযায়ী হাট, বাজার সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে চলিয়া গিয়াছে। সত্যি বলিতে কি, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হাট, বাজার এখনও পুরাতন জমিদারের অধিকারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ম্মতৎপরতা বা সততার অভাবে সরকারের অনেক পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া যাইতেছে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী শাসনযন্ত্র কিছুটা শিথিল হইয়া পড়িতেছে ! জমিদারী দখলে সরকারের এই ভূমিকাকে আমরা অভিনন্দন না জানাইয়া পারি না। জমিদারী দখলের ফলে একটা বিরাট টাকার অংশ সরকারী তহবিলে আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু ঠিক মত অনুসন্ধানের অভাবে বহু টাকার "রাজস্ব অপচয় হইতেছে। যে সব ক্ষেত্রে তড়িৎ গতিতে কাজ চালাইতে হইবে সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের সরকারী কর্ম্মচারীরা কচ্ছপ গতিতে কাজ চালাইয়া যান ! বাকসীহাটের "রাজস্ব অপচয়" এর সংবাদ সরকারী মহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী নীতি গ্রহণ করা খুবই উচিত ছিল কিন্তু তাহা আদৌ হয় নাই। ওয়াকিবহাল মহল হইতে জানা যায়, গত ১০।১০।৫৭ তারিখে S. L. R. O (Uluberia) মহাশয় বাকসীহাটের জমিদারকে হাট সংলগ্ন নদীর চর হইতে কোনরূপ কর বা "দান" আদায় করিতে নিষেধ করিয়া নোটিশ দেন। কিন্তু সরকারী নির্দেশ অমান্য করিয়া উক্ত জমিদার এখনও পর্যন্ত "দান" আদায় কার্য্য পুরাদমে অব্যাহত রাখিয়াছে কোন সাহসে ? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ?" —দেশসেবক (উলুবেড়িয়া)।

বীরভূমে ব্যাপক শস্যহানি

"অনাবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির জন্য আজ বীরভূমের কতকগুলি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে শস্যহানি হইয়াছে। সমগ্র বীরভূম জেলার জমির মধ্যে কিঞ্চিৎ কম এক-তৃতীয়াংশ জমি ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ক্যানেলের সুযোগ পাইয়াছে বাকী দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ জমির আজ যদি শস্য হানি হয় তাহার ফল কি ভীষণ হইবে তাহা আজ জেলাবাসী তথা জেলার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জেলা পরিভ্রমণ করিয়া যতদূর জেলার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই বরং অতীব চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে নূতন ধান উঠার সময়ও যদি ধানের দর ১৩৲ টাকা চালের দর ২৫৲ টাকা থাকে, তবে আগামী বর্ষার সময় অথবা তাহার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে ধানের দর অথবা চালের দর কি হইবে, একথা চিন্তা করিতেও ভয় হয়। বীরভূম জেলা চিরকাল খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত জেলা বলিয়া গণ্য, আজ যদি তাহারই অবস্থা এই হয় তাহা হইলে অন্যান্য জেলা তথা সমগ্র পশ্চিম বাংলার খাদ্যাবস্থা কি হইবে ইহা এক মহা সমস্যার কথা। সুতরাং আমরা এই সময় থাকিতেই সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দকে যাঁহারা অন্ততঃ জেলার খাদ্যশস্যের পরিসংখ্যান রিপোর্ট দেন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

—সেবা (সিউড়ী)।

কীটপোষ গবেষণাগার স্থানান্তরের অপচেষ্টা

"সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কীটপোষ বিভাগের কেন্দ্রীয় পর্য্যালোচনা সংস্থার তরফ হইতে বহরমপুরস্থ কেন্দ্রীয় গবেষণাগারটির উন্নয়নের জন্য ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় রিভিউ বোর্ড এই উভয় সংস্থায় মহীশূর অঞ্চলের সদস্যবৃন্দের প্রভাব বেশী থাকায় বহরমপুরের গবেষণাগারটির কেন্দ্রীয় পর্য্যায়ের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া আঞ্চলিক পর্য্যায়ে অবনত করাইতে চাহেন। এমতাবস্থায় এই গবেষণাগারটির উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেওয়াই হয় নাই। এই টানা-পড়েনের মধ্যে কেন্দ্রীয় রিভিউ বোর্ড একজন জাপানী বিশেষজ্ঞসহ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গবেষণাগারটির পরিদর্শন করিয়া যে ধরণের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে যে উক্ত গবেষণাগারের স্থানান্তর অবনতি ঘটিতে পারে।" —জনমত (বহরমপুর)।

কুটিরশিল্পের জীবন-মৃত্যু

"নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ শেষ হইতে না হইতে হস্তশিল্প সপ্তাহের সরকারী ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ শাসন অবসানের পর হইতে স্বাধীনতার দশ বৎসরের মধ্যে দেশ গঠনের রকমারি পরিকল্পনা এক একটি বিশেষ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মধ্যে এইরূপ বিশেষ প্রচার সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে, যাহা উৎসব দিনের কুলললনার অঙ্গসজ্জার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু কুলললনাদের অপর বেশভূষা রহিয়াছে—গৃহের অভ্যন্তরে তাহাদের নামমাত্র বস্ত্রখণ্ড আচ্ছাদনের মতই দেশের বাস্তব ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। অন্তত মহানগরী কলিকাতার সন্নিকটস্থ বারাসাত মহকুমার গ্রামে

বসিয়া আমরা ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। রেডিও মারফত বাণী-বক্তৃতা, সংবাদপত্রে মোটা মোটা বিজ্ঞাপন ও সচিত্র প্রবন্ধ ব্যতীত পল্লীর তাঁতশিল্পী কি পাইল? ইংরাজ পরাধীন ভারতে যন্ত্র সভ্যতার আমদানীর পর তাঁতশিল্পীদের ভাত উঠিয়া গিয়াছে, সামান্য খেলনার পুতুল হইতে বস্ত্র ধানভানা হইতে গুড় সন্দেশ তৈয়ারীর শিল্পগুলি কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার গোটা বাজার দখল করিয়া রাখিয়াছে। কুটিরশিল্প ও শিল্পীর জীবনের দুইটি প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান আজ পর্য্যন্ত হইল না—কেবল মিঠা কথার উৎসাহ এবং উপদেশ বক্তৃতাবাজী করিলে তাহাদের নবজীবন আসিবে না, কুটিরশিল্পের নূতন জীবন আনিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম শিল্প ও শিল্পীর জীবন-পথ বাধামুক্ত করিয়া দিতে হইবে। হস্তনির্ম্মিত দ্রব্যসম্ভারের যে বাজার কলকারখানা দখল করিয়া রাখিয়াছে সেই বাজার কুটিরজাত শিল্পের জন্য অবাধ মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। যদি পুরাতন ধারা অনুযায়ী 'তামাক খাইব—দুগ্ধও খাইব' ন্যায় হস্ত-নির্ম্মিত শিল্প এবং কলকারখানার উৎপন্ন শিল্প একই বাজারে পাশাপাশি প্রতিযোগিতা করিয়া চলে, তবে ইহা অনিবার্য্য সত্য যে কুটিরশিল্প সেখানে বাঁচিতে পারে নাই এবং কোনদিনই বাঁচিতে পারিবে না। এই যে মৃতপ্রায় কুটিরশিল্পের পুনর্জীবনের বনিয়াদ ইহা শক্ত সবল না করিয়া কেবল 'জাগো... ওঠো...ওঠো' বলিয়া হাজার বৎসর চিৎকার করিলেও হস্ত-নির্ম্মিত শিল্প জাগিবে না।"

—বারাসাত বার্তা।

চুরির হিড়িক

"সহরে ছোটখাটো চুরির সংবাদ প্রায়শ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কিছু কিছু পুলিশের গোচরে আনা হয়—অধিকাংশই থানায় জানানো হয় না। একটু বড় রকমের হইলে এবং থানায় সংবাদ দেওয়া হইলে পুলিশ সাধারণতঃ দায় সারা গোছের একটা তদন্ত করিয়া ইতিকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পুলিশ সম্বন্ধে সহরবাসীর মোটামুটি ধারণা এইরূপ। এই ধারণা যে অমূলক তাহা মনে করিবার কোনো কারণ নাই। কেন না সহরে—মফঃস্বল এলাকার কথা বাদ দিয়া—যে সমস্ত চুরির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শঙ্কিত হইবার কারণ যথেষ্ট রহিয়াছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে সহরের জনবহুল এলাকা হইতে দুইটি সরকারী জীপ অপহৃত হইয়াছে, আজও তাহার কোন কিনারা হয় নাই। বাঁকা নদীর রেলওয়ে ব্রীজের নিকট পাঞ্জাব মেলের ব্রেক ভ্যান ভাঙ্গিয়া বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রকাশ্য ভাবেই লুণ্ঠিত হইয়াছে।"

—বর্দ্ধমান বাণী।

বিড়ি-শ্রমিকদের দুর্দ্দশা

"মালিকগণের নির্ম্মম নীতির অনুসরণের ফলে আজ বিপুলসংখ্যক বিড়ি শ্রমিক একান্ত নিরুপায় ও তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার যক্ষ্মারোগাক্রান্ত, কারণ বিড়িশিল্পের সহিত এই রোগ অনেকটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মালিকগণ লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করিলেও শ্রমিকদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য ও নির্য্যাতিত শ্রমিকগণের অনুকূলে সরকারী সাহায্য ও হস্তক্ষেপের দাবী জানাইয়া স্থানীয় বিড়িশ্রমিক ইউনিয়নের সমস্ত আবেদনও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মালিক ও সরকারের এই উদাসীন মনোভাবের কোন সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। তবে এই অবস্থা চলিতে থাকিলে ফল যে শুভ হইবে না ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যাহা হউক, বিলম্বে হইলেও শ্রমমন্ত্রীর শুভ পদার্পণে শ্রমিকদের মনে নূতন ভাবে আশার সঞ্চার হইয়াছে এবং সরকারী পর্য্যায়ে আন্তরিকতার অভাব না ঘটিলে এই দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের যে একটি সুমীমাংসা হইবে ইহা অনেকেই ধারণা করিতেছেন। মন্ত্রীমহোদয় শীঘ্রই কলিকাতায় মহাকরণে মালিক ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধি দলের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইবেন ও এই বিরোধ মীমাংসার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন। আমরা এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।"

—ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)।

কথা ও কাজ

"কথার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে এবং কেবল কাজের নামে কোটি কোটি টাকাও অপব্যয় হইয়েছে। যে দেশে একজনের বাসের জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা অথচ লক্ষ লক্ষ লোক পথে পথে পড়িয়া রহিয়াছে সে দেশে সমস্তই সম্ভব। দেশের দায়িত্বশীল নেতারা বাক্যের পূর্ব্বে যদি মানুষ গড়িতেন তবে দেশ গঠন হইত এবং অপব্যয়ও বন্ধ হইত। দশটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। সাধারণ অবস্থা সর্ব্বদিক দিয়াই নিম্নগামী। মানুষের নৈতিক ও অর্থনৈতিক মান ধূলায় লুটাইয়া পড়িবার মত হইয়াছে। একদিকে চলিয়াছে কথা ও অকাজ আবার অন্যদিকে চলিয়াছে অসাধুতা ও দুর্নীতির জয়যাত্রা। মানুষ সুকৌশলে পিষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং দ্রুত যন্ত্রে পরিণত হইতেছে! আজ কথা বলার অধিকার যাহাদের তাহাদের কথায় আমরা শুনিতেছি যে আমাদের দেশ দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। কথার সহিত কাজের যদি মিল করিয়া দেখা যাইত তবে আমরা দেখিতে পাইতাম যে ইহা কোন দিকে দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে। এই অগ্রগতি যদি কল্যাণের দিকে হইত তবে বলিবার কিছু ছিল না কিন্তু যদি তাহা না হয় তবে তাহার ফল কি হইবে? একদিন ইহার জবাবদিহি হয়ত করিতে হইবে। মানুষ কাজ ও কথার মিল একদিন না একদিন খুঁজিয়া বাহির করিবে। সেদিন যদি সুখর না হয় তবে কাজ ও কথার গরমিল দূরের জন্য কর্ত্তাব্যক্তিদের এখন হইতেই মন দেওয়া প্রয়োজন।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)

পৌর নির্ব্বাচন ও ভোটার তালিকা

"আগামী মার্চ্চ মাসে বর্দ্ধমান পৌরসভার নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। গত কয়েক বৎসরের পৌরসভার অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটাইয়া সরকার স্বহস্তে পৌরসভার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন ও নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি গণের উপর পৌরসভার দায়িত্ব অর্পণের মনস্থ করিয়াছেন। তজ্জন্যে প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে ও সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ঠিক ভাবে ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্ব্বাচনের একটি বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং

ভোটার তালিকা প্রস্তুতির উপর লক্ষ্য রাখা বর্তমান পৌর শাসক ও সহরের অধিবাসিগণের বিশেষ কর্তব্য। সংশোধিত ভোটার তালিকায় স্থান পাইবার জন্য বহু ভুয়া ভোটারের আবেদন পত্র আসিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।"

—বর্দ্ধমান।

খাদ্যশস্যের মূল্য

"ধান্যমূল্য বৃদ্ধির একমাত্র কারণ, ধান বাহিরে রপ্তানী হইয়া যাওয়া। এ সম্বন্ধে আমরা বহুবারই মন্তব্য করিয়াছি। এক শ্রেণীর অতিলোভী ব্যবসায়ী বা চাউল কলের দালালগণ অতি গোপনে এতদঞ্চল হইতে ধান-চাউল ট্রাকযোগে ও নৌকাপথে বাহিরে চালান আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট সংবাদ আসিয়াছে। কাঁথি-কালীনগর পথিপার্শ্বে অনেকের মজুদ ধান ঐরূপ উচ্চমূল্যে চলিয়া গিয়াছে বলিয়াও অভিযোগ আসিয়াছে। বর্তমান এতদঞ্চলে যেরূপ শোচনীয় খাদ্যাবস্থা, এ অবস্থায় কি করিয়া বাহিরে ধান-চাউল রপ্তানী সম্ভব হইতে পারে! আর এ বৎসর ভাবী ফসলের আশাও যে ভাল হইবে, সে কথা বলা যায় না। একে ত নিতান্ত দেরীতে চাষাবাদ হইয়াছে, তার পর অধিকাংশ মাঠেই জলাভাবের দরুণ ধানবীযগুলি সর্ব্বাংশে পুষ্ট হইতে পারিবে না। ইহাতে ধান্যশস্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে বলিয়া কৃষকের বিশ্বাস। দেশের ভাবী অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ও বর্তমানের দুঃসহ পরিস্থিতির নিরসনকল্পে অচিরেই এতদঞ্চল হইতে ধান্যশস্য রপ্তানী বন্ধ করা উচিত। এ বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। নচেৎ পুনরায় মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া এ দেশবাসীর সঙ্কট অবস্থা ঘনাইয়া আসিবে।"

—নীহার (কাঁথি)।

যুবকদের কীর্ত্তি

"মাসখানেক আগে আপনি যেদিন প্রথম দেখেছিলেন সদর ডাকঘরের পিছনে উঠতে থাকা সুন্দর বালিকা বিদ্যালয়টি, সেদিন পুলকে আপনার মন ভরে উঠেছিলো—শিল্পময় পৃথিবীতে গড়ে ওঠা এই নতুন ভবনটির সাথে মনে মনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু এক মাস পর যখন আপনি আবার দেখলেন অর্দ্ধ-সমাপ্ত উক্ত গৃহটি, তখন চমকে উঠলেন আপনি, চমকে উঠবেনই, কারণ বর্তমান অবস্থায় দেশে সবাই চমকাচ্ছে। ভবনটির বিভিন্ন সৌন্দর্য্যের অন্যতম সৌন্দর্য্য অসংখ্য (আনুমানিক ৫'৬ শত) কাচের সাহায্যে নির্মিত জানালাগুলির একটি কাচও আর অক্ষত নাই। ভাবছেন কে করলো এই অবস্থা? কে করবে! করেছে আমাদের দেশেরই ভবিষ্যৎ কর্ণধারবৃন্দের কয়েক জন। কতটুকু আনন্দ পেয়েছেন তা তো আপনি জানেন না সত্যি, এটুকু নিশ্চয়ই জানেন নিছক আনন্দের জন্য তারা যে ক্ষতি রাষ্ট্রের ও প্রতিষ্ঠানের করলো তার ক্ষমা নাই। অন্যান্য স্বাধীন দেশের যুবক মহলের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনি তুলনা করতে সাহস পাবেন না এদের, কারণ তবে যে আমরা সত্যই মানুষ সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিবে আপনার মনে।"

—বার্তা (জলপাইগুড়ি)

আসাম সরকারের বদান্যতা

"আমরা শুনিতেছি, আসাম সরকার নাকি সত্বরই এইডেড স্কুল শিক্ষকদের বেতনের হারের আরও কিছুটা উন্নয়ন সাধন করিতে চাহিতেছেন। যদি বাস্তবিকই সরকার এই ব্যবস্থা করেন তবে আমরা সুখী হইব। আমরা এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ের প্রতি সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে চাই। এইডেড স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের কেরাণী, লাইব্রেরীয়ান এবং পিওন প্রভৃতিরও বেতনের হার যথাযোগ্য ভাবে বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। আমরা আসাম সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

শোক-সংবাদ

ডাঃ দুর্গেশ্বর মিশ্র

কলকাতার প্রবীণ চিকিৎসক বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ দুর্গেশ্বর মিশ্র ৮৫ বছর বয়সে গত ১৭ই কার্তিক পরলোকগত হয়েছেন। ডাঃ মিশ্রই কলেরায় প্রথম "স্যালাইন"-এর প্রবর্তন করেন পরে যা বহু বিশিষ্ট চিকিৎসকদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। শরীরচর্চা ও খেলাধুলাতেও এঁর যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। হাওড়ার "রিফিউজ"-এর ইনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও এঁর কম অবদান ছিল না। কয়েকটি গ্রন্থ ইনি রচনা করেছিলেন তন্মধ্যে "রামায়ণ বোধ"-এর নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়।

ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

গত ১৭ই কার্তিক প্রবীণ চিকিৎসক আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৭৫ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি গ্লাসগোর রয়্যাল ফ্যাকাল্টি অফ ফিজিসিয়ানস অ্যাণ্ড সার্জেনসের ফেলো নির্বাচিত হন (১৯১৫)। ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল কমিটির ইনি চেয়ারম্যান ছিলেন। ভারত সরকারের প্রথম টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারী বোর্ডের সঙ্গেও ইনি সংযুক্ত ছিলেন। [illegible] এবং থেরাপিউটিকস সম্বন্ধে এঁর কয়েকটি জনপ্রিয় গ্রন্থ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়।

ডক্টর আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডক্টর আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় গত ২২এ কার্তিক ৮৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ইনি একজন বিভাগীয় প্রধানরূপে দীর্ঘদিন প্রেসিডেন্সী কলেজকে সেবা করেছেন; অধ্যাপক ও একজন ফেলো হিসাবেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এঁর যোগসূত্র নিবিড় ছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কর্মভারও ইনি গ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের আসনও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে।

বোকেন চট্টোপাধ্যায়

বিগত দিনের সুপরিচিত চিত্রাভিনেতা বোকেন চট্টোপাধ্যায় গত ১২ই কার্তিক দেহান্তরিত হয়েছেন। বহুদিন যাবৎ সুনামের সঙ্গে ইনি অভিনয়-জগৎকে সেবা করেছেন। শেষ জীবনে ইনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন বাংলার অভিনয়-জগৎ থেকে।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা সমালোচনা

মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার সীমাসংখ্যা নেই জানবেন। আমার পত্রিকাটি আমাদের পরিবারের পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাড়ায় আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে যায়। আমাদের গৃহে কোন অতিথি এসে উঠলে আমরা তাকে মাসিক বসুমতী পড়তে দিই। পত্রিকাটি আমরা বাঁধিয়ে রাখি সযত্নে—কেন না, আমাদের আশা আমাদের উত্তরপুরুষ যেন মাসিক বসুমতী পড়া থেকে না বঞ্চিত হ'তে পারেন। শুনে হয়তো সুখী হবেন। মাসিক বসুমতীর শিশুদের বিভাগ আমার আড়াই বছরের শিশুপুত্রকে পড়ে শোনাতে হয় পত্রিকা আসতে না আসতে। আমার একজন অতিবৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী আছেন, তিনি সেযুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা। বর্তমানে চোখে আর দেখতে পান না। তবে কানে শুনতে পান, খুব কাছ থেকে কথা বললে। সম্পূর্ণ বধিরত্ব এখনও হয়তো তাঁর আসেনি। তাঁকেও মাসিক বসুমতী প'ড়ে শোনাতে হয় অনেক কিছু। যাই হোক, মাসিক বসুমতীর প্রশংসা ও সুখ্যাতি সুবিস্তৃত হ'লেও আমি একজন সাধারণ পাঠিকা হিসাবে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ না ক'রে পারছি না। (১) পত্রিকার ছাপার 'টাইপ' আরও বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে দৃষ্টি-শক্তিহীনতা দিন দিন যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে ভয় হয় মাসিক বসুমতীর মত অপরিহার্য কাগজ যদি এত ছোট 'টাইপে' ছাপা হয় তবে আমাদের মত সাধারণের খুবই ক্ষতি হবে। এ বিষয়ে সম্পাদক হিসাবে আপনি কি মতামত জানাবেন জানি না। কেন না, পত্রিকা ছাপার 'টেকনিকাল' পদ্ধতি আমার সঠিক জানা নেই। (২) আমার চিঠি পড়ে নিশ্চয়ই বুঝেছেন মাসিক বসুমতী আমরা প্রতি বছরে বাঁধাই এবং সোনার জলে নাম লিখিয়ে আলমারীতে সাজিয়ে রাখি। এমন হয়তো অনেকেই করেন। সুতরাং এখন অনুমান করতে পারেন, আমরা চাই বসুমতী ছাপার কাগজের উন্নতি করুক। এমন কাগজে ছাপা হোক যার স্থায়িত্ব অনেক বেশী। মাসিক বসুমতীর কাগজের কোয়ালিটির বদল হওয়া প্রয়োজন। নমস্কার। —শান্তিকণা দাশগুপ্তা। রিখিয়া। দেওঘর।

মৌলিক লেখা সহজপ্রাপ্য নয়, তাই কি বাঙলা সাময়িকপত্রে অনুবাদ প্রকাশের প্রচলন। অনেকে জানেন, বাঙলার রেনেসাঁস যুগে বাঙলা সাময়িক পত্রে অনুবাদ প্রকাশের ধারা চালু হয়ে যায়। এই যুগে বহু বিদেশী লেখা বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ধর্ম এবং দর্শনতত্ত্বই যদিও সেযুগে প্রাধান্য পেয়েছিল, কিন্তু অপ্রচ্ছন্ন-ভাবে তখনকার গল্প প্রবন্ধ আর উপন্যাসে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে। শুধু মাত্র বিদেশী ছন্দ নয়, বাঙালী সাহিত্যিকরা বিদেশী লেখার বিষয়বস্তু ও ভাব পর্য্যন্ত গ্রহণ ক'রেছিলেন। আমার আলোচ্য কিছুকাল যাবৎ মাসিক বসুমতীতে লক্ষ্য করছি, প্রতি মাসেই বেশ কয়েকটি অনুবাদ-কবিতা ছাপা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, অনুবাদে সাহিত্য আরও হৃষ্টপুষ্ট হয়। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের সমকালীন পরীক্ষা নিরীক্ষা, সাহিত্যিক মান এবং ভাষার ধারা জানা যায় একমাত্র অনুবাদের দোহাইয়ে। আমার অনুরোধ, কিছু বিদেশী আধুনিক কবির অনুবাদ মাসিক বসুমতীতে ছাপা হোক। আমাদের পত্রিকার যে সকল অনুবাদকরা লিখছেন তাঁদেরও জানাতে পারেন পাঠকদের পিপাসা। আমি আধুনিক কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক। আধুনিক কাব্যসাহিত্য পড়তে পড়তে অনুভব করি, পূর্ব্বগামী লেখক-লেখিকারা কত কষ্ট পেয়েছেন। বিদেশী আধুনিক কবিতা কথার চাতুরীতেই শেষ নয়, অন্ততঃ এলিয়ট, লরেন্স, স্পেণ্ডার, ডে লুইস, ইসারউডদের কাকেও এই চাতুরী খেলতে দেখলাম না। আমার বক্তব্য, বিদেশী আধুনিক কবিতা পড়বার সুযোগ পাওয়া গেলে আধুনিক কবিরা (সকলেই নয়) আধুনিক কাব্যের রূপ দেখতে পাবেন। আমরা পাঠক অধমেরা আধুনিক বাঙলা কবিতার অর্থজাল থেকে রেহাই পেতে চাই।—চিন্ময় ঘোষ। পাটনা।
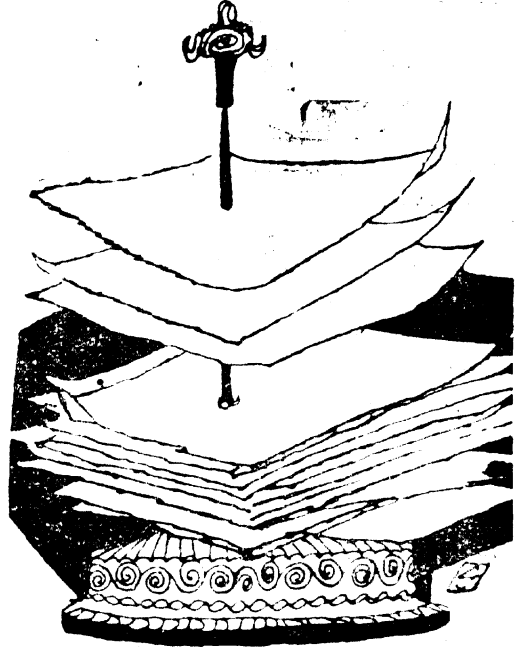
দীর্ঘদিন ধরে মাসিক বসুমতীর আমি অনুরাগিনী পাঠিকা। বসুমতীর সৌন্দর্য্য দিনের পর দিন আমাদের মুগ্ধ করে চলেছে। মাসিক বসুমতী যে পরিমাণে নতুন লেখক-লেখিকাকে উপহার দিচ্ছেন এদিক দিয়েও তাঁদের বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। একটি কথা বলি, নানাবিধ মনোরম রচনাসম্ভারে মাসিক বসুমতী দিনের পর দিন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে। আয়তন তার বেড়ে যাওয়ার দরুণ বছরে দু'টি করে সূচী আমাদের অসুবিধার উদ্রেক করে। সুতরাং আপনারা যদি বছরে তিন বার করে সূচী ছাপেন (অর্থাৎ ছ'মাসের পরিবর্তে চার মাস অন্তর) তো সংরক্ষণের দিক থেকে আমাদের অনেক উপকার হয়। এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।—সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী, এলাহাবাদ।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Sending Rs. 15/- for the Monthly Basumati. Please enlist our name as a monthly subscriber from the month of Kartic.—Secretary "Milan Chakra", Kamalabagan, Darjeeling.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের (কার্ত্তিক ১৩৬৪ হইতে চৈত্র ১৪৬৪ পর্য্যন্ত) চাঁদা ৭'৫০ টাকা পাঠাইলাম। লক্ষীরাণী সিংহ, রাঁচি।

Sending herewith Rs. 15/- being the yearly subscription for 'Masik Basumati'. Please arrange to send the same regularly with immediate effect to the undernoted address,—Genl. Secy. Khalari Cement Works Club, Palamau, Beher.

আমার সামনের বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইতেছি।
—অনীতা মল্লিক Motibag, Nagpur.

Half-yearly subscription of Rs. 7·50 for Monthly Basumati from Kartic to Chaitra this year.—Mukulrani Debi, Kulti, Burdwan.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীসুজাতা দেবী, প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলা সমিতি। Shahjanpur. U. P.

এই সঙ্গে ৭'৫০ টাকা পাঠাইলাম। আমাদিগকে আবার কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর গ্রাহক করিয়া লইবেন —সম্পাদিকা বাঙ্গালী মহিলা সমিতি, Byron Bazar, Raipur.

As I wish to be a subscriber of your Monthly Basumati, I send herewith Rs. 15/- being subscription for a year and should be glad if you would. Please arrange to send me the same regularly.—Secy. Deepling Staff Club, Upper Assam..

বাকী ছয় মাসের (কার্ত্তিক—চৈত্র) পত্রিকার মূল্যের দরুণ ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম—[illegible]থিকা রায়, কলিকাতা।

Herewith Sending Rs. 7·50 to you for the half-yearly subscription of "Monthly Basumati". Please send the copy from the month of Kartic. —Pranjali Das Gupta, Meerut, U. P.

এই সঙ্গে শ্রীমতী বাসন্তী ভট্টাচার্য্যের মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত প্রতি সংখ্যা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।
—P. Laha. Assam.

Please enroll my name as a contributor of "Monthly Basumati" from the month of Aswin 1364 (B.S.). I am sending Rs. 7/8/- as advance for six months subscription.—Meera Ghose, Poona.

মাসিক বসুমতীর জন্য ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম। এই কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বই পাঠাইবেন।—Kamana Roy. Balasore.

I am a subscriber of Monthly Basumati. I am remitting herewith my subscription for further six months from Kartic to Chaitra. Please acknowledge and arrange to send the Magazine regularly.—Mrs. Bela Sen Gupta, Jalpaiguri.

We thank you for supplying Masik Basumati containing valuable writings for the last year and as we do not like to find the supply discontinued, we are sending herewith Rs. 15/- in respect for another year (from Aswin to Bhadra 1365 B. S.). —Secy. Sanskrit Sansad, Ghatsila.

অদ্য সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মণিঅর্ডারযোগে পাঠাইলাম। আমাকে মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিবেন। ১৩৬৪ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে।—উমারাণী ভৌমিক, শিবসাগর, আসাম।

এ বৎসরের চাঁদা পাঠাইতেছি। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। নীচের ঠিকানায় মাসিক পত্র পাঠাবেন।—সেবা গঙ্গোপাধ্যায়, Serpentine Lane, Calcutta.

বিষয়		লেখক	
১। কথামৃত	(যুগবাণী)		
২। ১৮৫৭ বনাম ১৯৪৭	(প্রবন্ধ)	সুধাংশু দে	১৮৬
৩। তোমার আমার মন	(কবিতা)	বিমলচন্দ্র ঘোষ	১৮৮
৪। সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ	(প্রবন্ধ)	শ্রীঅনামী	১৮৯
৫। ওমর-হাফিজ কথা	(প্রবন্ধ)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৯১
৬। দু'টি কবিতা	(কবিতা)	জিয়া হায়দার	১৯৪
৭। পত্রগুচ্ছ			১৯৫
৮। এ মনটা এক গুচ্ছ মরসুমী ফুল	(কবিতা)	শেফালি সেনগুপ্তা	১৯৯
৯। স্মৃতিচিত্রণ	(আত্মস্মৃতি)	পরিমল গোস্বামী	২০০

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

'নিউস্ক্রিপ্ট'-এর বই

বৃত্ত

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

যে-প্রেমকে একবার বিবাহের অঙ্গীকারে শাশ্বত বলে উপলব্ধি করা গেল, তাকেও উত্তীর্ণ হয়ে নতুন দিগ্‌বলয়ে হৃদয়ের অনির্বাণ যাত্রা; যাত্রার আর শেষ নেই। কিন্তু মোহানা কি কখনো পাওয়া যাবে? বিবাহের ব্যবহার্যতায় যে-প্রেম সামান্য হয়ে গেল, তা থেকে মুক্তি খুঁজেছিল সত্যবান—'বৃত্ত'-র নায়ক। কিন্তু অন্য ঋজুরেখায় মুক্তির পথ ক'রে নেওয়া তার নিয়তি; সে-মুক্তি তার একই স্বকীয় কেন্দ্রের বিভিন্ন বৃত্তান্তরে পর্যটন, বিভিন্ন নারীবলয়ের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে একই কেন্দ্রে সংহত হওয়া শুধু অস্তিত্ব-বিচারের একটি শুভ-রাত্রিকে পেয়ে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য শুধু প্রথম শ্রেণীর কবিই নন, ঔপন্যাসিক হিসেবেও সাহিত্যে তিনি এক অনন্য ঐতিহ্যের ধারক। এই সরস-সুন্দর প্রেম-কাহিনীটি পরিণত প্রতিভার এক আশ্চর্য সৃষ্টি॥ ২·৫০

আঙুরলতা

বিমল কর

আঙুরলতা যে-মেয়েটির নাম, সে তার নামের মধ্যেই উদ্‌ঘাটিত। অন্ধকার সমাজে তার বাস, কিন্তু প্রকাশ্য সমাজের অপ্রকাশ্য অথচ অনিঃশেষ দাবীর হাতে সে সবচেয়ে বেশি নিষ্কাশিত। আশ্চর্য সং নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিষমুখ সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন বিমল কর। দৃষ্টিকোণে বৈজ্ঞানিক অনুভাবনা ও নির্মুক্ততার জন্যে আজকের সাহিত্যে তিনি এক নতুন শক্তির মতো। 'আঙুরলতা' আজ পর্যন্ত সর্বাধিক পরিণতির সাক্ষ্যে সাহিত্যে তাঁর এই উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রমাণিত করবে॥ ২·৭৫

গল্পলোক

সুবোধ ঘোষ

গত মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই এই কথাটা চলিত হয়ে গিয়েছিল যে, ছোটগল্পে এটা সুবোধ ঘোষের যুগ। সে-যুগের স্তরে-স্তরে সমাজবাদী সাজ্যাতিকভাবের যে-একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল সুবোধ ঘোষের 'ফসিল'-ই তার প্রথম ও চূড়ান্ত রসমূর্তি। সাহিত্যের মোড় তাঁর হাতেই প্রথম সার্থক বাস্তববাদীতার দিকে ঘুরেছিল। সেই হঠাৎ-বিস্ময় সাহিত্যে এক নতুন অভিজ্ঞতা। তখনকার সেই সুবোধ ঘোষ যেহেতু সাহিত্যে একটা নতুন অধ্যায়ের প্রস্তাবনা, তাই সে-সব গল্পের স্বাদ-বিচিত্রতার তুলনা নেই। 'গল্পলোক' সে-সব গল্পের এক মহৎ সঙ্কলন, এই কারণেই এ-গ্রন্থ পেয়ে সাহিত্য-পাঠক আনন্দিত হবেন॥ ৪·০০

নিউস্ক্রিপ্ট ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

সূচীপত্র

খেলার সময়
মা খুব বুদ্ধিমতী—খেলাধূলো করার জন্যে হাতের তাঁতের কাপড় দিয়ে তিনি খুব চমৎকার ফ্রক, সার্ট ও প্যান্ট তৈরী করে দিয়েছেন। এগুলো যেমন টেঁকসই তেমনি পরিষ্কার করতেও কোন অসুবিধে নেই। ঠাস বুনানীর, নানা রঙ্গের, নানা নক্সার তাঁতের কাপড় দিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলার পোষাক তৈরী করা যায়।
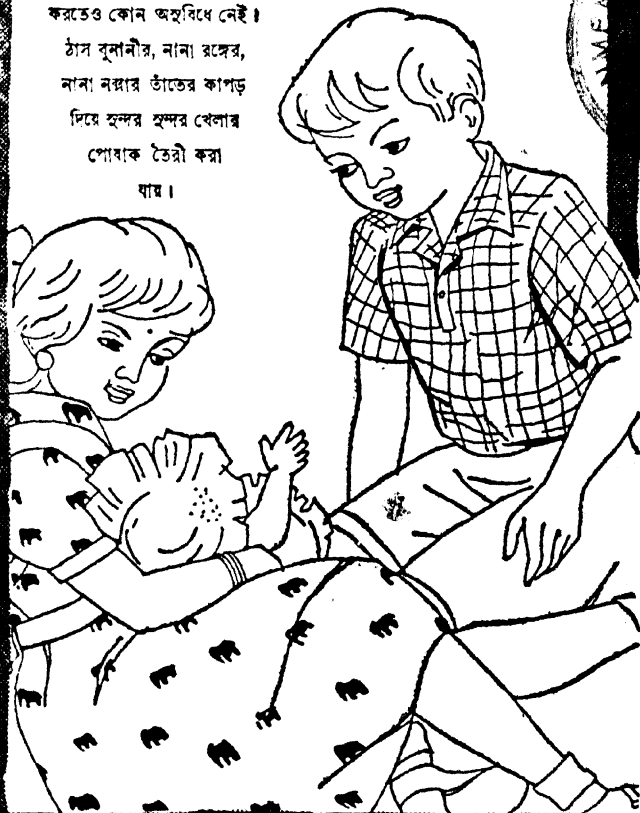
মাসিক বসুমতী
॥ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ॥

(জলরঙ)

হাটের পথে

—পঞ্চানন রায় অঙ্কিত

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি।

ভারত-রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত

১৯৫৪-৫৬ এর সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার-প্রাপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নূতনতম কাব্যগ্রন্থ

'সা গ র থে কে ফে রা' ৩৲

জীবনের মন্ত্রগাঢ় উপলব্ধি ও উল্লাস

প্রচ্ছদ-সজ্জায় অভিনব প্রবর্তনা

১৯৫৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার-প্রাপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগ্রন্থ

স্ব নি র্বা চি ত গ ল্প ৪৲

১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার-প্রাপ্ত

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কাঞ্চন-মূল্য ৪৲

. . . .

১৩৬৪ সালে বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের তালিকা :

৭ই বৈশাখ বেরিয়েছে : প্রতিভা বসুর—**সবচেয়ে যা বড় ১॥০** ॥ নলিনীকান্ত সরকারের—**শ্রদ্ধাস্পদেষু ২॥০** ॥ ৭ই জ্যৈষ্ঠ বেরিয়েছে : সুবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের—**অবনীন্দ্র-চরিতম্ ৫৲** ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—**রূপহলুদ ২৲** ॥ ৭ই আষাঢ় বেরিয়েছে : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের—**কবি-চিত্ত ৫৲** ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের—**কলকাতার কাছেই ৫॥০** ॥ অজিতকৃষ্ণ বসুর—**প্রজ্ঞাপারমিতা ৬৲** ॥ অনুরূপা দেবীর—**উত্তরায়ণ ৫॥০** ॥ শ্রীখেলোয়াড়ের—**বিশ্বক্রীড়াঙ্গণে স্মরণীয় যাঁরা** (২য় ভাগ) ৩॥০ ॥ ৭ই শ্রাবণ বেরিয়েছে : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের—**বিদ্রোহে বাঙ্গালী ৫৸০** ॥ ৭ই ভাদ্র বেরিয়েছে : লীলা মজুমদারের—**হলদে পাখীর পালক ২৲** ॥ ৭ই আশ্বিন বেরিয়েছে : শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের—**শিশুর জীবন ও শিক্ষা ৪৸০** ॥ ৭ই কার্তিক বেরিয়েছে : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর—**পুরাতনী ৫৲** ॥ ৭ই অগ্রহায়ণ বেরিয়েছে : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের—**হেসে যাও ২৲** ॥ মোহিতলাল মজুমদারের—**বাংলার নবযুগ ৬৲** ॥

আমাদের বই

. . . .

স্বনির্বাচিত গল্প ॥ ১৪ খণ্ড বেরিয়েছে : প্রতি খণ্ড ৪৲ টাকা ॥

১। প্রবোধকুমার সান্যাল ২। প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৫। প্রতিভা বসু ৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৭। বুদ্ধদেব বসু ৮। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৯। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১০। আশাপূর্ণা দেবী ১১। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ১২। প্রমথনাথ বিশী ১৩। শিবরাম চক্রবর্তী ১৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পেয়ে ও দিয়ে

গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের জ্ঞাতার্থে অতঃপর আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইবে

অগ্রহায়ণে (১৩৬৪) পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **সাগর থেকে ফেরা** (কবিতাগ্রন্থ—২য় সং) ৩৲ ॥ বিমল মিত্রের **কন্যাপক্ষ** (উপন্যাস—ষষ্ঠ সং) ৩৲ ॥ দিলীপকুমার রায়ের **অঘটন আজো ঘটে** (উপন্যাস—২য় মুদ্রণ) ৫৲ ॥ মোহিতলাল মজুমদারের **সাহিত্য-বিচার** (প্রবন্ধ—২য় সং) ৫৲ ॥

সমান তৃপ্তি।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালচার **৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭** **ফোন : ৩৪-২৬৪১**

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো
সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO

৩৬শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

ভারতের ধর্ম অনেক দিন ধরিয়া নড়নচড়নহীন হইয়া আছে—আমরা চাই উহাকে গতিশীল করিতে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। অতীতকালে যেরূপ হইয়া আসিয়াছে তাহার অনতিক্রমে যেমন রাজপ্রাসাদে, তেমনি অতি দরিদ্র-ব্যক্তির পর্ণকুটিরেও যেন ধর্ম প্রবেশ করে। এই জাতির সাধারণ উত্তরাধিকার এবং জন্মগত স্বত্বস্বরূপে প্রাপ্ত ধর্মকে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে বিনা বেতনে বহন করিতে হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বায়ু যেমন সকলের অনায়াসলভ্য, ভারতের ধর্মও ঐরূপ সুলভ করিতে হইবে। আর ভারতে আমাদিগকে এইরূপেই কার্য করিতে হইবে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া এবং সামান্য সামান্য প্রভেদ লইয়া বিবাদ করিলে চলিবে না। আমি তোমাদিগকে কার্যপ্রণালীর আভাস এইটুকু দিতে চাই যে, যে সকল বিষয়ে আমাদের সকলের একমত, সেইগুলি প্রচার করা হউক—যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে, সেগুলি আপনা-আপনি দূর হইয়া যাইবে। আমি যেমন ভারতবাসীকে বরাবর বলিয়াছি, যদি গৃহে শত শত শতাব্দীর অন্ধকার থাকে, আর যদি আমরা সেই ঘরে গিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিয়া 'উঃ কি অন্ধকার, উঃ কি অন্ধকার' বলিতে থাকি, তবে কি অন্ধকার দূর হইবে? আলোক লইয়া আইস, অন্ধকার চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে।

বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক গৃহে বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবন গঠিত হউক—প্রত্যেক জীবাত্মায় গূঢ়ভাবে যে ঈশ্বরত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে জাগ্রত কর। তাহা হইলেই তোমার সফলতার পরিমাণ যতটুকুই হউক না কেন, তোমার মনে এই সন্তোষ আসিবে যে, তুমি মহাকার্যের জন্য জীবন-যাপন করিয়াছ ও মহাকার্যে প্রাণ দিয়াছ। যেরূপেই হউক, এই মহাকার্য সাধিত হইলেই মানবজাতির ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণ হইবে।

পূর্বের মত ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনিতে হইবে।···প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাইতে হইবে। যাঁহারা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের লোকের কাছে ideal (আদর্শ বা ইষ্ট)-রূপে খাড়া করিতে হইবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালাইয়া দাও দেখি। বৃন্দাবনলীলা-ফীলা এখন রাখিয়া দাও। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালাও; শক্তিপূজা চালাও।··· এখন শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পূজায় তোমাদের দেশে ফল হইবে না। বাঁশী বাজাইয়া এখন আর দেশের কল্যাণ হইবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধিসহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করিয়া সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগা।··· দেশটাকে এখন তুলিতে হইলে মহাবীরের পূজা চালাইতে হইবে, শক্তিপূজা চালাইতে হইবে; শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করিতে হইবে। তবে তোমাদের ও দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৫৭ বনাম ১৯৪৭

সুধাংশু দে

"......ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই বিদ্রোহই প্রথম বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ ভারতবাসীর মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়াছিল।......রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, তিলক, গান্ধীজী, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি কোন-না-কোন ভাবে স্বাধীনতার দীক্ষা পাইয়াছিলেন, এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব হইতেই।"

"......সেই দিক হইতে এই প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের অনস্বীকার্য গৌরব সবাই স্বীকার করিবেন......।"

—যুগান্তর, সম্পাদকীয়, ১৩।৮।৫৭

১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম 'জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম'-এর মর্যাদা দেওয়া সমীচীন কি না—শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রশ্ন লইয়া যথেষ্ট বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে প্রথম 'জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম'-এর মর্যাদা দিতে প্রয়াসী। তেমনি আবার ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডাঃ রমেশ মজুমদারের ন্যায় দুই জন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তাহাতে পরাঙ্মুখ।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন 'জাতীয়' শব্দটি প্রয়োগে সন্দিহান। আর ডাঃ রমেশ মজুমদারের ঘোর আপত্তি 'জাতীয়' ও 'স্বাধীনতা', দুইটি শব্দেই।

"বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়াছিল" বলিয়াই কি ইহাকে নির্বিবাদে 'জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম'-এর পর্যায়ভুক্ত করা চলে? "রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, তিলক, গান্ধীজী লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি কোন-না-কোন ভাবে স্বাধীনতার দীক্ষা পাইয়াছিলেন, এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব হইতেই"—যদি বা এই উক্তিটির যথার্থতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, তাহা হইলেও কি অনুরূপ সিদ্ধান্ত সপ্রমাণিত হয়?

গোলমাল অন্যত্র। দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে ইদানীংকালের যে বিতণ্ডা, তাহা তুমুল আকার ধারণ করিয়াছে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের Eighteen Fifty Seven ও ডাঃ রমেশ মজুমদারের The Sepoy Mutiny & The Revolt Of 1857 বই দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া।

ইঁহারা দুই জনেই দিক্‌পাল ইতিহাসবেত্তা। এই দুইটি বইয়ের ক্ষেত্রে তথ্য-সংগ্রহ পদ্ধতি দুই জনেরই প্রায় এক। যদিও তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। এবং অনেক স্থানে একই তথ্য হইতে দুই জন ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

'জাতীয়' শব্দটি প্রয়োগে ডাঃ সেন সন্দিহান মূলতঃ এই কারণে যে, "একই সময়ে ইতালী ও হাঙ্গেরীতে যে রাজনৈতিক বিপ্লব হয়, তাহাতে যেমন দেশব্যাপী আত্মচেতনার ও সংহতি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, ১৮৫৭-র ভারতীয় বিদ্রোহ তাহার তুলনায় নিতান্তই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। এবং তাহার পিছনে গোষ্ঠীস্বার্থ যতটা কাজ করিয়াছিল, দেশব্যাপী কল্যাণ-বুদ্ধির প্রেরণা ততটা ছিল না।" —Eighteen Fifty-Seven.

অপর পক্ষে, 'জাতীয়' ও 'স্বাধীনতা' দুইটি শব্দেই ডাঃ মজুমদারের ঘোর আপত্তি প্রধানতঃ এই জন্য যে, "শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শা'কে বিদ্রোহীরা আবার দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু বাহাদুর শা' ও তাঁহার পত্নী বেগম জিন্নৎ তলায় তলায় ইংরেজদের সঙ্গে দর কষাকষি করিতেছিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈও ইংরেজ-শিবিরে গোপনে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন।"—The Sepoy Mutiny & The Revolt Of 1857.

জনসাধারণের তৎকালীন রাজনৈতিক চেতনা অর্থাৎ জাতীয়তাবোধ-এর স্তর এবং শ্রেণী-স্বার্থ কি ভাবে কি পরিমাণ কাজ করিয়াছে, বিশেষ করিয়া জমিদার-শ্রেণী কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে—এই বিদ্রোহের স্বরূপ নির্ণয়ে তাহাই আসল মাপকাঠি।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর এক শত বৎসর তখন অতীত। জাতীয় ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব তখন এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। অনেক দিন পূর্বে ইংরেজ এদেশে আসিয়া থাকিলেও, শিল্পের ক্ষেত্রে তখনও এদেশে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে নাই। কাজেই শ্রমিক-শ্রেণী অনুল্লেখ্য।

ইউরোপের অবস্থা তখন অন্য রকম। ফরাসী বিপ্লব হয় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে। এবং শিল্প-বিপ্লব হয় তাহারও অনেক পূর্বে, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে।

১৭৫৭-র পূর্বেকার ভারতবর্ষের অবস্থা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এক-অখণ্ড ভারতবর্ষের ধারণা তখনও অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল। নানা কারণে নানা ভাবে ভারতবর্ষ শতধা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। এমন কি, মুসলমানদের পূর্ণ জাতীয় অধিকারসহ ভারতবর্ষে অবস্থিতি সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি পায় নাই।

কাজেই ১৮৫৭-র জাতীয় চেতনার স্তর অন্যান্য দেশের তুলনায়, বিশেষ করিয়া ইউরোপের জাতিসমূহের তুলনায় দুর্বল হওয়াটা স্বাভাবিক। সেই ক্ষেত্রে আন্দোলনের নেতৃত্ব জমিদার-শ্রেণীর করতলগত হওয়াটাও তেমনি স্বাভাবিক। এবং তাঁহাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসার মনোবৃত্তি একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী।—ইহা মানিয়া লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যে সকল নথিপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এই ইতিহাস, অর্থাৎ এই ইতিহাস রচনার মূল উপকরণ আহরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে দুই-একটি কথার অবতারণা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি।

* যে-সমস্ত নথিপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এই ইতিহাস রচনা হইয়াছে, সেইগুলি কতখানি নির্ভরযোগ্য? কেন না, বেশির ভাগ নথিপত্রই ইংরেজ কর্মচারিগণ অথবা ইংরেজদের মোসাহেব-জাতীয় ভারতীয়গণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারা কি এতই বোকা যে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্য নির্ভেজাল নথিপত্র সযত্নে রাখিয়া দিবেন!

* অনেক বৎসর পর্যন্ত ইংরেজদের ভয়ে এই সম্পর্কে আমাদের কেহ আসল কথাটি বলিতে বা লিখিতে সাহস করেন নাই। এই প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত ডাঃ সেনের বইয়ের ভূমিকাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি

লিখিয়াছেন : "No Indian dared at that time to speak or write freely about the events of 1857. A few Indians, who were servants or supporters of the Government, have left some account, but nobody who wanted to write freely and frankly had the courage to do so."

• হিন্দু-মুস্লিম সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ফাটলকে আশ্রয় করিবার কৌশল ইংরেজরা ১৯১৭ ও ১৯৪৭-এ প্রয়োগ করিয়াছেন। ১৮৫৭-তে যে তাঁহারা এই কৌশলটি কোন ব্যাপারেই ভুলিয়া যান নাই, ইহা বোধ হয় কোন লোকই অবিশ্বাস করিবেন না। এই কৌশলটি সম্পর্কে যে তাঁহারা সব সময় সচেতন, তাহার স্পষ্ট স্বাক্ষর তাঁহাদের দলিলপত্রেই। মিঃ ফরেষ্ট তাঁহার সম্পাদিত সরকারী নথিপত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছেন : "Among the many lessons the Indian Mutiny conveys to the historians, none is of greater importance than the warning that it is possible to have a revolution in which *Brahmins* and *Shudras*, Hindus and Mohammadans could be united against us, and that it is no safe to suppose that the peace and stability of our dominions, in any greater measure, depends on the continent being inhabited by different religious systems...."

• দেশে দিন ইংরেজ বিদ্বেষ ও অসন্তোষ যে এই বিদ্রোহের ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত ফাটিয়া পড়িয়াছিল এবং ইংরেজরাও যে এই বিদ্রোহের ব্যাপকতায় শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—ইংরেজদের রক্ষিত দলিলপত্রে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণের অভাব নাই। তখনকার লণ্ডন টাইমস্ পত্রে লিখিয়াছিল : "One of the great results that have flown from the rebellion of 1857-58 has been to make inhabitants of every part of India acquainted with each other."

এই বিদ্রোহ যে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রাম-এর সঠিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা ডাঃ সেনও তাঁহার বইতে উল্লেখ করিয়াছেন : "....The mutiny became a revolt and assumed a political character....what began as a fight for religion, ended as a War of Independence."

এই দুইটি বই ছাড়াও অন্যান্য বই ও তথ্য হইতে ইহা-সহজেই প্রমাণিত হয় যে—ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ-এ রূপান্তরিত হইয়া ১৮৫৭-র সংগ্রামের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

এক দিক হইতে বিচার করিতে গেলে, *Eighteen Fifty-Seven*-এর সিদ্ধান্ত, *The Sepoy Mutiny & The Revolt Of* 1857-এর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ

ডাঃ সেন, দেখা যাইতেছে, দুইটি কারণে 'জাতীয়' শব্দটি প্রয়োগে অনিচ্ছুক—(১) প্রারম্ভে ইহাতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম-এর মনোভাব না-থাকা, (২) জমিদার-শ্রেণীর নেতৃত্ব ও তাহার দুর্বল ভূমিকা।

কিন্তু আন্দোলনের গতিপথে তাহার রূপান্তর বিচিত্র নয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই রকম রূপান্তর ইতিহাসে অস্বাভাবিক নয়। অনেক দেশেই ইহা ঘটিয়াছে। এবং আমাদের দেশে তাহার ব্যতিক্রম কিছু নয়।

এই সংগ্রামের নেতৃত্বের দিক বিচার করিলে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তখনকার জাতীয় আন্দোলনে সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব একপ্রকার অবধারিত। এক দিকে ইংরেজদেরকে যেমন তাঁহাদের অপছন্দ, তেমনি সাধারণ মানুষ ক্ষমতাসীন হউক, ইহাও নিশ্চয়ই তাঁহাদের কাম্য নয়। কাজেই তাঁহাদের দোদুল্যমানতা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, আপোষ-মীমাংসার মনোভাব চিরাচরিত। এমন কি, জাতীয় আন্দোলনে ধনতান্ত্রিক-শ্রেণী নেতৃত্ব করিলেও এই দুর্বলতা অনিবার্য। আমাদের ১৯৪৭-এর জাতীয় স্বাধীনতাকে বিচার করিয়া দেখিলেও আন্দোলনকারী জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার তুলনায় নেতৃত্বের এই দুর্বল ভূমিকা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। কাজেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোন নেতা আপোষ মীমাংসার তালে ছিল কি-না—তাহা নিশ্চয়ই এত বড় কথা নয়, যত বড় করিয়া তাহাকে ভাবা হইতেছে। এবং ভাবিয়া যতখানি অবাক মনে হইতেছে।

যেহেতু এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা-যুদ্ধে রূপান্তরিত হইয়াছিল, কাজেই তাহাকে 'জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম'-এর মর্যাদা দিতে আপত্তি কেন?

দেখা যাইতেছে, যত গোলমাল ঐ 'জাতীয়তা' ও 'স্বাধীনতা' শব্দ দুইটির রাজনৈতিক সংজ্ঞায়। এবং 'জাতীয়তা' ও 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে যাঁহার যেই রকম দৃষ্টিভঙ্গী, তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে ১৮৫৭-র বিচারে প্রবৃত্ত।

জাতীয়তাবাদের স্তরভেদ আছে। সামন্ততন্ত্রের জাতীয়তাবাদ, ধনতন্ত্রের জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রের জাতীয়তাবাদ—এক বস্তু নয়। তথাপি তাহারা প্রত্যেকেই জাতীয়তাবাদ।

তেমনি স্বাধীনতারও রকমফের আছে। অবস্থা অনুপাতে সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা না আসিলেও দেশের স্বাধীনতা আসিতে পারে, যদিও সমাজতন্ত্র আসিতে পারে না। স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র যেমন আলাদা বস্তু, তেমনি সমাজতান্ত্রিক দেশের স্বাধীনতাও এক আলাদা বস্তু। কিন্তু স্বাধীনতা উভয়েই।

আন্দোলনের পিছনে গোষ্ঠী-স্বার্থ অর্থাৎ তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থই বেশি কাজ করিয়াছে বলিয়া ডাঃ সেন, বিশেষ করিয়া ডাঃ মজুমদার যে ইহাকে 'জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' আখ্যা দিতে নারাজ, এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাঁহারা ১৯৪৭-এর আমাদের এই স্বাধীনতাকে তাহা হইলে কী আখ্যায় ভূষিত করিবেন? আর তাহার জন্য যে সংগ্রাম, তাহাকেই বা কোন পর্যায়ে ফেলিবেন? যেহেতু মোটামুটি ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, দেশের শাসন-ক্ষমতা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ হইতে এদেশের ধনিকশ্রেণীর হাতে আসিয়াছে এবং নেতৃত্বে আপোষ মীমাংসার মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল—কাজেই কি বলিব, আমরা স্বাধীনতা পাই নাই? অথবা,

যেহেতু ১৯৪৬-৪৭ সালে সারা ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল—কাজেই কি বলিব ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পিছনে জাতীয়তাবাদ অনুপস্থিত ?

ইতিহাসের বিচারে ডাঃ মজুমদার, বিশেষ করিয়া ডাঃ সেন শ্রেণী-স্বার্থের স্থান দিয়াছেন খুব উর্দ্ধে—এই জন্য সত্যি তাঁহারা নমস্য। তাঁহারাও যে ইতিহাস-পরিক্রমায় শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকারের মত ইংরেজ আমলে আসিয়া 'স্যার' হইয়া যান নাই—তজ্জন্য তাঁহারা উভয়েই সকলের শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ও বর্তমানকার কয়েকটি অতি-বামপন্থী পার্টির ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্ধারণ ব্যাপারে যে 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'—দৃষ্টিভঙ্গী, ডাঃ সেন, বিশেষ করিয়া ডাঃ মজুমদার তাহা দ্বারা অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন। [এই বিষয়ে তাঁহারা নিজেরাই হয়ত সচেতন নন।] যে-যুগে আমাদের দেশের বামপন্থী দলগুলি 'অত্যুগ্র সাম্যবাদ ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা' (লেনিনের ভাষায়: leftwing Communism and infantile disorder)-এর হাত হইতে মুক্তি-প্রয়াসী, সেই যুগে ইঁহাদের মত দুই জন পণ্ডিত-ব্যক্তির মধ্যে 'অত্যুগ্র সাম্যবাদ ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা'-র লক্ষণ পরিস্ফুট— ইহা ভাবিলে কে না আশ্চর্য হইবেন ?

আমাদের ১৯৪৭-এর জাতীয় স্বাধীনতায় যত গলদই থাকুক না কেন—এবং জাতীয় নেতাদের মধ্যে অনেক বাহাদুর শাহ আছেন জানিয়াও—এ স্বাধীনতাকে 'জাতীয় স্বাধীনতা'-য় আখ্যায়িত করা ছাড়া অন্য কোন আখ্যায় ভূষিত করা চলে না। এবং এই একই কারণে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ প্রথম 'জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম'-এর মর্যাদার দাবী রাখে।

তখনকার দিনের সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছ হইতে এবং সামন্ততান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের নেতাদের কাছ হইতে ইহার চাইতে অধিক কী আর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ?

এই দিক হইতে বিচার করিয়া, এই প্রথম 'জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম'-এর অনস্বীকার্য গৌরব কে না স্বীকার করিবেন ?

ডাঃ সেন, বিশেষ করিয়া ডাঃ মজুমদার আমাদের ১৯৪৭-এর এই স্বাধীনতাকে আবার কি আখ্যায় ভূষিত করেন—তাহার অপেক্ষায় থাকা গেল।

তোমার আমার মন

বিমলচন্দ্র ঘোষ

মাঝ রাত্রির চাঁদ
তোমার আমার মন !
পুব আকাশের পাখি
মুখর সারাক্ষণ।
ঝাউ-ঝির-ঝির হাওয়া
সব খুঁজে সব পাওয়া
দিগন্তহীন মাঠ
তোমার আমার মন।

গঙ্গাতে ঢেউ ওঠে
শিব-শিবানীর প্রেমে,
বুকের সিঁড়ি বেয়ে
নিস্তলে যাই নেমে।
সোনার কুম্ভ কাঁখে
ভোরবেলা বৈশাখে
তোমায় দেখে রাঙা
পূর্ব-দিগঙ্গন ॥

সমুদ্র আজ নীল
শ্যামকে ভালবেসে,
আকাশ গাঢ় নীল
নীল যমুনায় ভেসে।
হৃদয় উপবাসী
বৃন্দাবনের বাঁশী
বনের লতায়-পাতায়
কাঁপছে কী উন্মন।

তিন ভুবনের বাধা
বুকের তমাল-তলে
ডাকলে কেন আমায় ?
সমুদ্রে ঢেউ জ্বলে।
মাটির বুকে মণি
শূন্যে সন্ধ্যামণি
জ্বলছে আপন জ্বালায়
তোমার আমার মন।

সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅনামী

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের গুরুদেব, সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের নেতাজী, এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে দুইটি মহাপুরুষের সমগ্র জীবনের বীজ নিহিত রহিয়াছে!

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা জানাইবার চেষ্টা করা হইল।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হিসাবে, ১৯৩৯ সালে জানুয়ারী মাসে যখন শান্তিনিকেতনে যান, আম্রকুঞ্জে তাঁহার সাদর সম্বর্দ্ধনার জন্য যে আয়োজন করা হয়, সেখানে কবি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

কবি তাঁহার 'তাসের দেশের' দ্বিতীয় সংস্করণ সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন, "কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রাণসঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলাম।" "আজ তরুণ বাংলা তথা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সুভাষচন্দ্র; তিনি আজ নির্জীব প্রাণে সংগ্রামের মন্ত্র দিতেছেন," কবির 'তাসের দেশ' এর মর্ম্মকথা "আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা, সুভাষচন্দ্র সেই বাণীর বাহক বলিয়া কবির ভরসা,—তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হইবে।"

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের কার্য্যাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "যে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতের যে অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে, তাঁহার কথা বারে বারে স্বীকার করিয়াও বলিলেন, তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়, অন্য কোনো কর্ম্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে এবং যদি কোনো কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞও তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তাঁর কামনার অভিব্যক্তি—কিন্তু দূরের থেকে।" [প্রবাসী ১৩৪৬, আষাঢ়]

তিনি লিখিলেন, "আজ আমি জানি, বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের, সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে যে বাংলাকে আমরা বড় করব সেই বাংলাকে বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ় সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে, বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙ্গালী প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।" [রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।]

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্টের পদে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর অমতে দ্বিতীয় বার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিয়াছিলেন, ঐ প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রকে যে টেলিগ্রাম করেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম। "The dignity and forbearance which you have shown in the midst of a most aggravating situation has won my admiration and confidence in your leadership. The same decorum has still to be maintained by Bengal for the sake of her own self-respect and thereby so help to turn your apparent defeat into a permanent victory."

—*The Statesman, Cal., May* 4, 1939.

রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন, দেশের মধ্যে প্রধান ও নবীনের দ্বন্দ্বের সময় সুভাষচন্দ্রই দেশনায়কত্ব করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি, সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের পরই (১৯৩৯, মে) কবি 'দেশনায়ক' নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার ভাষণ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াও বিশেষ কারণে কবির জীবিতকালে প্রচার করা হয় নাই।

এইবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের অভিমত জানাইবার প্রয়াস করা যাক। একবার ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের নিকট সুভাষচন্দ্র তাঁহার কয়েকজন তরুণ বন্ধুকে লইয়া গিয়াছিলেন স্বদেশ-সেবার উপদেশ লইবার জন্য। কিন্তু তাঁহারা উদ্দীপনাময়ী বাণীর পরিবর্ত্তে গ্রাম সংগঠনের বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছিলেন। ঐ কথাগুলি তখন তাঁহাদের মোটেই ভাল লাগে নাই, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশের মর্ম্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি হইতে লাগিল।

পরে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট থাকাকালীন তাঁহার এক ভাষণে বলেন, "যে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের পর বর্ত্তমান থাকিবে না ইহা সত্য নয়, ইহার বর্ত্তমান আকার স্থায়ী না হইতে পারে কিন্তু ইহার সত্য অংশ ভিন্নরূপে চিরস্থায়ী হইবে।" [প্রবাসী ১৩৪৫ পৌষ]

সুভাষচন্দ্র মহাজাতি সদনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবার জন্য কবিকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, মহাজাতি সদনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের সংবাদ পাইয়া সুভাষচন্দ্রকে কবি এক পত্রে লিখিয়া পাঠান, "তোমাদের সংকল্পিত কংগ্রেস ভবনের পরিকল্পনাটিই যথোচিত হয়েছে বলে মনে করি, এই ভবনের প্রয়োজনীয়তা বিচিত্র এবং ব্যাপক সর্বজনের আনুকূল্যে এর প্রতিষ্ঠা উপযুক্তরূপে সম্পন্ন হবে আশা করে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, এই গৃহের সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যের এবং গৌরবের রূপ দেখতে পাব।"

মহাজাতি সদনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবার অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে বলেন, "গুরুদেব আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে, কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—আপনি বিশ্বকবি, আমাদের স্বপ্ন মূর্ত্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা,

যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ছে তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি স্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে—এ গৃহ তারই জীবন-কেন্দ্র হয়ে মহাজাতি সদন নাম সার্থক করে তুলুক, এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।" [প্রবাসী ১৩৪৬, আশ্বিন]

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীযুগের স্মৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলাদেশের কয়েকখানি কাগজে যে মাতামাতি শুরু হয়েছিল এবং ঐ মর্ম্মস্পর্শী প্রবন্ধটি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত হীন ও নির্লজ্জ প্রচারকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহা লক্ষ্য করে কবি এক বিবৃতিতে বলিলেন, "অল্প কয়েকদিন হোলো আমার কোন ভাষণে আমি দেশের লোকের কাছে যে বেদনা জানিয়েছিলাম সেটাতে বিশেষ ভাবে সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে একটা অনুমান সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সেটা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে ব্যক্তিবিশেষকে এরকম গঞ্জনা আমার স্বভাবসংগত নয়।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৭ আষাঢ় ২০]

"মোকাবিলায় আমি সুভাসকে কখনো ভর্ৎসনা করিনি তা নয়, করেছি তার কারণ তাঁকে স্নেহ করি, কিন্তু সেদিন আমি সাধারণতঃ বাংলাদেশের এই শ্রেণীর লোককেই ধিক্কার জানিয়ে দিলুম, যাঁরা কাজ করেন না, কলহ করেন, দল বাঁধতে গিয়ে দল ভাঙেন। ব্যক্তিগত ভাবে সুভাষকে আমি স্নেহ করি,...তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসেন এবং দেশবিদেশের রাজনীতিচর্চা করেছেন, সেইজন্য তাঁর কাছে আমি আশা করি এবং দাবী করি তিনিও দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, তার সাংঘাতিক অনৈক্য গহ্বরের উপরে সেতু বন্ধন করবেন। তাঁর প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করবেন, তাঁর দেশসেবা সার্থক হবে। চারিদিকে দলীয় আঘাতে অভিঘাতে তাঁর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই সস্নেহ শুভকামনা।" [আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৭ আষাঢ় ২০] ঐ সময়ে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসরণ আন্দোলনের জন্য সুভাষচন্দ্রকে বাংলা গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য ১৯৪১ সালে জানুয়ারী মাসে স্বগৃহে বন্দী থাকাকালীন অন্তর্দ্ধান করেন, ঐ বৎসরেই ৭ই আগষ্ট কবির মহাপ্রয়াণ হয়, কবি এই পৃথিবী ত্যাগ করে যাবার পূর্ব্বে, তাঁহার প্রিয় দেশনায়ক সুভাষের বিদেশে অবস্থিতির সংবাদ জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন কি না জানি না।

সুভাষচন্দ্র বিদেশে যাইয়া স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁহার "আজাদ হিন্দ" বাহিনীর জন্য 'জনগণমন'কেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের জন্য 'জনগণমন'কেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে লোকসভায় স্থির করা হইয়াছে। পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যে ফ্রান্সের এবং রুশিয়ার ছাড়া সাহিত্যিক গরিমা ও সার্বভৌম আবেদন সম্বলিত গানের খুবই অভাব—তাছাড়া কোনো দেশের জাতীয় সঙ্গীত সে দেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন' সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, আর নেতাজী ভারতবর্ষকে নবজীবন মন্ত্র দান করিয়াছেন—"জয় হিন্দ"।

আজিকার পুণ্যতিথিতে দুই মহামানবকে প্রণাম জানিয়ে, এই প্রবন্ধ শেষ করলাম।

"যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল
যত হিংসা-হলাহল
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি'।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার;
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দ্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহিত!
ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত!
এ আমার এ তোমার পাপ।"

—রবীন্দ্রনাথ

ওমর-হাফিজ কথা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আলোচ্য বস্তু প্রাচীন পারস্যের দু'জন মহাকবির কাব্যগাথার আলোচনা। একজন গীয়াসুদ্দিন ইবন আবুল ফতেহ ওমর বিন ইব্রাহিম অল খৈয়াম অর্থাৎ ওমর খৈয়াম, অন্য জন খাজা শামসুদ্দিন মুহম্মদ অর্থাৎ হাফিজ। প্রথম জনের সঙ্গে বাঙলা দেশ যতটা পরিচিত, অপর জনের সঙ্গে ততটা নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

ওমর খৈয়াম এই পৃথিবীতে এসেছিলেন আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে আর হাফিজ এসেছিলেন ছয় শত বছর আগে। যদিও এদের দু'জনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান চার শত বছরের কিন্তু বলবার বিষয়বস্তুর মধ্যে আশ্চর্য্য মিল আছে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কাছে সত্য জিনিষটা শাশ্বতরূপে প্রতিভাত হয়। চিরন্তন সত্য তাঁদের কাছে ধরা দেয় আর তাই সব মহাপুরুষের মূল কথায় মিল পাওয়া যায়।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, ওমর রচনা করেছিলেন 'রোবাই' আর হাফিজ রচনা করেছিলেন 'গজল'। উভয় কবিই জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। আমরা পুতুলখেলায় ভুলে এ সত্যটা সম্বন্ধে একেবারেই যেন অজ্ঞ থাকি। জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা মনে হলে অন্তর ঔদাস্যে ভরে ওঠে। তাই এঁরা ডাক দিয়ে বলেছেন :—

"ভেবে কি দেখেছ সখি কত ক্ষণস্থায়ী এ জীবন
একটা প্রভাত আসে বিকশিত ফুলের মতন
মরা বাঁচা শুধু একবেলা
খেয়ালীর সৃজনের খেলা।"—(ওমর খৈয়াম)

"মহাকালের মহোৎসবে
সবাই সেথা ক্ষণিক রবে
শূন্য হলে সুরার পাত্র
ফিরবে যে যার আপন ঘরে"—(হাফিজ)

হাফিজ আরও এগিয়ে গেছেন, জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহ জেগেছে। তিনি বলেছেন :—

"একমুঠো মাটি শুধু যার
শেষ শয্যা, বল দেখি তার
কিবা কাজ বৃথা গান গেয়ে
কার আশে শূন্যপানে চেয়ে।"—(হাফিজ)

কবির বাণী আমাদের অন্তর স্পর্শ করে।

জীবন ও যৌবন যখন ক্ষণস্থায়ী তখন তা ভোগ করাই চরম সার্থকতা। আমরা পরলোকের পুণ্য সঞ্চয়ে ইহলোককে অবহেলা করি। আমরা ভুলে যাই, এই জীবন আর যৌবন চলে গেলে আর তা কোন মতেই ফিরে আসবে না, তাই :—

"বাঁচবে ধরায় যে ক'টা দিন
জীবন-জোয়ার না হতে ক্ষীণ
ভোগ করে নাও দেহের সুধা
থাকবে না ওর কিছুই অবশেষ।"—(হাফিজ)

"দুদিনের জীবন যৌবন
বৃথা কেন করো তারে ক্ষয়
তন্দ্রালোকে বিরচি শয়ন ?"—(ওমর খৈয়াম)

উভয় কবিই সৌন্দর্য্যের পূজারী, প্রেমের উপাসক। যতদূর জানা যায়, হাফিজের অন্তর্লোকবাসিনী কেউ ছিলেন কিন্তু ওমর সম্বন্ধে এরকম কোন অনুমান করা শক্ত ; কারণ সময়ের ব্যবধান।

হাফিজ প্রেমকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বর্ণনা করেছেন :—

"তাই তো আমরা আজ এই জানি সার
আনন্দের চেয়ে বড় কিছু নাই আর
প্রেম ছাড়া পৃথিবীতে বল কি বা আছে ?"—(হাফিজ)

ওমর কিন্তু প্রেমকে নয়, প্রিয়াকেই দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ আসন। জগতের চেয়েও মূল্যবান তাঁর প্রিয়া :—

"অন্তর হতে আদরিণী তুমি
জগতের চেয়ে দামী
প্রাণের অধিক প্রিয়তমা ওগো
মিথ্যা বলিনি আমি।"—(ওমর)

সুন্দর রূপের বর্ণনায় হাফিজ বলেছেন :

"তোমার কাজল কাল দু'টি আঁখি
খুন করে গেছে আমার প্রাণ
হে প্রিয় সে খুনে রঞ্জিত হৃদি
নিও সে আমার চরম দান।"—(হাফিজ)

কবির চিত্তে চাঞ্চল্য জাগে অদর্শনের বেদনায়। অপরূপ রূপে মন বুঝি আর বাধা মানে না। প্রশ্ন করেন :—

"তুমি যে চাঁদের মুখে দাও টেনে গুণ্ঠন
তোমার চিকণ কালো কেশে
মন-পাখী উড়ে যায়, তোমার সে রূপে হায়
উন্মাদ করিবে কি শেষে ?"—(হাফিজ)

ওমরের লেখায় কিন্তু এতটা অধীরতা প্রকাশ পায় না, এখানে যেন কবি কিছুটা সংযমী। তিনি লিখেছেন :—

"তোমার রঙ্গিন অধর সখি
বিশ্ব-হৃদয় মুগ্ধ করে
তোমার চোখের চাউনি যেন
নিত্য-নূতন শক্তি ধরে।"—(ওমর)

ওমর খৈয়াম প্রিয়ার রূপের কাছে বা তার সাহচর্য্যের তুলনায় বাদশাহীও অকিঞ্চিৎকর মনে করেন :—

"হতেম যদি বাদশাহ, আমি
এর চেয়ে কি সুখের হতো ?
তোমার রূপের এই যে আলো
উজ্জ্বল যেনো চাঁদের মতো।"—(ওমর)

আর হাফিজ প্রিয়ার গালের তিলের জন্যে বাদশাহী বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন :—

"তার কপোলের তিলের তলে
বিলিয়ে দেবো অকাতরে
খাস বুখারা সমরখন্দ ভাই।"—(হাফিজ)

উভয় কবির কাব্যেই সুরা আর সাকীর জয়গান। সুরার নেশায় তাঁরা জগতের দুঃখ-দৈন্য থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। ওমর বলেছেন :—

"দাও পিয়ালা প্রিয়া আমার
অধরপুটে পূর্ণ করে
যাক অতীতের অনুতাপ আর
ভবিষ্যতের ভাবনা মরে।"—(ওমর)

হাফিজ বলছেন :—

"ওগো সাকী, প্রিয় প্রেমাতুরা
ঢেলে দাও বাকীটুকু সুরা
শুষে নিই পাত্রখানি চুঁয়ে।"—(হাফিজ)

গোঁড়ামী, ধর্ম্মান্ধতা, ভণ্ডামী সম্বন্ধে ওমর ও হাফিজ কঠিন বিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন তাঁদের রচনায়। আপাতদৃষ্টিতে যাদের ভাল মানুষের মত মনে হয় তাদেরই অন্তরে হয়ত শয়তানের বাসা আছে। এদের গোঁড়ামী বা ধর্ম্মান্ধতা বাইরের একটা মুখোস মাত্র এবং সুযোগ পেলে এরাও অনেক দ্রুত নীচে নামে। হাফিজ যেখানে একটু রহস্য করে বলেছেন :—

"নামাজ ফেলে কালকে রাতে
পীর এসেছেন পানশালাতে
দোস্ত! এখন বলতো আমায় ভাই
হতচ্ছাড়া আমরা কোথায় যাই ?"—(হাফিজ)

ওমর সেখানে সোজাসুজি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন :—

"যাঁরাই বেশী নিন্দা করেন
অন্য জনের দুর্ব্বলতার
ছড়িয়ে বেড়ান হাটবাজারে
আত্মীয়দের অখ্যাতি-ভার
ভণ্ড তারা সবাই জেনো
ভক্ত-বিটেল জনে জনে
পুণ্যবানের ছদ্মবেশে
পাপ করে যান সঙ্গোপনে
অন্ধকারের সুযোগ খুঁজে
দাঁড়িয়ে থাকেন অপেক্ষাতে
আমরা ঈষৎ আড়াল হলেই
তাঁরাও ঢোকেন পানশালাতে।"—(ওমর)

হাফিজ স্বভাবতঃ বৈরাগ্যের কবি বলেই তাঁর রচনায় বিদ্রূপের তীব্রতার অভাব লক্ষণীয়, মৃদু অভিযোগই তাঁর বিশেষত্ব। কিন্তু ওমরের সুতীব্র বিদ্রূপের বাণ অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে বিদ্ধ করে। মানুষকে অকারণ কুণ্ঠা, ভয়, লজ্জা, দ্বিধা থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ভালকে ভাল বলায় কোন অগৌরব নেই। তাই :—

"মুগ্ধ যারা গোলাপ পেয়ে
এগিয়ে এসে তুলুক তারা
কাপুরুষের মতন কেন
মিথ্যে ভয়ে মরছে সারা
নিক না তুলে সুরার আধার
দিনের আলোয় বেরিয়ে এসে
জড়িয়ে ধরুক বক্ষে তাদের
পাগল যাদের ভালবেসে।"—(ওমর)

যেখানে হাফিজ বলেছেন :—

"হাফিজ! চালাও সুরা ভণ্ডামী ছেড়ে দাও
পানশালে সুখে রবে মন
কিন্তু দোহাই তব, মূঢ় নির্বোধ সম
কোরাণেরে কোর না গ্রহণ।"—(হাফিজ)

যেখানে ওমর দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :—

"এক হাতে মোর কোরাণ শরীফ
মদের গেলাস অন্য হাতে
পুণ্য-পাপের সৎ-অসতের
দোস্তি সমান আমার সাথে।"—(ওমর)

নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন তথাকথিত সমাজপতির আসল রূপ তিনি এঁকেছেন একটি সুন্দর কবিতায় :—

"সে একদিন পানশালে কোন
বারাঙ্গনা দেখে
শেখজী বলেন ডেকে
দেখছি তুমি মূর্ত্তিমতী পাপ
মদ্যপায়ী ব্যভিচারীর অসংযমের ছাপ
অঙ্গে তোমার আঁকা
তোমার রূপের কদর্য্যতা
থাকছে না আর ঢাকা
বারবনিতা বললে হেসে স্বামী
দেখছ যা তা সত্য বটে আমি
কিন্তু তোমার বাইরে প্রভু
দেখতে যে রূপ পাই
যথার্থ কি অন্তরেতেও সত্য তুমি তাই ?"—(ওমর)

এক দিকে যেমন ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে অন্য দিকে তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে এবং আমাদের অসহায় অবস্থার সম্বন্ধেও উভয় কবির মধ্যেই ভারী সুন্দর মিল আছে। আমরা যে ঈশ্বরের হাতে ক্রীড়ণক মাত্র, এ বিষয়ে তাঁদের কোন সন্দেহ নেই। ওমর যখন বলছেন :—

"সকল কথাই তাঁহার জানা
পথঘাটেরও নাইতো মানা
বিশ্বরাজের রঙ্গনায়ক যিনি

চালান নিজেই নাট্যশালা
কার পরে কার আসবে পালা
জানেন সেটাও তোমার চেয়েও তিনি।"—(ওমর)

তখন হাফিজও যেন সেই একই কথা একই ভাবে বলতে চেয়েছেন :—

"তোমায় নিয়ে খেলার ছকে
চাল চেলেছেন যিনি
তোমার কথা সব জানা তাঁর
সকল কথাই জানেন তিনি।"—(হাফিজ)

অথবা—

"মুহূর্ত্তের শুধু অভিনয়
চলেছিলো বিশ্বময়
সাঙ্গ হলে রঙ্গলীলা যবনিকা পারে
গাঢ়তম চির-অন্ধকারে
নট-নটী করিছে প্রবেশ
জীবনেরও অবসানে নাটকেরও হয়ে যায় শেষ।"—(ওমর)

এখানে একজন পাশ্চাত্য কবির কথা মনে পড়ে, যিনি বলে গেছেন—

"The world is a stage
And we are all its actors."

অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনবার কি আকুল আগ্রহ দু'জনেরই কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। এখানে আবার মনে পড়ে যায় সৃষ্টিকর্ত্তার শক্তির কাছে কত নগণ্য, কত তুচ্ছ আমরা। তাঁর কঠিন বাঁধনে আমরা বাঁধা আছি।

"কেবল গেল না বোঝা যে রহস্য বুঝিবার নয়
দুর্জ্ঞেয়, দুর্লঙ্ঘ চিরকাল
মানুষের মৃত্যু আর ললাটের ভাগ্যলিপি-জাল।"—(ওমর)

"ভাগ্য নিয়ে খেলছ তুমি দুহাতে মোর চক্ষু টিপি।"
—(হাফিজ)

হাফিজের মনে প্রশ্ন জাগে, এই নিবিড় রহস্যের হাত থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই?

"হেরি মন উচাটন, কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
তবুও বারেক কি গো সাধ তব নাহি জাগে মনে
শিথিল করিতে ওই রহস্যের নিবিড় বাঁধন?"—(হাফিজ)

হাফিজ মাঝে মাঝে তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করেছেন। সন্দেহ করেছেন, পাপপুণ্য যা নিয়ে এত হানাহানি এত দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যে কোন প্রভেদ অথবা তাদের অস্তিত্বই আছে কি না। তিনি লিখেছেন :—

"কোথা আছে সৃষ্টিকর্তা
কোন লোকে কি তার প্রমাণ
জ্ঞান বুদ্ধি চিন্তা লয়ে
আজও কেহ পায়নি সন্ধান।"—(হাফিজ)

আবার অন্যত্র বলেছেন :—

"পাপ-পুণ্যে কি প্রভেদ? ধর্ম্ম আর শুচিতার
সম্বন্ধ কোথায়?
কে বা শোনে স্তুতিগান? সুরে যাহা প্রাণ পায়
সে সুর কোথায়?"

ওমর কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নি, বরং যা কিছু মন্দ এ ধরায় বিরাজমান তার জন্য ভগবানকে তিনি এমন তীব্র ভাষায় অভিযুক্ত করেছেন, যা আমাদের বিশেষ ভাবে নাড়া দেয় :—

"মানুষেরে হীনচেতা তুমিই করেছ হেথা
তোমারই সৃজিত যত কাল ফণীদল
আনন্দ নন্দনে আনে তীব্র হলাহল
যত কিছু মহাপাপে কলঙ্কিত মানুষের মুখ
সে তোমারই চুক
ক্ষমা চাও মানুষের কাছে
ক্ষমা কর দোষ তার যত কিছু আছে"—(ওমর)

দু'জন কবিই কিন্তু ঈশ্বরের পরম ভক্ত। দু'জনেই আপনাকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করেছেন ঈশ্বরের কাছে একান্ত ভাবে।

"এই শক্তি এই প্রাণ
এ সকলই তব দান
মোর সত্তা, আত্মা মোর
এ তো প্রভু তব ধন।" —(ওমর)

"আসিয়াছি দুয়ারে তোমার
সেবকের লয়ে অধিকার
হে প্রভু করুণা তব যাচি
চরণের দাস হয়ে আছি
মুখপানে ফিরে তুমি চাও।" —(হাফিজ)

কিন্তু ওমর খৈয়াম আরও এগিয়ে গেছেন। চিরমুক্ত মন নিয়ে, সর্ব্বরকম গোঁড়ামী, ধর্ম্মান্ধতা এবং সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন যে :—

"মন্দিরে কি মসজিদে ভাই
প্রভেদ কিছুই নাই
উভয় গৃহই ভক্তগণের
উপাসনার ঠাঁই
কুশের প্রতীক কোশাকুশি
কিংবা জপের মালা
পঞ্চপ্রদীপ ধূপধুনা বা
চেরাগ বাতি জ্বালা
সকলই সেই একই জনের
পূজার উপচার
বিশ্ব জুড়ে ভিন্ন প্রথায়
অর্চ্চনা হয় যাঁর।" —(ওমর)

ভাবলে বিস্ময় লাগে, আজ থেকে হাজার বছর আগে, মুসলমান হয়েও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওমর এত উদারতা কোথায় পেলেন!

ভারতের বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে যেমন ওমরের কবিতার সামঞ্জস্য দেখা যায়, তেমনি আবার হাফিজের রচনায় এবং তাঁর জীবন-দর্শনে ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ তিনি সুফী সম্প্রদায়ের লোক, যাঁরা ভগবানের ভক্ত প্রেমিক। ভগবানের সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ কখনও সখা, কখনও প্রেমিক; কখনও বা প্রণয়িনী। আমাদের এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে

প্রিয় বা সখা হিসাবে গ্রহণ করে ধর্ম্ম সাধনা করেন। এঁদের দু'টি কবিতা তুলে দিলেই বিষয়বস্তুটা পরিষ্কার হবে। ওমর বলেছেন :—

"যাঁহার গোপন স্থিতি ওতপ্রোত সৃষ্টির লীলায়
ছোট বড় নানা রূপে দিকে দিকে যাঁহার বিকাশ
সবার মাঝারে থেকে যিনি সদা অপ্রকাশ
জরা, মৃত্যু, যৌবনের বিশ্বজোড়া বিবর্ত্তনের মাঝে
একা সেই নির্ব্বিকার নিয়ত বিরাজে।"
—(ওমর)

হাফিজ বলেছেন :—

"ঘোমটা খোল ঘোমটা খোল
আমার পানে মুখটি তোল
আর কত কাল থাকবে বল
লুকিয়ে তোমার থাকা ?"

আবার অন্য ভাবে বলেছেন :—

"তুমি যে রাজার রাজা তুমি প্রিয়তম
রহ মোর প্রেমলোকে ধ্রুবতারা সম।"

আর একটা কথা বলে আমার রচনার সীমারেখা টানবো। ওমর খৈয়ামের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ তাঁর জীবিতাবস্থায় হয়েছে, এমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু হাফিজের পদধূলি প্রাচীন ভারতের লাহোরে পড়েছিল। বাঙলা চিরদিন কবি আর কাব্যের উপাসক ; তাই আমাদের পরম ভাগ্য যে, বাঙলার নবাব গীয়াসুদ্দীন তাঁকে বাঙলায় আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যদিও তিনি আসতে পারেননি কিন্তু তিনি তাঁর রচনার এক স্থানে বাঙলার নাম উল্লেখ করেছেন :—

"হিন্দুস্থানের তোতাপাখীরা সব
আমার গানের সুধা পান করে
জনে জনে মধুকণ্ঠ হয়ে উঠেছে দেখছি।
পারস্যের এই মিঠাই তাই
বাঙলায় চলছে আজ।"

দু'টি কবিতা

জিয়া হায়দার

অপরাহ্ন

অপরাহ্ন অলস-শয্যায়
নিঃসঙ্গ আকাশ দেখি
পাখীদের ডাক শুনি
বিশীর্ণ গাছের ডালে
অনাগত রাত্রির স্পন্দন।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে কত কিছু দেখে নিই
শ্রম-ক্লান্ত দেহে শুয়ে শুয়ে
বিষণ্ণ এ বিকেলের অলস শয্যায়
তবু কা'র এখানে আসার প্রত্যাশায়
আবার হৃদয় পড়ে নুয়ে
ক্লান্ত বিছানায়।

রাত্রি

সন্ধ্যার সোনালী আলো রাত্রির ঘোমটার ফাঁকে
নতুন বধূর মতো হাসে।
আনন্দের স্নিগ্ধতায় মিটি-মিটি উত্তর আকাশে।

জোনাক-পরীরা সব দীপমালা গাঁথে।
রূপকের কাহিনীতে স্বপ্নপুরী গড়ে।
সাতটি চম্পারে নিয়ে সাথে
পারুল মেয়েটি যেন উজ্জ্বল নয়ন তুলে চায়
যুগের প্রথম ভীরু রাতে
নীরব উন্মেষ হ'লো তার।
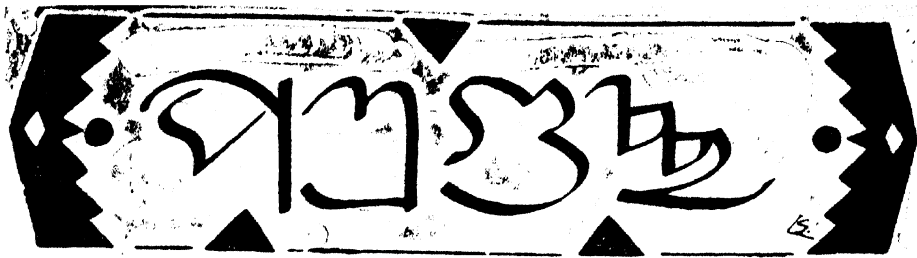
রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র

[ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে লিখিত]

১৩০৮ সালে লিখিত চিঠিগুলিতে প্রায়ই শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে মহারাজকুমারই তথায় প্রথম ছাত্ররূপে প্রবেশ লাভ করবেন—কথা ছিল। গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁকে কুমিল্লায় যেতে হয়, সেখানে সাহেবদের ক্লাবে যোগদান করায় এই চিঠির অবতারণা।

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু—

আমার শরীর ভাল নাই। কুমিল্লায় তোমাকে ক্লাবে প্রবেশ করান হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ইহা যে তোমার পক্ষে কষ্টকর হইবে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই বিজাতীয় বর্ব্বরগুলার অশিষ্ট ঔদ্ধত্য এবং কদর্য্য আচার অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বিশেষতঃ তাহারা আমাদিগকে চায় না, আমাদিগকে অবজ্ঞা করে, অথচ আমরা তাহাদের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াই, ইহা আমাদের পক্ষে অবমানকর। আমাদের সমস্ত জাতিকে যাহারা ঘৃণা করে আমাকে তাহারা সম্মান করিবে কি করিয়া এবং করিলেই বা তাহা আমি গ্রহণ করিব কেন? অপমানিত জাতির পক্ষে এই সাহেবের সোহাগ লইবার চেষ্টা—এমন লজ্জাকর দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না। যাহা হউক তুমি সহ্য করিয়া থাক এবং মনে মনে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কর—একপ হইলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তুমি নিজের তেজ রক্ষা করিতে পারিবে। যাহা শিখিবার তাহা শিক্ষা কর, যাহা দেখিবার তাহা চুপ করিয়া দেখ এবং যাহা মনে রাখিবার তাহা চিরদিন মনে পোষণ করিয়া রাখ। ঈশ্বর তোমাকে বিজাতির মোহ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ইতি শুক্রবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

যোড়াসাঁকো

কলিকাতা

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার অধ্যয়নের সুব্যবস্থা জন্য আমার পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। শুনিলাম সম্প্রতি ত্রিপুরায় একটা গোলযোগ বাধিয়াছে—সেই জন্য আমি এ সময়ে মহারাজের কাছে কোন প্রস্তাব করিলাম না। যতীকে * বলিয়া দিবে, সেখানকার বিপ্লব শান্তি হইলে আমাকে যেন সংবাদ দেয়। মহারাজ যদি বা আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হন তথাপি পারিষদবর্গ যদি সম্মান ও ব্যয়বাহুল্যের দোহাই দিয়া আপত্তি প্রকাশ করে তবে কি দাঁড়াইবে বলা কঠিন। একপ অবস্থায় কোন প্রকার সদভিপ্রায় সাধন প্রায় অসাধ্য বলিয়া আমার মনে এক এক সময় নৈরাশ্য উপস্থিত হয়—এবং ঐশ্বর্য্যশালীদের দ্বার হইতে বহু দূরে থাকিয়া যথাসাধ্য নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে ইচ্ছা বোধ করি। লক্ষ্মীমান পুরুষেরা নিজে মহদাশয় হইলেও ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা এমন পরিবেষ্টিত যে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের শুভ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহাদিগকে পৃথিবীর শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত করা অসম্ভব। ইতি ১৮ই শ্রাবণ, ১৩০৮

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* যতীন্দ্রনাথ বসু এক সময়ে প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। কাল শান্তিনিকেতনে আসিয়াছি—কলিকাতা হইতে সর্দ্দিকাশি সঙ্গে আনিয়াছি—এখানে আসিয়া আরোগ্য লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না আশা করিতেছি। মহারাজকে পত্র লিখিয়াছি—তোমার এখানে আসিতে কোন বাধা হইবে না বলিয়াই ভরসা করি। রথী তোমার জন্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। আসিবার সময় তোমার যন্ত্রাদি অর্থাৎ carpentry, fretwork প্রভৃতির হাতিয়ার সঙ্গে আনিয়ো। বাইসিকল্ ও ঘরে পড়িবার বই প্রভৃতিও আনিতে পার। আমরা এক জন সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেছি, তিনি সর্ব্ব প্রকার হাতের কাজে সুনিপুণ—তিনি ফোটোগ্রাফি প্রভৃতিও ভাল জানেন। তুমি আসিলেই* আমি বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করিয়া দিব। অগ্রহায়ণ মাস উত্তীর্ণ হইতে দিয়ো না। আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

যে অবস্থায়, যে সঙ্গে, যে শিক্ষার মধ্যে পতিত হও না কেন, ভারতবর্ষের আদর্শকে কোন মতেই হৃদয় হইতে ম্লান হইতে দিয়ো না।

* শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছাত্ররূপে মহারাজকুমারের যাওয়ার কথা ছিল।

ইহা নিশ্চয় মনে রাখিয়ো, য়ুরোপীয় বর্ব্বরেরা ভারতবর্ষের যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করে। সে উপহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়ো। তোমার শিক্ষক যদি ভারতবর্ষকে নিন্দা করে, তুমি সে নিন্দাকে নিরুত্তরে অবজ্ঞা করিয়ো। আমার বিদ্যালয়ে তোমার হয়ত না আসাই ভাল। কারণ আমি নিভৃতে লোকের আলোচনার বাহিরে আমার কাজ করিতে চাই। তুমি এখানে আসিলে সহস্র কথার সৃষ্টি হইয়া হট্টগোলের মধ্যে পড়িতে হইবে; তাহাতে আমার কাজের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জ্জনে, নিরুদ্বেগে, পবিত্র নির্ম্মল ভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই—তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাইরে না হোক, অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ়রূপে জান যে, দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আসবাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধন-সম্পদ, বাণিজ্য-ব্যবসায়, আসবাব আয়োজনের প্রাচুর্য্য যে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে, তাহারা বর্ব্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। শান্তিতে, সন্তোষে, মঙ্গলে, ক্ষমায়, জ্ঞানে, ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধন মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও। তুমি মুখে কোন বাদ-প্রতিবাদ করিয়া অনর্থক সংঘর্ষে বল নষ্ট করিয়ো না—স্তব্ধমৌন ভাবে অটল নিষ্ঠার সহিত ভারতবর্ষের নিকট একান্তচিত্তে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর। তোমার বর্ত্তমান শিক্ষা ও সঙ্গ এই ভাবের প্রতিকূল বলিয়াই এই বিরোধের সংঘাতে তোমার দৃঢ়তা আরো দ্বিগুণতর হইবে। এই বিরোধই তোমার শিক্ষার কারণ হইবে। আমি জানি তোমার অন্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের সহজ মাহাত্ম্য আপনি বিরাজ করিতেছে—সে তোমাকে এত কাল অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে—এখনো সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। ইংরাজ-শিক্ষক তোমার এই স্বাভাবিক তেজকে ম্লান ও নির্ব্বাপিত করিবার অনেক চেষ্টা করিবে—সেই প্রতিকূল চেষ্টায় তোমার তেজ বর্দ্ধিত হইয়া এই দুরূহ পরীক্ষা হইতে তোমাকে উত্তীর্ণ করুক। ভারতবর্ষের আশীর্ব্বাদ তোমাকে রক্ষা করুক, ঈশ্বরের অভয় হস্ত তোমাকে রক্ষা করুক, তোমার নিজের প্রতিভা তোমাকে রক্ষা করুক! বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়া আমাকে সুখী করিবে। আগামী নববর্ষে তুমি নবতেজে নববলে ভারত-সন্তান হইবার ব্রত গ্রহণ কর—সেই ব্রতকে প্রাণের চেয়ে বড় করিয়া মরণান্তকাল পালন করিয়ো।—ইতি ২৪শে চৈত্র, ১৩০৮

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শ—এই পত্রে অভিব্যক্ত।]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

বৎস, তুমি ক্ষত্রিয়, তাহা কদাপি বিস্মৃত হইয়ো না। কোন শিক্ষায় কোন সঙ্গে তোমার তেজবীর্য্য ও শ্রদ্ধা যেন অভিভূত না হয়। বিদেশীর উপদেশে যদি আমরা নিজেদের হীন বলিয়া মনে করি, তবেই আমাদের যথার্থ পরাভব। ইংরাজের শিক্ষায় ক্রমাগতই আমাদের নিজের প্রতি বিশ্বাস ও সম্ভ্রম চলিয়া গিয়া আমাদের মন য়ুরোপের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছে। সেই জন্য বেশভূষা, আহার-বিহার, গৃহসজ্জা, বিলাস-উপকরণে আমরা কেবলই ইংরাজের উচ্ছিষ্ট ভোগ করিতেছি। অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম্ম, অনাচার হইতে দেশকে সমাজকে রক্ষা করা ইহাই ক্ষত্রিয়ের কুলব্রত। এমন পবিত্র উন্নত ব্রত আর কিছুই হইতে পারে না, ভয় ত্যাগ করিয়া, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, দুঃখকে বরণ করিয়া, দৈন্যকে উপেক্ষা করিয়া, আত্মমর্য্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া ভারতবর্ষে ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শকে পুনরায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার ভার তুমি গ্রহণ কর। সেই ভার গ্রহণ করিতে হইলে নিজের সমস্ত তেজকে হোমাগ্নির ন্যায় হৃদয়ের গোপন গুহায় অহরহ প্রজ্বলিত করিয়া রাখিতে হইবে। মহাভারতের ভীষ্ম, অর্জ্জুন ও কর্ণ ক্ষত্রিয়ের আদর্শ। সেই আদর্শটি গ্রহণ করিয়ো। মূল মহাভারতে কালে কালে অনেক বাজে জিনিস প্রক্ষিপ্ত হইয়া এই মহাকাব্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সমস্ত বাদ দিয়া ইহার মূল কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া চলিলে প্রাচীন ক্ষত্রিয় সমাজের সহিত পরিচিত হইতে পারিবে। মহাভারত যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি। এই দুই সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিলেই—ভারতবর্ষ পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিতে পারিবে। আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো। ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত সাত্ত্বিক ভাবকে তোমরা বরণ করিলে চলিবে না। বলবীর্য্য তেজ সমাজে কে রক্ষা করিবে? সেই ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়? ব্রাহ্মণের শান্তি কাহার অটল বলের উপরে নিজেকে রক্ষা করিবে? সমাজে ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শকে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও বিঘ্ন হইতে সুরক্ষিত করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যই ক্ষাত্রতেজের মাহাত্ম্য। স্বেচ্ছাচার, বিলাস, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পারিষদগণের চাটুবাক্যে শুষ্ক অহঙ্কারে পরিস্ফীত হইয়া থাকা সুমহৎ ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে। এইরূপে আমাদের ক্ষত্রিয়দের তেজ নষ্ট, বুদ্ধি ভ্রষ্ট, চরিত্রবল চূর্ণ হইয়া তাহারা অবনতির পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার অবমাননায় অসাড় হইয়া কেবল কলুষিত প্রমোদে উন্মত্ত হইয়াছে। যাহারা সমস্ত সমাজের আশ্রয় ছিল তাহারা আজ পশুর মত হীনতা ও অবমাননায় লুণ্ঠিত হইয়া দিনযাপন করিতেছে! ইহা অপেক্ষা কি মৃত্যু শ্রেয়ঃ নহে? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে

এরূপ জীবন ' কি চরমতম দুর্গতি নহে ? বাঁচিয়া কি হইবে যদি এমন করিয়াই বাঁচিতে হয় ? নিজেকে ও নিজের সমাজকে বীর্য্য দাও, অভয় দাও, আশ্বাস দাও, ধর্ম্ম রক্ষা, ও আর্ত্তত্রাণ ব্রতে দীক্ষিত করো —তোমার জীবন চরিতার্থ হউক—ঈশ্বর তোমার ললাটে ক্ষাত্র মাহাত্ম্যের তিলক স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া দিন্। ইতি—

৭ই বৈশাখ ১৩০১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পু:—বৈশাখের বঙ্গদর্শনে আমার "নববর্ষ" প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিয়ো। তাহা ব্রাহ্মণের মনের কথা। তাহা ক্ষত্রিয়ের জন্য লিখি নাই। তথাপি তাহাতে চিন্তার বিষয় পাইবে।

[ক্ষত্রিয়-সন্তানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যুবক মহারাজকুমারকে উপদেশ।]

পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ

পরিচিত অপরিচিত কত লোককে কত চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তার লেখাজোখা নেই। যত দিন শরীর বয়েছে, আঙুল চলেছে, নিজের হাতে পরিচিত অপরিচিত সবাইকার চিঠির জবাব দিয়েছেন। পীড়িত হবার পরও সেক্রেটারিদের দ্বারা জবাব দিয়েছেন এবং সেই সব জবাবের অনেকগুলিতে স্বাক্ষরও ক'রেছেন। তাঁর লেখা একখানা পোষ্টকার্ডেও তাঁর স্বকীয়ত্ব কিছু আছে, সাহিত্যরস কিছু আছে! নানা বিষয়ে তাঁর মতামতও চিঠিগুলিতে আছে যা হয়ত তাঁর কোন বইয়ে নাই। কারো সাধ্য নাই তাঁর লেখা সব চিঠি সংগ্রহ ক'রে ছাপাতে পারেন। বিশ্বভারতী অবশ্য সংগৃহীত কতকগুলি ছাপবেন। আমাদের পুঁজিতে যত চিঠি আছে, সব ছাপা হয় নি, হবেও না। অকস্মাৎপ্রাপ্ত অন্যকে লেখা তাঁর ২১১ খানি চিঠি কোন-না-কোন বিশিষ্টতার জন্যে ছাপা হবে।

বাঁকুড়া জেলার রাগাগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর সরকারকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তাঁর নিন্দা-প্রশংসা সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। চিঠিখানি নীচে উদ্ধৃত করছি।

"ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তুমি আমার লেখাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েচ এতে আমি আনন্দ বোধ করি। বিশেষত আমি জানি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এই অধ্যবসায়ে সাধারণের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কাই তোমার বেশি। আমি তোমাকে উৎসাহ দিয়ে পত্রাদি লিখি নে তার একমাত্র কারণ, আমার সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি। নিরন্তর নিন্দাবাক্য আমি নীরবে সহ্য করেচি। তোমাদের প্রশংসাবাক্যও আমি তেমনি নীরবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি। তোমরা আমার রচনার সমাদর করে থাক এতে আমি উদাসীন এমন কথা মনে কোরো না—তোমার উদ্দেশ্য সফল হোক, এ ইচ্ছা স্বভাবতই আমি মনে পোষণ করে থাকি। আমার রচনায় যাঁরা আনন্দ পান তাঁরা তোমাকে সুহৃৎ বলেই গণ্য করবেন এতে সন্দেহ নেই।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি—

৩০শে আশ্বিন, ১৩৩৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

"মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই"

সন ১২৯৪ সালে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের "চিঠিপত্র" পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি এক দাদামশায় ও তাঁর নাতির নয়খানি চিঠির সমষ্টি। নাতির শেষ চিঠির শেষের দিকে আছে, "মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই।"

নাতি তার শেষ চিঠিতে কি লিখেছিলেন, কেন লিখেছিলেন, জানতে হ'লে, দাদামশায়ের তার আগেকার চিঠির কোন কোন কথা জানা দরকার। দাদামশায় শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মা তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেছিলেন :—

"আমি তো ভাই ভাবিয়া রাখিয়াছি, যে-দেশের আবহাওয়ায় বেশি মশা জন্মায় সেখানে বড়ো জাতি জন্মিতে পারে না। এই আমাদের জলাজমি জঙ্গল এই কোমল মৃত্তিকার মধ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর প্রবল সভ্যতার স্রোত আসিয়া আমাদের কাননবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন নিভৃত ক্ষুদ্র কুটীরগুলি কেবল ভাঙিয়া দিতেছে মাত্র। আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিতেছে কিন্তু উপায় নাই, কাজ বাড়াইয়া দিতেছে কিন্তু শরীর নাই, অসন্তোষ আনিয়া দিতেছে কিন্তু উদ্যম নাই। আমাদের যে স্বস্তি ছিল তাহা ভাসাইয়া দিতেছে—তাহার পরিবর্তে যে সুখের মরীচিকা রচনা করিতেছে তাহাও আমাদের দুষ্প্রাপ্য। কাজ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধি নাই কেবল অহর্নিশি শ্রান্তিই সার। আমার মনে হয় তার চেয়ে আমরা ছিলাম ভালো—আমাদের সেই স্নিগ্ধ কাননচ্ছায়ায়, পল্লবের মর্মর শব্দে, নদীর কলস্বরে, সুখের কুটীরে স্নেহশীল পিতামাতা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বজনবৎসল পুত্রকন্যা পরিবারপ্রতিম প্রতিবেশীদিগকে লইয়া যে নিরুপদ্রব নীড়টুকু রচনা করিয়াছিলাম, সে ছিলাম ভালো। য়ুরোপীয় বিরাট সভ্যতার পাষাণ-উপকরণ সকল আমরা কোথায় পাইব, কোথায় সে বিপুল বল, সে শ্রান্তিমোচন জলবায়ু, সে ধুরন্ধর প্রশস্ত ললাট। অবিশ্রাম কর্ম্মানুষ্ঠান, বাধাবিঘ্নের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধ নূতন নূতন পথের অনুসন্ধানে অবিশ্রাম ধাবন, অসন্তোষানলে অবিশ্রাম দহন—সে আমাদের এই প্রখর রৌদ্রতপ্ত আর্দ্র সিক্ত দেশে জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল দেহে পারিব কেন। কেবল আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আমরা পতঙ্গের মতো উগ্র সভ্যতানলে দগ্ধ হইয়া মরিব মাত্র।"

এই কথাগুলির মধ্যে মোটেই সত্যি কিছুই নাই বলা যায় না। তবু এমন কথা প'ড়ে কোন উষ্ণশোণিত সবলদেহ যুবক উত্তেজিত না হয়? তাই এর উত্তরে নাতি লিখলেন :—

"শ্রীচরণেষু

তবে আর কী। তবে সমস্ত চুলায় যাক। বাংলাদেশ তাহার আম-কাঁঠালের বাগান এবং বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসিয়া কেবল ঘরকন্না করিতেই থাক। স্কুল উঠাইয়া দাও, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সমুদয় কাগজপত্র বন্ধ করো, পৃথিবীর সকল বিষয় লইয়াই যে আন্দোলন-আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে সেটা বলপূর্বক স্থগিত করো, ইংরেজি পড়া একেবারেই বন্ধ করো, বিজ্ঞান শিখিয়ো না, যে সমস্ত মহাত্মা মানবজাতির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাস পড়িয়ো না, পৃথিবীর যে সকল মহৎ অনুষ্ঠান বাসুকির ন্যায় সহস্র শিরে মানবজাতিকে বিনাশ বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়া অটল উন্নতির পথে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া থাকো।

অর্থাৎ যাহাতে করিয়া হৃদয় জাগ্রত হয়, মনে উদ্যমের সঞ্চার হয়, বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হইয়া একত্রে কাজ করিবার জন্য অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হয়—স সমস্ত হইতে দূরে থাকো। পড়িবার মধ্যে নূতন পঞ্জিকা পড়ো, কোন দিন বার্তাকু নিষেধ ও কোন দিন কুষ্মাণ্ড বিধি তাহা লইয়া প্রতিদিন সমালোচনা করো। দালান, ডাবা হুঁকা, নস্য ও নিন্দা লইয়া এই রৌদ্রতাপদগ্ধ নিদাঘ-মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করো। সন্তানদের মাথার মধ্যে চাণক্যের শ্লোক প্রবেশ করাইয়া সেই মাথাগুলো ইহকাল ও পরকালের মতো ভক্ষ্য পদার্থ করিয়া রাখো।"

তার পর, আরো নিঃসংশয় হবার জন্যে নাতি দাদামশায়কে জিজ্ঞেস করছেন :—

"দাদামহাশয়, তুমি কি সত্যসত্যই বলিতেছ, আমরা এক শত বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিলাম, অবিকল সেই রূপ থাকাই ভালো, আর কিছু মাত্র উন্নতি হইয়া কাজ নাই; জ্ঞান লাভ করিয়া কাজ নাই, পাছে প্রবল জ্ঞানলালসা জন্মিয়া আমাদের দুর্বল দেহকে জীর্ণ করিয়া ফেলে। লোকহিতপ্রবর্তক উপদেশ শুনিয়া কাজ নাই, পাছে মানবহিতের জন্য কঠোর ব্রত পালন করিতে গিয়া এই প্রখর রৌদ্রতাপে আমরা শুষ্ক হইয়া যাই। বড়োলোকের জীবনবৃত্তান্ত পড়িয়া কাজ নাই, পাছে এই মশকের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদের দুর্বল হৃদয়ে বড়োলোক হইবার দুরাশা জাগ্রত হয়। তুমি পরামর্শ দিতেছ ঠাণ্ডা হও, ছায়ায় থাকো, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করো, ডাবের জল খাও, নাসারন্ধ্রে তৈল দাও এবং স্ত্রীপুত্রপরিবার ও প্রতিবেশীদিগকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখনিদ্রার আয়োজন করো।"

দাদামশায়ের পরামর্শ কিন্তু নাতি গ্রহণ করতে পারবে না। নাতির ভাষায় তার কারণটা শুনুন।

"কিন্তু এমন পরামর্শ দেওয়া বৃথা—সাবধান করা নিষ্ফল। বাঁশির ধ্বনি কানে আসিয়াছে, আমরা গৃহের বাহির হইব। যে বন্ধনে আমরা সমস্ত মানব জাতির সহিত যুক্ত, সেই বন্ধনে আজ টান পড়িয়াছে। বৃহৎ মানব আমাদিগকে ডাকিতেছে, তাহার সেবা করিতে না পারিলে আমাদের জীবন নিষ্ফল। আমাদের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র্য, বাৎসল্য, দাম্পত্য প্রেম—সমস্ত সে চাহিতেছে। তাহাকে যদি বঞ্চিত করি তবে আমাদের সমস্ত প্রেম ব্যর্থ হয়, আমাদের হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকে। যেমন বালিকা স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে যতই স্বামিপ্রেমের মর্ম অবগত হইতে থাকে, ততই তাহার হৃদয়ের সমুদয় প্রবৃত্তি স্বামীর অভিমুখিনী হইতে থাকে, তখন শরীরের কষ্ট, জীবনের ভয় বা কোনো উপদেশই তাহাকে স্বামিসেবা হইতে ফিরাইতে পারে না, তেমনি আমরা মানবপ্রেমের মর্ম অবগত হইতেছি এখন আমরা মানবসেবায় জীবন উৎসর্গ করিব, কোনো দাদামশায়ের কোনো উপদেশ তাহা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। মরণ হয় তো মরিব, কোনো উপায় নাই। কী সুখেই বা বাঁচিয়া আছি।"

দাদামশায় লিখেছিলেন, "প্রবল সভ্যতার স্রোত আসিয়া" "আমাদের যে স্বস্তি ছিল তাহা ভাসাইয়া দিতেছে"—ইত্যাদি। তারই উল্লেখ ক'রে নাতি লিখছেন :—

"আনন্দের কথা বলিতেছ। এই তো আনন্দ। এই নূতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন জীবন—এই তো আনন্দ। আনন্দের লক্ষণ কি নূতন কিছু ব্যক্ত হইতেছে না, জাগরণের ভাব কি কিছু প্রকাশ পাইতেছে না। বঙ্গসমাজের গঙ্গায় একটা জোয়ার আসিতেছে বলিয়া কি মনে হইতেছে না। তাই কি সমাজের সর্বাঙ্গ আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। আমাদের এদেশ নিরানন্দের দেশ, আমাদের এ দেশে রোগ-শোক-তাপ আছে, রোগে শোকে নিরানন্দে আমরা জীর্ণ হইয়া মরিতে বসিয়াছি—সেই জন্যই আমরা আনন্দ চাই, জীবন চাই—সেই জন্যই বলিতেছি নূতন স্রোত আসিয়া আমাদের মুমূর্ষু হৃদয়ের স্বাস্থ্য বিধান করুক—মরিতেই যদি হয় তো যেন আনন্দের প্রভাবেই মরিতে পারি।"

৫৪।৫৫ বৎসর পূর্বে ২৫।২৬ বৎসর বয়সের যুবা রবীন্দ্রনাথ তখনকার বাংলা দেশ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, এখনকার যুবকরা এখনকার বাংলা দেশ সম্বন্ধে তা বলতে পারেন কি না, তা তাঁরা বিবেচনা করবেন।

দাদামশায় লিখেছিলেন, "কেবল আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আমরা পতঙ্গের মতো উগ্র সভ্যতানলে দগ্ধ হইয়া মরিব মাত্র।" মরতেই যে হবে নাতি তা মেনে নিতে পারেন নি; উত্তরে লিখেছেন :—

"আর মরিব কেন। তুমি এমনি কি হিসাব জান যে, একবারে ঠিক দিয়া রাখিয়াছ যে, আমরা মরিতেই বসিয়াছি। তোমার বুড়ো মানুষের হিসাব অনুযায়ী মনুষ্য সমাজ চলে না। তুমি কি জান, মানুষ কোথা হইতে বল পায়, কোথা হইতে দৈবশক্তি লাভ করে। মনুষ্য সমাজ সাধারণত হিসাবে চলে বটে, কিন্তু এক এক সময়ে সেখানে যেন ভেলকি লাগিয়া যায় তখন আর হিসাবে মেলে না। অন্য সময়ে দুয়ে দুয়ে চার হয় সহসা এক দিন দুয়ে দুয়ে পাঁচ হইয়া যায়, তখন বুড়ো মানুষেরা চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। সহসা যখন নূতন ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইয়া জাতির হৃদয়ে আবর্ত রচনা করে তখনই সে ভেলকি লাগিবার সময় তখন যে কী হইতে কী হয় ঠাহর পাইবার জো নাই। অতএব আমবাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্রনীড়ের মধ্যে আর ফিরিব না।"

যুবা নাতি নবীনকিশোর শর্মা বৃদ্ধ দাদামশায় ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মাকে আপন প্রতিজ্ঞা জানাবার জন্যে লিখছেন :—

"হয় মরিব নয় বাঁচিব, এই কথাই ভালো। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই। ক্রমওয়েল যখন প্রজাদের দাসত্বরজ্জু ছেদন করিতেছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন; ওয়াশিংটন যখন নূতন জাতির স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা উঠাইয়াছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন। পৃথিবীর সর্বত্রই এমন কেহ মরে কেহ বাঁচে—তাহাতে আপত্তি কী। নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু। আমরা হয় বাঁচিব না হয় মরিব—তাই বলিয়া কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া দাদামশায়ের কোলের কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না। তোমার কি ভয় হয় পাছে তোমার বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকে। জিজ্ঞাসা করি, এখনই বা কে বাতি দিতেছে। সমস্তই যে অন্ধকার।

"বিদায় লইলাম, দাদা মহাশয়। আমাদের আর চিঠিপত্র চলিবে না। আমাদের কাজ করিবার বয়স। সংসারে কাজের

বাধা যথেষ্ট আছে—পদে পদে বিঘ্নবিপত্তি, তাহার পরে বুড়োমানুষের কাছ হইতে যদি নৈরাশ্য সঞ্চয় করিতে হয় তাহা হইলে যৌবন ফুরাইবার আগেই বৃদ্ধ হইতে হইবে। তাহা হইলে পঞ্চাশে পৌঁছিবার পূর্বেই অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিতেছে, আমি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিব না। তুমি বলিতেছ পথের মধ্যে খানা আছে ডোবা আছে, সেইখানে পড়িয়া তুমি ঘাড় ভাঙিয়া মরিবে, অতএব ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া থাকাই ভালো—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। আমি দুর্বল সত্য, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি তো বল পাইতেছি না; আমার ব্রতপালনের পক্ষে আমি হীনবুদ্ধি বটে কিন্তু তোমার উপদেশে আমি তো বুদ্ধি পাইতেছি না। অতএব আমার যেটুকু বল যেটুকু বুদ্ধি আছে তাহাই সম্বল করিয়া চলিলাম, মরিতে হয় তো চিরজীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মরিব।"

নাতির এই পত্রের উত্তরে দাদামশায় যে চিঠি লিখেছিলেন, সেইটিই "চিঠিপত্র" বইয়ের শেষ চিঠি। সেটি পড়লে বোঝা যায়, তিনি নবীনকিশোরের অযোগ্য দাদামশায় ছিলেন না। তার গোড়াতে তিনি বলছেন :—

"চিরজীবেষু,

ভায়া তোমার চিঠিতে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে আমি দুঃখিত নই। তোমাদের রক্তের তেজ আছে; মাঝে মাঝে তোমরা যে গরম হইয়া উঠ, ইহা দেখিয়া আমাদের আনন্দ বোধ হয়। আমাদের মতো শীতল রক্ত যদি তোমাদের হইত তাহা হইলে পৃথিবীর কাজ চলিত কী করিয়া? তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সর্বত্র মেরুপ্রদেশে পরিণত হইত।"

সমস্ত চিঠিটিই অভিনিবেশপূর্বক পড়বার যোগ্য। তার থেকে কেবল দু-একটি কথা উদ্ধৃত করি।

"কাজ নাই ভাই, আমার সংশয় আমার বিজ্ঞতা আমার কাছেই থাক, তোমরা নিঃসংশয়ে কাজ করো, নির্ভয়ে অগ্রসর হও। নূতন নূতন জ্ঞানের অনুসন্ধান করো, জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করো, যে স্রোতে পড়িয়াছ এই স্রোতকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতিতীর্থের দিকে ধাবমান হও; নিমগ্ন হইলে লজ্জার কারণ নাই, উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমাদের জন্মলাভ সার্থক হইবে, তোমাদের দুঃখিনী জন্মভূমি ধন্য হইবে।"

"···সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও কিন্তু পশ্চাতের সহিত বিবাদ করিয়ো না। এক প্রেমের সূত্রে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমানকে বাঁধিয়া রাখো।"

এ মনটা এক গুচ্ছ মরসুমী ফুল

শেফালি সেনগুপ্তা

এই মন এই মন
এক মুঠো স্বপ্নের মতন
এই আছে এই নেই দেতলীর তীরে,
ডানা মেলে ভেসে চলে দ্রুত কিংবা ধীরে।
এই মন—মনের আকাশে
সোনালী ভাবনা-রাশি নিরুদ্বেগে ভাসে
কক্ষ থেকে কক্ষপথে তারার মতন
ওরা নয়, ওরা নয়, এই বস্তু-পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজন।
এই মন পটভূমিকায়—
কখনো বা খর রোদে কখনো ছায়ায়
দেখেছি ওদের ভীড়। ওরা যেন খুশীর মিছিল
অলস হৃদয় ঘিরে ওরা শুধু করে ঝিলমিল।
ওগো মন ওরা কারা জান?
ওই সব খুশী-খুশী আলো অম্লান?
আশার স্ফুলিঙ্গ ওরা—নিরাশার মাঝে
জ্বলে ওঠে নিমেষেতে ফুলঝুরি সাজে।
এ জীবনে হিসেবের চুলচেরা ফাঁকে
আশার এ ফুলঝুরি নানা রং-এ আঁকে
এলোমেলো কত ছবি—হোক না সে ভুল,
তবুও তো মনে হয় এ মনটা এক গুচ্ছ মরসুমী ফুল।

পরিমল গোস্বামী

তৃতীয় পর্ব্ব

৪

ভাগলপুরে বলাইচাঁদের বাড়িতে যে ঘরে ল্যাবরেটরি ছিল, তারই পাশে রোগীদের বসবার জায়গা। দেহ নিষ্কাশিত বস্তুসমূহের পরীক্ষা তখন ভাগলপুরে—সম্ভবত একমাত্র এখানেই হত।

একদিন রাত্রে এক জীর্ণ বৃদ্ধ এসে হাজির। সে এসেছে পাড়াগাঁ থেকে, যক্ষ্মায় ভুগছে সন্দেহে কোনো ডাক্তার তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বলাই তার থুথু সংগ্রহ ক'রে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হল। রোগীর আর সে রাত্রে ফিরে যাবার কোনো উপায় রইল না, সেইখানেই শুয়ে রইল। ভীষণ কাসছিল রোগী। সমস্ত রাত ধ'রেই কেসেছে, সেই ছোট্ট ঘরখানায়। বলাই রাত্রেই তার থুথু পরীক্ষা করল এবং রিপোর্ট লিখে রাখল। স্পিউটামে অসংখ্য যক্ষ্মাজীবাণু। বলাই আমাকেও সে স্লাইড দেখাল মাইক্রোস্কোপে। নীলপটে লাল জীবাণু—এত যে গোণা যায় না। বীক্ষণক্ষেত্রের স্তর বদলালেও তেমনি অসংখ্য জীবাণু। এ জন্য কিভাবে স্লাইড প্রস্তুত করতে হয় তা সে আমাকে আগেই শিখিয়েছিল, এবং শুধু এটির নয় তার দেখা যাবতীয় জীবাণু আমাকে দেখাত এবং বুঝিয়ে দিত, বিভিন্ন জাতের ম্যালেরিয়ার জীবাণু, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস, এবং দুচার রকম জীবন্ত জীবাণু—ফাইলেরিয়া সহ। উপরন্তু রক্ত পরীক্ষার যাবতীয় অঙ্গগুলি সে দেখিয়েছিল আমাকে। প্রতিদিন এ সব দেখে দেখে এ বিষয়ে পূর্ব কৌতূহল আমার আরও বেড়ে গিয়েছিল। দেখাবার উৎসাহ বলাইয়ের খুব বেশি ছিল।

নিজে যা দেখেছি, জেনেছি বা উপলব্ধি করেছি—তার বিস্ময় অন্যের মনে সঞ্চার করার প্রবৃত্তি থেকেই তো সাহিত্যের জন্ম। বিস্ময় যখন মনের আধার ছাপিয়ে যায়, তখন তা অন্যের মনে কমিউনিকেট না করা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই—এটাই হল সাহিত্য-সর্জনের মূল কথা। আমাদের দেশের যাঁরা বড় বড় বিজ্ঞানী, তাঁদের মনে বিশ্বরহস্য খুব যে বিস্ময় জাগায় তা মনে হয় না, কারণ তাঁদের বিস্ময় সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা তাঁদের জাগে না। এ প্রবৃত্তি শুধু ইউরোপের বড় বড় বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায়, এবং তাঁরা নিজেরা সর্বজনপাঠ্য বিজ্ঞানসাহিত্য রচনা করেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা রসসাহিত্যের সীমানায় পৌঁছয়।

গ্রাম থেকে আগত বৃদ্ধের স্পিউটামের স্লাইড দেখে আমি স্তম্ভিত এবং কিঞ্চিৎ আতঙ্কগ্রস্তও। স্লাইড থেকে আমার দৃষ্টি ফিরল পাশের ঘরখানায়। স্পষ্ট দেখলাম সেখানে কোটি কোটি যক্ষ্মাজীবাণুতে সে ঘর ভরে উঠেছে, এবং আমি তার পাশেই ব'সে আছি!

ল্যাবরেটরির সংলগ্ন সে ঘর, মাঝখানে কোনো পার্টিশন নেই! এর পরেই যে ঘটনাটি ঘটল তাতে আমি প্রায় শিউরে উঠলাম।

বৃদ্ধ রোগীটি সকালে রিপোর্ট নিয়ে চলে যাবার একটু পরেই বলাইয়ের শিশুপুত্র (অসীম)-কে দেখি সেই ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে! আমি বলাইয়ের এই উদাসীনতায় তাকে কিছু তিরস্কার করলাম।

বলাই নির্বিকার। বলল, তাতে আর কি হয়েছে।

অবশেষে এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা শুনতে হল। শুনলাম "আমরা সর্বদা সব রকম জীবাণুর ভিতর বাস করছি, ওদের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই, কিন্তু কার পক্ষে কোন্ জীবাণু কখন ক্ষতিকর হয়ে উঠবে তা আমারা কেউ জানি না। অতএব অযথা দুশ্চিন্তা না ক'রে আর এক কাপ চা খাও।"

শিশু-অসীম মনের আনন্দে তখনও সে ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

বলাইয়ের দীর্ঘ বক্তৃতায় যুক্তির ভুল ছিল না কিছু। বেশ ভালই লাগল এ বিষয়ে নতুন দৃষ্টি লাভ করে, কিন্তু তবু যে যক্ষ্মারোগী সে ঘরে সমস্ত রাত লক্ষ লক্ষ জীবাণু ছড়িয়ে গেছে, সে ঘরে আপন শিশুসন্তানকে হামাগুড়ি দিতে দেখেও আপন মতে এতখানি নির্ভরশীল হওয়া কি সম্ভব? এ প্রশ্ন আমার মনে এসেছিল। কিন্তু বলাই সে কথা আমলই দিতে চায় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি তার বিশ্বাসের সঙ্গে তার ব্যবহারের কোনো বিরোধ নেই।

এখানে শুধু একটু কথা বলা দরকার যে যে-শিশুকে সেদিন যক্ষ্মা-জীবাণুর অরণ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে দেখে ভয় পেয়েছিলাম, সে কিছুকাল হল মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, এবং হয় তো ভবিষ্যতে কোনোদিন সে সেই যক্ষ্মারোগীর ছেলের স্পিউটাম নিয়ে মাইক্রোস্কোপে বসবে।

ভাগলপুরে থাকতে আর একটি রসিক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তখন। তাঁর নাম আশুদে। প্রায় তখন থেকেই অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর কৌতুক রচনা প'ড়ে আসছি নিয়মিত। আশুদের নাম ও পদবী তিনি নিজেই জুড়ে (ASUDE) হয়েছেন, বাংলাতে আমিও দুটি জুড়ে দিচ্ছি, এবং স্বীকার করছি কৌতুক সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি নেই! লেখাতে আজও তিনি সমান সরস এবং সজীব। তাঁর কাহিনীগুলি তাঁর নিজস্ব বর্ণনা ভঙ্গিতে না শুনলে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। বর্ণনাসহ কাহিনীগুলি সবই ত্রিমাত্রিক বা থার্ড ডাইমেনশন যুক্ত। তিনি যখন বলতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর চুল থেকে (মাথায় সামান্য যে ক'গাছা আছে তা থেকেই) পায়ের নখ পর্যন্ত সমগ্র দেহটা কৌতুক সৃষ্টিতে যোগ দেয়। তদুপরি তাঁর কণ্ঠ। বয়স ষাট থেকে নব্বুইয়ের মধ্যে ঠিক কোন্ বিন্দুতে এসে থেমেছে, চেহারা দেখে বোঝা যায় না।

তাঁর কণ্ঠ কৌতুকের আবহ সৃষ্টিতে অতুলনীয়। যেন এঁর জীবনটাই কৌতুক, অবশ্য যে জীবনটা চাঁদের আলোকিত দিকটির মতো সর্বদা আমাদের দিকে মেলে ধরেছেন। দুঃখের কথা তাঁর মুখে শুনিনি। সম্ভবতঃ তাঁর গলনালিতে এমন কোনো মুষল আছে যার আঘাতে নিষ্ক্রমণের পথে সকল দুঃখ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে কৌতুক হাস্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ভাগলপুরে আসার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় এবং যতবার সেখানে গিয়েছি, আশুদেহীন দিন একটিও কাটেনি। একসঙ্গে দুচার ঘণ্টা তিনি বিরামহীনভাবে আসর জমিয়ে রাখতে পারেন। ইংরেজী বাংলা দুইই সমান চলে, উপরন্তু হিন্দি তো আছেই; এ রকম উত্তেজক এবং মনোহর কৌতুক সৃষ্টি দুর্লভ। এ কথা আমি যন্ত্রে মেপে বলছি।

হিউমার মাপা কোনো যন্ত্র নেই, মনে হতে পারে অনেকের। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। যন্ত্র আছে।

দুজন জার্মান পদার্থবিদ্, গাইগার ও মুলার, এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, তা দিয়ে কোনো জিনিসে কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা আছে তা মাপা যায়। যন্ত্রটি 'গাইগার কাউণ্টার' নামে খ্যাত। হিউমার মাপেরও তেমনি একটি জীবন্ত যন্ত্র আমি ১৩৩৩ সালের শেষ দিকে আবিষ্কার করেছি। (গত মাসের বসুমতীতে আমি এই মানবিক যন্ত্র নিখিলচন্দ্র দাস সম্পর্কেই কিছু আভাস দিয়েছিলাম।)

এই যন্ত্র দিয়ে কলকাতা ব'সে আশুদের হিউমারও মাপা হয়েছে একাধিকবার। জানতে পারা গেছে এ যন্ত্রের উপর আশুদের হিউমারের প্রতিক্রিয়া এমন মারাত্মক যে তার কাছাকাছি এলে যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। যন্ত্রের কাঁটার বদলে সমগ্র যন্ত্রটি লাফাতে থাকে, এবং তা ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। জ্বর মাপা যন্ত্রের পারা যেমন অতি উত্তাপে যন্ত্রের মাথা ভেদ ক'রে বেরিয়ে যায়, এও ঠিক তেমনি।

আশুদের কুলকুচিবাবু, শুটার শশী প্রভৃতি গল্প সেই সময় শুনেছিলাম। সে সব গল্পের প্লট প্রকাশ ক'রে লাভ নেই, গানের সুরটাই যেখানে গানের পরিচয়, সেখানে গানের কথাগুলো আবৃত্তি ক'রে কিছুই বোঝানো যায় না। মনে রাখতে হবে আশুদে অভিনয় বিদ্যায় পাকা, এবং তিনি প্রসিদ্ধ ম্যাজিশিয়ান।

১৩৩৩ সালের কথা বলছিলাম। এর আগেও বলাইয়ের কাছে অনেকবার এসেছি, কিন্তু এবারের আসার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথম উদ্দেশ্য আগেই বলেছি—প্রাণরক্ষা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মানরক্ষা। বলাইয়ের রচনা শনিবারের চিঠিতে আমি ছাপব, এই আমার ইচ্ছা। তার কৌতুক সৃষ্টির ক্ষমতার সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলাম, তাই আমি জানতাম তাকে দিয়ে লেখাতে পারলে তা পাঠকদের বিশেষ উপভোগ্য হবে, আমিও তৃপ্ত হব।

কিন্তু বলাই অনেক দিন লেখা ছেড়ে দিয়েছে, তার ভিতরকার লেখকটি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ ক'রে মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে। সুদীর্ঘ আট বছর ধ'রে প'ড়ে আছে। অতএব এবারে ডাক্তারির পালা আমার। আমি ধীরে ধীরে মূর্ছিত লেখকটির গুপ্তাবাসে ঢুকে তার হৃদ্‌যন্ত্র মাসাজ করতে আরম্ভ করলাম। যন্ত্র চাঙ্গা হয়ে উঠল।

নির্ঝরের দ্বিতীয়বার স্বপ্নভঙ্গ! লেখা বেরোতে লাগল স্রোতের মতো।

শুধু আমার স্বাস্থ্য ভাল করা নয়, বলাই নিজেও তখন স্বাস্থ্যচর্চা করছিল প্রাতর্ভ্রমণ ক'রে। বলাইয়ের "প্রাতঃ" প্রায় ইংরেজী মতের প্রাতঃ। ভোর ৩৷-৪টেয় উঠে পড়ত। বলাই তার স্ত্রীসহ বেরোবে, আমারও এতে কল্যাণ হবে, শুনলাম। দু'তিন দিন গিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে। বেশ কিছুদূর হেঁটে আমরা ক্লান্ত হয়ে গিয়ে পৌঁছতাম বলাইয়ের বন্ধু শ্রীপাঁচুগোপাল সেনের বাড়িতে। তিনি ভাগলপুর জেলের বয়ন শিক্ষক ছিলেন। মার্কিন মুলুক থেকে তিনি বয়ন বিদ্যায় পক্কতা অর্জন ক'রে এসেছিলেন। প্রাণখোলা মানুষ। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী উষালতিকা সেন আতিথেয়তায় ছিলেন মুক্তহস্ত। তিনি যত্ন ক'রে উৎকৃষ্ট চা এবং তার অনুষঙ্গ রূপে মাখন টোস্ট ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে এনে আমাদের প্রলুব্ধ করতেন। বিলিতি ভঙ্গিতে খাঁটি ভারতীয় আতিথেয়তা, যেন তাঁরাই ধন্য হচ্ছেন এই রকম ভাব। কে ধন্য হচ্ছিল তা মনে-মনেই রয়ে গেল। শ্রীমতী উষালতিকা সেন বর্তমানে কলকাতা লেক টেরাসে অবস্থিত চিলড্রেনস কর্ণারের রেকট্রেস। এটি তাঁর সাধনার ক্ষেত্র।

ভাগলপুরে এঁদের কথা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে সম্ভবত এই কারণে যে আমি জীবনে ঐ একবারই মাত্র জেলে গিয়েছি। তা ভিন্ন এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে এঁরা যে মাখন খাইয়েছিলেন তার সঙ্গে কৌশলে কিছু নুনও খাইয়েছিলেন।

ভাগলপুরের জলকলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিজয়রত্ন বসু আর একটি মনোহর চরিত্র। তিনি আমাদের বিজয়দা। কোনো অতিথি
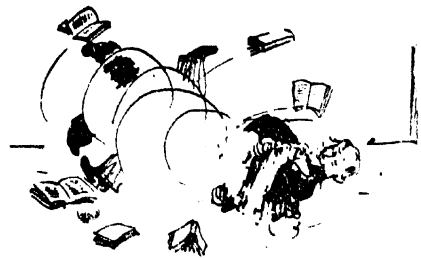
টমাস কারলাইল ও নিখিল দাস এক সঙ্গে গড়াতে লাগলেন

অভ্যাগত বা বন্ধু তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি তাঁকে কি ভাবে পরিচর্যা করবেন তার জন্য—আমাদের সকল পরিচিত মাত্রার অনেক বেশি অস্থির হয়ে ওঠেন। ভীষণ ব্যস্তসমস্ত ভাব। মনে হয় ব্যস্ত হয়ে ওঠাই তাঁর সর্বপ্রধান কাজ। বহুব্যস্ততার ফলে অনেক সময় ক্রিয়া লঘু হয় বহু আরম্ভের মতোই—কিন্তু বিজয়দার তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি ব্যস্ত হতে পারলেই খুশি। নিজ হাতে কাউকে কিছু করতে দেবেন না, করতে গেলে ছুটে গিয়ে নিজে ক'রে দেন। ভোলানাথের (বলাইয়ের ভাই, বরারী হাসপাতালের ডাক্তার) কাছে শুনেছি বিজয়দার এক অতিথি স্নানের সময় হলে বলেছিলেন, "এবারে স্নান ক'রে আসি" কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বিজয়দা অভ্যাসবশত হঠাৎ ব'লে ফেলেছিলেন—"না, না, আপনি কেন করবেন, আমি করছি।" এঁর সঙ্গে সবার বন্ধুত্ব। সর্বদা অন্যের জন্য কিছু ক'রে দেওয়ার সদিচ্ছা এঁর সমস্ত স্নায়ুতে ডাইনামো চালাচ্ছে।

বলাইয়ের অনেকগুলো লেখা নিয়ে ভাগলপুর থেকে বিদায় নিলাম। বনফুলের স্বাক্ষরে প্রথম লেখা বেরলো বৈশাখ (১৩৪০) সংখ্যায়, নাম "ভাদুড়ী ;" আরও একটি, নাম "আশাহতা," কিন্তু এটি অস্বাক্ষরিত। এর পর থেকে প্রতি মাসে স্বনামে বেনামে গদ্য এবং পদ্য দুইই বেরোতে লাগল। ১৩৪০ এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হল "জনপ্রিয় জনার্দন"। এ জাতীয় লেখাগুলি সবই ছোটগল্প বা নক্সা, ছন্দে লেখা।

জনার্দন একটি স্কুলের ছেলে। তার দুটি পৃথক জীবন—একটি পাবলিক ও অন্যটি প্রাইভেট। প্রাইভেটটি শেষ অধ্যায়ে উদ্ঘাটিত। সে পাড়ার সবার কাজে লাগে, তাকে না হলে কারোই চলে না। ছেলেটিও পরোপকারের জন্য সদাপ্রস্তুত। ইঙ্গিত পাবা মাত্র ছুটে যায়। কিন্তু তার বাড়িতে তার বাবার সঙ্গে তার সম্পর্কটি খুব মধুর নয়। শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে তার বাবা তার পিঠে ক্রমাগত জুতো মারছেন আর উত্তেজিত ভাবে নানা প্রশ্ন ক'রে চলেছেন—কত বার আর সে ম্যাট্রিক ফেল করবে, তার জুলফি এত লম্বা কেন, ইত্যাদি। অতঃপর নৈতিক শাসন চরমে উঠল, তিনি পুত্রের পশ্চাদ্দেশে লাথি মারতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোমর ভাঙার উদ্দেশ্যে শেষ লাথিটি উদ্যত করতেই জনার্দন স্কিপ ক'রে সার্কাসি কায়দায় তার বাবাকে স্যালিউট ক'রে পালিয়ে গেল।

এই হল জনার্দনের প্রাইভেট লাইফ।

মোট কাহিনীটির বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন ছন্দে লেখা, কৌতুক রসে থল থল করছে।

এ সম্পর্কে এতটা লেখার উদ্দেশ্য এই যে এই কাহিনীটি উপলক্ষ ক'রেই হিউমার মাপা মানবীর যন্ত্র আমি প্রথম আবিষ্কার করি। এমন জীবন্ত "হিউমার কাউণ্টার" পৃথিবীতে আর নেই।

অত্যন্ত গম্ভীর, কাঁচা পাকা চুল, কারলাইল ভক্ত নিখিলচন্দ্র দাস ছিলেন এক মার্কিন পুস্তক ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি।

১৩৪০ এর অগ্রহায়ণ মাস, ইংরেজী ১৯৩৩, নবেম্বর। অল্প পরিচিত নিখিল বাবু আমার কাছে এসেছিলেন একদিন। নানা বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল, কারলাইল সম্পর্কেই বেশি। প্রসঙ্গত বনফুলের কথা উঠল। জনপ্রিয় জনার্দন কবিতাটি আমার হাতে ছিল, সেটি তাঁকে পড়ে শোনালাম। শুনতে শুনতে তিনি অস্থির ভাবে হাসতে লাগলেন, এক একবার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলেন উত্তেজিত ভাবে। তার পর শেষ ক'টি লাইন পড়ার সময় নিজেকে আর কোনো দিকেই ধ'রে রাখতে পারলেন না, হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াতে লাগলেন।

পড়েছিলাম একটু থিয়েটারি ভঙ্গিতে।

আমার চোখে এ এক অভিনব দৃশ্য। যাঁকে কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত ঘোর দার্শনিক মনে ক'রে খুব ভেবে ভেবে কথা বলেছি, তাঁর এ কি মূর্তি! হাস্যরস যে কারো দেহে-মনে এমন ক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু দেখে শুনে হিউমারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা এবং আমার নিজের সম্পর্কে ভয় জাগল মনে।

নিখিলবাবু হাসছেন আর মেঝেতে গড়াচ্ছেন, আর সেই সঙ্গে গড়াচ্ছেন টমাস কারলাইল, আর গড়াচ্ছে তাঁর "সারটর রিসারটাস," "হীরোস অ্যাণ্ড হীরো ওয়রশিপ," "ফ্রেঞ্চ রিভোল্যুশন," "পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট" ইত্যাদির তত্ত্বে পুষ্ট একটি মগজ। স্বয়ং টমাস কারলাইলকে আমার সামনে হাসতে হাসতে গড়াতে দেখলে বিস্ময়ে যে পরিমাণ চমকে উঠতাম, তাঁর ভক্তকে দেখেও সেই পরিমাণ চমকিত হলাম।

আমিও গম্ভীর হয়ে থাকি নি।

পরদিন নিখিলবাবু আবার আমার কাছে এসেই বললেন, "ঐ কবিতাটার শেষ ক'টা লাইন আবার পড়ুন তো।" আমি সবটা কাহিনীই আবার পড়লাম।

কারলাইল পুনরায় ধূলিধূসরিত হলেন।

গত পঁচিশ বছরে নিখিলবাবুর উপর হিউমারের প্রতিক্রিয়ার একটি সুস্পষ্ট বিবর্তন ঘটেছে।

প্রথমে ছিল শুধু মাটিতে গড়ানো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হাসতে হাসতে পাশের লোককে মারা।

তৃতীয় পর্যায়ে টেবিল চেয়ার ওল্টানো এবং সম্ভব হলে ভেঙে ফেলা।

চতুর্থ পর্যায়ে নখ এবং দাঁতের ব্যবহার।

পঞ্চম পর্যায়ে নিজেকে আহত করা। কোনোটা বাদ দিয়ে নয় ; পরবর্তী পর্যায়গুলি সংযোজন করা হয়েছে প্রথমটির সঙ্গে।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে যখন শনিবারের চিঠির অফিস ছিল তখন থেকে এর আরম্ভ। বলা বাহুল্য নিখিলবাবুকে মেঝেতে গড়াতে দেখে আমিও খুব হেসেছিলাম। আমাকে হাসতে দেখলেন নিখিলবাবু পর পর দুদিন।

তৃতীয় দিনে আমার গায়ে হাত তুললেন।

দু' একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি তাঁর প্রতিক্রিয়া বিবর্তনের। ১৩৪০-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা শনিবারের চিঠি নতুন ঠিকানা ২৫।২ মোহনবাগান রো থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। জায়গাটি ট্রাম ও বাস লাইনের কাছে হওয়াতে সকালের দিকে এখানে বেশ বড় আড্ডা জমত। রবিবারে সে আড্ডা অনেক সময় ঘর ছাপিয়ে যেত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুশীলকুমার দে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল হোম, প্রমথনাথ বিশী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, কৃষ্ণধন দে,

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতিতে ছোট ঘরখানা ভরে উঠত। উৎসাহ ছত্রুরস্ত, সাহিত্য শিল্প রাজনীতি সমাজনীতি বেপরোয়া আলোচনা চলেছে। মোহিতলাল মজুমদার এলে তাঁর কাব্য পাঠে সবটা সময় কেটে যেত অনেক দিন। শৈলজানন্দের অনুচরস্থবল মুখোপাধ্যায় ভাল পড়তে পারত, কণ্ঠস্বরটা তার উপর দিয়েই যেত অনেক সময়। কীর্তি মিত্র লেনের বাড়ি থেকে আসা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কেও দেখা যেত কদাচিৎ। শনিবারে ব্রজেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এলে সে দিন বাক্ স্বাধীনতার অনুমতি চেয়ে নিতেন হাসতে হাসতে। বলতেন আজ শনিবার, অতএব—

আশুদে কলকাতা এলে আমার কাছে আসতেন, শনিবারের চিঠিতে তাঁর লেখা আমি ছেপেছি। আশুদে যেখানে উপস্থিত সেখানে একমাত্র বক্তা তিনিই, নতুন ধরনের আবহ সৃষ্টিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য স্বয়ং প্রকাশ। একদিন আশুদের সঙ্গে নিখিল বাবুর দেখা হয়ে গেল এখানে। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দশ সেকেণ্ডের মধ্যে এক বিপর্যয় কাণ্ড। পুরো দু' ঘণ্টা ধ'রে কি ধস্তাধস্তি! আশুদের হাসাবার ক্ষমতা এবং নিখিল বাবুর হাসবার ক্ষমতা এই দুইয়েরই পরিচয় দিয়েছি। সহজেই বোঝা উচিত এই দুজনের অপরিচয়ের বাধা দূর হতে এক মিনিটও লাগা উচিত নয়। লাগেও নি। মুহূর্তে পূর্ব-অপরিচয়ের বাধা ঘুচে উভয়ের মধ্যে একটা গভীর আত্মিক যোগাযোগ ঘটে গেল। যেন দুজনে কত কালের প্রাণের বন্ধু। দু'ঘণ্টা ধ'রে নিখিলবাবু নামক একটি দুর্দান্ত কন্ভালসিভ দেহপিণ্ডকে সামলাতে হল উপস্থিত সবার সমবেত চেষ্টায়। দুজন দুদিক থেকে তাঁর দুটি হাত টেনে বগলদাবা ক'রে ধ'রে রইলেন। দুটি প্রবলতর ম্যান-পাওয়ার আবদ্ধ হয়ে রইল এ কাজে। নিখিল বাবু অগত্যা দুটি পা ছুঁড়তে লাগলেন শূন্যে, দুখানি পা নয়, যেন উর্ধ্বলোকে দশগুণ বেগে দুটি সেলাইয়ের কলের ছুঁচ আকাশ সেলাই করছে।

থিয়েটারে ব'সে একদিন এই রকম হয়েছিল। প্রমথনাথ বিশীর ঋণং কৃত্বা হচ্ছিল, সমস্তক্ষণ প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী ও আমি তাঁর দুখানা হাত দুধার থেকে বগলদাবা করে টেনে ধরে রেখেছিলাম। কিন্তু পা দুখানাকে ঠেকাতে পারি নি। সে সময় মনে হয়েছিল যেন একটা শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ব্যাটারি তাঁর কোমরে বাঁধা আছে মাদুলির মতো, সেই ব্যাটারির দুদিক থেকে তার বেরিয়ে মোজার নিচে দিয়ে জুতোর মধ্যে ঢুকেছে, দুখানা হাত চেপে ধরলে তা স্বয়ংক্রিয় ভাবে 'সুইচ-অন' হয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্যালভানি আর ব্যাঙের পায়ের কথা মনে পড়ে যায়।

ছোট একখানা অস্টিন গাড়ি ছিল নিখিলবাবুর। তিনি নিজেই চালাতেন। সেই গাড়িতে, চলতি অবস্থায় স্টিয়ারিং ছেড়ে পাশে-বসা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ডান হাতখানা হঠাৎ তুলে নিয়ে দুহাতে ধরে, যেমন ক'রে লোকে ভুট্টা খায়, তেমনি ক'রে কামড়াতে লাগলেন। কারণ আমি পিছনের আসনে বসে সামান্য একটি হাসির কথা বলেছিলাম। স্টিয়ারিং ছেড়ে চলতি গাড়িতে হাসা ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়ার বিপদ বোধ করি তিনি পরে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাই একদিন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী (ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাঃ প্রকাশিত "ইওর হেলথ" মাসিকের সহকারী সম্পাদক) বসেছিল নিখিলবাবুর পাশে। আমি পিছনে। আমি কদাচিৎ তাঁর পাশে বসেছি। বসলেও কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করি। কারলাইলের কথায় এখন আর কাজ হয় না, কারলাইলকে তিনি নিজেই ভেঙে ধুলোয় ছড়িয়েছেন (ইমারসনকে ধরব কি না ভাবছি।)।

আমরা তিনজন চলছিলাম চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধ'রে বাগবাজারের দিকে। এমন সময় আমার কোনো একটি কথায় বারুদে আগুন জ্বলে উঠল। হাসতে হাসতে নিখিলবাবু পথের একপাশে গিয়ে গাড়ি থামালেন। সুধাংশু আতঙ্কিত হয়ে তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল ফুটপাথে। নিখিলবাবু লাফিয়ে পড়ে হাস্যরত অবস্থাতেই তাকে অনুসরণ করলেন এবং তাকে গিয়ে মারলেন। তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গাড়িতে এসে উঠলেন, সুধাংশু তাঁকে অনুসরণ করল। গাড়ি চলতে লাগল গম্ভীরভাবে। সেফটি ভাল্‌ভ ঠেলে অতিরিক্ত বাষ্প বেরিয়ে গেছে, অতএব কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। সমস্ত ঘটনাটি ঘটতে মাত্র এক মিনিট।

এ রকম বহু ঘটনা আছে।

ওয়েলিংটন স্কয়ারে নলিনীকান্ত সরকার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে নিখিলবাবুর দেখা হয়ে গেল। নিখিলবাবু গাড়ি থেকে নেমে আলাপ করতে লাগলেন ওঁদের সঙ্গে। পাশে ট্রাম দাঁড়িয়ে। ট্রাম ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা দুজনে একটি হাসির কথা ব'লে চলতি ট্রামে উঠে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন নিখিলবাবু একাই হাসছেন এবং বাগানের রেলিঙের উপর ঘুসি চালিয়ে হাত ক্ষত বিক্ষত করছেন।

ঘটনাস্থল অল ইণ্ডিয়া রেডিও। গত যুদ্ধের আগের ঘটনা আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অজিত চট্টোপাধ্যায় ক্যারিকেচারে পাকা। অজিত পরিচিত বন্ধুদের চালচলন নকল ক'রে দেখাচ্ছিল। তার মধ্যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ক্যারিকেচার খুবই ভাল হয়েছিল। নিখিল বাবু বিগলিত। তিনি ভীষণ হাসতে আরম্ভ করেছিলেন প্রথম থেকেই, তারপর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ক্যারিকেচার একটুখানি দেখেই তিনি এমন উদ্দাম হয়ে উঠলেন যে তাঁকে আর ঠেকানো গেল না। তিনি অজিতের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার পর সে কি কাণ্ড! অজিতকে মেরে প্রায় শেষ ক'রে ফেললেন। অজিত আমার

'ঋণং কৃত্বা' অভিনয়ে প্রফুল্ল লাহিড়ী ও আমি দু'দিক থেকে নিখিল দাসকে টেনে ধ'রে রাখলাম

ভাঁজ ঠিক করতে ব্যস্ত, নিখিলবাবু হাঁফাচ্ছেন। ঘেমে উঠেছেন। তার পর কপালের ঘাম মুছে হাঁফাতে হাঁফাতেই অজিতকে বললেন, "নৃপেনেরটা আবার দেখব।"

অজিত ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে।

আর একটি মাত্র ঘটনা বলি। একদিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উপর আক্রমণটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ব'লে নিখিলবাবুর নিজের ধারণা হয়েছিল। ধারণাটা হয়েছিল রাত বারোটায়, বিছানায় শুয়ে। তাঁর বিবেক জেগে উঠল, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। বিবেক সকালবেলা অবধি একটানা জেগে রইল। নিখিলবাবুও জাগলেন। বিবেকের নির্দেশে তিনি গিয়ে হাজির হলেন রামধন মিত্রের গলিতে। আহা, বন্ধু লোক, যদি কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে, অতএব একবার তাঁকে দেখা উচিত।

গিয়ে দেখলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে। মাথায় হাতে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অতি করুণভাবে ব'সে আছেন। "কিসের ব্যাণ্ডেজ ?"—"আপনারই কীর্তি।"

নিখিলবাবু বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় দেখবেন ভাবতে পারেননি। তাঁরই মারার ফলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়েছে এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে নিখিলবাবুর বারুদে আবার আগুন জ্বলে উঠল, তিনি ঐ ব্যাণ্ডেজের উপর ঘুঁসি চালাতে লাগলেন।

নিখিলবাবুর বয়স তখন পঞ্চাশ কি ষাট আমার জানা ছিল না। আমি শুধু তাঁর বর্তমান বয়সটি জানি—সত্তর।

এ রকম চরিত্র আর দ্বিতীয় জানি না।

হিউমার মাপা এই জীবন্ত যন্ত্রটি আজও অক্ষত। এঁর সম্পর্কে আগুনে একবার অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন। লেখাটির নাম ছিল "দি টেরিব্‌ল্ মিষ্টার দাস।"— বাইশ তেইশ বছর আগে। আমি একাধিকবার লিখেছি তাঁর সম্পর্কে।

স্মৃতিচিত্রণে, আমি যে সব ছবি একটু দূর থেকে দেখেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই ফিরে এঁকে চলেছি। আমাকেও আমি সেই ভাবেই দেখার চেষ্টা করেছি বেশির ভাগ জায়গায়। সবই প্রধানত বস্তুগত চিত্র, আত্মগত চিত্র অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ না করলে ফোটাই নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমসাময়িক কালের একটি স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহুমুখী চেষ্টাপ্রসূত একটা নবজীবনের স্রোত। তা আমার মনের মধ্যেই নিভৃতে ক্রিয়া করে চলেছে। দেশ-নেতাদের দুর্লভ সাহসিকতা মনোবল এবং ক্লান্তিহীন সংগ্রামের স্পর্শ অনুভব করেছি সমস্ত মনে,

১৯৩২ সালে নিউ এম্পায়ারে 'নবীন' অভিনয়

মনকে তা অনেক উঁচুতে তুলে রেখেছে। দৃশ্য শক্তির অদৃশ্য ক্রিয়া, তা রাজনীতির সঙ্গে যত বিচ্ছেদই থাক।

রাজনীতি সম্পর্কে তখন আবেগ-প্রবণদের কিছু বলতে যাওয়া মানেই দৈহিক লড়াইতে নেমে পড়তে বাধ্য হওয়া। তাই সাহিত্য চনাতেও পদে পদে আইন বাঁচিয়ে চলতে হবে। সে এক জঘন্য অবস্থা। আমার পক্ষে রাজনৈতিক হাঙ্গামার মধ্যে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, যাবার কোন উপায়ই ছিল না। এবং তা প্রধানত: আমার স্বাস্থ্যের জন্য, অংশত আমার মানসিক গঠনের জন্য।

কিন্তু এ বিষয়ে নিজের উপর এতটা বিশ্বাস সত্ত্বেও উপাসনাতে প্রকাশিত আমার সামান্য একটি গল্পের জন্য পুলিস থেকে সম্পাদক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের নামে একটি সতর্ক বাণী এসেছিল।

মোহনবাগান রো থেকে বোধ হয় সেই কালটা একটু দূরে আসা যাক। শনিবারের চিঠিতে প্রবেশের আগে কিরণকুমারই আমাকে উপাসনার লেখক রূপে হাজিরা দিতে পুনঃপুনঃ চাপ দিয়েছে। কিরণের সাহিত্যবোধ তীক্ষ্ণ, এবং সাহিত্যরুচি বুদ্ধিবৃত্তের রুচি। গোঁড়ামি বর্জিত, কিন্তু মান অতি কঠোর। এ কারণে কিরণের মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, এবং এখনও করি। থার্ড ইয়ারে পড়তে সাধারণ পপুলার জিনিস মাত্রেই তার ভাষায় ছিল ট্র্যাশ। কুড়ি বছর পরে সে ভাষার বদল হয়েছিল, লেখ্য থেকে আক্রমণ সরে গিয়েছিল ভোক্তার দিকে। অতি সাধারণ সাহিত্য বা শিল্প কবে যারা গদগদ হয়, কিরণের ভাষায় তাদের এটি মন্দ রুচির পরিচয়, bad taste।

কিরণের উৎসাহেই আমি উপাসনাতে একটি গল্প লিখেছিলাম, গল্পটির নাম এখন আমার মনে নেই। কিন্তু তার মূল চেহারাটি মনে আছে। একটি মেয়ে ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী হয়ে সেই পথেই চলছিল অন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে। নায়ক তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনল। তার ব্যক্তিত্ব ছিল প্রবল। মেয়েটি ভিন্ন পথে চলতে থাকে। তারপর বহুদিন পরে নায়ক জানতে পারে সে মারাত্মক অসুখে ভুগছে। তখন নায়ক আত্মগতভাবে শুধু চিন্তা করেছিল, এর জন্য কি তবে সেই দায়ী ? তাকে তার নিজের পথ থেকে ফিরিয়ে না আনলে কি ক্ষতি ছিল ? হয়তো এই বিপদ তার ঘটত না, মোট কথা দায়িত্বটা তার নিজেরই থাকত।

এ গল্পে যা কিছু ঘটেছে তা গল্পের নীতি রক্ষা করেই ঘটেছে, কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে গল্পের নীতি মিলবে কেন ? এই গল্পেই ব্রিটিশরাজ বারুদের গন্ধ পেয়েছিলেন।

কিরণের কথায় আর একটি রচনা দিই উপাসনায়। সে আমার ১৯৩২ সালে নিউ এম্পায়ারে দেখা রবীন্দ্রনাথ প্রযোজিত নবীন (বসন্ত) নামক ঋতুনাট্য সম্পর্কে রচনা।

এই অভিনয়টি পর পর তিন দিন দেখেছিলাম অতুলানন্দের সঙ্গে। এর আগে কোনো ঋতুনাট্যের অভিনয় আমি দেখিনি, এই প্রথম, অতএব কি পরিমাণ ভাল লেগেছিল তা বলা বাহুল্য মাত্র। একদিন জ্ঞানরঞ্জন রাউতকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম মঞ্চের ফোটো নেবার জন্য। ক্যামেরা ট্রাইপডে দাঁড় করিয়ে, দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে একখানা ফোটো তোলা হয়েছিল। সেই ফোটোগ্রাফের সঙ্গেই আমার রচনাটি ছাপা হয়। বাঁ দিকে কবি বসে আছেন বই হাতে নিয়ে। তাঁর বিপরীত দিকে গায়ক-গায়িকারা বসেছেন। মাঝখানটা নৃত্যের জন্য ফাঁকা।

অভিনয় দেখে আমার মনে যে ছবিটি জেগেছিল তাই

লিখেছিলাম। এই অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে আমি দুটি সমান্তরাল ছবি দেখেছিলাম। শুনেছি মাতালেরা অনেক সময় একটিকে দুটি দেখে, আমিও তাই দেখেছিলাম, যদিও তার মূলে কোনো মত্ততা ছিল না। আমি উপাসনার সেই প্রবন্ধে যা লিখেছিলাম, তার মূল কথাটা ছিল এই যে—আমি এর একটি ছবিতে দেখলাম নৃত্যগীত ও ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে বসন্তকে যে কথা বলা হল, যা বসন্তকে যে বন্দনা করা হল, সে কথা, সে বন্দনা, বসন্ত ঋতুর প্রতি কবির কথা, কবির বন্দনা। আমি ঐ একই সঙ্গে আর একটি ছবি দেখলাম তাতে দেখা গেল সমস্ত নৃত্যগীতের ভিতর দিয়ে কবিকেই আমরা বন্দনা করছি। কবি যেন দুটি ভূমিকা অভিনয় করছেন এ নাটকে। একবার তাঁর সঙ্গে আমরা বসন্ত ঋতুকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, আমাদের মনের কথা সব বলছি, আর একবার তিনি নিজে বসন্তের প্রতীক রূপে আমাদের বন্দনার মধ্যে দিয়ে আমাদের চোখে নিজের ছবিটি দেখে নিচ্ছেন। কবির সম্পূর্ণ নিজের কথাও এর কয়েকটি গানে আছে। তাই আমার চোখে এ অভিনয়ের যে দুটি রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তা আমার অনুভূতিতে একান্ত সত্য ছিল।

"এখনো বনের গান
বন্ধু হয়নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রতিই এ আবেদন, আমাদের মনে মনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, অর্থাৎ আমরা যেন কবিকেই এ কথা বলছি। তার কারণ কবির নিজের কথায়, ফাল্গুনের সমস্ত সত্তায়, কবি যে দান রেখে গেলেন, তার কথা শুনলাম এই 'নবীন' নাটকেই। ফাল্গুনের হাওয়ায় হাওয়ায় তিনি যে তাঁর আপন হারা বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ দান ক'রে গেলেন, তার অশোকে কিংশুকে তাঁর অকারণ সুখের মুহূর্তের যে রঙ লাগল, তার ঝাউয়ের দোলায় তাঁর দুঃখ রাতের যে গান মর্মরিত, সেই ফাগুনকে সেদিন প্রত্যক্ষ করলাম। 'খেলা ভাঙার খেলা'র মধ্যে দিয়ে দেখলাম কবির নিজেরই বিদায়-বেদনার আভাস। কবি বসন্তের মধ্যে নিজেরই জয়ের ছবি দেখছেন, "বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা," তিনি উপলব্ধি করলেন—

পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছে যে ঐ কেঁদে মরে—
মরণ এবার আনল আমার বরণডালা।
···কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা
উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা
আরাম বলে, 'এলো আমার যাবার পালা।'

এ তো কবির নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া। কিন্তু যখন পথের গানে শুনছিলাম—

"মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার
করুণ রঙিন পথে"

তখন সে পথে কবির নিজেরই আসা এবং স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাওয়ার বেদনার্ত ছবিখানি চোখের সম্মুখে ফুটে উঠেছিল। তার পর সর্বশেষ—সমস্ত আকাশে বাতাসে রাঙা আবির ছড়িয়ে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলা ঝড়ের মধ্যে শেষ বিদায় গ্রহণ। কিন্তু লুপ্তি নয়, বড় মুক্তির আশ্বাস ভরা সে গান। তার মধ্যে দেখলাম কবির নিজের জীবন-দর্শন—

"সব আশা-জাল যায় যে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে"···

যে তিনটি দিন আমার এই অভিনয় দেখার সৌভাগ্য ঘটেছিল, তার মধ্যেকার দুটি দিনে দুটি ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে একটি খুব তুচ্ছ হলেও আমার কাছে খুব মজার মনে হয়েছিল, এবং সম্ভবত কবি সেটি বেশি উপভোগ করেছিলেন। কবি এক জায়গায় আবৃত্তি করছেন :

"উৎসবের সোনার কাঠি তোমাকে ছুঁয়েছে, চোখ খুলেছে। এইবার সময় হল চারদিক দেখে নেবার। আজ দেখতে পাবে, ঐ শিশু হয়ে এসেছে চির নবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। তার দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ঐ সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। ঐ তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মর্মরিত হয়ে উঠল প্রাণ গীতিকার প্রথম ধুয়োটি।"

এই আবৃত্তি শেষ হলেই "ওরা অকারণে চঞ্চল" এই গানের সঙ্গে ছোট একটি মেয়ে (নন্দিনী ?) নাচবে। কিন্তু একদিন দেখলাম, সম্ভবত প্রথম দিন, মেয়েটি নাচবার জন্য ভীষণ ছটফট করছে, কবির আবৃত্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত তার ধৈর্য থাকছে না, সে বার বার চঞ্চল হয়ে নাচ আরম্ভ করতে যায়, আর কবি তার জামা টেনে ধরে ঠেকান। গানের স্পিরিটের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল! ওরা অকারণে চঞ্চল!

অভিনয়ের দিক দিয়ে এটি আয়রনি অবশ্যই, কেন না যারা অকারণে চঞ্চল, তাদের দিয়ে কি চঞ্চলতার অভিনয় করানো যায়? অভিনয়ের ধার ধারে না তারা।

আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথকে এতখানি উত্তেজিত অবস্থায় আর কখনো দেখিনি। উত্তেজিত, কিন্তু তবু সুজনতার চরম।

ঘটনাটি এই : অভিনয়ের সময় কোনো কোনো নৃত্য দৃশ্য শেষ হতে না হতে কখনো বা চলতে চলতেই কতকগুলি দর্শক খুব উৎসাহ দেওয়া হবে অনুমান ক'রে ভীষণ হাততালি দিচ্ছিল। দৃশ্য শেষ বললাম বটে কিন্তু সেটি বিরাম নয়, সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী আবৃত্তি এবং নৃত্য ও গীত। কিন্তু মাঝখানে দীর্ঘমেয়াদি হাততালিতে পরবর্তী অংশ আরম্ভ করায় বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। কোনো কোনো নৃত্যে হাততালির বহরটা হচ্ছিল অত্যন্ত বেশি। রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে ব'সে

বঙ্গশ্রী অফিসে স্বতঃ সম্মিলিত প্রাত্যহিক সংস্কৃতি বৈঠক

সহ্য করছিলেন এই উৎপাত, কিন্তু পারলেন না। অভিনয়ের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভের আগে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে জোড় হাতে এসে মঞ্চে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, "আপনারা দয়া ক'রে মাঝখানে হাততালি দেবেন না। অভিনয় চলতে চলতে হাততালি দেয় লোকে বিদ্রূপ করার জন্য। আর যদি ভাল লেগে হাততালি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন, তবে অভিনয় শেষ হলে দেবেন। এই ঋতুনাট্যটির মাঝখানের কোনো অংশ ভাল বা মন্দ নয়, কারণ এটি একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ জিনিস, খণ্ডখণ্ড পৃথক দৃশ্য নয়। অতএব আপনাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, আপনারা মাঝখানে হাততালি দিয়ে এর অখণ্ডতা নষ্ট করবেন না।"—ব'লেই দ্রুত পর্দার আড়ালে চ'লে গেলেন।

দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল।

বলবার সময় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, বিচলিত হওয়ার ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। হাত দু'খানা জোড় ছিল যতক্ষণ বলছিলেন, কিন্তু তবু তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা আদেশের সুর ছিল যাতে হাততালি-দেওয়া দর্শকদের মাথা লজ্জার নত হয়েছিল। পরবর্তী অংশে আর কেউ হাততালি দেয় নি।—দর্শকদের দিকের নীরবতায় একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

তখনকার দর্শকদের অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী, এবং সুখের বিষয় কবির তিরস্কার বাণীতে তারা লজ্জা পেয়েছিল আপন ভুল বুঝতে পেরে। আজকের দিনে এ রকম হ'লে তার কি পরিণাম হ'ত তা অনুমান করা কঠিন নয়।

১৯৩২ থেকে ১৯৫৭ সাল—সিকি শতাব্দীর দৈর্ঘ্য। এখন কি প্রেক্ষাগৃহে হাততালি বন্ধ হয়েছে?—জানি না, অনেক কাল এ থেকে দূরে আছি। তবে আজকাল সংস্কৃতি বৈঠক বেড়েছে, কিন্তু অশিষ্টতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংস্কৃতি হয় তো অক্ষম, কিংবা অশিষ্টতা দিয়ে সংস্কৃতিকে থামানো যাচ্ছে না, তাই দুইই অবাধে বেড়ে চলেছে।

থিয়েটারের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মুখে শুনেছি কোনো কোনো শিল্পী অভিনয়ের সময় হাততালির অপেক্ষা করেন। এমন কি পরিচিত লোকদের প্রেক্ষাগৃহে বসিয়ে দেন হাততালি দেওয়ার জন্য। এ বিষয়ে আমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবে যে কারণেই হোক, এই অভ্যাসের ফলে, অর্থাৎ নাটক বা সিনেমা, সব জায়গাতেই বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে হাততালি দেওয়ার অভ্যাসের ফলে, সব আর্টেরই যে একটি অখণ্ড রূপ আছে তা দেখার ক্ষমতা দর্শকদের নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য এখন বিশেষ ক'রে সিনেমায় দু' চারটে দৃশ্য ভাল থাকলেই যথেষ্ট মনে করা হয়। এটি প্রত্যক্ষ জানা ব্যাপার। সম্ভবত একমাত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই অধঃপতন এখনও হয়নি। দশ মিনিটের গানে সাত মিনিট যদি গলা বেসুরো বাজে, তাল ভুল হয়, তবু তিন মিনিট সুর ও তাল ঠিক রাখতে পারলেই বাহবা পাওয়া যায় না। কেউ বলে না যে খানিকটা বেসুরো বেতালা গাওয়া হলেও মোটের উপর গানটি খুব ভাল হয়েছে। তবে গানের মাঝখানেও হাততালি দেওয়া অভ্যাস হলে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সহনশীলতার কথায় আর একটি ঘটনা মনে পড়ল। ১৯৩০-৩১এর মধ্যে কোনো সময়। এক কবির বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। আমি কিছুক্ষণ ছিলাম সেখানে। পর্দার আড়াল থেকে একটি মেয়ের গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা শুরু হল। সে কণ্ঠ গানের উপযোগী আদৌ নয়, ভাঙা এবং বেসুরো। তদুপরি সে যে গানটি গাইল তা প্রচলিত একটি অতি সাধারণ রেকর্ডের গান, কার রচনা জানি না। প্রায় দশ মিনিট চলল সে গান, থামতেই চায় না।

এতক্ষণ ধ'রে এই অভ্যর্থনা তিনি বেশ ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করলেন। গান তাঁর কানে প্রবেশ করছিল কি না বোঝা যায় নি। অবশেষে গান শেষ হল।

তারপর নিমন্ত্রণকারী তাঁর ছেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছেলের বয়স পনেরো-ষোল। বললেন, "এ আপনার কবিতা বেশ পছন্দ করে।"—রবীন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে (এবং স্মিতভাবেও) কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন। সংবাদটি শুনে খুব প্রীত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তারপর পুত্রের পিতা বললেন, "এর হাতের লেখা ঠিক আপনার লেখার মতো।"

রবীন্দ্রনাথ এ কথা শুনে নিশ্চয় অভিভূত হলেন। এবং নিতান্তই দায়ে প'ড়ে এ নিয়ে কিছু রসিকতাও করলেন। বললেন, "অনেকেরই লেখা ঠিক আমার মতো—দেখেছি আমি। কিন্তু ভয়ের কথা, কবে কে হ্যাণ্ডনোট বের করবে কে জানে, বলবে, রবি ঠাকুর আমার কাছে দশ হাজার টাকা ধারেন।"

সেদিন আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কিরণকুমার রায় ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আরও দু একজন কে ছিলেন এখন আর মনে পড়ে না।

১৯৩৩ সাল থেকে ধর্মতলা ষ্ট্রীটে দুপুরবেলা থেকে রাত ৮টা ৯টা পর্যন্ত যে আড্ডা চলত তার তুলনা হয় না। সমসাময়িক প্রায় সকল লেখক শিল্পী সাংবাদিকদের ভিড় ছিল সেখানে। একখানা পূর্ণাঙ্গ নতুন কাগজে নিজের কল্পনা রূপ দিতে পারবেন, খরচের জন্য ভাবতে হবে না, এতে সজনীকান্তের উৎসাহও বেড়ে গিয়েছিল খুব।

আজকাল বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে যেখানে সেখানে সাংস্কৃতিক বৈঠক বা সভা বসে। তা সবই সভা বা বৈঠকের প্রথাগত অনুষ্ঠান। লোক ডেকে আনতে হয় সে সব বৈঠকে। কিন্তু বঙ্গশ্রীর প্রশস্ত ঘরে যে বৈঠক ও উপবৈঠক বসত প্রতিদিন তার মতো স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক বৈঠক আজকের যুগে কল্পনারও বাইরে। সে বৈঠক কখনো সর্বজনীন, কখনো তিন চারটি উপদলে বিভক্ত। একদিকে নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তুমুল তর্কে মত্ত, এক কোণে প্রমথনাথ বিশী ও চিত্রকর অরবিন্দ দত্ত পরস্পর কথার ছুরি চালাচ্ছে, আর এক কোণে রামচন্দ্র অধিকারী কাব্য আবৃত্তি করছেন, অন্য এক জায়গায় সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস কারো হস্তরেখা বিচার করছেন। কখনো সে ঘরে কুড়ি বাইশজন কুড়ি বাইশ রকমের আলোচনা চালাচ্ছেন এক সঙ্গে বসে।

সে বৈঠক আর নেই। যাঁরা আসতেন তাঁরাও অনেকে নেই। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, মোহিতলাল মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশ বিশ্বাস এঁরা আর বেঁচে নেই—অবশিষ্টদের মধ্যেও অনেকেই এখন ম্রিয়মাণ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীযদুনাথ রায়

[বর্ষীয়ান শিল্পপতি, দানব্রতী, জনসেবী]

বিশ্ববন্দিতা বঙ্গজননীর পূর্ব অংশ অধিকার করে আছে বিক্রমপুর। অসংখ্য শক্তিমান সন্তানের উপহার দিয়ে সে ভরিয়ে তুলেছে বাঙলা দেশকে অক্লান্ত গতিতে। মাতৃভূমির নামের সঙ্গে তাৎপর্য রেখে তাঁরা এমন ভাবে স্বাক্ষর রেখে গেলেন পৃথিবীর পান্থশালার হিসাবের খাতায়, যা থেকে প্রমাণিত হল যে বিক্রমে তাঁরাও আদিত্যের সঙ্গেই তুলনীয়। বিক্রমপুরের এই কালজয়ী সন্তানদের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করি উদ্ভিদবিজ্ঞার নবকপায়নের জনক স্যার জগদীশচন্দ্র, কলিযুগের কর্ণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, চিকিৎসাবিদ্যায় ধুরন্ধর সূর্যকুমার ওরফে গুডিভ চক্রবর্তী, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের স্বনামধন্য পুরুষ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, সরোজিনী নাইডুর বাবা বিখ্যাত চিকিৎসক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী সুপণ্ডিত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েক জনের নাম।

পিছিয়ে যাই সোয়া শ' থেকে দেড় শ' বছরের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা। আশায় আলোয় ভরপুর। প্রতিভা, মনীষা ও পাণ্ডিত্যের মিছিল চলছে পুরোদমে, মনুষ্যত্বশালী সন্তানরা প্রাণ পর্যন্ত পণ করে ঘুমন্ত দেশকে জাগানোর চেষ্টায় হয়েছেন ব্রতী। সেই সময়কার বাঙলা। বিক্রমপুরের আওতাধীনে ভাগ্যকুল গ্রাম। রায়েরা সেখানকার বাসিন্দা। শক্তিমান, কর্মী পুরুষ। পুরুষানুক্রমে তাঁদের বাস, গ্রামের তাঁরা প্রাণ। বিধাতাপুরুষ অন্য ধাতু দিয়ে গড়লেন গঙ্গাপ্রসাদ রায়কে, গতানুগতিক জীবনধারা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারল না। চাই বৈচিত্র্য, চাই পরিবর্তন, চাই আরও উন্নতি। নব নব সম্ভাবনার মুঠো মুঠো প্রতিশ্রুতিতে তখন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে কলকাতা শহর। পথে পথে ছড়ানো রয়েছে প্রতিষ্ঠার বীজ, জীবনের মাটিতে তা বপন করলেই হয়। অবাঙালী বৈশ্যের দল তখনও বাঙালীর উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে তাদের বিষদন্ত বাড়িয়ে দেয়নি বাঙলার মধুপাত্রের উদ্দেশে। বাঙলা তখন সোনার বাঙলা। কোম্পানীর শহর কলকেতা হাতছানি দিল গঙ্গাপ্রসাদকে। ভাগ্যদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ যাত্রা করলেন নতুন জীবনের উদ্দেশে, প্রাণকে বিপন্ন করে সুন্দরবনের উপর দিয়ে তিনি এলেন কলকাতায়। উত্তরে শোভাবাজার, হাটখোলা, কুমোরটুলি অঞ্চলে করলেন বসতি স্থাপন। নিজের কল্পনাকে বাস্তবে করলেন রূপায়িত বাণিজ্যের মাধ্যমে। চাল ও লবণের ব্যবসায়ে। নগরজীবনে সম্ভ্রান্তপুরুষ বলে গণ্য হলেন ভাগ্যান্বেষী গঙ্গাপ্রসাদ রায়। তাঁর পুত্র প্রেমচাঁদ রায়। পৌত্র রাজা শ্রীনাথ, রাজা জানকীনাথ ও রায়বাহাদুর সীতানাথ রায়। প্রপৌত্রদের মধ্যে বিশিষ্ট বাণিজ্যজীবী কুমার প্রমথনাথ ও ডোমিনিকান গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রতিভূ (Consul) কুমার রমেন্দ্রনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। গঙ্গাপ্রসাদের আরও একজন প্রপৌত্রের নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়। তিনি শ্রীযদুনাথ রায়। ব্যবসায় জগতে স্বনামধন্য পুরুষ। বিদ্যাবিস্তারেও অবদান যাঁর কম নয়।

রায়বাহাদুর সীতানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনাথ ১২৭৯ সালের ১৬ই শ্রাবণ (১৮৭২ খৃষ্টাব্দ) ভাগ্যকুলে পৈতৃক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা প্রথম শুরু হ'ল গ্রাম্য পাঠশালায়, পরে কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন হিন্দু স্কুলের ছাত্ররূপে। প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন, হঠাৎ দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পতিত হওয়ায় বাধ্য হলেন বন্ধ করতে কলেজী অধ্যয়ন। কলেজী পাঠ সমাপ্ত করেই যদুনাথ নিজেকে নিয়োজিত করলেন পিতৃ-পুরুষের ব্যবসায় কর্মে। আজ পর্যন্ত বাঙলার ব্যবসায় জগতে যদুনাথের আসন অটল। ইষ্টবেঙ্গল রিভার সার্ভিস, প্রেমচাঁদ জুট মিলস ও ইউনাইটেড ইনডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের ইতিহাসের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে যদুনাথের সংগঠনী এবং পরিচালন প্রতিভার প্রতিচ্ছবি। ভারতবর্ষে জাহাজ তৈরীর উন্নতিকল্পে সকল প্রদেশের আগ্রহী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হ'ল মারকেণ্টাইল মেরিন কমিটি (১৯২১-২২), বাঙলা দেশ থেকে একমাত্র যদুনাথ সভ্যরূপে নির্বাচিত হন ঐ কমিটিতে। এঁরা দু'বছর ধরে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, দিল্লী, রেঙ্গুন, প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ শিল্পের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। প্রেমচাঁদ জুট মিল স্থাপনের প্রাক্কালে পাটকল, তার সংগঠন, তার পরিচালনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের উদ্দেশে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যদুনাথ ইয়োরোপ যাত্রা করেন, সেখানে পাটকল ছাড়া জাহাজ নির্মাণ কৌশল, বিদ্যুতের কারখানা, লোহার প্লেট তৈরীর কারখানা সমূহও পরিদর্শন করেন। এই সময়ে যদুনাথকে তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন লণ্ডনে তৎকালীন ভারতীয় হাই কমিশনার আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী প্রথম ভারতীয় (১৮৯৭) লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টসএর সহ-সভাপতি স্বর্গীয় ডাঃ স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জেনেভায় অনুষ্ঠিত শ্রমিক-সম্মেলনে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করেন যদুনাথ (১৯২৯), লণ্ডন ও জেনেভা ছাড়া জার্মানী, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলিও প্রত্যক্ষ করেছেন যদুনাথ। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে অনুজ শ্রীপ্রিয়নাথ রায়ের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করলেন ইউনাইটেড ইনডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক, ক্রমে নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'ল যার শাখা-কার্যালয়। প্রভিন্সিয়াল য়্যাণ্ড সেন্ট্রাল ইনকাম-ট্যাক্স কমিটি ও ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত (১৯৩০ খৃঃ) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এনকোয়ারী

কমিটির সভ্যপদ, বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্সের সচিবপদ, ট্রাইটন ইনসিওরেন্স কোম্পানী ন্যাশানাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (আট বছরের জন্য) পরিচালকপদও যদুনাথ কর্তৃক অলঙ্কৃত। এ ছাড়া তিনি দু' বছরের জন্য কলকাতার বন্দরগুলির কমিশনাররূপে ও তিরিশ বছর ধ'রে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটরূপে দেশবাসীকে সেবা করে এসেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে যদুনাথ অত্যন্ত পরোপকারী বন্ধুবৎসল ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। দুর্ভিক্ষের সময় দিনের পর দিন ধ'রে বহু দুঃস্থ ব্যক্তিকে অকাতরে অন্ন ও অর্থ দান করে তাদের প্রভূত উপকার করেছেন। তাছাড়া গ্রামে এবং শহরেও বহু বিদ্যালয়, আরোগ্যালয়, চিকিৎসালয়, পান্থশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে মন্দিরাদি নির্মাণ করে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করে উপার্জিত অর্থের সদ্ব্যয় করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নিজেদের কয়েকটি বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' উদ্বাস্তুদের তিনি থাকতে দিয়েছেন। এ ছাড়াও দরিদ্রের দুঃখ মোচনে, মানুষের উপকারে তিনি কত যে অর্থ দান করেছেন তার কোন হিসেব নেই।

যদুনাথের সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া, ক্রিকেট খেলা প্রভৃতিতেও অসীম উৎসাহ ছিল। তাঁর দুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণদাস রায় ও শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র রায়ও কৃতী পুরুষ। উপযুক্ত বংশের উপযুক্ত সন্তান।

উত্তরাধিকার সূত্রে বা স্বীয় উপার্জনে অনেকেই বিপুল বিত্তের অধিকারী হন, কিন্তু সেই রত্নভাণ্ডার যাঁরা উন্মুক্ত করে দেন দেশ ও দশের কল্যাণে, সেই সার্থক পুরুষরাই নির্বিশেষে দাবী করতে পারেন সকলের শ্রদ্ধা। নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ছিয়াশী বছর বয়স্ক বৃদ্ধ ভূস্বামী যদুনাথ রায়ও তাঁদেরই এক জন।

ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী

[বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার]

বর্ত্তমান কালে বাংলা দেশে যে স্বল্প কয়েক জন বিজ্ঞানী উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রকে উন্নততর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, —ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী তাঁদের অন্যতম। এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতী মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। রসায়ন-বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা ও অধ্যাপনার সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁর চিন্তা ছিল, কি করে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার করা যায়। প্রাতঃস্মরণীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টি করবার যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাতে এই বিজ্ঞানীকেই রসায়ন-বিজ্ঞানের পরিভাষা সঙ্কলন করবার ভার দেওয়া হয়। অধ্যাপক ডাঃ চক্রবর্ত্তী তখন অন্যান্য কৃতী অধ্যাপক ও চিন্তানায়কদের সহায়তায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নেতৃত্বে বাংলায় যে বিজ্ঞানের ট্রেনিং দেওয়া হতো, তাতে রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপনার দায়িত্ব ছিল এই বিজ্ঞানীর উপর।
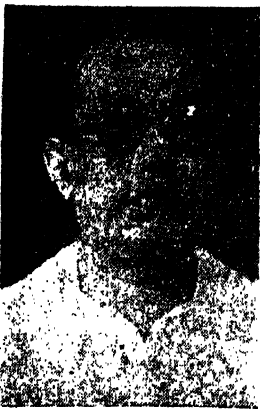
দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী

১৯০৩ সালের ১৮ই জানুয়ারী কলিকাতায় ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁদের দেশ ফরিদপুর জেলার কোটারীপাড়ায়, পরিবারে ইংরাজি শিক্ষার চলন একেবারেই ছিল না। পিতা জ্ঞানদাকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী ছিলেন ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। গীতার ভাষ্য রচয়িতা পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় এই বংশেরই সন্তান ছিলেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তীরা তিন ভাই, এক বোন। কোটারীপাড়া স্কুলে মাত্র ৫ মাস শিক্ষা গ্রহণ করবার পর পিতার সঙ্গে ডাঃ চক্রবর্ত্তী কলিকাতায় চলে আসেন এবং সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি এবং তাঁর ভাইদের মধ্যে দিয়েই ঐ পরিবারের সর্ব্বপ্রথম ইংরাজি শিক্ষার চলন সুরু হয়। ১৯২০ সালে ঐ স্কুল থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অবিভক্ত বাংলার সমস্ত স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী বেণীমাধব দাস মহাশয় তখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন,—তাঁরই উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানই ডাঃ চক্রবর্ত্তীর এই কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের প্রধান সহায়ক ছিল।

স্কুল থেকে পাশ করার পর অধ্যাপকেরা সকলেই তাঁকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করতে বললেন। কিন্তু সেখানে গণিত-বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকার জন্য তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আর্টস্ পড়তে ভর্ত্তি হন কিন্তু দু' মাস পড়েই বিষয় বদল করে নিয়ে বিজ্ঞান-বিভাগে চলে আসেন। ১৯২২ সালে আই, এস-সি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করে তিনি উত্তীর্ণ হন। এর পর ১৯২৪ সালে রসায়ন-বিজ্ঞানে অনার্স সহযোগে বি, এস-সি এবং ১৯২৬ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম, এস-সি পরীক্ষায় পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজেই রাজেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নিকট গবেষণা সুরু করেন। গবেষক-জীবনে অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী এবং অধ্যাপক অনুকূল সরকার প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। এম, এস-সি পড়ার সময় এবং পরে গবেষণা করার সময়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র ও স্নেহের পাত্র হবার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল।

১৯৩০ সালে তিনি পোষ্ট ডক্টরেট ফেলো হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে তাঁকে রসায়ন-বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ঐ বৎসরই জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানে তাঁর প্রকৃতিজ বস্তুসমূহের উপর গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অফ সায়ান্স উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের গবেষণাগারে তিনি নতুন করে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে গবেষণা আর অধ্যাপনা করেই ডক্টর চক্রবর্ত্তীর দিন কেটেছে,—১৯৫০ সালে নতুন কর্ম্মক্ষেত্র থেকে তাঁর ডাক এলো। তিনি পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং ইন সায়েন্স-এর সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। এই সময় অফিসের কাজকর্ম্মের মধ্যেও তাঁর মন পড়ে

[ছবি ফেরৎ পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট দিতে হয়।]

হাস্যময়ী

—নীরেন অধিকারী

ভুক্তাবশিষ্ট

—রতন দাশগুপ্ত
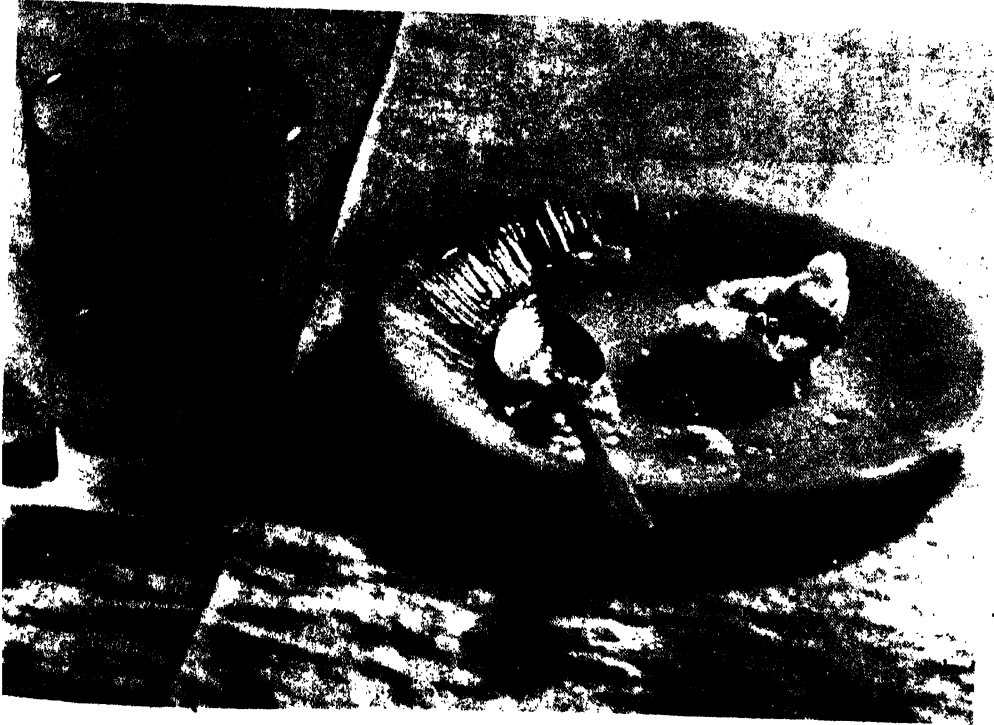
দূরদৃষ্টি

—গৌর চক্রবর্তী
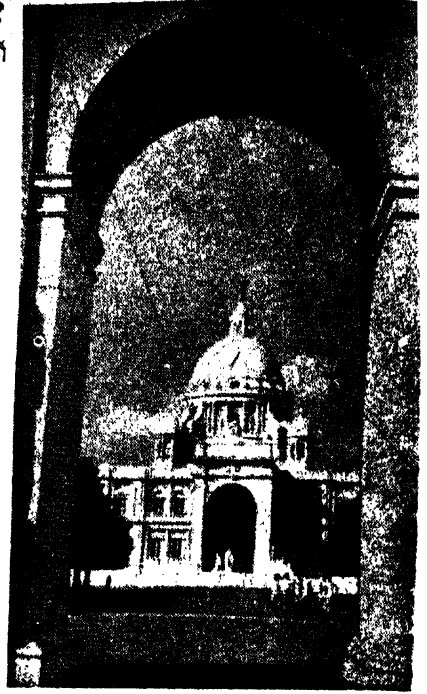
নর্তকী

—স্বদেশ ঘোষ

ক্ষুধার্ত

—বিবেকজ্যোতি মৈত্র

চিঠি আসে না কেন ?

—শি, সু, বসু

দেওয়ালীর রাতে —রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়

থাকতো অধ্যাপনার দিকে, তাই যতো দিন তিনি এই পদে ছিলেন—পার্ট টাইম লেকচারাররূপে অধ্যাপনা করতেন। শত গুরুত্বপূর্ণ অফিসের কাজের মধ্যেও ক্লাস নিতে নিয়মিত ছুটে আসতেন লেকচার হলে।

১৯৫৪ সালে আরও বড় কর্মক্ষেত্র থেকে তাঁকে আহ্বান জানানো হলো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রাররূপে তিনি বাংলা দেশের শিক্ষাজগতের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি যখন বি, এস-সি পাশ করেন, তখন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই এই অসাধারণ মেধাবী ছাত্রকে নানাপ্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে কোন সরকারী উচ্চপদ গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু শিক্ষাজগতের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ থাকার জন্য তিনি সেই প্রলোভন ত্যাগ করেন। এখন তাঁকে সেই অফিসের কাজই করতে হচ্ছে;—তবু তাঁর এই দায়িত্বের উপর বাংলার শিক্ষা-জগতের ভালো-মন্দ বহুলাংশে নির্ভর করছে বলে প্রকৃতপক্ষে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রেরই সম্মানীয় দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর নিজস্ব আদর্শের সঙ্গে কর্মজগতের পার্থক্য থাকলেও, মূলতঃ নীতির দিক দিয়ে কোন বিভেদ নেই।

বর্তমানে ভারতবর্ষের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জড়িত। ১৯৫০ সালে তিনি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়ান্সেস-এর সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির জৈব রসায়ন বিভাগের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত ঐ প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক কর্মসচিব নির্ব্বাচিত হন। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সঙ্গেও তিনি বিশেষ ভাবে জড়িত। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কলিকাতার দু'টি অধিবেশনে তিনি স্থানীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালের অধিবেশনে তিনি কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সায়ান্স অ্যাণ্ড কালচার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের শৈশব থেকেই তিনি ঐ পত্রিকা দু'টির সঙ্গে জড়িত।

ব্যক্তিগত জীবনে এই বিজ্ঞানী অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেই ভালোবাসেন। বই পড়া এবং গাছপালার পরিচর্য্যা করার সখ খুবই বেশী। গবেষক জীবনে প্রায় ৫০ খানি গবেষণামূলক মৌলিক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিশ্বভারতী এই বিজ্ঞানীর 'রঞ্জনশিল্প' নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেছে। ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তীর অকৃত্রিম অমায়িক ব্যবহার ও উদার চরিত্র অনুকরণযোগ্য। সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রদের কাছে তিনি অতি প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধেয়।

আচার্য্য ডাঃ সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৩ সালে ১২ই নভেম্বর কলিকাতায় আচার্য্য সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা আচার্য্য তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভবানীপুর খৃষ্টীয় ভজনালয়ের আচার্য্য ছিলেন। সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক পরোপকারী বলিয়া তিনি সকলের কাছে সমাদৃত ছিলেন। তাঁরই তৃতীয় পুত্র সুধীরকুমার। সুধীরকুমার ছেলেবেলা হইতেই খেলাধূলা ও লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। যে সময়ে এই দুইটির সমন্বয় ছিল না, সেই সময়ে পিতার স্নেহাধীনে এই দুইটির সম্যক্ পরিস্ফুট হয়েছিল। ১৯০৩ সালে তিনি National Football Club-এ খেলা সুরু করেন, সেই সময়ে এই দল খুবই বিখ্যাত ছিল। তার পর তিনি ১৯০৫ সালে মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান করেন। ১৯১১ সালে বিখ্যাত I. F. A. Shield ইহারা অধিকার করেন। সারা ভারতে তাঁদের গৌরব ঘোষিত হয়। ইত্যবসরে তিনি M. A. পাশ করিয়া L. M. S. College-এ অধ্যাপকের কাজ করিতে সুরু করেন। ১৯০৯ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কলেজ উঠিয়া যাওয়ায় ১৯১৫ হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি L. M. S. Institution-এর প্রধান শিক্ষক হন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইংলণ্ডে যান। ইংলণ্ডে যাইবার আগে তিনি ছাত্রমহলে সুপুরুষ ও সৌখীন হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বিলাত প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি ধুতি, পাঞ্জাবী ও চপ্পল ছাড়া অন্য কিছু পরিতেন না। তাঁর এই আদর্শ, তাঁর অজস্র ছাত্রমণ্ডলীকে নতুন ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিলাতে যাইয়া তিনি শিক্ষার নতুন ধারা দেখিয়া আসেন এবং ভারতে আসিয়া ভবানীপুরের বিশাল শিক্ষায়তন ছাড়িয়া নতুন ভাবে নতুন অনুপ্রেরণায় কলিকাতা হ'তে ১৪ মাইল দূরে, বিষ্ণুপুরে শিক্ষাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই সাহচর্য্যে চার জন মিশনারী সাহেব ঐ নতুন বিদ্যালয়ের সহকারী হিসাবে বহু দিন কার্য্য করেন। ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তা দিয়া গেলে মনে হয়, আর একটি ছোট শান্তিনিকেতনের উদ্ভব হইয়াছে। এখানে ২৮০টি ছেলে বিভিন্ন বোর্ডিং-হাউসে থাকে। বিশাল খেলিবার মাঠগুলি, চারটি সুন্দর পুকুর—প্রীতি, শান্তি, সান্ত্বনা ইত্যাদি নামকরণ করিয়াছেন। এই আদর্শ শিক্ষায়তন তাঁরই প্রাণপাত চেষ্টার প্রতীক। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে উপাসনা-গৃহ। তাঁর ধারণা, ধর্ম্মবিহীন জীবন ছাত্রের পক্ষে মারাত্মক। ঈশ্বরকে আদর্শ না করলে জীবন কখনও সার্থক হ'তে পারে না। এই আদর্শবাদ সামনে রেখে তিনি ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত এই শিক্ষাসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। খেলাধূলা, পড়াশুনা ও হাতের কাজের মাধ্যমে তিনি শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশে এমন কি বাইরেও সুনাম অর্জ্জন করেছে! তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপ্রাণ চেষ্টায়, তাই আজ সারা বাংলার তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী নানা ভাবে দেশের ও দশের সেবা করছেন। পশ্চিম-বাংলা কংগ্রেস তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন গত বছরে তাঁর অবদানের জন্য।

খৃষ্টীয় সমাজের নেতা হিসাবে তাঁর দান অতুলনীয়। তিনি অবৈতনিক আচার্য্য হিসাবে সারা জীবন খৃষ্টীয় সমাজের সেবা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পরিষদের সভাপতি হিসাবে বহু বৎসর বাংলার সেবা করিতেছেন।

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

তাঁহার সহজ সরল ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে তিনি অনুরাগী। বাগ্মী হিসাবে তাঁর সুনাম আছে। সাধারণের ভোটের দ্বারা উপর্য্যুপরি দুই বার তিনি ভারতীয় যুক্তমণ্ডলীর সভাপতি হইয়াছেন। তাঁর এই অবসর জীবনে তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন সমাজ-সেবার কাজে। তাঁহার কার্য্যতৎপরতা সকলের আদর্শস্থানীয়। শ্রীরামপুর মিশনারী বিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি দানে বিভূষিত করিয়াছেন। তাঁর মত একাধারে ধার্ম্মিক, শিক্ষাবিদ ও খেলোয়াড় ব্যক্তিকার দিনে খুবই দুর্ল্লভ! তাঁকে সম্মান করিয়া শ্রীরামপুর মিশনারী বিদ্যালয় যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীমতী সুখলতা রাও

[বিশিষ্ট লেখিকা, অঙ্কনশিল্পী ও সমাজসেবিকা]

বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিতা মহিলা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও স্নেহাশীর্ব্বাদে চিত্রকলা ও লেখনী চালনায় স্বনামধন্যা হইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীমতী সুখলতা রাও অন্যতমা। অবশ্য শিশু বয়স হইতে চিত্রাঙ্কনে তিনি আকৃষ্টা হন তাঁহার পিতৃদেব বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্য প্রকাশক শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর প্রভাবে, এবং বাল্যকাল হইতে গল্প লিখিবার বাসনা জাগরিত হয় পারিবারিক সূত্রে। ইঁহার পিতৃব্য ৺সারদারঞ্জন রায় বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং অপর দুই জন ৺কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন রায় বিশিষ্ট লেখক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

শ্রীমতী সুখলতা রাও ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা ৺সুকুমার রায় ও শ্রীসুবিনয় রায় এবং ভগিনী শ্রীমতী পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী লেখার বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা। তাঁহার ভগিনীকন্যা শ্রীমতী নলিনী দাস বর্ত্তমানে কলিকাতার Institute of Women's Training-এর অধ্যক্ষা এবং শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকার রাজ্যসরকারের শিক্ষাবিভাগে বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্তা রহিয়াছেন। ইঁহার মাতামহ ছিলেন বিগত শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক ৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এবং মাতামহী প্রথম মহিলা ডাক্তার (L. R. C. S. England) ৺কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। শ্রীমতী রাও ১৯০১ সালে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া বৃত্তিসহ বেথুন কলেজে বি, এ, অবধি পড়েন। ইতিমধ্যে তিনি টিচার্স ট্রেণিং কোর্স গ্রহণ করেন। তাঁহার সহপাঠিনীদের মধ্যে পাটনা কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী বনলতা দে, ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কলেজ ত্যাগের পর তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষিকা হিসাবে দুই বৎসর কার্য্য করেন।

সুখলতা রাও

১৯০৮ সালে তিনি ডাঃ জয়ন্ত রাও-র সহিত কলিকাতায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। তাঁহার শ্বশুরমহাশয় ৺মধুসূদন রাও উড়িষ্যায় 'ভক্তকবি' নামে সুপরিচিত ছিলেন। উড়িষ্যা নাগপুরের ভোঁসলাদের শাসনাধীনে থাকাকালীন তাঁহার পিতামহ সদাশিব রাও ও মাতামহ ভরত রাও প্রভৃতি কতিপয় ব্রাত্য মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয় পুরীধামে আগমন করিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

পঠদ্দশায় শ্রীমতী রাও ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন এবং পিতার (ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের তৎকালীন অঙ্কন-শিক্ষক) নিকট অঙ্কন-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত শিশু-মাসিক "সন্দেশ" পত্রিকায় তাঁহার লিখিত গল্পসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এলাহাবাদে 'প্রদীপ' পত্রিকা কলিকাতায় স্থানান্তরিত "প্রবাসী" এবং "মডার্ণ রিভ্যু" মাসিকদ্বয়ে সুখলতা দেবীর অঙ্কিত চিত্রগুলি মুদ্রিত হইতে থাকে। সেই সময় ফ্রান্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্কন-বিশারদ শ্রীশশীকুমার হেস, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার অঙ্কনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯০৮ সালে তিনি "বেহুলা" উপাখ্যান চিত্রে প্রকাশ করেন এবং পরে গল্পটি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া চিত্রসহ মুদ্রিত করেন। মুদ্রণের পূর্ব্বে কবিগুরু স্বয়ং উহাতে ভূমিকা লিখিয়া দেন।

'বিহার-উড়িষ্যা' প্রদেশের সিভিল সার্জ্জেন হিসাবে ডাঃ জয়ন্ত রাওকে নানা স্থানে অবস্থান করিতে হয়। সেই সূত্রে শ্রীমতী রাও নানারূপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে লিপ্ত হইবার সুযোগ পান। তন্মধ্যে শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র (কটক), র‍্যাভেনসা বালিকা বিদ্যালয়, গার্ল গাইডস, পুষ্প-প্রদর্শনী সমিতি, "আকাশবাণী"র কটক কেন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১ সালে স্থাপিত "ওড়িয়া নারী সেবাসঙ্ঘ"র তিনি অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী। ইঁহার নিজস্ব ভবনে বহু অভিনয়, জলসা, সভার আয়োজন এবং বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যকল্পে অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি কর্ম্মে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাসমরের সময় উড়িষ্যায় রেডক্রস সেবাবাহিনী গঠনের গুরুভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হয়। সেই সময় সমাজসেবার পুরস্কার হিসাবে তিনি কাইজার-ই-হিন্দ রৌপ্যপদকে ভূষিতা হন। A. I. W. C.-র তিনি একজন সক্রিয় সদস্যা ছিলেন।

সরকারী ব্যক্তিদের সহিত মেলামেশা সত্ত্বেও শ্রীমতী সুখলতা দেবী উড়িষ্যার জাতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত পরিচিত হন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে মহারাণী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, নিরুপমা দেবী, রাধারাণী দেবী, মহারাণী সুচারু দেবী, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের কন্যা ভক্তিউষা দাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বিশিষ্ট মহিলাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়।

১৯৫২ সালে কটকে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হন। ১৯৫৫ সালে কটকে শ্রীশ্রীসারদামাতা-শতবার্ষিকী উৎসবে তিনি পৌরোহিত্য

করেন। তিনি আই, এ ও বি, এ পরীক্ষার বাংলা ভাষার প্রশ্ন-রচয়িত্রী হইয়াছেন।

কটকের National Council of Women এর মুখপত্র মাসিক "আলোক" ১৯২৮ সালে শ্রীমতী রাও-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। উহা একত্রে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষায় মুদ্রিত হইত।

রবীন্দ্রনাথ সন্দর্শনে তিনি একবার শান্তিনিকেতনে গমন করিলে বহু বিশিষ্ট মনীষীদের সহিত পরিচিতা হন। রবীন্দ্র-প্রতিভা যে তাঁহাকে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখনে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা শ্রীমতী রাও আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া থাকেন।

তাঁহার পুত্র বর্ত্তমানে কেমব্রিজ সহরে PYE RADIO কোম্পানীতে টেলিভিসিন গবেষণায় লিপ্ত আছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা কলিকাতার অন্যতম বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অমলানন্দ দাস এক বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করায় শ্রীমতী রাও খুবই আঘাত পাইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সুখলতা দেবীকে ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা দিবসের নবম-বার্ষিক উৎসবে কলিকাতায় এক সভায় বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন।

তাঁহার লিখিত "গল্প আর গল্প" নিখিল-ভারত শিশু-সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ৺সুকুমার রায়ের "পাগলা দাশু" পুস্তকের সহিত একত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে। তাঁহার অঙ্কিত তৈলচিত্র ও জলরঙা ছবি কলিকাতা ও এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পদক লাভ করে। 'নতুন ছড়া', 'নিজে পড়', 'নিজে শেখ,' 'সোনার ময়ূর', 'অলিভুলির দেশে,' 'পথের আলো', ও 'Leading Lights' পুস্তকগুলি শ্রীমতী রাও লিখিত অবিস্মরণীয় শিশু-সাহিত্য।

অগ্রাণের গান

শ্রীসাধনা সরকার

অজস্র গভীর রঙ পালকের 'পর
প্রেম আর স্বপ্নের বিস্ময় মাখা
রোদের নরম রোমে ঢালু মাঠ ভরা।
ধানের সোনালি নীড়ে মেলে নীল পাখা
অঘ্রাণের পাখি। পাতা কুড়াবার দিন
ঘাসে ঘাসে—তাই মুখে নেই কথা
বিষণ্ণ বিকেলের। ঘুম পায় পৃথিবীর,
মাঠ ভরে ছড়ালো যে রঙের শূন্যতা
হলুদ অঘ্রাণ-পাখি। ক্ষেতের ভিতর
ঝরে পড়ে জীবনের ভালোবাসা-মাঠ:
সোনালি ধানের শীষে নীড় আর ডিম্ব
চুপে চুপে রেখে গেছে কোমল আস্বাদ।

নিস্তব্ধ ঘাসের বুকে রয়েছে গোপন
পিঙ্গলা কামনার নরম উচ্ছ্বাস—
রূপালি পালকে-মোড়া অঘ্রাণের পাখি
পৃথিবীকে এনে দিলো স্বপ্নের আশ্বাস।
আজ এই গোধূলির ছায়া-হাত ধরে
হৃদয়ের সাধগুলি যাক্ ভেসে ভেসে
রাতের শিশিরে-ভেজা নক্ষত্রের নীড়
শিহরি উঠুক নীল ডিমের আবেশে।
পৃথিবীর বুক ভরে সৃষ্টির ঘ্রাণ
সোনালি ধানের শীষে আজো লেগে রয়:
ঝরানো পাতার স্বাদে অধীর জীবন
অঘ্রাণের মুগ্ধ রাতে হলো রূপময়।

উদয়ভানু

আশ্রমে যেন শোকের ছায়া নেমেছে!

আচার্য্য কোথায় গেছেন কেউ জানে না। নিরুদ্দেশের পথে হয়তো তিনি যাত্রা ক'রেছেন! কিশোর ব্রহ্মচারীর দল, বিনিদ্রায় রাত্রি যাপন করেছে, প্রতীক্ষায় থেকেছে। দ্বিধাগ্রস্ত মনে এখানে সেখানে সন্ধান ক'রেছে, কিন্তু ফললাভ হয় না। তিনি জীবিত, না মৃত, মান্দারণে আছেন, না গেছেন দেশান্তরে, এই প্রসঙ্গের জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। উপনীত ব্রহ্মচারী, কর্তব্যকর্ম্মে বিরত হ'তে পারে না। গায়ত্রীজপের মৃদুগুঞ্জন শোনা যায় আশ্রমে। আচার্য্য বলেছেন, 'দর্শপৌর্ণমাস যাগাপেক্ষা ওঙ্কারাদির জপরূপ যজ্ঞ দশ গুণে অধিক শুভপ্রদ। সেই জপ যদি উপাংশুরূপে অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ সমীপস্থ লোকের কর্ণগোচর না হয়, তবে ফল শতগুণ হয়; যদি মানস-জপ হয় অর্থাৎ জিহ্বা অল্পও না কম্পিত হয়, তাতে সহস্র ফল জন্মে।' আকাশের নক্ষত্রমণ্ডল এখনও দেখা যায়। ক'জন ব্রহ্মচারী আসনে এক স্থানে দণ্ডায়মান, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করবেন, প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনায় রত। যাঁদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, যাঁরা চিন্তাগ্রস্ত তাঁরা নির্জ্জনে গেছেন। নদীজল সমীপে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাপনান্তে তাঁরা অনন্যমনে প্রণবব্যাহৃতি-সহকৃতি গায়ত্রী অধ্যয়ন করেছেন। দেখতে দেখতে নক্ষত্ররাজি অদৃশ্য হয়, সূর্য্যোদয়ের আভা দেখা দেয় আকাশের পূর্বাঞ্চলে। ব্রহ্মচারীর দল হোমকাষ্ঠ, ভিক্ষান্নের সঞ্চয় ও আচার্য্যের জলাদি আহরণরূপ হিতজনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যতই বিপদ হোক, সর্বদা শুদ্ধভাব, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী থাকতে হবে, নতুবা বিদ্যারূপ নিধির প্রতিপালক হওয়া সম্ভব হবে না। কর্তব্যে বিরত হ'লে অবকীর্ণী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ব্রহ্মচারীদের!

চন্দ্রকান্ত অনুদার নয়; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শিক্ষাদান করেন। জাতিবৈষম্য তেমন মানেন না। তাই আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কারও কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয়, শণবস্ত্রের অধোবসন, —কারও মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় ও ক্ষৌমবসন, কারও কারও বা ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় ও মেষলোমের অধোবাস। প্রথমোক্তগণ ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় এবং শেষোক্তগণ বৈশ্য ব্রহ্মচারী। ব্রাহ্মণের সুখস্পৃশ্য মুঞ্জময়ী মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মেখলা মৌর্ব্বীময়ী ধনুকছিলার ন্যায় ত্রিগুণিত, বৈশ্যের শণতন্তুর মেখলা। ব্রাহ্মণের হাতে কেশ পর্য্যন্ত প্রমাণ বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত বট কিম্বা খদিরের দণ্ড, বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত পীলু বা উডুম্বরের দণ্ড। ভিক্ষার প্রারম্ভে সূর্য্য-উপাসনা করণীয়, অতঃপর অগ্নি প্রদক্ষিণ এবং তদনন্তর ভিক্ষার্থে যাত্রা।

মান্দারণের পথে পথে ব্রহ্মচারীদের সুললিত কণ্ঠ শোনা যায়। দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন তাঁরা। ব্রাহ্মণ বলছেন, 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি'। ক্ষত্রিয়গণ বলছেন, 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি'। বৈশ্যরা বলছেন, 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি'।

কোথায় আচার্য্য চন্দ্রকান্ত, কে জানে? বনচারী বাঘের গর্ভে গেছেন হয়তো। বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা কি হত্যা করেছে তাঁকে? ব্রহ্মচারীর দল তবু আশা ত্যাগ করেন না। আশায় আশায় থাকেন।

একজন ব্রহ্মচারী বললেন চুপি চুপি,—আচার্য্য পাতক হয়েছেন। জমিদারগৃহে গতায়াত আছে তাঁর। সপ্তগ্রামের জমিদারপত্নীর সহ তাঁর কি সম্পর্ক কে জানে!

অন্যান্য শিষ্যবর্গ কানে হাত চাপালেন তৎক্ষণাৎ। আচার্য্যের দোষকথন বা নিন্দা শ্রুতিগোচর না হয় যেন।

—ক্ষান্ত হও গুরুভ্রাতা। এমন কথা উচ্চারণ করাও মহাপাপ। শিষ্যদের একজন বললে সভয়ে। নিরুদ্দিষ্ট আচার্য্যের সম্মান-রক্ষার্থে দুই কর কপালে স্পর্শ করলো।

কিন্তু বিরত হয় না নিন্দাকারী। আবার বললে সে,—'স্বভাবো এষ নারীনাং নরানামিহ দূষণম্।' জমিদারনন্দিনী আমাদিগের আচার্য্যকে তুষ্ট করতে চান কি?

—গুরুনিন্দা অনুচিত, অশাস্ত্রীয়। গুরুর পরীবাদে মৃত্যুর পর নিন্দুক গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হয়, নিন্দাকথনে পরজন্মে কুক্কুর হয়, তা কি জ্ঞাত আছো?

এই প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হয়। কথক এবং শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই নীরব হয়। গাছে গাছে ঘুমভাঙ্গা পাখীর কলকাকলী ব্যতীত অন্য কোন শব্দ আর শোনা যায় না। ভিক্ষাপ্রার্থী ব্রহ্মচারী যে যার পথ ধরে।

অতিক্রান্ত-প্রায় ব্রাহ্মমুহূর্ত। রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণে আমোদরের জলে আলো-আঁধারের প্রতিচ্ছায়া খেলছে। নদীর উপকূলে বৃক্ষশ্রেণী ও বনাঞ্চলে এখনও অন্ধকার লিপ্ত হয়ে আছে। পূর্বাকাশে লাল সিঁদুর ছড়িয়েছে যেন। আকাশভেদী মন্দিরচূড়ায় আর মসজিদ-মিনার-শীর্ষে কে আবীর মাখিয়েছে যেন।

কিন্তু সকলই যেন ধূমময়, স্পষ্ট দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন, কুয়াশা জাল বিস্তার ক'রেছে।

—ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

মান্দারণের ধূলিধূসর পথে পথে কিশোরকণ্ঠের প্রার্থনা পাখীর কলগানের মত শোনায় যেন। গৃহস্থের দ্বারপ্রান্ত থেকে ডাক দেয় তারা, নাতিউচ্চ মধুর কণ্ঠে। অন্নদান করেন গৃহবধূরা, ফলমূল শাকসব্জী। তেল আর ঘৃত। লবণ, মিছরী।

সকল খাদ্যে অধিকার নেই ব্রহ্মচারীর। মধু, মাংস, গুড় ভক্ষণ ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার নিষেধ। দাতা দেন, গ্রহীতা গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচারীদের দৃষ্টি ভূমিতে আনত। নারীদেহ প্রেক্ষণ বা অবলোকন রীতিবিরুদ্ধ ; দেহধর্ম্ম বিনষ্ট হয় যদি !

কেউ মুণ্ডিতকেশ, কারও মাথায় জটাভার, কেউ শিখামাত্র ধারণ করেছে। ভয়ে ভয়ে পথ চলেছে তারা। গ্রামাপথের দুই ধারে কসাড় ও বাবলাবন। শ্বাপদ আর সর্পের সহসা আক্রমণের আশঙ্কা আছে। তদুপরি ধর্ম্মাধর্ম্মের মতাভেদবৈষম্যে গ্রামের হাওয়া যেন বিষিয়ে আছে। বিধর্ম্মীদের মৃত্যুবাণ যদি ব্যর্থ না হয় ! কে কোথায় লুকিয়ে আছে, কেউ জানে না।

—ভিক্ষা দেহি ভবতি।

একটি সুরের একটি ছন্দ, গানের একটি পঙ্‌ক্তির মত প্রাতঃসন্ধ্যার হাল্কা হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়ায় ভিক্ষাপ্রার্থনার মন্ত্র। গৃহীর দুয়োরে দুয়োরে ডেকে ডেকে যায় বালকশিক্ষার্থীর দল। কত জন বধূকন্যা ভিক্ষা হাতে বৃথা দাঁড়িয়ে থাকেন। ওরা বৈদিক যাগ-অনুষ্ঠানে ব্রতী নয়, স্বেচ্ছাচারীর ঘরণী, তাই ওদের পরিহার করা হয়।

আশ্রম যেন শূন্য, আচার্য্যের অভাবে। শিষ্যবর্গের মনের সুখশান্তি ঘুচে গেছে যেন, পথ চলায় অকারণ ক্লান্তি দেখা দিয়েছে। ম্লানমুখ সকলের, ভগ্নমনের ছায়া ফুটেছে মুখমুকুরে। চোখের তারকা অচঞ্চল আজ। আচার্য্য আশ্রয় দান করেছেন তাঁর আশ্রমে। উপনয়নে দীক্ষা দিয়েছেন। যজ্ঞ-ক্রিয়া শিখিয়েছেন। বেদশাস্ত্র, উপনিষদ ও নানা বিদ্যা দান ক'রেছেন।

তিনি কোথায় ! শিষ্যদের চোখ, সাগ্রহে সন্ধান করে পথপ্রান্তে, বনের অন্তরালে। সেই তেপান্তরের দিকে দৃষ্টি চালিত হয়, দূর-দূরান্তরে। কিন্তু বৃথাই অন্বেষণ।

আমোদরের জল দিনরাত্রি মানে না। কুলু-কুলু রবে হাসতে হাসতে ভাসছে সর্বক্ষণ। গঙ্গামুখে ছুটে চলেছে ঢেউয়ের দোলায়, বিপুল বেগে। নদীর অন্যতীরে রাঙামাটি গ্রাম। মিথ্যা নামের বড়াই তার, মাটির বর্ণ রাঙা নয়, ঘন কালো। রাঙামাটির সঙ্ঘারামে জয়ঢাকের বাদ্য ধরলো হঠাৎ। বাতাস-কাঁপা গুরু-গুরু ধ্বনি, নদীর অন্য তীর থেকে—মান্দারণে প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

আমোদরের জল থেকে উঠে একটি মৎস্যকন্যা, যেন ডানার ভরে উড়ে চলেছে। বালি আর পলিমাটির নরমেও যেন সে স্পর্শকাতর,—দূর থেকে দেখায় যেন উড়ন্ত প্রজাপতি, উড়তে উড়তে চলেছে।

বণিককন্যা আনন্দকুমারী ! আঁচল উড়িয়ে ছুটছে বিদ্যুতের বেগে। বিজলী-রেখা খেলছে যেন ভোরের বেলাভূমিতে। তার মুক্ত কেশ উড়ছে পিছনে ধূমকেতুর মত। পায়ের তলে মনসার গুল্মশাখা, কঙ্কর, প্রস্তর। পথের কাঁটা অগ্রাহ্য করে আনন্দকুমারী। জীবন-মরণ সমস্যা এখন তার। অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

মরুভূমিতে মরূদ্যান দেখতে পেয়েছে যেন। অকূলে কূল দেখেছে। চৌধুরাণী দ্রুতবেগে ধাবমানা, কোন দিকে দৃক্‌পাত নেই তার। আসমানদীঘির তীরে উঠে ক্ষণেক অপেক্ষা করে। হাঁফ ধরে হয়তো অনভ্যাসে। আবার ছুটতে থাকে ক্ষিপ্রগতিতে। জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্ন-দেউলে প্রবেশ করে। বিদ্যুতের শিখা যেন, চকিতে অদৃশ্য হয়।

আনন্দকুমারীর পদক্ষেপের শব্দে বিচরণশীল উরগজাতি সভয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। গৃহের উঠানে আগাছার জঙ্গল, বাঁশ-বাখারি স্তূপীকৃত হয়ে আছে। ঘরের কবাটসমূহ চোরে করে চুরি করেছে। ইঁদুর, আরশুলা, বাদুড় পালে পালে ঘুরাফেরা করছে। চৌধুরাণী থমকে থাকে যেন, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সোপানশ্রেণীর দিকে অগ্রসর হয় ধীরে ধীরে। পদধ্বনি যেন না শোনা যায়। পাঠানপ্রহরীর নজরে পড়লে আর রক্ষা নেই আজ। একেই জমিদারপত্নীর বন্দিত্ব মোচন হয়েছে, প্রহরীর অজ্ঞাতে। তিনি এখন পলাতকা।

পা টিপে টিপে দ্বিতলে উঠলো আনন্দকুমারী। কেবল প্রহরী নয়, রাজকুমারীর পরিচারিকা আছে নিদ্রামগ্না। যদি জেগে ওঠে সে ! কুলবধূকে দেখতে না পেয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করবে সে। লোক জড় করবে হয়তো গলা-ফাটানো কান্নায়।

বন্ধঘরের শিকল অতি সন্তর্পণে মুক্ত করে চৌধুরাণী। কক্ষের মধ্যে বন্দী চন্দ্রকান্ত। নতমস্তকে ব'সে আছেন ! দেখে মনে হয়, গভীর চিন্তাকুল তিনি।

প্রথমে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে আনন্দকুমারী। পরিহাসের হাসি যেন তার মুখে। মুখাকৃতি ক্লেশে কাতর যেন। এক রাশ রুক্ষকেশ, পৃষ্ঠে আলুলায়িত। চোখের কোলে কালিমা। বস্ত্রাঞ্চল ভূমিতে লুণ্ঠিত।

—কি গো নাগর, সুখের ব্যাঘাত হয়েছে না কি ? হেসে হেসে কথা বললে চৌধুরাণী। ফিসফিসিয়ে বললে,—চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।

—চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রবৃত্তি নাই আমার। চন্দ্রকান্ত বললেন কেমন যেন নিরাশার সঙ্গে। বললেন,—তুমি কোথা থেকে আসছো এই অসময়ে ? আপন চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করতে পারি না।

মুখে আঁচল চেপে খিলখিল হাসি ধরলো আনন্দকুমারী। হাসতে হাসতে বললে,—এসো, এই স্থান পরিত্যাগ করি। দাসীর ঘুম ভাঙলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী কয়েক পা এগিয়ে চন্দ্রকান্তর একখানি হাত ধরলো। বললে,—চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রবৃত্তি নেই, এমন কথা শুনিয়ে আর হাসিও না। কথা বলতে বলতে ইতি-উতি দেখলো একবার। আবার বললে,—রাজকন্যের মন কে চুরি করেছে তাই শুনি ?

অধোবদন হ'লেন চন্দ্রকান্ত। সলজ্জায় বললেন,—আমাকে মার্জনা কর চৌধুরাণী।

সহসা ক্রোধের লাল আভা ফুটলো আনন্দকুমারীর মুখে। চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। ওষ্ঠাধর থরথর কাঁপতে থাকে। কথার সুরের পরিবর্তন হয় যেন। চৌধুরাণী বললে,—তোমাতে আমার মন-দেহ সমর্পণ করেছি জানবে। কিন্তু তুমি আমাকে বঞ্চিত

কয় কেন জানি না! ঘোর বিপদে ঠেলে দিয়েছিলে আমাকে। বহুকষ্টে আমি ঐ ম্লেচ্ছ ম্যালেটের কবল থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি জানি তোমার চরণে আমার ঠাঁই হবে। তা যদি না হয় আমাকে জানাও, আমি এখনই ধুতুরার ফল খেয়ে মৃত্যু বরণ করি।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—আমি এক্ষণে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

অশ্রুধারা আঁচলে মুছলো আনন্দকুমারী। কেমন যেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। চল আমরা যাই। অধিক বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা আছে। একেই রাজকন্যা নেই। পাঠানের হাতে বন্দুক আছে, ভুলে যাও কেন?

—কোথায় যাবে? প্রশ্ন করলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—কোথায় আমাদের স্থান হবে?

—তা জানি না। আপাততঃ এই ভিটা ত্যাগ করাই উচিত।

—গন্তব্য জানি না, কোথায় যাই!

—চল' যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে যাই। কথার শেষে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়লো চৌধুরাণী। তাকে অনুসরণ করেন চন্দ্রকান্ত। যেন ছায়ার মত অনুগামী তিনি। আনন্দকুমারী যেন কি এক বিপদ-ভয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভোরের আলো স্বচ্ছ হওয়ার আগে এই তল্লাট ছেড়ে যেতে হবে। মান্দারণের মানুষ জাগবে ঘুম থেকে, দেখতে পাবে তাদের গ্রামের মুখপোড়া কলঙ্কিনীকে। চৌধুরাণী সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে তরতরিয়ে, শব্দহীন পদক্ষেপ তার।

ফুল-ফোটানো, পাতা-কাঁপানো বাতাস চলেছে মৃদুমন্দ। ঘাসের বনে ঢেউ উঠছে থেকে থেকে। বৈশাখী-ফুলের গন্ধে বাতাস যেন ভারাক্রান্ত। আসমানদীঘির কাকচক্ষু জলে ক্ষীণ প্রবাহ খেলছে। দীঘির তীর থেকে এক ঝাঁক শালিখ, পাখা ঝাপটে উড়ে পালিয়ে যায় সভয়ে।

দীঘির তীরে এসে স্বস্তির শ্বাস ফেললো চৌধুরাণী। খানিক দাঁড়িয়ে পড়লো। হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে কথা বললে। বললে,—তোমার ব্রহ্মচর্য্য ঘুচে গেছে, অস্বীকার করবে? রাজকুমারী তোমার ব্রতভঙ্গ করলেন না কি?

চন্দ্রকান্ত নিরুত্তর। হতবাক যেন। হতাশ চাউনি তাঁর চোখে। এলোমেলো হাওয়ায় তাঁর উত্তরীয় উড়ছে।

আবার কথা বললে আনন্দকুমারী। বললে,—তোমার আশায় বাদ সাধলুম, কিন্তু আমি নিরুপায় জানবে।

—চরিত্র আর ব্রত থেকে আমি বহুকাল ভ্রষ্ট হয়েছি, যতদিন তোমার সংস্পর্শে এসেছি। চন্দ্রকান্ত বললেন দুঃখকাতর সুরে। বললেন,—আশ্রম আর শিষ্যবর্গের জন্য আমি চিন্তিত হই।

আনন্দকুমারী বললে,—গৃহস্থাশ্রমধর্ম পালন কর, সবই রক্ষা পাবে।

বিরক্তির সঙ্গে চন্দ্রকান্ত বললেন,—না তা হয় না। আশ্রমে আর নয়। আমি আচার্য্য, আমার আদর্শ শিষ্যরা গ্রহণ করবে। আমি ধর্মচ্যুত হয়েছি।

—যাই হোক, তোমার আর মুক্তি নেই জানবে। আমার মরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ হবে না। কথার শেষে এক ঝলক হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—এখন চল আমাদের গৃহে। মা যেমন বলবেন তেমন হবে। কথা বলতে বলতে পা চালায় সে। হাসির জের টেনে বললে,—রাজকন্যের স্মৃতি এখন ভুলে যাও, আর নয়। তিনি তো মান্দারণ ত্যাগ করেছেন। সহোদরের সঙ্গে সুতানুটি যাত্রা করেছেন।

মুখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—মান্দারণ ত্যাগ করেছেন! সুতানুটি যাত্রা করেছেন!

—হাঁ গো হাঁ। আনন্দকুমারী হেসে হেসে কথা বলে। বললে,—মনে ব্যথা পাও না কি! বিরহের জ্বালা ধরছে বুকে!

মনোভাব আর প্রকাশ করেন না চন্দ্রকান্ত। বললেন,—চল তোমাদের গৃহে যাই। ইতিমধ্যে তোমার মাতৃদেবীর সহ আমার আলাপ হয়েছে। তিনিও বলেছেন, আমি যেন তোমাকে গ্রহণ করি। তবে তিনি আমাদের উভয়কে স্থান দেবেন তাঁর গৃহে।

—তাই চল'। খুশীর হাসির সঙ্গে বললে চৌধুরাণী। নদীর তীরে পায়ে-চলা-পথ ধরে এগিয়ে চললো। চন্দ্রকান্ত তার সঙ্গে চললেন। আনন্দকুমারী বললে,—রাজকন্যার জীবন আমি রক্ষা করেছি। তাঁকে বজরায় পৌঁছে দিয়েছি, বাধাবিপত্তি মানিনি। নির্বিঘ্নে তারা মান্দারণ ছেড়ে গেছে।

লাল সূর্য্য পূর্ণাকারে দেখা দেন পূর্বাকাশে। দুধে-আলতায় পূর্ণ একখানি সুবৃহৎ থালা যেন। রৌদ্রালোকের বর্ণ যেন সোনালী। তেজহীন, কিন্তু দীপ্তিময়। নদী-তীরের পায়ে-চলা-পথ ধরে দু'জনে চলতে থাকে। যেন দু'জনের এক দেহ, যুগলমূর্ত্তি। চন্দ্রকান্ত বাম বাহুতে চৌধুরাণীর কটিদেশ জড়িয়ে ধরেন। স্বগত কবলেন আপন মনে,—গতস্য শোচনা নাস্তি!

নবারুণের স্বর্ণাভ আলো তাদের মুখে। চৌধুরাণীর মুখে তৃপ্তির হাস্যরেখা। চন্দ্রকান্ত কেমন যেন স্তব্ধ, বাক্যহারা।

বজরা তখন আমোদর থেকে গঙ্গায় পৌঁছেছে।

কাশীশঙ্করের বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠছে থেকে থেকে, গর্ব আর আনন্দে। আবার কয়েক থলি অর্থ বিলিয়েছেন মাঝিদের। শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলে মাঝিরা সোল্লাসে হাল টেনে চলেছে। গজেন্দ্রগমন নয়, ত্বরায় এগিয়ে চলেছে বৃহৎ বজরা।

বজরার এক কক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী। নতমুখে বসে আছেন। বিষণ্ণতা ফুটেছে তাঁর মুখে। তিনি হয়তো ভাবছেন নিজের অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ। কিছু যেন স্থির করতে পারছেন না এখনও। স্বামিগৃহ ত্যাগ করেছেন; অতঃপর কপালে কি আছে কে জানে!

কুমার কাশীশঙ্কর কাছে আসেন। সহোদরার মাথায় হাত রাখেন সস্নেহে। ধীরকণ্ঠে বললেন,—ভগিনী, বৃথা চিন্তা কর' কেন?

জমিদার কৃষ্ণরাম আর আচার্য্য চন্দ্রকান্তর মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে তাঁর স্মৃতিতে। মিহি মিষ্ট সুরে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—ভাই, আমার কপালে আরও কি দুঃখ আছে জানি না। তুমি বলতে পারো, স্বামি-সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিত না অনুচিত?

আকাশ-দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন কাশীশঙ্কর। কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবালু থাকলেন। বললেন,—স্বামী যদি পঙ্গু অথর্ব্ব হয়, জন্মান্ধ কিম্বা বিকলাঙ্গ হয়, স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী হয় যদি, তবে তাকে পরিত্যাগ করাই স্ত্রীর পক্ষে শ্রেয়ঃ। ইহাতে অধর্ম্ম নাই।

চোখে অশ্রুর প্লাবন দেখা যায়। রাজকুমারী সাশ্রুলোচনে বললেন,—কষ্টে কষ্টে আমি জর্জ্জরিত হয়ে আছি ভাই! সুখের মুখ কখনও দেখতে পাইনি সাতগ্রামে। স্বামিসোহাগ কা'কে বলে জানি না। তাই সধবার ধর্ম্ম আর পালন করি না। সীঁথিতে সিঁদুর দিই না। নিরামিষ খাই।

—আজ থেকে তোমার মুক্তি হয়েছে জানিও। কাশীশঙ্কর কথা বলেন আর ভগিনীর রুক্ষ মাথায় হাত বোলাতে থাকেন সস্নেহে।

কৃষ্ণরামের জন্য নয়, চন্দ্রকান্তর জন্য মনে মনে বিরহতাপ ভোগ করেন বিন্ধ্যবাসিনী। মেঘাবৃত চাঁদ যেমন থেকে থেকে দেখা দেয়, তেমনই চন্দ্রকান্তর মুখখানি এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও মাঝে মাঝে মনশ্চক্ষুতে দেখতে পান। তখন বক্ষ মধ্যে যেন এক অসহনীয় জ্বালা অনুভব করেন। কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না মুখে।

বিন্ধ্যবাসিনী চোখ মুছলেন আঁচলে। বললেন,—রাজমাতার পাছে কষ্ট হয় তাই এই যাত্রায় আমি অসম্মত হয়নি। কত দিন দেখতে পাই না মাকে। জ্যেষ্ঠ রাজাভাই ভাল আছেন তো? রাজবধূদের সমাচার কি?

—সকলেই ভাল আছেন শারীরিক। কাশীশঙ্কর বললেন,—তবে তোমার জন্য সকলেই মানসিক অশান্তি ভোগ করছেন।

—শিবশঙ্কর আর বনবালা কেমন আছে?

—ভালই আছে। তারা এখন মাথায় বর্দ্ধিত হয়েছে।

—মহেন্দ্রনাথ ভাই আর শিবানী?

—তারাও ভাল আছে। শিবানীর বিবাহ আসন্ন। তোমার আগমন প্রতীক্ষায় শিবানীর বিবাহানুষ্ঠান স্থগিত আছে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে বজরার হাল টানার অস্পষ্টতর ঝপ ঝপ শব্দ শোনা যায়। গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি কর্ণগোচর হয়। মাঝির দল সোৎসাহে হাল চালনা করছে। তাদের মেয়েকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে যেন।

—আনন্দকুমারীর সাহায্য কোন্ উপায়ে পাওয়া গেল, জানতে পারি?

কাশীশঙ্কর সহাস্যে বললেন,—সকলই বিধাতার ইচ্ছাধীন। গতরাতে আনন্দকুমারী আমার বজরার সমীপে এসে জীবন-রক্ষার প্রার্থনা জানায়। কে এক ম্লেচ্ছর অধীন থেকে পালিয়ে আসে সে। সাহায্য চায়। আনন্দ অবলা নারী, তাই আর প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

—এখন আমাদের গন্তব্য কোথায়?

—সুতানুটি অভিমুখে। তবে যতক্ষণ না ত্রিবেণী আর সপ্তগ্রামের সীমানা অতিক্রম করতে না পারি, ততক্ষণ আমাদিগের বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার নাই।

কাশীশঙ্কর কেবল বহুদর্শী নয়, দূরদর্শীও বটে। তাঁর অনুমান মিথ্যা হয় না। পাঠান প্রহরী অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করেছে রাজকন্যার অদর্শনে। তার কর্তব্যের অবহেলায় জমিদারপত্নী তার চোখে ধূলা দিয়ে পলায়ন করেছে। তীরের বেগে অশ্ব ছুটে চলেছে সপ্তগ্রামের পথে। জমিদার কৃষ্ণরামকে জ্ঞাত করাতে হবে সকল সমাচার। তিনি যদি কোন বিহিত করতে পারেন। শাস্তির ভয়, জীবননাশের ভয়—পাঠান প্রহরী অশ্ব ছুটিয়েছে শব্দগতি অপেক্ষা দ্রুততম গতিতে। তিলেক বিরতি নয়, অশ্ব ছুটে চলেছে ধূলি উড়িয়ে পিছনে। মৃত্যুর ভয় আছে, পাঠান তাই অশ্বকে পদাঘাত করছে থেকে থেকে। ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছে অশ্বগ্রীবা। মুখের ফেনা হাওয়ায় উড়ছে।

গড় মান্দারণ থেকে সপ্তগ্রামে যেতে হবে তাকে। কত দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে, খাল-বিল-নালা পার হতে হবে। মনিব কৃষ্ণরামের কাছে জানাতে হবে এই অলৌকিক দুঃসংবাদ। অশ্বের পদশব্দ প্রতি মুহূর্তে দূর থেকে দূরান্তে পৌঁছায়। পথিকজন সভয়ে পথ ছেড়ে দেয়। পাঠানের পদাঘাতে গতিবেগ আরও যেন দ্রুত হয়। পাঠানের কপালে স্বেদবিন্দু, সূর্য্যের আলোয় হীরার মত জ্বলছে!

[ক্রমশঃ।

শিক্ষার মাধ্যম কি হওয়া উচিত?

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ভূতপূর্ব বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য]

১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণে আমি বলেছিলাম: "আমরা যদি যথাযথ ইংরাজী শিক্ষায় অবহেলা করি, তাহলে আমাদের আন্তর্জ্জাতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মানসিক এবং এমন কি রাজনৈতিক জগতে আমাদের উপযুক্ত স্থান হারাবার ঝুঁকি কাঁধে নিতে হবে। সেজন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের কর্তৃপক্ষের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এই দিকটির প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেন।

আমাদের চ্যান্সেলারের শিক্ষা বিষয়ে সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আছে। দেশসেবায় তাঁর আগ্রহ যে কারো অপেক্ষা কম, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। আমি ইতিপূর্ব্বেই শিক্ষার প্রসারের জন্য তাঁর প্রভূত দানের উল্লেখ করেছি। নিজের কষ্টার্জ্জিত অর্থ থেকে তিনি দান করেছেন। কেন তিনি অর্থ দান করেছেন—না যাতে এদেশের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য সে অর্থ ব্যবহার করা যায়। আমাদের সকলের মত তিনিও উপলব্ধি করেছেন যে, শিক্ষা জাতীয় উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। তবুও তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, আপাততঃ ইংরেজীই আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। আমাদের ছাত্রদের শরীরবিদ্যা, ভূবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, ভূপদার্থ বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। বর্ত্তমানে ভারতের কোন ভাষায় এই সমস্ত বিষয়ে বিদেশী পুস্তক অনুবাদ যে কি করে সম্ভব হবে তা আমার ধারণা শক্তির বাইরে। ইংরেজী শিখলে আমাদের অনেক সুবিধে হবে। কারণ এই সব বিষয়ে যে কোন ইউরোপীয় ভাষায় লেখা বই ইংরেজীতে অনূদিত হয়। সেখানে এমন সব শিক্ষিত লোক আছেন যাঁরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজীতে বই অনুবাদ

করার বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। জার্ম্মাণ, ইটালীয়ান, ফরাসী, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষায় লেখা বই-এর ইংরেজী অনুবাদ আছে। ইংরেজী শিখলে আমরা সহজেই সে সব বই-এ লিখিত বিদ্যা সহজেই আয়ত্ত করতে পারব।

এ বিষয়ে আর একটি কথা বলার আছে। ভালভাবেই হ'ক আর অন্যায়ভাবেই হ'ক, গত দু'শ' বছর ধরে আমরা ইংরেজী শিখতে বাধ্য হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে এখন ইংরেজী ভারতের অধিবাসীদের সাধারণ ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজী ভাষায় নিজেদের ব্যক্ত করা আমাদের পক্ষে এখন অনেকটা সহজ হয়েছে। একে ত্যাগ করার দরকার আছে কি? ভারত এখন স্বাধীন সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ভারত এখন আর বিদেশী শক্তির অধীন নয়। কিন্তু সরকারের অধীন নয় বলেই কি আমাদের ইংরেজী ভাষা ত্যাগ করতে হবে? ভাষা কী দোষ করেছে?

ইংরেজী বা ফরাসী ভাষা না জেনে পৃথিবীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব বলে আমি মনে করি না। আমরা ইংরেজী শিখেছি, সে শিক্ষা আমরা পোষণ করব না কেন? প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজীতে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হয় বলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যের সংখ্যা এত বেশী। কিন্তু আমি একে প্রকৃত কারণ বলে মনে করিনে। এর কারণ হ'ল আমরা ইংরেজী ত্যাগ করব বলে স্থির করে ফেলেছি এবং সেজন্য ইংরেজী শিখতে যতটুকু মনোযোগ দেওয়া উচিত, ততটুকু দিচ্ছি নে। শেখবার সঙ্কল্প না থাকলে সংস্কৃত বা পালি যে-কোন ভারতীয় ভাষার মত ইংরেজীও শেখা সম্ভব নয়। কোন ভাষা শিখতে হলে তা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করা দরকার। কারণ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। কোন ভাষা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করতে হলে তার ব্যাকরণ ও রচনার প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। তবেই সেই ভাষার নির্ভুল ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করা সম্ভব। যদি মনে হয়, ইংরেজী ত্যাগ করা দরকার, তবে সর্ব্বতোভাবেই তা করতে হবে। কিন্তু তখন যে ভাষাকে অবলম্বন করা হবে, তাতে বুৎপত্তি অর্জন করা দরকার। সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য পাওয়া যাবে। কখনও মনে করবেন না যে, আমি ইংরেজীকে চিরকাল আমাদের জাতীয় ভাষা করে রাখতে চাইছি। আদৌ না। কিন্তু ইংরেজী ত্যাগ করবার আগে আমাদের এমন একটি ভাষা শিখতে হবে, যাতে বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে পুস্তক রচনা করা সম্ভব। ইংরেজীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগের জন্য দশ কি পনের বছরের কৃত্রিম সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। এমন ভাবে এই সীমারেখা টানতে হবে, যে সময়ের মধ্যে ইংরেজীর পরিবর্ত্তে ঠিক ঐ রকম একটি ভাষা তৈরী করা সম্ভব হয়ে উঠবে।"

১৯৫২ সালের সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম:

"আমাদের ভাল ভাল ছাত্রদের অধিকাংশই সামর্থ্যে কুলালে অধিকতর উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃটেন বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে থাকে। এক বৃটেনেই এখন তিন হাজার ভারতীয় ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের ইংল্যাণ্ড বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে না পারলে আমাদের ইংরেজী পড়তেই হবে। তবে চিরকাল তাই করতে হবে বলে আমার মনে হয় না। আমি সেই দিনের আশায় আছি, যেদিন আমাদের ছাত্ররা আমাদের দেশের কলেজে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারবে, উচ্চশিক্ষার জন্য সাগরপারে ছুটতে হবে না।

আমরা এমন এক দল নিঃস্বার্থ কর্ম্মী চাই, যারা ভারতের জাতীয় ভাষা এমনভাবে আয়ত্ত করবে যে, বিদেশী ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের বইগুলি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। ইংল্যাণ্ডে এমন কর্ম্মী আছে যারা জার্ম্মাণী, ফরাসী, রুশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় লেখা বই অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজীতে অনুবাদ করে এবং তার ফলে ইংরেজ-ছাত্ররা ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের বই-এর সাহায্য গ্রহণের সুযোগ পান।"

১৯৫৩ সালের সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম:

"আমাদের শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, হিন্দী আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে। সুতরাং এর উন্নতি সাধন করা দরকার। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, ভারতে অনেক ভাষা আছে এবং তাদের উপেক্ষা করা যায় না। আধুনিক পন্থায় ভারতীয় ভাষাসমূহের দ্রুত উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষার অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য সম্প্রতি ভারত সরকারকে একটি কমিটি নিয়োগ করার অনুরোধ জানান হয়েছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ভাষার বিকাশ হয় তাদের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকূল হলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হতে পারে। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা যদি কোন একটি বিশেষ ভাষাকে তাঁদের ভাব প্রকাশের বাহন করেন, তবে তার উন্নতি অতি অল্পকালের মধ্যেই হতে পারে। ভাষাতত্ত্ববিদ ও সমালোচকদের কমিটি শিক্ষার উন্নতি বিধানে নূতন এবং কার্যকরী প্রেরণা যোগাতে পারেন না। এই কমিটি বানান ও ব্যাকরণকে সহজ ও সরল করার নিয়মাবলী রচনা করতে পারেন এবং কারিগরী শব্দচয়ন ও তার মান নির্দ্ধারণ করতে পারেন। এসব কাজ যে খুবই দরকারী তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এইরূপ কৃত্রিম সাহায্য দ্বারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব ভাষা ব্যবহৃত হয় তার নূতন আকার দেওয়া বা নূতন বিষয়বস্তু সংযোজন করা সম্ভব নয়। সাহিত্যের উৎস মানব-হৃদয়ের গোপন কন্দরে লুক্কায়িত আছে এবং মামুলী প্রস্তাব বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা মানুষের গভীর আবেগকে স্পন্দিত করার আশা করা বাতুলতা।

আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো: চ্যান্সেলর ও অন্যান্য শিক্ষাব্রতীর অভিমত আপনাদের জানাতে চাই। শিক্ষা-দপ্তরের নিকট প্রেরিত এক পত্রে তাঁরা বলেছেন:

অশোভন দ্রুততার সঙ্গে আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করা হলে আমাদের শত বছরের সাধনা মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে আমাদের শিক্ষার মান নেমে যাবে। আপনাদের কাছে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে, আমাদের মান বজায় রাখার জন্য আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করুন। দৈবক্রমে হাইস্কুলে ইংরেজীকে দুর্ব্বল করা যদি কোন রাজ্য সরকারের নীতি হয়, তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ছাত্রের ইংরেজী জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিজেদের প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুমান করতে দিতে হবে। আমরা আবার বলি, নূতন মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি রচিত হলে তবে বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যমের আসন থেকে হটাতে পারবেন।"

কোনো উপদ্রব ছিল না। কালিকলম কাগজের ব্যবহার বর্জিত হইয়াছিল। ইহার আহ্বানলিপি শ্লেটে পেন্সিল দিয়া লিখিয়া সভ্যদের দর্শনার্থ তুলসী দ্বারবানের হাতে প্রেরিত হইত। কয়েকজন প্রযুক্তিবিদ্যাবিৎ ও নব্য ব্যারিষ্টার ইহার সভ্য থাকায় কলিকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতেও ঐ শ্লেটের গতিবিধি দেখা যাইত। অধিবেশনের যেমন কোনো নির্দিষ্ট দিন ছিল না, তেমনি অধিবেশনে আলোচনার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ও ছিল না। সংগীত, কবিতা, রহস্যালাপ ও পানভোজনাদিতে পরস্পরের আনন্দবর্ধন করা হইত। সভ্য-সংখ্যা ২৫ জনের অধিক ছিল না, বাছিয়া বাছিয়া সভ্য নির্বাচন করা হইত। সভ্যদের মধ্যে এক একজন আতিথেয়তার ভার গ্রহণ করিতেন। কবির প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সাহিত্যিক বলেন্দ্রনাথ ইহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কাগজপত্রের মধ্যে একখানি মোটা বাঁধানো খাতা সভাগৃহে রক্ষিত হইত। হেঁয়ালী, চিত্র, কবিতা, সংগীত-চিন্তা যাহার যাহা খুসি লিখিতেন। ইহার নাম ছিল 'খেয়ালখাতা'। পরবর্তীকালে ভারতী পত্রিকা বন্ধ হইবার ২।৪ বৎসর পূর্বে এই খেয়ালখাতা হইতে মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানের হস্তলিখিত পত্রিকাদির পূর্বপুরুষ এই খেয়ালখাতা। আধুনিক কালে রোটেরি ক্লাব প্রভৃতি সংঘকে খামখেয়ালী সভার উত্তরপুরুষ বলা যায়।

কবি কর্মশক্তিতেও অনন্যসাধারণ। ৩০ বৎসর বয়সে অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজ হস্তে জমির জরীপ কার্য হইতে জমির প্রকার ভেদ, অধিকারী ভেদ, নিরিখ নির্ধারণ প্রণালী, জমি সংক্রান্ত আইন কানুন, জমিজমার হিসাব, সেরেস্তার কাজ এ সমস্তই তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইল। ফলে কার্যপ্রণালীতে যে সকল দোষ ও শৈথিল্য ছিল তাহার আমূল সংশোধন ও পরিবর্তন তিনি করিয়া দিলেন। প্রজার সুখ সুবিধা উন্নতি, অভাব মোচন ও অভিযোগের যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা তিনি করিলেন। তাহাদের ন্যায়সংগত অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দূর করিবার ও শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করে শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির ও স্থানীয় কৃষি-ব্যাংক স্থাপন করিয়া প্রজাদের প্রাত্যহিক জীবনের কতকটা সুশৃংখলা সম্পাদন করিলেন, অনেক স্থলে রুগ্ন প্রজাদের চিকিৎসার ভার সহস্তে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার আয়ুর্বেদ, বায়োকেমিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যায় তিনি যে য্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক পরিত্যক্ত বহু রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন সে বিষয়ে আমরা পরে বলিব। কর্মচারীদের অবৈধ প্রাপ্তি ও অত্যাচার স্পৃহাও কঠোর শাসনে তিনি সংযত করিয়াছিলেন।

চাষী প্রজার দুঃখের প্রতি সহানুভূতি তাঁহার লেখনী মুখে অনেক প্রকাশ পাইয়াছে। মহর্ষি নিজে যখন জমিদারী দেখিতেন, তখন তাঁহারও প্রশংসায় প্রজারা ছিল মুখর। তাহারা বলিত 'আমরা রামরাজত্বে বাস করি।' বঙ্গদেশে এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত জমিদারী অল্পই আছে। কিন্তু বৈষয়িক কর্মের নীরস গুরুভার কবির সাধনাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। পদ্মার বিস্তৃত জল-রাশি ও মুক্ত বায়ু কবিকে আপনার করিয়া লইয়াছে! এই সময়ই কবির সাধনার যুগ। এই সময়েই সোনার বাঙলার সঙ্গে তাঁহার নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বাঙলার আকাশ বাঙলার বাতাস চিরদিন তাঁহার প্রাণে যে বাঁশী বাজাইয়াছে এইখানেই তাহার সূত্রপাত।

কবি যে জ্ঞানপথে অগ্রসর হইয়া প্রেমপথের সন্ধান পাইলেন তাহা তাঁহার আনন্দ উচ্ছ্বাসগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার ভগবান সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। নানা কর্মের মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া জীবনে পূর্ণ পরিণতিলাভ করিয়াছেন। তাই তাঁহার কণ্ঠেই শোনা যায়—

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগী বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্রদর্পে খল খল হাসে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে, মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য
বিকশিত লাজ;
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রা-পথ-তলে,
পুষ্পমালা মাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে,
কবি সঙ্গে চলে।

তারপর নটরাজের ঋতুরঙ্গশালার দ্বারোদ্ঘাটন। বাঁধন খোলার শিক্ষারম্ভ মহাকালের বিপুল নাচে।

প্রাণের মুক্তি মৃত্যু-রথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূত্রে
নিত্য-বোনা চিন্তা জালে।
শুনবি তো আয় কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নিচে
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।
রবির মুক্তি দেখ না চেয়ে
আলোক জাগায় নাচন গেয়ে
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।

তাঁহার দয়িত তাঁহার কাছে শুধু মালা লইয়া আসেন না, তরবারিও রাখিয়া যান—

এ যে মালা নয় গো এ যে তোমার তরবারি

আর পরম সাহসও তাঁহার আছে তাই তিনিই শুনাইতে পারেন।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ-জীবন পুণ্য করো দহন দানে।

তিনিই বলিতে পারেন।

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত
খড়্গ তোমার, হে বজ্রপাণি
চরম শোভায় রচিত

তাই

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগব আমি দাও মোরে সেই কান।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান।

বলাকায় এই চাওয়া ও বলা আরো সুস্পষ্ট, প্রকৃত শক্তিবাদী—

তোমার কাছে আরাম চেয়ে

পেলেম শুধু লজ্জা

এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে

পরাও রণ-সজ্জা

আঘাত আসুক নব নব

আঘাত পেয়ে অচল রব

বক্ষে আমার দুঃখে বাজে

তোমার জয়-ডঙ্ক

দেবো সকল শক্তি, লব

অভয় তব শঙ্খ।

ইহা জন্ম জন্ম করিয়া উদার ভাবে জীবন যাপন করিতে ইহাকে আদর্শ রাখিতে হয়, সকল সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়া জগৎস্রষ্টার সহিত যোগ রক্ষা করিতে হয়।

কতবার দীপিকের শিখা

আঁকিয়াছে ক্ষীণ টীকা

নিশ্চেতন নিশীথের ভালে

লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

তাই আমার আরতি দিন শেষে

করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

লহ এ প্রণাম—

জীবনের পূর্ণ পরিণাম।

• • •

তোমার ঐশ্বর্য মাঝে

সিংহাসন যেথায় বিরাজে

করিও আহ্বান,

সেথা এ প্রণতি মোর

পায় যেন স্থান।

কবির গোড়ার দিকে রচিত পারমার্থিক কবিতা শুনিয়া একদিন নবাব হাসিয়াছিলেন কিন্তু "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে" গানটি শুনিয়া মহর্ষিদেব বলিয়াছিলেন—"দেশের রাজশক্তি যদি দেশের ভাষা ও সাহিত্য বুঝিত, তাহা হইলে কবিকে তাহারাই পুরস্কৃত করিত কিন্তু যখন রাষ্ট্রশক্তির দিক হইতে সে সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।" তিনি তৎক্ষণাৎ কবিকে একখানি ৫০০্ টাকার চেক দিয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

কবির মতে অভিজ্ঞতা ও সহনশীলতাই মানবকে উন্নততর জীবনের বা ব্রহ্মলোকের উপযোগী করে। First deserve, then desire. বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়া আত্মবিকাশই যেন কবির আকাঙ্ক্ষা।

আমার ভার লাঘব করি' নাই বা দিলে সান্ত্বনা

বহিতে পারি এমনি যেন হয়

সার্থকতা তো আছেই, তাই

দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা

তোমারে যেন না করি সংশয়।

এই দারুণ পুরুষকারবাদী আত্মান্বেষীরও 'বাড়ি ফেরার' দিকে লক্ষ্য—

ছিন্ন ক'রে লও হে মোরে আর বিলম্ব নয়

ধূলায় পাছে ঝ'রে পড়ি এই জাগে মোর ভয়

• • •

যেটুকু এর রঙ ধরেছে

গন্ধে সুধার বুক ভরেছে

তোমার সেবায় লও সেটুকু থাকতে সুসময়

ছিন্ন করো ছিন্ন করো আর বিলম্ব নয়।

এই কবিতাটির শেষভাগে কবির ধর্মবিশ্বাসের একটি স্তরভূমির সন্ধান পাই—

এ ফুল তোমার মালার মাঝে

ঠাঁই পাবে কি জানি না যে

তবু তোমার আঘাতটি তার

ভাগ্যে যেন রয়।

রবীন্দ্রনাথ সাধনপথের শেষ সীমায় দেখেন 'রসো বৈ সঃ'। শতছিদ্র মর্ত্যজীবনের অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার স্বরূপকে পরিচ্ছন্ন আবেষ্টনে নিবিড় ভাবে আনন্দে বলিয়া উঠিয়াছেন—

হৃদয় আমার চায় যে দিতে শুধুই নিতে নয়।

আর

অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হয়ে

চরণে তব গোপনে তার গতি।

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে দিবস গেল বয়ে

তাহাতে মোর যা হয় হোক ক্ষতি।

* * *

বাহায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,

বিরহ হানি' তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে।

* * *

যে বীণা তব মন্দিরেতে বাজেনি তানে তানে

চরণে তব নীরবে তার গতি।

কবির রচনা।

ভারতাদিত্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তিনি আড়াই হাজারেরও বেশি গান রচনা করিয়াছেন।

কবির রচনা তব মন্দিরে জ্বালে ছন্দের ধূপ

সে মায়া বাষ্পে আকার লভিল তোমার কিসের রূপ।

তাঁহার গান তাঁহাকে চির দিন অমর করিয়া রাখিবে। কবি প্রকৃতির ভাবগ্রাহী পূজারী। ঋতুমঙ্গল, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব তাঁহার প্রকৃতির আনন্দবারতার দ্যোতক। তিনি শুনিয়াছিলেন, মেদুর আকাশে শঙ্করের ডমরুধ্বনি, তালে তালে নটরাজের প্রলয়নাচন কিসের ইঙ্গিত। কিন্তু কবি চিরদিন মোহমুক্ত বুদ্ধির অধিকারী তাই কবি-মনের বৈজ্ঞানিক প্রবণতার পরিচয় মেলে এবং জীবনের প্রান্তে কবি তাঁহার "বিশ্বপরিচয়" জ্ঞাপন করিয়া আমাদের চমৎকৃত ও মোহিত করিলেন। ইহা সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তথ্যপরিপূর্ণ।

লৌকিক রঙ্গ পরিহাস ও মনের নিত্য চাহিদা হাসির হিন্দোল একেবারে বর্জনপূর্বক বৌদ্ধ শ্রমণদের কঠোর গাম্ভীর্য অনুকরণে যে যুগে অনেক যুবককেই অস্বাভাবিক অকালপক্কতা দান করে, যুবক কবি সেই সকল যেপলা জালের গণ্ডির বাহিরে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। স্বাধীনতার পূজক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী তখন তাই "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়" বলিতেছে আর বঙ্কিমচন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণপাতে 'বঙ্গদর্শন' করিয়া প্রতিভার সোমধারা "প্রচারে" ধর্মব্যাখ্যা ও 'লোকরহস্য' উদ্‌ঘাটনে, লোকশিক্ষা ও মনোরঞ্জন রচনাবলীতে

দিক প্লাবিত করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও অব্যবহিত পরে ধুতি চাদর পরা বাঙালীর ও বঙ্গদেশের হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, এমন কি "কণিকা" কণিকা করিয়া স্বর্ণ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বহুপরে বঙ্কিমের অনুসরণে গদ্যকবিতায় (গদ্য গাথায়) রবীন্দ্রনাথ কলনাদিনী স্রোতস্বতীতে নিজেকে শতধা করিয়া মেলিয়া দিয়া বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্র ও বাঙালীর মনকে উর্বরতা দান করিয়াছেন। অরুণোদয়ের উষালোকে বঙ্কিমের রসজ্ঞ সমালোচক ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'গোচারণের মাঠের' দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলেন, রামেন্দ্রসুন্দর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' শুনাইলেন, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বেনের মেয়ে'র সুখ-দুঃখ কাহিনীতে গ্রথিত করিয়া আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতিকে নিজের ঘরের কথা ও ভাষার সহিত পুনঃ পরিচয় করাইয়া দিলেন। আলপনা দেওয়া প্রাঙ্গণে কথিত ভাষার ঘট হস্তে গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ পূর্বে যিনি শুদ্ধ ভাষাতেই উপন্যাস ও গল্প রচনা করিয়াছিলেন। পরন্তু দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধে নূতন সুর জাগাইয়া গাহিলেন—

জানি না তোর ধন রতন
আছে কিনা রাণীর মতন
জানি শুধু ভরে যে মন
তোমায় ভালোবেসে
সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।

পারসী ও আরবী কথার বুকনি দেওয়া "কর্দেরিফং" প্রণেতা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতাবলী সেকালের শিক্ষিত সমাজে যেমন আদর পাইত তেমনি সংগীত আসরেও ফার্সি গানেরই প্রথা বর্তমান থাকায় কালী মীর্জা (মুখোপাধ্যায়) ও রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) প্রভৃতিকে বাঙলায় মিয়া কি মল্লার ও সরির টপ্পা ভাঙিয়া মিলন বিরহাদি বর্ণনাত্মক বাঙলা বাণীযুক্ত গানের উদ্ভব করিতে হয় ও "বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা" বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয়। সাধারণ বাঙালী প্রাণ তখন তেমন গানের জন্য লালায়িত যাহার বাণী বোঝা যাইবে ও প্রাণস্পর্শী হইবে। তাই নাচাড়ি ছন্দে প্লাবিত বঙ্গদেশে কবির দলের প্রতিপত্তি ও খাঁটি বাঙলা গানের ও তৎসঙ্গে মার্গ সংগীতের উপভোগের জন্য হাফ আকড়াই ও ফুল আকড়াই গঠিত হয়। কিন্তু বিশেষ ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য ও উচ্চদরের সংগীতজ্ঞ, গায়ক বাদক, বিচারক ও তৎসঙ্গে সমঝদার শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশ ঘটানো দু'চারজন ধনাঢ্য ব্যক্তির উৎসাহ ভিন্ন হইত না।

বাঙলার মাটির গুণে "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল মলয়সমীর" যাবৎ বহমান, কানুকে অবলম্বন করিয়া বহুতর গান ও গীতিকাব্য জন্মিয়াছে ও আদর পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকেও ঐ তথ্য আকৃষ্ট করে। শ্রোতার মন বহুকালের সেচনে সিক্ত ছিল, তাই তাঁহার গীতগুলি অধিক জনপ্রিয় হয়। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর জন্য ভক্তমাল, অবদানশতক বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা, রাজস্থান, মহাবস্তুবদান ও উপনিষদ হইতে আহরণ করিয়াছেন। পরদুঃখকাতর রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবের সমস্যায় অধিক মনোযোগী, তাই ঘটনাপঙ্ক্তির মধ্যে পড়িয়া কোনো চিত্ত কী দুঃখ ও মনঃকষ্ট ভোগ করে ও করিতে পারে তাহার ছবি দিতে তিনি সুনিপুণ তুলিকা চালাইয়াছেন। আজীবনই জলপ্রপাতের মতো বহু নিম্নে স্থিত পাষাণবক্ষে কারুণ্যের প্রস্রবণ উৎক্ষেপ করিয়াছেন। চিত্তের গভীরতম tragedy-র দিকে দেশবাসীর মনকে তিনি টানিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয় স্পন্দন
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।

আবার তিনি যে সকলের সাথে মিশাইয়া আছেন তাহার প্রকাশ গীতিমাল্যে—

যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশীতে
জননীর মুখ তাকানো হাসিতে
সে সুরে আমারে বাজাও!

তখন বাউল গানের প্রচলন খুবই ছিল। ইহার শক্তির উৎসের সন্ধানে পরবর্তীকালে কবি ধাবিত হন। তাঁহার দীর্ঘকাল শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে বাস হেতু প্রাণের সে অভাব মিটিয়াছে। তিনি ভিখারী বৈরাগী ফকির ও বাউলের নিকট এই শ্রেণীর বহুগান শোনেন। দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব মিশ্রণে যে সুন্দর কাব্য ও গান হয়, যাহা কথা ও সুরের বিশিষ্ট মোচড়ে মর্মস্পর্শী করা যায়, সর্বশ্রেণীর লোকের পক্ষে সহজে ব্যবহৃত হইতে পারে, যাহা thoroughly democratic, তাহাই তিনি আবিষ্কার করেন। ফলে, তাঁহার কতকগুলি রচনা "বাউল" নামে প্রকাশিত হয় ও 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র অবাধ বিচরণ ও "ফাল্গুনীতে" অন্ধ বাউলের আবির্ভাব। তিনি ইহাদের ভাবে এতটা মুগ্ধ হন যে spiritual expression-এর জন্য ইহাদের ভাবভঙ্গি অনুকূল বিবেচনা করেন। আভিজাত্যের ও কৃত্রিমতার গণ্ডিতে তাঁহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিত, তাই শান্তিনিকেতনের তরুচ্ছায়ে যখন বর্ষান্তে নীল আকাশে শ্বেত পতাকা এবং বঙ্গের প্রান্তরে ধবল কাশফুলের দোলন দেখা যায়, দূরগামী ধবল বলাকামালা কাদম্বিনী-কোলে শোভায়, তখন পলিতকেশ 'ঠাকুরদা' বালকদলের অগ্রণী হইয়া তাহাদের সঙ্গ বড়ই ভালোবাসিতেন। তাই তাঁহার পরিণত কালের রচিত "শারদোৎসব" ও বালকের ক্রোড়ে দেওয়া "মুকুটএ" ভাবে ভাষায় কথার গাঁথুনি ও বাঁধুনিতে ও নাটকের গঠনে, অংক বিভাগে তুলনায় দেখা যায় ভারতের ভাবধারা, ভারতের বাণী তাঁহার রচনাকে পাশ্চাত্য প্রভাব অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্ট করিয়াছে। কালিদাসের ও বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রভাব, রামপ্রসাদী সংগীতের অর্থালংকার অলংবিস্তর রচনায় প্রকাশ। তবে 'রাজা', 'ডাকঘর' ও তৎপরবর্তী রূপক নাটকগুলি কিছু পরিমাণে মাতার্লিংকের নাটকগুলির সগোত্র।

রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্কিমযুগের সাহিত্যিক বলিয়া নিজেকে স্বীকার করেন তখন তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শে ও সাহিত্যিক জীবন গঠনে সে যুগের কিছুটা প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কী ধারণা তাহা বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে বিশেষ অধিবেশনে "বঙ্কিমচন্দ্র" সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে পরিস্ফুট। তিনি বলিয়াছেন—

"পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা আনন্দ উচ্ছ্বাসের

সহিত আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। দুই কালের সন্ধিস্থলে যাহারা না দাঁড়াইয়াছে, তাহারা সেই প্রবল প্রভেদ কিছুতেই অনুমান করিতে পারিবে না। * * * কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আমাদের প্রথম বর্ষার মতো আদৃত এবং ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। বঙ্গভূমি জাগ্রত কলরবে মুখরিত।

"তৎপূর্বে বাঙলাকে কেহ শ্রদ্ধা সহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষা তখন অত্যন্ত দীন মলিন ভাবে কাল যাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

"বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল, সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ও দরিদ্রের সুখ দুঃখের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও গভীর সহানুভূতি। কবির অনুভূতিও বিবিধ এবং বিচিত্র এবং তাহার প্রকাশ-ভঙ্গিমা অপরূপ। তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, ভোগের মধ্য দিয়া অন্তরের সংযম ও ত্যাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কবির আর একটি বিশিষ্ট ভাব তাঁহার জীবন দেবতা। কবি মনে করেন যে তিনি যন্ত্র মাত্র, জীবন দেবতাই তাঁহার অন্তরে থাকিয়া "যন্ত্রী" ভাবে সুর তুলিতেছেন। রসানুভূতি ও প্রেরণা সাহায্যে তাঁহার জীবনকে পূর্ণতা ও পরিণতির দিকে লইয়া যাইতেছেন। ইনি তাঁহার অন্তরবাসী প্রচ্ছন্ন পুরুষ। হিন্দু চিন্তানুসারে হৃষীকেশ :—

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি
আমার হৃদয় পানে চাইনি।

বহুকাল পরেও বিপত্নীক রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

অন্ধকারে ব'সে আছি এলে কোথা হতে
মন বলে তুমি।

অসীমকে সীমার মাঝে অনুভব—

কঠিন পাথর কাটি, মূর্তিকর গড়িছে প্রতিমা
অসীমের রূপ দিক জীবনের বাধাময় সীমা।

সাধকের পক্ষে সদাই কাম্য—

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব হেতু
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুম্
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েহহং ভবন্তম্।
(মুকুন্দমালা)

জগতের দ্বন্দ্ব সুখ দুঃখ হইতে পরিত্রাণের জন্য, হে ঈশ্বর, তোমার চরণ বন্দনা করি না। ঘোর কুম্ভীপাক নরক হইতে ত্রাণের জন্য তোমার সেবা করি না কিংবা সুন্দরী সহযোগে স্বর্গের সুখভোগের নিমিত্ত অভিলাষী নই। তোমার আরাধনা করি যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রতি ভাবের মধ্যে তুমি অবস্থান করো।

ইষ্টদেবকে নিজের মধ্যে অনুভব ও বাহিরের সব কিছুতেই তাঁহাকে দর্শন করা। ইহারই অপর পিঠ সোঽহং জ্ঞান, তৎসৎ বা তত্ত্বমসি।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন যে মানুষ দেশ, কাল, শিক্ষা, সাধনা, সভ্যতা, আচার ও প্রাদেশিক সংস্কারের আবেষ্টনে যতই বিচ্ছিন্ন হউক না কেন, মানুষের অন্তরে অন্তরে একটা রসের যোগ আছে যাহাতে মানুষমাত্রের সহিতই মানুষের সহানুভূতি জাগে। এই যোগ আছে বলিয়াই বিভিন্ন বিদেশীয় শিল্প ও সাহিত্যের রস গ্রহণে সে আকৃষ্ট ও সমর্থ হয় এবং পরের সুখে দুঃখে আনন্দ ও কষ্ট বোধ করে। তাঁহার মতে শিল্প ও সাহিত্য যতটা মানবতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততই তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইহা তাঁহার নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ রচনার ভিত্তি।

সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে

দেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে মধ্যে মধ্যে এক একটি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যাহাতে দেশবাসীর রসবোধ মার্জিত, উন্নত ও প্রশস্ত হয় তজ্জন্য ধীরে ধীরে অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত প্রবন্ধ, সমালোচনা, কৌতুকরচনা, সংবাদ সংকলন ও সঞ্চয় দ্বারা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া, তাহাতে নূতন নূতন ভঙ্গীপ্রদানে সর্ববিধ ভাবের প্রকাশশক্তি দানে যত্নবান ছিলেন। একটা সতেজ জাতিগত সাহিত্যিক জীবন বা চিন্ময় ভাবানুকূল আবহাওয়া (intellectual life and atmosphere) তিনি সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন। মানুষের বিভিন্ন চেষ্টার ও বৃত্তির উপযোগী চিন্তা-বৈচিত্র্য লইয়া বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক সাময়িক পত্রাদির উদ্ভব বাঙলা ভাষায় হইতেছিল। রাজনীতি, কৃষি, আয়ুর্বেদ, বিজ্ঞান, শিল্প, নাট্যকলা, চিকিৎসাতত্ত্ব আচার ও ধর্ম এবং বালক বালিকাদের উপযোগী পাঠ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বাঙলা ভাষার প্রসারতা ও কার্যকুশলতা দিন দিন পরীক্ষিত হইতেছিল। নবাগত ভাবের প্রবাহে ভাষারও সংস্কারে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল। কবিও এই অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া, সময়ে সময়ে বিশিষ্ট ভাবব্যঞ্জক ও চিন্তার দ্যোতক কাগজে বাহির করিয়া জনমত গঠন ও দেশের ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ভাষাতত্ত্বও মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিতেন। বর্তমান যুগে সকল সভ্যজাতির মধ্যে খবরের কাগজ রাষ্ট্রচেতনা ও রাষ্ট্রচালনার সহায়ক বলিয়া বিবেচিত। কামান অপেক্ষা অনেক সময় দেখা যায় বরনা কলম অধিক শক্তিশালী। পত্রিকা সম্পাদন ও পরিচালন যেমন গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ তেমনই দূরদৃষ্টি, কার্যদক্ষতা ও তৎপরতার পরিচায়ক। সম্পাদকেরাও জননেতা হিসাবে বহু প্রভাবশালী বলিয়া গণ্য হন। আমাদের দেশে সংবাদপত্রের প্রতি সম্ভ্রমবোধ আনয়নে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিগণ উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এক এ পত্রিকা বসুমতী, প্রবাসী ভারতবর্ষ, বিচিত্রা প্রভৃতি বাড়ী উন্নতি ও জাতির প্রধান সম্বল মাতৃভাষার এক একা বক, বলা যায়। কবির পিতামহ যখন বেঙ্গল হরকরা যাকে আগে

পত্রের মালিকত্ব (১৮২৯ খৃঃ) ক্রয় করেন তখন তাঁহারও জনমত গঠন ও প্রচলনের দিকে লক্ষ্য পড়ে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীকে স্বীয় রসানুভূতি বণ্টন করিয়া তাহার সাহায্যে তাহাদের চেতনা, প্রেরণা ও কার্যকারিতা ভিতর হইতে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ছাপাখানা সংক্রান্ত সম্পাদকের গতানুগতিক দৈনন্দিন সকল নীরস কার্যের বোঝা শ্রদ্ধার সহিত বহন করিতেন। যাহাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সাহিত্য সাধনার সহিত বাঙালী উত্তরকালে গৌরবের আসন প্রাপ্ত হয় সেজন্য সমগ্র বঙ্গভাষীদের ও বাণীসেবকদের নিত্য পূজা ও নৈমিত্তিক অর্চনার উপযুক্ত দৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত, বৃহত্তর ও প্রশস্ত বেদিকার উপর একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণে জীবনের বহু বৎসর তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙলা শব্দের ও ব্যাকরণের অনুশীলনোদ্দেশ্যে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙলার তদানীন্তন প্রথিতনামা সাহিত্যরথীদের লইয়া "বিদ্বজ্জন সম্মিলনী" নামক সাহিত্য-সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সে সমাজ কিন্তু স্থায়িত্বলাভ করিল না। বহু বৎসর পরে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের উদ্যোগে ১৭ জন সাহিত্যানুরাগী মিলিত হইয়া ১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ (২৯এ জুলাই ১৮৯৩) রবিবার তাঁহার ২১২ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ফরাসী য়্যাকাডেমী অব লিটরেচারের ন্যায় Bengal Academy of Literature নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হয়। পরে রাজাবাহাদুরের ১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীটস্থ নূতন বাসভবন নির্মিত হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মূল ভিত্তি। ইহার গঠনকর্তাদের অন্যতম ছিলেন মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজা বিনয়কৃষ্ণ (তখন মহারাজ-কুমার) সভাপতি, হীরেন্দ্রনাথ ও এল্ লিওটার্ড সহসভাপতি।

সভার উনবিংশ অধিবেশনে ১০ই পৌষ রবিবার ১৩০০ ইং ২৪ ডিসেম্বার ১৮৯৩ রাজনারায়ণ বসুর একখানি বাঙলা পত্র পাঠ করা হয়। পত্রে President, Bengal Academy of Litt. বলিয়া না লিখিয়া "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি"রূপে সম্বোধন ছিল। এই পত্রে লেখক প্রস্তাব করেন যে বাঙলা ভাষায় সভার কার্য সম্পাদিত হওয়া উচিত। পত্রের শেষের প্রস্তাব—যদি সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তবে মাতৃভাষা অনুশীলন না করিলে সে খ্যাতি লভনীয় নহে।

এ প্রস্তাব সভা গ্রহণ করিল না। প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান লেখক উমেশচন্দ্র বটব্যাল ১৩০০ সালের ৭ই ফাল্গুন রবিবার ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ অধিবেশনে সভ্যগণকে অনুরোধ করিলেন—অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জাবোধ হয়। তখন ঐ তারিখেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নাম স্থির হইল। [illegible]র অধিবেশনই পরিষদের প্রথম অধিবেশন। প্রথম সভাপতি তাঁহার গীত [illegible]দত্ত, সহ-সভাপতি নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্য ভক্তমা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মহাবস্তবদান সহ-সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তাফি। সাহিত্য পরিষদের রবীন্দ্রনাথ (Hony. member) রূপে পরিষদের গৌরব কবি ঘটনাপঞ্জির

বর্ধন করেন ও ইহার প্রসার বৃদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। যাঁহারা পরাশ্রয় হইতে আনিয়া পরিষদকে নিজাশ্রয়ে স্থাপিত করিতে কৃতসংকল্প হন, কবি তাঁহাদের অগ্রণী। রবীন্দ্রনাথ, পরিষদের একবার সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর, সুরেশ সমাজপতি প্রমুখ এগারোজন সভ্যের স্বাক্ষরিত পত্রানুসারে পরিষদের কার্যালয় কোনো সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে আলোচনা হয়। পরদিন ১৩০৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন কার্যালয় ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে (শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের মোড়ে) ভাড়াটিয়া বাড়িতে লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় পরিষদের বহু পুস্তক কবি নিজ হস্তে তাঁহার গাড়িতে অনেকবার তুলিয়া নূতন কার্যালয়ে পৌঁছাইয়া দেন। পরে বর্তমান নূতন ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের লোকের নিকট কবি ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারস্থ হন। ৺দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র পরিষদ-গৃহের জন্য হালসি বাগানের ভূমিখণ্ড যে পঞ্চজনার হস্তে ন্যস্ত করেন কবি তাঁহাদের অন্যতম। পরে লালগোলার ক্যাপ্টেন মহারাজা স্যার—যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় নিজ ব্যয়ে দ্বিতল নির্মাণ করাইয়া দেন। পরে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হইতে থাকে ও পরিষদের মিউজিয়াম গঠিত হয়। ১৩১৫ সালের ২১ অগ্রহায়ণ (১৯০৮, ৬ই ডিসেম্বর) পরিষদের বর্তমান নবনির্মিত মন্দিরে মন্দির-প্রবেশ যেদিন আপার সারকিউলার রোডে, এই উপলক্ষ্যে অগণিত জনমণ্ডলীকে পরিষদ-ভবনের সম্মুখে ও অভ্যন্তরে দেখা গিয়াছিল। বাঙলা সাহিত্যের নামে এত লোক জমায়েত অভূতপূর্ব! নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় ও দু-চার জন, জনতাকে শান্ত করিলে কবি অভিভাষণ দেন—

ভারতে প্রাচীনকালে পুত্র শব্দের অর্থ ছিল যে পূর্ণ করে। পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ ব্যাখ্যাটি পরবর্তীকালের। পিতা-মাতার অকৃতার্থতা ও অসমাপ্তি হইতে মুক্তিলাভের জন্যই পুত্রকে আমাদের দেশে দেবতার বিশেষ প্রসাদলাভের মতোই গণ্য করে। বন্ধত্ব মাত্রেই বন্ধন। যাহারা নিরন্তর কালের মধ্য দিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে দেশের সংকল্পকে সিদ্ধির পথে, মুক্তির পথে লইয়া যাইবে, তাহারাই দেশের পুত্র। তাহারা নানা কালের চেষ্টাকে একত্রে বাঁধিয়া চলিবে। দেশের চিত্তকে নানা ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে ও অনাগত কালের মধ্যে বহন করিয়া চলিবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে বঙ্গমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া আনন্দ পাইতেছি। ইহা বঙ্গদেশের আত্মপরিচয় চেষ্টাকে গ্রামে জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, এক কাল হইতে অন্য কালে বহন করিয়া চলিবে। পুত্র পিতৃ-কীর্তিকে এইরূপে ভবিষ্যৎ অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া অতীতের সহিত অনাগতকে এক করিয়া মানুষকে কৃতার্থ করে। সাহিত্য পরিষদও বাঙলা দেশের চিত্তকে নিত্যতা দান করিয়া তাহাকে সত্য করিয়া তুলিবার আশা বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার অভ্যুদয়কে দেশের পুণ্যফল বলিয়া গণনা করিতেছি।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আমার এই স্মৃতিকথা আমি লিখে চলি আরও ওই সব বিস্বাদ, বিবর্ণ, ঝিমিয়ে-পড়া, শ্বাসবিরোধী মুহূর্তগুলিকে সহনীয় করে তোলার জন্যে—

আমার এই স্মৃতিকথা যদি কখনো প্রকাশ পায় যদি কখনো দেখে দুনিয়ার আলো—আমার চোখের সামনে থেকে সে আলো যখন নিবে যাবে—আমার স্মৃতিকথাকে ঘিরে সমস্ত সমালোচনার ঝড়ের মুখের উপর আমি যখন হেসে উঠতে পারবো। এই দুনিয়াটাকে তো সহজেই দুটি ভাগে ফেলা যায়—একটি, বলতে গেলে বড় অংশটাই তো শুধু অজ্ঞতা আর অল্পশিক্ষার উচ্ছ্বাসে ভরা—আর একটি অংশ গভীর চিন্তাশীল আর শিক্ষিতদের। তাঁদের উদ্দেশ্যেই আমার পরিচিতি জানাই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা আমাকে বুঝবেন—শুধু বোঝা নয়, আমার সমস্ত কাজ অকাজ, ভালো-মন্দ ত্রুটি-বিচ্যুতির এই নির্ভীক স্পষ্ট আর সত্য রূপায়ণের প্রকৃত মূল্য, তাঁরাই দিতে পারবেন। এখনো অবধি যত দূর লিখেছি এই স্মৃতিকথা কোথাও করিনি একটুকু অতিরঞ্জন, কোথাও করিনি একটুকু অতিক্রম সত্যকে—আমার লেখনী দ্বিধাভরে থেমে যায়নি—বিচার করে দেখতে যে সত্যকে সে অকপটভাবে প্রকাশ করে চলেছে, সে আমার চরিত্রকে ম্লান, নিষ্প্রভ করে তুললো না, আমার ললাটে কলঙ্কতিলক এঁকে দিলো।

আমার জীবনের ইতিবৃত্ত একটানা সুরে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নয় কোথাও। এই স্মৃতিকথা কলুষিত করবে না কোনো পাঠক-হৃদয়—আমার উদ্দেশ্যও তা' নয়—কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা, আমার পাপ, আমার পুণ্য, আমার আদর্শ—এই সবের কাহিনী থেকে যা' পাবার সেই পাবে যে জ্ঞানে মৌমাছির মত অনেক ফুলের মধু সঞ্চয়ে আপন মধুকোষ পূর্ণ করে তুলতে।

• • • •

মাদ্রিদে কাটলো আরও পাঁচ-ছয় সপ্তাহ—ছোটোখাটো বিড়ম্বনায় ভরা। শেষের দিকে কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ মেলামেশা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলাম—নেহাৎ দু'-একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু আর স্নেহ-কৌতুকময়ী ইগ্নাশিয়া ছাড়া। তার পর আবার যাত্রা সুরু করলাম। কিন্তু আমার নিষ্ঠুর ভাগ্য দেবী বার্সিলোনার পথে ভ্যালেনসিয়ায় আমার যাত্রা রোধ করলেন। কয়েক দিন বিশ্রামের জন্য থেকে গেলাম ভ্যালেনসিয়া তে। এখানে একদিন বিখ্যাত 'ষাঁড়ের লড়াই' দেখতে গিয়ে মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখলাম একটি মহিলাকে—কি অপরূপ, কি আশ্চর্য সৌন্দর্য! শুধু অনিন্দ্যসুন্দর দেহসৌষ্ঠবই নয়—অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল সে রূপ মনে বুঝি চিরন্তন ছাপ রেখে যায়। কৌতূহল চাপতে না পেরে পাশের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম মহিলাটির পরিচয়।

—"ও, উনি হোলেন বিখ্যাত 'নিনা'।

—"বিখ্যাত কেন?"

—"সে কাহিনী যদি না জেনে থাকেন তবে এখন এখানে সে বিরাট কাহিনী বলা মুস্কিল।"

মিনিট দুয়েক মধ্যেই একজন সুবেশ ভদ্রলোক—যদিও চেহারাটায় কিঞ্চিৎ দুর্বৃত্তের ছাপ—সেই অপরূপ সৌন্দর্যময়ীর পাশ থেকে উঠে এসে আমার পাশের ভদ্রলোকটির কানে কি ফিশফিশ করে বললেন। তিনি আবার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে জানালেন যে, ওই মহিলাটি আমার পরিচয় জানতে চান। একটু বিগলিতই হোলাম বৈ কি এই অনুরোধে—তাই জানালাম মহিলাটির সম্মতি পেলে আমি নিজেই যাবো খেলার শেষে আমার পরিচয় দিতে।

—"আপনার কথার ভঙ্গীতে মনে হোচ্ছে আপনি ইতালীয়।"

—"হাঁ, ভেনিসের লোক।"

—"মহিলাটিও তাই।"

ভদ্রলোকটি মহিলাটির কাছে ফিরে গেলে আমার পাশের ভদ্রলোকটি এবার নিজে যেচেই এগিয়ে এলেন আমার কাছে মহিলাটির পরিচয় দিতে। নিনা একজন নর্তকী—তাছাড়া কাউন্ট অ্য বিকলার রক্ষিতা। কয়েক সপ্তাহ ধরে নিনা ভ্যালেনসিয়াতেই আছে; কারণ দুর্নাম আর অপবাদের জন্য বিশপ ওকে বার্সিলোনায় থাকতেই নিষেধ করেছেন। বার্সিলোনার ক্যাপ্টেন জেনারেল কাউন্ট অ্য বিকলা নিনার প্রেমে উন্মাদ—ওঁর কাছ থেকে নিনার দৈনিক বরাদ্দ পঞ্চাশ ডাবলুন।

—"তা' বোধ হয় উনি খরচ করেন না?"

—"করতে পারেন না। কারণ দিনে অন্ততঃ হাজারটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে থাকেন আর তার জন্য বেশ কিছু মূল্য দিতে হয় বৈ কি"—

খেলার শেষে গেলাম ওই নর্তকীর কাছে। উনি তখন ছয়টি খচ্চরে-টানা ওঁর সুদৃশ্য গাড়ীটিতে উঠতে যাচ্ছেন। আমাকে অভ্যর্থনা করলেন সেখানেই, নিমন্ত্রণ জানালেন পরদিন প্রাতরাশের। বললাম এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু হোতে পারে না—তখনো সেই বিগলিত ভাব আমার।

ছোটো ছোটো বহু উদ্যানঘেরা বিরাট প্রাসাদের মত বাড়ী নিনার। চতুর্দ্দিকে বহুমূল্য সুদৃশ্য আসবাব—আর অসংখ্য পরিচারক, পরিচারিকা, প্রত্যেকেই রীতিমত মূল্যবান উজ্জ্বল সুন্দর পোষাকে সজ্জিত। যে ঘরে আমাকে নিয়ে গেলো সে ঘরে ঢোকবার আগে

থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম তীব্র তীক্ষ্ণস্বরে কে যেন কাকে বকছে। ঢুকে দেখি সে স্বর নিনার—আর টেবিলের কাছে একজন ব্যবসায়ী ধরণের লোক বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে। তার জিনিষপত্র সব টেবিলে ছড়ানো।

—"আমার রাগ দেখে কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এই বোকা স্পেনীয়টা জোর করে আমাকে বোঝাতে চায় যে এগুলো খুব ভালো লেশ"—নিনা আমার দিকে চেয়ে বললে।

সত্যিই লেসগুলি খুবই ভালো। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো মতামত না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হোলো। বিশেষ করে এই প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই মতবিরোধ হওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না। চুপ করে রইলাম।

লেসওয়ালা বললে—"মাদাম, লেসগুলো যদি পছন্দ না হয় তবে থাক্। অন্য জিনিষগুলো কিছু রাখবেন ?"

—"হ্যাঁ, আর ওই লেসগুলোর সম্বন্ধে, অন্তত তোমাকে বোঝাবো যে আমার ব্যয়কুণ্ঠতার জন্য সে ওগুলি কিনিনি তা নয়"—বলেই একটা কাঁচি নিয়ে সমস্ত লেসগুলি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললে। যে লোকটি কাল ওর কাছ থেকে আমার পরিচয় জানতে এসেছিলো, তাকে দেখলাম ওই লেসগুলির পরিণতি দেখে শিউরে উঠতে।

—"ঈশ! আহা-হা-হা। কি করলে? লোকে যে পাগল বলবে তোমাকে!"

—"খুব হোয়েছে, চুপ করো—" বলেই নিনা লোকটিকে সজোরে এক কানমলা দিলে। সেও একটা তীব্র মন্তব্য করে বসলো। দেখলাম নিনা তাইতে কৌতুক উপভোগ করে হো-হো করে হেসে উঠলো। পরক্ষণেই ফেরিওয়ালাকে টাকার বিল দিতে বললে। সে কাগজটা এগিয়ে দিতেই টাকার অঙ্কের প্রতি দৃকপাত না করেই সই করে জানিয়ে দিলে অমুক লোকের কাছে গেলেই টাকা দিয়ে দেবে।

এতক্ষণে এলো গরম চকোলেটের গ্লাস। নিনা পরিচারিকাকে পাঠালে কানমলা খেয়ে পালিয়ে যাওয়া ভদ্রলোকটিকে ডেকে আনবার জন্য। আমার দিকে চেয়ে বললে,—"আপনি অবাক হবেন না ওর সঙ্গে আমার ব্যবহার দেখে। ও লোকটার কোনো মূল্যই নেই, একদম হতভাগ্য ওটা! কাউণ্ট রিকলা ওকে এখানে রেখেছেন আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে। ওকে মারলাম কেন জানেন? যাতে ও এই সমস্ত খবর ওর প্রভুটিকে লিখে জানায়।"

বিস্মিত হোয়ে শুধু দেখছিলাম নিনার প্রত্যেকটি আচরণ। সাধারণ কিছুর সঙ্গে যেন ওর তুলনাও করা যায় না। হতভাগ্য গোয়েন্দাটা এসে হাজির হোলো। আমাদের সঙ্গে চকোলেট খেতে খেতে একটি কথাও বললে না। ও চলে যেতে স্পেন, ইতালী, পর্তুগাল নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হোলো নিনার সঙ্গে। ওর সঙ্গে পরিচয়ে শুধু উত্তরোত্তর আশ্চর্য্যই হচ্ছিলাম। ঠিক এমন চরিত্রের কোনো মহিলা যে সম্ভব আমার এতদিনের অভিজ্ঞতাতেও তা জানতাম না। শুনলাম ও বিবাহিতা, ওর স্বামীরও নাচের পেশা। তাছাড়া ভেনিসের বিখ্যাত হাতুড়ে ডাক্তার পেলান্দির কন্যা। সব পরিচয় দেওয়া হোলে ও আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করলে সেইদিনই। কথা দিলাম নিমন্ত্রণ রাখবো। কিন্তু তার আগে একটু বাইরে বেড়িয়ে আসবার জন্যে তখনকার মত বিদায় নিলাম। প্রয়োজন ছিলো একটু একা ঘোরার—এই অসাধারণ চরিত্রের আশ্চর্য্য সুন্দরীর সম্বন্ধে মনে মনে একটু বিশ্লেষণ করার।

আশ্চর্য্য মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য নিনার! কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, শুধু সৌন্দর্য্য দিয়ে কোনো নারী পুরুষকে সুখী করতে পারে না। কারণ যত সৌন্দর্য্যই ওর থাক আমার কোনো অনুভূতিকেই ও জাগাতে পারেনি। নিমন্ত্রণের সময় গিয়ে দেখলাম, ওই প্রচণ্ড শীতেও গোয়েন্দাটার সঙ্গে নিনা বাগানে বেড়াচ্ছে—অত্যন্ত হালকা পোষাকে। আমাকে দেখে নিনা এগিয়ে এলো। আর খুব ঘরোয়া ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। খেতে খেতে নিনার কাছ থেকে অন্তত হাজারখানেক লাম্পট্যের কাহিনী শুনলাম, যার প্রত্যেকটির নায়িকা হোলো নিনা। আহারের পর প্রচুর পরিমাণে দামী সুস্বাদু মদ পরিবেশন করা হোলো। নিনা শুধু কৌতুক দেখবার জন্যে ওই হতভাগাটাকে এত মদ খাওয়ালে যে শেষে ও অজ্ঞান হোয়ে মেঝেতে পড়ে গেলো

আসার সময় নিনা আমাকে পরদিন সন্ধ্যায় শুধু নয়, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে আহারের নিমন্ত্রণ জানালে। আরও বললে যে, আমাদের নিভৃত আলাপে কেউ বাধা হবে না; কারণ ওই গোয়েন্দাটা অসুস্থ হোয়ে পড়বে এটা নিশ্চিত।

পরদিন সন্ধ্যায় যেতেই নিনা এগিয়ে এসে কৃত্রিম বিষাদভরা কণ্ঠে বললে,—"আহা, আজ মল্লিনারী (গোয়েন্দার নাম) অসুস্থ হোয়ে পড়েছে।"

—"তুমি বলেছিলে অসুস্থ হোয়ে পড়বে। তবে কি ওকে কিছু বিষ-টিষ দিয়েছো?"

—"স্বচ্ছন্দেই দিতে পারতাম—কিন্তু দেওয়া হয়নি।"

—"কিন্তু অন্য কিছু নিশ্চয়ই খাইয়েছো"—

—"ও যা ভালবাসে তাছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ওকথা থাক। তার চেয়ে আজ রাতটা উপভোগ করি এসো। আবার কাল সন্ধ্যায় তুমি আসবে—"

—"বোধ হয় না, কারণ কালই আমি ভ্যালেনসিয়া থেকে চলে যাচ্ছি।"

—"উঁহুঁ, যাওয়া তোমার হবে না। ভয় নেই, তার জন্যে তোমার গাড়ীর কোচম্যান একটা কথাও বলবে না। তাকে তার প্রাপ্য টাকা দিয়ে দেওয়া হোয়েছে—এই দ্যাখো রসিদ"—

এমন মধুর কৌতুকে আবদারের ভঙ্গীতে নিনা কথা বলছিলো যে রাগ হওয়া দূরের কথা হাসতে হাসতেই ওকে বললাম, ওর এতখানি সমাদরের যোগ্য নই আমি।

—"আরও অবাক লাগে আমার—এই বিরাট প্রাসাদের অধীশ্বরী হয়েও তোমার সঙ্গীর এত অভাব কেন? কেউ তো আসে না তোমার কাছে?"

—"কারণ সবাই ভয় পায় আসতে—ভয় পায় কাউণ্ট রিকলা—ওর অতি হিংসুক প্রকৃতিকে আর সবাই জানে, ওই অসুস্থ জানোয়ারটা এখানের প্রতিটি কথা প্রতিটি ঘটনা রিকলার কানে তুলে দেবে।

—"আমাদের কথা—আমাদের একত্রে আহার। আলোচনা সব কিছু?"

—"খুবই সম্ভব! কিন্তু ভয় পেলে নাকি?"

—"পাইনি এখনও—কিন্তু প্রয়োজন বুঝলে তোমায় জানিয়ে দেওয়া উচিত।"

—"প্রয়োজনই নেই—দোষটা তো সব আমার ঘাড়েই পড়বে।"

—"কিন্তু আমার জন্যে যে তোমার আর তোমার প্রেমিকের মধ্যে ভাঙন ধরবে তা' আমি চাই না।"

—"আমি যত ভালাই ওকে ও ততই আমাতে মুগ্ধ হয় আর সেই মিটমাটের দাম ওকে দিতে গভীর ভাবে"—

—"তার মানে তুমি ভালোবাসো না ও-কে"—

—"বাসি—ওর সর্বনাশ করার জন্তেই ভালোবাসি—কিন্তু ওর সম্পদের প্রাচুর্য্যের কাছে আজও পরাজিত—"

আশ্চর্য্য এ নারী! পাপের মতই এর মাধুর্য্যের আকর্ষণ—গোপন অন্ধকারের দূতীদের মতই কলুষিতা—নাগিনী-কন্তার মত বিষধরী···আর মৃত্যুর মত ভয়ঙ্করীরূপে ও সর্বনাশ করবে তারই, যে দুর্ভাগা ওকে ভালোবাসবে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার নিনার আতিথ্যে আমি অভ্যস্ত হোয়ে পড়লাম। বিশেষ করে আমরা তাস খেলায় সময় কাটাতাম। যার ফলে আমার পকেটের শূন্ততা ভরে উঠতে লাগলো। কয়েক দিনের মধ্যেই গোয়েন্দাটা সুস্থ হোয়ে উঠলো। সে-ও এসে আমাদের আসরে যোগ দিলে। কিন্তু ওর উপস্থিতিতে আর একটুও সচেতন হবার ইচ্ছা জাগতো না। নিনা ওকে দেখিয়ে উচ্ছ্বসিত আদরে আমাকে অভিষিক্ত করে ওকে বলতো, "কাউন্ট রিকার্ডোকে সব লিখে দাওগে যাও—যা খুশী তোমার।"

কিছু লিখেছিলো নিশ্চয়ই, কারণ বেচারী কাউন্টের চিঠি এলো বার্সিলোনাতে নিনাকে ফিরে যাবার কথা জানিয়ে—আশ্বাস দিয়ে বিপদ আর তার ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। নিনা আমাকেও অনুরোধ করলে বার্সিলোনা যেতে—সেখানে প্রতি রাত্রে দশটার পর আমাদের সাক্ষাৎ হোতে পারবে। আর যদি আমার অর্থাভাব থাকে তবে যত টাকা প্রয়োজন ও ধার দিতে রাজী। বার্সিলোনাতে একদিন আগে আমাকে যাবার অনুরোধ জানালে ও। তাহলে পথে তারাগনাতে আমরা মিলতে পারবো। তাই-ই হোলো। কোনো রকম অপবাদ যাতে না রটে তাই আমি আগেই গিয়ে তারাগনাতে আমার পাশের ঘরটাই নিনার জন্তে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

ভোরে উঠে নিনা বার্সিলোনাতে চলে গেলো আমাকে সন্ধ্যার আগে যাত্রা করতে নিষেধ করে দিয়ে। ওর একদিন পরে আমি পৌঁছাবো। তাছাড়া ওর কাছ থেকে কোনো খবর না পাওয়া অবধি যেন আমি দেখা না করি, সে বিষয়েও আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো।

প্রায় একটি সপ্তাহ কাটলো বার্সিলোনাতে—কোনো খবরই নেই নিনার কাছ থেকে। তারপর হঠাৎ একটা চিরকুট একজন দিয়ে গেলো—তাতে ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্তে যেতে লিখেছে—কিন্তু পায়ে হেঁটে আর কোনো পরিচারক না নিয়ে—রাত দশটার পর। সত্যিই যখন ওর প্রতি আমার এতটুকুও ভালোবাসা ছিল না তখন এ ভাবে যাওয়াটা বোকামী হোয়েছিলো বৈ কি—কিন্তু আমার পাঠক সম্প্রদায় জানেন পরিণামদর্শিতা আমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই।

নির্দিষ্ট সময়তেই গেলাম নিরস্ত্র, একাকী। গিয়ে পরিচয় হোলো নিনার বোনের সঙ্গে। বছর ছত্রিশের বিবাহিতা মহিলা। কিন্তু মুহূর্তের জন্তও উনি আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন না। একটি কথাও হোলো না নিনার সঙ্গে একান্ত নিভৃতে।

পরদিন শহরের পথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অফিসার এগিয়ে এলেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে। অতি বিনয়ী, অমায়িক ব্যবহার—আমি বললাম "আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন, আমি কিছুই মনে করবো না।"

—"দেখুন মশায়, আপনি বিদেশী, তাই আপনি স্পেনের লোকদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আপনি জানেন না রোজ রাতে নিনার বাড়ীতে উপস্থিত হোয়ে কি বিপদ আপনি নিজের মাথায় টেনে আনছেন।"

—"কেন কি হোয়েছে? আমার বিশ্বাস কাউন্ট ভালোরকমেই জানেন আমার আসা-যাওয়ার কথা। আর তাইতে তিনি বাধাও দেন না।"

—"জানেন তো নিশ্চয়ই—কিন্তু এখন বাধা না দেবার ভাণ করলেও ভীষণ ভাবে শাস্তি দেবেন এর জন্তু। আমার উপদেশ নিন মশায়, আপনার ওই রাতের প্রমোদ বন্ধ করে দিন।"

—"উপদেশের জন্তে ধন্তবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু যত দিন না কাউন্ট নিজে আমাকে বলবেন কিম্বা নিনা আমাকে যেতে বারণ করবে, তত দিন আমি যাওয়া ছাড়বো না"—

আমি এ ব্যাপার নিনাকে জানাই নি। প্রতি রাতেই যেতাম আগের মত। কি নির্বুদ্ধিতা—প্রেমে পড়লেও একটা কথা ছিলো!

তারিখটা ছিলো ১৪ই নভেম্বর। নিনার ঘরে ঢুকতেই দেখি একজন অচেনা লোক নিনাকে কি সব শিল্পকলা দেখাচ্ছে। কাছে যেতেই চিনলাম লোকটা আমার পুরাতন শত্রু অতি কুখ্যাত এক শিল্পী। সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে গেলো। নিনার হাত ধরে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম, এক্ষুণি ওই শয়তানটাকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে—নয়তো আমি নিজেই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো।

—"কিন্তু ও একজন চিত্রকর।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, আমি চিনি ওকে। সব বলবো পরে, এখন আগে ওকে তাড়াও।"

নিনা ওর বোনকে ডেকে বলে দিলে লোকটাকে চলে যেতে বলতে, আর যেন কখনো না আসে তাও জানিয়ে দিতে। ওর বোন ওকে বিদায় করে এসে বললে, যাবার সময়ে লোকটা বলে গেছে এর জন্তে আমাকে ভুগতে হবে।

পরদিন রাতে আবার গেলাম নিনার কাছে। ওর প্রাসাদের প্রবেশপথটি যেমন দীর্ঘ তেমনি অন্ধকার। মাত্র কয়েক পা' এগিয়েছি এমন সময় দুজন লোক অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি চকিতে এক পা পিছিয়ে এসেই আমার তলোয়ারটা বার করে সবচেয়ে কাছে যে লোকটা তাকে সজোরে আঘাত করলাম। সেই সঙ্গে 'খুন' 'খুন' বলে চীৎকার করে একেবারে পিছন ফিরে ঊর্দ্ধশ্বাসে রাস্তায় পড়ে ছুটতে লাগলাম। পিছন থেকে দ্বিতীয় লোকটা গুলী ছুড়েছিলো একটুর জন্ত বেঁচে গেলাম। প্রচণ্ড বেগে ছুটতে ছুটতে একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে

টুপীটা ছিটকে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু সেদিকে দৃকপাতও না করে সোজা এসে উঠলাম আমার হোটেলে। হোটেলের কর্ত্তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আমার রক্তমাখা তলোয়ার, দু'টুকরো হোয়ে যাওয়া কোটটা ফেলে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম—"আমি শুতে যাচ্ছি, আমার কোট আর তলোয়ার আপনি রাখুন। কাল আপনাকে নিয়ে আমি বিচারালয়ে যাবো ; কারণ আজ রাতে একজন খুন হোয়েছে—আপনি সাক্ষী দেবেন যে আত্মরক্ষা করতে গিয়েই হোয়েছে"—

—"কিন্তু আপনি এই শহর ছেড়ে এই মুহূর্ত্তে পালালেই ভালো করতেন"—

—"তার মানে ? আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না ?"

—"আপনার কথা আমি বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করি—কিন্তু দোহাই আপনি পালান, আমি আন্দাজ করতে পারছি কে আপনাকে আঘাত করেছে—ঈশ্বর জানেন এর পর কি হবে।"

—"কিছুই হবে না, আপনার কথায় এখন যদি আমি চলে যাই তবে নিজেকে দোষী প্রমাণিত করা হবে। আমার তলোয়ারটা রাখুন—দেখি কি হয়।"

ভোরবেলা সাতটারও আগে আমার দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ। হোটেলের কর্ত্তা আর তাঁর সঙ্গে একজন অফিসার আমার ঘরে ঢুকে আমার সমস্ত কাগজপত্র আর পাশপোর্ট চাইলেন আর আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব বেশ পরিবর্তন করে ওঁর সঙ্গে যেতে আদেশ করলেন। অন্যথায় জোর করতে উনি বাধ্য।

—"আমি আপনাদের বাধা দিচ্ছি না, কিন্তু কার হুকুমে আর কি অধিকারে আমার কাগজপত্র পাশপোর্ট আপনি নিচ্ছেন ?"

—"এখানকার শাসনকর্ত্তার আদেশে। অবশ্য আপনার কাগজ-পত্র সন্দেহজনক না হলে যথাসময়ে আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

আমার কিছু জামাকাপড় একটা ছোটো স্যুটকেশে ভরে নিলাম আর সমস্ত কাগজপত্র ওদের দিলাম, তার বদলে অবশ্য একটা রসিদও পেলাম। তার পর অফিসার আর তাঁর লোকজনের সঙ্গে এসে পৌঁছলাম একেবারে দুর্গের ভিতর। সেখানে দোতলায় একখানি খালি অথচ পরিচ্ছন্ন ঘরে আমাকে রাখা হোলো। ঘরের জানলা থেকে সামনেই একটা পার্ক দেখা যায়, জানলায় একটা গরাদ অবধি নেই। একা-একা বসে রইলাম যতক্ষণ না আমার ছোটো স্যুটকেশটা আর একপ্রস্থ বিছানা একজন প্রহরী দিয়ে গেলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম নিনাকে কি এসব জানানো উচিত ? লিখবো একটা চিঠি ওকে ? এমন সময় হঠাৎ বাইরে একটা শব্দ শুনে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি, নিনার বাড়ীতে দেখা আমার সেই পুরাতন শত্রুটিকে প্রহরীরা বন্দিশালায় নিয়ে যাচ্ছে। মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে শয়তানটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আমিও মনে মনে হেসে ফেললাম। এতক্ষণে বোঝা গেল ও নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে ভয়াবহ অপরাধ কিছু আবিষ্কার করেছে। এখন সেই সব অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া অবধি ওকেও বন্দী করে রাখা হবে।

দুপুরবেলা আহারের আয়োজন দেখলাম আশাতীত ভালো। তাছাড়া একটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একজন সিপাহী কালি-কলম আর বাতি দিয়ে গেল। আমার খাদ্যের কিছুটা ভাগ ওকে দিলাম, কৃতজ্ঞতায় ও বিগলিত হোয়ে রইলো।

চতুর্থ দিন সকালে সেই অফিসারটি এসে হাজির—বিনীত ভাবে জানালে দুঃসংবাদ আছে—আমায় দুর্গের ভিতর মাটির তলার অন্ধকার খুপরীর মধ্যে বন্ধ রাখার জন্য আদেশ এসেছে।

বড় বড় পাথরের টুকরো দিয়ে গাঁথা গোল ছোটো খুপরীর ভিতর আমাকে বন্ধ রাখা হোলো। বলা হোলো, আমার খুশীমত আহার্য্য সব সরবরাহ করা হবে আর আমি যদি চাই একটা আলোর ব্যবস্থাও হতে পারবে। যখন আমার আহার্য্য এলো অফিসারটিও সঙ্গে এলেন। মুরগীটাকে ছুরী দিয়ে কেটে অন্য সব খাদ্যের ভিতর কাঁটা দিয়ে গেঁথে গেঁথে পরখ করা হোলো ভিতরে কিছু আছে কি না। আহার্য্য আর মদ দুই-ই ছিলো চমৎকার আর পরিমাণে অন্ততঃ আরও ছয় জন খাবার মত। সে সব আমার প্রহরীদের মধ্যে আমি ভাগ করে দিলাম। বেচারারা সারা জীবনেও এত সুখাদ্য খায়নি—কৃতজ্ঞতায় ওরা আমার কেনা হোয়ে রইলো।

দীর্ঘ বিয়াল্লিশটি দিন কাটলো মাটির নীচে এই অন্ধকার কারা-কক্ষে। এই দীর্ঘ দিনগুলি ধরে আমি লিখেছিলাম 'অ্যামেলট দ্য হোসের' ভেনিসের শাসনতন্ত্রের ইতিহাস নামক বইটির একটি সম্পূর্ণ প্রতিবাদ। সম্পূর্ণ মন থেকেই লিখতে হোয়েছিলো, তাছাড়া কলমের অভাবে পেন্সিলে।

আটাশে ডিসেম্বর একজন অফিসার এসে আমাকে বেশ পরিবর্তন করে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন।

—"কোথায় যাচ্ছি আমরা ?"

—"ক্যাপ্টেন-জেনারেল আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন তাঁর কাছেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

অফিস ঘরে এসে দেখা হোলো আমাকে যিনি গ্রেপ্তার করেছিলেন সেই অফিসারটির সঙ্গে। তিনি আমাকে প্রাসাদের অপর অংশে নিয়ে গেলেন, সেখানে একজন কেরাণী আমাকে একটা তোরঙ্গ এনে দিলে, তার ভিতর আমার যাবতীয় কাগজপত্র রয়েছে দেখলাম। একটি কাগজের টুকরোও নষ্ট হয়নি। তিনটি পাশপোর্টও রয়েছে। অফিসারটি বললেন, ওগুলি আসলই বটে!

—"আমি জানি তা, আর বরাবরই জানতাম এগুলি জাল নয়।" আমি বললাম।

—"তা ঠিক, কিন্তু সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিলো। আর এখনই আপনাকে জানিয়ে রাখি যে, আপনাকে তিন দিনের মধ্যে বার্সিলোনা আর এক সপ্তাহের মধ্যে কাটালোনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

—"মানতে বাধ্য আমি, যদিও এটা আমার প্রতি অন্যায় অবিচার করা হোলো।"

—"আপনি এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন মাদ্রিদে—যদি ইচ্ছা করেন।"

—"অভিযোগ করবোই তবে প্যারিসে—মাদ্রিদে নয়। স্পেনের অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট হয়েছে। আপনি এখন দয়া করে আমার উপর যা কিছু আদেশ হোয়েছে সেগুলি লিখিত ভাবে দিন"—

একজন অফিসারের সঙ্গে আমার হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলের কর্ত্তাটি সত্যিই সজ্জন। ভারী খুশী হোলো আমাকে দেখে। জানালে আমার ঘর যেমন ছিলো তেমনি আছে একজনও ঢোকেনি ওই ঘরে। আমার সেই তলোয়ার, সেই দু'টুকরো কোট আমাকে ফিরিয়ে দিলে আর তার সঙ্গে অবাক হোলাম সেই পথের মধ্যে ফেলে আসা টুপীটা দেখে।

যখন আমি আমার বিলটা আনতে বললাম তখন হোটেলের কর্তা সবিনয়ে জানালেন, সমস্ত টাকাই পরিশোধ করা হোয়েছে—তাছাড়া তার উপর আদেশ এসেছিল যত দিন আমি বন্দী থাকবো তত দিন আর তারপর যত দিন বার্সিলোনাতে থাকবো, তত দিন আমার যা কিছু প্রয়োজনীয় সমস্ত সরবরাহ করতে হবে।

—"কিন্তু এ সবের জন্যে টাকা দিলেন কে?"

—"আপনিও যা জানেন আমিও তাই।"

—"আচ্ছা আমার সম্বন্ধে বিশেষ করে এই ব্যাপারটা নিয়ে শহরে কিছু বলাবলি হয়নি?"

—"যত রকম বাজে রটনা হোতে পারে সব হোয়েছে। অনেকে বলে, আপনিই নাকি বন্দুক ছুঁড়েছিলেন, কারণ আশ্চর্য্য ব্যাপার, একজনও আহত পাওয়া যায়নি। সাধারণের মধ্যে রটানো হোয়েছে আপনার পাশপোর্ট জাল, তাই আপনাকে গ্রেপ্তার করা হোয়েছে—কিন্তু প্রত্যেকেই আসল ব্যাপারটা জানে যে প্রকৃত কারণ হোলো নিনার সঙ্গে আপনার রাত্রি যাপন"—

—"কিন্তু আপনি তো জানেন মধ্যরাত্রিতেই আমি ফিরে আসতাম।"

—"সে কথা আমি সবাইকে বলেছি। কিন্তু আপনি যে রোজ ওই মহিলাটির কাছে যেতেন সেইটাই কোনো বিশেষ ভদ্রলোকের ঈর্ষ্যা আর বিদ্বেষের কারণ। এখনো আমার অনুরোধ রাখুন, আর ওই মহিলাটির ধার মাড়াবেন না"—

—"ভয় নেই। সে বিষয়ে আমি মনস্থির করে ফেলেছি এবার।"

তিন দিন পর যাত্রা সুরু হোলো আবার তিক্ত, ভারাক্রান্ত মনে। দিন তিনেক পরে ফ্রান্সের—আমার প্রিয় ফ্রান্সের একটি বড় গ্রামের মধ্যে একটি সরাইখানায় এসে পৌঁছলাম রাত্রি দশটায়। বহুদিন পর সুকোমল ফরাসী বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিলাম নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনায়, চোখ জুড়ে নামলো গভীর ঘুম—বিখ্যাত ফরাসী মদের কৃপায়।

কার্নিভালের সময়টাতে এ এসে পৌঁছলাম। থি্ ডলফিন্‌সে এই উঠেছিলাম এবার। সারা শহর উৎসবের কোলাহলে মুখরিত। কয়েক দিন খুব বেড়িয়ে একদিন সন্ধ্যায় সাংঘাতিক রকম ঠাণ্ডা লেগে গেলো। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লাম—ঘুম ভাঙলো প্লুরেসির অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে। গৃহকর্ত্তা একজন বৃদ্ধ ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হোয়ে উঠলো। দু'দিনের মধ্যেই মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো—বাঁচবার কোনো আশাই রইলো না। এমন কি পুরোহিত অবধি ডাকা হোলো স্বীকারোক্তি শোনার জন্য। কিন্তু এত অসহ্য যন্ত্রণার শেষে দশ দিন পর পুরো ষাট ঘণ্টা অচৈতন্য থাকার পর আমার জ্ঞান হোলো। বৃদ্ধ ডাক্তারও এবার জীবনের আশ্বাস দিলেন। তারপর সুরু হোলো সম্পূর্ণ বিশ্রামের মধ্য দিয়ে, শুশ্রূষার মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কাল। কিন্তু এই সমস্ত সময়টা আমাকে সেবা করেছে একটি অপরিচিতা সেবিকা। কি আশ্চর্য্য তন্ময়তা আর মমতা আর নিষ্ঠা—তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি আর নিখুঁত যত্নের কোথাও এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। বয়সের ভার তার ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো রকম অনুভূতির দুর্ব্বলতাই কখনো প্রকাশ পায়নি ওর অনলস সেবার কোনো মুহূর্তের অবসরে।

যখন আমি বাইরে বেরোবার মত সুস্থ হোয়ে উঠলাম তখন আমার যথাসাধ্য পুরস্কার ওকে দিয়েছিলাম আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। কে ওকে আমার সেবায় নিযুক্ত করেছিলো জানতে চাইলে ও জবাব দিয়েছিলো ওই বৃদ্ধ ডাক্তার। কিন্তু কিছুদিন পর যখন আমি ডাক্তারকে বলছিলাম নার্সটির কথা তখন উনি অবাক হোয়ে আমাকে জানালেন যে ওকে আগে কখনো দেখেন নি পর্য্যন্ত। গৃহকর্ত্তা আর তাঁর স্ত্রীও একই কথা বললেন—দেখা গেল ওই মহিলাটির সম্বন্ধে কেউই কিছু জানেন না—ও কে, আর কোথা থেকেই বা এসেছিলো! ওর আসার মত যাওয়াটাও হোয়ে রইলো রহস্যময়।

এখানে থাকতে বার বার আমার মনের পটে ভেসে উঠতো একটি মুখ—সে মুখ হেনরিয়েটার। আমার দিনরাতের অলস চিন্তা ভরে উঠতো ওর স্মৃতিতে। ওর প্রকৃত নাম আমি জেনেছিলাম। মার্কোলিনাকে দিয়ে ও খবর দিয়েছিলো 'য়েকস্' এতে খোঁজ করতে। আমি ভেবেছিলাম কোথাও কোনো সভায় কোনো সমিতি কোনো উৎসবে ওর সঙ্গে দেখা হবেই। প্রায়ই ওর নাম শুনতাম; কিন্তু কখনো ওর সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও করিনি কোথাও—চাইনি যে কেউ জানুক আমি ওকে চিনি। একবার ভাবলাম ও বোধ হয় বাগানবাড়ীতে আছে—আমারই অপেক্ষায়—স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর যাবো ওর কাছে এই আশায়—

গেলাম ওকে একটিবার দেখা করার উদ্দেশ্যে। পকেটে ওকে লেখা একটি চিঠি ভরে নিয়ে। চিঠিটা আগে পাঠিয়ে তারপর অপেক্ষা করবো ওর দরজায় যতক্ষণ না ও নিজে আসবে আমাকে স্বাগত জানাতে। সকাল এগারোটা নাগাদ পৌঁছলাম—চিঠিখানি দিলাম একজন পরিচারকের হাতে। সে বিনীত ভাবে জানালে, মাদামের কাছে চিঠিখানি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবে।

—"সে কি! উনি এখানে নেই নাকি?"

—"না, মহাশয়, মাদাম তো এখন 'য়েক্‌স্'এ"

—"কত দিন আছেন ওখানে?"

—"প্রায় ছ'মাস হোলো আছেন।"

—"কোথায় থাকেন সেখানে?"

—"ওর নিজেরই বাড়ীতে। এখানে গরমের সময়ে সপ্তাহ তিনেকের জন্যে আসেন।"

—"আমার চিঠিটা একবারটি ফিরিয়ে দেবে আর কয়েকটি লাইন লিখে দেবো।"

—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনি ভিতরে আসুন। আমি মাদামের ঘর খুলে দিচ্ছি আপনাকে—সেখানে আপনার প্রয়োজনীয় সবই পাবেন"—

ভিতরে এলাম ওর পিছনে পিছনে। তারপর আমার মনের অবস্থাটা একবার কল্পনা কর, যখন দেখলাম আমার মুখোমুখি সেই মহিলাটিকে যে মাত্র কয়েক দিন আগে অবধি আমার শুশ্রূষা করেছে সেই রহস্যময়ী সেবিকা—

—"আপনি! আপনি এখানে থাকেন?"

—"হ্যাঁ মহাশয়! গত দশ বছর ধরে আমি এখানেই আছি।"

—"তাহলে আপনি আমার সেবা করতে এসেছিলেন কেমন করে?"

—"মাদাম আমাকে জরুরী তলব করেছিলেন। আমি ওঁর কাছে যেতেই তখনি আমাকে পাঠালেন আপনার রোগশয্যার পাশে। তিনিই বলে দিয়েছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাতে যে ডাক্তারই পাঠিয়েছেন আমাকে।"

—"কিন্তু ডাক্তারও যে বললেন কিছু জানেন না?"

—"তাহলেও তিনিও বোধ হয় মাদামের নির্দ্দেশমত চলেছিলেন কিন্তু অবাক হচ্ছি আপনি এত দিনেও 'য়েক্স্'এ মাদামের দেখা পান নি?"

—"বোধ হয় উনি বেশী মেশেন না, কারণ আমি তো সর্ব্বত্রই যেতাম।"

—"বাড়ীতে মাদাম কারো সঙ্গে দেখা করেন না বটে কিন্তু যান তো সর্ব্বত্রই।"

—"আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য শুধু ওর সঙ্গে আমার দেখা হোলো না! ওকে কোথাও দেখে চিনতে পারি নি সে তো হোতেই পারে না। আপনি বলছেন ওর সঙ্গে দশ বছর ধরে আছেন। ওর চেহারা কি খুব বদলেছে? কিম্বা কোনো অসুখে ভুগে ওকে কি অন্য রকম দেখতে হয়ে গেছে? ওর চেহারায় কি বড় বেশী বয়সের ছাপ পড়েছে?"

—"ও-সব কিছুই নয়—ওর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অবশ্য অনেক ভালো হোয়েছে—কিন্তু এখনও তিরিশের বেশী বয়স বলে মনেই হয় না।"

—"আমি নিশ্চয়ই অন্ধ হোয়ে গিয়েছিলাম।"

হেনরিয়েটা, হেনরিয়েটা—ওর চিন্তাতেই আমার সমস্ত মন চঞ্চল হোয়ে ওঠে—এত কাছে এসে; এত আশার পরও ওর দেখা পেলাম না! সমস্ত মন একটা গভীর ব্যাকুল আবেগে ভরে উঠলো। কি যে করবো কিছুই যেন ঠিক করে উঠতে পারলাম না। আবার য়েক্স্-এতে ফিরে যাওয়া কি হবে? সেখানে ও একা আছে—বাড়ীতে কারো সঙ্গে দেখা করে না—তবে? তবে কোথায় বাধা ওর আমার সাথে কথা বলার আমাকে কিছু ইঙ্গিতে জানাবার?—কিন্তু যদি ও আমার সঙ্গে দেখা না করে? না না, সে হোতেই পারে না—ও যে এখনও আমাকে ভালো বাসে আমার রোগশয্যার পাশে অমন অতন্দ্র প্রহরী তাহলে পাঠালে কে? কোন হৃদয়ের ব্যাকুলতা? তবে—তবে কি কোথাও আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ওর সাগ্রহ উৎসুক দুটি গভীর চোখের উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে দিয়ে?—তাই কি দ্বিধায় দুলছে ওর মন? ও নিশ্চয়ই জানে আমি এখন য়েক্স্-এতে নেই—ও নিশ্চয়ই বুঝেছে আমি এখানে এসেছি। তবে? আমিই কি যাবো ওর কাছে এগিয়ে? না আগে লিখে জানাবো···

লিখে জানানোই ভালো। এই সিদ্ধান্তেই এলাম শেষ অবধি। চিঠিখানি লিখে পাঠিয়ে দিলাম। চিঠির শেষে জানিয়ে দিলাম মার্সেলসে প্রতীক্ষা করবো পত্রের উত্তরের—অবশেষে এলো আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু প্রত্যাশিত কয়েকটি লাইন—

—চির-পুরাতন বন্ধু আমার—

বলো তো এর চেয়ে রোমান্টিক আর কি হোতে পারে—সেই ছয় বছর আগে আমাদের দেখা আমার বাগান-বাড়ীতে আবার এখন বাইশ বছর পরে সেই সুদূর অতীতে জেনিভাতে বিদায় নেবার দিনটি থেকে? আজ আমরা দু'জনেই এগিয়ে চলেছি বার্দ্ধক্যের পথে—প্রকৃতির নিয়মে। কিন্তু বিশ্বাস করবে আমার একটি কথা? আজও তোমাকে ভালোবাসি তবু আমাকে চিনতে পারনি দেখে খুশীই হোয়েছি মনে মনে—না, কুৎসিত কুরূপ আমি হইনি,'তবু তোমার সেই হেনরিয়েটা আজ নেই। স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি তাকে তার দেহগঠনে পরিবর্ত্তন এনেছে বৈ কি—বিরাট পরিবর্ত্তন আজ আমি বিধবা, আজ আমি সুখী, আর আজ আমার অনেক টাকা—কেন বলছি জানো যদি তুমি কোনো দিন অভাবে পড়ো তাহলে শুধু হেনরিয়েটার কাছ থেকেই শূন্য ঝুলি ভরে নেবে বলে। এখানে এ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না—তুমি ফিরে এলে শুধু কতকগুলি ঘটনারই সৃষ্টি হবে—তা' আমি চাই না। তবে যদি পরে আবার আসো তখন দেখা হবে আমাদের—কিন্তু পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে নয়। শুধু এইটুকু আমার আনন্দ তোমার রোগশয্যার দীর্ঘ বিলম্বিত দিনগুলিকে কিছু সহনীয় করতে পেরেছি মেয়েটিকে পাঠিয়ে। ওর নিষ্ঠার প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস।

যদি তুমি চাও আমাদের মধ্যে এই পত্র লেখার সেতু বাঁধতে আমি সানন্দে রাজী। সেই 'দি লেডস' থেকে তোমার পালানোর পর আজ অবধি তোমার সমস্ত খবর তোমার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জানার জন্যে আমার মন উৎসুক হোয়ে আছে। আর এত দিন ধরে তোমার হৃদয়ের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাইতে আমি আজ অসঙ্কোচে তোমাকে বলতে পারি আমার সমস্ত গোপন পূর্ব-পরিচয়—কেন সেসেনাতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হোয়েছিলো··· কেন আমাকে স্বদেশেই ফিরে আসতে হোলো—সব তোমাকে জানাবো।

প্রথম ঘটনাটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আর অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। একমাত্র মঁসিয়ে দ্য আঁতোয়ানই সব ঘটনাটা জানেন। আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা তোমাকে জানাই তোমার সংযমের জন্য, আমার সম্বন্ধে এতটুকুও ঔৎসুক্য প্রকাশ না করার জন্যে। মার্কোলিনীর কাছে আমার সব খবর পেয়েছিলে নিশ্চয়ই—সেই ছ'বছর আগে?

বিদায়—

প্রত্যুত্তরে লিখেছিলাম আমার বিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্যের কাহিনী—সাগ্রহ সম্মতি জানিয়েছিলাম পত্রলেখার এই বন্ধনটুকু রাখতে। ফিরে এসেছিলো হেনরিয়েটা লিপির সেতু পার হোয়ে ওর সমস্ত গোপন পরিচয়ের অবগুণ্ঠন সরিয়ে—

একের পর এক চল্লিশখানি চিঠি পাই হেনরিয়েটার কাছ থেকে। যদি আমার আগে ওর মৃত্যু হয় তবে আমার স্মৃতিকথায় ওর প্রতিটি লিপি যোগ করে দেবো—আমার স্মৃতিকথার সঙ্গে ওর লেখার থাকবে অচ্ছেদ্য বন্ধন—

কিন্তু আজও হেনরিয়েটা বেঁচে আছে আর বার্দ্ধক্যের সীমারেখায় দাঁড়িয়েও সুখী—

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

ভাবি এক হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এক

কলকাতা থেকে জাহাজে উঠে পল্লব মহা ভাবনায় পড়ল।

অন্য পাঁচ জন যেমন বিলেত যায় কিছু একটা হবার বা করবার সঙ্কল্প নিয়ে, পল্লব নিজের মনের মধ্যে প্রাণপণ খুঁজেও তেমন কোনো তাগিদের দেখা পেল না। ভাবনা না হ'য়ে পারে?

সবাই ওকে বলত খোঁকালো। কিন্তু খোঁকের সঙ্গে রোখ কই —যা কুঙ্কুমের ছিল? পল্লব জাহাজের কেবিনে একা ব'সে ব'সে ভাবে: আহা, যদি কুঙ্কুমের কাছ থেকে তার জেদ-এর একটা ভগ্নাংশও ধার করা সম্ভব হত! কিন্তু এ নিয়ে পরিতাপেই বা ফল কি? এখনো সময় আছে—দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

পল্লবকে ওর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনরা সদা-টলমান (Vacillating) ব'লে দোষ দিলেও ওকে খানিকটা বুঝত কুঙ্কুম। সে ওর নানা ক্রিটিকের সঙ্গে লড়ত: "দেখো, মস্ত একটা কিছু করবেই করবে বিলেত গিয়ে—অমন প্রতিভা!" ইত্যাদি

কিন্তু ওর আত্মীয়-স্বজন, বিশেষ ক'রে ওর স্নেহময় মামা সুবিমল ভেবে অস্থির। তিনি ধরলেন ওকে: "কেম্ব্রিজে গিয়ে আই সি এস দিতেই হবে বাবা, লক্ষ্মীটি!" পল্লব জাহাজে উঠে বহু ভেবে চিন্তে ঠিক করল যে, যে-মামার কাছে এত স্নেহ পেয়েছে তাঁর কথাই রাখবে: ব্যারিষ্টার কি প্রফেসর হওয়ার চেয়ে আই-সি-এস পাশ ক'রে দেশে ফিরে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হ'য়ে মামার মুখোজ্জ্বল ক'রে মোটা মাইনের গদিয়ান হ'য়ে বসা—মন্দ কি? কিন্তু কুঙ্কুম ওকে বলল মনে মনে গণিতে ট্রাইপসও পড়বে। যেই মনে হয় কুঙ্কুমের কথা অমনি মামার অনুরোধের জোর আসে ক্ষীণ হ'য়ে। নিজের উপর ওর কী যে রাগ হয়! বন্ধুবর্গ তথা শত্রুবৃন্দ ওকে "সদা-টলমান" উপাধি দিল কি সাধে? কিন্তু ওর সমালোচকেরা অনেকে ওর "টলমানতা" নিয়ে হাসাহাসি করলেও, ওর জীবন যে-ভাবে গড়ে উঠেছিল তাতে ক'রে ওর পক্ষে কুঙ্কুমের মতন দৃঢ়সঙ্কল্প ও একাগ্রী হয়ে ফুটে ওঠা সম্ভব ছিল না। যেন—বলতে হ'লে ওখানে একটু পেছুতে হবে—পল্লব ততক্ষণ জাহাজে দুলুক—শরীরে তথা মনে।

দুই

পল্লবের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন ওর মা এ-সংসার থেকে চিরবিদায় নেন। মার অবিস্মরণীয় ও অপরূপ মুখশ্রী—বিশেষ ক'রে স্নেহসজল চোখ দু'টি—ওর মনের আকাশে তারার মতনই জ্বলত। ওর বাবা অনুপম ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তথা কবি, সুরকার, নাট্যকার, মাতৃহারা একমাত্র পুত্রের মুখ চেয়ে, তিনি আর বিবাহ করেন নি। বলতেন কথায় কথায়: বিবাহ মানুষের একবারই হয়।

পল্লব ইস্কুলে যেতে কাঁদত ব'লে অনুপম স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই ওকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। প্রাইভেট টিউটর ওকে পড়াত, কিন্তু তার উপর আদেশ দিল যে ছাত্রকে যেন জোর করা না হয়—ও ইচ্ছামতন পড়বে, ইচ্ছা না হ'লে খেলাধুলো করবে।

পল্লব খেলাধুলোর খুব ভক্ত ছিল না, পাঠ্যপুস্তকেরও নয়। ও দিনরাত পড়ত রাজ্যের বাংলা বই—নভেল, নাটক, কবিতা—বিশেষ ক'রে জীবনচরিত, আর মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ এই সব সেকেলে বই। এতে অনুপম খুব খুশি। বলতেন সগৌরবে: "ছেলে আমার সামান্যি নয়, এই বয়সে মহাপুরুষ-চরিত তথা শাস্ত্র পড়া!"

"সামান্য" হোক বা না হোক, পল্লবের সত্যি খুব ভালো লাগত এই সব পড়তে—কোন্ মহাপুরুষ কবে কোথায় কী করেছিলেন কী বলেছিলেন—আর রাজ্যের পৌরাণিক কাহিনী। ইংরাজি শিখতে ওর একটুও আগ্রহ ছিল না। অনুপম বললেন নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে: "নাই থাকল। ছেলে আমার নিরেট নয়—ইংরাজি ও দুদিনে শিখে নেবেই নেবে, এখন বনেদ পাকা হোক—জানুক আমরা কি ছিলাম, তাহ'লে বুঝবে কি হয়েছি—ফলে সাধ জাগবে আবার কিছু একটা হ'য়ে উঠবার। ওর মতিগতি ভালো।"

আর সঙ্গে সঙ্গে গান। ছেলেবেলা থেকেই পল্লব চমৎকার গাইতে পারত, হাতে তাল দিতও নির্ভুল। অনুপম নিজেও ছিলেন সুগায়ক, সুতরাং শৈশবেই ছেলের সঙ্গীত-প্রতিভার স্ফুরণ দেখতে না দেখতে মহা উৎসাহে ওকে গান শেখাতে আরম্ভ করলেন। তার পর বার বৎসর বয়সে পল্লবের উপনয়ন হবার সঙ্গে সঙ্গে দিলেন এক গ্রামোফোন উপহার। আর কোথায় যাবে? ও পড়াশুনো সব ছেড়ে রেকর্ড নিয়ে পড়ল, গ্রামোফোন থেকে বড় বড় গায়ক-গায়িকার গান গলায় তোলা সুরু করল—তান বাঁট সমেত। অনুপমের উৎসাহ আরো বেড়ে উঠল। বললেন: ছেলে আমার গাইয়ে হবে। বিধাতা সেদিন অলক্ষ্যে হেসেছিলেন বোধ হয়—মানুষের মুখে দৈববাণী শুনে।

আত্মীয়-স্বজন হাহাকার ক'রে উঠলেন "গাইয়ে? আমাদের দেশে গাইয়ে? যত রাজ্যের মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো ছেলেই গাইয়ে হয়। ওকে এক্ষুণি স্কুলে ভর্তি করো। তের বৎসরের ছেলে এখনো ইংরাজি জানে না—শুধু পুরাণ মহাভারত আর বাকি সময়টা গ্রামোফোনের রকমারি গান! হায় হায়! ওর গতি কী হবে?"...

অনুপম ছিলেন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। খানিকটা খামখেয়ালীই বলব। কাজেই লোকের কথায় কান দিলেন না। ঠিক এই সময়েই পল্লবের জীবনে কুঙ্কুমের আবির্ভাব।

তিন

পল্লব গিয়েছিল সরস্বতী পূজায় এক সভায় গান গাইতে। ওকে নানা জায়গায়ই ডাকতেন কর্মকর্তারা। ওর মিষ্ট কণ্ঠ, বিশেষ স্বদেশীগান ও ভজন কীর্তন শুনে অনেকেই চমকে যেত। সেদিন নিমন্ত্রণ ছিল এক ষ্টীমার-পার্টিতে।

পার্টিতে কুঙ্কুমও এসেছিলো। পল্লবের সমবয়সী। পল্লব কুঙ্কুমের নাম শুনেছিল নানা স্থানে। শুধু গাইয়ে ব'লেই নয়—স্কুলেই ওর নামডাক ছড়িয়ে পড়েছিল হীরের টুকরো ছেলে ব'লে: যেমন দেখতে শুনতে, বর্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে তেমনি পড়াশুনোয়। পল্লবের স্কুলের প্রতি বিরাগে প্রথম ভাঁটা আসে কুঙ্কুমের মেধার গুণগান শুনে। পল্লবের সমালোচকেরা বলতেন: প্রবেশিকা পরীক্ষার পড়িয়ে কুঙ্কুম হবে ফার্স্ট আর গাইয়ে পল্লব হবে লাষ্ট। শুনতে শুনতে ওর মন ফিরে গেল, ও রুখে উঠল—স্কুলে

ভর্তি হবেই হবে। কিন্তু ও যে ইংরেজি জানে না মোটেই—স্কুলে ওকে নেবে নিচু ক্লাসে। ও অনুপমকে ধরল—ওকে কুঙ্কুমের ক্লাসেই ভর্তি করে দিতে হবে—হবেই হবে। অনুপম খুশি হ'য়ে ওকে নিজেই ইংরেজি পড়ানো সুরু ক'রে দিলেন। কিন্তু সে কথা যথাস্থানে।

স্টীমারে ও গাইল দু'টি স্বদেশী গান "বঙ্গ আমার জননী আমার" ও "বন্দে মাতরম্।" কুঙ্কুম উজ্জ্বল মুখে ওর হাত চেপে ধরল, "কি চমৎকার গাও তুমি!"

কুঙ্কুমকে ও গড়ের মাঠে প্রায়ই দেখত ফুটবল ম্যাচ এবং মুগ্ধ হয়েছিল ওর সুঠাম বলিষ্ঠ গৌরকান্তি দেখে। তার উপরে স্কুলে নাকি প্রতি সাবজেক্টেই ফার্ষ্ট হয়! সোজা কথা! মন ওর মুখিয়ে ওঠে কুঙ্কুমের সঙ্গে আলাপ করতে, কিন্তু কেমন করে এগোয়? সময়ে সময়ে মনে হ'ত "আঃ, কুঙ্কুম যদি হ'ত আমাদের প্রতিবেশী তবে বেশ হ'ত, ছাদে উঠে পাশের বাড়ির ছাদে ওর সঙ্গে দেখা হ'ত রোজই, আলাপও কেউ ঠেকাতে পারত না।" কিন্তু কুঙ্কুম থাকে দক্ষিণ-কলকাতায়। পল্লব উত্তর-কলকাতায়। উপায়?

এ-হেন "প্রাংশুলভ্য" কুঙ্কুম ওর মতন বামনের কাছে এসে হঠাৎ ধরা দিল! ওর মনে হ'ল—যেন চাঁদ হাতে এল! সঙ্গে সঙ্গে ও আরো উৎসাহে ইংরেজি পড়া সুরু ক'রে দিল। অনুপমকে বলল, হিন্দু স্কুলে কুঙ্কুমের সহপাঠী ক'রে ওকে ভর্তি ক'রে দিতে না পারলে ও স্কুলে যাবেই না আদৌ। শুনে অনুপম ভারি খুশি—আরো দেখে যে ইংরাজি শিখতে ও দারুণ খাটতেও পেছপাও নয়।

সঙ্গীত তথা সাহিত্যে ওর প্রবেশ ছিল আবাল্য, কাজেই ইংরাজি শিখতে বেশি দেরি হ'ল না। বৎসর খানেকের মধ্যেই ও অনুপমের সুপারিশে কুঙ্কুমের স্কুলে ভর্তি হ'ল। স্কুলেও রোজ কুঙ্কুমের পাশেই বসে—কী আনন্দ! অন্য পড়ুয়ারা ওকে নাম দিল কুঙ্কুমের পোষা পাখি। তা দিক।

ক্লাসের পড়শুনোর ধরণ ধারণ কুঙ্কুম ওকে মাস তিন চারের মধ্যেই শিখিয়ে দিল। ফলে দেখতে দেখতে ওদের বন্ধন আরো নিবিড় হ'য়ে উঠল—বলাই বাহুল্য। ক্লাসেও পল্লব ভালো ছেলেদের মধ্যেই গণ্য হ'ল সব পরীক্ষায়। তবে কুঙ্কুম হ'ত ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড। পল্লবের একটুও দুঃখ হ'ত না কুঙ্কুমকে ডিঙিয়ে যেতে না পেরে। যে সত্যি বড়, তার কাছে মাথা নিচু করতে গৌরব বোধ করত ও আশৈশব, আর প্রথম থেকেই কুঙ্কুমকে ও সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ ক'রে নিয়েছিল বড় ব'লে।

চার

কিন্তু পড়াশুনোয় সেকেণ্ড হয় হ'লেও পাঠ্যপুস্তকে কুঙ্কুমের মতন ডুবতে পারে কই? পড়ার বই মুখস্থ করবার সময় ছাই কেবলই যে হাজারো গানের সুর তাল আঁখর আসে ভেসে! কুঙ্কুম ওকে সস্নেহে বলে: "যখন পড়বে তখন গানের কথা ভাববে না, বুঝলে ভাই? পড়াশুনোকে ভালোবাসতে হবে।" পল্লব ভাবে, কুঙ্কুম গান ভালোবাসলে বোধ হয় এমন কথা বলত না। পড়াশুনো করা যায় কিন্তু ভালোবাসা? ও কুঙ্কুমই পারে।

ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পল্লব কুঙ্কুমের অনেক নীচে স্থান পেল। কুঙ্কুমের উপরে মাত্র একটি ছাত্র; পল্লবের উপরে—তেইশটি। পঁচাত্তর পার্সেণ্ট নম্বর পেয়ে ও জলপানি পেল বটে, কিন্তু মাত্র দশ টাকার। কুঙ্কুম পেল—ত্রিশ টাকার। কুঙ্কুম ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল: "পরীক্ষা পাশে কি যায় আসে? তাছাড়া জলপানি তো পেয়েছ। দুঃখ কি?"

পল্লব কিন্তু কম্পীট করতে না পেরে একটুও বিমর্ষ হয়নি। পরীক্ষার পড়ায় যে আদৌ মনই দিতে পারে না সে, পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র হতে না পারলে মনমরা হবে কি দুঃখে? এজন্যে তো ওর 'পরে কুঙ্কুমের স্নেহ কমে যায়নি! তাছাড়া ওর মন যে আবাল্য গভীর আশ্রয় পেয়েছিল মহাপুরুষের জীবন চরিতে ও গানে। ইতিমধ্যে ও বিস্তর গান শিখেছিল, এক ওস্তাদ রেখে হিন্দুস্থানী খেয়াল টপ্পাও খানিকটা আয়ত্ত করেছিল তেলানা সার্গম সমেত। এমন কি, তবলার ঠেকা চিনে যথাকালে অনায়াসে সমে ফিরতেও পারত। পুত্রপ্রতিভা-গর্বিত অনুপম বলতেন, "সাবাস! জীতা রহো!"

ঠিক এই সময়ে পল্লবের প্রবেশিকা পাশের পরেই—অনুপমের হঠাৎ মাথার রক্তকোষ ছিঁড়ে মৃত্যু হ'ল সন্ন্যাস রোগে। তিন ঘণ্টায় সব শেষ। তাঁর শেষ ডাক—পল্লব। পল্লব তখন এক ওস্তাদের ওখানে গান শিখছিল। ফিরে এসে—স্তম্ভিত!...

চোখে ও অন্ধকার দেখল। ও মনে মনে প্রায়ই বলত অনুপমকে উদ্দেশ ক'রে: "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।" সত্যি, অনুপম ওকে মার অভাব বুঝতে দেননি, ঘিরে রেখেছিলেন তাঁর নিটোল গাঢ় স্নেহ দিয়ে। কখনো ওকে একটি ধমক পর্যন্ত দেননি, ওর গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা। এ-হেন পিতার আকস্মিক মৃত্যু! ওর স্নেহপ্রবণ মন নুয়ে পড়ল বেদনায়, নিরালায়।

এমন সময়ে এলেন ওর স্নেহময় মামা এগিয়ে—সুবিমল। তিনি ইংলণ্ড থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ ক'রে এসেছিলেন, তার উপরে ধনী পিতার পুত্র, দক্ষিণ-কলিকাতার একটি সুরম্য প্রাসাদে থাকতেন পরম আরামে। পল্লবকে বুকে জড়িয়ে বললেন: "ভয় কী বাবা! আমি আছি।" পল্লবের বুক জুড়িয়ে গেল। মামাকে সে ভালোবাসত শৈশব থেকেই। না ভালোবেসে উপায়ও ছিল না। এমন মামা!

পল্লব বলত কুঙ্কুমকে: "ভাই, ভগবানের কৃপা দেখ—মার স্থান নিলেন বাবা। বাবা যেতেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন মামাকে। নৈলে কী হ'ত আমায় বলো তো?"

ভয়ের কারণ ছিল বৈ কি! কারণ অনুপম শুধু চাকরি করেই নয়, নাটক লিখেও বিস্তর উপায় করেছিলেন। ফলে পল্লবের আর্থিক অবস্থা হ'য়ে উঠেছিল ধনী সন্তানেরই সগোত্র। তার উপর ওর মামার আশ্রয়ে আসতে না আসতে তিনি ওর সঞ্চিত অর্থকে খাটিয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বিগুণ করে দাঁড় করালেন। অনুপম কলকাতায় একটি সুরম্য বাড়ি রেখে গিয়েছিলেন, সুবিমল আর একটি বাড়ি তুললেন।

পল্লব মামার কাছ থেকেই প্রতি মাসে হাত খরচের জন্যে সামান্য কিছু নিত। সুবিমল ওকে নিয়তই সাবধান করতেন: "আমাদের কাছে আছিস বাবা, নিজের টাকা থেকে খরচ করবি কেন? তোর যা আয় আছে জমুক না, আমি তো চিরদিন থাকব না রে! তখন দু'হাতে খরচ করিস।"

পল্লবের চোখের পাতা ভিজে উঠত, মামাকে জড়িয়ে ধরে বলত:

"তুমি না থাকলে নাবালকের সম্পত্তি এমন ক'রে যখের ধনের মতন কে আগলে থাকত মামা ?" সুবিমল চোখের জল মুছে বলতেন : "সে কি রে ? তুই কি আমার ছেলে নোস বাবা ? তোর মামীমাও এই কথাই বলেন উঠতে বসতে : এমন ছেলে আমরা কোথায় পেতাম—দেখতেও যেমন, বুদ্ধিতেও তেমনি, কাউকে কি কখনো একটি কথা বলে চড়া গলায় ? তার উপর কী গান ! আহা, যেই ও 'মা মা' বলে গান ধরে, বোধ হয় সব মা-রই বুকের তারে বেজে ওঠে : "এই যে বাবা আমি !" পল্লবের মামা-মামার ছেলে ছিল না—মাত্র দুটি মেয়ে ! তারা ওকে সহোদর দাদাই ভাবত বরাবর।

কুঙ্কুম ওকে বলত : "সত্যিই তুমি ভাগ্যবান পল্লব ! এমন মামার সঙ্গে জোড় মিলন এমন মামীমার !"

কিন্তু মামার প্রাসাদে পরিচারক পরিচারিকা পরিবৃত হ'য়ে, গান জলসা মোটর হৈ হৈ এই সবের মধ্যে মানুষ হ'য়ে পল্লব হ'য়ে পড়ল সুখপ্রিয়। যার কোনো অভাবই নেই, না টাকাকড়ির না স্বাস্থ্যের, না বন্ধুবান্ধবের, তার মেরুদণ্ড একটু দুর্বল হয়ই হয়। পল্লব এটা আরো অনুভব করত কুঙ্কুমকে দেখে। যেন দশটা মানুষের মেরুদণ্ড জুড়ে বিধাতা ওর মেরুদণ্ড গড়েছিলেন। যা ধরবে তাই করবে। যেমন তেজ, তেমনি নিষ্ঠা সর্বোপরি নিখুঁত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ! স্কুলেই কুঙ্কুম যেন সবাইকার অজান্তেই হ'য়ে উঠেছিল নেতা ! পল্লব ভাবত, ইংরাজিতে ঠিকই বলে leaders are born not made.

এ-হেন কুঙ্কুমের কাছে পল্লব শুনত বিবেকানন্দের কথা। কী অগ্নিময় পুরুষ ! কুঙ্কুমের জ্বলন্ত উৎসাহের ছোঁয়াচে পল্লবের কিশোর মনে লাগল : ও পড়ল বিবেকানন্দের নানা বই নিয়ে। কিন্তু যেই পড়ল তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের স্তুতি অমনি ওর মনের সব তারগুলিই যেন একসঙ্গে উঠল বেজে ! ও ধরল শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। পড়তে পড়তে ওর বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর উঠল দুলে—বিবেকানন্দ গেলেন নেমে। ও ভাবতে লাগল ভগবানকে পেতে হবে সব আগে—ঠাকুরের বাণী : "ঈশ্বর-দর্শনই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য।"

এই নিয়ে কুঙ্কুমের সঙ্গে ওর প্রথম মতান্তর। কুঙ্কুম বলল : "না—মুক্তি মোক্ষ ভক্তি ও তো স্বার্থ, বিলাস। চাই পরার্থনিষ্ঠা, দেশের সেবা, দুর্গতদের উন্নয়ন—স্বামীজীর ভাষায় দরিদ্রনারায়ণ···"
পল্লব কুঙ্কুমের সঙ্গে পারতপক্ষে বড় একটা তর্ক করত না, কেবল এই এক স্থলে ও কুঙ্কুমের কথার প্রতিবাদ না ক'রে পারত না, বলত কুঙ্কুম যা বলছে সত্য হ'লেও, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ বিবেকানন্দের আদর্শের চেয়েও বড় জনসেবা নয়, ভগবানের বাহন হওয়া। কিন্তু ষোলো বছরের ছেলে কী জানবে ভগবানের বাহন হওয়ার মানে ? ও শুধু জল্পনা কল্পনা করত একদিন হঠাৎ ভগবদ্দর্শন হ'লে তাঁকে কী বলবে ? বলবে—ঠাকুর, তোমার পায়ে শুদ্ধা ভক্তি দাও—এই ঠাকুরের বাণী।

কুঙ্কুম শুনে গম্ভীর কণ্ঠে বলত : "সাবধান, পল্লব ! এই বৈরাগ্যেই আমাদের দেশের সর্বনাশ হয়েছে। শ্রেষ্ঠ মানুষ সব 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' বলতে বলতে পরমার্থের লোভে চ'লে গেছেন বনে জঙ্গলে গুহা-কন্দরে। ধর্ম ভালো, কিন্তু সবচেয়ে বড় ধর্ম হ'ল দেশের সেবা—দেশকে স্বাধীন করা—দুর্গতকে অন্নবস্ত্র বিদ্যা দান। ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে বড় জোর শান্তি লাভ হ'তে পারে তোমার আমার মতন দু'চার জনের কিন্তু দেশের দশের তাতে কী এল গেল ? তারা তো রইল যে তিমিরে সেই তিমিরে ! না, স্বামীজির বীর বাণীই আমাদের জীবনমন্ত্র হোক।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার' ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

পল্লবের হৃদয় তখনকার মত একথায় দুলে উঠত বৈ কি—কিন্তু ফের যেই পড়ত ঠাকুরের বাণী : "জগৎ কি এতটুকু না যে তুমি তার উপকার করবে ? যে শুনবে তোমার কথা ! তাঁর চাপরাশ পেয়েছ ? যদি পরোপকার করতে চাও, নিজে শিক্ষা দিতে চাও, আগে জো-সো ক'রে তাঁর পায়ে পৌঁছও। তিনি শক্তি দিলে তোমার একটা কথায় পাহাড় টলে যাবে। নৈলে পাঁচজনে বলবে 'বেশ বলছে'—কিন্তু তার পরেই যে কে সেই। পল্লবের মনে পড়ত দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাকার চণ্ডীচরণের কথা :—

সবাই বললে : "হাঃ হা হাঃ, লিখছে বেশ হাঃ হাঃ হাঃ।
যাহোক তোরা নিজের নিজের ঘটি বাটি সামলা।"

পাঁচ

জীবনের এই প্রথম আদর্শ-সংঘাতের লগ্নেই—অনুপমের আকস্মিক মৃত্যুর ঠিক পরেই—পল্লব চলে আসে মামার প্রাসাদে দক্ষিণ-কলিকাতায়। সেখানে আর একটা সুবিধা হ'ল, কুঙ্কুমেরও বাড়ি দক্ষিণ-কলিকাতায়। কাজেই কুঙ্কুমের সঙ্গে রোজই দেখা হ'ত, একসঙ্গে যেত ওরা গড়ের মাঠে বেড়াতে—ভোর হ'তে না হ'তে। কুঙ্কুম ওকে নানান্ স্তব শোনাত। ওর খুব প্রিয় ছিল গণপতি শাস্ত্রীর শক্তি-স্তব :

পুণ্যভূনিষেবণায় পুত্রমেতদুদ্যতং
পূর্ণকামমাদধাতু পাদলগ্নমম্বিকে।

পুণ্যভূমি ভারতের সেবা করতে তোমার পুত্রেরা চায়, তাই হে অম্বিকে, তুমি চরণাগত তাদের পূর্ণকাম করো।

কুঙ্কুম বলত : "এই-ই হ'ল শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতা, ভগবানকে ডাকতে হবে বৈ কি—কিন্তু ভক্তি-মুক্তির জন্য নয়, ডাকতে হবে। পুণ্যভূমি ভারতের সেবা করবার শক্তি লাভ করতে। আমাদের উঠতে হবে সব আগে। দানবরা আমাদের মা'র বুকে ব'সে, মা'কে আগে তাদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে—ঈশ্বর-টিশ্বর তার পরে। সব আগে দুর্গত দেশবাসীদের স্বাধীন ক'রে তাদের অন্ন-বস্ত্র-বিদ্যাদান, তার পরে জ্ঞান-ভক্তি নির্বাণের কথা ভাবা যাবে।

পল্লবের কিন্তু মনের দ্বিধা কাটত না। এক দিকে কুঙ্কুমের তেজোগর্ভ মনে ওর তরুণ মনে জ্ব'লে উঠত আগুন। কিন্তু সুখপ্রিয় তরুণ তো রাখতে পারত না এ-আগুন। বিলাসের ঝাপটায় নিবে যেত উদ্দীপনা। ফের সেই সদা টলমান জিজ্ঞাসুর শোচনীয় অবস্থা।

এমনি সময়ে ওরা ভর্তি হ'ল প্রেসিডেন্সি কলেজে। পল্লব সুবিমলের কথায় নিল সায়েন্স—আই-এস-সি। কুঙ্কুম নিল আর্ট—আই-এ।

কিন্তু বিজ্ঞানের স্বাদ পেতে না পেতে পল্লবের বিজ্ঞানে হ'ল অরুচি। কি হবে বস্তু সম্বন্ধে হাবি-জাবি তথ্য জড়ো ক'রে ? কিন্তু ওর মামা ওকে ধ'রে পড়লেন, "বাবা ! আমার একটি

কথা শুধু রাখ। আর চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যেই বিলেত যাবি। আমার বড় ইচ্ছা তুই আই-সি-এস দিবি। পাশ তুই করবিই—মেধায় তো কারুর চেয়েই খাটো নোস বাবা! কেবল তোর হাতে বিস্তর টাকা, একটা কাজ করা দরকার, নৈলে যে ঝোঁকানো, দিলদরিয়া ছেলে তুই বারো ভূতে লুটে পুটে খাবে। আমি তো আর কিছু চিরদিন জগ হ'য়ে আগলাতে পারব না তোর সম্পত্তি। তাই তুই বিজ্ঞান ও গণিত নে, আই-সি-এস পাশ কর, সুবিধে হবে।"

পল্লবের মনে হ'ল মন্দ কি? আই-সি-এস হয়ে, বড় সাহেব হাকিম হ'তে কার অসাধ? ও মামার কথামত বিজ্ঞানই নিল। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ঠাকুরের বাণী চাপা পড়ে গেল। "লোকে খবর চায়—বাবুর ক'খানা বাড়ি, কত টাকা, জমি জমা—এই সব। বাবুকে জানতে চায় কে? চাইতে হয় শুধু তাঁকে—এ-ও তো সাত পাঁচ জেনে হবে কি?"

ও পণ নিল—হোক, জানবে বিজ্ঞানের পঞ্জিকার কথা—যা জেনে মানুষ আজ এত বড় হয়েছে।

কিন্তু পণ নিলে হবে কি? ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে না ঢুকতে ওর মন উঠল বিষিয়ে। ধিক!—কয়লা বালি, দুর্গন্ধ গ্যাস, বানসেন বার্ণার, টেষ্ট-টুব, ব্রিটর্ট—এ ও তা সাত সতের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কত কি-ই যে ও ভেঙে ফেলে—অ্যামিডে দিনের দিন পাঞ্জাবি পোড়ায়—ওজন করা, মাপা, গ্রাম—ছি ছি—এ কি ভালোমানুষের পো-র কাজ? ও একদিন আর না পেরে কুঙ্কুমকে গিয়ে বলল, ও আই-এস-সি ছেড়ে আই-এ নেবে। কুঙ্কুম ব্যস্ত হ'য়ে বলল: "না না, তোমার অমন মামা—তাঁর মনে কষ্ট দিও না। তাছাড়া সাহিত্য, সংস্কৃত, ইংরাজি, ইতিহাস এ সব পড়ে বাড়িতেও পড়তে পারবে—একটু বিজ্ঞানের ক-খ শিখে রাখা মন্দ কি? দেখতে দেখতে ভালো লাগবে ভেবো না।"

কুঙ্কুমের কথা খানিকটা মাত্র ফলল। গণিতের চর্চা করতে করতে ওর হঠাৎ মাথা খুলে গেল। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের তথ্য জড়ো করতে করতে ফের ওর সুপ্ত বৈরাগ্য জেগে ওঠে বুঝি বা! মনে পড়ে ঠাকুরের কথা: বাবুর খবর নেওয়াই ঠিক—তাঁর সম্পত্তি তাঁরই থাক···এই সব বাণী ফের মনে প'ড়ে যায়। ফের ওর টলমান মন ট'লে ওঠে, ও ভাবে আই-এস-সি ছেড়ে আই-এ নেবে।

কিন্তু হ'ল না। কারণ, এই সময়ে ও পড়ল আর এক বন্ধুর প্রভাবে। সে মোহনলাল। মৈমনসিং থেকে এসেছিল—প্রবেশিকায় "থার্ড" হ'য়ে। বিজ্ঞানে অদ্ভুত মাথা। সে ওকে এমন কি রসায়ন যে রসায়ন—তাতেও রস পাওয়ার দীক্ষা দিল। আশ্চর্য তারুণ্যের ধর্ম! যাকেই ভালোবাসা যায়, তারই ছাপ পড়ে স্নেহের মাধ্যমে। মোহনলালকে ভালোবাসতে না বাসতে পল্লব এইচ-টু-এস-ও-ফোর, স্পেকট্রাম, ইলেকট্রোলাইসিস প্রভৃতি তথ্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হ'য়ে শেষটায় বিজ্ঞানেই কায়েম হ'য়ে রইল। কুঙ্কুম দেখে বলল, "ঠিকই হয়েছে, মহাভারতের কথা অমৃত সমান—ব্যূহের মধ্যে ঢোকা সোজা কিন্তু তা থেকে বেরুনো ভার।"

মোহনলাল ধনী জমিদারের ছেলে—মৈমনসিংহে ওরা হাতি চ'ড়ে বেড়ায়। পল্লব একবার এক ছুটিতে ওদের ওখানে গিয়ে কিছুদিন ছিল। মোহনলালের বিধবা মাকে দেখে ও মুগ্ধ না হ'য়ে পারেনি। কি ভক্তি! দিনরাত পূজা নিয়েই আছেন। ধনী বিধবা, কিন্তু এতটুকু কি বিরাম আছে? ভোর চারটেয় উঠেই ফুল তোলা, মন্দির মার্জন, পূজা-অর্চনা আরতি, ব্রত পার্বণ—ওর মধ্যে ফের জেগে উঠল নিবে যাওয়া ভক্তি।

কিন্তু মোহনলাল রেগেই অস্থির। বলল, "ওসব সেকেলে কাণ্ড ভাই, ওদিকে ঘেঁসো না। ও তোমার আমার কাজ নয়। আমাদের আগে মানুষ হতে হবে। ধর্ম ধর্ম করেই আমাদের সর্বনাশ হয়েছে কি না জোর ক'রে বলতে পারি না, কিন্তু এটা বলতে পারি যে, যুগে যুগে মানুষের মতি-গতি যায় বদলে। আমরা ডাক শুনেছি এ যুগের আর এ যুগের বাণী হ'ল, 'কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মানুষ হ'।"

মোহনলালের সঙ্গে কুঙ্কুমের ওখানে কিছু মিলও ছিল। কুঙ্কুম দেখতে দেখতে হ'য়ে বসল—মোহনলালের ভাষায়—"দেশধ্বজ"। মোহনলাল হ'য়ে বসল—কুঙ্কুমের ভাষায়—"স্বাবলম্বী মানবতা মন্ত্রের পূজারী"। কুঙ্কুম বলত, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী"। মোহনলাল বলত, বেকনের কথা: মানুষের যত কীর্তি—আমারি কীর্তি—বিশ্বের সবতাতেই আমার ঔৎসুক্যের স্বাক্ষর রইল।

ছয়

দেখতে দেখতে প্রেসিডেন্সি কলেজে ওরা তিন বন্ধু হ'য়ে উঠল অন্তরঙ্গ। ছেলেরা ঠাট্টা ক'রে বলত: যেন ট্রিনিটি—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—একজন করে সৃষ্টি, একজন সংরক্ষণ আর একজন বিপ্লব।

কুঙ্কুমের বিপ্লবী খেতাব কায়েম হ'য়ে গেল আর একটা আকস্মিক ঘটনায়। কলেজের এক সাহেব অধ্যাপক একটি ছাত্রকে একদিন খুব অপমান করেন। কুঙ্কুম বুক দিয়ে পড়ল—হ'য়ে দাঁড়াল দলপতি। প্রোটেষ্ট মিটিং হ'ল। সাহেব চোখ রাঙালেন। কুঙ্কুম গেল প্রিন্সিপালের কাছে—এর একটা বিহিত করুন। কিন্তু সাহেব অধ্যাপক। প্রিন্সিপাল ভড়কে গেলেন। কুঙ্কুম মোহনলাল ও আর পাঁচ জন ছাত্রের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একদিন তরুণ সপ্তরথীতে মিলে প্রবীণ সাহেবকে কলেজের মধ্যেই খুব উত্তম-মধ্যম দিল। সবাই জানত কুঙ্কুম দলপতি রিং-লীডার—কাজেই কুঙ্কুমকে কলেজ থেকে বার ক'রে দেওয়া হ'ল। ছাত্রদের মধ্যে ও হ'য়ে উঠল "হিরো" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের নেক নজরেও পড়তে হ'ল বৈ কি।

পল্লবের মন কুঙ্কুমের জন্যে ব্যথিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু কুঙ্কুম নির্বিচল: "বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়।"

"কিন্তু কী করবে তুমি?"

"বাড়িতেই পড়াশুনো করব। পরে সুবিধা পেলেই যাব বিলেত। সেখানে তো আর এরকম অপমান হবে না। সেখানে সবাই সমান। ওখানে ওরা রাজা আমরা দাস। এ গ্লানি থেকে মুক্ত হ'তেই হবে পল্লব!"

এর আগে কুঙ্কুমের দেশভক্তির সঙ্গে ছিল বিদ্যাস্পৃহা, এখন হ'য়ে দাঁড়ালো সে একান্তী। বিদ্যা ও পরের কথা, সব আগে চাই দেশকে স্বাধীন করা। এ লাঞ্ছনা অসহ্য।

পল্লব গণিতে "অনর্স" ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েও আনন্দ পেল না। কুঙ্কুম বহিষ্কৃত—এ-দুঃখ ও কোথায় রাখে?

মোহনলালও ফার্ষ্ট ক্লাস অনর্স পেল—রসায়নে প্রথম হ'য়ে।

তারপর তিন বন্ধুর জল্পনা।

কুসুম বলল: "মোহনলাল, তুমি আগে বিলেত যাও। তোমার পরে পল্লব, তার পরে আমি। বিলেতে ফের মিলব আমরা।"

সাত

মোহনলাল ও পল্লব পাশ করল ১৯১৮ সালে। এর পরেই কুসুম অনুমতি পেল পরীক্ষা দেবার। এক বৎসর প'ড়েই ও ১৯১৯-এ দর্শনে ফার্স্ট ক্লাস অনর্সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। কিন্তু ওর বাবা ভয় পেলেন ওকে বিলেত পাঠাতে। বললেন: "যদি আই-সি-এস দাও তবেই পাঠাব, নৈলে নয়।" তাঁর দোষ ছিল না, ভয়ে তাঁর রাতে ঘুম হ'ত না পাছে কুসুম জেলে যায়! তাই এই সর্ত। কুসুম পল্লবকে বলল চুপি চুপি: "তুমি কেমব্রিজে গিয়ে আমার অপেক্ষা করো, আমি এলাম ব'লে।"

পল্লব মহানন্দে মোহনলালকে গিয়ে বলল। অতঃপর তিন বন্ধুর কনফারেন্স। মোহনলাল বলল: "কিন্তু তোমার বাবা তো তোমাকে বিলেত পাঠাতে রাজি নন বলছিলে?"

কুসুম হেসে বলল: "নারাজকে রাজি করাবার উপায় আছে।"

"যথা?"

"বাবাকে কথা দিলাম—আই-সি-এস পরীক্ষা দেব। বাবা একগাল হেসে বললেন: 'ভবতু বংশতিলক:।"

মোহনলাল অবাক্! "তুমি আই-সি-এস পরীক্ষা দেবে—তুমি, কুসুম—আনন্দমঠের বীর সন্তান, 'ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে' বদ্ধপরিকর?"

কুসুম হো-হো ক'রে হেসে বলল: "বলেছ ভালো। তবে কি জানো? আই-সি-এস পরীক্ষা দেব এই কথাই দিয়েছি, পরীক্ষা পাশ ক'রে ম্লেচ্ছ মনিবের পাদুকাবহ হব, এমন কথা তো দিই নি?"

মোহনলাল মৃদু হেসে বলল: "আগে কহ আর। মানে—ভাষ্য।"

কুসুম বলল: "বিলেত আমাকে যেতেই হবে—অনেক কিছু শিখতে। কিন্তু বাবা যখন গোঁ ধরলেন আই-সি-এস পরীক্ষা না দিলে পাঠাবেন না তখন তাঁর সর্তে রাজি হ'লাম নিজের গোঁ বজায় রেখে, কিন্তু গোপন করে। অর্থাৎ পাশ যদি করি—চাকরি করব না—ব্যস্। এবার প্রাঞ্জল হয়েছে কি? কিন্তু সাবধান! একথা ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ না পায়—তাহ'লে বাবা আর বিলেত পাঠাবেন না। দেশের কাজে সব আগে চাই মন্ত্রগুপ্তি।"

তারপর ঘণ্টাখানেক ধ'রে তিন বন্ধুর কথাবার্তা হ'য়ে রেজলুশন পাশ হ'ল যে মোহনলাল আগে কেমব্রিজে গিয়ে লিখলে কুসুম ও পল্লব রওনা হবে। কেমব্রিজের কলেজে 'সীট' পাওয়া ভার। মোহনলাল দক্ষ দূত—সব ঠিকঠাক ক'রে তার করবে।

পল্লব আনন্দে অধীর। বলল: "তুমি যাবে কুসুম, থাকব আমরা একত্রে! উঃ! বিশ্বাস হচ্ছে না।"

কুসুম হেসে বলল: "But don't count your chickens, my poet, before they are hatched."

ভর্তৃহরি থেকে

[শ্রীঅরবিন্দের 'Century of Life' অবলম্বনে]

নমি সেই শান্তিময় মূর্ত জ্যোতির্নাথে—
অবিচ্ছিন্ন, দেশাতীত, কালাতীত যিনি,
সঙ্গহীন, বন্ধহীন, যিনি আত্মলীন,
তাঁরে নমি—চিরন্তন স্তব্ধ পারাবার।

আমার ধ্যানের মানসী যে, সে মোর প্রতি বিরক্ত,
সে চায় যারে, সে জন আবার অপর দারে আসক্ত।
আমার লাগি আরেক নারী উতলা—তার চায় না মন!
ধিক আমারে, ধিক প্রেয়সী, ধিক তাহারে ধিক মদন।

অজ্ঞজন সহজেই পরিতুষ্ট হয়,
বিশেষজ্ঞ তৃপ্ত হয় আরো অনায়াসে,—
স্বল্পজ্ঞানে যে বিদগ্ধ, বদ্ধ মোহপাশে,
তারে সন্তুষ্ট করা ব্রহ্মা-সাধ্য নয়।

মকর-দশন থেকে মণি কেড়ে আনা,—
উত্তাল সমুদ্রে নেমে পার হয়ে যাওয়া,
মাথার ভূষণরূপে সাপ পোষ মানা,
সবই সোজা, সোজা নয় মূর্খে জ্ঞান দেওয়া।

অনুবাদক: পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
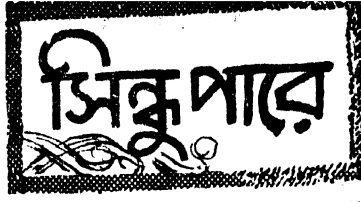
শ্রী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

আট

তিন-চার দিন পরেই চন্দ্রনাথ চলে গেল টরকি। আবার এ বাড়ীতে মিসেস ব্লেকের সঙ্গে একলাই থাকতে হল। চন্দ্রনাথ ভুল বলেছিল—চন্দ্রনাথ চলে যাওয়াতে মিসেস ব্লেকের আমার প্রতি ব্যবহার একটুও বদলাল না। সেই যেন ভাল করে কথা বলে না,—আমার খাওয়া দাওয়ার প্রতি সেই রকমই উদাসীন। চন্দ্রনাথ নাই, আমি একলা—বোধ হয় ব্যাপারটা নিদারুণ হয়ে উঠত আমার মনের দিক দিয়ে কিন্তু অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে এত দিন পরে হঠাৎ এমন একটা হাওয়া উঠল যে আমার মনের বেলুন আবার যেন উড়ল আকাশে, নীচের সমস্ত দৈন্য অনায়াসে তুচ্ছ করে। সেই কথাই এইবার বলি।

* * * *

মেঘাচ্ছন্ন বিকেল, চারটে বাজতে না বাজতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। দারুণ শীত—বাইরে একটা শন্-শন্ শব্দে জোর হাওয়া বইছে। ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথার টুপিটা একটু সামনের দিকে টেনে দিয়ে জোরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে ঢুকে আমি যেন বাঁচলাম। এলটাম পার্কে যাওয়ার ট্রেণ ছাড়তে তখনও কুড়ি মিনিট বাকী।

এত সকাল সকাল বাড়ী ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। কিন্তু করি-ই বা কি? একবার মনে হয়েছিল—যাই সুনীলদের ফ্ল্যাটে গিয়ে খানিকটা গল্প করে আসি। ইতিমধ্যে অবশ্য চন্দ্রনাথকে নিয়ে একদিন ওদের ওখানে বেড়িয়ে এসেছি। কথাও হয়েছিল—চন্দ্রনাথ টরকি থেকে ফিরে এলে সুনীল একদিন ডাল, ঝোল ভাত রেঁধে আমাদের খাওয়াবে। কিন্তু পাউইস গার্ডেনসে ওদের ফ্ল্যাটে চেয়ারিং ক্রশ থেকে দূরও অনেকটা, অনেকক্ষণ বাসে যেতে হয়। এবং এখন গেলে ওদের হয়ত বাড়ীতে না-ও পেতে পারি, শুধু শুধু ঘুরে মরাই হবে—এই সব ভেবে আজ আর ওদের ফ্ল্যাটে গেলাম না। ভাবলাম, চেয়ারিং ক্রশ বুকষ্টল থেকে হার্ডির 'টেস' বইখানা কিনে নিয়ে যাই—বাড়ীতে গিয়ে না হয় চুপচাপ বসে বসে পড়া যাবে। "উডল্যাণ্ডারস্" পড়ে অভিভূত হওয়ার পর চন্দ্রনাথ বিশেষ করে বলেছিল 'টেস' বইখানা পড়তে।

চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে বই-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সাজান বইগুলি দেখছি, এমন সময় মনে হল—কে যেন আমাকে লক্ষ্য করছে। পাশে চেয়ে দেখি একটু দূরে দাঁড়িয়ে একটি সুবেশা তরুণী, একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। মেয়েটিকে দেখেই ভাল লাগল। প্রথমেই নজরে পড়ল শরীরের গড়নটি—একহারা, কিন্তু যৌবনশ্রী অঙ্গে অঙ্গে লীলায়িত। একখানি সুশ্রী মুখের মধ্যে বড় বড় না হলেও তীক্ষ্ণ দুটি চোখের আকর্ষণী শক্তি স্বীকার না করে উপায় নাই। মাথার উপর এক পাশে একটি ছোট গোল নীল রং-এর টুপি একটু বেঁকিয়ে লাগান এবং বেশীর ভাগ খোলা মাথা। ঘন ঢেউখেলানো সোনালী চুলের বাহার মুখখানির শোভা যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটির দিকে চেয়ে তৎক্ষণাৎ মনে হল—মেয়েটি সুন্দরী, সে কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নাই। মেয়েটির দিকে চাইলাম—আমার সঙ্গে চোখোচোখী হওয়াতেও মেয়েটি চোখ নামিয়ে বা সরিয়ে নিল না। সোজা চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। হঠাৎ মনে হল—মেয়েটির মুখটি যেন চেনা।

দু'-এক সেকেণ্ড কি করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না—এগিয়ে গিয়ে কথা কইব না চোখ ফিরিয়ে নেব। দু'জনে দু'জনার দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় মেয়েটির চোখে এবং ঠোঁটে ঈষৎ একটু হাসির রেখা খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার টুপি তুলে মেয়েটিকে অভিবাদন জানালাম। মেয়েদের সঙ্গে এ ভদ্রতাটুকু ইতিমধ্যেই শিখেছিলাম।

একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম "শুভ সন্ধ্যা"! মেয়েটিও মিষ্টি "শুভ সন্ধ্যা" জানিয়ে চুপ করে গেল। এইবার কি বলি! হঠাৎ মাথায় কথা বলার বুদ্ধি এলো।

বললাম, "আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হয়?"

মেয়েটি ইতিমধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমার দিকে না তাকিয়েই শুধাল, "কোথায়?"

বললাম, "তা ত মনে করতে পাচ্ছি না!"

বললে, "আপনার স্মরণশক্তি ত বিশেষ প্রখর নয় দেখছি!"

শুধালাম, "কোথাও কি আমাদের দেখা হয়েছিল আগে?"

বললে, "হ্যাঁ।"

শুধালাম, "কোথায় বলুন ত?"

মেয়েটি খিল-খিল করে হেসে উঠল। হাসিটি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম কি না মনে নাই, তবে অবাক একটু নিশ্চয়ই হয়েছিলাম। হাসির মধ্যে একটা সুরও আছে তালও আছে। আমার ভুল হতে পারে কিন্তু মনে হয়েছিল যেন হাসিটি বিশেষ যত্নসহকারে অভ্যাস করা এবং ভালই দাঁড়িয়েছে। এ রকম হাসি আমি অন্য কোনও মেয়ের মুখে ইতিপূর্ব্বে শুনিনি।

বললাম, "হেসে কথাটা উড়িয়ে দিলেন কেন? দয়া করে বলুন, কোথায় আমাদের আগে দেখা হয়েছিল?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ত এলটাম্ পার্কে যাবেন?"

অবাক হয়ে শুধালাম, "তা আপনি কি করে জানলেন?"

বললে, "সেখানে ত ১৪নং গ্রীণহোম রোডে মিসেস ব্লেকের বাড়ীতে থাকেন—না?"

আরও অবাক হয়ে গেলাম।

শুধালাম, "আপনি আমার সম্বন্ধে এত খবর রাখেন কি করে?"

আবার একবার সেই হাসি। ষ্টেশনের বড় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "শুনুন! আপনার ট্রেণ ছাড়তে আর মাত্র দশ মিনিট বাকী। আপনি কি এই ট্রেণেই যাবেন না পরের কোনও ট্রেণে গেলেও চলবে?"

আগেই বলেছি—এলটাম্ পার্কে এত সকাল সকাল ফিরে যাওয়ার আমার কোনও আগ্রহ ছিল না এবং মেয়েটিকে ভাল করে চিনবার একটা প্রবল কৌতূহলও হল মনে।

বললাম, "আমার কোনও তাড়া নেই।"

বললে, "তাহলে চলুন কোনও একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে 'চা' খাওয়া যাক। সেইখানেই আলাপ করা যাবে।"

বললাম, "বেশ ত চলুন।"

• • • •

চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের পাশের একটা গলিতে সুন্দর একটা নিরিবিলি রেস্তোরাঁয় একটি কোণের টেবিলে আমরা গিয়ে বসলাম—মেয়েটিই নিয়ে গেল সেখানে। কোথায় মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আগে এবং মেয়েটি আমার বিষয় এত খবর জানলই বা কি করে—ভেবে কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। টেবিলে বসে চা আনতে বলে মেয়েটিকে শুধালাম, "বলুন না কোথায় আমাদের দেখা হয়েছিল আগে?"

বললে, "আপনার স্মরণশক্তি ত প্রখর নয়ই এবং ধৈর্য্যগুণেরও অভাব আছে দেখছি।"

বললাম, "সত্যিই জানতে বড্ড কৌতূহল হচ্ছে।"

বললে, "কৌতূহল দমন করাও ত একটা গুণ।"

কি আর বলি। চুপ করে গেলাম। লক্ষ্য করলাম—কথাবার্তার ভঙ্গিমায়, তীক্ষ্ণ দুটো চোখের মধ্য দিয়ে একটা চাপা দুষ্টু হাসি যেন সব সময় ঠিকরে পড়ছে। মেয়েটি শুধাল, "যাক ও কথা। মিসেস ব্রেককে কি রকম লাগে আপনার?"

শুধালাম, "আপনি মিসেস ব্রেককে চেনেন নাকি?"

বললে, "আলাপ হওয়া ত দূরের কথা—কোনও দিন দেখিওনি।"

বললাম, "তবে?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "তবে আবার কি? যাকে দেখিনি তার বিষয় কি জানতে নেই?"

বললাম, "তাকে জানার আপনার এই আগ্রহের কারণটা না শুনলে আপনার প্রশ্নের উত্তর কি করে দিই—বলুন?"

বললে, "মহিলাটির চরিত্রের প্রতি আমার কৌতূহল আছে।"

শুধালাম, "কৌতূহলের কারণটা কি?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে শুধাল, "আপনার ও বাড়ীতে থাকা ত মাসখানেকের উপর হয়ে গেল, না?"

বললাম, "তাও জানেন দেখছি!"

খিল খিল করে হেসে উঠল—আবার সেই হাসি। বললে, "আমি জানতে চাই—ভদ্রমহিলার আপনার প্রতি ব্যবহারে কি এখনও জোয়ার চলছে—না ভাঁটা হয়েছে সুরু?"

সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মেয়েটি কি যাদু জানে! মেয়েটির মুখের দিকে চাইলাম। দেখি—মেয়েটি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে আছে চেয়ে। চোখে সেই চাপা দুষ্টু হাসি।

চট্ করে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "যাক্—ও সব কথা আর একদিন হবে। এখন আপনার সঙ্গে পরিচয়টা পাকা করে নেওয়া যাক্। আপনার নামটি কি?"

একটু হেসে বললাম, "এত জানেন—আর সেটা জানেন না?"

সহজ ভাবে বলল, "না—সে খবরটা এখনও পাইনি।"

বললাম, "আমার নাম চৌধুরী—বিকাশ চৌধুরী।"

বললে, "বিক্—কি বললেন আর একবার বলুন।"

বললাম,—"বিকাশ।"

বললে, "তা শুধু বিক্ বলেই আপনাকে ডাকব, সেইটেই সহজ হয়—আপত্তি আছে?"

বললাম, "না।"

বললে, "আমি এমি—এমিলিয়া জনসন্। আপনি এমি বলে ডাকবেন—কেমন?"

বললাম, "বেশ ত!"

বললে, "আলাপ যখন হলো এবং আজই যখন আলাপের শেষ নয়, তখন আমার পরিচয়টাও আপনাকে বলে দিই। উত্তরে ইয়র্কসায়ারে হার্টবার্ণ গ্রামে আমার বাড়ী। বাবা মা এখনও বেঁচে—বাবার ময়দার কল আছে। তাঁরা গ্রামেই থাকেন। এক বড় বোন আছে—তারও বিয়ে হয়নি—বাবা-মার কাছেই থাকে। আমি লণ্ডনে চাকুরী করি। আর কিছু জানতে চান?"

বললাম, "না।"

বললে, "এবার আপনার পরিচয়টা বলুন—যদি আপত্তি না থাকে।"

বললাম, "আমার আর পরিচয় কি? আমি ভারতবর্ষীয় ডাক্তার—অতিরিক্ত পড়াশুনা করবার জন্য এ দেশে এসেছি।"

শুধাল, "দেশে কে কে আছে?"

বললাম, "সবাই আছে—বাবা, ভাই বোন, ইত্যাদি। মা অবশ্য আগেই মারা গেছেন।"

শুধাল, "ঐ ইত্যাদি কথাটার মানে কি?"

বললাম, "আপনি কি জানতে চান, সোজাভাবেই প্রশ্ন করুন না?"

আবার সেই হাসি। তারপর সোজা মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে শুধাল, "আপনি কি বিবাহিত?"

বললাম, "হাঁ।"

বলল, "তা স্ত্রীটিকেই ইত্যাদির মধ্যে দিলেন ফেলে?"

হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত বোধ হল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে জোরের সঙ্গেই বললাম, "আমরা ভারতবর্ষীয় কি না। প্রথমেই বড় গলায় স্ত্রীর কথা জাহির করতে একটু লজ্জা পাই।"

মেয়েটি হঠাৎ যেন বিশেষ মন্ত্রমধুর হয়ে গেল। বলল, "আমি সত্যিই দুঃখিত। আমায় ক্ষমা করবেন।"

বললাম "না না—আমি ত আপনার কোনও অপরাধ নিই নাই।"

একটু চুপ করে থেকে বললে, "আপনি বিবাহিত—বাঁচা গেল।"

শুধালাম, "কেন?"

বলল, "অবিবাহিত যুবকদের সঙ্গে মিশতে আমি বড় ভয় পাই।"

একটু হেসে শুধালাম, "তার কারণ?"

বলল, "তারা প্রেম ছাড়া কিছু বোঝে না। প্রেম দিয়েই সুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহ প্রস্তাব এনে বিব্রতের মধ্যে ফেলে।"

একটু হেসে শুধালাম, "অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে বুঝি ?"

আবার সেই হাসি। বলল, "কিছু কিছু হয়েছে বৈ কি। অভিজ্ঞতা না হলে কী জীবনটাকে চেনা যায় ?"

শুধালাম, "বিবাহিত লোকের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কি এই প্রথম ?"

বলল, "না। আগেও হয়েছে।"

বললাম, "তাদের বিষয় আশা করি ধারণা আপনার ভাল ?"

বলল, "অন্ততঃ তারা প্রেম দিয়েই সুরু করে না।"

এই রকম নানা কথায় সময় কেটে যেতে লাগল। আমি যা জানবার জন্ত দারুণ উৎসুক হয়ে আছি, সে কথা জিজ্ঞাসা করার সুযোগই ঘটল না। চা খাওয়া শেষ হলে রেস্তোরাঁর দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে আবার কথাটা তুললাম।

শুধালাম, "কৈ বললেন না—আপনি কি করে আমার বিষয় এত খবর পেলেন ? কোথায় আমাদের দেখা হয়েছিল ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে, নিজের হাতখানি ঘুরিয়ে হাতে বাঁধা ছোট ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ছ'টা বেজে দু মিনিট। এখনই না উঠলে আপনি ছ'টা কুড়ি মিনিটের গাড়ীও পাবেন না। মিসেস ব্লেক আর তা হলে রাত্রে খেতেই দেবেন না।"

সব খবরই রাখে দেখছি। বললাম, "আপনি আমাকে দারুণ কৌতূহলের মধ্যে রেখে দিলেন।"

বলল, "নির্বিকার হওয়ার চেয়ে কৌতূহল থাকা ভাল।"

উঠে দাঁড়াল। ক্রমে দুজনেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ষ্টেশনে এলাম। গাড়ী ছাড়তে তখন প্রায় দশ মিনিট বাকি। প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে করমর্দনে নরম হাতখানি হাতের মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কাল আবার দেখা হবে ত ?"

চোখের সেই দুষ্টু হাসি যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "কালই ?"

একটু জোরের সঙ্গে বললাম, "হ্যাঁ কালই।"

হঠাৎ যেন চোখের হাসি গেল নিবে। শান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে একটু অনুরোধের সুরে বলল, "না না বিক্, কাল নয়। কাল আমার মনিব আমায় চা খেতে বলেছেন। পরশু। আজ যেখানে দেখা হয়েছিল—ঐখানেই দেখা হবে। বিকেল চারটে পনের মিনিটের সময়।"

হাতখানা তখনও আমার হাতের মধ্যেই রয়েছে।

● ● ● ●

এই মেয়েটি সত্যিই মনটাকে যেন পেয়ে বসল। সমস্ত ট্রেণ, সমস্ত সন্ধ্যা, এই মেয়েটির কথাই ভেবেছি—কে এই রহস্যময়ী, আমার বিষয় এত খবর জানল কি করে ? এমন কি মিসেস ব্লেকের সহৃদয়তায় জোয়ার গিয়ে ভাঁটার টান লেগেছে—সে খবরটিও যেন তার জানা।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে এই মেয়েটির চিন্তায়ই মনটা উঠল ভরে। বারে বারে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল সেই বিদায়ের সময় তার শান্ত অনুরোধ ভরা চাহনিটি—"না-না বিক্ কাল নয়।"

পরের দিন বিকেল চারটে আন্দাজ দিনের কাজ সেরে চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে যখন এলাম, মনটা বোধ হয় একটু খারাপ হল—আজ ত তার সঙ্গে দেখা হবে না। এত সকাল সকাল বাড়ী ফেরার ইচ্ছে নেই—প্রায় ঘণ্টাখানেক চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে বই-এর দোকানে বই দেখতে লাগলাম। "টেস্" বইখানি পেলাম না হার্ডির Pair of Blue eyes বইখানা নিলাম কিনে। এ বইখানার প্রশংসাও চন্দ্রনাথের কাছে শুনেছিলাম। এতক্ষণ যে ষ্টেশনে অপেক্ষা করলাম, মনের কোণে আশা ছিল কি—যদি বা এসে পড়ে ? এতদিন পরে তা ঠিক বলতে পারি না। পাঁচটার পর একটা ট্রেণ ধরে গেলাম ফিরে।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভেঙেই মনটা যেন উৎফুল্ল বোধ হল—আজ তার সঙ্গে দেখা হবে। এ রকম হালকা উৎফুল্ল মন নিয়ে এ দেশে আমার ঘুম বোধ হয় ভাঙেনি কোনও দিন।

বুলা। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ—শেষ পর্য্যন্ত আমি মেয়েটির প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। কিন্তু তা ঠিক নয়। প্রেম করার কথা আমি মোটেই ভাবিনি। এত দিন পরে এই বয়সে সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে আমার মনে হচ্ছে যে, সে সময়টা আমার মনের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, আমার জীবনে এই মেয়েটির আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল—বিলেতে নিজের পায়ে নিজে সোজা হয়ে দাঁড়াবার জন্ত—একটা আত্মনির্ভরতায়। সোজা হয়ে না দাঁড়ালে মনের বেলুন আকাশে উড়বে কি করে ? তার মধ্যে একটা আনন্দও পাচ্ছিলাম, তাই এই মেয়েটির সঙ্গ পাওয়ার জন্ত মন হত অত আকুল। হয়ত বলবে—একটু সুন্দরী মেয়ের সঙ্গ পেয়েই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার শক্তি এলো ? আকাশে উড়ল মনের বেলুন ? উত্তরে শুধু এইটুকু বলতে চাই—শুধু আমার চরিত্রের দিকটাই নয় তখন আমার তরুণ যৌবন সে কথাটা ভুলো না এবং এই মেয়েটির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকুও লক্ষ্য করো। সেই সময় এই মেয়েটি আমার জীবনে না এলে হয়ত চন্দ্রনাথের মতন আমাকেও দেশে ফিরে যেতে হত। বলতে পার—ভালই ত হত তাহলে। কিন্তু বুলা ! সেটা যে বিধিলিপি নয়। উপায় কি ?

● ● ● ●

বিকেল চারটে বাজতে না বাজতে চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু চারটে পনের মিনিটের সময় মেয়েটি এলো না। এক প্রাণ আশা নিয়ে অপেক্ষা করছি, সময় কেটে যেতে লাগল কিন্তু কৈ মেয়েটি এলো না ত ! বই-এর ষ্টল-এর সামনে পায়চারী করে শুধু শরীরের দিক দিয়েই নয়, মনের দিক দিয়েও কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। যখন পৌণে পাঁচটা হল, মনের আশা ধীরে ধীরে যেন লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল—ক্রমে মনটা একটা হতাশায় উঠতে লাগল ভরে। যখন পাঁচটা বাজল—মনে হ'ল—যাই পাঁচটা বারো মিনিটের ট্রেণেই যাই ফিরে। মনে হয়েছিল—বৃথা অপেক্ষা করা, আমার সঙ্গে আর দেখা করবে না, আমার সঙ্গে মেলা-মেশা যে মিথ্যা, কোনই যে তার পরিণতি নাই। আমি যে বিবাহিত। তাই সে কথাটা কাল প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যাওয়ার সময় সেই চাহনিটা—'না না বিক, কাল নয়।' তার মধ্যেও কোনও ছলনা ছিল না। পাঁচটা বারো মিনিটের ট্রেণে যাই যাই করেও যেন যেতে পারলাম না। পাঁচটা পনের মিনিট হ'ল—হতাশায় বিরাট ফাঁকায় ক্রমে রাগে দুঃখে অভিমানে মনটা উঠতে লাগল ভরে। কিন্তু কার উপর রাগ, কিসের অভিমান—সে সব কথা তখন ভেবে দেখবার অবসরই

ছিল না। মতটাকে দৃঢ় করে ফেললাম—সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে ফিরে যাবই।

পাঁচটা বাইশ মিনিট—হঠাৎ চেয়ে দেখি, মেয়েটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে ঢুকছে। দ্রুতগতিতেই, একমুখ হাসি নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো। হাতখানি ধরে বলল, "বিক, রাগ করেছ?"

বললাম, "রাগ করার কারণ ঘটেনি কি?"

বলল, "না না বিক্, রাগ করো না। আমার উপায় ছিল না। সাধারণতঃ চারটের সময় আমার ছুটি হয়। আজ আমার মনিব চারটের সময় হঠাৎ কতকগুলো কাজ নিয়ে বসলেন—ডেকে পাঠালেন আমাকে।"

কথাগুলি সহজভাবেই বলে গেল—কোনও ছলনার আভাস পেলাম না। বললাম, "যদি আমি পাঁচটা বারো মিনিটের ট্রেনে চলে যেতাম—তাও ভেবেছিলাম।"

আবার চোখে ফিরে এলো সেই চাপা হাসির দীপ্তি।

বলল, "গেলে না যে?"

বললাম, "সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে নিশ্চয়ই যেতাম।"

বলল, "তাও যেতে না—আমি জানি। সেই পাঁচটা কুড়ি মিনিটের ট্রেন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।"

শুধালাম "আমার উপর তোমার এত আস্থা হল কি করে?"

বলল, "মানুষ কিছু কিছু চিনি। তুমি যে লোক ভাল।"

• • • •

দু'জনে গেলাম—কালকের সেই রেস্তোরাঁয়। এমিই বলছিল—"চল যাই কালকের সেই জায়গাটিতে। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। সেইখানেই চা-এর সঙ্গে দু'জনে কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে। আজ আর তোমাকে মিসেস ব্লেকের সাপারে যেতে দিচ্ছি না। তিনি একলাই সাপার খান আজ। কিছু খেয়ে দু'জনে চল একটা সিনেমায় যাই।"

বললাম, "কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মিসেস ব্লেককে আগে বলিনি—রাগ করবেন যে।"

বলল, "তা একটু করুন। বীতরাগের চেয়ে রাগ ভাল।"

রেস্তোরাঁয় বসে এমির দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম—বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল আজ তাকে। মাথার এক পাশে—আজ আর নীল নয়, একটি ছোট লাল টুপি একটু বেঁকিয়ে লাগানো, পরিধানেও একটা লাল রং-এর পোষাক। রেস্তোরাঁর উজ্জ্বল আলোতে এই লাল রং-এর মধ্য দিয়ে সারা অঙ্গের লাবণ্য যেন উছলে পড়েছে। লক্ষ্য করে দেখলাম—উজ্জ্বল চোখ দু'টির উপরে আজ যেন ভেসে উঠেছে একটা নূতনের মাধুর্য্য—তার উপলক্ষ্য কি জানি না।

রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া শেষ করে, চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশন থেকে খানিকটা দূরে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর একটা সিনেমায় গেলাম দু'জনে। এ দেশের সিনেমার নিয়ম কানুন একটু অন্য ধরণের—ঠিক তোমাদের দেশের মতন নয়। দুপুর বেলা কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সিনেমা সুরু হয় এবং সমস্ত দিনই চলে একটানা—একই ছবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান হয় বারে বারে। যার যখন খুশী যাচ্ছে—যার যখন খুশী বেরিয়ে আসছে। যতবার খুশী একই ছবি বসে বসে দেখ—আপত্তি নেই। রাত্রে এগারটা আন্দাজ কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন সিনেমা বন্ধ হয়ে যায়। সেদিন আমরা সাড়ে সাতটায় সিনেমায় ঢুকে সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত ছিলাম। কোনও একটি ছবির অর্দ্ধেক থেকে শুরু করে শেষ পর্য্যন্ত দেখে আবার গোড়া থেকে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম। অন্ধকারে সিনেমায় বসে মেয়েটির অঙ্গের সান্নিধ্য আমি যে একেবারেই উপভোগ করিনি এমন কথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। তবে অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে আশে-পাশে তরুণ-তরুণীদের জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকার ভঙ্গীর মধ্যে যে সব ব্যাপার চোখে পড়ল—তার তুলনায় আমাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের শালীনতায় নিজের মনেই যেন একটা গর্ব্ব অনুভব করেছিলাম—আজও মনে আছে।

অনেক কথা হয়েছিল সেদিন। বেশীর ভাগই অবশ্য রেস্তোঁরায়। সেই দিনই কথায় কথায় আমার কৌতূহলের নিবৃত্তি হলো। খেতে খেতে সোজা শুধালাম, "এমি! শোন! আজ তোমাকে বলতেই হবে—কি করে আমাকে চিনলে, আমার বিষয় এত খবর রাখলে কি করে?"

আবার সেই হাসি, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "লিনকলন্ হল হোটেল কি ভুলে গেছ?" তখনও বুঝি নি। বললাম, "লিন্কলন হল হোটেল, তা সেখানে ত মাত্র এক রাত্রি ছিলাম।"

বললে, "যখন তুমি হোটেল ছেড়ে চলে যাও—তখন তোমাকে আমি দেখেছিলাম এবং তারপর থেকে তোমাকে ভুলিনি।"

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সেই সিংহলবাসীর সঙ্গিনী—যার ছুটো চোখ ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎ-বাণে আমাকে বিদ্ধ করেছিল। মনের উপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতে কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।

বললাম, "মনে পড়েছে। তবে তুমি যে অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলে—আমি ত তোমার মুখখানি ঠিক দেখতে পাইনি। সে যাই হোক—আমার বিষয় এত খবর রাখলে কি করে?"

বলল, "সেটা বোঝা ত সোজা। সবই জিমির কাছে শোনা। জিমিও ত ঐ মিসেস ব্লেকের বাড়ীতেই ছিল। তোমাকে দেখার পরই জিমির কাছে সব খবর নিলাম।"

শুধালাম, "জিমি?"

বলল, "সেই যে সিংহলবাসী। মস্ত বড় তার নাম—"

আমি শুধালাম, "তা জিমি এখন কোথায়?"

বলল, "সে গ্লাসগো থেকে একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে দিন আট-দশ হল গ্লাসগো চলে গেছে।"

শুধালাম, "আর একটা কথা বলো। মিসেস ব্লেকের চরিত্রের প্রতি তোমার এত কৌতূহল কেন?"

বলল, "ভদ্রমহিলার চরিত্রে বোধ হয় একটু বিশেষত্ব আছে।"

শুধালাম, "কি রকম?"

বলল "সবই ত আমার জিমির কাছে শোনা। ভদ্রমহিলা প্রথম প্রথম খুব ভাল ব্যবহার করেন। তারপর কিছুদিন গেলেই ব্যবহারের হাওয়া উল্টো দিক দিয়ে বইতে সুরু হয়। জিমির সঙ্গেও তাই হয়েছিল এবং জিমির আগে তার এক বন্ধু ও বাড়ীতে ছিল, তার সঙ্গেও নাকি ঐ রকমই করেছিলেন।"

বললাম, "সত্যিই কেন জানি না, ওর ব্যবহার আমার প্রতিও আর ঠিক আগের মতন নেই।"

বলল, "নেই ত।" হেসে উঠল।

শুধালাম, "আচ্ছা কেন বল ত?"

বলল "তা ত জানি না। তাই ত মহিলাটির বিষয় আমার কৌতূহল।"

বললাম, "আমি ত ওর সঙ্গে ব্যবহারে কোনও অপরাধ করেছি বলে মনে হয় না?"

বলল, "জিমিরও ঠিক তাই। সে মহিলাটিকে শ্রদ্ধা করত। তাই শেষ পর্য্যন্ত মহিলাটির ব্যবহারে মনে কষ্ট পেয়েছিল। সত্যি বড় ভাল মানুষ ছিল জিমি।"

বললাম, "আমার এক বন্ধু ত ও বাড়ীতে থাকবার জন্ম এসেছে। তার প্রতি কিন্তু চমৎকার ব্যবহার।"

শুধাল, "নতুন বোধ হয়?"

বললাম, "হ্যাঁ—সে আমার অনেক পরে এসেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের মনেই যেন বলল, "আমার মনে হয় মহিলাটি একটা কিছু চান, যখন বোঝেন সেটা পাওয়ার কোনও আশা নাই, তখনই ব্যবহার যায় বিগড়ে।"

* * * *

যখন বাড়ী ফিরে এলাম—রাত এগারটা বেজে গেছে। ট্রেণের জন্ম খানিকক্ষণ চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং এমি শেষ পর্য্যন্ত ছিল আমার সঙ্গে। ষ্টেশনেই কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তুমি থাক কোথায়?" বলেছিল, "লণ্ডনেই থাকি—চেয়ারিং ক্রশ থেকে খুব বেশী দূর নয়।"

সে রাত্রে আর মিসেস ব্রেকের সঙ্গে দেখা হয়নি। পরের দিন সকালবেলা ব্রেকফাষ্টে গম্ভীর ভাবে বললেন, "কাল রাত্রে আপনার জন্ম আমাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। খাবেন না ত বলে যাননি।"

বললাম, "সত্যিই আমি বিশেষ দুঃখিত মিসেস ব্রেক। এর পরে রাত্রে না খেলে আমি আপনাকে আগেই বলে যাব।"

পরের দিন এমির সঙ্গে দেখা হল—বিকেল সাড়ে চারটেয়। চা খেতে খেতে নানা গল্প করে এলটাম পার্কে ফিরে এলাম দু'টা কুড়ি মিনিটের ট্রেণে।

এই রকম দিনের পর দিন এমির সঙ্গে আমার দেখা হতে লাগল—মাঝে মাঝে অবশ্য দু'-এক দিন যে বাদ যায়নি এমন নয়। যে দিনটা বাদ যাওয়ার কথা থাকত সেই দিন সকাল থেকেই মনটা একটু খারাপই হত। নীরেনের সম্বন্ধে ডোরার কথা শুনে চন্দ্রনাথ সুনীলকে বলেছিল, "সে তা হলে ওর টনিকের কাজ করে বলুন।" এমিও যেন আমার মনের দিক দিয়ে ক্রমে একটা টনিকের মতন হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে মিসেস ব্রেককে বলে আসতাম—রাত্রে খাব না। সমস্ত সন্ধ্যাটা এমির সঙ্গে কাটিয়ে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে আসতাম।

একদিন এমিকে শুধালাম, "আচ্ছা! প্রথম দিন তুমি চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে এসেছিলে কেন?"

সেদিন আমরা রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া শেষ করে গল্প করার জন্ম এসে বসেছিলাম—টেমস্ নদীর ধারে ক্লিওপ্যাট্রা নিডেলের নীচে। টেমস্ নদীর তীরে, চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশন থেকে খুব বেশী দূরে নয় বাঁধান একটি ঘাট এবং সেই ঘাটের উপর একটা উঁচু স্তম্ভ—তাকেই 'ক্লিওপ্যাট্রা নিডেল' বলে। দু'জনে নেমে প্রায় জলের কাছে গিয়ে বাঁধান ধাপের উপর বসেছিলাম—পায়ের তলায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দটি ভালই লাগছিল কানে। প্রায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করেই বসেছিলাম—আমাদের মধ্যে তফাৎ বিশেষ কিছু ছিল না বললেই সত্য কথা হবে। আমার প্রশ্নের উত্তরে কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বলল, "তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে।"

খুসী হয়ে শুধালাম, "আমার সঙ্গে?"

বলল, "হ্যাঁ। এর আগে আর একদিন এসেছিলাম, সাড়ে পাঁচটা থেকে দু'টা কুড়ির ট্রেণ পর্য্যন্ত দেখে গিয়েছিলাম চলে—দেখা পাইনি। জানি ত সন্ধ্যেবেলা সাপারের আগে তুমি ফিরবে।"

শুধালাম, "আলাপ নেই, অথচ আমার সঙ্গে দেখা করার তোমার এত আগ্রহ হল কেন?"

বলল, "সে কথাটাও ভেবে দেখিনি।"

বললাম, "ভেবে বল।"

বলল, "ও কথাটা ভাবতে সময় লাগবে—এখন হবে না।"

* * * *

বুলা! নিশ্চয়ই ভাবছ—এইবার প্রেমটা জমল। কিন্তু বিশ্বাস করো—এত ঘনিষ্ঠ মেলামেশা সত্ত্বেও প্রেমের কোনও পরিষ্কার অভিব্যক্তি ছিল না আমাদের মধ্যে। এমির মনের কথা ঠিক বলতে পারি না আমার মনের দিক দিয়েও সত্যি কথা বলতে গেলে—শেষ পর্য্যন্ত ঠিক বুঝতে পারি নি। তাই বোধ হয় তুমি জান কি না জানি না, এই মেয়েটির কথা ইতিমধ্যে একটা চিঠিতে বিস্তারিত সুধাকে লিখেছিলাম—আমার মনের দিক দিয়ে কোনও বাধা পাইনি। আজ আবার আরও বিস্তারিত ভাবে—সমস্তই খুলে তোমাকে লিখছি—তুমি যা হয় বুঝে নিয়ো। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটা ব্যাপারও তোমাকে বলা দরকার। ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও, আমাদের পরস্পরের প্রতি মনোভাবের ইঙ্গিত হয়ত কিছু পাবে।

সেদিন দু'জনে পিকেডেলী সার্কাসে একটা সিনেমায় বসে আছি—দু'জন দু'জনার দিকে হেলে বেশ গা ঘেঁষেই বসেছিলাম। হঠাৎ এমি একটা চকোলেটের খানিকটা ভেঙ্গে খেয়ে হাতখানি ঘুরিয়ে বাকিটা তুলে ধরল আমার মুখের কাছে। এমির হাতখানা আমার দু'হাত দিয়ে ধরে চকোলেটটুকু তুলে নিলাম মুখে এবং হঠাৎ আমার কি হল জানি না—সেই সঙ্গে এমির হাতখানির উপর একটা চুম্বনও দিলাম এঁকে এবং সেই ভাবে কিছুক্ষণ হাতখানাকে দু'হাতে চেপে রইলাম ধরে। ধীরে অথচ বেশ দৃঢ়ভাবে হাতখানি আমার হাতের মধ্য থেকে নিল সরিয়ে, তারপর কেমন একরকম ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল আমার মুখের দিকে। সে চাহনিটির মধ্যে চাপা হাসি ছিল কি না অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি। বলল, "ছিঃ ছিঃ বিক! তুমিও—"

লজ্জায় যেন মরে গেলাম। মাথা নীচু করে অপরাধীর সুরে বললাম, "আমায় ক্ষমা করো এমি! অপরাধ করে ফেলেছি—আর হবে না।" হঠাৎ চাপা রকমের সেই হাসি। তারপর বলল, "তুমি বড্ড ছেলেমানুষ বিক—তোমাকে একটু শাসনে রাখা দরকার দেখছি।"

এর চার-পাঁচ দিন পরের কথা। সেদিন আমরা দু'জনে একসঙ্গেই

পাপার খেয়ে গেলাম—হে মার্কেট থিয়েটারে, স্যার জেমস ব্যারীর লেখা 'মেরী রোজ' নাটকখানি দেখতে। দেখে যে কি রকম অভিভূত হয়েছিলাম বুলা! চিঠিতে লিখে তোমাকে বোঝাতে পারব না। থিয়েটারে এ রকম এর আগে কখনও দেখিনি আর বোধ হয় দেখবও না কখনও।

সে যাই হোক, থিয়েটার-ঘরে সিনেমার মতন ততটা অন্ধকার থাকে না জানই। কিন্তু সত্যিই অবাক হলাম যখন এমি বসবার একটু পরেই আমার একখানি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে রাখল নিজের কোলের উপরে। এই নিবিড় স্পর্শটুকুর মধ্যে কি যাদু ছিল জানি না, কিন্তু তার ফলে আমার মনের আনন্দের শিহরণটুকু অস্বীকার করব না।

* * * *

সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে এলাম—রাত বারোটারও পরে। বাড়ীতে ঢুকে সদর দরজার কাছে ওভারকোটগুলি ঝুলিয়ে রাখবার জায়গায় দেখি, চন্দ্রনাথের ওভারকোটটি ঝুলছে! বুঝলাম—চন্দ্রনাথ ফিরে এসেছে। চন্দ্রনাথ বলেছিল—দিন দশ-বারো বেড়িয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু তার ফিরে আসতে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিন হয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ছুটলাম উপরে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই চন্দ্রনাথের শোবার ঘরের দরজা। দরজায় একটু ধাক্কা দিয়েই সোজা ঢুকলাম ঘরে।

চন্দ্রনাথ তখনও ঘুমোয়নি। বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিল। আমাকে দেখেই হেসে শুধাল, "কি ব্যাপার হে তোমার? সমস্ত অঙ্গ দিয়ে যেন আনন্দ ঠিকরে পড়ছে।"

শুধালাম "তুমি এত দেরী করলে?

বলল, "সে কথা পরে হবে। আগে তোমার খবর বল। শুনলাম—আজ-কাল প্রায়ই রাত করে বাড়ী ফেরো। কি একটা নেশায় নাকি মশগুল হয়ে আছ?"

শুধালাম, "সে খবরটিও পেয়েছ?"

বলল, "পেয়েছি বৈ কি। তোমাকে দেখে ত সেটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়।"

বসে পড়লাম চন্দ্রনাথের বিছানার এক পাশে। মুখে বললাম; "এমি জনসন্।"

[ক্রমশঃ।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

হঠাৎ এক পশলা সাড়ে দশটার বৃষ্টি

বিচ্ছিরি এই বৃষ্টি
এই পথে পথে যত জল-কাদা সৃষ্টি
কেন মেঘ এল ঘন হ'য়ে নীল-আকাশে!
কেন হিম-হিম স্পর্শ লাগাল বাতাসে!
কেন বা প্রথমে কুয়াশার মত শীকর-কণাকে ছড়িয়ে
পরে নেমে এল অভিমানিনীর অলকে অশ্রু জড়িয়ে?
কা'রা বলেছিল ঠিক এ সময়ে নামতে—
কা'রা বলেছিল সাড়ে দশটায় ঘড়ির কাঁটায় থামতে?
দেরি হয়ে গেল পথে গেল কাদা ছড়িয়ে
ভিজে চটি আর শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে।
জল-ছল-ছল বৃষ্টি
কেন বা হৃদয়ে করল হঠাৎ অভিমান-ব্যথা সৃষ্টি!

নেইতো এখানে কেতকী-কুসুম-কুঞ্জ
যত ঝরা রেণু চূর্ণের কর্দমে
সময় পিছলে থামবে না জানি সমে।
দেখবে না চেয়ে আকাশের দিকে ঘন-নীল মেঘপুঞ্জ,
থেকে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকায়
আকাশকে ভুলে থাকা কি যে দোষ,
বৃষ্টিকে ভুলে থাকা আফশোষ—
তাই বুঝি এসে শহরের পরে শহরে মনকে ধমকায়।
—তা ছাড়া হঠাৎ কেন বা এ মেঘ-রঙ্গ
আমাদের মরা গাঙে কই আর সফেন-জল-তরঙ্গ—
তাই মনে হয় বিচ্ছিরি এই বৃষ্টি
শুধু পথে পথে কাজের সময় যত জল-কাদা সৃষ্টি!

তা ছাড়া যদি বা থাকে অবশেষে ঝাপসা-বৃষ্টি-ঝরানো আসর
রাত্রির ভাঙা প্রহরে
এই ধ্বসে-যাওয়া প্রাণ ধ্বসে-যাওয়া শহরে—
তখন তো জানি মেঘ নিঝুঝুম
রাত্রিবেলায় আসবে না ঘুম
—কিছুতেই জানি আসবে না ঘুম—
কান্ত এ দেহে জাগবে হঠাৎ দুরন্ত এক মন—
বৃষ্টির ফোঁটা গুণতে গুণতে
বজ্রের ডাক শুনতে শুনতে
জাগবে হঠাৎ কাঁদবে হঠাৎ—এমনিতে অকারণ।

কি কাজ আমার সে কান্না-কাঁদা
সাড়ে দশটায় পথ যার কাদা—
বিশেষ সে কাদা নয়কো সুরভি কেয়াকুঞ্জের রেণুতে
আর থেকে থেকে বাদলা-হাওয়ায় বাজবে না বাঁশী কখনো যখন
বিন্ধ্যাগিরির সুনিবিড় বনবেণুতে—
তা ছাড়া যখন থাকবে না কেউ নর্মদা-তীরে নর্মদ বিভ্রান্ত—
কেন মিছে তবে বৃষ্টিতে ভিজে হব অকারণ ক্লান্ত!

তাইতো বলছি বিচ্ছিরি এই বৃষ্টি,
পথে পথে শুধু কাজের সময় মিছে জল-কাদা সৃষ্টি!

বৃষ্টিরা শোনো—মেঘেরাও শোনো আজকে—
নষ্ট কোরো না আমাদের এই প্রাণধারণের কাজকে।
বরং যখন অবসর হবে পড়বো তখন মেঘদূত
আর শহরের হাওয়ায় শরীর এলিয়ে বলবো—অদ্ভুত।

জীবনায়ন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

পঞ্চাশটি বসন্ত পার হয়েছে পার্থের—তার বুকে ফুল ফোটেনি—সারা জীবনটা তার অনুর্ব্বর—যেন সাহারা মরুভূমি। নিজেকে সে ডুবিয়ে দেয় বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য্যে কখনও বা আর্ত্তের সেবায়। সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, বাউল নিয়ে কখনও বা উৎসাহে মেতে ওঠে ভারতবর্ষময় যেখানেই খোঁজ পায় সেখানেই সে ছুটে চলে—কোথাও বা খাঁটি রত্নের সন্ধান পায়। তাই সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই বাজিয়ে নেওয়া তার স্বভাবের একটা অঙ্গ ছিল। কিন্তু তার চির অতৃপ্ত মন কিছুতেই খুঁজে পায় না স্বস্তি, একটা কিছু ধরে বেঁচে থাকার অবলম্বন। শুধু চতুর্দ্দিকের এই একঘেয়ে নিরানন্দের মধ্যেও আনন্দের খোরাক খুঁজে নেবার সূত্রটুকু তার জানা আছে বলেই সে আজো ফুরিয়ে যায় নি।

সামনে কুম্ভমেলা। কী যেন একটা অজানা আকর্ষণ অনুভব করে পার্থ। তাই সে চন্দনপুর থেকে সোজা বেরিয়ে এল কলকাতায়, কুম্ভমেলায় স্নান করে অক্ষয় স্বর্গবাসের চাবিকাঠি পকেটস্থ করবে বলে।

কোন এক পার্কে বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল নিয়ে মহিলাদের একটা প্রকাণ্ড সভা হচ্ছে। লাউড স্পীকারে নারীকণ্ঠের বক্তৃতা শুনে সে থমকে দাঁড়ায়। গলা বাড়িয়ে দেখে, একজন মহিলা কোমরে কাপড় বেঁধে হাত-পা ছুঁড়ে বক্তৃতা চালিয়েছেন।

—আমি সত্যবানের কাছ থেকে সাবিত্রীকে কেড়ে নেব না—আমি নল থেকে দময়ন্তীকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই না—আমি তাদের জন্যই বলছি—যারা দিনের পর দিন অশ্রুনীরে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে—দিনের পর দিন স্বামীর অত্যাচারে যাদের জীবনটা বিষময় হয়ে ওঠে—যাদের 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল'—তাদের জন্যই আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ চাই। যদি বিবাহিত জীবনের কোনও রিসার্ভ থাকত, দেখা যেত, হয়ত অনেকেই থার্ড ক্লাস ছ্যাকরা-গাড়ীর মত জীবনটাকে টেনে নিয়ে চলেছে অতি দুঃখে, অতি কষ্টে।

দম নিয়ে, আবেগের আতিশয্যে, টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে সদম্ভে পুনরায় সুরু করেন—

—আমি—

—হ্যাঁ, তুমি!

মহা কোলাহল। জনৈকা মহিলা চীৎকার করে বলে উঠল—ঘর পুড়িয়ে এসে এখানে গলাবাজি করতে লজ্জা করে না?

পার্থ বিস্মিত হ'ল। এ কি! কুন্তলা! যার নিত্য নূতন অত্যাচারে তার কলেজের সতীর্থ, অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, রঞ্জন আত্মহত্যা করেছে! রঞ্জনের কাছেই সে শুনেছিল—কুন্তলার নিত্য নূতন পাগলামির কথা! সে ভুলে গিয়েছিল তার স্বামী, তার সংসার—ক্ষণিকের মোহে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। আজও কী তার মনের বিকার ঘুচলো না! পার্থেরও মনে পড়ে যায় মীরাকে একটি রাতের একটি কথা—থাক্ সেই অতীতের স্মৃতি! উদাসী পার্থ মিশে গেল জনারণ্যের মাঝে।

এলাহাবাদ যাবার পথে পার্থ বেনারসে নামলো। বিশ্বনাথ দর্শন করতে গিয়ে দেখে, যিনি বিশ্বের নাথ, তিনিও খাঁচায় বন্দী—তাঁকেও আর ছুঁয়ে প্রণাম করা যায় না। চিরাচরিত প্রথাও আজ নিষিদ্ধ। দূর হতে ভক্তি নিবেদন করে সে বেরিয়ে পড়ল এলাহাবাদের পথে। পরদিনই কুম্ভস্নান।

এবারের মত এত লোকসমাগম আর সে কখনও দেখে নি। প্রায় অর্দ্ধ কোটির ওপর। তার পর যে শোচনীয় দুর্ঘটনা সে চোখের সামনে দেখলো, উঃ, সে কী ভীষণ! তার মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ধর্ম্মের এই মাতামাতি ভাল কী মন্দ, এ নিয়ে সে কোনও দিনই আলোচনা করে না—কিন্তু এই যে ধর্ম্মবিশ্বাসের অত্যুগ্র উৎসাহ, যার ফলে এতগুলি মানুষের মর্ম্মন্তুদ মৃত্যু সে চোখের উপর দেখতে পেল—এর সার্থকতা কোথায়? সে কী বিরাট মানুষের স্তূপ। কেহ মৃত, কেহ বা অর্দ্ধমৃত, মুমূর্ষুর কাতর আর্ত্তনাদে সে কী বীভৎস কোলাহল! পার্থ চিন্তা করে—এই কী অক্ষয় স্বর্গবাস? জীবনের এই শোচনীয় পরিণতির জন্যে দায়ী কে?

নৌকায় ত্রিবেণী-সঙ্গমে যাওয়ার সাধারণ ভাড়া দু-চার আনা। এখন সেটা দেড়শো-দুশো টাকায় উঠেছে। আক্কেল সেলামী দিয়ে পার্থ যথারীতি কুম্ভস্নান সম্পন্ন করে।

ওপারে ঝুসি—শ্রেণিবদ্ধ সন্ন্যাসীদের ছাউনি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চেহারা, মত ও পথ নিয়ে তাদের চিরবিরোধ যেন এই কুম্ভস্নান উপলক্ষে আবার নূতন করে ঝালিয়ে নিতে চায়। পার্থ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

ক্রমে এক নিভৃত প্রান্তে, বালুর চড়ার উপর দিয়ে পার্থ হেঁটে চলে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়—সেই কাশ্মীরের সাধু না? সেই জটাজুটধারী অলৌকিক মূর্ত্তি!

পার্থের মনে পড়ে যায়—যখন তার বাইশ বছর বয়স—সে কাশ্মীরে গিয়ে একটি সুন্দর সুসজ্জিত হাউস্ বোটে কয়েক মাস কাটিয়েছিল। যেন একটা চিত্রিত স্বপ্ন ডাল হ্রদের বুকে ভেসে থাকতো। একদিন সে শঙ্করাচার্য্যের পাহাড়ে উঠে দেখতে পায়—এক সৌম্য, শান্ত গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা স্নিগ্ধ স্থির বিদ্যুৎ। সন্ন্যাসী পার্থকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ইসারায় বসতে বললেন। পরিহাসের সুরেই পার্থ তাকে বলেছিল—কেয়া সাধুজী, গাঁজাকে পয়সা চাহিয়ে। লেওজী দো রূপেয়া।

—তুমি যখন বাঙালী—বাঙলাই বল, কথা কইতে সুবিধা হবে।

পার্থ চমকে সাধুকে প্রশ্ন করে—আপনি বাঙালী না কি ?

তিনি মৃদুহাস্যে পার্থের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চাইলেন—পার্থের মাথায় হাত রাখতেই, তার শরীরে যেন একটা অলৌকিক শিহরণ বয়ে গেল। সন্ন্যাসী বললেন—পৃথিবীর সব ভাষাই জানতে হয়—যখন যার সঙ্গে যেটা দরকার। তবে, এবার শুধু তোমার জন্যেই এসেছি।

পার্থ স্বভাবসুলভ পরিহাসের সুরে উত্তর দেয়।—বাধিত হ'লাম ; কিন্তু কি হেতু আগমন, এ অধীন জানতে পারে কি ?

সেই সন্ন্যাসীর স্বর জলদগম্ভীর, চক্ষু মুদিত অবস্থায় বললেন—জানি, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর ধূনি আর ছাইমাথার ভাঁওতায় পড়েছো—তারা যা নয়, তাই জাহির করে তোমায় ঠকিয়েছে কিন্তু মুড়ি-মুড়কির এক দর কোরো না, তা হ'লে নির্ঘাৎ ঠকবে।

তার পর, পার্থ যে কে, কোত্থেকে এসেছে, তার জীবন-কথা একে একে সঠিক বলে দিয়ে শেষ কথা বললেন।

—তোমার ভিতর একটা বৃহৎ সম্ভাবনা রয়েছে—তুমি জ্যোতির্লোক থেকে নেমে এসেছো, নিজেকে চেনবার চেষ্টা কোরো। সংসারে দু'দিন পুতুলখেলা করে, আবার তোমাকে এ পথে আসতেই হবে।

পার্থর কণ্ঠে সেই অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হ'ল—ও সব নিয়ন্তরের খুট-বিড়ি—আমি বিশ্বাস করি না।

—ছিঃ, অমন কথা বলে না, তুমি যে ভগবানের কৃপাধন্য।

—তার প্রমাণ কি ? শুধু কথায় না কাজে ?

—আবার অবিশ্বাস ? ধমক দিয়ে সন্ন্যাসী বললেন।—খোলো তোমার কোট, পুলওভার।

—বল কি ঠাকুর ? এই দুর্জয় শীতে খালি গায়ে থাকলেই একেবারে ডবল নিউমোনিয়া না হয় ছিল ডাইবিয়া।

সন্ন্যাসী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে যেন শেষ আদেশ দিলেন—এক্ষুণি খোলো—

এ কী সম্মোহন ? পার্থ তখুনি নগ্নগাত্রে সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়ালো। তিনিও তাঁর কমণ্ডলু হতে জল ছিটিয়ে দিলেন।

পার্থর চক্ষু চড়কগাছ। বিস্মিত হয়ে দেখে, তার সমস্ত বুকে পেটে যেন চন্দন দিয়ে সুন্দর করে আঁকা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম !

এ কী ? এ তো বড় অদ্ভুত ! পার্থর সংশয় তবু ঘোচে না, বলে—দেখ সন্ন্যাসী, আমাকে এই ম্যাজিকটা শিখিয়ে দেবে ? বাংলা দেশে গিয়ে অনেককে দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেব—চাই কি টু পাইস পকেটেও আসবে। তোমার পায়ে পড়ি বাবা—তোমার হাতে যদি আরও কিছু উচাটন বা বশীকরণ মন্তর থাকে, ঝুলি ঝেড়ে সেটাও আমায় দাও—যত টাকা চাও, পাবে।

পার্থের কথা শুনে ঠাকুর ধ্যানস্থ। কিছুক্ষণ পরে প্রশান্ত ভাবে বললেন—তুমি ফিরে যাও—আজ রাত আটটা চুয়াল্লিশ মিনিটে একটা ভাল খবর পাবে—আর যা বললাম, মনে রেখো। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

—কোথায় ?

—তিনিই জানেন !

—গুড্ নাইট্ সাধুবাবা !

ব্রিচেস্ পরিহিত, এক পেয়ালা যৌবনসুরা পান করা বাইশ বছরের পার্থ সেদিন বিদায় নিয়েছিল।

চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি কিসের একটা টানে, সেই তেজোদ্দীপ্ত সন্ন্যাসীর পায়ে পার্থ আভূমি প্রণত হয়ে নিবেদন করে।

—আপনার সেই ঠিক আটটা চুয়াল্লিশ মিনিটেই আমি একটা তার পেয়েছিলাম—প্রিভি কাউন্সিলে একটা বড় মামলা জয়ের সংবাদ—আমাদের পাওনা কয়েক লাখ টাকা ফিরে এল—বাবা টেলিগ্রাম করেছিলেন।

সন্ন্যাসীর মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

—খবরটা পেয়েও আমার সংশয় ঘোচেনি। সময়টা দেখলাম, আপনার সঙ্গে যে সময় দেখা হয়েছিল তার দু'ঘণ্টা পরে তার করা হয়। পরদিন সকালেই ছুটে গেলাম সেই শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে—আপনাকে দেখতে পেলাম না। কয়েক জন অতিবৃদ্ধের কাছে শুনলাম আপনি বিশ পঁচিশ বছর অন্তর না কি একবার আসেন। আপনাকে একই ভাবে তাঁরাও দেখে আসছেন, আমিও আটাশ বছর পরে দেখলাম ঠিক তেমনি কোনও পরিবর্ত্তন নেই। বলুন আপনি কে ?

—তোমার সন্দেহ ঘুচলো ?

—কৈ, আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। বলুন আপনি কে ?

—নিজেকেই জিজ্ঞেস কর—উত্তর পাবে। আমি হচ্ছি তুমি, আবার তুমিই আমি। তুমি দ্বারকায় যাবে—না ?

—ইচ্ছে তো তাই।

—বেশ, যাও সেখানেও তোমার জীবনের আরো একটা অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হবে।

সন্ন্যাসী পার্থকে আরও কতকগুলো কথা বলে, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

—দুঃখে বিচলিত হয়ো না—যা কিছু তোমার জীবনে আসবে সবই তাঁর চরণে সমর্পণ করে দিও, শান্তি পাবে। তোমার সঙ্গে ব্যবহারিক জগতে আরও একবার শেষ দেখা হবে—আর সেই সাক্ষাতের পর সাত দিনের মধ্যেই তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানেই আবার ফিরে যাবে।

অশ্রুর বন্যা নেমে এল পার্থর চোখে। সম্বিৎহারা হয়ে সে সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

সংজ্ঞা ফিরে আসতেই দেখে সন্ন্যাসী নেই। মাথায় পর্ব্বত-ভার নিয়ে টলতে টলতে পার্থ ফিরে এল এপারে। সেই রাত্রেই সে এলাহাবাদ ত্যাগ করে চলে গেল।

জুনাগড়ে নেমে একদিন বেরিয়ে যায় রৈবতক পর্ব্বতে। কয়েক হাজার সিঁড়ি ভেঙ্গে গোরখনাথ ও গুরু দত্তাত্রেয় মন্দির দেখে আবার সে নেমে এল। ক্লান্তিহীন পার্থ আজ যেন কোন অদৃশ্যশক্তির টানে ছুটে চলেছে কোন পথে ? কে জানে !

তার পরের দিন পার্থ চলল মোটরে সোমনাথ মন্দিরের পথে। কিছুটা দূর যেতেই পথের মাঝে দেখতে পায়, বিলে কত রকমের বন্য হাঁসের ঝাঁক, আরো কিছুটা দূরে, হরিণের দল আশে-পাশে চরে বেড়ায়—বিকারহীন পার্থ শুধু নীরবে চেয়ে দেখে। একদিন ছিল—যখন সে শিকারে এক গুলীতেই যে কোনো জানোয়ারকে শুইয়ে দিত। আজ তার মধ্যে সেই ব্যাধের বৃত্তি আর খুঁজে পায় না। সোমনাথ দর্শন করে সেই রাত্রেই সে ধরল দ্বারকার পথ।

দ্বারাবতী—পার্থসারথির নগরী। তাই পার্থ সেই সোনার দ্বারকা, ঘুরে-ফিরে, বেশ ভাল করে দেখে নেয়। মনে হয়, এর সঙ্গে বুঝি তার জীবনের কোথায় যেন একটা যোগাযোগ আছে। দ্বারকানাথের সামনে দাঁড়িয়ে পার্থের চোখ দিয়ে তপ্ত অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ে। বিভ্রান্তের মত সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। যেন ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।

সমুদ্রের ধার দিয়ে হেঁটে চলে উদাসী পার্থ। কখনও থামে, কখনও চলে। দূরে দেখতে পায় একটা ছোট্ট মন্দির। পথিককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে ওটি শিবালয়—নাম ভড়কেশ্বর মহাদেব। পার্থ সেই দিকে এগিয়ে যায়।

নীল সাগরের ঢেউ এসে যেন কোন্ অনাদিকাল হতে মন্দিরের গায়ে অবিরাম আছড়ে পড়ে। জোয়ার এলে জলরাশির মধ্যে ঐ শুভ্র মন্দির শুধু জেগে থাকে, মনে হয় সে-ও বুঝি কোন্ বিরাটের ধ্যানে ডুবে আছে!

এখন জোয়ার নেই। পার্থ ধীরে ধীরে সমুদ্রের ধার থেকে নীচে থেমে মন্দিরের চড়াই পথে এগিয়ে গেল।

অপরাহ্ণ কাল অতিক্রান্ত। দিনান্তের সূর্য অগাধ জলরাশির মধ্যে ডুবে যায়। ভড়কেশ্বর মন্দিরের চূড়ায় তার শেষ আলো যেন সোনার রং বুলিয়ে দিয়েছে। স্বল্প সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে পার্থ দাঁড়ালো মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে।

এ কে! কে এই নারী? খুব যেন চেনা মুখ! এ কি সেই মীরা? এ নিভৃত মন্দিরে কি চায় সে? কিসের সন্ধানে সে-ও ছুটে এসেছে এত দূরে ভারতের শেষ প্রান্তে?

তপশ্চারিণীর চোখে অপূর্ব জ্যোতিঃ—পার্থর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললে,—জানতাম, তুমি আসবে।

পার্থর মনে পড়ে গেল, একদিন এই নারী উন্মুখ যৌবন নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—কে? মীরা?

—হ্যাঁ, আমি। কেমন আছ পার্থ?

—ভালই আছি, কিন্তু তুমি এ পথে এলে কেন?

—কি জানি, হয়ত পথেই পাবো বলে।

—তার মানে?

—ঘরে ত' পেলাম না। সে কথা আজ থাক—যা হয়নি, হ'বার ছিল না, তা' নিয়ে দুঃখ করি না। তোমার কথা কিছু বল, বিয়ে করেছ?

—করতে হয়েছে, তবে পুরোপুরি সংসারী হতে পারলাম কই? আমার এ বৈরাগী মনটাকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি।

—ঠিক তাই। সেদিন—সেই রাত্রে তোমার মুখে এই ভাবই দেখেছিলাম।

—আর তুমি?

—আমি? আমি শুধু মীরা—ভগবানের দাসী। হয়তো সেদিন আমার পাগলামি দেখে আমায় ঘেন্না করেছিলে—যার একটি চুম্বনের আশায়, সেই রাত্রে আমি ছুটে গিয়েছিলাম তোমার কাছে। তুমি আমায় ফিরিয়ে দিলে—মনে পড়ে?

পার্থর স্মরণে আসে, সেদিন, গভীর রাতে আকাশের তারা নীরব—শুধু তারকার দল তন্দ্রাহারা হয়ে কান পেতে শোনে প্রকৃতি বুঝি অচল গভীর ঠাটে বাজিয়ে চলেছে বেহাগের সুর! মীরা ঝড়ের মত এসে কত কথাই না বলেছিল!

—কী ভাবছো?

—তোমার অভিশাপের কথা! তাই হয়েছে—শান্তি পাই না—শুধু খুঁজে মরি।

—শুধু এই? আর কিছু নয়?

—ওঃ তুমি সেই ত্রিশ হাজার টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলছ? হ্যাঁ, খুব মনে পড়ে—তুমি সেই টাকা দিয়ে চেয়েছিলে একটি চুম্বন—বলেছিলে, ওই নিয়ে তুমি দেশান্তরী হবে—আর কখনও আমি তোমার মুখ দেখতে পাব না!

—তুমি ভুল বুঝেছিলে। আমার টাকা আর তোমার চুম্বন এক জাতের নয়। আমার সর্বস্ব দিয়ে মুক্তি চেয়েছিলাম শুধু তোমার ওই স্মৃতিটুকু নিয়ে আমি জীবন কাটাব বলে। থাক, বাজে কথায় আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে যেয়ো না। আজ সবই ত' সহজ হয়ে গিয়েছে। সেদিন আমি তোমাকে যা দিতে চেয়েছিলাম সে আমার ভালবাসা—কিন্তু পেলাম শুধু আঘাত!

—আঘাত?

—তুমি চমকে উঠো না পার্থ! সেই ব্যথাই আমার বুকে ফুল হয়ে ফুটে উঠলো।

—তুমিও সংসারী হয়ে সুখী হতে পারতে—জীবনকে অস্বীকার করা ঠিক হয় নি।

—তোমার অস্বীকারই আমার জীবনে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে—ভগবানের পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। সে হিসেবে, তুমি আমার গুরু।

লজ্জায় পার্থর মুখ ভরে যায়—গুরুগিরি আমার ধাতে সয় না—আমি নিজেই গুরু খুঁজতে বেরিয়েছি—অবিশ্যি এত দিন পরে পেলাম এই কুম্ভমেলায়।

—আমারও ইচ্ছে ছিল যাবার কিন্তু হয়ে উঠ্‌লো না—থাক্!

—তোমার মনে আছে মীরা, সেদিন আমি তোমায় কী বলে ডেকেছিলাম?

—হ্যাঁ, মনে আছে, মা!

—আজ তোমার মধ্যে সেই রূপই দেখতে পেলাম—আমার বহুদিনের একটা সমস্যা ঘুচে গেল।

—পার্থ, ভালবাসার রূপ যে কী, ঠিক জানি না—তবু এটুকু বুঝতে পারি, যখন সে আসে, তাকে আর বাধা দেওয়া যায় না। সমস্ত দেহ-মনকে সে জাগিয়ে তোলে, তখনই সুরু হয় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার পালা।

পার্থ স্তব্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, মীরা বলে যায়—আজ বুঝতে পারি, এই ভালবাসা শুধু পুরুষকে লক্ষ্য করে নয়, তাকে অবলম্বন করে সেই পরমপুরুষের চরণে পৌঁছে দেওয়া।

পার্থর মনে হয়, কি একটা হৃত-গৌরব ফিরে পেয়ে মীরা সমস্ত দেহে-মনে যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। যেন মর্ত্যের নয়, কি এক অপার্থিব আলোর বন্যায় সে আজ জ্যোতির্ময়ী!

পার্থ যেন অনুভব করে নিজের বুকে জাগরণের নূতন সূর্য্য—তারই সহস্র কিরণধারায় মীরার চিত্তশতদলে সে অবিরাম দিয়ে চলেছে আজ অসংখ্য চুম্বন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

অনেক দিন সুরমাদি'র বাড়িতে যাওয়া হয়নি। একটা রবিবার দেখে সেখানে খানিকক্ষণ কাটিয়ে এল হেনা। আসবার সময় একখানা বই চেয়ে নিয়ে এল। সেদিন বিকালের দিকে দাদার ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে সেই বইখানাই পড়ছিল হেনা। দরজার বাইরে বাবার গলা শোনা গেল, হেনা আছিস? সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল দোর-গোড়ায়। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে বিকাশ। চোখ তুলে তাকাতেই বুকের মধ্যে আবার জেগে উঠল সেই ভীতির স্পর্শ। বিকাশ হেসে বলল, পড়ছিলে বুঝি? হাতের বইখানার দিকে একবার তাকিয়ে বলল হেনা, এই দেখছিলাম একটু। আপনি কখন এলেন?

সদাশিব বললেন, আমি গিয়ে ধরে নিয়ে এলাম। একটু চা-টা কর। আমি ততক্ষণ ডাকটা দেখে আসি।

এর আগে হেনার ঘরে কোনো দিন আসেনি বিকাশ। এখানেই ঢুকবে না সদাশিবের বারান্দায় গিয়ে বসবে, এই ভেবে একটু ইতস্তত করছিল। হেনা বলল, আসুন না! সিঁড়ির ধাপ ক'টা উঠে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিতর দিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিকাশ বলল, জুতো নিয়ে আসবো?

—আপনি হাসালেন, দেখছি। জুতোটা আবার কোথায় রেখে আসবেন? মন্দিরে ঢুকছেন নাকি?—বলে হেসে উঠল হেনা।

—হাসির কথা নয়; সত্যিই মনে হচ্ছে মন্দিরে ঢুকছি। সাজানো-গোছানো ছিমছাম সেটা কিছু নতুন নয়। কিন্তু এরকম একখানি পরিচ্ছন্ন ঘর আমি কোথাও দেখিনি। উনি বুঝি তোমার দাদা?

হেনার মুখের উপর ঘনিয়ে এল ম্লান ছায়া। মৃদু কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

বিকাশ এগিয়ে গিয়ে সনতের ছবিখানার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর দেখল তার বইয়ের আলমারি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বইগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেনার দিকে ফিরে বলল, কি বই পড়ছিলে?

বইখানা এগিয়ে দিল হেনা। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা,' বিকাশের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। দু-চারটা পাতা উলটে বইখানা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, দাদাকে যে তুমি কতখানি ভালবাসতে এবং এখনো বাস, তা আমার জানতে বাকী নেই। তবু মনে হয়, তোমাদের দুজনের কোথায় একটা অমিল আছে।

—সে কথা কেন বলছেন?

তিনি হয়তো অতখানি আগ্রহ নিয়ে এ বইটা পড়তেন না।

—আপনি পড়েছেন এ বই?

বিকাশ হেসে উঠল, ওটাই যে আমাদের প্রথম ভাগ। এ পথে যারা এসেছে, তাদের অনেকেরই আদি দীক্ষা ঐ মারাঠী ব্রাহ্মণের কাছে। কিন্তু তোমার দাদার আলমারিতে ওর জায়গা হয়নি!

হেনা বলল, আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। যে দেশকে দাদা এত ভালবাসত, এও তো তারই দুঃখ-দুর্দশা, আর অভাব-অভিযোগের কাহিনী।

—তা ঠিক। তবে দুঃখ দেখে কারো প্রাণে জাগে করুণা, কারো মনে লাগে জ্বালা। তোমার দাদা সেই প্রথম দলের মানুষ। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেবার পথ, কল্যাণের পথ। আমরা যে পথে চলেছি, তার মধ্যে শুধু হিংসা আর প্রতিশোধ।

ছবিটার দিকে আর একবার চেয়ে বলল, বিদেশী শাসনের বেড়াজালের মধ্যে যে অসহায় অক্ষমতার বেদনা তার হাত থেকে তিনি নিস্তার পাননি, কিন্তু তাতে করে তাঁর মনের প্রশান্তি নষ্ট হয়নি। ঐ মুখ দেখেই বোঝা যায় তিনি অসুখী ছিলেন না। তাঁর কাজের মধ্যে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

—আপনাদের কাজে কি তৃপ্তি নেই?

আমাদের!—আবার হেসে উঠল বিকাশ। তারপর ধীরে ধীরে সেই উজ্জ্বল চোখ দুটো অগ্নিগোলকের মত জ্বলে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আগুনের জ্বালা যে কি জিনিষ, সে তুমি বুঝবে না হেনা!

অকস্মাৎ নিজেকে সম্বরণ করে সস্নেহ দৃষ্টিতে হেনার ভীতিবিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই বলছিলাম, এ পথে তুমি এসো না, হেনা! ক্ষোভ, অভিযোগ, বিদ্রোহ আর আক্রোশ, ঐ বই-এর মধ্যে যা ছড়িয়ে আছে, সে সব আমাদের জন্যেই থাক, তোমার পথে থাক স্নেহ, প্রীতি আর করুণা। তা না হলে, আমাদের মত যারা হতভাগা, তারা গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়?

হেনার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টি মেলে আবার বলল বিকাশ, শুনেছি, মানুষের চোখই হচ্ছে তার মনের দর্পণ। তাই যদি হয়, তোমার সম্বন্ধে আমার বোধ হয় ভুল হয়নি। হেনা নিঃশব্দে চোখ

নামিয়ে নিল। ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে সদাশিবের সাড়া পাওয়া গেল, বিকাশকে একটু চা-টা দিয়েছিস, হেনা?

—এই যে, যাই বাবা। আপনি পালাবেন না যেন। বলেই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

বিকাশের সম্বন্ধে নিজের মনের এই বিচিত্র অনুভূতি হেনা নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। কেন এমন হয়! যাকে দেখতে ইচ্ছা করে, যার কথা শুনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যায়, দু'দিন না এলে যার পথের দিকে পড়ে থাকে দু'টো চোখ, সে যখন কাছে এসে দাঁড়ায়, বুকের মধ্যে কিসের এ আতঙ্কের ছায়া! তার চোখের দিকে একটি বার চোখ পড়লে যেন মনে হয়, না, আমি যাই। অথচ যেতেও মন সরে না। এ কি বিচিত্র মানুষ, যে একই সঙ্গে কাছে টানে, আবার দূরে ঠেলে দেয়!

মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে হেনার মনের কোণে, এরই নাম কি ভালবাসা! কিন্তু প্রথম যৌবনের অনুকূল হাওয়ায় কুমারী হৃদয়ের নিভৃতে ভালবাসার যে অঙ্কুর জাগে তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? কোথায় সে পুলক শিহরণ, সে অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের স্পন্দন, সে অকারণে চোখ ছাপিয়ে পড়া অশ্রু। পদ্মকোরকের কাছে যেমন অরুণালোক, নারী-হৃদয়ের কাছে তেমনি প্রেম। তারই অদৃশ্য মোহন স্পর্শে একটি একটি করে পাপড়ি খুলবে, একটু একটু করে ছড়াবে তার গোপন সৌরভ। দিনের পর দিন তার সঙ্গে যুক্ত হবে শিশিরের সিক্ত স্পর্শ, বাতাসের মৃদু দোলা ভ্রমরের মধুগুঞ্জন। এমনি করে একদিন শোভায় সুধায় সানন্দে বেদনায় বিকশিত হবে অন্তর মাধুরীর সহস্রদল। হেনার মনের কাছে এই ছিল ভালবাসার রূপ। গল্পে পড়া প্রেমের চিত্র তার কল্পনাকে কোনো দিন নাড়া দেয়নি, যে সব বই সে পড়ত তার মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

কিন্তু সত্যিকার প্রেমের আস্বাদ পেয়েছে, এমন একটি মেয়েকে নিবিড় ভাবে জানবার সুযোগ সে পেয়েছে। ডাক্তার বাবুর মেয়ে শোভা। শুধু সমবয়সী নয় একই সঙ্গে ওরা মানুষ। কিছুদিন হল তার বিয়ে হয়ে গেছে। তারও বেশ কিছুদিন আগে থেকে সেই ছেলেটির সঙ্গে তার ভাব। পূর্বরাগের পালা যখন সুরু হল, সেই থেকে তার মনের প্রতিটি রঙীন মুহূর্তের সঙ্গে হেনার পরিচয়। একটি চিরপরিচিত গ্রাম্য নদী। কতকাল থেকে বয়ে চলেছে বাগানের পাশ দিয়ে শান্ত নিস্তরঙ্গ শীর্ণ জলরেখা। সে যদি হঠাৎ একদিন কোনো দূরাগত জোয়ারের আহ্বানে কেঁপে কূলে কূল ছাপিয়ে ওঠে, মানুষের মনে যেমন বিস্ময় জাগে, হেনাও তেমনি বিস্মিত হয়ে দেখত তার আজন্ম-সখীর নব নব রূপান্তর। কখনো উচ্ছল কখনো গভীর, কখনো উজ্জ্বল কখনো ম্রিয়মাণ। একটি বিশেষ মানুষকে আশ্রয় করে নারী-হৃদয়ের এই যে বিচিত্র বিকাশ, এই তো ভালবাসা! কিন্তু তার অন্তরে কোথায় সে অমৃত স্পর্শ। তার নিজের জীবনেও যদি সেই বিশেষ মানুষের আগমন ঘটে থাকে, তাকে ঘিরে হৃদয়ের কোণে কোণে কোথায় সেই মোহময় মধু-সঞ্চার! তাকে দেখে, তার কণ্ঠ শুনে মনের গহনে তাকে স্মরণ করে লজ্জায়, পুলকে, ব্যথায় উল্লাসে সমস্ত বুকখানা ভরে ওঠে কৈ? তবু সে আছে, ছড়িয়ে আছে সমস্ত চেতনায়। অন্তরে বাহিরে তাকে ভুলে থাকবার উপায় নেই।

খাতার এই অংশটি বারংবার পড়লেন তালুকদার। অনুভব করলেন হেনার মনের সেই গভীর দ্বন্দ্ব, নিদ্রায় জাগরণে তার সেই অস্থির আকুলতা। মানুষের মনেই বহু সূক্ষ্মতন্ত্রীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। নারী-হৃদয়ের যে অপরিসীম জটিলতা সংসারে প্রতিদিন বিস্ময় সৃষ্টি করছে, তাও তাঁর অজানা নয়। কিন্তু এই খাতার তিন চারখানা পাতা জুড়ে কয়েকটি মাত্র রেখা আশ্রয় করে একটি বালিকার বিক্ষত অন্তর্লোকের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছিল তার সঙ্গে এই বহুদর্শী মানুষটির কোনো দিন পরিচয় হয়নি। জীবনের মাঝখানে হঠাৎ যে এসে দাঁড়াল, তাকে গ্রহণ করবার প্রস্তুতি নেই, সরিয়ে দেবারও উপায় নেই, এর চেয়ে গভীর সমস্যা আর কি হতে পারে? এই মুহূর্তে যাকে চাই, পরমুহূর্তে তাকে চাই না। এই যুগপৎ বন্ধন ও মুক্তি-কামনার অন্তর্নিহিত রহস্য মহেশের কাছেও অস্পষ্ট রয়ে গেল। প্রেম নামক যে অপ্রমেয় বস্তুটির পূর্ণ সন্ধান কেউ কোনো দিন পায়নি, এও তার একটি নতুন প্রকাশ কি না, তিনি জানেন না। সুতরাং হেনার মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, তাঁর কাছেও সেটা প্রশ্নই রয়ে গেল। শুধু যে-কথা সে বলে গেছে আর যেটুকু সে বলেনি, সব মিলিয়ে একটি সত্য তার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। সেটি হচ্ছে এই—হেনার জীবনে বিকাশ শুধু আগন্তুক নয় পরম আবির্ভাব। তার এই আকস্মিক আগমন প্রেমিকের অভিসার নয়, বিজয়ীর অভিযান। সে এল এবং জয় করল। কিন্তু সে বিজয়বার্তা বিজিতার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ল তালুকদার সাহেবের। এই হেনারই আর একটা রূপ। কত সহজে কত অনায়াসে তার গোপন নারীহৃদয় সেদিন ধরা দিয়েছিল আর একজনের কাছে। অগ্নিমন্ত্রী বিপ্লবী বিকাশের সঙ্গে সেই নিরীহ শান্ত মানুষটির কত তফাৎ। তার মধ্যে না ছিল শক্তির প্রাবল্য, না ছিল ব্যক্তিত্বের দৃপ্ততা। দুচোখে আগুন ছড়িয়ে, বাকশৈলীর মোহ বিস্তার করে সে আসেনি। তার কণ্ঠ ছিল নীরব, চোখে ছিল ভীরু আবেদন। তবু তারই কাছে নুইয়ে পড়েছিল হেনার উন্মুখ অন্তর। ওরা কেউ মুখ ফুটে না বললেও এটুকু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। দেবতোষকে সেদিন বিমুখ হয়ে ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু সে প্রত্যাখ্যানের আঘাত শুধু একদিকে বাজেনি। যে পায়নি, তার চেয়ে যে দিতে পারল না, তার দুঃখটাই বোধ হয় আরও বড়। ডাক্তার চলে যাবার পর হেনাকে যেদিন প্রথম দেখলেন তালুকদার, এই কথাটাই তাঁর মনে হয়েছিল।

খাতার কাহিনী এগিয়ে চলল—

সকালে বেড়িয়ে ফিরে জামাটা খুলতে খুলতে বললেন সদাশিব, বিকাশকে দেখে এলাম। আজও জ্বর এসেছে, তবে আগের চেয়ে কম।

কি খাচ্ছেন? মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল হেনা।

—সেই তো হয়েছে মুস্কিল। দুধটা একেবারেই খেতে পারে না। গন্ধ লাগে। চাকরটাকে একটু বার্লি করে দিতে বলেছিল। সে সব কি ঐ ব্যাটার কর্ম। একেবারেই মুখে তুলতে পারেনি।

তুই এক কাজ কর না, মা? একটু বার্লি ফুটিয়ে নেবু-টেবু দিয়ে পাঠিয়ে দে ছেলেটার জন্যে।

হেনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, এবং শম্ভুকে ডেকে দিতে বলে এগিয়ে গেল বাবার ঘরের দিকে।

শম্ভু কি করবে? জিজ্ঞাসা করলেন সদাশিব।

—এক কৌটা বার্লি আনতে দিই। ঘরে যা আছে একটু, পুরোনো হয়ে গেছে।

—এই যে বার্লি আমি নিয়েই এসেছি মহিম সা'র দোকান থেকে। কোথায় রাখলাম! ছ্যাখ্ তো ঐ জামার পকেটে আছে বোধ হয়।

বিকালের দিকে খালি পাত্রটা ফিরিয়ে দিতে এসেছিল বিকাশের চাকর। বলল, রোজকার মত আজও কিছুতেই খাবেন না। তারপর যখন বললাম, ও-বাড়ির দিদিমণি নিজে করে পাঠিয়েছেন তখন চোঁ-চোঁ করে সবটা খেয়ে নিলেন। বলেছেন, সন্ধ্যার পর আর এক গেলাস নিয়ে আসিস আমার কথা বলে। ভারি ভালো লাগল সরবতটুকু।

এর পর থেকে কখনো বার্লি, কখনো সাগু কখনো একটু মশুর ডালের সুপ, হেনাই জোগাতে লাগল। ফলটাও সে ছাড়িয়ে পরিপাটি করে ডিসে সাজিয়ে দেয়। তা না হলে মুখে তুলতে চায় না বিকাশ। বিকালে ফলের সঙ্গে এক গেলাস দুধ দিতেই চাকর আপত্তি করল, দুধ খায় না বাবু। হেনা একটু হেসে বলল, না খেলে চলবে কেন। ব'লো আমি বলেছি খেতে। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এল শূন্য গেলাস।

ক'টা দিন দুশ্চিন্তায় কেটে যাবার পর সকালে খবর নিয়ে এলেন সদাশিব, দু'দিন থেকে জ্বর আর আসেনি। কাল ভাত দিতে বলেছেন ডাক্তার। সে ব্যবস্থাও হেনাকে করতে হল। পুরোনো সরু চাল আর তাজা মাগুর মাছের সন্ধানে সদাশিব ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেবার পূজো পড়েছিল শেষ আশ্বিনে। আর ক'টা দিন বাকী। রৌদ্র-ঝলমল আকাশে কেমন 'পূজো-পূজো' গন্ধ। এমন সময় একদিন বিকালের দিকে বিপুল ঘনঘটা সুরু হয়ে গেল। বিকাশের রাতের খাবারটা একটু সকাল সকাল পাঠিয়ে দিয়ে বাবা এবং রাখালকেও তাড়াতাড়ি করে বসিয়ে দিল হেনা। তারপর নিজের যাহোক দুটো মুখে পুরে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বিছানায় শুয়ে একটা কি বই পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনে ঘুম ভাঙতেই মনে হল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। খুলতে গিয়েও খুলল না। কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। বিছানার উপর বসেই জিজ্ঞাসা করল—কে?

ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর—আমি।

স্বরটা যেন চেনা-চেনা। দরজা খুলেই চমকে উঠল—আপনি?

—তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ, না? চৌকাঠ ধরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল বিকাশ।

সে কথার জবাব না দিয়ে তেমনি উৎকণ্ঠিত সুরে বলল হেনা, এত রাতে, এই অসুস্থ শরীরে। কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো?

—বিপদ থেকে তুমিই তো বাঁচিয়ে তুললে। বড্ড দেখতে ইচ্ছা হল তোমাকে। তাই চলে এলাম।

হেনার মুখের পেশীগুলো হঠাৎ দৃঢ় হয়ে উঠল। শুষ্ক কঠিন কণ্ঠে বলল, ভালো করেন নি বিকাশ বাবু, যান বাসায় ফিরে যান।

অ্যাঁ! চমকে উঠল বিকাশ। তার পর যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, এমনি সুরে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছ। আমি যাচ্ছি। বলেই, চলতে গিয়ে পা দুটো টলে উঠল, এবং পড়ে যাবার উপক্রম করতেই হেনা দু'হাতে ধরে ফেলল তার কাঁধের কাছটা। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, এ কি! আপনার গা বেজায় গরম। আবার জ্বর এল কখন? আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে বসিয়ে দিল তার তক্তপোষের বিছানার উপর।

বিকাশ হাঁপিয়ে পড়েছিল। একটু দম নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, এসেছে আজ সন্ধ্যাবেলায়। তার সঙ্গে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা! গোটা দুই অ্যাসপিরিন খেয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু ঘুমের মত এসেছিল। তারই মধ্যে দেখলাম, তুমি আমার পাশটিতে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছ। কি ঠাণ্ডা হাত আর কি মিষ্টি! তন্দ্রা ভেঙে যেতেই মনটা কেমন ছটফট করে উঠল। ছুটে এলাম তোমার কাছে।

থেমে থেমে ধীরে ধীরে বলল কথাগুলো। আরো কি বলতে যাচ্ছিল, হেনা থামিয়ে দিয়ে বলল, থাক্; আর কথা বলবেন না।

—কিন্তু আমাকে যে যেতে হবে। বলে আর একবার উঠতে চেষ্টা করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে বসে পড়ল খাটের উপর। কড়-কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এল এক ঝলক বিদ্যুৎ-চমক। সেই আলোয় বিকাশের মুখের উপর চোখ পড়তেই শিউরে উঠল হেনা। অস্ফুট স্বরে বলল, না, না! কোথায় যাবেন এই অসুস্থ শরীরে? বালিসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন চট করে শুয়ে পড়ুন।

—শুয়ে পড়বো? ক্লান্ত কণ্ঠে বলল বিকাশ। বেশ! কিন্তু তার পর?

হেনার মুখে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর যোগালো না। একবার ভাবল, বাবাকে ডাকি। সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত হল—কি ভাববেন তিনি? এমন সময় যেন সব সমস্যার সমাধান করে চেপে এল বৃষ্টি। হেনা উঠে গিয়ে দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিল। ঘরে অডিকলন ছিল। তালপাখা ছিল আলমারির মাথায়। সেই সব সংগ্রহ করে মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল গিয়ে তক্তপোষের ধারে। বিকাশ চোখ বুজে পড়ে রইল অসাড় নিস্পন্দের মত। তার জ্বর-তপ্ত কপালের উপর অডিকলনের জলপটি ঘন ঘন বদল হতে লাগল। সেই সিক্ত বস্ত্রখণ্ডের স্নিগ্ধতার সঙ্গে মিশে রইল কয়েকটি ক্ষিপ্রগতি কোমল আঙুলের স্পর্শ। কিন্তু ঐ মুদ্রিত চক্ষু পীড়িত মানুষটির বুকের কোনখানে কি সুর তারা লাগিয়ে তুলল, তার কোনো আভাস পাওয়া গেল না।

এমনি করে কখন গভীর হল বর্ষণ মুখর রাত্রি, কখন ঘুমের আবেশে জড়িয়ে এল দুটি ক্লান্ত চোখ, অবাধ্য মাথাটা অজ্ঞাতসারে লুটিয়ে পড়ল বিকাশের বালিসের পাশে, হেনার কাছে সবটাই রইল অজ্ঞাত।

এবারেও ঘুম ভাঙল সেই একই শব্দে—দরজার উপর ঘন ঘন করাঘাত। তার সঙ্গে অনেক মানুষের চাপা কোলাহল, পেট্রোম্যাক্স আলোর ছুটোছুটি। হঠাৎ উঠতে গিয়ে বাধা পড়ল। গলার চার

দিকে জড়িয়ে আছে একখানি রোগদুর্বল হাতের প্রগাঢ় বেষ্টনী। মুহূর্ত মধ্যে থেমে গেল বুকের স্পন্দন, অসাড় হয়ে গেল সমস্ত দেহ। পরক্ষণেই হাতখানা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল হেনা। বাইরের গোলমাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কে যেন ডেকে উঠল তার নাম ধরে। সাড়া দিতে গিয়ে গলায় স্বর ফুটল না। পা দুটোও বুঝি অচল হয়ে গেল। আবার জোরে জোরে দরজা ঠেলার শব্দ। বিকাশের ঘুম কি কিছুতেই ভাঙবে না! তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ত্রস্ত কণ্ঠে ডাকল হেনা, শুনছেন, শীগগির উঠুন। ধড়মড় করে উঠে বসল বিকাশ—কি হয়েছে?

—কারা সব দোর ঠেলছে। কি হবে!

এক মুহূর্তে কী ভেবে নিল বিকাশ। একটিবার তাকান ওর ভীতিবিহ্বল মুখের দিকে। তারপর যেন ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শান্তকণ্ঠে বলল, ভয় কি হেনা? আমি তো রয়েছি—বলেই দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল কপাট, ঠিক সামনেই দলবল নিয়ে বড় দারোগা হোসেন সাহেব। মস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, উঃ বাঁচালেন মশাই। চাকরিটা তাহলে রয়ে গেল আজকের মত। পেছনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি দেখছি ঠিকই আন্দাজ করেছিলে ছোটবাবু। গোড়ার দিকে এখানে এলে অনেক হয়রাণির হাত থেকে বাঁচা যেত, আর এমন ধারা ভিজে ঢোল হতে হত না। ছোটবাবু, মানে ছোট দারোগা একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল, আমার আন্দাজ কোনো দিন মিথ্যা হতে দেখেছেন? সারাদিন কিন্তু আমার কথাটা কানে তুলতেই চাননি। এবার দেখলেন তো স্যর? গরীবের কথা বাসি হলে ফলে।

—যাক, এবার চলো সব। এগুলো এখনি ছেড়ে না ফেললে নির্ঘাৎ নিমুনিয়ায় ধরবে। আপনিও আসুন বিকাশবাবু। মাষ্টার বাবু গেলেন কোথায়?

ছোট দারোগা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, হ্যাঁ; মাষ্টার বাবুকে একটু বুঝিয়ে বলে যান, স্যর, ভদ্দরলোকের পাড়ায় এসব বিন্দাবনী কাণ্ড না করে মেয়েকে বরং বাজারের মধ্যে একটা ঘর টর—

সাট, আপ, গর্জে উঠল বিকাশ। বড় দারোগার দিকে চেয়ে বলল, আপনার ঐ অ্যাসিষ্ট্যান্টটিকে বেশ করে বুঝিয়ে দিন, হোসেন সাহেব, আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনো অভদ্র ইঙ্গিত আমি সহ্য করবো না।

—আপনার স্ত্রী! হোসেনের সুরে গভীর বিস্ময় ফুটে উঠল। মানে, আমাদের পোষ্টমাষ্টারবাবুর মেয়ে ঐ—

—হ্যাঁ, তার কথাই বলছি।

—বিয়েটা বুঝি গান্ধর্ব্যমতে হয়েছিল? বলে উঠল ছোট দারোগা।

—আহা, ও সব কী কথা নিবারণ! ধমকের সুরে বললেন হোসেন সাহেব। তারপর আর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেলেন খিড়কির দিকে।

ঘরের এক কোণে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল হেনা। তার একান্ত কাছটিতে সরে এসে বলল বিকাশ, আমাদের তো আর লজ্জা করবার সময় নেই, হেনা! চল, তোমার বাবাকে প্রণাম করে আসি।

হেনার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বিকাশ তার জন্যে অপেক্ষাও করল না। ওর একখানা হাত তুলে নিল নিজের হাতের মধ্যে, একটুখানি চাপ দিল অসাড় আঙুলগুলোয়, তারপর সেই হাত ধরেই নিয়ে চলল সদাশিবের ঘরের দিকে। দরজা খোলাই ছিল। কোণের দিকে হ্যারিকেনটা রোজকার মত বসানো। পলতেটা কে যেন উসকে দিয়েছে। তারই আলোতে দেখা গেল, সদাশিব বিছানার উপর বসে আছেন। চোখ দুটো চেয়ে আছে। কিন্তু তারা যে দেখছে তার কোনো লক্ষণ নেই। হেনার হাত ধরে বিকাশ যখন সামনে এসে দাঁড়াল, তখনো সে দৃষ্টি তেমনি শূন্য-নিবদ্ধ। ওদের দেখতে পেয়েছিল বলে মনে হল না। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বিকাশ বলল, আমরা আপনার আশীর্বাদ চাইতে এসেছি। আপনাকে একটু উঠতে হবে।

যেন গভীর ধ্যান থেকে জেগে উঠলেন সদাশিব। ধীরে ধীরে বললেন, কী বলছ?

বিকাশ হেনাকে নিয়ে আর একটু এগিয়ে এল। নত হয়ে ওঁর পায়ের দিকে হাতটা বাড়িয়ে বলল, আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা সুখী হতে পারি।

সদাশিব উঠবার কোনো উদ্যোগ করলেন না। পা গুটিয়ে যেমন বসে ছিলেন, তেমনি রয়ে গেলেন। পলকের জন্য একবার হেনার বর্ণহীন মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে একটু ভাবতে দাও, বিকাশ!

—বেশ, বলে বিকাশ হেনার হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওরা দাঁড়িয়ে আছে, আমি তাহলে আসি।

সদাশিবের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যাবার জন্যে পা বাড়াল বিকাশ। পরক্ষণেই ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, যা কিছু ঘটেছে, আমিই তার জন্যে দায়ী। দোষ বলুন, অপরাধ বলুন, তারও সবটুকুই আমার। ওর তাতে কোনো অংশ নেই। একটুখানি থেমে আবার বলল, কিন্তু শুধু সেই জন্যেই, অর্থাৎ আপনাদের দুজনকে লজ্জা আর কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনার মেয়েকে আমি গ্রহণ করছি, একথা যদি মুহূর্তের তরেও মনে করে থাকেন, আমার উপর ঘোর অবিচার করা হবে। আমাকে আপনি স্নেহ করেন, আর হেনাকেও আমি—এ শুধু সেই জোর, আর কিছু নয়। আজকের দুর্ঘটনার সঙ্গে এর কোনো সংশ্রব নেই। তোমাকেও আমি সেই কথাই বলতে চাই হেনা!—সকালেই বোধ হয় ওরা আমাকে সদরে চালান দেবে। যাবার আগে হয়তো আর দেখা করবার সুযোগ হবে না। বলে, মিনিটখানেক অপেক্ষা করল। তারপর দু'জনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

অসুখ-বিসুখ বা অন্য কোনো কারণে পোষ্টমাষ্টার অফিসে যেতে না পারলে স্থানীয় ইস্কুলের একজন শিক্ষক এসে কাজ চালিয়ে যান। এইটাই বরাবরের নিয়ম। সকালে উঠে সদাশিব শম্ভুকে দিয়ে তাকেই খবর পাঠিয়ে দিলেন। হেনা যথারীতি চা দিয়ে গেল। নিঃশব্দে খেয়ে নিলেন। শম্ভু কলকে ধরিয়ে বসিয়ে গেল গড়গড়ার মাথায়। নলটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ টানলেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লেন নিজের বিছানায়। হেনা ছিল রান্নাঘরে। রাখালের মুখে খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল—এ কি, অসময়ে শুয়ে পড়লে যে? শরীরটা ভালো নেই বুঝি?

—না, মা, শরীর আমার ভালোই আছে।

আর কোনো প্রশ্ন না করেই চলে যাচ্ছিল হেনা। সদাশিব ডেকে ফেরালেন। কাছে এসে বসতে বললেন। তারপর মেয়ের কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার আনত মুখের পানে, যেন কী বলবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। অনেকক্ষণ পরে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, তোর মুখের দিকে আমি তো আর চাইতে পারছি না মা!

হেনা এতক্ষণ বাবার কাছ থেকে নিজেকে দূরে দূরেই সরিয়ে রাখছিল। তার মনের মধ্যে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ওঁর চোখে তার কোনো চিহ্ন না ধরা পড়ে, সেই দিকেই ছিল তার সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু বাবার আর্তকণ্ঠের এই একটি মাত্র কথা শুনে নিজেকে আর সে ধরে রাখতে পারল না। দুচোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা। বৃদ্ধ আবার বললেন, আজ যদি তোর মা থাকত, আমাকে কিছুই করতে হত না। তোর দাদাটা থাকলেও তোকে নিয়ে আমার কোনো ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ যে আমি একেবারেই একা! কোনো দিকেই কূল দেখতে পাচ্ছি না। কি করবো, কোন পথে যাবো, তোকেই তো বলে দিতে হবে মনে কর, আমি তোর বাপ নই, অক্ষম ছেলে।

একটু থেমে নিয়ে বললেন, বিকাশের কথা তো সব শুনলি? এবার তোর মনের ইচ্ছাটা আমাকে জানিয়ে দে। আমার কাছে লজ্জা করিস না, মা!

তার মনের ইচ্ছা কি, সে নিজেই জানে না যে জানিয়ে দেবে? দুদণ্ড শান্ত হয়ে মনের মুখোমুখী বসে বোঝাপড়া করে নেবে, সে সুযোগটাও তো পায়নি। বিকাশের মুখে সেই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক উক্তি শুনে হোসেন দারোগা আর তার পুলিশের দলটাই যে থ হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, তার চেয়েও বেশী চমকে উঠেছিল সে নিজে। এখনো সেই বিস্ময়ের ঘোর তার সমস্ত চেতনা অধিকার করে আছে। মনের গহনে দৃষ্টি পৌঁছতে পারেনি।

এদিকে তারই মুখ চেয়ে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন তার বাবা। তাঁর পেছনে অপেক্ষা করে আছে তাদের রক্তচক্ষু প্রতিবেশীর দল, তার নিজের মান সম্ভ্রম, তাদের পারিবারিক সম্মান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা। ভাবতে গিয়ে হেনার স্নায়ুকেন্দ্রের সমস্ত তারগুলো যেন দাঁড়িয়ে গেল। বেরিয়ে এল দু'টি অস্ফুট আর্তস্বর—আমি কিছু জানি না বাবা! আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না।

এইটুকু বলেই সে ভেঙে পড়ল বাবার বুকের উপর। সদাশিব ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

দরজার বাইরে শম্ভুর গলা শোনা গেল, থানার বড় বাবু একবার দেখা করতে চান। কথাটা হেনার কানে যেতেই সে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল পার্টিশনের ওপাশে। সদাশিবও উঠে বসে হোসেনকে ডেকে পাঠালেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তিনি এসে গেলেন। সদাশিবের খাটের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, আপনার অফিসে এসে দেখলাম, যদু মাষ্টার ডাক খুলছে। তারপর শম্ভুর কাছে শুনলাম, আপনার অসুখ। কেমন আছেন এখন?

সদাশিব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। মাটির দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বললেন, অসুখটা যে কি, আপনার কাছে তো লুকোনো নেই, দারোগা সায়েব! আপনি না এলে একটু সামলে নিয়ে আমিই যেতাম আপনার কাছে। আমি যে কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না।

হোসেন দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, আমার তো মনে হয়, পথ ঐ একটাই আছে মাষ্টার বাবু! আর বিকাশই সেটা দেখিয়ে দিয়েছে।

—কিন্তু, ওদের ঐ ছন্নছাড়া জীবন। বাড়ি-ঘর বলতে জেলখানা। কোন দিন ধরে ঝুলিয়ে দেবে, তারই বা ঠিক কি? মা-মরা মেয়েটাকে শেষকালে—

স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। হোসেন সাহেব কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। বোধ হয় ওঁকে শান্ত হবার সময় দিলেন। তারপর বললেন, আপনার আশঙ্কা যে একেবারে মিথ্যা তা কেউ বলবে না। কিন্তু, কিছু মনে করবেন না সদাশিব বাবু, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, মেয়ের ভবিষ্যতের চেয়ে এখন বড় ভাবনা হল ওর ইজ্জৎ। ওর হাতে যদি দেন, তবু খানিকটা মুখ রক্ষা হতে পারে। আর তা যদি না হয়, আপনার জাতভাই মশাইরা যে কি চীজ, তা তো আমার জানতে বাকী নেই? কোথায় গিয়ে যে ওরা থামবে, বলা বড্ড শক্ত। আপনাকে জবাই করার তোড়জোড় এরই মধ্যে সুরু হয়ে গেছে।

সদাশিব ভাবতে লাগলেন।

হোসেন অনেকটা যেন আশ্বাসের সুরে বললেন, তবে একটা কথা। ঐ-সব স্বদেশীওয়ালাদের আমি ভালো করেই চিনি। ওদের আর যা-ই দোষ থাক, কথার খেলাপ কা'কে বলে জানে না। মানুষগুলো একদম খাঁটি। একবার যেটা ধরবে, যেদিকে ঝোঁক পড়বে, তারই জন্যে জান কবুল। কে জানে, আপনার হেনাই হয়তো ওর মোড় ফিরিয়ে দিল। যে ভাবে ওর হাতটা চেপে ধরে নিয়ে এল আপনার কাছে, ও হাতে যে আবার রিভলবার উঠবে, আমার তো বিশ্বাস হয় না, মশাই! বলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন সাহেব। হাসি থামিয়ে চাপা গলায় বললেন, কী জানেন, Internment rlues break করলেও ছেলেটাকে চালান দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু বন্ধু আমাদের পায়ে পায়ে। ঐ নিবারণটাই হয়তো ছেড়ে দেবে একটা উড়ো চিঠি। তার পর চাকরি নিয়ে টানাটানি। কাজেই, send up করতেই হবে। তবে পুলিশ যাতে মামলা না চালায়, সে চেষ্টাও আমি করবো।

সদাশিবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি কিছু বলবার আগেই আবার সুরু করলেন হোসেন দারোগা, সাহেবটা পেয়েছি ভাল। কথা-টথা শোনে; আর আপনাদের দোয়ায়, একটু খাতিরও করে। আমি গিয়ে যদি বলি সাহেব, তোমার ঐ বিকাশ ঘোষের বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে। মনে রঙ ধরেছে ছোকরার। এখন সাদি টাদি করে সংসারী হোক। আমরাও নিশ্চিন্দি হই, আমার তো মনে হয় কথাটা ঠেলতে পারবে না। ইংরেজের বাচ্চা তো। খোদায় করলে চাই কি একেবারে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে।

সদাশিব ওঁর হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে বললেন, দয়া করে সেই সাহায্যটুকু আমায় করুন, দারোগা সাহেব! তাহলেই নিশ্চিন্ত মনে

মেয়েটাকে ওর হাতে সঁপে দিতে পারি। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

হোসেন সাহেব উঠে-পড়ে বললেন, আপনি ভাববেন না, মাষ্টার বাবু! আমার যদ্দুর সাধ্য, আমি নিশ্চয়ই করবো। আদ্দিন ধরে দেখছি তো আপনার মেয়ের মত মেয়ে হয় না। ওর চাচী তো 'হেনা' বলতে অজ্ঞান। ও সুখী হোক, আমরা সবাই তাই চাই।

গলা খাটো করে বললেন, তাছাড়া, আপনাকে বলতে আর বাধা কি, এই ক'দিনে ঐ ছেলেটার ওপরেও কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে, মশাই! দুটিতে মানাবেও চমৎকার! আচ্ছা, এবার তাহলে চলি। একগাদা লোক বসে আছে। আপনিও উঠে পড়ুন। অফিস যাওয়া বন্ধ করবেন না। শুয়ে থাকলেই যত রাজ্যের বাজে চিন্তা এসে জোটে।

সদাশিব উঠে দরজা পর্যন্ত গেলেন হোসেনের সঙ্গে। একটু ইতস্তত: করে বললেন, বিকাশকে একবার—

—সে কথা বলতে হবে না। যাবার আগে পাঠিয়ে দেবো।

ও-সি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। সদরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে এ বাড়িতে একবার এসেছিল বিকাশ। হেনা ছিল রান্নাঘরে। খোঁজ করতে করতে সেইখানে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার আনত মুখের দিকে চেয়ে বলল, নিজের কথাই শুধু বলে গেলাম। তোমার কথা আর শোনা হল না। ভুল করিনি, এইটুকু জানতে পারলেও একটু তৃপ্তি পেতাম যাবার সময়। দরজার চৌকাঠ ধরে নতমুখে দাঁড়িয়েছিল হেনা। কোন জবাব করেনি। হয়তো জবাব দেবার মত ছিল না কিছুই। ভুল যদি হয়েও থাকে, সে কথা আর জানিয়ে কী লাভ? ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, এসব প্রশ্ন তখন নিতান্ত অবান্তর। হেনার সামনে তখন একটিমাত্র পথ—অন্ধ নিয়তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। তাই সে দিয়েছিল। কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক, সে বিচারের অবকাশ ছিল না।

বিকাশ ক্ষণকাল অপেক্ষা করে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা আমার কোলকাতার ঠিকানা। আপাতত শ্রীঘরে যাচ্ছি। সেখানকার মেয়াদ বোধ হয় মাস তিনেক। তার পর আমাকে নিয়ে যে কি করবেন কর্তারা, এখনো স্থির করতে পারেন নি। তবে ছাড়া একদিন পাবোই, এবং তার পরেই এখানে এসে তোমাকে পাবো, এই ভরসা নিয়ে যাচ্ছি। যদি তার মধ্যে তোমাদের অন্য কোথাও যেতে হয়, ঐ ঠিকানায় একখানা চিঠি ছেড়ে দিও। যেখানেই থাকি সে চিঠি আমার হাতে পৌঁছবে। দেবে তো?

হেনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

বিকাশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা কোথায় গেলেন?

—অফিসে আছেন।

বলতে বলতেই সদাশিব এসে দাঁড়ালো ওদের কাছে। বিকাশ এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, হোসেন সাহেব আমাকে সব কিছুই বলেছেন। আশীর্বাদ করুন, যেন শীগগিরই আপনার কাছে ফিরে আসতে পারি।

সদাশিব ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তার পর কোনো রকমে বললেন, ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই বাবা! ও যেন কোনো দিন দুঃখ না পায়, এইটুকু তুমি দেখো।

বলেই চোখ মুছতে মুছতে নিজের ঘরে চলে গেলেন। বিকাশ যাবার জন্যে পা বাড়াল। পিছন থেকে কানে গেল মৃদু কণ্ঠের আহ্বান, একটু দাঁড়াও। ফিরে দাঁড়াতেই হেনা এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল ওর পায়ের কাছে। বিকাশের উদ্দেশে এইটাই ওর প্রথম প্রণাম। শুধু প্রণাম নয়, হয়তো সেই সঙ্গে তার শেষ প্রশ্নের বাক্যহীন উত্তর।

বাইরে থেকে পাহারাওয়ালার হাঁক শোনা গেল—জাহাজকা টাইম হো গিয়া, বাবু!

[ক্রমশঃ।

ধান কাটার গান

মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী

ও কামার ভাই,
শাণ দে, শাণ দে ভাই কাস্তের ভাঙা দাঁতে
ধান কাটবার শুভ দিন কাল প্রাতে—
অতি ভোরবেলা আকাশ-রঙীন, আমারও আকাশে রং
একাকার হয়ে বাজাবে রে ভাই সুখের সুর সারং;
বড় রাত হ'লো আলো টিম-টিম সময় তো আর নাই
চালাই হাপর, তেতে লাল লাল পেটাও কাস্তে ভাই।

ও ভাই,
চালাও হাতুড়ী সবল দু-হাতে গড়ে তোল ইস্পাত
শাণ দিয়ে দিয়ে জাগাও ধারাল দাঁত—
হাওয়ায় দোলানো ধানের শীষের অবিরাম হাতছানি
আমার রাতের ঘুম কেড়ে নেয় রঙীন স্বপন আনি;
হৃদয়ে আশার প্রদীপ জ্বেলেছি সে প্রদীপ লেলিহান
সোনালী ধানের আহ্বানে মোর রক্তে লেগেছে বান।

ও ভাই,
এবার শুধব হাল, বকেয়ার যাব আছে যত ঋণ;
মাঠে-মাঠে তাই খেটেছি সারাটে দিন—
আষাঢ়ে-ভাদরে দিয়েছি লাঙল বুনে গেছি চারা ধান,
সোনালী ধানের স্বপ্ন দেখেছি শুনি তার আহ্বান
কাল শুভদিন, রক্তে জোয়ার সবুর সয় না ভাই
চালাও, চালাও হাতুড়ী চালাও সময় তো আর নাই।

ও ভাই,
নূতন ধান্যে শুভ নবান্নে জানাব নিমন্ত্রণ
সে শুভদিনের স্বপ্নে বিভোর মন—
গাঁয়ের ছেলেরা ছড়া বেঁধে গা'বে লক্ষ্মীর আগমনী
ভেঙে যায় ঘুম স্বপ্নে হঠাৎ শুনি সুমধুর ধ্বনি;
কুলোভরা ধান দেব আর দেব দুয়ারে আল্পনা
চালাও চালাও হাতুড়ী চালাও সবুর সয় না আর।

স্নানের সময়
মনে
রাখবেন
একশ' বছরের
ঐতিহ্য,
বিশুদ্ধতা এবং
অপরিবর্ত্তিত
গুণগুলির জন্য
আজও সমাদৃত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

বিচিত্র ভ্রমণ*

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জ্ঞানাঞ্জন পাল

বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে আমেদাবাদে আসি ১৯৩০ সালে। তখন মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম ছিল শবরমতির তীরে, আমেদাবাদ শহরেরই প্রান্তে। একদিন সকালে তাঁর আশ্রম দেখতে গেলাম আমরা—বড়দি, আমার বালক পুত্র ও আমি। গান্ধীজি হয়ত শুনেছেন বিপিনচন্দ্র আমেদাবাদে এসেছেন, রাজনৈতিক কোনো কাজে অবশ্য নয়, ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ভারতের সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলতে। রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ যোগ একরূপ ছিন্ন হয়ে যায় ১৯২১ সালে বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনের পর। তারও প্রায় দশ বছর পরে আমরা আমেদাবাদে এসেছি। বিপিনচন্দ্র গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে যাননি, গান্ধীজিও আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। আমার মনে হয়েছে, এর কোন প্রয়োজনও সে সময় ছিল না।

এর আগে এরকম আশ্রম দেখার সুযোগ আমার হয়নি। ভারতের সব অংশেরই কিছু কিছু লোক গান্ধীজির আকর্ষণে এখানে এসেছেন, তাঁর আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবেন বলে। বাঙ্গালী কয়েক জন আছেন, ভারতের বাহিরের দু'-চার জনও আছেন। আমরা যখন যাই তখন তাঁরা আশ্রমের মাঠে কাজ করছেন। এক জন ইংরেজ আশ্রমবাসীও মাঠে নেমেছেন, অন্যদের সঙ্গে খালি গায়ে। অনেকটা জায়গা নিয়ে আশ্রম, অনেকগুলি কুটির, আর সমস্ত পরিষ্কার রাখার ভার ও শারীরিক শ্রমে কিছু উৎপাদন করার দায়িত্বও আশ্রমবাসীদের। মহাত্মা গান্ধীকে প্রণাম করার সুযোগ পেলাম আমরা। খালি গা, ছোট্ট খদ্দরের কাপড় পরা, পায়ে খড়ম, গান্ধীজি তাঁর কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, আমরা প্রণাম করলাম। বললেন 'খেয়ে যাবে তো' ? আমরা বললাম—'বাবাকে ত বলে আসিনি, তিনি যদি ভাবেন ?' গান্ধীজি বললেন—'ওহো, তোমরা ত আম্বালালের বাড়ীতে আছ। সেখানের খাওয়া আর আমাদের এখানকার আশ্রমের। I know the temptations of Ambalal's table—বলে হাসতে লাগলেন। ইংরেজীতেই আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, শেষের ভাষাটাও মনে আছে। আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করে বললেন—'ঠাকুর্দা'র মত হও।' এবার হিন্দিতে ; বালক পুত্র, ইংরেজী ত বুঝবে না।

আমাদের মনীষীরা বলেছেন, লোকোত্তর চরিত্রের যাঁরা অর্থাৎ সাধারণের বাহিরে, তাঁদের মনের গতি সাধারণের মাপকাঠিতে বিচার করতে নেই। কথাটা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এই স্বল্প আলাপেও মনে হল, সত্য। বিপিনচন্দ্র যে গান্ধীজির মত ও পথের বিরোধী তা ত গান্ধীজি জানতেন। কিন্তু তার জন্য তাঁর মনে ত কোনো দাগ পড়েনি ! নইলে এত সহজে তাঁর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হিসাবে কি বলতে পারতেন, আমার ছেলেকে—'ঠাকুর্দা'র মত হও।' আর বাবার মনের মধ্যেও যদি গান্ধীজির মতবাদ নয়, মানুষ গান্ধীজির মর্য্যাদা সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা থাকত, তা'হলে কি আমরা এত সহজে ও এরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে আসতে পারতাম ?

বস্তুত, আমার মনে হয়েছে, বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজির মতের বিরোধ ব্যক্তিগত ত নয়ই, এমন কি বাহিরের দিক থেকে অসহযোগের কর্মপন্থা নিয়েও নয়। বিপিনচন্দ্র স্বদেশী যুগের সৃষ্টি। স্বদেশী যুগ বাংলার নবজাগরণের ফল। জাগরণ মানে নতুন শক্তিতে জেগে ওঠা। এই নতুন শক্তির অনুভূতিই স্বদেশীতে রূপ পায়। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের স্বদেশী যুগের গানগুলি মনে করলেই এ কথা স্পষ্ট হবে। 'নিশিদিন ভরসা রাখিস্ ওরে মনে হবেই হবে,' 'তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না' প্রভৃতি গান শক্তির এই নতুন অনুভূতিই জাগিয়ে দেয়। স্বাধীনতার এই দুর্গম পথে অন্যে যেতে কুণ্ঠিত হওয়ায় কবির কণ্ঠ থেকে বেরুলো—'একলা চলো রে'। কোনো ভয়েই তখন আর আমরা ভীত নই। কবির ডাক আমাদের মরমে প্রবেশ করেছে—'মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী'। ইংরেজের শক্তিও উপেক্ষার বিষয় হ'ল। ইংরেজকে উদ্দেশ করে আমরা বলে উঠলাম—'বিধির বিধান ভাঙবে তুমি এমন শক্তিমান' ! এর মধ্যে ইংরেজের প্রতি কোনো বিদ্বেষ তখনো কিন্তু ফুটে ওঠে নি, ছিল কেবল দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগ—'আমার সোনার বাংলা, তোমায় ভালবাসি'। অরবিন্দের কণ্ঠ থেকে বেরুলো—এই নতুন স্বদেশপ্রেম বা নবজাতীয়তা ভগবানের সৃষ্টি, সুতরাং এর মৃত্যু নেই। ভগবানই এর প্রকৃত নায়ক, কারো দ্বারাই সুতরাং এ ধ্বংস হতে পারে না'। বিপিনচন্দ্রের লেখনীতে প্রকাশ হ'ল—সভায় প্রস্তাব পাশ করার সময় এখন নেই, এখন সংকল্প গ্রহণ করার সময় এসেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন আর নয়, এখন কাজ সংগঠন। বিদেশীর আশ্রয়ে কোনো সংস্কারই আর এখন কাম্য নয়—বিদেশী শাসনের সম্পূর্ণ অবসানই আমাদের লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, 'ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে রাজভক্তি আমাদের মিথ্যাচার হবে, কিন্তু ইংরেজের প্রতি কোনো বিদ্বেষও আমাদের নাই—তার অবসর পর্য্যন্ত নাই, কেন না আমাদের ব্রত আমাদের দেশকে আমরাই গড়ে তুলব। চোখে পড়ে—এঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বা শয়তানের সৃষ্টি, একথা পর্য্যন্ত কোথাও বলেন নি।

স্বদেশীর আগে বা পরে ঠিক এমনটি এ যুগে আমাদের জীবনে কখনো ঘটেনি। দেশের বিশাল জনতা জেগে উঠে অহিংস অসহযোগের পথে স্বাধীনতার সংগ্রামে নিজেরা প্রবৃত্ত হয়নি। বাংলায় স্বদেশী যুগে নবজাগরণের পরেই কিন্তু যুবকেরা ও তাদের নায়কেরা স্বাধীনতার লড়াই আরম্ভ করেন। ধর্মে, সমাজে, চিন্তায়, আচরণে, সাহিত্যে স্বাধীনতার সাধনা করে তারই ভিত্তিতে নবজাগরণের মন্দির রচিত হয় বাংলায়। সেই মন্দিরেই রাষ্ট্রীয় মুক্তির চিন্ময়ী দেবতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে স্বদেশী যুগের বাংলা। পূর্বের এই সাধনা ভারতের অন্যত্র কেউ এরকম নিষ্ঠার সঙ্গে করেনি। স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলায় তাই কোনো নতুন মতবাদ প্রয়োজন হয়নি। জেগে উঠেছে যারা তাদের বাইরের কোনো আলো বা অধিনায়ক পর্য্যন্ত দরকার হয় না। বাহিরের আলো নিবে গেলেও কবির বাণী তাতে পৌঁছেছে—বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে হয়ত একলাই চলতে হবে। অন্যায় তারা আর সহিবে না—কবির কাছ থেকেই তারা নতুন মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে—অন্যায় সহ্য করা অন্যায় করার মতই পাপ। স্বাধীনতার এই সাধনা হিংসাত্মক বললে ভুল হবে—যদিও অহিংসার ব্রত এ সকল সাধকদের ছিল না।

আমাদের এই নবজাগরণের ইতিহাস এখনো পর্যন্ত যথাযথ ভাবে লেখা হয়নি। স্বদেশী যুগের চিন্তা ও কর্মের মূল্য বিচার করাও সম্ভব হয়নি। এই নবজাগরণের প্রেরণা সব প্রথমে ও সব চাইতে বেশী আসে রামমোহনের কর্মচেষ্টা থেকে। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ভারত-পথিক বলেছেন। ভারতের সাধনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সন্ত কবীর তাকে ভারত-পন্থা বলেন। এই পথই রামমোহনের কাছে নতুন প্রভায় আলোকিত হয়ে ফের দেখা দেয় কয়েক শত বছর পরে এবং সেই পথেই তিনি এ যুগের সকল কর্মচেষ্টাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। তাতেই নবজাগরণের সূচনা হয়; সেজন্যই তিনি ভারত-পথিক। বাংলায় এই নবযুগের কথা মননশীল আলোচনায় যত প্রকাশিত হবে ততই স্পষ্ট হবে স্বদেশী-যুগের অন্তর্নিহিত আদর্শ ও প্রেরণা। তখনই জানা যাবে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে এর পার্থক্য কি বা কোথায় এবং তখনই বোঝা যাবে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজির মতবিরোধ ঘটেছিল কেন। কেন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির কর্মপন্থা মেনে নিতে পারেন নি, যদিও গান্ধীজির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না; গান্ধীজিই বা কেন রামমোহনকে যুগপ্রবর্তকের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন যা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ চিন্তানায়কেরা অকুণ্ঠ ভাষায় দিয়েছেন।

কিন্তু এ ত তত্ত্ব-আলোচনা। এ সত্ত্বেও মনে একটা কথা বুঝতে সময় লাগে, গান্ধীজির এত কাছে বিপিনচন্দ্র পাল রইলেন প্রায় এক পঞ্চকাল। অথচ পরস্পরে সাক্ষাৎ পর্যন্ত হ'ল না! বলেছি বটে তার প্রয়োজন ছিল না তখন। কিন্তু প্রয়োজন হ'ল না কেন? বিপিনচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন ১৯০৫ ও তার আগে থেকে। পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী নাকি তাঁর লেখনীতেই প্রথম বেরোয়। গান্ধীজি স্বাধীনতাই এনে দিতে পারেন বলছেন খুব শীঘ্র—তাঁর মতবাদ গ্রহণ করে তাঁর নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করলে। আমরা যুবকেরা ভেবেছি এতে এমন কি আছে যাতে বিপিনচন্দ্র গান্ধীজির এত বিরোধিতা করেন? এর কারণ বাহিরে পাওয়া যাবে না। পরে মনে হয়েছে, খুঁজতে হবে বিপিনচন্দ্রের প্রকৃতিতে। বিপিনচন্দ্রের অন্তঃপ্রকৃতি বলেছে—সাধারণে নতুন শক্তিতে জেগে উঠে নিজেরাই স্বরাজ আহরণ করবে। কর্মপন্থাও প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে উঠবে। কোনো মতবাদকে আশ্রয় করে, তাঁর ধারণায় যুক্তিহীন আবেগের পথে স্বাধীনতা এলেও তা সাধারণের জীবনে সার্থক হবে না। গান্ধীজি কিন্তু তাঁর অহিংস মতবাদ পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন স্বরাজলাভের পথেই। এত বড় পরীক্ষার ক্ষেত্র ও এত বড় প্রতিষ্ঠা অন্য কোনো পথে পাওয়া যাবে না। পরস্পরে দেখা করলে ত' এর কোনো মীমাংসা হবে না। এ ছাড়া দু'জনের মধ্যে প্রকৃতির পার্থক্যে আর একটা বড় বাধা সৃষ্টি করেছিল। যুক্তি ও বিচারের পথই বিপিনচন্দ্রের একমাত্র জানা পথ ছিল—রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে ত বটেই, ধর্মজীবনেও। যুক্তির পথে তিনি খিলাফত ও স্বরাজ, চরকা ও স্বাধীনতা, বর্ণাশ্রমে নিষ্ঠা ও বর্ণবৈষম্যে ঘৃণা মেলাতে পারতেন না। এগুলির মিলন অলৌকিক পথেই হতে পারে, যেমন অলৌকিক পথে আপোষ ছাড়া এক বৎসরে স্বরাজ লাভের প্রতিশ্রুতি সম্ভব হ'তে পারে। স্বরাজের দু'টো পথ বিপিনচন্দ্র জানতেন—একটা বিপ্লবের পথ ও অবস্থার গতি অনুকূল হ'লে আর একটা আপোষ বা সোলেনামার পথ। কিন্তু জনতা যদি বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলে আর নেতৃত্ব যদি চলে আপোষের দিকে তাকিয়ে, তা'হলে যুক্তির বিচারে তা শুভ হয় না। এটা বলছি বিপিনচন্দ্র কি মনে করতেন ও কেন তিনি গান্ধীজির অহিংস অসহযোগের পথে স্বরাজের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি, যেমন স্বদেশী আন্দোলনে পড়েছিলেন। এর ভাল-মন্দ বিচার এ কাহিনীর বাহিরে পড়ে।

আমেদাবাদে একটা ছোট ঘটনায় মনটা বিষণ্ণ হয়। এক গরীব পল্লীতে বিপিনচন্দ্র নিমন্ত্রিত হ'ন। আম্বালাল সারাভাইয়েই এক মোটর তাঁকে সেখানে নিয়ে যায়। চালক কথায় ও ব্যবহারে জানিয়ে দেন এরকম পল্লীতে তাঁদের গাড়ী এই প্রথম এলো। অতিথির জন্য আভিজাত্য যেন ক্ষুণ্ণ হ'ল। অসহযোগ আন্দোলনে দেশের ধনী নির্ধন হবে, এটা মনে করিনি, কিন্তু ধনের মর্য্যাদা কমে যাবে বা থাকবে না এবং একটা সাম্যের আদর্শ এ প্রতিষ্ঠা করবে, এটা মনে হয়েছিল। ছোট হলেও কতকটা বিপরীত অভিজ্ঞতায় মনে দুঃখ হয়।

আমেদাবাদ থেকে যাই সুরাটে। সুরাট গুজরাটিদের নতুন শিল্পপীঠ নয়, মাঝারি বাণিজ্য-স্থান। পুরানো শহর, ইতিহাসের ওঠানামা একাধিক বার দেখেছে। এরকম পুরানো শহরে এসে একটা জিনিষ চোখে পড়ে। ইংরেজ আসার পর এরা যেন হঠাৎ আরো বুড়ো হয়ে গেছে—অর্থনৈতিক জীবনে এমনই ওলট-পালট ইংরেজ করেছে। বাহির থেকে অন্য রকম মনে হলেও সত্য কথাটা বোধ হয় এই যে আমাদের দেশের প্রাচীন সাধনা ও সংস্কৃতিই ইংরেজের আক্রমণে টিকে রইল—শুধু তা নয়, নতুন প্রাণতাতেও জেগে উঠল —আর বাস্তব জীবনের বাকী সব বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। সাধারণের এই অসহায় চেহারাটা যেমন চোখে পড়ে গ্রামে, তেমন ধরা যায় এরকম পুরানো শহরে এলেও।

বোধ হয় সুরাটেই এক সাধক কবি ও এক সাহিত্যিক বিপিনচন্দ্রের সঙ্গী হ'ন। এই সাধক কবির কণ্ঠে তাঁরই রচিত একটা গান বার বার কয়েকটি সভায় শুনি। 'দেহ দেউলমে দেব বিরাজে'। দেহ দেবালয়, দেবতা এখানেই বাস করেন। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে এরকম ঘোরাটা আমার মনে হয়েছে, কতকটা তীর্থভ্রমণের মত। দেখতে যাইনি ঘরবাড়ী শহর, পুরানো মঠ মন্দির বা স্থাপত্যের নিদর্শন; দেখতে যাইনি নিসর্গেরও শোভা। পুণ্যের লোভেও ঘুরি না, সে আশা নেই। কিন্তু ঘুরি মানুষ দেখার আশায়, জেগেছে যে মানুষ বা যে মানুষ জাগছে। আমাদের মত যুবকদের মনে তখন সেটাই সবচাইতে বড় আশা ছিল। গুজরাটি সাধক কবির গানে এ কথাটাই মনে করিয়ে দেয়—মানুষ বড়; তার দেহ হেয় নয়, দেবতা এখানেই থাকেন। বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার আরম্ভ বা শেষে এই গান তাঁর ভাষণের সঙ্গে একটা সঙ্গত করত। মানুষের কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন ভারতের সাধনার নানা ব্যাখ্যানের মাধ্যমে।

বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতামালার যাঁরা ব্যবস্থা করেছেন, তাঁরা তাঁকে ও আমাদের তুললেন এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে। দোতলায় একটা বড় ঘর, সবটা আয়নায় মোড়া। আমাদের দেশের ধনীদের এই এক খেয়াল—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আয়না সমস্ত ঘর জুড়ে—যেমন দেখেছি কলিকাতায় তেমন দেখি এই সুদূর সুরাটে। এটা বোধ হয় বৈঠকখানা ও নাচঘর একসঙ্গে। কিন্তু আমাদের দেবালয় সংলগ্ন

নাটমন্দিরে মনে যে ভাব জাগে, এরকম নাচঘরে তা জাগে না। নাটমন্দিরে দেবতা আর মানুষ যেন এক হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে চান—অন্ততঃ লক্ষ্যটা মনে হয় তাই। কিন্তু ধনীর এরকম নাচঘরে না দেখি দেবতাকে, না পাই মানুষকে।

গুজরাটি অবস্থাপন্ন গৃহস্থের জীবনযাত্রার একটা ছবি এখানে দেখতে পাই। এঁরা জলের শুচিতায় বড় বিশ্বাসী। প্রতি শোবার ঘরেও এক ধারে একটা করে জলের কল। তাতে জল সর্বদা হাতের কাছে পাওয়া যায়, কিন্তু জল বেরুবার নলের সঙ্গে বাড়ীর সব নলের যোগ থাকায় যে গন্ধ সর্বদা আসে তাকে সুগন্ধ বলা যায় না। মহারাষ্ট্রে ও বিশেষ করে গুজরাটে সব বাড়ীতে প্রায় দোলনা দেখেছি একটা করে। ধনীর বাড়ীর দোলনা একটা শোভার জিনিষও বটে; চকচকে পিতলের শিকলিও বাঁধা, বসবার জায়গা চওড়া সেগুন কাঠে তৈরী, সুন্দর পালিস করা, এত চওড়া যে শোয়াও যায়। এঁদের বাড়ীর সমস্ত বাসন দেখি রূপার—থালা, গেলাস, বাটি, রেকাব সব। রোজ এরা এতে খান কি না জানি না, কিন্তু মাঝারি ধরণের নিমন্ত্রণ ভোজেও সকলকে এতে একসঙ্গে খাওয়ান যায়।

সুরাটের টাউন হলে বিপিনচন্দ্র এক বক্তৃতা দেন, বক্তৃতা ইংরেজীতেই হয়। সভাগৃহ দোতলায়, একতলায় বোধ হয় পৌর সমিতির অপিস। সভা ভাঙবার পর সিঁড়ি দিয়ে জনতার সঙ্গে যখন নামছি তখন কানে গেল একজনের মন্তব্য—what a voice and what an address at this age! বিপিনচন্দ্র তখন সত্তরের উপর। বয়সের চাইতেও সারা জীবন-সংগ্রামে শরীর জরায় ঘিরেছে; খালি গায়ে দেখা যায় কি জীর্ণ দেহ এই বৃদ্ধ বিদ্রোহী পুরুষটির। কিন্তু মুখে জরার চিহ্ন দেখিনি। মনের ছাপ মুখে নাকি ফুটে ওঠে। মনে কি তা'হলে জরা পৌছয় নি? একটা আশা তাঁর জীবন ঘিরে ছিল শেষ দিন পর্য্যন্ত। এদেশের নবজাগরণ সার্থক হবে। কিছু দিন আগে লেখা তাঁর বাংলা আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসরে' তিনি বলেছেন—মৃতপ্রায় একটা জাতি নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠছে তা তিনি জীবনে দেখেছেন। এই নবজাগরণের সঙ্গে তাঁর জীবনকে তিনি মিশিয়ে দিয়েছিলেন। জরার কোন জায়গা এখানে নেই। তাই মনে হয়েছে জরা তাঁর দেহ অধিকার করলেও মনকে স্পর্শ করতে পারিনি। আর এই নবজাগরণের অমৃত কাহিনীই বিপিনচন্দ্র সুরাটের শিক্ষিত সাধারণের কাছে সেদিন সংক্ষেপে বলেছিলেন। এ অঞ্চলে এসে মনে হয়েছে মারাঠি ও গুজরাটি মেয়েদের মধ্যে কে বেশী সুন্দরী বলা শক্ত। একটা কারণ হতে পারে, আমি মেয়েদের রূপ বিচারে দক্ষ নই। আমার মন কিন্তু ঝোঁকে মারাঠি মেয়েদের দিকে। তাদের দীপ্তি যেন বেশী। মারাঠি মেয়েরা বেশী কর্মঠ, হাতে-পায়ের কাজে বটে, মাথার কাজেও বটে। কবির ভারত ললনা যখন ভাল করে জাগেন নি আমাদের মধ্যে, তখনও এক মারাঠি মেয়ে বিদ্যায় ও সাহসে আমাদের মনে যে বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন, তার স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি। নাম তাঁর রমা বাঈ। কতকটা বাঙ্গালী মেয়েদের মত গুজরাটি মেয়েরাও গঠনে ও প্রকৃতিতে কোমল। কমনীয়তায় গুজরাটি মেয়েদের স্থান মারাঠি মেয়েদের উপরে। রং-এ ও লাবণ্যেও গুজরাটি মেয়েদের রূপের মূল্য কমে না—অন্যদের তুলনায় বোধ হয় বেশী পড়ে। কিন্তু গঠনে ও শ্রীতে মারাঠি মেয়েরা বেশী মর্য্যাদার দাবী করতে পারেন। চারটা জিনিষ আমরা মেয়েদের রূপবিচারে সাধারণত দেখি। প্রথম রং, এটা কিন্তু সব নীচে। তার উপরে গঠন; গঠনের রূপ স্থায়ী হয় শ্রমশীল কাজে। তার উপরে লাবণ্য। প্রাচীন সংস্কৃতে লাবণ্যের এক সংজ্ঞা আছে। আসল মুক্তাতে চাঁদের কিরণ পড়লে যে ঢল ঢল আভা বাহির হয়, তাকে পণ্ডিতেরা লাবণ্য বলেছেন। লাবণ্যের উপরে বা সবার উপরে শ্রী। লাবণ্য আপনি হয়, শ্রী অর্জন করতে হয়। মেয়ের মুখের লাবণ্য আমরা বলি, কথার বলি শ্রী। শ্রী কর্মদক্ষতায় ফোটে। মারাঠি মেয়েদের মধ্যে শ্রীর যে প্রাচুর্য্য বা প্রস্ফুট রূপ দেখেছি ভারতের অন্যত্র তা দেখিনি। এক অপূর্ব শ্রীর পরিবেশে কিন্তু গুজরাটি মেয়েদের এক অনুষ্ঠান এখানেই দেখেছিলাম। স্কুলের মেয়েদের এক উৎসব। যতটা মনে আছে বিপিনচন্দ্র বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হয়েছেন বা তাঁর জন্যই এ উৎসবের আয়োজন। মেয়েরা তাদের বিশিষ্ট অতিথিকে গর্বা নাচ দেখাল। মুগ্ধ হয়েছিলাম দেখে। এর আগে ভারতের আর এক প্রান্তে একবার মণিপুরী নৃত্য দেখেছিলাম, তখনও মুগ্ধ হয়েছিলাম। গর্বা গুজরাটি লোকনৃত্য মণিপুরী নৃত্যও তাই। ভারতের সংস্কৃতিতে সাধারণের দান যেখানে বেশী, বৈচিত্র্যও ফুটেছে সেখানেই। সাংসারিক জীবনে এত দুঃখ ও দৈন্যের মাঝেও দেশের সাধারণ আনন্দের এত বড় সম্পদ কি করে বাঁচিয়ে রেখেছেন ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়।

সুরাট থেকে ব্রোচ হয়ে আমরা ভাওনগরে যাই। ভাওনগর দেশীয় রাজ্য, আমরা রাজ-অতিথি। প্রভাশঙ্কর পাটানি তখন ভাওনগরের প্রধান মন্ত্রী। সমস্ত কাথিয়ার রাজ্যগুলিতে তাঁর অপরিসীম প্রভাব। তাঁরই আগ্রহে কাথিয়ার রাজ্যগুলিতে বিপিনচন্দ্রের সাংস্কৃতিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হয়। দেশীয় রাজ্যে রাজনীতিকের প্রবেশ নিষেধ। এমন কি কোচবিহার প্রমুখ বাংলার ছোট দেশীয় রাজ্যেও বিপিনচন্দ্র রাজনৈতিক কোনো কাজে গিয়েছেন বলে জানি না। কেশবচন্দ্রের দুই কন্যার সঙ্গে দুই দেশীয় রাজার বিবাহ হয়। তার পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এঁদের একটা যোগও স্থাপিত হয়, কিন্তু এ সম্পূর্ণ ধর্মের ক্ষেত্রে। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার আদর্শ থেকেও এ সময় অনেকটা সরে গেছে। তাঁর 'নববিধান' যুগের প্রয়োজনে প্রধানতঃ এক ধর্মসমন্বয়ের আন্দোলনে রূপ নেয়। দেশীয় রাজ্যে বিপিনচন্দ্রের এই প্রথম প্রবেশ—তাও অবশ্য কোনো রাষ্ট্রীয় কর্মে নয়।

কাথিয়াবে অনেকগুলি মাঝারি ও ছোট রাজ্য। টুকরা টুকরা ও ছোট ছোট এদেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রজা-সাধারণের ভালোর জন্য বিশেষ কিছু করা সম্ভবই হয় না। বড় দেশীয় রাজ্যে মন্ত্রী যদি কর্মী হন ও তাঁর মনে যদি কোন উঁচু আদর্শ জেগে থাকে ত প্রজার ভালোর জন্য তিনি কিছু করতে পারেন। বরোদায়, ত্রিবাঙ্কুরে, মহীশূরে, হায়দ্রাবাদে প্রজাহিতকর্মের কিছু কথা তাই আমরা শুনতে পাই। কিন্তু প্রজা-জাগরণ নয়। ইংরেজ তা কিছুতে হতে দেবে না। তা সত্ত্বেও রমেশ দত্ত প্রমুখ বরোদায় বা টি, মাধব রাও প্রভৃতি দক্ষিণে প্রজার ভালোর জন্য যা করতে পেরেছিলেন, অনেকগুলি ছোট বা মাঝারি রাজ্য কাথিয়ারে ছিল বলে প্রভাশঙ্কর পাটানি তা পারেন নি। বরোদার একটা তালুক আমরেলিতে জনশিক্ষায় যে সার্থক সূচনা দেখেছিলাম সমগ্র কাথিয়ারে তা দেখিনি।

ভাওনগরে উঠলুম আমরা রাজার অতিথি-ভবনে। দোতালা বাংলো বাড়ী, পুরো বিলাতী ধরণে সাজান। প্রভাশঙ্কর পাটানি

তখন ভাওনগরে ছিলেন না। আগে থেকে সব নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তাই কোনো অসুবিধা হয়নি। ভাওনগরে ছেলেদের একটা কলেজ আছে। সেখানেই ক'দিন বক্তৃতা হয়। তেমন কোনো উৎসাহ দেখেছিলাম বলে মনে নেই। দেশীয় রাজ্যের যে ছবি ক্রমে কাথিয়াবের অন্য রাজ্যগুলিতে ঘুরে চোখের সামনে খুলে যায়, তাতে নতুন জীবনের কথা, স্বাধীনতার উন্মেষের কথা রাষ্ট্রে না হোক, ধর্মে ও সমাজে—এখানে যে উৎসাহের সঞ্চার করবে না এটা স্বাভাবিক বলে মনে হলো। পৃথিবীর এগিয়ে চলার দেশের তুলনায় ভারত প্রাণতায় পিছিয়ে, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পূর্ণ প্রাণহীন। পরাধীনতা সত্ত্বেও দুনিয়ার জীবনস্রোতের সঙ্গে ভারতের যোগ স্থাপিত হওয়ায়, আর বিদেশী হলেও একই শাসনশৃঙ্খলে সবাই বাঁধা পড়ায় কমবেশী পরিমাণে নবজাগরণের যে সূচনা ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে সম্ভব হয়েছিল, তার ক্ষীণ আলোও দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করেনি। এর পরিচয় ভালো করে পাই যখন মাভি রাজ্যে যাই। বিরাট রাজবাড়ীর এক অংশে রাজ-অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থা। আতিথ্যের ত্রুটি দূরে থাক, আতিশয্যই চোখে পড়ে। সম্বর্দ্ধনার পালা শেষ হ'লে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম, রাজ্য ত ছোট নয়, বড় বা বেশী বিদ্যালয় নেই কেন? মন্ত্রী উত্তর দিলেন—পড়বে কে? সাধারণের শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করে তাদের মনকে এদিকে টেনে আনা যে রাজ্য-সরকারের কর্তব্য, এ বোধ এঁদের আছে বলে মনে হলো না। প্রকাণ্ড প্রাসাদের সর্বত্র রাত্রে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। শহরে বিজলী নেই, আছে কেবল প্রাসাদের জন্য। আর এই আলোই এই রাজ্যে একমাত্র আলো, বাকী সব অন্ধকার—যেমন মনের ভিতরে তেমন বাহিরে। প্রাসাদের মাঝখানে বাঁধান উঠানে এক বিকালে সভা হ'ল। বিপিনচন্দ্র জনতাকে কিছু বললেন হিন্দিতে—কি বললেন মনে নেই, কিন্তু সভার নিথর নিষ্প্রাণ চেহারা আজও মনে আছে। কোনো নতুন কথা যে এই জনতার কাছে আগে পৌঁছেচে তা মনে হলো না।

রাজ-আতিথ্যের আতিশয্যে এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। ভাওনগরে আসবার মুখে আমাদের ব্যবস্থাপক বন্ধু বিপিনচন্দ্রের জন্য এক অস্থায়ী পরিচারক বরাদ্দ করলেন। পরিচারক-হীন রাজ-অতিথি বোধ হয় সম্ভ্রমের দিক থেকে কিছু বে-মানান হয়, তাঁর মনে হ'ল। এই সব রাজ্যে সম্মানিত অতিথির সম্বর্দ্ধনায় এক ধারা আছে। প্রধান অতিথির সামনে রূপোর বড় থালায় সুপারি ইত্যাদির সঙ্গে ১০১৲ টাকা ধরা হয়; সঙ্গে তিলক-চন্দন কপালে পরিয়ে দেওয়া হয়। প্রধান অতিথির সঙ্গীদের প্রত্যেকের জন্য এই ভাবে ৫১৲ টাকা দেওয়া হয়, আর পরিচারকদের দেওয়া হয় ১১৲ টাকা করে। আমাদের এই অস্থায়ী পরিচারকটিও ৮৷১০ দিনে ৪টি রাজ্যে এভাবে ৪৪৲ টাকা মত পারিতোষিক লাভ করে। তার একান্ত আগ্রহ তখন বিপিনচন্দ্রের সে স্থায়ী পরিচারক হয়! সে হয়ত ভাবলো বিপিনচন্দ্র জগদ্গুরুর মত কেউ হবেন—যেখানে যাবেন সেখানে প্রণামী, আর তাঁর পরিচারকের পুরস্কার। অনেক কষ্টে তাকে বোঝাই যে বাবার কপালে টাকা পাওয়া আর এভাবে একটা নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার মাত্র।

মভি থেকে যাই পোরবন্দর রাজ্যে। ইংরেজ দেশীয় রাজ্যগুলিকে সমবেত বা সংহত চেষ্টায় কোনো কাজের সুযোগ কখনো দিতে চায়নি। পাশাপাশি যে সব রাজ্য তারাও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। একজনের রেল-ব্যবস্থা কেবল তারই, অন্যজনের পৃথক আয়োজন। এতে সময়ের ও অর্থের যে অযথা অপচয় হয়, তা পোরবন্দর আসার পথে বুঝতে পারি। এক রাজ্যের সীমা যেই শেষ হ'ল, অমনি ইঞ্জিন গেল বদলে, লোকজনও সব হ'ল আলাদা। এ ইঞ্জিন খুলে তার রাজ্যে রয়ে গেলো, অন্য রাজ্যের ইঞ্জিন হ'ল জোড়া, তার লোক-লস্কর এসে রেলের নিল ভার, তবে রেল ফের ছাড়লো। আবার পট-পরিবর্তন কয়েক মাইল গিয়ে যেমন ঐ রাজ্যের সীমানায় এসে পৌঁছান গেলো। বাবার জন্য একটা গাড়ী এঁরা আলাদা করে দিয়েছিলেন, আমাদের গাড়ী থেকে নামতে হয়নি। কিন্তু সারা রাত ইঞ্জিনের বাঁশি এত শুনেছি যে কলিকাতা থেকে বোম্বাই প্রায় হাজার মাইলের মধ্যেও তা শুনিনি। সকালে পৌঁছলাম পোরবন্দরে। রাজা নিজে এসেছেন তাঁর গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে। মানুষটি নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড়; বিলাতে একবার ভারতীয় ক্রিকেট-দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। খেলাধূলায় মানুষ বলে মানুষটি বেশ স্বাভাবিক। গান্ধীজির জন্ম পোরবন্দরেই। পথে যেতে আমাদের সেই ঐতিহাসিক গৃহখানি দেখালেন। সমুদ্রের একেবারে উপরেই রাজার নতুন প্রাসাদ! অতিথি-ভবনও সমুদ্রেরই তীরে। অতিথি-ভবনে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। রাজা ও তাঁর সঙ্গী (A-D-C) দুপুরের আহার আমাদের এক সঙ্গে খেতে এলেন। এখানে বিলাসের এক নতুন রূপ দেখলাম। সমুদ্রের লোণা নীল জল পাইপ করে অতিথি-ভবনের স্নানাগারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রকাণ্ড সাদা পোর্সিলেনের চৌবাচ্ছায় তা ধরা হয়, আর তাতেই সমুদ্রে না গিয়ে সমুদ্র-স্নান সম্ভব হয়। অবশ্য এ বিলাস বিপিনচন্দ্রের মত অতিথির জন্য নয়, রাজা-রাজড়া ও তাদেরও উপরে লাট-বেলাটদের জন্য বিলাস ও বিচ্ছিন্নতায় ছোট বড় মাঝারি রাজন্যদের যে সমস্ত শক্তি হরণ করে নেওয়া যায় আস্তে আস্তে ও একরকম তাদের অজান্তে, কাথিয়াবে এ সব রাজ্যে এসে তার সমস্ত ছবিটা চোখের উপর পরিষ্কার হয়ে গেল। ভেদ প্রাচীন কাল থেকে কূট রাজনীতির একটা অঙ্গ। তার সঙ্গে বিলাস যোগ করে ইংরেজ এদেশের রাজাদের পরাধীনতার শিকলে ভাল করে বেঁধেছে।

এঁদের কোনো শক্তি নেই, ইংরেজ প্রভুশক্তির এঁরা ক্ষীণ ছায়া মাত্র, করুণও বটে। কোনো উঁচু আকাঙ্ক্ষা এঁদের মধ্যে জাগবার সম্ভাবনায় ইংরেজ ভয় পায়। ভোগের উপকরণের তাই এত ব্যবস্থা; আর এ সেই ভোগ যার দ্বারা, আমাদের উপনিষদ বলেছেন, ইন্দ্রিয়ের ও মনের তেজ দ্রুত জীর্ণ হয়। এসকল রাজ্যে সাধারণের চেষ্টায় তৈরী কোনো প্রতিষ্ঠান দেখিনি, সাধারণের জন্যও কিছু দেখিনি কয়েকটি বিদ্যালয় ও দেবালয় ছাড়া। পোরবন্দরের এক মন্দিরের আঙিনাতেই এক সকালে বিপিনচন্দ্র এক সভায় কিছু বললেন, রাজাই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। পোরবন্দর থেকে রাজকোট হয়ে আমরা বম্বে ফিরে এলাম।

বিপিনচন্দ্র তাঁর জীবনের সন্ধ্যায় এই দীর্ঘ ভ্রমণে যে কথা নানাভাবে বিভিন্ন জায়গায় শোনালেন, তা কি পুরো সার্থকতা পেল, একথা মনে হয়েছে। যে নতুন আদর্শ সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, তার স্রোত নানা কারণে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই।

স্বদেশীর উচ্ছ্বসিত প্রবাহে নবজাগরণের স্পন্দন আমাদের জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গে যে সাড়া জাগিয়েছিল, তাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের তিক্ততা বেড়েছে, পূর্বে যা কখনো হয়নি এমন ভাবে সাধারণের মধ্যে এই তিক্ততা ছড়িয়েও পড়েছে। কিন্তু সমস্ত মনে-প্রাণে জীবনে কি জনতা জেগে উঠেছে? না জেগে ওঠার পথে চলেছে? স্বাধীনতার সংগ্রাম কি জাতিবৈরেই রূপ নেবে, না নব জীবনে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করবে? এসকল কথা মনে হয়েছে, ঠিক উত্তর পাইনি।

ভাওনগরে একটা ছোট ঘটনায় মনটা মুষড়ে যায়। আমরা ইদানীংয়ের ভাষায় যাদের হরিজন বলি, তাদেরই এক পল্লীতে বিপিনচন্দ্র আমন্ত্রিত হয়ে এক সকালে যান। আমরাও সঙ্গে। এক গেলাস জল চাইলাম খাব বলে। জল দিলেন না তাঁরা, দেখিয়ে দিলেন কাছের এক কূয়ো। জলই যখন জোর করে তাঁদের হাত থেকে নিলুম, বিস্ময় যেন তখনো তাঁদের যায়নি। বাবার সঙ্গে যে গুজরাটি সাহিত্যিকটি ছিলেন তিনি আবার ব্রাহ্মণ। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, অসোয়াস্তির ভাব, যদি তাঁকেও জল দিতে চান এঁরা খেতে! মনে হ'ল নতুন নামে আমরা এঁদের ডাকতে আরম্ভ করেছি। বলি এখন হরিজন; কিন্তু মনের শুচিতা এসেছে কি? নয় তো এঁরা কাছে আসেন না কেন? আমাদেরকে আপনার জন ভেবে? সাধারণ মানুষের কথা আমরা বলি। এযুগ তাদেরই জয়যাত্রার যুগ, অন্ততঃ এগিয়ে চলা অন্যদেশে। তাই সাধারণের জন্যই ত আমাদের দেশেরও মুক্তির সংগ্রাম। স্বাধীনতাতে ত তাদেরই প্রতিষ্ঠা করবে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বার বার মনে দ্বিধা জেগেছে, ঠিক পথে চলেছি ত? এটা বলছি স্বাধীনতা লাভের যোল বছর আগেকার ভাবনা, ১৯৩০ সালে। আজ স্বাধীনতা লাভের দশ বছর পরে সেই ভাবনা ভয় হয়ে যেন আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরেছে। সাধারণ মানুষ, মনে হয়, তার প্রতিষ্ঠা পায়নি, পাবার রাস্তাতেও সে পৌঁছয়নি। সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে যে গান শুনেছিলাম—দেহ দেবালয় আর সত্যিকার দেবতা সেখানেই বাস করেন, এ বোধ উজ্জ্বল হওয়া দূরে থাক, ক্রমে যেন স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। এ বোধ যদি সজীব হয়ে জেগে উঠত, তা'হলে কি স্থির হয়ে দেখতে পারতাম এখনো সাধারণ মানুষের এত লাঞ্ছনা? কিছু না করে কি থাকতে পারতাম—দেখো, এত সুকুমার জীবন ফোটবার আগেই অবজ্ঞায় ও অবহেলায় ঝরে পড়ছে, রাস্তায় ঘাটে, বস্তিতে, 'ক্যাম্পে'। আমাদের কল্পনায় বঙ্গে অশরীরী আত্মা অতৃপ্ত থাকলে ঘুরে বেড়ায়। কোনো বাণীও যদি জীবনে প্রতিফলিত না হয়, তাও বোধ হয় বার বার মনকে দোলা দেয়। এই ভাবেই মনে হয় প্রায় ত্রিশ বছর আগে শোনা ভারতের নবজাগরণ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্রের নানা ভাষণের স্মৃতি ও গুজরাটি সাধক কবির গান— 'দেহ দেউলমে দেব বিরাজে' আমার মনে আজও মধ্যে মধ্যে জাগে।

জাহাঙ্গীরের মদিরা-আসক্তি

পারসীতে লিখিত "ওয়াকিয়াত-ই জাহাঙ্গীরি" বলিয়া একখানি গ্রন্থ আছে। জনপ্রবাদ এইরূপ যে, স্বয়ং জাহাঙ্গীর সাত পুস্তকের অনেক অংশ লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তক জাহাঙ্গীরের নিজের "রোজনামচার" মত। তাঁহার দৈনিক জীবনের অনেক গোপনীয় রহস্য ইহার মধ্যে গুপ্ত ভাবে সন্নিহিত আছে।···জাহাঙ্গীর নিজে কতকগুলি আইন করিয়া সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন অথচ নিজে সর্ব্বপ্রধান আইন-লঙ্ঘনকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের প্রচলিত 'বিধিগুলির' এক স্থানে লিখিয়াছেন:

"মহম্মদীয় শাস্ত্রমতে সুরা মুসলমানের অব্যবহার্য্য, বিশেষতঃ যে কোন দ্রব্য হউক না কেন, যাহাতে মত্ততা উৎপাদন করে, তাহা মুসলমানের ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আমি রাজ্যমধ্যে যদিও এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলাম, তত্রাপি আমি ইহার ব্যবহার ভুলি নাই। আমার বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর, সেই সময়ে আমি প্রথম মদিরাপান আরম্ভ করি। তাহার পর কুড়ি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—এখনও তদ্রূপ চলিতেছে। প্রথম প্রথম যখন আমি সুরাপান আরম্ভ করি, তখন পনর হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ি পেয়ালা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন-রাতের মধ্যে নিঃশেষ করিয়াছি। যখন আমার শরীর মাটি হইতে আরম্ভ হইল, আমি যখন ইহার প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিলাম, তখন কাজেই পেয়ালার সংখ্যা কমাইতে হইল। এই অবস্থায় আমি ছয়-সাত পেয়ালা পান করিতাম। এই সময় আমার মদিরাপানের কোন বিশেষ নির্দ্ধারিত সময় ছিল না। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে যখন ইচ্ছা হইত খাইতাম। কিন্তু ত্রিশ বৎসরের পর আমাকে সময়ের বাঁধাবাঁধি করিতে হইল। তখন আমি কেবলমাত্র রাত্রিতে মদিরাপান করিতাম। পরিপাক-শক্তির উত্তেজনাই এই সময়ে আমার সুরাপানের প্রধান লক্ষ্য ছিল।"

জাহাঙ্গীর নিজে মদিরাপান করিয়াই যে নিশ্চিন্ত থাকিতেন তাহা নহে—রাজপুত্রগণেরও পরকাল খাইবার চেষ্টা দেখিতেন। পিতা হইয়া পুত্রকে মদিরোৎসবে মত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। পুত্রও উপযুক্ত পিতার সম্মান রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। জাহাঙ্গীর বাদশাহ 'ওয়াকিয়াত'-এর এক স্থলে লিখিয়াছেন:

"আজ মাসের পঁচিশে। এই দিন বড় আনন্দের। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ খরমের (পরে সাজাহান) বাৎসরিক তুলার দিন। আমার পুত্রের বয়স এখন চব্বিশ বৎসর। তাহার বিবাহ দিয়াছি এবং কুমারের সন্তানাদিও হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যুবরাজ মদিরাপানে অভ্যস্ত হন নাই। আজ আমি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম, বৎস! তুমি ছেলেপুলের বাপ হইয়াছ—সম্রাট ও তাঁহার পুত্রগণ মদিরাপান করিয়া থাকেন। আজ আমোদের দিন; তোমার সহিত আমি আজ একত্রে মদ্যপান করিব। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি—নওরোজের দিন, উৎসবের দিন তুমি পরিমিতভাবে মদ্যপান করিও। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখিও, জ্ঞানীরা অতিরিক্ত পানে বুদ্ধি কলুষিত করেন না। প্রকৃতপক্ষে মদ্যপানের উপকারের ভাগই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।"

মদিরায় তাঁহার নিজের কিরূপে প্রথম দীক্ষা হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই:

"আমার বয়ঃক্রম যখন চতুর্দ্দশ বৎসর তখন আমি মদিরার আস্বাদ কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। অতি শৈশবে রোগের চিকিৎসা-স্বরূপে

আমার মাতা ঠাকুরাণী বা ধাত্রী কখনও কখনও আমাকে একটু মদিরা পান করাইয়া দিতেন। এক সময় আমার ভয়ানক সর্দ্দি কাশি হইয়াছিল। তখন আমি বালকমাত্র। এই সময় বাবা একদিন আমাকে এক তোলা আরক এক কাঁচ্চা আন্দাজ গোলাপজলে মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর যখন আমার পিতা ইউসফজিদিগের বিদ্রোহ দমনে গিয়াছিলেন, তখন আমি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। একদিন যুদ্ধের অবকাশে আমরা পিতা-পুত্রে দলবল লইয়া শিকার করিতে গিয়াছিলাম। শিকারে শ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় নীলাব (সিন্ধু) নদীতীরে আমাদের ছাউনীতে ফিরিয়া আসিলাম। শরীর এত অবসন্ন যে কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। এই সময় আমার এক ভৃঙ্গার-বাহক আমার অবসন্ন অবস্থা দেখিয়া বলিল, 'জাঁহাপনা! বলিতে সাহস হয় না—যদি অল্পমাত্র মদিরা সেবন করেন তবে এখনই ক্লান্তি দূর হইয়া যায়।' চিকিৎসক হাকিম আলির শিবিরে তৎক্ষণাৎ কোন প্রকার উত্তেজক পানীয়ের জন্য আমি লোক পাঠাইলাম। সে আমাকে আন্দাজ দেড় পেয়ালা পীতবর্ণের এক প্রকার সুস্বাদু মদ্য একটি বোতলে করিয়া আনিয়া দিল। আমি মদিরাপাত্র শেষ করিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিলাম।

"সেই দিন হইতে আমার রীতিমত দীক্ষা আরম্ভ হইল। ইহার পর আমি দিন দিন মাত্রা বাড়াইতে লাগিলাম। আমি কেবলমাত্র আঙুরের মদিরা খাইতাম। কিন্তু তাহার কুফল শীঘ্র প্রকাশ হওয়ায় 'আরক' পানে মনোনিবেশ করিলাম। এই সময়ে আমি একজন পাকা মদ্যপায়ী হইয়া উঠিলাম। নয় বৎসর মধ্যে আমার পেয়ালা-সংখ্যা কুড়িতে উঠিয়াছে—ইহার মধ্যে চৌদ্দটি আমি দিনের বেলা ব্যবহার করিতাম, আর রাত্রের জন্য ছয়টি থাকিত। হিন্দুস্থানের মান অনুসারে এই কয় পেয়ালা মদিরার ওজন ছয় সের। এই সময়ে মদের সঙ্গে একটি মোরগের কাবাব এক রুটি খাইতাম। কিন্তু ইহার পরিণাম—শোচনীয় পরিণাম শীঘ্রই আমার শরীরে আবির্ভূত হইল। কেহ সাহস করিয়া আমাকে কিছু বলিতে পারিত না; কিন্তু এই সময়ে আমার দুর্দ্দশা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে আমি নিজ হাতে অনেক সময় পেয়ালা ধরিতে পারিতাম না—আমার হাত কাঁপিত, আর অপরে পেয়ালা ধরিয়া আমাকে পান করাইয়া দিত।"

• • • •

জাহাঙ্গীরের নিজের লিখিত বিবরণ ত এইরূপ। তাঁহার পরবর্তী ও সমসাময়িক অন্যান্য বিদেশীয় লেখকদিগের লিখিত বিবরণ হইতে এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংলণ্ডাধিপ জেম্‌সের রাজসভা হইতে স্যর টমাস রো দূতরূপে আগ্রায় আসেন। তিনি তাঁহার লিখিত বিবরণের এক স্থানে লিখিয়াছেন: "চারি কিম্বা পাঁচ বাক্স রক্তবর্ণ মদিরা সম্রাটকে উপহার দিলে 'চিপ সাইডের' মণি-মুক্তাদির অপেক্ষাও তাঁহার ও কুমারদের নিকট তাহা আদরণীয় হইবে।"

আর এক জন ভ্রমণকারী একস্থলে লিখিয়াছেন: "জাহাঙ্গীর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি যে অনুরাগ দেখাইতেন—তাহা তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা-জনিত নহে। খৃষ্টান-ধর্ম্মে মদ্যপান সম্বন্ধে যেরূপ সুবিধাকর ব্যবস্থা আছে কেবল তাহারই জন্য তিনি তাহাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিতেন।"

রাত্রিকালেই পূর্ণতেজে মদিরোৎসব চলিত। আগ্রায় যত ইউরোপীয় (ইহাদের মধ্যে পর্টুগীজের দলই বেশী) তাহাদের সকলেরই বাদশাহের গুপ্তগৃহে সন্ধ্যার পর মদিরাপানের নিমন্ত্রণ হইত। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পান ও নৃত্য-গীতাদি চলিত। কখনও কখনও প্রভাতকালেও ইহার বিরাম হইত না। মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া বাদশাহ যখন ঢলিয়া পড়িতেন, তখন আলোকমালা নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন।

"যেদিন গোঁড়া মুসলমানেরা উপবাস করিতেন, সেদিন জাহাঙ্গীর বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহার পান-গৃহের কাছে দুইটা ভয়ানক চিতা বাঘ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকিত। তিনি ইহাদিগকে সেই বাঘের মুখে ফেলিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া উপবাসব্রত-ভঙ্গ করাইতেন। অবশেষে প্রাণের ভয়ে তাহারাও সুরায় উন্মত্ত হইয়া উঠিত।"—যুদ্ধক্ষেত্রেও এই মদিরাস্রোতের বিরাম ছিল না। ঘোরতর রণ-কোলাহলের মধ্যে, জয়-পরাজয়ের মধ্যে যে সময় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা চিত্তবল সঞ্চয় করিতেন, জাহাঙ্গীর সেই সময় মদিরায় দৈহিক উত্তেজনা বাড়াইতেন।

Gladwin সাহেব তাঁহার লিখিত জাহাঙ্গীরের রাজত্ব বিবরণের এক স্থানে লিখিয়াছেন: "খুব যুদ্ধ চলিয়াছে—শত্রুপক্ষ যেন একটু প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে। হয়ত তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে মোগলের রক্তবর্ণ পতাকা ভূলুণ্ঠিত করিতেও পারে, এমন সঙ্কটময় সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষ মোকারেব খাঁ বাদশাহের সঙ্গে যোগ দিলেন। রাজপুতের তীক্ষ্ণ বর্শা আসিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করিল। মোকারেবকে আর হাতীর উপর উঠিতে হইল না। এই সময়ে কিদ্‌মিত্‌ পিরিষ্ট জাহাঙ্গীরের পেয়ালা-বাহক পানপাত্র ও মদিরা লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। বাদশাহ হাওদার উপর বসিয়া মদিরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। মোকারেবকেও উত্তেজিত করা হইল।"

নুরজাহানের পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও জাহাঙ্গীর মদিরা সেবন করিতেন। পরিশেষে যদিও রাজ্ঞী সম্রাটের এই দোষ অনেক পরিমাণে সংশোধিত করিয়াছিলেন এবং জাহাঙ্গীর নিজমুখেও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তত্রাচ বিপদের অবস্থাতে তাঁহার মদিরাসক্তি প্রবলভাব ধারণ করিত। যখন মহাব্বত খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিয়া নিজ শিবিরে লইয়া যান, তখন একদিন মহাব্বত তাঁহার বন্দি-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, স্বর্ণমণ্ডিত খট্টা ছাড়িয়া জাহাঙ্গীর বিমর্ষভাবে নীচে মখমলের উপর শুইয়া পড়িয়াছেন। বাদশাহের এই বিরস ও শোচনীয় ভাব দেখিয়া মহাব্বতের হৃদয় আর্দ্র হইল—তিনি সসম্মানে কহিলেন, "জাঁহাপনা! আপনার সন্তোষের জন্য আমি কি কার্য্য করিতে পারি আদেশ করুন?" জাহাঙ্গীর মহাব্বতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "যদি আমাকে প্রফুল্ল দেখিতে চাও, তবে কয়েক পাত্র মদিরা দাও ও সুলতানাকে আনিয়া দাও।" মহাব্বত বিনম্রভাবে উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা! এই দুইটির একটিও আমার দ্বারা হইবে না। প্রথমটি দিব না—কেন না তাহা আমাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। সুলতানাকেও আনিতে পারিব না—কারণ এ পর্য্যন্ত আমি চেষ্টা করিয়া আপনাকে যেরূপ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছি, সেই বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী এখানে আসিলেই তাহা বিফল হইয়া যাইবে।"—সাধনা—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম ভাগ ১২৯৯-১৩০০)।

এক মুঠো আকাশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

কেষ্ট দাঁড়িয়ে থেকেই নম্বর। ভদ্রলোক বসতে বলেন। কেষ্টর সেদিকে খেয়াল নেই, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সে যেন টেলিফোন করছে, হ্যালো, হ্যাঁ, অমলা সুতোর কল, শুনুন আমি মনোহর দাস কথা বলছি, আপনাদের পাশের ঘরে আমি থাকি। আজ্ঞে হাঁ, আমার ছেলে, কেমন আছে? একটু দয়া করে খবর নিয়ে বললে ভাল হয়। কিছুক্ষণ কেষ্ট চুপ করে থাকে। ও-পাশের কথা শুনে যেন বলে, হ্যাঁ বলুন, একশ' চার ডিগ্রী? আমায় খুঁজছে, বলুন আমি যাচ্ছি এক্ষুণি। টেলিফোন কেটে দিয়ে কেষ্ট ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে। চোখে জল ভরে আসে, এক গ্লাস জল খাওয়াবেন? ভদ্রলোক বেয়ারাকে জল আনতে বলে নিজে থেকেই প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে?

—ছেলেটার জ্বর। ক'দিনই একশ' চার-পাঁচ ডিগ্রী উঠছে। আজ একেবারে নেতিয়ে পড়েছে—

—ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?

—হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। গরীবদের ওরা দেখে না। বলে কেবিনে রাখুন, সে সামর্থ্য কোথায়? পাড়াতেও একজন ডাক্তারকে দেখিয়েছি উনি বলেন একজন স্পেশালিষ্ট-এর কাছে নিয়ে যেতে, ষোল টাকা ভিজিট, কোথায় পাব অত টাকা?

বেয়ারা জল নিয়ে আসে। ভদ্রলোক বলেন, জল খান।

কেষ্ট ঢক-ঢক করে সব জলটা খেয়ে ফেলে। উঠি, দাঁড়িয়ে বলে, যাই, সে বাড়ীতে একলা পড়ে আছে।

—একলা কেন, ছেলের মা?

কেষ্টর চোখ সজল হয়ে ওঠে, সে তো দু'বছর হল টি-বি-তে—একটু থেমে বলে, ছেলেটা গেলে জানি না কি নিয়ে বাঁচবো!

ভদ্রলোকের মনটা কেমন করে ওঠে; নিজের ছেলেটিও ক'দিন থেকে জ্বরে ভুগছে। তার কথা মনে পড়তেই বলেন, আমি আপনার ডাক্তারের ভিজিট দিচ্ছি, এই নিন ষোল টাকা।

কেষ্ট কেঁদে ফেলে, আপনি আমায় বাঁচালেন, এ কথা আমি কখনও ভুলব না স্যার!

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন, দেরী করবেন না, শীগগিরি ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন।

কেষ্ট নমস্কার করে বেরিয়ে আসে।

অনেক রকম পদ্ধতি কেষ্ট সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক করেছে। তার জন্যে একটা ব্যাগ-ভর্তি নানারকম উপকরণ, যা তার প্রায়ই কাজে লাগে। তারই মধ্যে থেকে একদিন একটা ছবি বার করে গৌরী জিজ্ঞেস করেছিলো, এটা কার ছবি?

—ও এক বড়লোকের বউ-এর। কাঁধ দিতে গিয়েছিলাম, শ্মশানে তোলা ছবি।

গৌরী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, বেশ দেখতে বৌটি, একমাথা সিঁদুর। কি হয়েছিল?

—জানি না।

—বয়স কত?

—তা-ও জানি না।

গৌরী আজ-কাল আর কেষ্টর কথা বিশ্বাস করে না। ভাবে, হয়ত কেষ্ট সবই জানে, বলতে চাইছে না। কেষ্ট কিন্তু সত্যিই জানতো না কাঁধ দেওয়ার জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, অত খোঁজে ওর দরকার কি? যার বৌ, তিনি খুব ঘটা করে পুড়িয়েছিলেন। অনেক ছবি তোলা হয় শ্মশানঘাটে। একটা ছবিতে কেষ্ট মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, উঠেছিল ভাল। শ্রাদ্ধের দিন খেতে গিয়ে ওই ছবিটা চেয়ে রেখেছিল।

গৌরী হঠাৎ বলে, এমন লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ভদ্রলোক বোধ হয়—

—কিছুই না। পরের বছরই আবার বিয়ে করেছিলেন।

কেষ্ট অবশ্য ছবিটা কাছে রেখেছে অন্য কারণে। এই ছবি দেখিয়ে অনেক টাকা রোজগার করেছে। একদফা স্ত্রীর অসুখ বলে টাকা এনেছে, তারপর স্ত্রী মারা গেছে বলে এই ছবি দেখিয়ে।

কেষ্ট এসে আগুনা'র চায়ের দোকানে ঢোকে। আজ-কাল আবার আগের মত কেষ্ট সকালে বা বিকেলে প্রায়ই এখানে চায়ের কাপ নিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়। পুজো এসে গেছে, পাড়ার ছেলেরা বারোয়ারীর ব্যবস্থা করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। সত্যেন বলে, এবার আমাদের পুজো সব চেয়ে ভাল হওয়া চাই, প্রতিমা হবে একেবারে হালফ্যাসানের।

—কি রকম?

—যাকে বলে 'অলট্রামডার্ন'। ফিল্ম-স্টারের মত চেহারা হবে—

—বলিস কি, বুড়োরা চেঁচামিচি করবে যে—

—দূর দূর, মুখে বলবে। খুসী হবে ওরাই সবচেয়ে বেশী।

ভোঁতন কথার মোড় ঘোরায়, মনে নেই আগের বছর বালীগঞ্জের সেই ঠাকুরটা? মা-দুর্গা থেকে ছেলে-পিলে সকলের মাথায় গান্ধীটুপি।

—মাইরী, কি অরিজিন্যালিটি বলতো। কাগজেও ছেপেছিল সে ছবিটা—

—সে তো পাব্লিসিটির জন্যে। আগের বার আমরা মাইকে গানই দিইনি—

—এবার আর বলতে হবে না। যত হিট সঙ আছে একের পর এক। কানে তালা লাগিয়ে দেব।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, চাঁদা কেমন উঠেছে?

—বিশেষ নয়।

—কেন?

—এখনও জোর-জবরদস্তি করা হয়নি তাই। এক কথায় আর কে দেয়?

—চাঁদা আদায়ে জোর দাও, দেখ যদি একটা এক্জিবিসান্ করতে পার।

—সে কি আর হবে?

—চেষ্টা করতে দোষ কি। অন্তত খানকয়েক দোকানও যদি বসাতে পারা যায়, সব উৎরে যাবে।

আশুদা' উৎসাহ দেন, এ যুক্তি মন্দ নয়, আমি একটা 'কাফে' খুলবো।

কেষ্ট বলে, আমি মনোহারীর দোকান দিতে রাজী আছি। লজেন্স, চকোলেট আর খুচরো-খাচরা যা পাওয়া যায়।

সবাই এ প্রস্তাবে রাজী হয়, তাই হোক, এক্জিবিশান—

সকলে চলে গেলে আশুদা' কেষ্টকে বলেন, তুমি এত দিন ছিলে না, আমাদের আড্ডাও জমতো না।

কেষ্ট হাসে, এবার থেকে ঠিক সময় মত পাবেন।

—দাদার খবর কি?

—পাচিল উঠতে যা দেরী। এখন আলাদা বন্দোবস্ত এক রকম হয়ে গেছে।

আশুদা' গলা নামিয়ে বলেন, আর গৌরী, তাকেও এ বাড়ীতে নিয়ে আস্‌ছো তো?

—প্রভাত বলেছে বুঝি? মাসখানেকের মধ্যে নয়। তার আগে বিয়েও তো করতে হবে।

আশু বাবু বিড়-বিড় করেন, দুটো মন্তর পড়লেই কি বিয়ে হয়, আসল হল মনের মিল।

কেষ্ট বেরুবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, তা সত্যি।

আশুদা' জিজ্ঞেস করেন, শ্যামার নাকি বিয়ে শুনছি?

—শুনছি তাই।

—পাত্রটি কে?

—একচল্লিশ বছরের দোজবর, দু'-ছেলের বাপ।

—আহা, তোমার দাদা যে কি? বাপ হয়ে নিজের মেয়েকে—

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এ শুধু আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে। শ্যামাকে আমি ভালবাসি কি না, তাই—

—যাই হোক, গৌরীকে একদিন নিয়ে এস।

আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেষ্ট কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

কেষ্ট গৌরীকে বলে, মাথার সিঁদুর তুলে ফেলে আজকে কুমারী সেজে এসো।

আগে গৌরী তর্ক করতো, এখন আর করে না, নির্দেশ মত কাজ করে। কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে মস্ত বড় একটা বাড়ীতে এসে ঢোকে। গৌরীকে বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলে সামনের বড় ঘরে ঢুকে যায়। গৃহস্বামী বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর ছেলে বসেছিল। কেষ্ট আলাপ করে বলে, আপনাকে বলেছিলাম আমার বোনের কথা—

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, যার বিয়ের চেষ্টা করছিলে?

—আজ্ঞে হাঁ, সব পাকাপাকি। বোনকেও নিয়ে এসেছি।

—কৈ দেখি।

কেষ্ট গৌরীকে ভেতরে নিয়ে আসে। গৌরী মাথায় অনেক চেষ্টা করেও বড় খোঁপা করেছে, কপালে ছোট টিপ, পরনে সবুজ-রঙ শাড়ী। গড় হয়ে গৌরী প্রণাম করে। ভদ্রলোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, বাঃ, খাসা মেয়ে! ছেলেটি কি করে?

—রেল কোম্পানীর গার্ড।

টাকাকড়ি চায় নাকি?

—না, সেদিক দিয়ে ভালো। যা মেয়ের কিছু গয়না-কাপড় তাই দিতেই পারছি না, বাবা নেই। আমার একটি বোন, ইচ্ছে তো করেই—

—তা তো বটেই। তা কিছু টাকা সংগ্রহ হয়েছে?

—প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। এটর্নী বাবু এক শ' টাকা দিয়েছেন—কেষ্ট কাগজ বার করে দেখায়।

ভদ্রলোক বাধা দেন, ঠিক আছে, ও-সব দেখাবার দরকার নেই, বাবা তোমায় কত টাকা দেবেন বলেছিলেন?

—বলেছিলেন বিয়ের ঠিক হলে এসো, টাকা পঞ্চাশেক দিয়ে দেব।

—বেশ, আমি দিতে বলে দিচ্ছি। সরকারকে ডেকে বলেন, এই ভদ্রলোককে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিন। কন্যাদায়ের সাহায্য বলে লিখে রাখবেন।

সরকারবাবু কেষ্টকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যান, সই করাতে। গৌরী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন সময় চোখ তুলতেই দেখে, ভদ্রলোক তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞেস করেন, কি নাম তোমার?

—গৌরী।

—বাঃ বেশ নাম। দাদার নাম কি?

—কেষ্ট।

—বাঃ ভাই-বোন দু'জনেরই দেবতাদের নাম। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস না ঐখানে।

ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে ফরাসপাতা চৌকীটা দেখান। গৌরী উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। চোখ মাটির দিকে থাকলেও বুঝতে পারে ভদ্রলোক একদৃষ্টে তাকেই দেখছেন।

কেষ্ট কিছুক্ষণ বাদেই টাকা নিয়ে ফিরে আসে। দু'জনে ভদ্রলোককে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে।

গৌরী মন্তব্য করে, ভদ্রলোক কি অসভ্য, সারাক্ষণ চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছিলেন।

নির্ব্বিকার কেষ্ট উত্তর দেয়, এ রকম একটু-আধটু সহ্য করতে হয় বই কি, পঞ্চাশ টাকা তো কম নয়?

গৌরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, টাকাটাই কি সব?

—এক রকম তা বলতে পারো।

যদিও এ ধরণের লোককে ঠকাতে গৌরীর আর মনে লাগে না কিন্তু তার খারাপ লাগে অন্যের বিশ্বাসের ওপর আঘাত করতে। সেদিনও যখন কেষ্ট তাকে স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভবানীপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, গৌরীর যথেষ্ট আপত্তি ছিল। সে ভালো করেই জানত, কেষ্ট এক বৃদ্ধের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে চলেছে!

দুপুরবেলা রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। চাকরেরা দরজার কাছে বসে তাস খেলায় ব্যস্ত। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কর্তাবাবু বাড়ী আছেন? একজন উত্তর দেয়, যমজ্জুন।

—আমাদের যে বিশেষ দরকার।

—আপনার নাম কি বলবো?

কেষ্ট একটা মাটির গণেশ বার করে তার হাতে দিয়ে বলে, এইটে দেখালেই হবে। বলো কুমোররা এসেছে। একটু বাদেই ওপরে ডাক পড়লো। গৃহস্বামী বৃদ্ধ ভদ্রলোক ইজিচেয়ারে বসে হাতে মাটির গণেশটি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। ওদের দেখে একমুখ হেসে তারিফ করে বলেন, বাঃ, এত সুন্দর হয়েছে!

কেষ্ট আর গৌরী দু'জনে প্রণাম করে। কেষ্ট বলে, আপনার দয়ায়।

—কারুর জন্যেই কিছু হয় না। নিজেদের ইচ্ছে, নিজেদের চেষ্টা থাকলে তবেই তো দাঁড়ান যায়। ভিক্ষে করে বাঁচা যায় না।

—আপনি প্রথমে টাকা দিয়েছিলেন, তবেই তো ব্যবসা করতে পারলাম।

—এখন কেমন রোজগার হচ্ছে?

—যা বিক্রী হচ্ছে, তাই দিয়ে সংসারও করছি আবার নতুন মালমশলাও কিনছি। চলে যাচ্ছে একরকম।

বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন, আমার যে কি ভালো লাগছে। দু'টিতে মিলে এসে প্রথম দিনই যখন সাহায্য চাইলে, তখনই বুঝেছিলাম, তোমাদের কাজ করার ক্ষমতা আছে, মন আছে। তাই ত বললাম মাটির পুতুলের ব্যবসা করতে। গাঁয়ে যে কাজ করতে, এখন পাকিস্থান হবার পর সহরে এলেও সে কাজ কেন চলবে না, দেখলে তো?

কেষ্ট বিনয়ে ভেঙ্গে পড়ে, আপনার সাহায্য না পেলে কোথায় খড়কুটোর মত ভেসে যেতাম!

—আমি খুব খুশী হয়েছি। এখন কি করতে চাও?

—সামনে পুজো আসছে। এই সময় যদি কিছু বেশী মাল তৈরী করতে পারি, তাহলে অনেক টাকা লাভ হয়।

—এ তো খুব ভালো কথা। কত টাকা লাগবে?

কেষ্ট ভেবে নিয়ে বলে, শ'খানেক। রঙ মাটি সবই বেশী করে কিনতে হবে। পুজোর বিক্রীর পর আমি টাকা ফেরৎ দিতে পারব।

বৃদ্ধ একটি মেয়েকে বলেন, যাও তো দাদু, একটু জলখাবার দিতে বল মাকে।

জল-মিষ্টি খাওয়া হলে ক্যাস বাক্স খুলে বৃদ্ধ পঞ্চাশ টাকা গৌরীর হাতে দেন, নাও মা এখন পঞ্চাশ টাকা। সামনের মাসে আরও পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যেও। মন দিয়ে কাজ কর, দেখবে কারুর উপর নির্ভর করতে হবে না।

গৌরী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, তার চোখে জল এসে যায়। রাস্তা থেকে আট আনার গণেশ কিনে বৃদ্ধের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করতে গৌরীর মোটেই ভাল লাগে না। অথচ কেষ্টকে বলে কোন ফল হয় না।

—অত দেখলে চলে না, এ আমার ব্যবসা।

—ব্যবসা আপনি করুন না, আমাকে টানছেন কেন?

—ক্ষতি কি?

এ কথার আর কি উত্তর দেবে গৌরী? সে কেষ্টর মুখের দিকে তাকায়, ভাবে, মনটা যে তার সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

মালা সিনহা বলেন, "আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট
সাবান ব্যবহার করি—এটি এত শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!"
উজ্জ্বল কালো চোখ, লাবণ্য, সব মিলিয়ে মালা সিনহা সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের মতনই মালা সিনহা ব্যবহার করেন বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান—তিনি পছন্দ করেন মোলায়েম, সুগন্ধ এই সাবানটি।
আপনিও এই বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবানের সাহায্যে ত্বকের যত্ন নিন! সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে এবং খরচ বাঁচাবার জন্যে বড় সাইজের সাবান ব্যবহার করুন।
লাক্স
টয়লেট সাবান
TOILET SOAP
LUX
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

শ্যামলকে নিরস্ত করতে না পেরে চুনীলাল মদনের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে গেল শ্যামলের মামার সঙ্গে দেখা করতে। জগৎ বাবু তখন সবে অফিস থেকে ফিরে বাইরের ঘরে বসেছেন; বটু বাবুও তক্তাপোষের ওপর খবরের কাগজ নিয়ে এক মনে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখছেন, এমন সময় চুনীলাল ঘরে ঢোকে।

জগৎ বাবু জিজ্ঞেস করেন, কা'কে চাই?

—জগৎ বাবু আছেন?

—আমিই।

চুনীলাল নমস্কার করে আস্তে আস্তে বলে, আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে।

—বল।

চুনীলাল বটুমামার দিকে তাকায়। জগৎ বাবু বুঝতে পেরে বলেন, উনি আমার আত্মীয়। ওঁর সামনে বলতে পার।

—শ্যামলের বিষয় দু'-একটা কথা আছে।

বটুমামা ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, শ্যামলের বিষয়! কি ব্যাপার? বস না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

চুনীলাল আস্তে আস্তে শ্যামল-এর সব কথা খুলে বলে।

জগৎ বাবুর চোখ কপালে উঠে যায়, বলো কি, শ্যামল বছরখানেক স্কুলে যায় না?

—না।

—পলিটিকস করছে?

—পলিটিকসের নামে গুণ্ডামী।

—না না, এ বিশ্বাস করা যায় না।

বটুমামা সুযোগ খুঁজছিলেন। মাথা নেড়ে বলেন, জানতাম। তোমায় কত বার বলেছি জগৎ, একটা বিচ্ছু, শয়তান ঐ শ্যামল।

জগৎ বাবু বলেন, ও যে বলতো কোচিং ক্লাশে যায়?

—মিথ্যে কথা। স্কুলে ওর নামই নেই।

—কি ভয়ানক ব্যাপার, এ যে বিশ্বাস করা যায় না।

চুনীলাল বলে, সেই জন্যেই সাবধান করতে এলাম। বদ্ সঙ্গে মিশছে।

—ভালো করেছো, খুব ভালো করেছো। এর যা হোক ব্যবস্থা আমি করবো।

চুনীলাল চলে গেলে জগৎ বাবু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করেন, কি মনে হয় বটু! ছেলেটা কি সত্যি কথা বলে গেল?

—শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলবে কেন?

—তাও বটে। যাই হোক, কাল আমি একবার স্কুলে গিয়ে খবর নেব।

বটুমামা তাড়াতাড়ি বলেন, ওর বাক্স-প্যাঁটরা খুলে দেখলে হয়।

—না না, আগে ভাল করে খবর নিই।

পরদিন আর সন্দেহ রইল না যে চুনীলাল সবই ঠিক কথা বলেছে। হেডমাষ্টার মশাই বললেন, শ্যামলের নাম তো বহুদিন কাটা গেছে।

জগৎ বাবুর মুখ কালো হয়ে যায়, আমি কিছুই জানি না।

—তাই নাকি, তাহলে তো সর্ব্বনেশে কথা!

—শুনছি নাকি রাজনীতি করছে। সে দলটাও গুণ্ডাদের আড্ডা—

—তা তো হবেই, বাঁদরামী করার একটা জায়গা চাইতো।

জগৎ বাবু মাথা গরম করে বাড়ী ফিরলেন। বটুমামা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেন, কি হোল?

—ছোকরা যা বলেছে সব সত্যি।

—তাহলে?

—কোথায় ওর বাক্স-প্যাঁটরা, দেখি তার ভেতর কি আছে।

বটু বাবু শুধু এই কথারই অপেক্ষা করছিলেন। তাড়াতাড়ি তালা ভেঙ্গে জগৎ বাবুর সামনে শ্যামলের ট্রাঙ্কটা খুলে ফেলেন। দু'জনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বাক্সভর্ত্তি নানারকম জিনিষ। হাতঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, সিগারেটের টিন, ছোটখাট সোনার গয়না! কতকগুলো সৌখীন জিনিস, তাছাড়া নগদ টাকা।

জগৎ বাবু গুণে দেখেন, শ' দুয়েক তো বটেই।

বটুমামা প্রথম কথা বলেন, দেখলে তো, ছেলে এক মিনিট বাড়ী থাকে না, এছাড়া কি করবে? পাকা চোর।

জগৎ বাবু গুরুগম্ভীর স্বরে বলেন, ভাগ্যে সময় থাকতে সাবধান হতে পেরেছি, কোন দিন আমাদেরই থানায় নিয়ে যেত।

—নিশ্চয়, আমার তো অনেক দিন থেকেই সন্দেহ হয়েছে।

—ওর বাবাকে একটা খবর দিতে হয়, এ-সব ছেলেকে বাড়ীতে রাখা মুস্কিল। আমি কিছু বলতে চাই না।

বটু বাবু তেতো গলায় বলেন, আমি হলে তো হতভাগাটাকে এখুনি দূর করে দিতাম, তোমার কাছে আস্কারা পেয়েই তো এমনি বদ্ হয়েছে—জগৎ বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, হাজার হোক নিজের ভাগ্নে তো?

জগৎ বাবু ঠিকই করে নিয়েছিলো শ্যামলের বাবা না আসা পর্য্যন্ত এ বিষয় নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করবেন না। কিন্তু শ্যামল নিজে থেকেই গোল বাধালে। রাত্রি ন'টা নাগাদ কালীর আড্ডা থেকে বাড়ী ফিরে ট্রাঙ্কের তালা ভাঙ্গা দেখে ওর মাথা গরম হয়ে ওঠে। ছোটদের জিজ্ঞেস করে, কে তালা ভেঙ্গেছে রে?

সকলে একসঙ্গে বলে ওঠে, বটুমামা।

আর যায় কোথায়! শ্যামল রাগে কাঁপতে কাঁপতে সোজা বটুমামার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কে আমার ট্রাঙ্ক খুলেছে?

বটু বাবু চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দেন, তোমার মামা—

শ্যামল চেঁচিয়ে বলে, মিথ্যে কথা, আপনি খুলেছেন।

—তা কি হয়েছে?

—আমাকে না জিজ্ঞেস করে কেন খুলেছেন?

—তোমার কীর্ত্তি-কলাপ দেখতে—

—আমার সব ব্যাপারে আপনি নাক গলান কেন?

—চোরের ওপর নজর রাখতে হবে না?

শ্যামল নিজেকে সামলাতে পারে না। বটু বাবুর ওপর তার চিরকালের রাগ, আজ তারই ঝাল ঝাড়ে। সজোরে ঘুষি চালিয়ে দেয় নাকের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে বটু বাবু বাপ রে, মা রে, বলে আর্ত্তনাদ করে ওঠেন, নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে সুরু করে। বাড়ীর সকলে হৈ-চৈ করে ছুটে আসে। শ্যামল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, রাগের মাথায় মারটা এত জোরে হয়ে যাবে, সে ভাবতে পারেনি।

জগৎ বাবুর মন মোটেই ভাল ছিল না, তাই আজ একটু বেশী

মাত্রায় পান করেছিলেন। শ্যামলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

মামার এ ধরণের গলা শ্যামল কখনও শোনেনি। বটু বাবু হাঁউ-মাউ করে কি বলতে যাচ্ছিলেন, জগৎ বাবু তাকেও ধমকে থামিয়ে দেন, চুপ, কর। জগৎ বাবুর থমথমে মুখ দেখে আর কারুর কথা বলার সাহস হয় না। শ্যামল কি করবে বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। জগৎ বাবু আবার বলেন সেই একই স্বরে, বেরোও, আমার বাড়ী থেকে।

শ্যামল মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। জগৎ বাবু চীৎকার করে ওঠেন, তোমার জিনিষপত্র যা আছে সব নিয়ে যাও। চোরাই মাল এখানে থাকবে না।

চাকরকে হুকুম দেন, এখুনি ওর সব জিনিষ বার করে দাও।

মিনিট কয়েকের মধ্যে জিনিষপত্র নিয়ে শ্যামল বেরিয়ে আসে। রিক্সায় চেপে এই প্রথম তার চোখে জল আসে। এ কি হোল, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মামাবাড়ীর এত দিনের সম্পর্ক চিরকালের মত ছিঁড়ে গেল? যে মামা কোন দিন তাকে একটা কড়া কথা পর্য্যন্ত বলেন নি, তিনিই আজ দূর দূর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন! আর পিসীমা, তিনিও কিছু বললেন না। শ্যামল তাঁকে পিসীমা বলে ডাকে, বাড়ীর অন্য ছেলেদের মত, যদিও তিনি তার মাসীমা, মার আপন ছোট বোন। বিধবা মানুষ, শ্যামলকে কিছু বলতেন না। তাঁর কথা মনে পড়তেই শ্যামলের চোখ দিয়ে আরও জল বেরিয়ে আসে। শ্যামলের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে বটুমামার ওপর, তিনিই যে মামার কানে লাগিয়ে লাগিয়ে শ্যামলের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করে দিয়েছেন, এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না।

এত রাত্রে কোথায় যাবে ভেবে না পেয়ে স্থির করে, অনন্ত কেবিনে যদি কেষ্টদা' থাকে। শ্যামলের মামাবাড়ী থেকে অনন্ত কেবিনই কাছে হয়, পৌঁছতে আধ ঘণ্টাও লাগে না। দোকানে লোক ছিল না বললেই হয়। আশু বাবু টাকা-পয়সার হিসেব মেলাচ্ছিলেন। শ্যামল কাছে গিয়ে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করে, কেষ্টদা'কে কোথায় পাব বলতে পারেন?

আশু বাবু উত্তর দেন, তা কি করে বলব, বিকেলের দিকে এসেছিলেন—

—আমার যে খুব দরকার—

—কাল বরং এস, বলে রাখব।

—না আজই।

আশু বাবু ভাল করে শ্যামলের মুখটা দেখে নেন, কি ব্যাপার বল তো?

—আজকের রাত কাটাবার একটা জায়গা চাই।

—কেন কি হয়েছে?

শ্যামল বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, বাড়ীতে ঝগড়া করে চলে এসেছি।

আশু বাবু হাসেন, তাতে কি হয়েছে, এমন ঝগড়াঝাঁটি সকলেরই হয়। এই বেলা ফিরে যাও, বাড়ীর সকলে ভাববেন।

—না, আমি ফিরতে পারব না।

—ছিঃ, অমন করতে নেই।

—আপনি বুঝতে পারবেন না, কেষ্টদা' হলে বুঝত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দেখি কোথায় জায়গা পাই।

আশু বাবু বাধা দিয়ে বলেন, থাকতে চাও, এ রাতটা এখানে থাকতে পার। চাকর দুটো তো থাকেই, টেবিলগুলো টেনে নিয়ে পাখার তলায় বিছানা করে নাও।

শ্যামল সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলেন, বাঁচালেন আশুদা', এত রাত্রে মাল-পত্তর নিয়ে যে কোথায় যেতাম—

—সে কি, বাক্স-টাক্স নিয়ে এসেছো? আশুদা' অবাক হ'ল।

শ্যামল রিক্সাওয়ালাকে ডেকে মাল নামাতে বলে। আশুদা' জিজ্ঞেস করেন, খেয়েছো?

—খিদে নেই।

আশুদা' হাসেন, রাত্তিরে খিদে পাবে। ছোঁড়া চাকরটাকে ডেকে বলেন, রুটি ডিম যা আছে শ্যামল বাবুকে খাইয়ে দিস, উনি আজ এই ঘরেই থাকবেন। আশুদা' ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা বার করে পকেটে রাখেন, চলি শ্যামল, কাল দেখা হবে।

শ্যামল হাসবার চেষ্টা করে, ভয় নেই আশুদা,' আপনার খদ্দের আসবার আগেই আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেব।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে শ্যামল একটা কথাই ভেবেছে যে সে আজ গৃহহারা। মার কথা তার মনে নেই, মারা গেছেন খুব ছোটবেলায়। বাবার সঙ্গে পরিচয় অল্প, মফঃস্বল থেকে আসেন যান। খুব বেশী তাকে ভালবাসেন বলেও মনে হয় না। শ্যামলের যা কিছু বল ভরসা সবই ছিল মামার উপর। সত্যিই জগৎ বাবু সদাশিব মানুষ, কোন দিন সাতে-পাঁচে থাকতেন না। নিজের ছেলে-মেয়ের মতই শ্যামলের জন্যে করেছেন। আজ এই প্রথম শ্যামলের মনে হয় সে বোধ হয় অন্যায় করেছে, নইলে মামা এতখানি চটে গেলেন কেন! কেষ্টদা,' মদন দেবেনদা', কালী, সকলের কথাই একে একে মনে পড়ে, কিন্তু কেষ্টদা' ছাড়া কারুর ওপরই তার ভরসা নেই। সম্প্রতি বেশী দেখা-শোনা না হলেও শ্যামলের স্থির বিশ্বাস হয়, সব কথা শুনলে কেষ্টদা' তার জন্যে কোন রকম ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়।

পরদিন কেষ্টর সঙ্গে দেখা হতেই শ্যামল একে একে সমস্ত কথা বলে যায়।

—আমি বলছি কেষ্টদা', এ-সব ঐ বটুমামার কাজ। মামার কানে নানা রকম লাগিয়েছে।

কেষ্ট অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আর বাড়ী ফিরবে না?

—ফেরবার উপায় নেই কেষ্টদা', মামা তাড়িয়ে দিয়েছেন।

—তোমার বাবাকে একটা চিঠি লেখ।

—কি হবে?

—বাঃ, বাবাকে জানাতে হবে তো।

—বেশ লিখব। এখন থাকব কোথায়?

—আমার কাছে। একটু থেমে কেষ্ট বলে, বল তো তোমার মামার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি।

শ্যামল কি ভাবে, না থাক। শেষ কালে আপনাকে যা-তা বলে দেবে।

—তা হলে এখন আমার সঙ্গে চল, তার পর তোমার বাবার চিঠি পেলে যা হোক করা যাবে।

কেষ্ট ট্যাকসী ডেকে মালপত্র সমেত শ্যামলকে বেহালায় নিয়ে যায়। শ্যামল গাড়ীতে জিজ্ঞেস করে, আপনার বাড়ীতে যাব, না?

—না। দাদার সঙ্গে গোলমাল চলছে, খাওয়া দাওয়ার মুস্কিল।

—আমার জন্যে অসুবিধেয় পড়তে হল আপনাকে।

—না, তোমাকে গৌরীর কাছে রেখে দেবো। ও একলা থাকে, তোমাকে পেলে খুসী হবে।

গৌরী কেষ্টর কাছে শ্যামলের কথা শুনেছিল এবং তার ভাইকে পোড়াতে যে শ্যামলও শ্মশানে গিয়েছিল সে কথা জানত। তাই বেরিয়ে এসে সাদরে অভ্যর্থনা করে, এসো ভাই, আমার কাছে থাকবে।

শ্যামল প্রথম প্রথম সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারে না। বাক্স বিছানা ঘরের এক কোণে রেখে চুপ করে বসে থাকে। কেষ্ট কাজে বেরুবার সময় গৌরীকে বলে যায়, শ্যামল রইল। বেচারী লজ্জা পাচ্ছে, একটু আলাপ করে নিও।

শ্যামলকে পেয়ে গৌরী সত্যিই খুসী হয়। এত দিন পর্য্যন্ত কেষ্ট আর চিনু ছাড়া তার কথা বলার লোক ছিল না। তাই ভাই-এর বয়সী এই ছেলেটিকে পেয়ে সহজেই কাছে টেনে নেয়।

—শ্যামল, কি খাবে বল?

—কিছু না।

—কেন, লজ্জা কি আমার কাছে? আমি তোমার কে হই জান?

শ্যামল চোখ নীচু করে বসে থাকে। গৌরীর বেশ মজা লাগে। হেসে বলে, গৌরীদি'।

শ্যামল এতক্ষণে হাসে। সহজ হয়ে বলে, এক গ্লাস জল দিন না গৌরীদি'!

শুধু জল আসে না, তার সঙ্গে মিষ্টিও। গৌরী সস্নেহ আদরে শ্যামলকে খাওয়ায়। চিনুকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দেয়, এই দেখ চিনু, একটা ভাই পেয়েছি। শ্যামলকে বলে, এ তোমার আর একটি দিদি, চিনুদি'!

শ্যামল মুখ তুলে হাসে।

এদের মধ্যে ভাব জমে উঠল খুব তাড়াতাড়ি। চিনু আর গৌরী দু'জনেই যেন এই ধরণের একটি ছেলের অভাব বোধ করছিল অনেক দিন। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে আসা এই দুটি নারীর স্নেহের সবটা দখল করে বসল শ্যামল। এর সঙ্গে বাইরে বেরুলে কেউ কিছু মনে করে না। বিশেষ করে পিনাকী, অন্য কারুর সঙ্গে বেরুলে চিনুকে বড় মার-ধোর করে। দুপুরের দিকে প্রায়ই শ্যামলকে নিয়ে এরা বাজারে যায়, নয়ত কোন দিন এমনিই খানিকটা ঘুরে আসে। শ্যামলেরও এই নতুন পাওয়া দিদি দু'টির সঙ্গ ভালো লাগে। এত দিন সে এরকম ভালবাসা পায়নি। তাকে যে কারুর কাজের জন্যে প্রয়োজন হতে পারে তাও সে জানতে পারে নি।

শ্যামল বলে, গৌরীদি', আপনার কাছে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে।

গৌরী হেসে বলে, দিদির কাছে ভাই-এর থাকতে ভাল লাগবে না?

শ্যামলের মনে হয় গৌরীর প্রত্যেকটা কথা কি মিষ্টি, কতখানি দরদ মেশানো।

—এত আদর-যত্ন আমি সত্যি কোন দিন পাই নি।

—মা না থাকলে ঐ রকমই মনে হয় ভাই!

শ্যামল আসার পর গৌরীকে আবার আগের মত হাসিখুশী দেখে কেষ্টও নিশ্চিন্ত হয়ে তার নিজের কাজে মন দিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, কেষ্টর সঙ্গে কাজে বেরুতেও এখন গৌরী সহজেই রাজী হয়। বোঝে টাকার দরকার আছে। আজ-কাল রোজই প্রায় গৌরীর ঘরে খাওয়া দাওয়া লেগে থাকে। পিনাকী সকালে বেরিয়ে গেলেই চিনু গৌরীর ঘরে চলে আসে, একসঙ্গে রান্না করে। কেষ্ট কোন দিনই দুপুরের আগে আসে না, তাই সকালের বাজার করে শ্যামল। সবাই হৈ-হৈ করে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে। কেষ্ট বেশী খরচা হচ্ছে বুঝেও গৌরীকে বারণ করে না। ভাবে, এতে যদি সে আনন্দ পায় তাই ভাল। রান্নায় গৌরীর হাত পাকা, বিশেষ করে মাছের তরকারীতে।

চিনুও গৌরীর দেখাদেখি কেষ্টকে কেষ্টদা' বলে ডাকে। আজ-কাল সে-ও নিঃসঙ্কোচে আলাপ করে। খেতে বসে বলে, আপনি খুব কম খান কেষ্টদা'!

—তাইতেই ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে।

—ও আপনার বাতিক, কি এমন মোটা আপনি?

কেষ্ট হেসে বলে, খাওয়াতে হয় শ্যামলকে খাওয়াও, ছোট ছেলে—

শ্যামল কৃত্রিম ভয়ে জোরে মাথা নাড়ে, ওরে বাবা, দিন নেই রাত নেই যা খাওয়া-দাওয়া সুরু হয়েছে, পরে মুস্কিলে পড়ব।

গৌরী হাসতে হাসতে আরও খানিকটা ভাত শ্যামলের থালায় ঢেলে দেয়।

সেদিন কেষ্ট একলাই কাজে বেরিয়ে যায়, গৌরী চিনুকে বলে, গান কর না চিনু, তোর গলাটা বেশ।

চিনুর ভাল লাগলে গান করে। শ্যামল বাক্সর উপর তবলার তাল ঠোকে।

গৌরী জিজ্ঞেস করে, থিয়েটারে তুই কি করে পার্ট করিস, ভয় করে না?

—বাবা, অত লোকের সামনে?

—তাতে কি হয়েছে? একবার পর্দা উঠে গেলে আর কি?

—আমি কিন্তু ভাবতেই পারি না।

—একবার করে দেখ না—

—কোথায়?

—কত অফিসের কর্ম্মচারীরা, কত ক্লাবে সব থিয়েটার হয়। সেখানে মেয়েদের পার্ট করার জন্যে বলে পাঠায়, টাকাও দেয়।

—তোকেও টাকা দেয়?

—নিশ্চয়, চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা, কখনও তার বেশীও দেয়। তোর চেহারা ভাল, পার্ট করতে পারলে নায়িকা হতে পারবি।

—আমি করতেই পারি না।

—চেষ্টা করলে কেন পারবি না? যাবি একদিন রিহার্সাল দেখতে?

গৌরীর কৌতূহল হয়, কবে?

—শীগ্‌গিরি একটা এ্যামেচার ক্লাবে প্লে হবে, প্রভাতদা' বলে পাঠিয়েছে।

—তাই নাকি, কি বই?

—প্রভাতদা'রই লেখা একটা নাটক।

—তাহলে নিশ্চয় খুব ভালো হবে?

গৌরী জিজ্ঞেস করে, কি করে জানলে?

শ্যামল মুরুব্বি চালে বলে, প্রভাতদা'র বই যে সিনেমায় উঠছে। আমাকে বলেছে একদিন ছবি তোলা দেখাতে নিয়ে যাবে।

গৌরী আবদারের সুরে বলে. আমরাও যাব, প্রভাতদা'কে তুই বলিস তো চিনু!

—তুই-ই বলতে পারিস, চল না আমার সঙ্গে রিহার্সালে—

—কেষ্টদা'কে জিজ্ঞেস করবো।

—কেষ্টদা' কিছু বলবে না। আমি তোর হয়ে মত চেয়ে নেব।

গৌরী খুশী হয়, হ্যাঁ, সেই ভাল।

এমনি কত রকম গল্প-গুজব করে তিন জনে। হাসি ঠাট্টার মধ্যে এদের দিন কেটে যায়। চিনু সত্যি গৌরীদের মধ্যে থেকে নতুন জীবন পেয়েছে। শ্যামল এ ধরণের সাংসারিক জীবনের স্বাদ আগে পায়নি। গৌরীর মনের কোণে যে বিষাদের মেঘ জমা হয়েছিল তা অনেকখানি হাল্কা হয়ে যায়, তবে কেষ্টর কাছে ঠিক আগের মত ধরা দিতে পারে না।

পিনাকীকে নিয়ে প্রভাত অনন্ত কেবিনে আসে, বস, চা খা। প্রভাত চা দিতে বলে পিনাকীকে জিজ্ঞেস করে, কি হোল, চিনুকে বলেছিলি?

—বলেছি।

—করতে রাজী আছে?

—করবে না কেন? কত টাকা দেবে?

—পঞ্চাশ।

—কিছু টাকা আমায় আগে দিতে হবে।

—সে তুই যা বলবি।

পিনাকী চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কবে থেকে রিহার্সাল সুরু হচ্ছে?

—পরশু। ওরা মেয়েদের আনবার আর পৌঁছবার জন্যে গাড়ী দেবে। আমি তুলে নিয়ে আসব চিনুকে।

—আচ্ছা. চিনুকে বলে রাখবো।

—তোর কাছে নতুন ছবি কিছু আছে নাকি?

—খান কয়েক পোট্রেট।

—দেখি।

পিনাকী দু'খানা বড় ছবি বার করে দেয়। প্রভাত দেখে সবগুলিই একটি নতুন মেয়ের বিভিন্ন ভঙ্গী। কয়েকটা বেশ ভাল উঠেছে। ছবির দিকে তাকিয়ে বলে, বাঃ বেশ উঠেছে তো!

—এগুলো নতুন তুলেছি।

—কে রে? প্রভাত প্রশ্ন করে।

—একটা মেয়ে।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, মেয়েটা কে, তাই বল না?

—চিত্ররূপা।

—বাবাঃ, নামটিও কবিতা।

—আমিই দিয়েছি।

—তাই নাকি? প্রভাত আড়চোখে পিনাকীর দিকে তাকায়, কি ব্যাপার, চিনু থেকে চিত্ররূপায় নাকি?

—তোর যত বাজে কথা। পিনাকী কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

বিনোদের পার্কসার্কাসের বাড়ীতেই নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে। বিনোদের বাড়ীর কেউ এখানে থাকে না। অপেক্ষাকৃত নির্জন পাড়ায় বাগানের মধ্যে ছোট্ট দোতলা বাড়ী। অতিথি বা আত্মীয় কেউ কলকাতায় এলে ওঠে, নয় ত বেশীর ভাগ সময়ই খালি পড়ে থাকে।

নাটকের চরিত্রানুযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রী যোগাড় হয়ে গেছে। সন্ধ্যের পর সপ্তাহে তিন দিন রিহার্সাল হয়। সব রকম খরচই বিনোদ দেয় বলে নায়কের পার্টটি সব সময় বিনোদই নেয়। মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্ট চিনুর। বিনোদ রিহার্সালের দিন নিজে গাড়ী করে তুলে নিয়ে আসে আবার শেষ হয়ে গেলে পৌঁছে দেয়।

আজ কেষ্টর অনুমতি নিয়ে চিনু গৌরীকেও নিয়ে এসেছে রিহার্সাল দেখতে। গৌরীর বেশ মজা লাগে। ঘরের এক দিকে সবাই বসে, ছেলেরা মেয়েরা। অন্য দিকে জায়গা খালি, দৃশ্য অনুযায়ী দু-একটা চেয়ার-টেবিল রাখা।

যাদের ডাকেন তারা উঠে গিয়ে অভিনয়ের মহড়া দেয়। চিনু উঠে যাবার সময় বলে, তুই বস্ গৌরী, আমি সিন্‌টা করে আসি।

চিনুকে অভিনয় করতে দেখে গৌরীর হাসি পায়। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসে। বিনোদের তখন পার্ট ছিল না। গৌরীর পাশে এসে বসে। ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞেস করে, কি রকম লাগছে আপনার?

গৌরী অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, ভালো।

—চিন্ময়ী দেবী বেশ ভালো অভিনয় করেন।

—হ্যাঁ।

—আপনি অভিনয় করেন না?

গৌরী হাসে, না।

—আমাদের সঙ্গে করুন না?

গৌরী লজ্জা পায়, পারবো না।

—চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

—আপনাদের তো আর পার্ট খালি নেই, সব মেয়েই তো এসে গেছে।

—যিনি সাধনার পার্ট করছেন তাঁর একটু অসুবিধে আছে।

গৌরী হাসে, আচ্ছা, বাড়ীতে জিজ্ঞেস করবো।

বিনোদের ডাক পড়ে, অভিনয়ের পার্ট করতে উঠে যায়। একটু বাদে চিনু গৌরীর পাশে এসে বসে।

—বাঃ, তুই তো বেশ ভাল করিস!

—এমন আর কি?

—বাবাঃ, অতগুলো কথা কি সুন্দর বলে গেলি!

চিনু কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, বিনোদ বাবুর সঙ্গে আলাপ হল?

—হ্যাঁ, বেশ ভালো লোক।

—কি বলছিলেন?

—এখানে পার্ট করার জন্যে।

—তাই নাকি, কোন পার্টটা?

—সাধনার। ঐ মেয়েটির কি অসুবিধে আছে?

—খুব ভালো হবে। তুই কর না, আমি বাড়ীতে শিখিয়ে দেবো।

সেদিন বাড়ীতে পৌঁছে দেবার সময় বিনোদ আবার বলে, চিন্ময়ী দেবী, আপনার উপর ভার রইল। সাধনার পার্টটা গৌরী দেবী করলে আমরা বেঁচে যাই।

চিনু দুষ্টুমী করে, আমার কথায় বুঝি রাজী হবে, আপনি বলুন ভালো করে।

—কি করে বলবো বলুন? গলবস্ত্র হয়ে?

গৌরী নিজে থেকে উত্তর দেয়, আমি বাড়ীতে জিজ্ঞেস করবো।

—বলেন তো আমি গিয়েও বলতে পারি।

—না, তার দরকার নেই। যদি অনুমতি পাই, তাহলে নিজেই চেষ্টা করব পার্ট করতে।

বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিয়ে বিনোদ হাত তুলে নমস্কার করে। চিনু আর গৌরীও প্রতি-নমস্কার করে ভেতরে চলে আসে।

কেষ্ট ঘরে গৌরীর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার এত হাসি-খুসী যে?

—খুব মজা হয় রিহার্সালে।

—তাই নাকি?

গৌরী শাড়ী বদলে কেষ্টর কাছে এসে বসে। জিজ্ঞেস করে, বিনোদ বাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

কেষ্ট প্রভাতের দেওয়া পত্রিকাটা দেখছিল, সেই দিকে তাকিয়েই বলে, কে বিনোদ?

—প্রভাত বাবুর বন্ধু।

—না বোধ হয়।

—বিনোদ বাবুর বাড়ীতেই রিহার্সাল হচ্ছে। একটু থেমে বলে, একটা কথা বলবো রাগ করবে না?

—কি?

—আমি থিয়েটারে পার্ট করবো।

কেষ্ট চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করে, কে আবার মাথায় ঢোকাল?

গৌরী মাথা নীচু করে উত্তর দেয়, চিনু বলছিল। একজন মেয়ে করছে না, তাই।

—তুমি করতে পারবে?

—জানি না। চিনু বলছে বাড়ীতে শিখিয়ে দেবে। তুমি যদি রাগ না কর, তাহলে—

—রাগ করার কি আছে, পারলে করবে বৈ কি।

—পঞ্চাশ টাকা দেবে বলেছে।

—এটা তো এ্যামেচার শো,' এখানে টাকা দেবে কেন?

—মেয়েদের দেয়।

কেষ্ট গম্ভীর গলায় বলে, ভালো কথা।

গৌরী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, সত্যি বল, তুমি রাগ করবে না তো?

কেষ্ট হেসে ফেলে, কি মুস্কিল, তুমি আর আমার কোন কথাই বিশ্বাস কর না দেখছি!

কেষ্টর মুখে হাসি দেখে গৌরী ভরসা পায়। বলে, আমি তাহলে চিনুকে বলে আসি, ও খুব খুসী হবে।

চিনুকে বলতেই সে ছুটে গৌরীর ঘরে আসে। কেষ্টকে বলে, আপনি মত দিয়েছেন তো? আমি বললাম গৌরীকে, কেষ্টদা' মোটেই রাগ করবে না। তবু আপনার মুখ থেকে না শুনে ওর সোয়াস্তি নেই।

গৌরী কুঁজোয় জল ভরে আনতে চলে যায়। কেষ্ট চিনুকে বলে, গৌরী এসব বিষয়ে একেবারে কাঁচা, তুমি দেখিয়ে দিও।

—সে ভার আপনার বলার আগেই নিয়েছি। একটু থেমে বলে, গৌরী আপনাকে খুব ভয় করে।

কেষ্ট হাসে, কেন, আমাকে দেখলে কি ভয় হয়?

—তা নয়। আপনি রাশভারী লোক। না বলে কিছু করতে সাহস পায় না।

—কেন, তুমি কি পিনাকীকে না বলেই কাজ কর?

চিনু আস্তে আস্তে বলে, অনেক সময় করতে হয়।

—সে তো ভালো কথা নয়।

—আপনি যে রকম গৌরীর জন্যে করেন সে তো আমার জন্যে তেমন করে না?

এ প্রশ্নের কেষ্ট আর কি উত্তর দেবে, চুপ করে থাকে। পিনাকীর সঙ্গে যে চিনুর খুব বেশী বনিবনা নেই, তা সে গৌরীর কাছে আগেই জেনেছিল।

গৌরী জল নিয়ে ঘরে ঢোকে। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, শ্যামল কোথায় জানো?

গৌরী মাথা নাড়ে না, বলেছিল বিকেলের মধ্যে ফিরবে।

শ্যামল এলো আরও এক ঘণ্টা বাদে। তখন রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। গৌরী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এত রাত হল যে?

শ্যামল ক্লান্ত স্বরে বলে, অনেক দিন বাদে দেবেনদা'র কাছে গেলাম। কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কে দেবেনদা'?

—নাম শোনেন নি, খুব বড় নেতা।

—কোন পার্টির?

—তা জানি না। খুব জেল-টেল খেটেছেন। পলিটিক্স্ করেন।

—ও সব দলে ভিড় না।

—কেন?

—খুব সুবিধেবাদী না হলে বিশেষ কিছু হয় না। শক্ত লাইন।

শ্যামল আর কথা বাড়ায় না। চেঁচিয়ে বলে, গৌরীদি', খেতে দিন। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

কেষ্ট পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে শ্যামলকে দেয়, নাও, তোমার চিঠি।

চিঠি পড়ে শ্যামলের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কার চিঠি?

—বাবার।

—কোথা থেকে লিখছেন?

—মামার বাড়ী থেকে। কাল দেখা করতে চান।

—কেষ্ট উৎসাহ দেয়, বেশ তো। সব কথা খুলে বল, উনি নিশ্চয় বুঝবেন।

শ্যামল চিন্তিত মুখে বলে, তাই বলবো।

গৌরী চেঁচিয়ে ডাকে, এস, ভাত বাড়া হয়ে গেছে।

কেষ্ট আর শ্যামল পাশাপাশি খেতে বসে। [ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(বঙ্কিমচন্দ্র)

নাট্যরূপ : শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

পঞ্চম দৃশ্য

[রাজচন্দ্রের বাটীর বহির্ভাগ। তখন বৈকাল। রাজচন্দ্র হীরালাল নামে নবাগত ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন।]

হীরালাল। তাই বলে সব জেনে-শুনে আপনি সতীনের ওপর মেয়ে দেবেন?

রাজচন্দ্র। কি করি বলুন, না দিলে ত আর বিয়ে হয় না।

হীরালাল। কি যে বলেন! বলি, পাত্রের কি কিছু অভাব আছে মশাই!

রাজচন্দ্র। অভাব আছে কি নেই তা জানি না। কিন্তু একটি পাত্রও ত জোটেনি এত কাল।

হীরালাল। তাহলে আপনি সেরকম করে চেষ্টা করেন নি এত দিন।

রাজচন্দ্র। সে কথা অবশ্য ঠিক যে, চেষ্টা করিনি। কিন্তু কি করে চেষ্টা করি বলুন? আমি গরীব। ফুল বেচে খাই। আমার মেয়েকে কেউ কি আর বিয়ে করতে রাজী হোত? তাছাড়া মেয়ে আমার কানা, বয়েসও একটু হয়েছে।

হীরালাল। বয়েস হয়েছে তাই কি? এখন বয়স্থা মেয়েই ত লোকে চায়। আরে মশাই! আমি যখন "সুশ্চ্ভিশ্চসাং" পত্রিকার এডিটর ছিলাম তখন এই মেয়ে বড় করে বিয়ে দেওয়ার জন্যে কত আর্টিকেল লিখেছি—সে সব আর্টিকেল পড়ে, আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল।

রাজচন্দ্র। (সবিস্ময়ে) তাই বুঝি?

হীরালাল। আজ্ঞে হাঁ। তাই ত বলছিলাম বাল্যবিবাহ! আরে ছি! ছি! আপনি যদি রাজী থাকেন ত দিন আপনার মেয়েকে আমার হাতে তুলে। আমি রাজী আছি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে। দেশের উন্নতির জন্যে আমাকে একটা 'এক্জাম্পল সেট' করবার সুযোগ দিন।

রাজচন্দ্র। আপনার হাতে আমার মেয়ে দেব, এ তো সৌভাগ্যের কথা! তবে কি জানেন, এখন কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে। এসময়ে কথার আর নড়চড় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া রামসদয় বাবুর ছোট ছেলে শচীন্দ্রই উদ্যোগী হয়ে এ বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। বিয়েও তাঁরাই দিচ্ছেন। তাঁরা যা করবেন তাই হবে। তাঁদের ওপর আমি কোন কথা বলতে পারব না।

হীরালাল। তাঁদের মতলব আপনি বুঝতে পারছেন না বলেই ঐ সব কথা বলছেন। আরে মশাই, ওঁরা বড়লোক। ওঁদের চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। ওঁদের বিশ্বাস করে কোন কাজ করবেন না মশাই,—ঠকবেন। তা যাক—যা ভাল বোঝেন করুন। আচ্ছা, আপনার ঘরে মদ আছে?

রাজচন্দ্র। (সবিস্ময়ে) মদ?

হীরালাল। আজ্ঞে হাঁ।

রাজচন্দ্র। মদ ত খাই না। মদ শুধু শুধু ঘরে রাখতে যাব কেন?

হীরালাল। আরে মশাই, আপনাকে সাবধান করে দেবার জন্যেই তো কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। হাজার হোক, এখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে যাচ্ছেন, ওগুলো যেন না থাকে।

রাজচন্দ্র। যে আজ্ঞে। আপনি এখন আসুন। আমাকে আবার এখুনি একবার মিত্তির বাড়ীতে যেতে হবে।

হীরালাল। এখুনি যাবেন?

রাজচন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ। সস্ত্রীক যাব। ছোট গিন্নীমা ডেকেছেন।

হীরালাল। হাঁ, তা ত বটেই। আচ্ছা চলি—

[এক দিকে হীরালাল ও অপর দিকে বিরক্তভাবে রাজচন্দ্র প্রস্থান করেন।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

(তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চাঁপা রাজচন্দ্রের বাড়ীর সন্নিকটস্থ এক গলির মোড়ে হীরালালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ইতিমধ্যে হীরালাল প্রবেশ করে। তাহাকে দেখিয়া চাঁপা বলে।)

চাঁপা। কি? কিছু হোল হীরালাল?

হীরালাল। না দিদি! সুবিধে হোল না। ওরা তাদের মেয়েকে তোমার সতীন করে তবে ছাড়বে।

চাঁপা। কি বললে?

হীরালাল। বলবে আর কি। বললে, রামসদয় বাবুর ছোট ছেলে শচীন্দ্রই বিয়ের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পাকা কথাও হয়ে গেছে। এখন আর কথার নড়চড় হবে না। কত বড় বড় লেকচার ঝাড়লাম "সুশ্চ্ভিশ্চসাং" পত্রিকার এডিটর ছিলাম এ-সব কথা বলেও—

চাঁপা। আরে রেখে দে তোর 'সুশ্চ্ভিশ্চ্'—এখন কি উপায় করা যায় তাই বল?

হীরালাল। উপায় একটা বাতলে রেখেছি দিদি! এখন তুমি রাজী হলেই—

চাঁপা। কি?

হীরালাল। আসবার সময় কথায় কথায় মেয়েটার বাপ বলে ফেললে যে ওরা সস্ত্রীক এখুনি মিত্তির বাড়ীতে যাবে। ওরা স্বামি-স্ত্রীতে চলে গেলে, তুমি আস্তে আস্তে ওদের বাড়ীর ভেতর ঢুকে মেয়েটাকে ভাল কথায় হোক, ভয় দেখিয়ে হোক, যেমন করে হোক বিয়েটাকে ভাঙ্গিয়ে দেবার চেষ্টা কর।

চাঁপা। এটা বড় মন্দ বলিসনি হীরালাল!

হীরালাল। দিদি! আরে এসো—ঐ যে ওরা বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। আমাকে দেখলেই চিনতে পারবে। ঐখানটায় ততক্ষণ আমরা গা-ঢাকা দিয়ে থাকি, ওরা চলে গেলেই, তুমি সোজা ওদের বাড়ীতে গিয়ে ঢুকবে।

চাঁপা। আচ্ছা। (উভয়ে আত্মগোপন করিল)

সপ্তম দৃশ্য

[রাজচন্দ্রের গৃহ। সন্ধ্যার অন্ধকারে রজনী একাকিনী তাহার ঘরে বসিয়া আপন মনে বলিতেছিল]

রজনী। পাত্র জুটেছে বলেই এখন বিয়ে করতে হবে? কেন? কানা বলে কেউ ত এত দিন বিয়ে করতে চায়নি, পারও জোটেনি। ছোটবাবুকে রামসদয় বাবুর ছোট বৌ সেদিন অমন করে আমার বিয়ে হয় কিনা জিজ্ঞাসা করার জন্যেই না এই বিপদ! ছোটবাবু পাত্র ঠিক করে দিলেন। কিন্তু কৈ? তিনিও আমার মনের কথা বুঝলেন না! তিনিও ত ইচ্ছে করলে আমায় বিয়ে করতে পারতেন? তাঁর ত আজও বিয়ে হয়নি। বিয়ে! বিয়ে! বিয়ে! সকলে যেন আমায় পাগল করে মারছে। মাকে কত করে বললাম, বাবার পায়ে ধরে কাঁদলাম—কেউ আমার কথা শুনলো না, কেউ আমার মনের কথা বুঝলো না!

(সহসা দরজা খোলার আওয়াজ হইল। রজনী চমকাইয়া উঠিল।

কে?

(চাঁপা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল)

চাঁপা। তোমার যম।

রজনী। আমার যম কি আছে?

চাঁপা। আছে। এই দেখ—

রজনী। আমি কানা। দেখব কি করে? শুধু জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমার যমই যদি হবে, তাহলে এত দিন তুমি কোথায় ছিলে?

চাঁপা। কোথায় ছিলাম এখুনি জানতে পারবে [illegible]। আবাগী! বিয়ের বড় সাধ না?

রজনী। বিশ্বাস কর, বিয়ের সাধ আমার একটুও নেই।

চাঁপা। না। নেই? দেখ, কানি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তাহলে যেদিন তুই ঘর করতে যাবি, সেই দিনই তোকে বিষ খাইয়ে মারব।

রজনী। ও! তাহলে ত তুমি আমার যম নও—তুমি আমার চাঁপা দিদি।

চাঁপা। (তাচ্ছিল্যভরে) উঃ! আমার দিদি! [illegible] বসে আছ দেখছি—

রজনী। বাবা-মা তোমার কথা বলাবলি করছিলেন যে, তোমার ছেলেপুলে হোল না বলে, তোমার স্বামী আবার আমায় বিয়ে করতে যাচ্ছেন, আর তোমার নামটা জানব না।

চাঁপা। সব খবর নেওয়া হয়ে গেছে দেখছি—

রজনী। বা রে! খবর নেব না? তোমার স্বামীর গলায় দ্বিতীয় বার মালা দিতে যাচ্ছি—

চাঁপা। ভাল করে মালা দেওয়াব তোমাকে।

রজনী। আহা! রাগ করছ কেন? বস না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। কানা মানুষ। পথ চিনে [illegible] এত দিন করে তোমার সঙ্গে দেখা করতাম।

চাঁপা। ভণিতা রেখে এখন কি বলতে চাও, বল—

রজনী। বলব আর কি। এই বিয়ের ব্যাপারে তুমিও যেমন বিরক্ত হয়েছ আমিও ঠিক তেমনি বিরক্ত হয়েছি। এখন বিয়েটা কিসে বন্ধ হয়, তার উপায় বলতে পার?

চাঁপা। বেশ তো। এ বিয়েতে যদি তোমার মত না থাকে, তাহলে সে কথাটা তোমার বাবা-মাকে বল না কেন?

রজনী। হাজার বার বলেছি। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

চাঁপা। তা মিত্তির বাবুদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের [illegible] বল না কেন?

রজনী। তাও করেছি, তাতেও কিছু হয়নি।

চাঁপা। তবে এক কাজ কর।

রজনী। কি?

চাঁপা। দু'দিন লুকিয়ে থাকবে?

রজনী। কোথায় লুকোব?

চাঁপা। আমার বাপের বাড়ী গিয়ে থাকবে?

রজনী। আমি কানা, চোখে দেখতে পাই না। নতুন জায়গায় কে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে?

চাঁপা। নিয়ে যাবার লোক আমি দিতে পারি।

রজনী। কিন্তু তাঁরা আমাকে স্থান দেবেন কেন?

চাঁপা। আমি বললে নিশ্চয়ই তারা স্থান দেবে। [illegible] আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব।

রজনী। বেশ। যাব।

চাঁপা। যাব নয়—এখুনি তাহলে আমার সঙ্গে [illegible]।

রজনী। এখুনি?

চাঁপা। হাঁ।

রজনী। কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে যাবার লোক [illegible] কি?

চাঁপা। যাবে [illegible] লোক আমি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি।

রজনী। বেশ। চল—

চাঁপা। এসো। ধর আমার হাত—

রজনী। বাড়ীর পথ সব আমার জানা। [illegible] দরকার নেই। বাক্সার দিকে ধরলেই হবে। [illegible] একখানা কাপড় নিই।

[রজনী আলনা হইতে একখানি কাপড় টানিয়া [illegible]

চল—

[দেখা গেল, রজনী ধীরে ধীরে চাঁপার সহিত ঘর হইতে বাহির হইল।]

অষ্টম দৃশ্য

[হীরালাল [illegible] অপেক্ষা করিতেছিল। [illegible] রজনীকে লইয়া চাঁপা প্রবেশ করিয়া বলিল]

চাঁপা। এই যে হীরালাল! রজনী আমাদের বাপের [illegible] রাজী হয়েছে। তাহলে তুই একে সঙ্গে করে নিয়ে [illegible] রজনী!

হীরালাল। আচ্ছা—

রজনী। যাঁর সঙ্গে আমায় পাঠাচ্ছেন, উনি কে?

চাঁপা। আমার ছোট ভাই। হীরালাল।

রজনী। আপনি যাবেন না?

চাঁপা। না, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী এদের না বলে, না কয়ে কি আমি যেতে পারি?

রজনী। কিন্তু ওঁর সঙ্গে যাওয়া কি আমার উচিত হবে?

চাঁপা। হীরালাল খুব ভাল ছেলে। ওর সংগে তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার। যাও, আর কথা বাড়িও না। আমি তাহলে চললাম হীরালাল!

হীরালাল। আচ্ছা—(চাঁপা চলিয়া গেল)

রঞ্জনী। উনি কি চলে গেলেন ?

হীরালাল। হাঁ। তুমি এসো আমার সঙ্গে—

রঞ্জনী। এখন কোথায় যাবেন ?

হীরালাল। জগন্নাথঘাটে। সেখানে গিয়ে নৌকা ভাড়া করে আমরা হুগলী যাব। এস—

রঞ্জনী। চলুন।

[উভয়ে পথ চলিতে সুরু করিল। সহসা ঘোড়ার গাড়ী আসার আওয়াজ]

হীরালাল। এদিকে সরে এস। ঘোড়ার গাড়ী—

রঞ্জনী। ভয় নেই। গাড়ী চাপা প'ড়ে মরার মত সৌভাগ্য আমি করিনি। (গাড়ীর শব্দ ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল।) গঙ্গার ঘাটে পৌঁছুতে আর কত দেরী ?

হীরালাল। আর খুব বেশী দেরী নেই—

[উভয়ে যথারীতি পথ চলিতে লাগিল। সহসা জনৈক মাতাল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল।]

মাতাল। এই রাত দুপুরে কে যায় ? সংগে দেখছি মেয়েছেলে! নাঃ। ভাল বলে মনে হচ্ছে না তো ? কে বাবা নন্দের চাঁদ— এই রাত দুপুরে কা'কে নিয়ে পিট্টান দিচ্ছো ?

রঞ্জনী। হীরালাল বাবু! আমার বড় ভয় করছে—

হীরালাল। কিচ্ছু ভয় নেই। আমি ত রয়েছি। চলে এসো— (উভয়ে আরো কিছুদূর অগ্রসর হইল। সহসা ঘড়িতে একটা বাজার শব্দ শোনা গেল)

রঞ্জনী। ঘড়িতে কি একটা বাজলো ?

হীরালাল। হাঁ।

রঞ্জনী। উঃ। এই এতক্ষণ আমরা পথ চলছি!

হীরালাল। আমি একা হলে এতক্ষণ কখন জগন্নাথঘাটে পৌঁছুতাম। তুমি অন্ধ মানুষ। ধীরে ধীরে পথ চলছ, দেরী তো হবেই।

রঞ্জনী। তা ঠিক। আচ্ছা, হীরালাল বাবু আপনার গায়ে জোর কেমন ?

হীরালাল। কেন ? এ কথা জেনে কি হবে ?

রঞ্জনী। না। হবে না কিছুই। এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

হীরালাল। তা গায়ে জোর বড় মন্দ নেই।

রঞ্জনী। আপনার হাতে ওটা কিসের লাঠি ?

হীরা। তালের।

রঞ্জনী। ওটা আপনি ভাঙতে পারেন ?

হীরা। না। এটা ভাঙা কি মুখের কথা ?

রঞ্জনী। আমার হাতে ওটা দিন তো দেখি ভাঙতে পারি কি না ?

হীরা। এই নাও—(লাঠিটি লইয়া রঞ্জনী অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত করিল। হীরালাল সবিস্ময়ে বলিল:) এ কি! তোমার হাতে তো কম জোর নেই দেখছি! অনায়াসে তুমি ওটাকে দুখানা করে ফেললে ?

রঞ্জনী। হাঁ। এখন এই লাঠির আধখানা আপনার কাছে থাক। আর আধখানা আমার কাছে থাক।

হীরা। এর অর্থ ?

রঞ্জনী। অর্থ এমন কিছুই নয়। গায়ে আমার কেমন জোর তা তো দেখলেনই। এখন এই আধখানা লাঠি আমার হাতে থাকলে, আপনি সহসা কোনো অত্যাচার আমার ওপর করতে সাহস করবেন না। এই আর কি।

হীরালাল। ও! তা যাক্। জগন্নাথঘাটে আমরা এসে গিয়েছি। এখন আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে নৌকোয় গিয়ে উঠতে পারবে কি ?

রঞ্জনী। খুব পারবো। অন্ধের হাতে লাঠি থাকলে পথ চলা, সিঁড়ি দিয়ে নামা, সিঁড়িতে ওঠা, খুব সহজ হয়ে যায়।

হীরালাল। তাহলে তুমি নেমে এসো। আমি ততক্ষণ মাঝিদের সংগে ভাড়া ঠিক করে ফেলিগে।

[রঞ্জনী ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। হীরালাল এদিকে তাড়াতাড়ি মাঝিদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।]

রঞ্জনী। বেশ তো—যান না।

[মাঝির সর্দার সাদর অভ্যর্থনা করিয়া হীরালালকে বলিল:]

মাঝি। এই যে আসুন বাবু! আসুন—কোথায় যাবেন ?

হীরালাল। হুগলী। কত ভাড়া নেবে ?

মাঝি। সোয়ারী ?

হীরালাল। দু'জন। আমি আর ঐ যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন আর একজন—

মাঝি। ও! তা নৌকো কি রাত্রেই ছাড়তে হবে ?

হীরালাল। হাঁ। এখুনি।

মাঝি। ও! বুঝেছি।

হীরালাল। বুঝেছি মানে ? যেতে পারবে কি না, তাই বলো ?

মাঝি। এই আমাদের কাজ। পারব না আর কেন ?

হীরালাল। ভাড়া নেবে কত ?

মাঝি। আজ্ঞে যা রেট, তাই দেবেন। দশ টাকা। কিন্তু এসব কাজে কিছু বখশিস চাই বাবু!

হীরালাল। বেশ তো। দেব না হয় কিছু বখশিস—

মাঝি। কিছু নয় বাবু! পাঁচটি টাকার কমে এ কাজ পারব না।

হীরালাল। বেশ, তাই দেব। (ইতিমধ্যে রঞ্জনী গঙ্গার কূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া) এই যে রঞ্জনী, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এদিকে। এই আমার হাতটা ধরে আস্তে আস্তে নৌকোয় উঠে পড়ো।

রঞ্জনী। হাত ধরতে হবে না। আপনি আমার এই লাঠিটা ধরে নৌকার কাছে নিয়ে চলুন। আমি ঠিক নিজে নিজে নৌকায় উঠতে পারবো।

হীরালাল। বেশ। তাই এসো। দাও তোমার লাঠি—

রঞ্জনী। এই নিন্।

হীরালাল। দেখ, নৌকায় উঠতে পারবে তো ? না ধরবো ?

রঞ্জনী। না না, ধরতে হবে না। এই ত নৌকায় হাত রেখেছি, এবার আমি খুব উঠতে পারবো।

কলেজে পড়া বৌ

সুনয়নী দেবীর দুঃখের অন্ত নেই। কি ভুলই না তিনি করেছিলেন ছেলেকে কোলকাতায় লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়ে। ছেলে কিনা বিয়ে করে বসল এক কলেজে পড়া মেয়েকে! ছেলের জন্যে তিনি পাত্রী ঠিক করেছিলেন কেষ্টনগরের বনেদী চাটুজ্যে পরিবারে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি—বয়স একটু কম কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়! টাকার কথাটাও ফ্যালনা নয়। নগদ দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাটুজ্যেরা। কথাটা এখনও ভাবলে খচ্ করে লাগে সুনয়নী দেবীর বুকে।

সুতপা ঘরে এলো দুগাছি শাঁখা আর দুগাছি চুড়ী সম্বল করে। প্রথম দিন প্রণাম করতে যাওয়ার সময় সুনয়নী দেবী পেছিয়ে গিয়েছিলেন দু'পা. "থাক থাক মা,"—তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া কলেজে পড়া মেয়ে সুতপার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই প্রথম দিনটি আজ প্রায় দেড় বছর পেছনে কিন্তু আজও শাশুড়ী কলেজে পড়া বৌকে আপন করে নিতে পারেন নি। রান্নাঘরের কোন কাজে সুতপা সাহায্য করতে এলেই তিনি বলেন—"থাক থাক বৌমা—এসব তো তোমাদের অভ্যাস নেই, আবার মাথা ধরবে।"

বিমল কোলকাতার এক সদাগরী আফিসে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করে। থাকে সহরতলীতে। রোজগার সামান্যই। বিয়ের আগে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের দেড় বছর পরে আজ বুঝতে পারে যে খরচ সংকুলান করা দরকার। [illegible] অনেক বেড়ে গেছে, কিছু সঞ্চয়ও থাকা দরকার। মায়ের হাতেই সংসার খরচের টাকা সে তুলে দেয়। ইদানিং মাকে আকারে ইঙ্গিতে দু একবার বলেছে যে খরচ কিছু কমানো দরকার। কিন্তু সুনয়নী দেবী গেছেন চটে। "তোর কলেজে পড়া বৌ বুঝি তোকে এই সব বুদ্ধি দিচ্ছে? এত দিন তো তোর এসব মনে হয়নি?" ভয়ে বিমল আর কিছু বলতে পারেনি।

সুতপা কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। "তুমি বুঝিয়ে বল মাকে। আর তিন মাস পরে আমাদের প্রথম সন্তান আসবে। এখন চারিদিক সামলে সুমলে না চললে চলবে কেন? তাছাড়াও ধর অসুখ বিসুখ আছে, সবাইয়ের সাধ আহ্লাদ আছে, কিছু তো বাঁচাতেই হবে। মায়েরই তো কতদিনকার সখ একটা গরদের থানের আর কত দিন তোমায় বলেছেন তরকারীর বাগানটা বেশ সুন্দর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে।"

মরীয়া হয়ে বিমল গেল মায়ের কাছে। খুলে বলল তাঁকে মনের কথা। কিন্তু হিতে বিপরীত হোল। সুনয়নী দেবী গেলেন ক্ষেপে। "যখনই তুই ওই কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করেছিস তখনই জানতাম পরিবারে অশান্তি আসবে। থাক তুই তোর বৌ আর সংসার নিয়ে—আমি চললাম দাদার বাড়ী।" কিছুতেই আটকানো গেল না

তাঁকে। বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন বরানগরে।

ফিরে এলেন তিনি প্রায় তিন মাস পরে। তাও এমনি নয়, বিমলের ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে তিনি অবাক। তাঁর সাধের ঝিঙে আর লাউডগার বাগানের চারপাশ দিয়ে কচি বাঁশের সুন্দর বেড়া। গেলেন সুতপার ঘরে। ফুটফুটে নাতীকে নিলেন কোলে তুলে। বিমল এসে ঢুকলো গরদের থান নিয়ে। আনন্দে সুনয়নী

দেবীর চোখের দুই কোণে জল চিকচিক করে উঠল। সুতপা বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে বলল—"মা তোমায় আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।" সুনয়নী দেবী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি ভয় নিয়েই ফিরেছিলাম মা, হয়তো দেখব বাড়ীঘর সব ছারখার হয়ে গেছে—কিন্তু কি লক্ষ্মীশ্রী সারা বাড়ী জুড়ে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—না মা কোথায় যাব এমন বৌ-নাতী ফেলে?"

এক দিন শুধু তিনি সুতপাকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন—"কি করে এত গুছিয়ে চালালে তুমি মা?" সুতপা বলল—"মা খরচ কত দিকে বাঁচাই দেখুন! উনি আগে আপিসে পয়সা খরচ করে আজে বাজে খাবার খেতেন, এখন বাড়ী থেকে টিফিন বাক্সে আমি ওঁর খাবার দিই। এতে খরচ অনেক বাঁচে, আর খাওয়াটাও ভাল হয়। ঠিকে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি—কাপড় কাচা, বাসন মাজা এসব কাজ আমি আর ঝি ভাগাভাগি করে করে নিই। আর সব চেয়ে বেশি সাশ্রয় করেছি খাবারে। আগে আপনি ঘি কিনতেন অত দামে—আর সে ঘি'ও সব সময় ভাল হোত না। আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডায় ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' চোখ আর ত্বক সুস্থ রাখে। আর থাকে ভিটামিন 'ডি' যা হাড়কে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ডালডায় রাঁধা সব খাবারই অত্যন্ত মুখরোচক হয়। এই সব কারণেই এবং স্বাস্থ্যদায়ক বলেই ডালডা আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে। ডালডা "শীল" করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে সব সময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালডায় ভেজালের কোন ভয় নেই কারণ খাঁটি ডালডা সব সময় পাওয়া যায় খেজুর গাছ মার্কা টিনে।"

সুনয়নী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর কলেজে পড়া বৌয়ের দিকে।

ব্যক্তি। না। শক্তি থাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যা—
অমর। তবে দেখ, পাষণ্ড! সে শক্তি আমার আছে কি না।
[রজনীকে যে ব্যক্তিটি আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। তাহার সহিত অমরনাথের মারপিট শুরু হইল। সহসা আক্রমণকারী অমরনাথের হাতে দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।]
অমর। (চীৎকার করে) আঃ!
রজনী। কি হোল?
অমর। খুন করে ফেলেছে।
রজনী। সে কি!
অমর। ভয় নেই! লোকটার কোমরে দা ছিল। হাতের ওপর সেই দা-এর একটা কোপ বসিয়ে দিয়ে লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল!
রজনী। খুব রক্ত পড়ছে কি?
অমর। হ্যাঁ। চাদর দিয়ে হাতটা বেঁধে নিই—
রজনী। আমিই আপনার এই সর্বনাশের কারণ!
অমর। (চাদর দিয়া হাত বাঁধিতে বাঁধিতে) না, না, সে কি কথা! এই বিপদে আমার যা কর্ত্তব্য তাই করেছি। কিন্তু ও লোকটা কে?
রজনী। তা ত জানিনে?
অমর। জান না?
রজনী। না। আমি জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলাম কিন্তু মরণ হোল না। এক নৌকার মাঝি-মাল্লারা আমাকে বাঁচালে। জ্ঞান হ'লে তাদেরই একজন জিজ্ঞাসা করলে, আমি কোথায় যাব? বললাম, তোমরা আমায় যেখানে নামিয়ে দেবে সেইখানেই নামবো। তারপর এই ঘটনা।
অমর। সে কি! কোথায় নামবে, কোথায় যাবে তার ঠিক নেই!
রজনী। না। যে ডুবে মরে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল তার আবার ঠিক-ঠিকানা—
অমর। আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কেন?
রজনী। সে অনেক কথা! সে দুঃখের কাহিনী এখন আপনাকে আমি বলতে পারব না।
অমর। তা না হয় নাই বললে। তোমাদের বাড়ী কোথায়?
রজনী। কোল্‌কাতায়।
অমর। কোল্‌কাতায় বাড়ী, তা এখানে এলে কি করে?
রজনী। সে অনেক কথা। আপনাকে আর একদিন বলবো।
অমর। তুমি কল্‌কাতায় যাবে?
রজনী। যদি কেউ দয়া করে নিয়ে যান।
অমর। আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি।
রজনী। কিন্তু এই অবস্থায় আপনার কি যাওয়া সম্ভব হবে?
অমর। না। কিছুদিন হোল এখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এসেছি, সেখানে দু'দিন থেকে, একটু সুস্থ হ'লে তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।
রজনী। কিন্তু আমি এ-ক'দিন থাকবো কোথায়?
অমর। তুমিও আমার আত্মীয়ের বাড়ীতেই থাকবে এস।
রজনী। আমার হাতটা না ধরলে আমি ত' পথ চলতে পারবো না। আমি যে অন্ধ!
অমর। অন্ধ!
রজনী। হ্যাঁ।
অমর। তোমার নামটি কি?
রজনী। রজনী।
অমর। রজনী! অন্ধ! র—জ—নী—
রজনী। কি ভাবছেন?
অমর। না, ও কিছু নয়! আচ্ছা, তোমার বাবার নাম কি রাজচন্দ্র দাস?
রজনী। আজ্ঞে হাঁ। (সাগ্রহে) আপনি কি আমার বাবাকে চেনেন?
অমর। (ইতস্তত করিয়া) না। মানে ঐ নামের এক ব্যক্তির রজনী নামে এক অন্ধ মেয়ের কথা আমাকে একজন বলেছিলেন কি না।
রজনী। কে তিনি?
অমর। তাঁর নাম গোবিন্দকান্ত দত্ত। কাশীতে তিনি থাকেন। আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে। হাত ধর।
[রজনী অমরনাথের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।
[ক্রমশঃ।

প্রাচীন কাব্যে রতি-বিলাপের নমুনা

"অন্য নায়িকার সনে নিশীথে বঞ্চিয়া ভোরে মোর কাছে এসেছিলা তুমি।
খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া মন-রাগ না সহিয়া মন্দ কাজ করেছিনু আমি॥
বকুলের মালা নিয়া দু'হাতে বন্ধন দিয়া কর্ণ-উৎপলে তাড়িছিলে।
সেই অভিমান মনে করিয়া আমার সনে রস-রঙ্গ সকলি ত্যজিলে॥
আর দুঃখ মনে জ্বলে একদিন নৃত্যকালে পদের নূপুর খসেছিল।
ত্বরা তুমি দিতে পায় বিলম্ব হইল তায় দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হইল॥
তাতে আমি মান করি নৃত্য-গীত পরিহরি বসিয়া রহিনু মৌনী হয়ে।
যত সাধ কৈলা তুমি পুনঃ না নাচিনু আমি তাতে রৈলে বিরস হইয়া॥"

—জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্য বা 'চণ্ডিকা-মঙ্গল' হইতে "বঙ্গের কবিতা" নামক গ্রন্থে উল্লেখিত।

ঝড়ের পরে

শ্রীবুলা দেবী

বিকেলের দিকে ঝম্‌ঝম্‌ করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ তখনও পরিষ্কার হয়নি, তারই ফাঁকে চকিতে কখন জানলা দিয়ে রোদের সোনালী আলোটুকু এসে, হেসে লুটিয়ে পড়ে রত্নার বিছানার উপর।

সুন্দর কাশ্মীরী কাজ-করা বেড-কভার দিয়ে ঢাকা নরম বিছানার উপর গা এলিয়ে শুয়ে থাকে রত্নাবলী। খুব ভাল লাগে তার এই পড়ন্ত রোদের তাপটুকুকে।

এই মাত্র হাসপাতাল থেকে ফিরেছে সে। অবসাদে ভরে যায় তার সারা অঙ্গ। আজ একটা জটিল ডেলিভারী কেস্‌ এসেছিল তার হাতে। সাধারণতঃ এ সব কেস হাসপাতালের বড় ডাক্তার অমিয় সেন নিয়ে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে রত্নাকেই নিতে হয় এ-সব কেস। হঠাৎ আজ ব্লাড-প্রেসারের চাপ বৃদ্ধিতে ডাঃ সেন আসতে পারেন নাই, সেজন্য আজ এ কেস্‌টি তার হাতেই আসে।

অতি সুশ্রী সেই মেয়েটির সুন্দর মুখখানি ভেসে ওঠে রত্নার চোখের সামনে। টানা-টানা বড় বড় চোখ দুটি। গভীর পল্লবে ঘেরা কালো দুটি চোখে কী অদ্ভুত যাদু মাখানো! [illegible] ছোট্ট একটি তিল। ফুটন্ত গোলাপের মত টুকটুকে রং। ধনুকের মত বাঁকানো পাতলা দুটি ঠোঁট। দেখলে না তাকিয়ে থাকা যায় না। অদ্ভুত এক টুকরো মিষ্টি স্বপ্নের মত। [illegible] লেগেছিল মেয়েটিকে। নামটিও যেন চেনা-চেনা। কোথায় শুনেছি যেন এই নামটি। নামটি মনে করবার চেষ্টা করে সে। [illegible] স্মৃতির পাতা ওল্টাতে থাকে রত্নাবলী।

আস্তে আস্তে মনে পড়ে যায় তার সেই হারিয়ে-যাওয়া মধুর দিনগুলির কথা। নিজের অজান্তে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক চিরে। ব্যথায় [illegible] পড়ে সে। হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি এসে ব্যথাভরা এক অপরূপ ছবি এঁকে দিয়ে যায় তার [illegible] অন্তরে।

সে-অনেক দিন আগে একবার পুজোর ছুটি কাটাতে ওরা সকলে মিলে শিলং বেড়াতে গিয়েছিল। [illegible] বাড়ীটাতে ছিল তারা। ছবির মত সুন্দর বাড়ীখানি। পরিষ্কার ঝকঝকে। নানা রকম [illegible] সারা বাড়ীখানি। চারিধারে [illegible] গাছের সারি। গাছের ডালে, বাতাসে [illegible] ওঠে। চমৎকার আবহাওয়া। পাহাড়ের কোলে [illegible] বাড়ীগুলি ছবির মত মনে হয়। খাসিয়া মেয়েদের [illegible] লাল আপেলের মত টুকটুকে রং। [illegible] ফুল। খুব ভাল লাগে রত্নার। [illegible] বনফুলের মিষ্টি গন্ধে নেশা ধরে যায় মনে। [illegible] লেকের ধারে, নইলে ওখানকার সব নামকরা [illegible] বেড়াতে যেত রত্না। হাসি-আনন্দের ভিতর [illegible] পেরিয়ে যায় তাদের। হারিয়ে-যাওয়া সেই মধুময় [illegible] আজও ভুলতে পারেনি রত্নাবলী। সেদিন কি [illegible] বৃষ্টি হয়েছিল। বেড়াবার পোষাক পরে বসন্তকে নিয়ে [illegible] ঝমঝম করে নামলো বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টি [illegible] গাছের পাতায়, জানলার কাচের শার্সীতে [illegible] একঘেয়ে শব্দ।

রাতে খাওয়ার পর বিছানার উপর বসে [illegible] তাণ্ডবলীলা দেখছিল রত্নাবলী। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের [illegible] বড় বড় গাছের ডালগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। বৃষ্টির [illegible] আর শেষ নেই। হঠাৎ বসন্তের কথাটি মনে পড়ে [illegible] পড়লো সে। মণিপুরী শাড়ী সরিয়ে বাবার [illegible] একবার। ঘুমের কোলে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। [illegible] সাথে মিতালী করে তাল রেখে ভারী নিঃশ্বাস [illegible] সাহেব। আস্তে আস্তে চলে আসে সে বসন্তের ঘরে। [illegible] তৈরী হচ্ছে সে। খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির জল [illegible] দিয়েছে ঘরের সবকিছু। দামী কার্পেটটা জলে [illegible] করছে। নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পায় রত্নাবলী!

বইগুলি যে ভিজে গেছে, বসন্তের পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে রত্না। নিমেষে দূরে এক ঝলক হাসির ভিতর দিয়ে [illegible] ধরে বসন্ত তাকে। টেনে আনে নিজের বুকের কাছটিতে। [illegible] একটা হাত দিয়ে রত্নার চিবুক তুলে বলে, বৃষ্টি আমার খুব ভাল লাগে রত্না। মনে হয় সারা পৃথিবী টুপটাপ বৃষ্টির নূপুর বাজিয়ে নেচে

ফুলের মত...
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।
Rexona
BLENDED WITH CADYL
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান
RP. 150-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

চলেছে। ঝড়ের সংগে মিতালী করে মানুষের মনের রঙীন সুরও বেজে ওঠে। তাই ত তোমায় এত কাছে পেলাম আজ, তাই ত আমি ঝড়-বৃষ্টিকে এত ভালবাসি।

আচমকা মেঘ ডেকে উঠতেই ভয় পেয়ে যায় রত্না, আর সরে আসে রজতের বুকের কাছে। ভয় কি? এই ত আমি আছি, গভীর অনুরাগে বলে রজত।

ঝড়ের সাথে সমানে তাল রেখে বৃষ্টি বেড়ে চলে। ঝড়ে পাইন গাছগুলি করুণ আর্তনাদ করে ওঠে গভীর বেদনায়। নিজেকে রিক্ত করে উজাড় করে দেয় প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যের পায়ে। বৃষ্টির একঘেয়ে রিমঝিম, রিমঝিম করুণ সুরের মূর্ছনা সমানে বেজে চলে। নীরব থমথমে চারি ধার।

খোলা জানলা দিয়ে জোলো হাওয়া এসে টেবিলে রাখা রজতের বইখাতার পাতাগুলি ওলট-পালট করে দিয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল থাকে না তাদের। আবার ভীষণ শব্দ করে মেঘ ডেকে ওঠে, বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে মেঘের বুক চিরে। ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো রত্না। সবলে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে ভরিয়ে দেয় রজত তাকে, তারপর এঁকে দেয় তার থরথর করে কেঁপে-ওঠা নরম দুটি ঠোঁটে প্রথম মিলনের চিহ্ন। রাত গভীর হতে থাকে।

রত্নার বাবার বন্ধুর ছেলে রজত আসে তাদের বাড়ী, ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার জন্য। মেধাবী ছাত্র ছিল রজত। ফরেন থেকে ঘুরিয়ে এনে একমাত্র আদরের দুলালী রত্নাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। মনে মনে ছবি আঁকেন রত্নার স্নেহময় পিতা। রজতকে ঘিরে ফুটে উঠেছিল রত্নার জীবন-শতদলের এক-একটি পাপড়ি। রজতের কথাটা অনেক দিন বাদে মনে পড়ে যায় তার। কান্নায় মোচড় দিয়ে ওঠে তার বুকখানি। তার কত আশা ছিল। কত রঙীন স্বপ্ন দিয়ে ঘিরে রেখেছিল রজতের চারি পাশ। ব্যথার ধাক্কায় আরেক দিকের মোড় ঘুরে যায় তার।

আরেক দিনের কথা মনে পড়ে গেলে ঘৃণা আর ভয়ে আজও শিউরে ওঠে রত্না। ছোটবেলায় একবার তার পিসীমার কাছে দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে অনেক দিন ছিল সেখানে। নন্দন পাহাড়ের কাছে ছিল তাদের বাড়ী। তাদের বাড়ীর পাশে সুবীররা থাকতো। তার বোন চিত্রার সংগে খুব ভাব হয় তার। প্রায়ই যেত তাদের বাড়ীতে। সেখানে ক্যারাম, লুডো খেলা হত তাদের। সেই সূত্রে সুবীরের সাথে আলাপ হয় তার। প্রায়ই তারা এক সংগে বিকেলের দিকে দল বেঁধে বেড়াতে যেত। হাঁটতে হাঁটতে নন্দন পাহাড়ের দিকে, নইলে বর্ণিডির পথ ধরে এগিয়ে যেত তারা।

একবার অনেকে মিলে ত্রিকূটে বেড়াতে গিয়েছিল তারা। ত্রিকূট পাহাড়ের বনের ভিতরে এসে রত্নার মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। গভীর শালবন। দু'ধারে শাল গাছ, মাঝে সরু পথ। লাল শিমুল আর বনপলাশে ছেয়ে গেছে চারিধার। চারিদিকে কেবল রং-এর ছড়াছড়ি! কত রকম নাম-না-জানা বনফুল ফুটে আছে। ঝিরঝিরে বাতাসে বন-মহুয়ার গন্ধে সমস্ত বনটি ভরপুর। মহুয়ার গন্ধে তাদের পাগল করে দেয়। নেশা লাগে তাদের মনে। চিত্রাকে নিয়ে অনেক দূরে ফুল তুলতে তুলতে আর ঝরে-পড়া মহুয়া কুড়াতে কুড়াতে চলে যায় রত্না। ফুল আর মহুয়ার নেশায় পথ হারিয়ে ফেলে তারা। ভয়ে দিশা হারিয়ে ফেলে কাঁদতে থাকে দু'জনেই। এক রাখাল ছেলে বাঁশী বাজিয়ে গরু নিয়ে ফিরছিল ঘরে। তারই সাহায্যে নেমে আসে তারা পাহাড় থেকে। রদ্দুর মিলিয়ে গেছে তখন। ছায়া নেমেছে শালবনে। মেঘে ছেয়ে ফেলেছে সমস্ত আকাশ। আস্তে আস্তে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে থাকে। পথে আসতে খুব ভিজে যায় তারা। ভয়ে আর বৃষ্টি ভেজাতে জ্বর আসে রত্নার। একনাগাড়ে আঠারো দিন ভুগেছিল! বাড়ীর সকলকে ভাবিয়ে তুলেছিল সে।

সব চাইতে বেশী সেবা করেছিল সুবীর। সমস্ত রাত ধরে সেবা করত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াত, জ্বরের চার্ট লিখত। বাড়াবাড়ি হলে গভীর রাতে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনত। তার সেবায় আস্তে আস্তে ভাল হয়ে ওঠে রত্না। সুবীরের আনন্দ আর ধরে না। এমনি ভাবে অনেকগুলি দিন তাদের হাসি-কলরবের ভিতর দিয়ে কেটে যায়। সুন্দরী এই কিশোরীকে খুবই ভাল লাগে তরুণ সুবীরের। রত্নাকে ঘিরে আস্তে আস্তে অনুরাগের বীজ বুনে চলে সুবীর। এসব কিছুই টের পায়নি কিশোরী রত্না। অনেক দিন থাকার পর ওরা চলে আসে কলকাতায়। ওদের চলে আসার আগের দিন সুবীর এসে বলে—আমি তোমায় ভালবাসি রত্না! পঞ্চদশী কিশোরী কি বুঝেছিল সেই জানে, এগিয়ে এসে হাত রেখেছিল তার হাতে। হেসে বলেছিল—মনে থাকবে তোমার কথা। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, ভুলেও গিয়েছিল সুবীরকে। কিন্তু অদৃষ্ট তাকে ভোলেনি।

ধূমকেতুর মত উদয় হলো আবার সে রত্নার জীবনে, রজতের সহপাঠিরূপে। রজতের সংগে সে একদিন আসে ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ীতে। সেখানে রত্নাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। চা, জলখাবার খেয়ে গল্প করে, অনেক রাত্রে বিদায় নেয় সে। তারপর থেকে ঘন ঘন আসতে থাকে সুবীর তাদের বাড়ীতে। নানা অছিলায় বার বার সেই পুরানো দিনের কথা শোনাতে থাকে রত্নাবলীকে। বিরক্ত আর ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে রত্না। রজতকে কিছু বলতে পারে না, যদি ভুল বুঝে রজত তাকে? কি করবে ভেবে দিশা হারিয়ে ফেলে সে। মনের এই অবস্থায় একদিন সুবীর তার হাত দুটি ধরে বলে—আর কত কাল? এবার তোমাকে আমার দরকার। একান্ত নিজের করে পেতে চাই আমি। তুমি ত জান, সেই দিনের জন্যই আমি অপেক্ষা করে আছি!

ভয়ার্ত চোখে রত্না সুবীরের দিকে চেয়ে বলে, না—না সুবীর, সে হয় না, সে হয় না। আমি রজতের, আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে এক মাত্র রজত ছাড়া আর কেউই নেই। আমি পারবো না রজতকে ছেড়ে আর কারোর গলায় মালা দিতে। তুমি চলে যাও, চলে যাও। আর কোন দিন এ বাড়ীর ছায়া মাড়িও না। উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপতে থাকে সে। হিংস্র চোখে কয়েক মিনিট চেয়ে থাকে সুবীর। তার পর টেনে টেনে বলে, দেখে নেবো তোমায়। কী করে রজতের গলায় মালা দাও তুমি? বলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় রত্নাদের বাড়ী থেকে।

নিয়তির নির্মম পরিহাসে হিংসার জালে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে সুবীর। আস্তে আস্তে সন্দেহের জাল বুনতে থাকে রজতের মনে। এক অশুভ মুহূর্তে রজত ভুল বোঝে রত্নাকে

কঠিন আঘাত করেছিল সে রত্নার অন্তরকে। প্রত্যাখ্যান করেছিল রত্নার নিষ্পাপ প্রেমকে।

অভিমানিনী রত্না অকপটে অতীতের সেই ফেলে-আসা কিশোরী জীবনের সমস্ত কথাই বলে কত কান্নাই না সেদিন কেঁদেছিল! এত দুঃখ, এত কান্না সবই ব্যর্থ হয়ে গেল রত্নাবলীর? রজত তাকে বিশ্বাস করলো না! ভুল বুঝে চলে গেল তাদের বাড়ী ছেড়ে! নিয়তির হলো জয়।

অনেক দিন বাদে রজতের বিবাহের আমন্ত্রণ লিপি পেয়েছিল সে। নিয়তির ঝড়ে আশামুকুল ঝরে যায়। ছিঁড়ে যায় বীণার তার। সব বৃথা হয়ে যায়। রজতের স্মৃতি ভুলবার চেষ্টায় ও সুবীরের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ডাক্তারী পড়তে সাগরপাড়ি দেয় সে।

লণ্ডনে বেজওয়াটার রোডে যে বাড়ীটাতে থাকতো তারা তার খুব কাছেই ছিল কেনসিংটন-গার্ডেনস। যখন খুব খারাপ লাগতো তার রজতের জন্য, অকারণে গুমরে কেঁদে উঠতো তার মন, তখনই সে চলে যেত সেই পার্কটিতে। কান্নায় ভেঙে পড়তো। কাঁদতো সে অফুরন্ত বুকফাটা কান্না। অনেকক্ষণ পরে মনকে শান্ত করে ফিরে আসতো সে বাড়ীতে।

আস্তে আস্তে মনকে চাবুক মেরে শক্ত করে ফেলে সে, যাতে ভাল ভাবে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করা যায়, সে দিকে মন দেয় আবার। ডাঃ আলফ্রেড রবার্টসনের কথা মনে পড়ে যায় তার। শান্ত সৌম্য মূর্তি। দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে যায়। ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাকে, তাঁরই সহচার্য্যে খুব ভাল ভাবে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করে রত্নাবলী। তার পর ডাঃ রবার্টসনের অধীনেই একটা নামকরা হাসপাতালে কাজ করে সে।

আস্তে আস্তে অনেকগুলি দিন গত হয়ে যায়। বিলেতে আসার পর থেকেই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিলেন তার পিতা সদাহাস্যময় ব্যারিষ্টার নিখিল ব্যানার্জী। মেয়ের মুখের দিকে চাইতে পারতেন না যেন তিনি। সব সময়েই চুপচাপ বসে আপন মনে পাইপ টানতেন। আবার কখনও বা আপন মনে পিয়ানো বাজাতেন। এমনি করে জীবনের আরও পাঁচ-ছ বছর কেটে যায় তাদের।

আদরের দুলালী রত্নাবলীর একক জীবনে একঘেয়ে দুঃখের ইতিহাস আর যেন সইতে পারলেন না সদাহাস্যময় ব্যারিষ্টার সাহেব। আস্তে আস্তে পটে-আঁকা ছবির মত মলিন হতে লাগলেন। পিতাকে নিয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠে রত্নাবলী। তাঁর শরীরটা সারাবার জন্যই এক রকম জোর করেই রত্না নিয়ে গেল সুইৎজারল্যাণ্ড। চমৎকার ভাবে সাজানো সুন্দর ছবির মত বাড়ীটাকে ভারী ভাল লাগলো রত্নার।

শান্ত পরিবেশের মধ্যে পাহাড়ের কোলে অনেকখানি জমির উপর ছিল তাদের বাংলোখানি। বসন্তের সুইৎজারল্যাণ্ড। তার অনুরাগের মৃদু পরশ লেগেছে গাছে গাছে। সোনালী রং-এর সেলেণ্ডাইন ফুলে ছেয়ে গেছে চারি ধার। বাংলোর সামনে মস্ত বড় বাগান। সমস্ত বাগানটিতে আলো করে ফুটে রয়েছে অসংখ্য মিষ্টি গন্ধে ভরা জেরিনিয়ামস্। তার মিষ্টি সুবাস বাতাসে ভেসে আসে। ওক্ আর দেওদার গাছের দোলায় বাতাসে মৃদু মর্ম্মর ধ্বনি জেগে ওঠে। দূরে চিরসুন্দর আল্পস দাঁড়িয়ে আছে নরম তুষারের ওড়না জড়িয়ে, চিরসুন্দরের প্রতীক্ষায়, কত যুগ-যুগান্ত ধরে তা কে জানে? সেই দিকে চেয়ে থাকে রত্না। খুব ভাল লাগে তার এই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যকে। মুগ্ধ হয়ে যায় সে।

ওখানে যাবার পর বেশ ভাল হয়ে উঠলেন ব্যারিষ্টার সাহেব। একদিন তার বাবার সাথে হাঁটতে হাঁটতে রাইন নদীর ধার দিয়ে ঝরা পাতা মাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল রত্না। দিনটা মেঘলাই ছিল। আস্তে আস্তে আকাশের কোলে দেখা দিল রাশি রাশি কালো মেঘ। দিনের আলো মুছে গেল। অন্ধকার হয়ে এলো চারি ধার। সুরু হলো তুষারের ঝড়। বৃষ্টিও পড়তে লাগলো সমানে তাল রেখে। ভিজে ভিজে যখন বাড়ী ফিরে এলো তারা, তখনও তুষার-বৃষ্টি থামে নাই। তুষারপাতে আর বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর এলো সেই রাত্রে ব্যারিষ্টার সাহেবের। সামান্য জ্বর উপেক্ষা করলেন তিনি। দুই-একদিনের ভিতরেও যখন জ্বর ছাড়লো না তাঁর, অস্থির হয়ে উঠলো রত্নাবলী। ডাক্তার দেখালো সে। বুকে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া বলে সন্দেহ করলেন ইংরেজ ডাক্তারটি। অনেক টাকা খরচা করতে লাগলো রত্না, তার স্নেহময় পিতাকে বাঁচাবার জন্য। ফল সে কিছুই পেল না। এত সেবা সব ব্যর্থ হয়ে গেল রত্নাবলীর। একদিন শেষ নিশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

আজ দু'বছর হয়ে গিয়েছে রত্না ভারতে ফিরেছে। চিন্তার জাল ছিঁড়ে ঘরের চারিধার চেয়ে দেখে নেয় একবার। কখন দিনের শেষে রাত্রি নেমে আসে বুঝতে পারে না রত্নাবলী। সহসা আয়া রূপার মা আলো জ্বালাতে আর তাকে ডাকতে চমক্ ভাঙে তার।

আস্তে আস্তে চুলের কাঁটাগুলি খুলে ড্রেসিং-টেবিলের উপর রেখে বেসিনে হাতমুখ ধুতে চলে যায়। ফিরে এসে ডাইনিং টেবিলে বসতেই খানসামা মিঞাউদ্দিন দিয়ে যায় চা আর নানা রকম খাবার। রূপার মা'র সাথে কথা বলতে বলতে খেতে থাকে রত্নাবলী। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ফিরে আসে ড্রইংরুমে। আস্তে আস্তে পিয়ানোর উপর সুরের ঝঙ্কার তোলে সে।

দিনের পর দিন চলে যায় তার। বেশ কিছু দিন পরে হঠাৎ একদিন টেলিফোনের ঘণ্টাটা বেজে ওঠে। সবে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে সোফার উপরে গা ঢেলে দিয়ে শুয়ে আছে সে। উঠতে যেন কিছুতেই ইচ্ছা করছে না আর। ক্লান্তিতে ছেয়ে গেছে তার সারা দেহ-মন। কোন রকমে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল রত্নাবলী।

হ্যালো ?

ডাঃ মিস ব্যানার্জি আছেন ? গলার স্বরে চমকে ওঠে রত্নাবলী। হারান দিনের সুর যেন ভেসে আসে কানে ! দু'-এক মিনিট চুপচাপ, তারপর নিজেকে সামলিয়ে নেয় রত্না। হ্যাঁ, আমিই কথা বলছি, বলুন ?

দেখুন, আপনাদের হাসপাতালে আপনার হাতেই আমার স্ত্রীর ডেলিভারী হয়। বেশ কিছু দিন হলো বাড়ী ফিরে এসেছিল সে। হঠাৎ একদিন বাথরুমে পড়ে গিয়ে হেমারেজ হতে সুরু করে। বড় দুর্ব্বল ছিল ; ডাক্তার আসবার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। সেই থেকে বাচ্চাটিও খুব ভুগছে, আপনি যদি দয়া করে একবার আমার এখানে আসেন তবে খুবই ভাল হয়। না পাওয়ার চিরন্তন সেই নারীহৃদয় কেঁদে ওঠে। একটু ভেবে উত্তর দেয় রত্না, আচ্ছা যাবো, কাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ। ঠিকানা চেয়ে নেয় সে। আচ্ছা নমস্কার, মনে থাকবে বলে রিসিভার নামিয়ে রাখে।

অনেক রাত অবধি জেগে থাকে রত্নাবলী। কিছুতেই ঘুম আসে না আর। কানের মাঝে সেই হারান সুরটি ভেসে আসে বারে বারে। একবার উঠে পায়চারী করতে থাকে সে। নিশুতি রাত। চারিদিকে শুধু নীরবতা। শুধু চাঁপা ফুলের মিঠে সৌরভ বাতাসে ভেসে আসে। মুখে-চোখে ভাল করে জল দিয়ে পাখার স্পিডটা বাড়িয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করে সে।

যখন ঘুম ভাঙ্গে তার, দিনের আলো ফুটে উঠেছে রাতের কালো ওড়না ছিঁড়ে। যথাসময়ে হাসপাতালে চলে যায় সে। ডিউটি সেরে যখন বাড়ীতে ফিরে আসে রত্নাবলী, তখন বিকেল হয়ে গেছে।

গাড়ী থেকে নামবার সময় সোফারকে বলে রত্না, আমি পাঁচটার একটু আগে বেরুবো, গাড়ী যেন ঠিক থাকে। মাথা হেলিয়ে আদেশ শুনে নেয় সোফার রতনলাল।

একটু বিশ্রাম করে প্রসাধন সেরে নেয়। ভায়োলেট রং-এর জর্জেট শাড়ী পরে সে। শাড়ীটি মিশে গেছে তার সুঠাম দেহের খাঁজে খাঁজে। অদ্ভুত সুন্দর দেখায় তাকে ! লেডিজ ব্যাগটি হাতে নিয়ে নিচে নেমে আসে রত্নাবলী।

রতনলালকে বাড়ীর নম্বরটা বলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে রত্না। কী জানি, এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে যায় তার সারা দেহ-মন। যথাসময়ে গাড়ী এসে থামে নিউ আলিপুরের নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটিতে।

লম্বা সেলাম ঠুকে দারোয়ান ফটক খুলে দেয়। গাড়ী লাল সুরকীর রাস্তা মাড়িয়ে বাটার-কা.পস্ ফুলের গাছের পাশ দিয়ে বারান্দায় এসে থামে। ছবির মত সুন্দর বাড়ীটি। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে চারিধার। খুশীর আমেজ নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে আসে রত্নাবলী। বেয়ারার হাতে কার্ড পাঠিয়ে সুসজ্জিত ড্রইংরুমে অপেক্ষা করতে থাকে সে। এক নিমেষে ঘরের চারিধার দেখে নেয়। চমৎকার সুন্দর ভাবে সাজানো ! সদ্যফোটা লাইলাক ফুলের মিষ্টি গন্ধে ঘরটা ভরপুর।

দামী কাশ্মীরী সিল্কের পর্দা সরিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করেন গৃহস্বামী মিঃ রজত চৌধুরী। হাত তুলে নমস্কার করতে চমকে ওঠে দু'জনেই। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায় গৃহস্বামী মিঃ চৌধুরী। মাথার ভিতর ঝিমঝিম করে রত্নাবলীর, সব কিছু গুলিয়ে যায় তার। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে নামভারী ডাঃ রত্নাবলী। চোখ নিচু করে কেমন অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

এক মিনিট স্তব্ধতা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না মিঃ চৌধুরী। আনন্দে চীৎকার করে ওঠে গৃহস্বামী রজত চৌধুরী, রত্না—রত্নাবলী ? তুমিই ডাক্তার মিস্ ব্যানার্জী ? আমি কোন দিনও ভাবতে পারি নাই রত্না, আবার আমাদের দেখা হবে। সামান্য ভুলে আমি তোমার কত বড় ক্ষতিই না করেছি ! আমি পরে সব শুনেছি। কিন্তু তখন কোনও প্রতিকার ছিল না আর। আবেগে ভেঙ্গে পড়ে রজত চৌধুরী।

রজতের কথায় বিস্ময়ের ঘোর কেটে যায় রত্নার। অতীত দিনের স্মৃতির মধ্যে ফিরে যায় সে। ফেলে-আসা দিনগুলি এসে ঘিরে দাঁড়ায় তার লুপ্ত ব্যথিত অন্তরের চারি পাশে।

নিজের দুর্ব্বল মনকে শাসন করে, আঘাত করে, কঠিন করে ফেলে। তারপর ধীরে ধীরে বলে—আপনি ভুল করছেন মিঃ চৌধুরী ! সেই রত্না আর নেই, ফেলে-আসা দিনগুলির মাঝে হারিয়ে গেছে সে। তার জায়গায় স্থান নিয়েছে ডাঃ মিস্ ব্যানার্জী। এ সব কথা এখন থাক্। কাজের কথায় আসুন। কেন আমায় ডেকেছিলেন সেই কথাই বলুন। আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলবার চেষ্টা করে রত্নাবলী।

অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে ব্যথিত হয়ে ওঠে রজত। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলে রজত, জানি, আজ আমার এ কথার আর কোন দাম নেই। তাছাড়া আর তুমি আমায় বিশ্বাস করবে না রত্না ! এ কথা সত্যি, করবীকে বিয়ে করে একদিনের জন্যও সুখী হতে পারিনি আমি, গভীর বিষণ্ণ এক খণ্ড মেঘের মত এক দুরন্ত জ্বালা সব সময় অনুভব করেছি আমার অশান্ত হৃদয়ে। কত খুঁজেছি তোমায়। সারা জীবন খালি অনুতাপের বোঝা বয়েছি আমি। আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর রত্নাবলী !

এক নিমেষে কি যেন ভাবে রত্না। মনের গহন তলে হারিয়ে যাওয়া তার ব্যর্থ হৃদয় হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। নিজেকে হারিয়ে নিয়তির কাছে পরাজয় মেনে নেয় সে। জলে ভরা দুটি চোখ তুলে ধরে রজতের দিকে। তারপর আনন্দে ঝলমলিয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে রজতের বুকে।

গভীর আনন্দে নিবিড় করে চেপে ধরে বুকের মাঝে রজত তাকে, আবেগে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে রত্নাবলী। পরম আদরে আলতো ভাবে হাত বোলাতে থাকে রজত তার নরম কালো চুলে।

আনন্দে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল তাদের গাল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো ঝরা শিউলী ফুলের মত।

আদর্শ পথ্য,
পানীয় ও খাদ্য
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILL/ LTD
MURARIPUKAR ROAD
ULTADANGA : CALCUTTA
লিলি
বার্লি
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
ও
স্বাস্থ্যপ্রদ

শ্রীমতী বাসবী বসু

ছুটির দিন ব'লে সব কাজেরই সময় পিছিয়ে গেছে। বিকেলের চা-পর্ব চুকিয়ে চুল বাঁধতে যখন ঘরে এলাম, 'রবি তখন রক্ত-রাগে রাঙা।' মনোমত ছাঁদে চুল বেঁধে গা-ধুয়ে প্রসাধনের কাজটাও প্রায় শেষ করে' এনেছি, এমন সময় কার মোটর যেন থামলো আমার বাংলোর সুমুখে। ঘরের জানালার পর্দা তুলে উঁকি দিলাম একটু—দেখলাম জিপ থেকে নেমে আমাদের গেটে ঢুকছেন স্যুটপরা দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক। মাথার ফেল্ট-হ্যাট সামনে ঝুঁকে পড়ে মুখটাকে আড়াল করলেও পিঠে ঝোলানো বন্দুকটা শিকারীর পরিচয় বহন করে এনেছে।

সামনের ল'নে অতিথিবৎসল গৃহস্বামী সশরীরে উপস্থিত আছেন, তাই নবাগতের জন্য আমার বেশী ব্যস্ত হবার দরকার নেই। মনে মনে বরং একটু খুশীই হোলাম আমার কর্তাটির সময় কাটানোর একটা উপলক্ষ জুটেছে দেখে। বেচারা এই বন্ধুবিহীন কর্মক্ষেত্রে প্রায় আবুহোসেনের মতো বন্ধু-কাঙাল হোয়ে পড়েছেন। কলকাতার বিরহে মেঘদূত রচনা করে ফেলেছেন প্রায়, তবে মর্মান্তিক এই যে, তার শ্রোতা একমাত্র আমি। গুন্-গুন্ করে থেমে-যাওয়া গানের সুরের সাথে বাকী প্রসাধনটুকু শেষ করে নিই লঘু হস্তে। তারপর বাইরের ঘরে এসে আর একবার দৃষ্টিপাত করি বাইরের ল'নে। সন্ধ্যার অন্ধকার ততক্ষণে চারিদিকে কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে। বিশেষ কিছুই নজরে এলো না।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ভাবছিলাম, বেয়ারা মারফৎ কর্তাদের ভিতরে এসে গল্প করার অনুরোধ জানাব। হঠাৎ কার হাসি দমকা বাতাসে ছুটে এসে আমার সমস্ত মনটাকে তোলপাড় করে দিলো। সমস্ত শরীর শিহরিত করে সমস্ত হৃদয় দিয়ে—অনুভব করলাম আনন্দকে আমি ভুলিনি। আজও তার হাসিতে তেমনই অনুরণন জাগে আমার অন্তরের নিভৃত কোঠায়। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এগিয়ে এলাম সামনের করিডর দিয়ে লনের কোলে ঝুলে-পড়া বগেনভলিয়া লতার আড়ালে। সেইখান থেকে আমার সজাগ শ্রবণশক্তি ওদের প্রতিটি কথা শোনালো আমায়।

আনন্দ বলছে—"হাসালেন মশায় হাসালেন। কোথায় ঠাণ্ডা। এইতো বেশ জমছে। ওই মোটা ওভারকোট আর কমফার্টারেও শীত করছে আপনার? এমন সন্ধ্যা কী ঘরের ভেতর দরজা এঁটে বসে থাকবার জন্যে? নাঃ দেখছি এমন বাংলোটা ভালো করে উপভোগ করেন না আপনি।" আমার নিরীহ কর্তাটি আর বিশেষ কিছু বলবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না বোধ হয়। অগত্যা সম্মতির সুরে বললেন, "তবে থাক আপনার যখন ভাল লাগছে। ওরে কে আছিস একটা আলো আনিস আর একটু কফি। সেই সঙ্গে আমার আলোয়ানটাও আনিস বাবা!"

আমার কিন্তু ভগবানের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে মিঃ সান্যাল। ভারী অবিবেচক সে ভদ্রলোক। আপনার বদলে এইখানে যদি আমায় পোষ্টেড করতেন কী আর এমন ক্ষতি হোতো তাঁর? আমিও কাছাকাছি রোজই একটু শিকার করতে পেতাম আর আপনাকেও কলকাতার সব সুখ বিসর্জন দিয়ে এত কষ্ট করে এখানে পড়ে থাকতে হোতো না।

মৃদু-মন্দ সমর্থনের হাসি ভেসে এলো অপর পক্ষের কাছ থেকে। বুঝলাম, স্বদেশ-বিরহীর কথাটা বেশ মনোমত হয়েছে। "তা-ঝা বলেছেন। নেহাৎই চাকরীর দায়ে, তা না হোলে এই বনে বসে বন্য প্রকৃতি দেখে তন্ময় হোয়ে থাকবো এমটা কাব্য-রসিক আমি নই।" আবার সশব্দে হাসলো আনন্দ। গাছের মাথায় একটা পাখী ঝটপট করে উড়ে গেল মনে হোল। বললে—"যাবেন নাকি পরশু দিন সামনের ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে ওপাশের জঙ্গলে। বিগ গেম আশা করতে পারি আমরা ওদিকটায়।"

সান্যাল মশাই বললেন—"রক্ষে করুন মশাই! ওদের সাথে দেখা করবার মোটেই আগ্রহ নেই আমার। তার চেয়ে বরং জমিয়ে একটা শিকারের গল্প বলুন দেখি, দিব্যি জমবে শীতের সন্ধ্যায়।"

"আচ্ছা, এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমার চেয়ে ভাল একটি শ্রোতা আছে, তাকে ধরে আনি।" অপর পক্ষের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়েন ভদ্রলোক—গৃহমুখো বাঙালী কি না।

এতক্ষণে খেয়াল হয় আমার। এভাবে লুকিয়ে ওদের গল্প শোনা আড়ি পাতবারই নামান্তর। কর্তাই বা কী ভাববেন আমায় এ অবস্থায় দেখলে! চকিতে ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়। উনি অন্ধকারে ধীরে ধীরে আসেন। চাকরটাকে ধমক লাগান আলো না জ্বালানর অপরাধে। শোবার ঘরে ঢুকে বলেন আমায়—"বাইরে এসো না একটু। এক ভদ্রলোক—নাম করা শিকারী এসেছেন আলাপ করতে। তাঁর শিকারের গল্প বলবেন শুনবে চলো।"

এড়াবার চেষ্টা করি, "বড্ডো মাথা ধরেছে ভাল লাগছে না।" উনি ছাড়েন না, বলেন—"আরে। আমারই কী ভাল লাগছে ঐ কাঠগোঁয়ারটার সাথে বকতে? চলো চলো বাইরের হাওয়ায় মাথাধরা কমে যাবে'খন।"

বেশী অনিচ্ছা প্রকাশ করার মতো জোর পাই না যেন। ভালমানুষের মতো আলনা থেকে কালো স্কার্ফটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে।

সামনের ছোট টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে বাতাসে কেঁপে কেঁপে। চারিদিকের বড় গাছের মাথায় শনশন করে উত্তুরে বাতাসের দাপাদাপি আর পাতা ঝরানোর খেলা—রীতিমত কনকনে ঠাণ্ডা। গল্পের পরিবেশটি চমৎকার!

আমার কিন্তু গল্প শোনার মেজাজ নেই আদপেই। সংকোচে আর ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হোয়ে উঠেছে দেহ-মন। মোটেই চাই নি আনন্দ আমায় চিনুক। নিজের মুখটাকে তাই যতটা সম্ভব ফিরিয়ে রেখেছিলাম আলোর দিক থেকে, আর শরীরটাকে যতটা পারা যায় লুকিয়েছিলাম কালো স্কার্ফটার আড়ালে। আমার স্বামী পরিচয় করালেন—ইনি শ্রীআনন্দ রায়—মস্ত বড়ো শিকারী। আর ইনি শ্রীমতী অমিতা সান্যাল—আমার স্ত্রী। বাধ্য হোয়ে সৌজন্য জানাতে

নমস্কার জানালাম। প্রতিদান নিতে গিয়ে চকিত চাহনিতে বুঝলাম, আনন্দ আমায় চিনেছে। খুবই ভয় হোল আমার। মনে হোল, ওকে যে আমি চিনি প্রথমেই সে কথা স্বীকার করা উচিত ছিল আমার; পরে জানা গেলে আরও বিশ্রী হবে। কিন্তু পারলাম না, কোন কথাই জোগালো না মুখে। নিজের মনের দুর্বলতা কণ্ঠরোধ করে রইলো আমার।

আনন্দ কিন্তু বেশ সহজ হাস্যে বললে—"অনেক ধন্যবাদ সান্যাল মশাই, এমন একটি শ্রোতা জোগাড় করে দেওয়ার জন্যে। তবে আপনাকে ধন্যবাদের সঙ্গে অভিনন্দনও জানাতে ইচ্ছা করছে আমার। আপনি মশায় অত্যন্ত ভাগ্যবান। এমন নন্দন কাননের মতো জায়গায় এমন স্ত্রী নিয়ে যিনি বাস করেন তিনি তো ইন্দ্রতুল্য সুখী।"

স্ত্রীর এ-হেন প্রশংসায় মেজাজ খুলে গেল সান্যাল মশায়ের। সহাস্যে বললেন—"ইন্দ্রত্বের বিপদও কম নয় মশাই! আপনার মতো কত দানবের লোভ। একটু আগেই তো বাংলোর মালিকানা পাল্টাপাল্টি করতে চাইছিলেন—স্ত্রীর বেলায় যেন সেরকম কিছু করবেন না।"

হা হা করে হাসলো আনন্দ। আমার মনে হোল ওর হাসি যেন কাচের টুকরোর মতো খান্‌-খান্‌ হোয়ে ছড়িয়ে গেল চার দিকে। সান্যাল আবার বললেন, "নিন্‌ সুরু করুন আপনার গল্প। নইলে গল্প জমবার আগেই আমরা জমে যাবো যে।"

—"না সত্যি, বাইরে বসে গল্প শোনা সান্যাল মশাইয়ের অভিজ্ঞতায় একটা লোমহর্ষক ব্যাপার! আর দেরী নয়—সুরু করি।"

"—শিকার করতে আমি চিরদিনই ভালবাসি। আশে-পাশে নানা জায়গা থেকে সুরু করে বহু দূর-দূরান্তর পর্য্যন্ত শিকারের নেশা আমায় ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। তবে কাছে-পিঠের মধ্যে রাঁচী আমার বেশী ভাল লাগে। একটু ছুটি পেলেই নিজের মোটরটি নিয়ে রাঁচী চলে যাই। নামে অবশ্য রাঁচীই বলছি, তবে বেশীর ভাগ সময়ই কাটে নেতের-হাট বা চক্রধরপুরের জঙ্গলে। আপনারা রাঁচী গেছেন? গেছেন হয়তো, একটু-আধটু বেড়িয়েও এসেছেন আশে-পাশের পাহাড়ে রাস্তায়। কিন্তু আমি যে সব জায়গায় ঘুরেছি সে সব পথ আপনার মত নিরীহ ভদ্র-সন্তানদের জন্য নয়—সে সব আমাদের মতো বন্ধুদের জন্যই অর্থাৎ শিকারীরা ছাড়া সে রাস্তায় আর কেউ যায় না। যে বছরের কথা বলছি সেবার প্রথম দিন রাঁচীতে পৌঁছে একটু আয়াস করে কাঁকে রোড ধরে বেড়াতে বেরিয়েছি, হঠাৎ কলেজের ক্লাসফ্রেণ্ড অরিন্দমের সাথে দেখা। আমায় দেখে ও যেন হাতে স্বর্গ পেল। এক রকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেল আমায়—ওদের বাড়ীতে। খুব একটা আগ্রহ নিয়ে অবশ্য যাইনি, ওদের বাড়ী, কিন্তু পরে বুঝলাম না গেলেই আমার লোকসান হোত। ওদের অবস্থা যে ভাল তা জানতাম কিন্তু এত ভাল তা জানতাম না।

"ওর বোন সুস্মিতার সাথে আলাপ হোল। ওরা দুটি ভাই-বোনেই সেবার রাঁচীতে বেড়াতে এসেছিলো। বলতে কি, হাঁফ ছাড়তে এসেছিলো আই-এ আর এম-এস-সি পরীক্ষার পর। সঙ্গে কয়েকজন বেয়ারা দ্বারোয়ান ছিল অবশ্য। যাই হোক, ভূমিকা রেখে আসল গল্পে আসি। সুস্মিতাকে দেখে আমি মুগ্ধ হোয়েছিলাম। কিছুদিনের মতো বিশ্বভুবন ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়। দু'বেলাই ওদের চায়ের টেবিলে সুস্মিতার হাতের চা না খেলে চায়ের কোন স্বাদই পেতাম না আর। বলতে লজ্জা নেই, দু'বেলার চাপর্বের মাঝের পর্বটা অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজনটাও সে সময় প্রায় সব দিনই ওখানে সমাধা হোত। কী যে যাদু করেছিলো আমায়—"

এই পর্য্যন্ত শুনে সহাস্যে টিপ্পনি কাটলেন সান্যাল মশাই—"এটা কী শিকারের গল্প মিঃ রায়?" গল্পটা যে কী শিকারের তা বুঝেছি আমি। আর যতই বুঝছি ততই কাঠ হয়ে যাচ্ছি ভিতরে। ওর গল্প আর শীতের কুয়াশা আবছা করে তুলেছে আমার বর্তমান সত্তাকে। টেনে বের করে এনেছে সতের বছরের একটি মেয়ের প্রথম প্রেমের পরশ-লাগা ভীরু কাঁপা মন। সান্যালের বুদ্ধির অগম্য ওর গল্পের তাৎপর্য্য। তারিফ করতে হয় ওর উদ্ভাবনী শক্তির। চক্ষের পলকে অরবিন্দকে অরিন্দম আর অমিতাকে সুস্মিতা বানিয়ে অম্লান বদনে চালিয়েছে ওর গল্প।

সান্যাল মশাইয়ের প্রশ্নেও বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হয় না আনন্দ। সে ধারা ওর স্বভাবে মোটেই নেই যে। রহস্যের হাসি টেনে বলে—"উঁহু এখন রসভঙ্গ নয়, সান্যাল মশাই! শুনুন আগে"—

সেদিন সুস্মিতার চোখে 'হিরো' ছিলাম আমি! অপরিসীম বিস্ময় আর অসীম শ্রদ্ধায় আয়ত নয়ন আমার মুখের পরে মেলে ধরে হাতের পরে গাল রেখে নিবিষ্ট মনে শুনতো আমার শিকার কাহিনী। আমিও সেই সময়ে বেশ দিনকতক

শিকার করার চাইতে শিকারের গল্প বলাটাকে অনেক বেশী মহৎ কাজ বলে ধরে নিয়েছিলাম। সে আসরে সময়ের মাত্রা ছিলো না মোটেই। গল্পের মধ্যেও সত্যের কিছু হয়তো অপলাপ ঘটে থাকতে পারে। তবে শিকারীর সে সময়ের মর্য্যাদার কথা স্মরণ করলে আর মিথ্যাবাদী বলে গাল দেবেন না, কেউ আশা করি। কাটছিলো ভালই। বাদ সাধলে আমার বন্ধুটি। ক্রমাগত শিকারের গল্প শুনে শুনে দিন পনের বাদেই দেখলাম ওর শিকারের নেশা লেগেছে। আমি ওদের বুঝিয়ে শান্ত করবারই চেষ্টা করেছিলাম; কারণ ওদের মতো আনাড়িকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে যাবার মতো পাকা শিকারী আমি তখন মোটেই হইনি। অথচ সেকথা খুলে বলবার সাহস ছিল না। তবু বললাম, ঘরে বসে শিকারের গল্প শোনা আর শিকার করা এক জিনিষ নয়। যত বলি ততই ওরা বেশী উৎসাহ পায়। একে নতুনত্বের গন্ধ তাতে আবার অ্যাডভেঞ্চারের মোহে ক্ষেপেছে অরিন্দম; তাকে আর কিছুতেই ঠেকানো গেলো না।

ভয়ের মতো সাহসও বড় ছোঁয়াচে ব্যায়রাম। সুমিতার রক্তেও তার দোলা লাগলো সহজেই। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কথায় কর্ণপাতও করলে না ওরা। তাই শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই ওদের কথায় কর্ণপাত করতে হোল। অবশেষে আমারই ফর্দ মাফিক বড় সাইজের টর্চ, বড় বড় ফ্লাস্ক আর ছোট সাইজের বিছানা এলো। এমন কি উৎসাহের মাথায় ওদের ব্রিচেস পর্য্যন্ত এলো। তার পর দিন তিনেকের মত রসদ বোঝাই করে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে এক দিন সূর্য্যোদয়ের মুহূর্তে আমরা বেরিয়ে পড়লাম চক্রধরপুরের রাস্তায়। আমার রাইফেল দুটোও যে সঙ্গে ছিলো, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সেদিনের সেই যাত্রাপথে আনন্দটুকু আজও আমার মনে আছে। অফুরন্ত হাসি আর খাওয়া, তারই ফাঁকে ফাঁকে সুমিতার গান। অরিন্দম অবশ্য অতটা কাব্যময় নয়। ওর মনোযোগটা খাওয়াতেই বেশী। আমি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করেছিলাম,—"যদিও এক গরুর গাড়ী আন্দাজ খাবার আমাদের সঙ্গে আছে, তবু অরিন্দম যে রেটে চালিয়েছে, তাতে শেষের দিন আমাদের সকলকে না শিবরাত্রি করতে হয়।" এমনতর আরও কত লঘু পরিহাস ছড়িয়ে আমরা যেন হাঁসের মতো উড়ে চলেছিলাম। পাহাড়ের নিষ্প্রাণ রাস্তা আর জঙ্গলের খাপছাড়া গাছপালা সেদিন আমাদের চোখে কী যে রঙে-রসে ভরপুর ছিলো, আজ আর তা ভাষায় বলা অসম্ভব!

ঠিক কত মাইল, তা আর মনে নেই। আমাদের গাড়ী বহু রাস্তা পেরিয়ে একেবারে বিকেল চারটের একটা ডাকবাংলোর সামনে আমাদের পৌঁছে দিলে।

ভারী ভালো লাগলো বাংলোটা। চারি দিকে পাখী কিচির-মিচির লাগিয়েছে। বোধ হয় দিনান্তের আশ্রয় সন্ধানে মিটিং করছে ওরা। বিকেলের সোনালী রোদ বুনো গাছপালার মাথায় নাচছে যেন।

অরিন্দম প্রথম প্রয়োজনগুলো সেরে পেট পুরে খাবার খেলে। তার পর উৎসাহের মাথায় ছবিও তুললে গোটা কতক। তার পর একটা ইজিচেয়ারে ভাল করে গা এলিয়ে দিলে। আমি ভাবছিলাম, দু'-একটা সাঁওতাল কুলী ডাকবো। ওরাই ভাল জানে, কোথায় কি ধরণের শিকার মেলে। ওদের সাহায্য নিলে শিকারের সুবিধা অনেক। আমার উদ্দেশ্য আভাসে ব্যক্ত করতেই অরিন্দম বললে—"আজ আমরা এইখানেই থাকি না কেন? দিব্যি বাংলোটি। তা ছাড়া সন্ধ্যা হোয়ে এলো, রাত্রিতে আজ আর জঙ্গলের মধ্যে না যাওয়াই ভাল না কি?"

ওর কথা শেষ হবার আগেই পাহাড়ী-ঝর্ণার মতো হেসে গড়িয়ে পড়লো সুমিতা। বললে—"তবেই তোমার শিকার করা হয়েছে দাদাভাই! শিকার কি এই ডাকবাংলোয় এসে ডেকচেয়ারে বসে তোমার সঙ্গে আলাপ করবে না কি?"

অরিন্দম বললে—"না বাপু, এত রাস্তা মোটরে এসে আমার ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। আজ আর নড়ছি না আমি।" বাস্তবিক সুমিতা অনেক টানাটানি করেও তুলতে পারলে না তার দাদাকে। মোটরে দীর্ঘ-পাড়ির ক্লান্তি আর পাহাড়তলীর ঠাণ্ডায় বড়লোকের আদুরে ছেলেটি একেবারে মিইয়ে গেছে। তখন ওকে ষ্টীম দিতে পারে, এত উত্তাপ ফ্লাস্কের চায়েও ছিলো না। সুমিতা কিন্তু অত সহজে ছাড়বার মেয়ে নয়, সে মন্দ-মন্থরে সন্ধ্যার আগমন দেখেও তখনই পাখা বন্ধ করতে রাজী হোল না। অগত্যা একটু পরেই ফেরবার আশ্বাস দিয়ে অরিন্দম আর লোকজন সমস্ত পিছনে ফেলে আমি ওর পিছু নিলাম, বন্দুকটা কাঁধে ফেলে। হাজার হোক, অবলা নারী তো। ঝোঁকের মাথায় যাচ্ছে বলেই কি অমন করে ওকে যেতে দেওয়া যায় সে-রাস্তায়!

তার পর? দোহাই সাহিত্য মশাই, সে-সময়ের প্রতি পদক্ষেপের বর্ণনা দিতে আদেশ করবেন না। কবি নই। ঝুম করে রসভঙ্গ করে বসবো। তবে এটুকু বলতে পারি, বলাকার মতো সবটা উড়তে না পারলেও মনটা উড়ু-উড়ুই করছিলো যেন। মনে হচ্ছিলো, সমস্ত লোকালয়ের বাইরে চুরি-করা সন্ধ্যাটি আর যেন না ফুরায়। আমার এক হাতে বন্দুক আর এক হাতে সুমিতার হাতটা আমার কোটের পকেটে টেনে রাখা। সুমিতার এক হাতে টর্চ। কতক্ষণ চলেছিলাম, বলা অসম্ভব। দুজনেই চলেছি নীরবে, শুধু সেই কনকনে হাওয়ায় পরস্পরের সান্নিধ্যের উষ্ণতাটুকুতে সমস্ত অনুভূতি ভরে। অন্ধকার কখন গাঢ় হোয়েছে, খেয়াল হয়নি। শীতের কুয়াশায় আবছা তৃতীয়ার চাঁদ ম্লান জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আমাদের চেতনা ফেরাতে পারে নি। আমরা তখন 'চলতি হাওয়ার পন্থী'। চেতনা ফিরলো যখন, হাত বিশেক দূরে একটা ভালুককে একমনে আমাদের যুগলমূর্ত্তি দেখতে দেখলাম।

চকিতে হাত ছাড়িয়ে গুলী ছুঁড়লাম। ভালুকটাও দুলে উঠলো মনে হোল। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী দুলে উঠলো সুমিতা। তার হাত থেকে টর্চ পড়ে পাথরে ঠোক্কর খেয়ে একেবারে চির-অন্ধকারে ডুবে গেল। সুমিতাকে নিয়ে সম্মুখ সমরে আর সাহস পেলাম না। আর তা সম্ভব ছিল না মোটেই। কারণ সুমিতা তখন আমায় প্রায় জড়িয়ে ধরে আছে। তাড়াতাড়ি সবচেয়ে কাছের গাছটায় ওঠবার কসরৎ সুরু করলাম দু'জনে। ভালুকটা মরেনি, তবে গুলী খেয়ে দিশেহারা হোয়ে গেছে—টলতে টলতে আসছে আমাদের দিকে। সুমিতাকে নিয়ে গাছে ওঠা সহজসাধ্য ছিলো না মোটেই। সে বেচারা জীবনে একটা গাছের ডাঁটিতে দোলাও দেয়নি। খানিকটা উঠেই ওর পা হড়কালো। [illegible]

বটে কিন্তু বন্দুকটা পড়ে গেল আমার হাত থেকে। অবস্থা বুঝুন একবার। ভালুকটাও ততক্ষণে গাছের তলায় এসে পৌঁছে গেছে। নেমে বন্দুক তুলে আনাও অসম্ভব। প্রায় দুর্গানাম জপ সুরু করেছি গাছের ওপর বসে। তবে ভগবান সহায়—ভালুকটার অদৃষ্টে গাছে উঠে আমাদের আক্রমণ করবার মতো শক্তি সঞ্চয় করা আর হোয়ে উঠলো না। বার কতক তর্জন গর্জন করে তার আগেই সে ভূমিশয্যা নিলো।

তার পর? রাতের কথা আর টানবো না। প্রভাতে মরা ভালুক আর বন্দুক নিয়ে আমরা যখন ফিরলাম বাংলোয়, অরিন্দম তখন ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে। চাকরগুলো জোর করে ধরে রেখেছে তাকে, নইলে সে নাকি রাতেই আমাদের খুঁজতে বেরোত। আমাদের দেখে রাগ করা বকাবকি করা চুলোয় যাক, সেই যে কি বলে—'হারানিধি পাইনু বলি হৃদয়ে লইলো তুলি—রাখিতে না সহে অবকাশ।' আমাকে তো তার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষাই নেই, আমি না থাকলে সে সুমিতাকে কী ফিরে পেতো আর? কলকাতায় ফিরলে অরিন্দমের পোড়া মুখখানা আর কী দেখতো কেউ?

আর আমরা? অর্থাৎ আমি আর সুমিতা কী করলাম তাইতো শুধোচ্ছেন? কী আর করবো? রোমান্সটুকু বাদ দিয়ে রোমাঞ্চটুকু পরিবেশন করলাম ওদের। শিকারের মধ্যে একটা ভালুক কিন্তু শিকারের কাহিনীতে মনের ডায়েরীর অনেকগুলো পাতা তখন ভরা হয়ে গেছে।

এই পর্য্যন্ত বলে একবার হাতঘড়িটা দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আনন্দ—"আজ চলি মিঃ সান্যাল! অনেক রাত হোয়ে গেছে।" অনেক রাস্তা যেতে হবে। উত্তরে আমার স্বামী কী বলেছেন শুনতে পাইনি আমি। ভারী পায়ের বুটের আওয়াজ মিলিয়ে গিয়ে জিপের যন্ত্র-দানবটা গর্জন করে ছুটে চলে গেলো—অন্ধকারের মধ্যে। আর তারই চলার পথের হাওয়া লেগে কতকগুলো ঝরা-পাতা উড়ে গেলো ফরফর করে। এতক্ষণে আবার নতুন করে বাতাসের হিমেল স্পর্শ অনুভব করলাম—ভারী মিষ্টি লাগলো। ও যেন আমার ঘরছাড়া গায়ে শেষরাতের ঝিরঝিরে বাতাস। তবু চেপে ধরলাম গায়ের কালো স্কার্ফটা।

বাতাসের ওই স্পর্শটুকুকে আমি যে বুকের মাঝে চেপে রা[খতে] চাই। ঝরা-পাতার মতো উড়িয়ে দিতে তো চাই না। আমার চুরি করা রক্তগোলাপ। সবার সামনে খোঁপায় পরার যদি ওকে নাও দিতে পারি, বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখলে দো[ষ] নেই?

প্রতাপাদিত্যের গোবিন্দ-বিগ্রহ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক উড়িষ্যা হইতে আনীত গোবিন্দদেবের বিগ্রহ রাজা বসন্ত রায়ের বংশধরগণের যত্নে বসিরহাটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিগ্রহের সহিত মোগল-প্রাধান্যকালের বাঙ্গালার শৌর্য্য-বীর্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠার স্মৃতি বিশেষ ভাবে বিজড়িত। বিগ্রহটি কষ্টিপাথরের—দ্বিভুজ মুরলীধর গোবিন্দ মূর্ত্তি। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে তাঁহার পতনে মোগলসম্রাটের সেনাপতি মানসিংহকে সাহায্যকারীর বংশধর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভার অলঙ্কার ভারতচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"যশোর-নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
যত মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
তাহে নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
কিছু ভয়ে যত ভূপতি তটস্থ॥
ভ. বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
রক্তেও ও বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
কথায় ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
ওদের ক যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

প্রতাপ বাঙ্গালী জমিদার হইয়া এরূপ বিক্রমশালী হইয়া উঠেন যে, তিনি আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন—মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার হীনতার পরিচায়ক মনে করিতেন। তাঁহার সেনাবল—

(১) বাহান্ন হাজার পদাতিক সৈন্য
(২) ষোড়শ দশ হস্তিসৈন্য
(৩) দশ হাজার অশ্বারোহী সৈনিক

ভারতচন্দ্র একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই—প্রতাপের সামরিক নৌবহর। তিনি যে নৌবহর রাখিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় এখনও "জাহাজঘাটা" প্রভৃতি নামে জানিতে পারা যায়।

যাঁহার বিক্রম এইরূপ, তিনি যে বাঙ্গালার বহু রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাইবেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। প্রতাপ আসামের রাজাকেও পরাভূত করিয়া আসাম স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি সেনাবল লইয়া উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। তাঁহার উড়িষ্যায় গমনের কারণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই। হয়ত উড়িষ্যা-জয়ের সুবিধা ও অসুবিধা লক্ষ্য করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

উড়িষ্যার পুরী হইতে তিনি গোবিন্দজীর বিগ্রহ আনয়ন করেন। উড়িষ্যাবাসীরা তাহাতে বাধা দিলে জলেশ্বর প্রভৃতি স্থানে তাহাদিগের সহিত প্রতাপের যুদ্ধ হয় এবং জয়ী প্রতাপ ঐ বিগ্রহ স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন। বিগ্রহটির জন্য তিনি অষ্টধাতুর রাধাবিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

রামগোপাল রায় লিখিয়াছেন :—

"নীলাচল হতে গোবিন্দজীকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তিযশ ঘোষয়ে ধরণী।
মহারাষ্ট্রীসনে তাতে যুদ্ধ বহুতর।
কতেক লিখিব সেই লিখিতে বিস্তর।
জলেশ্বর পাটনায় হইল সংগ্রাম।
জিনি মহারাষ্ট্রীগণে রাখিলেন মান।"

রামগোপাল উড়িয়াদিগকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

প্রতাপ (কালীগঞ্জ থানার এলাকায়) যে গ্রামে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন—তাহার গোপালপুর নামকরণ করেন।

বাঙ্গালার পুরাকীর্ত্তি-তালিকায় দেখা যায়—ঐ স্থানে চারিটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতাপ একটিতে গোবিন্দদেবের বিগ্রহ (রাধাসহ) স্থাপিত করেন। যখন পূর্ব্বোক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়, তখন তিনটি মন্দির ভূমিসাৎ হইয়াছে—একটি মাত্র বিদ্যমান। চারিদিকে চারিটি মন্দির—মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ। তালিকা সঙ্কলনকালে কেবল পূর্ব্বদিকের মন্দিরটি বিদ্যমান ছিল। মন্দিরের দ্বিতলে গম্বুজ ছিল কি চূড়া ("রত্ন") ছিল, জানিবার উপায় নাই। তখনই পূর্ব্ব দিকের মন্দিরের উপরতল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দ্বিতলে উঠিবার সোপানশ্রেণী ছিল। বিগ্রহ প্রথমে দ্বিতলে অবস্থিত ছিল। মন্দিরে কোন উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায় নাই—প্রাচীরগাত্রে হিন্দু দেব-দেবীর

বিগ্রহ

মূর্ত্তি ক্ষোদিত (ইষ্টকে ?)—কারুকার্য্য প্রশংসনীয়। মন্দিরগুলির সম্মুখে একটি দোলমঞ্চ ছিল। গোপালপুর প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর বা ঈশ্বরীপুর হইতে মাত্র তিন মাইল দূরবর্ত্তী—যমুনা নদীর কূলে অবস্থিত। বিগ্রহ—মন্দির ভগ্ন হইলে—পুরুষানুক্রমে পূজারী অধিকারীদিগের গৃহে—রায়পুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। প্রতি বৎসর দোলের সময় বিগ্রহ বসন্ত রায়ের বংশধরদিগের বাসস্থান নূরনগরে লইয়া যাওয়া হইত।

গোপালপুরে মন্দিরের নিকটে একটি শত বিঘাব্যাপী দীর্ঘিকা খনন করান হইয়াছিল।

প্রতি বৎসর দোলযাত্রার সময় নূরনগরে—গোবিন্দজীকে উপলক্ষ করিয়া বিরাট মেলা হইত।

রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর শ্রীরাজা লালমোহন রায় ও শ্রীরাজা নেপালচন্দ্র রায় বিগ্রহ বসিরহাটে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের সহযোগিতায় উপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। মন্দিরটি যদি গোপালপুরের মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হয়, তবে তাহা পুরাতন সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন হইবে।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য সভা—মধ্যস্থলে স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, বামে প্রধান-অতিথি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দক্ষিণে শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মার্গারেটের প্রতি

[*Mathew Arnold*-এর 'To Marguerite' কবিতা অবলম্বনে]

সীমিত সত্তার মাঝে নির্বাসিত জনহীন বালুকাবেলায়
অনন্ত সমুদ্র-মাঝে এ জীবন পুঞ্জীভূত প্রাণের প্রবাল
বিচ্ছিন্ন এক একটি দ্বীপ সমাহিত মৌন বেদনায়
চারিদিকে শুধু জল অজস্র তরংগক্ষুব্ধ বিপুল বিশাল।

কিন্তু যখনি চাঁদ হাসি ঢালে হিন্দোলিত বসন্ত বাতাসে
মায়াবী আঁচল হতে মুঠো মুঠো মৃদুমন্দ স্বপন ছড়ায়
সহসা সম্ভোগরত কোন পাখি গান গায় ক্লান্ত নিঃশ্বাসে
উতলা রাতের প্রান্তে মিলন-নিবিড় কোন উষ্ণ কুলায়,—

তখনি হতাশাহিম সপিল কামনা এক উঁকি মারে মনের বিবরে
অশরীভূত দুটি প্রাণ মিলনের সেতুপ'রে এক হ'ব তোমায় আমায়
অধীর আগ্রহ বুকে আশাবরী সুর বাজে প্রতীক্ষিত প্রাণের বাসরে
মদির-মিলন-স্বপ্নে রোমাঞ্চিত হৃদয়ের সূক্ষ্ম বীণায়।

নিমেষে মনে হয় যেন ভেঙ্গে ফেলি বিরহের সব ব্যবধান,
শিরায় শিরায় জাগে নিষ্ফল বেদনার বিষণ্ণ তুফান।

হয়ত মায়াবী কোন ঈশ্বরের কঠোর আদেশে
কল্পিত মিলননাট্যে কে যেন গো টেনে দেয় বিরহের কৃষ্ণ-যবনিকা
কামনার আগুন সব নিমেষেতে নিবে যায় দুরন্ত বাতাসে
লবণ-সমুদ্র শুধু তরংগ আঘাতে ভাঙ্গে জীবনের ত্রস্ত তটরেখা।

অনুবাদ—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ
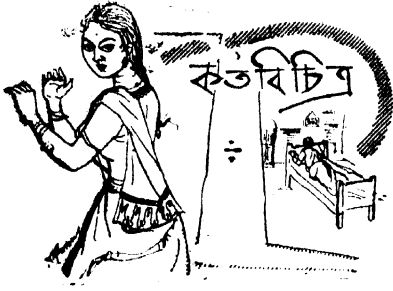
অনিলবরণ ঘোষ

ছিমছাম একটা ফ্ল্যাট বাড়ী। গভীর রাত। কক্ষপথ ধরে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। কিন্তু শ্যামলের চোখে ঘুম নেই। ছটফট করে বিছানায়।

দশ বছরের বিবাহিত জীবনে স্বপ্নাকে ছেড়ে একাকী শোয়া আজই অবশ্যি প্রথম নয়। পর পর চারটি সন্তানের জন্মের সাথে বিরহ-শয্যাও ওর পরিচিত হয়ে গেছে। কিন্তু আজকের এই একাকী ঘুমানোর অর্থ যে অন্য রকম। স্বপ্না আজ জোর করে ওকে ভিন্ন ঘরে চালান দিয়ে দু'ঘরের মধ্যকার দরজাটা শক্ত হাতে বন্ধ করে দিয়েছে। আর সন্তান চায় না স্বপ্না। ছ'বছরে চারটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সে ভয় পেয়ে গেছে। শ্যামলকে এড়িয়ে চলে, সাথে শুয়ে ভয়ে ঘামে, শ্যামল না ঘুমান অবধি জেগে থাকে।

শ্যামল কত বুঝিয়েছে, কত পথ বাতলিয়েছে। ওর একটা বুদ্ধি, একটা পরামর্শও স্বপ্নার ভাল লাগেনি। ঘেন্না করে, ভয় করে ওসব কথা ভাবতে। ওসবের চেয়ে দু'জনের দু'ঘরে শোয়া অনেক ভাল, অনেক সহজ।

এ ব্যবস্থায় মরীয়া হয়ে শ্যামল প্রতিবাদ করেছে, বাধা দিয়েছে। ওর কোন কথাই আমল দিতে রাজী নয়, কোন যুক্তিই শুনবে না স্বপ্না। জোর করেই স্বামীকে সে তফাৎ করে দেয়।

স্বপ্নার এ ব্যবহারে ব্যথা পায় শ্যামল। অভিমান জাগে। এ নিয়ে আর একটি কথাও সে তোলে না। খেয়ে দেয়ে গট-মট করে নিজের ঘরে ঢুকে খিল এঁটে শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর স্বপ্নার ঘর থেকেও খিল আঁটবার আওয়াজ পাওয়া যায়। পাশ-বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে শ্যামল চোখ বুজে থাকে। স্বপ্নার ঘর থেকে একটা বাচ্চার কান্না উঠল, কি যেন ছড়া কেটে স্বপ্না ওকে শান্ত করে। স্বপ্নার ঘর থেকে পাউডারের সুগন্ধ ভেসে আসে। শোবার আগে পাউডার প্রসাধন স্বপ্নার বহু দিনের অভ্যেস। পাউডার প্রসাধনের পরে খোঁপা-বাঁধা চুলগুলি শক্ত একটা বেণীতে বাঁধবে, গলার হার আর কানের দুল দু'টি খুলে বালিশের নীচে রাখবে, তার পর শোবে।

একটা অদৃশ্য পর্দায় ও ঘরের দৃশ্যগুলি একে একে ফুটে ওঠে, চোখ বুজেই শ্যামল দেখতে পাচ্ছে সব। খুট করে ও ঘরে সুইচের আওয়াজ। আলো নিবিয়ে স্বপ্না শুয়েছে।

বিছানায় শ্যামল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চোখ বুজে থাকে। স্বপ্নার ঘর থেকে আর কোন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। শ্যামল ছটফট করে, চোখ মেলে তাকায়। নাক বরাবর মশারির উপর নির্বিকারে একটা টিকটিকি ঘুরছে। ল্যাজ নেড়ে মশা ধরে খাচ্ছে, আর চোখ পাকিয়ে ওকে দেখছে।

পাশ ফেরে শ্যামল। এপাশ-ওপাশ করে। চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে আসে। বৃথা চেষ্টা। ঘুম আসে না।

অভিমানের মাথা খেয়ে এক সময় সশব্দে দোর খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। স্বপ্নার দরজার সামনে গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, দেশলাইটা দাও।

একটু সময় চুপচাপ। স্বপ্নার কণ্ঠে শোনা যায়, এত রাত্তিরে দেশলাই দিয়ে কি হবে।

—দরকার আছে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। স্বপ্নার কোন সাড়া নেই। অসহিষ্ণু শ্যামল তাড়া দেয়, কি হ'ল ?

—কোথায় রেখেছি মনে পড়ছে না।

শ্যামলের মনে হয়, অতি কষ্টে স্বপ্না হাসি চাপছে। গুম হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে এক সময় হুঙ্কার ছাড়ে। মনে পড়ছে না বললেই চলবে, খুঁজে দাও।

বিরক্ত কণ্ঠে স্বপ্না জবাব দেয়, রাত দুপুরে কি গোলমাল করছ, চার পাশে লোকজন রয়েছে, খেয়াল নেই ? জ্বালাতন কর না, যাও, ঘুমিয়ে থাকগে।

স্বপ্নার বক্তৃতায় রাগে শ্যামলের আপাদমস্তক জ্বলে যায়। একবার ভাবে, দরজা ভেঙে দেখিয়ে দেবে কি পরাক্রম। অতি কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ফিরে আসে ঘরে।

রাত গড়িয়ে যায়। একটা, দুটো, তিনটে। হাত-পায়ে জ্বালা শুরু হয়েছে। মাথা ঝিম-ঝিম করে। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। ভাবে, আর একবার চেষ্টা করে দেখবে কি ? আবার একটা কিছু ছুতো ধরে যাবে কি স্বপ্নার দরজায় ? অভিমান ফুঁশিয়ে ওঠে। দরকার নেই অত নীচু হবার।

কিন্তু এমন করে স্বপ্নার দূরে সরে যাওয়াটা যে কিছুতেই সহজ করে নিতে পারছে না শ্যামল ? স্বপ্না যে কখনও ওকে ভয় করে দূরে সরে থাকবে, এ কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল শ্যামল ? এই সেদিনও ওদের জীবন ছিল কত না মধুর, সুখ কল্পনার ঠাশ বুনানিতে ঠাশা। প্রথম সন্তান হবার পর স্বপ্নার কি আনন্দ ! আনন্দ অবশ্যি শ্যামলেরও কম হয়নি। কিন্তু সংসারের খরচ বেড়ে যাওয়ায়, সুদূর পশ্চিমের একটা শহরে বেশী বেতনের কাজ নিয়ে যেতে চেয়েছিল সে। স্বপ্নার জন্যই শেষ পর্যন্ত যাওয়া হ'ল না। যেতে দেয়নি স্বপ্না। অভিমান করে, কেঁদে একশা। কলকাতা ছেড়ে সে অন্য কোথাও থাকতে পারবে না। তার ওপর শ্যামলকে ছেড়ে রাত্রিবাস,—অসম্ভব !

বছর না ঘুরতে আবার আসে সন্তান। দু'বছর পরে আরেকটি তার পরও আরেকটি। ছ'বছরে চারটি সন্তানের জন্ম দিয়ে আঁতকে উঠল স্বপ্না। কেঁদে কাটাল কয়েকটা রাত। অবশেষে নিজেকে সে শক্ত করে নেয়। শ্যামলের কোন যুক্তি, কোন আপত্তিকেই কান দেয় না, মনের কোন দুর্বলতাকেই আমল দেয় না। স্বামীকে অন্য ঘরে ঠেলে দেয়।

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট সাবানেই
এসব কাচা হয়েছে!
সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ!
SUNLIGHT
SOAP
সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা
সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
S. 248-X32 BG

ছোটদের আসর

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
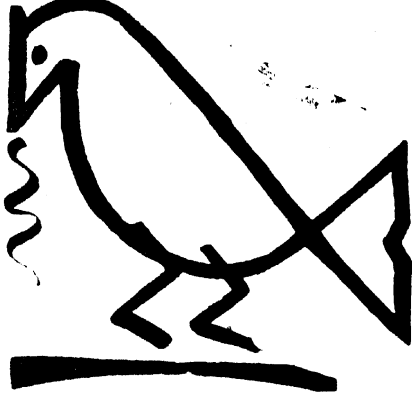
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আবার কলকাতা।

এবার মীরা মন দিয়ে পড়া আরম্ভ করলো। নিজের ঘরে পর্দা ফেলে দিয়ে সে দিন-রাত পড়তে লাগলো। এ বাড়ীর পড়ার নিয়ম, পর্দা ফেলা থাকলে কেউ ঢুকবে না। অন্য বাড়ীর মতন নয় যে, খিল দেওয়া থাকলেও ধড়াস ধড়াস দরজা ঠেলবে।

এ বাড়ীর নিয়ম নয়, কেউ যদি পড়ে, তবে চেঁচিয়ে গল্প করা। অন্য বাড়ী? পড়ছে তো পড়ছে তা কি হয়েছে? আমরা কি কথা বলব না তা ব'লে? মেয়েছেলের আবার পড়া! ও তো সখের পড়া!

পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়ে মীরার পরীক্ষার ফল ভালোই হল।

এর মধ্যে সে জুলজিক্যাল গার্ডেন যায়নি, বোটানিক্যালও নয়। এমন কি মিউজিয়মে যে পাথরের ঘরে কোণারকের মন্দিরের ছোট সংস্করণ আছে, যা তার কত দিন দেখবার ইচ্ছে, তাও দেখতে যায়নি।

পুরীর মেয়ে সে। কোণারক কত কাছে। কত দূর-দূরের লোক এসে দেখে গেছে। তাও মীরার দেখার সুযোগ হয়নি।

তাকে কেউ নিয়ে যায়নি কোণারকের বিশ্ববিখ্যাত সূর্য্যমন্দিরে। মন্দির নয়, রথ। পাথরের ঘোড়া ছুটিয়ে বালির ওপর চলেছে কত যুগ-যুগান্তর!

এ বাড়ীর ভাইয়ের নাম হয়েছে বাচ্চু। ভীষণ দুরন্ত হয়েছে। এক বছরও বয়স পুরো হয়নি, এখনি গোদা গোদা পা ফেলে দাঁড়াচ্ছে, চলছে থপ-থপ ক'রে।

সাহেব-বাড়ীর ছেলে হ'লেও প্রথমেই মাম্মা, বাব্বা বলছে। ড্যাডি, মাম্মি বলছে না। বড়লোকের ছেলে হলেও গরীবের ছেলের মতনই চেয়ে চেয়ে দেখছে। নতুন কিছু করছে না।

ফোকলা দাঁতে হাসছে। মীরার নাকটা কামড়ে দিচ্ছে। এ বাড়ীতে এসব অসভ্যতা চলে না, সে জ্ঞান ওর নেই। এমন কি, যেমন সকল ছেলে কাঁদে, অনেকক্ষণ ধ'রে অকারণে কাঁদে, কি হয়েছে কিছুতেই বলে না। এও অবিকল সেই রকম। এ পাড়ায় এ রকম কান্না খুব লজ্জার, সে খেয়াল ওর বিন্দুমাত্র নেই।

তফাৎ শুধু, অন্য ছেলের মতন ও ধুলো মাখতে পায় না। মাটি থেকে যা-তা কুড়িয়ে থপ ক'রে মুখে দিতে পারে না। ইলেকট্রিক-কেটলির কিংবা ইলেকট্রিক ইস্ত্রির ধারে-কাছেও যেতে পায় না। যে কোনো জুতো মুখে দিতে পায় না। হঠাৎ গরম জলে হাত ঝলসে যাওয়া কিংবা নাকের মধ্যে কিছু পুরে ফেলা, কিংবা বারান্দা দিয়ে নীচে কিছু ফেলে দেওয়া বা যে কোনো বিছানা নোংরা করা, আর দোলনা থেকে আচমকা পড়ে যাওয়া এর কোনোটাই ওর পক্ষে সম্ভব নয়। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে লোক আছে। আয়া আছে, ফিরিঙ্গী মেম আছে। সপ্তাহে সপ্তাহে ওর ওজন নেওয়া হয়—ফিতে দিয়ে ওকে মাপা হয়, নানা ধরণের ফুড, নানা ফলের রস, অলিভ অয়েল মাখানো, গাড়ীতে ক'রে ঘোরানো, ডাক্তার দেখানো সব দিন দেখে, ঘড়ি ধ'রে করানো হয়। এর সঙ্গে বাপের মায়ের কোনো যোগ নেই।

একজন কোর্টে চ'লে যায়। একজন পশমের পুলওভার বোনে। বুনছে তো বুনছে। বছরের পর বছর।

মীরার ভয় হয়েছিলো বাচ্চুকে ট্যাঁকে ক'রে ঘুরতে হবে। না। ওকে ছুঁতেই হয় না।

নিজের ভাইরা হ্যাংলা প্যাংলা কলকাতায় এসেছে। ও শুনেছে দে-মশাইয়ের কাজ গেছে। এখন কোন গুজরাটির সঙ্গে নাকি কারবার করছে।

দেখা হয়নি। দেখতে যেতে ইচ্ছে করে। মুখ ফুটে ড্যাডিকে বলতে পারে না। তারা গরীব। তবু তার ভাই। হোক সতাতো। বাবা তো নিজের। পিসি তো নিজের। একদিন সকাল সকাল ছুটি হল। ড্যাডির গাড়ী আসবে নিতে। অনেক পরে। কে যেন নামকরা লোক মারা গেছে, তাই ছুটি।

ও ট্রাম ধরলো। ঠিকানা খুঁজে হাজির হল ভাড়াবাড়ীতে। কলকাতার ভাড়া বাড়ী দেখাবার মতন নয়। বৌবাজার অঞ্চল। পার্কের কোণে বাড়ী। তিনতলায় একখানি ঘর আর রান্নাঘর, তারই ভাড়া পঁচাত্তর টাকা। দোতলায় দুখানি ঘর—একশ' আশী টাকা।

মীরার বাবা-মা তিনতলায়। বসবার জায়গা নেই, দাঁড়াবার জায়গা নেই।

কে যে কোথায় শোয়, কোথায় খায়—ওর জিগ্যেস করতে লজ্জা করলো।

এদিকে দোতলার ভাড়াটে ভাড়া দেয় না, মামলা চলছে। একতলার ভাড়াটে ভাড়া পাঁচ মাসের বাকি রেখে পালিয়ে গেছে। নতুন যে এসেছে সে কলের জল নিয়ে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করছে, সে কল খুললে আর কেউ পায় না।

ওরা দেয়াল ভাঙছে। খিল ভাঙছে। গালাগালি দিচ্ছে।

তবু কলকাতায় থাকা চাই। তবু জাঁক করা চাই। এখানে রোদ্দুর নেই, বাতাস নেই, তবু এ ভালো।

যেখানে রোদ্দুর আছে, বাতাস আছে, সে হল পাড়াগাঁ। সেখানে মানুষ থাকে? থাকে জংলী ভূতরা! আর এরা সব স্বর্গের অধিবাসী।

মীরা বাবাকে চুপি চুপি বললে—চিরদিন কি তোমার কষ্ট যাবে? কোনো দিন সুখ হবে না বাবা?

একদিন সুখ আসতেই হবে—ওর বাবা বলে—রাত্রির অন্ধকারের পর দিনের আলো ফোটে, আমার এত অভাবের পর একদিন সচ্ছলতা আসবেই। ভগবানের রাজ্যে অনিয়ম হয় না।

পিসি চন্দ্রপুলি করেছিলো। দিলে। মা চা ক'রে দিলে।

এ চা চার টাকা পাউণ্ড নয়, তবু খুব খারাপ লাগলো না।

হ্যালা প্যালা বড়ো হয়েছে। দিদির সঙ্গে তাদের তফাৎটা বুঝতে শিখেছে।

কিন্তু দিদি তাদের টেনে নিলো। বললে—আমি আছি সোনার খাঁচায় পোষা পাখী। ও আমার ভালো লাগছে না।

মীরার অদ্ভুত ইচ্ছে জাগলো—এখানে পা ছড়িয়ে চৌকাঠে ব'সে মায়ের হাতের আচার খেতে। যা খুসি তাই করার স্বাধীনতা তাকে যেন পেয়ে বসলো। কিন্তু হাত-ঘড়ি দেখে বুঝলো সময় হয়েছে। স্কুলে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ড্যাডির গাড়ী আসবে।

অল্পক্ষণের মধ্যে একটা কথা শুনে মীরার ভীষণ খারাপ লাগলো। হ্যালা প্যালা স্কুলে পড়ে। সব ছেলেই নাকি দুষ্টু। চক্ ভাঙে, বেঞ্চিতে ছুরি দিয়ে দাগ কাটে। মাষ্টারকে ভ্যাংচায়। দুষ্টুমি ক'রে মার খেলে বাড়ী থেকে বাবাকে ডেকে আনে। কেউ কেউ মাকে। তারা এসে ভীষণ ঝগড়া করে।

বাড়ীতে মাষ্টার রাখবার ক্ষমতা নেই বলে ওরা একটা কোচিংএ যায়। সেখানে প্রবীণ শিক্ষককে জ্বালিয়ে মারে। তার নাম মনোরঞ্জন। দরজার বাইরে থেকে—মোনা, করব তোকে তুলো ধোনা—ব'লে চেঁচায়। অন্য ছেলেদেরও চেঁচাতে বলে। তারা আবার জানলায় ইট ছোঁড়ে। সময়ে মাইনে দেয় না কেউ। মাষ্টারের চলে না। এদিকে কোচিংএর মাদুর ছিঁড়ে দেয়, চেয়ার ভাঙে। মাষ্টারের তালিদেওয়া জুতো পা দিয়ে স্যুট করে। কোনো কোনো দিন বুড়ো মাষ্টারের চোখে জল এসে যায় অপমানে। চমৎকার ভবিষ্যৎ বংশধররা!

মীরা ভাবে, তাই ভালো মেয়েরা চড়চড় ক'রে ওপরে উঠছে, আর অসভ্য ছেলেরা দিনের দিন নীচেই নামছে।

খাস বিলিতি মেম-শিক্ষয়িত্রী মীরাদের বলেছে—পঞ্চম জর্জ সম্রাট হয়ে যখন অক্সফোর্ডএ হাজির, তখন কলেজের অধ্যক্ষ টুপি খুলে রাজাকেও অভিনন্দন করেনি, বিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজার চেয়েও বড়ো। ইউ-পিতে, বিহারে মাষ্টার-সারদের খাতির অসাধারণ। আর রাশিয়ায় তো কথাই নেই। শিক্ষকের মাইনেও যেমন হাজার টাকার কম হয় না, সম্মানও সেই অনুপাতে!

মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, তখন যে পণ্ডিতের কাছে তিনি পড়েছেন, তাঁর রোজ আসতে দেরী হ'ত দেখে একটি কথাও বলতে পারেন নি। শুধু তাঁকে গিয়ে লজ্জা দিয়েছেন এই ব'লে—আপনি এখন এলেন বুঝি?

দু'-চার দিন এই রকম করতে করতে তিনি নিজেই নিজেকে সংশোধন করে নিলেন। মহাপণ্ডিত ছাত্রের কাছে 'নিয়মিত' হ'লেন অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথের দেশে অসভ্য আর বর্ব্বর, ছোরাছুরি আর সোডার বোতল। ভাবতে পারা যায়?

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘ'টে গেছে।

মীরার মাম্মি—অত যে মেমসাহেব—এক 'গুরু' ক'রে ফেলেছে।

গুরু তো ভালোই। পরমহংসদেব বলেছেন—গুরু তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে নিয়ে যায়। যেমন একটা নৌকোর মাঝির একলা দাঁড় টেনে যেতে অনেক সময় লাগে—নৌকোটাকে কোন ষ্টিমারের সঙ্গে বেঁধে দিলে তার পরিশ্রমও হয় না, তাড়াতাড়িও পৌঁছয়—যেখানে যাবার সেখানে—তেমনি গুরু শিষ্যকে সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু এ যুগের সৌখীন গুরুরা তো তা নয়! তারা বলে, কোনো দেবতাকে নয়, আমাকে পুজো করো।

প'ড়ে রইলো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী—গুরুর ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঠাকুরঘরে সিংহাসনে বসিয়ে করো পুজো। এটা যেন কেমন!

যদিও এর আগে 'ঠাকুর'—বলা মানুষকে সে দেখেছে, তবু তার মাম্মির ঠাকুর যেন অন্য রকম। গরদের কাপড়, গরদের পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, চোখে সোনার চশমা—খালি গান করে—গান আর গান।

মোটরে মোটরে পথ ছেয়ে যায়। যেমন জুতো হারায়, তেমনি গয়না হারায়, তবু লোকের আসার কামাই নেই।

হোম হয়। দীক্ষা নিয়ে কপালে টিকা নিতে হয়। ব্যস্, গুরু হয় মেস্‌মেরিজ্‌ম্। মাম্মির তাই হয়েছে। ড্যাডিকে নিয়ে গিয়েও দীক্ষা দিয়ে নিয়েছে। এখন দু'জনেই সন্ধ্যেবেলা কীর্ত্তন সুরু করেছে। বাড়ীতে ব'সেই কানের মধ্যে ওরা যেন শুনতে পায়—টাকা আনো—দু' হাজার টাকা। গুরু বলছে।

আর ওরা টাকা নিয়ে ছোটে। পাশের বাড়ীর দাশগুপ্ত বাবুও শিষ্য হয়েছে। সে খুব বড়লোক নয়। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আর দিতে পারছে না—অন্য শিষ্যরা বোঝালো দিতে হবে—আরো দিতে হবে, যেমন ক'রে হোক।

শুনলো না। এলো পাজামা আর শার্টপরা গুণ্ডার দল। কলকাতার গুরুদের গুণ্ডারা সকল গুরুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সকলের জন্যেই এরা খাটে। পাজামা ও সার্টপরা শিক্ষিত গুণ্ডার দল।

—দিতে হবে। আরো দিতে হবে।

গুরু চোখটি বুজে ধ্যানরত হয়ে থাকে—আধুনিক গান গাইতে গিয়ে গাইয়ে যেমন চোখ বুজোয়—আমি ত কিছুই জানি না। সব তিনিই করাচ্ছেন।

দাশগুপ্ত পাগলের মতন এসে বলে—মিষ্টার রায়চৌধুরী, আমায় বাঁচান। পুলিশে খবর দিন। সব সময়ে গুণ্ডা আমার পাশে পাশে ঘুরছে।

গুরুদেব যা চাইছেন, দিয়ে দিন না। সব দিয়ে দিলে আমার ছেলেপুলে খাবে কি? সে ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আমি তো এর মধ্যেই পঁচিশ হাজার দিয়েছি আশ্রমে। আপনার আছে, তাই দিয়েছেন। আমায় যে বাড়ী বেচতে হয়।

কলকাতার চারিধারে গুরুদেবদের চর—অধ্যাপক, ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনীয়ার, ইন্‌স্পেক্টর মায় স্পেশাল পুলিস, যারা পুলিশের ড্রেস প'রে বিনা পয়সায় ট্রামে যায়—সবাই বলে আমার গুরুদেব আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্যের কিছুই দেখে না মীরা, শুধু দেখে লেখাপড়া জানা লোকগুলো নিজেরা ভয় পায়, লোককে ভয় দেখায়। নিজেরা ঠকে। অপরকে ঠকায়। যেমন শনিঠাকুরের ভয় দেখিয়ে কত লোক দোকানদারদের কাছ থেকে বিনামূল্যে জিনিষ নেয়।

অসাধুতা—অসাধুতা চারিধারে অসাধুতা। বাবাদা' বলেছে, মানুষকে প্রথমে অবিশ্বাস করবে, বিশ্বাসের কিছু দেখলে তবে বিশ্বাস।

যাকৃগে। এ সব ভাবনায় ওর দরকার নেই।

স্কলারশিপ পেয়ে ও কলেজে এসে গেল। আর ও গাড়ীতে চড়বে না। সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে ও বাসে আসবে। যে সব মেয়েরা ভিড় করে কলেজ গেটে এসে দাঁড়ায়—বাড়ী যাবার পথে তাদের দেখা হয় অফিসযাত্রীদের সঙ্গে—তারা সবাই চায়—বড়ো হব আমরা বড়ো হব। আমরা জজ হব, ব্যারিষ্টার হব, মন্ত্রী হব, রাজ্যপাল হব। আমরা বিজ্ঞানের গবেষণা করব। লিখব দেশের ইতিহাস। গানে নাম করব। নাচে নাম করব। লেখায় নাম করব। আণবিক বোমা নিয়ে বাঙালী মেয়ে রিসার্চ্চ করবে, কে ভাবতে পেরেছিলো? ছেলেরা যখন সময় নষ্ট করছে সিনেমায় লাইন দিয়ে, জলসায় ভিড় করে, মেয়েরা তখন এগিয়ে চলেছে। বর্ম্মায় যেমন মেয়েরা কাজ করে, ছেলেরা নয় একদিন তেমনি বাঙলা দেশে মেয়েরা কাজের লোক হবে, ছেলেরা নয়, এই কথা মীরার মনে হয়। এই মেয়ের দলে ট্রামে বাসে ভিড় করে মীরাও এগিয়ে চলে।

ড্যাডির গুরু সেদিন দয়া ক'রে বাড়ীতে এলেন। বললেন, শান্তিপুরে রাস দেখতে যাব। অমনি গাড়ী বেরোলো, মাম্মি ড্যাডির সঙ্গে মীরাও কার-এ চ'ড়ে বসলো, রাস দেখবার লোভে। ডি সোটো গাড়ী ছুটে চললো যশোর রোড ধ'রে। বারাসতের পথ ছেড়ে দিয়ে চৌত্রিশ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরলো কংক্রীটের রাস্তা, যে রাস্তা যেমনি সুন্দর তেমনি ভীষণ। নামকরা লোকরা মারা গেছে এ রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনায়। ষাট মাইল স্পীডে মোটর চললো হরিণঘাটা, চাকদা, রাণাঘাট পেরিয়ে এলো শান্তিপুর। অদ্বৈতাচার্য্যের আশ্রমে ওরা উঠলো মালপো আর ক্ষীর খেতে।

একটা বড়ো বাড়ীর বারান্দা থেকে ওরা মহারাস যাত্রা দেখতে বসলো। বিরাট মেলা বসেছে পথের দু'ধারে। শান্তিপুরে শাড়ী, পেতল কাঁসার বাসন, কাঠের বারকোস, বেলুন, চাকি, পাঁপরভাজা, তেলেভাজা, খেলনা পুতুল। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে এসেছে মেয়ে-পুরুষ। শোভাযাত্রার প্রথমেই অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ বোঝাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্যামসুন্দর, রাধারমণ বিগ্রহ বিরাট ব্যাণ্ড আলো সঙ্কীর্ত্তন নিয়ে চলে গেল। ছেলে-মেয়েরা রাইরাজা সেজেছে পুতুলের মতন। অজস্র পয়সা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে লোকে। ময়ূরপঙ্খী মানুষের কাঁধে চলেছে। প্রথমে চলে গেছে কালীমূর্ত্তি। আবার এলো কালী। রাসকালী, কৃষ্ণকালী, জটিলা কুটিলা। কত দীর্ঘদিন ধ'রে শান্তিপুর তার ভাঙা রাসের মেলায় দেশ বিদেশের লোককে টেনে আনে। কত লোককে খাওয়ায় কত লোক! তবু বলে, শান্তিপুরে ভদ্রতা অতিথি সৎকার করতে জানে না। চিরকালের বদনাম। এখান থেকে ওরা কৃষ্ণনগর গেল একজন ভক্তের বাড়ীতে। আলোয় আলো কৃষ্ণনগর। ভাঙা ফটক, জঙ্গলে-ভরা বাড়ী নাকি এখানে অজস্র ছিল মাঝি বললে, —আজ একটাও নেই। নতুন শহর কৃষ্ণনগর জলাঙ্গী নদীর ধারে। যেন মহানগরী কলকাতারই একটা টুকরো। এখানে আসার কারণ—পরের দিন এক সভার উদ্বোধন করতে হবে গুরুজীকে। তার জন্তে একজন ধনী ভক্ত, যে তাঁকে আনিয়েছে, দেবে মোটা চাঁদা আশ্রমে। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্তে রাজার উপযোগী উপকরণ আসে, মীরা এ জিনিস দেখেনি। সে দেখেছে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের রক্তচক্ষু ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা ক'রে যাঁরা সাধারণের সেবা ক'রে যাচ্ছেন নিজেরা কষ্ট আর অপমান সহ্য ক'রে। বৃন্দাবন, গয়া, কাশী পুরীতে।

সভায় এক কবির আবির্ভাব হল, পাকা পাকা ঝাঁকড়া চুল, কালো মোটা চেহারা—নাম বললে খিনিকেষ্ট দাঁ—নাম শুনেই মেয়েরা হাসতে আরম্ভ করলো। তার পর সে পড়তে আরম্ভ করলো—

> আমি বেহুইন—
> ঘরে ঘরে ঢুকি সরমবিহীন।
> গোগ্রাসে খাই,
> যে যা দেয় তাই।
> পৃথিবীর বকযন্ত্র সদম্ভে দুরাই।
> মরু ঝড়ে—

দয়া ক'রে নেমে যাও ভাই!—কে যোগ করলো। হৈ হৈ গোলমাল। গরদের ধুতি, গেরুয়া সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা সন্ন্যাসী উঠে বলতে সুরু করলো—

দেশে ধর্ম্ম নেই কর্ম্ম নেই, মিথ্যাচারে রাজ্য ভ'রে গেছে। আমার গুরুর কৃপায় আমি পেয়েছি নতুন পথ। অর্থ অনর্থ। আমার শিষ্য ব্যারিষ্টার মিঃ রায়চৌধুরী, তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় স্থির করছেন আশ্রমের জনকল্যাণে দিয়ে দেবেন।

ঘন ঘন করতালি পড়লো। কিন্তু মীরার ড্যাডি ও মাম্‌মির মুখ শুকিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করবে, সে সাধ্য নেই। এর নাম মেস্‌মেরিজম্। মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখা।

মীরা ভেবেই পায় না, সমুদ্র-পারের আবহাওয়ায় যে মানুষ, খাঁটি ইংরেজের মতন যার চাল-চলন, মনের চিন্তা, কাজের ধারা, সে এ সব বুজরুকি সহ্য করে কি ক'রে?

মিসেস রায়চৌধুরী যে দুনিয়ার কাউকেই গ্রাহ্য করে না, সকলকেই ছোট ভাবে, সে কি করে লেখাপড়া-না-জানা এই হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর কথায় ওঠে বসে?

এ তো বলছে না—

> প্রভু বুদ্ধ লাগি
> আমি ভিক্ষা মাগি
> ও পুরবাসী কে রয়েছে জাগি—

এ বলছে—আমি ভগবান্। আমাকে দাও।

ভগবানও তো কোনো শাস্তি দিচ্ছেন না!

দিনে দিনে রায়চৌধুরীর ব্যাঙ্কের টাকা ক'মে আসতে লাগলো। রাশিয়ার রাসপুটিন এমনি ক'রে সম্রাজ্ঞী জারিনাকে ভুলিয়েছিলো। সে দেখিয়েছিলো তার গায়ে পিস্তলের গুলী লাগে না, কেউ জানত না তার আলখাল্লার নীচে ষ্টীলের বর্ম থাকত—সবাই বিশ্বাস করত ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন। সেও শেষে ধরা পড়েছিলো!

কলকাতায় কারুর অনেক টাকা থাকার এই বিপদ আছে—গুণ্ডা টাকা আদায় ক'রে নেবার চেষ্টা করবে। আসবে তারা সন্ন্যাসীর বেশে, দেশনেতার বেশে, পরোপকারীর মূর্ত্তি ধ'রে।

মীরা পাশের পর পাশ ক'রে যেতে লাগলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে খেয়ে বেলভেডিয়ারে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে পুরীর সমুদ্রতীরের সেই মেয়েটি ভারতের সেরা শহরের যত জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়, সে দিকে ত্রুটি রাখলো না। সে হল মীরা রায়চৌধুরী এম, এস, সি অনার্স ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। জীবনের রাস্তা তার খোলা হয়ে গেছে—রূপকথার রাজ্যে নয়, বাস্তব জগতে।

আর সে দারিদ্র্যকে ভয় করে না। আর সে ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা ভাবে না। ভাবে—কি ক'রে দেশের সত্যিকারের কাজে লাগবে একলা মাথা উঁচু ক'রে—মীরা রায়চৌধুরী এম-এস-সি।

বাচ্চুও বড় হ'য়ে গেছে। তার মস্তেশরী পড়া শেষ হ'য়ে এলো প্রায়।

এদের কাছে যে টাকা মীরা পাবে মনে করছিলো, আজ আর তা পাবার আশা নেই। সব সন্ন্যাসী নিয়ে যাচ্ছে।

মীরার কথা আর কেউ ভাবে না। সন্ন্যাসী ব'লে দিয়েছে ও নাস্তিক। আমাকে মানে না।

বাস্তবিকই ও মানে না। ড্যাডি মাম্মির অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ও না যায় কীর্ত্তন শুনতে, না বিশ্বাস করে আশ্রমের কার্য্যকলাপ। ওর একটা স্বাধীন মত আছে। ও আর ছোট খুকি নয়। এখন মীরা রায়চৌধুরী এম-এস্-সি। রিসার্চ্চ করছে। তিন বছর বাদে ফিনিস দিলে ডক্টর মীরা রায়চৌধুরী হবে।

এমন দিনে আবার গরীব বাপের সংসারে ফিরে যেতে ইচ্ছে হল। অন্ধকার রাত্রির পর বাবার জীবনে তো সকালের আলো এলো না। না পেলে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো টাকা, না পেলে লটারীর প্রাইজ। তবু আলো এসেছে মনে হচ্ছে। নতুন খবর এলো।

[ক্রমশঃ।

সত্যিকার গল্প

অশোক মুখোপাধ্যায়

গল্প নয় এটি—একটি কাহিনী। প্রায় সাত-আটশো বছর আগেকার। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাজশক্তির কবলে পড়ে কেমন করে ত্রিশ হাজার নিষ্পাপ কিশোরের জীবনে নেমে এসেছিল অন্ধকারের এক কালো পর্দ্দা, তারই এক অশ্রুসজল আলেখ্য। ইতিহাসের অসংখ্য উজ্জ্বল অধ্যায়ের মধ্যে এই কাহিনীটি আজও একফালি অন্ধকারের মত জেগে রয়েছে।

স্তব্ধ হলঘরটার এক দিক থেকে আর এক দিক পায়চারি করছেন ফ্রান্সের মহামান্য সম্রাট। চারিদিকে বসে রয়েছে পারিষদবৃন্দ। সবাই স্তব্ধ—চুপ হয়ে বসে কিসের যেন প্রতীক্ষা তারা করছে।

একটা মৃদু শব্দ হোল। পর্দা ঠেলে প্রবেশ করল সম্রাটের একজন পার্শ্বচর। এগিয়ে গেল সে রাজার দিকে। তারপর মৃদুস্বরে বলল—বার্ত্তাবহ ফিরে এসেছে।

সম্রাট অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে।

—আমাদের সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মুসলমানদের হাতে। বলেই পারিষদটি চুপ করে গেল। যেন একথা বলবার কোন মানেই হয় না। না বললেও সবাই বুঝতে পারছে। একটা সূঁচ পড়লেও যেন তার শব্দ শোনা যাবে—এমনই থমথমে ভাব বিরাজ করছে সভাকক্ষে। সম্রাট ধীরে ধীরে রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। পারিষদরা মাথা গুঁজে সেখানেই বসে রইল।

শয়নকক্ষের জানলার ধারে বসে সম্রাট ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। প্রভু যীশুর জন্মস্থান পবিত্র জেরুজালেম—তাকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই? ক্রুসেডে বার বার পরাজিত হতে হচ্ছে তাদের। প্রবল প্রতাপান্বিত মুসলিম শক্তিকে পরাজিত করবার কোন আশাই তো দেখা যাচ্ছে না। প্রতিটি খৃষ্টানের কাছে এর চাইতে লজ্জার কি থাকতে পারে?

ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে।

চার্চের একটি কক্ষে প্রধান পুরোহিত বসে বাইবেল পড়ছেন। শুভ্র সৌম্যমূর্ত্তি। আবক্ষ ধবধবে সাদা দাড়ি। সম্রাট ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন সেখানে। ম্লানমুখে একটি সোফায় বসে রইলেন চুপচাপ।

পুরোহিত মাথা তুলে সম্রাটের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—যুদ্ধের খবর আমি শুনেছি। এখন আমাদের জয়লাভের একটি মাত্র উপায় আছে।

—কি? কি সেই উপায়, বলুন? ব্যগ্রকণ্ঠে শুধোলেন সম্রাট।

—বালকদের ওপর রয়েছে প্রভু জেসাসের সস্নেহ আশীর্ব্বাদ। এবার বালকদের পাঠানো হোক ক্রুসেডে। আমাদের জয় তা হলে নিশ্চিত। জেসাসের আশীর্ব্বাদ কখনই বিফল হতে পারে না।

চুপ করে সম্রাট ভাবতে লাগলেন। মনে তাঁর দ্বন্দ্ব চলল অনেকক্ষণ। বিবেকবুদ্ধির সাথে সংস্কারের। শেষে সংস্কারই জয়ী হল। উৎফুল্ল হয়ে তিনি চললেন মন্ত্রী আর সেনাপতিদের সাথে পরামর্শ করতে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সবুজ আস্তরণে ঢাকা উপত্যকায় ভেড়া চরাতে চরাতে মিষ্টি সুরে গান গাইছিল ষ্টিফেন। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা ওর। বয়স কত আর হবে—পনের কি ষোল। গান গাইতে গাইতে সে দেখতে পেল একদল সেপাই এদিকেই এগিয়ে আসছে। দেখেই ত সে চুপ করে গেল। ভাবল ভোঁ করে এক দৌড়ে পালাবে কি না। কিন্তু তার আগেই সেপাইরা তার কাছে এসে গেছে।

—অ্যাই, চাকরী করবি?

—চাকরী?

—হ্যাঁ চাকরী। রাজার চাকরী। অনেক টাকা পাবি। পেট ভরে খেতে পাবি।

গরীব মেষপালকের ছেলে ষ্টিফেন। পেট ভরে কম দিনই খেতে পায়। পেটের উপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল সে—কিন্তু আমি কি পারব?

—হ্যাঁ খুব পারবি। চল আমাদের সাথে।

—দাঁড়ান, বাড়ীতে বলে আসি।

—না না, আগে নাম লিখিয়ে আয় রাজার দরবারে। তারপর এসে বলবি।

ভেড়ার পালের দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ষ্টিফেন বলল—চলুন।

শুধু ষ্টিফেনই নয়। আরো অনেক ছেলে সংগ্রহ করে এনেছে ওরা। প্রায় হাজার ত্রিশেক। লোভ দেখিয়ে মারধোরের ভয় দেখিয়ে তাদের ধরে এনেছে।

—কিন্তু চাকরীটা কি? গুঞ্জন করতে থাকে ছেলেরা।

শেষে ওরা শুনল যুদ্ধের চাকরী। শুনে কান্নাকাটি সুরু করে দিল বাড়ী ফেরার জন্য। কিন্তু সেপাইরা সতর্ক পাহারা রাখল, যাতে কেউ না পালাতে পারে।

তারপর একদিন সেই ত্রিশ হাজার বালককে নিয়ে যাওয়া হোল সমুদ্রের তীরে। অস্ত্রশস্ত্র-বোঝাই কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ অপেক্ষা করছিল সেখানে। রাজার লোকেরা ওদের তাতে উঠিয়ে দিল। তারপর অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে নেমে পড়ল জাহাজ থেকে। ভীত-ত্রস্ত ছেলেদের নিয়ে জাহাজ এগিয়ে চলল দূর সমুদ্রের দিকে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝির-ঝির করে হাওয়া বইছে। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।

জাহাজের ডেকে রেলিংএ হেলান দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে ষ্টিফেন। চারদিকে শুধু ঢেউ আর ঢেউ। আর তার ওপর সোনালি আলোর ঝিকিমিকি।

দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় ষ্টিফেন। মনে পড়ে তার জন্মভূমি সেই স্নেহময় ছোট পল্লীটির কথা। সেখানেও এখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে পাহাড়ের ওপারে। তার প্রিয় ভেড়ার দল মাঠে চরে বাড়ী ফিরছে।

ভাল লাগছে না তার একেবারে। শুনেছে, ওদের নাকি গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু কি জানে ওরা যুদ্ধের? তাকেই আবার করা হয়েছে দলের নেতা। নেতা হলে কি করতে হয় তাও যে সে জানে না।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল কয়েকটা জাহাজ তীরবেগে আর একদিকে ছুটে চলেছে। শোনা যাচ্ছে ভয়ার্ত্ত ছেলেদের সমবেত আর্ত্তনাদ। ষ্টিফেনও চীৎকার করে উঠল। হৈচৈ শুনে অন্যান্য জাহাজের ছেলেরাও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে বিরাট হট্টগোল। কিন্তু কি করবে তারা? অসহায়—একেবারে অসহায়। ওদিকে যে জাহাজগুলো দলছাড়া হয়ে ঢেউ-এর সাথে আছাড় খেতে খেতে ছুটে চলেছে, তাদের আরোহীরাও জাহাজকে কোন মতে সামাল দিতে পারছে না। কি করেই বা পারবে, বড় কেউ ত তাদের সাথে নেই!

কিছুক্ষণের মধ্যে দশ হাজার ছেলে সঙ্গে নিয়ে সে-জাহাজ ক'টা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল সমুদ্রের এদিক-ওদিক। তারা আর ফিরে এল না।

দিন কয়েক পর দূরে দেখা গেল মার্সাই বন্দর।

ছেলেরা অনেক কষ্টে জাহাজগুলো ভেড়াল সেখানে। কিন্তু নিষ্ঠুর রাজার হাত থেকে রেহাই পেল না। আবার তাদের জোর করে রওনা করিয়ে দেওয়া হল দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে।

সার্দ্দিনিয়া দ্বীপের কাছে পৌঁছাতে দুটো জাহাজের তলা ফুটো হয়ে গেল। হু-হু করে জল উঠতে লাগল জাহাজে। ডুবছে—জাহাজ দুটো ডুবছে। আবার কিশোর আরোহীদের আর্ত্ত চীৎকার। কিন্তু কে তাদের রক্ষা করবে? সমুদ্রের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

শোকার্ত্ত ভীত আরোহীদের নিয়ে বাকী জাহাজগুলো নিজেদের ইচ্ছেমতো ভেসে চলল লক্ষ্যহীন ভাবে। ষ্টিফেন বসে বসে ভাবে। আকাশ-পাতাল। তারা কি আর কোন দিন ফিরে যেতে পারবে? মা, বাবা, ছোট ছোট খেলার সাথীরা—কাউকেই বুঝি সে আর দেখতে পাবে না। তাদের গাঁয়ের গমক্ষেতগুলিতে এত দিনে গম পেকে এসেছে, ভেড়াগুলোর বাচ্চা দেওয়ার সময় হয়ে এলো, অথচ সেই কি না গাঁয়ে নেই!

ভগ্নপ্রায় জাহাজগুলো ছুটে চলেছে লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। ডাঙার কোন চিহ্নই নেই। এদিকে জাহাজের খাবার শেষ হয়ে এসেছে। ছেলেরা ভয় আর দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে উঠেছে।

এমন সময় দূরে কতকগুলো সাদা সাদা কি যেন দেখা গেল। অস্পষ্ট সেই ছবিগুলো কাছে এগিয়ে আসছে। ওরা চীৎকার করে, হাত নেড়ে যত রকম ভাবে সম্ভব জাহাজের লোকগুলোকে অনুনয় করল তাদের রক্ষা করবার জন্য। তা জাহাজের নাবিকদের খুব সদাশয়ই বলতে হবে। যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাল তারা। সাদরে তুলে নিল নিজেদের জাহাজে। রাত তখন নিশুতি। সমুদ্রের বুকে অন্ধকারের রহস্য। ছেলেরা বহুদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে।

হঠাৎ দূরে দেখা গেল কতকগুলি আলোর বিন্দু। কাছে এগিয়ে এলে দেখা গেল, একটা তুর্কী নৌবহর। সকালবেলা নাবিকরা ছেলেদের ডেকে বলল, আমরা ত দেশে ফিরে যাচ্ছি। তোমরা এদের জাহাজে ওঠ। এরাই তোমাদের পৌঁছে দেবে ফরাসী উপকূলে।

ছেলেরা তাদের কথামতো তুর্কীদের জাহাজে গিয়ে উঠল।

অধীর আগ্রহে ওরা প্রতিটি মুহূর্ত্ত গুণছে। আবার তারা দেশে ফিরে যাচ্ছে। উঃ, কত দিন—কত দিন পরে!

শেষে জাহাজ এক সময় এসে নোঙর ফেলল তীরের কাছে। হুড়োহুড়ি করে ওরা নেমে পড়ল ডাঙায়। হেসে-কেঁদে, ছুটোছুটি করে, মুঠো মুঠো মাটি গায়ে মেখে আনন্দ করতে লাগল।

হায় রে, তারা ত জানত না, ফরাসী দেশ এটা নয়—এটা তুরস্কের উপকূল। সেই নাবিকগুলো হচ্ছে আসলে জলদস্যু, আর তারা ওদের বেচে দিয়েছে এই তুর্কী দাসব্যবসায়ীদের হাতে।

তারপর যে কাহিনী, সে শুধু অত্যাচার আর অবিচারের, নির্মমতার আর নিষ্ঠুরতার। প্রতিটি ক্রীতদাসের জীবনে যা ঘটত তার চাইতে একটুও আলাদা নয়।

কিন্তু তখনও হয়ত ওরা দূর তুরস্কের কোন পল্লীতে মনিবের জমির উষর মাটি নিড়োতে নিড়োতে ভাবত জন্মভূমির কথা—মা-বাবা-ভাইবোন ভরা গৃহের কথা। ভাবতে ভাবতে হয়ত হু-হু করে চোখের জল বেরিয়ে আসত—ভিজিয়ে দিত সেই উত্তপ্ত মাটি। আর

ফিরেন? গমক্ষেত, পাহাড়ের কোলের সবুজ মাঠ আর ভেড়ার দলের সোনালি স্বপ্নের কাছে আর কোন দিনই গিয়ে সে পৌঁছতে পারল না।

আণ্ডেরসেনের গল্প

এক

কালো ফসল

মনে করো, খুব ঝড়-বাদল হ'য়ে গেলো, তারপর তুমি বেড়াতে বেরোলে, আর তোমাকে যেতে হ'লো ভুট্টাক্ষেতের পাশ দিয়ে। তখন যদি তাকিয়ে ছাখো, তা-হ'লে দেখবে ভুট্টার ডাঁটাগুলো কী-রকম যেন কালোরঙের হ'য়ে গেছে, যেন ঝলসে পুড়ে গেছে। আগে যেমন সবুজ ছিলো, এখন আর তেমন নেই। এর কারণ কি জানো? চাষীদের শুধোলে তারা বলবে, আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায়, তারি জন্যে অমন হয়। কিন্তু এ-সম্বন্ধে চড়ুইরা কী বলে শুনবে? শোনো তবে ওদের এ-দশা হবার কারণ। প্রথমেই ব'লে রাখি গল্পটা আমার নয়, চড়ুইয়ের কাছে শোনা; সে আবার শুনেছিলো এক বুড়ো উইলো-গাছের কাছে, ভুট্টার ক্ষেতের ঠিক গায়ের উপর যে দাঁড়িয়ে থাকতো, এবং এখনো আছে। কতো যে ওর বয়স তার কোনো লেখাজোখা নেই; বয়সের ভারে ওর গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে, সামনের দিকে কুঁজো হ'য়ে ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তাই ব'লে ওকে কিন্তু মোটেই খারাপ লাগে না দেখতে। গাছটা সামনের দিকে এমন ভাবে ঝুঁকে আছে যে, দেখলে মনে হয় সে বুঝি মাটিতে তার ডালগুলো ছোঁয়াবার জন্যেই এমন করেছে।

উইলোর চার পাশে নানান ধরণের ফসল হয় নানান ক্ষেতে। গম, ভুট্টা, ওট—সুন্দর ওট, যাদের ডগা পাকলে মনে হয় একঝাঁক হলদে ক্যানারি গাছের ডালে বসে আছে। ওটের শীষেরা খুব বিনয়ী; যতোই তারা পেকে টুশটুশে হোক, বা যতোই তাদের মাথা উঁচুতে উঠুক, তবু তাদের অহঙ্কার হয় না।

কিন্তু সেখানেও আবার ভুট্টারও একটা ক্ষেত আছে, বুড়ো উইলো গাছের ঠিক সামনেটায়। অন্য সব ফসলের মতো তারা কখনো মাথা নোয়ায় না, অহংকারে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভুট্টারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, 'দেখেছো, গমের শীষগুলো বা ওটেরা কী-রকম ছোটোলোক, এতোটুকু আত্মসম্মান বোধ নেই! একটু হাওয়া এলো, কি না-এলো, অমনি মাটিতে মাথা নুইয়ে ধুলো-বালিতে গড়াগড়ি! আমরা বাপু অমন ছোটোলোকের মতো যখন-তখন যার-তার সামনে মাথা নোয়াতে পারিনে।' বুড়ো উইলোকে ডেকে তারা বলতো, 'আচ্ছা, বুড়ো, তুমি তো অনেক দেখেছো পৃথিবীর,—বলো তো আমাদের মতো সুন্দর চেহারা আর কখনো দেখেছো কি? আমার ফুলেদের দিক তাকিয়ে ছাখো, রঙে ঝলমল আপেলেরা পর্যন্ত এতো সুন্দর নয়। তোমার কতো সৌভাগ্য বলো তো যে আমাদের দেখতে পাচ্ছো!'

বুড়ো উইলো হাওয়ায় মাথা দুলোত, নাড়াতোও একটু, আর বলতো, 'তা হবে, তা হবে।'

তার কথা শুনে অহংকারে নাক-সিঁটকে ভুট্টারা ঠাট্টা করতো, 'তুমি তো একটা অজ্ঞ বোকা, বলি, বয়েস কতো হ'লো, তা জানো তো? দেখছো না পায়ের উপর ঘাস গজিয়েছে তোমার।'

এখন একদিন এলো এক মারাত্মক ঝড়। সকল ফুল তাদের পাপড়ি মুড়ে পাতার আড়ালে লুকিয়ে, ডালসুদ্ধ মাথা নুইয়ে থাকলো আর ঝড় বয়ে যেতে লাগলো তাদের নোয়ানো মাথার উপর দিয়ে। কেবল অহংকারী ভুট্টার দল মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

'সর্বনাশ! করছো কি! শীগগির মাথা নুইয়ে রাখো আমাদের মতো।' ফুলেরা তাদের কানে-কানে ফিশফিশ ক'রে বলতে লাগলো।

'তার কোনো প্রয়োজন দেখছিনে।' হেঁকে বললে দাম্ভিক ভুট্টারা।

গমের শীষেরা ওদের গায়ে হেলে প'ড়ে বলতে লাগলো, 'কী সর্বনাশ করছো! মাথা নিচু করো, এক্ষুণি আমাদের মতো মাথা নিচু করো। দেখছো না ঝড়ের দেবতা ক্রুদ্ধ হ'য়ে এগিয়ে আসছেন তুমুল বেগে। দেখছো না তাঁর আগুনের পাখা আকাশের ঘন কালো মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার মাটি স্পর্শ করছে। দেখছো না তাঁর হাতে বিদ্যুতের লিকলিকে চাবুক ঝলসে উঠছে। এখনো সময় আছে, শীগগির মাথা নিচু করো, নইলে পরে দয়া চাইবার সময়ও পাবে না।'

'না, আমরা মাথা নোয়াবো না।' তেমনি দাম্ভিক গলায় বললে ভুট্টারা। 'কিছুতেই আমরা মাথা নিচু করবো না।'

'তোমাদের ফুলের পাপড়ি বুজিয়ে দাও, মাথা নিচু ক'রে প্রণাম করো ঝড়ের দেবতাকে।' বুড়ো উইলো বললে তাদের, 'মেঘ দিয়ে যখন ঝলসে ওঠে বাঁকা-চোরা বিদ্যুৎ, তাকিয়ো না সেই দিকে। যখন মেঘ ছিঁড়ে ফেলে বিদ্যুতের শিখা ঝলসে ওঠে, তখন সেই আলোয় স্বর্গের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায় বটে, কিন্তু সেদিকে তাকালে মানুষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যায়। কাজেই আমরা তো কোন ছার! মাটির সঙ্গে আমরা বাঁধা প'ড়ে আছি, মানুষের চেয়েও আমরা কতো ছোটো, আমাদের কি অমন দুঃসাহস করলে চলে?'

'ছোটোই বটে!' রেগে খাপ্পা হ'য়ে বললে ভুট্টারা, 'আচ্ছা, তোমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা ছোটো না বড়ো। এই ছাখো, আমরা স্বর্গের দিকে সোজা চেয়ে দেখছি, দেখি তোমাদের ঝড়ের দেবতা আমার কী করতে পারেন?' এই ব'লে একগুঁয়ে, জেদি, দাম্ভিক ভুট্টারা ঝড়ের মারাত্মক গর্জন আর বিদ্যুতের সাংঘাতিক আলোর মধ্যে মাথা উঁচু করে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে এতো জোরে বাজ পড়লো, আর এমন ভাবে ঝলসে উঠলো আঁকা-বাঁকা আগুনের বিদ্যুতের সাপ, যে মনে হ'লো সারা পৃথিবী বুঝি প্রচণ্ড আগুনে পুড়ে গেলো।

তারপর নামলো ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

কতোক্ষণ পরে ঝড়বাদল থেমে গিয়ে যখন আকাশের কোলে সোনালি আলোর রেখা ফুটে উঠলো, তখন দেখা গেলো বৃষ্টি-ধোয়া ফুলেরা তাজা হ'য়ে উঠেছে, গমের শীষেরা আরো সবুজ, আরো সতেজ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা দাম্ভিক ভুট্টারা বাজের আগুনে পুড়ে কয়লার মতো হয়ে গেছে। অঙ্গারের মতো কালো হ'য়ে গেছে তাদের সোনালি ফুল, ডাঁটাগুলো হ'য়ে গেছে মৃত ফ্যাকাশে শুকনো লতার মতো।

হাওয়ায় এলোমেলো দুলতে থাকলো বুড়ো উইলোর শাখা-প্রশাখা,

সবুজ পাতা থেকে ঝ'রে পড়লো বড়ো-বড়ো জলের ফোঁটা, এমন ভাবে যে মনে হ'লো সে যেন কাঁদছে। চড়ুইরা তাই দেখে শুধোলে, 'কাঁদছো কেন, বল তো? ভাখো তো কী সুন্দর দেখাচ্ছে চারদিক। মেঘ কেটে কী সুন্দর রোদ উঠেছে, ভাখো,—হালকা মেঘেরা ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের গায়ে, বাতাসে ফুলের গন্ধ। তবু, তুমি কাঁদছো কেন বুড়ো উইলো গাছ?'

তখন উইলো খুলে বললে ভুট্টাদের দম্ভ আর একগুঁয়েমির কথা, এবং বললে তার ফলে কী ভীষণ শাস্তি তাদের পেতে হ'লো—সেই কথা। আমি—হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেন যে গল্প বলছি—এটা শুনেছি চড়ুইয়ের কাছ থেকে। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তাকে একটা গল্প বলতে অনুরোধ করায় সে আমায় এটি শুনিয়েছে।

দুই

দেবদূত

'যখন কোনো ভালো ছেলেমেয়ে মারা যায়, আসে এক দেবদূত আকাশ থেকে, মৃতশিশুকে নেয় তার কোলে তুলে, তারপরে তার ঝলমলে লাল বিশাল ডানা ছড়িয়ে উড়ে যায় সেই সব দেশের উপর দিয়ে, যা জীবিতকালে প্রিয় ছিলো শিশুটির কাছে। তার পর জড়ো করে একগুচ্ছ ফুল, নিয়ে যায় তা দেবতার কাছে, যাতে ফুলেরা আরো সুন্দর ভাবে ফুটতে পারে স্বর্গের বাগানে, পৃথিবীর চেয়েও অনেক, অনেক সুন্দর ভাবে। আর যে-ফুল দেবতাকে সবচেয়ে বেশি খুশি করতে পারে, তাকে দেওয়া হয় গলার স্বর, আর তাকে যোগ দিতে দেওয়া হয় আনন্দের সমবেত সংগীতে অংশ গ্রহণ করতে।'

একটি মৃতশিশুকে কোলে ক'রে স্বর্গে নিয়ে যাবার সময় এই সব কথাই বলছিলো দেবতার এক দেবদূত, আর শিশুটি তা শুনছিলো যেন দূর-ধূসর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। তারপর তারা উড়ে গেলো সেই সব জায়গার উপর দিয়ে, যেখানে যেখানে সেই শিশু খেলতো আগে, তারপর উড়ে চ'লে গেলো ফুলে ফুলময় এক বাগানে।

দেবদূত ছোটো ছেলেটিকে জিগ্যেস করলে, 'বলো তো স্বর্গের বাগান সাজাবার জন্য কোন ফুলগুলিকে আমরা নিয়ে যাবো?'

কুঁড়ি আর আধ-ফোটা ফুলে ভর্তি গোলাপের একটা ভাঙা ডাল পড়েছিলো। ছেলেটি সেদিকে তাকিয়ে বললে, 'আহা বেচারা! এরা তো সব শুকিয়ে ম'রেই যাচ্ছে,—এসো, আমরা এদের নিয়ে যাই। স্বর্গের বাগানে এরা কতো সুন্দর হ'য়ে ফুটবে।'

দেবদূত সেই ভাঙা গোলাপের ডালটিকে তুলে নিলে। তারপর আদর ক'রে চুমো খেলো ছোটো ছেলেটিকে। তারপর তারা বাগান থেকে আরো কতো সুন্দর সব ফুল নিলে, নিলে রাত্রে পাপড়ি-বোজানো সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা, আর হাসনুহানাকেও। ফুলের ভারে দেবদূতের বুক ভ'রে উঠলো, ছোটো ছেলেটির চার পাশ ছেয়ে গেলো রকমারি ফুলে।

'অনেক ফুল তো তোলা হ'লো'—বললে ছোটো ছেলেটি—'চলো, এবার আমরা স্বর্গের বাগানে যাই।'

'হ্যাঁ, চলো।' দেবদূত ঘাড় নেড়ে ছেলেটির কথায় সায় দিলে বটে, কিন্তু তখনি সে দেবতার বাগানের দিকে উড়ে গেলো না। দেবদূত শহরের বড়ো-বড়ো রাস্তার উপর দিয়ে উড়তে লাগলো। তখন রাত্রি, তাই শহরের সোরগোল থেমে গেছে। উড়তে উড়তে একটা সরু নোংরা গলির ভিতর ঢুকলো তারা। সেই গলির এক ভাঙা পুরনো বাড়ির সামনে রাশি-রাশি জঞ্জাল প'ড়ে রয়েছে, ভাঙা হাড়ি-কুঁড়ি, ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো, উনুনের ছাই, মাছের আঁশ। এই সব জঞ্জালের ভিতর রয়েছে একটা ভাঙা ফুলের টব, আর একটা শুকনো নাম-না-জানা বুনো ফুলের ডাল। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে দেবদূত বললে, 'এসো, আমরা ডালটিকে নিয়ে যাই।'

এতো ভালো-ভালো ফুলের সঙ্গে এই শুকনো বনফুলের ডালটাকে নিয়ে যাবার কথা শুনে ছেলেটি অবাক হ'য়ে গেলো। চোখে-মুখে তার পড়লো ভাবনার ছাপ!

তাই দেখে দেবদূত বললে, 'ভাবছো, একে কেন নিয়ে যাচ্ছি? আচ্ছা, সে গল্প তোমাকে পথ চলতে চলতে বলবো।' তারপর দেবদূত স্বর্গের পথে উড়তে উড়তে ছেলেটিকে গল্প বলতে লাগলো। 'এই যে নোংরা গলির সামনে ভাঙা বাড়ি দেখলে, ঐখানে অন্ধকার ঘরের ভিতর একটি ছোটো ছেলে থাকতো। ছেলেটি এক ভয়ানক গরিব, তার উপর জন্ম থেকেই তার পা-দুটি নিঃসাড়। কাজেই দিন-রাত তাকে ঐ ঘরেই কাটাতে হ'তো। যখন সে একটু বড়ো হ'লো, গায়ে একটু জোর হ'লো, তখন লাঠির উপর ভর দিয়ে সে ঘরের ভিতর একটু-একটু বেড়াতে পারতো। কিন্তু ঐ-পর্যন্তই। অবশ পা তার আর ভালো হ'লো না। কাজেই পৃথিবীর আর কিছুই সে দেখতে পেলো না। মাঝে-মাঝে সামান্য একটু রোদ্দুর তার ঘরের কোণে পড়তো। সেইখানটিতে ব'সে সে অবাক হ'য়ে আলো দেখতো, আর ভাবতো, বাইরে এখন কতো আলো, সোনালি রোদ, রঙিন ফুল। একবার কি-একটা উৎসবের দিনে তার এক বন্ধু তাকে ডালপালাশুদ্ধ বনফুল উপহার দিয়েছিলো। সেগুলো পেয়ে তার কি ফুর্তি! জীবনে সে কখনো উপহার পায়নি, আর ফুল তো চোখেই ভাখেনি। পঙ্গু ছেলেটি তার মাকে ব'লে একটি টব কিনে নিলে। তারপর নিজের হাতে ডালগুলি পুঁতে দিলে টবে। টবটি তার শিয়রের দিকের জানলার কাছে রইলো। বুনো গাছটিকে ছোটো ছেলেটি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। যতো কষ্টই হোক, তবু সে রোজ নিজের হাতে জল দিতো। অন্ধকার ঘরে যেখানে যেটুকু রোদ আসতো, সেটুকু এই ফুলগাছের গায়ে লাগাবার চেষ্টা করতো।

বুনো ফুলগাছটি ছেলেটির মনের কথা বুঝতে পারতো। সে যে ওকে কতো ভালোবাসে জানতে পেরে আনন্দে শিউরে উঠতো। শুকনো ডাল সবুজ পাতায় ছেয়ে যেতো। আর তার অসহায় ছোটো বন্ধুর মনে আনন্দ দেবার জন্যই পাতার ফাঁকে-ফাঁকে রঙ-বেরঙের ফুল ফুটিয়ে তুলতো। ছোটো ছেলেটি সারাদিন ব'সে-ব'সে এই রঙিন ফুলগুলিকে দেখতো, আর আনন্দে তার গাল দু'টি লাল হ'য়ে উঠতো। রাতে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে [illegible] ফুলগুলির কথাই ভাবতো, এদেরই স্বপ্ন দেখতো,—[illegible] যখন মারা যাচ্ছিলো, তখনো এই ফুলগুলির [illegible] এখন এক বছর হ'লো ছেলেটি গেছে ঈশ্বরের কাছে। [illegible] ধরে গাছটিকে কেউ যত্ন করলে না, কেউ [illegible] ক্রমে-ক্রমে গাছটি শুকিয়ে ম'রে গেলো। [illegible] তাকে ঐ-সব জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দিলে। [illegible] ফুলগাছের ডাল,—একে আমি বুকে ক'রে [illegible]

যাবো। এই বনফুলটি গোলাপ, গন্ধরাজ, হাসনুহানা সবার চেয়ে বড়ো, কেন না, এ এক রুগ্ন শিশুর মনে যতো আনন্দ দিতে পেরেছে, তেমন আর কেউ পারে নি।'

ছেলেটি জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু তুমি এতো কথা কী ক'রে জানলে?'

দেবদূত বললে, 'আমি জানি, কেন না, আমি নিজেই সেই রোগা, পঙ্গু ছোটো ছেলে ছিলুম। কাজেই আমার নিজের ফুল নিজে চিনি বই কি।'

ছেলেটি অবাক হ'য়ে দেবদূতের সৌম্য, স্নিগ্ধ, সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে বার বার—এমন সময় তারা এসে পৌঁছলো স্বর্গলোকের দুয়ারে। দু-জনেই ঢুকে গেলো ভিতরে।

স্বর্গের দেবতা এগিয়ে এসে ছোটো ছেলেটিকে আদর ক'রে বুকে চেপে ধরলেন, আর অমনি সে-ও স্বর্গের দেবদূত হ'য়ে গেলো—তারও সুন্দর দুটি ডানা হ'লো—রোদের মতো ঝলমলে সোনালি।

তারপর দেবতা একে-একে আদর করলেন সকল ফুলকে, কিন্তু তিনি চুমো খেলেন কেবল একটু ফুলের পাপড়িতে,—সে হ'লো সেই শুকনো বনফুল। দেখতে দেখতে বনফুলটি আশ্চর্য রকমের সুন্দর হ'য়ে উঠলো, অপরূপ পরীর মতো, আর হঠাৎ সে এমন মিষ্টি সুরে গান গেয়ে উঠলো যে স্বর্গলোক আনন্দে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো।

যে-সব পরী আর দেবদূত দেবতাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো, তারাও আর থাকতে পারলে না, ফুলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইলো শুভ্র জ্যোতিঃপুঞ্জের উদাত্ত স্তোত্র। অবাক হ'য়ে ছোটো ছেলেটি—যে এখন নিজেই এক দেবতার দূত—দেখতে লাগলো বনফুলটির রূপ; সে বুঝতে পারলে, দেবতা সবচেয়ে ভালোবাসেন তাকেই, যে পরের মনে সুখ দেয়।

অনুবাদক: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের উপকথা

শ্রীসুলতা কর

বুদ্ধিমানের জয়

[ভূমিকা—কোন সুদূর অতীত কাল থেকে বাংলা দেশে কত সুন্দর রূপকথা, উপকথা চলে আসছে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, বৌদ্ধযুগে এই সব উপকথা রচিত হয়েছে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এইগুলি লেখা হয়নি। সেই সময় বাংলার ছায়াঘেরা শ্যামল মাটির কুটিরে সন্ধ্যার স্তিমিত প্রদীপের মিটমিটে আলোয় বসে ঠাকুমা, দিদিমা'রা, নাতি-নাতনীদের ভোলাবার জন্য মুখে মুখে এই সব রূপকথা, উপকথা রচনা করেছিলেন। তারপর অসংখ্য ঠাকুমা, দিদিমার মুখে মুখে এই কাহিনীগুলি যে কেমন করে আজও বেঁচে রয়েছে তা ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে! বাংলা দেশের ছেলেমেয়ের শৈশব সোনার রঙে রঙিয়ে তুলেছে এই সব রূপকথা আর উপকথা। 'বুদ্ধিমানের জয়' সেকালের একটি সুন্দর হাস্যরসাত্মক রূপকথা।]

এক গ্রামে খুব গরীব এক ব্রাহ্মণ বাস করত। তার নাম রামহরি। [illegible] তার [illegible] চলে। কোন রকমে সে [illegible]। কিন্তু এত গরীব [illegible] রামহরি খুব বুদ্ধিমান ছিল।

একদিন ছেলে-মেয়ে স্ত্রী আর সে নিজে সারা দিন উপোস করে রইল। একটা পয়সাও হাতে নেই। সারারাত জেগে বসে রামহরি ভাবতে লাগল—তাই ত কি করা যায়! এমনি ভাবে উপোস করে দিন কাটালে ত সবাই মিলে মারা পড়ব।

ভাবতে ভাবতে রাত কাটল। দুত্তোরি ছাই। এ গাঁয়ে আর থাকব না। দেখি অন্য গাঁয়ে গিয়ে মাথা খাটিয়ে কিছু রোজগার করতে পারি কি না।—বলতে বলতে রামহরি শেষ রাতের আবছা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। তারপর হাঁটতে আরম্ভ করল। হাঁটতে হাঁটতে দুটো গ্রাম পার হয়ে গেল। এদিকে বেলা বেড়ে উঠেছে। গরমের দিন। বেলা প্রায় দুপুর। প্রকাণ্ড এক মাঠ পার হতে গিয়ে রামহরি ঘেমে উঠল। ক্ষিদেয় পেটও জ্বলে যাচ্ছে। অতিকষ্টে মাঠ পার হয়ে একটা নতুন গ্রামে পৌঁছল। পৌঁছেই দেখে, সামনে এক খাবারের দোকান। দোকানে সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, মিঠাই থরে থরে সাজান রয়েছে। দেখেই রামহরির ক্ষিদে আরও বেড়ে গেল। আস্তে আস্তে এসে দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসল। বিদেশী লোক দেখে দোকানী জিজ্ঞেস করল—'মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে? কি খাবার দেব আপনাকে?'

রামহরি বলল—'অনেক দূর দেশ থেকে আমি বেড়িয়ে আসছি। সেজন্য কাপড়ও ময়লা হয়েছে, ক্লান্ত হয়েও পড়েছি।'

দোকানী গেঁয়ো লোক, কখনও বিদেশ যায়নি। জিজ্ঞেস করল—'মশায়, কোন দেশে গেছলেন?'

রামহরি তখন নানান নতুন দেশের মজার মজার গল্প বানিয়ে বলতে লাগল। দোকানী মশগুল হয়ে শুনতে লাগল। ব্রাহ্মণের উপর তার খুব শ্রদ্ধা হল।

বেলা বেড়ে চলেছে। দোকানী রামহরিকে বলল—'মশায়, একটু বসুন। আমি নদীতে তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়ে স্নান সেরে আসি। ফিরে এসে আপনার যা যা খাবার চাই দেব।' এই বলে দোকানী তার ছোট ছেলেকে বলল—'এই হরি, একটু দোকানে বস। আমি নদীতে একটা ডুব দিয়ে এখনি আসছি।' বলেই দোকানী তাড়াতাড়ি চলে গেল। ছোট ছেলে দোকানে এসে বসল।

রামহরি পথের দিকে চেয়ে ছিল। যেই দেখল দোকানী অনেক দূর চলে গেছে অমনি দোকানের তাক থেকে সন্দেশ, রসগোল্লা, মিঠাই, মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে গপ্ গপ্ করে খেতে লাগল। দোকানীর ছোট ছেলে ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। 'এই বামুন, তুমি এ কি করছ? তুমি এ কি করছ?' বলে চীৎকার করতে লাগল। রামহরি কোঁৎ করে গোটা কতক সন্দেশ, রসগোল্লা গিলে ফেলে বলল—'এই চেঁচাচ্ছিস কেন? তুই ছোট ছেলে, এ সব ব্যাপারের কি বুঝবি? যা তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে আয়।' ছোট ছেলেটা জিজ্ঞেস করল—'তোমার কি নাম বল? তবে ত বাবাকে গিয়ে বলব।' রামহরি গম্ভীর হয়ে বলল—'আমার নাম কাক।'

ছোট ছেলেটা খুব বোকা। সে বাবাকে এই ঘটনা বলবার জন্য দোকান ফেলে ছুটল।

দোকানীর ছোট ছেলে চলে যেতেই, রামহরি দোকানীর ক্যাশবাক্স খুলে ফেলল। বাক্সে পঞ্চাশ টাকা ছিল। সেই টাকা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে ছুটে পালাল। এদিকে দোকানীর ছোট ছেলে

ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে তার বাবার কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'ও বাবা, ও বাবা! তোমার সব সন্দেশ, রসগোল্লা খেয়ে ফেলল।' দোকানী জিজ্ঞেস করল—'কে খেল, কে খেল?' ছোট ছেলে বলল—'কাক সব খেয়েছে বাবা, কাক সব খেয়েছে।' ছেলের কথা শুনে দোকানী রেগে আগুন হয়ে ঠাস করে তার গালে চড় মেরে বলল—'একটা কাক তাড়াতে পারলি না? সন্দেশ রসগোল্লা সব খেয়ে গেল। চল্ আমার সঙ্গে।' এই বলে ছেলের হাত ধরে ছুটতে ছুটতে দোকানে এল। এসে দেখল ব্রাহ্মণ সেখানে নেই। ক্যাশবাক্স ভাঙ্গা, টাকাকড়ি কিছু নেই। হায় হায় করতে করতে দোকানী কপাল চাপড়াতে লাগল।

এদিকে রামহরি ছুটতে ছুটতে সেই গ্রাম ছাড়িয়ে এসে একটা বনের ভিতর ঢুকে, এক প্রকাণ্ড বটগাছের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যেই সেখানে দাঁড়িয়েছে অমনি ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে এক বুনো শূয়োর হঠাৎ তাকে তাড়া করে উঠল।

রামহরি ভয়ে আঁতকে উঠল। কিন্তু যতই ভয় পাক, বুদ্ধি তার ঠিক থাকে। তাড়াতাড়ি সে শূয়োরের লেজটা খুব জোরে চেপে ধরল। বোকা শূয়োর হতভম্ব হয়ে গেল। আর চরকীবাজীর মত প্রকাণ্ড বটগাছের চার পাশে বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল। রামহরিও তার লেজ ধরে বন্-বন্ করে ঘুরতে লাগল। কাপড়ের খুঁট থেকে সব টাকা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। ঠিক এমনি সময় সে দেশের রাজার সিপাহী তেজী ঘোড়ায় চেপে খট্-খট্ করে সেখানে এসে দাঁড়াল।

রাজার কি একটা কাজে এই বন পার হয়ে তাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে।

বনের ধারে এসে বুনো শূয়োরের লেজ ধরে বন্‌বন্ করে ঘোরা অবস্থায় রামহরিকে দেখে সে ত অবাক! জিজ্ঞেস করেল—'ও বামুন মশাই, ও বামুন মশাই, কি হয়েছে? এমন লেজ ধরে ঘুরছ কেন?' বুদ্ধিমান রামহরি ভাবল—এইবার একটা ফন্দী খাটাই। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'সিপাই মশাই, নমস্কার! ব্যাপার দেখে আপনি একটু আশ্চর্য্য হচ্ছেন বটে, তবে এমন কিছু নয়। দেখেই যখন ফেললেন তখন ব্যাপারটা খুলেই বলি। আমি এই কাছের গাঁয়ের বাসিন্দা। গরীব মানুষ, সে জন্য কুবের ঠাকুরের পূজা করলাম। কুবের ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে বর দিয়ে বললেন—'তোকে একটা বুনো শূয়োর দিচ্ছি। রোজ ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এর লেজ ধরে এই বটগাছের চারপাশে ঘুরবি আর যতক্ষণ ঘুরবি ততক্ষণ বুনো শূয়োরের মুখ থেকে টাকা বেরোবে। সেই টাকা কুড়িয়ে নিবি, তোর দুঃখু ঘুচবে। 'তাই রোজ আমি এর লেজ ধরে ঘুরি। ওই দেখুন মাটিতে কত টাকা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।'

বোকা সিপাই চেয়ে দেখে ঠিকই ত, মাটিময় টাকা গড়াগড়ি যাচ্ছে। সে বলল—'ঠাকুর মশাই, আমার ঘোড়াটি খুব দামী। এইটি তুমি নাও আর তোমার বুনো শূয়োরটি আমাকে দাও।' রামহরি বলল—'না না, তা কি কখনও হয়? কুবের ঠাকুরের বরে এই শূয়োর পেয়েছি, একে আমি ছাড়ব না।'

কাকুতি-মিনতি করে সিপাই বলতে লাগল—'ঠাকুর মশাই, দোহাই তোমার, ওটি আমাকে দাও। আমি তোমাকে ঘোড়া দেব, তাছাড়া আরও একশ' টাকা দেব।'

রামহরি বলল—'কি আর করি বল। তুমি হলে রাজার সিপাই। 'না' বললে হয়ত আমার গলাই কেটে ফেলবে। একশ' টাকা ওই বটগাছের পাশে রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে শূয়োরের লেজ চেপে ধর।'

সিপাই তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে একশ' টাকা গাছের গোড়ায় রাখল, তারপর শূয়োরের লেজ চেপে ধরল। যেই সে লেজ চেপে ধরল অমনি রামহরি একশ' টাকা কুড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটে পালাল। বোকা সিপাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগল আর দেখতে লাগল—শূয়োরের মুখ থেকে একটাও টাকা পড়ছে না, খালি ফেনা ঝরছে। তখন কি আর করে, লেজ ছেড়ে দিয়ে সিপাই লাফিয়ে একটা গাছে উঠল। শূয়োরটা ছুটে পালাল।

এদিকে রামহরি তেজী ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে এক গ্রামের জমিদারবাড়ীর সামনে এসে পৌছাল। সেখানে পৌছে ঘোড়া থামিয়ে জমিদারবাড়ীর বাইরের ফটকে ঘা মারল। জমিদারের লোকজন ফটক খুলে দেখল—তেজী ঘোড়ায় চড়ে এক ব্রাহ্মণ এসেছে। তারা ভাবল, এত দামী ঘোড়ায় চড়ে এসেছে ধনী লোক হবে বোধ হয়। জিজ্ঞেস করল—'আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?' রামহরি বলল—'আমি ব্রাহ্মণ। সোনার গ্রামের জমিদার। অনেক দূর দেশ থেকে বেড়িয়ে ফিরছি। আজ তোমার কর্তার বাড়ীর অতিথি হব।'

জমিদারমশাই খুব বড়লোক। এক ধনী ব্রাহ্মণ অতিথি হয়ে এসেছে শুনে তিনি নিজে এগিয়ে এসে রামহরিকে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। সোনার থালায়, সোনার বাটিতে প্রচুর সুখাদ্য তাকে খেতে দেওয়া হল। মখমলের বিছানায় শুতে দেওয়া হল। রামহরির ঘোড়াকেও আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে ভাল খাবার খাওয়ান হল। চাকরেরা ঘোড়াকে দলাই-মলাই করতে লাগল।

মাঝ রাতে জমিদারবাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই সময় রামহরি বিছানা ছেড়ে উঠল। তারপর পা টিপে টিপে আস্তাবলে গেল। আস্তাবলের মেঝেতে বসে নিজের ঘোড়ার পায়ের কাছের মাটি অল্প খুঁড়ে কোমরের খুঁট খুলে একশ টাকা পুঁতে ফেলল। তারপর আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

জমিদার মশায়ের রোজ ভোরে বাগানে বেড়ান অভ্যাস ছিল। সেদিনও তিনি ভোরে উঠে বাগানের দিকে যাচ্ছিলেন। যাবার সময় ঘোড়ার আস্তাবল পার হয়ে চলেছেন, এমন সময় শুনলেন খুট খুট করে কিসের আওয়াজ হচ্ছে। চেয়ে দেখেন রামহরি আস্তাবলে বসে ঘোড়ার পায়ের কাছের মাটি নরুণ দিয়ে খুঁড়ছে। অবাক হয়ে জমিদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন—'এ কি ব্যাপার! আপনি এখানে কি করছেন?'

রামহরি বলল—'আমি আস্তাবল সাফ করছি।'

জমিদারমশাই বললেন—'সে কি কথা? উঠুন, উঠুন, আপনি হলেন জমিদারবাড়ীর অতিথি। আপনি কেন একাজ করবেন? কত দাস-দাসী রয়েছে তারা একাজ করবে।'

রামহরি কিন্তু জমিদারের কোন কথা শুনল না। একমনে মাটি খুঁড়তে লাগল। তখন জমিদার আশ্চর্য্য হয়ে আস্তাবলে ঢুকে ব্রাহ্মণের সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দেখলেন, রামহরি মাটি খুঁড়ে একরাশ টাকা বার করছে।

জমিদার খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'এখানে এত টাকা কোথা থেকে এল?'

যেন খুব ভয় পেয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে রামহরি বলল—'জমিদার মশাই, দেখেই যখন ফেললেন তখন ঘটনাটা খুলেই বলতে হয়। আমি গরীব বামুন। দুঃখ ঘুচবে বলে অনেক দিন ধরে মহাদেবের পূজা করলাম। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে এই ঘোড়াটি দিলেন। বললেন—'রোজ রাতে এই ঘোড়ার মুখ থেকে একশ' টাকা পড়বে। রোজ ভোরে তুই নিজের হাতে আস্তাবল পরিষ্কার করবি আর সেই টাকা কুড়িয়ে নিবি, তা'হলেই তোর টাকা-কড়ির দুঃখ ঘুচবে।'

ব্রাহ্মণের কথা শুনে জমিদার মশাই বললেন—'ঠাকুর, ওই ঘোড়াটি আমাকে দিন। আমি আপনাকে পাঁচশ' টাকা দেব।'

রামহরি বলল—'না না, তা-ও কি হয়। এ আমার দেবতার কাছ থেকে পাওয়া ঘোড়া। ও আমার দুঃখ ঘোচাবে।'

জমিদার মশাই কাকুতি-মিনতি করে বললেন—'আচ্ছা আমি হাজার টাকা দিচ্ছি ঠাকুর, ওই ঘোড়াটি দাও।'

যেন ভারী মুস্কিলে পড়েছে, এই ভাব দেখিয়ে রামহরি বলল—'আপনি হলেন এ দেশের জমিদার। আর আমি এক গরীব বামুন। যদি না বলি হয়ত আমাকে কেটেই ফেলবেন। তবে তাই হোক। ঘোড়াটি নিন, টাকা দিন!' রামহরির কথা শুনে জমিদার ভারী খুশী। তাড়াতাড়ি হাজার টাকার তোড়া এনে তাকে দিলেন।

হাজার টাকা হাতে পেয়েই রামহরি তাড়াতাড়ি জমিদারবাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। একটু দূরে গিয়েই ছুটতে আরম্ভ করল। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই নিজের গ্রামে পৌঁছে গেল। তারপর বাড়ীর দরজায় পৌঁছে ধাক্কা দিতে লাগল—'ও গিন্নী, ও খোকা, ও খুকী, ছুটে আয়।'

চীৎকার শুনে ছেলে-মেয়ে গিন্নী ছুটে এল। রামহরিকে দেখে রামহরির স্ত্রী রেগে বলল—'ব্যাপার কি, ব্যাপার কি! তিন দিন তিন রাত না খেয়ে আমরা শুকিয়ে মরছি, আর তুমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে ফূর্ত্তি করছ?'

হাসতে হাসতে রামহরি বলল—'আর রাগ করো না গিন্নী! এই দেখ কি এনেছি। তোমাদের দুঃখ ঘুচল।' এই বলে টাকাকড়ি খুলে দেখাল। এক সঙ্গে এত টাকা দেখে গিন্নী ছেলেমেয়েরা হতভম্ব হয়ে গেল!

ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করতে লাগল—'কি করে এত টাকা রোজগার করলে বাবা?'—'বুদ্ধি রে বুদ্ধি। বুদ্ধি বেচে টাকা রোজগার করেছি।' বলে রামহরি সব ঘটনা খুলে বলল।

তারপর আর কি? গরীব ব্রাহ্মণের দুঃখ ঘুচল। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

আর ওদিকে সেই বোকা দোকানদার, বোকা সিপাই, বোকা জমিদার দেশের রাজার কাছে রামহরির নামে নালিশ করল।

সব ঘটনা শুনে রাজা বললেন—'যেমন তোমরা বোকা, তেমনি তার ফল পেয়েছ। ব্রাহ্মণের কোন দোষ নেই।'

কফির কাপে তাণ্ডব

যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

বিদেশের বিভিন্ন সহরে বিভিন্ন পরিবেশে আমাকে যাদুর খেলা পরিবেশন করতে হয়েছে। কখনও বা কোনও লর্ড বা কাউন্টের বৈঠকখানায় কখনও বা কোনও ক্লাবে আবার কখনও বা কোনও বড় হোটেলে বা বড় হলে। কাজেই নানা শ্রেণীর খেলাই সর্ব্বদা আমাকে প্রস্তুত রাখতে হয়েছে সময় বুঝে ব্যবস্থা করার জন্য। ছোট-বড় সবরকমের খেলাই তাই আমি stock এ রেখেছি।

প্যারিসের সহরতলী অঞ্চলে এক কাউন্টের বাড়ীতে একদিন আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল সান্ধ্যভোজের জন্য। সেই ভোজসভায় একটি অতিসাধারণ খেলা দেখিয়ে অনেক অসাধারণ প্রতিভাকে মুগ্ধ করেছিলাম আমি। সেই কথাই বলছি এবারে শোন।

কাউণ্ট সাহেবের খাস বেয়ারা 'আরনো'। ভারতীয় ফকির জ্যোতিষীর উপরে তার খুব আস্থা। প্রথমেই তার উপরে ইচ্ছা-শক্তি বিস্তার করে অতীত ও বর্ত্তমানের দু'-একটি ঘটনার কথা চুপি চুপি বললাম তার কানে কানে; শুনে তো সে অবাক! কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে হয়ে উঠল আমার বেশ অনুরক্ত। সুযোগ বুঝে তাকে আমার একটি মতলবের কথা তাকে খুলে বলতেই সে রাজী হয়ে গেল।

অতিথি অভ্যাগতেরা সবাই এসে পড়েছেন। তাঁদের খাতির করার জন্য কাউণ্ট সাহেব আমদানী করেছেন 'বোর্দ্যো' সহরের দামী মদ্য। গ্লাসে গ্লাসে ঘুরছে তা সবার হাতে। আমার হাত খালি দেখে অবাক হলেন কাউণ্ট, 'এ কি সরকার, তুমি পান করছ না?' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলাম, 'আমি মদ্যপান করি না।' কাউণ্ট তাঁর খাস বেয়ারাকে ডাকলেন, আমি তাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা কফি দিতে বললাম। যথাসময়ে গ্লাস-ভর্ত্তি কফি এসে গেল। আমি গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরলাম। কাউণ্ট আর তার বন্ধু-বান্ধবরা তখন আমারই কাছে দাঁড়িয়ে। আমার অনুরোধে তাঁদেরই একজন ট্রে থেকে একটি দুধের পাত্র তুলে নিয়ে আমার কফির গ্লাসে কয়েক ফোঁটা দুধ ঢেলে দিলেন। অবাক কাণ্ড! কফি যে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল ঘন কালো কালিতে! কাউণ্টের যে বন্ধুটি দুধ ঢেলেছিলেন তিনি তো মহা অপ্রস্তুত! অল্পক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলেন। হাসির রোল থামলে কাউণ্ট আমার পরিচয় দিলেন সবার কাছে!

"সুজ এ্যাভো ইসি প্রেজোয়ার ল্য গ্রা ম্যাজিসিয়া ভ ল্যাদ ম্যাসিও এ, সি, সরকার।" অর্থাৎ আজ সন্ধ্যায় আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় যাদুকর এ, সি, সরকারকে। ফরাসী দেশের টেলিভিসনের দৌলতে আমার নাম এবং গুণাবলীর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল তাঁদের সবারই। এবারে চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করে তাঁরা সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে আমাকে অভিনন্দিত করলেন। আমিও মাথা নীচু করে তাঁদের জানালাম অভিবাদন।

এবার শোন, কেমন করে কফি কালি হয়ে গিয়েছিল। কাউণ্ট সাহেবের খাস বেয়ারা আরনোকে আমি অনুরোধ করেছিলাম যে আমি কফি চাইলে সে যেন গ্লাসে করে খানিকটা আয়োডিন (tincture Iodine) মেশানো জল আর দুধের পাত্রে একটু ময়দা গোলা জল নিয়ে হাজির হয়। আয়োডিন গোলা জল দেখতে কফির মতন আর ময়দা গোলা জল তো দুধেরই মতন দেখতে।

তোমরাও খুব সহজে এ খেলা দেখাতে পারবে। টিনচার আয়োডিন তো সব বাড়িতেই আছে। তবে সাবধান, টিনচার আয়োডিন যেন কোন ভাবে মুখে না যায় এ কিন্তু খুবই বিষাক্ত জিনিষ।

বিবেকানন্দ স্তোত্র

সুমণি মিত্র

৩২

ব্রাহ্ম-নেতারা যারা সংস্কার চাও,
স্বামিজীর সঙ্গীত শুনে রেখে দাও।
সিদ্ধি সিদ্ধি বোলে চ্যাঁচালে কি হবে,
সিদ্ধিটা কিনে এনে বেটে গুলে খাও।

ধর্মটা জীবনেতে গুলে খেতে হবে ;
আত্মজ্ঞানের পথে পা বাড়াও তবে
মনুষ্যত্ব-বুদ্ধিটা শুভ হোয়ে গেলে
সর্ব সমস্যার সমাধান হবে।

তখন বুঝবে তুমি—আছে যতো ভাব,
কোনোটাই হেয় নয়, সবেতেই লাভ।
এম·এ পাশ কোরে গেলে আর কি তখন
নীচু ক্লাসে পড়ি বোলে দেবে সন্তাপ ?

তোমাদেরই মুখ থেকে শুনবো তখন
সর্বমনোপযোগী আশার বচন।
স্বামিজীর গলা থেকে সুর কেড়ে নিয়ে
তুমিও বোলবে—'আমি চাই না reform.'

* * *

"I do not believe in reform ;
I believe in growth.
I do not dare
To put myself
In the position of God
And dictate to our society,
'This way
Thou shouldst move
And not that.'

I simply want to be
Like the squirrel
In the building of Rama's bridge,
Who was quite content
To put on the bridge
His little quota of sand-dust.
That is my position."১

• • •

কে কার সংস্কার করে দুনিয়ার ?
বিশ্ব সৃষ্টি যিনি কোরেছেন, তাঁর
কটাক্ষে আসে-যায় লক্ষ জগৎ ;
কালকের সমুদ্র আজকে পাহাড় !

আজ যেটা পৃথিবীর সেরা বিস্ময়,
কালকে তা মন থেকে বিলুপ্ত হয়।
একদিন ছিলো নাকি 'টেথিস্ সাগর'
আজকে যেখানে ঐ গিরি হিমালয় !

ভাঙা-গড়া ওঠা-পড়া হবে চিরকাল,
আজকে নিশুতি রাত, কালকে সকাল।
তুমি এটা চাও আর নাই চাও, তবু
আজকের আনন্দ ব্যথা দেবে কাল।

কি কোরে বুঝবো বলো তাঁর এ-বিধান ?
কি কোরে বুঝবো কা'র কিসে কল্যাণ ?
তার চেয়ে বরঞ্চ অহমিকা ছেড়ে
'কাঠবেরালি'র মতো হোই নিষ্কাম।

• • •

"This wonderful national machine
Has worked through ages,
This wonderful river of national life
Is flowing before us.

১। "আমি সংস্কারে বিশ্বাস কোরি না, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। নিজেকে ঈশ্বরের আসনে বোসিয়ে আমি সমাজকে এ-হুকুম কোরতে সাহস কোরি না,—'এদিক দিয়ে তোমায় চোলতে হবে, ওদিক্ দিয়ে নয়।' আমি কেবল সেই কাঠবেরালির মতো হোতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় সামান্য এক মুঠো বালি বোয়ে এনে নিজেকে কৃতার্থ মনে কোরেছিল। ঐ হোচ্ছে আমার ভাব।" —*My plan of campaign.* (*comp. works, Vol. III, page* 213)

Who knows
And who dares to say
Whether it is good,
And how it shall move ?
Thousands of circumstances
Are crowding round it,
Giving it a special impulse,
Making it dull at one time,
And quicker at another.
Who dares command its motion ?

Ours is only to work
Without looking for results.
Feed the national life
With the fuel it wants,
But the growth is its own ;
None can dictate its growth to it "[২]

৩৩

সত্যকে কোনোদিন সামনে পেলেই,
আত্মার অনুভূতি দানা বাঁধলেই,
তখন বুঝবে তুমি এই দুনিয়ায়
ভালো আর মন্দের সীমারেখা নেই।

আজকে যা' ভালো—সেটা কালকে খারাপ,
যে-আগুনে হাত পোড়ে সেই রাঁধে ভাত।
ভালো আর মন্দটা একই জিনিসের
দু'-দুটো বিশেষ রূপ নামেই ফারাক্।

সুখ আর দুঃখটা দুটো নয় মোটে,
চাল নিয়ে ভাত রাঁধো, কেউ চিঁড়ে কোটে।
সুখ যদি ভাত হয়, দুঃখটা চিঁড়ে।
একই রূপান্তরে দুটো হোয়ে ওঠে।

অতএব পৃথিবীর সব কিছুতেই
ভালো ছাড়া বেশ কিছু মন্দ আছেই।
এমন কিছুই নেই যাতে অন্তত:
নিছক ভালোই আছে, মন্দটা নেই

* * *

"Evils are plentiful
In our society,
But
So are there evils
In every other socicty.

Here
Poverty is the great bane of life ;
There (in the west),
The life-weariness of luxury
Is the great bane
That is upon the race.

Here,
Men want to commit suicide
Because
They have nothing to eat ;
There (in the west),
They commit suicide
Because
They have so much to eat.

Evil is everywhere,
It is like chronic rheumatism.
Drive it from the foot,
It goes to the head ;
Drive it from there,
It goes somewhere else.
It is a question of chasing it
From place to place ;..

Evil and good
Are eternally conjoined,
The obverse and the reverse
Of the same coin.
If you have one,
You have the other ;....
Nay,
All life is evil.
No breath can be breathed
Without killing some one else ;
Not a morsel of food
Can be eaten
Without depriving
Some one of it."[৩]

২। এই অদ্ভুত জাতীয় যন্ত্র শত শত শতাব্দী ধোরে কাজ কোরে আসছে, এই অদ্ভুত জাতীয় জীবননদী আমাদের সামনে দিয়ে প্রবাহিত হোচ্ছে—কে জানে, কে সাহস কোরে বোল্‌তে পারে এটা ভালো কি খারাপ, এবং কি ভাবে এর গতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত? হাজার হাজার ঘটনাচক্র একে বিশেষ ভাবে বেগবান কোরেছে, সময়ে সময়ে সে-বেগ মৃদু এবং সময়ে সময়ে দ্রুত হোচ্ছে। কে ওর গতি নিয়ন্ত্রণ কোরতে সাহস কোরবে বলো? ফলাফলের চিন্তা না কোরে আমাদের শুধু কাজ কোরে যেতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনটার পুষ্টির জন্যে যা প্রয়োজন দাও, কিন্তু বেড়ে-ওঠাটা তার নিজের প্রকৃতির ওপর নির্ভর কোরছে; কারুর সাধ্য নেই তার ওপর হুকুম চালায়—'ওহে, তুমি এই ভাবে বেড়ে ওঠো'।"
—*My plan of campaign* (*comp. works, Vol III, page 213*)

৩। "আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে বটে, কিন্তু অন্যান্য সমাজেরও ঐ একই অবস্থা। এখানে জীবন দারিদ্র্যে জর্জরিত; পাশ্চাত্য দেশে বিলাসিতার অবসাদে সমস্ত জাতটা মৃতপ্রায়। এখানে লোকে খেতে না পেয়ে আত্মহত্যা করে; সেখানে আহারের অতিরিক্ত প্রাচুর্যের জন্যে লোকে আত্মহত্যা কোরে থাকে। দোষ সর্বত্রই আছে।

৩৪

অতএব সমাজের মাথাওয়ালা যাঁরা
নিছক্ ভালোই চান মন্দটা ছাড়া,
তাঁদের প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ, কারণ—
গরম 'আইস্ক্রিম্' খেতে চান তাঁরা।

আনন্দ-বেদনার বিচ্ছেদ নেই ;
দুঃখটা ছুটে আসে সুখ যেখানেই।
মাংসের কারিতে যে আনন্দ পাই,
ছাগোলের ব্যা-ব্যা-ডাক তার পেছনেই।

যারা এই সত্যটা জানে না তারাই
নিছক্ ভালোটা চায় মন্দ ছাড়াই ;
অথচ এ দুনিয়ার কোনো কিছুতেই
কারুর সাধ্য নেই একটা তাড়াই।
এ-কথা বোঝার পর তখন কি আর
মন্দকে বাদ দিয়ে চাও সংস্কার ?
তখন তুমিও ঐ জ্ঞানের বীণায়
স্বামিজীর ভঙ্গিতে দেবে ঝংকার।—

* * *

"We may verily imagine
That
There will be a place
Where
There will be only good,
And no evil,
Where
We shall only smile
And never weep.
This is impossible
In the very nature of things ;
For the condition
Will remain the same.

Wherever
There is
The power of producing smile in us,
There lurks
The power of producing tears.
Wherever
There is
The power of producing happiness,
There lurks somewhere
The power of making us miserable."

* * *

The sumtotal of happiness
And misery in this world
Is at least
The same throughout.
If a wave rises in the ocean
It makes a hollow somewhere.
If happiness comes to one man,
Unhappiness comes to another.

Men are increasing in numbers
And some animals
Are decreasing ; ....
The strong race
Eats up the weaker,
But
Do you think
That the strong race
Will be very happy ?
No ;
They will begin to kill eaeh other.

I do not see
On practical grounds,
How this world
Can become a heaven.
Facts are against it.
On theoretical grounds also
I see
It cannot be."৪

[ক্রমশঃ।

এটা হচ্ছে পুরোনো বাতের মতো। পা থেকে বাত তাড়ালে তো মাথায় বাত ধোরলো ; মাথা থেকে তাড়ালে তখন আবার শরীরের আর একটা অঙ্গ আশ্রয় কোরে বোসলো। তাকে কেবল এখান থেকে সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই সার।···ভালো মন্দ নিত্যসংযুক্ত, এক জিনিষেরই এপিঠ-ওপিঠ। একটাকে নিলে আর একটাকেও নিতে হবে ; শুধু তাই নয়, সমস্ত জীবনই দুঃখময়। কাউকে না কাউকে হত্যা না কোরে নিঃশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত অসম্ভব ; এক টুকরো খাবার খেতে হোলেও কেউ না কেউ বঞ্চিত হবেই।"

—*My plan of Campaign.* (*Comp. Works. Vol III, Page* 213 *and* 214).

৪। "আমরা অবিশ্যি এমন একটা জায়গা কল্পনা কোরতে পারি, যেখানে কেবল ভালোটাই থাকবে, খারাপটা নয়, যেখানে আমরা কেবল হাসবো, কাঁদবো না। কিন্তু যখন এই সমস্ত কারণ সমান ভাবে সর্বত্রই রয়েছে, তখন এরকম হওয়াটা অসম্ভব। যেখানেই আমাদের হাসাবার শক্তি, কাঁদাবার শক্তিও সেখানে। যেখানেই আমাদের সুখী করার শক্তি, দুঃখ দেওয়ার শক্তিও সেখানে।"

—*Maya and illusion, Jnana-yoga* (*page* 64 *and* 65).

"এই পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখের সমষ্টি সর্বদাই সমান। সমুদ্রে যদি একটা ঢেউ ওঠে, অন্য কোথাও নিশ্চয়ই একটা গর্ত তৈরী হবে। কোনো লোকে যদি সুখী হয়, তবে নিশ্চয়ই অন্য কেউ একজন দুঃখী হবে। মানুষের সংখ্যা যতোই বাড়ছে, পশুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে ;···শক্তিমান জাত দুর্বল জাতকে গ্রাস কোরছে, কিন্তু তোমরা কি তা'তে মনে করো তারা বড়ো সুখী হবে ? না, তারা আবার পরস্পরকে সংহার কোরতে সুরু কোরবে। জগৎটা কি কোরে যে একদিন স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে, তা তো আমি বুঝতে পারছি না। এ তো গ্যালো প্রত্যক্ষের বিষয়। আনুমানিক বিচার কোরেও দেখতে পাচ্ছি, তা' কখনো হবার নয়।"

—*Realisation, Jnana-yoga* (*page* 184 *and* 185).

বিজ্ঞানবার্ত্তা

পক্ষধর মিশ্র
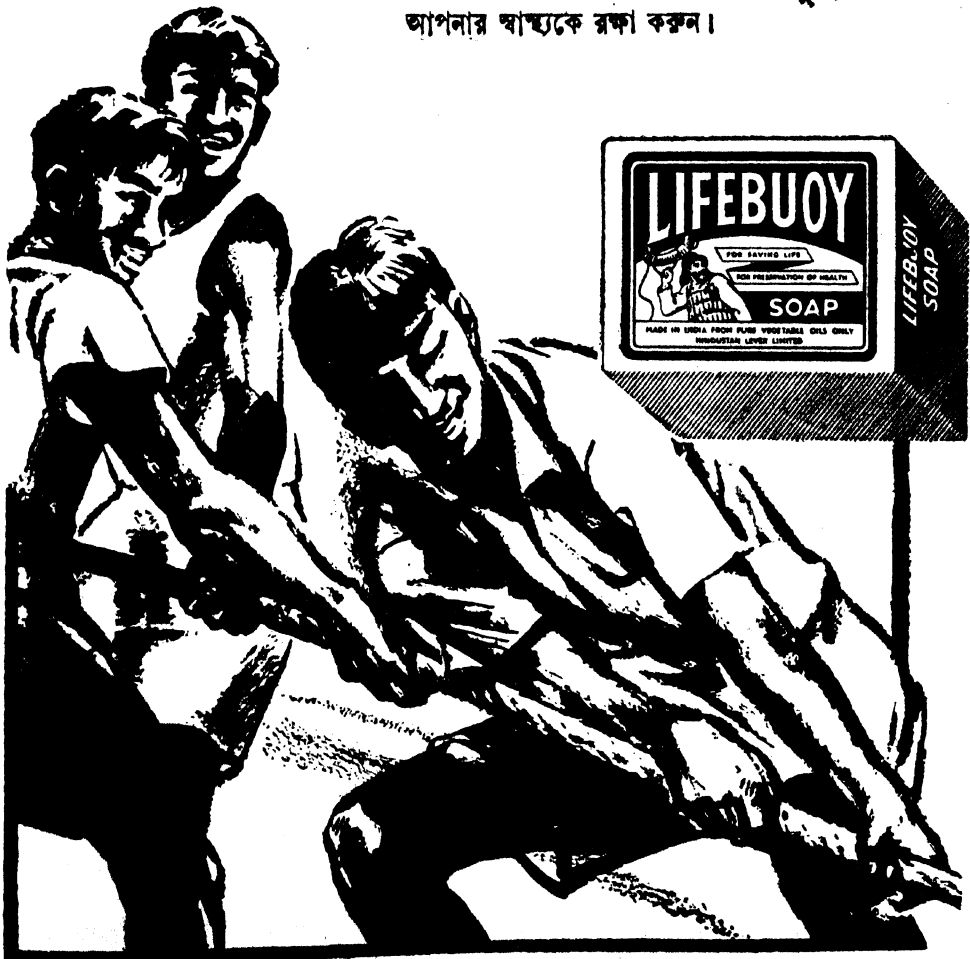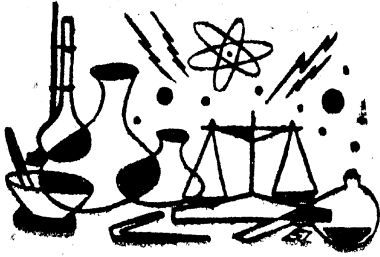
স্পুটনিকের খবরাখবরের বাজার এখন একটু মন্দা। রাশিয়া বা আমেরিকা নতুন কোন কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে না ছাড়লে আলোচনাটা আবার ঠিক জমবে না। দ্বিতীয় স্পুটনিক আর তার আরোহী লাইকার সংবাদ পুরোনো হয়ে গেছে, তাই সবাই আকাশের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন, রাশিয়ার বিরাটকায় একটনী তৃতীয় উপগ্রহের প্রতীক্ষায়। প্রথম উপগ্রহটি এবং তার রকেট কবে পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে তা নিয়েও বিজ্ঞানীমহলে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখি, কোন কোন বিজ্ঞানী ফতোয়া জারী করেছেন, অমুক দিন—অমুক সময়ে বোধ হয় রকেটটি পৃথিবীতে নেমে আসবে। কেউ কেউ আবার সন্দেহ প্রকাশ করছেন, ইতিমধ্যেই বোধ হয় রকেটটি পৃথিবীতে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অঞ্চলে নেমে এসেছে। শোনা যাচ্ছে, প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের অবতরণের সময়ও আসন্ন। যাই হোক না কেন, আপনার আমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই,—রকেটটি অথবা তার উপগ্রহ কোন সময়ই হঠাৎ আমাদের মাথার উপর এসে পড়বে না। পৃথিবীর বুকে নামবার সময়, বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

স্পুটনিকের সংবাদকে চাপা দিয়ে বর্ত্তমানে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে কৃত্রিম সূর্য্য, আর আলোর গতিসম্পন্ন কোয়াণ্টাম রকেট। বিজ্ঞানীরা এমন ভাবে ঘোষণা করতে আরম্ভ করেছেন যে, জনসাধারণ ধরেই নিয়েছেন—চাঁদে যাওয়া তো তাঁদের হাতের মুঠোয়। আগামী যুগে কোন গ্রহে অথবা নক্ষত্রে গিয়ে তাঁরা অবসর উপভোগ করবেন, সেই কথাই তাঁদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

• • • •

সোভিয়েট রাশিয়ার আর একটি বিরাট প্রচেষ্টার কথা সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা এমন এক ধরণের বিমান নির্ম্মাণ করতে চেষ্টা করছেন যা রকেটের মতো বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধস্তরে বিচরণ করে পৃথিবীতে ফিরে এসে সাধারণ বিমানের মতো মাটিতে অবতরণ করতে সমর্থ হবে।

মস্কো[illegible] আর একটি সুসংবাদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দুই জেট ইঞ্জিন-চালিত সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্ম্মিত একটি হেলিকপ্টার ১২ টন ওজন প্রায় ৮০০০ ফিট উচ্চে বহন করে নিয়ে গিয়ে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করেছে। জনৈক পরিকল্পনাকারী বিজ্ঞানীর মতে আর কিছু দিন পরে মোটর গাড়ীর বদলে লোকে সহর ও সহরতলীর মধ্যে যাতায়াত করবার জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করবে। এতে সময়ও বাঁচবে এবং যাতায়াতের সুবিধাও হবে অনেক বেশী।

• • • •

আজ থেকে একশ' বছর পরে মানব সভ্যতার অবস্থা কি রকম হবে, আমেরিকার আট জন প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী তার এক বিবরণ দিয়েছেন। একশ' বছর পরে আপনি ইচ্ছামতো চন্দ্রলোকে গিয়ে কোন ভাল হোটেলে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করতে পারবেন। কথা বলার জন্য কষ্ট স্বীকার করবার কোন প্রয়োজন নেই,—আপনার মনে কোন কথা উদয় হলেই অন্য লোক তা জানতে পারবেন। একটা মুস্কিল হবে বটে,—মনে এক মুখে এক, দু'রকম কথা বোধ হয় বলা যাবে না।

চেহারার জন্য কোন চিন্তা করবার নেই। নিজের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুশীমতো বদলে নেওয়া চলবে। দেহের আকৃতিও নিজের পছন্দ মতো লম্বা বা বেঁটে করে নেওয়া যাবে। সেদিন আমরা সবাই নিরামিষাশী হবো, শিল্পের জন্য সমস্ত কাঁচা মাল জোগাড় দেবে সমুদ্র। সূর্য্যালোক আর জল আমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করবে। ছেলে হবে না মেয়ে হবে, তা স্বামি-স্ত্রী নিজেরাই আলাপ-আলোচনা করে আগেই স্থির করে নিতে পারবেন। একবারে একটি, দু'টি বা তিনটি সন্তানের জন্ম হবে, তা নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতাও মানুষের থাকবে।

সেদিন সমগ্র পৃথিবীর আকাশ জুড়ে অবস্থান করবে অজস্র কৃত্রিম উপগ্রহ। তারা অতি সহজেই এক মহাদেশের বার্ত্তা অন্য মহাদেশে পৌঁছিয়ে দেবে,—বিশ্বের আবহাওয়ার খবর প্রতি ঘণ্টায় জানতে পারা যাবে। এমন কি, কোন দেশে যদি যুদ্ধের আয়োজন চলে তাহলেও ঐ কৃত্রিম উপগ্রহগুলি সঙ্কেত পাঠিয়ে সমগ্র বিশ্বকে সতর্ক করে দেবে। পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে সাত'শ কোটি, তখন কাউকেই আর সপ্তাহে আট ঘণ্টার বেশী কাজ করতে হবে না।

• • • •

আগামী ১৯৫৮ সালে ৩০শে নভেম্বর ভারতবর্ষের বিজ্ঞান গবেষণার শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোসের জন্ম শতবর্ষ পূর্ণ হবে। সমগ্র দেশে এই মহান্ বিজ্ঞানীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এক ব্যাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আচার্য্যদেবের জীবন এবং সাধনার সঙ্গে দেশবাসীর সম্পূর্ণ পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে সভাপতি করে একটি শক্তিশালী অনুষ্ঠান-সমিতিও প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই সমিতি আচার্য্যদেবের জীবনী-গ্রন্থগুলি আবার মুদ্রিত করবেন,—বাংলা ভাষায় তাঁর একটি জীবনী-গ্রন্থও প্রকাশ করা হবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের যে ক্ষেত্রে গবেষণা করেছিলেন তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে, খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের রচনা সমন্বিত একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করা হবে। এই জয়ন্তী উপলক্ষে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিসন আচার্য্যদেবের জীবন এবং বিজ্ঞান সাধনার বিষয়ে একটি ডকুমেন্টারী ছবি তুলতে মনস্থ করেছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোস মহাশয়ের দ্রব্যাদি, হাতের লেখা এবং গবেষণার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির এক বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে করা হবে। জানা গিয়েছে, এই প্রদর্শনীতে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কার্য্যকলাপের পরিচয়ও প্রদর্শিত হবে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

কবিগুরু বলেছিলেন,—"শেলি যদি বৈজ্ঞানিক হতেন তা'হলে তিনি জগদীশচন্দ্র হতে পারতেন।" প্রতিভাধর কবির কাব্য, জড়ের মধ্যে কল্পনার চক্ষুতে প্রাণের স্পন্দন দেখতে পায়। পরম শ্রদ্ধেয় মহামনীষী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুভূতির সহায়তায় নির্ব্বাক জীবনের গোপন স্পন্দনকে জগৎসভায় উদ্ঘাটিত করেছিলেন। ১৯০০ সালে প্যারিসে পদার্থবিদ্যা বিষয়ের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-মহাসম্মেলনে আচার্য জগদীশচন্দ্র, "বৃক্ষের জীবন ও মানুষের জীবন একই নিয়মে চলে," শীর্ষক এক আলোচনায় বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলকে স্তম্ভিত করেছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীর অসাধারণ সাফল্যে সমগ্র জগতে ধন্য ধন্য রব উঠলো। নির্ব্বাক উদ্ভিদ-জগতেরও প্রাণ আছে, প্রাণীদের মতো গাছও আচার করে, আঘাতে দেয় সাড়া—পরীক্ষামূলক ভাবে এই সত্য বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ছিলেন একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর পিতার কর্ম্মস্থল ছিল ফরিদপুরে; তাই তিনি ফরিদপুর বিদ্যালয়েই তাঁর বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। উচ্চ-শিক্ষার জন্য জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় এসে প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং তারপর সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় তিনি হোষ্টেলে বাস করতেন, হোষ্টেলে প্রায় সকলেই কলেজের ছাত্র, তাঁর সমবয়সী কেউ না থাকার জন্য তিনি উঠোনে একটি ছোট্ট বাগান করে সময় কাটাতেন। বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় নীরব প্রীতির সম্বন্ধ পর্য্যবেক্ষণ করা গিয়েছিল। জগদীশচন্দ্র ১৮৭৫ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চার বৎসর পরে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকেই বিজ্ঞানে বি-এ পাশ করেন।

এর পর তাঁকে ডাক্তারী পড়বার জন্য বিলাত পাঠান হলো। সেখানে ডাক্তারী পড়ার পরিশ্রম সহ্য করতে না পারার দরুণ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে তাঁকে বাধ্য হয়েই ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। দেশে ফিরেই এই মহাবিজ্ঞানীর অতুলনীয় গবেষক-জীবন সুরু হলো। প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি মৌলিক গবেষণা সুরু করলেন। সরকার প্রথম দিকে তাঁর গবেষণার জন্য কোন অর্থসাহায্য করতেন না,—সব কিছুই তাঁকে নিজের খরচে করতে হতো। মূল্যবান মৌলিক গবেষণার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এই ভারতীয় বিজ্ঞানীকে ডি, এস-সি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর মূল্যবান গবেষণা সমূহের ফলাফল নিয়মিত ভাবে বিদেশী পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশ করতেন। বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ভারত সরকার সজাগ হলেন এবং তাঁকে গবেষণার ব্যয় বহনের জন্য বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম নিকট দূরত্বে বেতার সঙ্কেত পাঠিয়ে বেতারের গোপন তথ্য আবিষ্কার করেন।

১৮৯৬ সালে পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসুকে সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞানাচার্য্য বিশ্ববিজয়ে বার হলেন। লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন ইত্যাদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলিতে তাঁর বক্তৃতায় সেখানকার বিজ্ঞানী মহল গেলেন অভিভূত হয়ে। লর্ড কেলভিন, অলিভার লজ প্রভৃতি খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা তাঁকে ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপনা করতে অনুরোধ জানালেন,—বিজ্ঞানাচার্য্য অক্ষমতা জানিয়ে ফিরে এলেন দেশে। ১৮৯৮ সালে দেশে ফিরে সুরু হলো জড়পদার্থ নিয়ে তাঁর গবেষণা—১৯০০ সালে প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানসভায় এই জড়পদার্থের উপর তাঁর বক্তৃতাই বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলকে স্তম্ভিত করেছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনা থেকে বিদায় নেবার সময়, সরকার এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীকে পুরো বেতনে ঐ প্রতিষ্ঠানের আজীবন সম্মানীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। ১৯১৫ সালে অবসর নেবার পরও উদ্ভিদ-জীবন বিষয়ে তাঁর গবেষণা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চলেছিল। অবসর নেবার মাত্র দু' বছরের মধ্যেই তাঁর এক শুভ জন্মদিনে প্রতিষ্ঠিত হলো বসু-বিজ্ঞান-মন্দির। নতুন উৎসাহে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে তিনি গবেষণা সুরু করলেন।

১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর দেশবাসী এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর সপ্ততিতম জয়ন্তী পালন উপলক্ষে বিজ্ঞানাচার্য্যের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে। দেশ-বিদেশের প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং মনীষীরাও আচার্য্যদেবকে বহু ভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। ১৯২০ সালে বিলাতের রয়েল সোসাইটী তাঁকে সভ্যরূপে গ্রহণ করে সম্মানিত করেন। ১৯১৯ সালে অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল্ এল্ ডি উপাধি দিয়ে সম্মান দেখান। রোমা রোঁলা তাঁর একটি উপন্যাস এই মহাবিজ্ঞানীকে উপহার দেবার সময় লিখেছিলেন,—'একটি নূতন পৃথিবীর আবিষ্কর্ত্তাকে'।

গিরিডিতে ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর সকাল আটটার সময় এই জগৎবরেণ্য মহাবিজ্ঞানীর মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর দেহ কলকাতায় এনে সৎকার করা হয়। মাত্র কয়েক দিন পরে ৩০শে নভেম্বর তাঁর জন্মদিনে শিষ্যবৃন্দ ও দেশবাসী এই মহামনীষীর অস্থি-ভস্ম সশ্রদ্ধচিত্তে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রোথিত করেন। এই বিজ্ঞানঋষির অমর প্রতিভার কথা বিজ্ঞান-জগতের কীর্ত্তিগাথায় চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

কিন্তু মনের খুঁতখুঁত মিটতে চায় না অমিতার। মনের ধর্মই এই। আপনকাটা ছকের সঙ্গে বা আপন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে যতদূর চলতে পারে, ঘাড় নাড়তে নাড়তেই এগোয়। কিন্তু তা যদি না হলো তবে আর তার ঘাড় নরম হতে চায় না কিছুতেই। কেবলি খুঁতখুঁত করে, কেবলি প্রশ্ন তোলে—এ যদি তো এ কি করে হলো! তা যদি তো এ কেন হলো না! অমিতার মনেও এমনি একরাশ 'কেনর' ভিড়। কিন্তু ও জানে ওরা দু' বোন পারে, অনেক মানতে না পারা ঘটনা শান্ত মনে মেনে নিতে। কোন 'কেন' নিয়ে প্রশ্ন না তুলে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে অনেক দূর পর্য্যন্ত। তবে সেই বা কেন কৌতূহলে ছোট করবে নিজেকে? মৌরী বই টেনে নিয়েছিল, ও টেনে নিল টেবিলের উপর থেকে দুপুরের অসমাপ্ত কাশ্মীরী কাজের সেলাইটা। মৌরী মন দিয়েছে বই-এ ও দিল হাতের কাজে। কিন্তু বদ্ধ ঘরের আলাপের মতো মুখ-বন্ধ মনও নিবিড় হয় বেশী। কেনর ছোট ছোট ঢেউ মিলিয়ে নিয়ে ওর মন ডুব দিল চিন্তায়। মনে হতে লাগলো, এভাবে ঘর-বাড়ী পরিচিত পরিবেশ আর আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে যে মেয়ে ভয় পায় না, সংসার করার পক্ষে সে মেয়ের সাহসটা কিছু বেশী নয় কি? কি জন্য আর কেনতে দরকার নেই, শুধু এই পারাটাই কি সাংঘাতিক নয়? ওর যে তেমন একটা অবস্থার কথা কল্পনা করতে ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শরীর—কোথায় যাবে জানে না, ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

দোষ দেওয়া যায় না অমিতাকে। পথটা যাদের কাছে এখান থেকে ওখানে, আর এ জায়গা থেকে ও জায়গায় যাবার সাঁকো মাত্র, তারা পথের কাছে কিছু চায় না, সেও তাদের কিছু দেয় না। তারা ভয় পায় সেও তাদের কেবল ভয়ই দেখায়। অমিতা কি করে জানবে, তাকে বিশ্বাস করে যে বেরিয়ে পড়তে পারে তার জন্য সে যে কেবল সৌন্দর্য্য সম্পদ আর তৃষ্ণার জল নিয়েই বসে থাকে তা নয়—হাত ধরে ধরে কত সুহৃদ কত বন্ধুই যে মিলিয়ে দেয়। ঘর যত বলে দেয় কি তত? শান্তি-স্বস্তি, আনন্দ-প্রেম-ভালোবাসা—যেন তার চার দেয়াল ঠাসা ও-সবে!

কিন্তু অমিতা যা নিয়ে ভাবছিল। সে ভাবছিল, এই মাত্র মঞ্জুর গল্পের ভেতর দিয়ে ও জেনেছে মমতা শান্ত—মমতা কথা-কম-বলা প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু এই প্রকৃতিগুলো সম্বন্ধেই আবার ওর বিশ্বাস কম, শ্রদ্ধা কম। কথা-বলা মানুষ বলে কয়ে নিজে পরিষ্কার অপরেরও বুঝতে কষ্ট হয় না তাদের। কিন্তু ঐ চুপ-থাকা মানুষদের আপাত দৃষ্টিতে যত মধুর মনে হয় তত মধু বড় ভেতরে থাকে না। কিন্তু না যায় তাদের বোঝা না যায় ধরাছোঁয়া। ঠাণ্ডা লড়াই আর ঠাণ্ডা মানুষ অমিতার মনে হয় এক। মমতাকে নিয়ে কি ও এতো মাথা ঘামাতো—কিন্তু মৌরীর যাবার দিন এলো বলে দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক সেই আসবে মঞ্জুরও। থাকতে হবে ওকে—অন্তত যতীন বাবুর জীবিত কালটা তো নিশ্চয়ই। সুখ্যাতি আর যশ অর্জন করে নেবে মমতা তার ঐ চুপ থাকা দিয়ে ওর জুটবে অপযশ। ও যে চুপ থাকতে পারে না। ভালোমন্দ মনে যা হোক বলে-করে খালাস। কিন্তু মুখে কোন সংশয়ই প্রকাশ করলো না সে। যদি ওরা ওকে ভুল বোঝে? যদি ওরা ভাবে বত্তার কাকার ব্যাপারটা নিয়েই মনে খট্‌কা বেধেছে অমিতার, তবে লজ্জার শেষ থাকবে না। আজ আর মনে মুখে এক হয়ে অনেক কথা বলে বসলো না সে। টেবিল-বাতিটার আরো একটু কাছে এগিয়ে বসে সূক্ষ্ম কাজের নক্সা ভরতে লাগল জামায়।

ওদের দু'জনার মাঝখানে মঞ্জুও চুপচাপ বসে রইলো খানিকক্ষণ। তার পর উঠে নেমন্তন্ন বাড়ীর শাড়ী কাপড় পালটালো। মাথার মস্ত খোঁপাটা থেকে বেলফুলের মালাটা নিল খুলে। ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটাকে মাঝখানটায় ছিঁড়ে ফেলে করলো দু'খানা। তার পর মালা দুটো এনে দিল মৌরী আর অমিতার খোঁপায় জড়িয়ে। ঘাড় কাত করে অমিতার দিকে তাকিয়ে বললো—যাই বলিস দিদি, চেহারাটা কিন্তু অনেকখানি। দেখছিস বৌদিকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে? মালাটা এতক্ষণ আমার মাথায় যেন চোখ বন্ধ করে ছিল। এবার সে চোখ মেলে মুখের দু' পাশ দিয়ে কেবল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, যে তাকে সুন্দর করলো আর সে যাকে সুন্দর করলো তাকে দেখতে।

রূপের প্রশংসায় খুশী না হয় কে? অমিতা ওর সুন্দর আঙুলে মুদ্রার ভঙ্গি তুলে মালাটাকে কাঁটা দিয়ে আটকাতে আটকাতে কিছুটা আনুনাসিক সুরেই বললে—আহা, তোমরা যেন সুন্দর নও? কিন্তু এমন ক্ষেত্রে এটা বলা শোভন বলেই অমিতার এই বলা। নইলে সত্যি সে বুঝে উঠতে পারে না—মৌরী মঞ্জুকে সুন্দর বলা যায় কি না। মৌরীর দিকে আড়-নয়নে তাকালো অমিতা—সুদর্শন বাবুর আর দেরী সইছে না এমনি!

মঞ্জু—তাই! তা তুমি বুঝলে কি করে?

—আহা, ভারি, কষ্ট বোঝা। যেই সুদর্শন বাবু এখান থেকে গেলেন আর অমনি লক্ষ্ণৌ থেকে তার বাবার মস্ত পালটানো চিঠি এলো—যদিও আমার ইচ্ছে ছিল মাঘ মাসেই কিন্তু বিয়েটা অগ্রহায়ণে হয় এটাই এখানকার ইচ্ছে। আর এখানের ইচ্ছেটাই যে শ্রীমানের ইচ্ছে—এটা বোকাও বোঝে।

—চেহারাটা যদি আর একটু খারাপ করতে পারতিস দিদি, তবে ছেলেদের ভালো লাগার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারতিস। কি করবি উপায় নেই। নাঃ, ভাগ্যটা দেখছি সর্ব রকমে আমারই ভালো। 'মুক্ত হয়েছি' বলে আমার সাধনায় বিচ্যুতি ঘটাতে কেউ পথ আগলে দাঁড়াবে না। যেদিন সিদ্ধি লাভ করে আমি ওদের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পাবো, সেদিন ওরাই ভীরু চোখ তুলে আমায় জিজ্ঞাসা করবে—দেখো তো—আমায় ভালো লাগে কি না?' হাসিমুখে আলনা থেকে শাড়ী টেনে নিয়ে মঞ্জু গিয়ে ঢুকলো স্নানের

আপনার সর্দি বিপজ্জনক হ'তে পারে !

গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে—এই উত্তম বিশেষ কার্য্যকরী মলমটি দিয়ে সর্দির যন্ত্রণা দূর করুন!

সর্দির জ্বালা যন্ত্রণা যখন এত সহজে দূর করা যায় তখন সর্দিতে কেন ভুগছেন ! শোবার সময় বুকে পিঠে ও গলায় ভিকস্ ভেপোরাব মালিশ করুন···আর সর্দি যেখানে যন্ত্রণা দিচ্ছে, ঠিক সেখানেই আপনি বোধ করবেন বেশ আরাম। ভিকস্ ভেপোরাব ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার সর্দির জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে ··· আর ঘুম থেকে উঠেই আপনি আবার আগের মতই সুস্থ বোধ করবেন। পরিবারের সকলের পক্ষে উপকারী।

ইহা দু'ভাবে সর্দি উপশম করে !

১

ইহা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে—

ভিকস ভেপোরাব থেকে যে শক্তিশালী ঔষধের গন্ধ বেরোয় তা' আপনি শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে গলায় ও নাকে সর্দির যন্ত্রণা দূর করতে পারেন।

২

ইহা ত্বকের ভিতর দি'য়ে কাজ করে

ভিকস ভেপোরাব মালিশ করা মাত্রই ইহা ত্বকের ভিতর দি'য়ে প্রবেশ করে, আপনার বুকের সর্দির ব্যথা দূর করে।

বুকে, পিঠে ও গলায় মালিশ করুন !

এখনই ভিকস ভেপোরাব ব্যবহার করুন ঃ

নূতন ছোট ট্রায়াল সাইজ টিন—মাত্র ৪০ নঃ পঃ ও তদুপরি ট্যাক্স।

327-B

ধরে। স্নানের ঝর্ণা থেকে ভেসে আসতে লাগলো গুন্-গুন্ করে গাওয়া গানের মতো গুন্-গুনে আবৃত্তি—

'ওগো বাঁশিওয়ালা,
বাজাও তোমার বাঁশি'—

জল-ঢালা আর থামার সঙ্গে সঙ্গে কখনো মঞ্জুর গলা স্পষ্ট হয় কখনো ঢেকে যায় জলের শব্দে। আর দরজা খুলে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে—

'আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক—'

আবৃত্তি করতে জানে মঞ্জু। সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে মৌরীর—

'ওগো বাঁশিওয়ালা,
বাজাও তোমার বাঁশি,
তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এলো ঘোমটা-খসা নারী
যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির—'

ফিটফাট হয়ে এসে ফের বসলো মঞ্জু মৌরীর কাছে। অমিতা অনেক আগেই চলে গিয়েছিল। মৌরীকে বললো—বইটা রাখবি একটু?

মঞ্জুর আবৃত্তিতে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় ভরপুর মৌরীর। ধীরে ধীরে বললো—বই আমি পড়ছিনে। কিন্তু কেন? আবার বাকী রইল কি?

—সব চাইতে বড় কথাটাই বাকী রয়ে গেছে।

হাতের বই আঙুলের চাপে বন্ধ করলো মৌরী।—সব চাইতে বড়? তবে বাকী রাখলি কেন?

—বৌদির জন্য। ওর খারাপ লাগত। কিন্তু তোর আবার তেমনি ভালো লাগবে।

উৎসুক হল মৌরী—শুনি।

এই রাতেও চুল ভিজিয়েই স্নান করে এসেছে মঞ্জু। সেই ভিজে চুল থেকে কয়েক ফোঁটা জল নেবে এসেছিল ঘাড় বেয়ে। আঁচল তুলে সে জল মুছতে মুছতে বললো—'মাসীর রূপ দেখিয়ে কাজ নিলে ওটা দিয়েই তার মূল্য দিতে হয়' এ কথার জবাব না দিয়ে মমতা চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল,—সত্যি কথাটা তা নয়। জবাব দিয়েছিল মমতা—অসম্ভব কড়া জবাব! মাসীর কথায় সোজা তার দিকে তাকিয়ে নাকি বলেছিল,—ওরা ওকে যে কাজটা দিতে চাচ্ছেন সেটাও তো ঐ রূপেরই জন্য। হতবুদ্ধি মাসীর মুখে কথা বেরুতে চায় না—তারা যে কাজটা ওকে দিতে চাচ্ছেন? মমতা কি বিয়ের কথা বলছে? তাই বলছে। আর এর পরই নাকি রাগান্ধ মাসীর ঐ তালাচাবি-টাবির ব্যাপার।

রত্নার কাকার সুন্দরী মেয়ে বিয়ে না করবার প্রতিজ্ঞার পেছনের রহস্য স্পষ্ট হলো মৌরীর কাছে। আঙুলের চাপ থেকে বইটা নামিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললো—এতক্ষণ ভাবনার কিছু আছে ভাবিনি। ভেবেছি, কুড়ি-একুশ বছর বয়সটায় কেউ লাফ দিয়ে এসে হাজির হয় না। আর এত নয় যে, বিয়ের রাত থেকে জীবন খাতার পাতায় লেখা শুরু হয়। গত পরিচ্ছেদে যা আছে—আছে, এটুকু বুঝতে পারাই যথেষ্ট হয়েছে, গত পরিচ্ছেদের গল্পে মেয়েটি যে মুনশীয়ানা দেখিয়েছে তার কাছে কাঁচা গল্প পাবো না। কিন্তু এখন ভাবনায় পড়ে গেলাম।

মঞ্জু ভেবেছিল অসম্ভব খুসী হয়ে উঠবে মৌরী। ওরই মন মতো কথা তো। আর ওই কি না উল্টো কথা বলছে। কারণটা কি?

—মাসীর মুখের উপর যে মেয়ে বিয়েটাকে রূপযৌবনের বিনিময়ে খাওয়া-পরার কাজ বলতে পারে, সে মেয়ে সেজে বসে সেই রূপের পরীক্ষার ভেতর দিয়েই আবার বিয়েতে রাজী হয় কি করে? আচ্ছা, যদি ধরেও নিই—বিয়ের প্রতি নয়, এই বিয়েটাতে মত ছিল না মমতার। আর অমন জোরালো জবাবটা সে মাসীর অসম্মানকর কথার কৈফিয়ত হবার জন্যই দিয়েছে। তবু ভাবনার কথা থাকে। যে পাতে যত [illegible] হবে তার চাইতে বেশী [illegible] শুধু নিজে নষ্ট হয় না—অনেকটা জায়গা জুড়ে নিয়ে নষ্ট হয়। [illegible] পাতের বেলাও ঠিক তেমনি। তাই ভাবছি, তোদের [illegible] বেশী হয়ে যায়।

—তোর পাল্লা-বাটখারার মাপ বিয়ের বাজারে চালু হয় আর ক'টাকে বিয়ে করতে হবে না। একটি আশ্চর্য মেয়ে মার হাত ধরে এসে আশ্রয় নিল মাসীর কাছে। মাসীর বিত্তবান বুদ্ধিমান দেওর তাকে ভালোবাসল, বিয়ে করতে চাইলো। একে ভাগ্য না মেনে যে মেয়ে ভাগ্য অন্বেষণে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে, তাকে আমি নমস্কার করি।

অমিতার খেতে আসবার ডাক কানে এলো। উঠে দাঁড়ালো মৌরী। বললো—এটা আমি স্বীকার করতে পারছি না মঞ্জু!

—কেন?

—নিজে ভাগ্য জয় করলো সে কোথায়? অপর দশ জন মেয়ের মতো বিয়ে দিয়েই তো সে তার ভাগ্য জয় করতে যাচ্ছে। একে পছন্দ হয়নি অন্যকে—এই তো?

উঠে দাঁড়ালো মঞ্জুও। বললো—তোর এই 'একে পছন্দ হয়নি তাই অন্যকে—এই তো।' এই 'এই তো' কথাটা ছোট হলেও কাজটা ছোট নয়। এর জন্য বাড়ী থেকে পথে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে—যে কাজটা খুব সহজ নয়।

'বাংলাদেশের মেয়ে...
অন্তরে বাহিরে মিল হয়নি—
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয়নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে
মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়—'

এমন দেশে ইচ্ছার সঙ্গে শক্তি আর সাহস [illegible] কপালে উঠে আসে নমস্কার জানাবার জন্য। [illegible] আমার মতের সঙ্গে মিলল কি মিলল না, তার কিছু [illegible]

এমন অনেক সময় হয়, কোন বিশেষ [illegible] একটা কবিতা ঘুরে-ফিরে কেবল মনের ভেতর [illegible] জানে সে সময়কার মনের অবস্থার সঙ্গে সে [illegible] থাকে কি না। কিন্তু মঞ্জুর বাঁশিওয়ালা [illegible] থামাচ্ছিল না। অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে ঘুরে [illegible]

সচকিতা —কান্তি ভাই (ষ্টুডিও সারিলা)
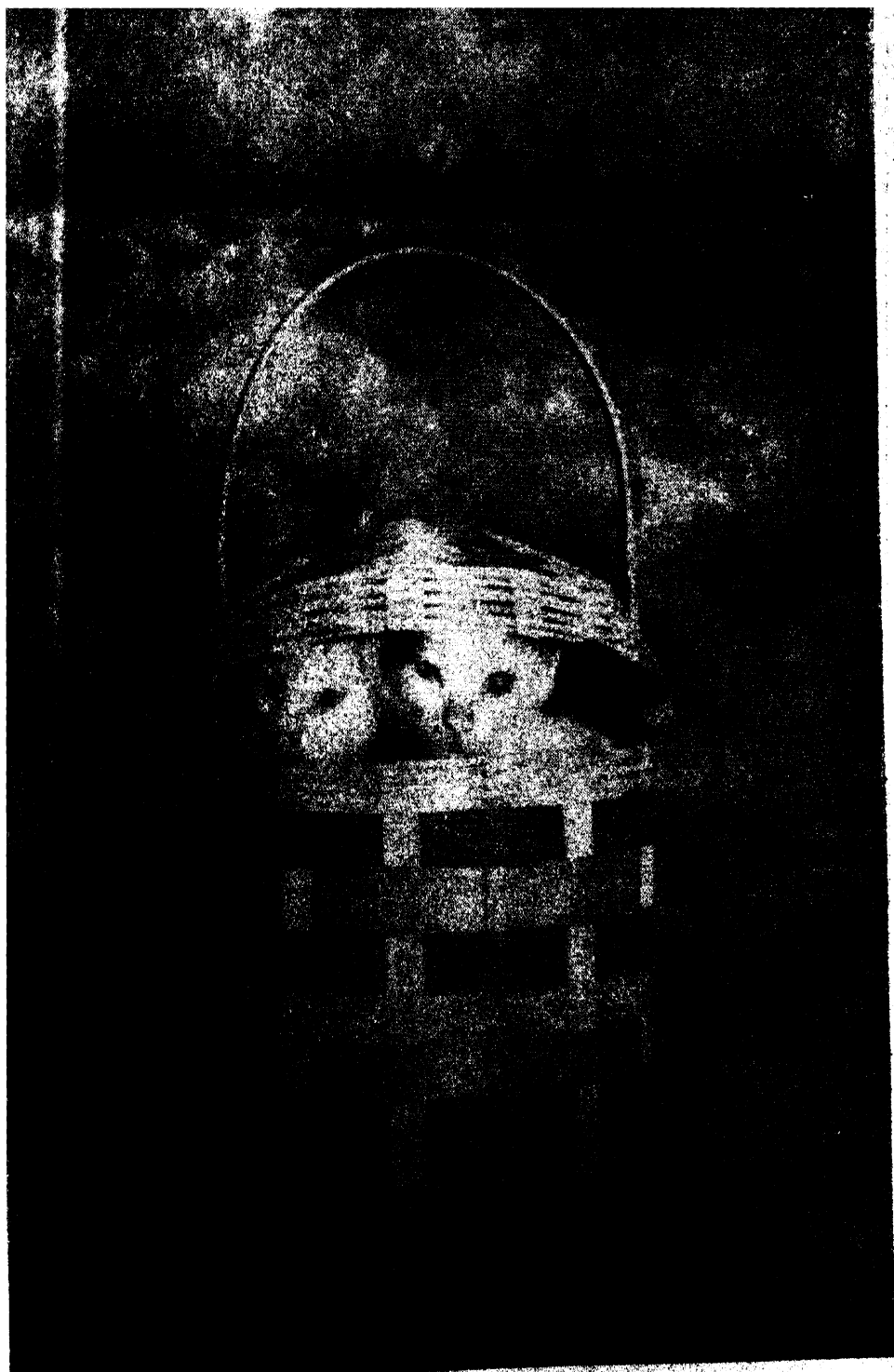
জাহাজ-ঘাট

—মণিমোহন প্রামাণিক

[ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম ধাম ও বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]

আলোছায়া

—স্বদেশ ঘোষ

অফুরন্ত —মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

'…বাঁশিওয়ালা
বাজাও তোমার বাঁশি
শুনি আমার নূতন নাম'—

পরের দিন আব্দারে ভেঙ্গে পড়লো মঞ্জু—চল দিদি, মমতার সঙ্গে একদিন আলাপ করে আসি। ছোড়দা'টা থাকলে ভালো হতো। ওকেও নিয়ে যেতাম। তুই কাছে বসে চালাচালি করে দেখতে পারতিস পাত্রে ধরবে কি ধরবে না। কিন্তু ও তো আসবে সেই আর বিয়ের আগে। চল আমরা একদিন ঘুরে আসি। যাবি?

—দু'দিন বাদেই তো আসছে আমাদের এখানে। যত খুসী আলাপ করিস। এখন থাক।

—দু'দিন বাদে! এক মাসের উপর তো তোরই বিয়ের বাকী। আরো দেরী হতে পারে ছোড়দা'র—মাত্র কাজে যোগ দিয়েছে, ছুটি না পাওয়ারও নাকি সম্ভাবনা প্রবল। একটু আলাপ-পরিচয় করে বাড়ীতে নিয়ে আসতে দোষটা কি! ইচ্ছে করে না তোর?

আমার ইচ্ছে করে না। মাথা নাড়লো মৌরী। এই বাড়ী-টাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া যদি বাবার কানে তোলে কেউ তবে বিয়ে হওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ছুতোর প্রত্যেকটুকুও তিনি দেখে ছাড়বেন না।

কিন্তু ধৈর্য্য ধরা মঞ্জুর কুষ্ঠিতে নেই। মনে হলে আর অকারণ অপেক্ষা সহ্য হয় না ওর। আচ্ছা বেশ তো বাবা, না হয় নাই জানলেন।

দু' বোন লুকিয়ে—যদিও মৌরীকে কথা দিয়ে সে কথা অমিতা পুরো রেখেছে। মমতার সেদিনের গল্প কাউকে বলেনি, এমন কি জয়দেবকেও নয়। তবু তাকেও না জানিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লো মৌরী' মঞ্জু মমতাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

—পথ চিনবি?

—কেন চিনব না? যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সামনে বাস থেকে নামবো। একটা রিক্সা নেবো। রিক্সাকে বলবো, চলো স্কুল-বাড়ীটার কাছে। ওখানে গেলে ঠিক আমি চিনে যাবো বাড়ী।

—তার চাইতে চল একটা ট্যাক্সি নিই। একেবারে যাদবপুর স্কুলে নিয়ে যেতে বলব। নইলে যদি ষ্টপেজ ভুল করে ফেলিস?

—ট্যাক্সি! বলিস কি! ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হবার প্রবাদ আছে। তুই যে সুদর্শন বাবুর গাড়ীর কথা শুনেই খোঁড়া হলি। ওঠ—ওঠ। বাসটা এসে দাঁড়াতেই ঠেলে মৌরীকে তুলে দিয়ে নিজে ওঠে। ঘড়ির দিকে নজর রেখেই বেরিয়েছিল ওরা, যেন অফিস-ভীড়টা শুরু হয়ে না যায়। তাই ভর্তি থাকলেও ভিড় ছিল না গাড়ীতে। বসতে পেলো। কিন্তু কতক্ষণ! দু-তিনটা ষ্টপেজ পার না হতেই ভরে উঠল গাড়ী। দুটি প্রৌঢ়া মহিলা এসে দাঁড়ালেন ওদের আসনের হাতল ধরে। শরীরটাকে শক্ত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করছিলেন তারা। কিন্তু ঝরঝরে বাসটা ঝাঁকানি দিতে দিতে চলেছিল, তাদের সর্বশরীর আর গাড়ী থামা-চলার সময়গুলোতে বেসামাল হয়ে পড়তে পড়তে সামলাতে হচ্ছিল বহু কষ্টে।

উঠে দাঁড়ালো মৌরী-মঞ্জু। হাত দিয়ে নিজেদের আসনটা দেখিয়ে দিয়ে বললো—বসুন আপনারা এখানে।
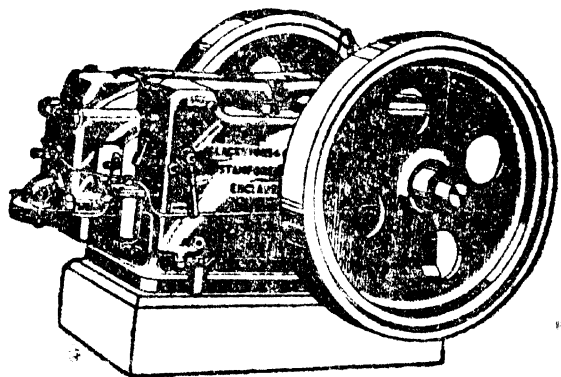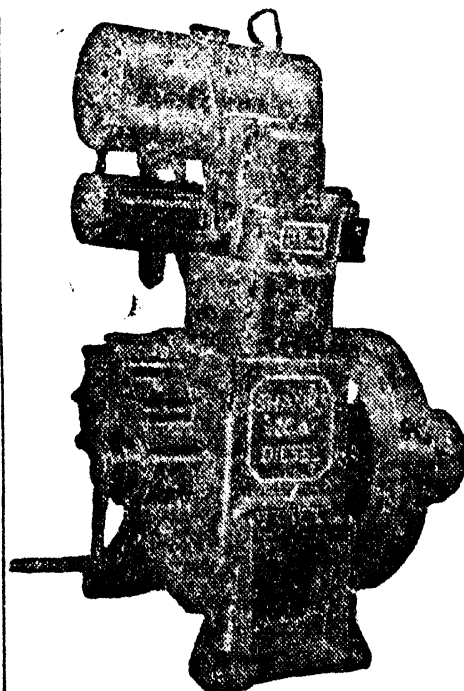
যেন বেঁচে গেলেন এমনি ভাবে বসে পড়লেন মহিলা দু'টি। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন—বেঁচে থাকো মা!

দাঁড়িয়ে রইলো ওরা দু'টো আসনের হাতল ধরে। বাসের ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে ওদের শরীরটাও ঝাঁকানি খেতে লাগল, এক-বাস লোক। ঘাড় শক্ত করে কেউ সামনের দিকে কেউ আশ-পাশের দিকে তাকিয়ে। যেন ভেতরটা তাদের চোখের বাইরে—চৈতন্যের বাইরে। তারা বসবার সময় দস্তুরমতো দেখে বসেছে লেডিস্ সিটে বসেনি। তারপর প্রৌঢ়া দু'জন ঝাঁকানির সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কি না তারা দেখেনি, এখনও তারা দেখছে না দু'টি মেয়ের এই কষ্টসাধ্য দাঁড়িয়ে থাকা।

হাসি পেলো মঞ্জুর। এই করে ছেলেরা ট্রামে-বাসে। কিন্তু অমন ঘাড় টান করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকার ভেতর কেমন যেন একটা গায়ের জ্বালা-জ্বালা ভাব প্রকাশ হয় না? 'সব তাতেই তো সমান, তবে আবার কি।' ঘাড় এর চাইতে বেশী বলতে পারে না। মুখ খুলবার সুযোগ দিলে যেন সবিদ্রূপে বলে উঠবে—সমানাধিকারের দাবী তুলছ, আদায়ও করছ। এখন তোমরা অবলা নও সবলা। বলের সঙ্গে চলো, বলো, হাঁটো—প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো। ট্রামে-বাসের এই সামান্য মেয়েলি চাহিদাটুকু ছাড়তে পারো না কেন?

ঠিক তক্ষুণি যে কথাগুলো এই ভাবে চিন্তা করেছিল মঞ্জু তা নয়। ষ্টপেজে ষ্টপেজে গাড়ী থামছিল, ভিড় বাড়ছিল। দু'দিক থেকে ঠেসে ধরা চাপ থেকে শরীরটাকে একটু হলেও আলগা রাখবার চেষ্টায় নিজেদের সংকুচিত করতে করতে এই জাতীয় কতগুলো কথাই ওর মনে হচ্ছিল—নারীত্বের চাওয়া বলে যে কতগুলো চাওয়া আছে, সে চাওয়াগুলোকে কি সমানাধিকারের বিদ্রূপে অসম্মান করা চলে? এই নারীত্বের চাওয়ার ভিড়ের চাপ থেকে শরীরটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হয়। জীবনের সমস্ত পথ সমান পায়ে চলেও এমন সময় আসে যখন নারীকে ব্যথায় থমকে দাঁড়াতে হয় তার সন্তানের জন্ম দিতে। তখন কি তাকে বলা চলে—থামলে চলবে না, সমানাধিকারে সমান চলতে হবে?

প্রৌঢ়া মহিলা দু'টি বার বার মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর ওদের অবস্থা দেখে যেন নিজেরা লজ্জিত হয়ে উঠছিলেন। আসনে বসে-থাকা মানুষগুলোর প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন যেন নিজেদের ছেলে ভাই বা ভায়ে হলে কানে ধরে তুলে দিতেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বোস মা তোমরা। আমরা সামনের স্টপেজেই নামবো।

—সামনের স্টপেজে? যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কাছে?

—হাঁ মা!

—আমরাও সেখানেই নামবো।

গাড়ী থামলে ভীড় ঠেলে নেমে মহিলা দু'জনকে নামতে সাহায্য করলো ওরা। আজকালকার শিক্ষিত মেয়েরা যে কত ভালো হয়, মনে হলো তারই আলোচনা করতে করতে দু'জনে গিয়ে একটা রিক্সায় উঠে বসলেন। মঞ্জুও একটা রিক্সা নিল। মৌরী জিজ্ঞাসা করলো—এখন?

—এখন? রিক্সাওলাকে নির্দেশ দিল মঞ্জু—চলো ফুলবাড়ীর কাছে। ঘড়িটা চোখের সামনে ধরে বললো—ছ'টা বেজে গেছে। এক ঘণ্টার উপর লেগে গেছে রে দিদি! আর দেখেছিস কেমন ঝট করে সন্ধ্যা হয়ে যায়!

—ফেরবার সময় তো রাত হয়ে যাবে, তখন কি করবি?

—ওঁরা আমাদের বাস পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই তুলে দিয়ে যাবেন। তারপর তো নামবো বাড়ীর দোরগোড়ায়। রাত কি করবে আমাদের?

—তোকে কোন কিছুই করতে পারবে না।

—তুই চটেছিস আমার উপর?

বোনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো মৌরী। বললো—চটেছিই তো। এই ভিড়ের ভেতর ভাত সেদ্ধ হয়ে নেবে—রিক্সায় করে ধুলো খেতে খেতে এই ভরা সন্ধ্যায় দু'জন হাজির হবো—পাগল ভাববে ওরা।

মঞ্জু মৌরীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগলো—বড়লোকী মেজাজ এসে গেছে তোর। ভিড়, ধুলো, রিক্সায় মন বিগড়াতে আরম্ভ করেছে। বুঝলাম তোর সঙ্গে আমার বেড়ানোর পাট ঘুচলো।

আঁচলটা রিক্সার চাকায় আটকে যাবার মতো হয়েছিল, সেটা তুলে কোমরে গুঁজে ভুরুতে একটা তীক্ষ্ণ বাঁকা টান দিয়ে মঞ্জুর দিকে তাকালো মৌরী—মানে?

—মানে—তোর গাড়ীতে আমি চড়বো না। তুইও রিক্সায় উঠবিনে।

—আমি রিক্সায় উঠব কি না সে কথা থাক, তুই আমার গাড়ীতে উঠবিনে কেন?

—তারপর ভিড়, ধুলো, রিক্সা আর সহ্য হতে চাইবে না তাই।

রেল-লাইনটা পার হয়ে কিছুটা ভেতরে ঢুকতেই যেন গ্রামে এসে পড়লো ওরা। ছোট-ছোট টিনের, কাঠের, মাটির বাড়ী। জবাফুল, গাঁদাফুল আর কলাগাছের ঝাড়, পুকুর। বাস থেকে নেমে যে বেলাটুকুর দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল—সন্ধ্যা হয়ে এলো বলে, এই পথটা শেষ না হতেই সেই সন্ধ্যা নেমে এলো। পথের আলোতে রাস্তা স্পষ্ট কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে গেল আশ-পাশের পুকুর-ডোবা-বাড়ী-ঘর-গাছপালা। এতটা ঝট করে সন্ধ্যা নেমে আসবে মঞ্জু তা বুঝতে পারেনি! দিন যে ছোট হয়ে আসছে এ খেয়াল ওর ছিল না। কোথাও রাস্তার মোড়ে কোথাও ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে ছেলের দল। ওদের দিকে চোখ পড়লে যতদূর অনুসরণ করা যায়, অনুসরণ করতে লাগলো চোখে।

—আহা দিদি, তোকে যাদবপুর টি, বি হাসপাতালটা দেখিয়ে দিতে ভুলে গেলাম। বেশ মস্ত। তবু কিছু নয়। বাংলাদেশটার জন্য বাংলাদেশটা জোড়া একটা দরকার কি না?

—তুই কি এদিকে আসিস নাকি? মৌরীর দৃষ্টিতে সন্দেহ।

—এ তো যাদবপুর। আমি না যাই বিশ্বের কোথায়—অবশ্যি মনে মনে। টাকা নেই যে।

রিক্সাওলা রিক্সা থামিয়ে জানালো—এই ফুলবাড়ী। আর মৌরীকে আশ্চর্য করে দিয়ে দু'-একবার এদিক-ওদিক নির্দেশ চালিয়ে মঞ্জু ঠিক গিয়ে মমতাদের বাড়ীর দরজায় নেমে রিক্সা-ভাড়া চুকিয়ে দিল। চারিদিক অন্ধকার। ঝিঁঝিপোকার ডাক, ব্যাঙের ডাক আর জ্বলছে-নিবছে জোনাকির আলো। বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো না ঐ অন্ধকার বাড়ীতে কোন

মানুষজন আছে। বাড়ীটা একরকম প্রাগুৈতিহাসিক। সামনের জমিগুলিতে দু-একটা বাড়ী তৈরী হচ্ছে মাত্র। কোনটা কিছু উঠেছে, কোনটায় সবে একতলার ছাদ পড়েছে। আর দরজা-জানালা-শূন্য ঘরগুলোর ভেতর চাপ চাপ অন্ধকার ঢুকে যেন জমাট আসর বসিয়েছে।

—কেউ যদি বাড়ী না থাকে? মৌরীর গলা শুকিয়ে কাঠ।

—কি হবে? বারান্দায় উঠে কড়ানাড়া দিল মঞ্জু। এ বাড়ীতে না থাকে, ঐ যে আলো দেখছিস ওখানে আছে। আঙুল দিয়ে মঞ্জু দূরের একটা আলোজ্বলা বাড়ী দেখিয়ে দিল।—রাস্তার দু'পাশটাও নিশ্চয়ই জনমানবশূন্য দেখে আসিসনি। ঐ মোড়ে একটা রিক্সা-ষ্ট্যাণ্ড আছে, তাও দেখেছিস নিশ্চয়ই। আবার কড়ানাড়া দিল মঞ্জু। এবার ঘরে বাতি জ্বলে উঠল। জানালা দিয়ে একটা জোর আলো এসে ছড়িয়ে পড়লো ওদের গায়েও। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজাও খুলে গেল—কে? যিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন, ওদের দেখে সরে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবার জায়গা দিয়ে আহ্বান জানালেন —আসুন।

ওরা দু'জনে ঘরে ঢুকলো। এ যে মমতার দাদা, এটা বলে দেবার দরকার হয় না। এক চেহারা। শুধু বোনের চেহারা যেমনি মেয়েলী ভাই-এর চেহারা তেমনি পুরুষোচিত। বোনের দেহগঠন যতটা কোমল ভাই-এর দেহগঠন ততটা কঠিন। ওরা চিনল। কিন্তু এ চিনলও না বুঝতেও পারলো না এরা কে। মমতার বয়সী দেখে ধরে নিয়ে থাকবে তার কাছেই এসেছে, তাই বললো—মমতা তো বাড়ী নেই। তবে এক্ষুণি হয়তো ফিরবে। মাকে ডেকে দিচ্ছি। বসুন আপনারা।

বুঝে উঠতে পারলেন না প্রথমটায় মা-ও। সেই তো একদিন দেখেছেন। আর ব্যাপারটাও তো একেবারেই অভাবনীয়ও তার কাছে। ওরা পরিচয় দিতে বুড়োমানুষের ভীমরতি ধরার উপর গাল-মন্দ করতে করতে হাত ধরে সাদরে এনে বসালেন। বললেন—তোমাদের বসাবো, তেমন কিছু কি আমাদের আছে?

—আমরা কিন্তু বড়লোক নই। তেমন কিছু ভেবে থাকলে কিন্তু বড্ড ভুল ভেবে রেখেছেন।

মঞ্জু মৌরীকে দেখিয়ে বললো—ও 'আমরা' বলে আমাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বললেও আর বেশী দিন ও আমাদের এই 'আমরার' ভেতর থাকছে না। তবে এটা সত্যি আমরা বড়লোক নই।

—আর বড়লোক গরিব! আমরা তো আজ ভিক্ষুক মা! ঘর-বাড়ী পুকুর-বাগান সব ফেলে এসে আজ আমরা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়েছি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, থাক ও সব কথা।

মঞ্জু বললো—আমার কিন্তু আগ্রহ লাগছে শুনতে। আমরা যদিও দেশছাড়া বহু দিন। তবু ওখানকারই মেয়ে। জন্মেছিও সেখানে।

—তাই বলো। নাড়ীর সঙ্গে যোগ থাকলে সে যোগ কি ছেঁড়া যায়? মায়ের সঙ্গে সন্তানের যোগ দাই-এর কাঁচিতে কি কাটা পড়ে? এই যে আসা এ যেন টেনে ছিঁড়ে তুলে নিয়ে আসা। খাওয়ায় স্বাদ পাইনে, বাতাস ঠাণ্ডা লাগে না। জল বিস্বাদ। মনের মিল খুঁজে পাইনে কারু সঙ্গে। আত্মীয়-পরিজনের চেহারা পর্যন্ত ঠেকে আরেক রকম। যেন তারাই সব চাইতে পর। কোথাও যেন প্রীতি নেই, প্রাণ নেই মা তোমাদের এখানে।

ওরা বুঝলো এই কথাগুলো মমতার মার মনে এমন অবস্থায় আছে যে, প্রথম নাড়ায়ই সেগুলো বেরিয়ে আসে। নইলে ইনি এত কথা বলার লোক নন।

হলোও তাই। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন—আমার ছেলের সঙ্গে তোমাদের আলাপ নেই। ও কিছু দিন এখানে ছিল না। বলে ডাক দিলেন—নীল, একবার এসো এ-ঘরে।

[ক্রমশঃ।

কল্লোল

প্রবীরকুমার বিশ্বাস

ওই শোন ভাই রে নয়া দিন ডাকছে
কল্লোল যৌবন দুর্জয় হাঁকছে।
গিরি-নদী দুর্বার দুস্তর পারাবার
পার হ'য়ে আসবেই আসবেই আসছে।
শোন শোন ওই শোন দুর্জয় যৌবন
নয়া দিন সূর্যের রোশনাই আনছে।
গান তার ভাই রে কান্নায় নাই রে—
মরশুম ফুল গান ফাল্গুন গাইছে।
দেখ দেখ ওই তার লাখো জোট পদভার
গম গম গম গম মেদিনী কাঁপছে।
ওই ওই চঞ্চল সাগরের কল্লোল
ছল ছল উচ্ছল হুঁশিয়ারী হাঁকছে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

রুকমারী বিলাতি ও দেশী সুখাদ্যগুলো চমৎকার ভাবে সাজানো হয়েছিলো টেবিলে। মাঝে মাঝে রূপোর ফ্লাওয়ার ভাসে, রক্তগোলাপ আর ম্যাগনোলিয়া রাখা হয়েছে। রূপোর কাশ্মীরী কারুকার্য্যখচিত ডিস, রূপোর কাঁটা-চামচ সারি সারি সাজানো। নিখুঁত ব্যাবস্থা। কোথাও কোনো ক্রটি অতিসন্ধানী দৃষ্টিতেও ধরা পড়বে না। টুং-টাং, কাঁটা-চামচের শব্দ; ঝিলমিলে হাসি, মৃদু গুঞ্জনের মাঝে ভোজন পর্ব্ব শেষ হল রাত্রি দশটায়।

অতিথিরা হলে এসে বসলেন। এবারে এলো আইসক্রিম, কোকোকোলা, তার সঙ্গে ককটেলও।

যাঁর যা অভিরুচি, তিনি তাই গ্রহণ করলেন। ককটেলের সম্মানই রক্ষিত হলো বেশী পরিমাণে। রাজাবাহাদুরের হাতে ফেনিল পাত্রটি এগিয়ে দিলেন মাসীমা। নিজে একপাত্র নিলেন, পম্পিয়া আর সুমিত্রাকেও এগিয়ে দিলেন। পাত্রের পর পাত্র উজাড় হচ্ছে, চারিদিকে স্ফূর্তি আমোদের ঝড় বইছে যেন, দিলখুস মেজাজে মন-প্রাণ উজাড় করে দিচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে যাকে যার ভালো লাগছে। সুমিতার ধারণায় আসে না মাসীমা কি জিনিস পান করালেন তাকে!

আস্বাদটা মন্দ নয়; কিন্তু গলা-বুক কেমন জ্বালা করছে। কানের ভেতর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মাথাটাও টলছে যেন। সে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু'টি হাতের ওপর মাথাটা রাখে।

রাজাবাহাদুরের গা ঘেঁষে তখন বসেছেন মাসীমা। চোখে তাঁর

বিলোল কটাক্ষ, হাতে সুরার পাত্র। রাজাবাহাদুরের একখানি হাত ওঁর কোমরে জড়ানো। দু'জনে হাসি-গল্পে মশগুল!

—সুমিতার বেসামাল অবস্থা দেখে অসীম তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে ঠাণ্ডা বরফজল, ওর ঘাড়ে-মাথায় বুলিয়ে দিয়ে বলে—বাড়ী যাবে মিতা?

—সুমিতা ওর দিকে মুখ তুলে চায়।

চোখ দু'টো যেন ভারি-ভারি ঠেকছে, আরক্ত হয়ে উঠেছে তন্ত নিটোল কপোল দু'টি।

—অসীমের দুই চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। ওর হাতখানা চেপে ধরে বলে—এসো।

মাসীমার দিকে একবার ফিরে চায় সুমিতা।

—তিনি তখন অন্য জগতে বিচরণ করছেন। অগত্যা সুমিতা এগিয়ে যায় অসীমের সঙ্গে। শরীরটা ভারি অবসন্ন ঠেকছে, পা কাঁপছে, সকলকার কাছে বিদায় নেওয়া আর সম্ভব হলো না।

—অসীমের গাড়ী ছুটে চলেছে। ড্রাইভ করছে সে নিজে, পাশে বসে সুমিতা।

উদগ্র কামনার আগুন জ্বলছে শরীরে মনে। তার দাহজ্বালা আজ অস্থির করে তুলেছে অসীমকে। অনিরুদ্ধ—রতনলাল,—ওরা সবাই যেন বাহু বিস্তার করেছে সুমিতার দিকে। কেন? ওদের অভাব কি?

ওদের রূপ আছে, আছে বড় বড় ডিগ্রি, সবার ওপরে আছে অপরিমিত অর্থ। মেয়েদের কাছে ওরা তো বেশী লোভনীয় হবে তার তুলনায়। কিন্তু তা হবে না, অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে ওদের আশালতাকে। সুমিতাকে কেউ পাবে না। ককটেল ওর উত্তেজনার মাত্রাকে চরম সীমায় বাড়িয়ে দিয়েছিলো। সুমিতা নিঝুম ভাবে বসেছিলো, চলন্ত গাড়ীর মধ্যে এলোমেলো হাওয়াটা ওর ভালো লাগছিলো।

—মিতা, আরেকটু কাছে সরে এসো।

—থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে সুমিতা, ওর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে।

—আর্তকণ্ঠে বললো—না, না, আমায় বাড়ীতে পৌঁছে দিন। অনেক রাত হয়ে গেছে।

কেমন লোলাতুর দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চেয়ে রইলো অসীম। তারপর এক হাতে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে সবলে কাছে টেনে নিলো। শত চেষ্টাতেও বাধা দিতে পারলো না সুমিতা। ওর সব শক্তি আজ যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। কি বলবার চেষ্টা করলো, গলা থেকে ক্ষীণ, অস্ফুট একটু আওয়াজ আর্তনাদের মত বের হলো। ওষ্ঠে অনুভব করলো, কামনার লোলুপ স্পর্শ। আচ্ছন্ন ভাবে পড়ে থাকে সুমিতা। ওর মানসিক সত্তাগুলো যেন পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসাড় হয়ে গেছে। নেই কোনো বোধশক্তি। চেতনা ফিরে পায় অসীমের ডাকে।

—চলো, ক্লাবে যাই মিতা।

—না, না, আর কোথাও নয়; এবারে আমায় ছেড়ে দিন অসীম বাবু, বাড়ী পৌঁছে দিন। কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর ওর। অসীমের বাহুবন্ধন আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে, গলার স্বরে মৃদু মেঘ-গর্জ্জন।

—না মিতা, না। আগুন জ্বেলেছো তুমি আমার মনে, প্রাণে, সারা অঙ্গে। তোমাকেই যে নেবাতে হবে সে-আগুন, তীব্র দাহ-জ্বালার শান্তি মিলবে একমাত্র তোমারই কাছে। তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাবো, তোমাকে কেউ পাবে না, কেউ পাবে না।

ক্লাবের সামনে গাড়ী থামিয়ে সুমিতার হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে, ওকে টেনে নিয়ে যায় অসীম নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে।

আসন্ন বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যেন মৃত্যুশঙ্কায় থর-থর করে কেঁপে উঠলো অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী পম্পিয়া নগরী।

পিতার ঔদাসীন্য, স্নেহহীনতা, দিদিমার শুষ্ক নিয়মানুবর্ত্তিতা ও হৃদয়হীন স্বার্থপরতার চরম মূল্য দিতে হল আজ সুমিতাকে।

রাত বারোটা বেজে গেছে। গেটের সামনে বসে ঝিমোচ্ছিলো দারোয়ান। গাড়ীর শব্দ পেয়ে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে গেট খুলে দিলো। সুমিতাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো অসীম। কম্পিত, অবসন্ন দেহে ওপরে উঠে এলো সুমিতা।

কেউ জেগে ছিলো না তার জন্যে। সে যেন কোন্ বন্ধনহীন উল্কা, আপন গতিবেগে ছুটে চলেছে। কোথায় চলেছে জানে না, শুধু জানে, তাকে জ্বলতে হবে, তাকে চলতে হবে।

সর্ব্বহারার বেদনার বোঝা বহন করে, সে তস্করের মত প্রবেশ করলো আপন ঘরে। দেহে-মনে তার কে যেন নর্দ্দমার পাঁক ছিটিয়ে দিয়েছে! শাড়ী-ব্লাউসগুলো খুলে ছুড়ে ফেলে দিলো একধারে। তার পর বাথটবের হিম-শীতল জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে স্নান করে, সাদা পাতলা একখানি মসলিন শাড়ী সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ঘরে এলো। শুভ্র বস্ত্রের স্নিগ্ধ শুচিতায় মনটা যেন কতকটা শান্ত হল। এক কোণে টেবিলে-রাখা শুচিশুভ্র রজনীগন্ধার ঝাড়টির দিকে চেয়ে অকস্মাৎ চোখ ভরে জল এলো ওর।

আলো নিবিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে গেলো খাবার ঘরে, রেফ্রিজেটার থেকে ঠাণ্ডা জল বার করে আকণ্ঠ পান করলো। বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। সংগ্রাম-ক্লান্ত দেহখানিকে এলিয়ে দিলো বিছানার ওপর। খানিকটা ছটফট করে ঘুমিয়ে পড়লো সুমিতা।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো একখানি মন-প্রাণ জুড়োনো ছবি। সুদাম এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। অপার্থিব ভাব-উজ্জ্বল চোখ দু'টি জ্বলছে তার ধ্রুবতারার মত। সে-আলোর দীপ্তির পানে যেন

চোখ মেলে চাইতে পারছে না সুমিতা। দু'হাতে চোখ ঢাকা দেয়। মৃদু হেসে, ওর একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিলো সুদাম! দরদভরা কণ্ঠে বললো—আলো চাইছো মিতা? এই তো কত আলো! নাও, অন্তর ভরে গ্রহণ করো তুমি। এ যে একান্ত তোমারই জন্যে।

আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে সুমিতা, সুদামের হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে।

—দাও আলো দামীদা', আলো দাও আমাকে। গভীর অন্ধকারে পথ হারিয়ে আমি যে কি হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা ভোগ করছি! তুমি আমার হাতটা ধরো; সরিয়ে নিয়ে চলো এখান থেকে।

উঃ! বুকে যেন কে পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। ঘুম ভেঙে গেলো করবীর ডাকে!

—এই মিতা, কাঁদছিস কেন? ওঠ—ওঠ!

কান্নার প্রবল উচ্ছ্বাসে বুকের ভেতরটা তখনও কাঁপছিলো সুমিতার; চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে। একটানা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে গেছে রাত্রির অন্ধকার। প্রভাতের ম্লান আলো চারিদিকে—সজল আঁধার মেঘসায়রে অবগাহন করছেন সূর্যদেব বোধ হয়, নিজের প্রচণ্ড তাপদগ্ধ দেহটার দাহজ্বালা জুড়োবার জন্য! উতোল হাওয়ার বুকে যেন কার অব্যক্ত বেদনার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি!

—ও মা! এখনও শুয়ে রইলি? আজ যে তোর জন্মদিন রে! কাল তো সকালে বলেছিলাম তোকে, মনে নেই বুঝি?

—মনে রেখেই বা লাভ কি ছোট-মাসী? জন্মদিন বলে যে তাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করতে হবে, এর মাঝে প্রকৃত সুযুক্তি কিছু নেই তো! আলস্যভরে পাশ ফেরে সুমিতা।

—ও মা! সে আবার কি কথা? গত বছরে জন্মদিন আসবার সাত দিন আগে থেকে তো চলছিলো তোর জল্পনা-কল্পনা। কি শাড়ী, গয়না হবে। নেমন্তন্ন হবে কা'কে কা'কে? ছোড়দা, আমি, তুই, কত ভাঙাগড়া করলাম এই ব্যাপার নিয়ে, পছন্দ আর হয় না—তারপর সুদাম এসে যা স্থির করলো, সেইটি হ'ল তোর মনোমত!

ওর পাশে বসে দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে করবী—এবারে সে নেই বলেই তোর কিছু ভালো লাগছে না—না রে মিতা?

বেদনার আঁধার মেঘে লাগলো সহানুভূতির উষ্ণ পরশ! বিগলিত হিমকণা নামলো অঝোর ধারায়। করবীর বুকে মুখ লুকিয়ে অশান্ত হৃদয়াবেগের ভারে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো সুমিতা।

—নিজেকে ভারি অপরাধী মনে হয় করবীর। হায় একি করলাম! যেখানে ওর ব্যথা, সেইখানেই আঘাত করলাম? হাল্কা পরিহাস ওর পক্ষে যে এমন বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে,—জানলে সুদামের সম্বন্ধে কোনো কথাই উত্থাপন করতো না সে।

সস্নেহে সুমিতার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে করবী—ক্ষমা কর মিতা, এমন সুন্দর সকালটা মাটি করলাম তোর! হ্যাঁ, হ্যাঁ রে, সুদামের চিঠিটার জবাব দিয়েছিস?—না শুধু কেঁদেই ভাসাবি?

সুমিতা সামলে নেয় নিজেকে, লজ্জিতভাবে বলে,—জবাব এক রকম লেখা হয়েছে—আজ শেষ করে ডাকে দেব।

[ক্রমশঃ।

একটি সত্য ঘটনা

(বিদেশী লেখার ছায়াবলম্বনে)

শ্রীমতী রেণু চট্টোপাধ্যায়

ছোটবয়সে আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না, আর আমার প্রকৃতিও ছিল খুব শান্ত ও চিন্তাশীল। এই কারণে আমি আমার বয়সী সকল চঞ্চল প্রকৃতির ছেলেদের এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতাম। আমাদের বাড়ীর কিছু দূরে ছিল একটি ছোট বন। প্রতিদিনই আমি হৈচৈ এড়িয়ে দুপুরের শান্ত মৌন অবসরটুকু কাটিয়ে দিতাম গাছের তলায়। আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল কতকগুলি কাক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি এইরকম ভাবে কাটিয়ে দিতাম। বেলা পড়ে আসত—গাছের ফাঁক দিয়ে, দিনের আলো যাবার আগে আমার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিত। দূরে গীর্জ্জার ঘণ্টা আমার বাড়ীর কথা মনে করিয়ে দিত। তবু পাছে সেই গভীর অখণ্ড শান্তি আমার পায়ের শব্দে চমকে ওঠে, এই ভেবে আমি উঠতে সাহস করতাম না। এমনি ভাবেই দিন কাটে।

একদিন ঠিক এমনি সময়ে, একটা মেয়ে আমার সামনে এসে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়াল। একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ছবি কিন্তু প্রাণের স্পন্দন নেই। মুখে শান্ত স্নিগ্ধ প্রসন্ন ছাপ কিন্তু দু'টি চোখে যেন পৃথিবীর সব বেদনা, সব ক্লান্তি নেমে এসেছে। মাথার চুলগুলো পিছন দিকে টেনে বাঁধা; কতকগুলো ছোট ছোট চুলের গোছা মুখে কপালে ঘাড়ে এসে পড়েছে। পরনে সাদা রেশমী পোষাক। এত কাছে এসে দাঁড়াল, যে তার মাথার দু'-একগাছা চুল বাতাসে উড়ে আমার গালে লাগল। আমার বুকের মধ্যে সমস্ত রক্ত তোলপাড় করে উঠল; আনন্দে আমার ভাষা হারিয়ে ফেললাম। ভয়ে আনন্দে চোখে হাত দিয়ে মাথা নিচু করলাম। কিছু পরে মাথা তুলে দেখি, মেয়েটি নেই।

বাড়ীতে এসে এ-কথা আমি কাউকে বলিনি। তারপর প্রতি দিনই কেন জানি না, মেয়েটিকে দেখবার জন্য আমি সেই বনে যেতাম। মন দুলত এক অদ্ভুত অনুভূতিতে—একদিকে আনন্দ, একদিকে ভয়। মেয়েটিও প্রতিদিন আসত—কিন্তু কিছুই তাকে স্পর্শ করে না।

তারপর আমি পড়লাম অসুখে। জ্বরের ঘোরে আমি মেয়েটির কথা বলতুম। অসুখ সারলে, মা আমাকে মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যখন জানলাম, যা দেখেছি ছায়া নয় সত্য তখন আমার শিশু-মন থেকে কত বড় একটা বোঝা নেমে হাল্কা হয়ে গেল, তা বোঝাতে পারব না।

এক বিদ্রোহী যুবক আহত অবস্থায় ক্লান্ত দেহে এই বনে এসে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। আঘাত-জর্জ্জরিত শ্রান্ত দেহে সে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল। এই অবস্থায় তাকে দেখে মেয়েটির করুণা হ'ল। মেয়েটির বাবা এক রাজভক্ত ধনী। কিন্তু যুবকটির অবস্থা দেখে আর মেয়ের করুণ মিনতিতে—তিনি যুবকটিকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবার অনুমতি দিলেন।

মেয়েটির মা ছিল না, সে নিজেই সেবার ভার নেয়। ধীরে ধীরে সেবা-চিকিৎসার গুণে যুবকটি আরোগ্যের পথে এল। তা রোগশয্যার সুদীর্ঘ দিনগুলি মেয়েটি তার মুখের দিকে চে

সেবা সাহচর্য্য সঙ্গীত দিয়ে ভরিয়ে তুলল। দিনগুলি হ'য়ে উঠল সুন্দর থেকে সুন্দরতর।

এমনি একটি সুন্দর দিনে যুবকটি মেয়েটির দিকে কৃতজ্ঞতা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ, দয়া দেখিয়েছেন। আজ আপনাকে আমার সম্বন্ধে সব কথা বলব, আর বলব এমন এক প্রিয়জনের কথা, যাঁর আমার প্রতি আপনার ব্যবহারের কথা শুনলে কৃতজ্ঞতার সীমা থাকবে না। আমার এই বিপদের দিনে, আমি যদি তাঁকে একটা চিঠি দিতে পারি তো খুব ভাল হয়। আমি নিজে লিখতে পারব না, আপনি দয়া ক'রে একটু লিখে দিতে পারবেন?' মেয়েটি মনে করল, সে তার মাকে চিঠি লিখবে। মেয়েটি হাসিমুখে রাজী হ'ল; তার বিছানার পাশে কাগজ কলম নিয়ে বসল। ছেলেটি আরম্ভ করল 'আমার প্রিয়তমা—' তারপর আরো কিছু বলার জন্য মেয়েটির মুখের দিকে তাকাতেই দেখল, সাদা পাথরের মত রক্তশূন্য মূর্তি, হতাশা ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে। পরের মুহূর্তেই মেয়েটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল, তার পায়ের কাছে। শয্যাশায়ী সে, উঠে তুলতে পারলো না মেয়েটিকে।

মেয়েটি ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল। কিন্তু বোধশক্তি হারাল চিরকালের জন্য। হতভাগ্য বৃদ্ধ পিতার স্নেহের ডাক আর সাড়া তোলে না তার হৃদয়ে। বেদনার তীব্রতায় তার হৃদয় মন পাথর হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মুখে চোখে, স্নিগ্ধ কোমল ছায়া তাকে রহস্যময়ী করে তুলেছিল—যেমনটি আমি তাকে দেখেছি সেদিন গাছের ছায়ায়, নির্জন সন্ধ্যায়। মৃত্যুদিন পর্যন্ত মেয়েটি রোজই আসত সেইখানে, সেই বেশে—যেখানে, যে বেশে, মেয়েটির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়।

প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতি

শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়

বহু বিচিত্রতায় ভরা এই মানুষের মন আর তার সাংসারিক নিয়মনিষ্ঠা। কত অদ্ভুত বিধি-নিষেধের বেড়াজালে সে যে কখন কী ভাবে জড়িয়ে পড়ে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

প্রায় প্রত্যেক জাতির সমাজে নর-নারীর মনে কিছু-না-কিছু সংস্কার আছেই এবং এই প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতির দ্বারা সেই সংস্কারকে মেনে চলা হয় বা সেই সংস্কারকে রক্ষা করা হয়।

সব চলতি প্রথার সঙ্গেই যে-কোনো ঐতিহাসিক তথ্য বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ আছে, তা মনে হয় না। সুখে-দুঃখে-ভরা মানব- মনের সহজ আবেদন ও রুচিবোধই এর অন্তর্নিহিত সত্য রূপ বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাবধারায় প্রচলিত হয়ে আসছে নানা রকমের প্রথা।

খৃষ্টধর্মীয় এক ভদ্রমহিলার কাছে শুনেছিলাম, তাঁদের একটি প্রবাদের কথা। শালিক পাখী দেখা নিয়ে ছোট্ট একটি শ্লোকে তিনি বললেন:—

এক শালিকে দুঃখ বাড়ায়
দুইয়ে পত্রের আশা,
তিন শালিকে মহানন্দ
বাড়ায় ভালবাসা।

সাধারণতঃ এই পাখীরা দল বেঁধে বাস করতেই ভালবাসে। হয়ত সেই কারণে দল-ছাড়া একটিকে চোখে-পড়া অমঙ্গল বলে মনে হয়। কিন্তু তার সঙ্গে দুটির মিলনে কী করে পত্র পাবার আশা থাকতে পারে, সহজ বুদ্ধিতে হয়ত এর উত্তর পাওয়া যায় না। যেমন বুঝতে পারা যায় না আমাদের পিছু-ডাকা বা যাত্রাপথে কারো হাঁচির শব্দ কানে এলে গনার বচন মনে পড়ে যাওয়া যাত্রা নাস্তি! শত শিক্ষিত মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির মনও সংশয় দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পারে না মনে হয়। একটু বসে গেলেই ভাল হয়, কি জানি কি বাধা পড়ে।

প্রবাদ আছে, দরজা বা জানলার মাথায় গামছা রাখতে নেই, বাড়ীতে মামলা-মকদ্দমা হয়। গামছার সঙ্গে মামলার কোন সম্পর্ক নেই বা থাকতে পারে না, কিন্তু দৃশ্যটি অতি অশোভন এবং এই সামান্য রুচিবোধটি না থাকায় শাসনের প্রয়োজনে এই অজুহাত দেখান হয়, এ-কথা বেশ বুঝতে পারা যায়।

নববধূকে গৃহ প্রবেশের কালে উথলে-ওঠা দুধ দেখান রীতি, পশ্চিমবাংলার বহু পুরাতন প্রথা—বধূর সৌভাগ্য অমনি উছলে পড়ার কামনায় আমরা এটা করে থাকি—বাস্তব সংসারে এই কামনা কতদূর সত্য হয় তা সকলেরই অজানা, কিন্তু চিরদিনের এ প্রথাকে ভাঙবার

সাহস কারো নেই। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা এ প্রথাকে আজো পালন করে থাকি।

ঋষি অগস্ত্য সেই কবে কোন্ যুগে বিজয় যাত্রা করেছিলেন আর তিনি ফিরে আসেন নি। সেদিন ছিল বুঝি মাসের প্রথম তারিখ। জানি না কোন পুঁথি পুরাণে এ নির্দেশ আছে। কিন্তু আজো আমরা মাসের পয়লাকে অগস্ত্য-যাত্রা নাম দিয়ে থাকি। প্রিয়জন বিদায় নিলে মনটা তাই শঙ্কাতুর হয়ে ওঠে ঐ দিনের কথা স্মরণ করে।

এই ভাবে খাওয়া-পরা থেকে আরম্ভ করে জন্ম-মৃত্যু ও আনন্দ উৎসবে আমরা এমন কতকগুলি প্রথাকে সংস্কাররূপে মেনে নিয়েছি কত যুগ-যুগান্ত ধরে, যাকে আজ তুচ্ছ জেনেও সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারি না। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেরই জীবনে এর প্রভাব বিস্তার করে আছে বেশী বা কম ভাবে। মানুষের জীবনে স্বচ্ছন্দ গতিপথে এই বিধি ও পদ্ধতি শুধু যে নিষেধের বাধায় চিরন্তন হয়ে আছে তাই নয়, একে আমরা মেনে নিয়েছি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও কর্মধারায় কোনটি কল্যাণের প্রতীক কোনটি স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে।

বারো জন নৃত্যপটীয়সী রাজকুমারী

এক রাজার বারো জন সুন্দরী মেয়ে ছিল। তারা সবসময় মিলেমিশে থাকত। একই ঘরে বারোটি বিছানায় তারা ঘুমোত—প্রতি রাতে ঘরে ঢোকবার পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। কয়েক দিন পর বড় গোল বাধল। সকাল বেলায় তাদের জুতো সছিদ্র অবস্থায় পাওয়া গেল—দেখে মনে হত যে সারা রাত তারা নেচেছে। রাজা চিন্তায় পড়লেন। কি করে যে এই ঘটনা ঘটছে, তার সন্ধান কেউ দিতে পারেনি।

অবশেষে রাজা দেশে ঘোষণা করলেন, যদি কেউ এই সমস্যা সমাধান করতে পারে, পুরস্কারস্বরূপ যে কোন রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পারবে এবং সিংহাসনে ভবিষ্যতে বসতে পারবে। সময় মাত্র তিন রাত দেওয়া হবে।

এক রাজপুত্র রাজার রাজ্যে এল। তাকে ভাল ভাবে অভ্যর্থনা করা হল। সন্ধ্যাবেলায় রাজকুমারীদের পাশের ঘরে জায়গা দেওয়া হল। অল্পক্ষণের মধ্যে রাজকুমার ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলে—দেখতে পেল রাজকুমারীদের জুতো সছিদ্র। একই ঘটনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাতে ঘটল। রাজার আদেশে রাজপুত্রের মাথা নেওয়া হল।

আরো অনেকে এসেছিল কিন্তু তাদেরও একই অবস্থা!

এই সময় একজন বুড়ো যোদ্ধা যুদ্ধে আহত হয়ে সেই রাজার রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল; যখন সে একটি বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় এক বুড়ির সঙ্গে দেখা হল। বুড়ি তাকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় সে যাবে?" যোদ্ধা উত্তর দিল, "আমি সেই জায়গা খুঁজছি, যেখানে বারো জন রাজকুমারী নাচে।" বুড়ি বলল, "খুব ভাল কথা। রাজপুরীতে সন্ধ্যেবেলায় রাজকুমারীদের দেওয়া মদের পাত্র ছোঁবে না, রাজকুমারীরা ঘর থেকে চলে গেলে ঘুমোবার ভাণ করবে। খুব সাবধানে কাজ করবে।" এই বলে বুড়ি যোদ্ধাকে একটি পোষাক দিল।

বুড়ির কথা মত যোদ্ধা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হল। রাজা তাকে ঝলমলে পোষাক দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে যোদ্ধাকে নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুক্ষণ পরে বড় রাজকুমারী মদের পাত্র নিয়ে এল। যোদ্ধা রাজকুমারীর হাত থেকে পাত্র নিল কিন্তু মদের পাত্র ছুঁলো না। শেষে ঘুমোবার ভাণ করল।

তার পর বারো জন রাজকুমারী সুন্দর সুন্দর পোষাক পরল এবং মনের আনন্দে নাচতে লাগল। সবচেয়ে ছোট রাজকুমারী বলল, "আমার মনে হয় কোন অঘটন ঘটবে।" বড় রাজকুমারী বলল, "বোকা মেয়ে! জান না কত জন রাজকুমার আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছে!"

সকলে প্রস্তুত হয়ে যোদ্ধাকে দেখতে গেল। যোদ্ধাকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এল। বড় রাজকুমারী বিছানার কাছে এসে হাততালি দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি গুপ্ত দ্বার বেরিয়ে এল। এই সময় যোদ্ধা লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠল—বুড়ির দেওয়া পোষাকটি গায়ে চাপিয়ে রাজকুমারীদের পিছন পিছন যেতে লাগল।

সকলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাগানে এসে পৌঁছাল। বাগান ভরা গাছ। গাছের পাতাগুলি রূপো দিয়ে মোড়া। যোদ্ধা চিহ্নস্বরূপ একটি ডাল ভেঙ্গে নিল। তারপর আর একটি বাগানে পৌঁছাল। পাতাগুলি সোনায় মোড়া। আবার যোদ্ধা একটি ডাল ভেঙ্গে নিল। কিছু দূর যাবার পর হ্রদের সামনে উপস্থিত হল, এক পাশে বারোটা নৌকা বাঁধা ছিল। তাতে অপেক্ষা করছিল বারো জন রাজকুমার। এক একটি রাজকুমারী এক একটি রাজকুমারের নৌকায় চাপল। যোদ্ধা ছোট রাজকুমারীর নৌকায় উঠল—যে রাজকুমার ছোট রাজকুমারীর সঙ্গী ছিল, সে বলল, "আমার মনে হয় নৌকার ওজন বেড়ে গিয়েছে—কিছুতেই ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙ্গে যেতে পারছি না।" ছোট রাজকুমারী উত্তর দিল, "নিশ্চয় বাতাসের জন্য।"

হ্রদের আর এক ধারে ছিল একটি দুর্গ—সেখান থেকে ভেসে আসছিল গানের সুর। সেখানে সকলে নৌকা থেকে নামল এবং দুর্গে প্রবেশ করল। প্রত্যেক রাজকুমার প্রত্যেক রাজকুমারীর সঙ্গে নাচল। যোদ্ধাও তাদের সঙ্গে নাচল। রাত তিনটে পর্যন্ত নাচল। ফিরবার পথে যোদ্ধা বড় রাজকুমারীর সঙ্গে নৌকায় উঠল। রাজকুমারীদের আগে আগে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বুড়ির দেওয়া পোষাকের একটি গুণ ছিল—যে এই পোষাক গায়ে চাপাত সে-ই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পারত। যোদ্ধা এই পোষাক পরে তিন রাত রাজকুমারীদের অনুসরণ করল। ঠিক সময়ে যোদ্ধা গোপন কথা বলবার জন্য রাজার সামনে উপস্থিত হল—সঙ্গে ছিল গাছের ডাল।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "রাতে কোন্ জায়গায় রাজকুমারীরা নাচে?"

যোদ্ধা উত্তর দিল, "মাটির নিচে একটি দুর্গে বারো জন রাজকুমারের সঙ্গে নাচে।"

রাজকুমারীরা যোদ্ধার কথা মেনে নিল। তারপর বড় রাজকুমারীর সঙ্গে যোদ্ধার বিয়ে হল—সুখে তারা দিন কাটাতে লাগল।

অনুবাদক: শ্রীবকুল ঘোষ

ঘরের মধ্যেই হাজার মাইল পাড়ি—
ঝিক্…ঝিক্…ঝিক্…ঘটাং "সব হঠকে, তুফান মেল—"
কিন্তু আসলে চলেছে খোকাবাবুর খেলার ইঞ্জিন। খোকাবাবুর কাছে এতে কিন্তু হাজার মাইল পাড়ি জমানোর মতই উত্তেজনা! এ উত্তেজনা চলার, গতির উত্তেজনা।
আমাদের অর্থাৎ হিন্দুস্থান লিভারের কাছে গতি এবং দূরত্বের গুরুত্ব অনেক। আপনাদের জন্যে আমরা প্রত্যেকদিন হাজার হাজার মাইল পাড়ি জমাই— ভারতবর্ষের ৩৫,০০০ মাইল রেলপথের কোন অংশই বাদ পড়েনা। কিন্তু জিনিষপত্র পাঠানোর আগেই আমরা স্থির করি কিভাবে জিনিষগুলি যাবে।
কিন্তু যেভাবেই হোক জিনিষগুলির গন্তব্যে পৌঁছতেই হবে এবং যেমন তেমন ভাবে নয়—সম্পূর্ণ ভাল অবস্থায়। কারণ, জনসাধারণ আমাদের তৈরী জিনিষগুলির ওপর আস্থাবান—আমাদের তৈরী সানলাইট সাবান আর ভিম রেক্সোনা আর ডালডা বনস্পতি এ সবই তো তাঁদের অনেকের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী! এইসব জিনিষের প্রয়োজন সব জায়গাতেই সারা বছর ধরে বেড়ে চলেছে।
আমরা এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সচেষ্ট। সেইজন্যে আমাদের তৈরী জিনিষগুলি শুধু যে আপনার নানারকম কাজে আসছে তাই নয়, জিনিষগুলি আপনারা নিয়মিত ঠিকসময় হাতের কাছে পাচ্ছেন।
নিয়মিত সরবরাহ আমাদের ব্যবসার গোড়ার কথা
দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার
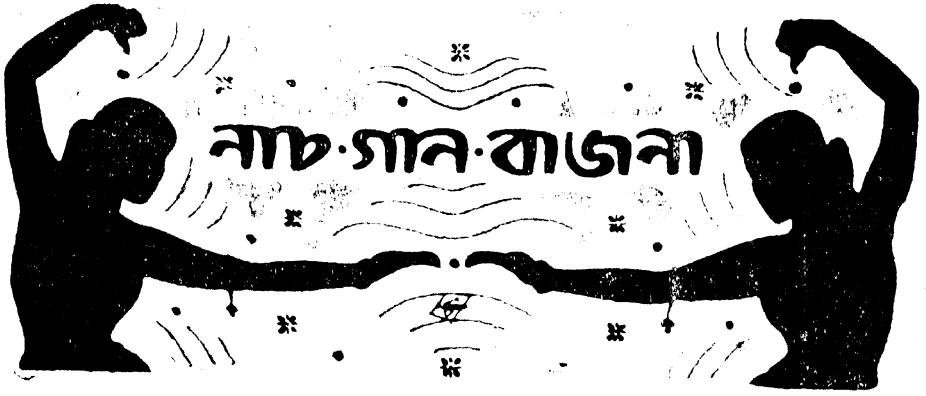
নৃত্যনাট্যের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ

মণি বর্দ্ধন

জাতি যখন স্বকীয়তা হারিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ ক'রে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপ করতে বসে, রুচি-রসবোধ যখন পঙ্কিল হয়ে গতিহীন হবার উপক্রম হয়, চিন্তা ও ভাবজগতের দৈন্য যখন জাতিকে অসহায় ক'রে তোলে, জাতির সেই মৃত্যুক্ষণে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের এমনি দুর্দিনে যাঁরা জন্ম নিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন। শিল্পে, সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, তাঁর দান ভারতকে জগৎসমক্ষে উন্নীত করেছে।

শুধু দর্শন, কাব্য, সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয়, এমন কি নৃত্যকলা ক্ষেত্রেও ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনঃপ্রচলনের জন্য তিনিই প্রথম উদ্যোগী হন। দেশবাসী কিন্তু সেদিন এই সত্যসুন্দরের সাধনায় এই একনিষ্ঠ সাধককে শ্লেষে, বিদ্রূপে ব্যতিব্যস্ত না ক'রে ছাড়েন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, সুন্দরের পূজারীর সুন্দরের সাধনা যাত্রাপথে সেদিন গতি হারায় নি। দেশের পক্ষে, শুধু দেশের পক্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের নৃত্যজগতের পক্ষে বিধাতার এই যে কি আশীর্বাদ, তা পূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার মত রুচি-রসবোধ আমাদের আজও জেগেছে কি না সন্দেহ!

প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা যে খৃষ্টপূর্ব্ব শতকেই কত দূর উৎকর্ষ লাভ করেছিল তা নাট্যশাস্ত্র দৃষ্টেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু নানা দৈবদুর্বিপাকে যুগধর্ম্মের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে দেশের নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনে দেশে সেই প্রাচীন নৃত্যকলারই অবশিষ্ট রইল শুধু বাইজীর শৃঙ্গার-রসাত্মক অশ্লীল গ্রীবা, অক্ষিপুট-তারকা ও কটিকর্ম্মে এবং বিভিন্ন প্রদেশের রঙ্গমঞ্চে ও যাত্রার আসরের জাতীয় বিজাতীয় নৃত্য-সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত নৃত্যপদ্ধতি, যার ফলে দেশের শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় নৃত্যকলাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করল। রঙ্গমঞ্চের প্রমোদকক্ষে নৃত্য তখন "ঠুন ঠুন পিয়ালা" ইত্যাদি গানের সঙ্গে সুরাপায়ীর দৃশ্যে চিত্তবিনোদনের উপায়রূপে আবদ্ধ। নৃত্যে যে সত্যসুন্দরের অভিব্যঞ্জনাও সম্ভব, দেশবাসী তা ভুলেই গেল।

সুন্দরের একনিষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথের মনেই প্রথম নৃত্যকলার এই মর্ম্মন্তুদ পরিণতি নির্ম্মম হয়ে বেজে উঠল। তাই দেশবাসীর বিদ্রূপ উপেক্ষা ক'রে নৃত্যশিল্পে পুনর্জাগরণের জন্য যত্নবান হলেন এবং তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চ্চা ব্যবস্থায় তৎপর হলেন। তাঁর অলৌকিক প্রতিভা, কর্ম্মোদ্যম ও অধ্যবসায়ের স্পর্শে মৃতপ্রায় নৃত্যকলায় জাগরণের প্রথম স্পন্দন অনুভূত হ'ল। আজ যে-দেশে ভদ্র-বিজ্ঞ-জ্ঞানী-সজ্জন সকলেরই নৃত্যকলার প্রতি পূর্ব্বের সেই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব বিদূরিত হয়েছে এবং ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৃত্যচর্চ্চার এ 'দুঃসাহস' জেগেছে, এর মূলেই কি রবীন্দ্রনাথের উদ্যম প্রচেষ্টাই নয়?

উনবিংশ শতকের শেষাশেষি এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা-পদ্ধতি বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন রূপে প্রায় (অশিক্ষিত?) নিরক্ষর মুষ্টিমেয় লোকের চর্চ্চার মধ্যে কোন প্রকারে বেঁচে ছিল। কিন্তু প্রাচীন নৃত্য-পদ্ধতি ও রূপের পূর্ণ রূপ কোথাও ছিল না। 'কথাকলি' নৃত্যে তখন মুদ্রা, অভিনয়ে আংশিক রূপবন্ধ ও রীতি প্রাধান্য লাভ করেছে; দক্ষিণী নৃত্য অঙ্গহার করণ, চারী, বর্ত্তনা প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত; কথক নৃত্য তাল-লয়ের সূক্ষ্ম বিভাগের সুদীর্ঘ "চক্রদার বোলের" সমষ্টি এবং মণিপুরী নৃত্য গমক-মীড়-প্রধান দেহকর্ম্মের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তার কারণ এই নৃত্যচর্চ্চা এ দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই প্রচলিত না থেকে, যেহেতু শুধু মুষ্টিমেয় ধর্ম্মপ্রাণ নৃত্যরসিকদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। সেজন্যই শিল্পীদের সেই প্রাদেশিক ধর্ম্ম, তদুপরি দেশের সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্রভাবে নব রসের মাত্র দু-চারটি রসব্যঞ্জনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। দক্ষিণী নৃত্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেশের—তাই বীর-রৌদ্ররসমূলক দেহকর্ম্মই তাদের নৃত্যের প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল; তেমনি মণিপুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের দেশের ব'লে শিল্পীর শুধু শান্ত-ভক্তি-রস-ব্যঞ্জনার সহায়ক দেহকর্ম্ম করণ অঙ্গহার গ্রহণ করেছিল। এমনি ক'রে কথাকলি, কথক প্রভৃতি নৃত্যে বিভেদ ও অপূর্ণতা এসে ভিন্ন রূপ গ্রহণ করল এবং বংশপরম্পরায় ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে থেকে নৃত্যকলা স্পন্দনহীন, বৈচিত্র্যহীন, মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম শুদ্ধ নামাবরণের ক্ষীণ গতানুগতিকের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে নৃত্যকলাকে সংমিশ্রণ-নৈপুণ্যে প্রাণবান ক'রে মুক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, উপরোক্ত প্রত্যেক প্রাদেশিক নৃত্যপদ্ধতিতে, যেহেতু নব রসের পূর্ণ ব্যঞ্জনা সম্ভব নয় কারণ বিভিন্নধর্ম্মী, এই নৃত্যে নব রসের পূর্ণ ব্যঞ্জনার জন্য কোন

এক বিশেষ পদ্ধতিকে আঁকড়ে না থেকে, রসভাব-প্রকাশ-উপযোগী বিভিন্ন নৃত্যপদ্ধতির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব নৃত্যরীতির সৃষ্টি করলেন। ভারতের শিল্পীর দীর্ঘকালাচরিত নৃত্যপদ্ধতির অবিমিশ্র শুদ্ধতার মোহে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে নৃত্যপদ্ধতির শুদ্ধতার ও অবিমিশ্রতার চেয়ে নৃত্যে রসের প্রাধান্য দিলেন। নৃত্যে রসভাব ব্যঞ্জনার পূর্ণতার জন্য যদি বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণের প্রয়োজন হয় তা দোষাবহ নহে এবং এই প্রকার নৃত্যসংমিশ্রণ যে অপরিহার্য্য এ কথা তিনি দেশবাসীকে শোনালেন। যেমন সমষ্টিগত শব্দযোজনায় যখন কোন ভাব প্রকাশ পায় তখনই হয় শব্দের সার্থকতা, তেমনি বিভিন্ন নৃত্যকর্ম্মের সহায়তায় কোন ভাব যখন পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তখনই হয় নৃত্য রূপবন্ধের সার্থকতা। নৃত্যের উদ্দেশ্য, নৃত্যরীতি-পদ্ধতিজ্ঞানের অবিমিশ্রতা প্রদর্শন করাই নয়—রস সৃষ্টি করা—নৃত্যকর্ম্ম নৃত্যপদ্ধতি ও রীতি রসসৃষ্টির বাহন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের মনেই প্রথম জাগল, নৃত্যের পুনরুজ্জীবনের প্রথম প্রচেষ্টাই হওয়া উচিত—দীর্ঘযুগ-অবজ্ঞাত নৃত্যকলার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা জাগ্রত করা এবং সেজন্য নৃত্যকে যুগোপযোগী করে গড়তে হবে নূতন ভাবসম্পদের নব ব্যঞ্জনায়। যে-শিল্পকলা দীর্ঘকাল দেশবাসীর অশ্রদ্ধার চাপে ক্ষীণপ্রাণ, সেই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা তখনই যখন অশ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে দেশবাসী তাকে সশ্রদ্ধভাবে দেখতে পারবে। অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা রসানুভূতির প্রধান অন্তরায়।

তাই রবীন্দ্রনাথ নূতন নৃত্যনাট্যের রচনা করলেন, সেই নাট্যোপযোগী নূতন গান লিখলেন, এবং আধুনিক রুচিসম্মত ব্যঞ্জনায় ও প্রকাশভঙ্গীতে ক'রে তুললেন তাকে যুগরুচি-অনুকূল। শুধু তাই নয়, অবজ্ঞাত শিল্পের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা জাগাবার জন্যে আপন জন পরিজন সহ নিজে রঙ্গমঞ্চে পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হলেন, যা কোন দিন দেশবাসী স্বপ্নেও ভাবে নি। প্রথমে অনেকেই উপহাস করলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কান দেন নি, তিনি জানতেন সুন্দরের মাহাত্ম্য এক দিন এরা স্বীকার করবেই—সুন্দরের সাধনায় কোন হীনতার স্থান নেই। আজ সেই সত্যসুন্দরের পূজারীর ঐকান্তিক সাধনার বলেই দেশবাসী আপনার হারান সম্পদ আবার ফিরে পেয়েছে। কত যুগের সুকৃতির ফলে বাংলার বুকে এ-হেন অদম্য অক্লান্ত সত্যসুন্দরের সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল কে জানে! রবীন্দ্রনাথ যখন নৃত্যাভিনয়ে স্বয়ং ভূমিকা গ্রহণ করতেন, এমন কি নৃত্যাভিনয়ে অন্যান্য শিল্পীর মত নিজেও তাঁহার দেহ নৃত্যছন্দে দোলায়িত করতেন, তখন তাঁহার বয়স ষাটের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, য-বয়সে এ দেশের লোক স্থবির হয়ে পড়ে, সর্ব্বাঙ্গে বার্দ্ধক্যের শৈথিল্য অবসাদ নেমে আসে। কিন্তু এ বয়সেও নৃত্যে পর্য্যন্ত তিনি ভূমিকা গ্রহণ করলেন, শুধু আত্মবিস্মৃত, আত্মবঞ্চিত দেশবাসী যদি তার হারান সম্পদ আবার ফিরে পায় এই আশায়। তিনি দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। অযথা বাহিক আড়ম্বরে মগ্ন দেশবাসীর ভাব ও রুচিরসের দৈন্য যে তাদের আজ অসহায় ক'রে তুলেছে তাই কি তাঁকে প্রতিনিয়ত পীড়ন করত? তাই কি তিনি দেশবাসীর রুচিরসবোধ জাগাবার জন্য দেশবাসীর শ্লেষ-বিদ্রূপ উপেক্ষা করেছিলেন? তাঁর এই রূপসৃষ্টিকে কেউ কেউ অশ্রদ্ধা করলেও তিনি কিন্তু সমগ্র দেশকে ভালবেসেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ বোধ হয় অবান্তর হবে না। কলকাতারই এক রঙ্গমঞ্চে কবিগুরু আপন জন-পরিজন ছাত্রছাত্রীসহ কোন এক নৃত্যাভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। অগণিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আমার এক সম্ভ্রান্ত জনৈক বন্ধু অভিনয় দেখতে দেখতে বঙ্গরঙ্গমঞ্চেরই এক স্বনামখ্যাত অভিনেতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কেমন লাগছে?" অভিনয়ের অজস্র সুখ্যাতি করার পরে বিশেষ ক'রে সেই অভিনেতা বললেন, "এ অভিনয়ে এরূপ পূর্ণব্যঞ্জনা সম্ভব হয়েছে, কারণ প্রথমতঃ কবিগুরু নিজে এদের পরিচালনা করছেন; দ্বিতীয়ত, সুশিক্ষিতা ভদ্রপরিবারের যে মেয়েদের নিয়ে এ রূপদান করেছেন, যে কারণে পূর্ণরূপব্যঞ্জনা সম্ভব হয়েছে, তা শুধু এ জন্যই সম্ভব হয়েছে যে কবিগুরু নিজেও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। ভদ্রপরিবারের সুশিক্ষিতা মহিলাদের সাহায্য রঙ্গমঞ্চে আমাদের পক্ষে পাওয়ার আশা শুধু দুরাশাই নয়—দুঃসাহস। আমাদের পক্ষে প্রতিদিন এমন কল্পনা করা মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ ব'লে দেশবাসী ভাবতেন। কবিগুরুর ব্যক্তিত্বের জন্যই আজ ইহা সম্ভব হয়েছে। শুধু এই নয়, আমাদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'লে এদের ভদ্রস্থ রাখা সম্ভব হয়তো হতো না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভূমিকায় আছেন ব'লে দেশবাসী মুখ ফুটে বিরুদ্ধাচরণ করছে না, নইলে—। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের বজ্রাবরণ।"

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভদ্রপরিবারের ছেলেমেয়ে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন বলেই অপাংক্তেয় নৃত্য পাংক্তেয় হ'ল। দীর্ঘ যুগের অবজ্ঞাত নৃত্যকলার প্রতি আবার দেশের শ্রদ্ধা

জাগলো। ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে নৃত্যচর্চ্চা সুরু হ'ল, অতি বড় রক্ষণশীল অভিভাবকও রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর প্রবর্ত্তিত নৃত্যচর্চ্চায় বাদ সাধলেন না। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যশিল্পের পুনর্জ্জাগরণের ইতিহাসে ইহাই প্রথম সূচনা। রবীন্দ্রনাথই প্রথম শ্রদ্ধা জাগালেন, তাঁরই গড়া ভিত্তিতে এসে অন্যান্য ভদ্র শিল্পী নৃত্যচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে ভারতের নৃত্যকলা শুধু প্রাণ ফিরে পেল তাই নয়, ধন্য হয়ে গেল, পূর্ণ হয়ে গেল।

বিশ্বের নৃত্যভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দান-প্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁর নৃত্যনাট্যের উল্লেখ করতে হয়। শিল্পী কবির ঐকান্তিক চেষ্টায় নৃত্যনাট্যেই প্রথম আত্মবিস্মৃত দেশবাসী বুঝতে শিখল যে নৃত্যের ভাব রূপ রস ও অপরূপ ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হ'তে পারে। তবে রবীন্দ্রনাথের সমসময়ে বা পূর্ব্বে যে ভারতে নৃত্য-নাট্যের অস্তিত্বই ছিল না তা নয়। নাট্যশাস্ত্রের যুগে (খৃঃ পূঃ ২০০) নৃত্যনাট্যের পূর্ণ বিকাশই লাভ করেছিল, যার আংশিক রীতি-পদ্ধতি দক্ষিণ-ভারতে—বিশেষতঃ কথাকলি নৃত্যের অথবা আহার্য্য-অভিনয়ের আড়ম্বরের মধ্যে রক্ষিত ছিল। মুষ্টিমেয় নৃত্যরসিক মধ্যে চর্চ্চা হচ্ছিল। আর ছিল নৃত্যনাট্যের প্রচলন আসাম অঞ্চলে মণিপুরে ঠাকুরঘরের সম্মুখে রাজানুগ্রহে বিশেষ-সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষ্ণবিষয়ক লীলাভিনয়ে। যদিও কথক শিল্পী বলেন যে কথক ও নৃত্যাভিনয় ছিল কিন্তু একই শিল্পী রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে রূপব্যঞ্জনা দিতেন ব'লে তাকে নৃত্যনাট্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয় এবং আমাদের আলোচ্যকালে কথকের এই নৃত্যাভিনয় আমরা "বাইজী"দের মধ্যেই ভাও বাৎলানে দেখতে পাই। কিন্তু উপরোক্ত সর্ব্বক্ষেত্রেই যেহেতু প্রায় নিরক্ষর শিল্পীদের মধ্যেই নৃত্য আবদ্ধ ছিল, সেজন্য তাতে যুগোপযোগী রুচিসম্মত ভাবসম্পদ ও রূপরস পরিবেশনের ধারা সুমার্জ্জিত ছিল না। এমন কি নৃত্যানুষঙ্গিক সঙ্গীত সম্পর্কেও শিল্পীর ঔদাসীন্য নৃত্যের ভাবব্যঞ্জনার পূর্ণতা লাভের অন্তরায় ছিল। কথক নৃত্য তখন চলেছে একঘেয়ে "লহরা"র সঙ্গে সম ফাঁকের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে; কথাকলি নৃত্যে তখন কর্ণাটক রাজ্যের নৃত্যের ভাব সম্পদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত একঘেয়ে শ্লোকম্ পদম্-এর সঙ্গে রূপায়ণের চেষ্টা চলেছে—মণিপুরে নৃত্যনাট্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, নূতন ভাবসম্পদ যোজনার চেষ্টা নেই, মুখমণ্ডলে কোন ব্যঞ্জনা নেই, কারণ ঠাকুরঘরের সম্মুখে ভক্তিরসাত্মক নৃত্যের বিধান, এবং নৃত্যানুষঙ্গিক সঙ্গীত বলতে শুধু কীর্ত্তনই প্রচলিত। এবং ভারতের নৃত্যকলা গতানুগতিকের বদ্ধ আবহাওয়ায়, মরণের ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যানুরাগ নৃত্যকে নূতন রূপে পরিবেশন করে প্রাণবন্ত করে তুললে। তিনি একের পর একটি নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করে চললেন, বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। যে মণিপুরী নৃত্যের কথাকলি-নৃত্যের একঘেয়েমী মনে অবসাদ আনত, রবীন্দ্রনাথের সেই মণিপুরী কথাকলি রীতিপদ্ধতি রূপবন্ধই তার প্রয়োগনৈপুণ্য ও সংমিশ্রণের অভিনবত্বে ও স্বকীয়তায় দেশবাসীর চোখের সম্মুখে অপরূপ সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠলো।

নৃত্যসংগঠননৈপুণ্যে, সঙ্গীতরচনাকৌশলে, সুর-সংযোজনার কৃতিত্বে প্রকাশভঙ্গীর চাতুর্য্যে রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট নূতন নৃত্যনাট্য বিশ্বের নৃত্যজগতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করলেও বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। নৃত্যানুষঙ্গিক আবহসঙ্গীত তিনি [illegible] প্রথম রচনা করলেন নৃত্যের ভাব প্রকা অনুকূল ক'রে। [illegible] মুখমণ্ডলের ব্যঞ্জনায়, যে ভাব পূর্ণত পেতে পারে, সেই [illegible] বজায় রেখে তিনি গান রচনা করলেন, সুরও সেই ভাবানুযায়ী সংযোজনা করলেন, ফলে নৃত্যনা প্রতিটি নৃত্যকম্প, আঙ্গিক অভিনয়, সুরের প্রতিটি মূর্চ্ছনা [illegible] সামঞ্জস্য ও অর্থপূর্ণ হয়েছে যে বিশ্বের নৃত্যজগতে [illegible] নৃত্য ভারতীয় নৃত্যে [illegible] সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াল। এ যাবৎ আমরা নাট্যের পূর্ণরূপ [illegible] রাশিয়ান ব্যালে নৃত্যের কথাই ভাবত কলকাতায় প্রদর্শিত [illegible] ব্যালে-শিল্পীসম্প্রদায়ের "সিলফাইডিস্" [illegible] উক্রেনিয়ান ব্যালে, [illegible] নৃত্যনাট্য দেখে উৎফুল্ল পরিতৃপ্ত মনে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে [illegible] কিন্তু আনন্দাতিশয্যের আবেগে একটু ধীর ভাবে ভেবে দেখিনি [illegible] নৃত্যনাট্যের আবেদন ও পূর্ণতার মূলে রয়েছে তাদের সঙ্গত সামঞ্জস্য নৃত্যানুষঙ্গিক যন্ত্রসঙ্গীত। আমাদের দেশে তখন মাদল, ঢ নয়তো সারেঙ্গী হারমোনিয়াম সঙ্গে নৃত্য চলছে। রবীন্দ্রনাথই [illegible] বুঝলেন এবং দেশবাসীকে বোঝালেন যে, নৃত্যের ভাবসম্পদ ব্যঞ্জনার পক্ষে আবহাওয়া-উপযোগী নৃত্যানুষঙ্গিক সঙ্গীত অপরিহা তিনি নিজেই তাই [illegible] রচনা ক'রে নিজেই সুর সংযো করলেন—ফলে পেলাম, "বাঁধন ছেঁড়া সাধন হবে, ছেড়ে যাব মাভৈঃ রবে"-এর মত গান, এখনও চোখে ভাসছে সেই "বাঁধন ছেঁ সঙ্গে হস্ত-চালনায় [illegible] সেই ভাবটি এবং সঙ্গে সঙ্গে "নির্ভয় আশার উৎফুল্লতার ব্যঞ্জনা যা শিল্পীদের দেহরেখায় মূর্ত হয়ে উঠত। এই পূর্ণরূপ ভাবে ভাবার [illegible] সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গান, সুর ও পরিচালনা নিজেই করেছিলেন বলেই। তিনি ছি একাধারে কবি, সুরকার ও নৃত্যরসিক। তাই তাঁর সৃষ্টি নৃত্যনা বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রইল, এমন কি রাশিয়ান ব্যালেকেও কোন [illegible] বিষয়ে ছাপিয়ে গেল। রাশিয়ান ব্যালে ছিল সুরসঙ্গতি সম্ সম্পৎশালী, নইলে নৃত্যরূপরীতি ও রূপ-বন্ধের ব্যঞ্জনায় ভার নৃত্যরূপবন্ধের তুলনায় নিষ্প্রভ। (অনেকে বলেন যে রাশি ব্যালের বর্তমান রূপবন্ধের অনেকটাই উদ্ভূত হয়েছিল ভার নৃত্যরীতি হতেই বৈচিত্র্য সমন্বয়ে। কোন সময়ে ভারতীয় রীতি ম এশিয়ায় গিয়েছিল, সেখান থেকে যায় বোখারা ও খিভায়, সে থেকে রাশিয়াতে গিয়ে সংগঠনের বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে এক স রাশিয়ান নৃত্যের বর্তমান রূপ পায়।) কারণ রাশিয়ান ব্যালে নৃত্যকম্প আয়াসসাধ্য হলেও অর্থহীন, প্রায় ব্যঞ্জনাবিহীন। ভারতী নৃত্যকম্পে যেমন সামান্য অঙ্গুলী-সঞ্চালনের "মুদ্রায়" ও [illegible] গ্রীবাকম্পে চরিত্রের যে ইঙ্গিত দেয়, পাশ্চাত্যের নৃত্যকম্পে তেমন কো নৃত্যকম্প নেই। সে দেশের দেবদূত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে "পিরোয়ে ক'রে দাঁড়ায়, আমাদের চোখে বিসদৃশ ঠেকে। আমরা দেবদূ গতিতে স্নিগ্ধতা, ধীরে মধুর ভাব দেখতে পাই না—আবার সেই এ "পিরোয়েট" রূপবন্ধ দেখি শয়তান এবং সামান্য মানব-চরিত্র ব্যঞ্জনাতেও। আমাদের দেশে কিন্তু মানব-গতি, দেবগতি, অসুরগ সম্পর্কে চরিত্রানুযায়ী যুক্তিসম্মত কঠোর বিধান ছিল এমন চরিত্রানুযায়ী নৃত্যানুষঙ্গিক সঙ্গীত তাল লয়াদিরও বিচিত্র বিধান ছি রবীন্দ্রনাথই ভারতীয় নৃত্যকম্পে প্রকাশভঙ্গী ব্যঞ্জনার যোজনা করলে যে মণিপুরী নৃত্যে মুখমণ্ডলে কোন ব্যঞ্জনা ছিল না, সেই মণি

নৃত্যই প্রয়োগ ও মিশ্রণ নৈপুণ্যে অপূর্ব্ব প্রাণবন্ত হয়ে নৃত্যনাট্যের সম্পদ হয়ে দাঁড়াল। ভারতীয় নৃত্যনাট্যে সঙ্গীতের যে অভাবের জন্য নৃত্যনাট্যের পূর্ণবিকাশ অসম্ভব ছিল, রবীন্দ্র-সঙ্গীত সে অভাব দূর করলো। নাট্যের চরিত্রের সংলাপ পর্য্যন্ত ভাবে ভাষায় সুরে গীত হয়ে অনুপম আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো। এমন কি অঙ্গরাগ রূপসজ্জা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য-পটাদির স্থলে বিশেষ প্রতীকাত্মক একটিমাত্র স্বস্তিকা চিহ্নই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির অনেকটা প্রকাশ করলো। এ ভাবেই রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত নৃত্য অনবদ্য হয়ে উঠলো। তবুও আমরা অনেকে বলে থাকি যে রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত নৃত্য আর যাই হোক ক্লাসিক নয়। "ক্লাসিক" অর্থে কি বুঝেন তাঁরাই জানেন। তাঁদের মতে, হয়ত আয়াসসাধ্য নৃত্যকল্পের সমষ্টি, এবং ভাবসম্পদহীন একঘেয়ে হস্তকম্প-চালনার ক্রিয়া, এবং ক্লাসিক অঙ্গ হিসাবে নর্ত্তক শিল্পীর সমে আসার প্রয়াসে চক্রদার বোলের শেষাংশে সামর্থ্যের অভাবে বিশ্রী মুখভঙ্গীটুকু পর্য্যন্তও (এ ক্ষেত্রে বলা ভাল আমি শুধু তাঁদের কথাই বলছি যাঁরা একমাত্র কথক নৃত্যকেই ক্লাসিক বলতে চান।)—গণচিত্ত তাতে রসাস্বাদন করুক আর নাই করুক। রবীন্দ্র-নৃত্যের সহজ স্বচ্ছ সাবলীল গতির অপরাধই হয়ত তাঁদের মতে ক্লাসিক হওয়ার অন্তরায় হয়েছে। তাঁরা মস্ত পণ্ডিত কিন্তু রসিক নন এ কথা বলা চলে এবং রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত নৃত্যে গণচিত্ত মুগ্ধ পরিতৃপ্ত হয় এবং তাতে মনের ও চোখের খোরাক উভয়ই আছে—এ কথাও কিন্তু স্বীকার্য্য, তাঁদের মতে রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত নৃত্য ক্লাসিক হউক আর নাই হউক।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শুধু সাময়িক আনন্দ পরিবেশনের জন্যই সৃষ্ট হয়নি। তিনি রস ও আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে শ্লেষ বিদ্রূপের নির্ম্মম আঘাতে দেশের সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি দেশের লোকের চোখের সামনে ধরে তুলেছেন। কারো শুধু "হিং টিং ছট্"-এর মত কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হননি "তাসের দেশে"র মত নৃত্যনাট্যেরও রচনা করেছেন। কৃষ্টি গেল কৃষ্টি গেল বলে কাকে বিদ্রূপ করেছেন দেশবাসী বেশ জানেন—আমার চোখে কিন্তু এখনও ভাসছে হরতনের পাঞ্জা, ইস্কাবনের টেক্কা, রুইতনের গোলামের শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভাবাবেগে, নৃত্যে আনন্দ প্রকাশের প্রচেষ্টা, যা দেখে আমাদের হাস্যোদ্রেক হচ্ছিল। এ বিদ্রূপ কি আমাদের গায়ে লাগে নি, আমরাও তো শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য মনের অজানিতে, সংস্কারাবদ্ধ হওয়ার ফলে, অনেক কিছুই ক'রে থাকি যা সত্যিই হাস্যকর—রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্য রচনার ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতে আমাদের যে হাস্যোদ্রেক করেছেন, যখন ভেবে দেখেছি,—বুঝেছি আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি অহং জ্ঞানই আমাদের হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়েছে—আমরা হয়ত লজ্জিত হয়েছি। দেশবাসীকে ভালবাসতেন বলেই নৃত্যপরিবেশন ছলেও এ শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়েছেন। এখনও হরতনের পাঞ্জা ইস্কাবনের টেক্কা রুইতনের গোলামের সোজা সোজা কাযাকার্য্য অদ্ভূত হস্তপদ চালনা-সৃতি আমাদের হাস্যোদ্রেক করে—এই যে অপূর্ব্ব রূপবন্ধের সৃষ্টি তা কথাকলি কথক প্রভৃতি নৃত্যে মিলবে না—এ ছিল কবিগুরুর মনের গড়া। এ বিশেষ হস্তপদের রূপবন্ধ দ্বারা ঠিক এমন রূপটি বিশুদ্ধ নবযানা নৃত্যের রীতি ব্যঞ্জনায় প্রকাশ সম্ভব হ'ত কি? নৃত্যের সংমিশ্রণ সম্পর্কেও বলা চলে যে কবিগুরুর রসবোধের সূক্ষ্মতার জন্য তাঁর মিশ্রণ আমাদের এত মুগ্ধ করে রাখতো যে কখন কোন নৃত্যরীতির মিশ্রণ কোথায় হ'ল আমরা ভাববার অবকাশই পেতাম না। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে তিনি কাণ্ডী নৃত্যের পরিবেশন করলেন; কিন্তু মণিপুরী কথাকলি পদ্ধতির সঙ্গে এমন স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে গেল, অনেকের চোখেই ধরা পড়ল না। তিনি কিন্তু ঠিক জায়গাতেই মিশ্রণ করলেন। নায়িকার মন যখন বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দকে পাবার জন্যে উন্মুখ, সে সময়ে বশীকরণ মন্ত্রে মায়ের প্রতিশ্রুতিতে সে করলো আনন্দে নৃত্য, তার দেহরেখায় কিন্তু মনের স্বার্থপরতার তামসিক ভাবের ব্যঞ্জনাই ফুটে উঠল, কাণ্ডী নৃত্যের রীতি দেহভঙ্গীতে—উদ্দাম ভাবে। যথাস্থানে এমন প্রয়োগ অন্য দ্বারা সম্ভব হ'ত না। "শাপমোচনে"র নৃত্যের তালভঙ্গের অপরাধে ইন্দ্রের, যক্ষের প্রতি অভিশাপ প্রদানকালীন হস্তের দৃঢ় ব্যঞ্জনাত্মক নির্দ্দেশ থেকে—শেষ অবধি সঙ্গতিপূর্ণ নৃত্যাভিনয় দর্শন কালে আমার জনৈক সম্ভ্রান্ত বন্ধু কোন এক বিদেশীকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিনয়ের মর্ম্মার্থ বুঝিয়ে দেবার সময়ে সেই বিদেশী ভদ্রলোক নাকি বলেছিলেন যে তিনি বাংলা ভাষা না জানলেও গানের এবং অভিনয়ের মর্ম্মার্থ নৃত্যাভিনয়েই সুষ্ঠু অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ক্ষেত্রেই কি বুঝা যায় না, যে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের প্রকাশ প্রয়োগনৈপুণ্যের জন্য আবেদন কত ব্যাপক ছিল? একথা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সমস্ত প্রযোজনা সম্পর্কেও বলা চলে। তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্যই নয়—তাঁর শেখাবার ক্ষমতাও যে কত ছিল, আমাদের অনেকেরই সে ধারণা নেই। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার নৈপুণ্য অনুমিত হবে।—আমার জাপানী বন্ধুবরকে যেদিন বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে নৃত্যাভিনয় করতে দেখলাম, আমার আর বিস্ময়ের অন্ত রইল না।—উৎসুক হয়ে, এত সহজে এমন নৃত্য কি ক'রে এত অল্প সময়ে সে শিখলে, প্রশ্ন করতেই সে ধীর ভাবে বললো—"Gurudev directed me." অথচ কিছু দিন পূর্ব্বেই এই জাপানী বন্ধুটিকেই আমি ভারতীয় নৃত্য শেখাবার চেষ্টায়, তার অত্যধিক পাশ্চাত্য নৃত্যচর্চ্চার ফলে তার দেহে নমনীয়তার অভাব দেখে হতাশ হয়ে ভেবেছিলাম আর যাই হোক ভারতীয় নৃত্য আয়ত্তাধীন তার কোন কালেই হবে না। আশ্চর্য্য হয়ে সেদিন ভেবেছিলাম—গুরুদেব কি অসম্ভব সম্ভব করতে পারেন!

আজ মনে পড়ে বহুদিন পূর্ব্বে যেদিন প্রথম রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে যাই, তিনি স্মিত হাস্যে বললেন বোলপুরে যেও। বোলপুরে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছি। তিনি কি নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত—আমাকে দেখেই তো তিনি নৃত্য-সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন—অনেক কথাই শুনালেন—আমি কিন্তু ভেবে গিয়েছিলাম অনেক কথাই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবো—জিজ্ঞেস করার পূর্ব্বেই তিনি সব বলতে সুরু করলেন; আমি সশ্রদ্ধ ভাবে স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। নানা দেশের নৃত্য প্রসঙ্গেও এমন অনেক কথাই শুনলাম যা হয়ত জীবনে শুনতাম না—যখন ফিরে আসি, ভাবতে লাগলাম তিনি কি সবই জানেন।" তাঁর এত সান্নিধ্য ও আন্তরিকতা উৎসাহ পেয়ে খুশী হলাম।

অনেক দিন পূর্ব্বে মণিপুর হ'তে নৃত্য শেখার পর গেলাম তাঁকে প্রণাম করতে—দেখি সবাই ফিরে আসছে, শুনলাম তিনি অসুস্থ। তবুও গেলাম, দেখা করার অনুমতিও পেলাম। দেখলাম, শান্ত মুখমণ্ডলে একটা ম্লান ছাপ। অবসন্ন দেহ চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে

ব'সে আছেন। আমাকে পেয়েই সোজা হয়ে বসলেন—মিষ্টি হেসে মণিপুর নৃত্যরীতি প্রসঙ্গে অনেক কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞেস করলেন এবং দেহমনের অবসাদ নিয়েও এমন ভাবে আলোচনা শুরু করলেন, আমি অবাক্ হয়ে শুধু ভাবলাম যে নৃত্যকে তিনি কত ভালবাসেন। পরে বললেন, 'এবার তোমার নূতন নাচ দেখবো।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে কলকাতা আসছেন?' শিশুর মত মিষ্টি হেসে বললেন, "আমি—আমি যখন কলকাতায় যাব, ঠিক জানতে পারবে—আমি কোথাও যখনই যাই ঢাক ঢোল পিটিয়েই যাই।" কবিগুরুর একি অপরূপ রূপ! মনে পড়লো ছেলেবেলার কথা—১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। স্কুল ছুটি হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করতে করতে গর্ব্ব ক'রে বাড়ী ফিরলাম, তখন জানতাম না রবীন্দ্রনাথ কি! তার পর রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পেলাম ছবিতে, তাঁর কাব্যে, বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আমার মনে তাঁর অলৌকিক প্রতিভার রেখাপাত করল। তার পর দর্শনে কাব্যে শিল্পে জগতের মনস্বীদের সম্মান শ্রদ্ধা তিনি পেলেন। বুক ভরে উঠল, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে এসে আজ তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। শুধু আমিই নই, ভারতে এমন শিল্পী বোধ হয় কেউ নেই যে তাঁর উৎসাহ, আন্তরিকতা পায় নি। তিনি ছিলেন শিল্পিগুরু, শিল্পিদরদী, শিল্পীর সহায়ক উৎসাহদাতা।

আজ রবীন্দ্রনাথ নেই—শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে তাঁর দান অতুলনীয়। কিন্তু তাঁকে আর আমরা আমাদের মধ্যে পাব না—উপদেশ উৎসাহের জন্ত তাঁর সংস্পর্শে আমরা যেতে পারব না—এ কথা মনে হলেই বুক কেমন ক'রে উঠে—বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না যে ভারতের রবি আজ অস্তমিত!

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

P 11932—"ঘুম ভুলেছি" গেয়েছেন কুমার শচীন দেববর্ম্মণ। N 80124—"পিয়ারে ঘরোয়া নহি" এবং "হায়েরে বিদেশিয়া" গেয়েছেন উৎপলা ও সতীনাথ। এ ছাড়া কথাচিত্রের গান N 76060 এবং N 76059.

কলম্বিয়া

GE 30372—বাণী চিত্রের দু'খানি গান—"আজ দু'জনার দু'টি পথ" এবং "তুমি যে আমার" গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। GE 30373—'অভয়ের বিয়ে' চিত্রে গেয়েছেন গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং GE 30374—"দীপ নেভা রাতে" এবং "কোন্ অচিন মধুকর" গেয়েছেন একই শিল্পী। GE 30379—'চন্দ্রনাথ' চিত্রের দু'খানি গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—"আকাশ পৃথিবী শোনে" এবং "ওই রাজার দুলালী সীতা" এবং GE 30380—"স্মৃতির বাঁশরী কার" এবং "মোর ভীরু সে কৃষ্ণকলি" গেয়েছেন যথাক্রমে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (৩৫)

কাজী অনিরুদ্ধ

শুধুমাত্র গতানুগতিক ভাবে কবিকুলের সংখ্যাবৃদ্ধি করা নয়, তথা বাঙলা সাহিত্যজগতের বুকের উপর সজীব সৃষ্টির একটি অমলিন স্বাক্ষর রেখে যাওয়ার বাসনায় যাঁরা একদিন দেখা দিয়েছিলেন সাহিত্য গগনে, সেই যুগস্রষ্টা কবিদের মধ্যে যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি কাজী নজরুল ইসলামের নাম। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঁধন ছেঁড়ার সাধনযজ্ঞে যখন দেশবাসী আহুতি দিচ্ছে অন্যতম ঋত্বিকরূপেই সেই সময়ে নজরুলের আবির্ভাব বাঙলার কাব্যক্ষেত্রে বিধাতার অপরিসীম আশীর্বাদেরই নামান্তর মাত্র। নজরুলের প্রধান উপাস্য হ'ল মানুষ। বিশেষ করে সর্বহারার সম্প্রদায়—তাদেরই মোহঘুম ভাঙানোর জন্যে সৃষ্টি হ'ল অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, সর্বহারা, ফণীমনসা, দোলন চাঁপা ইত্যাদি। নজরুলের সুযোগ্য পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ। পিতা দেশকে জাগালেন ছন্দে, পুত্র দেশের ঘুম ভাঙাচ্ছেন সুরে। কাব্যের মধ্যে দিয়ে নজরুল ঘরে ঘরে পরিবেশন করেছেন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র। গীতারের মধ্য দিয়ে সমগ্র সঙ্গীতজগতে যুগান্তর আনলেন অনিরুদ্ধ (ভারতবর্ষের গীতার বাদক সুজিত নাথের কৃতী ছাত্র)।

১৩৩৮ সালের ৭ই পৌষ (ডিসেম্বর ১৯৩১) পূজনীয় কবি কাজী নজরুলের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধের বড়দাদা বুলবুল শৈশবে মৃত। মেজদাদা কাজী সব্যসাচীও বহুজনের সুপরিচিত। সঙ্গীতশিল্পী এবং আবৃত্তির উপযোগী একটি সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী (এ তথ্য বেতার শ্রোতৃমণ্ডলীর অজানা নয়)। অনিরুদ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন আদর্শ বাণীমন্দিরে, সপ্তম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করলেন টাউন স্কুলে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল থেকে (১৯৪৬)। আই-এ পাশ করলেন জয়পুরিয়া কলেজের ছাত্ররূপে (১৯৪৮), জয়পুরিয়া থেকেই বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন অনিরুদ্ধ, নির্বাচনী পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে বাধা পড়ল (১৯৫০)।

নজরুল ইসলাম শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সরস্বতীর প্রকৃত উপাসক, শুভ্রজা শুধু বিদ্যারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী নন, সঙ্গীতেরও। দিগ্বিজয়ী কবি ছাড়া দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞরূপেও নজরুলের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বহু ছায়াচিত্রে সুরযোজনা করে, বহু গানে সুর দিয়ে, রেকর্ড কোম্পানীতে সঙ্গীত-শিক্ষকের কার্যভার কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে প্রমাণ করে গেছেন সুরলক্ষ্মীরও তিনি ত্যাজ্যপুত্র নন বরং প্রিয়পুত্রই। নজরুলের সঙ্গীতপ্রীতি পুত্রদের আকৃষ্ট করল। কিশোরকাল থেকেই বাড়ীতে দুই ভাই শুরু করলেন সঙ্গীতচর্চ্চা। বাড়ীতে এই সময়ে একটি গীতারযন্ত্র পাঠিয়ে দিলেন সুখ্যাত অভিনেতা ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস (এঁরই অন্যতম পুত্র বর্তমান বাঙলার এক অপরাজেয় অভিনেতা সত্যেন্দ্রনাথ ওরফে অনুপকুমার) শুরু হ'ল গীতারচর্চ্চা। তা ছাড়া বাল্যকাল থেকেই রেডিওতেও এঁরা গান গাইতেন (তখন নজরুল সম্পূর্ণ সুস্থ)। খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পী শ্রীসুকৃতি সেনের সহায়তায় সুজিত নাথের সংস্পর্শে আসেন কাজী অনিরুদ্ধ। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বেতারে প্রথম অনুষ্ঠান করেন অনিরুদ্ধ

ঐ বছরই প্রথম রেকর্ড করেন, আজ অবধি প্রায় তাঁর ছ'খানি রেকর্ড আছে, সব কটিই সুজিত বাবুর সঙ্গে। বর্তমানে এঁরা গুরু-শিষ্যে "বিভ্রান্ত" ছবিটিতে সুরযোজনা করছেন এবং 'সীমান্তস্বর্গ' ছবিটির আবহ-সঙ্গীত পরিচালনা করছেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে অনিরুদ্ধ স্প্যানীশ গীতার আয়ত্তে এনেছেন।

আজকের দিনে যাঁরা গীতার শিখছেন ও শেখাচ্ছেন, তা ঠিক ধারাসম্মত বা শাস্ত্রসম্মত হচ্ছে কি না প্রশ্ন করায় অনিরুদ্ধ উত্তর দেন—যাঁরা শিখছেন তাঁরা নেওয়ার আগেই দেবার জন্যে উৎসুক আর সেই দেওয়ার মধ্যে আন্তরিকতা নেই, আছে নিজেকে জাহির করার প্রচেষ্টা। যাঁরা শেখাচ্ছেন তাঁদের বিষয়ে এই ক'বছর লক্ষ্য ক'রে যে সিদ্ধান্তে আমি এসেছি তাতে দেখছি যে তাঁরা রীতি বা কৌশলের (টেকনিক) দিকে একটু বেশীমাত্রায় উদাসীন। অনিরুদ্ধ বলেন যে, এই গীতার হাওয়াইয়ান, সুতরাং সেই দেশীয় রীতি অনুসৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমার পরবর্তী প্রশ্ন যে, গীতারে তো অনেক কিছুই বাজানো যায়, সবই কি সিদ্ধ? কবি-পুত্র উত্তর দেন, বাজানো অনেক কিছুই যায়, তবে কি জানেন? এ হচ্ছে শাস্ত্র-সঙ্গীতের যন্ত্র, এখানে মীড়ের প্রয়োজন—এর গতি হবে মৃদু—শান্ত-সমাহিত সুরই পরিবেশিত হবে এতে, সে ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় গৎ বা ইংলিশ জাজ বাজানো যায়, তবে তা শ্রুতিমধুর মোটেই হবে না, তাতে স্বাভাবিকতা থাকবে না, কৃত্রিমতায় হবে ভরপুর। আজ-কাল কাঠের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক গীতার যন্ত্রের প্রচলন সম্বন্ধে অনিরুদ্ধের অভিমত জিজ্ঞাসা করায় উত্তর আসে, এ প্রচেষ্টা কল্যাণকর, কেন না বিদ্যুতের সাহায্যে এর শব্দযন্ত্রের প্রভূত উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। অনিরুদ্ধের ছাত্রদের মধ্যে বটুক নন্দী (ইনি সুজিত নাথের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত) দীপঙ্কর সেনগুপ্ত (সুবিখ্যাত গায়ক সন্তোষ সেনগুপ্তের পুত্র), শ্যামল দেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য)। দীপঙ্কর সম্বন্ধে অনিরুদ্ধ খুব উচ্চ আশা পোষণ করেন, তাঁর মতে দীপঙ্করের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতায় সমুজ্জ্বল।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে নজরুলের সুচিকিৎসার জন্ত তাঁকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কবি ও কবিপত্নীর সঙ্গে গেলেন তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র শিল্পী অনিরুদ্ধ। এই উপলক্ষে ইয়োরোপের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন অনিরুদ্ধ (কেবলমাত্র ফ্রান্স ছাড়া), বিদেশের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারি যে, সকল দেশে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট, রবীন্দ্রনাথের গান তো সেখানে অসাধারণ জনশ্রদ্ধা লাভ করেছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের দেশের হালকা গানগুলি পছন্দ করেন। ভারতীয় গানের সঙ্গে ইতালীয় গানের সাদৃশ্য আছে খুব। ওদের ভাষায় যথেষ্ট মিষ্টতা আছে। অপরাপর দেশগুলি যেমন মিশরকে, ইংল্যাণ্ড সে-রকম মোটেই নয়। বিদেশীর সঙ্গে কেন, নিজেদের মধ্যেও তারা অত্যন্ত কম বাক্য-বিনিময় করে, যেটুকু না হলে নয়।

আগে গীতারের সঙ্গে আনুসঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনিরুদ্ধের মতে এতে গীতার প্রায় অঙ্গহীন হয়ে পড়েছে এবং গীতার-বাদকের পক্ষে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এই অব্যবস্থা এবং যুক্তিহীন প্রথার অবিলম্বে অবসান কাজী অনিরুদ্ধের একান্ত ভাবে কাম্য।

যৌবনের উদ্দাম জোয়ারের প্রমূর্ত উদাহরণ কাজী নজরুল আজ শান্ত, স্তব্ধ, মৌন। অগ্নিবীণার কবি আজ ভাষাহীন। বিশ্বনিয়ন্তার চরণে প্রার্থনা করি, তারুণ্য-বন্দি নজরুলের সুপ্ত জীবন আবার জাগরণের প্রলেপে সঞ্জীবিত হোক এবং পিতা-পুত্রের দ্বৈত অবদানে সংস্কৃতির রত্নভূমি বঙ্গদেশ আবার নতুন করে ভরে উঠুক ছন্দে-সুরে-লালিত্যে।

তীরন্দাজ

নিশীথ মিত্র

ধূসর ধুলোর 'পরে যেখানে হলুদ-ফুল
হঠাৎ শুকিয়ে গেছে, সহসা ধ'রেছে ঘুণ
যে-বৃক্ষের শান্ত-দেহে ; হৃদয়ের মঞ্জুল
আমার নির্জন সাধ পেয়েছে সেখানে তৃণ

অপূর্ব্ব আস্বাদে ভরা সহস্র সোনালী তীর,
কিছু জল আর ফল ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার ;
এ যেন নিটোল আশা সামান্তই প্রবৃত্তির
মদির বাথার মতো অল্প কিছু পুরস্কার।

এ নির্জন কক্ষপথে পৃথিবীকে নিত্য ফুঁড়ে
সব শেষে দিয়ে যাবো কিছু তীর এই ফুঁড়ে।

কি ব্যবসা করা যায় ?

নতুন কোন পণ্য বা শিল্প নিয়ে কাজ-কারবার করতে হ'লে প্রথমেই ভাবতে হবে—সেইটি কি করে বাজারে দ্রুত চালু করা যায়। কেন না, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ক্ষেত্রে বাজার পাওয়ার প্রশ্নই সব চেয়ে বড় কথা। যে পণ্যের বাজার রয়েছে, চাহিদা আছে ব্যাপক, মান বজায় রেখে সরবরাহ করে যেতে পারলে ওতে লোকসানের ভয় তো নেই-ই, পরন্তু এইটি প্রমাণিত হবে শেষ অবধি—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।"

এখন দেখা যাক্—নয়া পণ্যের বাজার পেতে হ'লে কি কি বিষয়ে অবশ্য প্রযত্ন দেওয়া দরকার, সতর্ক হতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে বা অবস্থায়। প্রথমেই একটি বড় প্রশ্ন তুলতে হবে মনের ভেতর—যে জিনিষটি তৈরী হলো এবং যা বাজারে চালু করার দাবী রাখা হচ্ছে—সেইটি চাহিদা মিটাবার সত্যই উপযোগী কি না। জিনিষটির প্রকৃত মান বা গুণগত মূল্যের প্রশ্নই এখানে সরাসরি উঠছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলে অর্থাৎ নিজের উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেই বাজার পাওয়ার প্রশ্নেও বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন যেটি বাজারে নামবার আগেই ভাবতে হবে বিশেষ রকম—সেটি হচ্ছে যে সামগ্রীটি কারখানায় বা অন্য ভাবে তৈরী করা হলো, সেইটির বাজারে চাহিদা কি পরিমাণ হতে পারে। এইটি কি মুষ্টিমেয়ের বিলাস দ্রব্য না সর্ব্বসাধারণের অত্যাবশ্যক কোন জিনিষ? মোটের উপর বাজারে ক্রেতার সংখ্যা যত বেশী করে পাওয়া যাবে, পণ্যের জনপ্রিয়তাও হবে তত ব্যাপক আর জনপ্রিয়তা হওয়া অর্থই অধিক মুনাফা অর্জ্জন ও ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা।

উল্লিখিত প্রশ্ন দুটির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন পাশাপাশি রেখে ভাবা দরকার, নয়া পণ্যের বাজার পাওয়ার প্রশ্নটির সঙ্গে এইটি গভীর ভাবে জড়িত বুঝতে হবে। যে পণ্য নিয়ে কাজ-কারবার করবার উদ্যোগ হচ্ছে, ঝাঁপ দেবার আগেই নজর রাখা চাই প্রতিযোগিতা রয়েছে সেখানে কতখানি এবং কি ধরণের। প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য পেতে হলে (ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য এইটি অবশ্য না হ'লেই নয়) বাজারে চালু পণ্যের চেয়ে নিজস্ব পণ্যের কোন না কোন দিক থেকে উৎকর্ষ থাকতেই হবে। এছাড়া পণ্যটির বাজার-দরটি তুলনামূলক বিচারে সুলভ কি না, এই প্রশ্নটিও একই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে ভেবে দেখবার।

আরও কয়েকটি জরুরী বিষয় ভাবতে হবে, নয়া পণ্যের বাজার যদি সত্যি পেতে চাওয়া হয়। এর মধ্যে একটি বলা যায়, উৎপাদিত পণ্যটি বাইরে থেকে দেখতে বেশ মনোরম হতে হবে—উদ্দেশ্য প্রথম দফাতেই বাজারে ক্রেতাদের সহজ দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বাজার পাওয়ার দাবীতে যে পণ্যটি বার করা হয়েছে, এর একটি ট্রেড মার্কও আগে থেকেই স্থির করে নেওয়া ভাল। এতে সুবিধা হবে এই—সমজাতীয় পণ্য বাজারে আরও যদি বা থাকল, বিশেষ ব্রাণ্ডের জন্য নয়া পণ্যের নাম আপনি চালু হয়ে যাবে। ফলতঃ এই ব্যবস্থা অনুসরণে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও মুনাফা দুই-ই বর্দ্ধিত হয়ে আসবে দিনের পর দিন।

আধুনিক যুগে নয়া পণ্যের বাজার পাওয়া এবং বাজার সম্প্রসারণের একটি মস্ত উপায় ব্যাপক বিজ্ঞাপন বা প্রচারকার্য্য। এই মাধ্যমটি বণিক ও ব্যবসায়ীর পক্ষে এক্ষণে অপরিহার্য্যই বলতে পারা যায়। বিজ্ঞাপন মারফত পণ্য সম্পর্কে আগে থেকেই যদি একটা ভাল ধারণা সৃষ্টি করা যায়, বাজারে পণ্যটি চালুর ব্যাপারে অন্ততঃ আধাআধি নিশ্চিন্ত হতে বোধ হয় আপত্তি নেই। নয়া পণ্য এ ভাবেই বাজার ছেয়ে ফেলতে পারে, শুধু সব সময়ে লক্ষ্য রাখা চাই পণ্যের মান যেন কোন অবস্থাতেই নুয়ে না যায়।

খাদ্যে বিষক্রিয়া নিরোধ ব্যবস্থা

খাদ্যে বিষক্রিয়া বা বিষ, সংক্রমণ নিরোধ করতে হলে কতকগুলো নিয়ম বা ব্যবস্থা অপরিহার্য্য ভাবে পালনীয়। আমাদের চারিদিকে সর্ব্বক্ষণ নানা মারাত্মক রোগের জীবাণু বা জীবাণুবাহী কীটাদি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় যত্নের অভাবে খাদ্য দূষিত বা বিষ সংক্রামিত হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়। সেজন্যই খাদ্যে বিষক্রিয়া নিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকটি সূত্র নির্দ্দেশিত করেছেন স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা :—

খাদ্য প্রস্তুতকালে হয়ত ও আতের খাদ্যগুলো খুব ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে এবং রান্নার বাসনপত্রও হওয়া চাই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মাছি, ইঁদুর, বিড়াল প্রভৃতি যে খাদ্যদ্রব্য যাতে কিছুতেই স্পর্শ করতে না পারে, সেদিকে যথেষ্ট সতর্কতা নিতে হবে। ডিম একেবারে কাঁচা অবস্থায় না খেয়ে একটু সিদ্ধ করে নিলেই ভাল। দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য যতদূর সম্ভব রিফ্রিজেরেটর বা অনুরূপ কোন ঠাণ্ডা আধারে রাখতে হবে—লক্ষ্য করতে হবে কোন জীবাণু যেন ওতে মিশবার সুযোগ না পায়। পূর্ব্বদিনে রান্নাকরা মাল পরদিন খাওয়ার অভ্যাস বর্জ্জন করতে হবে। কারণ, রান্নিকরা বাসি মাংসে জীবাণু সংক্রমণ বা বিষক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে বেশী।

সবচেয়ে নিরাপদ—যে খাদ্য যেদিনে রান্না হবে সেদিনই একটু গরম করে খেয়ে নেওয়া রিফ্রিজেরেটারে রেখে আগের দিনকার রান্না মাংস বা মাংসজাত খাদ্য অবশ্য খাওয়া যেতে পারে।

ফল বা সবজী সিদ্ধ না করে যদি খাওয়া হয়, ধুয়ে নিতে হবে সেগুলোকে খুব ভালরকম। টিন বা পেতলে ভর্তি করা কোন খাদ্য খোলার যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে। মোটের উপর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাই সর্ব্বোপরি প্রয়োজন। প্রতিটি কার্য্যান্তরে সাবান ও গরম জল দিয়ে হাত ধৌত করার অভ্যাস চাই। রান্নার সময় যে তোয়ালে বা গামছা ব্যবহার করা হবে, সেইটি দিয়ে যেন কখনই মুখ, নাক, চোখ, চুল—এ সব স্পর্শ না করা হয়। খাদ্যের উপর কেন, খাদ্যের কাছাকাছি কোথাও কাসি বা হাঁচি চলবে না। রুগ্ন ব্যক্তি, বিশেষ করে যার উদরাময় বা সংক্রামক ব্যাধি রয়েছে, তাদের হাতে রন্ধনকার্য্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রেজর-ব্লেড-শিল্প ও ভারত

ভারতে সেফটি রেজর-ব্লেড-শিল্প গড়ে উঠেছে খুব বেশী দিন নয়। দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানকার অধিবাসীরা ব্লেডের জন্য বাইরের উপরই নির্ভরশীল ছিল সম্পূর্ণ। মাত্র নয় বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৮ সালে প্রথম সেফটি রেজর-ব্লেড নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপিত হয় এবং সেটি বোম্বাই-এ। সুতরাং আলোচ্য ব্লেড-শিল্পটিকে স্বাধীন ভারতের একটি উদ্যম বলে অনায়াসেই স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

বোম্বাই-এ রেজর-ব্লেড কারখানাটি গড়ে উঠতে উঠতে দেখা গেল বছর তিন মধ্যে আরও তিনটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এক্ষণে ব্লেড নির্ম্মাণের জন্য সারা ভারতে চালু রয়েছে পাঁচটি কারখানা। দু'টি বোম্বাই-এ; দু'টি কোলকাতায় এবং অবশিষ্টটি উজ্জয়িনীতে। এ কারখানাগুলোতে বছরে ব্লেড নির্ম্মিত হয়ে চলেছে প্রায় চুয়াল্লিশ কোটি।

দাড়ি কামাবার জন্য আগে ক্ষুরের ব্যবহারই ছিল ব্যাপক, কিন্তু যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিও পাল্টে চলেছে, এইটি লক্ষ্য করবার। আগের তুলনায় এক্ষণে সেফটি রেজরের প্রচলন নিঃসন্দেহে অনেক বেশী। দশ বছর পূর্ব্বেও দেখা যায়, ভারতে বছরে ২০ কোটি থেকে ২৫ কোটি ব্লেডের চাহিদা ছিল। কিন্তু সে স্থলে এখন বছরে এই দেশেই ৪০ কোটি থেকে ৪৫ কোটি রেজর-ব্লেড দরকার হচ্ছে। দিনের পর দিন চাহিদা বেড়েই চলেছে, এবং অনুমান করা হচ্ছে বছর চার কি পাঁচ মধ্যেই ভারতে প্রয়োজন হবে প্রায় ৬০ কোটি ব্লেড।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি রেজর-ব্লেড কারখানায় গড়পড়তা বছরে ব্লেড নির্ম্মিত হতে পারে ৮০ কোটি। অন্ততঃ কারখানা কর্ত্তৃপক্ষগণ তথা নিখিল ভারত রেজর ব্লেড নির্ম্মাতা সমিতি এই দাবী করে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য মেনে নেওয়া হলে এইটি পরিষ্কার যে, ভারতীয় কারখানাগুলিই ভারতের জনগণের ব্লেডের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। একটু আগেই বলা হোল এক্ষণে বছরে অনুমান ৪৪ কোটি ব্লেড তৈরী হচ্ছে এ কারখানা সমূহে।

রেজর-ব্লেড শিল্পের অগ্রগতির দিকে এ যাবৎ সরকারী দৃষ্টি সক্রিয় ভাবে নিবদ্ধ হয়নি। খুব অল্পদিন বিদেশ থেকে ব্লেড আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার মনোযোগী হয়েছেন। আরও দু'টি ব্লেড নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের জন্য লাইসেন্সও মঞ্জুর করা হয়েছে এরই ভেতর। প্রস্তাবিত কারখানা দু'টোর একটি স্থাপিত হবে দিল্লীতে এবং অপরটি উত্তর প্রদেশে। বৎসরে আরও ১০ কোটি ব্লেড যাতে নির্ম্মিত হ'তে পারে, কারখানা দু'টো স্থাপন করা হচ্ছে এ লক্ষ্য ও দাবী নিয়েই।

অবাধ আমদানীর সুযোগ ছিল বলেই এ পর্য্যন্ত ভারতে ব্লেড আমদানী হয়ে এসেছে বিপুল পরিমাণে। একটি হিসাবে দেখা যায় ১৯৫০-৫১ সালে এদেশে ১৮ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বৈদেশিক ব্লেড আমদানী হয়ে আসে। পর বৎসরে আমদানী সবচেয়ে বেশী পরিমিত হয় এবং আমদানীকৃত ঐ ব্লেডের মূল্য ছিল প্রায় ৮৮ লক্ষ্যাধিক টাকা। এক্ষণে বাইরে থেকে আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় দেশীয় ব্লেড-শিল্পের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়েছে, এইটি স্বীকার্য্য। রেজর-ব্লেড নির্ম্মাতা সমিতির একটি দাবী—দেশীয় পাঁচটি কারখানা এক্ষণে চালু আছে এবং আরও যে দু'টো কারখানা নিকট ভবিষ্যতে চালু হবে বলে আশা করা যায়, এ সব কয়টিতে বৎসরে ব্লেড নির্ম্মাণ করা সম্ভব হবে ৯০ কোটি এবং সে ১৯৬০-৬১ সাল মধ্যে। অথচ উক্ত সময় মধ্যে ভারতের নিজস্ব চাহিদা হবার সম্ভাবনা ৬০ কোটি ব্লেডের মত। এই থেকে দেখা যায়, বছর চার মধ্যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও ভারত প্রায় ৩০ কোটি রেজর-ব্লেড রপ্তানী করতে সক্ষম হবে বাইরে এবং এই যাতে তার অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হবে ৬০ লক্ষ থেকে ৯০ লক্ষ টাকা।

এই প্রসঙ্গে একটি জিনিষ বলতে হবে—এত কাল দেশীয় ব্লেড-শিল্পকে বিদেশী ব্লেডের সঙ্গে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। ব্লেডের আসল মূল্য ও মান যেখানে তার ধার—ক্ষুরস্থ ধারা। এই দিক থেকে ভারতীয় ব্লেড পিছিয়ে বলেই বিদেশী ব্লেড ভারতীয় বাজার এতখানি দখল করে রাখে। এক্ষণে সরকারী আমদানী নীতি অনুকূল হওয়ায় দেশীয় ব্লেড একচেটিয়া অধিকার পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে সত্য কিন্তু শিল্পের মান আশানুরূপ উন্নত না হওয়া পর্য্যন্ত এর জনপ্রিয়তা ও সমাদর বিদেশী ব্লেডের মত হয়ে উঠবে না। শুধু সস্তায় জিনিষ দেওয়াই বড় কথা নয়—সরবরাহকৃত জিনিষের কার্য্যকরী মূল্য কতখানি, সেটিই দেখবার। সুতরাং ভারতীয় ব্লেডশিল্প সংস্থাগুলোকে সবদিক বিবেচনা করে এগিয়ে যেতে হবে এবং তাঁদের সঙ্গে আবশ্যক সরকারী সহযোগিতাও না থাকলে নয়। কতকগুলো কাঁচামালের (প্রধানতঃ ষ্টীল ষ্ট্রিপ বা ইস্পাতের ফালি) জন্য ভারতীয় ব্লেড কারখানাগুলো এখনও বিদেশের উপর নির্ভরশীল। এ সকলের আমদানীর সুযোগ যাতে বরাবর থাকে, তৎপ্রতি সরকারী দৃষ্টি ও মনোযোগ অবশ্য থাকা চাই। মোটের উপর এক দিকে সরকারী সহযোগিতা এবং অপর দিকে মান উন্নয়নের জন্য উত্তম ও আগ্রহ যদি থাকে অব্যাহত, তা হলে ভারতীয় ব্লেড-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

নীলকণ্ঠ

বত্রিশ

গানের পৃথিবীতে মাত্র প্রবেশপত্র দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না শ্যামচাঁদ গড়াই। অতি দ্রুত প্রবেশিকা পর্যন্ত হাত ধরে পার করে নিয়ে গেলেন কখন মঞ্জরী নিজেও তা জানে না। এখন তার গাইতে বসে লজ্জা হয় না। ভয় হয় না। মনে হয় না যে সে পারবে না। বরং তার নিজের গলা যে এত মিষ্টি তা যদি সে আগে জানত তাহলে অভিনেত্রী না হয়ে সে গায়িকা হবার পথেই পা বাড়াত, এমন ইচ্ছাও যে তার না হয়, তা নয়। শ্যামচাঁদ প্রত্যহ রাতে আসতে লাগলেন। গানবাজনা শেষ হবার পরও থাকতে লাগলেন। প্রথম-প্রথম মাঝরাত পর্যন্ত। তার পর রাত ভোর হলে তুলে দিতে হোত বাড়ীর গাড়ীতে। মদে মদে বেহুঁশ হয়ে যেতেন সেদিন। গান শেখাবার জন্যে কিছু নিতেন না। গান শেষ হয়ে যাবার পর থাকবার জন্য দিতেন। মঞ্জরী একসময়ে শ্যামচাঁদের বাঁধা রক্ষিতা হয়ে দাঁড়ালো। অসুখী হলো না মঞ্জরী। শ্যামচাঁদ সুর নিয়ে সারাজীবন নাড়াচাড়া করলেও অসুরের শক্তি ধরতেন সেদিন শরীরে।

কালো শেরোয়ানি; সাদা চুড়িদার পায়জামা; মাথায় কাজকরা লক্ষ্ণৌ-এর টুপি। ইয়া বড় গোঁফে মৃগনাভির মত মাতালকরা আতর লাগানো। চোখ দুটো বড়ো বড়ো। একটু ভুঁড়ি হলেও দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেমানান ন'ন সেদিন শ্যামচাঁদ। হাসিতে খুসীতে জবরদস্তিতে নওজোয়ানের মতই প্রাণবন্ত পুরুষ শ্যামচাঁদ গড়াই। অর্থে কুবের; সামর্থ্যে দানব। পানে এবং ভোজনে বেপরোয়া। দেওয়া-থোয়ায় দরাজ। ফুটন্ত জলের মত; রেসের ঘোড়ার মত; রাবণের ঔদ্ধত্যের মত টগবগ করছে সর্বদাই।

কাল আসব বলে যাবার পর সেদিন কিন্তু আসেননি শ্যামচাঁদ গড়াই। তার বদলে সেদিন এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। শুধু আসেননি, এসে বলেছিলেন: মঞ্জরী একে খবরদার কিছুতে না বোলো না। যে জীবন এবং জীবিকা তুমি এখন নিতে চলেছ সেখানে শ্যামচাঁদ বাবুর সাহায্য ছাড়া সাফল্য অসম্ভব। তাছাড়া মানুষটি খুব খারাপ নয়। তুমি ঠকবে না।

মঞ্জরী কিছু বলেনি। কিন্তু বুঝেছিল সব। শ্রীকৃষ্ণ যেটুকু বলতে চাইছেন সে তো বটেই, যা বলতে চাইছেন না তা-ও। কিন্তু মঞ্জরী যখন এর জবাবে কি বলবে অথবা কি বলবে না ভাবছে, সেই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকলো মঞ্জরীর মা। মঞ্জরী প্রমাদ গুণলো। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। মঞ্জরীর মা'র কথা শুনেছেন; চোখে দেখেননি এর আগে। মঞ্জরী এবং শ্রীকৃষ্ণ কথা না বললেও মঞ্জরীর মা সোনাবালা এসেই শুরু করল: বাইশকোপ বাইশকোপ করে মেয়ে যে পাগল হয়ে গেল,—ব্যবসায় মন নেই,—পেট চলবে কি করে বাবা?

মঞ্জরী লজ্জায় মরে গেলো। সে যে পতিতার মেয়ে, এবং নিজে পতিতা,—এই অত্যন্ত সত্য কথায় যে তার লজ্জার কিছু নেই, ভয় পাওয়ার আছে, তা মনে না হয়ে বরং মনে হলো, ধরণী দ্বিধা হও। মাকে সে কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণ দত্তর সামনে আসতে দিত না। মঞ্জরীর মা বহুদিন চেয়েছে ব্যাপারটা বুঝতে। বাইশকোপে কত টাকা পাওয়া যায়! বাইশকোপ করেও ব্যবসা রাখতে দোষ কি। বাইশকোপে গিয়ে যদি দু-কূলই যায়?

মঞ্জরীর সেই এক জবাব ও-সব তুমি বুঝবে না মা,—এখন থেকেই অত ভয়ের কি আছে? কালই হাঁড়ি চড়বে না,—এমন হাল তো নেই! শুনে সোনাবালা সাংঘাতিক ক্ষিপ্ত হয়েছে। ভুলে গেছে মঞ্জরী তার পেটের মেয়ে। যা নয় তাই বলে, মুখ খারাপ করেছে, সেই ভাষায় যে একমাত্র ভাষা পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশেষ পল্লীর লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা। একসময়ে মঞ্জরীও উঠে গেছে কিন্তু তাতেও অসুবিধা হয় নি সোনাবালার একা একাই গজরাতে: শোন কথা একবার ছুঁড়ির। কাল হাঁড়ি চড়বে, তা জানি কিন্তু পরশু? তার কথা ভাবতে হবে না আজ? আর বাইশকোপ করবি বাইশকোপ কর,—তা বলে জাতব্যবসা ছাড়বি কেন? এই যে লোকগুলো ভদ্দরনোকের ছেলেগুলো রোজ এসে এসে দরজা থেকে ফিরে যাচ্ছে, বলি এরা আর আসবে? কথা তুললেই তো বলিস, ওসব তুমি বুঝবে না মা,—আমি বুঝবো না,—তুই বুঝবি? আমার পেটে তুই না তোর পেট থেকে আমি? বুঝবি, বুঝবি,—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে কি হয় তুই বুঝবি!

আজও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করল সোনাবালা, শ্রীকৃষ্ণ দত্তের কাছে। বললো: আপনি বলো বাবা ভালো মানুষের ছেলে, ওই তো চেহারার ছিরি, গানও শেখেনি, ও বাইশকোপ করে এমন কি গাড়ী ঘোড়া হবে শুনি? আর তাও না হয় সখ হয়েছে দু'দিন করগে যা,—তাই বলে জাত-ব্যবসা তুলে দিয়ে যেতে হবে? তুমি বলো বাবা,—আমি কি অন্যায় কথা বলছি?

মঞ্জরী মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হলো শ্রীকৃষ্ণ দত্তর উপস্থিতি। চীৎকার করে উঠল; ধাক্কা দিলো মাকে; তারপর এক সময়ে কাঁদতে লাগলো: মা, তুমি এখান থেকে যাবে না আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব আজ রাতে? সোনাবালা শেষ পর্যন্ত উঠে যায় বলতে-বলতে:

তুই দিবি কেন ? আমি গলায় দড়ি দেবো ; বিষ খাবো ; বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যাবো,—দেখে নিস।

সোনাবালা উঠে যাওয়ার একটু পরে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত বললেন : কি ব্যাপার, তুমি হঠাৎ ক্ষেপে গেলে কেন ?

মঞ্জরী : কেন যাব না বলতে পারেন ?

শ্রীকৃষ্ণ : তোমার মা তো কিছু অন্যায় বলে নি, সত্যিই তো ফিল্মে যদি তোমার কিছু না হয় তখন ?

মঞ্জরী : যদি-র কথা উঠছে না আর। আমার ফিল্মে হতেই হবে—

শ্রীকৃষ্ণ দত্ত তাকালেন মঞ্জরীর দিকে। মঞ্জরীর চোখ সোজা চেয়ে রইলো শ্রীকৃষ্ণ দত্তর চোখে। শ্রীকৃষ্ণ দত্তর চোখ এখন যাকে অবলোকন করছে সে কোনও মেয়ে নয় ; সে একটি প্রতিজ্ঞা। আগুনের শিখার মত পাতালের অতল থেকে সে তার বাহু মেলে দিয়েছে আকাশের ঊর্দ্ধে। স্বর্গ তার হাতের মুঠোয়। পৃথিবী তার পায়ের তলায়। শ্রীকৃষ্ণ দত্তর ধ্রুব প্রত্যয় হলো, এ পারবে। শুধু পারবে নয়, তিনি যতখানি পারবে বলে আশা করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী দূর যেতে পারবে।

ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হলেন শ্রীকৃষ্ণ মঞ্জরীর বাড়ী থেকে।

ঠিক তার পরের দিন থেকে পাকাপাকি ভাবে গান শেখাতে এলেন শ্যামচাঁদ গড়াই। শেখাতে এলেন কিন্তু সেদিন গান শেখালেন না, শোনালেন। সঙ্গে ছোকরা সাকরেদ দু'জন। তারা গাইলো। শ্যামচাঁদ তবলা সঙ্গত করলেন। তারপর একা তবলা বাজালেন। তারপর হারমনিয়ামে সা-রে-গা-মা বাজিয়ে শোনালেন। রাত এগারোটায় সাকরেদরা চলে গেল, কিন্তু শ্যামচাঁদ গেলেন না। মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মঞ্জরী উঠে গেল এক মিনিটের জন্যে। তারপর ফিরে এলো তাকিয়া নিয়ে আরো দুটো। শ্যামচাঁদ বারান্দায় গিয়ে ড্রাইভারকে ডাকলেন : মহম্মদ ! মহম্মদ এলো টিফিন কেরিয়ার নিয়ে। তার সঙ্গে খবর কাগজে মোড়া কি নিয়ে যেন। খবর কাগজ না খুলতেই মঞ্জরী বুঝলো। মদের বোতল। টিফিন কেরিয়ার থেকে বেরুলো মোগলাই খানা। চারজনের পক্ষেও অতিরিক্ত। শ্যামচাঁদ খাবার পরে সরে এলেন মঞ্জরীর কাছে। মঞ্জরীর নাকে এসে লাগলো মদের আর আতরের মিশ্রিত সুবাস। রাত বারোটা।

শ্যামচাঁদ গড়াই নতুন করে গড়ে দিলেন মঞ্জরীকে। শাড়ী-বাড়ী-গয়না পালটে দিলেন সব। নতুন শাড়ীতে জড়িয়ে, নতুন গয়নায় মুড়ে নতুন পাড়ায় নতুন বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। ফার্নিচার থেকে আরম্ভ করে সব নতুন। মার মঞ্জরীর বাড়ীতে পাপোষ পর্যন্ত এই প্রথম পা দিল শ্যামচাঁদের সখের অনুগ্রহে। দেওয়ালে দেখা দিলো বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি। ফুলদানীতে ফুল। স্নানের ঘরে বাথটাব। হাতে লেডিস রিষ্টওয়াচ। শ্যামচাঁদ গড়াই নিরস্ত করলেন সোনাবালাকে আর কিছু বলার সুযোগ থেকে ; মঞ্জরীকে
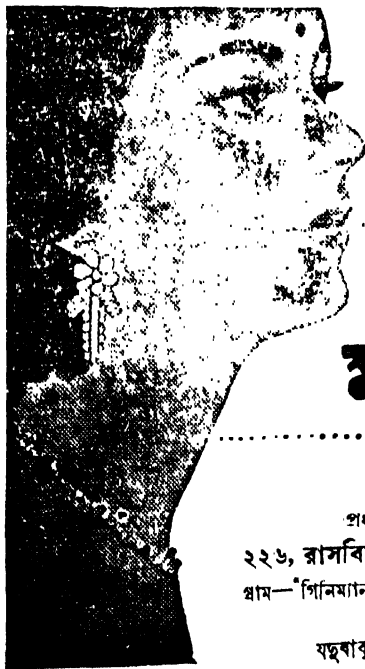
মুক্তি দিলেন অভিনয়ের জন্ম পূর্ণ প্রস্তুতির, কাঁকে কাঁকে অবশ্যম্ভাবী অজানের চেহারা দেখে আঁতকে ওঠার আতঙ্ক থেকে ; আর নিজেকে ছেড়ে দিলেন কিছুকালের মতো একজনের হাতে, সে-একজন তাঁরই আরেকজন হতে চলেছে ; যে একজন মেয়েমানুষ থেকে মেয়েতে নবজন্ম নেবার প্রতীক্ষায় অস্থির।

শ্যামচাদকে না জানিয়ে আরও একটি কাজ করলো মঞ্জরী। একজন মহিলাকে নিযুক্ত করলো ; সকাল বেলায় রোজ ছ'ঘণ্টা করে পড়িয়ে যাবেন বলে রাজী হলেন মুক্তিদেবী চট্টোরাজ। টাকার প্রশ্নে ভয় ছিলো না মঞ্জরীর, ভয় ছিলো মঞ্জরীর মত পরিচয় যার তাকে পড়াতে রাজী হবেন কি না মুক্তিদেবী। রাজী হলেন ; শুধু রাজী নয় ; সানন্দ সম্মতি দান করলেন। ছ'ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা হয়ে যায় কোনও কোনও দিন। ভ্রূক্ষেপ নেই। পড়াশোনা শেষ পর্যন্ত ছুঁতো হয়ে দাঁড়ালো। গল্প-গান-হাসি-ঠাট্টা। মঞ্জরী আর মুক্তিদেবী যেন ছ' পৃথিবীর ছ'জন নন ; নন ছাত্রী আর মাষ্টারণী ; ছজন যেন বন্ধু। তেমনই বন্ধু যেমন বন্ধুর কাছে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেও সব কথা বলায় কোথাও আটকায় না মঞ্জরীর। নিজেকে হাল্কা করে ; উজাড় করে দেয় নিজের যত চাপা কান্না। ব্যথা আর স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্নভঙ্গের, আশা আর ব্যর্থতার, আনন্দের আর ধিক্কারের ঢাকনা খুলে সামনে এসে দাঁড়ায় মঞ্জরী সেই মন নিয়ে যে মন নিরাভরণ ; নিরাবরণ। মুক্তিদেবী চট্টোরাজের চোখের সামনে পাঁকের ওপর পদ্ম তার বিস্ময়ের পাঁপড়ি মেলতে থাকে ; একটির পর একটি।

বিস্ময়ে স্তব্ধবাক হন মুক্তিদেবী চট্টোরাজ। কিছু দিতে এসেছিলেন মঞ্জরীকে ; তার পরিবর্তে যা নিয়ে যান অর্থ দিয়ে তার পরিমাপ হয় না। কোনও কষ্টিপাথরে যাচাই হয় না তার দাম। কোনও শাস্ত্র, কোনও বিজ্ঞায় কূল পাওয়া যায় না সেই রহস্যের।

শ্যামচাদ গড়াই প্রায় রোজ আসেন ; কিন্তু রোজই আসেন একথা বলা যায় না। কারণ ছ'-একদিন তাঁর আসায় বাদ পড়ে যে,—সে-ও প্রায় প্রতি সপ্তাহেই। সে ছ'-একদিন শ্যামচাদ বাঁধা নয় অন্ত কোথাও ; মঞ্জরীই বাঁধা সে ক'দিন। শুটিং শেষ করার পর বাড়ী ফিরবার গাড়ীতে পা দেবার আগে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সেদিন নাকে রুমাল চাপা দিয়ে, মঞ্জরীর পিঠে হাত রেখে বলেন : শ্যামবাবুকে বলো কাল যাব আমি তোমার ওখানে,—তার পরের দিন শ্যামচাদ আসেন না। দেখে রাগ হয় মঞ্জরীর। অর্থে এবং সামর্থ্যে অটুট শ্যামচাদ গড়াইও কেন যে মেনে নেন শ্রীকৃষ্ণ দত্তর মত না-দানব না-দেবতা এমন একটা কাপুরুষকে টুঁ শব্দ না করে, কেন যে নিজের জোর খাটান না মঞ্জরীর ব্যাপারেও, ভেবে রাগ হয় মঞ্জরীর। মঞ্জরীর নিজের না-হয় শ্রীকৃষ্ণকে 'না'-বলবার উপায় নেই। কিন্তু শ্যামচাদের ? তার কিসের ভয় ? কা'কে ভয় ? শ্রীকৃষ্ণ দত্তর চেয়ে সারা ভারতে নিজের ক্ষেত্রে শ্যামচাদের প্রতিষ্ঠা একটুকু কম নয় ? তবে ?

রাগ হয় মঞ্জরীর এক নয়, একাধিক কারণে। মজা দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ভয়ঙ্কর রাগ হয় মঞ্জরীর। ছ'টি হরিণকে একজন হরিণীর জন্তে লড়তে দেখলে আজও তার রক্তে বান ডাকে। পিছনে ফেলে এসেছে যে পঙ্কিল অতীত তার শিকড়ে শিকড়ে টান পড়ে। জানান দেয় সে মরে নি ; মৃতপ্রায় তবু কবর হয় নি আজও তার। শ্যামচাদ আর শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে একই দিনে তার কাছে এলে আজও মনের মধ্যে উঁকি মারে সেই ছুজনকে নিয়ে খেলা করার কৌতুক। কার মুখের চেহারা কেমন হয় দেখতে ভারী ইচ্ছে করে তার। আর সেই ইচ্ছেকে টুঁটি টিপে মারতে দেখে শ্যামচাদের ওপর ভীষণ রাগ হয় তার। কিন্তু মুখে কিছু বলে না মঞ্জরী।

মুখে কিছু বলে না বলেই মনে-মনে গরজায় মঞ্জরী। আরও এক কারণে রাগ হয় তার। জ্বালা ধরে সর্বাঙ্গে। শ্যামচাদ গড়াইকে মঞ্জরী বুঝতে পারে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দত্তকে নয়। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত দেবতা, না-দানব, পুরুষ না কাপুরুষ, কিছুরই হদিস পায় না মঞ্জরী। শ্যামচাদ আসে ; গান গায় ; গানের পর আর যা চায় তার মধ্যে অস্পষ্ট কিছু নেই। ধোঁকা নেই। ছলনা নেই। কাব্য নেই। স্পষ্ট ; সোজা ; সত্য। পুরুষ চিরকাল রমণীর কাছে যা চায়, যার জন্ম সে শাড়ী-বাড়ী-গহনা দিয়ে সাজিয়ে দেয় ঘর, তার চেয়ে এক নয়া পয়সাও বেশী চায় না শ্যামচাদ। কথা বলে কম। ন্যাকামী করেই না। কাব্য করে গুলোয় না গা। যেমন ক্ষিদে শ্যামচাদের, তেমনি খেতেও পারে সে। দিবালোকের মত ; জন্মযন্ত্রণার মত ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চিরকালের জন্তে থেমে যাওয়ার মতো শ্যামচাদ গড়াইর উপস্থিতি অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য, অপরিহার্য। শ্যামচাদের সঙ্গে মঞ্জরীর সম্পর্ক তাই নশ্বর হয়েও সত্য। এবং পুরুষ ও রমণীর এই সম্পর্কই সব কথা, সব কবিতার পরেও এই শুধু শাশ্বত।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দত্তকে বোঝা যে কোনও মেয়ের পক্ষে তো বটেই, মঞ্জরীর মত পুরুষানুক্রমে 'মেয়েমানুষের' পক্ষেও রীতিমত শক্ত। মঞ্জরীর কাছে তিনি যে কি চান মঞ্জরী তো জানেই না। মঞ্জরীর সন্দেহ শ্রীকৃষ্ণর নিজেরও তা অনেকটা অজানা। মদ স্পর্শ করেন না। সাদা চোখে আসেন ; চোখের নীচেটা আরো খানিকটা কালো করে ফেরত যান। কথা বলেন অনর্গল নাকে রুমাল চাপা দিয়ে। সে-সব কথা আগাগোড়া অসংলগ্ন ; উল্টোপাল্টা ; বিসদৃশ। এই মুহূর্তেই হয়ত নীতিসুধামালা আওড়াচ্ছেন ; পরের মুহূর্তেই হয়ত এমন কথা বলছেন, এমন অসঙ্গত, অশোভন, অশালীন উক্তি করছেন যা এই বিশেষ পল্লীতেও কেউ পানোমত্ত না হলে কদাচ উচ্চারণ করতে সাহস করে। অনেক রকম অসঙ্গত ব্যবহার করতে হয় পুরুষমানুষকে। জীবনভোর দেখেছে মঞ্জরী। একটুকু আশ্চর্য হয় না সে তাতে আর। একটুকু বিস্ময়ের সঞ্চার হয় না সেজন্তে। এতেই সে অভ্যস্ত। এই তার নিয়তি, কর্মফল, অথবা জন্মভোগ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দত্তর ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করবার ক্ষীণতম কোনও কারণ ঘটে নি কোনও দিন। বরং, আরেকটু পুরুষোচিত বর্বরতা দেখতে পেলে শ্রীকৃষ্ণর মধ্যে, স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারতো মঞ্জরী। আশ্বস্ত হত।

কিন্তু অস্বাভাবিক আচরণ শ্রীকৃষ্ণ দত্তর। তাতেই ভয় হয় মঞ্জরীর। তাতেই অস্বস্তি। কোন্ একটা বাংলা বইতে সে পড়েছে যে মদ খেয়ে যারা পতিতালয়ে যায় তাদের তবু ক্ষমা আছে, কিন্তু মদ না খেয়েও যারা যায় তাদের আর কোনও উপায় নেই। তারাই ভয়ঙ্কর। মঞ্জরী নিজেও জানে, এখানে যারা আসে তারা

পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় আসে। তারা প্রায়ই বিবাহিত। সংসারী। হয়ত সুখীও। সংসারে সুখী সেই লোকটি এখানে আসে না। সেই সুখী লোকটির মধ্যে যে অসুখী, উন্মত্ত পশুর বিচরণ সে-ই আসে এখানে। কিন্তু সাদা চোখে দিনের আলোয় আসতে আজও সে লজ্জা পায়। সে আসে রাতের অন্ধকারে নেশায় বুঁদ হয়ে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দত্ত আসেন কেন? মানুষের ভিতরকার যে আদিম বন্য পশু, শিকার দেখলে তার আজও তো ঝাঁপিয়ে পড়বার কথা। ঝাঁপিয়ে পড়া দূরে থাক এতটুকু চাঞ্চল্য পর্যন্ত দেখেনি কোনও দিন শ্রীকৃষ্ণর মধ্যে মঞ্জরী। সবটুকু উত্তাপ নিঃশেষিত হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টার কুৎসিত আলাপে, কদর্য কৌতূহলে; বিকৃত প্রশ্নোত্তরে।

মঞ্জরী মূর্খ। কিন্তু মঞ্জরী মেয়েমানুষ। তাই সে এরও উত্তর পায়। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তাই তার করুণা হয়। মনে দুরন্ত ক্ষুধা, আর বাইরে অফুরন্ত লজ্জা, এরই লড়াইয়ে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত এই অসহায় লোকগুলো চিরকাল মেয়েমানুষদের সমস্যা। এরা আসে যার তাড়নায়, এখানে এসে আবার সেই তাড়নার কারণে বিবেক দংশনের জ্বালা অনুভব করে অন্যান্ত বেশী।

দৈহিক ক্ষমতা নিঃশেষিতপ্রায় অথচ অপরিমিত লালসায় পর্যুদস্ত শ্রীকৃষ্ণ দত্ত, স্পষ্ট বুঝতে পারে মঞ্জরী। দৈহিক সুখের জন্ম যত না এখানে আসেন, তার চেয়ে অনেক বেশী আসতে বাধ্য হন মনের অসুখের তাড়নায়।

কিন্তু না শ্যামচাঁদ গড়াইয়ের কাছে, না শ্রীকৃষ্ণ দত্তর কাছে নিজের ভেতরের আসল যে মানুষটা তাকে মেলে ধরতে পারে মঞ্জরী। দু'জনের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্বার্থের। যার কাছে মঞ্জরীর সবচেয়ে বেশী নিঃসঙ্কোচে আবরণ উন্মোচিত করার কথা, সেই সোনাবালার সঙ্গে মঞ্জরীর মনের অমিল অসম্ভব; ব্যবধান দুস্তর। মঞ্জরী নিজেকে মেলে ধরে তাই যিনি তাকে পড়াতে আসেন সেই একমাত্র জন মুক্তিদেবী চট্টোরাজের কাছে। মুক্তিদেবী আসেন মঞ্জরীকে পড়াতে; মঞ্জরী এসে বসে মুক্তিদেবীর কাছে পড়তে। কিন্তু প্রায় কোনও দিনই না হয় পড়ানো, না পড়া। তার বদলে গল্প-গান-হাসি-কথা। মাষ্টারণী-ছাত্রী নয়; দুই সখী।

বিস্ময় মুক্তিদেবীকে দেখে মঞ্জরীর নয়। মঞ্জরীকে দেখতে দেখতে বিস্ময়ের শেষ নেই মুক্তির। শেখাতে এসেছিলেন না শিখতে এসেছিলেন মঞ্জরীর কাছে মুক্তিকে জিজ্ঞেস করলে সহসা এর সদুত্তর দিতে সময় নেবেন তিনিও। উত্তর দিতে পারলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই হবে যে পাঠ্য-পুস্তকের বুলি তোতাপাখীর মত মঞ্জরীকে গেলাতে এসে তিনি এমন একজনের কাছে এসেছেন যার কাছে না এলে জীবনের পাঠ রইত অসম্পূর্ণ। মঞ্জরী সত্যিই বিস্ময়। সমাজ-জীবনের অতলান্ত অন্ধকার থেকে একটির পর একটি ধাপ উঠে আসছে মঞ্জরী। যে কোনও ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের চেয়েও পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে যার প্রতিটি পদক্ষেপ অনেক বেশী করছে কৌতূহলের সঞ্চার।

ফুটপাথ থেকে প্রাসাদে পদার্পণ করলে কোনও ব্যক্তি তার নামে

হয় রাস্তা ; সাধারণ সৈনিকের ব্যারাকে লোহার খাটিয়ায় শুয়ে হাড়ের চেয়েও শক্ত পাঁউরুটির কড়া চিবুতে চিবুতে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখা যার জীবনে ভাগ্যের কৃপায় হয় সত্য,—'সে' হয় ইতিহাস। মূর্খ চাষার ছেলে যেদিন বিলাত যায় উচ্চতর শিক্ষার একমাত্র প্রমাণ ডিগ্রীর জন্ম, সেদিন তার ছবি ছাপা হয় খবর-কাগজে ; লোটা-কম্বল সম্বল করে যে মাড়োয়ার-তনয় বিদেশ-বিভুঁয়ে বাজে কাগজের বাণ্ডিল ফিরি করতে করতে ফাটকার অকল্যাণ ঘোরায় দুর্ভাগ্যের চাকা সে হয় একদিন শিল্পপতি,—কিন্তু মুক্তিদেবী চট্টোরাজ জানেন মঞ্জরী কোনও দিন হবে না প্রাতঃস্মরণীয়া।

কিন্তু মঞ্জরী কি এদের কারুর চেয়ে কম? তার উত্তরণ কি কম চমকপ্রদ? তার চেয়ে বড় মেটিরিয়ল, তার চেয়ে বড় স্কিম নিয়ে মানবজীবনের রচয়িতা কি দুবার নাড়াচাড়া করেছেন? মঞ্জরী শুধু একজন অখ্যাত অবজ্ঞাত অভিনেত্রী থেকে অবিস্মরণীয় শিল্পীর মধ্যে নবজন্ম নিতে চলেছে,—এইমাত্র সত্য হলে মুক্তিদেবীর কাছে মঞ্জরী হত ওয়াণ্ডার মাত্র। তাজমহল যেমন পরমাশ্চর্যের একটি ; কিন্তু ডিউক অফ উইণ্ডসর কেবলমাত্র ওয়াণ্ডার নয়। মানবেতিহাসের চরম বিস্ময়! সাহিত্যের ইতিবৃত্তে যেমন গল্পে যত বড় আর যত মহৎ সৃষ্টিই হোক তা' ওয়াণ্ডার, কিন্তু কবিতা হচ্ছে চিরকালের বিস্ময়! এভারেষ্ট-বিজয় হচ্ছে মানব-বিক্রমের পরম অধ্যায়—চরম ওয়াণ্ডার ; কিন্তু হিমালয় আজও জীবন-অভিযাত্রীদের অপার বিস্ময়!

এমনই একটি বিস্ময় মঞ্জরী! তার সাফল্যের ইতিহাস হচ্ছে ওয়াণ্ডার,—কিন্তু তার মধ্যে থেকে যে নতুন মানুষ জন্ম নিচ্ছে, সেই সৃষ্টির বেদনা হচ্ছে মুক্তির নয় শুধু, সকল মানুষের বিস্ময়। তারই কাছে হার মানেন মুক্তিদেবী রোজ ; তারই কাছে নত হন তিনি। প্রণত!

যে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত আসেন মঞ্জরীর বাড়ী নিশীথ-মৃগয়ায় এবং শিকারকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও শিকার করতে না পারার ব্যর্থ ধিক্কারে আত্মদহনে জ্বলে-পুড়ে ফিরে যান আর যে শ্রীকৃষ্ণ দত্তকে ষ্টুডিওর ফ্লোরে দেখতে পায় মঞ্জরী—এরা দু'জন এক হয়েও এক নয়। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সমস্ত আত্মগ্লানি বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তিত্বের প্রাণমূর্তি হয়ে এসে দাঁড়ান। প্রতিদিনের জীবন-যাপনের ক্লান্তির আর প্রাণধারণের গতানুগতিকতার খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে শিল্পী। আত্মসমাহিত ; ধ্যানী ; সিদ্ধ। কাদার পুতুল দেখা দেয় প্রতিমা হয়ে। একই লোক যে রাতে অতি নিম্নস্তরের রূপোপজীবিনীর ঘরে ক্লেদাক্ত পরিবেশ বিকৃত কামনার যূপকাষ্ঠে মাথা গলায়—সেই লোকই দিনের বেলায় কেমন করে হয়ে ওঠে কর্মের আর ধর্মের ; সৃষ্টির মর্মের, শিল্পের প্রাণধর্মের দেবতা,—মঞ্জরী তা জানে না। জানতে চায়ও না। শুধু জানাতে চায়—এমনই কোনও স্পর্শে যেন অহল্যার পাষাণে হয় প্রাণসঞ্চার ; পাঁকে ফুটে ওঠে পদ্ম। বাঁশের বুক চিরে যেমন বাজে সৃষ্টির বেণু।

ওল্ড থিয়েটারের ফ্লোরে শ্রীকৃষ্ণ দত্তর পায়ের আওয়াজে শশব্যস্ত হয় সব ক'টা লোক। এক্‌ষ্ট্রার ঘাগী থেকে নতুন মুখ পর্যন্ত তটস্থ হয় সবাই। হেড মাষ্টার ক্লাসে ঢুকলে যেমন হয় ছাত্ররা। কিন্তু বেত হাতে নয়, খালি হাতেই ঢোকেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। শুধু খালি হাতে নয়, কখনও গলার স্বরকে পর্যন্ত একটুকু উচ্চগ্রামে তোলেন না শ্রীকৃষ্ণ। তোলার প্রয়োজন পর্যন্ত হয় না। কি কুহক আছে চোখে, কি ব্যক্তিত্ব আছে অতি মৃদু বাচনভঙ্গীতে, ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে, কি যাদু আছে 'শ্রীকৃষ্ণ দত্ত' এই নামে কে জানে! হাওয়া থেমে যায়, হাসি বন্ধ হয়, নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত

শোনা যায়, সেই মরুভূমির মত নিস্তব্ধতায়। চোখের ওপরই দেখলো একদিন মঞ্জরী,—তন্দ্রাবতী, যার নামে লাল পড়ত সেদিন চিত্রাপিপাসুদের মুখ থেকে সেই তন্দ্রাবতীকে দুবার ঠিক মত তার অভিনয় না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজে সেই পার্ট প্লে করে দেখাচ্ছিলেন তখন সে হেসে ফেলতেই, ষ্টুডিও সুদ্ধ লোকের সামনে ঠাস করে চড় মারলেন শ্রীকৃষ্ণ। একটি টুঁ শব্দ করলো না, তরুণ-তরুণীর হৃদয়স্পন্দন বাড়ে যার নাম শুনলে সেই তন্দ্রাবতী দেবী। শুধু গ্লিসারিণ ছাড়াই হরিণ-চোখ বেয়ে অঝোর শ্রাবণ নামলো, রং-মাখা-করা দু'গাল বেয়ে!

আর। আরেক দিনের কথা কখনও ভুলতে পারে নি মঞ্জরী। আজও না। স্যুটিং প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,—আর একটা শট বাকী। এমন সময় ডেকে নিয়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এক নিদারুণ দুঃসম্বাদ দিলেন মঞ্জরীকে। সোনাবালা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন: মঞ্জরী, অবশ্য চলে যেতে পারে এখুনি,—চলে যাওয়াই উচিত,—তবে—। এই 'তবে'র মানে মঞ্জরী জানে। সে বলল তাই! না, স্যুটিং শেষ করেই যাবো।

বলল যে সে-ই মঞ্জরী আর নিজের মধ্যে নেই। হঠাৎ তার কাছে সব শূন্য হয়ে এলো। মিথ্যে মনে হলো প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, অর্থ। মেকী। মেকী! ভীষণ মেকী। কি প্রয়োজন ছিলো এর। তার চেয়ে জাত-ব্যবসাকে বজায় রেখে সোনাবালাকে নিয়ে সুখে ঘর করতে পারলে যেন সে শান্ত হতে পারত।

স্যুটিং শেষ হলো। মঞ্জরী দৌড়চ্ছে বাড়ী যাবে বলে। বাধা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ: অত অস্থির হবার কিছু নেই। হাসছেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। মঞ্জরী হতভম্ব। দরকার নেই কি?

না। সত্যই দরকার ছিলো না। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত নিজেই বললেন: তোমাকে মিথ্যে করে বলেছিলাম, মায়ের অসুখ। সোনাবালার কিসসু হয় নি। ভালোই আছে। তুমি নিশ্চিন্তে ঘরে যাও। আমার কাজ হয়ে গেছে। আজ অনসূয়ার রোলে এই মুডটারই দরকার ছিলো। কিছুতেই তুমি দুঃখের সেই বিমোহন মুড আনতে পারছিলে না। তাই তোমার ভালোর জন্যেই, মিথ্যে করে মায়ের অসুখের কথা বলতে হয়েছিল। আশা করি, মঞ্জরী তুমি মনে কিছু কর নেই? 'নি'-কে 'নেই'-করে বলা শ্রীকৃষ্ণ দত্তর অন্যতম মুদ্রাদোষ। 'করনি'-কে তিনি বলেন, 'কর নেই'। [ক্রমশঃ।

আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের কারও কারও বদ্ধমূল ধারণা আছে, লেখক মাত্রকেই দরিদ্র ও দুঃস্থ হ'তে হবে। তা যদি না হওয়া যায়, কেউ আর লেখক হ'তে পারবেন না। আমাদের লেখকদের অনাহারে থাকতে হবে: ছন্নছাড়ার মত ঘোরাঘুরি করতে হবে এবং শেষকালে দাতব্য হাসপাতালে মরতে হবে। এই ধরণের বোহেমিয়ান জীবনদর্শন যাঁর নেই, তিনি লেখনীধারণের অযোগ্য। অর্থাৎ সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও টাকাপয়সা সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশের পথে একান্ত অন্তরায়। সেযুগে একদা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় একটি রচনা প্রকাশিত হয়। রচনার উদ্দেশ্য, লেখকদের নাম ও নজীর তুলে প্রমাণ করা, দারিদ্র্য ও অর্থকষ্ট থাকলে মানুষের শিল্পমন, সাহিত্যিকবৃত্তি যথার্থ পথে পরিচালিত হয় না, বরং অন্তর্নিহিত প্রতিভা বাধাপ্রাপ্ত হয়। পেটে যার ক্ষুধা, সে নাকি শিল্পসাহিত্যের সেবা করতে পারে না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামের নজীর তুলেছিলেন, যথা—রাজা রামমোহন, রাজা রাধাকান্ত, রাজনারায়ণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, রাজা রাজেন্দ্রলাল, দীনবন্ধু, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, রাজা বিনয়কৃষ্ণ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ইত্যাদি। পেট্রিয়টের বক্তব্য, উল্লিখিতদের মধ্যে একজনও দরিদ্রঘরে জন্মগ্রহণ করেননি, যদিও আমাদের দেশবাসীর চরম দুঃখ আর দুরবস্থার চিত্র এঁদের মধ্যে অনেকেই দরদের সঙ্গেই অঙ্কিত করেছেন। দেশের দারিদ্র্য আর দশের দুঃখ গাইতে হ'লে কায়মনে দুঃখবাদী হওয়ার প্রয়োজন নেই। 'পেট্রিয়ট' সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন, অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, সংবৃত্তি লুপ্ত হ'তে থাকে মন থেকে। অভাব লোকের মনের ঔদার্যকে বিনষ্ট করে। অভাবীমন সর্বজনের মনের কথা জানতে পারে না। যে নিজে অসুখী, সে সুখ আর তৃপ্তিদানে কবে সমর্থ হয়? দুঃখবাদ বা বাউণ্ডুলেপণার বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা বলেছেন 'পেট্রিয়ট'। শেষে এ কথাও বলেছেন, শূন্য-উদরের লেখনীধারীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হ'লে ভবিষ্যতের শিল্প-সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ, অনাহারে মানবদেহ যখন পরিপুষ্ট লাভ করতে পারে না, তখন অনাহারী লেখকদের লেখায় সাহিত্যের পুষ্টিলাভ নৈব নৈব চ।

* * * *

কিন্তু বিধি হইল বাম।

ভারতীয় কবি ও সাহিত্যিকের কপালে লেখা আছে দুঃখবরণের অদৃশ্য লিপি, বরাত কে খণ্ডাবে! দেখা গেছে পরিসংখ্যায়, ভারতের অধিকাংশ কবি ও লেখকই অবর্ণনীয় দৈন্য ভোগ করেন। যাঁরা সরস্বতীর সেবায় লাগবেন, তাঁদের প্রতি লক্ষ্মী কৃপা করেন না। পুরাকালে ভারতের রাজা বাদশারা শিল্পী আর লেখকদের তবু রাজ-দরবারে ঠাঁই দিতেন। কবি আর লেখকরা বাঁচতেন সপরিবারে, রাজকীয় কৃপাদৃষ্টিতে। কিন্তু লেখার স্বতঃস্ফূর্ততায় রাজা-উজীররা বাধা দিতেন। যেহেতু রক্ষণাবেক্ষণ করছেন সেই হেতু তাঁদের অর্ডার মাফিক লিখতে হবে। কামিনীপ্রিয় রাজা-উজীরদের মন রাখতে অযথা যৌনকথার অবতারণা করতে হবে লেখার ছত্রে ছত্রে। এযুগেও এই রাজসিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব নেই আমাদের দেশে। এখানে মনে রাখতে হবে, ইদানীং রাজা নেই কিন্তু রাজনীতি আছে। সিংহগড়ের সিংহ নেই, কিন্তু গড় আছে। গড়ের মাঠ আছে বললে আরও ভাল হয়। কেন না, গড়ের মাঠেই আমাদের রাজনীতির প্লাটফর্ম, ভারতবিদ্বেষী অক্টারলোনীর ঠিক পাদপীঠস্থানে। রাজনীতির ব্যাকিং থাকলে লেখকদের আর ভাবনা চিন্তার কারণ নেই। তার মানে আর তাঁদের 'অরিজিনাল' ভাবতে হবে না কিছু। কোথা থেকে চলবে, কে চালাবে, কি ভাবে চালাবে—চিন্তা করতে হবে না। শুধু একমাত্র প্রতিদান, আপন আপন চিন্তা-ভাবনাকে রাজনীতির পায়ে বলি দিতে হবে। মৌলিক ভাবধারাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। নীতিবাদের প্রচার গাইতে হবে।

* * * *

ভারতের লেখককুল এমনই লোভশূন্য যে, নীতিবাদের দোহাই, সরকারী চাকরী, পার্টি বেপার্টির ইশারায় তেমন সাড়া দিতে পারলেন না এখনও। গান্ধীজীর মত 'মরবো তবু করবো' শ্লোগান গাইতে গাইতে মৃত্যুবরণ করতেও দেখা গেছে বেশ ক'জন কবি আর সাহিত্যিককে। কল্পনাতীত অভাবের ঘরে তাঁদের জন্ম হয়, মৃত্যু হয় হাসপাতালে। মৃত্যুর ঠিক আগে কিংবা পরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। কিঞ্চিৎ অর্থদান করা হয় কা'কেও কা'কেও, যাঁদের পক্ষ থেকে বলবার লোক থাকেন, অর্থাৎ যাঁদের 'রেফারেন্স' থাকে। এই 'রেফারেন্স' দরকার হয় সরকারী কর্তাদের কাছে, যাঁদের নিকট সাহিত্যের সাহিত্যিকের পরিচয় অজ্ঞাত। যাই হোক, যুগ যুগ ধ'রে এদেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকরা কষ্টভোগ করেছেন এবং আজও করছেন। ভবিষ্যতেও হয়তো এই দুর্ভোগ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। বাজলা

ভাষার আগে যখন আমরা প্রাকৃত ভাষাভাষী ছিলাম তখন কি দুরবস্থা ছিল তাই শুনুন :

জে জে গুণিনে জে জে অ চাইনো জে বিডড্ঢবিন্নানা।
দারিদ্দ রে বিঅকৃখণ তাণ তুমং সাণুবাওসি॥

বঙ্গানুবাদ—"রে বিচক্ষণ দারিদ্র্য, যাঁরা গুণী, যাঁরা যাঁরা ত্যাগী, যাঁরা যাঁরা বিচক্ষণ বিদ্বান্, তাদের প্রতিই তোমার অনুরাগ।"

এই অনুরাগের ঠেলা সামলাতে সামলাতে অনেকের দাতব্য চিকিৎসালয়ে যেতে হয় চিরকালের মত। প্রাকৃত-কবির মত পয়ার পদাবলী রচনাকারদের অনেকেই লেখার জন্য আক্ষেপ জানিয়েছেন, দুঃখের কশাঘাতে। শরৎচন্দ্র টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে পারেননি।

* * * *

আশার কথা, অধুনা যেন ততটা দারিদ্র্য আর নেই। লেখকদের অনেকেই (তাঁদের লেখার গুণে) বেশ কিছু অর্থ উপার্জ্জন করছেন, সমৃদ্ধ হয়েছেন। কলকাতার আনাচে-কানাচে ঘরবাড়ী তুলেছেন, গাড়ীর মালিক হয়েছেন, সুখে আছেন। কেউ কেউ কাজ করছেন সংবাদপত্রে, কিম্বা অন্যত্র। আমাদের লেখকদের জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তনে সকলেই খুশী হবেন আমাদের মত। এই সমৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। বাঙলা দেশে গত দশ বছরের মধ্যে পাঠকপাঠিকা সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ আকারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে যখন পৃথিবীর সকলকে বিপর্য্যস্ত করলে তখন থেকেই (বোমা পড়ার ভয়ে) মানুষ ঘরমুখী হয় আবার। গগনচুম্বী প্রাসাদ ছেড়ে শেলটার আর ট্রেঞ্চে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ঘরমুখী মানুষের কাছে ভাল বই ছাড়া অধিক আর কি আনন্দদান করতে পারে! পাঠকপাঠিকার ক্রয়ক্ষমতার মান নির্ণয় নয়, বইয়ের বিক্রয়সংখ্যা দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ত্তমান কালে এই পাঠকপাঠিকার যতই বৃদ্ধি পাবে লেখকদের ততই মঙ্গল। বাঙলা দেশে শোনা যায়, পাঠক অপেক্ষা পাঠিকাদের সংখ্যা অনেক বেশী। লাইব্রেরী বাঁচিয়ে রাখেন গৃহলক্ষ্মীরা। বইয়ের ক্রেতাদের মধ্যে আজকাল মহিলাক্রেতাদের লক্ষ্য করা যায়, বই-ঘরে তাঁদের বই বাছাই করতে দেখা যায় হামেশাই। বাঙালী লেখকদের লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও গৃহলক্ষ্মীরা (অর্থে পাঠিকারা) যদি লেখককুলের প্রতি সদয় থাকেন তবেই রক্ষা। আমরা মা সরস্বতীর কাছে আবেদন জানাই, তিনি আমাদের পাঠিকাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করুন।

শূন্য উদরে থেকে সৃষ্টিকার্য্য চলে না। যাযাবরবৃত্তিতে সাহিত্যিক প্রতিভার অকালে মৃত্যু হয়। আমরা বিশ্বাস করি, দারিদ্র্যের জ্বালা আর উৎপীড়নে মহৎ সাহিত্য রচনা করা যায় না। চিন্ পেটিয়টের সঙ্গে আমরা একমত।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

মনুস্মৃতির মেধাতিথি ভাষ্য

প্রথম খণ্ড

মনুসংহিতা ভারতের অমর গ্রন্থ। মানুষের সৃষ্টি থেকে অন্তকাল পর্য্যন্ত মনুর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। বেদমূলক ধর্ম্মসংহিতা সমূহের মধ্যে মনুস্মৃতির প্রামাণ্যই সর্ব্বাধিক। বেদবিরুদ্ধ স্মৃতি হিন্দু জাতির নিকট গ্রহণীয় নয়। আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যজ্ঞান, সংসারধর্ম্মনীতি, সর্ব্বোপরি মনুষ্য-সমাজের করণীয় অকরণীয়—মনুর নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত হয়। মনুসংহিতা মীমাংসাশাস্ত্রের আদিমতম গ্রন্থ—স্মৃতির মাধ্যমে মানুষের সমাজে প্রচারিত হয়ে এসেছে। কিন্তু মনুর বক্তব্য ও প্রমাণ, কারণ ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বহু বিজ্ঞজন বহু টীকা করেন। তন্মধ্যে মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্টের নাম আমাদের পরিচিত। কুল্লুক ছিলেন বাঙালী। বিখ্যাত পণ্ডিত পূজনীয় শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, সপ্ততীর্থ মহাশয় মেধাতিথির মনুস্মৃতিভাষ্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন। বিস্ময়ের বিষয়, প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশ বিভাগ। অনুবাদক কেবল মাত্র অনুবাদেই ক্ষান্ত হননি, স্মৃতির বহু জটিল স্থলের সঙ্গত অর্থ ও মীমাংসা নিরূপণে দেশবাসীকে উপকৃত করেছেন। পূজনীয় গুরুদেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসদানন্দ ভাদুড়ী মহাশয়ের ভূমিকাটিও অতি মূল্যবান। এই মহাগ্রন্থের যত বহুল প্রচার হয় ততই মঙ্গল লাভ। প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মূল্য নয় টাকা।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলা

স্বাধীনতা বলতে আজকের দিনে আমরা যা অর্থ করি, সেইটেই সম্পূর্ণ নয়। স্বাধীনতার অর্থ ব্যাপক, কেবলমাত্র শাসনক্ষেত্রের মধ্যেই তার অভিহিতি সীমাবদ্ধ নয়। বহুকাল ধরেই বাঙলাদেশে সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলছে, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস। জীবনের স্বাধীনতা, বাঁচবার স্বাধীনতা, মনুষ্যত্বের জয়গান গাইবার স্বাধীনতা আন্দোলন নবাবী আমলে, কোম্পানীর আমলে, বিটিশ আমলে চিরদিন ধরে হয়ে আসছে। সেই আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস সুললিত রচনার মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে লেখক উপস্থিত করেছেন। লেখকের সমস্ত শ্রম সফল হউক, এই কামনা করি। লেখক শ্রীনরহরি কবিরাজ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীসুরেন দত্ত। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-সংগ্রহ

বাঙলা সাহিত্যের দরবারে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান মাণিকের মতই উজ্জ্বল ও মহার্ঘ। আজকের দিনে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতারই নামান্তর। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প বাঙলাদেশে প্রথম আবির্ভাবেই আলোড়ন এনেছিল। তাঁর প্রত্যেকটি গল্প নতুন জীবনের পথের সন্ধান দেয়, বেঁচে থাকা শুধু নয়, বাঁচার মত বাঁচার আবেদন ছিল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। তাঁর বহুজন সমাদৃত গল্পগুলির সংকলন বর্ত্তমানে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলন প্রকাশের জন্য প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। এই গ্রন্থ ঘরে ঘরে আদৃত হোক, কামনা করি। প্রচ্ছদ-সজ্জা করেছেন কৃতী-শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীসুরেন দত্ত। দাম চার টাকা মাত্র।

হিমাদ্রি

বাঙলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার কাছে রাণী চন্দ অপরিচিতা নন। সংসাহিত্য সৃষ্টি করে, একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি জয়লাভ করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর "পূর্ণকুম্ভ"-এর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সাহিত্য-জগতের প্রত্যেকেই সবিশেষ অবহিত। "হিমাদ্রি" একটি ভ্রমণধর্মী রচনা। ভ্রমণকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। ধ্যানমৌন নগরাজ হিমালয়ের ভাব-গম্ভীর সমাহিত মূর্তির বর্ণনাটি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে লেখিকার লেখনীর কল্যাণে। ভাষা যথেষ্ট শক্তিময়ী, বর্ণনা স্বতঃস্ফূর্ত, গতি বাধাহীন—এই ত্রিবিধ গুণের জন্য এই গ্রন্থ যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে ও শ্রীমতী চন্দের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে এ বিষয়ে আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি। বরণীয় শিল্পাচার্য গগনেন্দ্রনাথের অঙ্কিত 'হিমাদ্রি' চিত্রটি গ্রন্থটির শোভা বর্দ্ধন করবে। বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলকাতা—৭ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। দাম সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

জীবনরঙ্গ

গার্হস্থ-জীবন ও অভিনয়-জগতের জীবন প্রধানতঃ এই দুই বিভিন্নধর্মী জীবনকেই চিত্রিত করে এদের মধ্যে প্রকৃত সংযোগসূত্র আবিষ্কার করে লেখক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সুরঞ্জনা নাম্নী মেয়েটির জীবনটাই যে, যে কোন নাটকের মতই বৈচিত্রময়ী, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করে জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনাকে পাশাপাশি সমানভাবে উপস্থাপিত করে সমগ্র কাহিনীটিকে মনোরম করে তুলেছেন। রাজশেখর রায়, চরিত্রটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ইয়ে-মামার চরিত্রটি এক কথায় দধীচির চরিত্র। এই চরিত্রটি প্রস্ফুটিতও হয়েছে যথোপযুক্ত দক্ষতার সঙ্গেই। আবার বলি, জীবনরঙ্গকে একটি পরম সুপাঠ্য গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়। ন্যাশানাল পাবলিশার্স, ১৪৫বি সাউথ সিঁথি রোড কলকাতা-২। দাম চার টাকা মাত্র।

নতুন দিন, নতুন মানুষ

নতুন দিন দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে নতুন সমাজ—সেই সঙ্গেই মানুষেরও হচ্ছে নবজন্ম—হতাশা ও ব্যর্থতার মোহনিশার অবসান হবে জীবনের আকাশে। দেখা দিচ্ছে নতুন সূর্য, নব মেঘ আশা ও উদ্দীপনার বাণী বহন করে। নতুন যুগের আলোর রশ্মিধারায় মানুষকে আজ অবগাহন করে দূর করতে হবে অতীতের গ্লানি। এই পটভূমিকায় রচিত হয়েছে আলোচ্যমান গ্রন্থটি। স্বীয় বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে লেখক সফল হয়েছেন। চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ রচনাতেও তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন পরেশ বসু। লেখক—রণজিৎকুমার সেন। প্রকাশক—লীলা প্রকাশনী, ৮৩ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড। দাম তিন টাকা মাত্র।

ভারতের সাধক

বহু জনের সাধনায় ভারতপীঠস্থান ধন্য হয়েছে। যুগ যুগ ধ'রে বহু সাধক এসেছেন আর তিরোধান করেছেন এ দেশে। এই সব সাধু ও সাধকদের মতামত ও বাণী সকল দেশবাসী গ্রহণ না করলেও একেক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি ভারতের সাধকের তৃতীয় খণ্ড। শঙ্করাচার্য্য, রামকৃষ্ণদেব, মহর্ষি রমণ, শ্রীঅরবিন্দ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি দ্বাদশ জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থখানিতে ধারাবাহিকতার কোন বালাই নেই, যাঁকে খুশী যেখানে স্থান দেওয়া হয়েছে লেখকের ইচ্ছায়। জীবনী সঙ্কলনের সূত্র নেই কিছু, যেজন্য বিশ্বাস করা যায় না। লেখকের একাডেমিক জ্ঞান নেই বললেই হয়। লেখক ও প্রকাশক ভবিষ্যতে সতর্ক হ'লে দেশবাসী উপকৃত হবে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, কয়েক জন সাহিত্যিকের উদ্ধৃতি প্রচ্ছদে যুক্ত করা হয়েছে। এগুলি যেমন উদ্দেশ্যমূলক, তেমনই হাস্যকর। দাম অযথা বেশী করা হয়েছে। রাইটার্স সিণ্ডিকেট। ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট টাকা।

বিদেশিনী

কয়েকটি বিদেশিনীকে কেন্দ্র করে ছোট গল্পের একটি সংকলন। রচয়িতা শেখর সেন লণ্ডনের ও ফ্রান্সের কয়েকটি নারীচরিত্রকে কেন্দ্রস্বরূপ দাঁড় করিয়ে সেই দেশ ও সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন উপরোক্ত গ্রন্থে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলী প্রশংসনীয়। নারীচরিত্র সৃষ্টিতে এবং তাদের অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত ফুটিয়ে তুলতেও লেখকের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচ্ছদচিত্রেও শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন উদীয়মানা শিল্পী শ্রীমতী হৈমন্তী সেন।—প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দু' টাকা মাত্র।

চকখড়ি

হর্ষ কিশোর, তার স্বপ্ন, তার পল্লীর পটভূমিকা থেকে হর্ষের কলকাতায় আগমন—এ শুধু গল্প নয়, গল্পের ঊর্দ্ধে জীবনের গভীর দৃষ্টি দিয়ে আঁকা একটি দ্বিধা-কম্পমান উপলব্ধির কাহিনী 'চকখড়ি' একটি স্বপ্নময় বালকের কিশোরকাল থেকে যৌবনে উন্মীলিত হওয়ার ইতিহাস। উপন্যাসের ভাষা উজ্জ্বল। নায়কের মন এ বইয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারুকার্য্যে বিশিষ্ট। বিকীর্ণ এবং পার্শ্বচরিত্রের কথোপকথন—তাদের আসা-যাওয়া স্নেহ ও কৌতুকের আলোয় টুকরো টুকরো সাজানো। তরুণ কবির লেখা 'চকখড়ি' পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদৃত হবে, আশা রাখি। আর্ট ইউনিয়ন। ৫৭।৭ গ্রে ষ্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস

ভারতবর্ষে যে ক'টি ভাষা প্রচার ও প্রসারের দিক দিয়ে আজ বহুলতা লাভ করেছে, হিন্দী ভাষা তাদের অন্যতম। ভারতবর্ষের নানাস্থানে হিন্দী ভাষা আজ ধীরে ধীরে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। হিন্দী সাহিত্যের একটি নাতিদীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেছেন শ্রীব্রজনন্দন সিংহ। হিন্দী সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের দ্বারা বহুল উপকৃত, সে বিষয়েও একটি তথ্যপূর্ণ ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যেরও যথেষ্ট প্রভাব হিন্দী সাহিত্যের উপর প্রতিভাত; এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে।

তথ্যানুসন্ধীরা বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন। ব্রজনন্দন বাবু নিজেও উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। বাঙলা ভাষায় রীতিমত পাঠ গ্রহণ করে বাঙলা ভাষায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। হিন্দীতে প্রকাশিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ কয়েক জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সম্বন্ধেও রচনাদি এই গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে। লেখককে আমরা অভিনন্দন জানাই। প্রকাশক—অথার্স কর্ণার, ১১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের পুস্তকাবলী

বিশ্বভারতী ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন থেকে বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ-মালায় আরও কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্যপূর্ণ ও সুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে শ্রীমনোমোহন ঘোষ "প্রাকৃত-সাহিত্যে" তদানীন্তন জনগণের ভাষায় যে সবল সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য ও নাটক গড়ে উঠেছিল সেই সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত ও সুচিন্তিত আলোচনা পরিবেশন করেছেন।···শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার "প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা" গ্রন্থে সনাতন এবং বিগত ভারতবর্ষে বিজ্ঞান যে পরিমাণে প্রসার লাভ করেছিল সেই সঙ্গে আয়ুর্বেদ জ্যোতিষেরও যে বিস্তৃতি ঘটেছিল সে সম্পর্কে একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।··· শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়ের "রসায়ন ও সভ্যতা" নামক গ্রন্থে সভ্যতার সঙ্গে রসায়নের যোগসূত্র যে কত সুনিবিড় সে সম্বন্ধে একটি আলোচনা এবং তৎসহ রসায়নশাস্ত্রের বিস্তৃত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হয়েছে।···শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসুর "রাশিবিজ্ঞানের কথা"য় রাশিবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।··· "পঞ্জিকা সংস্কার" নামক গ্রন্থে শ্রীক্ষেত্রমোহন বসুর রচনায় পঞ্জিকা সম্পর্কে সুচিন্তিত আলোচনা এবং তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর "বাংলার ভূমি ব্যবস্থা"য় আজকের দিনে ভূমি ব্যবস্থা কিরূপ হয়েছে এবং তা কি রকম হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। বাঙলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার একটি তথ্যপূর্ণ ইতিহাসও এই গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে।···বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের প্রতিটি গ্রন্থের মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

বধূবরণ

বাঙলা দেশের সাহিত্যানুরাগীদের কাছে যারা অপরিচিত ছিল, তারা প্রথম পরিচিত হ'ল শৈলজানন্দের কল্যাণে। যাদের সম্বন্ধে কেউ কোন দিন ভাবে নি, চিন্তা করে নি, তাদের সম্বন্ধে প্রথম ভাবলেন, চিন্তা করলেন শৈলজানন্দ। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে জাতিকে করে তুললেন রীতিমত সচেতন। তাঁর প্রথম জীবনের কয়েকটি গল্পের সংকলন বধূবরণ। এই গল্পগুলি প্রথম প্রকাশের সময়ে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। গল্পগুলি প্রত্যেকটি লেখকের হৃদয়ের গভীরতা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং সর্বহারাদের দুঃখে অপরিসীম বেদনা-বোধের প্রতিবিম্ব। লেখকের সহানুভূতিশীল প্রাণের স্বাক্ষর গল্পগুলি বহন করে। গল্পগুলি পূর্বের মতই পুনরায় ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করুক, এই কামনাই করি। প্রচ্ছদ অঙ্কনেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রেবতী সরকার। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

তৃষ্ণা

জগত জুড়ে আজ শুধু তৃষ্ণা। শুধু তৃষ্ণা। তৃষ্ণার নেশা আজ পাগল করেছে মানুষকে। মানুষ আজ উম্মাদ হয়ে উঠেছে জীবনের তৃষ্ণায়, ভালোবাসার তৃষ্ণায়, আলোকের তৃষ্ণায়। জীবন জুড়ে এই যে তৃষ্ণার মিছিল চলেছে তারই একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি পড়েছে উপরোক্ত কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন-গ্রন্থটিতে। বাংলা সাহিত্যে সমরেশ বসু আজ একটি বিশেষ আসনের অধিকারী। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বলিষ্ঠ, উন্নত এবং প্রশংসার যোগ্য। গল্পগুলিতে তাঁর বক্তব্য পাঠকচিত্তে রেখাপাত করতে পারবে বলে আশা করা যায়। খ্যাতিমান শিল্পী মাখন দত্তগুপ্ত-অঙ্কিত অপূর্ব প্রচ্ছদচিত্রটি গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা মাত্র।

বদল

শ্রীবিমলচন্দ্র মিত্র

কণ্ঠিবদল, মালাবদল শুনেছি সব কানে,
ঋতুবদল সৃষ্টিছাড়া হয়নি কোনখানে;
কিন্তু হায়! হ'লো একি, সবই গণ্ডগোল,
অঘ্রাণেতে অবাক সবে শুনে কোকিলের বোল!
শীতের দিনে চৈতী হাওয়া,
ধানের ক্ষেতে যায় না চাওয়া,
হাহাকারে দেশটি ভরা দৃষ্টি আকাশ পানে
(এখন) জোরের বদল "মুলুক মেলে" কেউ কারেও না মানে।
উল্টো যখন সব কিছুতেই,
বদল যখন পারে হ'তেই,
দুখের বদল এমন দিনে সুখ কেন না আনে?

Vanaspati

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

জুলেখা বাঈ আর ওয়াঙের কাহিনী দিলীপ শুনলো জেনীর মুখ থেকে। শুনে অনেকক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

জেনী আস্তে আস্তে বললো, "দিলীপ, এই হোলো আমাদের পরিবারের ইতিহাস। এর পর তুমি যদি আমায় বিয়ে করতে না চাও তো আমি একটুও দুঃখিত হবো না।"

দিলীপ মুখ ফিরিয়ে জেনীর দিকে তাকালো। বললো, "জেনী, এরকম একটা ইতিহাস আমাদের পরিবারের থাকলে আমি খুব গর্ব বোধ করতাম। নিঃসম্বল অবস্থায় তোমার বাবা এদেশে এসেছিলেন, খেটে রোজগার করে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করেছেন। এর চেয়ে বড় পরিচয় কোনো সাধারণ লোকের আর কি থাকতে পারে? অল্প বয়েসে কখন কি ভুলচুক করেছেন, তা নিয়ে আমি ভাবি না। জীবনটাকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবার জন্যে এরকম ভুল-চুকও দরকার হয়। তুমি সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে, আমি সাধারণ ঘরের সাধারণ ছেলে, আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসি—বিয়ে করে সুখী হবার জন্যে এই যথেষ্ট।"

"তা হলে এতক্ষণ কি ভাবছিলে?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"ভাবছিলাম অন্য কথা। আমারও একটা ছোটো ইতিহাস আছে, সেটা কেউ জানে না। আজ সে-কথা তোমাকেও জানানো দরকার।"

"আমি জেনে কি করবো?"

"আমার ইতিহাস জানলে পরে হয়তো তুমিই বরং আমায় বিয়ে করতে চাইবে না।"

জেনী চটে গেল। জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমায় কি ভাবো বলো তো?"

"আমি সত্যি বলছি জেনী!"

"দেখ দিলীপ," জেনী বললো, "কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার জানবার আগ্রহ আমার একটুও নেই। তবে আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ভাঙবার জন্যেই তোমার কথা আমার শোনা দরকার। বলো, কি বলছিলে।"

দিলীপ একটু হাসলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আমার মা নেই, জানো তো?"

"হ্যা, তুমি বলেছিলে একদিন।"

"আমার মা বাঙালী নয়," দিলীপ বললো।

"হ্যা, তা-ও শুনেছি।"

"বাবা যখন বিলেতে যান," দিলীপ বলে গেল, "তখন এক ইংরেজ-মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন।"

"তুমি বোধ হয় তোমার মাকে দেখনি, না? উনি বোধ হয় তোমার জন্মের পরই মারা যান?" জেনী আস্তে আস্তে বললো।

"না, আমি দেখেছি আমার মাকে। আমায় খুব ভালোবাসতেন। আর উনি মারা যান নি, বেঁচেই আছেন।"

"বেঁচে আছেন!"

"আমার যখন সাত বছর বয়েস মা তখন চা-বাগানের এক সায়েবের সঙ্গে পালিয়ে চলে যান। তারপর থেকে মায়ের কোনো খবর আর জানি না।"

দিলীপ চুপ করে রইলো।

জেনীও চুপ করে রইলো। আস্তে আস্তে জলে ভরে এলো তার চোখ দু'টো।

দিলীপের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো সে। বললো, "দিলীপ, আর কোনো কারণে যদি নাও বা হয়, শুধু এ কারণেই আমি তোমায় ছাড়তে পারবো না। তোমার যে আমায় দরকার। আমায় না হলে যে তোমার চলবে না।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো দু'জনে। দু'জনেরই যেন মনে হোলো সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত আকাশ, মানুষের ইতিহাসের সমস্ত অতীত, সমস্ত ভবিষ্যৎ সবই যেন শুধু তাদের দু'জনকেই ঘিরে রয়েছে।

বুড়ো ওয়াঙকে যখন দু'জনে গিয়ে বললো, সে চোখ বুজে চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আমি খুব খুশি হয়েছি। এ তো হবেই। অন্য দেশ থেকে লোক এসে আরেক দেশে বসবাস করে, প্রথম কিছুদিন নিজেদের মধ্যেই বিয়ে-থা করে, তারপর আস্তে আস্তে মিশে যায় দেশের অন্য সবার মধ্যে। আমাদের দেশেও এই হয়েছে, তোমাদের দেশেও হয়েছে। সব জায়গায় এই

হয়ে এসেছে, চিরকাল ধরে হতেও থাকবে। তোমরা সুখী হও, তা'হলে আমার দেশেরও কল্যাণ, তোমার দেশেরও কল্যাণ।"

জেনী মুখ নিচু করে বসে রইলো।

"আপনি অনুমতি দিলে আমি সামনের সোমবারই বিয়েটা রেজিষ্ট্রি করে ফেলতে চাই," দিলীপ বললো।

ওয়াঙ কি যেন ভাবলো অনেকক্ষণ। তারপর বললো, "না, এত তাড়াতাড়ি নয়। সামনের মাসে আহ্ কিম আর মিনির বিয়ে। তারপর তোমাদের।"

"আহ্ কিম আর মিনির বিয়ে?" জেনীর মুখ ঝলমল করে উঠলো।

"হ্যাঁ," হাসিতে ভরে উঠলো বুড়ো ওয়াঙের মুখ, বললো, "ওরা কাল আমার কাছে এসে মত নিয়ে গেছে। আহ্ কিম খুব ভালো ছেলে।"

"মিনি তো আমায় বলে নি," জেনী বললো।

"ও আমাকেই বলতে বলেছিলো তোমায়। আজ সারা সকাল তো তোমায় পাইনি।"

জেনী বললো, "চিয়েন চাংকে চিঠি লিখতে হবে।"

"আমি লিখে দিয়েছি," বুড়ো ওয়াঙ বললো, "ওর বোধ হয় আর মিনির সঙ্গে দেখা হোলো না। বিয়ের পর ওরা হ্যাংকাও চলে যাচ্ছে।"

"তাই নাকি?" প্রথমটা ঝলমল করে উঠলো জেনীর মুখ, তারপর বিষণ্ণ হয়ে গেল।

"এতে মন খারাপ করবার কি আছে?" বুড়ো ওয়াঙ সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "বাড়ির মেয়েরা বিয়ে করে স্বামীর ঘরে যাবে, বোনেদের মধ্যে আর দেখা হবে না আগের মতো, তবু ওয়াঙদের রক্ত ছুটো ধারায় ছ'দিকে বয়ে যাবে। এই তো চিরন্তন নিয়ম।"

"চিয়েন চাং যদি থাকতো!" জেনীর চোখ জলে ভরে উঠলো।

"ভায়েরাও চিরকাল বোনেদের সঙ্গে থাকে না জেনী," বললো বুড়ো ওয়াঙ, "অনেক সময় খবরও নেয় না। তবু বোনেরা ভায়েদের মনে রাখে, তাদের খোঁজ-খবর নেয়। আর একটা কথা জানো?—মনে হচ্ছে সুং চাং-ও বোধ হয় বিয়ে করবে শীগ্‌গিরি। সে মুখ ফুটে বলে নি আমায়, তবে তার মুখের চেহারা দেখে আমারই ওরকমই মনে হচ্ছে। হয়তো সে ভয় পাচ্ছে আমায় জিজ্ঞেস করতে, আমি রাজী হবো কি হবো না। তাই মনে হচ্ছে মেয়েটি নিশ্চয়ই অন্য জাতের। ওকে বলে দিও, ওর যদি মনে হয় ও সুখী হবে, আমি একটুও রাগ করবো না।"

জেনী আর দিলীপ চুপ করে রইলো।

"আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে," বুড়ো ওয়াঙ বললো, "তোমাদের মা তোমাদের বড়ো করে চোখ বুজেছে, এবার তোমরা নিজেদের পছন্দ মতো ঘর-সংসার পেতে সুখী হয়েছো দেখলে আমিও শান্তিতে চোখ বুজে তোমাদের মায়ের কাছে চলে যেতে পারবো। বড়ো ভালো মেয়ে ছিলো তোমাদের মা। অতো ভালো মেয়ে আমি আর দেখিনি।"

মাসখানেক পরে জানুয়ারীর এক স্নিগ্ধ দিনে মিনি ওয়াঙ আর আহ্ কিমের বিয়ে হয়ে গেল।

খুব সাদাসিধে নিরাড়ম্বর বিয়ে। আহ্ কিমের দাদা আহ্ তং আর তার বৌ, বুড়ো ওয়াঙের এক ভায়রাভায়ের পরিবার, জেনী ওয়াঙ, সুং চাং, সুং চাং, মিনি আর জেনীর কিছু বিদেশী বন্ধু, দিলীপ, যোগীন্দর সিং, সুলেমান এদের নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন হৈ চৈ হাসি ঠাট্টা গল্পের মধ্যে হয়ে গেল মিনি আর আহ্ কিমের বিয়ে।

বিয়ের পরই ওদের হংকং রওনা হওয়ার কথা, কিন্তু যাত্রা স্থগিত রাখতে হোলো। কারণ সুং চাং ঘোষণা করলো যে, সে ইতিমধ্যে একটি কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে এসেছে রোজী নামে সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে। এবার সে বাড়ীতে একটা ছোটোখাটো পার্টি দিতে চায়।

বুড়ো ওয়াঙ শুনে হাসলো, বললো, "লুকিয়ে বিয়ে করার কি দরকার ছিলো? আমায় আগে বললেই পারতে।"

বাড়ীতে ফিরিঙ্গি ধাঁচের ছোট্টো পার্টি। বুড়ো ওয়াঙ উপরে বসে রইলো। নিচে জড়ো হোলো জন পঁচিশ-তিরিশ অল্পবয়েসী চীনে, এ্যাংলোইণ্ডিয়ান, পাঞ্জাবী। তাদের মধ্যে দিলীপও। আর সেই পার্টিতে এলো টিং লিং আর যেং চেং শিয়াং।

টিং লিং দিলীপকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেল। বললো, "শুনলাম জেনীর সঙ্গে তোমার বিয়ের নাকি সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে? কন্‌গ্র্যাচুলেশান্‌স্। ও খুব ভালো মেয়ে। তুমি নিশ্চয়ই খুব সুখী হবে।"

"তোমাদের কি খবর," দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, "চেং শিয়াংকে খুব রোগা দেখাচ্ছে।"

"ও অনেক ঝঞ্ঝাটে আছে," টিং লিং বললো, "এখানে ওর নানারকম অসুবিধে হচ্ছে। ও সিঙ্গাপুরে চলে যাচ্ছে শীগ্‌গিরই। তারপর হয়তো তাই-পেহ্ চলে যাবে সেখান থেকে।"

"তা হলে নিশ্চয়ই তুমিও চলে যাচ্ছো?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"না, আমি যাচ্ছি না। যেখানেই যাই না কেন, ফরমোসায় আর নয়।"

"তা'হলে তুমি কি এখানে একা থাকবে?"

"না থাকবো না," টিং লিং বললো, "ষ্টিভ রবিনসনকে মনে আছে? ওই যে একজন আমেরিকানের সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো চিয়েন চাং, সে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছে।"

"তাই নাকি?" দিলীপ অবাক হোলো, "তুমি যে বলছিলে তোমার খুব ইচ্ছে করছে চীনে ফিরে যেতে?"

"অনেক ভেবে দেখলাম," টিং লিং বললো, "চীনে ফিরে কোথায়ই বা যাবো, কি-ই বা করবো। ওখানে আমার কেউ নেই। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আমি অন্য একরকম পরিবেশে মানুষ, চীনে গিয়ে হয়তো খাপ খাইয়ে নিতে পারবো নিজেকে। জানো দিলীপ, আমার মতো লোক যারা, দেশে গিয়ে ওরা সুখী হতে পারে না, আমাদের মতো লোকের দেশকে দূর থেকে ভালোবাসাই ভালো। তাই ঠিক করলাম, ষ্টিভ্ লোকটি ভালো, ওকে বিয়ে করে আমেরিকা চলে যাই, ওদেশে বড়ো হয়েছি, ওদেশেই ভালো থাকবো। তারপর যদি দুনিয়া একদিন বদলে যায়, এদেশে ওদেশে কোনো শত্রুতা না থাকে, তখন হয়তো ষ্টিভকে নিয়ে মাঝে মাঝে চীনে বেড়াতে যাবো, ফুল দিয়ে আসবো আমার মা-বাবার কবরের উপর।"

একটু চুপ করে রইলো টিং লিং। তারপর হাসি-হাসি মুখে বললো, "সেদিন শুধু আমি আর ষ্টিভ একা নয়, হয়তো তুমি আর জেনী, সুং চাং আর রোজী—আর আমাদের ছেলে-মেয়েরাও যাবে। হয়তো সবাই গিয়ে অতিথি হবো মিনি আর আহ্ কিমের বাড়িতে।"

আবার একটু চুপ করে রইলো টিং লিং, তারপর বিষণ্ণ মুখে বললো, "সবাই যাবে—শুধু যাবে না চেং শিয়াং আর যাবে না চিয়েন চাং, ওরা বড় হতভাগা।"

জানুয়ারী কেটে গেল, ফেব্রুয়ারী কাবার হয়ে গেল। মিনি আর আহ্ কিম চীন চলে গেল। চীনেপাড়ায় থাকতে চাইলো না সুং চাং-এর বৌ রোজী। পার্ক সার্কাসে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে সেখানে উঠে গেল সুং চাং।

"আমরা আর কদ্দিন এভাবে কাটাবো," জেনী জিজ্ঞেস করলো দিলীপকে।

"বলো কি করা যায়", দিলীপ উত্তর দিলো।

"বাবার জন্যে ভাবনা হচ্ছে। বাবা এ বাড়ি ছেড়ে নড়বে না। মা এ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, বাবাও তাই এখানেই কাটিয়ে দিতে চান তাঁর শেষ কটা দিন। তোমাকে আমি এখানে এসে থাকতে দেবো না। আর আমিও বাবাকে এখানে একলা ফেলে রেখে তোমার বাড়ি গিয়ে থাকতে পারবো না।"

"তা হলে?"

জেনী অনেকক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, "বাবাকে জিজ্ঞেস করবো কি করা যায়।"

"জিজ্ঞেস করে দেখ।"

"না, জিজ্ঞেস করবো না", বললো জেনী, "হয়তো মনে করবেন আমরা তাঁকে বাধা মনে করছি, যা করবো, আমাদেরই ভেবে ঠিক করতে হবে।"

"কি করবে বলো? আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না," দিলীপ বললো।

"একটা কথা বলবো দিলীপ, কিছু মনে করবে না?"

"মনে করবো কেন? বলো।"

"দিলীপ" জেনী আস্তে আস্তে বললো, "আমি ছাড়া বাবার আর কেউ নেই। এত দিন যখন কাটলোই, তখন আরো কিছুদিন যাক না।"

"বেশ, তাই হবে। আমি অপেক্ষা করবো," দিলীপ বললো।

• • • •

ওয়াঙ-পরিবারের এই দীর্ঘ ইতিহাস আর জেনী ওয়াঙের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার কাহিনী দিলীপ আমায় শুনিয়েছিলো সেই এক আষাঢ়ের দুপুর বেলা—কলকাতায় যখন সবে বর্ষা নেমেছে। আমি বাড়ি বসে, আর রাস্তায় এক-হাঁটু জল।

সেই বৃষ্টিতে দিলীপ এসে উপস্থিত হয়েছিলো ট্যাক্সি চেপে, ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে হয়েছিলো আমাকেই,—তারপর এসে ঘোষণা করেছিলো, সারাটা সকাল সুবিমল ভটচাযের বাড়ি বসে ওর বৌ

মল্লিকা আর মল্লিকার মামাতো বোন রেবা চৌধুরীর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, ওদের ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে, রেবার সঙ্গে পরের দিন সিনেমায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে, তারপর সোজা আমার এখানে চলে এসেছে চা-সিগারেট খেয়ে গল্প করার জন্যে।

চা এসেছিলো। দিলীপের জন্যে তিন প্যাকেট সিগারেটও এসেছিলো।

বাইরে ঝির-ঝির বৃষ্টি—কিন্তু বাদলা হাওয়ার সে রকম দাপট আর নেই তখন। এ-বাড়ি ও-বাড়ির জানলায় জানলায় কি রকম যেন একটু করুণ তার সাড়া।

রিকশ ঠুং-ঠুং করে গিয়েছিলো রাস্তা দিয়ে। স্তিমিত হয়ে এসেছিলো পাশের বাড়ির রেডিও। পাশের বাড়ির মেয়েদের সাড়াও আর পাওয়া যাচ্ছিলো না। আড্ডা সেরে হয়তো হেঁসেলে গিয়ে ঢুকেছিলো চায়ের ব্যবস্থা করতে।

দিলীপ একটি সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, "আচ্ছা রঞ্জন, রেবার সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম বলে কিছু মনে করিস নি তো?"

উত্তরে আমি একটু হেসেছিলাম। দিলীপ চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছিলো আমার দিকে।

তারপর আবার যখন ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি সুরু হয়েছিলো আরেক পশলা, আর গুরু-গুরু মেঘ ডেকে উঠেছিলো আবার, দিলীপ বলেছিলো আস্তে আস্তে, "আজ জেনীর গল্প করার মতোই দিন। শোন তা'হলে—।"

সে গল্প শুনলাম অনেকক্ষণ ধরে। শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। মিঠে রোদ্দুরে ঝিলমিল করছে রাস্তার দু'পাশে জমে-যাওয়া জল। আকাশটা বেশ ঠাণ্ডা নীল।

শুনলাম দিলীপ বলে যাচ্ছে,—"জেনী তখন আমায় আস্তে আস্তে বললো, 'দিলীপ, আমি ছাড়া বাবার আর কেউ নেই। এতদিন যখন কাটলো, তখন আরো কিছুদিন যাক না।' শুনে আমি বললাম, বেশ জেনী, তাই হবে। আমি অপেক্ষা করবো।"

গল্প শেষ করে দিলীপ আরেকটি সিগারেট ধরালো। তারপর বললো, "আচ্ছা রঞ্জন, তোকে একটা কথা বলবো কিছু মনে করবি না?"

"কি, বলো।"

"ভাবছি রেবার সঙ্গে সিনেমায় আমি যাবো না, তুই যা। টিকিটটা তোকে দিয়ে যাবো। রেবা তো তার সীটে বসে অপেক্ষা করবে। যখন দেখবে তার পাশে এসে যে বসেছে সে আমি নই, সে তুই, বেশ মজা হবে তখন।"

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "দিলীপ দা, মনে পড়ে সেদিন রেবার সঙ্গে আমি সিনেমায় যাচ্ছিলাম। তুমি জোর করে আমার টিকিট আরেক জনের কাছে বেচে দিলে। হলের ভিতর রেবা দেখলো তার পাশে যে এসে বসেছে সে আমি নই, সে অন্য লোক। এবার যদি তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখবার দিনও সে দেখে তার পাশে এসে বসেছে তুমি নও, আমি—সে এর পর থেকে ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখাই ছেড়ে দেবে।"

দিলীপ হাসলো। তারপর বললো, "তোর কাছে আরেকটা দরকারে এসেছি। আমায় পঁচিশটা টাকা ধার দে।"

"কেন?" আমি শঙ্কিত হলাম।

"আজ আমি আরেক জনকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছি। যাওয়াটা দরকার, অথচ আমার কাছে টাকা নেই।"

"আজ আবার কার সঙ্গে যাচ্ছো?"

"আমার এক বন্ধুপত্নীর সঙ্গে।"

"তার কাছ থেকে টাকা ধার নাও।"

"না রে," দিলীপ বললো, "সে হয় না। দে ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। টাকাটা দে। সোমবার দিন ফিরিয়ে দেবো।"

টাকাটা দিতে হোলো। যাওয়ার সময় সিগারেটের বাকী প্যাকেটটিও তুলে নিয়ে গেল সে। তখন পাঁচটা বাজে।

বাড়ি বসে ভালো লাগছিলো না। দিলীপের কাছে জেনীর গল্প শুনে বার বার রেবার কথা মনে পড়ছিলো। বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

কখন দেখি চলে এসেছি সুবিমল ভটচাযের বাড়ি। আমায় দেখে ওর বৌ মল্লিকা খুব খুশি। শিঙাড়া ভেজে খাওয়ালো।

রেবার খোঁজ করলাম। শুনলাম রেবা নেই, হস্টেলে ফিরে গেছে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, "আজ দিলীপ এসেছিলো বুঝি?"

মল্লিকার মুখে দিলীপের উচ্ছ্বসিত প্রসংশা শুনলাম। এমন আশ্চর্য সুন্দর ছেলে সে নাকি আর দেখেনি! এমন চমৎকার গল্প করে!

"কাল বুঝি ও রেবাকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"রেবাকে নিয়ে সিনেমায়!" মল্লিকা চোখ কপালে তুললো। তারপর হাসতে সুরু করলো, "তাই বলেছে বুঝি? খুব দুষ্টু তো আপনার বন্ধু? আপনার বুক যে তখন থেকেই জলতে সুরু করেছে সে আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি।—না, সিনেমায় যাওয়ার কথা একদম মিথ্যে। আর রেবার সঙ্গে ওর ভালো করে আলাপই হয়নি। রেবা তো ওর সঙ্গে মিনিট দশ কি পোনেরো মোটে গল্প করেছিলো। তারপর গিয়ে শুয়ে পড়েছিলো আমার ঘরে। ওর খুব মন খারাপ।"

"মন খারাপ? কেন?"

একটু গম্ভীর হয়ে গেল মল্লিকা। বললো, "আপনি জানেন না বুঝি?"

"না তো! কি ব্যাপার?"

"ওর মুখ থেকে শুনবেন," মল্লিকা বললো। ভাঙলো না কিছুতেই।

মল্লিকাদের ওখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ছ'টা প্রায় বাজে। কিছু করবার নেই। কি করা যায়, আর কোথায় যাওয়া যায়, অনেকক্ষণ ভাবলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম লাইট হাউসে।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট করছি, হঠাৎ দেখি, রেবাকে নিয়ে হল ঢুকছে দিলীপ।

রেবা আমায় দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু আমি আর দাঁড়ালাম না। টিকিটও কিনলাম না। সোজা বেরিয়ে এসে বাড়ি ফিরে এলাম।

তার পরদিন সকাল বেলা সবে মাত্র চা খেয়ে কাগজ পড়ছি, এমন সময় চাকরটা এসে বললো, "নিচে এক ভদ্রমহিলা ট্যাক্সিতে বসে আছেন। আপনাকে জামাটা গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়তে বলছেন। কোথায় নাকি যেতে হবে আপনার সঙ্গে।"

নিচে নেমে দেখি মল্লিকা। মল্লিকা আমায় নিয়ে গেল তাদের বাড়ি। বললো, "ভীষণ দরকার।" কি দরকার বলতে চাইলো না কিছুতেই।

সুবিমল আমায় দেখে বললে, "আমি একটু বেরোচ্ছি, তুই বোস। আজ এখানে খেয়ে যাবি। আমি ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই।"

মল্লিকা আমায় বসিয়ে গেল তাদের শোবার ঘরে। বললো, "আপনি বসুন। আমি চা করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। পেছন থেকে দু'টি ফর্সা হাত এসে চুড়ি ঠুনঠুন করে চায়ের কাপ সামনে নামিয়ে রাখলো। মুখ তুলে দেখি রেবা চৌধুরী।

"তুমি?"

"হ্যাঁ, আমিই তোমায় ডাকিয়ে এনেছি," রেবা উত্তর দিলো। তারপর বসলো সামনে মাটির উপর।

আমি চুপ করে রইলাম।

রেবা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "কাল আমায় লাইট হাউসে দিলীপ দা'র সঙ্গে দেখে তুমি রাগ করে চলে গেলে কেন?"

"রাগ করবো কেন? এমনি চলে গেলাম।"

রেবা হাসলো। বললো, "আচ্ছা মানলাম রাগ করো নি। কিন্তু দিলীপ দা' তোমার বন্ধু। তুমি ওকে আজো চিনলে না? ওর মতো ভালো লোক আমি দেখি নি। কাল মল্লিকাদি'র ওখান থেকে বেরিয়ে হস্টেলে ফেরার পথে ফেরাজিনিতে গিয়েছিলাম পেস্ট্রি কিনতে। দেখি দিলীপ দা' বসে আছে। বললো, 'আপনি যে আসবেন আমি জানতাম।' আমি শুনে প্রথমটা অবাক। তারপর মনে পড়লো যে, হ্যাঁ, মল্লিকা দি'কে একবার বলেছিলাম বটে যে হস্টেলে যাওয়ার সময় একবার ফেরাজিনি হয়ে যাবো। দিলীপ দা' বললো,

দাঁতের ক্ষয় ও মুখের

দুর্গন্ধ দূর করুন ঃ
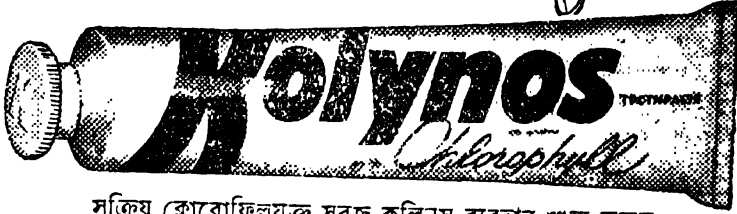
সক্রিয় ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ কলিনস ব্যবহার শুরু করুন

সবুজ কলিনস টুথপেস্ট কিনে নিন — এতে প্রকৃতির বিস্ময়কর
উপাদান সক্রিয় ক্লোরোফিল আছে। দন্তক্ষয় রোধে
এযে অনেক বেশী শক্তিশালী ··· এতে যে আপনার দাঁত
অনেক বেশী সুস্থ ও সুদৃঢ় থাকে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।
দুর্গন্ধশূন্য ঝরঝরে মুখ আর ঝকঝকে হাসি চানতো
সক্রিয় ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ কলিনস ব্যবহার করুন
···ক্লোরোফিলযুক্ত ফেনাই এর বৈশিষ্ট্য।

সবুজ কলিনস
··· সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ
ক্লোরোফিল টুথপেষ্ট

**রেজিষ্টার্ড পরিবেশক : জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড**

চা খেতে ঢুকেছিলাম। চা প্যাটিস খেয়ে এখন দেখছি পয়সায় কম পড়েছে। আমায় পাঁচটা টাকা ধার দেবেন?'—টাকা বার করে দিচ্ছিলাম, তখন সে বললে, 'পয়সা খরচা যখন করছেনই, নিজেও এক কাপ চা খেয়ে যান। তা নইলে আমার কোনো সান্ত্বনা থাকবে না। আপনার কাছ থেকে টাকা ধার করে চা খাচ্ছি অথচ আপনাকে খাওয়াচ্ছি না, এ কথা ভাবতেও মনে লাগছে।' কি আর করি, বসলাম দিলীপ দা'র সঙ্গে চা খেতে। কিছুক্ষণ গল্প করার পর দিলীপ দা' বললে তোমার কথা। বললে, 'রঞ্জনটা এমন ইরেস্‌পন্‌সিবল্‌। কাল বলেছিলো লাইট হাউসে দুটো টিকিট করে রাখতে। করলাম ওর কথামতো। আজ বললে, ওর সময় নেই, অন্য কি কাজ আছে, যেতে পারবে না। এখন বলুন তো কি মুস্কিল, কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে টিকিট বেচবার চেষ্টা করা আমার পোষায় না, ওসব রঞ্জন পারে। এখন আপনি যদি সিনেমা দেখতে রাজী হন তো ভালো, তা নইলে টিকিটটা মিছেমিছি নষ্ট হবে।' —কি আর করা যায়। এমন ভাবে বললে, না গিয়ে পারলাম না। তাছাড়া, মনটাও খুব খারাপ ছিলো।"

শুনে আমি চুপ করে রইলাম। কোনো কথা বললাম না।

"জানো রঞ্জন, আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে," রেবা আস্তে আস্তে বললো।

আমি চমকে উঠলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কে ঠিক করলো, তুমি নিজে?"

"না।"

"তোমার মা ঠিক করেছেন তা'হলে? সে হবে না—তোমার মাকে গিয়ে বলো—"

আমার কথার মাঝখানে থামিয়ে রেবা বললো, "আমার তো মা নেই। মারা গেছেন অনেক দিন।"

তখন মনে পড়লো। হ্যাঁ, রেবা বলেছিলো বটে। সে পশ্চিমে বড়ো হয়েছে। ওর মা সেখানেই মারা গেছেন ও যখন খুব ছোটো। ওর বাবাও পশ্চিমে থাকেন। তাই রেবা হষ্টেলে থেকেই পড়াশুনো করে।

"বিয়ের ঠিক করেছেন আমার বাবা," রেবা আস্তে আস্তে বললো, "উনি আজ কলকাতায় আসছেন। সামনের মাসে বিয়ে।"

"আমি গিয়ে বলবো তোমার বাবাকে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি আমার বাবাকে চেনো না।"

টেবিলের উপর একটি টেলিগ্রাম পড়েছিলো। হঠাৎ তলায় নামের উপর চোখ পড়লো। নাম লেখা আছে দর্পনারায়ণ চৌধুরী।

"দর্পনারায়ণ চৌধুরী!" আমি হঠাৎ বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ। আমার বাবা। তুমি চেনো নাকি?" রেবা জিজ্ঞেস করলো।

"দর্পনারায়ণ চৌধুরী তোমার বাবা?" আমি অবাক, "তার মানে, তুমি জুলেখা বাঈয়ের মেয়ে?" ফস করে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

রেবা বিষণ্ণ চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। [ক্রমশঃ।

আমি-শ্লোক

কমলাপ্রসাদ ঘোষ

আমার মৃত্যু আছে, আমি-র মৃত্যু নাই।
আমি সুন্দর, আমার-সীমায়
আমি নির্বিকল্প, অসীম সদাই।
আমার অন্ত আছে, আমি অনন্ত অশান্ত সুষমায়।
আগম-নিগম-নিগূঢ়-নিগদ আমি,
আমি মৃত্যুঞ্জয়,
মহামৃত্যুঞ্জয় আমি হরিহর নির্নিমিত্ত সমন্বয়।
আমি মহা-ওম্, আমিই চতুর্মুখ,
আমি উপনিষদের আপ্তবাক্য সেই ভূমৈব সুখ।
আমি আনন্দ, আমি সেই রসো বৈ সঃ;
আমি মহাবোধি মধুর-ভক্তি, আমি প্রেমবেদ অপৌরুষেয়,
সীমাহীন কোটি-কল্প আমার আমি উপান্ত,
আমার সে-আমি সদাই অনুধ্যেয়।
আমি চিন্ময় সার্বভৌম, আমি মহাকাশ-অনাদি-শূন্য,
আমি অচিন্ত্য পূর্ণপ্রজ্ঞা, আমি রূপারূপ, ধর্মপুণ্য।
আমি মহানির্বাণ,
বিশ্ব-সৃষ্টি-শতদল-সম্পুটে
আমি সত্যের-গূঢ়-গুহালীন লুপ্ত ও অলুপ্ত প্রাণ।

খেলাধুলা

গত ১৬ই নভেম্বর বিশ্ববিশ্রুত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়রা সাউথ ক্লাবে দু'দিন প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। জ্যাক ক্র্যামার, কেন রোজওয়াল, লুই হোড এবং পাঞ্চ সেগুরা খেলায় যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাহা অভূতপূর্ব্ব! বিশ্ব-টেনিসে এঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য্য। এঁরা প্রতিদিন দুইটি করে সিঙ্গলস এবং একটি করে ডাবলসের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এখানকার খেলায় সবচেয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন অষ্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়াল। এর পরই প্রশংসা অর্জ্জন করেছে দলপতি জ্যাক ক্র্যামার। সব চেয়ে নিরাশ করেছেন উপর্য্যুপরি দু'বার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান লুই হোড।

সাউথ ক্লাবের কোর্ট সম্পর্কে জ্যাক ক্র্যামারের অভিমত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস কোর্ট। লুই হোড বলেছেন—মাঠ চমৎকার—উইম্বলডন কোর্টের মত।

এই কীর্তিমান পেশাদার খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী খেলা দেখার জন্য কলকাতায় দর্শকদের মধ্যে একটা আলোড়ন এনে দিয়েছিল। টিকিটের অভাবে অনেক দর্শক হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন। প্রদর্শনী টেনিস খেলার ফলাফল:—

প্রথম দিনের খেলা

কেন রোজওয়াল ৬-৩, ৬-৩ সেটে লুই হোডকে পরাজিত করেন, পাঞ্চ সগুরা ৬-৪ ও ৭-৫ সেটে পরাজিত করেন জ্যাক ক্র্যামারকে।

ডাবলসের খেলায় ক্র্যামার ও সেগুরা ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে কেন রোজওয়াল ও লুই হোডকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা

কেন রোজওয়াল ৭-৫ ও ৭-৫ সেটে সেগুরাকে পরাজিত করেন ও জ্যাক ক্র্যামার লুই হোডকে পরাজিত করেন ৬-৩, ২-৬ ও ৬-৩ সেটে।

ডাবলসের খেলায় হোড ও রোজওয়াল ৬-২, ১-৬ ও ৬-৩ সেটে ক্র্যামার ও সেগুরাকে পরাজিত করেন।

* * *

বাঙলার টেবিল টেনিসের জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান দীপক ঘোষ এবার জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ানসিপ ছাড়াও সিনিয়র বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে। জুনিয়ারের খেলায় দীপক ঘোষ অন্যতম জুনিয়র খেলোয়াড় হ্যারীওকে আর সিনিয়র বিভাগের ফাইন্যালে খ্যাতনামা খেলোয়াড় জ্যোতির্ময় ব্যানার্জিকে পরাজিত করেছেন। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে পরাজিত করে দীপক ঘোষের এ চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। দীপক ঘোষের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল বলে মনে করি।

বেঙ্গল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপের মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ান কুমারী উষা আয়েঙ্গার স্ট্রেট গেমে মিসেস চমন কাপুরকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফ্যাইনাল—দীপক ঘোষ ২১—১৪, ১৮—২১, ১৪—২১, ২১—৭ ও ২১—১০ পয়েন্টে জ্যোতির্ময় ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি ও সমীর চ্যাটার্জি ১৭—২১, ২১—১৪, ২১—১০ ও ২১—১১ পয়েন্টে দীপক ঘোষ ও পি মিত্রকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিঙ্গলস ফ্যাইনাল—দীপক ঘোষ ২১—৮, ২১—৯ ও ২৮—২৬ পয়েন্টে হ্যারীওকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস ফ্যাইনাল—কুমারী উষা আয়েঙ্গার ২১—১০, ২১—১৬ ও ২২—২০ পয়েন্টে মিসেস চমন কাপুরকে পরাজিত করেন।

* * * *

ইডেন উদ্যানের ইনডোর ষ্টেডিয়ামে পূর্ব্বাঞ্চল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপের খেলা শেষ হয়ে গেছে। পূর্ব্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন রেলওয়ে খেড়োয়াড় কে, নাগরাজ। এই খেলায় ভারতের প্রায় সকল কুশলী খেলোয়াড়কেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু নাগরাজ ও থিরুভেঙ্গাডেম ছাড়া খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছাড়া আর কেউ অংশ গ্রহণ করেননি।

নাগারাজের বিরুদ্ধে বাংলার জুনিয়র খেলোয়াড় দীপক ঘোষ যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তা সত্যই প্রশংসনীয়! দীপক ঘোষ পাঁচটি গেমের মধ্যে দুটি গেম লাভ করেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় খেলা হচ্ছিল জ্যোতির্ময় ব্যানার্জির সঙ্গে থিরুভেঙ্গাডেমের খেলা।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল, কে নাগরাজ ১১-২১, ২১-১৫, ২১-৯, ২১-২ পয়েন্টে টি থিরুভেঙ্গাডেমকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস, টি থিরুভেঙ্গাডেম ও কে নাগরাজ ২১-১০, ২১-১২ ও ২১-১২ পয়েন্টে সমীর মুখার্জি ও জ্যোতির্ময় ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস, সরোজ ঘোষ ও কুমারী উষা আয়েঙ্গার ২০-২২, ২১-১৫, ২১-২৩ পয়েন্টে দীপক ঘোষ ও মিসেস চমন কাপুরকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস, কুমারী উষা আয়েঙ্গার ১৮-২১, ২১-১৮, ২১-১৩ ও ২১-১৩ পয়েন্টে মিসেস চমন কাপুরকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিঙ্গলস, দীপক ঘোষ ২১-১৫, ১৩-২১, ২১-১৩, ও ২১-১৫ পয়েন্টে হ্যারীও'কে পরাজিত করেন।

রোভার্স কাপ

এবারে রোভার্স কাপ লাভ করেছে হায়দ্রাবাদ সিটি পুলিশ দল। গতবারের রোভার্স বিজয়ী ও এবারে কলকাতার ফুটবল লীগের চ্যাম্পিয়াম মহামেডান স্পোর্টিং দলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করেছে।

২

এবারে হায়দ্রাবাদ পুলিশ রোভার্স কাপ লাভ করায় এ বছর আর কোন দলের পক্ষে 'ত্রিমুকুট' লাভের সম্ভাবনা রইলো না।

কলকাতার প্রধান চারটি দলই এবার রোভার্স কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ইষ্টবেঙ্গল দল তৃতীয় রাউণ্ডে বোম্বাইয়ের ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবের কাছে ৩-১ গোলে পরাজয় বরণ করেছে। মোহনবাগান দল কোয়ার্টার ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশের কাছে ২-১ গোলে পরাজয় বরণ করে। আর রাজস্থান দল মহামেডান স্পোর্টিং-এর কাছে ২-০ গোলে পরাজয় বরণ করে।

হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের এবারকার রোভার্স বিজয় সত্যই গৌরবজনক। কারণ, পুলিশ দলের অনেক কুশলী খেলোয়াড় দল পরিত্যাগ করে নানা দলে যোগদান করেছেন। তরুণ ও কয়েক জন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় নিয়ে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল এবার নিয়ে ছ'বার রোভার্স বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করে।

রোভার্স কাপের খেলা শেষ হওয়ার মুখে বোম্বাইয়ের রেফারীরা ধর্মঘট করেন। বোম্বাইয়ের রেফারীদের সংগে মতবিরোধ ঘটে মোহনবাগান ও হায়দ্রাবাদ পুলিশের খেলা নিয়ে। রেফারীজ এসোসিয়েসন ঠিক করেন গোডিহোনকে কিন্তু প্রতিযোগিতা কমিটির গোডিহোনের উপর আস্থা না থাকায় তাঁরা ভার দেন অপর একজন রেফারীকে। এতে স্বাভাবিক ভাবে ক্ষুব্ধ হন বোম্বাইয়ের রে- এর জন্যে খেলা পরিচালনা করতে তাঁরা অসম্মত হন। হাতের বিলাতের পাশ করা এ. পি. সিংহকে পাওয়ায় খেলা রক্ষা। এদিকে 'এস ও এস' কলকাতা, দিল্লী থেকে রেফারী চেয়ে প- বাঙলা থেকে জ্যোতি দত্ত ও দিল্লী থেকে এস লাটাগ যোগ- করেন। শেষ পর্য্যন্ত এঁরাই এবার রোভার্স কাপের শেষ খে- খেলান। কিন্তু পশ্চিম-ভারত ফুটবল এসোসিয়েসনের উচিৎ বোম্বাইয়ের রেফারীদের সংগে একটা মিটমাট করে নেওয়া।

• • • •

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবারেও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবার বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছে। ইং ১৯৫০ ও ১৯৫২ সালে ইষ্টবেঙ্গল দল এ গৌরব অর্জন করে। ইষ্টবেঙ্গল, রাজস্থান ও রেলওয়ে স্পোর্টস তিনটি দলের যো- কথা ছিল। শেষ পর্য্যন্ত রাজস্থান দল অংশ গ্রহণ ক- ফাইনালে কলকাতার দুটি দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শে- ইষ্টবেঙ্গল দল ২—০ গোলে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজি- দিল্লী ক্লথ মিলস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার গৌরব করে।

অভয়

[স্বামী বিবেকানন্দের 'To An Early Violet' কবিতা থেকে]

ভাববার কি গো শয্যা তোমার যদিই সুকঠিন মাটি,
আবরণী হয় যদি বা দারুণ হিমেল ঝঞ্ঝা;
কি হয়েছে যদি চলিবার পথে কোনও সঙ্গী নাহি,
যদি বৃথা হয় সুবাস ছড়ানো বিশ্ব পর;
কিবা ক্ষতি আর প্রেমের সাধনা যদিই বিফল হয়
তোমার সুবাস অনর্থ দেয়া এ বাতাসে
কিবা আসে-যায় উত্তম মাঝে অধমের পরাভব
এবং অন্যায় ন্যায়কে নাশলে কি যায়-আসে:—
স্নিগ্ধ প্রসূন তথাপি রাখিও স্বভাব অপরিবর্তিত,
হে ক্ষণকুসুম, তুমি মধুময় পবিত্র,
ঢালিয়ো নিয়ত তোমার অতুল সুরভিধারা
অযাচিত, পরিমিতি বিহীন ও নিশ্চিত!

অনুবাদ : শিপ্রা পিয়ালী।

রঙ্গপট

চুরি করা পাপ নয় ?

জাতীয় জীবনে চলচ্চিত্র আজ একটি বিশেষ আসন অধিকার করে আছে। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, নিজের প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই চলচ্চিত্রের শিল্পগত উন্নতিও যথেষ্ট হচ্ছে এবং উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে। আজকের দিনে চলচ্চিত্রের একটি দৈন্য আমাদের বিশেষ ভাবে ব্যথিত করে—সেটি তার কাহিনীর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বহু ছবির কলাকৌশল, অভিনয়ধারা, অন্যান্য বিভাগসমূহে কৃতিত্বের ছাপ পাওয়া গেলেও তার কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় না। ছবির একটুখানি দেখা গেলেই বোঝা যায়, "এটা অমুক বই থেকে।" এমনও দেখা গেছে, একটি বিদেশী ছবিকে কেন্দ্র করে পর পর চারখানি বাঙলা ছবি গড়ে উঠেছে। এই চৌর্যবৃত্তি সাহিত্যের তীর্থভূমি বাঙলা দেশে ঘটতে দেখলে অপরিসীম ব্যথার উদ্রেক করে। আজকে বাঙলা ছবি যারা বিশ্ববাসীর দরবারে আহ্বান পাচ্ছে পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে আজ আমাদের এই হীনতা প্রকাশিত হয়ে গেলে সেটি বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-পদধূলিধন্য বাঙলা দেশের লজ্জাই বৃদ্ধি করবে, সম্মান নয়। আমাদের কাহিনীকারদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

চন্দ্রনাথ

বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অবিস্মরণীয় অবদানগুলির মধ্যে চন্দ্রনাথ অন্যতম। চন্দ্রনাথের গল্পাংশ আজকের দিনে আর নতুন করে বলার কোন অর্থ হয় না। এর আগেও অভিনয়-জগতে চন্দ্রনাথের কয়েক বার পদার্পণ ঘটেছে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছবি বিশ্বাসকেও এর নামভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গেছে। চন্দ্রনাথের কাহিনীর সারাংশে রামায়ণের অনেক ছায়া পড়ে, তবে বাল্মীকির রামায়ণ বিচ্ছেদধর্মী কিন্তু শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ মিলনধর্মী। সীতার সঙ্গে রামের মিলনের কাহিনী রামায়ণে পাওয়া যায় না কিন্তু শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে সরযূকে। আর এইখানেই বাল্মীকির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তফাৎ। মূল কাহিনীতে কৈলাসখুড়োর মৃত্যুতে কাহিনীর পরিসমাপ্তি, এতে সপরিবারে চন্দ্রনাথের কাশী ত্যাগের পরই "সমাপ্তি" ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে করে ছবির বিন্দুমাত্র রসহানি ঘটেছে বলে মনে হয় না। ছবিটির মধ্যে কয়েকটি অসঙ্গতি বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে, শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় সরযূকে প্রথমে আমরা একটি দশমবর্ষীয়া বালিকারূপে দেখতে পাই কিন্তু ছবিতে গোড়া থেকেই সুচিত্রা সেনকে দেখতে পাচ্ছি সরযুর ভূমিকায়। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বাঙলাদেশে কি ওপথালমিস্টের অভাব ঘটেছে ? যে সরযু বিবাহের পর অনেক দিন গত হওয়া সত্ত্বেও ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হয়ে থাকে, ভাল করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না, সেক্ষেত্রে তার মুখে গান জুড়ে দেওয়াটা অত্যন্ত অশোভন হয়েছে। একজন দোষ করে কিন্তু তার ফলভোগ করে আর একজন নির্দোষী—এই যে নিষ্ঠুর প্রথা দিনের পর দিন ধরে সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছে তারই মুখর প্রতিবাদরূপে শরৎ-লেখনীর আবির্ভাব ও সার্থকতা। যাদের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্রের বঞ্চিতদের প্রতি বেদনা রূপলাভ করেছিল চন্দ্রনাথ তাদেরই অন্যতম। যখন চন্দ্রনাথ কাশী যাচ্ছে নির্বাসিতা সরযুর সন্ধানে, সেই সময়ে কাকার সঙ্গে তার বাক্যবিনিময় হয়—সেই অধ্যায়ের সংলাপগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী। ছবিতে সেই অধ্যায়টি প্রায় বুড়ী-ছোঁয়ার মত দেখানো হয়েছে।

চিত্রগ্রহণের কাজ প্রশংসনীয়। সঙ্গীতাংশ প্রশংসনীয় না হলেও খারাপ নয়। অভিনয়াংশে সকলের চেয়ে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়। ছোট চরিত্রে রীতিমত দাগ রেখে গেছেন তিনি। সুচিত্রা সেনের অভিনয়ের মধ্যে সঙ্কোচ, লজ্জা এবং ভীতির, চিহ্নগুলি অপূর্বভাবে রূপায়িত হয়েছে। উত্তমকুমার তাঁর সুনাম বজায় রেখেছেন। অভিনন্দন জানাই জহর গঙ্গোপাধ্যায়কে। চন্দ্রাবতী দেবী, পদ্মা দেবী, রেণুকা রায়, কমল মিত্র, তুলসী লাহিড়ী ও চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান বাবলা স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি।

জন্মতিথি

ছকে বাঁধা গতানুগতিক পথ ধরে বাঙলায় ছায়াছবি যখন গড়ে উঠছে সেই সময় জন্মতিথির আবির্ভাব সত্যই প্রশংসার যোগ্য। নতুনত্বের দিক দিয়ে, চিন্তার দিক দিয়ে, বক্তব্যের দিক দিয়ে ছবিখানি দর্শক-সাধারণের প্রশংসাভাজন হবে বলে আশা করা যায়। ছবিটির কাহিনী গড়ে উঠেছে দু'টি বালককে কেন্দ্র করে। তারাই ছবির নায়ক। অনাথ আশ্রমের দু'টি বালক সেখানকার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে এসে যত রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সেই সম্বন্ধেই একটি ইতিবৃত্ত এখানে বর্ণিত হয়েছে। শিশুমনের ভাবধারা তার কল্পনা, তার মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত, অনুভূতি, বিবেক প্রভৃতি সম্যকভাবে রূপলাভ করেছে। শিশুদের মনের এই বিভিন্ন ক্রিয়া পরিবেশন করে ছবিটির শ্রীবৃদ্ধি করা হয়েছে। অসঙ্গতি ও দোষ-ত্রুটি যা আছে তাও চোখ থেকে এড়ায় না। যেমন আশ্রমের অধ্যক্ষটিকে প্রাণহীন, নির্দয়রূপেই প্রথম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তাঁর যত অত্যাচার এবং যত নির্দয়তা কি ঐ পল্টু আর ভ্যাবলার বেলাতেই ? হরিপদ বাবুকেই ষ্টেশনটিতে বরাবর একলাই দেখে এসেছি (মফঃস্বলের ষ্টেশনে যা হয়ে থাকে) ছেলে দু'টির টিকিট কাটার সময়েই হঠাৎ ভুঁইফোড় ভাবে আর একজনকে দেখা গেল, এ যেন হরিপদ বাবুকে সেখানে দেখানো হবে না বলেই আর একজনকে দেখানো। মফঃস্বলে একটু গভীর রাত্রিতে নিস্তব্ধ অঞ্চলে আশে-পাশের ঘর থেকে শব্দ রীতিমত ভেসে যায় খানিক দূর অবধি—ফিস্ ফিস্ করে নয়, বেশ জোরেই

ভাবনা পল্টু যখন চলে যাবার শলা-পরামর্শ করছে হরিপদ বাবুর স্ত্রী জেগে থাকা সত্ত্বেও তা শুনতে পেলেন না! পল্টুকে পরে দেখছি সে বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে এবং অনাথও নয় কিন্তু কি করে সে অনাথ আশ্রমে গিয়ে পড়ল সে সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করা হয় নি আর ভাবনার পরিচয় তো অপরিচয়ের অন্তরালেই রয়ে গেল। অভিনয়াংশে সবচেয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন শ্রীমান্ বাবুয়া—উদ্দেশে পল্টুর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটিতে তাঁর অভিনয়-প্রতিভার একটি অবিস্মরণীয় ছাপ রয়ে গেল। শ্রীমান্ বিভুও সু-অভিনয় করেছেন, তবে এঁদের দু'জনকে উচ্চতার দিক দিয়ে একটু বেমানান দেখায়। জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, বিপিন গুপ্ত, অনুপকুমার, প্রেমাংশু বসু, ভানু চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, মণি শ্রীমানী, বেচু সিংহ, সুনীল দাস, মলিনা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী, প্রভৃতি শিল্পিগণ সু-অভিনয়ই করেছেন। বিশ বছর বাদে অশীতিপর বৃদ্ধ তারক বাগচীকে আবার দেখা গেল, ছোট-ভূমিকায়। নির্বাক ভূমিকায়ও তিনি প্রমাণ করলেন যে তাঁর পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণই আছে। জিলিপির দাম দেওয়া নিয়ে ও রিটার্ণ টিকিটের ব্যাপার নিয়ে যে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে সেই প্রচেষ্টাও সার্থক হয়েছে। সঙ্গীতে ও চিত্রগ্রহণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যথাক্রমে কালীপদ সেন ও ধীরেন দে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন "কেরাণীর জীবন"-খ্যাত শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়।

পথে হ'ল দেরী

বাঙলা ছায়াছবির সর্ব্বাঙ্গে প্রথম রঙের পরশ লাগল উপরোক্ত ছবিটিতে। রঙে রঙে রঙিন করে, বাঙলার জনপ্রিয় তারকাযুগলকে প্রধান ভূমিকাগুলি দিয়ে, সাজসজ্জার দিক দিয়ে ঝলমল করে তুলে দর্শকদের ছবিটি উপহার দিয়েছেন অগ্রদূত। শুধুমাত্র চাকচিক্য আর জৌলুষ দেখেই যাঁরা তৃপ্তিলাভ করতে চান তার উপর উত্তম-সুচিত্রার অনুরাগী যাঁরা, তাঁরা যে বিশেষভাবে এই ছবিটি দেখে তৃপ্ত হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় কিন্তু যাঁরা ভাবতে চান, যাঁরা চিন্তা করতে চান, যাঁরা বিচার করতে চান এবং এতগুলির পর যাঁরা ভাল কি মন্দ বিচার করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, এ ছবির মধ্যে তাঁরা কিন্তু পরিতৃপ্তির কণামাত্র আহরণ করতে সক্ষম হবেন না। কাহিনীর মধ্যে অভিনবত্ব কিছুই নেই, এর আবেদন এখনকার দিনে আর কারোর মনেই রেখাপাত করে না। সেই গতানুগতিক ভাবে খোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড় করে কত দিন চলবে? চটক দেখিয়ে বাজার মাৎ করার যুগ এখন চলে গেছে। শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাট ধনী, বিশিষ্ট ধনী প্রমথেশের সঙ্গে নাতনী মল্লিকার বিয়ের ঠিক করেন, মল্লিকা ভালবাসে গরীব ডাক্তার জয়ন্তকে, শ্রীপতির অর্থগর্বে ঘা লাগে, জয়ন্তও সেটা বুঝতে পারে, মল্লিকার টাকায় সে বিলেত যায় (তার আগেই তারা নিজেরা হিমালয়কে সাক্ষী রেখে পরস্পর পরস্পরকে স্বামি-স্ত্রী রূপেই গ্রহণ করে) সেখান থেকে পত্র-বিনিময় চলতে থাকে, শ্রীপতির কৌশলে এই পত্রযোগের সূত্র ছিন্ন হয়, জয়ন্তকে জানান হয় যে মল্লিকার পূর্ণ সম্মতিতে প্রমথেশের সঙ্গে তার বিবাহ হচ্ছে, মল্লিকা জানতে পারে যে আরতি নাম্নী একটি মেয়ের সঙ্গে জয়ন্ত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রমথেশকে বিয়ে না করার জন্য মল্লিকা গৃহত্যাগ করে ও নিজের শিক্ষয়িত্রী লতিকার বাড়ীতে এসে ওঠে। হঠাৎ ঘটনাচক্রে জয়ন্তর সঙ্গে মল্লিকার মিলন হয়, তখন মানসিক আঘাতের ফলে সে রীতিমত অসুস্থ ও শয্যাশায়িনী, অনেক সেবা-শুশ্রূষা ও

সুচিত্রা সেন

পরিচর্যার ফলে মল্লিকার আরোগ্যলাভ, সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান ও মধুময় পুনর্মিলন। সমস্ত গল্পটি যেন একটি ছকে বাঁধা—সেই ছক ধরে তার গতিধারা বয়ে চলেছে। দৃশ্য পরিবর্তনের একই পদ্ধতির প্রত্যেক বার প্রয়োগ একঘেয়ে মনে হয়। অতিরিক্ত বর্ণচ্ছটায় "টাইটেল পেজ"গুলি অতিকষ্টে পড়তে হয়। জয়ন্তর মত একজন সংযত ভদ্রলোকের পক্ষে হাসপাতালের নার্সের সঙ্গে ঐ জাতীয় রসিকতা মোটেই সমর্থন করা যায় না। হাসপাতালটির মধ্যে হাসপাতাল-সুলভ আবহাওয়া দেখতে পেলুম না। জয়ন্তকে বাদ দিলে দুটি ডাক্তার এবং একটি নার্স (অবশ্য বারেকের জন্যে আর একটিকে দেখেছি) ছাড়া হাসপাতাল জনশূন্য, (ভূতুড়ে ব্যাপার না কি?) মল্লিকাকে দিয়ে "ফিস" (fees) না বলিয়ে "অনরেরিয়েম" (honorarium) বলালেই ভালো হোত। শ্রীপতিকে হঠাৎ দর্শকদের সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল, তাঁর প্রসঙ্গ তখনই কিন্তু শেষ হয়নি, কাহিনার পরিণতি জানা গেছে, তারপরেই কৌতূহল হয় যে যাঁর জন্যে এত গোলযোগ তিনি শেষ অবধি কি করবেন, নিজের গোঁ ধরেই বসে থাকবেন না হাসিমুখে এদের আশীর্বাদ করবেন—এ সম্বন্ধে আমরা কোন উত্তরই ছবিটি থেকে পাইনি। সমগ্র কাহিনীটিতে একটি কালো ছাপ এঁকে দিয়ে গেছে এর সঙ্গীত পরিচালনা। সঙ্গীত পরিচালনা যে কত নিকৃষ্ট হতে পারে এবং সঙ্গীতের চিত্তহারী মৃদু-মূর্ছনার পরিবর্তে যে কতরকম বীভৎস শব্দ-তাণ্ডব সৃষ্টি করে দর্শককে বিরক্ত করা যায়, তারই একটি দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে সকলের আগে উল্লেখ করব অনুপকুমারের নাম। তাঁর মত প্রতিভাবান শিল্পীকে নিয়ে চিত্রজগৎ আজ অনায়াসে গর্ব করতে পারে। সুচিত্রা সেনের অভিনয় মুগ্ধ করেছে আমাদের। তাঁর শেষের দিকের অভিনয় ভোলবার নয়। মানসিক আঘাতগ্রস্ত শোকার্তা রোগিনীর অসহায়া করুণ কাতর রূপটি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলে সমগ্র দর্শককে অভিভূত করে তোলেন সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী বর্তমানে ইয়োরোপ-বিহারিণী সুচিত্রা সেন। উত্তমকুমার সু-অভিনয় করেছেন এইটুকু বলা যায়। ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী ও শোভা সেন স্ব স্ব চরিত্রগুলি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কমলা মুখোপাধ্যায় ও গোপাল মজুমদারকেও আমরা প্রশংসা করি তাঁদের চরিত্রোপযোগী সু-অভিনয়ের জন্য। এই দুই নবাগত শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা উন্নতি কামনা করি। এঁরা ছাড়া রূপায়ণে আছেন মিহির ভট্টাচার্য্য, শিশির বটব্যাল, শ্যাম লাহা, বিনয় লাহিড়ী, ভারতী দেবী, চিত্রিতা মণ্ডল প্রভৃতি। ছবিটির প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ভারতের স্বনামধন্য প্রচারবিদ শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল।

এই ছবির কর্মিবৃন্দের মধ্যে আর একজনকে আমাদের প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই—যাঁর অবদান ছবিটির সারা দেহে মাখানো রয়েছে, তিনি হচ্ছেন শিল্পনির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরী। এঁর শিল্পসজ্জা সত্যিই প্রশংসনীয়—অপূর্ব! শুধু মাত্র রঙে-রসে-চাকচিক্যে ভরপুর এই ছবির অন্তঃসারশূন্য কাহিনীটি রচনা করেছেন শ্রীমতী প্রতিভা বসু। দুঃখের বিষয়, তাঁর লেখনী এখানে প্রতিভার কিছুমাত্র ছাপ রেখে যেতে সমর্থ হল না।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

খ্যাতিমান সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর "কালামাটি" পরিচালিত হচ্ছে বাঙলার গৌরব তপন সিংহের দ্বারা। সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন বিশ্ববন্দিত শিল্পী রবিশঙ্কর। রূপারোপের দায়িত্ব পড়েছে অসিতবরণ, জীবেন বসু, অনুপকুমার দিলীপ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, রসরাজ চক্রবর্তী, উইলিয়াম ব্রুক, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, মানসী সোম, আভা মণ্ডল, নমিতা দত্ত প্রভৃতি শিল্পীদের উপর। • • "চাপা" ছবিটি পরিচালনা করছেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। কালীপদ সেন করছেন সঙ্গীত পরিচালনা। জহর গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, এম জ্যাকেরিয়া, শ্রীমান শ্যামল, অনুভা গুপ্তা, তপতী ঘোষ প্রভৃতি এতে করছেন অভিনয়। • • "মমবাণী" ছবিটি গড়ে উঠছে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায়। সঙ্গীত-পরিচালকরূপে ঘোষিত হয়েছে বরেণ্য সুরকার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের নাম। অভিনয়াংশে দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমকুমার, অনুপকুমার, মিহির ভট্টাচার্য, বেণু চৌধুরী, চন্দ্রা দেবী, ছায়া দেবী, মঞ্জু দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, সীমা দত্ত প্রভৃতিকে। • • সতীশ দাশগুপ্তের পরিচালনায় চিত্রায়িত হচ্ছে "নীলাকন্ঠ"। রূপায়ণে আছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, নবকুমার, অনুপকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান বিভু, শ্রীমান তিলক, শ্রীমান্ দেবাশীষ, চন্দ্রা দেবী, তাপসী রায়, রেণুকা রায়, তপতী ঘোষ, নিভাননী, বুলবুল, সীমা প্রভৃতি। • • দক্ষ চরিত্রাভিনেতা গৌর শী রচনা করেছেন "যমালয়ে জীবন্ত মানুষ"এর কাহিনী। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনায় অভিনয় করতে যাঁদের দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, অপর্ণা দেবী, লীলা পালের নাম উল্লেখনীয়। এতে সুরারোপ করছেন শ্যামল মিত্র।

• • • এ মাসের প্রচ্ছদপট • • •

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে একটি গ্রাম্য বালিকার আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হ'ল। আলোকচিত্রী শ্রীজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আইনের ফ্যাসাদ

"ইণ্ডিয়ান ল' ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রধান বিচারপতি শ্রী এস আর দাশ যাহা বলিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আইনের সারবস্তু অনুশীলন (Study of the essence of law) উহার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্ত্তমানে আইন এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, উহার সারবস্তু সমাজ ব্যবস্থার সহিত সম্পর্কহীন অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, আইনকে এই অতীন্দ্রিয় অবস্থা হইতে মানবিক স্তরে নামাইয়া আনিতে না পারিলে আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ন্যায়বিচার এবং সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের দাবী মিটানো সম্ভব হইতে পারে না। আমাদের আরও বিশ্বাস যে, আইন সম্পর্কে গবেষণা শুধু বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক হইলেই চলিবে না, উহা ঐতিহাসিক হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, আইনের যে যে ক্রমাভিব্যক্তি হইয়াছে, সে সম্পর্কেও গবেষণা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রয়োজন কি, সে সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে। যাঁহারা বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকেই বহাল রাখিতে চান, তাঁহারা জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ব্যাপারে কোন মৌলিক পরিবর্ত্তনের বিরোধী। তাঁহারা মনে করেন, বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা—উহার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিতে পারে। শুধু ঐগুলির সংশোধন করিলেই সমাজ ব্যবস্থা দোষ-ত্রুটিমুক্ত হইবে, এই মনোবৃত্তি দ্বারা যদি ইণ্ডিয়ান ল' ইনষ্টিটিউটের গবেষণা কার্য্য পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা জাতির কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না। এই মনোবৃত্তি লইয়া যে গবেষণা করা হইবে, তাহার লব্ধ ফল প্রতিক্রিয়াশীল এবং সমাজের অগ্রগতির বিরোধীই হইবে। আইন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কাজেই ঐতিহাসিক দিক হইতে নিরপেক্ষ ভাবে উহার গবেষণা করা সম্ভবপর বলিয়া আজও প্রমাণিত হয় নাই। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী কোন সত্য গ্রহণযোগ্য হইবে কি?"

—দৈনিক বসুমতী।

সংস্কৃতি সম্মেলন

"কলিকাতা সহরের নাগরিক জীবনের একটি বৃহৎ কৃতিত্ব অথবা গৌরবের সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। কলিকাতা সহর আজিও সংস্কৃতি-সচেতন। সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত ও অন্যান্য চারুকলা সম্পর্কে কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর যে সকল সম্মেলন ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা শুধু সংখ্যার দিক দিয়া নহে, উৎকর্ষের দিক দিয়াও সারা ভারতের যে-কোন নগরের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। রাজধানী দিল্লী তাহার রাজধানীত্বের কারণে সাম্প্রতিক কালে কিছু পরিমাণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ঘটনাস্থলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু দিল্লীর এই গুরুত্ব মূলতঃ সরকারের আনুকূল্যে ও সহায়তায় সম্ভব হইয়াছে। ভারত সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সরকারের সুবিধারই জন্য রাজধানীতে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে, এইমাত্র। স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ ঠিক জনজীবনের আগ্রহ ও প্রেরণার সৃষ্টি নহে, এই কথা বলিলে বোধ হয় দিল্লীর নিন্দা করা হয় না। কলিকাতা সহর এখনও সারা

ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের ধারক হইয়া রহিয়াছে, এই কথা বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। লক্ষ্য করিতে হয়, কলিকাতা সহরে সারা বৎসর ধরিয়া যে সকল সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগের ও আগ্রহের কীর্ত্তি। কোন সন্দেহ নাই, ইহা কলিকাতার জন-জীবনে সাংস্কৃতিক অভিরুচির সেই ঐতিহ্যগত উৎকর্ষ ও প্রাণবত্তার পরিচায়ক। বিশেষ ভাবে কলিকাতার সঙ্গীত-সম্মেলনগুলি নিখিল ভারতীয় প্রতিভার সম্মেলনে পরিণত হইয়া থাকে; এবং সেই হিসাবে কলিকাতা সহরকে উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারা যায়।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ভিত্তি ভঙ্গ হইবে

"বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তবিংশ অধিবেশনে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ যে অভিভাষণ দিয়াছেন, উগ্র হিন্দী প্রচারকদের দৃষ্টি তাহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তিনি এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'ভারতের কতকগুলি লোক' জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক একতার আবশ্যকতা উপেক্ষা করিয়া ভাষার নাম লইয়া জাতীয় একতার বন্ধনকেই ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাঃ সিংহ নিজে হিন্দী ভাষাভাষী। যে বিহার রাজ্যের অধিবাসীরা হিন্দীভাষী বলিয়া পরিচিত এবং যে রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট সরকারী কাজকর্মে অবিলম্বে হিন্দী প্রবর্ত্তনের জন্য তোড়জোড় করিতেছেন, ডাঃ সিংহ সেই রাজ্যের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী। এহেন ডাঃ সিংহই বলিয়াছেন:—'কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সময় ও সাবধানতা দরকার। আমরা যদি তাড়াতাড়িতে একটিমাত্র ভ্রান্ত পদক্ষেপও করিয়া বসি, তবে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। আমরা জোর করিয়া অপরের উপর হিন্দী চাপাইয়া দিতেছি। যদি এই ধারণা কাহারও মনে জন্মে, তবে হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা করিয়া যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে আমরা অগ্রসর হইতে চাই, তাহার ভিত্তিই ভাঙ্গিয়া যাইবে।' অহিন্দীভাষীরা এইরূপ কথা বলিলে অনেক হিন্দী-প্রেমিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কিন্তু ডাঃ সিংহের মত হিন্দীভাষী নেতা যখন এইরূপ পরামর্শ দিতেছেন, তখন হিন্দীপ্রেমিকেরা তাহা নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।"

—যুগান্তর।

সংবিধান পোড়ানো

"পণ্ডিত জহরলাল বলিয়াছেন—জাতীয় পতাকা এবং সংবিধান পোড়ানো মহাপাপ, চরম দেশদ্রোহিতা। জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে এই কথা আমরা মানি, কিন্তু সংবিধানের প্রতি ভক্তিতে কংগ্রেসী কর্ত্তাদের চোখে সাঁতার-পাণি খেলিতে শুরু হইয়াছে কবে? ডাঙ্গে বলিয়াছেন,—ইঁহারাই তিন বছরে তিন বার সংবিধান বদলাইয়াছেন। দশ বছরে নয় বার ভারতের সংবিধান বদলাইয়াছে। সংবিধান পরিবর্ত্তনশীল, উহা বদলাইবার জন্য যে কোন লোক বা দল আন্দোলন করিতে পারে। আমরাও মনে করি, বর্ত্তমান সংবিধান চালু থাকিলে বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংস করিতে আর বছর পঁচিশেক সময়ই যথেষ্ট। উহা বদলাইবার আন্দোলন বাঙ্গলাদেশে আজ না হউক, দুই দিন বাদে হইবেই। তবে এই আন্দোলন রামস্বামী নাইকার প্রদর্শিত অসভ্য পন্থার বদলে সভ্য উপায়ে হউক, ইহাই বাঞ্ছনীয়।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)

টেলিফোন বিভ্রাট

"আগরতলায় টেলিফোনের চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও টেলিফোনের সংযোগ লাইন দেওয়া হইতেছে না। শতাধিক আবেদনকারী ২ বৎসর যাবৎ তার বিভাগের নিকট বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও টেলিফোন পাইতেছেন না। ৩০০ টেলিফোনের বোর্ড হইতে ন্যূনপক্ষে ১০০টি টেলিফোন লাইন দেওয়া যায়। সরকারী টেলিফোন চাহিদা মিটাইতে কোন প্রকার কার্পণ্য করা হয় না যদিও জনসাধারণের অনুরোধ তার নাই বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়া থাকে। তারের সরবরাহ কম ইহাও সত্য। দুই বৎসরের মধ্যে তার না আসার যে কারণই থাকুক, দুই বৎসরের মধ্যে জনসাধারণ একটি টেলিফোনও পাইবে না কেন? তাহাই জিজ্ঞাস্য।"

—সেবক (ত্রিপুরা)।

চোরা-কারবারীকে গম প্রদান

"রাণীগঞ্জের কেশো গনোরিওয়ালা (মৃত) নামে জনৈক গম ডিলারের নামে মাসিক তিন হাজার মণ গমের কোটা ছিল। ইতিপুর্বে এই ব্যক্তি প্রায় ৫০ হাজার মণ গম বিক্রয়ের হিসাব দিতে না পারায় গমের ডিলারসিপ হইতে বঞ্চিত হয়। উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা ঐ নামেই গমের পারমিট সংগ্রহ করে—কিন্তু পুনরায় গমের চোরাকারবার করার জন্য পুলিশ গম সমেত ১টি ট্রাক ধরে—এবং পুলিশ এই ফার্ম্মের বিরুদ্ধে এমন রিপোর্ট দেন যে ইহার আর গম পাইবার কথা নহে। কিন্তু এই ফার্ম্মের খুঁটার জোর এমন যে এই সকল দোষ থাকা সত্ত্বেও মাসিক ২১০০ শত মণ গমের স্থায়ী পরমিট বরাদ্দ হইয়াছে। এই পারমিট পাওয়ার জন্য স্থানীয় শাসক সম্প্রদায়ের কোন হাত নাই।"

—জি, টি, রোড

অনর্থক বদনাম কেন?

"এখানকার তরুণরা ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছে—একথা আমরা কোন দিনই বিশ্বাস করি না। অফিস আদালত চুরি জুয়াচুরীর আড্ডা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহারই মধ্য হইতে, হাওড়া ফৌজদারী কোর্টের কর্ম্মচারী শ্রীমান বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫০০০৲ টাকার একটি থলি রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াও তৎক্ষণাৎ পুলিশে জমা দিয়া অসাধা ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমানের পদোন্নতি বিধান করি কর্ত্তৃপক্ষ সদ্ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কলিকাতার শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার স ইহাকে ধুতি ও শাল দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া উপযুক্ত কাজ করিয়াছেন।"

—পল্লীবাসী (বর্দ্ধমান

শিবাজী কে ছিলেন?

"আনন্দের বিষয়, ভুল স্বীকার করিয়া নেহরু বলিয়াছেন, তি ছেলেবেলায় ইংরাজ ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহা পড়িয়াছিলেন কি না, তাই শিবাজী সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মিয়াছি এখন ধারণা ঠিক হইয়া গিয়াছে (মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের আসন টলিতে দেখিয়াই কি এই দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়াছে?) এখন তিনি ঠিক ইতিহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ইংরাজের লেখা ইতিহাস ভা যে সব ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি ঘোলাটে করিয়া রাখিয়াছে তাহ কোন দিন পরিষ্কার হইয়া যাইত, যদি দৃষ্টি পরিষ্কার না করা পর্য্য হিন্দুরা তাঁহার দলকে ভোট দিতে প্রত্যাখ্যান করিত। বৃদ্ধ সাভারকর এই কথা বড় আগে বলিয়াছিলেন। কংগ্রেসের তর হইতে চেষ্টা হইতেছে, শিবাজী যে তাঁহাদের মতই সেকুলার ছিলেন সে কথা প্রতিপন্ন করার জন্য। শিবাজী মুসলমানদেরও দেখিতেন তাহাদের মসজিদ বানাইয়াছেন, এমন কি আফজল খাঁয়ের কবরের উপর সমাধিটাও তিনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাজেই শিবাজী সেকুলার না হইয়া যাইবেন কোথায়? কিন্তু শিবাজী যে 'এক ধর্ম হইবে ভারত' স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; 'এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' শ্লোগান দিয়াছিলেন সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে তাঁহারা রাজী হইবেন কি? বাপ রে, ওপথে যে জুজুর ভয়!"

—হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)

মাইকের দৌরাত্ম্য

"আজ-কাল লাউডস্পীকারের এত বেশী প্রচলন বাড়িয়াছে যে সহর কি মফঃস্বল সর্ব্বত্রই কোন কিছু একটা সামান্য ব্যাপারেও ইহার ব্যবহার হইতেছে। সহরের পথে ত কথাই নাই অহোরাত্রব্যাপী মাইকের যেরূপ চেঁচানি তাহাতে সাধারণ লোকের নিশ্চিন্তে থাকা দায়। সহরের পথে সামান্য ঔষধি প্রচারের জন্য রাস্তায় বসিয়াও এমন মাইকের গান চলিয়াছে দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন প্রচারের জন্য রিক্সায় করিয়া জনবহুল রাস্তার মধ্যে যখন হুড়াহুড়ি দেখা যায় তাহাতে পথচারীদের বিরক্তির সৃষ্টি করে। অধিকন্তু এই মাইক লইয়া খেলা করিয়া হল্লা সৃষ্টি করা একশ্রেণীর লোকের একটা অভ্যাসগত হইয়া উঠিয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা অনেকবারই উল্লেখ করিয়াছি যে সহরের মধ্যে ইহার দৌরাত্ম্য বন্ধ করা প্রয়োজন। কোন কিছু পূজা বা উৎসবে সমস্ত দিন-রাত্রি ধরিয়া যেভাবে মাইকে গান চলিতে থাকে তাহাতে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ত' ক্ষতি হয়ই অধিকন্তু ইহা সাধারণের পক্ষে খুবই বিরক্তিকর। অনেক দোকান আদিতে লোক জড় করার জন্যও আজকাল মাইক ব্যবহৃত হইতেছে। সহর-জীবনে মাইকের উৎপাত বন্ধের জন্য সরকারী দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এজন্য কারণে অকারণে যথেচ্ছ ভাবে মাইক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে একটি বিল গৃহীত হইতেছে।"

—দীপালি (কাঁথি)

নিজ বাসভূমে

"জনৈক কংগ্রেস সদস্য পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বড় বড় শিল্পে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী কর্মীর আনুপাতিক হার বিবৃত করিয়া জানান যে, বস্ত্রশিল্পে যেখানে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা ৩০ জনের মত, সেখানে অবাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৬১'৭৭ জন। পাটশিল্পে বাঙ্গালীর সংখ্যা মাত্র ২৩'৬৭ জন। ভাষাগত অসুবিধার জন্যও অনেক অবাঙ্গালী শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী যুবকের চাকুরী জোটে না! বাংলাদেশের শিল্প-সংস্থাসমূহে বিশেষতঃ বাঙ্গালী যুবক আজ চাকুরী পায় না। সেখানে অবাঙ্গালীর প্রভুত্ব কায়েমী হইয়া বসিয়াছে। এক শ্রেণীর অবাঙ্গালী শিল্পপতি ইংরাজদের নিকট হইতে শিল্প-সংস্থাসমূহ ক্রয় করিয়া বাঙ্গালী কর্মচারীদের তাড়াইয়া অবাঙ্গালী কর্মচারীদের ঢুকাইতেছেন—বিধান সভার বিভিন্ন সদস্যের বক্তৃতায় তাহা বার বার উপাপিত হইয়াছে এবং ইহা যে কোন রাজ্যই সহ্য করিবে না—তাহা বলা বাহুল্য! বাংলাই একমাত্র রাজ্য যেখানে বাঙ্গালীর মুখের অন্ন অন্যরা কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে আর বাঙ্গালী অসহায়ের মত হা-হুতাশ করিতেছে! ইহা শোভনও নহে, সঙ্গতও নহে। নিজ বাসভূমে আজ বাঙ্গালী পরবাসীর মত অবাঙ্গালী শিল্প-সংস্থার সামান্যতম চাকুরীর প্রত্যাশা হইতেও বঞ্চিত হইতেছে এবং অসহায়ের মত বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।"

—বীরভূম বার্ত্তা।

খাদ্যের ঘাটতি

"সরকারী আদেশে জেলার বাহিরে ইচ্ছামত ধান চাউল চালান দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ধানের দর পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু চাষীকে নিত্য যে জিনিষ কিনিতে হয় সেই সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের কোনটির দাম কমে নাই বরং বাড়িতেছে। বিধান সভার বিরোধীদল সরকারের সহিত খাদ্যঘাটতি সংগ্রামে একমত হইয়াছেন, সুতরাং পল্লী চাষীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য কমাইবার কথা কে বলিবে? অধিক উৎপাদন বাড়াইবার বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু খইলের দাম কমাইবার জন্য সাবসিডি দেওয়ার প্রস্তাব করিতে কোন কৃষক-দরদী পার্টি সদস্যকে দেখা গেল না। ধানের দাম এখন হইতে তিন মাস পর্যন্ত কম থাকা পল্লীর ছোট চাষীর পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ মার্চ্চ মাস পর্যন্ত তাহারা উদ্বৃত্ত ধান এমন কি খাবার ধানেরও অনেকটা অংশ বেচিয়া ঋণ ও অভাব পূরণ করিতে বাধ্য হয়। এপ্রিল, মে দুই মাস কোন গতিকে তাহাদের চলিয়া আবার জুন মাস হইতে অর্থাৎ চাষের সময় হইতে সুরু হয় খাদ্যাভাব হইতে সবকিছুরই অভাব। অধিক ফসল ফলাবে কে? যে চাষী নিজের খাদ্য জোটাইতে পারে না সে গরুর খাদ্য এবং জমির খাদ্যের ব্যবস্থা কি দিয়া করিবে?"

—বীরভূম বাণী।

বর-কনের হাট

"প্রাচীন কালে 'হাট' ব্যবহারিক জীবনে সব রকম আদান প্রদানের একটি কেন্দ্ররূপে গণ্য হইত। পণ্যকে কেন্দ্র করিয়া দেশ বিদেশের মানুষের মধ্যে হইত ভাবের আদান-প্রদান। মিথিলার সুপ্রাচীন হাট এদিক দিয়া একটি বিশিষ্টতার দাবী করিতে পারে, এই হাটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব, এখানকার হাটে বর-কনে হইল একমাত্র পণ্য। প্রাচীন মিথিলা এখনকার দ্বারভাঙ্গা। দ্বারভাঙ্গা মহকুমার মধুবনি হইতে তিন মাইল পশ্চিমে সৌরাঠ নামক গ্রামটি বিবাহের হাটরূপে বিশেষ ভাবে পরিচিত। প্রতি বৎসর ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ মাসে মিথিলার সর্ব্বত্র এই হাট বসার সংবাদ প্রচার হইলেই বিবাহার্থীর আত্মীয়স্বজন দলে দলে হাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সৌরাঠ গ্রামের মধ্যে তিনটি সুবিস্তৃত আমবাগানে ছায়াশীতল গাছের তলায় নির্দ্দিষ্ট হাটের অধিবেশন বসে। আমগাছগুলির আয়তন উহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কত প্রাচীন এই গাছগুলি, তাহা অনুমান করাও শক্ত। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, এই হাটের প্রচলন রামায়ণোক্ত জনক রাজার দ্বারাই আরম্ভ হইয়াছিল।"

—মুর্শিদাবাদ হিতৈষী।

আবগারী বিভাগে দুর্নীতি

"হঠাৎ আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারীদের তৎপরতা যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রামে গ্রামে হানা দিয়া বে-আইনী পচাই মদ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে এই ফসল কাটার সময় সাঁওতাল সম্প্রদায়ই বেশীর ভাগ ইহাদের কোপে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অবশ্য আমরা আদৌ বলিতে চাহি না যে, আবগারী বিভাগ পল্লী অঞ্চলে বে-আইনী মদ তৈয়ারী বন্ধ করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করুক। তবে তাহাদের এই কড়াকড়ি ভাব সহর অঞ্চলে দেখিতে পাইলে সুখী হইতাম। কেবল আমরা নহি, সহরের প্রায় প্রত্যেক অধিবাসী

জানেন কোন দোকানে অবাধে, প্রকাশ্যে এবং বেপরোয়া ভাবে মদ বিক্রয় হইয়া থাকে। কই আবগারী বিভাগকে ত এ দিকে বিশেষ নজর দিতে দেখি না! আমরা জানি, এই বিভাগের বিভিন্ন সার্কেলের ইনস্পেক্টার, সাব-ইনস্পেক্টারগণ কয়েক বৎসর হইতে একই স্থানে রহিয়াছেন। একই স্থানে বহু কাল থাকিলে পরিচয়জনিত দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে এবং অন্যান্য যাহা ঘটে তাহা আশা করি উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের ভালোভাবেই জানা আছে। কাজেই পল্লী অঞ্চলে হানা দিয়া ইহারা কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। আমরা আবগারী সুপারকে নিবেদন করিব যে, পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে সহরগুলির বে-আইনী মদ ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য কর্মচারীদের যেন নির্দ্দেশ দেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানাইব যে, যে সমস্ত কর্ম্মচারী অধিককাল এখানে আছেন তাহাদেরও অন্যত্র বদলির ব্যবস্থা করেন।"

—বর্দ্ধমান বাণী।

তোমার শ্রম, আমার টাকা

"কোন এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী তাঁর কর্ম্মচারী নন্দকে নিয়ে হাটে যান। কর্ম্মচারীর মাথায়, হাতে, পিঠে যতটুকু বোঝা চাপাইতে পারেন তাহা দিয়া নিজে বিরাট ভুঁড়ি দোলাইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে রসনা-তৃপ্তিকর খাবার খাইয়া বলিতেছেন—'নন্দ, ভাল করে মেহনৎ কর, তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবি, খেটে যা ফল পাবি।' বোঝার চাপে নন্দের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, হাঁটতে সে আর পারে না। কিন্তু এদিকে মনিব কেবল বলে, যা খেটে যা, পরিশ্রম কর জীবনে উন্নতি হবে। এই আদর্শ বাংলার দোকানী সমাজ তাঁদের অধীনস্থ কর্ম্মচারী সমাজকে শিক্ষণীয় হিসাবে ট্রেনিং দিতেছেন। শ্রমিকেরা খেটে খেটে সারা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এতেও মালিকগণের মন উঠিতেছে না। রাজ্যের সরকারী নির্দ্দেশ—অধিক ফলাও, পরিশ্রমে বিরত হইও না। মহা উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া উহা কাজে লাগান হইতেছে। এই প্রকারের মতলবের নেপথ্যের পরিভাষা এই—বেশী খাটো খাও অল্প, ষোল আনার মজুরী কর—পারিশ্রমিক পাইবে দুই আনা। তুমি খেটে মর আমি ধন-দৌলতের অধিকারী হই।"

—দোকান কর্ম্মচারী।

কর্তৃপক্ষের খেয়াল

"সম্প্রতি একটি বি, সি, জি মেডিক্যাল ইউনিট রঘুনাথগঞ্জে আসিয়াছে ও এই থানার পল্লী অঞ্চলে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। শোনা যাইতেছে, মিউনিসিপ্যাল এলেকায় ইঁহাদের কোন কার্য্যক্রম থাকিবে না, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ইহাই নির্দ্দেশ। শহরাঞ্চলকে এই ভাবে বাদ দিবার পশ্চাতে কোন যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যাল এলেকায় বর্ত্তমানে পঁচিশ হাজারের উপর লোকের বাস, তাছাড়া স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও প্রায় দুই হাজার। ক্ষয় বা যক্ষা রোগ শহরাঞ্চলে সহজে সংক্রমিত হয় বা বিস্তার লাভ করে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ছাত্র-ছাত্রীগণেরও স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ তাহাতে এই রোগের আক্রমণাশঙ্কা বড় কম নহে। এ অবস্থায় ইউনিটটি যখন এখানে আসিয়াছে তখন এই সুযোগে মিউনিসিপ্যাল এলেকার অধিবাসিগণকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া টীকা দিবার ব্যবস্থা করিলে ক্ষতি কি? আমরা বিষয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।"

—ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)

সংগ্রামের পথে শ্রমিক

"দেশোন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইস্পাত-শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে—একথা অনস্বীকার্য্য। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুসারে বার্ণপুর ইস্কো কারখানা বিশ্বব্যাঙ্ক ও ভারত সরকারের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা পেয়েছে এবং এই বিপুল পরিমাণ অর্থে কারখানা সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কতকগুলি বড় ও ছোট দেশী ও বিদেশী ঠিকাদার কোম্পানীকে। এই সমস্ত ঠিকাদার কোম্পানীর অধীনে বার্ণপুর কুলটিতে ১৫ হাজার নারী ও পুরুষ শ্রমিক সম্প্রসারণ কার্য্যে লিপ্ত। কিন্তু দেশোন্নয়নে ও কারখানা সম্প্রসারণ এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য যে সমস্ত শ্রমিক কর্ম্মচারী দিনের পর দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছে তাঁদের অবস্থা আজ যে পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে তা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। এই সমস্ত ঠিকাদার শ্রমিক কর্ম্মচারীদের অধিকাংশের বেতন দৈনিক মাত্র ১ থেকে ১।০ পর্য্যন্ত। এদের চাকরীর কোন স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তা নেই। মাগগী ভাতা, বোনাস, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সুবিধা, ওভারটাইমের বেতন প্রভৃতি এই সমস্ত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের ভাগ্যে আজও জোটেনি। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বা জ্বর হলেও এরা ছুটির বেতন পায় না বরং অনুপস্থিত থাকলে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। এরা আজও কারখানা আইনের কোন সুযোগ-সুবিধা পায় না। অথচ ঠিকাদার কোম্পানীগুলি বিশেষ করে বিদেশী ঠিকাদার কোম্পানীগুলি এই সমস্ত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের রক্তে উৎপাদিত লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা নিজেরা স্ফীত হয়ে শ্রমিক কর্ম্মচারীদের উপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকার বারে বারে সমাজবাদের কথা বলে থাকেন কিন্তু সরকারের এই ভাঁওতা সমাজবাদের কবলে এক দিকে যেমন কতকগুলি দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠান তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করছে, অপর দিকে তেমনি দেশেরই সাধারণ মানুষ শ্রমিক কর্ম্মচারী অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।"

—একতা (বার্ণপুর)

মোটরের উৎপাত অসহ্য

"এখন প্রশ্ন এই যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সরকারের যে সব আইন-কানুন আছে তাহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে কি না! প্রায়ই দেখা যায়, এই সব পথে অতিকায় লরীগুলি পর্ব্বতপ্রমাণ মাল লইয়া যাতায়াত করে। তাছাড়া অধিকবার 'ক্ষেপ' দিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময়েই ট্যাক্সিগুলি ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ মাইলেরও অধিক গতিবেগে যাতায়াত করে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহাদের চোখের সামনে এই সমস্ত ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটিতে থাকিলেও দুঃখের বিষয় ইহার কোন প্রতিকার হয় না। আজ পর্য্যন্ত এই পথে উপরোক্ত ধরণের অপরাধে কাহাকেও দণ্ডিত করা

হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। তবে কি ধরিয়া লইতে হইবে এলেকাটি অরণ্য-আইনের দ্বারা শাসিত? বর্তমানে মোটরচালক শ্রেণীর শুভ বুদ্ধির উপর পথচারীর ভাগ্য ছাড়িয়া দিলে বিপদ-আপদের আশঙ্কা মন্দীভূত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা বলা বাহুল্য। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অল্পদিন শিক্ষানবীশী করিয়াই কোনরূপে একটি চালকের লাইসেন্স সংগ্রহ করিয়া বসেন এবং অনেকেরই আবার শিক্ষা-দীক্ষা ও দায়িত্ববোধ এত কম যে তাঁহাদের কাহারও উপরই নির্ভর করা চলে না। কাজেই এ অবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কঠোরতর করা ছাড়া আমাদের মনে হয় কোন গত্যন্তর নাই। ইহার ফলে হয়ত বা ব্যক্তিবিশেষের কিছুটা অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের সামগ্রিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিলে ইহা সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। দুর্ঘটনাগুলির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, গাড়ীগুলির অস্বাভাবিক গতিবেগই ইহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। উচ্চগতিসম্পন্ন গাড়ীর "ষ্টিয়ারিং" বা "ব্রেক" নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, কাজেই সর্বপ্রযত্নে গাড়ীর গতিবেগ ও তৎসঙ্গে "ওভার লোডিং" (অতিরিক্ত বোঝাই) সংযত করা একান্ত প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই রাস্তায় লোকালয়গুলির সন্নিকটে এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট মোড়গুলিতে "স্পিড লিমিট" প্ল্যাকার্ড টাঙ্গাইয়া দিয়া চালকগণকে সতর্ক করা দরকার। তাছাড়া জঙ্গীপুর ও লালগোলায় পুলিশ কর্তৃক যদি মোটরগুলি ষ্ট্যাণ্ড হইতে ছাড়িবার ও পৌছিবার সময় রেকর্ড করার বন্দোবস্ত করা হয় তাহা হইলেও মধ্যবর্তী পথে গতিবেগ কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। মোটের উপর পুলিশ কর্তৃপক্ষ কিছুটা সজাগ হইলে এবং মাঝে মাঝে চেকিং-এর ব্যবস্থা করিলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা। আমরা এ বিষয়ে উর্দ্ধতন পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও বিশেষ করিয়া জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

—ভারতী।

মহার্ঘ ভাতা

"গত ১২ই ডিসেম্বরের 'জাগরণে' প্রকাশিত একটি পত্রে, বে-সরকারী স্কুলের জনৈক শিক্ষক একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। অভিযোগটি এই যে, বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকগণের ১৯৫৭ ইং সনের প্রদেয় মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও অদ্য পর্য্যন্ত দেওয়া হইতেছে না। আর্থিক বৎসরের ইহা দশম মাস চলিতেছে অথচ দরিদ্র শিক্ষকগণ অদ্য পর্যন্ত তাহাদের মহার্ঘ ভাতা পাইতেছেন না। ইহা নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর অভিযোগ। মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার উদ্দেশ্যই হইল—দ্রব্যমূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু দরিদ্র কর্ম্মচারিগণ সংসার চালাইতে যে মারাত্মক দুর্ভোগের সম্মুখীন হন—তাহার অন্ততঃ কতকটা লাঘব করা। যদিও, যে হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে অথবা পাইতেছে, সেই তুলনায় সরকার মহার্ঘ ভাতা নিতান্তই কম দিয়া থাকেন। অবশ্য সমস্ত কর্মচারীকে সম্পূর্ণ ভারমুক্ত করার সাধ্য বা আর্থিক আনুকূল্য সরকারের নাই—একথা আমরা জানি এবং মানি। কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও দরিদ্র কর্ম্মচারীদের মর্ম্মান্তিক দারিদ্র্যের জ্বালাটা যে-কোন হৃদয়বান ব্যক্তিরই অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারে না। সবচেয়ে মারাত্মক কথা এই যে, সরকার আর্থিক অনটনের মধ্যেও কর্ম্মচারীদের যেটুকু সাহায্য করিতে ইচ্ছুক—তাহার সুফলটাও দরিদ্র কর্ম্মচারিগণ অনেক সময়েই উপভোগ করিতে সক্ষম হন না। তন্মধ্যে বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকগণ আরও বেশী দুর্ভোগ ভুগিয়া থাকেন। প্রকাশ, ১৯৫৭ সালে বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের জন্য পূর্ব্বানুরূপ মাসিক ১৭৷৹ টাকা হিসাবে মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর হইয়াছে। পূজার পূর্ব্বে গত সেপ্টেম্বর মাসে অর্থাৎ আর্থিক বৎসরের ৭ম মাসে শিক্ষা বিভাগ বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকগণকে ৪ মাসের মহার্ঘ ভাতা দিবেন বলিয়া নাকি জানান। সে মতে তাঁহারা বিলও পেশ করেন। কিন্তু এই ডিসেম্বর মাসেও (আর্থিক বৎসরের দশম মাসে) তাঁহারা তাঁহাদের সেই ৪ মাসের মহার্ঘ ভাতাই পান নাই। ইহাতে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্যই যে সম্পূর্ণ বানচাল হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। দরিদ্র শিক্ষকগণ যদি প্রতি মাসে তাঁহাদের সাংসারিক খরচ চালাইয়াই যাইতে পারেন তবে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার প্রয়োজনই বা কি? দরিদ্র শিক্ষকগণ মাসিক সংসার-ব্যয় চালাইতে অক্ষম বলিয়াই সরকার মহার্ঘ ভাতা দিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় উহা সময় মত না দিবার কারণ কি,—কাহারও গাফিলতিতে এরূপ অব্যবস্থা হইয়াছে কি না—তাহার তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যদি কাহারও গাফিলতি বা ত্রুটিতে এরূপ মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে তবে অবশ্যই উহার বিহিত ব্যবস্থা সরকারকে করিতে হইবে। অন্যথায় সরকারের সমস্ত সদিচ্ছাই বানচাল হইয়া যাইতে বাধ্য। আমরা বিষয়টির প্রতি শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তথা ত্রিপুরা সরকারের একান্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" —জাগরণ (আগরতলা)

নামেই ডায়মণ্ডহারবার

"ডায়মণ্ডহারবার—কি চমকপ্রদ নাম! কত লোক ছুটে আসে সাময়িক অবসর বিনোদনের জন্য এই প্রকৃতিপুরী হুগলী তীরে অবস্থিত ছোট্ট মনোরম সহরটিতে। সহর বলিতে কিছু নাই। 'ডায়মণ্ডহারবার' বলিতে শুধু দুইটি আদালত আর কয়েকটি সরকারী অফিস, এই-ই বুঝায়। ষ্টেশন হইতে জেটিঘাট পর্য্যন্ত যে বিরাট রাস্তাটি রহিয়াছে তাহার উভয় পার্শ্বস্থ দোকানগুলিই সহরের একটি

প্রমাণস্বরূপ। ঐ সমস্ত দোকানগুলির অধিকাংশের সম্মুখে রাস্তার উপরে এমন ভাবে 'জঞ্জাল' বা 'নোংরা' ফেলিয়া রাখে যাহা রাস্তার সৌন্দর্য্য শুধু নষ্ট করে না ; তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি সাধন করে। তাহা ছাড়া এমন কয়েকটি দোকান রহিয়াছে যাহারা নাকি একেবারে রাস্তার উপরে কেরোসিন তৈলের ড্রাম, চেলা গরাণ কাঠ, লেপ-তোষকের তুলার বস্তা, কাঠ মাপিবার জন্য বিরাট দাঁড়িপাল্লা, কড়া—ইত্যাদি রাখিয়া অবলীলাক্রমে ব্যবসা চালাইতেছেন। পথচারীদের অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি নাই। ঐ সব দ্রব্যাদি ঐ ভাবে রাস্তার উপরে বা কিনারে রাখার ফলে পথচারীদের যে 'দুর্ভোগ ভুগিতে হয় তাহা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন। যাহাতে ঐ সমস্ত জিনিষপত্র রাস্তা হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে রাখা যায় তাহার জন্যে অবিলম্বে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের 'দৃষ্টিদান' করা একান্ত পক্ষে উচিত। কারণ, যে সমস্ত ব্যক্তি (বিশেষ করিয়া এখানকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বলিয়া কথিত) এই সাধারণ জ্ঞান বিবর্জিত অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা সরাসরি আবেদন করিলে ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। ষ্টেশন রোডটিও এত বিশ্রী যে চলা-ফেরা রীতিমত বিপজ্জনক। একদিকে বাঁধা দোকান আর অপর দিকে রেল কর্ত্তৃপক্ষের পাঁচিলের কোলে উঠতি দোকান। তার উপর প্রায়ই মাঝখানে হয় গরুর গাড়ী আর না হয় লরী দাঁড়াইয়া মাল বোঝাই বা খালাস করে। এখন এই অবস্থায় যদি আবার রিক্সা আর সাইকেলের ভীড় হয় তখন অবস্থাটি যে কি রকম দাঁড়ায় তাহা সহজেই অনুমেয়। 'ডায়মণ্ডহারবার'—শুনিতে বেশ নামটা। কিন্তু যাঁহার একবার পরিচয় ঘটিয়াছে তাঁহার মনের অবস্থা আর নাই বা বলিলাম।"

—প্রগতি (২৪ পরগণা)

শোক-সংবাদ

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বর্ষীয়ান জমিদার স্বনামধন্য স্বদেশসেবী গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী গত ১৩ই অগ্রাণ ৮৪ বছর বয়েসে পরলোক গমন করেছেন। ১৯০৫ সালের জাতীয় আন্দোলনে ব্রজেন্দ্রকিশোরের অবদান অসামান্য। জাতীয় শিল্প পরিষদের তহবিলে ইনি পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন, কালে যা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপলাভ করেছে। জাতীয়তাপন্থীদের সমর্থন করার জন্যেও এঁকে কয়েক বার বৃটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয়। সমাজের উন্নতিকল্পেও এঁর যথেষ্ট অবদানের চিহ্ন বিদ্যমান। সঙ্গীতেরও ইনি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। বহু গুণী শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। সঙ্গীত-বিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থেরও ইনি বাঙলায় অনুবাদ করেন। নাট্যকলারও ইনি যথেষ্ট অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁর পুত্র স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ব্রজেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুতে দেশ একজন দরদী দেশসেবীকে হারাল।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার ও স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৭) গত ২৩ে অগ্রাণ অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেছেন। ইনি কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট, বেঙ্গল অলিম্পিক য্যাসোসিয়েশান, পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশান, অটোমোবাইল য্যাসোসিয়েশান অফ বেঙ্গল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের সভাপতির আসনে সমাসীন ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র এবং সঙ্গীতেও এঁর প্রবল অনুরাগ ছিল।

পঞ্চানন সিংহ

প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও আশুতোষ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ (৭২) ২৩এ অগ্রাণ দেহান্তরিত হয়েছেন। শিক্ষা বিস্তারে ও শিক্ষাদানে এঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এম, কে, রায়

খ্যাতনামা ভূতত্ত্ববিদ এম, কে, রায় ৭৫ বছর বয়েসে গত ১ই অগ্রাণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি জিওলজি মাইনিং য্যাণ্ড মেটালজিকাল সোসাইটির ক্রমাগত তিন বছর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন ও ভারত সরকারের খনিজ উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত (১৯৫৬) আন্তর্জাতিক ভূবিদ্যা সম্মেলনে প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছিলেন।

চারুচন্দ্র বসু

কলকাতার জীবিত-জ্যেষ্ঠ য্যাটর্ণি চারুচন্দ্র বসু (৯৩) ২৩শে অগ্রাণ দেহরক্ষা করেছেন। আইনজ্ঞ মহলে ইনি যথেষ্ট শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এঁর দানে সমৃদ্ধ হয়েছে।

ভবানী ভাদুড়ী

নটগুরু শিশিরকুমার ও স্বর্গীয় বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর সুযোগ্য অনুজ প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা ভবানীকিশোর ভাদুড়ী মাত্র ৪৭ বছর বয়সে গত ১১ই অগ্রাণ লোকান্তরিত হয়েছেন। শিশিরকুমারের অধিনায়কত্বে ইনি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন ও অচিরে দর্শকচিত্ত জয় করেন। সিরাজদ্দৌলায় করিমচাচা, পরিচয়ে ডাঃ আলী ও শেষরক্ষায় গদাইয়ের ভূমিকাভিনয়ে ইনি দর্শকচিত্তে আলোড়ন এনেছিলেন। ইনি পরলোকগত ইঞ্জিনিয়ার হরিদাস ভাদুড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

ডি, এন, মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত শিল্পপতি ডি, এন, মুখোপাধ্যায় ৬৫ বছর বয়সে গত ১৫ই অগ্রাণ ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। ইনি বিহার ফায়ারব্রিকস য্যাণ্ড পটারিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। স্বগ্রাম বাকুলিয়ায় যথেষ্ট উন্নতি এঁর দ্বারা সাধিত হয়েছে।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

ভানু সিংহের পদাবলী

১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর আশ্বিন সংখ্যায় ৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রায়ণ" লেখাটির ১২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে :—"এই ভানু সিংহ লইয়া একটি কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই সময় অধ্যাপক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্মানীতে ছিলেন। সেখানে তিনি ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সহিত এদেশের কবিদের তুলনা করিয়া একটি নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে "ভানু সিংহকে" প্রাচীন পদকর্ত্তা বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন ও এই নিবন্ধ লিখিয়া তিনি "ডক্টর" উপাধি পান।"

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যে ভানু সিংহ সম্বন্ধে লিখে "ডক্টর" উপাধি পেয়েছিলেন সে কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় কিন্তু "ভানু সিংহ" সম্বন্ধে লিখে ডক্টর উপাধি পাননি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-জীবনীর প্রথম খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন :—"রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে জার্মানীতে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া এদেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লেখেন। তাহাতে তিনি ভানু সিংহকে প্রাচীন পদকর্তারূপে প্রচুর সম্মানদান করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, এই গ্রন্থখানি লিখিয়া নিশিকান্ত 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। এই উক্তিটি সম্বন্ধে সামান্য বিচার প্রয়োজন। নিশিকান্ত একুশ বৎসর বয়সে (১৮৭৩) বিলাত যান। এডিনবরা লাইপজিক, সেন্টপিটার্সবুর্গ প্রভৃতি নানা স্থানে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে The Yatroas নামে একখানি ছোটো বই লিখিয়া 'ডক্টর' উপাধি পান। সে গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে ভানু সিংহের কোনো কথা নাই। তবে জার্মাণ ভাষায় 'ভারতীয় গ্রন্থাবলী' নামে যে বইখানি লেখেন, তাহাতে যদি কিছু থাকে তো আমরা বলিতে পারি না। তবে সে বই লিখিয়া নিশিকান্ত 'ডক্টর' উপাধির মান পান নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভ্রমশূন্য নহে।" শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছেন। জীবনী-লেখককে হতে হবে যুক্তিবাদী। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনীর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় ৭ম পৃষ্ঠায় বলেছেন···"আমরা স্বভাবতঃ ইতিহাসবিমুখ, তাই সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা বিসর্জন দিয়া অন্ধ গুরুবাদী—নয়, সমস্ত প্রমাণ-প্রয়োগ তুচ্ছ করিয়া অহেতু নিন্দাবাদী। তথ্য নিরূপণ বিষয়ে আমরা স্বভাবতই শিথিল; আমাদের বিশ্বাস অল্পতেই। শোনাকথা বা 'গালগল্প' প্রমাণাভাবে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করি না; আবার তথ্যানুসন্ধানের জন্য মেহনত করিতেও পরাঙ্মুখ।" যাঁরা ভবিষ্যতে জীবনী লিখবেন তাঁদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। শ্রীসনৎকুমার মৌলিক, মেদিনীপুর।

কবি গোবিন্দদাসের পদাবলী

সুপ্রসিদ্ধ বাংলা মাসিক পত্রিকা "মাসিক বসুমতীর" পাঠক-পাঠিকা এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যানুরাগীদের প্রতি আমার নিবেদন—অনুগ্রহ করিয়া কবি গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত পদটির শুদ্ধতা সম্বন্ধে জ্ঞাত করাইয়া বাধিত করিবেন। ১৯৫৮ সালের "ইণ্টারমিডিয়েট" পরীক্ষার্থীদের জন্য যে "বাংলা সাহিত্য সঙ্কলন" প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে "গৌরচন্দ্রিকা" শীর্ষক একটি গোবিন্দদাসের পদ রহিয়াছে। কবিতাটির পংক্তিগুলি এইরূপ আছে—

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব
* * *
গোবিন্দদাস রহু দূর।"

অপ্রয়োজনীয় আতিশয্যে * * * চিহ্নিত করিয়া বাকী পদগুলি বর্ত্তমান আলোচনায় বাদ দেওয়া হইয়াছে।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর" চতুর্থ ভাগে গোবিন্দদাসের পদাবলীতে ৭ম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে "শ্রীরাগ" শীর্ষক পদে দেখা যায়—

"নীরদ নয়নে নব ঘন সিঞ্চনে
পূরল মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চয়ত
বিকসিত ভাবকদম্ব।
* * *
গোবিন্দ দাস বহু দূর।"

প্রথম পংক্তিতে "নয়নে" স্থানে "নয়ানে", "পুলক" স্থানে—"পূরল" দ্বিতীয় পংক্তিতে "চূয়ত" স্থানে "চয়ত", "বিকশিত" স্থানে "বিকসিত" এবং পরবর্তী পংক্তিতে রহু স্থানে "বহু" রহিয়াছে। মুদ্রণ প্রমাদ যদি কোন ক্ষেত্রে হইয়া থাকে তবে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।—শ্রীঅরুণকুমার মৈত্র, সাহিত্যশ্রী লুইস জুবিলী স্যানাটোরীয়াম, দার্জ্জিলিং।

পত্রিকা সমালোচনা

যুগ যুগ তপস্যার প্রভাবে মানুষ লাভ করে ঈশ্বরের দর্শন, দর্শন লাভে আনন্দে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে তাদের অন্তর। আমরাও তদ্রূপ দিনের পর দিন অপেক্ষা করে লাভ করি "মাসিক বসুমতীর" দর্শন। তারপর 'শ্রীমতীকে' কেন্দ্র করে সুরু হয় আমাদের সংগ্রাম। আমি বলি আমি আগে পড়বো। দিদি বলে আগে আমি পড়বো। এমন কি, দু'বছরের ভাগনেটাও ছুটে আসে ছবি দেখবার জন্যে। অবশেষে বাবা এসে 'শ্রীমতীকে' নিয়ে কেটে পড়েন। আমাদের তখন বাধ্য হয়েই ত্যাগ করতে হয় 'শ্রীমতী'র আশা। 'শ্রীমতী'র শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, আশা করি পাঠক-পাঠিকার কাছে চিরদিনই সে তার রূপ ও রস নিয়ে জাগ্রত থাকবে। —মিহির সেনগুপ্ত, প্রমোদনগর চা-বাগান, নীলামবাজার, কাছাড়।

ভাদ্র সংখ্যা চাই

আপনাদের প্রেরিত "মাসিক বসুমতী" পাইয়া আনন্দিত হইলাম (আশ্বিন সংখ্যা) কিন্তু ভাদ্র সংখ্যা পাইলাম না কি কারণে বুঝিতেছি না। বইটি পাইলাম না সেজন্য নয়, কিন্তু আপনার লেখা "রাস্তায় রাস্তায়" গল্পটির জন্য আমি প্রত্যেক মাসে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ভাদ্র সংখ্যাটি আমাকে পাঠাইলে বাধিত থাকিব। ঐ গল্পটির জন্যই বিশেষ করিয়া আমার "মাসিক বসুমতী"র প্রতি আকর্ষণ এবং ইহার জন্যই আরও ছয় মাসের গ্রাহিকা থাকিবার টাকা পাঠাইব। অধিক লিখিয়া আপনার সময় নষ্ট করিব না। আমার অত্যধিক আগ্রহ আপনার লেখার প্রতি বুঝিয়া ভাদ্র সংখ্যা পাঠাইয়া দিবেন। শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন।—মায়া মজুমদার। ভুবনেশ্বর।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হ'তে চাই

Subscription from Aswin 1364 to Bhadra 1365. Rs. 15·00.—Principal Berhampore Girls College.

১৩৬৪ সালের কার্তিক সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম।—আরতি মুখার্জ্জী। পশ্চিম দিনাজপুর।

Remitted Rs. 7·50 n. p. being the half-yearly snbscription of Monthly Basumati from Kartick of the current year.—Mayarani Das—Tripura.

I am herewith remitting my half-yearly subscription Rs. 7·50 n. p.—Sm. Bina Roy—Assam.

আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা পাঠালাম।—লতিকা লাহিড়ী, লেক রোড, কলিকাতা।

Subscription in advance for 6 months commencing from Kartick for Monthly Basumati is sent herewith, please continue to send Magazine regularly,—Sunita Dutt—Patna.

Rupees seven & fifty n. p. are sent herewith as subscription for Monthly Basumati for the months from Kartick to Chaitra for Bengali year 1364.—Swapna Sanyal—Malda.

অদ্য ৬ মাসের চাঁদা পাঠাইলাম, কার্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত। টাকা প্রাপ্তিমাত্র কার্ত্তিক সংখ্যা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী, ভাগলপুর।

এই সঙ্গে মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য পাঠাইলাম। Sm. Amala Bose, New Delhi.

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠাইলাম। দেববালা দেবী, পশ্চিম দিনাজপুর।

Sending herewith my half-yearly subscription, kindly acknowledge.—Sm. Juthika Mitra, Cuttack.

আজ মনিঅর্ডারে ৭৷৹ টাকা মাসিক বসুমতীর জন্য চাঁদা পাঠালাম। যথারীতি পূর্ব্ববৎ পত্রিকা পাঠাবেন। শ্রীমতী রুণি শেঠ। ডিব্রুগড়।

আগামী ৬ মাসিক চাঁদা বাবদ ৭·৫০ টাকা পাঠাইলাম—মালতী মুখার্জ্জী, নাগপুর।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা ৬ মাসের জন্য পাঠাইলাম। মীরা আচার্য্য—বোম্বাই।

পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ এই ছয় মাসের ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭৷৹ টাকা পাঠাইলাম। Arati Ganguly, Andhera Prodesh.

Half yearly subscription for Monthly Basumati—Alo Sengupto, Sion Road, Bombay.

মাসিক বসুমতীর ৬ মাসের চাঁদা (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র) পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন শ্রীমতী বাসন্তী ঘোষাল, দুর্গাপুর।

মাসিক বসুমতীর কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী গীতারাণী পাল, মেদিনীপুর।

কার্ত্তিক ১৩৬৪ সাল হইতে এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। কার্ত্তিক হইতে আমাকে গ্রাহিকাশ্রেণীভুক্ত করিয়া নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। Durga Banerjee, Bangalore.

৬ মাসের মাসিক বসুমতীর মূল্য হিসাবে ৭·৫০ টাকা পাঠাইলাম। যদি সম্ভব হয় আশ্বিন সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন।—Lily Mazumder, Darjeeling.

বাকী ৬ মাসের টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া প্রতি মাসের সংখ্যাগুলি তাড়াতাড়ি পাঠাইবেন।—Binapani Ghose, Parel, Bombay.

টাকা পাঠাতে দেরী হয়ে গেল। আরও ৬ মাসের ৭৷৹ টাকা পাঠালাম।—সুমিত্রা দাশগুপ্ত, শিলং

১৫৲ টাকা M. O. যোগে পাঠাইলাম। প্রতি মাসে মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Krishna Kumari Debi, Birbhum.

GOVERNMENT L
Cooch Behar

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সদ্য প্রকাশিত হইল

নব-কলেবরে নূতন প্রচ্ছদপট-শোভিত পরিবর্ধিত সংস্করণ

প্রবোধকুমার সান্যালের অমর উপন্যাস

নরেন্দ্রকুমার মিত্রের

সীমান্ত রেখা ৩৷৷০

সমারোহ ২৸০

আশাপূর্ণা দেবীর

সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ

স্বপ্নশর্বরী ৩৲

এগারো জন সুবিখ্যাত সাহিত্যিকের

মিলিত প্রচেষ্টায় উপন্যাস

উন্মেষ ৩৷৷০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমর গ্রন্থ

ক্ষণভঙ্গুর ২।০

গুপ্ত প্রকাশিকা—১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনকোরা নূতন বই

কালান্তর

পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ হওয়া যেমন একটা কালান্তর, তেমনি সংগ্রাম থেকে সংগঠনে উপস্থিত হওয়াও একটা কালান্তর। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এ দুটোই ঘটেছে এক সঙ্গে পরস্পরের পরিপূরকরূপে। তারই পটভূমিতে নিবদ্ধ এই উপন্যাসের কাহিনী এবং সে কাহিনী এক দিকে যেমন মহান আদর্শের জ্যোতিতে উজ্জ্বল অন্যদিকে তেমনি সুকঠিন বেদনার স্পর্শে উজ্জ্বল। যে কোন যুগ চেতনা পাঠক-পাঠিকাই বইটি পড়ে প্রীত হইবেন এবং আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বৃহৎ একটি অধ্যায়ের [illegible] বহু বিচিত্র নরনারীর সঙ্গে পরিচিত হবেন। নিপুণ চিত্রণে ও সংলাপে বইটি আদ্যোপান্ত মনোরম

মূল্য ৪৷৷০ (যুগান্তর ২রা জুন [illegible]) এই লেখকেরই **কালিন্দী** ৪৷৷০ **গণদেবতা** ৪৲ **পদচিহ্ন** ৪৷৷০ **আগুন** ৩৲

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের নবতম বই

মানব-দেউল

তুচ্ছ জীবনের মুহূর্ত দিয়ে গড়া এক সুবৃহৎ মন্দির। যন্ত্রস্থ

এই লেখকের অন্যান্য বই—

তুমি মম জীবন ৪৲ **প্রিয়া ও পৃথিবী** ৩৲ **বহ্নি বন্যা** ৩৲ **রাত্রি-জননী** ৩৲

ফাল্গুনীর **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৩৷৷০

জাগ্রত যৌবন ৩৷৷০

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের নূতন বই

নীল শাড়ী ৪৲

পলাতক ৪৲

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ৫৲

শ্রীকান্তের (৫ম পর্ব) ২৷৷০

শ্রীকান্তের (৬ষ্ঠ পর্ব) ২৷৷০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমৃতস্য পুত্রাঃ ২৷৷০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কেদার রাজা ৪৷৷০ **পথের পাঁচালী** ৫৲

জগতের জনবরেণ্য বিবাহ-বিজ্ঞানীদের অন্যতম

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

জন্ম-শাসন

রাজকুমারী অমৃত কাউরের [illegible] ও ভারতের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ [illegible] কে, লক্ষ্মণন্ লিখিত ভূমিকা শোভিত [illegible] ইহার আবশ্যকতা নূতন [illegible] আধুনিকতম [illegible] নিরোধ বিষয়ে [illegible] প্রাচীন ও [illegible] মত-পথ-বিধি-ঔষধ [illegible] বিবরণ প্রচুর [illegible] প্রকাশ হইয়াছে। [illegible] প্রকাশিত ও [illegible] বিরাট বই, বহু ছবি, মূল্য ৫৲, মাত্র [illegible] এই লেখকেরই একান্ত গোপনীয় [illegible] যৌবনের যাদুপুরী ৫৲, [illegible] কামে কামে ২৲, নারী বিপথে [illegible] কেন ৪৲ নরনারীর যৌনবোধ [illegible] ভালো প্রেমিক পিতামাতা

ডাঃ মাঃ পৃথক

কাত্যায়নী বুক ষ্টল [illegible] কলিকাতা—৬

খাকি/উলেন ব্রীচেস

প্রতিটি ~~১৪~~ প্রতিটি ৭

ওয়েব পাউচ

ডজন প্রতি ~~১৪~~

ডজন প্রতি ৯

লোহার ট্রে

ডজন প্রতি ~~৩২~~

ডজন প্রতি ১৬৷৹

অর্দ্ধেক মূল্যে কিনুন

খাকি উলেন ব্রীচেস, ওয়েব পাউচ, লোহার ট্রে

এবং অন্যান্য বহুবিধ ডিসপোজাল সামগ্রী যথা বিভিন্ন মাপের তাঁবু তারপলিন, এমেরি কাগজ, চামড়া ও ক্যানভাসের সু ও ওভার সু, মশারী, নার্সের পোষাক, হাফপ্যাণ্ট, মোজা ইত্যাদি, ইত্যাদি, দৈনন্দিন কাজে, অতি প্রয়োজনীয় ডিসপোজালের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য উত্তম কমিশনে ফেরীওয়ালা, দোকানদার ও দালাল আবশ্যক।

আর্মি সারপ্লাস ষ্টোর্স

১/১ গ্যালিফ ষ্ট্রীট (বাগবাজার ট্রাম টারমিনাস) কলিকাতা

টেলিফোন : ৫৫-২৮৮৮

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ‘হিমকল্যাণ’ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যান
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যাণ ক্যাষ্টর অয়েল সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৩৬শ বর্ষ—পৌষ, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

'পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্র দল'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

"এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খ্যালে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখনো বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্যে। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।"

"বেদে আছে হোমাপাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেক দিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, মাটীতে লাগলে একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে। তখন সে পাখী মা'র দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

"ত্যাখো, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায়, সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচ্ কচ্ ক'রে কেটে দিতে লাগল।"

"দেখ, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়, তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে; সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফিয়ে ওঠে, সেই গরুই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; ভিতরে খুব তেজ!"

"নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটী। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাকেও care (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় ব'সতে বললে—তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না! আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে ব'লে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নাই,—যেন কোন বন্ধন নাই! খুব ভাল আধার।

একাধারে অনেক গুণ ; গাইতে, বাজাতে, লিখতে, পড়তে। এদিকে জিতেন্দ্রিয়,—ব'লেছে, বিয়ে কোরবো না।···নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।"

"যেন খাপখোলা তলোয়ার নিয়ে বেড়াচ্ছে।"

"আমার যারা আপনার লোক, তারা বোকলেও আবার আসবে। আহা, নরেন্দ্রের কি স্বভাব! মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলত ; আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, 'শ্যালা তুই আর এখানে আসিস্ না।' তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না। কি বল?—নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ,—নিরাকারে নিষ্ঠা।"

"ও যেদিকে যাবে, সেইদিকেই একটা কিছু বড় হয়ে দাঁড়াবে।"

'নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো—ময়লা একখানা চাদর গায়ে,—কিন্তু চোক মুখ দেখে বোধ হলো ভিতরে কিছু আছে ;—তখন বেশী গান জানতো না। দুই একটা গান গাইলে,—'মন চল নিজ নিকেতনে,' আর 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।' যখন আস্‌তো,—একঘর লোক—তবু ওর দিক্‌পানে চেয়েই কথা কইতাম। ও বোলতো, 'এঁদের সঙ্গে কথা কন',—তবে কইতাম।

যদু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম,—ওকে দেখবার জন্য পাগল হ'য়েছিলাম। এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কান্না!—ভোলানাথ বললে, 'একটা কায়েতের ছেলের জন্য মশায় আপনার এরূপ করা উচিত নয়।' মোটা বামুন এক দিন হাতজোড় করে বললে, 'মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্যে আপনি এত অধীর কেন হন'?"

"নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এতো ভক্ত আসছে, ওর মত একটি নাই। এক একবার বসে বসে খতাই। তা দেখি, অন্যপদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল!

অন্যেরা কলসী, ঘটি, এসব হ'তে পারে,—নরেন্দ্র জালা!

ডোবা-পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি!—যেমন হালদার পুকুর।

মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু বড় রুই, আর সব নানা রকম মাছ—পোনা, কাঠিবাটা, এই সব।

খুব আধার,—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।

নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়-সুখের বশ নয়। পুরুষ-পায়রা। পুরুষ-পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়,—মাদি-পায়রা চুপ করে থাকে।···

নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়ীতে তাই ডানদিকে বসে।···

নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।"

"আশ্চর্য সব দর্শন হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। তার ভেতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার চুণী, আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টক্‌টকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মত জ্যোতিঃ। তার মধ্যে নরেন্দ্র।—সমাধিস্থ।

ধ্যানস্থ দেখে বললুম, 'ও নরেন্দ্র!' একটু চোখ চাইলে।—বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে।—তখন বললাম, 'মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর।—তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে'।"

"আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি; আর আমি ওর অনুগত।···

ওর মদ্দের ভাব (পুরুষভাব) আর আমার মেদি ভাব (প্রকৃতিভাব)। নরেন্দ্রের উঁচু ঘর, অখণ্ডের ঘর।"

"একদিন দেখিতেছি, মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র সূর্য তারকামণ্ডিত স্থূল জগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম-ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেব-দেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। উক্তরাজ্যের চরমসীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম—সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবীসকল পর্যান্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূরে নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, দিব্যজ্যোতিঃ ঘনতনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা দেবদেবিদিগকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র বিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্যশিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেবশিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল। পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বান-পূর্বক সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু অসীম আনন্দ প্রকাশ পূর্বক তাঁকে বলিতে লাগিল,—

'আমি যাইতেছি, তোমাকে যাইতে হইবে।'

ঋষি তাহার ঐরূপ অনুরোধে কোনো কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীর মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।"

"—ওগো ঘুমুলে?

—আজ্ঞে না।

—দেখ, নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংড়াইবার মত জোরে মোচড় দিচ্ছে; তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো; সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ; তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।"

"দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধ সত্ত্বগুণী; আমি দেখেছি সে অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন; তার কতগুণ তার ইয়ত্তা হয় না!···মাগো, আমি তাকে না দেখে আর থাক্‌তে পারি না,···

এত কাঁদলাম কিন্তু নরেন্দ্র ত এলোনা ; তাকে একবার দেখবার জন্তে প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্চে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্চে ; কিন্তু আমার এই টান্‌টা সে কিছু বুঝে না।···বুড়ো মিন্‌সে তার জন্ত এইরূপে অস্থির হয়েছি ও কাঁদ্‌ছি দেখে লোকেই বা কি বলবে, বল দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয়না, কিন্তু অপরে দেখে কি ভাববে, বল দেখি? কিন্তু কিছুতেই সাম্‌লাতে পাচ্চিনা।"

"এরা সব ছেলে মন্দ নয়, দেড়টা পাশ কোরেছে, শিষ্ট, শান্ত,—কিন্তু নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখতে পেলাম না! যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁস্ থাকেনা। আমার নরেন্দ্রের ভেতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ—টং টং করচে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ-কান টিপে কোনো রকমে দুতিনটে পাস করেচে, বস্, এই পর্য্যন্ত—ঐ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসে খেলে সব কাজ করে, পাশ করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়। সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্ত সকল ব্রাহ্মের স্থায় নয়,—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি?"

ঠাকুর। দেখিলাম, কেশব যেরূপ একটি শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিগুমান। আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার স্থায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরে জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইয়া মায়া-মোহের লেশ পর্য্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে!

নরেন। মহাশয়, করেন কি? লোকে আপনার ঐরূপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় মনে করিবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয় এবং কোথায় আমার স্থায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া!—আপনি তাঁহাদিগের সহিত আমার তুলনা করিয়া আর কখনও ঐরূপ কথা বলিবেন না।

ঠাকুর। কি করবো রে, তুই কি ভাবিস আমি ঐরূপ বলিয়াছি, মা—(শ্রীশ্রীজগদম্বা) আমাকে ঐরূপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি; মা আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও দেখান নাই, তাই বলিয়াছি।

নরেন। মা দেখাইয়া থাকেন, অথবা আপনার মাথার খেয়ালে ঐসকল উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? আমার ঐরূপ হইলে আমি নিশ্চয় বুঝিতাম, আমার মাথার খেয়ালে ঐরূপ দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে যে, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে অনেক স্থলে প্রতারিত করে। তদুপরি বিষয়-বিশেষ দর্শনের বাসনা যদি আমাদিগের মনে সতত জাগরিত থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই, উহারা (ইন্দ্রিয়গ্রাম) আমাদিগকে পদে পদে প্রতারিত করিয়া থাকে। আপনি আমাকে স্নেহ করেন এবং সকল বিষয়ে আমাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করেন—সেইজন্ত হয়ত আপনার ঐরূপ দর্শন সকল আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঠাকুর (ভাবিতেছেন)—তাইত, কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন্দ্রও মিথ্যা বলিবার লোক নহে; তাঁহার স্থায় দৃঢ় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিসকলের মনে সত্য ভিন্ন মিথ্যা সঙ্কল্পের উদয় হয়না, একথা শাস্ত্রেও আছে, তবে কি আমার দর্শন-সমূহে ভ্রম সম্ভাবনা আছে?

কিন্তু আমিত ইতিপূর্বে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) আমাকে সত্যভিন্ন মিথ্যা কখন দেখান নাই এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বারংবার আশ্বাসও পাইয়াছি, তবে সত্যপ্রাণ নরেন্দ্র আমার দর্শনসকল মাথার খেয়ালে উপস্থিত হয়, একথা বলে কেন?—কেন তাহার মন বলিবামাত্র ঐসকলকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করেনা?

মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা)—ওর (নরেন্দ্রের) কথা শুনিস্ কেন? কিছুদিন পরে ও (নরেন্দ্র) সবকথা সত্য বলে মানবে।

নরেন। ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর পরে হরিণ হয়েছিল, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে আপনার আমার বিষয়ে অত চিন্তা করার পরিণাম ভেবে সতর্ক হওয়া উচিত।··· আপনি আমাদের এত ভালবাসেন, শেষে কি আপনার জড়ভরতের মত অবস্থা হবে নাকি?

ঠাকুর। যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না; মা বল্লেন—তুই ওকে (নরেন্দ্রকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস্, তাই ভালবাসিস্, যেদিন ওর (নরেন্দ্রের) ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না।···জড়কে ভেবে জড়ভরত হয়ে থাকে, আমি যে চৈতন্তকে ভাবি রে! যেদিন তোদিগেতে মন আসবে, সেদিন সব দূর করে তাড়িয়ে দেব।

"নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ—নরেন্দ্র—ধ্যানসিদ্ধ—নরেন্দ্রের ভিতরে জ্ঞানাগ্নি সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া সর্বপ্রকার আহার্য্য-দোষকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে, সেজন্ত যেখানে-সেখানে যাহা-তাহা ভোজন করিলেও তাহার মন কলুষিত বা বিক্ষিপ্ত হইবে না—জ্ঞান-খড়্গ সহায়ে সে মায়াময় সমস্ত বন্ধনকে নিত্য খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, মহামায়া সেজন্ত তাহাকে কোনমতে নিজায়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না।"

নরেন্দ্র। মহাশয়, আজ হোটেলে, সাধারণে যাহাকে অখাদ্য বলে, খাইয়া আসিয়াছি।

ঠাকুর। তোর তাহাতে দোষ লাগিবে না; শোর গোরু খাইয়া যদি কেহ ভগবানে মন রাখে, তাহা হইলে উহা হবিষ্যান্নের তুল্য,—আর শাকপাতা খাইয়া যদি বিষয়-বাসনায় ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা শোর গোরু খাওয়া অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

তুই অখাদ্য খাইয়াছিস, তাহাতে আমার কিছু মনে হইতেছে না, কিন্তু (অন্ত সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগের কেহ যদি আসিয়া ঐকথা বলিত, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিতাম না।

ঠাকুর। (এক মাসাধিক কাল নরেনের প্রতি সর্বপ্রকারে উদাসীন থাকার পর) আচ্ছা, আমি তো তোর সঙ্গে একটা কথাও কইনা, তবে তুই এখানে কি করতে আসিস বল দেখি?

নরেন্দ্র। আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছে করে, তাই এসে থাকি।

ঠাকুর (প্রসন্ন হোয়ে)। আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা করে) দেখ্‌ছিলাম—আদর যত্ন না পেলে তুই পালাস কি না; তোর মত

আধারই এতটা (অবজ্ঞা ও উদাসীন ভাব) সহ্য করতে পারে— অপরে এতদিন কোন্‌কালে পলায়ন করতো, এদিক আর মাড়াতোনা।

"এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপ প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি, তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে। (করযোড়ে দাঁড়িয়ে) জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ।"

"পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন পদার্থেই ইতর-সাধারণের মত একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আলগা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব।

মেজেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গা-জলের জালাটি রহিয়াছে, তাহার নিকটেই বসিল। তাহার সঙ্গে সেদিন দুই চারি জন আলাপী ছোকরাও আসিয়াছিল। বুঝিলাম তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয়; ভোগের দিকেই দৃষ্টি!

গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম; বাঙ্গলা গান সে দুই চারিটি মাত্র তখন শিখিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরিল ও ষোল-আনা মন-প্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

পরে সে চলিয়া গেলে, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ-ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে বলিবার নহে। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে, মনে হইত বুকের ভিতরটা যেন কে গামছা নিংড়াইবার মত জোর করিয়া নিংড়াইতেছে। তখন আপনাকে আর সামলাইতে পারিতাম না, ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশের ঝাউতলায়, যেখানে কেহ বড় একটা যায় না, যাইয়া 'ওরে তুই আয় রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারচি না' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদতাম! খানিকটা এইরূপে কাঁদিয়া তবে আপনাকে সামলাইতে পারিতাম! ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ঐরূপ হইয়াছিল। আর সব ছেলেরা যারা এখানে আসিয়াছে, তাহাদের কাহারও কাহারও জন্য কখন কখন মন কেমন করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে!"

"(সমাধিস্থ ঠাকুরের স্পর্শে নরেনের বাহ্য-সংজ্ঞার লোপ হইলে) বাহ্য-সংজ্ঞার লোপ হইলে নরেন্দ্রকে সেদিন নানাকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কে সে—কোথা হইতে আসিয়াছে—কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে), কত দিন এখানে (পৃথিবীতে) থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম, তাহার ঐ কালের উত্তর সকল তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছিল। সে সকল কথা বলিতে নিষেধ আছে। উহা হইতেই কিন্তু জানিয়াছি সে (নরেন্দ্র) যেদিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ় সংকল্পসহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে! নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

"নরেনের জন্যে তোমাদের মাথাব্যথার দরকার নেই, আমি জানি, তার দ্বারা জীবনে কখনও যোষিৎ-সঙ্গ হবে না।"

"এমন আধার এযুগে জগতে আর কখন আসেনি।"

"জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ নামে যে দুই ঋষিমূর্তি পরিগ্রহ করে জগতের কল্যাণের জন্যে তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নর-ঋষির অবতার।"

"শুকদেবের মত মায়া স্পর্শ করতে পারে নি।"

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

১২৬৯ সালের ২১শে পৌষ, বাংলার আকাশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়। এই নক্ষত্রের দ্যুতিতে কেবল মাত্র বাংলা দেশই নয়, সমগ্র বহির্ভারত উদ্ভাসিত হয়েছে। এই মহাপুরুষের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর নাম দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামিজীর জন্মতিথিপূজা স্মরণে আমরা এই সংখ্যার প্রচ্ছদে তাঁর একটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র মুদ্রিত ক'রলাম। এই চিত্রখানিতে স্বামিজীর বেশ-ভূষা লক্ষ্যণীয়। তিনি ভারতের বাহিরে থাকাকালীন এই চিত্রটি গৃহীত হয়।

বাঙ্গলা ভাষা

নরেন্দ্রনাথ দত্ত

[১৯০০ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদককে স্বামিজী যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত]

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখ্‌বার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সে দিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক-চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ওকথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতিই আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখ্‌তে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমি ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ কল্‌কেতার ভাষাই চল্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিত্‌ছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কল্‌কেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক কর্‌তে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ কর্‌বেন। হেথায় গ্রাম্য ঈর্ষ্যাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর, বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য্য শঙ্করের মায়াভাষ্য দেখ, আর অর্ব্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।—এখুনি বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে, মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু' একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধুম্—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে—"রাজা আসীৎ"!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! —ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থাম্‌গুলোকে কুঁদে কুঁদে

সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা পাতা চিত্র বিচিত্রর কি ধূম্!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি কি ভাব, কি উদ্দেশ্যে, তা ভারত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধূম্! সে কি আঁকা বাঁকা ডামা ডোল্—ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ্। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত—কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন বল আসবে, তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু' হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই। তখন দেবতার মূর্ত্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গয়নাপরা মেয়েমাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ্ করবে।

ওঁ গঙ্গা

স্বামী বিবেকানন্দ

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্ম্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্না গোনা যায়, সেই অপূর্ব্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর হর হর" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের "হর হর" প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্য্যন্ত দেখেচ; কিন্তু আমাদের কর্দ্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণ-শুভ্রা, সহস্র-পোতবক্ষা এ কলকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার—কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে একি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি?—হবে! গঙ্গা গঙ্গা কোরে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন কোরে রাখে, পালপার্ব্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় কোরে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মাল্টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেলবারে আমিও একটু নিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্যজন-স্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই "হর হর হর," দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করচেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাকচেন—"হর হর হর!"

এবার তোমরাও পাঠিয়েচ দেখচি মাকে মান্দ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা কি অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মাকে প্রবেশ করিয়েছ ভায়া। তু—ভায়া বালব্রহ্মচারী "জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা"; ছিলেন "নমো ব্রহ্মণে" হয়েচেন, "নমো নারায়ণায়" (বাপ রক্ষা আছে), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদনায় প্রবেশ। যা হোক, খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদনাকার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেচে। সেটা ভেদ কোরে মা বেরুবার চেষ্টা করচেন। ভাবলুম সর্ব্বনাশ, এইখানেই যদি হিমাচল ভেদ, ঐরাবত ভাসান, জহ্নুর কুটীর ভাঙ্গা প্রভৃতি পর্ব্বাভিনয় হয় ত—গেচি। স্তব স্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লুম—মা! একটু থাক, কাল মান্দ্রাজে নেমে যা করবার হয় কোরো, সেদেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটীর, আর ঐ যে চক্চকে কামান টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল ত ওর কাছে মাখম, যত পার ভেঙ্গ, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহু; মা কি শোনে। তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বল্লুম—মা দেখ, ঐ যে পাগড়ি মাথায় জামা গায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক ওদিক করচে, ওরা হচ্চে নেড়ে—আসল গরুখেকো নেড়ে, আর ঐ যারা ঘরদোর সাফ কোরে ফিরচে, ওরা হচ্চে আসল মেথর, লাল বেগের * চেলা। যদি কথা না শোনো ত ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইচি আর কি। তাতেও যদি না শান্ত হও, তোমায় একুণি বাপের বাড়ী পাঠাব; ঐ যে ঘরটি দেখচ, ওর মধ্যে বন্ধ করে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে, আর তোমার ডাক-হাঁক সব যাবে, জমে একখানি পাথর হয়ে থাকতে হবে। তখন বেটী শান্ত হয়। বলি শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চোড়ে বসেন।

---

* ঐতিহাসিক ইলিয়টের মতে লালবেগীদের (ঝাড়ুদার মেথর সম্প্রদায়বিশেষ) উপাস্য আদিপুরুষ বা কুলদেবতা লালবেগ ও উত্তরপশ্চিমের লালগুরু (রাক্ষস অরণ্য কিরাত) অভিন্ন। বারাণসীবাসী লালবেগীদের মতে পীর জহরই (চিস্তিয়া সাধু সৈয়দ সাহ জুহুর) লালবেগ।

স্বামী বিবেকানন্দ

রোমাঁ রোঁলা

[Life and Gospel of Swami Vivekananda পুস্তকের ভূমিকা]

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করিবার এবং তাঁহার চিন্তার বীজ বিশ্বময় বপন করিবার দায়িত্ব তাঁহার যে মহান্ শিষ্যের উপর পড়িয়াছিল, তিনি ছিলেন দেহ ও মনের দিক হইতে রামকৃষ্ণের ঠিক বিপরীত।

দিব্যাত্মা রামকৃষ্ণ তাঁহার সমগ্র জীবন জগন্মাতার চরণতলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আশৈশব তিনি ছিলেন মহাদেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত; আত্মচেতনা জন্মিবার আগেই তাঁহার এই চেতনা জন্মিয়াছিল যে, তিনি মহাদেবীকে ভালবাসিয়াছেন। মহাদেবীর সহিত পুনর্মিলনের চেষ্টায় তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া বহু বেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তবে তাহা ছিল মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো—সে বেদনা বহনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে তাঁহার পবিত্র প্রেমের উপযুক্ত করিয়া তোলা। সকল জটিল দুর্গম অরণ্য, পথের প্রান্তে একাকী সেই মহাদেবীই ছিলেন বর্তমান। বহু রূপের মধ্যে তিনিই ছিলেন একাকী, সেই মহাদেবী—সেই বহুরূপিণী বিধাত্রী। রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি অন্যান্য সকল রূপকেও চিনিতে শিখিলেন, এই মহাদেবীর মধ্য দিয়াই তিনি আলিঙ্গন করিলেন সমগ্র বিশ্বকে। বিশ্বানন্দের এই প্রশান্ত পূর্ণতার মধ্যেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইল। এই বিশ্বানন্দের বন্দনাই বীঠোফেন[১] ও শীলার[২] পাশ্চাত্যের জন্য গাহিয়াছিলেন[৩]।

রামকৃষ্ণ কিন্তু এই বিশ্বানন্দকে বীঠোফেন ও শীলারের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বীঠোফেনের নিকট উহা ছিল বিবদমান বিশৃঙ্খল মেঘমালার অবকাশে নীলাকাশের ক্ষণিক প্রকাশ মাত্র। কিন্তু ভারতীয় রাজহংসপরমহংস ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দিনগুলির যবনিকা পার হইয়া চির শাশ্বতের স্বচ্ছ সরোবরে আপনার সুবিশাল শুভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন।

তাঁহাকে অনুকরণ করিবার অধিকার তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যদেরও ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই বিবেকানন্দও তাঁহার সুবিশাল পক্ষে ভর করিয়া চকিতে কখনো কদাচিৎ মাত্র ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের মধ্যে এই ঊর্ধ্বলোকে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। তাই বিবেকানন্দের কথা ভাবিলে বারে বারে আমার বিঠোফেনের কথা মনে পড়ে। তিনি যে সময়টুকু এই প্রশান্তির বক্ষে বিরাজ করিতেন, তখনও তাঁহার তরণীর পালে সকল দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিয়া লাগিত। পৃথিবীর যুগব্যাপী দুঃখ যন্ত্রণা তাঁহার চারিদিকে ক্ষুধিত সামুদ্রিক পক্ষীর মতো অহরহ ডানা ঝাপটাইয়া বেড়াইত। দুর্বলতার নহে—শক্তির—আবেগ তাঁহার সিংহ-হৃদয়ের মধ্যে উদ্বেল হইত। তিনি ছিলেন মূর্তিমান শক্তি; কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁহার বাণী। বিঠোফেনের মত তাঁহার কাছেও সকল সদগুণের মূল ছিল কর্ম। নিষ্ক্রিয়তাই প্রাচ্যের স্কন্ধে গুরুভার হইয়া চাপিয়া বসিয়াছিল। তাই নিষ্ক্রিয়তার প্রতি তাঁহার ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। তাই ঘৃণাভরে তিনি বলিয়াছিলেন:

"সর্বোপরি, শক্তিশালী হও! পৌরুষ লাভ করো! দুর্বৃত্ত যতোক্ষণ পৌরুষ ও শক্তির পরিচয় দেয়, ততোক্ষণ এমন কি তাহাকেও আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ, তাহার শক্তিই একদিন তাহাকে কুপথ ত্যাগ করিতে, এমন কি, সকল স্বার্থ বিসর্জন দিতে বাধ্য করিবে; এবং এই ভাবেই একদিন শক্তি তাহাকে সত্যের পথে ফিরাইয়া আনিবে।"[৪]

বিবেকানন্দের দেহ ছিল মল্লযোদ্ধার মতো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। তাহা রামকৃষ্ণের কোমল ও ক্ষীণদেহের ছিল ঠিক বিপরীত। বিবেকানন্দের ছিল সুদীর্ঘ দেহ (পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি)[৫], প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃতবক্ষ, সুদৃঢ় গঠন, কর্মিষ্ঠ পেশল বাহু, শ্যামল চিক্কণ ত্বক, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল,[৬] আর অপূর্ব আয়ত পল্লবভারে অবনত ঘনকৃষ্ণ দুটি চক্ষু। তাঁহার চক্ষু দেখিলে প্রাচীন সাহিত্যের সেই পদ্মপলাশের উপমা মনে পড়িত। বুদ্ধিতে, ব্যঞ্জনায়, পরিহাসে, করুণায় দৃপ্ত প্রখর ছিল সে চক্ষু; ভাবাবেগে ছিল তন্ময়; চেতনার গভীরে তাহা অবলীলায় অবগাহন করিত; রোষে হইয়া উঠিত অগ্নিবর্ষী; সে দৃষ্টির ইন্দ্রজাল হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার রাজকীয়তা; তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট। কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায়, কোথাও এমন কেহ তাঁহার পাশে আসেন নাই, যিনি তাঁহার নিকট নতশির না হইয়াছেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোতে কার্ডিন্যাল গিবন্‌স্ ধর্ম সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী সভায় ত্রিশ বৎসরের এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যুবক যখনই আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন সভায় অন্যান্য সভাগণের উপস্থিতির কথা মানুষে ভুলিয়া গেল। বিবেকানন্দের দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য, কমনীয় মাধুর্য এবং প্রশান্ত

১। বীঠোফেন—জার্মাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার।

২। শীলার—জার্মাণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও কবি।

৩। এখানে বীঠোফেনের নবম সিম্ফনির কথা বলা হইতেছে। শীলার রচিত 'আনন্দ বন্দনা' দিয়া এই সিম্ফনিটি শেষ হইয়াছে।

৪। রাজপুতানার আলোয়ারে শিষ্যদের প্রতি, ১৮৯১।

৫। তাঁহার ওজন ছিল ১৭০ পাউণ্ড। তিনি প্রথমবারে যখন এমেরিকা যান, তখন তাঁহার দেহের নির্ভুল মাপ 'ফ্রেনলজিক্যাল জার্নাল অব নিউ ইয়র্ক'এ প্রকাশিত হয়। পরে তাহা "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন" দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬। ভারতীয়দের অপেক্ষা তাতারদের সঙ্গেই তাঁহার চোয়ালের সাদৃশ্য ছিল অধিক। বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বড়াই করিতেন। "তাতাররা জাতির সেরা" একথা বলিতে তিনি ভালবাসিতেন।

মহিমা, তাঁহার চক্ষের কৃষ্ণাভ দ্যুতি, তাঁহার প্রশান্ত গাম্ভীর্য এবং বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পর হইতে তাঁহার কাংস্য-বিনিন্দিত কণ্ঠ ধ্বনি৭ তাঁহার বর্ণবিদ্বেষী মার্কিন অ্যাংলো-স্যাক্সন শ্রোতাদেরও বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল এবং ভারতবর্ষের এই সৈনিক দ্রষ্টার৮ চিন্তাধারা যুক্তরাষ্ট্রের বক্ষে গভীর ভাবে রেখাপাত করিল৯।

তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা কল্পনাও করা যায় না। তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আগেই আমি রামকৃষ্ণের একটি দিব্য দর্শনের বর্ণনা দিয়াছি। সেখানেও রামকৃষ্ণ তাঁহার এই প্রিয় শিষ্যের সংগে তাঁহার নিজের সম্পর্ককে এক মহর্ষির সংগে এক শিশুর সম্পর্কের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিবেকানন্দ নিজেকে কঠোর ভাবে বিচার করিয়া সবিনয়ে এই সম্মান লইতে অস্বীকার করিলেও তাঁহার এই অস্বীকারের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। সকলে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মধ্যে ভগবৎ-প্রেরিত এক নেতার সাক্ষাৎ পাইতেন—তাঁহার মধ্যে নির্দেশ দিবার, পরিচালিত করিবার যে শক্তি নিহিত ছিল, তাহার চিহ্ন সকলের চোখেই সহজে ধরা পড়িত। হিমালয়ে সহসা এক পর্যটকের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। পর্যটক তাঁহাকে না চিনিলেও থমকিয়া দাঁড়ান এবং বলিয়া উঠেন: "শিব!"...১০

তাঁহার স্বনির্বাচিত দেবতা যেন তাঁহার ললাটে নিজের নামটি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার ললাটের এই বিশাল উপলখণ্ডের উপর দিয়া বহু মানসিক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছিল। যে প্রশান্ত বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছ বিস্তারের উপর রামকৃষ্ণের মৃদু হাস্য চমকিত হইত, বিবেকানন্দ তাঁহার নিজের জীবনে তাহা কদাচিৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তাঁহার অতি শক্তিশালী দেহ,১১ তাঁহার অতি বিরাট মস্তিষ্ক আগে হইতেই তাঁহার বাত্যাব্যাকুলিত আত্মার রণক্ষেত্ররূপে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। সেখানে অতীত ও বর্তমান, প্রচ্য ও প্রতীচ্য, স্বপ্ন ও কর্ম স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম-শক্তি এতোই অধিক ছিল যে, তাঁহার নিজের স্বভাবের এক অংশকে বা সত্যের এক অংশকে বিসর্জন দিয়া কোনোরূপ সংগতি বিধান তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁহার এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার জন্য তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সে সংগ্রামে তাঁহার সাহস, এমন কি তাঁহার জীবনও নিঃশেষিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট জীবন ও সংগ্রামের অর্থ ছিল এক।১২ তাঁহার জীবনের দিনগুলিও ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। রামকৃষ্ণের ও তাঁহার এই মহান শিষ্যের মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ষোল বৎসর।...কিন্তু এই কয়েক বৎসরেই বিবেকানন্দ আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন।...চল্লিশ বৎসরের কম বয়সে এই মল্লবীর চিতাশয্যা গ্রহণ করেন।

কিন্তু সে চিতাগ্নি আজও নির্বাপিত হয় নাই। প্রাচীনকালের ফিনিক্স পক্ষীর১৩ মতোই তাঁহার চিতাভস্ম হইতে নূতন করিয়া ভারতের বিবেক—সেই ঐন্দ্রজালিক পক্ষী—উত্থিত হইয়াছে। উত্থিত হইয়াছে ভারতের ঐক্যে এবং তাহার মহান বাণীতে মানুষের বিশ্বাস। এই বাণীর কথা ভারতের প্রাচীন স্বপ্ন-দ্রষ্টারা বৈদিক যুগ হইতে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন; এই বাণীর হিসাব-নিকাশ আজ ভারতবাসীকে অবশিষ্ট মানবজাতির নিকট দিতে হইবে।

৭। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল 'ভায়লনসেলো' বাদ্য যন্ত্রের মতো। (একথা আমি মিস্ জোসেফিন ম্যাক্লেয়ডের মুখে শুনিয়াছি)! তাহাতে উত্থান-পতনের বৈপরীত্য ছিল না, ছিল গাম্ভীর্য, তবে তাঁহার ঝংকার সমগ্র সভা-কক্ষে এবং সকল শ্রোতার হৃদয়ে ঝংকৃত হইত। তিনি তাঁহার শ্রোতার উপর একবার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে, এই তীব্র ধ্বনিকে কর্ণ ভেদ করিয়া আত্মা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন। এমা কাল্ভের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। এমা কাল্ভে বলেন, তিনি ছিলেন চমৎকার 'ব্যারিটোন', তাঁহার গলার সুর ছিল চীনা গঙের আওয়াজের মতো।

৮। তিনি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ। কায়স্থরা ক্ষত্রিয় বা সৈনিক শ্রেণীর অন্তর্গত!

৯। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করিলে তাহা দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং তাঁহার অন্তরংগ ভক্তরূপে কয়েক জন অ্যামেরিকানকে তিনি পান।

১০। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণী।

১১। অবশ্য অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মধ্যে বহুমূত্র রোগের আক্রমণ লক্ষিত হয় এবং বহুমূত্র রোগেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই হারকিউলিসের পার্শ্বে মৃত্যু সর্বদাই উপস্থিত ছিল।

১২। জীবনকে তিনি কি "পরিপার্শ্বের বিরুদ্ধে সত্তার প্রকাশের ও বিকাশের চেষ্টা" বলিয়া বর্ণনা করেন নাই? (এপ্রিল ১৮৯১: ক্ষেত্রীর মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য।)

১৩। ফিনিক্স পক্ষী—পাশ্চাত্য পুরাণে বর্ণিত পক্ষী। কথিত আছে, ফিনিক্স তাহার ভস্ম হইতে পুনর্জন্ম লাভ করে।

"আর এক কথা বোঝ দাদা,—অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে।...তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এই মাত্র।...বলি খাওয়া ত সব দেশেই এক; তবে আমরা পা গুটিয়ে বসে খাই, বিলাতিরা পা ঝুলিয়ে বসে খায়। এখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি; তা ব'লে কি এদের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকতে হবে? আমার ঠ্যাং যে যমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে—টন্‌টনানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি? কাজেই পা গুটিয়ে এদের খাওয়া খাব বৈকি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মত করে—পা গুটিয়ে, আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে।"

—স্বামিজী [প্রাচ্য ও পাশ্চত্য, পৃঃ ২৬]।

ছাত্রদের প্রতি

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(ভূতপূর্ব বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য)

এ কালের অনেক উগ্র আধুনিকপন্থীদের কথায় কথায় রাশিয়ার নজীর তুলতে দেখা যায়। ছাত্রদের অনেকে রাশিয়ার প্রশংসা করেন। আমরাও করি। কিন্তু অনেকে ধারণা পোষণ করেন, রাশিয়ায় হয় তো শিক্ষাদান বা শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে, এ কথা আদপেই সত্য নয়। রাশিয়াতে ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত কঠোর বিধি-নিষেধের নিয়মে লেখাপড়া করতে হয়। আমি রুশ বিশেষজ্ঞের বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে রুশীয় ছাত্রদের পালনীয় কর্ত্তব্যের একটি তালিকা রচনা করেছি। আমাদের দেশের শিক্ষক ও ছাত্র-সম্প্রদায়ের উপকারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রদত্ত ভাষণ থেকে তালিকা উদ্ধৃত করেছি। রুশ বিশেষজ্ঞের নাম নিকোলাস। এ ছাড়া Russia goes to School গ্রন্থেরও সাহায্য নিয়েছি।

(১) শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন নাগরিক হবার ও নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান সোভিয়েট পিতৃভূমিকে অর্পণের জন্য দৃঢ় অধ্যবসায় নিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

(২) খুব পরিশ্রম করে পড়াশুনা করতে হবে এবং নিয়মিত ভাবে ও ঠিক সময়ে পাঠ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) কোন রকম ওজর আপত্তি না করে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকদের আদেশ পালন করতে হবে।

(৪) প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক, লেখবার সরঞ্জাম অর্থাৎ খাতা, পেন্সিল, কলম প্রভৃতি নিয়ে স্কুলে আসতে হবে এবং শিক্ষক ক্লাসে আসবার আগেই পাঠ গ্রহণের জন্য সর্ব্বরকমে তৈরী থাকতে হবে।

(৫) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, মাথা আঁচড়ে, ফিটফাট পোষাক পরে স্কুলে আসতে হবে।

(৬) ডেস্ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

(৭) ঘণ্টা পড়বার ঠিক আগে ক্লাসে নিজের জায়গায় গিয়ে বসতে হবে এবং পড়ানর সময় ক্লাসে ঢুকতে বা বেরুতে হলে শিক্ষকের অনুমতি নিতে হবে।

(৮) শিক্ষক যখন পড়াতে থাকবেন তখন ঠিক সোজা হয়ে বসে থাকতে হবে, ডেস্কের উপর কুনুই রেখে যথেচ্ছ ভাবে বসা চলবে না এবং শিক্ষক যা বলবেন তা একমনে শুনতে হবে। এই সময় যে বিষয়ে পড়ান হচ্ছে তা ছাড়া অন্য কোন কথা বলা চলবে না।

(৯) শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকের ক্লাসে ঢোকা ও বেরুনোর সময় উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের নমস্কার করতে হবে।

(১০) সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং শিক্ষক বসতে বললে তবে বসা যাবে। কোন প্রশ্ন করতে হলে বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে হাত তুলতে হবে।

(১১) হোম ওয়ার্কের খাতায় নির্ভুল ভাবে লিখতে হবে এবং তা পিতামাতাকে দেখাতে হবে।

(১২) প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। পথে কোনও শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হলে মাথা একটু নত করে নমস্কার জানাতে হবে। বালকেরা মাথার টুপি তুললেই চলবে।

(১৩) যারা বয়সে বড় তাদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করতে হবে। স্কুলে, পথে বা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে ভদ্র এবং নম্র আচরণ করতে হবে।

(১৪) কাকেও কড়া কথা বলবে না বা গালাগালি দেবে না, ধূমপান করবে না এবং জুয়াখেলা করবে না।

(১৫) স্কুলের সম্পত্তির এবং নিজের ও সহপাঠীদের জিনিষের প্রতি দরদ নিতে হবে।

(১৬) বৃদ্ধ ও শিশু, দুর্ব্বল ও রুগ্ন লোকদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, তাদের কথা ভাবতে হবে, তাদের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে, দরকার হলে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে এবং যতরকম ভাবে সম্ভব তাদের সাহায্য করতে হবে।

(১৭) মা বাপের কথা শুনতে হবে এবং তাঁদের ও ছোট ভাইবোনদের সাহায্য করতে হবে।

(১৮) নিজের ঘর, বিছানা, জামা, জুতো প্রভৃতি বেশ গুছিয়ে ফিটফাট রাখতে হবে।

(১৯) ছাত্রের কার্ড যত্ন করে নিজের কাছে রাখতে হবে এবং প্রধান বা অন্য কোন শিক্ষক দেখতে চাইলে তখনই তা দেখাতে হবে।

(২০) স্কুল ও ক্লাসের সম্মানকে নিজের সম্মানের মত রক্ষা করতে হবে।

এই সব নিয়ম অমান্য করলে শাস্তি দেওয়া হবে এবং চরম শাস্তি হল স্কুল থেকে বিতাড়ন।

রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতি আংশিক ভাবে জার্ম্মাণ পদ্ধতির মত। বিপ্লবের আগে রাশিয়ার শিক্ষার অবস্থা ভারতের চেয়েও খারাপ ছিল।

শিক্ষা কোন দেশেই সম্পূর্ণতঃ স্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরী হয় না, খাদ্যই তৈরী হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতেছি না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

৩৫

"Never think
You can make the world
Better and happier.
The bullock in the oil mill
Never reaches the wisp of hay
Tied in front of him,
He only grinds out the oil.
So
We chase
The will-o'-the-wisp of happiness
That always eludes us
And
We only grind Nature's mill,
Then die
Merely to begin again."[১]

১। "কখনো মনে কোরোনা, তুমি জগতের ভালো কোরতে পারো, তুমি তাকে সুখী কোরতে পারো। ঘানির বলদ তার সামনে বাঁধা কয়েক গাছি খড় পাবার জন্যে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু কোনোকালে সেখানে পৌছুতে পারেনা, সে কেবল ঘানিই ঘোরাতে থাকে। আমরাও সেইরকম সুখরূপ আলেয়াটার অনুসরণ কোরছি—যেটা সর্বদাই আমাদের সামনে থেকে সোরে-সোরে যাচ্ছে—আর আমরা শুধু প্রকৃতির ঘানিই ঘোরাচ্ছি। এইরকম ভাবে ঘানি টানতে টানতেই একদিন আমাদের মৃত্যু হয়, তারপরে আবার নোতুন কোরে ঘানিটানার পালা সুরু হয়।" —*Inspired Talks* (*comp. works, Vol, VII, page* 101)।

অতএব নিজেদের ভালো যদি চাও,
সুখের·দুরাশাটাকে এখুনি তাড়াও ;
সুখ আর দুঃখকে একই বোলে জেনে
আনন্দ-বেদনার পারে পাড়ি দাও।

* * *

"If
We could get rid of evil,
We should never
Catch a glimpse
Of anything higher ;
We would be satisfied
And never struggle
To get free.

When man finds
That
All the search for happiness in matter
Is nonsense,
Then
Religion begins."[২]

৩৬

সুখ আর দুঃখটা সমপরিমাণ,
কারুর সাধ্য নেই একটা কমান্ ;
যাঁদের সুখের আশা অন্তবিহীন,
অনন্ত বেদনায় তাঁরা খাবি খান্।

মায়ার প্রভাবে পোড়ে আমরা সবাই
দুঃখকে বাদ দিয়ে শুধু সুখ চাই,
মনে ভাবি—মন্দটা পরিমিত আর
টান্‌লে কেবলি বাড়ে শুধু ভালোটাই।

সমাজের মাথা যাঁরা দেশকে চালান্,
তাঁরাও এ-অসত্যে পা-টা হড়কান্ ;
মন্দের বিরুদ্ধে অভিযান কোরে
নিছক ভালোই শুধু রেখে যেতে চান !

'Utilitarian' যে যাই বলুক্,
যে যতোই যুক্তির তুফান তুলুক্,
'Greatest good'টা যারা একান্ত চায়,
Greatest evilটারও রাস্তা খুঁড়ুক্। [৩]

২। "যদি আমরা অশুভকে দূর কোরতে পারতাম, তাহোলে আমরা কখনোই কোনো উচ্চতর বস্তুর আভাস পর্যন্ত পেতাম না ; তাহোলে আমরা সন্তুষ্টই থাকতাম, মুক্ত হওয়ার জন্যে কখনো চেষ্টাই কোরতাম না। যখন মানুষ দ্যাখে—জড়জগতে সুখের অন্বেষণ একেবারেই বৃথা, তখনই ধর্ম-জীবনের সূত্রপাত।"—*Inspired Talks* (*oomp. works, Vol VII, page* 101)

৩। 'Utilitarianism' মতবাদের সমর্থক। 'Greatest good or happiness of the greatest number' অর্থাৎ

Good আর evil এর নেইকো ফারাক্,
আজকের ভালোটাই কাল্‌কে খারাপ।
কিংবা যেখানে যতো আছে বেশি সুখ
সেখানেই বেদনার বেশি উৎপাত!

পাশের বস্তিখানা ভাঙলো যে-ঝড়ে,
তাতেই লক্ষ কোটি জীবাণুরা মরে!
তোমার স্বার্থে যেটা হানলো আঘাত,
তাতেই লক্ষ রোগ বিদূরিত করে!

যাঁদের পয়সা আছে কাটলেট খান,
তাঁরাই বেশির ভাগ পেট্ হড়কান্!
যাঁদের শক্ত পেট্, প্রচণ্ড খিদে,
তাঁদের পয়সা নেই অন্ন জোগান্!

'সবচেয়ে বেশি লোকের সবচেয়ে বেশি মঙ্গল বা সুখ'—এই হোচ্ছে এই যুক্তিসর্বস্ব নীতির মূলমন্ত্র। Bentham-Mill প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিকেরা যুক্তির তুফান তুলে এই মোহগ্রস্ত মতবাদের মোক্তারী কোরে গ্যাছেন। তাঁরা হয়তো ভেবে নিয়েছেন—ক্রমবিকাশের গতিপথে একদিন যা কিছু অশুভ এবং দুঃখের, সব চোলে যাবে, মন্দ এবং দুঃখটা ক্রমশঃ কোমতে কোমতে এমন এক সুসময় উপস্থিত হবে, যখোন মন্দ বা দুঃখের উচ্ছেদ হোয়ে নিছক্ ভালোটাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটা খুবই লোভনীয় এবং চটক্‌দার, কিন্তু আসলে অন্তঃসারশূন্য। এতে ভালো বা মন্দকে, আনন্দ বা বেদনাকে বিচ্ছিন্ন কোরে ও-দুটোর পরিমাণ নির্দিষ্ট বোলে ধোরে নেওয়া হোচ্ছে; ধোরে নেওয়া হোচ্ছে—ভালো বা আনন্দ বোলে একটা পদার্থ আছে, যার ওজন একসের এবং খারাপ বা দুঃখ বোলেও আর একটা একসেরা জিনিস আছে, আর এই মন্দ বা দুঃখটা ক্রমাগতই কোমছে, ফলে এক সের ভালো বা আনন্দই শুধু অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে। যুক্তিটা খুবই উত্তম এবং আনন্দদায়ক, কিন্তু একে আদর্শ কোরে জীবনযাপন কোরলে কপালে অশেষ দুঃখ আছে। কেননা মানুষের অভিজ্ঞতা বোলছে—ভালোর মোতো মন্দও, সুখের মোতো দুঃখও ক্রমবর্দ্ধমান, আর ও-দুটো পরস্পর-বিরোধী কোনো পৃথক সত্তাও নয়, ওরা আসলে এক, একই জিনিসের এ-পিট আর ও-পিট। তাই আজ যেটা আনন্দ দিচ্ছে, কাল তাতেই বেদনা বোধ কোরছি। আজ গরম জলে চা কোরে খেয়ে যেমন হাসছি, কাল গরম জলে পা পুড়ে গিয়ে হয়তো কাঁদছি। তার মানে, একই জিনিস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হোচ্ছে, আজকের আনন্দই কালকে বেদনারূপে প্রতিভাত হোচ্ছে।

সুতরাং 'greatest good or happiness' চাইতে যাওয়া মানে greatest evil বা misery-কেও ডেকে আনা। আসলে greatest goodটা হোচ্ছে, good and evil—কাউকেই না-চাওয়া, ও-দুটোর পরপারে যে সত্তা রোয়েছে তারই দ্বারস্থ হওয়া। অর্থাৎ বাসনাবিনাশের বন্ধুর পথে পা বাড়ানো, স্বামিজী-হওয়ার দুর্গম পথে পাড়ি দেওয়া।

টাকার কুমীর যারা মোটর হাঁকায়,
তারাই অপুত্রক এই দুনিয়ায়!
যাদের পকেট খালি, তাদের ঘরেই
ছেলের পঙ্গপাল খিদেয় চ্যাঁচায়!

খানা-ডোবা-নর্দমা আছে গাঁয়েতেই,
সহরে সে-বিটকেল দৃশ্যটা নেই;
কিন্তু মড়ক আছে 'টাইফয়েডের',
জীবাণুর জন্ম যে ঢাকা-ড্রেনেতেই!

পাড়াগাঁয়ে গাড়ি নেই পায়ে হাঁটি তাই,
সহরেতে ট্রামে কোরে কেমন ব্যাড়াই।
কিন্তু বাতের ব্যথা সহরে বাবুর
অর্দ্ধেক কেড়ে ন্যায় পরমায়ুটাই!

বুদ্ধির আনন্দ নেই বুনোদের;
সে-হিসেবে আমাদের আনন্দ ঢের।
Shelley-Keats আমাদের আনন্দ দ্যায়,
সে-সূক্ষ্ম অনুভূতি নেইকো ওদের।

কিন্তু সে খায়-দায় থাকে আহ্লাদে,
বাঘের থাব্‌ড়া খায় তবু মরেনা সে।
আমরা সহুরে যারা বেশি শিক্ষিত,
সামান্য ব্রণ নিয়ে মোরি 'রিসিপ্লাসে'!

তাছাড়াও যে-স্নায়ুটা আমাদের প্রাণে
সুখ বা আনন্দের অনুভূতি আনে,
সেই আনে দুঃখের অনুভূতিটাও;
সুখ ও দুঃখ তাই একই পরিমাণে।

জংলী চাকোরটার চেয়ে শতগুণে
আমাদের সুখ বেশি শিক্ষার গুণে।
কিন্তু মজাটা দ্যাখো, আমাদের চেয়ে
দুঃখের দাহ তার কম ততোগুণে।

তাকে যদি মিহিসুরে দু-কথা শোনাই,
দুঃখিত হয় সে কি? লাথি-ঝাঁটা চাই।
আর দ্যাখো, বাঁকাসুরে একটা কথায়
নিদারুণ অভিমানে আমরা কোঁপাই।

অর্থাৎ যার স্নায়ু যতো বেশি মোটা,
সুখ বা দুঃখ তার ততো বেশি ভোঁতা।
স্নায়ুর সূক্ষ্মতাটা যার যতো বেশি,
তারই মনে ও-দুটোর ততো তীব্রতা।

স্বামিজী তো আনন্দ খুবই পেয়েছেন,
কিন্তু বেদনা তাঁর কম ভেবেছেন ?
দরিদ্র ভারতের কথা ভেবে ভেবে
জীবনের ক'টা দিন নিদ্রা গ্যাছেন ?

মোটকথা পৃথিবীর সুখ-দুঃখের,
হাসি ও চোখের জল, ভালো মন্দের
সমষ্টি চিরদিন সমপরিমাণ ;
কখনো ব্যতিক্রম হয়নিকো এর।

৩৭

অতএব এইখানে প্রশ্নটা এই—
অপরের মঙ্গল চাইতে কি নেই ?
মিছিমিছি খাটি কেন ভূতের ব্যাগার
হাসি যদি শেষ হয় চোখের জলেই ?

ভালো আর মন্দটা একই যদি হয়,
সমাজ-সেবার কাজে আসে সংশয় ;
এক সের পরিমাণ সুখ চাইলেই
এক সের দুঃখ যে ডেকে আনা হয় !

অতএব পরার্থে খাটবোনা সব ?
হাত-পা গুটিয়ে সব হবো কচ্ছপ ?
সুখ আর দুঃখটা অভিন্ন জেনে
তোমার আর্তনাদে থাক্‌বো নীরব ?

* * *

"Shall we not work
To do good then ?
Yes,
With more zest than ever,
But
What this knowledge
Will do for us,
Is to break down
Our fanaticism.
There will be
Less of fanaticism
And more of real work.
Fanatics can not work,
They waste
Three-fourths of their energy.
It is the level-headed,
Calm, practical man,
Who works.
So,
The power to work
Will increase
From this idea.
Knowing that
This is the state of things,
There will be more patience.
The sight of misery
Or evil
Will not be able
To throw us off our balance
And
Make us run
After shadows."[৪]

৩৮

সামান্য মানুষের কথা বাদ দাও,
এমনকি বুদ্ধের বিরুদ্ধতাও
মর্মান্তিক ভাবে হোয়েছে বিফল,
ভারতের ইতিহাস খুলে দেখে নাও।

বাহ্য-পুজোর প্রতি বিদ্বেষ তাঁর,
প্রতীক-পুজোর প্রতি তাঁর ধিক্কার
প্রতীক-পুজোর ঐ প্রবৃত্তিটাকে
অজান্তে কোরে গ্যাছে আরো জোরদার !

বুদ্ধ তো চেয়েছেন—আমরা সবাই
মূর্তিকে ফেলে দিয়ে নির্বাণ চাই,
কিন্তু ট্র্যাজিডি এই—তাঁরই মূর্তিতে
একদিন মেতেছিলো সারা এশিয়াই !

৪। "তবে কি আমরা শুভ কাজ কোরবো না ? কোরবো বৈ কি, আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি উৎসাহ নিয়েই কোরবো। কিন্তু এই জ্ঞান (অর্থাৎ ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ আসলে যে পরস্পর-বিরোধী দুটো পৃথক সত্তা নয়, এক জিনিসেরই এপিট-ওপিট) আমাদের উদ্ধত বাড়াবাড়ি এবং একঘেয়েমিকে দূর কোরবে।··· একঘেয়েমি কম হোয়ে আসল কাজটা বেশি হবে। একঘেয়ে লোকেরা কাজ কোরতে পারে না। তারা শক্তির চার ভাগের তিন ভাগ বৃথা নষ্ট করে। যাঁরা ধীর স্থির এবং অকাল্পনিক, তাঁরাই প্রকৃত কাজ কোরে থাকেন। অতএব এই জ্ঞান থেকে কাজ করবার শক্তি বেড়ে যাবে। ঘটনাচক্র এই রকমই জেনে মানুষের ধৈর্য বেড়ে যাবে। দুঃখ এবং অমঙ্গল আমাদের সমতা থেকে বিচ্যুত কোরতে পারবে না এবং আর আমাদের ছায়ার পেছনে দৌড়তে হবে না।"

—Maya and illusion, Jnana Yoga (Page 71)

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টির মূল,
তাঁর হাতে বুদ্ধও খেলার পুতুল,
বুদ্ধের বুদ্ধির কোদাল দিয়েই
মূর্তির খাল কেটে ভাসান দুকূল!

অমূর্ত-সাধকের ঐ সাধনার
প্রচণ্ড সিদ্ধিটা তাঁরই হাতিয়ার,
প্রতীকের বিরুদ্ধে তাকে লাগিয়েই
বিরুদ্ধ শক্তিতে তোলেন জোয়ার!

বুদ্ধের বুদ্ধির ঘাড়টা ভেঙেই,
মূর্তির বিরুদ্ধে তাঁকে লাগিয়েই
মূর্তির পিপাসাটা খুঁচিয়ে তোলেন,
রস-স্বরূপটির রসিকতা এই!

বেচারী বুদ্ধ যেই চোখ বুঁজলেন,
প্রস্তর-শিল্পীরা গর্জে এলেন!
তারপর বাটালি ও ছেনি সহযোগে
পাথর কাটেন আর বুদ্ধ গড়েন!

এই ভাবে বুদ্ধের বিরাট আত্মায়
অসংখ্য বাটালির অনন্ত ঘায়
বৌদ্ধই বুদ্ধের মূর্তিকে গোড়ে
মন্দির কোরেছেন সারা এশিয়ায়!

খবর-কাগজ যাঁরা নাড়েন-চাড়েন,
তাঁরা এই সত্যের কিছুটা জানেন;
পঁচিশ-শো বছরের পরেতেও আজ
এশিয়ার মাটি খুঁড়ে বুদ্ধ পাবেন!

শায়িত মূর্তি তাঁর ভূমি-শয্যায়,
দাঁড়ানো প্রতিকৃতি কৃপা-মুদ্রায়,
বিভিন্ন সাইজের ধ্যান-বিগ্রহ
পাঁচ হাত মাটি খুঁড়ে আজও পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম-পুজোর ঐ বিরুদ্ধতাই,
প্রতীক-পুজোর প্রতি ধিক্কারটাই
প্রতীকের আসনটা পাকা কোরে গ্যাছে
মানুষের হৃদয়ের শতদলে ভাই।

আমার তো মনে হয় এই আলোকেই
বিশিষ্ট ব্রাহ্মের বিফলতা এই—
প্রতিমার পরমায়ু বাড়িয়ে গ্যাছেন
সযত্নে প্রতিমার পেছনে লেগেই।

কুমোরটুলীর ঐ শিল্পীর কাজ
অন্ততঃ শতগুণে বেড়ে গ্যাছে আজ।
দুর্গা-সরস্বতী গুঁতোগুঁতি কোরে
চীৎপুরে ফুটপাথে করেন বিরাজ!

মূর্তি-পুজোটা এত বাড়ে দিন-দিন,
সহরে যায়না ট্যাকা পুজোর ক'দিন!
কিংবা থাকিই যদি কোলকাতাতেই
চাঁদার চাঁটায় প্রাণ যায় হিমসিম্!

আমার তো মনে হয়—এর মূলে ভাই
ব্রাহ্ম-নেতার দল, দায়ী তোমরাই।
মূর্তিকে বাড়িয়েছে স্রেফ্ তোমাদের
ধারকরা-ইংরিজী-বিদ্বেষটাই।

৩৯

"The history of the world
Teaches us
That
Wherever
There have been
Fanatical reforms,
The only result has been
That
They have defeated
Their own ends.

No greater upheaval
For the establishment
Of right and liberty
Can be imagined
Than the war
For the abolition of slavery
In America.
You all
Know about it.

And
What has been
Its results?
The slaves
Are a hundred times worse off today
Than they were
Before the abolition.

Before the abolition,
These poor Negroes
Were the property of somebody,
And, as properties,
They had to be looked after,
So that
They might not
Deteriorate.

Today
They are the property of nobody.
Their lives
Are of no value ;
They are burnt alive
On mere pretences.
They are shot down
Without any law
For their murderers ;
For they are niggers,
They are not human beings,
They are not even animals ;

And
That is the effect
Of such
Violent taking away of evil
By law,
Or by fanaticism.
Such is the testimony of history
Against every fanatical movement,
Even for doing good.
I have seen that,
My own experience
Has taught me that.

Therefore
I cannot join
Any one of these
Condemning societies." ৫

[ক্রমশঃ।

৫। "পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের শেখাচ্ছে, যেখানেই প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে কোনো রকম সংস্কার করবার চেষ্টা হোয়েছে, তার ফল হোয়েছে এই—যে উদ্দেশ্যে সংস্কার, সেই উদ্দেশ্যটাই বিফল হোয়ে গ্যাছে। অ্যামেরিকায় ক্রীতদাস-প্রথা রহিত করবার জন্যে যে যুদ্ধ হোয়েছিলো, মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে তার চেয়ে কোনো ঘোরতর আন্দোলন কল্পনা করা যায় না। তোমাদের সকলেই তা' জানো। কিন্তু এর ফলটা কি হোয়েছে ? দাস-ব্যবসা রদ্ হবার আগে তাদের যা অবস্থা ছিলো, আজ তাদের অবস্থা তার চেয়ে শতগুণে খারাপ। আগে এই হতভাগ্য নিগ্রোরা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হোতো—নিজের সম্পত্তি-হানির ভয়ে তারা যাতে দুর্বল এবং অকর্মণ্য হোয়ে না পড়ে, সেদিকে নজর দিতে হোতো। কিন্তু এখন তারা কারুরই সম্পত্তি নয়। তাদের জীবনের কোনো দামই নেই ; সামান্য ছুতো কোরে এখন তাদের জীবন্ত পোড়ানো হয়। তাদের গুলী কোরে মেরে ফ্যালা হয়, অথচ এই খুনেদের জন্যে কোনো আইনই নেই ; কারণ তারা হোচ্ছে 'নিগার'—তারা মানুষ নয়, এমন কি পশুরও অধম। আইনের দ্বারা কিংবা প্রবল উত্তেজনা নিয়ে সমাজের দোষ তাড়াতে যাওয়ার ফল হোচ্ছে এই। এমন কি কল্যাণসাধনের জন্যেও এই রকম উত্তেজনাপ্রসূত আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। আমি তা' দেখেছি, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি তা' শিখেছি। সেই জন্যে আমি দোষারোপকারী কোনো রকম সমিতির সঙ্গে যোগ দিতে পারি না।"—*My plan of campaign.* (*comp. works, Voll.* III, *page* 214 *and* 215)

"হাজার বছরের নানারকম হাঙ্গামায় জাতটা মলোনা কেন ? আমাদের রীতি-নীতি যদি এতই খারাপ ত আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না কেন ? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ত্রুটি কি হ'য়েছে ? তবু সব হিঁদু মরে লোপাট হ'ল না কেন—অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে ? যেমন আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায় হয়েছে এবং হচ্ছে ? তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা, ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এইটে প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ—যাঁরা অন্তর্বহিঃ সাহেব-সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু, তোমরা হে ইউরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর, যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে হাসেন-হোসেন করছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, জিহোবাও আসেননি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নেই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চ'ড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস্, মায় অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনারা পর্য্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এক কালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী—উনি চীন জাপান পর্য্যন্ত পূজো খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর-মা মেরী ক'রে কৃশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরির উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশ-মুণ্ড-কুড়ি হাতে রাবণ নাড়াতে পারেনি, ওকি এখন পাদ্রী-ফাদ্রীর কর্ম্ম।। ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড়না কেন ? চ'রে খাওগে না কেন ?"

—স্বামিজী [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। পৃঃ ৬]

বিভিন্ন গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবর্গকে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

"যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম ? যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু' হাজার বৎসর খালি বিচার করছে, ডান হাতে খাব, কি বাঁ হাতে, ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে—তাদের অধোগতি হবে না ত কার হবে ? দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না ; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape Comorin-এ মা-কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরোর উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয়না।"

"ওয়া গুরুকা ফতে ! আরে দাদা 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,' ঐ ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড় লোক তৈরী হয়ে যায়। মিশনরি-ফিসনরির কি কর্ম এ ধাক্কা সামলায় ? মোগল-পাঠান হদ্দ হল, এখন কি তাঁতির কর্ম ফার্সি পড়া ? ও সব চলবে না ভায়া, কিছু চিন্তা করো না। সকল কাজেই একদল বাহবা দেবে, আর একদল দুষমনাই করবে। আমাকে এরা (আমেরিকানরা) যমের মত দেখে। বলে, কোথা থেকে এ ব্যাটা এল, রাজ্যির মেয়েমদ্দ ওর পিছু ফেরে—গোঁড়ামীর জড় মারবার যোগাড়ে আছে। আগুন ধ'রে গেছে বাবা ! গুরুর কৃপায় যে আগুন ধ'রে গেছে, তা নেববার নয়। কালে গোঁড়াদের দম নিকলে যাবে।··· শরীরাভিমান ছেড়ে দাঁড়া। বল্ অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি ক'রে দেশটা গেল ! সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং। কি উৎপাত ! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে ; ওরে নেই নেই ব'লে কি কুকুর-বেড়াল হয়ে যাবি নাকি ? কিসের নেই ? কার নেই ? শিবোঽহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। ঐ যে দীনহীনা ভাব, ও হ'ল ব্যারাম—ওকি দীনতা ? ও গুপ্ত অহংকার !—Avalanche-এর মত দুনিয়ার ওপর পড়—দুনিয়া ফেটে যাক চড় চড় ক'রে, হর হর মহাদেব। 'নেই নেই বললে সাপের বিষও নেই হয়ে যায়।' No নেই নেই, বল্ হাঁ হাঁ, 'সোঽহং সোঽহং'।···ভয় কি ? কার সাধ্য বাধা দেয় ? কুম্ভস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্। (তারকা চর্বণ কোরবো, ত্রিভুবনটাকে বলপূর্বক উৎপাটন কোরবো, আমাদের কি জানো না।—আমরা রামকৃষ্ণের দাস ?)

ডর ? কার ডর ? কাদের ডর ?"

"যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে একটুকরো রুটি দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।"

"রামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি পাগলামি হচ্ছে ? আমার অদৃষ্টে সারাজীবন দেখছি গরু তাড়ানো ঘুচলো না। মস্তিষ্কহীন আহম্মকগুলো কেন যে এই বাজে আজগুবিগুলো লেখে তা জানিও না, বুঝিও না। মদকে ডি, গুপ্তের ওষুধে পরিণত করা ছাড়া—রামকৃষ্ণের কি জগতে আর কোনো কাজ ছিল না ? প্রভু আমাকে এই ছটাকে মাথা আহম্মকদের হাত থেকে রক্ষা করুন !···এই সব লোক ভগবানকে জানতে চায়—এদিকে রামকৃষ্ণের ভেতর বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না ! খাজা আহম্মকি। এরকম আহম্মক দেখলে আমার রক্ত টগবগ কোরে ফুটতে থাকে। শাস্ত্রে যে সব জ্ঞান, মতবাদ আকারে মাত্র রয়েছে, তিনি তার মূর্ত দৃষ্টান্ত—ঋষি ও অবতারেরা যা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নিজের জীবন দিয়ে তা দেখিয়ে গেছেন। শাস্ত্রগুলো মতবাদ মাত্র—তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই লোকটি ৫১ বৎসরব্যাপী একটা জীবনে পাঁচহাজার বৎসরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবনযাপন কোরে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্যে শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তরূপে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন।"

"ঠাকুর মন্দ নয়, তবে ঐটি all in all কোরে পুরোণো ফ্যাসনের nonsense করে ফেলবার একটা tendency আছে, আমার তাই ভয়। আমি জানি, তারা কেন ঐ পুরোণো ছেঁড়া ceremonial নিয়ে ব্যস্ত। ওদের Spirit চায় work, কোনও outlet নেই, তাই ঘণ্টা নেড়ে energy খরচ করে।"

"তোমাদের আক্কেলবুদ্ধি একপয়সাও নেই। Indian Mirror-কে পরমহংস মশাই নরেনকে হেন্ বলতেন তেন্ বলতেন, কেন ব'লতে গেলে—আর আজগুবি যাজগুবি যত—পরমহংস মশায়ের বুঝি আর কিছুই ছিল না ? খালি thought reading আর nonsense ! দু'পয়সার brain-গুলো ! ঘৃণা হয়ে যায় !"

"মিছিমিছি কর্তাভজার দল বাঁধতে আমার ইচ্ছে নেই। সমাজকে জগৎকে electrify কোরতে হবে। বসে বসে গল্পবাজির আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ ?···চেলা চাই at any risk। এক একজনে ১০০ মাথা মুড়িয়ে ফেল, young educated men—not fools, তবে বলি বাহাদুর। হুলুস্থুল বাধাতে হবে, হুঁকো ফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হ'য়ে যাও। জায়গায় জায়গায় Centre কর, খালি চেলা কর, যার মেয়েমদ্দ যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা Spiritual tidal wave আসছে—নীচ মহৎ হ'য়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হ'য়ে যাবে তাঁর কৃপায়—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।···

ওঠ, ওঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, onward onward ; মেয়েমদ্দে

আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে—onward onward, নামের সময় নেই, যশের সময় নেই, মুক্তির সময় নেই, ভক্তির সময় নেই, দেখা যাবে পরে। এখন এজন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর (ঠাকুরের) মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে দেখেও দেখচ না। একি ছেলেখেলা, একি জ্যাঠামি, একি চ্যাঙ্গরামি—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—হরে হরে।

"আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি।"

"ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা, তাতে আমার সন্দেহ নেই।···দাদা, বেদবেদান্ত, পুরাণ, ভাগবতে কি আছে তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না প'ড়লে কিছুতেই বোঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most perfect—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না, তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজন্যে চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবান হোক্। তিনি কি নামের দাস? ভায়া যীশুখৃষ্টকে জেলেমালায় ভগবান ব'লেছিল, পণ্ডিতেরা মেরে ফেললে, বুদ্ধকে বেণেরা খালি তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরির শেষ ভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত-ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর ব'লে পুজো ক'রেছে।···'যার সঙ্গে ঘর করি নি, সেই বড় ঘরণী'—এ যে আজন্ম দিনরাত্রি সঙ্গ ক'রেও যে তাঁদের চেয়ে ঢের বড় ব'লে বোধ হয়, এই ব্যাপারটা কি বুঝতে পার ভায়া?"

"দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্মই হ'য়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম নয় বাজেই গেল, মরদের বাত, কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়?···একঘেয়ে বল ব'লবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালবাসি। আমার মত অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি, মাফ্ ক'রবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেব? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ-জন্ম, এ-শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে। পেটের কথা খুলে বললুম দাদা, রাগ ক'রো না। আমি তোমাদের গোলাম, যতক্ষণ তোমরা তাঁর গোলাম—এক চুল তার বাইরে গেলে তোমরা আর আমি এক সমান। সমাজ-ফমাজ যত দেখছ দেশ-বিদেশে, সব যে তিনি গিলে রেখেছেন দাদা—'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।' (এরা আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে, হে অর্জুন, তুমি নিমিত্তমাত্র হও) আজ বা কাল ওসব তোমাদের অঙ্গে মিশিয়ে যাবে যে। হায় রে অল্প বিশ্বাস! তাঁর কৃপায় 'ব্রহ্মাণ্ডম্ গোষ্পদায়তে।' (ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ হয়ে যায়) নিমক্‌হারাম হয়ো না, ও-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমাদের আর কি চাই? তিনি শরণ দিয়েছেন, আবার কি চাই? ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা—আবার চাই কি? হে ভাই, যিনি খাইয়ে-পরিয়ে বুদ্ধি-বিদ্যে দিয়ে মানুষ করলেন, যিনি আত্মার চোখ খুলে দিলেন, যাঁকে দিন-রাত দেখলে যে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণামাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমক্‌হারামি!!! বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বইত নয়, অমন ঠাকুরের দয়া ভোল!···তোদের মত লাখ লাখ তিনি নিঃশ্বাসে তৈরী ক'রে নেবেন। তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য, যে তাঁর পায়ের ধুলো পেয়েছিস। ওরে পাগল, পরীর মত মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা, এ সকল তুচ্ছ হ'য়ে যাচ্ছে।

একি আমার জোরে! না, তিনি রক্ষা কচ্ছেন! যার তাঁকে বিশ্বাস নেই, আর মায়ের ওপর ভক্তি নেই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙ্গলা বল্লুম, মনে রেখ।"

"যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন সেইদিন থেকেই Modern India—সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর।"

"Orthodox পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্‌কালে, বা আচারী হিন্দু আমি কোন্‌কালে? I do not pose as one, বাঙ্গালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বার বছরের মেয়ের ছেলে হয়। যাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হ'য়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু ক'রতে পারলেনা, আবার লম্বা কথা! রাম! রাম! আহার গেড়ি-গুগলী, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুর জল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের গু-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাঁকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায় রে ভাই?"

"আমাদের জাতের কোন ভরসা নেই কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পরে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন; আর আষাড়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নেই। হরে হরে, বলি একটা কিছু ক'রে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হলো, কাল তার ওপর ভেঁপু হলো, পরশু তার ওপর চামর হলো—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাড়ে গল্প ২০০০ মারা হলো—চক্র-গদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরিজীতে imbecility বলে—যাদের মাথায় ঐরকম বেল্লোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দীম্ দুবার ঘুরবে, বা চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা, আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো, আর এরা

(ইংরেজেরা) ত্রিভুবনবিজয়ী। কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

যদি ভাল চাও ত ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজো করোগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ—তার পুজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম—ঘণ্টার ওপর চামড় চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশমিনিট বসবো কি আধঘণ্টা বসবো—এবিচারের নাম কর্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ্। ক্রোড় টাকা খরচ ক'রে কাশীবৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলচে আর পড়চে! এই ঠাকুর কাপড় ছাড়চেন, ত এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, ত এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে!"

"নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক,—আমার মুক্তির বাপ্ নির্বংশ। নিজের ভাবনা যখনি ভাববে, তখনি মনে অশান্তি।··· নরক, স্বর্গ, ভক্তি বা মুক্তি সব don't care. আপনার ভাল কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হ'য়ে যাও।"

"মা-ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেউই পারনা, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না! আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে! রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ।··· আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাপ আর বাপের ছেলেরা, একথা বুঝতে পারো কি?···

দাদা, রাগ করোনা, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার ওপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বড়। দাদা মাফ্ ক'রবে। দুটো খোলা কথা ব'লে ফেললুম। ঐ মায়ের দিকে আমিও গোঁড়া। মা'র হুকুম হ'লেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব ক'রতে পারে। আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ ক'রতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ ক'রে পগার পার, এই বোঝ।···

বাবুরামের মার বুড়োবয়সে বুদ্ধির হানি হ'য়েছে। জ্যেন্ত-দুর্গা (শ্রীমা') ছেড়ে মাটির দুর্গা পুজা ক'রতে বসেছে। দাদা বিশ্বাস বড় ধন, দাদা জ্যেন্ত-দুর্গার পুজো দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যেন্ত-দুর্গা মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে সেইদিন আমি একবার হাঁফ্ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছিনা। তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি ক'রে দাও দেখি। গিরিশ ঘোষ মায়ের পুজো করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য। দাদা মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি কো রামঃ। দাদা, ঐ যে বলছি ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের ওপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও।"

"ধর্ম কিন্তভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ্!! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নেই গোলোকেও নেই, সর্বভূতেও নেই, এখন ভাতের হাঁড়িতে।

"বইপত্র বাজে জঞ্জাল লিখে কি হবে? লোকের অন্তর স্পর্শ ক'রতে হলে জ্যান্ত লোকের মুখ থেকে যে জ্যান্ত ভাষা বেরোয়, সেইটিই হচ্ছে প্রধান উপায়; সেই ভাষার ভেতর দিয়ে সেই ব্যক্তির ভেতর যে ভাবের বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলছে, তা অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হ'য়ে যায়। তোমরা ত এখনও ছেলেমানুষ রয়েছ। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হতে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর।"

"কেবল জগতের বাহবা পেয়ে জীবনটা কাটানোর চেয়ে আমার কাছে আমার জীবনের আরও বেশী মূল্য আছে ব'লে মনে হয়।"

"সকল মহাপুরুষের চেলারাই চিরকাল গুরুর উপদেশগুলোর সঙ্গে সেই ব্যক্তিটিকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে, এবং অবশেষে ব্যক্তিটির জন্যে তাঁর ভাবগুলোকে নষ্ট কোরে দিয়েছে।"

"লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙুবি। বজ্রবাঁটুলের মত হ'তে হবে, যাতে পাহাড় পর্বত ভেদ হতে চায়।

দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব—যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভাল, যে না আসবে সে ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে, থাকুক। কুছ পরোয়া নেই।"

"নিকম্ম হতভাগার দল দশ বৎসরের মেয়ে বিয়ে ক'রতে কেবল জানে, আর জানে কি?"

"পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প, আবার সন্ধ্যেও ঘনিয়ে আসছে। আমাকে শীঘ্রই ঘরে ফিরতে হবে। আমার আদব কায়দা পরিপাটি করবার সময় নেই। আমি যা বলতে এসেছি তাই বলে উঠতে পারছি না। রাগ কোরোনা, আমি তোমাদের সকলকে শিশু দেখি। আমার জগৎকে কিছু দেবার আছে, আমার জগৎকে মনযোগান কথা বলবার সময় নেই, এবং তা ক'রতে গেলেই আমি ভণ্ড হ'য়ে পড়বো।···

কী! আমি যাজকদের মন যোগাতে চেষ্টা করবো!! দুঃখিত হয়োনা। তোমরা শিশু মাত্র আর শিশুদের কর্তব্য হচ্ছে অপরের অধীনে থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা।···

আমি এই পৃথিবীটাকে ঘৃণা করি—এই স্বপ্নকে, এই উৎকট দুঃস্বপ্নকে, তার গীর্জে এবং প্রবঞ্চনাকে, তার শাস্ত্র এবং বদমায়েসিগুলোকে, তার মিষ্টিমুখ এবং কপট হৃদয়কে, তার ধর্মের বাহ্যিক আস্ফালন এবং অন্তঃসারশূন্যতাকে, এবং সবচেয়ে ঘৃণা করি তার ধর্মের নামে দোকানদারীকে। কী! সংসারের ক্রীতদাসগুলো কি বলছে তাই দিয়ে আমার হৃদয়ের বিচার করবো! ছিঃ! সন্ন্যাসীকে চেননা। বেদ বলছেন, 'সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ।'···

"তথাকথিত সমাজ-সংস্কার নিয়ে ঘেঁটোনা, কেননা, গোড়ায় আধ্যাত্মিক সংস্কার না হলে কোনো প্রকার সংস্কারই হতে পারেনা।"

"ভগবানের যদি কৃপাদৃষ্টি না থাকে, তবে সমুদ্রে এক ফোঁটাও জল থাকেনা, গভীর অরণ্যে এক টুকরো কাঠও পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাঁড়ারে এক মুঠো অন্নও মেলেনা ; আর তাঁর ইচ্ছে হলে মরুভূমিতে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয়, ভিক্ষুকও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। একটা চড়ুই কোথায় গিয়ে পড়ছে—তাও তিনি দেখতে পান।"

"আমি তোমাদের জন্যে যতটা করেছি, তোমরা তারও উপযুক্ত নও।"

"দিনরাত বংশবৃদ্ধি এবং ঈশ্বর-অনুভূতি একদিনও একসঙ্গে চলতে পারে না।"

"আমার জীবনের অতীত ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা ক'রে আমার আপসোস হয় না। যদি দেখতুম যে, কোনও কাজ করিনি, কেবল লোক ঠকিয়ে খেয়েছি, তাহ'লে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।"

দাদা, মুক্তি নাই বা হ'ল। দু' চারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা। কি ছেলেমানুষি কথা! রাম রাম! আবার নেই নেই বললে সাপের বিষ ক্ষয় হ'য়ে যায় কি না! ও কোন্‌দিশী বিনয়—আমি কিছু জানি না—আমি কিছুই নই—ও কোন দেশী বৈরাগ্য আর বিনয় হে বাপু—ও রকম দীনহীন ভাবকে দূর ক'রে দিতে হবে। আমি জানিনি ত কোন শালা জানে? তুমি জাননা ত এতকাল করলে কি? ও সব নাস্তিকের কথা, লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমরা সব করতে পারি, সব করবো। যার কৃপায় আমি এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব।"

"কি বলবো তোদের? আর একটা ভূত যদি আমার মত পেতুম।"

"তোমার ভাল করলেই আমার ভাল হয়, দোসরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই। তুই ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব কচ্চে, আবার ভগবান কি গাছের ওপর ব'সে আছেন?"

"সাধুসন্ন্যাসী, আর ব্রাহ্মণ বদ্‌মাস দেশটা উৎসন্নে দিয়েছে। দেহি দেহি, চুরি বদ্‌মাসি—এরা আবার ধর্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে—ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—আর কাজ ত ভারি—আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে? ১৪ বার হাতে মাটি না করলে ১৪ পুরুষ নরকে যায় কি ২৪ পুরুষ, এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক'রেছেন আজ ২ হাজার বৎসর ধরে। এদিকে ¼ of the people are starving."

"হিন্দুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নেই, পুরাণে নেই, ভক্তিতে নেই, মুক্তিতে নেই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। এখন হিন্দুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে, আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, বস। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে লাগবে নাকি? যারা একটুকরো রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দেবে। যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হ'য়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি অপবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ is a form of mental disease সাবধান। All expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life...This is the secret of নিষ্কাম প্রেম, কর্ম & C."

"আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে বিস্ময়কর এই দেখিতে পাইবেন যে, ঐগুলি পুরাতন নয়। উহা ৫৬ বৎসরের পূর্বতন হইলেও আজও নূতন। কারণ, তিনি যাহা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ও পৃথিবীর সমস্যাসমূহের অনেক মূলতত্ত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই জন্য ইহা পুরাতন হয় নাই। আপনারা এখন পাঠ করিলেও ইহাকে নূতন মনে করিবেন। তিনি আমাদিগকে এমন কতকগুলি জিনিস দিয়াছেন, যাহা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া আমরা গৌরব বোধ করি। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। আমাদের দুর্বলতা ও অকৃতকার্যতার কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামিজী কিছুই গোপন রাখেন নাই। বস্তুতঃ আমাদের দোষগুলি ঢাকিয়া রাখা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই; কেন না, এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদিগকে সংশোধন করিতে হইবে। এইজন্য এই বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতেও এইরূপ মহত্ত্ব পরিব্যাপ্ত যে, উহা ভারতের অধঃপতনের দিনেও তাহার আদর্শকে সকলের নিকট গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছিল।" —শ্রীজওহরলাল নেহেরু।

স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

চতুর্থ পর্ব

১

মোহনবাগান রো-র আড্ডা ও বঙ্গশ্রীর আড্ডার বন্ধুরা অধিকাংশই এক, তবু স্থানমাহাত্ম্যে তাঁদের ব্যবহার কিছু পৃথক। একটি স্থান সঙ্কীর্ণ, অন্যটি প্রশস্ত, এতে ব্যবহারের যেটুকু তফাৎ হওয়া উচিত তাই। এই আড্ডারই কিছু অংশ মাঝে মাঝে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে দেখা যেত—বর্মন স্ট্রীটে—সন্ধ্যাবেলায়।

যাঁরা আসতেন তাঁদের অধিকাংশই তখন লেখকরূপে পরিচিত হয়েছেন এবং কেউ কেউ যশের প্রথম ধাপে এসে বসেছেন। শৈলজানন্দ প্রেমেন তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তারাশঙ্কর মানিক চমকপ্রদ সম্ভাবনাসহ সাহিত্যক্ষেত্রে নবপ্রবিষ্ট। দু'জনে বয়সে অনেক দূরে, তবু প্রবেশ প্রায় সমকালীন। শৈলজানন্দ তারাশঙ্কর একই দেশের, তবু শহরে আসতে তারাশঙ্কর কিছু দেরি ক'রে ফেলেছে। (তারাশঙ্করের বেলাতেও কিরণই সেতুর ভূমিকা নিয়েছিল।) তবে আপন ক্ষমতাবলে দেরির ক্ষতি তার পূরণ হয়ে গেছে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বিশ্বসাহিত্য-মধুপানে মত্ত এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ ক'রে অমৃত হ্রদে পতিত এবং বিগলিত। সৌন্দর্যের এমন প্যাশানেট ভোক্তা কম দেখা যায়। শুধু আবেগ দিয়ে গড়া স্বপ্নজগৎচারী একটি অশরীরী দেহ যেন জীবনভর অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই কঠিন মর্ত্যভূমিতে।

শৈলজানন্দ তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি এ সময়ে লিখে ফেলেছেন। জাতশিল্পী। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। তারাশঙ্করও জাতশিল্পী। প্রেমেন কিছু পৃথক। তাকে বলা যায় অভিজাত শিল্পী। তার সকল কবিতা, গল্প এবং উপন্যাসের গভীরে একটা বুদ্ধিবৃত্ত মার্জিতমানসের ছোঁয়া পাওয়া যায়। প্রেমেন সব সময় নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনটাকে দেখার চেষ্টা করেছে। সব সময় ওরিজিন্যাল এবং স্বতন্ত্র কিছু করতে হবে—এই চেতনার সঙ্গে সহজাত সৃষ্টিক্ষমতা মিসে, তাকে রিফাইন্‌ড করেছে বেশি।

বঙ্গশ্রী কাগজে ধারাবাহিক ফীচার লেখক তিনজনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের নাম বিরূপাক্ষ। (বর্তমানে তিনি বিরূপাক্ষ।)

বঙ্গশ্রীর নিয়মিত সভ্যদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিল কবি বাসবেন্দ্র ঠাকুর। তখন কবি, বর্তমানে শিল্পী। বয়স তখন পনেরো কি ষোল। বয়োজ্যেষ্ঠ যে কে ছিলেন তা আজ ভেবে বলা কঠিন কারণ সে বয়সে দাড়ি বা চুলে একটুখানি পাক ধরলেই সেই পক্কতা বৃদ্ধত্বের ছবি জাগাত মনে। চন্দননগরের যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সবচেয়ে বড় মনে হয়েছিল তখন। তিনি যুবক বয়সে হিতবাদীতে বৃদ্ধের বচন লিখে নাম করেছিলেন। বঙ্গশ্রীতে স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর সমবয়স্ক সম্ভবত ছিলেন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত—চেহারায় নকল রবি ঠাকুর। তার পরের ধাপে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, নলিনীকান্ত সরকার, যামিনী রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন দত্ত (যমদত্ত), ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন, অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস। তার পরের ধাপে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অতুল বসু, হরিপদ রায়

খালি টুপি থেকে অজস্র পায়রা বার করতে পারতেন

ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ, অরবিন্দ দত্ত, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বাগচী। তার পরের ধাপে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন মিত্র, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, রামচন্দ্র অধিকারী, কিরণকুমার রায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, অজিতকৃষ্ণ বসু (অকুব), প্রণব রায়, প্রমথনাথ বিশী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য এবং সর্বশেষ বাসবেন্দ্র ঠাকুর। (অনেক নামই বাদ পড়ে গেল, উপায় নেই)।

এটি প্রায়-নিয়মিতদের তালিকা। দু একটি নাম প্রক্ষিপ্ত আছে অবশ্য। পাঠক এ রকম একটি পরিবেশের কথা কল্পনা করলেই বুঝতে পারবেন এ জিনিস এখন কোথায়ও নেই এবং কোনো সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র ক'রেই এমন পরিবেশ রচনা আর সম্ভব নয়। এটি বিংশ শতকের শেষ সাহিত্যিক আড্ডা। এখনকার লেখকেরা গ্রন্থ প্রকাশকদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছেন।

সাহিত্য রচনায় তখনকার সবার মধ্যে স্বভাবতই একটা আন্তরিকতা ছিল, যা এ যুগে প্রায় দুর্লভ। কিংবা দেখার দৃষ্টি হারিয়েছি এমনও হতে পারে। এ যুগ 'সাধারণ জ্ঞান'-এর যুগ এবং শতকরা পঞ্চাশভাগ ভুল তথ্য সম্বলিত সব জ্ঞান প্রচারের বইগুলিতে যে কোনো জাতীয় ব্যবসায়ী লেখকরা বাজার ছেয়ে ফেলেছেন।

এটি সিনেমা যুগও বটে। সে যুগের লেখকেরা লেখার মধ্যে বাণিজ্য অংশটি প্রধান করে দেখেননি। সেটি লেখক-জীবনের একদিকে যেমন ছিল অভিশাপ, তেমনি সেই নির্লোভের বা অল্পলোভের পটে তাঁদের সৃষ্টি আপন প্রাণধর্মেই রূপ গ্রহণ করেছে। এখন পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যের বাণিজ্য-মূল্য বেড়েছে, কিন্তু আর এক অভিশাপ দেখা দিয়েছে সিনেমারূপে। অনেক সৎ-সাহিত্যিকের দৃষ্টি ঘুরে গেছে সে দিকে। রূপের বদলে রূপা। অনেকে বাংলা সিনেমার অবাস্তব ঘটনা বা পরিবেশ ভেবে ভেবেই তাঁদের গল্পকেও অবাস্তব এবং উদ্ভট ক'রে সাজিয়ে দিচ্ছেন, এবং আশা করছেন সিনেমায় তা চলবে। চলছেও। অতএব এক অভিশাপ থেকে আর এক অভিশাপে উত্তীর্ণ হওয়া। আগে পরিচালকেরা খারাপ ছবির কৈফিয়ৎ দিতেন—দর্শকেরা ভাল ছবি বুঝতে পারে না। অনেক লেখক এই কথার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁদেরও ধারণা ভাল জিনিস পরিচালকরা বুঝতে পারেন না। তবে বাংলা সিনেমা, পথের পাঁচালী ও অপরাজিতর মতো সাহিত্যকে সিনেমায় রূপান্তরিত ক'রে আর-সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। সিনেমামুখীরা আত্মমুখী হবেন আশা করি।

বঙ্গশ্রী আসরের কয়েকজনের চরিত্র বেশ উপভোগ্য ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে আগে। এ রকম নিরহঙ্কার এবং আত্মচেতনাহীন মানুষ কম দেখা যায়। লৌকিকতার ধার ধারতেন না তিনি, কোন্ ব্যবহার সঙ্গত বা অসঙ্গত, বা কোন্টা স্থানকালপাত্রের অনুপযোগী, সে জ্ঞান তাঁর ছিল না। যে প্রকৃতির আবেষ্টনে তাঁর জন্ম, সেই প্রকৃতির প্রভাব ভিন্ন শহরে প্রভাব তাঁর উপরে একেবারেই পড়েনি। বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে, পড়াশোনাও বেশ করেছিলেন। অনেক বিষয়েই তিনি আকর্ষক ভাষায় বলতে পারতেন। কিন্তু আচার-ব্যবহারে ছিলেন সম্পূর্ণ পল্লীর মানুষ। তিনি ধূমপান করতেন কিন্তু খরচ বিষয়ে তাঁর কৃপণতা ছিল। কৃপণতাও ঠিক নয়, নিজের জন্য বাজে খরচ করা তাঁর প্রয়োজনই বোধ হত না। অভাবের বোধই তাঁর কম ছিল। তাঁর মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে তাঁকে হুঁকোয় তামাক খেতে দেখেছি। ঘরের বাইরে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন পরনির্ভর। সিগারেট চেয়ে খেতেন। অনেক সময়েই চাইতে হত না, পেতেন। কৃপণের মতোই খেতেন। দারুণ গ্রীষ্মেও সিগারেট খেতে পাখা বন্ধ ক'রে দিতে হত, বলতেন পাখা চললে সিগারেট তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। জুতো কখনো পালিশ করাতেন না, ধুলোমাটিতে তা অতি করুণ দেখাত। জুতোর পরিবর্তন ঘটলেও, তার চেহারা দরজার বাইরে থেকে দেখেই আমার স্ত্রী বুঝতে পারত বিভূতিবাবু এসেছেন। এবং শুধু জুতো দেখেই খাবার আয়োজন করত। তাঁর জুতোর এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কখনো বদল হয়নি।

চড়া গলা, কিন্তু কর্কশ নয়, ধারালো। নিজের বক্তব্য অন্যের মনে বিঁধিয়ে দিতে পারতেন বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে। নিজের অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতা বিষয়ে তাঁর নিজের বিশ্বাস এমনই সহজ এবং দৃঢ় ছিল যে, একথা গর্ব ক'রে বলার তাঁর কোনো প্রবৃত্তিই কখনো হয় নি। উপরন্তু আর একটি আশ্চর্য গুণ ছিল। তাঁকে গাল দিলে কিছুই মনে করতেন না, পাল্টা আক্রমণ তাঁর ধাতে ছিল না। "আপনি কিছুই জানেন না" বললে মৃদু মৃদু হাসতেন, —অর্বাচীনের প্রতি করুণাপূর্ণ সে হাসি।

ভিতরে ভিতরে খুব রোমান্টিক ছিলেন। (রোমান্স শব্দের বাংলা সুনীতিবাবু করেছেন "রোচিষ্ণুতা", কথাটি ভাল।) প্যাশানেট ছিলেন, বস্তুগত শব্দবর্ণগন্ধে মিলিয়ে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, তাকে লোভীর মতো উপভোগ করতেন, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ অতি দীন এবং তা মলিনতাশূন্য। মাত্রাজ্ঞান শুধু আহারেই ছিল না।

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য খুব উপভোগ্য ছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কাছে একটি মজার গল্প শুনেছিলাম। একদিন বিভূতিবাবু ও তিনি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে চলছিলেন, হঠাৎ পিছনে ফিরে দেখেন বিভূতিবাবু একটি ছুটে-চলা মোটরের দিকে চেয়ে আছেন। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই বিভূতিবাবু ডান হাতে বুক চাপড়ে বলে উঠলেন "মেরে দিয়ে গেল।"

ঐ মোটরে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে চকিতে মিলিয়ে গেল। কি সাংঘাতিক ঘটনা! মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস প্রকাশের এই ছিল তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি। অত্যন্ত প্রাণখোলা ব্যাপার। সরল সরস রসিকতা। বিভূতি বাবুর প্রাণের গভীরে যে কি রকম 'রোচিষ্ণুতা' ছিল তার প্রমাণ একদিন চাক্ষুষ করেছি। তিনি নিজের আরামের জন্য এক পয়সা বাজে খরচ করতেন না। (তাঁকে সেই ভাবেই মেনে নিয়ে আনন্দ পেয়েছি।) ঘটনাটা এই—

ধর্মতলার বৈঠক থেকে বেরুতলা হয়ে সোজা হ্যারিসন রোডে যেতাম মাঝে মাঝে। বিভূতিবাবুও মির্জাপুর স্ট্রীটে যেতেন এই পথে। এক গ্রীষ্মকালের রাত প্রায় আটটায় সে পথে যেতে দেখি শশিভূষণ দে স্ট্রীটের ফুটপাথ থেকে বিভূতিবাবু চাঁপা ফুল কিনছেন। তাঁর অগোচরে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, দুটি চাঁপা

তিনি এক পয়সা দিয়ে কিনলেন। তাঁকে চমকে দিয়ে বলে উঠলাম "বিভূতিবাবু, এ কি ব্যাপার?" বিভূতিবাবু একটুখানি সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, "রোজ কিনি।"

ছুটি চাঁপা ফুল তাঁকে প্রায় প্রতিদিন কিনতে হয় একান্ত গোপনে, এই ঘটনাটির ভিতর দিয়ে আমি তাঁর মনের একটি দিক স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। সব মানুষেরই মনের একটা নিজস্ব দিক থাকে সেটি অত্যন্ত স্পর্শচেতন, কোমল এবং আলোকভীরু। বাইরের নিয়মে সে চলে না, তার নিজস্ব একটি ধারা আছে। সেখানে বাইরের কারো প্রবেশের অধিকার নেই। বিভূতিবাবুর এই নিজস্ব দিকটিতে আমার যেন সেদিন অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হয়েছিল, এমন ধারণা আমার হয়েছিল পরে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা মনে পড়ল। কোন্ বছর ঠিক মনে নেই, 'সেভেনথ হেভন' নামক একটা সিনেমাছবি দেখছিলাম আমরা তিনচার জন। চার্লস ফারেল ও জেনেট গেনরের ছবি। ছবি দেখে মুগ্ধ এবং আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে বেরিয়ে এসে কয়েক সেকেণ্ড পরেই খেয়াল হল অতুলানন্দ আমাদের সঙ্গে নেই। তাকে খুঁজে বার করা গেল আমাদের গন্তব্যের বিপরীত দিকে, কিছু দূরে। সে ইচ্ছে করেই আমাদের এড়িয়ে গিয়ে গোপনে চাঁপা ফুল কিনছিল এক ফুলওয়ালার কাছ থেকে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল। উদ্দেশ্য জানলে হয় তো ধরতাম না। অতুল অত্যন্ত লজ্জিত এবং মহা অপরাধীর মতো আমাদের অনুসরণ করল। 'সেভেনথ হেভন' দেখে সে এমন বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে, অনেকক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারে নি। সে প্রথমেই ছুটে গেছে ফুলওয়ালার কাছে তার বিবাহিতা বান্ধবীর জন্য কিছু চাঁপা ফুল কিনতে।

বিভূতিবাবুর মনের আর একটা দিক আর এক দিন উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, সে বৃত্তান্তটা এখানেই প্রকাশ করি।

বঙ্গশ্রীর প্রথম যুগে আমি কিছুদিন ক্যামেরাহীন ছিলাম। আমার দ্বিতীয় প্রিয় ক্যামেরাটি কিছুকাল আগে চুরি হয়ে গেছে। এ সময় ক্যামেরার দরকার হলে কুইক ফোটো সার্ভিসের হরিপদ সেন আমাকে তাঁদের যে কোনো ছোট বা বড় ফিল্ড-ক্যামেরা অবলীলাক্রমে ধার দিতেন। আমি যে ক্যামেরাপ্রিয়, এ কথা তখন কারোই অজানা ছিল না, এবং বিভূতিবাবু যে কখনো ক্যামেরা বিষয়ে উৎসুক ছিলেন, এমন আভাস কখনো পাইনি। তাই হঠাৎ একদিন (৩রা মার্চ ১৯৩৩) দুপুরে বিভূতিবাবু খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে এসেই বললেন, "আমাকে এখুনি ফোটো তোলা শিখিয়ে দিতে পারেন?"

জেরা ক'রে জানা গেল বিভূতি বাবু জীবনে কখনো ক্যামেরা স্পর্শ করেননি এবং সঙ্গেও কোনো ক্যামেরা নেই, কিন্তু দরকারটা জরুরি, কাজেই না শিখলেই যে নয়। জানা গেল তিনি সেই দিনই সন্ধ্যায় সম্বলপুর জেলার এক দূর পল্লীপথে অদ্ভুত এক জনহীন অরণ্যরাজ্যে চলেছেন একটি পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার দেখতে। জায়গাটার নাম বিক্রমখোল, সেখানে এক পাহাড়ের গায়ে ইতিহাসপূর্ব যুগের এক আশ্চর্য সাংকেতিক শিলালিপি দেখতে পাওয়া গেছে এবং পুরাতাত্ত্বিকেরা তা দেখে তখন জল্পনাকল্পনা করছেন। এইখানেই চলেছেন বিভূতিবাবু তাঁর এক বন্ধু (প্রমদ দাসগুপ্ত, সাবডেপুটি) সহ। বিভূতিবাবু সজনীকান্তের কাছে প্রস্তাব করেছেন বঙ্গশ্রী থেকে খরচ দিলে তার বিনিময়ে বিক্রমখোল শিলালিপি সম্পর্কে একটি রচনা দেবেন বঙ্গশ্রীতে। মাত্র দশটি টাকার ব্যাপার। একটি প্রবন্ধের দামও তখন দশ টাকা। গুরুতর আদৌ নয়। প্রমদবাবু অবশ্য একটি ক্যামেরা নেবেন, কিন্তু প্রমদ বাবুর উপর বিভূতিবাবুর তেমন আস্থা নেই, তাই তিনি নিজে চট করে শিখে নিয়ে নিজহাতে ছবি তুলবেন, এই আশায় আমার কাছে এসেছেন।

আমি সব শুনেই বুঝতে পারলাম বিভূতি বাবু এ সব ব্যাপারে যেটুকু শিশু ছিলেন তার চেয়েও শিশু হয়ে পড়েছেন, অতএব এ সুযোগ ছাড়া হবে না। আমি আমার প্রলুব্ধ করার সমস্ত শক্তিকে মনে মনে আহ্বান ক'রে বিভূতি বাবুকে কাত করলাম। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন আমাকে সঙ্গে না নিয়ে উপায় নেই। অতএব আমার জন্যও দশ টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিছু পরে শুনি কিরণের জন্যও দশ টাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তার দাবীটি কোন্ দিক থেকে উঠেছিল জানি না। তবে শিলালিপি দর্শনের মধ্যে 'ব্যাড টেষ্ট' কতখানি আছে তা পরীক্ষার দাবী সে তখন অবশ্যই করেনি।

সজনীকান্ত এ সব ব্যাপারে বেপরোয়া রকমের উদার ছিলেন। তাঁকে আমার অনেক সময় যাদুকর ব'লে মনে হয়েছে। একটা অদ্ভুত রহস্য দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখতেন, তা চমকপ্রদ ছিল এবং মনোহর ছিল। তিনি ইচ্ছে করলেই যে-কোনো সময় বীজ পুঁতে তিন মিনিটের মধ্যে গাছ জন্মানো এবং তা থেকে ফল ফলাতে পারতেন, খালি টুপি থেকে অজস্র পায়রা বার করতে পারতেন। তাই একের জায়গায় তিন জনের ব্যবস্থা হয়ে গেল অতি সহজেই।

ভ্রমণ পথে বিভূতি বাবুকে এই একটিবার মাত্র আনন্দে উন্মাদ হতে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে মোট তিনবার বাইরে গিয়েছি, কিন্তু এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সম্বলপুরের মতো এমন অল্প সম্বলে আনন্দের অতিভোজ পরে পাটনা (১৯৩৭) কিংবা পাবনার (১৯৩৯) পথে হয়নি। সম্বলপুর পথের নিসর্গ দৃশ্য সত্যিই অপরূপ। জনাকীর্ণ সমতল ভূমির বৃহত্তম শহর থেকে হঠাৎ পাহাড়িয়া দৃশ্যের এলোমেলো এবং নির্জন বিস্তারের মধ্যে গিয়ে পড়লে নিতান্ত পাষণ্ড ভিন্ন সবারই মনে অল্পবিস্তর একটা ভাবের উদয় হয়।

বিভূতিবাবু আমার হাত চেপে ধরে বললেন "ক্ষেপে যান, তা ছাড়া উপায় নেই।"

আমাদের মানসিক অবস্থা সে দিন কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল তার সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে আমার 'পথে পথে' নামক বইতে। সেদিনের সেই পথের পাঁচালিতে বিভূতিবাবুকে অনেকখানি পাওয়া যাবে। বিভূতিবাবুকে সেদিন ভাল ক'রে নিকট দৃষ্টিতে দেখেছি। আদর্শের সঙ্গে অভ্যাসের সংঘাত পদে পদে, আর কি উপভোগ্য তা! গাড়িতে চলতে চলতে দুধারের পাগলকরা দৃশ্যে বিভূতিবাবু উত্তেজনার চরমে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার হাত চেপে ধ'রে চিৎকার ক'রে বলেছিলেন, পরিমল বাবু, ক্ষেপে যান, তা ভিন্ন আর উপায় নেই।"—তার পরেই অবসন্ন ভাবে হঠাৎ চুপ ক'রে কিছুক্ষণ ব'সে থেকে গলা খুলে কীর্তন ধরলেন। কিরণ হয়ে পড়ল স্কুলের ছেলে। সে গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে পথের লোকদের হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। প্রমদবাবু স্বভাব গম্ভীর ছিলেন, প্রকৃতির প্রভাবে (কিংবা আমাদের কাণ্ড দেখে) আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গাড়ির মধ্যে আমরাই শুধু চার জন, আর কেউ ছিল না। থাকলে হয় তো ভয়ে চলতি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ত।

বঙ্গশ্রী আসরের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এখানকার অনিয়মিততা। যে-কোনো সাহিত্য অফিসের সম্পাদনা কাজ এতে ভাল হয় বলে আমার বিশ্বাস। বড় আড্ডার বিচিত্র আলোচনা অনেক সময় বিচিত্র কল্পনা জাগিয়ে তোলে লেখকদের মনে। তারপর রচনা কাজে একটি নির্দিষ্ট সময় থাকলেই যথেষ্ট। এখানে যে নানা বিষয়ে আলোচনা তর্কবিতর্ক এবং জল্পনাকল্পনা করার স্বাধীন সুযোগ ছিল সেই কারণেই এ আসর সবাইকে আকর্ষণ করত। এই আসর যখন সজনীকান্তের বিদায়ের পর ভেঙে গেল, এই মাসিকের অফিস ঘর যখন সম্পাদকদের কঠোর যোগ সাধনার ক্ষেত্র হল এবং নিয়মানুবর্তিতার অকটোপাসে বাঁধা পড়ল, তখন থেকে কাগজের শ্রী ক্রমশ মলিন হয়ে শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বই আর রইল না।

১৯৩২-এর শেষ থেকে ১৯৩৫-এর প্রায় মাঝামাঝি অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর বঙ্গশ্রীর সেই সংস্কৃতি বৈঠক চলেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, অশোক চট্টোপাধ্যায় এলে এঁরা প্রত্যেকেই আলোচনার কেন্দ্র হতেন, আসরের পরিধি বিস্তৃত হত। প্রত্যেকের আকর্ষণের রীতি পৃথক। সরস গল্পে সুনীতি বাবু বিশেষ পটু। সম্মুখস্থ খবরের কাগজে ঢালা মুড়ি পেঁয়াজি বেগুনিতে আর সবার সঙ্গে একান্নবর্তী হাত চালাতেও সমান পটু ছিল। তিনি যেদিন চক্রের কেন্দ্রে বসতেন, সেদিন আলাপের বিষয় পরিধিটি সকল পৃথিবীকে বেষ্টন করত। তাঁর বিবৃত দু একটি মজার গল্প আমি ইতি পূর্বে অন্যত্র বলেছি।

সুশীলকুমার দে ছিলেন ফুলবাবু। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, মিহি ধুতির কোঁচা মৃত্তিকাস্পর্শী, হাতে শৌখিন ছড়ি। পোষাকের মতো তাঁর ভাষাও ছিল খুব সতর্ক এবং সুপরিমিত। হাসি মুখ, কণ্ঠে কিছু ব্যঙ্গের সুর, নিজ পাণ্ডিত্যের বিষয়ের আলাপ কম, সবই প্রায় ঘরোয়া আলোচনা। কখনো নিজের লেখা কবিতা পড়ে শোনাতেন। কাব্যের ভাব ও ভাষা সুসংস্কৃত, সুসম্বদ্ধ, এবং সম্পূর্ণ ক্ল্যাসিক্যাল। চিত্রধর্মী বেশি।

মোহিতলাল মজুমদার আসতেন একটি কঠোর ব্যক্তিত্বের আবরণে মণ্ডিত হয়ে। এই সময়ে তাঁর কল্পিত প্রতিপক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গে তাঁর ঐকপাক্ষিক যুদ্ধ চলছে অবিরাম। তাঁর বিরোধিতা তখন অন্তত রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশেষ ভঙ্গি বা বিশেষ মতের বিরুদ্ধে নয়—গোটা রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ বলতে যা কিছু বোঝায় তার বিরুদ্ধে। উইও মিল তাঁর চোখে দৈত্যে রূপান্তরিত হয়েছিল বলেই এই বিভ্রাট। মোহিতলালের লিখন শক্তি ছিল অনন্যসাধারণ, তাঁর ভাষা ছিল অতি ধারালো এবং স্বচ্ছ, বক্তব্য অজস্র। শুধু তিনি একটি বিশেষ মতবাদের মধ্যে নিজেকে কঠিন ভাবে বেঁধে রেখেছিলেন বলেই তাঁকে যথেষ্ট দুঃখ পেতে হয়েছিল। অন্য কোনো মতের সঙ্গে তাঁর কোনো রফা ছিল না, তাঁর মতই একমাত্র সত্য মত, এটি তিনি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর লেখা ও বিশ্বাসে সমান জোর এবং সমান আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের ধারণার বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, আর কি এই কারণেই সম্ভবত তিনি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। নির্বান্ধবও হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত।

আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল। আমাকে অনেক আক্রমণের হাত থেকে তিনি বাঁচিয়েছেন আমার পক্ষ অবলম্বন ক'রে। কারণ আমি কখনো তাঁর কোনো মতের প্রতিবাদ করিনি, তাঁর সব কথাই আমি চুপ ক'রে শুনে যেতাম। আমাকে সে জন্য তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনার কথা প্রাণ খুলে বলেছেন অনেক সময়। তাঁর ছিল সাহিত্যগত প্রাণ। সাহিত্যকে তিনি ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু সে ধর্মের গোঁড়ামিটুকু না থাকলে তা আরও উঁচুতে উঠতে পারত। তিনি 'সত্যসুন্দর দাস' এই নাম গ্রহণ করেছিলেন। কেবলই মনে হয়েছে—তাঁর সত্য ও সুন্দরের concept-টি যদি উদারতর এবং বৃহত্তর সত্য ও সুন্দরের সমবৃত্ত হত।

নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে হঠাৎ একবারে বোঝা যায় না। তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা বেশি। সব বিষয়ে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে এবং পছন্দ-অপছন্দের এমন প্রবলতা আর কারো মধ্যে দেখিনি। এ বিষয়ে তিনি একেবারে চরমপন্থী। মনে প্রাণে তিনি ইংরেজ ধর্মী। ইংরেজ জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকেই আদর্শ জেনে সেই মানেই সব কিছু বিচার করতেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সমস্ত সত্তায়। এর অতিরিক্ত অন্য কিছুর সঙ্গে রফা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। ইংরেজী ভিন্ন ফরাসী জারমান ভাষা তিনি জানতেন। ইউরোপীয় সঙ্গীততত্ত্বে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানসম্মত। জীবনের প্রতি, এবং সর্বশাস্ত্রের প্রতি, তাঁর এই অভিগম বা অ্যাপ্রোচ আমার পছন্দসই ছিল। নীতির দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি মূলগত আত্মীয়তা অনুভব করেছি, কিন্তু নিজের বিশ্বাসের পথে নিজের জীবনকে অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করার কঠোরতা আমার মধ্যে কোথায়?

কত তিনি জানেন ভেবে বিস্মিত হয়েছি। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান সঙ্গীত ইতিহাস ভূগোলের তথ্যই যে তাঁর জানা তা নয়, সব বিষয়ের সকল তথ্যের উপরে তাঁর স্বাধীন চিন্তা এবং নিজস্ব মত গঠনের অবকাশ ছিল প্রচুর। অর্থাৎ তাঁর শিক্ষা শুধু বিদ্যা সংগ্রহে নয়, জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগের মূল সত্য দেখার ক্ষমতায় উত্তীর্ণ। তাই তিনি একই সঙ্গে সাহিত্য এবং সমরতত্ত্ব, চিত্রশিল্প এবং নৌ-বিজ্ঞান, কাব্য এবং ইতিহাস, সঙ্গীত এবং জীববিদ্যা, উদ্ভিদতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে নিজস্ব অভিমত সহ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য

প্রবন্ধ লিখতে পারতেন। এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা দিয়েই সম্ভবত তিনি জ্ঞানরাজ্যের বর্ণপরিচয় আরম্ভ করেন। ম্যাকমিলান প্রকাশিত তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনীতে সেই রকমই পড়েছি মনে পড়ে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগে তাঁর গতি দ্বিধাহীন। কোনো বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি সব সময় যত্ন ক'রে সে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতেন। অনেক সময় নিজের অসুবিধা অগ্রাহ্য ক'রেও এ কাজ তিনি করেছেন। তাই তাঁর কাছে কোনো বিষয় জানতে যেতে কোনো সংকোচ হয় নি কখনো।

তাঁর রুচির বিশেষত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলাম। বাছাই করা ইউরোপীয় সঙ্গীতের রেকর্ড সংগ্রহ করে আসছিলেন অনেক দিন ধ'রে, কিন্তু গ্রামোফোন নেই। বলতেন একটি বিশেষ গ্রামোফোন ভিন্ন বাজারের কোনো যন্ত্র কিনবেন না। লণ্ডন থেকে আসা সেই বিশেষ গ্রামোফোনের পরিচয় দেখালেন একদিন আমাকে। গিন নামক এক ভদ্রলোকের হাতে তৈরি সেই যন্ত্র, কলে তৈরি নয়। বিরাট তার হর্ণ। হর্ণটি কাঠের তৈরি। সাউণ্ড-বক্সে ফাইবার নীড্‌ল ব্যবহার করতে হয়। ধাতুনির্মিত নীড্‌লে কোনো রেকর্ড একবার বাজানো হলে সে রেকর্ড এ যন্ত্রে বাজানো যায় না। নীরদবাবু বলেছিলেন যে দিন এ রকম যন্ত্র কিনতে পারব, সেই দিন রেকর্ড শুনব! তিনি আমাদের এক দিন বিস্মিত ক'রে সেই গিনের তৈরি গ্রামোফোনেই তাঁর রেকর্ড দু'একখানা বাজিয়ে শোনালেন। বিজ্ঞাপনটি দেখেছিলাম ১১৩৬ সালে সম্ভবত। গ্রামোফোনটি দেখলাম ১১৪২ সালেই, মনে হয়। কিরণ ও আমি গিয়েছিলাম সেদিন নীরদবাবুর কাছে যুদ্ধ-বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে।

এ রকম গ্রামোফোন আগে দেখিনি। এ রকম কোমল এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বর যে গ্রামোফোনের হয় তাও জানা ছিল না। একটি আবৃত্তির রেকর্ড শুনেছিলাম—

"Behold her, single in the field,
You solitary highland lass!
Reaping and singing by herself;
Stop here or gently pass!"....

মধুর নারীকণ্ঠের আবৃত্তি—সম্পূর্ণ কবিতাটি এখনও কানে বাজছে, এমন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে এমন নাটকীয়তাহীন আবৃত্তিও আর শুনিনি। কবি মনের সমস্ত সেণ্টিমেণ্টটি এই আবৃত্তিতে অদ্ভুত রূপ পেয়েছিল। একবার শুনে মনে গাঁথা হয়ে আছে।

তখনও নীরদবাবু রেডিও সেট কেনেন নি। রেডিও বিষয়েও তাঁর একটা আদর্শ ছিল, বাধা ছিল সেইটি। নীরদবাবুর মতো 'স্পেশালিষ্ট ইন জেনারাল নলেজ' দ্বিতীয় আর দেখিনি, কল্পনা করাও দুঃসাধ্য এবং শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও।

অশোক চট্টোপাধ্যায় আমাদের বৈঠকের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। প্রতিমুহূর্তে এবং প্রতিবিষয়ে তাঁর কল্পনার মনোহর ঔদ্ধত্য আমাদের কাছে পরম উপভোগ্য ছিল। নিজে না হেসে গম্ভীর ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মজার মজার গল্প বানিয়ে বলতে পারতেন। শুধু মুখে বলা নয় ব্যঙ্গ কবিতা বা গল্প তিনি অবলীলাক্রমে লিখে যেতে পারতেন। শনিবারের চিঠিতে আমাকে প্রায় নিয়মিত লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর কল্পনায় যেমন ছিল অভিনবত্ব, তেমনি ছিল বলিষ্ঠতা। বাংলা ইংরেজী দুইই তাঁর সমান আয়ত্ত ছিল, হয় তো বা ইংরেজীতেই তিনি বেশি আরাম বোধ করতেন। বলিষ্ঠ দেহ, বলিষ্ঠ কল্পনা এবং কোমল হৃদয়। বন্ধুত্বে বয়স বা বিদ্যা বা শ্রেণীভেদ ছিল না। তাঁর মুখে শেষ গল্প শুনেছি বছর তিনেক আগে যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে বসে। ভূতের কথা উঠেছিল। জীবনে অনেক ভূত দেখেছেন তিনি, এবং এখনও দেখেন। ঘণ্টা দুই ধ'রে চার পাঁচটি ভূতের সাহায্যে জমিয়ে রেখেছিলেন সেদিন। সিকি শতাব্দীর ব্যবধান—গল্প বলা চলছে আজও, আগে যেমন চলত। শনিবারের চিঠি তাঁরই পরিকল্পনায় আবির্ভূত হয়, স্বত্বাধিকারীও ছিলেন তিনিই। সে ইতিহাস সজনীকান্তের আত্মস্মৃতিতে লেখা আছে।

নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে পরিচয় হয় এই সময়—মোহনবাগান রো-তে। গান্ধীজির শিষ্য নির্মলকুমার। আপন বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মজীবনকে মিলিয়ে চলছিলেন তিনি। মুখে নির্মল হাসিটি লেগে রয়েছে। উড়িষ্যার মন্দির নিয়ে অনেক অনুশীলন করেছেন। ফোটোগ্রাফ তুলতেন তাঁর নিজস্ব গবেষণা কাজে। নির্মলবাবুর সঙ্গে একদিন তখনকার আমাদের প্রতিবেশী শিক্ষাবিদ অনাথনাথ বসুর বাড়িতে গিয়ে প্রথম লাইকা ক্যামেরা দেখি—লাইকার সেই সাবেকি প্রথম মডেল। এদেশে তখনও ও ক্যামেরার চল হয়নি। নির্মলবাবু ওটি ব্যবহার করতেন। সেই থেকে এই ক্যামেরার প্রতি আমার লোভ জাগে। কিন্তু ইচ্ছা ও পাওয়ার মধ্যে তখনও অনেক ব্যবধান।

সে সময় ক্যামেরাধারীর সংখ্যা এ দেশে সীমাবদ্ধ। তাই ক্যামেরায়-ক্যামেরায় একটা সহজ আত্মীয়তা গড়ে উঠত। আমাদের কাছে ক্যামেরা-সংস্কৃতির বিনিময় সে যুগে লোভনীয় ছিল। তাই নির্মলকুমার বসু ও অনাথনাথ বসুর সঙ্গে এ দিক দিয়ে আমার একটি পৃথক সম্পর্ক ছিল। আমাদের বৃহৎ বঙ্গশ্রী পরিবারে তখন আর কারোই ক্যামেরা ছিল না।

নির্মলবাবুর চরিত্রে বেশ একটি উদার মাধুর্য। সামান্য একটি ঘটনা বলি। একদিন তাঁর হাতে বড় একটি চামড়ার ব্যাগ দেখি। ব্যাগটি নতুন নয়, কিন্তু নির্মলবাবুর হাতে নতুন। উৎকৃষ্ট চামড়া, ওজনে বেশ ভারী এবং ভিতরে অনেকগুলি ঘর। শুনে চমকে উঠলাম—নির্মলবাবু ঐ ব্যাগটি সম্প্রতি বউবাজারের সেকেণ্ড
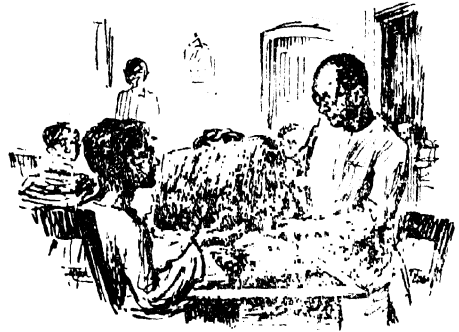
নির্মলবাবু বললেন ব্যাগটা আপনাকে দিলাম।

হাও বাজার থেকে মাত্র আড়াই টাকায় কিনেছেন। তখনই ওর দাম পঁচিশ টাকা বললেও বিশ্বাস করতাম। ব্যাগটিকে এবং তার ক্রেতাকে একই ভাষায় প্রশংসা করলাম। নির্মলবাবু খুব গর্বিত হলেন। পরদিন আবার তাঁর হাতে ঐ ব্যাগ দেখে আবার তাঁর এই ব্যাগ-ভাগ্যের উচ্চ প্রশংসা করলাম। তিনি যদি বলতেন ব্যাগটি বিনামূল্যে পেয়েছেন, তা হলে বলবার কিছুই ছিল না, কিন্তু আড়াই টাকায় ও রকম একটি ব্যাগ পাওয়া এবং সে কথা প্রচার করার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা আছে। শুনে মনে আঘাত লাগে না কি ?

পরদিন ঐ ব্যাগ নিয়ে আবার এলেন নির্মলবাবু এবং এসেই আমাকে কিছুই বলতে না দিয়ে বললেন, ব্যাগটি আপনাকে দিলাম। বলতে দিলেন না এই জন্য যে, কি বলব তা জানতেন। অতএব বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ কি। সে সময়ে অতি আনন্দে নির্মলবাবুর পরিবর্তে হয় তো ব্যাগটিকেই জড়িয়ে ধরেছিলাম। তবে ব্যাগের কাহিনী যে এইখানেই শেষ নয়, সে কথাটাও এই প্রসঙ্গে বলা দরকার !

ব্যাগ পেয়ে তখন আর কিছু ভাবতে পারিনি, কিন্তু পরদিন থেকে মনে একটু দুঃখ জাগল। আমার প্রশংসার মধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে হয় তো কিছু লোভও জেগেছিল, এবং তা নির্মলবাবু বুঝতে পেরেছিলেন। জ্ঞাতসারে যে জাগেনি তার কারণ ও রকম একটি সুন্দর ব্যাগ যে অনায়াসে হস্তান্তরিত হতে পারে, এ কল্পনা আমি করিনি। তাই বন্ধুর শখের জিনিসটিতে কিছু লজ্জার কারণও ঘটল। তদুপরি ব্যাগটি ওজনে এত ভারী যে আমার পক্ষে সেটিকে মূল্যবান আসবাবের মতো ঘরে ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় ছিল না। দু তিন দিন বাইরে বহন ক'রে হাতে ব্যথা হয়েছিল।

এবং ঠিক দু'তিন দিন পরে হঠাৎ সজনীকান্ত একটি আট টাকা দামের নতুন ব্যাগ আমাকে দিয়ে বললেন, ওটা আমাকে দিন।

দুদিক থেকে হাল্কা হওয়া গেল, ওজনের দিক থেকে এবং মনের দিক থেকে। সব শুনে মনে হবে সবটাই একটা সাজানো ব্যাপার এবং প্রত্যেকটি ধাপ পূর্বকল্পিত, কিন্তু সত্যিই তা নয়। তবে আমি এর পর থেকে সাবধান হয়েছি—নির্মলবাবুর কোনো শখের জিনিস আর কখনো একবারের বেশি প্রশংসা করিনি।

নির্মলবাবুকে লিখতে বলছিলাম কিছুদিন ধ'রে, যে-কোনো বিষয়ে। তিনি রাজি হলেন এবং কয়েকটি লেখা নিয়ে এসে বললেন, এগুলো চলবে? পড়ে দেখি সে এক আশ্চর্য রচনা। তাঁকে Cultural Anthropology-র জনক এবং উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের ও বিশেষ ভাবে কোনারকের মন্দিরের 'আমিন' ব'লে জানতাম, সাহিত্য রসস্রষ্টা রূপে জানতাম না, এই উপলক্ষেই তা জানার সুযোগ হল। তিনি চলতি পথে যে সব বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছেন, যে সব ঘটনা ঘটতে দেখেছেন, তারই কয়েকটিকে বেছে নিয়ে এমন এক একটি ছবি এঁকেছেন যা শিল্প বিচারে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। 'সঞ্জয়' ছদ্মনামে তিনি একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ রচনাও লিখেছিলেন। চরিত্র ও ঘটনা চিত্রণ অনেকগুলি একত্র ক'রে তাঁর 'পরিব্রাজকের ডায়ারি' বই। এ বইয়ের সংস্কারান্তর ঘটেছে।

নির্মলবাবু পরিব্রাজকই। আপন গবেষণা বিষয়ে নিষ্ঠাবান কর্মী, গান্ধীজির ধর্মে দীক্ষিত, কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি নেই, ভাবাবেগ অন্তরে থাকলেও, কাজের বেলায় বিশ্লেষণী পরীক্ষায় না টিকলে তার দিকে ঝোঁকেন না। তাই তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ My days with Gandhi তিনি যে নিস্পৃহতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন, তা গান্ধীভক্তদের কাছে খুব প্রিয় হয়নি।

নির্মলবাবু প্রকৃত রসিক ব্যক্তি। খুব মজার মজার গল্প তাঁর স্মৃতি-ভাণ্ডারে আছে। একদিন একটি ক্যামেরা উপলক্ষে বেশ একটি নাটক রচনা করলেন। একটি আশ্চর্য ক্যামেরা —নাম কম্পাস, বিজ্ঞাপন দেখেছি অনেক, চোখে দেখিনি। এত ছোট যে প্রায় হাতের মুঠোয় ধরে। এ রকম চতুষ্কোণ একটি ক্যামেরা, কিন্তু তার মধ্যে এমন জটিল সব আয়োজন যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। তিন রকম ফিল্টার তার মধ্যে ; প্লেট, রোল ফিল্ম, দু রকম তোলার ব্যবস্থা এবং এ ছাড়াও পঞ্চাশ রকম কৌশল। এতটুকু যন্ত্রে এত ব্যবস্থা—প্রায় কমিকের পর্যায়ে উঠেছে। নির্মলবাবু আমার সামনে সেই ক্যামেরা ধ'রে এবং কোনরকম ভূমিকা না ক'রে, অবিরাম এর একটার পর একটা বিস্ময় দেখাচ্ছেন আর বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। সে দিন তিনি একটি মনোহর ম্যাজিশিয়ানের ভূমিকা নিয়েছিলেন এই ক্যামেরাটিকে আশ্রয় ক'রে।

এই ক্যামেরাটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, এই সঙ্গে আমিও একটি মানবিক কম্পাস ক্যামেরার কথা পাড়ব এখানে। তাঁর নাম প্রমথনাথ বিশী। যন্ত্রটি হ্রস্বদেহ কিন্তু তার মধ্যে এমন বিচিত্র সব বিস্ময় আছে যা চরম চিত্তগ্রাহী। তাঁকে দেখে প্রথমেই মনে হবে—মনে হবে সেই রবীন্দ্রনাথের লাইনটি—"এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়।" অন্যান্য বিষয় একটার পর একটা উদ্ঘাটিত হবে পরিচয়ের পর। এতদিনে তাঁর প্রায় সব পরিচয়ই প্রকাশিত, কিন্তু তখন অধিকাংশ ক্রিয়া চলছে ছদ্মনামের আড়ালে। তখন স্কট টমসন, অমিত রায় ও স্বনামে তিনি ত্রিধাবিভক্ত ছিলেন, এখন প্র-না-বি ও স্বনামে দ্বিধাবিভক্ত। আগে লঘু গুরু দুইই, এখন লঘু কম, গুরু বেশি এবং গুরুগিরি আরও বেশি। একাধারে নাট্যকার, গল্প লেখক, উপন্যাস লেখক, সমালোচনা লেখক, রসরচনালেখক, প্রবন্ধ লেখক এবং কবি। 'কবি' গাল দেওয়ার ভাষারূপে ব্যবহার করছি না, প্রকৃত কবি। চেহারায় এবং চরিত্রে এমন পরস্পরবিরোধিতা সহজে দেখা যায় না। তাঁর কলমে মধুর এবং গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকম্পিত কাব্য-কথাগুলি এক অপরূপ প্রকাশব্যঞ্জনায় ঝলমল ক'রে ওঠে। তাঁর কবিতার ভাষায় ইন্দ্রজাল রচিত হয়। সে দিনের অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাঁকে ঘিরে। অজস্র লেখা লিখেছেন তখন, এখন আরও বেশি। কল্পনার বিস্তার বিস্ময়কর। আমাকে সব রকম লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর তিন চারটি নাটক, এক কলম ক'রে রস রচনা, ধারাবাহিক ব্যঙ্গ কবিতা এবং অনেক টুকরো ব্যঙ্গ রচনা আমি ছেপেছি। একবার 'স্বর্ণসীতা' সম্পর্কিত একটি ব্যঙ্গ কাব্য আমরা দুজনে মিলে লিখেছিলাম— একই রচনায় প্রথম দিক প্রমথনাথের, শেষের দিক আমার। তখনকার দিনের এ সব কথা মনে পড়লে মন পুলকিত হয়।

প্রমথ বাবু সে সময় বঙ্গশ্রী আসরের কয়েকজনকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন সম্পূর্ণ বেনামায়। কবিতাটির নাম [illegible]

পুরাতন পঞ্জিকা (শ, চিঠি, মাঘ ১৩৪১, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫)। এই কবিতায় আমার অংশটি বাদ দিয়ে ছেপেছিলাম। এর মধ্যমণি সজনীকান্ত। তারপর কিরণকুমার রায়, নিখিলচন্দ্র দাস, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল প্রভৃতি অনেকে আছেন। এই চরিত্র চিত্রণে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখা যায়, স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অনেকেরই বেশ ফুটে উঠেছে। দু'একটি উদ্ধৃত করি—প্রথমে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—

> ছু'ভল্যুম ডান হাতে, ছু'ভল্যুম বামে
> ছু'ভল্যুম ফেলে রেখে পথে কিংবা ট্রামে
> আলুথালু কেশপাশ, কে দাঁড়াস আসি
> খণ্ডিত চাদর ঐ বেদনা-বিলাসী ?
> দুঃখেরে কে আর্টরূপে করেছে অভ্যাস,
> সদাই নয়নে কার সন্ধ্যার আভাস ?
> বেদনার বৈতরণী-তরণী নাবিক
> বিরহের অনলের কে মহা সাগ্নিক ?
> আপনারা নাম বিনা একে চিনিবেন—
> স্বনামা পুরুষ ধন্য ইনি শ্রীনৃপেন।

তারপর কীটতত্ত্ববিদ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—

> বাসাহারাদের লাগি কে মরেন কেঁদে ?
> ভ্রমিছেন পথে পথে চাঁদা সেধে সেধে ?
> কার বাসা ? কারা তারা ? হরিজন নাকি ?
> কত টাকা প্রয়োজন, কত টাকা বাকি,
> তাহাদের নাম কি বা শুধায় সবাই
> বৈজ্ঞানিক গোপালদা বলে হায় ভাই,
> তাদেরি লাগিয়া মোর যাহা কিছু শিখা
> হতভাগ্য ভগ্নবাসা ক্ষুদে পিপীলিকা।

তারপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—

> মফঃসল হতে কার চলে যাওয়া-আসা,
> কলমে অলম্ নাহি, মুখে নাহি ভাষা।
> কে লেখে অমর গ্রন্থ আয়ু চিরকাল
> না পড়িয়া উপন্যাস কন্তিনাতাল।
> রাই-কমলের সূর্য (কুয়াশা-মলিন)
> ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট কার দেহখানি ক্ষীণ।
> নাম নাই করিলাম। (নাহি মেলে ছন্দে)
> সকলেই জানে তারে খ্যাতির সুগন্ধে।

তারাশঙ্করের তখনকার পরিচয়টি এতে পাওয়া যাবে। তবে এই রাইকমলের যুগে অতি চমকপ্রদ ছোট গল্প লেখাও চলছে ওসময় একের পর এক। তাঁর সুবিখ্যাত জলসাঘর প্রভৃতি এই সময়েরই লেখা।

তখনকার দিনে সবচেয়ে উৎসাহী বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক ছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। এঁর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের গবেষণা বিষয়ে বাংলাদেশে এঁর দৃষ্টান্ত ইনি একা। এঁর জীবন-কথা অতি বিচিত্র এবং অনেক সময় অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়কর। এঁর কীট বিষয়ে গবেষণা এবং সে বিষয়ে বিদেশী বিজ্ঞানী মহলে প্রশংসা পাওয়া—সবই তাঁর নিজ গুণে, অর্থাৎ তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষা কলেজে নয়, কলেজ দর্শন তাঁর ভাগ্যে সামান্যই ঘটেছিল, তাঁর যা কিছু শিক্ষা নিজে চোখে দেখে, এবং নিজের গরজে অনুশীলন ক'রে। বিজ্ঞানে এ রকম নিষ্ঠার কথা আমরা কেবল বিদেশী বিজ্ঞানীদের বেলাতেই শুনি। অতএব এঁর জীবনী প্রচারের প্রয়োজন আছে।

অ্যামেরিকার 'ন্যাচুর্যাল হিস্টোরি ম্যাগাজিন', 'সায়েণ্টিফিক মান্থলি' এবং লণ্ডনের এণ্টোমলজিক্যাল সোসাইটির জার্নাল ও এদেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর গবেষণা বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠে লেখকের সরল বর্ণনা-ভঙ্গি ও নিজ বিষয়ে অধিকারের বিস্তার দেখে পাঠক যখন মুগ্ধ হচ্ছেন, তখন কি তিনি কল্পনা করতে পারবেন যে, এই গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম যৌবনে কবির দল খুলে গ্রামে গ্রামে কবি ও জারিগান গেয়ে বেড়াতেন ? কিংবা সাহেবদের পাটকল-অফিসের টেলিফোন, এক্সচেঞ্জে অপারেটরের কাজ করতেন ? কিংবা ম্যাজিক দেখাতেন ?

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এখন বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের মাসিকপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্পাদক। তিনি আমাদের সকলেরই গোপালদা, ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন, আমার দু বছর আগে। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ ক'রে বসে থাকতে পারেন, কথা বলার মধ্যে সহজে ঢুকতে চান না। কিন্তু প্রেমেন মিত্রের 'ঘনাদা'কে যেমন তার সঙ্গীরা বহু কৌশলে উস্কানি দিয়ে দিয়ে তাঁকে তাঁর আশ্চর্য সব কাহিনী বিবৃত করার চোরাবালিতে নিয়ে ফেলত, আমাদের গোপালদাকেও অনেকটা সেইভাবে উস্কে দিতে হয়। তারপর বজ্র বিদ্যুৎ সহ আবেগ-ঝড় বয়ে যাবে। মাকড়সা, পিঁপড়ে, ব্যাঙ, শ্রোতার কাছে যত তুচ্ছ হোক, এদের যে কোনো একটিকে উপলক্ষ ক'রে এক একটা জগৎ গড়ে উঠবে আমাদের চোখের সামনে। কীটপতঙ্গ সাপ ব্যাঙের জীবনে তাঁর যে উন্মাদনা, তা অনেক সময় প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পান না তিনি। জৈবতত্ত্বে এমন অসাধারণ বিস্ময় এবং তার এমন আবেগময় প্রকাশ আমি অন্য কোনো বিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিনি।

তাঁর গবেষণার ব্যাপারে একটি করুণ ও কৌতুককর ঘটনা আমি মনে রেখেছি, দুটোই তাঁর মুখে শোনা। একবার এক পল্লীপথে চলতে চলতে হঠাৎ দেখেন পথের পাশের একটা ঘরের বেড়ার উপর মাকড়সা
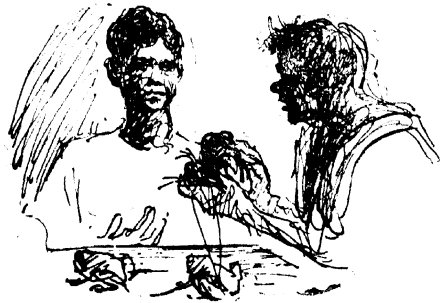
"এই ব্যাঙটা, বাবু, খেতে খুব ভাল হবে।"

জাল বুনছে। গোপালদার চলা থেমে গেল, তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সেইখানে। সে দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানো তাঁর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। তিনি আর সব ভুলে পলকহীন চোখে মাকড়সার বয়নবিদ্যা দেখতে লাগলেন। কিন্তু মাকড়সাটি তার জালবোনার স্থান বিষয়ে বিবেচনাশূন্য ছিল, কারণ স্থানটি ছিল একটি জানালার নিচে। সেটি বোঝা গেল যখন বাড়ির মালিক সাক্ষাৎ যমদূতের মতো এসে দাঁড়ালেন গোপালদার পাশে, এবং এসেই চ্যালেঞ্জ ক'রে বসলেন—ভদ্রলোকের বাড়ির জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এসব হচ্ছে কি? গোপালদার কথা আর কে বিশ্বাস করে, মাকড়সার জাল বোনা দেখার মতো একটি বাজে কৈফিয়ৎ সেখানে চলল না। ভদ্রলোক গোপালদার গায়ে হাত তুলেছিলেন সেদিন। তবে গোপালদা যেটুকু দেখেছিলেন এবং তাতে তাঁর যেটুকু আনন্দ হয়েছিল, ঐ গায়ে হাততোলাকে যদি তার দাম ধরা যায় তা হলে গোপালদার মতে দামটি শস্তাই।

গোপালদা এক সময় ব্যাঙ নিয়ে অনেক পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। একটি লোক কলকাতার বাইরে থেকে এসে তাঁকে ব্যাঙ সরবরাহ করত। এই লোকটির ধারণা ছিল গোপালদা ব্যাঙের মাংস খান, নইলে নিয়মিত ব্যাঙ কেনার আর কি মানে থাকতে পারে। তবে তার এ ধারণা সে মনে মনেই রেখেছিল, কারণ ব্যাঙ বেচে সে পয়সা পাচ্ছে, তার অতশত জানবার দরকার কি। মাত্র একদিন সে গোপালদাকে একটি খবর গোপন করতে পারেনি। খুব পুষ্ট একটি ব্যাঙ এনে বলেছিল, "আজকের এ ব্যাঙটি অতি সুস্বাদু হবে, বাবু, আজ একটু বেশি দাম দেবেন।"

[ক্রমশঃ।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

মহাকালী পাঠশালার গলি

মহাকালী পাঠশালার সঙ্কীর্ণ গলি
সহসা আকীর্ণ হলো এক বনপুষ্পের সৌরভে
—এক পরিচিত সৌরভে
খোয়া-ওঠা উঁচু-নীচু ইঁট-বাঁধানো
মহাকালী পাঠশালার গলি।
দু-ধারের পুরানো বাড়ীর কানা-শিকের বারান্দায়
টিন কাচ আর পলেস্তরার সর্বজনীনে
সকালের সূর্যালোক যখন দিশেহারা—
ঠিক সেই সময়ে এক দোতলার বারান্দা-ঘেঁষা ঘরের কোণে
হাইতোলা বনপুষ্পের সদ্য ঘুম-ভাঙা সৌরভ ছড়িয়ে গেল।
—খবর পেল না তার নিচেকার সরু গলি
যেখানে বৌ-এর, মজুরের আর দপ্তরীর উনুনে আগুন পড়েছে—
ডালের গন্ধে, চায়ের গন্ধে আর ময়দার কাই রাঁধার গন্ধে
এসে মিশেছে একতলা, দোতলা ও তেতলার
পরিত্যক্ত তরকারির খোসা, মাছের আঁশ ও শিশুদের
প্রভাতকালীন উপহার।

সেখানে দ্বিপ্রহরে তাসের আসর বসে
কাঁটাল গাছের তলায় মোটাসোটা পাতার মজবুত ছায়ায়,
ছেঁড়া ছেঁড়া ঘাস-ওঠা পথের ধারেই
বৃন্দাবনের চিরকিশোরের দেশ থেকে আসে ইয়া ইয়া পহ্‌লোয়ান্‌
ব্রজবুলির মিঠে সুর রূপান্তর পায় ব্রিজভাখায়—
অভিসারিণীর রিনিঝিনি নূপুরধ্বনির বদলে শোনা যায়
তাসের চটপট চপেটাঘাত,
ইয়া ছাতি—ইয়া গোঁফ—ইয়া টিকির ঘন ঘন আন্দোলনে
উপরের আকাশের চিলগুলি পাখা ছড়িয়ে আবর্তন করে
দূর থেকে আরো দূরে
গোলাপায়রার স্তিমিত কূজন দ্বিগুণ জেগে ওঠে।
চানাচুরওয়ালা থামে তার মাথার মোট নামিয়ে
সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চায় সে আসরের পানে—
নেশার মৌতাতে মজবুর হ'তে চায় যেন।

বিকেলে পড়ন্ত আলোর স্তিমিত দ্যুতি তির্যক হ'য়ে পড়ে
পুবদিকের নোনাধরা বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে
আর সে আলোয় ভাসতে ভাসতে প্রবল জলধারার মতন
সফেন হাস্যকল্লোলে তরঙ্গিত চাঞ্চল্যের প্রবল জোয়ারে
ভেসে যায় বিদ্যালয়ের মেয়েরা আজকে শেষঘণ্টার মুক্তিতে।
তাদের চোখের ক্লান্ত কজ্জলে আর শাড়ীর শ্রান্ত ভঙ্গিমায়
লুটিয়ে থাকে বিলোল সন্ধ্যার ম্লানিমা।

ক্রমে অন্ধকার নেমে আসে ঘোর হ'য়ে
কিন্তু মহাকালী পাঠশালার গলিতে আলো জ্বলে না।
শুধু এ বাড়ীর ও বাড়ীর জানলা থেকে ছিটকে পড়া
দু-একটি আলোক-রেখায় আরো রহস্যময় হয়ে
কাঁপতে থাকে অন্ধকার।
সে অন্ধকার পেরিয়ে
হয়তো কোনো বাড়ীর সিঁড়ির অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে থাকে দ্বিধাগ্রস্ত কোনো মন।
হয়তো তার চিত্ত আকীর্ণ হয় একটি সৌরভে—
এক বনপুষ্পের সৌরভে
যে সৌরভ হৃদয়ের দিগন্তে এসে কাঁপতে থাকে সূক্ষ্ম বাষ্পের মতন।

লেডি প্রতিমা মিত্র

[কৃষ্টিসম্পন্না সমাজসেবী বিশিষ্টা মহিলা]

"জায়ারূপে স্বামী ও তাঁহার পরিজনবর্গকে দেখাশুনা এবং জননী হিসাবে সন্তানদের প্রকৃত লালন পালন করা বিবাহিতা নারীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া বিধেয়, আর অবসর সময় সমাজ ও দেশের কর্মে আত্মনিয়োগ করা প্রশস্ত"—এই কয়টি কথা প্রথম সাক্ষাৎকারে আমায় জানালেন বিশিষ্টা বাঙ্গালী মহিলা লেডি প্রতিমা মিত্র শান্ত পরিবেশে অবস্থিত নিজস্ব ভবনের এক সুসজ্জিত ও বাহুল্যবর্জিত প্রকোষ্ঠে।

ময়ূরভঞ্জে লৌহ-আকর আবিষ্কারের মাধ্যমে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ইস্পাত শিল্প পত্তনের প্রথম পথিকৃৎ ভূতত্ত্ববিদ ৺প্রমথনাথ ও পত্নী ৺কমলা বসুর তৃতীয়া কন্যা প্রতিমা দেবী ১৮৯০ সালে দার্জ্জিলিঙে জন্মগ্রহণ করেন। সিভিলিয়ান সাহিত্যিক ৺রমেশচন্দ্র দত্ত ইঁহার মাতামহ ছিলেন। প্রতিমা দেবীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী লোকসভার ভূতপূর্ব্ব সদস্যা শ্রীমতী সুষমা সেন, দ্বিতীয়া ভগিনী ব্যারিষ্টার ৺রজতনাথ রায়ের স্ত্রী সুরমা দেবী এবং সিভিলিয়ান ৺জ্ঞানাঙ্কুর দের সহধর্ম্মিণী ৺উমা দেবী কনিষ্ঠা ভগিনী। লণ্ডনের অন্যতম ভারতীয় দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ অমরনাথ বসু ও বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক শ্রীমধু বসু তাঁহার ভ্রাতাদ্বয়।

প্রতিমা দেবী দার্জ্জিলিঙ ও কলিকাতার লরেটো বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন। কর্ম্মব্যপদেশে পিতার বহির্বাঙ্গালায় পরিভ্রমণের জন্য স্নেহময়ী জননী পুত্রকন্যাদের বরাবর দেখাশুনা করিতেন। কমলা দেবী মহারাণী সুনীতি দেবীর সহিত Miss Spiget এর স্কুলে পড়িতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে "মহিলা সমিতি"র যুগ্ম-সম্পাদিকা হিসাবে তিনি মেয়েদের তৈয়ারী হস্তশিল্পের যে সমাবেশ করেন, তাহা উচ্চ-প্রশংসিত হয়। প্রতিমা দেবীও উহাতে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত সমিতির উদ্যোগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় ও দেশবন্ধু-ভগিনী অমলা দাসের পরিচালনায় "মায়ার খেলা" নাটকে তিনি "প্রমদা"র অংশে অভিনয় করেন। সেই সময় তাঁহাদের গৃহে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরস্রষ্টা দীনেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নিজস্ব কণ্ঠে হাসির গান, সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্র ঠাকুরের আবৃত্তি প্রায় সন্ধ্যায় শোনা যাইত। এতদ্ব্যতীত বাসন্তী দেবী, সুচারু দেবী, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ও প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) প্রভৃতির সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত প্রমথনাথ ও কমলা দেবীর প্রগাঢ় পরিচয় ছিল। ফলে প্রতিমা দেবী সরোজিনী নাইডুকে 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহার কন্যা পশ্চিম বাঙ্গালার রাজ্যপালিকা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু শ্রীমতী মিত্রকে "মাসীমা" বলিয়া থাকেন। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইঁহাদের পারিবারিক বন্ধু। সাংবাদিক স্যার উষানাথ সেন ও কে, সি, রায়ের সঙ্গে লেডি মিত্রের বিশেষ পরিচয় ছিল।

১৯০৮ সালে রাঁচীতে ব্যারিষ্টার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রর সহিত প্রতিমা দেবীর বিবাহ হয়। সেই সময় প্রমথনাথ ও সত্যেন্দ্র ঠাকুর তথায় স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছিলেন এবং কমলা দেবী স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারকল্পে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিবাহ সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী সঙ্গীতে সমাগতদের মুগ্ধ করেন। সহায় সম্বলহীন ব্রজেন্দ্রলালকে নিজ কার্য্যের জন্য সেই সময় প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইত এবং যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হিসাবে শ্রীমতী মিত্র তাঁহাকে নানারূপে সাহায্য করিতে থাকেন। পরে তিনি বঙ্গ সরকারের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল এবং এ্যাডভোকেট জেনারেল হন এবং ১৯২৮ সালে আইন-সদস্য হিসাবে দিল্লীতে বড়লাটের শাসন-পরিষদে যোগদান করেন।

এইস্থানে কেন্দ্রীয় আইন সভার তদানীন্তন সদস্যদের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, এম, আর, জয়াকর ও এম, এ, জিন্নার সহিত স্যার ও লেডি

প্রতিমা মিত্র

মিত্রের ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। Sir John ও Lady Simon-এর সহিত লেডি মিত্রের বিশেষ পরিচয় হয়। এই সময় অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সালে দিল্লীর দুইটি বিবদমান মহিলা-সমিতিকে একত্র করিয়া তিনি উহার সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হন। দিল্লী লেডি আরউইন বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৩৪ সালে বাংলার শাসন-পরিষদের সদস্য হিসাবে স্যার বি, এল, মিত্র নিযুক্ত হওয়ায় লেডি মিত্র কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং স্যার জন এণ্ডারসন ও স্যার নাজিমুদ্দিন প্রভৃতির সহিত পরিচিত হন। ১৯৩৭ সালে ফেডারেল কোর্টে প্রধান বিচারপতি অথবা এ্যাডভোকেট-জেনারেল পদ গ্রহণের প্রস্তাব হইলে স্যার ব্রজেন্দ্রলাল শেষোক্তটি গ্রহণ করেন। লেডি মিত্র পুনরায় দিল্লী আগমন করিয়া নানারূপ সাংস্কৃতিক ও সমাজ-সেবার কর্ম্মে নিজেকে নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে সিমলা কালীবাড়ীর আমূল সংস্কার সাধন করিয়া সংলগ্ন ধর্ম্মশালা, গ্রন্থাগার ও বক্তৃতামঞ্চ প্রভৃতি তাঁহার প্রচেষ্টায় যুক্ত হয় এবং একটি 'হল' লেডি প্রতিমার নামের উদ্দেশ্যে রাখা হয়।

১৩৫০ সালের বাংলার মন্বন্তরে লেডি প্রতিমা দিল্লী হইতে প্রচুর সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালে ব্রজেন্দ্রলাল বরোদার দেওয়ান নিযুক্ত হইলে, লেডি মিত্র তাঁহার অনুগামিনী হন। সেখানে তিনি সাধারণ লোকেদের সহিত মিলামিশা করিতেন এবং সাধ্যমত তাহাদের অভাব অসুবিধা দূরীকরণ করিতেন। দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন ভারতের সহিত যুক্ত হওয়ার প্রশ্ন আলোচনার্থ ব্রজেন্দ্রলাল দিল্লী আগমন করিলে লেডি মিত্র লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেনের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। ১৯৪৭ সালে স্যার ব্রজেন্দ্রলাল পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর নিযুক্ত হইলে কলিকাতা "রাজভবনে" লেডি মিত্রের সুমিষ্ট আলাপ ও সুমধুর ব্যবহার সমাগত অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ৺ভবতোষ ঘটক ব্রজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন।

বর্ত্তমানে লেডি মিত্র 'কমলা গার্ল'স স্কুল,' 'নারী সেবাসঙ্ঘ' প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। gardening ও গান-বাজনা তাঁহার hobby. পিতৃ-নিবাস বনগ্রাম মহকুমার নৈপুর গ্রামে তিনি নিয়মিত গমন করিয়া থাকেন।

তাঁহার দেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ৺মতিলাল নেহরু ও তাঁহার স্বামীর সম্পর্ক ছিল মতিলালজীর ভাষায় "We cut anything that comes between us but we never cut each other." পণ্ডিত মালব্য, মিঃ জিন্না একবার তাঁহার দিল্লীস্থ সরকারী ভবনে একত্রে খানা করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভায় Treasury Bench এর সম্মুখে ভগৎসিং বোমা নিক্ষেপ করিলে সাইমন কমিশনের নেতা Sir John মন্তব্য করেন "Lady Mitter's calmness impressed me much". এক নিমন্ত্রণ-পত্রে ৺মতিলাল নেহরু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন "Highbrows,' lowbrows' & no-brows' lunch" ক্রিপস্ মিশনের নেতা Sir Stafford ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান, সুবক্তা এবং নিরামিষাশী। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দিল্লীবাসীর অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা ও মাউন্টব্যাটেন-প্রীতি এক স্মরণীয় স্মৃতি। ১৯৩০ সালে পুরাতন অন্তরঙ্গ অন্তরীণ বন্ধু মতিলালের দর্শনপ্রার্থী আইন সদস্য ব্রজেন্দ্রলাল সরকার-পক্ষে বাধাপ্রাপ্ত হইলে পদত্যাগ করিতে উদ্যত হন।

১৩৩৩ সালে জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্করের মৃত্যু ও ১৯৫০ সালে স্বামীর পরলোকগমন লেডি মিত্রকে খুবই আঘাত করে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে কলিকাতার অন্যতম বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিক্ষালয় "শঙ্কর মিত্র কীর্ত্তনালয়" স্থাপনা লেডি মিত্রের অন্যতম গঠনমূলক প্রতিভার পরিচয়।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভাস্কর মিত্র বর্ত্তমানে Andrew Yule কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর।

সুরেন্দ্রনাথ দাশ

[শিল্পরত্ন]

আজও কর্ম্মক্ষম শিল্পিগোষ্ঠীর প্রথম সারিতে যে কয়জনের নাম সহসা নজরে পড়ে, শিল্পরত্ন সুরেন্দ্রনাথ দাশ তাঁহাদের অন্যতম। হাওড়া জেলার অন্তর্গত জগৎবল্লভপুর থানার মাজুগ্রামে সন ১২৯০ সালের ৮ই ভাদ্র (ইং ১৮৮৩ সালের ২৫শে আগষ্ট) সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতার নাম অভয়চরণ এবং মাতার নাম কুসুমকুমারী। সুরেন্দ্রনাথের পিতা-মাতা বহুকাল আগেই পরলোকগমন করেছেন। পিতা অভয়চরণ একজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন ; তিনি The Indian Ryot নামক পুস্তকের রচয়িতা। এই পুস্তক রচনা ক'রে তদানীন্তন কালের সরকার এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দের সমাদর লাভ করেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং কর্ম্মব্যপদেশে তাঁকে সহরাঞ্চলেই বসবাস করতে হোতো, ফলে সুরেন্দ্রনাথ গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও বাল্যেই পিতা-মাতার সঙ্গে হাওড়ায় চলে আসেন।

সুরেন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয় কদমতলা ধাঁটরা বিদ্যালয়ে। অধুনা এই বিদ্যালয়ের নাম মধুসূদন পাল-চৌধুরী ইনষ্টিটিউশন। ছাত্রাবস্থাতেই সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে শিল্পানুরাগ দেখা যায়। তিনি ক্লাসের মধ্যেই বসে অবলীলাক্রমে শিক্ষকদের ছবি আঁকতেন। ছবির প্রতি এত আগ্রহ থাকায় সুরেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়তেন এবং ফলে একাধিকবার তাঁকে শিক্ষকের হাতে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগেশ সেনগুপ্ত সুরেন্দ্রনাথকে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি করার জন্য তাঁর পিতাকে উপদেশ দিলেন। ১৮৯৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৯০০ সাল থেকে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে বৃত্তি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় ১৯০১ সালে হাওড়া টাউন হলের জন্য সপ্তম এডওয়ার্ডের একটি তৈলচিত্র অঙ্কন করেন। ১৯০২-৩এ কলিকাতা মোহনমেলা প্রদর্শনীতে সুরেন্দ্রনাথের ছবি কর্ত্তৃপক্ষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মাত্র এক মাসের জন্য কাজ করেন। কেরাণীগিরি তাঁর সুকুমার শিল্পানুরাগের সমাধি রচনা করবে—এই অনুভূতিসহ তিনি চাকুরী ছেড়ে চলে আসেন। তার পরে আর জীবনে অন্যের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন নি।

দেশ-বিদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে একনিষ্ঠ শিল্পব্রতী সুরেন্দ্রনাথের শিল্প-নিদর্শন বিদ্যমান—তার মধ্যে স্যার আশুতোষের মাতা, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মাতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতা, বিচারপতি সি, সি, ঘোষ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাণী রাসমণি, স্যার হরিশঙ্কর পাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সুরেন্দ্রনাথ দাশ

সেনেট হলে ডা: সূর্য্যি সর্ব্বাধিকারীর, রামমোহন লাইব্রেরীতে রাজা রামমোহন রায়ের, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিচারপতি সামসুল হুদার, শরৎচন্দ্রের এবং রামমোহন রায়ের ও হাওড়া টাউন হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছবি এখনও বিদ্যমান।

এ ছাড়াও, কুচবিহার এবং ময়ুরভঞ্জের মহারাজার, বেরারের যুবরাজের, পাতিয়ালা, দ্বারভাঙ্গা, নেপাল এবং হায়দরাবাদের নিজাম দরবারে "দরবার গ্রুপ" প্রভৃতি তাঁর অঙ্কিত তৈলচিত্রগুলি শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

তাঁর অঙ্কিত বহু চিত্র ভারতের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করে। ১৯১৯ সালে অঙ্কিত "দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলা" চিত্রখানি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ ১৯২৫ সালে বাংলা সরকারের অনুমোদনে ওয়েম্বলী আর্ট এগজিবিশন, লণ্ডনে প্রদর্শিত হয় এবং ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯২৫ সালেই কাশীর "ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলে"র সভাপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাঁকে "শিল্পরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

সম্প্রতি সোভিয়েট নেতৃদ্বয়ের ভারত পরিভ্রমণকালে তাঁর অঙ্কিত "স্নেহচ্ছায়ায় সীতা" এবং "রাধাকৃষ্ণ" নামে দুইখানি তৈলচিত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদনে তাঁহাদের উপহার দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে তিনি এখন জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি অঙ্কনে রত আছেন।

সুরেন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পের ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেন। এদিকে সার্থক সাধনার নিদর্শনরূপে আজও তাঁর চিত্রশালায় বৈদ্যুতিক ঘড়ি সময় নির্দেশ ক'রে চলেছে। এই বিরাট ঘড়িটির প্রত্যেকটি জিনিষ সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব আবিষ্কার ও নিজ হস্তে তৈয়ারী। এই ঘড়ি বহু প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হ'য়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন।

ট্রেণ দুর্ঘটনা নিবারণের উদ্দেশ্যে তিনি Electrical Safety Device আবিষ্কার করেন। ১৯১৪ সালের এই আবিষ্কৃত পন্থার পরীক্ষার জন্য Sir Asutosh Mukherjee তদানীন্তনকালের সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিতে অখ্যাতনামা নীরব সাধক শিল্পীর জন্য সরকার অর্থব্যয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বাধীনতার পরেও এ চেষ্টা হ'য়েছে। কিন্তু অর্থের অভাবের অজুহাতে পরীক্ষা আজও সরকার গ্রহণ করেননি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[কথাশিল্পী]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রিকা 'কল্লোল'-এর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অচিন্ত্যকুমার নিঃসন্দেহে আপনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর সম্ভাবনাপূর্ণ আবির্ভাবে একদা রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রশস্তি-বাণী উচ্চারণ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায় ১৯০৩ সালে অচিন্ত্যকুমারের জন্ম হয়। তাঁদের পৈতৃক বাস ছিল ফরিদপুর। বাল্য ও কৈশোর তিনি নোয়াখালিতেই কাটিয়েছেন এবং সেখানেই পড়াশোনা করেছেন। পনের বছর বয়সে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন।

ছেলেবেলা থেকেই অচিন্ত্যকুমার সাহিত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগী। সেই স্কুলে পড়বার সময় থেকেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। তখনকার দিনে স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে কবিতা লেখাটা ছিল রীতিমত চরিত্রহানিকর। তাই এই কাব্যচর্চ্চা হত একান্ত গোপনে!

স্কুলের পর কলকাতার আশুতোষ কলেজে আই-এ পড়তে আরম্ভ করেন তিনি। অজস্র কবিতা লিখে চলেছেন তিনি তখন, কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাও মনে জেগেছে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় নিয়মিত পাঠাতেও লাগলেন তিনি কবিতা। কিন্তু পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তও নির্ম্মমের মত নিয়মিত ভাবেই প্রত্যর্পণ করতে লাগলেন সেই সমস্ত কবিতা!

হতাশার পর হতাশায় কবিতা লেখায় যখন প্রায় বৈরাগ্য আসার উপক্রম হয়েছে, তখন ক্লাসে সহপাঠীদের একজন তাঁকে পরামর্শ দিল কোন মেয়ের নাম দিয়ে কবিতা পাঠাতে। তাহলে নাকি সে কবিতা মনোনীত হবে নির্ঘাৎ। ছেলেরা যেখানে পুরো পৃষ্ঠা লিখেও পাশ করতে পারে না, মেয়েরা সেখানে এক লাইন লিখেই কেমন ফার্ষ্ট ডিভিশন পেয়ে যায়, তা আর কে না দেখেছে!"

যুক্তিটা অচিন্ত্যকুমারেরও মনে ধরল। নামও একটা বন্ধুটিই ঠিক করে দিল। নীহারিকা। তারপর অসীম সাহসে ভর করে সবে ফেরৎ-পাওয়া একটা কবিতাকেই 'নীহারিকা দেবী'র নামে পাঠান হল 'প্রবাসী'তে। আর সংগে সংগে মনোনীত হয়ে গেল কবিতাটি!

কবিতা প্রকাশিত হল, কিন্তু নাম হল কই? প্রথমতঃ লোককে তো বিশ্বাস করানই শক্ত যে, এটা তাঁরই লেখা। তারপর বিপদের ওপর বিপদ। অনেক পত্রিকা গায়ে পড়ে 'নীহারিকা দেবী'কে কবিতা লিখবার জন্য অনুরোধ করে পাঠাতে লাগল, কয়েকটা সাহিত্যসভায় নিমন্ত্রণও হল 'নীহারিকা দেবী'র।

তার ওপর আবার অভিভাবকদের গঞ্জনা। লক্ষণ তো ভাল নয়! কে এই নীহারিকা?

বিপদ থেকে তখন পরিত্রাণের একমাত্র উপায় স্বনামে আত্মপ্রকাশ করা। অনেক চেষ্টায় তা পারা গেল। তারপর 'ভারতী' পত্রিকারও ছাড়পত্র পাওয়া গেল। এমনি করে কলেজের ছাত্র অবস্থায়ই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি লাভ করলেন অচিন্ত্যকুমার।

আই-এ পড়বার সময়ই কলেজের সহপাঠী-বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'বাঁকা লেখা' উপন্যাসটি রচনা করেন, তাঁর ছাত্রাবস্থায়ই এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, আর এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

এরপর এম-এ পড়বার সময় অচিন্ত্যকুমার রচনা করেন তাঁর প্রথম স্বকীয় উপন্যাস 'বেদে।' এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর দেশের সুধীমহল, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত লেখককে অভিনন্দিত করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অমাবস্যা'ও এই সময় প্রকাশিত হয়।

এরপর 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হলে সাহিত্য সৃষ্টির বিস্তৃত ক্ষেত্র পেয়ে অচিন্ত্যকুমার এই পত্রিকার সংগে প্রায় প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট হলেন। আগাগোড়া তিনি এই পত্রিকার সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পত্রিকার শেষ বছর 'বিচিত্রা' পত্রিকায় সাব-এডিটরের চাকরি গ্রহণ করেন।

উনত্রিশ বছর বয়সে কৃতিত্বের সংগে এম-এ এবং বি-এল পাশ করবার পর অচিন্ত্যকুমার মফস্বলে মুন্সেফি শুরু করেন। কিন্তু এই দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরীও তাঁকে তাঁর সাহিত্যানুরাগ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি, সাহিত্যসৃষ্টিতে একান্ত ভাবেই মগ্ন থাকেন তিনি।

সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্য্যায়ে অচিন্ত্যকুমার বিশেষ করে রোমান্স-প্রধান সাহিত্যই রচনা করেন। প্রথম জীবনের রচনায় ভাষা নিয়ে অনেক অভিনব পরীক্ষা করেছেন তিনি, বিচিত্র উপমা ও অলঙ্কার প্রয়োগ করে ভাষার মধ্যে অধিকতর অর্থময়তা সৃষ্টির প্রয়াস দেখিয়েছেন, অত্যন্ত তেজস্বী ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক প্রকাশ ভঙ্গিতে, উপমায়, বর্ণনায় ও ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েই অচিন্ত্যকুমার বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

সাহিত্যের প্রচলিত রীতিনীতিকে উপেক্ষা করার দুঃসাহসও অচিন্ত্যকুমার তাঁর এই প্রথম যুগের সাহিত্যে দেখিয়েছেন। নিন্দায় এবং নির্য্যাতনে তাঁকে তাঁর মূল্যও কম দিতে হয় নি। ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর 'বিবাহের চেয়ে বড়' ও 'প্রাচীর ও প্রান্তর' উপন্যাস দু'টি অশ্লীলতার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হয়।

অচিন্ত্যকুমারের প্রথম যুগের রচনার মধ্যে ঊর্ণনাভ, তৃতীয় নয়ন, ছিনিমিনি প্রভৃতি উপন্যাস ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে জটিল প্রেমের কাহিনী। ইন্দ্রাণী, জননী জন্মভূমিশ্চ, নেপথ্যে, ঢেউয়ের পর ঢেউ, আসমুদ্র, প্রাচীর ও প্রান্তর প্রভৃতি বিবাহ-পরবর্ত্তী জটিলতা নিয়ে লেখা।

পরবর্ত্তীকালে অচিন্ত্যকুমার তাঁর মুন্সেফি-জীবনের অভিজ্ঞতার সীমার অন্তর্গত মার্জ্জিত চেহারার আর অমার্জ্জিত এবং অসামাজিক মনের বিচিত্র অফিসিয়াল শ্রেণীকে নিয়ে 'ইনি আর উনি', 'থাই-থালাসী,' 'অতিরিক্ত বাবু' প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক গল্প রচনা করে খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

এরপর পরিণত মন নিয়ে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রচনা আরম্ভ করার পর অচিন্ত্যকুমারের লেখার চেহারা একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়। এবার সাধারণ মানুষের কথা সাধারণ মানুষের ভাষায় রচনা করলেন তিনি, রোমান্স বর্জ্জন করে বাস্তবকে অবলম্বন করলেন। মফঃস্বলের সরকারী চাকুরী তাঁকে জনসাধারণের জীবনকে ভালভাবে জানবার সুযোগ দিয়েছিল। মন্বন্তর কালের এবং তার পরবর্ত্তী কয়েক বছরের অতি উৎকট অর্থনৈতিক সংকটও তাঁর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের নিয়ে লেখা 'রতন-বিবি' প্রভৃতি গল্প, যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্ত্তীকালের সরকারী অব্যবস্থা ও অসামর্থে সৃষ্ট সমস্যা নিয়ে 'কাঠ-খড়-কেরাসিন', 'চাষাভুষা' প্রভৃতি গল্প, 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী', 'পাথনা' এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় মধ্যবিত্তের কাহিনী নিয়ে লেখা 'যায় যদি যাক' এবং 'যে যাই বলুক' ইত্যাদি উপন্যাস তাঁর এই পর্য্যায়ের রচনার অন্তর্ভুক্ত।

অচিন্ত্যকুমার তাঁর এযুগের রচনায় রূঢ় বাস্তবের সংগে ঘর করে বেঁচে আছে যে মানুষ, সেই সাধারণ মানুষের দরবারে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন। তাঁর একালের রচনা পৃথিবীর ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম কতগুলো ঘটনার নগ্ন, রূঢ় ও বীভৎস ছবি। এই বীভৎসতাকে তিনি বর্ণনা করেছেন বাহুল্যবর্জ্জিত ভাষায় এবং সংযত উচ্ছ্বাসে।

সাহিত্য-জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অচিন্ত্যকুমার আধ্যাত্মিক বিষয়ে আকৃষ্ট হন এবং 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন।

অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যিক প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। গল্প, উপন্যাস, জীবনী, রম্য-রচনা ও কবিতায় উজ্জ্বল তাঁর সাহিত্য। অনুবাদ-সাহিত্যেও তিনি একজন কৃতী সাহিত্যিক। তাঁর 'আধুনিক সোভিয়েট গল্প' ইত্যাদি গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

অচিন্ত্যকুমারের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস: ডবল ডেকার, হুইসল, সঙ্কেতময়ী, দিগন্ত ও প্রচ্ছদপট। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: অমাবস্যা ও প্রিয়া ও পৃথিবী, 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশকালের কয়েক বছর এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার একটি সরস বর্ণনা 'কল্লোল যুগ।'

মফস্বলে মুন্সেফ হিসাবে কার্য্যারম্ভ করে পরবর্ত্তীকালে অচিন্ত্যকুমার স্বীয় প্রতিভাবলে সাব-জজ পদে উন্নীত হন। দীর্ঘকাল সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যে তিনি যে বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেও সে স্বীকৃতি বিদ্যমান। অনলস ও দৃঢ়চেতা এই মানুষটি একান্ত বন্ধুবৎসল ও রসিক পুরুষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই খ্যাতিমান সাহিত্যিককে 'শরৎচন্দ্র বক্তৃতায়' আমন্ত্রণ করে সম্মানিত করেছেন।

অধ্যক্ষ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ রায়

[অধ্যক্ষ, শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়, বাণীপুর, পশ্চিমবঙ্গ]

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, জীবনযুদ্ধের প্রতিটি অভিযানে মানুষের সফলতা নির্ভর করে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ওপর। পৃথিবীর সর্বত্র সমাজের অগ্রণীরা তাই শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি সুপরিকল্পিত ভাবে গঠন করাকেই জাতীয় অগ্রগতির অন্যতম প্রধান সোপান হিসেবে স্থির করেছেন। পরাধীন ভারতে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থা নিখুঁত ছিল না। গণ-জাগরণের জন্য, জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য, যে ধরণের দৈহিক ও মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন, পরাধীন ভারতে তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সার্থক ভাবে জীবন ধারণের জন্য দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়। এইজন্য প্রয়োজন বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতি। যার বৈশিষ্ট্য, পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের সঙ্গে ঐ বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ। দৈহিক ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষতার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয়। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রাক্তন শাসকগণ অবহিত ছিলেন, কিন্তু এই ধরণের শিক্ষা গ্রহণের অপরিহার্যতা বিষয়ে ভারতীয়দের গণচেতনা জাগ্রত করা সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন উদাসীন।

আলোচনা চলছিল পশ্চিমবঙ্গের স্নাতকোত্তর শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষের সংগে। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বাণীপুর শিক্ষা-পল্লীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কয়টি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তার মধ্যে স্নাতকোত্তর শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয় অন্যতম। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত শিক্ষকদের শারীর শিক্ষার শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগে ইচ্ছুক স্নাতকদের শিক্ষা গ্রহণ করবার অনুমতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শিক্ষা কেন্দ্রে দিয়েছেন। অধ্যক্ষ ক্ষিতীন্দ্রনাথ রায়ের তত্ত্বাবধনায় ও কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষকতায় বাংলাদেশের প্রায় ৩০ জন পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক বর্তমানে এখানে শিক্ষা গ্রহণ করছেন। অধ্যক্ষ শ্রীরায়ের মতে এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি শিক্ষক দেশের বালক-বালিকাদের আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন। আদর্শ সমাজ জীবনযাপনের জন্য, পুঁথিগত বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের উপযোগী দৈহিক সুস্থতার জন্য, জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবার জন্য ছেলেমেয়েদের শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শিক্ষার সুরু থেকে সচেতন করে দেওয়া উচিত, বলে শ্রীরায় মনে করেন। শ্রীরায় বলেন, আমাদের দেশে এই চিন্তাধারার সংগে পরিচিত শিক্ষকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী ও অভিভাবকদের এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত করাকেই শ্রীরায় তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

১৯০১ সালে যশোহর জেলার ময়না গ্রামে অধ্যক্ষ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেছেন। পিতা শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় সরকারী কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। এঁদের পরিবারের আয় ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল। পারিবারিক আবহাওয়ার বিশেষত্ব ছিল শিক্ষক গঠনের অনুকূল। পিতামহ ৺নগেন্দ্রনাথ রায়ের প্রচেষ্টায় বিহারে সমস্তিপুরে সর্বপ্রথম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মাতুল ৺শ্রীশচন্দ্র সেন জার্মানী হতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে প্রথমে লাহোরে ও পরে লক্ষ্ণৌতে অধ্যাপনা করতেন। মাতুল পরিবারের আবহাওয়ায় শ্রীরায় প্রগতিশীল শিক্ষার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। তাঁর ছাত্রদের মতে তিনি "আজন্ম শিক্ষক।"

শ্রীরায়ের শিক্ষা সুরু হয় টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলে। চট্টগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে সাফল্যের সংগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইনি রাজসাহী কলেজে অধ্যয়ন সুরু করেন। ১৯২২ সালে ঐ কলেজ থেকে বি-এস-সি পাশ করার পর ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। উচ্চ শিক্ষা লাভের এই সন্ধিক্ষণে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধীর বৈদেশিক শিক্ষা বর্জনের আহ্বানে তিনি সাড়া দেন ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাঁর পিতা তাঁকে মাদ্রাজে শারীর শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য যেতে বিশেষ ভাবে বাধ্য করলেন। শ্রীরায় স্বীকার করেন যে, ছেলেবেলায় শরীরচর্চ্চার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল, কিন্তু শারীর শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সংগে তিনি পরিচিত হন মাদ্রাজে শিক্ষা লাভ করার পর। ছাত্রাবস্থায় তিনি শরীর চর্চ্চা ও সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের যে দীক্ষা পেয়েছিলেন, তা পরিপূর্ণতা লাভ করে মাদ্রাজ ওয়াই, এম, সি, এ, কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ বাকের সান্নিধ্যে এসে।

শ্রীরায় স্মিত হাস্যের সংগে বলেন যে, শারীর শিক্ষা তখনকার দিনে অভিভাবকদের কাছে ছিল ভয়ের বস্তু। কেন না, এর বৃহত্তর দিকের সংগে বিশেষ কেউ পরিচিত ছিলেন না। তখনকার দিনের শরীর চর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য শরীর গঠনেই পর্যবসিত হত। শরীরচর্চ্চাকে সাধারণ লোক শিক্ষার অন্তরায় বলে মনে করত। মেয়েদের শারীর

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ রায়

শিক্ষা তখন ছিল কল্পনাতীত। ছেলেদের কাছে এই শিক্ষা মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না। কারণ সেই সময়ে শারীর শিক্ষায় সামরিক বিভাগীয় পদ্ধতির বিশেষ প্রভাব ছিল।

১৯৩২ সালে বঙ্গীয় সরকার অস্থায়ী ভাবে একটি শারীর শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র সৃষ্টি করেন। মিঃ জেমস্ বুকানন্ এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে শ্রীরায় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। দশ বৎসর এই শিক্ষণ কেন্দ্রে অধ্যাপনা করবার পর তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট স্বীকৃতি পেল। বর্তমানে শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের প্রত্যেকেই তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত। শ্রীরায় তাঁর জীবনে ব্রতচারীর জনক স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের প্রভাব স্বীকার করেন। তিনি সম্পাদক হিসেবে বঙ্গীয় ব্রতচারী সমিতির সংগে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মতে ব্রতচারী অবসর বিনোদক ক্রীড়া হিসেবে শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পদ বিশেষ। তিনি দুঃখের সংগে বলেন যে আমাদের দেশ এখনও ব্রতচারীর অবদান সম্বন্ধে অচেতন। অবসর বিনোদক সংস্থাগুলির মর্যাদা পাশ্চাত্য দেশে কতখানি তা তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন এবং ঐগুলির সংস্পর্শে এসে—Education and recreation, united they stand, divided they fall—এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করেছেন।

১৯৪২ সালে বঙ্গীয় সরকার শ্রীরায়কে বঙ্গীয় শারীর শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র ও যুব কল্যাণ সংস্থার পরিচালনার ভার দেন। তিনি ঐ যুগ্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক ও শারীর শিক্ষা অধিকর্তা রূপে নিযুক্ত হন। এই সময় থেকে শ্রীরায় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টারূপে ক্রীড়া জগতে স্বীকৃতি পেতে থাকেন। কুস্তি, সাঁতার, বাস্কেট বল, এ্যাথলেটিক্স দলের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক রূপে তিনি বহুবার বাংলার ক্রীড়া প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করেছেন। ক্রীড়া-জগতে বিচারক হিসাবে তিনি সমাদৃত।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসের তিনি অন্যতম বিচারক ছিলেন। এর কিছুকাল পর তিনি ন্যাশানাল এ্যাসোসিয়েসন্ অফ্ ফিজিক্যাল এডুকেশন এ্যাণ্ড রিক্রিয়েশন সংস্থার সহ-সভাপতি মনোনীত হন। ভারত সরকারের সেণ্ট্রাল এড্ভাইসরী বোর্ড অফ্ ফিজিক্যাল এডুকেশন এ্যাণ্ড রিক্রিয়েশন সংস্থার অন্যতম সদস্যরূপে ভারতের নরনারীর উপযুক্ত শারীর শিক্ষা ও অবসর বিনোদক খেলাধূলা বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে শ্রীরায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত National plan of physical Education and recreation গ্রন্থটির মধ্যে শ্রীরায়ের উক্ত পরিকল্পনায় দান সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৫৪ সালে শ্রীরায় আমেরিকা ও ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভের জন্য ইউনাইটেড নেশনের একটি ফেলোশিপ লাভ করেন। এই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য দেশের শারীর শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি, যুব কল্যাণ ও অবসর বিনোদক সংস্থাগুলির কর্মপদ্ধতি বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করা। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করার অল্পদিন বাদে ১৯৫৬ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার শারীরিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয় বাণীপুরে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন। ফলে শারীর শিক্ষা ও যুব কল্যাণ সংস্থার প্রধান পরিদর্শকের পদ এবং শারীর শিক্ষার অধ্যক্ষের পদ পৃথক করা হয়। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রীরায়ের উপযুক্ততার মর্যাদা দিয়েছেন তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ স্নাতকোত্তর শারীর শিক্ষা কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করে। শ্রীরায়ের তত্ত্বাবধানায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সময় বাংলাদেশের শারীর শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন, মহিলা শারীর শিক্ষক-শিক্ষণের স্থায়ী ব্যবস্থা করে। শ্রীরায় বলেন, "আমার আশা অদূর ভবিষ্যতে সফল হবেই এবং তা সফল করে তুলবেন এই মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের শিক্ষাধারায় বাংলার প্রতিটি ছেলেমেয়ে দেশের ও দশের সেবা করবার ও জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করবার শিক্ষা পাবে" বলে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার সংগে শ্রীরায় এখনও সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত। বেঙ্গল অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন, এ্যামেচার এ্যাথলেটিক্ ফেডারেশন, বেঙ্গল বাস্কেটবল এ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল ভলিবল ফেডারেশন, বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল রেষ্টলিং ফেডারেশন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল জিমন্যাষ্টিক্ এসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশানাল এ্যাসোসিয়েশন অফ্ ফিজিক্যাল এডুকেশন এ্যাণ্ড রিক্রিয়েশন ইত্যাদির কর্মপরিষদের সহিত শ্রী রায় বর্তমানে জড়িত। এ ছাড়া বহু যুব কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তাঁহার উপদেশে পরিপুষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত।

শারীর শিক্ষার প্রসার তাঁহার জীবনের ব্রত হলেও, সাহিত্য ও কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতি তাঁর আগ্রহ লক্ষণীয়। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন "এই দুটি আমার অনেক দিনের পুরোনো সাথী, অবশ্য আমি পারদর্শী নই।" পঞ্চাশোর্দ্ধের এই যুবা এখন নব প্রতিষ্ঠিত শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। আমরা তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের চরম বিকাশ কামনা করি।

"স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রতিকৃতি ও উপদেশ উভয়ের পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন? যে সমস্যাসমূহ আমার মনকে অনিশ্চিত ভাবে আলোড়ন করিতেছিল এবং যেগুলির সম্বন্ধে পরে আমি অবহিত হই, উহাদের সন্তোষজনক সমাধান তাঁহার মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র।
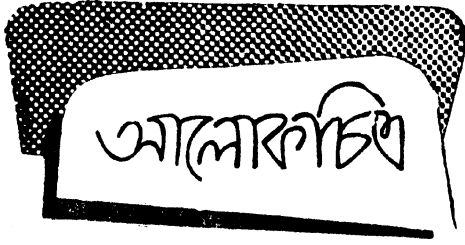
[ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম ধাম
ও বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]

বন্ধ জানালা
—মোহন চক্রবর্তী

হাসাহাসি
—[illegible] বসু

জানালার বাইরে
—অজিত মুখোপাধ্যায়

মুখ-আঁচলা —শি, সু, বসু
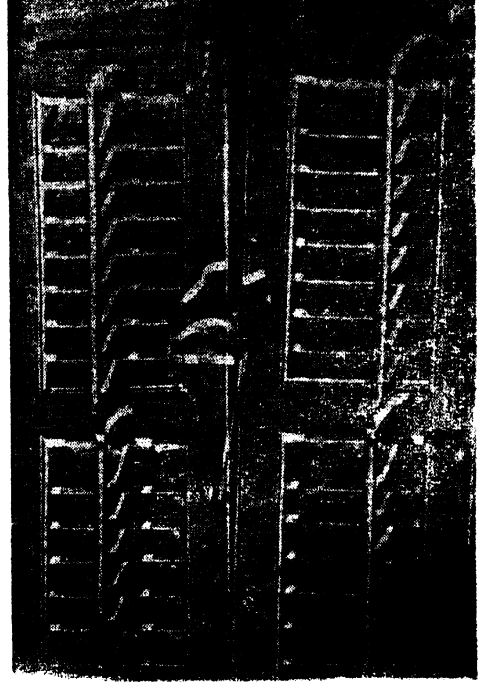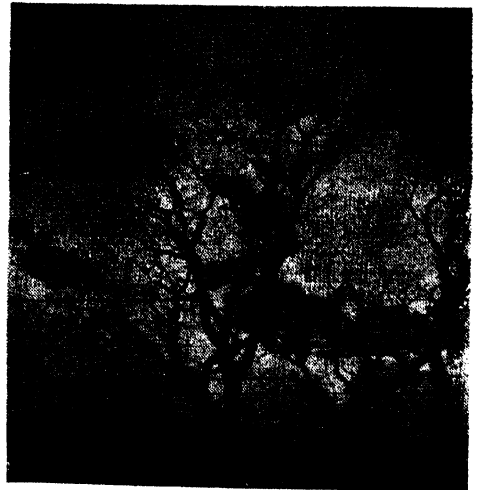
নর্তকী —কান্তু ভাই (সাংরিলা)

সন্ধ্যা-প্রণাম —বাবলু ধর

গিন্নী
—গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এই পরিষদেই কবি ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ভাষার ইঙ্গিত প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বের (Philology ও Phonetics) দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যখন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন প্রতিষ্ঠা হয় তখনো কবি ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে সভাপতিত্ব করেন। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনেরও কাশীতে প্রথম অধিবেশনে কবিই পৌরোহিত্য করেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে নয়, চিন্তাশীল দার্শনিক বলিয়াও তিনি দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছেন। নিখিল ভারত দার্শনিক সম্মেলনে তাহার সভাপতি ১৩৩২ সালে রবীন্দ্রনাথই নির্বাচিত হন। রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীতে কবি হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ দেন। ভরতপুর হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে তিনি হিন্দিতে বক্তৃতা দেন। নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনীর লখনউ অধিবেশনে তিনি ভারতীয় সংগীতের উন্নতিকল্পে বক্তৃতা করেন। বঙ্গভঙ্গ যুগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তিনি একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। এখানে পরীক্ষকরূপে তিনি কয়েক বার যে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে পরীক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি অপেক্ষা তাহার চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তি কতদূর বিকশিত হয় তাহাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। সেই কারণে পুস্তক দেখিয়া উত্তর দিবার ব্যবস্থা ছিল। যখন এই শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষপদ অলংকৃত করেন শ্রীঅরবিন্দ তখন কবির সহিত তাঁহার খুব নিকট ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তাঁহাকে কবি কী পরিমাণে শ্রদ্ধা করিতেন তাহা তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতা "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" হইতে বুঝা যায়। এই সময়ে নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলনে ও বক্তৃতায় যোগ দেন এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাকে সহায়করূপে পাইয়া দ্বিগুণ বল ও উৎসাহ লাভ করেন। এদিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জল্পনার মধ্যে।

সাহিত্যিকদের সেবায়

কবিকে নানা দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিকদের প্রতিও সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবি হেমচন্দ্র যখন অন্ধ হইয়া দারিদ্র্যদশায় পতিত হন, রবীন্দ্রনাথ তখন স্থির থাকিতে পারেন না। হারাণচন্দ্র রক্ষিত, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতির মতো রবীন্দ্রনাথও কবির জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হারাণ বাবু দুর্গাদাস বাবুকে পত্র লিখিতেছেন—একটা আনন্দ সংবাদ দিই। এইমাত্র রবিবাবুর এক পত্র পাইলাম যে ত্রিপুরার মহামান্য মহারাজা হেমচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়া হেমচন্দ্রকে তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি ও নগদ ২০০৲ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। তাই এত চেষ্টা ও পরিশ্রম বুঝি এইবার সার্থক হইল। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন যে কবিবর রবীন্দ্রনাথই ইহার মূলাধার। তাঁহার এই প্রকৃত কবিজনোচিত ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছে। * * * ১১এ আষাঢ় ১৩০৬।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিবারেরও একটা কর্তব্য আছে উপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতাকে জানাইয়া ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শিল্পী গগনেন্দ্রনাথকে বলিয়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য একটা মাসিক অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন। হেমচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র এইরূপ—

ওঁ

৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন
কলিকাতা

বহুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

আমার পিতাঠাকুর আপনাকে তাঁহার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইতে বলিয়াছেন এবং প্রতি মাসে আপনার সাহায্যার্থে ২০৲ নিয়মিত পাঠাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। প্রতি মাসের ২০এ তারিখে এখান হইতে টাকা প্রেরিত হইবে। গত মাসের টাকা পাঠাইলাম, অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিবেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসে ১০৲ করিয়া দিবেন এবং তাহাও এই সঙ্গে পাঠাইবেন। আপনার পুত্র আপনার গ্রন্থাবলী হইতে সংকলন করিয়া যে বাল্যপাঠ্য গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, আমার নিকট তাহার একখণ্ড প্রেরণ করিলে বিদ্যালয়ে তাহা প্রচার করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইব। কৃতকার্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমরা যে সামান্য অর্ঘ্য পাঠাইলাম তাহা গ্রহণ করিলে আনন্দলাভ করিব। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩০৬।

অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরলোকগত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনার পর দারুণ শিরোরোগে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসেন ও ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং গগনেন্দ্রনাথকে দিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় বঙ্গগৌরব ডাঃ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরকারের নিকট হইতে দীনেশচন্দ্রের জন্য নিয়মিত মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বোলপুরে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর দীনেশচন্দ্রের পুত্র অধ্যাপক অরুণচন্দ্রকে কবি

সেখানকার একজন ছাত্র করিয়া তাহার শিক্ষার সমস্ত ভার লইয়াছিলেন। তিনি কিরূপে চন্দননগরের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, হিতবাদীর সহ-সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিজে পত্র লিখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের শান্তিনিকেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে কথা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীতে বর্ণনা করিয়াছেন। কবি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ছোট গল্পে হাত পাকাইতে অনুরোধ করেন। বলেন—"তুমি যখন মোটে আমার চেয়ে ৬ বছরের ছোট তখন তো আমরা একবয়সী" এবং আজীবন আত্মীয়ের মতো দেখিতেন।

সচরাচর সাহিত্যিক বলিতে যাহা বুঝায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তাহা বলা না হইলেও তিনি যেমন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ছিলেন, সাহিত্যিক প্রতিভাও তাঁহার যে যথেষ্ট ছিল তাহার প্রমাণ তাঁহার "অব্যক্ত" প্রভৃতি গ্রন্থে ও নানা রচনায় দেখা যায়। এক সময়ে বহু বৎসর ইয়োরোপে গিয়া পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য ব্যাখ্যার জন্য তাঁহাকে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য অর্থকষ্টও সময়ে সময়ে ঘটিয়াছে। তাঁহার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন যে তিনি যেন তাঁহার বৈজ্ঞানিক সাধনার জন্য, কার্যোদ্ধারের জন্য অর্থের কথা না ভাবিয়া অবিরত ভাবে প্রচারকার্যে যত্নবান থাকেন। তাঁহার অর্থের অভাব যাহাতে না ঘটে সেজন্য দেশবাসী তাহার চেষ্টা করিবে।

ত্রিপুরাধিপ যখন তাঁহার পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কবির হস্তে কয়েক সহস্র মুদ্রা দেশের কোনো মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য দেন, কবি তখন সমস্ত টাকাই আচার্য বসুর মহৎ উদ্দেশ্যের পোষকতায় ব্যয় করেন। বলা বাহুল্য যে, ত্রিপুরাধিপ ইহাতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আর্থিক সাহায্য ভিন্ন যখন যে-কোনো সাহিত্যিক কবির নিকট সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় কোনো সাহায্য চাহিয়াছেন, কবি তাঁহার নানা কাজ ও সংকীর্ণ অবসরের মধ্যে সময় করিয়া সে সাহায্য দিয়া তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যখন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সুন্দর সংস্করণ 'পদরত্নমালা' নামে প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হন, তখন কবি তাঁহার সহকর্মী হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। পদাবলীতে ব্যবহৃত বহু শব্দের যথার্থ অর্থ বহু গবেষণায় নিরূপণ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঐ পদাবলীর সংগ্রহ ও পাঠ নির্ধারণে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মে পরের সৎকার্যে উৎসাহ দানকে মুদিতা বলে। "কড়ি ও কোমলের" তীব্র সমালোচনা, এমন কি ব্যক্তিগত আক্রমণ 'মিঠে কড়া' নামধেয় কবিতা সংগ্রহে 'রাহু' কর্তৃক প্রচারিত হয়, ইহা কাব্যবিশারদের ছদ্মনাম। কিন্তু তিনি অনুতপ্ত হইয়া কবির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা লইয়া উপস্থিত হইলে কবি তাঁহাকে সাদরে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য তাঁহার সাহিত্যপ্রচারে আনুকূল্য করিলেন।

কবি মহাপুরুষদের স্মৃতি উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী। কারণ, তদুপলক্ষে জাতির একতা ও শ্রদ্ধা পরিচর্যা তদ্দ্বারা সম্যক পুষ্টিলাভ করে। তাই কলিকাতায় শিবাজী উৎসব প্রচলন হয়, বীরাষ্টমী ব্রতের দ্বারা বাঙালী যুবকদের শারীরিক উৎকর্ষতা প্রদর্শনের একটি সুযোগ ও ক্ষেত্রের কল্পনা হয়। লোকমান্য তিলক যোগদানকল্পে কলিকাতায় আসেন। কবি তাঁহার 'শিবাজী' কবিতাটি পাঠ করিয়া এই অনুষ্ঠানের জয়কামনা করেন। বিদেশী ঐতিহাসিকের লেখা পড়িয়া বাল্যকাল হইতে শিবাজীকে, নানাকে, টোপিকে দস্যু বলিয়া জানিতাম। শিবাজীর শ্রদ্ধার দাবীটা রবীন্দ্র-লেখনীতে পাইলাম। তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীলের জন্য টাকা সংগ্রহও কবিই করিয়া দেন।

"সরল কৃত্তিবাসী রামায়ণ" লেখায় যোগীন্দ্রনাথ বসুর রামায়ণের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া যোগীন বাবুকে কবি উৎসাহিত করেন। বহু সাহিত্যিক ঐ বিষয়ে কবির নিকট ঋণী। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" ও শ্রীমান সজনীকান্ত দাশের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশ প্রচেষ্টা কবির প্রাণখোলা আশীর্বাদ উৎসাহলাভ করে। অনেক নূতন সাহিত্যব্রতীদের পাঠক সমাজের সহিত কবি প্রথম পরিচয় স্থাপনে যত্ন করিয়াছেন। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহাদের অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলালের "মন্দ্র" নামক কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায়ে দ্বিজেন্দ্র বাবুর গুণপণার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তরুণ সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট সংগীতবিদ সুগায়ক দ্বিজেন্দ্র-পুত্র দিলীপকুমারকে (মণ্টু) রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই স্নেহ করিতেন ও তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহারে নানা আলোচনা করিয়াছেন। পত্র লিখিলে তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়ার সৌজন্য রবীন্দ্র-চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। তাঁহার অসীম কাজের মধ্যেও পত্রযোগে যে যাহা জিজ্ঞাসা করে, তাহার উত্তর দেওয়া তিনি নিজের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। যেমন পূর্ববর্তীদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা, তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতিও তাঁহার তদ্রূপ স্নেহ। তাঁহার উৎসাহবাণী লাভে শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীমান শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ কবি ও সাহিত্যিকগণ লাভবান হইয়াছেন। অনেক সময় তাঁহাদের তিনি বিশেষ আদরই করিয়াছেন। সাহিত্যিকদের সহিত মেলামেশা ও পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের দ্বারা সামাজিকতা বৃদ্ধি চিরদিনই কবির নিকট স্পৃহনীয় ছিল। শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনায় কলিকাতাস্থ শরৎ-ভবনে কবি বলিয়াছিলেন—"আগেকার মতো, যদি আমি কলকাতা থেকে দূরে না থাকতুম তবে নবীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলামেশায় প্রত্যক্ষভাবে নিজেও উপকৃত হতুম।" এই জন্যই 'বিদ্বজ্জন সমাগম', 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন' প্রভৃতির কার্যে তিনি চিরদিন উৎসাহ দেখাইয়া গিয়াছেন।

প্রৌঢ়ের ও বৃদ্ধের নিত্যসহচর আত্মাভিমানপুষ্ট বাক্য ও কার্যের বিলাস, ঔজ্জ্বল্যহীন উৎসাহ ও সমশীতল হৃদয়বৃত্তি আশী বছরের চির তরুণ মনের অধিকারী কবিকে কোনোদিন কবলিত করিতে পারে নাই বরং তাঁহার অন্তরের রসপ্রস্রবণ ও সঙ্গলিপ্সা সকলকেই আকর্ষণ করিয়াছে। তাই বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনি অবকাশ পান নাই। তাঁহার শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অপরের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—ছুটির জন্যে কোষ্ঠী বের ক'রে মনিবকে দলিল দেখাচ্ছি, তিনি বলছেন বয়স হয়েছে তাতে কি, এখনো তো দেখছি তাগিদ দিলে যথেষ্ট কাজ

করতে পারো। অতএব যতক্ষণ না মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ছি ততক্ষণ লাগাম টেনে টেনে ছুট করাবেই।

'পূর্ণিমা মিলন' উঠিয়া গেলে অনেক পরে ৺জলধরদাদা ও কতিপয় তরুণ সাহিত্যিকের চেষ্টায় 'রবিবাসরের' জন্ম। পূর্ণিমার নিশীথেও যেমন কবিকে দেখা যাইত কবি মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির সঙ্গে, রবিবাসরেও সাহিত্যগগনের রবির মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হইয়াছে। অপর দিকে জোড়াসাঁকোর লাল কুঠি বিচিত্রাভবনেও সাহিত্যামোদীদের ও কলাবিদগণের নিয়মিত রূপে মেলামেশা, কাব্য, চিত্র, সংগীত প্রভৃতির পুষ্টিমানসে 'বিচিত্রা' নামধেয় একটি স্থায়ী বৈঠকের কবি সৃষ্টি করিলেন ও স্বয়ং পূর্ণমাত্রায় সর্বপ্রকারে আতিথেয়তার ভার লইলেন। যাঁহারা শান্তিনিকেতনে গিয়াছেন তাঁহারা কবির আতিথি-বাৎসল্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছেন।

তাঁহার উৎসাহে নবীন লেখকেরা নিজেদের ছোট ছোট রচনা লইয়া আসিতেন, তাহা বিচিত্রায় পাঠ ও আলোচনা হইত। কবি নিজেরও নূতন লেখা পাঠ করিতেন ও সকলের স্বাধীন মত গ্রহণ করিতেন। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সাহিত্যাচার্য, ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীগিরিজাকুমার বসু বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীমান প্রেমেন্দ্র মিত্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচি, শ্রীমান করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিকেরা এই অধিবেশনগুলির জন্য আগ্রহান্বিত থাকিতেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, ডাঃ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি প্রবীণ বন্ধুরাও যোগ দিতেন। এই বৈঠকেই একবার কবির 'ডাকঘর' অভিনীত হয়, যাহাতে স্বনামধন্য শিল্পী ও কবি শ্রীমান্ অসিতকুমার হালদার গোয়ালার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন। গীতাংশ ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়।

গত শতবর্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়ি, চিরদিনই নব সংস্কৃতির কেন্দ্র ও তথা হইতে নূতন ভাব শহরময় ও বাঙলার বর্ধিষ্ণু নগরসমূহে বিস্তার লাভ করে। প্রাচ্যশিল্পের পুরোধা ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যে সকল নূতন পন্থা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করেন, রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেই তাঁহাদের নিকট তাহার সম্যক পরিচয় লইতে যত্নশীল হইতেন এবং তথা হইতে তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী হইতে শিল্পী সংগ্রহ করিয়া শান্তিনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে লইয়া যাইতেন। এখান হইতেই শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুকে কবি লইয়া গিয়া শান্তিনিকেতনে প্রাচ্য অংকন-পদ্ধতি চর্চার জন্য একটি শিল্পশিক্ষা বিভাগ ও কলাভবনের প্রতিষ্ঠা করেন। তথাকার পুরাতন ছাত্র শ্রীমুকুলচন্দ্র দে'কে কিছুদিন অবনীন্দ্রনাথের নিকট রাখিয়া অংকনবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া সঙ্গে করিয়া জাপানে ও বিলাতে লইয়া যান ও মুকুলচন্দ্র A. R. C. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অসিতকুমারও শান্তিনিকেতনের ছাত্র, শিল্প অনুশীলনার্থে কবির সহিত জাপানে বাস করিয়াছেন।

ব্যঙ্গচিত্রাংকনে সিদ্ধহস্ত গগনেন্দ্রনাথের 'বিরূপ বজ্র' ব্যঙ্গচিত্রাবলী ও তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত বাঙলা গদ্যের নূতন ভঙ্গী ও শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা কবিকে যথেষ্ট আনন্দ দেয়। অবনীন্দ্র-জামাতা সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যখন 'কান্তিক প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রকাশকের কার্যে ব্রতী হন, কবি তাঁহার ব্যবসার উন্নতির জন্য ছাপা সম্বন্ধে ও প্রকাশ কার্যে নূতন পন্থা গ্রহণার্থে উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করেন। কবি নিজের রচনাবলী আমূল সংশোধন করিয়া একটি নূতন সংস্করণ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত করান। সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায়ও কবির প্রথম চয়নিকা প্রকাশিত হয়, যাহার স্থান পরে পূর্ণ করে সঞ্চয়িতা। মণিলাল, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি রবিমণ্ডলীর সদস্যরা কবির সাহচর্যে বিশেষ উপকৃত হন যেমন হন কিছু পরে সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। মণিলালের অকাল-মৃত্যুতে কবি বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা ঠাকুর-বাড়ির জ্ঞানচর্চার বৈচিত্র্য, অনন্যসাধারণ গুণগ্রাহিতা তাঁহাদের একটি বৈশিষ্ট্য। বাঙলার আদিযুগের ছাপাখানা, সংবাদপত্র, শাস্ত্র ও সংগীতবিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রকাশ ঠাকুর-পরিবারের বদান্যতার নিদর্শন। সংগীতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানাত্মক ডাক্তার উপাধিপ্রাপ্ত ও নানা দেশের সম্মানপ্রাপ্ত পাথুরেঘাটা-নিবাসী স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অবদান চিরস্মরণীয়।

PEN (Poets, Playwrights, Editors, Essayists, Novelists) Society প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার ভারতীয় শাখার সভাপতিরূপেও কবি সাহিত্যিকদেরই উৎসাহ দানে সেবা করিয়াছেন বলা চলে। ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণেরও পুস্তকে ভূমিকা লিখিয়া দিয়া কবি দার্শনিকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

দেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ

কবির স্বাদেশিকতা বাল্য হইতেই অর্জিত হইয়াছিল। পার্সিবাগানের হিন্দুমেলায় তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। কবির বয়স তখন ১৪ এবং একজন সুধী বালক কবিকে উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট পরিচিত করাইয়া দেন। 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ' লিখিয়া কবি তখন খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কবিতাটির কিয়দংশ পাঠ করেন কবি ও বাকি অংশ উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিয়া শুনান কবির সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ। তখন অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরেজি ও বাঙলায় মিশ্রিতভাবে প্রকাশিত হইত। ১২৮১ সালের ১৪ই ফাল্গুন (১৮৭৫, ২৫এ ফেব্রুয়ারি) অমৃতবাজারে বালক কবির এই দীর্ঘ কবিতা মুদ্রিত হয়। সুতরাং ১৮৭৫এর পূর্বে 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ' সম্ভবত প্রচারিত হয়।

একদিন রবীন্দ্রনাথই গাহিয়াছিলেন—

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।

মাতৃভূমির জন্য, মাতৃভাষার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এ কথা সত্য। দেশের দুর্দশায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কেবল "আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির" হওয়া দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মন যখন বড়ই ব্যথিত, তখন হৃদয়ের অন্তস্তল ধ্বনিত হইল—

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন্
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন
বর্শাহাতে ভরসা প্রাণে চলেছি নিশিদিন।

উৎসাহহীন, কর্মহীন আলস্যময় জীবন দুর্বহ। তাঁহার মতে, দেশবাসীর প্রতি কবির কর্তব্য গুরুতর। 'ছিন্নবাধা বালকের মতো' কেবল বাঁশী বাজানোই কবির একমাত্র কাজ নয়। তাঁহার মতে কবিকে দেশবাসীর—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

এই কারণে স্ত্রীবিয়োগের পরেই তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন দেশের সেবাক্ষেত্রে আর 'নৈবেদ্য' রচনার সময় হইতে দেখি তিনি নানা ভাবে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তাহাদের বলিতেছেন যে অন্যায় যে করে তার অপেক্ষা অন্যায় যে সহে সে বেশি দোষী। বঙ্গভঙ্গ যুগে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে রবীন্দ্রনাথ কায়মনোবাক্যে তাহাতে যোগ দিলেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি বলিলেন—

তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না
বারে বারে ঠেলতে হবে হয়তো দুয়ার খুলবে না

আর গাহিলেন—

একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে
তোর রক্তমাখা চরণতলে পথের কাঁটা একলা দল রে।

বিধাতার আশীর্বাদে জাতীয় জীবনে যে উৎসাহের বন্যা দেখা দিয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব! যাঁহারা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনো তাহা ভুলিতে পারিবেন না। ৩০এ আশ্বিন ১৩১২ বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইবে সরকার ঘোষণা করিলেন। তাহার পূর্ব হইতেই কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে প্রতিবাদ-সভা আহূত হইল এবং বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে মন্তব্য গৃহীত হইল। বাঙালী সেদিন শুধু সৌখীন বক্তৃতা করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই, অন্যান্য দেশের মতো, প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে দুর্বল প্রজাশক্তির যে সকল উপায় অবলম্বনীয়, জাতি তাহা গ্রাহ্য করিয়া লইল। টাউন হলের সভায় রবীন্দ্রনাথ "অবস্থা ও ব্যবস্থা" পাঠ করেন। ব্যবস্থা নির্দেশকালে সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিলেন, ইংরাজজাতির মর্মস্থল স্পর্শ করিতে হইলে তাহার একটি মাত্র কোমল স্থান আছে। সেইখানে আঘাত করিতে হইবে, সেটি Pocket nerve (ট্যাঁক-স্নায়ু) জাতির কর্তব্য সমস্ত বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া। সেজন্য যতদিন নিজেদের ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য নিজেদের শিল্পের সাহায্যে গড়িয়া তুলিতে না পারা যায়, ততদিন ইংল্যাণ্ড ভিন্ন অন্যান্য দেশের নিকট সে সকল দ্রব্য কিনিতে পারা যায়। দেশে যাহা প্রস্তুত হইতেছে তাহা যতদিন না সরেস হয় ততদিন নীরেস হইলেও তাহা আদর করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই"। দেশে সর্বত্র বিলাতী দ্রব্য বর্জন প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হইল। স্থির হইল বঙ্গভঙ্গের দিন কলিকাতার বাঙালীরা গঙ্গাস্নান করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিবে এবং বঙ্গভঙ্গ অস্বীকারের প্রতীকস্বরূপ পরস্পরের হাতে মিলনসূত্র বা রাখি বন্ধন করা হইবে। দেবতার ভোগ, রোগীর পথ্য ও বালকবালিকার আহার্য প্রস্তুত ভিন্ন সেদিন অন্য কিছু পাক হইবে না। বাঙলার সর্বত্র নূতন 'অরন্ধন' পর্ব অনুষ্ঠান প্রচারিত হইল। শহরের দোকান বাজার সব বন্ধ থাকিবে। দেশে সর্বত্রই একই দিনে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইবে স্থির হইল। কবির এই উপলক্ষে রচিত।

বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল
ধন্য হউক, ধন্য হউক, ধন্য হউক হে ভগবান!

প্রভৃতি "রাখি-সংগীত" মুদ্রিত হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সুর লয়ে সুগঠিত হইয়া জাতীয় সঙ্গীতরূপে ব্যবহারে আসিল। শহরে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখদের চেষ্টায় কয়েকটি 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়' গঠিত হইয়া পল্লীতে পল্লীতে রাজপথে ঐ গানের সাহায্যে ভিক্ষা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল।

রবীন্দ্রনাথও নিজপল্লীর যুবকদের লইয়া নগ্নপদে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া 'আমরা আজ দ্বারে দ্বারে ফিরব তোমার নাম গেয়ে' গান গাহিয়া অর্থ সংগ্রহে বাহির হইলেন। এই সকল অভিযানে কবির নিত্য সহচর ও সহায়ক ছিলেন তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র সুকণ্ঠ সংগীতাধ্যাপক দিনেন্দ্রনাথ (দিনু)। বঙ্গ-ভঙ্গের দিন প্রাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সুরেন্দ্র ও তাঁহাদের পল্লীর ভদ্রলোকদের লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া গঙ্গাস্নানে যান ও ফিরিয়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখি বন্ধন করিয়া দেন। দোকানপাট বন্ধ থাকিলেও দোকানীরা তাহাদের দোকানের সম্মুখে ও গৃহস্থরা তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল। মুসলমানেরাও সোল্লাসে শোভাযাত্রায় যোগদান করে। মেছোবাজারে (অধুনা কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে) ও বড়িপাড়ায় মুসলমান পল্লীতে সদলবলে যাইয়া কবি সকলের হাতে রাখি বাঁধেন। সেই দিন বৈকালে বাগবাজারে নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসুর বাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণে ভিক্ষা দিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বে দলে দলে নগ্নপদে জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থ দিবার আগ্রহে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল ও চতুর্দিক হইতে বিভিন্ন পাড়ার গানের দল তথায় আসিতে লাগিল। ঐ বাড়ি হইতে সমস্ত বাগবাজার ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোড পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ পালিত, মন্মথনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যোমকেশ মুস্তফি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ কলিকাতার তদানীন্তন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জনতার মধ্যে নগ্নপদে রুমাল লইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই অর্থের ঝুলিতে এক পয়সা হইতে হাজার টাকার নোটও পাওয়া গিয়াছিল। এই হাজার টাকা কে দিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। দেখা গেল একবেলায় প্রায় ৭৭০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়া জাতীয় ভাণ্ডার (National Fund)-এর সৃষ্টি হইল। সামান্য রোজগারী মুটে, মজুর, গোরুর গাড়ির চালক প্রভৃতিও তাহাদের দৈনন্দিন আয়ের অংশ দিতে ব্যগ্র হইয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সম্প্রদায়, বণিক ও শ্রমিক সম্প্রদায়, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের এইরূপ অসংকোচ সহযোগিতা ও অবাধ মিলন ইতিপূর্বে এদেশের কোনো জাতীয় প্রচেষ্টায় দেখা যায় নাই। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য করা যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল (লেখকও তন্মধ্যে অন্যতম), তাঁহারা দেখিয়াছেন যে কী অদ্ভুত কর্মশক্তির অধিকারী কবি ছিলেন। দ্বিপ্রহরের ২ ঘণ্টা বাদে প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন নানা স্থানে সভায় বক্তৃতা করা, তারপর রাত্রি ১১টা পর্যন্ত নেতৃবৃন্দের সহিত পল্লীসমিতি গঠন, পল্লীসমাজের পত্তন, নানারূপ কুটীর-শিল্পের আয়োজন, সিংহবাজারের

৭নং মদন চট্টোপাধ্যায় লেনে তাঁত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন, ক্লান্তির চিহ্নও দেখা যাইত না।

এই সময়েই জাতীয় সমাজের নিয়মাবলী উপলক্ষ্য করিয়া জাতীয় জীবনের সকল দিকের সাফল্য লাভের জন্য যে সকল ব্যবস্থা কবি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ করিয়াছিলেন তাহাতে কবির চিন্তাশীলতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির বিশেষ পরিচয় ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ তাহারা নিশ্চিহ্ন, কারণ যাঁহাদের নিকট তৎকালীন ইতিহাসের অনেক উপাদান রক্ষিত ছিল, তাঁহারা পরে রাজরোষের ভয়ে সেগুলি অগ্নিতে সমর্পণ করেন। এই সময়েই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় ও পরিষদের ব্যবহারার্থ তারকনাথ পালিত (পরে স্যার) যে জমি ও বাড়ি দান করেন তাহা রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় তারকনাথ ক্রয় করেন প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের (পরে রাজা) নিকট হইতে। উত্তরকালে বঙ্গগৌরব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় তারকনাথ পালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উক্ত বাড়ী সমর্পণ করিলে তথায় বর্তমান-কালের Univ. College of Science প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম ভারতীয় Wrangler, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র Union-এর সভাপতি আনন্দমোহন বসু যাঁহাকে পার্লামেন্ট-সভ্য ও রাজনীতি অধ্যাপক Henry Fawcett ভারতের ভাবী Gladstone বলিয়াছিলেন, দেশে ফিরিয়া সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন। আনন্দমোহন ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও হইয়াছিলেন। মৈমনসিংহের সুসন্তান আনন্দমোহন যখন স্থবির (বয়সের জন্য নয়), মৃত্যু প্রতীক্ষায় শায়িত শান্তমূর্তি ব্যারিস্টার আনন্দমোহনকে তখন ষ্ট্রেচারে করিয়া বাঙালীর রাজনৈতিক বৈঠকের জন্য Federation Hall-এর ভিত্তি স্থাপনের জন্য আনা হইলে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবার তিনি যে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন তাহা স্মরণীয়। দুঃখের বিষয় পার্সিবাগানের এই Hall অদ্যাপি সাকার রূপ ধারণ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্ররোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখিলেন, সরকার সে ব্রতকথা বন্ধ করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাউলের গানে দেশ ভরিয়া গেল। সেগুলিরও অনেক পাঠ ও রক্ষা ব্রিটিশ সরকার নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। কবি এই যুগে যে নিরস্ত্র নৈযুজ্যের বাণী প্রচার করেন ও যে পথ নির্দেশ করেন, পরবর্তী যুগে—

ওদের শিকল যত শক্ত হবে
মোদের বাঁধন তত টুটবে

পরীক্ষা হইয়া জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে।

এই সময়েই সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণপাত চেষ্টায় হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স বাঙালীর বীমা অফিস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে টিকটিকি বিভাগের শুভদৃষ্টি এইবার কবির উপরে পড়িল। জোড়াসাঁকো থানায় চুরির ডায়েরি লিখাইতে গিয়া কবির কোনো বন্ধু শুনিয়া আসিলেন কনস্টেবল দারোগার নিকট রিপোর্ট দিতেছে যে 'C' ক্লাসের ১২ নং আসামী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতকল্য বোলপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে।

কবির বাল্যকালেও এক গুপ্ত সভা ছিল, যেখানে তরবারি ও মড়ার খুলি স্পর্শ করিয়া বৈদিক মন্ত্রে সে সভার সদস্য হইবার শপথ গ্রহণ করিতে হইত ও তাহার একটা সাংকেতিক ভাষাও ছিল। সভার নাম হইয়াছিল 'হাঞ্চুপামুহাফ' অর্থাৎ 'সঞ্জীবনী সভা' (জীবনস্মৃতি দ্রঃ)। দেশের ডাকে চিরদিনই, নিভৃতে কালযাপন করিতে ভালোবাসিলেও, তিনি সাড়া দিয়াছেন; 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, 'সফলতার সদুপায়' প্রভৃতি তাঁহার প্রবন্ধগুলি দেশবাসীর অবশ্য পঠিতব্য। জাতির আশা আকাংক্ষার সহিত কবির চিরদিন একপ্রাণতা দেখা যায়; তবে তিনি কোনোদিনই নেতা হইতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি বরাবরই বলিয়াছেন—তিনি জননায়ক নন, তিনি কবি মাত্র।

কংগ্রেস ও প্রাদেশিক সম্মেলনের একজন চিহ্নিত কর্মী না হইলেও চিরদিন তাহাতে তিনি যোগ দিয়াছেন। যেমন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কংগ্রেসের ও জাতীয় আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিরা যতীন্দ্রমোহনেরও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পরিণত বয়সেও শাসকের অত্যাচারে কবির রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু অসাধারণ মনোবলে তাঁহার বাক্য উত্তপ্ত হইত না। কবিকে নিখিল ভারত সভার ষষ্ঠ অধিবেশনে (১৮৯৮) দেখিয়াছি, টাউন হলের অধিবেশনে তাঁহার স্বরচিত গান 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' রামপ্রসাদী সুরে শুনিয়াছি। ১৮৯৭ সালে নাটোরের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে কবি ছিলেন সভাপতি ও বাঙলায় সব কাজ করেন। ১৯০৭ সালে পাবনার প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে কবি বাঙলায় অভিভাষণ দেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া সভার উদ্বোধন করেন।

চট্টগ্রাম ও হিজলীর হত্যাকাণ্ডে ১৩৩৮ সালেও এক লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে গড়ের মাঠে জনসভায় সভাপতি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন—

* * হিজলীর গুলী চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে। * * যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে। * * এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশংকা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজার রক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে, সেই সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়বুদ্ধি কলুষিত হবেই।

* * আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই ব'লে সতর্ক করতে চাই যে বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কি কোনো শক্তি? * * ঘটনাটা স্বতঃই আপন লজ্জা-লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধ'রে আছে, সে উর্দ্ধে আমাদের ধিক্কারবাক্য পৌঁছতেই পারবে না। আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিনতর দুঃখ ও ত্যাগের জন্য যেন প্রস্তুত হতে পারি। * * *

রাজনীতিবিদ মনীষীরা কবির মতামতকে নত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন।

[ক্রমশঃ।

শিল্প-সাহিত্যের জাতবিচার

জ্যোতির্ময় রায়

এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত ধারণার প্রতিকূল। অতএব মতভেদ অনিবার্য—বিচারভেদের ঘাত-প্রতিঘাতী পথই দেয় সত্যের পরিচয়, তাই প্রতিবাদের আমন্ত্রণ নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা গেল।

বাংলায় 'শিল্প' শব্দের ব্যবহার খুবই ব্যাপ্ত অর্থে। যে-কোনো সমাজ-সম্পদ উৎপাদনের পদ্ধতিকেই বলা হয় শিল্প। আবার বাস্তব সার্থকতার উর্দ্ধে বিমূর্ত্ত আনন্দ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতিও আসে 'শিল্প' শব্দেরই এলাকায়। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বস্তুনির্ম্মাণ থেকে প্রয়োজনাতিক্রান্ত রসসৃষ্টি সবই হলো 'শিল্প'। এ আলোচনা অবিশ্যি শিল্প শব্দের অন্তর্ভুক্ত আনন্দবাহী আঙ্গিকগুলো সম্পর্কে; অর্থাৎ, শুধু শিল্প নয়, চারুশিল্প, যার গণ্ডীভুক্ত নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রসাহিত্য।

নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে সব শিল্পেরই চরমে যেমন এক মিল আছে প্রয়োজন মেটানো, তেমনি চারুশিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোও এসে একই পর্য্যায়ভুক্ত হয়েছে আনন্দ পরিবেশনের অঙ্গ হিসেবে। শুধু যে একই পর্য্যায়ভুক্ত তা নয়, সবগুলো অঙ্গকে এমনি একাত্ম ধ'রে হয়েছে যে জাত-ধর্ম্ম-গ্রহণ-শীলতায় তারতম্য থাকা সত্ত্বেও তারা মানে মর্য্যাদায় সমাসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের বিশ্লেষণী বুদ্ধি এবং পরিণত প্রজ্ঞা যে অঙ্গ আশ্রয় কোরে আনন্দ হয়ে উঠল তাকেও শিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত করা স্থূল বিচারেরই পরিচায়ক। অর্থাৎ সাহিত্যকে শিল্পের গণ্ডিতে ফেলা সঙ্গত হয়। ক্রমবিবর্ত্তনে সাহিত্য শিল্পের পরবর্ত্তী অবস্থা—এ দুয়ের মধ্যে জাত-ভেদ করার মতো যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। অবিশ্যি অতিচরমের ঐক্য টেনে একাত্মতা প্রমাণ করতে গেলে বলবো, বিশ্বের সব কিছুকেই ঠেলেঠুলে চরমের এমন একটা পর্য্যায়ে নিয়ে পৌঁছানো যায় যেখানটা ভেদাভেদবর্জ্জিত। বিচারই হলো ভেদবুদ্ধির ভেতরেই বিচারযুক্তি সব কিছু। অতএব তারই মধ্যে থেকে সূক্ষ্ম রেখায় বিভাগ কোরে চলা এবং তারতম্যের মাত্রা বুঝে মোটা দাগে আপেক্ষিক জাতবিচারই দেয় সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয়।

প্রথমে বোলে নেওয়া দরকার আনন্দ পরিবেশনের কোন-কোন পদ্ধতিকে শিল্প শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত করছি, এবং কেন করছি। নৃত্য, চিত্র আর সঙ্গীত এ তিনের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও এদের একই মূল নামের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ তিনের উদ্ভবের মূল এক এবং সেই কারণেই বিবর্ত্তনের ইতিহাসে বিকাশের দিক দিয়েও এরা সমসাময়িক। আমি শিল্প শব্দ ব্যবহার করছি মানুষের জৈব ছন্দোবদ্ধ মৌল আবেগপ্রসূত প্রাগৈতিহাসিক এই প্রাথমিক প্রকাশ ক'টি সম্পর্কে। অতএব বলবো শিল্পের জন্ম প্রাণের ঔরসে অবচেতনার গর্ভে। সাহিত্যের উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যাবে তার জন্ম প্রাণের ঔরসে বটে কিন্তু চেতনার গর্ভে। এই কারণেই সাহিত্য বয়সের তুলনায় শিল্পের চেয়ে অনেক অনেক নবীন। সাহিত্য মানুষের উন্নত চেতনার পরিণত অবস্থার দান।

নৃত্য চিত্র এবং সঙ্গীতের বীজাকারে প্রাথমিক বিকাশ হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কোনো প্রয়াস বা সচেতন মনের বিচার-বিশ্লেষণ তাতে প্রয়োজন হয়নি। যের দুই মৌল আবেগ—যৌন আর জীবিকা, যার আগ্রহ বা সার্থকতায় এসেছে যে উত্তেজনা আর উৎফুল্লতা তা-ই নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে আদিম মানবের জৈব ছন্দে। যে ছন্দে তার রক্ত চলে সেই ছন্দেই সে পা বাড়িয়েছে নাচের তালে, সেই তালেই সে অঙ্গে ভঙ্গী এনেছে আবেগগত বাস্তব ভঙ্গীর অনুকরণে—একই ছন্দে কণ্ঠের স্বরগ্রামে ফুটেছে সুর। প্রয়োজনের তাগিদেই বহিঃপ্রকৃতির আকৃতিবিশেষের ছন্দের অনুভূতি নিয়ে এঁকেছে ছবি। পরবর্ত্তী কালে শিল্পের এই বিভিন্ন বীজই পুষ্টি ও পরিণতি পেয়েছে। ক্রমবিবর্ত্তনে মানুষ উন্নত চেতনা ও বুদ্ধির অধিকারী হলো এবং সচেতন প্রয়াসে সমৃদ্ধ করলো শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিককে। অঙ্গ সমৃদ্ধ হলো বটে, কিন্তু যোগ রয়ে গেল নিছক মৌল আবেগ কয়টির সঙ্গেই। উন্নত চেতনালব্ধ সমাজব্যবস্থা, তার অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জটিলতা কোনো কিছুকেই তারা অঙ্গীভূত করতে পারলো না। না পারলো মিশ্র ভাবাবেগকে স্পর্শ করতে, না পারলো জটিল আবেগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্যকে মেলে ধরতে। স্থূল রকমের সামান্য একটা নজির টেনে বক্তব্যটা আর একটু পরিচ্ছন্ন করা যাক। নেচে বা ছবি এঁকে পিসেমশায় পরিচয়টা বোঝানো সম্ভব নয়, প্রিয়ার পরিচয়টা কিন্তু অনায়াসেই ফুটিয়ে তোলা যায়—তেমনি মাতৃত্বের রূপায়ণ সম্ভব কিন্তু মাসীমাত্বের নয়। আবেগগত অভিব্যক্তি সামান্য জটিলতার পথে পা বাড়ালেই আর তাকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তেমনি রাগিণী আলাপ কোরে দুঃখাবেগকে জাগিয়ে তোলা যায়, কিন্তু পুত্রশোক বা বিরহজনিত দুঃখের ভেদ বজায় রাখা চলে না। রাগিণী যখন বিশুদ্ধতা ছেড়ে সাহিত্যের কাব্যাংশের সঙ্গে মিশে গানরূপ মিশ্র শিল্পে পরিণত হয়, তখন অনেক জটিল ভাব তার অধিগম্য হয়ে ওঠে—শুধু বিরহ কেন, তা কি কোরে কত কাল পরে ঘটলো সে-কথাও বলতে পারে। অবিশ্যি তা বোলে গানকে আমি বিশুদ্ধ রাগিণীর চেয়ে উঁচু পর্য্যায়ের বলতে চাচ্ছি না। মিশ্র শিল্প পরিপূরকের মুখাপেক্ষী বোলে কোনো মতেই বিশুদ্ধ শিল্পের পর্য্যায়ে উঠতে পারে না। এ ক্ষেত্রে মিশ্র শিল্প আমার আলোচ্য নয়, অতএব তার কথা থাক। তাহলে দেখা যাচ্ছে, উক্ত শিল্প কয়টি সমাজ-জীবনকে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করতে অক্ষম। চিত্রে এবং নৃত্যে দু'-এক টুকরো জটিল জীবনের নির্য্যাস যদিই বা গুঁজে দেওয়া যায়, রাগসঙ্গীতে সেটুকুও অচল। এমন কি নৃত্য এবং চিত্র যেখানে ভাব-জটিলতা এবং বক্তব্যের বাহন, সেখানেও দেখা যায় বক্তব্যের গভীরতার বা প্রকাশভঙ্গীর পরিচ্ছন্নতায় তাদের শিল্পগত সার্থকতা নির্ভর করছে না। আলতামারার গুহাচিত্র থেকে শুরু কোরে আধুনিকতম চিত্রশিল্পের সার্থক কোনো চিত্রই বক্তব্যের জোরে বড় আসন জুড়ে বসেনি। বিভিন্ন শিল্প নিয়ে যেসব জটিল আলোচনা হয়ে থাকে তাও যে শিল্পবিশেষের আঙ্গিকগত জটিলতা, সমাজ-জীবনের জটিলতা বা গভীরতা নয়, এ কথাও এখানে স্মরণ রাখা দরকার। তাছাড়া শিল্প সম্পর্কে শিল্পী যদি কোনো গভীর ব্যাখ্যা দেন তো তার রকম বুঝে সেখানে তিনি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা সাহিত্যিক, শিল্পী ন'ন—তাঁর সৃষ্টির আবেদন ঐ ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়।

বিবর্তনের ইতিহাসে শিল্পের পরে এলো সাহিত্য—তারও শুরু সেই জৈব ছন্দে এবং প্রয়োজনের পটভূমিকায়। ছন্দাশ্রয়ী শব্দপ্রতীক ভাবলোকের জটিল স্তরকে দিলো আলিঙ্গন। পদ্য থেকে কাব্য, কাব্য থেকে কবিতা, ক্রমে সে এলো এগিয়ে। কিন্তু কবিতাও জীবনকে বিস্তৃত ভাবে গ্রহণ করতে পারলো না, নিলো তার নির্য্যাস—বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্যের এই অভাব পূরণ করতে বহু যুগ পরে জন্ম নিলো গদ্যসাহিত্য—যার কাছে বিস্তৃত সমাজ-জীবনের খুঁটিনাটি থেকে তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণী বুদ্ধির দান অবধি কোনো কিছুই অনধিগম্য রইলো না। এমন কি, সু-উন্নত মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংঘাতও তার হাতে ধরা দিলো। গদ্যরচয়িতা অন্তরে বাইরে পেলো অবাধ গতি। কবিতা অতখানি বিস্তৃত হতে পারে না বোলে তাকে খাটো আমি করছি না, কারণ গদ্যের বলা যেখানে থেমে যায় বলতে গেলে সেখান থেকেই তার বলার শুরু। পেছনকার না বলার অভাব সে পুষিয়ে দেয় ভাষাসীমান্তে মুখ খুলে।

জৈব ছন্দ থেকে শিল্পীর উদ্ভব বোলে জীব মাত্রেই শিল্পী হবে এ দাবী কেউ কোরে বসবেন না আশা করি। মস্তিষ্ক সবারই আছে, তা বোলে সবাই মস্তিষ্কবান্ নয়। শিল্পী হোতে হলেও বিশেষ এক সংবেদনশীলতা নিয়ে জন্মাতে হয়, যারই মাহাত্ম্যে মানুষ হয় গুণী। কিন্তু শিল্প শুধুই মাত্র গুণ, আর সাহিত্য কেবলমাত্র গুণ নয় জ্ঞানও বটে—জ্ঞানের উপাদান নিয়েই গুণের খেলা। মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরবের বস্তু, সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা তার উন্নত চেতনা এবং সেই চেতনাপ্রসূত বিশ্লেষণী বুদ্ধি। এই গৌরবের বস্তুকে তার আনন্দ পরিবেশনের যে অঙ্গ সর্ব্বাধিক গ্রহণ করতে পেরেছে তাকেই বলবো আমি মহত্তর কীর্তি। একমাত্র সাহিত্যই এই কীর্তির দাবী রাখে, কারণ সে জীবনদর্শনকে করেছে আনন্দের বিষয়বস্তু; এবং কেবলমাত্র যে আনন্দই দেয় তা নয়, দেয় এগিয়ে চলার গতি।

শিল্প ও সাহিত্যের উপাদানগত পার্থক্য নিয়েই যে শুধু দুয়ের মধ্যে জাতভেদ টানতে চাচ্ছি না নয়; আমি বলবো দুয়ের আবেদনও সম্পূর্ণ আলাদা। শিল্পের আনন্দ অনুভূতিগত আর সাহিত্যের আনন্দ হলো সচেতন উপলব্ধিগত। সুর শুনে বা ছবি দেখে থমকে পড়াটা মননক্রিয়ার মুখাপেক্ষী নয়, তার আবেদন সোজা আমাদের অনুভূতিতে ধরা দেয়। সাহিত্যের বেলায় ঠিক তার উল্টো, মননক্রিয়ার পথ বেয়েই পৌঁছতে হয় আনন্দলোকে। অর্থাৎ শিল্পের আবেদন মুখ্যত অনুভূতির জগতে আর সাহিত্যের আবেদন উপলব্ধির সচেতন আলোকে।

বিভিন্ন শিল্পের আঙ্গিক এবং উপাদান ভিন্ন, কিন্তু আবেদন ও আনন্দের মিল নিয়ে একই নামভুক্ত হতে পারে; কিন্তু সাহিত্য, যার আঙ্গিক, উপাদান, আবেদন, আনন্দ সবই আলাদা জাতের তাকে স্পষ্ট রেখায় পৃথক করাই উচিত। কেবলমাত্র আনন্দ শব্দটির সূত্রে ধোরে দুটিকে একশ্রেণীভুক্ত করা অনেকটা বিশ্বশক্তির দোহাই দিয়ে বস্তুজগতের বিভেদ ঘুচিয়ে দেওয়ার মতোই।

খাম

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষার প্রলেপে বিরহ-ফুলের মালা—
গাঁথা ছিল যত করেছ যে তায় বন্দী,
নিদয় ভাবে, বন্য পশুর মত
বিশ্বাসঘাতী, তোমার সঙ্গে সন্ধি?

কর্মমুখর দিনের দৃষ্টি এড়িয়ে
তুমি তো জান না কত রাত চুরি করে,
রচনা করেছি ভাষার সৌধচূড়া
দিয়েছি যে তাই কানায় কানায় ভরে।

মধু-বসন্ত এসেছিল অযাচিতে
ফিরে গেছে বার বার বিফলতা নিয়ে,
রেখে গেছে শুধু তার সকরুণ স্মৃতি
কামনা উঠেছে ফুটে আবেগে ফেনিয়ে।

এমনি করেই আঠারো বছর ধরে
ভাব ভাষা দিয়ে যা কিছু করেছি জমা—
লিপিকার রঙে রঙিয়েছিলেম তা'
রেখেছ মুঠোয়—তোমায় আবার ক্ষমা?

দিব্যনয়নে দেখতে পাচ্ছি আমি,
পড়েছ আমার প্রিয় দয়িতের ঘরে—
তোমার উপর নিচ্ছে সে প্রতিশোধ
তীক্ষ্ণ নখেতে তোমায় ছিন্ন করে।

সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

একটা চাপা আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল অনেক দিন থেকেই এবং সেই ধূমের অন্তরালে যে বহ্নি চাপা রয়েছে সে এক দিন প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করবে, এটা অনেক বিশারদরা কল্পনা করেছিলেন।

এই আগুনের উত্তাপটা ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগলো দেশবাসীর অন্তরে যখন তারা দেখলে, ইংরাজের কুটিল রাজনীতির চালে এ দেশের যাঁরা ছিলেন প্রভাবশালী নরপতি, তাঁদের পাকা বুনিয়াদ এক এক করে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে লাগলো।

১৮৪৩ সালের প্রথম বলি হোলো সিন্ধুদেশ। ওখানকার মীরেরা না কি ছিলেন বড়ই অত্যাচারী, সেই অত্যাচার থেকে সিন্ধুদেশবাসীদের রক্ষা করবার জন্যই সারা দেশটা চলে এলো ইংরাজ-সিংহের থাবার তলায়। কয়েক বছর পরেই ১৮৪৯ সালে পতন হোল শিবাজীর শেষ বংশধরের এবং সেই সঙ্গে লাল রংয়ে চিহ্নিত হোল সাতারা। কেবল শিবাজীর শেষ-প্রদীপ নিবলো তা নয়, পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিংহ—একদিন যিনি 'সব লাল হো যায়েগা' বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তারই পুত্র দিলীপ সিং দেখলেন সত্য সত্যই তাঁর পিতার রাজ্য লাল হয়ে গেল। ইংরেজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হোল সারা পাঞ্জাব। মোটা পেনসন নিয়ে বাসা বাঁধলেন কেশরীনন্দন দলীপ সিং ইংলণ্ডের নরফোকে।

যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের উপর দিয়ে। ১৮৫২ সালে গেল বর্ম্মা, তার পরের বছরেই একে একে ইংরাজের কুক্ষিগত হোল বেরার, নাগপুর, তাঞ্জোর। বৃদ্ধ পেশওয়া বাজীরাও পেনসন নিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন কানপুরের কাছে বিঠুরে। তাঁরই পালিতপুত্র ধুন্ধুপন্থ নানা বা ইতিহাসখ্যাত নানা শাহেব।

ইংরাজের লাল রংয়ের তুলি সেখানেই থামলো না। ১৮৫৪ সালে লাল হয়ে গেল অযোধ্যা। পেনসন দিতে ইংরাজ বাহাদুর কখনও কার্পণ্য করেন নি। ওয়াজিদ আলি শাহ বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা পেনসন নিয়ে অযোধ্যার রাজতক্ত ছেড়ে এলেন কলিকাতার মেটেবুরুজে। তাঁর নবাবীর গল্প আজও শোনা যায়। স্বয়ং রামচন্দ্রকেও একদিন অযোধ্যার সিংহাসন ছেড়ে দণ্ডকারণ্যে কুঁড়ে বাঁধতে হয়েছিল সপরিবারে—কিন্তু পেনসন তিনি পান নি।

অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠলো একদিন অতি তুচ্ছ কারণে। দমদম ক্যান্টনমেন্টের একজন নীচজাতীয় সিপাহীর সঙ্গে আর এক সিপাহীর কি নিয়ে একটা ঝগড়া হোল একদিন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ। তার জাত্যাভিমান সে ভোলে নি, কাজেই নীচজাতীয় ব্যক্তিটির স্পর্দ্ধার উল্লেখে সে জাতির দোহাই দিলে। সে লোকটিও ছাড়বার পাত্র নয়, সে বললে, জাতের অহঙ্কার আর কোরো না ঠাকুর! নূতন যে টোটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে রাইফেলে পরাচ্ছো, তাতে গরু আর শূয়োরের চর্ব্বি মাখানো। গরুর চর্ব্বি যে দাঁত দিয়ে কাটে, সে আবার জাতের—

জ্বলে উঠলো আগুন। এত বড় কথাটার সত্যাসত্য প্রমাণ করবার জন্য ব্যস্ত হোল অনেকে। এনফিল্ড রাইফেল তখন সৈন্যদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তাতে কার্টিজ পরাতে গেলে চর্ব্বিজাতীয় স্নেহপদার্থে সিক্ত করতে হয় এবং কার্টিজের শেষাংশ একটু ছিঁড়ে দেওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং সে কার্য্যটা দাঁত দিয়ে করাই সুবিধা।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ জানালেন যে, ও কার্টিজ তাঁদের আবিষ্কার নয়, খোদ Ordnance Committee of Great Britain তাঁদের নির্দ্দেশেই তৈরি হয়েছে। সুতরাং এখানকার মিলিটারী কর্ম্মকর্ত্তারা কেউ তার এদিক-ওদিক করতে পারেন না।

কিন্তু চর্ব্বির ব্যাপারটা? সেটা কি সত্য?

পরিষ্কার জবাব দিতে ইতস্তত করতে হোল কর্ত্তৃপক্ষের। তাঁরা জানালেন যে, সিপাহীরা যদি ইচ্ছা করে, তবে কোরা কার্টিজে তারা ঘি বা মাখন মাখিয়ে নিতে পারে।

এত দিন গরু-শূয়োরের চর্ব্বিমাখানো কার্টিজ দাঁত দিয়ে কেটে যে মহাপাপ করা হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত এই স্তোকবাক্যে হয় না।

ছড়িয়ে পড়লো এই খবর এক রেজিমেণ্ট থেকে আর এক রেজিমেণ্টে। দমদম থেকে বারাকপুরে, বারাকপুর থেকে বহরমপুর। ক্রমে সারা ভারতবর্ষময়।

এ সংবাদ যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে দেশব্যাপী হয়ে পড়লো, এ নিয়ে তখনকার কর্ত্তৃপক্ষ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। শোনা যায়, চাপাটি (রুটি) মাধ্যমে নাকি খবর প্রচারিত হোত। একজন চারখানা চাপাটি তৈরি করে চার জনকে দিত, তাদের প্রত্যেকে আবার চারখানা করে চাপাটি চালান করতো অন্যত্র। এরই মধ্যে থাকতো নাকি সাঙ্কেতিক লিপি এবং এই লিপিই chain letter এর মতো ভারতবর্ষময় প্রচারিত হোত।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৭—বারাকপুর থেকে ৩৪ নং পদাতিক বাহিনী রওনা হয়ে গেল বহরমপুরে। সেখানে থাকতো ১৯ নম্বর বাহিনী। কার্টিজের কাহিনী প্রচারিত হোল। ১৯ নম্বরের সিপাহীরা পরিষ্কার বললে, ও কার্টিজ আমরা ছোঁব না।

মিলিটারী ডিসিপ্লিনের এই অমর্য্যাদা দেখে ১৯ নম্বরের সকলের কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নেওয়া হোল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ মনে মনে একটু আতঙ্কিত হলেন।

স্নানের সময়
মনে
রাখবেন
একশ' বছরের
ঐতিহ্য,
বিশুদ্ধতা এবং
অপরিবর্ত্তিত
গুণগুলির জন্য
আজও সমাদৃত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

লর্ড ক্যানিং তখন গভর্ণর জেনারেল, তিনি হুকুম দিলেন চুরাশী নম্বর রেজিমেণ্ট যাচ্ছে বর্মায়, তাদের মনে এখনও এই বিষ ঢোকেনি, ফিরিয়ে আনো তাদের।

কিন্তু চাপাটি-দৌত্যের কৃপায় কার্টিজ সংবাদ ইতিমধ্যেই সারা উত্তর-ভারতময় সিপাহীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে। কাগজপত্র দেখলে, সারা ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয় সৈন্যসংখ্যা মাত্র চল্লিশ হাজার কিন্তু দিশী পল্টন-সংখ্যা তিন লক্ষ এগারো হাজার। ইতিপূর্ব্বে স্যার চার্লস নেপিয়ার গভর্ণমেণ্টকে সাবধান করে দিয়েছিলেন সংখ্যার এই অসামঞ্জস্যতা দূর করবার জন্য। কিন্তু তখন কিছু করা হয়নি।

কার্টিজ নিয়ে যখন এত হৈ-চৈ তখন দিল্লীর কেল্লায় বসে বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ রচনা করলেন এক কবিতা। তাঁর কবিখ্যাতি ছিল—

"কুছ চিল-ই-রুম নাহি কিয়া ইয়া শা-হি-রুষ নেহিন
যো কুছ কিয়া না সারে সে, সো কারতুস নে—

এর মানে হোল যে স্বয়ং রুমের (তুর্কীয়) সুলতান বা রুষের সাহ যে জয় করতে পারেন নি, এতদিন পরে কি চর্ব্বিমাখা কারতুজ দিয়ে তাই হবে ?

২৯শে মার্চ্চ তারিখে বারাকপুরের কেল্লায় মঙ্গল পাণ্ডে এক বন্দুক উঁচু করে প্রকাশ্যভাবেই চীৎকার করে উঠলো, জাগো ভাই সব, মারো ইংরেজকে !

৩৪ নম্বর বাহিনীর এডজুটেণ্ট ছিলেন লেফটনাণ্ট বঘ (Bough) তিনি এই চীৎকারে গরম হয়ে উঠলেন। ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলেন মঙ্গল পাণ্ডের দিকে। পাণ্ডে তখন মরিয়া। সে বন্দুক তুলে গুলী ছুঁড়লে বঘ সাহেবের ঘোড়াকে লক্ষ্য করে। কোমর থেকে পিস্তল বার করে বঘ এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে এগিয়ে এলেন, কিন্তু হঠাৎ ঝলক মেরে উঠলো মঙ্গল পাণ্ডের তলোয়ার এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন লেফটনাণ্ট বঘ। বিদ্রোহযজ্ঞে বোধ হয় বঘ সাহেবই প্রথম বলি।

হৈ-হৈ পড়ে গেল। ছুটে এলেন সার্জ্জেণ্ট মেজর হডসন, কিন্তু তাঁকেও ধরাশায়ী হতে হোল আর একটা তলোয়ারের আঘাতে। তখন জেনারেল হিয়ারসি এসে মঙ্গল পাণ্ডেকে পাকড়াও করলেন।

এর ফল যা হবার তা হোল। মঙ্গল পাণ্ডে এবং জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসি হোল ২১শে এপ্রিল তারিখে।

আগুন নিবলো না, জ্বলতে জ্বলতে ছড়িয়ে পড়লো দেশময়।

৯ই এবং ১০ই মে তাণ্ডব সুরু হোল দূর উত্তর-পশ্চিমের মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে।

সেদিন রবিবার—ইংরাজ অফিসাররা গির্জ্জায় গিয়ে ধর্ম্মাচরণ করছিলেন, হঠাৎ গুলীর আওয়াজে সবাই চমকে গেলেন। বাজারে আগুন জ্বলছে, সহরে চলেছে লুঠপাট এবং ক্যাণ্টনমেণ্টে চলেছে হত্যাকাণ্ড।

সেখান থেকে একটা বিরাট দল এলো দিল্লী। সম্রাট বাহাদুর শাহ—তখন নামেই সম্রাট—ইংরাজী ভাষায় titular king মাত্র। অতীতকালে বাহাদুর শাহের পিতামহ সম্রাট শাহ আলম যখন মারহাট্টা আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন ইংরাজ সৈন্যরাই তাঁকে সে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। লর্ড লেকের নাম এ সম্বন্ধে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা সগৌরবে ঘোষণা করেন। ইংরাজের সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাতেই সম্রাট শাহ আলমের জন্য একটা পেনসন নির্দ্ধারিত হয় এবং ভারতের ভাগ্যবিধাতার স্থান অধিকার করেন ইংরাজ। সেই অবধি দিল্লীর সম্রাটের মর্য্যাদা তাঁদের কাছে হয়, "A British subject, pensioner and titular king of Delhi."

এই স্বাধীনতার ইতিহাস—যাকে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা 'সিপাহী বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছেন, তার বিবরণ বহু গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জ্জা মোগল বাহাদুর এবং অন্যান্য পুত্রেরা এই স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন—সেটা ঐতিহাসিক সত্য।

আগুন জ্বলে উঠেছে কানপুরে, বেরিলিতে, লক্ষ্ণৌতে। মধ্যভারতে, ঝান্সীতে, বিহারে, আরায় এবং আরও বহু জায়গায়।

৮ই জুন দিল্লী অবরোধ সুরু হোল ইংরাজ বাহিনীর দ্বারা, কিন্তু জুন গেল, জুলাই আগষ্টও শেষ হয়ে গেল, তারা দিল্লীর অনতিদূরে পাহাড় (তাকে এখানে বলা হয় রিজ (Ridge) আসলে এটা আরাবল্লী পর্ব্বতমালার একটা বিক্ষিপ্ত অংশ) থেকে নেমে সহরের মধ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলে না। অবশেষে ১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর প্রাকার-বেষ্টনীর কাশ্মীর গেট বিধ্বস্ত করে সহরের মধ্যে প্রবেশ করলো ইংরাজ ফৌজ।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ আশ্রয় নিলেন তিন মাইল দূরে তাঁরই পূর্ব্বপুরুষ হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরে। সে বিরাট স্মৃতিসৌধকে একটা কেল্লা বললেও ভুল করা হয় না। নগর জয় করে ছুটলেন ক্যাপ্টেন হডসন বাহাদুর শাহের খোঁজে। বৃদ্ধ সম্রাটকে প্রাণে মারা হবে না এই আশ্বাস দিয়ে মহানুভবতা দেখালেন হডসন, কিন্তু সম্রাটের পুত্রদের সম্বন্ধে তাঁর ব্যবস্থা হোল অন্যরকম। তাঁদের বন্দী করে নিয়ে আসবার সময় জনতা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কাজেই হডসন সে অবস্থায় আর কি করেন ? ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখে গিয়েছেন "Hodson considered it necessary to shoot down the princes (who had surrendered unconditionally) with his own hand.

বন্দী বাহাদুর শাহের বিচারের আয়োজন হোল। পাঁচ জন বিচারপতি নিযুক্ত হলেন তাঁর অপরাধের ন্যায়বিচারের জন্য। তা ছাড়া রইলেন গভর্ণমেণ্ট প্রসিকিউটার।

সেই বিচারের বিস্তৃত বিবরণ পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট একখানি পুস্তকের আকারে মুদ্রিত করেছিলেন। অসংখ্য চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ সেই বিচারসভায় উপস্থাপিত করা হয়েছিল, বহু সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যেগুলির আলোচনা করবো। সেগুলি প্রধানতঃ—(১) সম্রাট নামধারী বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ (২) চুনীলাল নামা এক ব্যক্তির লেখা সে সময়ের ঘটনাবলীর একটা দিনপঞ্জী তাহারই কিয়দংশ (৩) সম্রাটের বর্ণনাপত্র (৪) গভর্ণমেণ্ট প্রসিকিউটারের বক্তৃতা এবং (৫) বিচারের রায়।

বিচার-পর্ব্ব

১৮৫৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে সুরু হোল দিল্লীতে এক মিলিটারী কমিশনের বিচারগৃহে দিল্লীর সম্রাট উপাধিধারী

বাহাদুর শাহ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাজদ্রোহের অপরাধে বিচার। পাঞ্জাবের চিফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স এবং দিল্লীর মিলিটারি ডিভিসনের কম্যাণ্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল পেনীর আদেশে গঠিত হোল এই বিচারসভা।

এই সভার সর্ব্বাধিনায়ক হলেন লেফটনেন্ট কর্ণেল ডয়েস এবং সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন—

১। মেজর পামার
২। মেজর রেডমণ্ড
৩। মেজর সইয়ার্স
৪। ক্যাপ্টেন রথনি

এ ছাড়া দোভাষীরূপে রইলেন জেমস মারফি এবং গভর্ণমেণ্ট প্রসিকিউটাররূপে মেজর এফ, জে, হ্যারিয়ট, ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল।

সম্রাট উপাধিধারী বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ হোল মাত্র চারটি।

প্রথম—বন্দী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হওয়া সত্ত্বেও ১৮৫৭ সালের ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং নাম না জানা বহু সৈন্য এবং সৈন্যবাহিনীর কর্ম্মচারীদের উৎসাহ এবং উপযুক্ত সাহায্য দিয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

দ্বিতীয়—১৮৫৭ সালের ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বন্দী তাঁর পুত্র মির্জ্জা মোগল—তিনিও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একজন প্রজা—এবং দিল্লী ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অসংখ্য জনমণ্ডলী—তারাও সকলেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রজা—তাদের সকলকেই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ করবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং যথোপযুক্ত সাহায্যও করেছিলেন।

তৃতীয়:—বন্দী স্বয়ং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুগত প্রজা হয়েও রাজ-আনুগত্য বর্জ্জন করে বিশ্বাসঘাতকরূপে ১৮৫৭ সালের ১১ই মে তারিখে নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন এবং সেই দিনই অন্যায় ভাবে দিল্লী শহর অধিকার করেন। এ ছাড়া ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিজের পুত্র মির্জ্জা মোগল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও অসংখ্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবে সিদ্ধ করবার জন্য অস্ত্রধারী সৈন্য সংগ্রহ করে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য পাঠিয়ে দেন।

চতুর্থ:—বন্দী ১৮৫৭ সালের ১৬ই মে এবং ঐ সময়ে দিল্লী প্রাসাদের সীমানার মধ্যে ৪৯ জন খাস ইয়ুরোপীয় এবং মিশ্রিত ইয়ুরোপীয় নর-নারীর নির্ম্মম হত্যাসাধনের সহায়তা করেন এবং ১০ই মে ও ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিয়োজিত সৈন্যদের দ্বারা ইয়ুরোপীয় অফিসার এবং অন্যান্য ইংরাজ নর-নারীর হত্যাসাধনের সহায়তা করেন। হত্যাকারীদের ভাল চাকুরি, পদোন্নতি এবং মর্য্যাদাবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব দেশীয় রাজন্যবর্গ আছেন, তাঁদের কাছেও হুকুমনামা পাঠান, যাতে তাঁরাও নিজেদের রাজ্যের এলাকার মধ্যে ইংরাজ এবং খৃশ্চান নর-নারীদের নির্ব্বিচারে হত্যা করেন। বন্দীর এই আচরণ ভারতবর্ষের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ১৮৫৭ সালের ১৬ আইন অনুসারে অতি ঘৃণিত অপরাধ বলেই গণ্য হয়।

বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহ নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলে ঘোষণা করেন।

সরকার পক্ষ থেকে বাহাদুর শাহের লেখা অথবা স্বাক্ষরিত বহু চিঠিপত্র আদালতে উপস্থাপিত করা হয় প্রমাণস্বরূপে।

চুনীলাল নামা এক ব্যক্তির কাজ ছিল সংবাদ সরবরাহ করা। তাহার বাড়ী থানাতল্লাসী করার ফলে ১১ই মে থেকে সুরু করে ২০শে মে পর্য্যন্ত—এই কয় দিনের ঘটনাবলী একটা ডায়েরীর আকারে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। বিচারসভায় সেই দিনলিপিও উপস্থাপিত করা হোল।

চুনীলালের দিনলিপি

১০ই মে ১৮৫৭—মিঃ ফ্রেজার সাহেব রাত্রে মিরাট হইতে একখানি চিঠি পাইয়া সেখানকার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের বিদ্রোহাত্মক আচরণ সংক্রান্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। ১১ই তারিখের সকালে খবর আসিল যে মিরাটের তৃতীয় ক্যাভালরি এবং দুই দল দেশীয় পদাতিক বাহিনী কার্টিজ ব্যবহারে আপত্তি জানাইয়া এক গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহারা দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া ফ্রেজার সাহেব ঝঝ্‌ঝরের নবাবের কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। Sir Theophilus Metcalfe সেই সময়ে সহরের মধ্যে আসিয়া প্রধান কোতোয়ালকে আদেশ দিলেন যে, দিল্লী সহরের প্রাচীরের সমস্ত ফটকগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক এবং সেখানে প্রহরীর ব্যবস্থা করা হউক। ফ্রেজার সাহেবও সেই সময় তাঁহার বগীতে চড়িয়া সহরের মধ্যে আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে দেহরক্ষিরূপে চলিল ঝঝ্‌ঝরের অশ্বারোহী বাহিনী। এই সময়ে শোনা গেল যে কয়েক জন বিদ্রোহী নদীতীরে আসিয়া সেখানকার টোলকালেকটরকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। এই বিদ্রোহী দল দিল্লী প্রাসাদের বুরুজের সামনে আসিয়া সম্রাটকে উদ্দেশ করিয়া বলিল যে, তাহারা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, সুতরাং ফটক খুলিয়া তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হউক। সম্রাট তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অধ্যক্ষকে জানান যে, মিরাট হইতে একদল সৈন্য আসিয়া হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া Captain Douglas সম্রাটের নিকট আসেন এবং ঐ সব সেনাদলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে অনর্থক গোলযোগের সৃষ্টি না করিয়া তাহাদের চলিয়া যাওয়াই উচিত। তাঁহার এই উপদেশবাণীতে তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া কাপ্তেন ডগলাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল যে তাঁহার সঙ্গে তাহারা ভবিষ্যতে বোঝাপড়া করিবে।

ইতিমধ্যে ফ্রেজার সাহেব কাশ্মীর গেটে আসিয়া সেখানকার প্রহরীদের বলিলেন যে, তাহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিমক খাইয়াছে, সুতরাং মিরাট হইতে আগত বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে তাহারা যেন তাঁহাকে সাহায্য করে। কিন্তু প্রহরীরা তাহাতে ঠিক সম্মতি দেয় নাই। ফ্রেজার সাহেব তখন ক্যালকাটা গেটে আসিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা

অবলম্বনের চেষ্টা করেন। তাঁহার জমাদার জোয়াখা সিং তাঁহাকে বলে যে, মুসলমানেরা সকলেই মনে মনে বিদ্রোহভাব পোষণ করিতেছে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে শহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু ফ্রেজার তাহাতে সম্মত হন না।

দেখিতে দেখিতে দিল্লীর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া গেল। Reverend Mr. Jennings এবং আর একজন প্রাসাদরক্ষীর ঘরের শীর্ষদেশ হইতে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন বিদ্রোহী সৈন্যদের মিরাট হইতে দলে দলে আগমন। Captain Douglas এই সময়ে ফ্রেজার সাহেবের কাছে আসিয়া একখানি চিঠি দিলেন। চিঠি পড়িয়াই ফ্রেজার তাঁহার দেহরক্ষীদের প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল, সামরি বাজারের মুসলমানেরা রাজঘাটে যাইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে এবং ফটক খুলিয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা জনস্রোতের মত দরিয়াগঞ্জ মহল্লায় প্রবেশ করিয়া ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া ইয়ুরোপীয়দের নির্মম ভাবে হত্যা করিতে সুরু করিল। দরিয়াগঞ্জের ডাক্তার চমনলাল তাঁহার ডিসপেন্সারীর রোয়াকে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিও নিহত হইলেন। মুসলমানেরা তখন বিদ্রোহীদের জানাইল যে, ফ্রেজার সাহেব ক্যালকাটা গেটের নিকটে আছেন। বিদ্রোহীরা তৎক্ষণাৎ মহা কলরব করিতে করিতে সেই দিকে চলিল এবং প্রহরীদের মধ্যে দুই জন তখনই নিহত হইল। ফ্রেজার সাহেবের দেহরক্ষী কোনও বাধাই দিল না। ফ্রেজার একখানা তরবারির আঘাতে একজনকে আহত করিয়া ডগলাস সাহেবের সঙ্গে বগীতে চড়িয়া কেল্লার ভিতর ফিরিয়া আসিলেন। কাপ্তেন ডগলাস তাঁহার নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেলেন এবং ফ্রেজার সাহেব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়েই আক্রান্ত হইলেন এবং সেইখানেই নিহত হইলেন।

বিদ্রোহী দল তখন উপরে ছুটিয়া গিয়া নিমেষের মধ্যে কাপ্তেন ডগলাস, রেভারেণ্ড জেনিংস এবং তাঁহার কন্যাকে নির্মম ভাবে হত্যা করিল। এই সময়ে শহরের মুসলমানরা ইয়ুরোপীয়দের বাড়ী-ঘর লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। Sir Theophilus Metcalfe ঘোড়ায় চড়িয়া উন্মুক্ত তরবারি লইয়া আসিতেছিলেন, বিদ্রোহীরা তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। চাঁদনি চকের রাস্তা দিয়া দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া মেটকাফ সাহেব আজমীর গেট দিয়া শহরের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দিল্লীর তিনটি পদাতিক সৈন্যদল ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। তাহারা কয়েক জনকে হত্যা করিয়া শহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কাশ্মীর গেট, দরিয়া গঞ্জ এবং মেজর স্কিনারের বাড়ীতে যতগুলি ইয়ুরোপীয় ছিল, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নির্মমভাবে নিহত হইল। তারপর ১২টি থানা ধ্বংস করা হইল এবং রাস্তার সমস্ত আলোগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। তারপর ব্যাঙ্ক আক্রমণ করা হইল। ব্যাঙ্কের দুই জন পুরুষ এবং তিনটি মহিলা দু'টি শিশু লইয়া বাড়ীর ছাদে উঠিলেন। বিদ্রোহীদের একজন পার্শ্ববর্তী একটা গাছে উঠিয়া ছাদে পৌঁছিবার চেষ্টা করিলে সে আহত হয়। তখন ব্যাঙ্কের বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল এবং সেই পুরুষ ও মহিলাদের হত্যা করা হইল। স্থানীয় মুসলমানেরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া জেহাদ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া ফেলিল। দিল্লীর তিনটি পদাতিক বাহিনী ট্রেজারী লুঠ করিয়া টাকাকড়ি যাহা পাইল নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। তারপর আদালত এবং কলেজ-বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিল। অশ্বারোহী সৈন্যের দল ক্যান্টনমেণ্ট আক্রমণ করিয়া সমস্ত বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিল।

অতঃপর মিরাট হইতে আগত অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী সম্রাটের নিকট আসিয়া তাঁহার সাহায্য চাহিল এবং জানাইল যে, সারা ভারতবর্ষে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্রাট তাহাদের জানাইলেন যে তাহাদের কার্য্যকলাপের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু শহরের ধ্বংসলীলা এবং লুঠতরাজ বন্ধ করিতে হইবে। সম্রাট তাহাদের সেলিমগড়ে আশ্রয় লইতে বলিলেন।

বিদ্রোহীরা এই সময় সংবাদ পায় যে, বারুদখানায় বহু ইংরাজ নর-নারী আশ্রয় লইয়াছে। তখন তাহারা সেই দিকে অভিযান চালাইল। ইতিমধ্যে শোনা গেল যে, বারুদখানা উড়িয়া গিয়াছে, সেখানকার সকলেই নিহত এবং আশে-পাশের বহু বাড়ীঘর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনজন সার্জেণ্ট এবং দুটি মহিলা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের বন্দী করিয়া সম্রাটের নিকট আনা হইল। সম্রাট তাঁহাদের আশ্রয় দিলেন। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং তাঁহার পরিজনবর্গ এবং ছদ্মবেশে মিঃ মনরোকে লইয়া বল্লভগড়ে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে কোষাধ্যক্ষ সালিগ্রামের বাড়ী লুণ্ঠিত হইল।

রাত্রে প্রাসাদদুর্গ হইতে ২১ বার তোপধ্বনি দ্বারা সম্রাটকে অভিনন্দিত করা হইল। সারা রাত্রি ধরিয়াই লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ ইত্যাদির জন্য সারা দিল্লী শহর আতঙ্কিত হইয়া রহিল।

১২ই মে ১৮৫৭—মঙ্গলবার সম্রাট দেওয়ানী খাসে আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন। ৫৪ রেজিমেণ্টের সুবাদার প্রার্থনা করিলেন যে প্রতিদিনের রসদ সরবরাহের জন্য এক জনকে নিযুক্ত করা হোক। অবশেষে রামসহায় মাল এবং দিলওয়ালী মালের উপর আদেশ হইল যে তাহারা প্রতিদিন ৫০০৲ টাকা মূল্যের রসদ সৈন্যবাহিনীকে সরবরাহ করিবে।

সংবাদ পাওয়া গেল, মহম্মদ ইব্রাহিম নামা এক ব্যক্তির বাড়ীতে চার জন ইয়ুরোপীয়কে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া একজন বিদ্রোহী ইব্রাহিমের বাড়ী লুঠ করিয়া চারি জনকেই হত্যা করিল। একটি ইয়ুরোপীয় মহিলা দেশীয় পোষাকে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনিও অব্যাহতি পাইলেন না।

এই সব সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি পাহাড়গঞ্জের কোতোয়াল মির্জ্জা মনিরুদ্দীন খাঁকে নগর-অধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত করিয়া আদেশ দিলেন যে, অবিলম্বে লুণ্ঠন এবং নরহত্যা বন্ধ করিতে হইবে। মির্জ্জা সাহেব বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন যে, সেই মুহূর্ত্তেই চৌরী বাজার লুণ্ঠিত হইতেছে। সম্রাট তখন পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ককে আদেশ দিলেন, দুর্গের এবং শহরের সমস্ত ফটকে এক রেজিমেণ্ট করিয়া সৈন্য মোতায়েন করা হউক। প্রজাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়া তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত নন।

ইতিমধ্যে নগরশেঠ মহল্লা আক্রান্ত হইল। সেখানকার অধিবাসীরা ইটপাটকেল ছুড়িয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

সম্রাট তাঁহার পুত্র মির্জ্জা মোগলকে আদেশ দিলেন যে, লুণ্ঠন ও হত্যা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হউক। মির্জ্জা মোগল

একটি হাতীতে চড়িয়া সৈন্যদল লইয়া বিভিন্ন থানায় উপস্থিত হইয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, লুণ্ঠনকারী দুষ্কৃতদের নাক এবং কান কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং কোনও দোকানদার যদি দোকান বন্ধ করে কিম্বা সৈন্যবাহিনীকে কোনও জিনিষ দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্দী করা হইবে এবং জরিমানা করা হইবে।

অতঃপর স্বয়ং বাদশাহ হাতীতে চড়িয়া, দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য এবং কামান লইয়া শহরের প্রধান রাজপথ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার আদেশ প্রচারিত হইতে লাগিল যে, সমস্ত দোকান খোলা হউক এবং ব্যবসাকার্য্য যথানিয়মিত ভাবে চলুক।

প্রাসাদে ফিরিয়া মির্জ্জা মনিরুদ্দিনকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া সম্রাট তাঁহাকে একটি পরিচ্ছদ উপঢৌকন দিলেন। মির্জ্জা সাহেব নজরানাস্বরূপ চারি টাকা বাদশাহের নিকট পেশ করিলেন।

১৩ই মে ১৮৫৭ বুধবার—বাদশাহ মসজিদে আসিলেন। নবাব মাহবুব আলি খাঁ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন। অভিযোগ হইল যে সৈন্যরা যথোপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী পাইতেছে না। হাসান আলি খাঁ সম্রাটকে জানাইলেন যে, প্রাসাদে যে সব সৈন্যবাহিনী উপস্থিত রহিয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই বিদ্রোহী এবং লুণ্ঠন ও হত্যা ব্যাপারে তাহারাই বেশীর ভাগ দায়ী। সুতরাং এই সব সৈন্যদের উপর আস্থা স্থাপন করা ঠিক সঙ্গত হইবে না। মির্জ্জা মোগল এবং আরও কয়েক জনকে তখন আদেশ দেওয়া হইল যে, প্রত্যেকে দু'টি করিয়া কামান লইয়া কাশ্মীর গেট, লাহোর গেট এবং দিল্লী গেটে যাইয়া শান্তি স্থাপন করুন। মির্জ্জা আবুল বখরকে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হইল।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, কিষেণগড়ের রাজা কল্যাণ সিংয়ের বাড়ীতে ২১ জন নর-নারী আত্মগোপন করিয়া আছে, এই সংবাদ পাইয়া সৈন্যদল সেখানে যাইয়া বন্দুকের গুলীতে তাহাদের সকলকেই হত্যা করে। কর্ণেল স্কিনারের বাড়ীতে কয়েক জন অশ্বারোহী হানা দিয়া যোসেফ স্কিনারের পুত্রকে বন্দী করিয়া আনিয়া কোতোয়ালীর সম্মুখে হত্যা করে।

মির্জ্জা মনিরুদ্দীন ঘোষণা করিলেন যে, কেহ সৈন্যদলে কাজ করিতে যদি ইচ্ছুক হয়, সে ব্যক্তি অনায়াসে আসিতে পারে; তবে নিজের অস্ত্র সঙ্গে আনিতে হইবে এবং যদি কাহারও বাড়ীতে কোনও ইংরাজকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ঘোষণার ফলে প্রায় ২০০ শত ব্যক্তিকে মির্জ্জা সাহেব নিযুক্ত করিয়া শহরের প্রধান রাজপথগুলিতে শান্তিরক্ষার জন্য পাঠাইলেন।

১৪ই মে ১৮৫৭ বৃহস্পতিবার—বাদশাহের কাছে বহু লোক পরিচিত হইলেন এবং সকলেই নজরানা দিলেন।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, চাঁদ রাওলের গুণ্ডার দল প্রতিরাত্রে সবজিমণ্ডী তেলিওয়ারা অঞ্চলে লুঠপাট করিতেছে। সম্রাট তাঁহার পুত্র মির্জ্জা মোগলকে আদেশ করিলেন, অবিলম্বে এই সব লুণ্ঠন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

একজন ইয়ুরোপীয় সৈন্য এবং একজন ইয়ুরোপীয় মহিলা বন্দী অবস্থায় সম্রাটের নিকট আনীত হইল। গুপ্তচর সন্দেহে তাহাদের কারাগারে পাঠানো হইল।

কয়েক জন সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্য জুতা পায়ে দিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

চার জন লোক মিরাট হইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে বৃটিশ বাহিনী দিল্লী অভিমুখে আসিতেছে। এ সংবাদ অবিশ্বাস করিয়া সেই চারি ব্যক্তিকে আটক করা হইল।

নিগমবোধ ঘাটের দারোগাকে আদেশ দেওয়া হইল যে ফ্রেজার ও কাপ্তেন ডগলাসের শবদেহ সমাহিত করা হউক এবং অন্যান্য ইয়ুরোপীয় নর-নারী যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহাদের দেহ নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হউক। আদেশ প্রতিপালিত হইল।

১৫ই মে ১৮৫৭ শুক্রবার—মৌলভী আবদুল কাদের সৈন্যদের বাকী বেতনের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া সম্রাটের নিকট পেশ করিলেন। মৌলভী সাহেব সম্প্রতি নবাব মাবুব আলি খাঁর সহকারী নিযুক্ত হওয়ায় সম্রাট তাঁহাকে এক জোড়া শাল উপহার দিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৌলভী সাহেব প্রস্থান করিলেন।

গোলাম নবী খাঁ, আকবর আলি, মৌলভী আহম্মদ আলি প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

খবর পাওয়া গেল যে, গুরগাঁওয়ের ট্রেজারি লুণ্ঠিত হইতেছে। সম্রাট আদেশ দিলেন যে তৎক্ষণাৎ একজন সৈন্য লইয়া সেখানকার টাকাকড়ি লইয়া রোহটক ট্রেজারিতে আনা হউক।

আবদুল করিমের প্রতি আদেশ হইল যে ৪০০ শত পদাতিক এবং এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করা হউক। পদাতিকের মাসিক বেতন ধার্য্য হইল প্রত্যেকের ৪৲ টাকা এবং অশ্বারোহীর ২০৲ টাকা।

কাজী ফয়জুল্লা পাঁচ টাকা নজরানা দিয়া সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহাকে নগরের কোতোয়াল নিযুক্ত করা হউক। তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

দেওয়ানী খাসে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করা হইল যে শাহ নিজামুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি দুই জন ইয়ুরোপীয় মহিলাকে তাঁহার বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। শাহ নিজামুদ্দিনকে আনা হইলে তিনি বলিলেন যে, সৈন্যরা তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসুক এবং সত্যই যদি দেখা যায় যে কোনও ইয়ুরোপীয় মহিলা তাঁহার বাড়ীতে লুক্কায়িত আছেন, তিনি নিজের মস্তক দিয়াও শাস্তি লইতে প্রস্তুত।

আগা মহম্মদ খাঁর বাড়ী লুণ্ঠিত হইল।

১৬ই মে ১৮৫৭ শনিবার—সম্রাট দেওয়ানী খাসে দরবার আহ্বান করিলেন। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর কয়েক জন একখানি চিঠি আনিয়া সম্রাটের নিকট পেশ করিল। চিঠিখানিতে হকিম আসানউল্লা খাঁ এবং নবাব মাহবুব আলি খাঁর স্বাক্ষর এবং মোহরের ছাপ আছে। চিঠিখানি দিল্লী গেটের নিকট একজনের কাছে ধরা পড়িয়াছে এবং উহা ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষকে লিখিত। চিঠিতে লেখা আছে যে ইংরাজেরা যদি অবিলম্বে দিল্লী শহর অধিকার করিয়া সম্রাজ্ঞী জিনৎ মহলের গর্ভজাত পুত্র মির্জ্জা মোগলকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে পত্রলেখকরা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

চিঠিখানি আসানউল্লা খাঁ এবং নবাব মাহবুব আলি খাঁকে

দেখানো হইলে তাঁহার উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে উহা জাল চিঠি। তাঁহাদের মোহরাঙ্কিত আংটি সম্রাটের সামনে রাখিয়া তাঁহারা বলিলেন যে চিঠির সিলমোহরের সঙ্গে এই মোহর মিলাইয়া দেখা হউক। কিন্তু সৈন্যরা সে কথা বিশ্বাস করিল না। তাহারা নিজেদের তরবারি খুলিয়া আসানউল্লা এবং মাহবুব আলিকে ঘিরিয়া রহিল এবং জানাইল যে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁহার যে যোগাযোগ আছে তাহার প্রমাণ তাহারা পাইয়াছে। আরও বলা হইল যে এই জন্যই বোধ হয় ইংরাজ-বন্দীদের ভার লইয়াছেন আসান উল্লা খাঁ; যাহাতে ইংরাজেরা আসিলেই তাহাদের হাতে বন্দীদের সমর্পণ করিয়া তিনি পুরস্কার লাভ করিবেন।

তৎক্ষণাৎ কয়েদখানা হইতে নর-নারী বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে ৫২টি ইয়ুরোপীয় বন্দীদের বাহিরে আনিয়া প্রত্যেককে নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হইল। তারপর সেই সকল মৃতদেহ দুইখানি গাড়ীতে বোঝাই করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল।

লাহোরী গেটের দোকানদাররা অভিযোগ করিল যে, সেখানকার দারোগা কাশীনাথ তাহাদের নিকট এক হাজার টাকা চাহিয়াছে। না দিলে তাহাদের বাঁধিয়া চালান দেওয়ার ভয় দেখাইয়াছে। কাজী ফয়জউল্লাকে আদেশ দেওয়া হইল কাশীনাথকে তৎক্ষণাৎ যেন বন্দী করা হয়।

১৭ই মে ১৮৫৭ রবিবার—সৈন্যাধ্যক্ষেরা আসিয়া সম্রাটের কাছে নিবেদন করিল যে, সেলিমগড়ের দুর্গ তাহারা সুরক্ষিত করিয়াছে। সম্রাট যদি স্বয়ং একবার সেখানে যাইয়া দেখিয়া আসেন তাহা হইলে তাহারা বড়ই আনন্দিত হইবে। সম্রাট তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া খোলা তাঞ্জামে সেখানে যাইয়া সব পরিদর্শন করিয়া আসিলেন এবং জানাইলেন যে, দেশের কাজে তাহাদের সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং আসানউল্লা খাঁ, মাহবুব আলি খাঁ এবং বেগম জিনৎমহলের প্রতি তাহারা যেন পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। এই সময় এক ব্যক্তি একখানি চিঠিসমেত ধরা পড়িল। চিঠিখানি মিরাট হইতে ইয়ুরোপীয়দের দ্বারা লিখিত। লোকটিকে একটি কামানের মুখে বাঁধিয়া রাখা হইল।

মির্জ্জা আমিনউদ্দীন খাঁ এবং মির্জ্জা জিয়াউদ্দীন খাঁকে সৈন্য সংগ্রহ করিবার আদেশ দেওয়া হইল এবং বলা হইল, তাহাদের বহু জায়গীর পুরস্কার দেওয়া হইবে।

গরহী হারসার হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, গুরগাঁও জেলার রাজস্ব হিসাবে বহু লক্ষ টাকা দিল্লীতে আনীত হইতেছিল, পথে প্রায় ৩০০ শত মেওয়াটি এবং গুজার মিলিয়া সেই টাকার রক্ষীদলকে আক্রমণ করিয়াছে। মৌলভী মহম্মদ বখরকে তৎক্ষণাৎ আদেশ দেওয়া হইল যে, পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য-বাহিনী লইয়া এখনই সেখানে যাইয়া সেই অর্থ উদ্ধার করা হউক।

সম্রাটের দুই জন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, মিরাট হইতে প্রায় এক হাজার ইয়ুরোপীয় সৈন্য কয়েক জন ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকাকে লইয়া সুরযকুণ্ডে একটি ছাউনি স্থাপন করিয়াছে এবং হাতী দিয়া সেখানে কামান আনানো হইয়াছে। আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, গুজাররা মিরাট হইতে সেলিমপুরের রাস্তায় অবাধে লুঠতরাজ করিতেছে। সম্রাট দুই দল পদাতিক সৈন্য যমুনাতীরে মোতায়েন থাকিতে আদেশ দিলেন। Sappers & Miners দলের পাঁচটি বিভাগ রুড়কী হইতে মিরাটে আসিয়াছিল। ইংরাজেরা তাহাদের কাজ করিতে বলায় তাহারা অসম্মত হয়। ফলে তাহাদের উপর গুলী চালানো হয়। বহু লোক হতাহত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে পলাইয়া দিল্লী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

পাতিয়ালার মহারাজা নরেন্দ্র সিং, জয়পুরের রাজা রামসিং, আনোয়ারের রাজা, যোধপুর, কোটা এবং বুন্দীর রাজাদের উপর পরোয়ানা পাঠানো হইল, যেন অবিলম্বে তাঁহারা সম্রাটের নিকট উপস্থিত হন।

১৮ই মে ১৮৫৭ সোমবার—সম্রাট দেওয়ানী খাসে আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। পাঁচ দল রক্ষীসৈন্য ইংরাজী বাজনা বাজাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিল। সম্রাট খেলাৎ এবং উপঢৌকন দিলেন তাঁর অনুগত অনেককে। তাঁর পুত্র মির্জ্জা মোগল সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অন্য পুত্রেরা মির্জ্জা কোটক সুলতান, মির্জ্জা খয়ের সুলতান, মির্জ্জা মেন্দু এবং অন্যান্য সন্তানদের পদাতিকবাহিনীর কর্ণেল পদে অভিষিক্ত করা হইল। তাঁহার পৌত্র আবুল বখরকে অশ্বারোহীদলের কর্ণেলের পদ দেওয়া হইল। মির্জ্জা মোগল সম্রাটকে পাঁচ মোহর নজরানা দিলেন এবং অন্যান্য পুত্রেরা প্রত্যেকে এক মোহর হিসাবে নজরানা দিলেন।

হাসান আলি খাঁকে জানানো হইল যে, তিনি প্রতিদিন দরবারে হাজির থাকিবেন এবং যদি সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা হইলে বিপুল জায়গীর পাইবেন। হাসান আলি বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন যে, সৈন্য বর্তমানে সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, তবে তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা হুজুরে হাজির থাকিবেন।

আনোয়ারে যে দূত পাঠানো হইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, অসংখ্য গুণ্ডার দল রাস্তা দখল করিয়াছে এবং লুঠতরাজ করিতেছে। তাহাদের ঘোড়া কাড়িয়া লইয়াছে এবং মহারাজাকে যে চিঠি পাঠানো হইয়াছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া টুকরো টুকরো করিয়া ছিঁড়িয়া ছিন্নখণ্ডগুলি তাহাদের ফেরত দিয়াছে। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তবে তাহারা মুক্তি পাইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিয়াছে।

ফারুকনগরের নবাব আহম্মদ আলি খাঁর নিকট পত্র লইয়া যে ব্যক্তি গিয়াছিল সেও ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, গুণ্ডারা তাহাকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই।

Sappers & Miners দল যাহারা মিরাট হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল তাহারা নিজেদের কাহিনী সম্রাটের নিকট বলিল। তাহাদের সেলিমগড়ে থাকিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

মির্জ্জা আবুল বকর সৈন্য লইয়া গুজারদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু খবর পাওয়া গেল যে, গুজাররা ইতিমধ্যে পলায়ন করিয়াছে।

১৯শে মে ১৮৫৭—মঙ্গলবার—সম্রাট দেওয়ানী খাসে আসিয়া বসিলেন। দুই জন সৈন্য মিরাট হইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে বহু পদাতিক, অশ্বারোহী গোলন্দাজ সৈন্য বেরিলী এবং মোরাদাবাদ হইতে মিরাটে সমবেত হইয়াছে। Sappers & Minersদের প্রতি ইংরাজেরা যে আচরণ করিয়াছে তাহার প্রতিবাদ জানায়। ইংরাজেরা তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করে, তাহারাও প্রত্যুত্তরে গোলাবর্ষণ করিয়াছে। এই সময় খোদার অভিপ্রায়ে একটি গোলা

ইংরাজদের বারুদস্তূপে গিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত স্থানটা উড়িয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট খুবই আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দ জ্ঞাপনের জন্য সেলিমগড় হইতে পাঁচ বার তোপধ্বনি করিবার আদেশ দেওয়া হইল।

সম্রাট তাঁহার পুত্র মির্জ্জা জাওয়ান বখতকে উজীরের পদে নিযুক্ত করিয়া একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং রূপার কলমদান উপহার দিলেন। মির্জ্জা সাহেব দশ মোহর নজরানা দিলেন।

আর এক পুত্র মির্জ্জা বখতাওয়ারকেও সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়া একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ দেওয়া হইল। ইনিও দুইটি মোহর এবং পাঁচটি টাকা সম্রাটকে নজরানা দিলেন।

পাতিয়ালার কুমার অজিত সিং দরবারে উপস্থিত হইয়া এক মোহর নজরানা দিলেন। তাঁহাকেও একটি পরিচ্ছদ দেওয়া হইল। কুমার সাহেব আরও পাঁচ টাকা নজরানা দিলেন।

সম্রাট সেলিমগড়ে গেলেন। সৈন্যেরা তাঁহাকে সামরিক অভিবাদন জানাইল। তাহারা বলিল যে, মিরাট হইতে আগত দূত ইংরাজ-শিবির ধ্বংসের যে বিবরণ দিয়াছে তাহা তাহারা বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাহারা নিজেরা মিরাট যাইয়া ইংরাজ-শিবির ভাল করিয়া ধ্বংস করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছে। সম্রাট জানাইলেন যে, সেরূপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহারা করিতে চায়, তাহা যেন সেনাপতি মির্জ্জা মোগলের অনুমতি লইয়া করা হয়।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, দিল্লী শহরের চিকিৎসকমণ্ডলী জুম্মা মসজিদের চূড়ায় এক নিশান তুলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, অবিশ্বাসী ইংরাজদের নির্ম্মূল করিতে হইবে। বহু মুসলমান সেই পতাকাতলে সমাগত হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, ইংরাজদের বধ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ পতাকার আর প্রয়োজন নাই। মৌলভী সদরউদ্দীন খাঁ জুম্মা মসজিদে যাইয়া অনেক বুঝাইয়া ঐ পতাকা সরাইয়া লইতে সমর্থ হন।

২০শে মে ১৮৫৭ বুধবার—সম্রাট দেওয়ানী খাসে আসিলেন। চিকিৎসক মহম্মদ সৈয়দ সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে বলিলে জুম্মা মসজিদে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত ইংরাজ যখন নিহত হইয়াছে তখন আর সে পতাকার কি প্রয়োজন? চিকিৎসক বলিলেন, অবিশ্বাসী হিন্দুদেরও বধ করা উচিত। সম্রাট বলিলেন, তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখেন, সুতরাং হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা পোষণ করা তাঁর ইচ্ছা নয়।

এক ব্যক্তি একটি ছোট পিতলের কামান চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে সংবাদ পাওয়া গেল। সম্রাট আদেশ দিলেন, তাহাকে একটি কামানের মুখে বাঁধিয়া তোপে উড়াইয়া দেওয়া হোক।

মির্জ্জা মোগলকে আদেশ দেওয়া হইল, ৪টি কামান, চার দল পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি মিরাট যাত্রা করুন এবং সেখানকার ইংরাজ-ছাউনি ধ্বংস করুন। মির্জ্জা মোগল জানাইলেন যে, মির্জ্জা আমিনউদ্দিন খাঁ, জিয়াউদ্দিন খাঁ, হাসান আলি খাঁ এবং আরও কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ অঞ্চলের ভূম্যধিকারী, তাঁহাদেরও তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ দেওয়া হউক। কিন্তু এই প্রস্তাবে ঐ সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই নীরব রহিলেন। সম্রাট তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া মির্জ্জা আবুল বখরকে আদেশ দিলেন যে তিনি অবিলম্বে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হউন। আসানউল্লা খাঁ এবং নবাব মাহবুব আলি খাঁকে আদেশ দেওয়া হইল, তিনি এই সৈন্য-বাহিনীর খাওয়ার খরচ বহন করিবেন।

মবারক খাসে দুই জন ইয়ুরোপীয় লুকাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের হত্যা করা হইল।

কয়েক জন সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়া জানাইলেন যে, পাঁচ জন বন্দী ইয়ুরোপীয় মহিলা আছেন, তাঁহাদের হত্যা করা হইবে। সম্রাট মাহবুব আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে স্ত্রীলোকদের হত্যা করা নীতিসঙ্গত হইবে কি না। মৌলভী সাহেব অভিমত প্রকাশ করিলেন যে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে নারীহত্যা করা উচিত নয়।

সম্রাট অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। শোনা গেল, তিনি সম্রাজ্ঞী এবং মুকুন্দলালের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত আছেন।

[ক্রমশঃ।

NOBEL PRIZE FOR INDIAN POET

"STOCKHOLM, Nov. 13—The Nobel prize for literature for 1913 has been awarded to the Indian poet Rabindranath Tagore.—*Reuter*.

Mr. Tagore who is fifty-two years old, is a Bengal-poet, beloved and almost worshipped in his own country. He is one of those rare authors who have produced fine literature in two languages. After a few delicate lyrics in English periodicals he gave us "Gitanjali," or "Song Offerings." and later "The Garden," both volumes being translations into rhythmic English prose of his own poems in Bengali."—*The Times*.

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(বঙ্কিমচন্দ্র)

নাট্যরূপ : শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী। রাজচন্দ্র অমরনাথের সহিত কথা কহিতেছিলেন।]

রাজচন্দ্র। উঃ! কি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় যে ক'দিন আমাদের কেটেছে কি বলব অমর বাবু! মেয়ের শোকে গিন্নি তো' একরকম অন্ন-জল ত্যাগ করেছিলেন।

অমর। মা-বাপের পক্ষে সেইটাই স্বাভাবিক।

রাজচন্দ্র। মৌখিক ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে ছোট করব না। আপনার কাছে আমরা চিরঋণী হ'য়ে রইলাম।

অমর। আচ্ছা, আপনার মেয়ে গৃহত্যাগ করে গেল কেন?

রাজচন্দ্র। কি জানি!

অমর। রজনী জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কি দুঃখে জানেন?

রাজচন্দ্র। না। রজনীর এমন কি দুঃখ আছে, তা তো আমরা ভেবেই পাই না। তার দুঃখের মধ্যে সে অন্ধ। কিন্তু তার জন্যে এত দিন পরে সে আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? তবে হাঁ, হ'তে পারে। সে বড় হয়েছে, আজও তার বিয়ে দিতে পারিনি। কিন্তু বিয়ের, যে সময়ে আমি বিয়ে সব ঠিক করলাম, সেই সময়েই ও নিরুদ্দেশ হোল।

অমর। কোথায় বিয়ের ঠিক করেছিলেন?

রাজচন্দ্র। এই কাছেই। হরনাথ বোসের ছেলে গোপালের সঙ্গে।

অমর। ও, গোপাল! অর্থাৎ চাঁপার স্বামী।

রাজচন্দ্র। হাঁ, আপনি সব জানেন দেখছি।

অমর। আমি যা জানি আপনিও তা জানেন না। রজনীর কাছে শুনেছি, চাঁপা সপত্নীযন্ত্রণার ভয়ে রজনীকে ভয় দেখিয়ে গৃহছাড়া করেছিল, তা জানেন?

রাজচন্দ্র। এ্যাঁ! সে কি!

অমর। হাঁ। আমি আরও যা জানি তা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আশা করি, তার যথাযথ উত্তর দেবেন, কোন কিছু গোপন করার চেষ্টা করবেন না।

রাজচন্দ্র। আপনার মত হিতাকাঙ্ক্ষীর কাছে ঈশ্বর সাক্ষী করে বলছি অমর বাবু, কোন কিছুই গোপন করবো না।

অমর। আমি জানি, রজনী আপনার নিজের মেয়ে নয়—পালিতা কন্যা, বলুন, ঠিক কি না?

রাজচন্দ্র। এ কি সাংঘাতিক প্রশ্ন করে বসলেন আপনি?

অমর। প্রশ্নটা একটু সাংঘাতিকই বটে। আর আমি এ-ও জানি যে, রজনী হরেকৃষ্ণ দাসের মেয়ে।

রাজচন্দ্র। আপনি কে তা জানি না। কিন্তু দোহাই আপনার! রজনীকে একথা বলবেন না।

অমর। এখন বলব না। কিন্তু বলতে তাকে একদিন হবেই। হরেকৃষ্ণ দাস যখন মারা যান, তখন তাঁর কিছু গহনা ছিল জানেন?

রাজচন্দ্র। গহনার কথা আমি কিছুই জানি না। আর গহনা তাঁর কাছ থেকে আমি কিছু পাইনি।

অমর। হরেকৃষ্ণ মারা গেলে আপনি কি তাঁর সম্পত্তির সন্ধানে দেশে গিয়েছিলেন?

রাজচন্দ্র। হাঁ, গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম, হরেকৃষ্ণ দাসের যা কিছু সম্পত্তি ছিল তা পুলিশে নিয়ে গেছে!

অমর। হুঁ, তারপর?

রাজচন্দ্র। তারপর আর কি? আমি আর তার জন্যে কোন চেষ্টা করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, পুলিশকে আমি বড় ভয় করি। রজনীর বালা চুরির মোকদ্দমায় বড় ভুগেছিলাম।

অমর। রজনীর বালা চুরি হয়েছিল নাকি?

রাজচন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ। অন্নপ্রাশনের সময় তার বালা চুরি গিয়েছিল। চোর ধরা পড়েছিল বর্দ্ধমানে। অনেক দিন মামলা চলেছিল। কলকাতা থেকে বর্দ্ধমানে আমাকে সাক্ষ্য দিতে যেতে হয়েছিল। বড্ড ভুগেছিলাম। তাই—

অমর। (হাসিয়া) ওহো! সেই ভয়ে হরেকৃষ্ণ দাসের সম্পত্তির জন্যে আর কোন চেষ্টা করেননি?

রাজচন্দ্র। ঠিক তাই—

অমর। আমি যদি এখন সেই সম্পত্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করি, আপনার কি তাতে আপত্তি আছে?

রাজচন্দ্র। না না, আপত্তি কি? ফিরে যদি পাওয়া যায় সে ত' ভালই—রজনী অন্ধ। তবু তার একটা হিল্লে হয়—

অমর। জেনে রাখুন, আমি এখানে এসেই সে চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছি। আচ্ছা আসি—

রাজচন্দ্র। আসুন। (অমরনাথ বাহির হইয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রামসদয় বসুর গৃহ)

(শচীন্দ্রের বসিবার ঘর, শচীন্দ্র একাকী বসিয়া বই পড়িতেছিল, এমন সময় অমরনাথ প্রবেশ করিয়া বলে]

অমর। নমস্কার!

শচীন্দ্র। নমস্কার! বসুন—আপনাকে ত চিনতে পারলাম না?

অমর। আমাকে চিনতে পারবেন না। আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এলাম শচীন বাবু—

শচীন্দ্র। বেশ তো বলুন। মশায়ের নামটা জানতে পারি কি?

অমর। বিলক্ষণ! আমার নাম অমরনাথ ঘোষ।

শচীন্দ্র। মশায়ের কি করা হয়?

অমর। কিছুই না। নিষ্কর্ম্মা লোক ঘুরে ঘুরে বেড়াই, এই আর কি। তা যাক্—কি বই পড়ছিলেন?

শচীন্দ্র। সেক্সপিয়ার।

অমর। ভাল। কিন্তু দেখুন, সেক্সপিয়ার কথা এবং কাজের মধ্যে দিয়ে যে চিত্রগুলি এঁকেছেন, তা চিত্রফলকে চিত্রিত করতে যাওয়া কিন্তু ধৃষ্টতা!

শচীন্দ্র। তার মানে?

অমর। মানে, আপনি এই ডেস্‌ডিমনার কথাই ধরুন, তার চরিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা আছে কিন্তু ধৈর্য্যের সঙ্গে সে সাহস কৈ? নম্রতার সঙ্গে সে অহঙ্কার কৈ?

শচীন্দ্র। মশায়ের দেখছি পড়াশোনা বেশ ভালই আছে।

অমর। আজ্ঞে হাঁ। তা পড়েছি, সামান্য কিছু। তা যাক্— যেজন্যে আপনার কাছে আসা—আচ্ছা, আপনি রাজচন্দ্র দাসের মেয়ে রজনীকে জানেন?

শচীন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ। জানি বৈ কি।

অমর। রজনীকে ফির পাওয়া গেছে শুনেছেন বোধ হয়?

শচীন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, শুনেছি।

অমর। এখন আমি তাকে বিয়ে করব স্থির করেছি। রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে। এখন আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলার দরকার।

শচীন্দ্র। যাঁর মেয়ে তাঁর সঙ্গে যখন কথা হয়ে গেছে তখন আর—

অমর। না না, কথাটা খুব জরুরী এবং যা আপনাকে না বলে আপনার বাবাকেই আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু—

শচীন্দ্র। তা বেশ তো, তাহলে বাবাকেই বলবেন।

অমর। দেখুন, আপনি স্থিরস্বভাব এবং ধর্মজ্ঞ। সেইজন্যেই কথাটা আপনার কাছে বলছি—

শচীন্দ্র। বেশ বলুন—

অমর। দেখুন, বহুকাল ধরে রজনীর কিছু বিষয় আপনারা ভোগ করছেন—

শচীন্দ্র। বলেন কি! রজনীর বিষয় আমরা ভোগ করছি? রাজচন্দ্র দাস ত ফুল বেচে খায়—সে আবার বিষয় পেল কি করে?

অমর। রজনী রাজচন্দ্র দাসের মেয়ে নয়—পালিতা কন্যা মাত্র।

শচীন্দ্র। সে কি! তবে সে কার মেয়ে?

অমর। মনোহর দাসের ছোট ভাই। হরেকৃষ্ণ দাসের মেয়ে— মনোহর দাস সপরিবারে নৌকাডুবি হয়ে মারা যায়। এদিকে হরেকৃষ্ণ দাসের স্ত্রী তখন বেঁচে নেই। হরেকৃষ্ণর একমাত্র কন্যা রজনী তাঁর মেসো রাজচন্দ্র দাসের কাছে মানুষ হচ্ছিল। পুলিশ এদিকে কোন খোঁজখবর না পেয়ে মনোহর দাসের মৃত্যু হয়েছে বলে রিপোর্ট দিলে।

শচীন্দ্র। (তাচ্ছিল্যভরে) হুঁ নিষ্কর্ম্মা লোকের কাণ্ডই আলাদা। নইলে এমন ইতিহাসের গবেষণা করেন? সরে পড়ুন মশায়, সরে পড়ুন, আমার কাজ আছে।

অমর। বিশ্বাস না করেন, অবশ্যই আমাকে সরে পড়তে হবে। তবে উকিল বিষ্ণুরাম বাবুর চিঠি পেলে তখন কিন্তু কথাটা এখনকারের মত হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। আচ্ছা চলি—

(অমরনাথের প্রস্থান ও কিছুক্ষণের মধ্যে অপর দিক দিয়া রামসদয়ের প্রবেশ)

রাম। দেখো শচীন, এইমাত্র উকিল বিষ্ণুরাম সরকারের একটা চিঠি পেলাম। চিঠির নীচে তাঁর ঠিকানা আছে। তুমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার আজই দেখা করবে। আমি চিঠিটা পেয়ে পর্য্যন্ত বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

শচীন্দ্র। কিসের চিঠি বাবা?

রাম। পড়লেই সব বুঝতে পারবে। এত কাল পরে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী গজালো কোথা থেকে, তা ত ভেবেই পাচ্ছি না।

শচীন্দ্র। দেখুন বাবা, এখুনি এক ভদ্রলোক এসে আমায়ও ঠিক ঐ কথাই বলে গেলেন।

রাম। তাই নাকি? তাহলে ব্যাপারটা তো বেশ ঘোরালো বলে মনে হচ্ছে। মনোহর দাস ত সপরিবারে জলে ডুবে মারা যায়। পুলিশও লাওয়ারেশ বলে রিপোর্ট দেয়—

শচীন্দ্র। সে কথা ঠিক। কিন্তু উনি বলছিলেন, তার কে এক ভাই ছিল হরেকৃষ্ণ দাস, তারই মেয়ে নাকি ঐ রজনী। আর সে-ই নাকি এখন মনোহর দাসের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

রাম। সে কি! রজনী তাহলে কি রাজচন্দ্র দাসের মেয়ে নয়?

শচীন্দ্র। না বাবা, রজনী নাকি তার পালিতা কন্যা। রাজচন্দ্র রজনীর আপন মেসো। রজনীকে রাজচন্দ্র নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছে, এই পর্য্যন্ত।

রাম। (চিন্তিত ভাবে) তাইতো—এখন দেখছি যদি সত্যিই রজনী হরেকৃষ্ণ দাসের মেয়ে প্রমাণ হয়, তাহলে তোমাদের দু'ভাইকে আমার বাবা যে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন তা বেহাত হয়ে যাবে।

শচীন্দ্র। বেহাত হয়ে যাবে? কেন?

রাম। ঐ মনোহর দাস ছিল বাবার পরম বন্ধু। বাবা যে প্রচুর টাকা-পয়সা, জমি-জমা ঘর-বাড়ী করে গিয়েছিলেন, তার মূলে ছিল মনোহর দাস। তার পরামর্শ ও বুদ্ধির গুণেই বাবা দশের একজন হতে পেরেছিলেন।

শচীন্দ্র। কই এ সব কথা তো জানতাম না?

রাম। তোমরা তখন জন্মাওনি। একদিন কি একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মনোহর দাসের সঙ্গে আমার মতান্তর হোল। দুঃখে, মনোহর দাস শুধু আমাদের কাজই ছাড়লেন না, সেই সঙ্গে জন্মের মত গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। আর এই মনোহর দাস চলে যাওয়ার জন্যে বাবার সঙ্গে আমার হোল মতবিরোধ। আমি রাগ করে ভবানীনগর থেকে কলকাতায় চলে এলাম।

শচীন্দ্র। সে কি!

রাম। হ্যাঁ। আর এরই জন্যে বাবা সমস্ত বিষয় সম্পত্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন। এইমাত্র যাঁর চিঠি তোমায় আমি দিলাম সেই বিষ্ণুরাম সরকারকে বাবা এষ্টেটের একজিকিউটর করে সমস্ত বিষয় মনোহর দাসকে দিয়ে যান। সর্ত্ত থাকে, মনোহর দাস বা তার ওয়ারিসনগণকে পাওয়া না গেলে আমার দুই ছেলে অর্থাৎ তোমরা দুই ভাই তাঁর সম্পত্তি পাবে। পরে মনোহর দাসের লাওয়ারেশে মৃত্যু হয়েছে জেনে বিষ্ণুরাম বাবুই এই সম্পত্তি আমাদের হাতে তুলে দেন।

শচীন্দ্র। অথচ সেই বিষ্ণুরাম বাবুই আজ চিঠি লিখছেন, বিষয় ছেড়ে দিতে হবে, কারণ মনোহর দাসের এক উত্তরাধিকারিণীর সন্ধান আজ পাওয়া গেছে—

রাম। সেইজন্যেই তো বিশেষ ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছি। সেদিন স্বেচ্ছায় যিনি এই বিষয় আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তিনিই আজ আবার ফিরিয়ে নিতে চাইছেন। বিষ্ণুরাম বাবু যে সৎ ব্যক্তি সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কেন না, ইচ্ছা করলে এ বিষয় ভোগ-দখল করার অধিকার থেকে তিনি আমাদের বঞ্চিত করতে পারতেন।

শচীন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা করতেন বৈ কি!

রাম। যাই হোক, প্রমাণের নথিপত্র দেখার জন্যে তিনি যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, তখন গিয়ে একবার দেখেই এসো—

শচীন্দ্র। যে আজ্ঞে।

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীর উঠান। রজনীর মা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত। ইহারই মাঝে লবঙ্গলতা প্রবেশ করিল]

রজনীর মা। এ কি! ছোট মা! কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো পড়বে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!

লবঙ্গ। আমি তো তোমায় ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম মালীবৌ! খুড়ি, কিছু মনে করো না—অনেক দিনের অভ্যাস, তাই মালীবৌ বলে ফেলেছি।

রজনীর মা। তাতে কি! ওর জন্যে লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই, চিরকাল যা বলে ডেকে আসছেন আজও তাই বলেই ডাকবেন।

লবঙ্গ। তা কি হয়? চিরকাল তোমাদের সম্পত্তি ভোগ করে আসছি। তাই বলে এখন, যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে ও সম্পত্তি আমাদের নয়, তখন কি আর সে সম্পত্তি আমরা ভোগ করতে পারি?

রজনীর মা। কিন্তু সম্পত্তি ত' আমরা এখনও দখল করিনি?

লবঙ্গ। তা করনি। কিন্তু দু'দিন বাদে করবে তো? তোমাদের ন্যায্য অধিকার আজ না হয় কাল ছেড়ে ত' আমাদের দিতেই হবে।

রজনীর মা। রজনীর কিন্তু সম্পত্তি দখল নেওয়া সম্পর্কে তেমন উৎসাহ নেই।

লবঙ্গ। কেন?

রজনীর মা। বোধ হয়, সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাওয়ার দুঃখে ছোটবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শু'ন। হাজার হোক তিনি ত' একদিন তার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করেছিলেন।

লবঙ্গ। শচীন্দ্রের অসুখের কারণ কিন্তু এ নয়—তা যাক্, তোমরা কি অমরনাথের সঙ্গেই রজনীর বিয়ে ঠিক করলে?

রজনীর মা। আজ্ঞে হ্যাঁ। হাজার হোক তাঁর চেষ্টায় রজনী যখন আজ সব কিছু ফিরে পেল—

লবঙ্গ। কিন্তু বিষয় যদি এখন আমরা না ছাড়ি?

রজনীর মা। তাহ'লে মোকদ্দমা করতে হবে।

লবঙ্গ। মোকদ্দমা করা সুখের কথা নয়—যারা ফুল বেচে খায়, তারা করবে মোকদ্দমা—

রজনীর মা। আমরা ফুল বেচে খাই সত্যি, কিন্তু অমর বাবু ফুল বেচে খান না—মোকদ্দমা করার মত ক্ষমতা তাঁর আছে। আর তা'ছাড়া যখন তিনি আমার জামাই হতে যাচ্ছেন, তখন সম্পত্তি বজায় রাখার জন্যে এ তো তাঁকে করতেই হবে।

লবঙ্গ। অমর বাবু মোকদ্দমা করে বিষয় পেলে তোমার কি উপকার হবে শুনি?

রজনীর মা। মেয়ে আমার সুখী হবে।

লবঙ্গ। আর আমার ছেলে শচীন্দ্রের সঙ্গে যদি তোমার মেয়ের বিয়ে হয়?

রজনীর মা। আপনার ছেলের সঙ্গে রজনীর বিয়ে? কি বলছেন?

লবঙ্গ। হাঁ, ঠিকই বলছি—আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হলে তুমি কি মনে কর সে সুখী হবে না?

রজনীর মা। না, না, তা কেন? তবে কি জানেন, রজনী বলে, অমরনাথ হতেই আমাদের সব। উনি যা বলবেন, তাই করতে হবে।

লবঙ্গ। রজনীর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। তোমার আপত্তি আছে?

রজনীর মা। সে কি কথা! আপনি রজনীর সঙ্গে দেখা করবেন, তার আবার আপত্তি কি?

লবঙ্গ। তাহলে আমি একবার রজনীর সঙ্গে দেখা করে যাই, কেমন?

রজনীর মা। বেশ তো।

[লবঙ্গলতাকে রজনীর ঘরের দিকে যাইতে দেখা গেল। রজনীর মা সবিস্ময়ে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

[দৃশ্যান্তর]

[রাজচন্দ্রের গৃহের অপরাংশ। লবঙ্গলতা রজনীর ঘরের দিকে যাইতেছিল, সহসা অপর দিক হইতে অমরনাথকে আসিতে দেখা গেল।]

অমর। এ কি লবঙ্গলতা! তুমি এখানে—

লবঙ্গ। আমিও ঠিক ঐ কথাই তোমায় জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। ভবানীনগরের অমরনাথ রজনীর বিষয় সম্পত্তি ফিরিয়ে নেওয়ার পরও এখানে কেন?

অমর। নিঃস্বার্থভাবে কেউ কি পরের জন্যে এত করে? রজনীর জন্যে যে এত করলাম, তার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। আর সেই জন্যেই এখানে—

লবঙ্গ। বুঝেছি। এবার রজনীকে বিয়ে করে তার বিষয় সম্পত্তি ভোগ করতে চাও?

অমর। ঠিক তাই। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, তুমি অসময়ে এখানে কেন?

লবঙ্গ। ভয় নেই, তোমার ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিতে আসিনি। তবে ইচ্ছা করলে তা পারি।

অমর। তুমি সব পার। কিন্তু ঐ-টি আর এখন পার না। পারলে, রজনীকে বিষয় দিয়ে, এখন সতীনকে নিজের হাতে বেঁধে খাওয়ানর ব্যবস্থা করতে না।

লবঙ্গ। (হাসিয়া) ভেবেছ সতীনের খোঁটা দিয়ে আমায় বিঁধবে? সতীনকে বেঁধে খাওয়ান দুঃখের কথা বটে, কিন্তু একটা পাহারাওলাকে ডেকে তোমায় ধরিয়ে দিলে, এখুনি আবার আমি পাঁচটা রাঁধুনী রাখতে পারি।

অমর। বিষয় রজনীর—আমাকে ধরিয়ে দিলে কি হবে? যার বিষয় সে তো ভোগ করতে থাকবে।

লবঙ্গ। তুমি কস্মিন কালে স্ত্রীলোককে চিনলে না। রজনী যাকে ভালবাসে তার জন্যে বিষয় এখুনি ছেড়ে দেবে।

অমর। অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করার জন্যে বিষয়টা তোমায় ঘুষ দেবে।

লবঙ্গ। ঠিক তাই।

অমর। তবে সে ঘুষ এত দিন চাওনি কেন? আমাদের বিয়ে হয়নি বলে? না কি?

লবঙ্গ। কেন যে চাইনি, তোমার মতো ছোট লোক তা বুঝতে পারবে না—চোরেরা বুঝতে পারে না যে, পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য। রজনীর সম্পত্তি রাখতে পারলেও আমি রাখবো কেন?

অমর। তুমি যদি এমন না হবে, তাহলে আমার মরণকুবুদ্ধি ঘটবে কেন? যাক, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ, তুমি যা জান, এতদিন তা যখন অন্য কাউকে বলনি, তখন সে কথা যেন রজনীকেও বলো না।

লবঙ্গ। আমি অতো ছোট নই যে, আজ বাদে কাল যে তোমার স্ত্রী হবে, তারই কাছে তোমার কুৎসা গাইব। যাক্—তোমার সঙ্গে আমার আরো কিছু কথা আছে। রজনীর কাছ থেকে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি বাড়িতে থাকবে কি?

অমর। থাকব।

লবঙ্গ। তাহলে আমি রজনীর কাছে যাই—

অমর। যাও।

[লবঙ্গলতা রজনীর ঘরে ঢুকিল। অমরনাথ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।]

[দৃশ্যান্তর]

(রজনীর ঘর। রজনী ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল, লবঙ্গলতা রজনীর নাম ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিল।)

লবঙ্গ। রজনী! রজনী!

রজনী। কে? ছোটমা?

লবঙ্গ। হ্যাঁ।

রজনী। আপনি আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন, এ যে কখনো ভাবিনি ছোটমা?

লবঙ্গ। আমরা যে সম্পত্তি এত কাল ভোগ করেছি, তুমিই যে একদিন সেই সম্পত্তির অধিকারিণী হবে, তাই কি আমরা কোন দিন ভেবেছিলাম?

রজনী। সম্পত্তির জ্বালাই আজ আমার সবচেয়ে বড় জ্বালা হয়েছে ছোটমা! আপনার নামে আমি সে-সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিচ্ছি, আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন।

লবঙ্গ। কিন্তু তোমার দান আমি নিতে যাবো কেন?

রজনী। আপনি না নেন, আমি অন্য কাউকে বিলিয়ে দেবো।

লবঙ্গ। কা'কে? অমর বাবুকে?

রজনী। আমি ওঁকে ভাল ভাবেই জানি। দিলেও উনি নেবেন না।

লবঙ্গ। আমি তোমার দান নিতে পারি রজনী! যদি তুমি আমার কিছু দান গ্রহণ কর।

রজনী। আপনার অনেক দানই তো আমি নিয়েছি।

লবঙ্গ। আরও কিছু নিতে হবে।

রজনী। বেশ। একখানি প্রসাদী কাপড় দেবেন।

লবঙ্গ। না। কাপড় নয়। আমি তোমাকে শচীন্দ্রকে দান করবো। তুমি তাকে স্বামিরূপে গ্রহণ করবে। আর তা যদি তুমি কর, তাহলে তোমার বিষয় আমি গ্রহণ করবো।

রজনী। তিনি যে আজ অসুখে শয্যাশায়ী, তার কারণ আমি। তাঁকে স্বামিরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু যাঁকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেছি, তাঁকে স্বামিরূপে গ্রহণ করার আজ আমার মুখ কোথায়?

লবঙ্গ। বিষয়ের শোকে শচীন শয্যাশায়ী হয়নি রজনী! তোর ভালবাসা থেকে সে আজ বঞ্চিত হতে চলেছে, আর সেই জন্যেই তার মনের অসুখ আজ দেহে দেখা দিয়েছে।

রজনী। তিনি আমায় ভালবাসেন?

লবঙ্গ। বাসে। আমাদের বাড়িতে যে সন্ন্যাসী ঠাকুর আসেন, তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিও বলেছেন, শচীন্দ্র তোকে ভালবাসে।

রজনী। ছোটমা! আমি সর্বনাশী। আমার জন্যে আজ আপনাদের এই সর্বনাশ। তাঁর কণ্ঠ তাঁর স্পর্শ আমাকেও বিচলিত করেছে। আমি অন্ধ। আমার অন্তরের কথা কে বুঝবে। ভাল যে বাসি, একথা প্রকাশ করতেও আজ আমার সঙ্কোচ। কিন্তু কি করব আমার উপায় নেই—ছোটমা! আমার উপায় নেই! (কাঁদিতে লাগিল)

লবঙ্গ। এখনও উপায় আছে। আর সেইজন্যেই তোর কাছে ছুটে এলাম। তোরা পরস্পর পরস্পরকে যখন ভালবাসিস্ তখন বিয়ের আর বাধা কি?

রজনী। আমি নিজেই বাধা। অমর বাবু আমার জন্যে অনেক করেছেন। পরের জন্যে পরে এতো করে না। নিজের প্রাণকে বিপন্ন করে তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। যাঁর কাছে আমি এত ঋণী, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না।

লবঙ্গ। তাহলে তোমার দান গ্রহণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আচ্ছা, আসি— (প্রস্থানোদ্যত)

রজনী। (বাধা দিয়া) আপনি বসুন, আর একটা কথা—

লবঙ্গ। আর কোন কথা নয়। তোকে যদি ছেলের বৌ করতে পারি রজনী! সেই দিন আবার কথা হবে।

[লবঙ্গলতা চলিয়া গেল। রজনী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

[দৃশ্যান্তর]

[রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীর অপরাংশে অমরনাথ লবঙ্গলতার জন্য যথারীতি অপেক্ষা করিতেছিল। লবঙ্গলতাকে দেখিয়া বলিল]

অমর। রজনীর সঙ্গে কথা হোল ?

লবঙ্গ। হাঁ।

অমর। কি বললে ?

লবঙ্গ। রজনী তার বিষয় আমাকে দিতে চায়।

অমর। বেশ তো।

লবঙ্গ। এর পরও কি তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও ?

অমর। চাই বৈ কি। বিষয়কে তো বিয়ে করব না। বিয়ে করব রজনীকে।

লবঙ্গ। আমি তো জানি, বিষয়ের জন্যেই তো তুমি রজনীকে বিয়ে করতে চাইছ—

অমর। ওটা তোমার কদর্য্য মনের চিন্তা।

লবঙ্গ। তা হতে পারে। কিন্তু বেছে বেছে অন্ধর ওপর তোমার এতো অনুরাগ হোল কেন ?

অমর। তুমিই বা বুড়োতে এত অনুরক্ত হলে কেন ?

লবঙ্গ। আমার স্বামী বুড়ো। সেকথা সবাই জানে। কিন্তু তাই বলে আমার সামনে তোমার ও কথা বলা উচিত নয়। যাক্, জেনে রাখো, তোমার সঙ্গে রজনীর যাতে বিয়েটা না হয় সেই চেষ্টাই আমি করব।

অমর। কেন ? আমি কি রজনীর যোগ্য নই ?

লবঙ্গ। না। তুমি কুপাত্র।

অমর। আমি কুপাত্র কিসে ?

লবঙ্গ। কুপাত্র কি সুপাত্র তা গায়ের জামাটা খুললেই প্রমাণ হয়ে যাবে।

অমর। না না, লবঙ্গ ! সেই পুরোন দিনের কথা আর এখানে—

লবঙ্গ। একটা গল্প বলব শুনবে ?

অমর। শুনব।

লবঙ্গ। প্রথম যৌবনে লোকে আমাকে রূপবতী বলত—আমার সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে একদিন এক চোর—বিয়ের সঙ্গে আমি যে ঘরে শুয়ে থাকতাম, সেই ঘরে সিঁধ দিলো—

অমর। তুমি আমায় ক্ষমা কর লবঙ্গ !

লবঙ্গ। তারপর সেই চোর সিঁধ কেটে আমার ঘরে ঢুকলো—চোরকে আমি চিনতে পারলাম।

অমর। লবঙ্গ—

লবঙ্গ। ভয় পেয়ে ঝিকে ঘুম থেকে ওঠালাম।

অমর। ক্ষমা কর। এ সব ঘটনা তো আমি জানি।

লবঙ্গ। চোরকে আদর করে খাটে বসালাম। আর ঝিকে দিয়ে খবর পাঠালাম সিঁধের মুখে দারোয়ানকে পাহারা দেবার জন্যে। আমি চোরকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বাইরে চলে গেলাম। যাবার সময় ঘরের শেকল তুলে দিলাম। চোর ঘরে বসে রইল। তারপর পাড়ার লোককে ডেকে জড়ো করলাম।

অমর। লবঙ্গ। ওসব কথা আজ আবার কেন ?

লবঙ্গ। চোর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করলো। তারপর লোহার শলা তপ্ত করে নিজের হাতে তার পিঠে লিখে দিলাম—চোর। যাক, খুব গরমের দিনেও বোধ হয় তুমি গায়ের জামা খুলে শোও না ?

অমর। না।

লবঙ্গ। জানি। লবঙ্গলতার হাতের লেখা মোছবার নয়—শোন, এইজন্যে বলছিলাম তুমি কুপাত্র। তুমি রজনীর যোগ্য নও। রজনীকে বিয়ে করার কল্পনা যদি তুমি ত্যাগ না কর, তাহলে বাধ্য হয়েই এ গল্প আমার রজনীকে শোনাতে হবে। আর ছেলের মঙ্গলের জন্যে এ কাজ আমাকে করতেই হবে।

অমর। ছেলের মঙ্গল ?

লবঙ্গ। শচীন্দ্র আজ রোগে যে শয্যা নিয়েছে সে বিষয়ের জন্যে নয়। রজনীর জন্যে—

অমর। রজনীর জন্যে ?

লবঙ্গ। হাঁ। শচীন্দ্র যেমন রজনীকে ভালবাসে, রজনীর সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলাম, রজনীও তেমনি শচীন্দ্রকে ভালবাসে কিন্তু তাদের মাঝখানে তুমি আজ বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছ।

অমর। রজনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো আমি তাকে বিয়ে করতে চাইনি ?

লবঙ্গ। তা চাওনি। কিন্তু রজনী তোমার উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমায় বিয়ে করতে চাইছে। রজনীর মঙ্গলের জন্যে, তোমার মঙ্গলের জন্যে, আমি অনুরোধ করছি তুমি রজনীকে বিয়ে করার কল্পনা ত্যাগ করো।

অমর। (হেসে) আমার মঙ্গল। আমার মঙ্গলের জন্যেই কি সেদিন তুমি আমার পিঠে—ঐ কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলে ?

লবঙ্গ। সেদিন তুমি কুকাজ করেছিলে আমিও বালিকা বুদ্ধিতে কুকাজ করেছিলাম। যার যে দণ্ড, বিধাতা তার বিচার করবেন। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

অমর। আমার কাছে তুমি কোন অপরাধ করনি লবঙ্গ ! বরং আমিই অপরাধ করেছিলাম আর তুমি তার উচিত দণ্ড দিয়েছিলে ! শোন, আর তোমার সঙ্গে কখনও আমার দেখা হবে না। তোমার পুত্রের জন্য, রজনীর জন্য আমি আবার পথে পাড়ি দেব।

লবঙ্গ। কোথায় যাবে ?

অমর। ভবঘুরে লোক আমি ! কোথায় যাব জানি না। তবে পরিচিত মানুষের লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকারই আমি চেষ্টা করব। তাই, যাবার আগে, আমার যা বিষয়-সম্পত্তি আছে তা দান করে যেতে চাই—

লবঙ্গ। কা'কে দান করবে ?

অমর। রজনীকে যে বিয়ে করবে। এই নাও—উইলটা লিখেই রেখেছি। রেখে দাও। (জামার পকেট হইতে উইল বাহির করিল)।

লবঙ্গ। কিন্তু আমি রেখে দেব কেন ?

অমর। তুমি আমার মঙ্গলাকাঙ্খী, তাই তোমার কাছেই ওটা রেখে গেলাম। আমি লোভের বশবর্ত্তী হয়ে, রজনীর চরিত্রে মোহিত হয়ে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। পিঠের ওপর তুমি একদিন ছাপ মেরে দিয়ে আমার চরিত্র সংশোধনের সুযোগ

দিয়েছিলে, আজও তেমনি লোভের হাত থেকে রক্ষা করে দু'টি জীবনের নিষ্পাপ প্রেমকে সংসারের বৃহৎ কাজে লাগাবার সুযোগ দিলে! তোমার ঋণ অপরিশোধ্য! আসি, বিদায়—

[লবঙ্গলতার হাতে উইলটি দিয়া ব্যস্তভাবে অমরনাথ চলিয়া গেল। লবঙ্গলতা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

তৃতীয় অঙ্ক

[ভবানীনগরে শচীন্দ্রের বাড়ী। তখন অপরাহ্ন কাল। শচীন্দ্র ব্যস্তভাবে অমরনাথকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।]

শচীন্দ্র। রঞ্জনী! রঞ্জনী! দেখো, দু'বছর বাদে কা'কে ধরে এনেছি।

রঞ্জনী। তাইতো! কি ভাগ্যি! দিন পায়ের ধুলো দিন—

(রঞ্জনী অমরনাথকে প্রণাম করিল)

অমর। জন্ম-এয়োস্ত্রী হও। তুমি যে ভাবে এসে আমায় আজ প্রণাম করলে রঞ্জনী! তা দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন—

শচীন্দ্র। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। রঞ্জনী এখন চোখে দেখতে পায়।

অমর। কিন্তু এ যে আশাতীত ব্যাপার!

শচীন্দ্র। সত্যিই আশাতীত! আমাদের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী প্রায়ই আসেন। তিনি আমাদের পরিবারের সকলকে খুব ভালবাসেন। তিনি যখন শুনলেন আমি রঞ্জনীকে বিয়ে করব, তখন বললেন—শুভদৃষ্টি হবে কি করে? আমি রহস্য করে বলি—আপনি দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবেন। তিনি বললেন—দেব। এক মাস পরে। সত্যিই এর এক মাস পরে ধীরে ধীরে রঞ্জনী দৃষ্টি ফিরে পেলো—

অমর। রঞ্জনীকে যারা আগে দেখেনি, তারা কিন্তু আজ কেউ একথা বিশ্বাস করবে না।

শচীন্দ্র। সে কথা ঠিক।

[সহসা একটি বাচ্চা ছেলেকে ঘরের মাঝে ঝুমঝুমি বাজাইতে দেখা গেল]

অমর। খেলনা নিয়ে ঘরের কোণে যে ছেলেটি খেলা করছে, ওটি কে রঞ্জনী?

রঞ্জনী। আমার ছেলে।

অমর। বাঃ! বেশ ছেলেটি তো! ওর কি নাম রেখেছেন শচীন বাবু?

শচীন্দ্র। অমরপ্রসাদ।

অমর। অ—ম—র—প্র—সা—দ! ও! আচ্ছা, আসি তাহলে—

রঞ্জনী। সে কি! একটু কিছু মুখে না দিয়েই চলে যাবেন?

অমর। আজ নয়! আর একদিন এসে খেয়ে যাব রঞ্জনী! অন্তর আজ পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে! আজ আমি—ভারাক্রান্ত!

[অমরনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন শচীন্দ্র ও রঞ্জনীর চোখে অশ্রু টলমল করিতেছে।]

যবনিকা
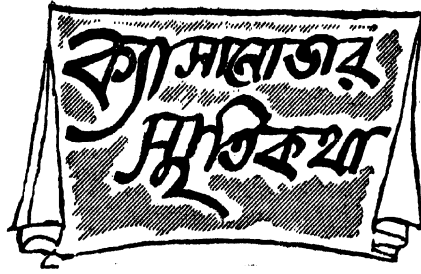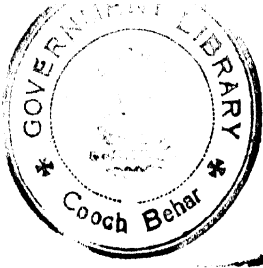
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আমার বহু পরিশ্রমে রচিত গ্রন্থ—আমেলট দ্য হোসের 'ভেনিস শাসনতন্ত্রের ইতিহাসের প্রতিবাদ' আজ সমাপ্তির পথে। স্পেনের বন্দিজীবনে নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি কাটিয়েছিলাম এই গ্রন্থটি রচনায়—কিন্তু তখন শুধু স্মৃতিটুকুই সম্বল ছিলো। ফ্রান্সে এসে সমস্ত রচনাটিকে সংশোধন করলাম। তখনি ভেবেছিলাম সুইজারল্যাণ্ড থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করবো। আমার উদ্দেশ্যের কথা পরিচিত বন্ধু মহলে প্রকাশ করতেই চারিদিক থেকে অযাচিত ভাবে সাহায্য পেলাম। আগেই শুনেছিলাম, লুগানোতে একটি খুব ভালো ছাপাখানা আছে আর সেখানে সেন্সারের কোনো হাঙ্গামা নেই। সবচেয়ে বড় কথা ওই ছাপাখানাটির মালিক একজন রীতিমত বিদ্বান লোক।

লুগানোতেই চলে এলাম। মালিকের সঙ্গে সব ব্যবস্থাও হোয়ে গেল। অতি সৎ প্রকৃতির লোক। প্রথমেই ভূমিকা আর সূচনাটি ছাপা হোয়ে এলো। পরিষ্কার হরফ আর সুন্দর দামী কাগজ দেখে খুব খুশী হোয়ে উঠলাম। এই সময় পুরো একটি মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি বইটির সুষ্ঠু প্রকাশের জন্যে। রবিবার উপাসনায় যাওয়া ছাড়া তুনিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিনি। অক্টোবরের শেষাশেষি সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হোলো—আর বছর ঘোরার আগেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ। লেখার উদ্দেশ্য টাকার চেয়েও বেশী ছিলো ভেনিসের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সুনজরে পড়ার। সত্যি, ইউরোপের দেশে দেশে এতদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত দেহ-মন চাইছিলো নিজের দেশে আপন জন্মভূমিতে ফিরে যেতে—এই নির্বাসিত জীবন তুঃসহ হোয়ে উঠেছিলো।

'হোসে'র ওই ইতিহাস গত সত্তর বছর ধরে নির্বিবাদে একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়ে এসেছিলা, কেউ কোনো দিন বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ জানায়নি। অবশ্য ভেনিসে থেকে কারও সাধ্য ছিলো না কোনো সমালোচনা করার···কারণ ভেনিসের শাসন বিভাগ ওই ইতিহাসের পক্ষে বা বিপক্ষে সমস্ত আলোচনাই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো। আমার বিশ্বাস, সে কাজটা আমারই জন্যে অপেক্ষা করেছিলো···আমার এই অস্বাভাবিক অবস্থার থেকে মুক্তি দিতে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে আর যে সব উদাহরণের সাহায্যে আমি ওই ইতিহাসটির ভুল-ভ্রান্তিগুলি তুলে ধরেছিলাম তাইতে নিজেরই আশা হোয়েছিল শাসন বিভাগের কাছ থেকে সুবিচার পাবার। স্বদেশে ফিরে আসার অনুমতি এখন সত্যিই আমার প্রাপ্য—আজ চৌদ্দ বছর নির্বাসনের শেষে! তা ছাড়াও মনে হোয়েছিলো, দেশের গোয়েন্দা বিভাগ তাদের সেদিনের নিষ্ঠুরতার প্রতিকারের এমন একটা সুযোগ সানন্দেই গ্রহণ করবে। অনুমান আমার ঠিকই হোয়েছিলো—যদিও ওরা আরও পাঁচটা বছর আমাকে অতি তুচ্ছ একটা কারণে অপেক্ষা করালো, যেটা ইচ্ছা হোলে তখনি করা যেতো। সে যাক্, আমার পরম আত্মীয় পিতৃসম মঁসিয়ে দ্য ব্রাগার্দী তখন বেঁচে নেই—তবু তাঁর সেই বন্ধু তুটি ছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় ভেনিসে পঞ্চাশ জন লোক গোপনে আমার বইখানির গ্রাহক হোলেন।

লুগানোতে কাজ শেষ হোলে সেখান থেকে গেলাম ট্যুরিন। কিছুকাল সেখানে কাটাবার পর পাড়ি দিলাম রোমে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুদীর্ঘ ছয়টি মাস রোমে কাটাবো মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম। তাই স্পেনীয় দূতাবাসের ঠিক সামনেই আমার বাসা ঠিক করলাম। রোমে এসে প্রথম দেখা করলাম পুরানো বন্ধু কার্ডিন্যাল দ্য বার্ণাসের সঙ্গে—সত্যিকারের খুশী হলেন উনি আমাকে দেখে। আরও খুশী আমার স্বচ্ছল অবস্থায়। ভেনিসের রাষ্ট্রদূতের কাছে আমার পরিচয়পত্রটি নিজেই নিয়ে যাবেন বললেন, সেই সঙ্গে আমার পক্ষ নিয়ে বেশ তু'-চার কথা বলারও সুবিধা পাবেন।

প্রিন্স দ্য সান্তাক্রস আমাকে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে একদিন দেখা করতে বললেন। যে কোনো দিন বেলা এগারোটা কিম্বা তুপুর তুটোর পর তাঁকে পাওয়া যাবে। তুপুর বেলা যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে হোলো। গিয়ে দেখি রাজবধূ শয্যালীনা—যেহেতু আমি খুব একজন গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি নই, তাই লৌকিকতার প্রয়োজন ছিল না। আমাকে সোজাসুজি সেই ঘরেই আহ্বান জানানো হোলো। আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য, কিছুই আমার জানতে বাকী রইলো না। সুকুমার তরুণ দেহখানি ঘিরে শুধু সৌন্দর্য্য নয়, আনন্দও যেন উচ্ছল হোয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ওর প্রতিটি ভঙ্গীতে, অনর্গল কথায় আর উচ্ছ্বসিত হাসিতে। উত্তরের অপেক্ষা না করেই অজস্র প্রশ্ন আর অদম্য কৌতূহল—সব মিলিয়ে সুন্দর সাজানো হাসিখুশী একটা পুতুল—কার্ডিন্যালের মন ভোলানোর খেলনা!

সারাক্ষণ গভীর দায়িত্বপূর্ণ, জটিল কাজকর্ম্মের মাঝখানে ও যেন ক্ষণিক অবসর বিনোদনের উপকরণ। কার্ডিন্যাল দিনে তিন বার আসতেন—আর প্রতি বার তাসের বাজি খেলে সুকৌশল পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে ওকে ছয় সেকুইন জিতিয়ে দিতেন। এমনি করে ও রোমের মধ্যে তখন সবচেয়ে ধনী মহিলা। তাই বোধ হয় প্রিন্স অন্তরের নিভৃততম কোণে ঈর্ষ্যার ঈষৎ জ্বালা অনুভব করলেও স্ত্রীর এই দৈনিক আঠারো সেকুইন লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি

করার মত নির্বোধ হোতে পারেন নি। বিশেষ করে যখন একা কার্ডিন্যালের জন্য আরও পাঁচটি দরদীর ভিড় আর বাজে গুজব রটনার হাত এড়ানো যায়, তখন মন্দ কী?

মাসখানেকের ভিতরই আমি এই তিনজনের একেবারে ছায়া হোয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে না হোলে ওঁদেরও এক মুহূর্ত চলতো না। আমি কিন্তু ওঁদের ভিতর তর্কাতর্কি কিম্বা ঝগড়াঝাঁটির উপক্রম হোলে তার ত্রিসীমানাতেও থাকতাম না। তবে একঘেয়ে ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলি সরস রঙ্গীন হাসি-গল্পে প্রাণবন্ত করে তুলতে আমি ছিলাম অপরিহার্য্য।

বেশ কাটছিলো দিনগুলি। প্রতিটি সন্ধ্যা কাটাতাম ডাচেস দ্য ফিয়ানের কাছে আর অপরাহ্ণটি ছিলো সান্তা ক্রসের প্রিন্সেস-এর জন্যে। বাকী সময়টা বাড়ীতেই কাটতো গৃহকর্ত্রীর কন্যা মার্গারিৎ আর মেনিকোচ্চিও নামে একটি তরুণের সঙ্গে হাসি-গল্পে। মেনিকোচ্চিও ঐ বাড়ীতেই থাকতো, ওকে আমার সত্যিকারের ভালো লাগতো। ও প্রেমে পড়েছিলো আর সারাক্ষণ আমার কাছে ওর প্রেমিকার গল্প করতো। ওর ভারী সখ ছিলো আমাকে একবার ওর প্রেমিকাকে দেখাতে। মেয়েটি থাকতো কনভেন্টে। মাত্র দশ বছর বয়সেই ওকে কনভেন্টে দিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ও মুক্তি পাবে একেবার বিয়ের সময়, তাও কার্ডিন্যালের অনুমতিতে। ওই কনভেন্টের সর্ব্বময় কর্ত্রী উনিই। মেনিকোচ্চিওর বোনও ওই একই কনভেন্টে ছিলো—তাকে ও প্রতি রবিবার দেখতে যেতো। সেখানেই ওর প্রেমিকাকে ও প্রথম দেখে আর কনভেন্টের নানা নিয়মের কড়াকড়ির ফলে এতদিনে পাঁচ-ছয়বারের বেশী কথাও বলতে পায়নি বেচারী!

ওই আশ্রমটি যাঁরা চালাতেন তাঁদের ঠিক মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী বলা যায় না। কারণ, তাঁদের কোনো ব্রত বা শপথ কিছুই করতে হয় না—সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদও ধারণ করতে হয় না। তবে মঠ ছেড়ে চলে যাবার জন্য কোনো দিনই ওঁরা লুব্ধ হোয়ে উঠতেন না। কারণ বেশ জানতেন, বাইরের দুনিয়ায় স্বাধীন ভাবে বেরিয়ে এলে রাস্তায় রাস্তায় একটু খাদ্যের আশায় ভিক্ষা করে বেড়ানো ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। আর তরুণী মেয়েদের পক্ষেও মুক্তির দুটি পথ—একটি বিবাহ আর একটি পলায়ন। দুটিই রীতিমত কষ্টসাধ্য!

শহরের ঠিক বাইরেই একটা বিশ্রী বিরাট বাড়ি নিয়ে আশ্রমটি। ডবল করে মোটা গরাদ দেওয়া বারান্দা। এত ঘেঁষাঘেঁষি গরাদ যে একটা শিশুরও হাত গলে না। আর ওধার থেকে যে কথা বলছে তাকে ভালো করে দেখাও যায় না। আমি মেনিকোচ্চিওকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার প্রেমিকাটিকে প্রেমে পড়বার মত ভালো করে দেখলে কোথা থেকে হে?

—প্রথম দিনেই ওদের কর্ত্রী একটি জ্বলন্ত বাতি ভুলে ফেলে গিয়েছিলো, অন্য সময় মেয়েটি আমার বোনের সঙ্গিনী হিসাবে আসতো—কিন্তু কোনো আলো না নিয়ে—আজও বোধ হয় আলো ছাড়াই আসবে। কারণ, পরিচারিকাটি 'মাদার সুপিরিয়র' (আশ্রমের কর্ত্রী)-কে তোমার আসার কথা জানাতে গেছে।

সত্যিই আমরা কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম, ঝাপসা অন্ধকারে তিনটি নারীমূর্ত্তি এগিয়ে এলো। ভালো কোরে কিছুই বোঝবার উপায় ছিলো না। শুধু শুনে বুঝলাম মেনিকোচ্চিওর বোনের কণ্ঠস্বর কি অপূর্ব্ব সুষমায় ভরা! মুহূর্ত্তে বুঝলাম, অন্ধ লোকেও কেমন করে প্রেমে পড়ে—সে শুধু এমন রমণীয় সুধাভরা স্বরের মাধুর্য্যে।

ওদের কর্ত্রীটিকেও তরুণী বলা যায়। বয়স ত্রিশেরও কম। আমি তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা চালাচ্ছিলাম। শুনলাম, পঁচিশ বছরের পর মেয়েরা অল্পবয়সী মেয়েদের উপর কর্ত্রীত্বভার পায়। আর পঁয়ত্রিশ বছরের পর আশ্রম থেকে চলে যেতে পারে ইচ্ছা করলে, কিন্তু সাধারণতঃ চলে যাবার ইচ্ছাটা কারো হয় না বড় একটা।

—তাহলে আপনাদের মধ্যে বৃদ্ধাও অনেক আছেন বলুন?

—তা' আমরা সবশুদ্ধ একশো'র উপর। একমাত্র বিয়ে করে চলে গেলে কিম্বা মারা গেলে আমাদের সংখ্যা কমে। আমিই তো গত বিশ বছর ধরে আছি এখানে। এতদিনে মাত্র চার জনের বিয়ে হতে দেখলাম। চার জনেই কিন্তু বিয়ের আসরে যাবার আগে বরকে দেখেই নি। যদি কেউ আমাদের কর্ত্তা কার্ডিন্যাল-এর কাছে আমাদের কাউকে বিবাহ করবার জন্যে অনুমতি চায়, তবে সে হয় পাগল নয় তার দুশো ক্রাউন মুদ্রার ভীষণ প্রয়োজন। অবশ্য স্ত্রীকে ভরণপোষণের ক্ষমতা আছে, সে খোঁজ না নিয়ে কার্ডিন্যাল কখনো অনুমতি দেন না।

—আচ্ছা যে বিয়ে করবে, সে পছন্দ করে কি করে?

—সে শুধু বয়স আর কি ধরণের স্ত্রী সে চায় সেটা কার্ডিন্যালকে জানায়। তিনি 'মাদার সুপিরিয়র'-এর উপরই নির্ব্বাচনের ভার দেন।

—এখানে খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা ভালোই নিশ্চয়ই?

—মোটেই নয়। বছরে হাজার ক্রাউন পাওয়া যায়, তাই দিয়ে এতগুলি মেয়ের পক্ষে ভালো ভাবে স্বচ্ছল, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকাটা স্বপ্ন—

—আচ্ছা, এই বন্দিশালায় তবে কারা ছেলে-মেয়েকে পাঠায়?

—যারা অত্যন্ত গরীব, নিতান্তই হতভাগা, তারাই। যারা জানে একটু বড় হলেই মেয়েকে বাইরের জগতের হিংস্র পশুদের আর লোভের হাত থেকে বাঁচাতে পারবো না, তারাই—যারা জানে, অন্যায় পথ থেকে রক্ষা করতে পারবে না মেয়েকে, তারাই—আর সেইজন্যেই আমাদের এখানে সব মেয়েরাই সুন্দরী আর রূপসী। এমন কি, যে মেয়ে যথেষ্ট সুন্দরী নয় তাকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর বিচারের ভারও কার্ডিন্যালের উপর, কখনও বা পুরোহিত আর মেয়েটির বাপ-মা-ও বিচারের ভার নেন। যে সুন্দরী নয় তাকে প্রত্যাখ্যানের কারণে ওঁরা বলেন, কুৎসিত মেয়েরা কোনো লোককেই প্রলোভিত করতে পারে না—তাদের দিয়ে পাপের প্রসার লাভেরও কোনো আশঙ্কা নেই তাই। বুঝতেই পারছেন, আমাদের এই যে চিরজীবন বন্দিনীদশা, এই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, এর জন্যে বার বার আমরা অভিশাপ দিই আমাদের বিধাতাকে রূপসী করে সৃষ্টি করার জন্যে—আমাদের রূপই তো আমাদের কাল!

আমি ভাবতেও পারছিলাম না এই আশ্রম-ব্যবস্থা কি করে সহ্য করা যায়? কারণ, যে রকম নিয়মের কড়াকড়ি তাইতে এই সব হতভাগিনীরা কোনো দিনই তাদের স্বামী মনোনয়ন করবার বিন্দুমাত্র সুযোগও পাবে না। তার ওপর দুশো ক্রাউন পণ দিয়ে বিয়ে করায়

নিয়মটি থাকাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বেশ একটি লাভজনক ব্যবস্থাও করেছেন। আমি ফিরে এসে কার্ডিন্যাল ড বার্ণাস আর প্রিন্সেস-এর সামনে সমস্ত বিস্তারিত জানালাম। ওঁরা বললেন, এ বিষয়ে পোপের কাছে আবেদন জানাবেন, যাতে আশ্রমবাসিনীরা দালানের ভিতরই সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ডাকতে পারেন—তাছাড়া অন্য সব নিয়মকানুনও সাধারণ আশ্রমগুলির মতই করা হবে। কার্ডিন্যাল আমাকে আবেদনপত্রটি লিখে 'মাদার সুপিরিয়রের' কাছে নিয়ে গিয়ে সবাই-এর সই করিয়ে আনবার কথা বললেন। প্রিন্সেস জানালেন, তারপর উনিও বাইরের থেকে বেশ কিছু সই যোগাড় করে দেবেন। কার্ডিন্যাল অরসিনি নিজেই আবেদনপত্রটি পোপের কাছে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পোপের কাছ থেকে অনুমতি আসতে একটুও দেরী হোলো না। উপরন্তু তিনি আরও অনুগ্রহ দেখালেন এই বলে যে, একটা তদন্ত বিভাগ খোলা হবে আশ্রমের কাজকর্ম্মের দিকে নজর রাখবার জন্য—আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা একশো থেকে কমিয়ে পঞ্চাশ করা হবে আর পণের সংখ্যা দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে। যে মেয়ে পঁচিশ বছর পার হওয়া সত্ত্বেও বিবাহিত হবে না, সে তার পণের টাকা নিয়ে আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে। বারো জন মেট্রন নিযুক্ত করা হবে মেয়েদের দেখাশোনার জন্য। আর বারো জন পরিচারিকা থাকবে গৃহকর্ম্ম করবার জন্য।

এই সব কাজ শেষ হতে, সমস্ত বন্দোবস্ত করতে বেশ কিছুদিন লাগলো। প্রথম দিন যেদিন সাক্ষাৎকারীদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোলো সেদিন মেনিকোচ্চিওর সঙ্গে আমি আবার গেলাম। ওর প্রেমিকাটি সত্যিই সুন্দরী কিন্তু ওর বোন—যেন রূপের ঝরণা—মাত্র বারো বছর বয়েস। ওর কমনীয়, দীর্ঘ সুঠাম সুকুমার তনুখানি কবির ভাষায় সঞ্চারিণী লতার মতই। আর কি আশ্চর্য্য রং—এমন মোমের মত নরম শাদা রঙ আমার চোখে আগে কখনো পড়েনি—তার সঙ্গে এমন মেঘের মত কালো চুল আর গভীর কালো চোখ! ওর রক্ষয়িত্রী, সঙ্গিনী যে মেয়েটি সঙ্গে এসেছিলো সে ওর চেয়ে প্রায় বছর দশেকের বড়। তার কাছে খবর পেলাম, নতুন ব্যবস্থায় আশ্রমের ভিতর কেমন প্রতিক্রিয়া হোয়েছে।

—'মাদার সুপিরিয়র' খুব খুশী হোয়েছেন। মেয়েরাও তো আনন্দে আটখানা! কিন্তু বৃদ্ধাদের নিয়েই মুস্কিল। তারা যা-তা রটাচ্ছে আর রাগের জ্বালায় সারাক্ষণ অশান্তি সৃষ্টি করছে।

মেনিকোচ্চিওর বোন আর্মেলিনা আমার সারা মন জুড়ে বসলো। ওর সঙ্গিনী এমিলিয়াকেও ভারী ভালো লাগলো। কিন্তু নিজের প্রবল উত্তেজনা অনুভব করে গোড়াতেই সাবধান হোলাম আর্মেলিনার সম্বন্ধে। ওর দাদার কাছে জানালাম আমি বিবাহিত, সেই সঙ্গে অনুরোধও করলাম কাউকে সেকথা না বলতে। এমনি করে নিজের চারদিকে একটা আড়াল তৈরী করতে লাগলাম, যাতে কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কোনো অসতর্কতা সুযোগ নিতে না পারে। তাছাড়াও আর্মেলিনাও যাতে আমাকে নিয়ে মিথ্যে স্বপ্নের জাল না বোনে।

কিন্তু ভালো লাগার তীব্র অনুভূতিকে তো অস্বীকার করা যায় না! হারও মানতে হয় বৈ কি মাঝে মাঝে। তাই প্রতি রাতেই একবার করে আশ্রমে না গিয়ে থাকতে পারতাম না। আর্মেলিনা আর এমিলিয়ার সঙ্গে গল্প-গুজব করে আর রাতের বরাদ্দ চকোলেট একসঙ্গে পান করে উঠে আসতাম প্রায় রাত এগারোটায়। ১৭৭১ সালে নববর্ষের দিন ওদের প্রত্যেককে উপহার দিলাম গরম কাপড়ের পোষাক আর 'মাদার সুপিরিয়র'কে চকোলেট, কফি, আর চিনি। আমি ওদের ক্ষুদ্র কোমল মুঠিতে চুমা খেলাম—ওদের জীবনে এই প্রথম পুরুষস্পর্শ। আমি আর্মেলিনাকে অনুনয় করলাম, বিনিময় একটি চুম্বন—কিন্তু গভীর লজ্জায় আর্মেলিনার চোখের ঘন পল্লবগুলি ধীরে ধীরে নত হোয়ে এলো, রক্তের ছোপ ধরলো মোমের মত সাদা গালে, নীরবে বসে রইলো আমার কাতর অনুরোধে কোনো সাড়া না দিয়েই।

প্রিন্সেস আর কার্ডিন্যাল ড বার্ণাসের কাছে আমার এই ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী খুব সরস করে বললাম—খুব উপভোগ করলেন দুজনেই। এমন কি কার্ডিন্যাল প্রস্তাব করলেন, একদিন ওঁরা সকলেই একসঙ্গে আশ্রম পরিদর্শনে যাবেন। সেখানে প্রিন্সেস আর্মেলিনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর সহজেই ওকে মাঝে মাঝে বাইরে নিয়ে আসবার অনুমতি যোগাড় করতে পারবেন। প্রস্তাবটা চমৎকার সন্দেহ নাই। আমি ঠিকই বুঝেছিলাম, এর মধ্য দিয়ে কার্ডিন্যাল নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে চান—আর্মেলিনা সম্বন্ধে। কিন্তু তাইতে আমার ঘাবড়াবার কিছু ছিল না।

আমাদের আশ্রম পরিদর্শনে যাবার কথাটা সারা আশ্রমে মুহূর্ত্তে ছড়িয়ে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ-ভাঙ্গা উত্তেজনায় মেতে উঠলো সবাই। ওদের জীবনে এই প্রথম একটা নতুন কিছু ঘটছে—এই প্রথম বাইরের দুনিয়াটা থেকে এক ঝলক আলো এসে ঢুকছে কত দিনের জমাটবাঁধা একঘেয়ে অন্ধকারের ভিতর। ক্বচিৎ, কদাচিৎ এক-আধজন ডাক্তার বা পুরোহিত ছাড়া এই বিরাট বন্দিশালায় কে কবে এসেছে?

সমস্ত আশ্রমটি ঘরে ঘরে দেখার পর সমস্ত আশ্রমবাসিনীদের ডাকা হোলো লম্বা দালানটায়। সেখানে অত সুন্দরীদের ভিড়ের মধ্যেও কার্ডিন্যাল এক মুহূর্ত্তেই চিনে নিলেন আর্মেলিনাকে। সত্যিই আর্মেলিনার রূপের আলোয় আর সবাইকেই নিষ্প্রভ লাগছিলো। প্রিন্সেস অবধি মুগ্ধ ওর রূপে—এগিয়ে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন আর্মেলিনাকে। তার পর এমিলিয়ার হাত দুটি ধরে বললেন—তোমার মুখখানি অত ম্লান কেন? তোমার বিষাদের কারণ আমি বুঝেছি, কিছু ভেব না, তুমি এমন সুন্দরী আর এমন লক্ষ্মী মেয়ে, আমি খুঁজে দেবো তোমার মনের মত সঙ্গী, তোমার যোগ্য স্বামী, যে তোমাকে হাসিতে ভরিয়ে তুলতে পারবে—

'মাদার সুপিরিয়রে'র মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠলো আর বৃদ্ধা কুমারীদের মুখে নামলো আষাঢ়ের ঘন মেঘ!

এর কয়েক দিন পরেই কার্ডিন্যালের অনুমতি নিয়ে প্রিন্সেস ওদের কয়েক জনকে নিজের প্রাসাদে সারাদিন কাটাবার জন্যে আর থিয়েটার দেখানোর জন্যে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। ওঁর নিজের চাপরাশ-আঁটা দরওয়ান, আর গাড়ী গেল ওদের আনতে। আমরা সবাই প্রাসাদে উপস্থিত ছিলাম। ওরা এলো। ভয়ে, লজ্জায়, নতুন পরিবেশে ওরা তটস্থ; লজ্জায় জড়োসড়ো।

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

সবাই ওদের সঙ্গে খুব দরদভরা মিষ্টি ব্যবহার করলেন, উৎসাহ দিতে লাগলেন, যাতে ওরা সহজ হোয়ে ওঠে সহজ ভাবে মন খুলে কথা বলতে পারে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! জীবনে প্রথম এই জাঁকজমক-ভরা বিরাট প্রাসাদ দেখে—চার পাশে এত সব বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোক দেখে ওরা আরও তটস্থ হোয়ে রইলো, পাছে কিছু বোকামি প্রকাশ পায় ওদের হাবে-ভাবে কি কথাবার্ত্তায়। রাত্রে থিয়েটার দেখার শেষে আমি ওদের পৌঁছে দেবার ভার নিলাম। এই মুহূর্তটির আশা করেছিলাম বৈ কি! কিন্তু সুযোগ নেবার সুরুতেই বাধা। একটি চুম্বনের প্রত্যাশায় লোলুপ হোয়ে উঠতেই ধাক্কা খেলাম—অন্ধকারে কোমল ক্ষুদ্র মুঠিটি নিজের হাতে টানতে গিয়ে অনুভব করলাম সজোরে ছিনিয়ে নেওয়া হোলো হাতখানি—অনুযোগের উত্তরে শুনলাম, আমার ব্যবহার অতি অশোভন। ভয় দেখালাম আর কখনো যাবো না ওদের কাছে—কেউই সে কথা মানলো না।

আট দিন চলে গেলো—একটি বারের জন্তও আর আশ্রমে যাইনি, দেখিনি ওই সব মনোহারিণী ধর্ম্মভীরু সন্ন্যাসিনীদের। আট দিন পর 'মাদার সুপিরিয়রে'র কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম, আমাকে দেখা করতে যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি যেতে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন কেন হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করেছি।

—আমি আর্মেলিনাকে ভালোবেসেছি তাই—

—আপনার উপর করুণা হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় ওকে ত্যাগ করার এটা কারণ নয়, তা ছাড়া দেখছেন না বেচারার নামে কত কিছু রটতে পারে—সকলে বলবে আপনার ভালোবাসাটা শুধু নিজের একটা খেয়াল চরিতার্থ করা। এখন খেয়াল মিটেছে, তাই ওকে ত্যাগ করলেন—

—বেশ, আমি কাল প্রাতরাশের সময়তেই এখানে আসছি। আর তারপর আপনি যদি অনুমতি দেন ওদের দুজনকে অপেরা দেখতে নিয়ে যাবো। কিন্তু আপনি আর্মেলিনাকে জানিয়ে রাখবেন যে, শুধু আপনার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করি বলেই আসছি আবার—

পরদিন সকালে যখন গেলাম তখন প্রথমেই এলো এমিলিয়া। এসেই আমাকে তিরস্কার করলো, আমার ব্যবহার নাকি অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো হোয়েছে—যাকে একটুও ভালো লাগে তার উপর এমন ব্যবহার নাকি কোনো মানুষই করতে পারে না। বিশেষ করে আর্মেলিনাকে আমি ভালোবাসি, একথা 'মাদার সুপিরিয়রে'র কাছে বলা নাকি অত্যন্ত অন্যায় হোয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা হোয়ে অবধি ছেলেমানুষ বেচারার কি কষ্টে যে দিন কাটছে!

—কেন? কেন বলো তো?

—কারণ ওর দৃঢ় ধারণা, আপনি ওকে ওর কর্ত্তব্য থেকে চ্যুত করছেন, ওর নিষ্ঠা নষ্ট করতে চাইছেন।

—তার জন্তেই তো ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছিলাম। তুমি কি ভাবো এতে আমার কিছু এসে-যায় না? আমার মনের শান্তিও নির্ভর করে ওকে একবার দেখতে পাওয়ার—অবশ্য যদি ওর আমার প্রতি সমান আগ্রহ থেকে থাকে, তবে কিছুই হবে না—সবই ঠিক থাকবে।

—আমাদের যে কিছু কর্ত্তব্য আছে—আর সে সবে তো আপনার কোনো বিশ্বাস নেই।

—বেশ তো, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হোয়েই থাক তোমরা। শুধু একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে মিথ্যে অভিযুক্ত কোরো না—যে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে থেকেই তোমাদের কর্ত্তব্যের প্রতি তার শ্রদ্ধা জানায়।

আর্মেলিনা ঘরে ঢুকতেই ওর পরিবর্ত্তন আমার চোখে পড়লো। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার চেহারা এত ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে কেন? মুখেও হাসি নেই?

—আপনার কাছ থেকে যে কি গভীর দুঃখ পেয়েছি, তা' আপনি জানেন না।

—বেশ, একটু মন ঠাণ্ডা করে বোসো—যে আঘাত দিয়েছি, তার বেদনা যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা করবো। আমাকে চিরকাল তোমার বন্ধু বলে জেনো আর যত দিন আমি রোমে থাকবো, সপ্তাহে একবার অন্ততঃ তোমার কাছে আসবোই—

—সপ্তাহে একবার! আপনি যে রোজ আসতেন?

—তোমার সঙ্গে কম দেখা হওয়াই ভালো আমার পক্ষে, তাইতে এই অশান্ত মনটাকে সংযত রাখতে পারবো—

—ভাবতেও কষ্ট হয়, আমি যেমন ভালোবাসি, আপনি সে-রকম বাসতে পারেন না।

—মানে, মনের সমস্ত আবেগ আর উত্তেজনা বর্জ্জন করে তো?

—তা' বলিনি, তবে আমি তো পারি নিজেকে সংযত করতে যখনি আমার আদর্শের সঙ্গে, কর্ত্তব্যের সঙ্গে সমতা না রেখে মনটা চঞ্চল হোয়ে ওঠে তখনি।

—তোমার বয়সে সম্ভব কিন্তু আমার বয়সে নতুন করে শেখা অসম্ভব, আর সত্যি বলতে কি, শিখতে চাইও না। সত্যি কথা বলবে, এই জোর করে মনকে সংযত করতে একটুও কষ্ট হয় না?

—আপনার সংস্পর্শে যে অনুভূতি জাগে, তাকে দমন করতে দুঃখ হয়। আমার ইচ্ছে হয়, আপনি যদি স্বয়ং পোপ হোতেন, আপনি যদি আমার বাবা হোতেন, এমন কি আপনি যদি আমার মত আর একটি মেয়ে হোতেন, তাহলে তো আমরা সারা দিনই একত্রে থাকতে পারতাম, আদর্শে, কর্ত্তব্যে কোথাও ত্রুটি ঘটতো না।

ওর এই সরলতাভরা ছলনা এত স্বাভাবিক অথচ এত অদ্ভুত যে, শুনতে শুনতে আমি না হেসে থাকতে পারলাম না।

অপেরা দেখে রাস্তার ধারে ছোট্টো একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকে পড়লাম ওদের নিয়ে। সেখানে পরিচারকটি এসে জিজ্ঞাসা করলে, অয়ষ্টার (ঝিনুক) খাবো কি না। ওদের মুখে দেখলাম, গভীর আগ্রহ অয়ষ্টার কেমন খেতে না জানি, ইচ্ছা করেই ওদের সামনে দামটা জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটি জানালে, একশোর দাম পঞ্চাশ পাওলী (ইতালীয় মুদ্রা)-র কম নয়। একশোটার অর্ডার দিলাম। যখন আর্মেলিনা বুঝলো যে, অয়ষ্টার খেতে পাঁচটি রোমান ক্রাউন খরচ হবে তখন আপত্তি জানালো প্রবল ভাবে। কিন্তু গভীর খুশীতে ঝিকমিকিয়ে উঠলো ওর চোখ দুটি। যখন আমি বললাম, ওর কাছে কোনো কিছুই আমার খুব দামী কি ভালো মনেই হয় না। তার পর প্রায় আধ ডজন শেষ করে ওর সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে বললে, এমন সুন্দর জিনিষ খাওয়া নিশ্চয়ই পাপ। এমিলিয়া উত্তর দিলে, জিনিষগুলি এত চমৎকার বলে নয়, আসলে প্রতি গ্রাসে এক পাওলী (মুদ্রা) করে গলাধঃকরণ করাটাই বোধ হয় আসল পাপ—

—এঁয়া সত্যি! অথচ আমাদের পরমারাধ্য পোপ বন্ধ করেন

না এ-সব খাওয়া ? এতেও যদি পেটুক হবার পাপ না হয় তো আর কিসে হবে ? আমি যদিও খেয়েছি কিন্তু স্বীকারোক্তির সময় নিশ্চয়ই বলবো বৈ কি, পেটুকের মত খেয়ে পাপ করেছি—

বেশ কাটলো সে সন্ধ্যাটা খাওয়াতে, হাসিতে গল্পেতে—মুছে গেলো মনের কোণের মেঘটুকু।

কিছু দিন পরে এমিলিয়ার পাণিপ্রার্থী হোয়ে একজন ব্যবসায়ী এলো। কিন্তু সে বেচারার মাত্র চার শ' ক্রাউন দেবার ক্ষমতা অথচ আশ্রম থেকে ছয় শ' ক্রাউন দাবী করা হোলো। দেখলাম এমিলিয়ার সমস্ত ভবিষ্যৎ সুখ নির্ভর করে ওর সার্থক পরিণয়ে; আর সেদিক থেকে ব্যবসায়ী লোকটি সব রকমেই বাঞ্ছনীয়, তাই আমিই বাকী টাকাটা দিয়ে দিলাম। আট দিনের মধ্যেই শুভ পরিণয় সমাপ্ত। এমিলিয়া চলে গেলো তার স্বামীর ঘরে। সেই সপ্তাহেই মেনিকোচ্চিও ওর প্রেমিকাকে বিয়ে করে রোমেতে স্থায়ী সংসার পাতলে।

'মাদার সুপিরিয়র' আর একটি ভারী চমৎকার মেয়েকে আর্মেলিনার সঙ্গিনী করে দিলেন। মেয়েটি আর্মেলিনার চেয়ে মাত্র তিন-চার বছরের বড়ো আর অপরূপ রূপসী—না, আমার ছোট্টো বান্ধবীটির মত নয় অবশ্য। ওর নাম স্কোলাস্তিকা। কি জানি কেন, স্কোলাস্তিকাকে আমার খুব একটা ভালো লাগেনি। স্কোলাস্তিকা কখনো থিয়েটার দেখেনি—কিন্তু আর্মেলিনা এবার রীতিমত আবদার ধরলো কর্নাচে যাবে। এটা আরও কঠিন ব্যাপার! যাই হোক আমি বললাম, ওরা যদি পুরুষের সাজে যেতে পারে তবেই নিয়ে যাবো। অবশ্য জামা-কাপড় সব আমি এনে দেবো। এতবড় একটা নতুনত্বের প্রস্তাবে দুজনেই রাজী। হোটেলে একটা ঘর ঠিক করে রাখলাম, জামা-কাপড় সেখানেই পাঠিয়ে সব বন্দোবস্ত করে রাখলাম। ঘরটিতে বেশ আগুনের ব্যবস্থাও ছিলো। আমি বললাম ওরা একা থাকতে চায় তো আমি ঠাণ্ডা সত্ত্বেও পাশের কামরায় যাচ্ছি। স্কোলাস্তিকা বলে উঠলো।

—দেখছি আমিই আপনাদের দুজনার মধ্যে বাধা। স্পষ্ট বোঝা যায় আপনারা দুজনে দুজনকে ভালোবাসেন—আমি তো শিশু নই—

—ঠিকই বলেছো স্কোলাস্তিকা, আমি আর্মেলিনাকে ভালোবাসি বটে কিন্তু ও আমাকে ভালোবাসে না। আর আমাকে দুঃখ দেবার হাজার ফন্দী খোঁজে; এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

মিনিট পনেরো যেতে না যেতেই ঘরের দরজায় টোকা পড়লো। আর্মেলিনা এসে বললে আমার সাহায্য ছাড়া পোষাক পরা অসম্ভব। তা ছাড়া জুতাজোড়া পায়ে ভীষণ আঁট হোচ্ছে। আমার গম্ভীর, ক্ষুব্ধ মুখ দেখে আর্মেলিনা হঠাৎ দুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে অজস্র চুম্বনে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে—উড়ে গেল মনের আকাশের কালো মেঘ-উচ্ছল হাসিতে লুটিয়ে পড়লো স্কোলাস্তিকা।

ঠিক বলেছি কি না, আমিই হোলাম দুজনার ভালোবাসার পথে অন্তরায়। কিন্তু আমার উপর যদি আস্থা না রাখেন তবে আমি কাল যাবো আপনাদের সঙ্গে অপেরা দেখতে—

এবার আর্মেলিনার আগ্রহাতিশয্যে স্কোলাস্তিকাকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভাবে একটি চুম্বন করলাম। ব্যস, শান্তি। আর্মেলিনা

খুশিতে উচ্ছ্বসিত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিখুঁত দুইটি যুবার সজ্জায় সজ্জিত দুই বান্ধবীকে নিয়ে হাজির হলাম বলনাচের আসরে।

বলনাচের আসরে যে ভয় একেবারেই করিনি, শেষ অবধি তাই হোলো। একটা ছোটো সাধারণ নাচের আসর—ছোটোখাটো ব্যবসায়ীদের সমাজের অনুষ্ঠান। পরিচিত কাউকে আশা করিনে। কিন্তু একজন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোয়ে গেলো। সপরিবারে এগিয়ে এসে আমার সুন্দর সঙ্গী দুটিকে বিশেষ করে অভিনন্দন জানালেন। বেচারারা এরকম পরিস্থিতিতে একেবারে নতুন, নিঃশব্দে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম, একটি দীর্ঘাঙ্গী তরুণী আর্মেলিনার কাছে এগিয়ে এসে নাচের আমন্ত্রণ জানালে। আমি লক্ষ্য করলাম তরুণীটি আর কেউ নয়, ফ্লোরেন্সের একটি তরুণ। প্রথম দিন থিয়েটারে আমার বক্সে একটা চিঠি এনে বার বার সতৃষ্ণ নয়নে আর্মেলিনার দিকে তাকাচ্ছিল। আজ তরুণীর পরিচ্ছদে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। আর্মেলিনা ওর স্বভাব-সরলতায় বললে, কোথায় যেন ওকে দেখেছি মনে হচ্ছে।

—আপনি ভুল করছেন, তবে আমার একটি ভাই আছে অবিকল আমার মত দেখতে—আর আপনারও বোধ হয় একটি অবিকল আপনার মত সুন্দরী বোন আছে—একেবারে আপনার প্রতিচ্ছবি—তাঁর সঙ্গে একটা থিয়েটারে আমার ভাই-এর পরিচয় হোয়েছিল।

ওর কথায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আর্মেলিনা নাচতে চাইলো না—সবাই বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলাই আমার কর্ত্তব্য—আর আর্মেলিনা সেই ফ্লোরেন্সের তরুণটির সঙ্গে কথা বলছিল দেখে সেদিকে আমার নজর না দেওয়াই উচিত—কিন্তু আমার প্রকৃতিটাই অত্যন্ত হিংসুক ধরণের। ওদের ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলতে দেখে রাগে আর হিংসায় আমার সমস্ত মন জ্বলতে লাগলো। তার উপর স্কোলাস্তিকাও উঠে পড়ে ঘরের অন্য প্রান্তে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলো।

একটু পরেই আমি এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। দেখি, একটি নিভৃত কোণে দুজনে মগ্ন আলাপ-আলোচনায়। আমাকে দেখেই স্কোলাস্তিকা এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে—জানালে, এঁর কথাই আমাকে ও আগে বলেছে, ইনি ওর পাণিপ্রার্থী। আমি যতদূর সম্ভব সংযত, বিনীত ভাবে ভদ্রতা বজায় রাখলাম। বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না—আর্মেলিনাকে ওই ফ্লোরেন্সের তরুণীটির সঙ্গে দেখার পর থেকে মনের জ্বালায় ওদের কাছ থেকে বেশীক্ষণ দূরে থাকতে পারছিলাম না। ফিরে এসে অবাক হোয়ে দেখলাম, ইতিমধ্যে আর্মেলিনা ওই তরুণটির সঙ্গে রীতিমত নাচতে সুরু করেছে—

—সব চেয়ে আশ্চর্য্য, তরুণটির প্রতিটি পদক্ষেপ এমন তন্ময়তার সঙ্গে অনুসরণ করে যাচ্ছে যে এতটুকু আড়ষ্ঠতা নেই ওর সহজ সাবলীল নৃত্যছন্দে।

সবাই প্রশংসায় মুখর হোয়ে উঠলো। নাচের শেষে আমি অত্যন্ত কষ্টার্জিত ভদ্রতার সঙ্গে হাসতে হাসতে সস্নেহ স্বরে বললাম আর্মেলিনাকে, তুমি জানো তো সাড়ে বারোটার মধ্যেই তোমার বাড়ী পৌঁছানো চাই।

—তা বটে, তবুও আপনিই তো আমাদের প্রভু এখন।

—না, শপথ ভঙ্গ করে প্রভুত্বের দায়িত্ব নিতে পারি না—গম্ভীর ভাবে বললাম—তবে তুমি যদি জোর কর তাহলে আমি আর অপেক্ষা করতে বাধ্য।

স্কোলাস্তিকার কাছে যেতেই ও উঠে পড়লো সঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। রাত্রি বারোটার মধ্যে ফিরবার জন্যে ও প্রস্তুত সে কথাও জানালো। অতএব সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলাম আমাদের হোটেলে। পথে একটি কথাও হোলো না। কিন্তু হোটেলে পৌঁছে বসে স্কোলাস্তিকা আর্মেলিনাকে অত্যন্ত তিরস্কার করতে লাগলো—ওর ব্যবহারের জন্যই আমাকে পার্টি শেষের দিকে অমন রূঢ় হোয়ে উঠতে হোয়েছিলো বলে। ওর জন্যে আমার পক্ষে আশ্রমের নিয়ম রক্ষাও সম্ভব হোয়ে উঠছিল না বলে। বুঝলাম না ঠিক এটা আমার উপরই প্রতিশোধ নিচ্ছিলো কি না আমার কিশোরী প্রিয়াকে লাঞ্ছিত করে। আর্মেলিনার দুটি কপোল বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতেই লাগলো—প্রচুর উপাদেয় আহার্য্য সত্ত্বেও কিছুই খেতে পারলে না—বিষণ্ণ, বিমর্ষ মুখে বসে বসে শুনলে—স্কোলাস্তিকা সহর্ষ উচ্ছ্বাসে তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ণ বিবরণ—আর আমার দুটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর বহুদর্শী মন আবিষ্কার করলে ওই দুটি বিষাদভরা ঘন কালো আঁখিপল্লবের গোপন ভাষা—আমার কিশোরী প্রিয়ার হৃদয়খানি মুগ্ধ—সেই ফ্লোরেন্সের তরুণের অপরূপ দেহকান্তিতে—ওই নিবিড় কালো গভীর দৃষ্টি স্বপ্ন রচনা করছে—প্রিয় মিলনের স্বপ্ন—কামনা করছে—ওর দুটি শুভ্র কোমল পাণির প্রার্থী হয়ে আসুক ফ্লোরেন্সের সেই তরুণ—ওর সারা সন্ধ্যার নৃত্যসঙ্গী সেই রূপকুমার—

এ কোন খেলা সুরু করেছি—কি হোলো আমার জয় না পরাজয় এই কথা ভাবতে ভাবতে সেই রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ভোরের আলোয় ঘুম ভেঙে প্রথমেই মনে হোলো উত্তর পেয়েছি—

—[এই অসমাপ্ত অংশটি থেকে পরের আরও দুটি অধ্যায় ক্যাসানোভার পাণ্ডুলিপি থেকে লুপ্ত। এর সঠিক কারণ আজও জানা যায়নি। ক্যাসানোভার বিরাট স্মৃতিকথার এই একটি অংশই বিলুপ্ত—আর্মেলিনার কাহিনী চিরকালের জন্যেই অজানা থেকে গেলো—তবে ক্যাসানোভার পরিণতি এই কাহিনীতে কোথায় দাঁড়াবে 'স্মৃতিকথা'য় অভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার কাছে তা' সহজেই অনুমেয়। অবশ্য সবই অনুমান। লুপ্ত অধ্যায়গুলির পর ক্যাসানোভাকে দেখা যায় ফ্লোরেন্সে। কেন হঠাৎ রোম ছেড়ে ফ্লোরেন্সে গেল—স্ব-ইচ্ছায় না আরও কোনো ঘটনাস্রোতে বাধ্য হোয়ে—কিছুই জানা যায় না—আর জানা যায় না ফ্লোরেন্সের সেই তরুণটির সঙ্গে আর্মেলিনার প্রেমের পরিণতি কোথায় দাঁড়ালো—

অনেকে অনুমান করেন, এই বিচ্ছিন্ন অংশটি ক্যাসানোভা নিজেই নষ্ট করেছিলেন পুনর্লিখনের জন্য—হয়ত অসুস্থতা কিম্বা অন্য কোনো কারণে অসমাপ্ত থেকে যায় ঐ অংশটির সংযোজন। কারণ, ১৭৯৮ সাল অবধি দেখা যায়, ক্যাসানোভা তখনও পাণ্ডুলিপিটি সংশোধন করে চলেছেন। মৃত্যু এসে জীবনের সমাপ্তি ঘটালো—তাই অসমাপ্ত 'স্মৃতিকথা'র ইতিকথা আর লেখা হোলো না—]

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

সিন্ধুপারে

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

নয়
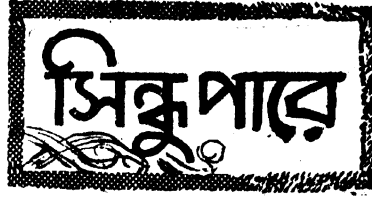
দেখতে দেখতে মাস খানেক গেল কেটে। কিন্তু এই মাস খানেকের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। চন্দ্রনাথ দেশে গেল ফিরে। আমিও চলে এলাম ১৪নং গ্রীণহোম রোড ছেড়ে, পাউইস গার্ডেনসে সুনীলদের ফ্ল্যাটে। পরে শুনেছিলাম, চন্দ্রনাথ দেশে গিয়ে আমাদের বন্ধু-বান্ধব যে কেউ আমার খবর জানতে চেয়েছে, তাদের সংক্ষেপে এক কথায় উত্তর দিয়েছে—এমি জনসন।

যাই হোক, চন্দ্রনাথ চলে যাওয়ার দিন সাতেক পরে, প্রথম যেদিন মিসেস ব্লেককে বলি যে, আমি তাঁর বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পাউইস্ গার্ডেনসে বন্ধুদের কাছে গিয়ে থাকব, তিনি যেন কেমন এক রকম ভাবে চাইলেন আমার দিকে। সে চাহনির মধ্যে আর যাই থাক, একটি দুঃখের ছায়া যে ফুটে উঠেছিল, সে কথা আমি আজও জোর করে বলতে পারি। মুখে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু অবাক হয়েছিলাম, মনে আছে।

চলে আসার সময় তাঁর ব্যবহারে শুধু যে আরও অবাক হয়েছিলাম তা নয়—বিশেষ মুগ্ধও হয়েছিলাম। আমাকে কিছুই করতে দিলেন না—নিজের হাতে আমার সমস্ত জিনিষপত্র দিলেন গুছিয়ে। সুধার ছবিখানি একটি নতুন লাল রংএর সিল্কের বড় রুমাল দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে রেখে দিলেন আমার সুটকেশের এক পাশে। রুমালখানি ওঁর নিজেরই ছিল, না কিনে এনেছিলেন, তা ঠিক বলতে পারি না, তবে এর পূর্ব্বে কখনও দেখি নি। সবই করে গেলেন কিন্তু মুখে কথা বেশী নাই—গম্ভীর ধরণ। ওঁর এই ধরণ দেখে রুমালের কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও জিজ্ঞাসা করা হল না।

বিদায় নেওয়ার কালে সদর দরজার কাছে করমর্দ্দনের সময় আমার দিকে চাইলেন—সত্যিই চোখ দুটি ছল-ছল করছে।

মুখে বললেন, আমার উপর রাগ করে যাচ্ছেন না তো ?

তাড়াতাড়ি বললাম, না, না। চন্দ্রনাথ চলে গেল, একলা এ বাড়ীতে থাকতে আমার ভাল লাগবে না।

বললেন, আবার দেখা হবে আশা করি ?

বললাম, নিশ্চয়। নিশ্চয়। আমি আসব মাঝে মাঝে।

বললেন, আমার এ দরজা আপনার জন্য বরাবরই রইল খোলা।

বুলা! এই মহিলাটির চরিত্র আজও আমার কাছে একটা রহস্যের মতনই হয়ে আছে।

* * * *

সুনীলদের ফ্ল্যাটে গিয়ে দিনগুলি মন্দ কাটতে লাগল না। ফ্ল্যাটটি ভালই—বেশ খটখটে। দু'খানা বড় ঘর এবং তার পাশ দিয়ে একটা টানা বারান্দা। বারান্দার শেষের দিকে রান্নাঘর এবং স্নানের ঘর। সামনের ঘরটি বসবার ঘর—কার্পেট পাতা এবং সোফা-কৌচও মোটামুটি ভালই। পরের ঘরটিতে তিনখানা খাট পাতা—আমরা শুই। বড় একটা প্রসাধন-টেবিলও রয়েছে সে-ঘরে—আমাদের তিন জনেরই চলে যায়। এ আসবাবপত্র সবই অবশ্য বাড়ীর সঙ্গে ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

বুলা! জানই ত তোমার মেজদা' অত্যন্ত আড্ডাবাজ লোক। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সুনীলদের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। যদিও একথা স্বীকার করতেই হবে মনের গভীরে আমার সুর কোনও দিনই মেলেনি ওদের মনের সঙ্গে—যেটা চন্দ্রনাথের সঙ্গে হয়েছিল। তবুও—নানা হাল্কা গল্প-গুজবে বেশীর ভাগ সময়ই যেত কেটে। দুজনার কাউকেই আমার মন্দ লাগেনি। যদিও শেষ পর্য্যন্ত ভাবটা জমেছিল সুনীলের সঙ্গেই বেশী। আমি শুধু আড্ডাবাজ নই, স্বভাবতঃ আমি ভীষণ কুঁড়েও বটে—সে খবরটা হয়ত তোমার এখন আর ঠিক মনে নেই। নিজের দৈনন্দিন ছোট ছোট কাজ শেষ করতে রোজই আমার প্রাণান্ত হত। কিন্তু এ দেশে উপায় নাই, তাই কোনও রকমে নিজেই সব করতাম। কিন্তু এই ফ্ল্যাটে আসার দু'-এক দিনের মধ্যেই সুনীল আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমার কাজ করে দিতে সুরু করল—বাধা দিলেও শুনত না। নীরেনের অনেক কাজ সুনীলই করে দিত—এ ফ্ল্যাটে এসে সেটা গোড়াতেই লক্ষ্য করেছিলাম এবং নীরেনও অনায়াসে সুনীলকে দিয়ে কাজগুলি করিয়ে নিত—যেন কোনও দ্বিধা ছিল না। ভেবেছিলাম—নীরেন অসুস্থ, তাই সুনীল যতটা পারে ওর কাজ করে দেয়। কিন্তু পরে যখন আমারও হাত থেকে কাজ নিতে সুরু করল—তখন বুঝলাম সুনীলের স্বভাবই ঐ। অসম্ভব চঞ্চল লোক—সব সময়ই কিছু একটা যেন করতে চায়। নিজের জুতো বুরুশ করতে সুরু করলে, একে একে আমাদের সকলের জুতো বুরুশ করে শেষ করে। দাড়ী কামান শেষ হলে, দাড়ী কামানোর আসবাবপত্র পরিষ্কার করতে চিরদিনই আমার কুঁড়েমি। সুনীল সেটা লক্ষ্য করেছিল কি না জানি না। প্রায়ই দেখতাম, আমার দাড়ী কামান শেষ হলে, যেখানেই থাকুক ছুটে এসে জিনিষগুলো আমার হাত থেকে নিয়ে যেত স্নানের ঘরে—পরিষ্কার করে আনবার জন্য। এ ছাড়া রান্নার কাজে ত প্রায়ই লেগে থাকত। সুনীলের হাতের রান্না ঝোল-ভাত খেয়ে খুব তৃপ্তি পেতাম সে যুগে—সে কথাটা আজও ভুলিনি।

আর একটা জিনিষ এসেই দেখলাম—দুজনের দুটি মেয়ে-বন্ধু আছে। নীরেনের মেয়ে-বন্ধুটির নাম 'ডোরা'—সে কথা আগেই শুনেছ। সুনীলের মেয়ে-বন্ধুটির নাম 'মলি'। আমার পরের দিনই দুজনের সঙ্গেই আলাপ হলো। প্রায় রোজই দুটি মেয়েই বিকেল চারটা আন্দাজ সেজে-গুজে ফ্ল্যাটে আসে এবং সুনীল মহা যত্ন সহকারে

তাদের চা খাওয়ায়। তারপর যদি বাইরে বৃষ্টি-বাদলা না থাকে, সুনীল, নীরেন দুজনেই যে যার মহিলা-বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে যায়—ফিরে আসতে আসতে রাত সাড়ে ন'টা-দশটা হয়। তখন অবশ্য সঙ্গে মেয়ে দুটি থাকে না। সাধারণতঃ দশটার আগে কোনও দিনই আমাদের ডিনার খাওয়া হয় না—রাত্রের রান্নাবান্না অবশ্য সকালেই করে রাখা হয়। মিসেস কামিং বলে একটি বুড়ী ঝি রোজ সকালে আসে এবং বাড়ী-ঘর-দোর পরিষ্কার করে বাসন ধুয়ে কতকটা রান্নাবান্না সেরে দিয়ে বেলা চারটা আন্দাজ চলে যায়—বাকি রান্না সুনীলই করে নেয়।

সত্য কথা বলতে গেলে—ডোরা ও মলি, কাউকেই আমার খুব বেশী ভাল লাগে নি। ডোরার রূপের প্রশংসা আগেই শুনেছিলাম, দেখে কিন্তু একটু হতাশ হলাম। সবই ভাল—লম্বা গড়ন, নাক চোখ মুখ বেশ টানা-টানা, কিন্তু আসল জিনিষটিরই যেন অভাব—অর্থাৎ চেহারায় মিষ্টতা একেবারেই নেই। তাই কোনও দিক দিয়ে কোনও আকর্ষণী শক্তি পেলাম না মেয়েটির মধ্যে। স্বভাব ধরণ-ধারণও মোটেই আমার মনের মতন নয়। অনবরত কথা বলে এবং অনবরত যেন ছটফট করে—কোথায়ও দু' দণ্ড যেন স্থির হয়ে বসতে পারে না। রোজই প্রায় লক্ষ্য করতাম—প্রথমে এসে যেখানে বসে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে গিয়ে বসে আর এক জায়গায় এবং একটু পরেই উঠে গিয়ে নীরেনের কোচের হাতার উপর বসে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নীরেনের গলা, মাথাটা কাৎ করে রাখে নীরেনের মাথার উপরে কিন্তু সে ভাবেও বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত চেয়ার কোচ ছেড়ে একটা টেবিলের উপর উঠে বসে যেন স্বস্তি পায়। এক কথায় নীরেনের বন্ধু কিন্তু স্বভাবটি ঠিক নীরেনের উল্টো। অতি ধীর স্থির ধরণ ধারণ নীরেনের, যেখানে বসে সেখান থেকে যেন উঠতেই পারে না।

মলি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এসেই ঘরের কোণে একটা বসবার জায়গা বেছে নেয় এবং শেষ পর্য্যন্ত সেইখানেই বসে থাকে। কম কথা বলে এবং সমস্তক্ষণ মৃদু মৃদু হাসে। সুনীল ত এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকার লোক নয়—এটা ওটা পাঁচটা কাজ তার লেগে আছেই। এবং এটাও লক্ষ্য করেছি—সুনীল এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবার সময় মলির চোখ দুটো সুনীলের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। সুনীলের বন্ধু, কিন্তু স্বভাবটি ঠিক সুনীলের বিপরীত। ছোটখাট মানুষটি—চেহারাটির মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নাই। তবে মুখখানার মধ্যে খুঁজলে যেন একটু মিষ্টতা পাওয়া যায়।

ফ্ল্যাটে আসবার তিন-চার দিনের মধ্যেই—তখনও এমিকে এ বাড়ীতে আনিনি বা এমির কথা এদের বলিনি কিছু—একদিন নীরেন আমাকে বলল, ওহে চৌধুরী! এ দেশে এসে করলে কি—এখনও একটা মেয়ে-বন্ধু জোটাতে পারলে না?

বললাম, কি করব?—আপনাদের মতন ভাগ্য ত আমার নয়?

নীরেন খিল-খিল করে হেসে উঠল—বোধ হয় আত্মসৌভাগ্যের গৌরবে। সুনীলকে ডেকে বলল, সুনীল! চৌধুরীকে একটা বন্ধু জুটিয়ে দাও। বেচারা এ রকম উপবাসী মন নিয়ে আর কত দিন থাকতে পারবে?

সুনীল বলল, উপবাসী মন হতে যাবে কেন? ওর মনটা রয়েছে, ওর তোরঙ্গের মধ্যে একটি লাল রুমালে বাঁধা।

সুধার ছবিখানি সুনীল যে এর মধ্যে লক্ষ্য করেছে সেটা টের পাইনি। অবশ্য আশ্চর্য্য কিছুই নয়, কেন না, প্রায়ই আমাকে কাপড় চোপড় বার করতে সুটকেশ খুলতে হয়—এবং অনেক সময় আমাদের সকলেরই সুটকেশ খোলাই পড়ে থাকে। সুটকেশ সুনীল কোনও দিন হয়ত গুছিয়েও রেখে থাকবে। তবে সুধার ছবিখানি এ ফ্ল্যাটে এসে কোনও দিনই বার করে সাজিয়ে রাখিনি।

নীরেন শুধাল, আপনি বুঝি বিবাহিত?

বললাম, হ্যাঁ।

বলল, তা আর কি হয়েছে। আমিও ত বিবাহিত। এ বিষয়ে সুনীলেরই বরাতটা ভাল—ও বিয়ে না করেই এসেছে। কিন্তু বিয়ে করে এসেছি বলে এ দেশে শুকিয়ে মরতে হবে—আমি এর মধ্যে কোনও যুক্তি দেখি না।

সুনীল বলল, সকলের মনোভাব ত একরকম নয়।

নীরেন বলল, ঠিক পাল্লায় পড়লেই মনোভাব ঠিক হয়ে যাবে। সুনীল, তুমি এক কাজ করো। সেই মেয়েটিকে—সেই যে জেনী, তাকে একদিন 'চা'-এ ডাকো। চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও তার।

সুনীল বলল, আরে ছিঃ, জেনীকে কি কারও পছন্দ হয়—যা উঁচু দাঁত!

নীরেন বলল, আরে নেই-মামার চেয়ে কাণা-মামা ভাল।

নীরেনের কথায় বোধ হয় মনে মনে একটু রাগ হল। আমি যে নেহাৎ একটা কাণামামা পেলেই বেঁচে যাই—আমাকে এত সস্তা ভাবার কারণটা কি? নীরেনকে বললাম, তা আপনি আমার জন্য অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?

নীরেন বলল, আমরা যে যার বন্ধু নিয়ে বেড়াই আর আপনি শুকনো মুখে একলা একলা ঘুরে বেড়ান—এটা দেখতেই ভাল, না ভাবতেই ভাল লাগে?

বললাম, তা প্রয়োজন হয়ত নিজেই জুটিয়ে নিতে পারব—আপনি আর অত আমার জন্য ভাববেন না।

কথার মধ্যে নিশ্চয়ই একটু ঝাঁঝ ছিল। কিন্তু নীরেন রাগ করা ত দূরের কথা, হি-হি করে উঠল হেসে। বলল, অত সোজা নয় হে চৌধুরী, অত সোজা নয়। কি বল হে সুনীল!

নীরেনকে খুসী করবার জন্য কি না জানি না, সুনীল বলল, তা ডোরার মতন মেয়ে পাওয়া সোজা নয় মানি, কিন্তু চৌধুরীর যা চেহারা মোটামুটি ভাল মেয়ে জুটিয়ে নিতে চৌধুরীর দেরী হবে না।

পরের দিনই বিকেল চারটের সময় এমিকে নিয়ে এলাম ফ্ল্যাটে। দিনটা শনিবার ছিল—দুপুরে একসঙ্গে লাঞ্চ (মধ্যাহ্ন ভোজন) খাওয়ার কথা আগে থেকেই ঠিক ছিল আমাদের। লাঞ্চ খাওয়ার পর এমিকে বলেছিলাম, চল আজ আমাদের ফ্ল্যাটে—বন্ধুদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। এমিও বিনা দ্বিধাই রাজী হয়েছিল। এমির পোষাকের দিকে চেয়ে মনে মনে খুসীই হয়েছিলাম—একটি মেরুণ রং-এর পোষাকে বেশ মানিয়েছিল এমিকে।

ফ্ল্যাটে ঢুকে বসবার ঘরে কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম সুনীল, নীরেন বসে গল্প করছে—বোধ হয় অপেক্ষা করছে মেয়ে-বন্ধুদের জন্য। দরজার কাছে গিয়ে দরজাটি ঈষৎ ফাঁক করে শুধালাম, আসতে পারি?

দু'জনেই সমস্বরে বলে উঠল, আসুন, আসুন, তা এত' ভণিতা কেন ?

বললাম, একটি বন্ধু আছেন আমার সঙ্গে। এই বলে এমিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

ঘরে হঠাৎ একটা বোমা ফাটলেও দু'জনে বোধ হয় অত চমকে যেত না। অবাক হয়ে দু'জনেই লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে।

আলাপ করিয়ে দিলাম, আমার বিশেষ বন্ধু—মিস্ এমিলিয়া জনসন। নীরেন এবং সুনীলেরও পরিচয় দিলাম। এমি একটি মধুর হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করে এগিয়ে দু'জনার সঙ্গেই করমর্দ্দন করল।

হঠাৎ সুনীল হো-হো করে হেসে চেয়ারে বসে পড়ল। বাংলায়ই বলল, চৌধুরী যে এত গভীর জলের মাছ—তা ত জানতাম না। নীরেন দাঁড়িয়েই রইল—হাঁ করে চেয়ে রইল এমির মুখের দিকে—যেন চোখ ফেরাতে পারেনি।

* * * *

এর পর থেকে এমিও ডোরা ও মলির মতন প্রায়ই বিকেলে এসে জুটতে লাগল ফ্লাটে এবং খানিকক্ষণ সবাই মিলে বসে গল্প-গুজব করে যে যার বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে যেতাম এবং রাত দশটা সাড়ে দশটার সময় আসতাম ফিরে। এই ভাবে ফ্লাটে আসার পর দিনগুলি কেটে যেতে লাগল এবং ক্রমে বোধ হয় মাস দেড়েকের মধ্যেই আমাদের ভাবের রাজ্যে ঘটল ভাবান্তর—সেই কথাটিই সূচনা থেকে এইবার বলি।

এমি আমাদের ফ্লাটে আসা-যাওয়া সুরু করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম—নীরেন বড্ড যেন এমির দিকে ঢলে পড়ল। এমি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ যেন ঘর থেকে নড়তে পারে না এবং ডোরা বেরিয়ে যাওয়ার জন্ত অনুরোধ করলেও, এমিকে নিয়ে আমি যতক্ষণ না বেরুই ততক্ষণ ওঠে না। আগেই বলেছি—নীরেন অত্যন্ত বড় লোকের ছেলে, তার পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার খুবই—সাধারণত ছাত্রমহলে এত ভাল পোষাক আমরা পরতাম না। তবুও এমি আসার পরে—সে বাহার যেন আরও গেল বেড়ে—রোজই নতুন দামী দামী টাই বাঁধে গলায় এবং রোজই পরিধানের পোষাকে একটু নতুনত্বের সৃষ্টি করে। পায়ের জুতো সাত দিনে সাত জোড়া বদলায় এবং সবই যে বিশেষ দামী—সেটা লক্ষ্য করাও কারো পক্ষে কঠিন হয়নি। এমি একদিন ত' সোজা জিজ্ঞাসাই করে বসল, মিঃ পালের ক'জোড়া জুতো আছে ?

হেসে বলল, তা পঁচিশ-ছাব্বিশ জোড়া। ওটা আমার একটা সখ।

এছাড়া কথায়-বার্ত্তায় ক্রমে নিজের টাকার গর্ব্বের ইঙ্গিত দিতেও করল সুরু—তাতে যে একটুও লজ্জা বোধ করেছিল, এমন ত মনে হয় না।

পরে একদিন বেড়াতে বেরিয়ে এমিকে হেসে বললাম, এমি! পাল যে তোমার দিকে বড্ড ঝুঁকেছে।

তৎক্ষণাৎ সহজ ভাবে উত্তর দিল, তা জানি।

শুধালাম, জান ? তুমিও তাহলে লক্ষ্য করেছ ?

বলল, তা আর করিনি ! এই নিয়ে ডোরার সঙ্গে পালের ঝগড়া হয়ে গেল।

বললাম, সে কি কথা ? তা ত শুনিনি ?

বলল, কেন ? দেখছ না ডোরা আজ ক'দিন আসছে না ?

বললাম, তা ত দেখেছি। কিন্তু শুনলাম যে ডোরার অসুখ করেছে।

বলল, তোমাদের তাই বলেছে—কিন্তু আমাকে বলেছে অন্ত কথা। অবশ্য আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

আশ্চর্য্য হলাম। শুধালাম, কি রকম ?

বলল, পরশু দিন মনে নেই, তোমার ফিরে আসতে প্রায় সাড়ে চারটে হ'ল। আমি অনেকক্ষণ আগে এসে তোমার জন্ত বসে ছিলাম। রায়ও ছিল না—বোধ হয় ভিতরে কাজে ছিল ব্যস্ত—সেদিন অনেক প্রাণের কথা বলেছিল আমাকে।

আরও আশ্চর্য্য হলাম। শুধালাম, মলির সামনেই ?

বলল, মলি ত পরশু দিন আসেনি ?

শুধালাম, কি প্রাণের কথা হলো ?

চোখে সেই দুষ্টু হাসি মাখিয়ে বলল, সে সব যে তোমাকে বলা বারণ গো ! বললে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

কথায় অভিমানের সুর মাখিয়ে বললাম, বেশ। বল না।

সেই হাসি হেসে উঠল। ধীর পদক্ষেপে আমরা রাস্তা দিয়ে চলছিলাম—এমির ডান হাতখানা আমার বাঁ হাতের উপর দিকটায় ছিল জড়ানো। আমার বাঁ হাতখানা নিজের অঙ্গে একটু ঈষৎ চেপে বলল, তোমার মতন ছেলেমানুষ নিয়ে কি করি বল ত ?

ইতিমধ্যে কখন যে মনের কোণে একটু আগুন ধরেছিল—টের পাইনি। সেটা নীরেনের আমার অসাক্ষাতে আমার বন্ধুর সঙ্গে মন-প্রাণের গোপন কথা বলার দরুণ, না এমির নীরেনকে প্রশ্রয় দেওয়ার দরুণ—তা ঠিক বলতে পারি না। মুখে বললাম, ছেলেমানুষীর কি হল। নীরেন তোমাকে একলা পেয়ে তার মনের গোপন কথা তোমাকে নিবেদন করেছে—সত্যিই তোমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলব আমি কোন অধিকারে ?

আবার সেই হাসি। বলল, ওটা একটা মানুষ নাকি। ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নই ওঠে না।

হঠাৎ যেন মনের আগুনে জল পড়ল। হেসে একটু যেন টেনে-টেনে বলল, শোন। ওর ত আমার কাছ থেকে আর কিছু আশা করবার স্পর্দ্ধা নেই—ও আমার কাছ থেকে একটু দয়া চায়, দরদ চায়।

শুধালাম, তাই বলল বুঝি তোমাকে ?

বলল, কত কথাই বলে গেল। আমার মতন একটি মেয়ের উপর সর্বস্ব দিয়ে নির্ভর করতে পারলে ও যেন বেঁচে যায়—অসুস্থ কি না।

শুধালাম, তা ডোরা কি হল ?

বলল ডোরার দ্বারা হল না। ডোরার মধ্যে সে জিনিষ যে ও পায়নি। আমার প্রতি ওর টানটা লক্ষ্য করে ডোরা একটু গোলমাল করেছিল। ও সোজা তাকে বলে দিয়েছে—ওর মধ্যে ত কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই। তাই ডোরা আর আসে না।

অতি সহজ ভাবে কথাগুলি বলে গেল—যদিও কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গটুকু লক্ষ্য করা মোটেই কঠিন হয়নি।

সত্য কথা বলতে গেলে—নীরেনের উপর মনে মনে কেমন যেন একটা রাগ হল। এখন ভেবে দেখি—রাগ করার কি

অধিকার ছিল আমার? এমির সঙ্গে আমার সম্পর্কে ত কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। আর আমার দিক দিয়ে বাধ্যবাধকতা হবেই বা কি করে! সত্যিই—কি ছেলেমানুষ ছিলাম!

এমি বলল, শোন। সামনের রবিবার দিন সকাল বেলা আমাকে যেতে বলেছে—আমার কয়েকটা ছবি তুলবে। অসম্ভব দামী ক্যামেরা আছে ওর, জান ত?

শুধালাম, তুমি রাজী হয়েছ?

সহজ ভাবেই বলল, কেন হব না? একশো পাউণ্ডের উপর ওর ক্যামেরাটার দাম। অত দামী ক্যামেরায় ত জন্মে আমার ছবি ওঠেনি—দেখি না কি হয়।

শুধু বললাম, হুঁ।

বলল, শুধু তাই না। যদি আমি দয়া করে রাজী হই—সেভয় হোটেলে লাঞ্চে নিয়ে যাবে আমাকে?

গম্ভীর ভাবে বললাম, বেশ ত।

একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বলল, তুমিও যাবে গো! তোমাকেও বলবে।

বললাম, আমার বয়ে গেছে যেতে।

আবার সেই হাসি। বলল, সেভয়-এর মত অত বড় হোটেলে জন্মেও লাঞ্চ খাইনি। তুমি আমার এত বড় আনন্দটা দেবে মাটি করে?

বললাম, মাটি কেন হবে! তুমি যাও না।

বলল, না, একলা ওর সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার প্রবৃত্তি নেই আমার।

কথাটা শুনে সুখী হলাম কি না জানি না কিন্তু যখন বাড়ী ফিরে এলাম—মনটা মোটেই হাল্কা উৎফুল্ল ছিল না এবং লক্ষ্য করলাম, নীরেনের উপর বুকের মধ্যে একটু রাগও জমে রয়েছে। নীরেনের সামনেই সুনীলকে ডেকে বললাম, শুনেছ হে রায়! রবিবার সকালে এখানে ফটো তোলার আসর বসছে। তার পর চাই কি সেভয়তে একটা লাঞ্চ পার্টিও হতে পারে।

নীরেন শুধু হি-হি করে হাসতে লাগল।

* * * *

এইবার রবিবার সকালের ব্যাপারটা বলি। এমি বেশ সকাল সকালই এলো আমাদের ফ্ল্যাটে—আমি বা সুনীল কেউ-ই তখনও তৈরী হয়নি। নীরেন সাধারণত আমাদের চেয়ে ভোরেই ওঠে। সেদিনও নীরেন ভোরে উঠে সেজে-গুজে বাইরের ঘরে গিয়ে বসেছিল—বোধ হয় অপেক্ষা করছিল এমির জন্য। আমি যখন তৈরী হয়ে বসবার ঘরে ঢুকলাম, দেখলাম এমি ও নীরেন বসে গল্প করছে। দেখলাম এমি বেশ সেজে এসেছে।

ঘরে ঢোকা মাত্র এমি আমাকে বলল, তোমার এত দেরী হল বিক! পাল ইতিমধ্যে আমার দুখানা ছবি তুলে নিয়েছে।

শুধালাম, ঘরের মধ্যেই?

বলল, হ্যাঁ। ঐ জানালার কাছে আমাকে বসিয়েছিল। দামী ক্যামেরা যে—বাইরে যাওয়ার দরকার হয় না।

নীরেন বলল, যে মিষ্টি, তার চারদিকের আবহাওয়া তার উপযোগী হয়েই ওঠে। দেখুন বাইরে—দিনটাও আজ পরিষ্কার।

সত্যি—রোদ যদিও ঠিক ওঠেনি তবুও বাইরেটা আজ অতটা মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাওয়া নয়।

ইতিমধ্যে সুনীল ঘরে ঢুকলো। তারপর আরও ছবি তোলা পালা হল সুরু। এমির আরও দু'খানা ছবি নিল নীরেন। বলতে লজ্জা করব না—একবার মনে বাসনা হয়েছিল, আমার আর এমি একসঙ্গে একটা ছবি তুলুক না। কিন্তু নীরেন সে কথা একবার বলল না, এমিও বলল কৈ!

তার পর এমি হঠাৎ বলে বসল, আমি দু'-একখানা ছবি তুলব। নীরেনের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার কল-কৌশল একটু নি শিখে। তার পর আমার দিকে চেয়ে বলল, বিক্! জানালার কা দাঁড়াও—তোমার একখানা ছবি তুলি।

আমার ছবি তোলা হলে বলল, এই বার তিন বন্ধুর একস একটা ছবি তুলব।

তা-ও হল। তার পর ক্যামেরাটি রেখে দিল এক পাশে।

নীরেন বোধ হয় আশা করেছিল—তারও একলা একটা ছ তুলবে এমি। হঠাৎ দেখলাম তার মুখখানা একটু মেঘাচ্ছন্ন হ গেল। সত্য কথা বলতে হলে, সেটা বোধ হয় আমি একটু উপভোগ করেছিলাম।

বসলাম সবাই। নীরেন এমির দিকে চেয়ে শুধাল, আপনি ছ তুলতে খুব ভালবাসেন বুঝি?

একটু হেসে মাথা দুলিয়ে এমি বলল, খুব—ওটা আমার এক বিশেষ সখ।

নীরেন তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে উঠে গেল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে একটা নতুন ক্যামেরা হাতে করে ঘরে ঢুকে এমির হাতে দিয়ে বলল এই নিন—আমার সামান্য প্রীতির নিবেদন। আশা করি, ছ তোলার সময় আমাকে মনে পড়বে।

এমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। এক হাতে ক্যামেরা, অ হাতে নীরেনের গলা জড়িয়ে তার গালে একটা ছোট চুমো খেয়ে বলল সত্যিই—আপনি একটি বন্ধু। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবে জানি না!

আমি একটু স্তম্ভিত হয়ে বসে আছি। সুনীল আমাকে চুপি চুপি বলল—জানেন, ঐ ক্যামেরাটা কিনেছিল ডোবার জন্য—বে দামী ক্যামেরা আমি জানি। দেখুন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াল।

* * * *

উপরোক্ত ঘটনার দিন সাতেক পরে আমাকে লণ্ডন ছেড়ে যেতে হল দিন তিনেকের জন্য।

বলতে ভুলে গিয়েছি—ফটো তোলার দিন সবাই মিলে সেভ হোটেলে লাঞ্চ খেতেও গিয়েছিলাম। নীরেনই খাওয়ালো, সেট বলাই বাহুল্য। আমি প্রথমটা যেতে অস্বীকার করেছিলাম—সেট মনে আছে। কিন্তু এমির বিশেষ পীড়াপীড়িতে বিশেষত শে পর্য্যন্ত যখন এমি সুনীলেরও মত করিয়ে নিল, তখন যেতেই হ'ল এই দিন সাতেকের মধ্যে নীরেন দু'দিন আমাদের সঙ্গে—অর্থা আমার ও এমির সঙ্গে বেড়াতেও বেরিয়েছিল এবং একদিন আমাদে সিনেমায়ও নিয়ে গিয়েছিল—সে কথাটাও বলে রাখা ভাল। আমর যে ওকে আদর করে সঙ্গে ডেকে নিয়েছি, তা মোটেই নয়। কি রকম যেন একটা নাছোড়বান্দা ধরণ, কিছুতেই যেন এমিকে ছাড়বে না—বারে বারে এমির কাছে কাতর অনুরোধ জানায়, সঙ্গে বেড়াবে

যাওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, যেদিন আমরা ওর অনুরোধ উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেছি, রাত্রে ফিরে এসে দেখেছি—পেট চেপে বিছানায় উপুড় হয়ে আছে শুয়ে, পেটের যন্ত্রণা নাকি অসহ্য বেড়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে সুনীলও বলতে সুরু করল, আপনারা ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন বেড়াতে—নৈলে কে সমস্ত রাত ওর পেটের ব্যথা সামলাবে? কিন্তু কেন জানি না, ওর ঐ রকম অবস্থায় ওর প্রতি আমার মনে কোনও করুণা ত হতই না, বরং কার্য্য-কারণের দিক দিয়ে ভেবে কেমন যেন একটা ঘৃণা হত মনে এবং শেষ পর্য্যন্ত এমিও যখন ওর হয়ে সুপারিশ করতে সুরু করল, আহা! চলুক না বেচারা! আমাদের সঙ্গে বিক্—তুমি অমত করো না। তখন এমির এ সুপারিশ আমার ভাল লাগত না। ফলে নীরেনের এই রকম নির্লজ্জ গায়ে-পড়া ধরণকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য ক্রমে যেন এমির উপরও শ্রদ্ধা হারাতে লাগলাম।

যাই হোক, এই অবস্থায় ফ্ল্যাটে আসার মাস দেড়েক পরে দিন তিনেকের জন্য আমাকে লণ্ডন ছেড়ে যেতে হল কেমব্রিজসায়ারের একটি পল্লীগ্রামে—গ্রামটির নাম ডড়িংটন। কেন, সেই কথাটা এইবার বলি।

লণ্ডনে ডাক্তারী লেকচার শোনার পালা আমার শেষ হয়েছে—প্রায় মাসখানেক আগে। এইবার পরীক্ষা দেওয়ার আগে ও দেশের আইন অনুসারে আমাকে কোনও হাসপাতালের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে অন্ততঃ ছয় মাস। তাই গত মাসখানেক ধরে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি ইংলণ্ডের নানা হাসপাতালে দরখাস্ত করেছি—হাসপাতালবাসী ডাক্তারের চাকুরীর জন্য। কিন্তু কোনও জায়গা থেকে সন্তোষ জনক কোনও উত্তর পাইনি। ক্রমে যখন হতাশ হয়ে পড়ছিলাম, এমন সময় ডড়িংটন হাসপাতাল থেকে একটা চিঠি পেলাম—পত্রপাঠ গিয়ে দেখা করার জন্য। তাই চিঠি পাওয়ার পরের দিনই আমাকে রওয়ানা হতে হ'ল।

লণ্ডন থেকে ট্রেণ ধরে পিটারবরায় ট্রেণ বদল করে মার্চ্চ নামে একটি ষ্টেশনে এসে নামলাম—বিকেল চারটের সময়। সেখান থেকে বাসে ডড়িংটন যেতে লাগে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট। ডড়িংটনে জর্জ্জ হোটেল নামে একটি সরাইয়ে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকালবেলা জর্জ্জ হোটেলেই ব্রেকফাষ্ট খেয়ে হাসপাতালে গেলাম—কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ডড়িংটন গ্রামটি আমার খুব ভাল লেগেছিল—সেই কথাটুকু শুধু এখন বলে রাখি এবং জর্জ্জ হোটেলটিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর। দোতালায় যে ঘরটিতে আমাকে থাকতে দিয়েছিল, সে ঘরে আসবাবপত্রের দিক দিয়ে অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি ছিল না। এবং সবই খুব দামী না হলেও বেশ রুচিসঙ্গত। দোতলায় অতিথিদের থাকবার জন্য সামনের দিকে এই রকম দু খানি ঘর আছে এবং পিছনের অংশে বাড়ীওয়ালা সস্ত্রীক বাস করেন। একতলায় ইংরাজীতে যাকে বলে 'বার'—অর্থাৎ মদের দোকান এবং পথিকদের বসে মদ খাওয়ার ঘর। যদিও ডড়িংটন ছোট একটি পল্লীগ্রাম মাত্র, তবুও লক্ষ্য করেছিলাম যে, সন্ধ্যের পরে অন্তত আট-দশখানা মোটরগাড়ী এসে হোটেলটির সামনে দাঁড়ায়। এরা

সবাই বিভিন্ন পথের যাত্রী—ডাডিংটনের উপর দিয়ে তিন-চারটি রাস্তা নানা দিকে চলে গিয়েছে, কোনটা গিয়েছে কেম্‌ব্রিজ, কোনটা গিয়েছে পিটারবারা, কোনটা গিয়েছে ইলি এবং সব রাস্তাই বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে গিয়েছে চলে। তাই বিভিন্ন পথের যাত্রীদের গাড়ী দাঁড় করিয়ে বিশ্রাম এবং সুরাপানের জন্যই ডডিংটনের এই জর্জ্জ হোটেলটি তৈরী। বুলা! হয়ত জান না, ইংলণ্ডের চারিদিকে শুধু বড় সহরেই নয়, ছোট ছোট গ্রামেও নানা জায়গায় ছড়ান এই রকম সরাই (ইংরাজীতে যাকে বলে Inn) আছে। এবং শুধু ইংলণ্ডেই নয়, স্কটল্যাণ্ডের চারিদিকেও ছড়ান রাস্তা—সুদূর অজ পল্লীগ্রামেও মোটর গাড়ীতে যাওয়া যায়।

যাই হোক, পরের দিন সকালবেলা হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা হল না। সুন্দর হাসপাতালটি—গ্রামের বাইরে অথচ গ্রাম থেকে মোটেই দূর নয়—চারিদিকে খোলা ধূ ধূ মাঠের মধ্যে যেন আপন গর্ব্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। হাসপাতালটি দেখেই মনে হল—গ্রাম্য ছোট হাসপাতাল বলতে আমরা যা বুঝি, মোটেই তা নয়, অনেকখানি জমি নিয়ে, চারিদিকে সুন্দর ফুলের বাগানঘেরা বেশ বড় হাসপাতাল। হাসপাতালের রেজিষ্ট্রার—লোকটি বেশ ভদ্র বলেই মনে হল—আমাকে বসিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোন করে ফিরে এসে বললেন, ডাঃ চৌধুরী! কাল সকালবেলা দশটার সময় একবার এখানে আসতে আপনার অসুবিধা হবে কি? মিঃ ব্লাক, যিনি এই হাসপাতালের প্রধান, তিনি একটু অসুস্থ। তাই আজ আসেননি। কাল সকালে দশটায় সময় দিলেন।

বললাম, না না—আমার আর অসুবিধা কি। কাল সকাল দশটায়ই আসব।

শুধালেন, কোথায় উঠেছেন?

বললাম, জর্জ্জ হোটেলে।

বললেন, জায়গা পেয়েছেন? ভাগ্যবান! এখানে ত আর থাকবার জায়গা নেই। নৈলে মার্চ্চ-এ কোনও হোটেলে উঠে, সেখান থেকে যাওয়া-আসা করতে হত।

সে রাতটাও জর্জ্জ হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন বেলা দশটার সময় হাসপাতালে গিয়ে কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে দেখা করলাম। অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন সবাই। কলকাতায় যে মাড়োয়ারী হাসপাতালে কাজ করেছি, তার বিষয় বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করলেন। সেখানে বেশীর ভাগ কি অসুখ হয় এবং এখানেই বা বেশীর ভাগ কি কি অসুখ দেখা দেয়—এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হল আমার সঙ্গে। শেষ পর্য্যন্ত যদি আমার অসুবিধা না হয় এবং দয়া করে যদি বিকেলে তিনটের সময় একবার খবর নিই—এই অনুরোধ আমাকে জানিয়ে বিদায় দিলেন।

কোন একটি গ্রাম্য কাফেতে লাঞ্চ খেয়ে বিকেল তিনটের সময় হাসপাতালে যেতেই রেজিষ্ট্রার সহাস্যে উঠে দাঁড়িয়ে আমার করমর্দ্দন করে বললেন, আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। চাকুরীতে আপনি মনোনীত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে একখানি চিঠি আমার হাতে দিলেন।

শুধালাম, কবে থেকে আমাকে চাকুরীতে যোগ দিতে হবে?

বললেন, ঐ চিঠিতেই সব লেখা আছে। সামনের মাসের ১লা থেকে—এখনও ত প্রায় বারো দিন বাকী। আপনার অসুবিধা হবে না আশা করি।

বললাম, না না, তাই হবে।

বললেন, এই হাসপাতালেই সুন্দর থাকবার ঘর পাবেন আপনি—কোনও দিকে কোনও অসুবিধা হবে না।

* * * *

সেই দিনেই বিকেল পাঁচটা আন্দাজ মার্চ্চ থেকে ট্রেণ ধরে যখন লণ্ডনের ইউষ্টন ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় দশটা। বাস নিয়ে ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। বাইরে থেকে থেকে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে এবং অসম্ভব ঠাণ্ডা।

ফ্ল্যাটে ঢুকে বসবার ঘরে গিয়ে দেখি, সুনীল একটা কৌচের উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে—আর কেউ নেই। সুনীল আমাকে দেখে কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই যে চৌধুরী! এসে পড়েছেন। কি হল?

গায়ের ওভারকোটটা খুলে দূরে একটা চেয়ারের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে বসলাম আগুনের গা ঘেঁষে একটা কৌচে। বলাই বাহুল্য, ঘরে কয়লার আগুন জ্বলছিল। সুনীল তাড়াতাড়ি আরও কিছু কয়লা আগুনে ঢেলে দিয়ে আগুনটাকে লোহার একটা সিক দিয়ে খুঁচিয়ে আরও উজ্জ্বল করে দিল।

বললাম, চাকরী ত হয়ে গেল। ১লা ফেব্রুয়ারী কাজে যোগ দিতে হবে।

সুনীল সোৎসাহে বলল, চমৎকার, আমার অভিনন্দন।

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। নীরেন কোথায়—এই প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘরে ঢুকেই জেগেছিল—কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে বাধল।

সুনীল বলল—তা হলে ডিনারের যোগাড় করি। নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে খুব?

এইবার শুধালাম, পাল খাবে না?

সুনীল বলল, ওর কথা ছেড়ে দিন। কাল রাত্রে ত বারোটার পর ফিরেছিল, বাইরে ডিনার খেয়ে। আজও বোধ হয় তাই। তারপর কথার মধ্যে একটু শ্লেষ মাখিয়ে বলল, তার উপর আজ আবার কুড়ি গিনির ওভারকোট কেনা হচ্ছে—

শুধালাম, কি রকম?

বলল, কাল নাকি বণ্ড ষ্ট্রীটে কুড়ি গিনির একটি ওভারকোট দেখে এসেছেন দুজনে—মিস জনসনের নাকি সেটা ভারি পছন্দ।

শুধালাম, তা ওভারকোটটি কার? নিজের না মিস্ জনসনের?

বলল, মিস্ জনসনের। তিনি যে ওভারকোটটা গায়ে দেন সেটা আমাদের পাল সাহেবের তত পছন্দ নয়।

চুপ করে রইলাম। কি আর বলব।

সুনীলই কথা বলল, রাগ করবেন না চৌধুরী! মিস জনসন মেয়ে তত সুবিধের নয় দেখছি।

বললাম, এ দেশের মেয়েরা সব, সবই এক ছাঁচে ঢালা।

সুনীল বলল, হ্যাঁ, পয়সা ঢালতে পারলেই—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, আমাদের দেশের আদর্শ এরা পাবে কোথায়?

রাত্রে খেয়ে দেয়ে সুধাকে বিস্তারিত চিঠি লিখতে বসলাম। নতুন চাকরীর খবরটা তাকেই ত আগে জানাতে হয়।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

বিকাশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সেটা প্রমাণ করতে হলে হেনাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়। হোসেন দারোগা পুলিশ সাহেবকে বোঝালেন, তাতে মামলা ফেঁসে যেতে পারে। ও রকম সাক্ষীর উপর ভরসা করা যায় না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মামলা চলল না। মাসখানেক হাজত ভোগ করবার পর বিকাশকে আবার যেতে হল অন্তরীণে, রংপুর জেলার কোন্ এক অখ্যাত থানায়। বেশী দিন থাকতে হল না। কয়েক মাস পরেই সরকার তাকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। খবরটা হোসেন সাহেবই পৌঁছে দিয়ে গেলেন সদাশিব বাবুর কাছে। এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তের পিছনে একজন বিধর্মী দারোগার হৃদয়ের দান কতখানি, সরকারী নথিপত্রে তার পরিচয় হয় তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু উপহাস এবং লাঞ্ছনা-জর্জর দু'টি মানুষের কৃতজ্ঞ অন্তরে সেটা অক্ষয় হয়ে রইল।

ক'দিন পরে বিকাশের চিঠিও এসে গেল। হেনার কাছে লেখা সামান্য কয়েক ছত্র—কলকাতা এসেছি। সদাশয় সরকার মুক্তি যেমন দিয়েছেন, তার সঙ্গে আর একটা বস্তু দান করেছেন, তার নাম ম্যালেরিয়া। সম্প্রতি তারই দাপটে শয্যাশায়ী। পায়ে একটু বল পেলেই বাহাদুরনগরের টিকেট কাটবো—ইত্যাদি।

সদাশিব কিছু দিন থেকে নানা অসুখে ভুগছিলেন। তাই নিয়েই কোনো রকমে আফিস করেন। অনেকখানি নির্জীব হয়ে পড়েছিলেন। এই চিঠি আসবার পর নতুন করে বল পেলেন। হেনার বিয়ে। তার প্রথম এবং শেষ কাজ। কিন্তু কি দিয়ে কি করতে হবে, কিছুই জানেন না। স্বজাতি বন্ধুবান্ধব যারা, সবাই একরকম সরে দাঁড়িয়েছেন। সমাজের দশ জনের সঙ্গে তাদের চলতে হয়। এতখানি কেলেঙ্কারির পর ওঁর সংস্রবে থাকলে তাদেরও বিপদ। বন্ধু বলতে, সহায় বলতে এক হোসেন সাহেব। কিন্তু তারা মুসলমান। সামাজিক কাজে-কর্মে কী সাহায্যই বা করতে পারবেন! সদাশিব স্থির করলেন, রাখালকে পাঠিয়ে তার মাকে আনিয়ে নেবেন। আপনার জন বলতে ঐ এক বোন। ছোট ভাইও একজন ছিল। সে নেই। বৌমাটি ছেলেপিলে নিয়ে কলকাতার বাসিন্দা। তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। আসবে কি না, সন্দেহ। এই তো গেল জনবল। ধনবলও বিশেষ কিছু নেই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সামান্য পুঁজি। তারই একটা অংশ তুলে নিয়ে কিছু কেনাকাটাও শুরু করলেন সদাশিব।

মাসখানেক কেটে গেল। বিকাশ এসে পৌঁছল না। চিঠি এলে ওঁর চোখেই আগে পড়বে। তবু হেনাকে ডেকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে, বিকাশের আর কোনো খবর-টবর পেলি?

—না তো? এবার সত্যিই মুষড়ে পড়লেন সদাশিব। এমন সময় হোসেন দারোগা বদলি হয়ে গেলেন। যিনি এলেন, বাহাদুরনগরের মাটিতে পা দিতে না দিতেই প্রচার করে দিলেন, ভ্রষ্টা মেয়ে ঘরে পুষে রেখে ভদ্রপল্লীতে বাস করা চলে না। অতএব সদাশিবকে হয় অবিলম্বে ছুটি নিতে হবে, নয়তো বদলি হয়ে চলে যেতে হবে। অন্যথায় এ সব পাপ কি করে বিদায় করতে হয়, তিনি ভালো ভাবেই জানেন। উপসংহারে কিঞ্চিৎ রসিকতাও করলেন ভক্তদের আসরে, তাঁর নাম হোসেন সেখ নয়, বরদা পাল, মেয়ে-দারোগা নয়, মদ্দা-দারোগা।

সেই রাত্রির পর হেনা একদিনের তরেও বাড়ির বাইরে যায়নি। পাড়ার মেয়েরাও কেউ তার কাছে আসেনি। শুধু শোভা একদিন এসেছিল। তার বাবা জানতে পেরে রাগারাগি সুরু করেন। তারপর আর সাহস করেনি। মাঝে মাঝে সুরমাদি' আসেন। খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে আসেন। সংসারের কাজ সব ওঁর ঘাড়ে। একটি ঠিকা ঝি ছিল। বাসন মেজে ঘর নিকিয়ে দিয়ে যেত। ডাক্তারগিন্নীর ধমক খেয়ে খেয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। একদিন রাত্রিবেলা চুপি চুপি এসে জানিয়ে গেছে সে কতখানি নিরুপায়। সদাশিব বাবুর এত কালের বাহন যে শম্ভু, সে-ও দারোগা বাবুর ভয়ে বাইরে বাসা করতে বাধ্য হয়েছে। আফিসের কাজটুকু সেরেই চলে যায়। বাড়ির মধ্যে আসে না। যদি বা আসে, কখনো কচিৎ, এবং তাও লুকিয়ে। রোজকার বাজার এবং কেনাকাটা যা কিছু, সব রাখালকেই করতে হয়।

নতুন দারোগার নোটিশ যখন কানে এল, সত্যিই বড় ভাবনায় পড়লেন সদাশিব। এই জাতীয় লোক যে মিথ্যা দম্ভ করে না এবং কোনো কিছুই এদের অসাধ্য নয়, তার অনেক দৃষ্টান্ত তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। সেদিন সকালের আফিস শেষ করে যখন ভিতরে এলেন, বেলা প্রায় বারটা। শরীর-মন দুই-ই যেন ভেঙ্গে পড়ছে। বারান্দায় এসে বসলেন তামাকের অপেক্ষায়। শম্ভু যাবার পর থেকে তামাক

তুমি নিজেই সাজেন। হেনা টিকেগুলো ধরিয়ে এনে দেয়। আজ দেখলেন রাখাল এসে কল্কেটা বসিয়ে দিয়ে গেল। নলটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ তোর ইস্কুল নেই ?

—ইস্কুলে যাইনি, মামাবাবু।

—কেন ?

রাখাল নিরুত্তর।

—খালি খালি কামাই করছিস কেন ? বিরক্তির সুরে জানতে চাইলেন সদাশিব বাবু। ছেলেটা তখনো সাড়া দিচ্ছে না দেখে ধমকে উঠলেন। রাখাল কাঁদ-কাঁদ সুরে বলল, ও ইস্কুলে আমি পড়বো না।

—কেন ? মাষ্টার মেরেছে ?

—না।

—তবে ?

—দিদির নামে কী সব বিশ্রী কথা বলছে ওরা। এদিক-ওদিক চেয়ে তেমনি চাপা কান্নার সুরে বলল রাখাল।

সদাশিব বাবুও ভয়ে-ভয়ে ঘরের দিকে তাকালেন। যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই। দরজার পাশেই হেনার আঁচলটা চোখে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে এল, স্নান করবার তাগিদ নিয়ে। সদাশিব সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, ছাখ্, সে আসেনি বা চিঠি দেয়নি বলে আমাদেরও চুপ করে থাকা উচিত হয়নি। অসুখ-বিসুখও তো করতে পারে। তুই বরং একখানা চিঠি দে।

হেনা তিক্ত হাসি হেসে বলল, আমার অতো সময় নেই, বাবা !

—বেশ, তুই না লিখিস, আমিই লিখবো।

হেনা চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, না।

সদাশিব হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলেন, এটাও না, ওটাও না ; তবে কি করতে চাস, বল ?

হেনা চমকে উঠল। বাবার এই সুর, এই চোখ তার একেবারে অচেনা। মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে আরো ক্ষেপে গেলেন সদাশিব। চেঁচিয়ে উঠলেন, তোর জন্যে আর কত লাঞ্ছনা সইবো, বলতে পারিস ? হয় তুই বিদায় হ, নয় তো আমাকে বিদায় দে। আর পারি না আমি—বলে হাতের নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝড়ের মত চলে গেলেন আফিসঘরে।

হেনা দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্ত্তির মত। সারা জীবনে রূঢ় কথা দূরে থাক, চড়া সুরেরই একটা ডাকও সে শোনেনি বাবার কাছ থেকে। তৃণের চেয়েও নম্র, তরুর চেয়েও সহিষ্ণু, পরম বৈষ্ণব সদাশিব।

অনেক দিন পরে অকস্মাৎ আজ দাদাকে মনে পড়ে গেল। পাঁজর ভেঙে এল অব্যক্ত যন্ত্রণায়। দু'হাতে বুক চেপে ধরে কোনো রকমে টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বেরিয়ে প্রথমে রাখালের ভাত বেড়ে দিল। তারপর বাবাকে ডাকতে গেল আফিস-ঘরে। একবার ডাকতেই সদাশিব নিঃশব্দে উঠে এলেন। কুয়োতলায় স্নান সেরে যা পারেন, মাথা নিচু করে দুটো খেয়ে নিলেন। হেনাও একবার বসল গিয়ে ভাতের পাতে। কিন্তু ভাতের গ্রাস গলা দিয়ে নামতে চাইল না। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল। হাত ধুতে যাবার পথে হঠাৎ কানে গেল, বাবা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করছেন রাখালকে, তোর দিদি খেয়েছে রে ?

রাখাল বলল, খেয়েছে।

সারাটা দিন হেনার কেবলই মনে হতে লাগল, সুরমাদি কত দিন আসেন নি। সন্ধ্যার পর আর থাকতে পারল না। রাস্তার লোক চলাচল যেমনি বন্ধ হয়ে এসেছে, অমনি রাখালকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ফটক পার হতেই, সুরমা এগিয়ে এসে বললেন, এই যে হেনা, এস, এস। তুমি এলে ভালই হল, তা না হলে আমিই যেতাম তোমার কাছে।

—কই আর যান আপনি ? একটুখানি অভিমানের সুর লাগল হেনার উত্তরে। সুরমাদি' কি ভাবছিলেন। বোধ হয় কথাটা তেমন মনোযোগ দিলেন না। রাখাল বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলল, আমি যাই দিদি, কতক্ষণ পরে আসবো ?

—না, না, যাবে কেন ? উত্তর দিলেন সুরমা। বারান্দায় এসে বসো, দিদিকে আজ বেশীক্ষণ আটকাবো না।

শোবার ঘরে নিয়েই বসালেন হেনাকে। সাধারণ কুশল-প্রশ্নের পর বললেন, তোমার বাবা যে ছুটি নেবেন, বলেছিলে। তা কদ্দূর হল ?

—ছুটি নিতে চাইছেন না। কাছাকাছি কোথাও বদলির চেষ্টায় আছেন বোধ হয়।

—কাছাকাছি গিয়ে আর কী লাভ হবে ? কুকুরগুলো সেখানেও ধাওয়া করতে ছাড়বে না।

—এখানটা ছেড়ে নড়তে চান না বাবা।

সুরমা একটা নিঃশ্বাস চেপে বললেন, জানি। কিন্তু—হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে চাই হেনা ! একবার মনে হয়েছিল থাক, বলে কাজ নেই। এখন দেখছি, না, তোমার এটা শোনার দরকার। শুনে হয়তো আঘাত পাবে। কিন্তু তোমার ওপর আমার ভরসা আছে। এত দিন ধরে দেখছি আঘাতে ভেঙে পড়বার মত মেয়ে তুমি নও। তবু—বলে একটু থামলেন সুরমা।

হেনা স্থির কণ্ঠেই বলল, আপনি বলুন, সুরমাদি' ! আঘাত টাঘাত আমার বড় একটা লাগে না।

সুরমা বললেন, অলোক এসেছিল। ওকে তুমি জানো, আমার ছোট ভাই। একটু স্বদেশী-টদেশী করে।

হেনার মনে পড়ল সেই রাতটার কথা, একবার ঝুঁকে এসে গিয়েছিল তাঁকে দেখেছি আমি। তারপর আবার চেপে গেল।

সুরমা বলে চলছেন, ওকে বলেছিলাম বিকাশের খোঁজ নিতে। পরিচয় নেই ; তবু একই পথের পথিক তো।. ঘনিষ্ঠ মহল থেকে ঠিক খবরই এনেছে। বিকাশ একটা চাকরি পেয়েছে পাটনায়। মাঝে মাঝে কলকাতা আসে। আর—

হেনার একাগ্র মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তেমনি মৃদু কণ্ঠে বললেন, কিছু দিন আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে। ওদের পার্টিরই মেয়ে। অনেক দিন থেকে জানা-শোনা।

হেনার মনে হল ঘরখানা যেন দুলে উঠল। চোখ বুজে চেপে ধরল তক্তপোষের কোণটা। সুরমা সস্নেহে ডান হাতখানা তার কাঁধের উপর রাখলেন। ধীরে ধীরে সান্ত্বনার সুরে বললেন, মেয়েমানুষের জীবন মানেই দুঃখের জীবন। তার মধ্যে সমাজের

বড় দুঃখ হল বঞ্চনা। সেই জন্যেই শক্ত হবার প্রয়োজন তাদেরই সবচেয়ে বেশী।

ততক্ষণে হেনা অনেকখানি সামলে নিয়েছে। অবিচল কণ্ঠেই জবাব দিল, আমি শক্তই আছি, সুরমাদি'!

আর বিশেষ কোনো কথা হল না। কয়েক মিনিট পরে রাস্তায় বেরিয়ে এসে একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল হেনা।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নক্ষত্র-বিরল অন্ধকার আকাশের দিকে। শিশির-সিক্ত স্নিগ্ধ রাত্রি। সহসা মনে পড়ে গেল এমনি একটা রাত। উঠোনের আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দীপ্তিময় চোখ দুটো তার চোখের উপর তুলে মৃদু হেসে বলেছিল বিকাশ, আমি যদি কবি হোতাম, তোমার এই চোখ দুটো নিয়ে একটা কবিতা লিখতাম। হেনার মুখে এসে গিয়েছিল, ভাগ্যিস হননি; তাই চোখ দুটো আমার বেঁচে গেল। কিন্তু সে কথা সে বলতে পারেনি। তার আগেই কানে এসেছিল বিকাশের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, ওরা যখন হাসে, মনে হয় রাত্রির বুকের ভেতর থেকে শিশির ঝরে পড়ছে।

আর একদিন। কিছুক্ষণ হল সন্ধ্যা হয়েছে। শুক্লপক্ষের একাদশী কিংবা তার কাছাকাছি কোনো রাত। বাসায় ফিরছিল বিকাশ। হেনা দাঁড়িয়েছিল ওদের খিড়কির দরজার পাশে। পরনে ছিল চাঁপাফুল-রং-এর সাড়ী। খোঁপায় পরেছিল একটি অর্দ্ধস্ফুট বাতাবীফুলের গুচ্ছ। সর্বাঙ্গে বাসন্তী জ্যোৎস্নার প্লাবন। কয়েক পা গিয়ে একবার ফিরে দাঁড়াল বিকাশ। এক মিনিট তাকিয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে। তার পর বলল, তোমার এই নামটা কে দিয়েছিলেন হেনা?

—তা তো জানি না! বোধ হয় দাদা। কেন? সে-কথা জিজ্ঞেস করছেন যে?

—সব মানুষের বেলায় নামটা শুধু নাম; তোমার বেলায় ওটা পরিচয়।

আশ্চর্য! মুগ্ধকণ্ঠের এই সব বন্দনা সেদিন তার নারী-হৃদয়ে একটুও মোহ সঞ্চার করে নি। বুকখানা শুধু কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। আজ সেই কথাগুলো স্মরণ করে চোখ দুটো জ্বলে জ্বলে উঠছে, চৈত্রের মধ্যাহ্নে অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেমন ঠিকরে পড়ে অগ্নিদাহ। মানুষ ভাবে, একটু যদি জল হত। একটু যদি কাঁদতে পারত হেনা। কাঁদবে কেমন করে? সুরমাদি' ভুল করেছেন। এ তো বঞ্চনার দুঃখ নয়, প্রবঞ্চনার অপমান। তাই চোখে জল নেই, আছে শুধু জ্বালা।

হেনা বাড়ি ফিরে দেখল, বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। অসময়ে খেয়ে এ বেলায় আর খিদে হয়নি এবং রাতে যে কিছু খাবেন না, সে কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। হেনাও সেজন্যে পীড়াপীড়ি করেনি। রোজকার মত ওঁর উষাপানের ব্যবস্থা, অর্থাৎ এক গ্লাস জল বেরোবার আগেই টিপয়ের উপর রেখে গিয়েছিল। দরজার বাইরে থেকেই শোনা গেল তাঁর নাক-ডাকার শব্দ। ঘুমিয়ে পড়েছেন সদাশিব। রাখালকে খেতে দিয়ে নিজেও কিছু মুখে দিয়ে
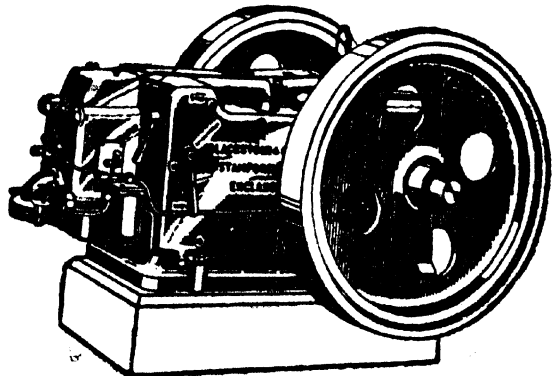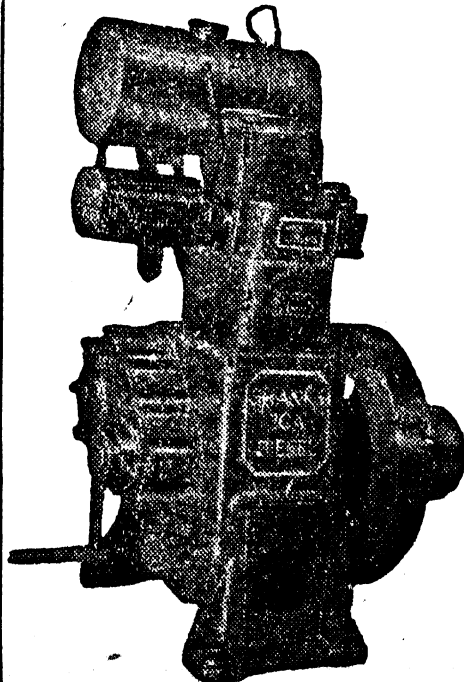
নিল। তারপর ঘরে গিয়ে সামান্ত দু'-একটা জামা-কাপড় খবরের কাগজে জড়িয়ে নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। একটুখানি কি ভাবল। কলমটা হাতে নিয়ে বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা গভীর নিঃশ্বাস। তারপর তাড়াতাড়ি করে লিখে গেল—

"বাবা, আমি চলে যাচ্ছি। তোমাকে বলতে গেলে তুমি যেতে দেবে না। তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমারও হয়তো পা উঠবে না। তাই রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রতিবেশীরা এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, হয়তো মনে মনে খুসী হবেন এই ভেবে যে, আমার মত একটা কুলটা মেয়ের এইটাই স্বাভাবিক পরিণাম। তারা কী ভাববেন, তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। আমার ভাবনা শুধু তোমার জন্যে। তোমাকে ছেড়ে যাবার যে দুঃখ সেটা হয়তো একদিন সইতে পারবো। কিন্তু তুমি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও মনে কর, তোমার ওপর রাগ করে, অভিমান করে চলে গেছি, দূরে গিয়েও সে কষ্ট আমার সইবে না। না, বাবা, তোমার নামে দিব্যি করে বলছি, আমি রাগ করে যাচ্ছি না। যাচ্ছি, কারণ যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

তুমি যে কত বড় আঘাত পাবে সে কথা আমার চেয়ে কে বেশী জানে? তবু আমাকে যেতে হল।

কোথায় যাবো, সে কথা ভাবতে গেলে আর যাওয়া হয় না। আমাদের যারা আপনার জন, তাদের দরজা আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। শুনেছি, আমাদের খোঁজ-খবর না রাখলেও, আমার কলঙ্কের কাহিনী কাকীমাদের কানেও পৌঁছে গেছে। মামারাও হয়তো জানতে পেরেছেন আমার পরিচয়। আজ আমার জন্যে খোলা আছে শুধু অন্তহীন পথ। তারই আশ্রয় নিলাম।

এবার তোমাকে যে কাজগুলো করতে হবে, তাই বলে যাচ্ছি। আমার মাথার দিব্যি রইল, এর একটাও যেন ভুলে যেও না, কিংবা ফেলে রেখো না। সকালে উঠেই শম্ভুকে ডেকে পাঠিয়ো। আগের মত এখানেই সে থাকবে। তোমাকে এবং রাখালকে দুটো রান্না করে দেবে। তারপর দু'-চারদিনের মধ্যেই রাখালকে পাঠিয়ে পিসীমাকে আনিয়ে নিও। আমার ওপর তিনি খুসী নন বলে তুমি তাকে আনতে চাওনি। হয়তো চাইলেও তিনি আসতেন না। কিন্তু সেজন্যে তার ওপর কোনো ক্ষোভ রেখো না। পিসীমার কোনো দোষ নেই। তা ছাড়া তুমি তো জানো, দাদা তাঁকে কথা দিয়ে এসেছিল। পিসীমা এসে থাকতেন, তোমার ভার নেবেন, এই ছিল তার শেষ ইচ্ছা।

আমার জন্যে ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করো না। কিংবা মিছেমিছি খোঁজাখুঁজি করবার চেষ্টা করো না। যখন যেখানে থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ চিরদিন আমাকে রক্ষা করবে, এই বিশ্বাস নিয়ে চললাম।

আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো।

তোমার হেনা।"

পুনশ্চ দিয়ে লিখল, "হাত-বাক্সের চাবিটা আমার বালিশের নিচে রেখে গেলাম। সংসার খরচের বাকী টাকাটা ওর মধ্যেই রইল। না, বাবা, আমি খালি হাতে যাচ্ছি না। ক' বছর থেকে পূজোর সময় তোমার কাছ থেকে পার্বণী পেয়েছি, তার সবটাই এত দিন জমিয়ে রেখেছিলাম। সামান্য হলেও এটাই আমার সব চেয়ে ব[illegible] সম্পদ।"

আরেকখানা কাগজ নিয়ে রাখালকে লিখল—"রাখাল ভাই, লক্ষ্মী হয়ে থেকো। মামাবাবুর অবাধ্য হয়ো না। তাঁকে সব সময়ে চোখে চোখে রেখো। তাঁর মত কাকিয়ে যত গাঁগগির পার, পিসীমাকে নিয়ে এসো। আমার কথা নিয়ে ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করো না। যে যাই বলুক সয়ে যেও। মন দিয়ে লেখাপড়া করো। একদিন যেন মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পার। সেই আশা নিয়ে দাদা তোমাকে নিয়ে এসেছিল, এ কথা কোনো দিন ভুলো না।

দিদির জন্যে কোনো দিন দুঃখ করো না।

দিদি—।"

আলাদা খামে চিঠি দুটো বন্ধ করে বাবার ঘরের সামনে বারান্দায় যে মোড়াটা আছে তার উপর চাপা দিয়ে রাখল। সকালে উঠে ঐখানে বসে সদাশিব রোজ তামাক খেয়ে থাকেন। আর একবার বন্ধ দরজায় কান লাগিয়ে শুনতে পেল নিয়মিত নিঃশ্বাসের শব্দ। তার পর কপাটের উপর মাথা ঠেকিয়ে বাবার উদ্দেশে শেষ প্রণাম রেখে খিড়কির দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল। চার দিকে নিঃসাড় নিঝুম। পাতলা কুয়াসার আবরণের নিচে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো। শরৎ-রাত্রির সিক্ত বাতাস, কোথা থেকে বয়ে নিয়ে এল এক ঝলক শিউলির গন্ধ। আঁচলটা মাথায় তুলে দিয়ে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে ষ্টেশনের পথে পা বাড়াল হেনা। কয়েক পা এগিয়ে একবার ফিরে চাইল সেই ফেলে-আসা ঘরগুলোর দিকে। জন্মভূমি না হলেও ওখানেই কেটেছে তার অনেকগুলো বছর। ঐ বাড়িতেই তার মা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন; ওখান থেকেই দাদা তার শেষ যাত্রায় বেরিয়েছিল। আজ সে-ও চলল। হয়তো তারও এটা শেষ যাত্রা। হঠাৎ বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। কোথা থেকে ছুটে এল একরাশ চোখের জল। ঝাপসা হয়ে গেল পথের রেখা। আঁচলে চোখ মুছে আর কোনো দিকে না চেয়ে পা চালিয়ে উঠে পড়ল বড় রাস্তায়।

ঘণ্টাখানেক পরেই বাহাদুরনগরের ঘাট ছেড়ে মেইল ষ্টীমার ছুটে চলল খুলনার পথে।

সমস্ত রাতটা কেটে গেল এলোমেলো নানা চিন্তায়। তার পর কখন একটু তন্দ্রামত এসেছিল, হেনা জানতে পারেনি। হঠাৎ ষ্টীমারের বাঁশীর শব্দে জেগে উঠে দেখে সকাল হয়ে গেছে। একটা কী ষ্টেশনে খানিকক্ষণ থেমে আবার চলতে শুরু করল ষ্টীমার। মেয়ে-কামরার সামনে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে সে-ও উঠে গিয়ে দাঁড়াল সেই রেলিং-এর ধারে।

ভাঙন পাড় ঘেঁষে ষ্টীমার চলছে। বড় বড় গাছগুলো ঝুঁকে আছে। যে কোনো মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, তলিয়ে যাবে রাক্ষসী আড়িয়াল খাঁর অতল গর্ভে। বাঁশবনের ফাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছে একটা টিনের চালা কিংবা খড়ের চালের চূড়া। ক্ষণেকের তরে দেখা দিয়ে আবার হারিয়ে যাচ্ছে গাছপালার আড়ালে। হঠাৎ দাদাকে মনে পড়ল। এমনি কোনোখানে দুর্দ্দান্ত নদীর কোন আবর্ত্তের মাঝে সে হারিয়ে গেছে, তার এতটুকু চিহ্নও কোনো দিন কেউ খুঁজে পাবে না। আস্তে আস্তে কখন এক সময়ে তার চোখের উপর থেকে লুপ্ত হয়ে গেল

সামনেকার ঐ বনশ্রেণী, ঐ ভেঙে-পড়া পাড়, ঐ গৃহস্থের কুটীর, ঐ চলন্ত নৌকার সারি। সব ছাপিয়ে জেগে উঠল তারই জীবনের কত খণ্ড খণ্ড চিত্র। বার বার করে দেখা দিল বাবার শীর্ণ মুখখানা। তার উপর জ্যোতিহীন ক্লান্ত দুটি চোখ, দুঃখে, শোকে বেদনায় পরিম্লান।

এই তো সেদিনের কথা। জ্বরে পড়েছিলেন সদাশিব। চোখ বুজে শুয়েছিলেন নির্জীবের মত। হেনা আস্তে আস্তে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, আর ভাবছিল, বাবা যদি তাড়াতাড়ি সেরে না ওঠেন, কী করবে সে, কেমন করে সামলাবে সব দিক? সদাশিব অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কী ভাবছিস, মা!

—কিছু না বাবা, তুমি ঘুমোও।

—আমার এখন ঘুম পাচ্ছে না। তুই আর কতক্ষণ বসে থাকবি। এবার ওঠ; বাইরেটা একটু ঘুরে আয়।

হেনা সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, মেয়ে না হয়ে আমি যদি তোমার ছেলে হোতাম? সদাশিবের মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভীত কণ্ঠে বললেন, না, মা, কাজ নেই তোর ছেলে হয়ে। ছেলে তো আমায় দিয়েছিলেন ভগবান। কী লাভ হল? বুড়ো বাপের মুখের দিকে তাকাল একবার? ঘর ছেড়ে পথের পানে ছুটল। প্রাণও দিল সেই পরের জন্যেই। না, না। ছেলে চাই না আমি। তুই মেয়ে হয়েই থাক আমার কাছে।

হেনা হেসে বলেছিল, এ তোমার উল্টো কথা হল, বাবা! মেয়েই তো সব চাইতে পর। কাছে থেকেও ভার, দূরে গিয়েও ভাবনা। বুড়ো বাপ খেটে মরছে, একদিন একটু বিশ্রাম নেবার অবসর নেই, তখন কোন্ কাজে লাগে সে? মেয়ে কি কোনো দিন বলতে পারে, বাবা, তুমি একটু জিরিয়ে নাও; তোমার বোঝাটা আমি কাঁধে তুলে নিলাম?

সদাশিব মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানালেন, সেটা তো মেয়ের কাজ নয়, মা! বাপের বোঝা না বইলেও, অনেক কিছুই তাকে বইতে হয়। আর কিছু যদি না-ও করে, শুধু একটুখানি তাকায় তার মুখের পানে, হাতখানা বুলিয়ে দেয় বুকের ওপর, বুঝতে চেষ্টা করে কোথায় তার ব্যথা। কিসের তার অভাব, সেই কি কম? সংসারে কার দাম যে কত, আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি।

বলে হেনার হাতখানি টেনে নিয়েছিলেন বুকের উপর। সেই নিঃস্ব, অসহায় মানুষটিকে একা ফেলে রেখে সে চলে যাচ্ছে! তাঁকে দুঃখের হাত থেকে, অপরাধ-লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাবার আর কোনো পথ নেই! কে জানে, বাবার সঙ্গে হয়তো এই তার শেষ দেখা। আবার ঝাপসা হয়ে এল চোখের দৃষ্টি।

সকালের দিকে ট্রেণ যখন শেয়ালদ'র কাছাকাছি এসে পড়েছে, পাশ থেকে একটি বর্ষীয়সী মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাবে, বাছা? হেনা বসেছিল বাইরের দিকে মুখ করে। হঠাৎ চমকে উঠল, তাই তো কোথায় যাবে, সে তো জানে না! কিন্তু উত্তর একটা দিতেই হবে। বলল পটলডাঙ্গা।

—কে আছেন সেখানে?

—আমার কাকীমার বাড়ি।

—তোমার সঙ্গে কোনো ব্যাটাছেলে নেই?

—না।

—একলা যাবে কেমন করে?

—ষ্টেশনে আমার দাদা আসবে।

মহিলাটি আর কোনো প্রশ্ন করলেন না কিন্তু তার ঐ একটি কথাতেই হেনার সম্বিৎ ফিরে এল। সমস্ত মনটা জুড়ে মাথা তুলে উঠল ঐ একটি প্রশ্ন—তাই তো, কোথায় যাবে সে? কাকীমার বাড়ি যাওয়া হবে না, কালীঘাটে মামাবাড়ির কারা সব থাকেন; সেখানেও ওঠা অসম্ভব। ছেলেবেলা একবার মাত্র এসেছিল কলকাতায়। সে কথা ভালো করে মনেও পড়ে না। চেষ্টা করলে তার মত মেয়েরা কোনো আশ্রম-টাশ্রমে কিছুদিনের জন্যে আশ্রয় পেতে পারে, এই রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কিছুই সে ভেবে দেখেনি। সেই ভাবনাই এখন আসন্ন সমস্যার রূপ নিয়ে একেবারে মুখোমুখী এসে দাঁড়াল। সম্ভব, অসম্ভব অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল অতসীর কথা। বছর দুই আগে বাহাদুরনগরে তার বাবা ছিলেন সাব রেজিষ্ট্রার। ওখানে থাকতেই তার বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। বড় ভাব ছিল হেনার সঙ্গে। যাবার সময় গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কোলকাতায় গেলে নিশ্চয়ই যাবি কিন্তু। নৈলে এ জন্মে তোর মুখ দেখবো না। ঠিকানাটাও বলেছিল বার বার করে। এখনো মনে আছে—২২।৭ বৈঠকখানা রোড। শেয়ালদ' ষ্টেশনের কাছেই—বলেছিল তার বর। ভদ্রলোক ভারী লাজুক। অতসীর পেছনে দাঁড়িয়ে কোনো রকমে বলে ফেলেছিল, 'নেমন্তন্নটা কিন্তু দুজনের তরফ থেকেই রইল।' ওদের ওখানে উঠলে কেমন হয়? তারপর ওরাই হয়তো একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে আবার ভাবনায় পড়ল হেনা। অগণিত মানুষের মিছিল। অসংখ্য গাড়িঘোড়ার স্রোত। সবাই ছুটে চলছে নিজের ধান্দায়। কারো দিকে ফিরে চাইবার অবসর নেই। চলতে চলতে দু-একজন শুধু তাকিয়ে গেল মুখের দিকে। কৌতূহলহীন নির্বাক দৃষ্টি। হেনা এতকাল জানত, মানুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে হলে চাই নির্জনতা। আজ প্রথম অনুভব করল, এই জনারণ্যই হচ্ছে গাঢ়তর আবরণ, যার নিচে আরো স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকা যায়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে এই সব কথাই বোধ হয় ভাবছিল।

"কাঁহা যাইবো দিদি?" চমকে উঠল। গলাটা যেন ওদের থানার সিপাই বলরাম সিংএর মত। সে-ও ওকে দিদি বলে ডাকত, আর কথাও বলত ঐ রকম ভাঙা বাংলায়। তাকিয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে এক বুড়ো রিক্সাওয়ালা। মুখ দেখেই বোঝা যায় সকাল থেকে কোনো সওয়ারী জোটেনি। হেনা বলল, বৈঠকখানায় যাবো।

—উঠ্, যাও। একটা সিকি বউনি দিব।

হেনা উঠে বসল।

নম্বর দেখে দেখে ২২।৭ বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল। খুলে দিল একটি বৌ। কাঁকে চাই? হেনা জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। ওমা, তুই কোত্থেকে? বলে, ওর হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল অতসী।

—[illegible] এসেছিলি। তাই এলাম।

—ঈস্! অল্পের জন্য তোর সঙ্গে দেখা হল না। এই দশ মিনিট হোল বেরিয়ে গেল।

—কোথায় গেলেন?

—বর্দ্ধমান। বদলি হয়ে গেছে এই তিন মাস।

—তাহলে এখন বিরহের পালা?

—বিরহ না ছাই! একটা শনিবারও বাদ যায় না। কিন্তু—হেনার সীঁথির দিকে তাকিয়ে বলল অতসী—তোর মতলবটা কি বল তো? যোগিনী সেজেই থাকবি নাকি চিরকাল? হেনা তেমনি হাসতে লাগল। অতসী জিজ্ঞাসা করল, কার সঙ্গে এসেছিস?

—কারো সঙ্গে নয়; একা।

কে, বৌমা? বলে, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একটি প্রৌঢ়া বিধবা। অতসী ফিস-ফিস করে বলল, শাশুড়ী। তারপর জবাব দিল, আমার সই হেনা। হেনা এগিয়ে গিয়ে মহিলাটির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তিনি ওর চিবুক স্পর্শ করে বললেন, এসো মা! কোত্থেকে আসছ?

—বাহাদুরনগর।

—ও, তোমার বাবা যেখানে ছিলেন? প্রশ্ন করলেন অতসীকে।

সে মাথা নাড়ল।

—ওখানেই বুঝি তোমাদের বাড়ি?

—না, আমার বাবা ওখানে চাকরি করেন।

—কী চাকরি?

—পোষ্টমাষ্টার।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন হেনার দিকে। তার পর পুত্রবধূকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, এর কথাই না তোমার বাবা সেদিন বলে গেলেন?

অতসী চাপা গলায় বলল, বাবা তো নিজে কিছু জানেন না। আমরা ওখানে থাকতে একজন কেরাণী ওঁর কাছে কাজ করত। কথায় কথায় কী সব ছাইভস্ম বলে গেছে। লোকটা ভালো নয়। ওর কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

—না, বৌমা। যা রটে, তার কিছুটা তো বটে।

অতসী তেমনি ফিস-ফিস করে বলল, আস্তে বলুন। শুনতে পাবে।

কিন্তু তার শাশুড়ী-ঠাকরুণের গলাটা একটু বরং চড়েই গেল। বললেন, ওকে যেন রান্নাঘরে-টরে নিয়ে বসিও না। ওখান থেকেই দু'-চার কথা বলে বিদায় করে দাও। আর আমার কাপড়টা দিয়ে এসো কলতলায়। বলে, তিনি বোধ হয় আর একবার স্নানের উদ্দেশে সেই দিকেই চললেন।

অতসী ফিরে আসতেই হেনা উঠে পড়ে বলল, এবার চলি, কেমন? তোর কর্ত্তাকে—

অতসী খপ্ করে তার হাতটা চেপে ধরে দৃঢ়স্বরে বলল, না।

হেনা ম্লান হেসে বলল, পাগল! নে, ছাড়। বেলা হল।

—না, ছাড়বো না। অন্তত আজকের দিনটা তোকে থেকে যেতে হবে!

—মাথা খারাপ করিস নে অতসী, গম্ভীর সুরে বলল হেনা।

—না, হেনা, মাথা আমার ঠিকই আছে। তুই যদি সত্যিই চলে যাস, বুঝবো, আমাদের এত দিনের ভালবাসা সব এ সব ভুয়ো।

হেনা ভাবতে লাগল। হঠাৎ উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল অ ও হরি! একটা জিনিষ তো তোকে দেখানোই হয়নি—বলেই ছু গিয়ে ঢুকল ওদিকের একটা ঘরে। যখন ফিরল, কোলে এ বছরখানেকের ঘুমন্ত মেয়ে, যেন একরাশ কুন্দফুল। হেনার দি বাড়িয়ে ধরে বলল, কেমন হয়েছে, বল দিকিন? হেনা কিছুই ব পারল না। নেতিয়ে-পড়া বাচ্চাটিকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল

শাশুড়ী আর উচ্চবাচ্য করলেন না। রান্না-খাওয়া সেরে নি ঘরে চলে গেলেন। তারপর দুই সখীতে পাশাপাশি খেতে ব খুলে দিল গল্পের ভাণ্ডার।

বিকালের দিকে হেনা বসেছিল বারান্দায়। অতসী গে কলতলায় গা ধুতে। হঠাৎ উঠোনের ওদিকটায় একখানা ঘর থে কেমন একটা কাতরানির শব্দ কানে এল। মেয়েমানুষের গল আওয়াজটা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। হেনা ব্যস্ত হয়ে উঠল। অ কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় একজন ঝি ছুটতে ছুট যাচ্ছিল গেটের দিকে। হেনার প্রশ্নের উত্তরে বলল, ব্যথা উঠে সেই সকাল থেকে। প্রথম হচ্ছে কি না। চলে আজ্জিনে বি চারটা হতে পারত। কষ্ট তো একটু হবেই বাছা! বল আমার দম আটকে আসছে। আমি এখন কী করি বল তো বাবু গেছে ডাক্তার ডাকতে। বাড়িতে দ্বিতীয় মনিষ্যি নেই।

—তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

—কোথায় আর যাবো! দেখছিলাম, বাবু আসছে কি না।

—চল তো, দেখি।

—তুমি যাবে? এসো, বাছা এসো। তুমি বুঝি এদের কে হও?

—হ্যাঁ, চলতে চলতে বলল হেনা।

—ওরাও এদেরই ভাড়াটে। একখানা ঘর নিয়ে স্বামি-স্ত্রী থাকে। আমি ঠিকে কাজ করি। বাবু বলল, তুমি একটু বসে বাতাসীর মা। আমি যাবো আর আসবো। তা, আর ফিরব নাম নেই। আমার কি এক জায়গায় বসে থাকলে চলে?

বৌটি তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করছে। হেনা কাছে গিয়ে বসতে ঘোলাটে চোখ দুটো ওর মুখের উপর তুলে বলল, উনি এখন এলেন না?

—এই তো এখনই এসে পড়বেন। আপনার কী কষ্ট হচ বলুন?

—দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না। অ বাকী কথাটা আটকে গেল।

—থাক; চুপ করুন। আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। এখু কমে যাবে।

খানিকটা শুশ্রূষার পর বৌটি অনেকখানি আরাম বোধ করল হেনার হাতখানা চেপে ধরে বলল, আমাকে ফেলে তুমি চলে যাবে ন বল?

—না, না। আপনি সুস্থ হোন্। আপনার খোকা না হে আমি যাচ্ছি নে।

বৌটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোমাদের কথা আমি বি

কিছু শুনতে পেয়েছি। অতসী বড় ভালো মেয়ে। কিন্তু বুড়ীটা দজ্জাল। তুমি ওখানে থাকতে পারবে না, ভাই!

হেনা চমকে উঠল। কিন্তু ওকে সেটা বুঝতে না দিয়ে বলল, আমি তো ওখানে থাকতে আসিনি। সে যাক্ গে। আপনি আর কথা বলবেন না।

হঠাৎ একটা দমকা ব্যথায় বৌটি আর্তনাদ করে উঠল। ঠিক সেই সময়ে ডাক্তারও এসে পড়লেন। পেছনে তার স্বামী। রোগিনীকে পরীক্ষা করে বললেন, একে এখনই কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। হাসপাতালের নাম শুনে বৌটি কান্না সুরু করল। তার স্বামী অনেক করে বোঝালেন, তোমার কিছু ভয় নেই, বিনু! খুব ভালো হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে তোমার কোনো কষ্ট হবে না। কিন্তু বিনতার সেই এক উত্তর—মরি তো এখানেই মরবো। হাসপাতালে যাবো না।

ডাক্তার তার পাশে বসে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, হাসপাতালে যেতে আপনার আপত্তি কিসের? ছোঁয়া-লেপার বাছবিচার নেই বলে?

—না। ও-সব আমি মানি না।

—তবে?

এ কথার উত্তর দিলেন তার স্বামী। বললেন চব্বিশ ঘণ্টা তারা যে আমাকে কাছে থাকতে দেবে না।

—এই ব্যাপার! মৃদু হেসে বললেন ডাক্তার, তাহলে নিয়ে চলুন আমার নার্সিংহোম্-এ। সেখানে কাছে থাকায় কোনো বাধা নেই।

স্বামীটি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তারপরেই শুষ্ক মুখে বললেন, কিন্তু ওখানকার খরচ পত্তর আমার সাধ্যের—

—আহা, চলুন না? খরচের জন্যে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বলেই আর এক বার তাড়া দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার সেন। বিনতা রাজী হল। কিন্তু জিদ ধরে বলল, হেনাকেও তার সঙ্গে যেতে হবে। স্বামীর দিকে ফিরে বলল, ও আমার আর জন্মের বোন। হঠাৎ কোত্থেকে এসে পড়ল। তা না হলে, তোমরা এসে আমাকে দেখতে পেতে? কখন মরে পড়ে থাকতাম।

হেনা পড়ল মহা সমস্যায়। নিতান্ত অপরিচিত একটি মেয়ের এই অদ্ভুত আব্দার দেখে একটু বিরক্তও হল মনে মনে। কিন্তু সে ভাব গোপন রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? সেখানে কত ভালো নার্স আছে। তারাই আপনাকে দেখবে। আমার কোনো দরকার হবে না। আমি বরং পরে গিয়ে আপনাকে আর আপনার খোকাকে দেখে আসবো।

বিনতার স্বামীও অনেক করে বোঝালেন। শেষের দিকে একটু বিরক্তির সুরেই বললেন, ওঁকে আর কত কষ্ট দেবে? নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবেন তোমার সঙ্গে? আর ওঁর অভিভাবকরাই বা যেতে দেবেন কেন?

বিনতা কোনো উত্তর করল না। সে অবস্থাও তার নয়। কিন্তু হেনার হাতখানা সে কিছুতেই ছাড়ল না। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ভদ্রলোক অনুনয়ের সুরে বললেন হেনার দিকে চেয়ে, আপনার যদি একান্ত অসুবিধা না হয়, ওর মুখ চেয়ে আর একটু দয়া করুন। একবারটি চলুন আমাদের সঙ্গে। পরে সুবিধা বুঝে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো। দেরি করলে ওকে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না।

এর পরে আর আপত্তি করা চলে না। মোটামুটি ব্যাপারটা দেখে এবং শুনে অতসীও সায় দিল।

তার পর ছত্রিশ ঘণ্টা যমে-মানুষে টানাটানির পর বিনতা বেঁচে উঠল। যম তার দাবি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু আর একটা জীবনের বিনিময়ে। মায়ের জন্যে প্রাণ দিল তার অনাগত সন্তান। শিশু ভূমিষ্ঠ হল। কিন্তু পৃথিবীর আলোয় চোখ খুলল না। পৃথিবীর বাতাসে পড়ল না তার প্রথম নিঃশ্বাস। বৃদ্ধ ডাক্তার সান্ত্বনা দিলেন। সেই চিরন্তন সান্ত্বনা—যে যাবার, সে যাবেই। তার জন্যে দুঃখ করো না, মা! গাছের সব ক'টা ফল কি টি'কে যায়?

হাসপাতালের মেয়াদ যেদিন শেষ হল, ডাক্তার এলেন দেখা করতে। ঘরে আর কেউ ছিল না। বিনতা প্রণাম করে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, ডাক্তার বাবু!
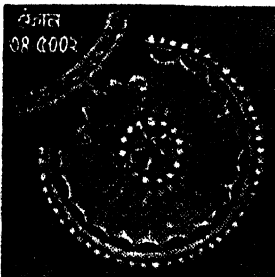
—বেশ তো, বল।

—হেনাকে তো আপনি ক'দিন ধরেই দেখলেন। ওকে একটু আশ্রয় দিতে হবে।

হেনা একটা কি হাতে করে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। নিজের নাম কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না, বোধ হয় ভাবতে লাগলেন। বিনতা আবার বলল, ও আমার সত্যিকার বোন নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী। সে তো আপনি নিজের চোখেই দেখলেন। ও আমার জন্যে যা করেছে, বোন কেন,

মা'-ও তা করত না। ওর আপনার জন কে আছেন, না আছেন, আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছি, যে কারণেই হোক, কোথাও ওর যাবার জায়গা নেই। আমার একখানা ঘরের সংসারে ওকে নিয়ে যেতে পারি না। পারলেও ও যেতে চাইবে না। কারো গলগ্রহ হয়ে থাকবার মেয়ে ও নয়। এখানে আপনার কত রকমের কাজ। তারই মধ্যে একটা সংস্থান যদি ওর জন্যে করে দিতে পারেন, একটা মেয়ে বেঁচে যায়।

ডাক্তারের কথা শোনা গেল, এই ক'দিনে যা দেখলাম, মেয়েটি সত্যিই আশ্চর্য! কিন্তু ওর করবার মত কোনো কাজ তো আমার এখানে দেখি না?

—নার্সের কাজ-টাজ?

—নার্স যে ক'জন দরকার, আমার আছে। তা ছাড়া, নার্সিং করতে হলে ও লাইনে কিছুটা পড়াশুনো এবং খানিকটা ট্রেনিংও দরকার। তা না হলে চলে না। আমার এখানে একজন ঝি-এর দরকার ছিল। কিন্তু সে কাজ তো ওকে দেওয়া যায় না?

—না, না, ছিঃ। ঝি-এর কাজ ও করতে যাবে কেন? তা হলে, আপাতত আমিই ওকে বলে কয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা কিন্তু আপনার ভরসাতেই থাকবো।

ডাক্তার কি বলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে হেনা ঘরে ঢুকে পড়ল। বিনতা বলল, অনেক দিন বাঁচবি। এই মাত্র তোর কথাই বলছিলাম ডাক্তার বাবুকে।

হেনা বলল, আমি সব শুনে ফেলেছি দিদি, যদিও আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কথা শোনা অন্যায়। কিন্তু আমার যা অবস্থা, ও-সব ভাবতে গেলে চলে না।

ডাক্তারের দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, আপনার ঐ ঝি-এর কাজটাই আমাকে দিতে হবে, ডাক্তার বাবু! আমি খুব করতে পারবো।

—কী বকছিস পাগলের মত, ধমকের সুরে বলল বিনতা।

—না, দিদি, তুমি আপত্তি করো না। ঝি-এর কাজ মানে বাসন-মাজা, বাটনা-বাটা, ঘর-ঝাঁট দেওয়া, বিছানাপত্তর তোলা-পাড়া, এই তো? ও-সব আমার অভ্যাস আছে। বাড়িতে সবই তো আমাকে করতে হত।

ডাক্তার হেসে ফেললেন, তুমি ভুল করছ। এটা অভ্যাস [illegible] পারা না পারার ব্যাপার নয়।

—আপনি যা বলতে চান আমি বুঝতে পেরেছি, সঙ্গে [illegible] জবাব দিল হেনা। সে সব ভেবেই বলেছি, মন আমার [illegible] আছে। কাজকে কাজ বলেই দেখবো। মান-মর্যাদার [illegible] তাকে জড়িয়ে ফেলে আপনাকে বিব্রত করবো না। আ[illegible] যদি আমার সব কথা জানতেন, তাহলে বুঝতেন, ও সব বে[illegible] বয়ে নিয়ে বেড়ালে আমার চলে না। ঘর ছাড়বার [illegible] সঙ্গেই ও সব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

কথাগুলো হালকা সুরেই বলতে চেয়েছিল হেনা। কিন্তু শে[illegible] দিকে স্বরটা কেমন গভীর হয়ে উঠল। হঠাৎ লক্ষ্য করল, ডা[illegible] এবং বিনতা দুজনেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার মু[illegible] দিকে।

শেষ পর্যন্ত দু'জনকেই মত দিতে হল। মনোরমা নার্সিং[illegible] ঝি-এর কাজে বহাল হল হেনা মিত্র। এই ঘরগুলোর মধ্যেই মনো[illegible] সেন একদিন স্বামি-পুত্রকন্যা নিয়ে সংসার পেতেছিলেন। [illegible] সন্তানের জন্মের সময় সেই সাজানো সংসার থেকে হঠাৎ তাঁকে বি[illegible] নিতে হল। ধাত্রীবিদ্যায় অতবড় দিকপাল হয়েও ডাক্তার সেন নি[illegible] স্ত্রীকে ধরে রাখতে পারলেন না। মা হতে গিয়ে এ রকম [illegible] মেয়েকেই তো অকালে চলে যেতে হয়। ডাক্তার মানুষের সে[illegible] দুঃখ করা চলে না। কিন্তু মনোরমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী—হাসপা[illegible] এবং চিকিৎসার কতকগুলো ত্রুটি, এই ক্ষোভটা ডাক্তার সেন কোনো [illegible] ভুলতে পারেন নি। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসা[illegible] ছেলে পড়াশুনো শেষ করে চাকরি পেয়ে চলে গেল দিল্লী। মেয়ে[illegible] বিয়ে দিয়ে দিলেন। বাড়িটা তখন ফাঁকা হয়ে গেল, তেতা[illegible] দুখানা ঘর নিজের জন্যে রেখে, বাকী সবটা জুড়ে গড়ে তুললেন [illegible] নার্সিং-হোম। প্রসূতি এবং নানা জটিল স্ত্রীরোগে যারা ভে[illegible] তারাই এখানকার অধিবাসিনী। এই ছোট প্রতিষ্ঠানের [illegible] প্রিয়তমা পত্নীর নামটা যুক্ত করে তাকে অমরত্ব দান করবেন, এ র[illegible] কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। এখানে যারা আসবে, ত[illegible] মনোরমার মত কেউ যেন অযত্নে, অবহেলায় কিংবা অব্যবস্থায় প্রা[illegible] না দেয়, এই কথাটা সর্বক্ষণ মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখবার [illegible] এই নামকরণ।

[ক্রমশঃ

পিয়াসা

শ্রীসমীরকুমার রায়

চকোর চুমিছে চাঁদের জোছনা বেলাভূমি চুমি সাগর ধায়
দূরদিগন্ত কত না আদরে চুমিছে শ্যামল বনানী-ছায়।
দখিণা সমীর ধীরে কাছে এসে চুমু এঁকে দেয় ধানের ক্ষেতে,
ঘুম দিয়ে যায় স্বপনের চুমু তন্দ্রালু দুটি আঁখির পাতে।
তবু ওগো প্রিয়া সবই মিছে মোর কিছু দাম তার নাই
আমার তৃষিত অধরে যদি না তোমার মধুর চুমুটি পাই

এক মুঠো আকাশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

পরদিন সকালবেলা শ্যামল বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাড়ী থেকে বেরুল বটে, কিন্তু ট্রাম চলতে সুরু করতেই নানা রকম ভাবনা এসে তার মাথায় জড়ো হয়। আবার সেই মামার বাড়ী যেতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। এই ক'দিন আগে সে সেখান থেকে অপমানে লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এসেছে, কোন মুখে আবার সেই বাড়ীতে ঢুকবে? চাকর-বাকর, মামাতো ভাইরা। তাদের কথা মনে হতেই শ্যামলের ভীষণ লজ্জা হয়। হয়তো বটুমামা আবার তাকে যা-তা কথা শোনাবেন। কি প্রয়োজন তার সেখানে গিয়ে? বাবার উপর তার কোন আস্থা নেই। ছোটবেলা থেকেই দেখেছে মামার কথায় উনি ওঠেন বসেন। নতুন কিছু তাঁর কাছে আশা করা ভুল। নয়তো আবার সেই মামার বাড়ীতেই দেখা করতে বলবেন কেন? শ্যামল তো পরিষ্কার করে সব কথা লিখে দিয়েছিলো।

মামাবাড়ীর কাছাকাছি এসে শ্যামল ট্রাম থেকে নেমে পড়ে। সামনের চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ গরম চা খায়। সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এতক্ষণে মনে মনে সে স্থির করে ফেলেছে আজ আর মামাবাড়ী যাবে না।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে শ্যামল সোজা গেল মদনের আড্ডায়। অনেক দিন বাদে দেখা। মদন উঠে এসে আশ্চর্য্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, কি খবর তোর, এত দিন আসিস নি কেন?

শ্যামল নীরস গলায় বলে, কেন শুনিসনি?

—কি?

—আমি এখন আর মামাবাড়ীতে নেই।

—কেন? কোথায় আছিস?

শ্যামল আস্তে আস্তে সব ঘটনার বর্ণনা করে। মদন শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সহানুভূতির স্বরে বলে, তুই এখন কেষ্টদা'র কাছে?

—হ্যাঁ, বেহালায়।

—ঠিকানা কি?

শ্যামল ঠিকানা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বলে, দরকার হলে চিঠিই দিস। গেলে হয়তো দেখা হবে না, কখন বাড়ী থাকি ঠিক তো নেই।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে। মদন বলতে সাহস করে না যে চুনীলালই শ্যামলের মামার কাছে এ সব কথা বলেছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, তোর মামা এ সব ব্যাপার জানলেন কি করে?

শ্যামল মুখ ব্যাঁকায়, কে জানে! বোধ হয় স্কুল থেকে লাগিয়েছে—

মদন বোঝে জগৎ বাবু চুনীলালের কথা শ্যামলকে বলেন নি। সহজ ভাবে বলে, কেষ্টদা' তাহলে আজ-কাল বেহালায় থাকে?

—হ্যাঁ।

—হঠাৎ?

—সেই যে ছেলেটাকে পোড়াতে শ্মশানে গিয়েছিলাম, তার দিদি এখন কেষ্টদা'র সঙ্গে থাকে কি না।

—তাই নাকি, কেষ্টদা' বিয়ে করেছে?

—হয়নি, হবে। মেয়েটা খুব ভাল, আমায় ভাই-এর মত ভালবাসে।

—আজ-কাল কি করছিস, দেবেনদা'র কাছে যাস না?

—যাই মাঝে মাঝে। রাত করে ফিরলে আবার গৌরীদি' বসে থাকে।

—এদিকে আর আসিস না?

—মামার বাড়ী থেকে চলে যাবার পর, এই প্রথম।

কথা বলতে বলতে দু'জনে বড় রাস্তায় এসে পড়ে। পাশে সারবন্দী বড় বড় দোকান। মদন হঠাৎ বলে, নন্দিতা—

কই? শ্যামল ভাল করে দেখে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, নন্দিতাই।

নন্দিতা তার মার সঙ্গে কাপড়ের দোকানে এসেছিল। কাপড় কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে।

—পুজোর বাজার সুরু করে দিয়েছে বোধ হয়।

—তাই হবে।

নন্দিতারা সামনের গাড়ীতে উঠতে যায়। পাশেই মদনরা দাঁড়িয়েছিল, নন্দিতা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসে। মদন আশ্চর্য্য হয়ে যায়, দেখেছিস শ্যামল, আমাদের চিনে গেছে।

—তা চিনবে না! সেই বই-এর দোকানে তো আমার সঙ্গে দু'-তিন দিন দেখা হয়েছে।

—তাই না কি, বলিসনি তো?

—এ আর বলার কি আছে! আমার নাম শ্যামল, তাও জানে।

নন্দিতাদের গাড়ী চলতে সুরু করে। পেছনের কাচ দিয়ে মেয়েটা আর একবার ফিরে তাকায়।

শ্যামল বলে, বোধ হয় মন্টুদা'কে খুঁজছে।

—চল মন্টুদা'কে খবর দিই।

—তুই যা। আমায় এখন যেতে হবে, কেষ্টদা' বসে থাকবে।

মদনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেহালায় ফিরতে গিয়ে শ্যামলের মনে হ'ল তাই তো কেষ্টদা'কে কি বলব। গেলেই তো বাবার কথা জিজ্ঞেস করবেন। মনে মনে ভাবে, কেষ্টদা'র সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হয়। কিন্তু মানুষ যা চায় সব সময় তাই পায় না। বাড়ী ফিরেই কেষ্টর সঙ্গে দেখা। শ্যামলকে দেখেই কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি হল শ্যামল, বাবা কি বললেন?

শ্যামল চট করে উত্তর দেয়, কি আর বলবেন! সব কথা আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

—মামা, বউমামা এঁরা ছিলেন ?

—না।

—তাহলে সব খোলাখুলি কথা হয়েছে।

—হয়েছে, তবে বাবাও কিছু ঠিক করতে পারেন নি। কালকে আবার যাব।

শ্যামল কেষ্টকে এড়িয়ে গৌরীকে জিজ্ঞেস করে, গৌরীদি', খাবার হয়েছে নাকি, আমায় আবার বেরুতে হবে। কেষ্টর আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বলে, শ্যামল খেয়ে নাও, আমি চলি।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

—পাড়ায়। এবার পূজোয় একজিবিশান করার কথা হয়েছে, তারই ব্যবস্থা করতে।

—আপনি একটা দোকান করবেন বলেছিলেন ?

—হ্যাঁ, ক'দিন মজা করা যাবে।

—আমি বিক্রি করবো কিন্তু।

—নিশ্চয়।

কেষ্ট চলে গেলে গৌরী শ্যামলের ভাত বেড়ে দেয়। শ্যামল জিজ্ঞেস করে, চিনুদি' আজ খাবে না ?

—আমরা দু'জনে একসঙ্গে খাব।

—আমার ফিরতে দেরী হবে।

—কোথায় যাচ্ছ ?

—দেবেনদা'র কাছেই।

গৌরী নিজের মনে হাসে, চিনু আমার মাষ্টার হয়েছে জান ত ?

—কেন ?

—আমাকে অভিনয় করা শেখাচ্ছে।

—কোন বইয়ে ?

—সেই যে তোমার প্রভাতদা'র লেখা নাটক।

—খুব ভাল হবে গৌরীদি', আমাকে কিন্তু পাশ দিতে হবে একটা।

গৌরী আরও হাসে, দেখি আমার নেয় কি না।

শ্যামল খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে উঠে যায়।

মদনের কাছে সব কথা শুনে চুনীলাল অবাক হয়ে যায়। সে কি, শ্যামলকে তাড়িয়ে দিয়েছে ?

মদন আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

—এতখানি হবে আমি আশা করি নি, চুনীলাল ক্ষুব্ধ স্বরে বলে।

—কি করা যায় এখন ?

চুনীলাল চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, যাবো আর এক বার ওর মামার কাছে।

—কি হবে ?

—বুঝিয়ে বলব।

—কি আর বোঝাবে। সব কথাই তো সত্যি। শ্যামল স্কুলে যায় না, গুণ্ডাদের দলে মিশছে, সব কথাই তো সত্যি।

চুনীলাল বলে, না, শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার জন্যে ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।

মদন বলে, এক কাজ করলে হয়, দেবেনদা'কে গিয়ে বোললে যদি শ্যামল শোনে।

চুনীলাল একটু ভেবে নিয়ে শেষে বলে, আচ্ছা, বিকেলের দিকে বরং দেবেনদা'র কাছেই যাব।

কালীর আড্ডায় দেবেনদা'র সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর, চুনীলাল এই প্রথম দেবেনদা'র বাসায় গেল। দেবেনদা' একলাই ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। চুনীলালকে দেখে একমুখ হেসে অভ্যর্থনা করেন, এসো চুনীলাল! অনেক দিন আসনি।

চুনীলাল স-অভিমানে বলে, আপনিও তো খোঁজ নেননি।

দেবেনদা' লজ্জা পান, কাজের ভিড়ে, বুঝছ না ?

চুনীলাল আলাপ করিয়ে দেয়, এটি আমার বন্ধু মদন, চেনেন তো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্যামলের সঙ্গে দু'-তিন দিন এসেছিল।

সাধারণ আলাপের পর, চুনীলাল শ্যামলের কথা পাড়ে। দেবেনদা', একটা দরকারী কথা আছে, কাউকে বলবেন না—

—না। কি কথা ?

—শ্যামল বলেছে কি না জানি না, ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—কেন ?

—স্কুলে যায় না। বাড়ীতে মিথ্যে বলে বাইরে ঘুরে বেড়াত।

—আমায় তো এসব বলে নি ?

—আপনি ওকে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিন।

দেবেনদা' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলেন, বলবো, তবে আমার কথা শুনবে কি না জানি না।

চুনীলাল বলে, সে কি, আপনি বললেও শুনবে না ?

—আজ-কাল তাই দেখছি। শ্যামল আর দু'-একজন আমার চেয়ে কালীর কথাই বেশী শোনে।

চুনীলাল রাগে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে। এই কথাই আমি সেদিন বলেছিলাম। সেদিন কালী আমায় মারলো, আপনি কিছু বললেন না। দেবেনদা' এ কথায় উত্তর দিতে পারেন না। মাথা নীচু করে বসে থাকেন। চুনীলাল বলে যায়, আমি খুব ভাল করে জানতাম, কালীর মতলব ভাল নয়। ওরা কেউ আপনার আদর্শ বোঝে না।

দেবেনদা' অসহায় ভাবে প্রশ্ন করেন, কিন্তু উপায় কি ?

—উপায় আমি কি বলবো, আপনাকেই ঠিক করতে হবে।

—আমি তো কিছুই ভেবে পাই না। একমাত্র কালীরাই যা আমার পার্টীকে ভালবাসে। আর কেউ কথা শোনে না।

—কথা শোনাবার দরকার কি ?

দেবেনদা'র চোখে জল আসে, আমার যে অনেক কথা দেশবাসীকে বলার আছে, তা কি বলা হবে না ?

—গুণ্ডাদের দিয়ে বলানোর চেয়ে না বলাই ভালো। আপনি বুঝতে পারছেন না যে, দেশের জন্যে দেশবাসীর জন্যে আপনি যে এতদিন স্বার্থ ত্যাগ করে জেলে কষ্ট পেয়েছেন, তারা আপনাকে কতখানি ধিক্কার দেবে পরে সুবিধাবাদী ভেবে। সেইজন্যেই তো কালীরা আপনাকে ছাড়তে চায় না।

দেবেনদা' দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারী করতে থাকেন, যাদের জন্যে প্রাণপ্রাত করে সারাজীবন খাটলাম, তারাই তো আর আমার চায় না।

চুনীলাল দৃঢ়স্বরে বলে, তাহলে আপনার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আর দেবার মত বোধ হয় আপনার কিছু নেই।

দেবেনদা'র এ প্রসঙ্গ আর ভালো লাগে না। শান্ত গলায় বলেন, আমায় এখন বেরুতে হবে চুনীলাল!

—আমরাও উঠবো। চুনীলাল উঠে দাঁড়ায়, শ্যামলকে একটু বোঝাবেন।

দেবেনদা' হ্যাঁ কি না কিছুই বলেন না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

দেবেনদা'র বাড়ী থেকে বেরিয়ে মদনই প্রথম কথা বলে, বাবা, তুমি তুখোড় লেকচার দিতে পার, একেবারে মুখস্থ।

চুনীলাল একথা কানে না তুলে বলে, দেবেনদা'র জন্যে সত্যি দুঃখ হয়। কতখানি খাঁটি লোক। শুধু পাওয়ার পলিটিক্স্ মাথায় ঢুকে দিনে দিনে কোথায় নেমে যাচ্ছে। নিজের স্বার্থ যখন কাজের চেয়ে বড় হয় মানুষের বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়।

কথা বলতে বলতে দু'জনে ট্রামে উঠে পড়ে।

সেদিন সিনেমা থেকে প্রভাত বেলারাণীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল বলে অরুণা চার-পাঁচ দিন রেগে কথা বলেনি। প্রভাত রোজই গেছে, রাগ ভাঙ্গাবার যত রকম কৌশল জানে সব রকম চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনও ফল হয় নি। রোজ প্রভাতকে অরুণার পড়ার ঘরে বসে থাকতে হয়। অরুণা বেশ দেরী করে নামে, একটি কথাও না বলে বইখাতা বার করে বসে। প্রভাত সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই মাথা ধরেছে বলে উঠে চলে যায়। অগত্যা প্রভাতকে শেষ চেষ্টা করতে হয়। সরাসরি অরুণাকে বলে, আমি আর তোমাকে পড়াতে পারব না। রমেশ বাবুকে বলে ছুটি চেয়ে নিচ্ছি। যে ছাত্রী কথা বলে না, তাকে কি করে পড়াব?

অরুণা এরও কোন উত্তর দেয় না।

প্রভাত বলে যায়, জীবনে এরকম অবস্থায় আমি কখনও পড়িনি। সেদিন বেলারাণী ধরে নিয়ে গেল ডায়ালগ দু'-একটা বদলাবার জন্যে, তার আমি কি করবো? যদি না যাই তো আমার বই নেবে কেন? তুমি কি চাও না আমার বই সিনেমা হয়?

অরুণা এতক্ষণে কথা বলে, তা চাইবো না কেন?

—তাহলে? বেলারাণীর হাতেই তো সব। সে যদি ডাকে আমায় যেতে হবে তো, আমি কি নিজের ইচ্ছেয় গেছি?

—কি রকম ড্যাব-ড্যাব করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

—কে?

—আপনার বেলারাণী। কি সঙের মত সেজেছিল। ছবিতেই যা ভালো দেখায়।

—সে তো সবাই জানে।

—আপনিই তো বলেন, কি চেহারা, কি সুন্দর কথাবার্তা। একেবারে প্রেমে পড়ে গেছেন।

প্রভাত ধমক দেয়, কি বাজে বক? তোমার কথায় যদি কোন আঁট থাকে।

অরুণা হেসে ফেলে, যেমন মাষ্টার তেমনই ছাত্রী হবে তো?

অরুণার মুখে হাসি দেখে প্রভাত আশ্বস্ত হয়, যাক্ তাহলে রাগ গেছে?

—যদি আপনি মাষ্টারী করা না ছাড়েন।

এবার প্রভাতও হাসিতে যোগ দেয়, মাষ্টারী ছাড়ার হুমকীতে কাজ হয়েছে বল?

—তা হবে না, আপনার মত ফাঁকিবাজ মাষ্টার মশাই আর কোথায় পাব?

প্রভাত ভুরু কুঁচকে বলে, তুমি দেখছি আমাকে আর আজ-কাল একেবারেই মানো না।

—কে বললে? ভীষণ ভীষণ মানি। সত্যি বলছি, দেখুন না ঠোঁটে আর লিপষ্টিক মাখি না।

—সত্যি!

—তা নজর করবেন কেন? কথা শোনাবার বেলা ওস্তাদ। ঠোঁটে রঙ মাখা আমি পছন্দ করি না। দেখলাম তো বেলারাণীকে, কি রঙই মেখেছে। ওকে তো কিছু বলতে পারেন না।

প্রভাত হাসে, কি মুস্কিল, দুনিয়াশুদ্ধ মেয়ে আমার পছন্দমত চলবে নাকি, তোমার যা বুদ্ধি।

এ ধরণের হাল্কা কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ অরুণার চোখ সজল হয়ে ওঠে। বলে, প্রভাতদা', বাবার আজ-কাল কি হয়েছে।

প্রভাত অরুণার চোখে জল দেখে বিচলিত হয়, কি হয়েছে?

—জানি না। অরুণা একবার চার দিক দেখে নিয়ে, নীচু গলায় বলে, রাত-দিন চুপ করে বসে ভাবেন, অফিসেও যান না।

—কবে থেকে?

—দিন দুই।

—শরীর খারাপ। জ্বর আছে?

—না।

—যদি চান আমি একবার দেখা করতে পারি।

—কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। চুপ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকেন।

—এত দিন বলনি কেন?

—মা বারণ করেছিলেন। অরুণা নীচু হয়ে চোখের জল মুছে ফেলে। বাবার কি হয়েছে বলুন না প্রভাতদা!

—না দেখলে কি করে বুঝবো?

অরুণা ধরাগলায় বলে, আমার কি রকম ভয় হচ্ছে।

—ভয়ের কি আছে? আমি তো রোজই আসছি। যদি সেরকম দরকার হয় ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিও।

প্রভাত অরুণাকে ভরসা দিয়ে বেরিয়ে আসে। তার মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়, সত্যি, হঠাৎ কেন রমেশ বাবু এমন হয়ে গেলেন? রমেশ বাবুর স্নেহপ্রবণ হাসিভরা মুখটা তার চোখের সামনে ভাসে।

চিনুর কাছে অভিনয় করতে শিখে গৌরী একদিনেই বিনোদের ক্লাবে বেশ নাম করে ফেলেছে। অভিনয়ের ধরণটা ওর খুব স্বাভাবিক, মনেই হয় না মুখস্থ বলছে। বিনোদ খুবই প্রশংসা করে—দেখুন তো কি অন্যায়। আপনি এত সুন্দর অভিনয় করেন অথচ কিছুতেই প্রথমে করতে চাইছিলেন না।

গৌরী লজ্জায় লাল হয়ে যায়। বিনয় করে উত্তর দেয়, সত্যি, আগে কখনও করিনি। কি করবো বলুন—

বিনোদ ভুরু উঁচু করে বলে, আশ্চর্য, আমি কোন মেয়েকে প্রথম চোটে এত ভালো অভিনয় করতে দেখিনি। ধরুন না এই চিন্ময়ী দেবীর কথা, কত দিন থেকে পার্ট করছেন কিন্তু আপনার মত নয়।

—সে কি বলছেন, আমি তো ওর কাছে শিখেছি।

—তাহলে গুরুমারা বিদ্যে আরম্ভ করেছেন বলতে হবে।

বিনোদের সঙ্গে গৌরীর কথা বলতে ভালো লাগে। সব সময় গৌরীকে খাতির করে কথা বলে। প্রথম প্রথম আশ্চর্য্য লাগলেও এখন গৌরীর অভ্যেস হয়ে গেছে।

বিনোদ বলে, গৌরী দেবী, আপনার গলার মত মনটাও মিষ্টি।

গৌরী লজ্জা পায়, কি যে বলেন—

—সত্যি বলছি। আপনার এতটুকু অহঙ্কার নেই। আপনি এ লাইনে থাকলে এক দিন খুব বড় অভিনেত্রী হতে পারবেন।

—গৌরী অবিশ্বাসের সুরে বলে, এত সহজে কি হয়?

—নিশ্চয় হয়। আপনার প্রতিভা আছে, চেষ্টা করা উচিত।

বিনোদ যে শুধু গৌরীর মন রেখেই কথা বলতো তা নয়, তার মধ্যে অনেকখানি সত্য ছিল। চিনুও কয়েক দিন রিহার্সালের পর বাড়ীতে কেষ্টকে বলেছিল, গৌরী কি সুন্দর পার্ট করছে, এক দিন চলুন না মহড়া দেখতে।

কেষ্ট ঠাট্টা করে বলে, তোমার তো গৌরীর সব কিছুই ভাল লাগে।

—বেশ তো নিজেই গিয়ে দেখুন না।

—তাহলে পরে ভাল লাগবে না। একেবারে আসল প্লে'র দিন যাব।

—আচ্ছা, সেই ভাল।

রিহার্সালের সময় বিনোদ বেশীর ভাগ সময়ই গৌরীর পাশে বসে বক বক করে। টাকা-পয়সাওয়ালা এত বড় একজন লোকের এ ধরণের সহজ মেলামেশায় গৌরী মুগ্ধ হয়। তাই রিহার্সালের দিনগুলির জন্যে অধীর আগ্রহে বসে থাকে। এ সপ্তাহে অনেকের অসুবিধে থাকায় একদিন মাত্র রিহার্সালের দিন স্থির হয়েছে; তাই আজ যখন চিনুর জ্বর হয়ে গেল, গৌরীর মন খারাপ হয়ে যায় যাওয়া হবে না বলে। কিন্তু চিনু বলে, তুই কেন যাবি না, ওদের মুস্কিল হবে যে। গৌরী আপত্তি জানায়, না চিনু, আমি একলা যাব না।

চিনু হাসে, তা কখনও হয়, রিহার্সালে তোর কামাই করা উচিত নয়। একে নতুন—

—বিনোদ বাবুর সঙ্গে একা—

—তাতে কি হয়েছে, বিনোদ বাবু তোকে খেয়ে ফেলবে না।

—কেষ্টদা' যদি কিছু মনে করে?

চিনু বোঝে গৌরীর রিহার্সালে যাবার খুবই ইচ্ছে শুধু মুখের

যা আপত্তি। হেসে বলে, এত মেয়ে আসছে যাচ্ছে, এতে মনে করার কি?

—তবু আমার ভয় করে।

—কেষ্টদা'কে না বললেই হ'ল। আমি তো এর পরের দিন থেকেই আবার যাব।

গৌরী আর আপত্তি করে না। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নেয়।

গৌরীকে একা দেখে বিনোদ জিজ্ঞেস করে, আপনার বান্ধবী যাবেন না?

—না। ওর শরীর খারাপ।

—তাহলে আপনি চলুন।

গৌরী উঠে বসে। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বিনোদ বলে, চিন্ময়ী দেবীকে ছেড়ে আপনি আসবেন, আমি ভাবিনি।

—কেন?

—যা বন্ধু-অন্ত প্রাণ!

—কেন, আমার বন্ধুকে নিয়ে সব সময় ঠাট্টা করেন বলুন তো?

বিনোদ প্রায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, আজ কিন্তু অনেক সময় আছে, একটু বেড়িয়ে যাবেন?

—কোথায়?

—গঙ্গার ধারে।

গৌরী চট্ করে উত্তর দিতে পারে না। বিনোদ জোর করে, চলুন না, কি হয়েছে?

বিনোদের পীড়াপীড়িতে ভালো-মন্দ বিবেচনা না করেই গৌরী বলে ফেলে, চলুন।

বিনোদ হাসে, ভয় নেই। আপনার কেষ্টদা'র সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে না।

—আহা, বেড়াতে গেলে কেষ্টদা' কি বলবে।

বিনোদ গৌরীদি'কে তাকিয়ে বলে, সত্যি, কেষ্ট বাবু ভাগ্যবান। আপনার মত মেয়েকে কত সহজে পেয়েছেন।

গৌরী ম্লান হাসে, আমার সব কথা তো আপনি শোনেন নি। আমার মত মেয়ে পথে-ঘাটে ছড়ানো আছে। কেষ্টদা' দয়া না করলে—

বিনোদ গম্ভীর হয়ে বলে, এখানে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি না. সব কথাই আপনার আমি জানি।

—গৌরী চমকে ওঠে, কি করে?

—বিনোদ অন্যমনস্ক ভাবে বলে যায়, গৌরী দেবী, বস্তি থেকে আপনাকে বার করে আনা কেষ্ট বাবুর উচিত হয় নি।

গৌরী বাধা দেয়, হঠাৎ এমন বিশ্রী গোলমাল হ'ল যে—

—জানি, রাজেন আমায় সব বলেছে।

—রাজেনের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?

—নিশ্চয়।

গৌরী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, রাজেন কেমন আছে?

—ভালো, তবে সে আপনাকে ভুলতে পারে নি।

—আশ্চর্য্য, সে কথাও আপনাকে বলেছে?

—বলেনি। তবে আমি বুঝতে পারি।

গঙ্গার ধারে গাড়ী রেখে দু'জনে নেমে পায়চারী করে। বিনোদ জিজ্ঞেস করে, আপনাদের বিয়ে কবে?

—ওনার দাদার সঙ্গে ঝগড়া চলছে। বাড়ী ভাগ হলে—

—বাড়ী ভাগ তো ওর অনেক দিন হয়ে গেছে।

—সে কি, আমি তো জানি না?

আমি জানি। ওকে জিজ্ঞেস করবেন।

গৌরীর চোখে জল এসে যায়। মুখ নীচু করে বলে, চলুন গাড়ীতে ফিরে যাই, আর হাঁটতে পারছি না।

—চলুন।

পার্কসার্কাসের বাড়ীতে এসে বিনোদ আর গৌরী দেখে, সবাই তাদের জন্যে বসে আছে। বিনোদ কৈফিয়তের সুরে বলে, কি করবো চিন্ময়ী দেবীর জ্বর। ইনিও কিছুতেই আসবেন না, জোর করে ধরে এনেছি।

রিহার্স্যাল সুরু হয়। গৌরী আজ কিছুতেই ভালো করে বলতে পারে না, বার বার ভুল করে। বিনোদ ফোড়ন কাটে, আজকে আর মন নেই, বন্ধুর শরীর খারাপ, তার ওপর জোর করে ধরে আনা হয়েছে।

গৌরীর সঙ্গে বিনোদের চোখাচোখি হতেই দু'জনে হেসে ফেলে। রিহার্স্যালের সময় আজ আর অন্য দিনের মত বিনোদ এসে গৌরীর পাশে বসলো না। একটা ফাজিল ছেলে মন্তব্য করে, বিনোদদা' সত্যিই জোর করে গৌরী দেবীকে ধরে এনেছে, তাই আর ভয়ে কাছে ঘেঁষছে না।

রাত্রে বাড়ী ফেরার সময় গাড়ীতে আর দু'জন মেয়ে থাকায়

বিনোদ গৌরীর সঙ্গে বিশেষ কথা বলার সুযোগ পায় না। গৌরীকে নামিয়ে বিনোদ বলে, কালও রিহার্স্যাল আছে, ভুলে যাবেন না।

গৌরী হেসে বলে, না, নমস্কার!

—নমস্কার!

গৌরী বেশ হাল্কা-মনে বাড়ীতে ঢোকে। প্রথমেই চিনুর ঘরে যায়। চিনু শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিল, গৌরীকে দেখে জিজ্ঞেস করলে, কেমন হ'ল?

গৌরী মুখ ব্যাজার করে বললে, ভাল নয়।

—কেন?

—তুই না থাকলে আমি বলতে পারি না।

—পাগলী, তা করলে হয়? পার্ট তো একলাই করতে হবে।

—সবাই তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

—রিহার্স্যালে না গেলেই খোঁজ পড়ে।

গৌরী চিনুর পাশে বসে মাথায় হাত দেয়, তোর এখনও তো বেশ জ্বর রে, কাল যেতে পারবি?

—বোধ হয় না, পায়েও ব্যথা রয়েছে।

গৌরী উঠে দাঁড়ায়, দেখ, কাল রিহার্স্যাল না রাখলেই ভাল হ'ত। যাই দেখি, কেষ্টদা' এলো কি না—

—না, এখনও আসেনি।

চিনু কালও রিহার্স্যালে না যেতে পারে এই সম্ভাবনায় গৌরী মনে মনে খুসী হয়। বিনোদ বাবুর ব্যবহার তার সত্যিই ভাল লেগেছে। কত নরম, কত সহানুভূতিশীল। হঠাৎ গৌরী ভাবে, বিনোদ বাবু কি বিয়ে করেন নি? বিনোদের সব কথা জানবার জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

গৌরীর সব চিন্তা ছিঁড়ে যায় কেষ্ট ফিরে আসতেই। বিনোদের কথাগুলো ভিড় করে আসে। থাকতে না পেরে গৌরী এক সময় জিজ্ঞেস করে, তোমাদের বাড়ী ভাগ হয়নি?

কেষ্ট গৌরীর মুখ থেকে এ ধরণের প্রশ্নে বিস্মিত হয়, হঠাৎ এ কথা কেন?

—এমনি জিজ্ঞেস করছি।

কেষ্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকায়, কে শিখিয়ে দিয়েছে?

গৌরী হাসবার চেষ্টা করে, কে আবার শেখাবে?

—নিশ্চয় কেউ বুদ্ধি দিয়েছে। কে তা জানি না, তবে ভালো করেনি।

—কেন?

—আজ তুমি বুঝতে পারবে না গৌরী, তবে এক দিন আসবে যখন বুঝবে।

এ ধরণের বড় বড় কথা কেষ্টর মুখে এত শুনেছে যে গৌরীর আর ধৈর্য্য থাকে না। রুক্ষ স্বরে বলে, ঘাট হয়েছে আর জিজ্ঞেস করবো না। নাও, মুখ-হাত-পা ধুয়ে নাও।

গৌরীর বলার ধরণে কেষ্ট ব্যথিত হয়, কিন্তু প্রকাশ করে না। মুখ-হাত ধুয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের থিয়েটার কবে?

—পুজোর সময়।

—তাহলে তো মুস্কিল! পুজোর সময় এক্জিবিশানে একটা দোকান খুলছি, ব্যস্ত থাকবো।

—দোকানে কারা বিক্রি করবে।

—আমি আর শ্যামল।

—আমিও থাকবো।

—সে কি করে হবে?

—কেন?

—পাড়ার মধ্যে কথা উঠবে।

বিনোদের কথাগুলো আবার গৌরীর মনে পড়ে যায়। বলে তাতে কি হয়েছে, বিয়ে তো হবেই।

—সে যখন হবে।

এ উত্তর গৌরী আশা করেনি। মনে মনে ভাবে বিনোদ হয়তো ঠিকই বলেছে, কেষ্ট বোধ হয় তাকে এখন এড়িয়ে যেতে চায়।

পরদিন বিনোদের গাড়ী অন্য দিনের চেয়ে আধ ঘণ্টা আগেই এলো। গৌরী আর চিনুর ঘরে না গিয়ে সোজা গাড়ীতে উঠে বসে।

বিনোদ জিজ্ঞেস করে, চিন্ময়ী দেবী আজও যাবেন না?

—না, বেশ জ্বর আছে এখনও।

—আমি কি দেখা করে যাবো?

গৌরী নীচু গলায় বলে, না, থাক।

—তথাস্তু। বলে বিনোদ গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয়।

গৌরীর আজ ইচ্ছে ছিল না যে চিনু তাদের সঙ্গে যায়। তাই বলতে গেলে দুপুরের পর একবারও সে চিনুর ঘরে যায় নি। পাছে চিনু বলে বসে, এখন বেশ ভাল আছি, তোর সঙ্গে যাব। গৌরী এক রকম নিঃশব্দেই বেরিয়ে এসেছে। চিনু বোধ হয় একটু অবাক হবে গৌরী ভাবে, তা হোক।

—কি ভাবছো? বিনোদের প্রশ্নে গৌরী চমকে ওঠে, চোখে চোখ রেখে বলে, কিছু না।

—আজ কোন দিকে যাবে বল?

—আপনি বলুন।

—পার্কসার্কাসের বাড়ীতেই যাওয়া যাক। রিহার্স্যাল সুরু হতে দেরী আছে, ওপরে বসে গল্প করা যাবে বেশ।

এ বাড়ীতে রিহার্স্যালে এসে গৌরী নীচে থেকেই বরাবর চলে গেছে। আজ ওপরে এসে সাজানো সুন্দর ঘর দেখে সে অবাক হয়। বলে, বাঃ, কি চমৎকার সাজানো!

বিনোদ হেসে বলে, এ তো কিছুই নয়। আগে আরও গোছান ছিল, এখন তো ব্যবহারই হয় না।

বিনোদ গৌরীকে ঘরগুলো দেখায়। দুটো শোবার ঘর, সঙ্গে সঙ্গে বাথরুম। মাঝখানে খাবার ঘর, পাশে বৈঠকখানা। চার পাশ দিয়ে বারান্দা গেছে। গৌরী সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখে। বলে, কি সুন্দর বাড়ী!

বারান্দায় দুটো চেয়ার এনে ওরা বসে। বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

গৌরী প্রশ্ন করে, দক্ষিণের শোবার ঘরে যে ভদ্রমহিলার ছবি দেখলাম, উনি কে?

—মা।

—মারা গেছেন?

—দশ বছর। একটু চুপ করে থেকে বিনোদ ধরাগলায় বলে, সেই থেকে আমার এই অবস্থা গৌরী! মা মারা যাবার পর থেকে চোখে অন্ধকার দেখলাম। উনি যে আমার কি ছিলেন কেউ বুঝবে না।

গৌরী সহানুভূতি প্রকাশ করে, আমি বুঝতে পারি! আপনার কথা থেকে, ব্যবহার থেকে। মায়ের স্নেহ-ভালবাসা না পেলে কারুর মন এত নরম হয় না।

—সত্যি গৌরী আমি নরম, ফুলের মত নরম। টাকা-সম্পত্তি পেয়েছি অনেক। বাবা, জ্যাঠামশাই-এর আবার দাদুর। এক পুরুষে উড়ানো যায় না, এত সম্পত্তি। কিন্তু কি হবে। এতটুকু শান্তি পেলাম না। আমি বড় একলা গৌরী!

—আপনি বিয়ে করেন নি?

—করেছিলাম। সে আর এক ট্র্যাজেডী। আমার স্ত্রী রূপসী শিক্ষিতা, কিন্তু বনলো না।

—কি রকম?

—দু'বছর এক সঙ্গে ছিলাম। এক দিনের জন্যেও সে আমাকে ভালোবাসে নি।

গৌরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, কেন?

বিনোদ ম্লান হাসে, মুখে না বললেও আমি জানতাম সে আমায় ঘেন্না করে। কারণ আমার লেখা-পড়া হয় নি। সব সময় ভাবতো আমি বড় লোকের মুখ্যু ছেলে। টাকা-পয়সার খারাপ দিকটাই জানি, ভালর সন্ধান পাইনি। চোখে-মুখে তার অবজ্ঞা ফুটে উঠত, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না গৌরী!

—তারপর?

—ওদের বাপের বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু লেখা-পড়ায় দক্ষ ভীষণ। আমি সেখানে গেলেও অস্বস্তি বোধ করতাম। এ সবও হয়ত আমি সহ্য করতাম, কিন্তু যেদিন দেখলাম আমার মাকেও সে ঘেন্না করে—

—তাও কি হয়?

বিনোদের চোখে জল এসে পড়ে। সামলে নিয়ে বলে, আমার মা ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে, ভালমানুষ। লেখাপড়া শেখেন নি, সব সময় পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকতেন। তাঁরই ওপর হল ওর আক্রোশ। উঠতে বসতে কথা শোনাত। পুজো-আচ্চাকে কুসংস্কার বলে ঠাট্টা করত। মাকে অসুখী দেখে মনে খুব কষ্ট পেতাম। কোনো এক ষষ্ঠীপুজোর দিন মা ওকে সংযম করতে বলেছিলেন। বিয়ে দু'বছর হলেও আমাদের কোন ছেলেপিলে হয়নি। মা শুভদিন দেখে একটা মানত করা শেকড় নিয়ে এসেছিলেন। আশ্চর্য্য, আমার স্ত্রী তাঁর সামনে শেকড়টা ফেলে দিয়ে বললে, এসব আমি বিশ্বাস করি না। মা কাঁদতে লাগলেন। আমার মাথায় আগুন চেপে গেল, মুখে যা এল তাই বললাম। রমলা তার একটি প্রতিবাদ করল না, আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল। ভাবলাম রমলা ওর ভুল বুঝতে পেরেছে, কিন্তু না। সেই দিনই ও বাপের বাড়ী চলে যায়, আর ফেরেনি। আমিও আনতে যাইনি। মা একবার গিয়েছিলেন, সে আসেনি।

গৌরী চুপ করে এতক্ষণ শুনছিল। জিজ্ঞেস করে, এখন তিনি—

—একটা মেয়েদের স্কুলে মাষ্টারী করে।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয় না?

—না।

—আর বিয়ে করলেন না কেন?

—এর পরও?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিনোদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে, যাক, ওসব কথা। চল, একবার নীচে যাই, রিহার্স্যালের সময় হ'ল।

সেই দিনই রিহার্স্যালের সময় এক ফাঁকে বিনোদ বলে, অনেক আজে-বাজে বকলাম, তোমার হয়ত খারাপ লাগলো। আমার মনটা বেশ হালকা লাগছে।

গৌরী মৃদুস্বরে বলে, আপনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন—

বিনোদ গাঢ় স্বরে উত্তর দেয়, তুমি আমায় ঠিক বুঝতে পেরেছো গৌরী, আমি বড় অসহায়।

গৌরী বিনোদের দিকে নরম চোখে তাকায়।

সারা রাত গৌরী বিনোদের কথা ভাবে। বিনোদ বড়লোক। এ ধরণের পয়সাওয়ালা লোকদের গৌরী চিরকাল দূর থেকেই দেখেছে। এই প্রথম সে একজনের সান্নিধ্য পেল। বিনোদ তাকে মুগ্ধ করেছে, তার ব্যবহারে তার সহানুভূতিশীল মন দিয়ে। এ মনের পরিচয় গৌরী আর কারুর কাছে পায়নি। এমন কি কেষ্টদা'র কাছেও না। আজ তার মনে হয়, কেষ্টদা'র মধ্যে যা আছে তা হোল, দয়া, অনুকম্পা, কর্ত্তব্যবোধ। যা নেই তা হোল ভালবাসা। বিনোদ কিন্তু সেই ভালবাসার সাজি ভরিয়ে ফুল এনেছে। গৌরীকে সে নারীর সম্মান দিয়েছে, এর চেয়ে বড় সম্মান গৌরী আশা করেনি। কেষ্টদা'র কাছে তার পরিচয় আশ্রিতা হিসেবে, নারী হিসেবে নয়। এ পার্থক্য যে কতখানি তা গৌরী নিজে ছাড়া আর কে বুঝবে? কেষ্ট এতদিন তার জন্যে যা যা করেছে সে সব কথা ছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেষ্ট না থাকলে বিনোদের সঙ্গে আলাপের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এ কথা মনে হতেই কেষ্টর জন্যে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠেছে। কিন্তু তা কৃতজ্ঞতাই, আর কিছু নয়।

হঠাৎ গৌরীর মনে হল যে এসব কি ভাবছে, এ যে অন্যায় পাপ। সর্বান্তঃকরণে কেষ্টর কথা ভাববার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তার এত দিনের অবহেলিত নারীত্ব সংযমের বাধা ভেঙ্গে বিনোদের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে।

গৌরী ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। ঘরের এক কোণে শ্যামল অকাতরে ঘুমচ্ছে। গৌরী নিঃশব্দে কুঁজো থেকে জল নিয়ে চোখে-মুখে ছিটিয়ে দেয়। মনটা অনেক শান্ত হয়ে আসে।

এরই মধ্যে এক দিন শ্যামার বিয়ে হয়ে গেল। পাড়ার লোক কেউ জানতো না। তাদের খেয়াল হ'ল শ্যামার চীৎকার করে কান্না শুনে। প্রথমে ভেবেছিল বলরামের ঘরে বুঝি কোন বিপদ হয়েছে। খবর নিতে এসে দেখে শ্যামার বিয়ে হচ্ছে।

কেষ্টর পক্ষেও সেই একই কথা, বলরাম তাকেও জানায়নি। বাড়ী ভাগ হয়ে গেছে। তাই দাদার অংশে যাবার বা সেখান থেকে কারুর আসার সুযোগ নেই। শ্যামার কান্না শুনে কেষ্ট অবশ্য বুঝেছিল যে জোর করে ওর বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সে নিরুপায়। ছাদ থেকে উঁকি মেরে দেখে বর এসেছে, সঙ্গে তিন জন পুরুত এক জন বরকর্ত্তা। এছাড়া আর কেউ নেই। বলরামের দিকেরও বিশেষ কেউ আসেনি। শুধু শ্যামার মামার বাড়ীর একগুষ্টি মেয়ে-বউ এসেছে স্ত্রীআচার করতে।

কেষ্ট তাকিয়ে তাকিয়ে বরকে দেখে। কালো মোটাসোটা দোহারা চেহারা। খোঁচা খোঁচা গোঁফ, মাথায় টাক, বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ তো হবেই, দেখলে আরও বেশী মনে হয়। শ্যামার চেহারা ভালো না হলেও বয়েস কম। বয়েসের শ্রীটুকু অন্তত আছে। কিন্তু এ ভদ্রলোকের তা-ও নেই।

শ্যামা কেঁদেই যাচ্ছে, তারস্বরে কান্না। বলরাম ধমকাচ্ছে, কান্না কেন, বিয়ের দিনে চোখের জল? শ্যামা উত্তর দেয় না। শাখা, শাড়ী, আর সিঁদুর দিয়ে শ্যামার বিয়ে হয়ে গেল।

বলরাম কোন দিন ভাবেন নি, এই কালো মেয়েটিকে এত সহজে পার করতে পারবেন। প্রতিবেশীরা—তাদের খবর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করলে বলেন, ভাচি দেবার লোক ডেকে লাভ কি?

কথা শুনে তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

পরদিন পাড়ার লোক জানালা দিয়ে দেখে রিকসা করে বর-বউ চলে গেল। শ্যামার কোন দিকে খেয়াল নেই, অঝোর ধারায় কাঁদছে।

কেষ্ট সারাক্ষণ ছিল না। শ্যামার কান্না শুনে থেকেই তার মনটা খারাপ হয়েছিল। একসময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনন্ত কেবিনে ঢোকে। আশুদা' জিজ্ঞেস করলেন, শরীর খারাপ হয়নি তো?

—না।

—শ্যামার যাবার সময় তুমি থাকলে না? তোমার জন্যে বড় কাঁদছিল।

—হুঁ।

আশুদা' বোঝেন কেষ্ট কথা বলতে চাইছে না। বলেন, বোস, তোমার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চা না খেয়েই কেষ্ট সেখান থেকে উঠে পড়ে, অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল বেহালায় যায়। গৌরী ঘরে ছিল না, রিহার্সালে গিয়েছিল। কেষ্ট পকেট থেকে আর একটা চাবী বার করে দরজা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে। দরজা খোলার শব্দে চিনু ভেবেছিল গৌরী বুঝি ফিরেছে। ঘরে ঢুকে কেষ্টকে দেখে বিস্মিত হয়।

—আপনি, এত সকাল সকাল?

—কেষ্ট ম্লান হেসে উত্তর দেয়, শরীরটা ভাল নেই।

—কি হ'ল?

—এমনি ম্যাজ-ম্যাজ করছে। গৌরী কোথায়?

—রিহার্সালে গেছে।

—তুমি যাওনি?

—না, আমার তো ক'দিন থেকে জ্বর।

—একলা গেছে?

—বিনোদ বাবু গাড়ী করে নিয়ে গেছেন, আবার পৌঁছে দেবে গৌরী তো একা কিছুতেই যাবে না। আমি জোর করে পা[ঠিয়ে] দিলাম।

কথাটা অবশ্য একেবারেই সত্যি নয়। কারণ, আজ যে রিহার্[সাল] আছে, গৌরী সে কথা চিনুকে আগে বলেই নি। এমন কি যা[বার] সময় জিজ্ঞেসও করেনি ও যাবে কি না। সেই জন্যেই চিনু [অভিমান] করতে এসেছিল, কিন্তু ঘরে কেষ্টকে দেখে সম্পূর্ণ অন্য কথা [বলে] যায়।

কেষ্ট হঠাৎ বলে, মাথাটা বড্ড ধরেছে।

—এ্যানাসিন আছে, দেবো?

—দাও।

চিনু এক গ্লাস জল আর বড়ি এনে দেয়। কেষ্ট অল্প সম[য়ের] মধ্যেই সুস্থ বোধ করে।

একটু পরে চিনু এসে জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন লাগছে কেষ্টদ[া]

—ভালোই। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।

চিনু যেন এই কথাটুকুরই অপেক্ষা করছিল। ঝুপ করে মাটিতে বসে পড়ে বলে, আপনি কি এত ভাবছেন?

—কে বললে?

—আমি বুঝতে পারি।

কেষ্ট আস্তে আস্তে বলে, ঠিক ধরেছ, সত্যি খুব ভাবছি।

চিনু আবার জিজ্ঞেস করে, কি নিয়ে এত ভাবছেন?

—শ্যামার আজ বিয়ে হয়ে গেল।

—আপনার ভাইঝির?

কেষ্ট ধীরে ধীরে শ্যামার কথা সব বলে। বলতে ভাল লা[গে] তাই বলে যায়। চিনু বলে নয়, গৌরী কি যে কেউ থাকলে বলতো, কিছুতেই সে চেপে রাখতে পারতো না। শ্যামা শুধু [...] কাকু বলে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। শুনে চি[নুর] চোখ জলে ভরে ওঠে। কান্নাভেজা গলায় বলে, তাই আপনার [মন] খারাপ হয়ে গেছে, না কেষ্টদা'?

কেষ্ট কোন উত্তর দেয় না।

—মানুষ কি করে এত নিষ্ঠুর হয়! শ্যামার বিয়েতে আপন[াকে] একবার ডাকলে না পর্য্যন্ত?

—পাছে আমি বাধা দিই। জোরবরে মাষ্টার, সেই কোন [...] পাড়াগাঁয়ে—

—বাধা দিলে তো ভালোর জন্যেই দিতেন।

—কে বুঝবে বলো? দাদা যে আমায়—কেষ্ট কথা শেষ ক[রতে] পারে না।

চিনুর সবটুকু সহানুভূতি কেষ্টর উপর গিয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে বলে, আপনি একটু বরং ঘুমিয়ে নিন।

কেষ্ট কথামত শুয়ে পড়ে, চিনু দরজা ভেজিয়ে দিয়ে [চলে] যায়।

বিনোদ আজ-কাল সুযোগ পেলেই গৌরীকে গাড়ীতে নিয়ে একা বেরিয়ে যায়। সেদিন শনিবার তাড়াতাড়ি রিহার্সাল শেষ হয়ে গেল। পিনাকী এসেছিল প্রোগ্রামের ছবি তুলতে। চিন্নুকে নিয়ে তার আর এক জায়গায় যাবার কথা। চিন্নু ইতস্তত করতে গৌরী জোর দিয়েই বলে, তুই যা না, আমাকে তো বিনোদ বাবুই পৌঁছে দেবেন।

চিন্নুরা চলে গেলে বিনোদ গৌরীকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে। বেহালা ছাড়িয়ে বিনোদের গাড়ী ডায়মণ্ডহারবারের পথে এগিয়ে যায়। বিনোদ জিজ্ঞেস করে, তোমার বেড়াতে ভালো লাগে না গৌরী?

—খু-উ-ব।

—কোথায় বেড়াতে যাও?

—আগে কেষ্টদা' নিয়ে যেত। বেহালায় আসার পর থেকে—

—আর যায় না, এই তো? আমি তো আগেই বলেছি, ও লোকগুলো ঠিক ঐ রকম। তোমাকে ঘর থেকে বার করে আনার জন্যে সব কিছু করবে, পরে একটা কথাও মনে থাকে না।

গৌরী গম্ভীর গলায় বলে, এখন তাই মনে হচ্ছে।

—তোমার কেষ্টদা' কি করেন?

গৌরী ইতস্তত করে উত্তর দেয়, ঠিক জানি না। শুনেছি কি ব্যবসা করেন।

—কি জানি, আমার মনে হয় না।

—কেন?

ভালো রোজগার থাকলে কেউ ঐ বাড়ীতে ওঠে! বদনাম হয়ে যাবে—

এ কথার উত্তর গৌরী দেয় না। বিনোদ বলে যায়, পয়সা থাকলে ভালো জায়গায় তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিত। লোকটার লজ্জা নেই!

—ক'দিন বাদেই বিয়ে হবার কথা—

সেজন্যে তো আরও দরকার। যার সঙ্গে দু'দিন বাদে বিয়ে হবে তাকে কি হাফ্-গেরস্ত করে রাখা যায়?

—আমি এত ভাবিনি।

—আমি তোমার কথা ভাবি বলেই বলছি। বাঁ হাতটা গৌরীর কাঁধের ওপর রেখে বিনোদ বলে, সত্যি বলছি, তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো, এরকম অপমান সহ্য করো না।

গৌরী কেঁদে ফেলে, কেষ্টদা' ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।

বিনোদ এই সুযোগই খুঁজছিল। গাড়ী বাঁ দিকে পার্ক করে গৌরীকে কাছে টেনে নেয়। কেন, আমি তো রয়েছি।

গৌরী তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

—গৌরী, তুমি কি আমায় ভালোবাসতে পারবে না? বিনোদ একটু থেমে আবার বলে, যেদিন তুমি প্রথম রিহার্সালে এলে সেদিন থেকেই তোমায় আমি ভালোবাসি। তুমি যাতে সুখী হও, যাতে বড় হও সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

গৌরী আজ নিজে থেকেই বিনোদের আহ্বানে সাড়া দেয়। কয়েকটি সুন্দর মুহূর্ত কেটে যায়, এত আনন্দ কোন দিন সে পায়নি।

বেলারাণীর প্রযোজনায় ছবি তৈরী শুরু করেছে। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও [illegible] [illegible] [illegible] হাতে

বেলারাণীর প্রথম সট্ নেওয়া হয়। প্রভাত চেষ্টা করে কয়েক জন খ্যাতনামা লেখককে ধরে এনেছিলো। বেলারাণী সারাক্ষণ ব্যস্ত, কে এলো, কে না এলো, তা দেখার সময় কোথায়?

বিনোদ কিন্তু এক কোণে দু'টি মেয়ে নিয়ে বসেছিলো, চিন্নু আর গৌরী। এদের এত দিনের ষ্টুডিও দেখার সখ মিটলো। শ্যামলও বাদ যায় নি, এদের পেছু-পেছু ঠিক এসেছে। প্রভাতকে কাছে পেয়ে বলে, কি প্রভাতদা', আপনি তো নিয়ে এলেন না?

প্রভাত শ্যামলকে দেখে প্রথমটা অবাক হলেও চিন্নুদের দেখে বুঝেছিলো, নিশ্চয় বিনোদ নিয়ে এসেছে। বললে, এসেছো তো, তবে আর কি?

শ্যামল চোখ টিপে বলে, ছবির মত নয় কিন্তু—

—কে?

—বেলারাণী।

আবার সেই অসভ্য কথা! বিরক্ত হয়ে প্রভাত সেখান থেকে সরে যায়। বেলারাণীর কাছে গিয়ে বলে, বেলা, এদিকের কাজ শেষ হ'তে আর কত দেরী?

বেলারাণী জিগ্যেস করে, কেন, তাড়া আছে নাকি?

—হ্যাঁ, বাড়ীতে—

—কি ব্যাপার?

—পরে বলবো। তোমার গাড়ীটা আমায় ছেড়ে দেবে?

বেলারাণীর সঙ্গে বিনোদের শুধু একবার কথা হয়েছিলো। বেলারাণী খোঁপা ঠিক করতে করতে জিগ্যেস করে, কি হলো, অনেক দিন আসনি যে?

বিনোদ গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, ব্যস্ত ছিলাম।

নতুন কথা! বেলারাণী ভ্রূ উঁচিয়ে তাকায়। তোমাদের নাটক কবে?

—পূজার সময়।

বেলারাণী চিন্নুদের ইঙ্গিত করে বলে, ওরা কা'রা, নাটকের নায়িকা নাকি?

বিনোদও বাঁকা উত্তর দেয়, কেন আপত্তি আছে?

—তা নয়, একটু ভালো দেখে জোগাড় করলেই পারতে।

—এ্যাক্টিং ভালো করে।

—তাই নাকি? আমার ছবিতে নামাও না, তবে টাকা দেবো না।

বিনোদ হাসে, সে দেখা যাবে।

প্রভাত ষ্টুডিও থেকে যাবার সময় বেলারাণীর কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা চেয়ে নিয়ে গেল। বিশেষ দরকার বেলা, পরে ফেরত দেব।

বেলারাণী অনুরোধ করে, আমার বাড়ীতে এসো, কি হয়েছে শোনার জন্যে বসে থাকবো।

—সময় পেলেই আসবো।

প্রভাত বেলারাণীকে কথা দিয়ে এসেছিল বটে গিয়ে দেখা করবে, কিন্তু পারে নি। অরুণার কাছ থেকে রমেশ বাবুর শরীর খারাপ শুনেই প্রভাত মনে মনে যে আশঙ্কা করেছিল, তা সত্যি সত্যিই ঘটেছে। শেয়ার মার্কেটে উনি অনেক টাকা লোকসান দিয়েছেন। ভাগ্য-বিপর্য্যয় একেই বলে! যে সময় বাজার তেজী ভেবে লোহার শেয়ার কিনলেন সেই সময়ই দাম চার-পাঁচ টাকা পড়ে গেল। পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা ঘর থেকে দিয়ে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন, কিন্তু এই টাকা উঠিয়ে আনতে গিয়েই মার খেলেন সবচেয়ে বেশী। বাজার মন্দা দেখে অনেক শেয়ার বেচলেন দাম পড়ে গেলে ধরে নেবেন মনে করে, কিন্তু পাকিস্তানে লীগ হারছে, খবর আসতেই শেয়ার বাজার গরম হয়ে উঠলো; শেয়ার-পিছু ছ'-সাত টাকা লোকসান হয়ে গেল। এবার আর বাড়ী ঘর গয়না সব কিছু বেচা ছাড়া উপায় রইল না। অরুণা যে সময় প্রভাতকে খবর দিয়েছিল তখন থেকেই দুঃসময়ের সুরু। রমেশ বাবু ঘর বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতেন। হঠাৎ একদিন থ্রমবসিস এ্যাটাক হল, অরুণা গাড়ী পাঠিয়ে প্রভাতকে ডেকে আনলে। তারপর থেকে সব কিছু ব্যবস্থাই প্রভাত করছে। ডাক্তারদের অনেক চেষ্টায় রমেশ বাবু বেঁচে উঠলেন বটে, কিন্তু বাঁ দিকটা পক্ষাঘাতে পড়ে গেল।

প্রভাত এ সময় অমানুষিক খেটেছে। দিন নেই, রাত নেই, রুগীর সেবা করেছে। অরুণার মা সব সময় বলেন, প্রভাত আমার দুঃসময়ে যা করেছে নিজের পেটের ছেলে ছাড়া আর কেউ এমন করতে পারে না।

রমেশ বাবু কিন্তু জড়ানো গলায় বলেন, আমার মরে যাওয়াই ছিল ভালো, কেন বাঁচালে?

অরুণা চোখের জল সামলাতে পারে না, এ কি বলছো বাবা!

—ঠিকই বলছি মা, আর বেঁচে কি হবে? ভালো করে তোর বিয়েটাও দিতে পারলাম না।

রমেশ বাবুর এই অসহায় কান্নাকে একমাত্র প্রভাতই সামলাতে পারে, ফের বাজে কথা ভেবে কাঁদছেন, এ করলে শরীর সারবে কি করে?

—সারিয়ে কি হবে?

—সে আবার কি কথা! শরীর ভালো হলেই আবার শেয়ার খাটাবেন।

রমেশ বাবু আঁতকে ওঠেন, আবার শেয়ার বাজারে! না না ওখানে না।

প্রভাত উৎসাহ দেয়। কেন, সব জিনিষের ভাল-মন্দ আছে। তাইতে এত ভেঙ্গে পড়লে কি চলে? আপনার মত এত চমৎকার স্পেকুলেটিভ বুদ্ধি ক'জন বাঙালীর আছে?

রমেশ বাবুর মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে, একথা তু[মি] বলেছো। যত মাড়োয়ারী আমার প্রশংসা করে বলে, বাঙা[লী] বহুৎ আচ্ছা বাজার কা চাল সামঝাতে হৈ।

—তবে সে কি কম কথা!

—কিন্তু এখন যে সব গেল।

—তাতে কি হয়েছে, আবার হবে।

যত রকম ভাবে হোক উৎসাহ দিয়ে ডাক্তারদের যত্ন করে প্রভাত রমেশ বাবুকে আরোগ্যের পথে নি[য়ে] অরুণার মা মাঝে মাঝে বলেন, এই দুঃসময়, কেউ এ[সে] সবাই লোকদেখানো—

অরুণা চোখ বড় বড় করে বলে, প্রভাতদা' না থ[াকলে কি] হত মা-মণি?

—ওর ঋণ কি আর আমরা শোধ করতে পারবো?

—প্রভাতদা' আজ বলছিলেন, এ বাড়ী ছেড়ে আ[মাদের] বাসাতেই নিয়ে যাবেন।

অরুণার মা ক্লান্ত স্বরে বলেন, তা যে কি করে স[ম্ভব] পারছি না। ওর ওখানে গিয়ে কি করে সবাই উঠবো? কি রাজী হবেন?

—প্রভাতদা' বাবাকে রাজী করাবেন বলেছেন, এ মা[সেই] বাড়ী ছেড়ে দেওয়ার কথা—

অরুণার মা হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠেন, কত সাধ ক[রে] করেছিলেন। এক কথায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে! ওঁর মু[খ] আমার চাইতে কষ্ট হয়।

আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রভাতের! অরুণার বাবাকে বুঝিয়ে বাসায় নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্রভাত বাসা বদলেছি[ল] তিনখানা, উপরে দু'খানা ঘরের ছোট্ট দোতলা বাড়ী। [উপরের] দুটিতে অরুণারা রইল, নীচে থাকে প্রভাত।

রমেশ বাবু জিজ্ঞেস করেন, এ ভাবে কত দিন চলবে?

প্রভাত হেসে বলে, যত দিন দরকার।

—তোমার এমন কি রোজগার?

—চার জনের যথেষ্ট চলে যাবে।

—এর চেয়ে আমার ঐ বাড়ীটাই বিক্রী করে দিলেই ভা[লো]

—অত সাধ করে বাড়ীটা করেছিলেন,—তাছাড়া মা[] আরও বাঁধা রইল—

রমেশ বাবুর ব্যাঙ্কে যা টাকা ছিল তা সব বের ক[রে] কয়েক হাজার টাকার দরকার ছিল। প্রভাত রমেশ বা[বুর বাড়ী] মর্টগেজ করে সব শোধ করে বাড়ীটা ভাড়া দিয়েছে। পাঁচ[] প্রভাত ভেবে রেখেছে, ঠিকমত খরচ বাঁচিয়ে চালালে বাড়ী [] ছাড়িয়ে নিতে পারবে।

রমেশ বাবু বলেন, তুমি বুদ্ধি ঠিকই করেছো, কিন্তু তোমার কষ্ট হবে—

প্রভাত মুখ নীচু করে বলে, আমার কি-ই বা ছিলো! চাকরী করে দিলেন, তাইতো বেঁচে গেলাম।

ভালো খবরের মধ্যে রমেশ বাবুর দুরবস্থার কথা শুনে মালিক ওর মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। মালিক মোহনলা[ল] এসে একদিন রমেশ বাবুর সঙ্গে দেখাও করে গেলেন।

পিঠ চাপড়ে বললেন, বড় হুঁসিয়ার আদমী আছেন, বড় হবে এক দিন।

রমেশ বাবুর চোখে জল আসে, এর মনটা যে কত বড়, তা আপনাকে কি করে বোঝাব!

মোহনলালজী চিরকাল কলকাতায় মানুষ। পরিষ্কার বাঙলা বোঝেন, বললেন খুব ভালো কথা, বাবুকে জামাই করে নিন।

একথা রমেশ বাবু অসুখ হবার আগে কখনও ভাবেননি। খুব ধুমধাম করে অরুণার বিয়ে দেবেন বলেই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় কি করে যে অরুণার বিয়ে দেবেন তাই ভেবে স্থির করে উঠতে পারছেন না। মোহনলালজীর কথার উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে, আমার তো সবই গেছে, শুধু হাতে অরুণাকে—

—প্রভাত বাধা দিয়ে বলে, ও সব কথা কেন ভাবছেন? অরুণার মত মেয়েকে যে পাবে সে-ই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে।

মোহনলালজী উৎসাহ দিয়ে বলেন, সেই কথাই তো বলছি। আপনি সাদীর সব ব্যবস্থা করে নিন। বেশী কিছু খরচ যা হবে আমি আপনাকে দেবো। আপনি আমার কত উপকার করেছেন।

রমেশ বাবু সজল চোখে বলেন, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন!

মোহনলালজীকে নিয়ে প্রভাত নীচে চলে গেলে অরুণার মা রমেশ বাবুর ঘরে এসে ঢোকেন। রমেশ বাবুর চোখ দিয়ে তখনও জল পড়ছে।

—কি হয়েছে গো, চোখে জল কেন?

—প্রভাতকে জামাই করবো ঠিক করলাম।

অরুণার মার মুখ হাসিতে ভরে যায়, এ তো খুব ভালো কথা। আমি রোজই বলবো বলবো ভাবি, বলে উঠতে পারি না। অরুণা তো প্রভাতদা' বলতে অজ্ঞান! প্রভাতও অরুণার জন্যে যে কি করে তা না দেখলে বুঝতে পারবে না।

ইতিমধ্যে বেলারাণী দু'বার গাড়ী পাঠিয়েছিলো প্রভাতের কাছে। প্রভাত যেতে পারেনি। ড্রাইভার ফিরে গিয়ে জানিয়েছিল, বাড়ীতে অসুখ আছে, বাবু আসতে পারলেন না।

বেলারাণী জানতো প্রভাত এখানে একা থাকে, অতএব তার বাড়ীতে আর কার অসুখ করতে পারে, ভেবে পেল না। তবে কি ওর বাবা-মা এখানে ফিরে এসেছেন? যাই হোক, সন্দেহভঞ্জনের জন্যই একরকম বেলারাণী নিজেই আজ প্রভাতের বাড়ী এসে হর্ণ দিল। প্রভাত বাড়ী ছিল না, অরুণা এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, আসুন, নামবেন না?

—প্রভাত বাবু বাড়ী নেই?

—তাতে কি হয়েছে, আমি তো আছি।

অরুণার কথা শুনে বেলারাণীর মনে কেমন যেন খটকা লাগে, তবে কি তার সঙ্গে প্রভাতের বিয়ে হয়ে গেছে! বেলারাণীকে একবার জানালও না? চট্ করে দেখে নেয় অরুণা মাথায় সিঁদুর দিয়েছে কি না। তা না দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে নেমে পড়ে।

নীচের বৈঠকখানায় তারা দু'জনে বসে। কি করে কথা সুরু হবে কেউ-ই ভেবে পায় না। এর আগে দু'জনের একবার মাত্র দেখা হয়েছিল সিনেমায়, তারপর এই দেখা। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবু অরুণা সেই কথাই তোলে। প্রভাতদা'র সঙ্গে মেট্রোতে আপনাকে দেখেছিলাম, তখন থেকেই আলাপ করার ইচ্ছে ছিলো।

বেলারাণী হেসে বলে, তবু তো আলাপ করেন নি, আমি নিজে এসে আলাপ করলাম।

—কি করবো, সময় পাইনি।

—ঐটাই পাওয়া শক্ত।

—বাবার বড় অসুখ যে—

—কি হয়েছে?

অরুণা সংক্ষেপে সব কথা বলে। সত্যি প্রভাতদা' না থাকলে যে আমাদের কি হত?

বেলারাণী মন দিয়ে শুনছিলো, চোখে জল এসে পড়ে, সত্যিই বড় ভালো লোক। তাছাড়া প্রভাত যে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে অরুণা!

বেলারাণীর মুখ থেকে একথা শুনতে অরুণার অদ্ভুত লাগে। বেলারাণী আবার বলে, 'তুমি' বললাম বলে রাগ কর না, আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। তুমি খুব ভাগ্য করেছ। তা না হলে এমন স্বামী কেউ পায় না।

অরুণার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠে।

—আমি প্রভাত বাবুর মুখে তোমার কথা প্রথম দিন শুনেই বুঝেছিলাম, তোমাদের দু'জনের জুড়ি মিলবে খুব চমৎকার! প্রভাত বাবুকে কত দিন বলেছি, উত্তর পাইনি। বল তো শুভদিনটা কবে?

পুজোর পর বোধ হয় অঘ্রাণ মাসে।

অরুণা বেলারাণীকে বসিয়ে খাওয়ালো শুধু তাই নয়, জোর করে উপরের ঘরে নিয়ে গেল বাবা-মা'র সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে। বেলারাণী দশ মিনিটের জন্যে এসে অরুণার কাছে দু' ঘণ্টা আটকে গেল। কিন্তু এতটুকু তার খারাপ লাগে নি। মনে হয়েছে কত দিনের পরিচিত এরা। বিশেষ করে অরুণার ব্যবহারে সে মুগ্ধ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এতটুকু মেয়ের কি গিন্নীপণা। কত সহজে বেলারাণীর সঙ্গে 'দিদি' সম্বন্ধ পাতিয়ে নিলে। আব্দার করে বললে, এবার থেকে বোনের কাছে আসতে হবে, কিন্তু শুধু প্রভাত বাবু প্রভাত বাবু করলে চলবে না বেলাদি'!

তার বলার ধরণে বেলারাণী হেসে ফেলে, নিশ্চয় আসবো। যা নেবুর আচার খাইয়েছো। প্রভাত বাবুকে এক দিন যেতে বলো। ওঁর বই উঠতে আরম্ভ করেছে।

—আমিও এক দিন ষ্টুডিও দেখতে যাবো।

—নিশ্চয় যাবে, আমায় খবর দিও, তুলে নিয়ে যাবো।

—কি মজা হবে, প্রভাতদা' কিছুতেই নিয়ে যায় না।

—দেখো তোমার প্রভাতদা' আবার আমায় না দোষ দেয়।

অরুণা মাথা দুলিয়ে বলে, না না আপনাকে কিছু বলবে না। এখন বলুন আবার কবে আসবেন।

—চেষ্টা করবো, দু'-চার দিনের মধ্যেই।

—না বলুন, আসবেন শনিবার দিন?

বেলারাণী হেসে ফেলে, বেশ আসবো।

—আমি বসে থাকবো কিন্তু।

—আচ্ছা, আচ্ছা, বলে হাসতে হাসতে বেলারাণী গাড়ীতে গিয়ে বসে।

[ক্রমশঃ।

ছোটদের আসর
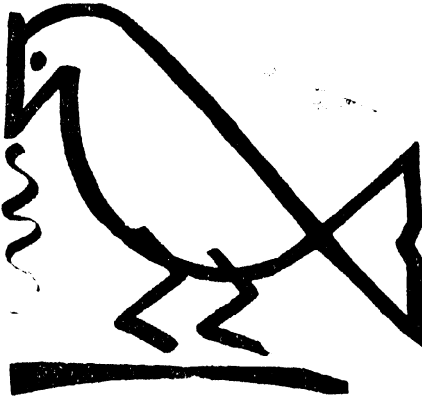
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পাশের বাড়ীতে বিয়ে হয়। সব নিঃশব্দে। বর আসে। বরযাত্রী আসে শব্দবিহীন মোটরকারে। নিমন্ত্রিত মেয়ে-পুরুষ যারা ট্যাক্সিতে আসে, তারাও নিজে নিজে ভাড়া দিয়ে দেয়। কেউ দাঁড়িয়ে নেই ভাড়া দিতে। ফটকের কাছে বাড়ীর কেউ অভ্যর্থনা করবার জন্যে নেই। আছে ভেতরে চেয়ারে বসে। এই যে এসো—কিংবা আসুন। ব্যস এই পর্যন্ত। ফটকে আছে শুধু চাপরাশপরা দরোয়ান। আর লালপাগড়ী পুলিশ গাড়ী সাম্‌লাবার জন্যে।

এখানে-ওখানে চাঁদোয়া খাটানো আছে। চেয়ার পাতা আছে। আছে ফ্যান। আছে আলো। বোসো। সরবৎ খাও। সিগারেট পোড়াও। অ্যাসট্রেতে ছাই ঝাড়ো। আস্তে কথা বলো।

খাবার জায়গায় সারি সারি গোল টেবিল। কেক, সন্দেশ আইসক্রীম এক কাপ। পান-টান নেই এখানে।

প্রেজেণ্ট এনেছে প্যাকেটে করে ক'রে সকলে।

চাপরাশীর হাতে লম্বা-ডাঁটি কোণের আলো—ঘরের কোণে থাকবে—বিলিতি শেড।

বাজারে সবচেয়ে দামী যে শাড়ী নতুন বেরিয়েছে তাই সকলের পরনে। মুখে পেণ্ট, ঠোঁটে লিপষ্টিক, আঁকা ভ্রূ। খুব মোটা যে সেও, খুব রোগা যে সেও, একরকম নকল গলায় কথা বলে, বাড়ীতে সে রকম বলে না; একরকম মেপে হাসে, বাড়ীতে সে রকম হাসে সবাই দেখায় কত আত্মীয়তা। বোঝা যায় নিজেকে দে এসেছে। পরকে দেখাতে নয়।

ক'নে এম-এ পাশ বরকে নিজে নিজেই প্রদক্ষিণ সাত বার। মোনামুনি, ... আমরা ওদের এখানে নেই। ই জানা অফিসে কাজকরা পুরোহিত, ধার-করা শালগ্রাম শিলা।

বড়ো বিদেশী কোম্পানীর বড়ো অফিসারের সঙ্গে ইঞ্জিনী মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যায়। দু'দিন বাদেই যাকে পাটিতে যেতে নাচতে হবে।

এই হল বড়োলোকের বালিগঞ্জ। অন্য বালিগঞ্জে গরী থাকে। বড়োলোকের বালিগঞ্জের আপত্তি করা উচিত গরীবপাড়ার নাম বালিগঞ্জ হবে কেন? যেমন এখনো চৌর গরীব থাকে না, তেমনি আগের বালিগঞ্জে এমন কেউ থাকতে না যার মোটর নেই, যে বিলেত যায় নি। সে পথ দিয়ে স বাস যেতে পেত না। রিক্সা পাওয়া যেত না। পায়ে-হাঁটা আ ট্রাম থেকে নেমে অনেক হেঁটে আসতে পারত না। 'ঘুঁটে-এ ব'লে ঘুঁটিয়াওলা ফটকের সামনে দাঁড়াতে পারত না।

আমি বড়োলোক, আমার অনেক টাকা, আমি সাহেব বাঙালী নয়—এমনি চিন্তা ছিল তাদের। তাদের মধ্য থেকে বিদ্যা আসেননি, বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দও না। এমনি পাড়া থেকে পঙ্কজের মতন বেরিয়েছিলেন নেতাজী।

মীরা আর একটা বিয়ে দেখতে গেছলো। ওরে বা গোলমাল! যেমনি আলো, তেমনি লোক, আর তেমনি হৈ-চৈ

প্রথমেই তো দরজার সামনে চীৎকার—বাগবাজার ট্যাক্সি দু' টাকা। টালিগঞ্জ ট্যাক্সি—সাত টাকা। নন্দনবাগান গাড়ি দেড় টাকা। প্রত্যেককে ভাড়া দিতে হবে। মেয়েরা মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে—পুরুষরা পুরুষদের।

এখানে বেনারসী চেলি, জরির জড়োয়ার গয়না, ঝিলিমিলি। এখানে উপহারের মধ্যে বই বেশী। নগদ দেওয়াও আছে। পাশে একজন নাম লিখে নিচ্ছে।

এখানে সাতাশ বছরের ভারী মেয়েকে পিঁড়েয় তুলে সগু ভগিনীপতীরা ঘেমে যাচ্ছে। একতলা থেকে দুতলা। 'বর বড় ক'নে বড়ো'—চিতের কাঠির আগুন, এয়োদের সাত পাক, না ছড়া—এখানে অনেক কাণ্ড! প্রীতি-উপহারের কবিতা—এ থেকে তিনতলা ছুটোছুটি—বিয়ে হচ্ছে বটে!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

বসতে হবে কুশাসনে। কত পায়ের ধুলোয় ধুসর কুশাসন। ওপর তোমার দামী শাড়ী নিয়ে ব হবে। বাড়ীতে তুমি যতই টেবিলে যতই সাহেব হও, এখানে সাম ব্যাপারে তোমায় ওখানে বসতেই হ

খাওয়া তো মীরার মুখস্থ। ভাজা একটা থাকবে লম্বা ফালি কাটা। বারো মাস বিয়ের সময় বেগুনভাজা পাবে কলকাতায়। ভাজা। কপির ডালনা। মাছের কা চপ। ফ্রাই। মাংস। লুচী আর পো

কখনো মালাইকারী। দু'রকম চাটনী। পাঁপরভাজা। তারপর দরবেশ আর লেডিগেনী থাকবেই। দরবেশ সবাই নেবে না। তবু থাকবে। দই-এর পর সন্দেশ আসবে। তারপর পান। তারপর জিগ্যেস করতে আসবে কেমন হল? পুরুষরা পুরুষদের। মেয়েরা মেয়েদের।

মীরা শুনেছে আগের দিনে মেয়েদের খাওয়া হলে তবে পুরুষদের হত। বামুনদের হলে তবে কায়স্থদের হত। এখন সব একসঙ্গে। বলুক না কেউ—আমি ব্রাহ্মণ। আলাদা বসব। লোকে তার দিকে চেয়ে দেখবে। ছি-ছি করবে। যেন কত বড়ো অন্যায়! আগের দিনে ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাশাপাশি বসলে যেমন অন্যায় হত। মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত।

মেয়ে আর পুরুষদের মাঝখানে কোথাও একটু পর্দা টাঙানো থাকে, কোথাও তা-ও না। দু'-চার জন মেয়ে তো পুরুষদের মাঝখানেই খালি পাতা থাকলে বসে যায়। আইবুড়ো মেয়েরা, সধবা মেয়েরা।

নেমন্তন্ন ক'রে এরা যোড়হাত। যেন ধন্য হয়ে গেছে, তুমি এসেছ বলে।

মীরার মনে পড়ে বালিগঞ্জের সেই বাড়ীতে কত লোক না খেয়ে চ'লে গেছে। কেউ লক্ষ্যও করেনি। যাকগে। ব'য়ে গেল। আমার বাড়ীর বন্দোবস্ত তো দেখে গেছে! তাহ'লেই হল!

একজন তো সেদিন খাওয়ালো একখানি ক'রে পেঁয়াজী আর আধ কাপ কফি। গাছে গাছে পাতায় পাতায় অনেক আলো জ্বলেছিলো।

এসেছিলো অফিসের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা। তারা কি মানুষ না কি? যতক্ষণ চাকরীতে আছে, কিছু বলতে পারবে? অফিস থেকে রিটায়ার করে বেরিয়ে গিয়ে গালাগাল দেবে। সে অনেক দিনের কথা। তারই মধ্যে এক জন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে বললো—এমন পেঁয়াজী জীবনে খাইনি স্যর! সে প্রায় কেঁদেই ফেললো। তারই উন্নতি হল। সকলেই জানলো পেঁয়াজীর মোসাহেবী করেই এর পদোন্নতি।

কত বিচিত্র মানুষ! কলি বলেছিলো গৌরাঙ্গদেবকে—আমার পাপের রাজত্বে তোমার নাম-গান এলে সব অচল হয়ে যাবে যে।

মহাপ্রভু বলেছিলেন,—ভয় নেই। নামের মাহাত্ম্য বুঝেছে তিনটি প্রাণী। আর সব হরি হরি হরি—মানে চুরি করি করি।

মোসাহেবীর একটা মুস্কিল আছে। যাকে ঘিরে মোসাহেবী, তার জোরে লোকের ওপর অত্যাচার করা, হাতে মাথা কাটা, বীরদর্প—সে যদি হঠাৎ চলে যায়—তখন মোসাহেবদের ভারী মুস্কিল হয়—তাদের দুঃখের দিন ঘনিয়ে আসে—তখন তারা জুতোর তলায়। লোকে তাদের মুখের ওপর বলে—আমরা তোমাদের ঘৃণা করি।

মীরা বড়ো হয়েছে। জগৎটা ভালো করে দেখতে শিখেছে। সব ছেলেমেয়েই একদিন বড়ো হয়। তখন চারি ধারের অবস্থা দেখে বড়ো হবার আনন্দ তাদের মুছে যায়।

এটা হয় ভারতবর্ষে। অন্য দেশে হয় না। সে দেশের ছেলে-মেয়েরা বড়ো হলে বড়ো কাজ করবার সুযোগ পায়। বড়োলোকের আত্মীয় নয় ব'লে ব'সে থাকতে হয় না।

পেনাং কি সুন্দর শহর! ছবিকে হার মানায়। দার্জ্জিলিং, সিমলা হিল পেনাং-এর কাছে কিছুই নয়। মীরার বান্ধবী মুকুল লিখেছে। সেখানে রাঁধুনী রাখা সহজ নয়। রাঁধুনীর মাইনে একশো টাকা। মোটরে আসবে। তোমার রান্না রেঁধে চ'লে যাবে।

মোটর আমেরিকাতেও পাওয়া যায়—চারশো টাকায়। তোমার বাড়ী পরিষ্কার ক'রে চাকর নিজের মোটরে চ'লে যাবে। ছোট কাজ ক'রে সে, কিন্তু সত্যি ছোট নয়।

বিলেতের গয়লাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো—তুমি কি দুধে জল দাও?

সে অবাক হয়ে গেছলো। মনে করেছিলো—দুধে জল না দেওয়া বুঝি মস্ত অপরাধ। সে ভয়ে ভয়ে ব'লেছিলে—দুধে যে জলীয় অংশ আছে, তা কি যথেষ্ট নয়? স্বাস্থ্যের জন্যে কি কিছু জল মেশানো দরকার?

প্রশ্নকর্ত্তা বলেছিলো, দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে নয়, তোমার ডবল লাভের জন্যে জল মেশাও না?

তাতে রক্তচক্ষু ক'রে সে এমন একটা W-H-A-T? ব'লেছিলো যে চমকে উঠতে হয়। তাদের দেশের গয়লারাও নমস্য। ঠকানো তারা ভাবতে পারে না। আর না ঠকানো আমরা ভাবতে পারি না।

তাই মীরা অবাক হয়ে গেল ওর বাবার অবস্থা দেখে। মগনলাল গুজরাটী, বিড়ির পাতার আর যেন কিসের কারবার করে—ওষুধ-বিষুধ, পাট ইত্যাদির। ওর বাবা তার কাগজপত্র লিখে দিয়ে ব্যবসাটা ঠিক মতন দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই দে মশাইয়ের জন্যে মস্ত বাড়ী ভাড়া করা হয়েছে। লাইট, টেলিফোন, মোটরকার। হ্যাংলা-প্যাংলা বড় স্কুলে পড়ছে। তাদের জামা-কাপড় খাওয়া-পরার কোনো অভাব আর নেই।

গুজরাটী মগনলাল। বাঙালীর জন্যে কত তার কৃতজ্ঞতা! মীরা ভাবতেই পারেনি কোনো দিন তার বাবা-মার জীবনে এত সুখ আসবে। কোনো দিন হ্যাংলা-প্যাংলা দেখবে এত ঐশ্বর্য্য। এ যেন স্বপ্ন! এ যেন রূপকথা! অথচ ভগবানের রাজত্বে নিত্য এমনি হয়। একদিন যে অনেক দুঃখের মধ্যে কাটায়, আর একদিন তার জীবনে অনেক সুখ আসে।

শুধু বিদ্যাসাগর মশাই নয়, কত গরীবের ছেলে কত দূর দূর পথ পাড়ি দিয়ে কত কষ্ট ক'রে লেখাপড়া করে, একদিন শহরের বুকে কত বড় বাড়ীর তারা মালিক হয়। খাঁটি মানুষ যারা, তারা স্বীকার করে—একদিন আমি গরীব ছিলাম। গরীবের ছেলের তারা উপকার করে।

অমানুষ যারা, তারা বলে চিরকালই আমরা বড়োলোক। গরীবদের তারা দূরে সরিয়ে রাখে। ছেলেকে বলে লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে—সে বার লাটসাহেবের সঙ্গে এক সেলুনে গেলাম—তুই তো ছিলি—কিংবা দেশবন্ধু তাঁর গলার মালা তোর গলায় পরিয়ে দিলেন, মনে আছে? ছেলে মাথা নেড়ে সায় দেয়—সব মনে আছে। বাপেরা এমনি ক'রে ছেলেদের মিথ্যাবাদী ক'রে তোলে। দেশের যেখানে যত বাড়োলোক আছে, সকলকার সঙ্গে তার নিত্য দেখা হচ্ছে, বাড়ীতে বসে

বসেই দেখা হচ্ছে ; যেখানে যত ঘটনা ঘটছে, সবই তার চোখের সামনে ঘটছে ; এমনি অভ্রান্ত মিথ্যা বলতে একদল লোকের ক্লান্তি নেই। মনে করে, সকলেই বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করছে।

মীরা দেখলো—বাপের মিথ্যাচারে ছেলের পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে। বৃহৎ চিন্তার রাস্তা বন্ধ করে বিপজ্জনক স্বার্থপর সে হয়ে উঠছে।

এ ঘটনা সে ড্যাডির এক বন্ধুর বাড়ীতেই দেখতে পেলো। বিলেতে চার বছর থেকে কোনো পাসই না ক'রে সে ফিরে এসে বললে—পাশ করেছে। ডিগ্রী আসছে। সে ডিগ্রী আর এলোনা!

জীবনে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করাটা ভুল। লোককে অগ্রাহ্য করলে শেষ পর্য্যন্ত ঠকতে হয়। সরকারী বড়ো কর্ম্মচারী সি, বিশ্বাস কাউকেই বিশ্বাস করলো না। নিজের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফ্ল্যাটেই কাটিয়ে দিলো। ভাই-বন্ধু যে এসেছে, কারুরই উপকার করেনি। মনে জানে, আমার পেনসন আছে, কারুর কাছে হাত পাততে আমায় হবেনা। কারুকে দরকার হবার আমার কথা নয়।

কিন্তু দরকার হল। সামান্য টাকার জন্যে বাড়ী শেষ হয় না, সেই সামান্য টাকাও কেউ দিলো না। না-দেওয়াটা বড়ো কথা নয়, তাকে অবিশ্বাস করাটাই বড়ো কথা।

অফিসে যারা মনে করে, আমি না হ'লে অফিস অচল, এক দিন তারাও চলে যায়, অফিস অচল হয়না। তারা একলা প'ড়ে থাকে, কেউ ডেকে খোঁজও নেয় না। এ শ্রেণীর লোকদের কাছে অফিসটাই ছিল জগৎ। বৃহৎ জগতকে তারা দেখেনি। অফিস-জগতের ক্ষতি করার ক্ষমতা হারিয়ে ঢোঁড়া সাপের মতন তারা নির্জ্জীব হয়ে থাকে। অবসর সময়টাকে সুন্দর করে তোলার বিদ্যে তাদের জানা নেই। তারা যা পেনশন পায়, অন্য নতুন লোকরা সারা মাস খেটে সে মাইনে পায় না—কিন্তু আনন্দ পায় ছোট চাকরীতে থেকেও, যে আনন্দ হতভাগ্য পেনসনভোগীর নেই।

মীরা দেখে আর ভাবে, তার ছোটবেলার সমুদ্রপারের যে হাওয়া, সে-ই সবচেয়ে সত্য। জীবনের সমুদ্রের সেই হাওয়ার জন্যে প্রাণের সমস্ত দরজা খোলা রাখার বিদ্যা অর্জ্জন করাই আসল জিনিস। ক'জন জানে এ কথা? ক'জন ভাবে এমন করে?

এখনো সাহেবদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে রবিবার গিয়ে অপেক্ষা করে, কখন ছোট ছোট খেলার এরোপ্লেন ডিজেল ইঞ্জিনে চালিয়ে আকাশে তুলে দেওয়া হবে—গোঁ গোঁ শব্দ করে চারিধারের গাছগুলোর ওপর দিয়ে ঘুরে সেগুলো আবার মাটিতে নেমে আসবে।

সেখানে বাঙালী ছেলেমেয়ে নেই। সামনের ফোর্টের মধ্যে চার তলা বাড়ী আছে, পার্ক আছে, বাজার হাট সিনেমা আছে—সে রহস্য জানবার জন্যে বাঙালী ছেলেমেয়েদের কি আগ্রহ আছে? তারা কি গঙ্গার ধারের জাহাজ দেখে ব'লে দিতে পারে দূর থেকে, কোন্ দেশের জাহাজ?

এরোপ্লেনে যারা চড়ে, তারাই কি জানে ষ্ট্রাটোসফিয়ারে কেন প্লেন আগে উঠে যায় তাড়াতাড়ি দূর দেশে পাড়ি জমাবার জন্যে? কলকাতা থেকে সেই আকাশে উঠে দিল্লী পৌঁছতে এক ঘণ্টাও লাগবে না, নামতে নামতে দিল্লী পার হয়ে করাচী? আজব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে অনবরত, কিন্তু সুখ-দুঃখ চিরকালের মতন আছে। আ[illegible] মান-অপমান, লাভ-ক্ষতি, হিংসা-দ্বেষ, পররাজ্য-লোভ—কুরুক্ষেত্রে[illegible] পর থেকে আজও অবধি তার একটুও পরিবর্ত্তন হয় নি।

আর আছে মৃত্যু—সমস্ত দর্প চূর্ণ করতে। ভগবানের শ[illegible] সেখানে জাগ্রত। যা ভোলার চেয়ে বোকামি আর কিছু নেই। মৃ[illegible] জীবনের শেষ কথা। অহঙ্কারের শেষ। মৃত্যুর পরেও যে থা[illegible] সে-ই সত্যি থাকে। সেই অমর হবার মন্ত্র জানত এশিয়া। আড়[illegible] হাজার বছর পরেও বুদ্ধদেব বেঁচে থাকেন উত্তর-বিহারের এক অখ্য[illegible] প্রান্তরে গাছতলায় মারা গিয়েও। বেঁচে থাকেন যীশাস্ ক্রা[illegible] দু' হাজার বছর পরেও, কাঁটার মুকুট প'রে অপমানিত প্রাণদ[illegible] নিয়েও।

মীরাকে এসে ধরলো কলেজের পুরোন বান্ধবীরা—আমরা এক[illegible] কবি-মিলন করব। রিসার্চের মেয়েদের কাব্য আসে না। মী[illegible] অবাক হ'য়ে গেল। আসলে কয়েকজন মেয়ে কবিতা লিখছে, তা[illegible] কবিতা শোনাবার আসর খুঁজছে।

চাঁদা তুলে হল আয়োজন। দেখা গেল বাংলাদেশে দুশো জন ক[illegible] আছে যারা হুড়োহুড়ি ক'রে আসতে চায়। এক চন্দ্র বলো সূ[illegible] বলো ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজ সেখানে অসংখ্য ষ্টার! রামব[illegible] মালা প'রে গদগদ হয়ে গেলেন। শ্যামবাবুও তথৈবচ। বি[illegible] ওঁদের একখানিও বই না পড়েছে মীরা, না পড়েছে আর কেউ[illegible] ওঁরাও বেশ জানেন, কোনো বাড়ীতে ওঁদের কোনো বইই নেই[illegible] বাকী যারা, তারা ঠেলাঠেলি ক'রে শোনাতে চায়, লোকে শুনে[illegible] না চাইলেও। দুশো কবির কাব্যপাঠের যন্ত্রণা সহ্য করতে হ[illegible] বাংলাদেশের সহিষ্ণু শ্রোতাদের দুপুর থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত[illegible] শ্রোতাদের মধ্যেও তো বেশীর ভাগই বক্তা! আর সারা বাংলাদেশে[illegible] পাঠকরা সে খবর পেয়ে লজ্জায় ম'রে গেল—বৃন্দাবনে পুরুষ[illegible] শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া? অমর হবার এর চেয়ে সস্তা পথ আর নাকি আছে[illegible]

আছে আর একটা—জীবনী লেখা। তোমার জীবন কিছুই [illegible] স্থির জেনেও তুমি রাতারাতি অমর হবার জন্যে জীবনের পুঁ[illegible] কয়েকপাতা ছড়াতে সুরু করে দাও, মনে মনে আত্মপ্রসাদ নি[illegible] যাও এই তো অমর হয়ে গেলাম!

মীরা ভাবে, এরা কেন ভুলে যায় রবীন্দ্রনাথ কি শুধু কবি[illegible] লিখেই বড়ো হয়েছিলেন? সেই বিরাট কর্ম্মী মানুষের ত্য[illegible] আদর্শ চিন্তা দূরদৃষ্টি যে গভীর সাধনার ফল, সেটা এড়িয়ে গে[illegible] চলবে কেন? কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীর ত্যাগবীর নাম নেওয়া যায়, যে[illegible] গ্রাহ্যও করে না।

সুতরাং কবির হাট বিবির হাটের মতন নগণ্য গ্রামের উপহ[illegible] হয়ে গেল। নামলোভী হলেই যদি নাম পাওয়া যায়, তাহ[illegible] মীরাদের চাকর বরেন খুব নামী লোক। সে ড্যাডির প[illegible] অফিসে নিয়ে যায়, হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরীর সকলে তাকে চে[illegible] সুতরাং সে নামী। যে সব ব্যারিষ্টার তাকে চিনত তারা অনে[illegible] জজ হয়ে গেছে, সুতরাং সে বলতে পারে সে জজেদের চেন[illegible] যদিও হাইকোর্টের চার দেয়ালের মধ্যে পরিচয় বন্দী ক[illegible] রাখতে অনেকেই নারাজ। তারাও চায় পাকিস্তানের সীমান্ত পর্য[illegible] জয়ধ্বনি উঠুক দেশসেবক বলে।

মানুষের তাড়া দেখে মীরার হাসি পায়। যে শিক্ষায় গরল

দুধে জল দেওয়া অন্যায় মনে করে, সেই শিক্ষাই আসল শিক্ষা। তার বাবার সেই শিক্ষা আছে। লক্ষ লক্ষ টাকা তার হাত দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, একটি পয়সা গরমিল হবার যো নেই। মগনলাল দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায় কারবারের জন্যে। তার কিছু দেখবার সময় নেই।

মীরা ভাবছিলো, এবার ফিরে আসে বাবার সংসারে। ও-বাড়ীতে সে এখন ধিক অবাঞ্ছিত না হ'লেও খুব যে ঈপ্সিত তাও তো নয়। এখন সে রিসার্চ স্কলারশিপ পাচ্ছে, নিজের খরচ নিজেই চালাতে পারবে। তার ভবিষ্যতেরও ভাবনা নেই।

কিন্তু ওপরে একজন আছে যাঁর ইচ্ছায় সমস্ত ঘটনা ঘটে, এ কথা বিশ্বাস করলেও ভালো করে প্রমাণ পেলো যখন সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে এসে তার বাবাকে পড়ে যেতে দেখে সে ধরে ফেললো। মাটিতেই শুইয়ে দিলো তার কোলে মাথাটা রেখে। ডাক্তার এসে শুধু বললো হয়ে গেছে।

নতুন বাড়ীর সমস্ত উজ্জ্বল আলো যেন হঠাৎ নিভে গেল। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোথায় নিয়ে যাবে বলে। টেলিফোন অনবরত বেজে যাচ্ছে। মগনলালের টেলিগ্রাম এসেছে।

[ক্রমশঃ।

যাদুকর

রোব্যার্ কারিণী

খুঁজো না, নিশ্চিত খুঁজেও তুমি পাবে না। আমিও খুঁজিনি এবং আবিষ্কারও করতে পারিনি। কোনও ভূগোলেও এদেশের নাম লেখা নেই—কোনও তরণীও ভেড়েনি এ কূলে।—এ দেশের নাম আজও আমি জানতে পারিনি।

এইটুকু জানলেই যথেষ্ট যে প্রাচ্যের এক সমুদ্রের ঊর্মিমালা এই প্রাচীন শ্বেত-মর্মর-প্রাসাদগুলির শেষ প্রান্তে এসে স্থির হয়ে গিয়েছে।—প্রাসাদের ফোয়ারাগুলি ছড়িয়ে দিত উত্তপ্ত মুক্তার মত অশ্রুরাশি—ফোয়ারার জলাধারে জলপান করতো কত পাখী, হরিণী আর মরুভূমির হাওয়া।—প্রাসাদের প্রতি স্তম্ভে রয়েছে দিব্য-স্থপতির নিপুণ হাতের ছাপ।

এই প্রাসাদগুলির একটি ছিল প্রাণহীন। এই স্বর্গপুরীর মত রাজ্যে পদার্পণ করেই সভাসদদের মন অসন্তোষে ভরে উঠল। এদেশের কাব্য তাদের অজানা। সুরে-বাঁধা বীণাটি রয়েছে অনাদরে পড়ে, যে বীণায় শুধু কবির হাতই তুলত ঝংকার, সেখানে মলয় পবনও পায়নি সাহস বীণার তন্ত্রীগুলোকে কাঁপাতে।—হাল্কা-গানে ভরা পার্চমেণ্ট কাগজগুলি রয়েছে ছড়ান এখানে-সেখানে পুরু গালিচার ওপর। জগতের গতানুগতিকতা আর নৈঃশব্দ্যের সুযোগে শুধু কয়েকটি নির্ভীক পাখী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পার্চমেণ্ট কাগজগুলির সামনে বসে তাদের প্রতিভা জাহির করতে আসে।

তবুও সহরটি প্রাণহীন। আনন্দ, সুখ, আশা, ভালবাসা—এসবের করা হয়েছে কণ্ঠরোধ—বীণাটি পড়ে রয়েছে রাজসিংহাসনের চাতালের ভেতর।

এই উপকথার দেশের রাণী দুঃখ কোন স্মরণাতীতকাল থেকে রাজত্ব করছেন। একদিন তিনি সভাসদপরিবৃতা হয়ে চললেন তাঁর প্রাসাদের কারাগার পরিদর্শন করতে। বাগানগুলি পেরিয়ে দেখতে পেলেন একটি বৃদ্ধ খঞ্জকে। সাহায্য করবার জন্য রাণী তাকে মূল্যবান কাঠের যষ্টি প্রদান করেন।

বৃদ্ধ ভর্ৎসনা করে—মহারাণী এমনি ক'রে তুমি আমার দুঃখ দূর করতে পারবে না।

ভূগর্ভস্থিত কারাগারের সম্মুখে এসে জিজ্ঞেস করেন রাণী দুঃখ কারারক্ষীকে—কেন বন্দীরা আমার করুণা প্রার্থনা করে? রোগে ক্ষয়িষ্ণু আঁখি, রুগ্নতা, ব্যাধি, যন্ত্রণা, মৃত্যু—এ সবই তো তাদের যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি আমার মহত্ত্বের প্রতি। এই হতভাগ্যদের কশাঘাতে মেরে ফেলা হোক—তারপর তাদের মৃতদেহগুলি রাজ্যের কুকুরদের ভেতর বিলিয়ে দেওয়া হোক।

এমনি ক'রে বাস করে প্রজারা রাণীর নির্মম শাসন-যন্ত্রের তলায়।

রাণী দুঃখ দ্বিতীয় বার কারাগার পরিদর্শন করতে যান। একটি দুর্দশাগ্রস্ত গরীব শিশুকে দেখতে পান। সে চিন্তা করতে করতে হাঁটছিল। রাণী তাকে একটি চাবুক উপহার দেন, যাতে সে বাগানে ক্রীড়ারত জন্তুগুলোকে শাসন করতে পারে।

ভর্ৎসনা করে শিশু—মহারাণী! এমনি করে তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারবে না।

কারাগারে রক্ষীকে প্রশ্ন করেন রাণী—কেন বন্দীদের চোখে দেখি বিদ্রূপের আলো? তাদের চোখগুলি উৎপাটিত ক'রে বিলিয়ে দেওয়া হোক শকুনীদের ভেতর। কেন অধরে তাদের অবজ্ঞার হাসি? প্রজ্জ্বলন্ত লৌহ দ্বারা বন্ধ করা হোক তাদের মুখ।—কবে থেকে বন্দীরা তাদের সম্রাজ্ঞীকে অবজ্ঞা করছে?

—যবে থেকে বন্দীদের ভেতর একজন গুন্ গুন্ ক'রে গেয়েছে একটি গান—যার মর্ম আমি বুঝতে পারি নি। জবাব দেয় কারারক্ষী।

—কশাঘাতে মেরে ফেলা হোক এই অজ্ঞাতনামা বন্দীকে, তার পর তার মৃতদেহ পুড়িয়ে ছাইগুলি নদীর জলে ছড়িয়ে দেওয়া হোক।

রাণী ফিরে আসেন প্রাসাদে নীরব, বিমূঢ়, পরিচারিকার সাথে।

রাণী তৃতীয় বার যান কারাগার পরিদর্শন করতে। পথে দেখেন একটি বুলবুল অপূর্ব কণ্ঠ-সংগীত বিতরণ করছে জগতের সব মানুষের জন্য। আদেশ দিলেন রাণী—এই নরকের পাখীটাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হোক চিরকালের জন্য। বন্দী হল সে সোনার খাঁচায়। ভুলে গেল গান বাগিচার শোকে।

কারাগারে রাণী প্রশ্ন করেন রক্ষীকে—কেন বন্দীদের প্রদীপ্ত ললাট হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে কারাগারের তমিস্রারাশি? পর্বতের শিলাখণ্ডের ওপর চূর্ণ করে দেওয়া হোক তাদের শিরগুলি।—এই ম্রিয়মান বন্দীদের কণ্ঠ হতে কেন এখনও ধ্বনিত হচ্ছে এই সংগীত? কণ্ঠরোধ ক'রে তাদের হত্যা করা হোক, তার পর তাদের মৃতদেহগুলি রাজ্যের সিংহদের বিলিয়ে দেওয়া হোক। কত দিন থেকে বন্দীরা আমাকে এড়িয়ে চলছে?

—যবে থেকে বন্দীদের ভেতর ছায়াময় মূর্তির মত একজন কশাঘাতেও নির্লিপ্ত থেকে মৃত্যুকে করেছে পরিহাস।

এই রহস্যময় মানুষটিকে আমার সভায় নিয়ে আসা হোক।—

রাণী দুঃখের সিংহাসনের সম্মুখে নিয়ে আসা হল বন্দীকে।—অনিন্দ্যসুন্দর এক তরুণ—তার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতে লেখনী

অক্ষম।—একটি নীল বৃত্ত রয়েছে তার ললাটকে পরিবেষ্টন করে—সোনালী কেশদাম আস্কন্ধ তরঙ্গায়িত।—হাল্কা সামরিক পোষাক যেন কুহেলীর আবরণ—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

জনাকীর্ণ সভায় রাণী দুঃখ প্রশ্ন করেন বন্দীকে—বন্দী! আলোকের মত তুমি সুন্দর!—কে তুমি?

—আমি সে, যে কখনও বন্দী হবে না তোমার। জবাব আসে বীণার ঝংকারের মত কণ্ঠস্বরে।

—কে তুমি?

—আমি সে যে কশাঘাতকে করেছে অবজ্ঞা! বন্দীদের আমি মুক্তি।

—কে তুমি?

—যে নগরী তোমার শাসন যন্ত্রের-চাপে আর্তনাদ করছে, সেই নগরীর আমি মুক্তিদাতা।—দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের জাহাজের পাল আমি ফুলিয়ে তুলি হাওয়া হয়ে।—যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিক যখন সূর্য্যাস্তের সময় রক্তিম দিনান্তে দৃষ্টি ফেলে হারিয়ে, তখন আমি গাই স্তোত্র।—আমি বিহঙ্গের পক্ষপুট, যে ঘুমন্ত শিশুর প্রশান্ত ললাটে এঁকে দেয় চুম্বন-রেখা! দুর্বল, দরিদ্র এবং অক্ষমকে আমি নিয়ে যাই মহান যাত্রাপথে।—বিত্তার আমি ঐকতান—আমি শিল্পের গৌরচন্দ্রিকা—আমি শিল্পীর পরম আত্মতৃপ্তি।—অন্ধের আমি দৃষ্টি-প্রদীপ।—নিপীড়িত আত্মার বুকে আমি আশা জাগাই।

আদর্শের বর্ম আর শ্রমের যন্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমি বিদ্রোহের তরবারি গড়ি। দুঃখ! তোমার সম্মিলিত মন্ত্রিসভা কি করতে পারে আমার?—অত্যাচার, সম্পদ, দাসত্ব, ঘৃণা, দুঃখ-দুর্দশা হচ্ছে তোমার মুকুটের অলঙ্কার? বন্দীদের হত্যা করে রাজ্য থেকে তুমি আনন্দকে করেছ নির্ব্বাসিত।—বন্দীরা যখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, তুমি তখন রয়েছ বিপুল সুখ-সম্পদের ভেতর পরম আত্মতৃপ্তিতে।—দুঃখ! আমি আমার ব্রত পালন করেছি, বন্দীদের দুঃখ আমি ঘুচিয়েছি, তাদের কণ্ঠে দিয়েছি গান।

—রহস্যময় যাদুকর, বল কে তুমি?

—আমি স্বপ্ন।

—স্বপ্ন অনাদৃত বীণাখানি তুলে নেয়, ঝংকার ওঠে বীণায় গানের—আশা, আনন্দ ও পরিত্রাণের। কারাগারের দুয়ার খুলে গেল, সূর্য্যের আলো নেমে এল বন্দীদের কাছে—তাদের সঙ্গে যায় জনাকীর্ণ উদ্যানের ভেতর পর্য্যন্ত।

স্বপ্ন এক বৃদ্ধ খঞ্জের দিকে এগিয়ে যায়। বৃদ্ধ ভুলে যায় তার যষ্টির কথা—চেয়ে দেখে এক তরুণ আনন্দে মুখরিত করে তুলছে চারিদিক।—এই বলিষ্ঠ তরুণ সে নিজেই। স্বপ্ন মিলিয়ে যায়—

স্বপ্ন দেখতে পায়—একটি শিশু তার দুর্ব্বল হাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটি ভারি চাবুক।—শিশুটি হিংসার যন্ত্রটিকে ফেলে রেখে সোহাগ করতে থাকে দুই হাত দিয়ে একটি চঞ্চল স্নেহপরায়ণ মেষকে।—স্বপ্ন মিলিয়ে যায়।

কারাগারের দ্বারের সম্মুখে স্বপ্ন তরবারির ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে যায় কারারক্ষীর দিকে—কারুকার্যময় মেঝের ওপর ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় ঢাল-তরোয়াল।

—শ্রমিক নিমীলিত নয়নে দেখে উর্বরা-সুফলা উপত্যকার ওপর একটি কুটীর। প্রশান্ত বৃষভ-যুগল জমিতে হাল টানছে—হালের পেছনে দাঁড়িয়ে কৃষক—এই কৃষক শ্রমিক নিজেই।—স্বপ্ন মিলিয়ে যায়।

স্বপ্ন দেখতে পায় বন্দী, বেদনার্ত বুলবুলকে সোনার খাঁচায়।—উন্মুক্ত হল দুয়ার—নীল আকাশে ক্ষুদ্র-বিহঙ্গ মেলে দেয় ডানা—তার আনন্দ-মুখর সংগীত ছড়িয়ে পড়ে আকাশে-বাতাসে।

সমস্ত সহর থেকে, ঝরণার জল থেকে, ফুলের ভেতর থেকে, মানুষের হৃদয় থেকে—সমস্ত প্রকৃতির ভেতর থেকে মুখরিত হয়ে ওঠে একটি দিব্য-সংগীত।—দুঃখের হয়েছে পরাজয়—স্বপ্ন গিয়েছে মিলিয়ে।

অনুবাদক—সুবীরকান্ত গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের চোখে তোমরা

শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হ'লেই তোমরা তাঁর প্রতি তোমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাও। কিন্তু তিনি যে তোমাদের কি রকম স্নেহ করতেন, তোমাদের জন্য কত ভাবতেন, কত যে কবিতা তোমাদের নিয়ে লিখে গেছেন, তার হিসাব তোমরা রাখনা। পাহাড় যেমন যত উঁচুই হোক্ না কেন তার গা বেয়ে জলের ধারা যেমন নীচু দিকে যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথ যত বিখ্যাত, বা যত বুড়োই হোন্ না কেন, তাঁর অন্তরের স্নেহ সব সময়েই তোমাদের ওপর বর্ষিত হ'য়েছিল।

বৈশাখ মাসে, কালবৈশাখীর সন্ধ্যা বেলায় যখন সারা আকাশ মেঘে ভরে যায়, ভীষণ ঝড়ের মাঝখানে যখন সুরু হয় মুষল ধারে বৃষ্টি পড়া, তখন তোমরা সুর করে বল তাঁরই সঙ্গে কবিতায় 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।' তারপরে খানকয়েক খবরের কাগজ জোগাড় করে নৌকা তৈয়ারী করার পালা সুরু হয়, রাস্তায় জল জমলে ছাড়বার জন্য। তখন হঠাৎ দেখা গেল মা রাগ করে অতগুলো কাগজ নষ্ট করবার জন্য হয়ত দু'ঘা তোমাদের পিঠে বসিয়ে দিলেন। ব্যস! তোমাদের হ'য়ে গেল ভীষণ রাগ। রাগের মাথায় তোমরা হয়ত মা-কে বলে বসলে—যাও, তোমার সঙ্গে খাবনা, তোমার সঙ্গে কিছু কোরব না, আমার যেখানে খুসী সেখানে চলে যাব। রবীন্দ্রনাথ করলেন কি, তোমাদের দলে হ'য়ে তোমাদের মনের কথা কবিতার প্রকাশ করলেন:—

আমি যাব না তোর কোলে
আমি খাব না তোর পাতে
আমার যেথায় খুসি সেথায়
যাবো চলে।

মা হয়ত বললেন বৃষ্টিতে ভিজে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং দোর-জানালা বন্ধ করে একটু শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাক। কত দেশ-বিদেশের গল্প, কত রাজা-রাণীর গল্প, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প। বৃষ্টিতে ভিজলে শুধু অসুখ করবে। ভাত, মাছ, তরকারী ফেলে ডাক্তারের তেতো ওষুধ খেতে হ'বে! কিন্তু তোমাদের অভিমান তখনও যায় নি। তোমরা বলে বসলে—বয়ে গেল, ভারী তো ডাক্তার। বাড়ীর কাছে পাড়ার ডাক্তারটাকে দেখলে গা জলে যায়। রবীন্দ্রনাথ চট করে বলে উঠলেন:—

পাড়াতে এসেছে এক নাড়ীটেপা ডাক্তার
দূর থেকে দেখা যায় অতি উঁচু নাক তার।
নাম লেখে ওষুধের, এদেশের পশুদের
সাধ্য কী পড়ে তাহা—এই বড়ো জাঁক তার॥

যাই হোক্ অনেক কষ্টে মা তোমাদের নিয়ে শুলেন। গল্প বলতে সুরু করলেন রূপকথার। সেই গল্প শুনে তোমাদের মনে হয়—

তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপ কথার
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ-কথার
* * * *
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা
মনে মনে॥

বুড়ো রবীন্দ্রনাথ একেবারে তোমাদের মত ছোট্টটি কি বল? গল্প শুনতে শুনতে খাবার সময় হয়ে এল। মা ভাবছেন আজকে একটু বেশী করে খেতে দিতে হবে। খোকা আমার রেগে আছে। কিন্তু তোমাদের অভিমান তখন একটুও নেই। মায়ের কোলের কাছে শুয়ে গল্প শুনে তোমাদের মেজাজ তখন খুসীতে ভরপুর। তবু মা ভাবছেন—

অল্পেতে খুসি হবে দামোদর শেঠ কি?
মুড়কির মোয়া চাই চাই ভাজা ভেটকি
* * * *
কাঁকড়ার ডিম চাই চাই যে গরম চা
না হয় খরচা হ'বে মাথা হ'বে হেঁট কি।

যাই হোক্, সে-দিন আর পড়া-শুনা না করে পেটটা ভরে খেয়ে দেয়ে ভাই বোন বীথি, টুলটুল এদের সবাইকে নিয়ে শুয়ে পড়লে মায়ের আঁচলের তলায়। ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে মা বলে ওঠেন—

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখতে যে চাই
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে—
জানিনে কোন্ মায়ায় কেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দু'টির আড়ালে॥

মায়ের যখন গল্প শেষ হ'য়ে যায় তখন তোমরা ঘুমে অচেতন।

তা'হলেই বুঝতে পারছ তোমাদের জন্ম রবীন্দ্রনাথ কত ভাবতেন, আর তোমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল কত মধুর!

জ্যাক

জসীমউদ্দীন

কোথা হ'তে এলো জ্যাক,
ছেলে বুড়ো যুবা আড়াআড়ি করে তারে পাড়ে সদা ডাক।
বুড়োদের দলে বুড়ো হয় সে যে ছেলেদের দলে ছেলে,
যখন যা খুশী ভোল বদলাতে পারে সে ইন্দ্রজালে।
বয়স্ক এই শিশুটি ঘুরিছে প্রাণরসে মাতোয়ার,
দেশ জাতি ভাষা, আদরিয়া তারে খুলে দেয় সব দ্বার।
এক দেশ হ'তে আর দেশ যেতে শিশু-বন্ধুরা বলে,
"প্রিয় জ্যাক! মোরা তোমার সঙ্গে সকলে যাইব চলে।"
যুবকেরা বলে, "তোমারে বন্ধু পাঠাব পত্র রোজ",
বুড়োরা যে কহে, "যেথা যাও ভায়া লইব তোমার খোঁজ।"

সত্যি কি তাই? ঘুরিতে ঘুরিতে এমন একটি দেশে,
পৌছিল জ্যাক, যেখানে ভাগ্য কাঁদিছে দুঃখের বেশে।
যেখানে ভুখারা কঠিন মাটিরে লাঙলের ঘায়ে চেরে,
আহরিয়া সুধা পরকে সঁপিয়া ক্ষুধা ক্ষুধা করি ফেরে।
যেখানে রাষ্ট্র জনগণে সঁপি মজুদকারীর হাতে,
ধেই ধেই করে নাচে উল্লাসে চোরাবাজারীর সাথে।
মরা মা'র বুকে কাঁদে যেথা শিশু ধরিয়া শুষ্ক স্তন,
সেথা গেলে জ্যাক সঙ্গে কি তার যাইবে বন্ধুগণ।

হয়ত' যাইবে হয়ত' যাবে না, তাহার বিদায় কালে,
এই কথাগুলি লিখে রাখিলাম মোর কবিতার জালে।
'নানান বরণ গাভী দেখি ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভ্রমিয়া দেখিলাম আমি একই মায়ের পুত।'
নানান দেশের আছে নানা জাতি নানা রীতিনীতি আশা,
দুঃখেরই শুধু ভাষা জাতি নাই, বুকে বুকে তার ভাষা।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

সুমিতাকে একরকম জোর করেই করবী নিউমার্কেটে নিয়ে গেলো, যাবার আগে অসীমকে একটা ফোন করলো করবী।

: আজ মিতার জন্মদিন। ও তো বেঁকে বসেছে কোনো উৎসবই করতে দেবে না, কিন্তু আমরা তা মেনে নিই কি করে? তাই ডাকছি আপনাকে, ফোনে ডাকলেই হবে তো? না, গিয়ে নেমন্তন্ন করতে হবে—হবে বলছেন? ধন্যবাদ—হ্যাঁ, নিউমার্কেট যাচ্ছি বেলা দশটা নাগাদ। আপনিও আসুন না; ওর শাড়ী, গয়না পছন্দ করবেন—আমার আবার রুচি-জ্ঞানের বালাই নেই কি না। গত বছর সুদাম ছিলো, সেই সব পছন্দ করেছিলো, এ বছরে মিতা ব্যাচারি বড় মনমরা হয়ে আছে। আচ্ছা আসছেন তো তাহলে? নমস্কার।

দিদিমাও ওদের সঙ্গে নিউমার্কেটে এসেছেন অপ্রসন্ন মন নিয়ে! আজকাল আর সুমিতার কোনো ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতে চান না, বলেন—অসীম আছে! দায়িত্বটা একজনের ওপর থাকাই যুক্তিসঙ্গত; তাহলে আর মতবিরোধ ঘটবে না!

নিউমার্কেটে অসীমকে দেখে, চমকে ওঠে সুমিতা, মুখখানি তার বিবর্ণ হয়ে যায়। সে জানতো না করবীর ফোন করবার কথা।

অসীমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সুমিতার মনের ভাব। হাসি মুখে সহজ-সুরে বলে সে—আমাকে ফাঁকি দিচ্ছিলে তো মিতা! কিন্তু তোমার জন্মদিনের ভোজটা ছাড়তে আমি মোটেই রাজি নই—এই দেখো, তুমি না ডাকলেও আমি ঠিক অপেক্ষা করছি—তোমাদের জন্যে।

তার পর মহা-উৎসাহ নিয়ে, নিউমার্কেট তোলপাড় করে তুললো,—ওর পছন্দ মতই শাড়ী-ব্লাউজ কেনা হল। সবুজ বেনারসী শাড়ীর সঙ্গে মানিয়ে কেনা হল পান্নার মালা। ফুলও নিলো এক রাশ।

এটা নয় ওটা। বাঃ এ শাড়ীটা কি চমৎকার—কোন শাড়ীটা বা তুলে নিয়ে সুমিতার গায়ে জড়িয়ে দেখলো,—ছোট, ছোট পরিহাস, টুকরো হাসির তাপ দিয়ে সুমিতার মনের গুরুভার কিছুটা লাঘব করা সম্ভব হল। যাবার সময় ক্ষীণ কণ্ঠে জানালো সুমিতা—আসবেন আপনি আজ সন্ধ্যায়।

বাড়ী ফেরার পথে, অলকাপুরীতে নেমন্তন্নটা সেরে যাওয়া হল। মাসীমা বললেন, দিদিমাকে। ঠিক আছে, আমিই সবাইকে নিয়ে যাবো, বড্ড বেলা হয়ে গেছে, আপনি বাড়ী যান দিদি।

অনেক দিন পরে যেন দিদিমা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। মহাব্যস্ত ভাবে, ঘোরা ফেরা করছেন সারা বাড়ীটাতে! বেয়ারা, বাবুর্চিরা বার বার ধমক খেতে লাগলো, করবীও ছুটোছুটি করলো মায়ের সঙ্গে।

—এই ছোড়দা। মাছগুলো সব খেয়ে ফেললে? দাঁড়াও মাকে বলছি।

—দোহাই তোর রুবি, বলিসনি মাকে কথা দিচ্ছি তোকে, আর দুটো মাস সবুর কর, ধনপতি ক্ষেত্রির তেসরা রাণী তোকে যদি করে দিতে না পারি তো আমার নামে কুকুর পুষিস। ভাজা মাছ কামড় দিতে দিতে অনিল জবাব দেয়।

—মাত্র তৃতীয়? ওতে আমার রুচি নেই ছোড়দা। তিন সাতে একুশের পদে যদি কোথাও বাহাল করতে পারো আমায়, তবে শুকতারার পঞ্চম স্বামিত্ব তোমার বরাতে মারে কে?

দু'জনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। সহাস্যে জবাব দেয় অনিল, তাহলে গলায় দড়ি দেবার একটা চান্স পাবো বলছিস?

—তা যেমন ঘন ঘন চান্স পাচ্ছো ছবিতে, তার মালিকানার আসলে পৌঁছোতে খুব দেরী লাগবে না ছোড়দা। বেশ বিজ্ঞ ভাবে জবাব দিলো করবী।

—ওমা! তোরা ভাই বোন এখানে দাঁড়িয়ে তো বেশ নিশ্চিন্ত মনে গল্প করছিস—ওদিকে বেলা যে পড়ে এলো গো। লোক জন সব এখুনি এসে পড়বে যে! হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললেন মায়া দেবী।

—সব তো রেডি মা। খালি ফুলের রিংগুলো টাঙানো বাকি। তা আমরা এখুনি সেরে ফেলছি। রামভজন সিং ফুলের তোড়া বাঁধছে। মিসেস বর্দ্ধণ এসে কোনো ত্রুটিই খুঁজে পাবেন না, এ তোমায় বলে দিলাম।

অনেক দিন পরে, এ বাড়ীতে আবার এসেছে হাস্য-কলরব-মুখরিত আনন্দোজ্জ্বল সন্ধ্যাকাল।

মাসীমা এসেছেন, অলকাপুরীর দলবল নিয়ে শুকতারাও এসেছে তাঁর সঙ্গে। সুমিতাকে মুখে যথেষ্ট শুভেচ্ছা জানালো শুকতারা, অন্তরে যদিও ছিলো তার প্রতি দারুণ বিদ্বেষ।

অলকাপুরীর আকাশে সে-ই একমাত্র ছিলো উজ্জ্বল নক্ষত্র। হঠাৎ তার পাশে, আরেকটি নক্ষত্রের চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য সহজে কি

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

মেনে নেওয়া যায়? অবিশ্যি ওর নাম যশ এখন আর অলকাপুরীর গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বসন্তসেনা বইখানা বাজারে খুব হিট্ করেছে, ওর খ্যাতি আজ সর্বত্র। পাঁচখানা বইতে পেয়েছে নায়িকার পার্ট। তবুও অসীমকে যেন কেমন কেমন মনে হয়, সুমিতার ওপরই মনে হয় পূর্ণআকর্ষণ? সন্দেহের কালো ছায়া মনে উঁকিঝুঁকি মারে।

—অসীমকে জিজ্ঞেস করলে সে হেসে উড়িয়ে, দেয় বলে,—জানো তো, মিতা সুদামের বাক্‌দত্তা। —তা বটে—তবুও—অসম্ভব কি তার পক্ষে?

লম্বা একটি টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে সুমিতার জন্মদিনের উপহারগুলো, উপহার দাতা বা দাত্রীর নাম তার সঙ্গেই লেখা আছে। শুকতারা টেবিলটির পাশে ঘোরা ফেরা করে, আড়চোখে দেখে জিনিষগুলো। একটা হীরে-পান্নাখচিত নেকলেশ ঝলমল করছিলো, নিওন লাইটে! নামলেখা তার গায়ে একটি কার্ডে,—অসীম হালদার!

জ্বালা করে শুকতারার চোখ দুটো! দু'তিনজন ছেলে-মেয়ের গান গাওয়া শেষ হ'ল, অনিল অনুরোধ করলো শুকতারাকে —এবারে আপনার গান শুনবো শুকতারা দেবী!

—বড্ড মাথাটা ধরেছে, অনিল বাবু, আজকে মাপ করুন আমায়।

অগত্যা—মারুতি মৈত্র আর সেঁজুতি মৈত্র—শুকতারার শূন্যস্থান পূর্ণ করলো রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করে!

অজিতা, বিজিতা, অনিরুদ্ধ আজ আসতে পারেনি—তাদের নেমন্তন্ন ছিলো। মহারাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের ভবনে!

এসেছেন দিদিমার বান্ধবীর দল, আর অনিলের বন্ধুরা। কবরী বা সুমিতার বান্ধবীরা আজ পায়নি আমন্ত্রণ, একমাত্র অলকাপুরীর গ্রুপ ছাড়া!

অসীম একাই একশো হয়ে সকল জায়গার তাল সমান ভাবে বজায় রাখছিলো। কখনও সুমিতার পাশে বসে, শুকতারার সঙ্গে রসিকতা করে, কখনও বা অযথা ছুটোছুটি লাফালাফি করে হাল্কা হাস্য-পরিহাসের ভেতর দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করছিলো।

নতুন ঝলমলে শাড়ী গহনায় ফুলে সুসজ্জিতা সুমিতাকে মানিয়েছিলো নক্ষত্রখচিত নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের মত।

গত বছরের স্মৃতি মাঝে মাঝে উন্মনা করে তুলছে ওকে—কিন্তু সে সুখসায়রে অবগাহন করবার সুযোগ দিচ্ছেনা অসীম। প্রতিমুহূর্ত্তে সচেতন করে তুলছে ওকে, তার সঙ্কুচিত মনটাকে সজীব সরস করে তোলার চেষ্টার আর বিরাম নেই যেন।

—না, অসীমের শক্তি আর ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না; সুমিতাকে সে ভাবিয়ে তোলে।

হ্যাঁ!—এইরকম বলিষ্ঠ প্রাণচঞ্চল পুরুষের সঙ্গ বোধ হয় প্রতিটি নারীই কামনা করে। এর প্রয়োজনকে স্বীকার করতেই হয় বাস্তব জীবনের চলার পথে। সুদাম যেন অন্য জগতের মানুষ। তার সঙ্গ চাঁদের আলোর মতই স্নিগ্ধ পবিত্র, মধুর ভাবপূর্ণ সে স্পর্শ, দগ্ধ প্রাণে আনে শান্তি, মনকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় কোন অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে।

কিন্তু অসীম যেন, মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য! তার তপ্ত স্পর্শ সুপ্ত নারীত্বকে জাগিয়ে তোলে, তার সান্নিধ্য এনে দেয় অন্তরে বাহিরে কামনার দাহ-জ্বালা। সে ভালো মন্দ কিছুই মানেনা। নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থের প্রয়োজনই তার মাঝে যেমন প্রকট, তেমনি উদ্দাম।

—কি ভাবছো মিতা?

কাঁধের ওপর কার বলিষ্ঠ হাতের চাপে চমকে ওঠে সুমিতা—ভীত চকিত দৃষ্টি মেলে ফিরিয়ে চায় অসীমের দিকে, ওর চোখের সঙ্গে চোখ মেলায় অসীম। কি ছিলো সে চোখে? শির শির করে ওঠে সুমিতার সর্ব্বাঙ্গ। ওর চোখের বিদ্যুৎ, যেন খেলে যায় এর স্নায়ুমণ্ডলীর রেখায় রেখায়। উঃ কি জ্বালাভরা চোখ দুটো? যেন ভয়াবহ পাহাড়ী ময়াল সাপের সর্ব্বগ্রাসী সম্মোহনশক্তি ঠিকরে পড়ছে ঐ চোখ দুটো থেকে। প্রাণপণ শক্তিতে ওর হাতটা নিজের কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে দেয় সুমিতা—তারপর বলে—কৈ, কিছু ভাবিনি তো।

ঘরের আবহাওয়াটা যেন অসহ্য মনে হয়, চঞ্চল পায়ে বাইরের বাগানে নেমে আসে সুমিতা। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় স্পষ্ট নজরে পড়ে একখানি ছবি লনের এককোণে, পাইন গাছের আড়ালে বসে আছে অনিল আর শুকতারা। পরস্পরের হাতে হাত বাঁধা, শুকতারার মাথাটি অনিলের কাঁধের ওপর হেলানো। আর এগোনো সম্ভব নয়, ক্লান্ত পায়ে হলে ফিরে আসে সুমিতা। করবী তখন গাইছে:

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু!

উঃ! আর যে ভালো লাগে না। শাড়ী, গয়না, ফুল, সব যেন গায়ে ফুটছে। নিওনলাইটের তীব্র দ্যুতি যেন সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে, চারি দিকে খালি উত্তেজনা আর প্রাণহীন উচ্ছ্বাস। তাই আর পারে না সে এদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে। বড় ক্লান্ত মনটা চাইছে একটু স্বস্তি, একটু শান্তি। বিচিত্র বর্ণের ফুলের ছড়াছড়ি চারি দিকে, রক্তলাল গোলাপগুলো তুলে নেয় সুমিতা—একবার নিস্পৃহ চোখে চেয়ে দেখে নামিয়ে রেখে দেয়।

কি যেন খুঁজছে সে, সজল হাওয়ার বুকে ছড়ানো যেন বড় চেনা, বড় ভালো লাগা একটা গন্ধ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। অর্কিড হাউসের গা ঘেঁষে কতকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি বকুল গাছ। ওই গাছতলাটিতে যে ওরা কত সকাল-সন্ধ্যায় বসেছে, সেই যখন ছিলো দুজনে, কতটুকু?

আশেপাশে খরগোশের দল খেলা করতো, সুদাম কবিতা শোনাতো ওকে। যখন সবে মা মারা গেছেন, দিন-রাত ঐ গাছতলায় সুদাম ওকে বসিয়ে কত গল্প শুনিয়েছে। ওরা দুজনে মিলে বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে মায়ের ছবিতে পরিয়ে দিয়েছে।

ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেলো সুমিতা বকুল গাছতলায়। আজও তেমনি ফুলের রাশ বিছিয়ে আছে গাছতলায় সেই আগেকার মত। চাঁদের আলোর অম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়েছে ফুলগুলোর ওপর। কি ধপধপে শাদা, কি মিষ্টি নরম।

দু'হাত ভরে ফুল তুলে নিলো সুমিতা, নিঃসাড়ে বাগানের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতর-বাড়ীতে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে গেলো। টেবিলের ওপর ছিলো সুদামের ছোট্ট একটি ফটো, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো স্থির হয়ে! হ্যাঁ, অস্থির চিত্ত, বোধ হয় একেই খুঁজছিল। দু'চোখ ভরে দেখলো সুদামকে, তার পর অঞ্জলিভরা ফুলগুলো দিলো তার সামনে ছড়িয়ে। হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করবার সময় ঝর ঝর করে ঝরে পড়লো কয়েক ফোঁটা চোখের জল। এতক্ষণে যেন অস্থির মনটা শান্ত হল।

—আমি এসেছি সুমিতা দেবী। আপনার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না, তাই যদিও রাত ন'টা বেজে গেছে; এ সময় আসাটা অশোভন, তবুও এলাম, আপনি ডেকেছেন বলে।

অবিকল সুদামের মত এ কার কণ্ঠস্বর? চমকে উঠলো সুমিতা, তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে দেখে, দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অনিরুদ্ধ।

লজ্জায় ওর মাথা নত হয়ে আসে। ওর নিভৃত, নীরব পূজা, অপরের দর্শনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—কিন্তু তাই তো হ'ল। ছি, ছি, কি ভাবছেন উনি।

কি ভাবছেন, আপনি এখানে জানলাম কেমন করে? সে তো খুব সোজা কথা। আপনি যখন বকুল ফুল কুড়োচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আমিও ঐ ফুলগুলোর লোভে এগিয়ে এসে গাছের পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। ঐ ফুল যে আমারও বড় প্রিয়, তাই এসেছিলাম ওর গন্ধ পেয়ে। আপনি ফুল কুড়িয়ে যে পথে চললেন, আমিও এক মুঠো ফুল তুলে নিয়ে আপনার পিছনে চলতে চলতে একেবারে এসে পড়েছি এখানে। অপরাধ করে থাকি, সাজা দিন। মাল সমেত চোর আপনার সামনেই, আত্মসমর্পণে উদ্যত।

হেসে ফেলে সুমিতা ওর কথার ধরণ দেখে! বলে ওকে—আসুন ঘরে, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

ঘরে প্রবেশ করলো অনিরুদ্ধ। সুদামের ছবিখানা দেখে, এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখলো ফটোখানা, আর দেখলো তার সামনে সুমিতার দেওয়া ফুলগুলোকে। স্মিত হাস্যের সঙ্গে বললো,—আপনার শ্রদ্ধার পাত্রকে যদিও চিনি না আমি, তবু আপনার আদেশ পেলে এ ফুলগুলো তাঁকেই নিবেদন করি।

—আপনার ইচ্ছা! উনি আমার দামীদা'। মানে—ওঁর নাম সুদাম হালদার। বিলেতে আছেন। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় সুমিতা।

বকুল ফুলগুলো অনিরুদ্ধ ছড়িয়ে দেয় সুদামের ছবির চার পাশে—আর এক ঝাড় শাদা গোলাপ সুমিতার হাতে তুলে দিয়ে বলে অনিরুদ্ধ—ওঁকে আমি প্রথমে চিনতে পারিনি সুমিতা দেবী, নাম শুনে এখন চিনলাম। বিলেতে থাকতে ফিরে আসবার সময় আলাপ হয়েছিলো ওঁর সঙ্গে। দু'চার দিনের আলাপেই ভারি ভালো লেগেছিলো ওঁকে! তখন কি জানতাম যে, ফিরে এসে তাঁর সঙ্গেই এমন মধুর যোগাযোগ ঘটবে আবার।

—দেখা হয়েছিলো আপনার সঙ্গে? কেমন দেখলেন তাঁকে? বেশ ভালো আছেন তো? সুমিতার কণ্ঠস্বরে করুণ ব্যাকুলতা।

—মিতা এখানে একলা কি করছো? ওঃ—অনিরুদ্ধ তুমি আছ? কখন এলে? বলতে, বলতে ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করলো অসীম!—থমকে দাঁড়ালো, সুদামের ছবির দিকে নজর পড়াতে। নিদারুণ বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বললো,—এসব কি হচ্ছে মিতা? মরা মানুষকে লোকে ফুল দেয়, ও তো বেঁচে আছে এখনও।

জবাব দিলো অনিরুদ্ধ—ঐটাই আমরা ভীষণ ভুল করি অসীমবাবু, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা প্রীতি যেখানে ঝরে পড়তে চায়, তার পরিবর্ত্তে পাওয়া যায় অকৃত্রিম আনন্দ, বিধি নিষেধের পাথর চাপিয়ে তার গতিপথকে রুদ্ধ করার পক্ষপাতী আমিও নই। জীবনের সঙ্গেই—প্রাণের সঙ্গেই চলে আদান প্রদান, মৃতের সঙ্গে নয়—ওটা আমার মনে হয়, নিছক্ লোক-দেখানো আড়ম্বর, ওর মধ্যে সত্যিকার আনন্দ কিছু থাকতে পারে না।

—আপনার সঙ্গে আমিও একমত অনিরুদ্ধ বাবু, মিষ্টিগলায় জবাব দেয় সুমিতা।

—বেশ বেশ, তাই হবে! এখন ক্ষিদেয় পেট বাপান্ত করছে, তার সন্ধানে যাই চলো, তারপর ঘটা করে ঢাক ঢোল বাজিয়ে সারারাত উৎসব কোরো মিতা, বাধা দেবার অবসর পাবো না, কথা বলতে বলতে—সুমিতার একখানি হাত সবলে চেপে ধরে ওকে টেনে নিয়ে চললো অসীম।

—আসুন অনিরুদ্ধবাবু। আর্ত্তস্বর সুমিতার কণ্ঠে।

আহারাদি পর্ব্বশেষে বিদায় নেবার সময় মাসীমা প্রচুর প্রশংসা করলেন দিদিমার আতিথেয়তা উন্নত রুচির এবং রান্নার বৈচিত্র্য আর নিপুণতার।

পরদিন সুদামকে লেখা অসমাপ্ত চিঠিখানি নিয়ে বসে সুমিতা, কিন্তু একি হ'ল,—মাত্র দুদিন আগে লেখা চিঠিটার আর কোনো অর্থ খুঁজে পায় না সুমিতা। মনের আকাশে, সঞ্চিত ভাবের মেঘগুলো যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। মাত্র দুটো দিন এনেছে বয়ে তার জীবনে কি সংঘাতময় পরিবর্ত্তন। যেমন প্রবল ভূমিকম্পের আলোড়নে, সহসা ঘটে যায় প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন,—তেমনি অকস্মাৎ ওলোট পালট হয়ে গেছে যেন ওর জীবনটা।

না, না, তা আর হয় না। দামীদা'কে সে ঠকাতে পারবে না। এখন তার ওপর আর কোনো দাবী নেই ওর। দেহ, মনের পবিত্রতা যখনই হারিয়েছে সে,—তখনই তার জীবনে হারিয়ে গেছে সুদাম, নিভে গেছে তার জীবনের আলো। এখন অকূলে ভেসে যাওয়া স্রোতের ফুল, সে ঝড়ের মুখে ঝরাপাতা। আর ভাবতে পারে না সুমিতা—অসমাপ্ত চিঠিটা রেখে দেয় প্যাডের মধ্যে। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে, বিকেল দু'টা বেজে গেছে, অলকাপুরীতে আছে ওর রিহার্সাল। শকুন্তলা নাটক অভিনীত হবে, নায়িকার পার্ট সুমিতার আর নায়ক অনিরুদ্ধ। সে ক্ষিপ্রহস্তে বেশ পরিবর্ত্তন করে নিয়ে অপেক্ষা করে অসীমের জন্য। নামের মোহ যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সোনার হরিণের মত।

মিনিট পনেরো পরেই অসীম এসে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো অলকাপুরীতে।

রিহার্সাল সুরু হ'ল। নৃত্যনাটিকা—নাচ আর গানের ভেতর দিয়ে নাটিকার অভিনয় চলবে, কথা থাকবে না।

নৃত্য পরিকল্পনা, গানের সুর, সবই মাসীমা নিজেই পরিচালনা করছেন। রকমারী নাচের পোষাক বা গহনা তো চলবে না এখানে। তাই অনেক গবেষণা করে ঠিক করতে হচ্ছে জমকালো লোভনীয় দৃশ্যগুলোকে। নানা ধাঁচের চুল বাঁধা, তার সঙ্গে মানিয়ে ফুলের আভরণ, সিল্কের গেরুয়া বসন অপরূপ ছাঁদে পরাচ্ছেন আবার খুলছেন। সুমিতাকে নিয়েই খুব বেশী ব্যস্ত আছেন তিনি। বিভিন্ন নাচের পোজে ফটো তুলিয়ে বিখ্যাত পত্রিকাগুলোতে দেওয়া হয়েছে। নাটকের কয়েকটি দৃশ্যের ছবি, অভিনয়ে কে কি পার্ট নিচ্ছেন তাঁদের নামের তালিকা, নায়করূপে অনিরুদ্ধের ছবি, প্রায় প্রতিটি সপ্তাহে বিভিন্ন কাগজে ইংরিজি সাপ্তাহিক ও বাংলা সিনেমা পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হচ্ছে।

জনসমাজে বেশ খানিকটা আলোড়ন জাগিয়েছেন এঁরা। অভিনয়ের সঠিক তারিখ জানবার জন্য চারিদিক থেকে আসছে চিঠিপত্র টেলিফোন। উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করছেন বিদগ্ধ সমাজের কেষ্ট বিষ্টুরা, মিসেস বর্ম্মণের অভিনব সাফল্য কামনায় প্রতি রিহার্সালের দিন এসে অলকাপুরীতে চপ, কাটলেট, চা, ককটেল্ ওড়াচ্ছেন। এর মোটা খরচা অবিশ্যি তাঁরাই বহন করেন সানন্দচিত্তে।

শকুন্তলা নাটিকার কয়েকটি দৃশ্যের পর পর রিহার্সাল চললো। দুষ্মন্তরূপী অনিরুদ্ধর সঙ্গে শকুন্তলারূপিণী সুমিতাকে মানিয়েছে চমৎকার।

মাসীমা গর্ব্বভরে বললেন—দেখেছো অসীম! মাত্র ক'মাসের শিক্ষায় সুমিতার কতটা উন্নতি হয়েছে? একেই বলে ছাই-চাপা আগুন। কাল্‌চারের বাতাস পেয়ে একেবারে হয়ে উঠেছে যাকে বলে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। ভবিষ্যতে মনে হয় ও শুকতারাকেও ছাড়িয়ে যাবে।

—উপযুক্ত গুরুর শিষ্যত্ব যে কত মূল্যবান, তার চমৎকার উদাহরণ সুমিতা। আপনার অলৌকিক শক্তি দেখে অবাক লাগে মাসীমা, আপনি কয়লাকেও হীরে করতে পারেন বলে মনে হয়। আমারই মাঝে'মাঝে মনে হয়, ঐ সব ব্যাবসা-ট্যাবসা বাজে ঝামেলা ছেড়ে দিয়ে এসে আপনার সঙ্গে এই সব উন্নত আর্টের চর্চ্চা করি, কিন্তু উপায় কি? দাদা তো সাধু হয়ে বৃন্দাবনে বসে আছেন, সব ঝামেলা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে।

সহাস্যে কথাগুলো বলতে আরম্ভ করে, খেদোক্তির মাঝে বলা শেষ করলো অসীম। প্রসন্ন হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠেন মাসীমা—Now, now take it easy, এখনও যথেষ্ট কাজ বাকি আছে। অনেক কাট-খড় পোড়াতে হবে, তবেই জয়লাভ করা সম্ভব হবে আমাদের।

—প্রচারের দিক্‌টায় আরো নজর দেওয়া চাই, সেজন্য একদিন বড় বড় কাগজের রিপোর্টারদের একটা জমকালো পার্টি দাও এখানে। ওদের দিয়েই এই অভিনয় সম্বন্ধে বেশ সরস প্রবন্ধ ছাপানো চাই। সেই দিনই অভিনয়ের সঠিক তারিখ প্রকাশ করা হবে। বিভিন্ন

কৌশল দ্বারা জনগণের চিত্তে আলোড়ন জাগাতে হবে—তবেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আর আমার দৃঢ় ধারণা ঐ একটি অভিনয়েতেই সুমিতা শ্রেষ্ঠ নৃত্য-শিল্পিরূপে পরিচিত হবে জনসমাজে—আমার কথার মর্মার্থ ও গুরুত্ব আশা করি বুঝতে পেরেছো?

বক্রদৃষ্টিতে অসীমের পানে একবার চেয়ে দেখলেন মাসীমা। যথাস্থানে তাঁর যথাযথ বাক্য প্রয়োগ, কার্য্যকরী হল কি না!

—আপনার শিক্ষা কি ব্যর্থ হতে পারে মাসীমা! এ অভিনয় যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখবে, এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। হ্যাঁ, আপনার কথামত সব ব্যবস্থা করবো, কিন্তু একটা অনুরোধ আমার রাখতে হবে—এই পার্টির সব খরচা কিন্তু আমার একার, এর ভাগ আমি অপর কাউকে দিতে রাজী নই।

বিজয়-হাস্যরেখা চিকমিকিয়ে ওঠে মাসীমার ওষ্ঠাধরে। সাগ্রহে বলেন তিনি—হ্যাঁ, মিতার ব্যাপার যখন আর তোমার এত আগ্রহ তারই জন্যে। আচ্ছা তাই হবে আপত্তি করবো না, তবে রতনলাল ক্ষেত্রেও খরচ করতে রাজি আছে, আচ্ছা ঠিক আছে এর পরের অভিনয়ের সমস্ত খরচা যাতে সে করতে পারে, সে সুযোগ তাকে আমি দেব।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, অলকাপুরীতে প্রচুর ভুরীভোজন আর আপ্যায়ন দ্বারা বিখ্যাত কাগজ ও পত্রিকার সাংবাদিক, শিল্পী আর সাহিত্যিকমণ্ডলীকে একটি জমকালো পার্টি দেওয়া হল।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সমস্ত নামকরা পত্রিকাগুলোতে অলকাপুরীর আসন্ন অভিনয়ের বিস্তারিত বিবরণ, মনোহর দৃশ্যের পর দৃশ্যের অভিনব কলা-কৌশলের কথা, আর ফটো প্রকাশিত হবার পর, রীতিমত সাড়া পড়ে গেলো মহানগরীর আকাশে বাতাসে পথে ঘাটে।

উৎসুক জনতার অধৈর্য্য প্রতীক্ষার একদিন অবসান ঘটলো সেই শুভলগ্নটির সঠিক তারিখ প্রকাশিত হবার পর। [ক্রমশঃ।

মা ও ছেলে

মোপাসাঁ

নৈশ ভোজনের পর ধূমপান-গৃহে কয়েকজন মিলে বেশ একটা মজলিশ গড়ে তুলেছিল। গল্পের বিষয়বস্তু ছিল যে—কে কবে, কেমন করে, অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্যের সম্পত্তি পেয়ে বড়লোক হয়ে উঠতে পারে; এমনি দু'একটা বাজে কল্পনা। আবহাওয়া যখন এরূপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, মসিয়ে লেক্রমেণ্ট যিনি প্রাজ্ঞ বিচারপতি ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বলে পরিচিত, হঠাৎ বলে উঠলেন যে আজ তিনি এমনি ধরণের এক উত্তরাধিকারীর গল্প বলবেন। তিনি আরও বললেন: আমি আজ এক উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, যে এক অদ্ভুত রকম বিপন্ন অবস্থায় গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে যে সমস্ত সাধারণ ঘটনা ঘটে থাকে, তাদেরই একটা। তবু আমার মনে হয়, জগতে যত ভয়ঙ্কর বীভৎস নাটকীয় ব্যাপার ঘটেছে, এ তাদেরই মধ্যে স্থান পেতে পারে।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই: প্রায় দু'মাস আগে আমি এক স্ত্রীলোকের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, মঁসিয়ে আমি আপনাকে এক ভয়ানক করুণ ও কষ্টকর কাজের ভার দিতে চাই। দয়া করে টেবিলের ওপর আমার যে উইলটা আছে, ওটা একবার দেখুন। আমি আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রকে ফিরে পেতে চাই—এ কাজের ভার আপনার। যদি আপনি কৃতকার্য্য হতে পারেন, তবে আপনি এক লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক আপনার ফি স্বরূপ পাবেন, আর অন্যথায় হাজার ফ্র্যাঙ্ক আপনার।

তাঁর গলার স্বর ভেঙে গিয়েছিল, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না—কেবল গলা দিয়ে ঘড়-ঘড় করে একটা শব্দ হচ্ছিল। একটু ভাল ভাবে কথা বলার জন্য তিনি আমাকে তাঁর বিছানায় উঠে বসতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করলেন। সেই মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীলোকটি বলতে লাগলেন। আমার এই ভয়ঙ্কর গল্পের প্রথম শ্রোতা আপনি। গল্প শেষ করার জন্য আমার যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন; তবুও আমাকে বলতেই হবে, কারণ এর সমস্ত বৃত্তান্তই আপনার জানা দরকার। আমি জানি আপনি একজন সহৃদয় ব্যক্তি এবং আমাকে আপ্রাণ সাহায্য করতে আপনি আন্তরিক চেষ্টা করবেন।

এইবার ব্যাপারটা বলি: আমার বিয়ের আগে আমি এক যুবককে ভালবাসতুম। তারও আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আর্থিক অবস্থা অনুকূল না হওয়ায়, সে আমার অভিভাবকের মনোনীত হল না, ফলে কিছুদিন পরে আমার বিয়ে হয়ে গেল একটি ধনী লোকের সঙ্গে। এই লোকটির সঙ্গে আমার বিয়ে হল, কতকটা অজ্ঞতা, কতকটা বাধ্যতা, আবার কতকটা বা উপেক্ষার মধ্যে, যেমন এই বয়সের মেয়েদের মধ্যে হয়ে থাকে। আমার একটি ছেলে হল দিনকতক পরে, আমার স্বামী গেলেন মারা।

যে যুবকটিকে আমি ভালবেসেছিলাম, সেও বিয়ে করেছিল। সে যখন জানলো আমার স্বামী মারা গেছেন, তখন সে দুঃখে ভেঙে পড়ল, কারণ তখন সে আর মুক্ত নয়—বিবাহিত। সে আমাকে দেখতে এসে এমন তীব্র ভাবে কাঁদতে লাগল যে, আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। প্রথম প্রথম সে আমাকে বন্ধু ভাবে দেখতে আসত। সম্ভবত তখনই তাকে আমার গ্রহণ করা উচিত হয়নি কিন্তু কি করব, তাকে গ্রহণ করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায়ই ছিল না। কারণ আমি এক নিঃসহায় অবস্থায় একেবারেই ভেঙে পড়েছি আর তা ছাড়া আমিও তাকে ভালবাসি! উঃ, মেয়েদের সময় সময় কি দুঃখই না সহ্য করতে হয়।

আমার বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন; সংসারে সে ছাড়া আমার আর কেউ ছিল না। রোজই সে আমার কাছে আসত, আর সারা সন্ধ্যা আমার সঙ্গে কাটাত। তার স্ত্রী বর্ত্তমান, এই ভেবে অন্তত আমার তাকে এত ঘন ঘন আসতে দেওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু আমি নিরুপায়। নিজের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করে ক্লান্ত।

অনুরাগের আলো কোন্ পথ দিয়ে এসে যে আমাদের দু'জনের দৃষ্টিকে রাঙিয়ে তুললে, কেমন করে যে সে আমার প্রণয়ী হয়ে উঠল, তা আজ আমি কেমন করে বলব। ভাষায় একে বোঝান যায় না। যখন দু'টি মানুষের আত্মা পরস্পরকে এক দুর্নিবার শক্তির দ্বারা আকর্ষণ করে, তখন কি কেউ একে বাধা দিতে পারে? মেয়েরা

যাকে ভালবাসে, তার সামান্য ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে নিজে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করতে পারে। প্রেমাস্পদ নতজানু হয়ে হৃদয়ের কামনা যখন চোখের জলে জড়িত প্রার্থনার ভাষায় নিবেদন করে, তখন এমন কোন নারী আছে, মঁসিয়ে আপনি বলতে পারেন, সে এই প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, কেবল মাত্র সামাজিক সম্মানের লোভে?

মোট কথা, আমি তার গৃহিণীরূপে রইলাম এবং বেশ সুখেই। আস্তে আস্তে আমি তার বান্ধবীর স্থান গ্রহণ করলাম—এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ও ভীরুতা।

আমরা দু'জনে মিলে আমার ছেলেকে বড় করে তুললাম। তার বয়স যখন সতের, তখনই সে এক জন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, উদার প্রকৃতির মানুষ হয়ে উঠল।

আমি আমার প্রণয়ীকে যতখানি ভালবাসতাম, আমার ছেলেও তাকে ততখানি ভালবাসতে লাগল, কারণ সে আমাদের দু'জনেরই স্নেহে-যত্নে লালিত, পালিত হ'য়ে উঠেছিল। আমার ছেলে আমার প্রণয়ীকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে ডাকত। সে তার কাছে কেবল সুপরামর্শ পেয়ে এবং সম্ভ্রম ও ভদ্রতার দৃষ্টান্ত দেখতে এতখানি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টি ছাড়া অন্য ভাবে দেখতেই পারত না। আমার প্রণয়ী তার কাছে তার মার বিশ্বাসী, পুরাণো ভক্ত ও তার অভিভাবক, রক্ষাকর্ত্তা, এমন কি পিতার সমান হয়ে উঠেছিল। সে ছেলেবেলা থেকেই এই লোকটিকে আমার পাশে থাকতে এবং আমাদের উভয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখে অভ্যস্ত ছিল বলেই সম্ভবত কোন প্রশ্ন আমাকে করেনি।

একসঙ্গে তিন জনে বসে খাওয়ায় আমি খুব আনন্দ পেতাম। এক সন্ধ্যায় আমি খাবার টেবিলে আমার প্রণয়ী ও ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং ভাবছিলাম তাদের মধ্যে কে আগে আসতে পারে।

এমন সময়ে হঠাৎ দরজাটা খুলে যেতেই আমি আমার প্রণয়ীকে দেখতে পেলাম। আমি গিয়ে তাকে উন্মুখ আলিঙ্গন দিয়ে অভ্যর্থনা করলাম। পরিবর্ত্তে সে আমার ঠোঁট দুটো এক সুদীর্ঘ সুমধুর চুম্বনে রাঙিয়ে দিল।

হঠাৎ একটা সামান্য আওয়াজে, অন্য লোকের উপস্থিত ভেবে আমরা চমকে উঠে পিছন দিকে তাকাতেই দেখলুম,—আমার ছেলে দাঁড়িয়ে; আমাদের দিকেই তার দৃষ্টি।

মুহূর্ত্তেই কি যেন একটা গোলমাল হয়ে গেল। পিছন দিকে সরে এসে আমি আমার ছেলের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলাম। কতকটা যেন প্রার্থনার ভঙ্গীতে, কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না। কারণ সে তখন সেখান থেকে চলে গেছে।

আমি ও আমার প্রণয়ী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম; কারুর মুখ থেকে একটি কথাও বেরুল না। আমি একটা আর্ম-চেয়ারে ঢলে পড়লাম। তখন আমার মনের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে চিরকালের জন্য অন্তর্দ্ধানের একটা অস্পষ্ট অথচ তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। সেই দুর্ভাগ্যের লজ্জার গ্লানি অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমার মন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছিল; আমার প্রত্যেক শিরাগুলো ব্যথায় টনটনিয়ে উঠছিল যা এরকম অবস্থায় পড়লে প্রত্যেক মাকেই অনুভব করতে হয়। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

সে ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু আমার ছেলে ফিরতে পারে এই ভেবে কাছে আসতে কথা বলতে বা স্পর্শ করতে সাহস পাচ্ছিল না। অবশেষে সে বললে, আমি তার কাছে যাচ্ছি এবং ব্যাপারটা কি ঘটেছে তাও বুঝিয়ে বলব, যাই ঘটুক, আমি তাকে বৃত্তান্তটা বুঝিয়ে বলব—এই রকম কতকগুলো অসংলগ্ন অর্থহীন কথা বলে সে ছুটে চলে গেল।

ভাঙ্গা মন নিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। সামান্য একটু শব্দ শুনলেই ভয়ে চমকে উঠতাম এবং অদ্ভুত অনুভূতিতে কাঁপতে থাকতাম। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি করে কাটাতে লাগলাম। একটা দুঃখে, যার অভিজ্ঞতা এর আগে আমার ছিল না, আমার বুক ফুলে উঠল। যে দুঃখ আমি ভোগ করছিলাম, তা ভগবান করুন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপী যেন কখন না ভোগ করে। আমার ছেলে কোথায়? সে কি ভাবে কোথায় আছে?

মাঝরাত্রে একজন লোক আমার প্রণয়ীর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এলো। চিঠির কথাগুলো এখনও আমার মনে আছে: তোমার ছেলে কি ফিরেছে? আমি তার দেখা পাইনি। এখন আমি তোমার কাছে যেতে চাই না, এখানে অপেক্ষা করছি। সেই কাগজটাতে আমি লিখে পাঠালাম: জিন এখনও ফেরেনি, তুমি তাকে নিশ্চয় খুঁজে বের কোরবে।

সারারাত্রি তার অপেক্ষায় আমি সেই আর্ম-চেয়ারে পড়ে রইলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে হচ্ছিল পাগলের মত চারি দিকে ছুটে বেড়াই, তবুও আমি না উঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার অপেক্ষায় বসে কাটিয়ে দিলাম। আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম ব্যাপারটা কতদূর দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমার বহু চেষ্টা ও মানসিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও কোন ধারণাই আমি করতে পারছিলাম না।

আমার ভয় হল যে, তাদের মধ্যে দেখা হতে পারে, এক্ষেত্রে আমার ছেলে কি রকম ব্যবহার করবে, এই ভেবে আমার মনে নানা রকম ভয়াবহ সন্দেহ আর ধারণা জেগে উঠল। মঁসিয়ে আপনি বোধ হয় আমার তখনকার মনোভাব বুঝতে পারছেন। আমার পরিচারক এ ব্যাপারের কিছুই জানত না। সে ভেবেছিল আমি বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছি। সে ঘরে ঢোকা মাত্র আমি তাকে হাত নেড়ে বেরিয়ে যেতে বললাম। সে ডাক্তারকে ডেকে পাঠাল। ডাক্তার বললেন আমার অসুস্থতার কারণ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য। আমার শিরঃপীড়া আরম্ভ হল; আমি শয্যাশায়ী হলাম।

কিছুদিন অসুস্থতার পর জ্ঞান হতেই বিছানার পাশে আমি আমার প্রণয়ীকে দেখলাম। চীৎকার করে উঠলাম: আমার ছেলে কোথায়? তার কাছ থেকে কোনও উত্তর এল না। আমার জিব জড়িয়ে এল: সে কি নেই? সে কি আত্মহত্যা করেছে?

না না, আমি শপথ করে বলছি তা কখনও হতে পারে না, যদিও আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি তাকে খুঁজে পাইনি।

আমি হঠাৎ রেগে উঠে উদ্ধত ভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম: তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও। যতক্ষণ না তুমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে, ততক্ষণ তুমি আমার সামনে বা কাছে এস না। মেয়েদের রাগ এমনি আগুনের মত দপ করে জ্বলে ওঠে, যুক্তি মানে না। সে চলে গেল। তাদের কারুর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। এমনি করেই মঁসিয়ে আমি শেষ কুড়ি বছর কাটিয়ে দিলাম। কেমন করে যে আমার দিন কাটছিল, তা কি আপনি ধারণা করতে পারবেন? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে দিনের পর দিন তার অপেক্ষায় কাটিয়ে দিতে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এ অপেক্ষার বোধ হয় আর শেষ নেই। কিন্তু না শীঘ্রই আমি এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব, মৃত্যু আমায় মুক্তি দেবে। এমনি করেই তাদের দু'জনাকে না দেখেও এতদিন কাটিয়ে দিলাম।

যে লোকটিকে আমি ভালবাসতাম, কুড়ি বছর ধরে সে প্রতিদিনই আমায় চিঠি লিখত কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গে দেখা করতে আমি রাজী হইনি, আমার মনে হত যদি আমার প্রণয়ী আসা মাত্রই আমার ছেলে এসে পড়ে।

উঃ! আমার ছেলে কোথায়? সে কি নেই, না বেঁচে আছে, না কোথায় লুকিয়ে আছে? সে বোধহয় অনেক দূরে, কোন এক অজানা দেশে রয়েছে। সে যদি জানত মার প্রতি সন্তান কত দূর নিষ্ঠুর হ'তে পারে? সে কি জানে, সে কি ভয়াবহ কষ্টের মধ্যে, কি গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে, কি মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে ফেলে গেছে, যা আমার জীবনের প্রারম্ভ থেকে বার্দ্ধক্যের শেষ শয্যায় পর্য্যন্ত ঘিরে রয়েছে। মঁসিয়ে এই কথাগুলো কি আপনি তাকে বলতে পারবেন না? দয়া করে আমার শেষ কথাগুলো তাকে আবার নতুন করে শোনাবেন—অসহায় মেয়েদের প্রতি সন্তানেরা একটু কম নিষ্ঠুরতা দেখালেও পারে, জীবন এমনিতেই তাদের প্রতি যথেষ্ট কঠিন, দুঃখের। সে কি কখনও ভাবেনি!—সে চলে যাবার পর থেকে কি অবস্থায় তার মার দিন কেটেছে? সে যেন তার মাকে ক্ষমা করে, ভালবাসে। তার মা যে শাস্তি ভোগ করেছে, সে রকম ভয়াবহ শাস্তি বোধহয় জগতের কোনও মেয়েকে সহ্য করতে হয়নি।

তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল; তাঁর শরীর কাঁপছিল। তাঁর ভাবে মনে হচ্ছিল যে যেন তাঁর শেষ কথাগুলো শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত পুত্রের উদ্দেশ্যেই বলছেন। স্ত্রীলোকটি আবার বললেন: মঁসিয়ে আপনি তাকে বলবেন আমি আর কখনও সেই লোকটির সঙ্গে দেখা করিনি। একবার কথা বন্ধ করে তিনি আবার ভাঙ্গা গলায় বললেন: আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি এবার যান। আমি একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরতে চাই, কারণ তাদের কেউই আমার কাছে নেই।

লেক্রমেণ্ট বললেন: আমি পাগলের মত কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। আমাকে এরকম ভাবে কাঁদতে দেখে আমার গাড়ীর চালক আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে এরকম কত নাটকই আমাদের নিয়ে ঘটছে। আমি বৃদ্ধার ছেলেকে খুঁজে পাইনি। আপনারা সেই যুবকের সম্বন্ধে যা কিছুই মনে করুন, আমি কিন্তু তাকে হত্যাকারী সন্তান ছাড়া আর কিছুই মনে করব না।

অনুবাদিকা—রেণু চট্টোপাধ্যায়

উপেক্ষিত পীঠ

শ্রীতৃপ্তি চক্রবর্ত্তী

দক্ষযজ্ঞের ভয়াবহ পরিণতিস্বরূপ সতীর দেহত্যাগ ও পত্নীশোকে উন্মাদ মহাদেবের প্রলয়নাচনের কাহিনী আজ কারুর অবিদিত নয়। বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাসতীর দেহ। সেই দেবী-দেহের প্রতিটি অংশের ওপরে গ'ড়ে ওঠে এক একটি আদ্যাশক্তির পীঠস্থান। একপ্রান্তে সুদূর বেলুচিস্থানের হিংলাজ আর অপর প্রান্তে কন্যাকুমারিকা—এদের মাঝে আদ্যাশক্তি মহামায়ার নানা মূর্ত্তি, নানা রূপ পরিগ্রহ করে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিরাজ করছে বাহান্নটি পীঠ। কোনো স্থানে পড়েছিল দেবীর হস্ত, কোথাও অঙ্গুলি, কোথাও বা অন্যান্য দেহাংশ। সারা ভারতের এই প্রসিদ্ধ তীর্থগুলি ভক্তজন সমাগমে দিবা রাত্র মুখরিত ও সমৃদ্ধ। এদের মাঝে এমন একটি পীঠস্থান আছে, খ্যাতি ও সমারোহে যে সকলের পিছনে,—পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ কাননের এককোণে ছোট একটি নাম-না-জানা বনফুলের মতো।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হাজারীবাগ থেকে রাঁচী আসার পথে অভাবনীয় ভাবে হয়েছিল এই পীঠ দর্শন। আমাদের গাড়ীটি ছোট হলেও আরোহীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। ধীরে সুস্থে গল্পে গুজবে অতিবাহিত হচ্ছিল পথ। ছোটনাগপুর পার্ব্বত্য অঞ্চল হিসেবে অভিহিত, কিন্তু এখানকার রাস্তাগুলির প্রশস্ততা ও পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয়। দুধারে সমতলভূমিতে গ্রাম্য সাঁওতালী মেয়েরা গরু

ছাগলের পাল ছেড়ে দিয়ে নির্ভাবনায় লোকসঙ্গীতের সাধনায় নিমগ্না। হৈমন্তিক ধানকাটা শেষ হয়ে গিয়েছে,—মাঠগুলিতে রুক্ষ ধূসরতা। শীতের হিমেল পরশে ঝরে পড়ছে হলুদ বর্ণের পাতার রাশি। সাঁওতালী বৃদ্ধারা ঝুড়ি ভরে আহরণ করতে ব্যস্ত শুকনো পাতা—শীতের দিনে যা একান্ত অপরিহার্য্য সামগ্রী।

অকস্মাৎ গাড়ীর গতি গেল মন্থর হয়ে। ষ্টীয়ারিং ছেড়ে দিয়ে উনি অবসাদের ভঙ্গীতে হাই তুলে দরজা খুলে নামলেন।

কী হোলো আবার? বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করি।

যা ঠাণ্ডা, একটু চা হ'লে বেশ হোতো।

তা তো হোতো, কিন্তু পাচ্ছো কোথায় চা? আমার এবার সত্যিই রাগ হয়। দোকান-হাট দূরে থাক, কোনো গ্রাম্য বসতিরও চিহ্ন নেই কাছে পিঠে।

উনি বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীর ক্যারিয়ার থেকে যখন স্পিরিট ল্যাম্প, দুধের বোতল, চিনির কৌটা ইত্যাদি সরঞ্জাম একে একে বের করে রাস্তার পাশে ঘাসের ওপরে এনে রাখতে লাগলেন, তখন বুঝলাম যে, চা না খেয়ে উনি আর গাড়ীতে উঠবেন না।

সুতরাং সেই মাঠের মধ্যে চায়ের পর্ব্ব সারা হোলো আমাদের। জন তিনেক সাঁওতালী মেয়ে তাদের পাতার ঝুড়ি ফেলে কাছে এসে আমার চা তৈরী দেখতে লাগলো অসীম-আগ্রহে। স্পিরিট ল্যাম্প দেখে কৌতূহলের শেষ নেই তাদের। একটু করে চায়ের ভাগও দিতে বেজায় খুশী তারা।

ঘর কাঁহা? তাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করি।

মন্দির জগহ (অর্থাৎ মন্দিরের কাছে)।

কোন মন্দির? কৌতূহল বেড়ে যায় আমার।

উ যো নদী কিনারে সতীমন্দির হউ (ঐ যে নদীর তীরে সতী মন্দির)।

নতুন জায়গার সন্ধান পেয়ে উনি তো আগ্রহে অধীর হয়ে উঠলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, হাজারীবাগ রোড ধরে আরো দু'মাইলটাক গেলে পথে পড়বে সাঁড়ী গ্রাম। এই গ্রামের অভ্যন্তরে পায়ে হাঁটা-পথে চলতে হবে মাইলখানেক, তার পর পাওয়া যাবে সেই সতীমন্দিরের দর্শন।

চায়ের সরঞ্জাম গাড়ীতে তুলে রওনা হ'লাম সাঁড়ী অভিমুখে। অনতিবিলম্বেই পৌছে গেলাম। স্থানীয় একটি লোককে জিজ্ঞাসা করতেই সে সাগ্রহে দেখিয়ে দিল। অতি সঙ্কীর্ণ মেঠো পথ, গাড়ী যাবার উপযুক্ত নয়। অগত্যা ড্রাইভারকে গাড়ীতে রেখে আমরা পায়ে-চলা পথে রওনা হ'লাম মন্দির অভিমুখে। আদিবাসীদের বসতি অতিক্রম করে চলেছি। ঘরে ঘরে নতুন ধানের সমারোহ, উঠানে স্তূপীকৃত গাছশুদ্ধ ছোলা, সরিষা ইত্যাদি শস্যরাশি গৃহবাসীদের মুখে ফুটিয়ে তুলেছে গৌরবের হাসি। বাতাসে ভেসে বেড়ায় নতুন গুড়ের সৌরভ। ফসল-কাটা শুকনো ক্ষেতের ওপর দিয়ে চলা কিন্তু নিতান্ত সহজ নয়। প্রায়ই পায়ে ব্যথা অনুভব করার জন্য দাঁড়াতে হচ্ছিল এবং বলা বাহুল্য সাঁওতাল মেয়েরা নতুন হাসির খোরাক পেয়ে আমাকে উত্তরোত্তর লজ্জিত করে তুলছিল।

যা হোক, হঠাৎ জলস্রোতের ঝির ঝির মিষ্টি শব্দে বুঝলাম গন্তব্য-স্থল অদূরবর্ত্তী। পায়ের ব্যথা বেদনা ভুলে এগিয়ে যাই। ছোট একটা উৎরাই পেরিয়েই চোখে পড়ে ছোট্ট পাহাড়ী নদী। জলের গভীরতা এক ফুট হবে কি না সন্দেহ। কিন্তু কী পরিষ্কার, স্বচ্ছ জল। নদীর গর্ভেই মন্দির। নদীর অনুপাতেই ছোটো। মন্দিরের চত্বরে বসে এক বৃদ্ধ গৈরিকধারী পুঁথি পাঠ করছিলেন, আমাদের দেখে ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করলেন। মন্দিরের ভিতরে স্বল্পপরিসর জায়গাটুকুর ভিতরে সতীর বিগ্রহ। সাধারণ ধূসর রঙের পাথরে তৈরী দেবী-প্রতিমার নাভিদেশ থেকে অবিরাম জলধারা বেরিয়ে নীচে একটি কালোপাথরের শিবলিঙ্গের ওপরে ঝরে পড়ছে। এইটুকুই এর বৈশিষ্ট্য।

মন্দিরের ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ, একটি ধুনুচি ও একটি মাটির সরায় কিছু ভিজানো ছোলা ব্যতীত আর কিছুই নজরে পড়লো না। সাজসজ্জা ও আভরণহীনা দেবী-প্রতিমা, কিন্তু শিল্পীর পরিকল্পনা ও গঠননৈপুণ্য সকল দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়েছে।

বাইরে গৈরিকধারী আমাদের বিশদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সতীদেহের নাভির কিছু অংশ এখানে পড়েছিল, তারই পরিণাম স্বরূপ এই দেবালয়ের উৎপত্তি!

কিন্তু কে দিলো এমন রূপ? কার হাতের যাদুস্পর্শে এমন প্রাণময়ী হয়ে উঠলো এই পাষাণময়ী প্রতিমা? অক্ষয় তুলিতে কে অমর করে রাখলো এই শাশ্বত দেব-সৌন্দর্য্য? সে কোন নাম-না-জানা সাধক শিল্পী, যার হাতে ধরা দিয়েছিলেন জগন্মাতা। তাই বুঝি ও বিগ্রহের প্রতিটি অঙ্গে সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে বিশ্বমাতৃত্বের চিরন্তন রূপ। চিরকালের প্রণম্য সেই অজ্ঞাত ভাস্কর, যিনি প্রকৃতির এমন শান্ত

মধুর পরিবেশে গড়ে রেখে গিয়েছেন অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত এই দিব্য মাতৃমূর্ত্তি।

প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হোলো। গৈরিকধারী আমাদের দেবীর প্রসাদ দিলেন কিছু ভিজানো ছোলা। জীবনে কয়েকটি তীর্থ দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। দিল্লীতে বিড়লা প্রতিষ্ঠিত লক্ষী জনার্দ্দনের মন্দিরের অপরূপ শোভায় হয়েছি চমৎকৃত। কালীঘাটে অসংখ্য ভক্ত জনের ও পাণ্ডা প্রবরদের কোলাহলমুখরিত কালিকার মন্দিরে বিভ্রান্ত হয়েছে চিত্ত। শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধামে বিগ্রহের ভোগরাগের পরিমাণ দেখে হয়েছি বিস্ময়ে হতবাক্। কিন্তু সেখানে রেখে আসতে পেরেছি কি আন্তরিক সভক্তি প্রণতি? অনুভব করতে পেরেছি কি সেখানে দেবতার কল্যাণ পরশ? কিন্তু ছোট নাগপুরের এই নিভৃত অঞ্চলে, অথ্যাত পাহাড়ী নদীর নিরন্তর কলতানে শোনা যায় কার বিরামহীন স্তব গান? প্রত্যূষে ও প্রদোষে কলকাকলিতে কার বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে বনবিহঙ্গের দল।

ঘরে থেকেও ঘোরাঘুরি

["সুগন্ধা" দিবালী সংখ্যায় প্রকাশিত Dr. A. W. Wartyর একটা মারাঠী গল্পের ছায়াবলম্বনে]

অনুরাধা ভট্টাচার্য্য

ভাদ্র মাসের চতুর্থী বিশেষতঃ গণেশ চতুর্থীর দিন চাঁদ দেখা নিষেধ। প্রবাদ আছে যে, চন্দ্র দেব নাকি গণেশকে ইঁদুর-বাহন হ'য়ে যেতে দেখে হেসেছিলেন। সিদ্ধিদাতার রাগ দেখে কে—তিনি চাঁদকে শাপ দিলেন,—তুই আমাকে দেখে হাসছিস কিন্তু গণেশ চতুর্থীর দিন লোক তোকে দেখতে ভয় পাবে আর যদি দৈবাৎ দেখেও ফেলে, তার শুধু কাঁদতে বাকি থাকবে।

অপমান আর অহেতুক কলঙ্কের ভয়ে হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই নষ্টচন্দ্র দেখতে ভয় পায়। পুরাণের মধ্যে লেখা আছে যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নষ্টচন্দ্র দেখার ফলস্বরূপ কলঙ্কের হাত থেকে অব্যাহতি পান নি—তাঁর উপর স্যমন্তক মণি হরণের অপবাদ এসেছিল এবং অনেক চেষ্টার পর তিনি সেই অপবাদ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। যদি স্বয়ং ভগবানের এই অবস্থা হয়, তবে আমাদের মত অক্ষম সাধারণের যে কতদূর হীনগতি হতে পারে, সেটা সহজেই অনুমেয়।

রক্ষা এই যে, নষ্টচন্দ্র দর্শনের কুফল থেকে অব্যাহতি পাবার দুটো সহজ উপায়ের ব্যবস্থা আছে। প্রথম, শ্রীকৃষ্ণের মণি হরণ আখ্যান শ্রবণ এবং সেটার যদি সুযোগ বা সুবিধা না হয়, তবে কারও কাছে ক্ষতিপীড়াকর বাক্যবাণ শ্রবণ অর্থাৎ সোজা কথায় গাল খাওয়া। ক্ষতিপীড়াকর বাক্যবাণ যে অবস্থা অনুযায়ী কর্ণকুহরে মধুবর্ষণ করিতে পারে, এটা তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি আর কি, সব কিছুই আপেক্ষিক অর্থাৎ সময়ে সময়ে বিষও ওষুধের কাজ করে। যাই হোক, অনেকেই এই দ্বিতীয় পন্থার অনুসরণ করাই পছন্দ করেন।

ছেলেরা তো নষ্টচন্দ্র দেখবার জন্য পাগল। কারণ স্পষ্ট, কারও বাগানের সাময়িক ফলগুলি পক্কোন্মুখ—রথ দেখাও হবে এবং কলা বেচাও হবে অর্থাৎ কলঙ্ক থেকে বাঁচাও যাবে, বাপ-মাও বকতে পাবে না অথচ ফলগুলি উপভোগ করবার এমন সুবর্ণসুযোগ হেলায় নষ্ট করা সমীচীন নয়।

মহারাষ্ট্র দেশে গণেশ পূজো একটা বড় উৎসব। প্রায় দশ দিন ধরে পূজোর হিড়িক লেগে থাকে। পাড়ায় পাড়ায় পূজো হয় এবং সেই উপলক্ষে নানা প্রোগ্রাম হয়। গণেশ চতুর্থীর দিন বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুর দর্শন করে বাড়ীর দরজায়ই চাঁদে দেখে ফেললাম। তীরে এসে তরী ডোবা আর কি! স্ত্রীকে বললাম, তুমি ঢুকে পড়ো, আমি একটু গাল খেয়ে আসি। আমার ধারণা ছিলো গাল খাওয়া সোজা, কিন্তু সময়ে সময়ে সোজা ব্যাপারও কতটা শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায় আপনাদের আমি তাই বলবো।

বাড়ীর কাছেই একজন রিটায়ার্ড মিলিটারী প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁর বাগানের বিশেষতঃ গোলাপ ফুলের খুব সখ ছিল। হরেক রকম গোলাপ তাঁর বাগান আমোদিত এবং আলোকিত করে রাখতো। কারও একটা ফুল ছোঁড়বার হুকুম ছিল না, তা তিনি যিনিই হোন। আমি ভাবলাম যে তাঁর কম্পাউণ্ডের মধ্যে গিয়ে তাঁরই সামনে কিছু গোলাপ ফুল ছিঁড়লেই কার্য্য হবে। গালও খাওয়া যাবে আর স্ত্রীকে কিছু ভাল ফুল উপহার দিতে পারবো। ভাগ্যক্রমে কর্ণেলকেও বারান্দায় বসে থাকতে দেখলাম। কোনও দ্বিধা না করে সোজা গেট খুলে ভেতরে গেলাম এবং পটাপট গোলাপ ফুল ছিঁড়তে লাগলাম।

কে রে! বলে কর্ণেল বাগানে নেমে এলেন এবং আমাকে দেখে বললেন, কি জহর বাবু নাকি? নমস্কার, পূজোর জন্য ফুল চাই তো, বেশ বেশ এই নিন আমার সবচেয়ে ভাল ফুল। বলে গোটা দশেক সেরা গোলাপ তুলে দিলেন। দেখুন আমার ভাগ্য! এই লোকই কয়েকদিন আগে আমার ভাইপো রবিকে ফুল তোলার জন্য শুধু মারতে বাকী রেখেছিলেন।

প্রথম বারেই হতাশ হ'লেও আমি সম্পূর্ণ নিরাশ হ'লাম না। ঘুরতে ঘুরতে একটা সিনেমায় যেয়ে হাজির। দেখি টিকিট-আফিসের সামনে লোকেরা সব লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সোজা গিয়ে লাইনের আগে দাঁড়ালাম এবং একটা টিকিট চেয়ে বসলাম, আমার পিছনের লোকটি অর্থাৎ যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত লাইনের প্রথমে দাঁড়িয়েছিল, প্রতিবাদ করে আর কি, কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো, তার পিছনের লোকটি তাকে টিপে বললো, কচ্ছিস কি, দারোগা সাহেব দেখছিস না। বাস! দারোগা সাহেব শোনা মাত্রই সে এবং অন্যান্য যারা উসখুস করছিলো সব একেবারে নির্বিকার যেন কিছুই হয় নি। যে সিনেমার লাইনে টিকিট-কাটা নিয়ে মারামারি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, সেখানে সামান্য গাল খাওয়াও ভাগ্যে জুটলো না।

কি করি, ভাবলাম সিনেমা-হলে গিয়ে ঢুকি, সেখানে যদি কিছু সুবিধা হয়, সিটে যেতে যেতে ইচ্ছে করে একজনের পা মাড়িয়ে দিলাম। তিনি তো আমার দিকে কটমট করে তাকালেন—আমি তো খুব খুসী, এবারে বোধ হয় লেগে গেলো। কিন্তু কি কুক্ষণেই 'সরি' কথাটার আবিষ্কার হয়েছিলো। আমার মুখ থেকে অজানতে 'সরি' বেরিয়ে গেলো। বাস 'বনা কাম বিগড় গয়া', লোকটির মুখ আর খুললো না। তিনি পা তুলে বসলেন—অন্যরাও দেখাদেখি তাই করলেন। এখানে আর সুবিধা হবে না দেখে আমি সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কিছু দূর যেতেই বারীনের সঙ্গে দেখা। অন্য সময় তাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে ফুটপাথের অন্য দিক দিয়ে যাই কিন্তু আজ তাকে দেখে গলে জল। খুসীতে মন ভরে গেলো। বার বার তিন বার এবারে

আমার কষ্ট সার্থক হবেই। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটার পার্টির মেম্বার, দেখা হলে গাল না দিয়ে জল খাই না। তার উপরে সন্ধ্যার দিকে বারীনের ভাতামৃত পান করবার সখ আছে। স্বয়ং হরিও মারতে পারবে না—গালাগালি হবেই।

কিন্তু কি বিপদ—বিজয়ার সময়েও যে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করে না, সেই বারীন আমায় দেখে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। আমি যতই জিগ্যেস করি কি হয়েছে, ততই কাঁদে। রাস্তায় লোক জড় হয়ে গেলো কিন্তু বারীনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। খানিকক্ষণ পরে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বারীন বললো, চলো, দোকানের বারান্দায় বসি। দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গিছলো তাই কোন কোন অসুবিধা হলো না। ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম কি ব্যাপার—বারীন তাদের ক্লাবের ডিরেক্টার এবং সাধারণতঃ হিরোর পার্ট করে। এবছর হিরোর পার্ট দেওয়া দূরে থাকুক, তাকে কাটা-সৈনিকের পার্টও দেওয়া হয় নি। কারণ সে না বললেও আমি বুঝলাম তার ডিক্টেটরশিপ সকলের অসহ্য হয়েছিলো।—আমি তোমাদের ক্লাবের মেম্বার হবো এবং ওরা পা ধরে সাধলেও যাব না।—কোন রকমে তাকে বুঝিয়ে ওর হাত থেকে ছাড়া পেলাম। অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকায়ে যায়।

এই রকম প্রায় ঘণ্টাখানেক বৃথা ঘুরে আবার বাড়ী ফিরলাম। যা আছে বরাতে ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম। দেঁতো হাসি হেসে গিন্নীকে সব বললাম, তাঁর মুখ গম্ভীর ছিলো অতটা বুঝতে পারিনি যে ঝটিকা আসন্নপ্রায়। আমার কথা শেস হতে না হতেই—যাও আর ন্যাকামি করে না। যতো বয়স হচ্ছে তত সখ বাড়ছে, কোথায় কোন সুন্দরীর পেছনে ঘুরছিলে, আমি আর বুঝি না যেন! ইত্যাদি। প্রায় ঝাড়া আধ ঘণ্টা গর্জন হলো। আমার আফশোষ হ'লো এই ভেবে যে, ঘরেই গাল দেবার লোক যখন মজুত তখন বাইরে বৃথাই ঘোরাঘুরি করলাম।

ব্যথিত মন

প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

নীরব সন্ধ্যাবেলায় বসি একা গৃহকোণে,
কত কথা ভেবে যাই আনমনে।
সুদূর শূন্যে তারাদের মালা জ্বলে ওঠে ধীরে ধীরে;
হৃদয়ের বীণা বাজে যেন আজ কি এক গভীর সুরে।
আমার স্বপ্ন আকাশে বাতাসে ছড়ানো,
জানি পৃথিবীর বুকে দাম নেই তার কোনো।
ছকে-বাঁধা এই জীবনের গতি চলে;
পায়ের তলায় কত না কামনা দলে।
একে একে চলে যায় কতদিন,
আমি শুধু থাকি যে বিত্তহীন।
তবু আজ এই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়, অন্তরের দুঃসহ ব্যথায়;
ক্লান্ত মন যেন সহসা খুঁজে পায় জীবনের
গভীরতর রহস্যময়তায়।
দুঃখের মাঝে বেদনার মাঝে পেলাম যে এক দুর্লভ ধন,
সে যে সবার মাঝে নিজেরে হারাবার সুগভীর আকিঞ্চন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

নীল!

নামটা মজার ঠেকল মঞ্জুর কাছে। মার উদ্দিষ্ট ঘরের দিকে তাকাল সে। দুটো ঘর পাশাপাশি। মাঝের দরজায় ঝুলছে একটা পুরোনো শাড়ী-কাটা পর্দা। কোন-আবরু রক্ষা করতে পারছে না সে, তবু তার থাকাটা একেবারে নিরর্থকও নয়। চোখের কাজ না ক'রলেও মনের কাজ করছিল। খোলা দরজা—ওটা আছে ব'লেই না ওরা অমন মুখ বরাবর বসে থাকতে পারছে। অবশ্যি এটা ওদের দিক, উল্টো পক্ষের তাতেও কিছু এসে যেত বলে মঞ্জুর মনে হ'লো না। ওর চঞ্চল দৃষ্টি আরো দু-একবার ওদিক ঘুরে এসেছে। তখনো দেখেছে, এখনো দেখলো, টেবিলের কাছে একটা হাত ভাঙা চেয়ারে বসে সে যেন কি লিখে চলেছে—সামনে ছড়ানো মোটা মোটা কয়েকখানা বই। হাতের কলমটাকে যে ভাবে ছোটাচ্ছে, তাতে প্রাণী হ'লে মুখে তার ফেনা ঝড়তো।

মার প্রথম ডাকে কোন সাড়া মিলল না তার কাছ থেকে! দ্বিতীয় ডাকে যে জবাবটা সে দিল সেটাও অভ্যাসের জবাব, যে অভ্যাসে ঘুমন্ত মানুষও অনেক সময় সাড়া দিয়ে ওঠে। তৃতীয় ডাকটা মা ও দিলের যেমন জোরের সঙ্গে, ছেলেও মুহূর্তে হাতের কলম নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আসছি। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! ডান হাতটা মাথার ঘন চুলের ভেতর চালাতে চালাতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সামনের খোলা বইটার পাতা ওলটাতে লাগল সে। মা উল্‌টিয়ে থাকা পরদার পাশ দিয়ে ছেলের দিকে একটা অসন্তুষ্টি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ছেলে আবার চেয়ার টেনে বসে পড়ে কলম তুলে নিল হাতে।

মা উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন এবার—আশ্চর্য্য ডাকলে একবার উঠে আস না পর্য্যন্ত! মমতা বাড়ী নেই, ওরা দুটি মমতার ননদ। যা হোক একটু চা-জলখাবারের ব্যবস্থা ক'রতে হবে আমায়। তুমি না এলে, ওদের একা ফেলে আমি যাই কি ক'রে? নিজের কাজ ছাড়া সব কিছুতে অবহেলা তোমার দিনদিন কেবল বাড়ছেই।

এতক্ষণে নীল সত্যি এ ঘরে এলো—যদিও ঘরে বসে লিখছিল সে। কিন্তু যেখানে বসে লেখে, লেখক কি সেখানে উপস্থিত থাকে! ঔপন্যাসিককে কি তার উপন্যাস পরিমণ্ডলের বাইরে খুঁজলে পাওয়া যায়? অভিযাত্রী যখন মেরু ঝড় অতিক্রম করে, সমুদ্র বরফ, পাহাড় ডিঙোয় তখন কি ভৌগোলিকই চেয়ারে থাকেন? ভারত ত্যাগের সময় ইংরাজ প্রতিনিধির সঙ্গ ছাড়তে চাচ্ছে না যে ঐতিহাসিক, ডাকলেই কি সে হাজির হ'তে পারে? অপ্রতিভ ভাবে উঠে দাঁড়ালো নীল, ও ঘর থেকেই একবার তাকালো, এ ঘরে উপবিষ্ট দুই বোনের দিকে, তার পর এসে ঢুকল এ ঘরে। সে জানে মার কথাগুলো বেশ স্পষ্টই শুনতে পেয়েছে ওরা। তাই কাছে এসে নমস্কার জানিয়ে বললো—অবহেলা শব্দটা মা এখানে ঠিক ব্যবহার করেন নি, বুঝতেই পারছেন। এটা মার আমার প্রতি তাঁর সাংসারিক নালিশের শব্দ এবং আজকের সকালেরই কোন অপরাধের। আমি কি করে জানব বলুন, আপনারা এ বাড়ীর এমন বিশিষ্ট অতিথি।

প্রতি-নমস্কার জানাতে গিয়ে ওরা লক্ষ্য ক'রল, এমন আশ্চর্য্য নীল চোখ আর কখনো দেখেনি। কোণের দিকে রাখা ছিল, তেল-ময়লায় কালো একটা ইজিচেয়ার। বোঝা যায় বাড়ীর কর্তার বসবার জায়গা সেটি। কারণ পাশেই রাখা আছে তামাক, টিকে, গড়গড়া। ব্যবস্থা নিজের হাত বাড়িয়ে ভরে নেবার, ভ'রে দেবার নিশ্চয়ই কেউ নেই। নলটা ইজিচেয়ারেই পড়েছিল। সেটা তুলে, গড়গড়ার গায় পেঁচিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা ক'রলো নীল—আমাদের এই বন্-বাদাড়ে বাড়ী চিনে আপনারা এলেন কি করে?

—রাস্তাঘাট চিনতে ওর জুড়ি নেই। মঞ্জু মৌরীকে দেখালো।

মৌরী বলল—আমরা এসেছিলাম আর একদিন।

—তাতে কি হয়? আমার এক বন্ধু দু'দিন এসেছে আমার সঙ্গে। এখনও রাতে আসবার কথা ব'ললে আঁতকে ওঠে।

—বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

—কেন? বিস্মিত চোখে তাকাল নীল।

—ছেলেদের অমন ভীরু হওয়া মানায় না।

হাসিমুখে বলল নীল—তা ঠিক। কিন্তু আপনি করবেন কি তার? ভয় কমাবার মন্ত্র জানেন না কি?

—মন্ত্র? না। মাথা নাড়ল মঞ্জু। ওঝার বিদ্যে আমার নেই। আপনার বন্ধুকে তো আমি চিনিনে, ওঝা-বদ্যির আওতা পার হয়েছেন নিশ্চয়ই?

হেসে উঠল নীল। কি জবাব দিত সে, কে জানে। মার ডাক শুনে আসছি বলে উঠে গেল। মঞ্জু তাকালো মৌরীর দিকে মৌরী, মঞ্জুর। মৌরী বলল,—কথা তুই বেশী না ব'লে একেবারেই পারিস না।

তা সে পারে না, চটপট স্বীকার ক'রে নিয়ে মঞ্জু বললো—দিদি দেখে আসি ভদ্রলোক কি লিখছেন—এ্যাঁ? প্রায় উঠে দাঁড়ায় সে।

বাঁধা দিল মৌরী—ছটফট করবিনে মঞ্জু। এভাবে একজনের লেখা কেউ পড়ে? যদি ব্যক্তিগত কিছু হয়।

অগত্যা থামতে হ'ল মঞ্জুকে। গা ছেড়ে বসে বলল—এত ক্যাঁকড়াও বের করতে পারিস তুই।

বসে রইল দু'বোন চুপচাপ। কিছু করবার না থাকলে চোখ এদিক-ওদিক ঘুরবেই। ওদের দৃষ্টিও ঘুরে ফিরে গিয়ে পড়তে লাগল রান্নাঘরে। একটা নীচু পাওয়ারের লালচে আলোতে বসে চা তৈরী করেছেন মমতার মা। মাঝে মাঝে একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তাঁর গিয়ে পড়ছে বাইরের দিকে। তিনি জানতেন মমতার ফিরতে রাত দশটা বেজে যাবে। ততক্ষণ কিছুতেই ওরা বসবে না। তবু শঙ্কিত হচ্ছিলেন তিনি, এমন তো হয় মাঝে মাঝে, যে সময় বলে যায় তার

চাইতে অনেক আগে এসে পড়ে। যদি আজ তাই হয়। বুকটা ধক্‌ধক্ শব্দ ক'রে ওঠে তাঁর। আরো তাড়াতাড়ি হাত চালান তিনি। নীল বাজার থেকে খাবার নিয়ে এলে, মা-ছেলে এক সঙ্গেই ঘরে এসে ঢুকলো। ওদের সামনে চা, মিষ্টি ধ'রে দিয়ে মা কৃতজ্ঞ-ঝরা কণ্ঠে ছেলেকে বললেন—ওদের দু'বোনকে আমি কি ব'লে যে আশীর্বাদ করব জানি নে। জানি তো ওদের বাবার একটুও মত ছিল না। থাকবেই বা কেন, কে চায় সেধে গরীবের মেয়ে আনতে। শুধু ওদের দু'বোনের জন্যই—

—না, না, তা কেন? বাবার নিজেরই খুব ভালো লেগেছে মমতাকে। ব'লে উঠল মৌরী। আর মঞ্জু লক্ষ্য করলো মার কথায় নীলের ভ্রূতে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়েছে।

কিন্তু সেদিন মমতার সঙ্গে মৌরী-মঞ্জুর দেখা হ'লো না—আটটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও না। মঞ্জুর কোন আপত্তি ছিল না বসবার বরং ইচ্ছেই ছিল। সবে তো আটটা! ওরা তো হামেশাই দশটায় বাড়ী ফেরে। এই অচেনা পথটুকু? তা হয় রিক্সায় যাবে, নয়তো এঁরা কেউ বাসে তুলে দিয়ে আসবেন। আর একদিন আসবে—আরো দশ দিন ওরা আসতে পারে—কিন্তু আজকের আসাটা তো বৃথা হবে। কিন্তু ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে কোন ভরসা পাচ্ছিল না মৌরী। ওর মনে হচ্ছিল ঘড়ির ঐ 'আটটা' ভুল—ওটা বন্ধ হয়ে আছে। এখন গভীর রাত—নইলে রাত আটটায় রাস্তা কখনো এমন স্তব্ধ ভাব ধরে? চার দিক থেকে আসছে শুধু ঝিঁঝি পোকার আর ব্যাঙের ডাক, যা আরো বদ্ধ ক'রে তুলছিল অন্ধকারটাকে। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে একেবারে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মৌরী—আজ উঠবো আমরা?

ওরা জানল না, মা মনে মনে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। বললেন—আগে একটা রিক্সা নিয়ে আসুক নীল।

মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়ে বলল—যেখান থেকে রিক্সা আনবেন, সেখান পর্য্যন্ত যদি আপনার সঙ্গে আমরা যাই। তবেই তো আমাদের একেবারে বাসে তুলে দিতে পারেন—তাই না?

কাছেই যে একটা রিক্সাষ্ট্যাণ্ড আছে মঞ্জুর মনে ছিল না। নীলের ভোলবার কথা নয়—সে সেখান থেকেই রিক্সা আনতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে কিছু বলল না। গায়ে পাঞ্জাবী চড়িয়ে এসে বলল—চলুন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের স্তব্ধতা এবং অন্ধকার কোনটাকেই তেমন ভীষণ বলে মনে হ'লো না মৌরীর। আকাশভরা অসংখ্য তারা! তারা কেউ অন্ধকার নয়—নীরবও নয়। কিছু বলছে। কি বলছে? বলছে কি—ঘরে একটা-দুটো বাতি জ্বেলে বসে বসে কি পাহাড়া দাও? বাইরে যে সহস্রবাতি জ্বেলে বসে আছি আমি তোমাদের জন্য।—ঠাণ্ডা বাতাস শরীরের উপর দিয়ে বয়ে শরীর ঠাণ্ডা ক'রে তুললো। গাছের পাতার ঝির-ঝির শব্দ সঙ্গীতের মত শোনাতে লাগল কানে। পায়ের নীচে কাচা মাটির পথ! আসবার সময় ধুলো আর ঝাঁকুনিতে যে অসহ্য ক'রে তুলেছিল, তাকেই এখন মনে হ'তে লাগল, নরমশরীর বিছিয়ে রেখেছে ওদের চলার জন্য। কিছু দূর গিয়ে এই কাঁচা পথটা কালো চওড়া পীচ ঢালা রাস্তার সঙ্গে মিলেছে। একটু থমকালো মৌরী—হৃদয়শূন্য একটা শহরে হাত যেন একটি ভীরু গ্রাম্য মেয়ের হাত চেপে ধরে আকর্ষণ করছে। খালি রিক্সাগুলো ওদের কাছে এসে গতি মন্থর করে, বেল বাজিয়ে যেন জিজ্ঞাসা করে যেতে লাগল—নেবে নাকি? পথ অনেকটা। যখন বাস-ষ্ট্যাণ্ডে এসে পৌছল, মঞ্জু মৌরী দুজনেই তখন ঘেমে জল।

নীল বললো—একটা রিক্সা নেওয়াই উচিত ছিল, খুব কষ্ট হয়েছে আপনাদের।

বাসের নম্বরের দিকে দৃষ্টি রাখতে রাখতে মঞ্জু বললো—ওর হয়েছে, হাঁটাটাকে ও ভয় করে।

একটা বাস ঠাসা ভীড় নিয়ে এসে দাঁড়ালো—তার দিকে তাকিয়ে সেটাতে ওঠার চেষ্টা ক'রল না ওরা। পাঞ্জাবী ড্রাইভার দুজন, দাঁড়াবার মত ফাঁকটুকুর দিকে তাকিয়ে ওদের লক্ষ্য ক'রে হাঁক ছাড়ল—গড়িয়া, পার্কসার্কাস, হাওড়া। চলে গেল সেটা। আবার শান্ত সব। ইতস্তত ছড়ান ছড়ান কিছু লোক। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে কেউ কেউ সিগারেট টানছে, কেউ এমনি। নীল এতক্ষণে একটা সিগারেট বের ক'রে অনুমতি চাইল, বিশেষ ক'রে মৌরীর দিকে তাকিয়ে, বোধহয় বড় বলে—ধরাতে পারি?

—ওকে জিজ্ঞাসা ক'রছেন? আর কিছুদিন বাদে হাওয়াটা ধোঁয়ায় ভরা না থাকলে ওর নিঃশ্বাস টানতে হালকা ঠেকবে। ওর যার সাথে বিয়ে, তিনি এমনি সিগারেট খান।

—আপনারও বিয়ে নাকি? সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা ক'রলো নীল।

—বাঃ, ছোড়দা আর ওর কিছু দিন আগে-পরেই তো দিন হয়েছে। আপনি জানেন না?

—না। এবার হাসলো নীল, বললো—আপনি বাদ রয়ে গেলেন যে? ভালো দিন নেই আর কাছে?

নীলের ঠোঁটের পরিহাস মঞ্জুর দৃষ্টি এড়ালো না। গম্ভীর ভাবে জবাব দিল সে—ভালো পাত্র নেই কাছে।

জবাবটা শুনে দুই ঠোঁটে সিগারেটটা চেপে ধরে নীল তার নীলচোখের দৃষ্টি এমন ভাবে মঞ্জুর ওপর ফেলল—মঞ্জুর মনে হ'ল যেন দূর সমুদ্রের অনুসন্ধানী আলো এসে পড়ল ওর মুখের ওপর। বাসে উঠে, মুখ বাড়িয়ে যখন—আচ্ছা—বলে বিদায় নিল—মঞ্জু দেখল, তখনও ঠিক সেই দৃষ্টি নীলের চোখে।

মমতাদের বাড়ী থেকে আসবার পর আর একদিন যাওয়ার কথা যে ওদের একেবারেই মনে না হ'লো তা নয়। কিন্তু মনে হওয়াটা কাজে পরিণত করে যে উৎসাহ তাতে নিশ্চয়ই তেমন জোর ছিল না। থাকলে মঞ্জুকে থামানো যেত না। এমন হয়। অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়নে ত্রুটি ঘটেনা—তবু কোথাও এমন একটা ঠাণ্ডা ভাব থেকে যায়, যার ছোঁয়ায় অপর পক্ষের উত্তাপটাও আসে ঠাণ্ডা হয়ে। মঞ্জুরও বোধ হয় তাই হয়ে থাকবে। বিশেষ ক'রে আসবার সময় মেয়ের সঙ্গে দেখা না হবার জন্য মা যে খেদটা প্রকাশ করলেন—তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন মনে না এলেও—সে বলা ওদের আর একদিন যাওয়ার আগ্রহ জাগল না।

বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে থাকে। বাড়ীতে চলে তারই আয়োজন। যদিও কিছু ঘাড়ে-পড়া দিন নয় তবু অমিতা হাত উল্টে বলে—দুটো বিয়ে সাত দিন আগে পরে—কি ক'রে সামলাবে

সব জানিনে। যতীনবাবুর কাছে একটা বিয়ের দিনই মুখ্য সেটা মৌরীর। বাসুদেবেরটা নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। ওটা সেরে দেবেন মৌরীর বিয়ের উদ্বৃত্ত দিয়েই। চোখ ধাঁধানো জৌলুষ হওয়া চাই মৌরীর বিয়ের। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে মোটা টাকা তুলে এনে চাষীর বীজ ছড়াবার মত ছিটিয়ে খরচ করতে লাগলেন—কারণ তিনি জানেন বীজের মায়া করে যে চাষী তার তোলা ধানে ভাণ্ডার ভরে না। বড় বড় যোগাযোগ—আসবে সব ধনীমানী। উপস্থিত থাকবেন সুদর্শনের বাবা যিনি ধনী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের অন্যতম। উঠে ঘরময় পায়চারী শুরু করে দেন যতীনবাবু। ছোট ঘর—দু'পা হাঁটলে দেয়াল নাকে ঠেকে, আবার ঘোরেন। চিন্তাও ঘোরে। মুখে দেখা দেয় আত্মগর্ব—খবরের কাগজে প্রকাশিত বিশিষ্ট অতিথিদের নাম আর উচ্চপদের তালিকা মনে করে। তার পক্ষথেকেও গেইটে, আসরে রাখতে হবে অভ্যর্থনা করবার জন্য অমনি সব বড় পদের ব্যক্তিদের। নইলে সম্বর্ধনা আর সুন্দর অমায়িক ব্যবহারের মূল্য কি থাকবে যে কাগজে তোলা যাবে।

যতীনবাবু চোখ বুজে বর নয়, কনে নয়, বিয়ে নয়, দেখেন কেবল বিয়ের আসরটা। সাদা আর লাল সালুতে মোড়া জ্যামিতিক নক্সায় তৈরী আসর—কার্পেটে কুশন চেয়ার। চাঁদোয়ার প্রতি পদ্মে ঝুলছে পাখা—ফুলে ধূপে গন্ধে চারিদিক আমোদিত। ডেকোরেটার চাই একজন—নামকরা ডেকোরেটার। খেয়াল রাখতে হবে আষাঢ়ের বৃষ্টি যেন এক ফোঁটা ভেতরে না পড়ে সে আসরের।

অমিতার নেই নিশ্বাস ফেলবার সময়—সকালে চায়ের পার্টটি ছুটোছুটির ভেতর কোনমতে সেরে বের হয় সে মার্কেটিং-এ। শাড়ী, গয়না, টয়লেট—দু দুটো বিয়ের। ভারটা যার উপর থাকে সেই বোঝে। মমতার পছন্দ, অপছন্দ কিছু জানা নেই। মৌরীর পছন্দ সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল জানে বলে, কিন্তু তাই কি সত্যি। কিছু না বললেও মুখের চেহারা দেখলে বুঝি বোঝা যায় না—মনমতো হওয়া, না হওয়াটা। একবারের যায়গায় বিশবার ছুটছে দোকানে, কোনবার অপরের মন উঠতে না দেখলে, কোনবার বা নিজেরই। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। শুধু বিরক্তি করে ওকে আষাঢ়ের বৃষ্টি। পথে বাজারে দোকানে ঝুপঝুপ নেমে নেমে এমন ত্যক্ত করে। বাবার গাড়ীটা সে আনিয়ে নিতে পেরেছে তাই রক্ষে। মেয়ের ননদের বিয়ের বাজার সওদা করার সুবিধা করার সুবিধার জন্য বাপ অফিস করছেন হাসিমুখে ট্রাম-ট্যাক্সিতে। অমিতার দিকে তাকিয়ে মৌরীর মনে হয়, নিজের ঝোঁক মত কাজ পেলে, কাজ আর আনন্দ এমন এক হয়ে যায় বলেই বোধ হয় বলে—যে নিজের গুণ অনুযায়ী কাজ খুঁজে পায়, সে ভাগ্যবান।

জয়দেব কখনো স্ত্রীকে খুসী করতে, কখনো একেবারে কিছু না করার লজ্জা থেকে মুখ বাঁচাতে অমিতার সঙ্গে ঘোরে। আবার সময় বুঝে সরে পড়ে। ছোটপিসি রোজ সন্ধ্যায় আসেন। পিসিমা বাবা, ছোটপিসিতে মিলে, খাবার মেনু, রান্নার জায়গা, নিমন্ত্রিতের লিষ্ট, পরিবেশনের পদ্ধতি—একে আনা, তাকে খবর পাঠানো; সব বিষয়ে পরামর্শ করেন রাত আটটা পর্য্যন্ত। তারপর আবার গাড়ী ছাড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়—পিসেমশাইএর ডিনারের সময় হয়েছে। বাসুদেবের ছুটি পাওয়া নিয়ে যে চিন্তাটা ছিল, সেটাও [illegible] আজ চিঠি পেয়ে—এক মাসের পুরো ছুটি পাচ্ছে সে।

আর রাযু! সে আনন্দে হাতে ডিগবাজী খেতে খেতে বারান্দা পার হয়। অমিতার গাড়ী থামার শব্দ কানে আসতেই তিন-চার সিঁড়ি টপকে টপকে টপকে নেমে যায় নীচে। হাতে প্যাকেটের উপর প্যাকেট তুলে, বুকে চেপে ধরে, আবার তেমনি সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে গেয়ে ওঠে—ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল, হরদম লাগাতা ঝাড়ু তাভি এ্যায়সা হাল—এটাই গায় এখন রাযু। ওদের আপিসে ভজমনটা বন্ধ, ক'দিন সে খুব গলা ছেড়ে—আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা—গাইতে আরম্ভ ক'রেছিল। কিন্তু পিসিমা গালমন্দ ক'রে প্রায় কাঁদিয়ে ফেলেছিলেন রাযুকে—বিয়ে বাড়ীতে একি অলক্ষুণে গান? মঞ্জু এসে সান্ত্বনা দিয়ে ঠিক ক'রে দিল—এখন থেকে এটা গাইবে।

মঞ্জু আছে সর্ব্বত্র। বাবা পিসীমাদের আলোচনায়, অমিতার মার্কেটিং-এ, পাঠ নিতে মৌরীর পাশে—টুকিটাকি সাংসারিক কাজ ক'রে চলা মৌরীর সঙ্গে। আবার এরই ভেতর কোন কোন দিন ন'টায় কলেজে গিয়ে সন্ধ্যা পার ক'রে ফিরায় কারণ [illegible] দেরীর কারণ জানতে চাইলে, ডান হাতটা তলোয়ার চালানোর ভঙ্গীতে তেরছা চালাতে চালাতে বলে—এই আর এই ক'রে বেরক কচু গাছ কাটছি।

—কচু গাছ কাটছিস?

—হাঁ। কচু গাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত হব। আজ আমরা কলেজে পার্লামেন্টারী সভা বসিয়েছিলাম—তাতে বিরুদ্ধ দলের নেতা নির্ব্বাচিত হয়েছিলাম আমি। উদ্বাস্তু সাহায্য বন্ধ করা নিয়ে এমন আক্রমণ করেছিলাম সরকার পক্ষকে—জবাব যোগাতে প্রধানমন্ত্রীরও। উঃ—তুই দিদি শুনতিস যদি, আমার পার্লামেন্টারী রিটোর্টগুলি! নকল সভা না হয়ে আসল হ'লেও জবাব দেবার কেউ আছে,—কই দেখতে পাচ্ছিনে! আণবিক, স্পুটনিক কোন যুগ নয়, এখন শুধু কথার যুগ চলছে আর কথার যুদ্ধ চলছে। কথা জানা চাই—কথা।

আর মৌরীর মনের কাঁটা সুদর্শন যে শুধু নিজের হাতে ফুল দিয়ে গিয়েছিল তাই নয়—ফুল ফোটাবার ব্যবসাও ক'রে রেখে গিয়েছিল। আষাঢ়ের আকাশভরা বর্ষণে সে ফুল তার মুদিত পাপড়ি একটি একটি ক'রে মেলে দিচ্ছিল। আর তাতে যে বিভোর ও না হচ্ছিল তাও নয়। করবার কিছু নেই—পিসীমা বাজার বন্দর ঘুরতে দেন না শ্রী নষ্ট হবে বলে। তবুও যেতে ইচ্ছে করে না। বসে বসে কখনো সুদর্শনের কথা ভাবে, বৃষ্টি থাকলে বৃষ্টি দেখে। বই পড়ে, নয়ত তাকিয়ে থাকে সামনের বাড়ীটার দিকে। এখানে নতুন ভাড়াটে এসেছে এ্যাংলো, দেখে তাদের বিদেশী জীবনযাত্রা। ছেলেটা বাড়ী থাকলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা রেকর্ড এত বেশী চালায় যে বিরক্তি ধরে যায়—রেকর্ডটার শুধু বিউটিফুল, বিউটিফুল, বিউটিফুল—এই তিনটি শব্দ ছাড়া মৌরী পরের একটা শব্দও ধরতে পারে না। ভাবে, কি সুন্দর বলছে—প্রিয়ার মুখ না প্রকৃতির ছবি?

একদিন কলেজে যাবার মুখে পিয়ন মঞ্জুর হাতে মৌরীর নাম লেখা একটি ছোট প্যাকেট আর একটি সবুজ এনভেলাপ দিলে—প্রথমটায় বুঝতে পারল না কিছু। তারপর ফুটোর কোণেই ছোট ক'রে—ফ্রম সুদর্শন—লেখাটি দেখে বুঝল। চিঠি আর প্যাকেটটা নিয়ে

তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এল ও। মৌরী, অমিতার কাছে গিয়ে রঙ্গীণ শাড়ীর আঁচলটা নাচের ভঙ্গীতে ধরে পাক খেতে খেতে গেয়ে উঠল—বিউটিফুল, বিউটিফুল বিউটিফুল। অমিতা জিনিষপত্র আলমারীতে তুলছিল মঞ্জুর সাড়া পেয়ে ঘুরে বলল—আজ বিকেলে তবে তুমি আমার সঙ্গে মার্কেটে যাচ্ছ না ?

—কেবল মার্কেট আর মার্কেট ! দেখনা হাতে কি আমার ?

—কি ? অমিতা-মৌরী, দুজনেই তাকালো ওর হাতের দিকে।

মঞ্জু বললো—পালকের মত হাল্কা ওজনের একটি খাম, আর ছোট্ট একটি প্যাকেট। কাল ওর জন্মদিন নয় বৌদি ?

—হাঁা, কিন্তু ও কি তোমার হাতে ?

—উপহার।

—তুমি আনলে ?

—দূর। সুদর্শনবাবু পাঠিয়েছেন।

প্যাকেটটা থেকে উপহার বেরুলো কিন্তু শুধু মৌরীর নয়—তিন জনেরই। সত্য বলে ভুল হয়, এমনি সুন্দর তিনটা কামিনী ফুলের গুচ্ছ, তিনটে সোনার কাটায় গাঁথা। বাক্সটার গায় লেখা—অমিতা, উপহার মৌরী, মঞ্জুকে—মৌরীর জন্মদিনে—সুদর্শন। মুগ্ধ হ'লো ওরা, ওদের জন্য পাঠানোর ভেতর সুদর্শনের বুদ্ধির, যে সুক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় মিললো তাতে—তারিফ, ক'রলো রুচির। আর সুন্দর উপহারটির জন্য হ'ল খুসী। এগুলো যেমন সত্য, তেমনি সত্য এক খণ্ড মেঘও এলো অমিতার মনে। কত সুক্ষ্ম, সুন্দর সুন্দর আনন্দের খবর জয়দেবের জানা নেই ! মঞ্জু তক্ষুণি গুঁজলো সেটা মাথায়—চললাম। চিঠিটা যদি দেখাস তো এসে দেখব। সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে এল—অনেকদিন পর জয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—বলেছি না ? আজ ওদের বাসায় যাব। ফিরতে দেরী হ'লে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিসনে যেন।

এই বলে আসার নিশ্চিন্ততার ভেতরও ঘড়ির দিকে নজর যে মঞ্জু না রাখছিল তা নয়। কিন্তু যখন খেয়াল হ'ল অনেকক্ষণ ধ'রে আটটা বেজে আছে—তখন শুনলো ওটা বন্ধ। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল—দশটা বাজে যে।

জয়া ওকে ট্রামে তুলে দিয়ে গেল। ট্রামের আধ-ঘণ্টার রাস্তা আচ্ছন্নের মত বসে রইল। জয়া ওর স্কুলের বন্ধু। কাল হঠাৎ দেখা হয়েছে। আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল দু'জনে দু'জনকে। কিন্তু কলেজে কেন পড়ছে না জিজ্ঞাসা করায় চোখে জল এসে গিয়েছিল জয়ার—জবাব দেয়নি সে। ঠিকানা চাইলে তাও দিতে যখন চাইল না, তখন সেটা মঞ্জু আদায় ক'রে নিয়েছিল। আর আজই এসে হাজির হ'ল। কিন্তু একি থাকা, একি বাঁচা ! লাইটের ব্যবস্থা আছে, তবু আলো জ্বলছে না—জ্বলছে মোমবাতি। শরীরে একটা শুধু মানুষ কাঠামো নিয়ে ওর মা ধুকতে ধুকতে রাঁধছেন আর কাশছেন, কাশছেন আর থু থু ফেলছেন। সামনে বাসে মা-রই আকৃতির দু'টি ভাই। কি তিনি রাঁধলেন, তাও বুঝল না—কি দিয়ে ওরা খেলো তাও দেখল না। ভাতটা ছিল, এটাই শুধু বুঝেছে। মা এরই ভেতর দু'টো কাপে চা দিয়ে গেলেন ওদের। মেয়ে কিছু

আনবার আগেই চা দেওয়ার জন্ত মার উপর বিরক্তি প্রকাশ করলো। কিন্তু মা আশ্চর্যরকম উদাসীন।

দশ বছরের ভাইটিকে নিশ্চয়ই কিছু আনতে পাঠিয়েছিল জয়া। দুটো সিঙাড়া এনে সে রাখলো মঞ্জুর কাছে। কিন্তু প্লেটের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে উঠে গেল জয়া। ভাই-এর কান ধরে চাপা গলায় কি ব'লে যে চড় মারলো দুটো। বুঝলো মঞ্জু। সিঙাড়া একটা ছোট, একটা বড়। প্লেটটার দিকেই তাকিয়েছিল মঞ্জু। এমনি সময় দরজার কড়া নড়ে উঠতেই ছুটে এসে ভেতরে ঢুকলো জয়া। ভাইকে ইসারায় বলে দিল—বল বাড়ী নেই আমি। পাওনাদার বাড়ীওলা? জয়ার মুখ অমন সাদা মরার মত হয়ে উঠল কেন? ভাইএর—কাল তবে কিন্তু দোকানদারবাবু চাল ডাল কিছু দেবেনা দিদি—কথাটায় কানে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল কেন অমন?

একটা আচ্ছন্নভাবের ভেতর চলছিল বলেই, বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়ানো বিরাট গাড়ীটা মঞ্জু খেয়াল করলো না। কিন্তু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পুরোদস্তুর সাহেবী পোষাক পরা এক ভদ্রলোককে ইতস্তত করতে দেখে, গাড়ীটার দিকেও লক্ষ্য পড়লো তার। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো—কাকে চান?

প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক ওর দিকে তাকাল। এবার মঞ্জু দেখল—তার পা ঠিক থাকতে চাচ্ছে না, চোখের দৃষ্টি লাল, মুখ না খোলা সত্ত্বেও আসপাশ ভরে উঠেছে মদের কড়া গন্ধে। মঞ্জুর দিকে মাতাল চোখের দৃষ্টি ফেলে সে যেন মনে মনে স্মরণ করতে চেষ্টা করতে লাগল—কাকে চাই? তাইতো, কাকে চাই!—কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারে না। সন্ধ্যায় যখন বাড়ী থেকে বের হয়, তখন ঠিক করেছে একবার এ ঠিকানায় তার আসতে হবে। তারপর ক্লাবেতে ঢুকে দু' এক পেগ খেয়ে নিতে গিয়ে অভ্যাস বসে ঢেলেছে আর খেয়ে চলেছে। কখন যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী আসবার সময় পার হয়ে গেছে—এ খেয়ালও যেমন তার নেই, এখানে আসবার কথাও তেমনি তার মনে ছিল না। এখানে এসে তাকে হাজির করেছে তার অচেতন মন—যে সহজে কিছু ভোলে না। কিন্তু সে নিজে সত্যি কিছু মনে করতে পারছিল না।

মঞ্জু লোকটির দিকে তাকিয়ে এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলল—তবে আজ আসুন। মনে পড়লে, কাল আসবেন।

লম্বা বেণী দুটোয় ঝাঁকি দিয়ে পেছনে সরিয়ে মঞ্জু ভেতরে ঢুকতে যাবে—লোকটি তার সামনে দাঁড়ালো, বললো—রাগ করবেন না। বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কাকে চাইতে এসেছিলাম, স্রেফ ভুলে গেছি।

অতিরিক্ত পানটা হয়ত এর অতিরিক্ত বেশীভাবেই ধাতস্থ—তাই ঠিক ভাবে দাঁড়াতে এবং ঠিক ভাবে কথা বলতে পারছিল। বাহ্যিক প্রকাশে কোন অভব্যতা ছিল না। কিন্তু যে জন্ত ও বস্তু খাওয়া—মনটাকে হালকা করা, মেজাজে স্ফূর্তি আনা প্রবৃত্তির ক্ষুধাটা চড়িয়ে দেওয়া—একটা গোটা মানুষের গোটা মনুষ্যত্বের থেকে কিছু ঝেড়ে ফেলা—সেগুলো তো পুরো মাত্রায়ই কাজ করছিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল সে—দামী সেন্টের গন্ধে ডুবিয়ে দিল বিলিতি মদের উগ্র গন্ধটাকে। মুখ মুছে রুমালটা ফের পকেটে গুঁজে বললো—যাকে চাইতে এসেছিলাম, তাকে দেখলে ঠিক মনে পড়ে যেত কাকে চাইতে এসেছি, কিন্তু এখন ইচ্ছে করছে বলি—আপনাকেই। সাহস হচ্ছে না।

মঞ্জুর মজা দেখার এবং মজা করার সখ এবং সাহস যে পর্যন্ত তাতে মনের অবস্থাটা স্বাভাবিক থাকলে কি জবাব দিত, বলে বসত বলা যায় না। মনটা ওর জয়ার ব্যাপারে এত বেশী চঞ্চল ছিল যে চঞ্চল মঞ্জুর বাহ্যিক চঞ্চলতাকে ঠেলে ভেতরের মঞ্জু এসে আজ ওর বাইরেটা ও দখল করে নিয়েছিল। লোকটার ধৃষ্টতায় একবার তার দিকে শুধু চাইল মঞ্জু। বললো—ইচ্ছে করছে, তবে সাহস পাচ্ছেন না? আপনার সুস্থ বুদ্ধির এই অবশিষ্টটুকুকে ধন্যবাদ। বলে আবার মঞ্জু পা বাড়াচ্ছে—বাঃ! বলে ভদ্রলোক তার ডান হাতটা হ্যাণ্ডসেকের ভঙ্গীতে বাড়িয়ে দিল মঞ্জুর দিকে। যদিও মঞ্জুর ধারণা, ভয় পেয়ে সে শুধু পেছু হটেছিল, শব্দ করেনি—কিন্তু নিশ্চয়ই তা নয়। শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল নইলে মোড়ের ছেলে তিনটি ছুটে এসে লোকটার দামী ইংলিশ টাইটা অমন মুঠো ক'রে চেপে ধরবে কেন? মার ধোর করবে না কি ওরা?—এই কি ক'রছ তোমরা? বলে কাছে এসে তাদের হাত ধরলো মঞ্জু। গাড়ীর দরজা খুলে ছুটে এল ড্রাইভার। যতীনবাবু বাড়ী ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন হকচকিয়ে—আপনি! লোকটির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। [ক্রমশঃ।

'সংসারে বাইরটাই আমাদের সুপরিচিত···আজ আমাদের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কষ্টিপাথর সমস্তই বাইরে। লোকে কী বলবে, লোকে কী করবে, সেই অনুসারেই আমাদের ভালোমন্দ সমস্ত ঠিক করে বসে আছি—এই জন্য···লোকভয় এমন চরম ভয়, লোকলজ্জা এমন একান্ত লজ্জা।···যার অস্ত্র শাণিত, সে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছে, যার শক্তি বেশী, সে আমাদের পায়ের তলায় রাখছে। সুখসমৃদ্ধির জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্ছি··তাই আজ আবার বলছি—ভাবো অন্তরে যে বিরাজে! একবার খবর নেও, আত্মরক্ষায় অচল সিংহাসনে আমাদের যে রাজা বসে আছেন।'

—রবীন্দ্রনাথ

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন

হায়দ্রাবাদে ফতে ময়দানস্থিত, জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ১৩ তম ও জাতীয় ব্যাডমিণ্টনের ২২ তম অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। উত্তর প্রদেশের ত্রিলোক শেঠ এবার নিয়ে উপর্য্যুপরি তিন বছর বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করলেন। এবং মহিলাদের বিভাগে বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছেন বম্বের শ্রীমতী প্রেম পরাশর। বয়েজ সিঙ্গলসে সুরেশ গোয়েল। গার্লস সিঙ্গলসে কুমারী বাসন্তী চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে।

এবারকার প্রতিযোগিতায় যত বেশী খেলোয়াড় যোগদান করেছেন ইতিপূর্ব্বে এত বেশী খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেন নি। এবারকার নতুন যোগদানকারী দেশ মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরালা প্রভৃতি।

আন্তঃরাজ্য ও জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ফাইন্যাল খেলার ফলাফল দেওয়া হইল।

আন্তঃরাজ্য ফাইন্যাল

ত্রিলোক শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৫, ১৫-৮ পয়েন্টে বিক্রম ভাটকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

পি, এস, চাওলা (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৫, ১৫-৮ পয়েন্টে বিক্রম ভাটকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

কুমারী মীনা সাহা (উত্তর প্রদেশ) ১১-১ ও ১১-৪ পয়েন্টে শ্রীমতী নিলীম ভিকসকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস—ত্রিলোক শেঠ (উত্তরপ্রদেশ) ১৫-৭ ১৫-৩ পয়েন্টে অমৃত দেওয়ানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল—আর, ডি, ভিমওয়ালা ও ভি, এন ডোঙ্গাড়ে (বোম্বে) ১০-১৫, ১৮-১৩ ও ১৫-১১ পয়েন্টে পি, এস চাওলা (উত্তর প্রদেশ) ও অমৃত দেওয়ানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস—শ্রীমতী প্রেম পরাশর (বোম্বে) ১১-৬ ও ১১-৭ পয়েন্টে শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়াকে (বোম্বে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—শ্রীমতী প্রেম পরাশর ও শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়া (বোম্বে) কুমারী মীনা সাহা ও কুমারী ভোসলেকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস—শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়া ও সি, ডি, দেওয়ান ১৫-৭, ১৫-১০ পয়েন্টে শ্রীমতী প্রেম পরাশর ও ডি, এন, ডোঙ্গাড়েকে পরাজিত করেন।

বয়েজ সিঙ্গলস্—সুরেশ গোয়েল (উত্তর প্রদেশ) ১৫-১১, ১-১৫, ও ১৫-১০ পয়েন্টে ডি, কে, খান্নাকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

গার্লস সিঙ্গলস্—কুমারী বাসন্তী (দিল্লী) ১২-৯ ও ১১-৮ পয়েন্টে কুমারী সুনীলা আপ্তেকে (মধ্যপ্রদেশ) পরাজিত করেন।

লন টেনিস

দিল্লী রাজ্য লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় ভারত-চ্যাম্পিয়ান কৃষ্ণণ গ্রেটবৃটেনের উদীয়মান খেলোয়াড় বিলি নাইটকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছেন। বিলি নাইট ও টনি পিকার্ড লাভ করেছেন ডাবলসের চ্যাম্পিয়ানশিপ। এবারকার খেলার ফলাফল নিচে দেওয়া হইল।

সিঙ্গলস্ ফাইন্যাল—কৃষ্ণণ ৬-৩, ৭-৯, ৬-০, ও ৯-৭ সেটে বিলি নাইটকে পরাজিত করেন।

ডাবলস্ ফাইন্যাল—বিলি নাইট ও টনি পিকার্ড ৭-৫, ৬-৪, ও ৬-২ সেটে কৃষ্ণণ ও উদয়কুমারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস্—মিসেস জে, বি, সিং ৬-২ ও ৬-২ সেটে মিসেস কে, সিংকে পরাজিত করেন।

মিক্সড্ ডাবলস—কৃষ্ণণ ও মিসেস জে, বি, সিং ৬-২ ও ৬-৩ সেটে উদয়কুমার ও মিস লীলা পাঞ্জাবীকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস্—প্রদীপ নায়া ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে বিমল ধাওয়াকে পরাজিত করেন।

ফুটবল

অবশেষে এবার আই, এফ, এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা শেষ হোল। এবার আই, এফ, এ শীল্ড লাভ করেছে এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপের রাণার্স আপ মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। মহামেডান দল ফাইন্যালে অতি সহজেই রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবকে ৩—০ গোলে পরাজিত করেন। একই বছরের লীগ ও শীল্ড মহামেডান দলের পক্ষে নতুন সম্মান লাভ নয়। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৬, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে মহামেডান দল এ সম্মান অর্জ্জন করে।

এবারে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা তেমন জমেনি। প্রথমতঃ আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষপাতদুষ্টতার প্রতিবাদে রাজস্থান দল এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয়ত কলকাতার বাইরেকার বহুদল অংশ গ্রহণ করেনি। তা ছাড়াও আই, এফ, এ-র কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থা ও নানান খেলায় অপ্রীতিকর ঘটনা। বিশেষত জর্জ্জ টেলিগ্রাফ ও মহামেডান স্পোর্টিং-এর কোয়ার্টার ফাইন্যাল, মহামেডান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের সেমিফাইন্যালে যে কলঙ্কমলিন ঘটনা আই, এফ শীল্ডের ঐতিহ্যময়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এবারের ফাইন্যাল খেলা উৎসাহ ও উদ্দীপনাহীনতার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। এইটুকু বলা যায় যোগ্যদল হিসাবে মহামেডান দল জয়লাভ করেছে।

দিল্লী ক্লথ মিলস প্রতিযোগিতায় গতবারের রাণার্স আপ ইষ্টবেঙ্গল দল বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে ইষ্টবেঙ্গল দল ১৯৫০ ও ১৯৫২ সালে এ সম্মান অর্জ্জন করেছিল।

ডুরাণ্ড কাপের খেলায় হায়দ্রাবাদ সিটি পুলিস দল ২-১ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছে।

ডেভিস কাপ

এ নিয়ে পর পর তিন বার অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ জয় করার গৌরব অর্জ্জন ক'রল। ডেভিস কাপের ইতিহাসে এ অবশ্য নতুন কোন ঘটনা নয় বা অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ সম্মানও নতুন নয়। এর আগে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং বৃটিশ আইলস পর পর ৪ বছর ডেভিস কাপ রেখেছে। আমেরিকা এককালে ৭ বছর, ফ্রান্স ৬ বছর ডেভিস কাপ রেখেছিল।

ডেভিস কাপ খেলাটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় টেনিসে বিজয়ীর পুরস্কার হলেও আগের বারের বিজয়ীর সংগে আঞ্চলিক বিজয়ীকে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলতে হয়। আগের বারের বিজয়ী কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেন। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় যে দেশ বিজয়ী হবে, সেই দেশকে আগের বারের বিজয়ীর সংগে খেলতে হবে ডেভিস কাপের বিজয়ীর সম্মানের জন্য।

গতবারের বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার সংগে এবার আমেরিকা চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হন। এবার নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ১৬ বারের সাক্ষাৎকার। উভয় দেশই ৮ বার করে ডেভিস কাপ লাভ করেছে।

এবারকার খেলার ফলাফল নিচে দেওয়া হল:

প্রথম দিন

এ্যাসলে কুপার (অষ্ট্রেলিয়া) ৩-৬, ৭-৫, ৬-১, ১-৬ ও ৬-৩ সেটে ভিক্ সেক্সাস (ইউ, এস, এ) পরাজিত করেন।

মল এণ্ডারসন (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৭-৫, ৩-৬, ৭-৯ ও ৬-২ সেটে ব্যারী ম্যাক্‌কে (ইউ, এস, এ) পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিন

মার্ভিন রোজ ও মল এণ্ডারসন (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪ ও ৮-৬ সেটে ভিক্ সেক্সাস ও ব্যারী ম্যাক্‌কে (ইউ, এস, এ) পরাজিত করেন।

তৃতীয় দিন

ব্যারী ম্যাক্ (ইউ, এস, এ) এ্যাসলে কুপারকে (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ১-৬, ৪-৬, ৬-৪ ও ৬-৩ সেটে পরাজিত করেন। ভিক্ সেক্সাস (ইউ, এস, এ) মল এণ্ডারসনকে (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-৩, ০-৬ ও ১৩-১১ সেটে পরাজিত করেন।

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, গতবারের ডেভিস কাপ খেলার পর অষ্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান টেনিস খেলোয়াড় কেন রোজওয়াল পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেছেন ও অপর ধুরন্ধর খেলোয়াড় লুই হোড় এ বছর উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানের পর পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। তাই অষ্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ বিজয় সত্যই প্রশংসনীয়।

ঝাঁসীর রাণী

শ্রীবিভূতিভূষণ বাগচী

তুরঙ্গ ধূসর, আকাশে বিদ্যুৎলেখা শৈল-তরঙ্গ হও পার,
স্ফুলিঙ্গের তীব্রগতি নাসারন্ধ্রে নীল ফেন
আন্দোলিত সহস্র কেশর।
ঝাঁসীর তোরণমুক্ত ছিন্ন ভিন্ন শতাব্দীর শৃঙ্খলের ভার,
মালবের প্রতি প্রান্তে লেলিহান অগ্নিশিখা দীপ্ত খরতর।

ব্যারাকে ব্যারাকে বারুদের স্তূপগৃহে উত্তুঙ্গ শপথ,
শক্তি বৃদ্ধি পণ্য যেথা অবরুদ্ধ প্রত্যহের প্রত্যাশা রঙীন;
অবিচ্ছিন্ন বেড়াজালে, নাগপাশে যে মানস নিষ্পেষণ-ক্ষীণ
অনন্ত আতঙ্ক ভারে প্রাণশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল যেই দিন;

সেই দিনে পলাশীর শত বর্ষ পরে, আজি হ'তে শতবর্ষ আগে
কি বাহ্নি জ্বালালে তুমি, হে বিদ্রোহী দেশমুক্তি রাগে!
তোমার সে প্রচণ্ড সংঘাতে চূর্ণ হোলো লৌহ-যবনিকা
রুদ্রম্পর্দ্ধা দিগন্তে বিলীন;
মুক্তির কল্লোল গানে জাগিল অনন্তপ্রাণ আশা অন্তহীন।

সেই প্রাণবন্যার প্লাবন ক্যালপী, জাহ্নবীকূলে,
ইন্দ্রপ্রস্থে, দোয়াবে, বিহারে,
মীরাটে, লক্ষ্মাবতী, কানপুরে, দূর বিন্ধ্য, আরাবল্লী পারে।
সে বিপুল মুক্তিস্রোত ভেঙে পড়ে বেত্রোয়ায়, চম্বলোর্ম্মি শিপ্রার
চঞ্চল বাঁধেতে বন্যা কালীসিন্ধু নর্ম্মদার প্রবাহ অপার।

দাতিয়া ওরচা ধর ঝাঁসী পান্না নাগোধ রতলাম
চারখারী ইন্দোর রেওয়া, শিপ্রী কাল্পী মোউ মালাথান;
সগর বুন্দেলা জাগে, বান্দা টঙ্ক পিপ্লিয়া পাতান
কোটাকী সেরাই জাগে, জাগে ধামো,
বারোদিয়া বিজয়ী ঝিরান্।

জীবনের জয়যাত্রা পারে, হে সৈনিক রাণী লক্ষ্মীবাঈ, জ্যোতির সম্ভারে
ভরে দাও আর্দ্র-সুপ্ত বিক্ষিপ্ত চিত্তেরে; এ জমাট অন্ধকারে
জ্বালাও অনল, সেই দীপ্ত মুক্তির মশাল, শতাব্দীর দ্বারে
দিকপূর্ণ আলোর প্রবাহ, প্রতি ক্রান্তি পরে অবিচ্ছিন্ন ধারে।

মালবের কৃষ্ণমৃত্তিকার ব্যথা ছিল বক্ষ জুড়ে বহুদিন,
হে "মণিকর্ণিকা" তখন কি জানে কেহ সেই ব্যথা
বহ্নিতে রঙীন,
একদিন ভরে দেবে মৃত্তিকা আকাশ—সে এক
স্ফুলিঙ্গ অনির্ব্বাণ
ভারতের ভবিষ্য দুয়ারে—সে এক ভরসা-দীপ্ত
প্রাণ অফুরান্।

আজও তাই আরাবল্লী, বিন্ধ্য শৈলে, ভাগীরথী-তীরে,
মধ্যভারতের সেই মালভূমি জুড়ে, আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য ঘিরে—
অরণ্যে প্রান্তরে ধ্বনিত ক্ষুরের শব্দ নিত্য অবিরাম,
সে ধূসর তুরঙ্গের পরে, সে মুক্তি সৈনিক আজও তূর্ণ ধাবমান।

সব দেশেই সমাদৃত
সুনিপুন
শিল্পপ্রতিভায়
মৌলিকতায়
আধুনিকতায় ও নির্ভরতায়
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর-৮৫৮

বিজ্ঞানবার্তা
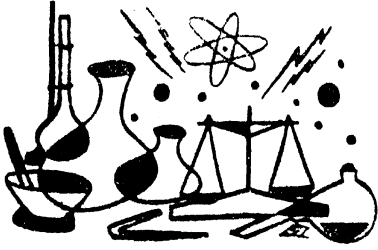
পক্ষধর মিশ্র

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমগ্র মানব-সমাজকে এক মহা সমস্যার সীমানায় এনে উপস্থিত করেছে, সৃষ্টি ও ধ্বংস, এই দুই রূপের মধ্যে বিজ্ঞানের ধ্বংসের রূপ উঠেছে প্রকট হয়ে। বিশ্বের চিন্তানায়কেরা বারে বারে বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন প্রজ্ঞা ও মানবতার দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা যেন তাঁদের গবেষণার রূপকে পরিচালিত করেন। প্রকৃতির অমোঘ শক্তির ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আজ বিজ্ঞানীদের হাতে, তাই একমাত্র তাঁরাই বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফলকে কল্যাণকৃৎ পথে নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন এখানে—কার্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ক্ষমতা কতোখানি? সত্যকে তাঁরা অনাবৃত করেন,—সাধারণ মানুষের সামনে ধরা পড়ে সত্যের দুটি রূপ—একটি ভয়ঙ্কর, অপরটি সুন্দর। এরপরেই তাঁদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা হয়ে আসে সঙ্কুচিত। প্রকাশের পরক্ষণেই সত্য সকলের হয়ে যায়,—তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তখন সমগ্র মানবসমাজের। মানুষ সত্যের সুন্দর রূপকে আরাধনা করতে পারে,—তাকে মঙ্গলদায়ক করে তুলতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে মানুষই ভয়ঙ্করের আবাহন ঘটিয়ে, সমগ্র সভ্যতাকেই করতে পারে বিপন্ন। সেখানে বিজ্ঞানীদের কোন হাত নেই,—আবিষ্কার করেই আবিষ্কর্তা খালাস। আবিষ্কারকে তখন চালিয়ে নিয়ে যান বিজ্ঞানী নয়, বিজ্ঞানের পরিবেশে শিক্ষিত সাধারণ মানুষ। এই মানুষদের পরিচালিত করে রাষ্ট্র, সুতরাং ভালো মন্দ সব কিছুর করার ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রকৃত পক্ষে ন্যস্ত হয়, রাষ্ট্র যাঁরা পরিচালিত করছেন তাঁদের উপরেই। বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষারোপ বিজ্ঞানীদের উপর করা, বিজ্ঞান গবেষণার মহান আদর্শের উপর আঘাত ছাড়া আর কিছু নয়। বিজ্ঞানীরা কি করতে পারেন? সম্ভাব্য ক্ষতিকারক পরিণামের কথা ভেবে যদি তাঁরা সত্যের রূপকে প্রকাশিত করতে দ্বিধা বোধ করেন, তাহলে বিজ্ঞান-সভ্যতার অগ্রগতিই রুদ্ধ হয়ে যাবে। ভালো মন্দ মিশিয়ে এই জগৎ, মন্দকে বাদ দিয়ে এই পৃথিবীতে কেবল ভালোকে বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। মানুষের মহৎ গুণাবলীর দ্বারা বিজ্ঞান আবিষ্কারের কালো দিককে আড়াল করে, আমাদের আলোর দিকে এগিয়ে চলতে হবে তবেই সভ্যতার অগ্রগতি নিরাপদ হবে। দায়, দায়িত্ব ও ক্ষমতা আসলে রাষ্ট্র পরিচালকদের।

পরমাণু-শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল অকল্যাণের মধ্যে দিয়ে, তার সেই রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত বলেই আত্মরক্ষার্থে বিজ্ঞানীদের [illegible] অনুশীলন করার জন্য চতুর্দিক থেকে অনুরোধ জানান হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা যদি এই শোচনীয় দুর্ঘটনাটিকে নিজেদের অপকীর্তি মনে করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সত্যের উদ্ঘাটনে আর উৎসাহী না হতেন, তাহলে বিজ্ঞান-দুনিয়ায় ঘটতো অপমৃত্যু। রাশিয়ার স্পুটনিক আর আকাশে স্থাপিত হতো না। স্পুটনিক দেখে মানুষের মনে যে আকাশ বিজয়ের আশা দেখা দিয়েছে তা কোনদিন কল্পনার রাজত্বেও আসতো না। বিজ্ঞান মানুষকে এখনও বন্ধুর মতো সহায়তা করতে চায়। তাকে মহৎ প্রাণে কল্যাণকৃৎ পথে চালিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব সমগ্র মানব সমাজের। বিজ্ঞানীকে নিজের পথে গবেষণা করতে হবে, নতুন সত্যের অজানা তথ্যের ঘটবে আত্মপ্রকাশ, তখন তাকে অমৃতসম্ভবা করে তুলবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞানীদের উপর আরোপ করবার জন্য যে মানবপ্রেমী, সমবেদনাশীল প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশের দরকার, তা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রনায়কদের আছে! শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারকরা পথের সন্ধান দিতে পারেন, কিন্তু সেই মহান পথে যাত্রা করার বাধা ও বিপত্তি দূর করতে পারেন দেশনেতারা, যাঁদের উপর সরকার পরিচালনা করবার দায়িত্ব দেশের মানুষ অর্পণ করেছে।

* * * *

ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা কি হবে, তা' নিয়ে তর্ক আর বিতর্কের অন্ত নেই, জাতীয় ভাষা যাই হোক না কেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে তার একটা বিরাট প্রভাব আছে এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজগত তারই মাধ্যমে পরিচালিত হবে, তাই এ বিষয়ে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। বর্তমান যুগকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ, এ যুগে মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ বাঁধা পড়ে আছে বিজ্ঞানের কাছে, সুতরাং দেশের অগ্রগতির জন্য, দুনিয়ার বিজ্ঞান জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চা অপরিহার্য। দেশের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার বর্তমানে যা অবস্থা, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণা ও শিক্ষা পরিচালিত করবার ক্ষমতা তাদের কোনটারই নেই। অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণা পরিচালিত করে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে সমপর্যায়ে এগিয়ে চলবার জন্য প্রত্যেক বিজ্ঞান-কর্মীর ইংরাজি অবশ্যই শিক্ষা করতে হবে। স্বীকার করি ইংরাজি একটি সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা, তবু এর সহায়তাকে অস্বীকার করে এগিয়ে চলবার সাহস বর্তমানে আমাদের নেই।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা আঞ্চলিক ভাষায় দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যতো তাড়াতাড়ি নতুন চিন্তা মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে তা ইংরাজির মতো একটি বিদেশী ভাষার সহায়তায় পাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ইংরাজির সহায়তায় দিতেই হবে, এবং দেশের বিজ্ঞান কর্মী ও যন্ত্রবিদদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন মেটাবার জন্য উচ্চাভিলাষী ছাত্রদের ইংরাজি শিক্ষা করতেই হবে। আমার এই আলোচনা পাঠ করতে করতে অনেকেই উত্তেজিত হয়ে বলবেন, দেখ বাপু, তোমায় ইংরাজির পক্ষে ওকালতি করতে হবে না। আমরা ইংরাজিকে পাত্তা দিতে আর রাজি নই।' ইংরাজি বিজ্ঞান জগতকে কিনে রাখে নি,—জার্মাণ, ফরাসী, রাশিয়ান ইত্যাদি আরো ভাষা আছে। তাদের মাধ্যমেও উচ্চতর বিজ্ঞান চর্চ্চা করা যায়, বিজ্ঞান-দুনিয়ার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলা যায়। আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করবো। একটি

সংখ্যাগরিষ্ঠ আঞ্চলিক ভাষাকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে সারা ভারতে প্রচার করবো, আর বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য যার যা ভালো লাগে সেইরকম কেউ ফরাসী, কেউ রাশিয়ান আবার কেউ বা জার্ম্মাণ শিখবো।

মানলাম,—কিন্তু উচ্চতম বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম তাহলে কি হবে? ফরাসী, জার্ম্মাণ বা রাশিয়ান অথবা ইংরাজি—কোন ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষা দেব? ভারতবর্ষের পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয় যদি পাঁচটা ভাষায় শিক্ষা দেন, তাহলে উচ্চতম গবেষণার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যেই আমরা সংযোগ হারিয়ে ফেলবো। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের আলোচনা চক্রে পাঁচটি প্রদেশের পাঁচ জন বিজ্ঞানী যদি পাঁচটি ভাষায় আলোচনা সুরু করেন তাহলে আমার আপনার অবস্থাটা কি হবে? খুশীমতো বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা কাদের পক্ষে সম্ভব? যাঁদের জাতীয় ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী, যাঁরা বিজ্ঞানের উচ্চতম চিন্তা স্বচ্ছন্দে নিজেদের জাতীয় ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন, যাঁদের নিজেদের ভাষায় যে কোন রকম সাম্প্রতিক চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য প্রচুর পরিমাণে বই আছে, তাঁদের পক্ষেই পছন্দ করার কথা উঠতে পারে। যতো দিন পর্য্যন্ত না আমাদের দেশের কোন একটি মাতৃভাষা এই পর্য্যায়ে উঠতে পারছে, ততদিন বিজ্ঞান চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, ইংরাজিকে পরিত্যাগ করার প্রস্তাব আত্মহত্যার সামিল।

আমার মনে হয়, ঠিক বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কোন ক্ষেত্রেই ইংরাজিকে একেবারে সরিয়ে কোন একটি দুর্ব্বল আঞ্চলিক ভাষাকে জোর করে বসান দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে না, অবশ্য ইংরাজি বিদেশী ভাষা, সুতরাং চিরকাল একে বসিয়ে রাখাও ভারতের পক্ষে সম্মানজনক না হতে পারে। উপস্থিত ইংরাজি থাক, নিজের নিজের আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করবার জন্য রাজ্যসরকারসমূহ আপ্রাণ চেষ্টা করুন। কেন্দ্রীয় সরকার সকলকেই সহায়তা করুন সমান ভাবে; দেখবেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি অথবা দুটি ভাষা ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়ে আপনা থেকেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে জাতীয় ভাষার সম্মান গ্রহণ করবে। সেদিন বিদেশী ভাষাকে সরাবার জন্য আইন পাশ করতে হবে না, চীৎকার করতে হবে না, নিজের ঘরকে শক্ত করুন, অপরের প্রবেশাধিকার আপনা থেকেই হয়ে যাবে বন্ধ। অতি-উৎসাহী হিন্দীওয়ালাদের কাছেও আমার তাই অনুরোধ,—তাঁরা ইংরাজিকে তাড়াবার জন্য যে উৎসাহ প্রকাশ করছেন, তা যদি হিন্দীকে সমৃদ্ধিশালী করবার জন্য খরচ করতেন, তাহলে দেশের অনেক মঙ্গল হতো। এই সময়টায় আর কিছু না করে তাঁরা যদি কেবল জ্ঞান বিজ্ঞানের কিছু ভাল ভাল বিদেশী বই হিন্দীতে অনুবাদ করে ফেলতে পারতেন, তাহলে হিন্দী ভাষার ছাত্রদের অনেক উপকারে লাগতো, হিন্দী ভাষাও একমাত্র জাতীয় ভাষার পদাধিকারের লড়াইয়ে শক্তি সংগ্রহ করতে পারতো।

পাছে ইংরাজি আর কয়েক বছর বেশী থেকে যায়—সেই দুশ্চিন্তায় অনেকেরই সুনিদ্রা হচ্ছে না! বুঝতে পারছি এটা তাঁদের মর্য্যাদার লড়াই, ভারতীয় ভাষার রাজত্বে ইংরাজির নেতৃত্ব ঠিক সম্মানজনক ঠেকছে না। কিন্তু দেশ আগে না ঠুনকো ভাষার 'মর্য্যাদা' আগে? রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখুন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ তাদের কি বিশাল প্রভাব প্রতিপত্তি। দুনিয়ার কোন দেশের চেয়ে সে আজ পেছিয়ে নেই। জারের আমলে তাদের কি ছিল? তাঁদের এই অবস্থা আমাদের মতো কথা বলে হয় নি, তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। অন্যান্য দেশ যা আবিষ্কার করেছে, তাঁরা আবার তার ঘটিয়েছেন পুনরাবৃত্তি। প্রতিটি কাজ তাঁরা নিজেদের হাতে করে তবে সন্তুষ্ট হয়েছেন। বিজ্ঞান-দুনিয়ার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছে হাতে কলমে। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা নাকি তখন, রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের 'কপি বুক সায়ান্টিষ্ট' বলে ঠাট্টা করতেন। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা কপি করতে করতেই একদিন অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন—আজ তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন সকলের চেয়ে।

একটা বিদেশী যন্ত্রপাতি এদেশে খারাপ হয়ে গেলে আমরা সারাতে পারি না, কিন্তু শুনেছি, রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি এনে একেবারে খুলে ফেলে প্রথম দিকে হুবহু ঠিক সেই জিনিষ নির্ম্মাণ করে নিজেদের দেশের অগ্রগতির জন্য কাজে লাগাতেন। প্রথমে অপরে যা করে তাই শিখে তাঁরা অপরের সমকক্ষ হলেন, তার পর নিজেদের চর্চ্চার দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে অপরকে গেলেন ছাড়িয়ে। তাঁদের দেশ যথেষ্ট অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও 'কপি বুক সায়ান্টিষ্ট' বলে উপহাস করাতে কোন দিনই তাঁরা বিচলিত হননি, তাঁদের একমাত্র দৃষ্টি ছিল নিজেদের মাতৃভূমির উন্নতি। ইংরেজ এতো বছর এদেশে বাস করে গেল,—ইংরাজি আর সামান্য কিছুদিন থাকলেই আমাদের এতো অসম্মান হবে যে তার জন্য দেশের চিন্তা, জগতের ও শিক্ষা-জগতের এক বৃহৎ ক্ষতি আমরা করতে পারি। তাই অনুরোধ, আগে মাতৃভাষাকে শক্তিশালী করুন, তারপর ইংরাজিকে সরান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে ইংরাজি ভাষাকে এদেশ থেকে প্রভুত্ব গুটিয়ে নিতে হবে। জোর করে কোন দুর্ব্বল ভাষাকে সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে রাতারাতি দেশ উন্নত হয়ে যাবে না।

সাইকেল শিল্পে ভারতের অগ্রগতি

ভারতে সাইকেল বা বাইসিকেল শিল্পের সূচনা এখন থেকে মাত্র ১৮ বছর আগে ১৯৩৯ সালে। তখনও দেশ ছিল বিদেশী করায়ত্ত, শুধু সীমাবদ্ধ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার আদায় করতে সমর্থ হয় ভারতের সংগ্রামী-জনতা। এইটুকু অধিকার হাতে পেয়েই জাতীয় পুনর্গঠনের লক্ষ্য থেকে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে তারা মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং সাইকেল শিল্প সেদিনের পরিকল্পিত গঠনসূচীর নিঃসংশয়ের অন্যতম।

বিদেশী সাইকেল সে সময় ভারতের বাজার ছেয়ে—অথচ দেশের সর্ব্বত্র সাইকেলের চাহিদা বিপুল। বোম্বাইয়ের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার অবশ্য এবিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্যদানে অগ্রণী হন। তাই ভারতের প্রথম সাইকেল-কারখানা গড়ে ওঠে সেই প্রদেশেই এবং এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় হিন্দ সাইকেল লিমিটেড।

হিন্দ সাইকেল কোম্পানীর গৃহীত প্রথম দফা কর্ম্মসূচী পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, সেদিনে তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রত্যহ দুইশত করে সাইকেল নির্ম্মাণ এবং উহাদের আবশ্যক বাজার পাওয়া,—ইত্যবসরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কা এসে লাগে ভারত উপ-মহাদেশে। এতে দেশীয় সাইকেল-শিল্পকে নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু সব অতিক্রম করে যুদ্ধোত্তর ভারত এই শিল্পক্ষেত্রে ক্রমেই এগিয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ায় অন্যান্য শিল্পাদির ন্যায় সাইকেল শিল্পেরও অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়ে গেল আপনি।

দেশীয় সাইকেলের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েই জাতীয় সরকার তাঁদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই এই শিল্পের উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণ করলেন। তখন সরকারী ভাবেই এই হিসাব ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল (পঞ্চ বর্ষ) মধ্যে এই দেশে নূতন সাইকেল ব্যবহৃত হবে কমপক্ষে ৫ লক্ষ। সরকার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনীতি ঘোষণা কালে সেইজন্যই সাইকেল-শিল্পের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ না করে পারেন নি। কার্য্যত দেখাও গেছে, হিন্দ সাইকেল কোম্পানী ছাড়া আরও তিনটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সাইকেল নির্ম্মাণ সংস্থান গড়ে উঠলো এখানে পর পর—উহারা যথাক্রমে এটলাস্ সাইকেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, সেন-র‍্যালে ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এবং টী, আই, সাইকেলস্ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতীয় কারখানাগুলোতে উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৫ লক্ষ সাইকেল। পরিকল্পনা শেষে হিসাব করে দেখা গেছে, লক্ষ্য পূরণ না হলেও আলোচ্য পাঁচ বছর সময় মধ্যে প্রায় ৪লক্ষ ৭০ হাজার সাইকেল নির্ম্মিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অন্যান্য শিল্পের ন্যায় সাইকেল-শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার খুব জোর দিয়েছেন। পরিকল্পিত প্রথম কর্ম্মসূচী অনুসারে ১৯৬০—৬১ সাল মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে নিজস্ব জাতীয় প্রচেষ্টায় সাইকেল নির্ম্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয় ১০ লক্ষ। কিন্তু পরে সংশোধিত পরিকল্পনায় এখানে প্রায় ১৫ লক্ষ ছোট, বড় ও মাঝারী সাইকেল নির্ম্মাণের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে পরিমাণ সাইকেল লক্ষ্য ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য দ্বিগুণেরও বেশী বা প্রায় তিনগুণ।

ভারতীয় বাইসিকেল-নির্ম্মাতা প্রতিষ্ঠান অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালেই লক্ষ্য অনুযায়ী সাইকেল নির্ম্মাণের গভীর আশা পোষণ করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এই দাবীই রাখছেন যে, নিকট ভবিষ্যতে প্রচুর সাইকেল বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হবে ভারতের পক্ষে। ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পথ ও সড়কে এক্ষণে সাইকেল চালু আছে প্রায় ৪০ লক্ষ। ১৯৬১ সালের মধ্যে ব্যবহৃত সাইকেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৭০ লক্ষ হবে, এরূপ বিশ্বাস। এই বিপুল চাহিদা মিটিয়েও ভারত বাইরে সাইকেল রপ্তানীর দাবী নিয়ে কাজে লিপ্ত আছে। জাতীয় সরকার আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর উপর আরও বিশেষ জোর দিচ্ছেন এই জন্য যে, যেমন করেই হোক বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ তাঁদের বাড়ান চাই। শুধু দেশীয় শিল্পের মান বিদেশী শিল্পের সমকক্ষ হলেই অর্থাৎ বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় ভারতীয় সাইকেল-শিল্প যদি পিছিয়ে না থাকলো, তাহলেই নিশ্চিন্ত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষ ভাবে পাঞ্জাবে—কারখানায় কারখানায় সাইকেলের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ (স্পেয়ার পার্টস্) তৈরী হচ্ছে। এইটিও আশার কথা।

রপ্তানী-বাজারে সাইকেল-শিল্পক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী হচ্ছে বৃটেন। বাইরের বাজার দখলের জন্য বৃটেন অভিনব পন্থা গ্রহণ করেছে। এর ভিতর একটি হচ্ছে দেশে বেশী মূল্যে সাইকেল বিক্রয় এবং বিদেশের বাজারগুলোতে সস্তা দরে সাইকেল ছেড়ে দেওয়া। এদিকে ভারতীয় সাইকেল-কারখানাগুলোতে সাইকেল তৈরীর খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী। বৃটেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হলে সাইকেলের নির্ম্মাণ-ব্যয় কি ভাবে কমতে পারে, সেইটি বিশেষ ভাবে না দেখলে নয়। সরকার ও উন্নয়ন পরিষদ অবশ্য আশা রাখছেন যে, ভারতীয় বাইসিকেল নিকট-প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ভাল বাজারের খোঁজ পাবে। এই শিল্পের আশানুরূপ অগ্রগতির জন্য জাতীয় সরকারের সাহায্য যে অত্যাবশ্যক, সেইটি সহজে

অনুমেয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের খাতিরে এবং দেশীয় সাইকেলের প্রসার ও উন্নতির তাগিদে তাঁরা যেন কর্ত্তব্যে পিছ্‌-পা না হন, এই দাবী রাখবো।

ভারতে সিগারেটের তামাক

ভারতে সিগারেটের উপযোগী তামাক উৎপন্ন হয়ে থাকে যথেষ্ট পরিমাণ এবং গুণাগুণের দিক থেকেও এ প্রথম শ্রেণীর বলা যায়। উৎপন্ন তামাকের মধ্যে অবশ্য ভার্জিনিয়া, নাটু ও সাদা বার্লে তামাকের স্থান সকলের আগে। গুদামগুলোতে মজুত অবস্থায় রং, গন্ধ ও গঠন-বৈশিষ্ট্য অনুসারে তামাকের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। এইভাবে পূর্ব্ব থেকে পরীক্ষিত ও চিহ্নিত (আগমার্ক) হয়ে যায় বলে বিশ্ব-বাজারে ভারতীয় তামাকের চাহিদা যেমন বেড়েছে, সুনামও বৃদ্ধি পেয়েছে সেই অনুপাতেই।

এই মাত্র বলা হলো—ভারতীয় তামাকের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তামাক হচ্ছে ভার্জিনিয়া, নাটু ও সাদা বার্লে। কোন্‌টি কোন্‌ শ্রেণীর তামাক, এ চিনবার ও বুঝবার কয়েকটি সহজ ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন ধূম্রশোধিত ভার্জিনিয়া তামাক দেখতে উজ্জ্বল কমলা (লেবু) রংয়ের এবং এর গঠন অনেকটা রেশমের মত। এই শ্রেণীর তামাক সহযোগে উৎকৃষ্ট সিগারেট তৈরী হতে পারে। অপর দিকে সূর্য্যতাপ শোধিত নাটু তামাক বাদামী রং বিশিষ্ট—ভার্জিনিয়ার সঙ্গে এইখানে উহার একটিমাত্র তফাৎ। নাটু তামাক দিয়েও উন্নত ধরণের সিগারেট তৈরী করা যায় এবং এর গন্ধটি বেশ সুন্দর।

এ ছাড়া সিগারেট তৈরীর জন্য ভারতে উৎপাদিত সাদা বার্লে তামাকও ভাল। সূর্য্যতাপে শুকিয়ে নেবার পর এই শ্রেণীর তামাকই রপ্তানী করা হয় বিদেশে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে।

একটি সরকারী হিসাব—ভারতে বছরে যে পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয়ে থাকে, রপ্তানী চাহিদা মিটাবার জন্যই তার এক-পঞ্চমাংশ নিয়োজিত হয়। এই হিসেবে দেখা গেছে—এখান থেকে প্রতি বছর বিদেশী রাষ্ট্রসমূহে রপ্তানী হয়ে যায় দশ কোটি পাউণ্ড পরিমিত তামাক গড়পড়তা। এই প্রসঙ্গে এইটিও লক্ষ্য করবার যে রপ্তানীকৃত উক্ত তামাকের মধ্যে প্রায় নয় কোটি পাউণ্ডই সিগারেটের উপযোগী তামাক। এই তামাক রপ্তানী মারফৎ ভারত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করছে প্রচুর—সরকারী হিসাব অনুসারেই বছরে বার কোটি টাকারও অধিক।

সিগারেটের তামাকের প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র ভারতের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ—ইহার চাষ অবশ্য অন্যান্য অঞ্চলেও বৃদ্ধি করা যায়। তবে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বে-সরকারী উদ্যমের সঙ্গে জাতীয় সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা। তামাক কি করে ধোঁয়া দিয়ে শোধন করতে হয়, রাজামুন্দ্রি ও গুন্টুরের গবেষণাগারে সে সম্বন্ধে শিক্ষাদানের একটি ব্যবস্থা এর ভেতর সরকার করেছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী-দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট ভারতীয় তামাক কমিটি প্রচারিত ইস্তাহারেই এই তামাক শোধন-পদ্ধতি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা জানতে পারা গেছে। কমিটির নির্দ্ধারণ অনুসারেই এই শিক্ষাকেন্দ্র—দুইটিতে ২০ জন করে ৪০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাকাল নির্দ্ধারিত হয়েছে দুই মাস। সরকারের এই ধরণের উদ্যম জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক নিশ্চয়ই বলা চলে।

একাধিক ভাষা শিক্ষার প্রশ্ন

ইংরেজীতে একটি চলতি প্রবাদ—Be Roman when in Rome অর্থাৎ যখন যেখানে থাকতে হবে, আচার ব্যবহার ও সভ্যতায় দিক থেকে সেখানকার উপযোগী হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনে এই যে মানিয়ে চলার দাবী, ভাষা প্রশ্নেও এইটি অনায়াসে তোলা যায়। বিলেতে যিনিই যাবেন, ইংরেজীতে কথা বলাই হবে তাঁর পক্ষে সুন্দর ও সমীচীন। অপর দিকে বাইরে থেকে বাংলায় কাউকে এসে থাকতে হলে বাংলা ভাষার সঙ্গে তার মোটামুটি পরিচিতি আগে থেকেই গড়ে উঠা ভাল। এই থেকে একটা জিনিষ দাঁড়াচ্ছে—নিছক মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা জানলেই যথেষ্ট হবে না, বিশেষ করে আজকের দিনে যখন বিশ্ব পরস্পরের খুব নিকট হয়ে গেছে।

নতুন একটি ভাষা ভাল ভাবে শিখে নেওয়া হয়ত কঠিন ব্যাপার, বেশ কিছুটা সময় ও শ্রমসাধ্য—কিন্তু কাজ চালাবার মত ভাষা শিখে নিতে এতটা ভাববার থাকতে পারে না। শুধু চাই একটুখানি মনোযোগ এবং সেই সঙ্গে একটি সঠিক ও সুসংবদ্ধ পঠন-পাঠন বিধান। পরীক্ষায় দেখা গেছে—যে কোন ভাষার হাজার খানিক শব্দ শিখলেই এবং চলতি বাক্য রচনার সাধারণ নিয়মগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারলেই কাজ চলে যায় বা চালিয়ে নেওয়া যায়। অপর দেশ ও জাতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যগত, কূটনৈতিক বা অন্য ধরণের বিশেষ সম্পর্ক গড়বার যেখানে প্রশ্ন—সেখানে আর দুই এক শত টেকনিক্যাল শব্দ হয়ত জানবার প্রয়োজন হতে পারে।

ভাষা শিখবার সবচেয়ে সহজপন্থা সে দেশের ভাষা শিখতে ও জানতে হবে, সেখানে যেয়ে একাদিক্রমে কিছুকাল থাকা। অবশ্য খুব কম লোকের পক্ষেই এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যক্রম অনুসরণ করা সম্ভবপর। এইটি যেখানে আদৌ হওয়ার নয়, সেখানে স্বদেশে থেকেই বৈদেশিক ভাষা শিখবার সুযোগ খুঁজে নিতে হবে। প্রাপ্ত-বয়স্ক অবস্থায় ভাষাবিদ শিক্ষকের অধীনে সপ্তাহে এক-দুই ঘণ্টাও যদি দেওয়া যায় তা হলে একটি পরদেশী ভাষা আপনার করে নিতে খুব কঠিন বা বিলম্ব হওয়ার কথা নয়।

বিলেতে নতুন ভাষা শিখবার বা শিখাবার একটি পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরীক্ষায় কাজের বলেও নাকি প্রমাণিত হয়েছে সেইটি। কাজ চালাবার মত ইটালীয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে এই অভিনব পরীক্ষাটি চালান হয়। পরীক্ষা কালে শিক্ষণীয় ভাষার ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড তৈরী করে চালিয়ে দেওয়া হয় সেইগুলো পর পর গ্রামফোনে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর ভিত্তি করে প্রায় তিন হাজার ইটালীয় শব্দ এই রেকর্ড কমিটিতে স্থান পায়। শ্রোতারা বার বার রেকর্ডগুলো বাজিয়ে শোনেন, একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষার সঙ্গেও আপনি পরিচিত হয়ে পড়েন। ভাষা শিক্ষার এই অপূর্ব্ব পদ্ধতিটি নিয়ে যে কোন দেশেই পরীক্ষা চালান যেতে পারে। মোটের উপর, আজকের দিনে একটি মাত্র ভাষা (মাতৃ ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা) নিয়ে বসে থাকলে চলতে পারে না, একাধিক ভাষা শিখবার ও জানবার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে সকলকে।

পারলৌকিক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ফিরিঙ্গিরা সত্যিই জিনিষটা তৈরী করতে জানে। এই আয়না জিনিসটা, এতে যে প্রতিচ্ছবি ফোটে তা যেমন উজ্জ্বল, তেমনি স্পষ্ট। আর হয়ত ঠিক সেই কারণেই—কিছুটা নিষ্ঠুরও।

আয়নাতে ফুটে-ওঠা নিজের মুখখানার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে রইল লালকুঁয়র। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকম করে দেখল। তারপর খাটিয়া থেকে উঠে খোলা দরজাটার সামনে এসে আরও ভাল করে চাইল।

না। ভুল দেখেনি সে। ঘরে আলোর অভাব আছে ঠিকই, ঝরোখা বা জানলাহীন ঘরে বাইরের মত আলো থাকা সম্ভব নয়—কিন্তু তাতে যে অসুবিধাটা হচ্ছিল, সেটা দূর হওয়াতেও ওর কোন সুবিধা হল না। যেটাকে ও দৃষ্টির অস্পষ্টতা বলে মনে করছিল—আসলে সেটা ওর জরাচিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। উজ্জ্বল আলোয় বরং আরও স্পষ্ট, মর্মান্তিক ভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠল—মিলিয়ে গেল না একটুও। ললাটে রেখা পড়েছে। চোখের নিচে কপালেও। সামান্য—তবু অস্বীকার করা চলে না।

সেই উজ্জ্বল মসৃণ ত্বক্—যা দেখে একদা শাহজাদা মির্জ্জা মুইযুদ্দীনের দৃষ্টি মোহমদির হয়ে উঠেছিল এবং সে মোহ আমরণ লেগেই ছিল তার দৃষ্টিতে—সে ত্বকেও কেমন একটা কর্কশ আস্তরণ যেন। পূর্ব্বের সে আশ্চর্য মসৃণতা আর একটুও অবশিষ্ট নেই। চোখের কোণেও পড়েছে কালি। যতটা কালি সুর্মা কি কাজলে ঢাকা যায়—তার চেয়ে অনেকটাই বেশি। চোখের কোলে সামান্য কালিমা কি কালিমার আভাস অনেক সময় পুরুষের চিত্তকে কামনা-চঞ্চল ক'রে তোলে, দৃষ্টিকে ক'রে তোলে বহ্নিশিখার মত দীপ্ত। কটাক্ষকে তোলে শানিয়ে। কিন্তু এ আরও কালো। অল্প বয়সের উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখে যেটুকু ছাপ রাখে তা নয়, অস্বাস্থ্য বা বয়সের চিহ্ন বহনকারী গভীর কালিমা এ।

দীর্ঘ দিনের কান্নায় চোখের পাতা উঠে গিয়েছে। ভাল ক'রে আয়নায় তাকাতে গিয়ে এটাও চোখে পড়ল। সেই সুদীর্ঘ পক্ষ্ম—যা বহুদূর অবধি কপোলে ছায়া বিস্তার করত—তা এখন হৃত গৌরব। একদা যা পুষ্পাচ্ছাদিত বনভূমির মত ছিল, আজ তা মরু-প্রান্তরের মত তৃণবিরল।

তা হোক—ভাল ক'রে কাজল টেনে দিলে এ দৈন্য হয়ত ঢাকা পড়বে—কিন্তু মুখের এই দাগগুলো, চোখের কোলের এই কালি?

আয়নাখানা নামিয়ে লালকুঁয়র আবার ফিরে এসে খাটিয়ায় বসল। সঙ্কীর্ণ অপ্রশস্ত ঘর, আসবাব নেই বললেই চলে। হাতীর দাঁতের মীনা করা আবলুশ কাঠের পালঙ্ক এবং ভেলভেটের শয্যা আজ স্বপ্নের মত দুর্লভ এবং অবাস্তব মনে হয়। মনে হয় এই খাটিয়া এবং সামান্য শয্যাতেই সে আজীবন অভ্যস্ত।

তাই-ই ত ছিল। সামান্য ব্যবসায়ীর মেয়ে সে, নিজে বেছে নিয়েছিল রাস্তার অতি সাধারণ নাচওয়ালীর জীবিকা। শুনেছে তানসেনের রক্ত আছে তার ধমনীতে। সেই রক্তই নাকি তার কণ্ঠস্বরকে দিয়েছে অফুরন্ত সুরৈশ্বর্য। কিন্তু আজ সে কথা ওর বিশ্বাস হয় না। পথের মেয়ে সে, পথের নাচওয়ালী। এই খাটিয়া, এই ধরণের শয্যাতেই অভ্যস্ত সে চিরকাল। বরং এমন দিন ঢের গেছে তখন এটুকুও জোটেনি তার। পথেই কেটেছে—সত্যিকারের আকাশের নিচে। পাকা বাড়ীর নিরাপদ আশ্রয় এবং নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন তখন সুখ-স্বর্গ বলে মনে হত। তার চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ছিল কল্পনাতীত।

তার পর এল জোয়ার। সৌভাগ্যের জোয়ার। সামান্যা বাঁদী সে, চেয়েছিল ময়ূর সিংহাসনে বসতে, চেয়েছিল দ্বিতীয় নূরজাহান হ'তে। দুনিয়ায় বাদশার তাজ পরলে চলবে না শুধু—সে তাজ পায়ে লোটানো চাই। এই ছিল তার স্বপ্ন!

তার এই দুঃসাহসিকতায় এই দুরাশার চরম পরীক্ষা হিসেবেই ভগবান বুঝি জীবনে এনেছিলেন সেই পরম সুখের দিনগুলি। খ্যাতি, যশ, অর্থ, প্রতাপ—সবই দিয়েছিলেন তিনি, দিয়ে মনটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন বুঝি।

ওঃ, তখনও যদি থামত সে তখনও যদি খুশি থাকত। সে চাইল আরও বেশি, আরও ঢের। বিধাতা হেসেছিলেন সেদিন ওর ধৃষ্টতায়, নির্মম, ক্রূর হাসি। দুনিয়ায় বাদশা, রাজ্যেশ্বরকে করে দিলেন ওর পদানত, পদাশ্রিত। সৌভাগ্যের নেশায় মাতাল হয়ে উঠল সে, পাগল হয়ে গেল। ছিনিমিনি খেলল তখ্‌ৎ নিয়ে, তাজ নিয়ে। চোখের ইঙ্গিতে কত ভিখারী হল রাজা—রাজা হল ভিখারী। তর্জনী হেলনে কত নির্দোষ নিরপরাধ মানুষের প্রাণ গেল, উন্মত্ত খেয়ালে খুনী আসামীরা পেল পরিত্রাণ। এত গুস্তাকি কি খোদা সইতে পারেন?

তাছাড়া ময়ূর-সিংহাসন এবং কোহ-ই-নূর—বাঁদীর কপালে সইবে কেন? মিলিয়ে গেল এক নিমেষেই যেন চোখের পলক না ফেলতে ফেলতেই। পরিপূর্ণ সুখের তীব্র স্মৃতিই রইল শুধু। হিন্দুদের পৌরাণিক রাক্ষস রাবণের চিতার মতই তা জ্বলতে লাগল বুকে। অনির্বাণ সে আগুনের পরিসমাপ্তি নেই—চিতাভস্মের স্তূপেও ঢাকা পড়ে না অনল।

যে জীবন ছিল ঈপ্সিত—আজ তা-ই দুর্ব্বহ। ওর জন্য—শুধু ওর জন্যই ওর বাদশা, ওর প্রেমিক, স্নেহাতুর মালিক প্রাণ দিলেন। আর—হে খোদা, অতিবড় শত্রুরও যেন অমন মৃত্যু না হয়! অমন পৈশাচিক, ভয়াবহ মৃত্যু!

ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়াল লালকুঁয়র। ছুটে বাইরে এল। হাওয়া কি দুনিয়ায় কোথাও নেই? থাকলে—সে নিঃশ্বাস নিতে পারছেনা কেন? সোহাগপুরা—বেওয়া মহলের এই সঙ্কীর্ণ ঘরে হাওয়া ঢোকে না—তাই? কিন্তু এর চেয়েও কদর্য ঢের বেশি সঙ্কীর্ণ ঘরেই ত সে এককালে থাকতে অভ্যস্ত ছিল। কৈ, তখন ত এমন ক'রে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসেনি তার।

না কি—তারই দুর্ভাগ্য, তারই কৃতকর্মের ফল এসে তার চারিদিকের হাওয়া বন্ধ ক'রে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—তাই?

আঃ! না, এই যে বাইরে হাওয়া আছে। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস। ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত। এই ত কি অফুরান ঐশ্বর্য! কৈ, এর জন্য ত কেউ মারামারি হানাহানি করে না। কেউ ত কেড়ে নিতে চায় না। অথচ এটুকু না থাকলে আর সবই ত অর্থহীন হয়ে যায়।

লালকুঁয়র সেই ঠাণ্ডা বাতাসে বার বার মাথাটায় ঝাঁকানি দিয়ে যেন প্রকৃতিস্থ হ'তে চেষ্টা করে। না। অনুশোচনা আর হাহাকারে সে এমন ক'রে দিন কাটাবে না। জীবন নিয়ে সে যখন খেলা করতেই চেয়েছিল—তখন একবার হেরেই আত্মসমর্পণ করবে না দুর্ভাগ্যের কাছে।

আর একবার খেলবে সে। খেল্ দেখাবেও। না হয় আবারও হারবে। এই চিতার আগুনের কথাটা ভাবতেই আজ প্রথম ওর কথাটা মনে পড়েছে। আগুন!—বেশ ত। এ আগুনে শুধু ও-ই জ্বলবে—জ্বালাতে পারবে না? কেন, ওর প্রাণ-শক্তির বহ্নি কি নিভে গেছে একেবারে? আবারও আগুন জ্বালবে সে। জ্বালাবে আবারও।

কিন্তু—ঐ কিন্তুটাই যে মস্ত সমস্যা হয়ে উঠেছে। সংসারটা মনে দেখা দিয়েছিল বলেই বহু দিন পরে দাসীকে দিয়ে এই আয়নাটা কিনে আনিয়েছে। আয়নার সাক্ষ্যে মন তার দমে যাবারই কথা। গেছেও খানিকটা। তবু এত সহজে হাল ছাড়তে রাজী নয় লালকুঁয়র।

শুনেছে এই ফিরিঙ্গিদেরই কি সব প্রসাধন আছে, যা মাখলে চর্মের রুক্ষতা মিলিয়ে পেলবতা আসে, অকাল-জরার দাগ নিশ্চিহ্ন হয়—শুকনো গালে আবার গোলাপ ফোটে। পাওয়া যায়, এই দিল্লী শহরেই পাওয়া যায়। কিন্তু নাকি বড় বেশি দাম।

বেওয়া মহলের অধিবাসিনী সে, সোহাগপুরার বাসিন্দা। একটি ঘর, মাসিক বিশ তঙ্কা খরচ আর দুজনের মত আটা, ডাল, ঘি, এই তার বরাদ্দ। পরিত্যক্ত জুতোর মতই বাদশাহী হারেমের বাড়তি স্ত্রীলোক তারা—এটুকু যে তাদের মেলে, পথে বসে ভিক্ষা করতে হয় না, এই ত যথেষ্ট, এর জন্যই তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আরও কি চায় সে? সে ত বিবাহিতা স্ত্রীও নয়। নতুন বাদশা—সোজাসুজি তাকে তাড়িয়ে দিতেও পারতেন—অথবা কোতল্ করাতে। তার অপরাধও ত কম নয়। না, বাদশা অনুগ্রহই করেছেন।

তবু বিশ টাকা বিশ টাকাই। তার মধ্যে থেকে একটি ঝিয়ের মাইনে এবং খরচাও চালাতে হয়। এখনও এটুকু বিলাস ছাড়তে পারে নি সে। একেবারে সোজাসুজি নিজের পোশাক নিজে কাচা—নিজের বিছানা নিজে রোদে দেওয়া—এটা এখনও অভ্যাস হয়নি।

আনতে পারত অনেক কিছুই—হয়ত শেষ মুহূর্তেও কয়েকটা মোতির মালা আনলেও তার ঢের দাম পাওয়া যেত। কিন্তু তা সে পারেনি। তার মালিকের শেষ মুহূর্তগুলিকে সুধায় ভরে দিতে সে-ও যে ত্রিপোলিয়া ফটকের ফাটকে আটকা ছিল। অবশ্য তার কাছ থেকে হয়ত কেউ অলঙ্কার কেড়ে নিত না—সে সব কথা মনেও হয়নি সেদিন। সামান্য যা তার গায়ে ছিল তাই নিয়েই সর্বহারা সর্বনাশিনী সেদিন পথে নেমে দাঁড়িয়েছিল। তারও অনেক কিছুই গেছে সেদিন পথে আসতে আসতে এবং এই ক'দিনে। একেবারে ধুলিগুঁড়ি যা আছে—সেটা সে রেখে দিয়েছে শেষ দিনের জন্য। যদি কোন দিন বাদশাহী খেয়ালে পথেই দাঁড়াতে হয়—সেই দিনের সম্বল! অসুখ বিসুখ অনেক কিছুই আছে ত।

সেই শেষ পুঁজি ভেঙেই আজকের এই খেয়াল মেটাবে নাকি? ক্ষতি কি? আর একবার শেষ বারের মত জ্বলে উঠতে না হয় ইহকালের সব পুঁজিই শেষ হবে। তবু সে-ই হবে বাঁচার মত বাঁচা!

বাইরে অপরাহ্নের আলো ম্লান হয়ে আসছে। এখনই দাসী আসবে চেরাগ নিয়ে। তার আগেই সেই গোপন তহবিল থেকে কিছু বার করতে হবে।

শুধুই ফিরিঙ্গি প্রসাধন দ্রব্য নয়। আরও অনেক কিছু চাই। সাজ পোষাক, অলঙ্কার—ঝুঁটো হলেও তার দাম পড়বে কিছু—আর দিল্লী যাওয়ার রাহাখরচা। দিল্লীতে থাকতেও হবে ক'দিন। অন্তত পঞ্চাশটি মোহর খরচা হবে। তা হোক। আজ আর কিছু ভাববে না সে।

—লালকুঁয়র উঠে অন্ধকারের মধ্যেই বিছানার তলায় হাতড়ায়। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে তার। কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ। কাঁপছে তার মন ও।

* * * *

আবার বয়েল গাড়ীর যাত্রা। সে আর দাসী। আবার দিল্লী। ধূলিধূসরিত ক্লান্ত দেহে আবারও একদিন শাজাহানাবাদের এক সঙ্কীর্ণ গলিতে এসে পৌছানো। আজও তার এ পথঘাটগুলো মনে আছে, এই ত আশ্চর্য। আসলে ক'দিনেরই বা কথা। এতগুলো বিপর্যয়, ভাগ্যের এমন বিচিত্র উত্থানপতন—এত দ্রুত ঘটে গেছে তার জীবনে যে, সেই জন্যেই মনে হচ্ছে বহুদিনের কথা হল। বয়সই বা কত তার? এরই মধ্যে বেওয়া মহলে সর্বস্বান্ত নির্বাপিত সমাহিত জীবনযাপন করার কথা নয়।

ফাতিমা নাচওয়ালীর বাড়ী খুঁজে বার করা গেল বৈ কি!

সে বুড়ী আজও তেমনি আছে। চোদ্দ-পনের বছর আগেও যেমন দেখেছিল ঠিক তেমনিই। পাকাচুলে তেমনিই মেহেদীর ছোপ, চোখের পাতায় তেমনি গায় কাজলের দাগ, ভাঙ্গা দাঁতে পানের কষ এবং মুখে কড়া তামাকের গন্ধ। সব ঠিক ঠিক—তেমনি। আজও যে সে তার পুরোনো ব্যবসা—ছোট ছোট মেয়েদের কিনে এনে পুষে নাচ শিখিয়ে বিক্রি করা বা বাদশা-নবাব-ওমরাহ্‌দের হারেমে সরবরাহ করা—ছাড়েনি, তা তার বাড়ীর বাইরে থেকেই, ঘুঙুরের আওয়াজে এবং কিশোরীদের কলকণ্ঠে টের পাওয়া যায়।

দাসী মারফৎ খবর পেয়ে বুড়ী বেরিয়ে এল। চেরাগের আলোতে ভুরু কুঁচকে চেয়েও চিনতে একটু দেরী হল—কিন্তু সেই ক্ষীণ দৃষ্টি এবং বিস্মৃতির কুয়াশা কাটিয়ে পরিচয়টা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতেই, ভূত দেখার মত ভয় পেয়ে তিন পা পেছিয়ে গেল সে। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় একটা দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে কোন মতে কম্পিত হাতে কুর্ণিশ করার একটা ভঙ্গী করতে করতে বহু কষ্টে উচ্চারণ করলে, 'মা-মা-মালেকা! আপনি! সত্যিই আপনি?'

লালকুঁয়ার এগিয়ে এসে হাতটা চেপে ধরলে ফাতিমার।—'চুপ। চুপ্‌! মালেকা নয়। বেগম নয়। বেওয়া, বাঁদী। আজ কিছুই নেই আমার। না ক্ষতি করার ক্ষমতা, না উপকার করার। অর্থ-সামর্থ্য সব গেছে। আজ আমিই তোমার সাহায্যপ্রার্থী। জাখো—আশ্রয় দেবে, না পথের মানুষ পথে গিয়ে দাঁড়াব?—মন খুলে বলো। এতটুকু ক্ষোভ রাখব না, এতটুকু অভিযোগ করব না। চক্ষুলজ্জার কোন কারণ নেই। বলো—।'

ফাতিমা সামলে নিয়েছে নিজেকে আর কোন সংশয়ও নেই। গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গী—পরিচিত যে তার, অতি পরিচিত।

সে লালীর হাত ছাড়িয়ে আভূমি নত হয়ে সেলাম করলে ওকে। বললে, 'এ বুড়ী আজও আপনার বাঁদী মালেকা। এ গরীবখানা আপনারই বাঁদী মহল। আসুন, ভেতরে আসুন।'

'তোমার বাড়ীতে আমাকে গোপনে আশ্রয় দিতে পারবে ত ফাতিমা। আমার পরিচয়, আমার অস্তিত্ব কেউ না জানতে পারে—এমন ভাবে?'

ফাতিমা আবারও একবার অভিবাদন করলে।—'এ কাজ বাঁদীর কাছে প্রথমও নয়, নতুনও নয় হজরৎ!'—সে লালকুঁয়ারের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল।

স্নান ও বিশ্রামের পর লালকুঁয়ার তার ইচ্ছাটা জানালে ফাতিমাকে। ফাতিমা অবাক হয়ে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে। সে কি ভুল শুনছে, না ভুল বুঝছে? অতিকষ্টে অবশেষে উচ্চারণ করে সে, 'আপনি? আপনি যাবেন?' স্পষ্ট অবিশ্বাস তার কণ্ঠে।

'হ্যাঁ। আমিই যাবো ফাতিমা। আমি সব পারি তা কি আজও তুমি জানো না?—একদিন রাস্তায় নাচ-ওয়ালাদের সঙ্গে তোমায় দোরে এসে দাঁড়িয়েছিলুম—সেদিনও তুমি দেখেছিলে আমাকে। আবার যেদিন দুনিয়ার বাদশার সঙ্গে তোমাকে দেখা দিতে এসেছিলুম—সেদিনও দেখেছ। আবার আজ এই—ভিখিরীর বেশে এসে দাঁড়িয়েছি—কিন্তু তাতে কি, আমি সেই আমিই—আজও চেষ্টা করলে অঘটন ঘটাতে পারব।'

'কিন্তু মালেকা' শুক্‌নো ঠোঁটে জিভ্‌টা বুলিয়ে নিয়ে বলে ফাতিমা, 'ফররুকশিয়ার বড় কড়া বাদশা। সিংহাসনে বসার দিন থেকেই রক্তপান শুরু করেছে সে—তবু তার তৃষ্ণা যেন মিটছে না। আর তেমনি তার যোগ্য সহচর হয়েছে—রাক্ষসের বন্ধু পিশাচ—মীরজুমলা।—যদি ধরা পড়ো মালেকা, মেয়েছেলে বলে, চাচী বলে রেয়াৎ করবে না।'

'তা আমি জানি ফাতিমা। সে জন্য প্রস্তুত হয়েই যাচ্ছি। আর তাতে ক্ষতিই বা কি, যে ক'টা দিন বাঁচতুম—নাই বা বাঁচলুম। জীবনটাকে নিয়ে একটু খেলেই দেখি না। সোহাগপুরায় জীবন, এত সমাধির নিয়ে বেঁচে থাকা। এর ওপর আমার লোভ নেই।'

'কিন্তু মালেকা'—আবারও বলতে যায় ফাতিমা।

লালকুঁয়ার বাধা দিয়ে বলে, 'জানি। তাও জানি। ধরা পড়লে শুধু আমার নয় তোমারও প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। কিন্তু এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারো না—যাতে তুমি নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখতে পারো? আর কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করে—কোনমতে খোজা জাবিদ খাঁর চোখ এড়িয়ে পারো না লালকেল্লার ঐ নরককুণ্ডে, ঐ শাহী-হারেমে ঢুকিয়ে দিতে?'

'তা হয় ত পারি মালেকা। আজও তোমার মেহেরবানীতে সে ক্ষমতা হয়ত রাখি। কিন্তু কী দরকার? মিছিমিছি আর কেন এ সংঘাতিক ঘূর্ণির মধ্যে এসে পড়ছ?'

সোজা হয়ে বসে লালকুঁয়ার।—'ভুলতে পারি না যে ফাতিমা, কিছুতেই ভুলতে পারি না! আমার মালিক আমার বাদশাকে কি নিষ্ঠুর ভাবে মেরেছে ওরা, কি অপমান করেছে। বাহাদুর শার বড় ছেলে সে—এ তখতের ন্যায্য মালিক। আমার অপরাধ যাই হোক, তারই ত তখৎ। তবু ফররুখশিয়ারের রাগ বুঝতে পারি, জাহান্দার শা, তার বাপের মৃত্যুর কারণ। কিন্তু ঐ সৈয়দ আবদুল্লা ঐ সৈয়দ হুসেন—ওরা কেন এ কাজ করলে? কি অনিষ্ট করেছিল জাহান্দার শা তাদের? ওদের এই বেইমানীর শোধ দেবই আমি ফাতিমা। আজ কিছুই নেই হয়ত—তবু এই দেহটা ত আছে। এই দেহটাতেই তিনি ভুলেছিলেন—আমার শাহানশাহ। এর জন্যেই তিনি ইহকাল, ভবিষ্যৎ, রাজ্য সিংহাসন, মান সম্মান—সমস্ত কিছু ভুলেছিলেন। সে দেহে এখনও কিছু আগুন আজও আছে—হয়ত খুবই সামান্য, হয়ত নিতান্তই স্ফুলিঙ্গ, তবু স্ফুলিঙ্গ থেকেও ত বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হয়

ফাতিমা। দেখাই যাক না। যদি এ চেষ্টায় মরি, তবু আমার দুঃখ নেই। মালিকের অফুরন্ত স্নেহের ঋণ কিছু ত শোধ হবে।'

দুটো কাঁধের বিচিত্র এক ভঙ্গী করে ফাতিমা বললে, 'সে দ্যাখো মালেকা, তোমার মর্জী।'

• • • •

অবাক হয়ে চেয়ে আছেন বাদশা ফররুখ্‌শিয়ার। চোখে পলক পড়ছে না তাঁর। তাঁর বয়স অল্প হলেও—নাচ তিনি অনেক দেখেছেন এই বয়সেই—অনেক নামকরা নর্তকীরই নাচ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। কিন্তু এমন নাচ—সত্যিই তিনি দেখেন নি। পা দু'টি যেন বাতাসে ভেসে আছে, পরীদের পাখনার মতই হালকা হাত দু'টি বিচিত্র লীলায় আন্দোলিত হচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। পুষ্পদণ্ডের মত নিখুঁত সুঠাম দেহযষ্টি কী অপূর্ব ছন্দেই না লীলায়িত হচ্ছে।

এ রূপ! এ কসরৎ! এ শিক্ষা, এতদিন ছিল কোথায়? কেউ এতদিন কেন খোঁজ দেয়নি এ রত্নের। তাতারী রক্তে আগুন লাগে ফররুখশিয়ারের। বিহ্বল হয়ে ডাকেন তিনি—'পিয়ারী, পিয়ারী কাছে এসো, আর একটু কাছে!'

বীণানিন্দিত কণ্ঠে উত্তর আসে, 'আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন শাহানশাহ!'

তা বটে। বিরক্তির সঙ্গে মনে পড়ে তাঁর। বন্ধু ও পার্ষদ উবেদুল্লা যখন এই মেয়েটির কথা বলে, তখন এই কথাই বলে যে—'অপূর্ব এক নর্তকীরত্ন পাঠাবো শাহানশাহ আপনার কাছে—এমন কখনও দেখেন নি, কল্পনাও করেননি—কিন্তু দু'টি শর্তে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার গায়ে হাত দিতে পারবেন না, তার মুখও দেখতে পাবেন না। আর সে নাচ দেখাবে একা, তার নিজস্ব তবলচী নিয়ে যাবে সে!'

'বলো কি মীরজুমলা!' ঠাট্টা করে বলেছিলেন সম্রাট, 'কী এমন বেহেস্তের হুরী তিনি যে, এত শর্ত ক'রে নাচ দেখতে হবে? আর এমনই বা কি সতী যে, স্বয়ং বাদশাও হাত দিতে পারবেন না গায়ে!'

'হাঁ শাহানশাহ, আমারও তাই মনে হয়েছিল কথাটা শুনে। তবে নাকি আমাকে যে বন্ধু এই রত্নের সন্ধান দিয়েছিল তার মতামতের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে বলেই রাজী হয়েছিলুম। এই ভাবেই আমিও দেখেছি তার নাচ। কিন্তু সে অপূর্ব জিনিস শাহানশাহ দেখে পর্যন্ত আপনার কথাই মনে হয়েছে খালি, আপনাকে না দেখিয়ে শান্তি নেই।'

অগত্যা রাজী হয়েছিলেন নবীন বাদশা। কৌতূহল শুধু, হয়ত বা একটু কৌতুকও বোধ হয়েছিল। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। সত্যিই এমন জিনিস দেখার আশা করেন নি। কোন কল্পনাও করেন নি। এ যেন সকল অভিজ্ঞতার বাইরে—

ঘরে 'সেজ্‌'-এর স্তিমিত আলো। দূরে এক কোণে তবলচী বসে আছে—কিংখাবের পর্দার সঙ্গে মিশে—ইঙ্গিতমাত্র পর্দার আড়ালে চলে যাবে। শাহী হারেমে যারা বাজাতে আসে তাদের সকলেরই এ সহবৎ শেখা আছে। সেই স্বপ্নের মত স্নিগ্ধ আলোতে পরীর মত মেয়েটি নাচছে। মাথায় মুখে সূক্ষ্ম মসলীনের অবগুণ্ঠন। তাতে ঐ সুঠাম সুন্দর দেহের মতই স্বর্গ-সুষমায় গড়া একখানা মুখের আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছে, বেশি কিছু নয়। তার ফলে বাদশার তুরাণী রক্তে আরও বেশি কৌতূহল আরও বেশি লালসা বাড়ছে—ঐ অবগুণ্ঠন জোর করে সরিয়ে ফেলে সুন্দর মুখের পরিপূর্ণ শোভা দেখবার এবং ঐ মুখের যে ডালিমকুঁড়ি অধর তিনি কল্পনা করছেন, তার সুধা পান করায় বাসনা উদগ্র হয়ে উঠছে।

জীবনে ইচ্ছা মাত্র রমণী সম্ভোগ করেছেন তিনি, বাদশা হবার আগেই। আর বাদশা হবার পরও সামান্যা এক নাচওয়ালী তাঁকে এমনি অবহেলা করে চলে যাবে?

অধীর অসহিষ্ণু ভাবে বলে ওঠেন বাদশা, 'হাঁ মনে আছে পিয়ারী। জোর ক'রে নেব না। কিন্তু কিনতে পারব না, এমন প্রতিজ্ঞা ত করিনি। কী কিমৎ তোমার বলো পিয়ারী—বাদশা আমি, তার জন্য আটকাবে না!'

হাসল মেয়েটি। মুক্তাঝরার মতই খিলখিলিয়ে হাসল সে। হাসির শব্দ রক্তের উন্মত্ততা এমন বাড়ায়—তা এতদিন জানতেন না তরুণ বাদশা ফররুখশিয়ার! উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অসহ ক্রোধে তাঁর কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। ইচ্ছে করছে টুকরো টুকরো করে ফেলেন ফুলের মত ঐ সামান্য দেহটা।

কিন্তু—মনে পড়ে গেল মীরজুমলার সতর্কবাণী! 'সাংঘাতিক মেয়ে শাহানশাহ। আমি প্রশ্ন করেছিলুম: ধরো যদি আমার কথার ঠিক না রাখি? সঙ্গে সঙ্গে—বোধ হয়, আমার শেষ কথা মুখ থেকে বেরোবার আগেই—বুক থেকে বের করেছিল ইরাণী কিরীচ।

বলেছিল : দুজনকে মারবার পক্ষে এ ছোরাই যথেষ্ট—কী বলেন নবাব সাহেব ? আগে আপনি, তারপর আমি।—খুব হুঁশিয়ার থাকবেন ! জোর করার মেয়ে সে নয় !'

কথাটা মনে প'ড়ে ক্রোধটাকে আরও দুঃসহই করে তোলে ; শুধু অধীর ভাবে নিজের ঠোঁট নিজে কামড়ে রক্তাক্ত করেন বাদশা। হাত মুঠো করতে করতে নখ বিঁধিয়ে দেন নিজেরই হাতের তালুতে—

'তুমি মেয়েছেলে না হ'লে তোমার গুস্তাকীর জবাব এখনই দিতুম ! কেন, কেন হাসছ তুমি ? কী এমন তোমার দাম যা হিন্দুস্তানের বাদশা দিতে পারেন না !'

হাসি বন্ধ হ'ল না। বরং আরও খিলখিলিয়ে উঠল সেই কম-কণ্ঠ। হাসতে হাসতেই বললে সে, 'গুস্তাকীর জবাব কি দেবেন আলিজা, ক্ষমতার মধ্যে আপনার আছে জান নেবার ক্ষমতা শুধু—তাও আমার মত অবলা জীবের, কিন্তু জানের পরোয়া যে করে না, তাকে নিয়ে কি করবেন ? আপনি হুকুম দিলে অকারণেই এই ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে দিতে পারি, এতটুকু তার জন্য দুঃখ করব না। দেখুন, দেব বসিয়ে ?'

বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল বাঁকা কিরীচখানা। হাতির দাঁতের কাজ করা হাতলে এতটুকু সরু একটু জিনিস—কিন্তু তার দিকে চাইলেই বোঝা যায়—সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতই শাণিত আর অব্যর্থ !

ফররুখশিয়ার যেন কঠিন একটা আঘাত পেয়ে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন। হতাশ হয়ে বসে পড়লেন দিওয়ানে। বললেন, 'কিন্তু আমাকে এত অবহেলা তোমার কিসের ? আমাকে বিদ্রূপ করার মত এত সাহস আসে কোথা থেকে।'

এবার হাসি বন্ধ হ'ল। নৃত্যরতা আগেই থেমেছিল, এবার অভিবাদন ক'রে স্থির হয়ে বসল। ইঙ্গিতে তবলচী নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'ল পর্দার আড়ালে।

নর্তকী হেসেই বললে, 'অপরাধ নেবেন না শাহানশাহ। অবহেলা ক'রে বিদ্রূপ ক'রে হাসিনি। হেসেছি আপনার ছেলে-মানুষীতে !—কী শাহী তখতে আপনি বসেছেন, তা আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি আলিজা ? কতটুকু ক্ষমতা আপনার ? এই হারেমের বাইরে আপনি আর কোথায় যা খুশী তাই করতে পারেন। বাদশাহী করছে ত আপনার উজীর-এ-আজম, কুতুব-উল-মুলুক আর তার ভাই !—আপনি দাম দেবার কথা বলছিলেন শাহানশাহ—কী দাম দেবেন আপনি ? বেশ, ধরা আমি দেব। এক ক্রোর টাকা আর সাতনরী মতির মালা। দেবেন ?'

মুখ শুকিয়ে ওঠে বাদশার। প্রতিকারহীন অপমানে রাঙাও হয়ে ওঠেন। ললাটে স্বেদবিন্দুর আভাস দেখা দেয়।

এক ক্রোর টাকা আর সাতনরী মতির মালা। এত টাকা শাহী খাজানায় নেই। এর শতাংশও আছে কি না সন্দেহ।

যুদ্ধের ফলে তাঁর কোষাগার নিঃশেষ। সিপাহীরা বহু দিনের বেতন পায়নি, রোজই গোলমাল করছে। বহু ঋণ সরকারের। আছে এক বেগমদের অলঙ্কার। সোনা-রূপোর বাসনগুলো পর্যন্ত লুঠ হয়ে গেছে। কৃপণ আজিম-উশ-শান বহু টাকা জমিয়েছিলেন কিন্তু সে সেই সর্বনাশা রাত্রিতেই তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে লুঠ-পাট হয়ে গেছে—এক কপর্দকও পাননি আজিম-উশশানের ছেলে ফররুখশিয়ার।

শুকনো ঠোঁটে জিভটা বুলিয়ে নিয়ে অসহায় ভাবে বাদশা বললেন, 'এ তুমি একেবারেই অসম্ভব দাম চাইছ। মাল না বেচবারই দাম এ তোমার। আমি কেন—আর কেউই দিতে পারবে না !'

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বেজে ওঠে সেই রজত-ঝরা কণ্ঠে, 'কে বলেছে আপনাকে শাহানশাহ ! এই শহরেই একটি মানুষ রাজী হয়েছে এ দাম দিতে। আপনারই কুতুব-উল-মুলুক ! সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ ঢের বেশি শাঁসালো লোক আপনার চেয়ে। নির্বোধ আপনি, শাহানশাহ গুস্তাকী মাফ করবেন, না বলে পারলুম না—জাফর খাঁর বাড়ী আর জুলফিকর খাঁর বাড়ী পেয়েছে তারা, ঐ দুটো বাড়ীতে জহরৎ কত ছিল তা জানেন ? জুলফিকর খাঁর আগে ও-বাড়ীতে থাকতেন সায়েস্তা খাঁ—দু'জনেরই বহু পুরুষের ঐশ্বর্য ওখানে জমানো ছিল। বাহাদুর শার চার ছেলেরই বিষয় লুঠ করেছে বা করিয়েছে ওরা, সব ছিল ওখানে। শাহানশাহ এ জমানাতে টাকা যার, রাজত্ব তার। এ কথা ওরাও জানে, তাই ওরা বলে বেড়িয়েছে যে, বাবরশাহী তখৎ এবার ওদেরই—দু ভাই ভাগ ক'রে নেবে তখৎ-এ-তাউস !—তাই, ধরা যদি দিতেই হয় ত তাদের হাতেই দেব। কি বলেন ?'

নিরুদ্ধ রোষে আবীরের মত লাল হয়ে উঠেছিল বাদশার মুখ—সে রক্তিমা কেটে এক রকমের রক্তহীন বিবর্ণতা ফুটে উঠল। যা সূক্ষ্ম বাষ্পের আকারে ছিল, এক্ষণে তা-ই বড় বড় জলবিন্দুতে পরিণত হল। ফররুখশিয়ারের আশ্চর্য সুন্দর শুভ্র ললাট ক্রমে যে জলবিন্দুতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি কি যেন বলতে গেলেন কিন্তু তাঁর শুষ্ক কণ্ঠ ভেদ করে তখনই কোন স্বর বেরোল না। বার-দুই ঢোক গিলে অতি কষ্টে বললেন, 'নাচওয়ালী, তুমি কে তা আমি জানি না। কিন্তু তুমিই আমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষিণী। আমার চোখ খুলে দিয়েছ তুমি। কিন্তু ভয় নেই, ওদের ষড়যন্ত্রের যোগ্য ফল পাবে ওরা।'

নর্তকী অভিবাদন করে উঠে দাঁড়াল। কুর্নিশ করে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই আকুল কণ্ঠে বাদশা আবার বলে উঠলেন, 'পিয়ারী পিয়ারী' তুমি এখনই চলে যেও না। আমি ঐ সৈয়দ আবদুল্লা আর হোসেন খাঁকে দলিত পিষ্ট করব, ওদের ঐ চুরিকরা ঐশ্বর্য সমস্ত এনে তোমার পায়ের তলায় ঢেলে দেব—তুমি প্রসন্ন হও, তুমি ধরা দাও।'

'যেদিন তা পারবেন সম্রাট, সেদিন যথাসময়ে এসে আপনার চরণে আশ্রয় নেব। আজ মাফ করবেন। এখন শুধু বখশীষটা পেলেই খুশী হবো !'

যেন প্রাণপণ চেষ্টায় বাদশা সামলে নিলেন নিজেকে। অপমানিত প্রত্যাখ্যাত হৃদয়াবেগের জ্বালায় দুই চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল—সেই বাষ্পের মধ্য দিয়ে সামনের এই মোহিনী নারীকে সর্পিণীর মতই মনে হ'ল—তাকে সহ্য করাও যায় না অথচ তার প্রভাবের বাইরেও যাওয়া যায় না যেন। কোন মতে গলা থেকে, সাতনরী নয়, এক নরী এক মোতির মালা খুলে নর্তকীর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে আবার এসে দিওয়ানে বসে পড়লেন—একান্ত অবসন্ন ভাবে।

* * * *

অন্ধকার রাত্রে দ্রুত পায়ে মহলের পর মহল পেরিয়ে চলল নর্তকী। তার অবারিত নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত গতি দেখে মনে হ'ল এখানে সে নবাগতা নয়—এ প্রাসাদের পথ-ঘাট অলি-গলি তার পরিচিত। একেবারে ত্রিপোলিয়া ফটকের সামনে এসে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

এইখানকার ফটকেই বাদশার বাদশা জাহান্দরকে বন্দী ক'রে রেখেছিল ওরা। তার পর এই মীরজুমলার পরামর্শে আর এই ফররুখশিয়ারের হুকুমে—কুৎসিত, অপমানকর ভাবে মেরেছে। লাথি মেরে মেরেছে ওরা—কুত্তার কুত্তা বেইমান নৌকর এক জুতোসুদ্ধ লাথি মেরেছে।

অস্ফুটকণ্ঠে শুধু এক বার একটা 'উঃ' শব্দ করে উঠল নাচওয়ালী। সামান্য অব্যক্ত কাতরোক্তি, কিন্তু তবু দূর থেকে শান্ত্রীদের পদচারণা সে-শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একজন বলে উঠল—'কে? কে ওখানে?'

এখনও এরা জেগে থাকবে এবং সত্যই পাহারা দেবে—তা আশা করেনি। ত্বরিৎ বিদ্যুৎ গতিতে নাচওয়ালী সরে এল সেখান থেকে।

পরোয়ানা আছে তার কাছে ঠিকই—নিরাপদে লালকিল্লা থেকে বেরিয়ে যাবার, কিন্তু কী দরকার হাঙ্গামা বাধাবার।

অশিক্ষিত বর্বর পাহারাদার ওরা—এই দূরে নির্জ্জনতার মধ্যে সুসজ্জিতা তরুণী মেয়ে পেলে এখনই হয়ত নিমেষে পাগল হয়ে উঠবে।

বাদশাকে ঠেকানো যায়, কারণ তাঁর সম্মানবোধ আছে। এরা পশু—এদের ঠেকানো শক্ত।

ওদিক দিয়ে ঘুরে নর্ত্তকী এক সময় দিল্লী ফটকের সামনে এসে পৌছল। বোধহয় আগে থাকতেই বলা ছিল—তবলচী এইখানেই অপেক্ষা করছিল। সে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ওর সঙ্গ নিলে।

তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। উষার খুব বেশী দেরী নেই। ঘুম চোখে বিরক্ত মুখে পাহারাদার পরোয়ানাখানা খুলে দেখলে। স্বয়ং মীরজুমলার হাতে লেখা পরোয়ানা—যে কোন সময় ফটক খুলে দিতে হবে। নাচওয়ালী ও তার তবলচী কোন সময়ই বাইরে যেতে বাধা না পায়। জরুরী, বিশেষ পরোয়ানা।

লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে পরোয়ানা চিনতে দেরী হয় না। বন্দুক নামিয়ে কোমর থেকে চাবির গোছা বার করে ফটকের ছোট কাটা দোরটা খুলে দেয় পাহারাদার। তার সঙ্গীরাও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, এত রাত্রে দোর খুলে দেওয়ায় তারা বিস্মিত হ'লেও কোন প্রশ্ন করলে না কেউ। একবার মাত্র চোখ খুলে দেখেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

নাচওয়ালীরা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই কাটা দোরটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে নর্ত্তকী!

রুক্ষ বালুময় মরুপ্রান্তরের মতই পড়ে আছে সমস্তটা। শেষ রাত্রের বাতাস যমুনার তীর থেকে আরও বালি উড়িয়ে নিয়ে আসছে। হু হু করে হাওয়া বইছে নদীর দিক থেকে—একটা হাহাকার

দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতই শোনাচ্ছে শব্দটা। ধু-ধু করছে মাঠ। সেই অস্পষ্ট আবছায়ায় জায়গাটা খুঁজে বার করা শক্ত। তবু মেয়েটি খুঁজে পায় জায়গাটা।

হ্যাঁ। তার অন্তত কোন সন্দেহ নেই। এই—এই খানেই শাহানশাহের কাটা কবন্ধ এবং মুণ্ডটা পড়েছিল। গলিত দুর্গন্ধ শব—শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য—তবু তা এককালে, তার বাদশা তার প্রিয়তমেরই দেহ ছিল। নদীর বালি উড়ে এসে ঢাকা পড়েছে, তবু চিনতে অসুবিধা নেই। ঐ বালি সরালে এখনও হয়ত রক্তের আভাস, পচা মাংসের সঙ্গে জটপাকানো বালির ডেলা মিলবে—

এই ত—এইখানে—ছুঁড়ে ফেলে দিল ওড়না মুখ থেকে। ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল অলঙ্কার গা থেকে। বহুমূল্য সাটিনের কামিজও খুলে ফেলে দিল গা থেকে। তার ভেতরে সামান্য সুতীর যে জামাটা ছিল—সেইটে রইল শুধু, তারপর সেই সাধারণ দীনবেশে দীনা হৃতসর্বস্বা রমণী সেইবালির উপর লুটিয়ে পড়ল আর্ত হৃদয় ভাঙ্গা হাহাকারে। বালি—রুক্ষ, শুষ্ক, তীক্ষ্ণ বালিতে মুখ রগড়ে রাজ্যেশ্বরেরও লোভনীয় সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে তুলল—

'শাহানশাহ—জাঁহাপনা—মাপ করো আমাকে, মাপ করো। যেন আল্লার দরবারে পৌঁছে তোমাকে পাই আবার, যেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসর পাই।'

বুক ফাটা কান্না। নদীর ধার থেকে আসা বাতাসের হাহাকারের সঙ্গে মিশে সেই নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রের অন্ধকারে সে কান্নার শব্দ বহুদূর পর্যন্ত প্রান্তরকে প্রতিধ্বনিত করে তুলল। সে প্রতিধ্বনি ঘুরতে ঘুরতে লাল কিল্লার পাষাণ প্রাচীরে ঘা খেয়ে অদ্ভুত বিচিত্র আর এক শব্দের সৃষ্টি করতে লাগল। যেন কোন পিশাচ সেই রাত্রির বুক চিরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে চাইছে—

তবলচী তার বাঁয়াতবলার পুঁটুলি নামিয়ে দ্রুত ছুটে এসে বালির ওপরই নর্তকীর পাশে বসে পড়ল। জোর করে তার মুখটা তুলে নিলে নিজের কোলের ওপর।

'মালেকা, মালেকা—এ কি করছেন! এখনই সবাই জানতে পারবে যে। এতক্ষণের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ করে দেবেন? শান্ত হোন, চুপ করুন!'

অনেকক্ষণের অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলে লালকুঁয়ার। উঠে বসে মুখের ওপর থেকে বিস্রস্ত কেশভার সরিয়ে কেমন এক রকমের বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'ঠিক বলেছ ফাতিমা। আর কাঁদব না। কাঁদলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কাঁদবার দরকারও নেই। আমার শাহানশাহের মৃত্যুর শোধ নিয়েছি আমি। ফররুখশিয়রের সিংহাসন টলিয়ে দিয়ে এসেছি। সৈয়দদের সঙ্গে ঝগড়া করে পারবে না ও তা আমি জানি, কেউই পারবে না। মুঘল সিংহাসনকে জাহান্নামে পাঠাতেই এসেছে ওরা। ফাতিমা, আমি আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ফররুখশিয়ারের পরিণাম। কেউ বাদ যাবে না। খোদার বিচার নিক্তির তৌলে নামে। জুলফিকর খাঁ, আসাদ খাঁ তাদের বিশ্বাসঘাতকতার দেনা শোধ দিয়েছে কড়ায় ক্রান্তিতে। ফররুখশিয়ারও দেবে। ঐ ত্রিপোলিয়ার ফটকে ঠিক ঐ রকম ভাবেই প্রাণ দেবে—অকারণ নৃশংসতা এবং অপমানের দাম উশুল হবে। না, আর আমি কাঁদব না।'

ফাতিমার কাঁধে ভর দিয়েই উঠে দাঁড়ায় লালকুঁয়ার। যেতে গিয়েও কী মনে পড়ে যায় আবার।

খুঁজে খুঁজে কুড়িয়ে নিয়ে আসে বাদশার দেওয়া মতির মালা—আর কুড়িয়ে নিয়ে আসে দুটো পাথর। তার পর পাথরের ওপর পাথর ঠুকে পাগলের মত রেণু রেণু করে গুঁড়োয় সেই বহুমূল্য মতির মালা।

গুঁড়োনো শেষ হলে সেই চূর্ণ দু'হাতে মিশিয়ে দেয় সেইখানকার বালির সঙ্গে। আর অস্ফুট কণ্ঠে বিড় বিড় করে বলে, 'প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও শাহানশাহ—তৃপ্ত হও!'

পূবের আকাশে তখন রক্তিমাভা জেগেছে, দূরে এরই মধ্যে দু-একজন স্নানার্থীকে দেখা যাচ্ছে যমুনার চড়া ভেঙ্গে চলতে। অসহিষ্ণু ফাতিমা একরকম জোর করেই টেনে তোলে ওকে।—'চলুন মালেকা। বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

আবার বয়েল গাড়ী। ধীর মন্থর তন্দ্রাতুর গতি তার। তেমনি কষ্টকর। তেমনি বৈচিত্র্যহীন।

আবার সেই সোহাগপুরা সামনে। জীবন্ত-সমাহিত সেই জীবন। বিশ টাকা মাসোহারা এবং দুজনের মত আটা ডাল ঘি।

তা হোক। লালকুঁয়ার এবার পরিতৃপ্ত। সে তার মালিকের শেষকৃত্য ক'রে আসতে পেরেছে। আর কোন ক্ষোভ নেই। *

* সোহাগপুরা—মুঘল সম্রাটবংশের অধঃপতনের সময় যখন দ্রুত এবং ক্ষণে-ক্ষণে বাদশা বদল হত—তখন স্থানাভাবের জন্য বিগত বাদশার হারেমও অপসারিত করার প্রয়োজন হ'ত। নতুন যিনি বাদশা হতেন, তাঁরও একাধিক স্ত্রী এবং অসংখ্য উপপত্নীর স্থান সংকুলান হওয়া দরকার। এই সব বেওয়া বা বিধবাদের জন্যই সোহাগপুরার উপনিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সামান্য মাসোহারা এবং খাদ্যের বরাদ্দ ক'রে হৃতগৌরব রমণীদের পাঠানো হত সেখানে। সোহাগপুরা নামটা সম্ভবত ব্যঙ্গার্থে কেউ দিয়েছিল। মুঘল সম্রাট জাহান্দার শা'র মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়তমা নর্তকী লালকুঁয়ারকেও এইখানে পাঠান হয়।—ইতিহাসে আছে যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের শৌর্যে ফররুখশিয়ার সিংহাসন লাভ করেছিলেন, অকস্মাৎ তাদের সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ এবং বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েন এবং তার ফলেই তাঁর পতন ঘটে। শেষ পর্যন্ত জাহান্দার শা'র অনুরূপ অবস্থাই হয়।

"পরিতাপের বিষয় যে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষার্থিগণকে নবভারতের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনপ্রদ ভাবরাশি শিক্ষাদান করিয়া তাঁহাদের চরিত্রগঠনের কোন চেষ্টাই করিতেছেন না।"

—ডক্টর ফেলিক্স ভ্যালয়ী।

মীনাক্ষি চৌধুরী

প্যারিসে দু'বছর থেকে যখন ইটালীর বন্দর থেকে হংকংগামী 'ভিক্টোরিয়া' জাহাজে ভারত-উদ্দেশে রওনা হ'লাম, তখন আমার আধখানা মন প্যারিসে অন্য আধখানা ভারতে।

কাষ্টমসের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কেবিনের পথে পা দিলাম। তাপনিয়ন্ত্রিত জাহাজের স্নিগ্ধতা মনকে খানিকটা জুড়িয়ে দিলো। কাপড় বদলে ডেকে এসে বসতেই খাবার বাজনা বেজে উঠল। কি বলছে—সিনরিনা খেতে কি যাবে না?—সুরে শব্দের আভাষ পাচ্ছি, ধরি-ধরি করেও কথাগুলো ধরতে পারছি না।

প্রথম দফায় আমার পালা, চারজনের টেব্‌ল। প্রাথমিক শুভেচ্ছা ও সাধারণ সংবাদ বিনিময়ের পর দক্ষিণ ভারতীয় দম্পতির জিজ্ঞাসায় নাম বলতেই পাশ থেকে একটি খরখরে কণ্ঠের অভিযোগ শুনলাম,—আপনি বাঙ্গালী! এতক্ষণ বলেননি কেন?

পেটে ক্ষিদে ও হাতে মেনু নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম—মুসোলিনী কারি, টর্পেডোর হেল্ভা, বুর্জোয়া সুপ অনেক লোভনীয় নাম, এবার চোখ তুলে ভালো করে দেখলাম—সিনরা না সিনরিনা? দেখে বুঝবার উপায় নেই। উত্তর দিলাম,—আপনি যে বাঙ্গালী তা কি করে জানব?

দেখে বোঝা উচিত ছিল। আট দিন একটি বাংলা শব্দ বলবার সুযোগ হয়নি, তারপর আরও দশ মিনিট ধরে ইংরাজী বলাচ্ছেন! আপনি ত' খুব খারাপ লোক।

আর আপনি খুব ভাল মেয়ে। আপনারও দেখে জানা উচিত ছিল আমি বাঙ্গালী।

বারে! আপনাকে দেখতে একটুও বাঙ্গালীর মত নয়, সে দোষ কি আমার!

না, সব দোষ আমার। আপনাকে দেখতে খাঁটি বাঙ্গালিনী।

নিশ্চয়। গড়ন, চলন, বলন—সব, সব। ইচ্ছা হ'ল বলি, আর ঝগড়াটাও?—কিন্তু সুযোগ হ'ল না, মিঃ আইয়ার বাধা দিলেন, ইংরাজীতে বলুন না, সবাই বুঝতে পারি।

তৎক্ষণাৎ উত্তর এল, মাফ করবেন। মিঃ বোস ইচ্ছা করলে ইংরাজীতে উত্তর দিতে পারেন কিন্তু আমি ওঁর সাথে ইংরাজী বলতে পারব না। বলেই প্রতি-জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা নিজেদের মধ্যেও তামিল বললেন না কেন? স্বামি-স্ত্রীর ইংরাজী গল্প আমিও অবাক্ হই কিন্তু এত অল্পপরিচয়ে এত কঠিন প্রশ্ন! একটু অপ্রতিভ হ'লাম, কি জানি আলোচনা কোন দিকে গড়ায়।

মিঃ আইয়ার লজ্জিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমার স্ত্রী গুজরাটি। আমাদের খাওয়া শেষ হয়েছিল—বিদায় নিয়ে উঠে এলাম।

পরদিন দেখা হ'ল, আইয়ার-দম্পতি একটু দেরীতেই আসেন।

নমস্কার সিনরিনা—।

আমি সিনরিনা নই—

কাছে জাহাজী নামের তালিকা ছিল, দেখালাম—

"ওটা ছাপার ভুল, আমি সিনরা।

আচ্ছা তবে তাই, কিন্তু কে জানে। বেশবাস দেখলে বোঝা কঠিন।

বেশবাস কেন, জাহাজের তের-চোদ্দ দিনের পরিচয়েও যে বুঝতে পেরেছি তা মনে হয় না। কখনও শ্রীমতি, কখনও শ্রীযুক্তা; সিনরিনার মত হাল্কা, সিনরার মত নিশ্চিন্ত। আর ঝগড়া, যেন মৌমাছির হুল—সেটা কার মত কি করে বলব! সে কোনও পক্ষকেই চটাতে ভয় হয়।

আইয়ার-দম্পতি যথারীতি খাওয়া সেরে খেলতে চলে গেলেন। আমরা এসে ডেকে বসলাম। কথা হ'ল অনেকক্ষণ। অবশ্য প্রায় সবটাই একতরফা। আট দিন কথা না বলার শোধ বোধ হয় এক দিনেই ওঠাবেন। ইটালীর কাষ্টমস্ আর জাহাজ-অফিস আমায় বেশ জ্বালিয়েছে, তাদেরই প্রশংসা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা। আর বিশ্বাস করাও কঠিন—এই বিচ্ছু মেয়েকে নাকি ইটালীয়ানরা প্রতিপদে আত্মীয়ের মত সাহায্য করেছে! অনেকক্ষণ পরে বোধহয় খেয়াল হল যে, গল্পে আমার তেমন আগ্রহ নেই, তখন নমস্কার সেরে অন্য ধারে উঠে গেলেন।

ধীরে ধীরে পরিচয় হ'ল—মৌমাছির 'মতই চপল, যদি বলি একটা গান করুন না, চটপট উত্তর দেয়—কোন্‌টা? 'লাল গায় নীল সুর, হাসি হাসি গন্ধ'। খাবার টেবিলে মৌমাছির [illegible] যোগাড়ে জাহাজের রান্নাঘর পর্যন্ত এক-আধবার [illegible] আমরা সবাই প্রায় মাছ মাংস খাই না, তাই [illegible] হয়—বেগুনী, দই, নিরামিষ কাটলেট ইত্যাদি—[illegible] মাঝেই পাওয়া যায়।

অবশ্য মাতৃভাষার ঝোঁকটা আমার উপর [illegible] যায়। একটু এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। [illegible] উঠে যেতেই ভুকড়ীর মত ফেটে পড়লেন—ইংরাজী [illegible] সব দুর্বোধ্য বিষয় দিয়ে সময়টাকে ঘিরে রাখলেন, [illegible] প্রবেশ না করতে পারি। বেশ ত' আমার [illegible]

নেব। মিঃ আইয়ার বাংলা বোঝেন না, তার ভাবটা বোঝা যায়, কিন্তু আপনার নিজের ভাষা সম্বন্ধে এই বিপিতামুলভ ব্যবহার দেখলে রাগ হয়।

বললাম, কি মুস্কিল, এমন কোন ষড়যন্ত্র আমাদের ছিল বলে ত' মনে হয় না। আপনার যতক্ষণ খুশী গল্প করবেন, খাবার টেবিল ছাড়া কি আর সময় নেই, না জায়গা নেই।

আমার কোন দরকার নেই, ঐ যে মিঃ আইয়ার আসছেন, আপনি যান।

বেশ ত' যাচ্ছি।

তখনকার মত গেলেও মনে মনে শঙ্কিত হইনা। জানি, অনেক—অনেকক্ষণ ধরে যখন সমুদ্রের দিকে চেয়ে একলাটি বসে থাকবে, আমাদের খেলা যখন শেষ হয়ে যাবে, দুপুর কেটে গিয়ে বিকেলের ছায়া সমুদ্রের নীলকে গাঢ় করে তুলবে, তখন এই রাগ ওর থাকবে না। নমস্কার করে পাশের চেয়ারটায় বসলে ওব মন কথা কয়ে উঠবে ; সব রকম গল্প হবে, নতুন কোথায় ঝগড়া হ'ল সে খবরও পাব। আগেকার সব রাগ ভুলে বলে উঠবে,—আপনার শঙ্কর মুখার্জির সাথে হঠাৎ চায়ের টেবিলে পরিচয় হ'ল। কাইরো না নিয়ে যাবার জন্য বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি।

কি যে করেন, কারও এতটুকু ত্রুটি ভুলতে পারেন না।

কেন পারব না, খুব পারি। জীবনে অনেক কথাই ভুলতে হয়, তা যদি না পারতাম—ঐ দেখুন সমুদ্র, দেখেছেন কত কাছে! এর সামান্যতম অংশই ডুবে মরবার পক্ষে যথেষ্ট। তাই বলে যে ছেলে সারা সন্ধ্যা মেয়েদের সাথে নাচতে পারে, সে কি না বলে, পথে নারী বিবর্জিতা! হ্যাঁ—সেই নারী যদি নিজের দেশের আর বিবাহিতা হয়।

তাই বলে প্রথম পরিচয়েই আপনি ঝগড়া করবেন! আপনার দেখছি কেউ বন্ধু হবে না।

বন্ধু হবার হলে এমনিই হয়। না হলেও কোন ক্ষতি নেই আপনার মিছে সহানুভূতি দেখাতে হবে না।

বন্ধু হবার হ'লে এমনিই হয়—তা ঠিক। তার পরিচয় শেষের দু'দিন পেলাম। সারা সকাল, সমস্ত বিকেল, রাত বারোটা—একটা-দুটো পর্য্যন্ত যে মেয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয় না, সিনরার মত নিশ্চিন্ত, সিনরিনার মত হাল্কা মনে যার অফুরন্ত কথা ; কাছে বসলে যে মেয়ে চোখে মুখে খুশী হয় ; যে মেয়ের কাছে বসতে সঙ্কোচ নেই, না উঠে আসতেও বাধা নেই ; সে মেয়ের কাছে জাহাজ ভেঙ্গে পড়লেও আলাপীর অভাব হয় না। ঝগড়া, তর্ক, হাসিতে ঢেউ-জানো-ডেক রাত বারোটা পর্য্যন্ত রোজ জেগে থাকে, বরং তাদের মধ্যে আমিই যাই হারিয়ে।

জাহাজ, বরাবর খুব শান্ত ছিল ; এডেনের কয়েক ঘণ্টা আগে এক ভয়ানক দুলতে সুরু করল—করাচী পর্যন্ত তা থামল না,—পুরো জাহাজ। প্রায় সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমন যে হবে যাত্রীদের আগেই তা জানা ছিল। তাই আমাদের খেলা, বল, নাচ গান—ইত্যাদি উৎসব হ'ল এডেনের আগের রাত্রেই।

সারাদিন মনটা ঠিক একত্র ছিল না। আধখানা মন ও পিছনে, আর আধখানা ঘরের দিকে ; সেখানে একটি প্রাণ দুয়ার ধরে দিন আর রাতের প্রতি মুহূর্তটি গুণছে। যত এগিয়ে

যাচ্ছি, মন ততই খণ্ডিত হচ্ছে, এক দিকের চিরবিচ্ছেদ, অন্য দিকের দর্শনব্যাকুলতা—দুইয়ের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি।

রাতের খাওয়া হলে নাচ-ঘরে এলাম, ভালই লাগল। দ্বিধাখণ্ডিত মন বুঝি একত্র হবার জন্য তৃতীয় কিছু চাইছিল। আমার টেবল-সঙ্গিনীকে দেখলাম একলাটি বসে। বেচারী! হয়ত প্রতিজ্ঞা করেছে আমার ভাষাপ্রীতির উপর আর জুলুম করবে না। এমন প্রতিজ্ঞা দিনে অনেক বারই করে। কাছে গিয়ে বসলাম। কোথায় প্রতিজ্ঞা! সমস্ত মন ওর যেন কলকল করে উঠল। ইচ্ছা করলেও এ মেয়ে চুপ করে থাকতে পারে না। অনেকক্ষণ ধরে আমায় শুনতে হ'ল বলনাচের ইতিকথা। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কখনও নেচেছেন?

না, নাচি নি। নাচের নিয়ম সামান্য জানি। যাবার পথে মিঃ রাজানি সবাইকে শেখাচ্ছিলেন কিন্তু কখনও অভ্যাস করি নি। আমাদের স্কুলেও বিনা পয়সায় শেখাত—সময় ছিল না, দরকারও হয় নি। অবশ্য সংস্কারগত কোন বাধা নেই, আমার আগে অনেক দিন গ্যাসট্রিকে ভুগছিলাম, ডাক্তার এক দিন বললেন, একলাটি থাকেন—নাচে যান না কেন, ওতে শরীর-মনের একটু চেঞ্জ হয়, দাঁড়ান, আমি সাথে করে নিয়ে যাব। তার পরে ত' হঠাৎ চলেই এলাম।

একটানা গল্পে আবার অন্যমনা হয়ে পড়ছি, সেটা কাটাবার জন্য বললাম, চলুন না একটু নাচি।

হাউয়ের মত দশ দিক ছড়ানো কথা নিমেষে চুপসে গেল। মিইয়ে যাওয়া গলায় উত্তর পেলাম—বললাম, যে জানি না।

চলুন, আমি শিখিয়ে দেব।

বলছি জানি না। আর কি শাড়ীতে এসেছি, এই কি নাচের পোষাক!

আমার মনে তখন জিদ্ চেপেছে। ডান হাতখানা পিঠে রেখে বলি, অজুহাত ছাড়ুন, জানেন ত' কেউ অনুরোধ করলে, না করতে নেই।

প্রথমদিনের খরখরে গলা ছলছলে হয়ে উঠেছে—এমন করে অনুরোধ করবেন না। জানি না যে, বরং শিখে নিয়ে আর একদিন নাচব! রোজকার কড়া আওয়াজ নরমে ভিজে গেছে; অমন বেয়াড়া, চড়া হালচালের পিছনে এমন স্পর্শাতুর মন আছে বুঝতে পারলে অনুরোধ করতাম না। সাদা চোখেও নাচের নেশা লাগে। এ নেশা যে ধরিয়েছে তার মুখের আদল দেখতে পেলাম নাচঘরের ছায়া ছায়া আলোতে, পার্শ্ববর্ত্তিনীর মুখে। নতুন করে যখন বাজনা বাজল আমরা তখন দলে। কিন্তু সঙ্গিনীর মুখ শ্রাবণের আকাশের মত ভারী, কানের কাছে ফিসফিস মিনতি—চলুন ফিরে যাই, সবাই যে হাসবে।

কে কাকে দেখছে, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, বাঃ এইত বেশ হচ্ছে।

ছাই হচ্ছে, আপনি আমায় ধর্মচ্যুত করছেন।

চমকে উঠলাম, কেন!

না জেনে কোন কিছু করা মানেই তার ধর্ম থেকে চ্যুত হওয়া।

সব কিছুই ত' প্রথমদিন না জানা দিয়েই সুরু হয়।

সেটা সবার আড়ালে।

বাজনা থেমে গেল কিন্তু মুখভার গেল না।

অনুতপ্ত হয়ে বলি, মাফ করবেন। আমি ভাবিনি আপনার এতটা খারাপ লাগবে।

কেন মাফ করবো! এতবার বললাম না,—না। এমন নাছোড় অনুরোধ করবেন জানলে নাচ শিখে তবে জাহাজের টিকিট কিনতাম। আমার আগে খবরটা পাঠালেই পারতেন!

কেন এত রাগ করছেন। কেই বা দেখেছে, কেই বা জানে যে আপনি নাচতে জানেন না।

কেউ কেউ দেখে। আমিই দেখি। দেখুন ঐ নীলশাড়ী সাদাসার্ট জোড়াটি কেমন মানিয়েছে, সবাই কি অত ভাল পারে, না সবাইকে অমন মানায়।

বেশ ত' এর পরদিন ভালো করে শিখে নাচবেন। তখন আপনাকেও সুন্দর দেখাবে।

ছাই দেখাবে।

এরপর অনেকক্ষণ ডেকে বসেছিলাম—অমন কথাবলা মেয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেল। মনে পড়ল লিডোর সেই কচি মেয়েটিকে, প্রথম প্রবাস-বেদনা যে থিতিয়ে এনেছিলো—নাচ দিয়ে নয়, তার লাজুক মুখের মায়া দিয়ে। তার নৃত্যজীবনের অগৌরবকে অনেক দিন সহানুভূতি দিয়ে মুছে নিতে মন চেয়েছে। তার জীবনে হয়ত কোন গ্লানিই ছিল না, লজ্জার ভাণটুকু তার অভিনয় আর সব আমার কল্পনা; সেই লজ্জা আজ একটি মেয়ের মুখে দেখলাম আর তার কারণ আমি নিজে। অনুতাপে মন ভরে কেবিনে নেমে এলাম—রাত তখন একটা। একটি মুখ অনেকক্ষণ আমার মনে আসা যাওয়া করতে লাগল।

সত্যি; কেউ কেউ দেখেন আর তা নিয়ে ঠাট্টাও করেন, দিদিত' খুব সুন্দর নাচতে পারেন—ঠাট্টা করবেন না, অপরপক্ষ লজ্জিত হয়ে উত্তর দেয়, কারুই বলতে পারেন—প্রথম পায়ে-খড়ি। কিছুতেই যাবো না—অর্দ্ধপথে ছেদ পড়ে—কিছুতেই না গেলে কে নিয়ে যেতে পারে!

এরপর নাকি দু'চারটে মিষ্টি কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে এসেছে। আমার জিদের ফল অন্যকে ভোগ করতে হ'ল শুনে অপ্রস্তুত হলাম, দেখা হতেই বললাম—

আপনাদের নাকি ছোটখাট একটি যুদ্ধ ঘটে গেছে। যাই হোক, আমি খুব দুঃখিত।

এ রকম মিথ্যে বলবার দরকার! আপনার দুঃখের পরোয়াও কেউ করে ফের। এইই হয়, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কোন কাজে অংশ নিলে তার ফলটুকু ঠিকই ভোগ করতে হয়।

বিকেলে একলা বসে আছি, আবার এলো—

আপনি বুঝি ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন?

বড্ড সোজাসুজি আক্রমণ করেন—

প্রথম আলাপেই বললেন না কেন। তাহলে আপনাকে গল্প শুনে শুনে এত কষ্ট পেতে হত না।

আত্মরক্ষার এ উপায়টা জানা থাকলে নিশ্চয়ই কাজে লাগাতাম।

সত্যি, একজন ডক্টরের সাথে কি এমন সাত সতের, আজে বাজে গল্প করা উচিত—

কথার এত অপচয় কি কারো সাথেই করা উচিত!

সে আমার খুশী, বাংলা যার ভাষা—গান গেয়ে আর কথা বলে—, তার যায় যদি দিন যাক্ চলে।

কাজ না করার জন্ম ভগবান শাস্তি দেবেন।

জানি। সে যাক্—আপনার প্রথমেই বলা উচিত ছিল, এরকম ঠকানোর মানে হয় না। পণ্ডিতদের সমীহ করতে হয় এ আমিও জানি, যা, তা গল্প করতে সঙ্কোচও হয়। কিন্তু এখন আপনার সাথে গম্ভীর হয়ে, নমস্কার কেমন আছেন ভালো ত'—এরকম করে কথা বলা আমার পক্ষে ভাবুন ত' কত কঠিন। এখন আমি কি করি? কি দরকার ছিল আপনার এত উঁচু ডিগ্রী নেবার!

সত্যিই ত' কি দরকার ছিল—বারবার তাই ভাবি।

করাচীতে পৌছুন'র আগের রাতে ক্যাপ্টেন আমাদের ভোজ দিলেন—পয়সা নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেনের নয়, আমাদেরই—, নামটা ক্যাপ্টেনের; সাথে নাচও ছিল, 'এক্সকিউজ মি' নাচ—তাতে বুঝি সবাইকেই অংশ নিতে হয়। সেদিন সে তার কথা রেখেছিল। নাচ কতটা নিখুঁত হয়েছিল জানি না—কিন্তু আগের দিনের অনমনীয় মন পালকের মত হাল্কা হয়ে উঠেছে। সেদিনের নিপ্পাড় শাড়ীতে পাড়ের রেখা পিছনে একহাত চওড়া জড়ি-আঁচল; ছুটি হাতে নির্ভরতা; তার দেহের ছোঁয়া মেয়েমন হয়ে আমার কানে বলেছে—আমাকে যে আহ্বান করে, স্বীকার করে, আমি তাকে আনন্দ ও শ্রীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা করি।—মায়ামাখানো রাত জীবনে কমই আসে। আমার ডান হাত বারবার খসখসে জড়ি থেকে পিছলে যাচ্ছে, এই নির্ভরতার দাম দেবার মত সম্বল আছে কি না তারই হিসাবে বার বার ভুল হচ্ছে তাই এ অন্যমনস্কতা—নয় ত' জড়িটাই বোধহয় খুব পিছল।

করেছেন কি! এমন খসখসে জড়ি যে সামলান কঠিন—হাল্কা গলায় আস্তে আস্তে বলি।

প্রথমদিন ঝগড়ায় যতটা বিরক্ত হয়েছিলাম—সজাগ দৃষ্টিতে তার চেয়ে কম বিব্রত হইনা। সমুদ্র-পীড়ার ছ'তিন দিন বিশ্রী কেটেছে, খাওয়ার সময়টা আমার কাছে শাস্তি বিশেষ। সদা-জাগ্রত দৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন।

না খাবার কি হয়েছে। না খেলে কষ্ট আরও বাড়ে, বাড়ীতেও' পৌছুতে হবে! দাঁড়ান লেবুর রস করে আনছি, দেখবেন ভালো লাগবে।

ছাড়ুন, আমিই করে নিচ্ছি। কে কোথা আবার কোন্ মন্তব্য করবে।

করুক, ক্ষতি কি।

মিছিমিছি আলোচনাটাই ক্ষতি।

মিথ্যে আলোচনায় আমার ত' মজা লাগে।

মজা। ছ'টি লোকের পরিচয় নিয়ে কথা ছড়ালে আপনার ভয় করেনা?

ভয় করবে কেন! ভয় ত' ঘটনাকে, ভয় ত' নিজেকে। যেখানে সে ভয় আছে তার দাম পুরোপুরি নিজেকেই দিতে হয়—লোকে আলোচনা করুক—চাই, নাই করুক। যেখানে ঘটনাই নেই, সেখানে ভয় কিসের? নির্ঝঞ্ঝাট মন নিয়ে রোদে বসে আচারের মত একটু একটু করে লোকের রটনা উপভোগ করতে তো তখন ভালো লাগে।

আমার ভালো লাগে না। লোকের কথাকে আমি ভয় করি, বিরক্ত হয়ে উত্তর দিই।

যে ঝগড়ার সুরু আমার সাথে তার শেষ 'বন্'-এর সর্দারজী-পত্নীতে, যাকে সে বলত সর্দারণী। অন্তত সেটাই সহযাত্রী পরম্পরা আমার কানে শেষ পৌছয়। এ বিষয়ে কোন কথা হয়নি সময়ও ছিল না।

করাচীতে নামার ইচ্ছা ছিল—ছ'চার জনকে জিজ্ঞাসা করতে সর্দারণী বুঝি ঠাট্টা করেছেন—

আপনি কি আমাদের সাথে যাবেন!

কেন যাবো না, আপনাদের অসুবিধা না হলেই যাবো।

আমাদের অসুবিধা কিসের, আমরা ত' সকলের সাথেই মিশি। আপনারই দাদা ছাড়া কারও সাথে গল্প করতে মন চায় না।

প্রথম থতমতটুকু সামলে নিয়ে নাকি কঠিন কণ্ঠে জবাব দিয়েছে, ঠিক যে জবাব ওঁরা চাইছিলেন।

হ্যাঁ, দাদাকে আমি ভীষণ ভালবাসি।

মিথ্যে সমালোচনা যে ভালবাসে, তার কোন ভয় নেই, কিন্তু আমি। বিরক্তি দিয়েই আমার মন সুরু করেছিল, কিন্তু সে অকৃপণ সঙ্গ, অফুরাণ কথা দিয়ে আমার দ্বিধা-বিভক্ত মনকে বারবার জুড়ে দিয়েছে। যদি অনেক অনেকদিন আগে এই জাহাজে ফিরতাম, তাহলে—তাহলে কি, মিথ্যে সমালোচনাকে ভয় করতাম না, তার মুখোমুখী হতে পারতাম?

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য-প্রভাবে আমার জীবনের উন্মেষ। নিবেদিতার মত আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ! আজ যদি স্বামিজী জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁহাকে আমি নিশ্চয়ই গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—একথা বলাই বাহুল্য।"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

ললিতাম্বিকা অন্তর্জনম

[ললিতাম্বিকা অন্তর্জনম মালয়ালম সাহিত্যের প্রখ্যাত ছোট গল্প লেখিকা। তিনি এক গোঁড়া নাম্বুদিরী (কেরলীয় ব্রাহ্মণ) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নাম্বুদিরী পরিবারের স্ত্রীলোকেরা অন্তর্জনম নামে পরিচিতা হন। এঁনার লেখার মধ্যে নাম্বুদিরী সমাজের আচার ব্যবহার রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়]

রাজম্মা যখন খুব ছোট্ট ছিল আর শিশুশ্রেণীতে পড়তো তখন অনেক বার সে তার বাবাকে মার কাছে বলতে শুনেছে—আমি আমার রাজম্মাকে গাঁয়ের মেয়েদের মতো মানুষ করবো না। ওকে আমি ইংরাজী পড়াবো, অনেক লেখাপড়া শেখাবো, তারপর ওকে কলেজে পাঠাবো। যখন রাজম্মা এম-এ পাশ করবে তখন ওকে আমি বিলেতে পাঠাবো। তবে ওর চাকরী করার তো দরকার নেই। আমার দেড় লক্ষ সম্পত্তির মালিক আমার রাজম্মা। ওকে খাওয়া পরার জন্য পয়সা রোজগার করতে হবে না। রাজম্মা একথা শুনে তার ক্লাসের বন্ধুদের বলেছিল—এই জানিস—আমার বাবা আমাকে অনেক লেখাপড়া শেখাবে, তার পর আমি কলেজ যাবো, আর তার পর বাবা আমাকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাবে।

ওর সহপাঠিনীরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে।

ইংল্যাণ্ড! সে আবার কোথায়?

ওঃ—ইংল্যাণ্ড এখান থেকে অনেক—অনেক দূরে। আমার বাবা বলেন সেখানে নাকি সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না।

সে আবার কি রে, সূর্য্য অস্ত যায় না, সে কেমন দেশ? তুই সেখানে তাহলে ঘুমোবি কি করে? সেখানে তো রাত নেই।—না বাবা তোমার ইংল্যাণ্ডে আমরা যাচ্ছি না। তুমি একাই সেখানে যাও।

রাজম্মা ভাবলো ওর বন্ধুদের মা-বাবা তো কোন দিন তাদের ইংল্যাণ্ডে পাঠাবে না, তাই তাদের ঈর্ষা হয়েছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে সে যাবেই, কোনও বাধা মানবে না। সে পড়বে, অনেক পড়বে, এম-এ পাশ করবে আর দেড় লক্ষ সম্পত্তির মালিক হবে। তখন কি আর ইংল্যাণ্ডে যাওয়া কঠিন হবে।

কিন্তু যখন সে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ করলো, তখন তার বাবা শঙ্কর পিল্লে চিন্তিত ভাবে বললেন—ইংরাজী স্কুল তো এখান থেকে মাইল চারেক দূর। রাজম্মাকে যদি ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করে দিই তাহলে বেচারীকে এই রোদে হেঁটে হেঁটে অতদূর যেতে হবে। নাঃ ও বেচারী অত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। আপাতত একজন গৃহশিক্ষক রেখে ওকে বাড়ীতে পড়াই, তারপর উঁচু ক্লাশে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেই হবে। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের গাড়ী কিনে ফেলবো। তখন ওর যাওয়া আসার কোনও ভাবনা থাকবে না।

স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক মালয়ালম সপ্ত শ্রেণী অবধি পড়েছিলেন। রাজম্মার বাবা তাঁকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। তিনি ক'দিন পড়াতে এলেন। তিনি শুধু নিজের নামটি কোনও রকমে ইংরাজীতে লিখতে জানতেন। তাই রাজম্মার নামটি পর্য্যন্ত তিনি ইংরাজীতে লিখতে শেখাতে পারলেন না।

রাজম্মার বাবা বললেন—মেয়েদের ইংরাজী পড়ে কি হবে। মেয়েরা যদি এম-এ, বি-এ, পাশ করে তাহ'লে তাদের বিয়ে করবে কে? আজকাল এইরকম পাশ করা বয়স্কা মেয়েদের ছড়াছড়ি, তাদের বিয়ে হওয়া কি মুশকিল। এত লেখাপড়া না শিখিয়ে রাজম্মাকে যদি আমি গানবাজনা শেখাই তাহ'লে অনেক কাজ দেবে। রাজম্মা গান সেলাই আর ছবি আঁকা শিখুক। বাড়ীতে একজন একদিন বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর কাছে রাজম্মার কথা বলতে বলতে শঙ্কর পিল্লে বললেন—দেখো, আমার মেয়েকে আমি গানে এমন পণ্ডিত করে তুলব যে, ও 'গীতবাণী' আখ্যা না পেয়ে যায় না।

রাজম্মা বাবার এই কথা শুনে খুব খুশী হোলো। সে সত্যিই গান খুব ভালো বাসতো। তাদের স্কুলের বার্ষিকী উপলক্ষে একটা মেয়ে গান করেছিল। তার সেই সুতীক্ষ্ণ গলার গান শুনে লোকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। যদি সে আজ বীণা বাজিয়ে গান করে তাহ'লে তার মত সুগায়িকার ভাগ্যে কি প্রশংসা লাভ না জুটবে। কথাটা ভাবতেই রাজম্মার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। রাজম্মার বাবা বললেন—আগে রাজম্মা গানের স্বরলিপি শিখুক, তার জন্যে নাম্বু পাম্বিক্করই যথেষ্ট। কিছু দিন পরে আমি ওস্তাদ সম্বাশিব ভাগবতরকে আমার মেয়ের গান শেখার ভার দেবো।

মন্দিরেতে নাগেশ্বর বাজাতো নাম্বু পাম্বিক্কর—সে এলো রাজম্মাকে সংগীত শিক্ষা দিতে। পাঁচ-ছয় মাস পরে ঠিকমত মাইনে না পাওয়ায় নাম্বু পাম্বিক্করের সঙ্গে রাজম্মার বাবার ঝগড়া হোলো। এর ফলে সে আর রাজম্মাকে গান শেখাতে এলো না। তত দিনে রাজম্মা সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি শিখেছে। ওর বাবা বললেন—কেন, রাজম্মার বেশী কিছু শেখার দরকার কি? আমার দেড় লাখ সম্পত্তির মালিক আমার এই মেয়ে। ওর এই সম্পত্তির লোভেই কত বি-এ, এম-এ, পাশ পাত্র এসে সাধাসাধি করবে। কেন, এই তো কিছু দিন আগে পেস্কার শঙ্কুণ্ণি মেনন তার ছেলের কথা বলছিল। তা ছাড়া পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও তার ছেলের বিষয়ে একবার ইঙ্গিত দিয়েছিল। ওর ছেলেকে যদি বিয়ের পর ইংল্যাণ্ডে পাঠাই তো এক্ষুণি সে তার ছেলের সঙ্গে রাজম্মার বিয়ে দেয়। কিন্তু রাজম্মার আমি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেব না। পনের বছর ওর পূর্ণ হোক, তার পর দেখা যাবে।

রাজম্মা বাবার এই কথা শুনে মনে মনে খুবই খুশী হ'লো। রাজম্মার অবশ্য মনে মনে পেস্কারের ছেলের চেয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের

ছেলেকেই বেশী পছন্দ। সে ভাবলো, একটা সামান্য কনষ্টেবলের উ-এরও কি সম্মান! ওদের গ্রামে ভারীদের বউ—বাবা! মূলোর তো বড় বড় দাঁত। তারই বা কি প্রতিপত্তি। তাহ'লে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পুত্রবধূ হ'লে তার অবস্থাটা কল্পনা করতেই রাজম্মার শিহরণ লাগছিলো। ক'দিন ধরে রাতের পর রাত সে শুধু সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বাংলোর স্বপ্ন দেখল। কি আড়ম্বর, কত জাঁকজমক, কত পুলিশ, কনষ্টেবল আর সে এদের সকলের ওপর তার আদেশ খাটাচ্ছে। সত্যি, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়।

আর এমনি ভাবে রাজম্মার পনের বছর পূর্ণ হ'লো। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা পেস্কার কারুরই কাছ থেকে কোনও খবর এলো না। রাজম্মা ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল—মনে মনে সে ভাবছিল যে, কি অদ্ভুত বোকা এই লোকগুলো। তার মত মেয়েকে পুত্রবধূ করার জন্যে তাদের কি একটুও আগ্রহ নেই।

এক দিন সে শুনতে পেল তার বাবা তার মাকে বলছেন—এত তাড়াহুড়ো করারই বা কি দরকার। আজ-কাল কেই বা এত শীগগির বিয়ে করে। আমাদের স্কুল-ইন্সপেক্ট্রেস জানকী আম্মাকে দেখ। মাসে দু'শো পঞ্চাশ মাইনে পায়, বয়স হোলো পঁয়ত্রিশ। এখনও অবধি তার বিয়ে করার কোনও চাড় নেই। আর মেরী মামেন, পঁয়ত্রিশ বছর তারও হোলো। সে এখনও পড়ছে। লেডী ডাক্তার চেলম্মার কথা কে না জানে। বিয়ের সময় তার দু'চারটে চুল সাদা হ'য়ে গিয়েছিল আর তিনটে বাঁধানো দাঁত। আজ-কালকার দিনে বাল্যবিবাহ শুধু সেকেলেই নয়, অত্যন্ত কষ্টদায়কও বটে। ভেবে দেখতো প্রত্যেক বছর সন্তানের জন্ম দেওয়া, তাদের দেখাশোনা মানুষ করে তোলার খরচ আর দায়িত্ব কতখানি। তুমি ভাবছ তোমার যেমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কেটেছে সেই রকম আর সকলেরই হোক্—তাই না?

রাজম্মা ভাবলো ঠিকই তো। মা প্রত্যেক বার একটি করে নতুন অতিথির আগমনে কি বিপর্যস্তই না হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক বছর নতুন অতিথির আবির্ভাব আর তাদের মৃত্যু। তার মায়ের অতগুলি সন্তানের মধ্যে একমাত্র সে-ই বেঁচে আছে—এই জন্যই বাবা তাকে এত ভালোবাসেন। আর এই রকম ভাবেই রাজম্মার সব আশার সমাধি তার অন্তরেই রচিত হ'ল। একটা আশার মৃত্যুর পর যখন আর একটা নতুন আশার আবির্ভাব হ'তো তখন হৃদয়ের আকুল কামনা দিয়ে সে সেই আশাকে সঞ্জীবিত করে রাখতো। তাই এক আশার মৃত্যুর পর হৃদয়ে যে শূন্যতা জাগতো অন্য আর এক আশার আবির্ভাব তার সেই শূন্যতাকে উড়িয়ে দিয়ে তার মনকে জীব সতেজ করে রাখতো।

এমনি করে রাজম্মার আঠারো বছর পূর্ণ হ'ল, তারপর বিশ আর এখন তার বয়স পঁচিশ। পাড়ার অন্য মেয়েরা তাকে 'দিদি' ব'লে ডাকত। তাদের এই 'দিদি' ডাকের উত্তর দিতে তার নিজের মনে কেমন যেন একটা লজ্জা হ'তো। সত্যিই সে এত বুড়ো হ'য়ে গেল। তাদের পাশের বাড়ীর সারদার কথা তার মনে পড়লো। তার চেয়ে সারদা পাঁচ বছরের ছোট, এখন সন্তানের জননী। সারদা আলওয়েতে তার বিয়ের চন্দ্রিকা যাপন করেছিল। তার স্বামী সেখানকার পোষ্ট অফিসে মাষ্টার। তার বিয়ের দিনই তার বর তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

রাজম্মার বালকৃষ্ণ বলে এক খুড়তুতো ভাই ছিল। খুব ছোটবেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে খেলাধূলো করতো, দুজনের দুজনকে খুব ভালও লাগতো। বালকৃষ্ণ হয়তো তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। একদিনের কথা তার মনে পড়লো, সেদিন ছিল চাঁদনী রাত। ওরা দুজনে বাইরের বারান্দায় বসে গল্প করছিল। হঠাৎ বালকৃষ্ণ রাজম্মার হাত দুটো তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল—রাজম! তুমি যখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ঘরে যাবে তখন কি আমাকে ভুলে যাবে? বালকৃষ্ণের চোখে যেন অন্য কি এক দৃষ্টি ছিল আর কথাগুলো বলতে বলতে তার গলাটা কেমন যেন ভারী হয়ে এসেছিল। রাজম্মা তার হাত দুটো জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গিয়েছিল। কি আস্পর্ধা! সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ভাবী পুত্রবধূর এত কাছাকাছি আসার দুঃসাহস সামান্য বালকৃষ্ণের হোলো। তারপর রাজম্মা তার আচার আচরণে বালকৃষ্ণকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে অনেক তফাৎ।

বালকৃষ্ণ এখন বিবাহিত। তার বউ উত্তর কেরলার এক জমিদারের মেয়ে। সে একশ' বিঘে জমির মালিক। রাজম্মার বাবা এই বিয়ের কথা শুনে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলেছিলেন—শুধু একশ' বিঘে জমি। দশ হাজার হ'লে. বোধ হয় ঐ নিগ্রোর মত কালো মেয়েকে বিয়ে করা যায়। আমার রাজম্মাকে একবার দেখ। দেখ তার সোনার মত রঙ। যে কোনও বড় জমিদার তার সমস্ত সম্পত্তি আমার রাজম্মার পায়ের কাছে ফেলে বসবে।

কিন্তু মজাটা এই যে, একটি জমিদারও তাদের সমস্ত সম্পত্তি রাজম্মার পায়ের কাছে ফেলে দিতে এগিয়ে এলনা। বোধ হয় আজকালকার যুবকেরা সৌন্দর্যের চেয়ে একশ' বিঘে জমিই পছন্দ করে।

কিছুদিন হোলো শঙ্কর পিল্লে অপরিচিত লোকদের নিমন্ত্রণ করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া শুরু করেছিলেন, যদি গ্রামে কেউ নতুন লোক আসতো তো শঙ্কর পিল্লে তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্যে সাদর নিমন্ত্রণ জানাতেন। তারপর বাড়ী নিয়ে গিয়ে তিনি কোনও না কোনও প্রকারে নিজের মেয়ের গুণগান বর্ণনা করতেন। রাজম্মা কেমন ভালো রান্না

জানে, সেলাই জানে, তার কত বুদ্ধি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি শঙ্কর পিল্লে এ কথাও বলতেন যে, রাজম্মাকে ছাড়া তাঁর চলে না বলে তিনি এত দিন তাঁর মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেন নি। তবে কাজটা অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো হয়েছে। রাজম্মাকে ছাড়া দিন কাটানো এইবার শিখতে হবে। কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিরা এ সম্বন্ধে একটাও কথা বলতো না। এমন কি, এত চা কেক্ খাওয়ার পরেও নয়। তাদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ গোপনে অনুসন্ধান করলো—বুড়োটা মেয়ের জন্য কত দিতে রাজী আছে? কেউ কেউ বললো—হাড়-কৃপণ বুড়ো।

রাজম্মার এখন বেশ বয়স হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি তাকে যারা দেখতে এসেছিল তাদের অনেকের চেয়ে তার বয়স বেশী। তখন শঙ্কর পিল্লে অন্য রাস্তা ধরলেন। এবার অপরিচিত যুবকদের আগমন কমে গিয়ে ঘটকদের আনাগোনা শুরু হোলো। ঘটকদের এক জন বললো—আজ-কালকার দিনে যৌতুক ছাড়া বিয়ে নেই। এখন মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের ভাবী জামাইদের বিলেতে অথবা অন্য অন্য জায়গায় উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাচ্ছে। যদি ভালো জামাই চান তাহ'লে তার দাম আপনাকে দিতে হবে।

শঙ্কর পিল্লে বললেন—সত্যি কথা। কিন্তু রাজম্মা আমার একটি মাত্র মেয়ে। আমার সব সম্পত্তি তো এক দিন তারই হবে।

না, আমার তো মনে হয় না যে, এতে কাজ দেবে। পয়সা-কড়ির ব্যাপারে সোজাসুজি নগদই ভালো।

শঙ্কর পিল্লে বললেন—বেশ তাই দেবেন। আপনি ভালো দেখে পাত্র জোগাড় করুন।

সম্প্রতি কিছু দিন হোলো শঙ্কর পিল্লে মোক্তারদের খুব গুণগান বর্ণনা করে বেড়াচ্ছিলেন। ওঃ মোক্তারদের কি প্রতাপ! কি সম্মান! কি ভালো কাজ। কৃষ্ণপুরে সেই যে মোক্তারটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, সত্যি এমন অমায়িক মার্জিত রুচিসম্পন্ন ছেলে আর দেখা যায় না। তিনি এক দিন কৃষ্ণপুরে গেলেন। বাস, তারপরেই তাঁর মত বদলে গেল—ওঃ মোক্তারদের কথা না বলাই ভালো। জঘন্য। তার চেয়ে উকিল ভালো। তাদেরও অনেক টাকা আয় আর প্রভাব-প্রতিপত্তিও কম নয়।

রাজম্মা তার বাবার এই সব কথা শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতো আর ভাবতো—সত্যি এদের যে-কোনও এক জনের সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হোতো।

একবার এক স্কুল-মাষ্টারের সঙ্গে রাজম্মার বিয়ে প্রায় সব ঠিক হয়ে এসেছিল। এমন কি, বিয়ের মণ্ডপ পর্য্যন্ত বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। শঙ্কর পিল্লে বললেন—শিক্ষা প্রচারের মতো মহান কাজ আর কি আছে আর বিশেষ করে এই স্কুল-শিক্ষকটির তুলনা হয়না। এই শিক্ষিত ভদ্র ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে হলে রাজম্মা সত্যিই সুখী হবে। এক হাজার টাকা যৌতুক দিতে শঙ্কর পিল্লে রাজী হলেন। কিন্তু ঠিক বিয়ের আগে এক হাজারের পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিতে গোলমাল হওয়ায় বিয়ে ভেঙে গেল। শঙ্কর পিল্লে অত্যন্ত চটে গিয়ে বললেন—হতভাগা গলায় দড়ি দিয়ে মরুক। আমার মেয়ের একটা গরীব স্কুল মাষ্টারের চেয়ে অনেক ভালো পাত্র জুটবে। প্রথম থেকেই আমার এ বিয়েতে বিশেষ মত ছিল না। কেবল বন্ধুদের তাগিদে রাজী হয়েছিলাম। ভালোই হয়েছে। হতভাগা ভিখিরী কোথাকার।

পরের মাসে রাজম্মার ত্রিশ বছর পূর্ণ হোলো। খুব নিঃশব্দে রাজম্মার জন্মদিন পালন করা হোলো। শঙ্কর পিল্লেকে রাজম্মার বয়স কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন—রাজম্মার বয়স? এই ষোলো কি সতের। ঠিক মনে পড়ছে না। সেই যে বছর আমি অ্যাসেম্বলীতে আসন পেলাম, সেই বছরই তো ওর জন্ম। এই তো সেদিনের কথা।

একদিন রাজম্মা শুনতে পেল যে এক ঘটক ওর বাবাকে বলছে আজকালকার ছেলেরা ছোট মেয়ে বিয়ে করতে চায়। যদি মেয়ের বয়স ষোলো বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তারা সেই মেয়ের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। আঠার বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তো আর কোনও আশাই নেই। মেয়েদের নৈতিক চরিত্রে আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস কমে আসছে। তাই তারা অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে করতে চায়।

শঙ্কর পিল্লে তা শুনে বললেন—বিয়ে না হয় ওর নাই হবে, কেন ওর কি খাওয়া পরার ভাবনা আছে।

তবে রাজম্মা ভাগ্যবতী। একদিন ভদ্রচেহারার একটি লোক তাদের গ্রামে এলেন। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। জানা গেলো ভদ্রলোক নাকি সাংবাদিক। তবে তাঁর চেহারা দেখে মনে হয়েছিল তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট বা তহশীলদারগোছের কিছু হবেন।

সাংবাদিকদের যে কি কাজ গ্রামের লোকেরা কেউ জানে না। কিন্তু শঙ্কর পিল্লে বললেন—ভদ্রলোক সাংবাদিক—সাংবাদিকের মতো বড় কাজ আর কি আছে। সাংবাদিকদের ক্ষমতা কত জানো? তারা গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা পর্য্যন্ত করতে পারে। তারা কাউকে ভয় করে না। তাদের কলম চলে বলেই সরকারের শাসনযন্ত্রের চাকাও চলে। তিনি সাংবাদিক ভদ্রলোককে নিজের বাড়ী নিয়ে এলেন এবং তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করার জন্য তাঁকে পেড়াপেড়ি শুরু করলেন। শঙ্কর পিল্লে তাঁকে বললেন, যতদিন আপনি এই গ্রামে থাকবেন ততদিন আমার বাড়ীকে নিজের বাড়ীর মতো মনে করে এখানে থাকতে একটুও লজ্জা বা দ্বিধাবোধ করবেন না। রাজম্মা আপনার নিজের বোনের মতো। সে আপনার দেখাশোনা সব করবে।

সাংবাদিকটি রাজম্মার দিকে চেয়ে বললেন—আমি গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে এসেছি। আমার পত্রিকা গ্রামের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলো প্রবন্ধ ছাপাতে চায়। তাছাড়া আমি একটি গ্রাম-উন্নয়ন-কেন্দ্রও স্থাপন করতে চাই। এই গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্রকে ভালোভাবে চালাতে গেলে মেয়েদের সাহায্যও দরকার। আশা করি, আপনি আপনার সহানুভূতি ও সহযোগিতা দিয়ে আমার এ কাজের সহায় হবেন।

রাজম্মা ভদ্রলোকের কথা শুনে মৃদু হাসলো। তাহ'লে সে এখন একজন নেত্রী হ'তে চলেছে। তার নাম কাগজে বেরোবে সেক্রেটারী রাজম্মা। শঙ্কর পিল্লে খুব খুশী হলেন। একটি গ্রাম-উন্নয়ন সমিতি—এই সাংবাদিকটি তার সংগঠক, আর রাজম্মা তার সাহায্যকারিণী। কি সম্মান। যাক, এতদিনে তাঁর আশা পূর্ণ হ'তে চললো। তিনি কাগজে ওয়ার্ধা এবং আরও অনেক জায়গায়

গ্রাম-উন্নয়ন সমিতির কথা পড়েছেন ; হয়তো একদিন গান্ধীজী স্বয়ং এই কেন্দ্র দেখতে আসতে পারেন এবং তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করতে পারেন। সত্যি রাজম্মার ভাগ্য ভাল।

এরপর রাজম্মা আর সেই সাংবাদিকটিকে প্রায়ই একত্রে দেখা যেতে লাগলো। তারা যে শুধু গ্রামোন্নতির কথা বলতো তা নয় তখনকার সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থার নানা সমস্যার কথাও তারা আলোচনা করতো।

সাংবাদিকটি মেয়েদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আদর্শকে সমর্থন করতেন এবং তাদের অধিকার অনধিকার নিয়ে নানা আলোচনা করতেন। তিনি রাজম্মাকে বলতেন—"সতীত্ব কাকে বলে জানো? সতীত্ব আর কিছুই নয়। এ শুধু স্বার্থপর পুরুষেরা মেয়েদের নীচে ঠেলে রেখে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধার জন্যে আবিষ্কার করেছে। এই যে সব অন্যান্য প্রাণী! তাদেরও তো ভগবান সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের কামনা-বাসনাকে যে কোনও উপায়ে চরিতার্থ করে! তবে মানুষের বেলায়ই বা আলাদা ব্যবস্থা কেন?"

প্রথম প্রথম এই সব কথা শুনে রাজম্মা রীতিমতো ভয় পেয়ে যেতো। মেয়েদের চরিত্রবতী হবার দরকার নেই? সেও তাহলে ঠিক পুরুষদের মতো যা খুশী বলতে পারে, যা খুশী করতে পারে? এতে কোনও পাপ, কোনও দোষ নেই। এতদিন পর্য্যন্ত তার ধারণা ছিল যে, কোনও অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে কোনও যুবকের দিকে তাকানোও পাপ। তার এই ত্রিশ বছরের ধারণার ভিত্তি আজ শিথিল হতে আরম্ভ করলো। তার ভয় হ'তে লাগলো হয়তো তার এই ধারণা শিথিল হ'তে হ'তে একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে।

সত্যি এই লোকটির বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে ভাষা রাজম্মা খুঁজে পেতো না। তিনি যখন মালয়ালম আর ইংরেজীতে মিশিয়ে এই সব আলোচনা করতেন তখন তার প্রতিবাদে রাজম্মা একটি কথাও বলতে পারতো না। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতো তার নিজেকে অসহায় মনে হ'তো। তাদের এই আলোচনা অনেক সময় মাঝরাত অবধি চলতো। শঙ্কর পিল্লে রাত্রে খাওয়ার পর হয় শুতে যেতেন, নয়তো অন্য কোথাও ঘুরে আসতে যেতেন। তাদের এই গভীর আলোচনায় তিনি বাধা দিতে চাইতেন না।

এইভাবে ছয় মাস কেটে গেল। কিছুদিন থেকে রাজম্মার শরীর খুব খারাপ যাচ্ছিল। গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্রে নিয়মিত আসতে পারছিল না। প্রায়ই তার মাথা ঘোরে। ক্ষিদে নেই এবং আরও নানা উপসর্গ দেখা দিল। শঙ্কর পিল্লের হঠাৎ সন্দেহ হ'লো। একদিন রাত্রে তিনি সেই সাংবাদিকটিকে নিজের ঘরে ডেকে বললেন—"আমি বিয়ের চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করতে চাই না। তবে তোমাকে রেজিষ্ট্রারে সই করতে হবে।"

পরের দিন গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র সংগঠকের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। বোধ হয় তিনি অন্য আর এক গ্রাম উদ্ধার করতে গেছেন। শঙ্কর পিল্লে সেইদিন আর তার পরের দিন অপেক্ষা করলেন। রাজম্মা একটু বেশীদিন অপেক্ষা করেছিল। তারপর যখন পুলিশ এক ডাকাতির দায়ে সাংবাদিকটিকে গ্রেপ্তার করতে এলো তখন রাজম্মা দুঃখে ভেঙ্গে পড়লো। চারিদিকে একেবারে ছিঃ ছিঃ পড়ে গেল। শঙ্কর পিল্লে কিন্তু দমলেন না। তিনি বললেন—এসব ব্যাপার কোথায় না হয়? এমন কোনও পরিবারের নাম করতে পারো যেখানে এরকম ঘটনা ঘটেনি?

রাজম্মা একটি সন্তান প্রসব করলো। তার খুব আশা ছিল যে, সে পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে কিন্তু সন্তান হ'লো একটি ছোট্ট মেয়ে। শঙ্কর পিল্লে বললেন—ছেলেরা তাদের মায়ের অবাধ্য হয় কিন্তু মেয়েরা তেমন নয়। মেয়েই ভালো।

মেয়েটি দেখতে হ'লো ঠিক তার বাপের মতো। একদিন শঙ্কর পিল্লে নাতনীকে কোলে বসিয়ে আদর করছিলেন আর বলছিলেন—আমি আমার খুকুমণিকে স্কুলে পাঠাবো। সে বি-এ, পাশ করবে। আমি তার জন্য লাখ্ টাকার সম্পত্তি রেখে যাবো।

রাজম্মা এই প্রথম প্রতিবাদ করে বলে উঠলো—"না, ওকে স্কুলে পাঠাতে হবে না। ওর জন্যে কোনও সম্পত্তি রাখতে হবে না।" সে তার বাবার কোল থেকে মেয়েকে ছিনিয়ে বাবার দিকে জ্বলন্ত চোখে চাইল। বৃদ্ধ শঙ্কর পিল্লে তার সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির মানে বুঝতে পারলেন কি না কে জানে।

অনুবাদিকা—নীলিনা আব্রাহাম।

যখন তারা বিদায় নিল

(Wenn Zwei Von einander Scheiden)

হেনরিক হাইনে

বিদায়ের আগে শেষবার তারা
দু'জনে বাড়ালো হাত,
তার পর এলো বিস্মিত জল চোখে
দীর্ঘশ্বাসের একক সঙ্গী রাত।

তারা তো চায়নি লোকায়ত বেদনাকে
অথবা করুণ বিচ্ছেদ হাহাকার,
বিদায়ের পরে অতিথির মতো কেন
ব্যথা ছুটে এলো, প্রাণে নিল স্বাধিকার!

অনুবাদ : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

তারপর মাসখানেক রেবার সঙ্গে দেখা হয়নি। দেখা হয়নি দিলীপের সঙ্গেও। সুবিমল আর ওর বৌ মল্লিকা দু'একবার দেখা করতে এসেছিলো। ওদের সঙ্গেও কোনো আলোচনা হয়নি রেবার সম্বন্ধে। শুধু এটুকু শুনেছিলাম যে, রেবার বাবা একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। রেবার বিয়ে হওয়া অবধি কলকাতায় থাকবেন। রেবা হস্টেল ছেড়ে দিয়ে এখন ওর বাবার সঙ্গে আছে। সবাই এখন রেবার বিয়ের কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত।

জুতো কিনতে গিয়েছিলাম আহ-তং'এর দোকানে। আমায় দেখে আহ-তং খুব খুশি। চা না খাইয়ে ছাড়বে না। ওর বৌ চা করে এনে দিলো। তাকিয়ে দেখলাম ওর বৌকে। দেখেই বোঝা যায় আর কয়েকদিনের মধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি হবে।

আহ-তং হাসলো। বললো,—"এবার যেটি হবে সেটি আমার সপ্তম সন্তান। পর পর তিনটি ছেলে হয়েছে। এবার আর ছেলে নয়। এবার একটি মেয়ে চাই। খুব ভালো মেয়ে। আমার বৌয়ের মতো মেয়ে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার বৌকে দিয়ে এখনো কাজকর্ম করাচ্ছো কেন? এই ক'টা দিন বিশ্রাম নিতে বলো।"

আহ-তং খুব জোরে হেসে উঠলো। বললো, "দু'দিন পরে ছেলে হবে বলে এখন থেকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, এমন কথা তো কোনো দিন শুনিনি। আমাদের দেশে মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করতে করতে অনেক সময় সন্তানের জন্ম দেয়। আর প্রসবের পরেই আবার কাজে লেগে যায়।"

"দু'দিন বিশ্রাম নিলে ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কিছু নেই। তবে দরকার হয় না। এর আগের বার যেদিন ওর ব্যথা উঠলো তখন সে রান্না করছে। বাড়িতে দু'জন অতিথি খাবে। সেই ব্যথা নিয়ে সে রান্না শেষ করলো। শেষ করে ওদের বসিয়ে দিয়ে আমায় বললো। আমি তখন কি করি? বাড়িতে অতিথি। একটা রিক্সা ডেকে দিলাম। সে রিক্সা চেপে একাই লাট্‌পাড়ার মেয়ে-হাসপাতালে চলে গেল। তিন দিন পর একদিন কাজে বেরিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে দেখি আমার বৌ রান্না করছে। আমায় দেখে হেসে বললো, "তোমার ছেলে উপরে ঘুমাচ্ছে।"

শুনে আমি হাসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "ছেলের ওজন কতো হয়েছিলো?"

আহ-তং সগর্বে উত্তর দিলো, "সাড়ে বারো পাউণ্ড। কী গলার জোর। বেন্টিক স্ট্রীটে কাঁদলে ট্যাংরায় বসে ওর কান্না শুনতে পাওয়া যেতো।"

"কি রকম দেখতে তোমার ছেলে? তোমার বৌয়ের মতো?"

"না। আমার বৌ বুঝি ভালো দেখতে", আহ-তং হাসতে হাসতে বললো, "আমার ছেলে দেখতে ঠিক আমারই মতো সুন্দর হয়েছে।"

"বেশ ভালো কথা। আশা করি, তোমার মেয়েও তোমার মতো সুন্দর হবে।"

"না, না, আমার সুন্দর মেয়ে দরকার নেই", আহ-তং তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো, "আমার চাই খুব ভালো মেয়ে, আমার বৌয়ের মতো ভালো, আমার ভাই আহ-কিমের বৌ মিনির মতো ভালো, মিনির বোন জেনীর মতো ভালো, জেনী-মিনির মা বুড়ি ওয়াংএর মতো ভালো। মেয়ে বড়ো হবে, ভালো রান্না করতে শিখবে, স্বামীর কাজে-কর্মে সাহায্য করবে, ছেলেপুলে মানুষ করবে, তার পর বুড়ো হয়ে ছেলে-মেয়ের বিয়ে-থা দিয়ে শান্তিতে চোখ বুঁজবে—ব্যস, এর বেশী কিছু চাইনে।"

একটু চুপ করে থেকে বললো, "আচ্ছা, তুমি তো দিলীপের বন্ধু—তুমি কি জানো? সবাই বলছে জেনীর সঙ্গে দিলীপের বিয়ে হবে।"

"হ্যাঁ—।"

"আমার মনে হয় না", আহ-তং আস্তে আস্তে বললো।

"কেন? জেনী বিয়ে করবে দিলীপকে?"

"জেনী করবে। চীনে মেয়ে, যাকে ভালোবাসে, তার জন্যে সব কিছু ছাড়তে পারে। কিন্তু দিলীপ বোধ হয় ওকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে না।"

"কেন?"

"দেখ রঞ্জন বাবু, আমি সেই ছেলেবেলা থেকে কলকাতায় আছি। কতো রকম ছেলে দেখলাম! দিলীপের মতো ছেলে কোনো দিন ঘর-সংসার করবার জন্যে ভালোবাসে না। শুধু ভালোবাসার জন্যে ভালোবাসে।"

এমন সময় দিলীপের প্রবেশ।

"ওহে আহ-তং। দাই-সাওকে বলো, চা খাওয়াতে। তোমার ছেলে কোথায়? ডাকো তাকে। চকোলেট এনেছি। ওরে গাধা রঞ্জন। তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। দাঁড়া, আগে আমার চীনে-বৌদির হাতে একটু চা খেয়ে নিই।"

"চীনে দাই-সাও'এর চা তো অনেক খেলে", আহ-তং হেসে বললো, "এবার থেকে চীনে বৌয়ের হাতে চা খেতে সুরু করো।"

"চীনে বৌ?" দিলীপ একগাল হাসলো, "দেখ আহ-তং, জেনীর মা চীনে, বাবা চীনে। কিন্তু আমাকে বিয়ে করবার পর জেনী চীনেও থাকবে না, বাঙালীও হতে পারবে না। কি হবে, ভগবান জানেন। নাও, নাও, তাড়াতাড়ি চা করতে বলো। আমাদের যেতে হবে। —রঞ্জন জুতো কিনসি বুঝি। কতো টাকা দিয়েছিস? পোনেরো? তুই একটা গাধা। তোকে পাঁচ টাকা ঠকিয়েছে। দেখি আহ-তং টাকা পাঁচটা বার করো তো। দাও।" টাকাটা পকেটে পুরলো দিলীপ। বলে গেল, "তোমার যা ন্যায্য পাওনা তুমি পেয়েছো। রঞ্জনের যা ন্যায্য দেনা, সে দিয়েছে। সুতরাং এটা আমার প্রফিট। আমার চেনা একটি মেয়ের নেমন্তন্ন আছে। এটা দিয়ে তার বিয়ের উপহার কিনবো।"

আবার চা এলো। চা খেয়ে দিলীপ আমায় বললো, "চল রঞ্জন, এবার বেরিয়ে পড়ি। অনেক দিন হুইস্কি খাইনি। টাকা আছে তোর সঙ্গে?"

"না।"

"নেই? কেন যে টাকা না নিয়ে বেরোস বুঝি না। চল কোথাও বসে তাহলে শুধু কোকা-কোলা খাই।"

কোকা-কোলাও হোলো না। আমরা চলে এলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। চীনেবাদাম কিনে ঘাসের উপর বসলাম। দিলীপ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে চীনেবাদাম খেলো।

তারপর বললো, "তুই একটা গাধা।"

"কেন?"

"চুপ করে বসে আছিস কেন?"

"কি করবো?"

"পরশু রেবার বিয়ে।"

"জানি।"

"ওর বাবাকে গিয়ে বল।"

"বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন আর হবে না।"

দিলীপ একটু ভাবলো।

তারপর বললো, "পালিয়ে যা রেবাকে নিয়ে, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।"

আমি হেসে ফেললাম।

"তোমার মাথা খারাপ দিলীপ দা'।"

"রেবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"না।"

"গিয়ে দেখা কর।"

"কী লাভ?"

"ওরে গাধা," দিলীপ চিৎকার করলো, "তুই যাকে

ভালোবাসিস তার সঙ্গে আরেক জনের বিয়ে হয়ে যাবে, আর তুই প্যাঁচার মতো মুখ করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে বসে চীনেবাদাম খাবি, এ আমি কি করে সহ্য করি বল। যদি গেলাসের পর গেলাস মদ খেতিস বার-এ বসে, তবু তোকে শ্রদ্ধা করতাম, তোর সঙ্গে বসে আমিও খেতাম, তোকে মহত্তর জীবনের জীবনদর্শন বুঝিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু চীনেবাদাম? স্কচ হুইস্কি নয়, রাম নয়, জিন নয়, বিয়ার নয়, এমন কি দিশী মদও নয়, শুধু চীনেবাদাম। তোর মুখদর্শন করতেও আমার ইচ্ছে করছে না।"

আমি একটু হেসে চুপ করে রইলাম। দিলীপও চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বললো, "আচ্ছা, তুই না হয় চুপ করে আছিস। কিন্তু রেবা কি করে এরকম চুপচাপ ব্যাপারটা মেনে নিলো বলতো?"

"সে জানে যে আর কিছু করবার উপায় নেই।"

দিলীপ আবার চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "তুই এক কাজ কর। তোরও তো পৌরুষ বলে একটা কিছু আছে। একটি মেয়ে তোকে কাঁচকলা দেখিয়ে আরেক জনকে বিয়ে করছে, এটা তুই সহ্য করবি কেন? তুইও একটা বিয়ে কর।"

"সে পরে দেখা যাবে," আমি উত্তর দিলাম।

"পরে নয়। এক্ষুণি।"

"এক্ষুণি?"

"হ্যাঁ। পরশু রেবার বিয়ে। তার আগে তুই বিয়ে করে ফেল।"

আমি হেসে ফেললাম।

"তুই হাসছিস? আমি সিরিয়াসলি বলছি। তবে হ্যাঁ, মেয়ে পাবি কোথায়?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। ভাখ, আমার এক বন্ধু আছে, অমূল্য রায়। তার বোনের বিয়ে হচ্ছে না। কিন্তু বেশ ভালো মেয়ে। আমি যদি বলি—"

"তুমি বড্ড বাজে বকছো দিলীপ দা'," আমি আস্তে আস্তে বললাম।

দিলীপ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। তারপর আরো আস্তে আস্তে বললো, "বেশ, তোর যা খুশি কর। এই চীনেবাদামগুলো তুই একলা বসে বসেই খা। আমি চললাম।"

তারপর দিন সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে আবার দিলীপের আবির্ভাব হোলো।

"ওরে রঞ্জন!"

"কি?"

"শুনেছিস?"

"কি?"

"রেবার বাবার নাম দর্পনারায়ণ চৌধুরি," বলে দিলীপ রেবার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র আমার নাকের নিচে আন্দোলিত করলো।

"হ্যাঁ, জানি।" আমি উত্তর দিলাম।

"তার মানে রেবা জুলেখা বাঈয়ের মেয়ে!"

"হ্যাঁ, তাও জানি।"

"তোকে কে বললে?"

"রেবা নিজেই বলেছে।"

"আশ্চর্য ব্যাপার!" দিলীপ এতক্ষণে একটি চেয়ার টেনে বসলো।

বসে লক্ষ্য করলো যে বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র একখানি আমার টেবিলের উপরও পড়ে রয়েছে।

"তোকেও নেমন্তন্ন করেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"ভালোই হোলো। তোতে আমাতে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। একসঙ্গে বসে হৈ-হৈ করে নেমন্তন্ন খাবো।"

"আমি কাল দার্জিলিং যাচ্ছি," আমি আস্তে আস্তে বললাম।

দিলীপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

তারপর বললো, "তুই রেবার বিয়েতে যাবি না?"

"বললাম তো কাল দার্জিলিং যাচ্ছি।"

"ভাখ বুদ্ধু, যে মেয়েকে ভালোবাসিস তার সঙ্গে বিয়ে হোলো না বলে নিজের পকেটের পয়সা খরচা করে দার্জিলিং যাবি? বিয়ে যখন হোলো, না অন্তত বিয়ের নেমন্তন্নটা খেয়ে নে। আর কিছু না হোক, অন্তত সেটুকুই লাভ।"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

দিলীপ চা খেলো, সিগারেট খেলো, নিজের মনে খানিকক্ষণ আবোল তাবোল বকে গেল।

তারপর উঠে দাঁড়ালো চেয়ার থেকে।

বললো, "নাঃ, তোর সঙ্গে জমছে না। তুই ক্যাবলার মতো বসে আছিস, কথা বলছিস না। আমি একা একা আর কাঁহাতক বকে যাবো। যাই, জেনার সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে আসি। তোর কাছে টাকা আছে? আমায় দশটা টাকা ধার দিবি?—নাঃ থাক, তুই যাকে ভালোবাসিস তার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তোর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তোকে আর বেশী কষ্ট দেওয়ার মানে হয়না। চলি রে। চিয়েরিও।"

দার্জিলিং যাওয়া হোলো না।

ভাবলাম, দিলীপ ঠাট্টা করে বললেও ঠিকই বলেছে। রেবার বিয়ে হয়ে যাবে বলে আমি যাবো দার্জিলিং? কেন?

সেজে গুজে ফিটফাট হয়ে রুমালে সেন্ট মেখে একটি প্রেজেন্ট কিনে নিয়ে নির্বিকার ভাবে নেমন্তন্ন খেতে গেলাম।

গিয়ে দেখি শানাই বাজছে। অনেক লোকজন, অনেক হুল্লোড়, হৈ-চৈ। শাঁখ বাজছে ঘন ঘন, উলু দিচ্ছে মেয়েরা। সুবিমল অভ্যাগতদের দেখাশুনো করতে ব্যস্ত, মল্লিকাও খুব হাসি হাসি মুখে ছুটোছুটি করছে। আমায় দেখে সুবিমল যেন একটু বেশী খাতির করে ভেতরে নিয়ে বসালো। দিলীপও এসে পড়লো মিনিট দুয়েকের মধ্যেই।

বললো, "তুই আসবি আমি জানতাম, অমূল্যর বোনকে বিয়ে করবি নাকি বল?"

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "জিজ্ঞেস করবার আর সময় পেলে না?"

একটু চুপ করে রইলো দিলীপ। তার পর বললো, "না রে, তুই আর বিয়ে করিস না। তা হলেই রেবার শিক্ষা হবে।"

"কি করে?"

"তুই আর বিয়ে করিসনি জানলে সে কি আর কোনো সুখে ঘর করতে পারবে তার স্বামীর সঙ্গে?"

আমি হাসতে লাগলাম।

কিন্তু শানাই যখন আরো জোরে বেজে উঠলো, বর এসে গেল, উলু দিয়ে উঠলো মেয়েরা, আর বসতে পারলাম না। দিলীপের চোখ এড়িয়ে, অন্য সবার চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। অনেকক্ষণ ভাবলাম, কোথায় যাওয়া যায়। একটি পার্কে গিয়ে বসলাম। তার কাছে আরেকটি বিয়ে-বাড়ি। সেখানেও শানাই বাজছে। বসতে পারলাম না সেখানেও।

উঠে চলে গেলাম চৌরঙ্গি পাড়ার একটি সিনেমা হলে। সেখানে একটি ক্রাইম পিক্‌চার দেখাচ্ছে। খুব মারামারি, খুব উত্তেজনা। ন'টার শো'তে তাই দেখলাম বসে বসে। বাড়ি ফিরলাম বারোটা নাগাদ।

চাকর বললো, "দিলীপ বাবু এসেছিলেন। দু' বার আপনার খোঁজ করে গেছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, সুবিমল বাবু আর ওঁর স্ত্রীও এসেছিলেন!"

"কেন রে?"

"জানি না। আপনি এলেই আপনাকে বিয়ে-বাড়িতে যেতে বললেন।"

আমার হাসি পেলো। না জানিয়ে যে পালিয়ে আসবো তারও উপায় নেই, তাও লক্ষ্য করবে? আমি আর কিছু না বলে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তার পরদিনও চুপচাপ বাড়ি বসে রইলাম। দিন দুই পরে দিলীপ আবার এলো। কিন্তু আজ যেন বড়ো গম্ভীর, বড়ো ক্লান্ত, বড়ো উদাস, বড়ো বিষণ্ণ। চুপচাপ এসে বসলো।

আস্তে আস্তে বললো, "তুই একটা গাধা।"

"কেন?"

"বিয়ে-বাড়ি থেকে পালিয়ে এলি কেন? আর এলিই যদি সোজা বাড়ি ফিরলি না কেন? আমি, সুবিমল, মল্লিকা দু'বার এসে তোকে খুঁজে গেছি।"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

"সেদিন বিয়ে-বাড়িতে খুব গোলমাল গেছে, জানিস?" দিলীপ বললো।

"না তো—!"

"শেষ মুহূর্তে হঠাৎ জানাজানি হয়ে যায় রেবা জুলেখা বাঈয়ের মেয়ে। শুনে ছেলের বাপ কোনো কথা শুনলো না, বিয়ের আসন থেকে ছেলে তুলে নিয়ে গেল।"

"তারপর?" আমি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলাম।

"তারপর আর কি? আমরা তোর খোঁজ করলাম, তোর বাড়ি এলাম, আরও দু'এক জায়গা খুঁজে দেখলাম, ইডিয়ট কোথাকার, কোথাও তোর পাত্তা নেই।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি?" দিলীপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো, "বিয়ের লগ্ন বয়ে যায়। সবাই আমায় ধরে পড়লো। শেষ পর্য্যন্ত আমিই বিয়ে করলাম রেবাকে।"

"তুমি!"

দিলীপ চুপ করে বসে রইলো। আমিও চুপ করে বসে রইলাম। চা খেলাম না, সিগারেট খেলাম না, কোনো কথাই বললাম না। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা এলো, সন্ধ্যা গভীর হয়ে রাত হোলো।

অনেকক্ষণ পর দিলীপ উঠে দাঁড়ালো। কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগুলো। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, "ভাখ রঞ্জন, তোর সঙ্গে আমি আর জীবনে কথা বলবো না। তোর ভালো করতে গিয়ে আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলাম, জেনীকে হারালাম, ওর কাছে মুখ দেখাবার রাস্তা রাখলাম না।"

"কেন দিলীপদা'?"

"ওরে উল্লুক, এও বুঝতে পারিস নি? রেবা যে জুলেখা বাঈয়ের মেয়ে বরযাত্রীদের মধ্যে একথা যে আমিই রটিয়ে দিয়েছিলাম—।"

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মাঘের অন্তিমেই

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

বাদামী চিলের দেহ রোদে ঢাকা মন্দির কার্ণিশে
বিশ্রমিত; ভবিষ্যৎ অদূরেই সুস্থ আর উজ্জ্বল আশ্বাসে,
আকাংখার কুঁড়ি হয়ে ফুটে ওঠে নির্জন সকালে।
মনকে ফেরাই তবু বসন্তের দ্বিপ্রহরে কিংবা কোন গ্রীষ্মের বিকেলে।

মায়ের শিয়রে মৃত্যু; পাতা-ঝরা গাছের তর্জনী
সম্ভাবনা-দাপ্ত এক অপরাধা নিপুণ সংকেতে
চিত্রিত রেখার মত। এক দিন মুছে যাবে জানি
নিশ্চয়ই নির্মম শীত—অন্ধকার দূর হবে সূর্যের আঘাতে।

বাদামী পাখির দেহ রোদে ঢাকা ছাদের কার্ণিশে
অভিভূত; অনেক ছন্দের পরে হিমভোরে খেয়ালী শিশির
টোকা দিয়ে ভেঙে দেবে জরাক্লান্ত জিনিয়ার ঘুম
ভীরু ব্যথা মুছে যাবে কার যেন আগ্নেয় নিঃশ্বাসে।

চৈত্রের স্পন্দন আমি শুনেছি ছায়ায়-মেশা রাতে
রক্তদ্রব পলাশের রোমাঞ্চিত কুহকের গানে।
মাঘেই পাঠাল চিঠি কেন জানি বসন্তের চাঁদ,
তাইত চেয়েছি ফিরে তোমাকে এ দৃঢ় জ্যোৎস্নাতে।

উদয়ভানু

মহাশ্বেতা আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ ক'রেছেন বললেই হয়। মুখে রুচি নেই, চোখে ঘুম নেই, কণ্ঠে কথা নেই। সাথীহারা পাখীর মত চুপচাপ বসে থাকেন, চোখে নিস্পৃহ দৃষ্টি ফুটিয়ে। বিরহ বেদনা যত না হোক, দুশ্চিন্তার সীমা নেই তাঁর। ভেবে ভেবে কূলকিনারা খুঁজে মেলে না যেন। ডান চোখের পাতা কাঁপে, যখন তখন বুক দুর দুর করে, উঠে দাঁড়ালে চোখে আঁধার দেখেন—ভাগ্যে কি লেখা আছে কে জানে! কুমারবাহাদুর কাশীশঙ্কর নেই, গৃহ যেন শূন্য হয়ে আছে। সাড়াশব্দ নেই কারও। শোকাতুরার মত দেওয়ালে দেহ এলিয়ে নীরবে বসে থাকেন মহাশ্বেতা। ঘর-সংসারে মন লাগে না তাঁর। বিপত্তারিণীকে ডাকেন মনে মনে,—তিনি যেন অক্ষত শরীরে ফিরে আসেন। তা যদি না হয় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবেন তিনি। বিষপান করবেন স্বেচ্ছায়। এ দেহ আর রাখবেন না কোনমতে। মনের সঙ্গোপনে ক্রোধের জ্বালা ধরে মাঝে মাঝে। রাজমাতা বিলাসবাসিনীর আর ননদিনী বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতি বিরূপ হন। কিন্তু মহাশ্বেতা যে নিরুপায়, তাঁর কথা আর প্রতিবাদ কে শুনছে!

—মাগো!

কুমারীকন্যা বনলতা ডাক দেয় ভার্ত স্বরে। মহাশ্বেতার পাশটিতে ব'সে থাকে পোষা বিড়ালের মত। মা গবাক্ষ-পথে দৃষ্টি চালিয়ে কি ভাবছেন অন্য মনে। মা নিরুত্তর, তাই আবার ডাক দেয় সে। বলে,—মাগো, তোমার কি হয়েছে? অসুখ করেছে?

এ পাশে ওপাশে মাথা দুলিয়ে মহাশ্বেতা বললেন,—না না অসুখ করবে কেন? খানিক থেমে ফিসফিসিয়ে বললেন,—তোমার বাবামশায়ের ভাবনায় অস্থির হয়ে আছি আমি। তিনি না ফিরলে কিছুতেই স্থির হ'তে পারি না যেন। তাঁকে না দেখলে—

—বাবামশাই কোথায় গেছেন মা? বনলতা শুধোয় সাগ্রহে। ড্যাবা ড্যাবা কাজলপরা চোখে ব্যাকুলতা যেন। আবার বললে সে,—যুদ্ধ করতে গেছেন?

মেয়ের মুখে হাত চাপেন মহাশ্বেতা। বললেন,—ছিঃ, এমন কথা বলতে নেই। যুদ্ধ করতে যাবেন কেন! তিনি গেছেন তোমার পিসীকে আনতে।

—পিসীকে আনতে! কথা দুটি নিজেই আবার বলে, স্বগত করে। বলে,—পিসী কবে আসবে মা? কতদিন পিসীকে দেখিনি আমি।

—জানি না মা। কিছুই বলতে পারি না।

বনলতা থামতে জানে না যেন। বললে,—পিসী আমাকে খব ভালবাসে। কত পুঁতি দিয়েছে তার ঠিক নেই। বউ পুতুল দিয়েছে, পুতুলের সাজ দিয়েছে। কথা বলার সঙ্গে পিসীর জন্যে আকুল হয় যেন। কথার শেষে সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

বেলা বয়ে যায়, খেয়াল নেই মহাশ্বেতার। সূর্যের রোদ বক্রিম হ'তে থাকে। গাছের শীষ থেকে ভূমিতে নেমেছে রোদ্দুর। বৈশাখের দিন, বাতাস স্তব্ধ হয়েছে। রসুই-ঘরে চুলি জ্বলে অযথা। সংসারের কাজে মন লাগে না যেন। মহাশ্বেতা বললেন,—বনলতা, তুমি রাঙ্গীকে ডেকে আনো। রান্নার কথা বলে দি। আমি আর পারি না উনুনপাড়ে যেতে।

মনিবের হুকুমের অপেক্ষায় ছিল রাঙ্গী। কাজের ঝাঁটা দালানে। রাঙ্গী দুয়োরে দেখা দেয়। বলে,—ওগো বনলতা জলখাবার আর দুধ খাবে চল'।

রাঙ্গীর কথায় কান নেই বনলতার। মহাশ্বেতার চিবুক ধরে সে, আকুলকণ্ঠে মিনতি জানায় মাকে। বলে,—তুমি জলখাবার খাবে না মা?

—না মা, খেতে রুচি নেই আমার। মনটা ভাল নেই। মহাশ্বেতা কথা বলেন আকাশপানে চোখ ফিরিয়ে। বললেন,— যাও তুমি, খাওগে।

—উঁহু। অসম্মতি জানায় বনলতা। মার কাছে গিয়ে মাথা দুলিয়ে না বললে। তার কোঁকড়া চুলের রাশি দুলতে থাকে। আবদারের সুরে বললে,—তুমি খাবে না, আমিও খাবো না।

স্নেহের আতিশয্যে হেসে ফেললেন মহাশ্বেতা। বললেন,— লক্ষ্মী সোনা আমার, পেটে কিছু না পড়লে পিত্তি রক্ষা হবে না। যাও খেয়ে এসো, আমি গল্প শোনাবো তোমাকে। গল্প শোনাবো। ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমীর গল্প বলবো।

নত মাথায় নিশ্চুপ বসে থাকে বনলতা। মুখে যেন গাম্ভীর্য ফুটেছে। দুই গালে দুটি টোল। ছোট ভুরু দুটিতে ভাঁজ পড়েছে যেন।

রাঙ্গী বললে সহাস্যে,—মেয়ের কথাই থাক রাণীমা। দুজনেই খাও। খেয়ে দেয়ে যত পারো গল্প শোনাও। আমার বনলতা কিছু অন্যায় বলেনি।

—আচ্ছা সৃষ্টিছাড়া মেয়ে বটে! ঈষৎ ক্রোধের সঙ্গে মহাশ্বেতা। যেন নাচার হয়েই বললেন,—তবে তাই। জলখাবার এখানেই দিয়ে যাও আমাদের দুজনের। আমার সুখদুঃখু বুঝবে না।

আহ্লাদ আর ধরে না রাঙ্গীর! হাসতে হাসতে বলে,—মেয়ের তোমার

লাখে একটা মেলে না। একরত্তি মেয়ের বিবেচনাটা লে তো!

—এত গুণগান গেও না ব্রাহ্মণী। মহাশ্বেতা মেয়ের মাথায় বুলাতে থাকেন। বললেন,—এত বললে গুমরে যে মাটিতে পা বে না।

—আমার বনলতা তেমন মেয়েই নয়। ব্রাহ্মণী হেসে হেসে । বললে,—কি রান্না হবে কিছুই তো বললে না মাঠাকরুণ।

খানিক স্তব্ধ থেকে মহাশ্বেতা বললেন,—তোমার যা মন চায় কর। খাওয়ার মানুষ যখন নেই, তখন আর কার জন্তে কষ্ট তুমি। এটা সেটা রাঁধবে! খানিক থেমে বললেন,— ভাত চাপিয়ে দাও। মাছের রেলা এখন ক'টা দিন থাক।

—তুমি যেমন বলবে তেমন ক'রবো। কথার শেষে ব্রাহ্মণী হয়ে যায়। তার মুখের খুশীর হাসি কখন মিলিয়ে গেছে।

কিন্তু বনলতার কচিমুখে আবার হাসি ফুটলো এতক্ষণে। মান সুরে বললে,—লক্ষ্মী সোনা আমার, পেটে কিছু না পিত্তি রক্ষে হবে না যে।

মেয়ের মুখে নিজের পূর্ব্বউক্তি শুনে মৃদুমন্দ হাসলেন তিনি। ,—পাকা গিন্নী হয়ে উঠেছো দেখছি।

আবার হাসলো বনলতা। পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো মা'র মাথা রেখে। চোখের 'পরে নেমে-আসা কুন্তলিকা সরিয়ে তাকে। বলে,—পিসী এলে আমি তাকে মারবো।

—কেন রে? সে আবার তোর ক্ষতি করলে কি?

—এ্যাত দিন আসেনি কেন পিসী?

—তার বর যে তাকে ছাড়ে না। তোমার গুণধর পিসে কি কি?

—তবে পিসেকেই পিটুনী দেবো। সামনে পাই একবার।

—তার নাগাল পাবে কি মা! পিসে তোমার সর্ব্বগুণের ভালমন্দের বিচার করেন না। একরোখা মানুষ, করেন। কুলীনের কুলীন, তাই ধরাকে সরা দেখেন। র বিয়ে করেছেন। তোমার পিসীকে কত কষ্ট দিচ্ছেন।

—কুলীন কাকে বলে মা? ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে বনলতা।

—আরও বয়েস হোক, তখন বুঝবে এ সব কথার মানে। মি আগে।

— বড় হবো মা?

— দশ বছর যেতে দাও, তারপর। তুমি যে এখনও

।

ঠে চোখ তুলে কি এক গভীর ভাবনায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে । কত যেন সমস্যা তার মাথায়। মা তার কপালে লেন,—ভগবানকে ডাকো এক মনে। তাঁকে বল,' মশাই যেন শীঘ্র ফিরে আসেন। অশান্তি যেন

কে মা? তাঁকে তো দেখিনি কখনও। তুমি

তিনি আছেন, তবু তাঁকে দেখা যায় না। তবে তিনি দেখা দেন। কৃপা করেন।

—আমি সাধনা ক'রবো মা। তুমি আমাকে শিখিয়ে দিও।

—খুব ভাল কথা। আগে বড় হও তুমি।

—কবে যে বড় হবো! কড়িকাঠে চোখ, কথার সুরে আফশোস যেন। খানিক থেমে থেকে আবার বললে,—বাবামশাইয়ের জন্তে যে আমার মন কেমন করছে। কবে আসবেন বাবামশাই?

—কাজকর্ম মিটিয়ে আসবেন। কত ঝামেলা তাঁর মাথায়! কত দুশ্চিন্তা!

ব্রাহ্মণী সোনার রেকাবী এনে বসিয়ে দেয় সমুখে। রেকাবীতে খাবার সাজানো। মিষ্টি আর নোনতা। মোরব্বা আর আচার। বাদাম আর পেস্তা। দুধের ফুলকাটা বাটী। ব্রাহ্মণী বললে,—বেলা নেই আর, জলখাবারের পালা এখনও চুকলো না। কখন যে কি করবো তার ঠিক নেই। ওদিকে গোটা তিনেক উনুন জ্ব'লে যাচ্ছে অহেতুক।

দালান থেকে রাজপ্রাসাদের প্রাচীর চোখে পড়ে। ছাদের চিলেকোটা দেখতে পাওয়া যায়। নাটমন্দিরের চূড়া। ছাদের শীর্ষে নিশানা উড়ছে হাওয়ার গতিতে। নিশানায় রাজাবাহাদুরের ব্যক্তিগত পরিচয়ের আখর-চিহ্ন। কাশীশঙ্কর হিন্দুমতের উপাসক, তাই পতাকার রঙ গৈরিক। আকৃতি ত্রিকোণ। বাঘের গর্জ্জন ভেসে আসছে ঐ দিক থেকে। মাঝে মাঝে চন্দনা, ময়না আর কাকাতুয়ার কলস্বর শোনা যায়। রাজার সখের চিড়িয়াখানার বাসিন্দারা সকালের আলো দেখে ডাকাডাকি করছে। বাঘ ক্ষুধার্ত হয়েছে হয়তো। এক খণ্ড কাঁচা মাংস না পাওয়া পর্য্যন্ত এই গর্জ্জন থামবে না।

চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। রাগ গোপন করতে হয়, বিরক্তি মুখে প্রকাশ করা যায় না। মহাশ্বেতা অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। রাজমাতার প্রতি বিরূপ হয়েছেন তিনি। শিশুর মত বায়না ধরেছেন যেন বিলাসবাসিনী। আকাশের চাঁদ চায় শিশু, রাজমাতা তাঁর একমাত্র কন্সাকে ফিরে চেয়েছেন।

—রাজকুমারীর বিয়ে না দিলেই পারতেন রাজমাতা। আপন মনে কথাগুলি বলে ফেললেন মহাশ্বেতা। বললেন,—ঘর-জামাই রাখলে পারতেন; এদিক ওদিক দু'দিকই রক্ষা হ'তো।

—যা ব'লেছো রাণীমাঠাকরুণ। ব্রাহ্মণী সায় দেয়। বলে,— রাজকুমারী সোয়ামীর ঘর ছেড়ে এলে লোক হাসবে বৈ তো নয়। নানা জনে নানা কথা বলবে। সোমথ মেয়ে একা একা থাকলে দুর্নাম রটবে, নিন্দের কথা উঠবে। এক মুহূর্ত থেমে বুকভরা শ্বাস টেনে নেয়। আবার বলে,—আমাদের ছোটমুখে বড়দের কথা শোভা পায় না। থাকতেও পারি না, মুখ ফসকে কথা কই।

—রাজমাতার খেয়ালে তোমাদের ছোটরাজাকে ঘরছাড়া হ'তে হয়েছে! মহাশ্বেতা ক্ষোভের সঙ্গে কথা বলেন। বললেন,—তিনি এখন সুস্থ দেহে ফিরলে বাঁচি। কপালে আমার কি আছে কিছুই জানি না।

ব্রাহ্মণী দুধের বাটি তুলে ধরে বনলতার মুখের কাছে। বলে,— ইষ্টকে ডাকো যত পারো, দুর্গানাম জপ কর'। দুর্গতি মোচন হবে ঠিক।

সহসা যেন নজরে পড়লো মহাশ্বেতার। তিনি দেখলেন, রাজপ্রাসাদের ছাদে এক পরম রূপবতী। শুভ্রবর্ণ, দীর্ঘনেত্র, আলুলায়িত কেশ। লাল পাড় সাদা ঢাকাই শাড়ীতে ঠিক প্রতিমার মত দেখায় যেন। কে? প্রথম দৃষ্টিতে চিনতে

হাসতে হাসতেই বললেন,—রাজামহাশয়, বেশ কিছু দূরে। যেতে যেতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।

—হাত চালাও তোমরা। ঢিমে তালে চললে রাত্রিটাও কাবার হবে যে! কাশীশঙ্কর হুকুমের সুরে বললেন। দিগন্তে চোখ ফেরালেন আবার। বললেন,—আজ আর দেরী সহ্য হয় না যে! ঘর-সংসার ফেলে এসেছি, মনটা হাঁকপাঁক করছে।

—বজরাতো হুজুর পক্ষীরাজ ঘোড়া নয়। সর্দার-মাঝি সহাস্যে বললে।

—তোমাদের মত এতগুলো মরদ থাকতে এত বিলম্ব হবে কেন?

—রাজামশাই, বিরাম বিশ্রাম নাই, হাত যে আর চলে না। কালঘাম ছুটছে আমাগোর। মুখে জল নাই, পেটে খাওয়া নাই, হাতে জোর পাই না।

—জগমোহন! ডাক দিলেন কাশীশঙ্কর। জোরালো কণ্ঠে।

ভাণ্ডারকক্ষ থেকে সাড়া দেয় জগমোহন। বললে,—হুজুর।

কাশীশঙ্কর বললেন,—দুধের ঘড়া একটা মাঝিদের দেও। দুগ্ধ পান করুক ওরা। বুকে বল পাবে তবে।

—কিছু কিছু মিঠাই দেওয়ার হুকুম হোক রাজামশাই। সর্দার খুশী হয়ে বললে, অনুরোধের সুরে।

—জগমোহন! মিঠাইয়ের চুবড়ী একটা দাও মাঝিদের!

—জয়, কুমারবাহাদুর কাশীশঙ্করের জয়! মাঝির দল সোল্লাসে জয়ধ্বনি তোলে গঙ্গার বুকে। উড়ন্ত কাক চিল চমকে ওঠে এই কলস্বরে। তীরভূমির আম্রকাননে প্রতিধ্বনি ছুটে বেড়াতে থাকে।

জগমোহন আহারের পাত্র বসিয়ে দেয় কাশীশঙ্করের সমুখে। মিষ্টান্ন, গঙ্গাজল আর দুধের ঘটি। বলে,—সেবা হোক কুমারবাহাদুর। আমি কৃতার্থ হই।

কাশীশঙ্কর চুপি চুপি শুধোলেন,—হাঁরে জগমোহন, বিন্ধ্যবাসিনী কি করছে?

—চুপ চাপ ব'সে আছেন রাজকন্যা। যেন পাষাণের মূর্ত্তি। মুখে কথা নাই তাঁর, আঁচল চাপা।

মান্দারণের মায়া কাটে না যেন। আনন্দকুমারী আর চন্দ্রকান্ত, যশোদা আর পাঠান প্রহরী—কাকেও যেন ভুলতে পারেন না। মান্দারণের গাছ-পালা, দীঘি-পুকুর, মন্দির, মসজিদ আর সজ্যারাম—ছবির মত ভাসছে যেন চোখে। রাজকুমারী তাঁর ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলেন। মান্দারণ ত্যাগ করতে হবে—কখনও ভাবতে পারেন নি। চন্দ্রকান্ত আর আনন্দকুমারী—দু'জনের পথের কাঁটা স'রে গেছে। রাজকন্যা আর নেই দু'জনের মাঝে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী। হতাশায় পূর্ণ দীর্ঘশ্বাস।

মৌনী হয়ে পাষাণ মূর্ত্তির মত অবিচল ব'সে আছেন বিন্ধ্যবাসিনী। অতীত আর ভবিষ্যৎ ভাবছেন। ফেলে আসা অতীত আর অনাগত, অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ।

দুধ আর মিঠাইয়ের লোভে মাঝিরা আবার সোৎসাহে হাল চালনা করতে থাকে। বজরার গতিবেগ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয় যেন। ছিপ, পানসি আর নৌকা পথ ছেড়ে স'রে যায়। দ্রুতগামী বজরার সংঘাতে চুরমার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। দাঁড়ের জলে সোনা জ্বলছে না আর, রূপা জ্বলছে সূর্য্যের ছটায়। চোখে দেখা যায় না সেই ঔজ্জ্বল্য, চোখ ঝলসে যায়। দৃষ্টি ব্যাহত হয়।

চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন কাশীশঙ্কর। সাধুরা তপস্যায় বসেছেন গঙ্গার জনহীন তীরে, বৃক্ষচ্ছায়ায়। হোমকুণ্ড জ্বলছে তাপসের। বাতাসে যেন গব্যঘৃত আর চন্দন দাহনের সুগন্ধ ভাসছে। ঘাটে ঘাটে গ্রাম্য বধূর দল, স্নানার্থীরা ডুব দেয় আকণ্ঠ জলে। চোখ ফিরিয়ে নিলেন কাশীশঙ্কর। পরদারকে দেখবেন না। দেখতে নাই অসংবৃতাদের। পাপ হয় না কি দেখলে।

মান্দারণের চৌধুরীগৃহে উৎসব লেগেছে আজ। অপহৃতা চৌধুরাণী আবার ফিরে এসেছে সশরীরে। চৌধুরীগৃহিণী নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলেন না, একমাত্র কন্যাকে দেখতে পেয়ে। এ স্বপ্ন না সত্য! আনন্দকুমারী তার মাতৃবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লো, ডুগরে ডুগরে কাঁদলো খানিক। জলভরা চোখ তুলে বললে,—মা, আমাকে ফেলে দেবে না তো? ঘরে ঠাঁই দেবে খুশী মনে?

আনন্দাশ্রু চৌধুরী-গৃহিণীর চোখে। তিনি বললেন,—তুমি আমার হারানো মানিক, কোথায় ফেলবো তোমাকে! তাই কি পারি মা! আমি যে তোমার গর্ভধারিণী। কথার শেষে কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললেন,—হ্যাঁরে আনন্দ, চন্দ্রকান্ত তোকে নেবে তো? ফেলে পালাবে না কি?

হেসে হেসে চৌধুরাণী বললে,—হাঁ নেবে, কথা দিয়েছে। পালাবে কোথায়।

—হাঁ ছাড়বি না তাকে। কর্ত্তা দেশে ফিরলেই তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা ক'রবো। চন্দ্রকান্ত কোথায় রে?

—সদরমহলে আছে, বিশ্রাম করছে। ফটকের পাহারাওলাদের বলে দিয়েছি, আমার বিনা অনুমতিতে তাকে বেরুতে দেবে না। কথা বলতে বলতে খিল খিল হাসি ধরলো চৌধুরাণী। তার স্বভাব-সুলভ হাসি।

—বেশ ক'রেছিস। খুব ক'রেছিস। কর্ত্তা এলেই তোদের দুই হাত এক ক'রে দেবো।

সদরমহলে চন্দ্রকান্ত এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে ধ্যানগম্ভীর হয়ে বসে আছেন এক চৌকীর 'পরে। দু'জন খানসামা তাঁর হুকুমের অপেক্ষায় দুয়োরে অপেক্ষা করছে। ঘৃণার উদ্রেক হয় তাঁর মনে—আনন্দকুমারীর দেহটার প্রতি। কিন্তু উপায় কি। যে অবদমিত, যে পতিত, তাকে গ্রহণ করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। হিন্দুজাতির বৈশিষ্ট্য এই—ঠাঁই দাও সকলকে। বরণ কর' অস্পৃশ্যকে। যে নীচু তাঁকে উচ্চে স্থান দাও। ক্ষয় নয়, সঞ্চয়। ব্যয় নয়, আয়। তবেই ধর্ম্ম আর সমাজ রক্ষা হবে।

রুদ্ধদ্বারে ক্ষীণ করাঘাতের শব্দ হয়। টোকা পড়ে দুয়োরে। দ্বার উন্মোচন করলেন চন্দ্রকান্ত। দেখালেন সদ্যোস্নাতা আনন্দকুমারী। মিষ্ট হাসি তার মুখে। হাতে আহারের পাত্র। সাজানো থালিকা আর জলপাত্র। কক্ষে সিঁদিয়ে ভেতর থেকে অর্গল তুলে দেয় চৌধুরাণী।

দুয়োরে প্রতীক্ষমান দু'জন খানসামা, হাসাহাসি করে পরস্পরে। চোখের ইশারায় কথা বলাবলি করে কি যেন। ব্যঙ্গের হাসি হাসে। টিটকারী কাটে। দুয়োরে কান রাখে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা তাদের। কিছুই শোনা যায় না। [ক্রমশঃ।

বাঙলা গদ্যের পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা খুব বেশী নয়, এ ধরণের কথা অনেকেই ব'লে থাকেন। নেহাৎ পরীক্ষার তাগিদ আর গবেষণার খাতিরে নিছক গদ্য পড়তে বাধ্য হয় কেউ কেউ। এই কারণেই বাঙলা প্রবন্ধের বইয়ের বিক্রয় আশানুরূপ নয়। ছাত্রছাত্রী আর গবেষক ব্যতীত অন্যান্য পাঠকপাঠিকাদের দেখা যায়, প্রেম-গল্প-রচনাকে সসম্মানে এড়িয়ে চলতে। বাঘ কিম্বা সিংহকে দেখলে যেমন সভয়ে পালাতে হয়, তেমনি বাঙলা প্রবন্ধকে দেখে পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কিছুকাল আগেও। বিদেশী কেতাবের বুলি আওড়ানো, সংস্কৃত শব্দ কপচানো, নীতি আর আদর্শবাদীদের উক্তি উগরানো, পাতায় পাতায় সাহায্যপ্রাপ্ত বইয়ের তালিকা ছেপে বিদ্যার জাহির করা মানেই বাঙলা প্রবন্ধ লেখা। এই রেওয়াজ চালু হওয়ার ঠেলায় হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্কের মত গদ্যাতঙ্ক রোগের প্রাদুর্ভাব হয় আমাদের দেশে। আমাদের সাহিত্যের গদ্যলেখকরা হয়তো মনে করেন, পাঠকপাঠিকাদের অবস্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মত,—জ্ঞানলিপ্সায় সদাবিনম্র। এই ধারণার বশীভূত হওয়ার দরুণ গদ্যলেখার রচনাকারদের তাই লেখকরূপ গ্রহণের পরিবর্তে 'মাষ্টারমশাই' বা শিক্ষকরূপ ধারণ করতে হয়। কিন্তু পাঠকপাঠিকারা নিজেদের অর্থব্যয়ে আর ছাত্রছাত্রী সাজতে রাজী নয়—এ কথা বিশ্বাস করতে পারেন না তাঁরা ? পাঠ্যপুস্তক লেখা আর সাধারণ গদ্য রচনা যে এক বস্তু নয়, আশা করি কেউ অস্বীকার করবেন না। বিগত দশ বছরে বাঙলা সাহিত্যে এমন সব গদ্যগ্রন্থ বেরিয়েছে, যাদের কোন মাথামুণ্ডু নেই বললেই হয়। সাহিত্য প্রকাশের নামে বাঙলা দেশে কাগজের যত অপব্যবহার হয় তত আর অন্য কোন দেশেই হয় না। কেন না, প্রবন্ধ বা গদ্যলেখকরা ইদানীং লেখার ধার ধারেন না, শুধু জানেন বইয়ের ভারই পাঠকদের চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাই কোন কোন সমালোচক, প্রবন্ধকার ও চরিতলেখকদের দেখা যায়, গণেশের মত অবিরাম লেখনী চালনায় রত হয়েছেন এবং প্রত্যেকেই রামায়ণ, মহাভারতের মত গুরুভার বই রাতারাতি লিখে ফেলছেন। রাতারাতি মহাগদ্য লিখতে হ'লে একই কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বার বার বলতে হয়; পথিকৃৎ পূর্বসূরীদের শ্রমলব্ধ রচনাকে বেমালুম আত্মসাৎ করতে হয়। যে-কোন বিষয়কে অকারণে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে এমন এক জবরজাব রূপ দেওয়া হয় যে, বই হাতে ধরলেই জ্ঞানচক্ষু কপালে উঠে যাবে। এক কথায় এই সব লেখকদের Glassblower-এর কাজ করতে হয়। তারপর-বইয়ের মূল্যমান অগ্নিতুল্য নির্দিষ্ট হবেই। দশ, পনেরো, বিশ, পঁচিশ ও ত্রিশ টাকা দাম ধার্য্য হবে যে কোন বইয়ের। আজ-কাল সরকারের শিক্ষাবিভাগ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমহলে গতায়াত থাকলে "যা হয় একটা কিছু"কে 'প্রামাণিক' বলে চালিয়ে দিতে পারা যায় অতি সহজেই। এখানে উল্লেখ করলে ভুল হবে না, কোন কোন বিরাটবপু মহাগদ্যগ্রন্থের আবার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাজারে ছাড়া হচ্ছে। বেবী ট্যাক্সির মত সাহিত্যের বাজারে তাদের আবির্ভাব যেন। যাই হোক, মৌলিক চিন্তাধারা বা অরিজিনাল থিঙ্কিং থাকলে কিছু বলার ছিল না, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, কয়েকজন তথাকথিত গবেষক অন্যের তথ্যকে নিজের আবিষ্কাররূপে বেমালুম চালিয়ে চলেছেন। কারণ, সে-যুগের বহু মূল্যবান বই বর্তমানে আর পাওয়া যায় না ছাপার অভাবে।

এর ফল খুবই খারাপ হয়েছে। কটমট ভাষায় দুর্বোধ্য বক্তব্যকে পাঠকের স্কন্ধে চাপানোর ফলে বিদ্রোহী পাঠক আর গুরুভার বই হাতে তুলতে নারাজ হচ্ছেন। সেই ভয়ে শক্ত গদ্যকে সহজ রূপ দিতে হচ্ছে অনেককে, রচনার পরিবর্তে রম্যরচনা লিখতে হচ্ছে অতি কষ্টে। অল্পমূল্য ধার্য্য করতে হচ্ছে রম্যরচনার। দশ, পনেরো, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ টাকা দাম ফেলতে অনেকেই রাজী আছেন, যদিও বিনিময়ে মাল যা পাওয়া যাচ্ছে তার আর বিশদ বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। গদ্যভাষার চতুর লেখকরা প্রকাশকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করছেন এবং অজ্ঞপ্রকাশকরা পাঠকপাঠিকার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে বদ্ধপরিকর হচ্ছেন। তবুও আমরা জানি, এ দেশের পাঠক-পাঠিকারা কোন কালেই মাথাহীন নয়। ঠকবাজী, জুয়াচুরী, বাটপাড়িকে আজ না হয় কাল তাঁরা ধ'রে ফেলেন। কিন্তু আপাতত কাগজের অপব্যয় রোধ করবে কে এই স্বাধীন দরিদ্র দেশে ? গদ্যলেখার বুদ্ধিজীবিদের আত্মস্ফীতির ব্যবসাদারী ফ্যাসন কে বদল করবে ?

* * * *

সম্প্রতি ভারতবর্ষে দু'টি সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন শেষ হয়েছে। একটি কলকাতায় এবং অপরটি আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই দু'টি সম্মেলনের একটিও সার্থক হয়নি—যথার্থ প্রতিনিধিত্বের অভাবে! উদ্যোক্তারা নিজেদের সুবিধার জন্য যাকে খুশী ডেকেছেন এবং সম্মেলনে যা মন চায় করেছেন। কলকাতায় নিখিল-ভারত লেখক-সম্মেলনে জহরলাল থেকে হীরেন মুখার্জী অর্থহীন প্রলাপ বকেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। জহরলাল হিন্দীর পক্ষে এবং বিপক্ষে অবান্তর কতকগুলি কথা ব'লেই ধপাস্ করে ব'সে পড়েছেন, সাহিত্যের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে সাহসী হননি। হীরেন মুখার্জী মনে করেছেন, সম্মেলনের শ্রোতারা তাঁর ক্লাশের ছাত্রছাত্রী বুঝি বা। তিনি ইংরাজী বলতে পারেন ভাল,

কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের কোন কথা বলার অধিকার তাঁর নেই। তাঁকে কখনও সমালোচকরূপে কেউ দেখতে পায়নি। অবশ্য তাঁর বক্তব্যের সমুচিত জবাব দিয়েছেন আনন্দবাজার পত্রিকা। আশা করি, শিক্ষক হীরেন মুখার্জীর কাণ্ডজ্ঞান হবে এই জবাব পড়লেই। এবং ভবিষ্যতে আর আবোল-তাবোল উক্তি করবেন না কখনও। আমেদাবাদে আদারব্যাপারী নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত বাঙলা সাহিত্যের কাট্যালগ আওড়ে বাহবা নেবার চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য এমনই অসার ও যুক্তিহীন যে, সাহিত্য-সম্মেলনে তা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোড়নও উঠলো না। পাবলিক সার্ভিশ কমিশন, ভাইস চ্যান্সেলারী আর সাহিত্যের সমালোচক হওয়া এক বস্তু নয়—তিনি হয়তো ভুলে গেছেন। আশা করি তিনিও ভবিষ্যতে সাবধান হবেন। সবচেয়ে মজার কথা বলেছেন শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, "সাহিত্য ছেলেখেলার জিনিষ নয়"।

সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এই উক্তি মনে মনে অনুধাবন করলে আমরা বাধিত হবো। কিন্তু উদ্যোক্তারা এমনই নির্লজ্জ ও যুক্তিহীন যে, ভাল কথা তাঁদের কানে ওঠে না। কাজের কথা তাঁরা মানতে চান না। কেবল নিজেদের কথা আর উদ্দেশ্য যাতে টিঁকতে পারে ও সাধিত হয়, সেই চেষ্টাতেই তাঁরা ব্যস্ত। কিন্তু বাঙলা সাহিত্য কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, আশা করি উদ্যোক্তারা অস্বীকার করবেন না।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

রামেশ্বরের শিবায়ন

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য সাধারণ্যে আজ বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু তাঁর অবদান সেদিন যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট করেছিল বঙ্গদেশের সাহিত্যকে। রামেশ্বরের নাম চিরদিন অমর হয়ে থাকবে তাঁর শিবায়ন বা সত্যনারায়ণের কথার জন্য। দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের পরমারাধ্য দেবতা। শিব শম্ভুর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমরা বাল্যকাল থেকেই কত কাহিনী শুনতে পাই মা ঠাকুমার কাছে, মহাকাব্যে পুরাণে, অমর কবিদের রচনায়। রামেশ্বরের শিবায়ন ত্রিলোকনাথের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে নানা তথ্য নানা কাহিনী পরিবেশন করেছে। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে দিয়ে রামেশ্বর যথেষ্ট পরিমাণে হাস্যরসও পরিবেশন করতে কার্পণ্য করেন নি। তৎকালীন সমাজের মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারারও একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এর মধ্যে পাওয়া যায়। তা ছাড়া শিবকেই কেন্দ্র করে গৌরী, শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী, নারদ, দক্ষ, মেনকা, সরস্বতী, রতি, বাণ, ঊষা, অনিরুদ্ধ, যম, ইন্দ্র, গণেশ, কার্তিক, ভীম, প্রভৃতি অনেকের প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে। বোদ্ধাদের দরবারে এর যথাযথ সমাদরলাভই আমাদের কাম্য। সম্পাদক—শ্রীযোগীলাল হালদার। প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দাম আট টাকা মাত্র।

অদ্ভুতানন্দ প্রসঙ্গ

পরম ভট্টারক পরিত্রাতা পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে আপোষ যাঁরা উদ্ভাসিত করেছিলেন সেদিনকার অধ্যাত্মলোকের আকাশ, লাটু মহারাজ তাঁদের অন্যতম। ঠাকুরের কৃপাশ্রয়ী শিষ্যবর্গের মধ্যে লাটু ছিলেন অবাঙ্গালী। ছাপরা জেলায় ছিল তাঁর ঘর। আসল নাম ছিল রাখতুরাম, ভৃত্য নিযুক্ত হন রাম দত্তের। হৃদয় চলে যাওয়ার পর ঠাকুরের সেবা-কার্যে নিয়োজিত হন লাটু। তারপর ঠাকুরের অপার করুণার অমৃতকুম্ভে নিজেকে নিমজ্জিত করে তার অমিয় ধারায় নিজেকে করলেন স্নাত। এই মহাপুরুষের জীবনী গ্রন্থ সংকলন করেছেন স্বামী সিদ্ধানন্দ। লাটু মহারাজের জীবনে যে নিষ্ঠা সংযম ও সাধনার ছাপ পাওয়া গিয়েছিল—দেশবাসীর সে বিষয়ে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন। গ্রন্থটিতে যুগাবতারের এবং মহারাজের একটি করে আলেখ্য মুদ্রিত হয়েছে। প্রকাশক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, (উত্তর প্রদেশ)। দাম দেড় টাকা মাত্র।

কঙ্কাবতী

বাঙলা সাহিত্যের কোষাগার সেদিন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে সব মণি-মুক্তো দিয়ে, তাদের মধ্যে অনায়াসে উল্লেখ করতে পারি "কঙ্কাবতী"র নাম। কঙ্কাবতীর লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-জননীর এক অমর সন্তান। কল্পনার সজীবতায়, ভাবের ব্যঞ্জনায়, সাহিত্যের দরবারে একটি স্থায়ী আসন তিনি নিজের অধিকারে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই উপন্যাসটি সেদিনকার মত বর্তমানকালেও যথোপযুক্ত প্রচারলাভ করুক—এই আমাদের কামনা। একটি বালিকাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী রচিত। তার চিন্তাধারা, তার কল্পনা, তার হর্ষ-ভীতি সম্যক্‌রূপে ফুটে উঠেছে। এই গ্রন্থপাঠে শুধু বালক-বালিকারাই নয়, বয়স্কেরাও প্রভূত আনন্দ আস্বাদনে সমর্থ হবেন। গ্রন্থটির মর্যাদাবৃদ্ধি হয়েছে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত একটি মুখবন্ধ সন্নিবেশিত করে। কঙ্কাবতী ত্রৈলোক্যনাথের অদ্বিতীয় কল্পনাশক্তির ধারক ও বাহক দুই-ই। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা-সংগ্রহ

বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালী মনীষার একটি অপূর্ব বিকাশ। বিগত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তিনি যে স্বাক্ষর রেখেছেন, আজও তা কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। বস্তুতঃ, তাঁর অনবদ্য লেখনী-প্রসূত বহু বিচিত্র রচনা সম্পদে আমাদের জাতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ। সঞ্জীব-রচনাবলীর একটি সুনির্ব্বাচিত সঙ্কলন বাঙালীর দীর্ঘকালের প্রত্যাশা। সে প্রত্যাশা মেটানর দাবী থেকেই 'প্রকাশিকা' আলোচ্য উপমার সংস্করণটি প্রকাশ করেছেন। এতে সঞ্জীবচন্দ্রের বিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'পালামৌ' স্বভাবতঃই স্থান পেয়েছে—আর আছে দু'টি উপন্যাস 'মাধবীলতা' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'। প্রতিটি রচনায় সঞ্জীব-প্রতিভার বিশেষ ছাপ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থখানির প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পাঠকের সহজ দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত সঞ্জীব-জীবনীটি এতে সংযোজিত করে প্রকাশক সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রকাশক—প্রকাশিকা, ১৩।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

কলকাতার কাছেই

দু'টি ভিন্নতর জীবনধারায় প্রবাহিত হচ্ছে নগর-জীবন আর গ্রাম্য-জীবন সম্পূর্ণ পৃথক সুরে তাদের বীণার ঝঙ্কার শোনা যায়। নগর-জীবনের কল-কোলাহল কর্মমুখর এবং আয়-ব্যয়ের চুলচেরা হিসেবের জঞ্জালের সঙ্গে পল্লী-জীবনের নিস্তরঙ্গ শান্ত পরিবেশ, বহুদূরব্যাপী প্রকৃতির শোভন রূপমাধুরী, দিগন্তস্পর্শী সবুজিমা ঠিক খাপখায় না। সেখানে এক বিভিন্ন জীবনধারা বয়ে চলেছে, পৃথক তার রূপ, ভিন্ন তার আবেদন। হাওড়া অঞ্চলের কয়েকটি অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ-কন্যাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। শ্যামা ও উমার চরিত্রচিত্রণে গজেন্দ্রকুমার মিত্র অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দুঃখ, দারিদ্র্যের রুক্ষ কঠোর মূর্তিকে লেখনীর সরস হৃদয়ানুভূতি দিয়ে যে ভাবে মর্মস্পর্শী করে উপস্থাপিত করেছেন গজেন্দ্রকুমার, এ জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। দাম সাড়ে পাঁচ টাকা মাত্র।

অরণ্য আদিম

বাঙলা সাহিত্যে রমাপদ চৌধুরীর শক্তির স্বাক্ষর নতুন করে পড়ল অরণ্য আদিমকে কেন্দ্র করে। ভারতে রেল-লাইনের ইতিকথা সাহিত্যপাঠকের কাছে প্রায় একরকম অজ্ঞাতই ছিল। পাহাড়-জঙ্গল ভেদ করে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিপন্ন করে, সংখ্যাতীত বাধাকে অতিক্রম করে কেমন করে দেশের বুকে জন্ম নিল রেল-লাইন, এই চমকপ্রদ কাহিনী উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন রমাপদ চৌধুরী। রমাপদ চৌধুরীর শক্তিমান বর্ণনায় অনেক অজানা তথ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ওঁর লেখনীর সরসতা ও সজীবতা সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছুই নেই। এ ছাড়া এক শ্রেণীর পার্ব্বত্য অধিবাসীরাও বিশেষ আসন পেয়েছে এই গ্রন্থে, মূলতত্ত্ব তারাই এবং প্রধান চরিত্র। তাদের সমাজ, চিন্তাধারা, এমন কি সংলাপ পর্যন্ত অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। প্রকাশক— ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

কথাশিল্পী

বাঙলাদেশের সাহিত্যগ্রন্থগুলি পাঠ করতে করতেই রচয়িতাদের সম্বন্ধে আপনা থেকেই মনের মধ্যে জেগে ওঠে দুর্বার এক কৌতূহল। তারা কেমনতরো মানুষ, কি তাদের পরিচয়, কোথায় তাদের বাস, জন্ম শিক্ষা, কেমনতরো তাদের আকৃতি। সাহিত্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যিকদের যথোচিত প্রচার প্রয়োজন। সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বহুজনেরই মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে বহুরকমের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা। উপরোক্ত গ্রন্থটি পাঠ করলে অনুসন্ধিৎসুরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন। বাঙলার জীবিত কথাশিল্পীদের সচিত্র জীবনী এতে প্রকাশিত হয়েছে সেই সঙ্গে তাঁদের গ্রন্থগুলির নাম। সাহিত্যিকদের সম্মান জানানোর জন্য প্রকাশক আমাদের অভিনন্দন ও শুভকামনা লাভ করবেন। সম্পাদনা শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ও পরেশ সাহা। প্রকাশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট কলকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

পৌষ-ফাগুনের পালা

তরুণ সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে সোমেন্দ্রনাথ রায়ের নাম স্বল্প বিচিত এঁর পৌষ-ফাগুনের পালা উপন্যাসটি বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে। সোমেন্দ্রনাথের রচনা পাঠক-চিত্তে তৃপ্তিরসই সিঞ্চন করবে বলে আশা করা যায়। নায়ক হরিপদ, নায়িকা শেলী বা শেফালি। পরিণতি তাদের মধুময় পথেই, কিন্তু সে পথের মধ্যে দিয়ে বিরহ-মিলনের অনেক আঁকা-বাকা রাস্তা চলে গেছে। ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরহ আর মিলনের যে প্রতিচ্ছবি লেখক উপস্থাপিত করেছেন তা যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এই উপন্যাসটির ভাষা, বর্ণনা-বিন্যাস মনোরম। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। দাম তিন টাকা মাত্র।

ফাগুনের পরশ

ইতিহাসের নীরস মরুভূমি থেকে মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারে অনেক সরস প্রেমের উপাখ্যান। ইতিহাস শুধু তরবারি আর যুদ্ধ নিয়েই পুষ্ট নয়—হৃদয় আর প্রেমও তাকে সমান ভাবে পুষ্ট করেছে। এই রকম দু'টি গল্প এখানে উপহার দিয়েছেন তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন শাসকের আমলে যে প্রেমের সৌধ গড়ে উঠেছিল, তারই অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন তুলসীপ্রসাদ। ভাষার সাবলীলতা পাঠককে মুগ্ধ করে। শুধু প্রেম নয়, তখনকার সমাজ, মানুষ, জীবনধারা অনেক কিছুরই সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পড়েছে। লেখকের আন্তরিকতা প্রশংসার্হ। প্রকাশক—আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স জবাকুসুম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনিউ। দাম দু'টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

তৃষ্ণা

অষ্টাদশবর্ষীয়া কিশোরী ফ্রাসোয়া সাগঁর Bonjour Tristesse আলোড়ন এনেছে পাঠক-সমাজে। ফ্রান্সে, মার্কিণ মুলুকে এবং যুক্তরাজ্যে মোট আট লক্ষ কপি বিক্রীত হয়েছে। ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্মান লাভ করেছেন এই মহিলা। একটি মেয়ে তার নিজের প্রেম কাহিনী এবং বিশেষ ভাবে অপরের সঙ্গে তার বিপত্নীক পিতার প্রেমকাহিনী বিবৃত করেছে। আত্ম-স্বীকৃতি যে কতদূর প্রাণস্পর্শী হতে পারে তার ছাপ পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। সাগঁর সিসিলের আত্মস্বীকৃতি শুধু প্রাণস্পর্শীই নয়, চমকপ্রদও। জীবনের তৃষ্ণা যে মানুষকে পাগল করে তোলে তার স্বাক্ষর পাওয়া যায় বিপত্নীক রেমঁ এবং তার দুই প্রণয়ী এলসা ও আনের চরিত্রে। কথা হচ্ছে, যে-পশ্চিমের মাটিতে যে বীজ বপন করলে যা ফল পাওয়া যায় ভারতের মাটিতে সেই বীজ সেই একই ফল উৎপন্ন করে কি না—এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তার অবকাশ আছে। অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী কল্পনা রায়। তাঁর অনুবাদ ক্ষমতা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। ভাষার স্বচ্ছতা বর্ণনার ব্যাপকতা পাঠককে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। শ্রীমতী রায় তাঁর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এই গ্রন্থে।—প্রকাশক আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স জবাকুসুম হাউস চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনিউ। দাম তিন টাকা মাত্র।

॥ প্রাপ্তি স্বীকার ॥

মুঠো মুঠো কুয়াশা

—প্রাণতোষ ঘটক। ভারতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

নীলকণ্ঠ

তেত্রিশ

'কবি কালিদাস' ছবি শেষ পর্যন্ত একদিন ছাড়পত্র পেলো। পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে দেখা দিলো রূপালী পর্দার গায়ে। সে দিনটি মনে রাখার মত। ছবির মুক্তির মুহূর্তটি কোনও দিন না ভুলবার। 'কবি কালিদাস' ছবির আবির্ভাব দিবস যখন পাবলিসিটির রণ-পায় দৌড়ে আসছিল দ্রুত, দ্রুততর হচ্ছিলো তখন মঞ্জরীর বুকের স্পন্দন। মনে হচ্ছিলো বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটার আওয়াজ বোধ হয় বাইরের কানে গিয়েও পৌঁছবে। মুক্তির দিন আর তার আগের ক'টা রাত একটি মুহূর্তও থামে নি বুকের ভেতর তোলপাড় করা উত্তেজনায় অস্থির জীবন-সমুদ্রের উত্তাল, উন্মত্ত ঢেউ। সেই ঢেউ কখনও নিয়ে গেছে নিশ্চিন্ততার, নির্ভরতার, সাফল্যের সমুদ্র তীরে, কখনও ডুবিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছে অসাফল্যের, গ্লানির, ধিক্কারের গভীর অতলে। সেই ক'টা রাত ঘুমোতে পারেনি মঞ্জরী। সেই ক'টা দিন খেতে পারেনি ভালো করে। বসতে পারে নি দণ্ড। বিছানায় গা এলিয়েছে; ক্লান্তিতে দুচোখের পাতা এসেছে ভরে। কিন্তু কোথায়? ঘুম কোথায়? খুট্ করে একটু সত্যি আওয়াজ হয়েছে অথবা তা' মনের ভুল,—ধড়মড় করে উঠে বসেছে মঞ্জরী। উঠে দাঁড়িয়েছে গিয়ে একেবারে খোলা জানলার কাছে। না। রাত শেষ হতে এখনও অনেকক্ষণ! এখনও গেল না আঁধার,—মনে মনে আউড়েছে মঞ্জরী। সূর্য উঠতে আরও কত সময়? মহাকালের রথের চাকার তলে কত রঙীন সূর্যোদয়, কত রক্তাক্ত সূর্যাস্ত প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে,—শুধু মঞ্জরীর জীবনে প্রথম সূর্যোদয়, আজও সে অসম্ভব হয়েই রইবে? তার সপ্তাশ্বের খুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে; শোনা যাচ্ছে সপ্তাশ্বের হ্রেষা; শুধু সূর্যের মুখ এখনও সময়ের মুখোসে ঢাকা। হে সূর্যদেব, তোমার অসময়ের অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে আত্মপ্রকাশ করো। হে জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য! মহাদ্যুতি সূর্য! সর্বপাপঘ্ন সূর্য! উদিত হও! সূর্যমুখী আজও তোমার উদয়ের পথ চেয়ে। হে দিবাকর! তুমি প্রসন্ন হও তার প্রতি।

তারপর এক সময়ে সূর্যমুখীর স্বপ্ন সত্য হলো। সূর্য উঠল। জগজ্জনের সমস্ত প্রশ্নকে মুহূর্তে নিরুত্তর করে; সমস্ত সন্দেহ করে নিরসন; রাত্রির তিমিরজালকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেখা দিলেন রক্তলোচন তপন। সময়ের সমুদ্রে স্নান করে সমাসীন হলেন মহাকালের রথে। চলতে আরম্ভ করল তার অবিরত চক্র। কালের যাত্রার ধ্বনি রইল অশ্রুত। আর তারই সঙ্গে অশ্রুত রইল নিতাই উধাও মহাকালের সেই রথের তলায় আঁধারের চক্রে পিষ্ট বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন! শুধু ভোর হলো মঞ্জরীর জীবন। নিজেকে মেলে ধরবার স্বপ্ন সত্য হলো সূর্যমুখীর।

'কবি কালিদাস' ছবি বহু ঢক্কানিনাদের মধ্যে মুক্তি মাত্র অভিনন্দিত হলো। কিন্তু সে অভিনন্দন কিছুই নয় তুলনায় যেমন অভ্যর্থনা পেলো এ ছবিতে একটি প্রায় সম্পূর্ণ নতুন মুখ। অনসূয়ার ভূমিকায় মঞ্জরীবালা। একটি নতুন তারা দেখা দিলো ছায়া-চিত্রাকাশে। অবাক হয়ে সবাই তাকিয়ে দেখলো। গবেষণা শুরু হয়ে গেলো। ভুল দেখছে না তো তারা? এ সত্যিই তারা না জোনাকি? না। ভুল হয় নি। তারাই। দপদপ করে জ্বলছে। আকাশের কপালে জ্বলজ্বল করছে নোতুন টিপ! এসেই ধাঁধিয়ে দিয়েছে চোখ। চোখ ফেরাতে দেয় নি কাউকে। আর কাউকে নিজের ওপর থেকে সরাতে দেয় নি নজর। মুহূর্তের জন্যেও হতে দেয় নি লক্ষ্যভ্রষ্ট। নাচে-গানে-অভিনয়ে পাগল করে দিয়েছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে। ছবি নয়; কবিতা। কথা নয়; গান। অভিনয় নয়; জীবন। মঞ্জরী এনেছে নতুন গুঞ্জন যার গুনগুন্ অতিক্রম করে গেছে শ্রীকৃষ্ণ দত্তর পরিচালনায় তোলা ওল্ড থিয়েটার্সের পতাকায় গৃহীত 'কবি কালিদাস' ছবির বিপুল ঢক্কানিনাদকে।

প্রথম রাতে দর্শক-পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কবি কালিদাস ছবি রূপালী পর্দায় দেখতে দেখতে যে রোমাঞ্চ করল অনসূয়ার শরীর-মনকে তার সঙ্গে এ জগতে কিছুরই তুলনা অসম্ভব। নিজেরই মনের সপ্রশংস স্বগতোক্তি বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে; এ-অভিনয় আমি করেছি। ছবি শেষ হয়ে যাবার অনেক আগেই ঘরে সেদিন যত লোক এবং যত স্ত্রীলোক ছিলো দর্শকাসনে তাদের সকলের সম্মিলিত অভিনন্দনে নন্দিত হলো একটি নতুন ধরণের অভিনয়। সে-অভিনয়ে মঞ্জরী জানে তার নিজের চেয়ে অনেক বেশী সিংহের অংশ প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণ দত্তর। কৃতজ্ঞতায় অশ্রু আপ্লুত হলো মঞ্জরীর চোখ। নিজের মনে-মনেই নমস্কার করল সে অভিনেত্রী মঞ্জরীর ছায়াস্রষ্টাকে। পুতুল থেকে প্রতিমা হয়ে সে প্রণাম নিলো না; বরং প্রণতি জানালো সেই পুরোহিতের পায়ে যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে সেই পুতুলে।

প্রথম রাতে গাড়ীতে করে বাড়ী ফেরার পথে মাতাল হল

মঞ্জরী। মদের নয় নিজের সাফল্যের নেশায়। মৃগনাভির গন্ধে যেমন পাগল হয়ে বনে-বনে ফেরে মৃগ। এত আনন্দ ছিলো জীবনে, এত উত্তেজনা,—এ যেন স্বপ্নেরও অগোচর ছিলো পেঁচী মঞ্জরীর। তাই সে বাড়ী যাবার পথে নিজেকে নিয়েই মশগুল হলো। কোথা থেকে যে উঠে আসছে এত সুখ কিছুতেই তার সন্ধান পেলো না সে। মাতালের মতই সে যেন গাড়ীতে চলেছে তবু গাড়ীতে নয়। উড়ে চলেছে সে। সাফল্যের চাকায় গর্জে উঠেছে জীবনের ইঞ্জিন। ধ্বক্-ধ্বক্ করছে তার বুক। অবিরত আবর্তিত হচ্ছে সামনের পাখা। পিছনের আর পাশের চাকা মাটি ছেড়ে স্পর্শ করেছে উর্দ্ধলোক। যাত্রা সুরু হয়ে গেলো এই মুহূর্তে। জীবনের জয়যাত্রা। অনেক দূর যেতে হবে; অনেক দূর। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।

স্বপ্ন ভাঙলো বাড়ীর দরজায় পা দিয়ে নিজের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে মঞ্জরীর। কে এলো আজ? কে আসতে পারে এখন? শ্রীকৃষ্ণ দত্ত? শ্যামচাঁদ গড়াই? যে-ই হোক! আজ তাকে ফিরিয়ে দেবে মঞ্জরী। আজ নয়। আজ কেউ নয়। আজ সে একা থাকবে। নিঃসঙ্গ। নিজেকে নিয়ে উন্মত্ত হবে আজ। নিজেকে সে দেখবে আজ প্রণয়ীর চোখ নিয়ে। আদর করবে; অভিমান করবে; কাঁদবে; হাসবে,—নিজেকে আজ সে নিজে ভালোবাসবে। আজকের রাত তার একার রাত। এ রাতের আনন্দ; এ রাতের দুঃখ সে নেবে না কারুর সঙ্গে ভাগ করে। কেউ জানবে না এই একটা নির্জন অথচ ভরপুর রাতের ইতিহাস। এ-রাত তার নিজের জন্যেই নিজের হাতে সে রচনা করবে।

ঘরে ঢুকবার আগে আরেক বার অনুমান করবার চেষ্টা করল মঞ্জরী। কে হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত এবং শ্যামচাঁদ গড়ায়ের নাম দুটোই বার বার মনের আয়নায় ভেসে উঠলেও, মঞ্জরী জানে তারা নয়। তারাও আজ তার মত অতটা না হলেও ছবির ভবিষ্যৎ নিয়ে যতটা ব্যস্ত অতটা নয় রাতের মৃগয়া নিয়ে। তাই তারা আজ অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে। পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় থাকবে ব্যাপৃত। কিন্তু তাহলে? আর কে আসবে। ইদানীং মঞ্জরীর দরজায় এতো রাতে আর কেউ আসে না। কারণ সবাই জানে প্রায় যে এ-সময়টার অধীশ্বর শ্যামচাঁদ গড়াই। মঞ্জরীও নয় এ-সময়ের সম্রাজ্ঞী। এ-সময়টুকু চুরি করে নয়; দাম দিয়ে কিনে রেখেছে শ্যামচাঁদ। এ সময়টুকুকে করেছে তার বাঁধা রক্ষিতা। যা ইচ্ছে তাই করবার; কিছুই না করবার এ-সময়ে, স্বাধীনতা আর কারুর না। শুধু শ্যামচাঁদ গড়ায়ের। সিঁড়িতে এসে একটু থেমেছিলো ভাববার জন্যে মঞ্জরী। তারপর দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ঘরের পর্দা ঠেলে ঢুকেই থেমে গেলো। যাকে সে বসে থাকতে দেখলো তাকে সে জানতো সে মুছে ফেলেছে চিরকালের মত মনের শ্লেট থেকে। সে বসেছিল মঞ্জরীর অপেক্ষায়। উঠে দাঁড়ালো সে; রাণী ঘরে এসে ঢুকলে চাকর যেমন করে উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেছে তার। ঠোঁট গেছে শুকিয়ে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে একটু ভিজিয়ে নিয়ে কম্পিত কণ্ঠস্বরে তোতলাতে লাগলো সে। আমি চলে যাচ্ছিলাম; মা বসতে বললেন—।

মঞ্জরী হাসলো। তারপর বললো: বসুন। আমি আসছি। —না। মঞ্জরী আজ দুলুবাবুকে কিছুতেই ফেরাবে না। সব সঙ্কল্প ভেসে যাক আকস্মিকতার জোয়ারে। প্রতিজ্ঞার বজ্রমুষ্টি হোক শিথিল। তার দুদিনের একমাত্র লোক দানপাত্রকে সে আজ ধনী হবার মুহূর্তে দেবে না ফিরিয়ে। দুলুবাবুই একমাত্র লোক আজ যে তার চরম লাঞ্ছনার দিনের একমাত্র সাক্ষী। আর সেদিন যখন মঞ্জরী ছিলো সকলের করুণার, অবজ্ঞার, তাচ্ছিল্যের পাত্রী সেদিন দুলুবাবু অন্তত লুকিয়ে এসে ঢোকে নি তার ঘরে। এসেছে তার ঘরেই আসছে যে—সকলকে তা জানিয়ে। সকলের চোখের ওপর দিয়ে।

তাই আজ দুলুবাবুকে কৃপা করবে মঞ্জরী। দয়া করে তাকে থাকতে দেবে তার ঘরে। রাত কাটাতে দেবে কারণ এরাত আর মঞ্জরীর জীবনে ফিরবে না। সামনে দিন আসছে। নতুন দিন।

চৌত্রিশ

সত্যিই আসছে নতুন দিন। সময়ের সমুদ্রে অবগাহন করে উঠে আসছে আর একটি নতুন দিন নতুনতর দিগন্তে। ধ্বসে আসা বাড়ীর প্যালেস্তারা খসা ইট-বার-করা গতরের মত ধোঁয়ার কালিতে কালো, বজ্রে বিদীর্ণ, আকাশের বুকে; বৃষ্টিতে বিবর্ণ আকাশের মুখে আবার কলি ফেরাচ্ছে প্রকৃতি। নিজের হাতে নীল রং গুলছে তার গায়ে। কত বৃষ্টি হয়ে গেছে; অন্ধকার মেঘ,—আকাশ মনে রাখে নি কিছুই। তার নীল অঙ্গে আবার আরম্ভ

হয়েছে সুনীল উৎসব। মঞ্জরীর জীবনেও উড্ডীন হয়েছে সেই উৎসবের পতাকা। ওলড্ থিয়েটারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে মঞ্জরী নতুন করে পাঁচ বছরের জন্যে। অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক বেশী প্রলোভনের আমন্ত্রণ এলেও মঞ্জরীর স্থির বুদ্ধি সে সব করেছে প্রত্যাখ্যান। মাইনে এক লাফে গিয়ে উঠেছে বারোশোর বিস্ফারিত অঙ্কে। পুরানোদের ঈর্ষ্যার ফণা তোলা আর নতুনদের হাঁ-হয়ে-যাওয়া মুখের লালা নিঃসরণই সার হয়েছে। মুহূর্তে ভারতবিখ্যাত তারকার মধ্যে পরিগণিত হয়েছে মঞ্জরী। কোম্পানী গাড়ী কিনে দিয়েছে নতুন। লেকের ধার ঘেঁসে দশ কাঠা জমির করে দিয়েছে বায়না। খ্যামটার গড়াই সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে সুরু করে দিয়েছেন বাড়ীর ভিত গাড়তে। সিনেমার কাগজে কাগজে প্রচ্ছদে-প্রচ্ছদে মঞ্জরীর মুখ হয়েছে মুদ্রিত। একরঙ দু'রঙ থেকে পাঁচ-ছ-রঙ টেকনিকলার করেছে মঞ্জরীর মুখ। তার বানানো জীবনী; তার সঙ্গে ইণ্টারভ্যুর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সচিত্র বিবরণ। আরও একটি নতুন মুখরোচক অভিজ্ঞতা হলো মঞ্জরীর। মনোজ্ঞ। কোথা থেকে কারা সব চিঠি দিতে লাগলো। কোনটায় নাম আছে। কোনটায় নাম নেই। কোনটার তলায় নামধামের পরিবর্তে 'ইতি অনুরাগী', 'ইতি ভক্ত' 'ইতি দর্শন-প্রার্থী' নানারকম পাঠান্ত। চিঠিগুলো বক্তব্যে বিচিত্র। আবেদনে আকুল। স্থূল, নির্বোধ অথবা বিকৃত। কেউ দেখা করতে চায়। কেউ চায় ছবি পেতে। কেউ পত্রোত্তর অথবা স্বাক্ষর। কেউ জানতে চায় কাগজে যে জীবনী বেরিয়েছে মঞ্জরীর তার কতটুকু সত্য আর কতটা ফিকশান। কেউ খোলাখুলি লিখেছে সঙ্গ চায় মঞ্জরীর; দর্শনী দিতে সে প্রস্তুত। কারুর ভাষা কদর্য কামনায় রীতিমত কুৎসিত। কেউ জিজ্ঞেস করেছে তাকে মনে পড়ে কি না? অনেকদিন সে গিয়েছে মঞ্জরীর কাছে; মঞ্জরী যখন খাস পাড়ার মেয়ে ছিলো সেই তখন।

এরই মধ্যে একখানি চিঠির ওপর মঞ্জরীর এক জোড়া চোখ এসে থামলো। থামতে বাধ্য হলো। খামের চেহারা, খামের ওপর প্রেরকের আত্মক্ষর খোদাই করা; চিঠির কাগজ এবং হাতের লেখা সবই যেন তীব্র ভাবে আকর্ষণ করল মঞ্জরীকে। বার বার পড়বার পরেও আবার পড়া তাই শেষ হয় না। চিঠিতে মঞ্জরীকে সম্বোধনের ভাষাই মঞ্জরীর বুকের সমস্ত রক্তটুকুকে তুলে এনে ছড়িয়ে দিলো মুখের ওপর। সেই গোধূলি-মুখের ওপর তুলি দিয়ে আঁকা দুটি অন্ধকার চোখ চিঠিটার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলো আরেকবার। চিঠি লিখেছে বিলাত ফেরৎ সদ্য স্বদেশপ্রত্যাগত এক যুবক। আগাগোড়া সম্বোধন করেছে মঞ্জরীকে 'আপনি' বলে। পাঠ লিখেছে: মঞ্জরী দেবী, মাননীয়াসু! চিঠির বক্তব্য স্পষ্ট! অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচিত। সেই যুবক এবং তার দুটি বন্ধু বিলাত থেকে সদ্য দেশে ফিরেছে। ফিরেই তাদের জীবনে প্রথম বাংলা ছবি দেখেছে। 'কবি কালিদাস'। অনসূয়ার ভূমিকাভিনেত্রী যে বাংলার মাটিতে সম্ভব স্বপ্নের অগোচর সেই অলীক-অলৌকিক ঘটনা যখন সত্য বলে প্রকটিত হয়েছে তখনই মঞ্জরীকে লিখেছে এই চিঠি। চা-পানে করেছে আমন্ত্রণ। পত্রদূত মারফৎ অপেক্ষা করছে সানন্দ সম্মতির।

চিঠিটা শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছে মঞ্জরী তার শিক্ষয়িত্রী এবং সখী মুক্তিদেবী চট্টোরাজকে। দেখান ইচ্ছের নয়। বাধ্য হয়ে। মনের কুঠরীতে দুর্লভ বৈদূর্যমণির মত তাকে সযত্নে রক্ষা করবে, এই ছিলো একান্তিক কামনা। কিন্তু প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়েছে সেই বাসনাকে। প্রয়োজন,—পত্রোত্তরের। সেই দায়েই দেখাতে হলো মুক্তিদেবীকে। তিনিই জবাব দিলেন মঞ্জরীর হয়ে। সন্ধ্যার পর দেখা করতে লিখলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের সামনে! আরও লিখলেন মঞ্জরীর ছবি যখন পত্রদাতা দেখেছেন তখন নিশ্চয়ই মঞ্জরীকে তিনি চিনতে পারবেন। চিনতে না পারলেও ক্ষতি নেই! গাড়ীর নম্বর হচ্ছে এই।

মঞ্জরী প্রস্তুত হতে লাগলো জীবনের স্মরণীয় সন্ধ্যার জন্যে!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের সামনে দেখা হলো এক সন্ধ্যায়। মেয়েমানুষের সঙ্গে খদ্দেরের নয়। যুবতীর সঙ্গে যুবকের। পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের। গোধূলির সঙ্গে গানের আলাপের।

যুবতী দেখল যুবক যাকে অপরূপ সুন্দর চেহারা বলে তা নয়; কিন্তু পুরুষালি চেহারা। সুঠাম অঙ্গ; ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ। যুবক দেখল, যুবতী যাকে ছবিতে সে দেখেছে তার চেয়ে অনেক নিরেশ দেখতে। কিন্তু দেখতে দেখতেই চোখের সামনে যে দাঁড়িয়ে সে সরে গিয়ে তার জায়গা নিলো ছবির অনসূয়া। মুহূর্তে মনে হলো সেই মেয়ে যার জন্য বিলিয়ে দেওয়া যায় সাম্রাজ্য; পাগল হওয়া যায়; হওয়া যায় কলঙ্কের অধীশ্বর। মাথা পেতে নেওয়া যায় সমাজের দণ্ড।

মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বলল যুবক: আমার নাম আলোক মিত্র। মঞ্জরীকে গাড়ী ছেড়ে দিতে বলে যুবক নিজের গাড়ীতে তুলে নিলো তাকে। তার পর নিয়ে এলো চৌরঙ্গীপাড়ায়। সেখানে হোটেলের বারান্দায় চায়ের পাত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিলো আরও দুটি বন্ধু সেই যুবকের। তারই মত বিলাত থেকে সদ্য ফেরৎ। দুটি বন্ধুই যুবকের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী প্রিয়দর্শন। কিন্তু যুবকের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক দুটো চোখের তুলনায় আর দুজনকেই বড় নিষ্প্রভ মনে হয়। মনে হয়, মাকাল ফল। মনে হয়, রাঙা মূলো। মঞ্জরী আগেও অনেক বার পেয়েছে; আজও আরেক বার প্রমাণ পেলো। সুন্দর চেহারার পুরুষ প্রায়ই বোকা-বোকা হয় দেখতে; প্রায়ই মেয়েলী হয় তারা। আলোক মিত্রের দুই বন্ধুর কোনজনকেই ব্যতিক্রম মনে করবার মত দ্রষ্টব্য খুঁজে পেলো না কিছু।

চৌরঙ্গীর অন্ধকারে বিজলী তারারা ফুটে উঠছে একের পর এক। বারান্দার অন্ধকারেও এতক্ষণে জ্বলে উঠেছে তড়িৎ-জ্যোৎস্না। নানা রকম আলো; নানা রঙের। বারান্দার এই কোণ থেকে অনেক দূর দেখা যায় চৌরঙ্গীর। এধার থেকে ওধার থেকে অনেক দূর। মঞ্জরী বসে বসে তা-ই দেখছিল। এমন দৃশ্য এমন জায়গা থেকে দেখা তার জীবনে এই প্রথম। এ দৃশ্য দেখে দেখে যাদের চোখ পচে গেছে, তারা তাকায় না কিন্তু যে কখনও এমন করে উঁচুতলা থেকে নীচু জমির মানুষজনকে দেখে নি, দেখে দেখে দেখার আর অবাক হবার আর অবাক হয়ে আবার দেখার বিস্ময় তাদের বাগ মানে না। চোখের পড়ে না পাতা। মনের মেটে না কৌতূহলের ক্ষুধা।

গণিকা এই মহানগরী; কলকাতা যার পৃথিবীর এপার থেকে
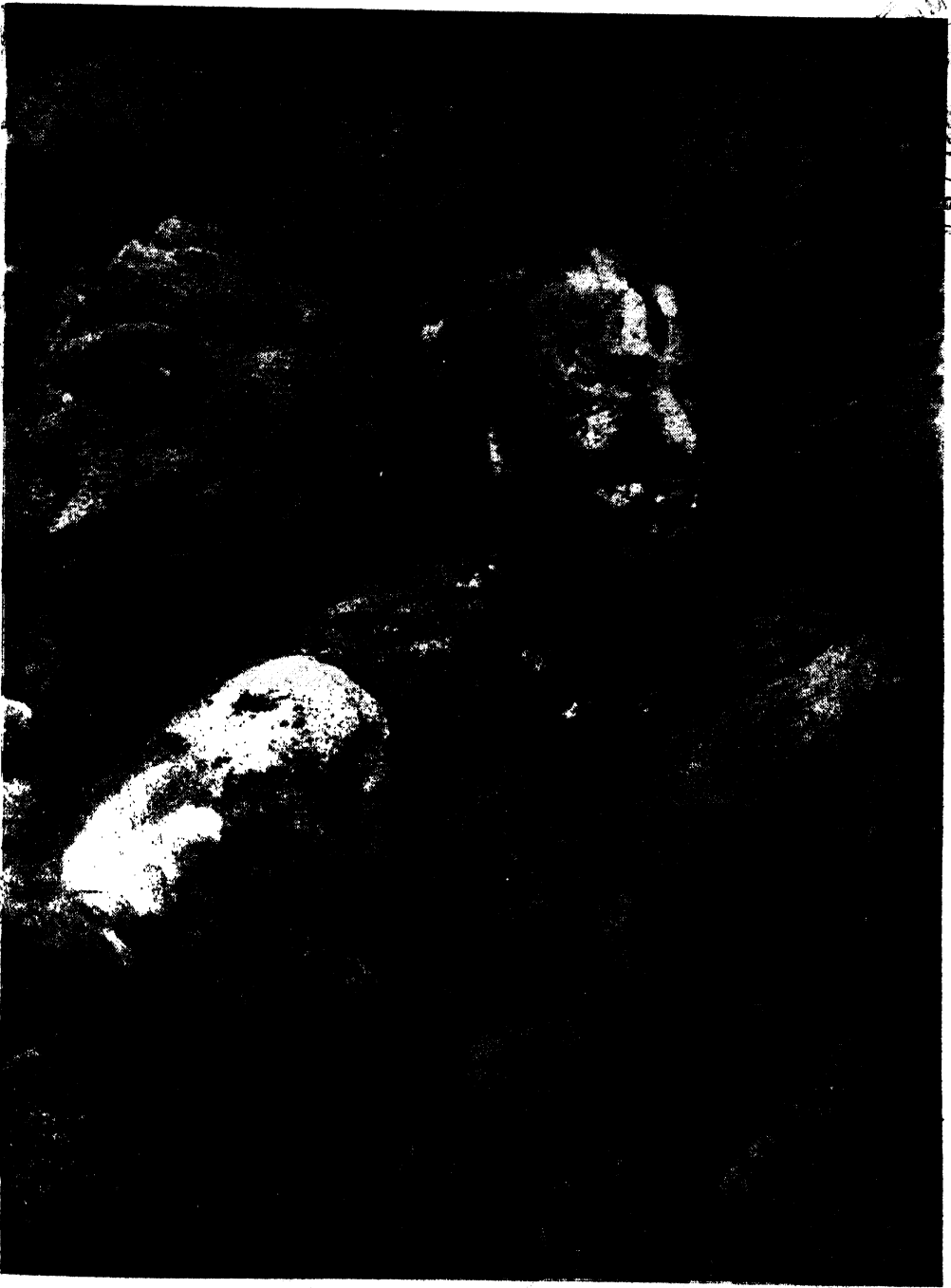
প্রস্তর-মূর্ত্তি —মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

॥ আ লো ক চি ত্র ॥

শিকারের সন্ধানে

—রামকিঙ্কর সিংহ

হংসেশ্বরী মন্দির

—আনন্দ মুখোপাধ্যায়

হারেম

—অজিত দে

পাঁচচূড়া মন্দির (বিষ্ণুপুর)

—তৃপ্তিশেখর দত্তরায়

ওপার পর্যন্ত প্রিয় নাম; সাজতে বসেছে এখন। তার সন্ধ্যা সুরু হতে যাচ্ছে। সাজছে সে। নিশীথ রাত্রির অভিসারিকা-সাজ। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের জন্ম অপেক্ষা করতে হয় নি তাকে। নিজের হাতে সে করছে নিজের মেক-আপ। সুইচের ওঠা-নামায় তার লাইট এণ্ড শেড। বিদ্যুতালোকিত বিজ্ঞাপনে বিচ্ছুরিত তার মুক্তোর মত হাসি। জলে উঠেই নিবে যাওয়া নিওনে তার কটাক্ষ। ভিক্টোরিয়া হাউসের আলোর গম্বুজ তার কালো চুলে জড়ানো মালার মতো। ভিখারীর পেশাগত আর্তনাদ, ফেরিওলার চীৎকার, ট্রামের ঘণ্টা, বাসের কণ্ডাক্টরের কমেণ্টারী, গাড়ীর হর্ণ,—এক বিচিত্র অর্কেষ্ট্রার বিরামবিহীন সিম্ফনী। গণিকা নগরীর সান্ধ্য আসর থেকে নিশীথ বাসর পর্যন্ত মাইফেলের তালে মেশানো ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক!

দেখতে-দেখতে নিজের কথাই মনে হলো মঞ্জরীর। নিজের আর যেখান থেকে সে এসেছে সেই পাড়ার মেয়েদের কথা। ঠিক এমনই করেই সন্ধ্যেবেলায় তারা সাজতে বসে। ঠিক এমনই করেই সাজ সমাপ্ত হবার আগেই আনাগোনা আরম্ভ হয়ে যায় পথ ভোলা পথিকের। তারা এসেই হাঁক দেয়; সন্ধ্যেবেলার চামেলী গো, সকালবেলার মল্লিকা—আমায় চেনো কি? ঠিক যেমন করে এই গণিকা নগরীর সান্ধ্য সজ্জা সমাপ্ত হবার আগেই আসতে সুরু করবে প্রণয় প্রার্থীর দল। কিন্তু এ প্রণয় মঞ্জরীদের পাড়ারই মতো পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। যার যেমন ট্যাকের জোর, মঞ্জরীদের মতই এই নগরীরও তার সঙ্গে ঠিক তেমনই ব্যবহার। অতটুকুই আপ্যায়ন; সোহাগ ঠিক সেই মাপের।

কেউ শুধু দূর থেকে দেখেই চলে যাবে এই সাজ। কেউ দর করবে, কিন্তু দরজা পেরুতে করবে না সাহস। কেউ বসবে তবে সে গানের আসরে যেমন আসল গাইয়ে আসবার আগে পাড়ার ছেলে ছোকরারা সময় কাটাবার জন্যে বসে তেমনি উটকো খদ্দের হিসেবেই ঠাঁই পাবে; তার চেয়ে বেশী নয়! তারা জানে কখন তাদের বসার এবং কতক্ষণ বসার এবং আবার কখন অন্তর্ধান হবার সময়। তার পর আরম্ভ হবে মৃগয়া। যারা আসবে তারাই এই বারনগরীর নিশীথ রাত্রির নায়ক ও অভিনায়ক।

তার পর এই নিশীথ নগরীর বুকেই আবার সকাল হবে। যেমন সকাল হয় মঞ্জরীদের পাড়ায়। তেমনই রাতের যারা উৎসব সকাল বেলায় তাদের শবের মত পড়ে থাকতে দেখে যেমন শিউরে ওঠে একই লোক ঠিক তেমনই গণিকা নগরীর সকালের চেহারা দেখে চমকে উঠে মনে করবে, কালি রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে—!

ভাবছিলো মঞ্জরী। কিন্তু চেয়ে চেয়ে দেখছিলো বিলাত ফেরৎ সদ্য স্বদেশ-প্রত্যাবৃত তিন যুবক তাদের প্রথম ভারতীয় অভিজ্ঞতা। দর্জি যেমন করে ফিতে দিয়ে মাপ নেয় তেমনি করে মাপছিলো তারা তিন জনই মনে-মনে। মঞ্জরীকে মেপে নিচ্ছিলো। এক সময়ে তার পর অবশ্য তিন জনই নিস্তব্ধতার বরফ ভাঙলো একই প্রশ্নে: নিন; চা যে জুড়িয়ে গেলো মঞ্জরী দেবী!

চমকে উঠলো মঞ্জরী। দেবী? যে-ডাক শোনবার জন্যে সারা জীবন ব্যর্থ প্রস্তুতির পর প্রস্তুতিতে ভুলে গিয়েছিলো যার সম্ভাবনা; ডুবিয়ে গিয়েছিলো ধিক্কারের অতলে সেই ডাক নিজে থেকে এসে আজ মনের ভাঙ্গা দরজায় মরচে-পড়া কড়া ধরে নাড়ছে। শব্দ আসছে আস্তে। আস্তে আসছে, তার দোষ ডাকের নয়; সে দোষ কড়ার। সে দোষ মরচে-ধরার। মঞ্জরীর মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো সেই ডাক। অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও ধরা পড়তে বাকী রইল না তার। তিনটি সদ্য পরিচিত যুবকের কাছে বেরিয়ে এলো যে, সে মেয়ে মানুষ নয়। মেয়ে।

চা ঢালার কথা মঞ্জরীর। কিন্তু আলোক মিত্রই পেয়ালায় চিনি-দুধ সহযোগে তৈরী করল চা। আলোক মিত্র বুঝে নিয়েছে মঞ্জরী চা আওয়াজ করে খায়। আওয়াজ না করে চা তৈরী করে দেওয়ার আশা তার কাছে দুরাশা মাত্র। মাথা নীচু করে চায়ের পেয়ালায় মুখ নামালো মঞ্জরী। দম বন্ধ করে ঠোঁট ডোবালো। পাছে শব্দ হয়ে যায়। পাছে আলোক মিত্র বুঝে ফেলে তা-ই য বুঝতে, মঞ্জরী জানে না, আর বাকী নেই আলোকের। শুধু আলোকের নয়। আলোকের দু বন্ধুরও।

অবশ্য এক সময়ে সহজ হয়ে এলো চারজনেই। ঠিকানা না জানা গলি রাস্তার দুরূহ পরিবেশ পার হয়ে চেনা পথের পরিচিত নম্বরে এসে পৌঁছনর মত টুকরো কথা বার্তার বাধো বাধো বেষ্টনী পার হয়ে প্রগলভ আলোচনায় সঙ্কোচ না মানা সব কথা সহজেই বলার খোলা মেলা জমিতে। বিলেতে ফিল্ম ষ্টুডিওর অবস্থা। সেখানকার অভিনেতা অভিনেত্রীদের রোজগার। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে এখানকার অভিজ্ঞতার বিনিময় হলো। প্রশ্ন করল: বাঙলা ছবি কেন ভালো হয় না। মঞ্জরী জবাব দিলো; তার কোনও মানে হয় কি না, কিছুই না জেনে, কিছুই না ভেবে জবাব দিলো।

তারপর এক সময়ে আলোকের এক বন্ধু তুলে নিলো মঞ্জরীর হাত। হাত দেখে সে। কৌতূহলী হয়ে উঠলো মঞ্জরী। হাত দেখে যা বলল বিশ্বাস করা যায় না তা। কিন্তু হালকা-হাসি ঠাট্টার মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে গম্ভীর হয়ে উঠলো করকোষ্ঠী বিচারক সেই বন্ধু। হাত ছেড়ে দিয়ে তাকাতে লাগলো মুখের দিকে মঞ্জরীর। অস্বস্তি বোধ করবার আগেই বন্ধুটি চোখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলো আলোকের মুখের ওপর। কিন্তু একটি কথাও আর বলল না সে। শুধু অসম্ভব থমথম করতে লাগলো তার মুখ।

একটু বাদেই চা-সভা ভঙ্গ হলো।

বাড়ী পৌঁছে দেবার গাড়ীতে যেতে যেতে একটি কথাও হলো না আর। সবাই নির্বাক। সবাই স্তব্ধ। ঝড় উঠবার আগে আকাশের চেহারা হয় যেমন ভয়াবহ আতঙ্কের। শুধু ঝড়ো হাওয়া বইতে সুরু করে দিয়েছে মঞ্জরীর মনে। মনের দরজা-জানলা খুলে দিয়েছে সব। তবু ঝোড়ো হাওয়া বলেই ভয় হয়। যে হাওয়া কাটিয়ে দিয়েছে মনের গুমোট সেই হাওয়াই আবার হঠাৎ বন্ধ না করে দেয় জানলা-দরজা সব। দিক। তবু একবার দুঃসাহস করবে মঞ্জরী। আজ সন্ধ্যের যৌবনের জয়তোরণের তলা দিয়ে তার এই প্রবেশ-জীবনের রাজসিংহাসনে আসীন হবার জন্যেই! ভাগ্যবিধাতার আহ্বান,—সে মাথা পেতে নেবে। মিলনের পরিবর্তে প্রহসন হলেও! [ক্রমশঃ।

শেষ লেখা

গীতা গুহ

শান্ত পরিবেশ—ভাবগম্ভীর অনাড়ম্বর ভাবে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হোচ্ছে। শুদ্ধ, শুচি করে তোলা হোয়েছে সভামণ্ডপ। ধূপ জ্বলছে। কয়েকটা ফুলের তোড়া। রজনীগন্ধার মালা পরে বড় অয়েল-পেন্টিংয়ের ছবিখানা যেন হাসছে, জীবন্ত রূপ তার, চোখ দুটির সেই উজ্জ্বল চাহনী।

বাঙ্গলা সাহিত্যের উদীয়মানা লেখিকা কাজরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু সকলকে স্তম্ভিত করেছিল। সুখ-দুঃখে একটা বছর পার হয়ে গেল। আজ প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হোচ্ছে।

কাজরী দেবীর শেষ উপন্যাসখানা নিয়ে আলোচনা করছিলেন. জনৈক বক্তা—দাম্পত্য জীবনের ... চিত্র আঁকতে পারতেন লেখিকা—সভাপতি স্নিগ্ধ ব্যথাতুর দৃষ্টিতে চাইছিলেন সিতাংশুশেখরের মুখের দিকে, কাজরীর স্বামী সিতাংশুশেখর। বক্তা বলছিলেন, অতি অল্পদিনের মধ্যে লেখিকার বলিষ্ঠ লেখনী সকলে মুগ্ধ করেছিল। তার মৃত্যু সাহিত্য জগতের অপুরণীয় ক্ষতি। আরও অনেক কথা বলে গেলেন তিনি।

সভাপতি সিতাংশুকে কিছু বলবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালেন, কিন্তু সিতাংশু সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারল না।

লেখিকার নানা গুণাবলী বর্ণনার পর সভা শেষ হোল। বাড়ি ফিরে এল সিতাংশু। কাজরীর মৃত্যুর পর প্রকাশিত তার শেষ উপন্যাসখানি—উজ্জ্বল, বাস্তব, মধুর দাম্পত্য চিত্র,—কিছু ঘটেছে তা যদি সত্য হয়, তবে কাজরীর খুঁটিনাটি বর্ণনাগুলি সব সত্য, কারণ তারা ঘটেছিল। হুবহু ঘটেছিল, সিতাংশু ভুলে যায়নি।

সিতাংশুশেখর হাসছিল। কাজরী তার স্ত্রী; দীর্ঘ দশ বছরেরও বেশী তারা এক সঙ্গে ঘর করেছিল, সুখের সংসার ছিল। কাজরী সকলকে সুখী করেছিল, লেখিকা কাজরী দেবী সুগৃহিণীরূপে সংসারকে সুন্দর করে তুলেছিল, কাজরীর সম্মানে সিতাংশুশেখরই সব থেকে বেশী সম্মানিত হোয়েছে। এ তো সহজ সত্যি কথা। সবাই একথা স্বীকার করে, এক সময়ে এ নিয়ে মনে গর্ব ছিল সিতাংশুর। কিন্তু আজকে? তবু মৃতা স্বনামধন্যা স্ত্রীর 'পরে আজকের অভিমানের কথা কারুকে জানান যায় না।

দশ বছরের মিলিত জীবনে কখনও মনোমালিন্য হয়নি তাদের—তারা আদর্শ দম্পতি। অসীম শ্রদ্ধা ছিল তাদের দাম্পত্য প্রীতির 'পরে আর পাঁচজনের। স্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত বাধ্য ছিল কাজরী, তার সব কথা, সব ইচ্ছা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিত কাজরী। হাসি মুখে সে সব সময় বলত, মেয়েদের স্বভাব যে লতার মত, জড়িয়ে ধরেই তারা উপরে উঠতে চায়। আশ্রয়চ্যুত হোলে, ধূলায় মলিন হবে।—এমন সুন্দর সুন্দর কত কথা কেমন মধুর ভাবে বলতে পারত সে।

কাজরী কিছু দিন রোগে ভুগেছিল। সকলে আন্তরিকতার সঙ্গেই তার রোগ মুক্তি চেয়েছিল। কাজরীর মমতা, স্নেহ, প্রীতি, মায়া অযাচিত ভাবে সকলের 'পরে বর্ষিত হোয়েছে, কাজরীকে সকলে ভালবাসত। নিরহঙ্কারী, বন্ধুবৎসল আরও কত বিশেষণে ভূষিতা কাজরী, কোন বিশেষণই মিথ্যা নয়।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে কাজরী একটা নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছিল; উপন্যাসটা শেষ হয়নি। কাজরী যখন যা কিছু লিখেছে, যতটুকু লেখা হোয়েছে তাই পড়িয়েছে সিতাংশুকে। বলত, সিতাংশুর বিচারের মূল্য তার কাছে সব থেকে দামী। সিতাংশুকে খুশি করবার মত কত কথা বলেছে কাজরী। তখন সিতাংশুও খুশি হোত।

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে লিখত কাজরী, কিন্তু সে রচনা সিতাংশুর কাছ থেকে সে গোপন করতে চাইত। তা বুঝত সিতাংশু, অবশ্য এ জন্য তার কোন দুঃখ ছিল না। বরঞ্চ মনে মনে একটা কৌতুক অনুভব করত, সে তো জানত, কাজরীর জীবনে এমন কিছু গোপন থাকতে পারে না, যে কথা তার অজানা।

কাজরী তখন সিতাংশুর সামনে লিখত না, হঠাৎ সে এসে পড়লে লেখাটা যথাসম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা করত। হাসি মুখে বলত, শেষ হোলে দেখবে।

সে লেখা শেষ হয়নি, কিন্তু অসম্পূর্ণ লেখাই সিতাংশু পড়েছে, অবশ্য তা কাজরীর মৃত্যুর পরে।

মারা যাবার মাত্র কয়েক দিন আগে কাজরী বলেছিল, ড্রয়ারে লেখাটা তুলে রেখেছি, আরও কিছুদিন পরে পড়বে, শেষ হোল না।

রোগদুর্বল শীর্ণ দেহ, বিছানায় শুয়ে থাকত কাজরী, কম্পিত হাত দুটো কলম চালাত। ক্লান্তি থাকলেও অবসাদকে সে প্রশ্রয় দিত না, যেন কী একটা বিরাট কাজ সে হাতে নিয়েছে, শেষ তাকে করতেই হবে। এত বেশি পরিশ্রম করতে বারণ করত সিতাংশু, জীবনে সেই প্রথম আর শেষ বারও সিতাংশুর কথার অবাধ্য হোয়েছিল কাজরী।

উপন্যাস শেষ হয়নি শেষ হোত না, শেষ জানা ছিল না কাজরীর সিতাংশু জেনেছিল। পাণ্ডুলিপি হাতে করে তাই সে ঘুরে বেড়িয়েছে, পৌঁছে দিয়েছে তা সিদ্ধার্থকে।

লাইনটানা একসারসাইজ বুক, যাতে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাতের লেখা লেখে, তাতে গল্প লিখত কাজরী। ওর মুক্তার মত গোটা গোটা হাতের লেখায় ভরে যেত পাতাগুলো। মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে সেই খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে কাজরী লিখেছিল সিতাংশুরই উদ্দেশ্যে।

—শেষ হোল না লেখা, তবু তুমি প'ড়। তারপর, পাণ্ডুলিপিটা, সিদ্ধার্থকে পৌঁছে দিও। আমাকে ক্ষমা কর।

সিদ্ধার্থকে পাণ্ডুলিপি পৌঁছে দিয়েছে সিতাংশু। কিন্তু ক্ষমা সে করেনি কাজরীকে। কাজরীকে আজ আর কাছে পাওয়া যাবে না, ওর ঠিকানা এখন কেউ জানে না, তাই তো সিতাংশুর পরলোককে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। পরজন্ম যদি আসে, ঠিক এ জীবন সে

চাইবে, আর পূর্বস্মৃতি থাকলেই তার জীবন সার্থক হবে। ক্ষমা সে করেনি, করতে পারে না, এ কথাটা পৌঁছে দিতে চায় সে। ভালবাসার নামে ঠকায় যে, তাকে করবে ক্ষমা ?

সিতাংশু সিদ্ধার্থকে চিনত, সে চেনা অতি সামান্ত কাজরীর বাপের বাড়িতে তাকে কয়েক বার দেখেছিল। কোন বিশেষ পরিচয় ছিল না। ওদের বাড়িতে অনেকেই আসা-যাওয়া করত, বরঞ্চ, সিদ্ধার্থকে মাত্র কয়েক বার দেখেছে।

কিন্তু মনে ছিল সিদ্ধার্থকে। কাজরীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে অনেকে এসেছিল শ্মশানঘাটে, সিদ্ধার্থও গিয়েছিল। সকলে সিতাংশুকে সান্ত্বনা জানাচ্ছিল, সিদ্ধার্থ কিছু বলেনি, মৃতার খুব কাছে সে দাঁড়িয়েছিল, সিতাংশু যেখানে বসেছিল তার পাশে। অনেকে সেদিন সিতাংশুর সঙ্গে তার বাড়ী ফিরল, কিন্তু সিদ্ধার্থ আসেনি।

সিতাংশুকেও ভুলে যায়নি সিদ্ধার্থ। সে যখন হাতের পাণ্ডুলিপিখানা সিদ্ধার্থর টেবিলের ওপর রেখে বলল, কাজরী এটা আপনাকে দিয়ে গেছে—বিস্মিত হোয়েছিল সিদ্ধার্থ।

সিতাংশু চলে গেল। একটা অসম্পূর্ণ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, স্বনামধন্যা লেখিকা কাজরী মৈত্রের শেষ লেখা সিদ্ধার্থের হাতে এসে তা পৌঁছল। কাজরী দেবীর মৃত্যুর ঠিক পরে, এমন একটি বস্তু অন্য কেউ পেলে নিশ্চয়ই চুপ করে থাকত না—যে কোন একটা পত্রিকা অফিসে গিয়ে সেটা ফেলে দিয়ে নিজের নাম ঠিকানা আর কাজরীর শেষ ইচ্ছা নিবেদন করলে সে নিজেই 'ইমপরট্যেন্ট' হোয়ে যেত! অসম্পূর্ণ লেখাকে সম্পূর্ণ অন্য কেউ করে দিত—ক্ষতি ছিল না তাতে। কিন্তু তেমন কিছুই করেনি সিদ্ধার্থ, মন দিয়ে পড়েছিল কেবল উপন্যাসখানা, দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি, ক্ষীণ হাসিও ফুটে উঠেনি ওর ঠোঁটের কোণায়, পাণ্ডুলিপিটা যত্ন করে তুলে রেখেছিল। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে সে এটা পড়তে দেয়নি, এ নিয়ে কারুর সঙ্গে কখনও কোন আলোচনাও সে করেনি।

দিনগুলো কাটে কাজ আর নিয়মের বাঁধাধরা পথে, বড্ড তাড়াতাড়ি। সময় নেই, কত কাজ। মাঝে মাঝে বিরক্তি লাগে মনে, জীবনে রস নেই, বৈচিত্র্য নেই। রাত গভীর হয়, চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম গাঢ় অন্ধকারে চাপা পড়ে যায় পৃথিবীর সব বাতিগুলো, সিদ্ধার্থের ঘুম আসে না।

বিছানা থেকে উঠে পড়ে সে। টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে দেয়, ঐ পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসতে হয় তাকে।

হাস্যলাস্যময়ী এক তরুণী কথার আধার যেন, আর আনন্দের ঝর্ণাধারা। ওর ব্যবহারে কেউ কোন ত্রুটি খুঁজে পাবে না, মন জয় করবার যাদু জানে যেন। কুমারী কাজরী, বিস্মিত হোয়ে তাকে দেখেছিল সিদ্ধার্থ; প্রথম যৌবনের সে রঙ্গীন স্বপ্ন কবে মুছে গেল। কী জানি, আজ সিদ্ধার্থের চুলেও হয়ত পাক ধরেছে!

বড্ড বেশি হাসত কাজরী, ওর মাধুর্যে মুগ্ধ হোত সকলে; সব রকম মানুষের সঙ্গে সমান ভাবে সে মিশতে পারত, হয়ত বা গল্পের উপাদান সে এমন ভাবেই সংগ্রহ করেছে। একদিন কাজরী অত্যন্ত লঘু ভাবে বলেছিল, আমরা কিন্তু মিথ্যে কথা লিখি না—অভিজ্ঞতা যা হোয়েছে জীবনে তারই সদ্ব্যবহার করি।

জীবনের অভিজ্ঞতা? উদীয়মানা লেখিকা কাজরীর উপন্যাস কিনেই পড়েছে সিদ্ধার্থ। কৌতূহল ছিল কী কিছু? কত রকম চরিত্র—কত রকম বর্ণনা—ভাল লাগত। না, সিদ্ধার্থের ব্যক্তিত্বের কোন ছাপ কাজরীর তো সৃষ্ট চরিত্রে কখনও প্রকাশ পায়নি—হয়ত কাজরীর চোখে তেমন কিছু পড়েনি, অতি সাধারণ মানুষ সিদ্ধার্থ, তার বৈশিষ্ট্য কাজরীর চোখে পড়বার কথা নয়।

কাজরীর প্রতিষ্ঠিত জীবনের খবর সিদ্ধার্থ পেত। কাজরী তার জীবনের বিশেষ একজন হোতে পারে—কিন্তু কাজরীর জীবনে সে কেউ নয় তো! অভিমান ছিল নাকি সিদ্ধার্থর মনে? পাণ্ডুলিপি আজ মুখস্থ হোয়ে গেছে।

উপন্যাস নয়, জীবনের কাহিনী—সে জীবনের সঙ্গে সিদ্ধার্থের পরিচয় ছিল কত গভীর।—মেয়েটি লিখত, লিখে সে আনন্দ পেত। মেয়েটির লেখা সম্মান পেল, শ্রদ্ধা পেল সে লেখিকা বলে। মেয়েটির সুনাম ছিল, সকলকে বন্ধু করে নেবার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তার।

বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকে সিদ্ধার্থ। হাসিখুশিতে ভরা উজ্জ্বল মেয়েটি। ছেলেবেলা থেকে তার পরস্পর চিনত পরস্পরকে, পরিচয় পুরাতন ছিল।

পুরাতন পরিচয় হঠাৎ একদিন সিদ্ধার্থ অবাক হোয়ে দেখল, কাজরী কত বড় হোয়ে গেছে। সিদ্ধার্থও বড় হোল—একটা ব্যবধান, আগের মত যখন তখন গিয়ে গল্প করা যায় না, সঙ্কোচ।

ঠিক এসব নানা ঘটনা, আর কথার বর্ণনায় রচনা ভরে উঠেছে। মেয়েটি বড় হোল, বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ধরল তার খেলার সাথীর দিকে কিন্তু চেনা গেল না। মেয়েটির গর্ব ছিল, সকলের মনের কাছে সে সরে যেতে পারে কিন্তু এবার পরাজিত হোল! কতগুলো পাতা ভরে দিয়ে গেছে কাজরী, সেই মেয়েটির অনুভূতির বর্ণনায় মেয়েটিকে কেউ চেনেনি কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হোয়ে যেত, সম্মানের বোঝা বইতে যে নুয়ে পড়ত ক্লান্তিতে কিন্তু হেসেছে সে কেউ জানেনি তাকে, তার গৌরব তাকে বেদনা দিয়েছে।

কিন্তু পাষাণ-দেবতার ঘুম ভাঙ্গেনি। অজানা ব্যথা তাকে ম্লান করে তুলেছে। সিদ্ধার্থ ভাবতে থাকে, ছোট ছোট কত কথা, কত ঘটনার সমাবেশে ভরে উঠেছে কাহিনী, সেগুলোর সাক্ষী যে ছিল সে নিজে। কিন্তু কৈ কাজরী তো কোন দিন কিছু বুঝতে দেয়নি। কাজরীর পরবর্তী গৌরবময় জীবন নিয়ে সে গৌরবান্বিতা ছিল, সেখানে সিদ্ধার্থর প্রবেশাধিকার থাকতেও পারে তা ভাবেনি সিদ্ধার্থ কখনও। মানুষকে সে চেনে এমন কথা নিয়ে গৌরব করেন সিদ্ধার্থ, গৌরব করবার তার কিইবা ছিল! কাজরী স্বনামধন্যা, তবু সিদ্ধার্থ ভিখারী নয়। অভিমান? অতীতের দিকে ফিরে যায় মন—কাজরী মৈত্রের সব উপন্যাস তার পড়া হোয়ে গেছে।

গল্প শুনেছে সিতাংশু বাড়িতে, কাজরীর স্বামী সিতাংশু মৈত্র কাজরীকে পেয়ে কত খুশি হোয়েছেন। কাজরী তার অপূর্ব দক্ষতায় সিতাংশুর পরিবারের সকলকে মুগ্ধ করেছে, সে সকলের প্রিয়পাত্রী। কিন্তু আশ্চর্য হয়নি সিদ্ধার্থ।

আরও দূরে চলে যেতে চায় মন। কুমারী কাজরীকে একদিন সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করেছিল, ঘর সংসার সে করবে কবে? কাজরী বলেছিল, ঘর সংসার করাটা জীবনে কী খুব একটা বড় কথা? সিদ্ধার্থ জানাল, সবাই তো তা করে থাকে। এরপর এ নিয়ে আর কোনদিন কথা হয়নি।

কাজরীর বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা হাতে নিয়ে হেসেছিল

সিদ্ধার্থ। আরও পরে ওর মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠত, যখন সে উদীয়মানা লেখিকার উপন্যাস পড়ত। বিয়ের পর থেকে বিবাহিত জীবনের জয়গান করাই যেন কাজরীর নেশা হোয়ে উঠেছিল। ওর লেখা পড়ে অসহ্য লাগত, তবু না পড়ে পারত না।

সেই দিনের বর্ণনা দিয়েছে কাজরী, তার অপ্রকাশিত উপন্যাসের নায়িকা যেদিন স্থির সিদ্ধান্তে এল, পাথরের দেবতার ঘুম ভাঙ্গবে না, কিন্তু সেই বা কেন নিজেকে মিথ্যা করে তুলবে? সবাই যা করে, সেও তাই করবে কেন তার অকারণ ক্রন্দন? ঝড়ে দুলে উঠল যেন চতুর্দিক—কি অপূর্ব বর্ণনা করতে জানত কাজরী, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি অনুভূতি। সিদ্ধার্থের দৃষ্টি যেন অতীতে বাদ হোতে চায় না, জীবনের রহস্য কী উদ্‌ঘাটিত হোতে পারে?

কাজরী এ উপন্যাসেও বিবাহিত জীবনের চিত্র এঁকেছে—অভিনয় করে তার নায়িকা—অসহ্য দিনরাতগুলো নিপুণ অভিনয়ে কেটে যায় তবু সান্ত্বনা, এই জীবনের শেষ আছে—মান, যশ, খ্যাতিরও সমাপ্তি ঘটবে সেদিনের প্রতীক্ষায় থাকে স্বনামধন্যা লেখিকা।

তবু ক্ষীণ আশা কী তখনও জাগ্রত করেনা সেই যন্ত্রচালিত অভিনয়সর্বস্ব জীবনকে? শুধু ক্লান্তি। চাইবার যেন সব কিছু ফুরিয়ে গেছে হতাশা, বেদনা, গ্লানি—তার শেষ নেই, লেখা শেষ হয়নি।

শেষ নেই সিদ্ধার্থ জানে, শেষ সে খুঁজে পাবে না। হতাশা, গ্লানি, বেদনা অনন্তকাল ধরে ক্লান্ত মানুষকে টেনে নিয়ে চলবে। গভীর অন্ধকার রাত্রি। ঘুম ভেঙ্গে যায়। কর্মব্যস্ত দিনগুলোও বুঝি স্তব্ধ হোয়ে আসে।

সিতাংশুশেখর মৈত্র কাজরী মৈত্রের স্বামী, মৃতা লেখিকার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য সে নিজ হাতে অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সিদ্ধার্থকে দিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে গৌরব নেই সিদ্ধার্থের। মৃত্যু প্রিয়জনকে দূরে সরিয়ে দেয় না, প্রয়োজন কী কাজরী দেবীর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আড়ম্বরপূর্ণ সভায় গিয়ে?

সিতাংশু মৈত্র আছে, মৃতা কাজরী মৈত্রের গৌরবে সে গৌরবান্বিত হোক। প্রকাশক সংস্করণের পর সংস্করণ ছেপে যাক্ ওর উপন্যাসগুলি নিয়ে। তাদের দলের একজন কোনদিন সিদ্ধার্থ ছিল না, আজও হোতে চায় না তাই।

নারীর মন

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

কার্ত্তিক সংখ্যা বসুমতীতে 'রবীন্দ্র বীক্ষায় নারীর মন' প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য কি, সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারিনি বলেই কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে মনে। রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে যেভাবে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতেও সাধারণ পাঠকের পক্ষে স্পষ্ট ধারণা করা কষ্টকর বলেই মনে হয়েছে।

নারী বা পুরুষ কারো কাছেই কারো মন স্বচ্ছ নয়। প্রাত্যহিক জীবনে পুরুষকে যে-কথা অনেকবার শুনতে হয় 'তোমাকে চিনতে বাকি নেই।' তার কারণ স্ত্রী ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের এবং অখণ্ড মনোযোগের দ্বারা স্বামীর মনোভাব অনেকটা বুঝতে পারেন। অনুরূপ মনোযোগ দিলে পুরুষেও পারেন বুঝতে নিঃসন্দেহে, না হলে সাহিত্যে এত বিভিন্ন প্রকৃতির নারী চরিত্র সৃষ্টি হল কি করে? তাছাড়া 'তোমাকে চিনতে বাকি নেই'—সংসারে পুরুষও এমন উক্তি করে থাকেন সন্দেহ উপস্থিত হলে। এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়। শিল্পী পুরুষকে, মহৎ পুরুষকে কোন মেয়ে বলতে পারবে না 'তোমাকে চিনতে বাকি নাই'। তুচ্ছার্থে কখনোই পারে না বলতে।

'মেয়েদের মনের অন্ত বোঝা ভার'—আজকের দিনেও এই ধরণের পরিহাস লঘু উক্তি শুনে দুঃখ হয়। কোন ইংরেজ মনীষী বলেছেন—'A woman who is perfectly truthful is perhaps an impossibility.' তাহলে সত্যবাদিতা শুধু পুরুষেই সম্ভব! আবার একথা ত আছেই—দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। মানুষের মনের গতি বিচিত্র সে নারী পুরুষ নির্বিশেষে।'

নারী-মন সম্বন্ধে পুরুষের—মনীষী শ্রেষ্ঠদেরও কৌতূহল অনন্ত। পুরুষকে জানারও অনন্ত কৌতূহল নারীর মনে—কিন্তু কেন অনন্ত-জগতে নারীর অন্তর প্রকাশের ভাষা পায় নি পুরুষের সমান তা শুধু বিস্ময়কর নয়, মর্মন্তুদ-বেদনায়। সে বেদনাবোধ পুরুষের সাধ্য নেই মেটাতে পারে। মিটবে যখন সে সত্যি পারবে যথার্থ ভাবে আপনাকে আপনি প্রকাশ করতে।

নারীর মনের সবচেয়ে বড় কথা তার হৃদয়াবেগ প্রবল, কৃতজ্ঞতা-বোধ পুরুষের চেয়ে বেশি, মমত্ববোধ সর্বব্যাপ্ত—যাকে পুরুষ সহস্রবার বলেছে মাতৃস্বভাব, আর স্বাভাবিক সরম। তাই প্রকাশ কম। 'মেয়েরা ব্যবধানের শূন্যতাকে সইতে পারে না' খুবই সত্য কথা, যথার্থ কথা। তাই নারী মাত্রেই অভিসারিকা। সেই পারে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা অতিক্রম করতে প্রিয়মিলনের উদ্দেশে। বৈষ্ণবকবি বলেছেন, প্রেমিকা নারী হল অভিসারিকা। কিন্তু তাই বলে শুধুমাত্র তাই দুঃখকে অতিক্রম করে যাবার অদম্য স্পৃহাই তার একমাত্র শাশ্বত সত্তা নয়। প্রেমিকের প্রতিও রয়েছে তার মনে সেবা ও শুশ্রূষার ভাব। শুধু পুরুষের বুকের রক্তে দোলা জাগিয়েই প্রেমিকার প্রেম সার্থক হয় না; তাকে তৃপ্ত, আশ্বস্ত, শান্ত করেই তার প্রকৃত আনন্দ। প্রত্যেকটি নারীর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে সেই প্রিয়-সত্তা ও মাতৃ-সত্তা।

'পুরুষের ভালবাসা নারী আদায় করে'? একথা দুঃখদায়ক ত বটেই, মস্ত বড় ভুলও। ভালবাসা নারী আদায় করে না—সম্রাজ্ঞীর মত পায় সে ভালবাসা। যেখানে ভালবাসা আদায় করতে হয়, লজ্জায় সে মরে যায় সেখানে। ভালবাসা পেলে তা হারাতে বড় বেশি বাজে নারীর। তাই যা পায়, তা একান্ত নিজের এই বোধে সে দুঃখ ভোগ করে মরে। ভালবাসলে তখন তার প্রেমাস্পদ থেকে নারী আপনাকে পৃথক রূপে ভাবতে পারে না; তার ভালয়-মন্দয় নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়; এই হল তার ভালবাসার স্বরূপ, এই হল নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। খুব কচিৎ দেখা যায়, মেয়ে প্রেম নিবেদন করেছে আগে। কিন্তু এই প্রেম গ্রহণের পরের অবস্থা মেয়েদের পুরুষের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

'পুরুষ সহন হলে মেয়েদের অনুরাগ সতেজ হতে পারে না'—এ কথা কি এই অর্থবহ নয় যে, দুঃখের দণ্ড ভোগ করতে হয় মেয়েকেই বেশি? তাহলে আর 'ছলাকলার' প্রসঙ্গ তুলে তুচ্ছ বিদ্বেষের, লঘু পরিহাসের সৃষ্টি করা কেন?

'অ্যানারাই ট্যানারদের পিছু নেয় এবং যতোক্ষণ না ধরতে পারে ততোক্ষণ হাল ছাড়ে না'—এ কথা শ' বলুন বা লেখক উদ্ধৃতি দিন তাতে ক্ষতি নেই, কারণ এই ব্যাধ-বৃত্তি কোন কোন মেয়ের মনে আছে নিশ্চয়, অসংখ্য পুরুষেরও আছে, কিন্তু 'ছলাকলা'র প্রসঙ্গে এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রকৃতির চক্রান্তে প্রাণি-জগতে স্ত্রী জাতির যে-স্থানটি নির্দিষ্ট, সেখানে পুরুষের অন্তরাত্মকে বং ধরায় এই ছলাকলাই। এটা ছলনা নয়—একান্ত ভাবেই এটি 'কলা'। এ 'কলা'-বিদ্যা স্ত্রীজাতির সহজাত এবং এ আছে বলেই রমণী এমন রমণীয়—এমন আকর্ষণ তার—এমন আকুল করে তোলে তার আবেদন। জীব প্রজননের অপরিহার্য অঙ্গ—'biological fact'.

'দ্বিধা করে নিজেকে যে পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায়, মেয়েরা তাকে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ করে না।' কথাটা ভাল করে বুঝে দেখতে হয়। যে পুরুষ মেয়ের কাছে সব সময়েই নিজেকে জানাতে চায় তাকে, সেই প্রগলভকে কি সত্যই সে বরণ করে, গ্রহণ করে? যে পৌরুষ মেয়েদের কাম্য, তাকে গড়ে তুলতে মন্দের খাদ মিশাবার যেমন প্রয়োজন নেই; মেয়েদের হৃদয়ে সত্যকার আসন পেতে হলে মন্দের তেজ দেখাবার দরকার নেই—প্রয়োজন আছে মহত্ব প্রকাশের। পুরুষ চরিত্রের মহিমময় ঔদার্যই নারীকে আকৃষ্ট করে সব চেয়ে বেশি। সে ক্ষমতার বশ নয়, কথনোই নয়। ভালবাসার বশ, প্রেমের বশ, মহানুভবতার বশ। পুরুষের আদিম-প্রকাশ-বাহুল্যে নারীর অন্তর্নিহিত মাধুর্যসত্তা অনেক সময়েই পীড়িত হয়। কিন্তু মেনে নেয় তা প্রকৃতির অমোঘ বিধান বলেই। তাই পুরুষ তার ঐশ্বর্য, আড়ম্বর ক্ষমতা প্রতিপত্তি দিয়ে নারীকে ব্যবহারিক সমৃদ্ধি দিতে পেরেই মূঢ় প্রত্যয়ে নিশ্চিন্ত হয় যে, ভালবাসা পাওয়া গিয়েছে সুদে আসলে।

পুরুষের মনে ভালবাসা আসে একাধিক বার, নারীর মনেও আসে। পুরুষ প্রকৃতি উদ্দাম; সমাজ পুরুষ-শাসিত এবং দেহ তার সহায়। নারী-প্রকৃতি স্বভাব শান্ত; সমাজ তার বাধা, দেহ অন্তরায়। নিজেকে প্রকাশের পথে এইগুলিই তার সবচেয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের পুরুষপ্রধান সংরক্ষণশীল সমাজ নারী-মনের একাধিক বসন্তপ্লাবনকে স্বীকার ত করেই নি বরং একনিষ্ঠতার স্তোকস্তুতি এমনি করেছে যে, নারীই তার মনে একাধিক প্রেমকে সত্য বলে স্বীকার করা দূরে থাক, পাপ বলেই ভেবেছে। এই যে বঞ্চনা, এর মূলে ক্রিয়া করেছে কি? পুরুষের সুবিধা নয় কি? এই যে স্তুতিবাদ একি আপন সুবিধা বজায় রাখবার জন্য নয়? পুরুষের গৃহজীবন অব্যাহত রাখবার দায়িত্ব কি একা মেয়েই পালন করেনি? আমাদের দেশে নারী সেদিন পর্যন্ত ছিল শিক্ষায় বঞ্চিত, আত্মীয়-পরিজন ব্যতীত অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে পরিচয়ে পর্যন্ত তার নানা রূপে নিষেধ। কি করে তার মনের প্রসার ঘটতে পারে? সেজন্য আগেকার দিনে নারী ও বিশেষ করে বিবাহিত নারী জীবনে যদি আর কোন পুরুষের ভালবাসা পেয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সে-মনের এবং সমাজের তার কেন্দ্র থেকে চ্যুত হয়ে পড়েছে, না হয় ভোগ করেছে নিরতিশয় যাতনা।

ভালবেসে, হয়ত ভালবাসায় ভুলে, আপনাকে বিলিয়ে কত মেয়ে যে পরিশেষে কোথায় স্থান পায়, তা আর স্পষ্ট করে বলবারও দরকার নেই। কিন্তু আমরা ক'জন এই মূঢ়া নারীর ভাগ্যবিপর্যয় সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করি? সমাজের নেপথ্যে তাদের অসহ্য দুঃখ কে খতিয়ে দেখে? কোন পুরুষ কি এমন মেয়েকে বিবাহ করে সমাজে উচ্চ স্থান দেন? কিন্তু যে-পুরুষ পণ্যানারীর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করেন না, তাঁরও ত গৃহজীবন সসম্মান সামাজিক স্বীকৃতি পায়। তাহলে দুঃখের দণ্ড পড়ে কার উপরে নির্দয় ভাবে? আবার সংসারে বাঁধা পড়বার আরও এক কারণ আছে মেয়ের; সে হল সন্তান। এই মোক্ষম বাঁধন। সব অপরাধ, সব গ্লানি দুহাতে দিয়ে মেয়ে ঠেলে দেয় দূরে যখন সে ঐ পুরুষের দেওয়া সন্তানের মুখের দিকে চায়। এর পরেও কি বলতে হবে মেয়ের মনে 'অন্তহীন ছলনা—পুরুষকে কৌশলে আয়ত্ত করে সে?

স্বভাবত নারী প্রকৃতির যে সর্বংসহা গুণ আছে তাই দিয়ে সে পুরুষের দুর্দ্ধর্ষ দস্যুতা এবং রুদ্রতা আপন স্বভাব মাধুর্যে ক্ষমা করে, সস্নেহ প্রশ্রয়ে সহ্য করে। প্রতিনিয়ত পুরুষকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা তার—সে আমার একান্ত আপন এই বৃত্তিতে। যাকে সে আপন বলে ভাবে তাকে, তার প্রিয়া ও জননী সত্তা দিয়ে আপনার অন্তরতম করে তোলে, তার ভাবনা, বাসনা, কামনা সেই একক কেন্দ্র করেই একটি নিবিড় নিটোল জীবন গড়ে তুলতে চায়। নিভৃত হৃদয় দিয়ে তাকে আরো বেশি ভালবাসতে চায়।

যথার্থ ভালবাসা মেয়ের কাছে পূজাই। তার ভালবাসার মধ্যে একদিকে যেমন থাকে সস্নেহ প্রশ্রয়, অপরদিকে ভালবাসার সাধ, তার ভাল লাগা পূর্ণ হয়না তৃপ্ত হয় না, যদি না সে পুরুষকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যদান করতে পারে, আমার চেয়ে প্রেমাস্পদ বড়, মহৎ এই ভাবতে না পারে। এই জন্যই বলেছি প্রেম গ্রহণের পর মেয়ের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর এই হল নারী স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তাই নারীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে হলে মহত্বই অর্জন করতে হবে পুরুষকে, মন্দের খাদ মেশাতে হবে না।

নারীর তৃপ্তি নেই নিজেকে প্রিয়ের জন্য উৎসর্গ না করে। পুরুষেরই কি সুখ আছে ধরা না পড়ে? কৌশল, ছল চাতুরী ত' প্রয়োজন নেই মেয়ের। ভাললাগাতে ইচ্ছা দুজনেরই মনে—সে মেয়েরও আছে, পুরুষেরও। যদি আত্মাভিমান নিয়ে বিচার করতে বসি তবে অন্তরের নাগাল পাওয়াই দুষ্কর; দোষ ত্রুটিই বড় হয়ে উঠবে—এ কথা নারীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য;

দুটি মানুষের মনের গতি একেবারে একখাতে কখনই বইতে পারে না, ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অবশ্যম্ভাবী। যখন নীড় বাঁধে তখন একে অপরের জন্য নিশ্চয় কিছু ত্যাগ করে। যে ক্ষেত্রে পারে না, সেখানেই বিরোধ বাধে।

প্রেম বলে জিনিস যত দিন থাকবে, নারীকে অর্ধেক কল্পনায় সৃষ্টি করবে পুরুষ, আর পুরুষকে ঘিরে মোহময় ইন্দ্রজাল রচনা করবে নারী—এর কোন বিরাম নেই।

র ঙ্গ প ট

লৌহকপাট

একটু দরদ, একটু করুণা, একটু অনুকম্পায় অনেক কিছু করা যায়—অনেক কিছুর রূপই পরিবর্তন করা হয় সম্ভব। শুধু মাত্র দরদভরা হৃদয় দিয়েই কুখ্যাত নরহন্তা দুর্ধর্ষ দানব তুল্য ডাকাতকে রূপান্তরিত করা যায় পরম স্নেহময় কোমলচিত্ত এক জন সামাজিক ব্যক্তিতে। কিন্তু লৌহকপাটের অন্তরালে একবার যাদের স্থান হয়েছে নির্ধারিত তাদের জন্তে এ সব কিছুই আমরা কাজে লাগাই না—তাদের প্রতি আমরা উজাড় করে দিই যত কিছু ঘৃণা, যত কিছু লাঞ্ছনা। যত কিছু অবজ্ঞা অথচ একবার ভুলেও ভেবে দেখি না যে দোষ যারা করে সে দোষ তারা শুধরেও নিতে পারে ঠিকমত পথনির্দেশ পেলে। সহসা ইচ্ছে করে কেউ বড় একটা দোষ করে না, পরিবেশের চাপেই কেউ হয় চোর, কেউ ডাকাত, কেউ খুনে। হয় কারা? খোঁজ নিলে দেখা যাবে আপনার আমার চেয়ে যাদের মর্যাদা হয়তো কোন অংশেই কম ছিল না। পরিবেশের সুকঠোর প্রভাবে অবনতির শেষ ধাপে যারা নেমে গেল—পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যারা সেই ক্রমনিমজ্জন দেখতে লাগল—তাদের মধ্যে কেউ এগিয়ে এল না ভাগ্যহতকে তুলে আনতে—এই নেমে যাওয়া হতভাগ্যের দল পেল কি? পেল লৌহকপাটের অন্তরালে আশ্রয়—ব্যর্থ হয়ে গেল তার সারা জীবনের আকাশ-কুসুম কল্পনা, মূল্যহীন হয়ে গেল তার আবেদন নিবেদন, অর্থহীন হয়ে গেল তার হৃদয়ের আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ।

ক'জন চিন্তা করে এই হতভাগ্যদের সম্বন্ধে, ক'জন মাথা ঘামায় এদের নিয়ে, ক'জনের অন্তর স্পর্শ করে এদের ব্যথা-বেদনার ভরা রুদ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাস? মনে পড়ে বাঙলার বরণীয় কবি স্বর্গীয় কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের "দ্বীপান্তর" কবিতাটি (ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া হোঁ)—মনে পড়ছে জরাসন্ধের লৌহকপাট। কিরণধনের দ্বীপান্তর কবিতাটি যে কেউ পড়বেন (অন্ততঃ হৃদয়ানুভূতি বস্তুটি যাঁর মধ্যে কিছু না হোক কিছুটা আছে) হলপ করে বলতে পারি চোখের জল আটকে রাখতে পারবেন না। ভাগ্যবঞ্চিতদের অভিমুখে সকলের চোখ ফেরালেন কিরণধন—তাদের দিকে নতুন করে আলোকপাত করলেন জরাসন্ধ।

ব্যক্তিগত জীবনে চারুচন্দ্র চক্রবর্তী বাঙলার একটি বিখ্যাত জেলখানার তত্ত্বাবধায়ক। জীবনের বিরাট একটি অংশ তাঁর অতিবাহিত হয়েছে এই নিপীড়িত বঞ্চিতদের সঙ্গে, তাদের মনের কথাগুলি নিঙড়ে বের করেছেন জরাসন্ধ। জেলারের রুক্ষ কঠোর আবরণে তাদের সামনে দেখা দেননি জরাসন্ধ, মানুষের হৃদয়ধর্মী মন নিয়ে তাদের মাঝখানে ধরা দিয়েছেন তিনি। জেলে বাসকালীন তাদের প্রতি শুধুমাত্র একটু যত্ন করেই ক্ষান্ত হন না তিনি, ভবিষ্যতে জেলে যাতে আর তাদের কখনো আসতে না হয় সে চিন্তাতেও তিনি বিভোর। তাঁর হাতে ভীতিপ্রদ বেত্রদণ্ড কখনো দেখতে পায় না কয়েদীরা, কয়েদীরা শুধু দেখতে থাকে তাঁর হাত থেকে ঝরে পড়ছে শুধু অপরিমিত স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসা। তাঁরই বহুজনপঠিত 'লৌহকপাট' উপন্যাসখানি চিত্রায়িত হয়ে এসেছে 'কাবুলীওয়ালার' সার্থক পরিচালক তপন সিংহের দক্ষ পরিচালনায়।

জেলারের সহকারী মলয়ের দৃষ্টিতে এখানে লেখক কাহিনীটি বর্ণনা করে গেছেন। চারজন কয়েদীর জীবন কাহিনী (তার মধ্যে দু'জনের জীবন কাহিনী চমকপ্রদ) তা ছাড়া কুন্তী নাম্নী একটি নারীর চরিত্র এর সম্পদবিশেষ। মলয়ের জীবনে কাঞ্চী নাম্নী একটি মেয়েকে দেখা যায় কিন্তু মলয়ের জীবনে বাসা বাঁধতে সক্ষম হয় না সে। এই প্রসঙ্গটি পরিচালনায় তপন সিংহ যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিরহের এই মৌন অভিব্যক্তিটি যথেষ্ট ভাবে অন্তর স্পর্শ করবে বলে ভরসা করা যায়। বদর মুন্সী ও ফকীরের চরিত্রটি অভিভূত করে ফেলে। যতীনের চরিত্রটি মনকে আকৃষ্ট করে। তা ছাড়া বইটির মুখ্য বৈশিষ্ট্য যে জেল জীবনটি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এখানে দেখানো হয়েছে। কয়েদীর জেলে ঢোকা থেকে জেল থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তার প্রতিদিনের প্রতিটি কর্মধারা সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষিত হয়ে এখানে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। জেল জীবন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায় ছবিটি দেখে।

রাজনৈতিক কর্মীরা গান-বাজনা করেন কথাটি শোনবার পরই দেখতে পেলুম একদল অপোগণ্ড গানের নামে রীতিমত বিপর্যয় সৃষ্টি করে—রাজনৈতিক বন্দী বলে কি এরাই প্রতিভাত হ'ল? এ বিষয়ে একটু আলোকপাত প্রয়োজন। কয়েদী পয়সা চুরি করছে, কথা হচ্ছে পয়সা সে পেল কোথায়? একজন ভূতপূর্ব দাগী আসামীর দ্বারা আর একজন পকেটমারের কাছ থেকে মণিব্যাগ উদ্ধার করে এনে মালিককে প্রত্যর্পণ করার দৃশ্যটিতে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোরকাটার ছায়া পড়ে না কি? নববিবাহিত বরকে ডাকাতে যখন আক্রমণ করেছে মেয়েটি তখন চেঁচাচ্ছে না কেন, যখন চেঁচাল তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

অভিনয়ে প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জু দেকে। তাঁদের অভিনয় দক্ষতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণস্বরূপ হয়ে রইল এই ছবিটি। প্রধান জেলারের চরিত্রটি অপরিসীম স্নেহের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন ছবি বিশ্বাস। কাহিনীর দরদী চরিত্রটি সুন্দরভাবেই রূপায়িত হয়েছে মালা সিনহার অভিনয়ে। যতীনরূপী অনিল চট্টোপাধ্যায় ও রহিমরূপী দেবী নিয়োগীর অভিনয় আমাদের অন্তর স্পর্শ করেছে। অমর মল্লিক, সলিল দত্ত, দিলীপ রায়, পারিজাত বসু, ভানু বন্দ্যো, জহর রায়, নৃপতি চট্টো, শৈলেন মুখো, রবীন

বন্দ্যো, ধীরাজ দাস, বেচু সিংহ, স্বরূপ মুখো এবং অজস্তা করের অভিনয়ও ভাল হয়েছে। নায়ক নির্মলকুমারের চলাফেরা মোটেই নায়কোচিত নয়, এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আলোকচিত্রের কাজ ভাল, সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আমরা বিরত রইলুম।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত"-এর একটি অংশে রাজলক্ষী ও শ্রীকান্ত নামে চিত্রায়িত হচ্ছে হরিদাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায়। নামভূমিকায় দেখা দেবেন সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার। অন্যান্যাংশে দেখা দেবেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, ছিজু ভাওয়াল, জহর রায়, তুলসী চক্র, নৃপতি চট্টো, হরিধন মুখো, মণি শ্রীমানী, রমা বন্দ্যো, রেবা বসু, রাজলক্ষী। সুর দিচ্ছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। শ্রীমতী কানন দেবীর এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। * * * ইতিহাসে অমর হয়ে আছে সম্রাট আকবরের নাম। আকবরের সময়ে ভারতের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এক প্রতিভাধরের প্রতিভার স্পর্শে। তানসেন তাঁর নাম। নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত সঙ্গীতবহুল এই চিত্রটিতে নামভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে অসীমকুমারকে। এঁকে ছাড়া দেখা যাবে শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা সহ ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখো, মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে। সঙ্গীতের উপদেশকরূপে নাম শোনা গেছে তানসেনের বংশধর দবীর খান, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ শক্তিধর সঙ্গীতজ্ঞদের। * * * সাধন সরকারের পরিচালনায় গড়ে উঠছে ডেলি প্যাসেঞ্জার ছবিটি। শৈলেশ দের লেখা গল্পে সুর দিচ্ছেন শ্যামল মিত্র, অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, প্রবীরকুমার, তুলসী লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, বৃন্দধন মুখো, হরিধন মুখো, নৃপতি চট্টো, শিবকালী চট্টো, ধীরাজ দাস, অমূল্য সান্যাল, শীতল বন্দ্যো, বাণীকণ্ঠ, মল্লিনা দেবী, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ, সাধনা রায়চৌধুরী, নিভাননী, রাণীবালা প্রভৃতি। * * * পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের আদিকবি বাল্মীকিই দস্যু রত্নাকরের প্রথম জীবনের সার্থক পরিণতি। এই মহাকবির জীবনীচিত্র গৃহীত হচ্ছে বংশী আশের পরিচালনায় ও কমল মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যো, ভানু বন্দ্যো, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, হরিধন মুখো, মলিনা দেবী, দীপ্তি রায় রেণুকা রায় ও শিখা বাগের অভিনয়ে। * * * বংশী আশ আর একজন ছবি তুলছেন "শ্রীশ্রীতারকেশ্বর"-এর উপর। এতে কাজী নজরুলের কয়েকটি গান শুনতে পাওয়া যাবে আর ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যো, কমল মিত্র, নীতীশ মুখো, মহেন্দ্র গুপ্ত, অজিত বন্দ্যো, নবকুমার, অনিল চট্টো, নৃপতি চট্টো, নবদ্বীপ হালদার, শ্রীমান্ আলোক, পদ্মা দেবী, শোভা সেন, অপর্ণা দেবী, স্বাগতা চক্রবর্তীর অভিনয় দেখতে পাওয়া যাবে।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী মঞ্জু দে

মঞ্জু দে এই নামটি চলচ্চিত্র জগতে দর্শক-সমাজে সুপরিচিত। শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের বধূ ও মেয়ে ইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেও শ্রীমতী দে শিল্প-জগৎকে নির্বাচন করলেন নিজের কর্মক্ষেত্র। শিল্পের প্রতি দরদ, কর্মনিষ্ঠা, এবং চরিত্রের মাধুর্য্যে তিনি চলচ্চিত্র জগতে নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন এরই মধ্যে। শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন প্রচুর। '৪২,' 'কাবলিওয়ালা' এবং বর্ত্তমানে 'লৌহকপাট' ছায়াছবিতে শ্রীমতী মঞ্জু দে'র অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শ্রীমতী দে নিজের জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে মিলিয়ে নিয়েছেন। নিজের মনের দরদ দিয়ে তিনি এই শিল্পকে ভালবেসেছেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে শ্রীমতী দের প্রতি অবিচার করা হবে। সেটি হচ্ছে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের কথা। 'কাবলিওয়ালা' ছবিখানি ভারতে ও ভারতের বাইরেও খ্যাতি অর্জন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানলাভ করেছে। এই ছবিখানিতে 'মিনি'র ভূমিকায় কুমারী টিঙ্কু ঠাকুর অপূর্ব্ব অভিনয় করেছে এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু একটি কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না, সেটি হচ্ছে টিঙ্কু ঠাকুরের আবিষ্কার করেছেন শ্রীমতী মঞ্জু দে। টিঙ্কুকে মিনির চরিত্রে রূপ দিতে সাহায্য ও শিক্ষা দিয়েছেন তিনিই। এক কথায় বলতে গেলে টিঙ্কুকে গড়ে পিঠে সার্থক ক'রবার মূলে রয়েছেন শ্রীমতী দে। এ জন্য তাঁর কৃতিত্বও কম নয়।

তাই এবারে ঠিক করলুম চলচ্চিত্র সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ ব্যাপারে শ্রীমতী দে'র কাছেই উপস্থিত হব। পূর্ব্বাহ্নে চিঠি দিয়ে সময় ঠিক করে নিয়েছিলুম। কাঁটায় কাঁটায় ১টার সময় এরই মধ্যে একটি রবিবারে গিয়ে হাজির হ'লুম তাঁর টালীগঞ্জের নেতাজী সুভাষ রোডের ছোট্ট বাড়ীখানিতে। ছোট হলেও শিল্পীর বাড়ী। সৌন্দর্য্যের অভাব নেই। গেট পেরিয়ে ভিতরে যেতেই এক বিপদ! সামনেই শ্রীমতী দে'র পোষা কুকুরটি শেকল দিয়ে বাঁধা। আমাকে দেখেই কুকুরটি যেমন করতে লাগলো তাতে অতি বড় সাহসীর মনেও ভয়ের সঞ্চার না হ'য়ে পারে না। সাংবাদিকের কথা ছেড়েই দিলুম। আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি কি করবো ঠিক ভেবে পাচ্ছি না—কিন্তু ঠিক এমনি সময় শ্রীমতী দে সহাস্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন এবং সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে নিয়ে বসালেন। কুকুরটির সমস্ত আস্ফালনই মুহূর্ত্তে বন্ধ হ'য়ে গেল।

আমি 'শুভস্য শীঘ্রম্' এ নীতিকথা মত আমার প্রশ্নমালাগুলো তাঁর সামনে তুলে ধরলুম। শ্রীমতী দে কোনরূপ কালবিলম্ব না করে আমার প্রশ্নের কতকগুলো জবাব দিলেন আর কতকগুলো জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্যক্ত হলেন। কথার ভাবে বুঝলুম তিনি একটু অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন। কিন্তু সাংবাদিকের কাজ যত কঠিনই হোক করতেই হ'বে—আমি থেমে যেতে পারলুম না।

শ্রীমতী দে বলতে আরম্ভ করলেন। আজ থেকে ১১৮০ বছর আগে হেমেন গুপ্ত পরিচালিত '৪২' ছায়া ছবিতে আত্মপ্রকাশ করি সর্ব্বপ্রথম। সেটি হচ্ছে ১৯৪১ সাল। কোন্ ছবিতে এবং কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সব চেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি যদি জিজ্ঞেস করেন তবে আমার পক্ষে বলা কঠিন। শিল্পী আমি, যখন যে ভূমিকায় অভিনয় করি সেই ভূমিকাটিই একান্ত নিজের বলে মনে করি। তবে যদি বলতেই হয় তবে বলবো, '৪২'

ছবিখানিতে বীণার চরিত্রে এবং 'কার পাপে' বিউটির ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে প্রচুর তৃপ্তিলাভ করেছি। চিত্র-জগতে যোগদানের মূলে রয়েছে আমার নিজের ইচ্ছা এবং personal liking, I wanted to be a real artist. চলচ্চিত্রে যোগদানের পর আপনার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন এসেছে কি? প্রশ্ন করলাম আমি।

শ্রীমতী মঞ্জু দে

শ্রীমতী দে ধীর ভাবে অথচ স্পষ্ট ভাষায় উত্তর করলেন—বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনই আসে নি। তবে সামাজিক জীবনে একটু পরিবর্ত্তন এসেছে, যেমন restricted movement.

আমার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী যদি জানতে চান, তবে বলবো যে, দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীতে আমার অসাধারণত্ব এমন কিছুই নাই যা উল্লেখ করা যেতে পারে। সকাল বেলায় আমার কুকুর আছে, সে তো দেখলেনই, তাকে পরিচর্যা করা, বাগানের কাজকর্ম্ম দেখা ও গাড়ীখানির তদারক করা—এগুলো সবই একরূপ আমি নিজে হাতে করি ও তাতে আনন্দ পাই প্রচুর। তার পর যেদিন স্যুটিং থাকে, সেদিন স্যুটিং-এ চলে যাই। যেদিন স্যুটিং থাকে না, সেদিন বাড়ী ঘর-দোরের কাজকর্ম্ম করি, সেলাই করি এবং গাড়ী নিয়ে বেড়াতে চলে যাই। এমনি ভাবে আমার দিনগুলো কাটে। বিশেষ hobby বলতে গার্ডেনিং, driving এবং গাড়ী নিয়ে বাইরে যাওয়া আমার 'হবি' বলতে পারেন। পড়াশুনোর কথা বলতে হলে বলবো, বাংলা গল্পের বই পড়ে থাকি, তবে একথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই—আমি খুবই কম বই পড়েছি।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে আপনার নিজের মতামত কি?

শ্রীমতী দে উত্তর করলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদাসিধে পোষাকই আমি পছন্দ করি। রঙীন কাপড়ও যে পছন্দ করি না তা নয়; তবে সেগুলো সাদাসিধে ধরণের হওয়া চাই।

এর পর আমি জিজ্ঞেস ক'রলুম, চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

শ্রীমতী দে দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন, অভিনয়-ক্ষমতা, সুকণ্ঠ, physical fitness and pleasing personality on the screen.

বাংলা ছবির উৎকর্ষ সাধন করতে হলে সব জিনিষটা ভাল ভাবে করা প্রয়োজন। গল্প বা কাহিনী, পরিচালনা, ক্যামেরা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের একান্ত সহযোগিতা সর্ব্বোপরি টিমওয়ার্কটি ভাল হওয়া চাই এবং তার সঙ্গে sincerity থাকলে সে ছবি ভাল না হয়ে পারে না কখনই, এটাই আমার নিজস্ব ধারণা বা মত। শ্রীমতী দে ধীরে ধীরে বলে চলেন, অদূর ভবিষ্যতে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন এসে যাবে চলচ্চিত্র জগতে। বাংলা ছবিগুলো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে, ইতোমধ্যেই তার সূচনা দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকেই ছবিতে নোতুন নোতুন জিনিষ দিতে আগ্রহশীল। 'পথের পাঁচালী' ও 'কাবলিওয়ালা' ছবির পরেই সকলেই নোতুন কিছু দেবার চেষ্টা করছেন তাঁদের ছবিতে।

সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? শ্রীমতী দে একটি ছোট্ট কথায় জবাব দিলেন, সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের যে স্থান হওয়া উচিত, তা এখনও হয়নি, তবে খুব শীগগিরই চলচ্চিত্র যথোপযুক্ত স্থান গ্রহণ করবে সমাজ-জীবনে। শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনগণকে অতি সহজেই শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব এবং আজ-কাল অনেকেই একথা স্বীকার করে থাকেন।

বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন কি? প্রশ্ন করলুম আমি।

শ্রীমতী মঞ্জু বললেন, অন্যের কথা আমি কি করে বলবো, তবে আমার নিজের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আসে না। কারণ this is my profession and I do it with full consent of my husband.

আমার অন্যান্য প্রশ্নগুলি শ্রীমতী মঞ্জু দে এড়িয়ে গেলেন। দু'-একটি ক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখলুম তিনি উত্যক্ত। তাই প্রশ্ন নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন বোধ করলুম না। ঋষিবাক্য স্মরণ করে 'ভিন্নরুচির্হি নরাঃ' শিল্পী ও মানুষ এরই দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে শ্রীমতী দে'র ভেতরে। থাক সে কথা।

এবারে আলোচনার শেষ পর্ব্ব টেনে নিলুম তাঁর আত্মজীবনীতে। শ্রীমতী দে বলে চলেন, ১৯২৬ সালে বহরমপুরে আমার জন্ম। বাল্যজীবন আমার বহরমপুরেই কাটে। আমার বয়স যখন এগারো তখন আমার মা মারা যান। আমরা তিন বোন ও এক ভাই। আমিই সব চাইতে ছোট। বহরমপুর থেকেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তার পর ছাপরা থেকে আই, এ এবং কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে বি, এ পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ পড়ি। ১৯৪৮ সালে আমার বে' হয়। ১৯৪৯ সালে আমি ছায়াছবিতে যোগ দি', সে থেকেই আমি চলচ্চিত্র জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে আছি। শিল্পী আমি, শিল্প সাধনাই আমার কাম্য এবং এতেই আমার জীবন ধন্য হোক।

অপেরা ভাঙবার পর

(ডি, এইচ, ল্যরেন্সের 'After the Opera' থেকে)

দামী পাথরের সিঁড়ির নিচে
বেদনায় মেলে ধরা বড় বড় চোখ নিয়ে মেয়েরা
মুহূর্তের আবেগে আহতদৃষ্টি রাখলে আমার সামনে
এবং মৃদু হাসলেম আমি।

বিহঙ্গীর মত মহিলারা
তাঁদের স্বচ্ছল সুবিন্যস্ত পা ফেলে নামতে নামতে
ভ্রূ কুঁচকে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন
যেন এই ভাঙনের মুখ থেকে
তাঁদেরকে পার করে দেবার জন্য
একটি নৌকো আসবে।

আর নাটক দেখে ফেরা বিক্ষিপ্ত জনতার
মাঝখানে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসলেম আমি
তারা যথার্থই ট্রেজেডিখানি উপলব্ধি করতে পেরেছে—
তা জানতে পেরে তৃপ্ত হলেম আমি।

কিন্তু আমি যখন ধূসরাভ মুখ দেখতে পেলেম
রোগাটে শুঁড়ির শোকার্ত লালচে চোখ
আমি আনন্দে ফিরে চলতে লাগলেম
যেখান থেকে এসেছিলেম
সেই পথে।

অনুবাদক :—সত্যধন ঘোষাল
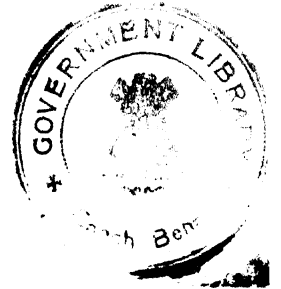
মহীপালের গীত

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন বাংলার গৌরব ছিলেন পাল রাজবংশ। শৌর্যে, বীর্যে, প্রজাগণের প্রতি কল্যাণ ও কর্তব্য কর্মে এবং নানা কীর্তিতে পাল নৃপতিবৃন্দ বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। জনসাধারণের নির্বাচিত রাজা গোপাল, সম্রাট ধর্মপাল, দিগ্বিজয়ী দেবপাল এবং স্বনামধন্য মহীপাল ছিলেন আদর্শ রাজা। বাংলা দেশের ইতিহাসে তাঁদের তুলনা বিরল।

কিন্তু 'বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি।' তাই এমন মহান বংশের কথা আজ আর বাঙ্গালীর স্মৃতিতে নেই। বৌদ্ধ-বাংলার সমস্ত চিহ্নের সঙ্গে ভারতের এই শেষ বৌদ্ধ রাজবংশের কথাও আজ অপরিচয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অথচ এমন দিন ছিল, যখন বাংলায় তাঁদের চেয়ে সম্মানিত এবং প্রিয় রাজা আর কেউ ছিলেন না। বাঙ্গালীর মনের মন্দিরে এমন আন্তরিক রাজপূজা আর কেউ লাভ করেন নি।

আবার তাঁদের মধ্যে প্রথম গোপালের পর প্রথম মহীপাল ছিলেন সব চেয়ে জনপ্রিয়। এমন কি, ধর্মপাল বা দেবপালের মতন মহান পূর্বসূরীদের চেয়েও তাঁর খ্যাতি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং তাঁর জীবিত কালেই আপামর বাঙ্গালী নর-নারীর হৃদয় জয় করেছিলেন তিনি। যদিও বীরত্বে ধর্মপাল বা দেবপাল ছিলেন আরো বড় এবং বাঙ্গালী রাজাদের মধ্যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রথম ও শেষ প্রতিষ্ঠাতা।

বাংলার ঘরে ঘরে লোকে গাইত মহীপালের মঙ্গলগাথা। তখন সর্বত্র শোনা যেত 'ধান ভানতে মহীপালের গীত,'—শিবের নয়। মহীপালের মৃত্যুর প্রায় পাঁচশ বছর পরে বৈষ্ণব কবির রচনায় পাওয়া যায়:

মহীপাল ভোগীপাল যোগীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥
(বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত')।

মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে। পাল রাজত্বের তখন অতি ভগ্নদশা। ধর্মপাল-দেবপালের বিশাল সাম্রাজ্য ত অতীত কথা সে সময়। তাঁদের পরবর্তী বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এই পাঁচ জন রাজার সময়ে পালরাজ্যের গৌরবরবি ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসে। পাঁচ পুরুষের এই ১৭৮ বছর রাজত্বকালে ক্রমে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে মাত্র মগধ অঞ্চলে হয় সীমাবদ্ধ। তাঁদের মধ্যে শেষ দু জন, দ্বিতীয় গোপাল এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের (যথাক্রমে মহীপালের পিতামহ ও পিতা) সময়েই দুর্ভাগ্য চরমে ওঠে। তাঁদের পিতৃভূমি বাংলা দেশই তখন তাঁদের হস্তচ্যুত।

পাল রাজত্বের এই বিষম দুর্দিনে বিগ্রহপাল-পুত্র মহীপাল ৯৮৮ খৃঃ মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। বর্তমান বিহার প্রদেশের দক্ষিণাংশের বাইরে তখন আর পাল রাজাদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। তাঁদের জন্মভূমি বরেন্দ্রী, রাঢ় দেশ, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ, উত্তর বিহার সমস্তই খণ্ড খণ্ড রাজ্যে পরিণত হয়েছে বিভিন্ন স্বাধীন রাজার অধীনে।

মহীপাল স্থির করলেন, পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে বংশের পূর্বগৌরব আবার ফিরিয়ে আনবেন। একাগ্রচিত্তে সেই কর্তব্যে নিজেকে নিয়োজিত করলেন তিনি।

মহীপাল মন্ত্রী ও সেনাপতিকে বললেন,—প্রথমে বরেন্দ্রভূমির মুক্তি। তারপর অন্য কথা।

বরেন্দ্র ও রাঢ় (উত্তর ও পশ্চিম বাংলা) তখন কম্বোজ-বংশীয় রাজার অধীন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন মহীপাল।

নব উৎসাহে মগধের সৈন্যদলকে নতুন করে গঠিত করলেন তিনি। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হ'ল তাঁর পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা। পিতৃভূমি উদ্ধারের প্রেরণায় সমগ্র বাহিনীর মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করলেন তিনি।

তাঁর নেতৃত্বে সুগঠিত সৈন্যদল যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'ল। তারপর মহীপাল স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তিনি প্রথমে অগ্রসর হলেন পূর্বমুখে। তাঁর আশু লক্ষ্য উত্তর রাঢ়। বাংলা বিজয়ের প্রথম সোপান। তখনকার উত্তর ও পশ্চিম বাংলা ছিল কাম্বোজ-বংশীয় রাজার পদানত।

কাম্বোজরাজ মহীপালের প্রচণ্ড আক্রমণের গতিরোধ করতে পারলেন না। উত্তর রাঢ় পদানত করে তাঁর বিজয়ী সৈন্য অগ্রসর হ'ল উত্তর দিকে।

গঙ্গা পার হয়ে মহীপাল সেনাবাহিনী নিয়ে পদার্পণ করলেন বরেন্দ্রীতে। দীর্ঘকাল পরে তাঁদের বংশের জন্মভূমিতে এসে তিনি দাঁড়ালেন। পিতামহ (দ্বিতীয়) গোপাল এবং পিতা

(দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল দুজনেই বরেন্দ্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে স্বদেশের মাটিতে আবার ফিরে এলেন পাল-কুল-তিলক! প্রদীপ্ত উৎসাহে তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হলেন বরেন্দ্র বিজয়ে। এখানে তাঁকে বাধা দেবার সাধ্য শত্রুর ছিল না। বরেন্দ্রভূমি আবার বহু দিন পরে পাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। বরেন্দ্রীর প্রজামণ্ডলী সানন্দে স্বাগত জানাতে লাগল তাঁকে—জয় মহারাজ মহীপালের জয়!

মহীপাল রাঢ় ও বরেন্দ্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। বহুকাল পরে শাসনকার্যের সুব্যবস্থা হ'ল; বিশৃঙ্খলার পর প্রজা-সাধারণ আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে লাগল।

তারপর একজন মন্ত্রীকে মহীপাল বললেন,—এইবার আমি বঙ্গ-বিজয়ে যাত্রা করব। আমার অনুপস্থিতিতে আপনার ওপর গুরুদায়িত্ব থাকবে। স্থির করেছি, শ্রীমান স্থিরপাল মগধের রাজকার্য্য পরিচালনা করবেন এবং শ্রীমান বসন্তপাল বরেন্দ্রে অবস্থান করে রাঢ়-বরেন্দ্রের কার্যভার নেবেন। এই দুই অনুজই অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ। আপনি উভয়কে উপযুক্ত মন্ত্রণা এবং সুপরামর্শ দান করবেন। আপনার ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে আমি যাত্রা করতে চাই।

মন্ত্রী সবিনয়ে বললেন—আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব মহারাজ, সে বিষয়ে কোন ত্রুটি ঘটবে না। অতি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। এখন নিশ্চিন্ত মনে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধযাত্রা করুন। আপনার জয় হোক।

বরেন্দ্র এবং রাঢ় বিজয়ের পর মহীপাল স্থানীয় বাগদী যোদ্ধাদের আপনার সৈন্যদলভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর বাহিনী আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পাল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গৌরবের সময়ে—সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে—সমস্ত ভারতবর্ষীয় জাতির মধ্যে থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হত। সে জন্যে পালরাজাদের তাম্রশাসনে অনাত্যদের তালিকার শেষে উল্লিখিত হত, 'গৌড়-মালব-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাট-ভাট।' মহীপালের সময়ে তেমন সৈন্যদলের আর সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রধানত মগধ ও বাংলা দেশের যোদ্ধৃশ্রেণী থেকে মহীপাল বীরোচিত সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন।

সেই সৈন্যদল নিয়ে শুভদিনে মহীপাল যাত্রা করলেন বঙ্গ (বর্তমান পূর্ববঙ্গ) অভিমুখে।

বঙ্গদেশে তখন রাজত্ব করছিলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা। এই চন্দ্র-রাজারা পূর্ববর্তী পাল রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে এক স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। চন্দ্রবংশের দুজন রাজার নাম জানা যায়। মহারাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তাঁর পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্র। ত্রৈলোক্যচন্দ্রই প্রথমে এই বংশের এক স্বাধীন রাজত্বের পত্তন করেন হরিকেল (বর্তমান পূর্ববাংলার প্রাচীন নাম) ও চন্দ্রদ্বীপে (বর্তমান বরিশাল)। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর ছিল তাঁদের রাজধানী এবং কোন কোন পণ্ডিতের মতে তাঁরাই সম্ভবত বিক্রমপুর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।

মহীপালের বিজয়ী বাহিনী বীর বিক্রমে বঙ্গ জয় করলো। রাজ্যলাভের তিন বছরের মধ্যেই মহারাজ মহীপাল এই অঞ্চল পালরাজ্যভুক্ত করেন। বর্তমান কুমিল্লার কাছে নারায়ণপুর ও বাঘাউরা গ্রামে তাঁর দুখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার থেকে একথা জানা যায়।

এমনি ভাবে মহীপাল উত্তর পশ্চিম ও পূর্ববাংলাকে পাল রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করলেন। উত্তর বিহার ও (মিথিলা) তিনি জয় করেছিলেন এবং বারাণসী পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। প্রপিতামহ রাজ্যপালের পর 'গৌড়েশ্বর' উপাধি আবার তিনি সগৌরবে সার্থক করে তুললেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবল প্রকাশে সমস্ত বিপক্ষদল বিধ্বস্ত করে অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করে, রাজগণের মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করে অবনীপাল হয়েছিলেন—মহীপালের বানগড় লিপির এই উক্তি মিথ্যা নয়।

বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তখনো তাঁর করায়ত্ত হয়নি, এই অবস্থায় মহা বিপদ উপস্থিত হল। সমগ্র বাংলাদেশ জয় করে শক্তি সঞ্চয় সম্পূর্ণ করবার আগেই মহীপালের দুর্ভাগ্যক্রমে দক্ষিণ-ভারতের রাজা রাজেন্দ্র চোল বাংলা আক্রমণ করলেন।

অশেষ পরাক্রান্ত এই তামিল নরপতির সমকক্ষ সে সময় সমস্ত ভারতবর্ষে আর কেউ ছিলেন না। বিন্ধ্যের দক্ষিণে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। তাঁর দিগ্বিজয়ী বাহিনী তখনকার ভারতের মধ্যেই শুধু অপরাজিত ছিল, তাই নয়। তাঁর নৌ-বাহিনী ভারতবর্ষের বাইরে, বঙ্গোপসাগরের পরপারে, সুদূর মালয় ও সুমাত্রা

পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল। এই বিরাট সাম্রাজ্যের অগণিত যুদ্ধজয়ী সৈন্যদল সেতুবন্ধ থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত পদানত করে প্রচণ্ড শক্তিতে বাংলার সীমান্তে হানা দিলো। চোল সেনাপতির সে ঝটিকা আক্রমণের সামনে দণ্ডভুক্তি রাজ (মেদিনীপুর) এবং দক্ষিণ-রাঢ়ের নৃপতি রণশূর পরাস্ত হলেন একে একে। তার পর মহীপালের রাজ্য আক্রান্ত হ'ল।

সেই চোল অভিযান প্রতিহত করবার শক্তি মহীপালের সৈন্য-বাহিনীর ছিল না। মহীপাল অজেয় বাহিনীর কাছে পরাজিত হলেন। তবে চোল সেনাপতির সে জয়লাভ স্থায়ী হয়নি। অর্থাৎ বাংলার কোন অংশে চোল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। শুধু লোকক্ষয় এবং ধ্বংসকার্যই সার হল।

চোল আক্রমণের ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের পর ধীরে ধীরে মহীপাল রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। রাজ্যে সুশাসন প্রবর্তন করলেন এবং প্রাচীন কীর্তির উদ্ধার ও রক্ষণকার্যে মন দিলেন।

পাল বংশের সমস্ত রাজাদের মতন মহীপালও ছিলেন বৌদ্ধ। বুদ্ধদেব-প্রবর্তিত ধর্মের ওপর তাঁর বিশ্বাস এবং অনুরাগ ছিল অবিচল। আজীবন তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সে সময়ে পালরাজ্যই ছিল বৌদ্ধধর্মের একমাত্র লীলাভূমি। ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় রাজাদের আশ্রয়চ্যুত এই ধর্মের তখন প্রধান অবলম্বন হলেন মহীপাল। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা এবং সাহায্যের ফলে বৌদ্ধধর্ম আরো অনেকদিন বাংলার মাটিতে সগৌরবে জীবিত ছিল।

তাঁর পিতা ও পিতামহের আমলের পর আবার 'ধর্ম' ও 'সঙ্ঘ' পূর্ণ রাজসাহায্য লাভ করলে। বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, মগধ, বারাণসী সর্বত্র তিনি বিহারের আচার্য ও জ্ঞানীগুণীদের সম্মানিত করতে লাগলেন, ভিক্ষুদের জীবনধারণের সুবিধা করে সঙ্ঘগুলির সুপরিচালনের ব্যবস্থা করলেন। অনেক নতুন মঠ ও বিহারের প্রতিষ্ঠা হল তাঁর নির্দেশে এবং নানা পুরাকীর্তির সংস্কারও তিনি করালেন নতুন করে।

নালন্দার মহাবিহার অগ্নিকাণ্ডের পর অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল। তিনি তার পুনর্নির্মাণ এবং বৌদ্ধ গয়ায় দুটি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর আদেশে স্থিরপাল ও বসন্তপাল অনেক পুরনো মন্দির সংস্কার ও নতুন মন্দির নির্মাণ করেন বারাণসীতে। তা ছাড়া সারনাথে প্রিয়দর্শী অশোক-প্রতিষ্ঠিত ধামেকস্তূপ, এবং মূলগন্ধকুটি বিহার ইত্যাদি ইতিহাসবিখ্যাত স্মৃতিচিহ্নগুলির জীর্ণ সংস্কার করা হয়। শুধু বৌদ্ধকীর্তি নয়, কাশীর অনেক হিন্দু দেবদেবীর মন্দির নির্মাণ এবং পুরাতনের সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেন মহীপাল।

তিনি একদিকে যেমন পালরাজ্যকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও নানা পুরাতন কীর্তিগুলিকেও সযত্নে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে রাখেন। এমনিভাবে তৎকালীন বাংলাদেশের আত্মগৌরব তিনি অনেকাংশে ফিরিয়ে আনেন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন। আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতে আবার বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি কয়েকটি বিশালাকার দীঘি এবং নতুন নতুন নগরও প্রতিষ্ঠিত করেন। তখনকার কালে দীঘি প্রতিষ্ঠা ছিল জনসাধারণের পক্ষে অতি কল্যাণকর কাজ। উত্তর বাংলায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীঘি বাংলাদেশের মধ্যে বৃহত্তম। মুর্শিদাবাদের সাগর দীঘির মতন বিরাট দীঘিও সচরাচর দেখা যায় না। মহীপাল অতি দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় সঠিক জানা যায়নি। তবে তিনি অধিক দিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নানা জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠাতা এবং বহু সদ্গুণের অধিকারী মহীপাল তাই লোকস্মৃতিতে অমর ছিলেন সুদীর্ঘকাল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নানা নগর, গ্রাম এবং দীঘিকার সঙ্গে আজো তাঁর নাম যুক্ত হয়ে আছে।

মুর্শিদাবাদের মহীপাল গ্রাম এবং সাগরদীঘি, রঙপুরের মহীগঞ্জ, বগুড়ার মহীপুর, দিনাজপুরের মহীসন্তোষ এবং মহীপাল দীঘি প্রায় হাজার বছর পূর্বেকার সেই জনপ্রিয় রাজার স্মৃতি-বিজড়িত!

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82769—কুমারী আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—"রাতের বাসরে ঐ ঝলমল তারাগুলি" ও "তোমার মনের রঙ লেগেছে।" সুরমাধুর্যে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে গান দু'খানি উপভোগ্য হয়েছে।

N 92597—ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ (স্বরোদ) "রাগ-ভাটিয়ার" ও "মধ্যম সে গারা"—গৎ দু'খানি স্বরোদের মাধ্যমে বাজিয়েছেন। সংগ্রহে রাখবার মত একখানি যন্ত্রগীতির রেকর্ড।

কলম্বিয়া

GE 24874—কুমারী গায়ত্রী বসুর কণ্ঠে দু'খানি আধুনিক গান—"হয়তো এখন তোমার চোখে" ও "সুখে-দুঃখে আমি" একটি সুরপ্রধান, অপরটি ছন্দোপ্রধান। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে শিল্পী গান দু'টি পরিবেশন করেছেন।

GE 30385—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "পথে হ'ল দেরী" বাণীচিত্রের দু'খানি গান—"তুমি না হয় রহিতে কাছে" ও "পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া।"

GE 30386—কুমারী আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় "পথে হ'ল দেরী" বাণীচিত্রের "কাকলী কুজন" ও "এই সাঁঝভরা লগনে" গান দু'টি পরিবেশন করেছেন।

GE 30387—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "পথে হ'ল দেরী" বাণীচিত্রের অন্য দু'খানি গান—"তুমি না হয় রহিতে কাছে" ও "এ শুধু গানের দিন।"

এ ছাড়াও "জীবনতৃষ্ণা" বাণীচিত্রের চারখানি গান—GE 30388 এবং GE 30389 রেকর্ডে গেয়েছেন—শ্রীমতী উৎপলা সেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা ও সুধাকন্ঠ লতামঙ্গেশকর। গানগুলি এরই মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে।

আমার কথা (৩৬)

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র

নিজেকে ভুলিয়া তন্ময়তার সহিত গান করা—ভাব ও কথা-প্রধান রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। ইহার যথার্থ রূপদানে সক্ষমা হয়েছেন সুকণ্ঠী ও দরদী গায়িকা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র।

এক শনিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতার অন্যতম বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিক্ষালয় 'রবিতীর্থে' শ্রীমতী মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আগমনের কারণ জানাইলাম। বিনয় ও নম্রতার সহিত তিনি বলিলেন, '১৯২৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করি। পিতা শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী। ভ্রাতা শ্রীসোমেন্দ্র মুখার্জি একজন ছায়াছবি পরিচালক। গৃহে সঙ্গীতচর্চা নিয়মিত ভাবে হইত। তা ছাড়া পিতৃদেব লেখক ও ঔপন্যাসিক হওয়ায় আমাদের গৃহে সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞদের প্রায়ই আসর বসিত। শেষোক্তদের মধ্যে অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের কথা বেশী মনে পড়ে। মল্লিক মহাশয়ের গান শুনিয়া আমি অল্প বয়সে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্টা হই ও নিয়মিত আয়ত্ত করিতে থাকি। বেথুন স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালে বিশ্বভারতী প্রদত্ত সঙ্গীত-বৃত্তি পাইয়া ১৯৪১ সালে শান্তিনিকেতনে গমন করি এবং ১৯৪৫ সালে ডিপ্লোমাসহ কলিকাতায় ফিরিয়া স্কটিশ চার্চ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় প্রাইভেট ছাত্রী হিসাবে প্রবেশিকা ও আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। ১৯৪৭ সালে বি-এ পাশ করি। পড়ার সাথে সাথে সঙ্গীত-সাধনা চলিতে থাকে। ১৯৪৩ সালে 'হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস'এ প্রথম রেকর্ড করা হয় আমার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান" এবং উহা খুবই জনপ্রিয় হয়। এ ছাড়া "ও তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে—তবে একলা চল রে" ইত্যাদি আরও কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং অতুলপ্রসাদের "একা মোর গানের তরী" রেকর্ড করা হয়। অতুলপ্রসাদের "চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে" শীঘ্রই বাহির হইতেছে।

সন্দীপন পাঠশালা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি কয়েকটি ছায়াছবিতে আমি প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে ছিলাম, কিন্তু ফিল্মে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়া আমার ভাল বোধ হয় না।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শ্রীঅনাদি দস্তিদার প্রভৃতিকে আমার সঙ্গীত-শিক্ষক হিসাবে পাইয়া ধন্যা হইয়াছি। শ্রীদ্বিজেন্দ্র চৌধুরীর নিকট অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুল গীত শিক্ষা করিয়াছি।'

'মাসিক বসুমতী'র সহিত তাঁহাদের অনেক দিনের যোগসূত্র রহিয়াছে, তাহা শ্রীমতী মিত্র জানাইতে ভুলিলেন না। 'আকাশ-বাণী' কলিকাতা কেন্দ্রের নিয়মিত গায়িকা হিসাবে তিনি বহু দিন হইতে যুক্তা রহিয়াছেন।

শেষে শ্রীমতী মিত্র জানালেন যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যদি বিশ্বকবির ভাবব্যঞ্জনা ব্যাহত হয়, তবে তিনি খুবই আঘাত পান।

অনুভব

শ্রীদীপ্তি সেনগুপ্তা

শোনো যমুনা!
কালের গতি ছাপ ফেলে গিয়েছে তোমার সর্বাঙ্গে।
তুমি রিক্তা, নিঃস্বা,
আজ ক্ষীণস্রোতা তুমি!
তবু পূর্ণিমার রাত্রির
স্নিগ্ধতার কাঁপন দেখলাম
তোমার আজকের দিনের ভীরুদৃষ্টির ফাঁকে।
আজও তুমি অপরূপ হয়ে রয়েছো
প্রিয়-মিলনের ক্ষণটিকে অমর করে।
বিগতযৌবনা তুমি,—
সেই উজ্জ্বল প্রাণবন্যার ধারা
তবু বয়ে গেছে তোমার সর্বাঙ্গে,
সেই স্নিগ্ধ মহার্চনার নমিত-ভঙ্গী।

শোনো যমুনা!
তোমার এ স্নিগ্ধতায় আমার মনও ভরে উঠলো
সেই মহাসঙ্গীতের সুমধুরতায়।
আজও তুমি শ্যামধারা মহামিলনের
সেই অপূর্ব সুর-ছন্দ শুনতে পাও কি না, জানি না,—

তবুও আমার দৃষ্টিতে তোমায় চেয়ে দেখলাম
তোমার স্থবিরতায় রয়ে গেছে
কালজয়ীর বিজয়বেশ।
তাই চন্দনস্নিগ্ধ দোল-পূর্ণিমা রাত্রির
মহানীরবতায় মনে হলো
তুমি মহাধ্যানযোগী।—
তোমার শাশ্বত মহিমায় দেখলাম
মহাশক্তির রূপ-কল্পনা।

আজ বলো যমুনা—
শুধুমাত্র কালোত্তীর্ণ সেই মহামিলনের
শুভ মুহূর্ত তুমি কি
আজো দেখতে পাও?
আজো কি নয়ন সম্মুখে
সহস্র বর্ষ আগের দোল-পূর্ণিমা
তোমায় দোলা দিয়ে যায়?
আজো কি শ্যামের বাঁশরী
আর রাই-এর নূপুর ছন্দের
মূর্চ্ছনা রেখে যায় তোমার বুকে?

সাম্প্রদায়িকতার পুরাতন বহ্নি

"শেখ আব্দুল্লা বলিয়াছেন, 'আমি সাম্প্রদায়িকতাবাদী নই ; আমি যখন কাশ্মীরের মুসলমানদের সমস্যার কথা তুলি তখন আমি চাই যে, সমস্যাগুলি উপলক্ষ করিয়া তাহার সমাধানের ব্যবস্থা হউক।' কিন্তু শেখ আবদুল্লার এই কথায় কেহই বিভ্রান্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। অতীতে দেখা গিয়াছে, জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার যে প্রচার চালান হয়, তাহাই সব চেয়ে মারাত্মক। সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মুক্তিলাভের পর শেখ আবদুল্লা ভারত সরকার ও কাশ্মীর সরকারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিলেও কাশ্মীর আক্রমণকারী পাকিস্তান সরকারের কোন সমালোচনা করেন নাই। এই নীরবতাকে আকস্মিক বলিয়া মনে করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম, কিন্তু শেখ আবদুল্লার আচরণ হইতে সেরূপ মিথ্যা আশা পোষণের কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। তিনি যে পথ বর্ত্তমানে অনুসরণ করিতেছেন, তাহা সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করারই পুরাতন পথ।"

—দৈনিক বসুমতী।

উপায়টা কি ?

"কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য-দপ্তর সমস্ত রাজ্য সরকারকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য দপ্তরকে খাদ্যবস্তুর অপচয় নিবারণে তৎপর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দিল্লীতে অতিথি নিয়ন্ত্রণ আদেশ পুনঃ-প্রবর্ত্তনের কথা হইলে, আমরা বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, জন্মতিথি, শ্রাদ্ধ ও পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে ঢালাও নিমন্ত্রণ এবং অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা আমাদের দেশে চলিত আছে। বেশীর ভাগ স্থলেই তাহাতে প্রয়োজনের চেয়ে আয়োজন অধিক করা হয় এবং এই আড়ম্বরটা এমনি দেশাচারে পরিণত হইয়াছে যে, ইহাতে খাদ্যবস্তুর অপচয় কাহারো নজরে পড়ে না। এ সব স্থলে সাধারণ ভাবে পঞ্চাশ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ এক শতের মধ্যে নিমন্ত্রণগ্রহণকারীদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। খাদ্যবস্তুর আয়োজনও পরিমিত হারে হওয়া উচিত। এ দিক হইতে অপচয় নিবারণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং তা অবিলম্বে কার্যকরী হওয়া আবশ্যক, ইহা অবশ্য বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই যেমন এক দিক, তেমনি আর একটা দিকও আছে। এ দেশে বহু লক্ষ নর-নারী আছেন, যাঁহারা অপচয় ত দূরস্থান, সর্বনিম্ন প্রয়োজনানুরূপে খাদ্যও পান না। ভাত, রুটি, ডাল, মাছ ও তরি-তরকারিই তাঁহাদের জোটে না। ফল, দুধ ও মিষ্ট দ্রব্যের কথা তুলিয়া লাভ নাই। উপর তলায় অপচয় ও নীচু তলায় অর্ধাহার অনাহার (সেই তলাটাই বৃহত্তর) এই অসামঞ্জস্য দূর করার উপায়টা কি ?"

—যুগান্তর।

কলিকাতা পৌর-প্রত্যাশা

"গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ অধিবেশনে পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যাপারে গলদ ও দুর্নীতি দূরীকরণ বিষয়ে কার্যকারী পন্থা গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত কমিটি গঠনের সম্পূর্ণ ভার মেয়রের উপর ন্যস্ত করা হয়। কমিটিতে মেয়র বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরও গ্রহণ করিতে পারিবেন। কাউন্সিলার ছাড়া বাহিরের লোকও প্রয়োজনমত গ্রহণ করা যাইবে। বিবরণে প্রকাশ : কংগ্রেস ও বিরোধী দলের সদস্যগণের পক্ষ হইতে মেয়রকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, কর্পোরেশনের ব্যবস্থাগত গলদ ও দুর্নীতি দূর করার যাবতীয় প্রচেষ্টায় তাঁহারা সাহায্য করিবেন। পরিচালনার বিধিব্যবস্থা প্রভৃতির ত্রুটি বা গলদ দূর করার জন্য বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন তথ্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু দুর্নীতি দূর করার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন ততটা নয়, যতটা প্রয়োজন সততা ও নীতির প্রতি, নিয়মনিষ্ঠার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা। মেয়র কমিটি গঠন করুন, কমিটি কর্তব্য নির্ধারণ করুন। কমিটি কাজের দ্বারা সুনাম অর্জন করিয়াছেন—ইহা দেখিবার প্রত্যাশায় রহিলাম।"

—আনন্দবাজার।

লজ্জার কথা

"বিদেশাগত অতিথিরা কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে স্মরণ করেন রবীন্দ্রনাথকে। কলিকাতার ঐতিহাসিক সম্বর্দ্ধনা সভায় দাঁড়াইয়া সোবিয়েৎ নেতৃদ্বয়, মার্শাল বুলগানিন ও নিকিতা ক্রুশ্চভ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধার বাণী উচ্চারণ করেন তাহা আমাদের মনে চিরদিন জাগরূক থাকিবে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর শান্তিনিকেতন পরিদর্শন ও রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষার্থে ষাট হাজার টাকা দান মোটেই মামুলী ব্যাপার নহে। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভিলিয়াম সিরোকী কলিকাতায় নাগরিক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহার বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব রহিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে হিটলারের সহিত কলঙ্কময় মিউনিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া 'গণতন্ত্র' ধ্বজাধারী ফ্রান্স ও বৃটেন যখন জার্মাণীর কাছে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিক্রয় করিয়া দেয়, তখন রবীন্দ্রনাথের ধিক্কার-বাণী সমগ্র জগতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পদানত চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে ভারতের নহে, পৃথিবীর জনমত সংগঠনে সেই বাণী সেদিন অনেকখানি সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, রবীন্দ্রনাথের নগরী কলিকাতার সম্বর্দ্ধনার উত্তরে চেকোশ্লোভাক প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক এই ঘটনাটির উপর বিশেষ গুরুত্বদান লক্ষ্যণীয়। অতিথি তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়াছেন ; আতিথ্য-দানকারী আমাদের কর্ত্তব্য এই আন্তর্জাতিকতার ঐতিহ্য হইতে যেন কোনক্রমেই আমরা বিচ্যুত না হই—সে দিকে নজর রাখা।"

—স্বাধীনতা।

বাদশাহী ভ্রমণ

'সংঘর্ষ' (শিলিগুড়ি) লিখিতেছেন : "প্রধান মন্ত্রী নেহরু চারি দিনব্যাপী দার্জ্জিলিং ও সিকিম ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার এই রাজকীয় ভ্রমণের ফলে দার্জ্জিলিং জেলার বা সিকিমের সাধারণ মানুষের কতটুকু উপকার সাধিত হইল, ইহা একমাত্র তিনি বা তাঁহার সরকার বলিতে পারিবেন। নেহরু ভুলেও কোথাও এই জেলার বা পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ বিশেষ সমস্যার কথা উল্লেখ করেন নাই। ইঙ্গ-ভারতীয় কালচারে পুষ্ট বা পুষ্টা একদল ধনী নরনারী ছাড়া সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে তিনি কোথাও আসেন নাই। পরন্তু পাহাড়চূড়া স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগদানেচ্ছু আগ্রহশীল সাধারণ মানুষকে ঐ স্থানের একমাত্র রাস্তায় চলিতে পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। কারণ উক্ত রাস্তাটি নিমন্ত্রিত ধনী মোটরবিহারীদের জন্য রিজার্ভ রাখা হইয়াছিল। নেহরুর এই বাদশাহী ভ্রমণের আয়োজন ও জাঁকজমকের জন্য বিপুল টাকার শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। এই টাকা জনসাধারণের। এ-ছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা বন্ধ রাখার জন্য জনসাধারণের দুর্ভোগও কম হয় নাই। শিলিগুড়ি-কাটিহার লাইনের যাত্রিবাহী ট্রেণসমূহকে প্রায় দেড় ঘণ্টা আটক রাখা হয়। কারণ লেবেল ক্রসিংগুলিকে এত সময় খোলা অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত দেশে এক জন ব্যক্তির জন্য যাত্রিবাহী ট্রেণ দেড়-ঘণ্টা অহেতুক আটক রাখার দৃষ্টান্ত বোধ হয় সারা পৃথিবীতে খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে না। যে দেশের মানুষ অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে মরে, যে দেশের শিশু ও নারী অসহায় রেলষ্টেশনের উন্মুক্ত প্রান্তরে বসবাস করে, সেই দেশের প্রধান-মন্ত্রীর ভ্রমণের অহেতুক জাঁকজমকের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় হয়। কংগ্রেসের জনকল্যাণকর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ইহাই স্বরূপ।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

আমাদের আবেদন

"পঃ বঙ্গের এক প্রান্তে প্রস্তর-কঙ্করময় অঞ্চলে অবস্থিত দীর্ঘদিনের অবহেলিত এই আকাশমুখী বাঁকুড়া জেলার এক মাত্র বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা "কংসাবতী প্রজেক্ট" আরম্ভ হওয়ায় লোকের মনে অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছিল ; অনেকে স্বেচ্ছায় জমিও ছাড়িয়া দিয়াছে এবং যে ভাবে কার্য্য অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আশা হইয়াছিল ২।১ বৎসরের মধ্যে কোন কোন অঞ্চল চাষের জল পাইবে, কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের কাটছাঁট দেখিয়া আমরা নিরাশ হই। আশা করি এই খাতে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করিলে একাধারে কার্য্যটি দ্রুত অগ্রসর হইবে, অপর দিকে এ জেলার ১৫।২০ হাজার বেকার জনমজুর কার্য্য পাইয়া সরকারের টেষ্ট রিলিফের অপব্যয় নিবারণ করিবে। উপসংহারে আমরা বলিব, এই অর্থ যদি বৈদেশিক অর্থে বা অন্য কোনরূপ পুর্ণবিন্যাসের দ্বারা বরাদ্দ করা সম্ভব না হয়—হুগলী হাওড়ায় যে সব সখের সেচ পরিকল্পনা (যেখানে ভগবানের দয়া স্বভাবতঃই বর্ষিত হয়) বলিয়া আমাদের বিশ্বাস তাহার কার্য্য কিছু পিছাইয়া এ জেলার অত্যাবশ্যকীয় সেচ ও মেদিনীপুরের বন্যাকে প্রাধান্য দিলে সরকার ধন্যবাদার্হ হইবেন। আমাদের বিশ্বাস দরদী হাওড়া হুগলীবাসীও ইহা সমর্থন করিবে। অন্যথায় আমরা কৃষি-দরদী মুখ্য মন্ত্রীর নিকট জেলার জনসাধারণের পক্ষে আবেদন জানাই :—যদি কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি না হয়, এই রাজ্যের বরাদ্দ অর্থ পুর্ণবিন্যাস করিয়া অন্যান্য বড় বড় পরিকল্পনার সংরক্ষিত অর্থ হইতে কিয়দংশ এতদঞ্চলের কৃষককুলের মঙ্গলের এই অতি প্রয়োজনীয় সেচ পরিকল্পনায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া এ জেলার মহৎ উপকার সাধন করুন।"

—মল্লভূম (বাঁকুড়া)

কংগ্রেস শাসনে চুরির বহর

"আর্ত্ত জনসাধারণের সেবায় সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং তথাকথিত জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান মারফৎ রিলিফ সাহায্য বাবদ যে সকল দ্রব্যাদি বিতরিত হওয়ার কথা, তাহার একটি বিরাট অংশ প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় হওয়ার সংবাদ কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বিতরণের জন্য আমেরিকান ঘি, আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের খয়রাতি ঔষধপত্র, রিলিফের গুঁড়া দুধ এবং বস্ত্রাদি বিতরিত না হইয়া প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় হইতেছে। এমন কি বিশ্ববিখ্যাত রেডক্রশ প্রতিষ্ঠান তাহার সুদক্ষ ব্যবস্থাদি থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের খয়রাতি দ্রব্যাদি যথারীতি বিতরণ করা সম্বন্ধে ক্রমেই বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেছে। তাহারা এক একটি কার্ডে প্রায় সাত টাকার জিনিষ প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীকে দিয়া থাকে। এইরূপ প্রায় হাজার কার্ড তাহারা প্রতিদিন ডাকে পোষ্ট করে। ডাক-পিওনরা সেই কার্ড বিলি না করিয়া আত্মসাৎ করিতেছে, এমন দৃষ্টান্ত রেডক্রশ অবগত আছে। সর্ব্বনাশের কথা ! কংগ্রেস শাসনে ভারতে কি এই ইতিহাস রচিত হইতেছে ?"

—ময়ূরাক্ষী (সিউড়ী)।

কাছাড়ের কথা

"কাছাড় জেলা নানা সমস্যার সম্মুখীন ; স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের আগমন, উপর্য্যুপরি বন্যা, খাদ্যসমস্যা, বেকার সমস্যা ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যাই এই জেলায় বর্ত্তমান। কংগ্রেস সরকার জনকল্যাণকল্পে পাঁচসালা পরিকল্পনা ও সমাজ-উন্নয়নমূলক যেসব কাজে হাত দিয়াছেন তাহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলে যে কাছাড়ের সমূহ উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্থিক দুরবস্থা আজ কাছাড়ের জনসাধারণকে, বিশেষ ভাবে কৃষককুল ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এমনি ভাবে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহারা আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। উপর্য্যুপরি বন্যার ফলে কাছাড়ের কৃষকসমাজ সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নানাপ্রকার ঋণভারে তাহারা আজ প্রপীড়িত। এক দিকে বন্যা, অপর দিকে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা এবং ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস এই সব কিছু মিলিয়া কাছাড়ের জনসাধারণ আজ তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাকুল। ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যান্য অংশের কথা ছাড়িয়া দিলেও আসামের অবশিষ্টাংশের সহিত কাছাড়ের যে যোগসূত্র রহিয়াছে, তাহা নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত, অনিশ্চিত, সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। ফলে বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষে কাছাড়ের জীবনযাত্রার অনভিপ্রেত বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে। কাছাড়ের বেকার সমস্যার সমাধান ও আর্থিক 'মান' উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এই জেলা প্রভূত বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ।"

—যুগশক্তি (শিলচর)

ভিতরের পরিচ্ছন্নতা চাই

"সরকারী পৌর শাসক যে ভাবে কাজ করিতেছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। শ্যামসায়রে পার্ক তৈয়ারী পুরাদমে চলিতেছে। টাউনহলে পার্ক এবং বক্তৃতামঞ্চ হইবে, কাজ আরম্ভ হইয়াছে, বহু রাস্তায় বিজলীবাতি দেওয়া হইয়াছে। করদাতাদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা হইতেছে—অত্যন্ত আশার কথা। তবে একটি কথা নিবেদন করিব। সহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার কাজে যাহারা নিযুক্ত আছে তাহাদের বাসগৃহ, রাস্তা এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য পৌরশাসক মহাশয়কে আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিলে সুখী হইতাম। ধনী এবং বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিদের জন্য রম্য উদ্যান সৃষ্টির পূর্ব্বে নরককুণ্ড সদৃশ ধাঙ্গড়পল্লীর সংস্কার সাধন কার্য্য কেন আরম্ভ হয় নাই তাহা আমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সহরের মধ্যস্থলে এখনও এমন ড্রেন সমূহ আছে যে সেখান দিয়া পথ চলিতে হইলে নাসিকায় কাপড় দিতে হয়। বাহিরের চাকচিক্য যেমনই শোভা পাইবে, মর্য্যাদা পাইবে যদি ভিতরেও অনুরূপ পরিচ্ছন্নতা বিরাজ করে।" —বর্দ্ধমান বাণী।

পঞ্চশীলের সার্থকতা

"গোয়ায় পর্ত্তুগীজ ঘাঁটী ভারতের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শক্তির সাহায্য পাইতেছে। ইন্দোনেশীয়া বিদেশী বিতাড়নের ব্যবস্থা করিতেছে। ইন্দোনেশীয়ার প্রেসিডেণ্টও ভারতে আসিয়াছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের ভারতে আগমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি ভারত Enlightend self interest-এর নীতি লইয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বীয় সমস্যা সমাধানে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হয় তাহা হইলেই ভারত শক্তিশালী হইতে পারিবে। যুদ্ধের কথা ভারত বলিতে পারে না; কারণ যুদ্ধবাদ অগ্রসর দেশগুলির সহিত ভারতের পার্থক্য অনেক। ভারত পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে না পারিলে কখনও শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিবে না। পঞ্চশীলের মহিমা প্রচারের দ্বারা বাস্তবলাভ কিছু হইবে না, যদি না পঞ্চশীলের সার্থকতার পথে পদক্ষেপ করা যায়।" —বীরভূম বাণী।

নিলাম ইস্তাহার

"কেবলমাত্র নিলাম ইস্তাহার লাঞ্ছিত সংবাদপত্র পাঠকদের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। মফঃস্বলের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে পাঠযোগ্য বিষয়বস্তু প্রায় কিছুই থাকে না।' একথা তিনি জঙ্গীপুর সংবাদ, পল্লীবাসী, দামোদর প্রভৃতি পত্রিকা নিয়মিত পড়িলে লিখিতেন না—লিখিয়াছেন 'কারণ' জি, টি রোডের মূল্য আদায় করিতে সম্পাদকের অনেকখানি বহুমূল্য সময় নষ্ট হইয়া যায়। এক পাতা জুড়িয়া স্বল্প মূল্যের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন লইলে যদি পত্রিকার কৌলীন্য ক্ষুণ্ণ না হয় তবে নিলাম ইস্তাহার ছাপিলেও এত বলার কিছু থাকে না। দলনিরপেক্ষ হইয়া মফঃস্বলের সাপ্তাহিকের পক্ষে নিলাম ইস্তাহারের আয় ব্যতিরেকে টিকিয়া থাকা একরূপ অসম্ভব—একথা স্বীকারে লজ্জার কিছু নাই, কারণ অন্য পত্রিকাগুলি কেহ প্রত্যক্ষ কেহ বা পরোক্ষ ভাবে কোনও দল বা দলপতির নিকট হইতে পুষ্টি সংগ্রহ করিয়া থাকে। এবং 'ইহারা কাহার সেবা করে' একথা বুঝিতে মুস্কিল হয় না।" —আসানসোল হিতৈষী।

ভাষার লড়াই

"শ্রদ্ধেয় কৃপালনীজী হিব্রু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সংস্কৃত সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষাও ঢের বেশী বলিতে পারিতেন। যাহাদের মাতৃভাষাগুলির মূল উৎস হইল সংস্কৃত, তাহাদের সংস্কৃত শিক্ষা করা যে ইস্রায়েলে নবাগত একজন বিদেশীর হিব্রু শিক্ষা করা অপেক্ষা ঢের সহজ, ইহা কে না বুঝিতে পারেন? রাজাজীর ইংরাজী প্রীতিকে তিনি যে spell of english বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, ইহাকে অতীত দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া যে নিন্দা করিয়াছেন, ইহা যেমন সমীচীন, তেমনি তিনি যে হিন্দীর পক্ষে ওকালতী করিয়া বসিয়াছেন—It only meant that it was to be the medium of inter provincial intercourse, ইহা ততোধিক অসমীচীন। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা যে চিরদিনই রাষ্ট্রশাসনে প্রাধান্যলাভ করিয়া যাইবে—এ আশঙ্কা দূর করিবার দিকে লক্ষ্য না করায় কৃপালনীজীর চেষ্টা ব্যর্থই হইয়াছে। তাঁহার নিজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে তিনি দেখিবেন—সংস্কৃত ভাষাই এ দেশের একমাত্র ভাষা যাহা হিন্দী ও ইংরাজীর বিবাদ মিটাইয়া সমস্ত ভারতবাসীকে রাষ্ট্রব্যাপারে তুল্য সুযোগ দান করিতে পারে। অন্য যে কোন চেষ্টা ব্যর্থ বাদানুবাদে পরিণত হইতে বাধ্য।" —পল্লীবাসী (কালনা)

দিন মজুরের দান

"মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার বরঞা থানার অন্তর্গত হাপিনা গ্রামের শ্রীধনগোপাল ভল্লা মজুর খাটিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তিনি তাঁর মজুরীর পয়সা হইতে প্রত্যহ চারি আনা সঞ্চয় করিয়া এক মাসে সাত টাকা আট আনা উক্ত গ্রামের বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণের জন্য দান করিয়াছেন। তাঁর মত গরীবের বিদ্যোৎসাহিতা প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।" —জঙ্গিপুর সংবাদ।

শোক-সংবাদ

দেশগুরু কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

দেশগুরু কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাপঞ্চানন মহাশয় বংশের যোগ্য বংশধররূপে বর্ত্তমান কালে স্ববংশীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশবাসীকে অধুনা-বিরল এক অনবদ্য উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিতেছিলেন।

সন ১২৮৯ সালের ৩রা আশ্বিন সোমবার রাত্রি ১টার সময় শুক্লাষ্টমীর শুভমুহূর্ত্তে ইনি মাতৃগর্ভ হইতে অবতীর্ণ হন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে উপনয়ন সংস্কার এবং সন ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালের নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডারহাটি গ্রাম নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ রামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত ইহার বিবাহ সংস্কার সংঘটিত হয়। ১৩১০ সালের ৮ই চৈত্র ঠাকুর ক্ষেত্রনাথ খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিষ্যবাটীতে অবস্থানকালীন অপ্রত্যাশিতরূপে নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করেন। পিতৃদেবের জীবদ্দশায় এবং পরেও শ্রীযুত কালীপ্রসাদ প্রথমে স্থানীয় অধ্যাপক কেদারনাথ বিদ্যাসাগর, গুরুদাস ন্যায়রত্ন ও তারাপদ
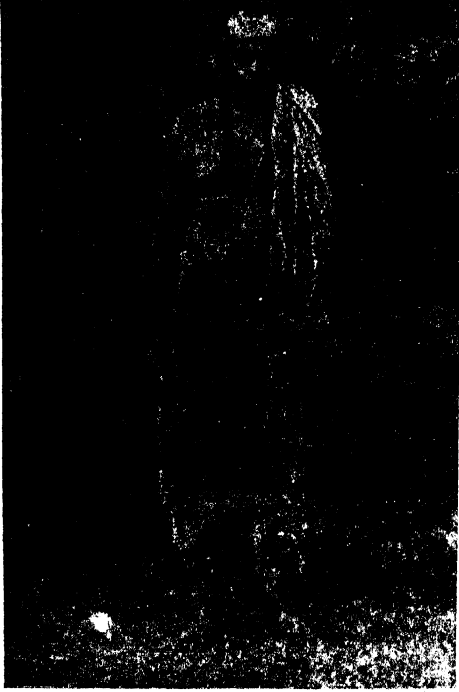
দেশগুরু কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ন্যায়রত্ন মহাশয়গণের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য ও তৎসহ পাঠ্যকোষ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। পরে সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন পুরুষোত্তম কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট এবং উহা সমাপ্ত করেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ভট্টপল্লী নিবাসী তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট। পরে উক্ত কলেজে এবং বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়ে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (দ্রাবিড়) মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র ও বেদান্তশাস্ত্র এবং পরম স্মার্ত্ত দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংসারের কর্ত্তব্যভার ইঁহার মনোমত শাস্ত্রচর্চ্চায় বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল এবং আশানুরূপ অধ্যয়নস্পৃহায় তৃপ্তি ব্যাহত করিয়াছিল। পরে স্বকৃত প্রচেষ্টার ফলে তন্ত্রশাস্ত্রে ইনি অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৩১২ সালের বৈশাখ মাসের পুণ্যতিথিতে ইনি বংশের রীতি অনুসারে স্বীয় মাতৃদেবীর নিকট তান্ত্রিক দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং সাধনপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ১৩২০ সালের পৌষের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে বাঁকুড়া জেলায় শিহড় গ্রামনিবাসী কৌলাবধূতাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের নিকট যথাক্রমে শাক্তাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, বেদাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, বীরাভিষেক অবধি অধিকার লাভ করেন। সেই সময়ে শ্রীগুরুদেবের নিকট কৌলাবধূত শ্রীহরিহরানন্দ সরস্বতী এই কৌল নাম প্রাপ্ত হন। ইঁহার জীবনের বাহ্য লোকগ্রাহ্যদিগের ইতিহাস এইরূপ। কিন্তু পরম অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক সাধনার ধারা সম্পূর্ণ গুপ্ত, তাহা প্রকাশ্য নহে। পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ইনিও স্বভাবতই একান্ত আত্মপ্রচার-বিমুখ ছিলেন। সাধারণ মানবের অগোচরে ইঁহার সাধনার ধারাপথ প্রবল ও অব্যাহত গতিতে সতত অগ্রসঙ্করণশীল হইয়া ইঁহাকে সাধনায় বহু উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছে। তাহা কখন কখন লৌকিক দুই একটি ঘটনার মধ্য দিয়া কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইঁহার দীক্ষিত শিষ্যসংখ্যা আজ বহু সহস্রে উপনীত হইয়াছে। উত্তর-ভারতের প্রধান প্রধান প্রায় সর্ব্বস্থানেই ইঁহার শিষ্য সম্প্রদায় বর্ত্তমান। কিন্তু কোন আড়ম্বর ছিল না, কোন প্রচার বা বিজ্ঞাপন ছিল না। একান্ত শান্ত ও সমাহিতভাবে বিশাল শিষ্য সম্প্রদায়কে যোগ্যপথে পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ধনী বা দরিদ্র, শিক্ষিত বা মূর্খ সকলেই তাঁহার সমান প্রিয় ছিল।

গত ১২ই পৌষ শুক্রবার বেলা ১১।৫৮ মিনিট সময়ে চিকিৎসকগণ ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নিয়তি তাঁহাকে লোকান্তরিত করে। ঊর্দ্ধলোকের অধিবাসী তিনি জীবশিক্ষার জন্য মর্ত্তে আসিয়াছিলেন, দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নিজে আদর্শ দেখাইয়া বহু শিক্ষা দিয়াছেন, আদর্শ গুরু ছিলেন, গুরুভার তাঁহার সহজধর্ম্ম ছিল। কর্ম্ম অবসানে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৫ বৎসর ৪ মাস। তাঁহার স্ত্রী, চারি পুত্র ও বিবাহিতা চারি কন্যা বর্ত্তমান। পুত্রগণের নাম সর্ব্বশ্রী তারাপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ ও গৌরীপ্রসাদ। আমরা পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

হিরণ্ময়ী সেন

বাঙলার স্মরণীয় কান্ত-কবি রজনীকান্ত সেনের সহধর্মিণী হিরণ্ময়ী সেন ৮৩ বছর বয়েসে গত ২রা পৌষ আম্বালায় পুত্রের ভবনে পরলোকগতা হয়েছেন।

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

জেমোর স্বনামধন্য জমিদার অজয়েন্দুনারায়ণ রায় ৬০ বছর বয়সে গত ১২ই পৌষ লোকান্তরিত হয়েছেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও ইনি অপরিচিত ছিলেন না। মাতুল স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সম্বন্ধে বহু রচনা ইনি বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিয়ে এসেছেন। অজয়েন্দুনারায়ণের মৃত্যুতে একজন সমাজসেবী প্রজাহিতৈষী সাহিত্যানুরাগীর অভাব ঘটল। তাঁহার স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

দুর্গাচরণ ঘোষাল

দৈনিক বসুমতীর ভূতপূর্ব বার্তা সম্পাদক ও বাঙলার একজন প্রবীণতম সাংবাদিক দুর্গাচরণ ঘোষাল কাব্যতীর্থ গত ১ই পৌষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে এঁর ৭০ বছর বয়স হয়েছিল। দুর্গাচরণের বসুমতীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল পঁয়তাল্লিশ বছরের। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল অবিচ্ছেদ্য। এঁর মৃত্যু বিশেষ করে বসুমতী কর্মিবৃন্দের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া বিস্তার করেছে। এই সাংবাদিকের আত্মার সদগতি কামনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা সমালোচনা

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর থেকে বাঙলা সাহিত্যে পত্রিকা প্রকাশের একটা হিড়িক পড়েছিল, অনেকেই জানেন। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল থেকে প্রায় হাজারখানেক নতুন পত্রপত্রিকা বাজারে ছাড়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব সদ্যোজাতদের মধ্যে অধিকাংশই অকালমৃত্যুর কবলে পতিত হয় যথার্থ ব্যবস্থা এবং যথোপযুক্ত অর্থের অভাবে। কলকাতার রাস্তার মোড়ে মোড়ে ষ্টলগুলি পরিদর্শন করলে দেখা যাবে, নতুন পত্রপত্রিকার পরিবর্ত্তে পুরাতন সাময়িক পত্রগুলি এখনও স্থান দখল ক'রে আছে। যদিও পুরানো কাগজের মধ্যে একমাত্র মাসিক বসুমতী আজ সকলের উচ্চে বিভিন্ন কারণে। আমার ধারণা, নতুন পত্রিকা প্রকাশে যাঁরা আগ্রহী ছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, পত্রিকা প্রকাশ করা চাট্টিখানি কথা নয়। হাতে প্রেস বা ছাপাখানা এবং কিছু অর্থ থাকলেই কাগজ চালানো যায় না। শুনতে পাই, নতুন কাগজগুলির সম্পাদকদের না কি শুধু সম্পাদনার কাজ ক'রেই কর্তব্য শেষ হয় না। ছাপাখানার কাজ, দপ্তরীর কাজ, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, গ্রাহক-গ্রাহিকা সঞ্চয় ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের কাজের দায়িত্ব সম্পাদকদেরই বহন করতে হয়। একের কাজ দশ জনে করতে পারেন ; কিন্তু দশ জনের কাজ যদি একজনকে করতে হয় ? আমার অনুরোধ, নতুন পত্রিকার উদ্যোগীরা যেন ভুলে না যান যে, কাগজ প্রকাশ করতে হ'লে প্রয়োজন হয় একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিষ্ঠানের। একখানা চারপেয়ে টেবল আর গোটা দুই চেয়ার মানেই কাগজের অফিস নয়। ব্যবসাগত দৃষ্টিভঙ্গীতে পত্রিকা প্রকাশের রীতি আমাদের দেশে নেই। তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, সাধনা, ভারতী, সবুজপত্র, কালিকলম, কল্লোল প্রভৃতি কাগজসমূহের পেছনে কমার্শিয়াল উদ্দেশ্য ছিল না। এক এক দল সাহিত্যিক নিজেদের লেখা প্রকাশের জন্য একত্র হয়ে এক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই দল যখন ভঙ্গ হয় তখনই কাগজের পাততাড়ি গুটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমাদের দেশের সম্পাদকের মৃত্যু হ'লে কাগজ বন্ধ হয়ে যায়, পরিচালক বা প্রযোজক অসুস্থ হ'লে কাগজ আর যথারীতি প্রকাশিত হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিদেশে এমন সব পত্রপত্রিকা আছে যাদের আয়ুষ্কাল শতাধিক বর্ষের এবং এখনও তাদের প্রচার অক্ষুণ্ণ আছে। এখানে আমাকে কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার নাম উদ্ধৃত করতে বাধ্য হতে হচ্ছে : যেমন এস্কোয়ার, পানচ্, মেন ওনলি, লিলিপুট, সায়েন্স ডাইজেষ্ট, ন্যাশানাল জিওগ্রাফী, পপুলার মেকানিকস্, কুরিয়ার, আর্গসি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য, বসুমতী বর্ত্তমানে যে রূপ গ্রহণ করেছে তা অনবদ্য। বসুমতী দেশের জন্য যা সেবা করছে, তার বিবরণ এই ব'লে শেষ করা যায় না। আমি জানি না, বসুমতীর ব্যবস্থা কি ধরণের। তবুও বসুমতীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো, এই পত্রিকাটি যেন চিরজীবী হয়। প্রেস বা ছাপাখানাকে বা পত্রিকাকে মনীষীরা ফোর্থ ষ্টেট আখ্যা দিয়েছেন। বর্তমান বাঙলায় উপযুক্ত দেশনেতার একান্তই অভাব। এ ক্ষেত্রে বসুমতী যেন ঠিক দেশনেতার কাজ করছে এবং বহু ভাবে দেশবাসীকে উপকৃত করছেন। বসুমতীর কাছে দেশ ও দেশবাসীর ঋণের সীমা নেই। এমন একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বদলীয় জনপ্রিয় পত্রিকার আয়ু কামনা করি আমি। আমাদের উত্তরপুরুষরা যেন এই অমৃতপানে বঞ্চিত না হন। বসুমতী দিনে দিনে আরও সমৃদ্ধ হোক। এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ, স্বত্বাধিকারী আর সম্পাদককে জানাই আমার অকৃত্রিম অভিনন্দন। বসুমতী ছাড়া আমার রাত্রি কাটে না, দিন চলে না জানবেন। বসুমতী আসতে দেরী হ'লে আমি অস্থির হয়ে উঠি। বসুমতীর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি।—প্রীতিলতা মুখোপাধ্যায়। দাদার, বোম্বাই।

গত সংখ্যায় আপনাদের কাগজের সাহিত্য পরিচয়ে সাহিত্যিকদের আর্থিক অবস্থার কথা আলোচিত হয়েছে। আপনাদের সঙ্গে আমরাও একমত। আমরা বিশ্বাস করি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, দীনদরিদ্র, সহায়সম্বলহীন সাহিত্যিক পাঠকদের তৃপ্তিদানে অক্ষম। ফরাসী দেশেও হাঘরে বাউণ্ডুলে সাহিত্যিকদের সংখ্যা প্রচুর। শুধু সাহিত্যিক নয়, শিল্পীরাও আছেন এই দলে। কিন্তু সর্ব্বাধুনিক ফরাসী সাহিত্য বাদ দিলেও, পূর্ব্বের ফরাসী সাহিত্যেও দেখা যায় এই ধরণের সাহিত্যিকরা তেমন কিছুই দিতে পারেননি দেশকে। এঁদের লেখায় একটা জাতক্রোধ পরিস্ফুট, সমাজের উঁচু আসনে যাঁরা আছেন তাঁদের প্রতিও কটাক্ষ স্পষ্ট, অসহ্য জ্বালার প্রকাশ লেখার ছত্রে ছত্রে। আসল কথা, অনাহারী লেখকদের লেখায় বিদ্বেষ ছাড়া আর তেমন কিছু খুঁজে মেলে না। দেশের দুরবস্থার অনুভূতিতে দুঃখকাতর লেখা অন্য বস্তু। গর্কী আর মায়াকোভস্কির লেখায় আছে এক সর্ব্বজনীন ব্যথাবেদনার প্রকাশ ; অত্যাচার আর অত্যাচারিতের সত্যিকার বিবরণে পরিপূর্ণ তাঁদের লেখার প্রতিটি ছত্র। কিন্তু লেখা যদি উদ্দেশ্যমূলক হয় ? শুধুমাত্র সাহিত্যসেবা ব্যতীত লেখক-লেখিকাদের যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে ? বর্ত্তমান রুশ সাহিত্যের রূপ তাই কি আর সর্ব্বজনের পক্ষে গ্রহণীয়

নয়? শত্রুকে অবমাননা করা, সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা করা, অন্যপক্ষকে পদদলিত করাই ইদানীং রুশ সাহিত্যের একটা বেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। সাহিত্য আর প্রচারের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। আমি শেষে অনুরোধ করবো, আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা যেন এই বিদ্বেষভাবাপন্ন জীবনদর্শন গ্রহণ না করেন। সত্যভাষণ আর অতিভাষণ এক নয়। ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছি বলেই যে দেশবাসীকে সেই জ্বালার অংশ গ্রহণ করতে হবে, তেমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি? তবে তো ওমর খৈয়ামের অমর রচনা আজ বানচাল হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির কোন মূল্য থাকে না। তুর্গেনিভের লেখা পাঠের প্রয়োজন হয় না। আপনাদের মত আমিও বিশ্বাস করি, অভুক্ত আর অনাহারীদের দ্বারা সাহিত্যসেবা চললেও, কাজের কাজ হয় না।—ছায়া মহাপাত্র। কটক। উড়িষ্যা।

কংগ্রেসের কর্তারা মহম্মদ তুগলককে হার মানাতে চাইছেন। দেশের পক্ষে যা যা বর্জনীয়, তাদেরই তারা প্রাধান্য দিতে বসেছেন। কংগ্রেস যেন দিন দিন হিন্দীভাষীদের একচেটিয়া সম্পত্তি হতে চলেছে। কোন প্রাদেশিক ভাষাই কংগ্রেসের দরবারে স্থান পাবে না, ইংরাজীর মত বহু প্রচারিত ও বহু প্রয়োজনীয় ভাষাকে বয়কট করতে হবে—এক এবং অদ্বিতীয় ভাষা বলতে যদি কিছু থাকে, তার নাম হিন্দী। রাজাগোপালাচারী আর শ্রীপ্রকাশের মত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ অধৈর্য্য প্রকাশ করছেন। হিন্দীর জ্বালায় প্রায় প্রত্যেক প্রদেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস রচিত রীতিনীতির লঙ্ঘনকার্য্য চলেছে দেশে দেশে। এ অত্যন্ত লজ্জার বিষয়! কিন্তু কংগ্রেস পরিচালকরা কানে তুলো আর পিঠে কুলো বেঁধেছেন। অসম্মান আর অপমান সহ্য হয়ে গেছে কংগ্রেসের। মহম্মদ তুগলক একটি শাসক সম্প্রদায়ের অধঃপতনের কারণ। কংগ্রেসও নিজের পায়ে কুড়ুল মারছে। সমগ্র দেশবাসী কংগ্রেসকে আর বরদাস্ত করবে না, যদি এই স্বেচ্ছাচারের পথে এগোয়। হিন্দীর পক্ষে বক্তব্য অসার, বিপক্ষে প্রচুর বক্তব্য আছে। আমরা দেখতে চাই না, কংগ্রেসের ধ্বংস। মানতেও চাই না প্রাদেশিক ভাষার অপমান। কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ কি সাবধান হবেন?—বিপুল সেন। ত্রিবেণী, হুগলী। পশ্চিমবঙ্গ।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমার ষাণ্মাসিক চাঁদা (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত) পাঠাইলাম। কার্ত্তিক সংখ্যা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—পূর্ণিমা চক্রবর্ত্তী, পাটনা।

Sending herewith Rs. 7·50 as half-yearly subscription for "Monthly Basumati." Kindly send the same from the issue of Nov.--Dec. --Nilima Bhar, New Delhi.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা (কার্ত্তিক হইতে) ৭।০ আনা পাঠাইলাম। বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—আরাধনা ঘোষ, পাটনা।

I am herewith sending Rs. 7/8/- as six month's subscription of Masik Basumati.—Mrs. Prabhabati Mookherjee, Agra.

অদ্য মাসিক বসুমতীর ছ'মাসের সডাক মূল্য বাবদ সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে ছয়মাসের পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলি নীচের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। Anima Banerjee, Chandi Ghose Road, Calcutta.

Being half-yearly subscription for Monthly Basumati. Please confirm receipt and send the Magazine regularly.—Ratan Singh, Jalpaiguri.

I am sending herewith Rs. 7·50 N. P. being my subscription from Agrahayan to Baisakh. —Bani Bhattacharya, Koderma.

Subscriber of your Monthly Basumati for one year from Aswin 1364 to Bhadra 1365, request you to please send my copies—Jayanti Maity, Midnapur.

I am sending Rs. 10·50 N. P. for Monthly Basumati to be sent by registered post from the month of Kartick.—Bela Rani Dev, Assam.

Please let me know the annual and half yearly subscription for your Monthly Magazine "Basumati"—M. Nalini,—Nellore, Andhra Pradesh.

আমি আপনার মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হতে চাই। কিন্তু বিপদ হচ্ছে আমি পাকিস্তানী, কি ভাবে টাকা প্রদান করতে হবে, তাহা জানালে টাকা জমা দিতাম। দয়া ক'রে বিবরণগুলি পত্রযোগে জানালে সুখী হতাম। Md. Abu Hena, Nawabganj, Rajshahi, East Pakisthan.

Enclosed please find Crossed Cheque for Rs. 15/- only being my renewal subscription for one year to Masik Basumati.—Bani Pramanik, Santipur, Nadia.

আমি পাকিস্তান হ'তে মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হইতে চাই। গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদার হার জানাইলে বাধিত হইব। Aziz Ahmed Chy., Jessore.

We have remitted Rs. 15/- and request you to credit it to our account and kindly acknowledge the receipt—Harkhdeo Prosad Darbhanga (Behar).

I am now in Calcutta for few months. Kindly send my M. Basumati to my new address—Madhuri Sen, Assam.

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মা আমাকে বুকের দুধ ছাড়িয়ে দিতে লাগলেন অষ্টারমিল্ক, কারণ অষ্টারমিল্ক শিশুদের উপযোগী সবচেয়ে ভাল দুধ—খাঁটি, পুষ্টিকর এবং অতি সহজে হজম হয়। শক্তি ও সামর্থ্যে, বুকের দুধ খাওয়া যে কোন শিশুর চাইতে আমি কোন অংশে কম নই।

আমি অষ্টারমিল্কের প্রতি কৃতজ্ঞ

OSTERMILK

অষ্টারমিল্ক মায়ের দুধের সমতুল্য

বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নিউ দিল্লী

D. 90

(ব্রোঞ্জমূর্ত্তি)

ভেনাস
—পি, এ, রেনোয়া নির্ম্মিত

৭ই মাঘের বই

নিরুপমা দেবীর (উপন্যাস)	অন্নপূর্ণার মন্দির	৩৷৷০
কণাদ গুপ্তের (উপন্যাস)	পূর্ব-মীমাংসা	২৷৷০
রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের (ছোটদের গল্পগ্রন্থ)	মায়াবাঁশী	১৷৷০

মাঘ মাসে পুনর্মুদ্রিত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যগ্রন্থ	সাগর থেকে ফেরা	৩৲	৩য় মুদ্রণ বার হয়েছে
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (উপন্যাস)	দেবকন্যা	৪৷৷০	২য় সং বার হয়েছে
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের (উপন্যাস)	সৃষ্টি	৫৲	২য় মুদ্রণ বার হয়েছে

. . . .

উপন্যাস ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **তুমি আর আমি** ১৷৷০ ঃ **প্রাচীর ও প্রান্তর** ৩৲ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **আগামী কাল** ২৷৷০ ॥ বনফুল-এর **ভীমপলশ্রী** ৪৷৷০ ॥ বুদ্ধদেব বসুর **হে বিজয়ী বীর** ৩৷৷০ ঃ **লাল মেঘ** ৩৲ ॥ ভবানী মুখোপাধ্যায়ের **কান্নাহাসির দোলা** ৩৷৵০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **ঠিক-ঠিকানা** ২৲ ॥ প্রতিভা বসুর **মনোলীনা** ২৷৷০ ॥ অনুরূপা দেবীর **চাওয়া ও পাওয়া** ৪৲ ঃ **ছায়াছবি** ২৲ ॥ সরোজকুমার রায় চৌধুরীর **অনুষ্টুপ ছন্দ** ৪৲ ॥ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের (বাংলায় অনন্যদিন কোরীর উপন্যাস) **ফুটলো কুসুম** ২৲ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **কাঞ্চন-মূল্য** ৪৲ ॥ বিমল মিত্রের **কন্যাপক্ষ** ৩৲ ঃ **সুয়োরাণী** ৩৲ ॥ শরৎচন্দ্রের শেষ রচনার দ্বারা সূচিত (বারোয়ারী উপন্যাস) **ভালোমন্দ** ৪৲ ॥ দেবেশ দাশের **রক্তরাগ** ৪৲ ॥ দিলীপকুমার রায়ের **অঘটন আজো ঘটে** ৫৲ ॥ গোকুল নাগের **পথিক** ৬৷৷০ ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **কলকাতার কাছেই** ৫৷৷০ ॥ অচিন্ত্যকৃষ্ণ বসুর **প্রজ্ঞাপারমিতা** ৬৲ ॥ অনুরূপা দেবীর **উত্তরায়ণ** ৫৷৷০ ॥

গল্পগ্রন্থ ঃ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সিন্ধুর টিপ** ২৷৷০ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **সপ্তপদী** ২৲ ঃ **অফুরন্ত** ২৷৷০ ঃ **পুতুল ও প্রতিমা** ৩৲ ॥ বিমল মিত্রের **পুতুলদিদি** ৩৲ ॥ সন্তোষকুমার ঘোষের **পারাবত** ৩৲ ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসুর **বাজীমাৎ** ১৷৵০ ॥ নীরাজ ভট্টাচার্যের **সাজানো বাগান** ২৲ ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দীর **শালিক কি চড়ুই** ৩৲ ॥ দ্বারেশ শর্মাচার্যের **জ্যোতিষীর ডায়েরী** ২৷৷০ ॥ প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) **ঘোষালের ত্রিকথা** ২৲ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জাতিস্মর** ২৷৷০ ॥ দেবেশ দাশের **রোম থেকে রমনা** ২৷৵০ ॥

কবিতা গ্রন্থ ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **প্রথমা** ২৷৷০ ঃ **সম্রাট** ২৲ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **প্রিয়া ও পৃথিবী** ২৲ ॥ মোহিতলাল মজুমদারের **সুনির্বাচিত কবিতা** ৪৷৷০ ॥ বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **একুশটা মেয়ে** ১৷৷০ ॥ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের **কবি-চিত্ত** ৫৲ ॥

বিবিধ ঃ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের **আত্ম-জীবনচরিত** ৩৲ ॥ রাসসুন্দরী দাসীর **আমার জীবন** ২৷৷০ ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর **পুরাতনী** ৫৲ ॥ রাজশেখর বসুর **বিচিন্তা** ২৷০ ॥ দিলীপকুমার রায়ের **দেশে দেশে চলি উড়ে** ৬৷৷০ ॥ শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের **অবনীন্দ্রচরিতম্** ৫৲ ॥ বিনয় ঘোষের **বাদশাহী আমল** ৫৲ ॥ শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের **শিশুর জীবন ও শিক্ষা** ৪৷৵০ ॥ ইন্দ্রনাথের **মিহি ও মোটা** ১৲ ॥ শ্রীভাস্করের **আপনার বিবাহযোগ** ২৷০ ঃ **আপনার অর্থভাগ্য** ১৷৵০ ॥ গৌরকিশোর ঘোষের **এই কলকাতায়** ২৲ ॥ নলিনীকান্ত সরকারের **হাসির অন্তরালে** ৩৲ ঃ **শ্রদ্ধাস্পদেষু** ২৷৷০ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **এখন যাঁদের দেখছি** ৪৷৷০ ॥

● প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয় ●

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি।

আমাদের বই

পেয়ে ও দিয়ে

সমান তৃপ্তি।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম ঃ কালচার　　৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭　　ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো
সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—মাঘ, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথামৃত

তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ় ভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর; কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে—তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব মহিমমণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে।

ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর বেশ-সহায়ে। অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না, তোমরা দুর্বল; বাস্তবিক সেই আত্মা সর্বশক্তিমান।

বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, আর ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিল। ইহাই রহস্য। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা আপনিই উন্নত হইবে। এদেশের ধর্মের নিশান যতই উচ্চ করা হউক, কিছুতেই পর্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এই হেতুই আজ ভারতবর্ষ ত্রিংশৎকোটি ভিক্ষুকের আবাসভূমি হইয়াছে।···আইস, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের উচ্চ হৃদয়, মহান আত্মা এবং অসাধারণ লোকহিতকারিতা শক্তির সম্মিলন করিয়া দিই।

আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে—জনসাধারণের উন্নতিবিধান—ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া। মনে রাখিবে—দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন। জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায় আপনি দাঁড়াইতে শিখাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্ত্য এবং ধর্মবিশ্বাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[পত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে আমার নিকট লিখিত, এগুলির মধ্য দিয়া আচার্যদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত তাঁহার বহুমুখী জিজ্ঞাসা, ব্যাপক বিদ্যানুরাগ ও সরল রসিক মনের পরিচয় ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি আলোচনার ক্ষেত্রে কখনও নিজেকে অভ্রান্ত মনে করিতেন না। 'নিরঞ্জন' শব্দ পূর্ববঙ্গের, এই ধারণা তিনি এক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং একখানি পত্রে দৃঢ়ভাবে এই ধারণার পোষকতা করিয়াছিলেন। চার বৎসর পরে যখন বুঝিলেন তাঁহার এ ধারণা সমীচীন নয়, তখন তাহা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে কোনও সংকোচ বোধ করেন নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত পণ্ডিতসমাজে বিরল। অতসীর স্বরূপ বুঝাইবার আগ্রহে তিনি তিসীর বীজ বুনিয়া উহার ফুল এক পত্রমধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী যাঁহারা আলোচনা করেন, চিঠিগুলি তাঁহাদের কাজে লাগিবে। —শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী]

Bankura
19. 5. 44

পণ্ডিতমহাশয়,

পরিষৎ পত্রিকায় 'বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়' পড়িতেছেন ত? প্রথমে ব্যাখ্যা পরে কাল গণনা, ব্যাখ্যা ঠিক হইতেছে কি? পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে, পুরা ব্রহ্মা রাবণবধার্থে ও রামের হিতার্থে 'অকালে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। দক্ষিণায়নকালে পূজা করিতে হইয়াছিল, এই হেতু অকাল বোধন, কালিকা পুরাণ কোন্ রামায়ণের প্রমাণে লিখিয়াছেন, আপনার জানা থাকিলে দয়া করিয়া জানাইবেন। 'অকাল' ঐরূপ শব্দ আছে কি? থাকিলে শ্লোকটি তুলিয়া দিবেন। এখানে গ্রন্থশালা নাই, এই হেতু আপনার কালক্ষেপ করাইতেছি।

বৈদিক কৃষ্টি আর দুইটি প্রকরণ লেখা হইয়াছে। চিত্র করাইতে বিলম্ব হইতেছে। আশা করি আপনার কুশল। ইতি

(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

Bankura
20. 6. 44

পণ্ডিতমহাশয়েষু,

সবিনয় নিবেদন—আপনি কৃষ্ণনগর কলেজে গিয়াছেন জানিতাম না, পণ্ডিতসমাজের বিচারের নিমিত্ত বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় লিখিত হইতেছে। সে সমাজে আপনিও আছেন। সে কাল পাঁচ কি দশ হাজার বৎসর পূর্বে, সে কথা নয়। ব্যাখ্যাই আসল। সে ব্যাখ্যা ঠিক মনে হইতেছে কি? ব্যাখ্যায় ভুল না থাকিলে কালেও ভুল থাকিবে না। অনেক দিন হইল ইংরেজীতে লিখিয়াছি। ছাপাইতে পারি নাই। আপনি দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন শুনেন নাই? খুলনা, ঢাকা, ত্রিপুরার লোককে শুধাইয়া তবে লিখিয়াছি। 'ভারতবর্ষে' প্রতিমা নিরঞ্জন ছাপা হয়। আষাঢ়ের ভারতবর্ষে 'সোম' পড়িবেন। সহজে মানিবেন না, জানি, (দুই একটা ছাপার ভুল আছে।) ফরিদপুর বিখ্যাত তান্ত্রিকের দেশ। বলিতে পারেন, মহাদেবকে বিশ্বেশ্বরকে (কাশীর) ভাং দেওয়া হয় কেন? দুর্গোৎসবের ইতিবৃত্ত লিখিবার ইচ্ছা আছে। বোধনের হেতু খুঁজিয়া পাইতেছি না।

জলপূর্ণ ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সরস্বতীপূজা রঘুনন্দনে আছে। 'ঘটে' স্থানে অনবধানতায় ঘটস্থিত জলে হইয়াছে। জলপূর্ণ ঘট ব্রহ্মাণ্ডের দ্যোতক। শালগ্রামশিলা কিসের? পণ্ডিতমহাশয়, symbol অর্থে কেহ কেহ 'প্রতীক' লিখিতেছেন। ইহা ঠিক কি? একটি শব্দ চাই। দুর্গাপূজা symbolical worship কি বলা যাইবে?

আপনাকে কাছে পাইলে আমার অনেক উপকার হইত। কৃষ্ণনগরে আমার সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীরামেন্দ্রনাথ ঘোষ (Retired Prof.) আছেন। আলাপ করিবেন। ইতি—

(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া
ইং ৯।[illegible]।৪৬

পণ্ডিতমহাশয়—

প্রবাসীতে ইংরেজীর বাংলা পড়িয়াছি। অবসর পাইতেছি না। আমারও লিখিবার ইচ্ছা আছে। বানানেও যথেচ্ছচারিতা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বিকল্প বিধি দিয়া ভাল করেন নাই। বাঙ্গালা, বাঙ্লা, বাংলা, বাঙ্‌লা—এত রকম বানান যে ভাষায় থাকে সে ভাষা শিক্ষণীয় নয়। বাংলা ব্যাকরণকর্তারা ভাল-মন্দ বিচার করেন না।

সম্প্রতি আমায় জানাইবেন, ভরত মল্লিক গীতার টীকা শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত হইয়াছে, কত বৎসর পূর্বে ছিলেন? তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল? আশা করি, ভাল আছেন। ইতি—

(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া
ইং ২২ ফেব্রুআরি
১৯৪৮

পণ্ডিতমহাশয়,

অমরের টীকাকার ভরত মল্লিকের দেশ ও কাল পাইয়াছি। অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছিলেন।

আপনি প্রবাসীতে tear gasএর বাংলা 'কাঁদানো' গ্যাস লিখিয়াছেন, 'কাঁদানো' শব্দ ঠিক হইয়াছে কি ? 'কাঁদানো' যাহাকে কাঁদানো হইয়াছে, যেমন শেখানো সাক্ষী, যে সাক্ষীকে শেখানো হইয়াছে। আমি মনে করি 'কাঁদানিয়া' হইবে। রূপান্তরে 'কাঁদান্তে'। আশা করি, আপনি কুশলে আছেন।

আমি যে দুর্গোৎসব ও বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে এত লিখিয়াছি, কোন পণ্ডিত তাহাতে দোষ ধরেন নাই। বাঙালী অতি শিষ্ট শান্ত হইয়াছে; কাহারও কথায় হাঁ বলে না, না বলে না। কেহ অপ্রিয় অসত্য বলিতে চায় না। কোন পত্রান্তরে আপনি গণপরিষদ বিচার করিয়াছেন, সে পত্রের নাম উল্লেখ করিলে ভাল হইত। আর কেহ পড় ক না পড় ক, আমি পড়িতাম ও জ্ঞানলাভ করিতাম। ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া
ইং ২১ মে (১৯৪৮)

পণ্ডিতমহাশয়,

অনেক দিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি। আমিও ঢাকা ও বরিশালে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম 'নিরঞ্জন' শব্দ সেখানে অজ্ঞাত, শব্দটি কোথা হইতে আসিল ? কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে প্রতিমা ভাসান প্রচলিত, আশ্চর্যের বিষয়, হাওড়ানিবাসী এক শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিলেন, তিনি নিরঞ্জন শব্দ তাঁহার পিতামহের মুখে শুনিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেখানকার কোন পুরাতন পণ্ডিত এই শব্দের উৎপত্তি করিয়াছিলেন।

বহু কাল পূর্বে কটকে 'রত্নদীপিকা' নামে ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত পুথী পাইয়াছিলাম, আমি বাঙ্গলা অক্ষরে লেখাইয়া আনিয়াছিলাম, নবরত্নের বর্ণনা দেখিয়া মনে হইতেছে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দের মধ্যে বইখানি প্রণীত হইয়াছিল। গ্রন্থকারের নাম চণ্ডেশ্বর, তিনি শৈব ছিলেন, আপনি চণ্ডেশ্বর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া থাকিবেন। আপনার অনুমানে তিনি কে ছিলেন, কোথায় ছিলেন, এবং কবে ছিলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় জানাইবেন।

আপনি tear gas বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'কাঁদানো' বলিতে চান। কিন্তু দেখুন, পচানা পাট, শেখানা সাক্ষী, শোয়ানা ছেলে ইত্যাদি প্রয়োগের সহিত মিলাইলে 'কাঁদানো' দাঁড়ায় যাহাকে কাঁদানো হইয়াছে, আপনার দৃষ্টান্তে কর্মব্যক্ত আছে। অতএব সদৃশ হইল না, বিচার করিবেন। ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া
২৫শে জ্যৈষ্ঠ

পণ্ডিতমহাশয়,

চণ্ডেশ্বর সম্বন্ধে আপনার উত্তর পাইয়াছি, আমার রত্নদীপিকা পুথীতেও দুইটি মঙ্গলাচরণ শ্লোকের পরে "তুলাপুরুষকৈর্দত্তাং রত্নধেনুং বিধিৎসয়া" ইত্যাদি আছে। আপনার অনুমিত চণ্ডেশ্বর হইতে পারেন। পুথীখানি রত্নপরীক্ষার সংগ্রহ গ্রন্থ। ওড়িয্যার রাজারা রত্ন সংগ্রহ করিতেন, এখনও করেন। বোধ হয় তাঁহাদের জ্ঞানের নিমিত্ত পুথী ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত ও ওড়িয়া ভাষায় টীকা প্রণীত হইয়াছিল। আমার পুথী খণ্ডিত, স্থানে স্থানে শ্লোক নাই। যাহাই হউক, আপনি চণ্ডেশ্বরের দেশ ও কাল দিয়াছেন। তদ্দ্বারা আমার উপকার হইল। * * পরিভাষা রচনায় আপনি যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাই সমীচীন। আমি constituent assembly এর বাংলা রাষ্ট্ররচনা পরিষদ্ করিয়া দিলাম, অবসর পাইলে * *—। ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁকুড়া
ইং ১১, ১, ৪৮।

পণ্ডিতমহাশয়,

আপনার নিকট একটা জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইয়াছে। এখানে অমরকোষের একখানি ইংরেজী সংস্করণ দেখিলাম, শব্দের অর্থ ইংরেজীতে, অক্ষর পুরাতন। শত বৎসর হইতে পারে, ৪ অক্ষর লম্বা S অক্ষরের মত। বইখানির নামপত্র নাই। বোধ হয় কলিকাতার পুরাতন বহির দোকানে কেনা। কে এই অমরকোষ করিয়াছিল ? colebrooke (কোলব্রুক) ? সত্বর জানাইবেন।

'প্রবাসী'তে যোগেশলিপি দেখিয়াছেন ? কেমন হইয়াছে ? আপনি পরিভাষা সমালোচনা করিতেছেন, এই নবলিপির সমালোচনা আপনার অনুপযুক্ত হইবে না।

আশা করি ভাল আছেন। ইতি— (স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁকুড়া
১৩৫৫।২০ মাঘ

পণ্ডিতমহাশয়,

প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার তিনটি প্রবন্ধ পড়িয়া প্রীত হইয়াছেন জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পণ্ডিত মহাশয়েরাই এই তিন প্রবন্ধ পড়িবেন, অন্য পাঠকেরা পাতা উল্টাইয়া দেখিবেন, বেতসলতাকুঞ্জ একটা ঝোপের মত দেখায়। মাটি স্পর্শ করিয়া সমুদয় ঝোপ নিবিড় পল্লবে আচ্ছাদিত থাকে, বাহির হইতে অভ্যন্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঝোপের উপর হইতে এখানে-ওখানে শাখা হাত দুই উত্থিত হইয়া নুইয়া পড়ে এবং তাহাকেই লম্বিত শাখা বলিয়াছি। লম্বিত শাখা দ্বারা কুঞ্জ নয়। শকুন্তলা নাটকের বেতসগৃহ এই বেতস ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। বেত আপনার সুপরিচিত। আপনি বেতের ঝোপে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন কি ? কুঞ্জ দেখিয়াছেন ?

আমার শব্দকোষে গণ্ডগ্রামের অর্থ ঠিক লিখিয়াছি, ভুল করি নাই। গহনার নৌকা পশ্চিমবঙ্গে পণ্যবাহী নৌকা। এই নৌকাতেই প্রয়োজন হইলে যাত্রীও যায়। পান্‌সীতে অল্প যাত্রীরা যায়। আমার কোষে লিখিয়া রাখিলাম, পূর্ববঙ্গে গহনার নৌকা যাত্রীবাহী নৌকা। আমার শব্দকোষ উপযুক্ত লোকের অভাবে সংশোধিত হইতে পারিতেছে না। সংশোধনের আশা প্রায় ত্যাগ করিয়াছি। আশা করি আপনি কুশলে আছেন। ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁকুড়া
২৬ মাঘ, ১৩৫৫

পণ্ডিতমহাশয়,

সেদিন একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। পরের উদ্যানের পুষ্পদ্বারা পূজা নিষিদ্ধ। ইহার প্রমাণ 'শব্দকল্পদ্রুমে' পুষ্প শব্দে

আছে। "অন্যায়তনজাতানি পুষ্পানি ন দাপয়েৎ।" "পরারোপিত-বৃক্ষস্য পুষ্পগ্রহণে দোষঃ। অগস্ত্যঃ।"

পণ্ডিতমহাশয়, বিষ্ণুধর্মোত্তর ছাপা হইয়াছে কি? আমি দেখিতে পাই নাই। একবার পাতা উল্টাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বোম্বাইএর ছাপা চাই না। ইতি—

(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁকুড়া
৫ চৈত্র, ১৩৫৫

পণ্ডিতমহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়াছি। কবিবর 'গণ্ডগ্রাম' বুঝিতে ভুল করিয়াছেন, জানিতাম না। আমার এক বন্ধু আর একটি ভুল ধরিয়াছেন। কবি না কি 'হংসবলাকা' লিখিয়াছেন। 'আবাহন' নামক পত্রে 'বনবেতসের বাঁশীতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ' সম্বন্ধে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় রবিরশ্মিতে লিখিয়াছেন, কবিবর তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, বেতস= বেত, কিন্তু বেতের বাঁশী হইতে পারে না। তিনি এক 'অরুপণ অভিধানে' পাইয়াছিলেন, বেতস শব্দের এক অর্থ বেণু আছে। কবিবর সে অভিধানের নাম করেন নাই। আমার বিশ্বাস, কোন সংস্কৃত অভিধানে এই অর্থ নাই। St. Petersburg অভিধানেও নাই। Monier Williams কৃত Sanskrit—English অভিধানে আছে,—বেতস, the ratan, a reed, a cane; 'বেতসগৃহ,' a house of reeds, ইংরেজী অভিধানে reed—kinds of firm-stemmed water or marsh plant, Cane,—Hollow jointed stem of giant reeds and grasses or solid stem of slender palms. বোধ হয় ইহা হইতে কবিবর বেণু আনিয়াছেন। Monier Williams কি ভুলই করিয়াছে! বেণুর কুঞ্জ স্বাভাবিক কুঞ্জ হইতে পারে না। বেণু স্বীকার করিলেও 'বনবেতসের বাঁশী' ইত্যাদির অর্থ পাই না।

আপনি কি স্বগ্রামে আছেন, না পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন? কি দারুণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে! ইতি—

(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁকুড়া
ইং ১৯৫০।২৭ জানুআরি।

পণ্ডিতমহাশয়,

একটা জিজ্ঞাস্য লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। পুষ্করিণীর জলে দেবতা-স্নান করাইতে হইলে, (১) সে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই কি না; যদি চাই, প্রমাণ দিবেন। (২) নিজের খনিত পুষ্করিণী, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত নয়, সে পুষ্করিণীর জলে দেবতা-স্নান হইতে পারে কি না, যদি পারে, প্রমাণ দিবেন।

সরকারী পণ্ডিতেরা 'গণ' শব্দ কিছুতেই ছাড়িবেন না। Democracy গণতন্ত্র; এখন Republic গণতন্ত্র হইল। আপনি 'গণ'শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়া অবিলম্বে 'প্রবাসী'তে কিছু লিখিতে পারেন না? আমি দুইবার লিখিয়াছি, কিন্তু কেহ মানিতেছে না, পূর্ব্ববঙ্গেও 'গণসমিতি (Peoples Association) হইয়াছে।

আমরা 'বঙ্গ' নাম চুরি করিয়া লইয়া তাহার স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে উল্লসিত হইয়াছি, আর, যে দেশ সত্য সত্যই বঙ্গ, সে অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। যখনই এই কথা আমার মনে ওঠে, তখনই ভাবি, আমরা শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ কাটিয়া ফেলিয়া উৎসব করিতেছি। কথাটা এইখানেই থাক। আশা করি আমার প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র পাইব। কেমন আছেন? ইতি—

বাঁকুড়া
ইং ১৯৫০। ১৪ ফেব্রুআরী

পণ্ডিতমহাশয়,

পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাইয়া উপকৃত হইয়াছি, কটক কলেজে থাকিবার সময় দুই জন সংস্কৃতে এম-এ কলেজের প্রোফেসর ছিলেন, কিন্তু কোনও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রয়োজন হইলে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার লোক পাইতাম না। আমি জেদ করিয়া টোলে-পড়া এক পণ্ডিতমহাশয়কে কলেজে ঢুকাইয়াছিলাম। তিনি যদিও নৈয়ায়িক, তথাপি সকল শাস্ত্রই জানিতেন। তিনি ইংরেজী জানিতেন না, কলেজের প্রিন্সিপাল, গবর্নিং বডি, ভারী আপত্তি করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি মহামহোপাধ্যায় হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহার অকাল মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার স্থান শূন্য রহিয়া যায়। মৃত্যুর কিছু পূর্বে আমি চলিয়া আসি, আপনার লিখিত প্রবন্ধ "উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা" পাইয়াছি। কৃষ্ণনগরে শীতে কাঁপেন নাই ত? এখানে কাঁপিতে হইয়াছে। ইতি—

(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া।
১৩৫৭।২৬ বৈশাখ।

পণ্ডিতমহাশয়,

আপনার পত্র পাইলাম, দেখিতেছি, আপনি আমার রচনা খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়েন। কিন্তু আমার দুঃখ হয়, আপনি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'দুর্গার প্রতিমা' পড়েন নাই। ১৩৫৫ পৌষের প্রবাসীতে 'জয়দেবের দুকূল' প্রসঙ্গেও দুকূল আসিয়াছে। যে কন্যার নাম অতসী রাখিয়াছি, তাহার দিদিরাও বিশ্বাস করে নাই, আমি বাজারে মসিনা আনিয়া একটা টবে বুনিয়াছিলাম। যদিও অসময়, ছোট চারা হইয়া ফুল ধরিয়াছিল। সেই ফুল অতসীর দিদিদিকে দেখাইয়াছিলাম, তখন তাহাদের বিশ্বাস হলেও পূর্বের ভুল ধারণা সহজে যায় নাই, আপনি তিসি-ফুল দেখিয়া থাকিবেন। যদি ইচ্ছা করেন, আপনার বাড়ীতেও মসিনা বুনিয়া গাছ করিয়া ফুল দেখিতে পারেন। বোধ হয় ইহার পর অধিক লিখিতে হইবে না।

সে যাহা হউক, কন্যাদের বিবাহ সম্বন্ধে আপনি কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা হয়। আর, যদি আপনার বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় চিন্তিত হইয়াছেন, এখানে এখন অতিশয় গ্রীষ্ম, ইতি—

(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া
১৩৫৭। ৬ আষাঢ়

পণ্ডিতমহাশয়,

প্রবাসীতে কন্যাদের বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ নিশ্চয় পড়িয়াছেন। আপনার অভিমত আমি মূল্যবান মনে করি, কারণ,

আপনি একে পণ্ডিত, তদুপরি শাস্ত্রজ্ঞ ও দেশজ্ঞ, কিছু অন্যায় লিখিয়া থাকিলে আপনি নিঃসঙ্কোচে আমায় জানাইবেন। আপনার বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় কন্যাদের বিবাহ একটা গুরুতর সমস্যা বুঝিয়া থাকিবেন, আশা করি, কুশলে আছেন।

ইতি
আশ্রব—
(স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া
১৩৫৭।৩০ আষাঢ়

পণ্ডিতমহাশয়,

কন্যাদের বিবাহ সমস্যার সমাধান করিবেন আপনারা। এত কন্যার বিবাহ সমস্যা শুনিতেছি, কিন্তু কন্যাদের পিতামাতা উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। দেখিতেছি, এত কালের হিন্দু সমাজ আর টিকিবে না। 'শনিবারের চিঠি'তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা করিতেছি। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা পড়িবেন। মাতৃবন্ধু ও পিতৃবন্ধুর সঙ্গে শ্বশুরবন্ধু উল্লেখের কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাই নাই। আমরা কিন্তু এই তিন বন্ধুকেই কুটুম্ব বলিয়া থাকি। ওড়িয়াতে বন্ধু ও কুটুম্ব শব্দ সংস্কৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমার প্রবন্ধে শ্বশুরবন্ধু উল্লেখ করায় অসঙ্গতিও হইয়াছে। কারণ, বিবাহের পূর্বেই শ্বশুরবন্ধু আসিয়াছেন। আপনার পত্র পাইয়া আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম।

অতসীর বাংলা নাম তিসী (flax)। বীজের নাম মসিনা, সংমসৃণা (linseed)। মসিনার তেলের নিমিত্ত নদীয়া জেলায় তিসীর বিস্তর চাষ হয়। বাজার হইতে দুই-এক পয়সার মসিনা কিনিয়া আপনার বাসার একটি উঁচু জমিতে বুনিয়া দিবেন। দুই-তিন মাসের মধ্যে ফুল দেখিতে পাইবেন। আমার প্রবন্ধের 'অতসী'র দিদিকে অতসীর ফুল দেখাইতে আমিও এই বুদ্ধি করিয়াছিলাম। অতসীর দুই-তিন জাত আছে। কোন কোন জাতের ফুলে ঈষৎ রক্ত আভা আছে। এই গাছের এক নাম ক্ষুমা। পূর্বকালে ক্ষৌম বস্ত্র ও দুকূল অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। প্রবাসীতে ১৩৫৫ পৌষ মাসে প্রকাশিত 'জয়দেবের দুকূল' পড়িবেন।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রচলিত ব্যাকরণের ভুল দেখাইয়া ভাল কাজ করিয়াছেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা না লিখিলে আমরা কেমন করিয়া জানিব? আমি আপনার প্রবন্ধ অবশ্য পড়িব।

আমার কয়েকটা প্রবন্ধ 'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ' নামে দুইখানা বহিতে প্রকাশিত হইয়াছে। দুইখানাই অজ্ঞাত ও অপ্রচলিত। অন্য কতক প্রবন্ধের কপি আছে। একবার শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন ও কয়েক জন আমার অনুরাগী পাঠক তিন খণ্ডে প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তৎপরিবর্তে Ancient Indian Life, এই নামে সাতটা ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া।
১৩৫৭।১১ আশ্বিন।

পণ্ডিতমহাশয়,

অনেক দিন হইল, আপনার পত্র পাইয়াছি উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল, ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার অল্পে অল্পে হইবেই হইবে। আমি যে পথ দেখাইয়াছি, সে পথে আসিতেই হইবে, কারণ দ্বিতীয় পথ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ৩টি পরীক্ষার ফল দেখিয়া যাহারা কখনও কিছু ভাবিত না, তাহারাও চিন্তিত হইয়াছে। আরও শুনুন, এখানকার কলেজ হইতে ৭০টি ছাত্র বি, এস-সি পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে অর্ধেক চোর সন্দেহে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় আছে।

পণ্ডিতমহাশয়, দোষজ্ঞ শব্দের অর্থ পণ্ডিত। আপনাতেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। আমার লেখায় ছিল 'ব্যাবহারিক', ছাপায় 'ব্যবহারিক' হইয়াছে। কিন্তু দেখিতেছি, গিরিশ বিদ্যারত্নের 'শব্দসারে' ও আপটের সং-ইংরেজী অভিধানে 'ব্যবহারিক' শব্দও আছে। 'শব্দসারে' অর্থ আছে, ব্যবহারসিদ্ধ। 'রূপাজীবিনী' না হইয়া 'রূপজীবিনী' হইবে; ইহা আমার অনবধানতার ফল। সাদৃশ্য না থাকিলে উপচার হইতে পারে কি? শূদ্রাণী যজ্ঞকর্মে অনধিকারিণী, কিন্তু গৃহপতির অন্য অসংখ্য কর্মে সহধর্মিণী। Fee,—Doctor's fee. Pleader's fee, Tuition fee ইত্যাদিতে শুল্ক শব্দ অদ্ভুত ঠেকে। ছাত্রেরা বেতন দেয়, শুল্ক দেয় না। পণ্য শুল্ক, কন্যার বিবাহের শুল্ক, নদী উত্তরণের শুল্ক, সংস্কৃতে বহু প্রচলিত আছে। অন্য কোন শব্দ না পাইয়া 'উপায়ন' করিয়াছি। এখানে ঔপচারিক অর্থ সঙ্গত মনে হয়।

আপনার সমালোচনা আমি বহুমূল্য জ্ঞান করি। এই কারণেই আপনাকে "পণ্ডিতমহাশয়" বলি। অতসীপুষ্প দেখিয়াছেন কি? ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া
১৩৫৭। ১০ অগ্রহায়ণ

পণ্ডিতমহাশয়,

আধুনিক সভ্যতার ব্যতিক্রম করিতেছি। আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনাদের আশীর্বাদ আমার চির-বাঞ্ছিত।

প্রায় এক মাস হইল আপনার আশীর্বাদী পত্র পাইয়াছি, মনে করিয়াছিলাম, সমিৎপাণি হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইব, কিন্তু অতসীর ফুল এখনও ফুটে নাই। আমি আপনার চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের নিমিত্ত অতসীর বীজ (তিসীর বীজ, মসিনা) বুনিয়াছি, ইতিমধ্যে ১৩৫৩ মাঘের প্রবাসীতে দুর্গার প্রতিমায় এবং ১৩৫৫ পৌষের প্রবাসীতে 'জয়দেবের দুকূল' প্রবন্ধে উল্লিখিত অতসীর বিষয় পড়িতে অনুরোধ করি। তাহাতে আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিমাংশে কোথাও পীতপুষ্পীকে অতসী বলিয়া ভ্রম করে, এমন শুনি নাই। পীতপুষ্পী নাম 'অমরে' আছে। আরও আছে, "অতসী স্যাৎ উমা ক্ষুমা," যখন আমার শব্দকোষে অতসী শব্দ লিখি, তখন আমার কনিষ্ঠ-সহোদর-প্রতিম রামেন্দ্রনাথ ঘোষ তর্ক তুলিয়াছিলেন। তিনি পীতপুষ্পীকে আতসী (অতসী) বলিয়াছিলেন, আরও দেখিবেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও দুর্গার ধ্যানে 'অতসীপুষ্পবর্ণা' পীতবর্ণা করিয়াছেন, এইরূপ কত পণ্ডিত দ্রব্য-নির্ণয়ে ভুল করিয়াছেন! পণ্ডিতমহাশয়, আপনি 'শকুন্তলা'

পড়াইতেছেন ; শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবার সময় ক্ষৌমবস্ত্র পরিয়াছিলেন ; টীকাকারেরা বুঝিয়াছেন, কৌষেয়। আরও একটি আশ্চর্যের কথা লিখি। সম্প্রতি বহু-প্রশংসিত নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' পড়িতেছিলাম, তাহাতে তিনি পট্টবস্ত্র অর্থে 'নালিতা-পাটের কাপড়' বুঝিয়াছেন। তিন-চার শত বৎসর হইতে পণ্ডিতেরা বেতস অর্থে কণ্টকী বেত্র বুঝিয়া আসিতেছেন। প্রবাসীতে আমার 'বেতসলতা' পড়িয়াছেন ত ?

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার 'বাংলা ব্যাকরণ' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' পূর্বে পড়িয়াছিলাম, আবার পড়িলাম। প্রবন্ধটি মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। আপনার সমুদয় মন্তব্য আমি স্বীকার করি। কিন্তু, দেখিলাম আপনি বিভাকর, দিবাকর ইত্যাদি শব্দকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলিতে চাহিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না। জন্মবার্ষিকী, সাময়িকী প্রভৃতি শব্দের রচনায় দোষ ধরিয়াছেন ; কিন্তু জন্মবার্ষিক ও জন্মবার্ষিকী, অর্থ এক নয়। জন্ম-বার্ষিক বিশেষণ, জন্মবার্ষিকী বিশেষ্য। এইরূপ জীবনী-জীবনচরিত ; বিবরণী-নির্দিষ্ট রীতিতে লিখিত বিবরণ। আপনি কি শব্দ ব্যবহার করিতে বলেন, জানিলে সুখী হইব। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার প্রধান আপত্তি,—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি বিভক্তি নামের সার্থকতা বাংলায় নাই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছিলেন, বাংলায় তিনটি মাত্র কারক আছে। তিনি কারক ও বিভক্তির মধ্যে গোল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বোধ হয়, আমিই প্রথমে বাংলায় ছয়টা কারকই দেখাই। দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি না বলিয়া বাংলায় কারক ধরিয়া বলাই ভাল মনে হয়।

পণ্ডিতমহাশয়, 'শুল্ক' শব্দটা আমার কানে বাধিতেছে। 'ডাক্তারের শুল্ক' বলিলে কেমন কেমন লাগে। একটা নূতন শব্দ রচনা করুন। সভার 'পৌরোহিত্য' 'উদ্গাতা' 'ঋত্বিক' ইত্যাদি যাঁহারা বলেন, তাঁহারা আলঙ্কারিক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কেমন করিয়া 'স্নাতক' 'সমাবর্তন' বলিতে পারেন ? আমি বৈয়াকরণ নই, শাব্দিকও নই। সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছে, তাহাই লিখিয়াছি। Common sense—সামান্য বুদ্ধি, ঠিক হইল কি ? Instinct—সহজ বুদ্ধি, ঠিক ত ? বাংলায় 'সামান্য' শব্দে অনেকে 'অল্প' বুঝেন। আমি আমার বাংলা ব্যাকরণে দ্বিরুক্ত ধাতু শব্দের, (যেমন কোঁড়া টনটন, দপ-দপ, ধক্-ধক্ করে, নৌকা টলমল করে, ইত্যাদি) প্রকৃত অর্থ বাহির করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এ সকল শব্দকে ধ্বন্যাত্মক বলিয়াছিলেন। আর, বোধ হয় আমিই প্রথমে সহচর, প্রতিচর, অনুচর প্রভৃতি নাম রাখিয়াছি। আপনার সম্মতি আছে ত ?

যে কৃষ্ণনগর কলেজ-মেগাজিনে রামেন্দ্রনাথ ঘোষের জীবনচরিত আছে, সেখানা আমি পাই নাই। পণ্ডিতমহাশয়, আপনি ভুলিয়াছেন, একবার সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। আপনার দোহারা গঠন, আ-গৌরবর্ণ, আমার উপরে বামস্কন্ধে লম্বিত উত্তরীয় মনে পড়িতেছে। আমি বলিয়াছিলাম, "আম কাঠালের পিড়ীখানি", আপনি হাসিয়াছিলেন।

ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁকুড়া
১৩৫৮।১৭ই বৈশাখ

পণ্ডিতমহাশয়,

আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তারা যে কত লোককে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, আপনার পত্রেও তাহার প্রমাণ পাইলাম। আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কোন্ বই লিখিয়াছি, যে জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে ? মৎপ্রণীত Ancient Indian Life বইখানির জন্য পুরস্কার। পত্রিকা সম্পাদক তাহার বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। দেখিলাম, Hindusthan Standard এক টিপ্পনীতে সেই ভুল করিয়াছেন। আপনাদের কলেজ-লাইব্রেরীতে এই বই থাকিতে পারে। আপনি পড়িয়া মন্তব্য করিলে আনন্দিত হইব। অবশ্য আপনার অভিনন্দন আমার চিরবাঞ্ছনীয়।

আপনার সে পত্র পাইয়াছি, পরে উত্তর দিব।

বিরামাদি চিহ্নের নাম কই ? ইংরেজীতে নাম 'কমা', ইহার বাংলা নাম কই ? 'বিস্ময়চিহ্ন', সেটা কি প্রকার ? তাহার নাম কই ? আমি উৎকলা প্রয়োগের যে নিয়ম দিয়াছি, তাহা আপনি সমর্থন করেন কি না, জানিতে ইচ্ছা করি। সে বলিয়া চলিয়া গেল, সংক্ষেপে, সে বলে' চলে' গেল ; আমার মতে ইহাই শুদ্ধ। সে ব'লে চ'লে গেল, লিখিলে কোন্ অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে ?

পণ্ডিতমহাশয়, গত বৎসর মাঘ ও ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে বৈদিক কৃষ্টির কাল সম্বন্ধে আমার দুইটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, আপনি বলিবেন না যে—"জ্যোতিষ জানি না, বুঝিতে পারি না।" * * * *

(স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া
১৩৫৯।২৩ ফাল্গুন

আগমবাগীশ মহাশয়,

আপনি তন্ত্রশাস্ত্র মন্থন করিতেছেন। নারদপঞ্চরাত্র একখানি তন্ত্র কি ? দুই-চারিটি বাক্যে ইহার বিষয় জানাইবেন। নারদ শ্বেতদ্বীপ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নর-নারায়ণ দেখিয়াছিলেন। তন্ত্রে হরিভক্তি আসে কেমন করিয়া ? ইহাতে কি কল্কির নাম আছে ?

আপনি সেখানে বৈদিক গ্রন্থ পাইবেন কি ? আমার দুই-একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আশা করি, ভাল আছেন। ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া
১৩৬০।৩ অগ্রহায়ণ

পণ্ডিতমহাশয়,

অনেক দিন আপনাকে পত্র লিখি নাই। কেমন আছেন ? আপনি তন্ত্রশাস্ত্র মন্থন করিয়াছেন, শিব যে তন্ত্রের বক্তা, সে তন্ত্র শৈব। শিবানী যে তন্ত্রের বক্তা, সে তন্ত্র শাক্ত। বৈষ্ণবতন্ত্রের বক্তা কে ? শ্রোতাই বা কে ? সপ্তর্ষি কোনও তন্ত্রের বক্তা ছিলেন কি ? তাঁহারা এক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন—মহাভারতে আছে। বোধ হয়, সে শাস্ত্র বৈষ্ণব, আমার এই কয়েক প্রশ্নের উত্তর দিয়া অজ্ঞানতিমির দূর করিবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় 'রামোপাখ্যান' পড়িয়াছেন কি? আমার ব্যাখ্যা কিরূপ লাগিল? ইতি—

(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁকুড়া
২।১।৫৪

পণ্ডিতমহাশয়,

অনেক দিন হইল, তন্ত্র-সম্বন্ধে আপনার উত্তর পাইয়াছি। আমি জানিতাম আগম তন্ত্র, নিগম বেদ। 'আগমবাগীশ' শুনিয়াছি, কিন্তু 'নিগমবাগীশ' শুনি নাই। বহুদিন হইল আমি তন্ত্রের প্রাচীনতা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম। সে প্রবন্ধ এক্ষণে অপর বিষয়ের সহিত একত্র করিয়া "পৌরাণিক উপাখ্যান" নামে এক গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টায় আছি, প্রবন্ধটির আয়তন প্রবাসীর ৫পৃষ্ঠা। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সে প্রবন্ধ একটু দেখিয়া দিলে নির্ভয়ে আমার নূতন গ্রন্থের অন্তর্গত করিতে পারি। সম্মতি পাইলে পাঠাইয়া দিব।

'রামোপাখ্যান' পড়িয়া আপনি কৌতুক বোধ করিয়াছেন, "ব্রজের কৃষ্ণ" পড়িলে আরও কৌতুক বোধ করিবেন, পৌরাণিক উপাখ্যানের ধর্মই এই, সমুদয় স্পষ্ট করিয়া লিখিলে পাঠক ও শ্রোতার কৌতূহল হইতে পারিত না। রামোপাখ্যানে কল্পনা কিছুই নাই, তবে সাধারণ পাঠকের নিকট একটু দুর্বোধ্য, স্বীকার করি।

আশা করি কুশলে আছেন।

ইতি—
(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁকুড়া
১৩৬০।২৭ পৌষ

পণ্ডিতমহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়াছি। ১৩৫৪ ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে আমার 'তন্ত্রের প্রাচীনতা' প্রকাশিত হইয়াছিল, যদি খুঁজিয়া না পান, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন, এক কপি পাঠাইব। ইহার প্রথম অংশ প্রায় এক পৃষ্ঠা নূতন পুস্তকে বাদ দিব, তন্ত্রের দুই-একটা বিষয় প্রাচীন হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র প্রাচীন নহে—ইহাই আমার মত। কারণ, তন্ত্র হর-পার্বতী সংবাদ।

আপনার [আমার (?)] পূজাপার্বণে আপনি কোন প্রবন্ধে নীলকণ্ঠ পাইয়াছেন, খুঁজিয়া পাইলাম না। পুনরুক্তি আছে, কিন্তু স্ববিরোধী উক্তি আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। পুনরুক্তি দ্বারা সাধারণ পাঠকের সুবিধা হইয়াছে। "পৌরাণিক উপাখ্যান" গ্রন্থে প্রবন্ধের আকরের উল্লেখ অবশ্য থাকিবে।

আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—

(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঁকুড়া
ইং ৩।২।৫৪

পণ্ডিতমহাশয়,

আমার তন্ত্র-প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা পাইয়া উপকৃত হইলাম। তন্ত্র সম্বন্ধে স্থূল জ্ঞান দিতে চেষ্টা করিয়াছি, সূক্ষ্ম জ্ঞান আপনারা দিবেন। তন্ত্রের সপ্তলক্ষণ শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত। বিশ্বভারতীর বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, এক সপ্ততীর্থ মহাশয় তন্ত্র সম্বন্ধে এক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন। কোন মহাপুরাণে দেবার্চনা-পদ্ধতি দেখিতে পাই নাই।

গবেষণা করিতে থাকুন, কিন্তু দেহের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। ইতি—

(স্বা:) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

শিবি-কাহিনী

গোপাল ভৌমিক

বহু মানুষের ভীড়ে
কাটিয়েছ সারা দিন,
বহুরূপী মন ঘিরে
এনেছ অনেক বার্তা, পেয়েছ অনেক;
মন কি ভরেছে তাতে? অভিষেক
হয়েছে কি বেদনা-সলিলে—
লিখেছ নিজের নাম বেনামী দলিলে
আত্মতৃপ্তি মন্ত্র নিয়ে প্রাণে?
বিষের শায়ক ছুঁড়ে
ভয় করে লাভ কি নিদানে।

এখন গভীর রাত। শান্ত চতুর্দিক।
দিন-ফেলা স্তব্ধতায় মনে হয় সকলই অলীক
কেবল সে-আমি ছাড়া;
নেই সাড়া, নেই তাড়া,
এখন একাকী
মুখোমুখি প্রশ্ন কর কে দিয়েছে ফাঁকি
তুমি না পৃথিবী?
তার পর যদি চাও হও নিজে শিবি।

পৃথিবীটা তীক্ষ্ণচঞ্চু শ্যেন হয়ে যদি
খুঁজে ফেরে নিরবধি
কি করে মেটাবে তার ভয়াবহ ক্ষুধা?
দিতে কি পারবে তুলে সুধা
তার লোভাতুর মুখে?
কে কাঁদে কে থাকে চিরসুখে
ভুলে গিয়ে যদি পার মুছে দিতে নাম—
তা'হলে জিতবে শিবি, হোক বিধি বাম।

'গৃহদাহ' ও 'শ্রীকান্ত'

গত ডিসেম্বরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শরৎ-স্মৃতি-বক্তৃতামালার অংশ।

কাজী আবদুল ওদুদ

'গৃহদাহ' প্রকাশিত হয় ১৩২৭ সালে, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের অল্প কিছুদিন পরে। 'গৃহদাহ' রচনায় শরৎচন্দ্র যে 'ঘরে বাইরে' থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিলেন তা অনুমান করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। প্রথমত, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা যেমন আন্দোলিত হলো তার স্বামী নিখিলেশ আর স্বামীর বন্ধু সন্দীপের আকর্ষণের মধ্যে, তেমনি 'গৃহদাহে' অচলা আন্দোলিত হলো মহিম আর মহিমের বন্ধু সুরেশের আকর্ষণের মধ্যে। দ্বিতীয়ত, নিখিলেশের সঙ্গে মহিমের আর সন্দীপের সঙ্গে সুরেশের অনেকখানি প্রকৃতিগত মিল রয়েছে। তবে মিল যতই থাকুক, পার্থক্যও এই দুই উপন্যাসের মধ্যে কম নেই, আর এই দুই উপন্যাসই বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে।

'গৃহদাহে'র প্রধান তিনটি চরিত্র হচ্ছে মহিম, অচলা, সুরেশ। এদের পরেই উল্লেখযোগ্য অচলার পিতা কেদার মুখুজ্যে, মৃণাল আর ডিহরীর রাম বাবু। আরো বহু চরিত্র এতে আছে, কিন্তু তাদের সৃষ্টি প্রধানত বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, তাই তেমন অর্থপূর্ণ সৃষ্টি তারা নয়। যে ছয়টি চরিত্রের উল্লেখ আমরা করলাম, তারা সবাই কিন্তু কম-বেশী অর্থপূর্ণ সৃষ্টি হয়েছে।

বলা হয়েছে, 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশের চরিত্রের সঙ্গে 'গৃহদাহে'র মহিমের চরিত্রের মিল রয়েছে। সহজেই এ মিল চোখে পড়ে। নিখিলেশ শান্ত, সংযত, জবরদস্তি তার ধাতে নেই, সে স্বাধীনতা ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পূজারী। তার স্ত্রীকে তাই সে বলে:

ঘর গড়া ফাঁকির মধ্যে কেবল মাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালবাসা সার্থক হবে—যে পেটুক মাছের ঝোল ভালবাসে সে মাছকে কেটে কুটে সাঁতলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভরতি করতে চায় না—সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে ত ভালো, না পারে ত ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে—তারপর যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাইনি কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্যে তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করিনি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

মহিমের কথা অবশ্য এতখানি মনোজ্ঞ করে কখনো ব্যক্ত করা হয়নি; তবে তার আচরণে আগাগোড়াই এটি প্রমাণিত হয়েছে, অন্যের উপরে কোনো জবরদস্তির কথা সে তো ভাবতেই পারে না। তার স্ত্রী অচলার উপরেও তার ইচ্ছার ভার সে চাপাতে অনিচ্ছুক। তবে নিখিলেশের চাইতে তাতে হৃদয়ের অংশ কম, অন্তত তাই প্রকাশ পেয়েছে। বিমলার প্রতি নিখিলেশের ভালবাসা ছিল গভীর, বিমলা তা জানতো, কিন্তু মহিমের সততা ও চারিত্রিক বল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও অচলা এ আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে যেন পারেনি যে মহিম তাকে সত্যই ভালবাসে। মানুষ হিসাবে নিখিলেশ মহিমের চাইতে অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ। তবে মহিমও সুনীতি, সদাচার এসবের পুতুল হয়ে ওঠেনি, তাতে সততা ও নীতিধর্ম সত্যই অনেকখানি জাগ্রত। বিমলার অভিযোগ ছিল এই যে, তার স্বামী সন্দীপের প্রভাব থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য হাত বাড়ায়নি; অচলারও অভিযোগ কতকটা এই ধরণের; তবে সন্দীপ বিমলাকে যতখানি বলে আকর্ষণ করেছিল অচলাকে সুরেশ আকর্ষণ করেছিল তার চাইতে আরো অনেক বেশী বলে। মানুষ হিসাবে মহিম আমাদের কিছু শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কিন্তু নিখিলেশ যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তা আরো গভীর। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর জীবন-সাধনার ব্যাপকতা ও গভীরতা দিয়ে গড়েছেন নিখিলেশকে; মহিমের তার স্রষ্টার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নয়। নৈতিক বোধের তীক্ষ্ণতা ও বীর্য শরৎচন্দ্রে যে নেই তা নয়, কিন্তু তা তাঁর অন্তর প্রকৃতির একটি অংশ মাত্র—সে অংশটিও যে সমগ্রের সঙ্গে খুব সুসমঞ্জস তা নয়। আমরা পরে দেখবো, শরৎচন্দ্রের জীবন-দর্শনের ত্রুটি চোখে পড়বার মতো; তাঁর শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি বোধ হয় প্রেম সম্পর্কে কিন্তু সে তো মুখ্যত হৃদয়ের ব্যাপার, তাই তার উপরে ভর দিয়ে দাঁড়াবার মতো শক্ত ঠাঁই সব সময়ে পাওয়া যায় না। মহিমের চরিত্রকে আরো কয়েক দিক দিয়ে দেখবার সুযোগ আমরা পাব অন্যান্য চরিত্রের আলোচনা কালে।

মহিমের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র সুরেশ—সন্দীপ ও নিখিলেশের বিপরীত চরিত্র। কিন্তু সন্দীপ একটি ব্যক্তি যতখানি হতে পেরেছে তার চাইতে অনেক বেশী সে একটি ভাবের বা 'আইডিয়া'র প্রতীক—সেই 'আইডিয়া' তার মুখে ব্যক্ত হয়েছে এই ভাবে:

যেটুকু আমার ভাগ্যে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ-কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।—লোভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হবো প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই।

সুরেশেরও মত এই ধরণের, মৃত্যুকে আসন্ন জেনে অচলাকে সে বলছে: আমার বিশ্বাস, মানুষের মন বলে স্বতন্ত্র কোন একটা বস্তু নেই। যা আছে সে এই দেহটারই ধর্ম। ভালবাসাও তাই। ভেবেছিলাম, তোমার দেহটাকে কোন মতে পেলে মনটাও পাবো। তোমার ভালবাসাও দুষ্প্রাপ্য হবে না—কে জানে হয়ত সত্যিই কোন দিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'তো।—কিন্তু আর তার সময় নেই।

কিন্তু সন্দীপের তুলনায় সুরেশ ব্যক্তি, অর্থাৎ রক্তমাংসের মানুষ, অনেক বেশী। তার দুর্বলতা, দুর্নীতি, এসব শরৎচন্দ্র অকপটে এঁকেছেন, সেই সঙ্গে এমন কিছুও তাতে দেখেছেন, যার প্রতি তাঁর

শ্রদ্ধা গভীর—তাঁর সেই শ্রদ্ধা পাঠকদেরও মনে সংক্রামিত হয়। কি সেই বস্তু? সেটি সুরেশের নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা। বন্ধুর ও আর্তের বিপদে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে সে তো কোনোদিনই ইতস্ততঃ করেনি, ভালবাসায়ও সে লাভালাভ ভালমন্দ-বিচাররহিত হয়ে তলিয়ে যায়। এই শেষোক্ত অবস্থা অবাঞ্ছিত—ভীতিকর। সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র সচেতন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর শিল্পিমন সচেতন এর দুর্লভতা সম্বন্ধেও। ভাল বা মন্দ কোনো কিছুতেই নিজেকে এমন বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা সন্দীপের নেই। সন্দীপের শক্তি ইচ্ছার শক্তি, বুদ্ধির শক্তি কিন্তু সুরেশের শক্তি হৃদয়ের শক্তি। তাই সন্দীপের হাত থেকে বিমলা অনেকটা সহজেই উদ্ধার পেয়েছিল; কিন্তু সুরেশকে ভয়ঙ্কর জেনেও তার হাত থেকে উদ্ধার পেতে অচলা যেন একই সঙ্গে চেয়েছে ও চায়নি। আর শেষ পর্যন্ত সে উদ্ধার পায়নি। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

সূচনায় আমরা সুরেশকে পাই একটি অবিকশিত তরুণরূপে—তার বুদ্ধি, কথাবার্তা, সবই অবিকাশের দ্বারা চিহ্নিত, কেবল তার ভিতরে যে আবেগ রয়েছে সেটি অতিশয় প্রবল। কিন্তু শুধু সেই আবেগ-প্রাবল্য দিয়ে কেমন করে সে যে মহিমের মতো বিচারবাদীর মন জয় করেছিল তা বোঝা কঠিন! অচলার মনও সূচনায় সে জয় করতে পারে নি। তবে তারুণ্যের একটি সহজ আকর্ষণ আছে নারীদের জন্য এবং জনসাধারণের জন্য—একথা বলেছেন গ্যেটে—সুরেশ হয়তো সেই ধরণের আকর্ষণের দ্বারা অচলাকে কিছু আকৃষ্ট করেছিল, আর তার ঐশ্বর্যও যে তার প্রভাব কিছু পরিমাণে বাড়িয়েছিল সে কথা শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন। তবে অচিরে সুরেশের তারুণ্যের তরলতা পরিবর্তিত হয়েছিল আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যে। শেষের দিকের সুরেশ পূর্ণ পরিণত যুবা—শুধু যুবার আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য নয়, বোধের তীক্ষ্ণতা ও সংকল্পের দৃঢ়তাও তাতে লক্ষণীয়।

সুরেশ নিজের বাসনা-কামনাকে সংযত করতে জানতো না—চাইতও না। অচলাকে দেখে বাস্তবিকই সে মুগ্ধ হয়েছিল—সন্দীপ বিমলাকে দেখে এমন মুগ্ধ হয়নি, সে বরং বিমলার মুগ্ধতার সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু সুরেশ অসীম কামনা বুকে ধরেও অপেক্ষা করেছে অচলার প্রসন্নতার জন্যে—অন্তত ডিহরীতে অচলা যখন তার একান্ত আয়ত্তের মধ্যে, তখন তার সেই পরিচয়ই আমরা পাই। অবশেষে অচলাকে সে পুরোপুরি পেলো। কিন্তু সেই পাওয়াই তার জীবনের পাত্র যেন কানায় কানায় বিস্বাদে ভরে দিলো—সে বুঝলো:

> প্রভাত-রবিকরে পথপ্রান্তে যে শিশিরবিন্দু দুলিতে থাকে, তাহার অপরূপ অক্ষুরন্ত সৌন্দর্য যে লোভী হাতে লইয়া উপভোগ করিতে চায়, ভুলটা সে ঠিক তেমনই করিয়াছে!—মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা—অসহ্য ভারী—

এখানেই তার এমন একটি পরিচয় আমরা পাই, যা অপ্রত্যাশিত। সে নাস্তিক, দেহবাদী, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের দুঃখ-বিপদও সহজেই তার অন্তরে বাজে, হয়তো সেই বেদনাবোধের মধ্যেই লুকিয়েছিল তার এই নব চেতনার বীজ,—হয়তো অচলার অন্তর প্রকৃতির সৌকুমার্য তার এই নব চেতনার সহায়ক হয়েছিল। যাই হোক, ডিহরীতে একটি নব চেতনা তাতে জাগলো, তার ফলে সে বুঝলো অচলাকে তার অনির্বাচিত জীবনধারা থেকে ছিনিয়ে এনে কত বড় ভুল সে করেছে। সেই ভুল তার জীবনকে করলো দিশাহারা—শক্তিহীন। সে ঠিক মরবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে মৃত্যু যখন এসে হাজির হলো, তখন সে বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলো। সঁপে দিলো আমরা বলতে পারি না—তার এই মৃত্যু যেন এক বিরাট ধ্বংস! কোনো আশা কোনো সান্ত্বনাই নেই তার সামনে—শুধু যার অসীম দুঃখের কারণ সে হয়েছে সেই অচলার জন্য তার মনের কোণে যে এই কামনা জাগলো, 'তার দেওয়া দুঃখও যেন অচলা একদিন অনায়াসে সইতে পারে', এই ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে শুধু সেইটি যেন এক ক্ষীণ কিন্তু অচঞ্চল দীপশিখা।

শরৎচন্দ্র ঠিক ট্র্যাজেডির লেখক নন, একথা আমরা বলেছি। কিন্তু তাঁর 'গৃহদাহ' একটি ট্র্যাজেডি হয়েছে। এতে দুটো ট্র্যাজেডি ঘটেছে, একটি সুরেশের জীবনে, অপরটি অচলার জীবনে। অচলার কথা পরে হবে। সুরেশের জীবনে যে ট্র্যাজেডি আমরা দেখছি তা আপাত দৃষ্টিতে এক ভয়াবহ শূন্যতাই—কেন না তার দুষ্কৃতির পরিমাণ ভয়াবহ। কিন্তু এমন একটি সর্বাত্মক ধ্বংসের মতো ব্যাপারের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত এই একটুকু সান্ত্বনা পাওয়া গেল যে শুধু অন্যায়, শুধু কামনার চরিতার্থতা, এই তার লক্ষ্য ছিল না—একটি অনির্বাণ প্রেম ও তারই আনুষঙ্গিক গূঢ় শুভকামনা তার অন্তরেও ছিল। সুরেশের শোচনীয় মৃত্যু যে এক সর্বাত্মক ধ্বংসই হলো না, আমাদের সমবেদনা আকর্ষণ করতে পারলো, তার কারণ তার অন্তরের এই প্রেম আর প্রেমের আনুষঙ্গিক গভীর গোপন শুভানুধ্যান—যার অস্তিত্ব এত দিন যেন তারও অজ্ঞাত ছিল। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সুরেশে দেখেছেন অসীম বৈরাগ্য। অন্তিমে সুরেশের মধ্যে যেন এক তটকূলহীন বৈরাগ্যই আমরা দেখি। কিন্তু আসলে এটি বৈরাগ্য নয়—শুধু বৈরাগ্য হলে এটি হতো এক বিরাট অহমিকা। এটি এক বিরাট ব্যর্থতাবোধ, সন্দেহ নেই কিন্তু তারই সঙ্গে রয়েছে প্রেমের নীরব শুভানুধ্যানও। অচলাকে সুরেশ সত্যই ভালবেসেছিল; কিন্তু তার এই বড় ভুল হয়েছিল যে সে প্রেমের ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যের অহংকার আর লোভকে প্রশ্রয় দিয়েছিল—পল্লবপ্রান্তটুকুই যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্যের এই মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে কি করিয়া? তাই এতখানি অনর্থ তার প্রেমাস্পদার জীবনে তো ঘটালোই, নিজের জীবনও সে বিধ্বস্ত করলো।

অন্তিমে সুরেশকে আমরা দেখি, অসাধারণ ভাবে শান্ত আর স্বল্পবাক্। কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমরা বুঝি, সে মহিম আর অচলার কাছে অন্তহীন ক্ষমা চেয়ে গেল,—হয়তো জীবনবিধাতার কাছেও। কেন না, অচলা তার মতো অপরাধীকেও ক্ষমা করতে পারবে, এ ভরসা তার মনের কোণে ঠাঁই পেলো।

এক সীমাহীন ব্যর্থতাবোধ আর কুণ্ঠিত শুভানুধ্যায়ী প্রেম—এই বিষ আর অমৃতের মিলনে সুরেশের জীবননাট্যের শেষ ক'টি দৃশ্য এক অবিস্মরণীয় ট্র্যাজেডি হয়েছে।

অচলার জীবন আর সেই জীবনের ট্র্যাজেডি আপাত দৃষ্টিতে কিছু কম জটিল মনে হয়। মনে হয় তার জীবনের ট্র্যাজেডির মূলে তার অনিশ্চয়তা—মহিম আর সুরেশ এই দুইজনের মধ্যে

কে যে প্রকৃতই তার প্রেমপাত্র, সে সম্বন্ধে সে যেন শেষ পর্যন্ত সুনিশ্চিত হতে পারেনি। আর তাতেই তার অমন সুকুমার আর সংযত জীবনে ঘটলো অমন ব্যর্থতা। এমনি করে অচলাকে বুঝতে পারলেই পাঠকদের মন বেশী খুশী হয়। কেন না, যা একই সঙ্গে অজটিল আর গভীর, তার দিকে পাঠকদের পক্ষপাত। কিন্তু শরৎচন্দ্র অচলার ভিতরে আরো খানিকটা জটিলতা এনে দিয়েছেন—সেই জটিলতা এসেছে ঐশ্বর্যের প্রতি তার কিছু আকর্ষণ, আর বিশেষ ভাবে যে জীবনধারায় সে মানুষ তার যে মজ্জাগত দুর্বলতা (অবশ্য শরৎচন্দ্রের মতে) সেই ছিদ্রপথে।

সূচনায় আমরা পাই, অচলার বিয়ে হতে যাচ্ছে মহিমের সঙ্গে। মহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সচ্চরিত্র, কিন্তু অবস্থাপন্ন নয় আদৌ; অচলা এ সব জানে, জেনেই এ বিয়েতে সম্মত হয়েছে। মহিমের অনুপস্থিতিকালে অচলাদের বাড়ীতে এই বিয়ে ভাঙতে এলো সুরেশ, মহিমের অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেন না যদিও সুরেশ নাস্তিক তবু সে হিন্দু সমাজের হিতৈষী, মহিমের মতো একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সন্তান যে বিয়ে করবে এক ব্রাহ্মকন্যাকে, এ চিন্তা তার অসহ্য। কিন্তু অচলাকে দেখে তার সমস্ত ব্রাহ্ম-বিদ্বেষ সত্ত্বেও যেন চক্ষের পলকে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। অচলার পিতাকে ও অচলাকে মহিমের নিঃস্ব অবস্থার কথা সে জানালো, তাতে অচলার পিতার উপরে ভাল কাজ হলো, ধনীর সন্তান সুরেশকে অচলার পিতা সমাদরও বেশ করলেন। এ বাড়ীতে ঘন ঘন সুরেশের যাতায়াত হতে লাগলো; অচলাকে তার মনের ভাব জানাতেও সে দেরী করলো না। অচলার পিতার কয়েক হাজার টাকার ঋণ সে উপযাচক হয়ে শোধ করে দিলো। এক রকম ঠিক হলো সুরেশের সঙ্গেই অচলার বিয়ে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অচলা জানালে, সে মহিমকেই বিয়ে করবে। তাতে সুরেশ ধৈর্য হারিয়ে ঠগ জোচ্চোর ইত্যাদি অকথ্য কথায় অচলাকে ও অচলার পিতাকে গালি দিয়ে কলকাতা ত্যাগ করলো; আবার কয়েক দিন পরে ফিরে এসে আন্তরিক ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। মহিমের সঙ্গে অচলার বিয়ে হয়ে গেল। সুরেশের ধনসম্পদ যে তার মনের উপরে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পরিচয় রয়েছে বিবাহের পরে স্বামীর উদ্দেশ্যে অচলার এই স্বগত-উক্তিতে। "প্রভু, আর আমি ভয় করিনে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকি নে কেন, সেই আমার স্বর্গ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ।"

কিন্তু পল্লীগ্রামে স্বামীর কুটীরে উপস্থিত হয়ে অচলার পক্ষে এ মনোভাব বজায় রাখা কঠিন হলো। মৃণাল নামে একটি মেয়েকে তার স্বামী নিয়ে এলো তার সাহায্যের জন্য। সে অচলার চাইতে বয়সে কয়েক বছরের বড়, বুদ্ধিমতী, কথায় ও কাজে অতিশয় চটপটে—নিজের স্বামীকে সে বললে, বায়াত্তুরে বুড়ো, অচলাকে বললে সতীন; তার এই ঠাট্টায় অচলা বিব্রত বোধ করলে তবু তার আসার ফলে স্বামিগৃহ তার জন্য কিঞ্চিৎ সুসহ হলো। এই মৃণালের বাবা আর মহিমের বাবা ছিলেন পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মহিমদের বাড়ীতেই মৃণাল মানুষ হয়, এক সময়ে মহিমের সঙ্গে তার বিয়ের কথাও হয়েছিল; মহিমকে সে সেজ-দাদামশাই বলে, সেই সুবাদে অচলাকে ঠাট্টা করলো সতীন বলে। মেয়েটি সবাইকে ভালবাসে আর কড়া কথা বলে, তার পঞ্চাশ-পেরোনো স্বামীকেও অতিশয় যত্ন করে। কিন্তু মহিমের প্রতি তার অন্তরের টানকে অচলা ভুল বুঝলো। একদিন অচলা রান্না করলো, কিন্তু সে রান্না না খেয়ে মৃণাল বাড়ী চলে গেল, কেন না তার শাশুড়ী শুচি-বায়ুগ্রস্তা। এতে অচলা নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করে মহিমকে জবাবদিহি করলো। তাদের কথা-কাটাকাটি যখন ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে তখন সুরেশ এসে হাজির হলো তাদের বাড়ীতে।

অচলা চাইলো সুরেশের সঙ্গে নিরিবিলি আলাপের সুযোগ তার না ঘটুক। কিন্তু মহিমের কাছে থেকে সে সম্পর্কে কোনো সাহায্য সে পেলো না। সুরেশ নিজের মনের ভাব গোপন করবার লোক নয়; তার উপস্থিতিতে অচলা ও মহিমের সম্বন্ধের ভারসাম্য যথেষ্ট টলে গেল। তা ছাড়া পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝি এতদূর গড়ালো যে অচলা একদিন বলে বসলো: "সুরেশ বাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে, তার ঘর করবার জন্য আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না।" কোনো অবস্থাতেই বিক্ষুব্ধ হওয়া মহিমের স্বভাবের বাইরে। সে বললে: "বেশ, কাল যেন অচলা সুরেশের সঙ্গেই কলকাতায় যায়। সেই রাত্রেই তাদের বাড়ীতে আগুন লাগলো। অচলার গহনাগুলো ভিন্ন কিছুই রক্ষা পেলো না।—অমন কড়া কথা বলে অচলার সম্বিৎ ফিরে এসেছিল। সে তার সমস্ত গহনা স্বামীকে দিয়ে বললে, এর দ্বারা পশ্চিমে কোথাও একটা ছোট বাড়ী কিনে তারা বাস করতে পারবে। কিন্তু মহিম তার গহনা নিতে অস্বীকৃত হলো, বললে, এ ক্ষতি সইবার সম্বল তোমার নেই—তোমার কাছ থেকে কিছুই আমি নিতে পারবো না।"

অচলা ও তার দাসীকে সুরেশের সঙ্গে ফিরে আসতে দেখে আর মহিমের বাড়ী আগুনে পুড়ে গেছে শুনে অচলার পিতা অত্যন্ত শঙ্কিত হলেন। তাঁর সন্দেহ নিরসনের জন্য অচলাকে শেষ পর্যন্ত বলতে হলো, পিতার মাথা হেঁট হতে পারে এমন কিছুই সে করেনি।

মহিম তার গ্রামে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়লো। সুরেশই গিয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে এনে ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলো ও অচলাও তার পিতাকে সংবাদ পাঠালো। যেদিন তাদের বাড়ী পুড়ে যায় সেই দিনই মৃণাল বিধবা হয়েছিল। সেও এসেছিল মহিমের শুশ্রূষা করতে। কঠিননিউমোনিয়ায় মহিম প্রলাপ বকছিল, তার অবস্থা দেখে অচলা সংজ্ঞা হারালো। পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে মহিমের শুশ্রূষার ভার নিলে। এই শুশ্রূষার ভিতর দিয়ে অচলা আবার যেন নিজেকে ফিরে পেলো। মহিম অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো। ঠিক হলো, অচলা তাকে জব্বলপুরে চেঞ্জে নিয়ে যাবে তার পিতার এক বন্ধুর আশ্রয়ে। কিন্তু যে গাড়ীতে তারা যাচ্ছিল সেই গাড়ীতে শেষ মুহূর্তে সুরেশও উঠলো মহিমের সঙ্গে চেঞ্জে যাবে বলে—মহিমই নাকি তাকে বলেছিল, তার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে, অচলাও নাকি তার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।

অচলা ছিল মেয়েদের গাড়ীতে। সে রাত্রে খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। এক ষ্টেশনে সুরেশ এসে অচলাকে নেমে পড়তে বললো ও তাকে নিয়ে এক ফার্ষ্ট ক্লাসের কামরায় তুলে দিয়ে বললে, সে মহিমকে আনতে যাচ্ছে। গাড়ী ছেড়ে দিলে সুরেশ তার সামনে দিয়ে

ছুটতে ছুটতে বলে গেল ভয় নেই, সে পাশের কামরাতেই আছে। অচলা সন্দিগ্ধ হলো। শীগ্‌গিরই সে বুঝলো, তার স্বামী এ গাড়ীতে নেই, সুরেশ তাকে ভুলিয়ে ভিন্ন গাড়ীতে তুলেছে। তার সংজ্ঞা যেন লোপ পেলো! কেঁদে সুরেশের পায়ে লুটিয়ে বললো—"কোথায় তিনি? তাঁকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ী থেকে ফেলে দিয়েচ?"·· ক্রমে অচলা জানতে পেলে সত্যই তারা চলেছে নরকের পথে। সুরেশ বললে, "যে অধঃপথে পথ দেখিয়ে এতদূর টেনে এনেচ, তার মাঝখানেও ইচ্ছে করলেই দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যাবে না। এখন শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে।" কথায় কথায় সে তাকে গণিকা বলে গালি দিলে। অচলা বললে, "পৃথিবীর কাছে, ভগবানের কাছে, আপনার কাছে এই আমার একমাত্র প্রাপ্য।"

প্রায় ভোরের সময় একটা ষ্টেশনে অচলা নেমে পড়লো। সুরেশও নামলো। ষ্টেশনের নাম ডিহরী। গাড়ী কলকাতায় যাচ্ছিল। সুরেশ বললে—"ভেবেছিলাম তুমি সোজা কলকাতায়ই ফিরে যেতে চাইবে, হঠাৎ এই ডিহরীতে নেমে পড়লে কেন?" অচলা বললে, "কলকাতায় আমি কার কাছে যাব?"

ষ্টেশনের কাছে এক পুরোনো সরাইতে তারা উঠেছিল। সেখানে সুরেশ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার চিকিৎসার জন্ম অচলাকেই ব্যস্ত হতে হলো। এই সূত্রে রাম বাবু নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাদের আশ্রয় নিতে হলো। সেখানে সবাই জানলো তারা স্বামি-স্ত্রী, যদিও অচলা নিজেকে সুরেশের কাছ থেকে দূরেই রাখলো। এই পরিস্থিতিতে কি করণীয়, অচলা ভেবে তার কূল-কিনারা পেলে না। কিছু দিন পরে সুরেশ এখানে এক মস্ত বাড়ী কিনলো। বাড়ীর যোগ্য গাড়ী, আসবাবপত্র, এসবও হলো। কিন্তু অচলা তার এই নতুন ভাগ্যকে স্বীকার করবে কি করবে না, তা স্থির করতে পারলো না। যে সমাজে সে মানুষ, তাতে ধনের সমাদর কম নয়, বিধবার পুনর্বিবাহের রীতি তো আছেই, স্বামী বর্জন করে অন্য স্বামী গ্রহণও প্রশংসনীয় না হলেও অবৈধ নয়, তবু তার নতুন ভাগ্যকে গ্রহণ করতে সে মনকে পুরোপুরি রাজী করাতে পারলো না। অবশেষে এক রাত্রে পিতৃপ্রতিম রাম বাবুর আগ্রহাতিশয্যে ও তাঁর কাছে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য সুরেশের কামরায় সে রাত্রি যাপন করতে গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল, তাহার মুখ মড়ার মতো সাদা, দুই চোখের কোণে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরণার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

কিন্তু এর পর যেন জোর করে সে বড়লোকের গৃহিণীর যোগ্য সাজসজ্জা গ্রহণ করলো—এমনি সাজসজ্জা করে তাদের নতুন জুড়ি গাড়ীতে সুরেশের সঙ্গে সে রাম বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল—সেখানে তাঁদের এক বড়লোক আত্মীয় এসেছিলেন। কিন্তু গিয়ে তারা পড়লো মহিমের সামনে—মহিম এসেছিল এই বড়লোকের ছেলের শিক্ষক হয়ে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে অচলা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। ফিরবার পথে সুরেশকে সে বললে—"আর কোথাও আমাকে নিয়ে চল।"

সুরেশের নিজের জীবন তার কাছে দুর্বহ, প্রায় অর্থহীন হয়ে উঠেছিল। দূরে গ্রামে প্লেগ হচ্ছিল। সুরেশ ওষুধপত্র পাঠাচ্ছিল। [illegible] চিকিৎসায় গেল।

দৈবক্রমে তার শরীরে প্লেগের বীজাণু ঢোকায় তার অন্তিম কাল ঘনিয়ে এলো। তার মৃত্যুশয্যায় সে মহিমকে ডাকলো তার ধনসম্পত্তি দরিদ্রদের জন্ম ব্যয় করবার ভার নিতে। মহিম এলে অচলা সম্বন্ধে সে বললে:

> অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসতো সে আমিও বুঝিনি, তুমি বুঝোনি—ও নিজেও বুঝতে পারেনি। সেটা তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে এমন ঘুলিয়ে উঠলো যে—যাক। এমন সুন্দর জিনিসটি মাটি করে ফেললুম—না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে। কিন্তু কি আর করা যাবে।

শরৎচন্দ্রের মতে অচলার জীবনের ট্র্যাজেডির মূলে যে সমাজে তার জন্ম, সেই সমাজের শিক্ষার বা আদর্শের ত্রুটি। হিন্দু-নারীর যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা জীবনে মরণে একজনকেই অনন্তগতি বলে ভাবা, তাঁর মতে, কেবল সেই শিক্ষাই নারীর সতীত্বকে রক্ষা করতে পারে, এ ভিন্ন আর কোনো ব্যবস্থাই বিপদের দিনে এ ব্যাপারে কার্যকরী হয় না।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, অচলা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ। অচলার জীবনের ট্র্যাজেডির মূলে তার অনিশ্চয়তাই। সে মন থেকে মহিমকেই স্বামী বলে বরণ করেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সুরেশের আবেগপ্রাবল্য, তার ধনসম্পদ, এসবের প্রলোভন থেকে নিজেকে রক্ষা করবার তেমন চেষ্টা করেনি। গাড়ীতে সুরেশের দারুণ মতলব সে যখন বুঝলো ও তার দ্বারা অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসিত হলো, তারপরও সুরেশের সংস্রব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেবার মতো শক্তি সে নিজের ভিতরে পেলে না, ডিহরীতে কিছুদিন বাস করার পর এ ভাবনাও তার মনে এলো যে স্বামী পরিত্যাগ করে অন্য স্বামী গ্রহণ অবৈধ নয়, যদিও নিন্দিত। তারপর রাম বাবুর অনুনয়ে পুরোপুরি সুরেশের ঘরণী হওয়া তার পক্ষে আর একটি ধাপ মাত্র। পাতিব্রত্যের সংকল্প কেন, যে কোনো সংকল্প তার ভিতরে প্রবল হলে তার জীবনের পরিণতি অন্য রকমের হতো।

আমরা দেখলাম অনিশ্চয়তাই অচলার জীবনের ট্র্যাজেডির মূলে। কিন্তু ট্র্যাজেডি তো শুধু ব্যর্থতায় নয়, সেই ব্যর্থতার সঙ্গে মহৎ-কিছুরও যোগ থাকা চাই। অচলার ক্ষেত্রে কি সেই মহৎ-কিছু?

সেটি অচলার সুরুচি ও স্বভাবগত সংযম। সেই সুরুচি ও সংযম তার কাছে মূল্যবান করেছিল প্রেমে একনিষ্ঠতা আর সদাচার—প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যও অজ্ঞাতসারে তার মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। তাই এক দুর্বার নিয়তি যখন শেষ পর্যন্ত তাকে সুরেশের একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে গেল, তখন সে পরিস্থিতিকে যুক্তির দিক থেকে সে তেমন দোষাবহ ভাবতে পারলো না—কিন্তু তার অন্তর-প্রকৃতি তাতে সাড়া দিলো না।—অচলার রুচি ও স্বভাবের সৌকুমার্য যে বার বার অসহায় ভাবে লাঞ্ছিত হলো এইটিই তার কাহিনীকে এতো করুণ করেছে মনে হয়।

গৃহদাহের তিনটি অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে অচলার পিতা কেদার মুখুয্যে চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে বেশী সার্থক হয়েছে। এই চরিত্রে রূপলাভ করেছে দুইটি ব্যাপার। একটি, কন্যার কলঙ্কে লজ্জিত পিতার চেহারা, অপরটি, এই দুর্ঘটনা কেদার মুখুয্যের চিন্তায় ও জীবনাদর্শে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটালো। প্রথম ছবিটি খুব স্পষ্ট হয়েছে,

পাঠকদের মনের উপরে প্রভাবও বিস্তার করে যথেষ্ট। সেই তুলনায় দ্বিতীয়টির প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা কম। কেদার মুখুয্যের মর্মপীড়া পাঠকদের মর্মকেও গভীর ভাবে স্পর্শ করে; কিন্তু যে সব যুক্তির দ্বারা তিনি অচলার পতনের জন্য দায়ী করেছেন নিজের সমাজের অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষাকে, তা দুর্বল। নিঃসম্পর্কীয় অথচ পরম স্নেহবতী মৃণালের সেবার নিপুণতা ও আন্তরিকতা তাঁকে তাগিদ দিলো এমন অপূর্ব ব্যাপারের মূল খুঁজে দেখতে। তিনি দেখলেন ব্রাহ্মদের মহা ত্রুটি এই যে, তাদের ধর্ম 'সমাজ ছাড়া', অর্থাৎ তা সুস্পষ্ট মতবাদ,—সমাজের পরম্পরাগত শিক্ষা-সংস্কারাদির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত নয়, দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি মৃণালকে বোঝাতে চাইছেন এই ভাবে :

> মানুষ শিখে তবে সাঁতার কাটে, কিন্তু যে পাখী জলচর, সে জন্মেই সাঁতার দেয়। এই শেখাটা তার কেউ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু কাজটাকে ফাঁকি দিয়ে কেবল ফলটুকু ত পাবার যো নেই মা। এ ত ভগবানের নিয়ম নয়। কোথাও না কোথাও, কোন না কোন আকারে শেখার দুঃখ তাকে বইতেই হবে। তাই ঐ জলচরটার মত যে নীড়ের মধ্যে তুমি জন্মকাল থেকে অনায়াসেই এত বড় বিদ্যে আয়ত্ত করে নিয়েচ, তোমাদের সেই বিরাট বিপুল সমাজ-নীড়টার কথাই আমি দিনরাত ভাবচি।

শরৎচন্দ্র এখানে সমাজ ও ধর্মের, অর্থাৎ সমাজের আচার-বিচার নিয়ম-শৃংখলার আর ধর্মের, অর্থাৎ জীবনের নিয়ামক চিন্তা ভাবনার যোগাযোগ সম্বন্ধে একটি জটিল কিন্তু বহু-আলোচিত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। আমরা তাঁর 'শেষ প্রশ্নে' দেখবো, এখানে তিনি যে মত সমর্থন করেছেন তার অনেকটাই সেখানে খণ্ডন করেছেন। এখানে মাত্র একটি কথাই আমরা বলবো, সে কথাটি এই যে, সভ্যতার কাজই হচ্ছে সব ক্ষেত্রে—ধর্মের ক্ষেত্রেও—মানুষের সজাগ চেষ্টার পরিমাণ বাড়িয়ে চলা। জগতের বিভিন্ন সমাজ ও ধর্ম আজ পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়েছে, তার ফলে এই সজাগ চেষ্টার পরিমাণ বাড়ানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে—পশুপক্ষীর সহজ সংস্কারের মতো মানুষের পরম্পরাগত আচার ও সংস্কার সেখানে তাকে বেশী সাহায্য করতে পারছে না। এই কথাই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত উক্তিতে—"সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির।" তাই কেদার মুখুয্যের সমাজ ও ধর্ম সংক্রান্ত কথাগুলো তাঁর বিক্ষুব্ধ হৃদয়-মনের পরিচায়ক বেশ হয়েছে, কিন্তু সেই পরিমাণে বিচারের কথা হয়নি।

মৃণালকে উপলক্ষ করে শরৎচন্দ্র নারীর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে অনেকগুলো কথা বলতে চেয়েছেন। কুমারী কালে হয়তো তার মনে মহিমের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু তার বিবাহ হয় অন্যলোকের সঙ্গে, সে-বর আবার বুড়ো। অচলা এক সময়ে ইংগিত করেছিল মহিমের সঙ্গে মৃণালের বিয়ে হলেই ভাল হতো। কেন না, "ছেলেবেলায় যে ভালবাসা জন্মায় তাকে উপেক্ষা করা ভাল কাজ নয়"। তার উত্তরে মৃণাল বলেছিল :

> এ সব তুমি কি খুঁজে বেড়াচ্ছ সেজ দি? তুমি কি মনে কর ছেলেবেলার সব ভালবাসারই শেষ ফল এই? না, মানুষ বিয়ে দেবার মালিক? এ শুধু এ-জন্মের নয় সেজদি, জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। আমি যাঁর চিরকালের দাসী তাঁর হাতে তিনি সঁপে দিয়েছেন। মানুষের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কি যায় আসে?

মৃণালের কথা সুস্পষ্ট এবং এই কথার পেছনে যে মতবাদ রয়েছে তাও সুপরিচিত। শুধু হিন্দু সমাজে নয়, অন্যান্য বহু সমাজেও এই মতবাদ, অথবা এমনি ধরণের মতবাদ একদিন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল। শরৎচন্দ্র নতুন করে এই মতবাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হয়তো এই কথাই বলতে চেয়েছেন—নারীর সতীত্বকে যদি আমরা মূল্য দিতে চাই তবে বিবাহের অচ্ছেদ্যতার কথা আমাদের বিশেষ ভাবে ভাবতে হবে।

শরৎচন্দ্রের এই চিন্তায় শ্রদ্ধেয় অনেক কিছু আছে, সেই সঙ্গে এতে দুর্বলতার পরিমাণও কম নয়। নারীর সতীত্বের আদর্শ সম্পর্কে ১৩৩১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মুন্সীগঞ্জের অধিবেশনে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন :—"পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়। এ কথার যদি এই অর্থ করা হয় যে মনুষ্যত্বের বেশী মূল্য, সে তুলনায় সতীত্বের মূল্য কম, তবে সেটি হবে কদর্থ, এর এই অর্থই করা উচিত যে অন্যান্য ভাল আদর্শের মতো সতীত্বও মহামূল্য, তবে তার যোগ ঘটা চাই পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব-সাধনের সঙ্গে, সেই যোগ না ঘটলে সতীত্ব হয়ে পড়ে এক সংকীর্ণ আদর্শ যার বেশী মূল্য স্বীকার করা কঠিন, মৃণালের পাতিব্রত্যের যে আদর্শের দিকে শরৎচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাতে মস্ত ত্রুটি এই যে, স্বামীটি এখানে প্রতীকস্থানীয় হয়েছে, কেন না সে বৃদ্ধ, অল্প দিনেই মারা গেল, তার গুণপণার কোনো পরিচয় পাঠকরা পেলো না, মৃণাল যে পেয়েছিল তারও উল্লেখ নেই। প্রতীক নিয়ে মাতামাতি, প্রচার, এ সব চলতে পারে, কিন্তু তাকে সত্যই ভালবাসা যায় না—ভালবাসা বিকশিত হতে পারে ও যারা ভালবাসে তাদের বিকাশের সহায়ক হতে পারে কোনো রক্তমাংসের মানুষের মহৎ গুণাবলীর সঙ্গে যদি তার যোগ ঘটে। ধর্ম নিত্য, শাশ্বত, এসব কথা যত সত্য, ধর্ম কি তা নিরন্তর আবিষ্কার করে চলতে হয় জীবনের প্রয়োজন ও দায়িত্বের দিকে তাকিয়ে, এ কথাও সত্য। শরৎচন্দ্র যে তা জানেন না তা নয় এর পরেই রাম বাবুর চরিত্রে তা আমরা দেখব। তবে মাঝে মাঝে সেই তীক্ষ্ণবোধ, কেমন করে যেন তাতে আচ্ছন্নও হয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানে তাঁর এক বড় পার্থক্য।

মৃণাল তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নির্লোভতা, সেবার আকাঙ্ক্ষা আ[illegible] চিরাচরিত ধর্মাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে তার সংকীর্ণ পরিবে[illegible] ভালই ফুটেছিল, কিন্তু তাকে কিছু পরিমাণে বিরক্তিকর করা হয়ে[illegible] দাম্পত্যজীবনের প্রাচীন আদর্শের প্রচারক সাজিয়ে। একা[illegible] অচলারা পুনরায় যে মৃণালদের ধারা অবলম্বন করে সার্থক হবে [illegible] সম্ভবপর নয়। অচলারা সার্থক হবে তাদেরই পথে আ[illegible] খোলা চোখে আরো সংকল্প নিয়ে চলে।

বইয়ের শেষে মৃণালের ক'টি কথা বেশ অর্থপূর্ণ। মহিম তা[illegible] বললে : "অচলা আমাকে একটা আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করি[illegible] মৃণাল, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারি নি। তোমার ক[illegible] হয়ত সে একটা উত্তর পেতেও পারে।" তার উত্তরে মৃণ[illegible] বললে : "পাবে বৈ কি সেজ-দা। কিন্তু আমার সকল শিক্ষাই তোমারই কাছে। আশ্রমই বল আশ্রয়ই বল, সে যে

কোথায়, এ খবর আমি সেজদিকে দিতে পারব, কিন্তু সেও তোমারই দেওয়া হবে।"

শরৎচন্দ্র কি মৃণালের কথায় ইংগিত করছেন যে মহিম অচলাকে যদি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে না-ও পারে তবু অচলার আশ্রয়স্থল তাকেই হতে হবে তার সব অপরাধ সত্ত্বেও? হয়তো তাই, কেননা, অচ্ছেদ্য বিবাহের তাই অর্থ। এই সম্পর্কে নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধার কথাও স্মরণীয়। শ্রীকান্তের মুখে তিনি বলেছেন:

"স্ত্রীলোককে কখনো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেননা তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই? নাই যদি তবে পথে ঘাটে এত পাপের মূর্তি দেখি কাহাদের? সবাই যদি সেই ইন্দ্রর দিদি, তবে এতপ্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ; যখন খুসি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতোই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে।"

শরৎচন্দ্রের এই চিন্তা বহুমূল্য নিঃসন্দেহ। মানুষের দোষ-ত্রুটি একান্ত করে দেখা অসার্থক। স্বামী ও স্ত্রীর তো বিশেষ ভাবেই উচিত পরস্পরের বড় দোষ-ত্রুটিও যথাসম্ভব উপেক্ষা করা, পরস্পরের প্রতি আস্থা বাড়িয়ে চলা। কিন্তু তবু এ ব্যবস্থা আইন হতে পারে না। প্রেম-প্রীতি উদারতা এ সব স্বতঃপ্রণোদিত হলে তবেই সার্থক ও সুন্দর হয়—ফরমাস এ সব ক্ষেত্রে অচল।

রাম বাবু চরিত্রটিতে ধর্মনিষ্ঠা, আচার-পরায়ণতা এ সব বলতে যা বোঝায় তার একটি বড় দুর্বলতার দিকে শরৎচন্দ্র অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এঁর সম্বন্ধে তিনি গোড়ায় বলেছেন: "এই বৃদ্ধলোকটি সত্যই হিন্দু ছিলেন, তাই হিন্দু-ধর্মের নিষ্ঠাকেই তিনি পাইয়াছিলেন, ইহার নিষ্ঠুরতাকে পান নাই।" রাম বাবুর হৃদয়বত্তার বহু পরিচয়ই দেওয়া হয়েছে। অচলা ও সুরেশ বিশেষ ক'রে অচলা (রাম বাবুর বাড়ীতে অচলা সুরমা নামে পরিচিতা) এই বিদেশে-বিভূঁইয়ে যাতে কিছু শান্তিতে ও আনন্দে দিন কাটাতে পারে সেদিকে সর্বদা তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি। কিন্তু এমন হৃদয়বান ব্যক্তিও যখন জানলেন, অচলা সুরেশের স্ত্রী নয়, অথচ তারই হাতের রান্না তিনি খেয়েছেন, ঠাকুরকে পর্য্যন্ত নিবেদন করেছেন, তখন সুরেশের মৃত্যুর পরে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে অচলার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে, সুরেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারই বা কি হবে এ সবের জন্য মহিমের উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে তিনি তীব্র শ্লেষে বলে উঠলেন:

"ওঃ—আপনিও যে ব্রাহ্ম, সেটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু মশাই, যত বড় ব্রহ্মজ্ঞানীই হোন, আমার সর্বনাশের পরিমাণ বুঝলে এই কুলটার সম্বন্ধে দয়া-মায়া মুখেও আনতেন না।" এই বলে তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে কাশীতে ছুটলেন।

অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে কোনো সদগুণের যদি যোগ ঘটে তবে কার্যকালে সেই গুণ যায় উবে আর অন্ধ সংস্কারই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রাম বাবু চরিত্রটি এই কঠোর সত্যের অদ্ভুত প্রতীক হয়েছে। —সমাজের অনেক ক্ষতস্থান যে শরৎচন্দ্র অশেষ দক্ষতায় উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন, শুধু তারই মূল্য হয়তো কম নয়। কতখানি, সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারা যায় ভলটেয়ার আদি সাহিত্যের প্রাচীন দিকপালদের কথা ভাবলে। অনেক সময় মনে হয় তাঁরা পুরোনো হয়ে গেছেন; কেন না তাঁরা যে সব সমস্যার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন সে সব আর এ কালের সমস্যা নয়। কিন্তু আবার দেখা যায় তাঁরা পুরোনো হননি—তাঁদের নির্দেশ নতুন অর্থ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে নতুন কালে। এই সব ভেবেই আমরা বলতে চেয়েছি, সাহিত্যে সব চাইতে বেশী দাম মানবিকতার। যে সাহিত্য গভীর ভাবে মানবিকতার প্রকাশক ও সমর্থক তা যেন শুধু সেই গুণেই মৃত্যুর মুঠো এড়িয়ে গেছে।

[আগামী বারে সমাপ্য।

জপাৎ সিদ্ধিঃ

শ্রীবিজয়মাধব চট্টোপাধ্যায়

'জপাৎ সিদ্ধিঃ' কথাটি তন্ত্রশাস্ত্রের কথা। ইহা যাঁহারা দৈব-বিশ্বাসী বা সাধনাকাঙ্ক্ষী অথবা সাধক—তাঁহারা জানেন এবং মানেন। এমন কি, একমাত্র এই 'জপ'কেই আশ্রয় করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিশেষ আশাও পোষণ করেন, এবং অন্যান্য কঠিনতর ও কঠিনতম সাধনাকে পরিত্যাগ করিয়া সারা জীবন ইহা লইয়াই অতিবাহন করেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে এই 'জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ' বাক্যটি দেবদেব মহাদেব দেবী পার্বতীকে বলিয়াছিলেন। দেবী তখন মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এই মহীতলে আমার সহস্র সহস্র সন্তান সহস্র সহস্র জপ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের সিদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন দুর্দ্দশাই বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে কি আমার এই কালাহত দুর্ভাগ্য সন্তানদের কোনও গতি নাই? তাহারা কি এইরূপ দুর্ভোগই সারা জীবন ভোগ করিবে?" তদুত্তরে মহাদেব দেবীকে বলিয়াছিলেন—"না দেবি! বিধিমত জপ করিলে যতবড় দুষ্কৃতই হউক না কেন, সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী; ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি। এখন 'জপ-বিধি' কি, তাহা শুন। যিনি তন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন এবং যাঁহার মন্ত্রচৈতন্য হইয়াছে এবং মন্ত্রচৈতন্য রহস্য জানেন, সেইরূপ গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তিনি যাহা উপদেশ দেন তাহা যথারীতি অনুসরণ করিতে হইবে; তাহা হইলেই অভিলষিত সিদ্ধিলাভের আশায় বঞ্চিত হইতে হইবে না।"

এই তো গেল মহাদেবের কথা। এ বিষয়ে আমাদের মনে অনেকগুলি প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। প্রথমতঃ প্রশ্ন হইবে যে, এরূপ গুরু কোথায় পাইব এবং তাঁহাকে চিনিবই বা কিরূপে? আমার মনে হয়—যাঁহাকে জীবনের কাণ্ডারী করিব, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় না লইয়া, কিছু দিন সঙ্গ না লইয়া, যতদূর সম্ভব তাঁহার বাহ্য আচার-ব্যবহার না দেখিয়া, কতকগুলি দালালের বা বাজে লোকের কথা শুনিয়া অথবা তাঁহার বাচনভঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া

বৎ-তৎক্ষণাৎ যাহাকে তাহাকে গুরু করা ঠিক নয়। অবশ্য দেখিয়া শুনিয়া গুরু মনোনীত করিলেই যে সকল সময়ই সদ্গুরু প্রাপ্ত হইব—তাহা না-ও হইতে পারে। তখন উপায় কি? উপায় আছে। শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ আছে—'মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্প-পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধো তথা শিষ্যঃ গুরুং গুর্বন্তরং ব্রজেৎ।' অতএব তাদৃশ জ্ঞানী গুরুর স্থলে যদি ভ্রান্তিবশতঃ অজ্ঞানী গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া থাকি, তবে যাঁহাকে তদপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া মনে হইবে তাঁহাকে এবং যিনি আমার সর্বসংশয় ছিন্ন করিতে পারেন, তাঁহাকেই গুরু করিতে হইবে। ইহা শিববাক্য। সুতরাং ইহাতে গুরুত্যাগরূপ পাতক হইবে না। বরং শাস্ত্রানুসারে আশানুরূপ ফললাভে মানব-জীবন সার্থক হইবে।

যাক, সে অনেক কথা। এখন জপের বিধি কি—তাহাই আলোচনা করা যাক। জপ তিন প্রকার—বাচিক, উপাংশু ও মানসিক। অর্থাৎ জোরে জোরে উচ্চারণ করিয়া, অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিয়া এবং মনে মনে মন্ত্র স্মরণ করিয়া। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, যে-হাত প্রতিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ যাহার তাহার নিকট দান লইয়া অপবিত্র হইয়াছে, আর যে-মুখ মিথ্যা ভাষণ দ্বারা এবং যে-মন পরস্ত্রী-বিষয়ক কলুষিত চিন্তা দ্বারা অপবিত্র হইয়াছে, তৎসমস্ত সাহায্যে জপ করিলে জপ-ফল বা সিদ্ধিপ্রাপ্তি সুদূর-পরাহত। অতএব যোগিজনগ্রাহ্য সর্বসিদ্ধিপ্রদ এবং পরম গুহ্য প্রাণিক-জপই সর্বোত্তম ও সর্বাবস্থায় সর্বজনের করণীয়। অগ্নি যেমন কখনই অপবিত্র হয় না, বরং সর্ব অপবিত্রতার সমূলে বিনাশকারী, তেমনি প্রাণবায়ু বা আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত যে জপ—তাহাই সকল সফলতার মূল। তবে ইহা সদ্গুরুর (যিনি ইহার সাধন জানেন) নিকট জানা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

সদ্গুরু শুধু উপদেশ দেন না, কিন্তু নিজে আচরণ করিয়া শিষ্যকে আচরণ করাইয়া থাকেন। এই জন্যই সদ্গুরুর অপর নাম আচার্য্য, অর্থাৎ যিনি আচার করিতে জানেন। শরীরের মধ্যে প্রাণই একমাত্র সদ্‌বস্তু। প্রাণ আছে বলিয়াই আমরা মল-মূত্রযুক্ত এই দেহে বাস করিয়াও সর্বদাই নিজেকে পবিত্র মনে করি। এই প্রাণই হৃৎচক্রের মধ্যে নারায়ণরূপে স্থিত রহিয়াছেন। তাইতো সর্বশাস্ত্রসার গীতা বলিয়াছেন—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।' আবার সেই প্রাণরূপী নারায়ণই ত্রিধাবিভক্ত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিতেছেন। শাস্ত্রবচন যথা—'প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণঃ বিষ্ণুঃ পিতামহঃ। প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্বং প্রাণময়ং জগৎ।' অবশ্য বাহ্যভাবে মন্ত্র জপের যে কোনও ফলই নাই, একথা আমি বলিতে চাহি নাই। কেন না, স্বরকম্পনে প্রাণগতির ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং নানারূপ মন্ত্র জপ-রূপ স্বরকম্পনের সাহায্যে প্রাণের ঊর্দ্ধাধঃ ও অন্য নানাবিধ গতি অবশ্যই হইবে এবং তাহাতে নানারূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াও যে সম্ভব,—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

কিন্তু ইহা জাগতিক। সুতরাং কাম্যফলপ্রসূ, এবং ইহার সীমা মনোময় স্তর পর্য্যন্ত। এই মনোময় স্তরে ভাবময় ভগবানের দেখা মিলিতে পারে। কিন্তু এই মনকে লয় না করিয়া জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় হওয়া যায় না। সুতরাং এমতাবস্থায় জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে লাভ করার চিন্তা করাও মস্তবড় পাগলামী! এই জ্ঞান মাত্র যোগের দ্বারাই লভ্য এবং পরমানন্দপ্রদ। 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।'—অর্থাৎ জ্ঞানের মত পবিত্রতম বস্তু আর এ জগতে নাই। যোগমার্গে সংসিদ্ধ হইলে এই জ্ঞান স্বতঃই লাভ হয় এবং মাত্র সেই জ্ঞান দ্বারাই আত্মদর্শন হয়। অন্য কোনও উপায়েই এই জ্ঞান লাভ হয় না। আত্মজ্ঞানই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। তাই যোগশিখা উপনিষৎ বলেন—'যোগাৎ পরতরং ন হি'—যোগ ভিন্ন শ্রেষ্ঠতর সাধন আর নাই।

যত কিছু সাধনার প্রধান ফল এই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং সকল সাধককেই পরিশেষে এই পবিত্রতম যোগ সাধনেই তাঁহাদের সাধনকর্মের সমাহার করিতে হইবে—'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' সুতরাং অন্য নানারূপ সাধনায় বৃথা সময়ের অপব্যবহার না করিয়া প্রথম হইতেই যোগ সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল; আর সেই যোগ সাধনার সর্বোত্তম প্রণালী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। এই গীতোক্ত যোগ জাতি-বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে কাহারও করিতে বাধা নাই—'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।' আর একটি বিশেষ কথা এই যে, মহাযোগেশ্বর হরি নিজ মুখে বলিয়াছেন—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।'—অর্থাৎ সমস্ত ধর্মমত ত্যাগ করিয়া আমার (আত্মার) ধর্ম্ম আচরণ করিয়া আত্মানন্দ লাভ কর। ইহাতে চিরাচরিত ধর্মাচরণ ত্যাগ করা হেতু কোনও রূপ পাতকের আশঙ্কা নাই। সুতরাং বৃথা শোক করিও না। আত্মজ্ঞানের দ্বারা সর্বপাপ নাশ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ মুক্তি লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

'জপাৎ সিদ্ধিঃ' যোগসাধনার গোড়ার কথা বা প্রথম ক্রম। প্রবর্ত্তক সাধক এই বহিঃ জপকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে প্রাণিক জপের উপদেশ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ক্রম-পদ্ধতি অনুসারে প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ ক্রিয়া লাভে কৃতার্থম্মন্য হয়েন। এই জন্যই এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতোক্ত যোগসাধনার অবতারণা।

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিমল গোস্বামী

চতুর্থ পর্ব

২

আমাদের দেশে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব দিয়ে প্রথম বিজ্ঞানের সূত্রপাত। আমাদের গোপালদার জীবনে একটি ভূত দিয়ে।

গোপালদা যে গ্রামের বাসিন্দা সেখানে এক বর্ষাকালে দারুণ গুজব রটে গেল যে মাঠের মধ্যে অবস্থিত পাঁচির মায়ের ভিটেয় ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে। ভূতেরা সেখানে প্রতিরাত্রে নিশ্চিন্তে ব'সে আগুন জ্বালাচ্ছে।

রাত্রে কেউ সে পথে যেতে আর সাহস করে না। বহু দূর থেকে সে আগুন দেখতেও কেউ রাজি নয়। যারা একবার দেখেছে তারা এমনই আতঙ্কগ্রস্ত যে তাদেরও কারো আর দ্বিতীয় বার দেখার প্রবৃত্তি নেই।

সেটি আলেয়ার আলো নয়, কারণ সে আগুন একই জায়গায় জ্বলে।

গোপালদা ঠিক করলেন ব্যাপার কি দেখবেন। কিন্তু ভয়ে যেতে পারেন না। মনের এক দিকে দুরন্ত বাসনা, অন্য দিকে সংস্কার এবং আতঙ্ক। অবশেষে ঠিক করলেন দু'চার জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে বেরোতে হবে।

মাত্র দুজনকে রাজি করানো গেল অনেক পরিশ্রম ক'রে।

বর্ষাকাল, গুঁড়ো গুঁড়ো হাল্কা বৃষ্টি ঝরছে। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা, রাত্রি নিরেট অন্ধকার। এমনি পরিবেশে, এমন ভয়ঙ্কর নির্জন গ্রাম্য প্রান্তরে তিন তরুণ চলেছেন ভূতের সন্ধানে। সঙ্গে একটিমাত্র হারিকেন লণ্ঠন আর ছাতা।

যথানির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গিয়ে প্রায় আশী গজ দূরে থেকে তাঁরা দেখতে পেলেন সামনের কচুবন ঘেঁটুবন পার হয়ে তাল ও তেঁতুল গাছের সিলুয়েটের আড়ালে জ্বলছে সেই আগুন। জ্বলছে আর নিবছে।

সামনের ঝোপ ঠেলে এগোতে হবে। তিন জনেই হতবুদ্ধি। অবশেষে এক জন তাঁর মনের কথা প্রকাশ করেই ফেললেন লজ্জার মাথা খেয়ে। বললেন, ভূত দেখতে এসেছিলাম, ভূত দেখেছি, আর শখ মিটে গেছে, আমি চললাম।—কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করলেন শুকনো গলায়, কাঁপা সুরে, দমিত ভঙ্গিতে। তাঁকে আর ঠেকানো গেল না। কচুপাতার মতোই কাঁপতে কাঁপতে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। বাকী রইলেন দু জন।

গোপালদা একটু এগোন, এবং অস্বাভাবিক চিৎকার ক'রে বলেন, "চলে এসো আমার সঙ্গে।" কিন্তু সঙ্গী বলেন, "কি কাজ ?" গোপালদারও মনে হয়, "কি কাজ ?"

গতি মিনিটে এক পা। অবশেষে দু জনে কোনো রকমে ঝোপের এলাকা পার হয়ে যান এবং গিয়ে বুঝতে পারেন, আগুন 'জ্বলছে নিবছে' না। ওরকম মনে হয়েছিল সামনের ঝোপগুলোর নড়া-পাতার আড়াল থেকে।

আগুন স্থির ভাবে জ্বলছে। উজ্জ্বল আগুন, চোখের ভুল হবার কথা নয়।

গোপালদা সঙ্গীকে বলেন, "এসো ভাই।"

সঙ্গী বলেন, "না।" এবং কাঁপতে থাকেন। গোপালদার মনের জোর ভেঙে পড়তে চায়। ইনিও কি শেষে ফিরে যাবেন ?

গোপালদা অগত্যা বলেন, "এক কাজ কর। তোমার যদি খুব বেশি ভয় হয়ে থাকে, তা হলে আর ঐ আগুনের দিকে তাকিও

ছাতা খুলে ভূতের আগুনকে আড়াল ক'রে তিনি বসে পড়লেন।

না। তুমি ছাতা আড়াল দিয়ে এইখানে বসে থাক, আমি একা এগোই।"

শেষে অনেক বিতর্কের পর তাই ঠিক হল। ছাতা খুলে ভূতের আগুনকে আড়াল ক'রে তিনি ব'সে পড়লেন সেইখানেই। সম্ভবত রামনাম করছিলেন ব'সে ব'সে এবং এই দুষ্কার্যে রাজি হওয়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন।

গোপালদার অবস্থাও খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কিন্তু দলপতির পিছিয়ে আসা চলে না। তিনি দু হাত এগিয়ে যান আর অতিরিক্ত এবং অস্বাভাবিক জোরে চিৎকার ক'রে বলেন, "এই তো আমি চলছি, এসো চলে আমার সঙ্গে, কোনো ভয় নেই। বুঝলে? কোনো ভয় নেই।"

ছাতার আড়ালে উপবিষ্ট সঙ্গী আরও জোরে চেঁচিয়ে বলেন, "কোনো ভয় নেই।"—ঠিক আমাদের ছোট মিতুর মতো, সে ভয় পেলে 'ভয় নেই, ভয় নেই' ব'লে ছুটতে থাকে।

অবশেষে আত্মভয় নিবারক চিৎকারের রক্ষাকবচকেই একমাত্র সম্বল ক'রে গোপালদা গিয়ে পৌঁছলেন সেই ভূতের অগ্নিকুণ্ডে।

সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বহুদিনের কাটা তেঁতুল গাছের গোড়ায় জ্বলছে সেই আগুন। বর্ষার জলে ভিজে ভিজে কাঠ পচে উঠেছে। এই পচা গুঁড়ি থেকে দেখা যায় এই আলো। আগুন নয়। অন্তত জ্বলন্ত আগুন নয়। পচা ভিজে কাঠ শুধু আলো বিকিরণ করে।

গোপালদা সেই গুঁড়িতে সন্তর্পণে হাত দিলেন। হাতে লেগে গেল তার ছোঁয়া। আঙুল থেকে আলো বেরোয় যে! সেই পচা এবং আলোবিকিরণকারী গুঁড়ি হাতে ভেঙে ভেঙে অনেকগুলো টুকরো সংগ্রহ ক'রে ফিরলেন গোপালদা। ছাতার আড়ালের সঙ্গী তখনও ছাতা ও রামনামের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা ক'রে চলেছেন।

সংগৃহীত টুকরোগুলিকে গোপালদা বিজ্ঞানের ভাষায় (এবং পুলিসের ভাষাতেও) যাকে বলে অবজারভেশনে রাখা, তাই করলেন। তিনি দেখলেন শুকোলে আলো দেয় না, ভিজিয়ে দিলে অদ্ভুত আলো দিতে থাকে। জলে ডুবিয়ে রাখলে আশ্চর্য সুন্দর দেখায়।

এই তথ্যের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কৃত আর এক ঘাস জাতীয় আলো-বিকিরণকারী উদ্ভিদের তথ্য মিলিয়ে গোপালদা প্রবাসীতে এক প্রবন্ধ লেখেন। এই সময় গোপালদা কোনো এক উপলক্ষে কলকাতায় আসেন। ডাক্তার সহায়রাম বসুও এ সময় ছত্রাক নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি প্রবন্ধলেখকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং আলো-বিকিরণকারী ছত্রাক সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারেন। গোপালদা, সাইকেলে ঘুরে ঘুরে তাঁর জন্য অনেক নমুনা সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন। অবশেষে গোপালদার লেখা আচার্য জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, এবং তিনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

কলেজের শিক্ষা প্রায় কিছুই না পেয়ে আপন গরজে বিজ্ঞানের পথে এতদূর এগিয়ে আসার দৃষ্টান্ত সম্ভবত এ দেশে দ্বিতীয় নেই।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কথা তখন সবে বেরিয়েছে। কিন্তু এই সময়ে অন্তত তাঁর আসল জগৎ রামমোহন রায়ের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ যখনই যে বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাইতেই এমন ডুবে গেছেন যে আপন গবেষণা বিষয়ের বাইরে কোনো আলাপই তিনি জমাতে পারতেন না। মোহনবাগান রো-এর বাড়িতে কোনো কোনো শনিবারে আলাপের সীমা গণ্ডি অতিক্রম করত, সে কথা আগে বলেছি। একগুঁয়ে দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, অথচ আলাপে হাসিমুখ, বন্ধুবৎসল এবং রসিকও কখনো কখনো। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু নানা প্রয়োজনে আমাকে যে সব চিঠি লিখেছেন তার সবগুলোতেই সম্বোধন লিখেছেন 'পরিমল দা'। মজার কথা এই যে, আমার দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ এখনও আমাকে এই সম্বোধন করেন—একজন হেমেন্দ্রকুমার রায়, অন্যজন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। একজনের বয়স প্রায় সত্তর, অন্য জনের পঁয়ষট্টি।

ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদের ব্রজেনদা ছিলেন। তাঁর চরিত্রে যে একগুঁয়েমি এবং দৃঢ়তা দেখেছি তারই বৃহত্তর সংস্করণ দেখেছি গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর চরিত্রে। একমাত্র মোহিতলাল মজুমদারকে এঁদের সঙ্গে এক বন্ধনীভুক্ত করা চলে।

রামমোহন রায়কে নিয়ে দুটি শক্তিশালী দলের মধ্যে এই সময় খুব টানাটানি চলছিল। রামরাম এবং শেখ বক্স ভিন্ন কি অভিন্ন এই ছিল দ্বন্দ্বের প্রধান বিষয়। এক দিকের নেতা রমাপ্রসাদ চন্দ, অন্যদিকের নেতা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত রমাপ্রসাদ চন্দই জয়লাভ করেছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী রাজা রামমোহন রায় (জীবন চরিতের নূতন খসড়া) নামক একখানি বই প্রকাশ করেন। গিরিজাশঙ্কর এক অদ্ভুত চরিত্র। গবেষণা কাজের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি সুন্দর মিলেছিল। তাঁর কথার মধ্যে কোথায়ও ফাঁক রাখতেন না। নিজে আইনজীবী, অতএব আটঘাট বেঁধে কথা বলতেন। নিজের উপর প্রবল দ্বিধাহীন বিশ্বাস, কারো সঙ্গে কোনো রফার প্রশ্ন নেই। খুব মজার মজার খবর বানিয়ে বলতেন, আমাকে দু একবার চিঠিতেও এমন খবর দিয়েছিলেন। এইখানে তাঁর আইনের কথা ভুল হত, রসিকতা ছিল বেপরোয়া। বহুকাল পরে তাঁকে ১৯৫৩ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছে শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমের সংলগ্ন বাড়িতে দেখেছি। তবে তিনি আমাকে দেখেছেন কি না সন্দেহ, বলেছিলেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, এবং চোখ কালো কাচে ঢাকা ছিল।

১৯৩৩ সালে রামমোহন স্মৃতি শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হয়। এই শতবার্ষিকীর এক প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রচার সচিব অমল হোমের সঙ্গে এই সময় আমার পরিচয় ঘটে। তখন তিনি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক। মধুরভাষী দীর্ঘদেহ এবং ব্যক্তিত্বে অতি স্বতন্ত্র। তিনি যেখানে উপস্থিত থাকেন সেখানেই তিনি তাঁর চারধারে একটি অনুপেক্ষণীয়রূপে আকর্ষক আবেষ্টন ফুটিয়ে তোলেন, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না। ক্রমে এঁর আরও কাছে আসবার সুযোগ ঘটেছে নানা উপলক্ষে, এবং এঁর বন্ধুবাৎসল্যে মুগ্ধ হয়েছি। অমল হোম বাংলা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত, সম্প্রতিকালে প্রকাশিত তাঁর 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' তার সাক্ষ্য বহন করছে।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে অমল হোম বহু তথ্যসম্বলিত খুব চমৎকার একখানি প্রচার-পুস্তিকা সম্পাদনা করেন। এই পুস্তিকা পরে অমল হোম সহযোগে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত

The Father of Modern India, Commemoration Volume of the Rammohan Roy Centenary Celebrations, 1933 (প্রকাশকাল ১৯৩৫) নামক বৃহৎ স্মারক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৩৩ সালেই মুঙ্গের থেকে আগত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হল। সে শনিবারের চিঠির লেখক। তার ছদ্মনাম চন্দ্রহাস। এর সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব গাঢ় হল। একটা সম্পর্কও বেরিয়ে পড়ল। আমরা ১৯১৭-১৮ তে একই সঙ্গে একই সেকশনে বিদ্যাসাগর কলেজে বি-এ পড়েছি। কিন্তু এই পরিচয়ের আগে কেউ কাউকে দেখেছি মনে পড়ল না। তবু অজান্তে হলেও দুটি বছর আমরা এক সঙ্গে উঠবোস করেছি, এতেই আনন্দ।

শরদিন্দু কবি, গল্পকার, নাট্যকার এবং উপন্যাস লেখক। খুব মিষ্টি হাত। ডিটেকটিভ গল্প লেখায় অপরাজেয়। তার ব্যোমকেশ সবার পরিচিত। বৈষ্ণব সাহিত্য হজম ক'রে এবং ইংরেজী রোমান্স সাহিত্যের প্রভাবে অতি মাত্রায় রোমান্সপ্রিয়, তার লেখা গল্পেও তার ছাপ। কৌতুক রচনাতে অসাধারণ নিপুণ। শনিবারের চিঠিতে তার যে সব কৌতুক কবিতা আমি ছেপেছি এত দিনে তার সংকলন প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কেন হয়নি জানি না। তার লেখা কৌতুক কাব্যের কিছু কিছু নমুনা আমি উদ্ধৃত করছি। কবিতার নাম 'পলাতকার প্রতি' (কার্তিক ১৩৪০)। প্রণয়িনী হাক্ শীলের সঙ্গে পালিয়েছে। কবির দুঃখ—"প্রিয়ে চাকশীলে (শেষে হাক্ শীলে?") ইত্যাদি। তার পর অপ্রত্যাশিত এবং চমকপ্রদ সব সংবাদ কবিতাটিকে উপভোগ ক'রে তুলেছে—

"সত্য যদি চটিয়াছিলে আমার পরে মানময়ী
দিলে না কেন বচনশরঘাত,
শুনিলে ভটিকয়েক তব ধারালো বাণী শানময়ী
তখনি সখি হতাম আমি কাত।"

তার পর এক জায়গায়—

"হাক্‌টা অতি বেয়াড়া ছোঁড়া ফচকে পাজি চ্যাংড়া গো
তাহার পরে দারুণ দারু খোর;
দু'দিন পরে খেদায়ে দিবে মারিয়া পিঠে খ্যাংরা গো
তখন হবে বিপদ অতি ঘোর।"

শরদিন্দুর আরো একটি কবিতা আমার কাছে খুব ভাল লেগেছিল। কৃষ্ণরাধিকার বিরুদ্ধে সখীর কাছে অভিযোগ করছেন এই হচ্ছে বিষয়। কবিতাটির নাম দুর্জয় মান। (ভাদ্র ১৩৪১) বহু অভিযোগের মাঝখানে কৃষ্ণ এক জায়গায় বলছেন—

নিকটে যাই যব কর দুহুঁ ধারই
চাহিলুঁ টুটইতে মান।
নাসাপর মুঝ ঘুঁষি চলাওল
দারুণ বজর সমান।
মুণ্ড ঘুরি হম পড়লুঁ চরণ তলে
নয়নে হেরি আঁধিয়ার।
তবহুঁ সো কোপ কঠিন-হিয় নাগরি
মোহে ন করল পিয়ার।
চরণ ধরিতে যব কর পরসারলুঁ
নিতম্বে মারল লাথি।
কুঞ্জ তেজি হম দ্রুতগতি ভাগলুঁ
আগ ভয়ে জনু হাতী।...

রাধিকা কৃষ্ণের নাকে ঘুঁসি চালাচ্ছেন, নিতম্বদেশে লাথি মারছেন এবং কৃষ্ণ অগ্নিভীত হাতীর মতো কুঞ্জ ছেড়ে পালাচ্ছেন—এ সবই মারাত্মক রকমের উপভোগ্য বিশুদ্ধ কৌতুক। শরদিন্দুর কৌতুক সৃষ্টির বিশেষ রীতির সঙ্গে এই ভাষা সুন্দর মানিয়ে গেছে। এ ছাড়াও অনেক লঘু বা গুরু কবিতা সে লিখেছে। তার মধ্যে তার 'শালী' আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই শালীর প্রেরণা হচ্ছে বনফুলের 'শালা'। শালা প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৪১ সংখ্যায়। পরিকল্পনার দিক থেকে এই ধারালো ব্যঙ্গ মৌলিক এবং তুলনাহীন। বাংলাদেশের দেশপ্রেম, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিভাগের ভণ্ডদের বিরুদ্ধে এর এক-একটি পদ এক-একটি গোলার মতো ফেটে পড়ছে। অতএব 'শালী'র ভূমিকা স্বরূপ 'শালা'র কিছু অংশ (আরম্ভ ও শেষ অংশটি।) উদ্ধৃত করি আগে—

সামান্য মনুষ্য নহ নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা,
হে শ্যালক, হে স্বভাব শালা।
বঙ্গদেশে বহু বেশে বহু বার দেখেছি তোমারে
রচিয়াছি তব জয়মালা।
বহুবার ক'রে গেছ অকিঞ্চন চিত্ত-পরশন,
সভামঞ্চে নেতৃবেশে হে শ্যালক সৌম্যদরশন,
প্রাণের আবেগে যবে বক্তৃতা করেছ বরষণ,
সে বাণীর জ্বালা—
বহু করতালি যোগে প্রাণমন করি' ধরষণ
কর্ণ দুটি করিয়াছে কালা;
হে শ্যালক, হে স্বদেশী শালা।...

এ রকম দশটি পদ। সবাইকে আক্রমণের পরেও যদি কেউ বাদ প'ড়ে গিয়ে থাকে সেই সন্দেহ কবিকে পীড়িত করল, অতএব—

অপরিচয়ের মাঝে থাক তুমি অশ্যালক বেশে
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালামূর্তি বাহিরায় এসে।
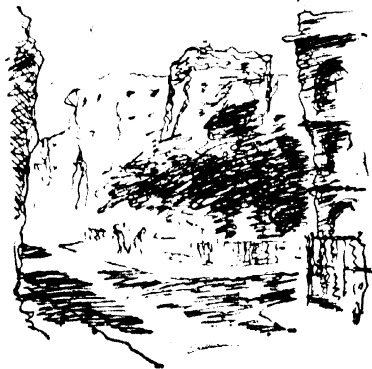
ভূমিকম্প শুধু অনুভব নয়, নিজ চোখে দেখা।

আত্মবন্ধু পরিজন কাছে গিয়ে দেখি হায় শেষে,
শালা, সব শালা!
দিন যায়, ক্রমে দেখি শালা সাগরেতে এসে মেশে—
দুনিয়ার যত নদীনালা,
হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা।

ফাল্গুনের শালা, শালীকে আহ্বান করল বৈশাখে। বিশুদ্ধ মধুর রস। (বলা বাহুল্য, স্বভাবতঃই)। শরদিন্দু মধুর রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তাই এমন সুন্দর একটি কবিতা পাওয়া গেল। এ কবিতা কি আজও মাসিকপত্রের পাতায় আত্মগোপন ক'রে আছে? বনফুলের শালা কিন্তু প্রকাশ্যে বেরিয়েছে দুভাবে। প্রথমত তার 'বনফুলের কবিতা' নামক বইতে, দ্বিতীয়ত সেনোলা রেকর্ডে নিজকণ্ঠের আবৃত্তিতে। শরদিন্দুর শালী হয় তো এখনো মাসিকের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন ক'রে আছে। আমি তার কিছু অংশ প্রকাশ করছি—

নহ প্রৌঢ়া, নহ বৃদ্ধা, নহ শিশু, নহ নাবালিকা,
হে তরুণী রূপসী শ্যালিকা।
ওষ্ঠে যবে আলতা দিয়া ভালে পর খয়েরের টীপ,
চাহিয়া তোমার পানে বুক মোর করে ঢিপ ঢিপ!
মনে হয় কেন আমি হলাম না দিল্লী-বাদশাহ
অথবা কুলীন পুত্র—গুষ্টিসুদ্ধ করিয়া বিবাহ
জীবন নির্বাহ
করিতাম মহানন্দে কুসুমে কুসুমে
পরিমল চুমে।...
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি হেসে ওঠে খিক খিক করি
তোমার সরস বাক্যে,—নিরঞ্জন মহিমা বিস্মরি;
তোমার গায়ের গন্ধে নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহে ঘন
বেল্লেল্লা মাতাল সম কবিকুল বিদারে গগন,
সঙ্গীত মগন।
মুচকি হাসিয়া চাও স্ফুরিতঈক্ষণা,
বিলোল স্বক্কণা।
শ্বশুর ভবনে যবে দেখা দাও হে বিদ্যুৎ শিখা,
দ্যুতিময়ী বিদুষী শ্যালিকা,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজি উঠে হৃদয়ের শতছিদ্র বাঁশি,
কদম কেশর সম মুঞ্জে উঠে রোমাঞ্চ বিকাশি;
চাহিয়া তোমার পানে অচঞ্চল রহে আঁখিতারা,
ভায়রা-ভায়ের ভাগ্য ভাবি' ভাবি' চিত্ত আত্মহারা
বহে অশ্রুধারা।...
ঐ শুন লুব্ধ কবি তোমালাগি রচিছে লালিকা,
হে নিষ্ঠুরা বধিরা শ্যালিকা।
স্বর্ণযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর?
বহু বিবাহের রীতি প্রচলিত হইবে আবার?...
মিলিবে না মিলিবে না—ভেঙে গেছে সে গৌরব টীকা,
হে সুদূর—দুর্লভ শ্যালিকা।
তাই আজি ধরাতলে জামাইষষ্ঠীর মধুমাসে,
চির-শালী-বিয়হের হা হুতাশ মিশে ভেসে আসে;
পূর্ণিমা নিশীথে যবে শত চাঁদ-বদনেতে হাসি—
গৃহিণীর কলকণ্ঠ শ্রবণে বাজায় ভাঙা কাঁসি—
ঝরে অশ্রুরাশি;
হতাশ হইয়া টানি গাঁজার কলিকা,
হে মোর শ্যালিকা!

শালী সম্পর্কে শরদিন্দুর যে আক্ষেপ, এ জাতীয় কবিতার সম্পর্কেও সেই আক্ষেপ করা চলে। এ ভঙ্গিও আর ফিরবে না।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী তখন সাপ্তাহিক নবশক্তির সম্পাদক। সার্কুলার রোডের নবশক্তি অফিসে তখন প্রায় নিয়মিত যেতাম। ১৩৩২ সালে সেটি, তখনও শনিবারের চিঠিতে যাইনি। নবশক্তিতে এই সময় অনেক লেখাই লিখেছি—সবই ব্যঙ্গ গল্প। সরোজ মধুরভাষী এবং তীক্ষ্ণরসবোধ সম্পন্ন, তার সান্নিধ্য ভাল লাগত। কিরণের সঙ্গে এর পূর্ববন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। বঙ্গশ্রী অফিসের বৈঠকে সরোজ প্রায় নিয়মিত আসত। দৈনিক বঙ্গবাণীর ঘরেও প্রবেশ করেছি মাঝে মাঝে। এইখানে শশাঙ্কমোহন চৌধুরী ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা হত। শশাঙ্কমোহনের নামের সঙ্গে চেহারা এবং স্বভাবের মিল ছিল তখন থেকেই। মাথায় টাক এবং মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বর্তমানে টাক আরও বিস্তৃত হয়ে সবটাই চাঁদের চেহারা পেয়েছে। শশাঙ্কমোহন আমার বহু পূর্বেই 'কালপরিক্রমা' শেষ করেছেন, আমি সবে আরম্ভ করেছি। প্রেমেন্দ্র এবং শশাঙ্কমোহন—এ দুজনের সঙ্গেও কিরণের মাধ্যমেই প্রথম পরিচয় হয়। প্রেমেন্দ্র উপাসনাতে 'সেতু' নামক একটি কবিতা লিখেছিল—তার আরম্ভ ছিল এই:

"বিরাট সেতু সে এ ধারের সাথে
ওধারে জুড়িতে চায়,
সে সেতু হয়েছে পার?"

এখন ভাবি সেই সেতু কি কিরণ?—

সরোজের কাছে ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীও যেতেন মাঝে মাঝে। যথেষ্ট আড্ডা দেওয়ার পর আমরা সরোজকে তার সম্পাদকীয় লেখার কাজকে নির্বিঘ্ন ক'রে উঠে পড়তাম ওখান থেকে। পথে নেমে ডাক্তার এমন সব কাহিনী আরম্ভ করতেন যা শেষ হত এসে ময়দানে। পা দুটো তখন প্রায় অচল।

১৩৩৪এর জানুয়ারি (?) দুপুরের পরেই আমি এসেছি বঙ্গশ্রী অফিসে। তারপর এলো শিল্পী অরবিন্দ দত্ত, তারপর ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ। সজনীকান্ত অনুপস্থিত, কিরণ কক্ষান্তরে। অরবিন্দ গল্প জমাতে ওস্তাদ এবং পার্থিব এবং অপার্থিব সর্ববিষয়ে তার নিজস্ব একটা থিওরি আছে। সেগুলো সে বেশ মনোহর ভাষায় বর্ণনা করতে পারে। বটকৃষ্ণ ঘোষ মিতভাষী। অতএব সেদিনের সভায় তখন একমাত্র বক্তা অরবিন্দ। এমন সময় টেবিল কেঁপে উঠল। আমি অত্যন্ত ভূমিকম্প-সচেতন, আমার ভিতরে হয়তো একটি অদৃশ্য সাইসমোগ্রাফ যন্ত্র আছে, দেখলাম দুজনেই টেবিল থেকে দূরে। অতএব তখনি ভূমিকম্প ঘোষণা ক'রে সবাই একসঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এলাম পথে। দেখি কিরণও এসেছে, এবং আরও অনেকে।

এ ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন, এমন প্রবল ভাবে আগে কখনো দুলিনি, বিপদেও না, স্ফূর্তিতেও না। আর

এ শুধু ভূমিকম্প অনুভব নয়, ভূমিকম্প নিজ চোখে দেখা। এর যে একটি চেহারা আছে, তা আগে জানা থাকলেও ঠিক এমন ভাবে দেখিনি। লী মেমোরিয়ালের বাড়ি ও ওয়েলিংটন স্কয়ারের কাছাকাছি ধর্মতলা স্ট্রীটের উপরে দাঁড়িয়ে দুলছি। এর মধ্যে ঘড়িও দেখে নিয়েছি। মোট প্রায় সাড়ে তিন মিনিট লেগেছিল দোলা থামতে। পায়ের নিচে যেন আশ্রয় নেই, অদ্ভুত একটা অনুভূতি। পথ, বাড়ি-ঘর, গাছপালা, সব যেন অবাস্তব, এখুনি চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাবে। সমস্ত জমি একবার এদিকে আর একবার বিপরীত দিকে হেলে পড়ছে। এতদিনের নির্ভর এবং স্থায়ী আশ্রয় এই জমি, তাকে মুহূর্তকালের জন্যও অবাস্তব মনে হলে মন অতিমাত্রায় বিচলিত না হয়ে পারে না। অতএব ভূমিকম্প শুধু বাইরেও নয়, ক্ষণকালের জন্য মনেও ঘটে গেল। সব যেন একটা অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেছে। আমরা শুধু একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছি—কোথায় এই সর্বনাশা ভূমিকম্পের এপিসেণ্টার? কোথায় সব ধ্বংস হয়ে গেল? ঘরে ফিরে আসছি, সিঁড়িতে তখনও পা কাঁপছে। সরু গলির ওপারে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারের বাস। তারা এত দিন তাদের ঘর থেকে আমাদের মাঝে মাঝে দেখেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। সেদিন তাদের একটি মেয়ে বিচলিত ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, "What happened?" উত্তরে শুধু বলেছিলাম, "A great thing!" সবাই এমন উত্তেজিত যে, সেই মুহূর্তে কারো মনে আর কোনো অপরিচয়ের সঙ্কোচ ছিল না।

পরে জানা গেল সব। বিহার অঞ্চলের মর্মভেদী কাহিনী সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। মুঙ্গেরের শরদিন্দু, ভাগলপুরের বলাই প্রভৃতির কাছে পরে শুনেছি, ওখানকার লোকেরা কেউ বা সবাই মিলে, কেউ বা আংশিক ভাবে চাপা পড়তে পড়তে দৈবাৎ বেঁচে গেছে। বাড়ি ভেঙে পড়েছে চোখের সামনে। তখন সেখানে ভূমিকম্প বিষয়ে যে যা ভাববাণী করেছে তাই সবাই চোখ বুজে বিশ্বাস করেছে। তার জন্য সেই দুর্দান্ত শীতে সেখানে অনেককেই দেহকম্পন অগ্রাহ্য ক'রে বাইরে তাঁবুর আশ্রয়ে থাকতে হয়েছে গৃহ কম্পনের ভয়ে। সেবারে কলকাতাতেও অসম্ভব রকমের শীত পড়েছিল।

এর কয়েক দিনের মধ্যেই সাপ্তাহিক ফরওয়ার্ড কাগজে বিহার ভূমিকম্পের সচিত্র খবর প্রকাশিত হয়। আমি হঠাৎ আবিষ্কার করি এই ছবি আগে কোথায়ও যেন দেখেছি। মনে পড়ল, সে হচ্ছে কোয়েটা ভূমিকম্পের ছবি। হয় তো ব্লক হাতের কাছে ছিল, কে আর ধরে, এই মনোভাব থেকেই এই কাণ্ড। এটি আবিষ্কার ক'রে ভূমিকম্পে যতটুকু উত্তেজিত হয়েছিলাম, তা থেকেও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম এবং সজনীকান্তকে উত্তেজিত করলাম। দুষ্টবুদ্ধি জেগে উঠল সম্মিলিত ভাবে। চারখানা ব্লক আনা হল বঙ্গশ্রীর "চতুষ্পাঠী"তে ছাপা ছবির। একটিতে স্পাইরাল নেবুলা, একটিতে আনাতোল ফ্রাঁস, একটিতে গ্যালিলিও, একটিতে মাউণ্ট উইলসন অবসারভেটরির টেলিস্কোপ। সজনীকান্ত শয়নকক্ষে ব'সে "ভারতপথিক ফরওয়ার্ড" নামক একটি ব্যঙ্গ রচনা লিখে দিলেন ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে। চারখানা পূর্ণপৃষ্ঠা হাফটোন ব্লক ছাপা হল। নীহারিকার ছবির ক্যাপশন দেওয়া হল 'ভূমিকম্পের পূর্বে বড়গ্রহের সম্মিলন।' আনাতোল ফ্রাঁসের ক্যাপশন হল 'ভূমিকম্পের পর নলিনীরঞ্জন সরকার।' গ্যালিলিওর ক্যাপশন হল 'ভূমিকম্পের পর শোকার্ত বিধানচন্দ্র রায়। টেলিস্কোপের ক্যাপশন হল 'ভূমিকম্পের পর ভাগলপুরের একটি টিউবওয়েল উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত (ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ল্যাবরেটরির সন্নিকট)।

এ সব প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৪০ সংখ্যায়। বিষয়টি এমনই জরুরি বোধ হয়েছিল যে সেটি বিশেষ রামমোহন রায় সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও শেষের দিকে এর জন্য স্থান ক'রে দিতে হল।

এই প্রসঙ্গে দুষ্টুমিবুদ্ধির আরও কয়েকটি ছবি মনে আসে। শরৎচন্দ্রের শিরে তখন রঙ্গ ব্যঙ্গ বর্ষণ করা হচ্ছিল নিয়মিত। একদিন কোনো সাপ্তাহিক কাগজে একটি ছবি দেখে সেই ছবির ব্লকখানা ধার ক'রে আনলাম। ছবিটি আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে উৎকৃষ্ট। থিয়েটারের অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঘছাল প'রে গলায় মাথায় সাপ জড়িয়ে ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ব্লকখানা শরৎচন্দ্রের অন্য একখানা কার্টুন ছবির পাশে ছাপা হল, ছবির উপরে লেখা রইল 'মহেশ' নিচে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কৌতুক সৃষ্টির অদম্য বাসনা দিকে দিকে আত্মপ্রকাশে ব্যাকুল। মাত্রা ছাড়িয়েছে অনেকবার। ১৯৩৪ সালের দোলের দিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আনন্দবাজার পত্রিকার কয়েকজন উৎসাহী এলেন আবির নিয়ে। তরল এবং চূর্ণ রঙে সব একাকার। কাউকে চেনবার উপায় নেই। সজনীকান্ত ও আমি মুহূর্তের মধ্যে অতিরঞ্জিত হলাম। মুখে, মাথার চুলে, এবং জামাকাপড়ে রঙের (এবং বেরঙের) এমন আতিশয্য যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে চেনা যায় না। সঙের ধর্মে দীক্ষিত হলে মনে হিংসা জাগে, অন্যকে আক্রমণ করতে ইচ্ছে হয়। পরিচিত সবাইকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত না করা পর্যন্ত ভাল লাগে না। অতএব তখনই ঠিক করা হল আমরা ওখান থেকে নিকটস্থ বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে যাব। তিনি তখন মোহনলাল স্ট্রীটের মোড়ের বড় বাড়িটার দোতলায় থাকতেন। তিন তলায় থাকতেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু তিনি সাহেবী মেজাজের মানুষ, অতদূরে উঠে লাভ নেই, অতএব লক্ষ্য দোতলাতেই আবদ্ধ করা গেল।

দল ধ'রে দোতলায় উঠে নলিনী দার দরজায় জোর ধাক্কা মেরে;

কম্বল-জড়ানো ম্যালেরিয়ায় কাঁপা চাকর দরজা খুলে দিল।

মেরে নলিনী দা, নলিনী দা, হাঁক দিলাম। মিনিটখানেক পরে আপাদমস্তক কম্বল জড়ানো প্রবল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এক চাকর জ্বরের ঘোরে কাঁপতে কাঁপতে এসে দরজা খুলে দিল এবং অতি করুণ এবং আর্তকণ্ঠে কোনো মতে বলল, বাবু তো বাড়িতে নেই। ব'লেই সেই দারুণ গ্রীষ্মে হু হু করে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল। চাকরকে অযথা এতটা কষ্ট দিতে হল এ জন্য দুঃখিত হলাম সবাই। নলিনীদাকে না পেয়ে দমেও গেলাম খুবই।

পরদিন স্তম্ভিত হয়ে নলিনীদার মুখে শুনি, তিনি স্বয়ং অসুস্থ চাকরের ভূমিকা অভিনয় ক'রেছিলেন। কি মারাত্মক কথা! অভিনয়টা সেদিন এমন সফল হয়েছিল যে তিনি আমাদের নাকের কাছে এগিয়ে এসে অতগুলো কথা ব'লে গেলেও আমরা ধরতে পারিনি। অমন গরমের দিনে মোটা কম্বল গায়ে-মাথায় জড়ানো এবং থর থর ক'রে কাঁপা সেই ছদ্মবেশ ভেদ করা সম্ভব ছিল না। দুঃসাহসিক অভিনয় বলতে হবে। মরীয়া হয়ে এ-খানি কিন্তু নিয়েছিলেন তাই রক্ষা, নইলে সামান্য একটু ইতস্তত ভাব থাকলেও নলিনী-দা সেদিন ধরা প'ড়ে যেতেন।

এই ঘটনাটি তিনি তাঁর 'হাসির অন্তরালে' পর্যায়ের একটি লেখায় এই ভাবে লিখেছেন—

"...বুড়ো শালিখদের শখ হয়েছে কোলি হেরাতে। এসেছেন সাহিত্যিকের দল। সটান উপরে উঠে এসে বন্ধ দরজায় কপাটে ধাক্কার পর ধাক্কা, আর ডাকাতের দলের মতো 'হে হৃদ হে হৃদ' চিৎকার। কোনো উপায় না পেয়ে আমি আপাদমস্তক কম্বল-মুড়ি দিয়ে, দরজা খুলে থর-থর ক'রে সারা দেহ কাঁপাতে-কাঁপাতে গিয়ে অবনতমস্তক হয়ে আর্তস্বরে তাঁদের নিবেদন করলাম, বাবু বাড়ি নেই।

সাহিত্যিক বন্ধুরা সেই প্রকাণ্ড মিথ্যাকে আমার উক্তিকে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চাকরের উক্তি ভেবে, হতাশ মনে সিঁড়ি বেয়ে নিচে চলে গেলেন।"

ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে আলোচনার পক্ষে কিঞ্চিৎ দায় হলেও নলিনীদার লেখার একটি কথার প্রতিবাদ করি। তিনি সামনে এসে যখন দাঁড়ালেন তখন অবনতমস্তক ছিলেন না—মাথা সোজাই ছিল, কারণ কম্বলের ঘোমটার ভিতর দিয়ে তাঁর জ্বরে ছলছল চোখের দুটো চিহ্ন আমি দেখেছিলাম। পরে ভেবে দেখেছি, ছলটা জ্বরের ছল নয়, চাপা কৌতুকের উচ্ছলতা।

আরও একটি মজার ঘটনা। রেলের এক কর্মচারী সদাশয় সাহিত্যপ্রেমিক ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী প্রায় আসতেন বঙ্গশ্রী অফিসে। তিনি একদিন নেমন্তন্ন করলেন তাঁর দেশে—ডানকুনিতে। শোনা গেল সকল দলের সাহিত্যিক সেখানে গিয়ে মিলবেন এবং কিছু একটা আলোচনা করবেন। সেটি যে কি তা আজ আর মনে আনা সম্ভব নয়, কেন না বিষয়টিতে আমি অন্তত কোনো গুরুত্বই দিই নি। মনে হচ্ছে সেটি ১৯৩৩ সাল। ৩৩ কি ৩৪ তাও এ ঘটনার পক্ষে অবান্তর। তবে কালটা গ্রীষ্ম এ কথাটি বেশ মনে আছে, কারণ সেখানে গিয়ে প্রচুর আম খেয়েছিলাম, এবং সে কথাটা আরও বেশি মনে আছে।

আমাদের দিকের নেতা সজনীকান্ত। আমরা অনেক আগে [illegible]

উঠোনটা বেশ দেখা যায়। জানালার নিচেই উঠোন। শনিবারের চিঠির তৎকালীন তথাকথিত বিরোধী দলের অনেকে এসে পৌঁছলেন সেখানে। আমাদের ডাক পড়ল, কারণ সভার কাজ তখনি আরম্ভ হবে। এমন সময় সজনীকান্তের মাথায় এক মতলব এলো, তিনি ভূপেন বাবুকে বললেন, একটা মজা করতে চাই, আমরা আর সভায় যাব না, এখানে ব'সে ব'সে সব দেখব। ভূপেন বাবু কি ভেবে আর বেশি টানাটানি করলেন না। দোতলা থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখব এ প্রস্তাবটা আমাদের সবারই খুব ভাল লাগল, এবং আমরা আগাগোড়া অদৃশ্য হয়েই রইলাম। ভীষণ কৌতুক বোধ হচ্ছিল। বক্তৃতা করলেন তাঁরা একে একে। কে কি বললেন তখন তা শোনার কোনো মনও ছিল না, কোনো উদ্দেশ্যও ছিল না। আমরা ছোট ছেলেদের মতো মহা কৌতুক অনুভব করছিলাম আগাগোড়া। সভা ভঙ্গ হলে আমরা ওখান থেকে রওনা হয়েছিলাম সবার পরে, এবং কলকাতা ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল।

তথাকথিত বিরোধী দল বলেছি এ জন্য যে শনিবারের চিঠি [illegible] সময়ে আর কোনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করছে না। কিন্তু [illegible] আগের ঐতিহ্য রেখে চলার চেষ্টা করা হত মাত্র। অচিন্ত্যকুমার বা প্রবোধকুমারের সঙ্গে তখন আমার পরিচয়ই ঘটেনি। ১১৬ সাল [illegible] কৈলাস বসু স্ট্রিটে কবি [illegible] দাস নাগরিক নামে একখানি পত্রিকা বার করেন। এঁর সঙ্গে সুনীল ধর ছিলেন, গোপাল মুখোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্র পালও সম্ভবত। এ কাগজে আমি লিখেছি এবং এখানে মাঝে মাঝে এসেছি। এই নাগরিক অফিসেই অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এবং এইখানে ব'সে যেমন অন্য দিন অন্যান্যের সঙ্গে, তেমনি এক দিন অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে তাসখেলেছি। যাহোক [illegible] নয়, কিন্তু আমি যে কখনো দলের কোনো বাধা অনুভব ক'রিনি, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। আরও একটি গৌণ দৃষ্টান্ত [illegible] যে, অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে আমার নাম এক স্থানে উল্লেখ করেছেন এবং সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে (প্রথম খণ্ড) আমার নাম এক স্থানে উল্লেখ করেছেন। দু'দিক থেকেই আমার প্রতি সমদৃষ্টি, অতএব আরও প্রমাণ আমি কোনো দলের নই।

হঠাৎ-খেয়ালের ঝোঁকে চলায় সজনীকান্তের জুড়ি ছিল না [illegible] একেবারে চরমপন্থী। এসব ব্যাপারে তাঁর প্রতিভা খুলে [illegible] চড়িৎশক্তিতে। এমন ইন্দ্রজালিক একটি চরিত্র সব সময় [illegible] নিজে সম্পাদক হয়ে সহকারী সম্পাদক কিরণকুমারকে কত বার [illegible] দেখিয়েছেন, কাজ ফেলে আড্ডা না দিলে চাকরি খেয়ে দেব। [illegible] কথাটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং [illegible] আর ঠিক এই রকম ব্যবহার ছিল ব'লেই [illegible] আমার বিশ্বাস। জোর ক'রে কাজটা [illegible] হয় এবং কাজে ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি [illegible]।

অজিতকৃষ্ণ বসুর আমরা [illegible] অ কৃ-ব এই ছদ্মনামে লিখতে [illegible] বিশুদ্ধ কৌতুক রচনায় তাঁর [illegible] মানুষটিও বড়ই ভাল।' [illegible]

অন্যত্র প্রকাশিত কোনো এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতিবাদে এক পাল্টা প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এলো এক তরুণ লেখক—নাম সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। সঙ্গে বঙ্গশ্রীর সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণ ও বিচার ছিল সুধাংশুর প্রবন্ধে। পড়ে দেখি, ভাষা যেমন চমৎকার, যুক্তি তেমনি জোরালো, এবং সমস্ত রচনাটি মৃদু শ্লেষের আবরণে বেশ উপভোগ্য। এই সূত্রে সুধাংশুপ্রকাশের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যে সে অনেক বিষয় গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুশীলন করেছে এবং তার যাবতীয় বিদ্যা সে তার মগজের গোপন সিন্দুকে পুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে পড়ে ষ্টিফেন লীককের কথা, তাঁর একটি রচনার নাম 'এ ম্যানুয়্যাল অফ এডুকেশন'—তাতে তিনি যাবতীয় কলেজীয় বিদ্যা শেষ পর্যন্ত যা মনে থাকে তার একটা তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি অত্যন্ত ছোট। তাতে জার্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়ের সম্পর্কে তাঁর যেটুকু মনে আছে তা উল্লেখ করেছেন: A German. very deep; but it was not really noticeable when he sat down, সুধাংশুপ্রকাশ সম্পর্কেও আমার শেষ ধারণা ঐ একই, শুধু জার্মানের স্থানে 'বেঙ্গলী' বসাতে হবে। সুধাংশু যে অন্তত বারোটি বিষয়ে সত্যিই পণ্ডিত, তা আবিষ্কার করতে আমার চব্বিশ বছর লেগেছে। বর্তমানে সে হাক-ডাক্তার নামে খ্যাত, কেননা সে এখন 'ইওর হেলথ' নামক ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত স্বাস্থ্যবিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিকপত্রের সহকারী সম্পাদক। Very deep!

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে আজকের দিনের লোকেরা হয় তো সিনেমা-পরিচালকরূপেই বেশি জানে। এ রকম জানা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁর সিনেমা-লাইনে আসার পিছনে কত দিনের প্রস্তুতি ছিল তা অনেকের জানা নেই। শৈলজানন্দ বঙ্গবাণীর কণ্ঠে কথা-সাহিত্যের যে মহামূল্যবান মালা পরিয়েছিলেন তা কখনো ম্লান হবে না। কিন্তু গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। এ দেশে যখন থেকে সিনেমা ছবি তৈরি হচ্ছে প্রায় তখন থেকে তাঁর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট। শুধু দৃষ্টি নয়, তখন তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ-ধ্যান-ধারণা সিনেমাকে কেন্দ্র ক'রে ঘুর-পাক খেয়েছে। আমি নিজে সিনেমা দেখতাম নিয়মিত, তাঁর সঙ্গে আমার সিনেমাতেই দেখা হত অধিকাংশ সময়। তারপর যখন রেডিওতে (১৯৩৬—৪১) সাপ্তাহিক সিনেমা ও থিয়েটার সমালোচনা আরম্ভ করি, তখন শৈলজানন্দকে প্রত্যেক সিনেমার নিয়মিত সঙ্গীরূপে পেয়েছি। তিনি এই ভাবে সিনেমা-(তান্ত্রিক) সাধক হয়েছেন। তখন তাঁর উত্তর-সাধক ছিল কবি ও গল্পলেখক সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দুজন সর্বদা একসঙ্গে।

শৈলজানন্দের ৫২ নম্বর শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের বাড়িতে মাঝে মাঝে গিয়েছি। একতলায় ঘরে ধূলিমলিন সতরঞ্চি বিছানো। বিড়ির টুকরো ইতস্ততঃ। সেইখানে ব'সে সিনেমার ধ্যান। একেবারে প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিংকিং। শুধু চিন্তা নয়, কাগজে বিজ্ঞাপন চলছে "আমারে বিকাতে চাই, কে নিবি তাই আপনারে?" —ভাবটা এই রকম। [illegible] সিনেমার [illegible] সমস্ত তৈরি, বিক্রির জন্য [illegible]

চলতে চলতে একাগ্র নিষ্ঠার বলে শৈলজানন্দ একদিন সিনেমার পথ খুঁজে পেয়ে আপন প্রতিভাবলে একতলা থেকে তেতলায় উঠে গেলেন। ভালমানুষ, কারো সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ করতে দেখিনি। আপন ধর্মে নিষ্ঠা দেখে অবাক হয়েছি।

শৈলজানন্দ ১৯৩৪ সালে 'ছায়া' নামক একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বার করেন। কোনো দিক দিয়েই ছায়ার আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারেন নি। এই কাগজের জন্য আমার কাছে একটি লেখা চেয়েছিলেন; লেখা একটি দিয়েছিলাম, সেটি ছায়ার দ্বিতীয় সংখ্যা (বৃহস্পতিবার ১০ই শ্রাবণ ১৩৪১)-তে ছাপা হয়। একখানা চিঠির আকারে ছোট্ট লেখা। এটি ছিল বাংলা সিনেমার প্রথম হাস্যকর যুগ। তার আগে অন্তত সাত আট বছর বাংলাদেশে সিনেমা ছবি রচনার অভ্যাস করা হচ্ছে, কিন্তু সাইকেলে ওঠা শেখার প্রথম পর্যায়ের মতো তা শুধু 'হপিং' বা এক পায়ে লাফানো, তার বেশি কিছুই না। অবশ্য আজও যে সাইকেলে চড়ার সমস্ত কৌশল আয়ত্ত হয়েছে এমন কথা কোনো বন্ধুর মুখেও শোনা যাবে না। আমার সেই চিঠিখানার অংশ উদ্ধৃত করি, তা থেকে সে যুগ সম্পর্কে একটুখানি আভাস পাওয়া যাবে।

"সম্পাদক মহাশয়, আপনার যখন 'ছায়া' দেখা দিয়াছে তখন কোনো দিক হইতে আলোকপাত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর সে আলো যদি অন্তর্দাহেই জ্বলিয়া থাকে, তাহা হইলেও ছায়াপাত হইতে আটকাইবে না, কাজেই···

···সাপ্তাহিক কাগজ···অতএব ধরিয়া লইতে পারি সিনেমা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবেন। অর্থাৎ কতগুলি বিদেশী ছবির প্রশংসা করিবেন এবং অনেকগুলি দেশী ছবির শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন।···আপনারা দেশী ছবির নিন্দা করিবেন কেন? এই জড়ভরতের দেশে কতকগুলি মূর্তি পর্দার উপরে নড়িয়া বেড়াইতেছে ইহাই কি যথেষ্ট নহে? যাহারা বসিতে পাইলে শুইতে চায়···তাহারা দলে দলে ছুটিয়া গাছে উঠিতেছে, নদীতে সাঁতার দিতেছে, মারামারি করিতেছে, এই দৃশ্যেই তো বাঙালীর বুক গর্বে আনন্দে ফুলিয়া উঠে। আমার মনে হয় নড়াটাই আসল, ইহার উপরে আর কোনো সত্য নাই। আপনার নিশ্চয় মনে আছে পাঁচ বছর পূর্বে সরস্বতী পূজার দিন এক সরস্বতী মূর্তির গলায় মালা

আমরা দোতলা থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখলাম।

কাঁপিতেছিল। সে দিন বাঙালী···মহা হুল্লোড়ে সে দৃশ্য দেখিয়া ভক্তিতে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিল। সেই বাঙালী সিনেমা দেখে। আমরাও বাঙালী, আমরা নড়ার বেশি আর কিছু বুঝি না।"

এই উদ্ধৃতিতে যে মালা কাঁপার কথা আছে, তা শ্যামবাজারের একটি দোতলায় ঘটিত কম্পন। আমিও গিয়েছিলাম দেখতে। দেখেই বোঝা গেল সরস্বতীর আসনের বিশেষ অবস্থানভঙ্গি ও মালায় সুতোর বিশেষ অবস্থান, বাইরের পথে চলা ভারী লরী বা ট্রামের কম্পনের যোগাযোগে উক্ত অলৌকিক ঘটনাটি ঘটছে। দেখার আগেই অবশ্য আমি এটি ভেবে গিয়েছিলাম। এবং যাঁরা অলৌকিক ভেবে গিয়েছিলেন, তাঁরাও এর মধ্যে অলৌকিক হাত স্পষ্ট দেখেছেন। ফেরবার সময় অপরিচিতদের সঙ্গে তর্ক বেধে উঠল (তাঁদের মধ্যে দুজনকে আমি চিনতাম, তাঁরা পরে প্রসিদ্ধ হয়েছেন); আমার বক্তব্য ছিল এই যে আগে লৌকিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ শেষ হোক, তারপর অলৌকিক ভাবা যাবে, কিন্তু সে প্রস্তাবে কেউ রাজি নয়। অগত্যা আমি বাকী পথটা নীরবে কাটিয়ে দিলাম।

উল্লেখিত 'ছায়া' সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাতে ওলটাতে দুটি বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। এই দুটি বিজ্ঞাপন আজ ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতে পারে। একটি মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়:

কলগীতি

১৬ বিবেকানন্দ রোড

আমাদের দোকানের বিশেষত্ব

কলগীতির যাঁরা নিয়মিত খরিদ্দার হবেন তাঁদের বাড়িতে পাঁচটি কোম্পানীর প্রতি মাসের সমস্ত রেকর্ড শুনে পছন্দ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে।···তাঁদের অর্ডারি রেকর্ড ইত্যাদি আমাদের লোক গিয়ে বাড়িতে দিয়ে আসবে।

কাজী নজরুল ইসলাম
স্বত্বাধিকারী।

আর একটি বিজ্ঞাপন—

নব নাট্যমন্দির

[সুসংস্কৃত ষ্টার রঙ্গমঞ্চ]

শনিবার ২৮শে জুলাই (১৯৩৪) রাত্রি আটটায়;
—পরদিন সাড়ে পাঁচটায়।
অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের—

বিরাজ বৌ

নাট্যরূপদাতা শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি।
নীলাম্বর—শিশিরকুমার।
বিরাজ—শ্রীমতী কঙ্কা।
এখন হইতে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করুন।

মাত্র ২৪ বছর আগের ঘটনা—অথচ সবই কেমন সেকেলে মনে হয়, এবং উভয় বিজ্ঞাপনদাতাই অদ্যাবধি জীবিত।

গোপাল হালদার বর্তমানে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং সমাজ-কর্মীরূপে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। আমি যখন শনিবারের চিঠিতে প্রবেশ করি তখন গোপাল হালদার কারাবাসে, এই রকম শুনেছিলাম। তাঁর একটা লেখা সজনীকান্তের মারফৎ পাই। লেখককে তখনো আমি দেখিনি। যে লেখাটি পেলাম সেটি একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ গল্প, ছন্দে লেখা। অতএব তাঁকে আমি কবি এবং ব্যঙ্গলেখক রূপেই প্রথম জানবার সুযোগ পেলাম। তারপর অনেক বছর পরে যখন তাঁর সঙ্গে সত্যিই পরিচয় ঘটল, তখন দেখি আর এক ব্যক্তি: ব্যঙ্গ কবিতার লেখকরূপে তাঁকে আর চেনা গেল না। হ'তে পারে হয় তো ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন বলেই তাঁর জেল হয়েছিল।

লেখাটির নাম 'সোফা ও খোঁপা'। নানা ছন্দে রচিত একটি প্রথম শ্রেণীর ব্যঙ্গ গল্প। শনিবারের চিঠির ১১ পৃষ্ঠা অধিকার করেছিল সেটি। কবি কাউপারের অনুসরণে—কবিতাটির আরম্ভ এই রকম—

I sing the Sofa
তার সনে জড়িত যে খোঁপা
চিরদিন রহিবে স্মরণে
ধরণে গড়নে আর নড়নে-চড়নে।

তোমারে প্রণমি তাই কবি কাউপার!
(বহু কাউ করিয়াছি পার
হোটেল টেবিলে
শুভ্র ট্যাঁকে ফিরিয়াছি শোধ করি বিলে
ভুলিয়া ঠেকুর, কিন্তু) তবু
ও হে মহাকবি! কভু
ভাবিনি গাহিতে হবে সোফার গীতিকা—

সোফার উপরে আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উচ্চ ধাপে উত্তীর্ণ দুই প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি এই কাহিনীর বিষয়। শেষ দিকের একটুখানি উদ্ধৃত করলেই তার সামান্য কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে—যদিও কাহিনীর বারো আনা ব্যঙ্গ পিছনে ফেলে আসতে হল শেষ দিকের একটি দৃশ্য দেখাবার জন্য। পূর্ব পর্যায়ের কিছু কিছু অনুমানে বুঝে নিতে হবে, কেন না সবটা কাহিনী উদ্ধারের স্থান নেই। কাহিনীটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথমে ভূমিকা, তার গোড়াটা উদ্ধৃত করেছি। দ্বিতীয় অংশে "সোফার আত্মকথা"। তৃতীয় অংশে "খোঁপার আত্মকথা"। সর্বশেষ—"উপসংহার"। নিচের উদ্ধৃতিটি "খোঁপার আত্মকথা"।

গুমরিয়ে উঠেছিল সোফা,
চমকিয়ে উঠেছিল গোপা,
মিটারের হাতখানি তবু নাহি বাধা মানি
খুঁজেছিল প্রিয়তম খোঁপা।···

ঠোঁট দু'টি পরশিতে খোঁপা
চমকিয়া উঠে বসে গোপা—
ছাড়ো ছাড়ো, শোনো শোনো! উঁহু উঁহু নো-নো-নো-নো!
দুম ক'রে ভেঙে পড়ে সোফা!

তার পরে চারিদিকে সাড়া
দুপ্ দাপ্ প্রবেশিছে কারা ?
মাতা আসে, আসে পিতা, আসে খাল আসে তিতা,
ভিড় ক'রে আসে বুঝি পাড়া !

ঠ্যাং খসা সোফাটির পরে
চম্‌কিয়া ত্'জনায় ধ'রে
দৃঢ় করি ভুজপাশে আছে তারা এক পাশে
—দেখছিল সবে ঢুকে ঘরে।

মিটারের দাঁতে ঝোলে খোঁপা !
টাক মাথা আগলায় গোপা—
তবু এ সে-ঠোঁটে রয় কালো মোজা খানকয়
সীনটি জমিয়া ওঠে তোফা !

এর পর উপসংহারটি কবির কল্পনা ও রচনাশক্তির অদ্ভূত পরিচয় বহন করছে—

মহাকবি পোপ !
বেণী-সংহারের ফলে যেই প্রেম কোপ
উঠেছিল জ্বলি,
গিয়েছ তা বলি
তোমার সুঠাম ডান-বামহীন ছন্দে।
অধম তোমারে বন্দে
নাহি নিজে গাহিবার আশা
না জোগায় ভাষা,
তাই মৌডিয়ম-মুখে বলি
বেণী রূপে কিম্বা খোঁপা রূপে ছলি
কেমনে ধরিল একদিন
মোজা নামে হীন
পাদ বস্ত্র প্রেমিকের প্রাণ—
টকিং রাখিল ব্ল টকিং-এর মান।
গাহিয়াছে এক অর্ধ, পোপ,
আমি গাহি অন্য অর্ধ, করিও না কোপ,
—প্রেমের সংহার হয় বেণীর সংহারে
বিয়ের বাজার খোলে খোঁপার বাহারে,
অতএব জয় গাহি, বাঙলার বিদূষীর খোঁপা
I sing the sofa. (নবেম্বর ১১৩৩)

আর, এক কবি—জগদীশ ভট্টাচার্য। সদ্য এম-এ পাস, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণধর্মে উচ্ছল। সর্বদা হাসি মুখ। কাব্য রচনায় মহা উৎসাহ। কলেজ বয়ের ছদ্মবেশে উৎকৃষ্ট সরস কবিতা লিখছে তখন। আর ছদ্মবেশই বা বলি কেন, কলেজের গন্ধ লেগে আছে গায়ে। কলেজ থেকে সদ্য বেরিয়ে এলেও কলেজের মোহাবরণ থেকে আদৌ মুক্ত নয়, তার কলমেও কলেজ-বয়ের গন্ধ—

"রোজ বিকেল বেলা এই জানলাখানির
ঠিক সামনে দিয়ে
ওই ঘড়ির কাঁটার সোয়া পাঁচটা হলে
এই রাস্তা বেয়ে ধীরে যায় সে চলে।
তুমি চিনবে ওকে
তার করুণ চোখে
খুব ক্লান্ত বিষণ্ণতা ফুটবে তাতে
খান তিনেক পুঁথিও আর থাকবে হাতে ;
যাবে আপন মনেই তার মেয়েলি বাঁটের
ছাতা বাঁ হাতে নিয়ে।
রোজ বিকেল বেলা এই জানলাখানির
ঠিক সামনে দিয়ে।"

ক্রমে তার মধ্যে একটি একটি ক'রে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার হবে, এবং তোমার অবস্থা কি হবে বলা বাহুল্য। অর্থাৎ—

"ঠিক দুদিন পরেই বাসা বদলে এদিকে
তুমি আসবে চলে।
তাহারো দুদিন পরে ধরবে পিছু ;
ও　বাড়িয়ে বলিনি আমি তেমন কিছু ;
—ছেলে তোমার মতো
দেখে এলাম কত !"...(নবেম্বর ১১৩৪)

কাছে ব'সে দূর থেকে দেখার ছল ! অর্থাৎ "দেখে এলাম কত" এই বিজ্ঞজনোচিত কথাটাই একটি ছলনা। বর্তমানের কবিমানসীর লেখকের এটি আদি কবিমানস ! [ক্রমশঃ।

ওয়ার্ডসওয়র্থের দেশে

শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত

অল্প কিছু দিন হোল ওয়ার্ডসওয়র্থের দেশ লেক-পল্লী থেকে বেড়িয়ে এলাম।

ছেলেবেলা থেকেই কত পড়েছি লেক-পল্লীর কথা, ছবি দেখেছি, অধ্যাপক মশাইরা ওয়ার্ডসওয়র্থ কবিতাবলী পড়ানর সময় বর্ণনা দিয়েছেন লেক ডিষ্ট্রিক্ট দেশটি কেমন, কবির মনের ওপর এ স্থানটির প্রভাব কতটা ইত্যাদি। এবার যখন সত্যিই সেই বহুকল্পিত লেক-পল্লীতে যাবার সুযোগ ঘটে গেল, তখন স্বভাবতঃই খুব খুশি না হয়ে পারিনি।

লেক ডিষ্ট্রিক্ট এলাকা ইংল্যাণ্ডের উত্তরে কাম্বারল্যাণ্ড, ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড ও ল্যাঙ্কাশায়ার নামে তিনটি জেলা নিয়ে প্রায় চারশো বর্গমাইল জুড়ে অবস্থিত। Windermere, Derwentwater, Ullswater, Coniston, Grasmere ইত্যাদি লেক, ছোট বড় পাহাড় আর উপত্যকা মিলে এ অঞ্চলটির প্রাকৃতিক শোভা অপরূপ। প্রতি বছর দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক এখানে বেড়াতে আসেন। অবশ্য আরেকটি কারণেও লেক পল্লীর নামডাক বেড়ে যায়। ওয়ার্ডসওয়র্থ, কোলরিজ, ডি কুইন্সী প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীরা এ এলাকায় বাস করতেন আর রচনা করে যান লেক-পল্লীর ওপর নানা কাব্য।

গত শীতের রোদে-ঝলমল এক দুপুরে—ইংরেজরা যাকে glorious sunny day বলে খুশীতে উপচে ওঠেন—লিভারপুল থেকে একটি কোচ চড়ে লেক-পল্লীর অন্যতম শহর অ্যামবলসাইডে আসা গেল। সঙ্গী হলেন মিঃ হোয়েব নামে এক নরওয়েজিয়ান ভদ্রলোক। লিভারপুলে আমার সঙ্গে একই হোটেলে ছিলেন। অসলো থেকে এসেছেন ব্যবসার কাজে বিলেতে। ইংরেজী ভাষায় তাঁর জ্ঞান পর্যাপ্ত ছিল না মোটেই, কিন্তু তিনি নাকি মাতৃভাষায় অনুবাদ পড়েছেন ওয়ার্ডসওয়র্থের অনেক কবিতার। অনেকটা সে আকর্ষণে, অনেকটা আবার আমার সনির্বন্ধ অনুরোধের বটে, হোয়েব সাহেব শেষ পর্যন্ত আমাকে তাঁর সঙ্গ দানে বাধিত করলেন।

গ্রাসমিয়ারে ওয়ার্ডসওয়র্থের ঘর

লিভারপুল থেকে প্রায় আশী মাইল রাস্তা অ্যামবলসাইড। পথে পার হলাম বিখ্যাত উইণ্ডারমিয়ার হ্রদ। এ হ্রদের প্রায় মুখেই বিরাজিত ছোট্ট সুন্দর শহর অ্যামবলসাইড। কোন লেক কবির আস্তানা ছিল না সত্যিই, কিন্তু তাঁরা সব বাস করতেন কাছাকাছিই এবং সে আকর্ষণে এখানে ভীড় জমাতেন জ্ঞানী-গুণী বহু লিকপাল।

অ্যামবলসাইড—ইয়ুথ হোটেল সঙ্ঘ পরিচালনা করেন এরকম একটা বেশ বড় হোটেল আছে। এ সঙ্ঘের একজন সভ্য হিসেবে আমি ওখানেই রাত কাটালাম। হোয়েব সাহেবও সেখানে থাকলেন অবশ্য আমার অতিথি হয়ে।

১৯৩০ সালে প্রথম গড়া হয় 'ইয়ুথ হোটেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়েলস।' যুবক-যুবতীরা দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে যাতে অল্প খরচে ভাল জায়গায় থাকতে পারে, তাই ছিল এই সঙ্ঘ গড়বার প্রধান উদ্দেশ্য। যা বর্ণনা করে বলা হয়েছিল To help all of limited means, especially young people, to a greater knowledge, care and love of the country side, particularly by providing hostels and other simple accommodation for them in their travles—অর্থাৎ দেশভ্রমণের সময় বাস করবার জন্য সারাদেশে হোটেল তৈরী করে পরিমিত সামর্থ্যের ছেলে-মেয়েদের গ্রাম অঞ্চলের দিকে টান জন্মানোতে সাহায্য করা।

আজকাল বৃটেন, আমেরিকা, ইউরোপের অধিকাংশ দেশগুলিতে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব দেশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত, সে সব দেশে ইয়ুথ হোটেল খোলা হয়েছে। এমন কি, আমাদের ভারতবর্ষে এরকম প্রায় আশীটা হোটেল আছে।

যাই হোক, অ্যামবলসাইড হোটেলে পৌঁছে দেখি যে 'টীন-এজার' (Teen-ager) থেকে সুরু করে ইন্-টোয়েন্টিদের (in-twenties) ছেলে-মেয়েতে ও-জায়গাটা একেবারে সরগরম। সকাল ছোট বড় দল বেঁধে লেক-ভ্রমণে বেরিয়েছে। কেউ সাইকেলে, কেউ হেঁটে, কেউ বা করছে হিচ-হাইকিং। হিচ-হাইকিং মানে হাত দেখিয়ে চলমান গাড়ী থামিয়ে চালক মশাইর মর্জি মত খানিকটা যাওয়া যায়। তার পর সেখান থেকে আবার আরেকটা গাড়ী থামিয়ে আরও কিছু দূর। এভাবে ক্রমশঃ এসে যায় গন্তব্য জায়গা অথবা কোথাও তার আশে-পাশে।

বাচ্চাদের হৈ-হল্লাতে তো কানে প্রায় তালা লাগবার উপক্রম। লাউঞ্জে বসে কেউ ধরেছে গান। অবশ্য শ্রোতাকে প্রায় অজ্ঞান করে দেবার মতনই সে গান। আবার কেউ মরিয়া হয়ে গাজিয়ে চলেছে উঁচু গ্রামের বাজনায় বেসুরো তান। কেউ মহোৎসাহে পিটছে তাস, কেউ বা লিখছে পাতার পর পাতা ডুম-ডায়েরী। লেকে ঘুরে কয়েকটি ছেলে ও মেয়ে তো কোন কাজেই মন বসাতে না পেরে

গতিতে সুরু করে দিল রক্ অ্যাণ্ড রোল নৃত্য। অবশ্য নাচ আরম্ভ করবার আগে এদিক-ওদিক ভাল করে দেখে নিতে ভুললো না যে ওয়ার্ডেন মশাই ত্রিসীমানার মধ্যেও নেই। তিনি বড় সোজা ব্যক্তি নন।

রাত আটটায় ডিনারের ঘণ্টা বাজল। আমরা তিল মাত্র দেরী না করে চটপট টেবিল দখল করে বসলাম। লম্বা লম্বা কাঠের টেবিল ও সেই মাপের বেঞ্চি।' অনেকটা আধুনিক কলকাতার বিয়ে-বাড়ির বসবার ব্যবস্থার মত বলতে পারা যায়।

খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটা মন্দ হয়নি। সেকেণ্ড হেল্পিং নিজে থেকেই হয়। 'আরেকটু' আর বলতে হয় না। বরঞ্চ অনেকেই 'আর না' বলবার সুযোগ পান।

'দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া' প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি, শেষ পদ অর্থাৎ 'মধুরেণ সমাপয়েতের' মধুর অংশটি অর্দ্ধ সমাপ্ত রেখেই সকলে যে যার আসন ছেড়ে ছুড়-ছুড় করে পালাচ্ছে। আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। এরা দৌড়াচ্ছে কেন? আগুন-টাগুন লাগল নাকি, না অন্য ঘরে নতুন কিছু খাবার-দাবারের আয়োজন আছে?

অকস্মাৎ একটি সুইস মেয়ে অর্থাৎ সুইজারল্যাণ্ড দেশের ললনা আমার সামনে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, একি! এখনও বসে আছ? শীগগির, খুব শীগগির পালাও।

সমস্ত ব্যাপারটার মাথামুণ্ড কিছুই তখনও আমার হৃদয়ঙ্গম হয়নি! কাজেই বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি? কেন? পালাব কেন? (সত্যি বলতে লজ্জা নেই, আমি তখনও মনে মনে ভাবছি যে সুইট ডিশটার আরেকটা হেল্পিং হোলে মন্দ হোত না)।

কেন? মেয়েটি বলে ওঠে, এখুনি টেরটা পাবে, কেন।

এদিকে অত বড় ডাইনিং হলটা দেখি প্রায় খালি।

হঠাৎ এ কি! ওয়ার্ডেন মশাই বেশ দ্রুত পদসঞ্চারে আমারই দিকে এগিয়ে আসছেন। প্রায় জনশূন্য ঘরটির দিকে একটা রোষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমাকে হেঁকে বললেন, তুমি কোন কাজ পেয়েছ?

আমি ততক্ষণে রীতিমত নার্ভাস। আমতা আমতা করে বললাম, স্যার কাজ? কি কাজ স্যার?

কিন্তু ওয়ার্ডেন সাহেবের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অপার আনন্দ লাভ করলেন বলে মনে হলো আমার জবাবে।

বললেন, তুমি তবে কিছুই পাওনি? ঠিক আছে। ঐ আছে বালতি, কাপড় ও এক-টিন সাবান। যত তাড়াতাড়ি পার প্লেটগুলি বেশ পরিষ্কার করে ধুয়ে-মুছে ফ্যাল তো?

মাথায় বাজ পড়লেও বোধ হয় অতটা মুষড়ে পড়তাম না। এখন অবশ্য বুঝতে দেরী হোল না কেন সুইস-হিতৈষিণী চম্পট দেবার সদুপদেশ দিয়েছিল। চোর পালানোর পর বুদ্ধি বাড়ল আর কি?

বেচারী ট্রোয়ের সাহেব আমার সঙ্গেই খেতে বসেছিলেন। তিনি প্রায় তথা ইয়ুথ হোস্টেলের অতিথি বলে কিন্তু ওয়ার্ডেন মশাই দয়া মায়া কোন চিহ্নই দেখালেন না। তার উপরেও কাজের ভার এসে মিলল। কি আর করি। আমরা দু'জন বিদেশী কিলা বাক্য ব্যয়ে বালতির পর বালতি জল, সাবান ও ন্যাকড়া সহযোগে পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে কর্ত্তব্য সম্পাদন করে লাউঞ্জে ফিরে এলাম। অবশ্য ওয়ার্ডেন সাহেবের সপ্রশংস সাধুবাদ অর্জন করেই। লাউঞ্জে এসে দেখি, সেই সুইস-তনয়া রহস্য বা রোমাঞ্চ সিরিজ-ভুক্ত কোন লোমহর্ষণকারী উপন্যাসে গভীর মনোনিবেশ করেছে—বেশ আরাম করে আগুনের ধারে বসে।

আমাদের দুই মূর্ত্তিকে দেখে সকলেরই মুচকি মুচকি হাসি। অকালপক্ক এক ইংরেজ-দুহিতা বলে উঠল: Ah! you two are back at last. We suppose you enjoyed it. পাশ থেকে আরেকটি মেয়ের টিপ্পনী: Did not you? বলেই তাদের সে কি হাসি! প্রায় লুটোপুটি খায় আর কি। কিন্তু কি আর করব? আমরাও তাদের হাসিতে যোগ দিলাম।

এ বিষয়ে আর কোন ভুল কিন্তু করিনি, পরদিন সকালে প্রাতরাশের বোধ হয় বেশ খানিকটা ফেলে রেখেই দে ছুট। ইয়ুথ হোস্টেলগুলির নিয়মই নাকি ঐ। যে সভ্য-সভ্যারা কোন হোস্টেলে রাত কাটাতে আসে, তাদের সেখানে কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। অবশ্য বিশদ ভাবে বুঝিয়ে না দিলেও চলবে যে, আমার বা বন্ধুবর ট্রোয়ের সাহেবের মত নেহাতই গোবেচারা দু'-একজন ছাড়া আর সকলেই 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' এই অমূল্য নীতিকথাটি প্রচুর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে পরিত্রাণ লাভ করে।

যাই হোক, সকালের চা ও টার পালা সাঙ্গ হবার পর গ্রাসমিয়ারের পথে রওনা হোলাম। পদব্রজেই মাইল চারেক রাস্তা। অবর্ণনীয় ভাবে সুন্দর পথের দু'ধারের দৃশ্য! এক পাশে ছোট-বড় পাহাড়ের কোলে লেকের নীল জল—আরেক পাশেও পাহাড় আর রং-বেরঙের গাছপালা। পাহাড়ের ঢালু বুকে মেষশাবক আর বিলিতি গরু—আর গাছের ডালে ডালে গাইয়ে পাখীর মেলা।

গ্রাসমিয়ারের খ্যাতি দ্বৈত। প্রথমত, সমস্ত লেক এলেকার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে আকর্ষণীয় বোধ হয় এই গ্রাসমিয়ার। দ্বিতীয়তঃ, কবি ওয়ার্ডসওয়রথ ও তাঁর বোন ডরোথী এখানেই বাসা বাঁধেন এবং গ্রাসমিয়ারকে অমর করে রেখে যান তাঁদের কাব্যে ও
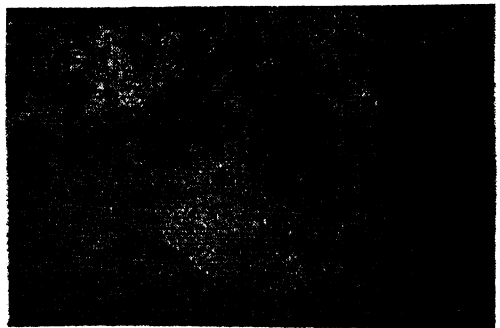
St. Oswald Church এ যাবার পথে তৃষ্ণার্ত পথিকদের জন্য নির্মিত একটি পানীয় জলের কল। কবি ওয়ার্ডসওয়রথের স্মৃতির উদ্দেশে।

ছন্দে। ওয়ার্ডসওয়রথের এক জীবনীকার সত্যিই লিখে গেছেন : Grasmere is twice blessed, for it has a natural wonder of its own and the glory that Wordsworth gave it.

কবি কোলরিজ গ্রাসমিয়ারকে জানতেন, রাস্কিন এই পল্লীটিকে ভালবাসতেন, ডি কুইন্সী ও সাদে এর কথা সুললিত ছন্দে লিখতেন।

ওয়ার্ডসওয়রথ গ্রাসমিয়ারে এসেছিলেন ১৭৯৯ সালে। বোন ডরোথীকে নিয়ে। তখন কবির জীবনে পার হয়েছে উনত্রিশটি বসন্ত। Tintern Abbey লিখে তিনি তত দিনে বেশ নাম করেছেন, কিন্তু এই গ্রাসমিয়ারেই হোল তাঁর কাব্যপ্রতিভার, তাঁর লেখনীশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ।

ওয়ার্ডসওয়রথ ও ডরোথী প্রকৃতিকে ভালবাসতেন সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাঁদের মিতালী ছিল গ্রাসমিয়ারে আলো-বাতাস, শীত-বসন্ত—যেন প্রতিটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে।

ইংরেজী সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটা অপূর্ব সম্পদ 'ডরোথীর জার্নাল'। এটা পড়লে দেখতে পাই, কি নিবিড় ভাবে ভাই আর বোন উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃতিকে।

যেমন ডরোথী একদিন লিখলেন :

....Afterwards William lay, and I lay, in the trench under the fence—he with his eyes shut, and listening to the waterfalls and the birds. There was no one waterfall above another—it was sound of waters in the air—the voice of the air. William heard me breathing, and rustling now and then, but we both lay still, and unseen by one another....

এ ধরণের অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে ডরোথীর জার্নাল থেকে—যা থেকে মূর্ত হয়ে ওঠে কেমন একহারা একপ্রাণ ডরোথী হয়েছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে।

গ্রাসমিয়ারে পৌঁছে প্রথমেই গেলাম ওয়ার্ডসওয়রথের বাড়ী Dove Cottageএ। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বিয়ে করে কবি সহধর্মিণী মেরীকে এখানে নিয়ে এলেন। কবি-বন্ধুরা তো রীতিমত অবাক হয়ে যেতেন যে, এত ছোট বাড়ীতে কি করে তাঁদের স্থান সঙ্কুলান হোত! ওয়ার্ডসওয়রথ, মেরী, ডরোথী, কবির ছেলে-মেয়েরা। মাঝে মাঝে আবার কোলরিজ, ডি কুইন্সী বা মেরীর সহোদরা সারাও এখানে এসে থাকতেন। একবার এলেন সার ওয়াল্টার স্কট তাঁদের সম্মানিত অতিথি হয়ে। তিনি দেখলেন যে, ডরোথী ও মেরী রান্নাঘরেই আহার পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন। সার ওয়াল্টার সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হলেন, কারণ বিলেতে তাঁদের পর্য্যায়ের মহাজনদের বাড়ীতে একই কামরায় রান্নাবান্না ও আহার করবার রেওয়াজ ছিল না মোটেই। পরে অবশ্য তিনি বুঝতে পারলেন যে, অত ছোট বাড়ীতে একই ঘরে একাধিক কাজকর্ম সারা ছাড়া আর উপায় নেই।
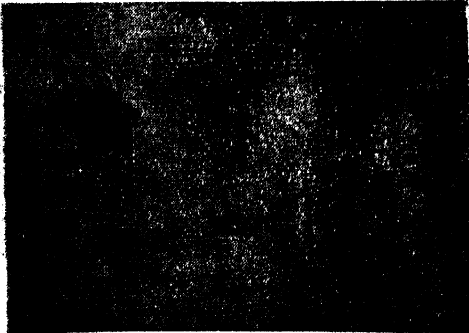
গ্রাসমিয়ারে কবির বাড়ী Dove Cottage

ডাভ কটেজের সামনেই ছোট সুন্দর একটা বাগান। মাঝে মাঝে খুব ভোরে উঠে বাগানে বসে থাকতেন ওয়ার্ডসওয়রথ। দু-নয়ন ভরে দেখতেন প্রকৃতির খেলা। সুন্দর একটা পাখী শিষ দিয়ে উঠল, একটা ফুলগাছ বাতাসে দুলছে, কিংবা হয়ত গাছ থেকে টুপ করে একটা আপেল খসে পড়ল। একদিন এই বাগানে বসেই পাখীর কূজন শুনতে শুনতে কবি লিখলেন :

In this sequestered nook how sweet
To sit upon my orchad seat !
And birds and flowers once more to greet
My last year's friends together.

ডাভকটেজের ভেতরে সব ঘুরে দেখলাম। দেখলাম, সেই ঘরটি যেখানে চার্লস ল্যাম্ব বা ডিকুইন্সী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আলাপ করে যেতেন কোলরিজের সঙ্গে। সেই ঘরটিও দেখলাম, যার দেওয়াল ডরোথী সাজিয়েছিলেন খবরের কাগজের টুকরো দিয়ে। আরও দেখলাম, সেই সিঁড়ি যা বহন করছে ওয়ার্ডসওয়রথ ও তাঁর মনীষী বন্ধুদের অগণতি পদচিহ্ন আর পদধূলি। তাঁদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র সব এখনও সযত্নে রাখা আছে। দেড়শ' বছর আগে যেমনি ছিল এখনও ঠিক যেন তেমনি।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ডসওয়রথ ডাভ-কটেজ ছাড়লেন। আর ডি কুইন্সী সেখানে এলেন। ডি কুইন্সী তাঁর কাব্য, আফিং ও স্বপ্নকে সঙ্গী করে প্রায় বিশ বছর কাটালেন ডাভ-কটেজে। তাঁর Confession গ্রন্থে তিনি লিখলেন :

This was the Scene of my struggles, the most tempestuous and bitter in my own mind, this the scene of my despondency and unhappiness, this the scence of my happiness.

এ Scene বা দৃশ্যপট হোল গ্রাসমিয়ারের—আর ডাভকটেজের।

ডাভকটেজ থেকে বেশী দূরে নয়—প্রায় ছ'শো বছরের প্রাচীন গির্জা St. Oswald Church। পাশ দিয়েই বইছে রথে নদী।

গির্জায় যাবার পথে কোন্ এক অজ্ঞাত বন্ধু তৃষ্ণার্ত পথিকদের জন্য একটি জলের কল নির্মাণ করিয়ে তা অর্পণ করেছেন অমর কবির স্মৃতির উদ্দেশে।

কবি কখন কখন এই গির্জার নির্জন প্রাঙ্গণে এসে নীরবে বসে থাকতেন। কখনও বা গোধূলিতে কোন অপরাহ্ণে তিনি ও ডরোথী

ঘাসের ওপর দেহ এলিয়ে দিতেন। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করতেন চৈতালী পবনের 'মর্মরহীন মর্মর' (that noiseless noise which lies in the summer air)।

ওই গির্জাই হোল সেই গির্জা—যাকে কবি তাঁর "The Excursion কাব্যে বর্ণনা করেছেন :

Not raised in nice proportions was the pile
But large and massy for duration built,
With pillars crowded, and the roof upheld,
by naked rafters intricately crossed,
like leafless under boughs, mid some thick grove
All withered by the depth of the shade above.

এই গির্জারই চত্বরে ওয়ার্ডসওয়রথের অন্তিম সমাধি। পাশেই শায়িত হার্টলী কোলরিজ। কবি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের পুত্র হার্টলী যখন ৫২ বছর বয়সে মারা গেলেন, তখন ভগ্নহৃদয় কবি ওয়ার্ডসওয়রথ গির্জার অধ্যক্ষকে অনুরোধ করলেন যে, হার্টলীর সমাধির কাছেই একখণ্ড জমি যেন তাঁর নিজের জন্য রাখা হয়। তাঁর বয়স তখন আশী পার হয়েছে। তিনি বলছিলেন :—

Let him (Hartley) lie by us; he would have wished it.

ভারী সাদাসিধে ওয়ার্ডসওয়রথের সমাধি-স্তম্ভ। ইট দিয়ে তৈরী একটি সাধারণ ফলকের ওপর খোদাই করা আছে শুধু কবি ও কবিপত্নীর নাম এবং তাঁদের মৃত্যুর সন :

William Wordsworth
1850

Mary Wordsworth
1859

কবি নাকি সব সময়ই এই ইচ্ছা প্রকাশ করতেন যে, তাঁর সমাধি যেন নিরাড়ম্বর হয়। তাঁরই এক আত্মীয় Bishop Wordsworth এর কথায় :

"He desired no splendid tomb in a public mausoleum; he reposes beneath the green turf, among the dalesmen of Grasmere, under the sycamores and yews of a country church-yard, by the side of a beautiful stream amid the mountains he loved.

প্রকৃতি-পাগল আরেক জন কবি William Watson ওয়ার্ডসওয়রথের সমাধি দেখতে এসে অভিভূত হয়ে পড়ে আবেগভরে লিখে গেলেন :

The old rude church with bare bold tower is here;
Beneath its shadow high-born Rotha flows,
Rotha remembering well who slumbers near,
And with cool murmur lulling his repose.

সহধর্মিণী মেরী ও সহোদরা ডরোথী সহ ওয়ার্ডসওয়রথ পরিবারের অনেকেরই অন্তিমশয্যা রচিত হয়েছিল এই গির্জার প্রাঙ্গণে।

গির্জার ভেতরে দেওয়ালের গায়ে ওয়ার্ডসওয়রথের প্রতিমূর্তি-সম্বলিত একটি মর্মর-স্মৃতিফলক দেখলাম। এতে খোদাই করা কবির গুণবাচক অনেক কথার ভেতর লেখা আছে :

A true philosopher and poet
......Failed not to lift
up the heart to holy things..
.....Tired not maintaining
the cause of the poor and simple.

ইত্যাদি ইত্যাদি।

Rydal Mount যেখানে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

Hawkshead এ Anne Tyson Cottage যেখানে বাল্যকালে কবি বাস করতেন।

কবির সমাধি-স্তম্ভ। দাঁড়িয়ে আছেন লেখকের বন্ধু মিঃ ষ্টোরের।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ডসওয়রথ গ্রাসমিয়ারের পাশের গ্রাম Rydal এ Rydal Mount নামে একটি বাড়ীতে উঠে এলেন। Rydal লেকের সামনেই একটু উঁচুতে Rydal Mount।

এই বাড়ীতেই কবি অতিবাহিত করেন জীবনের শেষ সাঁইত্রিশটি বছর। অনেক কারণে তাঁর জীবনে এ সময়টা হয়ে আছে বিশেষ স্মরণীয়।

এখানেই তিনি রচনা করেছিলেন Ecclestial Sonnet ও তাঁর কাব্যগুচ্ছের প্রায় অর্দ্ধেক।

এখানে D'Quincy ও Hartley Coleridge ওয়ার্ডসওয়রথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। Southeyর মৃত্যুর পর যখন ওয়ার্ডসওয়রথ ইংলণ্ডের রাজকবির আসন অলংকৃত করলেন, তখনও তিনি এখানেই। অবশেষে তাঁর শেষ নিশ্বাসও পড়েছিল এ বাড়ীতেই।

Rydal Lake এর কাছেই Nab scarএর পেছনে Nab Cottage। এই কুটিরে বাস করতেন Mr. Simpson নামে এক বৃদ্ধ কৃষক। ডি কুইন্সী তখন থাকতেন মাইলখানেক দূরে গ্রাসমিয়ারের ডাভকটেজে, যেখানে এর আগে কয়েক বছর কাটিয়ে গিয়েছিলেন ওয়ার্ডসওয়রথ ও ডরোথী।

ডি কুইন্সী সিম্পসনের মেয়েকে ভালবেসে ফেললেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই কৃষককন্যা হলেন তাঁর ঘরণী। ডি কুইন্সীর বয়স তখন একত্রিশ। যদিও ততদিনে আফিমের সর্বনাশী নেশা ডি কুইন্সীকে প্রায় সম্পূর্ণই গ্রাস করেছে, যদিও ডি কুইন্সী সময়ে অসময়ে ভবঘুরের মত পর্যটন করে বেড়াতেন স্থান থেকে স্থানান্তরে, তবুও তাঁর পত্নী তাঁকে ভালবেসেছিলেন প্রাণ দিয়ে, পতির প্রতি বিশ্বস্তা ছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বিয়ের পর প্রায় বিশ বছর জীবিতা ছিলেন ডি কুইন্সীপ্রিয়া। ডি কুইন্সী নিজে বেঁচেছিলেন আরও প্রায় বাইশ বছর।

এই Nab Cottage-এই তাঁর জীবনের শেষ এগারটি বছর কাটিয়েছিলেন হতভাগ্য হার্টলী কোলরিজ।

হার্টলী যখন ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন তাঁর বাবা স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ সুললিত কাব্যে লিখলেন :

But thou my babe, shall wander
like a breeze,
By lakes and sandy shores, beneath the crags
Of ancient mountains. So shalt thou
see and hear
The lovely shapes and sounds intelligible
Of that eternal language which thy
God utters.

হার্টলী যখন ছয় বৎসরের ছোট্ট শিশু, তখন পিতৃবন্ধু ওয়ার্ডসওয়রথ তাঁর দুরন্তপনা লক্ষ্য করে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কবি তাঁর আশঙ্কাকে রূপ দিলেন ছন্দে।—

O blessed vision ; happy child !
Thou art so exquisitely wild,
I think of thee urth many fears
For what may be thy lot in future years.

ওয়ার্ডসওয়রথের আশঙ্কাই যেন শেষ পর্যন্ত সত্যি হোল। অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফল ফলতে দেরী হোল না। অকালে প্রাণ হারালেন দুর্বলচিত্ত, চঞ্চলমনা হার্টলী কোলরিজ।

ওয়ার্ডসওয়রথ মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তেন তাঁর সাথীদের সঙ্গে। অনেক দূর চলে যেতেন লেক-পল্লীর আঁকা-বাঁকা রাস্তা ধরে।

এভাবেই একদিন বেড়াতে বেড়াতে ওয়ার্ডসওয়রথ ব্যাখ্যা করে দিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা Ode to Immortalityর একটি বহু-বিতর্কিত স্তবকের। এ স্তবকটি হোল :

Not for these I raise
The song of thanks and praise ;
But for those obstinate questionings
Of sense and outward things,
Fallings from us vanishings ;
Blank misgivings of a creature
Moving about in worlds not realized,
High instincts before which our
mortal nature
Did tremble like a guilty thing surprised.

একদিন কবি রাইডালে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় এক বন্ধু তাঁকে এর মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে দিতে অনুরোধ জানালেন।

তাঁর অনুরোধ শুনে কবি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর রাস্তা পেরিয়ে একটি বাড়ীর ফটক ধরে দাঁড়ালেন। ফটকটির পাঁচটি শিক। দৃঢ় মুষ্টিতে তিনি একটি শিক ধরলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন :

"There was a time in my life when I was often forced to grasp, like this, something that resisted, to be sure that there was anything outside of me. This gate, this bar, this road these trees fall away from me and vanished into thoughts. I was sure of the existence of mind,—I had no sense of the existence of matter.

Rydal mount ভবনের বর্তমান অধিবাসী Mr. Hulbert এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি এ বাড়ীতে বাস করছেন গত ত্রিশ বছর ধরে। স্বয়ং সাহিত্যসেবী ও ওয়ার্ডসওয়রথের একজন বিশিষ্ট অনুরাগী।

Hulbert সাহেব বললেন যে, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভারতীয়দের অনুরাগ লক্ষ্য করে তিনি খুবই আনন্দ অনুভব করেন। আরও বললেন, তাঁর বাড়ীর দর্শনার্থীদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশই ভারতীয়।

ঠিক একই কথা বলেছিলেন St. Oswald গির্জার প্রাঙ্গণে কবি সমাধির সামনে এক বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলা। এ [illegible] তাঁর জন্ম ও কর্ম। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করে [illegible] শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে যান কবির স্মৃতির উদ্দেশে [illegible] কত ভারতীয় দর্শনার্থীর সঙ্গে যে তাঁর [illegible] তার সংখ্যা মনে রাখা দুষ্কর। তাঁদের [illegible]

ওয়ার্ডসওয়রথের সম্পর্কে আলাপ করে দেখেছেন যে, কবি-বিষয়ক ওঁদের জ্ঞান সাধারণ ইংরেজ ছেলেদের চেয়ে বেশী। বেশ কয়েক জন ভারতবাসী নাকি ওয়ার্ডসওয়রথ, কোলরিজ, সাদের কবিতা তাঁকে গড়গড় করে মুখস্থ বলে শুনিয়েছেন।

Hulbert সাহেব বললেন যে প্রাচ্যে নীল নদীর দেশ মিশর পর্যন্ত তিনি গিয়েছেন, কিন্তু তাজমহলের দেশ ভারতে আসবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর বহুদিনের। তিনি বললেন :

I have been to the land of the Niles in the east, but the land of the Taj Mahal always fascinates me.

Hulbert সাহেবের থেকে বিদায় নিয়ে Ambleside-এ ফিরে এলাম। সেখানে একটি রেস্তোরাঁয় পেট ভরে খেয়ে নিলাম 'ফিশ অ্যাণ্ড চিপস্' (Fish & chips) যাকে প্রায় বিলেতের জাতীয় খাদ্য বলেই অভিহিত করা যায়। তারপর আমি ও ট্রৌয়ের সাহেব যাত্রা করলাম নিকটবর্তী গ্রাম Hawkshead এর উদ্দেশে।

Ambleside থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে Hawkshead লেক এলাকার একটি ছোট সুন্দর পল্লী। এখানকার উচ্চ-বিদ্যালয়ে ওয়ার্ডসওয়রথ ছেলেবেলায় ছাত্র ছিলেন। তিনি যে বেঞ্চিতে বসতেন, তাতে তিনি ছুরি দিয়ে নিজের নাম খোদাই করেছিলেন। সেটি এখনও যত্ন সহকারে রক্ষিত হচ্ছে। এ বিদ্যালয়ের সঙ্গে কবির অনেক স্মৃতি জড়িত। তাঁর যখন এ স্কুল ছেড়ে দেবার সময় এল, তখন আবেগভরে তিনি লিখেছিলেন :

Dear native regions, I foretell,
From what I feel at this farewell,
That, wheresoe'er my steps may tend,
And whersoever my course shall end
If in that hour a single tie
Survive of local sympathy,
My soul will cast the backward view
The longing look alone on you.

Hawkshead এ Anne Tyson Cottage নামে যে বাড়ীটিতে ওয়ার্ডসওয়রথ বাস করতেন সেটিও দেখলাম।

ওয়ার্ডসওয়রথের অপূর্ব সুন্দর দেশ লেক ডিষ্ট্রিক্টের মধুর স্মৃতি বহন করে যখন লিভারপুলে ফিরে এলাম, তখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গিয়েছে। বন্দরের কোলাহল হয়ে এসেছে স্তিমিত।

পৃথিবীতে

শ্রীসাধনা সরকার

নক্ষত্রের ইসারায় নির্জন রাতের আকাশ
উড়ন্ত পাখির গানে থরথর মায়াবী বাতাস
স্ফটিক-আলোকে যেন স্বপ্নের গুটি দেয় খুলে
উজ্জ্বল প্রজাপতি দেখা দিল মধ্য-নিশীথের নীল কূলে
দেবদারু-অরণ্যে সোনালি চিলের ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা রেশমের মত এই অন্ধকার।

শিশিরের গন্ধমাখা প্রান্তরের সবুজ শরীর
ফসলের আকাঙ্খায় গাঢ় রসে হয়ে আছে স্থির
ঘাসের ফড়িং—সেও ঘুমিয়েছে নীল জ্যোৎস্নায়
সাদা-কালো পায়রার ওড়াওড়ি আলোয়-ছায়ায়
ভ্রমরের গুঞ্জনের মত এই বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরীয় এক অপরূপ স্বপ্ন ভেসে আসে।

রামধনু হৃদয়ের নিটোল তরঙ্গে ডুব দিয়ে
রক্তিম কামনার উদ্বেলিত প্রবালটি নিয়ে
মেঘের অলিন্দে জাগে নক্ষত্রের প্রেমের প্রহরা
নম্র নীল জ্যোৎস্নার প্রান্তরে তিলোত্তমা আজ বসুন্ধরা
নীলাভ জোনাকিদের নির্জন ম্লান আঁখিকূলে
জীবনের নোনাস্বাদ গভীর বিস্ময়ে ওঠে দুলে
যেখানে সোনালি প্রেম জেগে আছে মৌন আকাঙ্খায়
অতন্দ্র প্রকৃতির নির্জন মেঘ-সীমানায়
পৃথিবীর এক পাশে একাকী মনের নীল নদী
সবুজ ঘাসের মত ঘ্রাণ নিয়ে অন্ধকারে বয়ে যায় যদি
চোখের পাতায় মত চুপি চুপি নেমে এসে একা
খোলা জানালার নীচে অকস্মাৎ দেয় যদি দেখা ?

তবু তারও পরে কোন অন্ধকার ঘনাবে নিবিড়
জীবনের মুখোমুখি নির্বাক্ স্বপ্নের ভিড়।

নীলকণ্ঠ

পঁয়ত্রিশ

আলোক মিত্র কলকাতার বনেদীতম বংশের একমাত্র বর্তমান পুরুষ। বাবা প্রচুর টাকা রেখে মারা গেছেন, আলোক বিলাত যাবার আগেই। আলোক বিলাত গিয়েছিলো বাপের পয়সা থাকলে বাঙালীর ছেলে বিলাত একবার যায়ই, এই কারণে। কিন্তু ব্যারিষ্টারী পড়তে অথবা আই-সি-এস দিতে নয়। গিয়েছিলো কিছুই না করতে। আলোকের সমাজে সবাই সে কথা জানে। তাই আলোক বিলাতে জর্ণালিজম শিখতে গেছে বললেও তারা জানতো আলোক আসলে কি করতে গেছে! কিছু না করতে যাওয়ারই অপর নাম এ-সমাজে জর্ণালিজম। এই বলাই রেওয়াজ। এতে দুপক্ষেরই সুবিধা। যে বলে সে জানে সে যা বলতে চাইছে যে শোনে তা বুঝতে তার ধোঁকা লাগে না।

তাই আলোক যখন ফিরে এলো তখন তার এদেশের আত্মীয়-বন্ধুদের বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য ছিলো না সে কোনও ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছে কি না জানবার জন্যে। বরং আলোক কোনও সাদা চামড়ার ওয়েট্রেস অথবা চেম্বার মেড বগলদাবাই করে ফিরেছে কি না তাই ছিলো কেবল কৌতূহলের অবশিষ্ট। কিন্তু আলোক তাদের সকলকেই সাংঘাতিক হতাশ করলো। আলোক যেমন গিয়েছিলো তেমনই ফিরে এসেছে। ঘরের ছেলে ঘরে। মায়ের মুখ শুধু প্রফুল্লতর। গর্বে ফুলে উঠেছে বুক। ডাইনীর কবল থেকে কারুর সাহায্য না নিয়েই ছেলে ফিরে এসেছে নিজেকে কারুর কাছে কবুল না করে। আত্মীয়-বন্ধুরা হতাশ হলেও একেবারে হাল ছাড়লো না। বাস্তবে হতাশ হয়ে কল্পনার হালভাঙা জাহাজে আশ্রয় নিলো। বিয়ে করে বিলেতেই রেখে এসেছে মেম-বউকে। সঙ্গে করে নিয়ে আসতে ভরসা পায়নি। এখানে মায়ের অনুমতি যদি শেষ পর্যন্ত না পায় তাহলে সরে পড়বে আলোক।

কিন্তু তাতেও নিরাশ হতে হলো সবাইকে। আলোক সরেও পড়লো না, মাকেও বলল না কিছু। এমন কি বিলাত থেকে এলো না কোনও সবুজ চিঠি। এখান থেকে গেলো না কোনও নীল খাম। সত্যিই তাই। বিলাতে কারুর কাছে হৃদয় জিম্মা রেখে আসে নি আলোক। কারুর নীল চোখ ভোলায় নি তাকে। এমন কি আলোকের সঙ্গে যে দুজন গিয়েছিলো। অর্থে ও সামর্থ্যে আলোকের চেয়ে অনেক কমজোরী হয়েও তারাও দু'-একবার যে বিলাতের লালপল্লীতে না ঢুঁ মেরেছে এমন নয়। যেখানে ঢুকতে গিয়ে ভদ্রলোকের চোখে পড়ে গেলে সে পল্লী ভদ্রলোকের অগম্য এবং লজ্জার কারণ সেই পল্লী একেবারেই আকর্ষণ করে নি আলোককে। একবারও না। দেশে ফিরে গিয়ে সে-পল্লীর অভিজ্ঞতা না বলতে পারার লজ্জা সে-পল্লীতে ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার চেয়েও লজ্জার, আলোক বছরের পর বছর বিলাতে থেকেও তার অবাধ আমন্ত্রণে সাড়া দেয় নি।

নিষিদ্ধ পল্লীতে নয়; ভদ্র ইংরাজ-পল্লীতেও কোনও সাদা মেয়ে এই কৃষ্ণকায় যুবকের চোখ ধাঁধাতে পারে নি। একবারও তার দেশের মেয়েদের তুলনায় কটা চোখের কটাক্ষে মনে হয় নি বিদ্যুৎ বেশী। হাঁটা চলা ঘোরা কথাবার্তা কিছুতেই জীবনের সন্ধান পায় নি আলোক। খুব স্থূল মনে হয়েছে; প্রাণবন্ত মনে হয় নি একবারও। অকারণে ব্যস্ত মনে হয়েছে; প্রাণোচ্ছল মনে হয়নি কখনও। রামধনুর মতো রঙীন মনে হয়েছে; কৃষ্ণচূড়ার মতো রক্তিম মনে হয় নি তো কই!

শুধু মদ খেতে শিখেছে আলোক। ভারতবর্ষের মাটিতেই পানপাত্রে ঠোঁট ভিজিয়েছে অনেক বার, তবু এদেশে অভ্যাস হয়েছে মাত্র; নেশা হয় নি তখনও। ওদেশে পা দেবার পর অনুশীলন গড়িয়েছে অনুরাগে। প্রচণ্ড নেশা করেও পা অটল রাখতে পারে এখন আলোক। সুরাই এখন জীবনের সব। সকাল থেকে সন্ধ্যা; সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত সুরার পাত্রই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। কিন্তু শুধু সুরাই। শাকী নয়।

আলোকদের সঙ্গে বাড়ী পৌঁছে দেবার গাড়ীতে উঠেও সোজা বাড়ী ফেরে নি সেদিন মঞ্জরী। গাড়ী থেকে নেমেছিলো বাড়ী থেকে একটু দূরে। সেখান থেকে গিয়েছিলো নিজের বাড়ী। যদিও তার বাসস্থান এখন নিষিদ্ধ পল্লীতে নয়, তবুও আলোকদের সে নিয়ে যেতে চায় নি নিজের বাড়ী। আলোককে ঠিকানাও দেয় নি বাড়ীর। আলোক এবং অন্যান্যদের চিঠি এখনও পর্যন্ত সবই পৌঁছয় ওলড় থিয়েটার্সের ঠিকানায়। সেখান থেকে মঞ্জরীর চিঠি আসে মঞ্জরীর হাতে। মঞ্জরী আলোককে বাড়ীতে নিয়ে আসতে চায় না আর শ্যামচাঁদ গড়াইকে চায় না জানতে দিতে আলোকের আবির্ভাব। শ্যামচাঁদের অপ্রিয়ভাগিনী হতে চায় না মঞ্জরী। এখনও যেখানে ওঠবার সেখানে উঠতে অনেক ধাপ বাকী। শ্যামচাঁদ সেই সিঁড়ির একটি খুঁটি। সবচেয়ে শক্ত খুঁটি।

সেই ওলড় থিয়েটার্সের ঠিকানাতেই এলো আলোকের দ্বিতীয় চিঠিও একদিন। প্রথম সাক্ষাতের খুব অল্প ব্যবধানে। সেই

চিঠিতে আলোক তার যে বন্ধু সেদিন মঞ্জরীর হাত দেখেছিলো তার রিপোর্ট দিয়েছে। বন্ধুটির নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে এই যে, মঞ্জরীর শুভবিবাহ যোগ আসন্ন। চিঠিটা ছিঁড়তে গিয়ে ছিঁড়লো না মঞ্জরী। হাসলো। শুভবিবাহ? শুভ কি অশুভ হবে, মঞ্জরী জানে না। শুধু জানে, বিবাহ তাকে একদিন করতেই হবে। সুনিশ্চিত। সমাজের যে মঞ্চ থেকে সে পড়ে গেছে, সেই মঞ্চে যদি আবার আরোহণ করতে হয় তাহলে বিয়ে তাকে একদিন করতেই হবে। এবং সে বিয়ে হবে যার-তার সঙ্গে নয়। ওই মঞ্চের সিংহাসন যে আলো করে বসে আছে এমন কারুর সঙ্গেই কেবলমাত্র বিয়ে হলে তবেই হবে অপরাধ না করে নির্বাসন দণ্ডভোগের যোগ্য প্রত্যুত্তর। কিন্তু তার এখন দেরী অনেক। এখন যেখানে ওঠবার সেখানে উঠতে অনেক ধাপ বাকী! শ্যামচাঁদ সেই সিঁড়ির একটি খুঁটি। সব চেয়ে শক্ত খুঁটি।

ছবিতে কাজ করতে-করতেই খ্যাতির আরও পথ প্রশস্ত হলো মঞ্জরীর। নতুন পথ। প্রশস্ততর পথ। ভাগ্যের নতুন দিগন্ত। তার গান রেকর্ড হলো একের পর এক। ছবিতে যে-সব গান সে গেয়েছে সেই সব গান। শ্যামচাঁদ গড়াইয়ের তত্ত্বাবধানেই গৃহীত হলো। গান রেকর্ড হলো যে শুধু, তাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে জয়গান আরম্ভ হয়ে গেল মঞ্জরীর। বিক্রয়ের সংখ্যায় মঞ্জরীর গানের রেকর্ড সত্যি সত্যি সব রেকর্ড ভাঙলো। ছেলে-ছোকরারা পাগল হয়ে গেলো গানের কলি গুনগুন্ করতে করতে। হাটে বাজারে, মাঠে, জলসায়, সিনেমায়—মঞ্জরীর গাওয়া গানের সুর। মাউথ অর্গান, যন্ত্রসঙ্গীতে, ঠোঁটের শীষে তারই পুনরাবৃত্তি। অভিনয়-ক্ষমতার সঙ্গে কণ্ঠস্বরের মাদকতা। সোনার সঙ্গে সোহাগা নয়। সুরের সঙ্গে সুরা।

নূতন যে ছবিতে কাজ পেল মঞ্জরী সে ছবির নাম: মুক্তি নেই! এ ছবিতে তাকে যাঁর সঙ্গে প্রধান ভূমিকায় নামতে হ'বে তিনি স্বনামধন্য পরিচালক-অভিনেতা পরমেশচন্দ্র। মুসকিলে পড়লো মঞ্জরী। শ্রীকৃষ্ণ দত্তর ধারার সঙ্গে পরমেশচন্দ্রের অভিনয়ধারার আকাশ-পাতাল ফারাক। সত্যিই তাই। দুজনের মধ্যে দুই মেরুর দূরত্ব। একজনের অভিনয়ের প্রধান মূলধন আবেগ। অন্যজনের বেগ। একজনের যতক্ষণ পর্যন্ত না সব কথা বলা হচ্ছে, হৃদয় নিঙড়ে না বেরুচ্ছে রস ততক্ষণ কিছুতেই হচ্ছে না। আরেক জন যত স্বল্পে, যত অল্পে বলা যায়, তারই চালিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা। একজনের আবেদন হৃদয়ে ঘা দেয়; অন্যজনের বুদ্ধিকে নাড়া। সব বলবার পরেও কিছুই বলা হল না,—শ্রীকৃষ্ণ দত্তর এই আক্ষেপ। আর কিছু না বলেই সব বলে দেওয়ার দুরূহ প্রচেষ্টা পরমেশচন্দ্রের।

নিজের অসুবিধের কথা একদিন পরমেশচন্দ্রকে বলেছিলো মঞ্জরী। কোন্ ধারাকে সে মানবে,—জিজ্ঞেস করেছিলো সে। পরমেশচন্দ্র বলেছিলেন, মঞ্জরী যদি সত্যিকারের শিল্পী হয় তো কোনও ধারাকেই সে একদিন মানবে না। নিজের পথ সে নিজে করে নেবে। যতক্ষণ সে শিল্পী নয় ততক্ষণই এর ধারা; ওর ধারা। যতক্ষণ জল ততক্ষণ যেমন পাত্র তেমনি আধার। কিন্তু জল থেকে যখন বস্তুর জন্ম তখন বস্তুর মাপেই আধার। অভিনয় শিখতে আসে সবাই যখন তখন, যে যেমন শেখায় সে তেমনি শেখে। তারই মধ্যে সেই মুহূর্তে কেউ শিল্পী হয়ে ওঠে তখন থেকেই তার একমাত্র শিক্ষক সে নিজে। কাদাকে যে কোনও কুমোর গড়ে-পিটে যে রকম খুসী পুতুল বানাতে পারে। কিন্তু মাটির পুতুল থেকে যখন আবির্ভূত হয় প্রাণের প্রতিমা, তখন সে খেলার পুতুল নয় আর, আরাধনার আধার। ফুলঝুরি ছোট ছেলের হাতে দিতেও ভয় নেই,—কিন্তু ফুলঝুরি যেই মশাল সেই আগুন নিয়ে খেলার কায়দা সে জানে সেই করায়ত্ত করতে পারে শুধু; অন্যে কেবল দগ্ধ হয় তাতে। জাতশিল্পীকে দিয়ে অভিনয় করানো যায় না; অভিনয় করতে দিতে হয়।

পরমেশচন্দ্র মঞ্জরীর জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, অর্থ, সামাজিক মান-সম্মান,—গোটা জীবনটা নিয়েই জুয়া খেলেন পরমেশচন্দ্র, মনে হয় মঞ্জরীর। যে-সব জিনিষ মঞ্জরীর কল্পনার স্বর্গ, পরমেশচন্দ্রের সে সবে জন্মগত অধিকার। অথচ যে কল্পনার স্বর্গের সামান্য আভাসে লাল পড়ে মঞ্জরীর মুখ দিয়ে, তারই প্রতি কি অসীম বিতৃষ্ণা এই বয়স্ক শিশুর! কিছুরই তোয়াক্কা রাখেন না তিনি। কোনও বস্তুরই যেন কোনও দাম নেই। জীবনটা যেন পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার খেলনা। কে কি বলল, কে কি বলল না, কিছুরই জন্যে নেই অনুযোগ। হিসেব নেই, সঞ্চয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই,—মাঝে মাঝে শুধু অদ্ভুত আবোল-তাবোল প্রশ্ন। হয়তো তার তলা দিয়ে বহমান কোনও গভীরতর ব্যঞ্জনা কিন্তু আপাতশ্রবণে মঞ্জরীর কানে তার কোনও অর্থবোধ হয় না।

ছিপছিপে চেহারা। ক্ষণভঙ্গুর। দুটি চোখে বুদ্ধির দীপ্তি! তবু পরমেশচন্দ্রের বুদ্ধিদীপ্ত দু চোখে বুদ্ধির দীপ্তি ছাড়িয়েও যা সত্য তা হচ্ছে নিরুদ্দেশের স্বপ্ন। সেই নেশাগ্রস্ত, স্বপ্নাবৃত চোখে মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন পরমেশ; আচ্ছা মঞ্জরী, তুমি কখনও ভালোবেসেছ?

তারপর মঞ্জরীকে সত্য জবাব না দিতে পারার অপদস্থ অবস্থার হাত থেকে রেহাই দিতে পরমেশচন্দ্র পরমুহূর্তে নিজেই বলেছিলেন: না। তুমি কাউকে ভালোবাসনি মঞ্জরী! বাসতে পারো না। তুমি শুধু নিজেকে নিয়েই মত্ত হয়েছ। উন্মত্ত। তুমি কি লক্ষ্য করে এগুচ্ছ তা জানি। প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, অর্থ, সামর্থ্য। যে সমাজ তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে,—সেই সমাজেরই মাথায় পা দিতে চলেছ তুমি। ভাবছ যেদিন পৌঁছাতে পারবে তোমার লক্ষ্যে সেদিন তোমার জয় হবে? না। যতই জয়জয়কার করুক সবাই, সেদিন তোমার হার হবে। তুমি জানো না, মানুষের জীবনের কোনও লক্ষ্য নেই, লক্ষ্য থাকার কোনও মানে হয় না। জীবনে বড় হবার জন্যে আমরা যা করি, সাধনা, পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, অথবা প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার,—সবই অনর্থক। জীবন সত্যিই এত বড় নয়।

বলে থামেন পরমেশচন্দ্র। তারপর ছোট ছেলে যেমন শ্লেটের ওপর সাদা চক দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটার পরমুহূর্তেই এক ঝটকায় সব মুছে দিয়ে আবার নতুন করে কাগের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাং আঁকতে বসে সমান উৎসাহে, তেমনি পুরো দম না নিয়েই পরমেশচন্দ্রই বলেন আবার: কি যা-তা বকছি আবোল-তাবোল?—যাক! আরেকটু নেশা করা যাক এবার জমিয়ে,—কি বলো মঞ্জরী?

মঞ্জরী কিছু বলে না। শুধু মদের পাত্র মুখের কাছে ধরে চমকে

ওঠেন পরমেশ। এ কার মুখ মনের ওপর ভাসছে? পরমেশচন্দ্রের নয়। Picture of Dorian Gray?

দ্বিতীয় চিঠির জবাবে মঞ্জরী এবারে যে চিঠি দেয় সে চিঠি তার জবানীতে মুক্তিদেবী চট্টোরাজের রচনা নয়। এ তার নিজের হাতে লেখা নিজের কথা। আলোক মিত্রকে সে এই চিঠিতে সে আসলে কি এবং কে, সব খুলে লিখে দেয়। স্পষ্ট করে; সহজ করে; সোজা ভাষায়। তার অতীত, তার বর্তমান,—সব। লিখতে-লিখতে একবারও থামে না। হাত কাঁপে না। ভয় হয় না। লজ্জা?—তা-ও না। বরং মনের ভার লাঘব হয়। হালকা হয় সে। লঘুপক্ষ প্রজাপতির মতো। অনেক দিন বাদে পায়ে-পায়ে ঘোরে হালকা পাখা। কথার বদলে বেরোয় গানের কলি। চোরাই মাল বয়ে বেড়াবার পর, এত দিনে সব বোঝা, গুরুভার পাষাণ নেমে যায় বুক থেকে। নিঃশ্বাস নিতে পারে মঞ্জরী। চিঠিটা লিখে আবার পড়তে গিয়ে হাসি পায় তার।

হাসি পায় এই ভেবে যে, এক মুহূর্ত আগেও এমন চিঠি কোনও সন্তপরিচিত লোককে লেখবার কথা সে ভাবতেও পারতো না। মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রতি মুহূর্তের অবস্থার দাস। এ চিঠি লেখবার জন্যে কেউ তাকে পেড়াপেড়ি করে নি। কোনও ভাবে দায়বদ্ধ হয় সে। আলোক জানতে চায় নি তার অতীত। অথবা তার অতীত সবাই জানে। আলোকও। তার বর্তমানও অজানা কি? সে বললেও সে যা, সে না বললেও সে তাই। অন্য কেউ নয়। অন্য কিছু নয়। তবে?

হ্যাঁ 'তবে' একটা আছে বই কি! একটা কারণ আছে। একেবারে অকারণ পুলকে মঞ্জরী লেখে নি এই চিঠি। এত কাঁচা সে নয়।

আলোকের যে বন্ধু মঞ্জরীর হাত দেখেছিলো, আর আলোক চিঠি লিখে যার ভবিষ্যদ্বাণী জানিয়েছিলো মঞ্জরীকে, যে মঞ্জরীর শুভ বিবাহ খুব শীঘ্র; শীঘ্র এবং সুনিশ্চিত,—সেই বন্ধুটি এক দিন এসেছিলো মঞ্জরীর বাড়ীতে। আলোককে না জানিয়েই এসেছিলো। মঞ্জরী বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলে নি। বারণ করেনি আসতে। তাই আবার এসেছিলো সে। পর পর কয়েক দিন। এবং এরই মধ্যে এক দিন—

না। ভয়ের কোনও কারণ ঘটায় নি। হাসির খোরাক জুগিয়েছিলো। হঠাৎ এক দিন মঞ্জরীকে বিবাহের প্রস্তাব করে বসে সে। একটু হকচকিয়ে গেলেও সামলে নিতে খুব বেশী সময় নেয় নি পেঁচো মঞ্জরী। মুখের গোড়ায় এসে গিয়েছিলো যোগ্য উত্তর। ভাবছিলো একবার বলে: কি? ভবিষ্যদ্বাণী হাতে-হাতে মিলিয়ে দেবার জন্যে নাকি এই প্রস্তাব? তার পর সে কথা না বলে অত্যন্ত ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেছিলো: বেশ, আপনার বাড়ীর লোকদের বলুন, আমার মায়ের কাছে প্রস্তাব করতে।

মঞ্জরী জানতো এই যথেষ্ট। এক মিনিট অপেক্ষা না করেই আর, উঠে গিয়েছিলো আলোকের বন্ধু এবং আর আসে নি। আর আসবে না জানতো মঞ্জরী। জানতো যে এর পর সে যাবে আলোকের কাছে। সবিস্তারে বলতে যাবে মঞ্জরী কি এবং কে। কিন্তু ভারী হতাশ হতে হবে তাকে। তার আগেই পৌঁছে যাবে মঞ্জরীর পত্র। শুধু পৌঁছে যাবে যে তাই নয়। পড়াও হয়ে যাবে আলোকের। দীর্ঘ চিঠি যদিও। পাঁচ পাতা ধরে লেখা। দু' হাজার আটশো নব্বইটি শব্দ সংবলিত। তবুও।

চিঠিটা লিখে যতটা হালকা হয়েছিলো মঞ্জরীর মন, চিঠি ফেলবার পর দ্বিগুণ ভারী হলো তার। ফেলবার পরই তার মনে হলো না লিখলেই হতো। কী দরকার ছিলো এই আত্মহত্যার? আলোক যা জানে তা জানুক। অথবা আলোক যা জানতে পারে তা নিজে থেকে জানতে পারুক। কিন্তু মঞ্জরী কেন তার জন্যে নিজেকে মেলে ধরবে একজন সদ্য-পরিচিতের কাছে? কার কাছে তার এ দায়? নিজের কাছে? কি সে দায়? কেনই বা সে দায়? আলোক তার কে?

এক দিন যায়; দু'দিন যায়। সপ্তাহ যায়। ঝড় তোলপাড় করে মঞ্জরীর মনে। কাল-বৈশাখীর দুরন্ত ঝড়। আলোকের কাছ থেকে কোনও জবাব আসে না। ওল্ড থিয়েটারের ঠিকানায় আসে অনেক লোকের অনেক চিঠি। সে সব চিঠির মধ্যে কোনও কোনটা'র জবাবও যায় মঞ্জরীর কাছ থেকে। শুধু সে চিঠির জবাবের জন্যে মঞ্জরী বসে,—সে চিঠি আসে না কোনও দিন। সে চিঠির জবাব আসবার আগেই একদিন রাত দশটায় হন্তদন্ত হয়ে আসেন শ্যামচাঁদ গড়াই। গানের সরঞ্জাম সাজিয়ে বসতে যাচ্ছিলো মঞ্জরী, শ্যামচাঁদ বললেন: না। সব তুলে ফেলো মঞ্জরী!

মানে?

মানে আজ গান নয়,—আজ নতুন একজন এসেছে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।

কোথায়?

মঞ্জরীর জিজ্ঞাসার ধরণে হেসে ফেলেন শ্যামচাঁদ গড়াই: না, না, তেমন কেউ নয়—আমার বন্ধু একজন, নীচে গাড়ীতে বসে আছে, নিয়ে আসছি।

একটু বাদে আগন্তুককে নিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকলেন শ্যামচাঁদ। আলাপ করিয়ে দিতে গিয়ে মঞ্জরীর চোখ পড়তে থেমে গেলেন। মঞ্জরী কি চেনে না কি?

না। তা কি করে সম্ভব?

মঞ্জরীর বুকের মধ্যে তখন হাডুডু খেলছে কে? কি করা উচিত তার এখন?

সে যে আগন্তুককে চেনে,—তা-ই স্বীকার করা,—না আগন্তুকের সঙ্গে প্রথম এই পরিচয়ের ভাণ করা?

শুধু এরই মধ্যে নিশ্চল, নিরুত্তেজিত আগন্তুক দু হাত তুলে নমস্কার করে নিজেই কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে চমৎকার হাসিতে উজ্জ্বল মুখে বললো: আমার নাম— [ক্রমশঃ।

স্পর্শক ভর

—স্বদেশ ঘোষ

দেথ ব্যবহার

—সাধন রায়

যন্ত্রমন্ত্র
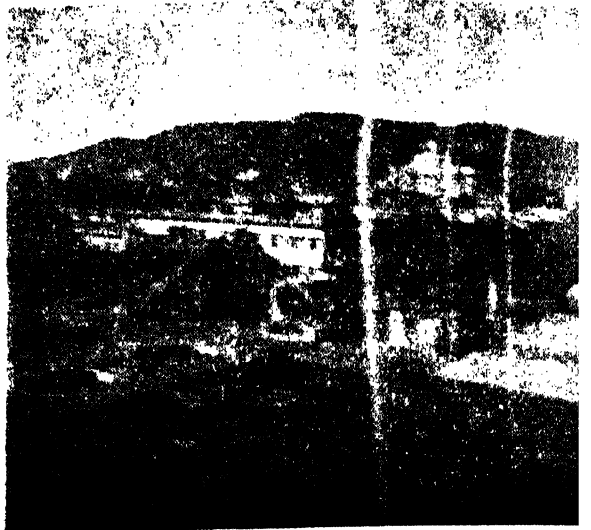
—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকৃতির শিল্প

—স্বদেশ ঘোষ

জলহস্তী নয়

—মন্টু বসাক

বস্ত্রশিল্পী

—বীরেশ অধিকারী

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে রাজস্থানের উদয়পুর প্যালেসের ময়ূর-চিত্রের আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রটি অরুণকুমার দত্ত গৃহীত।
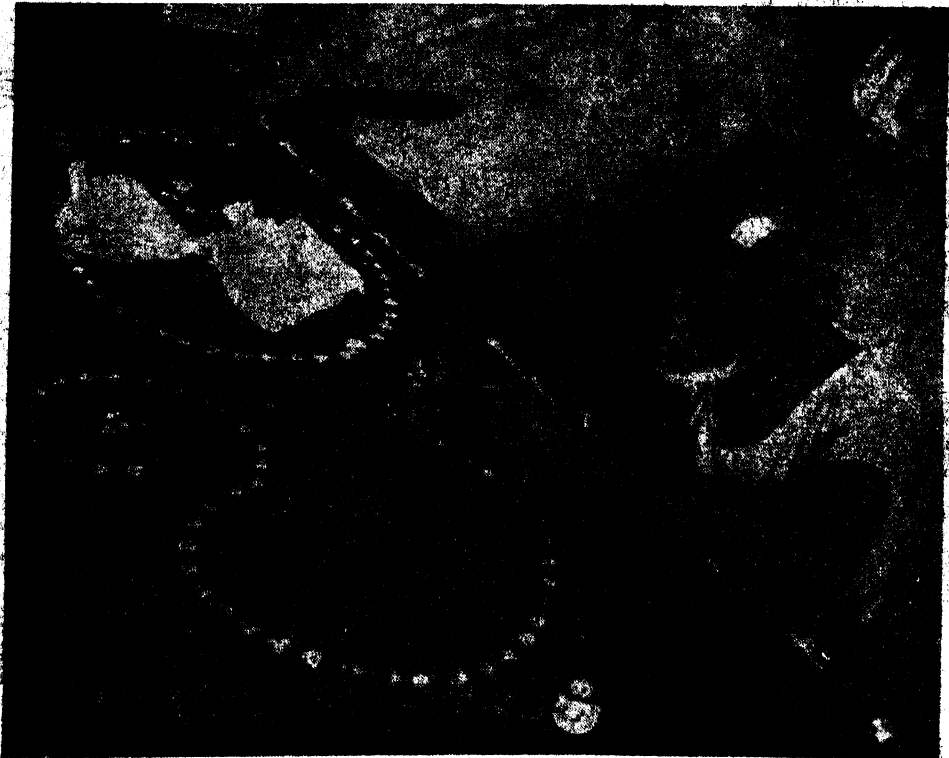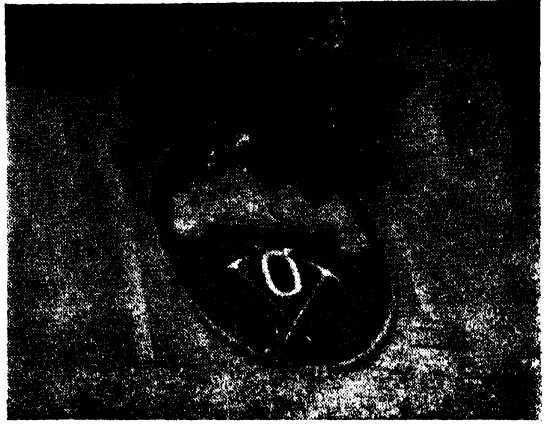
তেনজিং নোরকে ও তাঁর গৃহে প্রতীক-চিহ্ন, মাউন্ট এভারেষ্ট। —সুধাসিন্ধু বিশ্বাস

চিত্তোর গড়—হনুমান পোল —অরুণকুমার দত্ত
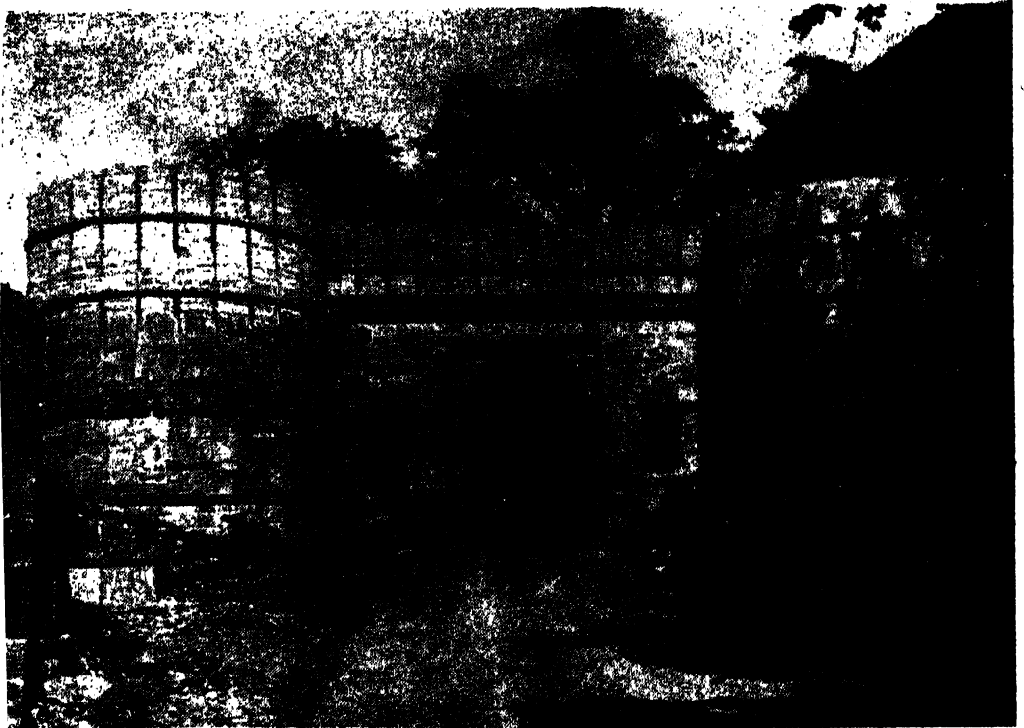
রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে

কবির বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কিছু বলি। দেশের শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের বংশগত। তাঁহার পিতামহ দ্বারকানাথ ত্রিবেণীতে একটি স্কুল স্থাপন করিয়া দেড় শত জন ছাত্রের শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করেন। রামমোহনের ইংরেজি স্কুল ও বেদান্ত বিদ্যালয়ের সকল কার্যে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। হিন্দু কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথ অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা কী ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা সর্বজনবিদিত। মহর্ষি কলিকাতা ও বংশবাটিতে বাঁশবেড়িয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় অক্ষয়কুমার দত্তকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে তাঁহার দ্বারা পুস্তকাদি রচনা করাইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহর্ষির আন্তরিক আগ্রহে ও চেষ্টায় 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়' (Hindu Charitable Institution) মিশনারিদের কবল হইতে হিন্দু-সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে স্থাপিত হয়। যখন কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের স্বনামধন্য বণিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্তক রাজেন্দ্রনাথ দত্ত উন্নত প্রথায় কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত করেন, মহর্ষি তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথ মনোনিবেশ করিতেই তিনি বুঝিলেন যে তাহা হইতে জাতির কোনো স্থায়ী মঙ্গল হওয়া শক্ত। ১৮৯২ খৃঃ "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ভাষাতেই বলিতেছি :—"সকল বড় দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানব জীবনের পূর্ণতা সাধন। এই লক্ষ্য হইতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নাই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁহাদের সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধনের জন্য বাহির হইতে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি, তখনকার কোনো কোনো পুরাতন দপ্তরে দেখা যায় প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপাইয়া শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করিয়াছেন। এই শিক্ষাপ্রণালীর সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক দোষ এই যে, ইহাতে গোড়া হইতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে আমরা নিঃস্ব। যাহা কিছু সমস্তই আমাদের বাহির হইতে লইতে হইবে। আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈত্রিক মূলধন যেন কাণা কড়ি নাই। ইহাতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তাহা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব ভাব জাগায়। মনের দাসত্ব যদি ঘুচাইতে চাই তাহা হইলে আমাদের শিক্ষার এই দীন ভাবকে ঘুচাইতে হইবে।"

"আমাদের একটা আদর্শ আছে সেটা কেবল পেট ভরাবার বা টাকা করবার নয়"—এই কথাটা জানিতে ও মানাতে, শিখাইতে কবি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে পুরাকালে গুরুগৃহে থাকিয়া পাঠের যে ব্যবস্থা ছিল, বটু গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষালাভ করিত, মানুষ হইবার পক্ষে তাহাই বোধহয় প্রকৃষ্ট ও একমাত্র পন্থা। কেবল বিদ্যালয়ে কাজ হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম চাই। "বাহিরের নানাপ্রকার চিত্ত-বিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে একটি শান্তিক্ষেত্র চাই।" কবির এইরূপ একটি উপযুক্ত শান্তিক্ষেত্র পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। তাঁহার পিতা মহর্ষিদেব একবার তাঁহার বন্ধু বীরভূমের সিংহ মহাশয়দের বাড়ি রায়পুরে (এই বংশেরই লর্ড সিংহ) নিমন্ত্রণে যাইবার পথে বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুর যাইবার সময় ভুবনডাঙা গ্রামের নিকট এক বিস্তৃত প্রান্তরে দুটি ছাতিম গাছের তলে বিশ্রাম করেন। এই ধূসর মাঠে দুটি গাছ ভিন্ন সবুজের চিহ্ন আর কিছুই ছিল না। এই স্থান তিনি নির্জন সাধনার জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। ইহা রায়পুরের সিংহ মহাশয়দের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। ১৭৮৪ শকে মহর্ষি তাঁহাদের নিকট হইতে ২০ বিঘা ভূমি সংগ্রহ করিয়া এইখানে একটি বাড়ী 'শান্তিনিকেতন' নির্মাণ করাইলেন (বর্তমান অতিথি ভবন)। এই বাড়ির চতুর্দিকে উহার ভূমি ফলফুলের বাগানে পরিণত হইল। রাজা রামমোহনের সহিত তাঁহার মালী রামহরি দাস বিলাত গিয়াছিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট কিছুদিন ছিল এবং সে সময়ে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের গোলাপবাগের সর্দার মালী হইয়াছিল। এই রামহরির উপর শান্তিনিকেতনের উদ্যান রচনার ভার মহর্ষি দিলেন। মহর্ষির পরিকল্পনা ফুটাইয়া তুলিতে রামহরির নির্দেশমতো ফল ও ফুলের গাছ ও বীজের সঙ্গে সঙ্গে উর্বর মৃত্তিকাও রেলে করিয়া আনীত হইল। এইখানে একটি কাচের মন্দির বহু ব্যয়ে নির্মিত হয়। মন্দিরের মেঝে শ্বেত পাথরের তৈরি, আর চারিদিকে নানারঙীন কাচের দেওয়াল, সিলিং, এবং অনেকগুলি দ্বার। দ্বারের দরজাগুলি মেলিয়া দিলেই চারিদিক একেবারে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। মন্দিরের নিত্য দুবেলা উপাসনার জন্য একজন পুরোহিত নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালে মহর্ষি একখানি অছি-পত্র করিয়া সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থ ইহা উৎসর্গ করেন এবং প্রতি বৎসর তাঁহার দীক্ষার দিন ৭ই পৌষ এখানে উৎসব

ও একটি মেলা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করেন। এই আশ্রমে একটি ভালো গ্রন্থাগার ও ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, অছিপত্রে এইরূপ নির্দেশ থাকে। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন, তখন মহর্ষি সানন্দে তাহা অনুমোদন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ ১৯০১এর ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে মাত্র ৫।৭টি ছাত্র লইয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই বিদ্যালয়ের সহিত অধ্যাপক ও শিক্ষাপরিদর্শকরূপে সময়ে সময়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায়, সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (কবির ভাগিনেয়), মোহিতচন্দ্র সেন, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, সংগীতাধ্যাপক দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু প্রভৃতি এবং নেপালচন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষ, আচার্য বেক, পিয়ার্সন, দীনবন্ধু চার্লস য়্যাণ্ডরুজ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের অনেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন। কর্ম সমিতিতে পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী, ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার প্রভৃতি ও "প্রধান" বা বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে প্রথম ভারতীয় F. B. A. আচার্য রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি ছিলেন ও আছেন।

শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা নিজে উপলব্ধি করার ফলে ও বালকদের জাপানী আত্মরক্ষা-প্রণালী যুযুৎসু শিখাইবার জন্য জাপানী ব্যায়ামবিদ ডাসকাগাকিকে কবি জাপান হইতে সঙ্গে লইয়া আসেন ও বোলপুরে শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে কবির প্রধান কীর্তি বিশ্বভারতী। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন স্কুল মাষ্টারকে এড়াইয়া আসিয়া এইখানে স্কুল মাষ্টারীতে ধরা দিলেন। আমাদের যুগে দুইজন De Rite উপাধিধারী না হইয়াও শিক্ষাদান নৈপুণ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরও বিস্ময়স্থল ও প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শান্তিনিকেতনের তথা ভারতের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও অপরজন রাণী ভবানী স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষক নাটোরের ৺মহারাজা কবি জগদিন্দ্রনাথ রায়। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষাপ্রণালীর ও শিক্ষাদান পদ্ধতির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বাঙলার কোনো খ্যাতনামা অধ্যাপক "মানসী" পত্রিকায় সে যুগে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে মুক্ত আকাশের নীচে গাছের তলায় বালকদের পাঠের ব্যবস্থা। এখানে যতদূর সম্ভব ছাত্রেরা মুক্তির স্বাদ পায়। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে এখানে তাহাদের হৃদয়ের নিবিড় যোগের যথেষ্ট অবসর। পার্শ্ববর্তী পল্লীগুলির সঙ্গেও তাহাদের যোগের ব্যবস্থা, ইহা ভিন্ন নিকটে কোথাও আগুন লাগিলে সে আগুন নিবাইতে যাওয়া ছাত্রদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। ইহার নিমিত্ত তাহাদিগকে অগ্নি নির্বাপনের উপায় ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী নিত্য অভ্যাস করিতে হয়। এইখানে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের চিন্তাশীল, আত্মকর্মক্ষম, সংযমী ও স্বাবলম্বী করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন।

এইখানেই আনন্দের মধ্য দিয়া শিক্ষার সাহায্যে মানুষের সকল সহজাত সংবৃত্তিগুলির স্ফুরণ ও পূর্ণবিকাশ সাধনে কবি সকল সংবাদ সংগ্রহ ও তাহাদের পরিদর্শন তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল। বিদ্যালয়ের কার্যপ্রণালীতেও বালকদের সম্পূর্ণ সহযোগিতার ও স্বাধীনতার অবসর দেওয়া হইয়াছে। সকল প্রকার ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। বালকেরা যাহাতে চিত্রে, সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, বিজ্ঞানে অনেক কিছু সৃষ্টি করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়। শিক্ষক সমভিব্যাহারে মধ্যে মধ্যে তাহাদের গ্রামান্তরে লইয়া যাওয়া হয় ও উদ্ভিদ সংগ্রহ, উদ্ভিদ চেনা ও তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে উৎসাহিত করা হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'শান্তিনিকেতন' পরিচালিত হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থ কবি ইংরাজি প্রবেশ, সংস্কৃত প্রবেশ, ছুটির পড়া, পাঠসঞ্চয়, সহজ পাঠ প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে, প্রার্থনার পরে কবি যে-সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহাই 'শান্তিনিকেতন' নামক গ্রন্থের কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু কেবলমাত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গরিমাকে তিনি অতি উচ্চ স্থানই দিয়াছেন। দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া তাহাদের শিক্ষাদান রীতি ও তাহার ফলাফল সম্যক বিচার করিয়া তিনি বুঝিলেন যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব বিনিময় না হইলে আধুনিক যুগে বিশ্বসভায়, বিশ্বজগতে বাঙালীর স্থান হইবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতীচ্যের সহিত অসহযোগের অর্থ নিজেদের বিপুল ক্ষতি। সেই কারণে কবি একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিলেন। এই মহাবিদ্যালয়ের তিনি নামকরণ করিলেন "বিশ্বভারতী"। ১৩২৬ সালের ১৮ই আষাঢ় ইহার কাজ আরম্ভ হইল। কবি নিজে তখন সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন। পরে ১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ—১৯২১এর ২২এ ডিসেম্বর দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের (পরে স্যার) পৌরোহিত্যে "বিশ্বভারতীর" উদ্বোধন হইয়া কিছুকাল পূর্বে ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি যখন কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত কবি তাহার প্রথম চান্সেলার ছিলেন। এক্ষণে বিশ্বভারতী কবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠার পর তিনি তাহার প্রথম আচার্য্য (প্রেসিডেণ্ট) হইলেন। তাঁহার বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালীর উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোকটিকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায় অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণিত যে ভারত নিজেরই মানস শক্তি দিয়া বিশ্ব সমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্যশিক্ষা, যাহা দ্বারা আমাদের মাতৃভূমির নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তির শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে। ভারতবর্ষ যখন নিজ শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার ... নৈন্য ছিল। * * * দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া

অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—লইবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দিবার বেলাও। অতএব ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে। এই নানা ধারা দিয়া ভারতের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারত আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমন করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ ও সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে যে-শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিকায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্রে মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে। সেই উৎস নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরাণিগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেপুটিগিরি, মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্র সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের ও চাকুরির সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপর নাই। তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতের যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে, আপন প্রতিষ্ঠানকে চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসিগণের সঙ্গে জীবিকার যোগ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ বিদ্যালয়কে আমি "বিশ্বভারতী" নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

কবি আরও বলেন—আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল আশ্রয়স্বরূপই অবলম্বন ক'রে তার উপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়।

"বিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও নেই। বীজের যদি প্রাণ থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে অংকুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে, তাহলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।

এই বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ ডাঃ সিলভ্যাঁ লেভি, উইন্টারনিজ, কার্লো ফরমিকি প্রমুখ বহু বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকবর্গের অধ্যাপনার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বভারতীকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার জন্য তিনি চিত্রশিল্প শিক্ষার্থ 'কলা-ভবন' প্রতিষ্ঠা এবং সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্যের এবং গোপালন ও তৎসংক্রান্ত ব্যবসায়ের এবং কুটীর-শিল্পের উন্নতি বিশ্বভারতীর অঙ্গীভূত করিবার জন্য ৺লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের নিকট বোলপুর হইতে এক মাইল দূরে স্থিত সুরুল গ্রাম ক্রয় করিয়া সেখানে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্য শান্তিনিকেতনে 'শ্রীভবন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পল্লী পুনর্গঠন কার্যও শ্রীনিকেতনে আরম্ভ হইয়াছে। নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থ ও কবির সমস্ত বাঙলা পুস্তকের স্বত্ব রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন। অভিনয়, বক্তৃতা প্রভৃতি উপায়ে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য কবিকে বহুদিন ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। তাঁহারই ব্যক্তিত্ব প্রভাবে ও তাঁহার সদুদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত বিশ্বভারতীর কার্যে সহায়তা করিতে কয়েকজন উদারচেতা দাতার নিকট হইতে অর্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতি মূলক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে। পল্লী সংগঠন ও উন্নত প্রণালীর কৃষি চর্চার জন্য এলমহার্স্ট বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং সুরুলে কার্যারম্ভ করেন। চীন ও ভারতের পরস্পরের সংস্কৃতির আদান প্রদানের নিমিত্ত চীন হইতে যে ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে 'চীনা ভবন'-এর প্রতিষ্ঠা হয়।

পৃথিবীর নানা স্থানে কবি যে সকল হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ পরিচয় মেলে। ১৮৮০ হইতে কবি ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, Centre of Indian Culture, Message of the Forest, শিক্ষার মিলন ও সত্যের আহ্বান, শ্রীরামকৃষ্ণশতবার্ষিকী, বিশ্ববিদ্যালয় কমলা বক্তৃতা, পূর্ব ও পশ্চিম, হিন্দুবিবাহ, ইংরাজ ও ভারতবাসী প্রভৃতি বিখ্যাত বক্তৃতার দ্বারা স্বদেশবাসিগণকে অনেক কিছু দিয়াছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহা তাঁহার এক বিরাট কীর্তি এবং বিশিষ্ট মনীষী ও দার্শনিক বলিয়া তাঁহার আসন অচল-প্রতিষ্ঠ করিয়া দিয়াছে। তাহাতেও কবিত্ব সৌরভ বর্তমান। তাঁহার কলিকাতা, অন্ধ্র অক্সফোর্ড বার্লিন, জুরিক, ইয়েল, হার্ভার্ড, টেক্সাস্, ওহিও, মার্কিণের কেমব্রিজ, ইলিনয়, শিকাগো, আয়োআ রাজ্য, মিউনিক, প্যারি, ফ্রাংকফোর্ট, ষ্ট্রাসবুর্গ, পিপিং বেলগ্রেড, তুরীণ, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী পাণ্ডিত্যে এবং জগতের ও মানবের হিতচিন্তায়—শুধু জ্ঞানগর্ভই নয়—মনোরম ও সুখপাঠ্য অমূল্য সম্পদ। অক্সফোর্ডে তিনি হিবার্ট বক্তৃতা দেন ১৯২৯ হইতে ১৯৩০।

বিশ্বভারতীর জন্য তিনি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন অতুলনীয়। প্রাচীনকালে তক্ষশীলা, নালন্দা ছিল, সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া ও জাতীয় সংস্কৃতি পুনর্জীবিত করিয়া, জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার আশা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এই বিশ্বভারতী।

সংগীতাদি আলোচনা

হিন্দু সংগীত-শাস্ত্রানুসারে সংগীত ত্রিধাবিভক্ত—গীত, বাদ্য, নাট্য। নৃত্যকলা নাট্যের অন্তর্গত। নাট্যাভিনয়ে ও গানে কবি দেশবিদেশে প্রসিদ্ধ। বিদেশী সংগীত শিখিয়া দেশীয় সংগীতের গুণাগুণ ও উন্নতি সাধনের কথা তাঁহার মনে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল। তিনি চিরদিন স্বাধীনতার প্রয়াসী, কোনোরূপ বন্ধন মানিতে চাহেন না। নাগপাশে দেশীয় সংগীতের দুশ্ছেদ্য বন্ধন তাঁহার প্রীতিকর হইত না। এজন্য অনেক সময়ে তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র হিতেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মতভেদ হইত। তাঁহারা উভয়েই সংগীতজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তবে রক্ষণশীল। এই হিতেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বাণী চট্টোপাধ্যায় সংগীতে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার উপাধি পান। ইনি ক্ষিতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা। সংগীতাচার্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিশেষ সাধনা ছিল মার্গসংগীতে ও মার্গ বা classical সংগীতালোচনায়, সুতরাং পথ ভিন্ন ছিল কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺প্রমোদকুমার ঠাকুর ইয়োরোপীয় যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী হইয়া অনেক গৎ রচনা করেন। তাঁহার একখানি সাংগীতিক স্বরলিপি "নীল যমুনা হিল্লোল" (Blue Jamuna Waltz) জার্মেণিতে বিশেষ আদৃত হয়। তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের সখ্যতা ছিল ও তাঁহার সংগীতানুভূতির জন্য কবি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। হয়তো তাঁহার মাত্র ২১ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যু না হইলে কবির মনের বাসনা দেশীয় সংগীতে পাশ্চাত্য harmony and melodyর সংমিশ্রণের কল্পনাটি আরো সত্বর ও সুন্দররূপে প্রতিফলিত করিতে পারিতেন। বিলাতে দ্বিতীয়বার যাইবার ঠিক পূর্বদিনে কবি মেডিক্যাল কলেজের হলে বীটন্ সোসাইটির (Bethune Soc.) আহ্বানে সংগীত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ও নিজে গান গাহিয়া তাঁহার বক্তব্য সভাস্থলে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এই বক্তৃতা ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠের "ভারতীতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সভায় সভাপতি ছিলেন রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি উক্ত প্রবন্ধের ও "বন্দে বাল্মিকীকোকিলং" বলিয়া প্রবন্ধকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রকাশ্য সভায় ইহাই কবির প্রথম প্রবন্ধ পাঠ। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতেরও উন্নতি কামনা করিতেছিলেন, ক্রমে কিছুদিন পরে তাঁহার সে সুযোগ মিলিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুণায় গিয়াছিলেন, তথায় তিনি "গায়ন-সমাজ" দেখিয়া আসেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার সেইরূপ একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা হয়। কলিকাতার ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায় নির্দোষ আমোদের মধ্য দিয়া যাহাতে অসংকোচ মিলনে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে পারেন, এরূপ একটি সাধারণ মিলন গৃহের অভাব বোধই তাঁহাকে এ বিষয়ে মনোযোগী করে। বিশেষত রসচর্চ্চার দ্বারা অনেক লোকের অনেক মনের কথোপকথনের একটি মানস-মিলনক্ষেত্র জাতির কল্যাণার্থে এ মহানগরীর বাঙালী ভদ্রপল্লীতে সংগঠিত হইয়া স্থায়ী আকারে বর্তমান থাকে তাহারও প্রয়োজন অনসুভূত ছিল না। যদিচ ইংরাজি কেতায় ইণ্ডিয়া ক্লাব ভারতীয়দের একটি স্বতন্ত্র মেলামেশার স্থান ছিল, তাহার লক্ষ্য ও কার্য্যপ্রণালী বিভিন্নরূপ ছিল ও মাসিক চাঁদার হারও মধ্যবিত্তের পক্ষে কিছু অধিক বিবেচিত হইত। শহরের ধনিগৃহে সংগীত-অভ্যাস, আমোদ-প্রমোদ ও জমায়েতের কেন্দ্রের জন্য প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র 'বৈঠকখানা-ঘর' থাকিলেও তাহার কার্যকারিতা নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। গৃহস্বামীর রুচি অনুসারেই অভ্যাগতদের চলিতে হইত ও আরাম, স্বচ্ছন্দতা, আমোদ ইত্যাদির সকল ব্যয়ই গৃহস্বামীকেই বহন করিতে হইত।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অন্যের দ্বারে উপস্থিত হওয়া, আদর-আপ্যায়নের কোনোরূপ ত্রুটি না থাকিলেও, কেবল কালক্ষেপণের জন্য ঘন ঘন যাওয়া গ্লানিকর বোধ হইত। অনেক চেষ্টার পর জ্যোতিরিন্দ্রের এই কল্পনা কার্যে পরিণত হইয়া ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের বাহবাটির দোতলার হলে ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ঘর লইয়া "ভারত সংগীত-সমাজ" নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইল। কলিকাতার যুবক ও মধ্যবয়স্ক অনেকেই আগ্রহের সহিত ইহার সভ্য হন ও প্রায় নিত্যই সমাজভবনে মিলিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে এস. পি সিংহ (পরে লর্ড), আশুতোষ চৌধুরী (পরে স্যার) প্রমুখ ব্যারিস্টারবৃন্দ ও বিলাত ফেরৎ ডাক্তাররা অনেকেই ইহার সভ্য হন। সুচারুরূপে কার্য্যারম্ভ কিন্তু আমাদের যেমন হয়—তিনজনে একসঙ্গে কাজ করিতে পারি না, এ ক্ষেত্রেও দলাদলি আরম্ভ হইয়া শেষে সেটা কেলেঙ্কারিতে পরিণত হইল। জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ অনেকেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনতিদূরে একটি সমগ্র বাড়ি আশুতোষ চৌধুরীর নামে lease লইয়া ভারত সংগীত সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। অপর দল পূর্বস্থানে 'সংগীত সমিতি' নাম দিয়া কিছুদিন তাঁহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিলেন।

সম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোকের বৈঠকখানার আদর্শে 'সমাজের' পরিচালনা হইত। বিস্তৃত হলে প্রশস্ত শাদা জাজিম তাকিয়া দেওয়া ফরাস বিছানা ও আলবোলা গড়গড়া পানদান ও গোলদানি ইহার আনুষ্ঠানিক রূপ ধার্য হয়। আমপাতার নল দেওয়া রূপাবাঁধা হুঁকা ও বৈঠক, পরাতে সজ্জিত সুবাসিত তাম্বুল ও বরফসংযুক্ত জল ও এইরেটেড পানীয়ের ব্যবস্থা হয়। দেশীয় নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, বিলাতি সচিত্র পত্রিকাবলী, তাস, পাশা ও দশ-পঁচিশ সভ্যদের অবসর বিনোদনের জন্য তথায় রক্ষিত হইত। তরুণদের জন্য অধিকন্তু একটি স্বতন্ত্র ঘরে তাঁহাদের অভ্যাস ও শিক্ষার কারণ ঐকতানের ঘর পিয়ানো, টেবিল-অর্গ্যান, হারমোনিয়াম, বেহালা ইত্যাদিতে সজ্জিত ছিল ও একজন সংগীত-শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। প্রাঙ্গণে একটি সুবৃহৎ বাঁধা রঙ্গমঞ্চ ছিল ও একটি ঘরে বিলিয়ার্ড খেলারও টেবিল ছিল।

কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীতে কৃতী বা গুণী কেহ কলিকাতায় আসিলেই যেমন তাঁহাকে সমাজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার কৃতিত্ব দেখিবার সুযোগ সভ্যদের দেওয়া হইত, তেমনিই আনন্দ, শিক্ষা ও সুসংস্কৃত প্রণালীর অভিনয়ের ব্যবস্থাও হইত।

প্রারম্ভ হইতে রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহ সহকারে "ভারত সংগীত সমাজে" যোগ দিয়াছিলেন। অভিনয়ের সহিত সংগীতের নিত্য সম্বন্ধ। সমাজের সভ্যদিগকে লইয়া অভিনয়ের আয়োজন

হইত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সহযোগী সম্পাদকরূপে যেমন সকল ব্যবস্থা ও আয়ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তেমনি অভিনয়, গীত ও নৃত্য শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। সংগীতচর্চার জন্য "সংগীত প্রকাশিকা" নাম দিয়া স্বরলিপিবহুল একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। স্বরলিপি ছাপার এক নব প্রণালীর প্রচলন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। অদ্যাবধি সুলভ মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য সেই গীতলিপিপদ্ধতিই ব্যবহৃত হইতেছে। সমাজের অনুষ্ঠিত অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত করিতে রবীন্দ্রনাথও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ব্যক্তিবিশেষের সম্বর্ধনার জন্য সময়ে সময়ে ভোজের আয়োজন সমাজে হইত। ভোজ্যতালিকা (Menu) মুদ্রণ করা হইত। বাঙলার মফঃস্বলের জমিদাররাও অনেকে ইহার সভ্য ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে সমাজে সাধারণের সহিত সমান ভাবে মিশিতেন। বিলাতে নব আবিষ্কার প্রদর্শন করিয়া যখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এক সান্ধ্য সম্মেলন ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। অভিনয়ে সময়নিষ্ঠার (punctuality) জন্য সমাজের সুনাম ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত কবিতা "আচার্য জগদীশচন্দ্র" এই উপলক্ষে রচিত হয়।

সভ্যেরা বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন, কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এমনই ছিলেন যে মাতৃভাষা উচ্চারণ করিতে অনেক সময়ে তাঁহাদের জিহ্বা অস্বীকার করিত, তন্মধ্যে কেহ কেহ বিলাত বা অ্যামেরিকা প্রত্যাগতও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিপ্রহরে কাহারও বাড়িতে ও সমাজভবনে গিয়া তাঁহাদের উচ্চারণ সংশোধন করিতেন, আবার সন্ধ্যায় মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভূমিকা পাঠের আবৃত্তি গ্রহণ করিতেন ও আনুসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গী শিক্ষা দিতেন। এইরূপে কিছুদিন ধরিয়া পরিশ্রম স্বীকারের পর সমাজ জাঁকাইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তখন ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

জীবনযাত্রা আগে চ'লে যায় ছুটে
কালে কালে তার খেলার পুতুল পিছনে ধূলায় লুটে।

এই সমাজে অভিনয়ার্থ "গোড়ায় গলদ" রচিত। ✓অমৃতলাল বসুর স্মৃতিপটে কোনো প্রকারে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রের কৃতিত্ব বলিয়া যে স্থান পাইয়াছিল তাহা "অমৃত মদিরায়" আভাস পাই। ইহার একটু কারণ আছে। যে সময়ের অভিনয়ের কথা তিনি বলিয়াছেন, তৎকালে মুদ্রিত গ্রন্থ বাহির হয় নাই এবং গ্রন্থকর্তার নামও প্রকাশিত হয় নাই।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি হইতে যথাযথ ভূমিকা শিক্ষা দেওয়া হয়। অভিনয়কালে দেখা গেল পুস্তকখানি দীর্ঘ ও অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ হইয়াছে। তখন রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব অধ্যবসায় ও ক্ষিপ্রতার সহিত উহার আমূল সংশোধন করিলেন, লিখিত অংশের বহু স্থান নির্মমভাবে কাটিয়া দিলেন। নূতন কথোপকথন সংযোগ দ্বারা উহাকে যে নূতন রূপ দান করিলেন তাহাতে সময়ের সাশ্রয় হইল। এক এক দিন মহলায় রাত্রি বারোটা বাজিয়া যাইত। কবি পদব্রজে তখন কাঁসারিপাড়ার মধ্য দিয়া বাড়ি ফিরিতেন। নিত্য অধিক রাত্রি হওয়ায় প্রতিবাদস্বরূপ এক দিন সন্ধ্যায় সভ্যদের সমক্ষে একটি গল্প বলেন যাহাতে সকলে সচকিত হইয়া উঠে; তিনি বলেন—"কাল রাতে যা মুস্কিলে পড়েছিলুম! বা'ড় পৌঁছে কাপড় ছেড়ে খেতে তো বসলুম। খাবার একেবারে ঠাণ্ডা, ও-দিকে গিন্নী গরম। কোনো রকমে সামলানো গেছে।" বলিবার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। তদবধি সভ্যদের মধ্যে রাত্রি নয়টা বাজিলেই "খাবার ঠাণ্ডা, গিন্নী গরম" কথাটি একটি standing joke হইয়া দাঁড়াইল। কবিও পরিশোধিত নাটকে উহা এক স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন। [ক্রমশঃ।

ছন্দ-বিলার

মাধবী ভট্টাচার্য

রাঙা আবীরের ধুম
কেড়ে নিল মোর ঘুম,
আমি চোখ মেলে চেয়ে দেখেছি
প্রিয়ার মনের মুকুরে আমার মনের ছবিটি এঁকেছি।
রাঙা আবীরের ধুম,
আর গোটা দুই চুম
আমি প্রাণ খুলে পান কোরেছি—
প্রিয়ার মধুর নিবিড় সোহাগ এ দুই অধরে ধরেছি।
রাঙা আবীরের ধুম,
কেড়ে নিয়ে গেল ঘুম,
আমি সারা রাত ধরে জেগেছি—
কখন আসিবে প্রিয়তম বলে, নিশিভোর শুধু ভেবেছি।

সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

অভিযোগের প্রত্যুত্তরে সম্রাট বাহাদুর শাহের বিবৃতি

প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করা হইতেছে : হাঙ্গামা বাধিবার পূর্ব্বদিনেও আমি কিছুই জানিতাম না। সকাল ৮টার সময় বিদ্রোহী সৈন্যদল প্রাসাদের জানালার নিচে আসিয়া একটা বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি করে এবং বলে যে, মিরাটের ইংরাজদের বধ করিয়া তাহারা এখানে আসিয়াছে। এই নৃশংসতার কারণ স্বরূপ তাহারা বলে যে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই জাতিধর্ম্মে আঘাত করিয়া ইংরাজেরা গরু এবং শূকরের চর্ব্বিমাখানো কার্টিজ তাহাদের দাঁত দিয়া ছিঁড়িতে বাধ্য করায় তাহারা উত্তেজিত হইয়াছে। এই কথা বলিবামাত্র আমি জানালার নিচেকার ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিবার আদেশ দিলাম এবং প্রাসাদের রক্ষী সৈন্যদের অধ্যক্ষকে এই গোলযোগের সংবাদ দিলাম। তিনি আমার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে জানাইলেন যে তিনি নিজে ঐ সব সৈন্যদের নিকট যাইয়া তাহাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবেন। সুতরাং ফটক খুলিয়া দেওয়া হউক। আমি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি বারান্দায় যাইয়া বিদ্রোহী সৈন্যদলকে কিছু বলিলে, তাহারা চলিয়া গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ আমাকে জানাইলেন যে, এই সব গোলযোগের প্রতিবিধান তিনি এখনই করিবেন।

অল্পক্ষণ পরেই ফ্রেজার সাহেব দুইটি বন্দুক চাহিয়া একখানি চিঠি পাঠাইলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ দুইটি পাল্কী পাঠাইবার প্রার্থনা জানাইয়া একখানি চিঠি পাঠাইলেন। জানা গেল যে, দুইটি মহিলাকে ঐ পাল্কীতে আমার নিকট পাঠানো হইবে এবং আমি যেন তাঁহাদের বেগম মহলে লুকাইয়া রাখি। বন্দুক এবং পাল্কী পাঠানোর জন্য আমি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই আমি সংবাদ পাইলাম যে, পাল্কী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ফ্রেজার সাহেব এবং প্রাসাদের রক্ষী সৈন্যাধ্যক্ষ এবং মহিলাদ্বয় সকলেই ইতিমধ্যে নিহত হইয়াছেন।

আরও কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম যে, বিদ্রোহী সৈন্যগণ দলে দলে দেওয়ানী খাস এবং মসজিদের সম্মুখে আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। আমি তাহাদের অবিলম্বে চলিয়া যাওয়ার জন্য বলিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের উদ্দেশ্য কি ? প্রত্যুত্তরে তাহারা জানাইল যে, তাহারা জীবনপণ করিয়া এতদূরে আসিয়াছে ; সুতরাং আমি যেন নীরব দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিয়া কেবল তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া যাই। পাছে তাহারা আমাকেও আক্রমণ করিয়া বধ করে, সেই ভয়ে আমি অন্দর মহলে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এই সব হত্যাকারিগণ কয়েকজন ইয়ুরোপীয় নর-নারীকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল এবং আমাকে জানাইল যে, বারুদখানা হইতে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাহাদের বধ করা হইবে। আমি তাহাদের অনেক অনুরোধ করিয়া বন্দীদের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম। বিদ্রোহী সৈন্যরা কিন্তু নিজেদের জিম্মায় ঐ বন্দীদের রাখিয়া দিল। পরে আবার তাহাদের হত্যা করিতে উদ্যত হইলে আমি আবার অনুনয় বিনয় করিয়া ঐ বন্দীদের হত্যা করা হইতে তাহাদের নিবৃত্ত করি। অবশেষে আবার তাহারা তাহাদের ঐ নৃশংস কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে আমি আবার তাহাদের নিরস্ত করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এবারে তাহারা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহারা নৃশংসবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া ঐ বন্দীদের হত্যা করিল। এই হত্যা সাধনের জন্য আমি কোন আদেশই দিই নাই। মির্জ্জা মোগল, মির্জ্জা খয়ের সুলতান, মির্জ্জা আবুল বকর এবং আমার ভৃত্য বসন্ত এ সম্বন্ধে আমার নাম লইয়া কোনও আদেশ দিয়াছিল কি না, তাহা আমার জানা নাই।

আমার রক্ষী সৈন্যদলের মধ্যে কেহ এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল কি না, তাহাও আমার জানা নাই। যদি কেহ লিপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে হয়তো তাহারা মির্জ্জা মোগলের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া থাকিবে। হত্যাকাণ্ডের পরেও আমাকে এ বিষয়ে কেহ সংবাদ দেয় নাই। কয়েক জন সাক্ষী ফ্রেজার সাহেব এবং প্রাসাদের সৈন্যাধ্যক্ষের হত্যা ব্যাপারে আমার ভৃত্যদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধেও আমার একই উত্তর, আমি কোনও আদেশ দিই নাই। তাহারা যদি এ ব্যাপারে যোগ দিয়া থাকে তবে নিজের ইচ্ছাতেই দিয়া থাকিবে। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ফ্রেজার সাহেব বা অন্য কোনও ইয়ুরোপীয়দের হত্যা সম্বন্ধে আমি কোনও আদেশই দিই নাই। মুকুন্দলাল এবং অন্যান্য সাক্ষীরা এ বিষয়ে আমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, সবই মিথ্যা। মির্জ্জা মোগল এবং মির্জ্জা খয়ের সুলতান হয়তো এ বিষয়ে আদেশ দিয়া থাকিতে পারেন ; কারণ তাঁহারা বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

'এই সকল ঘটনার পরে বিদ্রোহী সৈন্যেরা মির্জ্জা মোগল, মির্জ্জা খয়ের সুলতান এবং আবুল বকরকে আমার নিকট উপস্থাপিত করিয়া জানাইল যে, উহাদের তাহারা অধিনায়ক করিতে চায়। আমি প্রথমে তাহাদের এ কথায় কর্ণপাত করি নাই। কিন্তু সৈন্যেরা যখন পুনঃপুনঃ তাহাদের দাবী জানাইতে লাগিল এবং মির্জ্জা মোগল অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাতার নিকট চলিয়া গেলেন, আমি সৈন্যদের

হয়ে নীরব রহিলাম। আমার নীরব থাকায় তাহারা আমার সম্মতি আছে মনে করিয়া মির্জ্জা মোগলকে তাহাদের সেনাপতি পদে বরণ করিল। হুকুমনামায় আমার স্বাক্ষর এবং সহিমোহর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ইয়ুরোপীয়দের হত্যা করিয়া বিদ্রোহী সৈন্যদল আমাকে বন্দী করায় আমার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার কোনও উপায় ছিল না। তাহারা কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া আমার নিকট আনিয়া আমাকে স্বাক্ষর এবং সহিমোহর করিতে বাধ্য করে। কয়েক বার তাহারা হুকুমনামার মুসাবিদা করিয়া আমার নিজের মুন্সীকে দিয়া তাহা লেখাইতে বাধ্য করে।

কোন কোন সময়ে সাদা লেফাফাতে তাহারা আমার শিলমোহরের ছাপ দিয়া লয়। তাহার মধ্যে কি কাগজ ছিল এবং তাহাতে কি লেখা ছিল, তাহা কিছুই আমি জানিতাম না। আমি এবং আমার মুন্সী মুকুন্দলাল প্রাণভয়ে কিছুই বলিতে পারিতাম না। আমার নিজ হস্তে লেখা আদেশগুলি সম্বন্ধেও আমার ইহাই বক্তব্য।

মির্জ্জা মোগল বা মির্জ্জা খয়ের সুলতান অথবা আবুল বকর কিম্বা তাহাদের সৈন্যরা যখনই কোনও দরখাস্ত আমার নিকটে লইয়া আসিত, তাহাদের সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী থাকিত এবং আমাকে স্বহস্তে সেই সকল দরখাস্তের উপর তাহাদের নির্দেশমত আদেশ লিখিতে বাধ্য করিত। তাহারা আমাকে শুনাইয়া বলিত যে, তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য যিনি না করিবেন, তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। তাহাদের ভয়ে আমার কিছুই বলিবার শক্তি ছিল না। তাহারা আমার সম্বন্ধেও অভিযোগ করিত যে, আমি ইংরাজদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিতেছি এবং আসানউল্লা খাঁ, মাহবুব আলি খাঁ এবং সম্রাজ্ঞী জিনৎ মহল সম্বন্ধেও তাহারা অনুরূপ ধারণা পোষণ করিত। অবশেষে একদিন তাহারা আসানউল্লার বাড়ী লুঠ করিয়া তাহাকে বন্দী করিল। তাহাকে হত্যা করিতে তাহারা কৃতসংকল্প হইয়াছিল, কিন্তু অনেক অনুনয়-বিনয় করায় তাহাকে হত্যা করে নাই, তবে এখনও সে তাহাদের হাতে বন্দী। ইহার পরে তাহারা এ কথাও বলে যে, আমাকে গদীচ্যুত করিয়া তাহারা মির্জ্জা মোগলকে সিংহাসনে বসাইবে। সুতরাং স্থির ভাবে চিন্তা এবং বিচার করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে, এ অবস্থায় আমার পক্ষে কি করা সম্ভব ছিল এবং তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবারই বা কি কারণ আমার থাকিতে পারে। বিদ্রোহীরা আমার কাছে এমন প্রস্তাবও করিয়াছিল যে, রাণী জিনৎ মহলকে তাহারা ইংরাজের সমর্থক বলিয়া সন্দেহ করে এবং সেজন্য তাঁহাকেও তাহারা বন্দী করিয়া রাখিবে। আমার যদি কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আসানউল্লা এবং মাহবুব আলি কি কখনও বন্দী হইতে পারিত? না আসানউল্লার বাড়ী লুণ্ঠিত হইতে পারিত?

বিদ্রোহীরা নিজেদের বিচারসভা গঠন করিয়াছিল এবং সেখানে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিত। আমি কোন সময়েই সে সভায় যোগ দিই নাই। আমাকে না জানাইয়াই তাহারা যে কেবল বহু লোকের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে তাহা নয়, সময়ে সময়ে এক একটি রাজপথের সমুদয় বাড়ী অবাধে লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং বণিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে নিজেদের প্রয়োজন মত টাকা জোর করিয়া আদায় করিয়া লইয়াছে। এ অবস্থায় আমি কি করিতে পারি? তাহারা হঠাৎ আসিয়া আমাকেও বন্দী করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের ইচ্ছামত কার্য্য না করিলে আমাকেও হত্যা করিবার ভয় দেখাইল। এ কথা সকলেই জানে।

এই অবস্থায় হতাশ হইয়া আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া আমি প্রথমে কুতব সাহেবের দরগায় যাইব, তারপর যাইব আজমীরে এবং সেখান হইতে চলিয়া যাইব মক্কাধামে। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যরা আমার সে সংকল্পেও বাধা দিল। ইহারাই বারুদখানা এবং ট্রেজারি ধ্বংস করিয়াছে, আমি তাহা হইতে কিছুই লই নাই এবং তাহারাও আমাকে কিছুই আনিয়া দেয় নাই। তাহারা একদিন রাণী জিনৎ মহলের বাসস্থান লুঠ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। সুতরাং বেশ বোঝা যাইবে যে, এই সব বিদ্রোহী সৈন্যরা যদি আমার বাধ্য হইত, তাহা হইলে এই সব ঘটনা কি ঘটিতে পারিত? ইহা ছাড়া এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, দরিদ্রতম ব্যক্তিকেও কেহ বলিতে পারে না যে তোমার স্ত্রীকে আমরা বন্দী করিব।

হাবসী কামবার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমিই তাহাকে মক্কা যাইবার অনুমতি দিয়াছিলাম। আমি তাহাকে পারস্য দেশে পাঠাই নাই, কিম্বা পারস্য সম্রাটের নিকট কোন চিঠিও আমি লিখি নাই। কোন লোক মিথ্যা করিয়া এই কথা রটনা করিয়াছে। মহম্মদ দরবেশের দরখাস্ত আমার লেখা নয়—সুতরাং তাহা বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। যদি আমার কোনও শত্রু কিম্বা মিয়া হাসান আসবাবির কোনও শত্রু যদি এই দরখাস্ত পাঠাইয়া থাকে, তাহার উপর নির্ভর করা সঙ্গত নয়। বিদ্রোহী সৈন্যরা আমাকে কুর্ণিশ পর্য্যন্ত করিত না। তাহারা দেওয়ানী খাস এবং মসজিদের ভিতর জুতা পায়ে দিয়াই প্রবেশ করিত। যাহারা নিজেদের প্রভুদের নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের উপর কখনও কি বিশ্বাস স্থাপন করা চলে? আমাকেও তাহারা বন্দী করিয়া আমার নাম ব্যবহার করিবার সুযোগ লইয়া তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত কার্য্য করিত। আমি নিঃসহায়, নিরস্ত্র, অর্থহীন, গোলাবারুদ বা কোনও প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্য না পাওয়া অবস্থায় নিজের ইচ্ছায় কি করিতে পারি? কিন্তু তাহাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য কোন সময়েই দিই নাই। বিদ্রোহী সৈন্যদল যখন প্রথম আমার প্রাসাদের নীচে উপস্থিত হইল, আমি তৎক্ষণাৎ জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। প্রাসাদরক্ষীকে আমি তখনই সংবাদ দিয়াছিলাম এবং তাঁহাকেও বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আমি মহিলাদের নিরাপদে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দুইটি পাল্কী পাঠাইয়াছিলাম এবং প্রাসাদের দ্বার সুরক্ষিত করিবার জন্য দুইটি তোপ পাঠাইয়াছিলাম। সেই রাত্রেই আমি আগ্রাতে মহামান্য লেফটনান্ট গভর্ণর সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থার বিবরণ দিয়া উটের পিঠে দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়াছিলাম। যতক্ষণ আমার হাতে ক্ষমতা ছিল, আমি যথাসাধ্য করিয়াছি। আমি নিজের ইচ্ছায় শোভাযাত্রা করিয়া বাহিরে যাই নাই; আমি সৈন্যদের কবলে পড়িয়া তাহাদের ইচ্ছামত কার্য্য বাধ্য হইয়া করিয়াছি। যে কয় জন ভৃত্য আমার নিজের কাছে রাখিয়াছিলাম, তাহারা যাহাতে আমার জীবন রক্ষা করিতে পারে, সেই কারণেই রাখিয়াছিলাম। তাহারাও যখন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন আমি প্রাসাদ হইতে গোপনে চলিয়া গিয়া হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরে যাইয়া আত্মগোপন করিয়াছিলাম। সেখান হইতেই আমাকে

আত্মসমর্পণ করিতে বলা হয় এবং জানানো হয় যে, আমার জীবনের কোনও হানি করা হইবে না। আমি তৎক্ষণাৎ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট নিজেকে সমর্পণ করি। বিদ্রোহী সৈন্তরা তাহাদের সঙ্গে আমাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি যাই নাই।

এই বর্ণনাপত্রে যে সব কথা লিখিত হইল, তাহা সমস্তই আমার নিজের মুখের কথা হইতে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে একটিও মিথ্যা বা অসত্য কথা নাই। ভগবানের নাম লইয়া বলিতেছি যে, যাহা নিছক সত্য, আমি কেবল তাহাই বিবৃত করিয়াছি। প্রথমেই শপথ করিয়া বলিয়াছি যে, আমি সত্য ছাড়া আর কিছুই বলিব না, এক্ষণে তাহাই বলিলাম।

(স্বাক্ষর)

পুনশ্চ—বিদ্রোহী সৈন্তদের ক্রিয়াকলাপ এবং খাজা সাহেব এবং মক্কা যাইবার আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া মির্জ্জা মোগলকে আমি যে পত্র লিখিয়াছি সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ঐরূপ কোনও পত্রের কথা আমার স্মরণ নাই। চিঠিখানিতে যে আদেশ দেওয়া আছে উহা উর্দ্দু ভাষায় লিখিত। আমার দেরেস্তায় উর্দ্দু ভাষা ব্যবহৃত হয় না, সেখানে সবই ফার্সী ভাষায় লেখাপড়া হয়। সুতরাং কোথায় এবং কি ভাবে ঐ পত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। সংসারে বীতরাগ হইয়া আমি মক্কা যাইবার সংকল্প করায় মির্জ্জা মোগল বোধ হয় ঐ পত্রখানি লেখাইয়া আমার সহি-মোহর অঙ্কিত করিয়া থাকিবে। মোটের উপর বিদ্রোহী সৈন্তদের প্রতি আমার বিরক্তি এবং আমার নিঃসহায় অবস্থাও ঐ পত্র হইতেই প্রমাণিত হয়। অন্যান্য যে সব কাগজপত্র এই আদালতে দাখিল করা হইয়াছে। যথা—রাজা গোলাপ সিংকে লেখা চিঠিখানি, বখত খাঁর দরখাস্ত এবং তাহার উপর আমার সহিমোহরের ছাপ, এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, আমি এসব চিঠির কিছুই জানি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিদ্রোহী সেনাদল আমার অজ্ঞাতসারে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত চিঠিপত্র লেখাইত এবং তাহাতে আমার সহি-মোহরের ছাপ দিত। হয়তো যে সব চিঠিপত্র লিখিতে এবং স্বাক্ষর করিতে তাহারা আমাকে বাধ্য করিত, এগুলিও সেই ধরণের চিঠি ছাড়া আর কিছুই নয়। (স্বাক্ষর)

অতঃপর জজ এডভোকেট জেনারেল তাঁহার ভাষণ সুরু করিলেন।

জজ এডভোকেট জেনারেলের ভাষণ

মাননীয়গণ—এই বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সব ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমি পারিয়াছি, সেইগুলি যথাযথ ভাবে আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্ত আমাদের কয়েক মাস সময় লাগিয়াছে, সে সময় সহরের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিতেছিল। সুতরাং আমার বিশ্বাস, যে সকল ঘটনার বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা সমস্তই সত্য এবং তথ্যপূর্ণ। যাঁহার বিচারের জন্ত এই সভা গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ গৃহীত হইয়াছে সে বিষয়ে তিনি দোষী কিম্বা নির্দ্দোষী, ইহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে তাঁহার পদমর্য্যাদা এবং তাহার সুযোগ লইয়া যে সব অমানুষিক কীর্ত্তিকলাপ সংঘটিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রথমেই, যে সকল কারণে এই সব নির্ম্মম ঘটনাবলী, যাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অভিনব বলিয়া মনে হইবে, এবং যাহা ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতিকেই প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিব।

ঠিক কি কারণে এবং কাহার দ্বারা এই অমানুষিক বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ড প্রথমে সুরু হয় তাহার সঠিক সংবাদ সম্বন্ধে এখনও মতভেদ আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের প্ররোচনায় এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া ওঠে, এবং সে সকল তথ্য যে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই তাহা নহে। তবে বর্ত্তমানে আমি বলিতে চাই যে, দিল্লীর রাজসভায় এ সম্বন্ধে চক্রান্ত এবং গোপন পরামর্শ অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। এই বিচারসভায় যিনি বন্দী তাঁর সম্রাট উপাধির দ্বারা তিনি ধর্ম্মান্ধ মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে উচ্চতম নক্ষত্ররূপে গণ্য হইতেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দিকেই চাহিয়া অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছে।

এইবার আমি ঘটনাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

গত মে মাসে মিরাটে কার্টিজ ব্যবহার করিতে অসম্মত হওয়ায় 3rd Light Cavalry তে যে ৮৫জন সৈনিকের সেখানকার সামরিক আদালতে বিচার হয়, তাহাদের বিচারকের রায় শুনাইয়া হাতে-পায়ে শিকল পরাইয়া প্যারেড গ্রাউণ্ডে ৯ই মে সকালে হাজির করা হয়। এই ঘটনার পরদিন সন্ধায় অর্থাৎ ঠিক ৩৬ ঘণ্টা পরে ১০ই মে তারিখে মিরাটের তিনটি দেশীয় রেজিমেণ্ট বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। ৩৬ ঘণ্টা নিতান্ত অল্প সময় নয়, সুতরাং এই বিদ্রোহীদলের সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান অসম্ভব ছিল না। গাড়ী করিয়া মিরাট হইতে দিল্লী আসিতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। বিদ্রোহীরা যে দিল্লীর 38th Native Infantry দলের কি করিয়া সংযোগ স্থাপন করিল, তাহার বিবরণ ক্যাপ্টেন টিটলার ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গাড়ী-বোঝাই বিদ্রোহীদল রবিবার সন্ধ্যায় 38th দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, রবিবার সন্ধ্যায় যে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম মিলিত হইয়াছিল তাহা নহে। আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে অবাধ্য সৈন্তগণের বিচার নিষ্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাহারা স্থির করিয়াছিল যে কার্টিজ ব্যবহারে যদি তাহাদের বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে মিরাট এবং দিল্লীর সমস্ত দেশীয় সৈন্তরা একত্রিত হইয়া বিদ্রোহী হইবে। আমরা এমন প্রমাণও পাইয়াছি যে, রবিবার সন্ধ্যার সময়েই দিল্লী প্রাসাদের রক্ষী সৈন্তরা এ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দিল্লী বা মিরাটে এ সময়ে চর্ব্বিমাখানো কার্টিজ একটিও ছিল না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সকল কার্টিজ বহু কাল হইতে বিভিন্ন কেল্লার বারুদখানায় যাহাদের দ্বারা প্রস্তুত হইত তাহারা সকলেই ঐ সব বিদ্রোহী সৈন্তদের স্বজাতীয় অথবা সমধর্ম্মী। তাহারা যদি জানিত যে কার্টিজে আপত্তিকর পদার্থ আছে তাহা হইলে তাহারাই কি উহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইত? দেখা গিয়াছে যে, এই সব কার্টিজ ব্যবহারে হিন্দু বা মুসলমান সৈন্তদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত

হইবে না যে, কার্টিজ ব্যবহারের আপত্তি প্রকৃতপক্ষে গুরুতর বলিয়া তাহারা মনে করে নাই। আসলে তাহারা ইংরাজদের হত্যা করিয়া বর্তমান বিচার-সভায় যিনি বন্দিরূপে উপস্থিত, তাঁহারই পতাকাতলে উপস্থিত হইয়া ইঁহারা যাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, সেই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এই বিচার-সভায় বহু কাগজ এবং চিঠিপত্র আদালতে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, কিন্তু কোনও পত্রেই স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না যে, ইংরাজের বিরুদ্ধে ইহাদের অসন্তোষের কারণ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কাজেই এই বিদ্রোহ এবং লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের যে সব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেন হইল এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি, তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। বিদ্রোহের সময় অন্যান্য সিপাহীদের উত্তেজিত করিবার সময় তাহারা সাড়ম্বরে চর্ব্বি-মাখানো কার্টিজের কাহিনী শুরু করিয়াছে। অথচ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সে-সময়ে এ অঞ্চলে ঐ সব কার্টিজ মোটেই ছিল না। সুতরাং কি কারণে এই বিভীষিকার সৃষ্টি হইল, তাহা এক বিচিত্র রহস্য! কার্টিজের ব্যাপার যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ঐ আপত্তিকর বস্তু ব্যবহার করিতে বিরত হইবার জন্য রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষের নিকট সামান্য একটি দরখাস্ত করিলেই যথেষ্ট হইত। সুতরাং আমার বিশ্বাস, এই বীভৎস ব্যাপারের অন্তরালে এমন একটা ষড়যন্ত্র আছে, যাহা কার্টিজ-কাহিনী অপেক্ষা অনেক অনেক গুরুতর।

যে আয়োজন এবং ব্যবস্থাপনার দ্বারা এই বিদ্রোহী শক্তিকে পরিচালিত করা হইয়াছে এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড ও বীভৎস অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট বিচক্ষণতা এবং কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় আছে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের বহু স্থানে যেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়াছে, সেখানে কার্টিজের কোনও উল্লেখই হয় নাই। ইংরাজদের হত্যা করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে হইবে, এই অদম্য ইচ্ছাই বিভিন্ন স্থানের লোকদের প্রভাবিত করিয়াছে। তাহারা জানিয়াছিল যে হত্যা, লুণ্ঠন এবং যে কোনও অত্যাচারই তাহারা করুক না কেন, কাহারও কাছে কোনও শাস্তিই তাহাদের পাইতে হইবে না। সুতরাং কার্টিজ ব্যবহারে আপত্তি করার জন্যই এই বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? কোনও গুরুতর ষড়যন্ত্র ব্যতীত একটা অতি তুচ্ছ কারণে কি এই নির্ম্মম ব্যাপার ঘটিতে পারে? মিরাটের তিনটি বিদ্রোহী রেজিমেণ্ট এবং দিল্লীর কয়েকটি রেজিমেণ্ট একত্রে মিলিত হইলেও কি কখন কল্পনা করিতে পারে যে সেই শক্তির দ্বারা তাহারা ভারত হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিতে পারিবে?

মাননীয় বিচারপতিগণের নিকট আমার এই নিবেদন যে, যদি এ কথা মানিয়াও লওয়া হয় যে পূর্ব্ব হইতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের এবং রক্তপ্লাবী বিদ্রোহের কোনও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না, তবু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে একটা বড় রকমের ষড়যন্ত্র ছাড়া এ ব্যাপার ঘটিতে পারিত না। যে নৃশংসতার সহিত এই সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার এক মাত্র কারণ যে আপত্তিকর কার্টিজ, ইহা কখনই হইতে পারে না। ১০ই মে তারিখে কার্টিজের ঘটনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাটিতে আর সে কথার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। ৮৫ জন সিপাহীকে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইতেছিল তখনও কোনও অসন্তোষের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এবং 3rd cavalry-র অবশিষ্ট সৈন্যগণ তখনও শান্ত ও নীতিবদ্ধ ভাবেই ছিল। ১১ই তারিখে দিল্লীতে যে আগুন জ্বলিয়া ওঠে তাহার জন্য সিপাহীদের প্রস্তুত করিতে অনেকখানি সময় এবং অবসরের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাপ্তেন টিটয়ারের বিবৃতিতে সে কথা স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বগঠিত একটা গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া গাড়ীবোঝাই সিপাহীরা মিরাট হইতে দিল্লী আসিয়া বিদ্রোহের আগুন জ্বালিতে পারিত না।

মিরাটের বিদ্রোহ ব্যাপারে দেশীয় সৈনিকদের যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইয়ুরোপীয় সৈন্য এবং কর্ম্মচারীদের ছাউনি হইতে দেশীয় সৈন্যদের ছাউনির দূরত্ব প্রায় ২ মাইল। দেশীয় ছাউনিতে কোনও গোলমাল বা কলরব হইলে ইয়ুরোপীয় ছাউনি হইতে তাহা শুনিতে পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। কোনও গোলযোগ বাধিলে ইয়ুরোপীয় অফিসাররা স্বভাবতঃই তাহা মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন কিন্তু গোলযোগের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইতেই অনেকটা সময় চলিয়া যায়। এ দিকে দেশীয় সৈন্যরা এই বিলম্বের সুযোগ লইয়া অনেক দূরে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে অফিসাররা দেশীয় ছাউনিতে গিয়া সিপাহীদের দেখিতে পান নাই এবং তাহাদের গতিবিধি সম্বন্ধেও কোনও সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সিপাহীরা এক এক দলে পাঁচ ছয় বা দশ জনে মিলিয়া একটা গোপন স্থানে সমবেত হয়। তার পর রীতিমত সামরিক কায়দায় মার্চ্চ করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয়।

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই বিদ্রোহী সৈন্যদল দিল্লীতে আসিয়া এই মোকদ্দমায় যিনি বন্দী—তাঁহার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্বোধন করে। এ ব্যাপারটা খুবই গুরুতর এবং বেশ বোঝা যায় যে পূর্ব্ব হইতেই এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। সিপাহীদের প্রতি বন্দীর প্রকাশ্য সহানুভূতি এবং তাহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্বন্ধে এইবার আমি আমার বক্তব্য বলিব।

বিদ্রোহের আগুন জ্বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বন্দীর চোখের সম্মুখে তাঁহার নিজের ভৃত্যেরাই ইয়ুরোপীয়দের রক্তে কেল্লার মাটি রঞ্জিত করিল। যখন আমরা চিন্তা করি যে, সেই সব নিহতদের মধ্যে অসহায়া নারী এবং শিশু ছিল—যাহারা কখনই কোনও ক্ষতি করিতে পারিত না, তখনই এই ঘটনার দারুণ বীভৎসতার কথা এবং মানুষ যে কতখানি নৃশংস হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের হৃৎকম্প হয়। আমরা ভাবিয়া পাই না যে এই বন্দী, যিনি শিক্ষিত বলিয়া নিজেকে প্রচার করেন, যিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব করেন, যিনি অভিজাত বলিয়া খ্যাত, বয়সের ভারে যিনি নত হইয়া পড়িয়াছেন, এই শুভ্রকেশধারী বৃদ্ধ—কি করিয়া তিনি নিজেকে এই বর্ব্বরের মত কার্য্যে—যে কার্য্যের পরিচয় দিতে বন্যপশুরাও ঘৃণা বোধ করে, তাহাতে নিজেকে জড়িত করিলেন!

তাইমুর রাজবংশের শেষ রাজা সত্য সত্যই এই নৃশংস ও ভয়াবহ

ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন কি না, তাহাই আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর আলোচনা প্রয়োজন। যে সব হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি পরিষ্কার দিবালোকে, বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং অতি প্রকাশ্য ভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সব হত্যাকাণ্ড এই বন্দীর নিজের ভৃত্যদের দ্বারা প্রাসাদের সীমানার মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই কথা বলা প্রয়োজন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনেও দিল্লী প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যে বন্দীর সার্ব্বভৌম অধিকার ছিল। আমি অবশ্য এ কথা বলিতে চাহি না যে, এই সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্দী পূর্ব্ব হইতেই অনুমোদন করিয়াছিলেন। আমরা কেবল প্রমাণের সাহায্যেই আমাদের বক্তব্য বলিব।

হাকিম আসানউল্লা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি এবং দরবারের উকীল গোলাম আব্বাস সম্রাটের নিকট উপস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ ফটকের নিকট পড়িয়া আছে এবং বিদ্রোহীরা কাপ্তেন ডগলাসকে হত্যা করিতে ছুটিয়াছে। সম্রাটের পাল্কী-বেহারারা সেই সময়ে সেখানে আসে, তাহারাও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলে। তাহারা আরও জানায় যে দ্বিতলে যে সব ইয়ুরোপীয় নর-নারী আছেন, তাঁহাদের হত্যা করিবার জন্য একদল সেখানে যাইতেছে। বন্দীর নিজের ভৃত্যেরা এই সব বীভৎস হত্যাকাণ্ডে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, বন্দী সে কথা গোপন করিতেছেন কেন? বন্দী বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের ভৃত্যেরা এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তাহা তিনি জানিতেন না এবং এ ব্যাপার কাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল তাহাও তিনি জানিতেন না। এত বড় একটা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করিবার কি তাৎপর্য্য ছিল? এত দিন পরেও আমরা সহজেই জানিতে পারিয়াছি, কাহারা এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিল। সম্রাটের নিজের ভৃত্যেরাই এ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, এ কথা স্থানীয় সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং যে সকল প্রমাণের দ্বারা স্থির হইয়াছে যে সম্রাটের নিজের ভৃত্যেরাই এই সব হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমি সেই সব প্রমাণের মধ্য হইতে একটিমাত্র উল্লেখ করিব :—

"এই সময়ে ফ্রেজার সাহেব গোলমাল থামাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলাম যে কাজী নামক এক মণিকার তাহার তরবারির দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই বাদশাহের ভৃত্যেরা আসিয়া ভূপতিত ফ্রেজার সাহেবের উপরে ক্রমান্বয়ে তরবারির আঘাত করিতে লাগিল। ফ্রেজারের হত্যাকারীদের মধ্যে একজন ছিল হাবসী। এই ঘটনার পরেই তাহারা দ্বিতলের দিকে ধাবিত হইল। আমি তখন অন্য দ্বার দিয়া উপরে যাইয়া সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি অন্যান্য দরজাগুলিও বন্ধ করিতেছিলাম, এমন সময় দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া তাহারা উপরে উঠিয়া পড়িল এবং যে ঘরে কাপ্তেন ডগলাস, মিষ্টার হাচিনসন এবং মিষ্টার জেনিংস ছিলেন, সেই ঘরে যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেখানে দুইজন মহিলা ছিলেন, তাঁহাদেরও সেই সঙ্গে হত্যা করা হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলাম। আমি নীচে আসিবামাত্র মুগো নামা বাদসাহের এক ভৃত্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাপ্তেন ডগলাস কোথায়? বলিয়াই আমাকে ধরিয়া আবার উপরে লইয়া আসিল। আমি বলিলাম, তোমরাই তো তাঁহাদের সকলকে হত্যা করিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছ। উপরে আসিয়া দেখিলাম, কাপ্তেন ডগলাস তখনও জীবিত রহিয়াছেন। তাহা দেখিয়াই মুগো তাহার তরবারির এক আঘাতে ডগলাসের মৃত্যু ঘটাইল।"

সুতরাং বেশ বোঝা যাইতেছে যে, বাদশাহের ভৃত্যবর্গই এই সব হত্যাকাণ্ডের নায়ক। এইবার আসানউল্লা খাঁর উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই সব হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যখন বন্দীর নিকট বিবৃত করা হইল তখন তিনি কি করিলেন? তিনি তখন আদেশ দিলেন যে প্রাসাদদুর্গের ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই আদেশের অর্থ কি? হত্যাকারীরা যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই কি এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল? যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সে উদ্দেশ্যে ঐ আদেশ দেওয়া হয় নাই। হাকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বন্দী সেই সব অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করা বা শাস্তি দেওয়ার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই এবং বলিয়াছেন যে, চারিদিকে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কিছু করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বন্দী বাদশাহ নামে খ্যাত এবং তাঁহারই ভৃত্যেরা যদি তাঁহার পদমর্য্যাদার অবমাননা করিয়া থাকে, তাহা হইলে দুষ্কৃতদের শাস্তি দিয়া তাঁহার আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবার সে সুযোগ তিনি ত্যাগ করিলেন কেন?

আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁহার ভৃত্যবর্গের দ্বারা এই যে নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল ইহা তাঁহার আদেশ অনুসারে না ঘটিলেও এ ব্যাপারে তাঁহার সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। এই ব্যাপারে অপরাধী কোনও ভৃত্যকে বরখাস্ত করা হয় নাই, এ বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করাও হয় নাই, বরং সেই সব দুষ্কৃতদের বেতন দিয়া প্রতিপালন করা হইয়াছিল। এই সব প্রমাণের পরেও কি আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে বন্দী এ ব্যাপারে অপরাধী নন? দেশের আইন কি বলে, সে কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তার বাহিরেও একটা উচ্চতর আইন আছে, সেটা বিবেকের আইন, বুদ্ধি-বিবেচনার আইন। সে আইনের শাস্তি পৃথিবীর মানুষের প্রদত্ত দণ্ড বিধানের চেয়ে অনেক অনেক ভয়াবহ। ভগবানের আইনকে কোনও মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না।

এইবার বারুদখানার ঘটনাবলীর দিকে আমরা মনঃসংযোগ করিব। কাপ্তেন ফরেষ্ট বলিয়াছেন যে, সকাল ৯টার সময় মিরাট হইতে আগত বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ ভাবে পোলের উপর দিয়া আসিতেছিল। তাহাদের পুরোভাগে ছিল অশ্বারোহী দল। এক ঘণ্টার মধ্যেই কেল্লার ফটকের বাহিরে প্রহরারত পদাতিক বাহিনীর একজন সুবেদার আসিয়া জানাইল যে, দিল্লীর সম্রাট বারুদখানা অধিকার করিবার এবং সেখানকার সমস্ত ইয়ুরোপীয়দের রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন। এ আদেশ যদি অন্যথা করা হয়, তাহা হইলে কাহাকেও বারুদখানার বাহিরে যাইতে দেওয়া হইবে না। অল্পক্ষণ পরেই সম্রাটের নিজস্ব সেনাবাহিনীর এক কর্ম্মচারী তাঁহার অনুচরবর্গ লইয়া সেখানে আসিয়া সেই সুবেদারকে

জানাইল যে, তাহার নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন।

সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, অত্যন্ত ব্যস্ততা এবং তৎপরতার সহিত বারুদখানা অধিকার করা হইয়াছিল। এবং এই কার্য্যের মূলে ছিল সম্রাট এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণের আদেশ। যে প্রণালীতে এই কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল তাহার জন্য যে পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন চলিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ভিতরের খবর সম্পূর্ণ ভাবে না জানা থাকিলে অন্য কাহারও পক্ষে এতখানি তৎপরতার সহিত এ কার্য্য করা সম্ভব ছিল না। তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় বারুদখানাটি হস্তগত করা যে কতখানি প্রয়োজনীয় ব্যাপার, আশা করি এই আদালত সে কথা স্মরণ রাখিবেন। এই নরমেধ যজ্ঞের ব্যাপারে একজন সম্রাটকে তাহার মধ্যে লিপ্ত করার উদ্দেশ্য কি থাকিতে পারে? উপস্থিত বিপদ এবং নানা অসুবিধার তুলনায় তাঁহাকে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র দেখানো হইয়াছিল তাহা অকিঞ্চিৎকর। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার নিজের জীবন, ধন-সম্পত্তি সবই বিপন্ন করিয়াছেন। কিসের জন্য? রাজমুকুটের জন্য?—না যে শাসনদণ্ড নিজের শিথিল হস্তে ধারণ করিতে তিনি অক্ষম, সেই দণ্ড ধারণ করিবার দুর্ব্বার লোভের জন্য? এই জন্যই কি বৃদ্ধবয়সে তিনি নিজের সৈন্যদের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে বারুদখানা অধিকার করিলেন? যখন বিদ্রোহের গুরুত্ব কেহই বুঝিতে পারেন নাই, যে সময়ে কেবলমাত্র অরাজকতা এবং লুঠপাঠ সবে সুরু হইয়াছে, অথবা ভবিষ্যতে যে গুরুতর বিপর্য্যয় ঘটিবে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কি তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন?

আমরা শুনিয়াছি যে, বন্দী নাকি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে পশ্চিম দিক হইতে এক প্রলয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস আসিয়া সব গ্রাস করিবে। বন্দীর ধর্ম্মউপদেষ্টা হাসান আকসারি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অবিশ্বাসী ইংরাজদের বধ করিয়া ফেলিতে হইবে এবং পারস্যের শাহ আসিয়া আবার হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বন্দীর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন।

১১ই মে সোমবার কি ঘটিবে তাহা সম্রাটের জানা ছিল, এ কথা যদি সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে আমি বলিব যে রাজপ্রাসাদের অন্য কোনও ব্যক্তি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। রাজকুমার জওয়ান বখত ইংরাজদের হত্যা সম্বন্ধে যেরূপ উচ্ছ্বসিত ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে, এই চক্রান্ত কেবল সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এবং ইহা কেবল তাহাদের দ্বারাই উদ্ভূত হয় নাই। প্রাসাদের সকলেই এ ব্যাপার জানিতেন। ১১ এবং ২০ রেজিমেণ্টের পদাতিক দল যখন বারুদখানা আক্রমণ করিতে যায়, তখন এই বন্দী প্রকাশ্য ভাবেই তাহাদের উৎসাহ দেন এবং তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ক্রমে তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেন। বোধ হয় তখন মনে করেন নাই যে হিন্দুস্থানের সিংহাসনের পরিবর্ত্তে অন্য কোনও পরিণাম তাঁহার ভাগ্যে সঞ্চিত আছে।

এইবার আমি লেফটনাণ্ট উইলোবির কথা উল্লেখ করিব। তিনিই ছিলেন বারুদখানার অধ্যক্ষ। তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ইংরাজ সৈন্য যখন দেখিলেন যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বারুদখানাকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না, তখন তিনি এবং তাঁহার সাহসী বন্ধুগণ নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বারুদখানা উড়াইয়া দিলেন। তাঁহারা বীরগতি লাভ করিলেন। তাঁহাদের বীরত্বের কাহিনী ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করিবেন, আমার সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি এবারে অন্য বিষয়ের অবতারণা করিব। বারুদখানা ধ্বংস করিবার পরেও ইংরাজ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের গতিরোধ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজশক্তি তখন তাঁহাদের পক্ষে ছিল না, কাজেই পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কোনও উপায়ই তাঁহারা তখন দেখিতে পাইলেন না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লী সহরে বিদ্রোহীরা যে সব নৃশংস কাণ্ড করিল, তাহার তুলনা অতীত ইতিহাসে নাই। ঠিক এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে, সম্রাট স্বয়ং এই বিভীষিকার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। ১১ই মে অপরাহ্নে সম্রাট দেওয়ানী খাসের তক্তে বসিলেন এবং সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে একে একে অভিবাদন করিল এবং তিনিও তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাটের দরবারের আইন-বিশারদ গোলাম আব্বাস বলিলেন যে, প্রত্যেকের মাথায় হাত রাখিয়া সম্রাটের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনের অর্থ হইল এই যে, আমি তোমাদের আনুগত্য গ্রহণ করিলাম। তখনই তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইল কি না সে কথা গোলাম আব্বাস সঠিক বলিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার পুনর্বায় সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠার ঘোষণাস্বরূপ ২১ বার তোপধ্বনি করা হইয়াছিল।

এই সব ঘটনা দ্বারা বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইতেছে।

বিদ্যা, যশঃ, ধন, মান, পরোপকার এ সকল অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ হইলেও ইহার কোনটিই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিজের শরীর-মনের উন্নতি করিয়া, নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর বিদ্যা দ্বারা হউক, বুদ্ধি দ্বারা হউক, ধন দ্বারা হউক, সমাজকে কিঞ্চিৎ ঋণী করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। নচেৎ শুধু বিদ্যা লইয়া, ধন লইয়া, শক্তি লইয়া, স্বাস্থ্য লইয়া ধুইয়া খাইলে কিছু হইবে না।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
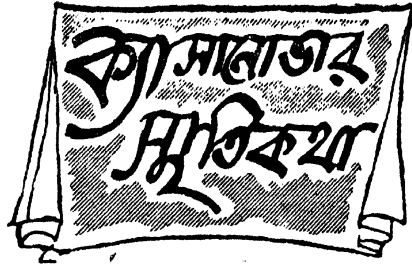
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

[লুপ্ত অধ্যায় দুটির পরবর্তী অধ্যায়ের এই বিচ্ছিন্ন অংশটি]

——সব কিছুর বিশদ বিবরণ না দিয়ে শুধু যত দিন খুশী ওঁর রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বসবাস করার অনুমতিটুকু চাইলাম। অবশ্য এই নবীন বয়সী ডিউকটির কৌতূহলী প্রশ্ন মেটাতে আমার স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসনের কারণটিও জানাতে হোয়েছিলো। তাঁকে আশ্বাসও দিলাম নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার আহার-বাসস্থানের জন্যে কারো কাছেই আমাকে হাত পাততে হবে না—আমার নিজের কিছু টাকাকড়ি আছে—আমি শুধু নিশ্চিন্ত হোয়ে আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে যাই।

—যত দিন আপনার আচার-আচরণে কোনো ত্রুটি না ঘটে তত দিন আমার দেশের আইন আর শৃঙ্খলাই আপনাকে রক্ষা করবে, নিশ্চিন্ত থাকুন এ বিষয়ে। যাই হোক, আমার কাছেই প্রথম আসতে আমি সত্যিই ভারী খুশী হোয়েছি। আচ্ছা, আপনার কোনো বন্ধু বান্ধব ফ্লোরেন্সে নেই ?

—বছর দশেক আগে এই ফ্লোরেন্সের প্রত্যেকটি গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিলো। কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ নির্জ্জন ভাবে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম চাই, তাই পুরানো পরিচয় ঝালিয়ে নেবার এতটুকুও উৎসাহ আমার নেই।

যাই হোক, এবার নির্ঝঞ্ঝাটে কিছু দিন কাটানো যাবে ভেবে বেশ ভালো লাগলো। একটি অতি নিরীহ সাধু প্রকৃতির ব্যবসাদারের বাড়ীতেই দুখানি ঘর নিয়ে আমার বাসা বাঁধলাম। বাড়ীতে শুধু ওই ভদ্রলোকটির কুরূপা স্ত্রী টি ছাড়া আর কেউই ছিল না আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাতে। প্রায় সপ্তাহ তিনেক কাটিয়েছিলাম এখানে বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে। এমন সময় কাউণ্ট ষ্ট্রাটিকো তাঁর আঠারো বছরের ছাত্র মোরোসিনিকে নিয়ে ফ্লোরেন্সে এসে হাজির। ও ওঁর পা ভেঙে যাওয়াতে বাইরে বেরোতে পারতেন না, তাই আমাকেই অনুরোধ করলেন মোরোসিনির সঙ্গে সব সময় থাকার, তা' নাহলে কুসঙ্গে মিশে ওর অধঃপতন হোতে পারে।

এতে আমার পড়াশোনারই যে ক্ষতি হোলো তাই শুধু নয়, নির্জ্জন বাসের সব পরিকল্পনাও ভেস্তে গেলো। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই এই বিকৃতরুচি তরুণটির সঙ্গী হোতে হোলো। মোরোসিনির প্রকৃতি ছিলো অদ্ভুত! শিক্ষা, সাহিত্য, সংসঙ্গ, কিম্বা জ্ঞানী-গুণীর প্রতি ওর এতটুকু আকর্ষণ ছিলো না। শুধু বেছে বেছে দেশের দুর্গম স্থানগুলিতে [illegible] ছুটতো নিজের প্রাণ-সংশয় করে, আর প্রচুর নয়, অতি নীচু স্তরের মেয়েদের নিয়ে কুৎসিততম সম্ভোগ ছিলো ওর প্রাত্যহিক আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ।

দুটি মাস ও ফ্লোরেন্সে ছিলো, তার মধ্যে বিশ বার ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি আমি। কি ঘৃণাই করতাম ওর সঙ্গকে—শুধু কর্ত্তব্যবোধে ওকে ত্যাগ করতে পারি নি।

আর একটি বন্ধু জুটেছিলো আমার এই সময়—জানোভিচ্। সুন্দর কান্তি, অটুট স্বাস্থ্য, সতেজ প্রাণের আনন্দে ভরপুর। ওকে দেখে মনে হোতো, ওর মধ্যে অনেক কিছু সম্ভাবনা আছে, অনুকূল পরিবেশে ও অনেক উন্নতি করতে পারে। ওকে দেখে আরও মনে পড়তো, পনেরো বছর আগেকার যুবক ক্যাসানোভাকে। কিন্তু ওর মধ্যেও বেশভূষা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ওর প্রচণ্ড অমিতব্যয়িতা দেখে ভয় হোতো, কোনো দিন এমন কোনো ভুল করে বসবে, যা আমার ভাগ্যেও ঘটেছিলো। জানোভিচের বাড়ীতে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তার নাম 'জেন্'। অবশ্য এরা কেউই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না, এমনি মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হোতো শুধু।

লর্ড লিঙ্কন, বয়স বিশ বছরও পার হয়নি, ডিউক অফ্ নিউকাস্ল্-এর একমাত্র সন্তান, এ সময় ফ্লোরেন্সে ছিলো। বিখ্যাত নর্ত্তকী লা লাম্বার্ত্তির প্রেমে সে বেচারা একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। প্রতিদিন অপেরার শেষে গিয়ে লা লাম্বার্ত্তির সঙ্গে দেখা করতো কিন্তু ওর বাড়ী অবধি সঙ্গে যেতে বেচারার সাহসে কুলাত না। অবশ্য গেলে অভ্যর্থনা ভালোই জুটতো কপালে। কারণ একে ইংরেজ অর্থাৎ ধরেই নেওয়া যায় মস্ত ধনী, তার উপর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ!

জানোভিচ রীতিমত ঝানু, গোড়া থেকেই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। তার পর নিজেই লা লাম্বার্ত্তির সঙ্গে পরিচয় পাকা করে নিয়ে লিঙ্কনকে ওর বাড়ীতে নিয়ে যেতে লাগলো। লা লাম্বার্ত্তিও এই চক্রান্তে ছিলো, তাই তরুণ ইংরেজ-তনয়টিকে প্রেমের অভিনয়ে মুগ্ধ করে জালে ফেলতে একটুও দেরী করেনি। আত্মহারা, প্রেমমুগ্ধ লিঙ্কন প্রতিদিন রাত্রেই ওর বাড়ীতে নৈশভোজনে উপস্থিত থাকতো আর শেষে তাসের জুয়ায় মেতে যেতো লাম্বার্ত্তি, জানোভিচ্ আর জেনের সঙ্গে। প্রথম প্রথম ওরা ওকে কয়েক শ' মুদ্রা জিতিয়ে দিয়ে খেলার নেশাটা জাগিয়ে দেয়। বেচারী লিঙ্কন তখন ওদের হাতের পুতুল—তার পর থেকেই ওদের চাতুরীর জালে ও ধরা পড়লো। প্রতি রাত্রে বাজী হেরে হেরে সর্ব্বস্বান্ত হোতে চললো লিঙ্কন। শেষ অবধি জেনের কাছেই ওর ঋণ দাঁড়ালো বারো হাজার গিনি। তার মধ্যে তিন হাজার মাত্র শোধ করতে পেরেছিলো, বাকী তিনটি

[illegible]

টাকা তুলতে। এ-সব গল্প আমি লিঙ্কনের মুখেই শুনেছিলাম, যখন 'বোলোনা'তে আমার সঙ্গে ওর দেখা হয় তখন।

সারা ফ্লোরেন্সে তখন সবার মুখেই এই কথা। বাঙ্কার তাসোতাসি জানোভিচকে লিঙ্কনের নির্দ্দেশমত ছয় হাজার গিনি তখন দিয়েছে। এমন সময় আমার অবস্থাটা একবার ভাবো, হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক এসে সোজা আমার ঘরে ঢুকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করে নিয়ে জানালে, ডিউকের আদেশ, তিন দিনের মধ্যে আমাকে ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে যেতে হবে।

তারিখটা ছিলো আটাশে ডিসেম্বর। ঠিক তিন বছর আগে এই একই তারিখে আমাকে বার্সিলোনা ছেড়ে চলে যাবার আদেশ এসেছিলো। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! স্তম্ভিত হোয়ে বসে থাকা ছাড়া সে মুহূর্ত্তে কিছু করবার রইলো না। বার বার প্রশ্ন করেও কোনো কারণই জানতে পারলাম না এই আকস্মিক আদেশের। শুধু জানলাম এটা রাজার নির্দ্দেশ, আমাকে এটা মানতেই হবে। বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, অপমানিত হৃদয়ে মেনে নিতে বাধ্য হলাম।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের শেষ তারিখটিতে এসে পৌছলাম 'বোলোনা'তে। ভেনিসের একজন অতি সম্ভ্রান্ত, পদস্থ ভদ্রলোক সিনর দা জাগুরী আর মঁসিয়ে ব্রাগাদাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু আর আমারও অকৃত্রিম সুহৃদ সিনর দান্দালোর সঙ্গে আমার রীতিমত পত্রালাপ চলতো। দুজনেই চাইতেন যাতে আমি আবার স্বদেশে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে জীবনযাত্রা সুরু করতে পারি। এই সম্বন্ধে আমরা তিন জনেই চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে নানা ধরণের পরামর্শ আর আলোচনা চালাতাম। সিনর দান্দালো জানালেন যে, আমার এখন ভেনিসের যথাসম্ভব কাছে থাকা উচিত—যাতে ভেনিসের তদন্তবিভাগ আমার উপর নজর রাখতে পারে আর আমার নির্ব্বিরোধী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হোতে পারে। এ বিষয়ে আমার দু'-একজন পরিচিত সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী বন্ধুও সাধ্যমত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। 'ত্রিয়েস্তি'তেই যাওয়া ঠিক করলাম। সিনর দা জাগুরী সেখানে ওঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে আমার পরিচয় লিখে পাঠালেন। দিন দশেক ত্রিয়েস্তিতে থাকার সময়টুকুতে ওয়ারশ' থেকে সংগ্রহ করে আনা আমার স্মৃতিকথাগুলি একত্রিত করে তাইতে পোলাণ্ডে এলিজাবেথ পেত্রোভ্‌নার মৃত্যুর পর থেকে যা কিছু ঘটেছে তার পূর্ণ বিবরণও ছিলো—তাছাড়া ওই হতভাগ্য দেশটার খণ্ডিত হওয়ার দুর্দ্দশার ইতিহাসও লিখতে সুরু করেছিলাম তখন।

প্রতিশোধস্পৃহা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর দুর্নীতিই পোলাণ্ডের পতনের কারণ। আর আলস্য, অহমিকা, দুর্নীতিই ফ্রান্সের পতনের কারণ। প্রত্যেকটি রাজ্যচ্যুত রাজাই একটা নিরেট নির্ব্বোধ —আর নিরেট নির্ব্বোধ রাজামাত্রেই সিংহাসনচ্যুত হয়। লুই নিজের পাপেই নিজে ধ্বংস হোলো। রাজোচিত বিজ্ঞতা দূরদর্শিতা আর প্রখরতার প্রয়োজন হয় বুদ্ধিমান শিক্ষিত প্রজাদের শাসন করতে হোলে—তাই থাকলে আজ লুইকে সিংহাসন হারাতে হোত না,—একদল দুর্ব্বৃত্ত শয়তানের কবল থেকে ভীতিবিহ্বল ফ্রান্সকে, —কাপুরুষ, অসভ্য অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত থেকে কলুষিত ফ্রান্সকে,—আর প্রচণ্ড শক্তিশালী পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচার, ধনলিপ্সা আর ধর্ম্মোন্মাদনার হাত থেকে আতঙ্কিত, ক্লিষ্ট ফ্রান্সকে সে তুলে ধরতে পারতো। ফ্রান্সের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ব্যাধির প্রকোপ আজ দেখা দিয়েছে তার প্রতিকার অন্য যে কোনো দেশেই আজ সহজসাধ্য—কিন্তু আমি জানি ফ্রান্সে তা' অসাধ্য। আমি আজ বার্দ্ধক্যের পথে কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখবে আমার ধারণা ঠিক কি না। ফ্রান্সের সম্ভ্রান্ত, অভিজাত সম্প্রদায় আজ শুধু করুণা ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে তাদের কাছে যারা সব সময় সব কিছুকেই করুণা আর সহানুভূতি দেখাতে প্রস্তুত! কিন্তু আমার মনে ওরা শুধু জাগায় ঘৃণা—কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই অভিজাত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় যদি তাদের সমস্ত দৃঢ়তা সমস্ত শক্তি একত্র করে সিংহাসনের চার পাশে এসে দাঁড়াতো যদি শক্তির বিরুদ্ধে শক্তির লড়াই চালিয়ে যেত, তাহলে ওই ইতর জনসাধারণের বিপ্লব এক মুহূর্ত্তেই ছাই করে দিতে পারতো সমস্ত জাতটাকে ওরা ধ্বংসের মুখে টেনে আনবার আগেই। শেষ বারের মত আমি বলছি, আমার মতে ওদের কর্ত্তব্য, ওদের স্বার্থ, ওদের সম্মান সবকিছুই দাবী করেছিলো এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে ওরা এসে এক হোয়ে দাঁড়াবে রাজাকে রক্ষা করতে, কিম্বা তার পতনের সঙ্গে নিজেদেরও সমাপ্তি ঘটাবে। অথচ তার বদলে ওরা গেল বিদেশে, নিজেদের অতীত গৌরবের আর বর্ত্তমান হতভাগ্যের কাঁদুনী গেয়ে বেড়িয়ে তাদের সহানুভূতির উদ্রেক করতে —এতে কার মঙ্গল সাধন হবে? কি লেখা আছে ফ্রান্সের অদৃষ্ট-লিপিতে? মুণ্ডহীন কবন্ধের মত ওর পরমায়ু কত কাল—কত দিন?

* * * *

পয়লা ডিসেম্বর তারিখে পুলিসের কর্ত্তা ব্যারণ পিত্তোনি আমাকে খবর পাঠালেন তাঁর বাড়ীতে একবার যেতে—সেখানে ভেনিস থেকে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে গেলাম—মনে দুর্দ্দান্ত কৌতূহল; ব্যারণ আমাকে নিয়ে একজন সুন্দর চেহারার ভদ্রলোকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছে বুঝলাম।

—আমার মন বলছে আপনি নিশ্চয়ই সিনর দা জাগুরী।

আমি বললাম—ঠিক ঠিক বলেছো ক্যাসানোভা! আমি যখন দান্দালোর কাছে শুনলাম তুমি এখানে, তখনি এসে তোমাকে অভিনন্দন জানাবো ভেবেছিলাম, তোমার স্বদেশে ফেরার দিন এগিয়ে এলো বলে। এ বছর না হোলেও আসছে বছর তো নিশ্চয়ই—

একজন সুপুরুষ বৃদ্ধ এইবার ঘরে ঢুকে ওই অভিনন্দনে যোগ দিলেন। তারপর পিত্তোনিকে জানালেন, ওর বাড়ীতে নৈশ-ভোজনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। সেই সঙ্গে এও বললেন যে, আমার সঙ্গে এখনও ওঁর আলাপ হয়নি।

—কী! এই ছোট্টো শহরটায় ক্যাসানোভা দশ দিন ধরে রয়েছে অথচ ভেনিসের রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে এখনও ওর পরিচয় হয়নি! সিনর জাগুরী আশ্চর্য্য হোয়ে গেলেন।

খুব রহস্যপ্রিয় এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি। আমার সৌভাগ্য, আমি ওঁর বন্ধুত্ব অর্জন করতে পেরেছিলাম—ত্রিয়েস্তিতে দু'টি বছর সে বন্ধুত্ব আমার অনেক অনেক কাজে লেগেছে। আর আমি জানি, স্বদেশের শাসন বিভাগের মার্জনা লাভে ওঁর কতখানি হাত আছে ওঁর কতখানি সহায়তা আছে আমার দেশে ফেরার অনুমতিটুকু পাওয়াতে। সত্যিই আমার জীবনে তখন একমাত্র লক্ষ্য কেমন করে নিজের দেশটিতে

ফিরে যাবো এই দীর্ঘ নির্ব্বাসনের শেষে—শুধু সেই আশা নিয়েই বেঁচেছিলাম তখন।

ত্রিয়েস্তিতে বেশ শান্তিতেই দিনগুলি কাটছিলো। অতি অনাড়ম্বর সহজ সরল জীবনযাত্রা যাকে বলে—উপায় কি, মাত্র পনেরোটি সেকুইন মাসে বাঁধা আয় তখন। জুয়াখেলা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম, তা ছাড়া নৈশভোজনটাও কোনো না কোনো বন্ধুর বাড়ী সারা হোতো—ভেনিসের রাজপ্রতিনিধি, কি ফ্রান্সের রাজদূত কিম্বা ব্যারণ পিত্তোনি যার বাড়ীতেই হোক জুটে যেত ঠিকই। ভেনিসের রাজদূতের সহায়তায় তার মাধ্যমে খানিকটা দেশসেবার সুযোগও জুটে গিয়েছিলো। বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে বেশ খানিকটা সাহায্য করতে পেরেছিলাম—কয়েকটি পুরানো চুক্তির নতুনতর সর্ত্ত আর কয়েকটি নূতন চুক্তির ব্যবস্থা করে দেওয়াতে বেশ মোটারকম লাভ হয়—কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ভেনিস রাষ্ট্র থেকে আমি একসঙ্গে একশ ডুকাট পাই আর মাসে দশ সেকুইন করে মাসোহারা। অভাব মিটে গেলো আমার—বেশ স্বচ্ছন্দ এলো জীবনযাত্রায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রিয়েস্তিতে অভিজাত মহিলা সম্প্রদায়ের হঠাৎ প্রচণ্ড সখ হোলো ফরাসী নাটক অভিনয় করার। বেচারা আমাকেই তাঁরা মনোনীত করলেন, নাট্য পরিচালক, সজ্জা পরিচালক, মঞ্চ ব্যবস্থাপক অর্থাৎ এক কথায় সব কিছুরই ব্যবস্থাপক। শুধু নাটক ঠিক করে দেওয়া নয়, কোন অংশ কে অভিনয় করবেন, তারও ব্যবস্থা করতে হোলো। সত্যিই বিপদে পড়েছিলাম—মহিলাদের অভিনয়ে যে কৌতুক আনন্দ বরাতে জুটবে ভেবেছিলাম তা'তো জুটলো না; শুধু অক্লান্ত পরিশ্রমে বিরক্তিই জাগতে লাগলো।

প্রতিটি অভিনেত্রীই তো আনকোরা, এ বিষয়ে তার উপর সারা দিন প্রত্যেকের কাছে ছুটোছুটি করে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অংশটি মুখস্থ করানো—সে যে কী কষ্টসাধ্য, ঈশ্বর জানেন। একপাতা মুখস্থ করে তো তার আগের পাতাটা ভুলে যায়। সবাই জানে ইতালীতে যদি কোনরকম বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, তার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন নারী শিক্ষায় বিপ্লব আনার। সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায়ও মেয়েদের অল্প কয়েক বছরের জন্যে কনভেণ্টে দিয়েই খালাস। যতক্ষণ না বাপ-মায়ের মনোনীত সুপাত্রের সঙ্গে মালাবদল ঘটছে—যাকে তারা চেনেও নি, জানেও নি, যাদের সম্বন্ধে মনের কোণে এতটুকু ভালবাসার স্বপ্ন জাগেনি—ব্যস্ বাকী জীবনটাতেও স্বামীর সম্বন্ধে অতি নিরপেক্ষ অতি নিস্পৃহ ভাবে কাটিয়ে দেয়। বেশীর ভাগ সময়েতেই অবশ্য উভয়পক্ষই এই ভুলের প্রতিকার করে ব্যভিচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়ে। ইতালীতে অভিজাত বংশের ধারাবাহিকতা একটা কথার কথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও খুব কম লোকেই পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হবার অধিকার রাখে।

ফরাসী নাটকের জন্য যাঁরা তখন 'গোরিস্'এ এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাউণ্ট টোরিয়ানির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। উনি বার বার আমাকে অনুরোধ জানালেন, গোরিস্ থেকে মাইল ছয়েক দূরে তাঁর একটি পল্লী-নিবাস আছে; সেখানে আমি যেন গিয়ে শরৎ

লোকটির বয়স ত্রিশের বেশী নয়, অবিবাহিত কিন্তু ওর কুৎসিত মুখখানায় নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা আর কামুকতার ছাপ যেন স্পষ্ট করে ফুটে আছে। কিন্তু এমন আন্তরিকতা আর আগ্রহের সঙ্গে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালে যে মন একটুও সায় না দিলেও জোর করে ভাবলাম, লোকটাকে দেখে হয়ত ভুল বুঝেছিলাম।

প্রত্যেকের কাছেই শুনলাম ও লোক ভালো—শুধু মেয়েদের সম্বন্ধে ওর অসম্ভব দুর্ব্বলতা আর প্রকাণ্ড ঝগড়া বা অপমানে ভীষণ ভাবে প্রতিশোধ নেয়। যাই হোক, আমি ওঁকে কথা দিলাম যে সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখে আমি 'গোরিস্'এ ওঁর সঙ্গে দেখা করবো, তারপর দুজনে একসঙ্গে স্পার্সাতে ওঁর গ্রামের বাড়ীতে যাবো।

'গোরিস'এ ওঁর বাড়ী যখন পৌঁছলাম শুনলাম উনি বাড়ী নেই। বললাম আমি ওঁরই আমন্ত্রিত অতিথি। তখন আমার জিনিষপত্র লোকজনেরা গাড়ী থেকে নামিয়ে নিলে। জিনিষপত্র রেখে 'গোরিস'এ আমার একটি বন্ধু কাউণ্ট টরেসের বাড়ীতে দেখা করতে গেলাম—সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন অবধি সেরে ফিরে এলাম যখন তখন শুনলাম টোরিয়ানী স্পার্সাতে চলে গেছেন, কালকের আগে ফিরবেন না—তবে আমার জন্য হোটেলে একখানা ঘর আর খাবারের ব্যবস্থা করা হোয়েছে। অগত্যা সেখানেই গেলাম। যেমন বিশ্রী ঘর তেমন বিশ্রী আহার। মনে হোলো, এ কী রকম ভদ্রতা, ওঁর জানানো উচিত ছিলো ওর বাড়ীতে থাকবার মত বাড়তি ঘর নেই একটাও। পরদিন ভোরেই উনি এসে হাজির। ঠিক সময় আসার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানালেন, আমার সাহচর্য্যে কত আনন্দ পাবেন তা-ও বলতে ভুললেন না। পরক্ষণেই দুঃখপ্রকাশ করে জানালেন যে, স্পার্সাতে দিন দুয়েক যাওয়া স্থগিত রাখতে হবে; কারণ আদালতে ওর একটা মামলা চলছে একটা চাষীর সঙ্গে, সে নাকি ওর কাছ থেকে টাকা ধারই শুধু করেনি, উলটো চাপ দিয়েছে ওঁর কাছে টাকা পাবে বলে।

—বেশ আমিও যাবো আপনার সঙ্গে মামলাটা শুনতে—একটু আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

কিন্তু একটু পরেই উনি বেরিয়ে গেলেন, আমাকে কখন খাবো, খাবো কি না, এসব কিছুই না জিজ্ঞাসা করে। আমি বুঝে উঠতে পারলাম না এরকম ব্যবহারের কারণ, তবে ইচ্ছে করেই যে এমন অভদ্রতা করছেন, সেকথা জোর করে মন থেকে তাড়াতে চাইলাম।

নিজের মনে নিজেকেই বললাম—ক্যাসানোভা ঠিক আছে। নিশ্চয়ই ও-সব তোমার মনের ভুল। মানুষের মনের কিনারা কে কবে করতে পেরেছে বলো? তুমি যখন ভাবছো যে তুমি ঠিকই চিনেছো তখনও হয়তো তার মনের অতল রহস্যের কোনো সন্ধানই পাওনি তুমি। নিজের মনের রহস্যই সারা জীবনে ভেদ করে ওঠা যায় না। ও-সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে অন্য ভাবে ভাবো তো। কাউণ্ট তোমাকে তার গ্রামের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, শহরের বাড়ীতে তার আতিথেয়তায় ত্রুটি হবে, তুমি ধরছো কেন? শহরের বাড়ীতে তোমাকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করবার কথা তো তার নেই, তবে? ধৈর্য্য ধরো, সব ঠিক হোয়ে যাবে।

...র কৌতূহল মেটাতেই গেলাম। দেখলাম বিচারকেরা রয়েছেন, ... প্রতিপক্ষ তাদের উকিল, ব্যারিষ্টার নিয়ে হাজির। চাষীটির ...লের চেহারা নিরীহ শান্ত প্রকৃতির, মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। কাউণ্টের ... সঙ্গীগুলির চেহারাই ধূর্ত্ততা আর শয়তানীতে ভরা। কাউণ্ট ...রেস আমার সঙ্গে এসেছিলেন। আমার কানে কানে জানালেন, এ ...পারটা গোড়া থেকেই ওঁর জানা। চাষীটি দু বার হেরে গেছে, ...রই উচ্চ আদালতে আবেদন জানিয়েছে। টৌরিয়ানোই শেষ ...ধি জিতে যাবে, যদি ঐ চাষীটি প্রমাণ করতে না পারে যে ওর ...ছে যে সব রসিদ আছে সেগুলি টৌরিয়ানোর নিজের হাতে সই ...রা—আর সে কথাই কাউণ্ট স্পষ্টই অস্বীকার করেছে। যদি চাষীটি ...রে যায় তবে যে গোটা পরিবারটাই ছারখারে যাবে, তাই শুধু নয়, ...কেও কারাগারে যেতে হবে। আর কাউণ্ট হারলে ওদেরও ওই ...শা হবে। চাষীটির পাশে ওর স্ত্রী আর দুটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ...য়ে দু'টি শুধু তাদের রূপের জোরেই বোধ হয় পৃথিবীর সব ...মামলাতেই জিততে পারতো। ওদের পোষাক-পরিচ্ছদেই ওদের ...রিদ্র প্রকট—তাছাড়া ওদের শান্ত নিরীহ অবনমিত দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় প্রবলের অত্যাচারে কতখানি জর্জ্জরিত ওরা। দুই পক্ষের উকিলেরই ঘণ্টা দু'য়েক বলবার অধিকার আছে। চাষীটির উকিল মাত্র আধ ঘণ্টা বললেন। আর বিচারকের সামনে রসিদের খাতাটা মেলে ধরলেন, তার প্রত্যেক পাতাতেই কাউণ্টের স্বাক্ষর রয়েছে সেই দিন অবধি, যেদিন থেকে ওর মেয়েদের কাউণ্টের বাড়ীতে একলা যেতে নিষেধ করে প্রকৃত পিতার কর্ত্তব্য করেছিলো। তারপর আর কিছু কাগজপত্র দেখালেন যাতে করে কাউণ্ট চেষ্টা করেছেন ওই সব স্বাক্ষরগুলি জাল বলে প্রমাণ করতে। উকিলটি প্রমাণ করলেন কাউণ্টের ওই প্রচেষ্টা কতখানি অসম্ভব। তারপর আবেদন করলেন একটি নিরীহ নির্ব্বিবাদী চাষী পরিবারকে ওই সব জোচ্চোরের খপ্পর থেকে বাঁচাবার জন্য।

কাউণ্টের ব্যারিষ্টার ঝাড়া দু'ঘণ্টার উপরও বক্তৃতা চালাচ্ছিলেন। শেষে বিচারক বাধ্য হোয়ে থামিয়ে দিলেন। এমন কোনো অপমান ছিল না যা তিনি প্রতিপক্ষের উপর বর্ষণ করতে কসুর করলেন। এর পর রায় বেরোবার অপেক্ষায় আমরা সকলেই অন্য একটি হলে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, চাষী-পরিবারটি এক কোণে নিজেরাই চুপচাপ বসেছিলো। ওদের সান্ত্বনার বাণী জোগাতে খোশামোদ করতে বা মিথ্যা স্তোক দিতে কোনো বন্ধু পরিষদ বা মিত্রবেশী শত্রু কিছুই ছিল না। কিন্তু কাউণ্টের চার পাশে দশ-বারোজন মিলে সমোল্লাসে চীৎকার করতে লাগলো, যেন তাদের দৃঢ় ধারণা মামলায় তাদের জয় অনিবার্য্য।

আমি কাউণ্ট টরেসের কানে চুপি চুপি বললাম টৌরিয়ানির হেরে যাওয়াই উচিত। অন্তত ওর ব্যারিষ্টারের ওই অশ্লীল, অপমানকর বক্তৃতার অপরাধের জন্যেই। ওর কান দুটো কেটে নিয়ে ওকে ছয় মাসের জন্যে পিলরিতে (শাস্তি দেবার কাঠের যন্ত্র। মধ্যে গর্ত্ত করা গলায় বেঁধে রাখার জন্য) বেঁধে রাখা উচিত।

—সেই সঙ্গে ওর মক্কেলকেও—টরেস বেশ জোরেই বলে উঠলো। ঘণ্টাখানেক পরে আদালতের কেরাণী এসে দুই পক্ষকে দুটি কাগজ দিয়ে গেলো। কাউণ্ট হো-হো কোরে হেসে উঠে সেটা চীৎকার করে পড়তে লাগলো। আদালত কাউণ্টকেই অভিযুক্ত করেছে রসিদের স্বাক্ষর অস্বীকার করার জন্য, আর তার শাস্তিস্বরূপ এক বছরের পুরো মাহিনা ওই চাষীটিকে দিতে হবে। আর এই অভিযোগ ছাড়া অন্য কোনো অভিযোগ যদি ওই চাষীটির থাকে, তবে তার জন্যে আবার মামলা করার অধিকার চাষীটিকে দেওয়া হোল।

টৌরিয়ানীর ব্যারিষ্টারের মুখটি চুণ হোয়ে উঠলো। কিন্তু তার মক্কেল তাকে তার প্রাপ্য ছয়টি সেকুইন দিলেন। তার পর সবাই মিলে আদালত থেকে বাড়ী ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে উঠে আমরা স্পার্সাতে গেলাম। পাহাড়ের উপর বাড়ীখানি বেশ বড়ই। টৌরিয়ানী আমাকে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়ে একতলায় ছোটো একখানি ঘরে এসে জানালে, সেটাই আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছে। বিশ্রী কয়েকটা আসবাব, তার উপর আলো-বাতাসও খেলে না বললেই হয়। টৌরিয়ানী বললে, এই ঘরখানা আমার বাবার সবচেয়ে প্রিয় ঘর ছিলো, তিনিও তোমার মত পড়াশোনা করতেই ভালোবাসতেন। এখানে সম্পূর্ণ ইচ্ছামত আপন খুশীমত কাটান, কেউ আপনার কাছে আসবে না।

অনেক বেলায় খাওয়া হোলো। মধ্যাহ্ন ভোজন তো বাদই গেলো। সবচেয়ে বিশ্রী লাগলো টৌরিয়ানী অসম্ভব তাড়াতাড়ি খেতে সুরু করে দু' মিনিটেই খাওয়া শেষ করে আমাকে বললে, আমি নাকি ভীষণ দেরী করে খাই। খাবার পর বিদায় নিয়ে জানিয়ে গেলো পরদিন দেখা হবে। আমিও আমার ঘরে চলে এলাম জিনিষপত্র ঠিক করতে। আমি সে সময় পোলাণ্ডের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে ব্যস্ত ছিলাম। রাত্রি অন্ধকার হোয়ে আসতে আমি একটা আলো আনতে বললাম। কিছু পরে একটি ভৃত্য এসে হাজির একটা চর্ব্বির বাতি নিয়ে। ভারী বিশ্রী লাগলো—একটা মোমবাতি কিম্বা একটা লণ্ঠন দেওয়া উচিত ছিলো আমাকে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কাজ করার জন্যে কোন চাকরকে রাখা হোয়েছে কি? সে বললে, কাউণ্ট তাদের সে সম্বন্ধে কোনো নির্দ্দেশই দেননি, তবে আমার দরকার হোলে ওরা কাজ করে দেবে।

ঘরে চাকরদের ডাকার জন্যে কোনো ঘণ্টাও ছিল না। তাই কোনো দরকারেই তাদের সাড়া মিলবে না।

—আমার ঘরের কাজ কে করে গেছে?

—একজন ঝি এই ঘরের কাজ করে।

—তার কাছে কি আলাদা চাবি আছে?

—তার দরকার নেই তো কিছু। কারণ, আপনার দরজায় তালা লাগাবার কোনো ব্যবস্থাই নেই, আপনি রাত্রে ভিতর থেকে ছিটকিনী লাগিয়ে শুতে পারেন।

মনের যে কি বিরক্তি তা প্রকাশ করা যায় না, বিশেষ করে একটু পরেই হাঁচতে গিয়ে সেই একমাত্র চর্ব্বির বাতিটিও যখন নিবে গেলো। অন্ধকারে অচেনা জায়গায় কোথায় হাতড়াতে হাতড়াতে যাবো। তার চেয়ে ঠিক করলাম শুয়ে পড়াই ভালো।

সকালে উঠে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে কাউণ্টকে সুপ্রভাত জানাতে গেলাম। টৌরিয়ানী তখন চাকরের সাহায্যে বেশভূষা করতে ব্যস্ত। যখন বললাম আমি ওর সঙ্গেই প্রাতরাশ করবো, তখন টৌরিয়ানী ব্যস্ত হোয়ে বলে উঠলো প্রাতরাশের অভ্যাস ওর নেই, তাছাড়া এ সময়টা ও চাষীদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকে—ওর মতে চাষীগুলো প্রত্যেকেই চোর। অবশ্য শেষে বললে আমার যদি প্রাতরাশের অভ্যাস থাকে, তাহলে ওর রাঁধুনীকে জানালে একটু কফি হয়তো পেতে পারি।

—আপনার হোয়ে গেলে আপনার চাকরকে বলে দেবেন আমার চুলগুলো কাটার ব্যবস্থা করে দিতে, আমি সবিনয়ে বললাম।

—আশ্চর্য্য! আপনি সঙ্গে করে নিজের একটা চাকরও আনেন নি? অবশ্য আমার তাতে কিছু যায়-আসে না, আপনাকেই অপেক্ষা করতে হবে—

—অপেক্ষা করতে আমি রাজী। কিন্তু আর একটি কথা, আমার ঘরের দরজায় একটা চাবি করাতে চাই। কিছু দরকারী কাগজপত্র আমার সঙ্গে রয়েছে।

—আমার বাড়ীতে ও সবের কোনো ভয় নেই।

—তা' হোতে পারে। কিন্তু ছোটোখাটো চিঠিপত্র সহজেই হারিয়ে বা গুলিয়ে যেতে পারে।

মিনিট পাঁচেক চুপ করে থেকে কাউণ্ট একজন চাকরকে ডেকে চাবী লাগাবার হুকুম দিয়ে দিলেন। ওর খাটের পাশে একখানা বই ছিলো, আমি বইখানি একবার দেখবার অনুমতি চাইলে বেশ ভদ্রভাবেই জানালেন, ওর অনুরোধ বইখানিতে যেন আমি হাত না দিই। তৎক্ষণাৎ চলে এলাম অবশ্য হাসিমুখেই, জানিয়ে এলাম যে আমি দেখেই বুঝেছি প্রার্থনার বই ওখানি।

—আপনার অনুমান ঠিকই, স্বীকার করলে টোবিয়ানী।

ঘরে ফিরে এলাম। বিশ্রী, ভারী বিশ্রী লাগছিলো। প্রথমটা মনে হোলো এখনি চলে যাই এখান থেকে। বিশেষ করে যখন টোবিয়ানীর ঘরে টেবিলে রাখা মোমবাতিটা চোখে পড়েছিলো, তখন ঘৃণায় ভরে উঠেছিলো মনটা, আমার নিজের ঘরে চর্ব্বির বাতির কথা ভেবে। আমি না ওর অতিথি! যদিও আমার সম্বল আজ মাত্র পঞ্চাশটি ডুকাট কিন্তু আজও পুরানো স্বচ্ছল দিনের মত গর্ব্বটা ঠিকই টিকে আছে। কিন্তু নাঃ, চলে যাওয়ার কথা মন থেকে তাড়ালাম। অন্যায় করবো না, কোনো অন্যায় করতে চাই না আর।

পরদিন সকালে একজন চাকর একটা কাপে করে নিজের রুচিমত চিনি, দুধ মিশিয়ে একেবারে তৈরী করা ঠাণ্ডা জোলো কফি এনে দিলে। আমি ছুঁলামও না। শুধু হাসতে হাসতে বললাম, আমার ওই কফিটা ওর মুখেই ছুঁড়ে ফেলার ইচ্ছা ছিলো—এই ভাবে কেউ কোথাও কফি দেয় না, দিতে হয় না।

চুল কাটবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম চাকরটাকে, মোমবাতির বদলে আমাকে চর্ব্বির বাতি দিয়েছিলো কেন?

—আজ্ঞে, কি করবো বলুন, আমাকে যা দেওয়া হোয়েছিলো তাই দিয়েছি। চর্ব্বির বাতিটা আপনাকে দেবার জন্যে আর মোমবাতিটা আমাদের মনিবের জন্যে দেওয়া হোয়েছিলো।

আগের দিন বাড়ীর পুরোহিতের সঙ্গে খাবার টেবিলে আলাপ হোয়েছিল। শুনেছিলাম, এ বাড়ীর সব কিছু কেনাকাটার ভারও তার উপর। সোজা তাঁর কাছে গিয়ে কিছু মোমবাতি কিনে দাম দিয়ে দিলাম হাতে হাতে। তিনি বললেন, মনিবকেও একথা জানাবেন। তাঁর কাছেই শুনলাম, একটার সময় খেতে যেতে হবে। সেই শুনে ঠিক সাড়ে বারোটার পরই খাবার ঘরে গিয়ে হাজির। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, টোবিয়ানীর তখন অর্দ্ধেক খাওয়া শেষ। কোনো মতে নিজেকে সংযত করে বললাম, পুরোহিত আমাকে একটার সময় আসতে বলেছিলেন।

—সাধারণতঃ তাই হয়, তবে আজ আমাকে কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে, তাই বারোটায় খাবার দিতে বলেছিলাম, নির্ব্বিকার ভাবে টোবিয়ানী বলে গেলো। তার পর চাকরদের ডেকে বলে দিলে, যে সব খাবার আগে দেওয়া হোয়ে গেছে, সেগুলি আবার নিয়ে আসতে। বারণ করলাম। যা তখনো টেবিলে অবশিষ্ট ছিলো, তাই দিয়েই খাওয়া শেষ করলাম।

পরদিন পুরোহিত নিজে এসে হাজির, মোমবাতির দাম ফিরিয়ে দিতে। মনিবের নাকি হুকুম হোয়েছে, এ বাড়ীতে আমাকে সব বিষয়ে ওঁর মতই মানতে হবে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ একটু পরেই চাকর এসে হাজির, ট্রে-তে করে গরম কফি, আলাদা জাগে দুধ, চিনি ইত্যাদি সমেত। দরজায় নতুন তালা ঝুললো। বেশ পরিবর্ত্তনে সাহায্যের জন্য চাকরও এলো—গোটা আবহাওয়াই যেন হঠাৎ বদলে গেলো।

মনে মনে ভাবলাম, তাহলে আমি বেশ ভালো শিক্ষাই দিয়েছি। কিন্তু ভুল ভাঙলো। সপ্তাহ না কাটতেই কাউণ্ট একদিন আমাকে কিছু না জানিয়েই 'গোরিস'এ চলে গেলেন। পুরো দশটি দিন কাটিয়ে যেদিন ফিরলেন আমি সেদিন বললাম যে, আমার সঙ্গলাভের জন্যই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করা হোয়েছে, কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে আমার সঙ্গ এতই অপ্রীতিকর, তখন আমি ত্রিয়েস্তেই ফিরে যাবো—এই নির্জ্জন বিষণ্ণ পুরীতে একা-একা দিন কাটানোর যন্ত্রণায় ভুগতে চাই না আর। টোবিয়ানী এই শুনে অজস্র কাকুতি-মিনতিতে ভেঙে পড়লো। বার বার আশ্বাস দিলে আর কখনও এমন হবে না। ওর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না, থেকেই যেতে হোলো।

কি একঘেয়ে নীরস বিবর্ণ দিন কাটছিলো স্পার্সায়। ওর একটা বিরাট আঙুরক্ষেত ছিলো, সেই আঙুরক্ষেতের চাষীদের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার আর হাম্লা চালিয়ে যেত অক্লান্ত ভাবে। দেখে দেখে সমস্ত মনটা ওর উপর বিরূপ হোয়ে উঠছিলো; শেষে একদিন একটা ঘটনায় টোবিয়ানীর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হোলো।

স্পার্সার ওই বিরক্তিকর, ঝিমিয়ে-পড়া, ক্লান্তিভরা দিনগুলির মধ্যে এতটুকু আনন্দ ছিল না। ওরই মধ্যে একটি তরুণী বিধবার অনাবিল সৌন্দর্য্য আর মিষ্টি ব্যবহার আমার অনেক দিনের রুক্ষ শুষ্ক হৃদয়ে যেন এক পশলা ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত ঝরে পড়লো। ঘনিষ্ঠ করলাম পরিচয়, ছোটোখাটো উপহারের বিনিময়, মধুর হাসিভরা আলাপের দান-প্রতিদানে। ক্রমে রাজী করলাম মেয়েটিকে রাতের অন্ধকারে আমার ঘরে সঙ্গোপনে আসতে অভিসারিকার বেশে। রাস্তার ধারের একটি ছোট্টো দরজা খুলে রাখতাম, যাতে ওর যাওয়া-আসা কারো চোখেই না পড়ে। নীরস দিনের শেষে কাটলো কয়েকটি সুধায় ভরা রাত। কিন্তু হঠাৎ একদিন ও বেরিয়ে গেলে দরজাটা বন্ধ করতেই কানে গেলো ওর তীব্র আর্ত্তনাদ। ছুটে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম শয়তান টোবিয়ানী মেয়েটির ঝুঁটিটা হাতের মুঠোতে চেপে ধরে একটা লাঠির বাড়ি ওকে প্রহার করছে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম শয়তানটার উপর, দুজনেই জড়াজড়ি করে পড়ে গেলাম মাটিতে। এই সুযোগে মেয়েটি ছুটে পালালো। আমার একটু অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ আমার পায়ে শুধু ড্রেসিং গাউনটা জড়ানো ছিলো, কিন্তু আমি এক হাতে লাঠিটা ধরে ফেলে আর এক হাতে ওর গলা টিপে ধরেছিলাম। এত জোরে টিপে ধরেছিলাম যে ওর জিবটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছিলো। বাধ্য হোয়ে আমার চুলের

মুঠি ওকে ছেড়ে দিতে হোলো দমবন্ধ হোয়ে আসা যন্ত্রণায়। সেই সময় ওর মাথায় সজোরে একটা ঘুষি চালালাম ; পরক্ষণেই সোজা নিজের ঘরে। জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এসেই ভাগ্যক্রমে একটা গরুর গাড়ী মিলে গেলো, গাড়োয়ানটা আমাকে 'গোরিস' অবধি পৌঁছে দিতে রাজী হোলো দুপুরের আগেই।

জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় একজন চাকর খবর দিলে, কাউণ্ট এক মিনিটের জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি লিখে দিলাম যা ঘটেছে, তার পর আমাদের দেখা না হওয়াই মঙ্গল, অন্তত এ বাড়ীতে আর নয়। একটু পরেই কাউণ্ট এসে হাজির —আপনি যখন গেলেন না তখন আমিই এলাম।

—কি চান বলুন ?

—এ ভাবে আপনার চলে যাওয়াটা আমার পক্ষে অপমানকর, অতএব আমি আপনাকে যেতে দেব না।

—তাই নাকি ! কেমন করে বাধা দেবেন জানতে পারি কি ?

—আমি আপনার একলা যাওয়াটা অন্তত: বন্ধ করতে পারি। দু জনে একসঙ্গে গেলেই আর সম্মানে বাধবে না।

—ওহো: বুঝেছি ; বেশ যান, পিস্তল কি তলোয়ার যা খুশী নিয়ে আসুন। আমার গরুর গাড়ীতে দু জনের জায়গার অভাব হবে না।

—না, আমার গাড়ীতে আমার সঙ্গে যাবেন, আর একসঙ্গে আহার করার পর আমরা বেরোবো।

—লোকে আমাকে উন্মাদ বলবে, এর পরও যদি আপনার সঙ্গে একসঙ্গে আহার করি। আমাদের মারামারির কথাটা এতক্ষণে সারা গ্রাম জেনেছে, তার সঙ্গে কুৎসিত রটনাও বাদ যায়নি।

—তাহলে আমিই আপনার কাছে আহার করবো। গাড়ী ফিরিয়ে দিন, আমার গাড়ীতেই আমরা যাবো—অন্তত: কেলেঙ্কারী তাতে আর বাড়বে না।

তার পর দুপুর পর্যন্ত উনি আমার সঙ্গে রইলেন, আর সারাক্ষণ বোঝাতে চাইলেন যে অন্যায়টা আমার। কারণ উনি যদি পথে কোনো চাষী মেয়েকে ধরে মারেন তবে তাইতে আমার মাথাব্যথার কিছু কারণ নেই—মেয়েটি তো আমার সম্পত্তি নয়।

—কী! আপনি ভেবেছেন একটা অসহায়, নিরীহ মেয়ের উপর আপনার অত্যাচার আমি নির্ব্বিবাদে মেনে নেবো ? বিশেষ করে কয়েক মুহূর্ত আগেও যে আমার বাহুপাশে বাঁধা ছিলো ! ভীতু, লম্পট ছাড়া আর কেউই চুপ করে থাকতে পারতো না, ঐ অবস্থায় আপনি পারতেন নিরপেক্ষ দর্শকের মত দাঁড়িয়ে মজা দেখতে ?

কাউণ্ট কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পর ধীরে ধীরে বললেন, এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই, যে বেঁচে থাকবে তার পক্ষে সেটা কিছু গৌরবের হবে না।

সজোরে হেসে উঠে তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষে আর বিদ্রূপে ওকে জর্জ্জরিত করে তুললাম।

—আমরা দু জনেই একটা জঙ্গলে যাবো দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য। যদি আপনিই বেঁচে থাকেন তবে আমার গাড়োয়ানকে আপনি ইচ্ছামত নির্দ্দেশ দিতে পারেন। যেখানে খুশি আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্যে।

।কাউণ্ট স্পষ্ট ভাবে বললেন। খুব ভালো কথা। তলোয়ার না পিস্তল ?

—তলোয়ার।

খুব জমকালো ভোজনের পর রওনা হোলাম দুজনে। মনটা বেশ ফূর্ত্তিতে ভরে উঠেছিলো। শুনলাম, কাউণ্ট চালককে নির্দ্দেশ দিলেন গোরিস রোড ধরে যাবার জন্যে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন থামবার নির্দ্দেশ দেবেন, কিন্তু কোথায় কি ? দিব্যি চলে এলাম শহরে, একটিও বাক্যব্যয় না করে। শহরে পৌঁছে উনি তখন নির্দ্দেশ দিলেন সেই হোটেলে নিয়ে যেতে। প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লাম—আমাদের বিখ্যাত দ্বন্দ্বযুদ্ধ ধোঁয়া হোয়ে মিলিয়ে গেল !

—আপনি ঠিকই করেছেন। আমরা পরস্পরের বন্ধুই থাকবো। তবে প্রতিজ্ঞা করুন যেন এই ঘটনা কোথাও প্রকাশ না পায়। আর যদিই বা কেউ এ প্রসঙ্গ তোলে হাল্কা ভাবে উড়িয়ে দেবেন—সকাতর মিনতি জানালেন কাউণ্ট।

কথা দিলাম, পরস্পরের হস্তমর্দ্দনে ব্যাপারটার ওইখানেই নিষ্পত্তি হোলো। তখনকার মত গোরিসেই একটা নিরিবিলি বাসা দেখে উঠে এলাম। অনেক কাজ বাকী। আপাততঃ পোলাণ্ডের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করতেই হবে। টোরিয়ানীর সঙ্গে আমার বিবাদের কথা ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার হোয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি কোনো সময়েই কোনো গুরুত্ব দিতাম না ও-সব কথায়। কিছুকাল পরে বেশ একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী কন্যার পাণিগ্রহণ করে টোরিয়ানী। তারপর যত দিন বেঁচে ছিলো মেয়েটির জীবন অত্যাচারে দুর্ব্যবহারে জর্জ্জরিত করে তুলেছিলো। শেষ অবধি মেয়েটির ভাগ্যজোরে বিয়ের বছর তেরো-চোদ্দ পরেই উন্মাদ হোয়ে অতি শোচনীয় অবস্থায় মারা যায়।

১৭৭৩ সালের শেষ তারিখটিতে গোরিস ছেড়ে চলে এলাম 'ত্রিয়েস্ত'-এ। সরকারী চৌরাস্তার উপর বেশ বড় একটি হোটেলের কয়েকখানি কামরা নিয়ে আমার নতুন বাসা বাঁধলাম। *

• • • •

[এইখানেই এমনি আকস্মিক ভাবে সমাপ্ত হোয়েছে ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা। আজও কেউ জানে না ক্যাসানোভা মৃত্যুর আগে স্মৃতিকথা শেষ করেছিলো কি না, না আকস্মিক ভাবে মৃত্যুই তাঁর লেখনীকে স্তব্ধ করে দেয়। স্মৃতিকথার ইতিকথা কোনোদিন লেখা হোয়েছিলো কি না—লেখা হোলেও তাকে সংশোধনের জন্য ক্যাসানোভা নিজেই নষ্ট করেছেন কি না—কিম্বা পাণ্ডুলিপিগুলি কোনো দায়িত্বহীন অসাবধানীর হাতে পড়েছিলো কি না, সবই রয়ে গেছে অনিশ্চয়তার আড়ালে। শুধু জানা যায়, শেষ-জীবনে তাঁর সব অপরাধ ক্ষমা করা হয় ভেনিসের রাষ্ট্রবিভাগ থেকে—দীর্ঘদিন নির্ব্বাসনের শেষে বহু আকাঙ্খিত মাতৃভূমিতে আবার ফিরে এলেন ক্যাসানোভা জীবনের শেষের কয়টি দিন শান্তিতে ভরে তোলার আশায়]

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

---

* "ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা" যথা শীঘ্র সুদৃশ্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রকাশক আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স। জবাকুসুম হাউস। ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

সমাপ্ত

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

দশ

যথাসময়ে ডডিংটন হাসপাতালে এসে যোগ দিলাম এবং তার মাস দেড়েক পরে সুনীলের চিঠিখানি এলো।

*　　*　　*　　*

এই মাস দেড়েক ডডিংটনে মোটামুটি ভালই কাটল। ডডিংটন হাসপাতালে বাসের জন্য যে ঘর খালি পেলাম—ঘরখানি খুব বড় না হলেও বেশ সুন্দর। খাট-বিছানা, প্রসাধন টেবিল ও দুটো আলমারি, আমার ব্যবহারের জন্য ঘরে পেলাম এবং এ ছাড়া জানালার পাশে একখানি কৌচ—বসে ভারি আরাম পাওয়া যায়। যদিও এই জানালাটিই ঘরের একমাত্র জানালা, তবুও জানালাটি বেশ বড় এবং এই জানালা দিয়ে বহু দূর পর্য্যন্ত মাঠের পর মাঠ ঢেউ খেলিয়ে চলে গেছে, বসে বসে দেখা যায়। যখন প্রথম এলাম তখন দুর্দ্দান্ত শীত। এই শীতে ঘরে আগুন জ্বালাবার জায়গাটিতে দিন-রাত আগুন জ্বলছে এবং একটি পরিচারিকা সমস্তক্ষণ সব ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখে যেত আগুন ঠিক জ্বলছে কি না—এই তার কাজ। এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়ার দিক দিয়েও ব্যবস্থা বেশ ভাল। ভোরে দরজায় ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে একটু শব্দ করে আগে জানিয়ে একটি পরিচারিকা ঘরে ঢুকে চা দিয়ে যেত এবং এ ছাড়া অন্য অন্য খাবার ঠিক সময় মত দেওয়া হত। তবে সেগুলো আমরা খেতাম—আমাদের একটি সাধারণ বসবার ঘর আছে এবং তারই এক পাশে খাবার টেবিল সাজান—সেইখানে।

আমরা বলতে, আমরা একসঙ্গে খেতাম চার জন। যে রেজিষ্ট্রারটির কথা আগে বলেছিলাম, নাম মিঃ ফরেষ্টার, তিনি এবং আমারই মতন আর এক জন হাসপাতালবাসী ডাক্তার। এবং দেখে অত্যন্ত সুখী হয়েছিলাম যে, তার মধ্যে এক জন আমারই মতন ভারতবাসী—মাদ্রাজের লোক—নাম ডাক্তার নায়ার। এবং কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম—বিশেষ উপযুক্ত লোক বলে এই হাসপাতালে তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল। দু'-চার দিনের আলাপেই বোঝা গেল—ইনি বিশেষ ভদ্রলোক এবং যদিও খুব কম কথা বলেন, সকলের উপকার করবার জন্য সব সময়ে যেন উৎসুক।

হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা কম নয়—আশে-পাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায়ই রোগী আসত—এবং আমাদের তিন জনার মধ্যে কাজ বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে ভাগ করা, তাই কাজের চাপও খুব বেশী মনে হয়নি। তবে ছুটী আমাদের ছিল না বললেই হয়, প্রায় সব সময়ই হাসপাতালের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে থাকতে হত। কিন্তু প্রত্যেক দু' সপ্তাহ অন্তর পালা করে আমরা দু'দিনের ছুটী পেতাম, তখন আমরা যা খুসী তাই করতে পারতাম অর্থাৎ হাসপাতাল ছেড়ে দূরে কোথাও [illegible] আসতে কোনও বাধা ছিল না। এ ছাড়া নিজেদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা দু'-তিন ঘণ্টা বাইরে ঘুরে আসাও সহজ ছিল। বলতে ভুলে গিয়েছি, কিছু দিন হাসপাতালে কাজ করার পর আমার আর্থিক অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল হয়ে উঠল। বাড়ী থেকে মাসোহারা ত আছেই, তা ছাড়া হাসপাতালে সাপ্তাহিক একটা বেতন পেতাম এবং তা-ও নিতান্ত কম নয়।

ডাঃ নায়ারের বিষয় আরও একটু বিস্তারিত করে বলা দরকার। ডাঃ নায়ার আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতে সুরু করেছেন। আমার কাজের নানা ব্যাপারে শুধু যে আমাকে সু-পরামর্শ দিতেন তাই নয়, অনেক সময় কাজের দিক দিয়ে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে, একটু খবর পেলেই বিনা দ্বিধায় আমার পাশে এসে দাঁড়াতেন—নিজের হাতের কাজ ফেলে।

এ ছাড়া বাকি আমাদের দুজন ডাক্তারের মধ্যে যে কেউ দুই তিন ঘণ্টার জন্য বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই ডাঃ নায়ার নিজের কাজের সঙ্গে সেই সময়টার জন্য আনন্দে তার কাজের দায়িত্ব নিতে একটুকুও দ্বিধা বোধ করতেন না। ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলি।

ডডিংটন থেকে অল্প কিছু দূরে চারি দিকে উন্মুক্ত তরঙ্গায়িত মাঠের মধ্যে একটু উঁচু জায়গায় একটা গ্রাম্য ক্লাব আছে—নাম 'রেনবো' ক্লাব। চারিদিকে কাচ আঁটা ছোট একটি বাংলো—তার ভিতরে যেখানেই বসা যায়, চারিদিকে চোখের অবাধ গতির কোনও বাধা নেই। বিভিন্ন আশে-পাশের দূর দূর গ্রাম থেকে তরুণ-তরুণীরা অনেক সময় বিকেল হতে না হতেই এই ক্লাবে এসে জুটত এবং সন্ধ্যের পরেও অনেকক্ষণ থেকে যে যার গ্রামে যেত ফিরে। বাইরে টেনিস, ব্যাডমিণ্টন খেলার বন্দোবস্ত ত ছিলই এবং এ ছাড়া ভিতরে তাস পিংপং খেলারও ব্যবস্থা ছিল। তখন শীতকাল, তাই বাইরের খেলাধুলো তখন বন্ধ—ভিতরের খেলা পুরোদমে চলে, কোনও বাধা নাই।

ডডিংটন হাসপাতালের ডাক্তাররা সাধারণত এই ক্লাবের সভ্য হন—আমিও হয়েছিলাম। তাস বা পিংপং খেলার দিকে আমার মোটেই ঝোঁক ছিল না, তাই আমি বড় একটা যেতাম না ক্লাবে। তা ছাড়া যদিও আমি আড্ডাবাজ লোক, কিন্তু আমার আড্ডার আনন্দ ছিল পরিচিত মনের মতন লোকের সঙ্গে—বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন অপরিচিত লোকের সঙ্গে অনায়াসে মেলামেশা করে জমে উঠবার ক্ষমতা আমার ছিল না। ক্লাবের আর একটা আকর্ষণ ছিল সস্তায় সুরা পান। সেদিকেও আমার বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না। কিন্তু আমাদের আর একজন সহকর্মী ডাঃ স্মিথ—তার রাত্রিবেলা তাস খেলার বিশেষ ঝোঁক—যে খেলাকে এরা

পালের শরীরের কথা আগেই বলেছি। ডাক্তার না হলেও এটুকু বোঝা আমার পক্ষে কঠিন নয় যে, ও দ্রুত মৃত্যুর পথে চলেছে। অনেক সময় শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে ওর বিছানায় ওর চাপা কাতরোক্তি শুনতে পাই—পেট চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

পালকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু শোনে না বা বুঝেও বোঝে না। আমার কথা শুনে ওমার খাইয়ামের কবিতার কি একটা পদ আবৃত্তি করে বলে—যে কদিন বেঁচে আছি আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতে দাও, বাধা দিয়ো না। এমিকেও বোঝাবার চেষ্টা করেছি। শুনে কি যেন এক রকম ব্যঙ্গের হাসি হেসে ওঠে, কিছু বলে না—এ রকম হাসি ত আমি জীবনে শুনিনি!

তাই আপনাকে অন্ততঃ দুদিনের জন্য আসতে বলছি—এসে এর যা হয় একটা বিহিত করুন। হয়ত বলবেন—ফ্ল্যাট তুলে দাও। কিন্তু ফ্ল্যাটের ভাড়া দেয় নীরেন—ওর নামেই ফ্ল্যাট, আমি কি করে তুলে দেব? এক আমি ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে পারি—কিন্তু তাতে আমার মন সায় দেয় না। যতই যা হোক, ওর মৃত্যুর সময়ও ত পাশে একজন থাকার দরকার।

হয়ত শুধাবেন—তা আমি গিয়ে কি করতে পারি? কিন্তু পারেন বলে আমার বিশ্বাস—তাই এই চিঠি লিখছি। এমির কথায়-বার্ত্তায় এটুকু বোঝা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হয়নি যে এমি আপনাকে মনে মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে আজও। আপনার বিরুদ্ধে কোনও কথার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত সহ্য করে না—সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে ওঠে। এই নিয়ে একদিন ত নীরেনের সঙ্গে তুমুল লড়াই হয়ে গিয়েছিল। নীরেন কি বলেছিল জানি না কিন্তু ওদের কলহের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরী হয়নি। শেষ পর্য্যন্ত এমি একটা নিদারুণ ঘৃণা ভরে নীরেনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি তাঁর (অর্থাৎ আপনার) পায়ের নখের যোগ্য লোক নও, সব সময় এই কথাটা মনে রেখে তাঁর সম্বন্ধে কথা বলো।

তাই আমার বিশ্বাস—আপনি এসে যদি এমিকে একটু বুঝিয়ে জোর করে সোজা বলেন, হয়ত কাজ হবে। আর কাজ হোক্ বা নাই হোক—নীরেনকে বাঁচাবার জন্য একটা চেষ্টা করা ত আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। আপনি একবার এলে, আপনার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে একটা পরামর্শ করতে পারলেও যে আমি বাঁচি।

ভালবাসা নেবেন। ইতি আপনাদের

সুনীল।

চিঠিখানা পড়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। এবং শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির করলাম। নীরেনকে আমি যতই মনে মনে ঘৃণা করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত বিদেশে এই ভাবে ও জীবনটা দেবে—ভাবতে মনটা কাতর হলো।

* * * *

শনি-রবি আমার ছুটাই ছিল—শুক্রবার সন্ধ্যেটা ডাঃ নায়ারকে বলে ছুটী করে নিয়ে, শুক্রবারই বিকেলের গাড়ীতে মার্চ্চ থেকে রওয়ানা হয়ে লণ্ডনে ওদের ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছতে সেই রাত সাড়ে দশটা হলো। সুনীল ফ্ল্যাটেই ছিল—নীরেন ছিল না।

সুনীল আমাকে দেখে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল। শুনলাম—নীরেন তিন-চার দিন পরে আজ আবার [illegible] বাইরে [illegible] ডিনার খাওয়ার কথা।

সুনীলের সঙ্গে অনেক কথা হলো—নীরেনকে নিয়ে। কথায় কথায় আমি বলেছিলাম, টাকার জোরেই ত এত কাণ্ড করছে। ওর বাড়ীতে চিঠি লিখে কতকটা জানিয়ে, ওর টাকার দিকটা কিছু বন্ধ করলে হয় না?

সুনীল বলল, সে কথা আমিও যে ভাবিনি—তা নয়। ও যখন হাসপাতালে ওর বাপের সঙ্গে আমার দু'-একখানা চিঠিপত্রও আদান-প্রদান হয়েছিল। কিন্তু সে দিক দিয়ে কোনও ফল হবে না।

শুধালাম, কেন?

বলল, জানেন ত ওর বাপ অসম্ভব বড়লোক—একজন নামজাদা জমিদার, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। এখন বুড়ো হয়েছেন। নীরেনই একমাত্র ছেলে। ছেলে যদি কেঁদে-কেটে চিঠি লিখে জানায়—টাকার অভাবে এখানে থাকতে ওর কষ্ট হচ্ছে, কম টাকায় সাধারণ ছেলেদের মতন চালান ওর শরীরের দিক দিয়ে একেবারেই সম্ভব নয়—ছেলের প্রতি অন্ধ স্নেহে আমাদের সব কথা যাবে ভেসে। তা ছাড়া এখানে ব্যাঙ্কে, ওর হাতেই ত আট-দশ হাজার টাকা আছে।

শুধালাম, কি রকম?

বললো, ওর অসুখের সময় ওর বাপ চিকিৎসার কোনও দিক দিয়ে কোনও ত্রুটী না হয়, সেজন্য প্রায় এক হাজার পাউণ্ড পাঠিয়েছিলেন—দু' দফায়। তার বাকি টাকাটা যে সবই ওর হাতে।

বললাম, তা ওর ত স্ত্রী আছে দেশে। সেদিক দিয়ে কিছু করা যায় না?

সুনীল বললো, তা জানেন না বুঝি? অশিক্ষিত মহিলা, বয়সও বেশী নয়—ষোলো-সতের হবে। ওদের বংশে মা লক্ষ্মীর অসম্ভব কৃপা কিন্তু মা সরস্বতীর বিশেষ ঠাঁই আছে বলে মনে হয় না। নীরেনই বোধ হয় ওদের বংশে প্রথম গ্র্যাজুয়েট।

* * * *

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই কানে এলো—পিয়ানোর টুং-টাং শব্দ। চেয়ে দেখি, নীরেন একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে সেই ঘরেই বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

আমি শুয়েছিলাম বসবার ঘরে, শোবার ঘরে নয়। আমি চলে যাওয়ার পর শোবার ঘরের একটা খাট ওরা তুলে দিয়েছিল, তাই সুনীল আমার বিছানা বসবার ঘরে এক পাশে কার্পেটের উপর মেঝেতেই দিয়েছিল পেতে এবং আগের দিন রাত্রে খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শোওয়া মাত্র আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—নীরেন তখনও ফিরে আসেনি। সমস্ত দিন হাসপাতালে কাজ করেছি এবং অতক্ষণ বসে এসেছি ট্রেণে—ক্লান্ত ছিলাম নিশ্চয়ই। সুনীলই এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে আমার বিছানায় রেখে আমার ঘুম ভাঙ্গাল।

তখনও ঘুমের আমেজ পুরো কাটেনি। পিয়ানোর টুং-টাং শব্দ কানে বেসুরো লাগল। তার পর নীরেন যখন গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগল—

তখন তুমি নাই বা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে গো
নাই বা আমায় ডাকলে—

তখন সত্যিই বিরক্তি এলো মনে। অমন গানখানাকে কি বিকৃত সুরেই না গাইছে!

বললাম, কি যা-তা চেঁচাচ্ছেন ?

নীরেন হি-হি করে হেসে উঠল।

আগের দিন রাত্রেই সুনীলের কাছে শুনেছিলাম—নতুন পিয়ানো ভাড়া করা হয়েছে, এমির সখ।

সুনীল বলেছিল, এমি কিন্তু পিয়ানো বাজায় ভাল। শোনেন নি ? বলেছিলাম, না ?

* * * *

এমির সঙ্গে দেখা হল, বিকেল সাড়ে চারটার সময় সেজেগুজে এলো ফ্ল্যাটে। এমিকে দেখে একটু অবাক হলাম। সাজগোজের বাহার অবশ্য অসম্ভব বেড়ে গেছে—পরিধানে অত্যন্ত দামী পোষাক। কিন্তু দেখেই মনে হল মুখের সে মাধুর্য্যটুকু যেন আর নেই। সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি কেমন যেন হয়ে গিয়েছে ঘোলাটে, যেন একটা আলস্যে ঢুলু-ঢুলু। মুখের উপর পরিষ্কার ফুটে উঠেছে একটা উগ্র দম্ভের ছাপ। আরও অবাক হলাম, যখন ঘরে ঢুকে আমাকে দেখেই, এই যে বিক—কখন এলে ? বলে ছুটে এলো আমার কাছে এবং আমার গলা জড়িয়ে আমার গালে দিল একটা ছোট্ট চুম্বন। এর আগে কখনও এমি আমাকে চুমো খায়নি।

ঘরে আমি একলা ছিলাম না। সুনীল ছিল এবং নীরেনও সেজেগুজে বসেছিল—বোধ হয় বেরুবার জন্য তৈরী হয়ে। দু-চারটে একথা ওকথার পর, নীরেন যখন উঠে দাঁড়িয়ে এমিকে বলল, চল—বেরুনো যাক্। তখন বেশ জোরের সঙ্গেই এমিকে বললাম, এমি বসো। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

এমি উঠে দাঁড়িয়েছিল—শুনেই এমি বসল।

নীরেন এ অবস্থায়, তার ঘরে থাকা উচিত কি না, সেইটুকু বোধ হয় বিবেচনা করার জন্য দু-একবার ঘরের মধ্যেই পায়চারী করল, তারপর গিয়ে ঘরের কোণে বসল একটা চেয়ারে—ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না। সুনীল বসেই ছিল। আমি এমিকে বসতে বলার পর, হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনারা তা হলে কথাবার্ত্তা বলুন—আমি চা নিয়ে আসি।

বললাম, না, আপনিও বসুন। চা পরে হবে।

সুনীল সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, এমি! তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যই আমি বিশেষ করে এসেছি লণ্ডনে—দুদিনের ছুটিতে। নইলে আসতাম না।

এমি চুপ করে রইল—কোনও কথা বলল না। এমির উপর মনে মনে আমার রাগও ছিল নাকি ? কথার সুর ক্রমে কড়া হ'ল। বললাম, আমি ডাক্তার। তাই নীরেনের শরীরের খবর আমি জানি। তুমিও যে জান না—এমন নয়। তাই বলি—তুমি জেনে-শুনে ইচ্ছে করে নীরেনকে যে ভাবে মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাচ্ছ—তাতে তোমাকে নরহন্তা বললে কি অন্যায় বলা হবে ?

এমি সোজা একবার চাইল আমার দিকে—চোখ দুটি এইবার সত্যি জ্বলে উঠল। কিন্তু কোনও কথা বলল না।

আবার বললাম এবার বিশেষ জোরের সঙ্গে, নীরেন আমাদের দেশের ছেলে। দেশে তার স্ত্রী এখনও বেঁচে। তুমি—তুমি বিদেশিনী। আমাদের চোখের সামনে তুমি ছলনার খেলা খেলে ক্রমে তাকে—

হঠাৎ এমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দ্রুত এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বলল—চুপ।

বললাম, না চুপ করব না। তোমার মতন মেয়েকে—

হঠাৎ আমার গালে বসিয়ে দিল এক চড় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার কোলের উপর বসে পড়ে আমার গলা জড়িয়ে বুকে মাথা রেখে আকুল ভাবে কেঁদে বলল, বিক্! বিক্! আমাকে ক্ষমা করো! আমাকে ক্ষমা করো। আমি বড় দুঃখিনী। জান না জান না—

বাকি কথা কান্নায় গেল ভেঙ্গে। সেই অবস্থায় চুপ করে বসে রইলাম, কি আর করি! কান্নার বেগ ক্রমে একটু রোধ হলে উঠে বসল আমার কোলের উপরে। মুখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। ক্রমে চোখ পড়ল নীরেনের উপর। হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে নীরেনের দিকে দেখিয়ে তারস্বরে বলল, ওটা একটা মানুষ নাকি! ওর বেঁচে থাকলেই বা কি, মরে গেলেই বা কি।

তার পর উঠে দাঁড়াল। নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট একটি আয়না বার করে, মুখের প্রসাধন নিল খানিকটা ঠিক করে। তার পর কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা গেল দরজার কাছে। দরজাটি খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি বিক! আমি চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নীরেনও এমি! এমি! বলে বার দুই ডেকে, কোনও উত্তর না পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

[ক্রমশঃ।

যাহারা দুঃখ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ, তাহারা কোনো দিনও জাতির দুর্গতি দূর করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁহারা ভগীরথের মতো তেজোময় দুর্দ্ধর্ষ-গঙ্গা-প্রবাহ চালিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই সহজে ও অনায়াসে সেই দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারেন নাই। পদে পদে পরাজিত ও বিফল হইয়াও তাঁহারা অবিচলিত-চিত্তে অগ্রসর হইয়াছেন, সহস্র বিঘ্ন-বিপদের মধ্যেও শির উন্নত করিয়া রহিয়াছেন। —জগদীশচন্দ্র বসু।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ
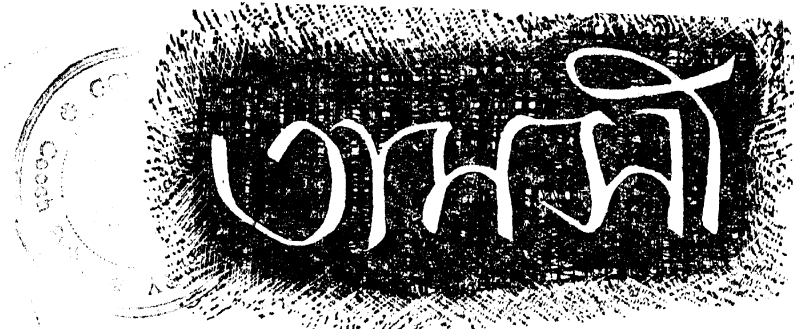
যে ঝি-এর জায়গায় হেনাকে বহাল করা হল, এখানে তার কোনো থাকবার ব্যবস্থা ছিল না। সে তার নিজের বাসা থেকেই আসা-যাওয়া করত। কিন্তু হেনার প্রথম প্রয়োজন আশ্রয়। দোতলার কোণের দিকে একখানা ছোট ঘর থেকে জিনিষপত্র সরিয়ে তার থাকবার জায়গা করে দেওয়া হল। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া জাতীয় মোটা কাজগুলো ছিল অন্য ঝিদের ভাগে। রুগীদের খাওয়ানো, পরানো এবং অন্যান্য ফাইফরমাস মেটানো এই সব পড়ল হেনার হাতে। নার্সদের কাজ রুটিন দিয়ে বাঁধা। সেটা তাদের 'ডিউটি'। কিন্তু রুগ্ন মানুষের প্রয়োজন রুটিন মেনে চলে না। নার্সের ঘড়িধরা নির্দিষ্ট সীমার বাইরেও খানিকটা সেবা, খানিকটা পরিচর্যার ক্ষেত্র পড়ে থাকে, রুগীর কাছে যার মূল্য অনেক। হেনার সঙ্গে নার্সিংহোম বাসিন্দাদের যোগ ছিল সেইখানে। এই মেয়েটি যে তাদের আপনার কেউ নয়, হাসপাতালের লোক, এ কথা তারা প্রায়ই ভুলে যেত, সে-ও মনে করিয়ে দিত না।

Suffering humanity বলে একটা কথা হেনা কোনো বইতে পড়ে থাকবে। নিজের চোখে না দেখলেও দাদার কাছে শুনে শুনে এ সম্বন্ধে একটা ছবি তার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার যেমন শেষ নেই, তার বৈচিত্র্যও তেমনি অন্তহীন। জরা, ব্যাধি, অভাব, দারিদ্র্য তার নিত্যসহচর। তার উপরে মাঝে মাঝে দেখা দেয় নির্মম প্রকৃতির দুর্জয় রোষ, ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, ভূমিকম্প। মানুষ পঙ্গপালের মত প্রাণ দেয়, কিংবা অসহায় পশুর মত বনে-জঙ্গলে উন্মুক্ত আকাশতলে পড়ে ছটফট করে। বিধাতার দেওয়া এই যে দুঃখের পশরা তাকে বইতে হয়, তার মধ্যে নারী-পুরুষের সমান অংশ। এই সেবা-নিবাসে এসে হেনার চোখে পড়ল দুঃস্থ এবং আর্ত মানুষের আর একটা রূপ। সেখানে নারী একা। এ সংকট তার নারী-জন্মের সংকট। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালেই মা হবার দায় মেনে নিতে হবে। মাতৃত্ব তার গৌরব আবার এই মাতৃত্বই তার অভিশাপ। সন্তানের জন্মলগ্নের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে জননীর মৃত্যুযোগ। মা হতে যে এল, তার এক চোখে থাকে আশার আলো, আরেক চোখে মরণের ছায়া। কেউ জানে না, সে আলোছায়ার খেলায় কে জিতবে আর কে হারবে! যন্ত্রপাতি নিয়ে যিনি শিয়রে এসে দাঁড়ালেন, যত বড় ধন্বন্তরিই হউক না কেন, তিনিও শিশুর মত অজ্ঞ এবং অসহায়। তাই, হয়তো দেখা গেল সূতিকাগৃহের দুয়ারে উৎসবের দীপ জ্বলতে গিয়ে জ্বলল না, শুভ শঙ্খ বাজতে গিয়ে থেমে গেল। মা হওয়ার স্বপ্ন আর বেদনা নিয়ে যে এল, সে ফিরে গেল রিক্ত হস্তে। কারো হয়তো ফিরে যাওয়া আর হল না, ডাক এল কোন্ অজানা দেশের। শূন্য শয্যায় অনাদরে পড়ে রইল মাতৃঘাতী শিশু।

কিন্তু আরোগ্য-নিবাসের এ শুধু একটা দিক। এরই পাশাপাশি রয়েছে সফল মাতৃত্বের পরিপূর্ণ রূপ। সেখানে নবজাতকের কান্নার শব্দে মৃতপ্রায় জননীর দেহে ফিরে আসে জীবনের স্পন্দন। রক্তহীন পাণ্ডুর মুখের উপর মিলিয়ে যায় যন্ত্রণার রেখা। দু'চোখ ভরে দেখেছে হেনা, তরুণী মা মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলে কম্পমান হাত দু'টি বাড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে তার সদ্যোজাত প্রথম সন্তান। যার হাত ওঠেনি, ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছে সলজ্জ মুখে, কেমন হয়েছে খোকা? নিজের বুকের ভিতর থেকে সেই ক্ষুদ্র কোমল পুতুলটিকে মায়ের কোলে তুলে দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছে হেনা, চাঁদের মত ছেলে হয়েছে আপনার। এই দেখুন না?

বাইরের 'কল' এলে হেনাকেও মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে যেতেন ডাক্তার সেন। প্রয়োজন বুঝে কোথাও কোথাও ওরই হাতে পড়ত প্রসূতিকে দাঁড় করিয়ে দেবার ভার। এমনি একটা বাড়িতে ক'দিন ওকে কাটাতে হয়েছিল। সে দৃশ্য আজও চোখে লেগে আছে। বাগবাজারের একটা বস্তি। প্রসব করিয়ে ডাক্তার চলে গেছেন। তার পর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। ছেঁড়া কাঁথার উপর পড়ে আছে প্রসূতির রক্তহীন জীর্ণ দেহ। বাড়ি-ঘরের অবস্থা তার চেয়েও জীর্ণ। জাতকের দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হবে মানুষের ছেলে নয়, পাখীর ছানা। সেই ক্ষীণপ্রাণ জীবটিকে কোলে নিয়ে পলতে করে একটু মিছরির জল খাওয়াবার চেষ্টা করছিল হেনা। হঠাৎ কান্নার রোল কানে যেতেই পেছনে তাকিয়ে দেখে, একটি ঐক্যতান প্রসেশন। সকলের সামনে যেটি, তার বয়স বোধ হয় সাড়ে তিন, তার পেছনে দুই, তার পেছনে বাবার কোলে চড়ে যেটি সব চেয়ে বেশী আস্ফালন করছে, সে বোধ হয় একের কোঠা পেরোয়নি। ভদ্রলোক তার স্ত্রীর নিস্পন্দ দেহের দিকে চেয়ে অম্লান বদনে বললেন, কোনোটাকেই তো ঠেকাতে পারছি না। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। স্বামী এবার সুর চড়ালেন, চুপ করে থাকলে

চলবে কেন? এগুলোকে কে সামলায়? ছুটো ভাত তো গেলাতে হবে। হেনা স্থান-কাল-পাত্র ভুলে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, আপনি বলছেন কী? উনি কী করে ভাত খাওয়াবেন এই অবস্থায়? ভদ্রলোক হেসে ফেললেন, কী করবো, বল। আমরা তো আর বড়লোক নই যে দু-চারটা ঝি-চাকর রাখবো। একার সংসারে—তার কথা শেষ হবার আগেই একটা ক্ষীণ সুর বেরিয়ে এল সেই কঙ্কালের মুখ থেকে, খোকাকে ওখানে বসিয়ে দিয়ে এক থালা ভাত দিয়ে যাও।

ভদ্রলোক চলে গেলে হেনার দিকে তাকিয়ে বলল বৌটি, আমি চাইনি ভাই! এর একটাকেও চাইনি। সবগুলো যদি একদিনে শেষ হয়ে যেত, আমি বাঁচতাম।

ওদের কী দোষ! রুক্ষ স্বরে বলে উঠল হেনা।

—না ভাই, দোষ ওদের নয়, দোষ বিধাতার। সে যে চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে। যে বইতে পারে না, তারই মাথায় চাপিয়ে দেয় বোঝা। আর যে পারে, কিছু মনে করো না ভাই! তুমি কুমারী মেয়ে। কিন্তু তোমাকে দেখে তখন থেকে ভাবছি, ছেলে পেটে ধরা তোমার মত মেয়েকেই মানায়। তোমার চোখ-মুখ-বুক, হাত দুখানা, তোমার প্রতিটি অঙ্গ যে মা হবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

এর ক'দিন পরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল হেনা। ফুটফুটে মেয়ে কোলে করে বসে আছে তাদের বাহাদুরনগরের বাড়ির বারান্দায়। তার পিঠের কাছে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বিকাশ। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, খুকুর নাম রেখেছ?

—বাঃ, আমি রাখবো না কি নাম? সলজ্জ হাসি হেসে বলে উঠল হেনা।

বেশ, তাহলে আমিই রাখছি। ওর নাম রইল মঞ্জরী। হেনার মঞ্জরী। কবিগুরুর লাইন।

যখন ঘুম ভাঙল, লজ্জায় ঘৃণায় অস্বস্তির তাড়নায় সে যেন নিজের কাছে নিজেই মুখ দেখাতে পারছিল না। পরের দিনও কোনো কাজে মন দিতে পারেনি। ছিঃ ছিঃ, এ কি স্বপ্ন দেখল সে! উন্মত্ত কল্পনায় যা কখনো ভাবতেও পারেনি, তাও কি কোনো দিন স্বপ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে? তবে কি নিজের অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনের গভীরতম তলদেশে এমনি কোনো অসঙ্গত আকাঙ্খা বুদ্বুদের মত জেগে উঠেছিল ক্ষণেকের তরে? উঠেই আবার মিলিয়ে গেছে, সে জানতে পারেনি? তাই যদি হয়, নিজের কাছে তার অপরাধের সীমা নেই।

অনেক দিন পরে বাবার কথা মনে করে বুকের ভিতরটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কে জানে কেমন আছেন তিনি? কত দিন মনে হয়েছে একটা চিঠি লিখে খবর নেবে। কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেও দু-একবার। দু-এক লাইন লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। না; চিঠি লিখবার পথ তার বন্ধ হয়ে গেছে। খবর পেলেই তিনি ছুটে আসবেন। এসে দেখবেন, তার হেনা আজ হাসপাতালের ঝি। সে আঘাত সইতে পারবেন না। তার চেয়ে এই ভালো। কেউ নেই তার। স্বজন বান্ধব সকলের নাগালের বাইরে, সে একা। হঠাৎ সুরমা দি'কে মনে পড়ে গেল। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল, কুঁজো থেকে খানিকটা জল নিয়ে দুচোখে ঝাপটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল রুগীদের ওয়ার্ডে। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে ভুলতে চেষ্টা করল সেই ফেলে-আসা দিনগুলো। কিন্তু মানুষের মন তো একখানা শ্লেট নয় যে ইচ্ছা করলেই তার পুরানো লেখাগুলো মুছে ফেলা যায়, আবার ইচ্ছা করলেই তাকে ভরে দেওয়া যায় নতুন লেখায়। সমস্ত দিনটা কেটে গেল আচ্ছন্নের মত। বিকাল হতেই ছুটি চাইতে গেল ডাক্তারবাবুর কাছে।

কোথায় যাবে? প্রশ্ন করলেন ডাক্তার সেন।

—বিনতা দি'র কাছে যাবো একটু। আজ হয়তো না-ও ফিরতে পারি।

ডাক্তার একবার তাকালেন ওর মুখের দিকে। কি দেখলেন, কে জানে? তারপর বললেন, আচ্ছা যাও।

বিনতার ঘরেই অতসী এসেছিল তার শাশুড়ীকে লুকিয়ে। একথা ওকথার পর বলেছিল, বাবা এসেছিলেন এর মধ্যে। জ্যাঠামশাই ওখানে নেই। ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন কোলকাতায়।

কোথায় আছেন? ব্যাকুল প্রশ্নটা হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল হেনার মুখ থেকে। অতসী বলতে পারেনি। কেমন করেই বা পারবে? এই জনাকীর্ণ নিষ্ঠুর সহরের অন্তহীন পথের কোন্ প্রান্তে কার আশ্রয়ে কেমন করে তাঁর দিন কাটছে, জানবার কোনো উপায় নেই। কাকীমাদের কথা মনে হয়েছিল। সেখানে গেলে হয়তো খোঁজ মিলতে পারে। ছুটে গিয়ে একটি বার শুধু দেখে আসা। শুধু চোখের দেখা। পরক্ষণেই নিজের মনকে গুটিয়ে নিয়েছিল হেনা। তা হয় না।

পরদিন সকালেই সে ফিরতে চেয়েছিল নার্সিং হোম্-এ। বিনতা আসতে দেয়নি। খাইয়ে দাইয়ে বিকেলের দিকে রওনা করে দিয়েছিল। ঘরে ফিরে কাপড় ছাড়ছে, জুনিয়র নার্স বীণা এসে বলল, কোথায় গিয়েছিলি? তিন নম্বর তোকে ডেকে ডেকে হয়রাণ। তিন নম্বরের নাম শুনেই হেনার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। বলল, কেন?

—বাঃ জানিস না বুঝি? ওর বর এসেছে যে। হঠাৎ এসে পড়েছে বোধ হয়। তখন থেকে সাজগোজের কি ধুম। ইচ্ছা ছিল, তোকে দিয়েই চুলটা বাঁধিয়ে নেয়। তা আর হল না। নিজেই যা হোক করে জড়িয়ে নিয়েছে। এবার চা-টা দিতে হবে। তোর খোঁজ করছিল।

বীণা চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে গলা নামিয়ে বলল, জানিস, এবার বোধ হয় ওর আঁটকুড়ী নাম ঘুচল। ডাক্তারবাবু ওর বরকে তাই বলছিলেন। অপারেশনে ফল হয়েছে। ক'দিনের মধ্যেই ছাড়া পাবে। গেলেই বাঁচি। আপদ যায় একটা। কী বলিস? তম্বি-হম্বিটা তোর ওপরেই তো বেশী।

নার্সের শেষের কথাগুলো বোধ হয় হেনার কানে যায় নি। তার মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বাজছিল একটি মাত্র লাইন, এবার বোধ হয় ওর আঁটকুড়ী নাম ঘুচল। এত দিনে মা হবে শিবানী, ঐ পুরুষোচিত কঠিন দেহে ফুটে উঠবে মাতৃত্বের শ্রী। মনে পড়ল, প্রথম যেদিন সে এল এই নার্সিংহোম-এ। এই তো মাসখানেক আগেকার কথা। কি একটা কাজে ডাক্তারের চেম্বারেই যাচ্ছিল হেনা। দরজার

সামনে আসতেই হঠাৎ কানে গেল, কা'কে যেন বলছেন ডাক্তারবাবু, কি করবো মা, আমরা ডাক্তার। যতই অপ্রিয় হোক, সত্যি কথাই আমাদের বলতে হয়, আমি যা দেখলাম, তোমার সন্তান হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবিশ্যি, আমার মতই যে তোমাকে মেনে নিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমি হয় তো ভুল করছি, তুমি বরং অন্য কাউকে দেখাও।

কথাগুলো যাকে বলা হল সে ছিল দরজার আড়ালে। রেনা তাকে দেখতে পায় নি, কিন্তু উত্তরটা শুনতে পেল। শুষ্ক ক্ষীণ-কণ্ঠ, তার মধ্যে নৈরাশ্যের সুর। বলল, আর কা'কে দেখাবো, বলুন? সবাই ঐ এক কথাই বলছেন। কিন্তু এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। টেবিলের উপর একটা কাচের কাগজ-চাপা পড়েছিল। খানিকক্ষণ সেটা নাড়-চাড়া করলেন। তার পর মাথা তুলে বললেন, একটা অপারেশন করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাতে প্রতিকারের আশা যতখানি, তার চেয়ে বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশী।

—বিপদ! ম্লান হেসে বলল শিবানী, চরম বিপদের জন্য তৈরি হয়েই আমি আপনার কাছে এসেছি, ডাক্তারবাবু! এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে—বলে মাঝপথেই থেমে গেল।

ডাক্তার যেন সন্ধানী-দৃষ্টিতে তাকালেন তার রোগিণীর দিকে। তার পর বললেন, তোমার স্বামী রাজী হবেন?

—নিশ্চয়ই। আমার কোনো ইচ্ছাতেই তিনি বাধা দেন না। তা ছাড়া, আপনি জানেন না ডাক্তারবাবু, একটি ছেলের সাধ তার বোধ হয় আমার চেয়েও বেশী।

এর পরে অপারেশন সম্বন্ধে দু-চারটা কথা হল। স্থির হল, তিন মাসেক পরে স্বামীকে সঙ্গে করে একেবারে তৈরি হয়ে আসবে। শিবানী উঠে পড়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে রেনাও দাঁড়াল গিয়ে ঘরের মধ্যে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলার আগে একবার পাশের দিকে চেয়ে দেখল, দুটি তীক্ষ্ণ চোখ যেন তার সর্বাঙ্গ গ্রাস করতে চাইছে। বিরক্তি এবং অস্বস্তি যতই হোক, রেনার মনে আজ আর কোনো বিস্ময় দেখা দিল না। কিছু দিন থেকেই লক্ষ্য করেছে, অপরিচিত মেয়েরা যখন তার দিকে তাকায়, ঠিক সহজ দৃষ্টিতে তাকায় না। অনেকের চোখেই থাকে হয় লোভ, নয় চাঞ্চল্য, নয়তো এমনি ঈর্ষ্যা কিংবা বিদ্বেষের বিষ। অনেক ভেবেও কারণ খুঁজে পেত না। সে তো রূপসী নয়? তবে কি দেখে এরা? তারপর তার চোখ খুলে গেল বাগবাজারের সেই কন্যা বৌদির একটি মাত্র কথায়—তোমার প্রতিটি অঙ্গ যে মা হবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। কিছু দিন আগে এখানকার একটি অল্পবয়সী নার্স তাকে একখানা বই পড়তে দিয়েছিল, শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন। অতগুলো চরিত্রের মধ্যে সব চেয়ে তার মনকে নাড়া দিয়েছিল কিরণময়ী। তারই একটা দুঃসাহসিক উক্তি মনে পড়ে গেল—সন্তান ধারণের জন্যই তৈরি নারীর রূপ। পড়তে পড়তে কান দুটো তার লাল হয়ে উঠেছিল। শিবানীর লুব্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের দিকে যখন চোখ ফেরাল, সেই লজ্জা-জড়ীন অব্যক্ত অনুভূতি তার নিভৃত অন্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

[illegible]

বাসার বাইরে। তিনি আসতে পারেন নি। লিখিত সম্মতি জানিয়েছেন ডাক্তারের কাছে, অপারেশন সম্বন্ধে স্ত্রীর সঙ্গে তিনি একমত। সেই দিন সন্ধ্যার মুখে তিন নম্বর ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল রেনা। শিবানী ডেকে ফেরাল, শোনো। কি কর তুমি এখানে?

—ঝি-এর কাজ করি।

—ঝি-এর কাজ! বলে কপাল কুঞ্চিত করে তাকিয়েছিল শিবানী। একটা সামান্য কথার মধ্যে যে কতখানি ঘৃণা অবজ্ঞা আর তিক্ততা একসঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে, রেনার কাছে যেমন করে আর কোনো দিন ধরা পড়েনি। সেই দিন প্রথম সে তীব্রভাবে অনুভব করেছিল, কি এবার বেদনা আর অপমান। তার পর থেকে ক্রমাগত লাঞ্ছনা আর রূঢ় ব্যবহার ছাড়া আর কিছু সে পায়নি এই তিন নম্বরের কাছ থেকে। রেনা জবাব দেয়নি, প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু মনটা তার তিক্ত বিষিয়ে কালো হয়ে গেছে।

দিন তিনেকের মধ্যেই অপারেশন হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সেরে উঠল শিবানী। আজ সে সম্পূর্ণ নিরাময়। শুধু তাই নয়, অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ডাক্তার। মিস, সাফল্য এবং আশঙ্কা নিয়ে তিনি অনুমান করেছিলেন। আজ তিনি নিশ্চিন্ত। তাঁর পরীক্ষা সফল হয়েছে। মন সাধ পূর্ণ হয়েছে শিবানীর। খবর পেয়ে প্রবাস থেকে ছুটে এসেছেন তার স্বামী। হয়তো বছর না যেতেই তার কোলে আসবে কোলজোড়া খোকা। রেনার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার সেই অসম্পূর্ণ স্বপ্ন। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। তারপর অন্তরের কোন অতল থেকে বেরিয়ে এল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস।

তিন নম্বর থেকে আবার তাগিদ এসে গেল, চা চাই। এক কাপ নয়, দু' কাপ। শিবানী একা নয়, তারা দু'জন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে তার ঐ পাথরের মত কঠিন মুখ। পাশাপাশি বসে চা খাবে আর গল্প করবে। তার পর তারা চলে যাবে, যেমন করে আরো কত লোক চলে গেছে। সে-ই শুধু পড়ে থাকবে তাদের চা যোগাবার ভার নিয়ে। তীব্র রূঢ় কণ্ঠের ডাক ভেসে এল—ঝি—! শিবানীর গলা। অন্য সবাই তাকে নাম ধরে ডাকে। কিন্তু শিবানীর কাছে সে শুধু ঝি। রেনার চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। একান্ত অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে পা বাড়াল বাঁ দিকে রান্নাঘরের দিকে।

দু' হাতে চায়ের কাপ-ডিশ নিয়ে তিন নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই রেনার কানে গেল একটা পরিচিত স্বর। থমকে দাঁড়াল সেইখানেই। একটুখানি মৃদু কণ্ঠ, কিন্তু সে যেন বিপুল বেগে এসে আছড়ে পড়ল তার বুকের উপর। দরজার পর্দা বাতাসে একটু সরে যেতেই শিউরে উঠল রেনা। এ কি! এ যে অবিকল তারই মত। না, না। এই তো সে। সেই দুটো আগুন-ভরা চোখ, যারা দুর্বার বেগে আকর্ষণ করে, আবার জড়ের দোলায় সরিয়ে দেয়। কাপ-ডিশ তুলিয়ে দেয়, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে দেয় না। রেনার পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেল। নড়বার শক্তি রইল না। ঠিক সামনে খাটের বাজুতে রেনার দিকে পেছন করে আছে। শিবানী ছিল পাশের দিকে। আস্তে আস্তে একান্ত কাছটিতে সরে এল। স্বামীটি

দীর্ঘ বলিষ্ঠ হাতের বেষ্টনে। সেই হাত, যে একদিন প্রায় সমস্ত রাত ধরে তারই কণ্ঠের চারদিকে জড়িয়ে ছিল। সেই উত্তপ্ত গাঢ় স্পর্শ বিদ্যুৎ-শিখার মত ফিরে এল রেনার সমস্ত দেহের রক্তকণায়। বুকের ভিতর জ্বলে উঠল দাবানল। দু চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল তার হলকা। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল। কম্পিত হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল চায়ের পেয়ালা।

ঘরের ভিতর থেকে শিবানীর কর্কশ স্বর গর্জে উঠল—কে? রেনা জবাব দিল না। নিচু হয়ে বসে পেয়ালার ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে তুলতে লাগল। শিবানী বেরিয়ে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, ভাঙলি তো কাপটা? তোর আজ-কাল কি হয়েছে বল তো! চোখ দুটো থাকে কোথায়?—বলেই দ্রুত কণ্ঠে ফিরে গেল ঘরের মধ্যে। রেনার কানে গেল সেই গম্ভীর কণ্ঠের মৃদু প্রশ্ন—কে ও?

—ঐ ঝিটা, আর কে! একেবারে জ্বালিয়ে গেল।

—আহা, ওর দোষ কি, হেসে বলল সেই স্বর, আমাদের কাণ্ড দেখে হয়তো মাথা ঘুরে গেছে।

—ঠিক বলেছ! ও সব পারে। নিশ্চয়ই দেখছিল লুকিয়ে লুকিয়ে।—বলেই আবার বেরিয়ে এল শিবানী। ঝাঁঝ দিয়ে বলল, কি করছিলি এখানে দাঁড়িয়ে? রেনা জবাব দিল না। শিবানীর যেন আরো রাগ চেপে গেল। এগিয়ে গিয়ে ওর চিবুক ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, বল কি দেখছিলি। আমরা স্বামি-স্ত্রী বসেছি ঘরের মধ্যে, লজ্জা করে না তোর জানালায় বসে উঁকি মারতে? বেহায়া কোথাকার।

স্বামি-স্ত্রী! তীব্র কশাঘাতে কেঁপে ককিয়ে উঠল রেনার সমস্ত চেতনা। ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠল শুধু বিষাক্ত হাসির বুদ্বুদ। স্বামি-স্ত্রী!

কাচের টুকরাগুলো কুড়িয়ে, ফেলে দিয়ে রেনা ফিরে এল তার ছোট্ট ঘরটিতে। চোখ দুটো থেকে তখনো ঝরে পড়ছে সেই স্ফুলিঙ্গ। উদ্ধত বুকখানা দ্রুত উত্থানে উঠছে নামছে। দুঃখ নয়, ব্যথা নয়, দুঃসহ প্রতিহিংসার তাড়না। স্বামি-স্ত্রী! ঠোঁট দুটো আবার কুঁচকে উঠল। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বিকৃত স্বর—স্বামি-স্ত্রী! তোমাদের ঐ স্বামি-স্ত্রীর সুখের ঘর আমি ভেঙে দেবো, পুড়িয়ে দেবো তোমাদের সাধের সংসার। না, না—আমি যা পাইনি, তোমাকেও তা পেতে দেবো না, শিবানী!

কিন্তু কেমন করে? ওদের বঞ্চিত করবার, ওদের ঐ মিলিত জীবনের সুখৈশ্বর্য ধ্বংস করে দেবার মত কি অস্ত্র আছে তার হাতে? আছে বৈ কি? দৃঢ় কণ্ঠে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল রেনা। আমারই হাতে রয়েছে ওদের মৃত্যুবাণ। একটি বার শুধু ছুটে গিয়ে দাঁড়াবো ওদের সামনে, মাথা উঁচু করে বলবো, এত কাল যাকে 'ঝি' বলে ঘৃণা করেছ, অপমান করেছ পদে পদে, তার দিকে একবার চেয়ে দ্যাখ শিবানী! জিজ্ঞেস কর তোমার প্রেমিক স্বামীকে, কে সেই ঝি। ওর কাছে কী তার পরিচয়। শোনো, শিবানী, বিয়ের রাতে ঐ হাত থেকে যে মালা পেয়ে তুমি ধন্য হয়েছিলে, সে মালা বাসি, সে এই ঝি-এর গলার শুকনো মালা!

নিষ্ঠুর উল্লাসে নিজের মনে হেসে উঠল রেনা। পরমুহূর্তেই

আবার সন্দেহে আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। বিকাশ যদি সব অস্বীকার করে? যদি বলে, কে তুমি? তোমাকে আমি চিনি না, কোনো দিন দেখিনি। তুমি যা বলছ, সব মিথ্যা, সব পাগলের প্রলাপ! তাহলে? কী প্রমাণ আছে তার? কে বিশ্বাস করবে তুচ্ছ একটা ঝি-এর কথা? সবাই হাসবে, টিটকারি দেবে। বলবে ছি, ছি, হেনাটা কি নির্লজ্জ! হয়তো মিথ্যা অভিযোগের অপরাধে তাড়িয়ে দেবেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু তাই বলে মুখ বুজে হার মানবে হেনা, আর ওদের হবে জিৎ! ওরা হাত ধরাধরি করে চলে যাবে আর ও শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে দরজার পাশে! হাত পেতে নেবে ওদের একটু ভিক্ষার অনুগ্রহ, একটু তাচ্ছিল্যের হাসি! সে হাসি নিবিয়ে দেবার কোনো চেষ্টাই করবে না?

বন্ধ দরজার ওপাশে কড়া নড়ে উঠল। খুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল হেনা। হয়তো আবার ডাকছে শিবানী। পাঠিয়েছে নতুন কোনো হুকুম। নাঃ, সে খুলবে না। কিছুতেই না; কোন মতেই না। বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল। কম্পাউণ্ডার বিপিন বাবুর গলা। নিশ্চয়ই কোনো জরুরি দরকার। দরজা খুলতেই একটা কৌটা বাড়িয়ে ধরে বলল বিপিন, ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন। আর্জেন্ট কল, ওপরে যাবার সময় নেই। এটা তোমাকে রেখে দিতে বললেন। সাবধানে রেখো। আমিও যাচ্ছি ওঁর সঙ্গে। ছুটতে ছুটতে চলে গেল কম্পাউণ্ডার। দরজা বন্ধ করে দিয়ে হেনা তাকাল তার হাতের জিনিসটার দিকে। সন্ধ্যাবেলায় একটু করে আফিম খেয়ে থাকেন ডাক্তার সেন। তারই কৌটা, আস্তে আস্তে ডালাটা খুলে ফেলল। কালো কালো অনেকগুলো বড়ি। বিষ! কেমন একটা ভাঙা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলার ভিতর থেকে। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই তো সেই মহাস্ত্র। এতক্ষণ যা চেয়েছিলাম, এই সেই মৃত্যুবাণ। তার একান্ত মনের কামনা শুনতে পেয়েছেন ভগবান। আফিম নয়, এ তাঁর প্রত্যাদেশ।

কপাটের গায়ে করাঘাত। আবার কে ডাকছে! কৌটোটা তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল হেনা। দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল বীণা। চমকে উঠল ওর মুখের দিকে চেয়ে—এ কি! চোখ মুখ বসে গেছে কেন? অসুখ করেছে নাকি?

না না, অসুখ করবে কেন? ম্লান হেসে জবাব দিল হেনা।

বড্ড গুরুজারি হচ্ছে। সাবধানে থাকিস। হ্যাঁ: আবার ডাকছে তিন নম্বর। কাপ ভাঙিস বলে চা দিতে হবে না? যা, নিয়ে আয়।

বেরিয়ে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, এক কাপ দিস। ভদ্রলোক চলে গেছে। কাল এসে নিয়ে যাবে। খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে আছে, দেখলাম।

একতলায় রান্নাঘরের বারান্দায় চা তৈরির সরঞ্জাম। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে চিনি মেশাতে মেশাতে চার দিকটা একবার চেয়ে দেখল হেনা। কেউ নেই, বুকের ভিতর থেকে কৌটোটা বের করে খুলতে গিয়ে হাত দুটো কেঁপে উঠল। আর একবার চেষ্টা করতে যাবে, বারান্দার ওধারে কার পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওটা আবার লুকিয়ে ফেলল আঁচলের তলায়। আর দেরি করা চলে না। কৌটো রইল বাঁ হাতের মুঠোয়। ডান হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়। তিন নম্বরে ঢুকে দেখল, শিবানী নেই। পাশেই বাথরুম। সেখান থেকে জল পড়ার শব্দ আসছে। কাপটা নামিয়ে রাখতেই পেছন থেকে বীণা এসে ঢুকল। হাতে মেজার গেলাস। ফিস-ফিস করে বলল, কোথায়? হেনা চোখের ইসারায় বাথরুমটা দেখিয়ে দিল। গেলাসটা টেবিলের উপর রেখে মুখে একখানা বই চাপা দিয়ে বলল বীণা, ওষুধটা খেয়ে নিতে বলিস। এ কী! কার ছবি রে? ও-ও! যুগল মূর্তি। বেশ করে দেখা হচ্ছিল বুঝি ছুটিতে মিলে? এ মা! এ কী রকম দাঁড়াবার ছিরি! কী অসভ্য বাবা!

ছবিটা তুলে ধরল হেনার চোখের সামনে। তারপর রেখে দিয়ে চলে গেল হাসতে হাসতে। পলকমাত্র নজর পড়তেই হেনার বিবর্জর অন্তর জুড়ে দাপর জ্বলে উঠল সেই দাবানল। হঠাৎ মনে হল চোখের উপর থেকে নিবে গেছে পৃথিবীর সব আলো, মিলিয়ে গেছে বিধাতার সব সৃষ্টি। চারদিকে শুধু অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার। তারই মধ্যে জ্বলন্ত বিদ্রূপের মত দাঁড়িয়ে আছে ঐ অসহ ছবিখানা একটি সুখী দম্পতির প্রেমপূর্ণ আলোকচিত্র। সামনের দিকে দাঁড়িয়ে শিবানী, তার কাঁধের উপর চিবুক রেখে হাসছে বিকাশ। কী এক দুর্বার জিঘাংসা মুহূর্তমধ্যে হেনার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলল। শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল তার নেশা, নেচে উঠল রক্তধারা।

তার পরের মুহূর্তগুলো আজ আর কিছুতেই সে স্মরণ করতে পারে না। আবছায়ার মত শুধু মনে পড়ে কম্পিত হাত দু খানা যন্ত্রচালিতের মত কখন বোধ হয় খুলে ফেলেছিল আফিমের কৌটা। দুটো বড়ি তুলে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল মেজার গেলাসের মধ্যে। ঠিক সেই সময়ে খুট করে শব্দ হয়েছিল বাথরুমের দরজায়, আর তারই সঙ্গে রাশি রাশি ভয় যেন দৈত্যের মত ছুটে এসেছিল তাকে ধরবার জন্যে। তার বুকের ভেতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠেছিল, পালাও। চোখের নিমেষে বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে গিয়ে সে লুটিয়ে পড়েছিল তার বিছানার উপর। তার পরে আর কিছুই তার মনে নেই। কতক্ষণ অসাড় হয়ে পড়েছিল তাও জানে না। যখন জ্ঞান হল চারদিক নিঝুম হয়ে গেছে। ওয়ার্ডের দিক থেকে রুগীদের কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মাথা তুলতে গিয়ে মনে হল সমস্ত শরীরখানা দুলছে। পিপাসায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। উঠে জল গড়িয়ে খাবে, সে শক্তিও নেই, সমস্ত শরীরে দারুণ অবসাদ।

আরও খানিকক্ষণ নির্জীবের মত পড়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে টলতে টলতে কুঁজোর কাছে গিয়ে দেখল, তারই পাশে ঢাকা দেওয়া পড়ে আছে তার রাত্রির খাবার। ঠাকুর হয়তো কখন রেখে গেছে। ঘুমুচ্ছে মনে করে আর ডাকেনি। খাবার তেমনি পড়ে রইল। দু গেলাস জল খেয়ে দেয়াল ধরে ধরে হেনা আবার ফিরে এল বিছানায়। গভীর ক্লান্তিতে দু চোখ জুড়ে নেমে এল ঘুম। ঠিক ঘুম নয়, কী এক রকম আবেশময় অসাড়তায় জড়িয়ে গেল স্নায়ুজাল।

ভোরের দিকে সেই আচ্ছন্ন ভাবটা যখন একটু তরল হয়ে এসেছে, হেনার কানে গেল কিসের একটা বড় গোলমাল। কারা যেন ব্যস্ত ভাবে চলাফেরা করছে, অনেকে মিলে কথা বলছে, তারি একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন। হঠাৎ তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে এল কম্পাউণ্ডার।

ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল, কোথায় ফেলেছ আফিমের কৌটো ? হেনার হৃৎপিণ্ডটা যেন এক নিমেষে অচল হয়ে গেল। চোখে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারল, তার সমস্ত মুখের উপর থেকে নেমে গেছে রক্তস্রোত। ছাইএর মত সাদা দু'খানা ঠোঁট শুধু নড়ে উঠল একবার। একটু ক্ষীণ শব্দও শোনা গেল না।

কী, কথা বলছ না যে ? ফেটে পড়ল বিপিন। ডাক্তারবাবু ডাকছেন তোমাকে। শীগগির চল।

হেনা উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু মাথা তুলতে পারল না। মগজ দুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে। সমস্ত শরীরে ব্যথা। এতক্ষণে বোধ হয় বিপিনের নজর পড়ল তার মুখের দিকে। খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, অসুখ করেছে বুঝি ? থাক, আর উঠতে হবে না। শুয়ে থাকো। শেষ কালে আমার হাতেই বুঝি দড়ি পড়ল—বলেই তেমনি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল বীণা। চাপা গলায় বলল, ও কী, তুই এখনো উঠিসনি ! ওদিকে যে সর্বনাশ ! শিবানী আত্মহত্যা করেছে। ডাক্তারবাবুর আফিমের কৌটো পাওয়া গেছে তার টেবিলের তলায়।

আত্মহত্যা ! হেনার মনে হল একখানা বিশাল পাথর যেন এই মাত্র নেমে গেল তার বুকের উপর থেকে। আবার বুঝি হৃৎস্পন্দন শোনা যাচ্ছে, মুখের উপর ফিরে আসছে রক্তের ধারা। ওর দিকে চোখ পড়তেই বীণা এসে বসে পড়ল শিয়রের পাশে। কপালে হাত দিয়ে বলল, ও মা ! জ্বর এল কখন ? কিছু বলিসনি তো ! পায়ের কাছে যে চাদরটা গোটানো পড়ে ছিল, সেইটাই পাট খুলে গলা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে বলল, শুয়ে থাক, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি।

না, না, ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে অনেকটা যেন চেঁচিয়ে উঠল হেনা। তার পর আস্তে আস্তে ফিস-ফিস করে বলল, ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হবে না। কিছু হয়নি আমার।

বীণা হেসে উঠল, পাগল ! তোর ভয় কিসের ? তুই তো আর বিষ দিসনি।

নিজের অজ্ঞাতে আর একবার চমকে উঠল হেনা।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সেন এলেন। গাল দুটো অনেকখানি ঝুলে পড়েছে। থমথম করছে মুখ। চোখের কোণে কালি। নিঃশব্দে ওর হাতখানা তুলে নাড়ী দেখলেন। তার পর আস্তে নামিয়ে রেখে বললেন, দরজা বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে থাকো। বীণাকে বলছি, মাথাটা সে ধুয়ে দিয়ে যাবে।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার। এক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বললেন, আফিমের কৌটোটা কোথায় রেখেছিলে ?

—আমার হাতে ছিল।

—তার পর ?

হেনা জবাব দিতে পারল না। গলাটা আবার শুকিয়ে আসছে।

—শিবানীর ঘরে গিয়েছিলে কেন ?

—চা দিতে।

ডাক্তার আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। চিন্তান্বিত মুখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।
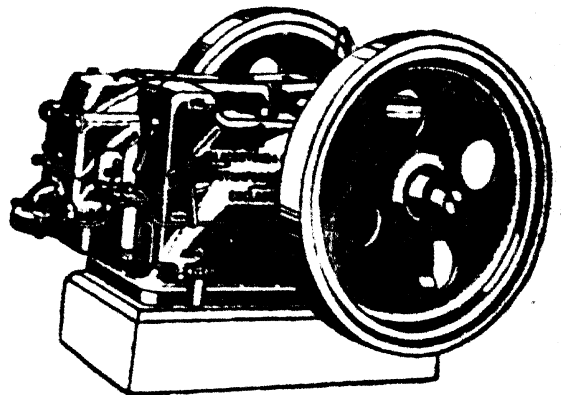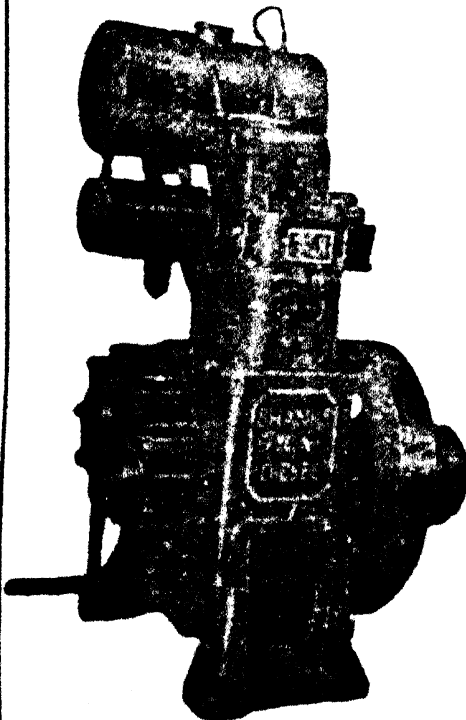
হেনাও উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে কয়েক মগ জল গড়িয়ে চাপড়ে দিল মাথায়। অনেকখানি সুস্থবোধ করল। সেই সঙ্গে সমস্ত ঘটনাগুলো ক্রমে ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে এল তার মোহাবিষ্ট মস্তিষ্কের মধ্যে। যে মূঢ় ভয় এতক্ষণ তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, হঠাৎ বোধ হয় কেটে গেল। বিছানায় পড়ে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল। কিসের এক দুর্দম প্রেরণায় সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্থির ভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করল ঘরের মধ্যে। তার পর সহসা বেরিয়ে পড়ল কটেজের ওয়ার্ডের দিকে।

তিন নম্বরের সামনে যেতেই কানে গেল সেই গম্ভীর কণ্ঠ। সুস্পষ্ট দৃঢ় স্বর। একটুকু কম্পন নেই, নেই অল্পমাত্র উত্তেজনা—আপনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, ডাক্তার সেন! আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেনি, করতে পারে না। যে কোনো কারণেই হোক, কেউ তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

হেনার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল। পা দুটো অচল হয়ে গেল। সেইখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পেল ডাক্তার সেনের প্রতিবাদ—এ আপনি কি বলছেন, বিকাশ বাবু! আমার এখানে এমন কে থাকতে পারে, একজন অসুস্থ মহিলাকে বিনা দোষে খুন করবে? আমার একটি ঝি ভুল করে আমার আফিমের কৌটোটা ওঁর ঘরে ফেলে গিয়েছিল। উনি নিশ্চয়ই তার থেকে দুটো বড়ি তুলে নিয়েছেন।

হেনার মনে হল, কী একটা প্রচণ্ড শক্তি তাকে ঠেলে এগিয়ে দিল। ঘরের ভিতরে পা দিয়েই সে বলে উঠল, না, সে বড়ি দুটো আমিই ওঁর ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। বিকাশ বসে ছিল অন্য দিকে মুখ করে। হঠাৎ যেন বিদ্যুতের আঘাতে উঠে দাঁড়াল। মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটি মাত্র কথা—তুমি!

—হ্যাঁ, আমি। আমিই খুন করেছি আপনার—আপনার স্ত্রীকে। কারণটাও কি জানতে চান? তবে শুনুন। কারণ—কারণ—আর কিছু বলবার আগেই পা দুটো আবার টলে উঠল। দুহাত বাড়িয়ে কি যেন ধরতে গেল। ডাক্তারবাবু ছিলেন ঘরের ওদিকটায়। তাঁর চিৎকার শোনা গেল। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসবার আগেই শিবানীর শূন্য খাটের উপর লুটিয়ে পড়ল তার সংজ্ঞাহীন দেহ।

ডাক্তার সেন শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন। খুনের অভিযোগ থেকে হেনাকে বাঁচাবার জন্য সম্ভব অসম্ভব কোনো চেষ্টাই বাদ দেননি। পুলিশের কাছে বলেছিলেন, আজ সকালেই ওকে পরীক্ষা করে ব্রেন বিকারের লক্ষণ পাওয়া গেছে। যা কিছু বলছে, সব বিকারের প্রলাপ। ওর কথায় কোনো গুরুত্ব দেবেন না।

পুলিশ যখন শুনল না, নিম্ন আদালতে গিয়ে হলপ করে বলেছিলেন, শিবানীর বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। তাছাড়া, রুগ্না বলে তার নিজের ওপর একটা ধিক্কার এসে গিয়েছিল। এই রকম যার মনের অবস্থা, তার ঘরে ভুল করে আফিমের কৌটো ফেলে এসেছিল বলে আসামীকে আমি কড়া ভাষায় তিরস্কার করেছিলাম, তাড়িয়ে দেবো বলে শাসিয়েছিলাম। সংসারে ওর কেউ নেই। আমাকেই ও বাপ বলে জানে। তেমনি ভালবাসে এবং ভক্তি করে। আমার রূঢ় ব্যবহার ওর মনে যে ভীষণ আঘাত দিয়েছে, তারই ফলে এই খুনের অপরাধ তুলে নিয়েছে নিজের ঘাড়ে। এটা confession নয়, নিছক অভিমান। ওকে আমি অনেক দিন থেকে দেখছি। খুন করা তো দূরের কথা, খুনের কল্পনাও ওর মত মেয়ের পক্ষে অসম্ভব!

এর পরেও যখন ছোট হাকিম হেনাকে দায়রায় সোপর্দ করলেন, তখনো হাল ছাড়েননি ডাক্তার সেন। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে দীর্ঘ আবেদন জানিয়েছিলেন জজ সাহেবের এজলাসে। বলেছিলেন, আমি একজন বহুদর্শী চিকিৎসক। আমি বারবার বলছি, এবং সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আসামী প্রকৃতিস্থ নয়। আফিমের কৌটো ফেলে আসার যে অপরাধ সেই অপরাধ-বোধই ওর confession-এর কারণ। এও এক রকমের মানসিক বিকৃতি; আমরা যাকে বলি mental derangement এবং অদ্ভুত ধরনের obcession; একটা বিশেষ ঝোঁক ওকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। অন্য কোনো দিকে মন দেবার ক্ষমতা নেই। এই অবস্থায়, কেবলমাত্র ওর একটা বিকৃত স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে যদি এই নিষ্পাপ, নিরপরাধ মেয়েটাকে খুনী সাব্যস্ত করা হয়, তার চেয়ে ঘোর অবিচার আর হতে পারে না।

কিন্তু জজ-সাহেব হেনার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পান নি এবং হয়তো সেই জন্য তার স্বীকারোক্তি অবিশ্বাস করেন নি। শুধু বারবার প্রশ্ন করেছেন, শিবানীকে বিষ দিয়েছিলে কেন? তার বিরুদ্ধে কি তোমার অভিযোগ? উত্তরে হেনা তার আগের কথারই পুনরুক্তি করে গেছে—আমি যা বলেছি, তার বেশী আর কিছু বলবার নেই। আমি খুন করেছি। তার জন্যে যে শাস্তি আমার প্রাপ্য, তাই আমাকে দিন। বার বার এক কথা বলতে আমার কষ্ট হয়।

খুনী আসামী যদি আদালতে নিজেকে সমর্থন করবার জন্য উকিল নিযুক্ত করতে না পারে, সরকার সে ব্যবস্থা করে থাকেন। হেনার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন একজন তরুণ উকিল। তিনি আসামীপক্ষে অভিযোগ অস্বীকার করে গেছেন। সরকার পক্ষের প্রবীণ উকিল তাকে অপরাধী প্রমাণ করলেও অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডের সুপারিশ জানিয়েছিলেন। হয়তো তারই ফলে চরম শাস্তি না দিয়ে জজ সাহেব তাকে মাত্র পাঁচ বছরের জন্য জেলে পাঠাবার আদেশ দেন।

যখন বিচার চলছিল, বিনতা স্বামীকে সঙ্গে করে মাঝে মাঝে জেল-হাজতে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত। সে ক'বার এসেছে প্রতিবারই বলত, তোর কাশীর ঠিকানাটা দে। একবার তোর জামাইবাবুকে পাঠিয়ে দেবো, সেখান থেকে বাবার খোঁজ পাওয়া যায় কি না। হেনা রাজী হয়নি। বার বার পীড়াপীড়ি করাতে বলেছিল, কি হবে খোঁজ নিয়ে। আমার মন বলছে, বাবা নেই। আর যদি থাকেনও, আমার এই খবর শুনলেই সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করবেন।

সেই দৃশ্যটা যেন চোখের উপর প্রত্যক্ষ করে অস্ফুটস্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল, না, না, সেটা আমি কিছুতেই সইতে পারবো না।

তবু সইতে হয়েছিল। জেল হয়ে যাবার পর কাশীর কাছ থেকে বিনতাই এনেছিল সেই চরম সংবাদ। হার্টফেল করে নয়, নানারকম অসুখে ভুগে ভুগে হাসপাতালে মারা গেছেন সদাশিব। হেনার চোখে সেদিন এক বিন্দু জল দেখা যায়নি। বোধ হয় সব জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। তারপর এই জেলে বন্দিনী জীবন কেটেছিল। শেষ সময়ে বড় কষ্ট পেয়ে থাকুন, ভগবান তাঁকে এক দিক দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। মেয়ের এই চরম পরিণাম দেখে বাবার অভিশাপ বুকে করে শেষ নিশ্বাস ফেলতে হয়নি। [ক্রমশঃ।

এক মুঠো আকাশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

অনন্ত কেবিনে আবার হৈ-চৈ হল্লোড়। আশ্বিন মাস পড়ে গেছে। আর ক'দিন বাদেই পুজো। তারই তোড়জোড় চলছে। এ বছর প্রথম পুজোর সংগে একজিবিশনের আয়োজন হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ ঘর দোকান বসবে, সে-ও তো কম কথা নয়। কেষ্ট বুদ্ধি না দিলে এ কাজে পুজো কমিটি হাতই দিত না। দু'-এক ঘর দোকান বসবে বলে কাজ আরম্ভ হয়েছিল, এখন সেটা ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

আশুদা'র দোকানে পাড়ার ছেলেদের আবার ভীড় জমছে, যেমন জমেছিল বাবর রোডের ইলেকশানের সময়। মোহন, ন্যাচা, বিশু সবাই সকাল থেকে কাপের পর কাপ চা ওড়াচ্ছে আর নতুন নতুন প্ল্যান ঠিক করে সারা দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

মোহন বললে, দেখলি শালা বাবর রোডের কাণ্ডটা, মাত্র পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছে।

বিশু বলে, আমি তো ভেবেছিলাম, একটা পয়সাও দেবে না—

—কেন, পাড়ার পুজো!

—সেই জন্যেই তো আরও দেবে না। শুনছি হয়তো বাগবাজারে, মোহনবাগানে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেছে।

—যা যা, ও সব মক্কেলকে খুব জানি। প্যাঁচে না পড়লে শালারা টাকা বার করে না।

ইতিমধ্যে কেষ্ট এসে ঢোকে। ছেলেদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, ব্যাপার কি রে? এত বেলা পর্যন্ত সব বসে বসে আড্ডাবাজী করা হচ্ছে, মাঠে গিয়ে তাঁর কাজকর্ম হচ্ছে কি না—

মোহন চট্ করে থামিয়ে দেয়, ও নিয়ে ভেবো না কেষ্টদা'! সব ঠিক আছে, আমরা পালা করে পাহারা দিচ্ছি।

আশুদা' বললেন, প্যাণ্ডেলে অনন্ত কেবিনের যে স্টল হবে, দেখবে কি জিনিস দিই।

ন্যাচা জিজ্ঞেস করে, সে যাই দিন আশুদা', ভলান্টিয়াররা ফ্রী খেতে পাবে তো?

—পাগোল নাকি, তাহলে তো আমাকেই খেয়ে ফেলবে।

—সে এদিকেও খাবে ওদিকেও খাবে। আমরা ছাড়ব না—

আশুদা' কপট ভয়ের ভাব করে বললেন, কেষ্ট ব্যাপার শুনছ? এ হলে আমি দোকান খুলছি না ভাই।

কেষ্ট হেসে উত্তর দেয়, আপনার কাছে আবদার করবে না তো কার কাছে করবে বলুন। যাই হোক আমি নিয়ম করে দেবো, দু'বেলা এক কাপ করে চা ফ্রী পেলেই হবে।

—তাতে আমার আপত্তি নেই। চা ফ্রী পাবে, কিন্তু টা'টা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে।

শুধু যে এ ভাবে হাসি-ঠাট্টা চলে তাই নয়, কি ভাবে কাজ হবে, কোন ঘরে কিসের দোকান বসবে সব কিছুর আলোচনাই এইখানে। এককথায় বলতে গেলে অনন্ত কেবিন পুজো কমিটির সদস্যদের অফিস। কেষ্ট এখানে ক'দিন থেকে দশটা-পাঁচটা কাজ করছে, বলতে গেলে তারই ওপর সমস্ত ভার। ডেকরেটার, ইলেকট্রিশিয়ান, প্রতিমা গড়ার শিল্পী, অতগুলো দোকানদার, সকলের সংগে মাথা ঠিক করে কাজ করা সহজ কথা নয়। ঝক্কি তো লেগেই আছে, এটা হয় তো ওটা হয় না, সব দিক সামলিয়ে নিয়ে কাজ করতে একমাত্র কেষ্টই পারে।

এই ভাবে চললো প্রায় দিন পনেরো। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি। আশুদা', শ্যামল, কেষ্ট আর তার সাংগোপাঙ্গ সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম। অবশ্য ফল খুব ভাল হ'ল। ষষ্ঠীর আগের দিন সব কাজ শেষ। ষষ্ঠীর দিন পুজোর মণ্ডপ আর প্রদর্শনী আলোয় ঝলমল করে উঠল। সকলের মুখেই এক কথা, এ রকম পুজো এ পাড়ায় কখনও হয়নি। কেষ্টর জয়-জয়কার।

পুজোর ক'দিন ভীষণ ভীড়, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লোকের শেষ নেই। বরং দুপুরের দিকে কম, কিন্তু সন্ধ্যের পর আলো জ্বললে কাতারে কাতারে লোক আসে। প্রতিমা দেখতে নয়, প্রদর্শনী দেখতে। প্রতিমা খুব ভালো হয়নি। আগের বছরের মতও নয়। কারণ, কেষ্টরা সব চেয়ে কম টাকা খরচ করেছে প্রতিমা গড়ানর জন্যে। কেষ্ট বলে, ওতো পয়সা নষ্ট। পুজোর সামগ্রীও যত কম খরচে হয় ভাল—

আশুদা' মৃদু আপত্তি করেছিলেন, তা বলে প্রতিমা গড়ার খরচা কমিয়ে দেবে, পুজো তো মায়েরই?

—কেউ প্রতিমা দেখে না আজ-কাল। এত বছর তো খুব ভাল ভাল প্রতিমা করেছেন, লোক এসেছে দেখতে? এইবার দেখবেন ভীড়। ডেকরেশানে কত খরচ করেছি দেখেছেন? তাই প্ল্যান সাকসেস হবে। আলোর চর্কী ঘুরবে, মাইকে গান দিচ্ছি, ভীষণ জমবে।

কেষ্টর কথা মিথ্যা হয়নি। ঝলমলে আলো, রেকর্ডের গান আর দোকানের মেলা টেনে এনেছে অসংখ্য লোক, সব পাড়া থেকে। ছোকরারা ভলান্টিয়ারদের ব্যাজ লাগিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রদর্শনী দেখার পথ দড়ি দিয়ে দু'ভাগ করা। ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থা। কোন কোন ভলান্টিয়ার মেয়েদের দিকে ডিউটি পাবে, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রায় মারামারি হবার যোগাড়। শেষ পর্যন্ত কেষ্টকে এসে ডিউটির ব্যবস্থা করে দিতে হয়।

আশুদা'র দোকানে চা-সরবৎ খুব বিক্রী হয়। বলতে গেলে আসল দোকানে এখন উনি বিশেষ কোন ব্যবস্থাই রাখেন নি। সবাইকে নিয়ে প্যাণ্ডেলে চলে এসেছেন। কেষ্ট রোজ জিজ্ঞেস করে, কেমন বিক্রী হল আশুদা'?

—মন্দ নয়। হৈ-চৈও হচ্ছে, কাজও হচ্ছে। প্রত্যেক বছর একজিবিসান কোর্‌ছে, আর অনন্ত কেবিনের জন্তে একটা ষ্টল বাঁধা।

—আমার দোকানও খারাপ চলছে না।

—হ্যাঁ, শ্যামল তাই বলছিলো—

—ছেলেটা খুব কাজের আছে।

কেষ্টর দোকান প্রদর্শনীর এক কোণে। কিন্তু জায়গাটা ভাল। সকলকেই একবার এদিকে আসতে হয়। জিনিষপত্র বেশী না থাকলেও বিক্রী ভালই হচ্ছে। ফউন্টেনপেনের কালী, মুখে মাখা পাউডার, কতকগুলো সস্তার বই, লজেন্স, চকোলেট, কাপড়কাচা সাবান, এই হ'ল বিক্রীর সামগ্রী। যা সব চেয়ে বেশী চলে তা হোল লজেন্স আর বিস্কুট।

শ্যামল চৌকস ছেলে, জিনিষ বিক্রী করার ক্ষমতা ওর আছে। পাউডার খুলে মেয়েদের হাতে লাগিয়ে দেয়, বয়স অনুযায়ী মা কিংবা দিদি বলে সম্বোধন করে, এই যে, মেখে দেখুন না একবার। জিনিষ ভাল না হলে দাম ফেরৎ দেব। এক বৃদ্ধা নেড়ে-চেড়ে বল্লেন, কত দাম বাবা?

—এক টাকা মাত্র, বিলিতি মাল।

—বিলিতি জিনিষ কি এক টাকায় হয়?

—লাভ করে তো বিক্রী করছি না মা, পুজোর মণ্ডপে কি কেউ ব্যবসা করতে আসে। কৌটোর পেছনে লেখা আছে, দেখুন—শ্যামল নিজেই কৌটো উল্টে দেখিয়ে দেয় লেখা আছে, মেড ইন্ দি গ্রেট বৃটেন কোং। বলে, বললাম, বিলিতি জিনিষ।

—তাহলে দাও বাবা, এক কৌটো নিয়ে যাই।

টাকা দিয়ে বৃদ্ধা পাউডার নিয়ে চলে যায়। লক্ষ্মণ জিজ্ঞেস করে, সত্যি বিলিতি মাল নাকি রে শ্যামল?

লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্যামলের ভাব কালীর আড্ডায়। এ পাড়ায় বাড়ী, তাই সময় পেলেই দোকানে এসে বসে। শ্যামলও খুশী হত দোকানে একজন সঙ্গী পেয়ে।

—দূর গাধা, লেখা আছে দি গ্রেট বৃটেন কোম্পানী। লোকে ভাবে বিলিতি মাল।

—যাদের মাল তাদের কত দিবি?

—কৌটো-পিছু আট আনা।

—বলিস কি রে, এত লাভ?

শ্যামল হাসে। উত্তর না দিয়ে চেঁচাতে শুরু করে, এই যে ফাউন্টেনপেনের দিশী কালী, মুখে মাখার বিলিতি পাউডার, ছবির বই, বাচ্চাদের লজেন্স—

এক খদ্দরপরা ভদ্রলোক আসেন, দেখলেই মনে হয় সেই ধরণের লোক যাঁরা ভুলেও বিলিতি জিনিষ ব্যবহার করেন না। জিজ্ঞেস করলেন, ফাউন্টেনপেনের কি কালী ভাই!

শ্যামল কালীর শিশি এগিয়ে দেয়, এই যে দাদা এক শিশি মসী—

—মসী, ভাল নাম দিয়েছে। দেখতেও বেশ—

—শুধু দেখতে নয়, কালিও খুব ভাল। যে কোন বিলিতি কালির সমান। এই দেখুন—বলে শ্যামল পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন বার করে দেয়, আমি তো ছ'বছর থেকে শুধু এই কালি ব্যবহার করছি।

ভদ্রলোক কাগজে দু'-একবার নাম সই করলেন, ভালই মনে হচ্ছে, কত দাম?

—আট আনা।

ভদ্রলোক পয়সা দিয়ে চলে গেলেন। শ্যামল আট আনাটা বাজিয়ে নিয়ে বলে চার আনা। শালা কলমে ভরলেই নিবের বারটা বেজে যাবে।

—কেন, তোর কলম তো বেশ চলছে।

শ্যামল হাসে, তুইও যেমন, ওতে তো বিলিতি কালি ভরা আছে।

মদনের সঙ্গে একদিন এখানেই দেখা। বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে প্রতিমা দেখতে এসেছে। শ্যামল পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞেস করে, আমাদের পোষ্টঅফিস কেমন চলছে রে, মনুদা'র চিঠি পেতে অসুবিধা হয় না তো?

—মদন উত্তর দেয়, মনুদা' খুব খুশী। দিনে দুটো করে চিঠি ছাড়ে।

—সত্যি নাকি। দোকানদারটা তো মাইরী লাল হয়ে গেল।

—তা আর বলছে, মাসে প্রায় তিরিশ টাকা।

—শেষ পর্যন্ত হবে কি বলতো?

—হয় বিয়ে না হয় আত্মহত্যা। নন্দিতা না করলেও মনুদা' তো নির্ঘাত। একটু থেমে মদন জিজ্ঞেস করে, এ দোকানটা কার?

—কেষ্টদা'র, তবে আমারও বলতে পারিস।

—আসব আর একদিন।

মদন বাড়ীর লোকদের সঙ্গে চলে যায়।

সেদিন অষ্টমী পুজো। শ্যামল সকালে এসেই, ধূপ ধুনো জেলে দোকানঘর সুবাসিত করে রেখেছে। ভীড় আজ অসম্ভব রকম বেশী। সব সময় দোকানে চার-পাঁচজন খদ্দের। এক ভদ্রলোককে মসী কালির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করছিল এমন সময় মেয়েদের দিক থেকে একজন মিহি গলায় জিজ্ঞেস করে—এ বইটার দাম কত?

শ্যামল বইটার দিকে তাকিয়েই জবাব দেয়, শারদীয়া সংখ্যা, অনেক ছবি আছে। দাম মাত্র দু' টাকা—আর এ বইটা?

যে ভদ্রলোক কালি কিনছিলেন তাকে অপেক্ষা করতে বলে শ্যামল মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায়। ভাল করে তাকিয়ে দেখে সে নন্দিতা। শ্যামল হেসে জিজ্ঞেস করে, একলা নাকি?

—না মা'রা এসেছেন। ঐ দোকানে আচার কিনছেন।

—যত ভীড় ঐ দোকানে, এ দিকে কেউ আসেই না।

কথার ধরণে নন্দিতা হেসে ফেলে, দোকানে তো কিছুই নেই, কি কিনতে আসবে শুনি?

বাঃ, এই তো কত জিনিষ রয়েছে।

নন্দিতা একটা বই তুলে নিয়ে বলে, এইটে নিচ্ছি। ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে দেয়। বাকী পয়সা ফেরৎ দেবার সময় শ্যামল নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে, চিঠি ঠিকমত পাচ্ছেন?

—পাই। বলেই নন্দিতা ব্যস্তভাবে সামনের দিকে তাকায়, ঐ যে মা'রা আসছেন, আমি যাই।

শ্যামল অন্য দিকে ফিরে গিয়ে দেখে, ভদ্রলোক চলে গেছেন। সে নিয়ে ওর দুঃখ হয় না। ভাবে, কতক্ষণে রসিয়ে রসিয়ে মদনের কাছে নন্দিতার কথা বলবে।

সন্ধ্যার পর অরুণাকে নিয়ে প্রভাত এলো একজিবিশান দেখতে। সে জানত কেষ্ট, আগুদা' দোকান খুলেছে, একবার না গেলে দুঃখ করবে।

সত্যিই প্রভাতদের দেখে কেষ্টর আর আগুদা'র আনন্দের সীমা থাকে না। আগুদা' বার বার বলেন, বৌমা আমার লক্ষ্মীমন্ত। সুখী হও মা, খুব সুখী হও। আমার দোকানে কি খাবে বল?

অরুণা বাধা দিয়ে বলে, এখন আর কেন কষ্ট করবেন?

—তা হবে না। আগুদার' দোকানে প্রথম দিন এসেছো কিছু খেতেই হবে।

আগুদা' ছাড়লেন না, যত্ন করে বসিয়ে খাওয়ালেন। প্রভাত এক সময় কেষ্টকে জিজ্ঞেস করে। থিয়েটার দেখতে যাচ্ছিস কাল?

—কি করে যাবো একজিবিশান ছেড়ে?

—একবার যাস, গৌরী ভালো পার্ট করছে।

—দেখি যদি সময় পাই।

—গৌরী-চিনু আজ এখানে আসবে বলেছিলো।

—এখনও আসেনি, হয়তো রিহার্সালে গেছে, রাত করে আসবে।

আগুদা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভাতরা কেষ্টর সঙ্গে প্রদর্শনীর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। অরুণাকে অবশ্য মেয়েদের পথ ধরেই চলতে হয়।

প্রভাত জিগ্যেস করে, তোদের বিয়ের কি হ'ল?

—এসব ঝামেলা চুকলে পর দেখা যাবে।

—বেশী দিন ফেলে রাখিস না।

—না ভাবছি, দু'-এক মাসের মধ্যেই।

প্রভাত হেসে বলে, আর সামনের অঘ্রাণ মাসে দু' জনেই ঝুলে পড়ি।

—দেখি, কেষ্ট ছোট্ট উত্তর দেয়।

গৌরী, চিনু আর বিনোদ সেই সন্ধ্যাতেই দোকান দেখতে এলো বটে, তবে বেশ রাত করে।

শ্যামল গৌরীদের দেখে খুশী হয়, তবু অনুযোগ করে বলে, বাবা কত রাত করলেন?

গৌরী হাসে, কি করবো, রিহার্সাল শেষ করে আসবো তো?

—কাল কি রকম হবে?

—মনে তো হচ্ছে, ভালোই।

—আমার বোধ হয় দেখা হবে না, দোকানে একজনকে থাকতে হবে তো?

বিনোদ ঠাট্টা করে বলে, এই তো দোকানের মাল, ও ফেলে রেখে গেলেও কেউ নেবে না। যাকগে তোমার কেষ্টদা' কোথায়?

—প্রভাতদা'র সঙ্গে বেরিয়েছেন, এখুনি আসবেন।

—বলো আমরা এসেছিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরে কেষ্ট না আসায় ওরা গাড়ীতে ফিরে যায়।

পরদিন সকালে উঠে স্নান সেরে গৌরী তৈরী হয়ে রইল বিনোদের সঙ্গে বেরুবে বলে। কান্নাবাড়া হাঙ্গামা নেই। পুজোর ক'দিন কেষ্ট বা শ্যামল বাড়ী ফেরে না খেতে। রাত্রেও দেরী হয়ে গেলে শ্যামল কেষ্টর বাড়ীতে গিয়ে শোয়, এত দূরে বেহালায় আর আসে না। কথাই ছিল আজ সকালে বিনোদ গৌরীদের নিয়ে যাবে স্টেজ সাজাতে। কিন্তু চিনু যে সকালে যেতে পারবে না, গৌরী আগে থেকেই জানত। কারণ পিনাকীর জন্যে রান্না করে রাখতে হবে তাকে।

বিনোদের গাড়ী আসতেই দরজা বন্ধ করে গৌরী গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে। বিনোদ একমুখ হেসে অভ্যর্থনা করে, বাঃ, একেবারে তৈরী যে!

—আমি কি কোন দিন দেরী করি?

—চিনু কোথায়?

—ঘরে পিনাকী আছে তাই আর ডাকিনি। এখন কোথায় যাবে?

—বাড়ীতে।

গাড়ী চলতে চলতে গৌরী জিজ্ঞেস করে, চিনু যদি আসত তাহলে কি করতে?

—তা হলে স্টেজে যেতে হত, সারা সকালটা নষ্ট।

—পার্ক সার্কাসের বাড়ীতে পৌছে বিনোদ গৌরীকে নিয়ে বারান্দায় বসে।

—গৌরী, তুমি এই থিয়েটারে পার্ট করতে না এলে তো আলাপ হত না।

—সত্যি!

—কি আশ্চর্য্য বল তো। কোথায় ছিলে তুমি আর কোথায় ছিলাম আমি। কার সঙ্গে যে কি ভাবে আলাপ হয়, তা আগে থেকে কে বলতে পারে?

গৌরী ঠিক এই কথাই নিজের মনে অনেক বার ভেবেছে। মনে মনে চিনুকে ধন্যবাদও দিয়েছে এই রিহার্সালে নিয়ে আসার জন্যে।

—আপনারা আর কষ্ট করবেন কেন, আমি ছেড়ে দিয়ে আসব।

গৌরীকে নিয়ে একলা বেরুবার সুযোগ পাবে বিনোদ আশা করেনি, তাই চিন্ময় চলে যেতে ছুটে এল গৌরীর কাছে। গৌরী সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বসে ছিল। বিনোদ বললে, চল গৌরী, চিন্ময়রা চলে গেছে।

—চল।

মাকে যা বলবার বলে দিয়ে বিনোদ গৌরীকে নিয়ে গাড়ীতে বসে প্রথম কথাই বললে, তোমার পার্ট আজ খুব সুন্দর হয়েছে গৌরী।

—সত্যি?

—বাইরের সবাই তাই বলছে, এমন কি বেলারাণীও।

গৌরী আশ্চর্য হয়ে বলে, বেলারাণী?

—হ্যাঁ, ও তো কাল আমায় যেতে বলেছে। তোমার ছবিতে পার্ট দেওয়া নিয়ে কথা হবে।

গৌরী কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যায়, তুমি আমার জন্যে কত করছ!

—কিছুই না। তোমার মধ্যে যে গুণ আছে তাই ফুটিয়ে দিচ্ছি।

—কেষ্টদা'রা আসেনি?

—না বোধ হয়। তাহলে প্রভাত বলতো, ও তোমাকে বড় হতে দিতে চায় না, একটা ঘরে বন্ধ করে রাখতে চায়।

—আজ-কাল সত্যিই তাই মনে হচ্ছে।

—মনে হয় নয়, নিশ্চয়। পুজোর প্যাণ্ডেলে বসে রইল তবু তোমার থিয়েটার দেখতে আসতে চাইল না। এই তার ভালবাসা!

গৌরী হঠাৎ বলে, কেষ্টদা' আমায় ভালোবাসে না, ভালোবাসা কি, ও তা বোঝেই না—

বিনোদ অন্ধকারে গাড়ী রেখে গৌরীর কাছে সরে এসে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, তুমি ভুল বুঝতে পেরেছো দেখে খুসী হলাম।

—তুমিই তো আমায় বুঝিয়ে দিয়েছো।

—আমি যে তোমায় ভালবাসি।

—জানি।

বিনোদ যখন গৌরীকে বেহালার বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিলে তখন বারোটা বেজে গেছে। বিনোদ নীচু গলায় বলে, কাল আমি বিকেলের দিকে আসব।

—চারটের সময়।

—চারটে-সাড়ে চারটে, সকালে যাবো বেলারাণীর কাছে।

বিনোদ চলে গেলে গৌরী দরজার চাবি খুলে ঘরের মধ্যে ঢোকে। রামদা আজও আসেনি। মনে মনে গৌরী খুশীই হয়, একলা ভবে

থেকে তার ব্যবহারে সে পীড়িত হয়েছে। এর পরিণাম তার অজানা নেই, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।

গৌরীদের ঘর খোলার শব্দে চিনু বেরিয়ে এসে দেখে, কেষ্ট ঘরে ঢুকছে। চিনুকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করলে, কি চিনু, তোমার বন্ধুটি বেরিয়ে গেছে না কি?

—হাঁ।

—কোথায় গেছে?

—সিনেমা দেখতে।

—তুমি গেলে না?

—না।

চিনু সিনেমার কথা উল্লেখ করে না। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, চা খাবেন?

কেষ্ট হেসে বলে, পেলে খুব ভাল হয়, সকাল থেকে বড় খাটুনি গেছে—

—আমি এখনি নিয়ে আসছি।

কেষ্ট জুতো খুলে বিছানায় পা এলিয়ে দেয়, শুয়ে শুয়ে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে পড়ে।

চিনু চা নিয়ে এসে দেখে, কেষ্ট চোখ বুজে শুয়ে আছে। বলে, চা এনেছি।

কেষ্ট উঠে বসে হাত বাড়িয়ে চা নেয়, তুমি খাবে না?

—খেয়েছি।

—বস।

বিছানার আর এক প্রান্তে চিনু বসে। কেষ্ট চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, আঃ, চমৎকার চা করেছ।

—ঘরে আর কিছু নেই, দিতে পারলাম না।

—কিছু দরকার নেই, এ শুধু চা-ই ভাল। একটু পরে নিজে থেকেই বলে, ক'দিনই গৌরীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। সময় মত আসতেই পারি না, রোজ হয় ও আমার উপর খুব চটে গেছে। যা হোক, কালকের মধ্যেই সব গোলমাল মিটে যাবে, আজ বেশ নিশ্চিন্ত।

—গৌরীকে কিছু বলব?

—হাঁ, মানে আমার চিঠি এসেছে।

—তাই নাকি, কি রকম আছে সে?

চিনু যে তাদের সম্বন্ধে এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করবে কেষ্ট তা ভাবে নি। জিজ্ঞেস করে, তুমি তাদের কথা জান?

চিনু হাসে, সব জানি। বলুন ও কেমন আছে?

কেষ্ট খাম থেকে চিঠি বার করে বলে, তোমায় পড়ে শোনাই। 'শ্রীচরণেষু দাদা, বিয়ের সময় হইতে তোমার সহিত আর দেখা হয় নাই। তোমার জন্য ভাবি মন কেমন করে। তুমি কেমন আছ জানাইও। আমরা এখানে খুব ভালো আছি। সংসার লইয়া ব্যস্ত আছি। ছেলেরা দু'জন আমার কথা সব শোনে। আমায় খুব ভালবাসে। তোমাদের জামাই এখানকার নাম-করা লোক, সকলে খুব খাতির করে। তুমি একবার এখানে আসিলে ভাল হয়, নিশ্চয় করে আসিও। প্রণাম নিও। ইতি তোমার স্নেহের ছায়া।'

চিনু একগাল হেসে বলে, ছায়া নিশ্চয় সুখী হয়েছে।

—কি জানি, চিঠি পড়ে তো বুঝতে পারছি না।

—আমি ঠিক বুঝেছি। মেয়েরা সুখী না হলে এমন করে লিখতে পারে না।

—তা হবে।

—চিঠির উত্তর দেবেন না?

—দেবো, গৌরী আসুক।

চিনু নিজে থেকে বলে, কেন, পোষ্টকার্ড নেই বুঝি?

—শুধু তাই নয়, লিখেও দিতে হবে। আমার হাতের লেখা বড্ড খারাপ।

—আমি লিখে দেবো?

কেষ্ট চিনুর দিকে তাকায়। চিনু দাঁড়িয়ে বলে, পোষ্টকার্ড নিয়ে আসি?

—আন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চিনু দোয়াত-কলম আর পোষ্টকার্ড নিয়ে এসে বসে, বলুন, কি লিখবো।

কেষ্ট ম্লান হাসে, আমাকে আগে কখনও চিঠি দিই নি।

চিনু চিঠির ওপরে লেখে, শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

কেষ্ট বলে যায়, 'তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। তুমি সুখী হলেই আমি খুশী হব। পুজোর ক'দিন বড় ঝামেলায় আছি। যদি পারি কিছু দিন বাদে তোমার বাড়ী যাবো। তোমরা আমার ভালবাসা নিও।'

চিনু জিজ্ঞেস করে, আর কিছু লিখবেন না?

—আর কি লিখবো ?

—আপনি গেলে শ্যামা বড় আনন্দ পাবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থেকেও গৌরী যখন ফিরল না কেষ্ট উঠে পড়ে, আমি এখন চলি। ও-দিকে অনেক কাজ বাকী, বিসর্জ্জনের ব্যাপার—

—তা জানিনে। আমারাও যাব ভাসান দেখতে, সাতটার পর।

কেষ্ট বেহালা থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলো পুজার মণ্ডপে। রাত্রি আটটার সময় প্রতিমা বেরোবে। এখনও দলে দলে লোক আসছে ঠাকুর দেখতে। গেটের মুখে বিশুর সঙ্গে দেখা।

—মাইরি কেষ্টদা', আর এক দিন প্রতিমা রেখে দাও। কি ভিড় দেখছো !

—তা কি হয় ?

—না হয়, এক কাজ করো। প্রতিমা যাক, এক্জিবিশানটা রেখে দাও।

কেষ্ট হাসে, তাহলে কি আর ভিড় হবে ভেবেছিস, সব ফাঁকা হয়ে যাবে।

—কখ্খোনো নয়, খুব লোক আসবে। প্রতিমা দেখবার চেয়ে ঠাকুর দেখতে বেশী লোক আসে—

—তার মানে ?

—তা-ও বুঝতে পারছ না ? বিশু হো-হো করে হাসে। পাশ দিয়ে ল্যাংচা যাচ্ছিল, বিশু তাকে ডেকে বলে, শুনেছিস, কেষ্টদা' ঠাকুর আর প্রতিমার তফাৎ বুঝতে পারছে না।

ল্যাংচা উত্তর দেয়, কি করে বুঝবে ? তোমার কথা কি সহজে বোঝা যায় ? জানো কেষ্টদা', বিশুর মতে প্রতিমা হ'ল মাটির তৈরী আর ঠাকুর হল জ্যান্ত, যারা ঘুরে বেড়ায়।

কেষ্ট হাসে, বিশু ভালো বলেছে, লোকে ঠাকুর দেখতেই আসে।

কেষ্ট মণ্ডপের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে, মদন আরও দুজনকে নিয়ে বসে আছে। উঠে এসে বললে, কেষ্টদা', আপনার জন্যেই বসে আছি।

—কি ব্যাপার মদন, তোমাকে অনেক দিন দেখিনি।

—বাবার শরীরটা ভাল নেই।

—কি হ'ল ?

—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আজও আসতে পারতাম না, এলাম এঁদের জন্যে। এই আমার বন্ধু চুনীলাল আর ইনি শ্যামলের বাবা, শশধর বাবু।

শশধর বাবু কেষ্টর কাছে এগিয়ে আসেন, শ্যামলের বিষয় দু'-একটা কথা বলার আছে।

—বলুন।

—ও এখন আপনার কাছে থাকে তো ?

—হ্যাঁ।

—ওর মামার বাড়ীতে কি ব্যাপার নিয়ে গোলমাল হয়েছে, জানেন বোধ হয় ?

—শ্যামলই যা বলেছে।

—কি বলেছে জানি না। তবে তার পর থেকে আমার সঙ্গেও আর দেখা করেনি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কেষ্ট বিস্মিত হয়, সে কি, আমি তো জানি আপনার সঙ্গে ওর কথাবার্ত্তা হয়।

—সামনে নয়, চিঠিতে।

শশধর বাবু সব কথা খুলে বলেন। কেন শ্যামলের মামার বাড়ীতে ঝগড়া হয়, কোন্ দলে শ্যামল মিশছে এবং তাঁর সঙ্গে দেখাও করে না, চিঠিরও উত্তর দেয় না পর্য্যন্ত।

কেষ্ট চুপ করে থেকে বলে, বিশ্বাস করুন, এর কিছুই আমি জানি না। আমি এখুনি এর ব্যবস্থা করছি।

কেষ্ট ভোতনকে পাঠিয়ে দেয় শ্যামলকে দোকান থেকে ধরে আনার জন্যে। কিন্তু ভোতন ফিরে এসে জানাল, শ্যামল একটু আগে দোকান বন্ধ করে চলে গেছে, পাশের দোকানদার তাই বললে।

কেষ্ট শশধর বাবুকে ভরসা দিয়ে বলে, আজই কি কাল সকালে আমার সঙ্গে শ্যামলের নিশ্চয় দেখা হবে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো।

কেষ্টর মাথা গরম হয়ে ওঠে। শ্যামল যে তাকে না জানিয়ে কিছু করতে পারে, তা তার জানা ছিল না। তার উপর বার বার মিথ্যে কথা বলেছে। সেও তো ভয়ানক কথা, এর বিহিত তাকে করতেই হবে। কাছে পেলে এখনই শ্যামলের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতো, না পেয়ে মনে মনেই গজরাতে থাকে। অবাধ্য ছেলেদের শায়েস্তা করতে সে জানে। আজ বিসর্জ্জনের হাঙ্গামায় বোধ হয় সম্ভব হবে না, তবে পরদিন সকালেই শ্যামলের সঙ্গে বোঝাপড়া সে করবে বলে ঠিক করে।

চিনুর সংগে কথা-কাটাকাটি করে মেজাজ দেখিয়ে গৌরী বিনোদের গাড়ীতে এসে উঠলো বটে, কিন্তু মনের মধ্যে দুর্ভাবনার অন্ত রইল না। এত দিন বিনোদের সঙ্গে বার হওয়া নিয়ে কেষ্ট কোন কথাই বলেনি। আজ যদি চিনু তার নামে নতুন করে লাগায় হয়ত কেষ্ট তার ওপর রাগ করতে পারে। গাড়ী চলতে সুরু করলে বিনোদ জিজ্ঞেস করে, কি এত ভাবছ গম্ভীর হয়ে ?

—কিছু না।

—তবু ?

—চিনুটা যেন কি রকম !

—কি হল ?

—আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, কেষ্টদা'কে বলে দেবে বলে।

বিনোদ হাসে, ও, এই ! আমি ভাবলাম হাতী-ঘোড়া আর কিছু। তা ওর তো হিংসে হবেই। যাক্‌গে ও সব বাজে কথা, বেলারাণীর কাছে গিয়েছিলাম।

—কি বললেন ?

—তোমায় ষ্টুডিওতে নিয়ে যেতে।

—কবে ?

—সামনের সপ্তাহে যে কোন দিন।

—সত্যি ?

—বিশ্বাস হচ্ছে না ?

—আমি পারব না।

—কি, ষ্টুডিওতে যেতে ?

গৌরী ব্যস্ত হয়ে বলে, না, বলছি সিনেমায় পার্ট করতে।

—প্রথমে ঐ রকম মনে হয়, নামলে দেখবে কিছুই নয়। বেলারাণীও ঠিক এই রকম বলত।

গৌরী জিজ্ঞেস করে, কি করে জানলে?

বিনোদ হাসে, এ তো জানা কথা। তুমি কবে যাবে বল?

—যেদিন বলবে।

বিনোদ ভুরু কুঁচকে বলে, কেষ্টদা'র অনুমতি নিতে হবে তো?

—সে আমি আদায় করে নেব।

একটা ছোট রেস্তোরাঁয় চা পান করে তারা এল গঙ্গার ধারে। বিকেল থেকেই ঠাকুর বিসর্জ্জন শুরু হয়েছে। একের পর এক লরীতে প্রতিমা নিয়ে আসছে। সন্ধ্যে হতেই কত রকম আলো দিয়ে সাজিয়ে সামনে নাচতে নাচতে ছেলেরা চলেছে। চার দিকে ঢাকের, ব্যাণ্ডের বাজনার শব্দ। বিনোদ আর গৌরী গাড়ীর মধ্যে বসে বসে অনেকক্ষণ দেখে। অন্ধকার বেশী হয়ে এলে গৌরী বলে, চল, ফেরা যাক।

—এত শীগ্‌গিরী?

—আজ বিসর্জ্জন, কেষ্টদা'রা হয়ত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে।

—চল।

বেহালার বাড়ীর কাছে এসে গৌরীরা দেখে সব অন্ধকার। কোন ঘরেই আলো জ্বলছে না।

বিনোদ বলে, কেউ নেই, সবাই বেরিয়েছে। তুমিই সাত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে।

গৌরী মৃদু স্বরে বলে, এখন তাই মনে হচ্ছে।

—একলা ভয় করবে না?

—আমি কি খুকী নাকি?

বিনোদ গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কিন্তু বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—

—একটু দাঁড়াও, আমি জল নিয়ে আসছি।

—ভয় না পেলে আমিও সঙ্গে যেতে পারি।

—ভয় কিসের? এস।

বিনোদ গৌরীর সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে ওঠে। গৌরী চাবি বার করে দরজা খোলে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে ডাকে, এস, যদিও তোমার বসবার মত ঘর এ নয়।

—কে বললে? বিনোদ মাটিতে পাতা বিছানার উপর বসে পড়ে।

গৌরী জল আর মিষ্টি নিয়ে আসে, নারকোল নাড়ু, খাও। আমি করেছি।

বিনোদ খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে?

—আমি দেখে আসছি।

গৌরী সন্তর্পণে বেরিয়ে যায়। ফিরে এসে বলে, ভয় নেই। চট্‌ করে কেউ আসবে না। চিনুদের ঘরেও তালা বন্ধ, ভাসান দেখতে গেছে নিশ্চয়।

—তাহলে দরজাটা ভেজিয়ে দাও।

গৌরী কথামত দরজা বন্ধ করে দেয়। বিনোদ ডাকে, আমার কাছে বোসো।

গৌরী বিনোদের কাছে গিয়ে বসে। বিনোদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এই দিনটি আমার প্রিয়; কত জনের কথা মনে হয়, যাদের প্রণাম করতাম একে একে তারা সব চলে গেল!

—আমার ত কেউ নেই। গত বছরও ভাইটা ছিল; বলতে গিয়ে গৌরীর চোখে জল ভরে আসে।

বিনোদ গৌরীর একটা হাত টেনে নিয়ে বলে, ছিঃ গৌরী, কেঁদ না। লক্ষীটি, বিনোদের কাছে সহানুভূতি পেয়ে গৌরীর কান্নার উচ্ছ্বাস বেড়ে যায়। খুব সাবধানে বিনোদ গৌরীকে তার দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে বেঁধে ফেলে।

পুজোর ক'দিনই শ্যামল ব্যস্ত ছিল দোকান নিয়ে। হৈ-হৈ করে দিন কেটেছে, লক্ষ্মণ প্রায় সব সময় তার সঙ্গে থাকতো। বিক্রী করার সময় সাহায্য করত। অবসর সময়ে দুজনে বসে গল্প করত। লক্ষ্মণের দোষের মধ্যে মেয়েদের দিকে বড় হ্যাংলার মত তাকায়! শ্যামল কত বার বলেছে, ওরকম করে তাকাস না। কি ভাববে—

লক্ষ্মণ তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দেয়, কি আবার ভাববে, সেজেগুজে এসেছেই তো দেখাতে—

তবু শ্যামল আর কিছু বলত না যদি না লক্ষ্মণ সপ্তমীর দিন বিক্রী করার সময় একটা মেয়েকে চারটে চুড়ি বেশী দিয়ে দিত। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, ও কি, চারটে বেশী দিলি কেন?

লক্ষ্মণ পানখাওয়া দাঁত বার করে বলে, কি বড় বড় চোখ, মাইরি।

শ্যামল থাকতে না পেরে হেসে ফেলেছিল।

বিসর্জ্জনের দিন লক্ষ্মণ বললে, আজ কিন্তু আর সন্ধ্যের পর আসবো না।

—কেন?

—বাঃ, আজ বিজয়া। বাড়ীতে সকলকে প্রণাম করতে হবে যে, নইলে আর রক্ষে থাকবে না।

শ্যামলের মুখ শুকিয়ে যায়, আজকের এ দিনটাতেও সে বাড়ী ফিরতে পারবে না। মামা, পিসীমা, বাবা, সবাই এসে জড়ো হবেন মাঝখানের উঠোনে। গৃহদেবতাকে প্রণাম করে একের পর এক

গৌরী শ্যামলকে দেখিয়ে বলে, একে নিয়ে কি করবো ?

—তাই তো, ভাবনার কথা। ওকে নিয়ে এক ঘরে থাকা ঠিক হবে না।

—কি করি ?

—আমি ওকে বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

বিনোদ শ্যামলকে পাঁজাকোলা করে তুলে বারান্দায় বিছানা করে শুইয়ে দেয়।

যাবার সময় গৌরী বিনোদকে গড় হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। বিনোদ গৌরীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, মৃদুস্বরে বলে, যদি কোন গোলমাল হয় সোজা আমার কাছে চলে এসো।

বিনোদ চলে গেলে গৌরী দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে।

কেষ্ট ভোরবেলা উঠে চলল বেতালার দিকে। কাল রাত্রেই সে আসতো গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে, যদি না প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে বাড়ী ফিরতেই রাত এগারোটা বেজে যেত। তা ছাড়া মনে মনে একথাও ভেবেছিল শ্যামল যেমন পুজোর ক'দিন বেতালায় না গিয়ে তার বাড়ীতে তেমনি বিজয়ার দিনও হয়তো আসবে। কিন্তু বাড়ী ফিরে শ্যামলকে না দেখে স্থির করেছিল পর দিন ভোরবেলাই গৌরীর কাছে যাবে।

কেষ্ট যখন বেতালায় এসে পৌঁছাল তখনও বেলা বাড়ে নি। গৌরীর ঘরের সামনে শ্যামলকে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। শ্যামল স্থির হয়ে ঘুমিয়ে আছে, তাকে না ডেকে কেষ্ট দরজায় আঘাত দেয়। গৌরী একটু দরজা ফাঁক করে দেখে নিয়ে বলে, ও: তুমি! কেষ্ট লক্ষ্য করে গৌরীর চোখে-মুখে কেমন যেন আতঙ্কের ভাব। জিগ্যেস করে কি হয়েছে গৌরী ?

গৌরী বলে, আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম।

—কেন ?

—শ্যামল কাল—

—কি হয়েছে, বল ?

—কি রকম নেশা করে এসেছিল, ঘরের মধ্যে ঢুকে মাতলামি—

—একলা ?

—সঙ্গে একটা লোক ছিল।

কেষ্টর আর কথা শোনার ধৈর্য্য থাকে না, মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠে, বারান্দায় বেরিয়ে এসে শ্যামলের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকি দেয়। শ্যামল ধড়-মড় করে উঠে বসে, অপ্রস্তুত মুখে বলে, কেষ্টদা'! এ অনেক বেলা হয়ে গেছে বুঝি ? কেষ্টর পায়ে হাত দিয়ে বলে, আপনাকে বিজয়ার প্রণাম করা হয় নি।

কেষ্ট সে কথার উত্তর না দিয়ে কর্কশ গলায় বলে, ঘরের ভিতরে এসো।

শ্যামল কেষ্টর কঠিন স্বরে অবাক হয়ে যায়, ভয়ে ভয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে।

আমার বাড়ী চলে এসো।

বিনোদ গৌরীকে আসতে দেখে প্রথমেই জিগ্যেস করে, কিছু হয়নি তো।

—কেষ্টদা' আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তাই নাকি? ভালো কথা।

—সেকথা পরে হবে। এখন চল—

—কোথায়?

—বেলাবাঈর কাছে। ওদিকে যদি ঠিক হয়ে যায় আমি বেহালা ছেড়ে চলে আসবো।

—সত্যি? কেষ্টদাকে?

—আর আমি পারছি না, সত্যি পারছি না।

বিনোদ গৌরীকে নিয়ে যখন বেলাবাঈর বাড়িতে এল বেলাবাঈ তখন সবে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে বসেছে। বিনোদ এসেছে শুনে উপরে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো।

বিনোদ জিগ্যেস করে, ব্যাপার কি এত বেলায় ঘুম থেকে উঠলে যে?

বেলাবাঈ হেসে বলে, কাল এক বিশ্রী পার্টি ছিল, রাত ভোর খাটুনি গেছে। তোমরা বস।

বিনোদ আর গৌরী বড় সোফায় পাশাপাশি বসে।

—কি খাবেন বলুন?

গৌরী মৃদু স্বরে বলে, খেয়ে এসেছি।

—না খেয়ে আসেননি তা জানি, চা আনতে বলি কি বলুন? বেয়ারাকে দু কাপ চা আনতে বলে।

বেলাবাঈ নিজ থেকেই বলে, আপনার পার্ট সেদিন দেখলাম বেশ হয়েছিলো। কথাগুলো আর একটু স্পষ্ট করতে ভালো হয়।

—আগে তো কখনও করিনি।

—তাই শুনলাম বিনোদ বলছিলো।

বিনোদ খাবার খেতে খেতে জিগ্যেস করে, গৌরীকে করে স্টুডিওতে নিয়ে যাবো?

—সামনের সপ্তাহে দু'দিনই আমার শুটিং আছে, সোমবারই নিয়ে এসো। সেখানে আর কি আছে। উনিও ওর মুখ ভালোই হবে।

—সেই তো ভালো গৌরী, সোমবার তোমায় আমি নিয়ে যাবো।

গৌরী নীরবে সম্মতি জানায়।

বেলাবাঈ জিগ্যেস করে, কি ধরনের পার্ট আপনার ভাল লাগে?

—অত আমি বুঝি না যা পারবো তাই দেবেন।

—প্রভাত বাবুর সঙ্গে কথা বলে আপনার পার্ট ঠিক করবো।

বিনোদ জিগ্যেস করে। প্রভাতের খবর কি, অনেক দিন দেখিনি।

—বিয়ের জোড়জোর করছে আর কি। আজ একবার আমার কাছে যাবে বলেছিলাম। আজ কি বার বিনোদ?

—শনিবার।

—ঠিক কথা, বিকেলের দিকে যেতে পারবো কি না কে জানে, এই বেলা সেরে আসি।

বিনোদরা উঠে পড়ে। গৌরী হাত তুলে নমস্কার করে বলে, সোমবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

গাড়ীতে উঠেই বিনোদ প্রশ্ন করে, কেষ্টদাকে কবে বলবে?

—যেদিন প্রথম সুযোগ পাবো।

—এই লাইনে থাকবে স্থির করেছো?

—করেছি।

—এখন কোথায় যাবে?

—ঘর।

—বাড়ী ফেরার তাড়া নেই?

—না।

—কেষ্টদা' জানে কোথায় এসেছ?

—না।

—ফিরলে যখন যদি জিজ্ঞেস করে?

—সাচ্চা কথাই বলব

—ভয় করবে না?

—না।

বিনোদ হেসে বলে, তবে চল আমার সঙ্গে, একেবারে সন্ধ্যের সময় বাড়ী যেও।

[ক্রমশঃ।

ভোরের বেলার পাখী

অনুরাধা দেবী

আমি ওরে, ভোরের বেলার পাখী!
ঘুম-ভাঙা-সুর কণ্ঠে লয়ে দখিন্ বায়ে থাকি।
সেই সুরেতে ফুল হ'য়ে ওই ফুটলো কুঁড়ির দল;
পূব-আকাশে রং-এর খেলা ঝিক্ করে চঞ্চল।
ঘাসের বুকে শিশির-ফোঁটার মুক্তা মাণিক জ্বলে,
ঢেউ দিয়ে ধান-শিসগুলি যে সোনার সাজে চলে।
সুখ দুখের যার যা' আছে বুকের তলায় রাখি,
দুলাই যেন এমনি ভাবেই মধুর কণ্ঠে ডাকি।
আমি ওরে, ভোরের বেলার পাখী।

দীপান্বিতা

মণি সিংহ

সহরটা যেন বাংলা দেশের বাইরে। রুক্ষ লাল মাটি। লাল কাঁকরের রাস্তা। রাস্তার দু'পাশের শাল, দেওদার, মেহগিনি গাছগুলির পাতাও ধূলায় লাল। ফাগুন মাস থেকে দুরন্ত পশ্চিমা হাওয়ায় লু চলে। তখন বাড়ীগুলি সব দুপুর বেলা জানালা দরজা বন্ধ করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকে। বিকেলের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়। নিদ্রিত সহর জেগে ওঠে। দলে দলে বেড়াতে বেরোয় তরুণ-তরুণীর দল। টেনিসকোর্টগুলিতে লাল শালুর বর্ডার দেওয়া কালো জাল খাটানো হয়। নীল পর্দা ঝোলে কোর্টের দুই প্রান্তে। বেতের চেয়ার বেতের টেবিল সাজানো হয় গাছের ছায়ায়। একে একে নীল ব্লেজার গায়ে ফ্লানেলের পাতলুন পরে খেলোয়াড়রা এসে জমতে থাকে টেনিস র‍্যাকেট হাতে, সাদা কেডস পায়ে।

ব্যারিষ্টার তরফদার সাহেবের বাংলোতেই খেলাটা জমে বেশী। কয়েকজন তরুণ অফিসার নিয়মিত হাজিরা দেয় তরফদারের টেনিস কোর্টে। ভালো খেলোয়াড় বলে ওদের ডাক পড়ে সব বাড়ীতেই। কালেক্টর বোস সাহেবের বাড়ী, পুলিস সাহেব মিঃ অ্যাডামসের বাড়ী,

সিভিল সার্জ্জন ক্যাপ্টেন চৌধুরীর বাড়ী, মিশনারী মিঃ জ্যাকসনের বাংলা, সব বাড়ীতেই ডাক পড়ে ওদের। বিশেষতঃ সত্যকামের। কিন্তু তরফদার সাহেবের টেনিস কোর্টেই বেশীর ভাগ সময় দেখা যায় ওদের। লোকে বলে তরফদার সাহেবের রূপসী তরুণী ভার্য্যা আলেয়া তরফদারের আকর্ষণেই ছোকরার দল ওখানে গিয়ে ভীড় করে। খেলার পর তরফদার সাহেবের ড্রইং রুমে বসে চা খেতে খেতে আলেয়া তরফদারের কীর্ত্তন শোনা। তারপর তরফদার দম্পতীর সঙ্গে ব্রিজ খেলে রাত দশটা-এগারটার সময় বাড়ী ফেরা। ক্রমে এই দাঁড়িয়েছে সত্যকামের দৈনন্দিন সান্ধ্য কর্ম্মসূচী।

চন্দ্রা রাহার আসরে হাজিরা দেয় সত্যকাম ছুটির দিন সকাল বেলা। রূপসী বলে খ্যাতি আছে চন্দ্রার এ সহরে। সেই খ্যাতিটাকে ধরে রাখবার জন্য পরিশ্রম এবং চেষ্টার অন্ত নেই চন্দ্রার। গোবেচারী স্বামী নির্ম্মল স্ত্রীর প্রসাধনের উপকরণ যোগাতে যোগাতে হয়রান। স্ত্রীর রূপের খ্যাতিতে ওরও বেশ গর্ব্ব। তাই তরুণ স্তাবকের দল যখন চন্দ্রাকে ঘিরে মৌমাছির মত গুন্‌-গুন্‌ করে, তখন আসরের এক কোণে বসে মিটিমিটি হাসে নির্ম্মল। আসরের জন্য চায়ের ব্যবস্থা, বাজার থেকে খাবার আনার ব্যবস্থা, তরুণ গায়কদের জন্য হারমনিয়ম, বাঁয়া তবলা এগিয়ে দেওয়া, কখনও বা কোন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডেকে আনা—এসবই নির্ম্মলকে করতে হয়।

আজকাল সত্যকামের আসা-যাওয়াটা একটু অনিয়মিত হয়ে উঠেছে এই আসরে। ছুটির দিনও নাকি সে তরফদার সাহেবের বাড়ীতেই সকালটাও কাটিয়ে দেয়।

কোন দিন হঠাৎ চন্দ্রার আসরে এসে হাজির হলে, হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা করে বন্ধুগণ সত্যকামকে। চন্দ্রার চোখের কোণে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। বাঁকা হাসি হেসে বলে চন্দ্রা, এই যে মিঃ রায়, পথ ভুলে নাকি?

ঝক্‌ঝকে হাসি হেসে বলে সত্যকাম, পথ আর ভুলতে পারিলাম কৈ, মিসেস্ রাহা। পথের মানুষ পথই যে সর্ব্বদা টানে আমাকে। যদি পথ-ভোলা পথিক হতে পারতাম—

বিনয় গেয়ে ওঠে,

এই পথে নিতি কর গতাগতি
নূপুরের ধ্বনি শুনিগো,
করি রাধারে নৈরাশ—

চন্দ্রার মুখ চোখ লাল হয়ে যায়। কি হচ্ছে বিনয় বাবু, বলে থামিয়ে দেয় চন্দ্রা বিনয়কে।

কিন্তু হাসির লহর ওঠে আসরে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় চন্দ্রা সত্যকামের মুখের দিকে। কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই সে মুখে। সেও হাসছে সকলের সঙ্গে যোগ দিয়ে।

মুখ কালো হয়ে যায় চন্দ্রার। পরাজয় হয়েছে তার। তার রূপের আকর্ষণের জোয়ারে মন্দা পড়েছে নাকি। লুকিয়ে সামনের দেওয়ালের বড় আয়নাখানার দিকে তাকায় চন্দ্রা। ঐ তো ঢল-ঢল মুখখানি জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে আছে তারই দিকে আয়নার ভেতর থেকে। চিবুকের পাশের তিলটিকে নকল বলে ধরা যায় না। নিপুণ হস্তের স্পর্শে গালের এবং ঠোঁটের রক্তিমাভা অস্বাভাবিক বলে কেউ ধরতে পারবে না। তবে? তবে কেন সত্যকামের মন হঠাৎ এমন নিস্পৃহ হয়ে উঠলো তার ওপর?

হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে যায় চন্দ্রা। স্তাবকের দল বসে থাকে অপেক্ষা করে। দেরী দেখে নির্মল যায় দেখতে দেরী করছে কেন চন্দ্রা। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে খবর দেয় মিসেস্ রাহার ভয়ানক মাথা ধরেছে। বিছানায় শুয়ে ছট-ফট করছে।

খবরটা দিয়েই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নির্মল। ডাক্তারকে খবর দিতে। চাকর পাঠালে দেরী হতে পারে। তাই নিজেই ছুটে যায় ডাক্তার ডাকতে।

আসর ভঙ্গ হয়ে যায়। সকলেই চলে যায়। দোতলার জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখে চন্দ্রা, সত্যকামের টু'সিটারটা ছুটে চলেছে। তরফদার সাহেবের বাংলোর রাস্তায়। তরুণী রূপসী আলেয়া তরফদারের রূপের বহ্নিশিখা টানছে পতঙ্গের ন্যায় সত্যকামকে।

কঠিন হয়ে ওঠে চন্দ্রার মুখের পেশীগুলি। ইস্পাতের ন্যায় ঝক্-মক্ করে ওঠে ওর ঈষৎ পিঙ্গল চোখ দুটি।

ড্রেসিং-আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় চন্দ্রা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আয়নার ভেতর। তার প্রসাধনের কৃত্রিমতা ধরা পড়ে ওর নিজের কাছে। চোখের নীচের কালোটা ঢাকা পড়েনি কাজল রেখায়। মুখের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পাউডার আর রুজের ভেতর দিয়ে।

হঠাৎ ক্ষেপে যায় চন্দ্রা।

স্নো, পাউডার, ক্রিম, রুজ, লিপষ্টিক—সমস্ত প্রসাধনের উপকরণ আছড়ে ফেলে মেঝের ওপর। তারপর নিজেও আছড়ে পড়ে বিছানার ওপর।

ষ্টেলা ভট্টাচার্য্য দাঁড়িয়ে আছে তাদের বাড়ীর হাতার গেটের ওপর ভর দিয়ে। শীতের সোনালী রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে তাকে ঘিরে। কানের দুল চিক্-মিক্ করছে রোদে। ফোলা ফোলা গাল দু'টি রোদের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরী ওভার কোটটা এঁটে আছে গায়ে।

ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে সত্যকামের টু'সীটারটা ষ্টেলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়ী থেকে নেমে আসে সত্যকাম। ষ্টেলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

চুপ চাপ দাঁড়িয়ে যে? সত্যকাম জিজ্ঞাসা করে হেসে; সাদা দাঁতগুলি রোদে ঝক্ মক্ করে ওঠে।

কোন জবাব না দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ষ্টেলা হাসিমুখে।

ওর জবাবের অপেক্ষা না করেই সত্যকাম বলে, চল ষ্টেলা, বেড়িয়ে আসি একটু। ছুটির দিনটা শুধু ঘুরে বেড়াতেই ইচ্ছে করছে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খোঁজে ষ্টেলা। তারপর বলে, মা'কে বলে আসি। একটু দাঁড়ান, মিঃ রায়।

লঘুপদে ছুটে যায় ষ্টেলা! একটু পরেই ফিরে আসে, ছোট্ট ক্যামেরাটি কাঁধে ঝুলিয়ে।

টু'সীটারটা লাল ধুলো উড়িয়ে ছোটে। ত্রিশূল পাহাড়ের দিকে। গাড়ীটা একটা গাছের ছায়ায় রেখে দু'জনে উঠে যায় পাহাড়ের ওপর। ক্যামেরাটা ঝুলছে এবার সত্যকামের কাঁধে। একটা পাথরের ওপর বসে হাঁপাতে থাকে ষ্টেলা। পাহাড়ে উঠবার পরিশ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে ষ্টেলার কপালে, দুই গালে। রক্তিমাভ ফোলা ফোলা দু'টি গাল। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নিটোল বুকখানি ওঠা-নামা করছে। চূর্ণ কুন্তল কাঁপছে বাতাসে। মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে আছে ষ্টেলা বহু নীচে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের পানে। একটা সরু জলের রেখা প্রান্তরের বুক চিরে বেয়ে গিয়ে একটা শালবনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ক্লিক্!

ষ্টেলা চমকে তাকায়। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে সত্যকাম ক্যামেরা হাতে।

আবার ক্লিক্!

চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা! চুরি করে আমার ফটো তোলা হচ্ছে! হেসে বলে ষ্টেলা।

সত্যকামও হাসে। বলে এই ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে চমৎকার ছবি আসবে তোমার। আরও কয়েকটা তুলি কেমন?

আমার অনুমতির অপেক্ষা তো করেন নি মিঃ রায়। সুতরাং জিজ্ঞাসাটা যে অধিকন্তু সেটা বলাই বাহুল্য। নয় কি?

ষ্টেলার হাসিটি বড় মিষ্টি। সেই হাসিটুকু ধরে ফেলে সত্যকাম ক্যামেরায়।

ফিরে আসে দু'জনে আবার লাল ধুলোর ঝড় বইয়ে। ষ্টেলাকে তাদের বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিয়ে সত্যকামের টু'সীটারটা আবার চলে ঝড়ের বেগে।

বেলা হয়েছে অনেক। কিন্তু বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে না সত্যকামের। হঠাৎ ওর গাড়ীটা গিয়ে ঢুকলো একটা বাড়ীর গেটের ভেতর। বিস্তীর্ণ বাগানের মাঝখানে ছবির মত বাংলাখানি। এখানে-ওখানে শাল, মেহগিনির কুঞ্জ। কাঠচাঁপা আর আমলকির গাছ। একদিকে কাঁকরের বুকে সরস সবুজ আভা। একখণ্ড ফুলের বাগান। টকটকে লাল গোলাপ আর মৌসুমী ফুলের সমারোহ।

মেহগিনির ছায়ায় বেতের চেয়ারে বসে আছে মিলি। কোলের ওপর একখানি খোলা বই।

সত্যকামের গাড়ী এসে থামতেই মিলি চকিতে তাকায় একবার মুখ তুলে। তার পর ধীর পদক্ষেপে চলে যায় বাড়ীর ভেতর, কোন দিকে না তাকিয়ে।

সত্যকামের হাসি মিলিয়ে যায় মুখ থেকে। একমুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে কি ভাবে সত্যকাম। তার পরই গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দেয়।

গেটের ভিতর দিয়ে গাড়ীটা বেরিয়ে যেতেই ছুটে বেরিয়ে এলো বাড়ীর ভেতর থেকে মনীশ। সত্যকামের বন্ধু। ওর টেনিস খেলার পার্টনার। শিকারের সাথী।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো মনীশ কিছুক্ষণ অপস্রিয়মান গাড়ীটার দিকে। তার পর আপন মনেই হেসে বললো, পাগল!

কে পাগল, দাদা? পেছন থেকে জিজ্ঞেস করে মিলি।

সত্যকামের কথা বলছি রে। এলোই বা কেন, আর দেখা না করেই বা চলে গেল কেন, বুঝতে পারছি না। তুই বলতে পারিস, মিলি? অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করে মনীশ।

তোমার বন্ধুর মনের খবর তুমিই বেশী জানো, দাদা।

আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তবে দেখলাম বেলা আটটার সময় ষ্টেলাকে নিয়ে কোথা গেল আর ফিরে এলো এই মাত্র। শুষ্ক কণ্ঠে বলে মিলি।

তুই কি করে জানলি? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে মনীশ।

লাল হয়ে যায় মিলির মুখ। কিন্তু পরক্ষণেই খিল্-খিল্ করে হেসে ওঠে। বলে বাবে, রাস্তা দিয়ে লোক গেলে চোখে পড়ে না? চলে যায় মিলি। মনীশ ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেলা বারোটা বাজে। জ্যাকসনের বাংলার সামনে অন্যমনস্ক ভাবে গাড়ীটা থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে সত্যকাম। এই অসময়ে মিসেস জ্যাক্সনের সঙ্গে দেখা করাটা শোভন হবে কি না চিন্তা করে।

কিন্তু সমস্যার সমাধান করে মেরী জ্যাক্সন্ নিজেই। বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে ওর দিকেই আসছে মেরী। গাড়ী থেকে নেমে পড়ে সত্যকাম।

ষ্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে দিবা স্বপ্ন দেখছিলে নাকি, রায়? হেসে বলে মেরী।

না, ভাবছিলাম এই অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করা উচিত হবে কি না। কুণ্ঠিত ভাবে বলে সত্যকাম।

Don't be silly, Roy. You know you are always very—very welcome. সত্যকামের মুখের ওপর আয়ত নীল নয়ন মেলে বলে মেরী।

I know you are very kind, Mrs. Jackson. হেসে বলে সত্যকাম।

kind? Is that the word? রহস্যভরা কণ্ঠে বলে মেরী, সত্যকামের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে।

মিঃ জ্যাক্সন কোথায়? মেরীর কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করে সত্যকাম।

ওঃ! তার কথা আর ব'লো না। ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বেরিয়ে গেছে লেপার অ্যাসাইলামে। ফিরবে সেই রাত্রে।

দুপুরের লাঞ্চ! জিজ্ঞেস করে সত্যকাম সংক্ষেপে ওর সঙ্গে যেতে যেতে।

কিছু স্যাণ্ডুইচ্ আর এক ফ্লাস্ক কফি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে! ও দিয়েই লাঞ্চ সেরে নেবে জর্জ্জ। কুষ্ঠ আশ্রম নিয়েই মেতে আছে ও। রাত্রেও অনেক দিন বাড়ী ফেরে না। ওখানেই একটা ঘর আছে ওর আলাদা। সেখানেই রাত কাটিয়ে দেয় কাজের চাপ বেশী পড়লে। নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে মেরী নিজের ভাষায়।

ড্রইংরুমে সত্যকামকে বসিয়ে দুজনে কুষ্ঠ-আশ্রম সম্বন্ধে গল্প করে। সেখানকার রুগীদের কথা বলে মেরী, ওঃ! Horrible! Horrible! কারুর নাক নেই, কারুর বা কান দুটো খসে পড়েছে, পা খসে পড়েছে কারুর, সর্ব্বাঙ্গে ঘা। বীভৎস। বলতে বলতে শিউরে ওঠে মেরী জ্যাকসন, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে মেরী, বলে, ওসব unpleasant কথা থাক। আমি বাবুর্চিখানা থেকে আসছি একটু। লাঞ্চ খেয়ে যাবে এখানে। না—না—আমি কোন আপত্তিই শুনবো না। তোমার বাড়ীতে লোক পাঠাচ্ছি।

লঘু পদে চলে যায় মেরী। ঘরটার চার দিকে তাকায় সত্যকাম। স্নিগ্ধ শান্ত একটা পরিবেশ। আসবাবের বাহুল্য নেই। একসেট সোফা কয়েকখানি গদি-আঁটা চেয়ার সুষ্ঠু ভাবে সাজানো। সেণ্টার টেবিলে একটা জয়পুরী কাজকরা পেতলের গামলায় নানা রঙের মৌসুমী ফুলের তোড়া। দেওয়ালে, ম্যাডোনা, ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্ট, আর শিষ্যদের সঙ্গে যিশুর ছবি।

এক পাশে একটা চওড়া সোফার ওপর লাল শালুর আবরণে ঢাকা একটা সেতার। মেরী সেতার শিখছে ওস্তাদের কাছে।

ঢাকনি খুলে সেতারটা নিয়ে বসলো সত্যকাম। টুং-টাং করতে করতে গৌড়সারেঙ্গের সুরের ভেতর তন্ময় হয়ে যায় সত্যকাম এক সময়। বাজনা শেষ করে সেতারটা তুলে রাখে সত্যকাম।

How Sweet!

চমকে তাকিয়ে দেখে সত্যকাম মেরী এসে কখন বসেছে তারই পেছনে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে। স্প্রিং-এর গদির ভেতর একেবারে ডুবে বসে আছে মেরী কুঁকড়ে মুকড়ে খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে। চোখে স্বপ্নের ঘোর। নীল নয়ন দু'টিতে আলো ছায়ার খেলা। বেদনার স্নিগ্ধ মেঘ কখন নেমে এসেছে মেরীর নীল চোখের আকাশে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে যায় মেরী। ফিরে আসে অনেক পরে। সত্যকামের বাড়ী ফিরতে বেশ দেরী হয় সেদিন।

স্নান করে টেনিসের পোষাক পরে তৈরী হচ্ছে সত্যকাম। তরফদার সাহেবের কুঠিতে টেনিস পার্টিতে যেতে হবে। মিসেস তরফদারের নেমন্তন্ন পেয়েছে সত্যকাম বাড়ী ফিরেই।

শীগ্‌গির চা পাঠিয়ে দাও মা, হেঁকে বলে সত্যকাম। টেনিস সু'র ফিতে বাঁধতে বাঁধতে।

খুট্ করে শব্দ হয়। মুখ তোলে সত্যকাম। বনানী চায়ের ট্রে নামিয়ে রাখছে টেবিলের ওপর। গার্লস স্কুলের হেড মিষ্ট্রেসের মেয়ে বনানী বিশ্বাস। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। পাশাপাশি বাড়ী। এ বাড়ীতে বনানীর অবাধ গতি। সত্যকাম বাড়ী থাকলে ওর কাছে আসে পড়া বুঝিয়ে নেবার নাম করে গল্প করতে। না থাকলে সুনয়নী দেবীর কাছে আসে সেলাই শিখতে।

তুমি রামহরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ হয়েছো না কি বনানী? সে কোথায়? হেসে বলে সত্যকাম।

গম্ভীর ভাবে চা ঢালতে থাকে বনানী ওর কথার জবাব না দিয়ে। মনে মনে হাসে সত্যকাম। কিন্তু মুখখানি করুণ করে বলে, আজ আমার আর চা খাওয়া হোল না দেখছি।

কেন? চমকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে বনানী।

এত গম্ভীর হয়ে তৈরী করলে, চা তেঁতো হয়ে যায়, জানো না বুঝি? গম্ভীর হতে চেষ্টা করতে করতে বলে সত্যকাম।

ফিক করে হেসে ফেলে বনানী। তার পর মুখ ফিরিয়ে বলে, যান, আপনার সঙ্গে কথা বলবো না আর।

অপরাধ? বিস্ময়ের ভাণ করে জিজ্ঞেস করে সত্যকাম।

আবার জিজ্ঞেস করছেন অপরাধের কথা? আজ দুপুর বেলা আমাকে নিয়ে শালতোড়া বেড়াতে যাবার কথা ছিল না? কথা ছিল না যে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার নিয়ে যাবো। সেখানে গিয়ে পাহাড়ের ওপর বসে আমাকে শেলির,

'ক্লাউড,' বুঝিয়ে দেবেন। আমি টিফিন কেরিয়ারে খাবার ভর্ত্তি করে কাপড় চোপড় পরে বসে আছি—পথের দিকে তাকিয়ে সেই বেলা এগারোটা থেকে—

ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলে বনানী। সত্যকাম কিছু বলবার আগেই ঝড়ের ন্যায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ষোড়শী মেয়েটি।

অপ্রতিভ ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওর গমন পথের দিকে সত্যকাম। কিন্তু পরক্ষণেই হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে। চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে লঘু পদে বেরিয়ে যায় সত্যকাম টেনিস র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে। টেনিস পার্টিতে পৌঁছতে দেরী হ'লে অ্যালেয়া তরফদারের কাছে বকুনি খেতে হবে। লাল ধুলো উড়িয়ে ছোটে সত্যকামের টু'সীটার ট্যাল্‌বট্।

সত্যকামের দিনগুলি ছুটে চলেছে দ্রুতগতিতে। ভাবনা নেই চিন্তা নেই। টেনিস খেলে, শিকার করে, গান গেয়ে, সেতার বাজিয়ে আনন্দের তরঙ্গের পর তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে সত্যকাম।

কানাঘুষা চলে ওর আর অ্যালেয়া তরফদারকে নিয়ে। হাসাহাসি করে লোকে ওর আর মেরী জ্যাকসনের সম্পর্ক নিয়ে। চন্দ্রা রাহাকে নিয়ে প্রথমটা কথা উঠেছিল। কিন্তু এখন আর কেউ তার কথা উল্লেখ করে না সত্যকামের নামের সঙ্গে। সুনয়নী দেবীর মনে একটা ক্ষীণ আশা বনানীকে বুঝি ভালবাসে সত্যকাম। বিয়ের ফুল ফোটে বুঝি এবার ছেলের।

সত্যকামের দর্শন কদাচিৎ মেলে আজকাল চন্দ্রার রবিবাসরীয় আসরে। বিষের জ্বালায় জ্বলে চন্দ্রা। বেচারী নির্ম্মল সাইকেল নিয়ে ছুটাছুটি করে সত্যকামকে ধরে আনতে। কিন্তু মুখ শুকনো করে ফিরে আসে বেচারী। সত্যকাম বাড়ী নেই। কোথায় গেছে? কেউ জানে না।

মনের ভাব গোপন করতে চেষ্টা করে চন্দ্রা। একটা কুটিল হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে।

স্বামীকে ধমকে বলে, তাকে ডাকতে যেতে তোমায় কে বলেছে? কাল রাত বারোটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে গেল এখানে। কাল তো বলেই গেছে, আজ আসতে পারবে না সে। তার এন্‌গেজমেণ্ট আছে। ধমক খেয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় নির্ম্মল। মুখে তার বিস্ময়।

কোথায় এন্‌গেজমেণ্ট মিসেস রাহা? জিজ্ঞেস করে বিনয়।

সেটা কি বলে দিতে হবে নাকি, বিনয় বাবু? ছুরির ফলার মত হেসে বলে চন্দ্রা।

কাল অনেক কথাই বলেছে বেচারী। ওকে যে রাহুতে গ্রাস করেছে, সেই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছে আমাকে সারাক্ষণ। উদ্ধারের উপায় খুঁজে পাচ্ছে না বেচারী।

তাই নাকি? কি বলছিল সত্যকাম? জিজ্ঞেস করে হীরেন। চন্দ্রার চায়ের আসরের নিয়মিত সভ্য সে।

কুৎসার আভাসে উপস্থিত সকলের মুখেই উগ্র আগ্রহ ফুটে ওঠে।

থাক্ ওসব। বড় ঘরের বড় কথা। এসব নিয়ে আলোচনা করতে আমার ভাল লাগে না। তবে বলে রাখছি আমি, একটা কেলেঙ্কারী ঘটতে আর দেরী নেই। এখন ওসব কথা ছেড়ে, বিনয় বাবু গান আরম্ভ করুন।

হারমনিয়মটা টেনে নিয়ে গান ধরে বিনয়—

শাশ ননদীয়া জাগে
ক্যায়সে আ উঁ'—

চাঁদ বাবুর সুনিপুণ হাতে তবলাটা যেন কথা কয়ে ওঠে। প্রতি বাড়ীতেই গানের আসরে ওস্তাদ চাঁদ বাবুর ডাক পড়ে। তরফদার সাহেবও ওর কাছে তবলা শেখেন।

কুলোকে বলে যত ঘরের কুৎসা চাঁদ বাবুর মাধ্যমেই রটনা হয় সহরে।

হেডলাইট জ্বালিয়ে লাল ধুলোর ঝড় উড়িয়ে রাত্রির অন্ধকারকে গাঢ়তর করে ছুটেছে সত্যকামের টু'সীটার টাল্‌বট।

জ্যাকসনের বাংলোয় হাজির হ'তে পাঁচ মিনিটও লাগে না। You naughty boy! বিকেলে আসোনি কেন? আজকের টেনিসটাই মাটি হোল। Perhaps there was something more attractive somewhere else!

প্রশ্নের আকারে তথ্য পরিবেশন করে মেরী নীল নয়নে কটাক্ষ হেনে।

But to me there's only one oasis in this blessed desert, and you very well know what it is.

সুদক্ষ চাটুকারের মত বলে সত্যকাম। রক্তিমাভা দেখা দেয় মেরীর গালে।

Naughty, naughty is the word for you, you vain flatterer. এখন চলো ভেতরে। সত্যকামের হাত না ছেড়েই বলে মেরী।

Lead kindly light, বলে হাসতে হাসতে মেরীর সঙ্গে ড্রইং-রুমে প্রবেশ করে সত্যকাম।

চায়ের ট্রে রেখে যায় বেয়ারা। রোজই দেখে লোকটাকে সত্যকাম। আজ হঠাৎ চোখে পড়ে গেল লোকটার সুঠাম দেহ, কালো আবলুস কাঠের মত রঙ, আয়ত চক্ষু, তীক্ষ্ণ নাসা।

লোকটার চোখে যেন হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠেই নিভে যায়। এত তাড়াতাড়ি পরিবর্ত্তনটা ঘটে যায় যে সত্যকামের মনে হয় ভুল দেখেছে বুঝি ও।

মেরী জ্যাকসনের দিকে তাকায় সত্যকাম। মাথা নীচু করে চা ঢালছে মেরী।

বেয়ারার দিকে তাকায় সত্যকাম। পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে লোকটা। মেরীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে।

চা খাওয়া হয়ে যায়। আবদুল চায়ের ট্রে নিয়ে নীরবে চলে যায়

মেরী কি ভাবছে। সত্যকামের মনও কোথায় চলে গেছে।

ফিরে আসে সত্যকামের মন বাস্তব জগতে।

মেরী বলছে ফিস ফিস করে আধো আধো স্বরে, আজ বড়ো একা আমি, সত্যকাম। আজ তুমি সেতার বাজাবে। আমি শুনবো। শুনতে শুনতে আমি সুরের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবো। তুমি বাজনা থামিয়ে ভেঙ্গে দিও না আমার স্বপ্ন।

সারা রাতই কি আমি বীণা বাজিয়ে তোমার কানের কাছে প্রেম গুঞ্জন শুনাবো, মেরী? জোরে বলে সত্যকাম।

ঐ, আজ সারা রাত তুমি বীণা বাজাবে। আমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবো নীল মহাসাগরের মাঝখানে ছায়াচ্ছন্ন একটা দ্বীপের। অজানা ফুলের গন্ধে পাগল হয়ে অজানা পাখীরা গান গাইছে অজানা গাছের সবুজ পাতার ভেতর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেখানে—তোমার বাজনা শুনতে শুনতে সেই দ্বীপের স্বপ্ন দেখবো আমি, সত্যকাম।

কিন্তু ঝড় আসছে যে। শুনছো না মেরী, মেঘেরা বাদল বাজাতে শুরু করছে। পাগল হাওয়া শন-শন করে বাঁশী বাজাচ্ছে। গাছপালা উতোল হয়ে নৃত্য শুরু করেছে। এখনি নামবে বৃষ্টির ধারা। এখন কি সেতার বাজনা ভালো লাগবে তোমার মেরী? সত্যকামের স্বরেও বাদলের নেশা লেগেছে।

খোলা জানালা দিয়ে শুকনো পাতা আর ধূলোর ঝড় ছুটে আসে। বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। নিকটে কোথাও বাজ পড়ে। আবদুল ছুটে এসে তাড়াতাড়ি দরজা-জানালার সার্সি বন্ধ ক'রে চলে যায়।

মেরীর মুখে আগুনের ঝলক্। উত্তেজনায় কাঁপছে মেরী, ভাল লাগবে সত্যকাম! খুব ভাল লাগবে আজ ঝড়ের রাতে তোমার বাজনা। এমন একটা সুর বাজাও সত্যকাম, যাতে বাইরের ঝড় আমার মনের ভেতর প্রবেশ করে। চাপা উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলে মেরী।

বিস্মিত হয় সত্যকাম ওর উত্তেজনা দেখে, কিন্তু কোন কথা না বলে সেতারটি তুলে নেয়। মেঘমল্লারের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে যন্ত্রে। গম্ গম্ করতে থাকে ঘরখানি।

মেরীর মনের তারেও ঝঙ্কার দেয় সেই সুর। সত্যকামের হাতের সুদক্ষ স্পর্শে বীণাটি যেন জীবন পেয়ে যায়। সুরের সমুদ্রে ডুবে যায় সত্যকাম।

বাইরে ঝড়ের মাতামাতি। বৃষ্টির ধারা এসে আঘাত করছে সার্সির গায়ে। বিজলী চমকাচ্ছে ঘন ঘন। কাচের ভেতর দিয়ে তার ঝলক্ আসছে ঘরের ভেতর। ওদের মনের ভেতরও বুঝি।

মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে মেরী সোফার ওপর। ফিকে গোলাপী রঙের স্বল্পাচ্ছাদনে ঢাকা পড়েনি তার দেহের সুষমা। কিউপিডের তীক্ষ্ণ শর উদ্যত হয়ে আছে নিটোল বক্ষের ওপর। গভীর আবেগে কাঁপছে মেরী থর-থর করে।

ঠুক্! ঠুক্! ঠুক্! ঠুক্! দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে। শুনতে পায় না সত্যকাম। আচ্ছন্ন মেরীর কানেও সে শব্দ প্রবেশ করে না।

ঠুক্! ঠুক্! আবদুল দরজা খুলে দেয়। উন্মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়িয়ে মিলি। আকাশী রঙের প্লাষ্টিকের বর্ষাতি বেয়ে জলের ধারা ঝরে পড়ছে পাপোষের ওপর। আর কালো চুলের খোঁপা থেকে। ভেজা ছাতাটি বাইরে বারান্দায় ঠেসান। কয়েকগাছি চূর্ণকুন্তল উড়ছে দমকা হাওয়ায়।

মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায় মেরী জ্যাকসনের। তাল কেটে যায় সত্যকামের। বাজনা থামিয়ে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ধরে মিলির দিকে। Come in Millie! এই beastly weatherএ বেরিয়েছো! Why, you are soaked through and through, where had you been? বিরক্তি দমন করে বলে মেরী জ্যাকসন।

মিলি নীরসকণ্ঠে বলে, কুন্তলার বাড়ী গিয়েছিলাম, মিসেস জ্যাক্‌সন! ফেরবার পথে জল এলো। না, ভেতরে গিয়ে তোমার মূল্যবান্ কার্পেট আর নষ্ট করবো না। তারপর সত্যকামের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে চলো।

মেরীর দিকে তাকায় সত্যকাম। ঠোঁট কামড়ে গম্ভীর হয়ে আছে মেরী।

ওঠো, আমি আর দেরী করতে পারছি না। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে মিলি।

কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ায় সত্যকাম। মেরী জ্যাক্‌সনের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে। পরক্ষণে, গুড নাইট্, মিসেস জ্যাক্‌সন, বলে মিলির পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ট্যাক্সিটা দরজার সামনে ভিজছে। জলের ছাটে ভেতরকার গদি সপ-সপ করছে।

গাড়ীর সীটগুলি ভিজে গেছে দেখছি। পর্দাগুলো তোলা হয়নি; আপন মনেই বলে সত্যকাম।

গাড়ীর কথা কি আর মনে ছিল তোমার? তোমার গাড়ীতে অন্য লোককে চড়িও। আমি হেঁটেই চললাম।

বলতে বলতে এগিয়ে যায় মিলি। সত্যকাম কোন কথা না বলে ওর সঙ্গে হাঁটতে থাকে। গাড়ীটা পড়ে থাকে ওখানেই।

এই ঝড়-জলে বেরুনো উচিত হয়নি তোমার মিলি! জলে ভিজে একটা অসুখ না হয়। আস্তে আস্তে বলে সত্যকাম।

অত দরদে কাজ নেই, সংক্ষেপে ব'লে চলতে থাকে মিলি।

আর কোন কথা বলতে পারে না সত্যকাম। নীরবে মিলির পাশে পাশে চলতে থাকে। মিলির কাছে এলেই ওর সমস্ত ভাষা মূক হ'য়ে যায়।

ঝড়ের বেগ কমে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু নির্জ্জন পথের দু'ধারের শাল এবং দেবদারু গাছগুলি তখনও থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে দমকা হাওয়ায়। আর ঝর-ঝর করে জল ঝরে পড়ছে পাতা থেকে ওদের মাথার ওপর।

সত্যকামের পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবীটা ভিজে লেপটে গেছে ওর সুঠাম দেহের সঙ্গে। জল ঝরে পড়ছে কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ থেকে।

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার ক্ষণিক আলোকে সত্যকামের চোখে ধরা পড়ে মিলির চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি। ওর দেহের পানে তাকাচ্ছে মিলি আড়চোখে।

শিউরে ওঠে সত্যকামের দেহ সেই দৃষ্টিতে। কিসের আলোড়ন জাগে ওর মনে!

এ কী অনুভূতি? সত্যকাম তার মনের ভেতর সন্ধান করে। সেখানে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে মেঘমল্লারের সুর। এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে আবছা অন্ধকার পথে মিলির পাশে পাশে চলতে চলতে মন তার ভরে উঠেছে কানায় কানায়। মনে মনে বলে সত্যকাম, হে অন্তর্যামী, আজকে এই ঝড়ের রাতে এই ছায়াচ্ছন্ন পথে এই চলার যেন শেষ না হয়।

কিন্তু চলার শেষ হয়ে যায় এক সময়ে। হঠাৎ আলোকোজ্জ্বল বাড়ীটার পেছনে বাগানের ভেতর এসে পড়ে ওরা দুজনে।

বিদ্যুতের তীব্র আলো ঝলসে উঠলো, সত্যকাম তাকিয়ে দেখলো মিলি চেয়ে আছে তার পানে।

কি ছিল মিলির চোখে? আজও বলতে পারে না সত্যকাম। কিন্তু সেই দৃষ্টি! কোন দিন ভুলতে পারে নি সে।

মিলি অদৃশ্য হয়ে যায় বাড়ীর ভেতর পেছনের দরজা দিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ সেইখানে সত্যকাম।

মেঘেদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে শুক্লপক্ষের চাঁদ। আলোছায়ার খেলা চলেছে চার দিকে। কোথা থেকে কি একটা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে যেন।

টুপ টুপ করে মাথার ওপর কি ঝরে পড়ছে ওপর থেকে অনেক ক্ষণ ধরে।

হঠাৎ খেয়াল হয় সত্যকামের। মিলিদের বাগানের বকুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছে সে। বকুল ঝরে পড়ছে ওর মাথার ওপর। তারই গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করছিল এতক্ষণ।

অসাড় হয়ে গেছে সত্যকামের দেহ জলে ভিজে। তার চেয়েও অসাড় হয়েছে তার মন বিদের আঘাতে। তাই এতক্ষণ স্পষ্ট করে ধরা পড়েনি ওর কাছে বকুলের গন্ধ।

এবার চেতনা ফিরে আসতেই খুসী হয়ে ওঠে সত্যকামের মন। বকুলের গন্ধে। আর মিলির অদ্ভুত ব্যবহারের কথা মনে করে।

অনেকগুলি বকুল ফুল কুড়িয়ে নিয়ে পকেট ভর্ত্তি করে সত্যকাম। তারপর খুসী মনে চলতে থাকে। পেছনে না ফিরেও মনে হয় ওর, কে যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে অনিমেষে ঐ বাড়ীটার অন্ধকার জানালা থেকে।

বর্ষা যায়। শরৎ আসে। পুজোর ছুটি ফুরিয়ে যায় হৈ-হুল্লোড় করে। কোন দুঃখ নেই। কোন ভাবনা নেই সত্যকামের মনে। তরফদার সাহেবের বাড়ী থেকে টেনিসের পর ড্রিঙ্ক খেলে। ডিনার খেয়ে বাড়ী ফেরে সে রাত বারোটায়। মেরী জ্যাকসনের বাংলায় যায় কোন দিন সন্ধ্যার পর। সেখান থেকেও ফিরতে বেশ রাত হয় বৈ কি। চন্দ্রা রাহার আসরেও যায় সত্যকাম। ষ্টেলা ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে সত্যকামের টুলবট ধূলো উড়িয়ে ছোটে শালবনের পথে। ধবনির জঙ্গল পেরিয়ে। বনানীকে 'ক্লাউড' 'লুসি গ্রে' পড়ায় বিসনিয়া পাহাড়ের ওপর অর্জ্জুন গাছটার তলায় বসে।

মিলিদের বাড়ীও যায় কোন দিন সন্ধ্যার পরে। মিলি গান শিখছে চাঁদ বাবুর কাছে। খেয়াল। মালকোষ সুরে গান গায় মিলি,—আজ মেরে ঘর আইলা সুমত প্যারে—কখনও গায়,—

ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

গানের আসর থেকে চুপি চুপি পালিয়ে আসে সত্যকাম। মিলির সান্নিধ্য ওকে অশান্ত করে দেয়। মনের ভেতর অপরিসীম বেদনার বোবা কান্না গুমরে ওঠে। চুপি চুপি পালিয়ে আসে সত্যকাম।

ঘরের বাইরে এসে শুনতে পায় চাঁদ বাবুর আফশোস। আহা তা তালটা কেটে গেল যে! বেশ তো হচ্ছিল।

গান ততক্ষণে থেমে গেছে। ছুটে পালায় সত্যকাম। মিলির দৃষ্টি অনুসরণ করছে তাকে।

ওখান থেকে চলে যায় জ্যাকসনের বাড়ী। নয়তো তরফদার সাহেবের বাংলো।

অনেক রাতে ফেরে বাড়ীতে। একা থাকতে ভয় পায় সত্যকাম তার নিজের ঘরে। রাত্রির অন্ধকার থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে আসে ওর মন। ওর নিজেরই মন ওর দিকে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষে।

পথ খোঁজে সত্যকাম নিজের মনের কাছ থেকে পালাবার জন্য। সেতারটা তুলে নেয় তাড়াতাড়ি। রাত শেষ হয়ে আসে। বীণায় ঝঙ্কার দেয় জয়জয়ন্তী, দরবারী কানাড়া, বেহাগ।

শ্রান্ত হয়ে শয্যায় এলিয়ে দেয় দেহ সত্যকাম। খোলা জানালা দিয়ে হেমন্তের ঠাণ্ডা হাওয়া শান্ত করে ওর দেহ। বাইরে পূব আকাশের দিকে তাকায় সত্যকাম অসীম আগ্রহে। সেখানে রাত্রি-শেষের রহস্যময় নিস্তব্ধতায় শুকতারা থেকে মিলি তাকিয়ে আছে ওর দিকে একদৃষ্টে।

তারপর এলো সেই চিরস্মরণীয় রাত্রিটি। সেই দেওয়ালির রাত্রি। সহস্র দীপ-শিখা কাঁপছে সহরের বুকে। ছাদের আলিসার ওপর কনুই রেখে তাকিয়ে আছে সত্যকাম দীপান্বিতা নগরীর পানে।

মা গেছেন দেবীর মন্দিরে পূজা দিতে, রামহরি গেছে সঙ্গে। যে মোমবাতিগুলি জ্বালিয়ে রেখে গেছে সে ছাদের আলিসায়, একে একে নিবে গেছে সব।

রান্নাঘরে ঠাকুর রান্না করছে। বাতাসী ঝি ঠাকুরের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে আর বাটনা বাটছে বোধ হয়।

কত সুখী ওরা। সত্যকামের মনের ভেতর জ্বালা করে ওঠে। চার দিকে আলোর উৎসব। বাজী পুড়ছে সর্বত্র। কিন্তু তার ঘর আজ অন্ধকার।

বহুদিন আগে শোনা একটা সিনেমায় গান সে আনমনে গুন্-গুন্ করে গায়,

ঘর-ঘর দেওয়ালি,
মেরা ঘর হ্যায় আন্ধেরা।

মন ওর গুমরে ওঠে কিসের ব্যথায়। নেমন্তন্ন ছিল আজো তরফদারের বাড়ী ডিনারে। চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল চন্দ্রা রাহা তার বাড়ীতে সন্ধ্যায় মজলিসে যেতে অনুরোধ করে, ষ্টেলা ভট্টাচার্য্যের আমন্ত্রণ ছিল। মেরী জ্যাকসনও বেয়ারা পাঠিয়েছিল। বনানী বলেছিল, তাকে নিয়ে দেওয়ালি দেখতে যাবার জন্য। কিন্তু মিলির আহ্বান এলো না। আসবেও না কোন দিন।

শরীর অসুস্থ বলে সকলের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছে সত্যকাম।

ভাল লাগে না। কিছু ভাল লাগে না তার। কিছুদিন ধরে চন্দ্রা রাহাকে ঘন ঘন যেতে দেখা যাচ্ছে তরফদারের বাড়ীতে। মিঃ তরফদারের সঙ্গে ফিস্-ফিস করে কি গল্প করে। তরফদার সাহেবের ব্যবহারও সত্যকামের ওপর যেন কেমন একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। মাঝে মাঝে কেমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে যেন তাকান ভদ্রলোক ওর দিকে আর তার স্ত্রীর দিকে। ওরা দুজনে হয়তো তখন কোন হাসির কথা নিয়ে হাসাহাসি করছে।

আজ কেন যেন এ সব কথা মনে হয় সত্যকামের। আজ হঠাৎ ওদের সকলের সংসর্গ ওর কাছে বিষাক্ত মনে হয়।

কিন্তু মিলি কেন ডাক্‌লো না তাকে আজকের এই দীপান্বিতা রাতে! যখন সহস্র দীপ-শিখা কাঁপতে কাঁপতে একে একে নিবে যাচ্ছে সহরের বুকে!

কিন্তু আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! পরমক্ষণটি কি এত দিনে এলো তার জীবনে?

ওর পাশে এসে কে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে। কার চুলের মৃদু সুবাস, দেহের অবর্ণনীয় সূক্ষ্ম সৌরভ আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাকে ধীরে ধীরে। কার দেহের মৃদু উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে ওর দেহে!

মুখ না ফিরিয়েও জানতে পারে সত্যকাম তার জীবনে পরমাশ্চর্য্য ক্ষণটি এতদিনে এসেছে। জ্বলে উঠেছে সহস্রবাতি তার ঘরে।

মিলি এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সেই দৃষ্টির আহ্বানে ফিরে তাকায় সত্যকাম।

ওর ধূপছায়া রঙের রেশমী সাড়ী থেকে বিন্দু বিন্দু আলোর কণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, দীপান্বিতা রাতের আলো ঠিকরে পড়ছে মিলির ধূপছায়া সাড়ীতে। তার অতল গভীর কালো চোখে। আর কালো চুলে।

দু বাহু বাড়িয়ে দেয় সত্যকাম স্বপ্নাচ্ছন্নের মত। নিশি-পাওয়া মানুষের মত ওর চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে মিলি।—ওর বুকের ভেতর এলিয়ে পড়ে আছে মিলি। ওর কাঁধে মাথা রেখে। একরাশ চন্দ্রমল্লিকা থরথর করে কাঁপছে ওর বুকের ভেতর। মিলি! অতি আদরে ডাকে সত্যকাম।

চুপ কর। কথা কয়ে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না তুমি। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে মিলি।

একি! কাঁদছো তুমি মিলি? কেন কাঁদছো তুমি? আদর করে ফিস্‌-ফিস করে মিলির কানে কানে বলে সত্যকাম।

ওর কথার জবাব না দিয়ে পড়ে থাকে মিলি সত্যকামের বুকের ভেতর। ওর কাঁধে মাথা রেখে। টপ-টপ করে মুক্তাধারা ঝরে পড়ছে মিলির গভীর কালো চোখ থেকে। স্বাতি নক্ষত্রের জল ঝরছে নীল আকাশ থেকে।

মিলির চোখের জলে জবাব পেয়ে যায় সত্যকাম তার প্রশ্নের, কেন কাঁদছে মিলি বুঝতে পারে বুঝি ও।

কী সান্ত্বনা দেবে সত্যকাম মিলিকে? মিলিও কি ভুল বুঝেছে তাকে? ওর মুখখানি তুলে ধরতে চেষ্টা করে সত্যকাম। কি বলতে যায়।

হঠাৎ সত্যকামের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কোন কথা না বলে, কোন দিকে না তাকিয়ে ছুটে চলে যায় মিলি।

এত অকস্মাৎ চলে যায় মিলি যে, সত্যকামের মনে হয় এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল বুঝি সে। কিন্তু মিলির চুলের মৃদু সুবাস, তার দেহের অবর্ণনীয় সূক্ষ্ম সৌরভ মনে করিয়ে দেয় সত্যকামকে মিলি এসেছিল আজকের এই দীপান্বিতা রাত্রে। তার আঁধার ঘরে সহস্র বাতি জ্বলে উঠেছিল তার আগমনে। অন্ধকার আবার ঘনিয়ে আসে।

প্রথমে কানাকানি। তারপর প্রকাশ্যেই রটে যায়। মিঃ তরফদার তার স্ত্রী আলেয়া তরফদারকে রিভলভার দিয়ে গুলী করে হত্যা করেছেন। দুপুর বেলা বেয়ারা রসুল এসে কি একটা খবর দিতেই গাড়ী হাঁকিয়ে নিজের কুঠিতে ছুটে যান তরফদার সাহেব কাছারী থেকে। কিছুক্ষণ পরেই শয়নকক্ষ থেকে পর পর দুটি গুলীর আওয়াজ শোনা যায়। মেম সাহেবের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে বাবুর্চি, খানসামা, আয়া ছুটে যায়। সত্যকামকে বিবর্ণ মুখে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখতে পায় ওরা। তার পিছু-পিছু ছুটে যায় তরফদার সাহেব ধূমায়িত রিভলভার হাতে। ওদের দেখে থমকে দাঁড়ান তরফদার সাহেব। তারপর আবার শয়নকক্ষে ঢুকে দরজাটা দড়াম্ ক'রে বন্ধ করে দেন।

আত্মহত্যা বলেই সাব্যস্ত হয় আলেয়া তরফদারের মৃত্যু। পুলিস এসে দেখতে পায়; আটত্রিশ বোরের রিভলভারটা আলেয়ার ডান হাতের মুঠোর ভেতর। সুঠাম দেহখানি পড়ে আছে মেঝের ওপর। চোখ দুটি স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে। কপালের ডান পাশে একটি ছিদ্র থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তখনও কার্পেটের ওপর।

পুলিস, ম্যাজিষ্ট্রেট হাতের মুঠোয় তরফদার সাহেবের। তাই স্ত্রীকে খুন করেও রেহাই পেয়ে গেল লোকটা, সহরবাসী মন্তব্য করে।

কিন্তু সত্যকাম? তাকে ক্ষমা করতে পারে না কেউ। দুশ্চরিত্র লম্পট সত্যকামকে আর সহ্য করতে পারবে না কেউ। তার মত বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে সংস্রব রাখতে পারে না কোন ভদ্রমহিলা।

ঘর থেকে বেরোয় না সত্যকাম। কেউ ডাকে না তাকে। ডাক আসে না তার চন্দ্রা রাহার আসরে। ষ্টেলা ভট্টাচার্য্য ডাকে না তাকে। তার সঙ্গে ত্রিশূল পাহাড়ে ছবি তোলার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ষ্টেলার। বনানী আসে না তার কাছে শেলির কবিতা বুঝতে। জ্যাক্‌সনের বাড়ী থেকেও ডাক আসে না।

কালো কুৎসা রটে গেছে তার নামে সহরে। ক্লাবে গেলে অপমানিত হবে সত্যকাম ছেলেদের কাছে। কারুর বাড়ী গেলে ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে দড়াম করে।

এ সব খবর পৌঁছে গেছে সত্যকামের কাছে। কিন্তু আজ নিন্দা প্রশংসা এক হয়ে গেছে তার নিকট। মন হয়েছে অসাড়। মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয়। কিছুই যেন বুঝতে পারে না সে। তার চোখের সামনে সারাক্ষণ ভাসছে আলেয়ার রক্তাক্ত দেহ। কানে ধ্বনিত হচ্ছে তার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

এখনও বুঝতে পারে না সত্যকাম হঠাৎ কি হয়ে গেল!

মিসেস তরফদারের ছোট্ট চিঠিখানা পেয়ে প্রথমটা বিস্মিত হয়েছিল সত্যকাম। হঠাৎ দুপুর বেলা তাকে ডেকে পাঠাবার কোন অর্থ খুঁজে পায়নি সে। কিন্তু জরুরী আহ্বান। হাতের কাজ ফেলে আফিস থেকেই টু'সীটারটা হাঁকিয়ে উপস্থিত হয় সত্যকাম তরফদার সাহেবের বাংলায়।

গাড়ী থামতেই একটা বেয়ারা এসে ডেকে নিয়ে যায় ওকে একেবারে আলেয়া তরফদারের শয়নকক্ষের সামনে।

বিস্ময়ের সীমা থাকে না সত্যকামের। মিসেস তরফদার ডেকে পাঠিয়েছে তাকে একেবারে তার শয়নকক্ষে! বিশ্বাস হতে চায় না। কোন বিবাহিতা নারীর শয়নকক্ষে একজন অনাত্মীয় পুরুষের প্রবেশ শুধু অশোভন নয়, নীতিবিরুদ্ধ।

দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে সত্যকাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা খুলে যায়। দ্বারপথে দাঁড়িয়ে আলেয়া। অবিন্যস্ত বেশবাস। উস্কো-খুস্কো চুল। শুকনো মুখ। চোখ দুটি ফোলা। কাঁদছিল নাকি আলেয়া?

ভেতরে এসো সত্যকাম, ওকে ভাববার অবকাশ না দিয়ে আহ্বান জানায় আলেয়া।

যন্ত্রচালিতের মত প্রবেশ করে সত্যকাম আলেয়া তরফদারের শয়নকক্ষে। আলেয়ার মুখের দিকে তাকায় সে। অস্বাভাবিক হয়ে গেছে তার চোখের দৃষ্টি! কি একটা উত্তেজনায় জ্বলছে তার চোখ দুটি। গৌরবর্ণ মুখখানি সিঁদুরের মত লাল টকটকে হয়ে গেছে।

একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা কাঁপছে মৃদু মৃদু বাতাসে। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে সত্যকাম। মুখে আসে না কোন কথা।

হঠাৎ শয্যার ওপর এলিয়ে পড়ে আলেয়া, বালিসে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে আলেয়া। বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার তরফদার সাহেবের বিদুষী তরুণী ভার্য্যা কাঁদছে, কি দুঃখ তার? আর তাকেই বা এমন সময়ে ডেকে এনেছে কেন সে তার নিভৃত শয়নকক্ষে? কি কথা বলতে ডেকেছে তাকে? কী করতে পারে সে আলেয়ার দুঃখ দূর করতে?

নানা প্রশ্ন ভীড় করে আসে সত্যকামের মনে। কিন্তু আলেয়া কাঁদছে। হঠাৎ একটা কাজ করে বসলো সত্যকাম। আজও সে বুঝতে পারে না কেন এমন কাজ করলো সে। হঠাৎ নীচু হয়ে আলেয়ার মুখখানি তুলে ধরতে চেষ্টা করলো সত্যকাম।

So, that's that. আমি ঠিকই ধরেছিলাম তা'হলে। মিসেস রাহা তা'হলে মিথ্যে বলেন নি।

মিঃ তরফদারের বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনে ছিট্‌কে সরে যায় সত্যকাম।

হাতের রিভলভারটি তার দিকে উঁচিয়ে বলেন তরফদার সাহেব, Stand still and don't move an inch, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে আমার, সত্যকাম!

মিঃ তরফদার!

Shut up and keep silent you scoundrel, till I have finished with her.

ধম্‌কে থামিয়ে দেন সত্যকামকে তরফদার সাহেব। তার পর আলেয়ার দিকে তাকান।

বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে আলেয়া, তার হাতের রিভলভারটির দিকে। ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপছে। দু'হাত দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরে আছে আলেয়া।

বিষের ছুরির মত এক টুকরো হাসি লেগে আছে তরফদারের মুখে।

সত্যকাম ভাবছে, লোকটা পাগল হয়ে গেছে নাকি?

আলেয়া বুঝি ভাবছে, এর পর?

তরফদার সাহেব ভাবছেন, কা'কে শেষ করবেন আগে?

হঠাৎ বিকৃত কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন মিঃ তরফদার স্ত্রীকে,

আজ সকালে যে জন্য চাবুক মেরেছিলাম তোমাকে, সেটা যে মিথ্যে নয়, হাতে হাতেই প্রমাণ পেয়ে গেলাম। Now, I shall first shoot your lover like a dog and then—

না, না, ভুল বুঝেছো তুমি। ভুল—ভুল—ছুটে এসে সত্যকামকে আড়াল করে দাঁড়ায় আলেয়া। কিন্তু ততক্ষণে ট্রিগার টেনেছেন তরফদার সাহেব।

পড়ে গেল আলেয়া। আবার ট্রিগার টানেন তরফদার সাহেব। কিন্তু হাত কাঁপছে তখন। সত্যকামের কানের কাছ দিয়ে গুলীটা গিয়ে দেওয়ালে লেগে ঠিকরে পড়ে।

পালিয়ে এসেছিল সত্যকাম। কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছিল। কাপুরুষ, কাপুরুষ, কাপুরুষ! সারা দিন সারা রাত নিজের ঘরের ভেতর পায়চারি করে আর বলে সে নিজেকে, কাপুরুষ, কাপুরুষ, কাপুরুষ! এলোমেলো চিন্তার রাশি একের পর এক ভীড় করে মাথার ভেতর।

আলেয়া তরফদার ডেকে পাঠিয়েছিল কেন তাকে? কি বলতে চেয়েছিল আলেয়া? তাকে বাঁচাতে গিয়েই প্রাণ দিল আলেয়া। কিন্তু কেন?

কি বলেছিল চন্দ্রা রায় মিঃ তরফদারকে? কিন্তু আলেয়া কেন ডেকেছিল তাকে? কি বলতে চেয়েছিল আলেয়া?

সারা দিন সারা রাত পায়চারি করছে সত্যকাম, বন্ধ ঘরের ভেতর।

একটা বড় সান্ত্বনা সত্যকামের। মা নেই এখানে। কিছু দিন পূর্ব্বে চলে গেছেন দেশের বাড়ীতে। পুত্রের কুৎসা-কলঙ্কের কথা পৌঁছাবে না তাঁর কাছে।

কিন্তু মিলি? জোর করে মনকে ফিরিয়ে নেয় সেদিক থেকে। মিলি আর আসবে না। দীপান্বিতা রাতের সহস্র বাতি জ্বলবে না আর তার আঁধার ঘরে। আর আসবে না মিলি।

অভুক্ত অনিদ্র সত্যকাম পায়চারি করছে ঘরের ভেতর। ঠাকুর খাবার দিয়ে ডাকতে এসে সাড়া না পেয়ে ফিরে গেছে বার বার।

রাত্রি গভীর হচ্ছে। অতন্দ্র রাত্রি তাকিয়ে আছে নির্নিমেষে তার দিকে। জানালার ভেতর দিয়ে লক্ষ তারার হাতছানি।

ধীরে-সুস্থে ডবল ব্যারেল গ্রীণারটা বের করে সত্যকাম খাপ থেকে। ব্যারেলের ভেতরটা ঝক্-ঝক্ করছে। একটা চোখ বন্ধ করে অভ্যাসমত দেখে নেয় সত্যকাম। তারপর ব্যাগের ভেতর খুঁজে দুটি এল্. জি টোটা বের করে।

ধীরে-সুস্থে বন্দুকটা লোড্ করে সত্যকাম। দুটি ব্যারেলই তৈরী এবার।

বন্দুকটা সন্তর্পণে পাশে রেখে দেয়। তারপর অতি আদরে সেতারটা টেনে নেয় সত্যকাম, অন্যমনস্ক ভাবে টুং-টাং আওয়াজ করতে থাকে তারে। কোন গান নয়, কোন গৎও নয়। শুধু টুং-টাং আওয়াজ।

কিন্তু এক একটা ঝঙ্কারের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে তার বুকের ভেতর থেকে নিঙড়েপড়া অশ্রুরাশি। গুমরে উঠছে রাজ্যের বেদনা একটা একটা গমকে।

দরজার বাইরে বসে রামহরি নিঃশব্দে চোখ মোছে। আর তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মাথা খোঁড়ে।

আরও গভীর হয় রাত্রি। খোলা জানালা দিয়ে পূব-আকাশের অগণিত নক্ষত্র তাকিয়ে আছে তার পানে। এখনও শুকতারাটি আসে নি সেখানে।

এবার দরবারী কানাড়ার আলাপ ফুটে উঠছে সেতারের ঝঙ্কারে। একটা সর্ব্বহারা আত্মা ঝড়ের রাতে পথ হারিয়ে কেঁদে মরছে।

দরজার বাইরে মিলি কাঁদছে রামহরির সাথে। মিলির পা জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে মাথা কুটছে সত্যকামের পুরাতন ভৃত্য।

সেতারটা রেখে বন্দুকটা তুলে নেয় সত্যকাম। চিবুকের নীচে নলটা লাগিয়ে জানালা দিয়ে পূব-আকাশের দিকে আবার তাকায় সত্যকাম। না, মিলির চোখ নেই সেখানে।

গ্রীণারের দুটো ঘোড়াই ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে এক সঙ্গে চাপ দেয় সত্যকাম। কিন্তু এ কি? ফায়ার হোল না কেন? তার সুদিনের সাথী বন্দুকটাও কি ত্যাগ করলো তাকে আজ? ওঃ! মনে পড়েছে, সেফটি ক্যাচটি রিলিজ করা হয়নি তো! বন্দুকের কুঁদোটি তুলে নেয় সত্যকাম, সেফ্টি ক্যাচটি ধীরে-সুস্থে রিলিজ করে আবার চিবুকের নীচে নলটা রাখে।

কিন্তু দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে?

এ তো রামহরি নয়? ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রামহরি। আর ডাকবে না সে। আর, তার কর্কশ হাতের আঘাত তো এ নয়? মৃদু করাঘাতের সঙ্গে চুড়ির টুং-টুং আওয়াজ বাজছে জলতরঙ্গের মত।

না, মন ছলনা করছে তাকে।

বন্দুকটা ঠিক করে ধরে আবার সত্যকাম দৃঢ় মুষ্টিতে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এগিয়ে দেয় ডবল ব্যারেল বন্দুকটার ঘোড়া দুটোর দিকে। এক সঙ্গে ফায়ার করতে হবে দুটো ব্যারেলই।

আবার বাধা! এবার ধাক্কা পড়ছে বেশ জোরে। কে বলছে রুদ্ধ কণ্ঠে, ওগো খোলো দরজা। খোলো, খোলো। দরজায় মাথা কুটছে বুঝি সাথে সাথে!

মিলি? আপন মনে হাসে সত্যকাম। আজ এই চরম মুহূর্ত্তে তাকে নিয়ে কত খেলাই খেলছে তার মন।

তবুও বন্দুকটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে সত্যকাম।

তারপর ধীরে-সুস্থে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, নিউ এম্পায়ারে মিসেস, ইন্দিরা বস্থণের পরিচালনায় অলকাপুরী সম্প্রদায় শকুন্তলা নাটিকাটি মঞ্চস্থ করলেন। সন্ধ্যা ছ'টায় অভিনয় আরম্ভ হ'ল। অতবড় রঙ্গালয়ে যাকে বলে তিল ধারণের জায়গা ছিলো না। স্থানাভাবে হতাশ চিত্তে ফিরে গেলো বহু লোক। প্রথমে অভিজাত মহলে উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হয়েছিলো বক্সের আর প্রথমশ্রেণীর কার্ডগুলো। তারপর জনসাধারণ টিকিট কেনবার অধিকার পেলো।

নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় সুমিতা ত্রিবেদী আর অনিরুদ্ধ বসুর অভিনয় দর্শকচিত্তে একাধারে আনন্দ আর বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলো। ওদের অভিনয় যেমন সাবলীল, তেমনি প্রাণবন্ত। দৃশ্যপট, রূপসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীত সবই উচ্চস্তরের, একথা সমালোচকরা একবাক্যে স্বীকার করলেন। এ ধরণের সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় নাকি খুব কমই দেখা গেছে, এরকম অভিমত দর্শকদের মুখে মুখে গুঞ্জরিত হতে লাগলো।

গ্রীণরুমে অনেকে এলেন মাসীমাকে অভিনন্দন জানাতে, এমন একটি অপূর্ব্ব আনন্দরস জনসমাজে পরিবেশনের জন্য।

অনিল আর করবীর সঙ্গে দিদিমাও এসেছিলেন অভিনয় দেখতে। বক্সে বসে সুমিতার অভিনয় দেখতে দেখতে ধিক্কার দিচ্ছিলেন নিজের দুরদৃষ্টকে। হায়, হায়, এ মেয়েটার জন্যে তো কেউ মাথা ঘামায়নি? আপনা হতেই কেমন উন্নতি হ'ল! আর তিনি নিজে কত কত

বাতিঘর

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

বুদ্ধি খরচ করলেন যার জন্যে, সে কিনা একেবারেই অন্ধকারে রইলো! একেই বলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা! সেই একচোখো অদৃশ্য ভাগ্য-বিধাতার অসহ্য পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে কি কিছু করবার নেই? তীব্র বিদ্বেষের জ্বালায় মুখ বিকৃত করলেন তিনি।

করবী চোখভরে মনভরে দেখছিলো তার অতি স্নেহের মিতাকে। মিতার প্রতি তার অন্তরে স্নেহের রুদ্ধদ্বার যেন অকস্মাৎ খুলে গিয়েছিলো। বান্ধবীর মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিলো—মাতৃহৃদয়ের বিগলিত স্নেহ-করুণায়।

সে এখন আর সুমিতার প্রতিদ্বন্দী নয়—মাতৃহীনা, পিতৃপরিত্যক্তা মেয়েটির প্রতি সে একাধারে মাতৃস্নেহ আর প্রিয়বান্ধবীর ভালোবাসার পসরা মেলে ধরেছে। ওর যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করুক। সুখী হোক বেচারী মেয়েটা।

উগ্র বিলাসিতা, অভিনব সাজসজ্জায় কৃত্রিম রূপসাধনার প্রয়োজনও শেষ হয়েছে তার। সে আর সেই আগেকার করবী নেই,—এখন শুভ্র পরিচ্ছদধারিণী অতি সাধারণ মেয়ে। মনে তার শুভ্রশুচিতার সাম্যভাব। মুখে সন্তোষপূর্ণ স্নিগ্ধ হাসি।

আজ এখানে আসবার সময় ওর পরনে সাধারণ শাদা শাড়ী দেখে, মায়া দেবী চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন—এ আবার কোন ঢং? নার্শের সাজ-পোষাক কেন? কাজের বদল হয়েছে বুঝি? এবারে কি হাসপাতালে ডাক পড়েছে?

করবী খিল-খিল করে হেসে জবাব দিয়েছিলো—না মা, অত সৌভাগ্য তোমার মেয়ের এখনও হয়নি!—তবে, অনেক দিন তো ছদ্মবেশ কাটালাম, এখন দিনকতক স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছি।

শুকতারাও এসেছিলো, তার প্রতিদ্বন্দিতার পরাকাষ্ঠা দেখবার অভিপ্রায়ে।

বক্সে ওর পাশে বসেছিলো অনিল। চারি পাশের দর্শকরা যখন সুমিতার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলো, তখন শুকতারা বিদ্রূপভরা কণ্ঠে করলো তার প্রতিবাদ।

—মিতার নাচে এখনও জড়তা রয়ে গেছে। মুখের ভাব আরো ভাবব্যঞ্জনাময় হওয়া উচিত ছিলো; তবে এই প্রথম তো? আশা করা যায় পরের অভিনয়টা আরো ভালো হবে। পায়ের ষ্টেপ এ জায়গাটায় আরেকটু দ্রুত হলে উতরে যেতো! গানের তাল যেনো ঠিক থাকছে না, নার্ভাস হয়ে পড়ছে বোধ হয়, ইত্যাদি।

ঠিক পাশের বক্সে বসে মিসেস বাসু শুনছিলেন শুকতারার শ্লেষ-বিদ্বেষভরা টুকরো টুকরো কথাগুলো। তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ রয়েছে নায়কের পার্টে; সেজন্যে অভিনয়টির উচ্ছ্বসিত প্রশংসার আশা করেন তিনি।

নায়ক-নায়িকা দুটোই অপূর্ব্ব লাগছে তাঁর চোখে, না, শুকতারার অর্থহীন বাক্যবাণগুলো হজম করা যায় না।

এক অঙ্ক শেষ হবার পর আলো জ্বলে উঠলো। মিসেস বাসু মুখ বাড়িয়ে বললেন——কে ওখানে? ও'মা! আমাদের শুকতারা যে, আমি ভেবেছিলাম অপর কেউ।

শুকতারা হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে অল্প হাসি ঠোঁটে মাখিয়ে বললো—আপনি রয়েছেন পাশের বক্সে? এতক্ষণ বুঝতে পারিনি তো? এই যে অজি, বিজি, তোমরাও এসেছো? পাশে উনি কে? ঠিক চিনতে পারছি না তো?

সব দেশেই সমাদৃত
সুনিপুন
শিল্পপ্রতিভায়
মৌলিকতায়
আধুনিকতায় ও নির্ভরতায়

—অজিতা ভ্রূ বাঁকিয়ে জবাব দিলো—আমাদের দেখা তো যথা-তথায় মেলে, কিন্তু তুমি ভাই এখন ছবির মানুষ ; সে কারণ তোমাকে আজ সশরীরে দেখতে পাওয়া, আমাদেরই গুডলাক্ বলতে হবে—এঁকে চিনতে পারলে না ?—আমাদের বাড়ী নিশ্চয়ই দেখেছো এঁকে,—অবশ্য অনেক দিন আগে। যখন অনেক বার যাতায়াত ছিলো তোমার আমাদের ওখানে। আচ্ছা, নতুন করে আবার ওঁর সঙ্গে পরিচয়টাই না হয় করিয়ে দিচ্ছি। মহারাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ রাও'র নাত্‌নী ইনি,—পম্পিয়া রাও। এবারে চিনতে পারছো বোধ হয় ?

—ওঃ হো ! ঠিক্ ঠিক্, মাপ করবেন পম্পা দেবি ! সত্যিই প্রথমে আমি ঠিক্ ঠাওর করতে পারিনি। ভারি খুসি হলাম আজ আপনাকে দেখে !—তবে রতনলাল ক্ষেত্রির কাছে আপনাদের খবর আমি পাই,—তাঁর বইতে আমার হিরোইনের পার্ট ছিলো কি না ?

—আই, সি. রতনলাল,—আমাদের গল্প খুব বাড়িয়ে বলে বুঝি ! হি-হি-হি-হি ! মুখে রুমাল চাপা দিয়ে পম্পিয়া হেসে ওঠে।

চাপা রোষ আর অপমানের জ্বালায় সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে শুকতারার। কৌশলে দমন করে মানসিক বিপর্যয় ; মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে—ওঃ,—এঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করানো হয়নি.—ইনি সুমিতার মামা, অনিল চাটার্জ্জি ; অনেকগুলো ছবিতে হিরোর পার্ট করেছেন, সে খবর বোধ হয় আর আমাকে বলতে হবে না ?

মিসেস্ বাসু এতক্ষণে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,—আপনি সুমিতার মামা ? ভারি খুসি হলাম দেখে।—আপনার ভাগ্‌নীর নাচ, গান, অভিনয় সবই এত চমৎকার লাগছে যে, দেখে আমি রীতিমত অবাক হয়ে যাচ্ছি। শুনলাম, এইটি নাকি ষ্টেজে ওর প্রথম অভিনয় ? মেয়েটিকে রূপে-গুণে একেবারে অনন্যা বলা চলে। আর এর মূলে রয়েছে মিসেস বর্দ্ধণের শিক্ষা, বাহাদুরী তাঁরও কিছু কম নয় !

অজি, বিজি, সমস্বরে বলে ওঠে,—ঠিক বলেছো মা, কি চমৎকার লাগছে সুমিতাকে আজ ! এবারে আমরাও কিন্তু অলকাপুরীর সভ্যা হবো, এ তোমাকে বলে রাখছি মা !

অনিল যে কি জবাব দেবে, ভেবে পায় না। সুমিতার সুখ্যাতি করে সে শুকতারার বিরাগভাজন হতে চায় না। আমতা-আমতা করে বললো—হ্যাঁ, মিসেস বর্দ্ধণের শক্তিকে মানতেই হবে। গুণী মহিলা। আর সুমিতাও—মানে—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলো শুকতারা—অসাধারণ, অনন্যা ! স্বর্গের ইন্দ্রাণীও হার মানে ওর কাছে ! এই তো ?

—তোমার ধারণা মিথ্যে নয় মা ! স্বর্গের ইন্দ্রাণীকে কল্পনা করা যায় এই রকম মেয়েকে দেখলে ! সুমিতা যে মর্ত্ত্যের ইন্দ্রাণী, একথা কে না বলবে ?

কথাগুলো বলতে বলতে মিসেস বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যাই, মিসেস বর্দ্ধণকে জানিয়ে আসি আমার অভিনন্দন ! আর সুমিতাকেও একটু উৎসাহ দিইগে। এস অজি, বিজি, পম্পা—সদলে মিসেস বাসু বক্স ছেড়ে উঠে গেলেন।

রুদ্ধ আক্রোশে ওষ্ঠ দংশন করলো শুকতারা। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝে শঙ্কিত হয়ে ওঠে অনিল। শুকতারার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, বড্ড বাড়িয়ে কথা বলেন ভদ্রমহিলা। মিতাকে অযথা কতকগুলো তোষামোদ বাক্য শুনিয়ে ওর মাথাটি একেবারে খেয়ে দেবেন দেখছি।

—উদ্দেশ্যটা ওঁদের হচ্ছে, ওকে বাড়িয়ে আমাকে ছোট করা। আমি ঘাস খাই না তো, ওসব কথার চাল বোঝবার মত মগজ আমার আছে। আর এসব নষ্টামির মূলে আছে ঐ অসীম। সেই সুমিতাকে খাড়া করেছে আমাকে ছোট করবার জন্যে। আচ্ছা, এ অপমানের প্রতিশোধ কেমন করে নিতে হয়, তা আমিও দেখিয়ে দেব।

আলো নিবলো, যবনিকা সরে গেলো, আবার আরম্ভ হল অভিনয়।

অগণিত দর্শকবৃন্দের সাধুবাদ ও সম্মিলিত করতালির সঙ্গে শেষ দৃশ্যের যবনিকাপাত হলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার সরে গেলো পর্দ্দা। শিল্পীদের নিয়ে স্বয়ং মিসেস বর্দ্ধণ এসেছেন ষ্টেজের ওপর। সহাস্যে ঘোষণা করলেন, অনিরুদ্ধ বসুর মাতা, স্বর্গীয় আর, এন, বসুর সুযোগ্যা পত্নী মিসেস বাসু আজকের অভিনয় দেখে, খুসি হয়ে কুমারী সুমিতা ত্রিবেদীকে একটি স্বর্ণপদক দান করেছেন আর শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ বসুর প্রাণবন্ত অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে রাজকুমারী পম্পিয়া রাও, তাঁকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দিচ্ছেন। অলকাপুরীর পক্ষ থেকে আমি এই মাননীয়া মহিলাদের তাঁদের গুণগ্রাহিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করলেন দর্শকবৃন্দ। বক্স থেকে শুকতারা জ্বলন্ত উল্কার মত ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলো, চলমান ভিড়ের সঙ্গে।

হতচকিত অবস্থায় খানিকটা এদিক ওদিক ওকে খোঁজবার বৃথা চেষ্টা করে, হতাশ চিত্তে অনিল একাই নেমে এলো পথে।

অনিলের সঙ্গ এড়ানোই ছিলো শুকতারার উদ্দেশ্য। সে চলে গেলো দেখে, রোষরুদ্ধ চিত্তে চললো গ্রীণরুমের দিকে। আজ সুমিতার দর যাচাই করবে সে। সেজন্য মোক্ষম আকর্ষণী বাণ হানবে অসীমের বুকে।

দেখা যাক সুমিতার ভালোবাসার বর্ম্ম কতখানি দুর্ভেদ্য ! গ্রীণরুমে যেতে হল না, পথেই দেখা হয়ে গেলো অসীমের সঙ্গে। একরাশ ফুল নিয়ে মহাব্যস্ত ভাবে সে চলেছে গ্রীণরুমের দিকে। পাশ থেকে শুকতারা চেপে ধরলো ওর একখানি হাত। একটু চমকে উঠে অসীম শুকতারাকে দেখে সহাস্যে বললো এই যে তারা, ভালো তো ? অভিনয় কেমন লাগলো বলো ?—

চমৎকার ! একেবারে অনির্ব্বচ্য। অতুলনীয় আরো কিছু বলতে হবে। যাক ভাগ্যিস অভিনয়টা দেখতে এসেছিলাম তাই ভাগ্যে মিললো তোমার দর্শন। একটা জ্বলন্ত তুবড়ী যেন ছিট্‌কে পড়লো—শুকতারার কণ্ঠ থেকে।

বিব্রত ভাবে জবাব দিলো অসীম—কেন, আমার দেখা পাওয়া তো খুব কষ্টসাধ্য নয় ? বরং তোমারই আজ-কাল দেখা মেলে না অলকাপুরীতে।

—আমার প্রয়োজন তো ফুরিয়েছে গো! জায়গাটি আমার বেদখল হয়ে গেছে; এখন গেলে যে স্থানাভাব ঘটবে, তাই সে পথ বর্জ্জন করা ছাড়া উপায় কি বলো? যাক্ সে কথা, আজ আমার গাড়ী নেই, দয়া করে একটু পৌঁছে দেবে কি? দেখো আবার কারুর মতামত নিতে হয় কি না।

মনে মনে যথেষ্ট অস্বস্তি অনুভব করা সত্বেও মুখে হাসি-খুসির ভাব মাখিয়ে বললো অসীম—এ কি একটা কথা হলো? তোমাকে পৌঁছে দেব না? এক মিনিট, মাসীমাকে ফুলগুলো দিয়ে আসি।

ক্ষিপ্র পদক্ষেপে গ্রীণরুমে চলে গেলো অসীম। বিজয় উল্লাসের তরঙ্গহিল্লোলে দুলে উঠলো শুকতারার আতপ্ত অন্তর। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ফিরে এলো অসীম। বাহুবন্ধনে ওর কটিদেশ আবদ্ধ করে এগিয়ে গেলো নিজের গাড়ীর কাছে।

পার্ক ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট ধরে ছুটে চলেছে অসীমের বুইক কার।

অসীমের মনে জেগেছে কিছুকাল আগেকার কথা। যখন শুকতারার সাহচর্য্য ছিলো তার নিত্যকার একান্ত প্রয়োজনীয়, কামনার বস্তু। কিন্তু সুমিতা তার জীবনে আবির্ভাব হবার পরেই ওদিকে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। সুমিতার রূপের চেয়েও তার সম্পত্তিই অবিশ্যি বেশী লোভনীয় তার কাছে। তা না হলে, মাদকতা ঢের বেশী শুকতারার ভেতর। আচ্ছা, এ দুটি নারীকেই কি জীবনের খাঁচায় ধরে রাখা যায় না? সামঞ্জস্য ঘটানো কি একেবারেই অসম্ভব? কখনই নয়। অন্ততঃ তার মত অসাধারণ মেধাবী পুরুষের পক্ষে অসম্ভব কথাটাই মূল্যহীন—বাজে।

শুকতারার কাঁধে হাতের চাপ দিতে দিতে বললো অসীম—কার ধ্যানে তন্ময় হয়ে আছো? মনটাকেই যদি ফেলে আসতে হলো, তবে কি প্রয়োজন ছিলো আমার সঙ্গে আসবার?

মুচকি হেসে ওর চোখের সঙ্গে চোখ মেলালো শুকতারা। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত দুটো লোভাতুর জ্বলজ্বলে চোখ! হ্যাঁ এইরকম একটা চাউনিই আজ কামনা করেছিলো তার অন্তর। এ চাউনির অর্থ জানে সে।

সুমিতা এসে কেড়ে নেবে তার প্রণয়ীকে—আর সেই পরাজয়ের অপমান নীরবে মেনে নিতে হবে?

সে পাত্রী শুকতারা দেবী নয়! অবশ্য এখন তু করে ডাকলেই অনেক শাঁসালো মাল গড়াগড়ি খাবে তার পায়ের তলায়—কিন্তু তাতে কি? সুমিতাকে ছোট করতে হলে, ফিরে পাওয়া চাই অসীমের পূর্ব্ব-অনুরাগ!

মনের উচ্ছ্বাস চেপে রেখে, ঠোঁট ফুলিয়ে বলে শুকতারা।—থাক্, থাক্, ঢের হয়েছে আর অভিনয়ে কাজ নেই, ওতে অরুচি ধরে গেছে; এখন দয়া করে বাড়ীর দিকে যাবে কি?

—না বাড়ী নয়, চলো ক্লাবে। চাপা গর্জ্জন অসীমের কণ্ঠস্বরে!

গাড়ীর ভেতরের ছোট ব্র্যাকেটের সামনের ডালা সরিয়ে অসীম বার করলো ছোট আকারের একটি কাচের বোতল। ঢক্ ঢক্ করে তার খানিকটা অংশ নিজে পান করে এগিয়ে দিলো শুকতারার হাতে।

—নাও, বাকিটুকু গলায় ঢেলে দাও।

—উঃ! আজ একান্তই ছাড়বে না দেখছি! কৃত্রিম কাতরোক্তি করে বোতলটি নিয়ে উজাড় করে নিজের গলায় ঢেলে দিলো শুকতারা।

বোতলটি ব্র্যাকেটে ফেলে দিয়ে,—অসীমের কাঁধের ওপর এলিয়ে দিলো নিজের মাথাটি। আধো-আধো বুলি ধ্বনিত হতে লাগলো অসীমের কানে, ধমনীতে, উত্তপ্ত মস্তিষ্কে।

মাই ডিয়ারেষ্ট! ও, মাই সুইট হার্ট!

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটে চলেছে অনিরুদ্ধর গাড়ী। ড্রাইভ করছে সে নিজে, পাশে তার অন্যমনস্ক ভাবে বসে ছিলো সুমিতা।

অসীম হঠাৎ কোন জরুরী প্রয়োজনে চলে গেছে, অগত্যা মাসীমা অনিরুদ্ধকে আদেশ করলেন, সুমিতাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে।

অভিনয় শেষ হবার পরেই দিদিমা চলে গিয়েছিলেন করবীকে নিয়ে। সুমিতার দেরী হবে, কারণ তখন অভিনন্দনের ভিড় জমেছে গ্রীণরুমে, আর অসীম তো আছেই ওকে পৌঁছে দেবার জন্যে, অনর্থক তিনি আর বসে থাকবেন কেন?

এলোমেলো চিন্তার বাতাস বইছে সুমিতার মনে। অভিনয়ের সাফল্য, মুগ্ধ অভিনন্দন, রাশি রাশি পুষ্পস্তবক, রঙিন আলোর ঝলমলানি, অজস্র স্তুতিবাদ; কি দিলো তাকে?

মনে কেন এত অস্থিরতা? অতৃপ্তির দংশন? কি প্রয়োজন তার? কিসের জন্য প্রাণে এ আকুলতা?

—কিন্তু এ কোন্ রাস্তা? কোথায় চলেছে সে?

—আমরা কি বাড়ীর দিকে যাচ্ছি না? অনিরুদ্ধকে প্রশ্ন করে সুমিতা।

—না মিতা, তোমাকে যে একদিনও একলা একান্ত নির্জ্জনে পাইনি আমি। তাই আজ তোমার মত না নিয়েই একটু নির্জ্জনপথে এগিয়ে চলেছি; কিছু অন্যায় করলাম কি?

—বড্ড রাত হয়ে গেছে অনিরুদ্ধ বাবু! আজ ফিরে চলুন, অন্য আরেক দিন আসবো এ পথে। কাতর অনুনয় ভরা সুরে বলে সুমিতা।

ওর একখানি হাত নিজের হাতে টেনে নেয় অনিরুদ্ধ। মিনতি ভরা কণ্ঠে বলে,—তুমি কি আমার মনের কথা কিছুই বুঝতে চাও না মিতা? এই হাতখানি পাবার আশা আমার পক্ষে কি একান্তই দুরাশা? আমি কিসে তোমার অনুপযুক্ত? বলো, বলো, একটা জবাব দাও মিতা!

কয়েক মুহূর্ত্ত বিহ্বল ভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো সুমিতা, দুটি চোখ ভরে যায় জলে। হাতখানি ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো সে, বেদনা-ম্লান চোখ দুটি ওর চোখের সামনে তুলে ধরে।

—এ অভিশপ্ত সঙ্গ আপনি আর কামনা করবেন না অনিরুদ্ধ বাবু!—আপনি আর কামনা করবেন না।—ক্ষমা করুন আমাকে।

অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে গলার স্বর তার থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। তাকে দমন করার অভিপ্রায়ে দু হাতে মুখ ঢাকা দেয় সুমিতা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, বাঁধভাঙা বন্যার মত হু হু করে

অশ্রুবন্যা নেমে এলো ওর দুটি চোখের কূল ছাপিয়ে। দু হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে সুমিতা।

অবাক লাগে অনিরুদ্ধর। এতখানি ভেঙে পড়বার কি এমন কারণ ঘটলো? নিজেকে যেন বড় অপরাধী বলে মনে হল।

ব্যথিত কণ্ঠে বলে সে—আমাকে ক্ষমা করো মিতা! না জেনে যদি তোমার মনে আঘাত করে থাকি। বিশ্বাস করো, শুধু তোমাকে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো কুমতলব আমার মনে নেই। কোনো অশুচি বাসনাকে আমি মনে পোষণ করিনি। চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। গাড়ী ঘুরিয়ে নিলো অনিরুদ্ধ।

আঁচলে চোখ মুছে অনিরুদ্ধর পানে চাইলো সুমিতা। সত্যিই কোনো পঙ্কিল কামনার ছায়া নেই তো ওর মুখে? পবিত্র ভাবগম্ভীর মুখখানি যেন বড় চেনা-চেনা। ষ্টীয়ারিংধরা ওর হাতখানির ওপর নিজের হাতটি রেখে শান্তভাবে বলে সুমিতা—আমার দাদা নেই, আমার সে শূন্যতা কি আপনি পূরণ করতে পারেন না অনিরুদ্ধদা'? মাকে হারিয়েছি, বাপ থেকেও নেই! আমার দাদাদা'—সেও বহু—বহুদূরে। একটু স্নেহের অভাবে জীবনটা যেন আমার মরুভূমি হয়ে গেছে।

সবাই চায় আমার রূপ, আমার দেহ, আমার সম্পত্তি, সত্যিকারের ভালো আমায় কেউ বাসে না দাদা! প্রকৃত আপনজন আমার কেউ নেই। তাই মনে হয়, আমি যেন একটা বন্ধনহীন জ্বলন্ত উল্কা। শুধু জ্বলে জ্বলে, ফুরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর বুঝি কিছু নেই আমার জীবনে।

চমক লাগে অনিরুদ্ধর মনে। সম্রাজ্ঞীর ছদ্মবেশের অন্তরালে এ কোন্ বেদনাময়ী নারী আত্মগোপন করে ছিলো এতদিন! ওর প্রতি গভীর মমতায় ও বেদনায় অনিরুদ্ধর সারা অন্তরটা যেন হায় হায় করে উঠলো! দরদভরা গলায় বলে সে—এত দুঃখ, এত হতাশা, কেন তোমার মনে মিতা? মা, বাবা তো সকলের থাকে না? কত ঝড়-ঝাপটা, অভাব-অনটন আছে মানুষের জীবনে, তবুও অমন ভেঙে পড়লে চলে কি? তোমার আপন জনও তো অনেকে আছেন, তবে আমি জানি না, প্রকৃত ব্যথা তোমার কোনখানে। যদি জানতে পারি, জীবন দিয়ে তোমার সে ব্যথা মুছে দেবার চেষ্টা করবো মিতা! বলবে আমায়? দেবে আমাকে সে অধিকার?

বলবো দাদা, সব বলবো। আপনাকে না বললে আমি পাগোল হয়ে যাবো যে! তবে আজ নয়, আরেক দিন। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনার ছোট বোনের স্থান আমাকে দিলেন কি না? সেই পবিত্র স্নেহের দাবী আমি করতে পারি কি না আপনার কাছে?

একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে অনিরুদ্ধ সুমিতার ম্লান-করুণ মুখখানির পানে। তারপর গভীর স্বরে বললো—হ্যাঁ, দিলাম তোমাকে সে অধিকার।

ঘন কালো মেঘের যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করেছে আকাশের চাঁদ-তারা। নিথর নিঝুম কালো রাত্রি! স্তব্ধ বাতাস। বোবা গাছপালা, ঝপসি অন্ধকারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রেতিনীদের মত! জনবিরল পথে হু-হু শব্দে ছুটে চলেছে অনিরুদ্ধর গাড়ীখানি। ষ্টীয়ারিং ধরে আত্মসমাহিত ভাবে বসেছিলো অনিরুদ্ধ। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অঘ্রাণের ঠাণ্ডা বুঝি শীতল করতে পারেনি ওর মনের দাহজ্বালাকে। অন্তর্বেদনার জমাট উত্তাপ, বিন্দু বিন্দু আকারে ঝরে পড়ছে কপাল বেয়ে। সীটে হেলান দিয়ে বড় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে সুমিতা। ওর-ও চোখের কোণে জল-জল করছে জমাট অশ্রুকণা! কিন্তু ওর এ অশ্রু বেদনার নয়, কোনো আপন জনকে ফিরে পাওয়ার নিবিড় শান্তিসিক্ত হৃদয়ের পুলক-বিগলিত অশ্রু! [ক্রমশঃ।

সুদানের কথা কিছু

লীলা মজুমদার

বারান্দায় বসে আছি চুপচাপ। নিস্তব্ধ দুপুর। চার ধারে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। অস্বাভাবিক গরম চলেছে এখন এখানে—আমাদের দেশের পচা ভাদ্রের জের এখানে আশ্বিন মাসেও চলেছে পুরোদমে—বিরাট এক কম্পাউণ্ড নিয়ে আমাদের এ সরকারী বাড়ী। তাতে আছে নাম-না-জানা অনেক রকম গাছ ও ফুলগাছের সারি। পরিচিত গাছের ভেতরে আছে আমাদের দেশের নিমগাছের মতনই এক রকম গাছ, তবে একেবারে এক না হোলেও এক পরিবারভুক্ত তো বটেই। এ গাছগুলো থাকার দরুণ মরুপ্রান্তরের উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে এলেও নিমপাতার শীতল পরশে শীতল হোয়ে এ অসহনীয় গরমে আমাদের গায়ে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। ফুলের সারির ভেতরে রঙ্গীন ফুল ও মাধবীলতাকেই একেবারে অতি পরিচিত মনে হয়। এখানকার সব চাইতে নয়নাভিরাম মনে হয় পাখীদের মেলা! কি সুন্দর সুন্দর রং-বেরংয়ের পাখী যে এখানে দেখা যায়, আর কোথাও আমি দেখিনি তা! ছোট ছোট পাখী কিন্তু কি অপূর্ব্ব সুন্দর তাদের রংয়ের বাহার! মনে হয় বুঝি কোনও বিখ্যাত শিল্পী অতি মনোনিবেশ সহকারে তাদের রং মিলিয়ে মিলিয়ে সাজিয়ে মরুর দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন—ওদের সুন্দর রূপে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করবার জন্য। সত্যি বোধ হয় তাই! তা নইলে নিগ্রোদের দেশে এত সুন্দর পাখীর সমাবেশ আশ্চর্য্য বই কি!

তবে নিগ্রোর দেশ বলাটা আমার ঠিক নয় বোধ হয়। নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও আলোকপ্রাপ্ত সুদানবাসিগণ নিজেদের নিগ্রো বলে পরিচয় দিতে একেবারেই নারাজ, কিন্তু আমাদের চিরাচরিত বদ্ধমূল ধারণা, আফ্রিকার অধিবাসিগণ সকলেই নিগ্রো। তাই বলে আমরা মিশরবাসিগণকে নিগ্রো বলি না, তাদের বলি মিশরীয়। তেমনি সুদানের অধিবাসিগণও নিজেদের নিগ্রো না বোলে পরিচয় দিতে চান সুদানী বা আরবীয় বোলে। কেন, তারও অবিশ্যি যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে দেবে। নিজেদের সম্বন্ধে সকল বিষয়েই সচেতন এরা এখন, বিশ্বের দরবারে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জেগেছে অদম্য বাসনা। তার জন্যই আমন্ত্রণ কোরে আনছে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ হ'তে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক ও আইন-বিশেষজ্ঞদের।

তিমিরাচ্ছন্ন মহাদেশের বুকে একটি অখ্যাতনামা স্থান ছিল সুদান। বিশ্বের কেউই বিশেষ খবর নেবার প্রয়োজন মনে করতো না, কি হচ্ছে না হচ্ছে এই বিরাট আয়তনের দেশটির ভেতরে, শুধু এর

যুগ্ম ইংরেজ ও মিশরীয় শাসনকর্ত্তাদের স্বার্থ-প্রণোদিত, লুব্ধ সজাগ দৃষ্টি ছাড়া। কিন্তু বিশ্বের চোখের অন্তরালেই অনেক ঘটনা সংঘটিত হোয়ে যাচ্ছিল এর বুকে এবং শিক্ষিত সুদানবাসিগণ যথেষ্ট সচেতন হোয়ে উঠছিল নিজেদের সম্বন্ধে। স্বাধীনতার মন্ত্র জেগে উঠছিল তাদেরও অন্তরের অন্তস্তল হতে। তাই এতদিনকার সুপ্ত সুদানিগণের শিক্ষিত মন যখন শৃঙ্খলতার হাত হ'তে নিজের দেশকে মুক্ত করবার জন্যে প্রথমে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী জানালো ইংরেজ ও মিশরীয় দরবারের কাছে, তখনি টনক পড়লো

এর শাসনকর্ত্তাদের মাঝে এবং জগতের সকল সভ্যদেশীয়দেরই বিস্ময় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টি এসে পড়লো সুদানের উপরে, এর আকস্মিক নব জনজাগরণে—

"হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।"

কি কোরে এ জাগরণ প্রথম সুরু হোল এদের ভেতরে, বলতে গেলে বলতে হয় কিছু সুদানের পূর্ব্বতন যুগের কথা। আজ দুপুরের শান্ত নির্জ্জন পরিবেশে বসে চার ধারের পারিপার্শ্বিকতা হ'তে মাঝে মাঝে মনটা দূরে সরে গিয়ে ভাবছে, কি কোরে এদের মনে জাগলো প্রথম আলো! জেগে উঠলো স্বাধীনতার বীজমন্ত্র! এ নিশ্চয়ই ভগবানেরই অমোঘ বিধান। মানুষের অধিকার হ'তে তাকে বেশী দিন বঞ্চিত কোরে রাখা যায় না। একদিন না একদিন সকলের মনেই পরাধীনতার জ্বালা জেগে উঠে এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য জীবন মন তুচ্ছ কোরে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে—যদিও সুদানবাসিগণকে খুব বেশী সংগ্রামের সম্মুখীন হ'তে হয়নি তবুও ইঙ্গ-মিশরীয় শাসনকর্ত্তাদের আমলে এদের ক্রমজাগরিত রাজনৈতিক প্রসারতা আলোচনা করলে দেখা যায়, এর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ধারা আছে। প্রথমতঃ ১৮৯৮ হ'তে ১৯৩৮, দ্বিতীয়তঃ ১৯৩৮ হ'তে ১৯৫১, আর তৃতীয়তঃ ১৯৫১ হ'তে ১৯৫৩—সময়গুলোর সাথে সাথে এদের সমস্ত ইতিহাসই চোখের সামনে ভেসে উঠে একে একে এবং অবশেষে কি কোরে ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী এরা নিজেদের স্বাধীন বোলে ঘোষণা করে। জানাতে ইচ্ছে করে আমার দেশবাসিগণকে—যারা এখনও বিশেষ কিছুই খবর রাখেন না সুদান সম্বন্ধে—আজ সুদান আর ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান বোলে পরিচিত নয়—বিশ্বের কাছে আজ এর একমাত্র পরিচয় 'দি রিপাবলিক অব দি সুদান'—জনগণের দ্বারা পরিচালিত গণতান্ত্রিক দেশ।

সুদান একটি বিশাল দেশ—এর আয়তন প্রায় ১০,০০০০০

বর্গমাইল—আমাদের ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের সমান—কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ১০, ০৬৬, ৬১৬। ইহার পরিধি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান এবং এই বৃহৎ পরিধির মধ্যে জলবায়ু কৃষিকার্য্য ও জীবিকা নির্ব্বাহের বৈষম্য খুবই দেখা যায় এবং এর অধিবাসিগণের মধ্যেও যথেষ্ট জাতিগত প্রভেদ আছে। জলবায়ু, অবস্থান ও এর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সমস্ত কিছু আলোচনা করলে সুদানকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়—উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ।

ইহার উত্তর সীমায় ওয়াদী হালফা সাহারা মরুভূমির অন্তর্গত দু'শো মাইলব্যাপী আতমার মরুভূমিতে অবস্থিত—এই মরুভূমির মধ্যভাগ দিয়ে নীলনদ প্রবাহিত—এবং এই রূপালী নদীর দুধারে প্রকৃতির অনবদ্য দান এর আশে-পাশের অধিবাসিগণের জীবন প্রণালী সহজ ও সরল করে দিয়েছে। এই নদীর পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের অবস্থিতি ও জীবনধারণ অনেকটা মিশরের দক্ষিণাঞ্চলের মতন। এখানে বৃষ্টি একেবারেই হয় না এবং ইহাই এখানকার বিশেষত্ব—শীত ও গ্রীষ্ম দু'টোই ভয়ানক বেশী, সমস্ত সুদানের ভেতরে মধ্যসুদানই সব চাইতে বেশী ঘনবসতি ও উন্নতমান স্থান। ওয়াদী হালফা হ'তে ৪৫০ মাইল দক্ষিণে সমগ্র সুদানের রাজধানী খারটুম এই অঞ্চলে অবস্থিত। ব্লু নাইল ও হোয়াইট নাইলের মধ্যবর্ত্তী জমির উপরে ভারী সুন্দর ভাবে পরিকল্পিত এ সহরটি সাজানো বাগানের মতন অবস্থিত। এ জায়গাটির অবস্থানের সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে হাতীর শুঁড়ের সাথে—তাই এর নামকরণ হোয়েছে খারটুম অর্থাৎ হাতীর শুঁড়।

এখানে প্রায় ৭১,০০০ হাজার লোকের বসতি। ভিন্ন ভিন্ন বহু দেশীয় অধিবাসীই এখানে বসবাস করে। এখানেও শীত ও গরম দু'টোই বেশী, তবে গরমের প্রকোপটাই একটু বেশী মনে হয়। সে সময় খারটুম প্রায় বসবাসের অনুপযুক্ত হোয়ে উঠে। অবিশ্যি শুধু খারটুম নয়, সমগ্র সুদানই তখন মরুর প্রকৃত রূপ ধারণ করে। কিন্তু তা হোলেও খারটুমের গরমের যেন তুলনা মেলা ভার; আবার শীতকাল এত স্নিগ্ধ ও মনোরম হোয়ে দেখা দেয় যে, তখন এই প্রচণ্ডরূপের কোনও আভাসই পাওয়া যায় না।

নাইল নদীর পশ্চিমে ব্লু নাইল ও হোয়াইট নাইলের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত সহর ওমদুরমান। এখানে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে অনেক কিছুই—উনবিংশ শতাব্দীতে ১৫ বছরব্যাপী খলিফার রাজত্ব কালের মেহেদী গভর্ণমেন্টের স্মরণীয় অনেক কিছু এখানে দেখতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ এক কালে খলিফার আবাসস্থল, বর্ত্তমানে নানান রকম সেকালের অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাহিত্য প্রভৃতির যাদুঘররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওমদুরমান এক কালে ধর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ও নানাবিধ শিল্পকলায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। এখনও এখানে সোনা-রূপার, হাতীর দাঁতের ও চামড়ার সুক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত সৌখিন দ্রব্যের প্রচুর সমাবেশ আছে। বর্ত্তমানে অনেক ভারতীয় গুজরাটী এখানে ব্যবসায় ও বসবাস সুরু করেছে, ফলে ভারতের সহিত নানাবিধ ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে সুদানের যোগ স্থাপিত হোয়েছে। একটি গর্ব্বের বিষয় এই যে, একবার শ্রীসুকুমার সেন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সুদানে এসে এদের মনে একরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যে, ওমদুরমানের একটি অন্যতম প্রধান রাস্তার নামকরণ হোয়েছে তাঁরই নামে।

মধ্যসুদান তিনটি প্রদেশে বিভক্ত—ব্লু নাইল, কর্দোফান ও কাসালা। ব্লু নাইল প্রদেশের রাজধানীই ওয়াদমেদানী। যেখানে ভারতীয় সরকারী ইঞ্জিনিয়ারদের বাস, ব্লু নাইল নদীর ধারে এ জায়গাটির অনেকটা আমাদের বাংলাদেশের মতনই পরিবেশ ও আবহাওয়া। মরুর দেশে অবস্থিত হোলেও এর চার ধারে প্রকৃতির শ্যামল রূপের অবধি নেই। তার জন্যই এ জায়গাটিকে গ্রীণল্যাণ্ড অব সুদান অর্থাৎ সুদানের সবুজের দেশ বলা হয়। গরম কালে দিনের বেলা গরম যদিও মাঝে মাঝে সত্যি হয় খুবই বেশী কিন্তু কোলকাতার মতনই আবার সন্ধ্যের পর হালকা ঝিরঝিরে এক ঠাণ্ডা হাওয়া নদীর ওপর দিয়ে বয়ে এসে সারাদিনের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে দেয় আমাদের।

এখানেও আছে বিভিন্ন দেশীয় বহুজাতির বসবাস—ভারতীয়, ইংরেজ, ইজিপ্সিয়ান, সিরিয়ান, আর্মেনিয়ান, গ্রীক ও দক্ষিণ-আফ্রিকার বাসিন্দাও কিছু কিছু। ভারতীয় গুজরাটীদের সংখ্যা বেশী এবং সকলেই ব্যবসায় উপলক্ষে এদেশে এসে স্থায়িভাবে বসবাস সুরু করে দিয়েছে।

ব্লু নাইল প্রদেশ ছাড়াও খারটুমের দক্ষিণে ব্লু নাইল ও হোয়াইট নাইলের মধ্যবর্ত্তী জায়গায় জেজিরা অবস্থিত। সেখানকার জমির উর্বরতা খুবই প্রসিদ্ধ। লক্ষ লক্ষ জমি নিয়ে তুলো, গমজাতীয় একরূপ শস্য ও বীনের সবুজ চাষ সমস্ত জায়গাটিতে মরুপ্রান্তরে এক অভিনব রূপ প্রদান করে। তুলোর চাষ ও তার উৎকর্ষতাই এদেশের সমৃদ্ধির একমাত্র অন্যতম কারণ।

মধ্যসুদানের ভৌগোলিক বিশেষত্বের সাথে আরব দেশের কিছু কিছু অংশের সাদৃশ্য মেলে—সপ্তম শতাব্দীতে কিছু কিছু আরব মিশরের পথে বা লোহিত সাগর অতিক্রম কোরে সুদানে বসবাস করতে এসেছিলো এবং হ্যামেটিক ককেশিয়ানদের মতন হ্যামেটিক নিগ্রোদের তাড়িয়ে নিজেরা মধ্যসুদানে বাস সুরু করেছিল। কাজেই দেখা যায়, মধ্যসুদানের কয়েকটি জায়গা ছাড়া যেখানে অধিবাসিগণ পূর্ব্বতন সুদানীদেরই বংশধর, তারা ব্যতীত আর সকলেই আরব-বংশোদ্ভূত। তবে এদেশীয়গণ যে নিজেদের একমাত্র আরবরক্তসম্পন্ন বোলে দাবী করে, তাতে ঐতিহাসিকদের মাঝে খুবই মতদ্বৈধ দেখা যায়। আমাদের অবিশ্যি সে দ্বন্দ্বে প্রয়োজন নেই—শুধু এদেশীয়রা নিজেদের নিগ্রো বোলে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক, তাই জানাবার জন্যই এর অবতারণা। আমার কিন্তু মনে হয়, সুদানের অধিবাসিগণকে সুদানী বলাই যুক্তিসঙ্গত। কি হবে তার সত্য যাচাই করবার জন্য যুগ যুগ পূর্ব্বের বংশাবলী আলোচনা করবার? তবে এরা যে একেবারেই নিগ্রো নয় শুধু মাত্র আরবীয়, তা মানতেও কিন্তু মন চাইবে না, শুধু প্রকাশ না করলেই হোল।

এখানে ভাষা একমাত্র আরবী, তবে এদেশীয়দের আরবী নাকি প্রকৃত আরবী ভাষা হ'তে কিছুটা স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ছাঁদের। অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই মুসলমান, কিছুসংখ্যক খৃষ্টানও আছে।

এবারে কিছু বলি দক্ষিণ-সুদানের কথা। সুদানের দক্ষিণ প্রান্ত সীমারেখার পরই বেলজিয়াম কঙ্গো, উগাণ্ডা, কেনিয়া অবস্থিত। এ স্থানে বৃষ্টি অন্যান্য জায়গা হতে কিছুটা বেশী হয় এবং তার জন্য গরমের সময় গরমের তাপও কিছুটা কম হয়। এর অধিকাংশই নিবিড় বনরাজিতে আচ্ছন্ন এবং এখনও উত্তর বা মধ্যভাগ

হ'তে দক্ষিণে যাবার রেলপথ হয়নি। প্লেনে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে কিন্তু তা এত ব্যয়সাধ্য যে, সাধারণের পক্ষে তা ব্যবহার করা একটু কষ্টকর বৈ কি? এ ছাড়া আছে নাইল নদীর উপর দিয়ে ষ্টীমারে যাবার ব্যবস্থা। সেটা যদিও সময়সাপেক্ষ, তবুও ভারী চমৎকার সে ভ্রমণ! ষ্টীমারে যাবার সময় নদী ও তার পার্শ্বস্থিত অঞ্চলটি ঠিক ছবির মতন দেখতে মনে হয়। নদীর ধারে ধারে লম্বা ঘাস ও একেশীয়া গাছের সারি।

মাঝে মাঝে দেখা যায় অপূর্ব্ব সুন্দর সব পাখীর প্রাচুর্য্য। ধীরে ধীরে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হোলে আফ্রিকার বিখ্যাত কুমীর, হিপোপটেমাস ইত্যাদির নাকি দর্শন প্রায়ই মেলে। আমাদের ভাগ্যে যদিও এখনও দেখবার সম্ভাবনা হয়নি, তবুও এদের মুখে শুনতে পাওয়া যায় খুব—আরও দক্ষিণে ইকোয়েটোরিয়ার প্রাদেশিক সহর জুবা অভিমুখে অগ্রসর হোলে সুরু হয় ঘন বনরাজি—যেখানে ষ্টীমার হ'তেও মাঝে মাঝে দেখা যায় বুনো হাতীর দল চরে বেড়াচ্ছে লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতরে। তা ছাড়া বুনো মোষ, জিরাফ, গণ্ডার, সিংহ ও অন্যান্য হিংস্র বন্যজন্তুরও প্রচুর বাস আছে এই দক্ষিণের জঙ্গলে।

এখানকার অধিবাসিগণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং পোষাক-পরিচ্ছদে এখনও যথেষ্ট অচেতন। এখানকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নানাবর্ণের জাতির সমাবেশ এবং এত বেশী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সব জাতির উৎপত্তি যে, তা লিখতে গেলে আরেক অধ্যায়ের সৃষ্টি হোয়ে যাবে।

সুদানে বহুদিন যাবৎ ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা প্রসার লাভ করেছিল। ক্রীতদাস-ব্যবসায়িগণ মিশরের পাশা ও সুদানে মিশরীয় শাসনকর্ত্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় ইহা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। ইংরেজ ভ্রমণকারিগণ ধীরে ধীরে যখন মিশর হ'তে সুদানের দিকেও তাদের অভিযান শুরু করেন, তখনি তাদের প্রথম দৃষ্টি পড়ে এই ক্রীতদাস ব্যবসার প্রতি। ১৮১১ খৃঃ জে, এল, বুরখার্দ্দ তাঁহার 'সুদান অভিযান কাহিনী'তে ইহা প্রথম প্রকাশিত করেন এবং তাহার পর হতেই অন্যান্য ভ্রমণকারিগণও মিশরে মহম্মদ আলি পাশার অধীনস্থ ইংরেজ ব্যবসায়ী ও কর্ম্মচারিবৃন্দের নিকট হ'তে তাহাদের প্রতিবেশী দেশ সুদান সম্বন্ধে নানান তথ্য সংগ্রহ করে এবং প্রকৃত তথ্য অবগত হোয়ে মহম্মদ আলি পাশার নিকট এর তীব্র প্রতিবাদ করে। সেখান হ'তে বিফল মনোরথ হ'য়ে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন এই ক্রীতদাস প্রথা দমন করবার উদ্দেশ্য নিয়েই বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও কতিপয় বৃটিশ ক্রীতদাস-দমন সমাজ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং এদেরই প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই ক্রীতদাস ব্যবসা সুদান হ'তে চিরতরে বন্ধ হোয়ে যায়।

কিন্তু বৃটেনের মিশর অধিকারের পূর্ব্বে সুদানের সাথে কোনও রূপ রাজনৈতিক বা বাণিজ্য সম্পর্কীয় সম্বন্ধ গড়ে ওঠবার সুযোগ সম্ভব হয়নি। ১৮৮২ খৃঃ মিশরে তাদের অধিকার স্থাপিত হবার পর সুদান অভিমুখেও সে অধিকার প্রসারিত করতে বৃটেন মনোনিবেশ করে। সে সময়ে সুদানে আভ্যন্তরীণ নানাবিধ গোলযোগ চলছিল। যাহারা শাসনপদ্ধতিতে একেবারেই অজ্ঞ ও অকর্মণ্য বোলে প্রতীয়মান হোত, তাদেরই বিশেষ কোরে সুদানে পাঠানো হোত শাসনকর্ত্তারূপে মিশরের প্রতিভূস্বরূপ। অথবা যাহারা মিশরে অক্ষম বা অবাঞ্ছনীয় বোলে গণ্য হোত, তাদের শাস্তিস্বরূপ পাঠানো হোত সুদানের শাসক হিসেবে। এবং এই জাতীয় শাসকগণ সুদানের শাসন-পদ্ধতিতে বিন্দুমাত্রও উন্নতি বিধান না কোরে শুধুমাত্র নিজেদের ধন ও ঐশ্বর্য্য বাড়াবার প্রতিই বেশী মনোযোগী হোয়ে উঠতো। ফলে দেশের ভেতরে খাদ্যাভাব, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা খুবই ছিল। দেশের এমনি দুর্দ্দিনে মহম্মদ আলি ইবন আবদুল্লা নামে এক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি নিজেকে "আল্ মেহেদী আল্ মুন্তাজার" অর্থাৎ "সত্য পথের পথ-প্রদর্শক" বোলে ঘোষণা করেন এবং শাসনতন্ত্রের এই অপব্যবহারকে নিজ বিপ্লবের একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাস, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অপরাজেয় নেতৃত্ব এবং সেই সঙ্গে বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির প্রতি জনসাধারণের তীব্র বিরাগ ও অসন্তোষ তার তিন বছরব্যাপী বিপ্লবে (১৮৮১—১৮৮৪) সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তিকে পরাজিত কোরে নিজেকে দেশের ধর্ম্মপালক শাসনকর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায় হয়। তাহার মৃত্যুর পর খলিফা আবদুল্লাইর দীর্ঘ তেরো বৎসরব্যাপী সুদানে রাজত্ব করার পরই সুদান ইঙ্গ-মিশরীয় শাসনকর্ত্তাদের অধীনে চলে আসে।

কিন্তু সুদান ইঙ্গ-মিশরীয় শাসনকর্ত্তাদের শাসনাধীনে আসার পর দীর্ঘ ৪৭ বৎসরের ব্যবধানে পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক কিছুই সংঘটিত হয় এবং সেই সময়ে এ দেশেও দেখা দেয় অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। এদের দেহে-মনে-প্রাণে—দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রমোন্নতির সাথে সাথে আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন হয় এবং দেশে শিক্ষা যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করে। ধীরে ধীরে স্কুল-কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় এবং সুদানিগণ ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত হোয়ে রাজনৈতিক ভাবাপন্ন হোয়ে উঠে এবং নিজেদের সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনও হোয়ে উঠে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম জাতীয় সচেতনতা দেখা দেয়, প্রথম মহাযুদ্ধের পর—১৯২১ হ'তে ১৯২৪ সালেই প্রথম কয়েকটি দল ও সমাজ গড়ে উঠে, যারা কেউ কেউ স্বাধীন হবার জন্য, কেউ বা শুধু মিশরের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য দাবী জানায়। এই সময় হ'তেই দেশবাসীর মধ্যে প্রতিবাদ জানাবার সাড়া জেগে উঠে এবং বড় বড় সহরের উপর দিয়ে তা শোভাযাত্রা সহকারে ঘোষণা ক'রবার স্পৃহা দেখা দেয়। ফলে দেশে কিছু দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হোতে থাকে এবং ইহাই ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের ইতিহাসে প্রথম রাজনৈতিক বিপ্লব-রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু গভর্ণমেন্টের কঠোর শাসনে রাজনৈতিক সচেতনতায় এ অঙ্কুর অচিরেই বিনষ্ট হোয়ে যায়।

আবার ১৯৩১ খৃঃ শিক্ষিত সুদানীদের ভেতরে রাজনৈতিক ভাব পুনর্জ্জাগরিত হোয়ে উঠে—এই সময়ে খার্টুমের গর্ডন কলেজের গ্রাজুয়েট ছাত্রদের প্রথম আন্দোলন সুরু হয় এবং তখনই তারা রাজনৈতিক প্রয়োজনে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা লাভ করে। ইহার ফলে ১৯৩৭ সালে 'গ্রাজুয়েট সাধারণ কংগ্রেস'এর উৎপত্তি হয়। প্রথমে ইহার কার্য্যাবলী স্কুল-কলেজেই সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমশঃ সমগ্র শিক্ষিত সুদানীদের মধ্যে ইহা প্রচারিত হয়। এই কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দের রাজনৈতিক মনোভাব বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে না পারায় গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ইহা সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয়।

ধীরে ধীরে কংগ্রেসের কার্য্যধারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রবেশ লাভ

করে—প্রথমে ১৯৪২ সালের ৩রা এপ্রিল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট সমগ্র সুদানের তরফ হ'তে ইঙ্গ-মিশরীয় শাসনকর্ত্তাদের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন—তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দাবীর প্রস্তাব। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তা সম্পূর্ণ অনমুমোদিত হয় এবং রাজনৈতিক কোনও রূপ আলোচনাতেও গভর্ণমেণ্ট অসম্মতি প্রকাশ করে। তবে কয়েক জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে মৌখিক আশ্বাস দিলেও সরকারী ভাবে লিখিত কোনরূপ লিখিত আশ্বাস দিতে রাজী হোলেন না। ইহার ফলে কংগ্রেসেও দু'টি দলের সৃষ্টি হয়—একটি মৌখিক আশ্বাসে আস্থাবান হোয়ে পৃথক একটি দল গড়ে তোলে এবং নাম হয় Umma Party, এবং অপর যারা কোনও সরকারী ভাবে লিখিত আশ্বাস ব্যতীত আর কিছুতে আস্থাবান নয়, তারা মিশরের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার আশায় এক'পৃথক দল গড়ে তোলে—যার নাম হয় Unity Party. যখন শেষোক্ত দল কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রাধান্য লাভ করে তখন তারা মিশরের সাথে যুক্ত থেকে তাদের অধীনে ডিমোক্রেটিক সুদানী গভর্ণমেণ্ট তৈরী করবার প্রস্তাব গভর্ণর জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

১৯৪৫ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মিশরের সাথে কথাবার্ত্তা চালাবার এ প্রস্তাব অনুমোদন করে—তখন কংগ্রেসের কয়েকজন স্বাধীন সভ্যের সুবিবেচিত চিন্তার ফলে দু'টি বিরুদ্ধ সুদানী দল কয়েকটি সর্ত্তানুযায়ী পরস্পরের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে সম্মত হয় এবং তাদের সকলের পক্ষ হ'তে কয়েক জন সুদানী প্রতিনিধি মিশরের নেতাদের সাথে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য কায়রো গমন করে। কিন্তু কায়রোতে মিশরীয় রাজনৈতিক নেতাগণ যখন সুদানকে চিরস্থায়ী ভাবে মিশরের অধীনে যুক্ত থাকিবার প্রস্তাব করে, তখন সুদানী প্রতিনিধিদিগের মধ্যে পুনরায় মতদ্বৈধ দেখা দেয়।

এই মতদ্বৈধের ফলে কিছুই স্থির করতে না পেরে এক দল লণ্ডনে মিঃ বেভিসের কাছে ও অপর দল লেক্ সাক্সেসে সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাবের সুবিচারের আশায় পাঠিয়ে দেয়।

১৯৪৭ হ'তে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত সুদানের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলে ইংরেজ ও মিশরের মধ্যে নানারূপ বাদ-প্রতিবাদ চলছিল। মিশর নিজেকে ভৌগোলিক সীমা, সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাবে সুদানের সমকক্ষতার দাবী জানিয়ে প্রচার করে যে, নীলনদের উপত্যকা চিরকাল মিশরের অধীনে যুক্ত থাকাই যুক্তিসঙ্গত এবং বৃটিশের অবিলম্বে সুদনের ভূমি ত্যাগ করা উচিত। অপর দিকে ইংরেজগণ নিজেদের দাবীর কোনওরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে না পেয়ে মিশরের দাবী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কোরে স্বায়ত্তশাসনে পূর্ণ সক্ষম শিক্ষিত সুদানীদের নিজ দেশের ভবিষ্যৎ নিজেদেরই স্থির করবার সুযোগ প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

ইংরেজ ও মিশরের যখন এরূপ বাদানুবাদ চলছিল, তখন সুদানিগণও একেবারে নিশ্চেষ্ট হোয়ে বসে ছিল না। দেশের শাসন-ক্ষমতার নানারূপ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলছিল। প্রাদেশিক শাসন বিভাগে তাদের ক্ষমতা থাকলেও ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগে কোনওরূপ অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ তাদের হয়নি। এই সময়ে বৃটিশ ও মিশরের অনুমোদন পেয়ে গভর্ণর জেনারেল উত্তর-সুদানে সুদানীদের নিয়ে এক উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করেন। ইহার ফলে সুদানিগণ তাদের দেশের সরকারের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ লাভ করে। ইহার পর মিশরের অনুমোদন ব্যতীতই কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ও লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর প্রথম পত্তন হয় এ দেশে। কাউন্সিল ও এসেম্বলী স্থাপনের পর ঠিক হোল, এর অর্দ্ধেক সভ্য হবে সুদানী এবং কাউন্সিলের প্রথম ১২ জন সভ্যের মধ্যে ৬জন হোল সুদানী এবং তাহাদের মধ্যে ৩ জনকে কৃষিবাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য তিনটি বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তবে এসেম্বলীর সম্বন্ধে স্থির হয়, এর সব সদস্যই হবে সুদানী এবং প্রথম লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর ৯১জন সভ্যের ভেতরে ৮৫জনই হোয়েছিল সুদানী এবং অবশিষ্ট ৬জন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৃটিশ সভ্য।

এই ভাবে সুদানিগণ শিক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দেশের শাসন-ক্ষমতায় নিজেদের অধিকার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করার ফলে ইউনাইটেড নেশন কর্ত্তৃক তাদের স্বায়ত্তশাসন ও স্বরাজ অর্জ্জনের দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার বোলে অনুমোদন করা হয়। ইহার ফলেই ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেন ও মিশর কর্ত্তৃক এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—তাতে পরবর্ত্তী তিন বছরের জন্য সুদানকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয় এবং এই তিন বছরের শেষে সুদানিগণ নিজেদের দেশের ভবিষ্যৎ নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে স্থির করিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়।

১৯৫৩ সালের সেই চুক্তির ফলেই ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী হ'তে সুদান এক স্বাধীন দেশ বোলে পরিগণিত ও পরিচিত হয় জগতের কাছে।

"আজি এ উষার পুণ্য লগনে
উঠেছে নবীন সূর্য্য গগনে।"

শিশুর যত্ন

রেণুকা চক্রবর্ত্তী

খবর পেলাম, বিমলারা কলকাতা বদলী হয়ে এসেছে। আর বিমলার একটি ছেলে হয়েছে। বড় সুখবর। বিমলা পুন্নামক নরকের ভয়ে সিঁটিয়ে আছে কি না জানি না, তবে বেচারী যে পর পর পাঁচটি কন্যা প্রসব করে চোরেরও বাড়া হয়ে দিন কাটাচ্ছে, তা জানতাম। তদুপরি শাশুড়ীর বৌ-এর কীর্ত্তি পাঁচ জনের কাছে ব্যাখ্যা ও বৌকে অন্তর-টিপুনী দেওয়া তো আছেই। সুরেশ বাবু স্ত্রীকে হয়ত গালি দিতেন না, তবে যখন তখন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা তুলে যা হা-হুতাশ করতেন, তা বিমলার পক্ষে সে শ্রুতিমধুর হত না, এ হলপ করে বলতে পারি। এবং এর সবটুকু অপরাধ বিমলা নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়ে বেচারী আর মাথা তুলতে পারত না।

খবর পেয়েই বিমলার বাসায় যাব যাব করেও কিছু দিন দেরী হয়ে গেল। রাজ্যের কাজ যেন ভীড় করে একের পর এক সময় বুঝে আমায় বিভ্রান্ত করে তুলল। তাই যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ওদের বাসায় যেতে বেশ কিছু দিন দেরী হয়ে গেল।

আমায় দেখেই বিমলা সোল্লাসে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে ছেলে কোলে দিলে।

আমি দেখলাম শিশুটি বড় রোগা আর হাল্কা। এমন রোগা কেন বিমলা? বলতেই বিমলা কেঁদে ফেলল।

বললে, ভাই, কি বলব তোমায়, দেখেছ তো আমার মেয়েদের স্বাস্থ্য? ওদের আমি এতটুকু যত্ন করি না, ওরা যা পায় তাই খায়, যেখানে-সেখানে শোয়, সময় মত একটা গরম জামা পর্য্যন্ত গায়ে দেয় না, তবু ভগবানের কৃপায় ওরা ভালই আছে। আর এই ছেলেকে আমি এতটুকু নামতে দিই না, সব সময় কোলে আছে। খোকাকে গরম জল ছাড়া কখনো স্নান করাই না। ওর ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে আমরা সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে শুই। তবু কি করে ওর ঠাণ্ডা লাগে, বল ত? আমাদের সাধ্যে কুলোয় না, তবু ওকে দুধই খাওয়াই, পেট-খারাপ ওর লেগেই আছে। চেহারা তো দেখছই। অথচ আমার মেয়েদের আট মাস দশ মাসে ভাত ধরিয়েছি। এ ভগবানের কেমন বিচার বল ত?

এক সঙ্গে এত কথা বলে বিমলা যেন হাঁপিয়ে পড়ে। গলদ কোথায়, এতক্ষণে বুঝতে পারি।

মনে পড়ল অনেক দিন আগের একটা ঘটনা। দু'জন মহিলাকে দেখেছিলাম মুরগী পুষতে। একজন লেগন মোরগ রাখতেন আর দেশী মুরগী। ঐগুলির বাচ্চা ফুটিয়ে কি যত্নই না করতেন। বাচ্চাগুলিকে আটকে রেখে খেতে দিতেন শাক, বাঁধাকপি, ছোট মাছ, গুগ্‌লি। মাঝে মাঝে নিজে গার্ড দিয়ে দিতেন এক-আধ ঘণ্টা। পটাশ অব পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে ঘর ধুইয়ে দিতেন। রশুন খাওয়াতেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দিনের পর দিন এঁর মুরগীতে মড়ক লেগে একেবারে ধ্বংস হয়ে যেত। মহিলাও না-ছোড়-বান্দা, তিনি আবার নূতন উৎসাহে বিদেশী মুরগীর পোলট্রী করেন, বহু বই খরিদ করে এ সম্বন্ধে পড়াশুনা করেন, কিন্তু তবু ভংটাকা আর তাঁর ভাগ্যে জুটল না, প্রতিবারই মড়ক লেগে তাঁর বহু যত্ন বহু সাধনা ব্যর্থ করে দেয়।

দ্বিতীয় মহিলা পুষতেন কতকগুলি দেশী মুরগী। তিনিও অনেক বাচ্চা ফোটাতেন। আর বাচ্চাগুলি ২১ দিন একটু গার্ড দিয়ে রেখেই ছেড়ে দিতেন মার সঙ্গে। ২১টি বাচ্চা হয়ত চিলে বেড়ালে নিত কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। বাকীগুলি দিব্যি বেড়ে উঠত। ওরা দু-এক মুঠো ভাত বা ধান মুরগীকে খেতে দিত। আর এন্তার বাচ্চা খেত ও ডিম ফোটাত। এঁর মুরগীর কখনো মড়ক লাগতে দেখিনি।

অযত্ন যেমন ক্ষতিকারক, তেমন অতিরিক্ত যত্নও তাই। পুতু-পুতু মোটেই ভাল নয়। মানুষ মুরগী নয়! তবু মানুষও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। মাটি হাওয়া আলো তেল জল এ সব ছাড়া শিশু সুস্থ থাকবে কি করে? প্রবাদ আছে—"কোলের ছেলে জরা, মাটির ছেলে সেরা।" বন্ধ ঘরে শিশুকে শোয়ালে বাইরে বেরুলেই তার ঠাণ্ডা লাগবেই। গরম জল একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে ঠাণ্ডা জল তার পক্ষে মারাত্মক হবে। অথচ শিশুর প্রকৃতি আর কিছু বদলাতে পারে না। সে সুযোগ পেলেই জল ঘাঁটবে। শিশুর প্রকৃতি হল প্রতিটি জিনিষ স্পর্শ করে মুখে দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। শিশুকে বেশী কোলে রাখলে তার স্বাস্থ্যই শুধু খারাপ হয় না, সে পিছিয়ে পড়ে। শিশুর শরীর প্রকৃতির নিয়মেই সুস্থ থাকে, সে ওঠে রাত্রি চারটায়। উঠেই পায়খানা করবে, খাওয়া একটু বেশী হলে তুলে দেবে। কফ হলে তুলে দিবে, একটু শরীর খারাপ হলে খেতে চাইবে না।

এখন আমরা যদি জোর করে ওকে ভোরবেলা উঠতে না দিই বা খেতে না চাইলেও জোর করে খাওয়াই, তবে ওর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে কেন? শিশু শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করতে ভালবাসে। প্রথম খেলার উপকরণ ওর নিজের হাত-পা। হাত-পা চেনা হয়ে গেলে তার পর লাল রং চিনতে থাকে। মাঝে মাঝে শিশুর পক্ষে কাঁদাও মঙ্গলজনক। তাতে শিশুর লাংসের জোর বাড়ে। খেলায় বাধা দিলে শিশুর মেজাজ বিগড়ে যায়, একাগ্রতা নষ্ট হয়।

শিশুকে তিন ঘণ্টা পর খাওয়ানো অভ্যাস করা ভাল। প্রথম হয়ত একটু উস্‌খুস্‌ করবে, বা কাঁদবে, তখন মুখে একটু মধু বা মিছরির জল দিলেই শান্ত হবে। তার পর অভ্যাস হয়ে যাবে। আঙুলে ন্যাকড়া জড়িয়ে গ্লিসারিন মাখিয়ে মাঝে মাঝে মুখটা পরিষ্কার করে দেওয়া ভাল। দাঁত উঠলে তো জলন্যাকড়া দিয়ে নিশ্চয়ই দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। ছ' মাস বয়স থেকে শিশুকে কিছু শক্ত জিনিষ খেতে দিলে ওর দাঁত ওঠার সুবিধে হয়। এ সময় দেখা যায় শিশু কামড়াতে চায়। বিস্কুট বা পাউরুটি বেশ কড়া টোষ্ট বা আখ একটু থেতো করে দিলে ওদের দাঁত ওঠা সহজ হয়, আরামও পায়। এ সময় শিশুর ষ্টার্চফুড দরকার। যেমন একটু আলু, বা ডিমের হলদে অংশটা, দুটি ভাত, ভাত একেবারেই খাওয়ানো না গেলে এক-আধ ঝিনুক ফেন। বার্লি সাগু বিস্কুট ইত্যাদি দেওয়া দরকার। এ সময় আদর করে শুধু দুধ খাওয়ালে লিভারের দোষ হয়ে চিরদিনের জন্য শিশুর লিভারটি নষ্ট হয়ে যাবে। শিশুর খাওয়া স্নান এ-গুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ে করা দরকার; তাতে ওর স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, নিয়মানুবর্ত্তিতা হয়। সঙ্গে আদর করে শিশুকে কখনো খাওয়াতে নেই।

ওদের পোষাক-আসাকও খুব ঢিলে হওয়া ভাল। যেন পোষাকের ভেতর দিয়ে যতটা সম্ভব বায়ু চলাচল করতে পারে। গরমের সময় বেশীর ভাগ সময় খালি গা রাখাই সঙ্গত। শীতের সময় অবশ্য ভিন্ন কথা। তখন আবার যথোপযুক্ত গরম জামা-কাপড় পরানোই প্রয়োজন। তা বলে ঘরে বন্ধ করে রাখা বা কখনো মাটিতে নামতে ওর তার না দেওয়া উচিত নয়।

তবে কি শিশুকে তার নিজের উপরই ছেড়ে দেওয়া যায়? না, তা সম্ভব নয়; গার্ড দিতে হবে বৈ কি, তা বলে অস্বাভাবিক উপায়ে নয়। অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। জল-হাওয়া-আলো এ সব তার চাই-ই। পরিমাণ মত এ না পেলে স্বাস্থ্য ও মনোবল কোনটাই তার হবে না।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

বাবাকে দেখে এবং তার মুখের বিস্মিত 'আপনি !' শুনে আর কোন দিকে না তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল মঞ্জু। ওর মনটা গেল আরো বেসুরো হয়ে। মনে হলো বাড়াবাড়িটা করে ফেলেছে ওই। কোনো মানে হয় না এতটা ভয় পাওয়ার। লোকটা যখন মাতাল তখন কিছু ওলট-পালট ব্যবহার করবেই—তা যত সাবধানীই হোক। জয়ার বাড়ী থেকে মনে যে অন্ধকার নিয়ে ফিরেছিল সে-ই ভূত দেখাচ্ছে ওকে। হাফ সার্ট গায়, মালকোঁচা দিয়ে ধুতি-পরা লোকটাকে ও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে জয়াদের রকে—সেই লোকটা আর এই লোকটা যেন এক হয়ে গিয়েছিল ওর কাছে।

দোতলার বারান্দায় উঠতেই ছোট ছোট পায়ের দুপদাপ শব্দ তুলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো ওকে—অমিতার ছেলে-মেয়ে। মুহূর্তে মুছে গেল মঞ্জুর মন থেকে জয়ার বাড়ীর আর নিজের বাড়ীর দুটো খারাপ-লাগা ঘটনা। হাতের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটু গেড়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে, দু' হাতের বন্ধনে বেড়ে কাছে টেনে আনল মঞ্জু ওদের। একবার এর গালে একবার ওর গালে চুমু খেতে খেতে বলতে লাগলো—ও মা গো, পিসীর বিয়ের প্রথম 'নায়র' এসেছে গো ! উলু পড়েছিল তো ? জল দিয়ে পা ধুয়েছিল তো ? তেল-সিঁদুর পান দিয়েছিল তো ?

'নায়র' শব্দ বুঝল না ওরা। ওটা পূব-বাংলার কথা। কিন্তু সে জন্য আটকালো না। শিশু কি কথার জবাব দেয় ? সে নিজের কথা বলে। পিসীর হাত ধরে বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে ভাই-বোনে কখনো এক সঙ্গে, কখনো একের কথা আরেক জন কেড়ে নিয়ে বলতে বলতে চললো—আজ দুপুরে দাদু গিয়ে ওদের নিয়ে এসেছেন। মা বলেছেন ভালো সীর বিয়ে পর্য্যন্ত ওরা এখানে থাকবে। ওদের এক বড় মাসী আছেন জানে কি সী ? জানে ? তার ছেলে মেয়ে নানক আর ঝুমুর কে ? তাও জানে ! নেচে উঠল রিন্টু—ওরাও এসেছে সী। ঘরের দরজার কাছে এসে হঠাৎ মঞ্জুর শাড়ী ধরে টেনে তাকে থামিয়ে রিন্টু ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস-ফিস করে উঠল—গিয়ে ওদেরও চুমু খেয়ো কিন্তু সী ! নইলে এমন হিংসের কথা বলবে ঝুমুর।

ঝুমুর তো দেখেনি আমি যে তোমাদের চুমু খেয়েছি।

—কে জানে বাবা ! গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালো রিন্টু। যেন কোথা দিয়ে যে ঘটনার সাক্ষী থেকে যায় কে জানে, এই বলতে চায় সে। হেসে উঠল মঞ্জু।

ঘরে ঢুকে ওদেরই বয়সী দু'টি ছেলে-মেয়েকে চোখের ইসারায় দেখিয়ে স্মরণ করিয়ে দিল রিন্টু সীকে চুমুর কথা। নিছক সতর্কতা না পেছনে এর আতিথেয়তাও লুকোনো রয়েছে, বুঝল না মঞ্জু। হাসিমুখে ক্ষুদে মহিলাটির নির্দ্দেশ পালন করল সে। অমিতা চার জনকে একরকম তাড়িয়ে নিয়ে চলল ঘুমোবার জন্য। আর মঞ্জু এসে বসে পড়লো মৌরীর পায়ের কাছে। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল মৌরী এমন ভাবে, যেন বললো—কিছু বলব না।

—আচ্ছা, তোর উপায়টা হবে কি রে দিদি ? এখন নয় যতই দেরী করি, ফিরে এলেই নিশ্চিন্ত হতে পারিস। কিন্তু শ্বশুরঘরে গিয়ে হয়তো সমস্ত রাত ঘুমোলিই না, আমার ফেরা না ফেরাটা বুঝলিনে বলে ! তবু মৌরীকে অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকতে দেখে, দিদির দু'হাঁটু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওর হাঁটুর উপর নিজের মুখটা চেপে বললো—ঘটনা কি সব ঘড়ি ধরে ঘটে ?

—ঘটনা বুঝি তোর জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী হয় ?

—না, তা হয় না। লেখকদের গল্পের জন্য কি বিশেষ সব ঘটনা বসে বসে কেউ ঘটায় ? অশেষ ঘটনাস্রোত থেকে বিশেষ ঘটনা তুলে নেয় তাঁদের দৃষ্টি। তাই না ?

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। 'আসছি।' বলে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে যতীন বাবুর দিকে তাকিয়ে বললো—লোকটি কে বাবা ?

হাতের ছড়ি আলনায় রেখে ধীর হাতে পাঞ্জাবীর বোতাম খুলতে খুলতে জবাব দিলেন যতীন বাবু, চিনবিনে।

—সে তো নিশ্চয়ই। যদি চিনবই, তবে জানতে চাইবো কেন ? বলে আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো সে।

যতীন বাবু পাঞ্জাবীর পকেট থেকে মানিব্যাগ খুলে আলনার কাছ থেকে গেলেন টেবিলের কাছে। রাখলেন সেটাকে টেবিলের উপর। ঘড়িটা খুলে রাখলেন তার পাশে। পাঞ্জাবীটা হাত উঁচু করে টেনে খুলতে খুলতে আবার এলেন আলনাটার কাছে। খুলে সেটাকে রাখলেন ব্রাকেটে। কাপড় ছেড়ে পরলেন লুঙ্গী। জুতো খুলে পায় দিলেন বিদ্যাসাগরী চটি। ইজিচেয়ারে শরীর টান করে বসে হাঁক ছাড়লেন—রামু, তামাক।

আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে রইল মঞ্জু। দু' গাল ফুলিয়ে কলকের ফুঁ দিতে দিতে এসে হাজির হলো রামু। গড়গড়ায় কল্কে বসিয়ে আরো কয়েকটা জোর ফুঁ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। নলটা হাতে তুলে নিয়ে এতক্ষণে তাকালেন যতীন বাবু মেয়ের দিকে।—লোকটার পরিচয় দিয়ে তোমার কি হবে ? জেনে রাখো লোকটা ভালো নয়।

. চলে এলো মঞ্জু। অমন একটা মন্দলোক কেন এসেছিল, কি দরকার ছিল তার এখানে ? সে কথা পর্য্যন্ত জানতে চাইলো না।

কিন্তু পরের দিন লোকটি তার নিজের পরিচয় নিজেই জানিয়ে গেল মঞ্জুকে। কলেজে যাবার সময় নীচের ঘরে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছিল মঞ্জু ব্যাগের ভেতর সব ঠিক আছে কি না—পয়সা, লাইব্রেরী-কার্ড, রুমাল। ঘরে একটা ছায়া পড়তে তাকিয়ে দেখে কালকের সেই লোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তেমনি দামী স্যুটপরা। কোটের বুকে গোঁজা লাল কাঠগোলাপ। ব্যাগের ফ্যাসনার টেনে দিতে দিতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো মঞ্জু।

দরজা ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকলো লোকটি। তার চকচকে জুতোর মাথায় খেলতে খেলতে রোদটাও যেন লোকটির সঙ্গে সঙ্গে এসে

ঢুকলো ঘরে। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালো সে। বললো—আমি আপনার কাছে এসেছি।

—আমার কাছে? এতটা বিস্মিত বুঝি মঞ্জু জীবনে কোন দিন হয়নি!

—হাঁ। এবার মাথা, শরীর দুই-ই সোজা করে টান হলো লোকটি। বললো—আমার ক'টা কথা আপনাকে শুনতে হবে এবং সেজন্য একটু সময় আমি চাইব আপনার কাছে।

মঞ্জু দৃষ্টিটাকে হাতের ঘড়ির দিকেই নিতে যাচ্ছিল, লোকটি বলে উঠলো—জানি আপনার কলেজের সময় হয়ে গেছে, আর নয়তো এক্ষুনি সময় হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার আজ কলেজে যাওয়া হবে না।

—কলেজে যাওয়া হবে না!

—না। মাথা নাড়লো সে।

মুখের ভাবটাকে দৃঢ় এবং কঠিন করলো মঞ্জু। বললো—আচ্ছা তা দেখা যাবে। আপনার কি বলবার আছে বলুন?

—এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবো? লোকটির এই জিজ্ঞাসার ভেতর এমন একটা সুর ছিল যে, হেসে ফেললো মঞ্জু। কিন্তু তক্ষুনি হাসিটাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললো—বসুন।

—আপনি?

—বসছি। বসল মঞ্জু।

লোকটি কিন্তু তক্ষুনি বসল না। পায়চারী করতে লাগল ঘরটার ভেতর। পরে মঞ্জু দেখেছে এটাই এর স্বভাব। দাঁড়িয়েই থাক আর বসেই থাক, কথা বলবার সময় হাঁটাহাঁটি শুরু করে দেবেই।

মঞ্জু দেখতে লাগল লোকটিকে। ফর্সা রং রোদে পুড়ে যে রকম তামাটে চেহারা নেয়, মুখের রংটা ঠিক তেমনি তামাটে। কপালটা বিশাল। এতোটা বড় হয়তো ছিল না। চুল উঠে গিয়েছে। খাড়া নাক। চোখের কোণে গাঢ় কালি। যেন রাত্রি তার চোখের পাতার বিশ্রাম-শয্যাচ্যুত হয়ে দিনের পর দিন গড়িয়ে গড়িয়ে এসে চোখের কোলে জমাট বেঁধেছে।

'লোকটা ভালো নয়' বাবার এই কথাটা হঠাৎ কানে আঘাত করলো মঞ্জুর। মুখের ঢিলে-হয়ে-আসা ভাবটা আবার শক্ত করে তুললো সে। এখানে বসতে বলার যে অস্বাচ্ছন্দ্য ভাবটা ওর মনে ছিল, সেটা গেল দূর হয়ে। হাঁ একটা অস্বস্তি ছিল ওর মনে। এটা ওদের বসবার ঘর নয়। ভেতর-বাড়ী যাতায়াতের পথ আর বাজে লোকের সঙ্গে কথা সেরে নেবার ঘর। একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার পড়ে আছে। আর আছে রাঙুর মাদুরে-জড়ানো বিছানাটা। যে ঘরে যে ঘুমোয় সে ঘরটা তার, এই রাঙুর ধারণা। তাই দেয়াল ভরে ফেলেছে সে খোদের নায়িকাদের ছবি দিয়ে। লোকটিকে যেন ঘরটা ধরে উঠতে পারছিল না। পারবেই বা কি করে? দরজায় দাঁড়ানো তার 'প্রেসিডেন্ট' গাড়ীটাও তো ভাবনার জগতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলছিল। মঞ্জু নিজেকে বোঝালো, এই ভালো হয়েছে। লোকটা ভালো নয়। কিন্তু কৌতূহল সে সত্যি বোধ করছিল। ও বলেছে, বাবা বাড়ী আছেন। তা থাকুন। দরকার নেই তার। সে কথা বলতে এসেছে ওর সঙ্গে। চা না খেয়েই কেন ছুটে এসেছে, সে কারণটা ওর এখনো খোলা হয়নি। কিন্তু কথাটা নিশ্চয়ই সত্য। কোটে-গোঁজা কাঠগোলাপের লাল পাপড়ি কালো হয়ে ঢলে পড়েছে। রাতের কোট গায়ে চাপিয়ে আয়নার কাছে গেলে নিশ্চয়ই ওটা ওখানে থাকতো না। ঘরের ভেতর যে মি[illegible] গন্ধটা, তাও কালকের। রাতের স্প্রে-করা সুগন্ধ পরের দিন যেমন থাকে। মঞ্জুর মনে হলো, বাসী-পোষাক, বাসী-গন্ধ, বাসী ফুল সমেত ঘুম থেকে উঠে-আসা এই লোকটিও যেন বাসী।

লোকটি এসে চেয়ারে বসলো। কোন ভূমিকা না করে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললো—আমার এ কথাটা আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে—কাল রাতে আপনারা যেটাকে অসম্মানের হাত-বাড়ানো ভেবেছিলেন, সেটা সত্যি তা ছিল না। আমি প্রচুর ড্রিঙ্ক করেছিলাম—করিও তাই। মাথাটা পরিচ্ছন্ন ছিল না, বুদ্ধির জায়গায় ছিল নেশা—মাথা-জমাট-বাঁধা নেশা। তার প্রভাবে বলে ফেলেছিলামও একটা গর্হিত কথা—এ-ও সত্য। কিন্তু আমি বর্বর নই। দশ-পনেরোটা বছর একটানা বিদেশে কাটিয়ে আমার সম্ভাষণ অভিবাদন সব কিছুতেই হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা দাঁড়িয়ে গেছে স্বভাবে। কাল আপনার তিরস্কৃত জবাব 'সুস্থ বুদ্ধির অবশিষ্টটুকুকে ধন্যবাদ' কথাটা খুসী করেছিল আমাকে। তাই সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম—বিশ্বাস করলেন?

লোকটি সম্বন্ধে বাবার মতামতটা ছাড়া আর কোন কারণ খুঁজে

পেলো না মঞ্জু অবিশ্বাসের। না, বাবার কথার এমন মূল্য ওদের কাছে নয়। বললো—কেন করবো না। ভদ্রলোকের পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক।

বিদেশী প্রথায় অভ্যস্ত হাতটা বুঝি কালকের মতোই আবার এগিয়ে আসছিল, তাকে ঢুকিয়ে দিল সে পকেটে। বললো—বাঁচালেন।

টেবিলের দিকে ঝুঁকে বসে কথা বলছিল লোকটি। এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। বললো—কাল রাতে একটুও ঘুমোতে পারিনি—নেশার লোকের ঘুম না হওয়া, বুঝতেই পারেন মনে কতটা অস্বস্তি থাকলে। নিজের অদৃষ্টে যে দুর্ভোগ আর অসম্মানটা ঘটল সে কথা মনে হলো না একবারও, কেবল মনে হতে লাগল, কি করে আপনাকে বোঝাবো, বিশ্বাস করাবো, আমার সত্য মনোভাবটা। ভোরবেলাও বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ভাবছিলাম—কখন দেখা করি, কি বলি, কি ভাবে ক্ষমা চাই। হঠাৎ ফোন এলো। আমার এক আত্মীয় পুলিসের বড় চাকুরে। বিস্মিত হয়ে তিনি জানতে চাচ্ছেন—ব্যাপার কি? কাল নাকি মাতাল অবস্থায় গিয়ে তুমি তোমাদের ভাড়াটের মেয়ের সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করেছ? তিন জন সাক্ষী নিয়ে তারা থানায় এজাহার করে গেছে। বলে গেছে আজ নালিশ করবে।

—বাবা থানায় এজাহার করেছেন? নালিশ করবেন আজ?

—আপনি জানেন না?

সে কথার জবাব দিল না মঞ্জু। বললো—আপনাদের ভিতর সম্পর্কটা আগে থেকেই তিক্ত হয়ে না থাকলে তো এমন হবার কথা নয়।

—আমার সঙ্গে নয়। আমার সঙ্গে আপনার বাবার পরিচয় খুবই কম। দু-একবার তাঁকে দেখেছি এই পর্য্যন্ত। সম্পর্কটা তিক্ত তাঁর আমার বাবার সঙ্গে, আমার ভাইদের সঙ্গে।

—কারণ?

—বাড়ীওলা-ভাড়াটে সম্পর্কটা কিছু বেশী কম তাই হয়—হয় না কি?

—আপনি বাড়ীওলা?

গাল দুটোও অদ্ভুত রকম এক ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটি বললো—না। আমি বাড়ীওলার ছেলে। মা চোখের জল ফেলে তাতেও সন্দেহ প্রকাশ করে বসায়, হঠাৎ আবেগে তাঁদের ছেলে হয়ে কিছু করতে গিয়ে দেখতেই পাচ্ছেন কি ঝামেলা!

বাড়ীওলার ছেলে হয়ে আমার কাজ নেই। তাঁর আরো পাঁচ ছেলে আছে, তিনি আছেন। আপনার বাবাকে বলবেন, তাঁরাই তাঁর প্রতিপক্ষ। উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আর আপনার সময় নেবো না। আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো এ লাভটা নিশ্চয়ই আমার মনে থাকবে—আর কোন দিন যদি আপনার সঙ্গে দেখা না-ও হয়। আচ্ছা, আসি। এসে যে ভাবে অভিবাদন করেছিল তেমনি ভাবে সামান্য মাথা নুইয়ে লোকটি চলে গেলো।

মঞ্জু উঠে এলো উপরে।—দিদির বিয়ে পর্য্যন্ত তো তুমি ছুটি নিয়েছ?

—হাঁ। যতীন বাবু সিল্কের চাদরটা গলায় ঝুলোতে ঝুলোতে বললেন।

—আজ তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? কোর্টে?

আলনা থেকে ছড়িটা তুলে নিতে গিয়ে হাতটা থেমে গেল যতীন বাবুর—কে বললো তোকে?

এ কথার জবাব না দিয়ে মঞ্জু বললো—কালকের ঘটনা তুমি নায় গিয়ে সাক্ষী-সাবুদ রেখে ডায়েরী করিয়ে এসেছ?

—রজত এসেছিল?

—সেই ভদ্রলোকের নাম যদি রজত হয়, তবে সে এসেছিল।

—তুই কথা বললি কেন? কাল বলিনি তোকে লোকটা ভালো নয়?

বিরক্ত হলো মঞ্জু, সেটা ওর স্বভাবে নেই। বললো—ভালো-মন্দ বেছে লোক কথা বলে না।

মেঝেতে ছড়ি ঠুকলো যতীন বাবু—হাঁ, তাই বলে। একটা বদমাস মাতালের সঙ্গে ভদ্রমেয়েরা কথা বলে না। এর চরিত্রের তুমি কি জান?

—দরকার নেই আমার জেনে। চরিত্রের মন্দ দিকটা যে দেখবে সে বুঝবে সেটা। আমি ভালোটুকু দেখছি, সেটাই জানি। অশিষ্ট ব্যবহার সে আমার সঙ্গে কিছু করেনি, তাই আমরাও করবো না।

—তোমার ইচ্ছায়? ছড়ি-হাতে হনহনিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পাশ কাটিয়ে আরো জোরের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল মঞ্জু—আমাকে দরকার হবে, সে কথা মনে রেখো।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যতীন বাবু।

কোন কৌতূহল প্রকাশ করলো না মৌরী। কিছু শুনতে চাইল না মঞ্জুর কাছে। না, মনটা আর বিরূপ করতে চায় না সে। এখান থেকে যাবার দিন ওর এগিয়ে আসছে, যতখানি সম্ভব সবার প্রতি প্রসন্ন মন নিয়ে যেতে চায় ও। তার জন্য যদি চোখ বুঁজে বসে থাকতে হয় তো তাই থাকবে। যদি বোবা হতে হয় তো তাই হবে।

যতীন বাবু থ বনে যাওয়াটাকে নিয়ে গেলেন থমথমায়।

কয়েক দিন পর সন্ধ্যায় ভীষণ এক নালিশ নিয়ে এসে হাজির হলো রিনু। মঞ্জুকে টেনে দালানের এক কোণে নিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক নজর রাখতে রাখতে ফিস-ফিস করে বললো—জানো সী, ঝুমুবরা বলছে কি আমাদের বাড়ীর খাওয়া নাকি ভালো নয়। চিংড়ি মাছে এলার্জি হয়। ওদের চিংড়ি খাওয়া বারণ, এখানে দু বেলাই নাকি চিংড়ি। আজ মাছ খায়নি ও, তাই পেট ভরেনি ওর।

—সত্যি তো! সাংঘাতিক লজ্জার কথা তো রিন্ রিন্! তোমার এ লজ্জা নিশ্চয়ই আমি ঢেকে দেবো। যাও তৈরী হয়ে এসো। আমরা ওদের রেষ্টুরেন্টে খাইয়ে আনবো—কেমন?

উল্লাসে ছুট দিল রিনু।

অমিতার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে ওদের চার জনকে সঙ্গে করে উঠল গিয়ে মঞ্জু ট্যাক্সিতে। মৌরীকে ডেকেছিল। চার জনকে নিয়ে একা সামলাতে পারবিনে বলে তৈরী হতেও যাচ্ছিল মৌরী। কিন্তু যেই মঞ্জু বললো ট্যাক্সি করবো, অমনি ওর মত বদলে গেল—তবে আর কি ট্যাক্সিতে যখন যাচ্ছিস একাই পারবি। ইচ্ছে করছে না আমার। ট্যাক্সিতে বসে মনে মনে হিসাব করে মঞ্জু—আসা-যাওয়ার ভাড়া, চারটা আইসক্রিম—হয়ে যাবে।

—সী, কিরণো।

—ফিরপো ! এটাও ঝুমুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না কি !

ঠিক তাই। জানো সী, ঝুমুর ফিরপোতে খেয়েছে। আমরা কোন দিনও—এক দিনও খাইনি।

—আচ্ছা চলো।

গাড়ীর গদী নাচতে লাগলো ওদের নৃত্যে। ফিরপোতে ঢুকে ওদের নিয়ে চলে গেল মঞ্জু একেবারে ডান দিকের কোণে। বললো—চারটে বড় আইসক্রিম বলি, কেমন ?

ঝুমুর গম্ভীর ভাবে বললো—আইসক্রিম ডিনারের শেষে খায় তো।

ডিনার ! ঝুমুরের গোলগাল মুখের দিকে তাকালো মঞ্জু। ডিনার কি এখন খায় ? রাত আটটায় হয় ডিনার। সে আমরা আর একদিন আসবো। আজ আইসক্রিম।

—সে দিন তো আমরা সন্ধ্যার সময়ই ডিনার খেয়েছিলাম।

অধৈর্য্য রিমু বলে উঠল—তুমি জিজ্ঞাসা করেই দেখ না সী !

মঞ্জু বুঝল শুধু আইসক্রিমে ওদের খুসী করা যাবে না। আইসক্রিম তো ওরা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে খেতে পারে। তার জন্য এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল ? বয় এলে অর্ডার দিল মঞ্জু—চারটে চিকেন পেটিজ। চারটে ফ্রাই।

—সী, তোমার ?

টেবিলে টেবিলে লোক। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে হাসলো মঞ্জু। হাতের ইসারায় থামিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললো—এখানে কথা বলতে হয় না।

কিছুক্ষণ বাদে পাঁচটি ধোঁয়াওঠা সুপ-ডিস ট্রেতে সাজিয়ে বয় এলো ওদের টেবিলে। বাধা দিল মঞ্জু—এ অর্ডার আমার নয়।

বয় শুনল না, ডিসগুলো ছোটদের সামনে ধরে দিতে দিতে বললো—সাহেব অর্ডার দিয়েছে।

—কে সাহেব ! তুমি ভুল করেছ। মাত্র বলতে যাচ্ছিল মঞ্জু, হন্তদন্ত ভাবে রজত এসে কাছে দাঁড়ালো।—হাঁ, হাঁ ঠিক আছে। ডিস দিয়ে বয় চলে গেল। মঞ্জুকে বিমূঢ় করে দিয়ে রজত নেপকিনের ভাঁজ খুলে খুলে বাচ্চাদের কোলে পেতে দিতে লাগল। হাতে তুলে দিতে লাগল চামচে। তারপর মঞ্জুর নেপকিনটা ধরলো এগিয়ে। ঠিক কালকের মতোই দামী সেন্টের গন্ধের সঙ্গে মিশে আসছে বিলিতি মদের গন্ধ। কিন্তু কি করতে পারে মঞ্জু? নাটকীয় কিছু নয় নিশ্চয়ই। পেছন দিককার টেবিলটায় যারা গ্লাস সামনে নিয়ে বসেছিল, নিশ্চয়ই রজত তাদের একজন।

অন্য টেবিল থেকে একটা চেয়ার টেনে এনে রজত বসলো। বাচ্চাদের মত ওর হাতেও তুলে দিল চামচেটা।

নিতে হলো মঞ্জুকে।—আপনি বুঝি শক্ত জিনিষ খান না ?

হাসল রজত।—খাই। ক'জন বন্ধুকে ডিনারে বলেছি। আপনাকে দেখে 'এখানে বড্ড ভিড়' এই বলে ওদের দিয়েই প্রিন্সেস'এ পাঠিয়ে বলেছি, আমি এই আসছি। এ সৌভাগ্যের কথা তো কল্পনা করিনি।

কাঁটা-চামচায় অনভ্যস্ত যে শুধু ছোটরা, তা তো নয়। মঞ্জুও। রজত ছোটদের হাত থেকে ছুরি-কাঁটা নিয়ে মাংস ছাড়িয়ে কাঁটায় বিঁধে যেমন ওদের হাতে-তুলে দিতে লাগল ঠিক তেমনি হঠাৎ মঞ্জুর হাতের ছুরি-কাঁটা নিয়ে রোস্টের বিরাট টুকরোকে বাগে এনে ছোট ছোট করে এগিয়ে দিতে লাগলো ওর দিকেও। শুধু বাচ্চাদের সময় সময় মুখেও তুলে দিচ্ছিল। মঞ্জুর বেলা বাদ রাখছিল সেটা। আশ্চর্য্যই লাগছিল মঞ্জুর।

খাওয়া হলে আগে গিয়ে নিজের গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়ালো সে। বাচ্চারা উঠলে মঞ্জু বললো—একটা ধন্যবাদ দি, কি বলেন ?

রজত হাতের সিগারেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে হাতটা মঞ্জুর দিকে বাড়াতে যাচ্ছিল। থেমে হেসে বললো—দেখলেন তো। এবার নিশ্চয়ই আর অবিশ্বাস করবেন না। তারপর বললো—আপনার সঙ্গে পরিচয়টা রাখতে চাই। আসবেন একদিন ?

—কোথায় ? আপনার বাড়ীতে ?

—আমি বাড়ীতে থাকিনে।

—বাড়ীতে থাকেন না। কোথায় থাকেন তবে ?

—গ্রেণ্ডে। আপত্তি আছে ?

—অভিজ্ঞতা নেই। আপনার সঙ্গে পরিচয়টা হয়েছে অস্বাভাবিক ভাবে। আজকের দেখাটা হলো অভাবিত ভাবে। এর পরের সাক্ষাৎটাও তেমনি ভাবে হয়ে যাবে কোথাও। আচ্ছা—নমস্কার। মঞ্জু নমস্কার জানিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল।

সব শুনে সাবধান করলো মৌরী—কখনো ওঁর হোটেলে যাবিনে বলে রাখছি।

—কি হবে গেলে ?

—হবে আবার কি।

—তবে যাবো না কেন ?

—দেখ মঞ্জু, ছেলেমানুষি করবি নে। ভদ্রলোক জলের বদলে মদ খান। থাকেন বাড়ীঘর ফেলে হোটেলে। সুন্দর জীবন কাটান না, ধরে নিতে পারি।

—তা জানিনে। আমার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করেন, এই বলতে পারি। অপরের সঙ্গে কি করেন তা নিয়ে দরকার কি আমার ?

—না, অন্যের সঙ্গের ব্যবহার দেখেই বুঝতে হয়, ভবিষ্যতে তার কাছে কি ব্যবহার পাবো।

—মানি নে। স্বভাব যেমন একটা মস্ত সত্য কথা, তার চাইতে একটুও কম সত্য নয়, মানুষের চেহারা একটা নয়। ব্যক্তিভেদে মানুষ চেহারা বদলায়।

—জ্যাঠামো করবি নে।

—এটা উত্তর হলো ?

—এটা ধমক হলো। ব্যক্তিভেদে চেহারা বদলায় তারাই, যাদের নিজস্ব কোন চরিত্র নেই।

—তোর তো নিজস্ব চরিত্র আছে। ব্যক্তিত্ব আছে। তোর এক চেহারা আমার সঙ্গে, বাবার সঙ্গে, ছোট পিসীর সঙ্গে ? যারা যারা আসেন, যান, বসেন, সবার সঙ্গে ? তাঁদের মতও কি তোর সম্বন্ধে সবার এক ? কেউ বলে, আহা মৌরীর মত মেয়ে হয় না। কেউ বলে, এমন মেয়ের খুরে নমস্কার।

—ইস ! যেমন নিজে বকতে পারিস, তেমনি অপরকে বকাতে পারিস। চরিত্রতত্ত্ব বিশ্লেষণে আর দরকার নেই। আমার কথা হলো, ওঁর হোটেলে তুমি যাবে না। [ক্রমশঃ।

গোলমাল বাধল বিবাহ বাসরে। হরিমোহনবাবু অর্থাৎ পাত্রের পিতা উঠে দাঁড়ালেন—"পাই পয়সা পর্য্যন্ত মিটিয়ে না দিলে বিবাহ বন্ধ হয়ে যাবে।" বিবাহ বাসরে একটা বাজ পড়লেও লোকে এত স্তম্ভিত হয়ে যেতোনা। সুলেখা চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত উঠে বসল—তার ঘোমটা গেল খসে। সানাইয়ে

পূরিয়া ধানেশ্রীর সুর একটা মীড়ের মুখে এসে হঠাৎ বেসুরো আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল—"সেকি?" খোকন ছুটে গেল বাসরে, বাবুর খোঁজে। কিন্তু বাবু কোথায়? আর একজনকেও পাওয়া যাচ্ছিলনা। তিনি হচ্ছেন বাচস্পতি মশায়। হরিমোহনবাবুর গুরুদেব। তাঁর কথা হরিমোহনবাবুর পরিবারে সবাই মেনে চলে বেদবাক্যের মত। হরিমোহনবাবু চারিদিক খুঁজে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। একজন বলল এ বাড়ীর ছেলে

বাবু আর সুলেখার এক বান্ধবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে গল্প করতে দেখেছে। বাচস্পতি মশায়কে না পাওয়া গেলে তো বিপদ—তাঁর মতামত না নিয়ে হরিমোনবাবু কখনও কিছু করেননা। চরিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। খোঁজ পাওয়া গেল প্রায় আধঘণ্টা পরে। খোকন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল বাবু আর বাচস্পতি মশায় দুজনকেই সে দেখেছে। "আপনারা সব আমার পেছনে আসুন—"

দলবল নিয়ে হরিমোহনবাবু চললেন তার পেছনে।

সে সবাইকে নিয়ে গেল তেতলার চিলে কোঠায়। দরজা বন্ধ। তারই একটা ফুটো দেখিয়ে সে বলল—"দেখুন"। হরিমোহনবাবু প্রথমে উঁকী মারলেন। তারপর একে একে সবাই। কাউরোই মুখে রা নেই। বাচস্পতি মশাই নানারকম চর্ব্বচোষ্যের মধ্যেখানে বিরাজমান। সুলেখার বান্ধবী চামেলী তাঁকে যত্ন করে পরিবেশন করছে। আর বাবু তাঁর সাথে অনর্গল গল্প করে যাচ্ছে—"তোমার টিকি অত বড় কেন? টীকিতে ফুল গোঁজা কেন?" বাচস্পতি মশাই পরমানন্দে খাচ্ছেন আর হুঁ হ্যাঁ করে দায়সারা গোছের উত্তর দিচ্ছেন। দরজা খুলে সবাই যখন ঢুকে পড়ল বাচস্পতি মশাই একটু লজ্জায় পড়ে ছিলেন বৈকী। "এই বালক বালিকাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উদ্রেক হোল। তা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম দু একটি মিষ্টান্নের ব্যবস্থা সম্ভব কিনা। কিন্তু এই মা আমার কোন কথা শুনলেনা—" বলেই এক বিরাট ঢেঁকুর তুললেন। বরযাত্রীদের মধ্যে থেকে গণপতি বলে উঠল "করেছেন কি ঠাকুর মশায়! আমি ভিয়েন চড়াবার জায়গায় গিয়ে দেখি সব খাবারই 'ডালডায়' রাঁধা। একেবারে শাক বেগুণভাজা থেকে মিষ্টি অবধি—ঘিয়ের নামগন্ধ নেই।" বাচস্পতি মশাই অবাক হয়ে গেলেন—"তাই নাকি? বড় অবাক কথা। আমি জানতাম 'ডালডায়' শুধু ভাজাভুজিই হয়। মুড়োঘণ্ট, মাছের ঝোল, চচ্চড়ি শাক, ডালনা যে এতো ভাল হয় তাতো জানতামনা। আমি গিয়েই গিন্নি কে বলব।" চামেলী বলল— "হ্যাঁ, অত দাম দিয়ে ঘি কেনার ক্ষমতা আমাদের নেই আর কিনলেও সে ঘি সবসময় ভাল হয়না। তার থেকে 'ডালডা' ভাল। 'ডালডায়' রান্না ভাল হয়, শরীরও ভাল থাকে। 'ডালডা' বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ তেল থেকে তৈরী হয় আর শীলকরা ডবল ঢাকনাওলা টিনে 'ডালডা' সবসময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া 'ডালডার' প্রতি আউন্সে ভাল ঘিয়ের সমানই ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়।"

হরিমোহনবাবু যখন বাচস্পতি মশাই কে খুলে বললেন সব কথা বাচস্পতি মশাই গেলেন বেজায় চটে। অনেকক্ষণ কোন কথাই বললেননা। তাঁর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে আশুবাবুর অর্থাৎ সুলেখার বাবার মন আশঙ্কায় ভরে উঠল। তারপর তিনি কথা বললেন। চামেলির দিকে তাকিয়ে বললেন—"আর দুটো মিষ্টান্ন দাও তো মা।" তারপর হরিমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—"হরি, পয়সাটা তোর কাছে এত বড়? ছেলেকে তুই বেচতে এসেচিস! বেরো তুই আমার সামনে থেকে—আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এ বিয়ে দেব।" বলে তিনি কোমরের গিট বাঁধতে বাঁধতে সত্যি উঠে দাঁড়ালেন। আশুবাবু এসে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর দুটি পা।

করিম মিঞার সানাইয়ে ছিঁড়ে যাওয়া মীড়ের মুখ থেকে পুরিয়া ধানেশ্রীর সুর আবার আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলল।

ছোটদের আসর
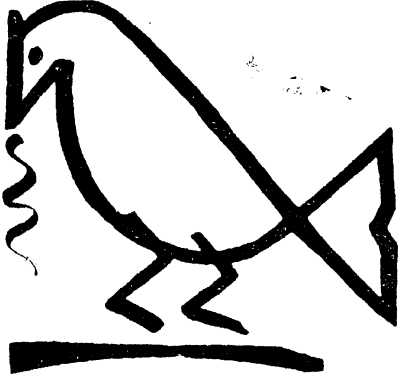
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আজ মীরার মনে পড়ছে কত দিন তার বাবাকে মা কথা শুনিয়েছে—তোমার সংসারে খেটে খেটে আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল। কখনো কিছু চাই না, গয়না না, শাড়ী না—টিপে টিপে তুমি পয়সা বের করবে—

তার বাবা হেসে বলেছে—কি করব, যেমন আয় তেমনি তো ব্যয় হবে? একশো টাকাও আয় নয়, তার ওপরে খরচ করি কি ক'রে? ধার করতেও পারব না—চুরি করতেও পারব না।

সে সব আমার জানবার দরকার নেই। কোনো মেয়েই সে কথা বোঝে না, বলে, যেখান থেকে পারো এনে দাও। আর আমার একখানা ভালো শাড়ী নেই যে কোথাও যাই।

আমারও তো নেই। ছেলেদেরও তো নেই। কি করবে বলো? যেমন ভাগ্য!

তোমার ভাগ্য কি কখনো ফিরতে নেই? চিরজন্ম কেবল দুঃখ আর দুঃখ?

কিছু বলা যায় না! হঠাৎ বরাত ফিরতেও পারে। অন্ধকার রাত্রির পরই সকাল আসে। ভগবান দয়া করলে সবই হয়।

ঐ বিশ্বাস নিয়েই থাকো! তার মা ঝঙ্কার দিয়েছিলো।

কিন্তু তার বাবার কথাই সত্যি হয়েছিলো। এত টাকা এসেছিলো তাদের সংসারে যে কল্পনার অতীত! জানে না মীরা এ সব দেখে তার মা কি বলেছিলো।

কিন্তু আবার তো দুঃখের দিন ঘনিয়ে এলো।

আজ তার মা রয়েছে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীতে। ঘরে ঘরে আলো পাখা। সামনে প্রকাণ্ড লন দক্ষিণের হাওয়া বয়ে আনে। বাড়ীতে সবশুদ্ধ সাতাশখানা ঘর। দূর থেকে দেখায় যেন প্রাসাদ। মোটর গাড়ী, টেলিফোন, ড্রাইভার, দরোয়ান, রাঁধুনী, চাকর-ঝি—ঘরভর্তি ফার্নিচার; বড়লোকের সব উপকরণই আছে।

কিন্তু আর কিছুই থাকবে না।

হ্যাংলা-প্যাংলার দামী পোষাক প'রে স্কুলে যাওয়া আর চলবে না; পিসিমার নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ভাগবত পাঠ বন্ধ হল। বন্ধ হল মায়ের সোয়েটার বোনা ইজিচেয়ারে ব'সে।

মীরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। দেখা করলো সে মগনলালের সঙ্গে।

মগনলাল ছেলেমানুষের মতন কাঁদতে লাগলো—তোমার বাবা আমার যা উপকার ক'রে গেছেন—জীবনে আমি ভুলতে পারব না মীরা!

কিন্তু এদের কি হবে কাকাবাবু?

কাদের কি হবে?

আমার মা আর ভায়েদের আরো কিছু দিন বাড়ীটায় থাকতে দিন।

কোন্ বাড়ীটায়?

যে বাড়ীটায় ওঁরা আছেন। আমি একটু দেখে-শুনে নিই।

তোমার দেখা-শোনার জন্তে আমি অপেক্ষা করতে যাব কেন!

আপনি দয়া করবেন না?

কিসের দয়া?

মীরা ভাবলো অবাঙালীরা এই রকমই হয়, বাঙালীর দুঃখ বোঝে না।

তবু বললে, এই শোকের সময়—

শোকে কি সান্ত্বনা আছে? এ শোক কি কোনো দিন ভোলা যাবে? কত বছর কেটে যাবে, তবু ভোলা যাবে না।

আপনাকে অনেক বছর অপেক্ষা করতে বলছি না। শুধু ক'টা দিন—

কিসের ক'টা দিন?

বলছি তো মায়েদের বাড়ী ছাড়ার।

বাড়ী ছাড়বে কেন?

আপনি বুঝতে পারছেন না?

কিছু বুঝতে পারছি না। আমি শুধু এই বুঝছি, তুমি ওদের দেখা-শোনার কথা বলছ।

আমি ছাড়া আর কে দেখবে ওদের? বাবা চ'লে গেছেন, আর কে আছে?

কেন, আমি তো আছি।

মীরা বলে, এবার আমার না বোঝবার পালা। আপনি কি বলছেন, ঠিক বুঝছি না। বাবা চ'লে গেলেন, আর তো ও-বাড়ীতে ওদের থাকা চলবে না?

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

কেন চলবে না? কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি? ট্যাঙ্কে জল কছে না?

অসুবিধে কিছুই নেই। রাজার হালে ওরা আছে। কিন্তু এ চা চলবে না?

কেন চলবে না?

এখন ওরা কি সুবাদে ওখানে থাকবে?

দাঁড়াও, দাঁড়াও, সুবাদে মানেটা বুঝে নিই। আমায় বুঝে নিতে ও। সক্কালবেলা কি সব কথা বলছ, আমি ভালো বাংলা জানি না—

সুবাদে মানে অধিকারে।

হ্যাংলা-প্যাংলা ওখানে থাকবে তাদের কাকাবাবুর ভাইপো হওয়ার অধিকারে। তোমার মা থাকবেন আমার বৌদি হওয়ার অধিকারে। পিসিমা থাকবেন ভাইয়ের অধিকারে।

লোকজন সব এমনি থাকবে?

না থাকলে চলবে কি ক'রে? কাজ হবে কি ক'রে?

টেলিফোন? মোটর?

নিশ্চয়ই। ও-ও তো দরকার। না দরকার নয়? আপনি কি বলছেন কাকাবাবু?—মীরা অবাক হয়।

মগনলাল বলে,—আমি এই বলছি কি যেমন সব চলছিলো, তেমনিই চলবে। কিছু পরিবর্ত্তন হবে না। শুধু তোমার বাবা আর আমার বন্ধু যে চ'লে গেছেন, সেই অভাব কখনো ভুলতে পারব না।

কিন্তু মাসে এই পাঁচ-সাতশো টাকা আপনি খরচ ক'রে যাবেন?

পাঁচ-সাত লাখ টাকা যে তোমার বাবার জন্যে পেয়েছি। এখন একটা দলিল করা আছে, তোমাদের দেখার—তোমার বাবাও জানতেন না—যাতে কারবারের শেয়ার আমাদের দু'জনের সমান সমান। কাজেই বুঝতে পারছ, তাঁর অংশের পাওনা মাসিক আয় তো কম নয়, তা থেকে না হয় হাজার টাকাই সংসার খরচ গেল!

মীরা অবাক হয়। ভাবে, পৃথিবীতে এখনো এমন মানুষও আছে? তাই তো পৃথিবী নরক হয়ে যায়নি।

মীরার মা-পিসিমাও অবাক হয়। তাদের মাথার ওপর থেকে দুর্ভাবনার পাহাড় স'রে যায়। তারা সহজ হবার চেষ্টা করে। ক'দিন রাত্রে ঘুম ছিল না।

শুধু হ্যাংলা-প্যাংলা কিছু বুঝতে পারে না। দু'দিন তাদের সুখ বন্ধ হয়েছে, সকালবেলার জলখাবার বন্ধ হয়েছে—তাদের বলা হয়েছে, আবার মুড়ি খাওয়া অভ্যাস করতে হবে।

আবার তাদের মাইনে দেওয়া বন্ধ হবে, খাতা থেকে নাম কাটা যাবে। আবার ম্লান মুখে বাড়ী ফিরতে হবে।

বড়োমানুষিয়ানার স্বাদ একবার পেলে গরীবানার মধ্যে ফিরতে শুধু কষ্ট হয় না, অনেক টিটকিরি সহ্য করতে হয় অনেক লোকের।

যেমন পাড়ার বাড়ুয্যে সাহেব প্রায় দু'লক্ষ টাকা জমিয়েও পরের সুখ সহ্য করতে পারে না, তার ছেলেমেয়েদের চেয়ে কেউ বেশী সাহেবিয়ানা করে, এ তার পক্ষে অসহ্য—বললে হ্যাংলা-প্যাংলাকে ডেকে—খুব দুঃখ্যু হচ্ছে তোমাদের—এ সব ছেড়ে ছুড়ে ঘর ভাড়া ক'রে থাকতে হবে ব'লে?—

প্যাংলা বললে, দুখ্যু তো হবেই। বাড়ুয্যের খোসাহে সাণ্ডেল তো হেসেই বাঁচে না।

দুখ্যু তো হবেই! সাহেবকে জীবনে দুখ্যু পেতে হয়নি, হবেও না। খোসাহেব একটা নয়, অনেকগুলো।

হ্যা হ্যা হ্যা ক'রে হাসে। এতে হাসবার কি আছে, হ্যাংলা ভেবেই পায় না। কিন্তু জগতে এত নোংরা লোকও আছে, যারা পরের দুঃখে যত আনন্দ পায়, নিজের সুখেও তত আনন্দ পায় না।

পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকরীতে ঢুকে বাবা শুধু ওপরওলার খোসামোদ ক'রে পরের সর্ব্বনাশ ক'রে অনেক উন্নতির আসনে গিয়ে বসে, হঠাৎ সাহেব সাজে, মুখে মিছরির ছুরির মতন হাসি দিয়ে কেবলি লোকের ক্ষতি করে, তাদের মত সাঙ্ঘাতিক জানোয়ার বাঘও নয়, সাপও নয়, ছুঁচো তাদের চেয়ে ঢের ভালো।

এই ক'দিনে পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে এই ধরণের জন্তুগুলোকে ভালো ক'রে ওদের দেখা হয়ে গেল। এর জন্যে চিড়িয়াখানায় যেতে হল না। কিন্তু হঠাৎ সকলকার মুখ চূণ হ'য়ে গেল। সাপগুলো যেন গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে গেল!

এ পাড়ায় এমন ঘটার শ্রাদ্ধ কেও দেখেনি। এমন কাঙালীভোজনও কেউ কখনো করায়নি! পাড়ায় যত ঘর গরীব-পরিবার ছিল, সকলকে আলাদা ক'রে খাওয়ালো মগনলাল। বাদ দিলো প্রত্যেকটি চালবাজ লোককে। বাড়ীর আলো নিবলো না, পাখা থামলো না, দরোয়ান সরলো না, মোটর হটলো না। যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটি চলতে লাগলো।

এ কি তিংসুটে লোকরা সহ্য করতে পারে? তাদের দম ফেটে যায়। অসুখে পড়ে।

মীরার মার হাতে সেই দলিল এলো—যাতে বিরাট কারবারের আধাআধি শেয়ার হ্যাংলা-প্যাংলার।

ওদিকে গুরুদেবকে দিয়ে দিয়ে ব্যারিষ্টার রায়চৌধুরীর ব্যাঙ্কের টাকা শেষ হয়ে আসে। বাড়ী বাঁধা পড়বার উপক্রম। ড্যাডি একদিন লাইব্রেরী-ঘরে ওকে ডাকলো। কড়িকাঠ-ঠেকানো সারি সারি আলমারী, আইনের বইয়ে ঠাসা। চামড়ায় বাঁধানো, সোনার জলে নাম লেখা হাজার হাজার বই। এত বইও মানুষ এক জীবনে প'ড়ে শেষ করতে পারে?

স্যর রাসবিহারীর এর চেয়ে বড় লাইব্রেরী ছিল। শুধু বই ছিল না, বইয়ের পাতা তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি জজ তৈরী করতেন, জজেদের শেখাতে পারতেন, কিন্তু জজিয়তী নেননি।

স্যর টি, পালিতের এমনি বই ছিল। রাসবিহারী উকীল, তারক পালিত ব্যারিষ্টার। দু'জনে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন। কোনো গুরুদেবকে নয়, ধর্ম্মের জন্যে নয়,—কর্ম্মের জন্যে, শিক্ষার জন্যে।

তাঁরা যখন ছিলেন, তখন কে জজ ছিল, কে লাটসাহেব ছিল, কে জমিদার ছিল, কে বড়লোক ছিল, আমরা জানি না। জানতে চাইও না—জানলেও সকলকে আমরা ভুলেছি, কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেখে, বিজ্ঞান কলেজ দেখে, আমরা এঁদের দু'জনকে মনে করি। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

একসঙ্গে এতগুলো কথাই মীরার মনে হল—লাইব্রেরীরুমে ঢুকে। যখনি সে এ ঘরে আসে, তখনই তার এমনি মনে হয়।

স্যর আশুতোষের এত বই আসত যে আলমারীতে সব ধরত না, ঘরেও না, বাইরে সিঁড়ির পাশে রাখতে হত।

রবীন্দ্রনাথেরও কত বই ছিল! বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কী বিরাট লাইব্রেরী! যিনিই বড়ো হয়েছেন, তিনি কত পড়েছেন। না প'ড়ে কেউ কি বড়ো হ'তে পারে? শোনো মীরা!

এতক্ষণ ড্যাডি চুপ ক'রে ছিলো। কি ভাবছিলো।

মাম্মিও এসে পড়লো। মাম্মি এখন আর উল বোনে না। ষ্টাইলের কথা বলে না। গরদের শাড়ী বেশীর ভাগই পরে।

দু'জনেই ওরা অনেক গম্ভীর হ'য়ে গেছে। পরলোক সম্বন্ধে কি সব আলোচনা হয়। মীরার মনে হয়—সৎসঙ্গের এই একটা মস্ত মূল্য। পরিবর্ত্তন আনবেই।

শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা নয়, পরের উপকার করা, পরের কথা ভাবা, পরের দুঃখ বোঝা—এই সব মহৎ গুণ দেখা দেবেই।

শোনো মীরা, আমাদের পুরোনো বাড়ীতে নীচের তলায় একজন গরীব লোক থাকত পরিবার নিয়ে। প্রেসে কাজ করত। সে অসুখে পড়েছে। তার স্ত্রী আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে।

মীরা আশ্চর্য্য হয়, হয়তো একজন কম্পোজিটর কিংবা মেশিনম্যান—যারা হাতে-পায়ে কালি মেখে অপরের বই ঝকঝকে ক'রে তোলে, যারা হয়তো সারা দিন ব'সে কিংবা সারা রাত জেগে লেখকদের প্রসিদ্ধ হ'তে সাহায্য করে, পণ্ডিতকে করে বিখ্যাত, তাদের কথা কে ভাবে? বিশেষ করে এই সব সাহেব-ব্যারিষ্টারেরা তো নয়ই। আজ ধর্ম্মসভায় গিয়ে তাদের কথা মনে পড়েছে। যারা বংশমর্য্যাদায়, শিক্ষা-দীক্ষায় কারুর চেয়ে নীচু নয়—সেই সব ম্লানমুখ প্রেসের লোকদের—হাজার হাজার প্রেসের লক্ষ লক্ষ অখ্যাত কর্ম্মচারীদের একজনকে।

তবু ভালো। চুপ করে শোনে—আমাদের দু'জনের নিজস্ব টাকা যে ছিল ব্যাঙ্কে, শেষ হ'য়ে এসেছে। তোমার নামে আলাদা টাকা আছে, তাই থেকে দু'হাজার টাকা কি দিতে পারি? এখন তুমি সাবালিকা হয়েছ, তোমার মত চাই, তোমার সই চাই।

এক্ষণি। এক্ষণি। মীরা চেঁচিয়ে ওঠে। যে টাকার কথার সে কিছুই জানে না, যার জন্যে তার কোনোই মায়া নেই, সেই টাকায় একজন রুগ্ন মানুষ সুস্থ হয়ে উঠবে, একটা ঘরে হাসি ফুটবে, ছেলেমেয়েরা আনন্দে ছুটোছুটি করবে, এর মধ্যে আর কোনো কথা আছে নাকি? সে সই করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়।

তার মুখে একটা আলো ফুটে ওঠে, যে আলো,—ব্যারিষ্টারের মনে হয়—পৃথিবীর নয়, স্বর্গের।

মেয়েরাই পারে এত সহজে টাকাকে অস্বীকার করতে করুণায়। সব মেয়ে অবশ্য পারে না। পুরুষরা কিন্তু হিসাব করে। নিজের রেখে তবে দান। হিসাব না করে যারা দান করে, তারা বিদ্যাসাগর, মাইকেল, মণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ মল্লিক, চিত্তরঞ্জন।

মেয়েদের মধ্যে অহল্যাবাঈ, রাসমণি ছেড়ে দাও, ঘরে ঘরে বুড়িদের দেখ, সব দিয়ে দিচ্ছে—যেখানে যত পয়সা জমানো ছিল—যে ঠকিয়ে নিতে পারে, তাকে। ভাইপো, ভাগুরপো, ছেলে, পুরুত, পাণ্ডা, নাপিত, ভিখারী।

মীরার বিদুষী ব'লে নাম হয়ে গেছে, এবার আবৃত্তি বিচারের জন্যে ওকে ডাকছে। ওর মনে পড়লো, ওর এক বান্ধবী ছিল কৃষ্ণা। শালকেতে আবৃত্তি করেছিলো—পদ্মনদের তীরে। সমস্ত ছেলেদের হারিয়ে দিয়ে পদক পেয়েছিলো, বিচারকর্ত্তা আপত্তি করেছিলো, কণ্ঠ পাকড়ি, ধরিল আঁকড়ি হবে, না কণ্ঠ পাকোড়ি ধরিলো আঁকোড়ি হবে, কৃষ্ণারই জয় হয়েছিলো, সামান্য ব্যাপারে আটকায়নি। রাধার মতন সুন্দরী সেই কৃষ্ণা! কি জানি, কোথায় কা'দের পুত্রবধূ, কিন্তু সে রকম আবৃত্তি আর মীরা শোনেনি ঐ কবিতার।

আর ছিলো শর্ম্মিষ্ঠা। নিজের লেখা কবিতা সে পড়তে পারত অদ্ভুত সুন্দর ভঙ্গীতে। কবিখ্যাতি সে অর্জ্জন করত বাংলা দেশে, যদি লিখে চলত। সে'ও কোথায় হারিয়ে গেল, বালিগঞ্জ থেকে নিউ আলিপুর, সেখান থেকে কোথায়! তার প্রাণের বন্ধু অঞ্জলিও তার খবর দিতে পারলো না।

এমনি ক'রে একদিন সেই সব সঙ্গিনীরাও হারিয়ে যায়, যাদের সঙ্গে কখনো ছাড়াছাড়ি হবে, একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারা যায়নি! এ যেন আলাপ রেল-ষ্টেশনের—রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে—ভস্‌ভস আড্ডা।

এর পর একদিন বক্তৃতার আমন্ত্রণ এলো মহিলা-সভায়। এইবার মুস্কিল হল মীরার। বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতে হয়। অনেক লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কিংবা ব'সে নতুন কিছু বলা কখনোই সহজ ব্যাপার নয়। পা কাঁপে, গলা কাঁপে।

ভালো ক'রে বলতে পারা খুব সাহসের পরিচয়। খুসি করা আরো শক্ত। হাসানো তো অসম্ভব। হাসির কথাতেও সকলে হাসতে চায় না। আর চাই মাত্রা-জ্ঞান, কতটা বলব, কতটা বলব না। ছোটদের আবৃত্তি করার মধ্যে, গান করার মধ্যে সেই সাহসটা হ'য়ে যায়, কিন্তু নিজের ভাষায় গুছিয়ে কিছু বলতে পারা অন্য জিনিস।

গান্ধী জেনেছিলেন, তাঁকে বক্তৃতা করতে হবে অনেক লোকের কাছে। ওকালতি করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। আদালতে ক'জন লোকের সামনে সামান্য কিছু বলা, তাও তিনি শেষ করতে পারেননি। মক্কেলের দেওয়া জীবনের প্রথম তিরিশ টাকা তিনি লজ্জায় ফেরৎ দিয়েছিলেন। সেই মানুষকে লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে হয়েছে, গলার স্বর কাঁপেনি, ভয় তাঁর হয়নি। কি ক'রে এ অসাধ্য সাধন হল? অভ্যাস।

মীরার অভ্যাস করার সময় নেই। সভায় গিয়ে দেখলে—মেয়েরা প্রায় পঞ্চাশ জন। বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতীর অভাব নেই। অধ্যাপিকারাও আছে।

মীরা বললে, আমাকে আপনারা ভালোবেসে ডেকেছেন, এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অনাথ ছেলেমেয়েদের ভার আপনারা নিচ্ছেন দেশের মায়েরা, এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে? আমাদের কবি বলেছেন—

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব।
মাতৃহারা মা যদি না পায়,
তবে আজ কিসের উৎসব?

কিন্তু এ কথা প্রমাণ করতে হয় কাজে। বক্তৃতা দিয়ে নয়। আমার দ্বারা তো নয়ই। এ সম্বন্ধে একটি গল্প শুনুন :—

গল্পের নামে সবাই উৎসুক হ'য়ে ওঠে। মেয়েরা শিক্ষিতাই হোক্, গৃহিণীই হোক্, গল্প শুনতে খুব পটু।

মীরা ব'লে চলে :—চেষ্টারটন মস্ত বড়ো লেখক ছিলেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তিনি লিখতেই পারতেন। বলতে কিছু পারতেন না। খেতেও পারতেন প্রচুর। এক দিন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে জব্দ করবার জন্যে এক ভোজে তাঁকে ডেকে আনলো। ডিনারে তো খাওয়া-দাওয়া অনেকই থাকে। চেষ্টারটন গোগ্রাসে এমন খেয়েছেন যে নড়তে পারছেন না। ডিনারের নিয়ম হল—প্রধান অতিথিকে বক্তৃতা দিতে হয়। চেষ্টারটন প্রধান অতিথি। তাঁকে বক্তৃতার জন্যে অনুরোধ করা হল। তিনি কষ্টেসৃষ্টে উঠলেন, উঠে বললেন—আমি জানি ডিনারে বক্তৃতা দিতে হয়, যা আমি মোটেই পারি না। লোভে প'ড়ে নেমন্তন্ন গ্রহণ ক'রে এখন পড়েছি বিপদে। কিন্তু কিছু দিন আগে যে মুস্কিলে পড়েছিলুম, তার কথাটা বলে মিই। আমি বেড়াতে বেড়াতে এক জঙ্গলে গিয়ে পড়ি। সন্ধ্যে হ'তেই এক বাঘ এসে আমাকে ধরেছে, বললে—চেষ্টারটন, তোমায় খাব। তোমার গায়ে অনেক মাংস। তোমাকে দিয়েই আজ আমার ডিনার। আমি বললুম—বেশ, ভালো কথা। আমাকে দিয়েই ডিনার করো। কিন্তু ডিনারের বক্তৃতা তৈরী করেছ কি? খাবার পর যে বক্তৃতা তোমায় দিতে হবে, সেটার ব্যবস্থা হয়েছে? বাঘ তো সে কথা শুনেই বললে—বাপ্‌স্! আমার দরকার নেই ডিনারে। ব'লেই ল্যাজ তুলে ছুট। যে বক্তৃতার নাম শুনে বাঘ-যে-বাঘ—সে'ও পালায়, সেখানে আমি কোন্ ছার?

মেয়েরা তো হেসে লুটিয়ে পড়লো। মীরা এই ফাঁকে ব'লে নিলে—যেখানে চেষ্টারটনের মতন বড়ো লেখক হার মানেন, সেখানে আমি মীরা রায়চৌধুরী কোন্ ছার? [ক্রমশঃ।

একটি ছেলের কথা

(রাশিয়ার গল্প)

শহরের গা বেয়ে ভল্‌গা নদী চলে গিয়েছে। নদীর ধারে শ্যামকো নামে একটি ছেলে থাকত। সে গরীব ছিল, বন্ধু-বান্ধব কেউ ছিল না। দু'টি জিনিষ অতি প্রিয় ছিল—একটি বেহালা আর একটি ভল্‌গা। গ্রামে নাচের আসরে সারা রাত বেহালা বাজাত কিন্তু কেউ তাকে লক্ষ্য ক'রত না। কখন কখনও জেলেদের মাছ ধরতে সাহায্য করত, জেলেরা দয়া করে তাকে একটি মাছ দিত।

একদিন বিকেলে জেলেরা শহরে মাছ বিক্রী করতে গেল, সেই সময় শ্যামকো তাদের জালগুলো পাহারা দিতে লাগল। নদীর ধারে বসে একমনে বেহালা বাজাতে লাগল আর ভল্‌গার কথা চিন্তা করতে লাগল।

এই সময় হঠাৎ নদীর মধ্যে ঘূর্ণিজল দেখতে পেল। তার চার দিকে ছোট ছোট ঢেউ আড়াআড়ি ভাবে ঘুরছিল, মধ্যে ছিল একটি গর্ত। সেই গর্তের মধ্যে থেকে বেরোল একটি অদ্ভুত জীব! সবুজ রংয়ের লম্বা চুল আর ধারালো চোখ ছিল। ভাঙা ঢেউ যে ভাষায় তীরের সঙ্গে কথা বলে, অদ্ভুত জীবটি সেই ভাষায় শ্যামকোর সঙ্গে কথা বলল, সমুদ্রের রাজা তোমার বাজনা শুনেছেন। তিনি তোমাকে দেখতে চান।

শ্যামকোর চোখ বড় হয়ে গেল—বলল, আমি যদি রাজার কাছে বাজনা বাজাই, রাজা কি দেবেন?

অদ্ভুত জীবটি উত্তর দিল, তোমার যা ইচ্ছে, তাই পছন্দ কর। রাজা তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করবেন। কিন্তু রাজা তোমাকে যখন ডাকবেন, তোমাকে আসতেই হবে।

তখন শ্যামকো বলল, আমাকে সোনা দাও, আমি যাব।

দূত ঢেউয়ের নীচে ডুব দিল। যখন ঘূর্ণিজল স্থির হল, তখন শ্যামকো দেখতে পেল, কিছু যেন জলের মধ্যে ভাসছে। কিছু পরে শ্যামকো দেখতে পেল যে, সেটি একটি বাক্স। আনন্দের সঙ্গে ধরল। বাক্সের মধ্যে ছিল সোনার টুকরো।

শ্যামকো খুব খুসী হ'ল। নিজের জন্য ভাল পোষাক কিনল। দোকান খুলল। ক্রমে নামকরা ব্যবসায়ী হ'ল। ব্যবসার জন্য তাকে এদিক ওদিক যেতে হ'ত।

একবার শ্যামকো কাস্পিয়ান সাগরের উপর দিয়ে জাহাজে চড়ে যাচ্ছিল। এই সময় ঝড় উঠল। জাহাজ প্রায় ডুবে যাবার অবস্থা, নাবিকরা ভয় পেল—ব'লল, সমুদ্রের রাজা কোন কারণে বিরক্ত হয়েছেন সন্দেহ নেই। আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যার জন্য আজ আমাদের এই অবস্থা। আমরা তাকে খুঁজে বার ক'রব এবং সমুদ্রে ফেলে দেব।

তারা একটি দড়িকে একই মাপের সমান টুকরো করে কাটল। প্রত্যেক টুকরোতে একটি করে গিঁট দিল। শেষে সব টুকরোগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে লোকদের একটি করে টুকরো বার করতে ব'লল। যখন শ্যামকোর পালা এল, শ্যামকো গিঁটশুদ্ধ এক টুকরো দড়ি বার করল। নাবিকরা চিৎকার করে বলে উঠল। 'যাদুকর!' কিন্তু শ্যামকো বুঝতে পেরেছিল যে, সমুদ্রের রাজার ডাক এসেছে। শ্যামকো বেহালা নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিল।

শ্যামকো জলের মধ্যে দিয়ে নীচে চলে গেল। সামনে দেখতে পেল রাজপ্রাসাদ। দু'জন পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামকো তাদের ভ্রূক্ষেপ না করে সামনে দিয়ে গট্‌গট্ করে হেঁটে চলে গেল একটা বড় ঘরের মধ্যে। রাজা সেখানে বিশ্রাম করছিলেন।

রাজা শ্যামকোকে দেখে খুসী হলেন। বললেন, অনেক দিন থেকেই তোমার এখানে আসার কথা ছিল। এখন তুমি বাজনা বাজাও।

শ্যামকোর বাজনার সঙ্গে সঙ্গে রাজা নাচতে লাগলেন। বাড়ীর মত উঁচু ঢেউ সাগরের উপর দিয়ে যেতে লাগল। সকলে ভয় পেল।

শেষে রাজা ব'ললেন, এত সুন্দর বাজাও! এখানে থাক। আমার তিরিশটি মেয়ে আছে। এদের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হবে, তাকে তুমি নাও।

এর পর রাজা তার মেয়েদের দেখাতে লাগলেন। উনত্রিশ জন মেয়ে রাজার সামনে দিয়ে চলে গেল কিন্তু কাউকে শ্যামকোর চোখে লাগল না। শেষে রাজার ছোট মেয়ে শ্যামকোর সামনে দাঁড়াল। শ্যামকোর বড় ভাল লাগল। জিজ্ঞেস ক'রল নাম। নাম শুনলো ভল্‌গা। রাজার কথাই শ্যামকো রাখল। ভল্‌গাকে বিয়ে করে তারা আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন রাতে শ্যামকোর মনে হ'ল যে, ভল্‌গা ঘরে নেই। জেগে উঠল। দেখল, ভল্‌গার ধারে শুয়ে আছে, হাতে রয়েছে বেহালা। অবস্থা একই আছে। স্বপ্ন ভেঙে গেল। বাস্তব জগতে ফিরে এল। কিন্তু ভল্‌গা তার পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে। মনের দুঃখে শ্যামকো বেহালা নিল এবং নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিল। ফিরে যেতে চায় ভল্‌গার কাছে। অনুবাদ :—বকুল ঘোষ।

সুমণি মিত্র

০

"Have no words of condemnation,..
I must again
Draw your attention
To the fact
That
Cursing and vilifying and abusing
Do not
And can not produce
Anything good,
They have been tried
For years and years.
And
No valuable result
Has been obtained." ১

* * *

"All the reformers in India
Made the serious mistake
Of holding religion
Accountable
For all the horrors of priestcraft
And degeneration,
And went forthwith
To pull down
The indestructible structure,..

Begining from Buddha
Down to Ram Mohan Roy,
Everyone made the mistake
Of holding caste
To be a religious institution
And tried to pull down
Religion and caste altogether
And failed." ২

* * *

Hear me, my friend
I have discovered the secret
Through the grace of the Lord.
Religion is not at fault.
..But
It was the want
Of practical application
The want of sympathy—
The want of heart." ৩

৪১

হে রামমোহন,
যুগের সারথি তুমি,
অসংখ্য গুণে গুণী,
সত্যিই তুমি অনুপম।

১। "নিন্দে কোরোনা,...আমি আবার তোমাদের স্মরণ কোরিয়ে দিচ্ছি, অভিশাপ, নিন্দে এবং গালাগালির দ্বারা কোনো সংকাজ হয় না। বহু বছর ধোরে তা' করা হোয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো সুফল ফলেনি।"
—The mission of the Vedanta, Lectures from Colombo to Almora (*Page* 108.)

২। "ভারতের সব সংস্কার কই ? ধর্মকেই সমস্ত পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অবনতির জন্যে দায়ী কোরে গুরুতর ভুল কোরে গ্যাছেন। তাঁরা হিন্দুধর্মের এই অবিনশ্বর কাঠামোটাকে ভাঙ্গতে উদ্যত হোয়েছিলেন,...
বুদ্ধ থেকে রামমোহন রায় পর্যন্ত সবাই এই ভুলটা কোরেছিলেন যে, জাতিভেদ একটা ধর্মবিধান, তাই তাঁরা ধর্ম এবং জাতি দুটোকেই এক সঙ্গে ভাঙ্গতে চেষ্টা কোরেছিলেন, কিন্তু বিফল হোয়েছেন।"
—Letters of Swami Vivekananda (*Page* 68. *Letter no* 53. *dated 2nd Nov.*, 1893)

৩। "শোনো বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি এর রহস্য আবিষ্কার কোরেছি। হিন্দুধর্মের কোনো গলদ নেই।...সমাজের এই দুরবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কাজে না লাগানো, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।"
—Letters. (*Page* 63. *Letter no* 52. *dated* 20*th August*, 1893.)

জাতীয় জীবনে এই
তোমার কীর্তি নেই,
এমন বিভাগ খুব কম।

তবুও তোমার
প্রচণ্ড মনীষার
নির্মোহ দৃষ্টির
নিশ্চয়ই আছে ব্যতিক্রম।৪

ভারতের ইতিহাসে
যে-যুগের কোরেছো বোধন,
সেই যুগে সর্বপ্রথম
সমাজ-সংস্কারে
সনাতন ধর্মকে
তুমিই কি করোনি জখম?
সমাজের সব দোষ
ধর্মের ঘাড়ে ফেলে
ধর্মের চাওনি ভাঙন?৫
স্বামিজীও আজীবন
সমাজের সেবা কোরেছেন,
তাই বোলে ধর্মকে
কোরেছেন গালিবর্ষণ?
সনাতন ধর্মের
গায়ে হাত তুলতে গ্যাছেন?
স্বধর্ম লঙ্ঘনে
কোনোদিন দিয়েছেন মন?

৪। আমাদের পৌরাণিক যুগের বিচারে রাজা রামমোহনের মতো অত বড়ো মনীষীও নিতান্ত অনুদার মতামত প্রচার কোরে গ্যাছেন। পুরাণের ভক্তি-ধর্মকে অধঃপতিত যুগের একটা নিম্নস্তরের ধর্ম বোলতে লজ্জাবোধ করেননি। শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের আক্রমণের উত্তর দিতে গিয়ে পুরাণ সম্বন্ধে তিনি বোলেছেন,—"পুরাণে অধিক এই যে, মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক প্রকারে পরমার্থ সাধন বিনা জন্মক্ষেপ করিবে কিংবা কুকর্মে প্রবৃত্ত হইবে, অতএব নিরবলম্বন হইতে ও কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্বদা আগ্রহ হয়, তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।" রামমোহনের এই গবেষণা খুব প্রশংসনীয় নয়। কেননা, পুরাণের যুগ অধঃপতিত যুগ নয়। আমাদের জাতীয় জীবনে এও একটা বিকাশের যুগ। ভক্তিতত্ত্বের চরম বিকাশ এই পৌরাণিক যুগেই। অতএব যারা বেদান্তের অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ও ধারণায় অসমর্থ, পুরাণের ভক্তি-ধর্ম তাদের জন্তেই,—রাজার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। কেননা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি অবতারেরা তাঁর এই উক্তির জীবন্ত প্রতিবাদ। সবাই জানেন, ধর্মজীবনে তাঁরা মূর্তি-পূজক, কিন্তু কেউ কি বোলবেন ধর্ম-জগতে তাঁরা নিম্ন অধিকারী? অদ্বৈতবেদান্তবাদী, যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দও বেলুড়-মঠে দুর্গোৎসব কোরেছিলেন, কালীঘাটে, ক্ষীরভবানীর মন্দিরে কিংবা অমরনাথে পুজো দিয়েছিলেন। তবে কি তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী নন, কিংবা রাজার ভাষায় 'মন্দবুদ্ধি'? মূর্খেরা মূর্তির সাহায্য নেবে আর বুদ্ধিমান অমূর্তের ধ্যান কোরবে,—রাজার এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নয়। মূর্তি ও অমূর্ত-পুজোয় বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য জ্ঞান করা নির্বুদ্ধিতা। অমূর্তের উপাসনা শুধু মূর্খ লোককে কেন, অনেক মূর্খ জাতিকেও গ্রহণ কোরতে ছাখা গ্যাছে, আবার অনেক অসাধারণ ধী-সম্পন্ন মহাপুরুষরাও মূর্তির সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করেননি।

যাই হোক, রামমোহন তাঁর অসামান্ত মনীষা সত্বেও সম্ভবতঃ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান,—এই ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারাটাকে হৃদয়ঙ্গম কোরতে পারেননি।

সংস্কার-যুগে রামমোহনের পর বিজ্ঞানঅনুরাগী অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ে' পুরাণ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা কোরেছেন, তা' অনেকটা রামমোহনী সিদ্ধান্তেরই সামিল। পুরাণের সাধনাঙ্গে যে-সব অশ্লীল আবর্জনা এসে জমেছিলো, তিনি তার বিরুদ্ধেই লেখনী ধারণ কোরেছিলেন।

সংস্কার-যুগে একমাত্র কেশব সেনের মধ্যেই পৌরাণিক ভক্তিবাদের পুনর্বিকাশ ছাখা যায়। ম্যাক্সমূলার এবং অন্তান্ত মনীষীদের মতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পরই ধর্মজীবনে তাঁর এই পরিবর্তন এসেছিলো। তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তন, সংস্কার-যুগের দৃষ্টিতে কলঙ্কের বোলে মনে হোলেও, আমাদের জাতীয় দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই গৌরবের।

পরে, সমন্বয়-যুগে স্বামিজীর কাছ থেকে, শঙ্কর অনুগামী, অদ্বৈতবেদান্তবাদী বিবেকানন্দের কাছ থেকে পুরাণের এই ভক্তি-ধর্ম সম্বন্ধে অনেক উন্নত, উদার এবং বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি।

৫। রাজা রামমোহন রায় স্পষ্ট বোলেছেন, অন্ততঃ সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্তে হিন্দুধর্মের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

"...I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interests. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them, has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprises..It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of thier political advantage and social comfort."

—Extract from a letter to J. Digboy. England, Jan. 18, 1828 by Ram Mohan Roy.

তিনি জানতেন—
নৈতিক শিক্ষার বলে
ব্যক্তির চরিত্র উন্নত হোলে
সুপ্ত আত্মবোধ জাগাবে যখোন,
তখন নিজেরই জোরে
নিজেরাই উঠে-পোড়ে
নিজেদের কোরবে শোধন।
জাতিভেদ ভালো কি ভালো না,
পুতুল-পূজোটা শুভ কিনা,
সে-ব্যাপারে নেতাদের
চিন্তার নেই প্রয়োজন
পারো যদি খুলে দাও চোখ,
দাও তাকে জ্ঞানের আলোক,
দেখবে—নিজেই
নিজের সংস্কার কোরবে তখন।
সমাজ-সংস্কারে
অন্ততঃ তার বেশি
আর কিছু নেই প্রয়োজন।

অথচ তুমিই রাজা
এ-সত্য ভুলে,
সমাজের হিতার্থে
সদর্পে আস্তিন তুলে
সনাতন ধর্মকে
কোরে গ্যাছো গালিবর্ষণ।
পুরাণের ধর্মকে
অসত্য মনে করা
তোমার কি হোয়েছে শোভন ?
কেন তুমি তেড়ে-ফুঁড়ে
ভক্তিবাদের প্রতি
সদম্ভে হোলে নির্মম ?

মুসলিমী মতবাদ
আজীবন আকণ্ঠ ঠুসে,
মূর্তি-পূজোর প্রতি
বিজাতীয় বিদ্বেষ পুষে
পুরাণের ধর্মকে
কেন তুমি করো বর্জন ?
ভেবেছো কি আমাদের
জাতীয় জীবনে এর
এতটুকু নেই প্রয়োজন ?
নিজে যেটা ভালোবাসো,
ইস্লামী আদর্শ
জোর কোরে গেলানোটা ভ্রম।৬

কিংবা বেদান্তবাদী
হোতে হবে বোলে
মূর্তি বা ভক্তিকে
পায়েতে থেঁতলে যাবে চোলে ?
স্বামিজী বা শঙ্কর,
তাঁরাও তো বেদান্তবাদী,
তাই বোলে তাঁদের কি
ভক্তির বিকাশটা কম ?

৬। রামমোহনের জীবনে ইস্লামধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বাল্যকাল থেকেই তিনি ইস্লামের নিরঙ্কুশ একেশ্বরবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হোয়েছিলেন। কাজেই মূর্তি-পূজো এবং দেব-দেবী-বহুল পুরাণের ভক্তি-ধর্মকে সুনজরে দেখতে পারেননি। পরে ধর্ম-জীবনে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ গ্রহণ কোরে মূর্তি-পূজোর প্রতি আরো নির্মম হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি "হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এতে যুক্তি-তর্কের দ্বারা মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধতা করা হোয়েছে। এর কয়েক বছর পরে "মানজারা" নামে আর একটি ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তার পর আবার উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বছরে তিনি "তুহফাতুল্ মওয়াহিদ্দীন" রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি যুক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা কোরতে গিয়ে কোরাণ ও হাদিস থেকে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত কোরেছেন। তাঁর এই মুস্লিম্-প্রীতি সম্বন্ধে আলোচনা কোরতে গিয়ে ইংরেজ জীবনীকার Miss Sophia Dobson Collet লিখছেন,—"Ram Mohan seemed always pleased to have an opportunity of defending the character of Mohomet. He began to write a biography which was unhappily never finished."

ঐ প্রসঙ্গেই Abbe Gregoire লিখছেন—রামমোহন "prepared himself for his polemical career from the logic of the Arabian which he regards as superior to every other."

তাছাড়া, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও মুসলিমী প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তিনি সর্বদা চোগা, চাপকান, পায়জামা পোরতেন এবং প্রত্যহ পোলাও, কোপ্তা, কোর্মা ইত্যাদি মুসলমানী খাবার খেতেন। উন্নত সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে তিনি যে-ধর্মের ভিত্তি পত্তন কোরে গ্যাছেন, শুধু বেদ বা উপনিষদ থেকেই তার উপাদান সংগ্রহ করেননি, বরং মুসলমানদের কোরাণ, হজরত মোহাম্মদের জীবনী, মোতাজেলা দর্শন, সুফী সাহিত্য এবং মুসলমানী সভ্যতা এবং কৃষ্টি থেকেই মাল-মসলা সংগ্রহ কোরেছেন বেশি। মুসলমানেরা তাই আজও তাঁকে ইসলাম-অনুগামী মনে কোরে গর্ববোধ করে।

বিদুষী মুসলিম মহিলা শাম-সুন-নাহার নির্ভয়ে লিখছেন,—"একথা মনে কোরে আজ মুসলমান গৌরব অনুভব ক'রতে পারে যে, রামমোহনের প্রতীক উপাসনার প্রতি বিতৃষ্ণা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্পর্কে তাঁর ধারণা, বিধর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার, নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সর্বোপরি লোক-শ্রেয়ঃ ও বিচার-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া, ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তিনি ইসলামের কাছেই সবচেয়ে ঋণী।"

৪২

স্বয়ং জীবন্ত বেদ
শ্রীরামকৃষ্ণদেব
মূর্তি-পূজক ব্রাহ্মণ।
শুক্‌নো বিচার কোরে
নিছক্ গায়ের জোরে
যাঁদের কোরেছো বর্জন,
পুরাণ-কথিত সেই
দেব-দেবী আদপেই
অলীক্ বা অদৃশ্য নন্।
কেউ তাঁখা চেয়েছেন ?
ঠাকুরই তো পেয়েছেন
তাঁদের দিব্য দর্শন।
শুধু চোখে তাঁখা নয়,
অন্তরঙ্গতায়
কতো দিন কতো কথা কন্।

এইবার রামমোহন-অনুরাগী আচার্য ব্রজেন শীল কি বোলেছেন নবেন ? "..it was Islamic culture, the culture of agdad and Bassora, filtered through an Indian Madrassa, that first woke the boy's mind. Euclidean Geometry, the categories of Porphyry's Logic through the Arabic 'Mantiq,' yrical raptures of Persian 'ghazals' felt in the lood..first opened his mind's eye. And thus did flatun (Plato) and Aristu (Aristotle) of Old reece visit the Brahmin boy in an Arabic uise.

The foundations of his studies in Persian nd Arabic were thus laid at Patna, and he rew up in later years to be a 'Zabardast Moulavi', wise with wisdom of Quran Sharif arned in Mohammadan Law and Jurisprudence nd versed in the polemics of all the 63 schools f Mohammadan Theology.

And it must never be forgotten that the free hought and the universalistic outlook of the Mohammadan rationalists (the Mutaza'lis of he 8th century), and the Mohammadan Unitarians (the Muwahhiddin) were among he most powerful of the formative influences on he Raja's mental growth. And some of his arly tracts on monotheistic and anti-idolatrous orship appear to have written in Persian."

—Rommohan Roy : The Universal man.

তোমাদেরই প্রতিবাদে
এ-কথা সিংহনাদে
বোলেছেন ব্রহ্ম স্বয়ং।
ভক্তিটা পাকা হোলে
আমরাও সকলে
নিশ্চয়ই পাবো দর্শন।
ভক্তি থাকলে তাঁরা
দেবেন না কেন সাড়া:
ভক্তের অধীন যখোন্?
বুদ্ধির আলো জ্বেলে
পুরাণকে ঠেলে ফেলে
যে-যুগের কোরেছো বোধন,
তোমারই সে-যুগটার
প্রচণ্ড প্রতিবাদ
ঠাকুরের বোধির সাধন।
সাধনালব্ধ এই
সত্যানুভূতিতেই
ছুটে গ্যাছে বুদ্ধির দম্।
'ভক্তের রাজা' এই ৭
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণেই
পুরাণের পুনরাগমন।

৪৩

যাই হোক্ রাজা
এ-ব্যাপারে তুমি অনুদার।
শাস্ত্রের গতি তুমি স্বীকার কোরেও
পুরাণের যুগ-সত্তাটার
বিকাশের ধারাটাকে
কোনোদিন করোনি স্বীকার।
সত্যি বলো তো রাজা
অধঃপতন ছাড়া
পুরাণের কিছু নেই আর?
বিবর্তনের ধারা থেকে
পুরাণের যুগ-ধর্মটাকে
বিচ্ছিন্ন কোরে তার
সঙ্গতি খোঁজাটা কেমন?
মূল সুর থেকে তাকে
ছিঁড়ে এনে কেন তুমি
তার প্রতি হোলে নির্মম
ধর্ম, সমাজ বলো
সবই তো সচল।
প্রত্যেক যুগই
যে-যুগটা চোলে গ্যালো
তারই ফলাফল।

সে-হিসেবে স্বামিজীও
তোমাদেরই ভাবের ফসল।
পৃথিবীর কোনো কিছুতেই
বেখাপ্পা বোলে কিছু নেই,
বিবর্তনের স্রোতে
আচম্কা ছেদ কিছু নেই।
সবাইকে চাই সকলের।
আগত ও অনাগত ভাবধারা যতো
গাঁটছড়া বাঁধা সকলের।
কোনো ভাবই ভুঁইফোড় নয়,
পুরাণের যুগটাও
ভারতীয় ইতিহাসে
উড়ে-আসা জঞ্জাল নয়।

এক একটা যুগ যেন
সংগীত-মুখরিত
সাগরের এক একটা ঢেউ।
কালের সাগর থেকে
একটা যুগকে যদি
জোর কোরে ছিঁড়ে এনে কেউ
কলগান আশা কোরে থাকে,
তার কানে সে-যুগের সুর
বেসুরোর মতো বাজবেই;
—সেটা তারই বুদ্ধির ভ্রম,
সমঝদারের কাছে
সে-যুগেরও আছে প্রয়োজন।

মোটকথা এই—
বিকাশের ধারাটাকে
মেনে নিয়ে তবে
সে-যুগের মন নিয়ে
সে-যুগকে বুঝে নিতে হবে।

আমাদের জাতীয় জীবনে
বেদ আর পুরাণের মাঝখানটায়
বিবর্তনের ধারা
আচম্কা যায়নিকো থেমে।
উপনিষদের বুক থেকে
আমরা হঠাৎ
পিছলে পোড়িনি কেউ
পুরাণের পঙ্কিল যুগে।
উপনিষদের ব্রহ্মই
যুগপ্রয়োজনে
বিবর্তনের পথে
তাঁথা তান ঈশ্বররূপে। [ক্রমশঃ

৭। মা'র কাছে ঠাকুরের প্রার্থনা ছিলো,—"মা, আমি ভক্তের রাজা হবো।"
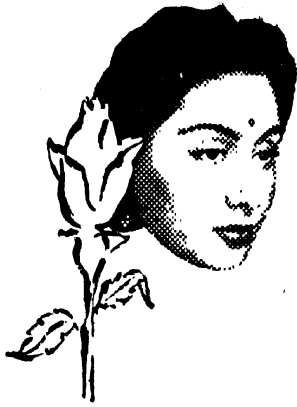
Rexona
BLENDED WITH CADYL
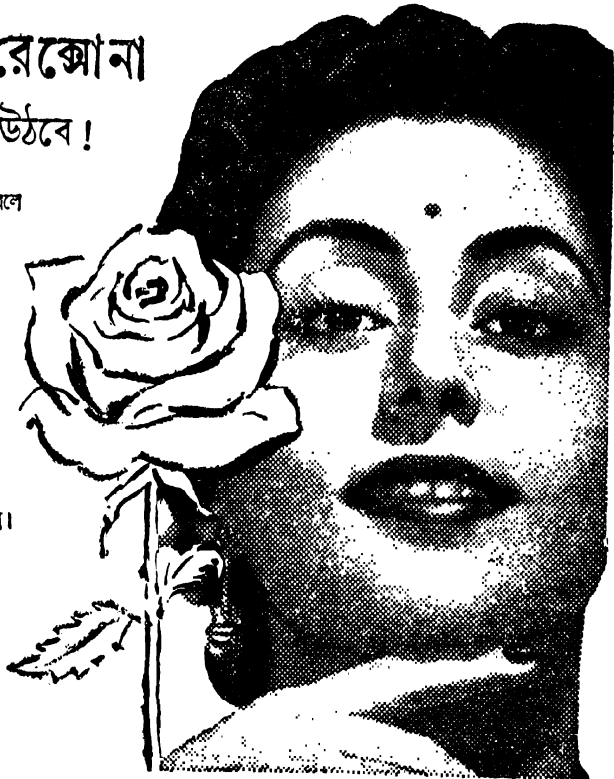
জাতীয় টেনিস

শুভ নব বর্ষের প্রথম দিনে জাতীয় লন টেনিসের ফাইন্যাল খেলায় সুইডেনের দুই নম্বর খেলোয়াড় উলফ স্লিডের কাছে ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় কৃষ্ণণের পরাজয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন শ্রীমতী জে, বি, সিং। পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যালে গ্রেট-বৃটেনের বিনি নাইট ও টনি পিকার্ড ভারতের কৃষ্ণণ ও কুমারকে ষ্ট্রেট শেটে পরাজিত হন। জাতীয় টেনিসে জুনিয়ার গ্রুপের খেলাটি দর্শকদের আনন্দ দান করেছে প্রচুর। জাতীয় টেনিসে জুনিয়ার বিভাগে এবার ৭০জন বালক খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করে।

এবারে প্রথম এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে পরাজিত খেলোয়াড়দের নিয়ে এ বছর থেকেই জাতীয় টেনিসে প্লেট টুর্নামেণ্ট নামে এক নতুন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। এ বছরের বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন পাঞ্জাবের জুনিয়র খেলোয়াড় অজিতকুমার।

এবারকার জাতীয় টেনিসের ফলাফল :—

সিঙ্গলস ফাইন্যাল—উলফ স্লিড ৬-৩, ৬-২, ৪-৬, ৪-৬ ও ৬-৩ সেটে কৃষ্ণণকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল—মিসেস জে, বি, সিং ৬-২ ও ৬-৩ সেটে মিস লীলা পাঞ্জাবীকে পরাজিত করেন।

বয়েজ সিঙ্গলস ফাইন্যাল—প্রেমজিৎলাল, জয়দেব মুখার্জিকে ১-৭, ৪-৬ ও ৬-৩ সেটে পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল—মিস এ লামসডেন ৬-৪, ২-৬ ও ৬-২ সেটে মিস আপিয়াকে পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইন্যাল—নরেশকুমার ও আর কৃষ্ণণ ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-২ সেটে বিনি নাইট ও টনি পিকার্ডকে পরাজিত করেন।

বয়েজ ডাবলস—প্রেমজিৎলাল ও জয়দেব মুখার্জি ৬-২ ও ৬-৩ সেটে পি কোলী ও এম পি মিশ্রকে পরাজিত করেন।

মিকস্‌ড ডাবলস ফাইন্যাল—নরেশকুমার ও মিসেস কে সিং ৫-৭, ৬-৪ ও ৬-২ সেটে বিনি নাইট ও মিসেস জে, বি সিংকে পরাজিত করেন।

জাতীয় টেবিল টেনিস

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত জাতীয় টেবিল টেনিসে বোম্বাইয়ের পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে লাভ করেছে চ্যাম্পিয়ানসিপ। গতবারের চ্যাম্পিয়ান গৌতম দেওয়ান বোম্বাইয়ের অপর এক খেলোয়াড় বি, এস খাম্বাটাকে পরাজিত করে পর পর দুই বার চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করলেন। ডাবলসের পুরস্কার বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়রাই লাভ করেছেন। গতবারের মহিলা চ্যাম্পিয়ান মহারাষ্ট্রের কুমারী মীরা পরাঞ্জেকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন মাদ্রাজের মিস রাসেল জন। জুনিয়র বিভাগে বাংলার উদীয়মান খেলোয়াড় দীপক ঘোষ গতবারের বিজয়ী জে, সি ভোরাকে ফাইন্যালে পরাজিত করেছে।

* * * *

ভারতের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য কটকের নবনির্মিত বড়বাটি ষ্টেডিয়ামে আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলবে। এ্যাথলেটিকস্‌, ভলিবল, কপাটি, মুষ্টিযুদ্ধ, জিমন্যাষ্টিক ও ভারোত্তোলন এই ৬টি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

* * * *

প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাইতে 'ফ্লাড-লাইট' হকি খেলার উদ্বোধন করবেন। বোম্বাই হকি এ্যাসোসিয়েসনের মাঠে বৈদ্যুতিক আলোকমালার ব্যবস্থা করতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছে। এ নব-প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

বাংলার সম্পদ

প্রতি বছরের মত এ বছরও 'জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘের' উদ্যোগে নয় দিনব্যাপী শিক্ষাশিবির শেষ হয়ে গেছে।

বাংলা দেশের বিভিন্ন দিক থেকে ছেলে-মেয়ে এবারের শিক্ষা-শিবিরে যোগদান করেছে।

এ শিক্ষাশিবিরকে অস্থায়ী 'ক্যাণ্টনমেণ্ট' বললে ভুল হয় না। লেক ময়দানের বিরাট এলাকা নিয়ে তৈরী হয়েছে শিবির। সারি সারি তাঁবু, সামরিক আদব-কায়দা। নানান রকমের ব্যায়াম প্রদর্শনী। এর ভেতর আছে অফিস, হাসপাতাল, ডাকঘর। স্বাস্থ্যপরীক্ষাকেন্দ্র।

দৈনন্দিন কর্মসূচী। ভোর পাঁচটায় বিউগিল বাজার সংগে সংগে শয্যা ত্যাগ। তার পর নিজের নিজের বিছানাপত্র একটি নিয়মে সাজিয়ে রাখা। সর্ব্বত্রই নিয়ম। 'উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম। নিয়ম কাটাইবার যো নাই।' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই বাণীটি এখানে সবিশেষ প্রযোজ্য।

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর প্রার্থনা। খালি হাতে সমষ্টি ব্যায়াম। তার পর প্রাতরাশ। এর পর শুরু হয় শিক্ষা। স্নান, মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রাম দেড় ঘণ্টা। ব্রতচারী, লাঠিখেলা, যোগব্যায়াম, ডাম্বেল, ড্রিল, লেজিম প্রভৃতি নানান রকম খেলাধূলা। বৈকালিক জলযোগের পর পতাকা অবনমন। সন্ধ্যায় খেলাধূলা, বিশেষ সামাজিক বয়স্ক শিক্ষাশ্রেণী। নৈশভোজের পর রাতের মজলিস। ইংরাজীতে যাকে বলে Camp fire। এই মজলিসে আছে গান, আবৃত্তি, বাজনা, ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়ে এ মজলিস প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সারা দিনের ক্লান্তির পর, এ মজলিসে সবাই যোগদান করে আনন্দ পায়। রাত দশটায় আবার বিউগিল বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে বিছানা নিতে হয়।

এই নয় দিনে নানান জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা এসেছিলেন। ছেলে-মেয়েদের নানান উপদেশ দিয়ে গেছেন। এবার এসেছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জ্জি। এই বারই প্রথম তিনি সংঘের শিবির পরিদর্শন করলেন। বে-সরকারী প্রচেষ্টায় এত বড় শিবিরের যে আয়োজন করা যেতে পারে, দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এ শিবিরে নানান জ্ঞানী-গুণীরা এসেছিলেন। যেমন—ডাঃ কালিদাস নাগ, অতুল্য ঘোষ শ্রীমতী কৃষ্ণরেণু গুহ, শ্রীমতী লীলা দে, কলকাতার মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা।

এই শিক্ষাশিবিরের মধ্যে 'জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘ' যে আদর্শটি তুলে ধরতে চেয়েছেন সেটি হল নিয়মানুবর্ত্তিতা, শৃঙ্খলা।

আজ আমরা সমাজ-জীবনে এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছি, যেখানে শুধু অস্থিরতা, এ হচ্ছে যুগসন্ধিক্ষণের যুগ। এ সময় জাতি যদি তার নিজস্ব পথ বেছে না নিতে পারে, তাহলে তার পতন অনিবার্য্য। শুধু শরীরচর্চ্চা করলেই হবে না, সমাজ ও দেশের কল্যাণে প্রতিটি যুবক-যুবতীর মনের বিকাশ এবং কর্ম্মতৎপরতার- যোগ্য স্ফুরণ হওয়া প্রয়োজন। এবং এ পরিকল্পনা নিয়েই 'জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘ' এগিয়ে এসেছে।

'জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘে'র এ প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়! নয় দিনের শিক্ষা-শিবিরে শিক্ষার্থীরা কতটুকু পেল, কি লাভবান হোল, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু এই যে ভ্রাতৃত্বের সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন, এ এক অমূল্য সম্পদ। এই যে প্রচেষ্টা জাতীয় জীবনের একান্ত প্রয়োজন, সে কথা অনস্বীকার্য্য। 'জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘে'র এ কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই।

'জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘে'র কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল।

খিদিরপুর একাডেমী 'এ' দল পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুচকাওয়াজ দল বলে অভিনন্দিত হয়।

মহিলা বিভাগে দক্ষিণ-কলিকাতার 'লেক স্কুল ফর গার্লস' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালিকা দল বলে বিবেচিত হয়।

সামরিক বাদ্য 'পাইপ ব্যাণ্ডে' জাগৃতি ও 'বিউগিল ব্যাণ্ডে' ঘুসুড়ি তরুণ সমিতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দল বলে ঘোষিত।

এদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

মুক্তি চাই

স্নেহ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তি আমার নাই !
কত দুঃখ সহে যাই,
শেষ বুঝি তার নাই,
ব্যর্থ আমি, ব্যর্থ জীবনটাই।

মুক্তি আমি চাই,
ওগো, মুক্তি কোথা পাই ?
দুঃখ আমার তোমারে বুঝাই,
মূর্খ আমি, সাধ্য আমার নাই।

যে ভুল করেছি ভাই,
মার্জ্জনা তার নাই ;
যত ব্যথা যত দুঃখ পাই,
সবই আমার প্রাপ্য বুঝি তাই।

ভুল করেছি ভাই,
মুক্তি আমার নাই ;
মিথ্যে মায়ায় হাসি কাঁদি তাই,
লুপ্ত আমি, লুপ্ত জীবনটাই।

শুধু কাজ, কাজই করে যাই,
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব কিছু নাই।
জীবনযুদ্ধে হার মেনেছি ভাই,
রিক্ত আমি, রিক্ত জীবনটাই।
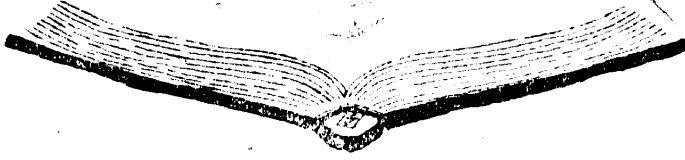
ভাষা প্রসঙ্গে কঙ্গরসিকতা

কাজ নেই কর্ম্ম নেই, শুধু বক্তৃতা আর কথাবাজী! কলকাতা থেকে অনেক দূরে নয় আর আকাশ-পথে, সেই দিল্লীর কর্ম্মকর্ত্তাদের কথা বলছি। দুঃখ-দারিদ্র্য যাদের বরাতের লেখা, সেই দেশের বাসিন্দারা যাদের হাতে দেশের শাসন আর শোষণের ভার ভোট মারফৎ তুলে দিয়েছে, সেই কংগ্রেস আজ আবার সেই পুরাকালের কঙ্গরসে পরিণত হ'তে চলেছে এবং এই কঙ্গরসিকতার ঠেলায় দেশের বুদ্ধিজীবী থেকে যাদের অর্থাভাবে বুদ্ধি সংগ্রহের সামর্থ্য নেই, তাদেরও পর্য্যন্ত অবস্থা যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আর বলবার নয়। দিল্লী থেকে থেকে ডাক ছাড়ছে আর সাড়া দিচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ। দিল্লী হুকুমজারি করছেন, 'হিন্দী বলতে হবে।' দিল্লী বলছেন, 'ইংরাজী বলতে পাবে না।'

কথা বলবে একজন, আর কথার ভাষা বাতলাবেন অন্য একজন। কি বলতে হবে আর কি বলতে হবে না, তাও সরকারী শাসনে মেনে নিতে হবে, রসিকতা ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যায়? হিন্দী আর ইংরাজী অর্থে ভারতের রাষ্ট্রভাষা আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজভাষা নয়—ভারতবর্ষের এই ভাষা-সমস্যার পিছনে গূঢ় এক উদ্দেশ্য আছে, যা খোলাখুলি সকলেই বলতে পারেন।

শ্রীপ্রকাশ একদা বলেছিলেন, হিন্দী ভাষায় জবর রকমের খিস্তী-খেউড় বলা যায়। ব্যস! আর ইংরাজী ভাষার বিপক্ষে (রাজদ্রোহের অভিমান আর আছে)! কিছু বলবার নেই, স্বপক্ষে বলতে গেলে, মাসিক বসুমতীর পুরা একটি সংখ্যা প্রয়োজন হবে। মাসিক বসুমতী এমন কিছু ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষক নয়, তবুও বলা যায়, পৃথিবীতে আজ বিনা ইংরাজী শিক্ষায় কেউ নিজেকে শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করে। ইংরাজী পরিত্যাগে আজকের দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হবে। তবে কি কংগ্রেস ভাবছেন, দেশবাসী ইংরাজী শিখলে দেশের ক্ষতিবৃদ্ধি হবে? দেশ শিক্ষার আলোক দেখলে দেশের মানদণ্ডের অধিকারীদের ভীত হওয়ার আশা আছে কি?

হিন্দী শিখতে হবে অশিক্ষার জন্য, আর ইংরাজী শিখতে হবে না, শিক্ষাপ্রাপ্ত না হওয়ার জন্য। 'কঙ্গরসিকতা' ছাড়া আর কি আখ্যা দেবেন, আপনি?

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

নারদস্মৃতি

অতীতকে অন্বেষণের স্পৃহাই ভারতের সংস্কৃতির অবলুপ্ত অধ্যায়গুলিকে আজও জীবন্ত করে রেখেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে মন যখনই অনেকগুলো শতাব্দী ডিঙিয়ে সুদূর অতীতের রাজ্যে চলে যায়, তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনেক ছাড়িয়ে-যাওয়া কাহিনী, ইতিহাস, উপাখ্যান, সমাজচিত্র, ধর্মচিন্তা—যা ভবিষ্যতের মানুষের জীবনের সাফল্য-সোপান নির্মাণের হয় প্রথম ও প্রধান সহায়ক। ভারতীয়েরা ধর্মগ্রন্থগুলিকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন। জীবনের আলোর সন্ধান করেছেন তাদেরই পাতায় পাতায়। তাদের প্রভাবেই নিজেদের করেছেন প্রভাবান্বিত। এক কথায়,—সমগ্র জীবনধারা পরিচালনার চাবিকাঠি ছিল এই ধর্মগ্রন্থগুলি। এ দেশের ধর্মগ্রন্থ সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন মনু। তাতে মোট এক লক্ষ শ্লোক ছিল। দেবর্ষি নারদ তাকে সংক্ষেপিত করলেন বারো হাজার শ্লোকে। মানবের জীবনযাত্রার প্রতিটি ধারা সম্বন্ধে যে বিধান তখন স্থিরীকৃত হয়েছিল, তার নিখুঁত চিত্র পাওয়া যাবে উপরোক্ত গ্রন্থে। এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য বলে মনে করা যায়। এতে মূল সংস্কৃতের সঙ্গে শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদও আছে। অনুবাদক ও সম্পাদক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। সংস্কৃত কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

বঙ্গদেশের কৃষক

বাঙলা সাহিত্যের নবরূপায়ণের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র, এ কথা নতুন করে বলার নয়। বাঙলা সাহিত্যের ভাল দেশকে তিনি করলেন মহিমায় মণ্ডিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে যে সুনিবিড় দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, তার সৃষ্টি শুধু উচ্ছ্বাস আর ভাবালুতার তরঙ্গে নয়—রীতিমত যুক্তির বেড়াজালে। বাঙলা দেশের কৃষককুল রীতিমত ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দেশের সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধির মূল যারা তারাই সব চেয়ে নিঃস্ব, বঞ্চিত, শোষিত। সেই সর্বহারাদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের ন্যায্য দাবী সমর্থন করে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন সবল প্রতিবাদ। সেই রচনাগুলিই দীর্ঘকাল পরে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়

প্রকাশলাভ করেছে। এই রচনাগুলি আজকের দিনের সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নবরূপায়ণে সহায়ক হবে। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা করেছেন তরুণ শিল্পী মণীন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—জে, এন, চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম দুই টাকা মাত্র।

মৃতের কথোপকথন

দু'জন মৃতকে কেন্দ্র করে তাদের মুখে সংলাপ যোগ করে যে সাহিত্যসৃষ্টি হয়, তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে খুবই স্বল্পসংখ্যক। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত উপরোক্ত গ্রন্থে এই শূন্যতা পূর্ণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মোট একুশটি আলাপনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র কেন্দ্র করে সেই সংলাপের মধ্যে সমকালীন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী কৃতিত্বের সঙ্গে পরিস্ফুটিত করেছেন। শুধু সাহিত্যগত বা রাজনৈতিক আলাপনই এতে লিপিবদ্ধ হয়নি—মানুষের সব কোণগুলির প্রতিচ্ছবি লেখক সন্নিবেশিত করেছেন। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বহু কাল আগে। এই আলাপনগুলির মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থটির রচয়িতা শ্রীঅরবিন্দ (ইংরাজীতে) এবং ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম রচনার লেখিকা ভগিনী নিবেদিতা (ইংরাজীতে)। এই গ্রন্থ পাঠকচিত্তে নতুন রসের সৃষ্টি করবে, আশা করা যায়। প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। দাম দুই টাকা মাত্র।

বাঙলার নবযুগ

ঊনবিংশ শতাব্দী বিধাতার আশীর্বাদের মত দেখা দিয়েছিল বাঙালীর জাতীয় জীবনে। বহু কাল ধরে জীবনযাত্রার যে তরঙ্গ গতানুগতিক পথ অবলম্বন করে বয়ে আসছিল অথচ তার সৃষ্টিশক্তি ক্ষয়ে গিয়েছিল নিঃশেষিত, সেই গতানুগতিকতার মূলে কুঠারাঘাত করে দেখা দিল ঊনবিংশ শতাব্দী। তার শক্তিময়ী স্পর্শে বাঙলা দেশ ভরে উঠল প্রাচুর্যে, শক্তিতে, উৎকর্ষে। এই শতাব্দী গঠনের যুগ। বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি শিল্পকর্ম, দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারাকে নতুন রূপ দিয়ে গেল। বাঙলা দেশে দেখা দিল একটি নতুন যুগ, এই শতাব্দীর প্রতিভাধর সন্তানগণের সমন্বয়ে। সেই নবযুগের একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন মোহিতলাল উপরোক্ত গ্রন্থে। যে পথ অবলম্বন করে বাঙলা দেশ উন্নতির শীর্ষ শিখরে আরোহণে হয়েছে সমর্থ—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত জানা থাকে এই গ্রন্থপাঠে। ঐ শতাব্দীজাত বাঙলার বরণীয় কবি স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদারের বহু তথ্যপূর্ণ এই গ্রন্থটির যোগ্য সমাদরই হবে আশা রাখি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম—ছয় টাকা মাত্র।

লালকালো

ভারতের বরেণ্য মনস্তত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু যে শিশুসাহিত্যক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষতাসম্পন্ন পথিক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে উপরোক্ত গ্রন্থে। শিশুদের মনের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের কল্পনাকে কেন্দ্র করে সুন্দর কাহিনী পরিবেশন করেছেন লেখক। যথেষ্ট উপভোগ্য ও পরম মনোরম বলে এই গ্রন্থটি গণ্য হবে শিশু-পাঠকদের দরবারে। অনেকগুলি সুন্দর চিত্র সহযোগে এর শোভা বর্ধন করেছেন শিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন। "ঐ বুঝি করে ধাঁ নাহি যার নাম" ছবিটি লেখকের নিজের আঁকা। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম তিন টাকা মাত্র।

শরৎচন্দ্র—দেশ ও সমাজ

শরৎ-সাহিত্য বাঙালীর পরম আদরের বস্তু। শরৎচন্দ্রের অমর লেখনী অভিভূত করেছে পাঠকচিত্তে মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর মমত্ববোধের জন্যে। সমগ্র সমাজে তথা দেশে তাঁর আবেদন যথেষ্ট ভাবে হয়েছে অনুভূত। গণচিত্তকে করেছে প্রভাবপুষ্ট। দেশের ও সমাজের অস্পষ্ট ভাবে দেখে তার সম্বন্ধে আবছা ধারণায় নিজেকে তুষ্ট করেন নি শরৎচন্দ্র, তাঁর অন্তরের অন্তস্তলের বাণী শুনেছেন উদ্গ্রীব ভাবে অধীর আগ্রহে কান পেতে। এই অসীম অন্বেষণের ছায়া পড়ল তাঁর সাহিত্যে, তাই তো তাঁর সাহিত্যে সমগ্র ভাবে ফুটে উঠল একটি সমাজ, তার প্রতিটি কর্মধারা, শাখা-প্রশাখা, ভাবকল্পনা। এই সম্বন্ধে উপরোক্ত গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন সুকবি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রসিক মহলে এই গ্রন্থ যথোচিত সমাদর লাভ করতে সমর্থ হবে। প্রকাশ করেছেন এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম দু'টাকা মাত্র।

ধূপছায়া

সাহিত্যের আকাশে ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। পাণ্ডিত্যের জ্যোতির্লোকের সিংহদ্বারও তাঁর কাছে চির অবারিত। কতকগুলো লঘু-গুরু নিবন্ধের সংকলন উপরোক্ত গ্রন্থটি আলী সাহেবের বহুপ্রসূ লেখনীর দীপ্তির পরিচায়ক। আলী সাহেবের পাণ্ডিত্য কেবলমাত্র বিদ্বজ্জন-দরবারেই সীমাবদ্ধ নয়—সর্বসাধারণের অন্তর্দুয়ারে ঘা দিয়ে যায় তাঁর লেখনীর আবেদন। সময়ের প্রবাহে কালোপযোগী শত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর জীবনধারা প্রবাহিত হলেও আত্মার বিশ্বব্যাপী আত্মীয়তার ক্ষেত্রে তার মানসলোকে পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র চিহ্ন পড়ে নি। এই সত্যই ফুটে উঠছে ডক্টর আলীর লেখনী থেকে। প্রকাশক ত্রিবেণী প্রকাশন, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, দাম চার টাকা মাত্র!

পরমায়ু

গল্পকার হিসেবে সন্তোষকুমার ঘোষের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। পূর্বে প্রকাশিত এঁর গ্রন্থগুলির জনপ্রিয়তা এঁকে সাহিত্যের দরবারে একটি বিশেষ আসনের অধিকারী হতে সক্ষম করেছে। কতকগুলি গল্প সংকলিত করে উপরোক্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে। গল্পগুলি সন্তোষকুমারের প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী ও শক্তিমান লেখনীর শক্তির পরিচায়ক। গল্পগুলির আবেদন পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করে। লেখকের বক্তব্য বিশেষ ভাবে মনে ছায়াপাত করে। প্রকাশক ত্রিবেণী প্রকাশন, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

গল্প সময়—জীবনপ্রবাহ

আজকের দিনে যে জটিলতার মধ্যে দিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধারা বয়ে চলেছে, তারই একটি সম্যক্ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে লেখক চেষ্টা করেছেন। জীবনের সর্বঅঙ্গে যে এক বিরাট প্রশ্ন ছায়াপাত করে চলেছে, তার দিকেই লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লেখকের অনুভূতি ও দরদ পরিপূর্ণ ভাবে ফুটে ওঠে। কয়েকটি গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। তবে গল্পগুলির গঠনরীতি ছায়াচিত্রের চিত্রনাট্য রচনার পদ্ধতি অনুসরণ করা। মাঝে মাঝে কয়েকটি সংলাপও স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করে নাটকীয়তার গণ্ডীতে পা দেয়। লেখক—কানাইলাল ঘোষ। প্রকাশক—দি প্রকাশনী, ৮২, গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৩। দাম চার টাকা মাত্র।

গান্ধীজীর ন্যাসবাদ

বৈষয়িক ক্ষেত্রে ন্যাস-ব্যবস্থা একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির যথাযোগ্য অধিকারী সম্পত্তি সংরক্ষণে অপারগ হলে বা অল্পবয়স্ক থাকলে সেই সম্পত্তির পরিচালনভার অর্পিত হয় কয়েক জন ন্যাসরক্ষকের হাতে। যত দিন না প্রকৃত উত্তরাধিকারী বিষয়ে পরিচালনার জন্যে আইনের অনুমোদন লাভ না করেন তত দিন এই ন্যাসরক্ষকদের নির্দেশেই বিষয়ের পরিচালন কার্য হয়। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থায় কতকগুলি আঙ্গিক ত্রুটি ছিল, যেগুলি বিশেষ ভাবে সমালোচনীয়। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যে অভিমত পোষণ করতেন বা এই ত্রুটি সংশোধনের ব্যাপারে যে মহামূল্য নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন, সেই সম্পর্কেই প্রথিতযশা সুধী শ্রীনির্মলকুমার বসু একটি সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দেশবাসীর সম্মুখে গান্ধীজীর অভিমত সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ইংরাজী রচনার অনুবাদ করেছেন শ্রীদীপঙ্কর দাশগুপ্ত। প্রকাশক গান্ধী-স্মারকনিধি বাঙলা শাখা। পরিবেশক এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল

আজ থেকে প্রায় সোয়া শ' বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীনিত্যগোপাল। তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ ত্যাগোজ্জ্বল জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন শ্রীনিত্যকৃষ্ণানন্দ অবধূত। নিত্যগোপালের জীবনী সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহ পোষণ করেন, এই গ্রন্থ পাঠে তাঁরা উপকৃত হতে পারেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীমতী আরতি রায়। প্রকাশক—নিত্যনারায়ণ মঠ, পোঃ গোমো, বিহার। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

বোরোবুদুরের ডাক

শিশু ও কিশোরদের সাহিত্যের দরবারে ইন্দিরা দেবী একজন পরমপ্রিয়া লেখিকা। তাঁর "বোরোবুদুরের ডাক" গ্রন্থটি পরম উপভোগ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সৌম্যর শৈশব থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ পর্যন্ত সুবিস্তৃত প্রতিচ্ছবি বর্ণনা করেছেন ইন্দিরা দেবী। সেই প্রসঙ্গে বোরোবুদুর ও তৎসহ পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলির সংক্ষিপ্ত অথচ যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। নির্মল বাবুর চিত্রাবলী আকর্ষণীয়। দাশরথি পালের প্রচ্ছদপট অঙ্কন সুন্দর হয়েছে। প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড দাম দুই টাকা মাত্র।

স্বাধিকার

সাহিত্যক্ষেত্রে ডক্টর মতিলাল দাশ অপরিচিত নন। বর্তমানে তাঁর উপরোক্ত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। সহজ স্বাভাবিক পরিবেশে লেখক তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। লেখকের আন্তরিকতার প্রশংসা করি। প্রকাশক—আলোকতীর্থ প্রট ৪০১, নিউ আলীপুর, কলকতা—৩৩। দাম—দু' টাকা মাত্র।

রাজধানীর সূর্য

উদীয়মান তরুণ লেখকদের মধ্যে বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য অন্যতম। বিবেকরঞ্জনের সঙ্গে মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার অপরিচয় নেই। তাঁর কতকগুলি গল্প একত্রে সংকলিত হয়ে উপরোক্ত নামে প্রকাশলাভ করেছে। গল্পগুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, সংবেদনশীল, এবং লেখকের দরদভরা চিত্তের পরিচায়ক। লেখকের যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী মনকে নাড়া দিয়ে যায়। প্রারম্ভে ভারতের সহ-রাষ্ট্রপতি বিশ্বনন্দিত সুধীবর আচার্য রাধাকৃষ্ণণের লেখা মুখবন্ধ গ্রন্থটির শোভা বর্ধন করেছে। প্রচ্ছদপট অঙ্কনে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সন্ধ্যা গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি কলেজ রো। দাম তিন টাকা মাত্র।

মধুকরী

সুসাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষের নবতম গ্রন্থ মধুকরী। কেবলমাত্র সন্দেহ স্বামি-স্ত্রীর সুখের সংসারে মধুময় পরিবেশের পরিবর্তে যে কি পরিমাণ তিক্ততার সৃষ্টি করে তারই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। মানুষের জীবনের উপরেও যে কৃত্রিমতার ছাপ পড়েছে এবং তা যে জীবনকে ক্রমশঃই নিম্নগামী করছে এ বিষয়েও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুমথনাথ। ব্যঞ্জনায় বর্ণনায় ও সংলাপে গ্রন্থটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। প্রকাশক অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, ১-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। দাম—সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

বিজ্ঞানবার্ত্তা

পক্ষধর মিশ্র

১৯৫৭ সালের বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারের গুরুত্ব খুবই বেশী। কারণ, এই সাতান্ন সালের গোড়ার দিকেই ইউরোপের সুপ্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকা-সমূহতে বিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতাবলীর উপর এক বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। এই মসীযুদ্ধে হারমান হারজ, রয়েল সুইডিস অ্যাকাডামি অফ সায়ান্সেস-এর সম্পাদক অধ্যাপক আর'ন ওয়েষ্টগ্রেণ, কারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের সভাপতি ডাঃ ষ্টেন ফ্রিবার্গ প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিরা যোগদান করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রয়েল সুইডিস্ অ্যাকাডামি অফ সায়ান্সেস রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানে এবং ক্যারোলিনস্কা ইনসটিটিউট চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রতি বৎসর নোবেল পুরস্কার কা'কে দিয়ে সম্মানিত করা হবে, তা স্থির করেন।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার কা'কে দেওয়া হবে, এই প্রধান প্রশ্নেই দ্বন্দ্বটা সুরু হয়েছে। যিনি সারা জীবন সার্থক সাধনার ফলে বর্ত্তমানে খ্যাতি ও সৌভাগ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছেন, তিনিই এই মহাসম্মানের যোগ্যতম প্রার্থী? না যে তরুণ বিজ্ঞানী অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিলেও সাধনায় সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেন নি, তাঁকেই এই পুরস্কার দিয়ে গবেষণায় সিদ্ধিলাভের জন্য অনুপ্রাণিত ও সহায়তা করা হবে?—এই কঠিন প্রশ্ন বিচারকর্ত্তাদের বিশেষ বিচলিত করে তুলেছে। মহামতি নোবেল কিন্তু তরুণ প্রতিভাধরদেরই সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠাবানদের সহায়তা করার জন্য তিনি মোটেই চিন্তিত ছিলেন না। জীবনের পথে যে সব কল্পনাপ্রবণ ক্ষমতাশালী তরুণ বিজ্ঞানীরা পরিচয়ের অভাবে পদে পদে অগ্রসর হতে বাধা পাচ্ছেন, অর্থের জন্য তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হচ্ছেন না, তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করাই নোবেলের উদ্দেশ্য ছিল। যে সব খ্যাতনামা তরুণ বিজ্ঞানীরা রসায়ন, পদার্থ অথবা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন এক বিরাট আবিষ্কারের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র সামর্থ্যের অভাবের জন্য সম্পূর্ণ করতে পারছেন না, মহামতি নোবেলের প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপ দিতে হলে তাঁদের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত ও অর্থ সাহায্য করাই হোল এ নির্বাচকমণ্ডলীর পবিত্রতম কর্ত্তব্য। কিছু না করলে নোবেল পুরস্কার নিশ্চয়ই দেওয়া হবে না—কিন্তু পুরস্কার দেওয়া হবে কিছু করবার জন্য। হারমান্ হারজের আলোচনায় ঠিক এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে, যাতে রুটি জোগাড়ের চেষ্টা কোন বিরাট আবিষ্কারের প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়, তার জন্যই নোবেল পুরস্কারের অর্থব্যয় হওয়া উচিত।

কর্ম্মকর্ত্তাদের পক্ষ থেকেও কয়েক জন এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তিও চিন্তা করে দেখবার মতো। বিরাট আবিষ্কারের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছেন,—বিচার বিবেচনা করে ঠিক এ রকম তরুণ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের নির্ব্বাচিত করা খুবই কঠিন কাজ। বিজ্ঞানীদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোন কিছু আবিষ্কার হবার অনেক পরে তার গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা গেছে; সুতরাং আগের থেকেই আবিষ্কারের মূল্য উপলব্ধি করা সহজ কাজ নয়। নির্ব্বাচকমণ্ডলী কোন আবিষ্কারের বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ না হয়ে পুরস্কার দিয়ে তার ভালো-মন্দের দায়িত্ব নিতে বোধ হয় চান না। বিরাট কিছু আশা করে পুরস্কার দেওয়া হলো কিন্তু ফলাফল উদ্রেক করলো আশঙ্কার,—তখন দুনিয়ার সমালোচনার দায়িত্ব সামলাবেন কে? অনেকেই চিৎকার করে উঠবেন বিচারকমণ্ডলী অর্থের অপব্যয় করছেন,—এই ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য বা সম্মানিত করার কোন কারণই ছিল না। এই নিশ্চয়তার জন্যই স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংকে পেনিসিলিন আবিষ্কারের বহু পরে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন পেনিসিলিনের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা গেল, তখনই তাঁর আবিষ্কর্ত্তাকে প্রায় ১৫ বছর আগেকার অতুলনীয় সাফল্যের জন্য সম্মানিত করা হলো। আইনষ্টাইনকে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর থিওরী অফ্ রিলেটিভিটির উপর তরুণ বয়সে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নি। কারণ, তাঁর মতবাদের বৈধতা বিচার করা সম্ভব ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষের মতে বর্ত্তমান কালে নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্যের উপর খুব বেশী জোর দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, নোবেলের সময়ের চেয়ে এই টাকার মূল্য অনেক কমে গেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই আরও অনেক পুরস্কার আছে—যার অর্থমূল্য নোবেল পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশী। তাছাড়াও আজকের দিনে কোন প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানকর্মী—যাঁরা নোবেল পুরস্কার পাবার মতো বিরাট আবিষ্কারের সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁদের গবেষণা করার সুযোগের অভাব হবে বলে মনে হয় না। নানা দেশের সরকার অর্থ সাহায্য করেন, বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণামন্দির আছে, একটা কিছু না কিছু জুটে যাবে বলে আশা করা যায়। বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের সম্মান এখনও বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাই এর অমর্য্যাদা যাতে না হয় সেদিকে কঠিন দৃষ্টি রাখা হবে,—তরুণ অথবা প্রবীণ কোন বিজ্ঞানীরই পেতে বাধা থাকবে না।

এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্ত্তমান বৎসরে রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানে পুরস্কার ঘোষণা করার সময় সুইডিস রয়েল অ্যাকাডামি অফ্ সায়ান্সেস-এর সভ্যরা বিশেষ চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। দুটি বিষয়ে দুটি বিপরীত ধারার গবেষণা সম্মান লাভ করেছে। পদার্থ-বিজ্ঞানের অসাধারণ আবিষ্কারটি সাম্প্রতিক, কিন্তু রসায়ন-বিজ্ঞানের আবিষ্কারটি গত কুড়ি বৎসরের কঠোর সাধনার মধ্যে দিয়ে রূপ পরিগ্রহণ করেছে। পদার্থ-বিজ্ঞানে দু'জন তরুণ চীনা বিজ্ঞানী 'সমতার নিয়মে'র উপর গবেষণার জন্য এই বৎসরের নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। দু'জনেই আমেরিকায় গবেষণা করছেন—তাঁদের নাম সুং দাও লী এবং চেন নিং ইয়াং। বয়স যথাক্রমে ৩০ ও ৩৪ বৎসর। ডাঃ লীর বয়স ৩০ বৎসর হলেও তাঁকে একজন অতি অল্পবয়স্ক কলেজের ছাত্রের ন্যায় দেখায়।

এই বিজ্ঞানিদ্বয়ের মধ্যে কেউই হাতে-কলমে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ করেন না,—তাঁরা গণিত-বিজ্ঞানের সহায়তায় দেখিয়েছিলেন যে, পদার্থের মধ্যে সমতার নিয়ম অচল। এই বৎসরেই পরীক্ষামূলক ভাবে তাঁদের মতবাদ সমর্থিত হয়েছে এবং তাই তাঁরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করলেন।

রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানের বিখ্যাত স্কচ অধ্যাপক স্যার আলেকজাণ্ডার টড্। পদার্থবিজ্ঞানীদের মতো সাম্প্রতিক এই বৎসরের বিরাট কোন আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি,—তাঁর মনীষা সমাদর লাভ করেছে গত দুই দশকের অবদানের মধ্যে দিয়ে। টডের বয়স ৫০ বছর—সুতরাং তাঁকে নবীন না বলা গেলেও বোধ হয় একেবারে প্রবীণদের দলে ফেলা যায় না। তার উপর টডের গবেষণার ধারা এক বিরাট আবিষ্কারের সম্মুখীন হয়েছে বলা যেতে পারে। কারণ, তাঁরই পদ্ধতি অনুসরণ করে শীঘ্রই একদিন নিউক্লিক অ্যাসিড হয়তো সংশ্লেষিত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তর্ক-বিতর্কের ফলাফল নোবেলের উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে মোটের উপর শুভ হয়েছে। বিচারকেরা তরুণদের এবং বিরাট আবিষ্কারের দ্বারদেশে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন।

বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার টড কয়েক বছর আগে একবার ভারতবর্ষে ঘুরে গিয়েছিলেন, অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কর্মীই তাঁর সঙ্গে পরিচিত। প্রচারের প্রতি তাঁর নির্লিপ্ততা এবং গবেষণার প্রতি তাঁর একান্ত আকর্ষণ সুবিদিত। এই স্বনামধন্য বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মধারার বিষয়ে তাই সামান্য কিছু আলোচনার অবতারণা করছি।

কোন সভা-সমিতিতে স্যার আলেকজাণ্ডার টডকে যে কোন নতুন লোকও এক নজরে চিনে নিতে পারবেন। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা এই বিজ্ঞানী ১৯০৭ সালে গ্লাসগোতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয় অললান গ্লেনস স্কুলে,—উচ্চশিক্ষা লাভ করেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। লিষ্টার ইন্সটিটিউট, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজি প্রভৃতি নানা স্থানে অধ্যাপনা করার পর বর্ত্তমানে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-রসায়নের অধ্যাপক। ১৯৩১ সালে টড বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার রবার্ট রবিনসনের নিকট প্রকৃতিজ বস্তুর উপর গবেষণা সুরু করেন। ফুলের মধ্যে উৎপন্ন রঙ তাঁর সেই সময়কার গবেষণার মূল বিষয় ছিল। ক্রমে ক্রমে তিনি অতি ক্ষুদ্র জীবন্ত দেহকোষের মধ্যে যে জটিল রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ বর্ত্তমান, তার প্রকৃতি নির্দ্ধারণকল্পে গবেষণা সুরু করলেন। অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হওয়ার জন্য জীব-বিজ্ঞানীরা জীবদেহের এই রসায়ন দ্রব্য বিষয়ে বিশেষ কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করতে সমর্থ হননি। বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার টড এক এক করে জীবদেহের কয়েকটি রসায়ন দ্রব্য সংশ্লেষিত করে ফেললেন। এই সময় তিনি ভিটামিন 'বি-ওয়ান' সংশ্লেষিত করেন; তাঁর উদ্ভাবিত এই ভিটামিন সংশ্লেষণের একটি পদ্ধতি শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে। পেশীর কার্য্যপরিচালনা এবং অতিক্ষুদ্র দেহকোষের বৃদ্ধির জন্য শক্তিসরবরাহকারী অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট এবং অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট সম্পূর্ণরূপে সংশ্লেষণের দ্বারা প্রস্তুত করাও এই বিজ্ঞানীর এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার।

এই ভাবে গবেষণা পরিচালিত করতে করতে বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার টড ধীরে ধীরে দেহকোষের কাঠামোর কেন্দ্রবস্তুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এইখানেই অবস্থান করছে সৃষ্টির মূল কারণ। জীবন্ত দেহকোষের সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নিউক্লিক অ্যাসিড, এর কাঠামোর বিষয়ে অনুসন্ধানই টডের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। টডের উদ্ভাবিত পদ্ধতির দ্বারাই একদিন হয়তো নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। জীবদেহের এক বিচিত্র রহস্যময় রসায়ন দ্রব্য এই নিউক্লিক অ্যাসিড, এর কাঠামোর পরিচয় উদ্ঘাটন করার জন্য স্যার আলেকজাণ্ডার টডকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। বিচারকর্ত্তারা অবশ্য পুরস্কার ঘোষণা করার সময়ে তাঁর ভিটামিন বি—১২ এবং আফিঙের মূল পদার্থের উপর মূল্যবান গবেষণার কথাও উল্লেখ করেছেন।

পৈত্রিক গুণাবলী সন্তানের দেহে সঞ্চারিত ও বৃদ্ধি করার জন্য নিউক্লিক অ্যাসিডের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় একে জীবনের রসায়ন বলা যেতে পারে,—বিজ্ঞানী টড এই জীবন-রসায়নের রহস্যের নিকটবর্ত্তী হয়েছেন। পাঠকেরা প্রশ্ন করতে পারেন, নিউক্লিক অ্যাসিড কি? অতিক্ষুদ্র জীবন্ত দেহকোষ গঠিত হয় এক জাতীয় প্রোটিনের দ্বারা—নাম তার নিউক্লিও প্রোটিন। নিউক্লিক অ্যাসিড এই প্রোটিনের অত্যাবশ্যক অংশ। ১৮৬৮ সালে হাসপাতালের ফেলে-দেওয়া সার্জিক্যাল ব্যাণ্ডেজে অবস্থিত পুঁজ থেকে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ ফসফরাস সমন্বিত একটি পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল। তাই নিউক্লিও প্রোটিন এবং এর থেকে প্রস্তুত হয় নিউক্লিক অ্যাসিড।

জীবনের রসায়নের রহস্যভেদকারী, বিরাট দেহ এই বিজ্ঞানী 'সর্বশক্তিমান টড' নামে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়। প্রতিদিন সকালে গবেষণাগারের দিকে যাত্রা করেন সাইকেলে চড়ে।—বিড়াল, ফুল এবং রেডিওর প্রতি তাঁর বিশেষ প্রীতি আছে। একটি বিরাট বাগান-সমন্বিত বাড়ীতে তিনি দুটি পোষা বিড়াল নিয়ে বাস করেন। মাত্র দু'বছর আগে ১৯৫৫ সালে রয়েল সোসাইটি তাঁকে রয়েল মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেছে। বর্ত্তমানে তিনি গ্রেট বৃটেনের 'অ্যাডভাইসারী কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক পলিসি'র সভাপতি।

হায়, হায়, জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম-কলি নয়ন কিরণে,
একটি হৃদয়ব্যথা যদি না ঘুচালে
বুক ভরা প্রেম ঢেলে, কি ফল জীবনে?

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
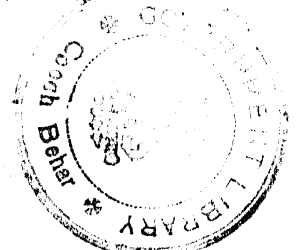
রজত সেন

তখনও ঘরের বাতাসে গত রাত্রির সুবাস, বালিশের পাশে চুলের কাঁটা, মাটিতে ছড়ানো রজনীগন্ধা। নূতন আলনায় চেলী ঝুলছে, আর নূতন সব ভাঁজ-করা শাড়ি আর জামা; নূতন ডিজাইনের ড্রেসিং টেবিলের উপর গত রাত্রিতে খুলে-রাখা কিছু গয়না। সুলতা মাটিতে বসল; শরীরে সম্ভোগের ক্লান্তি, পায়ে আলতার রেখা, সীঁথিতে সদ্য-সিঁদূরের দাগ, চোখে কাজল, গালে ওষ্ঠ-নিপীড়নের আভাস। নূতন গ্লাডস্টোন ব্যাগটা খুলে ফেলল সে, শাড়ি আর জামার স্তূপের নিচে হাত ঢুকাল, ছবির ফ্রেমের উপর, [illegible] উপর হাত বুলাতে লাগল; পিছনে পায়ের শব্দে চমকে [illegible] হাত তুলে নিল সুলতা।

কি খুঁজছ? অমিয় তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল।

কিছু না। ব্যাগের ডালাটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল সুলতা।

চা-টা আমাদের ঘরেই আনতে বললাম, মুখ ধুয়েছ?

সুলতা ঘাড় নাড়ল, মুখ ধুয়েছে সে।

তোয়ালেটা আলনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অমিয় বসল খাটের উপর পা ঝুলিয়ে, ডাকল, এসো এখানে।

সুলতা কাছে এসে দাঁড়াল, অমিয় তাকে আকর্ষণ করল, বসিয়ে দিল হাঁটুর উপর, হাত দিয়ে কোমর বেষ্টন করল।

কেউ এসে পড়বে। সংকোচে জড়সড় হয়ে বলল সুলতা।

আসুক না! বাঁ হাতটা খোঁপার নিচে দিয়ে ডান হাতে চিবুক ধরে অমিয় সুলতার মুখটা নিয়ে এল নিজের মুখের উপর; সুলতার পাতলা ঠোঁট ডুবে গেল তার মুখের মধ্যে।

চায়ের ট্রে-হাতে বেয়ারা ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে, সুলতা সরে গেল; ঘরের কোণ থেকে টিপয় নিয়ে এসে রাখল অমিয়র সামনে; ট্রে নামিয়ে রেখে বেয়ারা চলে গেল।

একটা চেয়ার টেনে আনল সুলতা, বসে পড়ে বলল, দেখলেন ত?

দেখবার কি আছে? এখনও আপনি? অমিয় দাঁড়াল।

সুলতা চেয়ার ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু অমিয় হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল; আগে বল তুমি, না হলে ছাড়ব না!

তুমি।

অমিয় ওকে মুক্ত করে আবার বসল খাটের উপর।

সুলতা চা তৈরী করল, টোষ্টে মাখন আর জ্যাম লাগাল, ডিমে ছিটাল মরিচ আর নুণ।

বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে তোমাকে ক্লাবে নিয়ে যাব, এই ধর সাতটা।

ওরে বাবা! আমি সেখানে গিয়ে কি করব?

অনেকেই তোমাকে দেখেনি, দেখতে চাইছে।

আমাকে আবার দেখবার কি আছে? চা নাও।

আছে। পেয়ালার উপর দিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল অমিয়।

ওঁদের সংগে কথা বলতে আমার হাত-পা ঘামবে।

তোমায় ত কথা বলতে হবে না, তুমি শুধু ঘর আলো করে বসে থাকবে। অমিয় আধখানা ডিম মুখে পুরে দিল।

যাও। সুলতার রক্তাভ চিবুক আরও লাল হয়ে উঠল।

আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়ে না তুমি? অমিয় মন্তব্য করল।

দশটার সময় অমিয় কোর্টে চলে গেল। সুলতার আর কিছু করবার নেই; নিচে অমিয়র খাবার সময় টেবিলে উপস্থিত থাকতে পারেনি বলে মনটা তার এখনও খুঁতখুঁত করছে। ছোট বাড়ী, উপরে তিনখানি, নিচে তিনখানি ঘর; নিচে অমিয়র বৈঠকখানা, খাবার আর রান্নাঘর, উপরে শোবার ঘর, বসবার আর পিসিমার ঘর। পাটনা থেকে অমিয়র মা এই পিসিমাকে নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে। বিয়ের পরদিনই অমিয়র মা-বাবা পাটনায় ফিরে গেছেন, পিসিমাকে রেখে গেছেন অভিভাবিকা, প্রতিনিধি। অমিয়র বাবা পাটনায় প্রসিদ্ধ উকিল, আর সন্তানহীনা পিসিমার স্বামী পঁচিশ বছর নিরুদ্দেশ, গতবারের কুম্ভমেলায় হরিদ্বারে পিসিমা স্বামীকে দেখতে পেয়েছিলেন সন্ন্যাসীদের ভিড়ে।

গেরুয়া উত্তরীয় আকর্ষণ করে কে? সন্ন্যাসী থামল; হাতে কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটা।

একটু এদিকে আসুন।

সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী তাকাল, স্নান-লগ্নের বাকি নেই আর, সন্ন্যাসীদের ভিড়ের বাইরে এল সে; কেউ তাকাল না, কেউ অপেক্ষা করল না; এখানে কেউ কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না, সবাই এগিয়ে যায়—অদ্ভুত এক নেশায়, আশ্চর্য এক তাড়নায়; স্বামী এগিয়ে যায়, সহধর্মিণী পড়ে থাকে পিছনে; জননী এগিয়ে যায়, সন্তান পড়ে থাকে পিছনে।

কে আপনি! আমার স্নানের বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন?

আমি আপনার স্ত্রী, চেয়ে দেখুন, চিনতে পারবেন।

স্ত্রী! সন্ন্যাসী চমকে উঠল, এমন কথা বলবেন না, সন্ন্যাসীর কিছু থাকে না, গৃহ-সংসার, স্ত্রী কিছুই না।

আজ তুমি সন্ন্যাসী, একদিন তুমি গৃহী ছিলে; একদিন তুমি আমায় নারায়ণ সাক্ষী রেখে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলে। তুমি স্ত্রী-ত্যাগী, পলাতক, পাতক; কোনো দিন তোমার মুক্তি হবে না।

জন সমুদ্রের দিকে সন্ন্যাসী তাকাল, তাকাল সূর্যের দিকে, জোয়ারের মত স্নানার্থী নরনারী এগিয়ে চলেছে—গৃহী-জীবনের কথা আমার মনে নেই, মনে আনতে নেই, সম্পূর্ণ বিস্মরণ আনতে না পারলে আমি আর সন্ন্যাসী কি? আমি আপনাকে চিনি না, পথ ছাড়ুন।

তুমি ত আমাকে একটা সন্তান দিয়ে আসতে পারতে, কি নিয়ে জীবন কাটবে আমার? এতবড় শাস্তি দেবার কোনো অধিকার ছিল তোমার? আমার জীবন ব্যর্থ করে তুমি মুক্তি অন্বেষণ করছ?

আমি আপনাকে চিনি না, আপনি ভুল করেছেন; ঈশ্বরকে ডাকুন, মানুষের মুক্তির আর কোনো পথ নেই।

ঈশ্বরকে? পরিণত-যৌবনা রমণীটি তার অন্তরের সমস্ত আসক্তি আর বাসনা নিয়ে হেসে উঠল, তুমি ঈশ্বরকে পেয়েছ সন্ন্যাসী?

সন্ন্যাসী আবার চমকে উঠল, বলল, পথ দিন।

যাও।

এ-কাহিনী অমিয়র কাছে শুনেছিল সুলতা।

সেই পিসিমা আছেন এখানে, তিনি এই সংসারের কর্ত্রী, আর এই পিসিমার কাছ থেকে সুলতা কেন যে নিজেকে আড়াল করে রাখে—তার কোনো কারণ সে খুঁজে পায়নি। কিন্তু কোনো কারণেই সামান্যতম বিরক্তিও তিনি প্রকাশ করেন নি, কোনো অসন্তোষও নয়। আর ওঁর মুখের স্নিগ্ধ হাসিটুকুও অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও ম্লান হয়ে যেতে দেখেনি সুলতা। বাড়িতে পা দিয়েই সে-ও কোনো কারণে নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা করেনি—নিজের অধিকার বা কর্ত্রীত্বের কথা দূরে থাক। পিসিমার অনুপস্থিতিতে সে একদিন ঢুকেছিল তাঁর ঘরে, ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে শুধু কয়েকখানি বাংলা উপন্যাসই তার চোখে পড়েছিল, কোনো ধর্মের বই নয়, কোনো পুঁথি নয়, এমন কি একখানি রামায়ণ-মহাভারতও নয়। সে বিস্মিত হয়েছিল—পিসিমা পুজো-আহ্নিক করেন না? ঠাকুরের নাম করেন না? ঘরে কোনো দেবতার ছবি নেই! কোনো ঠাকুরের ছবি নেই! কোনো চিহ্ন নেই আধ্যাত্মিকতার! সুলতা বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে, আর পিসিমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায় সে। তা হোক, অমিয়র খাবার সময়ে উপস্থিত থাকতে পারেনি বলে কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করছিল সে। তার অবশ্য কোনো উপায়ও ছিল না, সেই যে ভদ্রমহিলা অমিয়র পাশের টেবিলটা দখল করে বসেছিল, খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও চেয়ার ছাড়েননি তিনি।

সন্ধ্যার পর সুলতাকে ক্লাবে যেতে হল। চারি দিকে প্যান্ট-কোট-পরা যুবক আর কিছু সুবেশা যুবতীর ভিড়, সুলতা গোপনে দেখল কারুর কারুর সীঁথিতে লুকানো-সিঁদুরের দাগ। তাকে ঘিরে ধরল ওরা; ভয়চকিতা হরিণীর মত তার চোখ খুঁজতে লাগল অমিয়কে। অমিয় তখন পাশের ছোট ঘরে। তরুণ ব্যারিষ্টার হিসাবে অমিয় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে, তার বন্ধু এবং স্তাবকের সংখ্যাও কম নয়; তারা ওকে সহজে ছাড়ল না।

টাই-আঁটা, পিছনে উল্টানো ঘন চুল, সুদর্শন একটি যুবক তাকে, হ্যাঁ, তাকেই বলছে, আপনি সুন্দরী, কিন্তু কতটা সুন্দরী, সেটা কি কেউ বলেছে আপনাকে?

ভয়ে ভয়ে চোখ তুলল সুলতা।

আপনার জন্যই ত পৃথিবীর কত রাজত্ব ছারখার হয়ে গেছে, আপনাকে উদ্দেশ করেই ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়েছে, আপনার—

গাঢ় লিপষ্টিক্-রাঙা ঠোঁট উলটে একটি যুবতী নায়কটির কাঁধে হাত রেখে বলল, 'লে অফ্, সী ইজ এ কিড', এসো।

এবারে এল আর এক দল, কিন্তু ততক্ষণে অমিয় এসে পড়েছে। সুলতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অমিয় বলল, চল পালাই।

গেটের কাছে দরোয়ান লম্বা সেলাম করল, অমিয় তাকে পাঁচ টাকা বকশিস করল।

গাড়িতে বসে সে জিজ্ঞেস করল, কোন্ দিকে যাব?

চল না।

গাড়ি দৌড় দিল।

ওরা বড় বিরক্ত করছিল, না ? জিজ্ঞেস করল অমিয়।

ঐ ভদ্রলোকটি কে ? সরু গোঁফ, ব্যাক-ব্রাস-করা চুল ?

ও ! অমিয় জোরে হেসে উঠল। আমারই মত আইন-ব্যবসায়ী, পয়সা আছে, পসার নেই ; গিগোলো।

গিগোলো কি ?

অমিয় ওর কোমরে হাত রাখল।

এ্যাক্‌সিডেণ্ট করবে। সুলতা আরও সরে এল ওর গায়ের কাছে।

সেরা এ্যাকসিডেণ্ট ত ঘটেই গেছে।

কি ?

বিয়েটা। জীবনের সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল না ?

কি ওলট-পালট হয়ে গেল ? সুলতা তাকাল।

এই ধর, মনের মধ্যে একটা ভাবনা ঢুকে রইল ত ?

কিসের ভাবনা ?

তোমার।

সুলতা অমিয়র কাঁধে হাত রাখতে গিয়ে সিটের পিছনে হাত রাখল, ওর বুকের স্পর্শ লাগছে অমিয়র শরীরে। অমিয় গাড়ি থামিয়ে ওকে টেনে আনল বুকের উপর, মুখটা নামিয়ে আনল।

হঠাৎ ছিটকে এক হাত সরে গেল সুলতা, তুমি মদ খাও ?

মদ ? ওঃ, অমিয় হো-হো করে হেসে উঠল, ও কিছু নয়, ক্লাবে পার্টিতে আমাদের একটু-আধটু না খেলে চলবে কেমন করে ? ধর একজন বড় মক্কেল পার্টি দিল, সেখানে একটু না ছুঁলে বলবে আন্‌শোশিয়্যাল, পরে হয়ত আমার কাছে আর আসবেই না। এতে এত ঘাবড়ে যাবার কি আছে ? আমায় কি মাতলামি করতে দেখছ ? কাছে এসো।

না, সুলতা আরও সরে বসল, বল, আর কোনো দিন মদ ছোঁবে না ?

অমিয় তার আসনে গা ডুবিয়ে দিল, চুপ করে রইল।

বল।

কি ?

আর কখনও খাবে না ?

আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।

আমাকে ছুঁয়ে বল। সুলতা আবার সরে এল ওর গায়ের কাছে।

এই ছুঁয়ে বলছি—আর মদ ছোঁব না, হল ?

সুলতা হাসল।

গাড়ি চালাতে চালাতে এক সময়ে অমিয় বলল, তোমাকে দেখে ত মনে হয় না তোমার হিষ্টিরিয়া আছে ?

সুলতা আহত হল, তবু হাসল। সে বলল, হিষ্টিরিয়ার কি দেখলে ?

কিছু কেনাকাটার আছে ? না বাড়ি ফিরবে ?

চল ফিরি।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিল অমিয়। রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর কাছে আসতে সুলতা বলল, একটু কালীঘাট নিয়ে যাবে ?

কালীঘাট ? কালীঘাটে কে থাকে ?

একটু মন্দিরে যাব।

মন্দিরে কি করবে ?

মন্দিরে লোকে কি করে ?

আবার গাড়ি ঘোরাল অমিয়।

দূর থেকে ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল, হয়ত আরতি আরম্ভ হয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে সুলতা জিজ্ঞেস করল, তুমি আসবে না ?

আমি বসছি গাড়িতে।

এস না, প্রণাম করে আসবে, আমি একটু আরতি দেখব ; মন্দিরের কাছে এসে একটা প্রণাম করবে না ? এস।

প্যাণ্ট-কোট পরে কেউ মন্দিরে ঢোকে ? ঠাকুর ভীষণ রাগ করবেন, কাল একটা বড় মামলা আছে, হেরে যাব ; আমি বসছি।

কিছু পয়সা দেবে না কি ?

নিশ্চয়। পকেট থেকে খুচরো পয়সা আর কিছু নোট সুলতার হাতে এগিয়ে দিল সে।

পয়সা বিলোতে বিলোতে মন্দিরে ঢুকল সুলতা, পাণ্ডাদের হাত ছাড়িয়ে, ভিড় এড়িয়ে, নিচে প্রতিমার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল ; কেমন একটা অব্যক্ত আতংকে শিউরে উঠল তার সমস্ত শরীর, পা কাঁপতে লাগল ; ধূপের গন্ধ, ঘণ্টার শব্দ, চীৎকার ! চোখ বুজল সুলতা, হাত জোড় করে বলল : ঠাকুর, আমায় স্বামীকে ক্ষমা কর তুমি, সুমতি দাও ; সুমতি দাও। আর কিছু মনে এল না তার ; চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল সে, হঠাৎ খেয়াল হল তার মনের মধ্যে ভাসছে পিসিমা, অমিয়, ক্লাবের সেই লোকটি, গত রাত্রিতে আয়নায় তার উলঙ্গ দেহ ! চোখ খুলল সে, নিচু হয়ে প্রতিমার পা স্পর্শ করল, আবার শরীরে সেই শিহরণ ; সিঁদুর নিয়ে কপালে লাগাল সে, কিছু ফুল কুড়িয়ে নিল। একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক তারই পাশে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছিল, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই কনুইটা এগিয়ে লোকটা তার বুক স্পর্শ করল ; সেদিকে না তাকিয়েই সুলতা ছিটকে বেরিয়ে এল, উপরে এসে প্রণামীর থালায় একগোছা এক টাকার নোট রাখল, শান্তিজল দিল মুখে, মাথায় ; আর একবার প্রণাম করল।

সিঁড়ির নিচে জুতো খুঁজল সে, দেখল চার দিকে, জুতো পাওয়া গেল না ; বিয়ের দু'দিন আগে অনেক দাম দিয়ে সে জুতো-জোড়া কিনেছিল ; অমিয় রাগ করবে হয়ত। বাইরে আসবার সময় কেউ হঠাৎ শরীরের চাপ দিল তার পিছনে ; সুলতা তাকাল পিছনে, সেই ভদ্রলোক, কপালে সিঁদুরের বড় ফোঁটা। তাড়াতাড়ি রাস্তায় এসে পড়ল সুলতা।

অমিয় গাড়ির দরজা খুলে দিল, সুলতা উঠে বসল : জান, জুতোটা পাওয়া গেল না !

সে কি ? দেখেছ ভাল করে ? কোথায় রেখেছিলে ?

সিঁড়ির নিচে।

ভেবেছিলাম, একবার গাড়িতে রেখে যেতে বলব।

বললে না কেন ? তোমারই দোষ তা হলে ? সুলতা হেসে উঠল।

এখন ত তাই মনে হচ্ছে। গাড়িতে স্টার্ট দিল অমিয়।

এই নাও, আশীর্বাদী, মাথায় দাও।

অমিয় গাড়ি চালিয়ে দিল, পথের দিকে চোখ তার।

নাও।

রাখ, পরে নেবো।

হাত বাড়িয়ে অমিয়র কপালে ফুল ঠেকিয়ে দিল সুলতা।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে অমিয় দেখল, বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে, ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে, লোক আসবার কথা ছিল।

সুলতা উপরে এল, অমিয় ঢুকল বৈঠকখানায়।

খালিপায়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটেছে সুলতা, তাই আগে স্নানের ঘরে ঢুকল সে; আঁচলের গেরো খুলে মন্দিরের ফুল নিল হাতে, কোথায় রাখে? দেয়াল-তাক থেকে সাবান, টুথপেষ্ট, ব্রাস, তেলের শিশি সব নামিয়ে রাখল চৌবাচ্চার উপর, কয়েক মগ জল ঢেলে দিল তাকের উপর, ফুল রাখল এক কোণায়, শাড়ি, সায়া, জামা খুলে ভিজিয়ে দিল জলে; তার পর আলোটা নিবিয়ে পা টিপে টিপে বাইরে এল, বারান্দা অন্ধকার, শোবার ঘরও অন্ধকার, শোবার ঘরে গিয়ে পৌঁছাবার আগেই শুনতে পেল অমিয় দুটো করে ধাপ এক সঙ্গে ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে আসছে; দৌড়ে গিয়ে আবার স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল, দরজা বন্ধ করে দিল, বাতি জ্বালবার সময় পায়নি সে, সুইস্ বাইরে।

অমিয় ঘরে ঢুকল, বাতি জ্বালল; পোষাক ছাড়ল, পা-জামা আর পাঞ্জাবী পরে গেল স্নান-ঘরের দিকে, সুইসটা নামিয়ে দিল, দরজা ঠেলে দেখল বন্ধ। বিস্মিত হল সে, জিজ্ঞেস করল, তুমি ভিতরে নাকি?

হ্যাঁ। উত্তর এল।

বাতি জ্বালনি কেন?

আমার কাপড়-জামা দরজার বাইরে যায় না।

অমিয় আলনা থেকে শাড়ি আর জামা এনে রাখল রেলিং-এর উপর, 'রাখলাম এখানে, আমি নিচে যাচ্ছি।' চটির শব্দ করল সে।

সুলতা দরজা খুলে প্রথমে গলাটা বার করে তাকাল, তার পর যেই বেরিয়ে এসেছে অমিয় দু' হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল।

সুলতা প্রায় চীৎকার করে উঠল।

অমিয় বলল, আমি। চ্যাচাচ্ছ কেন?

ছেড়ে দাও, শীগগির ছেড়ে দাও! না হলে চীৎকার করব আমি।

আর—অমিয়র বাস্তবিক মনে হল, ও আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। হাত সরিয়ে নিল সে। নেমে এল নিচে, মনে হল অস্পষ্ট অন্ধকারে বুকের কাছে যাকে টেনে এনেছিল—সে তার স্ত্রী সুলতা নয়, অন্য কোনো মেয়ে।

স্নানের ঘর থেকে বেরোবার সময় সযত্নে ফুল ক'টা তুলে নিল সুলতা; ব্যাগ খুলে কৌটোর নিচে রাখল সাবধানে।

অমিয়র কাজ সেরে উপরে আসতে বেশ রাত হল, সুলতা টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় বই পড়ছিল। এখনও খাওনি তুমি?

বই বন্ধ করে সুলতা উঠে বসল, বা রে! আমি একা খেয়ে নেব নাকি?

এসো এসো, চল, খেতে যাই। অমিয় হাত বাড়িয়ে দিল, নিশ্চয় তোমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে?

হাতের সঙ্গে হাত জড়িয়ে তারা সিঁড়ি পর্যন্ত গেল।

টেবিলে খাবার এসে পৌঁছানো পর্যন্ত পিসিমার তদারক চলে, তার পর আর তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। ওদের খাবার পর তিনি খেতে আসেন।

একদিন অমিয় বলেছিল, পিসিমা, তুমি একা-একা খাও কেন? আমাদের সঙ্গে খেলেই ত পার?

পিসিমার সেই স্নিগ্ধ হাসি, আমার আহারটা শুধু মাত্র আহার ছাড়া আর ত কিছু নয়, আমার সংগে খেতে বসে তোদেরও তাই হবে, মাঝখান থেকে খাওয়ার আনন্দটুকুও ত নষ্ট!

পিসিমাকে ভাল না লাগবার, ভাল না বাসবার কোনোই কারণ নেই, কোনোই কারণ খুঁজে পায়নি সুলতা, তবু কেন পিসিমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে সে? কেন এড়িয়ে চলে ওঁকে? আর—হঠাৎ আজ মনে হল সুলতার—পিসিমাও তাকে কোনো দিন ডাকেন নি, কোনো দিন ঘরে ঢোকেন নি তাদের; বিনা প্রয়োজনে একটি কথা বলেন নি কখনও, কথার সময় বলেন নি বাড়তি কথা; উচ্ছ্বাস নয়, আবেগ নয়, এমন কি স্নেহও নয়।
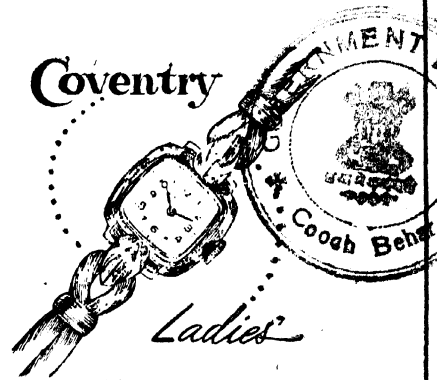
আর কেমন যেন খাওয়াটা উপভোগ করতে পারল না সুলতা, হাত গুটিয়ে নিল সে; অমিয় জিজ্ঞেস করল, কি হল তোমার? খাচ্ছ না যে?

পেট ভরে গেল হঠাৎ।

কৈ, তেমন ত কিছু খাওনি, মাছটা খেয়ে ফেল।

আর খেতে পারছি না।

অমিয় হাত বাড়িয়ে সুলতার থালা থেকে মাছটা তুলে নিল;

সুলতা প্রায় থাবা মারতে যাচ্ছিল, অমিয় ততক্ষণে খানিকটা মুখে পুরে দিয়েছে।

দেখ ত, কি করলে? সুলতা নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কি করলাম?

আমার পাত থেকে নিয়ে খেলে?

খেলাম, জীবনের সব-কিছুর সংগে আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়ে নিয়েছ তোমরা—অর্থাৎ মেয়েরা; অমিয় হাসল, তোমার থালা থেকে খেলেই যত আপত্তি, কিন্তু তোমাকে, গলা নিচু করে, চুমো খেতে ত আপত্তি নেই?

চুপ, চুপ! শংকিত গলায় বলে উঠল সুলতা।

মুখ ধুয়ে উপরে এল ওরা। পিসিমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অমিয় বলল, পিসিমা খেতে যাও।

সুলতা চুল আঁচড়াচ্ছিল ড্রেসিং টেবিলের সামনে, অমিয় তার খাটে নথিপত্র নিয়ে বসল, আয়নায় দেখল সুলতা, জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন কাজ করবে না কি?

এই, একটু! তুমি ঘুমাচ্ছ না কি?

সুলতা জবাব দিল না, চুল আঁচড়ে খোঁপা বাঁধল, ঘরের কোণায় ভাঁজকরা পর্দার আড়ালে কাপড় বদলাল, বাসি কাপড়ে শোবে না সে। ঘুম আসে না, কেমন অস্বস্তি লাগে।

বাসি আবার কি? অমিয় জিজ্ঞেস করেছিল এক দিন।

বা রে! বাসি হল না? সারা দিন পরে আছি?

পরিত্যক্ত শাড়ি-জামা পা দিয়ে খাটের নিচে ঠেলে দিল সে। শিয়রে ছোট টেবিলে বাতিটা জ্বালিয়ে বালিসে হেলান দিয়ে বই পড়তে লাগল।

অমিয় এক সময়ে তাকিয়ে দেখল, গায়ের উপর বই রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে সুলতা। উঠে এল সে, বইটা আস্তে আস্তে উঠিয়ে রাখল টেবিলের উপর, বালিসটা ঠিক করে দিল, হয়ত ঘুম ভেঙ্গে যাবে, মশারিটা ফেলে দিল, মশারির প্রান্তটা লাগল সুলতার কপালে, ঘুম ভেঙ্গে গেল; হাত বাড়িয়ে অমিয়কে স্পর্শ করল সে, অমিয় ওর হাত তুলে নিল নিজের হাতে, বসল পাশে, জিজ্ঞেস করল, ঘুম ভেঙ্গে গেল?

সুলতা উত্তর দিল না। ঈষৎ আকর্ষণ করল তাকে, অমিয় ঝুঁকে পড়ল তার বুকের উপর। সুলতা হাত বাড়িয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিল, তোমার বাতিটাও নিবিয়ে দিয়ে এস।

থাক না?

মশারির বাইরে এল অমিয়, বাতিটা নিবিয়ে সুলতার খাটের কাছে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। দুটো হাত বাড়িয়ে সুলতা তাকে প্রায় টেনে নিল।

এক-পাউণ্ড-প্রেমের অভিজ্ঞতা যে কত অকেজো, প্রথম দিনই অমিয় সেটা বুঝতে পেরেছিল, তাই কিছুটা সতর্ক হয়েছে সে; সরম আর সহযোগিতার পার্থক্যটা বুঝতে শিখেছে।

নিচে দরজা বন্ধ করার শব্দ হল; রাস্তায় কেশে উঠল কেউ।

নূতন গাড়ির অতি অস্পষ্ট শব্দ! মোটরের হর্ণ শোনা গেল, বাতাসের ধাক্কায় মশারির ঝালর নড়ে উঠল।

সুলতা অমিয়র হাতের উপর হাত রেখে বলল, ও-গুলো থাক না।

তেমনি নিচু গলায় অমিয় বলল, অন্ধকারে আমি কি দেখতে পাচ্ছি?

সুলতা আবার কি বলতে গেল, অমিয় ততক্ষণে মুখ নামিয়ে এনেছে।

এক সময়ে হঠাৎ উলঙ্গ প্রতিমার কথা মনে পড়ল সুলতার। মনে হল, নগ্ন বুকের উপর অমিয়র দেহের স্পর্শ নয়, মানুষের খুলির স্পর্শ! অমিয়র পিঠ থেকে দুটো হাত নামিয়ে আনল সে, রাখল বিছানার উপর, এক হাতে তার খড়্গ, অন্য হাতে রক্তাক্ত নরমুণ্ড; শরীরের সমস্ত কাঁপুনি তার থেমে গেল এক মুহূর্তে! নিথর হয়ে পড়ে রইল সে।

অমিয় যখন তার বিছানায় গিয়ে বসল, তখনও সুলতা ভয় আর আতংকে নিস্পন্দ হয়ে রইল। পায়ের কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে শাড়িটা তুলে নেবার পর্যন্ত আর শক্তি নেই।

পরদিন অমিয় কোর্টে যাবার পর সুলতা পিসিমার কাছে গেল, বলল, পিসিমা, আমি একটু কালীঘাট যাব?

কালীঘাট? কেন? অমিয় বুঝি সারা দিন তার নথিপত্র নিয়ে থাকে?

সুলতা হাসল, না, তা নয়, যেতে ইচ্ছে করছিল।

তা যাও বাছা, তবে পাগলামী সুরু করে দিও না,—সবে সংসারে পা দিয়েছ, কি বলছে অমিয়? এখন ছেলেপুলে চায় না নাকি?

চাকরকে ট্যাক্সী ডাকতে বলে, সুলতা তৈরী হয়ে নিল।

মন্দিরের বাইরে ডালি কিনল সে, বড় জবাফুলের মালা কিনল। পুজোর পর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলল, ঠাকুর, তুমি আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

শুধু ফিরবার সময় ট্যাক্সীতে বসে মনে হল, চোখের জলটা সত্যি নয়, আতংকটাই সত্যি; মনে মনে শক্ত হবার চেষ্টা করল সে।

পিসিমাকেই কথাটা পাড়ল সে। সিঁড়ির উপরের ঘরটা ত পড়েই আছে।

তা ত আছেই, কি করবে ওখানে?

ঠাকুর-ঘর করব।

ঠাকুর-ঘর? সেই স্নিগ্ধ হাসিটা মিলিয়ে গেল তাঁর মুখ থেকে; শান্ত, কোমল, রেখাগুলি কঠিন হয়ে উঠল। মনে হল ঠিক কথাগুলি খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি, তবু বললেন, সংসারই ত তোমার ঠাকুর-ঘর, সংসারটাকে আঁকড়ে ধর দু'হাতে; সত্যিকারের স্ত্রী আর মা হবার চেষ্টা কর; এখন থেকেই এই পলায়নের প্রবৃত্তি কেন? শুধু নিজের জন্যই এই স্বার্থপরতার আয়োজন কেন?

পিসিমার গলার শব্দ আর চোখের দৃষ্টির আড়ালে সুলতা সেদিন যেন এক নূতন মানুষের সন্ধান পেল।

গুরু-টুরু আছে না কি? শান্ত হাসিটা পিসিমার ফিরে আসছে আবার।

না। বলল সুলতা।

পুজোর ঘরে কিছু পাবে না, গুরুর সন্ধান করবে। কেন? কিসের তোমার এই শূন্যতা? কিসের জন্য অমিয়র জীবনটা তুমি ব্যর্থ করে দিতে চাও?

সুলতা উত্তর দিল না। সিঁড়ির ঘরটা খালিই ছিল; সুলতা একদিন নিজের হাতেই ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে করে ফেলল। কালীঘাট থেকে আনল জলচৌকি, পিতলের ছোট থালা, গ্লাস, ধূপদানী আর শাঁখ; জানালায় পর্দা লাগাল, দড়ি টাঙিয়ে ঝুলিয়ে রাখল গরদের শাড়ি আর জামা,—তার পুজার কাপড়। গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগের তলা থেকে এত দিন পরে বার করল লক্ষ্মীর ফটো, আঁচল দিয়ে মুছল। জলচৌকিতে প্রথম বসাল লক্ষ্মী। স্নান করে এল; গরদের শাড়ি আর জামা পরল; মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল অনেকক্ষণ। বেশী সময় নেই; অমিয় উপরে আসবে এখুনি। তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে নিচে এল সে।

তারপর অমিয় কোর্ট যাবার পর সে বসল পুজোয়। কোনো পুজোরই মন্ত্র বা রীতি তার জানা নেই। চোখ বুজে বসে রইল সে, কিন্তু চোখের সামনে কোনো মূর্তিই জাগিয়ে তুলতে পারল না; সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার মনে আসতে লাগল তার।

কিন্তু রাত্রেই দেখা দেয় তার সমস্যা, ভয়ে কাঁপতে থাকে সে, ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়, মনটাকে শূন্য করবার চেষ্টা করে।

দেখতে দেখতে পুজার ঘরে ছবি বাড়তে লাগল, কালীর ছবি ছাড়া আর কোনো ছবিই বাদ গেল না, জলচৌকি বাড়ল; চিনে মাটির শিব, কৃষ্ণ আর রাধিকা এল। বৃহস্পতি বার সুর করে পড়তে লাগল লক্ষ্মীর পাঁচালী।

আর পিসিমা যে জন্যে অপেক্ষা করছিলেন—তারই লক্ষণ দেখা গেল এক দিন। সুলতা সন্তানসম্ভবা হল; নিশ্চিন্তের হাসি হাসলেন তিনি। সুলতা স্তব্ধ হল; এমন বাধার জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে। তৈরী হতে সময় লাগল তার।

একটা ব্যাপারে নিরাপদ হল সে। বিবস্ত্রা না হলেও অমিয়র অনুযোগ থাকে না, তার দেহ আর নগ্ন প্রতিমার সঙ্গে রূপান্তরিত হয় না; স্বস্তি পেল সে, আতংক-মুক্ত হল।

হাসপাতালে গিয়ে সমস্ত নিয়ম আর শৃঙ্খলা থেকে বিমুক্ত হয়ে গেল সে।

সদ্যোজাত ছেলেকে দেখিয়ে পিসিমা বললেন, এত দিন পাথরের ধ্যান করছিলে, এবারে পেলে সত্যিকার কৃষ্ণ।

সুলতা আশ্চর্য হয়ে ঘুমন্ত এক পুতুলের দিকে তাকাল, তারই শরীর থেকে জন্ম এই শিশুর?

বাড়ি ফিরে শিশুর পরিচর্যায় জড়িয়ে পড়ল সুলতা। এমন ক্ষুদ্র মানুষের জন্যে এত কিছু করতে হয়?

অমিয় আয়া রাখবার প্রস্তাব করল পিসিমাকে। পিসিমা সরাসরি বাতিল করে দিলেন, তোরা কি জোর করে আধুনিক হতে চাস্ না কি? দু'-দুটো স্ত্রীলোক রয়েছি আমরা, আমরা দেখতে পারব না? শেষকালে বিজাতীয় আয়া রাখতে হবে?

পিসিমা ইচ্ছে করেই দেখেন না, বরং শিশু পরিচর্যার বিরাট এক ফিরিস্তি দিয়ে রেখেছেন সুলতাকে। এর যেন নড়চড় না হয়; কেন না, এখন যদি কোনো রকম অযত্ন হয়, ভবিষ্যতে অনেক ভুগতে হবে। বলে রাখলাম।

অমিয়র পসার বাড়ল অনেক। টাকার সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগল; রাত্রে কখন সে কাজ সেরে উপরে আসে—টেরও পায় না সুলতা। এক সঙ্গে খাওয়া অনেক দিনই বন্ধ হয়ে গেছে। পুজোর ঘরে গিয়ে পাঁচ মিনিট বসবার উপায় নেই; ছেলের চীৎকারে ছুটে আসতে হয়, পিসিমার উপর রাগ করে। কি এমন কাজ ওঁর, ছেলেটাকে একটু কোলে নিতে পারেন না!

সেদিন অমিয় উপরে এসে দেখল, সুলতা বই পড়ছে।

এখনও ঘুমাও নি?

তুমি খেয়েছ? সুলতা বই বন্ধ করল।

এই ত খেয়ে এলাম। অমিয় ওর পাশে বসে পড়ল।

সময় হল তোমার? সরে বসতে গিয়ে অপ্রত্যাশিত বাধা পেল সুলতা।

সারা দিনের পরিশ্রমের পর অমিয় ক্লান্তিবোধ করছিল, কিন্তু সুলতার প্রতি সে যে উদাসীন নয়—এটা ব্যক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল সে।

ছাড়। ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমের জন্যে সারা রাত্রিই ত পড়ে রয়েছে।

আর বাতি নিবাবার প্রয়োজন নেই।

আবার মদ খেয়েছ? অমিয়র বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল সে।

সামান্য একটু।

তুমি না আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, ও-সব ছোঁবে না?

করেছিলাম, না—এই যে!—হ্যাঁ—

জুইফুলের মৃদু গন্ধ আর জোরালো আলো দুটোই সুলতা বরদাস্ত করল সেদিন। কিন্তু ঘুম এল না; বার বার মনে হতে লাগল—তার উপর অন্যায় করা হয়েছে, ঘোরতর অন্যায়; অন্যায় নয়, স্থির করল সে, অপমান। তার নারীত্বের অপমান।

পরদিন নূতন সংকল্প নিয়ে ঠাকুর-ঘরে ঢুকল সে। এখন কিছু সময় পাচ্ছে সে। ছেলেটা তিন বছরে পড়ল; চারি দিকে খেলনা ছড়িয়ে তার মধ্যে বসিয়ে রাখে ওকে। নেহাৎ কিছু না ঘটলে তার সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

অমিয় এক দিন বলল, চল, পুজোর সময় বাইরে যাই, অনেক দিন কলকাতার বাইরে যাইনি।

চল। সুলতা খুশি হয়ে উঠল, চল, পুরী যাই।

বেশ।

সমুদ্র দেখে মুগ্ধ হল সুলতা, স্নান করে উল্লসিত হল। মনের কোথায় দ্বন্দ্ব আর বিরোধ দেখা দিয়েছে, সমুদ্রের হাওয়ায় সব উড়িয়ে নিয়ে গেল।

জগন্নাথের মন্দিরে যাবে না?

শুনেছি ভয়ানক ভিড়, আর এমন অন্ধকার—নিজের হাত দেখা যায় না, সুইমিং কষ্টুমটা তুমি পর না কেন? শাড়ি পরে সমুদ্রে স্নান করা যায়?

অত লোকের মাঝখানে সং সাজতে পারব না আমি; তুমি না বললে, অনেক বার পুরী এসেছ?

এসেছি। আচ্ছা, স্নান করতে না যাও, এখানেই একবার পর না দেখি। আমি ক্যামেরাটা বার করি।

এত বার পুরী এসেছ, জগন্নাথ দর্শন করনি? আজ চল, আমার সংগে।

ওরে বাবা! ভিড়ের মধ্যে কেউ যদি ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়, সবাই তাকে মাড়িয়ে চলে যাবে, জান?

তোমার যত আজগুবি কথা, যাবে না ত?

আমি ততক্ষণ নন্দকুমারকে দেখি, তুমি পুণ্যটা করে এস; দু'জনেই গেলে ছেলেটা থাকবে কার কাছে?

এ কথাটা মনে হয়নি সুলতার। একাই গেল সে, দুটো বলবান পাণ্ডা সঙ্গে নিয়ে।

ফিরবার সময় আঁচলের নিচে টুঁটো জগন্নাথের ফোটো নিয়ে এল, লুকিয়ে রাখল বাক্সে; অমিয়কে বলল, নাও, প্রসাদ মুখে দাও।

মুখে দেবার দরকার কি? মাথায় ঠেকিয়ে দাও না।

সুলতা হাত বাড়াল, মুখ ফিরিয়ে নিল অমিয়। শেষ পর্যন্ত প্রসাদটা ওর মাথায় ঠেকিয়ে ক্ষান্ত হতে হল সুলতাকে।

সাত দিন পরে ফিরবার সময় ওরা দুজনাই ফিরল কলকাতায়, নন্দকুমারকে রেখে আসতে হল জগন্নাথের কাছে। কলকাতা থেকে ডাক্তার আনিয়েও কিছু করা গেল না; ডাক্তারকে আর হোটেল পর্যন্ত আসতে হয়নি; ষ্টেশন-ওয়েটিং-রুমে দিনটা কাটিয়ে ফিরতি ট্রেণে কলকাতা রওনা হয়েছে ডাক্তার।

অমিয় নিজেকে ধিক্কার দিল। ভদ্রলোকের ছেলে কলেরায় মরবে, এটা যেন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না সে।

কলকাতার বাড়িতে পা দিয়েই সুলতা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল, কিন্তু অনেক চীৎকার করেও শেষ পর্যন্ত মনে হল না বুকটা তার খান-খান হয়ে গেছে। দুঃখের আঘাতে কেন সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে না? কেন লোপ পায়নি তার ক্ষুধা? তৃষ্ণা?

অমিয়র অনেক কাজ, কাজের মধ্যে ডুবে গেল সে; আর নিজেকে শুদ্ধ করবার জন্যে সুলতা খাওয়া বন্ধ করে দিল। প্রথম দিন কষ্ট হল, দ্বিতীয় দিন কষ্টটা সহ্য হয়ে গেল। তৃতীয় দিন পিসিমা দুধের বাটি নিয়ে এসে কড়া কড়া ধমক লাগালেন, উপোস করলেই কি তোমার ছেলে আসবে, না, দুঃখটা বেশি করে দেখানো হবে? নাও।

সকালে দুধ, দুপুরে ফল আর রাত্রে লুচি-সন্দেশ খেয়ে অনশন ভংগ করা হল। সংসার থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঠাকুরসেবায় মন দিল সে। সারা সকালটা কেটে যায় পুজোর ঘরে; সন্ধ্যাটাও তাই; ছোট একটা ঘণ্টা কিনেছে, বাজায় যখন তখন। হয়ত, ভাবল সুলতা, দেবতার উপর সত্যিকারের ভক্তি নেই বলেই ভগবান তাকে এমন শাস্তিটা দিলেন!

কিছু টাকা দেবে? একদিন সে বলল অমিয়কে।

দেবো, কি করবে?

নন্দর নামে একটা মন্দির তৈরী করব, ছোট্ট গোবিন্দের মন্দির।

মন্দির কি হবে? সে-টাকা দিয়ে হাসপাতালে কয়েকটা বেড করে দেওয়া যেতে পারে, বা একটা চিলড্রেনস্ ওয়ার্ড।

না, কোনো নির্জন জায়গায় ছোট একটা মন্দির করে দাও, খুব কম খরচে। যেখানে গিয়ে বসা যাবে, খানিকক্ষণ সময় কাটানো যাবে।

বাড়িতে মন বসছে না?

বাড়ি ত আছেই, দেবে?

দেবো। বলল অমিয়।

মন্দির হবার আগেই জঠরে সন্তান এল।

পিসিমা বললেন, ও-সব পাগলামী ছাড়, একজন অযত্নে গেল, এটার ওপর যেন কোন রকম অযত্ন না হয়।

কিন্তু সে না হতে পারল নিজের উপর খুশি, না অমিয়র উপর। মনে হল তাকে সংসারে জড়িয়ে ফেলবার অমিয়র একটা সস্তা কৌশল। বুঝা উচিত ছিল তার; নিজেরও কি না এতটুকু সংযম নেই? দেহের ক্ষণিক উন্মাদনাটাই বার বার তার কাছে এত বড় হয়ে দেখা দেয় কেন? এমন করে আসক্তির হাতে সমর্পণ করার দুর্বলতাটুকু সে যদি অতিক্রম করে উঠতে না পারে—তা-হলে কেমন করে ভগবৎ-চিন্তায় নিজেকে সমর্পণ করবে? কেমন করে পৌঁছাবে ঈশ্বরের কাছে?

সংসার থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনবে, স্থির করল সুলতা। এমন কি, অমিয় পর্য্যন্ত জানতে পারবে না। আর কয়েকটা মাস, তারপরেই তার মুক্তি! আর কোনো বন্ধনেই ধরা দেবে না, মনে মনে শপথ করল সে। মহৎ সংকল্পের প্রেরণায় মুখটা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল; আপন মনেই হাসল সে; সব, সংসারের সব চক্রান্তকেই ব্যর্থ করে দেবে।

ইতিমধ্যে অমিয়র কেরাণীকে নিয়ে জমি দেখে বেড়াতে লাগল সুলতা। অবশেষে বেহালায় ছোট এক খণ্ড জমি অত্যন্ত পছন্দ হয়ে গেল; চমৎকার মন্দির হবে এখানে! অমিয়কে বলল, জমিটা কেন, খুব সস্তা।

সবিতা চ্যাটার্জ্জী
বলেন "আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি—এটি এমন একটি বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবান!"
সবিতা এখন বাংলা দেশে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের অন্ত-তম। কিন্তু শুধু তাঁর অভিনয় নয়, তাঁর সুকোমল সৌন্দর্য্য এবং অপূর্ব লাবণ্যও চিত্রামোদীদের মুগ্ধ করেছে। এই লাবণ্যের যত্ন তিনি নেন মোলায়েম লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে। আপনিও বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে ত্বকের যত্ন নিন। সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে বড় সাইজের সাবান কিনুন।
LUX
TOILET SOAP
'লাক্স টয়লেট সাবান
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
LTS. 539-X52 BG

এত ব্যস্ত হবার কি আছে? জবাব দিল অমিয়, আর কয়েকটা মাস কাটিয়ে দাও না, হাংগামাটা চুকে যাক। আমি ত আর দেখা-শুনো করবার সময় পাব না, তোমাকেই তদ্বির করে মন্দির তৈরী করাতে হবে।

জমিটা কেনা থাক, হয়ত বিক্রি হয়ে যাবে।

বায়না করে রাখি বরং, তাহলে ত জমি হাত-ছাড়া হবার সম্ভাবনা নেই। যদি যায় ত অল্প টাকার উপর দিয়েই যাবে, ভাবল অমিয়।

* * *

ক্লোরোফরমের ঘোর তখনও কাটেনি। কি চাই বলুন চট করে? ছেলে, না মেয়ে?

আচ্ছন্নের মত তাকাল সুলতা, ট্রের উপর সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে নার্স। সদ্যঃস্নাত শিশু, কাঁদছে, কোঁকড়া চুল, নীল চোখ, দুধ আর গোলাপের রং, হৃৎপিণ্ডে আবার দোলা লাগল তার, তবু চোখ ফিরিয়ে নিল সে, এখন থেকেই মন শক্ত করবে সে।

মেয়ে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল? জিজ্ঞেস করল নার্স।

সুলতা মুখ ফিরিয়ে নিল।

একটু সুস্থ হয়েই মন্দিরের জন্তে অমিয়কে ঘোরতর তাগিদ লাগাল সে; আর কয়েকটা মাস যাক না। বলল অমিয়।

না, নন্দর নামে সংকল্প করেছি আমি, ওর আত্মার সদ্গতি হবে না!

আত্মার সদগতি? অমিয় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল; আত্মায় বিশ্বাস কর তুমি?

বাঃ, আত্মায় বিশ্বাস করব না? মানুষ মরে গেলেই সব ফুরিয়ে গেল না কি? এ পৃথিবীতে তুমি এলে কোথা থেকে? আমি এলাম কোথা থেকে?

এর উত্তর কি?

জমি কেনা হয়ে গেল।

আর অনুরাধার জন্তে এল আয়া।

সাড়ে চার মাসের মধ্যে মন্দির তৈরী হয়ে গেল, শুভদিন দেখে অনেক সমারোহ করে গোবিন্দ স্থাপন করা হল। সকালে পূজা, ভোগ, রাত্রে আরতি, প্রসাদ বিতরণ। সংকীর্তন, কাঙ্গালী ভোজন। এতদিন পরে সত্যিকারের কাজ খুঁজে পেল সুলতা। সন্ধ্যার পর যখন শ্বেতপাথরের মেঝেয় চোখ বুজে বসে থাকে সুলতা, ধূপ জ্বলতে থাকে, ঘণ্টা বাজে, আর ফুলের সুরভি; মনটা তার উধাও হয়ে যায়, ধূপের ধোঁয়ার মত যেন মিলিয়ে যায় শূন্তে!

হয়ত কোনো দিন অনুরাধা কাঁদে, কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত করে না সুলতা, সাতটার সময় তৈরী থাকে গাড়ি, একেবারে দরজা খুলে অপেক্ষা করে, তারপর এক দৌড়ে মন্দির।

পাড়ার মেয়েদের ভিড় জমতে লাগল, কৌতূহল আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না তাদের, এত অল্প বয়সে এত ভক্তি? চাপা গুঞ্জন সুলতার কানে এসে পৌছায়, প্রশংসা আর স্তুতির গুঞ্জন! সুলতা চোখ বুজে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে থাকে; গোবিন্দের ধ্যান করে।

কিন্তু গোবিন্দ কোথায়? গোবিন্দ কত দূরে? সংসারের অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি আলোচনা তার কানে পৌছায়; এদের কি একটুকু ভক্তি নেই? ঠাকুরের কাছে এসেও এরা সংসারের অতি সাধারণ কথা ভুলতে পারে না?

গোবিন্দের মূর্তি মনে আনবার চেষ্টা করে সে, গোবিন্দই সার, গোবিন্দই মুক্তি।

কিন্তু কৈ? ভক্তি কোথায়? কেন সে হাজার চেষ্টা করেও ঠাকুরকে হৃদয়ে আনতে পারে না? সারা অন্তর দিয়ে ভাবতে পারে না ঠাকুরের কথা? চোখ বুজলেই কেন মনের মধ্যে ভেসে আসে দুনিয়ার অর্থহীন সব তুচ্ছ চিন্তা?

এক সন্ধ্যাবেলায় একটি মহিলা এল, সিঁড়ির নিচে চটি খুলে উঠে এল উপরে। অনেক সময় নিয়ে প্রণাম করে বসল একটু দূরে, চোখ বুজল। পরিণত-যৌবনা মহিলাটির দিকে কয়েক বার তাকাল সুলতা; সীঁথিতে সিঁদুর, পরনে লালপাড় শাড়ি, কিছু গয়না; সুন্দর কপালটি, যত্ন করে আঁচড়ানো চুল; প্রথম যৌবনে সত্যিকারের সুন্দরী ছিল, মনে হল সুলতার। সেই যে চোখ বুজে বসে রইল, চোখ খুলল না একটি বারও, একটু নড়ল না পর্যন্ত। মাথার আঁচল খুলে পড়েছে ঘাড়ের উপর, মোটা বিনুণীর উঁচু খোঁপা।

একে একে সবাই যখন চলে গেল—হঠাৎ যেন তার ধ্যান ভাঙ্গল, চোখ খুলে তাকাল সে, উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোয় সুলতা দেখল ওর মুখখানি আশ্চর্য প্রশান্ত! গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল, ধীর মন্থর পায়ে সিঁড়ির ধাপ ক'টা পার হয়ে চটিতে পা ঢুকাল, তার পর রাস্তায় এসে পড়ল।

গাড়ি করে যাবার সময় সুলতা দেখল, মহিলাটি তখনও হাঁটছে। গাড়ি থামাতে বলল সে, মুখ বার করে জিজ্ঞেস করল, আসুন না, আপনাকে পৌছে দিই।

অতি স্নিগ্ধ শান্ত হাসল সে, না, না, আমি ঐ সামনের গলিতেই থাকি, ধন্যবাদ!

সুলতা গাড়ি চালাবার আদেশ দিল।

আবার আর একদিন এল সে। সুলতা লক্ষ্য করেছে, সপ্তায় দু'দিন আসে ও। কারুর সংগেই ওর আলাপ নেই, আলাপ করবার কোনো চেষ্টাও করে না। এমন কি, এমন যে সুন্দর একটি মন্দির তার সম্বন্ধেও কোনো ঔৎসুক্য দেখা যায়নি ওর! তাই বা হবে কেন? ভাবল সুলতা, এমন অন্তর দিয়ে দেবতার ধ্যান যে করতে পারে— মন্দিরের কাঠামো বা কারুকার্য নিয়ে কি তার দরকার?

একটু দাঁড়ান। সেদিন যাবার সময় সুলতা তাকে থামাল।

মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল সে, হাসল।

অনেক দিন ভাবছিলাম আপনার সংগে আলাপ করব, বলল সুলতা। হয়ত আপনি কিছু ভাববেন।

ভাববার কি আছে? সুখী হলাম; আপনি কোথায় থাকেন?

ভবানীপুর, আসুন না। পাঁচ মিনিট বসবেন, আপত্তি আছে?

না, আপত্তি কিসের?

উপরে এসে ওরা বসল পাশাপাশি।

পুরোহিত মন্দিরের দরজায় তালা লাগিয়ে বলল, মা, আমি যাচ্ছি।

আসুন, ড্রাইভারকে বলুন, পৌছে দেবে।

পুরোহিত চলে গেল।

দেরি হয়ে যাচ্ছে না ত ? সুলতা জিজ্ঞেস করল, ছেলেমেয়েরা সব বড় হয়ে গেছে বুঝি ?

তার জন্যে ভাবনা নেই কিছু, আপনার ক'টি ?

একটি মেয়ে, সাত মাস হল ; একটি ছেলে ছিল এর আগে ; তারই নামে এই মন্দির।

ও, এ মন্দির বুঝি আপনি তৈরী করিয়েছেন ?

যতখানি আশ্চর্য হবে ভেবেছিল সুলতা তার কিছুই নয়, এমন কৌতূহলশূন্য স্ত্রীলোক তার চোখে পড়েনি কখন।

আপনার স্বামী কি করেন ?

ব্যারিষ্টার। আড়চোখে তাকাল সুলতা। না, কোনো ভাবান্তর নেই ; প্রতিষ্ঠা, সম্মান, যশ—কোনো কিছুর উপর আগ্রহ নেই ওর, সত্যিকারের সাধিকা যারা—তারা ত এমনি নিরাসক্ত, এমনি নির্লিপ্তই হয়।

একটু চুপচাপ, মন্দিরের পিছনে কিছু গাছপালা, পাতায় অস্পষ্ট মর্মর, ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে।

গাড়ি ফেরৎ এল।

রান্নার লোক আছে বুঝি ? কিন্তু এমন মামুলি প্রশ্ন সুলতা করতে চায়নি।

রান্নার লোক ? আপনার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে। আমার ত পাঁচ মিনিটের পথ।

না, কি আর এমন রাত ! সাড়ে আটটা হবে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

করুন।

আপনি ঠিক মন দিয়ে ডাকতে পারেন ঠাকুরকে ? সুলতা আর একটু কাছে সরে বসল।

চেষ্টা করি।

রাস্তায় ফস করে দেশলাইএর কাঠি জ্বলে উঠল। ড্রাইভার বিড়ি কিংবা সিগারেট ধরালো বুঝি।

তা ছাড়া—বুঝলেন—ও আবার বলল, আমার সত্যিকারের কোনো বন্ধন নেই, তাই—

আপনার স্বামী ?

কৃষ্ণই আমার স্বামী। চোখ বুঝলেই সেই পরম জ্যোতির্ময়মূর্তি ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে, চারি দিকে আশ্চর্য আলো।

সুলতা ওকে স্পর্শ করল, ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল, আমি কেন পারি না ?

পারবেন, নিশ্চয়ই পারবেন।

বড় রাস্তা থেকে ট্রামের ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। চলুন, রাত। সুলতার বাহু আকর্ষণ করল সে।

গাড়ির কাছে সুলতা জিজ্ঞেস করল, আপনার ঠাকুরঘরে আমায় নে যাবেন একদিন ?

আমার ঠাকুরঘর ? অন্ধকারে মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল।

ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

উঠুন, রাত্রি হয়ে গেল।

আপনি আসুন না ? আপনাকে গলির মোড়ে নামিয়ে দিই।

এটুকু ত পথ, তা ছাড়া ষ্টেশনারী দোকানে আমার কয়েকটা কেনবার আছে, আপনি আসুন।

সুলতা উঠল গাড়িতে।

যেতে যেতে সুলতার মনে হল, ওর পুজোর ঘর আছে নিশ্চয়ই, একদিন দেখতে হবে, একদিন সে যাবে।

পরে একদিন মন্দির থেকে যাবার সময় ও জিজ্ঞেস করল, আপনি এখন যাবেন না ?

আমি আর একটু বসি। বলল সুলতা।

কিন্তু সে যখন রাস্তায় এল—সুলতাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে সে-ও এল রাস্তায়, ড্রাইভারকে বলল, আপনি অপেক্ষা করুন এখানে, আমি আসছি।

দূর থেকে সুলতা দেখতে পেল মহিলাটি একটি ষ্টেশনারী দোকানে ঢুকল, সুলতা দাঁড়াল একটি রিক্সার পিছনে।

একটা প্যাকেট নিয়ে ও রাস্তায় এল, রাস্তাটা পার হয়ে একটা সরু প্রায় অন্ধকার গলিতে ঢুকল। একটি মাত্র গ্যাসলাইট জ্বলছে গলির প্রান্তে। সুলতাও রাস্তা পার হল। ডান দিকে ছোট একতলা বাড়ি, পাশ দিয়ে ঢুকল মেয়েটি। সুলতা পা চালিয়ে এল। আড়ালে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে তাকিয়ে রইল সে। বাড়ি ঢুকবার রাস্তা ; প্রায় আট ফুট উঁচু দেওয়াল বাড়িটার শেষ পর্যন্ত। প্রথম দরজাটা অতিক্রম করে দ্বিতীয় দরজার সামনে দাঁড়াল সে। একটুখানি সময় ; অন্ধকারে কি করছে ঠিক বুঝতে পারল না সুলতা। হয়ত দরজার তালা খুলছে, কিংবা অপেক্ষা করছে কেউ দরজা খুলে দেবে। ভিতরে ঢুকল সে, বাতি জ্বালল, আলো এসে পড়ল বাইরের গলিতে, প্রায় আট ফুট লম্বা উঁচু দেওয়ালে।

আজ নয়, আর এক দিন আসবে সুলতা। একেবারে অবাক করে দেবে ওকে ; ওর পুজোর ঘরে গিয়ে বসবে, অনেকক্ষণ গল্প করবে।

যাবার আগে মেয়েটা কান্না জুড়ে দিয়েছে। সুলতা ভীষণ বিরক্ত হল। আয়া নিয়ে এল তার কাছে ; সুলতা ধমক দিল, এতগুলো টাকা মাইনে নাও, একটা বাচ্চার কান্না থামাতে পার না তুমি ?

গাড়ি যখন চলতে সুরু করেছে—তখনও মেয়েটা কাঁদছে।

মন দিয়ে আরতি দেখতে পারল না সে, পাঁচ মিনিট বসতে পারল না চোখ বুজে। আটটার সময় মন্দির খালি হয়ে গেলে সুলতা উঠে পড়ল। গাড়িতে উঠে বলল, ট্রাম-লাইনের কাছে থামবেন।

গাড়ি মোড় বাঁকবার আগেই সুলতা বলল, এই গাছটার কাছেই রাখুন, আমি একটু নামব।

গাড়ি থামলে সুলতা নামল—একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে এগিয়ে গেল সুলতা।

বাড়িটার জানালাগুলি বন্ধ, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে পর্দা দেখা যাচ্ছে, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। অন্ধকার গলিটায় ঢুকবার আগে কেমন যেন ভয় পেল সে; কত দূরে তার বাড়ি, রাস্তার কোন্ প্রান্তে অপেক্ষা করছে হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার অমিয় গাঙ্গুলীর গাড়ি, আর এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পল্লীর অচেনা এই বাড়ি! কিন্তু সুলতা ভাবল, ভয়টা কিসের? ভয় পাবার কি আছে?

গলির মধ্যে ঢুকল সুলতা, সরু পথ, ডান দিকে বাড়ি, বাঁ দিকে উঁচু দেওয়াল। প্রথম দরজাটা পার হয়ে দ্বিতীয় দরজাটার সামনে সে থামল, জানালার খড়খড়িও বন্ধ। দরজাটা ঠেলে দেখল, বন্ধ। কড়া নাড়বে কি না ভাবছিল; গলির দরজায় লোকের ছায়া দেখে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল সে, হৃৎপিণ্ডটা লাফাতে আরম্ভ করল।

একটি লোক ঢুকল গলিতে, বিরাট আকৃতির একটি লোক কিংবা হয়ত অন্ধকারেই অত বড় মনে হচ্ছে! আস্তে আস্তে এগিয়ে এল লোকটি; ও কি টলছে? ঠিক মত পা পড়ছে না ওর। প্রথম দরজার কাছে এক মুহূর্ত থেমে দরজায় জোরে ধাক্কা মারল লোকটি। সুলতার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল সেই সঙ্গে।

ভিতর থেকে মেয়েলী গলার সাড়া এল, লোক আছে।

অস্পষ্ট, জড়ানো গলায় লোকটা কি যেন বলে উঠল, সুলতা বুঝতে পারল না ঠিক। লোকটি এগিয়ে এল দ্বিতীয় দরজার দিকে। এক মুহূর্তের জন্যে সুলতার ইচ্ছে হল পিছন দিকে দৌড় মারে, সাহস হল না, ঘোরতর অন্ধকার!

লোকটি তার একেবারে কাছে এসে পড়েছে। মাঝখানে এক হাতেরও ব্যবধান নেই; সত্যি, লোকটা রীতিমত লম্বা-চওড়া; আর সুলতার নাকে সেই উৎকট গন্ধটা এসে লাগল—যে গন্ধটা অতি মৃদু পরিমাণে সে মাঝে মাঝে পেয়েছে অমিয়র মুখ থেকে। লোকটা দেখতে পেল তাকে, জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, কে? ললিতা নাকি? হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ধরে ফেলল, তারপর ধরল হাত; মুখটা আরও এগিয়ে এনে ভাল করে দেখল সুলতাকে, বলল, আরে! এ যে মধুবালা! অবাক করলে গোবিন্দ! দুটি বিশাল হাতে সুলতাকে সে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে।

নিজেকে মুক্ত করবার বৃথাই চেষ্টা করল সে। উগ্র গন্ধের তাড়নায় নিশ্বাসটা তার বন্ধ হয়ে এল। ডেলিভারী রুম থেকে ট্রে করে তাকে যখন নিয়ে আসছিল তার কেবিনে—ঠিক তেমনি হতে লাগল তার। চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তা —তখনও তার মনে ছিল ব্যারিষ্টার অমিয় গাঙ্গুলীর স্ত্রী সে, কো তার মন্দির, কোথায় গাড়ি, অচেনা গলির অন্ধকারে এক মাতা বুকের মধ্যে চীৎকার করছে সুলতা গাঙ্গুলী! গলায় শব্দটা কেউ থাবা মেরে বন্ধ করে দিল, হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে কানের মধ্যে।

বাহুতে যেখানে লোকটা জন্তুর থাবার মত তাকে আঁকড়ে ধরে —সেখানের পেশীগুলি অবশ হয়ে এসেছে। অন্য হাতে জামা ধরে টা মারল লোকটা, জামাটা সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গেল; ঠাণ্ডা ধারালো ছুরি আঁচড়ে তার বুকের চামড়া যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।

তবু সুলতা বলতে পারল, ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি।

লোকটা বিকট শব্দে হেসে উঠল, দরজায় কয়েকটা লাথি মে বলল, ললিতা সখি, দরজাটা একবার খোল না! দেখ ন মধুবালাকে পেয়েছি।

দরজা খোলার শব্দ হল। মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে একটা লোক প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ছেড়ে দিন, আপনাকে সব গয়না খুলে দিচ্ছি।

এক টানে লোকটা তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে, বলল, দে ললিতা! চেয়ে দেখ!

দেবতার ছবির উদ্দেশে দেওয়ালের দিকে তাকাল সুলতা। ব করে তোলা সংগমের ছবি চার দিকে, চোখ নামাল সে। দেখল সে মেয়েটিই, পা ঝুলিয়ে বসেছে খাটের উপর। তেমনি উঁচু করে বাঁধা খোঁপা। পরনে শুধু মাত্র একটি সায়া, কোমর থেকে কোনো রকমে ঝুলছে, দড়িটাও বাঁধা নেই। আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে, পাশের টিপয়ের উপর খালি বোতল, গ্লাসে অর্ধেক লাল পানীয়। তাকাল সুলতার দিকে, ভাল করে দেখল, বলল, ছেড়ে দাও মন্মথ!

লোকটা সুলতার হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল, সেও ভাল করে দেখল সুলতাকে, পরিষ্কার স্বরে বলল, মাপ করবেন।

সুলতা ঘুরে দাঁড়াল, চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ল গলিতে, দাঁড়াল। শাড়ির প্রান্তটা ক্ষিপ্র হাতে গায়ে জড়িয়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

গাড়িতে হাত রেখে হাঁফাতে লাগল সে; ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে শরীরটাকে সে প্রায় ছুড়ে দিল আসনের উপর, নিচু হয়ে মুখ ঢাকল দু' হাতের মধ্যে।

গাড়ি ছুটল।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় রাস্তা থেকে মেয়েটার কান্না শুনেছিল সুলতা, হঠাৎ শুধু সে কান্নার শব্দটাই তার কানে এসে লাগল বার বার; সোজা হয়ে বসল সে।

মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদ্গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাশির মূলকারণ দূর করুন
OF IMITATION
SIROLIN
'ROCHE'
for COUGHS COLDS and all irritable and inflamed conditions of the Chest and Respiratory Tract
VOLTAS
সিরোলিন খান
নিরাপদ পারিবারিক ওষুধ

মন দিয়ে আরতি দেখতে পারল না সে, পাঁচ মিনিট বসতে পারল না চোখ বুজে। আটটার সময় মন্দির খালি হয়ে গেলে সুলতা উঠে পড়ল। গাড়িতে উঠে বলল, ট্রাম-লাইনের কাছে থামবেন।

গাড়ি মোড় বাঁকবার আগেই সুলতা বলল, এই গাছটার কাছেই রাখুন, আমি একটু নামব।

গাড়ি থামলে সুলতা নামল—একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে এগিয়ে গেল সুলতা।

বাড়িটার জানালাগুলি বন্ধ, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে পর্দা দেখা যাচ্ছে, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। অন্ধকার গলিটায় ঢুকবার আগে কেমন যেন ভয় পেল সে; কত দূরে তার বাড়ি, রাস্তার কোন্ প্রান্তে অপেক্ষা করছে হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার অমিয় গাঙ্গুলীর গাড়ি, আর এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পল্লীর অচেনা এই বাড়ি! কিন্তু সুলতা ভাবল, ভয়টা কিসের? ভয় পাবার কি আছে?

গলির মধ্যে ঢুকল সুলতা, সরু পথ, ডান দিকে বাড়ি, বাঁ দিকে উঁচু দেওয়াল। প্রথম দরজাটা পার হয়ে দ্বিতীয় দরজাটার সামনে সে থামল, জানালার খড়খড়িও বন্ধ। দরজাটা ঠেলে দেখল, বন্ধ। কড়া নাড়বে কি না ভাবছিল; গলির দরজায় লোকের ছায়া দেখে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল সে, হৃৎপিণ্ডটা লাফাতে আরম্ভ করল।

একটি লোক ঢুকল গলিতে, বিরাট আকৃতির একটি লোক কিংবা হয়ত অন্ধকারেই অত বড় মনে হচ্ছে! আস্তে আস্তে এগিয়ে এল লোকটি; ও কি টলছে? ঠিক মত পা পড়ছে না ওর। প্রথম দরজার কাছে এক মুহূর্ত থেমে দরজায় জোরে ধাক্কা মারল লোকটি। সুলতার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল সেই সঙ্গে।

ভিতর থেকে মেয়েলী গলার সাড়া এল, লোক আছে।

অস্পষ্ট, জড়ানো গলায় লোকটা কি যেন বলে উঠল, সুলতা বুঝতে পারল না ঠিক। লোকটি এগিয়ে এল দ্বিতীয় দরজার দিকে। এক মুহূর্তের জন্যে সুলতার ইচ্ছে হল পিছন দিকে দৌড় মারে, সাহস হল না, ঘোরতর অন্ধকার!

লোকটি তার একেবারে কাছে এসে পড়েছে। মাঝখানে এক হাতেরও ব্যবধান নেই; সত্যি, লোকটা রীতিমত লম্বা-চওড়া; আর সুলতার নাকে সেই উৎকট গন্ধটা এসে লাগল—যে গন্ধটা অতি মৃদু পরিমাণে সে মাঝে মাঝে পেয়েছে অমিয়র মুখ থেকে। লোকটা দেখতে পেল তাকে, জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, কে? ললিতা নাকি? হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ধরে ফেলল, তারপর ধরল হাত; মুখটা আরও এগিয়ে এনে ভাল করে দেখল সুলতাকে, বলল, আরে! এ যে মধুবালা! অবাক করলে গোবিন্দ! দুটি বিশাল হাতে সুলতাকে সে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে।

নিজেকে মুক্ত করবার বৃথাই চেষ্টা করল সে। উগ্র গন্ধের তাড়নায় নিশ্বাসটা তার বন্ধ হয়ে এল। ডেলিভারী রুম থেকে ষ্ট্রেচারে করে তাকে যখন নিয়ে আসছিল তার কেবিনে—ঠিক তেমনি মনে হতে লাগল তার। চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তখনও —তখনও তার মনে ছিল ব্যারিষ্টার অমিয় গাঙ্গুলীর স্ত্রী সে, কোথায় তার মন্দির, কোথায় গাড়ি, অচেনা গলির অন্ধকারে এক মাতালের বুকের মধ্যে চীৎকার করছে সুলতা গাঙ্গুলী! গলার শব্দটা কেউ যেন থাবা মেরে বন্ধ করে দিল, হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে কানের মধ্যে।

বাহুতে যেখানে লোকটা জন্তুর থাবার মত তাকে আঁকড়ে ধরেছে —সেখানের পেশীগুলি অবশ হয়ে এসেছে। অন্য হাতে জামা ধরে টান মারল লোকটা, জামাটা সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গেল; ঠাণ্ডা ধারালো ছুরির আঁচড়ে তার বুকের চামড়া যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।

তবু সুলতা বলতে পারল, ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি।

লোকটা বিকট শব্দে হেসে উঠল, দরজায় কয়েকটা লাথি মেরে বলল, ললিতা সখি, দরজাটা একবার খোল না! দেখ না, মধুবালাকে পেয়েছি।

দরজা খোলার শব্দ হল। মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে একটা লোক প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ছেড়ে দিন, আপনাকে সব গয়না খুলে দিচ্ছি।

এক টানে লোকটা তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল, বলল, দেখ, ললিতা! চেয়ে দেখ!

দেবতার ছবির উদ্দেশে দেওয়ালের দিকে তাকাল সুলতা। বড় করে তোলা সংগমের ছবি চার দিকে, চোখ নামাল সে। দেখল সেই মেয়েটিই, পা ঝুলিয়ে বসেছে খাটের উপর। তেমনি উঁচু করে বাঁধা খোঁপা। পরনে শুধু মাত্র একটি সায়া, কোমর থেকে কোনো রকমে ঝুলছে, দড়িটাও বাঁধা নেই। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে, পাশের টিপয়ের উপর খালি বোতল, গ্লাসে অর্ধেক লাল পানীয়। তাকাল সুলতার দিকে, ভাল করে দেখল, বলল, ছেড়ে দাও মন্মথ!

লোকটা সুলতার হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল, সেও ভাল করে দেখল সুলতাকে, পরিষ্কার স্বরে বলল, মাপ করবেন।

সুলতা ঘুরে দাঁড়াল, চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ল গলিতে, দাঁড়াল। শাড়ির প্রান্তটা ক্ষিপ্র হাতে গায়ে জড়িয়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

গাড়িতে হাত রেখে হাঁফাতে লাগল সে; ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে শরীরটাকে সে প্রায় ছুড়ে দিল আসনের উপর, নিচু হয়ে মুখ ঢাকল দু' হাতের মধ্যে।

গাড়ি ছুটল।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় রাস্তা থেকে মেয়েটার কান্না শুনেছিল সুলতা, হঠাৎ শুধু সে কান্নার শব্দটাই তার কানে এসে লাগল বার বার; সোজা হয়ে বসল সে।

মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদ্গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাশির মূলকারণ দূর করুন

সিরোলিন খান

নিরাপদ পারিবারিক ওষুধ

সিরোলিন কেবল যে কাশি 'থামিয়ে দেয়' তা নয়—
কাশির মূলকারণ দুষ্ট-
জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।

একমাত্র ডিষ্ট্রিবিউটার্স :—
ভলটাস লিমিটেড

V.T. 4983

কাগজ-শিল্প

বার্তাবহন, জ্ঞান-বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি নানা ভাবে অসংখ্য কাজে নিয়োজিত হয়ে বর্তমান সভ্যতার উন্নতি ও রক্ষণের জন্যে একটি দ্রব্যের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ—সে হলো কাগজ।

প্রধান উপাদান

তুলা, লিনেন, শণ, পাট, কাঠ, এস্পার্টো ঘাস, সাবাই ঘাস, বাঁশ, খড় প্রভৃতি আঁশওয়ালা উদ্ভিদ কাগজের মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চিনির কলের পরিত্যক্ত আখের ছিবড়া থেকেও কাগজ তৈরী হয়। অধিকাংশ কাগজ কাঠ থেকেই তৈরী করা হয়। ভারতবর্ষে সাবাই ঘাস ও বাঁশই কাগজ তৈরী করবার প্রধান উপাদান। আখের ছিবড়া, ন্যাকড়া, শণের পুরনো দড়ি প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়।

আঁশ নিষ্কাশন

প্রথমে কাগজের মূল উপাদান থেকে আঁশ নিষ্কাশন করতে হবে। আঁশ বের করবার প্রধানত তিনটি উপায় আছে, যথা—রাসায়নিক, যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক ও যান্ত্রিক যুগ্ম ব্যবস্থা। কোন উপাদান থেকে কি প্রকার কাগজ তৈরী হবে, তার উপরই নির্ভর করে কোন উপায় অবলম্বনে মাল প্রস্তুত করা হবে।

উদ্ভিদের আঁশের প্রধান উপকরণ হলো সেলুলোজ। সেলুলোজ জড়িয়ে আছে লিগনিন প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের সঙ্গে। রাসায়নিক প্রথায় কাগজের মূল উপাদানকে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ সহযোগে নিয়ন্ত্রিত তাপ ও চাপে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সিদ্ধ করা হয়। ফলে লিগনিন ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত দ্রব্যগুলি সেলুলোজ থেকে অনেকটা গলে যায়। সেলুলোজকে যত বিশুদ্ধ করে কাগজ তৈরী করা যাবে, কাগজ ততই ভাল এবং স্থায়ী হবে। রাসায়নিক প্রথায় ক্যালসিয়াম বাইসালফাইট, সোডিয়াম সালফাইড, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, চুণ ও সোডিয়াম কার্বনেটের মিশ্রণ, ক্লোরিণ গ্যাস প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যগুলি অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রথায় নিষ্কাশিত আঁশকে রাসায়নিক আঁশ বলে।

উদ্ভিদের মধ্যে তুলার আঁশেই সব চেয়ে বেশী সেলুলোজ থাকে। কাজেই তুলা থেকে অনায়াসে সবচেয়ে বিশুদ্ধ সেলুলোজ পাওয়া যায়। তুলা থেকেই সবচেয়ে ভাল কাগজ হয়।

যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক ও যান্ত্রিক যুগ্ম ব্যবস্থায় প্রধানত কাঠ নিষ্কাশণ করা হয়। যান্ত্রিক উপায়ে গোটা কাঠকে যন্ত্রের সাহায্যে পেষণ ক'রে আঁশময় করা হয়। কাঠের বড় বড় খণ্ডকে ঘূর্ণায়মান পাথরের গায়ে চেপে রাখা হয়। ঐ উপায়ে পাথর কাঠ থেকে আঁশ বের করতে থাকে। পাথরের উপর জলের ধারা দেওয়া হয়। জলের ধারার সঙ্গে আঁশগুলি বেরিয়ে আসে। লিগনিন প্রভৃতি অবাঞ্ছিত দ্রব্যাদি আঁশের সঙ্গেই থেকে যায়। এই উপায়ে প্রস্তুত আঁশকে যান্ত্রিক আঁশ বলে।

রাসায়নিক প্রথার তুলনায় যান্ত্রিক প্রথায় অন্যান্য মাল-মসলা ও যন্ত্রপাতি অনেক কম দরকার হয় এবং আঁশও প্রায় দ্বিগুণ পাওয়া যায়। কারণ, এই প্রথায় প্রস্তুত মালে সেলুলোজের সঙ্গে কাঠের অন্যান্য ভেজালগুলি সবই থেকে যায়। কাজেই এই মালে তৈরী কাগজ খুব সস্তা হয়, কিন্তু জোর কম হয়। কিছুদিন পরেই কাগজ হলদে এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়। কাজেই ওরূপ কাগজের ব্যবহার খুব সীমাবদ্ধ, কেবল সেই সব কাজের জন্যে ব্যবহার করা হয়, যেগুলি অনেক দিন রাখবার দরকার হয় না; যেমন—খবরের কাগজ, সস্তার বই ও পত্রিকা, কাগজের বোর্ড প্রভৃতি।

রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উভয় উপায় প্রয়োগে প্রথমে কাঠকে সোডিয়াম সালফাইডের ন্যায় রাসায়নিক দ্রব্যে খানিকটা নরম ক'রে তারপর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আঁশ বার করা হয়। ইহা বিশুদ্ধ যান্ত্রিক আঁশ। এই প্রথায় প্রস্তুত কাগজ পরিমাণের অনুপাতে এবং গুণাবলীতে রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক প্রথায় উৎপন্ন উভয় মালের মাঝামাঝি।

বিরঞ্জন

উদ্ভিদ্ থেকে যে আঁশ নিষ্কাশণ করা হয়, তাতে ভেজাল সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় না বলেই কাগজ রঙীন হয়। এরূপ আঁশ খুব ভাল সাদা কাগজ তৈরী করবার পক্ষে অনুপযোগী। বিরঞ্জন প্রক্রিয়ায় এরূপ আঁশ বিশুদ্ধ করে সাদা করা হয়। বিরঞ্জন প্রথার উদ্দেশ্যই হলো পরিমিত ব্যয়ে এরূপ ভাবে স্থায়ী সাদা রং করা—যাতে আঁশের ভৌত এবং রাসায়নিক গুণাবলীর উপর বিশেষ অনিষ্টকর ক্রিয়া না হয়। ক্লোরিন এবং হাইপোক্লোরাইটই বিরঞ্জন করবার প্রধান সামগ্রী। পেরক্সাইড, ক্লোরিন-ডাইঅক্সাইড এবং ক্লোরাইটও বিশেষ অবস্থায় বিরঞ্জক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বিরঞ্জন প্রথায় প্রধানত রঙীন দ্রব্যকে বর্ণহীন ও দ্রবণীয় ক'রে অপসারিত করা হয়। বিরঞ্জন এরূপ অবস্থায় করতে হবে, যেন অতিরিক্ত বিরঞ্জক দ্রব্যের জন্যে সেলুলোজ বিকৃত না হয়।

অধিকাংশ কাগজ তৈরী করবার জন্যে আঁশ একেবারে বিশুদ্ধ করতে হয় না, খানিকটা ময়লা থেকেই যায়। কিন্তু রেয়ন, সেলুলোজ

অ্যাসিটেট প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করতে হলে খাঁটি সেলুলোজ দরকার হয়, তাতে বিশেষ ভেজাল থাকলে চলে না।

মণ্ড তৈরী

বিরঞ্জনের পরেও আঁশগুলি কাগজ তৈরীর উপযোগী হয় না। এরূপ মাল দিয়ে কাগজ তৈরী করা সম্ভব হলেও কাগজ শক্ত এবং মসৃণ হবে না। সব জায়গায় মাল সমান না হওয়ায় এবং কাগজের অনেক জায়গায় আঁশের ডেলা থাকায় সেগুলি দাগের মত দেখাবে। কারণ তখনও আঁশের সবগুলি গোছা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি। এরূপ কাগজ বিশেষ কোন কাজে আসে না। কাজেই আঁশগুলিকে যান্ত্রিক উপায়ে কাগজ তৈরীর উপযোগী করে নিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে পেষণ করা বলে। কাগজ তৈরী করবার জন্যে এই প্রক্রিয়া বিশেষ দরকারী। বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ তৈরী করবার জন্যে পেষণের প্রক্রিয়াও বিভিন্ন রকমের হয়। পেষণের তারতম্যের উপরেই কাগজের গুণাবলী নির্ভর করে। পেষণের পর আঁশগুলি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায়। এরূপ মণ্ড অনেকটা জলে মিশিয়ে দিলে প্রত্যেকটি আঁশ আলাদা হয়ে যায় এবং কাগজ তৈরী করবার সময় সর্বত্র সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পেষণ-যন্ত্রে আঁশ কেটে নমনীয় করা হয়। শক্ত আঁশের চেয়ে নমনীয় আঁশই পরস্পরকে অধিকতর আবদ্ধ করে রাখে এবং তাতে কাগজের পাত ভাল হয়। পেষণযন্ত্র আঁশগুলিকে থেতলো ক'রে ছিঁড়ে, পিষে দেয়। আঁশের গা দিয়ে কেঁকড়ি বেরিয়ে যায়। এই কেঁকড়িগুলি পরস্পরকে সংবদ্ধ করে বলেই কাগজ দৃঢ় হয়। আঁশ পিষে যত কেঁকড়ি বের করা যাবে, কাগজ তৈরীতে আঁশগুলির পরস্পারের বুনানি তত ভাল হবে এবং কাগজও দৃঢ় হবে। পেষণ করবার সময় আঁশগুলি জল শোষণ করে।

আঁশ কতটা পেষণ করা হয়েছে এবং তাতে কতটা জল খাওয়ানো হয়েছে, তার উপরই নির্ভর করবে এরূপ মণ্ডে তৈরী কাগজের গুণাবলী কিরূপ হবে। যদি আঁশ কেটে লম্বায় ছোট করা হয়, কিন্তু রগড়ানো, থেতলানো কিংবা বিশেষ ভাবে জল খাওয়ানো না হয়, তাহলে এরূপ মণ্ডে তৈরী কাগজ শক্ত এবং মসৃণ হবে না। এ সব কাগজ পরিস্রাবণ, শোষণ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। অপর পক্ষে আঁশকে রগড়ে, থেঁতলে অনেক সময় ধ'রে পেষণ করা যেতে পারে, যাতে আঁশ থেকে অনেক কেঁকড়ি বের হয় এবং আঁশ অনেকটা জল শোষণ ক'রে নেয়। এরূপ মণ্ডে তৈরী কাগজ খুব শক্ত ও মসৃণ হবে। ব্যাঙ্কের নোট, বণ্ড, লেজার, দরকারী দলিল, যা অনেক দিন স্থায়ী হবে এবং চিত্রাঙ্কনের জন্যে এ সব কাগজ ব্যবহৃত হয়।

লেখবার ও ছাপার সাধারণ কাগজ তৈরী করতে হলে এই উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় পেষণ করতে হয়।

পেষণ-যন্ত্রে মণ্ডের সঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি দ্রব্য যোগ করা হয়; যেমন—ফট্‌কিরি, রজনের সাবান, ষ্টার্চ, শিরিষ, সোডিয়াম সিলিকেট, চীনামাটি, রং প্রভৃতি।

জল, কালি প্রভৃতি তরল পদার্থ শোষণ করা প্রতিরোধ করবার জন্যে কাগজে কলপ দেওয়া হয়। শোষক কাগজে কোন কলপ দেওয়া হয় না; কাজেই এরূপ কাগজে সহজেই কালি শোষণ করতে পারে। ব্যবহারের অবস্থা অনুসারে অন্যান্য কাগজে কলপের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ছাপার সময় যাতে সহজেই শোষণ করতে পারে, সেজন্যে লেখবার চেয়ে ছাপার কাগজে কম কলপ দেওয়া হয়। আঁকবার, নক্সা করবার, দেয়ালে লাগাবার, মলাট এবং ঠোঙা করবার কাগজে বেশী কলপ দিতে হয়, যাতে কাগজ সহজেই আর্দ্র হয়ে নরম না হয়।

কেজিন মিশ্রিত রজনের সাবান, শিরিষ, মোমের অবদ্রব প্রভৃতি কলপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবস্থা বিশেষে ষ্টার্চ সোডিয়াম সিলিকেট প্রভৃতি যোগ করলে কলপের সাহায্য করে। সাধারণতঃ রজনের কলপ পেষণযন্ত্রে যোগ করা হয়। কাগজের বাইরে মাখানোর জন্যে শিরিষ কিংবা ষ্টার্চ ব্যবহৃত হয়।

পেষণযন্ত্রে কলপের সঙ্গে ফট্‌কিরি মেশাতে হয়, তবেই কলপ থেকে ঠিক ফল পাওয়া যায়। ফট্‌কিরি না মেশালে কাগজ তৈরী করবার সময় পাত থেকে কলপ ধোলাই হয়ে যায়, কলপের কোন গুণই পাওয়া যায় না। কাজেই কলপ দেবার সময় ফট্‌কিরি খুবই দরকারী।

কয়েকটি খনিজ পদার্থ পেষণযন্ত্রে মণ্ডের সঙ্গে যোগ করা হয়; যেমন চীনামাটি, ট্যাল্‌ক্, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, টিটানিয়াম ডাইঅক্সাইড, ক্যালসিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফাইড প্রভৃতি। এই পদার্থগুলি আঁশের রন্ধ্র ভরাট ক'রে কাগজের ওজন বাড়ায়, কাগজ নমনীয় করে, ভৌত ও দৃষ্টি সম্বন্ধীয় কতকগুলি গুণের উন্নতি করে এবং অস্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। এদের পূরক বলে। পূরক থাকে বলেই ইস্ত্রি করবার পর কাগজের পাতের মসৃণতা, মুদ্রাঙ্কনের কার্যকারিতা ও দেখবার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আঁশের চেয়ে খনিজ পদার্থের কণাগুলি ছাপার কালির তরল পদার্থ সহজেই শোষণ করে, কাজেই মুদ্রণের কার্যকারিতার উন্নতি হয়।

বিশেষ উদ্দেশ্যেও পূরক দেওয়া হয়। যেমন, সিগারেটের কাগজে ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে দহন নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং বিদ্যুৎ-পরিবাহী কাগজে কার্বন যোগ করা হয় বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্যে।

পেষণ-যন্ত্রে যে মণ্ড বোঝাই করা হয়, তার রং অনুজ্জ্বল সাদা। কাজেই এই মাল দিয়ে উজ্জ্বল সাদা রঙের কাগজ তৈরী করতে হলে মালের রং শোধন করা দরকার। ময়লা কাপড় সোডা দিয়ে সিদ্ধ করবার পর নীলের জলে না ধুয়ে ইস্ত্রি করলে যেমন কাপড়ের উজ্জ্বল সাদা রং হয় না, এই প্রক্রিয়াও সেইরূপ। এজন্যে সাদা কাগজ তৈরী করতে হলেও পেষণ-যন্ত্রে মণ্ডের সঙ্গে সামান্য নীল কিংবা লাল রং যোগ করা হয়।

রঙীন কাগজ তৈরী করতে হলে রঞ্জকদ্রব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেষণ-যন্ত্রে মণ্ডের সঙ্গে যোগ করা হয়। কখন কখন তৈরী কাগজের উপরও রং লাগানো হয়।

কাগজ তৈরী

এই ভাবে প্রস্তুত মণ্ড থেকে কাগজের পাত তৈরী হয়। আঁশগুলি পরস্পারের মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পাত তৈরী না করলে কাগজ ভাল হয় না। কাচ, কৃত্রিম রেশম কিংবা অ্যাজবেষ্টসের আঁশ পরস্পারের মধ্যে সংবদ্ধ হয় না। কাজেই এই সব আঁশ দিয়ে দৃঢ় পাত প্রস্তুত করা যায় না। অপর পক্ষে, পরস্পারের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সেলুলোজ আঁশের বিশেষত্ব। সেলুলোজের আঁশ

উপযুক্তরূপে পেষণ করলে আঁশগুলির পরস্পরের বাঁধন খুব দৃঢ় হয়; কাজেই এরূপ আঁশ দিয়ে খুব শক্ত কাগজ তৈরী করা যায়।

কাগজ তৈরীর ছাঁচের জালি কলে চালানো হয় এবং বিভিন্ন যান্ত্রিক উপায়ে পাতের জল অপসারিত করে কাগজ অবিচ্ছিন্ন ভাবে একটি রীলে জড়ানো হয়। অবিচ্ছিন্ন কাগজের পাত তৈরীর এরূপ কলকে "ফোরড্রিনীয়ার কল" বলে। ফোরড্রিনীয়ার কলের প্রধান অংগ হলো ফসফর ব্রোঞ্জের মিহি তার দিয়ে বোনা একটি লম্বা জালির চাদর। জালির দুই প্রান্ত জোড়ালাগানো—একটি লম্বা সুতীর চাদরের দুই দিকে শেলাই করলে যেরূপ হয়। জালিটি অনুভূমিক ভাবে বিছিয়ে আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত কয়েকটি রোলারের (টেবল রোলের) উপর একটি বেল্টের ন্যায় ঘোরানো হয়।

জালির উপরে সরবরাহ করবার আগে মণ্ড মোটা এবং মিহি ছাঁকনির ভিতর দিয়ে পরপর ছাঁকতে হয়, যাতে মণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে কোন ডেলা কিংবা ভেজাল এড়িয়ে না যায়। তারপর অনেক জল দিয়ে মণ্ড পাতলা করতে হয়, যাতে আঁশগুলি উত্তমরূপে বিক্ষিপ্ত এবং অবলম্বিত থাকে। এরূপ তরল মণ্ডে শতকরা প্রায় এক ভাগ আঁশ, পূরক প্রভৃতি নিরেট বস্তু এবং অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগই জল থাকে।

চলন্ত জালির উপর মণ্ড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জালির উপরে ছড়িয়ে পড়ে। তরল মণ্ডের জল জালির ছিদ্র দিয়ে ঝরে পড়ে এবং পাত তৈরী হতে থাকে। দুটি চতুষ্কোণ রবারের বেল্ট জালির দু' পাশে চেপে থেকে পুলির উপর ঘোরে। এ জন্যে মণ্ড জালির দু' পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। এদের নিয়ন্ত্রণ ক'রে ঠিক করা হয়—কাগজ কতটা চওড়া হবে।

জালি একাধিক সাক্‌শন বক্সের উপর দিয়ে যাবার সময় বাক্সগুলি মণ্ড থেকে অনেক জল টেনে নেয়। দুটো সাক্‌শন বক্সের মাঝখানে, যেখানে পাত থেকে অনেকটা জল অপসারিত করা হয়েছে, খুব কম চাপ দিয়ে একটি রোল ঘুরতে থাকে। একে ড্যাণ্ডি রোল বলে। ড্যাণ্ডি রোল পাতের অসমান আঁশগুলিকে চাপ দিয়ে সমান ক'রে দেয় এবং দরকার মত পাতের উপর কোন নক্সার ছাপ দেয়। তার দিয়ে নক্সা তৈরী করে রোলের জালির উপর ঝালা হয়। রোল ঘোরবার সময় ভিজা পাতের উপর নক্সার ছাপ দিতে থাকে। একে বলে জলছাপ।

এর পর কুচ-রোল এবং একাধিক প্রস্থ প্রেসরোলের ভিতর দিয়ে চালিয়ে ভিজা পাত থেকে যতটা সম্ভব আরও জল দূরীভূত করা হয়। এখানে ভিজা পাতকে পশমের কম্বলের উপর দিয়ে চালানো হয়, পাতকে অবলম্বন দেবার জন্যে যাতে ছিঁড়ে না যায় এবং পাত থেকে আরও জল শোষণ করবার জন্যে।

চাপ প্রক্রিয়ার পর ভিজা পাতকে যথেষ্ট তাপ দিয়ে গরম করতে হয়, যাতে পাতের জল বাষ্প হয়ে উবে যায়। কতকগুলি ঘূর্ণায়মান পালিশ-করা লোহার সিলিণ্ডারের ভিতর ষ্টীম প্রবেশ করিয়ে উপরিভাগ উত্তপ্ত করা হয়। ভিজা পাত কম্বলের সঙ্গে সিলিণ্ডারগুলির গা বেয়ে চলবার সময় কম্বলভিজা পাতকে উত্তপ্ত সিলিণ্ডারগুলির গায়ে চাপ দিতে থাকে। এই উপায়ে পাতের জল বাষ্প হয়ে উবে যায় এবং পাত শুকিয়ে যায়।

পাত শুকানোর পর দুই অথবা তিন প্রস্থ ভারী লোহার রোলারের ভিতর দিয়ে অধিক চাপে চালিয়ে কাগজ ইস্ত্রি করা হয়। এক প্রস্থে প্রায় ৩-১০টি রোলার পর পর খাড়া থাকে। এই রোলারগুলিকে ক্যালেণ্ডার বলে। ইস্ত্রির পর কাগজ আরও পাতলা, ঘন, মসৃণ এবং চকচকে হয়। পূরক, বিশেষতঃ চীনামাটি, মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়। ইস্ত্রি করবার সময় কাগজ খানিকটা আর্দ্র হলে পরে দেখতে আরও ভাল হয়।

তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে কাগজের পাত একটি রীলে জড়ানো হতে থাকে। যথেষ্ট কাগজ জড়ানো হলে রীলটি সরিয়ে কাটাই করবার যন্ত্রে বসানো হয় এবং মাপমত পাত কাটা হয়।

হাতে-তৈরী কাগজ

কাগজ তৈরী করবার ছোট ছাঁচ হাত দিয়ে পাতলা মণ্ডে ডুবিয়ে ছোট ছোট পৃথক কাগজের পাত প্রস্তুত করা হয়। সেজন্যে এ প্রথায় উৎপন্ন কাগজকে হাতে-তৈরী কাগজ বলে। পাতগুলি ঝুলিয়ে রেখে আস্তে আস্তে শুকানো হয়। পরে শিরিষ-সিদ্ধ-করা জলে ডুবিয়ে কলপ দেওয়া হয়। কলপমাখানো পাতগুলি থাক ক'রে একদিন রাখা হয়। তারপর আলাদা ক'রে শুকিয়ে যন্ত্রে পালিশ করা হয়।

হাতে-তৈরী কাগজের বেশী দাম হলেও চাহিদা আছে। বিয়ে এবং অন্যান্য উৎসবে সৌখীনতার জন্যে এই শ্রেণীর কাগজ ব্যবহৃত হয়। চিত্রকর কিংবা নক্সানবীশ এক পাত কাগজের উপর অনেক শ্রম ও সময় ক্ষেপণ করে। কাজেই এসব ক্ষেত্রে খুব উচ্চ শ্রেণীর কাগজই তাদের দরকার। ব্যাঙ্কের নোট, লেজার ও হিসাবের খাতা, রাসায়নিক বিশ্লেষণে পরিস্রাবণ, দলিল, উইল, সনদ, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রভৃতির জন্যেও এই শ্রেণীর কাগজ ব্যবহৃত হয়।

কাগজের গুণ

বিভিন্ন কাজে কাগজ নিয়োগ ক'রে কাগজ ব্যবহারের সীমা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিশেষ কাজের উপযোগী বিশেষ কাগজ উৎপাদন করা হচ্ছে। বর্তমানে যে কোন কাজের জন্যে বিশেষ-গুণ-সম্পন্ন কাগজ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বিবিধ উপাদান থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নানাপ্রকার কাগজ তৈরী করা হচ্ছে। যান্ত্রিক আঁশে তৈরী খুব সস্তা কাগজ থেকে আরম্ভ ক'রে সম্পূর্ণরূপে ন্যাকড়ার আঁশে প্রস্তুত হাতে-তৈরী বহুমূল্য কাগজ পর্যন্ত নানা মূল্যের অসংখ্য প্রকার কাগজ মানুষের সব রকম চাহিদাই মেটাতে পারে। কোন কাগজ পাতলা, কোন কাগজ মোটা; কোন কাগজ স্বচ্ছ, কোন কাগজ অস্বচ্ছ; কোন কাগজ মসৃণ, কোন কাগজ অমসৃণ; কোন কাগজ কালি তেল, জল প্রভৃতি সহজেই শোষণ করে, কোন কাগজ এসব তরল পদার্থ প্রতিরোধ করে।

যদিও প্রত্যেক শ্রেণীর কাগজই একই মূল উপাদান সেলুলোজ থেকে উৎপন্ন, তাহলেও সব শ্রেণীর কাগজেরই কোন সাধারণ গুণ নেই। ব্যবহারিক প্রয়োগ অনুসারেই কাগজের ভিতর বিশেষ গুণ উৎপন্ন করা হয়। এক শ্রেণীর কাগজের পক্ষে যে গুণ বাঞ্ছনীয়, অন্য শ্রেণীর কাগজের পক্ষে তা ক্ষতিজনক। শক্ত কাগজ ঠোঙা তৈরীর পক্ষে ভাল, কিন্তু লিথোগ্রাফির জন্যে নমনীয় কাগজই

উৎকৃষ্ট। অস্বচ্ছতাই বাইবেল কাগজের প্রধান গুণ, অপর পক্ষে গ্ল্যাসিন কাগজে স্বচ্ছতা অত্যাবশ্যক। এক শ্রেণীর কাগজ অন্য শ্রেণীর কাগজের পরিবর্তে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। লেখবার কাগজ চোষক কাগজের পরিবর্তে কিংবা ছাপার কাগজ সিগারেট কাগজের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় না। কাজেই সব রকম কাগজের গুণ বিচার করবার জন্যে কোন সাধারণ নিয়ম করা সম্ভব নয়। কোন কাগজ কাজ বিশেষের পক্ষে উপযুক্ত হলেই তার গুণের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হবে।

কাগজের ব্যবহার

কাগজ ব্যবহারের রীতি সম্বন্ধে বিশেষতঃ ছাপানোর জন্যে, জানতে হলে কাগজের পাত সম্বন্ধে একটি বিষয় বোঝা দরকার। কাগজের পাতের গঠন ও আয়তনের কিঞ্চিদধিক পরিবর্তন হয়। সদ্য-প্রস্তুত সকল কাগজের আয়তনই অস্থায়ী। পাত প্রস্তুত করবার কিছুক্ষণ পূর্বেই আঁশগুলি তীব্র অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। আঁশগুলিকে ধোলাই ও বিরঞ্জনের পর পেষণ-যন্ত্রে কাটা, থেঁতলানো ও জল খাওয়ানো হয়েছে। এগুলির ভিতরে কলপ অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই চাপ ও তাপ প্রয়োগে একেবারে আর্দ্র অবস্থা থেকে আঁশগুলিকে শুকনো অবস্থায় আনা হয়েছে।

কাগজ-কলের এক প্রান্তে পাতলা মণ্ডের ভিতর শতকরা এক ভাগেরও কম আঁশ এবং নিরানব্বই ভাগেরও বেশী জল থাকে। আর কয়েক মিনিট পরই কলের অপর প্রান্তে একটি কাগজের পাত উৎপন্ন হয়, যার শতাংশের প্রায় ছিয়ানব্বই ভাগই আঁশ এবং চার ভাগ মাত্র জল। কলের ভিতর চালানোর সময় কাগজের পাতটিকে ঝাঁকানি দেওয়া হয়, প্রেসরোলের ভিতর চেপে আঁশগুলিকে সংবদ্ধ করা হয়, উত্তপ্ত সিলিণ্ডারের উপর চাপা হয়, অবশেষে ভারী ক্যালেণ্ডার রোলের ভিতর পেষণ করা হয়। এই ভাবে কলে দলিত ও মথিত হয়ে আঁশগুলি যেন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তারপরই যেন নিজেদের সত্তা আবার ফিরে পেয়ে আঁশগুলি সম্প্রসারিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া প্রথমে খুব দ্রুতই চলতে থাকে, তারপর ক্রমে আস্তে হয়ে, অবশেষে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তখনই কাগজে পরিণত হয়।

এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, সাধারণ অবস্থায় সেলুলোজ আঁশের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬।৭ ভাগ জল থাকে। কিন্তু সদ্য-প্রস্তুত কাগজে এর চেয়ে কম জল থাকে। এইরূপে অত্যধিক ভাবে না শুকালে কাগজের পাত কুঁচকে যাবে এবং সমতল হয়ে বসবে না। এইজন্যে অত্যধিক শুকানো সদ্য-প্রস্তুত কাগজ গুদামে রেখে দেওয়া হয়, যাতে আঁশগুলি হাওয়া থেকে জল আহরণ করে পাতে পরিণত করে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। কাজেই কাগজ তাড়াতাড়ি পরিণত করবার জন্যে রীলে জড়ানোর পূর্বে গরম পাতের উপর জলের কণিকা ছড়ানো হয়। পরিণত করবার আর একটি উপায় হলো, কোন ঘরের ভিতর বায়ুর তাপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ক'রে পাতগুলি ঝুলিয়ে রাখা। এভাবে পাতগুলি তাড়াতাড়ি পরিণত হয়। অনেক কলেই এই প্রক্রিয়ায় পাত পরিণত করবার ব্যবস্থা আছে।

অপরিণত কাগজ মুদ্রাকরের নিকট সরবরাহ করলে পাত অসমতল হয়ে বসার দরুণ মুদ্রণের সময় অনেক বিঘ্ন হবে এবং কাগজ সম্বন্ধে অধিকাংশ অভিযোগের মূল কারণ, কাগজ ঠিকমত পরিণত না ক'রে সরবরাহ করা কিংবা পরিণত কাগজ পাওয়া সত্ত্বেও মুদ্রণের সময় ছাপাখানার অনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় পাত্রের আয়তনের পরিবর্তন হওয়া। যে কাগজে অনেক প্রচার রং নিখুঁত ভাবে মুদ্রিত করতে হবে, সে কাগজ বিশেষ ভাবে পরিণত করা দরকার। সম্পূর্ণ ন্যাকড়ার আঁসে তৈরী উৎকৃষ্ট কাগজই হোক, কিংবা যান্ত্রিক আঁশে তৈরী অসাধারণ কাগজই হোক, সবারই এ গুণ থাকা দরকার। অপরিণত কাগজে সূক্ষ্ম কাজ করা মোটেই সম্ভব নয়। সস্তা কাগজের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর অধিক মূল্যের কাগজ খুব সাবধানতার সঙ্গে পরিণত করা দরকার। কারণ, এ সব কাগজ ছাপানোর পরে দেখতে সুন্দর হয় এবং অধিক দিন স্থায়ী হয়। অপরপক্ষে, কম দামের কাগজ অল্প দিন পরেই ফেলে দেওয়া হয়।

দীর্ঘকালস্থায়ী দলিলপত্রের জন্যে তুলা এবং লিনেনের বিশুদ্ধ সেলুলোজ আঁশ দিয়ে কাগজ তৈরী করা হয়। সবচেয়ে ভাল ছাপার কাগজ প্রস্তুত হয় বহু ব্যবহৃত তুলার ন্যাকড়ার কোমল আঁশ দিয়ে। এরূপ উপাদানে উৎপন্ন কাগজ নমনীয়, মসৃণ ও অস্বচ্ছ হয়।

আর্ট পেপার ব্যবহৃত হয় কেবল ছবি ছাপানোর জন্যে। এ শ্রেণীর কাগজ সাধারণ কাগজের মত নয়। এতে সাধারণ কাগজকে কাঠামোরূপে ব্যবহার ক'রে উপরিভাগে পূরক, শিরিষ প্রভৃতির মিশ্রণের প্রলেপ মাখানো হয়। এ শ্রেণীর কাগজ খুব ভঙ্গুর, ভাঁজ করলে ফেটে যায়। আর্ট পেপারের গা আলো প্রতিফলিত করে, এই জন্যে চোখের পীড়াদায়ক হয়। অতি উজ্জ্বল পালিস করা কাগজে বই ছাপানো উচিত নয়। যদি দরকার হয়, আর্ট পেপারে হাফটোন ছেপে পৃথকভাবে বই-এর ভিতরে জুড়ে দেওয়া যায়।

সাধারণ বই ছাপবার জন্যে কলের ক্যালেণ্ডার রোলে পালিসকরা কাগজ ব্যবহার করাই ভাল। এরূপ কাগজ খানিকটা মসৃণ হাওয়াতে অল্প কালি প্রয়োগ ক'রেও পরিষ্কার মুদ্রণ হয় এবং যে কোন শ্রেণীর মুদ্রণের জন্যেই ব্যবহৃত হতে পারে।

খবরের কাগজ, সস্তা বই প্রভৃতি মুদ্রণের জন্যে কাঠ থেকে উৎপন্ন যান্ত্রিক আঁশ দিয়ে তৈরী কাগজ নিয়োগ করাই ভাল। যান্ত্রিক আঁশই নিউজপ্রিণ্ট বা খবরের কাগজের প্রধান উপাদান। এ শ্রেণীর কাগজে শতকরা প্রায় আশী ভাগ যান্ত্রিক আঁশ এবং অবশিষ্ট রাসায়নিক আঁশ থাকে।

মোটা অ্যাণ্টিক ও ফেদারওয়েট কাগজ ব্যবহার করা খুবই বিরক্তিকর। এ শ্রেণীর কাগজ তৈরী করা, ব্যবহার করা এবং ছাপানো অসুবিধাজনক। ছাপানোর সময় অধিক কালি ব্যবহার করতে হয় এবং কাগজ থেকে আঁশ বেরিয়ে এসে কল নোংরা করে ও কাজের ব্যাঘাত করে। এরূপ কাগজে ছাপা বই আলমারির অনেকটা জায়গা দখল করে। রীতিমত ব্যবহার করলে কিছুদিন পরেই বই থেকে পাতা বেরিয়ে আসে। এরূপ বই পুনরায় বাঁধানোও সম্ভব নয়।

মোটা কাগজের পরিবর্তে পাতলা কাগজ ব্যবহার করা সব দিকেই সুবিধাজনক। কাগজ-কল যে কোন প্রকার পাতলা কাগজ সরবরাহ করতে পারে। পাতলা কাগজ মোটা কাগজের

চেয়ে অধিকতর দৃঢ় হতে পারে এবং কোমল হতে পারে, কাজেই ব্যবহার করতে আরামদায়ক হবে এবং ছাপতে ও বাঁধাই করতেও সহজ হবে। পাতলা কাগজ যথেষ্ট অস্বচ্ছ হতে পারে, কাজেই মুদ্রণের হরফ উলটা দিকে দেখা যাবে না। বাইবেল বা ইণ্ডিয়া পেপার যথেষ্ট পাতলা হলেও এত অস্বচ্ছ যে, কাগজের দুই দিকেই ছাপার হরফ পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। পাতলা কাগজ বই ছাপার জন্মে নিয়োগ করলে বই-এর দোকানে এবং সাধারণ পাঠাগারে নির্দিষ্ট জায়গায় অনেক বেশী বই রাখা যায়। কোথাও বেড়াতে যাবার সময় আমরা অধিক সংখ্যক বই সঙ্গে নিতে পারি।

ডেক্‌ল্‌-এজ, বা পালকের ন্যায় ঢেউখেলানো অসমান প্রান্ত-বিশিষ্ট হাতে-তৈরী কাগজের পাত চিঠিপত্রের জন্মে ব্যবহার করলে সুরুচি ও মর্যাদার পরিচায়ক হবে।

বাইরে কলপ-মাখানো কাগজই লিখবার পক্ষে খুব উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কাগজে লিখতে গেলে শিরিষের একটি মসৃণ স্তরের উপরেই লেখা হয়। কাজেই লেখা খুব সহজ ও আরামদায়ক হয়। কিন্তু পেষণ-যন্ত্রে কলপ যোগ ক'রে যে কাগজ তৈরী হয়, তাতে লিখতে গেলে আঁশের উপরেই লিখতে হয়। এরূপ কাগজে লেখবার সময় কলমের নিচের খোঁচা লেগে কাগজ থেকে আঁশ উঠতে পারে। কিন্তু প্রথমোক্ত কাগজে আঁশগুলি শিরিষের আঠা দিয়ে জোড়া থাকে বলে এরূপ হবার সম্ভাবনা নেই।

সবচেয়ে ভাল ড্রয়িং-পেপার প্রস্তুত করা যায় লিনেন কিংবা তুলার নতুন ন্যাকড়া দিয়ে। ইহা খুব সাবধানতার সঙ্গে প্রস্তুত করা হয়। কাগজে আঁশের স্বাভাবিক রংই বজায় থাকে, আর কোন বিশেষ রং দেওয়া হয় না। পেন্সিলে ছবি আঁকবার কাগজ মসৃণ করা হয় এবং চিত্রকরের রুচি অনুযায়ী পালিশ দেওয়া হয়। কিন্তু রঙীন ছবি আঁকবার কাগজ অমসৃণ রাখা হয়।

কাগজ সম্বন্ধে বিচার করতে হলে বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রণ প্রণালী ও কাগজের অন্যান্য ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। বিশেষ কাজে প্রয়োগ করতে হলে কাগজের কিরূপ বিশেষ গুণ আবশ্যক, তৈরী করবার সময় কাগজের ভিতর ঐ-সব গুণ কি ভাবে উৎপন্ন করা যায় এবং কাগজের আভা, ঔজ্জ্বল্য, গঠন-সৌষ্ঠব, আয়তন প্রভৃতির সামান্যতম পার্থক্যের তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার। বহু দিন চর্চার ফলেই এ-সব বিষয় আয়ত্ত করা যায়।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন।

হে সমুদ্র! হে অসীম!

মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী

শূন্যের অসীম আর পৃথিবীর অসীমের নীল
যেখানে মিলেছে এসে টেনে এক ম্লান শুভ্র-রেখা,
সেখানেও শেষ নেই হে সমুদ্র, তুমি শুধু একা,
দিবসেতে মেঘ সাথী রাত্রে গোণ তারার মিছিল।

একা-একা মৌনতার মুক্তি পেতে মাটির আহ্বানে
উচ্ছ্বসিত কলরোলে ছুটে আসে বিপুল মত্ততা,
সগর্জনে কথা বলে সাড়া দাও কি যে আকুলতা,
আমি জানি কোন্ কথা বল তুমি মৃত্তিকার কানে।

হায় কি মাটির মায়া বার বার শত বাহু দিয়া
বেষ্টিয়া মেটে না আশা অবিশ্রাম ঝাঁপ দাও বুকে,
মাটির চুম্বন স্পর্শ বাসুকির লক্ষ লক্ষ মুখে
লাভ করে টলমল ফিরে যাও নেশামত্ত হিয়া।

সমুদ্র, তোমার এই উচ্ছ্বাসের গভীর অতলে
শুনেছি অনন্ত লীলা কোন এক অনাদি অতীতে,
সৃষ্টির প্রথম বীজ অঙ্কুরিত তোমারই নিভৃতে,
আজ তার প্রতিধ্বনি ওঙ্কারিত শূন্যে-জলে-স্থলে।

সার্থক সৃষ্টির লীলা, প্রতীক মানুষ যুগে-যুগে
রচেছে বিভিন্ন ছন্দে তোমার, মাটির বন্দী গান,
তোমারই অন্তর হতে লক্ষ্মীরে বরিয়া মহীয়ান,
যায জগজ্জয়ী পথ খুঁজে ও-বিপুল বুকে।

যোজন যোজন দূর তোমার ও-বক্ষ বিস্তার,
সুনীল জলধি শুধু অবিশ্রাম ছল ছল জল,
সৃষ্টির অনন্ত লীলা অন্তরালে চলে অবিরল,
এখানে মৃত্তিকা-গর্ভে চিহ্ন পাই কণা মাত্র তার।

এখানে মৃত্তিকা-গর্ভে শত শত ফসিল কঙ্কালে,
অনাদি অতীতে তব অন্তরালে সৃষ্টির স্বাক্ষর,
এনে দেয় আলোড়ন কি বিপুল বিস্ময়ের ঝড়,
এ বিশাল হিমালয় সে-ও ছিল তব অন্তরালে।

এখানে বালুকা-তটে রোদ্দুরের রেশমী রুমাল
সিক্ত করে দিয়ে যাও অবিশ্রাম অতসী মেদুরে,
বিস্ময়ের শুভ্র মেঘ ছায়া ফেলে মনের মুকুরে,
কত বুকে এঁকে গেছ এমনি বিস্ময় কত কাল!

হে সমুদ্র! কবি আমি, মানুষ, প্রতীক সভ্যতার,
যদিও অসীম তুমি আজ তবু পেয়েছি সীমানা,
বিজ্ঞানের জয়রথে মানুষের দুরন্ত কামনা,
প্রেম, মৈত্রী, লোভ, হিংসা দেশে দেশে লভেছে বিস্তার।

হে সমুদ্র! হে অসীম! হে বিপুল! জলধি বিস্তার!
পৃথিবীর স্বেদসৃষ্ট হে অশান্ত লবণাক্ত নীল,
জল দাও! হে জলদা, শান্ত কর তৃষ্ণার্ত নিখিল,
সেই জীব সৃষ্টিক্ষণে এ তব আদিম অঙ্গীকার।

মৃত্তিকার জন্ম-লগ্নে হে সমুদ্র, মৃত্তিকার প্রিয়,
প্রেম দাও, স্নেহ দাও, আলিঙ্গন অবিশ্রাম আর—
মেঘ হয়ে জল দাও, মেটাও তৃষ্ণার্ত হাহাকার,
অতসী মেদুর ফুলে ভরে আনি বন্দনার থালি।

ওপর থেকে নীচে

—মীরেন অধিকারী

দ্রাক্ষাফল

—মিহির চট্টোপাধ্যায়

পুতুলনাচ —রতন দাশগুপ্ত

মুখে ভাত —শ্রীঅজয়

পাহাড়িয়া — সুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

মাছ-ধরা জাল —আনন্দ মুখোপাধ্যায়
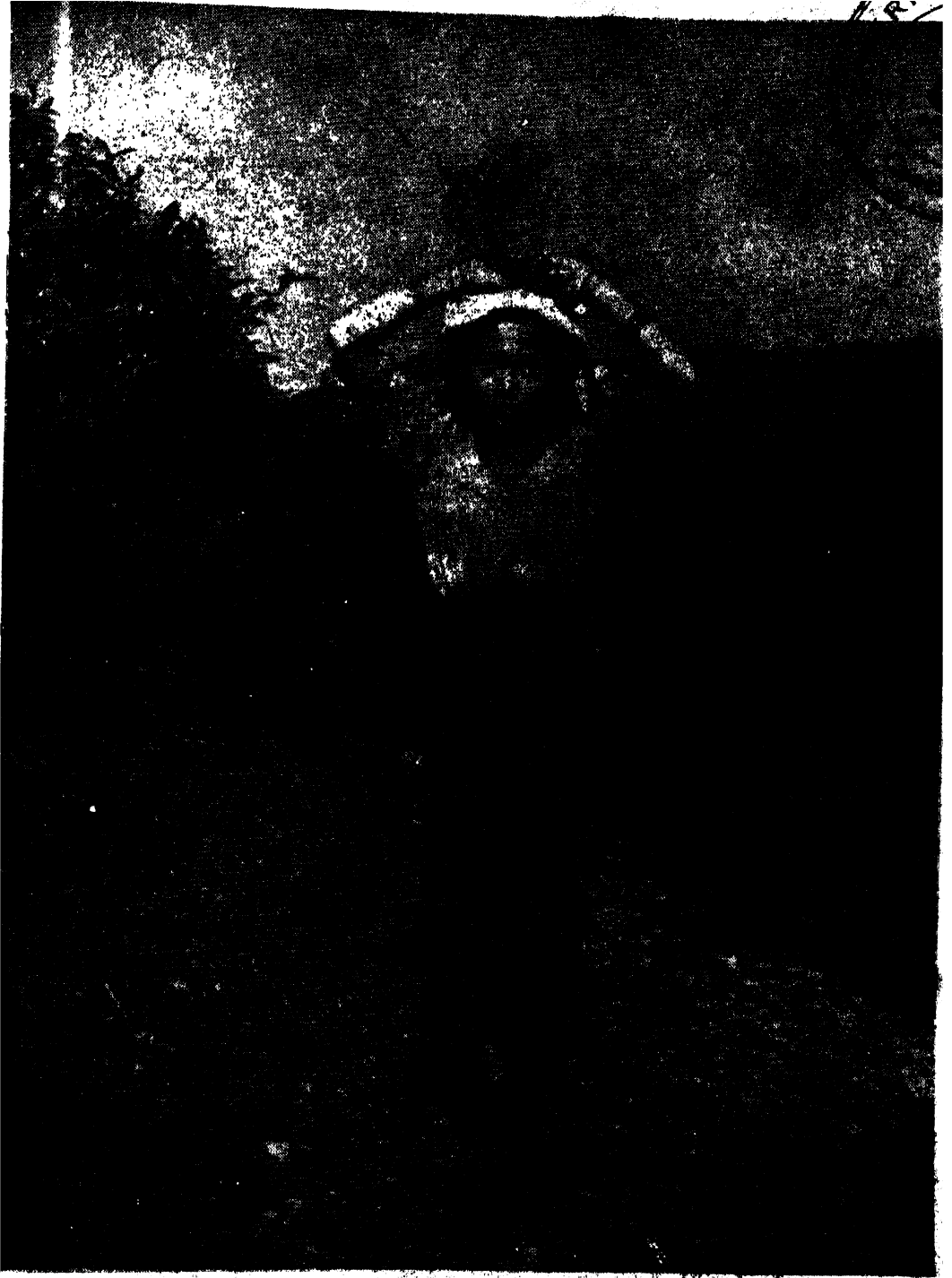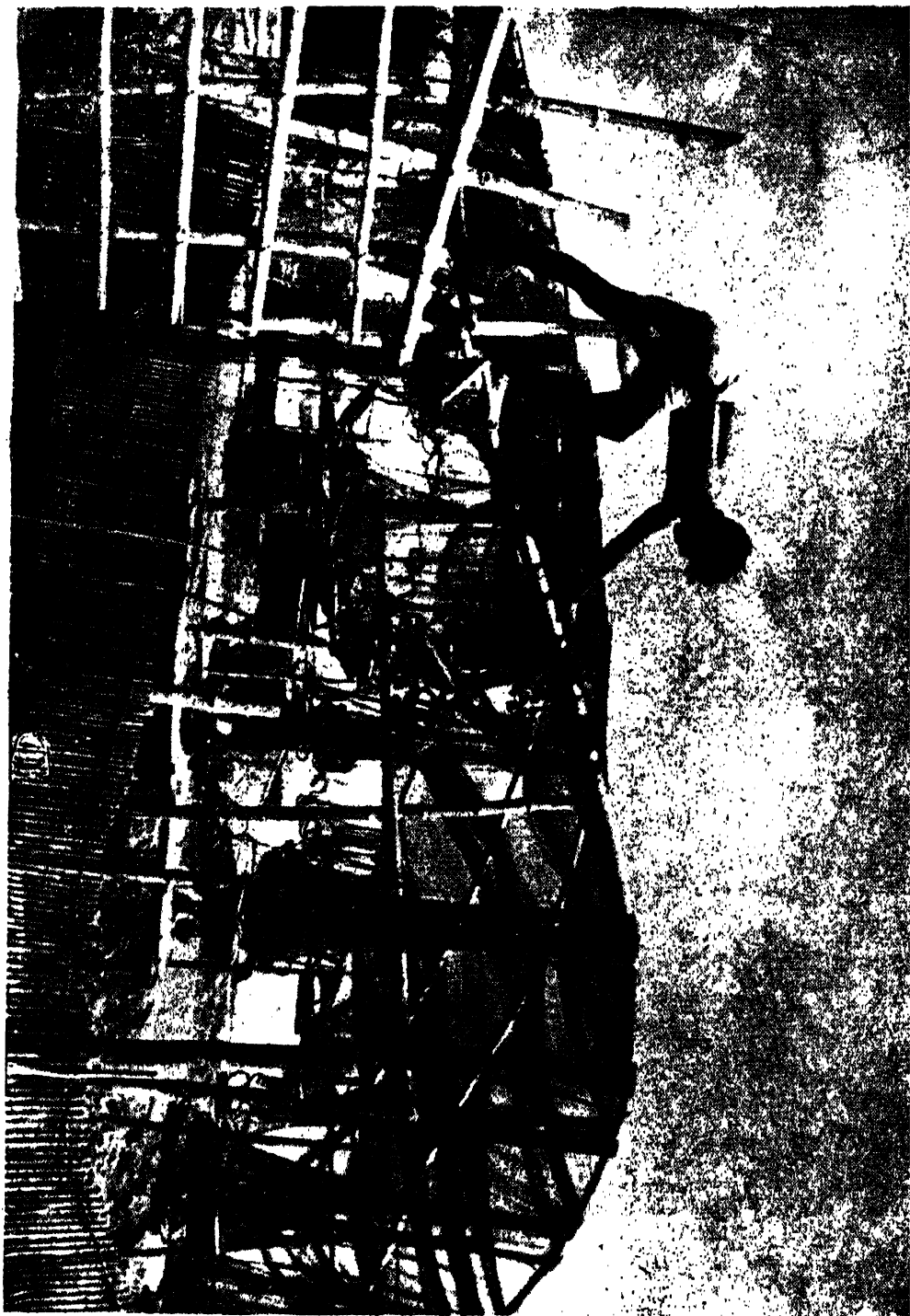
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

বৃষ্টি থেমে গেছে কখন। অপরাহ্ণের ঝাপসা বাতাবরণ কেটে গিয়ে আবার রৌদ্র-উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চার দিক।

উনিশ শো আটচল্লিশ উনপঞ্চাশের স্মরণের মিছিল পার হয়ে ফিরে এলাম উনিশ শো ছাপ্পান্নোর আষাঢ় মাসের নিরালা অপরাহ্ণে।

সামনে তাকিয়ে দেখি, পুরোনো দিনের ছোটো ছোটো অলিগলি কিছুই নেই। বড়ো রাস্তা বেরুচ্ছে সেণ্ট্রাল এভিনিউ থেকে চিৎপুর পর্যন্ত। সেই অসমাপ্ত রাজপথের এক পাশে, যেখানে উত্তর থেকে একটি সরুগলি এসে পড়েছে, একটি ছোট্টো চীনে রেস্তরাঁয় মুখোমুখি বসে আছি আমি আর জেনী ওয়াং।

আস্তে আস্তে মনে পড়লো—নানকিংএ খেতে ডেকেছিলো পাঞ্জাবী বন্ধু যোগীন্দার সিং। খাওয়া দাওয়ার পর সে চলে গেল অফিসপাড়ার দিকে। আমার গন্তব্যস্থল সেণ্ট্রাল এভিনিউ। তাই শর্টকাট করছিলাম এদিক দিয়ে।

আকাশে তখন নিবিড় কালো মেঘ। হঠাৎ দেখেছিলাম, ওধার থেকে আসছে খুব চেনা-চেনা মনে হওয়া কে একজন। চিনেছিলাম কাছাকাছি আসতেই। সে জেনী ওয়াং।

দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বৃষ্টি নামলো। আমরা দুজনে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম পাশের ছোট্টো রেস্তরাঁয়।

দিনের বেলা। বেশ ফাঁকা, নিরিবিলি। যেখানে আমি আর জেনী মুখোমুখি বসে, সেখান থেকে ওধারের ফাঁকা জায়গাটি দেখা যায়।

সেখানে যখন ঝাপসা হয়ে বৃষ্টি নামলো, তখন আমার মনখানি ভেসে গেল অনেক স্মরণের ওপারে। মনে হোলো যেন সেখানে আর ফাঁকা নয়, ঝাপসা নয়। সেখানে তখন আঁকাবাঁকা গলি। সেখানে তখন অনেক লোকের আসা-যাওয়া। উনিশ শো ছাপ্পান্নোর আষাঢ় মাসে সজল দিন মুছে গিয়ে যখন আমার মন ঘিরে নামলো উনিশ শো আটচল্লিশের ফাল্গুনের এক ধূসর সন্ধ্যা, তখন সেই হারানো বিবি আমেলিয়া লেন ধরে দিলীপের সঙ্গে আমি প্রথম চলেছি—ওয়াংদের বাড়ি।

সেই অনেক কথা মনে-পড়া মুহূর্তগুলোয় যখন আবার ফিরে এলাম উনিশ-শো ছাপ্পান্নোর আষাঢ় মাসের নিরালা অপরাহ্ণে, শুনলাম জেনী আমায় বলছে, তুমি বড্ড আনমনা হয়ে গেছ রঞ্জন, কি ভাবছো ?

হেসে উত্তর দিলাম, বিশেষ কিছু নয়। শুধু ভাবছিলাম ওখানে আমাদের সন্ধ্যাগুলো কি করম হৈ-চৈ করে কেটে গেছে এক সময়।

"সবারই একটি বয়েস আসে," জেনী আস্তে আস্তে বললো, "যখন সবারই দিনগুলো হৈ-চৈ করে কাটে। তার পর যে যার কাজে জড়িয়ে পড়ে, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কারো সঙ্গে কারো দেখা হয় না বড় একটা। দেখা হলেও কি খবর, কেমন আছো, গোছের দু'-চারটা মামুলী কথা বলে বিদায় নিতে হয়। এই মস্তো বড়ো শহরের কাজের ব্যস্ততায় আজ-কাল আর কে কার খবর রাখে ?"

"তুমি এখন কি করছো জেনী," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি ? আমি চাকরি করি হুং-সুং-তাও মেমোরিয়াল হাইস্কুলে।"

"মাস্টারি করছো তাহলে ?"

"মাস্টারি নয়। আমি স্কুলের অফিসে চাকরি করি।"

অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম দিলীপের কথা জিজ্ঞেস করবো কি না। স্থির করলাম, এত বছর যখন কেটে গেছে, তখন জিজ্ঞেস করলে ক্ষতি নেই।

"আচ্ছা, জেনী, দিলীপের সঙ্গে দেখা হয় ?"

জেনী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। খুব সহজ, মিষ্টি সেই হাসি। জিজ্ঞেস করলো, "রেবার সঙ্গে তোমার দেখা হয়, রঞ্জন ?"

আমি হেসে ফেললাম।

"না। দিলীপের বিয়ের পর রেবার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।"

"ওর বিয়ের পর দিলীপের সঙ্গেও আমার দেখা হয়নি, রঞ্জন।"

আমি চুপ করে রইলাম।

"আচ্ছা, তুমি ওদের বাড়ী যাও না কেন রঞ্জন ? দিলীপ তো তোমার খুব বন্ধু।"

"দিলীপ প্রায়ই আমার ওখানে আসে। আমায় যেতে বলেনি কোনো দিন। তাই যাইনি।" আমি উত্তর দিলাম।

"তুমি নিজের থেকে গেলেই পারতে ?"

"কি লাভ ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"দেখ রঞ্জন, তোমরা বড্ড বেশী ভাবপ্রবণ," জেনী বললো। "তুমি যে ওখানে যাও না তার মানে এই যে এখনো পুরোনো ব্যাপারটা মনে করে রেখে দিয়েছো। তুমি এখনো বিয়ে করো নি নিশ্চয়ই—?"

আমি হাসলাম একটুখানি।

"সে তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি," জেনী বলে গেল, "জীবনটাকে সহজ ভাবে নেওয়ার চেষ্টা করো, রঞ্জন! দিলীপ তোমার বন্ধু, রেবা তোমার বন্ধুর বৌ—এখন ওদের সঙ্গে ঠিক সে ভাবে মিলবে।"

"তুমি দিলীপের সঙ্গে আর মেশো না কেন?"

"ওকে পাবো কোথায়? সে তো বিয়ের পর আমার কাছে আর এলো না। ও কি ভেবেছে, ও এলে আমি ওকে কিছু বলতাম? আমি বলতাম, তুমি যা করেছো, ঠিকই করেছো। আমি হলেও ঠিক তাই করতাম। কিন্তু সে তো এলো না, অকারণ মনে মনে সে নিজের কাছে অপরাধী হয়ে রইলো।"

"তুমি বিয়ে করবে না জেনী?"

"আমি? হ্যাঁ—নিশ্চয়ই করবো।"

"কবে করবে?"

"করবো বলে যেদিন স্থির করবো, সেদিনই করে ফেলবো।"

আমি একটু হেসে চুপ করে রইলাম। জেনী বুঝলো আমি কি ভাবছি।

বললো, "জানো রঞ্জন, আমাদের স্কুলে যে জিওগ্রাফির মাষ্টার তার নাম লু-চি-চিয়াং। খুব ভালোমানুষ, সাদাসিধে। স্কুলে পড়ায় আর বাদবাকি সময়টা পড়াশুনো করে। উত্তর-চীনের ভূগোলের উপর ওর কয়েকটি প্রবন্ধ পিকিংএর দু'-চারটি পত্রিকায় বেরিয়েছে। ইদানীং সে পড়াশুনো একটু কম করে। তার কারণ হলাম আমি।"

"তাকেই বিয়ে করবে ঠিক করেছো নাকি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তাকে এখনো বলিনি। সে-ও আমায় কিছু মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় নি। এমনি আমাদের বাড়ি আসে প্রত্যেক দিন। ও আমায় যেদিন বলবে, সেদিনই রাজী হবো।"

বাইরের দিকে তাকালাম। রোদ উঠেছে। মেঘের আবরণ মুছে গেছে। উজ্জ্বল নীলিমায় প্রশান্ত হয়ে আছে কলকাতার আকাশ। রেস্তোরাঁ থেকে দু'জনেই বেরিয়ে এলাম। জেনী আমার ঠিকানা নিলো। আমিও লিখে নিলাম তার ঠিকানা। সে বললো, "দিলীপকে বোলো আমার কথা। অনেক দিন দেখা হয়নি। একদিন ওকে নিয়ে এসো আমাদের বাড়ি। আর আমার কথা শোনো, তুমিও যাও দিলীপদের বাড়ি। গিয়ে যখন দেখবে রেবা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে সংসার করছে, তখন তোমারও মনের ভার কেটে যাবে। তারপর অন্য কাউকে খুঁজে নিয়ে তার সঙ্গে সংসার পাততে তোমার একটুও কষ্ট হবে না। তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু আমরা বুঝি—তুমি যে এখনো এরকম আছো, তাতে রেবার মনে নিশ্চয়ই একটা গোপন দুঃখ আছে। যদি তোমার জীবনও সহজ হয়ে ওঠে, সব চেয়ে বেশী খুশি হবে রেবা। অন্তত তার জন্যে হলেও তোমার এটা করা উচিত। যে কোনো অবস্থায় মধ্যেই সুখী হবার জন্যে চেষ্টা করা উচিত সবারই। যদি তুমি, আমি, দিলীপ, রেবা সবাই যে যার মতন সুখী হতে পারি, তাহলে আগের দিনগুলোর মাধুর্যই আমাদের চিরকাল মনে থাকবে, অপর দিনগুলোর ব্যথায় মুহূর্তগুলো আর বেদনাময় মনে হবে না কখনো।"

আমি নির্বিকার ভাবে শুনে গেলাম চুপ করে। জেনী বলে গেল, "এসো একদিন। না এলে খুবই দুঃখিত হবো। দিলীপকে বোলো আমার কথা। ওকেও নিয়ে এসো সঙ্গে করে।"

জেনী চলে গেল।

দিলীপের সঙ্গে দেখা হোলো দিন তিন-চার পরে। বললাম, "জানো, দিলীপদা', সেদিন জেনীর সঙ্গে দেখা হোলো।"

"জেনী? আমাদের জেনী ওয়াং? আমায় বলিস নি কেন এতক্ষণ? কি রকম আছে সে? অনেক দিন দেখা হয় নি ওর সঙ্গে।" কি যেন একটু ভাবলো দিলীপ। তারপর বললে, "সত্যি অনেক দিন হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। কতটুকু দেখেছিলাম তাকে। তখন ফ্রক পরতো। এখন বেশ গাউন স্কার্ট এসব পরে, না?"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম দিলীপের দিকে। কতটুকু দেখেছিলো কা'কে? জেনীকে? কোন জেনীর কথা বলছে দিলীপ দা?

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেনী ওয়াং। যেই জেনী বুড়ো ওয়াংএর মেয়ে, চিয়েন-চাং সুং-চাং'এর বোন জেনী, আহ-কিমের বৌ মিনির দিদি।"

"হ্যাঁ, হাঁ, সেই জেনী। আমিও তারই কথা বলছি রে গাধা," দিলীপ বললো।

"তাকে তুমি কতোটুকু দেখেছ মানে—তখনই তো তার বয়েস ছিলো কুড়ি-একুশ!"

"কুড়ি-একুশ আবার বয়েস নাকি রে? আমাদের কাছে একেবারে বাচ্চা। তখন যাদের কুড়ি-একুশ, তাদের বয়েসী অনেক মেয়েকে ছেলেবেলায়—আমার ছেলেবেলায় নয়, ওদের ছেলেবেলায়—কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি," বললো দিলীপ।

"আচ্ছা দিলীপ দা, তুমি না তার সঙ্গে প্রেম করতে?"

"প্রেম? ওরে গাধা, প্রেম কি কেউ বয়েসের হিসেব করে করে? বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা যায়, মাঝ-বয়েসীর সঙ্গে করা যায়, আবার বুড়ির সঙ্গেও করা যায়। প্রেম এক সুমহান, স্বর্গীয় অনুভূতি! তুই হতভাগা তার কি বুঝবি রে? কি রকম আছে জেনী?"

"জেনী বিয়ে করছে।"

"তাই নাকি। বেশ বেশ। যাদের এইটুকু বাচ্চা দেখেছি সেদিনও, সব্বাই টুক টুক বিয়ে করে ফেলছে যে! ব্যাপার কি? তা' কা'কে বিয়ে করছে জেনী?"

"লু চিউ-চিয়াং কে।"

"সে আবার কে?"

"হুং-সুং-তাও মেমোরিয়াল স্কুলের জিওগ্রাফির মাষ্টার।"

"খুব ভালো কথা। জেনী আমাদের নেমন্তন্ন করবে তো?"

"তোমায় একদিন নিয়ে যেতে বলেছে," আমি বললাম।

"কা'কে নিয়ে যেতে বলেছে?" "আমাকে?"

"বেশ তো, চল একদিন তোকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"না, দিলীপ দা'—"

"না, না, লজ্জা কিসের। চল একদিন—।"

"আমি সে কথা বলিনি। তুমি উল্টো বুঝলে। জেনী আমায় বলেছে একদিন তোমায় নিয়ে যেতে," আমি বললাম।

"একই কথা, আমি তোকে নিয়ে যাবো না তুই আমায় নিয়ে যাবি, এর মধ্যে তফাৎটা কি, আমি তো বুঝতে পারছি না। আসলে তো দু'জনে একসঙ্গে যাবো। একই ট্রামে কিংবা একই বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাবো। তুই যদি ট্যাক্সির পয়সাটা দিতে রাজী থাকিস তো একই ট্যাক্সিতে যাবো। তবে গিয়ে সময় নষ্ট। মাল-ফাল খাওয়াবে জেনী?

ও-সব তালে মেয়েরা নেই। ওর দাদা ওয়াং চিয়েন চাং খাওয়াতো। কী দিলদরিয়া লোক ছিলো সে। জেনী আর কি খাওয়াবে। বড় জোর এক পেয়ালা চা আর একটু চিংড়ির ঠ্যাং-ভাজা। এর জন্যে অতো কষ্ট করে অতোটা পথ যাওয়ার কোনো মানে হয় না।"

"যাই হোক, অতো করে বলেছে। চলো একদিন", আমি বললাম।

"বেশ তো। কবে যাবি বল—।"

একটি দিন ঠিক করলাম।

দিলীপ সেদিন খুব ব্যস্ত। আরেকটি দিন ঠিক করতে বললো।

করলাম।

সে দিন দিলীপ কা'কে যেন বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে।

আরেক দিন বললাম।

সেদিনও যাওয়া হোলো না। দিলীপকে নাকি সেদিন ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হবে।

এমনি করে কেটে গেল তিন-চার মাস।

তখন বোধ হয় পুজোর ছুটি। বাড়িতে চুপচাপ বসে একটি মাসিক পত্রিকা পড়ছি। এমন সময় চাকর এসে বললো, কে যেন ডাকছে। বেরিয়ে দেখি, অচেনা কে একজন। শাদা প্যান্ট আর সিল্কের হাওয়াইআন শার্ট পরা, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। মুখ দেখে বোঝা যায় ভদ্রলোক চাইনীজ।

পরিষ্কার ইংরেজিতে বললো, "আমাদের আগে আলাপ হয়নি। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আপনিও আমায় চেনেন। আমি লু চিউ-চিয়াং, ছং-সুং-তাও মেমোরিয়াল হাইস্কুলের টিচার।"

"আপনি মিষ্টার লু?" আমি তার সঙ্গে করমর্দন করে বললাম, "আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। ভেতরে আসুন।"

চিউ-চিয়াং পাঁচ মিনিটের বেশী বসলো না। সে শুধু খবর দিতে এসেছিলো যে জেনী আমায় একবার ডেকেছে।

জেনীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তার পরদিন। লু চিউ-চিয়াংও ছিলো।

"দিলীপকে আমার কথা বলেছিলে," জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ"

"ওকে একদিন নিয়ে এলে না কেন?"

"ও একদিন আসবে বলেছে।"

খানিকক্ষণ একথা সেকথার পর জেনী বললো, "তোমায় ডেকেছি একটু দরকারে। দিলীপ, যোগীন্দার সিং, হেনরি ডি'সুজা, মেহতা, এদের সবার ঠিকানা তো তোমার কাছে আছে। আমার দরকার সেগুলো।"

"বেশ, দিয়ে যাবো একদিন।"

"একদিন নয়, আমার কালই চাই।"

"কেন, এত তাড়া কিসের?"

জেনী হাসলো। বললো, "বলো তো তাড়া কিসের?" বলে লু চিউ-চিয়াং এর দিকে তাকিয়ে হাসলো।

চিউ-চিয়াং এর ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল।

আমি হেসে ফেললাম। জিজ্ঞেস করলাম, "দিন ঠিক হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। সোমবার দিন, বিকেলবেলা পার্টি। আমার এখানে তো জায়গা হবে না। তাই হুং-সুং-তাও মেমোরিয়াল স্কুলের হলেই ব্যবস্থা করতে হোলো।"

চিউ-চিয়াং-এর করমর্দন করে কনগ্র্যাচুলেশানস জানালাম।

তার পর জেনী জিজ্ঞেস করলো, "দিলীপদের বাড়ি গিয়েছিলে?"

"না, যাইনি।"

"রেবার সঙ্গেও দেখা হয়নি?"

"না।"

"সে আমি আঁচ করেছিলাম। চলো, এখন যাই।"

"এখন?" আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

"হ্যাঁ, কেন নয়? রেবার সঙ্গে আমার আলাপ নেই। তার সঙ্গে আলাপ করবো। দিলীপকেও নেমন্তন্ন করে আসবো। আমি না গেলে সে আসবে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যাও। আমি যাবো না।"

"না, তুমিও যাবে", বলে জেনী লোক পাঠালো ট্যাক্সি ডাকতে।

দিলীপের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। জেনী আমায় জোর করে টেনে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। পেছন পেছন এলো লু চিউ-চিয়াং। দরজা খুলে দিলো রেবা নিজেই।

কি বলবো ভাবছিলাম, কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই রেবা বলে উঠলো, "আরে? তুমি? এদ্দিন পর আমাদের মনে পড়লো? এসো এসো এসো। ভেতরে এসো।"

"এঁকে চেনো? মিস জেনী ওয়াং। আর মিষ্টার চিউ-চিয়াং।"

"হ্যাঁ, নাম শুনেছি। খুব খুশি হলাম দেখা হওয়ায়। ভেতরে আসুন।"

তিন বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে পুতুল খেলছিলো। তাকে দেখিয়ে রেবা বললো, "এ আমার মেয়ে, মঞ্জু। এদিকে এসো মঞ্জু। ডাকলে যেতে হয়। তোমার মামা যে, মামার কাছে যাও লক্ষীটি!"

বাড়িতে রেবা একাই। দিলীপ কোথায় যেন বেরিয়েছে। তবে ফিরে আসবার সময় হয়েছে। তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। ছ'টায় সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা। টিকিট করে রাখা আছে।

"এখনো বিয়ে করো নি কেন রঞ্জন? করে ফেল, করে ফেল, করে ফেল। আমার এক পিসতুতো বোন আছে। দেখবো তোমার জন্যে?"

জেনী ওয়াং তখন মুখ টিপে একটু একটু হাসছে। আমার মনে হোলো গলার কাছে কি যেন আটকে আছে। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। চার দিকে তাকিয়ে দেখি, নিরাড়ম্বর গৃহসজ্জার মধ্যে একটা শান্ত-স্নিগ্ধ লক্ষীশ্রী।

মঞ্জু পুতুল নিয়ে চুপচাপ বসে আছে রেবার কোলে। পাশে টেবিলের উপর দিলীপের একখানি ছবি।

হঠাৎ যেন মনের উপর থেকে একটি দীর্ঘকাল ধরে চাপিয়ে রাখা গুরুভার বোঝা নেমে গেল।

রেবা চা নিয়ে এলো। গল্প-গুজবে কেটে গেল আধ ঘণ্টা। ছ'টা প্রায় বাজে।

"দিলীপ এখনো আসছে না কেন?" চিউ-চিয়াং জিজ্ঞেস করলো।

"আমিও তো তাই ভাবছি", রেবা উত্তর দিলো, "এর মধ্যে এসে পড়া উচিত ছিলো।"

আরো খানিকক্ষণ বসে জেনী ওয়াং বললো, "আমায় তো এবার উঠতে হবে। অন্য কাজ আছে আমাদের।"

রেবাকে বিয়ের কার্ড দিয়ে জেনী ওয়াং বললো, "নিশ্চয়ই আসছো। দিলীপকে বোলো যে আমরা অনেকক্ষণ বসেছিলাম।"

রেবা আমাদের ট্যাক্সি অবধি এগিয়ে দিলো।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। আমি মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। রেবার দুষ্টু মেয়েটি ছুটে রাস্তায় নামতে চাইছে। রেবা তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

খানিকটা পথ এসে জেনী চিউ-চিয়াংকে নামিয়ে দিলো, বললো, "তুমি এখান থেকে আরেকটি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও চিউ-চিয়াং! আমি একটু অন্য দিকে যাচ্ছি। যাওয়ার পথে রঞ্জনকে নামিয়ে দেবো।"

চিউ-চিয়াং ভালোমানুষ। চুপচাপ নেমে চলে গেল।

ট্যাক্সি এসে থামলো পার্ক ষ্ট্রীটের এক আইসক্রীম বারের সামনে।

ভেতরে গিয়ে বসে দুটো আইসক্রীমের অর্ডার দিয়ে জেনী বললো, "তোমায় একটা কথা বলবার জন্যে এখানে নিয়ে এলাম। জানো, দিলীপ এসেছিলো ঠিক সময়েই।"

"কে বললে?"

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি। ওর বাড়ির সামনে আমরা যখন ট্যাক্সি থেকে নামছি, তখন দেখি, সে অন্য দিক থেকে হেঁটে হেঁটে আসছে। সে-ও আমাদের দেখতে পেয়েছিলো, কিন্তু বোধ হয় ভেবেছিলো যে আমি ওকে দেখতে পাইনি। আমাদের দেখতে পেয়েই দিলীপ তাড়াতাড়ি এক পাশে আড়ালে সরে গেল। তাই আমি আর ওকে ডাকলাম না, তোমাদেরও বললাম না। শুধু রেবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি বলেই ভেতরে গেলাম।"

"আশ্চর্য ব্যাপার!"

"কিছু আশ্চর্য নয়," জেনী বললো, "এটা ওর মনের দুর্বলতা। ওর কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি। ওকে বলে

দিও, ও যেন এরকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেয়। এতে ওরই ক্ষতি হবে।"

জেনীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল লু চিউ-চিয়াংএর। দিলীপ বিয়ের পার্টিতে যায় নি। তবে রেবা গিয়েছিলো। জেনী খুব সহজ ভাবেই রেবাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, "দিলীপ আসেনি কেন?"

রেবা জানালো যে, দিলীপের মাথা ধরেছে।

জেনী আমাকে পরে বলেছিলো, দিলীপের যে মাথা ধরবে সে আমি জানতাম, বেচারা দিলীপ!

দিন সাতেক পর একদিন দিলীপ এসে উপস্থিত। বললো, "জেনীর বিয়ের পার্টিতে কি রকম লোক হয়েছিলো রে? আমার এমন মাথা ধরলো যে যাওয়া হোলো না।"

"জেনী বলেছে যে, সে আগেই জানতো তোমার মাথা ধরবে," আমি উত্তর দিলাম।

"মানে?"

"আচ্ছা, দিলীপ দা', সেদিন জেনী আর চিউ-চিয়াংকে নিয়ে যখন তোমার বাড়ি গেলাম, ট্যাক্সি থেকে আমাদের নামতে দেখে তুমি আড়ালে সরে দাঁড়ালে কেন?"

"তোরা দেখতে পেয়েছিলি?"

"আমরা কেউ দেখিনি, শুধু জেনী দেখতে পেয়েছিলো।"

প্রথম দেখলাম দিলীপের মতো স্মার্ট ছেলের মুখ পাংশু হয়ে গেল।

তার পর আস্তে আস্তে বললো, "ওর সঙ্গে যে আমি দেখা করতে চাইনি, তা হয়। কিন্তু রেবার সামনে আমি কিছুতেই জেনীর মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ—আমি, দিলীপ দু'জনেই।

তার পর হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠলো।

বললো, "চল।"

"কোথায়?"

"জেনীদের বাড়ি।"

"এখন? বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ গিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে?"

"চল না।"

চায়না টাউনের ছোটো গলিটার ভিতর ট্যাক্সি ঢোকে না। মোড় থেকেই সেটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ দিলীপ বললে, "আরে? ওরা বেরুচ্ছে দেখছি।"

তাকিয়ে দেখি, উল্টো দিক থেকে লু চিউ-চিয়াং আর জেনী হেঁটে আসছে।

আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। ওরাও পথ ধরে এদিকেই হেঁটে আসছিলো। কাছাকাছি আসতে জেনী তাকালো আমার দিকে। আমিও জেনীর দিকে তাকালাম। দিলীপ তাকালো জেনীর দিকে।

কিন্তু জেনী দিলীপের দিকে তাকালো না।

"জেনী?" দিলীপ ডাকলো।

জেনী কোনো উত্তর দিলো না।

"জেনী, আমি দিলীপ," দিলীপ বললো।

জেনী আর লু-চিউ-চিয়াং দিলীপের পাশ কাটিয়ে পথ ধরে এগিয়ে চলে গেল। আমি আস্তে আস্তে সরে গেলাম এক পাশে।

দিলীপ পথের মাঝখানে পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো,—তাকিয়েই রইলো যতক্ষণ না নিজেদের মনে গল্প করতে করতে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল জেনী আর চিউ-চিয়াং।

তখন পথের এদিকে-ওদিকে ফুটফুটে চীনে খোকা-খুকুদের হট্টগোল। নতুন পথের ওপাশে দোকানগুলোর সামনে সাজানো রঙিন মোমবাতি, রঙিন ফানুস, বাজি-পটকা, কাগজের ফুল আর ফেস্টুন, ঝাপসা কাঠের শো-কেসের ভেতর থেকে উঁকি মারছে চীনে-মাটির পুতুল। আর আশে-পাশের রান্নাঘর থেকে চর্বির গন্ধ, অনুস্বরান্ত কলরব, কাঠের খড়মের ঠক-ঠক পদশব্দ।

দক্ষিণে মিলিয়ে গেল জেনী ওয়াং। দিলীপের পাশ কাটিয়ে ঘড়-ঘড় করতে করতে খোয়া-ছড়ানো পথের উপর দিয়ে চলে গেল একটি ষ্টীমরোলার। উত্তরের আঁকা-বাঁকা অলি-গলির কোনো কানাচে ঝিমিয়ে পড়ে রইলো বহু শতাব্দী পার হয়ে নির্জীব-হয়ে-আসা চায়না-টাউন।

সমাপ্ত

এস মূর্তি দিই

রমেন্দ্র ঘটক-চৌধুরী

অবাক-বিস্ময়ে স্তব্ধ তারাগুলি মিটিমিটি হাসে
এখানে বিক্ষিপ্ত মন ছুটে মরে উন্মত্ত উল্লাসে।
উদ্‌ভ্রান্ত বাতাস খোঁজে ঝাউ-গাছে কি যে রিক্ত সুর
বৈশাখের ধান-বোনা ক্লান্ত দুপুর;

হাত কাঁপে
কাস্তের রোঁয়ায় সুপ্ত বীজের জীবন কেঁদে মরে কম্‌—
আমার আকাঙ্খী প্রাণে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে
ফসলের যুবরাজ নির্বাপিত ক্ষুধার জঠরে।

আমি খুঁজি এলোকেশী ঝড়ের বিরাম নিশ্চিন্ত আরাম।
তারপর উদ্দাম ঝড়ের রাত্রি এনে দিক ভোরের উত্তর
তুমি এস মূর্তি দিই অঙ্কুরের নব বাঙ্ময়।

অতুলপ্রসাদী গান

শ্রীজয়দেব রায়

বাংলা দেশে আধুনিক রাগপ্রধান গানের প্রবর্ত্তক অতুলপ্রসাদ সেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই আজ অসংখ্য গান রচিত হইতেছে।

অতুলপ্রসাদ চিরকাল বাংলা দেশের বাহিরে প্রবাসে বাস করিয়া গিয়াছেন। তাই বাংলা দেশের স্নিগ্ধ প্রকৃতির নমনীয়তার প্রতি তাঁহার একটা রোম্যান্টিক আকর্ষণ ছিল। তাঁহার গানে সেই প্রীতিকর দুরত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোরক্ষপুরে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণে তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন—

"সেদিন আমার দেশের কয়েকটি ভাই আমাকে তাদের নবজাত পত্রিকার জন্য একটি কবিতা বা গান লিখে পাঠাতে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেছিলেন। তখন আমার দেশের গ্রামখানির কথা মনে পড়ে গেল। আমার সেই মিষ্টি দেশটি আমার চোখের সামনে, আমার প্রাণের সামনে ভাসতে লাগল, ভাল ক'রে মনে হ'ল আমি ভুলিনি, ভুলিনি আমার দেশমাতাকে, যদিও প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর সেই গ্রামখানিতে আমি যাইনি। দূর দেশে থাকলে কি হবে, মা'র টান বড় টান।" সেই কথাই তিনি গানেও বলিয়াছেন—

প্রবাসী চল্ রে দেশে চল্,
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া এমন গাঙের জল।
মনে পড়ে দেশের মাঠে ক্ষেত-ভরা সব ধান,
মনে পড়ে পুকুরপাড়ে বকুল গাছের গান;
মনে পড়ে তরুণ চাষীর করুণ বাঁশীর তান;
মনে পড়ে আকাশ-ভরা মেঘ ও পাখীর দল।

পূর্ববঙ্গের সন্তান অতুলপ্রসাদ কোন দিনই তাঁহার জন্মভূমিকে ভোলেন নাই, তাঁহার গানে অজস্রধারায় বর্ষিত হইয়াছে দেশজননীর পদে পুষ্পার্ঘ্য।

এই 'Yearning for something afar' তাঁহার দেশপ্রেমের গানগুলিকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

কেবল বঙ্গদেশ নয়, বাংলা ভাষার প্রতিও তাঁহার ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ। 'আমারি বাংলা ভাষা' গানের বাউল অতুলপ্রসাদ চিরকালই ভাষাজননীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদের সাহিত্য-কলা নবীন সৌষ্ঠবে সুন্দর। কবিতা ও গান বাংলা সাহিত্যকে ও বাঙ্গালী জাতিকে চিরদিন অমর করে রাখবে এমন কবিতাপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয় জাতি জগতে আছে কি-না জানি না তাই আমি গেয়েছি—

কি বাহু বাংলা গানে গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।"

রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় অতুলপ্রসাদ শৈশবে কোন সাঙ্গীতিক পরিবেশে লালিত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করেন নাই। পরিণত বয়সে কিন্তু অতুলপ্রসাদ সাহিত্যিক বন্ধু-সমাজ লাভ করিয়াছিলেন। এই সাহিত্য-সমাজের অন্যতম ছিল 'খামখেয়ালী সভা'।

খামখেয়ালী সভার সদস্যরা সবাই ছিলেন বাংলা দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রভৃতি ছিলেন সে-সমিতির সদস্য। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলি অতুলপ্রসাদ সেই সভায় গাহিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে-কারণে তাঁহাকে স্নেহভরে বলিতেন 'নন্দলাল'। এই খামখেয়ালী সভার সূত্রেই অতুলপ্রসাদ প্রথম ঘনিষ্ঠ সাহিত্য পরিবেশ লাভ করেন। অবশ্য এই বিষয়ে তিনি একবারে বঞ্চিতও ছিলেন না। তাঁহার মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন সেকালের একজন সংস্কৃতিবান পুরুষ, ব্রাহ্মসমাজের তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু বাউল গান ছিল। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার একটি বিখ্যাত গান উদ্ধৃত করা হইল—

ডোব ডোব ডোব রূপসাগরে, যদি শীতল হবি রূপ নেহারে,
ডোব রে অতল সুতল নিতল তলে, তল-তলাতল রসের ধারে।
ডুবতে গেলে বুঝবে কেমন উঠতে নি রে ইচ্ছা করে।
(ভোলা মন ডুবে দেখ)
কেবল ডুব, ডুবাডুব, ডুব, ডুবাডুব, ডুবে ডুবে ডুব, বিচারে।
হবে এক ডুবেতে সাধন সিদ্ধি মানবজীবন সফল করে,
(ভোলা মন ডুবে দেখ)
দিলে সেই গভীরে জীবন ছেড়ে, রসাতলের রস পাবি রে।

অতুলপ্রসাদের অধিকাংশ গানই ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শে গঠিত। তাঁহার গানে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাবসম্পাত বিশেষ কোথাও হয় নাই। দীর্ঘকাল ইউরোপে বাস করিয়া এবং বিলাতী

সঙ্গীতের রীতিমত অনুশীলন করিয়াও তিনি যে তাঁহার গানের স্বধর্মচ্যুতি করেন নাই, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

ইংলণ্ড-প্রবাস কালে অতুলপ্রসাদ পাশ্চাত্য নাট্যকলা ও চিত্র-বিস্তারও চর্চ্চা করেন। ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ ও বিলাতী গানের সঙ্গে তাহার পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি ইংরেজী ভাষায় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া এক সভায় তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। সে প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান কথা বলিয়া পাশ্চাত্য কলারসিকদের স্তম্ভিত করেন।

অতুলপ্রসাদের গানে পাশ্চাত্য প্রভাব তবে আসিয়াছে পরোক্ষ ভাবে। তাঁহার স্বদেশী গানগুলির উদাত্ত সুর, সাবলীল গতি এবং সমবেত কণ্ঠযোজনার অবকাশ বিলাতী রীতিতেই রচিত। প্রসঙ্গক্রমে বিখ্যাত 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী'র নামের উল্লেখ করিতে হয়—এই গানটির গায়নভঙ্গী ইটালিয়ান গণ্ডালা নামক লোকগীতের অনুকরণে রচিত। কথিত আছে, নেপলসের ভিখারীদের মুখে 'ফাউষ্টে'র গান শুনিয়া তিনি সেখানেই গানটি রচনা করিয়াছিলেন।

প্রবাসী অতুলপ্রসাদ উত্তর-ভারতের নানা ভঙ্গীর লোকসঙ্গীতের সুরকে বাংলা গানে প্রথম ব্যবহার করেন। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট গান শাওয়নী, কাজরী, লউনি, রামায়ণী, হোলি, চৈতী প্রভৃতির অনুসরণে তিনি বহু গান রচনা করিয়াছেন। যেমন—

শাওয়নী—ঝরিছে ঝরঝর গরজে গরগর।
কাজরী—জল বলে চল্, মোর সাথে চল্।
লউনি—কেন এলে মোর ঘরে।
রামায়ণী—যতই গড়ি সাধের তরী, যতই করি আশা।
হোলি—এস হুজনে খেলি হোলি, হে মোর কালো।
চৈতী—মন বনে কে এলে।

বাংলা গানে এই সকল সুর ও গীতিরীতির প্রবর্তন তাঁহার বিশিষ্ট অবদান। তুলসীদাস ও কবীরের ভজনগান ছিল তাঁহার অতি প্রিয়, এ সকল গান তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়াই থাকিত।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অতুলপ্রসাদও ছিলেন বর্ষার কবি। তাঁহার গানের মধ্যে এমন একটা কারুণ্যময় উদাস বিরহের সুর আছে যে, তাহা বর্ষায় অবিশ্রান্ত বর্ষণক্লান্ত রাত্রিতে আপনা হইতেই গুঞ্জরিয়া উঠে। কবি নিজেও কত বর্ষামুখর রাত্রি বাদলধারা দেখিতে দেখিতে ঐ সকল গান গাহিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন—বর্ষার গানগুলির সুর বাঙালীর প্রাণকে কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদের গতির চঞ্চলতা ও কমনীয়তার জন্য। কিন্তু বাংলার গ্রামে ও শহরে এই গানগুলি গাহিতে গাহিতে দূর ভবিষ্যতে কবে কোন বাঙালী মনে করিবে টেরাইয়ের সেই নিঝুম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির রাত্রি, উদাস কবি যখন বারেইচের ডাক বাংলোর বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বর্ষা প্রকৃতির বিরহবেদন ভোগ করিতেন, অন্তর বাহির দুই ভরিয়া একটা ঘন অন্ধকার যামিনীর গুরুভারে যখন তাঁহাকে অসীমের প্রেম সম্ভাষণ জানাইত।

তাঁহার বর্ষার গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বাদল ঝুমঝুম বোলে, না জানি কি বলে (পিলুখাম্বাজ); ঝরিছে ঝরঝর, গরজে গরগর (শাওয়ন); প্রবল ঘন মেঘ আজি নীল ঘন ব্যোম' পরে (মেঘ); শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে, আয় গো কে ঝুলিবি আয় (পিলু) প্রভৃতি।

আমার কথা (৩৭)

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বর্তমান ভারতে মার্গসঙ্গীতকে যে অল্প কয়েক জন শিল্পী সাধনা ও অবৈতনিক "পেশা" হিসাবে গ্রহণ করিয়া উহার প্রসারে ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তন্মধ্যে বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম। শ্রোতৃমহলে তিনি "হীরু গাঙ্গুলী" নামে সমধিক পরিচিত। দিনশেষে তাঁহার কর্মকেন্দ্রে এক বিপরীত সমাবেশে আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলে তিনি বলেন:

"১১২২ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করি। পিতা ৺মন্মথনাথ গাঙ্গুলী কলিকাতা হাইকোর্টের ডেপুটী রেজিষ্টার ও মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। জ্যেঠামহাশয়দ্বয় সুরথনাথ হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কুমুদনাথ এটর্ণী ছিলেন। সুরথনাথের পুত্রদ্বয় শ্রীশ্যামকুমার ও শ্রীকৃষ্ণকুমার (নাটু বাবু) সঙ্গীতজ্ঞ মহলে সুপরিচিত। মাতামহ ৺রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রথম সেক্রেটারী এবং ৺প্রমথ ব্যানার্জ্জি ও যাদবকৃষ্ণ বসুর সহায়তায় তিনি "ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাবা দিল্লীর বাবু খাঁ ও পরে নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকট তবলা শেখেন। 'তবলা-লহরা' ও তবলাকে সঙ্গীতাসরে

স্থান দান বাবার প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হয়। একবার একজন মেথরকে বাড়ীতে তবলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাবাকে যথেষ্ট কথা শুনিতে হয়—কিন্তু সঙ্গীতে ছুৎমার্গ নাই বলিয়া বাবা মনে করিতেন।

আমি ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৩০ সালে স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে বি-এ, ১৯৩৩ সালে আইন এবং ১৯৩৭ সালে এটর্ণীশীপ পরীক্ষা পাশ করি।

তিন বৎসর বয়সে প্রথম তবলা বাজাতে শুরু করি এবং শিক্ষাগুরু হন প্রথমে বাবা, পরে নগেন্দ্র বসু এবং ১৯১১—৩৬ সাল পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ মরিশ সঙ্গীত কলেজের শিক্ষক খলিফা আবেদ হোসেন খাঁ। তাঁহার প্রপিতামহ মিয়া বক্স্‌ প্রথম তবলা সৃষ্টি করেন। তবলার উদ্ধতন পর্য্যায় হল 'ধক্কড়'—যাহা 'পাখোয়াজ' হইতে উদ্ভূত। তবলা শেখার জন্য আত্মীয় ও পরিচিত মহলে হাস্যাস্পদ হয়েছিলাম কিন্তু বাবার দৃঢ়তা ও আগ্রহ কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পিতৃবন্ধু ৺হেমাঙ্গ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমি ঋণী।

১৯৩৩ সালে প্রথম এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত-সম্মেলনে যোগদান করি এবং পর পর আগ্রা, দিল্লী, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ এবং বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলা সঙ্গীত-সম্মেলনে শিল্পী অথবা সভাপতি হিসাবে যোগদান করি। আজ যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে থাকে, ইহার মূল উদ্যোক্তা হলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও উপাচার্য্য ৺দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তাঁহার প্রেরণায় ৺ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, আমি এবং অন্যান্য কয়েক জন মিলিয়া 'অল-বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স' গঠন করি এবং ১৯৩৪ সালে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের পৌরোহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সিনেট হলে উহার প্রথম উদ্বোধন করেন। ইহার পর নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন ও অন্যান্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কিন্তু দুঃখের কথা যে, এখনকার বেশীর ভাগ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেবল অর্থাগমের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু সঙ্গীতরসগ্রাহীদের জন্য কোন কেন্দ্রীয় সঙ্গীতস্থান বা বাঙ্গালী সঙ্গীতশিল্পীদের উন্নত পর্য্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য কোন শিক্ষাসদন নির্ম্মাণের জন্য অর্থ ব্যয়িত হয় না। আজ যদি অনুষ্ঠানগুলির উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসেন, আমার মনে হয় যে রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন। স্থানাভাবে ও অর্থাভাবে শীতের রাত্রে শ্রোতৃবৃন্দের ফুটপাথে উপবেশন বাস্তবিক বেদনাদায়ক।

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে এপ্রিল ১৯৪৩ সালে প্রথম তবলা বাজাই কিন্তু বেতারসূচীতে 'এ্যামেচার' কথাটি লিখিতে রাজী না হওয়ায় অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমি আর অনুষ্ঠানে শিল্পী হিসাবে যোগদান করি নাই। তবে ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে সঙ্গীত সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা আকাশবাণীতে পাঠ করি। এ ছাড়া ১৯৫৩-৫৪ সালে সঙ্গীত-নাটক আকাদেমীর কয়েকটি অধিবেশনে যোগদান করি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Music-এর সূচী-কমিটির সদস্য ছিলাম। ১৯৪৪-৪৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশন নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার ছিলাম। বয়েজ স্কাউট, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি কতিপয় প্রতিষ্ঠানের সহিত বরাবর যুক্ত রহিয়াছি।

যদিও গত কয়েক বৎসরে গীত ও বাদ্যচর্চ্চা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবুও সঙ্গীতশাস্ত্রের গবেষণা (Deep Research) কোথাও দেখা যায় না। আর বাংলা দেশে কয়েক জন অল্পবয়স্ক যুবক সুচারুভাবে তবলা শিখিয়াছেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, এ্যামেচার সঙ্গীতশিল্পীদের সরকারী মহলে বিশেষ কদর দেখা যায় না। 'মাসিক বসুমতী' পড়িতে তিনি বেশ উৎসাহবোধ করেন, সে কথা জানাইতে ভুলিলেন না।

শত অসুবিধার মধ্যেও পিতৃদেব বাদ্য হিসাবে তবলাকে যে স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সুযোগ্য পুত্র হিসাবে হীরেন বাবু সেই আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন।

Your education is absolutely worthless, if it not built on a solid foundation of truth and purity. If you are not careful about the personal purity of your lives then I tell you that you are lost, although you may become perfect finished scholars.

—*Mahatma Gandhi*

সুন্দর রূপ ছিল তার। কালোরাণী ছিল চোখের মণি। কথা বলতে বলতে রাজা ধীরপদে দুয়োরের দিকে অগ্রসর হ'লেন। বললেন,—কালোই না কি জগতের আলো। কৃষ্ণ কালো, কালি কালো, কোকিল কালো, চোখের মণি তাও কালো—

মহেশনাথ আবার সজোরে হেসে উঠলেন। হো হো হাসতে হাসতে বললেন,—একটা বাদ দিলে কেন রাজা। কাকও যে কালো, তোমাদের মহিষনাথও যে কালো—

নিজের রসিকতায় মহেশনাথ নিজেই হাসতে থাকলেন। অলস মধ্যাহ্নের থমকানো স্তব্ধতা হাসির আলোড়নে মূর্চ্ছনা তুললো যেন।

দুয়োর থেকে ফিরে আবার কথা বললেন কালীশঙ্কর। ইদিক সিদিক দেখলেন একবার। বললেন,—মহেশনাথ, আমার কি দুঃসময় পড়েছে, বলতে পারো? অনুজ কাশীশঙ্করের বর্তমান রাশিফলই বা কিরূপ দেখতে পাও?

রাজার কথা শেষ হ'তে না হতে মহেশনাথ এলোমেলো কাগজের পাট খুলতে ব্যস্ত হলেন। বললেন,—তিষ্ঠ তিষ্ঠ, তিলেক তিষ্ঠ! মাথায় আমার দুশ্চিন্তা, তথাপি গণনা ক'রবো।

—থাক্ থাক্ মহেশনাথ। রাজাবাহাদুর ফিস ফিস কথা বললেন। চারদিকে লক্ষ্য বুলিয়ে বললেন,—চিন্তামুক্ত হও, তত:পরে গণনায় প্রবৃত্ত হইও। তাড়া নাই কিছু। আমি এখন যাই, পরে তোমার সুবিধামত শুনিও।

—তথাস্তু তথাস্তু।

মহেশনাথ রাজার কথায় সায় দিলেন, কিন্তু কোষ্ঠী খোঁজাখুঁজিতে নিবৃত্ত হ'লেন না। বরং তৎপর হ'লেন আরও। দুয়োরে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, রাজাবাহাদুর কক্ষ ত্যাগ করেছেন। বিড় বিড়িয়ে বললেন,—রাহুর দৃষ্টি পড়েছে রাজপুরীতে। ফলাফল পুরাপুরি অশুভ। ফলং মড়কম্। হো হো হো—

মহেশনাথের ফিসফিস স্বগতোক্তি যেন বিষধর সর্পের ফোঁস-ফোঁসানির মত শোনায়! মনের সুপ্ত আনন্দ হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর মুখে এক বিশ্রী হাসির আভাব উঁকি দেয়। কেমন রহস্যময় এই হাসি। গুপ্ত অভিসন্ধির বহিঃপ্রকাশের মত দেখায় যেন। মহেশনাথ আবার আপন মনে কথা বলতে থাকেন। এটা সেটা নাড়াচাড়া করেন আর বলেন,—তুমি আসল আর আমি নকল। বাহবা! কেয়া বাত, কেয়া বাত!

কার কোষ্ঠী দেখছিলেন কে জানে, কথা বলতে বলতে এবং দেখতে দেখতে হঠাৎ মহেশনাথের চক্ষু স্থির হয়ে যায়। কথা থেমে যায়, মুখের হাসি অদৃশ্য হয়ে যায়। সাগ্রহে দেখতে থাকেন কোষ্ঠীর লেখা। সুসংস্কৃত ভাষায় জাতকের বিচার লিখিত হয়েছে। মহেশনাথের বিশ্বাস হয় না নিজের চোখ দু'টিকে। বিচারের কয়েক সারি লেখা বার বার পড়লেন তিনি। মনে মনে পড়লেন। তার পর শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে পড়লেন। পড়লেন, 'জাতকের জীবনাশঙ্কা আছে পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ অতিক্রমণের সময়ে। গুরু আঘাতের সম্ভাবনা আছে। কোন ক্রমে যদি জীবন রক্ষা পায় তো জাতক ভবিষ্যৎকালে দিগ্বিজয়ে সমর্থ হইবে। দৈবক্রিয়ায় শুভ ফলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।'

নিজের চোখ দু'টিকে বিশ্বাস হয় না মহেশনাথের। কয়েক সারি লেখা, আবার পড়লেন তিনি। আবার, আবার, আবার। পড়তে পড়তে তিনি নিজেই আশঙ্কিত হ'লেন। দুঃখের হাসি হাসলেন।

মধ্যাহ্নের মাটিফাটা রৌদ্রালোক সহ্য করা যায় না যেন।

মাথার ব্রহ্মতালু যেন চিড় খেয়ে যায় কড়া রোদের তাপে। যেন আগুনের স্পর্শ লাগে। বজরার ছাদ জনশূন্য, শুভ্র ফরাসে কয়েকটি তাকিয়া ব্যতীত আর কিছুই নজরে পড়ে না। গঙ্গার জলে কোটি কোটি রোদের টুকরো ছাড়িয়ে আছে হীরকপিণ্ডের মত, ভেসে ভেসে এগিয়ে চলেছে। নদীতে নৌকার তেমন সমাবেশ নেই এই দ্বিপ্রহরে। বৈশাখের তপ্ত রোদের কবল থেকে অব্যাহতির জন্য মাঝিরা হয়তো ছইয়ের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। নদীর তীরে ভিড়েছে ছিপ, পানসি আর নৌকা। বেলা অধিক হওয়ার পর, সূর্য্যের তেজ হ্রাস পাওয়ার পর, মাঝিরা আবার হাল ধরবে। খেয়াপারের ঘাটে নৌকা বাঁধবে। চিৎকার করবে, ডাকবে খেয়াপারের যাত্রীদের।

কাশীশঙ্করের বজরার মাঝিদের বিশ্রাম নেই এক দণ্ড। মাঝ গঙ্গা থেকে হাল চালনার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ভেসে আসছে উষ্ণ বাতাসে। মাঝিরা মাথায় লাল শালুর টুকরো বেঁধেছে। বজরা বেশ ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণ অভিমুখ।

বজরার কক্ষমধ্যে কাশীশঙ্কর। তাকিয়ায় দেহ হেলিয়ে দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহের কষ্ট লাঘব করছেন। দু'জন খানসমা রামপাখার হাওয়া খেলায় বজরার ঘরে। কাশীশঙ্কর নিদ্রিত নয়, তাঁর চক্ষু নিমীলিত মাত্র। সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনী আকাশ দেখছেন খুপরি থেকে। রাজহংসের ডানার মত শুভ্রাকাশ। অনেক উঁচুতে একের পর এক পাক দিয়ে যায় চিল আর শকুন। নীচে থেকে দেখায় যেন কয়েকটি পতঙ্গ, উড়ছে উচ্চাকাশে।

গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্। পর পর কয়েকটি শব্দ দুই তীরের বিশাল কানন কম্পিত করলো সহসা। নদীর বাঁকে বাঁকে ফিরে সেই শব্দ দূরের আকাশপ্রান্ত থেকে প্রতিক্ষিপ্ত হয়। গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্! আবার সেই শব্দধারা, বাতাসের গতিকে ব্যাহত করে যেন। নদীর অন্য তীরে প্রতিধ্বনি ছড়ায়। গগনভেদী শব্দে কাক চিল চমকে চমকে ওঠে।

মাঝিদের মধ্যে কথা আর বাদ প্রতিবাদের কলরোল শুরু হয়। বন্দুকের গোলা ছুটে আসছে কোথা থেকে। গঙ্গার দুই তীর অতি বিস্তৃত অরণ্য। মিশামিশি গাছের অনন্ত শ্রেণী—যেন ছিদ্র ও বিচ্ছেদশূন্য। অরণ্যে আলোক প্রবেশের পথ নেই, সূচীভেদ্য অন্ধকার। পাতা ও পল্লবের মর্মর, পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ অরণ্যে শোনা যায় না। ঘন ঘন বন্দুকের ধ্বনিতে ঐ অন্তশূন্য অরণ্যে পশু-পাখীর আর্ত চিৎকার ভেসে উঠলো। আম কাঁটাল বাবলা তেঁতুলের শাখা কেঁপে কেঁপে উঠলো।

বজরার কক্ষমধ্যে কাশীশঙ্করের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে কখন। তিনি দেখছেন ইতিউতি। কোথা থেকে বন্দুকের জ্বলন্ত গোলা উড়ে আসছে। কুমারবাহাদুর ত্বরায় উঠলেন। অস্ত্রঘরে গেলেন। বন্দুক আর বারুদগাদার সরঞ্জামে হাত দিলেন।

—হুজুর, বজরা আক্রমণ করেছে। এখন উপায়? পেছন থেকে জগমোহন কথা বললে ত্রস্তকণ্ঠে। বললে,—আমাকে একটা বন্দুক দিন ছোটরাজা।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আক্রমণকারীদের অবস্থিতি কোথায় জগমোহন?

পরিবারের
সকলেরই
প্রিয় সাবান

মার্গো সোপ নিয়মিত ব্যবহারে দেহের ত্বক কোমল ও মসৃণ হয়। রোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে মার্গো সোপের প্রচুর ফেনা দেহ নির্মল ও বীজাণুমুক্ত করে। পরিবারের সকলের জন্য আদর্শ এই সাবান কমনীয় ত্বকের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ। এমনকি শীতের রুক্ষ দিনগুলিতেও ত্বককে আশ্চর্য মসৃণ রাখে।

মার্গো সোপ

নির্গন্ধিকৃত নিম তেল থেকে প্রস্তুত

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

CMC-11 BEN

—নদীর তীরে কুমারবাহাদুর। জগমোহন একটি বন্দুক হাতে তুলে নেয় আর কথা বলে। তার ভাবগতিক যেন বড়ই চঞ্চল। বললে,—শত্রুকে নজরে পড়ে না, জঙ্গলে তারা আত্মগোপন করেছে।

আবার বললেন কাশীশঙ্কর,—শত্রুশিবিকাও কি দৃষ্টিগোচর হয় না?

—আদপেই নয় হুজুর। বন্দুকের শব্দ আর ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। আক্রমণের লক্ষ্য হুজুরের এই বজরা।

মাঝিরা চিৎকার করে সভয়ে, কিন্তু আপন আপন কার্য্যে বিরত হয় না। বজরার কয়েক হাত দূরে বন্দুকের গোলা এসে পড়ছে। জলন্ত অগ্নিকণা কক্ষচ্যুত গ্রহাণুপুঞ্জের মত ছড়িয়ে পড়ছে যত্র তত্র।

কাশীশঙ্কর ঘরের বাইরে এসে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন চতুর্দ্দিকে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। শুধু মাত্র ধূম্ররেখা, এখানে সেখানে থমকে আছে খণ্ড মেঘের মত। নদীর বুকে বারুদের পিণ্ড এসে পড়ছে তড়িৎগতিতে।

জগমোহন বললে,—কুমারবাহাদুর, এই দুঃসাহসের উচিত জবাব দিন। বন্দুকের বদলে বন্দুক। দুটা চারটা তোপ দাগতে থাকেন। শত্রু না মনে করে, আমরা অসহায়, অস্ত্র নাই আমাদের কাছে।

গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্—আবার একরাশ অগ্নিগোলক ভাসলো নদীর বুকে। চলন্ত বজরা, তাই লক্ষ্য স্থির থাকে না। কুমারবাহাদুরও সাড়া দিলেন, জবাব দিলেন। তিনিও একের পর এক বন্দুক দাগলেন সশব্দে। তীরের দিকে ছুটলো অগ্নিপিণ্ড। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

এমন সময়ে বজরার ছাদে এসে ছিটকে পড়লো ছুটন্ত আগুনের তারাফুল। একজন মাল্লা, সে হয়তো মথোয় আঘাত পেয়েছে।

বজরা যেন জলকম্পে আড়াআড়ি দুলছে ঘন ঘন। তবুও বজরার গতি অব্যাহত।

—ভাই, এই বিপদে ঝাঁপ দিও না। ঘর থেকে কখন বেরিয়ে পড়েছেন রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—বজরায় সাদা নিশেন তুলে দেওয়া হোক। আমি জানি এ কার ষড়যন্ত্র। আমার মুক্তি হয়তো বিধাতা লিখতে ভুলে গেছেন।

—তুমি ব্যস্ত হও কেন বিন্ধ্য? ঘরের অভ্যন্তরে যাও। অতর্কিতে যদি আঘাত লাগে কে রক্ষা করবে! আত্মসমর্পণ আমার কোষ্ঠীতে লেখা নাই।

রাজকুমারী বললেন,—আমার প্রাণের কোন মূল্য নাই। বজরা যদি রক্ষা পায় তো আমাদের সকলেই সসম্মানে ঘরে ফিরবে; নতুবা আমরা নিঃশেষ হব।

—দেখা যাক্ কি হয়। কথার শেষে আবার বন্দুক দাগলেন কুমারবাহাদুর। আকাশ কেঁপে উঠলো যেন বজ্রধ্বনিতে। বললেন,—বিন্ধ্য, তুই আর এক পলও এখানে থাকবি না। ঘরের মধ্যেই থাক্ আপাতত। দেখা যাক কি হয়।

বিন্ধ্যবাসিনী দীপ্তকণ্ঠে বললেন,—আক্রমণকারী যে কে আমি অনুমানে বুঝেছি। সাতগাঁয়ের জমিদারের কীর্তি। মান্দারণের প্রহরী হয়তো খবর দিয়েছে তাঁকে।

কোন কথায় কর্ণপাতের অবকাশ নেই কাশীশঙ্করের। তাঁর চোখে ধরা পড়েছে শত্রুর ঘাঁটি। তিনি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুক দেগে চলেছেন। জগমোহনও থামছে না। প্রভুর লক্ষ্য সেও অনুসরণ করছে। আর একবার বন্দুকের ঘোড়া টিপলো সে! বললে,—রক্তের বদলে রক্ত, বন্দুকের বদলে বন্দুক।

খানিক বিরতির পর আবার নদীতীর থেকে রাশি রাশি আগুনের ফুলঝুরি ছুটে আসতে থাকে। ঘন ঘন গুম গুম আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক তীরের মত অগ্নিবর্ষণ চললো। বজরার একজন মাল্লা আহত হয় মাথায়। তার জ্ঞানহীন দেহটা নদীর জলে ছিটকে পড়লো। বৃন্তচ্যুত ফলের মত জলে পড়লো সে।

রাজকুমারী বললেন,—ভাই, তোপ দাগাদাগিতে বিরত হও। সাদা নিশান দেখাও। নচেৎ রক্ষা পাওয়া কঠিন। বন্দুকের বদলে যদি কামান দাগে তখন কে রক্ষা করবে!

—উপায় নাই কুমারবাহাদুর। রাজকন্যার কথাই ঠিক। জগমোহন কথার শেষে আবার একবার বক দাগলো। তার চাঞ্চল্যে বজরা দুলে দুলে উঠলো।

—তবে তাই হোক। কেমন যেন নিরুপায়ের মত কাশীশঙ্কর বললেন। জোর গলায় বললেন,—মাঝি-সর্দ্দার সাদা নিশান দেখাও এখনই। মাস্তুলে পতাকা তুলে দাও।

দেখতে দেখতে শ্বেতপতাকা উঠতে থাকে মাস্তুলশীর্ষে। শান্তির প্রতীকচিহ্ন শ্বেতবর্ণের পতাকা। সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রের আকাশফাটা শব্দ থেমে যায়। জগমোহন দেখতে পায়, একখানি ছিপ নদীর তীর থেকে এই দিকে আসছে সর্পগতিতে। জগমোহন বললে,—হুজুর, ছিপখানকে আগে আসতে দিন। বক্তব্য কি তাই শুনুন।

—তথাস্তু জগমোহন। তোমরা সকলে যেমন বলবে তেমন হবে। তবে আমার সহোদরাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবো না কোনমতে। কুমারবাহাদুর কথা বলছেন দৃঢ়কণ্ঠে। বললেন,—কোন' সর্ত্তেই আমি রাজী নই।

বিন্ধ্যবাসিনীর বক্ষ দুরু দুরু করে। রাজকন্যা বজরার ঘরে সিঁদিয়ে গেলেন। বললেন,—সাতগাঁয়ের জমিদারের খেয়ালে আমি নিজেকে বিকাতে চাই না। আত্মসমর্পণের চেয়ে গঙ্গায় আমার ঝাঁপ দেওয়া অনেক সুখের, অনেক মঙ্গলের।

ঘন ঘন আকাশফাটা শব্দের পর দুই পক্ষের নীরবতায় প্রাকৃতিক শান্তি আবার বিরাজ করে। পশুপাখীর আর্ত ডাকে কেউ কান দেয় না। অন্যপক্ষের ছিপখানি ছুটে আসছে ক্ষিপ্রগতিতে।

কাশীশঙ্কর সাগ্রহে অপেক্ষা করেন, শত্রুপক্ষের বক্তব্য শোনার আশায় অধীর হয়ে থাকেন। কুমারবাহাদুরের কপালে স্বেদবিন্দু ফুটেছে কায়ক্লেশে। এক ঝলক বাতাস এসে কুমারের ললাটে স্পর্শ বুলায় যেন। শ্রমের পর শান্তির প্রলেপ লাগে যেন।

শান্তি আর যুদ্ধবিরতির প্রতীকচিহ্ন শ্বেতনিশানা পৎ পৎ উড়ছে বজরার মাস্তুলে। বজরা যেন গতি হারিয়েছে। রাজকুমারী মৃত্যু বরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। বিপদ ঘনীভূত হ'লেই তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবেন। বিন্ধ্যবাসিনী মনে মনে ইষ্টমন্ত্র আওড়ে চলেছেন। বিপত্তারিণীর বীজমন্ত্র বলছেন।

গঙ্গার জলের গতি আছে কিন্তু জ্ঞান নেই। জলপ্রবাহ হাসছে যেন খিল খিল। কুল কুল ব'য়ে চলেছে অবিরাম। গঙ্গা এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। বিন্ধ্যবাসিনীও কি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। কে জানে!

[ক্রমশঃ।

চারজন

ভট্টপল্লীর পণ্ডিতচূড়ামণি শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ

ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া বঙ্গদেশের সংস্কৃতচর্চার একটি পীঠস্থান, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে বশিষ্ঠ গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত সিদ্ধপুরুষ নারায়ণ ঠাকুরকে ভাটপাড়ার তৎকালীন ভূস্বামী রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ৺পরমানন্দ হালদার মহাশয় গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া, ব্রহ্মত্রভূমি দিয়া এই গ্রামে বাস করান। এখন নারায়ণ ঠাকুরের বংশধরেরা সংখ্যায় ১২০টি পরিবারে বিস্তৃত হইয়াছেন। ঐ নারায়ণ ঠাকুরের সময় হইতেই ভাটপাড়ায় শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ হয় এবং গত দুই শতাব্দী ধরিয়া ইহার ক্রমিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়া অদ্যাপি তাহা অম্লান আছে বলিলে কোনো অত্যুক্তি হয় না। আজ 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকদিগের নিকট যাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য উপস্থাপিত করিতেছি, তিনি ঐ বংশেরই এক সুযোগ্য সন্তান শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। ইনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর (১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ) মাসে ভাটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ। ইনিও একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ছিলেন। ভাটপাড়ার পণ্ডিত ৺দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ করিয়া নারায়ণচন্দ্র ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের (শিক্ষা পরিষদের) 'কাব্যতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। তাহার পর পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে 'স্মৃতিতীর্থ' হন। ৺পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন ও ৺পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট তর্ক ও মীমাংসা অধ্যয়ন করেন। তাহার পর হইতেই বাটীর চতুষ্পাঠীতে ও ভাটপাড়া সংস্কৃত কলেজে কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন।

১৯ বৎসর এইভাবে অধ্যাপনার পর ইনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। এই ১৯ বৎসরের মধ্যে তাঁহার ৩৮টি ছাত্র (অর্থাৎ গড়ে বৎসরে দুইটি করিয়া ছাত্র) প্রায় প্রতি বৎসরই স্মৃতিশাস্ত্র উপাধি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করিয়া স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশ ইনি উড়িষ্যার অন্তর্গত (বর্তমানে ইহার রাজধানী) ভুবনেশ্বর নগরে যাপন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসার দুই একমাস পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পরলোকগত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি হইতে তাঁহার সুকবিত্ব ও আশুকবিত্বের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে ঐ ভুবনেশ্বর ভ্রমণ সংক্রান্ত একটি খণ্ডকাব্য লিখিতে উৎসাহিত করেন।

শ্লোকটি এই :—

নানাপুষ্পপরাগভারবহনাৎ প্রাভাতিকে মারুতে
মন্দং বাত্যবলোকয়েদ্ যদি গিরেঃ প্রাচীং দিশংমূর্দ্ধগঃ।
গাঢ়শ্যামবনালিমধ্যগপথং বীক্ষ্যাতিরক্তং ধ্রুবং
সিন্দুরারুণিতাং স্মরেন্নবধূসীমন্তলেখাং মুদা।

অর্থাৎ, যখন নানা পুষ্পের পরাগরূপ ভার বহনের জন্য প্রভাতকালীন বায়ু মৃদুমন্দ বহিতেছে, তখন যদি কেহ কোনো পর্বতের উপরে উঠিয়া পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে গাঢ় শ্যামবর্ণ বনরাজীর মধ্যগামী (সূর্য্যকরোজ্জ্বল) অতিশয় লোহিতবর্ণ পথ দেখিয়া সে নিশ্চয়ই আনন্দসহকারে নববধূর সিন্দুররঞ্জিত সীমন্তরেখার কথা স্মরণ করিবে।

অধ্যক্ষ দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রেরণায় স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কয়েক মাসের মধ্যেই 'ভুবনেশ্বরবৈভবম্' নামক খণ্ডকাব্যটি রচনা করিয়া ফেলেন। ইহা পূর্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত এবং ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৪৪। এই খণ্ডকাব্যখানি ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ মহাশয়ের দ্বারা রচিত সংস্কৃত টিপ্পনী সমেত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বোল্লিখিত শ্লোকটি ঐ পুস্তকের পূর্বভাগে ৪৭ সংখ্যক শ্লোকরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার পরেই স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বঙ্গভাষায় 'হিন্দু স্ত্রী ধনাধিকার'

শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ

নামক গবেষণাত্মক পুস্তক লিখিয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'যোগেন্দ্র গবেষণা পুরস্কার' লাভ করেন এবং ঐ পুস্তকখানিও ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ভারত সরকারের তদানীন্তন আইন সদস্য স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীন ভারতে নারী' নামক পুস্তকে ইহার সুস্পষ্টতা ও সমগ্রতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাত্র এই দুই মাস অস্থায়ী ভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে অধ্যাপনার কার্য্য করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইনি আড়াই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া ভাটপাড়ার একটি শিবলিঙ্গহীন জীর্ণ উপেক্ষিত শিব মন্দিরের সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কার সাধন করেন এবং তাহাতে নূতন কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে এবং ইঁহার সন্তানাদি নাই। কিন্তু স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও সহাস্যবদনে গৃহে অধ্যাপনাদি করিয়া নিজের অবশিষ্ট জীবনকে সার্থক ও ভাটপাড়াকে গৌরবান্বিত করিতেছেন।

সম্প্রতি তাঁহার সম্পাদিত 'নারদস্মৃতি' তাঁহার রচিত বঙ্গানুবাদ সমেত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বহু পূর্বে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জার্মাণ-পণ্ডিত ডক্টর জুলিয়াস্ জলী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সংস্করণটি অধুনা নিঃশেষিত হইয়াছে বলিয়া, স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের এই বঙ্গানুবাদসহ সংস্করণ প্রাচীন স্মৃতির গবেষক ছাত্রদিগের যথেষ্ট উপকারে আসিবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

[বর্ষীয়ান সাহিত্যস্রষ্টা]

চিন্তা যেখানে সময়কে অতিক্রম করে, সেখান থেকেই জন্ম নেয় এক ধরণের ট্রাজিডী। শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টর জীবন এই ধরণেরই একটি ট্রাজিডীর বস্তুরূপ। নইলে যখন শুধু বাংলা সাহিত্য মানে হৃদয়াবেগের বেসাতি। একান্নবর্তী পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে ভুল বুঝাবুঝি, আর পুকুর ভরা মাছ, গোলা ভরা ধানের স্বপ্ন। সেই সময়ে মানুষের মনে মনে যে জীবন জিজ্ঞাসা অন্তরটাকে কুরে কুরে খায়, জান্তিক্সপের চোখ চমকানিতে জীবনের সবটুকু উদ্ধার করে দিয়ে আত্মার জীবনে কানাকড়িও মেলে না। এমনি সব ছোট বড় প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে ধরে দিলেন কেন? ইচ্ছে প্রগাঢ় ছিল তাঁর এসব কথা বুঝে নেবে সবাই। কিন্তু প্রত্যাশার সঙ্গে পরিস্থিতির আপোষ আছে কই? যেমন আপোষ ছিল না তাঁর জন্ম লগ্নে। ১৮৮১ সালের ১লা জুলাই জন্ম হ'ল বিভূতিভূষণের। পিতা—নফরচন্দ্র ভট্ট, মাতা যোগমায়া দেবী। প্রাচুর্য্যের মধ্যেই জন্মালেন তিনি। ছোট থেকেই চোখে পড়ল তাঁর অভ্যস্ত-ভ্রাতাদের আমিরী চালের জীবন ধারণ। উঁচু তলার জানালা দিয়ে অন্যের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি। আর একদিকে আকর্ষণ করল তাঁর পিতার অগাধ পাণ্ডিত্য। তখন সবে ইংরিজী শিক্ষা আসন গেড়ে বসেছে। বিভূতিভূষণ আর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চানন সেই ইংরিজী শিক্ষার হাওয়ায় বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। একদিক রয়েছে তাঁদের সংস্কৃত শিক্ষার বনিয়াদ অন্যদিকে পাশ্চাত্য দৃষ্টির আবেগ। বিভূতিভূষণের অন্তর তাই এক যুক্তিবাদী আধ্যাত্মিকতায় গড়ে উঠতে লাগল। তাঁর এই জীবন দর্শনের আঁচ গিয়ে লাগল ভগিনী নিরুপমার মনে। এই নিরুপমাও আকাশে বাতাসে এক অভিনব জীবনের সন্ধান করে বেড়াতো। আর সেই সব সন্ধান ছন্দে ছন্দে কবিতা হয়ে ফুটত তাঁর একান্ত গোপনীয় খাতা-খানায়। এই খাতার শুধু অন্যতম পাঠক ছিলেন বিভূতিভূষণ।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

ইতিমধ্যে পিতার সরকারী উচ্চ চাকুরী হওয়ার দরুণ পিতার সঙ্গে বিভূতিভূষণ বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বদলী হয়ে চলেছেন। কখনো চট্টগ্রাম, কখনো বরিশাল কখনো আবার হুগলী, চুঁচড়ো। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের মানুষ। নানাম রকম ঘটনায় অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে উঠছে তাঁর। আর শিক্ষা জীবনের বিশেষ পর্য্যায়ে পৌছুলেন এসে ভাগলপুরে। এখনকার জুবিলী কলেজই তাঁর ছাত্র জীবনের একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ইতিমধ্যে স্বামী বিয়োগ হয়েছে নিরুপমার। তিনিও তখন ভ্রাতার কাছে ছায়ার মতন রয়েছেন। আর তাঁর প্রথম উপন্যাস "উৎশৃঙ্খল" লেখার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এই ভাগলপুরের স্মৃতি বিভূতিভূষণের সারা জীবনের স্মৃতি। এখনো বুড়া সে সব কথা মনে করতে গেলে তাঁর বার্দ্ধক্যের চোখও জলে জলে একাকার হয়ে যায়। এ জীবন তাঁর আত্মসচেতনার জীবন। জ্ঞান সঞ্চয়ের জীবন, আবার যৌবনের মায়া উপবনের জীবনও। সঙ্গী সাথীর সহৃদয়তা থেকে শুরু করে সাহিত্য জীবনের অন্যতম সাথী শরৎচন্দ্র, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলী, উপেন্দ্র গাঙ্গুলী, সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে কাল কাটানোর অনেক সব মধুময় ঘটনায় ঠাসা।

এই ভাগলপুরেই সাহিত্য বাসর শুরু হ'ল। সাহিত্য পত্র "ছায়া" হস্ত-প্রেসে মুদ্রিত হ'ল। আর আসর জমলো নানা রকম আলোচনায়, অন্তরালবর্তিনী নিরুপমাও যোগ দিলেন এই সব কথাবার্তায়। প্রস্তুতি চলতে লাগল উত্তরকালের জন কয়েক বলিষ্ঠ কথাশিল্পীর। শরৎচন্দ্র যখন মাঠে ঘাটে শ্মশানে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন। বলিষ্ঠ এক পুরুষ মূর্তি দেখে ইন্দ্রনাথকে চিনে নিচ্ছেন—ঠিক সেই সময় বিভূতিভূষণ তাঁর সামনে এনে

[illegible]তার পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হলেন সত্যজিৎ [illegible]তা সিগনেট প্রেসের অধিকাংশ বইগুলির অলঙ্করণ [illegible]তিভার স্বাক্ষরবাহী।

[illegible]আরও একটি পরিকল্পনা দীর্ঘ দিন ধরে দানা বেঁধে [illegible] সত্যজিতের মনের কোণে। চলচ্চিত্র। ছায়াচিত্রের [illegible] কেবল মাত্র অর্থহীন ভাবে ছায়ালোকে ছন্দহীন [illegible]রীতিমত ভাবে তার বুকের উপর নিজের কীর্তির ছাপ [illegible]তার সর্ব গাত্রে নিজের প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে [illegible] তাই নয়, বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করে দেওয়া যে, [illegible]রা পৃথিবীকে অভিভূত করে তুলতে পারে। রীতিমত [illegible] থাকেন সত্যজিৎ—বারংবার দেখেন এক একটি [illegible]বিটি মুখস্থ হয়ে যায়, মুখস্থ হয় তাদের প্রত্যেকটি [illegible]কৌশল, দৃশ্যবিভাগ। এক একটি কাহিনী অবলম্বন [illegible] রচনা করতে থাকেন সত্যজিৎ। ১৯৫০ সালে [illegible]রে থাকাকালীন সত্যজিৎ ইংল্যাণ্ডে অতিবাহিত [illegible] একটি বছরের প্রায় অর্ধাংশ এই সময়ে প্রায় পঁচানব্বইটি [illegible] থাকেন সত্যজিৎ রায়। সিগনেটের "আম-আটির [illegible] পাঁচালীর সংক্ষিপ্ত শিশু সংস্করণ)র অলঙ্করণের [illegible] ধারণা হল এই কাহিনী দিয়ে সুন্দর ছবি হয়। [illegible] চিত্রনাট্য রচনা। তারপর? তার পর নানা বাধা-বিঘ্ন [illegible] শুরু হ'ল চিত্রগ্রহণ। আবার বাধা—আবার বিঘ্ন—[illegible] অতিক্রমণ। অবশেষে একদিন মুক্তি পেল পথের [illegible] ভাদ্র ১৩৬২)। বহুকাল বাদে যেন আবার রূপ [illegible] রোম্যান্ মহাবীরের অমর উক্তি—ভেনি! ভিডি! [illegible] পাঁচালী আলোড়ন আনল ছায়ালোকে, গড্ডলিকার [illegible] যাওয়া চলচ্চিত্রের গতিধারার মোড় দিল ঘুরিয়ে, [illegible]তিকতার মূলে করল কুঠারাঘাত। দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গীর [illegible] পরিবর্তন, বাজারের "সিসনড্" পরিচালকদের উদ্দেশে বলল "অল্-ভাগো", বঙ্গজগতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করল পথের পাঁচালী। খ্যাতি তার ঘরের কোণেই রইল না সীমাবদ্ধ, ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, দেশ থেকে দেশান্তরে। সারা ভারতে অপূর্ব উত্তেজনা সৃষ্টি করল পথের পাঁচালী লাভ করল রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক। তারপরের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক, আরও বিশাল। পৃথিবীর নানা স্থানে প্রদর্শিত হ'ল মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চিত্র পথের পাঁচালী আর লাভ করল অবর্ণনীয় জন সম্বর্ধনা। পথের পাঁচালী গেল এডিনবারায়, ক্যানেতে, সান ফ্রান্সিসকোয়, ম্যানিলায়। ভিনিসের চিত্রামোদীরা পৃথিবীর ছায়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে পথের পাঁচালীর পরবর্তী অংশ অপরাজিতকে বিভূষিত করে সম্মান জানাল তার চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায়কে, জানাল বাঙলাদেশকে, জানাল এর মূলস্রষ্টা বাঙলার দিকপাল সাহিত্যরথী স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

পথের পাঁচালী ও অপরাজিতের পর সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় পরশ পাথর বর্তমানে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে চিত্রায়িত হচ্ছে তারাশঙ্করের জলসাঘর।

বর্তমান বৎসরে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার সত্যজিৎ রায়কে "পদ্মশ্রী" যুক্ত করে সম্মান জানিয়েছেন। শ্রীরায় মাসিক বসুমতীর একজন অনুরাগী পাঠক।

বাঙলার ছায়ালোকের চলার পথে জমেছিল স্তূপীকৃত আবর্জনা, সেই জঞ্জাল অপসারণ করে সেই পথকে সত্যজিৎ করে তুলেছেন পরম মোহনীয়, চিত্রজগতে সৃষ্টি করেছেন নতুন যুগ। ছায়াছবির আকাশে বাতাসে আজ প্রাণের মাতন, যৌবনের জোয়ার, সৃজনী শক্তির বন্যাধারা সম্ভব হয়েছে এই কুশলী স্রষ্টার কল্যাণময় করস্পর্শে। ছন্দসম্রাট সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অবিস্মরণীয় দুটি লাইন উদ্ধৃত করে গুটিয়ে নিই আজকের আসর।

ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে।

সরস্বতী বন্দনা

পঙ্কজিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যাম তৃণপরে মাঘের শিশিরে রজতাসন সম
রবির কিরণে হীরকের দ্যুতি শোভে কিবা অনুপম,
রজতাসনা শুভ্রবসনা বাগদেবী বীণাপাণি
আগমন হেতু কে বিছাল হেথা রজত আসনখানি।
কার আবাহন বন্দনা গানে মুখরিত ধরা আজ
শুভ্র-রজত শোভায় ধরিল অভিনব শুভ সাজ।
বীণা ঝঙ্কারে সবার মানসে কোন সুরে ওঠে তান
সর্বমানবে সেই সুরে গাহে কার বন্দনা গান।
রচিয়া যতনে পুষ্প স্তবক শ্বেত কুসুমের মালা
কাহারে বরিতে আনে সযতনে সাজায়ে বরণডালা।
মঙ্গলঘট চিত্রিত করি রাখি সহকার শাখা
বেদীমূলে আঁকে যতনে শিল্পী-চারু আলিপনা রেখা,
শিশু ও বৃদ্ধ সমতালে গাহে যাঁর বন্দনা বাণী
হে দেবী ভারতী প্রণমি চরণে কুসুম অর্ঘ্য দানি।

রঙ্গপট

মুড়ি ও মিছরির একদর (?)

বর্তমান বর্ষে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় সম্মানে যাঁরা সম্মানিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে চলচ্চিত্র জগতেরও কয়েকজনের নাম উল্লেখিত হয়েছে। শ্রীদেবকীকুমার বসু, শ্রীমতী দেবিকারাণী ও শ্রীমতী নার্গিসের সঙ্গেই শ্রীসত্যজিৎ রায়কেও "পদ্মশ্রী" যুক্ত করা হয়েছে। সত্যজিৎ বাবুর সম্মানপ্রাপ্তিতে শুধু আমরা কেন সারা দেশই গৌরববোধ করছে। তবে কথা হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় সম্মান বর্ষণ করার ভার যাঁদের উপর তাঁদের কি এটুকু সামান্যতম জ্ঞান ঘটে নেই যে মুড়ি আর মিছরির দর কখনও এক হয় না—না হয়তো সত্যজিৎ ও নার্গিস এক সম্মানের অধিকারী-অধিকারিণী হন কি করে—এ কথা যে কোন লোক বলবে যে সত্যজিৎ ও নার্গিস দু'জনের প্রতিভার আকাশ-পাতাল তফাৎ। চলচ্চিত্রের দরবারে যে আসন সত্যজিৎ রায়ের জন্য স্থিরীকৃত হয়েছে সে আসনের ধারে কাছে নার্গিস যেতে পারেন কি—সত্যজিতের অবদানে দেশের চিত্রজগত যতখানি গড়ে উঠেছে নার্গিসের অবদান তার সঙ্গে সমভাবে তুলনীয় কি, বিশ্বের দরবারে দেশীয় চিত্রসম্ভার যিনি পরম কৃতিত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত করে জাতির গৌরববৃদ্ধি করলেন তার প্রতিদান স্বরূপ দেশের সরকার যদি তাঁকে আজ নার্গিসের সঙ্গে সমান আসনে বসান তা হলে তা তাঁকে অপমান করার নামান্তর ছাড়া আর কি? এতে সত্যজিতবাবুর কিছুই আসে যায় না জনগণের অন্তররাজ্যের যে সম্মান তিনি ইতোমধ্যে পেয়েছেন তার কাছে এই সম্মানের গুরুত্ব কতটুকু কিন্তু এর ফলে রাষ্ট্রীয় কর্তাদের অন্তরের সংকীর্ণতাই নগ্ন হয়ে পড়ল। রাষ্ট্র গুণীজনদের সম্মান দিন এ জিনিষ আমরা শতবার সমর্থন করি কিন্তু তাই বলে তাঁরা যদি মুড়ি ও মিছরির একদর স্থির করেন তা হলে তা দেশবাসীর সমর্থনলাভ কোনদিনই করতে পারবে না।

পরশপাথর

ছোট একটি ঢেলা, না আছে চোখ ধাঁধানো রূপ, না আছে আকর্ষণ করার কোন ইন্দ্রজাল। না থাক—আছে গুণ, অবর্ণনীয়, অপূর্ব, অনির্বচনীয়। যা সে স্পর্শ করবে তাই সঙ্গে সঙ্গে রূপান্বিত হবে সোনায়, অর্থাৎ পথে যা পড়ে থাকত ঐ ঢেলা পাথরটির পরশপ্রভাবে তার স্থান নিরূপিত হ'ল লোহার সিন্দুকে। এক জোড়া চোখও যার দিকে পড়ত না—তারই দিকে স্থির দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ করে আছে হাজার হাজার জোড়া-জোড়া চোখ। কানা-কড়িও যার দাম ছিল না তার দাম এখন হাজার-হাজার টাকা। এত গুণ ধরে এই ছোট্ট ঢেলা পরশপাথর। দীর্ঘদিন ধরে এই যে রূপকটি মানুষের মন অধিকার করে আছে, এর পিছনে আত্মগোপন করে রয়েছে কোন সত্য, হয়তো তা এই যে-যে কোন প্রতিভাধর ব্যক্তির স্পর্শপ্রভাবে অতি সাধারণ জিনিষও হয়ে ওঠে অসাধারণ। এ ধারণা যে আমাদের অমূলক নয় তার জীবন্ত উদাহরণই তো সত্যজিৎ রায়। পরশপাথর ছায়াছবির সার্থক পরিচালক। একটু কথা বলে রাখি—না বললে হয়তো ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে একটু আগেই যে উক্তি আমরা করলুম তার মানে এ নয় যে কাহিনী হিসেবে পরশপাথরকে আমরা সাধারণের পর্যায়ে ফেলছি বা তার গুরুত্ব আমরা গ্রাহ্যই করছি না। বাঙ্গালার রসসাহিত্য লোকে শ্রদ্ধেয় ডক্টর রাজশেখর বসু মহাশয় একজন উজ্জলতম নক্ষত্র এ সম্বন্ধে' নতুন করে বলার কিছুই নেই। তবে যে বীজে যে ফল জন্মায়, যে চেহারায় যে বেশভূষা মানায়, যে জায়গায় যে জিনিষটি শোভা পায় তেমনই পরশপাথর যখন প্রথমে গল্পাকারে আবির্ভূত হয় তখন সেই গল্প থেকে যে ছবি হতে পারে এ ধারণা কি কারুর মধ্যে জেগে উঠেছিল? রাজশেখর বাবুর লেখা পড়তে অপূর্ব লাগে, রসসাহিত্য হিসেবে তার তুলনা নেই। ভাল লাগে তাঁর শব্দ চয়নের জন্যে, ভাল লাগে ভাব বিন্যাসের মাধুর্যে, ভাল লাগে তাঁর ঘটনাটি উপস্থাপিত করার চাতুর্যে। মনের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে তাঁর গল্প কিন্তু সেই গল্প চিত্রোপযোগী কি? বইয়ের পাতা তাঁর গল্প যত রসিয়ে বলতে পারে, হলের পর্দা কি সেই ভাবে রসিয়ে বলতে পারে—ছাপাখানার কালি যে ভাবে তাঁর গল্প ফুটিয়ে তুলতে পারে, ক্যামেরার কৌশলী দৃষ্টি আর এডিটারের কাঁচি ঠিক সেই ভাবে পারে কি—সুতরাং সে ক্ষেত্রে পরশ পাথর কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ চিত্রধর্মী করে তার মধ্যে সার্থক চিত্ররূপ দিয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করার জন্যে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার অসাধারণত্ব অনস্বীকার্য।

"এক রোজ কা সুলতান" এর মতই ক্ষণিকের ধনী পরেশ দত্তর জীবন বৈচিত্র্য যে নিখুঁত ভাবে ফোটানো হয়েছে সে বিষয়ে ভাবতেও বিস্ময় লাগে, একটি পুরো প্রেম-ঘটিত ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে, প্রেমের সার্থক পরিণতি স্বরূপ মঙ্গল শঙ্খের সূচনাও দেখা যাচ্ছে অথচ প্রেমিকা অনুপস্থিত, প্রেমিককে দূরভাষ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করতেই দেখা যাচ্ছে এখানেও সত্যজিৎ রায়ের পরিচালন-প্রতিভা মুগ্ধ করেছে দর্শক সাধারণকে।

একটি মানুষ। অর্থহীন, বিত্তহীন, প্রতিষ্ঠাহীন। সোজা বাঙলায় যাকে বলে ছাপোষা লোক। হঠাৎ পরশ পাথরের কল্যাণে তার জীবন ধারা রাতারাতি গেল বদলে। প্রচুর অর্থের অধিকারী হল সে। সেই অর্থ থেকে এল বৈভব, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য। টাকার নেশায় তখন সে পাগল, সেই সঙ্গে আর একটি নেশাও তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে নামের নেশা—কেবল মাত্র নামের জন্যে সে অকাতরে অর্থব্যয় করে চলেছে, সে অর্থে জনগণের উপকার হচ্ছে সত্য তবে তার দান উপকারের উদ্দেশ্যে নেয় সে দান নাম কেনার উদ্দেশ্যে। এর পর মানুষকে আরও একটি নেশা আচ্ছন্ন করে ফেলে—পরেশ দত্তকেও তাই করল কেমন করে তার অবস্থা ফিরল সেই রহস্যের চাবি কাঠি সকলের

সামনে সে একদিন বার করে দিলে। যা ঘটবার তাই ঘটল, ঈর্ষান্বিত মাড়োয়ারির ঈর্ষ্যার বহ্নিতে পরেশ দত্তকে পুলিশের হাতে বিসর্জন দিতে হল নিজের প্রতিষ্ঠাকে। পাথর তার আগেই গিলে ফেলল তার সেক্রেটারী। যেই পাথর হজম হয়ে গেল অমনি সব সোণা হয়ে গেল আবার লোহা।

আবার পরেশ দত্তের গতানুগতিক জীবন। অর্থাৎ স্বপ্নের মেয়াদ গেল ফুরিয়ে আবার যথারীতি দিনের কাজ শুরু। নেশা কেটে গেছে, সুস্থিরতা এসেছে ফিরে। মেকাপ-এর কাজ শেষ হয়ে গেল, বেরিয়ে এল আবার আসল আকৃতি।

অভিনয়াংশে অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তুলসী চক্রবর্ত্তী। ছবিটির তিনিই প্রাণ, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনিই কাহিনীটিকে টেনে নিয়ে গেছেন। প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই শক্তিমান অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই স্বর্গগতা রাণীবালার স্মৃতির উদ্দেশে, এ মর জগতের সমালোচনার নিন্দা-খ্যাতির গণ্ডী থেকে আজ তিনি বহু উর্ধ্বে তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করি। নির্বাক অভিনয়ে (বারেকের জন্যে একটি কথা বলেছেন) কেবলমাত্র বেশ-পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে অপূর্ব হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন জহর রায়। দর্শকচিত্তে অভিনয়-প্রতিভার মাধ্যমে যথাযোগ্য পরিতৃপ্তি সঞ্চার করেছেন গঙ্গাপদ বসু, বীরেশ্বর সেন, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী ও শ্রীমান্ মানস। সঙ্গীতে ও আলোকচিত্রে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন যথাক্রমে বিশ্ববরেণ্য সুরসাধক রবিশঙ্কর এবং সুব্রত মিত্র। এঁদের কাজ প্রভাবের ছায়া এঁকে যায় দর্শক-মন-মানসে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

ভারতের অধ্যাত্মলোকে আজ অমর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে সাধকপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার নাম। ক্ষ্যাপাবাবার জীবনী অবলম্বন করে নারায়ণ ঘোষের পরিচালনায় গড়ে উঠছে একটি ছায়াছবি। এতে রূপদান করছেন শ্রীমতী মলিনা দেবী এবং নামভূমিকায় শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তা ছাড়া ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, হরিধন মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী। * * * তারাশঙ্করের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' পরিচালনা করছেন সলিল সেন। এতে শঙ্কর ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে দু'জনের সম্মিলন ঘটেছে। সঙ্গীতের পরিচালনভার গ্রহণ করেছেন রবিশঙ্কর এবং নৃত্যের ভার গ্রহণ করেছেন তাঁর মধ্যমাগ্রজ শ্রীদেবেন্দ্রশঙ্কর। চরিত্রগুলি রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, অনুপকুমার, অন্তরীক্ষ-খ্যাত কালীপদ চক্রবর্ত্তী, দেবী নিয়োগী, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় বেচু সিংহ, মঞ্জু দে, সন্ধ্যা রায়, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি দাস প্রভৃতি। * * * কমল দাশগুপ্তের সুরযোজনায় গড়ে উঠছে 'আধুনিকা'র চিত্ররূপ। বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালনকার্য অগ্রসর হচ্ছে। পর্দায় দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অসীমকুমার, বেচু সিংহ, জহর রায়, পদ্মা দেবী, অনিতা গুহ আর বহুকাল পরে বাঙলা ছবিতে দেখা যাবে মদিরাক্ষী মলয়া সরকারকে। * * * কলঙ্কী চাঁদ ছবিতে শিব ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অভিনয় করছেন কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, আশীষকুমার, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ, অপর্ণা দেবী নীলিমা দাস এবং নবাগতা শ্রীমতী দীপিকা দাসকে। * * * নির্মল সর্বজ্ঞের পরিচালনাধীনে এগিয়ে যাচ্ছে 'দশটা-পাঁচটা'র চিত্রায়ণের কাজ। যাঁদের অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁরা হচ্ছেন—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

উদীয়মান অভিনেতা অসীমকুমার

চলচ্চিত্র জগতে একখানি মাত্র ছবিতে আত্মপ্রকাশের পরই প্রচুর সুনাম ও খ্যাতি অর্জ্জনের অধিকারী হয়েছেন, এমন শিল্পীর সংখ্যা খুবই বিরল। এদিক থেকে উদীয়মান শিল্পী অসীমকুমারের নাম বিশেষ ভাবে করতে হয়। সারা বাংলা ও উড়িষ্যা যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে একদিন প্রেমের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল, সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরিত্রে রূপদানেই ছায়াছবিতে তাঁর চরম সাফল্যের পথ প্রশস্ত হ'য়ে যায়। এ যেন একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, শিল্প-মন ও শিল্প-প্রতিভা যদি থাকে, তবেই বুঝি এমনটি সম্ভব।

অসীমকুমারের জন্ম হ'লো ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে উড়িষ্যার ঢেঙ্কানলে। কিন্তু বড়ো হলেন নদীয়ায়—কৃষ্ণনগরে। হাসতে হাসতে বললুম, মহাপ্রভুর রূপদান এত সার্থক কি করে হল, এবার বুঝতে পারলুম।

মৃদু হাসির সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি, বাস্তবিক আমি নিজেই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই, মহাপ্রভুর চরিত্র রূপায়নে এতো সার্থক আমি কি করে হলুম। প্রতি দিনই বহু লোক আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে চলেছেন।

আমি বললুম, আপনার ওপর মহাপ্রভুর কৃপা, একটা আশ্চর্য্য যোগাযোগ আছে আপনার সঙ্গে তাঁর। উড়িষ্যা ও বাঙলা দু'টোর ভাবধারাই এসে মিশেছে আপনার মধ্যে।

স্বর্গত রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র অসীমকুমার। তাঁরা তিন ভাই ও চার বোন। সকলের আদর ও স্নেহচ্ছায়ায় বড়ো হ'তে থাকেন অসীমকুমার। সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে পাশ করে আশুতোষ কলেজে তিনি শিক্ষার সমাপ্তি করেন।

সুচেহারা ও সুকণ্ঠের অধিকারী অসীমকুমার চিত্রজগতে আসবার আগে এ্যামেচার হিসাবে বহু অভিনয় করেন এবং সকলের কাছ থেকেই প্রচুর প্রশংসা পেতে থাকেন।

তিনি বললেন, ছোটবেলা থেকেই আমার সখ ছিলো চিত্রজগতে আমি অভিনয় করবো। বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি। বলতে গেলে তাঁদের উৎসাহেই আমি এতদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছি।

আমি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললুম, আপনার আবির্ভাবে বাস্তবিকই চিত্রজগৎ লাভবান হয়েছে। এবার আমি আপনাকে কতকগুলো প্রশ্ন করবো—আমার কথা কেড়ে নিয়ে অসীমবাবু

বললেন, দেখুন আমার এখন সাধনা চলেছে। মনে-প্রাণে চেষ্টা করে চলেছি এ জগতে আমাকে স্থায়ী আসন করে নিতেই হবে। আমি এখন শিক্ষার্থী। সবার আশীর্ব্বাদ আর শুভেচ্ছা আমার কাম্য। আমার সম্বন্ধে জানাবার মতো কিছুই এখনও সঞ্চয় হয় নাই।

আমি বললুম, তবু মোটামুটি কতকগুলো প্রশ্ন করবো—জানেন তো সাংবাদিকের কাজ। হেসে বললেন অসীমবাবু, বেশ বলুন। তবে সব জবাব কি মনের মতো পাবেন।

বললুম, চলচ্চিত্রে যে আপনি স্থায়ী আসন লাভ করবেন বলে আকাঙ্ক্ষিত—সে বিষয়ে কি আপনি আশান্বিত।

প্রশ্ন করে আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে সে মুখের পরিবর্ত্তন। সেই মহাপ্রভু। যে চোখে দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের অনমনীয় ভাব। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। এ হ'চ্ছে আত্মবিশ্বাসের প্রশ্ন। মহাপ্রভুর চরিত্র অভিনয় করে আমি পেয়েছি সকলকার আশীর্ব্বাদ, আপনি বোধ হয় জানেন আমি প্রখ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদারের নির্মীয়মান ছবি "মর্মবাণী"র নায়ক বরুণের ভূমিকায় অভিনয় করছি। আমার বিশ্বাস এই 'বরুণই' আমাকে চিত্রজগতে স্থায়ী আসন করে দিয়ে যাবেন।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে আপনি কী রকম ধারণা পোষণ করেন।

এবার হেসে উঠলেন তিনি, বললেন, সে মশাই ঠিক কিছু বলতে পারবো না। তবে আমি নিজে খুব Smart পোষাক পছন্দ করি। ফুলপ্যাণ্ট পরতেই ভালোবাসি। পাঞ্জাবী পরি না। পরলে মনে হয় খুব গুরুগম্ভীর হয়ে গেছি।

দৈনন্দিন কার্য্যসূচী বলতে বিশেষ কিছুই নেই। নিয়মিত শয্যাত্যাগ করি। একটু আধটু দেহচর্চাও করে থাকি। সাধারণ লোকে যা করে আমিও তাই করি।

আমার প্রশ্নে বললেন, হ্যাঁ বই পড়তে ভালোবাসি। তবে প্রচুর বই পড়বার সময় কোথায় বলুন। তাই মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোই বেছে বেছে পড়ি। তাতে সার বস্তুটুকু পেয়ে যাই। কিন্তু নাটক পড়তে আমি ভালোবাসি। তাই নাটকটা ঠিক মত পড়ি।

বললুম, তবে অভিনয় খুব দেখেন।

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, ছবি, দেখা আমার হবি বলতে পারেন। তবে সেটা ইংরেজী ছবি। সুযোগ পেলেই আমি ইংরেজী ছবি দেখি। খেলাধূলা? ফুটবল খুব ভালো খেলতুম। এখন আর খেলি না ছেড়ে দিয়েছি।

আমি বললুম আর একটি প্রশ্ন করবো, আচ্ছা বড়ো অভিনেতা হোতে হ'তে হ'লে কি কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন?

অসীমবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, দেখুন ঠিক এ প্রশ্নের যে কি জবাব দেব বলতে পারছি না। অনেকে অনেক কথা বলেছেন সে আমি পড়েছি বা শুনেছি। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন বড়ো অভিনেতা হোতে হ'লে ভালো drama sense থাকা দরকার। যে চরিত্র আমি অভিনয় করবো সেটা ঠিক মতো বুঝতে হবে। তারপর পরিচালক মহাশয় ঠিক যেমনটি চাইবেন তেমনটি করতে পারলেই—আমার মনে হয় বড়ো অভিনেতা হওয়া যায়। অবিশ্যি তার সঙ্গে ভালো চেহারা ও ভালো গলা তো হতেই হবে।

অসীমবাবুর জবাবটি আমার খুব ভালো লাগলো। শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের সন্তান তিনি। ব্যবহারে কোনরূপ ত্রুটি পেলুম না। এখন তিনি চিত্রজগতে নতুন বলেই পরিচিত। দেখলুম এ বিষয়ে তিনি খুব সচেতন। তাই তাঁর চেষ্টা ও সাধনার বিরাম নেই। আমাকে তিনি বললেন, আপনি কি মনে করেন চিত্রজগতে আমি স্থায়ী আসন লাভ করতে পারবো।

সাংবাদিক হয়েও বুঝতে পারি, একজন তরুণ যুবক—জীবনের পথ পরিক্রমায় যাত্রা সুরু—দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের দোলায় দোদুল্যমান। আমি আশা ও উৎসাহ দিয়ে বললুম, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই অসীমবাবু। নিজের দিক দিয়ে ত্রুটি কিছু রাখবেন না, আসন আপনার স্থায়ী হবেই।

অগ্রসর হবার মতো আর কিছুই ছিলো না, তাই এবার নমস্কারান্তে বিদায় গ্রহণ করলুম।

হেমন্ত সন্ধ্যা

কমলা দেবী

হেমন্ত-সন্ধ্যার ম্লান আলো—
সর্বহারা সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের রংও রাঙা ছবি।
যেন কোন বিবাগী বাউল কবি
উদাসী ঝঙ্কারে
ধরণীর প্রাণ-বীণা তারে
যে সুর বাজালো,
সেই তার রিক্ত, ব্যর্থ রেশটুকু যেন
ধূসর সাঁঝের এই আলোতে মিলালো।

অন্তর বাহিরে কার ব্যথা—
কি যেন হারায়ে গেছে, না পাওয়ার
কি যেন বেদনা
স্তব্ধ মৌন বাণীরূপে
ব্যথাহত নিখিলের নিঃশব্দ চৌদিকে
যুগান্তের সুগভীর গোপন সাধনা সম
গুঞ্জরিছে চুপে চুপে।
একি আকুলতা!

কিছুতে আর মন ভরে না
বাদল আসে ছেয়ে
দুষ্টু আমার মিষ্টি হল
কোলে লজেন্স পেয়ে॥
কোলে
লজেন্স ও টফি
প্রস্তুত কারক
কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০
Kolay
CONFECTIONERY

শিক্ষা প্রসঙ্গে

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য)

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি অতীতে যা ছিল, তা থেকে পৃথক ধরণের হওয়া দরকার। বর্ত্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তা আর দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। এর পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। একে নতুন করে গঠন করতে হবে।

শিক্ষাকে প্রধানত তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক করা দরকার এবং দেশের সরকারকে সেজন্য ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ দেশবাসীর উপর যেন ভার চাপান না হয়। ভারতে অধিবাসীদের বড় একটা অংশ এই বোঝা বইতে অক্ষম। প্রায় দেখা যায়, দরিদ্র লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ছোট ছোট ছেলেদের সামান্য রোজগারের কাজে নিযুক্ত করে থাকেন। তা করলে চলবে না। এ বিষয়ে সরকারের চুপ করে থাকা বা কৃপণতা করা উচিত নয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের তরুণদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপযুক্ত করে দেয়। একথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেকের বিশ্ববিদ্যালয়ের বা উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্যতা বা গুণাবলী থাকে না। এই সব ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করার অর্থ মা-বাপের অনর্থক অর্থব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে সমাজেরও ক্ষতি হয়। কারণ যদি তারা কোনক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ও, তবু তারা তাদের বিশেষ প্রবণতা দেখাবার উপযুক্ত সুযোগ পায় না। ফলে দেখা দেয় নৈরাশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের সকলের জন্য নয়। যারা এই শিক্ষা দ্বারা নিজেদের এবং দেশের উপকার করতে সক্ষম, এ শিক্ষা তাদেরই জন্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ে আমাদের গুরুদায়িত্ব বর্ত্তমান। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপযুক্ত নয়, তাদের জন্য আমাদের উপযুক্ত পথ বের করতে হবে। আমাদের তরুণ তরুণীরা যে যে বিষয়ে উন্নতি করতে সক্ষম তাদের মনোযোগ সেই সব দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। সামান্য মাইনের চাকরীর জন্য ছুটোছুটি না করে তারা যাতে দেশের প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত করতে পারে, সেজন্য তাদের প্রবণতা অনুযায়ী কারিগরী শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। অন্যথা প্রচুর পরিমাণে কর্ম্মশক্তি অকেজো হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

অন্যান্য বহু দেশের ন্যায় এ দেশেও শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা কালের গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। পৃথিবীর দ্রুত পরিবর্ত্তন ও উন্নয়ন হচ্ছে। বর্ত্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ছেলেদের এই পরিবর্ত্তন ও উন্নয়নের উপযোগী করে তুলতে পারছে না। আমাদের কেবল একটি বিশেষ দেশ বা জাতির কথা ভাবলে চলবে না। স্মরণ রাখতে হবে, যে কোন দেশে যে কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন হলে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদেরও তা স্পর্শ করবে। একটি জাতির ভালমন্দ অপর জাতির ভাল মন্দের কারণ হয়। বিজ্ঞান আজ সমস্ত দূরত্বের অবসান ঘটিয়েছে। সেজন্য আজ আমাদের একটি পরিবারের মত বাস করতে হবে। শিক্ষাকে সমগ্র মানব জাতির সেবায় উৎসর্গ করতে হবে। আমাদের ছেলেদের এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা আত্মকেন্দ্রিকতা বা বেপরোয়া সামাজিকতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আমাদের ছেলেদের মনে সমাজ সম্বন্ধে এমন একটা ভাব প্রবেশ করাতে হবে যাতে তারা পরবর্ত্তী কালে বিশ্ব সমাজের পূর্ণ সদস্যপদ অর্জ্জন করতে পারে। স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ কালে যাতে তারা এই বিশ্বসমাজ সম্বন্ধে একটা ব্যাপক ধারণা করে নিতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারতবর্ষের প্রতিটি অধিবাসীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা একটি সমস্যার বিষয় এবং এই সমস্যা আজ সর্বত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালের ২৫এ নভেম্বর এক ইংরাজী দৈনিকে প্রকাশিত আচার্য যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধটিও আশা করি সর্বজনপঠিত। তাঁর মতে এই শিক্ষাল্পতার প্রধান কারণ দু'টি। প্রথম—উপযুক্ত ভাবে শিক্ষাদানের অভাব, দ্বিতীয়—শিক্ষালাভের দক্ষিণার মহার্ঘ্যতা। তাঁর নিজের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় তিনি বলেছেন যে, অধিকাংশ ভারতীয় বিদ্যার্থীরা কঠোর পরিশ্রম করতে সম্মত এবং সক্ষমও কেবলমাত্র তাদের যথার্থ ভাবে পরিচালিত করার দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। কথা হচ্ছে, এই জাতীয় শিক্ষক কোথায়? ভাল শিক্ষক পেলেই চলবে না—তাঁকে তাঁর সম্মানানুযায়ী উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কার্পণ্য করলে চলবে না। ১৮১৮ সালে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার শিক্ষাধিকর্তার আসনে সমাসীন ছিলেন ডক্টর সি. মার্টিন এই প্রসঙ্গে তিনি যে উক্তি করে গেছেন তা এখানে উল্লেখ করেছেন আচার্য যদুনাথ। ডক্টর মার্টিন বলেছেন যে, "একটি সূত্রধরকে মাসিক নব্বুই টাকার কমে আমি পাই না কিন্তু একজন বি-এ পাশ করা ভদ্রলোককে শিক্ষক হিসাবে আমি মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকায় অনায়াসে পেতে পারি।" এই প্রসঙ্গে ডক্টর মার্টিনের উক্তিটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তখনকার দিনে অর্থাৎ যেদিন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আজকের তুলনায় ঢের বেশী আশাপ্রদ ছিল—ডক্টর মার্টিন যদি এই ব্যাপারে ঐ ভাষা ব্যবহার করে থাকেন, তা হলে আজকের দিনে এই অগ্নিমূল্যের যুগে ঐ বিষয়টিই উপলক্ষ করে আমরা কোন্ ভাষা ব্যবহার করব? সেদিনকার মানুষেরই দৈনন্দিন ব্যয়ের হার আজকের দিনে যে কি বর্ধিত আকার ধারণ করেছে তা সহজেই অনুমেয়। পরিস্থিতির চাপে মানুষের আয়ও কমেছে যেমনই ব্যয়ও বেড়ে গেছে ঠিক সম-পরিমাণে।

অবশ্য এ কথা ভুললে চলবে না যে একজন প্রতিষ্ঠাবান আইনজীবী যে টাকা উপার্জন করেন সেই সমপরিমাণ টাকার আশা করা একজনের শিক্ষকের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। আবার একজন শিল্পপতির যা উপার্জন সেই অঙ্কের টাকা উপার্জনের স্বপ্নদেখা প্রতিষ্ঠাবান আইনজীবীরও অনুচিত। প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পেশায় উপার্জনের অঙ্কের ভিন্ন ভিন্ন সীমাও নির্দিষ্ট আছে, সুতরাং যে যে পেশায় প্রতিষ্ঠাবান তাঁর সেই নির্দিষ্ট অঙ্কই হাসিমুখে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা উচিত।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে শরণ নিতে হবে এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই। উপাধিই শিক্ষার শেষ ধাপ নয়, জীবনকে প্রকৃত ও সার্থক ভাবে গঠন করাই শিক্ষালাভের পরম সার্থকতা এবং মূলমন্ত্র ছাত্রদের সহজাত প্রতিভার মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা তাদের জীবনে হোক বদ্ধমূল। ঐ সহজাত প্রতিভা ও ক্ষমতা যাতে যথার্থভাবে ব্যবহৃত হয়ে তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে সে বিষয়ে তাদের যত্নবান হওয়া উচিত।

আজকের দিনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠালাভের হাজার-হাজার পথ খুঁজে পায় অতি সহজেই। তখনকার দিনে এত সুযোগ এত সুবিধে ছাত্রদের জন্যে ছিল না—সেই জন্যে তারা একটা গতানুগতিক পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হোত। অতএব আজকের দিনে যে সুযোগ ও সুবিধাগুলি সানন্দে হাতছানি দিচ্ছে ছাত্রদের তা উপেক্ষা করা কোন কারণেই উচিত নয়।

ভারতের প্রত্যেকটি মানুষকে সত্যিকারের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, কেবলমাত্র উপাধি প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না—বলিষ্ঠ, আলোকোজ্জ্বল, সার্থকতার স্বাক্ষরবাহী যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার আলোকে তাদের হতে হবে স্নাত। তবেই তাদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ আপনা জেগে উঠবে, জীবনের যাত্রা পথের দুর্গমতা তাদের ভয় দেখাতে পারবে না, যে কোন কঠোরতাকেই হাসিমুখে তারা করতে পারবে বরণ।

আজকের দিনের শিক্ষাধারা দুষ্ট এ কথা বলছি না তবে এইটুকু বলছি যে এর কোন কিছু উন্নতি সাধিত না করে এই সুখ্যাতির মূলে কুঠারাঘাত করছে, আমি এই প্রথার একটি আমূল পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। তবে এই পরিবর্তন রাতারাতি সম্ভব হবে না—হয়ও না কখনো, ইতিহাস সাক্ষী দেবে যে যে কোন পরিবর্তন কখনও এক বা দুই বছরে সম্ভব হয় নি, হয়েছে যুগের যুগব্যাপী প্রচেষ্টায়, নিষ্ঠায়, উদ্যমে! আজকের দিনে যে ধারা চলছে অবশ্য তা একেবারে পরিবর্তন করলে খেই হারিয়ে যাবে, যোগসূত্র হয়ে যাবে ছিন্ন অতএব পুরোনো কাঠামোকে যথাসাধ্য বজায় রেখে নতুন ব্যবস্থাধারার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হতে পারে, কে চায় যে ভবিষ্যত অতীতের বন্ধন ছিন্ন করবে। অতএব উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই যুগোপযোগী কয়েকটি সংস্কারের আশু প্রয়োজন। ভবিষ্যতকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অতীত যে অপরিহার্য নতুন ধারার প্রবর্তন করার প্রারম্ভে এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি কনফুসিয়াসের উক্তি "ভবিষ্যতের যথার্থ অভিব্যক্তির জন্যে অনুধাবন কর অতীতকে।"

শুধু আত্মতুষ্টি !

"রেলওয়ে দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম লোকসভায় বলিয়াছেন, রেলওয়েতে দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। তাঁহার বিবৃতিতে প্রকাশ, জানুয়ারী মাসের শেষদিকে তিনি বিভিন্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজারদের সঙ্গে বিষয়টি লইয়া আলোচনা করেন এবং বাহিরে রেল লাইন তত্ত্বাবধান করায় কাজ যাহাতে আরও সতর্কতার সঙ্গে করা হয়, কারখানার ভিতরের কর্ম্মীরা যাহাতে দুর্ঘটনা নিবারণের ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হন, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা চলিতেছে। এই বিশেষ ব্যবস্থা যে কি, তাহা অবশ্য রেলওয়ে-মন্ত্রী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন নাই। কিন্তু যে ব্যবস্থাই অবলম্বিত হউক, তাহার কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হইবে দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পাইল কি-না তাহার দ্বারা। রেলওয়ের পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা অহেতুক আত্মতুষ্টির মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহার ফলে দুর্ঘটনা নিবারণের কাজ ব্যাহত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আত্মতুষ্টির মনোভাব কতখানি দূর হইয়াছে তাহাই প্রশ্ন।"

—দৈনিক বসুমতী।

শিশু হত্যার নামান্তর

"অর্থ-সঙ্কটে পতিত হইয়া ভারত সরকার ব্যয় সঙ্কোচের পথ সন্ধানে কিছু দিন যাবৎ বিশেষভাবে ব্যস্ত আছেন। কথায় বলে উত্তম থাকিলেই উপায় হয়। কার্যতঃ হইয়াছেও তাহাই। অনেক অনুসন্ধানের পর ভারত সরকার খরচ বাঁচাইবার একটা অভিনব উপায় খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবির সমূহে যেসব শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে যেহেতু জন্মগত অধিকার বলেই তাহারা ভারতীয় নাগরিকরূপে গণ্য হইবার যোগ্য, অতএব নবজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বৎসর বয়স্ক সেই সব শিশুদের ক্যাশ ডোল দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ভারত সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ পরিকল্পনার বহর দেখিয়া বাংলার কোন এক জমিদার কর্তৃক অবলম্বিত অনুরূপ একটি পরিকল্পনার কথা স্মরণ হইতেছে। তাঁহার বাড়ীতে যখন বিরাট কোন ব্যাপার হইত, আমন্ত্রিত অতিথিদের ভোজনের নিমিত্ত চব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়ের বিপুল সম্ভারে ভাণ্ডারঘর ভরিয়া উঠিত, জমিদার তখন সতর্ক প্রহরীরূপে স্বয়ং বসিয়া থাকিতেন মুড়ির বস্তার উপরে। পাছে মুড়ি চুরি করিয়া বা বেশী খরচ করিয়া দিয়া কেহ তাঁহার সর্বনাশ করে ইহাই তাঁহার আশঙ্কা। ক্ষীর, দই, লুচি, সন্দেশ মাংস-পোলাও পাতায় পাতায় গড়াগড়ি যাক তাহাতে কতটুকু ক্ষতিই বা সাধিত হইবে। সাবধান! মুড়ির ব্যয়বাহুল্যে পতিত হইয়া যেন সর্বস্বান্ত হইতে না হয়। অপূর্ব এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া ভারত সরকারও এযাত্রা আর্থিক সঙ্কট হইতে সম্ভবতঃ বাঁচিয়া গেলেন, শিশুর খাদ্য হরণ করিবার এই অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবিত না হইলে, ভারত সরকারের যে কী সর্বনাশ হইত সে কথা ভাবিয়া আমরাও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছি।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

গাফিলতির খেসারত

"ধানবাদ হইতে সাত মাইল দূরবর্তী সিন্দুয়ার নিকট একটি যাত্রিবাহী বাসে বিস্ফোরণ ঘটায় দুইজন মহিলা, একটি শিশু ও চারজন বয়স্ক পুরুষ শোচনীয় ভাবে প্রাণ হারাইয়াছেন। আরো কয়েকজন আহত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। ঘটনার বিবরণে জানা যাইতেছে যে, একজন যাত্রী মধ্যপথে বাসের পিছনে একটা বস্তা উঠান। এই বস্তাতেই কোনরূপ বিস্ফোরক পদার্থ ছিল, যাহা চলতি গাড়ীর ঝাঁকানিতে জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা হইতেই দুর্ঘটনা ঘটে। ইতিপূর্বে মাদ্রাজে, আসানসোলে এবং আরো কোন কোন স্থানে বৃহত্তর আকারের বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ঘটনাগুলি সবই অসাবধানতা ও আহাম্মকীর ফল, না আরো কিছু তা লইয়া অনেকেরই সন্দেহ আছে। আসলে নাগরিক কর্তব্য ও সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান না থাকার ফলে অনেক সময় আমরা নিজেরাও চরম বিপদে পড়ি, অন্যদেরও সর্বনাশ ডাকিয়া আনি। নৌকাডুবি, গাড়ী চাপা, অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ, ট্রেন উল্টানো, নানা ঘটনাতেই আমাদের এই বিচারবিহীনতা, বুদ্ধিশৈথিল্য ও গাফিলতি ফুটিয়া উঠে। আর ধনপ্রাণের মূল্যে ইহারই দণ্ড দিতে হয়।"

—যুগান্তর।

শিক্ষকদের অনশন

"পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকেরা অনশন ধর্ম্মঘট করিতে চলিয়াছেন। তাঁহাদের বিবৃতিতে প্রকাশ,—সরকারী কর্তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন আনয়ন এই ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য। যাহাদের হৃদয় বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায়, মনুষ্যত্ব পিশাচত্ব বলিয়া কোন বস্তু যাহাদের মধ্যে নাই, তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তন কয়েকজন লোক অনশনের দ্বারা কিরূপে আনিবেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। লাভের মধ্যে শিক্ষক ধর্ম্মঘট বে-আইনি করিয়া বিল আসিতেছে। ডাক ধর্ম্মঘটের যে পরিণতি এবং ফলে যে নূতন আইন লাভ হইয়াছে, এক্ষেত্রেও তাহার অতিরিক্ত কিছু দেখিতে পাইতেছি না। বাঙ্গলা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপর্যয় আসিয়াছে তাহার যোগ্য নেতৃত্ব আসিতেছে না ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। এ, বি, টি, এ, যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারেন নাই।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ

"বর্ধমান মিউনিসিপাল নির্বাচনে কংগ্রেস স্বনামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া বেনামে প্রার্থী দাঁড় করাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীবিধান রায়ের মন্ত্রিমণ্ডলী পৌরসভায় গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করার চেষ্টায় রত। আর পৌরসভায় জনমঙ্গলের কাজের খরচের দায়িত্বও এখন পর্যন্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অস্বীকৃত। তাঁহাদের ধারণা শহর, বাজার বা গ্রাম অঞ্চলে তাঁহারা যেসব কর আদায় করিয়া যথেচ্ছ খরচ করেন, এখানকার লোক তাহাতে হকদার নহে—যদিও পৃথিবীতে সর্বত্রই এই অর্থের গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্থানীয় এলাকার প্রাপ্য বলিয়া স্বীকৃত। আবার পশ্চিম বাংলায় শ্রীঈশ্বরদাস জালানের কৃপায় সারা ভারতে প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে পৌর নির্বাচন ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নাই। যাঁহারা ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন, তাঁহারা ভাড়ার সঙ্গে এক পঞ্চমাংশে বা তাহার উপর ট্যাক্স দেন। কিন্তু পৌরসভার শাসন ব্যবস্থায় তাঁহাদের বক্তব্য কিছু নাই। প্রধান মন্ত্রী নেহরু পর্যন্ত একটু চাপা ইসারা দিয়া বলিয়াছেন, আমাদের ধারণা কেন্দ্রে ও রাজ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন করিলেই গণতন্ত্র হইল, কিন্তু সর্বত্র ইহা প্রবর্তিত না হইলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় না। (১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে স্বায়ত্তশাসন বিভাগীয় মন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে কিংবা অন্যান্য রাজ্যের মত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট এখানে হইলে চটকল এলাকার ইউরোপীয় ব্যবসাদার আর শ্রীঈশ্বরদাস জালানের বন্ধু-বান্ধবদের বিশেষ অসুবিধা হয়।"

—নতুন পত্রিকা (বর্দ্ধমান)।

বিচার বিভাগীয় ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ

"বিচার বিভাগ যাঁহারা বাছিয়া লইবেন—তাঁহারা যদি মহকুমা শাসক হইতে না পারেন এবং অপর দিকে তাঁহাদের জেলা জজ হইবার যোগ্যতা না থাকায় তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিলেই চলে। এই বিষয়ে সমাধান করিতে হইলে ইহাদের বিশেষ পরীক্ষা লইয়া সাবজজ বা জেলা জজের পদে উন্নীত করিবার সুবিধা দিতে হইবে অন্যথায় তাহাদের মহকুমা শাসকের পদে উন্নীত করিতে হইবে। তবেই ইহারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। এদিকে শাসন বিভাগে যাহারা থাকিবেন তাঁহারা কি ১৪৪, ১০৭ ধারা জারী করা আর পিটিসন তদন্ত করা অথবা ট্রেজারী প্রভৃতি বাজে কাজ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইবেন। ভবিষ্যতে যদিও ইহারা মহকুমা শাসক হইতে পারিবেন তবে বিচার করিবার ক্ষমতাই যদি না থাকল তবে বৈকব্বী পদে উন্নীত হইয়া লাভই বা কি? ইহাই হইল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের মনের চেহারা।"

—জি, টি রোড।

সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না!

"বিশ্বস্তসূত্রের এক সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় ভি এম হাসপাতালে, দরিদ্র শিশু এবং বৃদ্ধদের মধ্যে বিতরণের জন্য কিছু দুধ আসে। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার নাকি শরীর ভাল নয়, দুধ দেওয়া সম্ভব হইবে না ইত্যাদি অজুহাত তুলিয়া গত ১লা ফেব্রুয়ারী প্রার্থিদিগকে ফেরত দিতে চাহেন। শেষে জনৈকা নার্স দুধ বিতরণে রাজী হইলেও উক্ত ডাক্তারের আদেশ না পাওয়ায় তিনি দুগ্ধ বিতরণে অসমর্থা হন। নিরুপায় হইয়া প্রার্থিগণ জেলাশাসক মহাশয়কে সকল ঘটনা জ্ঞাত করে। জেলাশাসক মহাশয় নাকি ডাক্তারের ঐরূপ তালবাহানার কৈফিয়ত তলব করেন ও তন্মুহূর্তে দুধ বিতরণের নির্দ্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী দুধ বিতরণও আরম্ভ হয়। আরও প্রকাশ, প্রত্যেক শনিবারেই নাকি এইরূপ দুগ্ধ বিতরণের নিয়ম। কিন্তু প্রার্থিগণ দুই সপ্তাহেও একবার দুধ পায় না।"

—জাগরণ (ত্রিপুরা)।

হুগলী জেলার খাদ্য-সংকট

"হুগলী জেলায় আমন ধানের উৎপাদন সম্বন্ধে যে আশঙ্কা আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে করিয়াছিলাম আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় গড়ে বিঘা প্রতি ৮।১০ মণ ফসলের স্থলে ৪।৫ মণ ফলিয়াছে কি না সন্দেহ। অভিজ্ঞ চাষীদের মতে গত বৎসরের প্রবল বন্যা সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরের উৎপাদন অনেক কম। ধানের দর পূর্ব্বাপর বৎসর অপেক্ষা বেশী হইলেও প্রকৃত চাষীর কোন লাভই হইতেছে না। কারণ উদ্বৃত্ত হইলে তবে বিক্রয়ের প্রশ্ন ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিযোগ করিয়া থাকেন যে চাষীদের মজুতের জন্য বাজারে ধান-চালের উর্দ্ধগতি নামান সম্ভব হয় না। কিন্তু কথাটার মধ্যে যে বিন্দুমাত্র সত্য নাই তাহা একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায়। দরিদ্র চাষীর পক্ষে ধান মজুত করিয়া রাখিবার মত আর্থিক সঙ্গতি কোথায়? ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনের তাড়নায় দর যাহাই হউক না কেন নূতন ধান বিক্রয় করিতে চাষী বাধ্য হয়। আলোচ্য বৎসরে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে প্রকৃত চাষী ছয় মাসের খোরাকী ধানও উৎপাদন করিতে পারে নাই। সরকারের রাজস্ব, মহাজন ও মুদীর দোকানের ধারের জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া খোরাকী ধানের কিছু অংশ বিক্রয় করিতে হইতেছে। একটু চিন্তা করিলেই সরকার বুঝিতে পারিবেন যে উচ্চমূল্যে ধান বিক্রয় করিয়া প্রকৃত লাভবান হয় মুষ্টিমেয় কয়েক জন জোতদার ব্যবসায়ী ও ধনিক সম্প্রদায়।"

—সংগ্রাম (হুগলী)।

সংস্কৃত ভাষার মহত্ত্ব

"দেশের লোকের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন ব্যতিরেকে চতুর্দ্দিকের দুর্নীতি প্রবাহ বন্ধ হইবে না এবং দেশ ধ্বংসের মুখে

অগ্রসর হইতে থাকিবে! মানসিক বৃত্তির স্ফূর্তি বা উৎকর্ষ সাধনের সম্পদ্‌ সংস্কৃতের মধ্যেই সুলভ প্রভূত পরিমাণে। কমিশন আরও বলিয়াছেন হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলেও অহিন্দীভাষী প্রদেশসমূহে মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দী শিক্ষা দিতে গিয়া ছাত্রদিগের উপর ভাষাশিক্ষার অযথা চাপ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সকল প্রদেশেই ছাত্রগণের মাতৃভাষা, ইংরাজী ও সংস্কৃত—মধ্যশিক্ষাপর্য্যায়ে এই তিনটি ভাষার অধ্যয়নই হইবে প্রয়োজনসিদ্ধির পক্ষে পর্য্যাপ্ত। বাধ্যতামূলক ভাবে হিন্দীশিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই, তবে যদি কেহ সর্ব্বভারতীয় চাকুরীর জন্য প্রস্তুত হইতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে হিন্দীশিক্ষা করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। মোটের উপর কমিশন সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা যদি মূল কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে, তবে সকল দিক্‌ দিয়াই দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। হিন্দীর উপর আমাদের কোনরূপ আক্রোশ নাই, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হয় হউক কিন্তু সংস্কৃতকে বাদ দিলে চলিবে না। সংস্কৃত ভারতবর্ষের প্রদেশবিশেষের ভাষা নহে, সংস্কৃত সকলের ভাষা। পাশাপাশি সংস্কৃত ও হিন্দী রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হউক, দেশবাসী আনন্দিত হইবে—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।"

—পুণ্যভূমি (তারকেশ্বর)।

রেলে মাল চালান

"দেশে সৎলোকের অভাব নাই কিন্তু মুস্কিল এই যে সততা বা সাধুতা দেখাইতে গেলে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই জন্যই নিষ্ক্রিয় থাকা ভাল তবুও অসাধুতার বিরুদ্ধে কিছু না বলার নীতি মানুষ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে। রেলের সঙ্ঘবদ্ধ চুরি দুই দিনে বন্ধ করা যায়। ইহার জন্য সর্ব্ব বিভাগে সর্ব্বস্তরে মোটা মোটা মাহিনার কর্ম্মচারী রহিয়াছে, তথাপি রেল কর্ত্তৃপক্ষকে জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হয় কেন? ক্ষতিপূরণই একমাত্র ইহার প্রতিকার বলিয়া মনে করা হয় কেন তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। মানুষ যে মাল চালান দেয় সেই মাল চায়। তিন চার বৎসর পরে মালের মূল্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইলে এবং তাহার জন্য বহু ব্যয় বিধান করিতে হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা অনুমান করিবার মত শক্তি যাহাদের নাই, তাহারা জিন্দাবাদ ও ফুলের মালা কুড়াইতেই ব্যস্ত। রেল ভাড়া, মাশুল ইত্যাদি বাড়াইয়া দিয়াছে অথচ মাল চলাচলের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে পারে না ইহা যে কত বড় লজ্জার কথা তাহা চিন্তা করা যায় না। সেখানে নাকি চলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চুরি ও ডাকাতি এবং এই চুরি এ ডাকাতির টাকা ভাগ বাঁটোয়ারা হয়। এই ব্যাপার রেল কর্ত্তৃপক্ষ হইতে সুরু করিয়া জনসাধারণের অনেকেই জানেন এবং ইহা লইয়া আলোচনাও হয় কিন্তু প্রতিকার হয় না। যাহারা ইহার প্রতিকার করিতে পারেন না তাহাদের তরফ হইতে যখন ক্ষতিপূরণের দাবী লইয়া নানা টালবাহনা সুরু হয় তখন আমরা মনে করি যে ইহা একটি চমৎকার অবস্থা। এককে মারিয়া অপরের লাভবান হইবার কি চমৎকার সড়ক সরকার বাহাদুর পাকা করিয়া দিয়াছেন। রেলে মাল চুরি বন্ধ করিলে এত ঝামেলার কোন প্রয়োজন ছিল না। যেখানে সকলেই চোর নয় সেখানে সত্যিকার চোর ধরা পড়ে না কেন ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অসাধুতা, দুর্নীতি, চুরি ও জুয়াচ্চুরি ধরা পড়ে। তাহা ধরিতে গেলে শক্তি, সামর্থ্য ও নৈতিক দৃঢ়তা প্রয়োজন। প্রত্যেক সরকারের তাহা থাকা উচিত।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

ঋণ আদায়ের সার্টিফিকেট ও ক্রোক।

"মহকুমার জনগণের অবস্থা শোচনীয় একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বিশেষ কাহারও ঘরে ধান নাই। অন্য কোন ফসল নাই। সোনা দানা গরু ছাগল যার যাহা ছিল তার অধিকাংশই হয় বিক্রয় না হয় বন্ধক পড়িয়াছে! যাহাদের ধান অথবা চাল কিনিয়া খাইতে হইতেছে তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। মাঘ মাসেই বারো তেরো টাকা মণ ধান আর ২৪।২৫ টাকা মণ চাল কিনিয়া ক'দিন বাঁচিবে? শতকরা ১৫ জনের চাষের ধান বিক্রয় ছাড়া অর্থাগমের অন্য কোন পথ নাই; কাজেই ধান না হওয়াতে সমস্ত আর্থিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবিলম্বে টেষ্ট রিলিফ, প্রচুর আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী প্রয়োজন হইয়াছে সরকারী ঋণ আদায় ও সকল প্রকার সার্টিফিকেট জারী ও ক্রোক বন্ধ করার জন্য আবেদন করা। সরকারী পাওনা আদায়ের জন্য যে ভাবে জুলুমবাজী চলিতেছে তাহাতে চারি দিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। সরকারী অর্থ আদায় করিতে হইবে একথা আমরা জানি কিন্তু একথাও সরকারী কর্ম্মচারীদের স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে—স্বাধীন গণতন্ত্র কল্যাণময় রাষ্ট্রের সরকার 'কাবুলিওয়ালা' নহে। অক্ষম, দুঃস্থ জনসাধারণের যথা সর্ব্বস্ব 'ঢোল পিটাইয়া' নিলাম করার অধিকার সরকারের নাই। যে দায়িত্বে ও কর্ত্তব্যে সরকার ঋণ ও টেষ্ট রিলিফ মঞ্জুর করার কথা ঘোষণা করিতেছেন, সেই দায়িত্বে ও কর্ত্তব্য জ্ঞানেই অবিলম্বে সকল প্রকার ঋণ আদায় বন্ধ রাখিতে হইবে। দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অবিলম্বে ঋণ আদায় ও সার্টিফিকেট জারী বন্ধ না করিলে দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। এই কথার মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি নাই, কোন মিথ্যা প্রচার নাই ইহা অতি সহজ সত্য কথা। আইন সভার সদস্যরা কি দেশের সংবাদ রাখেন না? তাঁহারা এ সম্পর্কে কি করিতেছেন তাহা দেশবাসী জানিতে চাহে।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

দায়ী কাহারা?

"বীরভূম তথা সারা বাংলায় খাদ্যাবস্থা যে রাস্তায় আগাইয়া চলিয়াছে তাহার পরিণতি কি তাহা ভাবিতেও সাধারণ মানুষ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। বিশেষ করিয়া যখন দেখা যাইতেছে যে সরকারী হুকুম প্রদত্ত হইয়াও পাল্টাইয়া যাইতেছে তখন মানুষের দিশাহারা না হইয়া উপায় কি? কিছুদিন পূর্ব্বে যখন বাজারে ধান্য এবং চাউলের মূল্য ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল তখন সরকার উদ্বৃত্ত জেলাগুলিতে কর্ডন ঘোষণা করিয়া চাউল এবং ধান্যের দর

বাঁধিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। যদিও কোনও প্রকাশ্য ঘোষণা এ সম্বন্ধে জনসমক্ষে প্রচারিত হয় নাই তবুও একটা ন্যায্য দর যথা ১০॥০ টাকা ধান্য ও ১৬।০ টাকা চাউল বলিয়া সকলে জানিতে পারে। এ সঙ্গে সরকার বাহিরে বিক্রয়ার্থ পারমিট প্রথারও প্রবর্তন করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের জেলা সমাহর্তা সরকারী ঘোষণার আগেই একবার কর্ডন ঘোষণা করিয়াছিলেন! যাই হোক এই ব্যাপারে সরকারী হাত আসিয়া পরার পর মুহূর্ত হইতে এবং বিশেষ করিয়া পারমিট প্রথার জন্য বাজারে একটা স্থিতাবস্থা নামিয়া আসে এবং একথা সকলেই জানে যে কয়েক দিন পূর্ব পর্য্যন্ত ধান্য ও চাউলের বাজার দর পূর্ব তুলনায় অনেক নামিয়া আসিয়াছিল। ইহার দ্বারা লোভী ব্যবসাদার ও মজুতদার ও অধিক জমির মালিক যাহারা তাহাদের মন বিষণ্ণ হইলেও লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন ও অল্প ভূমি সম্পন্ন মজুর, চাষী, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত এবং অল্প আয় সম্পন্ন সহর-অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মনে কথঞ্চিত সাময়িক শান্তি নামিয়া আসে। তাহারা আশা করে যে সরকার কোটি কোটি মানুষের দিকে তাকাইয়া বাজার যাহারা কাঁপাইয়া তুলিতেছে তাহাদের দমন করিতে সক্ষম হইবেন এবং সরকারী নীতি স্থায়ী হইবে।"

—বীরভূমবার্ত্তা।

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক হারাণ চাকলাদার

বহু ভাষাবিদ সর্বজন-শ্রদ্ধেয় মনীষী অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার ৫ই মাঘ রাত্রে ৮৫ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছেন। ইনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং চল্লিশ বছর পরিশ্রম করে শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহেব বঙ্গানুবাদ করে সুধীসমাজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার অধিকারী হন। ডন-সোসাইটির সঙ্গে এঁর নিবিড় যোগ ছিল এবং যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানকালের রূপান্তর সম্ভব হয়েছে অধ্যাপক চাকলাদার তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর লোকান্তর গমনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ক্ষতি সাধিত হ'ল।

ডাঃ যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী

স্বনামধন্য স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ অধ্যাপক ডাঃ যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী ২৭শে মাঘ ৬৪ বছর বয়েসে পরলোক গমন করেছেন। ১৯৩৪ সাল থেকে আজীবন ইনি আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ঐ কলেজের স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যাবিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগেও ইনি ঐ বিষয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। বিলাতের রয়্যাল কলেজ অফ অবসটেট্রিশিয়ান য়্যাণ্ড জিনকোলজিষ্টএর ইনি একজন সদস্য ছিলেন এবং বেঙ্গল অবসটেট্রিশিয়ান য়্যাণ্ড জিনকোলজিক্যাল সোসাইটির ইনি সহ-সভাপতি ছিলেন। কলকাতা ছাড়া মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ইনি একজন পরীক্ষক ছিলেন।

নির্মলচন্দ্র ঘোষ

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও অমৃতবাজার পত্রিকার বাণিজ্য-সম্পাদক নির্মলচন্দ্র ঘোষ ১ই মাঘ ৬৩ বছর বয়েসে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু ঐ বৃত্তি কোন দিন গ্রহণ করেন নি। ১৯২৫ সালে ইনি সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে ইনি অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন। ইনি ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার একজন পরিচালক ছিলেন এবং ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির সভাপতি ছিলেন, বেঙ্গল প্রেস-য়্যাডভাইসারি কমিটিরও এক জন সভ্য ছিলেন। যুগান্তরের প্রতিষ্ঠাকালে ইনি তার ম্যানেজার ছিলেন মৃত্যুকালে তার পরিচালক-মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য ছিলেন। এ ছাড়াও আরও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শ্যামাপদ রায়

কলকাতা হাইকোর্টের জীবিত জ্যেষ্ঠ ব্যারিষ্টার শ্যামাপদ রায় ৮ই মাঘ ৮৬ বছর বয়েসে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আন্দুল মহীয়াড়ীর স্বনামধন্য জমিদার স্বর্গীয় রায়-বাহাদুর কালীপ্রসন্ন রায়ের ইনি মধ্যম পুত্র ছিলেন।

তুলসীচরণ রায়

বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি তুলসীচরণ রায় ৭ই মাঘ ৭২ বছর বয়েসে প্রাণরক্ষা করেছেন। কলকাতার পৌরসভার কাউন্সিলারপদও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে।

রাণীবালা দেবী

বাঙলার প্রথিত-যশা অভিনেত্রী রাণীবালা দেবী গত ১১শে মাঘ মাত্র ৪২ বছর বয়েসে দেহান্তরিতা হয়েছেন। সুদীর্ঘ ২৭ বছর ধরে স্বীয় অভিনয়কুশলতায় বাঙলার অভিনয় জগতকে ইনি সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন। ১৯৩১ সালে নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমারের শিক্ষাধীনে রাণীবালার অভিনয় জীবন শুরু হয়। স্বর্গতা নীহারবালাও এঁকে অভিনয় সম্বন্ধে পাঠ দেন। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ মিশ্রের কাছে ইনি সঙ্গীত অধ্যয়ন করেন। বহু নাটকে ও বহু ছবিতে এঁকে দেখা গেছে। রাণীবালার সম্প্রতিকতম চিত্র "পরশপাথর" গৌরবের সঙ্গে বর্তমানে প্রদর্শিত হচ্ছে। এতে নায়িকার ভূমিকায় তিনি অপূর্ব অভিনয়ে দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করেছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

বিদেশী কুকুরপ্রীতি কেন?

বাঙালী জাতির আন্তর্জাতিক খ্যাতি লুপ্ত হ'তে বসেছে—গত দশ বছরের মধ্যে। শিক্ষা দীক্ষা, শিল্পবিজ্ঞান ও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীর একনায়কত্ব—আর কি কল্পনা করা যায়? ইংরাজ আমলে অধিকাংশ উচ্চপদের কাজে বাঙালীর একচেটিয়া অধিকার কেউ খর্ব্ব করতে পারেনি। সর্ব্ব ধরণের প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বাঙলার সম্মান রক্ষা হয়েছে শীর্ষস্থানে। কেবলমাত্র বুদ্ধিবলে বাঙালী পৃথিবীর সকল দেশেই সসম্মানে স্থান পেয়েছে। বাঙালীর বাহুবলের পরিচয় বিস্তারিত দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই। পুরাকালের কথা বাদ দিয়ে ইংরাজ আমলকে ধরলেও সেযুগের 'বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট'এর দক্ষতা ও শক্তিসামর্থ্য যুদ্ধ-ইতিহাসের পাতায় চিরকাল লেখা থাকবে। বাঙালী সেনানায়কের আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠন পরিকল্পনায় শিউরে উঠেছে রাজদণ্ডধারী ব্রিটিশ সিংহ। মণিপুরে ইম্ফলে মুক্তিফৌজের ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের গৌরবোজ্জল কাহিনীও যুদ্ধ-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে। কিন্তু বর্তমান কালে বাঙালী জাতির অধঃপাতের ইঙ্গিত প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। অধুনা বাঙলা দেশে যথার্থ ও যোগ্য দেশনেতার একান্তই অভাব। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দলপতিদের খেয়াল খুশীতে প্রায় অকেজো বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। বাঙলা দেশে আজ নেতা নেই, নেই কোন গণ-আন্দোলনের সুসংবদ্ধ প্রোগ্রাম। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাঙলা দেশের তথাকথিত নেতা ও নেত্রীগণ বাঙলা দেশের স্বার্থ রক্ষায় আর তৎপর নয়। তাঁদের দৃষ্টি বহির্ভারতের আদর্শের প্রতি সীমিত। বিদেশের স্বার্থ দেখেন আগে, তারপর স্বদেশের কথা চিন্তা করেন তাঁরা। আইক আর ক্রুশ্চেভ-এর কথা তাঁদের কাছে আজ গীতার উক্তির সমতুল্য। আদর্শ দেশ বলতে আমেরিকা আর রাশিয়া ছাড়া আর কিছু নেই। লেনিনের মত লিঙ্কনও গুলীবিদ্ধ হয়েছিলেন। মৃত্যুর পর ষ্টালিনের দশা যা হয়েছে তাঁর স্বদেশে—কোন সভ্যজাতি তা হয়তো কল্পনা করতে পারে না। কালকের ষ্টালিন ও আজকের ক্রুশ্চেভের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখা যায় না। বুদ্ধিমান ক্রুশ্চভ ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে বললেও প্রকারান্তরে তিনি নিজেকে সেই পূজার দেবতারূপেই প্রকাশ করছেন। এবং বলতে বাধা নেই তাঁর অবর্তমানে ষ্টালিনের মতই হয়তো হাল হবে তাঁর। অর্থাৎ পদে পদে নাজেহাল হ'তে হবে। ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের মাঝে রাশিয়ার মত আমেরিকা তাণ্ডবের বাহুখেলা দেখাতেই ব্যস্ত। স্পুৎনিক দেশ আক্রমণের একটি মাধ্যম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু ঘূর্ণায়মান উপগ্রহ কি কোন' দেশের মানুষের চিত্ত জয় করতে পারবে? দেশ আক্রমণ এবং দেশের মানুষের মনকে জয় করা এক ধরণের কাজ নয়। যাই হোক বিদেশের কুকুরদের বাঙলার রাজনৈতিক নেতারা যদি দেবতারূপে পূজা করতে থাকেন, তবে তো দেশের ঠাকুরদের আর কোথাও ঠাঁই হয় না। এখনও সময় আছে। বাঙালী জাতি যদি আত্ম-অনুসন্ধানে না প্রবৃত্ত হয় এখনও—ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। আমাদের দেশের তথাকথিত নেতারা কি অবহিত হবেন?—শ্রীমতী মালা ঘোষচৌধুরী। রেঙ্গুন।

আর আস্থা নেই
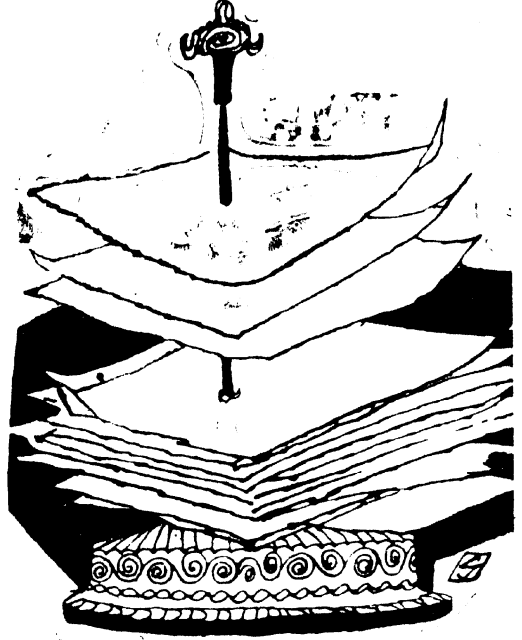
কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। পঙ্গু আর বিকলাঙ্গের নাম নীলমণি বা মদনমোহন। চোর জোচ্চোরের নাম শ্রীকৃষ্ণ। স্বাধীন ভারতবর্ষে এখনও আরও কত কি দেখতে হবে তা স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন। কমনওয়েলথভুক্ত ভারত সরকারের কীর্তি ও কীর্তিমানদের অপকীর্তিতে ভারতের সম্মান আজ ক্ষুণ্ণ হ'তে চলেছে। জীবনবীমা কর্পোরেশনের টাকা জনসাধারণের। জীবনবীমা জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার উপরি-উক্তদের সাহায্যে দেশের অর্থনীতিকে কোথায় ঠেলে ফেলেছে, ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে। যে দেশের অর্থমন্ত্রী চুরি জুয়াচুরিকে স্বেচ্ছায় ও স্বার্থের খাতিরে প্রশ্রয় দিতে পারে সে দেশের সরকারের পতন কামনা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে! দেশবাসীর কষ্টার্জিত মুদ্রা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে মুন্দ্রা কোম্পানী। চুরির-দায়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু সন্ধান করলে সরকারের পক্ষপুটে মুন্দ্রাসম আরও যে কতজন আছেন তাদের উল্লাস মিলতে পারে। আমাদের অনর্থমন্ত্রীর অকাল বিদায়ে ভারতের ভাগ্যবিধাতা জওহরলালও কাঁদুনি গেয়েছেন। কৃষ্ণমাচারীর মত কাজের লোক নাকি ভূভারতেও আর একটিও নেই। আমি শুধু ভাবছি, বিদেশী সরকার ভারতবর্ষকে আর টাকা দিতে সাহস পাবে কি? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কতদূর অগ্রসর হবে! Dishonesty is the best policy যাঁদের কাছে একমাত্র শ্লোগান—তাদের প্রতি দেশের মানুষ আর কত কাল আস্থা রাখবে? অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবে তেমন দলও আর নেই। সুতরাং চুরি জুয়াচুরি থামবে কি—অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগের পরেও?—রেণুকা চক্রবর্তী। ডিগবয়। আসাম।

হ রে ক র ক ম বা

'কালচার' বলতে কি বোঝা যায়? কলকাতা তথা পশ্চিম বাঙলায় কিছুকাল ঘোরাঘুরি করলে বাঙালীর কালচারের জন্য আর কেউ গর্ব্বে বুক ফুলাতে পারবেন না, হলফ ক'রে বলতে পারি। পার্কের পাশে খাদিভাণ্ডারের পাশেই মদের দোকান, মন্দির মসজিদের

আশপাশেই পতিতালয়, পাঠশালা আর বিদ্যালয়ের পাশেই ছায়াছবির প্রেক্ষাগৃহ। দেওয়ালে দেওয়ালে মহাপুরুষের আবির্ভাব উৎসব জয়ন্তীর বিজ্ঞপ্তির পাশেই নাগিশ-বৈজয়ন্তী-সুচিত্রার রঙীন ছবি—গায়ে আবার জামার বালাই নেই। শুধু কাপড়ে যতদূর ঢাকা পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় লৌহমানবের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি গত কয়েক বছরে দেশের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন ক'রেছেন! কিন্তু এবম্প্রকার জগাখিচুড়ী অবস্থার যদি বিলোপ সাধন তিনি না করেন, তবে তাঁর সকল চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া হবে। তাঁর সংস্কারকার্য্য বিফল হবে। তিনি কি আমার বক্তব্যে কর্ণপাত করবেন? —মালবিকা রায়। কান্দি। মুর্শিদাবাদ।

পত্রিকা সমালোচনা

মাসিক বসুমতী আমার অত্যন্ত প্রিয় পত্রিকা। আমার ধারণা এমন সর্ব্বরুচি সমন্বয় আর কোন পত্রিকায় নেই। সাধারণতঃই পত্রিকা মারফত কোন না কোন দলনীতি প্রচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু আপনার পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব কোন মুখস দলাদলি নেই।

মাসিক বসুমতীর অন্যতম অর্থাৎ এর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ। এগুলি জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণ তো করেই উপরন্তু পথ ভ্রান্তকে পথ নির্দ্দেশ করে। যেমন—'চারজন'এর কত বিখ্যাত ও প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর কথা পড়ে যখন জানতে পারি তাঁরাও আমাদের মতই সাধারণ ও সামান্য থেকে নিজের চেষ্টায় অসাধারণ ও অসামান্য হয়েছেন তখন উৎসাহ বোধ হয় প্রচুর। তারপর ব্যবসা-বিমুখ বাঙ্গালীকে আপনারা ব্যবসা করতে উৎসাহ দিয়েও কম কৃতজ্ঞতা ভাজন হচ্ছেন না দেশবাসীর।

প্রতি সংখ্যায় অনেকগুলি উপন্যাস ও অনুবাদ সাহিত্য পরিবেশিত হয় আপনার পত্রিকায়। সব সময় সবগুলিই যে আমার মনমত হয় তা বলছি না তবে আপনার সম্পাদনার প্রশংসা করি কারণ বিভিন্ন রুচির লোক এই প্রবাদ স্মরণ করেই আপনি নিশ্চয় এমন বিভিন্ন সমাজ ও সমস্যা তুলে ধরেন।

ভবিষ্যতে আরও বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইলো। একটা বিষয় শুধু বলি 'ছোটগল্পের' প্রতি আপনি আর একটু নজর যদি দেন তো ভাল হয়।

অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে কিন্তু অক্ষম লেখনী প্রকাশ করতে পারছে না। শুধু এইটুকু বলেই চিঠি শেষ করছি আপনার সম্পাদিত মাসিক বসুমতী যন্ত্রণাকাতর রোগীর সান্ত্বনা, নিঃসঙ্গের সঙ্গী। কামনা করি আপনার সুদক্ষ সম্পাদনায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক। বাঙ্গালার শিল্প ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন রূপে এই পত্রিকা চিরদিন অম্লান থাকুক।—বীথি মুখোপাধ্যায়। রাসবিহারী এভিনিউ। কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

I am sending herewith Rupees ten and fifty N. P. as advance subscription for M. Basumati. kindly despatch the same to the address given below.—Capt. R. N. Sanyal, Hq. 19, Infantry Brigade.

Kindly send *Monthly Basumati*.—*C. C. Mukherjee, Civil Lines. Raipur. M. P.*

পনেরো টাকা পাঠাইলাম। আমাকে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা শ্রেণিভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন। প্রতি মাসে রীতিমত কাগজ পাঠাইবেন।—শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা নাহা। নাহা-ভবন। উলুবাড়ী, গৌহাটি, আসাম।

মাসিক বসুমতীর গ্রাহকমূল্য পাঠালাম। যথাশীঘ্র পত্রিকা পাঠাবেন।—Sm. Aruna Bor. Maynaguri, Jalpaiguri.

সডাক মূল্য পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাতে বিলম্ব করবেন না।—শ্রীমতী শান্তি লাহিড়ী। ১, ক্লাইভ রোড, কাণপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ টাকা পাঠালাম। সবশেষে প্রকাশিত সংখ্যা থেকে আমাকে গ্রহণ করবেন।—বিশ্বরঞ্জন সাহা। S. A. S. Training school. Nagpur

Subscription in advance for Masik Basumati is sent herewith. Please continue to send regularly.—Sm. Sulekha Roy. Ambarnath.

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠালাম। পত্রিকা নিয়মমত পাঠাতে অন্যথা করবেন না। নমস্কারসহ—শ্রীমতী বাসন্তী ভট্টাচার্য্য। S. N. 51808.

মাসিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহিকা হ'তে চাই। কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে মাসিক বসুমতী চাই।—কণিকা দত্ত। সম্বলপুর, উড়িষ্যা।

Subscription for Monthly Basumati, Please send at the following address—Kumari Diparani Banerjee. Dandinhat. 24 Parganas.

মাসিক বসুমতীর এক বছরের গ্রাহকমূল্য মণিঅর্ডার যোগে পাঠানো হইল।—Secretary. W/Jkd. Colliery Institute, Surgiya M. P.

পনেরো টাকা পাঠাইলাম। আশ্বিন সংখ্যা থেকে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—জি. মাহাতো। 52146.

পত্রিকার গ্রাহকমূল্য পনেরো টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা নিয়মিত যেন পাঠানো হয়। Sm. Mira Debi. Indu Nibas. Hasanpur Chak, Patna.

কর্মব্যস্ততার জন্য টাকা পাঠাতে দেরী হয়েছে। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাবেন।—শ্রীমতী ইলারাণী পাল। শঙ্কর শেঠ রোড, পুণা-২।

Sending herewith subscription. Send copy at your earliest—Mrs. Namita Das Gupta. M. 47830.

পত্রিকার বাকী মূল্য পাঠালাম। পত্রিকা যথাশীঘ্র পাঠাইবেন।—শ্রীউষা দেবী। ৪৭১১৫।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ টাকা পাঠাইতেছি।—শ্রীযশোদারাণী চোংদার। ৪৩০৭১।

মণি অর্ডার করিয়া টাকা পাঠালাম। প্রাপ্তি জানাবেন।—মিনতি বসু। Hirakud Colony. Sambalpur, Orissa.

মাসিক বসুমতীর নতুন গ্রাহক করিয়া চলতি মাস হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন।—Sm. Renuka Rani Bera. Pataspur, Midnapur.

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

টাটার ও-ডি-কোলন সাবান
এখন ক্রীম-ও-সোনালি রঙের মোড়কে
আগের চেয়ে আরো তাজা থাকে

TATA'S EAU DE COLOGNE Toilet soap

যেমন মিষ্টি গন্ধ তেমনি স্নিগ্ধ … নতুন অ্যালু-মিনিয়াম পাতে মোড়া ব'লে এখন আগের চেয়েও তাজা থাকে। **টাটার ও-ডি-কোলন** সাবান এখন আপনার মন কেড়ে নেবে… যখনই নেবেন, এর নতুন ক্রীম-ও-সোনালি রঙের মোড়কে একেবারে টাট্‌কা তৈরীর মতো সুগন্ধে ভরপুর জিনিসটি পাবেন।

কম খরচায়
স্নানের বিলাস
উপভোগ করুন!

টাটা অয়েল মিল্‌স
কোম্পানী লিমিটেড

ডিউমেক্স বেবী ফুড খাওয়ান

আধুনিক অলঙ্কার নির্মাণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী
এইচ, পি, সরকার
এণ্ড কোং
১২৫, এ,
বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ফোন • ৩৪-৪৮৪৮
HS

মাসিক বসুমতী

(জলরঙ)

শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী

॥ ফাল্গুন, ১৩৬৪ ॥

—কমল চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
HIMKALYAN
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যাণ ক্যাষ্টর অয়েল সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO

৩৬শ বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

ভারতের অবনতির কারণ

ক্ষত্রিয়গণ চিরকালই ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ, সুতরাং তাঁহারাই বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার সনাতন রক্ষক। দেশ হইতে কুসংস্কার তাড়াইবার জন্য চিরকাল তাঁহারা বজ্রবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, আর ভারতেতিহাসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলের অত্যাচার হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার অভেদ্য প্রাচীরস্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান আছেন।

যখন তাঁহাদের অধিকাংশ ঘোর অজ্ঞানে নিমগ্ন হইলেন, আর অপরাংশ মধ্য-এশিয়ার বর্বর জাতির সহিত শোণিতসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ভারতে পুরোহিতগণের অপ্রতিহত শক্তিস্থাপনে তরবারি নিয়োজিত করিলেন, তখনই ভারতের পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়া আসিল, আর ভারতভূমি একেবারে ডুবিয়া গেল—কখনও আর উঠিবেও না, যত দিন না ক্ষত্রিয় নিজে জাগরিত হইয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া অবশিষ্ট জাতিগণের চরণ-শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দেন। পৌরোহিত্যই ভারতের সর্বনাশের মূল। মানুষ নিজ ভ্রাতাকে হীনাবস্থা করিয়া স্বয়ং কি কখন হীনভাবাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারে ?

আমার মনে হয়, দেশের ইতরসাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির একটি কারণ।

শত শত শতাব্দী ধরিয়া লোককে মানবের হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদ সমূহ শিখান হইয়াছে ; তাহাদিগকে শিখান হইয়াছে—তাহারা কিছুই নহে। সমগ্র জগতের সর্বসাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে—তোমরা মানুষ নও। শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগকে এইরূপে ভয় দেখান হইয়াছে ; ক্রমশঃ তাহারা সত্য সত্যই পশুপদবীতে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগকে কখন আত্মতত্ত্ব শুনিতে দেওয়া হয় নাই।

হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না। আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরীব পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্মও এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক' ও 'ব্যবহারিক' নামক মত দ্বারা সর্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে। —স্বামী বিবেকানন্দ

ভারত-ইতিহাস
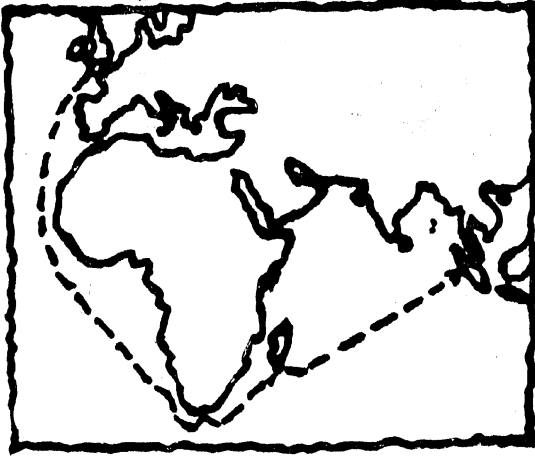
শ্রীবিনায়ক সেন

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন, কয়েক বৎসরের কথা—দশটি মাত্র বৎসর। এই দশ বৎসরের পূর্ব্বে মানুষ কল্পনায়ও আনতে পারতো না যে, ভারত একদিন স্বাধীন হবে! ইংরেজ যে ভাবে ভারতের ঘাড়ে চেপে বসেছিল, তাতে কেউ ভাবতেই পারেনি যে কালের অমোঘ নিয়মে তারাও একদিন হঠবে, ইংরেজ রাজত্বেও আসবে একদিন সূর্য্যাস্ত। ভারতবর্ষের দুঃস্বপ্নের তিনশ'টি বৎসরের পর ইংরেজের রাজদণ্ড আজ অপসারিত হয়েছে, তার গত একশ'টি বৎসর সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজত্ব, একশ'টি বৎসর কোম্পানীর! আর তার পূর্ব্বের একশ'টি বৎসর প্রস্তুতি, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় পঙ্গপালের আগমন এবং ভারতের মাটিতে তাদের নিজেদের ভেতরে হানাহানি মারামারি খাওয়া-খাওয়ী আর দেশী-লোকের অশান্তির দুঃখের ইতিহাস।

আজকের এই সহজ যানবাহনের দিনে পৃথিবীটা অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে, তার সুদূরতম দেশ একেবারে ঘরের দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে; অথচ তিন-চারশ' বৎসর আগেও এমন ছিল না। যার যার নিজের গণ্ডীর ভেতরে সে থাকতো আর বিদেশের সংবাদ যদি জানতো তা'শুধু জানতো ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে। এক দেশের উপজাত বস্তু বহু হাত ঘুরে আর এক দেশে গিয়ে হাজির হতো আর এই হাত বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের বর্ণনাও পল্লবিত হ'তে হ'তে পর্য্যবেশিত হ'তো হয় দেবালয়ে নয় দৈত্যালয়ে। ফলে সে দেশ ভালই হোক আর মন্দই হোক, লোকের কাছে হয়ে উঠত এক রহস্যঘেরা নিকেতন। পূর্ব্বদেশ অর্থাৎ চীন, ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, শ্যাম তেমনি চিরদিন পশ্চিমের কাছে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, পর্ত্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইতালীয় গ্রীসের কাছে ছিল সেই রহস্যময় পৃথিবীর সুদূর প্রত্যন্ত—যার সঙ্গে একমাত্র সংযোগ ছিল মধ্যমণি আরব ও পারস্য দেশের মাধ্যমে। পূর্ব্বজাত মাল পশ্চিমের বাজারে বিক্রী করতে তারাই ছিল একমাত্র কারবারী।

অতীতের পৃথিবীতে দু'টি দল চিরদিন দেশ-বিদেশে সব চাইতে বেশী ঘুরে বেড়িয়েছে। তার একটি হচ্ছে ব্যবসায়ী ও আর একটি দস্যুদল—জলদস্যুর দল, সমাজ যাদের ত্যাগ করেছে। ১২৯৫ সালে মার্কো পোলো আর তার বাবা ও কাকা ইউরোপের কাছে এত দিন অজানা পথে, চীন ও ভারতবর্ষের সংবাদ নিয়ে যায়। কিন্তু তার পরও তিনশ' বৎসর পর্য্যন্ত সে দেশের সঙ্গে সরাসরি কাজ-কারবার করবার কল্পনা কেউ করেনি। আরবী ও পারসী বণিকের উপরে নির্ভর করেই তারা খুসী ছিল। তবুও কেউ কেউ অজ্ঞাত অখ্যাত ভাবে জাহাজ ভাসিয়ে গিয়ে হাজির হতো বিদেশের কূলে, সে যাত্রা ছিল বিপদসঙ্কুল, জাহাজডুবির ভয় ও জলদস্যুর ভয় ছিল পদে পদে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে এমনি এক ভারতীয় মালে বোঝাই পর্ত্তুগীজ জাহাজ কেড়ে নেয় ইংরেজ দস্যুদল এবং তা' নিয়ে যায় লণ্ডনে। এই সব জলদস্যুরা যতক্ষণ বিদেশীকে লুণ্ঠন করত দেশের রাজা বা রাষ্ট্র তাদের কোন শাসন করত না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই রাজা নিজেই লুঠের মালের এক বৃহৎ অংশের বিনিময়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতাই করতেন। পর্ত্তুগীজদের এই জাহাজ ছিল হাতীর দাঁতের জিনিষ, কাপড়, মসলিন, সিল্ক, সিল্কের কার্পেট, মণিমুক্তা, মশলা এবং অন্যান্য শিল্প-সামগ্রীতে ভর্ত্তি। এ সমস্ত নিয়ে লণ্ডনের বাজারে রীতিমত প্রদর্শনী করে পূর্ব্বদেশের ঐশ্বর্য্যসম্ভার এবং উন্নততর বিলাসবস্তু দেখানো হয় বিলাতের জনসাধারণকে। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের বণিক সম্প্রদায়ের লোভ জেগে ওঠে এবং পরের বৎসর ক্যাপ্টেন জেম্স ল্যাঙ্কাষ্টার নামে এক নাবিকের অধীনে তারা বিলাতী মাল দিয়ে তিনখানা জাহাজ পাঠায় ভারতবর্ষের সঙ্গে সিল্ক ও মশলার ব্যবসা করতে। ইউরোপ তখন সিল্ক তৈরী করতে পারত না; কারণ ওটা যে পোকার সূতো থেকে হয় সেই কথাটা ওদের জানা ছিল না। আর মশলা বিলাতের মাটিতে হয় না, ওটা ছিল ওদের পক্ষে মহাবিলাস। গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচ বিলাতে বিক্রী হ'তো গুণে গুণে আর আদা, দারুচিনি বিক্রী হ'তো ডাক্তারের নিক্তিতে। এমনি উচ্চ মূল্যে মশলার স্বাদ মেটাতে হ'তো তখন ওদের!

তত দিন পর্য্যন্ত বিলাতী জাহাজ ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে তুরস্কের কনষ্টান্টিনোপল পর্য্যন্তই এসেছে এবং তাদের ব্যবসা ছিল আরবীদের সাথে। ল্যাভাণ্ট কোম্পানী বলে একটি সওদাগরী দল ছিল তখনকার বিলাতের বৃহত্তম কারবারী অফিস। মাদ্রে-ডি-ডিও'র (লুণ্ঠিত পর্ত্তুগীজ জাহাজ) লুঠের মাল দেখে বিলাতের জনসাধারণের ভেতরে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তারই বশবর্ত্তী হয়ে তারা রাণী এলিজাবেথের কাছে আবেদন পেশ করে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করবার অনুমতির। তাদের মতলব ছিল, সমুদ্র দিয়ে তাদের জাহাজ তুরস্ক পর্য্যন্ত নিয়ে এসে সেখান থেকে উট, ঘোড়া, গাধা ও গাড়ীতে করে মাল ভারতবর্ষে পৌছানো। এই ল্যাভাণ্ট কোম্পানীই পাঠায় ঐ ল্যাঙ্কাষ্টারকে।

কিন্তু মধ্য-এশিয়ার স্থলপথে ডাকাতের হাতে পড়েই এদের এই প্রথম প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যায়। ল্যাভাণ্ট কোম্পানী ভারতবর্ষের সঙ্গে

ব্যবসা করবার আর চেষ্টা করেনি। এর প্রায় দশ বৎসর পরে রাণী এলিজাবেথ আর একটি সওদাগরী দলকে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা করবার জন্ম পনেরো বৎসরের সনন্দ দান করেন। এই কোম্পানীই পরে "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে পরিচিত হয়। কোম্পানীর সনন্দ বার বার পনেরো বৎসর করে বাড়িয়ে দেওয়া হ'তো। ১৮৩৪ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্ট আইন করে এই পেটোয়া ব্যবস্থা রদ করে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ২৫৮ বৎসর ভারতবর্ষের সঙ্গে কারবার করেছিল। পৃথিবীতে এত বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আর তৈরী হয়নি।

প্রথম যে চারটি জাহাজ এই কোম্পানী ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিল, তাও ঐ দশ বৎসর পূর্ব্বের ক্যাপ্টেন ল্যাঙ্কাষ্টারের অধীনেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজা ও শাসনকর্ত্তাদের কাছে রাণী এলিজাবেথের চিঠি ও বিস্তর বিলেতী মালপত্র নিয়ে তারা ঝ'ড়ো ফেব্রুয়ারী মাসের দিনে টেমস্ ত্যাগ করে। এবার আর তারা কনষ্টানটিনোপলের পথে যায়নি। এরা সরাসরি আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষে আসবার মতলব, করে, ভাস্কো-ডা-গামা তার পূর্ব্বেই সে পথের সন্ধান দিয়েছে। টেমস্ থেকে রওনা হয়ে সাত মাস বাদে উত্তমাশা অন্তরীপে এসে তারা নোঙর ফেলল। তার আরও চার মাস বাদে এসে হাজির হলো মাডাগাস্কারের কূলে। তখন নাবিকরা শ্রান্ত, বিপর্য্যস্ত ও অসুস্থ। কাঠের জাহাজও ঝড়ে-জলে জীর্ণ। মাডাগাস্কারের কূলে তাদের তিন মাস থাকতে হয় জাহাজ মেরামত করতে ও নিজেদের ভগ্নস্বাস্থ্যও খানিকটা মেরামত করে নিতে। তার পর আবার ভেসে টেমস্ ত্যাগ করবার প্রায় পাঁচ মাস বাদে এক জুনের সকাল বেলা সুমাত্রার উপকূলে এসে এই বাহিনী নোঙর গাড়ে। সমুদ্রের বুকে জাহাজ চলার পথ তখনও সম্যক নিরূপিত হয়নি, তাই তারা ভারত মহাসাগরের ভেতর দিয়ে গেলেও ভারতবর্ষের ভূখণ্ডটা ধরতে পারেনি।

এত দিনের এত কষ্টকর এবং এত বিপজ্জনক যাত্রার পর স্বভাবতঃই মানুষ আশা করবে যে, তারা সেই পর্ত্তুগীজ জাহাজের মত সিল্ক, হাতীর দাঁতের জিনিষ, হীরা, মণি-মুক্তা নিয়ে দেশে ফিরবে! কিন্তু তা' না করে তারা দেশে ফিরল আরও দেড় বৎসর বাদে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড গোলমরিচ নিয়ে। দেশের সমস্ত গোলমরিচ ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছল তারা তাদের দেশে। যারা ব্যবসা করতে নেমেছিল তারা—ভাল ভাবেই জানতো তারা কি করছে। গোলমরিচ সে কালের ইংল্যাণ্ডের ধনী ও খাদ্য-রসিকের কাছে ছিল একটি বিশেষ বিলাস। ১৬০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একদিন ল্যাঙ্কাষ্টারের জাহাজ ফিরে গিয়ে যখন লণ্ডনের জাহাজ-ঘাটে ভিড়ল, কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত গোলমরিচ ঘাট থেকে উড়ে গেল কল্পনাতীত দামে! সত্যি কথা বলতে কি, সে প্রচেষ্টায় উদ্যোগকারীদের এত লাভ হয়েছিল যে এক বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীর আদেশে ল্যাঙ্কাষ্টারকে জাহাজ নিয়ে আর এক পত্তন পূর্ব্বদেশে আসতে হয় এবং আর একবার তাঁর সংগৃহীত গোলমরিচ লণ্ডনের জাহাজঘাটে বিক্রীত হয়ে যায় পূর্ব্ববারের মত লাভে।

পূর্ব্বদেশে তাদের তৃতীয় অভিযান আসে ক্যাপ্টেন কিলিং নামে এক নাবিকের অধীনে, প্রথম জেম্‌স্ তখন ইংল্যাণ্ডের রাজা। ভারতবর্ষে ইংরেজদের বাণিজ্যের সুবিধাদানের অনুরোধ করে তিনি পত্র দেন মোগল সম্রাটের কাছে। পর্ত্তুগীজরা তার আগেই এদেশে এসে পৌঁছেছে, এখন এই ইংরেজের আগমনে তাদের একটু টনক নড়ল। ফলে এই দুই দলে বহু বিরোধ, বহু সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত এ দেশে বাণিজ্যের আশা অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ ও ওলন্দাজদের হাতে ছেড়ে দিয়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে তারা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। ওলন্দাজ, ফরাসী ইত্যাদি অন্যান্য—ইউরোপীয়রাও তত দিনে ভারতবর্ষে আসতে আরম্ভ করেছে।

ইংরেজের এই বাণিজ্যসংস্থার আদি নাম ছিল, "ইউনাইটেড কোম্পানী অব্ মারচেণ্ট ভেনচারার্স অব্ ইংলণ্ড ট্রেডিং টু ইষ্ট-ইণ্ডিজ" কিন্তু এ নাম বেশী দিন থাকেনি। অল্পদিনের ভেতরেই এই গালভরা নাম পালটিয়ে শুধু "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী"তে রূপান্তরিত করা হয়। ভারতবর্ষের লোকের কাছে তা' পরিচিত হয়ে' উঠেছিল "জন কোম্পানী" বলে' এবং কোম্পানীর শেষ দিন পর্য্যন্ত সাধারণের কাছে তা' ঐ নামেই পরিচিত ছিল। এই নামকরণ হয় সেই ভারতাগত ইংরেজদের পরস্পরকে "জন" বলে' সম্বোধন করবার ফলে।

আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানী বেশ ফেঁপে উঠল আয়তন ও মর্য্যাদা দু'য়েতেই। তাদের নিজেদের জাহাজ তৈরীর কারখানাও তৈরী হলো বিলেতে এবং ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে পারস্য আরব ও আফ্রিকার কূলে কূলে তৈরী হয়ে উঠল বাণিজ্যঘাঁটির সুন্দর একটি শৃঙ্খল। এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এদের নিজেদের কারখানায় তৈরী প্রথম দুই জাহাজের নামকরণ হয়েছিল, "গোলমরিচ" ও "ব্যবসা বৃদ্ধি"—Pepper Corn ও Trades Increase। ব্যবসা আরম্ভ হবার কুড়ি বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর শুধু জাহাজ-কর্ম্মচারীর সংখ্যাই উঠেছিল আড়াই হাজারে আর জাহাজের স্থান সঙ্কুলান ছিল দশ হাজার টন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম বাণিজ্যকেন্দ্র তৈরী হয় সুমাত্রাদ্বীপের 'আচীন' নগরে। ১৬০১ সালে এর পত্তনী করে সেই পূর্ব্ববর্ণিত ল্যাঙ্কাষ্টার। এইখান থেকেই ধীরে ধীরে তাদের বাণিজ্যের সূত্রপাত হয় মালয়, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষে। ইংরেজ যেখানেই গিয়েছে মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই পেলেই প্রথমেই তৈরী করেছে একটি কেল্লা, ভারতবর্ষে এদের প্রথম কেল্লা তৈরী হয় মাদ্রাজ নগরে ১৬৪০ সালে। একশ' বছরের মধ্যে এই জন কোম্পানী এত ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে উঠল যে প্রয়োজনে এরা টাকা ধার দিতে লাগল ভারত সম্রাট ও ভারতের অন্যান্য রাজন্যদের। বিলেত ও ভারতবর্ষ দু' জায়গাতেই কোম্পানীর চাকরী হয়ে উঠল লোভনীয়, সম্মান ও লাভ দু'দিক থেকেই। বাংলাদেশের সে কালের বহু নামকরা ধনীর প্রথম ধনের সূত্রপাত হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী করেই; নয়তো কোন না কোন রকমে এই কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে।

প্রথম যখন ইউরোপীয়রা এদেশে এল, তারা এসেছিল ভাল মনে ব্যবসা করতেই। রাজত্বের কথা তাদের মনে হয়েছে পরে, সেটা নিতান্তই আবশ্যিক। মোগল সাম্রাজ্যে তখন ঘুণ ধরেছে, দেশব্যাপী অরাজকতা, অশিক্ষা আর গৃহবিবাদ, কর্ত্তারা বিলাস-ব্যসনে আর অত্যাচারে মত্ত, জনসাধারণ অসহায়। ইউরোপীয়রা পেল চষা জমি,

উদগত হয়ে উঠল তাদের ঔপনিবেবিক স্বার্থ। তাই তাদের নিজেদের ভেতরে কলহ আর কলহ, এ দেশবাসীর সঙ্গে। ধীরে ধীরে আর সবাই নতি স্বীকার করল ইংরেজের কাছে, ভারতবর্ষে মাতব্বর হয়ে উঠল ইংরেজ। তখন তারা এদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের একটা বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করেছে। তারই ফলে পলাশীর যুদ্ধ, মহীশূরের যুদ্ধ, কালিকটের যুদ্ধ, পাঞ্জাবের যুদ্ধ, ঝাঁসির যুদ্ধ। এমনি করে ভারতবর্ষের লোক যখন অস্থির হয়ে উঠেছে, তখন আজ থেকে এক শত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫৭ সালে একদিন আরম্ভ হয়ে যায় সিপাহীর যুদ্ধ। যদিও একে 'বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে সেই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার আন্দোলন। ইংরেজ যে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের গলা চেপে ধরছে ভারতবাসীর পক্ষে সেই চেতনার গভীরতম উন্মেষ। সে যুদ্ধ হয়ে যায় এবং সেদিনের বিলেতের রাণী—রাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনের ভার নিয়ে নিলেন নিজের হাতে। ইংরেজ ভাল করে ভারতবর্ষের ঘাড়ে চেপে বসল, ভারতবর্ষ বৃটিশের সাম্রাজ্যভুক্ত হলো। সাম্রাজ্যের অধীনে প্রথম বড় লাট হ'লেন লর্ড ক্যানিং, তারপরেই ধীরে ধীরে উঠে গেল 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' আরম্ভ হলো ইংরেজের অধীনে ভারতের জনগণের নূতন ভাগ্যেতিহাস।

তিনশ'টি বৎসর ১৬৫৭র কিছু আগে এদেশে এল ইউরোপীয় বণিকদল। টুপীওয়ালা ফর্সা ফর্সা মানুষ, তাদের জমকালো পোষাক আর 'টুনাপেট' 'টুনাপেট' ভাষা সেদিন দেশের লোকের কাছে ছিল ভারী একটা মজার ব্যাপার, বেশ একটা তাথবার সামগ্রী। আরও একশ'টি বছর, তারা ভারতবর্ষের পক্ষে হয়ে উঠল জঞ্জাল, ভারতবর্ষের একটা প্রদেশের শাসনকর্তা সেদিন বলেছিল, "ইংরেজ দেশ থেকে তাড়াতে দরকার হয় শুধু এক জোড়া চটি জুতা।" একথা বলবার মানুষ সেদিন দেশে ছিল এবং তখনও পর্য্যন্ত ইংরেজ ভারতবর্ষে ছিল মাত্র দোকানদার। ১৭৫৭ সালে হ'লো পলাশীর যুদ্ধ, সূত্রপাত হ'লো ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আরম্ভের। ১৮৫৭ সাল, সিপাহীর যুদ্ধ তৈরী হ'লো সে সাম্রাজ্যের পাকা বনিয়াদ, ৯০ বৎসর পরে ১৯৪৭ এ হ'লো যার শেষ। আজ ১৯৫৭, চলমান পৃথিবী চলেছে তার আপন খেয়ালে, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' আজকের এই চলার হিসেব নেবে অন্য লোক।

এই চাঁদ

মাধবী ভট্টাচার্য

পুরো চাঁদ নয়—আধখানা চাঁদ
মেঘের আড়ালে ঢাকা,
আধখানা তার কালোর কাজলে মাখা।
এই চাঁদ এ আজকের নয়
যুগ যুগ গেছে বয়ে,
এই চাঁদ সে আজকের মতো
মেঘের যাতনা সয়ে:
দিন দিন ধরে
তিল তিল করে—
কালোর কালিতে আঁকি
নিজেরে দিয়েছে ফাঁকি।

এই চাঁদ সে গত জনমে
হেরেছি নবীন প্রভাতে,
সূর্য্যের সাত রঙের ঝলকে
মরেছে আলোর আঘাতে।
এই চাঁদ ও রাত্রি বেলায়
হেসেছে আমার জীবন-খেলায়
আগামী জীবন-সূচনা কোরেছে
পেয়েছে বীণার সুঘাতে।

এই চাঁদ আমি দেখেছি এখন,
এই চাঁদ আমি দেখিব তখন:
এ জীবন-মাঝে তন্দ্রার সুখে
ঢলিয়া পড়িব যবে—
এই চাঁদ ও আজকের মতো
আমারে কি কথা ক'বে?

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচার

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু

[খুলনা কাড়াপাড়ার জমিদার অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ইতিহাসপ্রিয় সাহিত্যরসিক (অধুনা স্বর্গীয়) রায়সাহেব নিকুঞ্জবিহারী রায় একচেটিয়া ব্যবসায়ে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচার" এবং যশোহর খুলনার লবণ প্রস্তুত ও ব্যবসায়ের কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। শেষোক্ত ব্যবসায়ের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি বিজড়িত. সেই কীর্ত্তি এবং কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের ঐতিহাসিক স্মৃতি জাগ্রত রাখিতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন ও তাহা জনসমাজে প্রচার করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করেন এজন্য তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাবলী এবং কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান আমাকে দেন, তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে পুস্তিকা লেখা হয় ও ছাপার জন্য স্থানীয় একটি প্রেসের দ্বারস্থ হইতে হয়। প্রেসের ম্যানেজার খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি চাহেন, পরিতাপে বিষয় ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি দেন নাই, কপিও বাজেয়াপ্ত করেন। সে ১৮ বৎসর পূর্ব্বের কথা, দেশ আজ স্বাধীন, যে স্মৃতি লোপ পাইতেছে তাহা রক্ষা করিতে এবং স্বর্গীয় মনীষীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে ইহাই সংক্ষেপে প্রবন্ধাকারে প্রকাশের উদ্যম মাত্র। —লেখক]

লবণ, সুপারি ও তামাক

মানব সভ্যতার আদি হইতে খাদ্যের প্রধান উপকরণ হিসাবে লবণের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহা যে শুধু খাদ্যকে সুস্বাদু করে তাহা নহে, পরন্তু ইহা খাদ্যের অন্যতম উপাদান। আমাদের দেহের পুষ্টির জন্য, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন ষ্টার্চ ইত্যাদি যে সকল খাদ্যের প্রয়োজন তাহার মধ্যে খনিজ অন্যতম ; অথচ ইহার প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য নাই, এবং লবণ ব্যতীত অন্য কোন খনিজ খাদ্য আমরা গ্রহণও করি না। শরীরের পুষ্টিবিধানে এবং দেহযন্ত্রকে সচল রাখিবার জন্য লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য, অথচ এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সচেতন নহি। বলা বাহুল্য, খাদ্য হিসাবে ব্যতীতও অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যেও লবণ প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন—অনেক প্রকারের তরকারী শুকাইয়া রাখিতে, মৎস্যের পচন নিবারণে, লবণাক্ত মৎস্য প্রস্তুতে, মাংস, পনীর, মাখন ইত্যাদি সংরক্ষণে ; জ্যাম্ জেলি, আচার প্রভৃতি প্রস্তুতে। লবণের এই প্রকারের শিল্পজ ব্যবস্থায় নিতান্ত কম নহে, লবণ হইতে কষ্টিক ক্ষার হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সোডা কার্বনেট, সোডা ফসফেট, ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরিণ গ্যাস ইত্যাদি বহু দ্রব্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং লবণের ব্যবহার এবং প্রয়োজন যে অত্যধিক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই ; লবণ গোজাতির পুষ্টি সাধনের একটি প্রধান উপকরণ। গরুকে প্রচুর পরিমাণ লবণ খাইতে দিতে হয়, তাহা ইদানীং অনেকেই জানেন না। ইংরেজের একচেটিয়া লবণের ব্যবসায় এবং লবণকরের জন্য এই প্রথা আর প্রচলিত নাই, গরুর ভাগ্যে লবণ জুটিবে কি, এমন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র লোক আছে, যাহাদের এক মুষ্টি অন্নের সঙ্গে এক তোলা লবণ জোটে না, লবণসমুদ্রের কূলে বাস করিয়াও তাহাদিগকে অদৃষ্টের এই কঠোর বিড়ম্বনায় সম্মুখীন হইতে হইয়াছে !

হিন্দু রাজত্বে লবণের উপর কোন শুল্ক ছিল না, মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কালেও লবণ ব্যবসায়ে কোন করের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ফলতঃ হিন্দু মুসলমান রাজত্বে লবণের উপর কর গ্রহণ রাজনীতিবিরুদ্ধ ছিল।

দিল্লীর শেষ স্বাধীন বাদশাহ শাহ আলমের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিন্স মীর্জা আলী কদর সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করার অপরাধে ইংরেজের বন্দী হইয়া ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত রেঙ্গুনের নিকটবর্ত্তী সায়েজিন নামক স্থানে বন্দি-জীবন যাপন করিতেছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত ইঞ্জিনিয়ার নিকুঞ্জবিহারী রায় (পরে রায়সাহেব) প্রমুখ বঙ্গদেশের কতিপয় যুবক কার্য্যোপলক্ষে ব্রহ্মদেশে যাইয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত দেখা করেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া যুবকগণ ইংরেজ গবর্ণমেন্টের কর্মচারী বলিয়া পরিচয় দিলে প্রিন্স আলী কদর তাঁহার স্বভাব-সুলভ তেজস্বিতার সঙ্গে ইংরেজকে রাজার পরিবর্ত্তে বণিক বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছিলেন—রাজা কখনই লবণ, জল ও পায়খানার উপর ট্যাক্স ধরিতে পারে না। তিনি আরও বলেন, মুসলমান রাজত্বে মানবের অত্যাবশ্যকীয় ভগবানের এই সকল দানের উপর কখনই ট্যাক্স বসানো হইত না ; কিন্তু যে জমিতে লবণ প্রস্তুত হইত, তাহার খাজনা লওয়া কোম্পানীর সময় হইতেই লবণ-কর গ্রহণ আরম্ভ হয়। কাশ্মীরী, ভাটিয়া, গুজরাটী, মুলতানী, পাঠান, শেখ, পশরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক এই দেশে আসিয়া লবণের ব্যবসায় করিত।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুন তারিখে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-রবি চিরতরে অস্তমিত হয়। নবাব সিরাজদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু ক্লাইভই প্রকৃত দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, এই সময়েই কোম্পানীর কর্মচারিগণ অক্ষম দুর্বল নবাবকে বাধ্য করিয়া এ দেশের লবণ, তামাক ও সুপারীর বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম প্রচার করিয়া লয়েন।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী ভ্যান্সিটার্ট সাহেব কাউন্সিলের সদস্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে বাঙ্গালার মসনদে বসান। মীরকাশিম কার্য্যকুশল ও বুদ্ধিমান নবাব ছিলেন। নামে মাত্র নবাব থাকিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্য সহ্য করিবেন, এরূপ লোক তিনি ছিলেন না। সুতরাং কোম্পানীর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল। লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায় তাহার কারণ।

ইংলণ্ড হইতে লর্ড ক্লাইভ পুনরায় কোম্পানীর অধীনে গভর্ণর হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়া ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগকে লিখিলেন যে, কোম্পানীর সঙ্গে এবারের অসদ্ব্যবহারের প্রধান কারণ, লবণ, তামাক এবং সুপারীতে এবারের একচেটিয়া ব্যবসায়ে

কোম্পানীর হস্তক্ষেপ। ফলতঃ কোম্পানীর শাসনের সুব্যবস্থা করিতে হইলে, এই বিরোধের মীমাংসা করিতে হইবে, সুতরাং একচেটিয়া ব্যবসায়ের সংস্কার প্রয়োজন। ডিরেক্টরগণ লর্ড ক্লাইভের উপর মীমাংসার ভার দেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে আরও কয়েকজন সদস্য লইয়া লর্ড ক্লাইভ এক কমিটি গঠন করেন, সংস্কার উদ্দেশ্য করিয়া কমিটি গঠিত হইল বটে, কিন্তু এই সকল দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ের নামে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এস্থলে দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে মুদ্রিত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য তৎকালের ব্যবসায়ী এবং কলিকাতার মেয়র কোর্টের মাননীয় জজ মিঃ উইলিয়ম বোল্টস (Bolts) তাঁহার প্রণীত Consideration on Indian Affairs পুস্তকে অত্যাচারের রোমাঞ্চকর বিবরণ দিয়াছেন। লবণ, সুপারী এবং তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায়ের পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই তিনি লিখিয়াছেন :

We come across to consider a monopoly, the most cruel in its nature and most destructive in its consequences to the Company's affairs in Bengal of all that have of late been established there. Perhaps it stands unparalleled in the history of any government that ever existed on earth, considered as a public act ; and we shall be not less astonished when we consider the men who promoted it and the reason given by them for the establishment of such exclusive dealings in what may there be considered as necessaries of life—অর্থাৎ, আমরা এইক্ষণে একটি একচেটিয়া ব্যবসায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি যে, ব্যবসায় তাহার প্রকৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর এবং পরিণামে বঙ্গদেশে কোম্পানীর বিষয়কর্ম্মে ধ্বংসশীল। পৃথিবীতে এ যাবৎ যত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সাধারণ বিধি হিসাবে, তাহাদের ইতিহাসে ইহার বোধ হয় তুলনা নাই, যাঁহারা ইহার উৎসাহদাতা এবং মানবজীবনের এই অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠার কারণ, তাঁহারা যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে অত্যধিক বিস্মিত হইতে হয়।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট ফোর্ট উইলিয়মে মিঃ বি, ডবলু, বামার-এর সভাপতিত্বে যে কমিটি বসে, তাহাতে কতকগুলি মন্তব্য গৃহীত হয়। অন্যান্য বিষয় ব্যতীতও ইহাতে স্বীকৃত হয় যে, লবণ, সুপারী এবং তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইবার জন্য একটি কোম্পানী গঠিত হউক এবং বঙ্গদেশে এই সকল দ্রব্য যত পরিমাণেই আমদানী বা উৎপন্ন হউক, সমস্তই এই কোম্পানী কিনিয়া লইবে ; অন্য কেহ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ইহা বিজ্ঞাপন দ্বারা জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

কোম্পানী নবাবকে কমিটিতে রাখিয়া অথবা শিখণ্ডীস্বরূপ তাঁহাকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া প্রজাদের সর্ব্বনাশের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দেন। নবাবকে দিয়া দেশের জমিদারদের উপর পরোয়ানা জারি করা হইল, তাঁহারা অবিলম্বে কলিকাতায় যাইয়া কমিটির সহিত ব্যবসায় করিবার জন্য একরারনামা লিখিয়া দিবেন। ছোট-বড় প্রত্যেক জমিদারকে পুরুষানুক্রমিক জমিজমার স্বত্বভোগ করিতে এই কার্য্যে বলপূর্ব্বক বাধ্য করা হয়, জমিদারদিগের নিকট হইতে যে বাধ্যতামূলক একরারনামা বা মুচলেকা লওয়া হইত, তাহার একটি নমুনা এস্থলে ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল :

"নবাবের নিকট হইতে যে পরোয়ানা প্রাপ্ত হইয়াছি, তদনুসারে আমি—ইনজেলী জেলার দেরাহুমনা পরগণার শ্রীযদুরাম চৌধুরী অঙ্গীকার করিতেছি যে, কমিটি ও কাউন্সিলের ভদ্রমহোদয়গণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া লবণ ব্যবসায় সম্বন্ধে সমস্ত স্থির করিব অন্য কাহারও সঙ্গে ব্যবসায় করিব না। বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার লবণ, তামাক ও সুপারির ক্রয়-বিক্রয় এই কোম্পানীর সহিত করিব অন্য কাহারও সঙ্গে করিব না। তাঁহাদের বিনানুমতিতে এক দানা লবণও অন্যথাচরণ করিব না। আমার জমিদারীতে যে সমস্ত লবণ প্রস্তুত হইবে তাহা সমস্তই অবিলম্বে উক্ত কোম্পানীর নিকট পৌঁছাইয়া দিব এবং তাঁহাদের নির্দ্ধারিত মূল্য লইব। ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমি কোম্পানীর সরকারের নিকট প্রতি মণে ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে জরিমানা দিব।"

একটি পরোয়ানার নমুনা যথা—(দেশের একজন জমিদারের প্রতি পারস্যভাষায় লিখিত নবাবের আদেশের অনুবাদ, তাং···শুক্র। ···আগষ্ট ১৭৬৫)।

"জল্লামোস্তা পরগণার লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর গোমস্তার প্রতি। এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করান যাইতেছে যে গভর্ণর ও তাঁহার কমিটি এবং সভার ভদ্রমহোদয়গণ এই মর্ম্মে এক অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে লবণ তৈয়ারী সম্বন্ধে কোন চুক্তিপত্র ঠিক না করা পর্য্যন্ত লবণ তৈয়ারী ও কোন জেলায় লবণ রাখা নিষিদ্ধ থাকিবে, উক্ত ভদ্র মহোদয়গণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একজন গোমস্তা পাঠাইতে হইবে এবং একখানি অঙ্গীকারপত্র দিতে হইবে। অতঃপর তিনি তাঁহার এই ব্যবসায় চালাইতে এবং লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু গভর্ণর এবং তাঁহার কমিটি ও সভার ভদ্রমহোদয়গণের নিকট যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন অঙ্গীকারপত্র দাখিল করা না হইবে ততক্ষণ কেহই ইহা প্রস্তুত করিতে পারিবেন না, সুতরাং এই আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি অনতিবিলম্বে তোমার গোমস্তাকে উক্ত ভদ্র মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দাও এবং চুক্তিপত্র দাখিল করিয়া তোমার ব্যবসায় ঠিকমত বন্দোবস্ত করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ কর। বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইলে তোমার ভাল হইবে না। এই আদেশ বিশেষ জরুরী বলিয়া মানিয়া লইতে বলা হইতেছে (Bolts' consideration on Indian Affairs pp. 176-177)।"

এই প্রকারের আদেশ পরগণার সকল রাজা এবং জমিদারের প্রতি প্রদত্ত হয় এবং তাহাদের নিকট হইতে 'কড়ায় গণ্ডায়' কাজ আদায় করিয়া লওয়া হয়। এই ভাবে কোম্পানী এই তিনটি দ্রব্যের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লয়েন।

কোম্পানী ১০০ শত মণ লবণ ৭৫৲ টাকায় খরিদ করিয়া নানা স্থানে ৫০০৲ শত টাকা এবং ততোধিক মুদ্রায় বিক্রয় করিতেন। দরিদ্র প্রজাগণ এক টাকার লবণ ৬।০ টাকায় ক্রয় করিত।

গ্রন্থকার মিঃ বোল্টস বলেন—কমিটী দেখাইতেছেন, নবাবের নিকট হইতে লবণ, সুপারী এবং তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায় লওয়া হইয়াছে, কিন্তু নবাবের স্বার্থ ইহাতে সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াই লওয়া হইয়াছে। সমস্ত স্বত্বই নবাবের অথবা তাঁহাকে বার্ষিক নজরাণা দেওয়া হয়; অথচ ৩রা সেপ্টেম্বর যে সভা আহূত হয়, তাহার মন্তব্যের ৮ম ও ১০ম ধারায় বলা হইতেছে, কমিটী-নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা না মানিলে নবাবের কর্মচারিগণকে বিতাড়িত করা হইবে এবং নবাবের নাম করিয়া যে শুল্ক আদায় হইবে, তাহা কোম্পানীর তহবিলে যাইবে। ৬ষ্ঠ এবং ৭ম ধারা অনুসারে দ্বিতীয় বৎসরে লবণ কমিটী-নির্দিষ্ট মূল্যে প্রত্যেক সহর এবং গ্রামে বিক্রীত হইবে। কোম্পানীর লবণ ক্রেতাগণের মধ্যে যদি কেহ ঐ সকল স্থানের নির্দিষ্ট হারের এক কড়ি অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করে, তবে তাহার অধিকারে যে লবণ পাওয়া যাইবে, সমস্ত ত বাজেয়াপ্ত করা হইবেই, অধিকন্তু প্রত্যেক ১০০ শত মণ বিক্রীত লবণের জন্ম তাহাকে ৪০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হইবে। বাজেয়াপ্ত লবণ এবং জরিমানার টাকার অর্দ্ধেক কোম্পানীতে জমা দেওয়া হইবে, অপর অর্দ্ধেক সংবাদদাতা পাইবে। এই স্বেচ্ছাচারমূলক আইন অনুসারে কলিকাতার মদন দত্ত, শোভারাম বসাক এবং আরও অনেক লবণ ব্যবসায়ীকে বহু অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল। কমিটী জোর-জবরদস্তী করিয়াই এই টাকা আদায় করেন।

লবণ, সুপারী এবং তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায় হাতে লইবার সময়ে লর্ড ক্লাইভ যেমন কতকগুলি বাজে কারণ দেখাইয়াছিলেন, ইহাকে বহাল রাখিতেও ক্লাইভের পরিচালিত কমিটি সেইরূপ বাজে কারণ দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। নবাবের পূর্ণ স্বার্থ রক্ষিত হইবে, দেশীয় ব্যবসায়িগণের উপর সুবিচার করা হইবে, ইত্যাদি অনেক শূন্যগর্ভ অঙ্গীকার ইহার মধ্যে ছিল।

এই ব্যবসায়ের পরিণতি সম্বন্ধে মিঃ বোল্টস সর্ব্বশেষে বলিতেছেন—প্রত্যেক ব্যবসায়ী আমাদের সহিত একমত হইবেন যে, এইরূপ একটি একচেটিয়া ব্যবসায় দেশের জনসাধারণের এবং শিল্পদ্রব্যের ঘোর অনিষ্টকারী। আমরা ইহা অসঙ্কোচে ঘোষণা করিব যে, বাঙ্গালা দেশে যে ব্যবসায়ের অবনতি হইয়াছে এবং দেশ দুঃখ-দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে, তাহা এই একচেটিয়া ব্যবসা হইতে হইয়াছে।
(Bolts' Consideration on Indian Affairs page 185)

কি যে ভাবে ওরা

জয়ন্তী সেন

কি যে ভাবে ওরা দলে দলে
মাটির বুকের মত অরণ্যের প্রাচীন সত্তার
স্থিতিশীল মন নিয়ে আকাশের নিবিড় মানসে
ওরা করে আনাগোনা আকাশের একই সূর্য্যালোকে।
একই পৃথিবীর ছবি দুই চোখে প্রতিবিম্ব করে
প্রাচীন বসন্ত ঋতু পরিচিত পল্লবের প্রাণে
উচ্ছ্বসিত যে মুহূর্ত্তে তারি স্বপ্নে ওরা মুখরিত।
রিক্ততার তীর ছেড়ে পরিপূর্ণতার উপকূলে
ওরা যাযাবর চলে দলে দলে সুদূর সীমায়।
পৃথিবী ত এক নয়—ওরা ভাবে বিস্ময়-বিবশা
কোথায় নিষ্ফল হল হৃদয়ের পূর্ণ আয়োজন
কোথা স্বপ্ন আলোতে বিলীন
কোথা দুরাশার ডানা উড়ে উড়ে পালক ঝরানো

চিহ্নহীন ইতিহাস স্তব্ধ কোন নীল সরোবর
আবর্ত্তের আকস্মিক ঘূর্ণী বেগে উত্তাল অধীর
কোন নদী নিরুদ্বেগ শান্ত সমাহিত
পালকিক বদ্বীপের ধাত্রী-স্নেহে কোমল মানস
কোন স্রোত বালুতটে উত্তমের বিফল প্রয়াসে
সংঘাত মুখর ক্ষুব্ধ অবশেষে সত্বাহীন ঘুমে।
ওদের মনের দেশে পরিবর্ত কোন আলোড়ন
কভু দৃশ্যমান নয়—ওরা জানে এক নীলাকাশ
সব স্থিতিহীন ঝড় তুচ্ছ করে অপার অসীম
অনন্ত আনন্দলোক—মুক্তির পূর্ণতা আশ্বাস।
পাতালে ফেনিল ঢেউ ওঠে নামে ওরা মৌন মনে
দূরত্বের বাতায়নে খুলে দেখে কত কি যে ভাবে
তারপর অনায়াস কলোচ্ছ্বাসে ওরা ভেসে যায়
জীবনের আলো প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী ওদের ডানায়
আনন্দ-মুখর সুর—নীচে আর্ত্ত বিক্ষুব্ধ জগত
ফেনায় অনন্ত কুচি সূর্য্যালোকে জলে ঝিলমিল।
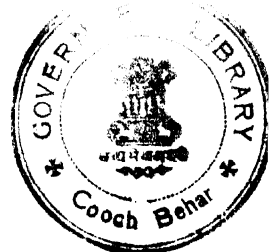
পরিমল গোস্বামী

চতুর্থ

৩

শনিবারের চিঠিতে সম্পাদকরূপে যোগ দিই ১৯৩২ সালের নবেম্বর মাসে। ডিসেম্বর ১৯৩২ বা পৌষ ১৩৩৯ সংখ্যা থেকে আমার নাম সম্পাদকরূপে ছাপা হতে থাকে। এর প্রায় দু বছর পরে ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর (ভাদ্র ১৩৪১) সংখ্যা থেকে কয়েক মাসের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমার নামের সঙ্গে ছাপা হতে থাকে সহকারী সম্পাদকরূপে। এ শুধু নামের জন্যই নাম, বিশেষ প্রয়োজনে। তারাশঙ্কর যে বেকার নয় চাকরি করছে, এটি দেখানোর দরকার হয়েছিল বিশেষ মহলে। তারাশঙ্কর তখন সন্দেহজনক চরিত্র, ব্রিটিশরাজের বিবেচনায় বিপজ্জনক। চাকরিতে আবদ্ধ থাকলে রাজদ্রোহের শয়তানিটা দমিত থাকে।

এর আগে তারাশঙ্কর চমৎকার একটি ব্যঙ্গ-গল্প লিখেছে শনিবারের চিঠিতে। গল্পটির নাম অ্যাও। এখানে লেখকের ছদ্মনাম হাবু শর্মা। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ (মাঘ ১৩৪১) সংখ্যায় আমি 'নূতন কাগজের প্ল্যান' নামক একটি ব্যঙ্গ-রচনা লিখি। সেটি ক্ষুদ্রাকার একটি সম্পূর্ণ মাসিক পত্র—১৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সেই উপমাসিকের গদ্য অংশ সবই আমার লেখা। কবিতা বিভাগে দুটি কবিতা, একটির লেখক তারাশঙ্কর, অন্যটির লেখক বনফুল। তারাশঙ্করের কবিতা রচনার হাত ভাল ছিল, কিন্তু সম্ভবত 'কমন সেন্স' দ্রুত উন্মেষিত হওয়াতে এ পথে আর বেশি দূর এগোয় নি।

শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর সঙ্গে এই সময় পরিচয় ঘটে। সে আন্দুল মৌরী থেকে ছবির গোছা নিয়ে কলকাতায় আসত মাঝে মাঝে। আমি এক গোছা রেখে দিয়েছিলাম। সবই কার্টুন ছবি। সেগুলো মাঝে মাঝে নিজেদের প্রয়োজন মতো পরিচয় দিয়ে ছাপা হত। সেই তার প্রথম প্রকাশ। শৈলর সেই প্রাথমিক শিল্পশৈলীর দ্রুত উন্নতি হয়েছে, এখন সে পাকা শিল্পী।

ভাগলপুরে কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য নামক লেখক এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়। তখনও তিনি ফরাসী দেশে গিয়ে অ্যাজেনিয়োর রূপে বেতনার্থের কাজে নামেন নি। প্রবাসীতে তখন তাঁর লেখা কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে, পরে ফ্রান্সে গিয়ে বঙ্গশ্রী ও শনিবারের চিঠিতেও লিখেছেন। তাঁর দেশে ফেরার পর ১৯৩৫ সালের কোনো সময় বলাই ভাগলপুর থেকে আমাকে এক চিঠিতে জানায় 'কপিল একখানা কাগজ বার করতে চায়, তোমার পরামর্শ দরকার।'

আমি ভেবে দেখলাম মফঃসল থেকে কাগজ বার ক'রে চালানো কাজের কথা নয়। তার চেয়ে কপিলপ্রসাদ যদি সজনীকান্তের সঙ্গে যোগ দেন, তা হলে শনিবারের চিঠিকেই আরও বড় ক'রে তোলা যাবে। শনিবারের চিঠি তখন ক্ষীণাঙ্গ ছিল এবং সজনীকান্ত বঙ্গশ্রী ত্যাগ করেছেন। (আমি যখন শনিবারের চিঠির ভার নিই তখন তার কিঞ্চিৎ দেনা ছিল, কিন্তু সে দেনা তখনকার কর্মকর্তা প্রবোধ নানের তিন বছরের চেষ্টায় শোধ হয়েও সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত দেখানো সম্ভব হয়েছিল।)

সজনীকান্ত ও কপিলপ্রসাদকে মিলিয়ে দিলাম। খুব উৎসাহ দেখা গেল কিছু দিন। ভিতরে ভিতরে কি ঘটল তা আমার জানবার দরকার ছিল না, কৌতূহলও ছিল না। দুইয়ের যোগাযোগের ফলে আমি শুধু প্রত্যক্ষ করলাম 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউসে'র পক্ষ থেকে কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত' 'বনফুলের কবিতা' ও আরও দু-একখানা বই প্রকাশিত হল এবং একখানি সাপ্তাহিক।

'বনফুলের কবিতা' (১৯৩৬)-এর ভূমিকাটি বেশ উপভোগ্য এবং এতে কিছু খবরও পাওয়া যাবে :

"আমার কাব্য-প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন বটুদা [সুধাংশুশেখর মজুমদার, সাহেবগঞ্জ], প্রবোধদা, [প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহেবগঞ্জ] ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীপরিমল গোস্বামী। নিরুৎসাহ দ্বারা পরোক্ষ ভাবে উৎসাহ দিয়াছেন অনেকে। তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নহে।

ইঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই অনশনের দেশে কবিতা প্রকাশের দুঃসাহসের জন্য সোদর-প্রতিম কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়েছি।

ভগবান আছেন।"—"বনফুল"

নতুন যে সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হল তার নাম হল

"নূতন পত্রিকা"—সম্পাদক নীরদচন্দ্র চৌধুরী। নীরদ বাবুর মতো মনীষী এবং অভিজ্ঞ সাংবাদিকের হাতে কাগজখানা একটি বিশেষ চেহারা পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন সুন্দর কাগজখানার পাঁচটি আবির্ভাবের পরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল। সম্ভবত টাকার অভাবেই, কিন্তু তাই বা কেন, সে রহস্য ভেদ করা আমার সাধ্য ছিল না। দুইটি চরিত্রই রহস্যময়। সজনীকান্তের রহস্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তার মধ্যে কৌতুক অংশ ছিল অনেকখানি, কিন্তু কপিলপ্রসাদের রহস্য খুব সীরিয়াস। পরমাণুর কেন্দ্রকে ঘিরে যেমন ইলেকট্রনেরা অতিবেগে ঘোরার ফলে বাইরে থেকে সে কেন্দ্রে পৌঁছানো দুঃসাধ্য, কপিলপ্রসাদের চার দিকে তেমনি তাঁর কথার ইলেকট্রন সমূহ প্রবল ঘূর্ণনের সাহায্যে তাঁর আবেষ্টনকে নীরেট এবং কঠিন ক'রে তুলেছে, ভিতরে প্রবেশের কল্পনাই করা যায় না।

নূতন পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র আজ চিত্তাকর্ষক বোধ হয়। (১) সম্রাট পঞ্চম জর্জ, রাষ্ট্রীয় জীবনে বস্তুতন্ত্রতা, কিপলিং—নীরদচন্দ্র চৌধুরী। (২) ইসলামি সভ্যতার স্বরূপ, সার যদুনাথ সরকার (৩) মার্জিন (রম্য রচনা) প্র-না-বি। (৪) জগদীশ সমীপে, অমল হোম, (৫) আঁটি (গল্প) মনোজ বসু। (৬) দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। (৭) কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসর (পুস্তক প্রসঙ্গ) নির্মলকুমার বসু। (৮) দাদু (সমালোচনা) সুকুমার সেন। (৯) কলিকাতা ষ্টেশনের প্রোগ্রাম (রেডিও) নলিনীকান্ত সরকার (নামের উল্লেখ ছিল না) (১০) নবনাট্য মন্দিরে রীতিমত নাটক (সমালোচনা) পরিমল গোস্বামী। পরবর্তী ৪ সংখ্যার লেখক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, অনাথনাথ বসু, বলাহক নন্দী (নীরদচন্দ্র চৌধুরী), গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বনফুল, চারুচন্দ্র চৌধুরী, অশোক মৈত্র, নির্মলকুমার বসু, হিরণকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, নলিনীকান্ত সরকার, সুকুমার সেন, সুকুমার বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

আমি এর প্রত্যেক সংখ্যাতেই লিখেছি। নীরদচন্দ্র প্রত্যেক সংখ্যায় অনেকখানি ক'রে লিখতেন। বলাহক নন্দীর ছদ্ম নামে তিনি চমৎকার একটি ব্যঙ্গ রচনা লিখেছিলেন। তিনি বর্তমানে ইংরেজী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় কিছু লেখেন কি না জানি না, কিন্তু বাংলায় লিখলে বাংলার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হত নিশ্চয়।

নীরদ বাবুর নূতন পত্রিকার সেই ব্যঙ্গ রচনাটির নাম 'গরুর গাড়ি ও রবারের টায়ার।' রচনাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করি।

"গত বৎসর ঠিক এমনই দিনের কথা। গড়ের মাঠ হইতে বাড়ীর দিকে ফিরিতেছি, হঠাৎ সামনে রশিখানেক দূরে একটা নূতন ধরণের যান চোখে পড়িল। শীতশেষের মিহি উড়ানীর মত কুয়াসা চারি দিক অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, তার উপর গাড়ীটা আগাইয়া যাইতেছে, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টার পর লক্ষ্য করিলাম গাড়োয়ানের দুই পাশে দুই জোড়া বাঁকানো শিং। সুতরাং কোন জাতীয় প্রাণী গাড়িটি টানিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এই যানটির মধ্যে গরুর গাড়ীর সেই ঝাঁকুনি, ধ্বনিবৈচিত্র্য বা অসমান গতি খুঁজিয়া পাইলাম না। যে গরুর গাড়ীতে কার্ষপণ বোঝাই করিয়া অনাথ পিণ্ডদ জেতবন ঢাকিয়া দিয়াছিলেন,' যে গরুর গাড়ীকে ভারুত স্তূপের রেলিং-এ উৎকীর্ণ দেখিয়াছি, যে গরুর গাড়ীর কথা আলালের ঘরের দুলালে পড়িয়াছি, যে গরুর গাড়ী কলিকাতার রাস্তায় ট্রাম লরী ও মোটর গাড়ীকে স্পর্ধা করিয়া বিরাজ করিতেছে, যে গরুর গাড়ী তার দেহ ও মনের স্বাতন্ত্র্য যুগে যুগে অপরিবর্তিত রাখিয়াছে, যে গরুর গাড়ী সনাতন হিন্দু সমাজের প্রতীক না হইলেও একমাত্র সমধর্মী, তাহার সহিত এই নব্যপন্থী যানটির সাদৃশ্য ছিল না। বরঞ্চ সনাতনপন্থীরা দেখিলে দুঃখিত হইতেন, উহার নীচের দিকটা হুবহু এয়ারোপ্লেনের নীচের দিকটার মত। এ যেন নামাবলী-পরা পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্টনের বুট-পটি আঁটিয়া চলিয়াছে।...

জিনিসটি মনে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই পরেও উহার কথা অনেক ভাবিয়াছি। সেই রবার টায়ারওয়ালা গরুর গাড়ীর ছবি কল্পনার চোখে ভাসিয়া উঠিলে প্রথম প্রথম বড় বিসদৃশ ঠেকিত, মনে হইত কেহ যেন হার্মনি যোগ করিয়া ধ্রুপদ গাহিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, গরুর গাড়ীতে টায়ার যোজনা বর্তমান ভারতীয় সভ্যতার একেবারে গোড়ার কথা।... আমরা ভারতবর্ষকেও ছাড়ি নাই, ইউরোপকেও ছাড়ি নাই; এ দুয়ের...ব্যাঘ্র ও বৃষভের সমন্বয় করিবার জন্য বিজ্ঞান ও বেদান্তের লোয়েষ্ট কমন্ ফ্যাক্টর বাহির করিয়াছি। আজ যদি আমাদের কেহ জিজ্ঞাসা করে কি চাও...আর যদি আমাদের চাওয়া-না-চাওয়ার স্বাধীনতা থাকে, তবে যে আমরা ষোল আনা মোটর না লইয়া মোটরের এক আনা লক্ষণযুক্ত গরুর গাড়ী লইব, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কি?

"বোধ করি এত বড় একটা কথার প্রমাণ চাহিবেন। দিতেছি। যদি 'পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্' এই প্রাচীন বাক্যটিতে পিতাদের মনোবাঞ্ছার প্রকৃত ইঙ্গিত থাকে তবে এ যুগের সূতা কাটিবার কলের নিকট হার মানিয়া চরকার নিশ্চয়ই গর্বভরে বিদায় লইবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহাকে যাইতে দিতেছি কৈ? শুধু যাইতে না দিলেও কথা ছিল না, হতভাগ্য বৃদ্ধকে আমরা আমাদের অনেকের হতভাগ্য বৃদ্ধ পিতার মত সংস্কারও করিতে চাহিতেছি।...

"গরুর গাড়ী ও রবার টায়ার—যেন হার্মনি যোগ করিয়া ধ্রুপদ গাহিবার চেষ্টা..."

"আজ হলিউড ও কালীঘাট মিলিয়াছে। ছিন্নমস্তা পর্দার উপর নাচিতেছেন, শঙ্কর ক্যামেরার সহায়তায় দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতেছেন। ইহাই ত সিনথেসিস—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন।"

নীরদ বাবু সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি। আমি এ সময়ে প্রবাসীতে লিখতে শুরু করেছি, প্রবাসীর পুস্তক সমালোচনাও করছি নিয়মিত। এই বিভাগে ইউরোপ ভ্রমণ সংক্রান্ত একখানা বইএর আমি সমালোচনা লিখি। বইখানা প'ড়ে আমার যা মনে হয়েছিল খুব সংযত ভাবে তাই লিখেছিলাম। আমার বক্তব্য মোটামুটি ছিল এই যে—ভ্রমণ কাহিনী নানা ভাবে লেখা যেতে পারে। অল্প দিন ভ্রমণ ক'রে বাইরের ধারণা থেকে, বেশি দিন বিদেশে বাস ক'রে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, অথবা বিদেশে আদৌ না গিয়ে ঘরে বসে রেফারেন্স বই খুলে কল্পনার সাহায্যে। আলোচ্য বইখানি প'ড়ে মনে হয়, এ বই লেখার জন্য বিদেশ ভ্রমণ অত্যাবশ্যক ছিল না, ঘরে বসেই লেখা যেত। তথ্যের দিক দিয়েও কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়ল।

এই সমালোচনা প্রকাশের কিছু দিনের মধ্যেই প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে উক্ত গ্রন্থকারের লেখা একখানা চিঠি পাঠিয়ে সেই চিঠির জবাব চাইলেন আমার কাছে। চিঠিখানা প্রবাসী-সম্পাদকের নামে লেখা। লেখক অভিযোগ করেছেন—'দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচককে আপনারা বই দিয়েছেন কেন', ইত্যাদি।

আমি তৎক্ষণাৎ নীরদ বাবুর শরণাপন্ন হলাম। বইখানা পড়ে মনে এমনিতেই বিতৃষ্ণা জেগেছিল, তার উপর লেখকের ঐ চিঠি, অতএব উপযুক্ত জবাবের জন্য মনে প্রেরণা জাগল এবং জাগল নীরদ বাবু আছেন জেনেই। আমার অভিজ্ঞতায় এই একটিমাত্র ব্যক্তিকেই জানি, যিনি ইউরোপে না গিয়েও ইউরোপের সকল বিভাগের সকল খবর জেনে ব'সে আছেন। (নীরদ বাবু অনেক পরে ইউরোপে গেছেন।)

কিন্তু নীরদ বাবুকে বই দেওয়ার পর প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে তাঁর দেখা না পেয়ে চিন্তিত হলাম। দু' একবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনেছি, বাড়িতে নেই। তখনও জানি না, তাঁর নিরুদ্দেশের কারণ ঐ বইখানা। তিনি ওতে শত শত তথ্যের ভুল বার ক'রে মহা উত্তেজিত অবস্থায় বইখানা বরানগর থেকে বালিগঞ্জের যাবতীয় বন্ধুকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন।

অবশেষে এক দিন তিনি আমার কাছে এসে সব বললেন এবং নির্দেশ দিলেন, ভুলগুলোর শ্রেণী বিভাগ ক'রে সাজাতে। ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রতি পৃষ্ঠায় তিন কলম ক'রে সাজানো হল বিভিন্ন নামে। ইতিহাস বিষয়ে ভুল, ভূগোল বিষয়ে ভুল, নামে ভুল, প্রাচীন চিত্রাদির অবস্থান উল্লেখে ভুল, এবং সর্বশেষ রুচিহীনতা। যতদূর মনে পড়ে, তিন-চার শীট লেগেছিল মোট। একখানি চিঠিসহ এই তালিকা রামানন্দ বাবুকে পাঠিয়ে দিলাম। সম্ভবত তিনি এ তালিকা গ্রন্থকারকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কেন না এর পরে সব চুপ। কিন্তু নীরদ বাবুর মনে যে উত্তেজনা জেগেছে, তাতে তিনি চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। তিনি এই জাতীয় বইএর বিরুদ্ধে একটি রচনা লিখে আমাকে দিলেন, আমি সেটি শনিবারের চিঠিতে ছেপেছিলাম। সেটি হিংস্র আক্রমণ। 'শ্বশুরের টাকায় অনেকেই বিলেত যায়'—ইত্যাদি।

কবি অজিত দত্তের সঙ্গে এই সময়েই পরিচয় হয়। তখন তিনি অধ্যাপক এবং এতদিন পরে পুনরায় অধ্যাপক, মাঝখানে স্কুলপালানো ছেলের মতো বেরিয়ে গিয়ে নানা পথে ঘুরে এলেন। গ্রন্থপ্রকাশকও হয়েছেন তিনি। অনেক লেখকই এখন প্রকাশনার পথে নেমে সুখ বোধ করছেন মনে হয়। সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, গজেন্দ্র মিত্র, সুমথ ঘোষ ইত্যাদির নাম এই সঙ্গে যোগ করা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একদিন আমাকে বলেছিল সে নিজে নিজের বই ছাপছে। একদিন চেঁচিয়ে বলেছিল, শুধু আমি নই, এ পথে সবাইকে নামতে হবে।

সব দেশেই লেখকদের চেয়ে প্রকাশকেরা ধনী। বিলেতি একটি গল্প মনে পড়ল। একটি মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে তার বান্ধবী তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল, "ছেলেটিকে প্রকাশক মনে ক'রে তার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলাম, পরে জানতে পারলাম সে শুধুই একজন গ্রন্থকার, তাই বিয়ে ভেঙে দিলাম।"

কিন্তু প্রকাশক হোন বা না হোন, লেখকদের পক্ষে একবার লেখা অভ্যাস হলে ছাড়া শক্ত। একমাত্র ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ব্যতিক্রম। তিনি আজও জীবিত, কিন্তু বহু দিন লেখা বন্ধ করেছেন। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয়ের যে পরিধিতে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম, সে পরিধি আজও প্রায় তেমনি আছে, এবং বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আজও জীবিত থেকে অক্লান্তভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন ক'রে চলেছেন। এমন কি, কিরণও মাঝখানে ভিন্ন পথে ঘুরে আবার ফিরে এসেছে সাহিত্য রচনার পথে। এ অভ্যাস ছাড়া শক্ত এবং কিরণের মতো সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির সাহিত্যপথে পুনরাগমন আমার কাছে আনন্দকর বোধ হচ্ছে।

যে সময়ের কথা লিখছি (১৯৩২—৩৬) এ সময়ে লেখিকা-সমস্যা এত কম ছিল যে তা তুচ্ছ করা চলে। আজকের দিনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা এ কালের দর্শকের চোখে স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু ১৯৫৮ সালের লেখিকা-বাহিনীকে ১৯৩২ সালে হঠাৎ দেখা গেলে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটে যেত। সে যুগে মাসিকপত্র অফিসে একবার মাত্র অন্নপূর্ণা ও ক্ষণপ্রভাকে দেখেছি। এ যুগে লেখিকাদের ঠেকানোই এক সমস্যা। সে জন্য কোনো কোনো সমাজ-কল্যাণী মহিলা, সম্ভবতঃ পুরুষদের প্রতি করুণা বশত, পৃথক সাম্প্রদায়িক পত্রিকা বার করেছেন। তাতে লেখকদের প্রবেশ নিষেধ হওয়াতে অনেক লেখিকাকে সে সব পত্রিকা টেনে নিয়ে একটা ভারসাম্য রক্ষা করছে।

এ সময় আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে মাঝে মাঝে সান্ধ্য আড্ডা বসত। আড্ডার মধ্যমণি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। মাখন সেন মহাশয় ছিলেন খুব সীরিয়াস, কাজের লোক, তিনি আড্ডায় এসেছেন ব'লে মনে পড়ে না, তবে প্রফুল্ল সরকার মহাশয়কে দেখেছি। সত্যেনদার মুখে কোনো আগল ছিল না, এবং সম্ভব অসম্ভব সব কথা তাঁর মুখে শুনতে ভাল লাগত। আমরা সবাই তা উপভোগ করতাম, প্রফুল্ল বাবু স্বল্পবাক ছিলেন, তিনি মৃদু মৃদু হাসতেন। যেদিন হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড নতুন বেরোল সেদিন সকাল

বেলা মাখন দা এক কপি কাগজ হাতে ক'রে এলেন মোহনবাগান রোতে, সজনীকান্তকে দেখাতে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

১৩৩৬ সালের মাঝামাঝি আমার বুদ্বুদ নামক একটি ব্যঙ্গ গল্পের বই ছাপা হয়, আমার প্রথম বই। এবং এই বছরেই আমি শনিবারের চিঠির সম্পাদনা ত্যাগ করি, সাড়ে তিন বছর পরে। সজনীকান্তের বঙ্গশ্রী ত্যাগ, ও তারপর নানা পরীক্ষামূলক জীবিকার্জন অভিযান, এবং সে সবই ব্যর্থ অভিযান। শেষ পর্যন্ত সজনী-কপিল ও সজনী-নিখিল যোগাযোগটাও ব্যর্থ হল। অতএব সজনীকান্তকে তাঁর পুরাতন বন্ধু শনিবারের চিঠিকেই অবলম্বন করতে হল, তাই। এবং আমি সম্পূর্ণ বিপন্ন না হই সেজন্ত তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সজনীকান্তের পুরাতন বন্ধু, তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাকে প্রতি রবিবারে 'স্টেজ অ্যাণ্ড স্ক্রীন' বক্তৃতা দিতে হত পনেরো মিনিট করে। এ কাজ করেছিলাম ১৩৪১ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার বছর। প্রতি রবিবার পঙ্কজকুমার মল্লিকের গানের আসর শেষ হতেই আমার থিয়েটার সিনেমা সমালোচনা আরম্ভ হত। সমালোচকরূপে আমার নাম ছিল স্পেক্টেটর, নামটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণের দেওয়া। থিয়েটার সিনেমার সমালোচক আগে ছিলেন মনোমোহন ঘোষ, চিত্রগুপ্ত ছদ্মনামে।

এর আগে রেডিওতে মাঝে মাঝে দু-একটি বক্তৃতা দিয়েছি। ১৩৩৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্র জন্মতিথিতে একদিন অভিনয়ও করেছিলাম রেডিওতে, রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠের খাতা। মোট অভিনেতা সাত জন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও আমি। আমি বেছে বেছে এমন একটি ভূমিকা নিয়েছিলাম যাতে কথা মাত্র একটি। আমার কৃতিত্ব এইটুকুই। পাকা অভিনেতা তিন জন, শরদিন্দু, প্রমথনাথ ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। ব্রজেনদা'ও সেদিন বিপিনের ভূমিকায় খুব জমিয়েছিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এই সময় আমাকে মাইকের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার কৌশলটি যত্ন করে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই নির্দেশ আমার খুব কাজে লেগেছিল।

এর কিছু কাল আগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে নির্মলকুমার বসু বাস করতেন। সেইখানে বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ও বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং সে পরিচয় আজ আরও নিবিড়। দুজনেই আমার শুভার্থী এবং দুজনেই পণ্ডিত ব্যক্তি। বিনয়কৃষ্ণ দত্ত তখন বিষাণ নামক পাক্ষিক পত্রিকা চালাচ্ছেন। সন্ন্যাসীর মতো জীবনটা কাটিয়ে দিলেন গ্রন্থারণ্যে বসে। বহু বিষয়ে পড়াশোনা এবং যে-কোনো বিষয়ে তর্ক করায় এঁর গভীর নিষ্ঠা। তাঁর বিরাট লাইব্রেরি, বন্ধুরা সবাই তাঁর গ্রন্থাগার থেকে শত শত বই নিয়ে গেছেন, সে সব বই আর ফিরে আসেনি কিন্তু সেজন্ত কোনো আক্ষেপ নেই। নিজের বহু টাকা খরচ করে অন্তের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন। মনে-প্রাণে সত্য সন্ন্যাসী।

মনে দুষ্টুমি বুদ্ধি জাগলে সমস্ত দিন না খেয়ে তর্ক করতে রাজি, প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত ক'রে তাকে হারিয়ে দেওয়ার কৌশলটি বেশ আয়ত্ত। বিমলাপ্রসাদ বুদ্ধিবৃত্ত লেখক, রচনায় অনবদ্য। মধুর এবং মার্জিত ভাষা, বক্তব্যের বিষয়ও বিচিত্র এবং সর্বদা সুসম্বদ্ধ এবং লজিক্যাল। অর্থাৎ যে সব গুণ থাকলে খুব পপুলার হওয়া যায়, তার অভাব।

এঁদের দুজনকে অতিরিক্ত পেয়ে আমার তখনকার সাহিত্যিক পরিধি আরও অনেক বিস্তৃত বোধ করেছিলাম, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর পর হঠাৎ নতুন পরিবেশে যেতে প্রথমে কিছু দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে দুঃখ ঘুচে গেল, কেন না নতুন পরিবেশে পুরনো অনেক বন্ধুকেই পাওয়া গেল। নলিনীকান্ত সরকার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে সর্বদা পেতাম রেডিওতে ; এদিকে ১৩৩৬ থেকেই আরও একটি খণ্ড-কাজ এই সঙ্গে পাওয়া গেল সেনোলা প্রতিষ্ঠানে। প্রচারের কাজ। মাসে যত রেকর্ড প্রকাশিত হত সে রেকর্ডের পরিচয় সম্বলিত একখানি মাসিক পুস্তিকা লিখতে হত। মনোরম কাজ। এ কাজে আগে ছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আমাকে এ কাজে ডাকাতেও বীরেন্দ্রকৃষ্ণের হাত ছিল। এক দিকে রেডিওর পটভূমিতে নাটক গান, সেনোলার পটভূমিতেও তাই, এবং এতদুভয়ের মধ্যে পরিচিত বন্ধুদেরই আনাগোনা। অতএব উভয় স্থানের জন্তই বন্ধুদের সাহায্যে এক নতুন রচনায় হাতেখড়ি দিলাম। সে হচ্ছে নাটক রচনা, বড় নাটক ও ছোট নাটক। এমন কি গানও রচনা করেছিলাম সেনোলা রেকর্ডের জন্ত। আমার প্রথম দুটি গান আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী সেনের কণ্ঠে সেনোলা রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। সেনোলার স্বত্বাধিকারী বিভূতিভূষণ সেন অমায়িক এবং উদার এবং আমার সঙ্গে তাঁর ছিল প্রীতির সম্পর্ক। এ পরিবেশের কার্তিক চক্রবর্তী, সুধীন চক্রবর্তীও ছিলেন খুব নিষ্ঠাবান কর্মী।

সেনোলার জন্ত এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়ে একবার এমন এক নাটক লিখতে হয়েছিল, যা আমার দ্বারা লেখা সম্ভব বলে আমিও কল্পনা করিনি, সেনোলা ষ্টুডিওর তৎকালীন পরিচালক সৌরেন্দ্র সেনও কল্পনা করেননি। সৌরেন বাবু একবার আমাকে বললেন, "বড়ই বিপদে পড়েছি, উদ্ধারের আপনি একটি ব্যবস্থা করুন।" শুনলাম, তাঁরা লক্ষহীরা নামক একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ৭ খানা রেকর্ডে একখানা নাটক প্রকাশ করতে চান। এ নাটক লেখার পর তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন, কিন্তু শৈলজানন্দ লিখতে অস্বীকার করেছেন। কারণ

পৃথক সাম্প্রদায়িক মহিলা পত্রিকা বার করেছেন, তাতে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ···

তিনি বলেছেন, নাটকের বিষয়বস্তু তাঁর পছন্দ নয়, তদুপরি এক মুনিকে শূলে চড়াতে হবে—এ সব তাঁর দ্বারা হবে না।

শুনে শৈলজানন্দের উপর শ্রদ্ধা হল। কারণ, ঐ কাহিনীতে এমন সব ব্যাপার আছে যা আধুনিক রুচির বিচারে বীভৎস। সাহিত্যিক হয়ে এ কাহিনী লেখায় মন সরে না স্বভাবতই। আমি চিন্তা ক'রে দেখলাম, এক মাত্র লোক আছেন যিনি রাজি হতেও পারেন, কারণ তিনি বহু পূর্বেই আমাকে জানিয়ে রেখেছিলেন—নাটক লেখার কাজ থাকলে তাঁকে যেন আমি স্মরণ করি।

তিনি গুণী লোক। নাম সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, কবি ঈশ্বর গুপ্তের পৌত্র। এঁর কথা আগে বলেছি, দেখতে নকল রবি ঠাকুর। শুনেছিলাম, তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রে 'কমলের দুঃখ' লিখে নীতিবাগীশদের রোষভাজন হয়েছিলেন। অয়েল পেন্টিং করতে পারতেন। আমি অবশ্য একখানা মাত্র ছবি দেখেছি, তাঁর উল্টোডাঙার বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। ব্রহ্মদেশে অনেক দিন ছিলেন শুনেছিলাম। সেখানে কবি সুধীর চৌধুরীর সঙ্গে নাট্যাভিনয়ে খুব উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্গশ্রীতে তিনি গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার নোবেল প্রাইজ (১৯২৬) পাওয়া উপন্যাস মা অনুবাদ করেছিলেন ধারাবাহিক ভাবে। শিশিরকুমার ভাদুড়ির অনুপস্থিতিতে একদিন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বিজয়া নাটকে রাসবিহারীর ভূমিকায় নেমেছিলেন, অভিনয় ভালই লেগেছিল।

তাঁর অভাব ছিল খুব, এ কথা বলতেন। শত্রুরা বলত ওটা তাঁর একটা ছল, যথেষ্ট পয়সা আছে। লক্ষহীরা লেখার জন্য তাঁকেই ডেকে পাঠালাম। তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে সব শুনলেন ক্রীক রোতে সেনোলা ষ্টুডিওর ঘরে বসে। মোট ১৪টি দৃশ্য হবে, প্রতি দৃশ্য সওয়া তিন মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া চাই। সব শুনে তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হল, এবং এ জন্য যে টাকা পাবেন তা শুনে আরও। বললেন এ তো দিন দশেকের ব্যাপার।

সব কথা শেষে তিনি উঠলেন। কোনো একটি শীতের সকাল। দোতলা থেকে তাঁর সঙ্গে নিচে নেমে গিয়ে বিদায় দিলাম তাঁকে। আমাকে তিনি বললেন, "দু আনা পয়সা দিতে পারেন?" আমি চারটি পয়সা দিয়ে বললাম আর নেই। তিনি বললেন, "আচ্ছা, ওতেই হবে।" তার পর এক মাস কেটে গেল, তাঁর আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। অগত্যা আমার নিজের মান রক্ষার্থে আমাকেই ভার নিতে হল এই অসাধ্য সাধনের। মূল প্লট একটুখানি বেঁকিয়ে দিয়ে, একটুখানি আধুনিক রুচির উপযুক্ত ৭খানি রেকর্ডের উপযুক্ত ক'রে লিখে দিলাম। তবে মুনিকে শূলের হাত থেকে বাঁচানো গেল না।

অসুখের আক্রমণের চেয়ে বহু প্রেসক্রিপশনের আক্রমণে অস্থির হয়ে উঠতে হয়।

বাছাই করা শিল্পীরা মিলে অভিনয় করলেন। তুলসী লাহিড়ী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, আশু বোস, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, সরযূবালা, নিভাননী প্রভৃতি থিয়েটার ও সিনেমাশিল্পী ও বীণাপাণি দেবী নামের এক বিশিষ্ট গায়িকা মিলে পালাটি বেশ জমিয়ে তুললেন। পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অনুরোধে এই নাটকটিই আরও বাড়িয়ে, রেডিওতে দু-ঘণ্টা অভিনয়ের উপযোগী ক'রে দিলাম, সেখানে নাটকটি চার পাঁচ বার অভিনীত হয়েছিল।

রেডিওর সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি-এল এখানে একজন পরামর্শদাতা ছিলেন। কয়েকখানি ছোটদের নক্সায় নতুন ধরণের সঙ্গীতের আবহ পরিকল্পনা দ্বারা রেকর্ডগুলিকে তিনি পরম উপভোগ্য এবং বিখ্যাত করে তুলেছিলেন। স্মরণীয় সুর-সংযোজক আর ছিলেন উমাপদ ভট্টাচার্য, এম-এ। এঁদের পরবর্তী ধাপে শৈলেশ দত্তগুপ্ত, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, নিতাই ঘটক প্রভৃতি। এখানে আমার মধ্যস্থতায় বাংলা বিহার একত্র মিলেছিল। মুঙ্গেরের শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উমার তপস্যা ও ডিটেকটিভ, এই দু খানা নাটক প্রকাশিত হয়। ভাগলপুরের বনফুলের নিজকণ্ঠের আবৃত্তি মালা একখানা রেকর্ডে প্রকাশিত হয় এবং ভাগলপুরের আশু দে'র একখানি কৌতুক নক্সা প্রকাশিত হয়; এদের সবার সঙ্গেই আমি দমদম এচ-এম-ভি ষ্টুডিওতে যেতাম রেকর্ডিং এর সময়। একবার আমার একখানি নক্সায় শরদিন্দু অভিনয় করল বেশ সাফল্যের সঙ্গে। সেখানা পূজা কমিকের রেকর্ড।

রেকর্ডিংএর সময় কত সময় বাকী আছে শিল্পীকে তা আঙুল খাড়া ক'রে দেখাতে হয়। আশু দের আবৃত্তির দিন তাঁর আর দু মিনিট আছে দেখানো হল দু আঙুল খাড়া ক'রে, তারপর এক মিনিট আছে দেখানো হল এক আঙুল খাড়া ক'রে। কিন্তু তবু প্রথম বারে তাঁর আবৃত্তি নির্দিষ্ট সাড়ে তিন মিনিট অতিক্রম ক'রে গেল। দ্বিতীয় বারে ঠিক হল। আশু দে বললেন এক মিনিট পর্যন্ত তো বেশ দেখানো হল এক আঙুল দিয়ে, কিন্তু আধ মিনিট কি ক'রে দেখাবে? এই বিষয়ে মনে দারুণ কৌতূহল জাগাতে মনোযোগ চলে গেল আঙুলের দিকে, তাই আবৃত্তি করতে করতে সময় পার হয়ে গিয়েছিল। পরে তিনি রেকর্ডিংএর ব্যাপারটাই অমৃতবাজার পত্রিকায় খুব মজার ক'রে লিখেছিলেন। 'প্যাটার' শিরোনামায়।

এ পর্যন্ত আমি দ্বিতীয় বার আর নিজ স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ তুলিনি তাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। ছেলেবেলার ম্যালেরিয়ার হাত থেকে মুক্তি পেলেও নাক এবং গলা আক্রমণকারী শত্রুরা বরাবর তৎপর ছিল এবং দু' এক মাস অন্তর দেহযন্ত্রটাকে কারখানায় এনে পরীক্ষা করানোর দরকার হত। এ বিষয়ে আমাকে তখন সব চেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন প্রবীণ এবং প্রসিদ্ধ লেখক ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি-টি-এম। আমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমার পক্ষ অবলম্বন তিনি সব সময় অকৃপণ ভাবে করেছেন। আজও মাঝে মাঝে পূর্ব-অভ্যাস বশতঃ এ কাজ তিনি করে থাকেন, যদিও শত্রুপক্ষ প্রবলতর হওয়াতে আধুনিকতম অস্ত্রে সজ্জিত নবীন চিকিৎসক পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, আর, সি, পি, আমার প্রধান আঘাতগুলি ঠেকিয়ে দেবার ভার গ্রহণ করেছে এবং সর্বদা প্রহরীর কাজে নিযুক্ত আছে নবীনতর ডাক্তার মোহিত মৌলিক এম-বি, বি-এস।

শত্রুবেষ্টিত সংসারে আমি একা নই, বিশ্বশুদ্ধ সবাই এ বিষয়ে প্রায় আমার মতোই অসহায়, চিকিৎসকেরাও এ থেকে বাদ নেই। তবে বাংলা দেশের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অসুখের কথা উচ্চারণ করামাত্র শ্রোতামাত্রেই চিকিৎসকে পরিণত হয় এবং নিজ নিজ প্রিয় ওষুধ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তখন অসুখের আক্রমণের চেয়ে বহু জনের পরস্পর-বিরোধী প্রেসক্রিপসনের আক্রমণে অস্থির হয়ে উঠতে হয়।—কিন্তু এসব প্রসঙ্গতঃ।

১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে পাটনা প্রভাতী সংঘের নিমন্ত্রণে—এক কথায় মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের নিমন্ত্রণে পাটনা যেতে হল। মণির সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় ঘটেছিল ভাগলপুরে, এবং শনিবারের চিঠিতে তার অনেকগুলো লেখাও আমি ছেপেছি। প্রভাতী সংঘের মধ্যমণি ছিল সে, স্বাস্থ্যবান গৌরবর্ণ তরুণ, সদ্য এম-এ পাস, মধুর এবং উদার স্বভাব। পাটনার এই সম্মেলনের সভাপতি হলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। আমরা কলকাতা থেকে পাঁচ জন গেলাম এক সঙ্গে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও আমি। প্রচণ্ড শীত। নীরদ বাবু গাড়িতে উঠে প্রকাণ্ড এক তিব্বতী কোট গায়ে পরলেন। শুনলাম সেটি অমল হোমের কাছ থেকে পাওয়া। এই কোট গায়ে তাঁর চেহারা এমন এক জাঁকজমকপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পেল যে আমরাও ঐ সঙ্গে অন্য যাত্রীর চোখে বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে উঠলাম। হয়তো তাঁরা ভাবলেন তিব্বতী কোনো ছোটখাটো লামাগুরুর সঙ্গে আমরা কয়েক জন শিষ্য চলেছি।

ভাগলপুর থেকে বলাই একা গেল পাটনায়।

পাটনায় এই আমার প্রথম যাওয়া। এর আগে ১৯৩৫ সালে একটি সুযোগ এসেছিল, কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে আমার যাওয়া হয়নি। ১৯৩৫ সালের সেই উপলক্ষটি ছিল পাটনায় বনফুলের প্রথম প্রকাশ্য অভিনন্দন। সে অভিনন্দন আমার আনন্দের এবং গর্বের, এবং না যেতে পারায়, দুঃখের। এ প্রসঙ্গে সে কথাটা বলে রাখি।

সামান্য এক একটি ঘটনায় কি ভাবে এক একজনের জীবনের মোড় ঘোরে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এ বিষয়ে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তার অবিস্মরণীয় মুহূর্তে অনেক ঘটনাই বিবৃত করেছে। সজনীকান্তের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল একটি শ্বেতহস্তী। আমার জীবনের মোড় ঘুরল লালমিয়ার রোমান্সে। বলাইয়ের জীবনের মোড় ঘোরার অব্যবহিত কারণ আমার ল্যারিনজাইটিস।

শনিবারের চিঠিতে প্রবেশের তিন মাস পরে ভাগলপুরে যাই স্বাস্থ্যের জন্য এবং বলাইকে সাহিত্যপথে পুনঃপ্রবেশ উদ্বুদ্ধ করতে। বলাই তখন প্রায় আট বছর হাইবারনেট করছিল ডাক্তারি শাস্ত্রে ডুবে। এত দিন তার লেখা প্রায় বিয়ের প্রীতি উপহার লেখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বলাইকে নতুন ক'রে লেখানোর ব্যাপারে আমাকে যে সব প্রক্রিয়া করতে হয়েছিল তা বিস্তারিত বলার দরকার নেই, তবে আমাকে খুব যত্ন নিতে হয়েছিল। ক্ষমতা আত্মপ্রকাশে ব্যাকুল, অথচ অনভ্যাসে ঠিক মতো প্রকাশ হচ্ছে না, এ অবস্থা অবশ্য বলাইয়ের খুব বেশি দিন ছিল না। ফুল আপন প্রাণধর্মেই ফুটেছিল, আমি শুধু সতর্ক মালীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম কিছুদিন। বলাইয়ের পক্ষে এর প্রয়োজন ছিল। তাই বলাই পাটনায় যে অভিনন্দন লাভ করেছিল তার আনন্দ সে আমার সঙ্গে ভাগ ক'রে ভোগ করার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। ২২-১১-৩৫ তারিখে সে আমাকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে সে বলছে: "তুমি পাটনায় গেলে দেখিতে পাইবে যে তোমার হাতে-গড়া 'বনফুল' কত লোকের মনোহরণ করিয়াছে! গড়িয়াছ বলিয়া গড় করিতেছি। চুম্বন লও।" বলাই আত্মক্ষমতা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিল বলেই তার মনে লেশমাত্র inferiority complex ছিল না, তাই এ ভাষায় লেখায় তার কোনো দ্বিধা আসেনি মনে।

পাটনায় গিয়ে পৌঁছলাম আমরা দুর্দান্ত শীতে, এবং গিয়ে উঠলাম বিখ্যাত সমাদ্দার গৃহে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পাটনায় নানাস্থানে যে রকম আহার্যের রাজকীয় ব্যবস্থা হল তাতে সাময়িক ভাবে সাহিত্য আমাদের কাছে গৌণ বোধ হয়েছিল অবশ্যই। রাত্রির ক্লান্তিটা প্রকাশ করার সুযোগই পাওয়া গেল না। বিভূতি বাবু নির্বিকার। মনে কোনো উত্তেজনা নেই, উচ্ছ্বাস নেই, যেন মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসবাড়িতে তাঁর অভ্যস্ত ঘুম ভাঙল। তিনি প্রাতরাশ শেষ ক'রেই একটু দূরে গাছপালার মধ্যে গিয়ে খাতা নিয়ে বসলেন। কাজের লোক। সেখানে বসে বসে ডায়ারি লিখতে লাগলেন। তাঁকে পাওয়া গেল ঘণ্টাখানেক পরে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি যেখানেই থাকেন, সেখানেই প্রতিদিন তিনি কিছু কিছু ডায়ারি লেখেন। ঘরের বাইরে বসে দু-চোখে যে দৃশ্য দেখছেন তার একটা শব্দচিত্র এঁকে রাখেন। চোখে দেখা পারিপার্শ্বিকের নিখুঁত বর্ণনা লিখে রাখলে পরে তা তাঁর গল্প বা উপন্যাসের পট হিসেবে ব্যবহার করার খুব সুবিধে হয়। কথাটা আমার মনে ধ'রেছিল। আমিও এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলাম, কিন্তু তা ব্যবহার করেছিলাম অন্যভাবে; তখন-তখন চোখে দেখে লিখলে কল্পনা করতে হয় না, আবহাওয়া রেডিমেড থাকে। এদেশে রবীন্দ্রনাথই তাঁর ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এই রীতির প্রথম প্রবর্তক বলে মনে হয়।

আমি দু' তিনটি ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছি ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই। ডুয়ার্সের পথে ও পশ্চিম-হিমালয়ের পথে—এ দুটি ভ্রমণই ('পথে পথে' গ্রন্থ দ্রঃ) পথে পথে শেষ করেছি। এমন কি, ট্রাকে বসে বিরাম সময়ে অথবা গভীর অরণ্যে ব'সে, অথবা ওয়েটিং রুমে বসেও

'বিভূতিবাবু গাছপালার মধ্যে গিয়ে বসে ডায়ারি লিখতে লাগলেন।

লিখেছি। এ ভাবে লেখা খুব আরামপ্রদ বোধ হয়, এবং বর্ণনা নিখুঁত হয়। আমার গালুডি ভ্রমণ তো সম্পূর্ণ ফোটোগ্রাফধর্মী। একটা একটা করে বিষয়বস্তু দেখে দেখে লেখা।

নীরদবাবু সভাপতিরূপে পাটনায় যে ভাষণ দেন, তাতে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির সমস্ত দিকের যে বিশ্লেষণ ছিল, তা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি যুক্তিপূর্ণ। সংস্কৃতি বা কালচার কি এবং তা প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের যোগে আমাদের দেশে কি রূপ পেয়েছে এবং এর ভবিষ্যৎ কি, এই সব কথা তিনি আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, আমাদের সমাজ, জীবনযাত্রার যে স্তরে উঠলে তাতে সংস্কৃতি সৃষ্টি সম্ভব, সেই স্তরে এখনও পৌঁছতে পারেনি। তাঁর মতে তাই আমাদের একশ বছরের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেছিলেন আমাদের নবযুগ প্রবর্তকগণ ইউরোপ ও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে একেবারে প্রথমেই সেই পুষ্পচয়নের কামনা করেছিলেন। যে ক্ষেত্রে তার জন্ম সম্ভব হবে, যে গাছে তা ফুটবে, তার কথা একবারও ভাবেননি। নীরদবাবু তাঁর ভাষণ একটি মূল্যবান কথা দিয়ে শেষ করেছিলেন: আমাদের আজ সেই ভুল সংশোধন করতে হবে, আকাশে ফুল ফোটাবার বৃথা স্বপ্ন না দেখে হলকর্ষণে নিযুক্ত হতে হবে।

এই বক্তৃতাটি পাটনায় বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। আমাদেরও ভাগ্যে কিছু প্রশংসা জুটেছিল, এই সুযোগে তার চিহ্ন এঁকে রাখি এখানে। পাটনার খবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তিন দিন প্রকাশিত হয়। পাটনা থেকে ২৭শে জানুয়ারি ১৯৩৭ প্রেরিত যে খবরটি আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়, সেইটি দুদিনের সম্মেলন শেষের খবর। তার অংশ-বিশেষ এই—

"পাটনা প্রভাতী সঙ্ঘের সাহিত্য সম্মেলন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। কলিকাতা হইতে কবি ও সাহিত্যিকগণ প্রাচীন ভারতের পাটলীপুত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর রসধারা সিঞ্চন করিয়া গেলেন। চিন্তাশীল লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অভিভাষণে···বহুদিন পরে আমরা যেন চিন্তার গতানুগতিকতা হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মনে যে দুই চারিজন সাহিত্যিক বিমল শুভ্র হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহারা সত্যই জাতির কল্যাণকামী বন্ধু।"

বলা বাহুল্য শেষের এই উক্তিটি সজনীকান্ত, বনফুল ও আমার সম্পর্কিত উক্তি। কিন্তু আমার সম্পর্কে অন্তত এটুকু বলতে পারি যে, আমি যে দুটি রচনা পাঠ করেছিলাম, তা কারো কল্যাণ উদ্দেশে রচিত ছিল না। একটি রচনা ঐখানেই লিখেছিলাম সেটি প্রথম অধিবেশনে পড়ি। দ্বিতীয় অধিবেশনে পড়ি একটি ব্যঙ্গ গল্প।

ঐ সংবাদের আর এক অংশে—"সামাজিক জীবনের ইতিহাস যে কতদূর চিত্তাকর্ষক হইতে পারে তাহা দেখাইয়াছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।···সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ কি, কি কি উপাদানে কিরূপ ভাবে রূপান্তরিত হইয়া রস সৃষ্টি করে, তাহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।··· একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য যে পাটনার প্রাচীনরাও নবীনের নূতন চিন্তাকে সাদরে অভিনন্দন করিতে পারেন। তাহার প্রমাণ পাটনার সাহিত্যসেবকগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ মথুরানাথ সিংহ মহাশয় কর্তৃক সমাগত যুবক সাহিত্যিকগণের অভিনন্দন।"

৬ই ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) বিহার হেরাল্ডে এই সম্মেলনের একটি অতি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে আমার একটি টেষ্টিমোনিয়াল আছে, যেটি আমার আবৃত্তি সম্পর্কে প্রথম গুণীজনের মত।—

Mr. Parimal Goswami, sometime editor of Sanibarer Chithi, has a very distinctive power of delivery. The strong humour of his short sketches was enhanced by his very effective distribution of pauses and emphasis."—এই অতিপ্রশংসায় কে না অভিভূত হবে?

রেডিওতে প্রতি রবিবারে আমার বক্তৃতা সঙ্গীতশিক্ষার আসরের পরেই। এ জন্য প্রতিদিন শ্রেফ পরস্পর দেখা হওয়ার চাপে পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল। তাঁর তখন অনুচর ছিলেন অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র বসু। রেডিও-ষ্টেশন আমাদের ছিল একটি বড় আড্ডা। আমার অনেক নাটিকা এখানে অভিনীত হয়েছে, তাই রিহার্সালেও উপস্থিত থাকতে হত শিল্পীদের অনুরোধে। এই কথাটির আরও বিস্তার প্রয়োজন। তখন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন বক্তৃতা, গান, নাটক ইত্যাদি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। ষ্টেপলটন ছিলেন ষ্টেশন-ডাইরেক্টর।

নৃপেন্দ্রনাথ খুব রসিক ব্যক্তি ছিলেন। আমাকে একবার কতকগুলি নাটিকা লিখতে বলেন—প্রত্যেকটির বিস্তার ২০ মিনিট। তাঁর শর্ত ছিল এই যে, তিনটিমাত্র চরিত্র থাকবে, দুটি পুরুষ ও একটি নারী। শিল্পীদের নামও তিনি জানিয়ে দিলেন। (তাঁদের দুজন এখন আর বেঁচে নেই।) একজন শৈলেন চৌধুরী ও অন্যজন নিউ থিয়েটার্সের কৌতুক-অভিনেতা ইন্দু মুখোপাধ্যায়। অভিনেত্রী হচ্ছেন ঊষাবালা বা পটল, (যিনি শিশিরকুমারের পার্টির সঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিলেন।) শিল্পীরূপে সবাই সুবিখ্যাত।

এই পর্যায়ে আমি চারটি নক্সা লিখেছিলাম, 'পিপাসা', 'স্বামী সন্ধান', 'এইটে কি কম?' (পরে গুঞ্জন) ও 'সাপ্তাহিক সমাচার'। অন্যান্য রেডিও-নাটিকার সঙ্গে এই চারটি আমার, "ঘুঘু" নামক বইতে স্থান পেয়েছে। 'এইটে কি কম?' নামটি, নাটিকা-পরিকল্পনা এবং লেখার আগেই আমাকে দেওয়া হয়েছিল, দিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। এটি তাঁর নিজস্ব কৌতুক। আমি আপত্তি করিনি।

এই নাটিকাগুলি খুব ভাল ভাবে রিহার্সাল দেওয়া হত প্রত্যেকটি অন্তত তিন দিন। শৈলেন চৌধুরী এবং ইন্দু মুখুজ্জে—দুজনেই তখন যশের শিখরে। কিন্তু তাঁরা দুজনেই প্রত্যেকটি রিহার্সালে আমাকে থাকতে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা বলেছিলেন আমি কোন্ কথাটা ঠিক কি অর্থে বা কোন ইঙ্গিতপূর্ণ ক'রে ব্যবহার করেছি, অথবা কোন কথাটির উপর জোর দিতে চাই, তা সেই সময় আমার কাছ থেকে তাঁরা ভাল ক'রে বুঝে নিতে চান।

নিজেদের বিষয়ে কোনো দাম্ভিকতা নেই, উপরন্তু নিজেদের ছোট করা! অতএব এই অনুরোধ আমার কাছে নতুন বোধ হয়েছিল, এবং অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। আমি এ জন্য প্রত্যেক রিহার্সালে উপস্থিত থাকতাম। সুরেশ চক্রবর্তীর যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতের 'অডিশন' আসরেও অনেকদিন গিয়ে বসেছি। সে অভিজ্ঞতাও খুব কৌতূহলোদ্দীপক, এবং অনেক মজার ঘটনা সেখানে প্রত্যক্ষ করেছি।

[ক্রমশঃ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

[বিখ্যাত ঔপন্যাসিক]

বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী ঔপন্যাসিক অনেকেই আছেন, কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায় একাধারে শক্তিশালী এবং মহৎ ঔপন্যাসিক ! ভাষা-সৌন্দর্যে তাঁর সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। ভাষায় ও বর্ণনায় অলঙ্কারের বাহুল্য না ঘটিয়েও তাকে যে কতখানি সতেজ ও সরস করে তোলা যায়, অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যই তার প্রমাণ !

উড়িষ্যার ঢেনকানল রাজ্যের রাজধানী নিজগড়ে ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ অন্নদাশঙ্করের জন্ম হয়। তাঁর পিতা শ্রীনিমাইচরণ রায় সেখানকার রাজদরবারে চাকরি করতেন। তাঁদের পৈতৃক বাস ছিল বালেশ্বর, তারও আগে হুগলী জেলায়।

জীবনের প্রথম উনিশ বছর অন্নদাশঙ্কর কাটিয়েছেন উড়িষ্যায়, প্রধানত ঢেনকানলে, পুরীতে ও কটকে। খুব ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে শুয়ে শুয়ে তাঁর মুখে তিনি শুনতেন রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, দেশী-বিদেশী রূপকথা, কাহিনী ও কিংবদন্তী। তখন থেকেই বুঝি মনে মনে অস্পষ্ট আয়োজন চলছিল নিজেও একদিন এমনি করে লিখবার।

স্কুলে পড়বার সময় অন্নদাশঙ্কর হাতে-লেখা একটা মাসিক পত্রিকা বের করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেটি ছিল ওড়িয়া ভাষায়। তবে ওড়িয়া ভাষায় লিখলেও অন্নদাশঙ্করের পাঠ্য ছিল যত রাজ্যের বাংলা বই আর মাসিকপত্র।

স্কুলের পরীক্ষায় একবার অন্নদাশঙ্কর প্রাইজ পান টলষ্টয়ের ছোট গল্পের ইংরেজী অনুবাদের একটি বই। তার থেকে একটা গল্পের বাংলা অনুবাদ করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দেন। তাঁর বয়স বোধ হয় তখন ষোল। 'তিনটি প্রশ্ন' নামে সেই গল্প প্রবাসীতে ছাপা হল। এই ভাবে স্কুলের ছাত্র অবস্থায়ই 'প্রবাসী'র মত পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন।

অন্নদাশঙ্করের জীবনের স্বপ্ন ছিল তখন সাংবাদিক হওয়া। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর তাই তিনি কলকাতায় এলেন সংবাদপত্র সম্পাদনা শিখতে। কিন্তু অভিভাবকদের ইচ্ছায় তাঁকে আবার কটকে ফিরে কলেজে ভর্তি হতে হল।

ছাত্রজীবনে অন্নদাশঙ্কর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আই, এ, পরীক্ষায় তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও স্কলারশিপ লাভ করেন।

এর পর এম, এ, পড়তে পড়তে অন্নদাশঙ্কর আই, সি, এস, প্রতিযোগিতায় যোগ দেন এবং সারা ভারতে পঞ্চম স্থান অধিকার কিন্তু সে বছর সিভিল সার্ভিসে তিন জনকে গ্রহণ করায় পরের করেন। বছর আবার পরীক্ষা দিয়ে তিনি সারা ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সরকারী খরচে দু'বছরের জন্ত বিলেত গমন করেন।

অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যচর্চাও অবশ্য এর মধ্যে চলছিল। কলেজে ছিল তাঁদের 'ননসেন্স ক্লাব'! ক্লাবের হাতে-লেখা পত্রিকায় অন্নদাশঙ্কর ইংরেজী, বাংলা ও ওড়িয়া তিন ভাষাতেই লিখতেন। মাঝে মাঝে মাসিকপত্রেও লেখা দিতেন। প্রবাসী, ভারতী ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হত, আবার শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া মাসিকপত্রেও ওড়িয়া ভাষায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবীশ হয়ে বিলেত যাত্রার পথ থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেন তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনী 'পথে-প্রবাসে।' তিন চার কিস্তি ছাপা হবার পর এই ভ্রমণ-কাহিনী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন। এর পর বিলেতে বসেই অন্নদাশঙ্কর রচনা করেন তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ 'তারুণ্য'। তাঁর বয়স তখন চব্বিশ বছর।

বিলেত থেকে ফিরে অন্নদাশঙ্কর ১৯২৯ সালে বাংলা সরকারের শাসন বিভাগে যোগদান করেন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হলেও তিনি কিন্তু সাহিত্যের পথ আর ত্যাগ করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলা ও ওড়িয়া এই দুই ভাষার নৌকায় পা রেখে তিনি কালপারাবার পাড়ি দিতে পারবেন না। অতএব ওড়িয়া লেখায় তিনি ক্ষান্তি দিলেন। বাঙালী পাঠক জেনে বিস্মিত হবেন যে, ওড়িয়া ভাষায় তিনি কয়েকটি গ্রন্থ পর্য্যন্ত এর মধ্যে রচনা করে ফেলেছিলেন এবং ওড়িয়া মাসিকপত্রে তাঁর তখন প্রথম পৃষ্ঠায় অধিকার ছিল।

রচনার বৈশিষ্ট্যে অন্নদাশঙ্কর অল্পকালের মধ্যেই বাংলা দেশের সাহিত্যিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। এই সম্পর্কে এখানে একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর বৈঠকখানায় একদিন গৃহকর্ত্তা বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। প্রায় সকলেই নামকরা সাহিত্যিক। তরুণ অন্নদাশঙ্করও তাঁদের মধ্যে আছেন, যদিও তখনও তাঁকে নামকরা বলা চলে না। হঠাৎ প্রমথ চৌধুরী বললেন, আকবর বাদশার দরবারে একবার এক গুণী এলেন। এমন গান শোনালেন যে, বড় বড় ওস্তাদেরা তাঁদের শির থেকে শিরোপা খুলে তাঁর দিকে ফেলে দিলেন। আকবর জানতে চাইলেন, ব্যাপার কি! তাঁরা নিবেদন করলেন, জাঁহাপনা, এখন থেকে ইনিই শোনাবেন, আমরা শুনব! তারপর তরুণ অন্নদাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে প্রমথ চৌধুরী বললেন, এখন থেকে তুমিই লিখবে, আমরা পড়ব।

সাহিত্য-জীবনের প্রথম অধ্যায়েই এমনি প্রশংসা, এমনি অভিনন্দন লাভ করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর দেশের গুণী সমাজের কাছ থেকে।

প্রথম গ্রন্থ 'তারুণ্য' প্রকাশিত হবার দশ বছরের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর যে সব গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : প্রকৃতির পরিহাস, আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা ও সত্যাসত্য। যার যথা দেশ, অজ্ঞাতবাস, কলঙ্কবতী, দুঃখমোচন, মর্ত্ত্যের স্বর্গ ও অপসরণ—এই ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 'সত্যাসত্য' আড়াই হাজারেরও বেশি পৃষ্ঠার এক বিরাট উপন্যাস এবং এত বড় উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম রচনা করেন।

গল্প ও উপন্যাস রচনা ছাড়া প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও কবিতা রচনা দ্বারাও অন্নদাশঙ্কর বাংলা-সাহিত্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী 'পথে-প্রবাসে' একদা বাঙালী পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও রচনা করেন প্রবন্ধ-পুস্তক 'আমরা', কাব্যগ্রন্থ 'রাখি', 'একটি বসন্ত', 'কামনা পঞ্চপ্রদীপ' ইত্যাদি।

কর্ম্মজীবনে অন্নদাশঙ্কর জেলাম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির পদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু এই সব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও সাহিত্য-প্রচেষ্টায় তাঁর অধ্যবসায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আজীবন অক্ষুণ্ণ রয়েছে। চাকুরি-জীবনের দীর্ঘকাল স্বভাবতই তিনি শুধু অবসর সময়েই লিখতে পেরেছেন। তাঁর বিপুল রচনার দিকে তাকিয়ে তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে, সাহিত্যের প্রতি কতটা মমতা থাকলে মানুষ এভাবে তার বিশ্রামের সবটুকু সময় সাহিত্য-চর্চায় ব্যয় করতে পারে।

শাসন বিভাগে দীর্ঘ চাকুরি-জীবনের পর অন্নদাশঙ্কর অবসর গ্রহণ করে তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছানুযায়ী এখন স্থায়িভাবে শান্তিনিকেতনে থাকেন এবং সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করে আছেন।

অন্নদাশঙ্করের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : না, কন্যা, অসমাপিকা, রত্ন ও শ্রীমতী ইত্যাদি। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ : সাহিত্যে সঙ্কট, জীয়নকাটি, বিনুর বই ও আধুনিকতা।

শ্রীকেদারেশ্বর ঘোষ

[সাংবাদিক ও 'ষ্টেটস্‌ম্যান'এর মুখ্য বার্ত্তা-সংগ্রাহক]

সংবাদপত্রকে বলা হয় দেশের Fourth Estate—কিন্তু ইহার গঠনে ও পারিপাট্যে যে একজন নীরব কর্মী আত্মপ্রচারবিমুখ হইয়া নানারূপ দুঃখকষ্ট ও গ্লানির মধ্যে কর্ম সমাধা করিয়া থাকেন—তাহা অনেকের নিকট অজানিত। ইহাদের মধ্যে অন্যতম হলেন 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার চীফ রিপোর্টার শ্রীকেদারেশ্বর ঘোষ। কিন্তু সাংবাদিক মহলে তিনি পরিচিত 'শ্রীকেদার ঘোষ' রূপে।

১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীঘোষ কুমিল্লা জেলার বাবুরহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺মহেন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন বাংলার বিশিষ্ট জননায়ক ৺হরদয়াল পালের 'দক্ষিণ হস্ত' স্বরূপ। তিনি বাল্যে পালমহাশয়ের গৃহে থাকিয়া বিদ্যা-শিক্ষা আরম্ভ করেন। পিতার সাথে পুত্রের উপরও হরদয়ালের আদর্শ ও রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়। এতদ্ব্যতীত মহেন্দ্রকুমার রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় হওয়ায় এবং প্রায়ই শান্তিনিকেতনে আগমনের জন্য কেদার বাবুর উপর কবিগুরুর যথেষ্ট স্নেহদৃষ্টি পতিত হয়। রাজনৈতিক সভাসমিতিতে মহেন্দ্রকুমার তিন পুত্রকে দিয়া জাতীয় ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করাইতেন। ফলে, সমগ্র কুমিল্লা জেলায় উহা প্রসার লাভ করে।

১৯২১ সালে জাতীয় আন্দোলনের সময় কেদারেশ্বরকে স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ৺হরদয়াল পাল প্রতিষ্ঠিত ন্যাশানাল স্কুলে ভর্ত্তি করান হয়। অর্থাভাবে উহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পুনরায় গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়ে চলিয়া আসেন। ১৯২৪ সালে দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত ও হরদয়াল পালের পরিচালনায় চাঁদপুরে চা শ্রমিকরা মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে বিরাট আন্দোলন করেন, মহেন্দ্রকুমারকে উহার সাফল্যের জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হয়। ফলে তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া কয়েকমাসের মধ্যে পরলোক গমন করেন। কিন্তু শোকসন্তপ্তা স্ত্রী শ্রীমতী প্রিয়তমা ঘোষ চারিটি শিশুসন্তানের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

১৯৩০ সালে বাবুরহাট বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীঘোষ কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে আই, এস, সি-তে ভর্ত্তি হন। ইচ্ছা ছিল চিকিৎসক হওয়ার কিন্তু অর্থাভাবে অক্ষম হওয়ায় বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি, এ, পড়া সত্ত্বেও পুস্তকাভাবে পাশ কোর্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ৺শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশে তিনি বিনা বেতনে ইংরাজীতে এম, এ, পড়েন কিন্তু ফি জমা দিতে না পারায় উক্ত পরীক্ষা দেন নাই।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার অব্যবহিত পরে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের জন্য কুমিল্লা 'অভয়-আশ্রমে' চলিয়া আসেন এবং মেদিনীপুরে আইন অমান্যের জন্য প্রেরিত হন। তথায় পুলিশের বহু অত্যাচার সহ্য করিতে হয় কিন্তু শ্রীঘোষ মেদিনীপুর জেলার সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের জাতীয় চেতনা দেখিয়া মুগ্ধ হন।

বাল্যকাল হইতে তিনি ব্যায়াম ও ৺পুলিনদাস প্রবর্ত্তিত লাঠি এবং ফুটবল খেলায় অনুরাগী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল টীমের একাদশের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম! এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় English Literary Society-র সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে টাকী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীফণীভূষণ মুখার্জি, Excise Superintendent শ্রীঅমৃতলাল মুখার্জি, ডেপুটী সেক্রেটারীদ্বয় শ্রীনরেন পাল ও শ্রীঅমিয় মিত্রর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৬ সালে রাজনৈতিক কারণে কলিকাতা পুলিশে ইনস্‌পেক্টার পদ না পাওয়ায় শ্রীঘোষ শর্টহ্যাণ্ড শিখিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৭ সালে 'যুগান্তর' প্রতিষ্ঠিত হইলে একমাত্র রিপোর্টার হিসাবে তাঁহাকে গ্রহণ করা হয়। শ্রীযতীন ভট্টাচার্য্য উহার সম্পাদক ছিলেন। তখন শ্রীঘোষ একটি টীন-আচ্ছাদিত গৃহে বাস করিতেন। কয়েক মাস পরে বিশেষ কারণবশতঃ শ্রীঘোষ প্রমুখ কয়েকজন সাংবাদিক কর্ম্মে অনুপস্থিত হওয়ায় অলিখিত ভাবে কর্ম্মচ্যুত হন। ভারতে 'কর্ম্মরত সাংবাদিকদের' ইহাই প্রথম একত্রে 'কর্ম্ম-বিরতি' বলিয়া শ্রীঘোষ মনে করেন। ১৯৩৮ সালে কয়েক মাস ইউনাইটেড প্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া

শ্রীকেদারেশ্বর ঘোষ

তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে' যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসে (বর্ত্তমানে পি, টি, আই,) যোগদান করিয়া ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তথায় কার্য্য করেন। মাত্র ৮০৲ টাকা মাহিনায় প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইত। সেই সময় তিনি বাংলা সরকারের 'Denial Policy' ও জামসেদপুরের শ্রমিক অশান্তির সংবাদ প্রকাশ করার জন্য তৎকালীন সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। কিন্তু সাংবাদিকেরা কখন নিজেদের বিপদের কথা চিন্তা করেন না—দেশ ও দশের চিন্তাই যে তাঁহাদের স্বপ্ন-সাধনা!

সরকারী কোপদৃষ্টির প্রতিক্রিয়া হিসাবে এল 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা হইতে কেদার বাবুর সাদর আহ্বান তিন শত টাকা মাসিক বেতনে চীফ রিপোর্টার পদ গ্রহণের জন্য। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালী জেলার দাঙ্গা লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি অকুস্থলে রওয়ানা হলেন একমাত্র সাংবাদিক হিসাবে। দিনের পর দিন পাঠালেন রাজনৈতিক নেতাদের কারচুপির ষড়যন্ত্র, যাহার সঙ্গে জেলার সাধারণ লোকের কোন সম্পর্ক ছিল না। যুগপৎ প্রকাশিত হল কলিকাতা ও দিল্লী সংস্করণে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তখন দিল্লীর ভাঙ্গী কলোনীতে। পড়লেন মহামানব সেই বিবরণ—অনুভব করলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কষ্ট—বললেন Written in Statesman—Matter is Serious—ছুটে এলেন নোয়াখালীতে—পদব্রজে গ্রাম-পরিক্রমা করতে লাগলেন—আর কবিগুরুর দরদী গান পরিবেশিত হল 'ও তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে—তবে একলা চল্ রে'। ইহার পর শ্রীঘোষ গেলেন রেঙ্গুণে আউঙ সান হত্যার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহের জন্য। ১৯৪৮ সালে ষ্টেটসম্যানের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহাকে দিল্লী পাঠান হয় এবং ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত তিনি নানাপর্য্যায়ের সংবাদ সংগ্রহ করেন। সেই সময় তিনি দিল্লী প্রেস এ্যাসোশিয়েশনের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া প্রেস সম্মেলনে ভারতীয় দলের নেতা হিসাবে অষ্ট্রেলিয়া গমন করেন এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সংবাদপত্রে অনেকগুলি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৪৫ সালে কলিকাতা প্রেস ক্লাব কয়েক জনের সহিত গঠন করেন এবং ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। গত দুই বৎসর তিনি উহার নির্ব্বাচিত সভাপতিরূপে কার্য্য করিতেছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সঙ্ঘের সহঃ-সভাপতি হন। ১৯৪২ সালে তাঁহার প্রেরিত ক্রিপস্ মিশনের বিবরণ পাঠকদের মুগ্ধ করে। নির্ভীক ও তেজস্বী শ্রীঘোষের সাংবাদিক জীবনে Objective reporting and Exclusive News সংগ্রহ তাঁহার সহকর্ম্মীদের প্রশংসা অর্জ্জন করে। ১৯৫৬ সালে 'ষ্টেটসম্যান'এর চীফ রিপোর্টার পদে উন্নীত হন।

আমার জিজ্ঞাসায় তিনি জানান যে, কোন কর্ম্মরত সাংবাদিকের নির্ব্বাচনী পদে অবতীর্ণ হওয়া উচিত নয়। বর্ত্তমানে সংবাদপত্র সমূহের সাধারণ ব্যক্তিদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধা পরিবেশন করা প্রয়োজন। পূর্ব্বের ন্যায় সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন অপেক্ষা দেশের সর্ব্বস্তরের ও শ্রেণীর মূক আবেদনকে মুখর করে তোলার দায়িত্ব সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের প্রধান অবলম্বন হওয়া বিধেয়। কর্ম্মরত সাংবাদিক আইনকে তিনি স্বাগত জানান।

শেষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীঘোষ জানালেন যে, 'মাসিক বসুমতী' তিনি বহুদিন হইতে পড়িয়া থাকেন এবং ইহার সম্পাদনা ও কয়েকটি Features পাঠক-সমাজের খুবই উপকারে লাগিয়া থাকে।

শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

[সেবাব্রতী ও মানবদরদী]

দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কশাঘাতে নিষ্পেষিত প্রারম্ভিক জীবন যে আতুর, অনাথ ও অসহায়দের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যায়, তাহা অকৃতদার, অক্লান্তকর্ম্মী ও "ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুক" শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শনে প্রতিফলিত হইয়াছে।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান শ্রীমুখোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালে ২৪ পরগণার আড়িয়াদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলালয়ে প্রতিপালিত পিতৃহীন বালক ১৯০৯ সালে স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাভাবে পড়াশুনায় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তজ্জন্য তিনি স্থানীয় অনাথ ভাণ্ডারের কর্ম্মী হিসাবে নানারূপ সমাজসেবার কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত করেন। কিছু দিনের মধ্যে এক সওদাগরী অফিসে সামান্য বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং উপার্জ্জিত অর্থ অনাথ ভাণ্ডারে দিতে থাকেন। পরিচালক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে গমন করায় ১৯১২ সালে স্থানীয় অনাথ ভাণ্ডার পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার শ্রীমুখোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত করা হয়। সেবাধর্ম্মী শম্ভুনাথের তৎপরতায় কিছু দিনের মধ্যে রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, নাড়াজোলের

রাজা নরেন্দ্রলাল খান, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, রায়-বাহাদুর জলধর সেন, রসরাজ অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্তা নলেন্দ্রবালা নন্দী, বিখ্যাত ঔষধ-ব্যবসায়ী ও, এন, মুখার্জ্জি, স্যার ওঙ্কারমল জেঠিয়া, মাগনীরাম বাঙ্গড় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উক্ত ভাণ্ডারকে নানারূপে সহায়তা করিতে থাকেন। এইরূপ সাহায্যলাভের ফলে তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে সক্ষম হন এবং উত্তরবঙ্গের বন্যা, বিহারের ভূমিকম্প, বর্দ্ধমানের বন্যা, মেদিনীপুরের ঝড় ও বন্যা ইত্যাদি বিবিধ আর্ত্তত্রাণে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে শম্ভুনাথের উদ্যোগে আড়িয়াদহে ক্রীত একটি সুবৃহৎ অট্টালিকায় অনাথ ভাণ্ডার স্থানান্তরিত করিয়া কুটীর-শিল্প, বিদ্যালয় পরিচালনা ও দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধন করা হয়।

কিছুকাল পরে দ্বিতীয় মহাসমরের পটভূমিকায় উদ্ভূত মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে (১৩৫০ সালের মন্বন্তর) যখন দলে দলে নরনারী আত্ম-বলিদান করিতে থাকেন, তখন মানবদরদী শম্ভুনাথ সদলে দরিদ্র, অনাথ ও বিপন্ন মধ্যবিত্তদের সাহায্যকল্পে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করেন। ভগবৎ-বিশ্বাসী শ্রীমুখোপাধ্যায়ের এই মহৎ প্রচেষ্টায় মোহিনী মিলস, ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ প্রভৃতি বেসরকারী সংগঠনগুলির ও সরকারী সাহায্য আসিতে থাকে।

এই সময় এক দিন অনাহারক্লিষ্ট তিনটি আসন্ন-প্রসবা নারীর পথিপার্শ্বে সন্তান প্রসব ও তজ্জনিত দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া শম্ভুনাথ অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন। কারণ, মাতা ও সন্তান, প্রসূতি ও শিশুর মধ্যে থাকে অনাগত দিনের মানুষ ও তাহার সমাজ। উহার এইরূপ অপচয় বন্ধ করার জন্য ব্যাকুল শম্ভুনাথ ১৯৪৭ সালে আড়িয়াদহে "শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান" গড়িয়া তুলিলেন। এইবারও ইহার সাহায্যে এগিয়ে এলেন রাজ্যপাল ৺হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জি, এল, মেহতা, অচ্যুৎ আনন্দ পাই, বেঙ্গল ইমিউনিটি, জাডিন আণ্ডারসন কোম্পানী ও আরও অনেকে। রাজ্য সরকার শম্ভুনাথের কর্ম্ম-প্রতিভায় সন্তুষ্ট হইয়া এই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে 'ধাত্রী-শিক্ষা'র ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মাতৃমঙ্গলের সহিত শিশুকল্যাণ ব্যবস্থা অঙ্গীভূত না হইলে প্রসূতি হাসপাতালের উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ইহা শ্রীমুখোপাধ্যায় অনুভব করিলেন। তজ্জন্য ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রসূতি-সদনের সহিত ছয়টি শিশু-শয্যা সমন্বিত একটি স্বতন্ত্র বিভাগের কার্য্যারম্ভ করা হয়। কিন্তু দূরদর্শী শম্ভুনাথ দেখিলেন যে একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ শিশু হাসপাতাল না হইলে প্রয়োজন মিটান যায় না। তাই শ্রীমুখো-পাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকারের আনুকূল্যে

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্ত "মাতৃমঙ্গল" সংলগ্ন দুই বিঘা জমির উপর ভারত-বরেণ্য চিকিৎসক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নামাঙ্কিত "ডাঃ বি, সি, রায় শিশুসদন" ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্না উদ্বোধন করেন। ইহার বিভিন্ন বিভাগ গঠনে কেন্দ্রীয়-সরকার, রাজ্য সরকার, রেড্ক্রস সোসাইটী, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পরিষদ, মোহিনী মিলস ও কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির দান উল্লেখযোগ্য।

দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় যে "পরিবার-পরিকল্পনা" প্রয়োজন, ইহাও সংগঠক শম্ভুনাথ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সেই জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শানুযায়ী ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে একটি "পরিবার-পরিকল্পনা" কেন্দ্র মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোজিত হয়।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের উক্ত প্রতিষ্ঠান-চতুষ্টয় শুধু ব্যারাকপুর মহকুমা নহে, ২৪ পরগণা জেলার এক বৃহদংশের উপকার সাধন করিতেছে।

বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবে শম্ভুনাথ "রাজ্যপাল-পদক" পান এবং স্বাধীনতার দশম-বার্ষিক উৎসবে জাতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রেরণা এবং নীরব সেবা যে কোন এক অনির্দেশ্য শক্তির আশীর্ব্বাদে অর্থাভাবে নিস্তব্ধ হইয়া যায় না, তাহা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতন কর্ম্মসাধক ও আজীবন মানবদরদী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যধারা অনুসরণ করিলে বুঝা যায়।

ডক্টর ত্রিগুণা সেন

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ ও মহানগরীর পৌরপ্রধান]

ম্যালেরিয়ায় পড়লে চোখ-কান বুঁজে, নাক সিঁটকে কোনরকমে কুইনাইন গলাধঃকরণ করার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পাঠ্যক্রমগুলি হৃদয়ঙ্গম করলে ডিগ্রীলাভের পথ সুগম হয় বটে কিন্তু তাতে করে পরিপূর্ণ মানবত্ব লাভ করা যায় না। আর শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিপূর্ণ মানবত্বের আভাস যতক্ষণ না সূচিত হচ্ছে, শিক্ষাপদ্ধতি ততক্ষণ ব্যর্থ। বিশ শতাব্দীর বোধনবেলায় বাংলা দেশের শিক্ষাপদ্ধতির এই ক্রম-ব্যর্থতা বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করল তৎকালীন কয়েক জন দেশসেবকের দৃষ্টি। তাঁরা পরিষ্কার অনুভব করলেন যে ছাত্রদের মধ্যে আত্মসচেতনতা, জাতীয় কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন অপরিহার্য। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জন্ম নিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। কালের গতিতে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজ সেই পরিষদ রূপায়িত হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমান কালের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকল্পে এগিয়ে এসেছিলেন যে ক'জন, তাঁদের অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানবীর রাজা সুবোধ মল্লিক, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, স্যার তারকনাথ পালিত, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ দেশবরেণ্য মনীষীদের উদ্দেশে জানাই প্রণাম। পরাশোভিত এই শিক্ষায়তনের আজকের দিনের সর্বাধ্যক্ষ (Rector) পূর্বাচার্যদের সুযোগ্য উত্তর সাধক, বিদেশের বুকে বাঙলার গৌরববর্দ্ধক ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর, ত্রিগুণা সেন। আজকের দিনে কলকাতা মহানগরীর পৌরপালকরূপেও যিনি সমাসীন।

পরলোকগত গোলোকনাথ সেন মহাশয়ের পুত্র ত্রিগুণাচরণ সেনের জন্ম হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। যে শিক্ষায়তনের প্রধান কর্ণধাররূপে আজ তিনি পরিদৃশ্যমান, সেই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর জন্মের সালটির মিল খুব নিবিড় অর্থাৎ ঐ শিক্ষায়তনের বীজ বপন করা হয় ঐ ১৯০৫ সালেই। ত্রিগুণাচরণের মাতুল ছিলেন ব্রতচারী আন্দোলনের পুরোধা বাঙলার স্বনামধন্য পুরুষ স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত। বাল্যশিক্ষা শুরু হ'ল শিলচরে। সেখান থেকে আই. এস. সি পাশ করে ভর্তি হলেন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই পূর্বতন একটি রূপ)। এখান থেকে বি. ই. পাশ করলেন ১৯২৬ সালে। তারপর আরও দু'বছর এখানেই অধ্যাপনা করে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভার্থে যাত্রা করলেন জার্মাণীর উদ্দেশে (১৯২৯)। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টরেট লাভ করলেন ১৯৩২ সালে। তারপর "বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি"।

কয়েকটা দিন মাত্র। দেশে ফিরে এসে দেশের উন্নতিকর সুমধুর স্বপ্নে যখন যুবক ত্রিগুণাচরণ সমাচ্ছন্ন, মন প্রাণ যখন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিপূর্ণ, ঠিক সেই সময়েই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ছুতোয় তরুণ শিক্ষাব্রতী ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সনকে আটক করা হ'ল। একটি বছর তাঁকে আটক করে রাখার পর বাঙলা প্রেসিডেন্সী থেকে তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হ'ল। তাঁর নামে পরোয়ানার বৈধতা শেষ হ'ল ১৯৩৯ সালে অর্থাৎ ঠিক ছ'টি বছর পর। এই ছ'বছর ত্রিগুণাচরণ দেশে ছিলেন না ঠিকই তেমনই নিশ্চেষ্ট হয়েও ছিলেন না, ভারতের নানা স্থানে নানাবিধ শিল্পকর্মের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন ডক্টর সেন। এর পর আরও চার বছর বাদে দেশে এলেন ডক্টর সেন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসাররূপে। পরের বছর হলেন অধ্যক্ষ। তারপর মহাবিদ্যালয় যখন পরিণত হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৫৫) অধ্যক্ষ ত্রিগুণাচরণও রূপান্বিত হলেন রেক্টার ত্রিগুণাচরণে। কলকাতা পৌরসভার অল্ডারম্যান হলেন ১৯৫৭ সালে। সেই বছরই কলকাতার মেয়রের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন ত্রিগুণাচরণ সেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ইনি অন্যতম সদস্য। এ ছাড়া কলকাতার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টেরও ইনি একজন ট্রাষ্টী।

১৯৫৬ সালে মার্কিণ মুল্লুক ও ইয়োরোপ ভ্রমণ করলেন ত্রিগুণাচরণ। ডক্টর সেনের মতে নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়ে দেখলে জার্মাণীর দোসর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, এ দিকে সে আজও পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের সম্বন্ধে এখনকার দিনে ওদের ধারণা কি রকম? উত্তর আসে—"স্পিরিচুয়ালিশমের প্রভাবে মেটিরিয়ালিশম্ আমাদের ধ্বংস করতে পারছে না অর্থাৎ আমাদের আত্মা এখনো অজড়, আধ্যাত্মিকতার কল্যাণেই জড়ত্ব এখনো আমাদের গ্রাস করতে পারছে না।" ডক্টর সেনের মতে দশ বছরে আমাদের যতটা এগোনো দরকার ততটা অগ্রগতি দুঃখের বিষয়ে আমাদের ঘটেনি। দীর্ঘ দীনের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাবিদ আচার্য ত্রিগুণাচরণকে প্রশ্ন করি—ছাত্রদের সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? জনপ্রিয় অধ্যক্ষের কাছ থেকে উত্তর এল—"আমাদের ছাত্রদের মধ্যে লাভ ফর আইডিয়ালিশম্ যতটা আছে আর কোথাও তা আপনি পাবেন না কিন্তু বলবার কথা হচ্ছে যে, তাদের চোখের সামনে উপযুক্ত আইডিয়া গ্রো করাতে কেউ সক্ষম হচ্ছেন না এবং ঠিক এইজন্যেই তারা ঠিক সত্যিকারের পথ খুঁজে পাচ্ছে না।" নির্মাণ কৌশলের দিকে ভারত আজ পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে সে সম্ভাবনাও রয়েছে তার মধ্যে—তবে তার আজকের দিনের চরিত্রের রূপটি বদলে ফেলতে হবে—আলোচনা প্রসঙ্গে এ অভিমতও তিনি ব্যক্ত করলেন। ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে ত্রিগুণাচরণ গভীর ভাবে জড়িত ছিলেন। ব্রতচারী নৃত্যেও তিনি গ্রহণ করেছেন অংশ।

পঞ্চাশ অতিক্রম করলেও ত্রিগুণাচরণের মন তারুণ্যধর্মী, বার্ধক্য তাঁর কর্মমুখর জীবনের নাগাল থেকে এখনো শত হাত দূরে। সকালে ছাত্রদের আবাসগুলি ত্রিগুণাচরণের অবশ্য পরিদর্শনীয়। সাড়ে আটটা থেকে বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে দপ্তরে, তার পর প্রায় সাতটা অবধি কাটে পৌর প্রতিষ্ঠানে। নিজের ছাত্রদের সম্বন্ধে ত্রিগুণাচরণ বলেন—"তাদের কাছ থেকে যা আমি চেয়েছি তার ঢের বেশী তারা আমায় দিয়েছে। ভক্তি শ্রদ্ধা তো দিয়েইছে। তার উপর যা দিয়েছে তারই নাম ভালোবাসা। দিয়েছে প্রচুর, দিয়েছে অজস্র, দিয়েছে মুঠো মুঠো।"

শব্দমুখর হাওড়া ষ্টেশন থেকে অসংখ্য যাত্রীতে নিজেকে পূর্ণ করে কলকাতা শহরের নানা রাজপথ দিয়ে এঁকে-বেঁকে সরকারী ছাপমারা আটের বি বাসটা ক্লান্ত হয়ে যেখানটায় থেমে যায় ঠিক তারই সামনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে বেশ খানিকটা হাঁটলে বাঁ হাতে সর্বাধ্যক্ষের ঘর। ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, মাটি ও শূন্যের বুকে প্রকৃতির স্বাক্ষর! সামনে ব'সে ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেন। মুখে মৃদু হাসি, চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি, হাতে জলন্ত সিগারেট। আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে মনেই হয় না যে একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার, এত বড় শিক্ষায়তনের সর্বাধ্যক্ষ, ভারতের বৃহত্তম নগরীর পৌরপাল বরং কেবলই মনে হয় যেন অত্যন্ত আপন জন, কাছের মানুষ, পরম শুভাকাঙ্খী।

"সাধারণ অর্থে রাজনীতিজ্ঞ বলিতে যাহা বোঝায়, স্বামী বিবেকানন্দ তাহা ছিলেন না বটে, তথাপি আমি মনে করি, তিনি ভারতের বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মহান প্রবর্তক (ইচ্ছা করিলে আপনারা অন্য কোন শব্দও ব্যবহার করিতে পারেন) ছিলেন। পরবর্তী কালে যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে কম-বেশি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আধুনিক ভারতকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছেন।" —শ্রীজওহরলাল নেহেরু।

নীলকণ্ঠ

ছত্রিশ

আগন্তুককে শেষ পর্যন্ত নাম অবশ্য বলতে হয়নি সেদিন। শ্যামচাঁদের বিস্মিত দৃষ্টিকে আরও বিস্ফারিত করবার জন্যেই হয়ত মঞ্জরী বলল: আপনার নাম আলোক মিত্র? খাঁ সাহেবের জলসায় আপনাকে দেখেছি। যাক। নিশ্চিন্ত হলেন শ্যামচাঁদ গড়াই। নিশ্চিন্ত হতেন না যদি খোলা জানলা দিয়ে বাইরের আকাশে তাকাতেন। তাকালে দেখতে পেতেন শ্যামচাঁদকে লক্ষ্য করেই বাঁকা চাঁদ বোধ হয় মুচকি হাসছে।

সেদিন যাবার আগে শ্যামচাঁদ গড়াই নিজের অজান্তে একটা সুখবর দিয়ে গেলেন মঞ্জরী এবং আলোক, দুজনকেই। অজান্তেই। কারণ শ্যামচাঁদ মুখখানাকে যথাসম্ভব করুণ করেই বলেছিলেন: মঞ্জু, দিন সাতেকের জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে যে—। মঞ্জরীও মুখ কালো করে জিজ্ঞেস করেছিলো: কোথায়? মঞ্জরী পাকা অভিনেত্রী। শুধু বাইরে নয়; ঘরেও। শ্যামচাঁদ জবাব দিলেন: না, না তেমনি দূরে কোথাও নয়, আসামে। জলসা আছে কয়েক দিন। সাত দিনের বেশী হবে না।

সাতটা পুরো দিন আর রাত থাকবেন না শ্যামচাঁদ। মধু বর্ষণ করল কথাটা মঞ্জরীর কানে। মুখ দেখে অবশ্য মনে হলো বিষ খেতে দিয়েছেন তাকে শ্যামচাঁদ। শ্যামচাঁদ খুসী হলেন মঞ্জরীর চোখ দেখে। সে চোখে শুধু শ্যামচাঁদেরই মুখ আঁকা। শ্যামচাঁদ আসামে চলে যাবার পরের দিনই মঞ্জরী যদিও নিশ্চিত জানতো আলোক আসবে, তবুও আলোক যখন রাত্তিরে সত্যি-সত্যি এলো তখন কিন্তু মঞ্জরী আকাশ থেকে পড়ার ভান না করে পারলো না। জিজ্ঞেস করল সহাস্যে: আপনি?

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে জবাব করলো আলোক মিত্র: কেন? আসতে নেই?

মঞ্জরী: কাল এসেছিলেন, সে জানতেন না শ্যাম বাবু আপনাকে এখানে নিয়ে আসছেন বলে,—কিন্তু আজ?

আলোক: এখানে নিয়ে আসছেন জানলে আসতাম না, তা জানলে কি করে?

মঞ্জরী সে কথার কোনও জবাব দিলো না। বাঁধভাঙ্গা খুসীর বান ডেকেছে তার মনে। দুকূল হয়েছে প্লাবিত। পাল্টা প্রশ্ন করলো সে: আমার চিঠি পাওনি তুমি?

আলোক জবাব দিলো না। পাল্টা প্রশ্ন করল না। হাসলো।

মঞ্জরীর মন অবগাহন করল আলোকের ঝর্ণাধারায়।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দু'জনে কোনও কথা বলল না। কথা বলবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করল না! দুরন্ত দুঃসহ অস্থির আবেগে কাঁপতে লাগলো মঞ্জরীর শরীর। রিমঝিম করতে লাগল অবশ স্নায়ু। চোখের দু'কোণে কান্না হয়ে বাজতে লাগলো আনন্দের গান আর আলোর বহ্নি। বহু দূর দিগন্তে হাসতে লাগল চাঁদ যেমন হেসেছে সে বার বার মাটির মানুষের ছেলেমানুষীতে হাজার হাজার বছর ধরে।

শুধু আকাশের বিপুল বুকে সেই মুহূর্তে জন্ম নিলো আরেকটি তারা। শুকতারা নয়। সুখতারা! পৃথিবীর প্রথম রাত্রি থেকে যতবার ভালো বেসেছে একজন পুরুষ একজন রমণীকে তত বার আকাশে জ্বলেছে তারা। একটি একটি করে ছেয়ে গেছে তারায়-তারায়। আজ সেখানে আরেকটি আলোর শিখা জ্বালিয়ে তুললো আরেকটি রমণী এবং আরেক জন পুরুষ। তাদের একজনের জাত নেই; আর আরেক জন অভিজাত।

একটু সময় নিলো মঞ্জরী সামলে নিতে, তার পর আলোককে বলল: কিন্তু আজ চলে যাও এখনই; এবং একদিনও আর এসো না—যত দিন না শ্যাম বাবু এখানে আবার আসেন।

কেন?

কারণ, শ্যাম বাবু কলকাতায় আছেন।

সে কি?

হ্যাঁ। শ্যামচাঁদ কোথাও যায়নি। কলকাতাতেই আছেন। আলোকের সঙ্গে মঞ্জরীর ব্যাপার নিয়ে উড়ো চিঠি দিয়েছিলো একদিন। তারই ফলে লোক লাগিয়েছিলেন শ্যামচাঁদ। গোকুল প্রোডাকশনের সেই লোকটাকে, প্রথম দিনেই যার সঙ্গে মঞ্জরীর দেখা হয়েছিলো ট্রামে! লোক লাগিয়েও হয়নি। নিজে আলোককে নিয়ে উঠেছেন মঞ্জরীর ঘরে। চলে যাচ্ছেন বলে ফাঁদ পেতে রেখে এসে খবর নিচ্ছেন মঞ্জরী কি করে, আলোক কি করে। খবর যা পেয়েছেন তা খারাপ নয়। দিন কয়েক বাদে গোকুলই খবর নিয়ে এসেছে। আলোক মাত্র একদিন গিয়েছিলো। তা-ও মঞ্জরী তাকে বসায় নি। বিদায় করে দিয়েছে পত্রপাঠ। আর তার পর একদিনও ছায়া মাড়ায় নি আলোক মঞ্জরীর। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন শ্যামচাঁদ। মঞ্জরীকে চিনতে ভুল হয় নি তাঁর। ছিঁড়ে কুচি-কুচি করেছিলেন উড়ো চিঠি। হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

হাওয়া উড়িয়ে হাত ছাড়া করবার পর মনে হয়েছিলো পুড়িয়ে দিলেই ভালো হতো। যদি ছেঁড়া টুকরো কারুর হাতে গিয়ে পড়ে আবার। পড়লেই বা! মঞ্জরী তাঁর বাঁধারক্ষিতা,—বউ নয় তো!

শ্যামচাঁদ গড়াই সব খবরই নিয়েছিলেন। কেবল একটি খবর ছাড়া। গোকুলকে তিনি শুধু তাঁর একার চর মনে করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। গোকুল, যে যার কাছেই পয়সা তারই চর, এ খবর শ্যামচাঁদ নেবার দরকার মনে করেন নি। মঞ্জরী তাই গোকুলকেই ফিরতি-চর লাগিয়ে সাবধান হয়ে গেছে সময় থাকতেই। শ্যামচাঁদ বিশ্বাস করেছিলেন গোকুলকে। মঞ্জরী করে নি। তার পেশার হাতেখড়িই লোককে অবিশ্বাস। গোকুলকে যেমন এক চোখ রাখতে বলেছিলো শ্যামচাঁদের ওপর, তেমনি নিজে দু' চোখের কড়া পাহারায় নজরবন্দী রেখেছিলো গোকুলকে। গোকুল জানতো না এ খবর; শ্যামচাঁদও জানতেন না।

জানতো সোনাবালা। মঞ্জরীকে সে পেটে ধরেছে। আগুন নিয়ে খেলতে দেখে সাবধান করতে চায় মেয়েকে। মঞ্জরী কিন্তু হাসে। আগুন নিয়ে খেলতে যে ভয় পায় সে মেয়ে কিন্তু মেয়েমানুষ নয়। মঞ্জরী সোনাবালার মেয়ে, কিন্তু শ্যামচাঁদের সে কে? শ্যামচাঁদের সে মেয়েমানুষ।

'মুক্তি নেই' ছবিটির মুক্তিলাভ ঘটলো ঠিক এই সময়েই। আর এই সময় থেকেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী নিজে এসেই প্রায় ধরা দিলেন মঞ্জরীর জীবনে। ভাগ্যের পাখায় ভর করে এলো সুদিন। এলো সমারোহ। সুখ্যাতি; অর্থ; নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ দিন। 'মুক্তি নেই' ছবিটির মুক্তি মাত্র যেটুকু সন্দেহের অবকাশ ছিলো তা আর রইলো না। পুরানো যাদের শেষ আশা ছিলো যে প্রথম ছবিতে বিড়ালাক্ষীর ভাগ্যে সৌভাগ্যের শিকা দৈবাৎ ছিঁড়েছে, তাদের বাড়া আশায় ছাই দিলো মঞ্জরী। মুক্তি ছবিতে চিরকালের মতো উচ্চারিত হলো মঞ্জরীর অভিনয় স্বীকৃতি। Fluke নয়! মঞ্জরী সত্যিই অভিনেত্রী। সেই অভিনেত্রী যাকে অভিনয় করতে হয় না চেষ্টা করে। অথবা যার অভিনয় দেখে মনে হয় অভিনয় নয়।

নিজের বাড়ী মাথা তুলছিলো এতদিন একটু একটু করে লেকের ধারে। এই সময় আকাশের মাথায় ঠেকে গিয়ে থামলো তার মাথা তোলা। সম্পূর্ণ হলো বাড়ী। গৃহপ্রবেশ করলো মঞ্জরী সদলবলে। মা-র জন্যে শ্বেত পাথরের গাঁথা মেঝে-সুদ্ধ বিরাট ঠাকুরঘর। বেলারাণীর আলাদা মহল। শুধু মঞ্জরী নয়; সবার অলক্ষ্যে ভাগ্যলক্ষ্মীই স্বয়ং গৃহপ্রবেশ করলেন মঞ্জরীর সঙ্গেই।

গৃহপ্রবেশের আগে শুধু গৃহই সমাপ্ত হলো না। গৃহসজ্জার কোথাও রইল না অসম্পূর্ণতা অথবা ফাঁকা। যামিনী রায়ের ছবিতে, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর তৈরী মূর্তিতে, ল্যাজারাসের আসবাবপত্তরে, শম্ভো ঠাকুরের ফ্রেস্কোতে অপূর্ব আকার ধারণ করল অভিনেত্রীর নতুন গৃহ। বইয়ের কেসে রবি ঠাকুর, বর্ণার্ড শ, হক্সলী এবং রাসেলের পেছনে লুকিয়ে রইলো মঞ্জরীর প্রিয় লেখক শশধর দত্ত। দেখে কেউ তারিফ করলো রুচির। কেউ মুখ টিপে হাসলো। সে-হাসির সরল অর্থ: অর্থ থাকলে কি অনর্থই না বাধানো যায়।

হাততালি অথবা উপহাস কিছুই গায়ে মাখলো না মঞ্জরী। মঞ্জরী জানে সাফল্যই সব। সাফল্য এসেছে যার জীবনে কে কি বললো জানবার তার প্রয়োজন নেই। কি ভাবে অর্জিত সেই সাফল্য তার ইতিহাস-বিশ্লেষণেরও কোন মানে হয় না। সাফল্যের একমাত্র মানে হয় সাফল্যেই মানুষের জীবনের সঙ্গে যদি কিছুর তুলনা চলে, সে হচ্ছে খেলা। খেলায় জিতটাই সব। যে হারে সে-ই বলে কেবল যে খেলায় হার-জিত বড় নয়; বড় হচ্ছে খেলাটাই। খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি হচ্ছে আবার খেলার চেয়েও বড়ো। কিন্তু যে জেতে সে জানে খেলার ইতিহাসে লেখা রইবে শুধু বিজয়ীর নাম। কি ভাবে হয়েছে বিজয় লাভ তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ইতিবৃত্তকারের। জানে বলেই সে জেতে।

আজ টলিউডের বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সুনিশ্চিত ভাবে মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী মঞ্জরী দেবী যখন তাঁর প্রযোজনায় গৃহীত চিত্রের শুটিংএর সাময়িক বিরতির অবসরে হঠাৎ নিজেকে হারান,—তখন তাঁর নিজের জীবনের ছায়াছবির নায়িকা নয়, দর্শকাসনে হন উপবিষ্ট! ভেসে আসে অতীত অধ্যায়। অতিক্রান্ত লোক। ধূসর পাণ্ডুলিপি। আজ লোকে যখন তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে মঞ্জরীর সাফল্য একলক্ষ্যে লক্ষ্যের দিকে অদ্রুত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপেরই পুরস্কার, তখন না হেসে পারে না সে। বাইরে থেকে বিচার করলে অবশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মঞ্জরী অধ্যবসায়, স্থিরলক্ষ্য, প্রতিশ্রুতি, অনুশীলন আর প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমেরই যোগফল। কিন্তু মঞ্জরী জানে, সে সৌভাগ্যের বরপুত্রীমাত্র। নিয়তি তাকে নিয়তই নিয়ে চলেছে সূর্যোদয়ের প্রত্যূষে।

এই সাফল্যে তার নিজের রচনা অতি সামান্য অংশ জুড়ে। সফল না হয়ে তার উপায় ছিলো না। সৌভাগ্য তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে চিরকালের মতো গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছে সাফল্যের সঙ্গে। পরিশ্রম করেছে সে; অভিনয়-প্রতিভা করেছে পুঁজি; অধ্যবসায়ের অদ্রুত কিন্তু দৃঢ়পাখায় করেছে ভর; প্রতিটি পদক্ষেপ করেছে হিসেব করে। সবই ঠিক। কিন্তু সাফল্যের বিচারে এ-সবই বেঠিক। ভাগ্য। ভাগ্য ছাড়া এ-সবেরই কোন মূল্য নেই।

মঞ্জরীর নিজের জীবনেই নয় শুধু; সকলের জীবনেই এই সত্য। অনেকেই তার মত পরিশ্রম করেছে; অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তাদের কারুর বিশ্বাস ছিলো না কম। হিসেব করে এগুতে ভুল করেনি তারাও। প্রতিভার পুঁজি তাদের কারুর কারুর মঞ্জরীর চেয়ে কিছু কম ছিলো কি? না। তবে তারা কেন হেরে গেল? এর উত্তর,—ওই ভাগ্য। ভাগ্য যাকে হারাবে তাকে ঠিক রাস্তা দিয়ে অঙ্ক কষে নিয়ে যাবে, কিন্তু শেষ অঙ্কের শেষ হাসি হাসতে দেবে না তাকে। কিছুতেই দেবে না। যে পথ ধরে প্রাতঃস্মরণীয়রা বরণীয় হয়েছেন সেই ধ্বজা ধরে অনুসরণ করলে পঞ্চপাঠ ঠিক হয় কিন্তু জীবনের পাঠ হয় শেষ পর্যন্ত বেঠিক।

আরব্যোপন্যাসকে যারা অলীক বলে। বলে অলৌকিক তারা জানে না, মানুষের জীবন আসলে আরব্যোপন্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। চিচিং ফাঁক এই দুটি কথার মধ্যেই মানবজীবনের চরম সত্য নিহিত। চিচিং ফাঁক! সত্যিই তাই। চিচিং ফাঁক ছাড়া আর সবই ফাঁকি। মানুষের জীবন কি?—এর কোনও উত্তর নেই মুদ্রিত পুস্তকে। মানুষের জীবন কি,—তারই উত্তরে অনির্বাণ জলছে একটি প্রদীপ। মানুষের জীবনের সমস্ত অর্থ জলে উঠেছে

সেই প্রদীপের আলোয়। মানুষের জীবন হচ্ছে সেই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ!

আলোকের বাড়ীতে কথাটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে উঠলো এক সময়ে। শুধু উঠলো বললে ভুল হবে। কথাটা আলোকের বাড়ীর কড়া ধরে রীতিমত নেড়ে জানান দিলো যে সে এসেছে। আলোকের শুভানুধ্যায়ীদের কান থেকে কানে গড়াতে গড়াতেই কথাটা আলোকের মায়ের কানে গিয়ে বাজলো। আলোকের মা কথাটা শুনে হাসলেন, তার পরে আলোককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: হ্যাঁ রে আলো, মেয়েটা কে রে?

কোন্ মেয়ে মা? আলোক যেন বুঝতে পারেনি।

আরে যার সঙ্গে তোর মেলামেশা উচিত নয় মোটে!

অ, মঞ্জরী?

এই তো, নিজেও বুঝিস যে তার সঙ্গে তোর মেলামেশা ঠিক নয়, তবে মিশিস কেন?

না, তা বলিনি তো মা!

তবে কি বলেছিস? তাই তো বললি,—বললি না এইমাত্র?

না। তোমাকে যে কেউ কেউ মঞ্জরীর কথা তুলে সাবধান করে গেছে তা আঁচ করেছিলাম।

মেয়েটা দেখতে কেমন রে?

এই তো দেখো না—ছবি রয়েছে।

আলোকের মা তাকিয়ে দেখলেন ঘর ভর্তি নানা মাপের নানান পোজের ছবি। সব। মঞ্জরীর। দেখবার পর আবার জিজ্ঞেস করেন: মেয়েটা প্লে করে?

হ্যাঁ মা, খুব ভালো প্লে করে সিনেমায়!

আমাকে দেখাবি একদিন?

হ্যাঁ মা, আজই নিয়ে যাবো তোমাকে দেখাতে,—খুব ভালো করেছে, যে ছবিতে সেখানা এখন আবার চলছে!

মঞ্জরীর নোতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশের দিন সবাই গেছিলো, শুধু আলোক ছাড়া। পরের দিন সকালে মঞ্জরী পায়রাদের খাওয়াচ্ছে যখন নিজের হাতে, তখন হুড়মুড় করে এসে ঢুকলো আলোক। মঞ্জরী পায়রাদের খাওয়াতে খাওয়াতেই জিজ্ঞেস করলো: কাল এলে না কেন? ভেতরে এসো,—কি খাবে?

আলোক: কিচ্ছু না।

মঞ্জরী: কেন?

আলোক: আমি তো আর সখের পায়রা নই।

দু'জনেই হেসে ফেললো। হাসি থামতে আলোক বললো: হাসির কথা নয়।

তোমাকে একবার আমাদের বাড়ী যেতে হবে; মা দেখতে চেয়েছেন তোমাকে।

মঞ্জরী: সে কি? কেন? হঠাৎ!

আলোক: হঠাৎই বলতে পারো। আত্মীয়-স্বজনরা বলছেন তোমার সঙ্গে আমার মেলামেশা নাকি উচিত হচ্ছে না। তাই মা তোমাকে একবার দেখতে চান—

মঞ্জরী: দেখলে বুঝবেন?

আলোক: তা বুঝবেন বৈ কি! মা যে—

মঞ্জরীকে সন্ধ্যেবেলায় মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েই আলোক কাজের অছিলায় বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে। বলে গেলো, ঘণ্টা দুয়েক বাদে ফিরে আসবে মঞ্জরীকে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্যে। মঞ্জরীকে দেখে খুব খুসী হয়ে আলোকের মা বললেন; খুব খুসী হয়েছি মা তোমাকে দেখে খুব খুসী হয়েছি। তুমি যে গরদের শাড়ী পরে মালা জপতে জপতে আসো নি এজন্তে খুব খুসী হয়েছি।

মঞ্জরী সাজ্যাতিক সেজে গিয়েছিলো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত জড়োয়ায় মুড়ে। মঞ্জরীকে নিজে বসে খাওয়ালেন আলোকের মা। তারপর বললেন: তোমাকে মঞ্জু বলে ডাকবো।

দু'ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা হয়ে যায়, প্রায় আলোকের দেখা নেই। আলোকের মা বলেন: ও ওইরকমই। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, অন্য লোক তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আলোকের মায়ের কথা শেষ হয়েছে, আর মনে হয়েছে তখুনি নীচে কে যেন এলো। বলতে বলতেই আলোক এসেছে বোধ হয়। না। একজন চাকর এসে খবর দিলো: বাইরের বাবু এসেছেন একজন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বস,—আমি আসছি। তারপর মঞ্জরীকে মা বলেন; তুমি একটু বোসো, আমি আসছি।

নীচে গিয়ে আগন্তুককে দেখেই বোঝেন আসার কারণ।

আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়ে বলে: হঠাৎ আসায় অবাক হয়েছেন মা?

আলোকের মা: না জানতাম, তুমি আসবে—

আগন্তুক: তাহলে সবই শুনেছেন?

আলোকের মা: কি?

আগন্তুক: মঞ্জরীর মতো মেয়ের সঙ্গে আলোকের মেশা? —আপনি মঞ্জরীর সব ইতিহাস জানেন না—

আলোকের মা: সব জানি বাবা,—তুমি ওপরে এসো—

ওপরে মঞ্জরী যেখানে বসে আছে সেখানে আগন্তুককে নিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে বলেন: এইতো এর কথা বলছিলে তো। এতো ভালো মেয়ে খুব, এর সঙ্গে আলোকের মেলা-মেশা খারাপ কেন বাবা?

আগন্তুককে দেখে, আর মায়ের কথা শুনে মঞ্জরীর মুখ এক রহস্যমণ্ডিত হাসিতে ভরে যায়।

কিন্তু আগন্তুকের ওপর দিকে চুমরে তোলা গোঁফের প্রান্ত নিজে থেকেই ঝুলে পড়ে নীচের দিকে। মুখ নীচু করেন শ্যামচাঁদ গড়াই। এমন অবস্থায় কখনও পড়েননি এর আগে। দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ হয়।

আলোক ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। [ক্রমশঃ।

সমাজের নীচ হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণ-বন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড় চেষ্টার বিষয়। —রবীন্দ্রনাথ।

চরিত্র ও শিক্ষা

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ও উপাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

আজ ভারত স্বাধীন। বহু বৎসরের সাধনা ও বীরোচিত সংগ্রামের ফলে এই স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, নিজের উপর যতক্ষণ না প্রভুত্ব আসিতেছে, ততক্ষণ কোন মানুষই স্বাধীন নয়। পক্ষান্তরে, নিয়ম বা আইনানুগ হওয়ার মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতার বীজ নিহিত। জাতিকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি-বিশেষকে এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে হইবে। এ কথাও ঠিক—ব্যক্তি-চরিত্রের দ্বারাই একটি সমগ্র জাতির চরিত্র নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। জাতীয় উন্নতিও জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল মানুষের উন্নতির সমষ্টিমাত্র। অপর দিকে বড় রকমের সামাজিক দুর্নীতি যেখানে বিদ্যমান, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তি-জীবনেই সেই দুর্নীতি বাসা বাঁধিয়া আছে। আইন করিয়াই ইহার অবসান ঘটান যাইতে পারে না। পরন্তু এই ভাবে ইহা নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিলে বিপরীত ফলই হওয়া সম্ভব। দুর্নীতি তখন নূতন রূপ লইয়া দেখা দিবার পথ খুঁজিয়া লইবে। এই অবস্থায় প্রতিকারের জন্য সর্ব্বাগ্রে চাই—ব্যক্তি-জীবন ও চরিত্রের আমূল সংশোধন। বস্তুতঃ, মানুষ যাহাতে স্বেচ্ছায় (আইনের চাপে নয়) আপন চিন্তা ও আচরণে উন্নততর জীবন-ধর্ম্মকে অনুসরণ করে, সেই ভাব সাহায্য করাই হইতেছে সবচেয়ে বড় স্বাদেশিকতা বা স্বদেশপ্রেম।

সহজ কথায়, জাতিকে উন্নত করিতে হইলে ব্যক্তি-চরিত্রের উন্নতিসাধন না করিলে নয়। স্বাধীনতার সহিত কতকগুলি গুরুদায়িত্ব ও কঠিন কার্য্য আমাদের উপর বর্ত্তাইয়াছে। ভারতের নাগরিক হিসাবে আমরা এক্ষণে আমাদের নিজেদের সরকার গঠন করিয়াছি। ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার জন্য আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ। প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিচার পায়, যাহাতে তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা থাকে, প্রত্যেকেই যাহাতে সম-মর্য্যাদা ও সুযোগের অধিকারী হন এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয় ঐক্য যাহাতে গড়িয়া উঠে, এই সকলের ব্যবস্থা করিতে আমরা প্রতিশ্রুত। ভারত ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিকের নিকট আমরা এই স্বীকৃতি দিয়াছি—ধর্ম্মের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা কোথাও ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। এই নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করিয়াই সম্মুখে আগাইয়া যাওয়ার পথ আমাদের রচনা করিতে হইবে। সুতরাং ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, সকলের আগে ব্যক্তি-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই একান্ত ভাবে প্রয়োজন। আবার চরিত্র গঠন করিতে হইলে নাগরিকদের যথার্থ শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নাই। যথার্থ শিক্ষা বলিতে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকেই বুঝায়—যে শিক্ষা মানুষকে সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বাবস্থায় ন্যায়, দক্ষতা ও প্রাণতার সঙ্গে কাজ করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলে। আমাদের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তাও [illegible] ইহা অনস্বীকার্য্য।

শিক্ষা ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত এই আদর্শ আমাদের অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। দশ কি বিশ বৎসরের মধ্যে এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ না-ও সম্ভব হইতে পারে কিন্তু এই মহৎ আদর্শটিকে সম্মুখে ধরিয়া না রাখিলে কিছুতেই চলিবে না। আদর্শ ব্যতিরেকে ব্যক্তি-মানুষের উন্নতি সম্ভবপর নহে; আর ব্যক্তি-উন্নতিই যদি না হইল তাহা হইলে ব্যক্তির সমষ্টি জাতির উন্নতিও অসম্ভব। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জীবনে উচ্চ আদর্শ এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছা ভাব ছাড়া আর কিছুই টিকিয়া থাকে না। প্রতিটি শিশু, বালক ও যুবজনকে আদর্শমুখী করিয়া তোলা আমাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাদের চরিত্র যদি ঠিক ভাবে গঠিত হয় এবং সুনির্দ্ধারিত পন্থায় তাহারা যদি এখন হইতেই কাজ করিবার অভ্যাস করে, তাহা হইলে পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনদায়িত্ব গ্রহণেও তাহারা সক্ষম হইবে। প্রত্যেক শিশু, বালক ও তরুণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, নিছক প্রত্যাশা করিলেই সাফল্য জুটিবে না, সাফল্যের জন্য উপযুক্ত মূল্য দেওয়া চাই, শ্রম ও অধ্যবসায় চাই। এই মূল্য না দিয়া বিশ্বে যে কোন কাজেই সফলতার আশা সুদূরপরাহত। আজ আমাদের যে স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, উহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলেও কাজ না করিলে চলিবে না—সরকারী ও বেসরকারী সকল ক্ষেত্রে নিজেদের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারিলে হইবে না। ব্যক্তি-জীবন ও জাতি-জীবন হইতে সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি যেমন করিয়াই হউক দূরীভূত করিতে হইবে। প্রত্যেককেই মনে রাখিতে হইবে যে, নির্ম্মল, সুস্থ ও নীতিবাদী জীবন ছাড়া একটি নির্ম্মল, সুস্থ ও নৈতিক মান-সম্পন্ন জাতি গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে।

আমরা একটি গণতন্ত্রবাদী জাতি। কিন্তু এই কথা স্মরণ না রাখিলে নয় যে, গণতন্ত্র বলিতে এই বুঝায় না যে, মুষ্টিমেয় লোকই মাত্র বাঁচিয়া থাকিবে। প্রকৃত গণতন্ত্রে অধিবাসীরা একে অন্যের মত শুনিবেন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও ব্যক্তি-স্বার্থের ঊর্দ্ধে থাকিয়া কাজ করিবেন। তাঁহাদিগকে সকল প্রশ্ন শান্ত ভাবে ও নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে এবং শুভেচ্ছা ও সৌভ্রাত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। এই পরিবেশে স্বভাবতঃই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে সমগ্র জাতির কাজ চলিবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সকলের ক্ষেত্রেই হইবে প্রযোজ্য। 'সমগ্র জাতি' হইতে কেহ যেন নিজকে আলাদা করিয়া না দেখেন। সমগ্র জাতির কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ—জাতির সুখ-সমৃদ্ধিতেই ব্যক্তিরও সুখ ও সমৃদ্ধি।

স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর দেশে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং নূতন নূতন প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে হাজির হইয়াছে। দেশের

ছাত্রসমাজ ও সমগ্র দেশবাসীর নিকট আমি এই আবেদন জানাইব যে, তাঁহারা যেন ঐক্যবদ্ধ হন এবং এমন কোন শক্তি সৃজন করেন, যাহাতে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে উহা সক্রিয় ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে। ছাত্রদের আমি এই কথাও বলিব যে, রাজনীতিতে যোগদানের পূর্ব্বে তাঁহারা যেন নিজদিগকে উক্ত ক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলেন। আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক দলগুলির দ্বন্দ্বের এক একটি কেন্দ্রে পরিণত করা সম্পূর্ণ ভুল ও ক্ষতিকারক। এই স্থলে আমি আমাদের প্রধান মন্ত্রীর তাৎপর্য্যপূর্ণ নিম্নোক্ত কথা কয়টি উদ্ধৃত না করিয়া পারিব না—"শিল্প ক্ষেত্রে বিরোধ খুবই খারাপ, কিন্তু আমরা যে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সেই পর্য্যায়ে টানিয়া নিতেছি, এইটি আমার নিকট অদ্ভুত মনে হইতেছে। এই ব্যাপারে ছাত্র কিংবা শিক্ষকদের দোষারোপ করিয়া কিছু ফল হইবে না।"

এই সকল ব্যাপার যে ঘটিতেছে এবং আমাদের যুবসমাজের যথার্থ অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহাতে আমি গভীর উদ্বেগবোধ করিতেছি। সরকার কার্য্য-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু এইটি নিছক সরকারের বিচার্য্য বিষয় নয়। ইহা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ব্যাপারে জনমত গঠন আবশ্যক। মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের এবং সর্ব্বোপরি যুবক-যুবতীদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই ধরণের বিশৃঙ্খলার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে। নিজেদের তথা সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে তাঁহারা কি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে চাহেন? এই পথে কি চরিত্র গঠিত হইতে পারে কিংবা জ্ঞান সঞ্চিত হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে অবশ্য বিস্তারিত কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে সর্ব্বোপরি জানিয়া রাখিতে হইবে যে, আদর্শ চরিত্র ও আদর্শ শিক্ষাই হইতেছে জাতির সুদৃঢ় ভিত্তিমূল।

সেদিন ছিল সকাল, আর আজ সন্ধ্যা

শ্রী মজুমদার

আগমনী তার শোনা গিয়েছিল—
সে এসেছিল
এসেছিল, ডেকেছিল দাদু বোলে,
তখনো সে ছিল দু'বছরের ছোট্ট শিশু,
আঁস্তাকুড় থেকে নিয়ে আসা হোল তাকে—
সে এল
তার ছোট্ট দুখানি হাত বাড়িয়ে—
লাল ঠোঁট দুটোকে নেড়ে
(যেন তার কিছু বক্তব্য ছিল।)
সেদিন ছিল সকাল।
আর আজ সন্ধ্যা,
সে গেল চলে
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে
আর তিন দিন ব্যর্থ প্রতিবাদ জানিয়ে
সে গেল চলে।
এই সুন্দর (?) পৃথিবীর (লোকে বলে) হাওয়া নিঃশ্বাস
সব নিলে কেড়ে,
কেড়ে নিলে দয়ালু ভগবান (?) তার কাছ থেকে।
কিছু জোটেনি তার ভাগ্যে (?)
একটা হোমিওপ্যাথির বড়ি
বা ডাষ্টবিনে ফেলা ছোট্ট এক টুকরো রুটি।
সে যে ছিল গরীবের মেয়ে।
তাই সে গেল চলে নীরবে নিঃশব্দে
দাদুকে কাঁদিয়ে দিয়ে।
আর কেউ জানলো না, পুড়লো না কোন কাঠ
তার চিতার উপর।
হোল না কোন বড় রকমের শ্রাদ্ধ
সব শেষে তার জন্য মৃত্যুকর হোল বরাদ্দ !
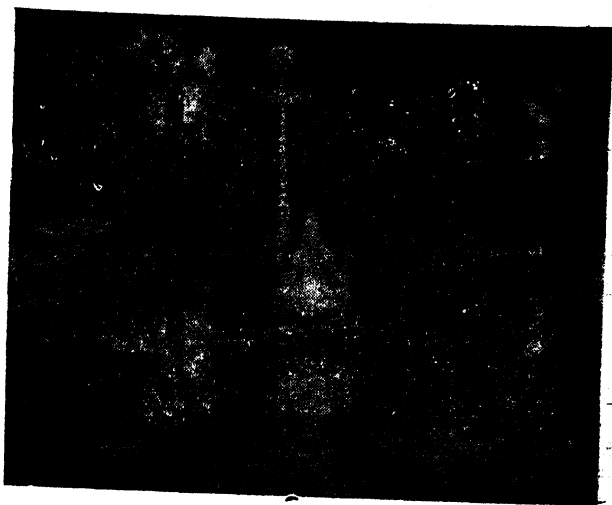
উদ্যান, মাদ্রাজ

—দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জলাধার

—গৌর চক্রবর্তী

মুখ-মুকুর

—কান্তি হাই সাহিলা)

ডালহৌসী

—অমিত রায়

ত্রিযোগীনারায়ণ-মন্দির

—অসীমকুমার মণ্ডল

মণিপুরী নৃত্য

—সুশীল চক্রবর্তী

শিখিনৃত্য —শচীকুমার মিত্র
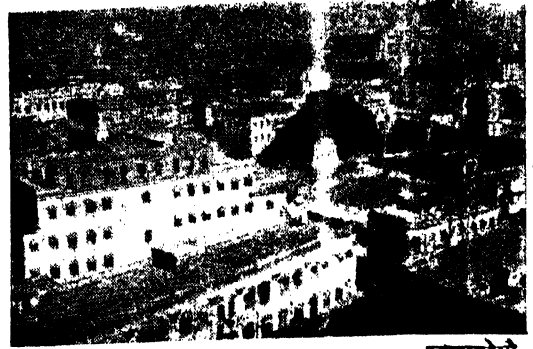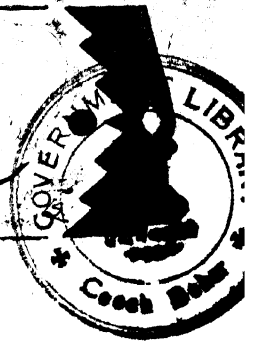
বাতায়নিকের পত্র

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত]

(১)

এক দিকে আমাদের বিশ্বজগৎ, আরেক দিকে আমাদের কর্ম্ম-সংসার। সংসারটাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা, জগৎটাকে নিয়ে আমাদের কোনো দায় নেই। এই জন্যে জগতের সঙ্গে আমাদের অহেতুক আত্মীয়তার সম্বন্ধটাকে যতটা পারি আড়াল করে রাখতে হয়, নইলে সংসারের ভাগে মনোযোগের কম্‌তি পড়ে' কাজের ক্ষতি হয়। তাই আমাদের আপিস থেকে বিশ্বকে বারো মাস ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে এমনি হয় যে দরকার পড়লেও আর তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

দরকার পড়েও। কেন না বিশ্বটা সত্য। সত্যের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ নাও যদি থাকে তবু অন্য সম্বন্ধ আছেই। সেই সম্বন্ধকে অন্যমনস্ক হয়ে অস্বীকার করলেও তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশেষে কর্ম্মে ক্লান্তি আসে, দিনের আলো ম্লান হয়, সংসারের বদ্ধ আয়তনের মধ্যে গুমট অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। তখন মন তার হিসাবের পাকা খাতা বন্ধ করে বলে ওঠে, বিশ্বকে আমার চাই, নইলে আর বাঁচিনে।

কিন্তু নিকটের সব দরজাগুলোর তলায় মরচে পড়ে গেছে, চাবি আর খোলে না। রেলভাড়া করে দূরে যেতে হয়। আপিসের ছাদটার উপরেই এবং তার আশেপাশেই যে-আকাশ নীল, যে-ধরণী শ্যামল, যে-জলের ধারা মুখরিত, তাকেই দেখবার জন্যে ছুটে যেতে হয় এটোয়া-কাটোয়া-ছোটনাগপুরে।

এত কথা হঠাৎ আমার মনে উদয় হল কেন বলি। তোমরা সবাই জান, পুরাকালে এক সময়ে আমি সম্পূর্ণ বেকার ছিলুম। অর্থাৎ আমার প্রধান সম্বন্ধ ছিল জগতের সঙ্গে। তারপরে কিছুকাল থেকে সেই আমার প্রথম বয়সের সমস্ত অকৃতকর্ম্মের বকেয়া শোধে লেগে গিয়েছিলুম। অর্থাৎ এখনকার প্রধান সম্বন্ধ হল সংসারের সঙ্গে। অথচ তখনকার সঙ্গে এখনকার দিনের যে এত বড় একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে, কাজ করতে করতে তা ভুলে গিয়েছিলুম। এই ভোলবার ক্ষমতাই হচ্চে মনের বিশেষ ক্ষমতা। সে দু-নৌকোয় পা দেয় না; সে যখন একটা নৌকোয় থাকে তখন অন্য নৌকোটাকে পিছনে বেঁধে রাখে।

এমন সময় আমার শরীর অসুস্থ হল। সংসারের কাছ থেকে কিছুদিনের মত ছুটি মিলল। দোতলা ঘরের পুব দিকের প্রান্তে খোলা জানলার ধারে একটা লম্বা কেদারায় ঠেস দিয়ে বসা গেল। দুটো দিন না যেতেই দেখা গেল অনেক দূরে এসে পড়েছি—রেলভাড়া দিয়েও এতদূরে আসা যায় না।

যখন আমেরিকায় যাই, জাপানে যাই, ভ্রমণের কথায় ভরে ভরে তোমাদের চিঠি লিখে পাঠাই। পথখরচাটার সমান ওজনের গৌরব তাদের দিতে হয়। কিন্তু এই যে আমার নিখরচার যাত্রা কাজের পার থেকে অকাজের পারে, তারও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা চলে,—মাঝে মাঝে লিখব। মুস্কিল এই যে, কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ বড় দুর্লভ। আরো একটা কথা এই যে, আমার এই নিখরচার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিনা-কড়ি দামের উপযুক্ত নেহাৎ হাল্কা হওয়া উচিত—লেখনীর পক্ষে সেই হাল্কা চাল ইচ্ছা করলেই হয় না; কারণ লেখনী স্বভাবতই গজেন্দ্রগামিনী।

জগৎটাকে কেজো অভ্যাসের বেড়ার পারে ঠেলে রেখে অবশেষে ক্রমে আমার ধারণা হয়েছিল আমি খুব কাজের লোক। এই ধারণাটা জন্মালেই মনে হয় আমি অত্যন্ত দরকারী; আমাকে না-হলে চলে না। মানুষকে বিনা মাইনেয় খাটিয়ে নেবার জন্যে প্রকৃতির হাতে যে-সমস্ত উপায় আছে এই অহঙ্কারটা সকলের সেরা। টাকা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেই টাকার পরিমাণেই কাজ করে, সেটা একটা বাঁধা পরিমাণ; কাজেই তাদের ছুটি মেলে,—বরাদ্দ ছুটির বেশি কাজ করাকে তারা লোক্‌সান জ্ঞান করে না।

আমাকে নইলে চলে না, এই কথা মনে করে এতদিন ভারি ব্যস্ত হয়ে কাজ করা গেছে, চোখের পলক ফেল্‌তে সাহস হয়নি। ডাক্তার বলেচে, 'এইখানেই বাস্‌ কর, একটু থাম!' আমি বলেচি, 'আমি থামলে চলে কই?' ঠিক এমন সময়ে চাকা ভেঙে আমার রথ এই জানলাটার সামনে এসে থামল। এখানে দাঁড়িয়ে অনেকদিন পরে ঐ মহাকাশের দিকে তাকালুম। সেখানে দেখি মহাকালের রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ অগ্নিচক্র ঘুরতে ঘুরতে চলেচে; না উড়চে ধুলো, না উঠচে শব্দ, না পথের গায়ে একটুও চিহ্ন পড়চে। ঐ রথের চলার সঙ্গে বাঁধা হয়ে বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেচে। এক মুহূর্ত্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল। মনে হল স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমাকে না হলেও চলে। কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র কারো অভাবে, কারো শৈথিল্যে, কোথাও এক তিল বা একপল বেধে যাবে এমন লক্ষণ ত দেখিনে। 'আমি-নইলে-চলে-না'র দেশ থেকে 'আমি-নইলে-চলে'র দেশে ধাঁ করে এসে পৌচেছি কেবলমাত্র ঐ ডেস্কের থেকে এই জানলার ধারটুকুতে এসে।

কিন্তু কথাটাকে এত সহজে মেনে নিতে পারব না। মুখে যদি বা মানি, মন মানে না। আমি থাকলেও যা আমি গেলেও তা এইটেই যদি সত্য হবে, তবে আমার অহঙ্কার এক মুহূর্ত্তের জন্যেও

বিশ্বে কোথাও স্থান পেলে কি করে? তার টিঁকে থাকবার জোর কিসের উপরে? দেশকাল জুড়ে আয়োজনের ত অন্ত নেই, তবু এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমাকে কেউ বরখাস্ত করতে পারলে না। আমাকে না হলে চলে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমি আছি।

আমি যে আমি সেই থাকার মূল্যই হচ্চে অহঙ্কার। এই মূল্য যতক্ষণ নিজের মধ্যে পাচ্চি ততক্ষণ নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার সমস্ত দায় সমস্ত দুঃখ অনবরত বহন করে চলেচি। সেইজন্য বৌদ্ধরা বলেচে, এই অহঙ্কারটাকে বিসর্জ্জন করলেই টিঁকে থাকার মূল মেরে দেওয়া হয়, কেননা তখন আর টিঁকে থাকার মজুরি পোষায় না।

যাই হোক্, এই মূল্য ত কোনো একটা ভাণ্ডার থেকে জোগানো হয়েচে। অর্থাৎ আমি থাকি এরই গরজ কোনো এক জায়গায় আছে; সেই গরজ অনুসারেই আমাকে মূল্য দেওয়া হয়েচে। আমি থাকি এই ইচ্ছার আনুকূল্য সমস্ত বিশ্ব করচে, বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু। সেই পরম ইচ্ছার গৌরবই আমার অহঙ্কারে বিকশিত। সেই ইচ্ছার গৌরবেই এই অতি ক্ষুদ্র আমি বিশ্বের কিছুর চেয়েই পরিমাণ ও মূল্যে কম নই।

এই ইচ্ছাকে মানুষ দুই রকম ভাবে দেখেচে। কেউ বলেচে এ হচ্চে শক্তিময়ের খেয়াল, কেউ বলেচে এ হচ্চে আনন্দময়ের আনন্দ। আর যারা বলেচে, এ হচ্চে মায়া, অর্থাৎ যা নেই তারই থাকা, তাদের কথা ছেড়ে দিলুম।

আমার থাকাটা শক্তির প্রকাশ, না প্রীতির প্রকাশ, এইটে যে যেমন মনে করে সে সেইভাবে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে। শক্তিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার এক চেহারা, আর প্রীতিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। শক্তির জগতে আমার অহঙ্কারের যে দিকে গতি, প্রীতির জগতে আমার অহঙ্কারের গতি ঠিক তার উলটো দিকে।

শক্তিকে মাপা যায়; তার সংখ্যা, তার ওজন, তার বেগ সমস্তেরই আয়তন গণিতের অঙ্কের মধ্যে ধরা পড়ে। তাই যারা শক্তিকেই চরম বলে জানে তারা আয়তনে বড় হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে।

এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়! শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্চে।

বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্চে তার বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা—অর্থাৎ তার সসীমতা। মানুষের ইতিহাসে যত কিছু দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলা তার অধিকাংশই এই সীমানার চৌহদ্দি নিয়ে। পরিমাণের দিকে নিজের সীমানা অত্যন্ত বাড়াতে গেলেই পরিমাণের দিকে অন্যের সীমানা কাড়তে হয়। অতএব শক্তির অহঙ্কার যে হেতু আয়তন-বিস্তারেরই অহঙ্কার, সেইজন্যে এইদিকে দাঁড়িয়ে খুব লম্বা দূরবীণ কষলেও লড়াইয়ের রক্তসমুদ্র পেরিয়ে শান্তির কূল কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই যে বস্তুতান্ত্রিক বিশ্ব, এই যে শক্তির ক্ষেত্র, এর আয়তনের অঙ্কগুলো যোগ দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখি তেরিজটা একটানা বেড়ে চলবার দিকেই ছুটচে না। বেড়ে চলবার তত্ত্বের মধ্যে হঠাৎ উঁচোট খেয়ে দেখা যায় সুষমার তত্ত্ব পথ আগলে। দেখি কেবলি গতি নয়, যতিও আছে। ছন্দের এই অমোঘ নিয়মকে শক্তি যখন অন্ধ অহঙ্কারে অতিক্রম করতে যায় তখনি তার আত্মঘাত ঘটে। মানুষের ইতিহাসে এইরকম বার বার দেখা যাচ্চে। সেইজন্যে মানুষ বলেচে অতি দর্পে হতা লঙ্কা। সেইজন্যে ব্যাবিলনের অত্যুদ্ধত সৌধচূড়ার পতনবার্ত্তা এখনো মানুষ স্মরণ করে।

তবেই দেখচি, শক্তিতত্ত্ব, যার বাহ্যপ্রকাশ আয়তনে, সেটাই চরমতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব নয়। বিশ্বের তাল-মেলাবার বেলায় আপনাকে তার থামিয়ে দিতে হয়। সেই সংযমের সিংহদ্বারই হচ্চে কল্যাণের সিংহদ্বার। এই কল্যাণের মূল্য আয়তন নিয়ে নয়, বহুলতা নিয়ে নয়। যে এঁকে অন্তরে জেনেচে, সে ছিন্ন কন্থায় লজ্জা পায় না, সে রাজমুকুট ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে।

শক্তিতত্ত্ব থেকে সুষমাতত্ত্বে এসে পৌঁছিয়েই বুঝতে পারি, ভুল জায়গায় এতদিন এত নৈবেদ্য জুগিয়েছি। বলির পশুর রক্তে যে-শক্তি ফুলে উঠল সে কেবল ফেটে মরবার জন্যেই। তার পিছনে যতই সৈন্য যতই কামান লাগাই না কেন, রণতরীর পরিধি যতই বৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলি, লুঠের ভাগকে যতই বিপুল করে তুলতে থাকি, অঙ্কের জোরে মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না, শেষকালে ঐ অতি বড় অঙ্কেরই চাপে নিজের বস্তার নীচে নিজে গুঁড়িয়ে মরতে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন জিনিষপত্র বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে এই বস্তু-কথার রাজ্যে মৈত্রেয়ীকে প্রতিষ্ঠিত করে যাচ্ছিলেন, তখনই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্!' বহু, বহু, বহু, সব বহুকে জুড়ে জুড়েও, অঙ্কের পর অঙ্ক যোগ করে করেও তবু ত অমৃতে গিয়ে পৌঁছন যায় না। শব্দকে কেবলি অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এবং চড়িয়ে দিয়ে যে জিনিষটা পাওয়া যায় সেটা হল হুঙ্কার, আর শব্দকে সুর দিয়ে লয় দিয়ে সংযত সম্পূর্ণতা দান করলে যে-জিনিষটা পাওয়া যায় সেইটেই হল সঙ্গীত; ঐ হুঙ্কারটা হল শক্তি, এর পরিমাণ পাওয়া যায়, আর সঙ্গীতটা হল অমৃত, হাতে বহরে ওকে কোথাও মাপবার জো নেই।

এই অমৃতের ক্ষেত্রে মানুষের অহঙ্কারের স্রোত নিজের উলটো দিকে, উৎসর্জ্জনের দিকে। মানুষ আপনার দিকে কেবলি সমস্তকে টানতে টানতে প্রকাণ্ডতা লাভ করে, কিন্তু আপনাকে সমস্তর দিকে উৎসর্গ করতে করতে সে সামঞ্জস্য লাভ করে। এই সামঞ্জস্যেই শান্তি। কোনো বাহ্যব্যবস্থাকে বিস্তীর্ণতর করার দ্বারা, শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিমানকে জোড়া দিয়ে পুঞ্জীভূত করার দ্বারা, কখনই সেই শান্তি পাওয়া যাবে না যে-শান্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, যে-শান্তি অলোভে, যে-শান্তি সংযমে, যে-শান্তি ক্ষমায়।

প্রশ্ন তুলেছিলুম,—আমার সত্তার পরমমূল্যটি কোন্ সত্যের মধ্যে? শক্তিময়ের শক্তিতে, না, আনন্দময়ের আনন্দে?

শক্তিকেই যদি সেই সত্য বলে বরণ করি, তা হলে বিরোধকেও চরম ও চিরন্তন বলে মানতেই হবে। য়ুরোপের অনেক আধুনিক লেখক সেই কথাই স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক প্রচার করচেন। তাঁরা বলচেন, শান্তির ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম, দুর্ব্বলের আত্মরক্ষা করবার কৃত্রিম দুর্গ;—বিশ্বের বিধান এই দুর্গকে খাতির করে না; শেষ পর্য্যন্ত শক্তিরই

জয় হয়—অতএব ভীরু ধর্মভাবুকের দল যাকে অধর্ম বলে' নিন্দা করে, সেই অধর্মই কৃতার্থতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

অন্যদল সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না ; সমস্ত মেনে নিয়েই তারা বলে :—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি—সমূলস্ত বিনশ্যতি॥

ঐশ্বর্য্যগর্ব্বেও মানুষের মন বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, আবার দারিদ্র্যের দুঃখে ও অপমানেও মানুষের সমস্ত লোলুপ প্রবৃত্তি বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ সকল দেবতার উপরে সেই শক্তিকে আসন দিতে লজ্জিত হয় না—যে ক্রুর শক্তির দক্ষিণহস্তে অন্যায়ের এবং বামহস্তে ছলনার অস্ত্র। প্রতাপস্ফরামত্ত য়ুরোপের পলিটিক্স এই শক্তিপূজা। এই জন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবলি প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চায় ; অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে-মূর্ত্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গমূর্ত্তি নয় ; কিন্তু তার লেলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই। ঐ দেখ পীস্-কনফারেন্সের সভাক্ষেত্রে তা লক্ লক্ করচে।

অপর পক্ষে একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণচণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্ম্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভব-গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হল।

আজকের দিনেও দেখি আমাদের দেশে সেই হাওয়া উঠেচে। আমরা ধর্ম্মের নাম করেই একদল লোক বলচি, ধর্ম্মভীরুতাও ভীরুতা ; বলচি যারা বীর, অন্যায় তাদের পক্ষে অন্যায় নয়। তাই দেখি সাংসারিকতায় যারা কৃতার্থ এবং সাংসারিকতায় যারা অকৃতার্থ, দুইয়েরই সুর এক জায়গায় এসে মেলে। ধর্ম্মকে উভয়েই বাধা বলে জানে—সেই বাধা গায়ের জোরে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু গায়ের জোরই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জোর নয়।

এই বড় দুঃসময়ে কামনা করি শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না—তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব। সেই মনুষ্যত্বের অভিমান আমাদের হোক্, যে-অভিমানে মানুষ এই স্থূল বস্তুজগতের প্রবল প্রকাণ্ডতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বলতে পারে, আমার সম্পদ এখানে নয় ; বলতে পারে শৃঙ্খলে আমি বন্দী হই নে, আঘাতে আমি আহত হই নে, মৃত্যুতে আমি মরি নে ; বলতে পারে 'যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' আমাদের পিতামহেরা বলে গেছেন, 'এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত'—যিনি অমৃত, যিনি অভয় তাঁকে উপাসনা করে শান্ত হও। তাঁদের উপদেশকে আমরা মাথায় লই, এবং মৃত্যু ও সকল ভয়ের অতীত যে-শান্তি সেই শান্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করি।

(২)

কারো উঠোন চষে দেওয়া আমাদের ভাষায় চূড়ান্ত শাস্তি বলে গণ্য। কেন না উঠোনে মানুষ সেই বৃহৎ সম্পদকে আপন করেচে, যেটাকে বলে ফাঁক। বাহিরে এই ফাঁক দুর্লভ নয়, কিন্তু সেই বাহিরের জিনিষকে ভিতরের করে আপনার করে না তুললে তাকে পেয়েও না-পাওয়া হয়। উঠোনে ফাঁকটাকে মানুষ নিজের ঘরের জিনিষ করে তোলে ; ঐখানে সূর্য্যের আলো তার আপনার আলো হয়ে দেখা দেয়, ঐখানে তার ঘরের ছেলে আকাশের চাঁদকে হাততালি দিয়ে ডাকে। কাজেই উঠোনকেও যদি বেকার না রেখে তাকে ফসলের ক্ষেত বানিয়ে তোলা যায়, তা হলে যে-বিশ্ব মানুষের আপন ঘরের বিশ্ব তারই বাসা ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

সত্যকার ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ধনী এই ফাঁকটাকে বড় করে রাখতে পারে না। যে-সমস্ত জিনিষপত্র দিয়ে ধনী আপনার ঘর বোঝাই করে তার দাম খুব বেশি—কিন্তু যে-ফাঁকটা দিয়ে তার আঙিনা হয় প্রশস্ত, তার বাগান হয় বিস্তীর্ণ সেইটেই হচ্চে সব চেয়ে দামী। সদাগরের দোকান-ঘর জিনিষপত্রে ঠাসা ; সেখানে ফাঁক রাখবার শক্তি তার নেই। দোকানে সদাগর কৃপণ, সেখানে লক্ষপতি হয়েও সে দরিদ্র। কিন্তু সেই সদাগরের বাসের বাড়িতে ঘরগুলো লম্বায় চওড়ায় উঁচুতে সকলদিকেই প্রয়োজনকে ধিক্কার করে ফাঁকটাকেই বেশি আদর দিয়েচে, আর বাগানের ত কথাই নেই। এইখানেই সদাগর ধনী।

শুধু কেবল জায়গার ফাঁকা নয়, সময়ের ফাঁকাও বহুমূল্য। ধনী তার অনেক টাকা দিয়ে এই অবকাশ কিনতে পায়। তার ঐশ্বর্য্যের প্রধান লক্ষণ এই যে লম্বা লম্বা সময় সে ফেলে রাখতে পারে। হঠাৎ কেউ তার সময়ের উঠোন চষতে পারে না।

আরেকটা ফাঁকা, যেটা সব চেয়ে দামী, সে হচ্চে মনের ফাঁকা। যা কিছু নিয়ে মন চিন্তা করতে বাধ্য হয়, কিছুতেই ছাড় পায় না, তাকেই বলে দুশ্চিন্তা। গরীবের চিন্তা, হতভাগার চিন্তা মনকে একেবারে আঁকড়ে থাকে, অশত্থ গাছের শিকড়গুলো ভাঙা মন্দিরকে যে রকম আঁকড়ে ধরে। দুঃখ জিনিষটা আমাদের চৈতন্যের ফাঁক বুজিয়ে দেয়। শরীরের সুস্থ অবস্থা তাকেই বলে যেটা হচ্চে শারীর-চৈতন্যের ফাঁকা ময়দান। কিন্তু হোক দেখি বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুলের গাঁটের প্রান্তে বাতের বেদনা, অমনি শারীর-চৈতন্যের ফাঁক বুজে দায়, সমস্ত চৈতন্য ব্যথায় ভরে ওঠে। মন যে ফাঁকা চায় দুঃখে সেই ফাঁকা পায় না।

স্থানের ফাঁকা না পেলে যেমন ভালো করে বাঁচা যায় না, তেমনি সময়ের ফাঁকা চিন্তার ফাঁকা না পেলে মন বড় করে ভাবতে পারে না ; সত্য তার কাছে ছোট হয়ে যায়। সেই ছোট সত্য মিট্‌মিটে আলোর মত ভয়কে প্রশ্রয় দেয়, দৃষ্টিকে প্রতারণা করে এবং মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করে রাখে।

আজকের দিনে ভারতবাসী হয়ে নিজের সকলের চেয়ে বড় দৌর্ভাগ্য অনুভব করচি এই জানলার কাছটাতে এসে। আমাদের ভাগ্যে জানলার ফাঁক গেছে বুজে ; জীবনের এ-কোণে ও-কোণে একটু-আধটু যা ছুটির পোড়ো জায়গা ছিল তা কাঁটাগাছে ভরে গেল।

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিষ প্রচুর ছিল, সেটাকে আমরা খুব মহামূল্য বলেই জানি, সে হচ্চে সত্যকে খুব বড় করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মত মনের উদার অবকাশ। ভারতবর্ষ একদিন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভের উপরকার সব চেয়ে বড় ফাঁকায় দাঁড়িয়ে সেই সত্যকেই সুস্পষ্ট করে দেখছিল, 'যং লব্ধাচাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।'

কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষের সেই ধ্যানের বড় অবকাশটি

নষ্ট হল। আজকের দিনে ভারতবাসীর আর ছুটি নেই; তার মনের অন্তরতম ছুটির উৎসটি শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেল, বেদনায় তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

তাই আজ যখনি এই বাতায়নে এসে বসেছি, অমনি দেখি আমাদের আঙিনা থেকে উঠছে দুর্ব্বলের কান্না; সেই দুর্ব্বলের কান্নায় আমাদের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম, সমস্ত অবকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। আজকের দিনে দুর্ব্বল যত ভয়ঙ্কর দুর্ব্বল, জগতের ইতিহাসে এমন আর কোনো দিনই ছিল না।

বিজ্ঞানের কৃপায় বাহুবল আজ নিদারুণ দুর্জ্জয়। পালোয়ান আজ জলস্থল আকাশ সর্ব্বত্রই সিংহনাদে তাল ঠুকে বেড়াচ্ছে। আকাশ একদিন মানুষের হিংসাকে আপন সীমানায় ঢুকতে দেয় নি। মানুষের ক্রূরতা আজ সেই শূন্যকেও অধিকার করেছে। সমুদ্রের তলা থেকে আরম্ভ করে বায়ুমণ্ডলের প্রান্ত পর্য্যন্ত সব জায়গাতেই বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্ত বয়ে চলল।

এমন অবস্থায়, যখন সবলের সঙ্গে দুর্ব্বলের বৈষম্য এত অত্যন্ত বেশি, তখনও যদি দেখা যায় এতবড় বলবানেরও ভীরুতা ঘুচল না, তাহলে সেই ভীরুতার কারণটা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখা দরকার এই জন্যে যে, য়ুরোপে আজকের যে-শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্চে সেই শান্তি টেকসই হবে কি না সেই বিচার করতে হলে এই সমস্ত বলিষ্ঠদের মনস্তত্ত্ব বুঝে দেখা চাই।

যুদ্ধ যখন প্রবল বেগে চলছিল, যখন হারের আশঙ্কা জিতের আশার চেয়ে কম ছিল না, তখন সেই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সন্ধির সর্ত্তভঙ্গ, অস্ত্রাদি-প্রয়োগে বিধিবিরুদ্ধতা, নিরস্ত্র শত্রুদের প্রতি বায়ুরথ থেকে অস্ত্রবর্ষণ প্রভৃতি কাণ্ডকে এ পক্ষ crime অর্থাৎ অপরাধ বলে অভিযোগ করেছিলেন। মানুষ crime কখন করে? যখন সে ধর্ম্মের গরজের চেয়ে আর কোনো একটা গরজকে প্রবল বলে মনে করে। যুদ্ধে জয়লাভের গরজটাকেই জর্ম্মাণী ন্যায়াচরণের গরজের চেয়ে আশু গুরুতর বোধ করেছিল। এ পক্ষ যখন সেজন্যে আঘাত পাচ্ছিলেন তখন বলছিলেন, জর্ম্মাণীর পক্ষে কাজটা একেবারেই ভালো হচ্চে না; হোক না যুদ্ধ, তাই বলে কি আইন নেই ধর্ম্ম নেই? আর যখন বিজিত প্রদেশে জর্ম্মাণী লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিতে দয়াবোধ করেনি তখন আশু প্রয়োজনের দিক থেকে জর্ম্মাণীর পক্ষে তার কারণ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এ পক্ষে বলেছিল আশু প্রয়োজন সাধনটাই কি মানুষের চরম মনুষ্যত্ব? সভ্যতার কি একটা দায়িত্ব নেই? সেই দায়িত্ব রক্ষার চেয়ে যারা উপস্থিত কাজ উদ্ধারকেই বড় মনে করে তারা কি সভ্যসমাজে স্থান পেতে পারে?

ধর্ম্মের দিক থেকে এসকল কথার একেবারে জবাব নেই। শুনে আমাদের মনে হয়েছিল যুদ্ধের অগ্নিতে এবার বুঝি কলিযুগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেল, এতদিন পরে মানুষের দশা ফিরবে, কেন না তার মন ফিরচে। মন না ফিরলে কেবলমাত্র অবস্থা বা ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনে কখনই কোনো ফল পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের তখন হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল। আমাদের দেশে শ্মশান-বৈরাগ্যকে লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। তার কারণ, প্রিয়জনের আশু মৃত্যুতে মন যখন দুর্ব্বল তখনকার বৈরাগ্যে বিশ্বাস নেই, সবল মনের বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। তেমনি যুদ্ধকালের অনিশ্চয়তায় মন যখন দুর্ব্বল তখনকার ধর্ম্মবাক্যকে ষোলো আনা বিশ্বাস করা যায় না।

যুদ্ধে এ পক্ষের জিত হল। এখন কি করলে পৃথিবীতে শান্তির ভিত পাকা হয় তাই নিয়ে পঞ্চায়েৎ বসে গেছে। কথা-কাটাকাটি, প্রস্তাব-চালাচালি, রাজ্য-ভাগাভাগি চলচে। এই কারখানা ঘর থেকে কি আকার এবং কি শক্তি নিয়ে কোন যন্ত্র বেরুবে তা ঠিক বুঝতে পারচিনে।

আর কিছু না বুঝি একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসচে; এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টি সংকার হলনা, মন বদল হয়নি। কলিযুগের সেই সিংহাসনটা আজ কোনখানে? লোভের উপরে। পেতে চাই, রাখতে চাই, কোনো মতেই কোথাও একটুও কিছু ছাড়তে চাইনে। সেইজন্যেই অতি বড় বলিষ্ঠেরও ভয়, কি-জানি যদি দৈবাৎ এখন বা সুদূর কালেও একটুখানিও লোকসান হয়। যেখানে লোকসান কোনোমতেই সইবে না, সেখানে আইনের দোহাই, ধর্ম্মের দোহাই মিথ্যে। সেখানে অন্যায়কে কর্ত্তব্য বলে আপনাকে ভোলাতে একটুও সময় লাগে না; সেখানে দোষের বিচার দোষের পরিমাণের দিক থেকে নয়, আইনের দিক থেকে নয়, নিজের লোভের দিক থেকে।

এই ভয়ঙ্কর লোভের দিনে সবলকে যখন ভয় করতে থাকে, তখন উচ্চস্থানের ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ফেরফারকির কথা হতে থাকে, তখন আইনের মধ্যে কোনো ছিদ্র কোনো জায়গায় যাতে একটুও না থাকতে পারে সেই চেষ্টা হয়। কিন্তু দুর্ব্বলকে যখন সেই সময়েই সেই লোভেরই তাড়ায় সবল এতটুকু পরিমাণেও ভয় করে, তখন শাসনের উত্তেজনা কোনো দোহাই মানতে চায় না, তখন আইনের মধ্যে বড় বড় ছিদ্র খনন করা হয়।

প্রবলের ভয়ে এবং দুর্ব্বলের ভয়ে মস্ত একটা তফাৎ আছে। দুর্ব্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে, আর প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে। সকলেই জানেন কিছুকাল থেকে পাশ্চাত্য দেশে Yellow Peril বা পীত-সঙ্কট নাম নিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েচে। এই আতঙ্কের মূল কথাটা এই যে, প্রবলের লোভ সন্দেহ করচে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোনো একদিন প্রবল বাধা পায়। বাধা পাবার সম্ভাবনা কিসে? যদি আর কোনো জাতি এই প্রবলদেরই মত সকল বিষয়ে বড় হয়ে ওঠে। তাদের মত বড় হওয়া একটা সঙ্কট—এইটে নিবারণ করবার জন্যে অন্যদের চেপে ছোট করে রাখা দরকার। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই নীতি নিয়ে বাকি জগতের সঙ্গে কারবার করচে। এই নীতিতে নিরন্তর যে-ভয় জাগিয়ে রাখে তাতে শান্তি টিকতে পারে না।

জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস লিখচেন:—

It does not, however, appear at first sight that the Yellow Peril at which European economists are terrified is to be compared to the White Peril suspended over Asia. The Chinese do not send to Paris, Berlin, and St. Petersburg missionaries to teach Christians the Fung-Chui, and sow disorder in European affairs. A Chinese expeditionary force did not land in Quiberon Bay to demand of the Government of the Republic extra-territoriality, i. e., the right of

trying by a tribunal of mandarins cases pending between Chinese and Europeans. Admiral Togo did not come and bombard Brest Roads with a dozen battleships, for the purpose of improving Japanese trade in France. * * * * He did not burn Verseilles in the name of a higher civilisation. The army of the Great Asiatic Powers did not carry away to Tokio and Peaking the Louvre paintings and the silver service of the Elysee.

No Indeed ! Monsieur Edmond Thery himself admits that the yellow men are not sufficiently civilised to imitate the whites so faithfully. Nor does he forsee that they will ever rise to so high a moral culture. How could it be possible for them to posses our virtues ? They are not Christians. But men entitled to speak consider that the Yellow Peril is none the less to be dreaded for all that it is economic. Japan and China organised by Japan, threaten us, in all the markets of Europe, with a competition frightful, monstrous, enormous, and deformed, the mere idea of which causes the hair of the economists to stand on end.

অর্থাৎ লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেই জন্যে যে নীচে আছে তাকে চিরকালই নীচে চেপে রাখতে চায়, এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্চে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে।

যতক্ষণ এই লোভ আছে ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পিস্-কনফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে অনেক জিনিস তৈরি হচ্ছে কিন্তু কলে-তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করিনে। কর্মিক ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, এক রাজ্য অন্য রাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

এমন অবস্থায় সবল পক্ষীয়েরা যখন আপোষ-নিষ্পত্তির যোগে শান্তি-কামনা করে তখন তারা নিজেদের পাবে পাকা বাঁধ বেঁধে এবং অন্যদের পারে পাকা খাদ কেটে লোভের স্রোতটাকে নিজেদের দিক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। বসুন্ধরাকে এমন জায়গায় পরস্পর বখরা করে নিতে চায় যে জায়গাটা যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই যেখানে দাঁত বসে, এবং ছিঁড়তে গিয়ে নখে যদি আঘাত লাগে, নখ তার শোধ তুলতে পারে। কিন্তু জোর করে বলা যায় এমন ভাবে চিরদিন চলবে না ; ভাগ সমান হবে না, লোভের ক্ষুধা সব জায়গায় সমান করে ভরবে না, পাপের ছিদ্র নানা জায়গায় থেকে যাবে ; হঠাৎ একদিন ভরা-ডুবি হবে।

বিধাতা আমাদের একটা দিকে নিশ্চিন্ত করেছেন, ঐ বলের দিকটায় আমাদের রাস্তা একেবারে শেষ কাঁকটুকু পর্য্যন্ত বন্ধ, যে-আশা রাস্তা না পেলেও উড়ে চলে সেই আশারও ডানা কাটা পড়েচে। আমাদের জন্যে কেবল একটা বড় পথ আছে, সে হচ্চে দুঃখের উপরে যাবার পথ। রিপু আমাদের বাইরে থেকে আঘাত দিচ্চে দিক, তাকে আমরা অন্তরে আশ্রয় দেব না। যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড় হতে পারব তখন আমাদের মার-খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড় হবার পথ না লড়াই করা, না দরখাস্ত লেখা।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবম্ অধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥

(৩)

অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্যের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের সঙ্গে ? সেটা কেবল এই বাতায়ন-টুকুতে। কিন্তু নিজের মধ্যে কার সঙ্গে কে কথা কয় ?

একটা উপমা দেওয়া যাক্। মাটির জলের খানিকটা সূক্ষ্ম হয়ে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যায়। সেখান থেকে সেই নির্ম্মল দ্যুলোকের সঙ্গীত এবং উদার বেগ নিয়ে ধারায় ধারায় পুনর্ব্বার সে মাটির জলে ফিরে আসতে থাকে।

এই জলেরই মত মানুষের মনের একটা ভাগ সংসারের ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে উড়ে যায়, সেই আকাশচারী মনটা মাঝে মাঝে আবার যদি এই ভূচর মনের সঙ্গে মিলতে পারে তবে তাতেই পূর্ণতা বটে।

কিন্তু এমন সকল মরু প্রদেশ আছে যেখানে প্রায় সমস্ত বৎসর ধরেই অনাবৃষ্টি। বাষ্প হয়ে যা উপরে চলে গেল বর্ষণ হয়ে তা আর ধরায় নেমে আসে না। নীচের মনের সঙ্গে উপরের মনের আর মিলন হয় না। সেখানে খাল-কাটা জলে কাজ চলে যায় কিন্তু সেখানে আকাশের সঙ্গে মাটির শুভ সঙ্গমের সঙ্গীত এবং শঙ্খধ্বনি কোথায় ? সেখানে বর্ষণ-মুখরিত রসের উৎসব হল না ! সেখানে মনের মধ্যে চির-বিরহের একটা শুষ্কতা রয়ে গেল।

এ ত গেল অনাবৃষ্টির কথা। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কাদাবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি প্রভৃতি নানা উৎপাতের কথা শোনা যায়। আকাশের বিশুদ্ধতা যখন চলে যায়, বাতাস যখন পৃথিবীর নানা আবর্জ্জনায় পূর্ণ হয়ে থাকে তখনি এই সব কাণ্ড ঘটে। তখন আকাশের বাণীও নির্ম্মল হয়ে পৃথিবীকে পবিত্র করে না। পৃথিবীরই পাপ পৃথিবীতে ফিরে আসতে থাকে।

আজকের দিনে সেই দুর্য্যোগ ঘটেচে। পৃথিবীর পাপের ধূলিতে আকাশের বর্ষণও আবিল হয়ে নামচে। নির্ম্মল ধারায় পুণ্যস্নানের জন্যে অনেক দিনের যে প্রতীক্ষা তাও আজ বারে বারে ব্যর্থ হল। মনের মধ্যে কাদা লাগচে এবং রক্তের চিহ্ন এসে পড়চে ; বার বার কত আর মুছব ?

রক্ত-কলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ যে আজ একটা শান্তির দরবার উঠেচে, ঊর্দ্ধ আকাশের নির্ম্মল নিঃশব্দতা তার বেসুরকে ধুয়ে দিতে পারচে না।

শান্তি ? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে ? ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা ল্যাজের মত কিলবিল করচে, তারা শান্তি চায় বটে কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে ; দাম দিয়ে নয়। সে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীর সর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।

দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীর সরের বড় বড় ভাণ্ডগুলো প্রায় আছে দুর্ব্বলদের জিম্মায়। এই জন্য যে-ত্যাগশীলতায় সত্যকার শান্তি সেই ত্যাগের ইচ্ছা প্রবলদের মনে কিছুতেই সহজ হতে পারচে না। যেখানে শক্ত পাহারা সেখানে লোভ দমন করতে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। সেখানে মানুষ সংযত হয় এবং নিজেকে খুব ভালো ছেলে বলেই মনে করে। কিন্তু আলগা পাহারা যেখানে, সেখানে ভয়ও থাকে না, লজ্জাও চলে যায়। এমন-সব জায়গা আছে যেখানে ভালো ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিলে লাভ আছে; কিন্তু দুর্ব্বলের সঙ্গে যেখানে কারবার সেখানে বেচারা প্রবল পক্ষের ভালো হওয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বলেই যে কত কঠিন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল্ ফ্রাঁসের লেখা থেকে একটা জায়গা উদ্ধৃত করি। তিনি চীন দেশের সঙ্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ আলোচনা উপলক্ষে লিখচেন :—

In our own times, the Christian acquired the habit of sending jointly or separately into that vast Empire, whenever order was disturbed, soldiers who restored it by means of theft, rape, pillage, murder, and incendiarism, and of proceeding at short intervals with the pacific penetration of the country with rifles and guns. The poorly armed Chinese either defend themselves badly or not at all, and so they are massacred with delightful facility. * * * In 1901, order having been disturbed at Peking, the troops of the five great Powers, under the command of a German Field Marshal, restored it by the customary means. Having in this fashion covered themselves with military glory, the five Powers signed one of the innumerable treaties by which they guarantee the integrity of the very China whose provinces they divide among themselves.

পীকিনে যে ভাঙ-চুর, লুটপাট ও উৎপাত হয়েছিল মানুষের দুঃখ এবং অপমানের পক্ষে সে বড় কম নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে লজ্জা পাওয়ার এবং লজ্জা দেওয়ার পরিমাণ আধুনিক য়ুরোপীয় যুদ্ধ-ঘটিত আলোচনার তুলনায় কতই অপরিমাণমাত্র তা সকলেই জানেন। এর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ভালো হওয়ার যে কঠিন আদর্শ মানুষের মনুষ্যত্বকে উর্দ্ধে ধারণ করে রাখে দুর্ব্বলের সংসর্গে সেইটে নেমে যায়। মানুষ নিজের অগোচরে নিজের সঙ্গে একটা সন্ধিপত্র লেখাপড়া করে নেয়,—বলে ভালোমন্দর বিচার নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের যে একটা নিরন্তর লড়াই চলচে অমুক-অমুক চৌহদ্দির মধ্যে সেটাকে যথেষ্ট পরিমাণ ঢিল দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে আমরাও একাজ করেছি —শূদ্রকে ব্রাহ্মণ এত দুর্ব্বল করেছিল যে তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের না ছিল লজ্জা না ছিল ভয়। আমাদের সংহিতাগুলি আলোচনা করলে একথা ধরা পড়বে। দেশ-জুড়ে আজ তার যে ফল ফলেচে তা বোঝবার শক্তি পর্য্যন্ত চলে গেছে, দুর্গতি এত গভীর।

যে দুর্ব্বল, সবলের পক্ষে সে তেমনি ভয়ঙ্কর হাতীর পক্ষে যেমন চোরাবালি। এই বালি বাধা দিতে পারে না বলেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, কেবলি নীচের দিকে টেনে নেয়। শক্তির আয়তন যত প্রকাণ্ড, তার ভার যতই বেশি, তার প্রতি অশক্তির নীচের দিকের টান ততই ভয়ঙ্কর। যে মাটি বাধা দেয় না, তাকে পদাঘাত যত জোরেই করবে, পদের পক্ষে ততই বিপদ ঘটবে।

যে-জায়গায় হাওয়া হালকা সেই জায়গাই হচ্চে ঝড়ের কেন্দ্র। এই জন্যে য়ুরোপের বড় বড় ঝড়ের আসল জন্মস্থান এসিয়া আফ্রিকা। ঐখানে বাধা কম, ঐখানে ন্যায়পরতার য়ুরোপীয় আদর্শ খাড়া রাখবার প্রেরণা দুর্ব্বল। এবং আশ্চর্য্য এই যে, সেই ন্যায়পরতার আদর্শ যে নেমে চলেছে বলদর্পে মানুষ সেটা বুঝতেই পারে না। এইটেই হচ্চে দুর্গতির পরাকাষ্ঠা।

এই অসাড়তা, এই অন্ধতা এতদূর পর্য্যন্ত যায় যে, এক এক সময়ে তার কাণ্ড দেখে বড় দুঃখেও হাসি আসে। য়ুরোপের শুঁড়িখানা থেকে পোলিটিকাল মদ খেয়ে মাতাল হয়েচে এমন একদল যুবক আমাদের দেশে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে। তাই দেখে অনেকবার এই কথাই ভেবেছি, মানুষের স্বদেশী পাপের ত অভাব নেই, এর উপরে যারা বিদেশী পাপের আমদানি করচে তারা আমাদের কলুষের ভার আরো দুর্ব্বহ করে তুলচে। এমন সময়ে আমাদের বাংলাদেশের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা এই সমস্ত পোলিটিক্যাল হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্য করে বলে বসলেন, খুন করা সম্বন্ধে বাংলাদেশের ধর্ম্মবুদ্ধি য়ুরোপের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র; তিনি বলেন, বাঙালী জানে, খুন করা আর কিছুই নয়, মানুষকে এক লোক থেকে আরেক লোকে চালান করে দেওয়া মাত্র! * যে-পাশ্চাত্যদের কাছে বাঙালী ছাত্র এই-সমস্ত অপকর্ম্ম শিখেচে অবশেষে তাঁদেরই কাছ থেকে এই বিচার। পলিটিক্সের হাটে তাঁরা মানুষের প্রাণ যে কি রকম ভয়ঙ্কর সস্তা করে তুলেচেন, সেটা বোধ হয় অভ্যাসবশত নিজে তেমন করে দেখেন না, বাইরের লোকে যেমন দেখতে পায়। এই সব পলিটিক্সবিলাসীদের কি কোনো বিশেষ মনস্তত্ত্ব নেই? তাঁদের সেই মনস্তত্ত্বের শিক্ষাটাই আজ সমস্ত পৃথিবীময় খুন ছড়িয়ে চলেচে, এ-কথা তাঁরাও ভুললেন?

ওরা আমাদের থেকে আলাদা, একেবারে ভিতরের দিক থেকে আলাদা—এই কথা যারা বলে তারা এরা-ওরার সম্বন্ধকে গোড়া-ঘেঁসে কলুষিত করে। এদের সম্বন্ধে যে-নিয়ম ওদের সম্বন্ধে সে-নিয়ম চলতেই পারে না বলে তারা নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে ঠাণ্ডা রাখে; অন্যায়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতার মধ্যে যতটুকু চক্ষুলজ্জা এবং অস্বস্তি আছে সেটুকু তারা মেরে রাখতে চায়। যতদিন ধরে প্রাচ্যদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের সম্বন্ধ হয়েচে ততদিন থেকেই এই-সব বুলির

* ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ দ্বীপে প্রতি লক্ষ লোকে ১৭ অংশ লোকের খুনের অভিযোগে বিচার হয়েছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে প্রতি লক্ষ লোকে •৮ অংশ লোকের খুনের চার্জ্জে বিচার হয়েছিল। হাতের কাছে বই না থাকাতে সম্পূর্ণ তালিকা দিতে পারলাম না।

উৎপত্তি হয়েচে। গায়ের জোরে যাদের প্রতি অন্যায় করা সহজ, তাদের সম্বন্ধে অন্যায় করতে পাছে মনের জোরেও কোথাও বাধে সেই জন্তে এরা সে রাস্তাটুকুও সাফ রাখতে চায়।

আমি পূর্ব্বেই বলেচি, দুর্ব্বলের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়, নিজেদের এক আদর্শে বিচার করি, অন্যদের অন্য আদর্শে। নিজেদের ছাত্রেরা যখন গোলমাল করে তখন সেটাকে স্নেহপূর্ব্বক বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য, অন্যদের ছাত্ররাও যখন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে সেটাকে চোখ রাঙিয়ে বলি নষ্টামি। পরজাতিবিদ্বেষের লেশমাত্র লক্ষণে ভয়ঙ্কর রাগ হয় যখন সেটা দেখি দুর্ব্বলের তরফে, আর নিজের তরফে তার সাতগুণ বেশি থাকলেও তার এত রকমের সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় যে, সেটার প্রতি স্নেহই জন্মায়। আবার আনাতোল ফ্রাঁসের দ্বারস্থ হচ্চি। তার কারণ, চিত্ত তাঁর স্বচ্ছ, কল্পনা তাঁর দীপ্যমান, এবং যেটা অসঙ্গত সেটা তাঁর কৌতুকদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তে ধরা পড়ে, পররাজ্যশাসনের বালাই তাঁর কোনোদিন ঘটেনি। চীনেদের কথাই চলচে :—

They are polite and ceremonious, but are reproached with cherishing feeble sentiments of affection for Europeans. The grievances we have against them are greatly of those which Mr. Du Chaillu cherished towards his Gorilla. Mr. Du Chaillu, while in a forest, brought down with his rifle the mother of a Gorilla. In its death the brute was still pressing its young to its bosom. He tore it from its embrace, and dragged it with him in a cage across Africa, for the purpose of selling it in Europe. Now, the young animal gave him just cause for complaint. It was unsociable, and actually starved itself to death. 'I was powerless,' says Mr. Du Chaillu. 'to correct its evil nauture.'

তাই বলচি, সবলের সব চেয়ে বড় বিপদ হচ্চে দুর্ব্বলের কাছে। দুর্ব্বল তার ধর্ম্মবুদ্ধি এমন করে অপহরণ করে যে, সবল তা দেখতেই পায়না, বুঝতেই পারে না। আজকের দিনে এই বিপদটাই পৃথিবীতে সব চেয়ে বেড়ে উটচে। কেননা হঠাৎ বাহুবলের অতিবৃদ্ধি ঘটেচে। দুর্ব্বলকে শাসন করা ক্রমেই নিরতিশয় অবাধ হয়ে আসচে। এই শাসন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এতই আটঘাট-বাঁধ যে, এর জালে যে বেচারা পড়েচে কোথাও কোনোকালে এতটুকু ফাঁক দিয়ে একটুখানি বেরবার তার আশা নেই। তবুও কিছুতেই আশ মিটচে না, কেননা লোভ যে ভীরু, সে অতিবড় শক্তিমানকেও নিশ্চিন্ত হতে দেয় না। শক্তিমান তাই বসে বসে এই ঠাওরাচ্চে যে শাসনের ইস্ক্রু-কলে এমনি করে প্যাঁচ দিতে হবে যে, নালিশ জানাতে মানুষের সাহস হবে না, সাক্ষ্য দিতে ভয় পাবে, ঘরের কোণেও চেঁচিয়ে কাঁদলে অপরাধ হবে। কিন্তু শাসনকে এত বেশি সহজ করে ফেলে যারা সেই শাসনের ভার নিচ্চে, নিজের মনুষ্যত্বের তহবিল ভেঙে এই অতি-সহজ শাসনের মূল্য তাদের জোগাতে হবে। প্রতিদিন এই যে তহবিল ভেঙে চলা এর ফলটা প্রতিদিন নানা আকারে নিজের ঘরেই দেখা দেবে। এখনো দেখা দিচ্চে কিন্তু তার হিসাব কেউ মিলিয়ে দেখচে না।

এই ত প্রবলপক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য। আমাদের পক্ষে এসব কথা বেশি করে আলোচনা করতে বড় লজ্জা বোধ হয়, কেননা বাইরে থেকে এর আকারটা উপদেশের মত—কিন্তু এর ভিতরের চেহারাটা মার খেয়ে কান্নারই রূপান্তর। একদিকে ভয় আরেক দিকে কান্না, দুর্ব্বলের এইটেই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় লজ্জা। প্রবলের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি আমাদের নেই কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াই আমাদের করতেই হবে। আর যাই করি, ভয় আমরা করব না, এবং কথা বলা যদি বন্ধ করে দেয় তবে সমুদ্রের এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত নাকি সুরে কান্না আমরা তুলব না।

দুঃখের আগুন যখন জ্বলে তখন কেবল তার তাপেই জ্বলে মরব আর তার আলোটা কোনো কাজেই লাগাব না এটা হলেই সব চেয়ে বড় লোকসান। সেই আলোটাতে মোহ-আঁধার ঘুচুক, একবার ভালো করে চেয়ে দেখ। নিজের মনকে একবার জিজ্ঞাসা কর, ঐ বীভৎস শক্তিটাই কি সত্যই বড়? মানুষ পদমানের কৃত্রিম উচ্চমঞ্চে চড়ে বসে আপনাকে উঁচু মনে করবে। সেখান থেকে সে যে ভাঙচে এবং গড়চে বিশ্ববিধাতার আইনের সঙ্গে তার মিল হচ্চে না। সেই মানুষকে হঠাৎ যত বড় দেখাচ্ছে সে কি সত্যই তত বড়? বাইরে থেকে সে ভাঙচুর করতে পারে কিন্তু ভিতর থেকে মানুষের জীবনের সম্পদ লেশমাত্র যোগ করে দিয়ে যাবার সাধ্য ওর আছে? ও সন্ধি করতে পারে কিন্তু শান্তি দিতে পারে কি? ও অভিভূত করতে পারে কিন্তু শক্তি দান করতে পারে কি? আজ প্রায় দুহাজার বছর আগে সামান্য একদল জাল-জীবীর অখ্যাত এক গুরুকে প্রবল রোমসাম্রাজ্যের একজন শাসনকর্ত্তা চোরের সঙ্গে সমান দণ্ডকাষ্ঠে বিঁধে মেরেছিল। সেদিন সেই শাসনকর্ত্তার ভোজের অন্নে কোনো ব্যঞ্জনের ত্রুটি হয়নি এবং সে আপন রাজপালঙ্কে আরামেই ঘুমতে গিয়েছিল। সেদিন বাইরে থেকে বড় দেখিয়েছিল কাকে? আর আজ? সেদিন সেই মশানে বেদনা এবং মৃত্যু এবং ভয়, আর রাজপ্রাসাদে ভোগ এবং সমারোহ? আর আজ? আমরা কার কাছে মাথা নত করব? 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?'

৪

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্চে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথা মনে হয় যে, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে সেটা ধর্ম্মনীতিগত আদর্শেরই তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে নূতন দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারেন, তাহলেই তাঁকে বরণ করবার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে দেখি একেবারেই উল্টো। এককালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই। অর্থাৎ যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কি? গায়ের জোর। কি উপায়ে দখল করবে? যে উপায়েই হোক। তার পরে যে সকল উপায় দেখা গেল মানুষের

সদ্বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হল। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ৎ দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, কি করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েচে। এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।

সেদিনকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের যে একটা আবছায়া দেখতে পাচ্চি সেটা এই রকম :—বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল-দ্বীপের মত প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম্ম জীর্ণ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্ব্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশ আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মত নির্ব্বাণমুক্তির পক্ষে; প্রলয়েই তাঁর আনন্দ।

কিন্তু এই শান্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা টিকল না। য়ুরোপেও আধুনিক শক্তিপূজক বলচেন, যিশুর মত অমন গরীবের দেবতা, নিরীহ দেবতা, অমন নেহাৎ ফিকে রক্তের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে, যেমন করে হোক যে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে না মানে বাধা, না পায় ব্যথা, না করে লজ্জা। কিন্তু য়ুরোপে এই যে বুলি উঠেচে সে কাদের পানসভার বুলি? যারা জিতেছে, যারা লুটেচে, পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে যারা তাদের মদের চাট বানিয়ে খাচ্চে।

আমাদের দেশের মঙ্গলগানের আসরেও ঐ বুলিই উঠেছিল। কিন্তু এ বুলি কোনখান থেকে উঠল? যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে। তারা স্বপ্ন দেখল। কখন? যখন—

নারায়ণ, পরাশর, এড়াইল দামোদর,
উপনীত কুচট্যানগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিলুঁ উদকপান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

সেদিনকার শক্তির স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র—সে স্বপ্নের মূল ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের মধ্যে।

শোনা গেছে, ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষরে হয় না—এর চরণে চরণে মিল। সেই পাঁচশো বছর পূর্ব্বের এক চরণের সঙ্গে আজ পাঁচশো বছর পরের এক চরণের চমৎকার মিল শোনা যাচ্চে না কি? য়ুরোপের শক্তিপূজক আজ বুক ফুলিয়ে বড় সমারোহেই শক্তির পূজো করচেন; মদে তাঁর দুই চক্ষু জবাফুলের মত টকটক করচে; খাঁড়া শাণিত; বলির পশু যূপে বাঁধা। তাঁরা কেউ কেউ বলচেন আমরা যিশুকে মানিনে, আবার কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মত গোঁজামিলন দিয়ে বলচেন, যিশুর সঙ্গে শক্তির সঙ্গে ভেদ করে দেওয়া ঠিক নয়, অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে দুজনকেই সমান মানবার মন্ত্র আছে। অর্থাৎ একদল মদ খাচ্ছেন রাজাসনে বসে, আরেক দল পুলপিটে চড়ে।

আর আমরাও বলচি, শিবকে মানব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা। আমার চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেচি। কিন্তু সে মঙ্গল গান স্বপ্নলব্ধ। ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের স্বপ্ন। জয়ীর চণ্ডীপূজায় আর পরাজিতের চণ্ডীগানে এই তফাৎ।

স্বপ্নেতেই যে আমাদের চণ্ডীগানের আদি এবং স্বপ্নেতেই যে তার অন্ত তার প্রমাণ কি? ঐ দেখ না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী ফুল্লরার বারমাস্যা একবার শোন; কিন্তু হল কি? হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন একটা আংটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে এই সামান্য ব্যাধ যখন লড়াই করল, তখন খামকা স্বয়ং হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। এ'কেই বলে শক্তির স্বপ্ন ক্ষুধা এবং ভয়ের বরপুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে মা মা করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যার সে ভেদ করে না, সে যেন-তেন প্রকারে ছোটকে বড়, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্যে যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমনভাবে আছ আলস্যভরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তারস্বরে বলতে হবে—মা, মা, মা!

যখন মোগল-পাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে বাহুরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেলে সেটা শক্তিরই রূপ। সেখানে ধর্ম্মের হিসাব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমি সব সহ্য করব, তবুও কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না, তাহলেই মানুষের জিৎ হয়। চাঁদ সদাগর কিম্বা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছুদূর পর্য্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। মারের পর মার খেয়েচে কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয়নি। মিথ্যা এবং অন্যায় চারদিক থেকে তাদের আক্রমণ করলে; চণ্ডী বললেন, ভয়ে অভিভূত করে, দুঃখে জর্জ্জরিত করে, ক্ষতিতে দুর্ব্বল করে, মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে জোর করে পুজো আদায় করবই! নইলে? নইলে আমার প্রেসটিজ্ যায়। ধর্ম্মের প্রেসটিজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেসটিজ হচ্চে ক্ষমতার প্রেসটিজ। অতএব মারের পর মার, মারের পর মার!

অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হল, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধমরা সদাগর মাথা হেঁট করলে। শক্তি তাদের এক দিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল সে দুঃখে তেমন অপমান নেই যেমন অপমান এই মাথা হেঁট করে। যে আত্মা অভয়, যে আত্মা [illegible] আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা বলে, [illegible] চেয়ে বড় বলে মানলে। এইখানেই শক্তির সকলের [illegible] পরিচয় পাওয়া গেল।

আমরা আজ য়ুরোপের দেবতাকে স্বপ্নে পুজো [illegible]

এইখানেতেই য়ুরোপের কাছে আমাদের সব চেয়ে পরাভব হয়েচে। যদি সে আমাদের আঘাত করতে চায় করুক, আমরা সহ্য করব, কিন্তু তাই বলে পুজো করব ? সে চলবে না ; কেননা পুজো করতে হবে ধর্ম্মরাজকে। সে দুঃখ দেবে, দিকৃণে : কিন্তু হারিয়ে দেবে ? কিছুতে না। মরার বাড়া গাল নেই ; কিন্তু মরেও অমর হওয়া যায় এই কথা যদি কিছুতে ভুলিয়ে দেয় তাহলে তার চেয়ে সর্ব্বনেশে মৃত্যু আর নেই।

মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।

(৫)

মানুষের ইতিহাসের রথ আজ যত বড় ধাক্কা খেয়েচে এমন আর কোনোদিনই খায়নি। তার কারণ আধুনিক ইতিহাসের রথটা কলের গাড়ি, বড় কৌশলে ওর লোহার রাস্তা বাঁধা, আর এক একটা ইঞ্জিনের পেছনে গাড়ির শ্রেণী প্রকাণ্ড লম্বা হয়ে বাঁধা পড়েচে ? তার পরে ওর পথ চলেচে জগৎজুড়ে, নানা জায়গায় নানা পথে কাটাকাটি। কাজেই কলে কলে যদি একবার সংঘাত বাধল যদি পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলতে না পারলে, তাহলে সেই দুর্যোগে ভাঙচুরের পরিমাণ অতি ভয়ানক হয়ে ওঠে, এবং পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত থরথর করে কাঁপতে থাকে।

এই কলের গাড়ির সংঘাত এবারে খুব প্রবল ধাক্কায় ঘটেছে —কি মাল কি সওয়ারী নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। তাই চারি দিকে প্রশ্ন উঠেছে, একি হল, কেমন করে হল, কি করলে ভবিষ্যতে এমন আর না হতে পারে ?

মানুষের ইতিহাসে এই প্রশ্ন এবং বিচার যখন উঠে পড়েছে তখন আমাদেরও কি ভাবতে হবে না ? তখন শুধুই কি পরের নামে নালিশ করব ? নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করব না ?

আমি পূর্ব্বেও আভাস দিয়েছি এখনও বলছি দুর্ব্বলের দায়িত্ব বড় ভয়ানক। বাতাসে যেখানে যা-কিছু ব্যাধির বীজ ভাসছে দুর্ব্বল তাকেই আতিথ্য দান করে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে। ভীরু কেবল ভয়ের কারণকে বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমানকে সৃষ্টি করে।

চোখে যেখানে আমরা দেখতে পাইনে সেখানে আমাদের ব্যথা পৌঁছয় না ; মাটির উপর যে সব পোকা মাকড় আছে তাদের আমরা অবাধে মাড়িয়ে চলি কিন্তু যদি সামনে একটা পাখী এসে পড়ে তার উপরে পা ফেলতে সহজে পারিনে। পাখীর সম্বন্ধে যে বিচার করি পিঁপড়ের সম্বন্ধে সে বিচার করিনে।

অতএব মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য তাকে এমনটি হতে হবে যাতে তাকে মানুষ বলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ কর্ত্তব্য কেবল তার নিজের সুবিধের জন্যে নয়, পরের দায়িত্বের জন্যেও। মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে, এটা, যে-লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারো পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে খর্ব্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয় মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে। কেন না, যেখানেই আমরা মানুষকে বড় দেখি সেখানেই আপনাকে বড় বলে চিনতে পারি—এই পরিচয় যত সত্য হয় নিজেকে বড় রাখবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে তত সহজ নয়।

প্রত্যেক মানুষের যে-দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে দেশে আপনিই বড় হয়। সেখানে মানুষ বড় করে বাঁচবার জন্যে নিজের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করে, এবং বাধা পেলে শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করতে থাকে। সে মানুষ যারই সামনে আসুক, তার চোখে সে পড়বেই—কাজেই ব্যবহারের বেলায় তার সঙ্গে ভেবে চিন্তে ব্যবহার করতেই হবে। তাকে বিচার করবার সময় কেবলমাত্র বিচারকের নিজের বিচারবুদ্ধির উপরেই যে ভরসা তা নয়, যথোচিত বিচার পাবার দাবী তার নিজের মধ্যেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

অতএব যে জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেচে তার একটা লক্ষণ এই যে, ক্রমশই সে জাতির প্রত্যেক বিভাগের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকরতা চলে যাচ্ছে। যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরোগৌরব দাবী করবার অধিকার পাচ্ছে। এইজন্যেই সেখানে মানুষ ভাবছে, কি করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে, এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্যলাভ করবে।

কিন্তু আমাদের দেশে কি হয়েছে ? আমরা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেচি। তারা যে খাটো এটা কোন তর্ক বা বিচারের উপরে নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেছি। এমনি হয়েছে যে, যাকে ছোটো করেছি সে নিজে হাত জোড় করে বলছে আমি ছোটো। সমাজে তাদের অধিকারকে বড়র সমতুল্য করতে চেষ্টা করলে তারাই সব চেয়ে বেশি আপত্তি করে।

এমনি করে অপমানকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা ও অভ্যাস সমাজের স্তরে স্তরে নানা আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। যারা নীচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি—তাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সকল বিষয়েই হীন হলেও উপরের লোককে সেটা বাজে না। বরঞ্চ তাদের চাল-চলন যদি উপরের আদর্শ অবলম্বন করতে যায় তাহলে সেটাতে বিরক্তি বোধ হয়।

তার পরে এই সব চির-অপমানে-দীক্ষিত মানুষগুলো যখন মানবসভায় স্বভাবতই জোরগলায় সম্মান দাবী করতে না পারে, যখন তারা এত সঙ্কুচিত হয়ে থাকে যে বিদেশী উদ্ধতভাবে তাদের অবজ্ঞা করতে অন্তরে বাহিরে বাধা বোধ না করে, তখন সেটাকে কি আমাদের নিজেরই কৃতকর্ম্ম বলে গ্রহণ করব না ?

আমরা নিজেরা সমাজে যে অন্যায়কে আটেঘাটে বিধি বিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী করে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যের হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে তখন সেটা সম্বন্ধে সর্ব্বতো ভাবে আপত্তি করবার জোর আমাদের কোথায় ?

জোর করি সেই বিদেশীরই ধর্ম্মবুদ্ধির দোহাই দিয়ে। সে দোহাইয়ে কি লজ্জা বেড়ে ওঠে না ! এ কথা বলতে কি মাথা হেঁট হয়ে যায় না, যে, সমাজে আমাদের আদর্শকে আমরা ছোট করে রাখব, আর পলিটিক্সে তোমাদের আদর্শকে তোমরা উঁচু করে রাখ ? আমরা দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল করে রাখব আর তোমরা তোমাদের ঔদার্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকার আমাদের হাতে নিজে তুলে দেবে ? যেখানে আমাদের এলেকা সেখানে ধর্ম্মের নামে আমরা অতি কঠোর কৃপণতা করব, কিন্তু যেখানে তোমাদের এলেকা সেখানে সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে অপর্য্যাপ্ত

বদান্ততার জন্যে তোমাদের কাছে দরবার করতে থাকব এমনবলি কথা কোন মুখে? আর যদি আমাদের দরবার মঞ্জুর হয়? যদি আমরা আমাদের দেশের লোককে প্রত্যহ অপমান করতে কুণ্ঠিত না হই, অথচ বিদেশের লোক এসে আপন ধর্ম্মবুদ্ধিতে সেই অপমানিতদের সম্মানিত করে তাহলে ভিতরে বাহিরেই কি আমাদের পরাভব সম্পূর্ণ হয় না?

আজকের দিনে যে কারণে হোক দুঃখ এবং অপমানের বেদনা নিরতিশয় প্রবল হয়ে উঠেছে; এই উপলক্ষে আমাদের মনে একটা কথা আশা করবার আছে সেটা হচ্ছে এই যে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে যখন অন্য পক্ষের পরাভব হচ্ছে তখন সেইখানে আমরা এদের উপরে উঠব। তাহলে এদের হাতের আঘাতে আমাদের গৌরব হানি করবে না বরং বাড়াবে। কিন্তু সেখানেও কি আমরা বলব, ধর্ম্মবুদ্ধিতে তোমরা আমাদের চেয়েবড় হয়ে থাক; নিজেদের সম্বন্ধে আমরা যে রকম ব্যবহার করবার আশা করিনে আমাদের সম্বন্ধে তোমরা সেইরকম ব্যবহারই কর? অর্থাৎ চিরদিনই নিজের ব্যবস্থায় আমরা নিজেদের খাটো করে রাখি, আর চিরদিনই তোমরা নিজগুণে আমাদের বড় করে তোলো। সমস্ত বরাৎই অন্যের উপরে, আর নিজের উপরে একটুও নয়? এত অশ্রদ্ধা নিজেকে, আর এতই শ্রদ্ধা অন্যকে? বাহুবলগত অধমতার চেয়ে এই ধর্ম্মবুদ্ধিগত অধমতা কি আরো বেশি নিকৃষ্ট নয়?

অল্পকাল হল একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নীচে হিন্দু-মুসলমান আহার করতে পারবে না, এমন কি সেই আহারে হিন্দু-মুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য্য যদি নাও থাকে। যাঁরা এ কথা বলতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্ত্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূলে। এই সন্দেহ যখন করেন তখন ধর্ম্মবিচারে তাঁরা বিদেশীকে দণ্ডনীয় মনে করেন। এর একমাত্র কারণ ধর্ম্মের দাবী নিজের উপরে তাঁদের যতটা, বিদেশীর উপরে তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমরা দুঃসহরূপে পাকা করে রাখব সেইটেই ধর্ম্ম, কিন্তু বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোনো কারণেই কোনো মতেই নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধর্ম্ম। আত্মপক্ষে দুর্ব্বলতাকে সৃষ্টি করব ধর্ম্মের নামে, বিরুদ্ধ পক্ষে সেই দুর্ব্বলতাকে ব্যবহার করলেই সেটাকে অন্যায় বলব।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্ছে দেওয়ালের এপারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না? তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই আবশ্যক হবে না। হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই নিষেধটা বুদ্ধিমানজীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্য্যন্ত চলে গেছে। সমাজের বিধানে নিজের বারো আনা ব্যবহারের কোনো প্রকার সঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করতে আমরা বাধ্য নই; যেমন বাধ্য নয় গাছপালা কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষী। পলিটিক্সে বিদেশীর সঙ্গে কারবারে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শিখেছি,—সে ক্ষেত্রে সকল রকম বিধিবিধানের একটা বুদ্ধিগত জবাবদিহি আছে বলে মানতে অভ্যাস করছি; কিন্তু সমাজে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার, যার উপরে পরস্পরের গুরুতর সুখ-দুঃখ শুভাশুভ প্রত্যহ নির্ভর করে সে সম্বন্ধে বুদ্ধির কোনো কৈফিয়ৎ নেওয়া চলে একথা আমরা ভাবতেও একেবারে ভুলে গেছি।

এমনি করে যে-দেশে ধর্ম্মবুদ্ধিতে এবং কর্ম্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস করে রেখেছে, সে-দেশে কর্ত্তৃত্বের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না। সে দেশে এই সকল অধিকারের জন্যে পরের বদান্যতার উপরে নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলেছি মানুষ যেখানে নিজেকে নিজে অত্যন্ত ছোট এবং অপমানিত করে রাখে সেখানে তার কোনো দাবী স্বভাবত কারো মনে গিয়ে পৌঁছয় না। সেই জন্যে তাদের সঙ্গে যে-সকল প্রবলের ব্যবহার চলে সেই প্রবলদের প্রতিদিন দুর্গতি ঘটতে থাকে। মানুষের সঙ্গে আচরণের আদর্শ তাদের না নেমে গিয়ে থাকতে পারে না। ক্রমশই তাদের পক্ষে অন্যায়, ঔদ্ধত্য এবং নিষ্ঠুরতা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে। নিজের ইচ্ছাকে অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে একান্ত সহজ হওয়াতেই মানব-স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা নিজের অগোচরেই তাদের মনে শিথিল হয়ে আসে। ক্ষমতা যতই অবাধ হয় ক্ষমতা ততই মানুষকে নীচের দিকে নিয়ে যায়। এইজন্যে ক্ষমতাকে যথোচিত পরিমাণে বাধা দেবার শক্তি যার মধ্যে নেই তার দুর্ব্বলতা সমস্ত মানুষেরই শত্রু। আমাদের সমাজ মানুষের ভিতর থেকে সেই বাধা দূর করবার একটা অতি ভয়ঙ্কর এবং অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র। এই যন্ত্র একদিকে বিধান-অক্ষৌহিণী দিয়ে আমাদের চারদিকে বেড়ে ধরেছে, আর একদিকে, যে-বুদ্ধি, যে-যুক্তি দ্বারা আমরা এর সঙ্গে লড়াই করে মুক্তিলাভ করতে পারতুম, সেই বুদ্ধিকে, সেই যুক্তিকে একেবারে নির্ম্মূল করে কেটে দিয়েছে। তার পরে অন্যদিকে অতি লঘু ত্রুটির জন্যে অতি গুরুদণ্ড। খাওয়া শোওয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম স্খলন সম্বন্ধে শাস্তি অতি কঠোর। একদিকে মূঢ়তার ভারে অন্যদিকে ভয়ের শাসনে মানুষকে অভিভূত করে জীবনযাত্রার অতি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তার স্বাভিরুচি ও স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। তার পরে? তার পরে ভিক্ষা, ভিক্ষা না মিললে কান্না। এই ভিক্ষা যদি অতি সহজেই মেলে, আর এই কান্না যদি অতি সহজেই থামে, তাহলে সকল প্রকার মারের চেয়ে অপমানের চেয়ে সে আমাদের বড় দুর্গতির কারণ হবে। নিজেকে আমরা নিজে ছোট করে রাখব, আর অন্যে আমাদের বড় অধিকার দিয়ে প্রশ্রয় দেবে এই অভিশাপ বিধাতা আমাদের দেবেন না বলেই আমাদের এত দুঃখের পর দুঃখ।

জাহাজের খোলের ভিতরটায় যখন জল বোঝাই হয়েছে তখনি জাহাজের বাইরেকার জলের মার সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ভিতরকার জলটা তেমন দৃশ্যমান নয়, তার চালচলন তেমন প্রচণ্ড নয়, সে মারে ভারের দ্বারা, আঘাতের দ্বারা নয়, এইজন্যে বাইরের ঢেউয়ের চড় চাপড়ের উপরেই দোষারোপ করে তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু হয় মরতে হবে নয় একদিন এই সুবুদ্ধি মাথায় আসবে যে আসল মরণ ঐ ভিতরকার জলের মধ্যে, ওটাকে যত শীঘ্র পারা যায় সেঁচে ফেলতেই হবে। কাজটা যদি দুঃসাধ্যও হয়, তবু একথা মনে রাখা চাই যে, সমুদ্র সেঁচে ফেলা সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ, খোলের জল সেঁচে ফেলা। একথা মনে রাখতে হবে, বাইরে বাধাবিঘ্ন [illegible] চিরদিনই থাকবে, থাকলে ভাল বই মন্দ নয়—কিন্তু অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এইজন্যে ভিতরের দিকে [illegible] দিকে তাকাতে হবে, তাতে অপমান [illegible]

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এইরূপ হাস্যোজ্জ্বল অনাবিল রসিকতার উদাহরণ তাঁহার সকল পুস্তকেই দিয়াছেন ও স্বজন বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার পরিহাস-উক্তি humorous, কিন্তু কোথাও অমার্জিত বা coarse নহে। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলনে তিনি বঙ্কিমের পথানুগামী। তাঁহার দৃশ্যকাব্যগুলি সংক্ষিপ্ত আকার, ভাষায়, কথার বাঁধুনীতে তীক্ষ্ণ ও প্রবচনে উজ্জ্বল। যাহাতে স্বল্প আয়োজনে অল্প সময়ের মধ্যে অভিনীত হইয়া উচ্চাঙ্গের নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের অনুভূতিতে অধিক আনন্দ বিতরণ করিতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সর্বদা মনোযোগী। শিক্ষাকালীন আবশ্যকমত পরিবর্তনের দ্বারা অভিনয়ের শেষ রূপ ধার্য হয়। সুতরাং সংগীত আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহার নাটকীয় রচনার উৎকর্ষতা তিনি অর্জন করিয়াছেন কিন্তু অভিনেতাদের অভিনয়কলার তাদৃশ উচ্চতর বোধের অভাবে সহজে কেহ রচনার মাধুর্য ফুটাইতে পারেন না। আলোচ্য বইখানিতে সমাজের অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা নাট্যাচার্য অমৃতলালের (ভুনী বাবু) ভাষাতে যাহা লিখিত তাহা নিম্নে দিবার পূর্বে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আছে। সংগীত সমাজের নিমন্ত্রণ পত্রে R. S. V. P. (ফরাসী ভাষায় Repondez Sil Vous Plait) অর্থাৎ ইংরেজিতে Reply if you please থাকিত। ইহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে উত্তর দিতে হয়, তিনি নিমন্ত্রণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন কি না। ইহা নিমন্ত্রণ গ্রহণের পদ্ধতি ও নিমন্ত্রণকর্তার প্রতি সৌজন্য বলিয়া পরিগণিত। উপস্থিতে অপারগ হইলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লেখাও কর্তব্য। অমৃতলাল বসু R. S. V. P.র উত্তরে লেখেন—

আবার বসন্ত আসে এবার মকর মাসে
দেবেন সাকার রূপে দেখা সরস্বতী
সমাজের সভ্যগণ আনন্দে উন্মুক্ত মন
সারস্বত-সন্নিধানে দিয়াছেন মতি
বসন্তে বসন্তে যেন ফুটন্ত হৃদয়ে হেন
প্রেমসূত্রে গাঁথা হয় বাণীপুত্র-হার
বসুজ অমৃতলাল পুরিয়া প্রাণের থাল
স্নেহ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা দেয় উপহার
যদি নাহি প্রাণ তার ভেঙ্গে ফেলে কারাগার
ছুটিয়া পালায় এই রোগের জ্বালায়।
হ'লে পুন নিমন্ত্রণ গিয়া গীত-নিকেতন
আসিবে আনন্দ ভ'য়ে হৃদয়-ডালায়।

* * *

আবার পালটে পট কারা এরা নব নট
"জয় জয় বাহবা-ধ্বনিতে জয়"

নাটোরের মহারাজ সঙ্গে রবি কবিরাজ
ধনী জ্ঞানী সুধী সনে নয়নে উদয়

* * * *

পরে শুরু অভিনয় কাব্যে জ্যোতি কথা কয়
সরস প্রকৃতি হতে হাসি ধারা ঝরে
আঁখি-মন-অভিরাম "গোড়ায় গলদ" নাম
প্রহসন লোকমন প্রফুল্লিত করে
হেমচন্দ্র বেণী সঙ্গে, প্রকাশ প্রকাশ রঙ্গে
অঙ্গভঙ্গী রঙ্গ দেখে হইল বিস্ময়
সবে সখে অভিনেতা, কে জানি এদের নেতা
প্রতিভা যে শিক্ষাদাতা বুঝি পরিচয়।

উক্ত গ্রন্থকারের দেওয়া উদ্দেশ বিবৃতি :—

নাটোরের মহারাজা কবি জগদিন্দ্রনাথ রায়

রবি—কোকিল-কবি রবীন্দ্রনাথ কবি-কুলীন

জ্যোতি—পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র, নাট্যকার, কবি, সংস্কৃত ও ফরাসী বিবিধ গ্রন্থের অনুবাদক, phrenologist জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হেমচন্দ্র—বসু-মল্লিক, ক্রীক রো নিবাসী, গোপীনগরের বসু-মল্লিক বংশীয়।

বেণী—বহুবাজারের দত্ত পরিবারের।

প্রকাশ—অক্রুর দত্ত লেনের অক্রুর দত্তের বংশধর প্রকাশচন্দ্র।

এই নেতা ও শিক্ষাদাতা স্বয়ং গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি এই নাটকে মঞ্চে উঠেন নাই, নেপথ্যে থাকিয়া অভিনেতাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহাতে অভিনয়টি সর্বজনমনোরম হয়, সে সম্বন্ধে কিরূপ উৎসাহ লইয়াছিলেন তাহার একটি কৌতুকাবহ ঘটনা উল্লেখ করি।

বন্ধু ৺অটলকুমার সেনের মুখে শোনা ও বেণীমাধব দত্ত সমর্থিত। উভয়েই আমার সতীর্থ ছিলেন ও সংগীত সমাজেরও আমি সভ্য ছিলাম। অটল বাবু চোরবাগান কাঁসারিপাড়া নিবাসী। চুঁচুড়া নিবাসী বিখ্যাত কিংকর সেন, যাঁহার নামে চন্দননগরে এখনো কিংকর সেনের গড় বলিয়া স্থান প্রচলিত আছে, ইঁহার পূর্বপুরুষ। অটলবাবু কলিকাতায় ফ্রীমেসন ও তাঁহার নামে একটি মেসনিক লজ বা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত। তিনি "বানহাউসের" বড়বাবু অর্থাৎ আমদানী ও রপ্তানী মাল Port Commissioner এর মালখানায় কারবারীদের পক্ষে নির্দিষ্ট খরচে সংরক্ষণের জন্য যে সমিতি আছে Bonded Warehouse Association চলিত কথায় মহাজনেরা তাহাকে "বানহাউস" বলেন। গোড়ায় গলদে "শিবু ডাক্তারের" ভূমিকা

তাঁহার ছিল ও "নিমাইয়ের" ভূমিকা লন বেণী বাবু। বেণী বড় সশংক নট nervous ছিলেন। হাসির প্রয়োজনে কিছুতেই হাসিতে পারিতেন না। কবি তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে নেপথ্য হইতে তিনি তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দিবেন। কেবল বেণী যেন অভিনয়কালীন তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখেন। যথাকালে মুখে বেণীর হাসি দর্শকদের মুগ্ধ করে। ইহার হেতু গুরু-শিষ্য সংবাদে কবি এমন মুখভঙ্গী করেন যে, বেণীর হাসি পায়। কবি কিন্তু হাস্যরসিকের ভূমিকায় কখনো অবতীর্ণ হন নাই। আরো দুই জনের নাম অভিনেতারূপে এই নাটকে উল্লেখযোগ্য, ব্যারিষ্টার ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় 'ললিতের' ভূমিকায় ও "চন্দ্র বাবুর" ভূমিকায় শ্রীশচন্দ্র বসু। বোস সাহেবের নাম লুপ্ত হইয়া "চন্দরদা" কিছুকাল হইয়াছিল। ইনি আজো চন্দননগরে আদি বাস্তুভিটার সহিত যোগ রাখিয়াছেন, যদিও বালিগঞ্জে বাস করেন।

বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় কালীন মহারাজা জগদিন্দ্র "অবিনাশের" ও গ্রন্থকর্তা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং "কেদারের" ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'কেদারের' সাজপাটে, ভঙ্গিমা ও চালচলনে, রূপসজ্জায় ও আচরণে (make-up and mannerism) এমন একটা হ্যালাগোছা ও কপট বিনয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন যাহাতে চরিত্রের অন্তর্লিখিত ভাবটি পরিস্ফুট হয় এবং "অবিনাশের" অতিরিক্ত সাজের পার্শ্বে বৈষম্যটাও বেশ লক্ষ্যীভূত হয়। চেষ্টাকৃত অযত্নের আবরণে স্বার্থসাধনের গূঢ় অভিপ্রায় ঢাকা দিবার 'কেদারের' চেষ্টা যেন সহজেই নজরে পড়ে। আঁচড়ানো চুলে আঙুল চালাইয়া উস্কোখুস্কো ভাব করা, কামিজের, হাতের ও বুকের বোতাম খোলা ঝলঝলে ভাব ও অগোছালো পাট করা চাদর প্রভৃতির সাহায্যে সহজেই যাহাতে মনে হয় কেদার লোকটা বেশ সাদাসিধে নিরীহ ও বিনয়ী।

শ্রীশচন্দ্র বসুর মুখে শুনিয়াছি যে, "রবি বাবু প্রথম প্রথম নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে ভালোবাসতেন। ষ্টেজে বের হতে নারাজ ছিলেন, standoffishness"। ক্রমে ক্রমে সে সংকোচ কাটিয়া যায়।

হাস্যোচ্ছল কবিকে অনেকেই দেখিয়াছেন সুরসিক বক্তা। একদা আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র শ্রীমান গোপালদাস চট্টোপাধ্যায় কবিকে প্রণাম করিলে তাঁহাকে বলা হয় একে কতটুকু দেখেছেন, আজ কত বড় হয়েছে। কবি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—"সেটা ওর দোষ নয়, ওর বয়েসের দোষ।" অর্থাৎ বয়সই উহাকে বড় করিয়া দিয়াছে।

ভারত সংগীত সমাজে ইংরাজি নাটকেরও অভিনয় হয়। সেক্সপীয়রের Julius Caesar হইতে কতিপয় দৃশ্য অভিনীত হয়। নিম্নলিখিত সভ্যগণ ভূমিকা গ্রহণ করেন—

সীজার—ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র (পরে স্যার)

মার্ক এণ্টনি—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুথসেয়ার (দৈবজ্ঞ)—পূর্ণচন্দ্র দত্ত, ইনি প্রকাশচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর পুত্র।

লুসিয়াস্—মনোমোহন মল্লিক, ব্যারিষ্টার।

সত্যেন্দ্রনাথ তখন খাটের কোটায়, আমেদাবাদে জেলা ও দায়রা বিচারক। অবসর গ্রহণের পূর্বে কলিকাতায় ফারলো উপভোগ করিতেছেন। উদারচেতা সত্যেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠদের সহিত মিশিবার সময় বয়সের পার্থক্যে বাধা পাইত না। তাঁহার ও জ্যোতিরিন্দ্রের অমায়িক ভাব ও লোক-সঙ্গপ্রিয়তা নিত্য বালিগঞ্জ হইতে চোরবাগান অঞ্চলে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাগাড়ি ফিটনে করিয়া সমাজে আসা যাওয়া করাইয়াছিল। সাহিত্যকে যে বয়স্কদের মজলিসে আনন্দের উপাদানে পরিণত করা যায় তাহা সত্যেন্দ্র "স্বয়ং আচরি" প্রথম দেখাইলেন। তিনি কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট এবং সংগীত সমাজ-মঞ্চে বাংলাতে ও ইংরাজিতে কবিতা আবৃত্তি করিয়া দেখান যে আবৃত্তি ছাত্রদের জন্যই শুধু নহে, বয়স্কদের পক্ষে উহা আদৌ নিতান্ত ছেলেমানুষী নহে। পরে প্রৌঢ়দেরও আবৃত্তি প্রচলিত হইল।

অতঃপর সমাজে জ্যোতিরিন্দ্রের 'অশ্রুমতি' অভিনয়ে আকবরের ভূমিকা লন বাগবাজারের রায় পশুপতিনাথ বসু। রবীন্দ্রনাথের বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি রেকর্ড করা হইয়াছে। অবসর বিনোদনের স্থান ভিন্ন তিনি স্বভাবত গম্ভীরপ্রকৃতি ও গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া চলিতেন, তাঁহার চলাফেরায় কথাবার্তায় decorum বোধ যথেষ্ট প্রতিভাত হইত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব বেশ রাসভারি ছিল। বিশ্বের বিস্ময় এই বাঙালী কবিকে দেখিবার ও তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য সর্বদেশের জনসাধারণের আগ্রহ প্রবল কিন্তু তাঁহার সম্মুখে যাহা খুসি কথা বলার সাহস অল্পলোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। ৺গগনেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় ঠাকুরপরিবারের "মিলনী" সভার পাঠচক্রে কবিকে Mathew Arnolds এর কাব্যাংশ ও কবির স্বরচিত নাটক 'মালিনী' ও গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়িয়া শুনাইতে দেখিয়াছি যখন তিনি পঞ্চাশোর্ধ্বে। সে স্বরলহরীর সুখস্মৃতি এখনো কানে বাজিয়া আছে। এই বৈঠকখানাতেই অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সান্ধ্য বৈঠকের একটি ব্যবস্থা কিছুকাল ছিল। তাহাতে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত মূল রামায়ণ ও মহাভারত হইতে সব্যাখ্যা পাঠ করিতেন। অন্যান্য পুরাণের উপাখ্যানও কখনো কখনো বলিতেন। কবিও মধ্যে মধ্যে শ্রোতারূপে এই বৈঠকে থাকিতেন। বাড়ির তরুণদের পক্ষে এইরূপ একটা স্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কবিই এই ব্যবস্থার মূলে ছিলেন শুনিয়াছি। মৃদু অভিনয় ছলা ও মিনমিনে গলা, অঙ্গ চালনায় বাধ বাধ ভাব দর্শকের মনকে মঞ্চস্থিত কার্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। অভিনেতার একটু সতর্ক থাকা আবশ্যক যে কৃত্রিমতার মাত্রাধিক্য বশতঃ ব্যঙ্গের কারণ না হয়। শ্রীমান্ শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরবর্তীকালে এই উচ্চারণ বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করিয়া বলিবার ভঙ্গীতে প্রভূত উন্নতি আনয়ন করিয়াছেন। ফলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নূতন সুর জাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণ নাট্যালয়ে তাঁহার শিক্ষকতার গুণে অনেক নটনটী পূর্বাপেক্ষা ভাষণরীতি মার্জিত করিয়া অভিনয়কলার সুউচ্চ মানদণ্ড সম্বন্ধে কিছু বোধ উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সমাজে অভিনয় করিয়া ও করাইয়া কবির কৃতিত্বের কথা স্মরণার্থে তিনি বিভিন্ন সময়ে যে সকল ভূমিকা লইয়া নব নব রসের পরিবেশনে স্বদেশবাসীদের মানসিক ভোজে তৃপ্তি দিয়াছেন তাহার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করিতেছি—

'মানময়ী'তে 'মদন', এমন কর্ম আর করব না তে 'অলীকবাবু,' 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় 'বাল্মীকি,' 'কালমৃগয়া'য় 'অন্ধমুনি,' বীরজিতলায় 'রাজা ও রাণী'তে 'রাজা বিক্রমদেব,' এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে 'বিসর্জনে' 'জয়সিংহ' ৬৩ বৎসর বয়সে, শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতায়

শারদোৎসবে 'ঠাকুরদা' ও 'সন্ন্যাসী,' 'প্রায়শ্চিত্ত'তে 'ধনঞ্জয় বৈরাগী,' 'রাজা'য় 'ঠাকুরদা,' 'অচলায়তন'-এ 'আচার্য,' 'ফাল্গুনী'-তে 'অন্ধ বাউল ও কবি,' 'ডাকঘর'-এ 'ঠাকুরদা' 'তপতী'-তে 'রাজা বিক্রমদেব,' 'অরূপরতন'-এ 'রাজা,' 'নটীর পূজা'য় 'ভিক্ষু উপালী'। প্রতি ভূমিকায় তিনি নূতন নূতন সৃষ্টির আনন্দদান করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চ যে জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ইহা কবি চিরদিন বলিতেছেন।

ভারতীয় সংগীত বিষয়ে harmonics এর অভাব সম্বন্ধে প্রৌঢ় কবি একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সূত্রে তালের অল্প বিস্তর ব্যতিক্রম সাধন করিয়া কিরূপে নূতন ভাবের রসের অবতারণা করা যায় তাহা ব্রহ্মবাদিনী ছন্দমাতার বরপুত্র সেক্ষেত্রে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছিলেন। তখনো তাঁহার গলা পূর্ববৎ সুমিষ্ট ও সমান timberএ ছিল। ভারতীয় সংগীতের উন্নতিকল্পে এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে গবেষণা করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে তিনি সকলকে আহ্বান করেন। তিনিই ছাত্রদের মিলিতকণ্ঠে স্বর তৃতীয় পঞ্চমের যোগ বা কোমল সুরের মিশ্রণে গানে কিরূপ স্বর সংগতি, major and minor chord যোগে সমবেত সংগীত (chorus) নাদগাম্ভীর ও দানাদার (tone) করিতে পারা যায় তাহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ জনসাধারণের শ্রুতিগোচর করেন।

গীত রচনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ ভাষার যথেষ্ট সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার গানের ভাষা অপূর্ব। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছিলেন—

জগৎ-কবি-সভায় মোরা
তোমার করি গর্ব
বাঙালী আজ গানের রাজা
নহে তো তারা খর্ব।

যাহা রসজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে আনন্দদায়ক উত্তেজনায় পরিগণিত হইতে পারে তাহা, অনভিজ্ঞ সাধারণ দেশবাসীকে তাহাদের কর্মক্লান্ত দেহ ও শ্রান্ত মনকে নব উন্মাদনা দিয়া প্রফুল্লিত করিতে পারে না। এদেশের আপামর সংস্কার কিছু আধ্যাত্মিক খোরাকের আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতের অভিব্যক্তিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ সুর ও তালের সহযোগে যে ভাবব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছেন তাহা সংগীতামোদীদের মধ্যে প্রচলিত করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অধুনা ভারতীয় প্রধান প্রধান সংগীতাচার্য ও সুরজ্ঞেরা মানিয়া লইয়াছেন যে আর্যাবর্তের খ্যাতনামা 'হিন্দু-সংগীতের' অন্তর্ভুক্ত 'রবীন্দ্র-সংগীত' বলিয়া একটা বিভাগ থাকা উচিত। প্রতিযোগিতা আসরে বা পরীক্ষান্তে উপাধি বা অভিজ্ঞান-পত্র দিবার ব্যবস্থা আছে; তাই দুটি ধারা সৃজিত হইয়াছে, একটি মার্গ (Classical), অপরটি আধুনিক। বাঙলার নিজস্ব সম্পদ চারটি—কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী ও রবীন্দ্র-সংগীত। আধুনিকের মধ্যে রবীন্দ্র-রচিত গানের মধ্যে মার্গ-সংগীতও আছে। সেগুলি বাদে বাকি যাহা কবির নিজস্ব ধারায় রচিত তাহার একটি বিশেষ থাকের ও ঐ গানে অভিজ্ঞ পরীক্ষকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে বাণীর ভাব-স্ফুরণের ও কবির দেওয়া বিশেষ কর্তপের খোঁচগুলির বিচার অনুসারে পারিতোষিক ধার্য হয়। গীতের বর্ণনীয় বিষয়-বস্তুটি যাহাতে শ্রোতাদের মনে গভীর রেখাপাত করিতে পারে, সে জন্য গায়ক ইচ্ছানুসারে মিশ্র সুরের ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেখানে কথা সুরের অনুসরণ করে না, সুর কথার অনুসরণ করে, ফলে কথানুগামী স্বরলহরীর মূর্ছনা দেওয়ায় অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়া লোকের সহজ ও ব্যাপক ব্যবহারে আসে। এমন সংগীত-প্রক্রিয়া প্রাদেশিক হইলেও যখন বাঙলা ভাষীদের নিজস্ব সম্পদরূপে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার মর্যাদা সহ তাহাকে জাতীয় কল্যাণার্থে থাকিতে দেওয়া সমীচীন, নতুবা জাতীয় গীত-প্রতিভা নষ্ট হইয়া যাইবে। রবীন্দ্র-সংগীত পদাবলী-কীর্তন, সারী গান, বাউল ও রামপ্রসাদী মালসী সুরের মতো আমাদের মনের নিত্য প্রয়োজনের অভাব পূরণ করিয়াছে।

ললিতকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গলা স্বভাবতঃ উচ্চ স্বরগ্রামে খেলিতে ভালোবাসে; তাহাতে যে সংগীতের আভাস ও আন্দোলন, তাহার রূপ ও রস তিনি শ্রোতাকে যথাসাধ্য বণ্টন করেন। কিন্তু তাঁহার কবিমন তাহাতে তৃপ্তি পায় না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথা ও ভাবের দ্বারা নিকটস্থ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে চান। তাঁহার প্রকৃত উত্তর-সাধককে বাঙ্‌ময় রূপের দ্বারা অন্য সুরে লইয়া যাইতে ব্যস্ত, তাই তিনি বলেন—

আমার সুরগুলি পায় চরণ,
আমি পাই না তোমারে।
তোমার সাথে গানের খেলা,
দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশী বাজায়
সকাল বেলাতে।

প্রভেদাত্মক কবিতার ছন্দ ও সংগীতের ছন্দ উভয় Techniqueএ সুদক্ষ রবীন্দ্রনাথ যাহাতে বাণীর ও সুরের চাল কতকটা এক হইয়া আমাদের প্রাণকে রসসিক্ত করে ও ক্ষণিকের তন্ময়তা আনে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতারঞ্জিত যে অভিনব কলকাকলীর সৃষ্টি করেন তাহা তাঁহারই কণ্ঠে স্বাভাবিক ও শোভন হয়। কথার অর্থবোধক যতি ও সুরতরঙ্গের বিরাম স্থান যাহাতে সমকালিক হয় তাহার ব্যবস্থা করেন।

সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

বিখ্যাত সংগীতাচার্য ও সুরবাহার বাদক ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর সাহচর্যে ও স্বরলিপি প্রস্তুত করণে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহিত হন। গোসাঁইজির কালওয়াতি বা কলাবতী গান কবি প্রায়ই শুনিতেন। কবির সহিত গোসাঁইজির রাগ আলাপ ও বাঙলা গান আমরাও শুনিয়াছি।

১৩৩১ সালে কৈসরবাগ লখনউতে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনীর প্রতিষ্ঠায় গোস্বামী মহাশয় সংগীতশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ও সুশিক্ষিত সুমার্জিত সুমিষ্ট কণ্ঠের গীত আলাপনে আলাবন্দ খাঁ, ভাতখণ্ডে প্রভৃতি রাজোয়াড়া, বোম্বাই ও উত্তর-ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদদের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া বাঙলায় মুখোজ্জ্বল করেন। তিনি নিজে রসজ্ঞ ও রবীন্দ্র-সংগীতের ভাবগ্রাহী হওয়ায়

ঐ সম্মেলনীতে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি স্বতন্ত্র স্থান লাভ ও প্রতিযোগিতার বিষয়রূপে গণ্য হওয়া সহজসাধ্য হইয়াছিল।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া কবিও স্বকীয় প্রবর্তিত সংগীত-প্রণালী ও অভিব্যক্তির অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি সুযোগ্য exponents পাওয়ায় ইহাকে স্থায়িত্ব অর্পণে সক্ষম হইয়াছেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে কতকগুলি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির একত্র সমাবেশে রবীন্দ্র-সংগীতের অভিব্যক্তির অংকুর যেন উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়াছিল। তাঁহার অগ্রজ ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তাঁহার অগ্রজা ৺সাহিত্যসম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁহার বিদুষী কন্যা সুপরিচিতা দেশনেত্রী সরলা দেবী-চৌধুরাণী ও কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী সত্যেন্দ্র-তনয়া বিখ্যাত সংগীতজ্ঞা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী প্রমুখ ও ৺হিতেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভ্রাতুষ্পুত্রমণ্ডলী তাঁহার এই নবাগত বাণীর উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ কণ্ঠের অনবদ্য মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া বাঙালীকে উপঢৌকন দিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ, জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ রবীন্দ্র-সংগীতে সুরদান ও স্বরলিপি করিয়া দিয়াছেন। কবি নিজে কার্যগতিকে ও অবসর অভাবে তাঁহার গানের সুর ভুলিয়া যাইতেন। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর মিশ্র ছাত্রদের রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষা দিতেন। স্যর আশুতোষ চৌধুরী ও লেডি চৌধুরী (কবির সেজদাদা হেমেন্দ্র-তনয়া ৺প্রতিভা দেবী) প্রতিষ্ঠিত 'সংগীত সংঘ'তে মিশ্রের বিস্তর ছাত্রছাত্রী ছিল, তাহারাও শিখিত। বিবিধ সংগীতের স্বরলিপি "শত গান" সরলা দেবী প্রকাশ করেন যাহাতে কবির দেশাত্মক আদি বিবিধ গান কয়েকটি ছিল। জ্যোতিরিন্দ্র "হারমোনিয়াম শিক্ষা ও স্বরলিপি" এবং "স্বরলিপি গীতিমালা" প্রকাশ করেন। তাহাতেও কবির গানের অনেক স্বরলিপি প্রচারলাভ করে।

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটকটি যখন প্রকাশিত হয় তখন প্রত্যেক গানের স্বরলিপি তৎসহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় এবং "গীতবিতান" প্রভৃতি কবি নিজেও অনেক গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। সংগীতাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংগীতবিদ সুরেন্দ্রনাথও কবির গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেন ১৯০৮-১১ সালে। মিশ্রের জামাতা ও শিষ্য বাচাওয়ান সংগীত-চৌধুরী শান্তিনিকেতনে সংগীত শিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্র-সংগীতের মাধুর্য, গাম্ভীর্য ও মনোহারিত্বও অপরিসীম এবং বহু দরিদ্র সংগীতশিক্ষক এই সংগীত শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের অন্নের সংস্থান করিতে পারিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে সুকণ্ঠ অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গ্রাম্য সুরের চর্চার শিক্ষা দানের সহিত রবীন্দ্র-সংগীতেরও শিক্ষকতা করেন। ইঁহার পর বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া সংগীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ও পরে বিশ্বভারতী মহাবিদ্যালয়ের সংগীত-গুরু ও নাটকীয় বিভাগের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। ইনি কবির বড়দাদা দ্বিজেন্দ্র নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺দ্বীপেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র। ৺দিনেন্দ্র বা দিনু সুকবি, সুঅভিনেতা ও বিবিধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংগীতবিদ। তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠের অতুলনীয় সুর-লহরীতে কবির গানগুলি সাহিত্যরসানুভূতি মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিত। তাঁহার সুর সম্বন্ধে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও দ্রুত স্বরলিপি লিখন স্বয়ং কবিকে অনেক সময় আনন্দ-বিহ্বল করিয়াছে এবং কবির প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে রচনার উৎসধারাকে অধিকতর লীলাচঞ্চল করিয়াছে। ঈপ্সিত রকমের একটি সুযোগ্য শিষ্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমী অধ্যাপক পাইয়া কবি বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। তাই তাঁহার গীতবহুল নাটিকা 'ফাল্গুনী' দিনেন্দ্রকে উৎসর্গ করার সময় কবি নিজের তৃপ্তিতে এইভাবে আকার দিয়াছেন—"আমার সকল নাটের কাণ্ডারী, আমার সকল গানের ভাণ্ডারী"। দিনেন্দ্রের প্রতিভা ও প্রচেষ্টায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও কবির বৈশিষ্ট্যযুক্ত সংগীত আলাপন আদৃত হইয়া নটনটীর কণ্ঠে শ্রোতৃবর্গের মনে নব নব আনন্দের হিল্লোল বহাইয়াছে।

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের শিক্ষায় রবীন্দ্র সংগীত বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীর কণ্ঠে স্থায়ী আসনলাভ করিয়া ও তাহাদের জী নযাত্রার ও জ্ঞানাহরণের পথে আনন্দবর্তিকারূপে থাকিয়া বাঙলার গ্রামে গ্রামে ও প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে কাশীতে, এলাহাবাদে, দিল্লীতে ডেরাডুনে, সাঁওতাল পরগণায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দিনেন্দ্রের অন্যতম কৃতী শিষ্য স্বনামধন্য শ্রীমান্ পঙ্কজকুমার মল্লিক।

পরন্তু শিক্ষাকেন্দ্রটিও উৎসব আনন্দের স্মৃতিমণ্ডিত হইয়া বিদ্যার্থীদের নিকট স্নেহবৎসল মাতৃরূপা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে। এই ভাব থাকায় বিদ্যালয়ের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ আজীবন অক্ষুণ্ণ থাকিবে ও স্বীয় সন্তান-সন্ততিগণের নিকট স্নেহার্দ্রভাষণে বাল্যের শিক্ষা ও ক্রীড়াভূমি এই বাণীমাতৃকা (Alma Mater) আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত কীর্তিত হইবে। এই বিদ্যাপীঠটিকে সাধারণ শিক্ষাগার হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা পরিবেষ্টনের প্রভাব, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসাধন, সখ্যতা, সহযোগিতা ও কর্মের মধ্য দিয়া মর্মের ও সামাজিক বৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধনে সংগীত ও ঋতুতে ঋতুতে উৎসব বিধান ও যে সময়ে তরুণ মন নমনীয় থাকে ও কিঞ্চিৎ আয়াসে স্বাভাবিক অনুপ্রাণতায় সাড়া দিয়া কর্মে উদ্বুদ্ধ করে সে অবস্থায় শিক্ষার একটা বিশেষ ছাপ দিবার জন্য কবির লক্ষ্য ও আদর্শ থাকায়, দিনেন্দ্রনাথের সহজ মিশিবার ক্ষমতা ও রস-সঞ্চারের বিবিধ চেষ্টা সত্যই কবির মনোগত অভিপ্রায়ানুযায়ী রসসিক্ত করিয়া স্থানটিকে অভ্যাগতদের মনে প্রকৃতই মানসলোকের আভাস দিতে সক্ষম হয়। এ বিষয়ে দিনেন্দ্রের ব্যক্তিত্ব কী পরিমাণে সাহায্য করে তাহা তাঁহার বন্ধুবর্গের সুবিদিত। তাঁহার শিক্ষাদানের ফলে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর রত্নাকরের অতল গর্ভে নিহিত রত্নের মতো প্রবাদ বচন না হইয়া লোকের কণ্ঠে জ্যোতিপ্রদ ও দোদুল্যমান হইয়া উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে এবং তাহা বহুল প্রচারিত স্বরলিপিতে নানা দেশবাসীর, এমন কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সংগীতকলাবিদের কণ্ঠেও প্রসারিত ও শোভাবর্ধন করিয়াছে। আধুনিক যুগে থাকিয়াও দিনেন্দ্রনাথ স্বভাবজ সংকোচের ফলে তাঁহার কণ্ঠের আবৃত্তি ও গানের স্থায়িত্ব দিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা করেন নাই।

নটগুরু গিরিশচন্দ্র প্রাকসবাকচিত্রের যুগের লোক বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন "দেহ-পট সনে নট সকলই হারায়।" ছাপাখানার কল্যাণে গ্রন্থকারদের আয়ু পাঠক-পাঠিকার নিকট বাড়িয়াছে। বঙ্গদেশবাসীমাত্রেই রবীন্দ্র-সংগীতের প্রসিদ্ধ স্বরলিপি-কারদের নিকট ঋণী।

শিষ্যপরম্পরার গুরুমুখী বিদ্যার প্রবাহকে প্রাচীন গ্রীকেরা school বলিতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া আধুনিক শিক্ষালয়েরও এই আখ্যা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা ও কলাকুশলতার বৈশিষ্ট্যকে সেইরূপ স্কুল আখ্যা প্রযোজ্য। তাঁহাকে যুগপ্রবর্তক গুরুদেব ধরিয়া তাঁহার আশ্রমনিঃসৃত শিষ্য-প্রশিষ্য উত্তর-সাধিত সাহিত্য, শিল্পাচার্য নন্দলালের শিক্ষকতায় শিল্প এবং সংগীতের নব মূর্ছনার গঙ্গাধারাকে শঙ্খনিনাদী ভগীরথ-কল্প দিনেন্দ্র প্রদর্শিত পথে সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশকে অমৃত রচনাভিসিক্ত হইতে আশা করিব। কবির সকল সাংগীতিক ভাবের ও সকল সুরের মূর্ত আধার—শান্তিনিকেতন ও কলিকাতার তরুণ তরুণীদের শ্রদ্ধার দিনদা, কবির আদরের নাতি দিনদা সম্বন্ধে কবি সময়ে সময়ে আদর করিয়া বলিতেন "আমার গানকে বাঁচাবার জন্যেই দিনুর জন্ম।" ইহা কবির প্রাণের কথা বা প্রশংসার উক্তি হিসাবে বড় কম নহে। কবির অন্যতম প্রিয় শিষ্য, ঐতিহাসিক কবিতায় রচনাদক্ষ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন—

সপ্ত সুরের সাতটি ঘোড়া চালায় যে গো ইঙ্গিতে,
বিশ্বাকাশের সেই রবিরে
বাঙলাদেশের সেই কবিরে
কে পারে কথার রঙ্গে রঙ্গিতে
তারে কে সুর শুনাবে সংগীতে।

দিনেন্দ্রই সেই কবিকে যখন তখন সুর শুনাইতে পারিয়াছিলেন; শুধু কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীত নয়, ভরতের নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী হিন্দু-সংগীতের আর একটি বিভাগ দৃশ্য কাব্যের প্রেক্ষাগৃহে প্রযোজনায়, নাটকীয় কলাতে ও কবির মনোমত অভিনয় করিতে দিনেন্দ্র কতকটা সমর্থ হইয়াছিলেন।

কবির নিজের অভিনয়সঙ্গীদের মধ্যে কৌতুকাভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ ও গম্ভীর অংশে উঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ বিশেষ যশস্বী ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে পারিবারিক অভিনয় মজলিশে একবার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতুল-পুত্র স্বনামধন্য নটশেখর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি (মুখোপাধ্যায়) মহাশয়ের সহিত কবিকে অভিনয় করিতে হয়। মুস্তফি মহাশয়ের অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের কারুকার্য এত সূক্ষ্ম ও প্রচুর ছিল যে সহযোগী অভিনেতাদের পক্ষে নিজ ভূমিকায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ রাখা কঠিন হইত। আমরা কবির নিজ মুখে শুনিয়াছি যে অতটা stage free অভিনেতার সহিত অভিনয় করিতে তাঁহাকে সদা সতর্ক থাকিতে হইত। "বৈকুণ্ঠের খাতা"র 'ঈশানের' ভূমিকা লইতেন মতিলাল চক্রবর্তী যিনি তিন পুরুষের খেলার সাথী ছিলেন। উপযুক্ত অভিনেতার সমাবেশ কবিকে নূতন নূতন নাটক রচনার প্রোৎসাহিত করে। শিল্পী ও শিশু-সাহিত্যিক গগনেন্দ্রনাথ অংকিত মতিবাবুর চিত্র ৺ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। আর একজন বড়দের বন্ধু পরিণত বয়সেও ছোটদের সুহৃদ ছিলেন, তিনি নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার। তাঁহাকে সকলে বড় অক্ষয় বাবু বলিতেন। ছোট অক্ষয় বাবুর কথা পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি অক্ষয় চৌধুরী। বড় অক্ষয় বাবু সু-অভিনেতা ছিলেন। বাঙলার স্থায়ী সাধারণ নাট্যমঞ্চের প্রবর্তকরূপে নট নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু ও অর্ধেন্দুশেখর সুপরিচিত; তথাপি একাধারে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙলার সাধারণ নাট্যালয়ের পরিপালক। হাস্যার্ণব মুস্তফি সাহেবের মুখে অক্ষয় মজুমদার সম্বন্ধে শুনিয়াছি "বাল্মীকি প্রতিভার" অভিনয়ে দস্যুসর্দারের ভূমিকায় গানে ও ভাবব্যঞ্জনায় তিনি এমন হাস্যরস ফুটাইয়াছিলেন যে লেডি ল্যান্সডাউন অভিনয়দর্শনকালে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেন ও বলেন—He is my man ও সাজঘরে (Green room) যাইয়া তাঁহার সহিত করমর্দন করেন। বর্তমান বঙ্গভাষার কয়েকটি অতুলনীয় সম্পদ তাঁহার অভিনয় কুশলতাকে ক্ষেত্র দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ও তাঁহারই অভিনয় দ্বারা উচ্চশিক্ষিত সমাজে উহা প্রচারিত হয়। বৈঠকখানায় বন্ধুসমাগমে যে ভাঁড়ামি-বর্জিত বিশুদ্ধ সাহিত্যিক-রসদ্বারা ভদ্রমহোদয়দের নাটকীয় স্পৃহা ও গল্পরসের আনন্দ একাধারে উপভোগ্য ও চরিতার্থ করা যায় তাহা কবি তাঁহারই ব্যঞ্জনায় সপ্রমাণ করেন। এই নব প্রকার একাত্মক অভিনয়ের কল্পনা কবি সংস্কৃতে রচিত পুরাতন "ভাণের" অনুসরণে লেখেন। বস্তুগত পার্থক্য তাঁহার নিজস্ব। বালকদের অভিনয় সাহায্যার্থ "মুকুট" এবং বিবিধ হেঁয়ালী নাট্য রচিত হয়। সেইরূপ বালিকাদের জন্য পুরুষবর্জিত নাটিকা "মায়ার খেলা" প্রণয়ন করেন। স্ত্রীবর্জিত তিন অংক নাটক "বৈকুণ্ঠের খাতা" পুরুষদের জন্য রচিত হয়। এই অভিনয় উপলক্ষে নাটোরের মহারাজা ৺জগদিন্দ্রনাথের সহিত কবির যে সখ্যতা হয় তাহা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া আজীবন অটুট ছিল।

বড় অক্ষয়ের জন্য লিখিত "বিনি পয়সার ভোজ," "অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি" এবং "হঠাৎ অবতার" আজো স্বচ্ছ হাস্য ও আনন্দ বিতরণ করে। এতগুলি অভিনয়ে বক্তাকে এমন ভাবে গতিবিধি ও কথা বার্তা চালাইতে হয়, যাহাতে সহযোগী নটের অস্তিত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে না থাকিলেও দর্শকের মনে তাহাদের উপস্থিতির ভ্রান্তি আনয়ন করিতে পারে। দর্শকের কল্পনা শক্তিকে উদ্রেক করা প্রাচীন নাটক অভিনয়ে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। শেক্সপীয়ারের 'নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন'তে (A Mid-summer Night's Dream) Bottom এর উক্তিতে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দেশে যাত্রাতেও ইহা বিদ্যমান। বালি ও যবদ্বীপে পৌরাণিক দৃশ্য ভিনয়েও scene প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে খোলা ময়দানে ইহার কথা সিংহলের ডাঃ আনন্দকুমার স্বামী বলেন। পরিণত বয়সে কবি যে সকল মানসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা নাট্যগুরু শ্রীমান শিশিরকুমার ও দিনেন্দ্রনাথের ও একবার গগনেন্দ্রনাথের বিপুল চেষ্টা ও উৎসাহী তরুণদের সাহায্যে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে। ইহার পূর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে কবির নাটক অভিনয় করেন প্রথিতযশা নট ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। কবির 'গোড়ায় গলদ' পরে 'শেষ রক্ষা' আখ্যা পায় ও শিশিরকুমারের প্রযোজনায় ক্রমান্বয় অভিনীত হয়। শিশির 'চন্দ্রবাবু' সাজিতেন। ভবানীপুর সংগীত সমাজ ও বহুবাজার ওল্ড ক্লাবের ও পরে সাধারণ রঙ্গালয়ের ও সবাক চিত্রের সুযোগ্য অভিনেতা ও গায়ক শ্রীমান্ তিনকড়ি চক্রবর্তী ও তদীয় শিষ্য রূপদক্ষ শ্রীমান অহীন্দ্র চৌধুরীকে পাইয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চ পরিচালকেরা রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' পুনঃ পুনঃ অভিনয় সাফল্য অর্জন করেন। তিনকড়ি 'অক্ষয়ের' ভূমিকায় ও নটসূর্য অহীন্দ্রভূষণ 'চন্দ্রবাবুর' চরিত্রে কবির মনোমত রূপ দিতে সক্ষম হন। কবিও

অভিনয় দেখিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। 'শেষরক্ষায়' শিশিরকুমারের অভিনয় ও 'গোরা'য় 'পানুবাবুর' ভূমিকায় প্রাক্তন উকিল নটশেখর শ্রীমান নরেশচন্দ্র মিত্রের অভিনয় কবিকে যথেষ্ট তৃপ্তি দান করে। কবির নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলির রুচি সংগত সম্যক প্রকাশ সুনিপুণা সন্তর্পণশীলা অভিনেত্রী ব্যতীত এক প্রকার অসম্ভব। নাট্য মন্দির প্রতিষ্ঠা ও 'সীতা'র অভিনয় ও তৎপূর্বে বেঙ্গলী থিয়েটারে 'আলমগীর' অভিনয় হইতে বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে নব যুগের সূত্রপাত ও বন্ধুবর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদ্বোধনায় অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ি ইহার অগ্রদূত। তিনি নট, নাট্যাচার্য ও প্রয়োগশিল্পী। তাঁহার শিক্ষাদান গুণে ও অভিনেতৃ-বর্গের অধ্যবসায়ে সামাজিক নাটকের অভিনয় কলা এখন উৎকর্ষতা লাভ করিয়া সাধারণের প্রীতিকর হইয়াছে ও বহুকাল মঞ্চে ও সবাক-চিত্রে দর্শক সুধী জনকে আনন্দ দিতে থাকিবে। শিশিরকুমার শুধু ইংরাজি ও ফরাসী সাহিত্যেই সুপণ্ডিত নন, তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসিক। শিশিরকুমারের সুস্পষ্ট উচ্চারণরীতি সুদূর পল্লীগ্রামে ও গণ্ডগ্রামেও উদীয়মান সখের নটদের শ্লাঘার বস্তু। তিনি নিজে বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া দেশের অল্প-শিক্ষিতগণের রুচি সংশোধন মানসেও এই জাতির রস-পরিচায়ক চারুশিল্পের উন্নতি আনয়ন প্রয়াসী হইয়া নাট্যালয়ে ও নটজীবনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মার্কিণ ভূখণ্ডে ইংরাজিভাষী শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে বাঙলার অভিনয় সদলে দেখাইয়া আসিয়াছেন। সে সময় য্যামেরিকায় রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করিতেছিলেন। (১৯৩০)। কবিও তাঁহাকে সেখানে সাদর আপ্যায়ন করেন। কবি বলেন—তাঁহাদের merit যেরূপ আছে তাহাতে দেশের লোকের সেবায় নিয়োগ করিলে ঢের বেশি কাজের মতো কাজ হইবে, বিদেশে শুধু তার অপচয়। উপরন্তু কবি বহু বার পাশ্চাত্য দেশসমূহে থাকিয়া যে ঐশ্বর্যের দম্ভ ও বিলাস দেখিয়াছেন ও তৎপার্শ্বে এত ভীষণ দৈন্য ও দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও তাহাদের রাজনৈতিক ও ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজের প্রচারের ফলে যে মনোভাবের সহিত পরিচিত হইয়াছেন যে তাহাদের আর তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তিনি ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার কোনো স্বদেশবাসী সেখানে থাকিয়া দুঃখ-কষ্ট ভোগ বা সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেন। উপার্জনের ও তাহা হইতে ব্যয় সংকুলানের বিশেষ আশা তিনি করেন না। মৎপুত্র শ্রীমান্ রমেন্দ্রনাথ (দেবু, অবনীন্দ্রশিষ্য শিল্পী) শিল্পাধ্যক্ষরূপে শিশিরকুমারের সহিত ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি হইয়া য্যামেরিকায় গিয়াছিলেন এবং কবির সহিত সেখানে দেখা করিবার সময় শিশিরকুমারের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারই মুখে কবির এই বাণীর কথা শ্রবণ করি। কবি দেবুকেও বিশেষ যত্ন করেন ও জার্মেনীতে বিশ্বশিল্প প্রদর্শনীতে তাহার চিত্র সম্মানলাভ করিয়াছে জানিয়া অংকনবিদ্যার উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইতে বলেন ও দেশই যে ক্ষেত্র, তাদৃশ অর্থকরী না হইলেও যে যথেষ্ট সুযোগ আছে, সে বিষয়ে মনোযোগী হইয়া বাড়ী ফিরিতে বলেন। দিলীপকুমার রায় সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য পাশ্চাত্যদেশে বহু ভ্রমণ করিয়াছেন ও বিদেশে কবির ঘনিষ্ঠ সংযোগের সুযোগ পান। তাঁহার সহিত কবিগুরুর একটি কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করি। 'তীর্থংকর' পুস্তকের ২২৪ পৃষ্ঠায় দিলীপকুমার লিখিতেছেন—

কবি খুব মন দিয়ে শুনলেন, পরে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—তোমার পয়লা নম্বর প্রশ্নের উত্তরে গোড়াতেই ব'লে রাখতে চাই যে মার্গ ও হিন্দুস্থানী সংগীত আমি সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসি—বাল্যকাল থেকেই—আর প্রতি সুন্দর সৃষ্টি পুরোনো হলেও রসিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে, এই তো হওয়া উচিত। যাঁরা সত্যিকার ভালো গান শুনেও বলেন—ও কী, তা-না-না-না মেও মেও বাপু ও ভালো লাগে না, তাঁদেরকে আমি বলব—তোমার ভালো লাগে না, এজন্যে তোমার সঙ্গে তর্ক করব না, কেননা রুচি নিয়ে তর্ক নিষ্ফল, কেবল বলব তোমরা একথা সগৌরবে বোলো না, লক্ষীটি! কারণ ভালো জিনিস ভালো না লাগাটা লজ্জারই বিষয়, গৌরবের নয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর সংগীত যখন সত্যই মার্গসংগীতের একটি মহৎ বিকাশ, তখন সেটা যদি তোমাদের কারুর ভালো না-ও লাগে তো সলজ্জেই বোলো—ও রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই করিনি বা করবার সময় পাইনি, নইলে ভালো লাগত নিশ্চয়ই।

ইহা তো সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ ও কবিজনোচিত গভীরতর অনুভূতির কথা ইতিপূর্বে ১৩২৪ ভাদ্রের 'সবুজপত্রে' তিনি লেখেন :—

আমাদের মতে রাগরাগিণী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গান সমস্ত জগতের। ভৈরব যেন ভোরের আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা। কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি নিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন। ভারতের সংগীতে মানুষের মনে বিশেষ ভাবে এই বিশ্ব রসটিকেই রসিয়ে তোলবার ভার নিয়েছে। তাই যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গম্ভীর যাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নেই; তাই সে মধুর ব'লেই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী। নরনারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে সেটিকে সে স্মরণ করাতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের সাধনা তারি বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তিবিশেষের বিবাহ ঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয়।

তবু যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা পার হতে পারিনি। তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসটা তাদেরই বজায় থাকে। আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের কিন্তু তার চলার বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধে না। * * * তবে এও নিশ্চিত যে আমাদের গানে স্বর-সংগতি (harmony) ব্যবহার করতে হ'লে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হবে। অন্তত মূল সুরকে সে যদি ঠেলে চলতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে স্পর্ধা হবে। * * * অতএব আমাদের গানের পিছনে যদি সানুচর নিযুক্ত থাকে তবে দেখতে হবে তারা যেন না পদে পদে আলো হাওয়া আটকায়। * *

—এক হাতে রাজদণ্ড, অন্য হাতে রাজছত্র, কাঁধে জয়ধ্বজা এবং মাথায় সিংহাসন বয়ে রাজাকে যদি চলতে হয়, তবে তাতে বাহাদুরী প্রকাশ পায় বটে কিন্তু তার চেয়ে শোভন ও সুসংগত হয় যদি এই আসবাবগুলি নানা স্থানে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। [illegible] গানের যদি অনুচর বরাদ্দ হয় তবে সংগীতের [illegible] ঐ দিকে চালান ক'রে দিতে পারি।

'গৃহদাহ' ও 'শ্রীকান্ত'

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কাজী আবদুল ওদুদ

শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালে, দ্বিতীয় পর্ব ১৩১৮ সালে, তৃতীয় পর্ব ১৩২৭ সালে আর চতুর্থ পর্ব ১৩৩৩ সালে। এটি বোধ হয় শরৎচন্দ্রের সব চাইতে জনপ্রিয় উপন্যাস। এটি যে অনেকাংশেই শরৎচন্দ্রের আত্মচরিত, অনেকেরই সেই ধারণা। শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তিতে তাঁর চরিত্রগুলোর শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তব; সেই হিসাবে শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী যে অনেক পরিমাণে শরৎচন্দ্রের নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী হবে এ খুব সম্ভবপর ব্যাপার। তবে জীবনের বিচিত্র ছবি, বিশেষ করে রাজলক্ষ্মীর জীবনের পরিণতি, এতে এমন যত্নে চিত্রিত হয়েছে যে তা থেকে মনে হয় অন্যান্য শিল্পীর মতো শরৎচন্দ্রও তাঁর এই উপন্যাস রচনায় সংগঠনী কল্পনা ও মননের সাহায্য কম নেন নি।

আমরা 'শুভদা'য় দেখেছি, বাইশ বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্র প্রেম সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিণত ভাবনার পরিচয় দিচ্ছেন। 'শ্রীকান্তে' দেখা যাচ্ছে শ্রীকান্ত তার অন্নদা-দিদির দেখা পেয়েছিল পনেরো যোল বছর বয়সে। অন্নদার মতো কোনো অসাধারণ নারীই হয়তো কিশোর শরৎচন্দ্রের মনে সতীত্ব পতিব্রতা প্রেম ইত্যাদি সম্বন্ধে গভীর ভাবনা সঞ্চারিত করেছিল। তাঁর সেই ভাবনার বহু পরিচয় তাঁর বিভিন্ন রচনায় আমরা দেখেছি, শ্রীকান্তেও পাবো। শরৎচন্দ্র অবশ্য প্রেম ও দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধেই ভাবেননি, জীবনের আরো বহু বহু ব্যাপারের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল—তারও পরিচয় আমরা পেয়েছি। তবে প্রেমের বিচিত্র রূপ আর দাম্পত্যজীবনের সমস্যা যে তাঁর গভীরতম মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, এ যথার্থ।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের সব চাইতে বড় উপন্যাস—এতে স্মরণীয় চরিত্রের সংখ্যাও সব চাইতে বেশী। ইন্দ্রনাথ, অন্নদা-দিদি, শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সুনন্দা, বজ্রানন্দ, গহর, কমললতা, এতগুলো বিশিষ্ট সৃষ্টি তাঁর অপর কোনো বইতে সম্ভবপর হয়নি; ছোটোখাটো স্মরণীয় ঘটনা ও চরিত্রের সংখ্যাও এতে সুপ্রচুর—দি রয়াল বেঙ্গল টাইগারের উপাখ্যান, অন্ধকার রাত্রে ইন্দ্র ও শ্রীকান্তর ডিঙিতে গঙ্গায় ভাসা ও মাছচুরি, নতুন-দার নৌকাযাত্রা, অমাবস্যার রাত্রে শ্রীকান্তের মহাশ্মশানের অভিজ্ঞতা, সমুদ্রে সাইক্লোন, টগর ও তার মানুষ নন্দমিস্ত্রী, বর্মী স্ত্রীকে নিয়ে বাঙালী স্বামীর কীর্তি, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ-দম্পতি, ডোমদের বিয়েতে মন্ত্রের বিশুদ্ধি, রাজলক্ষ্মীর ভৃত্য, রতন এ সবই বাঙালী পড়ুয়াদের স্মৃতিতে স্থায়ী আনন্দ-সম্পদে পরিণত হয়েছে। এর প্রধান চরিত্রগুলোর দিকে তাকানো যাক্।

'পথের দাবী'র সব্যসাচীকে তো শরৎচন্দ্র মহামানব করেই এঁকেছেন। শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ তরুণ যুবক মাত্র হয়েও অনেক ব্যাপারে মহামানবের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ের জোর, বিশেষ করে তার সাহস, মহামানবের মতো। তার অকপটতাও অসাধারণ—শ্রীকান্তের মতে, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের মতে, তার সেই অসাধারণ অকপটতা তাকে এক পরমাশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী করেছিল। শ্রীকান্ত তাতে কোনো ত্রুটি দেখেনি—দেখা অসম্ভব ছিল; শরৎচন্দ্রও যেন তাতে কোনো ত্রুটি দেখেন নি। কিন্তু তার যে ছবি আমরা পাচ্ছি তা থেকে বোঝা যায় আসলে সে একটি অ-সাধারণ বা অদ্ভুত চরিত্র—তার এক অংশ অসাধারণ ভাবে বিকশিত, অপর অংশ অসাধারণ ভাবে অবিকশিত। সে অল্প বয়সেই এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করে যায়—খ্যাতনামা কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের ধারণা, সন্ন্যাসী হয়ে সে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিল। কিন্তু তার পক্ষে তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধ গুহায় প্রবেশ লাভ অথবা অকালমৃত্যু লাভও কম স্বাভাবিক নয়। শ্রীকান্ত তাকে নিজের চাইতে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ বলে জানতো। কিন্তু শ্রীকান্ত যেমন ইন্দ্রনাথ থেকে এবং আরো বহু জনের কাছ থেকে বহু ভাবে প্রেরণা লাভ করে নিজের অন্তর্জীবন সমৃদ্ধ করেছিল সে শক্তি যে ইন্দ্রনাথের ছিল না, এইটি ছিল তার বিকাশের পথে বড় অন্তরায়। মহৎ পরিণতির মূলে একই সঙ্গে সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায় হৃদয়-শক্তি আর বিকাশশীল মস্তিষ্ক-শক্তি।

অন্নদা একটি অসাধারণ চরিত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে শ্রীকান্ত যে পতিব্রতা-শিরোমণিরূপে দেখেছে সেখানে একটু বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে। তার অমন স্বামীকে সত্যই সে ভালবাসতো, তার নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় অবশ্য আমরা পাই। কিন্তু কি ধরণের সেই ভালবাসা? যাকে বলা হয় 'অন্ধ' প্রেম তা কি তাই? অন্নদার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, দায়িত্ববোধও অসাধারণ। তার স্বামী তার বিধবা বোনের প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে হত্যা করে পালিয়েছিল। এমন স্বামীর প্রতি 'অন্ধ'ভালবাসা যদি এক সময়ে তার থেকেও থাকে তবু তা পরে যথেষ্ট বদলে না যাওয়া অস্বাভাবিক—অমানবিক। স্বামীর এই কাজে যে অন্নদা মর্মাহত হয়েছিল সে কথা সে নিজেই বলেছে। তাহলে পাতিব্রত্যের এখানে অর্থ কি? স্বামীর কাজের কোনো বিচার না করে তার অনুবর্তন, শ্রদ্ধায় ও কর্তব্যবোধে, সেটি তো এখানে সম্ভবপর হয়নি। অন্নদা নিজে বলেছে,—স্বামী যখন জাত দিলেন তারও সেই সঙ্গে জাত গেল, স্ত্রী সহধর্মিণী বই ত নয়। এর উপর আছে জন্মান্তর সম্বন্ধে তার দৃঢ় সংস্কার। অর্থাৎ, অদৃষ্টের বিধান বা ভগবৎ-বিধান বলেই অন্নদা তার জীবনের এত বড় বিপর্যয় মেনে নিয়েছিল—সেইটি মনে হয় তার মুখ্য ভাবনা, তারই অনুগত হয়েছিল স্বামীর অনুগমন—স্বামীরও প্রতি তার সীমাহীন ক্ষমা ও করুণা—মাতা যেমন অসীম মমতায় সহ্য করে সন্তানের শত অত্যাচার, অনেকটা সেই ধরণের ব্যাপার। কিন্তু একে সোজাসুজি পাতিব্রত্য নাম দিয়ে এর চেহারা ঝাপসা করে ফেলা হয়েছে, প্রকাশ তেমন করা হয়নি। এ সম্বন্ধে শ্রীকান্ত হয়তো কিছু সচেতন হয়েছিল অভয়ার এই কথায়:

সংসারে সব নর-নারী এক ছাঁচে তৈরী নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না।

শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে আমরা শেষে আলোচনা করবো।

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে খুব চোখে পড়বার মতো চরিত্র হচ্ছে অভয়া ; এক হিসাবে শরৎ-সাহিত্যে সে অনন্যা। তার কিছু সাদৃশ্য কমলের সঙ্গে। কিন্তু কমল নামে ও ভাষায় বাঙালী হলেও মেজাজে জাতীয়তাবর্জিত। কিন্তু অভয়া বাঙালী হিন্দুর মেয়ে, তার সেই সামাজিক পরিচয় মুছে ফেলে অন্য সমাজে সে যাবে না এই তার সংকল্প আর সেই সমাজে থেকেই সে তার স্বাভাবিক অধিকার দাবি করছে যা তার সমাজ অন্যায় ভাবে তাকে অস্বীকার করছে। কি অধিকার সে চায় ? সে বলছে :

আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে ফলে ভরে উঠে সার্থক হত শ্রীকান্ত বাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেড়ানোই কি আমার নারীজন্মের সব চেয়ে বড় সাধনা ? রোহিণী বাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন ? তাঁর ভালবাসা ত আপনি দেখে গেছেন ? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই ; এমন লোকের সমস্ত জীবনটাকে পঙ্গু করে দিয়ে আমি আর সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্ত বাবু ! একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামি-স্ত্রী উভয়ের কাছে স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকে জোর করে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া করে রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব ? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন তিনি কি তাতেই খুসি হবেন ? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুসি বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মলাভ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না ; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যেতে পারবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের মত বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। না হলে তারা একেবারে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে।

শ্রীকান্তের সংস্কারে বাধলেও সে অভয়ার এই দাবীর যাথার্থ্য সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার না করে পারলো না। তার উক্তি এই :

···সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকালের জন্য মনে হইল, সেই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমনিই বটে। সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব ; যেন ইহাদের রক্ত মাংস আছে ; যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর। মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিও না।

বলা বাহুল্য, এ স্বীকৃতি শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতি। চিরাচরিত সংস্কার শরৎচন্দ্রের মধ্যে কম প্রবল ছিল না—তাঁর রচনায় তার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু তিনি মানুষটি আসলে ছিলেন দরদী—প্রেমিক—বিশেষ করে যারা বঞ্চিত যারা অত্যাচারিত তাদের ব্যথায় তিনি ছিলেন একান্ত ব্যথিত। তাঁর অভয়া আর গফুর জোলা তাঁর সেই গভীর ব্যথার অপূর্ব সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর সেই ব্যথা অত্যন্ত সত্য বলেই এরা এমন প্রাণবন্ত হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে যে অন্তরে অন্তরে এদের দাবীর সত্যতা স্বীকার না করে আমরা পারছি না—মুখে ওজর আপত্তি জানাবার দিনও যে এত শীগগির ফুরিয়ে যাবে এ আমরা ভাবিনি।

তৃতীয় পর্বে বিশিষ্ট সৃষ্টি হচ্ছে বজ্রানন্দ আর সুনন্দা। বজ্রানন্দ সন্ন্যাসী, কিন্তু সন্ন্যাসী সে মাত্র এই ব্যাপারে যে সে গেরুয়াধারী আর স্ত্রীত্যাগী, সন্ন্যাসীর জপতপ গাম্ভীর্য যেন তার ত্রিসীমানায়ও নেই—সব সময়ে তার হাসি-খুশী ভাব, আর ভাল খাবার পেলে সে রীতিমত আনন্দিত হয়। কিন্তু তবু সবার প্রিয় এই সন্ন্যাসীটি বাস্তবিকই মোহবর্জিত। অন্ত মোহ তার তো নেইই, স্নেহও তাকে বাঁধতে পারে না। রাজলক্ষ্মী তাকে ছোট ভায়ের মতো ভালবাসে, তাকে ছেড়ে দিতে তার চোখে জল আসে। বজ্রানন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হেসে বলে, "আশ্চর্য এই বাংলা দেশটা। এর পথে ঘাটে মা বোন, সাধ্য কি এদের এড়িয়ে যাই।" কিন্তু চমৎকার এড়িয়েও সে যায়, গিয়ে "ছোটলোকদের" সেবায়, তাদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে ডুবে যায়। আবার সচ্ছন্দে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যায়। বজ্রানন্দ যেন এক অপূর্ব যৌবনের মূর্তি—সে-যৌবন পূর্ণবিকশিত, কিন্তু তার সৌন্দর্য বাড়িয়েছে সহজ আনন্দ, অলোভ আর অমত্ততা, আর তার বীর্যের পরিচয় অশ্রান্ত শুভ সাধনায়। সন্ন্যাসী এমন মন কাড়তে পারে—সাহিত্যে এটি বিরল।

সুনন্দাকে তার স্রষ্টা অপূর্ব রূপলাবণ্য দিয়ে সৃষ্টি করে আবার নিজেই তার প্রতি অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করেছেন। অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করবার মতো কিছু ত্রুটি তাতে রয়েছে, তবু তার লাবণ্য অপূর্ব। আমরা সেই দিকেই চাইবো, তার স্রষ্টার অপ্রসন্নতাকে তেমন আমল দেব না।

সুনন্দার বড়-জা কুশারী-গৃহিণীকে রাজলক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত বেশী পছন্দ করলো, বলা যেতে পারে এ পক্ষপাত শরৎচন্দ্রেরই। সুনন্দার বড়-জার মতো স্নেহে মমতায় ভরপুর নারী যেমন আমাদের সমাজে তেমনি আমাদের সাহিত্যে বেশ চোখে পড়ে—সে আমাদের সৌভাগ্য ; কিন্তু সুনন্দার মতো তীক্ষ্ণ-নৈতিকবোধ-সম্পন্না নারী 'লাখে না মিলয়ে এক'। অবশ্য তার এই অপূর্ব আত্মিক সম্পদের সঙ্গে মিশেছে শাস্ত্র-নির্দেশিত কৃচ্ছ্রসাধনার দিকে তার কিছু নেশা—সে নেশা রাজলক্ষ্মীকে কিছুদিনের জন্য পেয়ে বসলো আর শেষে তা কেটে যাবার পর রাজলক্ষ্মী সুনন্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হলো। কিন্তু

সুনন্দার নৈতিক চেতনা তার চরিত্রে যে অপূর্ব দৃঢ়তা দিয়েছে তার শুভ ফলও তার সমস্ত পরিবেশে আমরা দেখতে পাই—সুনন্দার সংকল্পের দৃঢ়তা ভিন্ন কুশারী মশাইয়ের মতি যে সুপথে যেত না তা যথার্থ। ওই দিকটায় রাজলক্ষ্মী ও শরৎচন্দ্র কম তাকিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের আঁকা ছবির দাম যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মতামতের চাইতে আরো বেশী দিচ্ছি, আমাদের ধারণা, শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মূল্যায়নে এই রীতি অবলম্বন না করে উপায় নেই। তাঁর ভিতরে স্পষ্ট সুবিরোধ রয়েছে, সে জন্যে তাঁর মতামত সম্বন্ধে আমাদের সব সময়েই একটু বেশী হুঁসিয়ার হতে হবে। কিন্তু বাস্তবকে দেখবার অদ্ভুত চোখ ছিল তাঁর, সে জন্য তাঁর আঁকা ছবির অনেক মূল্য—অসার্থক বা কম চিত্তাকর্ষক সে সব যেন হতেই পারে না।

চতুর্থ পর্বের বিশিষ্ট চরিত্র গহর ও কমললতা। গহর পল্লীকবি—শ্রীকান্তের বাল্যবন্ধু। লেখাপড়া সে সামান্যই জানে; কিন্তু ছেলেবেলায় কবিতার লেখা তাকে পেয়ে বসেছিল, সে সংকল্প করেছিল রামায়ণের কাহিনী নিয়ে কাব্য লিখে কৃত্তিবাসকে হারিয়ে দেবে—সে নেশা তার আর কাটেনি। বারো বৎসর ধরে সে তার কাব্য সাধনা করে চলেছে, কত যে লিখেছে তার অন্ত নেই। শ্রীকান্তকে দিন সাতেক ধরে তার কাব্য শুনতে হলো। শুনে নিঃশ্বাস ফেলে সে নিজের মনে বললে—'এ সব কোন কাজে লাগবে।' শুধু এই ভেবে সে একটু সান্ত্বনা পেল—লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন গন্ধহীন কত ফুল ফুটে আপনি শুকোয়; বিশ্ববিধানে যদি সে সবে কোনো সার্থকতা থাকে তবে গহরের সাধনাও ব্যর্থ নয়।

এই ক্ষ্যাপাটে পল্লীকবি কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে একেবারে খাঁটি সোনা। সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ আমাদের মুগ্ধ করেছে—অন্তরের দিক দিয়ে গহরও তারই মতো নির্লোভ আর সুন্দর। তার বাবা প্রচুর ধনসম্পত্তি রেখে গেছে, কিন্তু তার মন ধনের দিকে যায়ই না। তার পিতামহ ছিল ফকির—বাউল গান আর রামপ্রসাদী গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াতো, সেই পথচারী ফকিরের সে যথার্থ সন্তান। শ্রীকান্তকে সে বললে—"তোর কাজ কি বর্মায় গিয়ে। আমাদের দুজনেরই আপনার বলতে কেউ নেই, আয় না দু'ভায়ে এখানেই এক সঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিই।" আর একদিন সে বললে, "বাবা অনেক টাকা রেখে গেছে সে আমার কাজে লাগলো না—কিন্তু তোদের (শ্রীকান্ত ও তার ভাবী স্ত্রীর) হয়ত কাজে লেগে যাবে।"

গহরের পিতামাতা অনেক দিন হলো গত হয়েছে, স্ত্রীও মারা গেছে। কিন্তু তার বাড়ীর পাশে মুরারিপুরের আখড়ার কমললতা বৈষ্ণবীকে সে অত্যন্ত ভালবেসে ফেলেছে। কমললতা তাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু এত ভালবাসলেও গহর কখনো মুখ ফুটে তাকে কিছুই বলে না। তার এই গভীর ভালবাসা এক গভীর নীরব আত্মনিবেদন।

অল্প দিনেই তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো। মঠের লোকদের আপত্তি সত্ত্বেও কমললতা একান্ত যত্নে তার সেবা করলো। মৃত্যুর পূর্বে গহর তার সম্পত্তি নানাভাবে দান করে গেলো, কমললতার জন্যও কিছু দিয়ে গেল—যদি সে নেয়।

গহরের নির্লোভতা, বিশেষ করে তার চরিত্রের আশ্চর্য ঋজুতায় আমাদের সবারই চিত্ত গভীরভাবে স্পর্শ করে। শ্রীকান্তর কথাই আমাদের মনে পড়ে: লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন গন্ধহীন কত ফুল ফুটে আপনি শুকোয়।

কমললতা বৈষ্ণবী দেখতে কুৎসিত নয়, সুন্দরীও তেমন নয়; কিন্তু সে গহরকে মুগ্ধ করলো। তার গ্লানিময় ও দুঃখময় জীবনের কাহিনী সে একদিন অকপটে শ্রীকান্তকে বললো। কমললতা নিজের জীবনের সব গ্লানি অকপটে শ্রীকান্তের সামনে মেলে ধরেছে শুনে রাজলক্ষ্মীও নিজের জীবনের সব কথা বলে মনের ভার হালকা করলো। কিন্তু এই বয়সেই কমলতা অনেক দাগা পেয়েছিল, তাই নতুন করে আর কোনো বাঁধন স্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এক সময় সে শ্রীকান্তকে ডেকেছিল বৃন্দাবন যাত্রায় তার সঙ্গী হতে, কিন্তু শেষে সত্যই যখন তাকে মুরারিপুরের আখড়া ছেড়ে যেতে হয়েছিল আখড়ার কর্তাব্যক্তিদের বিধানে (কেন না সে সহরের বাড়ী গিয়ে তার অসুখের সময়ে সেবা করেছিল) তখন শ্রীকান্তকে সে বলেছিলো:

> আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, নির্ভয় হও। আমার জন্য তুমি ভেবে ভেবে আর মন খারাপ করো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

কমললতার ঘরের মায়া ঘুচে গিয়েছিল—বিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা তাকে এক অপার্থিব আনন্দের সন্ধান দিয়েছিল। তার স্বভাবের এই অবন্ধনের মাধুর্যই শ্রীকান্তের ভিতরকার ভবঘুরেকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিল।

তার চরিত্রের তেমন মূল্য ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেননি, কিন্তু মোহিতলাল তাকে অমূল্য জ্ঞান করেছেন—তিনি তাতে দেখেছেন অপূর্ব আধ্যাত্মিক সম্পদ। আমাদের মনে হয়েছে এই দুই মতের মাঝামাঝি জায়গায় কমললতার সত্যকার স্থান। তাকে কোনো বৈষ্ণব রসতত্ত্বের প্রতিমূর্তি জ্ঞান করলে আমরা তার বিশিষ্ট মানবিক রূপটি হারাবো। সে আমাদের মনকে সত্যই আকৃষ্ট করে, তার অকপটতা নির্লোভতা ও অবন্ধনের ভাবের সঙ্গে সে একান্ত স্নেহময়ী—এই সব সেই আকর্ষণের মূলে।

শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্র যদি নিজেকে চিত্রিত করে থাকেন তবে বুঝতে হবে শরৎচন্দ্রের পরিণত জীবন তাতে প্রতিফলিত হয়েছে, কেন না, তিনি নিজে বলেছেন, নব যৌবনে তাঁকে এমন অনেক কিছু করতে হয়েছিল যাকে ভাল বলা যায় না। কিন্তু শ্রীকান্তে তেমন মন্দ কিছুর চিহ্ন নেই। উপন্যাসের মধ্যে শ্রীকান্তর ভূমিকা মোটের উপর দর্শকের ভূমিকা—অবশ্য সেই দর্শক যেমন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন তেমনি তীক্ষ্ণ-ন্যায়-অন্যায় বোধযুক্ত। যাকে সাধারণত কাজ বলা হয়। অর্থাৎ টাকা পয়সা আদি রোজগার তাতে তাকে কিছু দিনের জন্য ব্যাপৃত দেখি মাত্র বর্মায়। কিন্তু আসলে এই দর্শক হওয়াও শ্রীকান্তের জন্য হয়েছে এক বড় কাজ। ন্যায়-অন্যায় বোধ সজাগ রেখে আর বিশেষ করে তার অতিশয় সজাগ দুটি চোখের সাহায্যে সে প্রধানত মানুষের ভিতরে আর কখনো কখনো প্রকৃতির ভিতরে যে সব অপূর্ব সম্পদের সাক্ষাৎ পেলো, তাতে তার জীবন তো সার্থক হলোই, পাঠকরাও বুঝলো এমন দেখাই অসাধারণ কাজ—জীবন-সাধনা।

এই অসাধারণ দর্শকের জীবনে একটি সত্যও দেখা দিলো পিয়ারী বাঈজীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের কাল থেকে। শ্রীকান্ত গান বাজনা কিছু জানতো (শরৎচন্দ্রও জানতেন) জমিদারের তাঁবুতে পিয়ারীর গান তার বেশ ভাল লাগলো। কিন্তু

শাগ.গিরই পিয়ারী কিছু খোঁচা দিয়েই তাকে বললো জমিদারের মোসাহেবি ত্যাগ করে অন্য কোনো ভাল পথ দেখতে। শ্রীকান্ত বিরক্ত হলো, কিন্তু শাগ.গিরই জানলো পিয়ারী তার ছেলেবেলার পরিচিতা রাজলক্ষ্মী—যে পাঠশালায় সে সরদারপোড়ো ছিল সেই পাঠশালায় রাজলক্ষ্মীও পড়তো। আর তার মার খেতো, কিন্তু মুখ বুজে তাকে পাকা বৈঁচি ফলের মালা যোগাতো। সেদিনে ম্যালেরিয়ায় ভুগে রাজলক্ষ্মীর পেটটা ছিল হাঁড়ির মতো, হাত-পা কাঠির মতো, আর চুলগুলো যেন তামার শলা। সেই রোগা মেয়েটি শ্রীকান্তকে যে ভালবাসতো শ্রীকান্ত তা স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু দেখা গেল রাজলক্ষ্মীর জীবনে বহু ওলটপালট ঘটে গেছে, আজ সে অতুল রূপ-লাবণ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারিণী পাটনার বিখ্যাত পিয়ারী বাঈজী। কিন্তু এতো পরিবর্তনের মধ্যেও ছেলেবেলার সেই ভালবাসার দীপশিখা তার অন্তরে নেবেনি, বরং শ্রীকান্তের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হবার ফলে তা যেন নতুন তেজে জ্বলে উঠলো।

রাজলক্ষ্মীর গভীর প্রেম শ্রীকান্তকে স্পর্শ করলো। কিন্তু তাতে সে একই সঙ্গে হলো বিস্মিত লজ্জিত আর আনন্দিত। এতদিন তার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা ছিল তার অন্নদা-দিদি—সন্ন্যাসিনী, পরমপবিত্রা। প্রেম বলতেও সে বুঝতো তারই মতো একনিষ্ঠ পবিত্র প্রেম। কিন্তু আজ কি না তার লাভ হলো এক পতিতার প্রেম এবং তা সে প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। নিজের দশার সে এই বর্ণনা দিয়েছে :

আমি টের পাইয়াছি, মানুষ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই নিজের সমস্ত পরিচয় পায় না। সে যা নয় তাই বলিয়া নিজেকে জানিয়া রাখে এবং বাহিরে প্রচার করিয়া শুধু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে; এবং যে দণ্ড ইহাতে দিতে হয়, তা নিতান্ত লঘুও নয়। ···আমি ত নিজে জানি আমি কোন্ নারীর আদর্শে এতদিন কি কথা 'প্রিচ' করিয়া বেড়াইয়াছি। সুতরাং আজ আমার এ দুর্গতির ইতিহাসে লোকে যখন বলিবে, শ্রীকান্তটা হম্‌বগ—হিপোক্রিট, তখন আমাকে চুপ করিয়াই শুনিতে হইবে। অথচ হিপোক্রিট্ আমি ছিলাম না; হম্‌বগ করা আমার স্বভাব নয়। আমার অপরাধ শুধু এই যে আমার মধ্যে যে দুর্বলতা আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া তাহারই মত আর একটা দুর্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া, একেবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিস্ময়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; কিন্তু যাও বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাও জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার একেবারে ঠাঁই নাই; কিন্তু পুলক যে হৃদয়ের কানায়-কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে! লোকসান যা হয় তা হোক, হৃদয় যে ইহাকে ত্যাগ করিতে চাহে না!

শাগ.গিরই জমিদারের তাঁবু থেকে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী অর্থাৎ পিয়ারী বাঈজী দুজনই চলে গেল—রাজলক্ষ্মী গেল পাটনায়, শ্রীকান্ত গেল গ্রামে তার বাড়ীতে। এর পর শ্রীকান্তর কিছুদিন কাটলো এক সন্ন্যাসীর দলে। সেখান থেকে অসুস্থ হয়ে সে রাজলক্ষ্মীর শরণ নিলো। রাজলক্ষ্মীর একান্ত যত্নে মরণাপন্ন অসুখ থেকে সে সেরে উঠ্‌লো।· রাজলক্ষ্মীর এক আত্মীয়ের পুত্র রাজলক্ষ্মীর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখছিল। সে তাকে মা বলতো। সে তরুণ যুবক, সম্প্রতি এন্ট্রান্স পাশ করেছে। সে কি মনে করবে এই ভেবে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বাড়ী যেতে বললো। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর এই আচরণের অর্থ বুঝলো। তাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে সে বললে :

বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়। ছোট-খাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ এক পদও নড়াইতে পারিত।

এর পর শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে এলো চাকরির খোঁজে বর্মায় যাবার সংকল্প নিয়ে। রাজলক্ষ্মী বললে, "আমি অনেক ভেবে দেখলুম, তোমার অত দূরদেশে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।" শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কথায় সম্মত হলো না। রাজলক্ষ্মী বললে, "তার টাকা পয়সা যা আছে তা কি কোনোদিন শ্রীকান্তর কাজে লাগতে পারে না?" শ্রীকান্ত বললে, "না, কোনো দিন না।" রাজলক্ষ্মী তাকে আর একটি কঠিন প্রশ্ন করলে, "পুরুষ মানুষ যত মন্দই হয়ে থাক, ভাল হতে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে অভাবে পড়ে একদিন যা করেছি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন?" রাজলক্ষ্মী সব ছেড়ে ছুড়ে শ্রীকান্তর সঙ্গে বর্মায় যেতে চাইলে। শ্রীকান্ত বললে, "তোমাকে সঙ্গে নিতে পারিনে বটে, কিন্তু যখন ডাকবে, তখনি ফিরে আসব। যেখানেই থাকি চিরদিন আমি তোমারই থাকব রাজলক্ষ্মী!"

বর্মা থেকে শ্রীকান্ত অভয়ার কথা রাজলক্ষ্মীকে লিখলো। উত্তরে রাজলক্ষ্মী লিখলো···"তিনি (অভয়া) বয়সে আমার ছোট কি বড়, জানি না, জানার আবশ্যকও নেই; তিনি শুদ্ধমাত্র তাঁর তেজের দ্বারা আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য।"

বর্মা থেকে ফিরে শ্রীকান্ত দেখলে রাজলক্ষ্মীর ভিতরে বেশ একটি পরিবর্তন ঘটেছে—সে যেন অনেকখানি গৃহস্থজীবন ও সন্তানের জন্য কাঙাল হয়ে উঠেছে। শ্রীকান্ত বুঝলো অভয়ার প্রভাব তার উপরে পড়েছে। রাজলক্ষ্মীকে সে বললে : "লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি করে?" রাজলক্ষ্মী চায় না যে শ্রীকান্ত সম্ভ্রম ত্যাগ করে। কিন্তু সে বললে, "তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদেরই সম্ভ্রম আছে, আমাদের নেই? আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তোমাদের জন্যই কত শত-সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধূলোর মত ফেলে দিয়েছে সে কথা তুমি জাননা বটে, কিন্তু আমি জানি।" শ্রীকান্ত বাড়ী ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লো। সংবাদ পেয়ে সেই গ্রামেই রাজলক্ষ্মী এসে হাজির হলো যদিও এক সময়ে তার মা সেখানে রাষ্ট্র করেছিল রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়েছে। শ্রীকান্ত গ্রামবৃদ্ধদের সামনে রাজলক্ষ্মীর কুণ্ঠা দেখে বললে, "তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেছ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী?"

শ্রীকান্তর কঠিন ম্যালেরিয়া হয়েছিল। হাওয়া বদলের জন্য তাকে নিয়ে রাজলক্ষ্মী গেল সাঁইথিয়ার কাছে গঙ্গামাটিতে বাস করতে। এর পূর্বেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। এইবার সে নিজেকে বললে, "যে পিয়ারীকে তুমি

জানতে না, সে জানার বাহিরেই তোমার পড়িয়া থাক্। কিন্তু যে রাজলক্ষ্মী একদিন তোমারই ছিল, আজ তাহাকেই তুমি সকল চিত্ত দিয়া গ্রহণ কর এবং যাঁহার হাত দিয়া সংসারের সকল সার্থকতা নিরন্তর ঝরিতেছে ইহারও শেষ সার্থকতা তাঁহারই হাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও।" কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ভিতরে এক নতুন সংগ্রাম চলেছিল। এর পূর্বেই সে একজন গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিল, গঙ্গামাটিতে শাস্ত্রজ্ঞা সুনন্দাও তাকে কৃচ্ছ্রসাধনার নতুন মন্ত্র দিলে। এর ফলে অলক্ষিত ভাবে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে যেন এক দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হলো। শ্রীকান্ত বর্মায় ফেরার সংকল্প নিয়ে গ্রামে ফিরলো, রাজলক্ষ্মী গেল পশ্চিমে। বর্মা যাত্রা করবার আগে শ্রীকান্ত একবার কাশীতে গেল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে, রাজলক্ষ্মী তাই বলে দিয়েছিল। গিয়ে দেখল রাজলক্ষ্মী থান কাপড় পরেছে, তার মাথার অমন সুন্দর চুল সব কেটে ফেলেছে।

দেশে ফিরে এসে শ্রীকান্তর এক বিয়ে জুটে গেল, জোটালেন তার বাবার মাতুল তাঁর বড় শ্যালিকার নাতনীর সঙ্গে। তাঁদের কথা ঠেলে ফেলা শ্রীকান্তর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো। সে রাজলক্ষ্মীর মত চেয়ে পাঠালো। রাজলক্ষ্মী লিখলো:

> ভেবেছিলুম জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে,—তাকে নির্মল আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আজ তার উৎসই যদি যায় শুকিয়ে ত থাকলো আমার জপ-তপ পূজা-অর্চনা, থাকলো সুনন্দা, থাকলো আমার গুরুদেব। স্বেচ্ছায় মরণ আমি চাইনে। কিন্তু আমাকে অপমান করার ফন্দি যদি করে থাক, সে বুদ্ধি ত্যাগ করো। তুমি দিলে বিষ আমি নেব, কিন্তু ও নিতে পারবো না।···

পাত্রীটির পাত্র জুটিয়ে দিয়ে শ্রীকান্ত গেল তার বাল্যবন্ধু গহরের বাড়ীতে। অদূরে মুরারিপুরের আখড়া—সেই আখড়ায় কমললতা বৈষ্ণবীর সঙ্গে তার পরিচয় হলো। কমললতার পরিচয় আমরা পেয়েছি, শ্রীকান্ত তার দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিল সেকথাও জেনেছি। কিন্তু এই মুগ্ধ হওয়া কি ধরণের? শ্রীকান্তর মধ্যে একটি ভবঘুরে ভাব ছিল, সে মুগ্ধ হয়েছিল কমললতার ভিতরকার বাঁধনহারাকে দেখে, এই আমাদের মনে হয়েছে। 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় বলছে:

> যে ভালবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দু'টোই আমি চাই।

কমললতার প্রতি শ্রীকান্তর ভালবাসা সেই ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকা, জাতীয় ভালবাসা, তাই গ্রন্থের শেষে বিদায় নিয়ে যাওয়ার কালে কমললতা যখন শ্রীকান্তকে বললো:

> আমি জানি আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদ-পদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্ম ভেবে আর তুমি মন খারাপ করো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

তার উত্তরে শ্রীকান্ত বললে:

> তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার বলে আর তোমাকে অসম্মান করবো না।

মোহিত বাবুর মতে শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তর মিলন ঘটেনি, সে-মিলন ঘটেছিল কমললতার সঙ্গে। উপরে শ্রীকান্তের যে উক্তি আমরা উদ্ধৃত করলাম—আর এইটি গ্রন্থে তার শেষ উক্তি—সেটি স্পষ্ট ভাবেই তাঁর সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। এ ভিন্ন শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বেই রাজলক্ষ্মী বলছে:

> ···আর আমিও তোমার জীবনে সত্যি করে এসেছিলুম, যাবার আগে সেই আসার চিহ্ন রেখে যাব না? অমনি নিষ্ফলা চলে যাব? কিছুতেই তা আমি হতে দেবো না।

শ্রীকান্তও কমললতা ও রাজলক্ষ্মী দুজনকে তার মনে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ভাবছে:

> জানি সে (কমললতা) পালাই পালাই করিতেছে। হেতু জানি না তবু মনে সন্দেহ নাই মুরারিপুর আশ্রমে দিন তাহার প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। হয়ত একদিন এই খবরটাই অকস্মাৎ আসিয়া পৌঁছিবে। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশাহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সকল শুভ-চিন্তায় অবিশ্রাম কর্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ ছায়া; করুণায় মমতায় হৃদয়-যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমে সর্বব্যাপী মহিমায় আমার চিত্তলোকে সে যে-আসনে অধিষ্ঠিত তাহার তুলনা করিতে পারি এমন কিছুই জানিনা।

রাজলক্ষ্মীর জীবনে মিলন এলো বহু বিড়ম্বনার ভিতর দিয়ে। সেই সব বিড়ম্বনাকে কেউ কেউ ট্র্যাজিডির মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবিকই তা দেওয়া যায় না, কেননা রাজলক্ষ্মীর কাহিনী শেষ পর্যন্ত মিলনাত্মক। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে মিলনের পথে শ্রীকান্তকেও বহু বাধার সম্মুখীন হতে হলো। সে-সবের মধ্যে তার নিজের সম্ভ্রমবোধের বাধাই সব চাইতে বড়। কিন্তু সে বাধা সে বহু দ্বিধার পরে জয় করতে পারলো পবিত্রতার দিকে সুন্দর জীবনের দিকে রাজলক্ষ্মীর অশ্রান্ত গতি দেখে—সে-গতি অর্থহীন করেছিল তার এক সময়ের ক্রটি-বিচ্যুতি।

ছোটখাটো ঘটনা ও চরিত্র বলতে আমরা যে সবের ইঙ্গিত করেছি সে সব এতই পরিচিত যে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা না করলেও পাঠকদের কাছে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা নাই। তবে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ-দম্পতি, বিশেষ করে ব্রাহ্মণী সম্বন্ধে আলোচনার কিছু প্রয়োজন আছে। উল্টা-পাল্টা ব্যবহার-যুক্ত অদ্ভুত চরিত্র শরৎচন্দ্র আরো ঢের এঁকেছেন, কিন্তু এই অগ্রদানী ব্রাহ্মণী সে সবের মধ্যে মিশে যায় না তার মহার্ঘ হৃদয়-সম্পদের গুণে। দারিদ্র্য, আর সমাজের অবোধ আর নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার, স্বামীর নির্বুদ্ধিতা, এসব তাকে এতখানি ধৈর্য্যহীন করেছে যে বিশিষ্ট অতিথির অপমানকর কথা তার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে যায়; কিন্তু নিজের ভুল তার বুঝতে দেরী হয় না; তখনো কোনো নাটকীয় আচরণ তাতে প্রকাশ পায় না। প্রকাশ পায় গ্রাম্য সমাজের স্বাভাবিক ভদ্রতা, অথচ ভিতরে ভিতরে নিজের আচরণের জন্ম সে যে দুঃখিত, কিছু লজ্জিতও, এটিও অপ্রকাশিত থাকে না। বাংলার এক কোণে এই একটি বহু-সংস্কারে আচ্ছন্ন সাধারণ মেয়ে ধরণে-ধারণে প্রাদেশিক

ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ ও সমবেদনা তাকে করে তুলেছে সার্বভৌমিকও। কিন্তু বিরাজ-বৌ-এর বিরাজের চোখ বিশেষ সংস্কারের দিকেই, তাই প্রাদেশিকতা তার ঘুচলো না। যে-সব চরিত্র অত্যন্ত প্রাদেশিক তারাই কেমন করে সার্বভৌমিক হয়ে ওঠে প্রাক-বিপ্লব রুষ-সাহিত্যে তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শরৎচন্দ্রকে আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি এক সময়ে ভেবেছিলেন দুর্নীতির প্রচারক। এর পরই সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমাদের করতে হবে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের যে পরিচয় আমরা পেলাম তাতে দেখা যাচ্ছে—আসলে তিনি সুনীতি, সদাচার, পবিত্রতা প্রেম ও শ্রদ্ধার-বন্ধনে-বদ্ধ দাম্পত্য-জীবন, এ সবেরই প্রচারক। অবশ্য সকলের উপরে তিনি মানবদরদী, দুঃস্থ ও অত্যাচারিতদের জন্য তাঁর বেদনা যেন সীমাহীন—যারা ভুল করে অথবা অবস্থার চক্রে বিপথে পা বাড়িয়ে সমাজের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েছে তাদেরও তিনি জানেন দুঃস্থ ও অত্যাচারিত বলেই।

স্বীকার করতেই হবে, তাঁর এই মনোভাব অতি শ্রদ্ধেয় মনোভাব, সভ্য ও বিচারসম্মত জীবনের জন্য যাকে বলা যায় irreducible minimum তাই। দেশ চলেছেও সেই irreducible minimum-কে স্বীকৃতি দেবার পথে।

কিন্তু তাঁর এই অসাধারণ গুণের সঙ্গে অনেক ত্রুটিও যে যুক্ত, তারও কিছু কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি—সে সবের মধ্যে খুব চোখে পড়বার মত হচ্ছে বিচার আর ভাবালুতা এই দুয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর দোল খাওয়া। তাঁর রচনার একটা উল্লেখযোগ্য অংশের বিশেষ আবেদন বাঙালী পাঠকদেরই কাছে, এও আমরা দেখেছি। কিন্তু মানুষের জন্য আর সত্যের জন্য তাঁর অকৃত্রিম প্রেম যে শেষ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয় নাই, আর অসাধারণ তাঁর অঙ্কন-ক্ষমতা—এতে তাঁর প্রতিভা এক মহৎ মর্যাদারই অধিকারী হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তিনি অবিস্মরণীয়—বৃহত্তর জগতেও সমাদৃত হবার মতো সম্পদ তাঁর রচনায় রয়েছে, এ কথা কালে কালে আরো স্বীকৃত হবে, এই আমাদের ধারণা।

সমাপ্ত

দীর্ঘায়ু লাভ করতে হলে

ফ্রান্সের ভিটেলে 'দীর্ঘজীবন কংগ্রেস'-এ যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রের চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞগণ দীর্ঘায়ু লাভের নয়টি মূল্যবান সূত্র বা পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন। উহারা যথাক্রমে—(১) ৫০ বৎসর বয়স হয়ে গেলেই সুস্থ থাকলেও বিশেষজ্ঞ দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্র (হার্ট) পরীক্ষা করে নিতে হবে। (২) গুরুতর অসুখ থেকে আরোগ্য লাভের ছয় মাস পর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলেও চিকিৎসক দ্বারা আর একবার পরীক্ষা করে নিতে হবে—উদ্দেশ্য, সেই ব্যাধির কোন কুফল বা দাগ শরীরের কোথাও লুকিয়ে থাকল কি না সে-টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। (৩) এক জন সুদক্ষ পারিবারিক চিকিৎসক নির্ব্বাচিত করা এবং তাঁর উপর পুরোপুরি আস্থা রেখে চলা। জন্মাবধি সমস্ত তথ্য বা বিবরণ সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ ভাবে জানা থাকলে আরও ভাল। (৪) দীর্ঘজীবন লাভের প্রশ্নে একটি সবচেয়ে বড় কথা—সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বমুহূর্ত্তে মানসিক শান্তি ও স্থৈর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখা। (৫) ৫০ বৎসর বয়স অবধি কঠোর শ্রমে অভ্যস্ত থাকলে পঞ্চাশোর্দ্ধেও শ্রম করে যেতে হবে। তবে একটি জিনিষ স্মরণ রাখা দরকার—পেশার সঙ্গে সামর্থ্যের ঐক্য গড়ে উঠা চাই। (৬) জীবনপথে অনেকটা অগ্রসর হয়েও দীর্ঘায়ুর জন্য সচেষ্ট হওয়া যাবে—এইরূপ ধারণা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সোজা কথায় তরুণ বয়সেই দীর্ঘজীবনের মজবুত ভিৎ গড়ে তোলা আবশ্যক। (৭) হাওয়া বদল বা স্থান পরিবর্ত্তন করলেই দীর্ঘায়ু অর্জ্জন সম্ভব, এই ধরণের ধারণাও পোষণ করলে হবে না। (৮) পরিবারের অনেকেই দীর্ঘজীবন পেয়েছেন, সুতরাং নিজের ক্ষেত্রেও সেইটি না হয়ে পারে না বা হবেই, এইরূপ বিশ্বাস মনে স্থান দেওয়াও অনুচিত। (৯) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধ্যান-ধারণা মিলিয়ে সুস্থ ও সুন্দর জীবন-যাত্রার জন্য প্রথম থেকেই সক্রিয় মনোযোগ নিবদ্ধ করা চাই।

[পুর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

খাতাটা যখন শেষ করলেন তালুকদার, এই পাতাগুলোর মধ্যে যে মেয়েটি ছড়িয়ে আছে, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা হল। অনেক দিন ধরেই তো দেখে আসছেন। নানা অবস্থার মধ্যে তার বিচিত্র পরিচয়ও কম পাননি। তবু, একদিন যাকে দেখেছেন, আর আজ যাকে দেখবেন, তারা দুটি আলাদা মানুষ, তাদের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। অতীত জীবনের মধ্যে মানুষের যে পরিচয়, সেটা যেমন সত্য নয়, তেমনি অতীতকে বাদ দিয়েও সে অপূর্ণাঙ্গ। দেবতোষ হয়তো তা স্বীকার করবে না। সে বলে, মানুষের আসল রূপ যদি জানতে চান, সেটা তার নিজের মধ্যেই পাবেন, তার ইতিহাসের মধ্যে নয়। তার অতীতের চেয়ে বড় বর্তমান এবং তার চেয়েও বড় তার ভবিষ্যৎ। সে কি ছিল তা দিয়ে আমার কাজ নেই, সে কি এবং কি হতে পারে, তারই মধ্যে তাকে খুঁজতে চাই।

কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু ছবিকে বিচার করতে হলে যেমন তার পটভূমিকে বাদ দেওয়া যায় না, তেমনি মানুষের পরিপূর্ণ রূপ পেতে হলে তাকেও দাঁড় করাতে হবে তার বিগত জীবনের কাঠামোর উপর। একদিন যে-হেনাকে দেখে এসেছেন তালুকদার, সে শুধু নিরাভরণ রেখাচিত্র; এবার যে এসে দাঁড়াল তার চোখের সুমুখে, সে একটি বহুবর্ণ-রঞ্জিত নিপুণ শিল্প-সৃষ্টি।

দেখা হওয়ার অন্য প্রয়োজনও ছিল। হেনা সেই জাতের মেয়ে, যারা ফাঁকি দিয়ে কিছুই পেতে চায় না। অন্যের দয়া বা অনুকম্পার উপর তার লোভ নেই। এই কারাপ্রাচীরের মধ্যে বসেও নারী-জীবনের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে অনায়াসে পেয়েছিল, তার দিকেও সে হাত বাড়ায়নি। বুক ফেটে গেছে, তবু শ্বাস রুদ্ধ করে বলেছে, আমার সবটুকু না জেনে যা দিতে চাইছ, সেটা আমার প্রাপ্য নয়। ও তুমি ফিরিয়ে নাও। খাতাটা তার হাতে দেবার আগে মহেশকেও সে ঐ কথাই বলে গেছে—যে কাজের ভার আমাকে দিতে চাইছেন, পেলে আমি ধন্য হবো। কিন্তু তার আগে আমার সব কথা শুনুন, শুনে বিচার করুন, সে অধিকার আমার আছে কি না।

সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন। তারই জন্যে হয় তো সে অপেক্ষা করে আছে।

তালুকদার স্থির করলেন, কালই তাকে ডেকে পাঠাবেন। ঠিক সেই সময়ে ডাক খুলতে গিয়ে পেলেন দেবতোষের চিঠি। অন্যান্য কথার পর লিখেছেন—ডাক্তার—ছুটি যে অফুরন্ত নয়, সে কথা ভুলতে বসেছিলাম। সরকার দয়া করে দিন চারেক আগে সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে আমাকে চালান করেছেন রাঙামাটির জঙ্গলে। সেখানে একটা বাড়তি রোজগার অর্থাৎ ভাতার ব্যবস্থা আছে তারও উল্লেখ আছে হুকুমনামায়। আমি কিন্তু ভাতার লোভ এবং রাঙামাটির রঙীন মায়া দুটোই ত্যাগ করে এই কালো মাটি আঁকড়ে থাকাই স্থির করলাম। আপনি হয়তো বলবেন, ওটা নেহাৎ মাটি খাওয়ার কাজ হল। কি করবো দাদা, চাকরি-ভাগ্য আমার কোষ্ঠিতে নেই। তাই বলে এখানেও যে একটা কিছু করে তুলবার আয়োজন করবো, মনের মধ্যে সে জোরও পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার সেই ভ্রমণ তালিকাটা এবার সুরু করে দিই। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে মাকে নিয়ে। সঙ্গে যেতেও নারাজ, একা থাকতেও ইচ্ছা নেই। আমাকে নিয়ে বড্ড বেশী ভাবছেন, এবং সেই জন্যে আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছেন।

বেলঘরিয়ার খবর ভালো। শান্তি সেরে উঠেছে এবং যথারীতি কাজ-কর্ম চালাচ্ছে। মা মাঝে মাঝে যান। আপনাকে একবার আসতে বলছেন। না; ওখানে কোনো সমস্যা নেই। আপাততঃ ওঁর এক মাত্র সমস্যা বোধ হয় আমি। কবে আসছেন ?

বীরু নীরুকে দেখে এসেছি। ওরা ভালো আছে। সুলোচনা দেবীর দুশ্চিন্তার কারণ তালুকদার অনুমান করলেন। দেবতোষের চিঠির প্রতি ছত্রেও তার সমর্থন পাওয়া গেল। ডাক্তারের জল খাবার পর থেকে ঘটনাস্রোত যে পথ ধরেছে, তার সঙ্গে তিনিও অনেকখানি জড়িয়ে পড়েছেন। নির্লিপ্ত দর্শক হয়ে বসে থাকবার দিন আর নেই। আর দেরি না করে পরদিনই কলকাতা রওনা হলেন। হেনার সঙ্গে দেখা হবার আগে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা বোধ হয় দু দিক থেকেই প্রয়োজন।

এই চিঠির কয়েক দিন আগের ঘটনা। গভীর রাতে সুলোচনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশের ঘরটা দেবতোষের। মাঝখানের দরজা ভেজানো থাকে। ছেলে ঘুমিয়ে থাকলে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। সুলোচনা কান পেতে রইলেন। কোনো শব্দ পেলেন না। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন। ভেজানো দরজা খুলে দেখলেন, বিছানা খালি। বুকখানা কেঁপে উঠল! বাইরে বেরোতেই চোখে পড়ল অন্ধকার বারান্দার কোণের দিকে একটা ক্যাম্প চেয়ারে চুপ করে পড়ে আছেন দেবতোষ। মা কাছে যেতেই চমকে উঠলেন—কে ?

—আমি।

—তুমি এখনো ঘুমোওনি ?

সুলোচনা সে কথার জবাব দিলেন না। সস্নেহ মৃদু কণ্ঠে বললেন, তোর কি হয়েছে, দেবু! আমাকে খুলে বল।

—কই, কিছুই তো হয়নি মা! এমনিই, ঘুম আসছিল না তাই।

—মার কাছে মিছে কথা বলতে নেই দেবতোষ, গম্ভীর সুরে বললেন সুলোচনা। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। সিক্ত কণ্ঠে বললেন, তুই তো জানিস, বাবা, তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই। যা হয়েছে বল। আমার কাছে লজ্জা করিসনে।

দেবতোষ কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে বললেন, সে কথা জেনে কোনো লাভ নেই, মা! তা ছাড়া তোমাকে হয়তো ঠিক বোঝাতে পারবো না। মাঝখান থেকে তুমি শুধু কষ্ট পাবে।

মা আর পীড়াপীড়ি না করে বললেন, আমাকে না বলিস মহেশকে সব বলতে পারবি তো ?

—তিনি সব জানেন।

দেবতোষ বাড়ি ছিলেন না। সুলোচনার ঘরে বসে তাঁরই মুখ থেকে এই কাহিনীটুকু সমস্ত মন দিয়ে শুনছিলেন তালুকদার। শোনবার পর বললেন, হ্যাঁ, মা! আমি সবই জানি, এবং বলবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছি।

তবে—

সুলোচনা একটু যেন ক্ষুণ্ণ সুরে বললেন, এ বিষয়ে আমার মন তো তোমার অজানা নেই, মহেশ! তবে আর ইতস্তত করছ কেন ?

—না, মা! কিছুদিন আগে হলেও হয়তো দ্বিধা করতাম। কিন্তু আজ আপনার কাছে আমার কোনো কুণ্ঠা নেই। সে মেয়েটিকে আমি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে জানি।

সুলোচনা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তাহলে আমাকে নিয়ে চল বাবা! আমি দেখে আশীর্বাদ করে আসি।

মহেশ মুহূর্তকাল ওঁর আগ্রহাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেখানে আপনি যেতে পারেন না, মা!

—কেন ? অনেক দূরে বুঝি ? তা হোক—

—না, বেশী দূরে নয়, আমারই কাছে, মানে আমার জেলখানায়।

সুলোচনার মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন নিচের দিকে। তারপর মুখ তুলে বললেন, জেল-এ থাকলেই যে তাকে ঘরে আনা যায় না, আজ আর সে ভুল আমার নেই, মহেশ! তুমিই সেটা ভেঙে দিয়েছ। তবু বহু পুরুষের সংস্কার। কত জায়গায় যে টান পড়ে। তাছাড়া আমি একা নই। দেবতোষ শুধু আমার ছেলে নয়, বনেদী জমিদার-বংশের সন্তান। তাদের আজ কিছুই নেই; কিন্তু বংশ-মর্যাদার দম্ভটা এখনো ছাড়তে পারেনি। তাই ভাবছি—

—সেই কথা ভেবেই আমি ইতস্ততঃ করছিলাম, আপনার কথা ভেবে নয়। আপনাকে তো আমি চিনি। চিনি বলেই আজ সেই আশ্চর্য মেয়েটির সমস্ত কাহিনী আপনার কাছে বলতে এসেছি। সে-ও চায়, তার সবটুকু নিয়ে যে পরিচয় তাই সবাই জানুক। এই কথা বলেই সে দেবতোষকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

—ফিরিয়ে দিয়েছে! সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন সুলোচনা।

—হ্যাঁ, মা! কিন্তু কেন দিয়েছে, কোথায় তার বাধা, সে কথাও আপনাকে বলবো।

হেমন্তের ছোট বেলা শেষ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। হঠাৎ বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সুলোচনা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। তুমি একটু বসো বাবা! আমি চট করে সন্ধ্যেটা দিয়ে আসি।—বলেই বেরিয়ে গেলেন ঠাকুরঘরের দিকে।

গৃহদেবতার আসনের পাশে ঘিয়ের প্রদীপ জেলে দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন সুলোচনা। অন্যদিনের মত আজও তার অন্তরে জেগে উঠল একটি মাত্র প্রার্থনা, আমার দেবতোষের মঙ্গল হোক। সে যেন কোনো দুঃখ না পায়।

একটু পরেই যখন ফিরে এলেন, মহেশের চোখে পড়ল মায়ের মুখের উপর যে উদ্বেগের রেখা ফুটে উঠেছিল, সে সব মিলিয়ে গেছে। স্নিগ্ধ চোখ দুটিতে ভেসে রয়েছে একটি পরম নির্ভরতার জ্যোতি, তার সঙ্গে মেশানো গভীর ঔৎসুক্যের ছায়া।

তালুকদার সুরু করলেন, সেই রাত থেকে যেদিন প্রথম একটি অচেনা মেয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল মারাত্মক যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষার আবেদন নিয়ে। ডাক্তার দেবতোষের আপত্তি টিকল না। তারপর ধীরে ধীরে কেমন করে তারা এগিয়ে এল একে অন্যের কাছাকাছি, এবং শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলেন দেবতোষ। তারপর জানালেন, যে কাহিনী সে লিখে গেছে আত্মপ্রচারের জন্যে, আত্মপ্রকাশের জন্যে। মহেশের কণ্ঠ যখন থেমে গেল, তার পরেও অনেকক্ষণ যেন সম্মোহিত হয়ে বসে রইলেন সুলোচনা। কাছাকাছি কোথায় পেটা-ঘণ্টার শব্দ কানে যেতেই চমকে উঠলেন, ক'টা বাজল ?

ইস! অনেক রাত হয়েছে তো? দেবু এখনো এল না!

মহেশ হেসে বললেন, দেবু অনেকক্ষণ এসেছে, মা! আমাদের সামনে দিয়েই গেছে তার ঘরে।

সুলোচনা মনে মনে লজ্জিত হলেন। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, তোমরা হাত-মুখ ধুয়ে এসো, বাবা! খাবার আমার তৈরি আছে। শুধু একটু গরম করে দেবো।

পরদিন সকালে উঠে বেলঘরিয়া যাবার আয়োজন করছিলেন তালুকদার। সুলোচনা বাইরে থেকে ডাকলেন, মহেশ!

—মা! সাড়া দিয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

—তেনাকে তোমরা ছাড়বে কবে ?

—ওর খালাসের জন্য আমরা সুপারিশ করে পাঠিয়েছি। যে কোনো দিন মঞ্জুর হয়ে আসতে পারে।

সেই দিনই আমাকে টেলিগ্রাম করো। তোমার ওখানে গিয়েই আশীর্বাদ করে আসবো।

বিস্ময়াবিষ্ট চোখ দুটো তুলে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন তালুকদার। উত্তর দেবার কথাটাও বোধ হয় মনে পড়ল না। সুলোচনা ক্ষণকাল অপেক্ষা করে মৃদু হেসে বললেন, তুমি বোধ হয় খুব অবাক হয়ে গেছ? অবাক হবার কথাই বটে।

আস্তে আস্তে তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। অনুনয়ের সুরে বললেন, কাল প্রথম দিকে কিছু না জেনে এই মেয়েটির সম্বন্ধে আমার মনে যে দ্বিধা দেখা দিয়েছিল, তার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করো বাবা!

—ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কি বলছেন মা! এতে যে আমার

স্নানের সময়
মনে
রাখবেন
একশ' বছরের
ঐতিহ্য,
বিশুদ্ধতা এবং
অপরিবর্ত্তিত
গুণগুলির জন্য
আজও সমাদৃত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

অপরাধ হয়। বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সুলোচনার পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন তালুকদার। তার পর বললেন, এ আমি জানতাম মা। মেয়েটা যত বড় অপরাধই করে থাক, আপনার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে না। কিন্তু সে জন্যে আমার বাড়িতে আপনাকে যেতে হবে কেন? ওকেই আমি আপনার পায়ের কাছে নিয়ে আসবো।

—না, বাবা! ওর আর কেউ না থাক, তুমি তো আছ। বিয়ের আগেই শ্বশুরের ভিটেয় পা দেবে, এতখানি অনাথ সে হতে যাবে কেন?

—আর বলতে হবে না মা! আমিই সব ব্যবস্থা করবো।

খাতাটা জেলর সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে নিজের সেল-এ ফিরে হেনার সেদিন মনে হল তার বুকের উপর থেকে একটা গুরু ভারও সেই সঙ্গে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। অনেক দিন পরে ভারী হালকা মনে হল নিজেকে। সংসারের কাছে সে সুবিচার পায়নি। এক দিকে পেয়েছে অসঙ্গত লাঞ্ছনা আর অন্যায় প্রবঞ্চনা, আর এক দিকে অন্ধ স্নেহ এবং অহেতুক অনুগ্রহ। কোনোটাই তার ন্যায্য পাওনা নয়। আদালতের কাছেও সে সুবিচার চেয়েছিল, পেয়েছে দয়া। এই কারাজীবনের অন্তরালে তার নিভৃত অন্তরের দুয়ারে যার দেখা মিলল, তিনিও তাকে একান্ত করে চাইলেন, কিন্তু জেনে নিতে চাইলেন না। কেবল একটি মাত্র মানুষ তাকে তুচ্ছও করেন নি, মিথ্যা মূল্যও দেননি। এই পাঁচিল-ঘেরা স্বল্প-পরিসর গণ্ডীটুকুর মধ্যেই শুধু দেখেন নি, দেখতে চেয়েছেন তার সমগ্র জীবনের বিস্তৃত আঙ্গিনায়। এটা কেবল তার বেলাতেই নয়। এখানকার প্রতিটি অধিবাসীকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেন, তার মধ্যে এক দিকে গভীর সংবেদন, আর এক দিকে সূক্ষ্ম বিচারবোধ। অপরাধীকে ক্ষমার চোখে দেখলেও, অপরাধকে ক্ষমা করেন না। কর্ত্তব্যে দৃঢ় কিন্তু মমতায় কোমল এই মানুষটির প্রতি হেনার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। তাই তাঁর একটি মাত্র কথায় নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে সে নিঃসঙ্কোচে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

হেনা আশা করেছিল, তার সব কথা জানবার পর জেলর সাহেব তাকে ডেকে পাঠাবেন। স্পষ্ট ভাবে বলে দেবেন, কোথায় কতটুকু তার প্রাপ্য, কতখানি তার অধিকার। কিন্তু দু দিন চার দিন করে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল, ডাক এল না। তারপর একদিন শুনল, তিনি বাইরে চলে গেছেন। তবে কি খাতাটা তিনি পড়েন নি? কিংবা পড়ে স্থির করেছেন, যে কাজ তাকে দিতে চেয়েছিলেন, সে তার যোগ্য নয়? হেনার ভয় হল, এই মানুষটির উদার অন্তরের একটি কোণে যে স্থানটুকু সে পেয়েছিল, তাও বুঝি তার হারিয়ে গেল! ধরে দাঁড়াবার মত আর কিছুই রইল না। অথচ, কিছুক্ষণ আগেই সে দৃঢ়কণ্ঠে বলে গেছে, আমি যা করেছি, এবং করিনি, তারই বলে যা আমার পাওনা, তার বেশী আমার কোনো দাবী নেই।

এমনিই হয়ে থাকে। হেনার দোষ নেই। এরই নাম মানুষের মন। অন্যের অন্তরের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে দুর্নিবার কামনা, তার থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়। শুধু নিজের মধ্যে তার যে কাম্য, তাতে তার মন ভরে না। নিজের বাইরেও তার অধিকার বিস্তারের প্রয়োজন। তাই সে কারো কাছে চায় স্নেহ প্রীতি, কারো কাছে প্রেম, কারো কাছে শ্রদ্ধা সম্মান, কারো কাছে আনুগত্য! এমন সময় আসে যখন প্রতিবেশীর হিংসা দ্বেষ এবং বৈরিতাও তাকে তৃপ্তি দেয়। তবু তো কিছু পেলাম। মানুষের কাছে সব চেয়ে দুঃসহ তার প্রতি অপরের ঔদাসীন্য।

রবিবার। কাজ বন্ধ। কিন্তু উলের ক্লাসের দুটি নতুন মেয়েকে তালিম দিতে গিয়ে সমস্ত সকাল হেনাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। খেয়ে-দেয়ে একখানা বই নিয়ে বসেছিল। নানা এলোমেলো চিন্তায় তাতেও মন দিতে পারেনি। কমলাকে ডেকে পাঠাবে কি না ভাবছে, এমন সময় সুশীলা এসে বলল বইটই রেখে একটু ঘুমিয়ে নে দিদিন। ঠিক চারটা বাজলেই আবার যেতে হবে আফিসে।

—আফিসে কেন? জিজ্ঞাসা করল হেনা।

—জেলর সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন।

হেনার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—ফিরে এসেছেন তিনি?

—আজ সকালেই ফিরেছেন।

সুশীলা চলে যেতেই হেনার মনের মধ্যে আবার জেগে উঠল সেই আশঙ্কার ছায়া। কি জানি কি বলবেন তিনি! বইখানা বন্ধ করে একটু গড়িয়ে নেবার আয়োজন করছে, সেল্-এর সামনে হঠাৎ কমলাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, আয়। একটু আগেই তোর কথা ভাবছিলাম।

কমলা অনেকখানি সেরে উঠেছে। চোখে-মুখে ঝলমল করছে নতুন ফিরে-পাওয়া স্বাস্থ্য। তার উপর মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে টানা চোখ দুটো আর একটু টেনে বলল, সত্যি? ভাগ্যিস ব্যাটাছেলে নই? তাহলে তো এখনি গলে জল হয়ে যেতাম!

—ভালোই হত। আমিও ঝাঁট দিয়ে নর্দমায় নামিয়ে দিতাম।

—উল্টো বললে দিদি! ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে নর্দমা দিয়ে গড়িয়েই তো এসেছিলাম এখানে। তুমিই প্রথম তুলে নিলে দুহাত দিয়ে।

—আমি?

—তাছাড়া আর কে? যাক সে সব কথা। তোমাকে একটা নতুন জিনিষ দেখাতে এলাম।

—কি, দেখি?

—এই নাও। বলে বুকের ভিতর থেকে বের করে দিল একটা খাম।

হেনা হাত না বাড়িয়েই বলল, কার চিঠি?

—আমার।

—কে লিখেছে?

পড়েই দ্যাখো না?

খামখানা খুলে সকলের নিচে নামটায় চোখ পড়তেই উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল হেনা, সনৎ লিখেছে!

—হুঁ; কিন্তু অতো খুসী হচ্ছ যা ভেবে, তা নয়।

কয়েক লাইনের চিঠি। উপরে কলকাতার একটা ঠিকানা। লিখেছে—

'কমল, এতদিন তোমাকে চিঠি লিখিনি। কোন্ দুঃখেই বা লিখবো? অনেক দূরে ছিলাম। যখন ফিরলাম, তখন আর কিছুই করবার নেই। জেলের আফিসে চিঠি লিখে জেনেছি,

তোমার বেরোতে আর পাঁচ-ছ' মাস বাকী। ঠিক তারিখটা খালাস পাবার মাসখানেক আগে জানা যাবে। তুমিও জানতে পারবে। সে দিনটা সময় মত আমাকে জানাতে ভুলো না। সরকার মশাই জেল-গেটে উপস্থিত থাকবেন। তার পরের যা কিছু ব্যবস্থা, সব ভার তাকে দেওয়া রইল।

তোমারই সনৎ।'

পড়া শেষ করে হেনা ধীরে ধীরে ভাঁজ করল কাগজখানা। খামে ভরে বিছানার পাশে রেখে দিয়ে নিঃশব্দে তাকাল কমলার মুখের দিকে।

—আমি তো কারো অনুগ্রহ-ভিক্ষা করছিনে, বেশ খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল কমলা, তবে তার কিসের দায়?

—ভালবাসার দায়, মুখ টিপে হেসে বলল হেনা।

—তুমি আর জ্বালিও না, বাপু!

হেনা কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, একটি বার যদি দেখা হত আমার সঙ্গে? ভারী ভীরু ছেলেটা।

কমলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, ভীরু মানে?

—দেখতে পাচ্ছিস না, কী রকম ছটফট করে মরছে? অথচ মুখ ফুটে বলতে পাচ্ছে না, কমল, তুমি আমার কাছে চলে এসো। কি এক তুচ্ছ সংস্কারের বাধা প্রতিবারেই ওর বুক চেপে ধরছে। ঝেড়ে ফেলবে, সে সাহসটুকু নেই।

—তুমি যাকে তুচ্ছ সংস্কার বলছ, হয়তো সেইটাই ওর কাছে সব চেয়ে বড়।

তা হতে পারে না, কমলা! ভালবাসার চেয়ে বড় কিছুই নেই।

—সে কথা কি তোমার মুখে সাজে হেনাদি'?

হেনা চমকে উঠল। এত স্পষ্ট, যে কমলার চোখ এড়াতে পারল না। সেই দিকে চেয়ে আবার বলল কমলা, সে বাধা তো তুমিও কাটিয়ে উঠতে পারনি?

—আমি যে মেয়েমানুষ রে! ওরা পুরুষ। আমরা যা পারি না, ওরা তা সহজেই পারে। দেখা হলে এই কথাটাই শুধু ওকে মনে করিয়ে দিতাম। ওর চিঠির কি উত্তর দিতে চাস?

—উত্তর আবার কি দেবো?

—তা হয় না, কমলা!

—বেশ, তাহলে একটা ধন্যবাদ পাঠিয়ে দিয়ে বলবো আমার পথ আমিই বেছে নিতে পারবো।

—সে পথটা কি শুনি?

—অমন একজন ভগিনীপতি থাকতে আমার আবার পথের ভাবনা কিসের? তুমি জানো না বুঝি, ভদ্রলোক তিন চার বার এই জেলগেটে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছেন! তাতেই মনে হয়, ফিরে গিয়ে দিদির সতীন হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করবার ভরসা এখনো আছে। মা-ও নিশ্চিন্ত হয়, আর দিদিও তার বছর বছর আঁতুড়ঘরে যাবার দায়টা বোনের ঘাড়ে চাপিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

—তোর মুখে কি কিছুই বাধে না, কমলা? ব্যথিত কণ্ঠে বলল হেনা।

—কি করবো দিদি! যে ভালবাসা শুধু দায়, শুধু অনুগ্রহ, ভালো ভালো কথা দিয়ে ভুলিয়ে দূর থেকে শুধু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা, তার চেয়ে আমার ঐ নরক শতগুণে ভাল। ঐখানেই আমি ফিরে যাবো।

—না; সেটা কিছুতেই হবে না। আমি তোকে যেতে দেবো না।

—তুমি! সে জোর তোমার ছিল দিদি, কিন্তু তুমি তা ইচ্ছে করেই হারিয়েছ। তুমিও আজ আমারই মত অসহায়।

—আমরা কেউ অসহায় নই, কমলা! ওটা তোর ভুল। মেয়েমানুষ হলেও আমরা মানুষ। আমাদেরও হাত-পা আছে। তারই ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি, চলতে পারি। না; এটা শুধু কেতাবে লেখা ফাঁকা কথা নয়, এর মধ্যে ভরসা আছে, এবং সে ভরসা দিয়েছেন এমন একজন যাকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি।

—সে শ্রদ্ধা বজায় রেখেই বলবো, মেয়েদের তিনি শুধু মানুষ বলে দেখেছেন, মেয়েমানুষ বলে দেখেন নি। তিনি হয়তো জানেন না, তাদের ঐ হাত-পা-এর জোর আসে শুধু একটা জায়গা থেকে। ঐ একটি মাত্র খুঁটি, যা না পেলে, শুধু ফাঁকা মাঠে চরে বেড়ানোই সার। পথও নেই, আশ্রয়ও নেই।

সেল-এর বাইরে সুশীলার গলা শোনা গেল—কি বকতেই পারে ছুটোতে!

সামনে এসে হেনাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আর আধ ঘণ্টা পরেই যেতে হবে কিন্তু। দেরি হলে বাবুদের ভিড় লেগে যাবে।

—কিচ্ছু দেরি হবে না, মাসীমা! এই দেখুন না, আমি পাঁচ মিনিটে তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

—তোমার তৈরি হওয়া যে কি, তা কি আমি জানি না? ঐ রকম এলোচুলে গেলে আমি কখখনো নিয়ে যাবো না, বলে দিচ্ছি। ওর চুলটা ভালো করে বেঁধে দে তো, কমলা!

বলেই, হন হন করে চলে গেল জমাদারণী। কেমন জব্দ! বলে কমলা চুল বাঁধতে বসল। আর বিশেষ কিছু কথাবার্তা হল না। উঠবার আগে চিঠিখানা ওর হাতে দিয়ে বলল হেনা, উত্তর এখন থাক। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু লিখিস না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।

রবিবার হলেও চারটা বাজবার আগেই জেলর বাবু অফিসে এসে পড়লেন, এবং তার কয়েক মিনিট পরেই সুশীলার পেছনে হেনা এসে দাঁড়াল তাঁর দরজার সামনে। সুশীলা যথারীতি সেলাম করে চলে গেল। একটা টুল দেখিয়ে হেনাকে বসতে বললেন তালুকদার। হাতের কাজটা সেরে নিয়ে বললেন, সুশীলা বলছিল, তুমি আমার খোঁজ করছিলে। কি ব্যাপার বলতো?

হেনা সলজ্জ কণ্ঠে বলল, কিছু না, এমনিই। আপনি বুঝি সরকারী কাজে বাইরে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ; তবে কাজটা সরকারী নয়, আমার নিজের। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

জেলর সাহেবের মা আছেন, কখনো শোনেনি হেনা। সাগ্রহে চোখ তুলে তাকাল। সেটা লক্ষ্য করে বললেন তালুকদার, আমার ঠিক নিজের মা নয়, দেবতোষের মা। তবে আমিও তাঁকে মা বলেই জানি।

হেনা নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে নিল। তালুকদার বললেন, সে কথা পরে হবে। তার আগে তোমাকে একটা দরকারী খবর দেবো। কোলকাতায় আমাদের হেড অফিস থেকে জেনে এলাম, গভর্ণমেণ্ট তোমার খালাস মঞ্জুর করেছেন। হয়তো দু-চার দিনের মধ্যেই তোমাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারবো।

হেনার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। চোখে ফুটে উঠল শঙ্কিত এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টি—খালাস পেয়ে কোথায় যাবে সে? তালুকদার বোধ হয় বুঝতে পারলেন তার চোখের ভাষা। মৃদু হেসে বললেন, ছেড়ে দিলেও একেবারে ছাড়া পাবে না। তার পরের প্ল্যানও আমরা স্থির করে ফেলেছি।

হেনার কণ্ঠে সাহস ফিরে এল। বলল, আমাকে যে আপনার কাজে লাগিয়ে দেবেন, বলেছিলেন?

—তা আর হল কৈ? সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সে কাজের ভার তোমায় দেওয়া হবে না।

—হবে না! নিরাশ সুরে বলল হেনা।

—না; কিন্তু তুমি যা ভাবছ সে জন্যে নয়। অন্য কারণ আছে।

—কী কারণ? রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল হেনা।

তার কারণ, হেনার মুখের দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন তালুকদার, দেবত্তোর আজও তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

হেনার মুখের উপর ফুটে উঠল বেদনার ম্লান ছায়া। মাথাটা নুইয়ে পড়ল মাটির দিকে।

তালুকদার গভীর সুরে বললেন, শুধু তাই নয়। তার চেয়েও বড় কথা, মা তোমাকে চান।

যেন তড়িৎ-স্পর্শে সহসা মাথা তুলে হেনা বলে উঠল, কিন্তু, তিনি তো আমার কোনো কথাই জানেন না?

—জানেন। আমার কাছ থেকে সব কিছুই তিনি শুনেছেন। ড্রয়ার খুলে একখানা ভাঁজকরা কাগজ বের করে বললেন, সব শুনেই আমার হাত দিয়ে তোমাকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। এই নাও তাঁর চিঠি।

হেনার হাত কাঁপছিল। কোনো রকমে চিঠিখানা নিয়ে খুলে ফেলল। কয়েকটি মাত্র লাইন।

'সুচরিতাসু,

মা হেনা, তোমাকে কোনো দিন দেখি নাই, তবু মনে হইতেছে, তোমার পবিত্র সুন্দর মুখখানা যেন আমার চোখের উপর ভাসিতেছে। আমি সব শুনিয়াছি। তুমি আসিয়া আমার দেবত্তোরের ভার লও। তাহা হইলেই আমি সুখী ও নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সেই শুভদিনটির অপেক্ষায় রহিলাম। আমার মহেশই সব ব্যবস্থা করিবে।

নিত্য-আশীর্বাদিকা তোমার মা।'

চিঠি পড়া শেষ হল। তারপরেও অনেকক্ষণ তার কোনো সাড় রইল না। দু'চোখের কোণ বেয়ে গণ্ড ভাসিয়ে দিয়ে নেমে এল যে অবিরল ধারা, তাও বোধ হয় তার অজ্ঞাত রয়ে গেল। তারপর সহসা এগিয়ে গিয়ে মাথাটা লুটিয়ে দিল মহেশের পায়ের উপর।

তিনি বাধা দিলেন না, পা দুটোও টেনে নিলেন না। পরম স্নেহে ওর মাথার উপর ডান হাতখানা রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, মনে মনে আমারও এই কামনাই ছিল। এক কয়েদ থেকে ছাড়া পেয়ে আর এক কয়েদে ঢুকতে যাচ্ছ। আমিও নিশ্চিন্ত। এই নতুন কয়েদ তোমার অক্ষয় হোক। সুখী হও তোমরা। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমার আর কিছুই নেই।

কিছুক্ষণ পরে নিজের সেলটিতে যখন ফিরে এল হেনা, সমস্ত পৃথিবীর রং তার চোখে বদলে গেছে। এই দীর্ঘ-পরিচিত বাড়িগুলো, এই পাঁচিলঘেরা মাঠ, তার পাশে ঐ গাছপালা, সবগুলোর জন্যে কী এক গভীর মমতায় সমস্ত বুকখানা তার ভরে উঠল। খানিকটা দূরে হাসপাতালের পাশে ঐ নেবু-ঝোপটার দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ে গেল অনেক দিনের অনেক কথা। মধুর আবেশে চোখ দুটো বুজে এল। হঠাৎ মনে পড়ল বুড়ীর সেই শীর্ণ মুখখানা। সে আর ফিরে আসেনি। এখান থেকেই খালাস পেয়ে বাড়ি চলে গেছে। কে জানে আজ কোথায় আছে, কেমন আছে। কতক্ষণ যে তন্ময় হয়ে ছিল, জানতেও পায়েনি। চোখ খুলতেই দেখল, কমলা বিস্ময়বিষ্ট চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়া দিয়ে বলল, কী দেখছিস অমন হাঁ করে?

—দেখছি তোমাকে। সত্যি দিদি, এত সুন্দর তোমাকে কোনো দিন দেখিনি। কী হল তোমার?

—হবে আবার কী!

—না বললে ছাড়ছি নে। কী দেখলে, কী শুনে এলে বল।

হেনা বলল না কিছুই। বুকের ভিতর থেকে মায়ের চিঠিখানা শুধু তুলে দিল কমলার হাতে। অমনি কোথা থেকে একরাশ লজ্জা এসে তার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরল। দিদি! তীব্র উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল কমলা। সঙ্গে সঙ্গে ওকে বিপুল আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

দিন তিনেক পরে সকালবেলা নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ কলরবে জেগে উঠল জেনানা ফাটক। খাটনিঘর থেকে মেয়েরা ছুটে এসে জড়ো হল হেনার চারদিকে। সবারই চোখে জল! যারা একদিন তাকে নানা ভাবে আঘাত দিয়েছে, তাদেরও এক চোখে হাসি, আর এক চোখে আঁচল। নিটিং ক্লাসের মেয়েগুলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হেনার চোখ দুটোও শুষ্ক রইল না। সুশীলা মাঝে মাঝে এসে তাড়া দিয়ে চলেছে। সবার কাছ থেকে একে একে বিদায় নিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল হেনা। কেউ প্রণাম করল, কেউ দুহাতে জড়িয়ে ধরল, কেউ মাথায় হাত দিয়ে জানাল তাদের শেষ বারের আশীর্বাদ। হঠাৎ চোখে পড়ল সকলের চেয়ে দূরে কোণের দিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ফুলবাবু! তার হুকুম আসেনি। খালাস না-মঞ্জুর করেছেন সরকার। হেনা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে হাতখানা তার কাঁধের উপর রাখতেই সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আঁচল চেপে ধরল চোখের উপর। হেনা কিছুই বলতে পারল না। বলবার কী-ই বা আছে! কমলাও দাঁড়িয়ে ছিল সবার থেকে আলাদা। চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল হেনা, যা বলেছি সব মনে আছে তো? সনতের চিঠি আমার কাছেই রইল। তোকে আর জবাব দিতে হবে না। যা করবার আমিই করবো। ছাড়া পেলেই তুই সোজা আমার কাছে গিয়ে উঠবি। মাসীমাকে আর জেলর সাহেবকে সব বলে যাচ্ছি।

কমলা কিছুই বলতে পারল না। প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

মেইল ষ্টীমার 'ফ্যালকন্' বিশাল ঢেউ তুলে গোয়ালন্দ-ঘাটে এসে যখন লাগল, তার কিছুক্ষণ আগেই পদ্মার বুকে সন্ধ্যা নেমেছে। দোতলার ডেকে রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে গাছপালাহীন বিস্তীর্ণ বালির চর, তার উপরে অসংখ্য চালাঘর। কুয়াসা-মলিন অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ঢাকা পড়ে আছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস করছে রেলের এঞ্জিন। ঘণ্টা দুই পরে বহু যাত্রী নিয়ে ছুটে চলবে কলকাতার পথে। সুশীলা এবং হেনাকেও যেতে হবে সেই সঙ্গে। বেলঘরিয়ার বাড়িতেই উঠবে ওরা। তিন চার দিন পরে জেলর সাহেবও এসে পড়বেন। তারপর আশীর্বাদ, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের আয়োজন। সব হবে ঐ বাড়িতেই। শান্তি আছে, উমা আছে, আরো সব মেয়েরা আছে। তারাই সব করবে। উৎসবে, আলোকে, হাসি-কলরবে মুখর হয়ে উঠবে তাদের ঘুমন্ত গৃহাঙ্গন। গৃহ যাদের জুটল না, সংসার যাদের জঞ্জালের মত বাইরে ফেলে দিয়েছে, ক্ষণেকের তরে তারাও পাবে গৃহজীবনের স্বাদ। এই তো চেয়েছিলেন তালুকদার। এর চেয়েও অনেক বেশী তার আশা। আরও যারা পড়ে রইল তার আশ্রয়ে, জীবনের সূর্য যাদের মধ্যগগন ছেড়ে যায়নি, একে একে তারাও একদিন মনের মত ঘর-বর পেয়ে সুখী হবে, সার্থক হবে। হেনার মত তাদেরও মুখের উপর ফুটে উঠবে সলজ্জ আনন্দের রক্তিম আভা। এই তাঁর চিরকালের স্বপ্ন। আজ তিনি একা নন। এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দেবতোষ, আর এক পাশে হেনা। সবার উপরে রয়েছে মায়ের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। জীবনের অপরাহ্ণবেলায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘপ্রসারী দৃষ্টির সুমুখে যেন এক নতুন প্রভাতের অস্পষ্ট আভাস দেখতে পেলেন তালুকদার। মীরার কথা মনে পড়ল। কানে বেজে উঠল তার ক্ষীণ কণ্ঠের শেষ অনুনয়। নবীন উৎসাহে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মহেশ বাবু। এইতো সবে সুরু। বাকী পড়ে আছে অনেক পথ। কিন্তু সফল তাকে হতেই হবে। মীরার আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না।

ষ্টেশনের এক পাশে ভিড় থেকে খানিকটা দূরে জেলর সাহেবের দেওয়া নতুন ট্রাঙ্কটার উপর বসে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল হেনা। মনে পড়ছিল বাহাদুর-নগরের সেই দিনগুলো। দাদার সঙ্গে এমনি কত দিন এসে বসত আড়িয়াল খাঁর নির্জ্জন ঘাটে। এই তো সেদিনের কথা। তারপর ছুটে এল কত মেঘ, কত ঝড়, তার এই ক্ষুদ্র জীবনের সরু পথ জুড়ে জমে উঠল কত ধুলো কত আবর্জ্জনা। আজ কি সত্যিই সব কেটে গেছে? দেখা দিয়েছে নির্মল আকাশ? কি জানি কি নিয়ে আসছে তার অনাগত ভবিষ্যৎ! সহসা বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল। আজ এই আনন্দের দিনে এ তার কিসের ভয়, মনের কোণে কেন এই আশঙ্কার ছায়া!

সুশীলা সব দিকটা একবার ঘুরে এসে বলল, ওয়েটিংরুমের যা ছিরি! মা গো! ভাঙা চালাঘর; চার দিকে চাটাইয়ের বেড়া। হ্যাঁ; ইষ্টেশন যদি দেখতে হয়, বুঝলি হেনা, যাস আমাদের বরিশালের ঘাটে। কী একখানা ওয়েটিংরুম। ঢুকলেই মনে হবে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ি, আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

হেনা নিঃশব্দে হাসতে লাগল। এই বরিশাল-গরবিনীর অনেক উচ্ছ্বাস সে আগেও শুনেছে। বরিশালের চাল, সুপারী এবং কাউঠার (কচ্ছপ) নাম করতে এখনো যে তার মাসীমার রসনা সজল হয়ে ওঠে সে পরিচয়ও সে অনেক বার পেয়েছে। সুশীলা বলল, মেয়েদের ঘরটা দেখলাম একদম খালি। রাত-বিরেতে ওখানে গিয়ে কাজ নেই। পুরুষদের ঘরেই বসবি চল।

চলুন, বলে হেনাও ওঠে পড়ল।

সেখানেও বিশেষ লোকজন নেই। এক ভদ্রলোক তার স্ত্রী আর গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে নিয়ে এই মাত্র চলে গেলেন। সেই খালি বেঞ্চিটাই একটু ঝেড়ে নিয়ে হেনা বসে পড়ল। সুশীলা গেল খাবার কিনতে। ঘরের ও পাশটায় আর একখানা বেঞ্চি জুড়ে কে-একজন শুয়ে আছেন। সর্বাঙ্গ সাদা চাদরে ঢাকা। বেরিয়ে আছে চোখ আর নাকের খানিকটা মাংস। দেখেই বোঝা যায় অসুস্থ। একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল হেনা। কিছুক্ষণ পরে আবার নজর পড়তেই দেখল, সেই চোখ দুটো যেন অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভারী অস্বস্তি বোধ হল। উঠে গিয়ে এ দিকটায় পিছন ফিরে সরে দাঁড়াল জানালার ধারে। আরও খানিকটা বাদে এ দিকে ফিরতেই আবার চোখে পড়ল সেই একাগ্র দৃষ্টি। অমন করে কি দেখছে লোকটা? বাইরে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় ঘরে ঢুকল একটি ছেলে। অনেকটা তারই বয়সী হবে। ব্যস্তভাবে অসুস্থ লোকটির কাছে গিয়ে বলল, ইনভ্যালিড চেয়ার পাওয়া গেল না। একটা ষ্ট্রেচার হয়তো জোগাড় হতে পারে। পাই ভালোই, না পেলেও ক্ষতি নেই। আমরা দুজনেই আপনাকে কাঁধে করে ওপরের ডেকে তুলে দিতে পারব।

—তাই দিও, ভাই, ক্ষীণকণ্ঠে বলল লোকটি। কাঁধে চড়ার দিন তো আর বাকী নেই। রিহার্সালটা আগেই হয়ে যাক।···বলে হাসতে গিয়ে প্রবল কাশির দমক আর সামলাতে পারল না। মনে হল এখনি দম বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেটি কী করবে ভেবে না পেয়ে এদিক ওদিক করছিল, চমকে উঠল ঠিক পিঠের কাছে নারীকণ্ঠ শুনে—একটু সরুন তো। সরে যেতেই হেনা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মাটিতে হাঁটু রেখে বসে পড়ল বেঞ্চির পাশে এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বুকের কাপড় সরিয়ে নিপুণ হাতে মালিশ করে দিতে লাগল। খানিকটা কফ উঠে এসেছিল, তার সঙ্গে রক্ত। আঁচলের কোণে মুখটা মুছে নিতে গেলে প্রতিবাদ করে উঠল ভদ্রলোক, ও কী করছ; বড্ড ছোঁয়াচে রোগ, জানো না?

—জানি। আপনি চুপ করুন তো।

রোগী আর কথা বলল না; নিঃশব্দে চোখ বুজে পড়ে রইল। তখনো তার স্পন্দিত বুকের উপর হেনার কোমল আঙুলগুলো মৃদু স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। দেখতে পেল, সেই কোটরগত চক্ষু শীর্ণ মুখখানা যেন দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে জড়িয়ে আছে পরম তৃপ্তির প্রসন্নতা।

অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর বিকাশই আবার কথা বলল, যাও; এবার কাপড়টা ছেড়ে ফেল। আর দেরি করো না। নোংরা জায়গাটা বেশ করে ধুয়ে ফেল লাইজল দিয়ে।

ছেলেটির দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ওঁকে একবার নদীর ধারে নিয়ে যাও তো সুরেন। লাইজলের শিশিটা সুটকেশে খুললেই পাবে।

—আপনি আগে সুস্থ হউন; তারপর গেলেই হবে। মৃদুকণ্ঠে

বলল হেনা। গলাটা যেন ধরে গেছে, সেটা নিজের কানেও লুকানো রইল না। বিকাশ ব্যস্ত হয়ে উঠল, না না; এবার উঠে পড়। আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি।

আবছায়া চাঁদের আলোয় বালির চর ভেঙে পদ্মার দিকে যেতে যেতে সুরেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, উনি কি আপনার কোনো আত্মীয়?

—না।

ছেলেটি একটু বেশী সরল। এর পরেও প্রশ্ন করল, জানা-শুনা আছে বুঝি?

—হাঁ।

মিনিট দুই চলার পর একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল সুরেন, আত্মীয়-স্বজন বলতে ওঁর কেউ নেই। আপনি কি ওঁর সব কথা জানেন?

—না।

—কেমন করেই বা জানবেন? চিরদিনই উনি একা। সেই কোন্ ছেলেবেলায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর প্রায় সমস্ত জীবন কাটালেন বনে, জঙ্গলে, জেলে আর ইণ্টারণী ক্যাম্পে। যখন ছাড়া পেলেন, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে; মনেও আর জোর নেই। বললেন, এবার সংসারী হবো। একটি মেয়েকে ওঁর ভালো লেগেছিল। তাকে নাকি কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল আর একজনের সঙ্গে। কবে কোন্ বিপদ থেকে নাকি বাঁচিয়েছিল ওঁকে। সেইটাই হল তার দলিল। পার্টি-লীডার রায় দিয়ে বসলেন, ওকেই বিয়ে করতে হবে। টেররিষ্টদের এই ডিসিপ্লিনটাই হল চরম কথা। আপনাকে এসব বলছি বলে কিছু মনে করছেন না তো?

—না, না। আপনি বলুন; মনে করবার কী আছে?

—এই মাত্র যে দরদ দিয়ে ওঁর সেবা করতে দেখলাম, তাতেই মনে হল আপনাকে সব বলা চলে। বিকাশ দা'র মত এতবড় একটা মানুষ কোনো দিন দেখিনি, জীবনে এতখানি শ্রদ্ধাও কাউকে করিনি। যাক্ সে কথা। যা বলছিলাম। বিয়েতে উনি সুখী হলেন না। আর, সে তো মেয়ে নয়, রায়বাঘিনী। তবু প্রাণপণে তাকে সুখী করতে চেষ্টা করেছেন। সে যা চায়, কোনো দিন 'না' বলেন নি। শেষটায় বোধ হয় আর পারলেন না। সামান্য একটা চাকরি নিয়ে চলে গেলেন পাটনায়। তার কিছু দিন পরে ওঁর স্ত্রী গেল হাসপাতালে। সেইখানে থাকতেই একদিন বিষ খেয়ে মরল।

আপনার অজ্ঞাতসারে আবার চমকে উঠল হেনা। সুরেন সেটা লক্ষ্য না করে বলে চলল, কেউ কেউ বলে, বিষ সে নিজে খায়নি। তার দুর্ব্যবহারে টিঁকতে না পেরে কে নাকি খাইয়েছিল। কিন্তু বিকাশ দা' বলেন, সে আত্মহত্যা করেছিল। যাক্। সেই দিন থেকে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। দু' বছর আর খোঁজ নেই। চেনা-শোনা যাকেই জিজ্ঞেস করি, কেউ বলতে পারে না। তারপর যেদিন ফিরে এলেন, দেখে চেনা যায় না। শরীরে আর কিছু নেই। রোজ জ্বর হয়; তার সঙ্গে কাশি আর রক্ত। জিজ্ঞেস করলে চেপে যান। আমরা ক'জন জানতে পেরে জোর করে নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে। তাঁরই চেষ্টায় যাদবপুরে একটা ফ্রি বেড পাওয়া গেল। তাও কি যেতে চান? জীবনটা যেন খেলার জিনিষ! হাসেন আর বলেন, 'কী হবে সেরে উঠে। বেঁচে থাকার কোনো অর্থই খুঁজে পাই না।' একরকম ধরে-বেঁধেই ভর্তি করে দেওয়া হল। ভালোর দিকেই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কী খেয়াল হল, দেশে যাবো। দেশ মানে নারায়ণগঞ্জ থেকে মাইল দশেক দূরে এক অজ-পাড়াগাঁ। ডাক্তার কবরেজের নাম-গন্ধও নেই তিন মাইলের মধ্যে। কিন্তু কী করবো! চিরকাল দেখে এলাম, একবার জিদ ধরলে বিকাশ ঘোষকে ঠেকায় এমন সাধ্য কারো নেই।

—সেখানে ওঁর কে আছেন? এতক্ষণে প্রশ্ন করল হেনা।

—কে আর থাকবে! থাকবার মধ্যে আছে এ বুড়ী মাসী। তাকে কে দেখে তার ঠিক নেই। সে কথাও বলেছিলাম। উত্তর শুনলে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। মা মারা গেলে ঐ মাসীই নাকি ওঁকে বাঁচিয়েছিল। তাই মরবার আগে তারি কাছে ফিরে যেতে চান।

ষ্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে পদ্মার তীরে একটা নির্জন জায়গা দেখিয়ে দিয়ে সুরেন বলল, এই নিন আপনার কাপড় আর লাইজলের শিশি! আমি ঐ ঢিবিটার ওপাশে থাকবো। আপনার হয়ে গেলে ডাকবেন।

সেইখানে দাঁড়িয়ে পরিম্লান জ্যোৎস্নায় ঢাকা প্রশান্ত পদ্মার আদিগন্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে কী এক অব্যক্ত বেদনায় হেনার দু'চোখ জলে ভরে উঠল। মনে হল, তার সম্মুখে যে জীবন পড়ে আছে, সেও এমনি অস্পষ্ট, এমনি রহস্যময় আবছায়ায় ঢাকা!

কাপড় বদলাতে আর ইচ্ছা হল না। রক্তের দাগটুকু ধুয়ে নিয়ে সুরেনের সঙ্গে যখন ওয়েটিং রুমে ফিরে এল তখনো সুশীলার দেখা নেই। সুরেনের বন্ধুটি ততক্ষণে এসে গেছে এবং জিনিষপত্র বেঁধেছেঁদে যাবার আয়োজন করছে। একটু পরেই তারা বেরিয়ে গেল বোধ হয় টিকেট কিনতে। ঘরে রইল শুধু ওরা দুজন। হঠাৎ নিজের নামটা কানে যেতেই চমকে উঠল হেনা। সেই কণ্ঠ, কিন্তু অনেকখানি ক্ষীণ, অনেকখানি দুর্বল; যেন কতদূর থেকে ভেসে এল সেই বহুদিনের পুরানো ডাক। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রশান্ত মৃদুস্বরে বলল বিকাশ, আমার জন্যে অনেক দুঃখ অনেক লাঞ্ছনা তোমাকে সইতে হয়েছে, কিন্তু তার কোনোটাই আমি ইচ্ছে করে দিইনি। পার তো এই শেষ সময়ে আমাকে ক্ষমা ক'রো। একটুখানি দম নিয়ে আবার বলল, তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার এই সুযোগটুকু দেবার জন্যেই বোধ হয় বিধাতা আমাদের দেখা করিয়ে দিলেন। নইলে এর তো কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ ভারী হালকা লাগছে বুকটা। মনে হচ্ছে, এবার নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারবো।

একটা অদম্য কান্নার ঢেউ বুকের ভিতর থেকে উঠে এসে হেনার কণ্ঠ চেপে ধরল। কোনো কথাই বলা হল না। ঠিক সেই সময়ে সুরেন আর তার সঙ্গীটি এসে পড়ল একটা ষ্ট্রেচার নিয়ে। হেনা আবার জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। মিনিট কয়েকের মধ্যে ওকে একটা ছোট নমস্কার জানিয়ে সুরেন আর তার বন্ধু ধরাধরি করে বিকাশের শীর্ণ দেহটা ষ্ট্রেচারে তুলে নিয়ে চলে গেল। সেই দৃশ্য

ওয়েটিংরুমের [illegible] দাঁড়ি[illegible]

একা। এমনি করে কেটে গেল কতক্ষণ। হঠাৎ কী এক দুর্বার শক্তির টানে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। চিৎকার করে বলল, 'দাঁড়ান; আমি যাবো।' ওরা ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মুহূর্ত কাল বিহ্বল দৃষ্টি মেলে চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখল হেনা। ভিড়ের মধ্যে আবহাওয়ার মত দেখা গেল, বিকাশের দেহখানা সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরান্তরে। সেইটুকু লক্ষ্য করেই সে ছুটে চলল উর্দ্ধশ্বাসে।

বিপরীত দিক থেকে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে ব্যস্ত ভাবে ফিরছিল সুশীলা। হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, এ কী! কোথায় চলেছিস ছুটতে ছুটতে! আমাদের পথ ওদিকে নয়।

একবার থমকে দাঁড়াল হেনা। আর্ত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ মাসীমা! এই দিকেই আমার পথ। আমার ডাক এসে গেছে।

—বলছিস কী পাগলের মত! ফিরে আয়। গাড়ির সময় হয়ে গেছে।

আর ফিরবার উপায় নেই। ওঁদের বললেন। আমি চললাম। বলেই আবার চলতে সুরু করল।

—কোথায় যাচ্ছিস! কার সঙ্গে চললি? শোন—

—দেখতে পাননি? ঐ যে নিয়ে গেল। আমার শত্রু, আমার চিরদিনের শত্রু!···বলতে বলতেই আবার মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

ষ্ট্রেচারটা দেখতে পেয়েছিল সুশীলা। কিন্তু আর কিছুই বুঝতে না পেরে ডাকতে ডাকতে চলল ওর পেছনে।

জাহাজের সিঁড়ি তখন তোলা হচ্ছে। একখানা তক্তা শুধু বাকী। পারের লোকেরা সভয়ে চেয়ে দেখল, তারই উপর দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে একটি দুঃসাহসী মেয়ে। পদ্মার হাওয়ায় উড়ছে তার এলো চুল, লুটিয়ে পড়ছে আঁচল। কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। খালাসীরা চিৎকার করে উঠল দুর্বোধ্য ভাষায়। ততক্ষণে সে উঠে গেছে নিচেকার ডেকের উপরে।

সুশীলা যখন ঘাটে এসে পৌছল, তার একটু আগেই শেষ সিঁড়িখানা সরিয়ে নিয়েছে খালাসীরা। পদ্মার বুকে সফেন আলোড়ন তুলে জেগে উঠেছে জাহাজের চাকা। জমাদারণীর চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে গেল। বুক থেকে বেরিয়ে এল শুধু একটা অসহায় ডাক—হেনা···। 'ফ্যালকন'এর গম্ভীর গর্জ্জনে সে ডাক কারো কানে পৌছল না।

সমাপ্ত

রাজধানীর পথে-পথে

উমা দেবী

চৌরঙ্গীর বিনাকা খুকু

বিনাকা খুকু! সন্ধ্যেবেলা মাজন হাতে নিয়ে
কেন আছ পথে দাঁড়িয়ে?
নীল জামা আর হলদে চুলে
লাল হাতে নীল মাজন তুলে
কাঁদের তুমি অবাক হয়ে দেখছ তাকিয়ে?

মারাঠী দিদি বিনির রেশম বড্ড ভালোবাসে
লাল-জামা আর সবুজ শাড়ির রঙের আলো জ্বালায় আকাশে,
ওকেই তুমি দেখতে কি গো চাও—
দুষ্টু মেয়ে! ছটফটিয়ে কোথায় তুমি যাও?
এই যে দেখি দাঁড়িয়ে আছ—এই দেখি উধাও!
মা যে তোমার কোথায় আছে—জানতে বুঝি চাও?

যা খুশি তাই কর শুধু এইটুকু সাবধান,
পিছন পানে তাকিয়ো না কক্ষনো
দেখো না কো কারা করে আলোর তলে নীলসমুদ্রে স্নান
গোলাপ গোলাপ গায়ে তাদের নাই যে জামা কোনো—
ওদের তুমি দেখবে না কক্ষনো!

বিনাকা খুকু, শীতের রাতে দাঁড়িয়ে আছ কেন?
টুথব্রাশ আর মাজন নিয়ে কী ধরণের খেলা?
জবাব তো নাই তাকিয়ে আছ বেজায় বোকা যেন
ঘুমোতে যাও দুষ্টু খুকু, ঘুমোও তো এই বেলা!
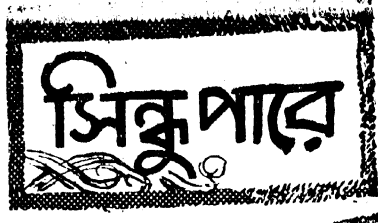
শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

এগার

দেখতে দেখতে আরও প্রায় এক মাস কেটে গেল। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। আমি সেদিন সন্ধ্যেটা ছুটি করে 'রেনবো' ক্লাবে ছিলাম।

ইতিমধ্যে বসন্ত লেগেছে এ দেশে। কি রূপ যে এ দেশটির উপর ক্রমে ফুটে উঠল—বুলা! তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। অবাক হয়ে ভেবেছি—কোথায় লুকিয়ে ছিল এ রূপ এত দিন! এত দিন এ দেশটা যেন ছিল মরে। মাঠে মাঠে ঘাসগুলোর সবুজ রংএ যেন প্রাণ ছিল না। এদিক-ওদিক যেদিকে গাছগুলো সব ছিল দাঁড়িয়ে, এক একটা মরা কাঁকলাসের মতন—ডালে পাতা ছিল না। দেশের লোকগুলোর সঙ্গে বাইরের কোনও যোগ ছিল না বললেও হয়—কোনও রকমে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে, বাইরেটাকে জীবন থেকে একেবারে দূর করে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। একটা বিরাট কালো দৈত্য যেন সমস্ত দেশটিকে গ্রাস করেছিল। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখেছি—দু'-একটি লোক যদিও বা রাস্তা দিয়ে চলে, যেন ছুটে পালায় কতক্ষণে এই দৈত্যের কবল থেকে রেহাই পাবে।

কিন্তু এলো বসন্ত। সমস্ত দেশটা যেন একটা নতুন মন্ত্রে ক্রমে উঠল জেগে! মাঠে মাঠে সবুজ ঘাসের উপর নতুন রংএর তুলি বুলিয়ে দেওয়া হল। গাছে গাছে নতুন সবুজ কচিপাতার অভিযানে গাছগুলি মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল বেঁচে। পথে-মাঠে লোকগুলো ক্রমে বেরিয়ে পড়ল বাইরের আমন্ত্রণে। জেগে উঠল সমস্ত দেশটি একটা নতুন প্রাণের স্পর্শে। কালো দৈত্যটা আর নাই—আকাশপারে বিদায় নিয়েছে। তাই বোধ হয় আকাশের রংটাও ক্রমে হয়ে উঠতে লাগল নীল।

কালো দৈত্যটা গ্রাস করেছিল বলেই বোধ হয় বিকেল চারটে বাজতে না বাজতে অন্ধকার হয়ে যেত। কিন্তু একটু একটু করে দৈত্যের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে বেলা বড় হতে সুরু হল—এখন এপ্রিলের মাঝামাঝি, অন্ধকার হতে প্রায় ন'টা বাজে।

'রেনবো' ক্লাবে টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলা সুরু হয়ে গেছে। টেনিস খেলার দিকে বরাবরই আমার অত্যন্ত ঝোঁক—দেশে থাকতেও টেনিস খেলতাম। তাই এখন বিকেল পাঁচটার পরেই 'রেনবো' ক্লাবে এসে জুটি—টেনিস খেলার লোভে।

সে সময়টা প্রায় রোজই বিকেলে ক্লাবে আসতে আমার কোনও বাধা ছিল না। তার কারণ ডাঃ নায়ার ত ছিলেনই এবং ডাঃ স্মিথ চলে গিয়ে তাঁর জায়গায় নতুন একজন ডাক্তার এসেছিলেন—ডাঃ গ্রেহাম। ডাঃ গ্রেহাম ছিলেন বিবাহিত, স্ত্রী এবং একটি শিশু কন্যা নিয়ে ডাউণ্টন হাসপাতালে এসেছিলেন এবং হাসপাতালের সংলগ্ন দু'খানি ঘর তাদের দেওয়া হয়েছিল—বসবাসের জন্য। তিনি বড় একটা ক্লাবে আসতেন না, কেন না, ফুরসুৎ পেলেই তিনি স্ত্রীকে সঙ্গ দিতেন এবং স্ত্রীটিও যদিও তরুণী, শিশু কন্যাটিকে ফেলে বেশী বেরুতে চাইতেন না। ডাঃ গ্রেহামও লোক ভাল ছিলেন। মাঝে মাঝে তার উপরও আমার কাজের ভারটুকু দিয়ে আসতে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি।

যেদিনের কথা বলছি, সেদিন ক্লাবে পর পর তিন সেট টেনিস খেলে একটু ক্লান্ত হয়ে এক পেয়ালা চা নিয়ে ক্লাবঘরের মধ্যে নয়, বাইরে বারান্দায় এক কোণে একটা চেয়ারে নিরিবিলি গিয়ে বসলাম। সামনে ছোট একটি টেবিলের উপর রাখলাম চা-এর পেয়ালাটি। ক্লাবের বাড়ীটি মোটেই বড় নয়—একখানি মাঝারি রকমের ঘর এবং তৎসংলগ্ন এক পাশে ছোট একটি বারান্দা। বারান্দাটির চারি দিকে বড় বড় কাচের জানালা, শীতকালে বন্ধই থাকে, এবং এখনও যদিও শীতের প্রকোপ খানিকটা কমেছে, তবুও এ-সব জানালা বড় একটা খোলা হয় না। বেশীর ভাগ সভ্যেরা সন্ধ্যের পর ঘরের মধ্যেই থাকে, তার কারণ ঘরের মধ্যে তাস খেলার ব্যবস্থা আছে, গল্প-গুজবের সুবিধা হয় এবং সুরাপানের জায়গাটিও ঘরের মধ্যেই। আমি যখন চা-এর পেয়ালাটি নিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং বারান্দায় অন্য কোনও লোক ছিল না। ঘরের মধ্যে দুটো উজ্জ্বল আলো—বারান্দার একটি আলো—তাও তত উজ্জ্বল নয়। যাই হোক, সে আলোটিও আমি দিলাম নিবিয়ে—বোধ হয় একান্তে নিরিবিলি চাটুকু উপভোগ করবার জন্য।

আমি যে কোণটিতে বসেছিলাম, তার পাশেই বাইরে ক্লাব ঘরের কোণের দিকে একটা চেরীগাছ ছিল—গাছের নীচে একটা বাঁধান বসবার জায়গা। চেরীগাছে ইতিমধ্যেই থোকা-থোকা চেরীফুল দেখা দিয়েছে—আমি লক্ষ্য করেছিলাম। একবার ইচ্ছে হয়েছিল—যাই চা-এর পেয়ালাটি নিয়ে চেরীগাছতলায় বসি, হবে আরও নিরিবিলি। মনে হল—একটা জানালা খুলে দিলেও হয়। আমি যে কোণটিতে বসেছিলাম—তার পাশেই জানালাটি দিলাম খুলে। যদিও ঠাণ্ডা, তবুও বাইরের বিশুদ্ধ হাওয়াটি ভালই লাগল। সেদিন বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষ—বাইরেটা অন্ধকারই ছিল। জানালাটি খুলে দিতেই চেরীগাছতলা থেকে মৃদু কথাবার্ত্তা এলো কানে। ভাবলাম—একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা অন্ধকারের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে—এ আর এদেশে নতুন কি! কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম—প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, দুটিই তরুণী। কথাবার্ত্তা যেটুকু যা কানে এলো, এবং যেটুকু আজও মনে আছে—বলি।

প্রথম তরুণী। "এত লোক তোর জন্ত পাগল, অথচ তোর কাউকেই মনে ধরে না—তুই যে কি রকম মানুষ চাস, আমি ত ভেবে পাই না!"

২য় তরুণী। "আরও একটু ভেবে দেখ না। হয়ত পেয়ে যাবি।"

১ম। "কথাটার মানে কি? ইতিমধ্যে কারো কাছে মনটা ধরা দিয়েছে নাকি?"

২য়। "হতেও বা পারে।"

১ম। "কে সেই ভাগ্যবান শুনি?"

২য় মেয়েটি একটু চাপা রকমের হাসি হেসে উঠল—বড় মিষ্টি শোনাল হাসিটি। পরে বলল, "শোন্। আমি জগতে এমন একটি মানুষ খুঁজে নিতে চাই যে তৈরী হয়েছে শুধু আমারই জন্ত।"

১ম। "সেটা বুঝবি কি করে?"

২য়। "চোখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়।"

১ম। "কি জানি! তোর কথার ভাব পাওয়া কঠিন।"

২য়। যতক্ষণ সে মানুষটিকে না পাচ্ছি, কারো কাছে ধরা দেবো না। যদি পাই, তারই বুকে নিঃশেষে ঢেলে দেবো প্রাণ।"

১ম। "যদি না পাও জীবনের আনন্দটুকুই হারালে।"

২য়। "জীবনের আনন্দ বুঝি খালি পাওয়ার মধ্যেই। তার জন্ত অপেক্ষা করার মধ্যেও আছে। তাকে পেয়ে হারাবার মধ্যেও আছে।"

১ম। "কি যে বলিস? হারাবার মধ্যে আবার আনন্দ কি?"

২য়। "হারালে তারই স্মৃতি বুকে নিয়ে জীবনটা মধুর করে তোলা যায়—তার মধ্যে আনন্দ নেই?"

১ম। "তোর এ-সব বড় বড় কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না মার্লি!"

২য় মেয়েটির কথাগুলি শুনে শুধু যে অবাক হ'লাম তাই নয়—বিশেষ মুগ্ধও হলাম। হারাবার মধ্যেও আনন্দ—একটি তরুণী মেয়ের মুখে এ সব কথা? কে এই মেয়েটি? নাম শুনলাম—মার্লি। ভাল করে চিনে রাখবার জন্ত জানালা দিয়ে সন্তর্পণে মুখ বাড়ালাম। অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। কথাও আর কিছু কানে এলো না। বোধ হয় মেয়ে দুটি ততক্ষণে ঘুরে ক্লাবের সম্মুখে বাগানের দিকে গেছে চলে।

কে এই মেয়েটি? ক্লাবে গত দিন পনর থেকে রীতিমত আসা-যাওয়া করি—বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় আট-দশটি মেয়ে আসে এই ক্লাবে, তাও প্রত্যেকে রোজ আসে না—তাদের মধ্যে কি কেউ? এ সবই গ্রাম্য মেয়ে—এদের ধরণ-ধারণ লণ্ডনের মেয়েদের চেয়ে বেশ একটু স্বতন্ত্র। লণ্ডনের মেয়েদের মতন এদের পোষাক ও সাজগোজের তত বাহার নেই—বেশ সাদাসিধে সভ্য পোষাক এদের পরিধানে। এবং বিশেষ করে—যেটা দেখে আমি সুখী হয়েছিলাম—এদের ব্যবহারে একটি সলজ্জ ভাব ছিল, যেটা মেয়েদের মাধুর্য্য বাড়িয়েই দেয় এবং যেটা লণ্ডনের মেয়েরা হারিয়ে ফেলেছে। লক্ষ্য করেছি—গায়ে পড়ে কেউ অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করে না এবং আলাপ করিয়ে দিলেও একটু সলজ্জ হাসিতে অভিনন্দন জানায়—উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে না। অবশ্য প্রায় প্রত্যেক মেয়েরই—বিশেষতঃ সুশ্রী মেয়েদের

—একটা করে ইংরেজীতে যাকে বলে Boy friend (যুবক-বন্ধু) আছে এবং বেশীর ভাগ মেয়েরাই তাদেরই সঙ্গে আসে ক্লাবে। কিন্তু এই সব বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহারে কোনও মেয়েই শিষ্টতার সীমা ছাড়ায় না—এটুকুও লক্ষ্য করেছি।

যখনকার কথা বলছি, তখন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এ-সব কোনও মেয়েরই আলাপ হয়নি—এক মিস জয়েস ছাড়া। মিস জয়েসই একমাত্র মেয়ে, যিনি টেনিস খেলার দলে ছিলেন—অন্য অন্য মেয়েরা বেশীর ভাগই ছিল হয় ব্যাডমিণ্টন কিংবা পিং-পং এর দলে। মিস্ জয়েস দেখতে মোটেই সুশ্রী ছিলেন না—কেমন যেন রোগা পাকান চেহারা—এবং তাঁর ধরণ-ধারণের মধ্যে রমণীসুলভ মাধুর্য্যের কোথায়ও কোনও ঠাঁই ছিল না। এ ছাড়া আমাদের টেনিসের দলে ছিল আরও চার জন ইংরেজ যুবক—বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসত এবং তাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা না হলেও বেশ আলাপ হয়েছিল। মোটের উপর দশ-বারোটি পুরুষ আসত এ ক্লাবে এবং সকলেই আমার সঙ্গে দেখা হলে স্বাভাবিক ভদ্রতায় শুভ সম্ভাষণ জানিয়ে আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করত—কোনও দিনই এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আগেই বলেছি—আমার সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত মিস জয়েস ছাড়া কোনও মেয়েরই আলাপ হয়নি এবং সত্য কথা বলতে গেলে, কোনও মেয়েকেই আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করিনি—কেবল একটি ছাড়া। কেন লক্ষ্য করিনি তার কারণ বোধ হয়—এমি জনসনের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে এদেশের মেয়েদের প্রতি বিশ্বাস আমি একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলাম। এবং শ্রদ্ধাও যে খুব বেশী ছিল—এমন কথা বলতে পারি না। তাই বোধ হয় মনে মনে ধারণা হয়েছিল যে, এ দেশের মেয়েরা আমার মতন কালো বিদেশীর সঙ্গে সত্যিকারের প্রাণ দিয়ে কিছুতেই মিশবে না। সুতরাং আমারই বা কি দরকার গায়ে পড়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করার? নিজের আত্মসম্মান নিজেই বাঁচিয়ে চলা উচিত—এই রকম একটা ধারণা নিয়ে সব মেয়েদের কাছ থেকে নিজেকে রাখতাম একটু দূরে। খেলা-ধূলোর পর যখন মেয়ে-পুরুষ মিলে দলে দলে বসে গল্পগুজব হ'ত, কোনও দলের কাছেই এগিয়ে যেতাম না। কখনও কখনও অবশ্য কোনও কোনও পুরুষ আমি একলা বসে আছি দেখে নিজেদের ভদ্রতায় আমার কাছে এগিয়ে এসে বসে খানিকক্ষণ গল্প করত—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

কেবল একটি মেয়েকে লক্ষ্য করেছিলাম—কেন না, তাকে লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না। সমস্ত মেয়েদের মধ্যে এমনই একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল তার যে, সে অনায়াসে চোখে পড়বেই। সমস্ত মেয়ের চেয়ে সে ছিল একটু লম্বা অথচ লম্বা হওয়ার দরুণ শরীরের গড়নের সামঞ্জস্যে এতটুকুও ত্রুটি ঘটেনি। একহারা পুষ্ট গড়ন—যৌবনের লালিত্যে মেয়েটির অঙ্গে অঙ্গে নিজেরই পরিপূর্ণতায় হয়েছিল ধন্য। মুখের দিকে চেয়ে দেখেছি—ও রকম একখানা মিষ্টি মুখ যেন জীবনে দেখিনি, মুখখানিতে যেন মধু ঢালা। মুখের দিকে চাইলেই বিশেষ করে চোখে পড়ে দুটো চোখ, কালো দুটো চোখ, যার অতলস্পর্শী গভীরতায় যেন রয়েছে প্রাণসমুদ্রের অশান্ত লীলা, অথচ যার বাইরের অভিব্যক্তি, শান্ত সমাহিত এবং একটু যেন বিষণ্ণ। লক্ষ্য করেছি—মুখখানির উপরে মাঝে মাঝে মৃদু হাসিতে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়, অথচ তার পিছনে কোনও বজ্রনিনাদ নেই। এক মাথা কালো চুলে মুখের শোভা যেন আরও দিয়েছে বাড়িয়ে—অন্য রং-এর চুল যেন ও-মুখে মানাতই না। গায়ের বর্ণটির মধ্যেও এ দেশের অন্য মেয়েদের তুলনায় একটা বিশেষত্ব ছিল—উৎকট সাদা বা লাল নয়—উজ্জ্বল গোলাপী।

মেয়েটির ধরণ-ধারণের বৈশিষ্ট্যও আমার লক্ষ্য এড়ায়নি। কথায় কথায় খিল-খিল হাসিতে গড়িয়ে পড়া বা একটা উৎকট আত্মদম্ভের গর্ব্বিত ধরণ—এর কোনওটাই মেয়েটির মধ্যে ছিল না। পুরুষরা প্রায় সকলেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার জন্য সব সময়ই উৎসুক—সেটুকু লক্ষ্য করা মোটেই আমার পক্ষে কঠিন হয়নি। কিন্তু মেয়েটি সব সময়েই তাদের সঙ্গে মধুর হেসে সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা বলত এবং দু-একটা কথার পরেই মাথাটা ঈষৎ নীচু হয়ে যেত—যেন নিজের স্বাভাবিক লজ্জার ভাবে।

মেয়েটির ঘনিষ্ঠ দলে ছিল—আরও দু জন দুটি পুরুষ। তার মধ্যে একটি যুবক, বছর সাতাশ-আটাশ বয়স হবে এবং আর একটিকে বালক বললেও হয়—সতের-আঠারোর বেশী বয়স নয়। এই তিন জনেই এক সঙ্গে ক্লাবে আসত। এবং ক্লাবে আসার পর আরও দুটি ওদের দলে এসে জুটত—একটি যুবক এবং একটি তরুণী। যতক্ষণ ক্লাবে থাকত এই পাঁচ জনেই প্রায় সমস্তক্ষণ থাকত এক সঙ্গে। এরা সকলেই ছিল ব্যাডমিণ্টন খেলার দলে—তাই আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগই ছিল না।

মেয়েটির সম্পর্কে তার ঘনিষ্ঠ পুরুষ দুটির কথাও যেটুকু যা দেখেছি এই খানেই বলি। যুবকটি দেখতে মন্দ নয়—নাক-চোখ বেশ টানা-টানা, মুখের গড়নটিও ভাল, কিন্তু সেরকম লম্বা নয়, একটু হৃষ্টপুষ্ট ধরণের চেহারা। মুখের মধ্যে একটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল, এবং সব সময় শুধু কথাবার্ত্তায়ই নয়, ধরণে-ধারণেও সে একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি—এই কথাটি পাঁচ জনকে জানাবার জন্য সে ছিল সর্ব্বদা উদগ্রীব। বিশেষতঃ মেয়েটির দিক দিয়ে—সেই যেন মেয়েটির রক্ষক, সর্ব্বদিক দিয়ে মেয়েটিকে আড়াল করে বাঁচিয়ে রাখা যেন তারই কর্ত্তব্য, মেয়েটি যেন তারই কথায় ওঠে বসে—এইটুকু সকলের মধ্যে শুধু জাহির করা নয়, জাহির করে একটা গর্ব্ব অনুভব করত, সেটুকু বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিলাম। মেয়েটিও যেন সহজেই তার কথা মেনে নিত—এ নিয়ে কোনও বিরোধের সৃষ্টি কোনও দিন হয়েছে বলে বুঝিনি। ভেবেছিলাম—বোধ হয় দু জনে বিবাহ-পাশে আবদ্ধ, তাই বোধ হয় মেয়েটি সহজেই পুরুষটিকে নেয় মেনে।

বালকটির কথা একটু স্বতন্ত্র। সে ছায়ার মতন মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত—যেন এক মিনিট তাকে চোখের আড়াল করতে পারে না। তাকে বাদ দিয়ে যুবক ও মেয়েটিকে কখনও একলা দেখিনি, যেন একলা তাদের মিলন সে কিছুতেই ঘটতে দেবে না। মেয়েটিও বালকটিকে যে একটু বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখত—সেটুকু বোঝা মোটেই কঠিন হয়নি।

এইখানে আমাদের ক্লাব-বাড়ীখানির আরও একটু পরিচয় দিই। ক্লাব-বাড়ীখানির দক্ষিণ দিক দিয়ে একটি রাস্তা মাঠের উপর দিয়ে বেঁকে চলে গিয়েছে পূর্ব্বদিকে—এই রাস্তাটির উপরই বাড়ীখানির সদর গেট। এই গেট দিয়ে ঢুকেই একটা ফুলের বাগান এবং সেই

বাগানের ভিতর দিয়ে একটি সরু রাস্তা ঘরখানির সদর দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এদিকে বড় গাছ কিছুই নাই, কেবল ঘরখানির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে বারান্দাটির পাশে একটি চেরীগাছ। এবং পূর্ব্বদিকেই ক্লাব-প্রাঙ্গণে মাঠের উপর আমাদের টেনিস খেলার স্থান। ব্যাডমিণ্টন খেলার স্থানটি ক্লাবঘরের অন্য দিকে—অর্থাৎ পশ্চিম দিকে। তাই ব্যাডমিণ্টন খেলার দলের সঙ্গে টেনিসের দলের কোনও যোগাযোগই হয় না। ক্লাবঘরের পিছন দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে সবুজ ঘাসে-ঢাকা সুন্দর প্রাঙ্গণ—শীতের প্রকোপ না থাকলে সেখানে ছোট ছোট টেবিল চেয়ার বার করে বসা হয়, চা ইত্যাদি পানের জন্য। তার পিছনে ক্লাব-প্রাঙ্গণের বাইরে তরঙ্গায়িত মাঠের পরে মাঠ, দূরে দূরে ছড়ান এক একটা ওক কিংবা ওয়ালনাট গাছ এবং কখনও বা পুঞ্জীভূত তিন-চারটা ফারগাছের সারি—বসন্তের প্রারম্ভে, কচি পাতার ঘন সবুজে চোখ জুড়িয়ে দেয়। শুধু উত্তরে কেন—ক্লাব-প্রাঙ্গণের চারি দিকেই একই দৃশ্য! কাছাকাছি সহজ দৃষ্টির মধ্যে কোনও বাড়ী-ঘর দেখা দেয় না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মেয়ে দুটির অন্তর্দ্ধানের পরে চা খাওয়া শেষ হলেও খানিকক্ষণ চুপ করে বারান্দায় বসেছিলাম—কে এই মেয়েটি? যে মেয়েটিকে আমি লক্ষ্য করেছি, সেই কি?

* * * *

আরও চার-পাঁচ দিন পরের কথা। সেদিন সন্ধ্যায় ক্লাবে বৈঠকী সাপার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বলতে ভুলে গিয়েছি—এ সব গ্রাম্য অঞ্চলে লণ্ডনের মতন সন্ধ্যাবেলা ডিনার খায় না। দুপুরের খাওয়াটি যাকে লণ্ডনে বলে লাঞ্চ—সেইটিই এদের ডিনার। সন্ধ্যার মুখে হালকা রকমের খাওয়া এদের—সেটাকে বলে সাপার। তোমার মনে আছে বোধ হয়, মিসেস ব্লেক গ্রাম্য প্রথা অনুসারে সন্ধ্যাবেলার খাওয়াটিকে সাপারই বলতেন। লাঞ্চ বলে এ সব গ্রাম্য অঞ্চলে কিছুই নাই। আমাদের হাসপাতালের ব্যবস্থাও ছিল ঐ রকম। ক্লাবে আসতে দেরী হলে হাসপাতালে সাপার খেয়েই আসতাম কিন্তু বেশীর ভাগ দিনই বলে আসতাম—আমার ঘরে সাপার গুছিয়ে রেখে দিতে। ঠিক দিত রেখে। এখন দিনের আলো পাওয়া যায় প্রায় রাত ন'টা পর্য্যন্ত—তাই ক্লাবে এসে টেনিস খেলে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যের পরে সাপার খাওয়াটাই আমার বেশী পছন্দসই ছিল। সাধারণত ছ'টা সাড়ে ছ'টা আন্দাজ এরা সাপার খায়।

সেদিন ক্লাবে বৈঠকী সাপারের ব্যবস্থা হয়েছিল। তার কারণ সেদিন খাওয়ার সময় ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে বছরের জন্য নির্ব্বাচিত 'মে কুইন' (বসন্তের রাণীর) নাম ঘোষণা করার কথা ছিল। ব্যাপারটা দু-এক জনার কাছে শুনে যেটুকু যা বুঝেছিলাম তোমাকে বলি।

প্রত্যেক বছর এই এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ক্লাবেরই মেয়েদের মধ্য থেকে একজনকে 'মে কুইন' নির্ব্বাচিত করা হয়। সমস্ত সভ্যদের ভোটের দ্বারাই হয় নির্ব্বাচন এবং এই ভোটের ব্যাপারটি যেদিন সাপার খাওয়ার কথা ছিল তার দু'দিন আগে হয়ে গিয়েছিল এবং আমাকে যথারীতি তার খবরও জানান হয়েছিল, কিন্তু আমি সেদিন ক্লাবে যাইনি। ইচ্ছে করেই যাইনি। কেন না, আমি ত মেয়েদের মধ্যে কাউকে চিনি না—কা'কেই বা ভোট দেব? তাছাড়া ব্যাপারটার প্রতি আমার তখন পর্য্যন্ত কোনও আগ্রহই জন্মায়নি এবং এদের এ-সব উৎসবের মধ্যে—আমি কালো, আমি বিদেশী, আমার না থাকাই ভাল—এই রকম একটা মনোভাব যে আমার ছিল না এমন নয়। শুনেছিলাম ভোট, যাকে বলে "বাই ব্যালট" তাই হয়েছিল, অর্থাৎ কে কা'কে ভোট দিল—জানবার কোনও উপায় ছিল না।

ক্লাবের নিয়মানুসারে—যাকে 'মে কুইন' নির্ব্বাচিত করা হয়, তার বয়স হওয়া উচিত সতের থেকে বাইশ বছরের মধ্যে এবং দু' বছরের বেশী কেউই 'মে কুইন' নির্ব্বাচিত হওয়ার অধিকার পায় না। যাকে 'মে কুইন' নির্ব্বাচিত করা হয় তার যে কুমারীই হতে হবে এমন কোনও নিয়ম নাই—বিবাহিতা মেয়েরাও 'মে কুইন' নির্ব্বাচিত হতে পারে। শুধু যে রূপের দিক দিয়েই 'মে কুইন' নির্ব্বাচিত হবে, তাও নয়—যদিও রূপটি নিশ্চয়ই বিশেষ বিবেচনার বিষয়—শিষ্টতা, চরিত্রগত মাধুর্য্য এবং মোটের উপর সকলের প্রীতিভাজন কি না—এ সবও নির্ব্বাচনের সময় লক্ষ্য করা দরকার। এই জন্যই কোনও মেয়েকে বিশেষ ভাবে মনোনীত করে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয় না। সাধারণ মেলামেশার মধ্য দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটি বিচার করতে হবে—এই নিয়ম। এবং ভোট দেওয়ার অধিকার সব সভ্যদেরই ছিল—মেয়েদেরও।

এই 'মে কুইন' উৎসবের বিভিন্ন প্রথা ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। এ অঞ্চলের প্রথা অনুসারে অন্ততঃ 'রেনবো' ক্লাবের নিয়মানুসারে যে মেয়েটি 'মে কুইন' নির্ব্বাচিত হত, তাকে একটা বিশেষ অধিকার দেওয়া হত। অধিকারটি হচ্ছে—সে কোনও একটি বিশিষ্ট দিনে, যেদিন এই উপলক্ষে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়, তার পছন্দসই একটি পুরুষকে চুম্বনে ধন্য করে দিতে পারে; এবং তাতে কোনও দোষ ধরা হয় না। ইচ্ছে করলে ব্যাপারটি দুজনেই গোপন রাখতে পারে কিন্তু প্রকাশ করলেও কোনও লজ্জার কারণ নাই। কেন না, পুরুষটির পক্ষে সেটা একটি মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে গণ্য করা হয় এবং সকলেই তাকে জানায় অভিনন্দন। এমন কি, পুরুষটি যদি বিবাহিতও হয়—বিবাহিত পুরুষদেরও এ উৎসবে যোগ দিতে কোনও বাধা নাই। ব্যাপারটি জানলে তার স্ত্রী তাকে হাস্যরসে বিদ্রূপ করতে অবশ্য ছাড়ে না, কিন্তু স্বামীর সৌভাগ্যে গৌরবই বোধ করে। এই উৎসবটি সাধারণতঃ হয় মে মাসের পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যেবেলা। ব্যাপারটি আরও একটু বলি।

মে মাসের পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যেবেলা, যে মেয়েটি 'মে কুইন' নির্ব্বাচিত হল, তাকে ক্লাবের অন্য অন্য মেয়েরা ফুলের গয়না পরিয়ে মনোরম করে সাজিয়ে দেয় এবং তারপর মেয়েটি গিয়ে বসে বাগানের কোনও একটা নিরিবিলি কোণে সকলের চোখের একটু আড়ালে—পূর্ণিমার আলোয়। তারপর ক্লাবের সভ্যরা এক এক করে তার কাছে যায় এবং প্রথা অনুসারে তার সামনে হাঁটু গেড়ে তাকে অন্ততঃ একটি ফুল উপহার দেয়। যদি কেউ ইচ্ছে করে কোনও দামী জিনিষও উপহার দিতে পারে, তাতে কোন বাধা নেই। তার পর মেয়েটি তার দিকে একখানি হাত দেয় বাড়িয়ে এবং পুরুষটি সেই হাতখানিতে এঁকে দেয় একটি চুম্বনের রেখা। এরই মধ্যে এই সময় যে কোনও একজন পুরুষকে প্রথা অনুসারে একজনার বেশী নয়—উপহারের প্রতিদানে একটি চুম্বন দিয়ে কৃতার্থ করে দেয় 'মে কুইন।'

যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে বৈঠকী সাপারের

ব্যবস্থা ছিল—আমি গিয়েছিলাম। কোন মেয়েটিকে এরা 'মে কুইন' নির্ব্বাচিত করেছে—জানবার বোধ হয় একটু কৌতূহল হয়েছিল মনে। ক্লাবে গিয়ে দেখলাম, খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে, ঘরের মধ্যে নয়, ক্লাবের উত্তর দিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে—চার-পাঁচ জন করে বসতে পারে, এই রকম এক একটি টেবিল ছড়িয়ে সাজান হয়েছে এবং খাবারগুলিও রয়েছে তারই উপরে। আমি গিয়ে পাশের একটি টেবিলে বসলাম—মিস্ জয়েস ও আমার পরিচিত আর একটি মধ্যবয়সী ইংরেজ ভদ্রলোক সেই টেবিলে আগেই বসেছিলেন।

খাওয়া দাওয়া সুরু হল এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম—আমাদের টেবিল থেকে অল্প কিছু দূরে আর একটি টেবিলে সেই মেয়েটি—একমাত্র যাকে আমি মেয়েদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি—তার দলের সঙ্গে বসে খাচ্ছে—সকলেই কথায়-বার্ত্তায় বেশ মশগুল। আগেই বলেছি—তার দলে ছিল দুটি পুরুষ, একটি তরুণী এবং তরুণীটির সঙ্গী আর একটি যুবক।

খাওয়া দাওয়া এবং টেবিলে টেবিলে গল্পগুজব বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় মাঠের মাঝামাঝি একটা টেবিল থেকে মিঃ সোয়ান উঠে দাঁড়ালেন। মিঃ সোয়ান এই ক্লাবের সেক্রেটারী। তিনি প্রৌঢ়—মাথায় চকচক করছে টাক—এবং তিনি ছিলেন বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী তাঁর পাশে বসেই খাচ্ছিলেন। সকলেই হাততালি দিয়ে উঠল। মিঃ সোয়ান বললেন, "বন্ধুগণ! আজ আমরা কি জন্য এখানে মিলিত হয়েছি—সকলেই জানেন। আমাদের 'মে কুইন' নির্ব্বাচনের কাজ শেষ হয়েছে—আজ এখনই আমি তার ফলাফল আপনাদের কাছে ঘোষণা করব। আমার যে সব তরুণী বন্ধুরা এই প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করেননি, তাঁদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তাঁরা যেন মনের আনন্দে এ বছরের জন্য নির্ব্বাচিত 'মে কুইন' ভগিনীটিকে উৎসবের দিন মধুর করে সাজিয়ে দিয়ে উৎসবটিকে সার্থক করে তোলেন—কেন না, এ যে তাঁদেরই উৎসব। আমার পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে কার অদৃষ্টে সৌভাগ্যের চিহ্নটি অঙ্কিত হবে—আমি জানি না। হয়ত আমার অদৃষ্টের জন্যই সেটি আছে তোলা—বলা যায় কি! যদি আমার অদৃষ্টে ঘটে, আমি কিন্তু সে কথা কাউকে বলছি না। (স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে) কথায় বলে সাবধানের মার নেই। (সকলের হাস্য) যাই হোক, যার অদৃষ্টেই ঘটুক—আমি তাকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখি।"

"এ বছরের জন্য 'মে কুইন' নির্ব্বাচিত হয়েছেন—একটু চুপ করে চারিদিকে চেয়ে সকলের কৌতূহল একটু দিলেন বাড়িয়ে, তারপর বললেন, "মিস মার্লিন ফ্রেজার।"

এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের টেবিল ছেড়ে আমারই লক্ষ্য করা মেয়েটির টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। সে মেয়েটিও উঠে দাঁড়াল। তার করমর্দ্দন করে তাকে জানালেন অভিনন্দন, চারি দিকে হাততালির রোল পড়ে গেল।

মার্লিন—মালি—একই নাম ত? সমস্ত মনটাকে এই চিন্তা পেয়ে বসল।

* * * *

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরের কথা। ক্লাবের বেশীর ভাগ সভ্যই একে একে 'মে কুইনের' টেবিলে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে ক্লাব থেকে নিয়েছে বিদায়। আমার টেবিলের দুটি সঙ্গীও গিয়েছে চলে—আমি একাই আমার টেবিলে ছিলাম বসে। দিগন্তে ক্লাবের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, একটা বড় একগাছের মাথার উপরে এক ফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে—গোধূলীর ম্লান আলো সেই ক্ষীণ চাঁদের আলোটুকুর সঙ্গে মিশে সমস্ত জগৎটার উপর ছড়িয়ে পড়েছে যেন একটা আধঘুমন্ত স্বপ্নের মায়ায়। আমি তন্ময় হয়ে বসেছিলাম—উঠি-উঠি করেও উঠতে ইচ্ছে করছিল না।

এতক্ষণ যে উঠিনি—তার আরও একটু কারণ ছিল। সকলেই দেখলাম—একে একে 'মে কুইনের' কাছে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেল। অতএব সেটা ত আমারও কর্ত্তব্য—না করলে ভাববেই বা কি! অথচ—আলাপ নাই, পরিচয় নাই, মশগুল হয়ে ওদের টেবিলে গল্প করছে ওরা—উঠে ওদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে গায়ে পড়ে অভিনন্দন জানাই বা কি করে—কেমন যেন একটু সঙ্কোচও বোধ হচ্ছিল। তাই কি করি ঠিক ভেবে উঠতে না পেরে—বসেই ছিলাম। কেন না ওরা তখনও বসেছিল ওদের টেবিলে। ক্রমে ভেবে ঠিক করেছিলাম—ওরা যখন উঠে চলে যাবে তখন এগিয়ে করমর্দ্দন করে দেবো অভিনন্দন জানিয়ে। কিন্তু ক্লাবের ভদ্রতা অনুসারে 'মে কুইনকে' কি শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়? তাহলে? আমি না উঠলে ত উঠতে পারবে না!

বসে আছি, এমন সময় দেখলাম, ওদের দলটা উঠল। ওরা বসেছিল প্রাঙ্গণের উত্তর প্রান্তে একটা টেবিলে। আমি ছিলাম পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। দক্ষিণ দিকেও ক্লাবের সদর—তাই দক্ষিণমুখোই ওরা এগোতে লাগল। আমি আমার চেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম, খানিকটা এগিয়ে এলে এগিয়ে গিয়ে জানিয়ে দেবো অভিনন্দন। প্রাঙ্গণে তখন অন্য কেউ ছিল না, দু-চার জন যারা ক্লাবে ছিল তারা তখন ঘরের মধ্যে সুরাপানে ছিল মশগুল।

একটু অবাক হলাম দেখে—ওরা আমার টেবিলের দিকেই এগিয়ে আসছে। সত্যিই এসে দাঁড়াল। আমিও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে বললে, "আপনি আমায় অভিনন্দন জানালেন না?"

হাত বাড়িয়ে করমর্দ্দন করতে করতে বললাম, "এই ত জানাচ্ছি, এগিয়ে গিয়ে জানাবার ভরসা পাইনি।"

মৃদু মধুর হেসে বললে, "আপনি বুঝি এগোতে শেখেন নি?"

বললাম "না, পেছিয়ে থাকতেই আমি ভালবাসি।"

ইতিমধ্যে অন্য মেয়েটির ইঙ্গিতে তার সঙ্গী যুবকটি আরও দু-তিনখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এলো আমাদের টেবিলে। তার দিকে তাকিয়ে 'মে কুইন' বলল, "আবার চেয়ার আনছ কেন? রাত হয়ে গেল যে।"

অন্য মেয়েটির চোখে-মুখে একটা হাসি খেলে গেল—আমার লক্ষ্য এড়ায় নি। মুখে বলল, "বসাই যাক না একটু। ভদ্রলোকের সঙ্গে নতুন আলাপ হলো।"

'মে কুইন' বলল, "হয়ত ভদ্রলোকেরও যাওয়ার তাড়া আছে।"

তাড়াতাড়ি বললাম "না না। বসুন না, আমার কোনও তাড়া নাই।"

সবাই বসল। 'মে কুইনের সঙ্গী যুবকটি—বালকটি নয়—সকলের

সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। 'মে কুইনে'র নাম ত আগেই শুনেছি। অন্য মেয়েটির নাম শুনলাম—ডরথী ওয়েব। তার সঙ্গী যুবকটির নাম শুনলাম—মিঃ হেরল্ড কলিনস। বালকটির নাম শুনলাম—টম ব্রায়েন। এবং নিজের নাম বলল—ফিলিপ মস্কটন।

তারপর বলল, "আপনি ডাক্তার ডডিংটন হাসপাতালে কাজ করেন এ খবরটা অবশ্য আমরা শুনেছি, কিন্তু আপনার নামটি ত শুনিনি?"

বললাম, "আমার নাম চৌধুরী।"

সেই যুবকটি আবার শুধাল, "যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

বললাম, "করুন না।"

শুধাল, "আপনি কোন দেশীয়?"

বললাম, "আমি ভারতবাসী।"

কথাটা শোনা মাত্র সকলের মধ্যে একটু যেন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল লক্ষ্য করলাম। 'মে কুইনে'র মুখে একটু মৃদু হাসি খেলে গেল।

হেসে বললাম, "ভারতবাসী হয়ে কি কোনও অপরাধ করে ফেলেছি?"

সকলেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল "না-না-না। তা নয়।" তার পর ডরথী বলল "ব্যাপারটি কি জানেন—আপনাকে খুলেই বলি। নয়ত আপনি ভুল বুঝবেন। আপনি কোন দেশীয়, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম—আপনি হয়ত দক্ষিণ-ইটালীর লোক। আর আর সবাই অন্য অন্য দেশ আন্দাজ করেছে। এক মাত্র মার্লি স্থির বিশ্বাসে বরাবরই বলেছে—আপনি ভারতবাসী।"

মার্লি—এইবার ত নামটাও গেল মিলে। তাহলে সেদিন সন্ধ্যের পরে অন্ধকারের আড়ালের তরুণী দুটি মার্লিন ও ডরথী। আর কোন সন্দেহ নাই। মনটা কেন জানি না উৎফুল্ল হয়ে উঠল। একবার ভাল করে মার্লিনের দিকে চেয়ে দেখলাম। চোখোচোখী হওয়াতেই মার্লিন চোখ দুটি নামিয়ে নিল।

মার্লিনের সঙ্গের যুবকটি একটু যেন ভেবে বলল, "আচ্ছা আমাদের সকলের মধ্যে মার্লি এ বিষয় অত স্থির নিশ্চিত হল কি করে? ও ত এর পূর্ব্বে কখনও ভারতবাসী দেখেনি!"

ডরথী বলল "নিশ্চয়ই ও কারও কাছে শুনেছে।"

মার্লিন বলল "কক্ষনো না। কারও সঙ্গে আমার এ নিয়ে কথা হয়নি।"

ডরথী বলল, "তা হলে তুমি বুঝলে কি করে? যাদু জান না কি?"

মার্লিন মৃদু হেসে বলল, "বুদ্ধি থাকলে যাদুও জানা যায়।"

মার্লিনের সঙ্গের বালকটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—"আমি জানি—আমি দেখেছি।"

ডরথী শুধাল, "কি দেখেছ টম?"

টম্ তাড়াতাড়ি বলল, "ও যে সেদিন ক্লাবের সভ্যদের নাম-ধাম লেখা খাতা দেখছিল চুপি চুপি, আমাকে ফাঁকি দেওয়া"—
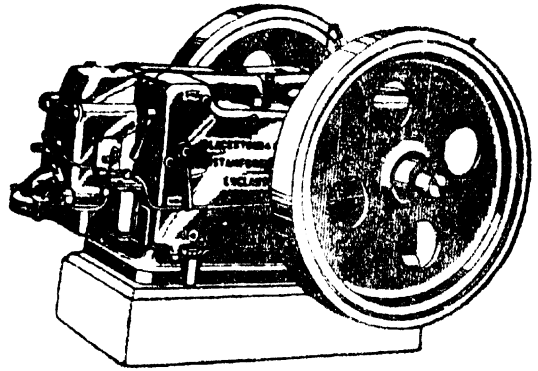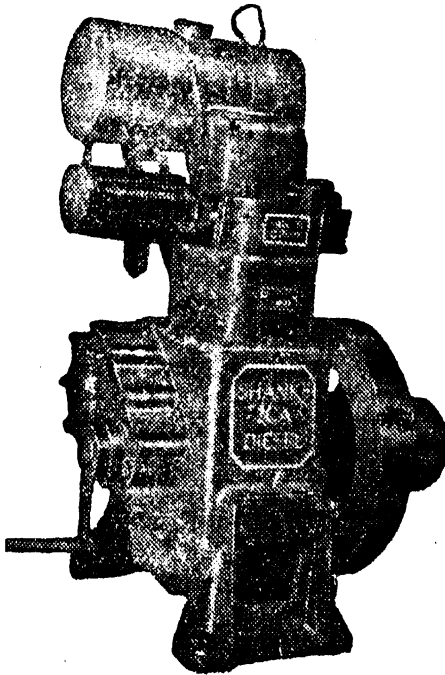
মার্লি ঈষৎ ধমকের সুরে বলল, "তুই চুপ কর টম্।"

টম চুপ করে গেল।

"ও! তাই"—ডরথী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

লক্ষ্য করেছিলাম—অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে মার্লিনের মুখখানা যেন একটু লাল হয়ে উঠল। বোধ হয় কথাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্ম মার্লিন আমার দিকে চেয়ে বলল, "আপনি খুব ভাল টেনিস খেলেন—আমি জানি।"

টেনিস একটু ভাল খেলি বলে আমার নিজেরও বিশ্বাস। শুধালাম, "আপনি কি করে জানলেন? আপনাকে ত কখনও টেনিস খেলার দিকে দেখিনি?"

বলল, "কাছে না গেলে বুঝি দেখা যায় না?"

বললাম, "কাছে গেলেই ত ভাল দেখা যায়।"

মৃদু হেসে বলল, "সব সময় নয়।"

ডরথী একটা চাপা হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করে বলল, "ও যে অনেক সময় ব্যাডমিণ্টন খেলা ছেড়ে উত্তরের বাগানের কোণটিতে বসে টেনিস খেলা দেখে। টেনিস খেলার দিকে ওর আগ্রহটা ক্রমেই যেন বাড়ছে।"

মার্লিনকে বললাম, "তাহলে আপনি টেনিস খেলেন না কেন?"

মার্লিন বলল, "আগ্রহ থাকলেই কি সব হয়?"

বললাম, "তেমন আগ্রহ থাকলে হতে বাধ্য।"

মার্লিন বলল, "তাহলে হয়ত তেমন আগ্রহটি আমার এখনও হয়নি।"

হঠাৎ মার্লিনের সঙ্গী যুবকটি অর্থাৎ মঙ্কটন উঠে দাঁড়াল। বলল "চল, এইবার সব যাওয়া যাক্—রাত হয়ে গেল।"

সকলেই উঠল—আমিও। এক সঙ্গেই ধীর পদক্ষেপে ক্লাবের সদর গেট পর্য্যন্ত এলাম। সেখানে ডরথী ও তার সঙ্গী যুবকটি বিদায় নিল—তারা যাবে পূর্ব্বমুখে। শুনলাম—ঐ রাস্তা ধরে গিয়ে মাইল দুই দূরে ওদের গ্রাম—গ্রামটির নাম নাইটহাম্। ডরথীর সঙ্গের যুবকটিকে আমার ভালই লাগছিল—সুশ্রী, একটু লাজুক ধরণের—এতক্ষণ একটিও কথা বলেনি। ডরথী মেয়েটিকেও মন্দ লাগেনি—ছোটখাট হাল্কা ধরণের চেহারা, ছোট মুখখানিতে একটু লাবণ্যের মাধুর্য্য সহজেই চোখে পড়ে।

ওরা চলে গেলে মার্লিন আমার দিকে চেয়ে বলল, "চলুন যাওয়া যাক্। আমাদের একই পথ।"

চলতে চলতে শুধালাম, "আপনারা কত দূরে থাকেন?"

মঙ্কটন বলল, "মার্লিন থাকে লংডেল গ্রামে—আপনাদের ডড়িংটনের পাশেই। টমও সেই গ্রামেই থাকে। তারপর আর একটা মাঠ পেরিয়ে আমার গ্রামে যেতে হয়—হাইটন্।"

মার্লিন বলল, "ফিল। আজ রাত হয়ে গেছে, তোমার আর লংডেল ঘুরে যাওয়ার দরকার কি? তুমি বরং সোজাই চলে যাও।"

ফিলিপ মঙ্কটন বলল, "এমন আর কি রাত হয়েছে—ঠিক আছে।"

শুনলাম—হাইটনে যাওয়ার ডড়িংটন দিয়ে সোজা রাস্তা আছে, লংডেল ঘুরে না গেলেও হয়।"

শুধালাম, "লংডেল গ্রামটি ডড়িংটনের কোন দিকে?"

মঙ্কটন বলল, "ডড়িংটনের জর্জ্জ হোটেল জানেন?"

বলল, "তার পিছনেই একটা চার্চ্চ আছে। সেই চার্চ্চটির পিছনে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, একটা ছোট্ট মাঠ পেরিয়েই লংডেল। ছোট্ট গ্রাম—নিজস্ব কোনও অস্তিত্ব নেই—ডড়িংটনেরই একটা পাড়া বললেও হয়। টম ও মার্লিন কাছাকাছি বাড়ীতেই থাকে।"

চার জনে সেই রাস্তাটি দিয়ে চলেছি পশ্চিমমুখো। রাস্তাটি সরু, তাই চার জনে ঠিক সহজ ভাবে পাশাপাশি যাওয়া যায় না। তাই বেশীর ভাগই আমি একটু পেছিয়ে যাচ্ছিলাম। এই রাস্তাটা দিয়ে প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর ডড়িংটনের একটি সদর রাস্তা পাওয়া যায়—সেটি উত্তর-পশ্চিমে চলে গিয়েছে—পিটারবরার দিকে। সেই রাস্তার মোড় থেকে খানিকটা দক্ষিণমুখো গেলেই ডড়িংটন হাসপাতালের সদর গেট। সেই রাস্তা দিয়ে আরও একটু দক্ষিণে গেলেই গ্রাম এবং একটু এগিয়ে গেলেই ডড়িংটনের তিনটি রাস্তার মোড়—একটি মার্চ্চ, একটি কেম্ব্রিজ এবং একটি পিটারবরার দিকে গিয়েছে চলে। এই মোড়েই জর্জ্জ হোটেল এবং এই মোড়টির নাম ক্লকটাওয়ার—অর্থাৎ তিনটি রাস্তার মোড়ে একটি স্তম্ভের উপর একটি ঘড়ি বসান আছে।

মাঠের পথ দিয়ে চলেছি—তখনও ডড়িংটনের সদর রাস্তায় আসিনি। আগেই বলেছি—আমি বেশীর ভাগই একটু পেছিয়ে যাচ্ছিলাম। চার জনে পাশাপাশি চলা ঠিক সহজ নয়, সেইটেই যে আমার পেছিয়ে চলার একমাত্র কারণ, ঠিক তা নয়। তোমাকে সরল ভাবেই বলি—পিছন থেকে মেয়েটির নিখুঁত গড়নে তার চলে যাওয়ার ভঙ্গীটি সেই অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় মধুর লাগছিল চোখে। একটি সাদা রংএর পোষাক ছিল পরিধানে—তার উপর দিয়ে লম্বা কালো চুলের বিনুনীটি পিঠ ছাড়িয়ে আরও নেমে এসেছিল এবং চলার ভঙ্গীর তালে তালে যেন একটি অপরূপ ছন্দে খাচ্ছিল দোল—আমি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে ছিলাম।

একটু যেতে যেতেই দেখলাম, মঙ্কটন নিজের ডান বাহুটি দিয়ে মেয়েটির নিটোল বাঁ বাহুটি নিল জড়িয়ে—যেন এটা তারই একান্ত নিজস্ব অধিকার। কিন্তু দেখে একটু মজাই লাগল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টম—বোধ হয় একটু দূরে ছিল—ছুটে গিয়ে মেয়েটির অপর বাহুটি নিজের বাহু দিয়ে জড়াল।

এই ভাবে দু' পা এগিয়েই, মেয়েটি হঠাৎ মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে একটু বেঁকিয়ে আমার দিকে চাইল—মুখখানির উপর একটা স্বাভাবিক লজ্জার আরক্তিম আভা যে পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল, তা লক্ষ্য করতে আমার দেরী হয়নি। মৃদু হেসে বলল, "এইবার আপনাকে কোথায় রাখি?"

আস্তে বললাম, "যেখানে প্রাণ চায়।"

কথাটা ঠিক কানে গেল কি না জানি না।

* * *

সেদিন রাত্রে মাঝে মাঝে প্রায়ই অন্তমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম—এ কথা তোমার কাছে সরল ভাবেই স্বীকার করি বুলা! সেই চলে যাওয়ার ভঙ্গীটির ছন্দ থেকে আমার প্রাণে লাগছিল দোল।

[ক্রমশঃ

এক মুঠো আকাশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

প্রভাতের ছোট বাড়ীর চেহারা একদিনেই অনেকখানি বদলে গেছে ! অরুণার মা'র সুনিপুণ গৃহিণীপণায় সংসারের সব কাজ নিখুঁত ভাবে চলছে। প্রভাতের রোজগার খুব বেশী না হলেও কেউ সত্যি অভাব অনুভব করে না। রমেশ বাবুর শরীরও আগের চেয়ে অনেকটা ভালো। বাঁদিকটা যে পক্ষাঘাতে পড়ে গিয়েছিলো, তাতে অল্প অল্প করে জোর পাচ্ছেন। ঘর থেকে বারান্দা অন্য কারুর কাঁধে ভর দিয়ে বেড়াতে পারেন। নিয়ম করে সকালবেলা কাগজ পড়া, দুপুরে ঘুমনো, বিকেলের পর প্রভাত ফিরলে তাস খেলা চলে।

আজ ছুটির দিন বলে সকাল থেকেই তাস খেলা সুরু হয়েছে। রমেশ বাবু আর প্রভাত এক দিকে, অন্য দিকে অরুণার মা আর অরুণা। টোয়েণ্টি নাইন খেলাটাই সকলে জানে, তাই বেশীর ভাগ সময় ঐ খেলাই হয়।

প্রভাত বলে, এ খেলা কলকাতার কা'রা খেলে জানো অরুণা ?

—কারা ?

—উড়ে চাকরেরা।

অরুণা বলে, সত্যি কথা। বাপি, সেই যে আমাদের বলিয়া ঠাকুর ছিল মনে আছে, কি রকম খেলতো—খেলা বেশ জমে উঠেছে। প্রভাতদের তিনটে লাল বেরিয়েছে, অরুণাদের একটা কালো। এমন সময় নীচে থেকে বেলারাণীর গলা শোনা গেল।

—অরুণা আছো, অরুণা ?

—যাই, সাড়া দিয়ে অরুণা বলে, নিশ্চয় বেলাদি' এসেছে, এখানে ডেকে আনি।

কয়েক মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। বেলারাণীকে নিয়ে অরুণা ঘরে ঢোকে। নিজে থেকেই বলে, বাঃ, বেলাদি'কে হলদে শাড়ীতে কি সুন্দর মানিয়েছে, না ?

অরুণার মা হেসে অভ্যর্থনা করেন, এসো, কত দিন পরে এলে বলতো। বসো এখানে।

বেলারাণী বলে, অনেক কাজ পড়ে গিয়েছিল। আজ একটু ফাঁকা আছে, তাই বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছি। বেলারাণী অরুণার মা-বাবাকে প্রণাম করে।

অরুণার মা আশীর্ব্বাদ করেন, বেঁচে থাকো মা ! বাবা বললেন, যশস্বিনী হও।

প্রভাত জিজ্ঞেস করে, তুমি টোয়েণ্টি নাইন খেলো তো ?

বেলারাণী হেসে জবাব দেয়, খেলি না, তবে খেলতে জানি।

মা বললেন, আমার হাতটা নিয়ে অরুণার সঙ্গে তুমি বসতো মা, আমি এখুনি আসছি।

আবার খেলা সুরু হল। বেলারাণীর বরাত ভালো, দু'দানে খেলার চেহারা গেল পাল্টে। বেলারাণীর কুড়ির খেলা, অপর পক্ষকে একটাও পিঠ না দিয়ে খেলা করে কালো বুজিয়ে লাল খুলিয়ে দিলে। আর পরের দানে প্রভাতের আঠারোর ডাকে ডবল দিয়ে ওদের দুটো লালই বন্ধ করে দেয়।

অরুণা বলে, বেলাদি' খুব ভালো খেলে, আমার সঙ্গে যাকে দিয়ে প্রভাতদা' আর বাপি খালি খালি হারিয়ে দেয়।

অরুণার মা প্লেটে মিষ্টি সাজিয়ে এনে বেলারাণীকে খাওয়াতে বসলেন। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। প্রভাত একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে নীচে নেমে যায়, আমি আসছি, কোন চিঠিপত্র আছে কি না দেখি।

বেলারাণী অরুণার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, এখন কি রকম আছেন ?

—অনেকটা ভাল। রমেশ বাবুর গলা ভারী হয়ে আসে, প্রভাত আমায় নতুন জীবন দিয়েছে। কি ভাবে যে ভুলিয়ে রাখে ! সকাল বেলা কাগজ পড়িয়ে শোনায়, অন্য সময় বই পড়ে, কত রকম বই পড়ে। সন্ধ্যেবেলা তাস খেলে, কি অন্য কিছু। অবশ্য এ-সব প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রভাত নতুন করে ধরিয়েছে, খুব ভালো লাগছে।

—প্রভাত বাবুর মনটার কোন তুলনা পাই না। সকলকেই এত ভালবাসেন !

—সত্যি কথা, বেলারাণী অরুণার গাল ধরে আদর করে বলে, বিয়ে করে, অগ্রহায়ণ মাসে তো ?

অরুণা মাথা নীচু করে বসে থাকে।

অরুণার মা উত্তর দেন, হ্যাঁ, অগ্রাণের মাঝামাঝি। সামনের সপ্তাহে আমরা হাওয়া বদলাতে একটু বাইরে যাব।

—কোথায় ?

—জগদীশপুর। ওঁর বন্ধুর বড় বাড়ী আছে। আগেও আমরা গেছি। ডাক্তার বলছে, ঘুরে এলে অনেক উপকার হবে।

—চেঞ্জটা খুবই দরকার, আপনারা সকলেই যাবেন তো ?

—হ্যাঁ, প্রভাতও এক মাসের ছুটি পেয়েছে।

অনেকক্ষণ গল্প করে বেলারাণী বিদায় চায়, আমি এবার আসি, আপনারা ফিরে এলে আবার দেখা করব।

নীচের ঘরে প্রভাত বসে চিঠির উত্তর দিচ্ছিল, অরুণা বেলারাণীকে সেখানেই নিয়ে এল।

—এই যে, বেলাদি' চলে যাচ্ছেন।

প্রভাত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, এর মধ্যেই ?

—বাঃ, এক ঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে।

—তাই নাকি ?

—চেঞ্জে যাবার আগে একবার আসবেন, যদি কিছু অদল-বদল করার থাকে।

—পরশু-তরশু যাব।

বেলারাণী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে, গৌরী মেয়েটি কে?

—কেন বলুন তো?

—দরকার আছে, চেনেন নাকি?

প্রভাত বলে, চিনি, তবে বিশেষ নয়।

—ও ফিল্মে পার্ট করতে চায়।

প্রভাত বিস্মিত হলেও মুখে কিছু বলে না। বেলারাণী চলে যেতেই অরুণা জিজ্ঞেস করে, কে গৌরী?

—তোমায় বলেছিলাম, সেই কেষ্ট, যার সঙ্গে পুজোর প্যাণ্ডেলে তোমার আলাপ করিয়েছিলাম?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভোরবেলা একদিন যে মেয়েটিকে নিয়ে তোমার বাসায় গিয়েছিল?

প্রভাত সায় দেয়, সেই-ই গৌরী। আমাকে বোঝালে মেয়েটাকে বিয়ে করবে, এখন দেখছি সিনেমায় নামিয়ে রোজগার করার মতলব। আশ্চর্য্য!

ফেলে-আসা দিনের অনেক ঘটনা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে অনেক গলদ হয়ত চোখে পড়ে—যা সে সময় নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। বেহালা থেকে বেরিয়ে পুজোর মণ্ডপে আসা পর্য্যন্ত কেষ্ট সারাক্ষণ শ্যামলের কথাই ভেবেছে। যে শ্যামলকে প্রথম দিন সিনেমার সামনে থেকে টেনে বার করে এনে নিজের পথে চালিয়েছিল, যাকে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির অনেক উপায় বের করেছিল, সেই শ্যামলকে নিজের অজান্তে কেষ্ট ভালোবেসেছিল। তা না হলে সব সময় শ্যামলের কথা কেন সে চিন্তা করেছে? কেন বাড়ী থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলে নিঃসঙ্কোচে গৌরীর সঙ্গে থাকতে দিয়েছে? কেন তার দোকানের সমস্ত ভার শ্যামলকে দিয়ে সে খুশী হয়েছে? আজ রাগের মাথায় শ্যামলকে মেরে তাড়িয়ে দিল, শুধু সে কেষ্টর কাছে মিথ্যে কথা বলেছিল বলে। শ্যামলের অভিযোগ হয়ত সত্যি, কেষ্টই তাকে মিথ্যে কথা বলতে শিখিয়েছিল। কিন্তু সে শুধু অর্থ উপার্জ্জনের কৌশল হিসেবে। মনুষ্যত্বকে বিক্রী করার জন্যে নয়। ব্যবসায় মিথ্যে কথা কে না বলে, কেষ্ট তাকে ব্যবসা করতেই শিখিয়েছে, গুরুমারা বিদ্যে আয়ত্ত করতে নয়। তার মনে শ্যামল যে আঘাত দিয়েছে তারই প্রতিশোধ নিতে সে শ্যামলকে এত নির্ম্মম ভাবে প্রহার করতে পেরেছে। তবে এ কথাও সে ভেবেছে, শ্যামল এসে তার পায়ে হাত দিয়ে মাপ চাইলে সে আবার তাকে কাছে টেনে নেবে।

পুজার মণ্ডপে পৌঁছে ক্লান্ত অবসন্ন কেষ্ট আশুদা'র কেবিনের এক কোণে বসে গরম চায়ের অর্ডার দেয়। প্রদর্শনী ভেঙ্গে গেছে, দোকানের মাল বাক্স বন্ধ করে ঠেলাগাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে। ডেকরেটারের লোক এসে কাপড় খুলে ফেলছে একদিনের মধ্যেই, পুজার মণ্ডপ আবার ছেলেদের খেলার মাঠে রূপান্তরিত হবে।

আশুদা' নিজের দোকানে ছিলেন। স্টলে এসে কেষ্টকে দেখে বললেন, সারা রাত ঘুমোওনি নাকি? এত রুক্ষ দেখাচ্ছে কেন?

কেষ্ট বিরক্তিমাখা গলায় বলে, আর বলবেন না আশুদা'! শুধু ঝুটো ঝামেলা—

—কি হোল আবার?

—শ্যামলটাকে আজ বড় মেরেছি।

আশু বাবু বিস্মিত হন, শ্যামল আবার কি করল?

—ক'দিন থেকে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছে। তার বাবার সঙ্গে দেখা করে কথা বলে এই সব, অথচ একদিনও সে তার বাবার কাছে যায়নি। তাছাড়া কাল নেশা করে বাড়ী ফিরেছিল, গৌরী ভয় পেয়ে গেছে।

—এ ত মারাত্মক কথা?

—রাগের মাথায় ছেলেটাকে খুব মেরেছি।

আশু বাবু চুপ করে থেকে বললেন, এবারে গৌরীর কথা একটু ভাবো।

কেষ্ট মুখ তুলে তাকায়।

—আমি বলছি বিয়ে-থা করে ফেল। মেয়েটাকে আর ঝুলিয়ে রেখো না। প্রভাতরা তো অঘ্রাণে বিয়ে করছে, ওই সঙ্গে তোমাদেরটাও হয়ে যাক।

কেষ্ট মৃদু স্বরে বলে, আমিও তাই ভাবছি।

—অত ভাবনার কি আছে? ক' মাস থেকেই তো দেখছি শুধু ভাবছ, পুরুত ডেকে একটা দিন ঠিক কর, আমরা পাঁচ জন তো আছি!

—আপনাদের ওপরই তো ভরসা আশুদা'!

আশুদা' বলেন, তুমি বরং বাড়ী যাও, চান-টান করে এস।

কেষ্ট উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গে, তাই যাই।

অপমানিত, লাঞ্ছিত শ্যামল বেহালার বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে চলল জলিলের বাড়ী। জলিলের বাড়ী কাছেই। কাল রাত্রে কি কি ঘটেছিল তার কাছে শোনা না অবধি কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছে না। মামার বাড়ী থেকেও তাকে একদিন এমনি ভাবে চলে আসতে হয়েছিল সত্যি কথা, কিন্তু সেদিন তার নিজেরই দোষ ছিল বেশী। কিন্তু আজ কোন রকম দোষ না থাকা সত্ত্বেও কেষ্টদা' তাকে বিশ্রী ভাষায় গাল দিয়েছে, নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করেছে। আর যাই করুক, কেষ্টর কাজে তো শ্যামল কোন দিন অবহেলা করেনি, তবে সে একবারও শ্যামলকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কেন এরকম দুর্ব্যবহার করল? মনে মনে ভাবল, কাল নেশার ঘোরে যদি কোন রকম অন্যায় করে থাকে, জলিল হয়ত তার হদিশ দিতে পারে।

জলিল ঘুম থেকে উঠে দাওয়ায় বসে দাঁতন করছিল। শ্যামলকে রিক্সা চড়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি রে, নেশা ছুটেছে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে শ্যামল জলিলের কাছে এসে বসল। শ্যামলের ছিন্ন-ভিন্ন পোষাক, ফোলা-ফোলা চেহারা দেখে জলিল আশ্চর্য্য হয়ে জিগ্যেস করে, কি হয়েছে রে?

শ্যামল গম্ভীর গলায় উত্তর দেয়, সে অনেক কথা, পরে বলছি। আগে বললে, কাল আমি কি বেশী মাতলামি করেছি?

—না, তুই তো খালি ঘুমিয়ে পড়ছিলি। কোন রকমে তোকে বাড়ীতে পৌঁছে দিলাম।

—তাহলে তুই কি কাউকে কিছু বলেছিলি?

—আমি বলবো কেন?

শ্যামল চিন্তিত হয়, তাহলে?

মীনাকুমারী তাঁর ত্বকের যত্ন নেন
লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে "এটি এত
সম্পূর্ণ রকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!" তিনি বলেন
বিয়োগান্ত করুণ ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী
মীনাকুমারী আজ ভারতে সর্বাধিক জন-
প্রিয় চিত্র তারকাদের অন্যতম।
তিনি কিন্তু শুধু কুশলী অভিনেত্রীই নন,
তাঁর চেহারাও অত্যন্ত সুন্দর—শুটিংয়ের
সময় গরম আর্কল্যাম্পের তাতেও তাঁর
ত্বক থাকে মসৃন ও লাবণ্যময়। অবশ্য
লাবণ্যের যত্ন নেওয়ার একটি গোপন
উপায় তাঁর জানা আছে। "আমি
সর্বদা বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট
সাবান ব্যবহার করি। এটি একটি
অপূর্ব মোলায়েম, সুগন্ধী সাবান।"
নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি
দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে আপনার
ত্বক কত সতেজ, কত সুন্দর হয়ে
উঠছে!
কমাল
আমরোহীর 'পাকীজা'
চিত্রের তারকা
LUX
TOILET SOAP

—কি বলছিস, বুঝতে পারছি না। অমি ঘরে ঢুকে দেখলাম, তোর গৌরী একটা অন্য লোকের সঙ্গে বসে আছে।

—অন্য লোক কে ?

—আমি কি করে চিনবো ? দেখে তো বেশ মালদার বলে মনে হল।

—চোখে চশমা ছিল ?

—হাঁ, বাড়ীতে ঢোকার আগে সাদা রঙের গাড়ী দেখলাম।

—তবে শালা বিনোদ।

লোকটা ঘুঘু, চোখ টিপে আমার হাতে দুটো টাকা দিলে, যাতে না তোকে এ-সব কথা বলি। শ্যামল চুপ করে থাকে, জলিল নিজে থেকেই বলে, তোকে বলে রাখছি শ্যামল, ও-সব মেয়ে মানুষের সঙ্গে ঘর করিস না। তোকে শুধু ধোঁকা দেবে।

শ্যামল বোঝে, জলিল এখনও ভুল করছে। গৌরীকে তার পোষা পাখী ভেবে। আস্তে আস্তে সব কথা সে খুলে বলে, কি ভাবে কেষ্টদা'র সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কেমন করে মামার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে এখানে এসে উঠে। গৌরীর সঙ্গে কেষ্টদা'র সম্বন্ধ বা কি।

জলিল সব শুনে বলে, এত দিন আমায় এসব কথা বলিসনি কেন ?

—মজা দেখার জন্যে, ভাবতাম, তোরা আমায় গৌরীকে নিয়ে রগড় করিস। তাতে আর এসে-যাচ্ছে কি ?

জলিল গম্ভীর স্বরে বলে, তোর কেষ্টদা' শালা বেইমান, আজ থেকে আমার এখানেই থাকবি।

—এখানে আর কে কে আছে ?

—আমি, রাজীব আর মানকে। দুটো কামরা আছে, দু'জন দু'জন এক ঘরে থেকে যাবে।

—আমার জিনিষপত্র আনতে হবে যে।

—ওরা আসুক। একসঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসব।

শ্যামল স্নান করে জলিলের পায়জামা পাঞ্জাবী পরে নেয়। সামনের দোকান থেকে গরম তেলেভাজা আর চা এনে দু'জনে খেতে বসে।

জলিল জিজ্ঞেস করে, মোটর চালাতে জানিস ?

—না।

—চটপট শিখে ফেল।

—তুই শিখিয়ে দিস।

—সে সব তালিম দিয়ে দেব। এখন শুধু ঐ কাজটাই ভাল চলছে। গাড়ী সরাতে হবে—

—তোরা সরিয়েছিস ?

জলিল হাসে, রাজীবটা ওস্তাদ আছে।

—কি রকম ?

—ব্রেবোর্ণ রোডে একটা অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ড্রাইভার গাড়ী রেখে ওপরে চলে গেল। রাজীব সেই ফাঁকে গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট করলে। বুদ্ধু ড্রাইভার চাবীটা সংগে নিয়ে গেছে। ভেবেছিল ষ্টার্ট করতে পারব না। ইঞ্জিন খুলে সেলফের তার টেনে ষ্টার্ট করে আমরা চম্পট দিলাম।

—পুলিশ ধরতে পারল না ?

—ধরবে কি, তার আগেই সব পার্টস খুলে বিক্রী করে দিয়েছি। বডিটা শুধু রাত্রে ঠেলে রেখে দিয়ে এসেছিলাম এক গলির মধ্যে, পুলিশ সেটা নিয়ে গেছে। কালীর এই তো এখন সবচেয়ে বড় কাজ। আমরা তিন জন, তুইও এই দলে ভিড়ে যা।

খানিক বাদে রাজীব আর মানকে ফিরল। কোন দোকানে গাড়ীর পার্টস বিক্রী করেছিল, আজ গিয়েছিল দাম আদায় করতে। জলিলের হাতে পঁচিশটা টাকা দিয়ে বলে, বাকীটা সামনের সপ্তাহে দেবে বলেছে।

জলিলদের নিয়ে শ্যামল গেল বেহালার বাড়ী থেকে মালগুলো উদ্ধার করতে। চিনু ছাড়া আর কেউ ছিল না।

শ্যামল হাঁক দিয়ে বললে, আমার মালগুলো নিয়ে যাব, আপনার কাছে চাবী আছে ?

চিনু কোন কথা না বলে চাবীটা বার করে দেয়। শ্যামল দরজা খুলে জলিলের সাহায্যে বাক্সগুলো বারান্দায় বের করে আনে। জলিল ফিস-ফিস করে জিজ্ঞেস করে, ও ছুঁড়ীটা কে রে ?

—গৌরীর বন্ধু।

—খাসা জায়গায় তুই ছিলি মাইরী, জলিল চোখ টিপে ইঙ্গিত করে।

শ্যামল আর কথা না বাড়িয়ে চাবীটা চিনুর হাতে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

কেষ্ট নিজের বাড়ীতে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। এক সময় ঘুমিয়েও পড়েছিল। জেগে উঠে দেখে, প্রায় বারোটা বাজে। তাড়াতাড়ি চান করে নেয়। আজ আশুদা'র কথাগুলো তার মনে নতুন চিন্তা এনে দিয়েছে। সত্যিই তো, এ ক'মাস গৌরীর কোন ব্যবস্থাই সে করেনি। উচিত ছিল এরই মধ্যে বিয়ে করা। সকালবেলা শ্যামলের সঙ্গে এই অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে গৌরীর সঙ্গে ভালো করে কথা বলারও সময় পায়নি। এমন কি, খেতে আসবে কি না তাও বলে আসতে ভুলে গেছে। তবে একথা ঠিক, গৌরী তাকে দেখলে নিশ্চয় খুশী হবে। প্রয়োজন হলে নতুন করে ভাত চাপিয়ে তাকে খাওয়াবে, এরকম তো আগে কত বারই হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, বেহালায় পৌঁছে কেষ্ট দেখলে, আজও গৌরী বাড়ী নেই। ঘরে তালাবন্ধ। তাড়াতাড়িতে কেষ্ট নিজের চাবী আনতে ভুলে গিয়েছিল। বাড়ীওয়ালার চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, এঘরের চাবী আর আছে কি না জান ?

চাকরের উত্তর দেবার আগেই চিনু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, হ্যাঁ কেষ্টদা', গৌরী আমায় চাবী দিয়ে গেছে।

চিনুর কাছ থেকে চাবী নিয়ে দরজা খুলতে খুলতে কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, গৌরী কোথায় গেল ?

—জানি না।

—বলে যায়নি ?

—না। শুধু শ্যামল এলে জিনিষপত্র দিয়ে দিতে বলেছিল, সে নিয়ে গেছে।

কেষ্ট গম্ভীর স্বরে বলে, ও!

চিনু কেষ্টর পিছু-পিছু ঘরের মধ্যে ঢোকে, আপনার নিশ্চয় এখনও খাওয়া হয়নি ? আমি খাবার নিয়ে আসি—

—কোথা থেকে ?

চিনু হাসে, কেন, আমি রান্না করি না বুঝি ?

—তা বলিনি। গৌরী বাড়ীতে খাবে না ?

—বোধ হয় না। এখনও যখন রান্না করেনি।

চিনু কেষ্টকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেষ্ট জামা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে। পাশে একটা পাঁজী ছিল, পাতা উল্টে বর্ষফল দেখে। লেখা রয়েছে অনেক রকম কথা, কিছু ভাল কিছু মন্দ। পড়তে বেশ লাগে। দশ মিনিটের মধ্যে চিনু গরম ভাত ডাল আর মাছের ঝোল নিয়ে এল। কেষ্ট রসিকতা করে বলে, তুমি যে দ্রৌপদী দেখছি, রান্না সব সময় মজুত।

—রোজই থাকে। বলতে গিয়ে চিনুর গলা ভারী হয়ে যায়।

—কেন ?

—ওর জন্যে করে রাখতে হয়।

—কে পিনাকী, এখনও ফেরেনি ?

—না। আজ আর আসবে না। চিনুর চোখ সজল হয়ে ওঠে।

কেষ্ট চিনুর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে ওদের মধ্যে কোন গোলমাল হয়েছে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে চিনু থালা-বাসন তুলে নিয়ে চলে যায়। কেষ্ট হাত ধুয়ে এসে মোড়ার ওপর বসে। একটু পরে চিনু ফিরে এল দু'খিলি পান নিয়ে। কেষ্ট হেসে বলে, ওইটেরই অভাব বোধ করছিলাম। পান দুটো মুখে পুরে সিগরেট ধরায়।

—আপনি শুয়ে পড়ুন, গৌরী হয়ত এখুনি ফিরবে।

কেষ্ট মৃদু স্বরে বলে, এবার সামনের অঘ্রাণে বিয়েটা করে ফেলব ভাবছি।

চিনুর চোখ চকচক করে ওঠে, খুব ভাল কথা। ঐ সময় শীত পড়বে। আমাদের কিন্তু খুব খাওয়াতে হবে কেষ্টদা'।

—খাওয়াবার ভার আশুদা' নিয়েছেন, সে দিক থেকে নির্ঝঞ্ঝাট।

—কোথা থেকে বিয়ে হবে ?

—আমার বাড়ী থেকে।

—এ জায়গাটা ছেড়ে দেবেন তাহলে ?

—রেখে আর কি হবে ? বলেই কেষ্টর মনে হল গৌরী চলে গেলে সত্যি চিনু বড় একলা পড়ে যাবে। তাই বলে, তোমায় কিন্তু বেশীর ভাগ সময় গৌরীর কাছে গিয়ে থাকবে হবে, নইলে ও একা থাকতে পারবে না।

চিনু কেমন যেন আনমনা হয়ে বলে, কেন পারবে না, ঠিক পারবে ! যাই, ঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে। কেষ্টর দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে চিনু ঘর থেকে চলে যায়।

কেষ্ট ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গৌরী কখন ফিরে এসে শাড়ী বদলে চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছে, কেষ্ট জানতেই পারেনি। উঠে বসে জিজ্ঞেস করে, কখন এলে গৌরী ?

—অনেকক্ষণ।

—দুপুরে খেলে কোথায় ?

—গৌরী চট্ করে বলে, বেলাদি'র কাছে।

—কোন বেলাদি' ?

—বেলারাণী। ছবিতে খুব ভাল পার্ট করে।

—তোমার সঙ্গে আলাপ হ'ল কি করে ?

—বাঃ, প্রভাত বাবু করিয়ে দিলেন যে।

মনে মনে কেষ্ট আশ্চর্য্য না হয়ে পারে না। গৌরীর সঙ্গে কেষ্টর কি সম্বন্ধ, প্রভাত ভাল করেই জানে। তবু কেষ্টকে না জানিয়ে গৌরীকে বেলারাণীর কাছে নিয়ে গেল কি করে তাই ভাবে। মুখে বলে, বেলারাণী শুধু তোমাকেই খেতে বলেছিল, চিনুকে ডাকে নি ?

গৌরী মুখে আঙুল চাপা দেয়, চুপ ! এ-সব কথা চিনুকে বোল না, বেচারী দুঃখ পাবে। ওর পার্ট বেলাদি'র পছন্দ হয় নি।

চায়ের জল ফুটে গিয়েছিল। কেষ্ট সুযোগ খোঁজে কখন গৌরীর কাছে বিয়ের কথা পাড়বে। চা খেতে বসেই বলে, জান ত অঘ্রাণ মাসে প্রভাতের বিয়ে ?

—শুনেছি।

—আমাদের ঐ সময়ে হলেই ভাল হয়।

—বিয়ের এত তাড়া কিসের ?

কেষ্ট চোখ তুলে তাকায়, তাড়া মানে, এ ভাবে আর ক'দিন থাকা চলবে ?

—মন্দ কি ?

—আশ্চর্য্য ! একটা থিয়েটারে পার্ট করেই নাটকের ভাষায় কথা বলছ !

—কেষ্ট গৌরীকে লক্ষ্য করে। তার চাল-চলনে বৈচিত্র্য এসেছে। চুল বাঁধা, শাড়ী পরার ধরণ, চোখে-মুখে রঙের প্রলেপ। গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কেষ্ট বলে, তুমি অনেক বদলে গেছ, শুধু কথায় নয়, সাজ-পোষাকেও।

গৌরী হেসে বলে, তুমিই তো চাইতে আমি সেজে-গুজে থাকি।

—যখন চাইতাম, তখন তো করনি ?

—সুযোগ পাইনি।

—এখন পাচ্ছো ?

—হ্যাঁ। বেলাদি'র কাছে প্রায়ই যাই।

—একথা তো আমায় বলনি ?

—তুমি তো জানতে চাও নি ?

কেষ্টর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, আমি ব্যস্ত ছিলাম।

গৌরী তরল গলায় বলে, তাই বিরক্ত করিনি।

—আমি বুঝতে পারছি না গৌরী, তোমার বেলাদি' কি চায় ?

—আমি ছবিতে নামি।

—ছবিতে, সিনেমায় ! কেষ্টর বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

—হ্যাঁ, অনেক টাকা পাওয়া যাবে।

—টাকা, টাকাটাই কি সব ?

—অন্ততঃ তুমি তো তাই বুঝিয়েছিলে।

কেষ্ট আর কোন কথা বলতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি পাকা কথা দিয়ে এসেছ ?

গৌরী কেষ্টর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে বলে, না, তোমার মত না নিয়ে কি আমি কথা দিতে পারি ?

—তাহলে না করে দিও।

—বেশ।

কেষ্ট উঠে জামা পরে। পকেট থেকে শ্যামার চিঠিটা পড়ে যায়। কুড়িয়ে নিয়ে বলে, শ্যামা অনেক করে বলেছে ওদের গ্রামে যাবার জন্যে।

—চিনুর কাছে শুনছিলাম। ঘুরে এস না ক'দিন।

—ভাবছি সামনের সপ্তাহে দু'-তিন দিনের জন্যে যাব।

—শ্যামা তোমায় পেলে সত্যিই খুব খুসী হবে।

কেষ্ট নিজের মনেই বলে, লিখেছে ওরা সুখী হয়েছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

কেষ্ট ঠিকই করেছিল সোমবার দিন শ্যামার কাছে কিশোরপুরে যাবে। মাঝে শুধু একদিন, তাও রবিবার। দোকান হাট সবই প্রায় বন্ধ। তাই গৌরীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যা খোলা আছে, তারই মধ্যে পছন্দ করে কয়েকটা জিনিষ কেনার জন্যে। বিশেষ করে পুজোর পর যাচ্ছে। শ্যামার জন্যে শাড়ী, জামাইয়ের জন্যে ধুতি সবই নিতে হবে। গৌরী মনে করিয়ে দেয়, ওদের বাচ্চা দুটির জন্যে কয়েকটা সার্ট-প্যান্ট নিয়ে নাও।

—কত বড়, মাপ তো জানি না!

—আন্দাজ মত নিয়ে নাও না।

বাজার করতে এত সময় লাগবে কেষ্ট ভাবেনি। গৌরীর জন্যে একটা শাড়ী কেষ্টর পছন্দ হয়েছিল। গৌরী কিন্তু কিনতে দিলে না। বলে, এইতো সেদিন অতগুলো শাড়ী কিনলে আমার জন্যে, আবার কেন?

বাজার সারা হলে কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে একটা ছোট দোকানে খেতে গেল। দোকানটা পাঞ্জাবীর। ভাত, ডাল, মাংস সবই পাওয়া যায়। গৌরীর কিন্তু মোটেই ক্ষিদে ছিল না। নেড়ে-চেড়ে রেখে দিলে। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি হোল, কিছু খাচ্ছ না? আগে তো বাইরে খেতে খুব ভালবাসতে।

—আজ-কাল আর ভাল লাগে না।

কিশোরপুর যাবার দিন কেষ্ট গৌরীকে বিশেষ করে বারণ করে যায়, আমি দু'-তিন দিনের মধ্যেই ফিরব। এর মধ্যে বেলাদি'র কাছে তুমি যেও না। যা বলতে হয় ফিরে আসার পর হবে।

গৌরী বলে, অত বার করে বলতে হবে না। একবার না করেছ, সেই যথেষ্ট।

কেষ্ট চিনুকে বলে, গৌরী একলা রইল, তোমরা দু'জনে মিলে থেকো।

চিনু উত্তর দেয়, আমি তো সব সময়েই বাড়ী থাকি।

—তা তো জানি। তাই বলছি, গৌরীকে একটু দেখো।

—দেখতে দিলে তো? বলে চিনু গৌরীর দিকে তাকিয়ে হাসে। গৌরী কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বলে, চিনু আজ-কাল বড় হেঁয়ালী করে, তুমি বুঝতে পারবে না।

কেষ্ট হেসে ফেলে, তাই দেখছি। দুই বন্ধুতে এমন নাটুকেপণা শুরু করেছ, আমার মাথায় ঢোকে না কিছু।

কিশোরপুর যেতে বালীচক ষ্টেশনে নেমে বাসে করে দশ মাইল সবং পর্য্যন্ত আসতে হয়। তারপর হাঁটাপথে গন্তব্যস্থানে পৌছতে মাইল দুয়েক লাগে জানা ছিল বলেই কেষ্ট জামা-কাপড় সব-কিছু একটা বিছানার মধ্যে বেঁধে নিয়েছিল। ট্রেণ বাস ছেড়ে বিছানা কাঁধে করে হাঁটতে হাঁটতে কেষ্ট সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ কিশোরপুর এসে পৌছয়। কেষ্ট যে আসবে চিঠি দিয়ে তা আগে জানায়নি। গ্রামে পৌছে ব্রজদুলাল বাবুর নাম করতেই সকলে বাড়ী চিনিয়ে দিলে। কেষ্ট যে এভাবে আসতে পারে শ্যামা কোনদিনই আশা করেনি। বেরিয়ে এসে প্রণাম করে টানতে টানতে কেষ্টকে ঘরে নিয়ে যায়।

—সত্যি কাকু, তুমি এসেছ. আমি যে কি খুসী হয়েছি!

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, ব্রজদুলাল কোথায়?

—ছেলে পড়াতে গেছেন। এখুনি আসবেন। উনি আমাদের বাড়ীর সকলের কথা খুব জিজ্ঞেস করেন। কেউ একবারও এল না।

—সে কি, দাদা আসেনি?

—বাবা, মা কেউ না। তুমিই প্রথম।

দুটি ছোট ছেলে ঝগড়া করতে করতে ঘরে ঢোকে, শ্যামার সংগে অপরিচিত একজনকে দেখে চুপ করে যায়।

শ্যামা বলে, এ দুটি আমার ছেলে। ওরে তোদের দাদু হয়, প্রণাম কর।

বলামাত্র ছেলে দুটি ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করে কেষ্টকে, কেষ্ট ব্যস্ত হয়ে বলে, বিছানাটা খুলি দাঁড়া। এদের জন্যে জামা, কাপড়, খেলনা এনেছি। জামা গায়ে হয় কি না দেখ তো—

ছেলে দুটি উৎসাহ ভরে কেষ্টর সংগে বিছানা খুলতে লেগে যায়। কেষ্ট ছোট ছোট সার্ট-প্যান্ট বার করে বলে, পরে দেখ তো তোমাদের হয় কি না।

বাচ্চা দুটো সেইখানেই উদোম হয়ে সার্ট-প্যান্ট পরতে থাকে। কেষ্ট শাড়ী-ধুতিগুলো শ্যামার হাতে দিয়ে বলে—এগুলো তোদের।

জিনিষগুলো নিতে গিয়ে শ্যামার চোখে জল এসে যায়। বলে, কাকু, তুমি আমার মুখ রেখেছ।

দাদা যে পুজোর তত্ত্বও পাঠায় নি সে কথা বুঝতে কেষ্টর দেরী হয় না। বলে, আমার কোটের পকেটে লজেন্স আছে, ওদের দিয়ে দে।

ছেলে দুটি সহজেই কেষ্টর ভক্ত হয়ে পড়ে। জামা পরে বলে, দেখুন কেমন দেখাচ্ছে।

কেষ্ট দেখে বলে, জামাগুলো আন্দাজ করে এনেছিলাম, বেশ গায়ে হয়েছে তো!

ব্রজদুলাল বাড়ী ফিরতে আসর আরও জমে উঠল। কোলা-কুলি করে বললে, কেষ্ট বাবু, আপনার কথা শ্যামার মুখে সব সময় শুনি। আলাপ করবার খুব ইচ্ছে ছিল।

শ্যামা এগিয়ে এসে বলে, দেখ না, কাকু কত জিনিষ এনেছে।

ব্রজদুলাল মৃদুস্বরে বলে, এ সব আবার কেন? লৌকিকতা আমার ভাল লাগে না।

কেষ্ট বাধা দেয়, লৌকিকতা কি বলছো, পুজোর সময় শ্যামার জন্যে শাড়ী দেব না?

—একশ' বার দেবেন, কিন্তু আমার জন্যে কেন?

শ্যামা বলে, কাকু এই এল, আর তুমি বক্তৃতা শুরু করলে?

ব্রজদুলাল হেসে ফেলে, না না বক্তৃতা দিইনি। তুমি কাকুকে বেশ কিছু দিন ধরে রাখ।

কেষ্ট আপত্তি জানায়, না, না, এই বেস্পতি বারেই আমায় যেতে হবে।

শ্যামা জোর দিয়ে বলে, ছাড়লে তো। এক মাসের আগে তুমি এক পা নড়তে পারবে না। ছেলে দুটিকে ডেকে বলে, মিধু, কিটু, তোরা খবর্দ্দার দাদুকে ছাড়িস না।

বলামাত্রই তারা দু'জন এগিয়ে এসে পল্টনের মত কেষ্টর হাত দুটো চেপে ধরে: এক সংগে চেঁচামিচি করে, আমরা গোরা পল্টন, কিছুতেই তোমায় ছাড়ব না।

তাদের কথার ভঙ্গীতে কেষ্ট, শ্যামা, ব্রজদুলাল তিন জনেই জোরে হেসে ওঠে।

কেষ্ট যেদিন কিশোরপুর গেল, সেই দিনই গৌরীর ষ্টুডিওতে যাবার কথা। বিনোদ সোমবার দুপুরে এসে গৌরীকে নিয়ে ষ্টুডিওতে গেছে। সেখানে বেশী সময় লাগেনি, খান কয়েক ছবি তুলে আর গলার স্বর পরীক্ষা করে বেলারাণী তাদের ছুটি দিয়েছে। তবু সন্ধ্যে না হতেই গৌরী বাড়ী ফিরে আসে। বিনোদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তার সঙ্গে যায় না। বলে, আজকের দিনটা সাবধানে থাকি। কাল থেকে তো ফাঁকা আছি।

বিনোদ গৌরীর হাতটা ধরে বলে, তাহলে কিন্তু কাল ভোরেই আসব।

উত্তরে গৌরী বলে, সে তোমার যা খুসী।

বারান্দায় চিনু দাঁড়িয়েছিল। বিনোদের গাড়ী থেকে গৌরীকে নেমে আসতে দেখল, তবু কোন কথা বলে না। গৌরী নিজে থেকে বলে, জিজ্ঞেস করলি না কোথায় গিয়েছিলাম?

চিনু ঠোঁট ওলটায়; আমার কি দরকার।

—আয়, ঘরের ভেতর আয়।

—না থাক। অনেক কাজ বাকী।

—কেন, ঘরে কর্ত্তা আছে নাকি?

চিনু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, না।

আর কোন কথা না বাড়িয়ে গৌরী ঘরের মধ্যে ঢোকে! একবার ভাবে, বিনোদের সঙ্গে থাকলেই ভাল হত। একলা-একলা এ ঘরে কাঁহাতক বসে থাকবো। আবার রান্না করতে হবে, খেতে হবে, ভাবতেই বিশ্রী লাগে। শুধু এইটুকুই আনন্দ যে কাল থেকে সে যেখানে খুসী যেতে পারে, যতক্ষণ খুসী থাকতে পারে। এ তিন দিন কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবার নেই।

কেষ্টর একটা পাঞ্জাবী পেরেকে ঝুলছিল। পকেটের কাছে ছিঁড়ে গেছে, গৌরী সেটা নিয়ে সেলাই করতে বসে। মনে পড়ল তার বাবার কথা। এমনি করে সে তাঁর জামা সেলাই করে দিয়েছে। কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি দেশে টোল চালাতেন। এতটুকু পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না। অথচ কি নিদারুণ কষ্টে তাঁর শেষ জীবনটা কাটল! চোখের সামনে গৌরীর মার মৃত্যু দেখে কেমন যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। সে ভাবেও হয়ত দিন কেটে যেত যদি না দেশ ভাগ হবার পর বিধর্ম্মীরা এসে বাড়ীর গৃহদেবতাকে অশুদ্ধ করার চেষ্টা করত। তিনি নিজে হাতে নারায়ণকে জলে ফেলে দেন। সেই দিন থেকেই বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেন। ক'দিন বাদেই তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল নদীর ধারে, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। পুরোন কথা ভাবতে গিয়ে গৌরীর গা ছমছম করে ওঠে। বাবার কথা ভাবলে এখন তাঁর শেষ জীবনের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলোই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই জন্যে গ্রামের কথা, শৈশবের কথা সে জোর করে সরিয়ে রাখে। রাজেনের কথা এখনও তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ছেলেটা তাকে দিয়েছিল অনেক। কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত! গৌরীর ভাইকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। তাই উপায় থাকলেও তার অসুখের সময় কিছু সাহায্য করেনি। তা না হলে গৌরীও হয়ত ভাসতে ভাসতে এতদূর চলে আসত না!

কেষ্টর কথা মনে হতেই গৌরী অস্বস্তি বোধ করে। মানুষটা অসৎ, কোন দিন সত্যি কথা বলে না। মুখোস খসে না পড়লে গৌরী কোন দিন ভাবতে পারত না যাকে সে একদিন দেবতা বলে ডেকেছিল সে এতখানি নীচ হতে পারে! অথচ একথাও সত্যি, গৌরীর প্রতি সে কোন দিন অসদ্ব্যবহার করেনি। এমন কি তার জন্যে স্বার্থত্যাগও করেছে যথেষ্ট। তা না হলে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ভাগ করল কেন? গৌরীর নিজেকে অসহায় মনে হয়। সে কেষ্টকে ঘৃণা করতে চায়, মনে-প্রাণে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, কিন্তু পারে না। এ না পারার কারণ যে কি তা অনেক বিচার করেও গৌরী স্পষ্ট বুঝতে পারে না। তবে একথা সত্যি, কোথা থেকে কৃতজ্ঞতার ক্ষীণ সুর বেজে ওঠে, যাকে উপেক্ষা করবার সাধ্য তার নেই।

রাত্রে আর গৌরীর রান্না করা হল না। ঘরে যা সামান্য মিষ্টি ছিল তাই দিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়ে।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গৌরীর নিজেকে খুব হাল্কা মনে হয়। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পা ধুয়ে তৈরী হয়ে নেয়। বিনোদ কখন এসে পড়বে তার ঠিক কি! চায়ের জল চাপিয়েছিল কিন্তু খাওয়া হল না, তার আগেই বিনোদের গাড়ী এসে পড়ে। গৌরী ছুটে এসে বলে, আমি কিন্তু এখনও চা খাইনি, দু'মিনিট সময় দাও তো খেয়ে নিই।

—কিচ্ছু দরকার নেই, চল, আমার সঙ্গে সব কিছু আছে।

গৌরী আর দ্বিধা করল না, যদিও বুঝলো চিনু জানালার পর্দা ফাঁক করে সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তবু ইচ্ছে করে হাসতে হাসতে সামনের দরজা খুলে বিনোদের পাশে গিয়ে বসলো।

গাড়ী ছুটলো জোরে, হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে। গৌরী জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছি আমরা ?

—চল না।

—আমার যে খিদে পেয়েছে।

—এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে খাবো।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো বিরাট বাগানের মধ্যে।

—বাঃ, সুন্দর তো, কা'দের বাগান ?

—সকলের, যারা বেড়াতে আসে।

ছায়া দেখে বিনোদ জায়গা ঠিক করলো, দু'জনে মিলে ধরাধরি করে গাড়ী থেকে খাবার নামিয়ে আনে।

—এ কি করেছ। এত খাবার কে খাবে ?

—আমরা।

—আমরা কি রাক্ষস ?

কথা বলতে বলতে তারা বিলাতী দোকানের ছোট ছোট কাগজের বাক্স খুলে কেক প্যাটি বার করে খেতে সুরু করে। বিনোদ নিজেকে ঘাসের উপর এলিয়ে দিয়ে বলে, কত দিন বাদে এখানে এলাম। এর নাম বোটানিক্যাল গার্ডেন।

কেষ্টদা' একদিন এখানে আনবে বলেছিল।

—গাড়ী না থাকলে এসে কোন লাভ হয় না।

সারা দুপুর কোথা দিয়ে কেটে গেল গৌরী বুঝতে পারেনি। মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়িয়েছে, কখনও হেঁটে, কখনও গাড়ীতে, কত ফুল কত গাছ, কি সুন্দর পুকুর ! বেলা চারটে নাগাদ বিনোদ বলে, চল ফেরা যাক।

—না আর একটু থাকি।

—চল, বিকেলে একটা সিনেমায় যাবো।

—একদিনে সব করলে ফুরিয়ে যাবে যে।

—উপায় কি, তিন দিনের তো মেয়াদ, তার পর তো আবার জেলখানা।

বিনোদের পার্কসার্কাসের বাড়ীতে তারা সন্ধ্যার সময় এসে পৌছাল। উপরের ঘরে গৌরীকে নিয়ে গিয়ে বিনোদ বললে, তুমি শাড়ী বদলে নাও, আমি চান করে নিচ্ছি।

—এখানে শাড়ী কোথায় পাবো ?

—ডান দিকের দেরাজটা খুলে দেখো। বলে বিনোদ ঘর থেকে চলে যায়।

গৌরী দেরাজ খুলে দেখে, একটা বড় কাগজের প্যাকেট, তার উপর গৌরীর নাম লেখা ভেতরে তিনটে সুন্দর শাড়ী। হাত দিয়েই বোঝে খুব দামী সিল্ক। তাড়াতাড়ি দরজা ভেজিয়ে, লাল শাড়ীটা পরে ফেলে আয়নার সামনে নিজেকে দেখতে অবাক লাগে !

বিনোদ এসে দরজায় ধাক্কা না দিলে গৌরীর খেয়াল হত না। তবু আরও আধ ঘণ্টা লাগে গৌরীর সেজেগুজে বেরুতে। সত্যিই তাকে ভালো দেখাচ্ছিলো। বিনোদ বলে, কেমন মানিয়েছে বল ত ? গৌরী আরক্ত মুখে মাথা নীচু করে থাকে।

সিনেমা দেখে ওরা গেল দোকানে খেতে, সেখানেও খুব হৈ-হৈ করে কাটলো, একসময় গৌরী বললে, এত দামী শাড়ী পরে আমি কিন্তু বাড়ী ফিরতে পারবো না। শাড়ী বদলে তারপর যাবো।

—তোমার যা ইচ্ছে।

—সাড়ে ন'টা বাজে, চল এবার যাওয়া যাক। তোমার বাড়ী হয়ে বেহালা ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

—তাতে কি হয়েছে।

—বাবা ! চিন্ময়ী দেবী আছেন যে, নোট বই-এ টাইম টুকে রাখবেন।

—ওকে একটা শাড়ী দিয়ে দিও, খুশী হয়ে যাবে।

পার্কসার্কাসের বাড়ীতে ফিরে এসে বিনোদ লম্বা হয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে। গৌরী মৃদুস্বরে বলে, তুমি উঠে পাশের ঘরে যাও, আমি এবার কাপড় ছেড়ে নি।

বিনোদ হাই তোলে, আমি আর পারছি না উঠতে।

—আঃ, রাত হয়ে যাচ্ছে।

বিনোদ গৌরীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে, গৌরী, শোন।

—কি ?

—এখানে এসো।

—লক্ষ্মীটি, আমি কাপড়টা ছেড়ে নিই, তারপর আসছি।

বিনোদ আবদারের সুরে বলে, এস না, তাহলেই আমি ঘর থেকে চলে যাবো।

অগত্যা গৌরী বিনোদের কাছে আসে, বিনোদ বলে বস।

গৌরী খাটের উপর বসতেই বিনোদ তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে, গৌরী ক্ষীণস্বরে বলে, ছেড়ে দাও, রাত হয়ে যাবে।

—তাতে কি হয়েছে, একটা রাত তো ?

—গৌরী আর প্রতিবাদ করতে পারে না, বিহ্বল হয়ে যায়, দেহের যে এতখানি আকর্ষণ আছে তা সে আগে কোন দিন উপলব্ধি করেনি। নিজেকে অসহায় ভাবে বিনোদের কাছে ধরা দেয়। তারই মধ্যে একবার গৌরী জিজ্ঞেস করে, আর কখন বাড়ী ফিরবো।

বিনোদ ধীরস্বরে বলে, আজ ফিরতে হবে না।

—সে কি ?

—কি হয়েছে। খুব ভোরে তোমায় পৌছে দিয়ে আসবো, কেউ জানতে পারবে না।

সেদিন রাত্রে যে গৌরী বাড়ী ফেরেনি, সত্যিই তা কেউ বুঝতে পারেনি। এমন কি চিনুও না। পরদিন দেখা হতে গৌরীকে বলেছিলো, কাল সারা দিন দেখা হয়নি, খুব ঘুরেছিস বুঝি ?

—তা ঘুরেছি বৈ কি।

—ভালো। চিনু আর কোন কথা বলে না, আজ-কাল ও গৌরীকে এড়িয়ে চলতে চায় যতদূর সম্ভব।

গৌরীর সাহস এতে বেড়েছে বৈ কমেনি। বিনোদের সঙ্গে দেখা হতেই বলেছিলো, কেউ বুঝতে পারেনি।

—সে আমি জানতাম।

—আজ কিন্তু আর নয়। যদি ধরা পড়ে যাই ?

—পড়বে কেন ? একটু থেমে বলে, সত্যি আমি আর একলা থাকতে পারছি না গৌরী !

এর পর থেকে রোজই বিনোদ গৌরীকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সারা দিন সারা রাত কাটিয়ে ভোরবেলা বাড়ীর কাছে ছেড়ে দিয়ে

গেছে। এর মধ্যে কিসের যেন এক উন্মাদনা আছে। গৌরী কিছুতেই বিনোদকে বাধা দিতে পারে না।

ইতিমধ্যে কেষ্টর একটা চিঠি এসেছিল, ক'দিন আসতে তার আরও দেরী হবে। শ্যামা কিছুতেই ছাড়ছে না। বিনোদ মন্তব্য করে, শ্যামা একেবারে না ছাড়লেই তো ভালো।

গৌরী মৃদু স্বরে বলে, অন্তত দিন কয়েক তো ধরে রাখুন।

—তার পর ?

—এলে তো একদিন বোঝাপাড়া হবেই।

এরই মধ্যে একদিন বেলারাণীর বাড়ী প্রভাতের সঙ্গে দেখা। গৌরী একটা পার্ট পেয়েছে ছবিতে কাজ করার জন্য। গৌরী আজ লাল শাড়ীর সঙ্গে কালো ব্লাউজ পরে সুন্দর সেজে এসেছে। বেলারাণী তারিফ করে বলে, বা: সুন্দর দেখাচ্ছে! বিনোদ, এ তো তোমার পছন্দ করা দেখছি।

বিনোদ হাসে, তোমার অজানা আর কি!

ড্রইংরুমে বসে তারা গল্প করছিলো। এমন সময় প্রভাত এসে হাজির। হাত তুলে নমস্কার করে বলে, কাল জগদীশপুরে যাচ্ছি, তা দেখা করতে এলাম।

বেলারাণী চেষ্টা করে হাসে, কালই ?

—হাঁ।

—কবে ফিরছেন ?

—এক মাস বাদে।

—তার পরই বিয়ে, বেশ আছেন। আপনারা বসুন, আমি চা আনতে বলি।

বেলারাণী উঠে গেলে প্রভাত বিনোদের সঙ্গে আলাপ করে। আপনার কি খবর বিনোদ বাবু!

—ভালোই।

—ছবি কেমন উঠছে।

—বেলা তো সারাক্ষণই আপনার তারিফ করছে। ছবি ভালো উঠলে নাকি আপনারই লেখার কৃতিত্ব।

প্রভাত জোরে হেসে ওঠে। তাই নাকি ?

এতক্ষণে গৌরীর দিকে তার নজর পড়ে, নিখুঁত সাজে প্রথমে তাকে চিনতে পারিনি। এখন জিগ্যেস করে, ভালো আছেন ?

গৌরী মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—কেষ্ট কোথায় গেছে ?

—কিশোরপুর, শ্যামার কাছে।

—কবে ফিরবে ?

—ঠিক নেই।

বেলারাণী ফিরে আসে। খানিকক্ষণ মামুলি কথাবার্তা হয়। প্রভাতের যাবার সময় হলে বেলারাণী তাকে নিয়ে বাইরের দরজার কাছে এসে কথা বলে। পার তো চিঠি দিও।

—দেবো, অরুণাকেও দিতে বলবো।

বেলারাণী অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাটকের রিহার্সাল বিনোদের কোন বাড়ীতে হ'ত। পার্কসার্কাসে কি ?

—হাঁ, কেন ?

—গৌরীর সঙ্গে বিনোদের ঐখানেই আলাপ।

—যত দূর মনে হয়, কেন ?

—পরে বলবো। গৌরীকে মুক্তার পার্টে দিলাম।

—পারবে ?

—বুঝতে পারছি না, তবে চেষ্টা আছে, তাছাড়া বিনোদের তদ্বির। আমি টাকা দেবো না বলেছি। ঐ বোধ হয় দেবে আমার নাম করে। হাঁ কার কি ভাবছো ?

প্রভাত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, না কিছু না, চলি।

প্রভাত চলে গেলে, বেলারাণী আবার বিনোদের সঙ্গে যোগ দেয়।

[ক্রমশঃ।

জীবন-ক্ষুধা

বন্দে আলী মিয়া

আমার যাত্রা-পথ ছায়াহীন ধূসর বিজন—
অজানা শঙ্কা জাগে—একা-একা নিঃসঙ্গ জীবন।
বন্ধুর-পথে চলি—পদে পদে কণ্টক আঘাত,
চলেছি অনাদি লোকে—কোথা মোর উদয় প্রভাত!

নিঠুর নিয়তি হাসে—প্রদোষের ম্লানিমা ঘনায়,
আমার প্রবাস দ্বীপ কাঁদিতেছে উত্তরী বায়।
সিন্ধু-শকুনি ওড়ে, ফুঁসিতেছে সাগরের জল
রাত্রির প্রহর শেষে শুনিতেছি জন-কোলাহল।

আমার যাত্রা-পথে দিকে দিকে জাগে মহাকাশ—
জানি না কোথায় কাঁদে যৌবনের ক্ষুধিত পিয়াস!
আমার দিনের পাত্রে জমিয়াছে আঁখির আসব
রাতের শিয়রে আছে প্রেমহীন বিস্মৃতির শব।

এখনো প্রাণের শিখা জ্বলিতেছে তন্দ্রাবিহীন,
তিমির বিদারি আজো কার বাঁশী জাগে রাত্রি-দিন!
আমার পথের প্রান্তে উদ্যত-ফণা কালনাগ
বিষে তার নীল হলো প্রভাতের ভৈরবী রাগ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

দিল্লীর প্রাক্তন রাজা নামে অভিহিত মহম্মদ বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যে কয়টি অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহার প্রথমটি—

তিনি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পেন্সনভোগী হইয়াও ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবর ১৮৫৭ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে সেনাবাহিনীর সুবেদার মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও অনেককে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বহু অখ্যাত সৈনিক এবং কর্ম্মচারীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন এবং যথোপযুক্ত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সব প্রমাণ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও আমি এই বিচার-সভায় উপস্থাপিত করিয়া আপনাদের ক্লান্তি আনিতে চাহি না। কেবল যে সব প্রমাণ নথীভুক্ত হইয়াছে সেইগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

এই বিচার-সভায় অভিযুক্ত মহম্মদ বাহাদুর শাহ কি ভাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পেন্সনভোগী হইয়াছেন তাহার বিবরণ মিষ্টার সণ্ডার্স (অস্থায়ী কমিশনার এবং লেফটনাণ্ট গভর্ণরের এজেণ্ট) ব্যক্ত করিয়াছেন। অভিযুক্ত বাহাদুর শাহের পিতামহ শাহ আলম ১৮০৩ সালে যখন মহারাষ্ট্র বাহিনীর হস্তে বন্দী হইয়া অসহায় জীবন-যাপন করিতেছিলেন, তখন তিনি বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় এবং সেই দিন হইতেই দিল্লীর সম্রাট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পেন্সনভোগী প্রজা বলিয়া গণ্য হন। সুতরাং এই রাজবংশের সাম্প্রতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বৃটিশ কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করা হয় নাই এবং বৃটিশের নিকট হইতে তাঁহারা এ যাবৎ উপকারই পাইয়া আসিতেছেন। বন্দীর পিতামহ শাহ আলম সে সময় কেবল যে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন তাহা নয়, মহারাষ্ট্র বাহিনী কর্ত্তৃক তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছিল, যতদূর অবমাননা সহ্য করা যাইতে পারে, তাহার অনেক বেশী তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং যথেষ্ট অমর্য্যাদার সহিত তাঁহাকে বন্দি-জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। সেই সময় লর্ড লেকের নেতৃত্বে ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে, অমর্য্যাদা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে এবং তাঁহার পদমর্য্যাদা অনুযায়ী তাঁহাকে পেন্সন এবং হৃতগৌরবের অধিকারী হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। সেই গৌরব পেন্সন এবং পদমর্য্যাদা এই বন্দী তিন-পুরুষ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, অবশেষে আখ্যানোক্ত সর্পের মত তিনি ফণা বিস্তার করিয়া যাহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, তাহাদেরই দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং যাহাতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায় সেই ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার সেনাবিভাগের সুবেদার মহম্মদ বখত খাঁকে নিজের হাতে যে পত্র তিনি লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই পত্র আমি এই আদালতে দাখিল করিলাম—

"বিশিষ্ট কর্ম্মাধ্যক্ষ মহিমান্বিত মহম্মদ বখত খাঁর প্রতি—

আমাদের শুভেচ্ছা জানিবে। নিমক হইতে আগত সৈন্যদল আলাপুরে পৌছিয়াছে কিন্তু তাহাদের মানপত্র সব এখানেই রহিয়াছে। সে কারণ তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি অবিলম্বে দুই শত সৈন্য এবং পাঁচ কিম্বা সাত দল পদাতিক লইয়া তাহাদের মানপত্র, তাঁবু, রসদ ইত্যাদি সমস্ত আলাপুরে নির্বিঘ্নে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। ইদগার নিকট যে সব অবিশ্বাসীর দল সমবেত হইয়াছে তাহারা যেন কোনমতেই অগ্রসর হইতে না পারে। সৈন্যদল যদি বিজয়ী হইয়া ফিরিতে না পারে বা তাহাদের যুদ্ধ উপকরণের কোনরূপ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তাহার ফল যে কিরূপ ভয়াবহ হইবে সে কথা স্মরণ রাখিবে। এ বিষয়ে তোমাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। এই আদেশ যেন বিশেষ ভাবে প্রতিপালিত হয়।"

এ চিঠিতে কোনও তারিখ নাই, কিন্তু চিঠিখানিতে লিখিত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায় যে, বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই এই পত্র লিখিত হইয়াছিল।

বন্দী এই আদালতে তাঁহার যে লিখিত ভাষণ দিয়াছেন তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, তিনি ঘটনাচক্রে পড়িয়াই বিদ্রোহ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে কোনও সংবাদই পান নাই। বিদ্রোহী সেনানীরা তাঁহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টিত করে এবং তিনি নিজের জীবন বিপন্ন মনে করিয়া নিজের মহলে চলিয়া যান। বিদ্রোহী সৈন্যরা স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলকেই বন্দী করে, সে সময় তিনি উপর্য্যুপরি দুইবার তাহাদের অনেক অনুরোধ করিয়া সেই সব বন্দীদের জীবন রক্ষা করেন। তৃতীয় বারে তাঁহার অনুরোধ, অনুনয় সব ব্যর্থ হয়, বিদ্রোহীরা তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াই তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশের বিরুদ্ধে সেই সব অসহায় নরনারীর হত্যা সাধন করে।

বন্দীর এ উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহার

কথার সমর্থনে কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। বরং তাঁহার লিখিত যে সব আদেশলিপি পাওয়া গিয়েছে, তাহাতে তাঁহার বর্ণনার অসত্যতাই প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজের পক্ষ সমর্থনে তিনি সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নিজের যে কোনও ক্ষমতাই ছিল না এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। নিজের স্বাক্ষর বা নিজের শীলমোহরকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না, সেজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, বাধ্য হইয়াই তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং তাঁহার বিনা অনুমতিতেই তাঁহার শীলমোহরের ছাপ চিঠির উপর অঙ্কিত হইতেছে।

কিন্তু বন্দী যদি অসহায় হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরে যাওয়া এবং পুনরায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসা তাহার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইল? তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা জোর করিয়া কিম্বা তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে হুমায়ুন-সমাধিভবনে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু সেখান হইতে তাঁহার ফিরিয়া আসা কিরূপে সম্ভব হইল? তাঁহার জবানবন্দীতে তিনি বলিয়াছেন যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা যখন ইতস্তত ঘোরাফেরা করিতেছিল তখন আমি সুযোগ পাইয়া প্রাসাদের জানালা দিয়া বাহিরে আসিয়া হুমায়ুনের সমাধি-ভবনে চলিয়া গেলাম।

বিদ্রোহী সৈন্যদের কবল হইতে যদি তিনি মুক্ত হইতে চাহিতেন তাহা হইলে দিল্লী-প্রাসাদে থাকাই তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল। যাই হোক, তাঁহার জবানবন্দীর প্রতি ছত্র লইয়া আলোচনা করার অভিপ্রায় আমার নাই। তাঁহার প্রতি আনীত অভিযোগের প্রথম দফা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আমি অতঃপর অভিযোগের দ্বিতীয় দফা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বন্দী বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ—১৮৫৭ সালের ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের বিভিন্ন সময়ে বন্দী তাঁর পুত্র মির্জ্জা মোগল—তিনিও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের একজন প্রজা—এবং দিল্লী ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বহু লোক সকলেই বৃটিশ গভর্ণমেন্টের প্রজা—তাহাদের গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত এবং যথোপযুক্ত সাহায্য করিয়াছিলেন।

এ অভিযোগ সম্বন্ধে প্রমাণ ও চিঠিপত্র এত বেশী সংখ্যায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে যে, তাহার সবগুলি লইয়া আলোচনা করা সম্ভব নয়।

তখনকার সংবাদপত্রগুলিতে প্রচার হইয়াছিল যে, মির্জ্জা মোগল প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সেই পদের উপযুক্ত পরিচ্ছদ উপহার পাইয়াছেন। জনশ্রুতির কথা ছাড়িয়া দিলেও অসংখ্য চিঠিপত্র হইতে দেখা যায় যে, পুত্র মির্জ্জা মোগল তাঁহার

পিতা বাহাদুর শাহের পরেই দিল্লীর বিদ্রোহিগণের নেতা। উদাহরণস্বরূপ কেবল একখানি মাত্র পত্র নজফগড়ের দারোগা মৌলভী মহম্মদ জহর আলি লিখিত—এই বিচারসভায় পেশ করিব।

পত্রখানি এই :—

"সম্রাট ! জগতের আশ্রয় সমীপে—

সম্রাটের আদেশ নজফগড়ের সমুদয় ঠাকুর, চৌধুরী, কানুনগো ও পাটোয়ারীদের পরিষ্কার ভাবে জানানো হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে উচিত ব্যবস্থা সবই করা হইয়াছে। সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে এবং তাহাদের বলা হইয়াছে যে তাহাদের বেতন এই জেলার রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে। এই ব্যাপারে নিয়োজিত কয়েক জন গাজী যতক্ষণ উপস্থিত না হইতেছেন ততক্ষণ এই অধীন ভৃত্যের বিবরণ হয়তো বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না। এই অধীন গোলামের আরও নিবেদন এই যে, লাগলি, কাকরৌলা, দাচাউ কালান এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা ফলাফলের কথা বিবেচনা না করিয়াই লুঠপাঠ আরম্ভ করিয়াছে।"

এই একখানি চিঠি হইতেই বন্দীর বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় অভিযোগ আনীত হইয়াছে অর্থাৎ বন্দী তাঁহার পুত্র মির্জ্জা মোগল এবং দিল্লী ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বহু লোককে বিদ্রোহে প্ররোচিত করিয়াছিলেন—তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া যায়।

উপরোক্ত ঐ পত্রের উপর বন্দী স্বহস্তে তাঁহার পুত্র মির্জ্জা মোগলকে লিখিত আদেশ দিতেছেন যে, একদল সৈন্য অবিলম্বে নজফগড়ে পাঠানো হউক এবং তাহারা দরখাস্তকারীকে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহের কাজে সাহায্য করুক।

আরও একখানি পত্র সম্প্রতি আমার হাতে আসিয়াছে। এখানি এই আদালতে ইতিপূর্ব্বে দাখিল করা হয় নাই, কিন্তু এখন আপনাদের সমক্ষে ইহা পাঠ করাই ভাল। এই চিঠিখানি ১২ই জুলাই তারিখে খুরজপুরার নবাবের পুত্র আমীর আলি কর্তৃক লিখিত—

"হে সম্রাট, পৃথিবীর আশ্রয়—

অধীনের নিবেদন যে, সে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়াছে যে দরবারে স্বয়ং দরিয়ুম দ্বারীর কার্য্য করিতে গর্ব্ববোধ করিতে পারিতেন। এই অধীন সম্রাটের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও দ্বিধা বোধ করে না এবং সম্রাটের আবাসভূমি—যেখানে স্বর্গের দূতেরা সর্ব্বদা দ্বাররক্ষা করিতেছে, সেইখানে ঘৃণিত ইংরাজেরা যুদ্ধসজ্জা করিতেছে দেখিয়া অধীন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীতে আলো দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই অধীন ভৃত্য সিংহের ন্যায় যুদ্ধে অগ্রসর হইবার শিক্ষাই পাইয়াছে, শৃগালের ন্যায় পলায়নের শিক্ষা পায় নাই।

"সুতরাং যদি সম্রাটের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই দীন ভৃত্যকে যুদ্ধচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিন দিনের মধ্যেই শ্বেতচর্ম্মধারী ভাগ্যহতদের নির্ম্মূল করিয়া দিতে পারে।"

এই দরখাস্তের উপর বন্দী পেন্সিলে স্বহস্তে লিখিয়াছেন, মির্জ্জা জহুরুদ্দিন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দরখাস্তকারীকে নিযুক্ত করিবেন।

বন্দী বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ :—তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রজা হইয়াও রাজ-আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া বিশ্বাসঘাতকরূপে ১৮৫৭ সালের ১১ই মে তারিখে নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন এবং সেই দিনই অন্যায়ভাবে দিল্লী সহর অধিকার করেন। ইহা ছাড়া ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিজের পুত্র মির্জ্জা মোগল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও বহু বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্রধারী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নিয়োজিত করেন।

বন্দী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পেনসনভোগী, এ কথা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগের আলোচনার সময় বলা হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বন্দীকে বা তাঁহার পরিবারস্থ কাহারও প্রতি কোনও অসৎ আচরণ করেন নাই বরং তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান ঘটাইয়া পেনসন ও বহুবিধ সুবিধার আকারে বহু লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি আমরা দেখিতেছি, যাহাদের নিকট উপকৃত সেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকেই উচ্ছেদ করিবার জন্য বিশ্বাসঘাতকের মত এই বন্দী অগ্রসর হইয়াছেন।

গোলযোগের প্রথম দিনে অপরাহ্ণেই তিনি বিদ্রোহী সেনাদলের আনুগত্য গ্রহণ করেন দেওয়ানী খাসে। তাহাদের মাথার উপর হাত রাখিয়া নিজেও তাহাদের দলভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। এ দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। তাঁহার ন্যায় একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া, ন্যুব্জ দেহে সম্রাটের ভূমিকায় এত বড় লোমহর্ষণ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করিয়াছেন! মানুষের অন্তঃকরণে বিবেক বলিয়া যে বস্তু আছে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিসর্জন দিয়া যে সব নরহন্তার দল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তিনি তাহাদের মধ্যমণি হইয়াছিলেন।

তিনি নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহার বহু প্রত্যক্ষদর্শী আছে। বন্দীর উকিল স্বীকার করিয়াছেন যে, ১১ই মে তারিখেই তিনি সম্রাটরূপে ঘোষিত হন। গোলাপ নামা একজন রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে, সেই দিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বত্র ঘোষণা করা হয় যে, এখন হইতে এই বন্দীরই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। চুনী নামা আর এক ব্যক্তি বলে যে, ১১ই তারিখের মধ্যরাত্রে কুড়িটি তোপধ্বনি সে তাহার বাড়ী হইতে শুনিয়াছিল এবং তাহার পরদিন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় যে, সাম্রাজ্য এখন তাঁহার হাতেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি সেই দিনই অন্যায় ভাবে দিল্লী সহর অধিকার করেন। এ সম্বন্ধে বলিবার বা প্রমাণ দেখাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাইবে।

অভিযোগের পরবর্ত্তী অংশ—এই বন্দী ১০ই মে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে তাঁহার পুত্র মির্জ্জা মোগল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ বখত খাঁ এবং আরও বহু বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং অস্ত্রধারী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন।

মির্জ্জা মোগল প্রকাশ্য ভাবেই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং

এই উপলক্ষে কয়েক দিন পরেই এক রাজকীয় শোভাযাত্রা বাহির হয়। এ ব্যাপারের একজন প্রত্যক্ষদর্শী চুনীলাল সাক্ষ্য দিয়াছে। কিন্তু ঠিক কোন তারিখে ঐ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল তাহা সে বলিতে পারে নাই। এই নিয়োগের পরেই মির্জ্জা মোগল যুদ্ধ ব্যাপারে সর্ব্বাধিনায়ক হইয়া ওঠেন। তার পর সৈন্যাধ্যক্ষ বখত খাঁ উপস্থিত হইলে তিনিই প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান শাসক পদে নিয়োজিত হন। (Commander-in-Chief and Lord Governor General) তাঁহার আগমনের তারিখ ১লা জুলাই। তাঁহার আগমনে মির্জ্জা মোগল অসন্তুষ্ট হন। কারণ, ১৭ই জুলাই তারিখে তিনি একখানি পত্রে তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছেন যে, সহরের বাহিরে ইংরাজদের আক্রমণ করিবার জন্য তিনি সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন, এমন সময় বখত খাঁ তাহাদের অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন এবং জানান যে তাঁহার আদেশ ব্যতীত সৈন্যেরা যেন অগ্রসর না হয়। তাহার ফলে সেই সেনাবাহিনীকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই ঘটনা বিবৃত করিয়া মির্জ্জা মোগল জানাইয়াছেন যে, এরূপ আচরণে যে কোনও ব্যক্তি নিজেকে অপমানিত বোধ করেন, সুতরাং পরিষ্কার ভাবে আদেশ দেওয়া হোক যে সৈন্যবাহিনীর প্রকৃত অধিনায়ক কে।

এই পত্রের উপর সম্রাটের কোনও লিখিত আদেশ দেখা যায় না, তবে ১৮ই তারিখেই দেখা যায় যে, মির্জ্জা মোগল এবং বখত খাঁ উভয়েই একযোগে মিলিত হইয়াছেন। ১১শে তারিখে একখানি চিঠিতে মির্জ্জা মোগল তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছেন, "গত কল্য হইতে আমাদের আক্রমণের সমস্ত বন্দোবস্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। দিনে বা রাত্রে আমরা আক্রমণ করিতে পারি। আলাপুর অঞ্চল হইতে আমরা যদি সাহায্য পাই তাহা হইলে ঈশ্বরের কৃপায় এবং সম্রাটের মহিমায় আমাদের জয় নিশ্চিত। সে কারণ আমার প্রার্থনা যে সাহায্য পাঠাইবার জন্য বেরিলির সৈন্যাধ্যক্ষকে সম্রাটের নিকট হইতে আদেশ দেওয়া হউক। তিনি তাঁহার সৈন্যগণ লইয়া আলাপুরের দিকে অগ্রসর হউন এবং সেই দিক হইতে অধিবাসীদের আক্রমণ করুন। আপনার এই ভৃত্য এদিক হইতে আক্রমণ করিবে এবং এই উভয় দল দুই এক দিনের মধ্যেই নরকের কীটদের নরকে পাঠাইতে সক্ষম হইবে। আলাপুরগামী সৈন্যদল শত্রুর রসদ বন্ধ করিয়া দিতেও পারিবে।"

এই পত্রের উপর সম্রাটের স্বহস্ত-লিখিত আদেশ আছে—"মির্জ্জা মোগল যেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাহা করিবেন। আরও একটি আদেশ সেই পত্রে দেখা যায়। সম্ভবতঃ তাহা মির্জ্জা মোগলের দ্বারা লিখিত—বেরিলির সৈন্যাধ্যক্ষকে আদেশ দেওয়া হউক।"

আমার বিবেচনায় তিন জনের একত্র হইয়া ষড়যন্ত্র করা এবং একমত হওয়ার এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে আরও দু' খানি পত্র আমি এই আদালতে পেশ করিতে চাই। একখানি মহম্মদ বখত খাঁর একটি ঘোষণাপত্র—ইহার তারিখ ১২ই জুলাই। ইহাতে লিখিত আছে—

"জায়গীরদার, বৃত্তিভোগী এবং নিষ্কর সম্পত্তি-ভোগীদের এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, যদি দেখা যায় যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন অথবা তাহাদের নিকট কোনরূপ সংবাদ সরবরাহ করিয়া বা জিনিষপত্র দিয়া কোনও ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্ষমা করা হইবে না। এই ঘোষণাপত্র দ্বারা তাঁহাদের জানানো যাইতেছে যে, তাঁহারা এই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন যে যখন সম্পূর্ণ ভাবে আমরা জয়ী হইব তখন তাঁহাদের সমুদয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ ভাবে ফেরত দেওয়া হইবে (অবশ্য নিজ নিজ স্বত্ব সংক্রান্ত দলিলাদি দেখাইতে হইবে) এবং যদি বর্ত্তমান গোলযোগের আগে তাঁহারা কোনোরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। এই ঘোষণাপত্রের পরেও যদি প্রমাণিত হয় যে কোনও ব্যক্তি ইংরাজদের নিকট কোনও সংবাদ বা অন্য কোনরূপ সাহায্য পাঠাইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে। নগরের কোতোয়ালকে এতদ্দ্বারা জানানো যায় যে, তিনি প্রত্যেক জায়গীরদার বা নিষ্করভোগীর স্বাক্ষর এই ঘোষণাপত্রের পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়া ইহা মহামাননীয় সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিবেন।"

অপর পত্রখানি ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বয়ং সম্রাটের স্বাক্ষর-সম্বলিত। তাহাতে লেখা আছে—

"তোমাকে জানানো যাইতেছে যে, বাদ্যযন্ত্র দ্বারা সহরময় ঘোষণা করিবে যে ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ (জেহাদ) এবং ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই আমরা এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি। সুতরাং এই নগরে বা নগরের বাহিরে বিভিন্ন গ্রাম সমূহের সমস্ত হিন্দু মুসলমান অথবা যাঁরা হিন্দুস্থানের যে অধিবাসী আমাদের বিপক্ষে এবং ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধে সমবেত হইয়াছে তাহারা নেপালবাসী হউক বা শিখ হউক বা হিমালয়বাসী হউক, সকলেই যেন ইংরাজ বা তাহাদের কর্ম্মচারীদের বধ করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম রক্ষার সহায়তা করে। তাহাদের এই অভয়বাণী জানানো হউক যে, ইংরাজদের ভয় করিবার কোনও কারণ নাই। যে মুহূর্ত্তে তাহারা ইংরাজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া আমাদের পক্ষে যোগদান করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের সম্বন্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইবে এবং যাহাতে তাহারা নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বজায় রাখিতে পারে, তাহার সমুদয় ব্যবস্থাই করা হইবে। তাহারা ইংরাজ-শিবির হইতে লুণ্ঠন করিয়া যদি কিছু সম্পত্তি আহরণ করিয়া থাকে, তাহাও তাহারা নিজেদের অধিকারে রাখিতে পারিবে। ইহা ছাড়াও সম্রাটের নিকট হইতে যথাযোগ্য পুরস্কারও তাহারা পাইবে।"

এই পত্রখানি সম্রাটের প্রধান কোতোয়ালী হইতে অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে কোতোয়ালীর শীলমোহর দেওয়া আছে এবং সহকারী নগরপাল ভাউ সিং ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহা নৃপ-আদেশের অবিকল প্রতিলিপি। বন্দীর বিরুদ্ধে যে তৃতীয় অভিযোগটি ছিল, এই পত্রখানি যে সম্বন্ধেও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চতুর্থ অভিযোগের শেষের অংশ সম্বন্ধেও এ প্রমাণটি প্রয়োগ করা যায়। আরও বহু চিঠিপত্র আছে কিন্তু সেগুলি আমি আদালতে দাখিল করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

চতুর্থ অভিযোগের প্রতি আমি এই বিচারসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বন্দী ১৮৫৭ সালের ১৬ই মে এবং ঐ সময়ের দিল্লী-প্রাসাদের সীমানার মধ্যে ৪৯ জন খাস ইয়ুরোপীয় এবং মিশ্রিত ইয়ুরোপীয় নরনারীর নির্ম্মম হত্যাসাধনের সহায়তা করেন।

এই সব হতভাগ্য নরনারীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই। সেই বিভীষিকাময় ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এই বিচার-সভার অবিদিত নয় এবং সে ঘটনা ভুলিবারও নয়। যে পৈশাচিক

নিষ্ঠুরতার ফলে নারী এবং শিশুদেরও তরবারির মুখে আহুতি দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ধর্মচ্যুত বলা চলে না। সে কার্য্য এতই পৈশাচিক ও বীভৎস যে, বিভিন্ন স্থানে একই রকমের পৈশাচিক ঘটনা যদি না ঘটিত তাহা হইলে ইহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে মনে দ্বিধা জন্মিত। এই ভীতিপ্রদ দুর্ঘটনার উদাহরণ দেওয়াও মর্ম্মান্তিক। আমাদের দেখাইতে হইবে যে সেই ৪৯ জন হত্যাকাণ্ডের হত্যাকার্য্যের ব্যাপারে এই বন্দী কতখানি সংশ্লিষ্ট। এই সকল নারী ও শিশুদের হত্যার ব্যাপারের প্রতি ঘটনাটির সঙ্গে বন্দীর কি সম্বন্ধ ছিল, তাহারই আলোচনা করিব। তাহাদের বন্দী করা, আটক রাখা, নির্য্যাতন করা এবং অবশেষে তাহাদের চরম পরিণতির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

প্রথমেই চিকিৎসক আসানউল্লা খাঁর উক্তির প্রতি আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল এতগুলি ইংরাজ রমণী ও বালক-বালিকাদের প্রাসাদের মধ্যে আনিয়া আটক রাখা হইল কেন? তিনি উত্তরে জানাইলেন যে, বিদ্রোহীরা সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে উহাদের সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রাসাদের মধ্যে যখন তাহারা নিজেদের বাসস্থান স্থির করিয়া লয়, তখন উহাদেরও লইয়া আসে। অতঃপর তাহারা সেই সব বন্দীদের নিজেদের হেফাজতে না রাখিয়া সম্রাটের আদেশ প্রার্থনা করে। তিনি আদেশ দেন যে রন্ধনশালায় ঐ সব বন্দীদের স্থান দেওয়া হউক, কারণ সেখানে পর্য্যন্ত স্থান পাওয়া যাইবে।

এই বিচারসভার অবগতির জন্য আমি জানাইতে চাই যে, আসানউল্লার বক্তব্য জানিবার পর আমি নিজে সেই স্থানে গিয়া তাহার পর্য্যাপ্ততা পরীক্ষা করিয়াছি। স্থানটি ৪০ ফুট লম্বা, ১২ ফুট চওড়া এবং প্রায় ১০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। উহা পুরাতন, নোংরা এবং দেওয়ালের চুণ বালি বর্জ্জিত। অন্ধকার, মেঝে খারাপ, জানালা নাই এবং আলো-বাতাস যাইবারও কোন রাস্তা নাই। মিসেস এলড্‌ওয়েল এখানে বন্দী ছিলেন, তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন :—

"আমাদের সকলকে একটা অন্ধকার ঘরে রাখা হইল। সে ঘরে কোনও জানালা ছিল না। মাত্র একটি দরজা ছিল। ঘরটি মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তার উপর আমরা অনেকে একত্রে সেই ঘরে ছিলাম। সিপাহীরা মাঝে মাঝে আসিয়া আমাদের এবং ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাইত। তাহার ফলে সেই একটি মাত্র দরজাও আমাদের বন্ধ করিয়া রাখিতে হইত, তাহার ফলে আলো বা বাতাস কিছুই পাওয়া সম্ভব ছিল না। সিপাহীরা তাহাদের বন্দুক লইয়া আমাদের ভয় দেখাইয়া বলিত যে, আমরা যদি মুসলমান হইয়া বন্দিরূপে থাকিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সম্রাট আমাদের প্রাণ-ভিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু সম্রাটের খাস সেনাদল বলিত যে, আমাদের টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া কাক-চিলদের আহার্য্যে পরিণত করা হইবে। আমাদের কদর্য্য আহার দেওয়া হইত, তবে দুইবার সম্রাট আমাদের জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"

এই বন্দী এবং তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর তিনি দিয়াছেন বটে! একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, এই বন্দী পরিবারস্থ মহিলাগণ যেখানে থাকেন সেখানে বহু লোকের আশ্রয় অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারে এবং তাঁহার প্রাসাদ মধ্যে এমন সব গুপ্ত গৃহ আছে যেখানে পাঁচ শত নরনারীকে নিরাপদে রাখা যাইতে পারে এবং যে সব স্থানে বিদ্রোহীরা প্রবেশ করিতে সাহস করে না। আর একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে, বন্দীর প্রাসাদদুর্গে এমন বহু ঘর আছে যেখানে ঐ সব রমণী ও শিশুদের বেশ ভাল ভাবেই রাখা যাইতে পারিত। কিন্তু এই বন্দী সে সব কিছুই করেন নাই। ইংরাজ নরনারী ও শিশুগুলির জন্য এমন স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যেখানে শৃগাল-কুকুরেও থাকিতে ঘৃণা বোধ করে। বহু টাকা পেনসন, রাজপ্রাসাদে অবস্থান এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বদান্যতার উপযুক্ত প্রতিদানই এই বন্দী দিয়াছেন! আসানউল্লা খাঁ এবং মিসেস এলডয়েল উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে এই সব ব্যবস্থার জন্য দায়ী এই বন্দী স্বয়ং।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অতি সামান্য সামান্য ব্যাপারের জন্য তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং তাহাই প্রত্যেকটিতে তিনি স্বহস্তে আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত ব্যাপার যে তাঁহার প্রত্যক্ষ আদেশ অনুযায়ী ঘটিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আলোচ্য ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি যে, তিনি স্বয়ং বন্দিশালা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। হতভাগ্য বন্দিনীদের উপর সতর্ক প্রহরী নিয়োজিত যাহারা ছিল, তাহারা সম্রাটের নিজেরই লোক। তাহাদের যে খাদ্য দেওয়া হইত তাহাও সম্রাটের নির্দ্দেশেই দেওয়া হইত; এমন কি মাত্র দুই বার অপেক্ষাকৃত ভাল খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনিই করিয়াছেন। প্রহরিগণ বন্দিনীদের বার বার বলিয়াছে যে, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সম্রাট তাহাদের মার্জ্জনা করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন এই যে, এমন একটি ঘটনাও কি দেখা গিয়াছে—যাহাতে এই বন্দী ঐ সব নর-নারীর প্রতি একটু সদয় ব্যবহারের উদাহরণ দেখাইয়াছেন বা তাহাদের রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? মোটেই না। ঐ সব নারী ও শিশুদের জন্য তিলে তিলে নির্ম্মম মৃত্যু, নয়তো তরবারির আঘাতে মৃত্যু, ইহা ভিন্ন অন্য কোন গতিই ছিল না।

আমার মনে হয়, এই বন্দীর সম্বন্ধে এই আদালত কি রায় দেন, তাহা জানিবার জন্য এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করা উচিত। প্রমাণের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। গোলাপ নামা এক চাপরাশী বলিয়াছে যে, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবার দুই দিন পূর্ব্বেই সে জানিতে পারিয়াছিল যে উহাদের হত্যা করা হইবে এবং সেদিন বহু লোক ঐ নির্ম্মম কাণ্ড দেখিবার জন্য রাজপ্রাসাদে সমবেত হইয়াছিল। আরও অনেক সাক্ষী এই কথা সমর্থন করিয়াছে। এমন কি, সকাল আটটা হইতে ন'টার মধ্যে যে এই নরমেধ যজ্ঞ করা হইবে সে সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। জনসাধারণ বা সৈন্যমণ্ডলী সহসা বিক্ষুব্ধ হওয়ায় যে এই ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা নয়। সাক্ষী বলিয়াছেন যে, স্বয়ং সম্রাট অথবা মির্জ্জা মোগল এই উভয়ের মধ্যে একজনের আদেশ ব্যতীত এই নির্ম্মম কাণ্ড কিছুতেই হইতে পারিত না। সাক্ষী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, ইউরোপীয় বন্দীদের

একত্র দাঁড় করাইয়া তাহাদের চারি দিকে সম্রাটের সৈন্যরা বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহীদলের সৈন্যরাও ছিল, সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনীর সৈন্যরাও ছিল। হঠাৎ এক সময়ে সকলে নিজ নিজ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া এবং ক্রমান্বয়ে বন্দীদের নির্বিচারে হত্যা করিতে লাগিল।

সংবাদ সরবরাহকারী চুনীলালকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে কাহার আদেশে এই পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে? তিনি বলেন যে, একমাত্র সম্রাট ছাড়া আর কেহই এরূপ আদেশ দিতে পারেন না। আর একজন সাক্ষী বলিয়াছেন যে এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে প্রাসাদের ছাদ হইতে মির্জ্জা মোগল এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন।

সম্রাটের আদেশেই এই নির্ম্মম কার্য্য করা হয় এবং মির্জ্জা মোগল ইহার অন্যতম দর্শক ছিলেন, এ কথা সম্রাটের কর্ম্মচারী মুকুন্দলালও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিন দিন যাবৎ এই সব বন্দীদের সংগ্রহ করা হয়। মির্জ্জা মোগল কয়েক জন সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে সম্রাটের নিকট আসিয়া ইহাদের হত্যা করিবার আদেশ প্রার্থনা করেন। সম্রাট তখন মহালের মধ্য ছিলেন। মির্জ্জা মোগল এবং বসন্ত আলি খাঁ মহালের ভিতর যান। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন এবং বসন্ত খাঁ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, বন্দীদের হত্যা করিবার আদেশ সম্রাট দিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে রাজসভার দিনলিপি বা ডায়েরী আরও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সম্বন্ধে আসানউল্লা খাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে রাজসভায় কি নিয়মিত ভাবে দিনলিপি রাখা হয়? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, হ্যাঁ, হয়। বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজসভার দিনলিপি প্রত্যহই লেখা হইয়া থাকে। তখন দিনলিপির একখানি পৃষ্ঠা তাঁহাকে দেখানো হইলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহই রাজসভার দিনলিপি লিখিয়া থাকে ইহা তাহারই হস্তাক্ষর এবং ইহা সেই দিনলিপিরই একখানি পৃষ্ঠা।

১৬ই মে ১৮৫৭ তারিখের ডায়েরীর অনুবাদ আমি পাঠ করিতেছি—

দেওয়ানী খাসে সম্রাট দরবার আহ্বান করিলেন। ৪১ জন ইংরাজ বন্দী হইয়াছেন; সৈন্যরা প্রার্থনা করিল যে তাহাদের হাতে ঐ সব বন্দীদের সমর্পণ করা হউক। সম্রাট তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া বলিলেন, সেনাবাহিনী উহাদের সম্বন্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। বন্দীরা তখন তরবারির আঘাতে নিহত হইল। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

যে সব মৌখিক এবং লিখিত প্রমাণগুলি এই বিচারসভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। বন্দীর আত্মপক্ষ সমর্থনে যে লিখিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি মিথ্যার জাল বোনা হইয়াছে মাত্র এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব সাংঘাতিক প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। চতুর্থ অভিযোগের শেষ অংশ সম্বন্ধে এইবার আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

এ বিষয়ে আমি মাত্র তিনখানি পত্রের প্রতি এই বিচারসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তিনখানি পত্রই এই বন্দী কর্ত্তৃক লিখিত। একখানি লিখিত হইয়াছে কচ্ছভোজের শাসনকর্ত্তা রাওভারাকে, আর একখানি যশলমীরের অধিপতি রণজিৎ সিংকে তৃতীয়খানির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জম্মু কাশ্মীরের রাজা গুলাব সিং।

রাওভারাকে লিখিত পত্রখানি এইরূপ—

আমার কাছে সংবাদ আসিয়াছে যে, চিরবিশ্বস্ত তুমি তোমার অধিকার সীমার মধ্যে সমস্ত অধিবাসীদের তরবারির মুখে আহুতি দিয়া তোমার অধিকৃত রাজ্য কলঙ্কমুক্ত করিয়াছ। তোমার এই পত্রে তোমাকে সম্মান জানানো হইতেছে। তোমার রাজ্যের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করিবে যাহাতে ঈশ্বরের ভক্তগণ যেন কোনরূপে লাঞ্ছিত বা অপদস্থ না হয়। অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও লোক যদি সমুদ্রপথে তোমার রাজ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধ্বংস করিবে। ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদন রহিল।

যশলমীরের অধিপতি রণজিৎ সিংকে লিখিত দ্বিতীয় পত্রখানি—

আমাদের বিশ্বাস যে তোমার রাজ্যের মধ্যে অবিশ্বাসী ইংরাজ সম্প্রদায়ের এক প্রাণীও বর্ত্তমানে নাই। যদি লুক্কায়িত ভাবে কিম্বা পলাতকরূপে কেহ এখনও থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে হত্যা করিবে। তারপর তোমার রাজ্য পরিচালনার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোমার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তোমাকে আমাদের বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া তোমার পদমর্য্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। [ক্রমশঃ।

সমকালীন

শ্রীতারক সেন

যে গাছের কোলে মাটির মমতা নাই
নয়নের জলে সূর্য নিরুত্তাপ।
ছলনা যে তার মুকুলের বাসনাই
ভরেছে হৃদয় হলুদের গুটিকায়।

তবু সাধ কেন এ হৃদয়ে খোঁজে ঠাঁই
শত বসন্তে সাধ আমার অনুতাপ।
যে গাছের কোলে মাটির মমতা নাই
নয়নের জলে সূর্য নিরুত্তাপ।

অপরূপা

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

১

সোনালী ছোপ পড়েছে পাতায়-পাতায়। বাসন্তী রোদ কুহক-তুলি বুলিয়ে দিয়েছে বন-বনানী-প্রান্তরে। পশ্চিম আকাশে রঙের খেলা। নীলসাগরের ও-পাশটায় তরল সোনার সঙ্গে দুধে-আলতা মিশিয়ে ঢেলে দিয়েছে কোন এক যাদুকর! সূর্য নেমেছে পশ্চিম-পাটে। পাহাড়ের কোলে ফাল্গুনী সন্ধ্যার পূর্বাভাস।

সুজাতার ডাকে চমকে উঠে মণীশ। স্বপ্নে সে ডুবে আছে। সে পড়ছে ইতিহাস; ইতিহাসের পাতা উল্টে যাচ্ছে মণীশ। পাতার পর পাতা স্মৃতির খাতা খুলে যাচ্ছে। বৃদ্ধ রহমন দারোগার করুণ আবেগে ছিন্ন হয়ে গেছে স্মৃতির যবনিকা। অতীতের কলকাকলি শুনতে পাচ্ছে সে। প্রত্যেকটি ধূলিকণা যেন কথা কইছে। গাছপালা ও লতাপাতার মধ্যে অগুনতি চেনা-অচেনা মুখ উঁকি-ঝুঁকি মারছে। সুজাতাও রয়েছে তাদের মাঝে।

হারিয়ে-যাওয়া অতীতে, ফেলে-আসা কৈশোরে ফিরে গেছে মণীশ। কি আশ্চর্য! তাদের মধ্যে নিজেকেও দেখছে মণীশ। কিন্তু এ মণীশে আর সে মণীশে কত তফাৎ! অবাক হয়ে নিজের কিশোর প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। আপন মনে হাসে মণীশ। না, না, শুধু কৈশোর নয়, হামাগুড়ি-দেওয়া শিশুজীবন থেকে যৌবন পর্যন্ত সব ছবিই তার চোখের সামনে।

সুজাতার ডাকে হকচকিয়ে উঠে মণীশ। বিহ্বল স্বপ্নভরা তার দৃষ্টি। তার মনে হল, সামনের রক্তকরবী গাছটা হঠাৎ সুজাতার মূর্তি ধরে এগিয়ে এসেছে। কিশোরী সুজাতার দীপ্ত ভঙ্গী এখনও তার চোখে লেগে রয়েছে। এ কি? কিশোরী সুজাতা রূপ পালটাচ্ছে! লাজনম্রা কৌতুকময়ী কিশোরীর মধ্যে এল যৌবনের আবেশ! উদ্ভিন্নযৌবনা সুজাতার চোখের ভাষা পাঠ করছিল সে। এমন সময় রূঢ় বাস্তব এসে আঘাত করলে। তারপর বিস্মৃতির অন্ধকার। সে অন্ধকারের কালো পর্দা সরিয়ে দিয়ে এ কোন্ সুজাতা দাঁড়াল এসে তার পাশে? বিস্মিত হয় মণীশ। সে কি স্বপ্ন দেখছিল?

সুজাতা বললে,—এ কি মণীশদা'! চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কখন্ চা দিয়ে গেছি!

দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা। যৌবন যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সুজাতার মাঝে। দীপ্ত শান্তি তার চোখে-মুখে। মৃদু হাসি সুজাতার মুখে। মণীশের খেয়ালই নেই। এতক্ষণ স্বপ্নে বিভোর ছিল সে। সে দেখছিল কুড়ি বছর আগেকার সেই সুজাতাকে। ছিপছিপে পাতলা গড়ন, তীক্ষ্ণ চোখ, দীপ্ত মুখশ্রী; কোঁকড়ান এলো চুলের রাশি বাতাসে উড়ছে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম প্রভাতের সেই উন্মাদনার চিত্র! কানে তার ভেসে আসছে,—বন্দে মাতরম্, আল্লাহ আকবর; পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে, তবুও এগিয়ে আসছে স্বেচ্ছাসৈনিকের দল। সুরথ আর নাসিরের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল সুজাতা। রক্ত দেখে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। সুরথের বোন সুজাতা। রহমন দারোগার ছেলে নাসির। কি জানি কেন, সুজাতার মাথা কোলে নিয়ে বসেছিল মণীশ।

কিশোর জীবনের স্বপ্নছবি। সুজাতাকে এত দিন দূর থেকেই দেখেছে মণীশ। সংকোচও ছিল তার বেশী। সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে মিশতে তার বাধত। সুজাতাও থাকত দূরে দূরে। কিন্তু সেদিন থেকে এ ব্যবধান দূর হয়ে গেল। সর্বেশ্বর মাষ্টারের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল মণীশ। আধপাগলা সর্বেশ্বর; কিন্তু তাঁকে সবাই ভয় করে চলত। সেই ভয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধাও মিশ্রিত ছিল। আর বিশদ অর্থে তাঁর পরিবারের কোঠা শূন্যই ছিল। সুরথ, সুজাতা আর আধাবুড়ী এক আয়া বাতাসী দিদিকে নিয়েই তাঁর সংসার। সুরথের অভাব ঘুচাল মণীশ। তারপর কত কি ঘটে গেল। সংকোচ ও লজ্জা আসে মণীশের মনে। উদ্গত যৌবনের স্বপ্ন! কৈশোর থেকে দুজনের পদক্ষেপ যৌবনের পথে।

তারপর অঘটন ঘটে গেল। প্রথম যৌবনের স্বপ্ন গেল ভেঙে। দু'জনের মধ্যে রচিত হল দূর ব্যবধান,—কুড়ি বছরের বিস্মৃতি আজ কেটে গেছে। নূতন সুজাতা দাঁড়িয়ে তার সামনে; গাম্ভীর্য এসে গেছে; উচ্ছলতা আর নেই। সর্বেশ্বর সুরথ আর বাতাসী আজ পরপারে। সুজাতাই এ ঘরে কর্ত্রী. কিন্তু আজও সর্বেশ্বর মাষ্টারের ঘরখানি তেমনি শূন্য। শূন্যতার অভিশাপ দিয়ে গেছেন সর্বেশ্বর মাষ্টার। সুজাতার জীবনেও শূন্যতা; কিন্তু সে শূন্যতা ভরে দিচ্ছে পাহাড়ী বালক-বালিকা। সুজাতার সঙ্গী আজ বাতাসীর বদলে চন্দনা,—পাহাড়ী মেয়ে। আর সর্বেশ্বরের স্থান নিয়েছেন রহমন দারোগা।

সুজাতার কথায় রূঢ় বাস্তবে ফিরে আসে মণীশ। হাসিমুখে সুজাতা বলছে,—তোমার সে আনমনা ভাবটা আজো গেল না মণীশদা'! কি আশ্চর্য মানুষ তুমি!

মণীশ উত্তর দেয়,—বোধ হয় যায়নি সুজাতা! কিন্তু তোমার দেখছি সবই গিয়েছে।

সুজাতা বলে,—না, না, আমার কোন কিছুই যায়নি মণীশদা'। সবই বেঁধে রেখেছি আমি। হারানো দিনগুলো বেঁধে রেখেছি, দেখতে পাচ্ছ না?

মণীশ সুজাতার মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার মুখে কোন উত্তর জোগায় না। সুজাতার কথাবার্তা তার কাছে

হেঁয়ালির মতই ঠেকে। নূতন করে দেখছে মণীশ ; পুরাতন তার কাছে নূতন হয়ে ধরা দিয়েছে। সুজাতার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তবুও মনে হয়, দু'জনের সেই যোগসূত্রটা ছিন্ন হয়ে যায়নি। সেই সূত্রই তাকে টেনে এনেছে। সুজাতা তার শূন্যতা পূরণ করেনি। সে কি শুধু মণীশেরই জন্যে ?

মণীশকে চুপ করে থাকতে দেখে সুজাতা বলে উঠে,—কি ভাবছ, মণীশদা' ! আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারনি। আমি সত্য কথাই বলেছি।

মণীশ উত্তর দেয়,—বুঝেছি সুজাতা। তবুও মনে হয় একটা বড় কাজে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছ তুমি। ঐ সব পাড়াগাঁ ছেলে-মেয়েদের গড়ে তোলার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছ। তুমি মহৎ কাজ করছ সুজাতা !

এবার সুজাতা হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর সে বলল,—কি বললে ? মহৎ কাজ ? নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া নয় মণীশদা' ! নিজেকে ভুলে থাকা বলতে পার। আর কেন এমন হল, তা তুমি নিজেই জানো।

মণীশ চমকে উঠল। তার অন্তরের তারগুলো যেন সুজাতার কথায় কেঁপে উঠল। পুলক-অনুভূতি বিহ্বল করে তুলল মণীশকে। আবেগ ভরে মণীশ বললে,—আমি এতটা ভাবতে পারিনি সুজাতা !

সুজাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়—যাক ঐ সব কথা। কুড়ি বছর আগেকার দিনে আর আমরা কেউই ফিরে যেতে পারব না। তুমি আজ অতিথি ; দু'দিন পরেই আবার চলে যাচ্ছ।

মণীশ বলে,—বিশ্বাস করো সুজাতা, আবার ফিরে আসব আমি।

সুজাতা কৌতুকের হাসি হাসে,—আবার ? নিশ্চয়ই আবার কুড়ি বছর পরে ?

মণীশ লজ্জিত হয়। সে উত্তর দেয়,—না, তুমি বিশ্বাস করো, আর ফিরে যাবার ইচ্ছাও আমার নেই।

সুজাতা বলে,—বুঝেছি মণীশদা' ! যাদের ছেড়ে যাও, তাদের ভুলে থাকার অসাধারণ শক্তি তোমার আছে। কিন্তু দোহাই তোমার, আর নতুন করে এ খেলা খেলতে যেও না।

মণীশ উত্তর দেয়,—ভুল বুঝেছ সুজাতা ! আমার সে খেলা, খেলবার সঙ্গী এখনও জুটেনি আর।

সুজাতার মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে ; তার মধ্যেও দেখা যায় পুলক-শিহরণ। সে শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়,—তুমি ভুল করেছ মণীশদা' ! কেন এ ভুল করলে ?

সুজাতাকে নূতন মূর্তিতে দেখলে মণীশ। বিষণ্ণ প্রশান্তি নেমে আসে মণীশের চোখে-মুখে। তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ফেলে-আসা অতীতের দিনগুলি জল-জল করে স্মৃতির পাতায়। মণীশ ভাবে, তাদের দু'জনের জীবনই ব্যর্থ হয়ে গেছে। অতীতকে ভুলে যায়নি সুজাতা। অতীতকে আঁকড়েই রয়েছে সে। কিন্তু মণীশ অতীতকে আঁকড়ে থাকেনি। সেই দারুণ আঘাতের পর এদিকে আর মুখ ফেরায়নি। দু'জনের জীবনধারায়ও তফাৎ রয়েছে। মিলনের পথে এসেছিল বাধা ; আজ সে বাধা সত্যই কি কেটে গেছে ?

সুজাতার কপালের উপরের দিকটায় হঠাৎ মণীশের চোখ পড়ল। এই যে, সুজাতার কপালের দাগটা এখনও মুছে যায়নি ! কিসের সাক্ষ্য দিচ্ছে ওটা ? মণীশকেই বিদ্রূপ করছে। তাকে বাঁচাতে গিয়েই সুজাতার মাথায় আঘাত লেগেছিল। মণীশকে লক্ষ্য করেই লাঠি ছুড়েছিল পুলিশ। চোখের পলকে সুজাতা তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। পালিয়ে গিয়েছিল মণীশ। কিন্তু সুজাতা সেদিন ছাপ কেটেছিল তার হৃদয়-ফলকে। বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে মণীশ আজ আবিষ্কার করলে,—সে ছাপ আজও মুছে যায়নি। আধপাগলা সর্বেশ্বর মাষ্টার যে এত কঠোর হতে পারেন, তা মণীশ ভাবতেও পারেনি। সে দিন অভিমান করেছিল সে। ভেবেছিল সুজাতাই এর জন্য দায়ী। সর্বেশ্বর সাবধান করে দিয়েছিলেন ; সুজাতাও সরে গিয়েছিল তার চোখের সামনে থেকে।

সুজাতাও অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকে ; তার মনেও কি তোলপাড় উঠেছে। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর সুজাতাই বলে উঠে,—এত ভাবছ কেন মণীশদা' ! সে সুজাতা মরে গেছে।

মণীশ বললে,—না। তোমায় দেখে আজ আমার ভুল ভেঙে গেছে। বিস্মৃতির অতল থেকে আমিও নতুন করে আমাকে পেয়েছি সুজাতা ! সেদিন ভুলই করেছিলাম।

সুজাতা হেসে হেসে উত্তর দেয়,—সে আবার কি রকম মণীশদা' ।

মণীশ বলে,—তোমায় আমি বুঝাতে পারব না। কুড়ি বছর আগে আমিই ভুল করেছিলাম। কিন্তু তুমি ভুল করনি ; আঁকড়ে রয়েছ সেই পুরাতনকে। আলেয়ার পেছনে তুমি ছুটোনি।

সুজাতা কৌতুকভরে বলে,—কোন দরকার হয়নি মণীশদা' !

মণীশ বলে, এটাই একটা মস্ত বড় কাজ। আর আমি ছুটেছি আলেয়ার পেছনে। ধরতে পারিনি। শুধু হোঁচট খেয়ে খেয়ে মরেছি।

সুজাতা বলে,—তার মাঝেও আনন্দ আছে মণীশদা'। সে আনন্দ দেয় নতুনের সন্ধান। আলেয়ার পেছনে ছুটেই মানুষ আজ গুহা থেকে নগরে এসে পৌঁছেছে।

মণীশ তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে—তাতে কি মানুষ শান্তি পেয়েছে সুজাতা ? শুধু মত্ততার নেশা মানুষকে পাগল করে তুলেছে।

সুজাতা জবাব দেয়,—তাহলে বলতে চাও, আবার গিরিগুহার আদিম জীবনে ফিরে যাবে মানুষ ?

মণীশ বলে,—গেলে ভালই হ'ত সুজাতা ! সহজ সরল জীবনই ভাল। জড়তা মানুষকে মাতাল করে তুলেছে, ধ্বংসের পথে চলেছে মানুষ।

সুজাতা জবাব দেয়—সহজ সরল জীবন বলতে তুমি কি বলতে চাও মণীশদা' ? আমার তো মনে হয়, সবই মনের ব্যাপার।

মণীশ বলে,—না। তোমার এ কথাটা স্বীকার করতে পারলাম না। আমরাই আমাদের অভাব বাড়িয়ে চলেছি। আড়ম্বর ছেড়ে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারছি না বলেই আমরা সুখী হতে পারছি না।

—মণীশদা', তোমার একথাটা সত্যি হলেও মানতে পারছি না।

—কেন সুজাতা ?

—বুঝতেই পার, সভ্যজীবনের সঙ্গে মনের জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

—তা সত্যি বটে। কিন্তু মন তো নিজের ইচ্ছায় চলে না, আমরাই তাকে চালাই। তুমি কি বলতে চাও, এই বনের মানুষগুলি মনের সুখে আছে?

—নিশ্চয়ই। বাগানে ফুল ফুটিয়ে যে আনন্দ সে আনন্দ এরা পাচ্ছে। এ আনন্দের সঙ্গে মাতালের মত্ততার তুলনা করা চলে না। তুমি এই পাহাড়ের কোলে এই সরল মানুষদের নিয়ে সেই আনন্দই পাচ্ছ। তা না হলে অতীতের বোঝা তোমাকে চেপে ধরত। বল, সত্যি বলছি কি না?

সুজাতার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—থাক ও-সব কথা। কিছু বোঝাতে পারব না মণীশদা'! মানুষের মনটা দেখা এত সহজ নয়। সুখই বল, আর শান্তিই বল, সবই মনের চাওয়া আর পাওয়ার উপর নির্ভর করে।

—কিন্তু পরিবেশই বেশী কাজ করে সুজাতা! আজ বুঝতে পারছি তোমার মত পরিবেশে থাকলে মনের হাহাকারও শান্ত হয়ে যেত। নগর-বন্দর হাহাকারেরই কারখানা।

মণীশের কথায় সুজাতা হেসে জবাব দেয়,—সবই ঠিক মণীশদা'! একথাটা ভেবে আজ কোন লাভ নেই। দু'দিনের অতিথি হয়ে এসেছ, আমাদের তো একেবারে ভুলেই গিয়েছিলে। রহমন সাহেবের সঙ্গে দেখা না হলে আমাদের মত জংলী পাহাড়ীদের মনেই পড়ত। বড় লোক শম্ভুদা'র আস্তানা থেকেই চলে যেতে।

মণীশ উত্তর দেয়,—না, না।

সুজাত বললে,—যাক, তোমার যে চা খাওয়া হোল না। একটু বস, আমি চা নিয়ে আসছি।

সুজাতা চলে গেল। তার কথা শুনে মণীশের মুখে হাসির সঙ্গে লজ্জাও দেখা দিয়েছিল। তার সে হাসি বিদ্রূপের মতই লাগল মণীশের কাছে। সুজাতার কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু সত্যিই কি মণীশ তাদের ভুলে গিয়েছিল? না না, সর্বেশ্বরের পথ তার কাছে দুষ্কর মনে হয়েছিল সেদিন। নিজের ভবিষ্যৎ ভুলে গিয়ে এই পাহাড়ী বুনো মানুষদের নিয়ে থাকতে পারত না মণীশ। সে বুঝেছিল তার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যৌবনের উচ্ছলতায় সে বৃহৎ স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্নের অনেকখানি সাফল্য এসেছে আজ। তাই ফেরবার সুযোগ পেয়েছে আবার কাঞ্চনগড়ে। এ ফেরাটাও বড় আকস্মিক; এই আকস্মিকতা তাকে ফিরিয়ে নিতে চায় আবার সেই অতীতে। কিন্তু স রকম তো আর ফেরা চলে না। শৈশব, বাল্য, কৈশোর-যৌবন,—একের পর একের মৃত্যু হয়েছে।

মণীশ এসেছে জেলার সদর সহরে। এক সাহিত্য-মণ্ডল আহ্বান করেছে তাকে। যেদিন সে আহ্বান তার কাছে পৌঁছাল সেদিন অভিভূত হয়ে পড়েছিল মণীশ। কুড়ি বছর আগেকার ছবি ভেবেছিল সেদিন। সুজাতাও উঁকিঝুঁকি দিয়ে দিল মনের কোণে। তার নিজের জীবন যে শূন্যতায় ভরে উঠেছে, সে খেয়ালটাও তার ছিল না। সেদিনের সে আহ্বান আঘাত দিয়েছিল তার অন্তরে। সুজাতার কথা সে কল্পনা করেছিল। পল্লীবধূ, পল্লীগৃহিণী, সন্তান-জননী সুজাতার ছবি তার মনকে পীড়িত করেছিল। সুজাতা যে এমন করে নিজেকে ধরে রেখেছে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

সময় ও দূরত্বের ব্যবধান দূর হয়ে গেল। স্মৃতি-বিজড়িত তার চিরপরিচিত জন্মভূমিতে ফিরে এল মণীশ। এ কি! শম্ভুনাথ দত্ত অভ্যর্থনা করলেন তাকে! এ যে তাদের বাল্যের সেই শম্ভুদা'? কুড়ি বছর আগে এই শম্ভুদা'ই অসহযোগ আন্দোলনে পাগল হয়ে কাঞ্চনগড়ের ছেলেদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। ক্লাশ এইট পর্যন্ত উঠতেই তিন তিন বার হোঁচট খেয়ে সরস্বতীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন যে শম্ভুদা', সেই শম্ভুদা'ই এখন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন কোন যাদুমন্ত্রে! শম্ভুদা'র পিতৃ-ভক্তির চাপরাশ দীন-ভবনের জৌলুস দেখে মণীশ স্তম্ভিত হয়। শম্ভুদা'র বাবা দীননাথের কি সৌভাগ্য! শম্ভুদা'ই মণীশকে একবার কাঞ্চনগড় দেখে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। শম্ভুদা'র বাড়ীতেই সে তাঁর পল্লীভবন তারিণী-কুটিরে দু'দিনের জন্ম অতিথি হয়ে এসেছিল। অতীতের স্মৃতি পীড়ন করে মণীশকে। কী দারিদ্র্য ভোগ করেছেন শম্ভুজননী তারিণী দেবী! শম্ভুদা'র মামা বরদা উকিলের দয়ার দানেই তাদের সংসার চলত, আর শম্ভুদা' দেশের কাজে উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াত।

সেই দু'দিনের পরিক্রমা আজ দশ দিনেই মণীশের শেষ হোল না। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রহমন সাহেবের সঙ্গে। তারপর সর্বেশ্বরের আশ্রমে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেল মণীশ! কুড়ি বছর পরে সুজাতাকে এমন ভাবে দেখতে পাবে, তা সে ভাবতেও পারেনি।

সর্বেশ্বরের কথা আজ মনে পড়ল। তাঁর সত্যিকারের পরিচয় কি তখন মণীশ জানত? রহস্যময় পুরুষ ছিলেন আধপাগলা সর্বেশ্বর। কোথা থেকে এসে কাঞ্চনগড়ের এই পাহাড়ের কোলে বাসা বেঁধেছিলেন, কেউ তা জানত না। এক পাশে কাঞ্চনগড় আর এক পাশে ফুলছড়ি। দু'গাঁয়ের লোকেরাই বিস্মিত হল তাঁকে দেখে। প্রথম প্রথম তাঁকে এড়িয়ে চলত গাঁয়ের লোক। কিন্তু পাহাড়ীরা তাঁকে আপন করে নিয়েছিল। পাহাড়ীরাই তাঁকে মাষ্টারমশাই আখ্যা দিয়েছিল।

সর্বেশ্বরের কন্যা সুজাতা। পাহাড়ীদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াত। পাহাড়ীরাই ছিল সর্বেশ্বরের আপন জন। তিনি তাদের মধ্যে বিরাট পরিবর্ত্তন এনেছিলেন। পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা পাততাড়ি বগলে সকাল-সন্ধ্যায় সর্বেশ্বরের উঠোনে জড় হ'ত। তিনি তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে নূতন আলোর নেশায় মাতিয়ে তুলেছিলেন। পাহাড়ীবস্তীর চেহারা পালটে দিয়েছিলেন সর্বেশ্বর।

সর্বেশ্বরের কার্যকলাপ ভাল চোখে দেখেন নি ফুলছড়ি গ্রামের জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী। কাঞ্চনগড়ের সুলেমান রাজাও বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন,—পাগল, পাগল লোকটা। ভদ্রসমাজে মেশে না; লেখাপড়া জানে। ইংরেজী কাগজও রাখে রীতিমত। কিন্তু ওই জানোয়ারদের নিয়েই দিন-রাত মত্ত থাকে।

পাহাড়ের কোলেই সর্বেশ্বরের ঘর। সুজাতা আর সুরথ প্রথম এখানে ছিল না। তারা এল অনেক দিন পরে। দুরন্ত মেয়ে সুজাতা; তার পিঙ্গল কটা চোখে ভয়-ডর কিছুই ছিল না। স্কুলের পথেই সর্বেশ্বরের আস্তানা; আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ঢেউ-খেলানো পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে চলে গেছে। সেই পথ দিয়ে মাঝে মাঝে পাহাড়ীদের সঙ্গে ছুটে যেত সুজাতা। সেই সুজাতা আজও পাহাড়ীদের মাঝে রয়ে গেছে। [ক্রমশঃ।

সামুদ্রিক জন্তু তিমির অবদান

জলে ও স্থলে কত জীব-জন্তু রয়েছে, আসলে যারা মানুষের পরম শত্রু। কিন্তু বিজ্ঞানসিদ্ধ হাতিয়ারের সহায়তায় সেই শত্রুকেই মানুষ নিয়োজিত করে চলেছে আপন কাজে নানা ভাবে। সামুদ্রিক ভয়াবহ জীব তিমি সম্পর্কে এই কথাটি আজ বেশ জোর দিয়ে বলা যায়। এই বিরাটকায় জন্তুটি মানুষের কাছে এক কালে কী মারাত্মক ছিল কিন্তু বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে মানুষ ভয়ে একে দূরে ঠেলে রাখে নি। জলজ-জীব তিমিকে তাই দেখতে পাওয়া যায় বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে—একে অবলম্বন করে মানুষের বিচিত্র প্রয়োজন মেটাবার চলেছে চেষ্টা।

তিমি বা 'হোয়েল' সামুদ্রিক জীব হলেও মৎস্য-পর্যায়ে পড়ে না—এইটি অণ্ডজ প্রাণীই নয়, শাবক প্রসব করে। ৪০ ফুট থেকে ১০০ ফুট পর্যন্তও লম্বা হয়ে থাকে এই জন্তুটি এবং ওজনের দিক থেকে ইহা হতে পারে ১৫০ টনেরও উপর। ইহার সম্মুখ ভাগ স্থূল—মুখটি প্রকাণ্ড, অপর দিকে মস্তকের আয়তন হচ্ছে শরীরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু নাগরিক বিশেষ করে নরওয়েজীয়ানরা সমুদ্রজলে তিমি শিকারে খুব অভ্যস্ত। তিমি শিকারের দ্বারা জীবন ধারণ করে আসছে, এমন ব্যক্তি বা পরিবারের সংখ্যাও অতলান্তিকের তীরবর্তী দেশগুলোতে কম নয়।

এই বৃহদাকার জলজ-জন্তুটি কিন্তু নানা জাতীয় হয়ে থাকে। এর ভেতর 'স্পারমহোয়েল' নামে পরিচিত তিমিশ্রেণী শিকারীদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। এই শ্রেণীর তিমিগুলোর মুখজোড় ভীষণ ধরণের দাঁত দেখতে পাওয়া যায় এবং এই দাঁত দিয়েই সমুদ্রজল থেকে শিকার ধরে উদর পূর্তি করে এরা। 'স্পারমহোয়েল' ছাড়া 'রর্কোয়াল হোয়েল' নামধেয় আরও একটি শ্রেণীর তিমিও ধরা পড়তে দেখা যায় কুমেরু অঞ্চলে। এতদঞ্চলবর্তী দরিয়ায় গত বৎসর তিমি শিকারে ৮টি জাতির জাহাজ নিয়োজিত হয় এবং এই অভিযানে তিমি মারা পড়ে প্রায় ৪০ হাজার। এর পূর্ববর্তী বৎসরে বিভিন্ন শিকারকেন্দ্রে যে তিমি আটক করা হয়, সংখ্যায় উহা ৫৫ হাজারেরও বেশী।

এই প্রসঙ্গে তিমির বিভিন্নমুখী অবদানের কথা আপনিই উঠে যায়। এই ভয়াবহ ও বিরাটাকার জন্তুটির চামড়ার নীচে ৮।১০ ইঞ্চি পুরু 'ফ্যাট' বা চর্বি থাকে। শিকারীর দল তিমি শিকারের জন্য যে এতটা ব্যস্ত—এর মূলে আছে এই বহুমূল্য ও বহু প্রয়োজনীয় পদার্থটি। তিমির প্রকাণ্ড মুখগহ্বরে হাড়ের মত যে জিনিষ থাকে, সে দুটিও যথেষ্ট মূল্যবান। 'স্পারম্ হোয়েল'গুলোর মাথায় পর্য্যাপ্ত তৈল সংরক্ষিত (রিজার্ভ) থাকে এবং সেই কারণে এই তিমিগুলো ধরা হয় অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যায়। গত বৎসর এক মাত্র দক্ষিণমেরু অঞ্চলে ধৃত তিমি সমূহ থেকে তৈল পাওয়া যায় প্রায় ৪ লক্ষ টন। এর পূর্ববর্তী বৎসরেও বিশ্বের বিভিন্ন শিকার-কেন্দ্রে যে সংখ্যক তিমি শিকার হয়, এদের থেকে তৈল ('স্পারম অয়েল' সহ) নিষ্কাশিত হয়েছে ৫ লক্ষ টনেরও অধিক।

তিমির দেহ থেকে উল্লিখিতরূপ নানা উপাদান নিয়ে গবেষণা চলে আসছে বেশ কিছুকাল থেকে। একে কেন্দ্র করে বহু বড় বড় কারখানা ও শিল্পসংস্থা গড়ে উঠেছে আজ আমেরিকা ও ইউরোপের কতকগুলো দেশে। তিমিদেহ-নিঃসৃত পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে মানুষের ব্যবহার্য্য কত রকমারী পণ্য এ যুগে তৈরী হচ্ছে। তিমির তৈল থেকে উৎপাদিত মোমবাতি ('ক্যাণ্ডল') কৃত্রিম মাখন ('মার্গ্যারিন') সাবান ('সোপ') প্রভৃতি বিশ্ব-বাজারে বহুল প্রচলিত। আবার 'অ্যাম্বার গ্রিস' বা তিমি থেকে লব্ধ মোম জাতীয় দ্রব্য দিয়েও তৈরী করা হচ্ছে বহু ধরণের প্রসাধন বা বিলাস সামগ্রী।

সামুদ্রিক ভয়াবহ জন্তু তিমিকে আজ মানুষ কাজে লাগাচ্ছে উহার বিভিন্ন উপাদানের সহায়তায় ঔষধাদি প্রস্তুত করেও। 'রর্কোয়াল' শ্রেণীর তিমিগুলোর 'লিভার' বা যকৃৎ-এ 'খাদ্যপ্রাণ—ক' (ভিটামিন এ) যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলে ধরা হয়। ওসলোর রাসায়নিক গবেষণাগারে এই অমূল্য উপাদান নিষ্কাশনের ব্যবস্থা চলে আসছে বহুদিন থেকেই। ইউরোপীয় গবেষকগণ তিমিতৈলকে খাদ্যোপযোগী চর্ব্বিতে পরিণত করেছেন এবং হোটেল, রেস্তোরাঁ প্রভৃতিতেও এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তিমির মাংসও খাদ্য হিসাবে অনেক স্থলে চলতি এবং ইহার দেহাবশেষ থেকে সারও ('ফারটি লাইজার') তৈরী করা হয়ে থাকে।

আধুনিক কল-কারখানা সমূহ চালাবার ব্যাপারেও 'স্পারম' তিমির তৈলের মূল্য ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। এর ভেতর পিচ্ছিলকর উপাদান এত বেশী যে, এই দিয়ে পেট্রোলিয়ম ছাড়াও অনায়াসেই যন্ত্রপাতি চালান যায়। 'স্পারম' তৈল থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর কাজে বর্তমানে বহু কারখানা ও কোম্পানী নিযুক্ত রয়েছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় যে-টি উহার নাম হচ্ছে আর্চার ডেনিয়েলস—মিডল্যাণ্ড (মিনিয়াপোলিস)। তাঁদের দৃষ্টিতে 'স্পারম' তিমি থেকে সংগৃহীত তৈল শিল্প কাজে ব্যবহারের জন্য একটি মস্ত কাঁচা মাল।

তিমিকে কেন্দ্র করে এ যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বহু দূর

অগ্রসর হয়েছে। এই জলজ জন্তুটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন একটি আন্তর্জাতিক তিমি কমিশন। ১৭ জাতি সমন্বিত এই কমিশনের প্রধান কাজ—তিমিধরা জাহাজে যে তিমিই আটক পড়ুক, প্রথমেই সেইটি পুং জাতীয় কি স্ত্রী জাতীয়, এইটি এবং উহার বয়স ও আকৃতি, সংক্ষিপ্ত বিচিত্র বিবরণ জেনে নেওয়া। শুধু তাই নয়, এই কমিশনের তত্ত্বাবধানে ধৃত তিমির অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থায় পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। 'স্পার্ম' তিমি সমুদ্রনিম্নে ৩ হাজার ফুট পর্য্যন্ত ছুটতে পারে এবং আধ ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে সুস্থ দেহে উঠে আসতে পারে উপরের দিকে। তিমির হৃদযন্ত্র ('হার্ট') এমন কি শক্তিশালী উপাদানে গঠিত, যার জন্য এটি সম্ভব হয়। অষ্ট্রেলিয়ার একটি নৌ-গবেষক দল এ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। অপর একটি অনুরূপ গবেষক দলের নেতৃত্ব করছেন হৃদ্‌বিশেষজ্ঞ পল ডুডলে হোয়াইট। এ ধরণের মূল্যবান গবেষণা সমাপ্ত হলে অকালমৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার ব্যবস্থা হতে পারে—বিজ্ঞানীরা এই দাবীটি রাখছেন।

'স্কাইস্ক্রেপার' বা গগনচুম্বী অট্টালিকা

মানুষ সভ্যতার পথে যত এগিয়ে চলেছে—প্রশ্ন, সমস্যা ও জটিলতাও তার সম্মুখে হাজির হচ্ছে নানাবিধ এবং মাত্রার দিক থেকেও সে কম নয়। অপরাপর সমস্যার ভেতর আজিকার দিনে ভারতে তো বটেই, বিশ্বব্যাপী একটি বড় সমস্যা—গৃহসমস্যা, আবাস ভবনের সমস্যা। গুহা-গহ্বর আশ্রয় করে যে মানুষের জীবনযাত্রা হয় সুরু, বৃক্ষতল বা তপোবন ছিল এককালে যার আদর্শ বাসভূমি, আজ সে-মানুষ ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে পৃথিবীময়। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঠাঁই পাওয়ার প্রশ্ন যখন হয়ে উঠতে লাগল জটিল হতে জটিলতর, তখন থেকেই নির্ম্মাণ শুরু হলো দ্বিতল, ত্রিতল ভবন। এই ভাবে দেখা যাবে, ধাপে ধাপে এসে উপস্থিত হয়েছে বর্ত্তমান 'স্কাইস্ক্রেপার' বা গগনচুম্বী (বহুতলাবিশিষ্ট) অট্টালিকার দাবী বা প্রয়োজন।

'স্কাইস্ক্রেপার' নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য বহুকাল পূর্ব্বেই বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে আছে। নিউইয়র্কে দশ তলার উপরে অট্টালিকার সংখ্যা আজ ৪ হাজারের কম হবে না। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ভবন হিসাবে যেটি পরিচিত, সেই 'এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং'ও এই মহানগরীতেই দাঁড়িয়ে। মাটি থেকে এই বিশাল ভবনের উচ্চতা হচ্ছে ১২৫০ ফুট এবং ইহা ১০২ তলাবিশিষ্ট। ৮৬তম তলায় পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে গ্যালারী স্থাপিত আছে সেখান থেকে চতুর্দ্দিকে চোখে পড়ে থাকে ২৫ মাইল দূরত্ব পর্য্যন্ত দৃশ্যাদি।

নিউইয়র্কের ন্যায় এত বেশী সংখ্যক এবং এত উচ্চতা-সম্পন্ন 'স্কাইস্ক্রেপার' অন্যত্র আর কোথাও নির্ম্মিত হতে দেখা যায়নি। কোলকাতা ও লণ্ডনের কথা বলতে হলে—একটি মহানগরীতে ৮।১০ তলা কিম্বা ইহার চেয়েও উচ্চতাবিশিষ্ট বাড়ী যে কয়টি আছে, হাতেই গোণা যায়। আকাশস্পর্শী প্রাসাদ নির্ম্মাণের প্রসঙ্গে আমেরিকার পর নাম করতে হয় প্রধানতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার। ভূতল থেকে যতদূর সম্ভব উপর অবধি বাসা বাঁধবার যথেষ্ট উদ্যম সেদিন অবধি তার দেখা গেছে। 'স্কাইস্ক্রেপার' তালিকায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানও প্রথম পর্য্যায়ে, এইটি সুবিদিত।

কিন্তু, আজ প্রশ্ন উঠছে, 'স্কাইস্ক্রেপার' বা গগনচুম্বী (বহুতলা বিশিষ্ট) অট্টালিকা না হলেই কি আজিকার মানুষের নয়? গত বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা স্মরণ থাকায় এবং বর্ত্তমান যুদ্ধোত্তর পরমাণবিক কূচকাওয়াজের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'স্কাইস্ক্রেপার' নির্ম্মাণে নিউইয়র্ককে ছাড়িয়ে যাবার যে স্বপ্ন সেদিন অবধি মস্কোর ছিল, আজ সেইটি তার নেই। পরন্তু সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভ প্রকাশ্যে আকাশস্পর্শী ভবনের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেছেন। অন্যান্য কতক দেশে এমন কি আমেরিকাতেও এই প্রশ্নটির উপর ঊর্দ্ধতন মহলের ভাবনা শুরু হয়েছে জোর।

ক্রুশ্চেভের 'স্কাইস্ক্রেপার' বিরোধী ঘোষণার সমর্থনে প্রধান যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে—এইরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ অর্থের অপচয়ই ঘটায়—ইহা নিছক জাঁকজমকেরই পরিচায়ক। অবশ্য এইটি মস্ত বিতর্কের বিষয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু রুশিয়ায় এই থেকেই সুরু হয়ে গেছে 'স্কাইস্ক্রেপার' তোলার পরিকল্পনা। 'প্যালেস অব সোভিয়েট্‌স' বা সোভিয়েট প্রাসাদ নামে যে ভবনটি নির্ম্মিত হলে বিশ্বের দীর্ঘতম ভবন হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করত এবং তার উচ্চতা (১৪১২ ফুট) নিউইয়র্কএর প্রসিদ্ধ এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং থেকেও বেশী হবার ছিল কথা, সে দুটি অন্ততঃ ক্রুশ্চেভের আমলে রূপায়িত হলো না, ধরে লওয়া যেতে পারে।

বর্ত্তমান রকেট ও স্পুটনিকের যুগে দাঁড়িয়ে মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষও স্কাইস্ক্রেপার সম্পর্কে চিন্তাধারা পাল্টাতে সুরু করেছেন। আজ তারা 'স্কাইস্ক্রেপার' গড়ে উপরের দিকে উঠবার চেয়েও ভূনিম্নে যতদূর সম্ভব কক্ষ বিস্তারের কথাই ভাবছেন বেশী করে, ফ্রান্স ও বৃটেনের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষও গগনচুম্বী ভবন নির্ম্মাণ প্রশ্নে জল্পনা-কল্পনা করছেন অনেকটা একই ধারায়। প্যারিস পৌর পরিষদ সম্প্রতি ২০ তলা একটি ভবন নির্ম্মাণের পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এই 'স্কাইস্ক্রেপারটি' নির্ম্মিত হওয়ার কথাছিল চ্যাম্প ডু মারস্‌ এর কাছাকাছি। প্রথমই কথা হলো—লোকসংখ্যা যখন এমনি বাড়তে আরম্ভ করল যে, ভূপৃষ্ঠে সাধারণ ভবনে স্থান সঙ্কুলান সম্ভবপর নয়, তখনই 'স্কাইস্ক্রেপার' নির্ম্মিত হয় অবশ্য চিকাগো সহরে এবং সে ঠিক লোকসংখ্যার কারণে নয়। ১৮৮৪ সালে সেখানে যখন একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ তৈরীর কাজ শেষ হলো, তখন দর্শকবৃন্দ অবাক হয়ে যায়। তার পরেই নিউইয়র্ক এই ধরণের অট্টালিকা নির্ম্মাণ ব্যাপারে এগিয়ে আসে এবং বিংশ শতাব্দী আরম্ভের মুখেই গড়ে তুলল বিখ্যাত ফ্ল্যাটিরণ বিল্ডিং।

'স্কাইস্ক্রেপার' বা গগনচুম্বী অট্টালিকার স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি খুঁজে পাওয়া গেছল, আজ পরিবর্ত্তিত আন্তর্জাতিক অবস্থাধীনেও সেগুলো গভীরভাবে ভেবে দেখবার। একটি 'স্কাইস্ক্রেপার' নির্ম্মিত হলে অল্প জায়গায় বহুলোকের থাকবার ও কাজ কারবারের ব্যবস্থা অনায়াসেই হয়ে যেতে পারে, এই কারণেই অনেকে দাবী করেন জনবহুল লণ্ডন ও প্যারিস নগরীতেও বহুসংখ্যায় 'স্কাইস্ক্রেপার' গড়ে উঠা উচিত। এই প্রসঙ্গে ভারতের কোলকাতা ও অন্যান্য নগরীগুলোর কথা বলতে হয়। গৃহসমস্যা, আবাসভবনের প্রশ্ন এই দেশে খুবই জটিলতর হয়ে দেখা দিয়েছে। 'স্কাইস্ক্রেপার' বা গগনচুম্বী ভবন নির্ম্মাণ করে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে কি না, সরকারী ও বেসরকারী উভয় দিক থেকেই এইটি ভেবে দেখা দরকার।

শ্রীমতী ছবি মুখোপাধ্যায়

ঢং করে একটা ঘণ্টার ধ্বনি বেজে ওঠে। তার পরেই ঘস্-ঘস্ শব্দে চতুর্দ্দিকে বাষ্প ছড়িয়ে এঞ্জিন ষ্টীম ছাড়ে। আট নম্বর পিটটার মুখে একেবারে ডুলীটা এসে লেগে গেল চোখের পলক ফেলার অনেক আগে। পৃথিবীর কোন অন্ধকার অতল থেকে আবার উঠে এল খাঁকী পোষাকপরা ক'জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

সুশান্ত তখন কিন্তু অফিসের সিঁড়িটার উপরে দাঁড়িয়েছিল। যেন সত্যি সে বোকা হয়ে গেছে দূরে ঐ ছুটে-যাওয়া কাল রংয়ের কারটির দ্রুতগতি লক্ষ্য করে। ভাবতেই বুঝি পারছে না স্বল্প পরিচয়ের সূত্র ধরে এমন একটা পরিস্থিতি হতে পারে!

ডুলী থেকে নেমে অ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার অজিত রাহা ঘণ্টিঘরের দিকে এগুতে এগুতে সকৌতুক কণ্ঠে বলে উঠল, হরিদা আমাদের ম্যানেজার সাহেবকে কলা দেখিয়ে ব্রাউন সরে পড়েছে মোটর নিয়ে।

বহুদিনের পুরান সার্ভেয়ার বৃদ্ধ হরিহর সামন্ত রসাল কাটেন এই সুযোগটা পেয়ে—আগেই বলেছিলাম না চৌধুরী সাহেবকে, কেমন হ'ল ত এইবার? আরে বাপু আমি কি আজকের লোক, সেই তখনকার দিনে ম্যাকাস্কি সাহেবের আমল থেকে আছি, ব্রাউন সাহেবকে খুব জানি, স্বভাবই হ'ল পরের মোটর চাপা।

কিন্তু সি. এম. ই. সাহেবটিও কম নয়। ব্রাউনকে হার খাওয়ায় ছ্যাঁচড়ামীতে! দেখলেন ত', সার্ভের সময় কত বার আমাদের চেনটা টেনে পরীক্ষা করে দেখেছে মাপে কোথাও ছোট করেছি কি না। কেন, ছোট করে মেপে আমাদের কি লাভ? খাদ খুলছে প্রোপ্রাইটর, আমরা শুধু ম্যাপ অবারী কাজ করব, এতে অত হুমকী কিসের?

রাগে অপমানে হরিহরদা'র সহকারী হিসাবে ছোট সার্ভেবাবু কল্যাণ গর্জ্জে ওঠে।

কল্যাণের কথায় সায় দিয়ে এতক্ষণ পরে ইঞ্জিনীয়ার সত্যেন দাস মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, হুঁ কত বড় অডাসিটি আমার সঙ্গে বয়লার সম্বন্ধে তর্ক করে। ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে কতটুকু জানে ঐ ভোগলা পেতে কলকাতার এঁদো গলিতে নেড়েগুলোর সঙ্গে ওঠ-বস করা টিনপটিয়া সাহেব হব সাহেবটি! নিতান্ত এখানে কাজ করি বলে নইলে, ঘুঁষিয়ে ব্যাটার থ্যাবড়া নাকটা আজ শেষ করতাম। ওয়ার মার্কেটের জল্দি ফসলের মাল নই আমরা। রীতিমত শিবপুর থেকে স্কলারসিপ পাওয়া ছেলে। নইলে, অহল্যাবাঈ কোল সাপ্লাই এণ্ড কোং এতে মোটা মাইনে দিয়ে নিয়ে আসত না। কথার সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন তার সোনার জল দিয়ে প্রীতি উপহার লেখা বিয়েতে পাওয়া রূপোর সিগারেট-কেসটা খুলে সকলের দিকে এগিয়ে মনের সব গ্লানিটা যেন এতক্ষণে উদ্গীরণ করে।

অজিত রাহা সিগারেট নিতে নিতে বলে উঠল, কপালে করে খাচ্ছে নইলে কি জানে বলুন ত? আমরা যখন মাইনিং স্কুলে পড়ি তখন, প্রায়ই ত' খাদে নামতে হত। তখন প্রফেসাররা পিলার কাটিং সম্বন্ধে কত উপদেশ, কত সাবধানতার কথা আমাদের শিখিয়েছেন। কিন্তু, এই যে চার নম্বরে পিলার কাটিং হচ্ছে সেটা কি আইনসঙ্গত, না যুক্তিসঙ্গত, বলুন ত'?

হরিহর দা' তাঁর চিরকালের কাচি বিড়ির কোটা—অর্থে একটি ছোট্ট এ্যালোমিনিয়ামের কৌটো খুলে বিড়ি বার করতে করতে মৃদু হেসে বলেন, আরে বাপু, পকেট সঙ্গত ব্যাপারটা ত', তা হলেই হ'ল! এর পর তোমার কুলী মজুর যদি মরে মরবে, তাতে হব্ সাহেব গব্ সাহেবের কিছুই হবে না। কথাতেই বলে, মারাত্মক কোন রোগ থেকে বেঁচে উঠলে সেটা পিশাচ হয়। এটা ত' রোগ থেকে বাঁচেনি, গ্রেট ওয়ারের সময় বলে গানার না কি ছিল, সেখান থেকে বেঁচে এসেছে বলেই এত অর্থপিশাচ হয়েছে। টাকা দিলে সব কিছু ওকে দিয়ে করান যায়।

দুষ্টু হেসে কল্যাণ বলে: কিন্তু আমার ত' মনে হয় হরিহর দা' উপমায় কিছু ভুল করলেন। মারাত্মক রোগ থেকে বেঁচে উঠলে প্রবাদ কথা আছে যে, কোন দুঃখ আসছে তাই বেঁচে গেল এত বড় রোগ থেকে।

অজিত রাহা হরিহর দা'র পক্ষ টেনে সহাস্যে পাল্টা জবাব দেয়—এই তুলনা আগে ছিল কিন্তু, অ্যাটম বোমের যুগে উপমাকে একটু বদল করতেই হয়; সুতরাং হরিহর দা'ই রাইট।

বিড়িতে জোর একটা টান দিয়ে, খক্-খক্ করে কেশে, হরিহর দা' ঘাড় নেড়ে মন্তব্য করলেন রসাল সুরে: যুগের পরিবর্ত্তন হয়েছে বলেই ত' আজ আর হব্ সাহেব তার সেই গামছা পেতে পিঁড়ির ওপর কলাই-ওঠা সানকীতে ভাতের সঙ্গে দু'-পয়সার কুচো চিংড়ির কাঁটা খাচ্ছে না। কেমন চেহারাটা ফিরেছে দেখেছ একবার! অহল্যাবাঈ কোম্পানীকে বেশ দুয়ে আদায় করছে ব্যাটা গোখেকো।

সকলেই মেনে নেয় কথাটা। লোকটা নিতান্তই কপাল জোরে সরকারী কাজটা পেয়েছে, নইলে কোন যোগ্যতা আছে হব্ সাহেবের? একটা ক্ষোভের শ্বাস ফেলে সত্যেন দাস বলে উঠল, তখনকার

এই [illegible] সুযোগ নিয়েছে ওরা। ওয়ার কেয়ত হলেই চাকরী পাকা [illegible] এইবার কোন সুযোগ পেল না কেউ। অথচ [illegible] ওয়ার কোথায় লাগে এই ওয়ান্ত ওয়ারের কাছে। বৃটিশ চির-[illegible] আমাদের ওপর এক চাল বেশী চালিয়ে গেল, শেষ পর্য্যন্ত থাকলে কি হত কে জানে!

থাকলে এই হব সাহেব জাতীয় লোকেদের পদসেবা করতে হত। বলে অজিত রাহা হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বললে, না ব্রাউন দেখছি, সত্যি ম্যানেজার সাহেবকে বিভ্রাটে ফেললে! এখন উনি বাংলোয় ফিরবেন কি করে?

হরিহর দা' দল ভেঙ্গে সামনে এগুতে এগুতে রহস্য করেন: এখন ওঁকে বাংলোয় ফিরতে কে বলছে? মাঠে বসে বরং গাবু খেললে কাজ দেবে। জেনে-শুনে মোটর যদি দেয় তাকে বলব কি? মাইন ইন্সপেক্সশনে আসে না আসে কোথায় কার মোটরটা নিয়ে বেড়িয়ে আজ নিতে পারবে এই উদ্দেশ্যে।

মিসেস ত বলে, ওর ভয়ে গ্যারাজে তালা দিয়ে রাখে শুনেছি। বেকুলে আর পাত্তাই থাকে না, এমনি পাঁড়মাতাল বুড়ো। সত্যেন সহাস্যে ইন্ধন জুগিয়ে দেয় হরিহর দা'র কথায়।

হাতের নিঃশেষিত সিগারেটটা কল্যাণ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলে, তেমনি হয়েছে মেয়েটা, বুড়োর ওপরে যায় এককাঠি। আসানসোল আর ধানবাদ যেন জল-ভাত মেয়েটার কাছে।

ব্রাউনের মেয়ের সম্বন্ধে অজিত রাহা কি যেন আর কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে হরিহর দা' তাঁর সবুজ সুতোবাঁধা আর একটা কাচ্চি বিড়ি ধরিয়ে ক'টা কলজেফাটা টান দিয়ে হুম্‌কে উঠলেন, আরে ডোরা কি ব্রাউনের মেয়ে নাকি! ভাগিনী, ভাগনী, বড্ড ভালবাসত বোনটাকে। তোমরা তখন বোধ হয় মায়ের কোলে হামা দিচ্ছো সেই—সেই তখনকার দিনে কে না জানত উইলিয়াম সাহেবকে! মস্ত কোল-মার্চেন্ট ছিল, সেই ত ব্রাউনকে বিলেত থেকে মাইন সম্বন্ধে পাশ করিয়ে আনে ভারতে। বোনের দৌলতেই ওর ভাগ্য খুলল। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত এমন লস খেলে বিজনেসে যে, উইলিয়াম সাহেব তার বাথরুমে রিভলভারে গুলী ভরে ঠিক এমনি যায়গায় দু-দুটো গুলী দিলে বসিয়ে। বলে, তিনি ঘাড়টা পিছনে একটু কাৎ করে আঙ্গুল দিয়ে ঐ ঘন দাড়ীতে সুশোভিত থুতনীটা উঁচু করে তুলে স্থানটা নির্দেশ করেন বেশ একটি নাটকীয় ভঙ্গিতে।

সুশান্ত এই দিকেই আসছিল। কথাটা কানে না গেলেও ভঙ্গিটা দেখে হেসে ফেলে বললে, কি হল আবার আপনার দাড়িতে! ছাঁটটা ত শুনি একেবারে এডওয়ার্ডের ফটো থেকে তুলেছেন। গাঙ্গু কি নষ্ট করে দিলে ছাঁট?

হরিহর দা' দাড়িতে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাত বুলিয়ে কেশবিরল মাথাটা দুলিয়ে কৌতুকোদ্দীপক চোখ নাচিয়ে বলেন, হুঁ—নিজের হাতে ছাঁটকাট, গাঙ্গুর কাছে আমার কোন প্রয়োজনই নেই। দেখাচ্ছিলাম উইলিয়াম সাহেব কেমন দুটো গুলী বসালে থুতনীর তলায়। হ্যাঁ, সুইসাইড যদি করতে হয় অমনি করেই করা উচিত। একেবারে প্রাণবায়ু ব্রহ্মতালু ভেদ করে শূন্যে মিলিয়ে গেল। হরিহর দা' গম্ভীর ভাবে বিড়ি টানেন কথার শেষে।

প্রেত হবার আর ভয় নেই, নয় হরি দা'! হা-হা করে হেসে অজিত রাহা কথার উপর আর একটা রং বোলায়।

কিন্তু আমার ত' মনে হচ্ছে উইলিয়াম সাহেব সুইসাইড না করে ব্রাউন সুইসাইড করলে বেঁচে যেতাম। একে মাথা ধরেছে আন-বেয়ারেব্যাল, এখন হাঁটতে হবে কতটা পথ। কথার সঙ্গে সঙ্গে সুশান্ত প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকটা মোছে। সর্দ্দি হয়েছে হঠাৎ যেন! শীতের প্রথমেই ঠাণ্ডা পড়েছে অস্বাভাবিক!

সেইটেই যখন হ'ল না তখন আপনার দিক থেকে একটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল, আগেই বলেছিলাম। বিজ্ঞের হাসি হাসেন হরিহর দা'।

রিকোয়েষ্ট করলে পারা যায় না হরিহর দা'! কথায় বুড়ো একেবারে মধু ঢালে যে। অজিত রাহার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে সত্যেন হাসতে হাসতে বলে—মনে আছে আপনার ধনসা কলিয়ারীর কথা? মোটর বাইকটা নিয়েই রওনা হ'ল বুড়ো। মোট কথা পরের বা সামনে পাবে ক'দিন ভোগ না করে ছাড়বে না যেন পলিসি করেছে।

বিরক্ত হাস্যে সুশান্ত বলে উঠল, সেই ত' দেখছি, এবার থেকে মাইন ইন্সপেক্টার আসবার আগে আমার গাড়ী বিকল করে না রাখলে চলবে না বুঝেছি। এখন আমি হেঁটে ঐ দূর থেকে পিটগুলো দেখি আচ্ছা আব্দার! কথা বলতে বলতে মাথার যন্ত্রণায় সুশান্ত বিরক্ত ভাবে দুটো আঙ্গুলে কপালের দু'পাশের রগ দুটো সজোরে টিপে ধরে।

সারা দিনের ক্লান্তির পর মনটা বেজায় তিক্ত হয়ে উঠেছে। বেলাও আর নেই, পাঁচটা প্রায় বাজে এখন, স্নান, খাওয়া কিছুই হয়নি। নূতন খাদ একটা খুলছে, এবং একটা খাদের পিলার কাটিং করে জল বোঝাই হবে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সুতরাং সরকারী খনি পরিদর্শন প্রয়োজনে মাস খানেক ধরে এত আনাগোণা হচ্ছে বড় বড় কর্ম্মচারী হিসাবে খাঁটি সাহেব, বাঙ্গালী সাহেবদের যে, সুশান্ত অস্থির হয়ে উঠেছে একেবারে। নিজেও সে একজন বিলেত ফেরত মাইনিং এঞ্জিনিয়ার কিন্তু, নিজের দায়িত্বেও সব কাজ করতে পারলেও সরকারী অফিস থেকে একটা আদেশপত্রের মত হুকুম, এক তাদের তত্ত্বাবধানের তলায় থাকতেই হবে প্রত্যেক কলিয়ারীর। এটা যেমনই বিরক্তিকর ব্যাপার তেমনি হাঙ্গামা! স্বাধীনতা থেকেও স্বাধীনতা নেই। ঠিক সেই সময়ে আর একটি অ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজারকে ফট ফট শব্দে দূরের ঐ পাঁচ নম্বর পিটের দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

অজিত রাহা উৎসাহিত স্বরে বললে, আপনি রাধেশ বাবুর বাইকে উঠুন না কেন? ঐদিক দিয়েই যাবে ত' সে।

হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বস সাহেবের ফটফটিয়ায় উঠে বসুন গে। ব্রাউন আপনার মোটর নিয়ে গেছে, সুতরাং আপনিও চেপে বসুন বসের ওপর।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হরিহর দা' হাসেন পাশের ভাঙ্গা দাঁতটা বার করে।

কৌতুকপ্রিয় হরিহর দা'র কথায় সুশান্ত কেন, অনেক পদস্থ কর্ম্মচারীই এ পর্য্যন্ত কখনও হাসি দমন করতে পারেনি। সুতরাং

সুশান্ত যে হাসবে, এটা বোধ হয় সকলে অনুমান করেই হা-হা করে হাসে। সুশান্তর দিকে ফিরে কল্যাণ বলে ওঠে ঐ সঙ্গে, একেই বলে বুঝি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে!

কিন্তু বুদোর ঘাড়ে চাপতে পারলেও, ঐ ভাঙা বাইকের গোঁ-গোঁ ফটফট শব্দ কি আমি সামলাতে পারব? বরং বল সাহেবই সবলে শ্রবণশক্তি রোধ করে, বাইক ছুটিয়ে বাংলো পৌঁছুন নির্বিঘ্নে এই কামনা করি। ওতে চেপে পৈতৃক প্রাণটুকু খোয়াতে আমি অন্ততঃ রাজি নই। বাবাঃ, মাটির বাইক বটে বল সাহেবের! বলে হাসতে লাগল সুশান্ত বল সাহেবকে লক্ষ্য করে।

লম্বা, চওড়া, ধপধপে ফর্সা বলিষ্ঠ। ত্রিশ-বত্রিশের একটি যুবক সদ্য মাইনিং স্কুল থেকে পাশ করা এ্যাপ্রেনটিস হিসাবে অ্যাসিসটেণ্ট ম্যানেজার ধীরাজ বল ততক্ষণে তার মোটর বাইক থেকে নেমে পড়ে কথায় ফোড়ন কাটে—কেন, এমন কি খারাপ বাইকটা, চোরের হাত থেকে অন্ততঃ জিনিসটা আমি বাঁচিয়ে রেখেছি ত'? আসুন, আপনাকে পৌঁছে দিই বাংলো পর্যান্ত। কোন ট্রাবল দেবে না, শুধু ক্যারিয়রে বসে আপনি কান দুটো শক্ত করে চেপে থাকবেন, দেখবেন কেমন স্মুদ চলে যায় বাইকটা, খাড়াই-উৎরাই একটুও টের পাবেন না, এমনি এক্সসেলেণ্ট ছুটবে। একবার সাহস করে উঠলেই গুণ বুঝবেন।

কৃত্রিম ভয়ে সুশান্ত বলে উঠল, না মশাই, আমার অত সাহস দেখাবার দরকার নেই। শব্দেই গুণাগুণ সম্বন্ধে আমি জোরাল সার্টিফিকেট দিচ্ছি।

অজিত বাবু কিন্তু বিপদে পড়লে আমার জগন্নাথের প্রশংসা করেন।

যেহেতু ঐ রথে ওঁর চাপা অভ্যেস আছে বলেই চাপতে পারেন। আমিও সহ্য করতে পারি না ফট ফট ফট শব্দটা। বলে সহাস্য মুখে সন্তোষ সুশান্তর দিকে তাকায়। তার পর রিষ্টওয়াচটার উপর দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে সত্রাসে যেন বলে উঠল, আজ মা আসবেন সন্ধ্যের ট্রেণে, কথায় কথায় দেরি করে ফেললাম। এক্ষুণি ষ্টেশনে না পৌঁছুলে চলবে না, কথার সঙ্গে সঙ্গে সে পথ সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে বাঁ-হাতি মোড় বেঁকে ধ্বসা খাদটার পাশে অদৃশ্য হয়ে যায় মুহূর্তে। মায়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য সন্তান এমনই উন্মুখ চঞ্চল যে, ভদ্রতার বিদায়টুকুও নেবার অবসর পায় না।

অজিত রাঙা আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন স্বগত-উক্তি করে: মা আসবেন কি সাধে, ছেলের টাকার থাঁই মেটাতে বুড়ি আসছে। টাকাও আছে বুড়ির হাতে। কথার শেষ রেশটা মিলিয়ে যাবার আগেই একটা আক্ষেপের বুঝি শ্বাস পড়ে সারা বুকটা মুচড়ে।

হরিহর দা' মুচকে হেসে কথার প্যাঁচ কষেন, সন্তোষ হ'ল সেই তখনকার আমলের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের ছেলে। টাকার গদিতে শুয়ে যে থাকে না, এই যথেষ্ট! তা লোকটা কিন্তু খুব সাচ্চা, আমরা যদি অত টাকা একসঙ্গে পেতাম, মাটিতে কি দাঁড়িয়ে থাকতাম? কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হা-হা করে হাসেন আর একটা বিড়ি বার করতে করতে।

কল্যাণ সহাস্য মুখে বলে উঠল, হুঁ, তখন কি আর বিড়িতে

পোষাত আপনার ? রীতিমত ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। কিন্তু আপাততঃ এখন বাড়ীর দিকে হাঁটা না দিলে, পেটে পিঠে যে এক হয়ে যাবে দাদা! চলুন আর দেরি করিয়ে দেবেন না গল্প কেঁদে শেষে, বৌদির কাছে আমি বকুনী খাব।

মাথা নেড়ে অজিত রাহা সায় দেয়—তা নেহাত ভুল বলেন নি কল্যাণ বাবু, ঠানদি প্যাটার্ণের বৌদিটির মুখ বড় ধারাল। সেদিন আমার গিন্নীকে বলে খুব এক চোট নিয়েছিলেন সারা রাত ধরে ব্রিজ খেলার জন্যে। অপরাধী হ'ল একজন, শাস্তি হল অপরের। সুতরাং কল্যাণ বাবুর নতুন বৌটি, কেন সেই বেচারীকে গঞ্জনা শোনান আপনার শ্রীমতী চণ্ডিকা ঠাকুরাণীর জ্বালাময়ী জিহ্বা দিয়ে? বরং আমাদের উচিত, কল্যাণ বাবুকে তাড়াতাড়ি বাড়ী পাঠানর জন্যে নিজে থেকে তাগিদ দেওয়া। শত হলেও বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট এবং বিয়েও করেছে মাত্র মাস তিন-চারেক।

কল্যাণ মুখ-চোখ লাল করে প্রতিবাদ করে। গরীব মানুষের জীবনটা কাব্যের ছন্দ নিয়ে গড়ে না রাহা সাহেব! এখন যদি আমার কোয়ার্টারে যান দেখবেন গিয়ে, বৌ বোধ হয় রান্নাঘরে হিমসিম খাচ্ছে। ভাই-বোনকে মানুষ করতে হবে! কি বা আয়, এর ভেতর বিয়ে করাই ভুল, নিতান্ত বোনটার বিয়ের টাকার জন্যই আমাকে বিয়ে করতে হল। সত্যি গরীবের জীবনটাই একটা পরিহাস!

কল্যাণের কথাটা বেশ লাগে বোধ হয় হরিহর দা'র মনেও। তিনি কৌতুক করেই বলেন তবু, স্বপ্ন বড়লোক হই।

ধীরাজ ধনীর সন্তান। আশৈশব বিলাসের ভিতর মানুষ হয়েছে সে, একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে অজিত রাহার দিকে তাকিয়ে যেন কথায় ছেদ দেবার উদ্দেশ্যেই বললে, আসুন না অজিত বাবু! আপনাকে বাংলো অবধি পৌঁছে দিই। চৌধুরী সাহেব যখন উঠছেনই না শব্দের ভয়ে তখন, আপনাকে না হয় পৌঁছে দিই। কথার সঙ্গে সঙ্গে সে মোটর বাইকে উঠে বসে, সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে দু' হাতে হ্যাণ্ডেল দুটো ধরে মোটরে ষ্টার্ট দেয়।

অজিত রাহা মুহূর্ত্তের জন্য সুশান্তর দিকে তাকায়। তার পরেই একটু হাসি টেনে বলে ফেলে, আর দেরি করলে ঘরে বকুনী খেতে হবে। এখন বোধ হয় না খেয়ে মিসেস বসে আছেন। ওঁকে নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালাতন! এ যুগের শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করেও দেখছি, সীতা-সাবিত্রীর আমল এঁদের গা থেকে মোছেনি। তাই ত ঘরে বলি, এর চেয়ে তোমার হেড মিসট্রেসের কাজই ছিল বরং ভাল। ওঁর কিন্তু এই জীবনটাই বেশী ভাল লাগে। ভীষণ সংসারী মন মশাই, ভীষণ সংসারী। এখন নিশ্চয়ই বারান্দায় ঘুরছে, ঐ দেখুন ত শাড়ী মনে হচ্ছে না টিলাটার ওপর? বলতে বলতে একটু যেন বেশ উৎসুক-ব্যাকুল চোখেই অজিত রাহা দূরে অস্পষ্ট বাংলোটার দিকে তৃষিত দৃষ্টি বুলিয়ে দ্রুত পায়ে একেবারে লাফ মেরে উঠে বসে ধীরাজের ক্যারিয়ারে। এবং চোখের পলক ফেলার আগেই ধীরাজ বল তার ভাঙ্গা মোটর বাইকখানা নানা বিচিত্র শব্দ চতুর্দিকে ছড়িয়ে চালের মুখে হাওয়ার বেগে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মৃদু হেসে হরিহর দা' দাড়িতে হাত বুলিয়ে সুশান্তর দিকে ফিরে বললেন, অজিত রাহা ভারি হুঁসিয়ার ছেলে, শালীটিকে হাতছাড়া হতে দেয়নি।

গলা নামিয়ে কল্যাণ কথায় রস ছড়ায়, আপনার সে সুযোগ থাকলে বৌদিকে বোধ হয় তালাক দিতেন, কেমন নয় কি?

সুশান্ত বগ দুটো সজোরে টিপে এতক্ষণ অজিত রাহার বাংলোর দিকে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ দিয়ে কিছু যেন লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ হরিহর দা'র কথায় চমকে উঠে বলে, হ্যাঁ, আর দেরি করে লাভ নেই, সন্ধ্যে হয়ে এল, বলেই সেই ধ্বসা খাদটার পাশ দিয়ে আর একটা যে সরু পায়ে-চলা পথ সেই দিকে সে এগিয়ে গেল। ক্রমশ ভারি বুটের শব্দ মিলিয়ে যায় খাদের ডুলী নামার ঢং-ঢং শব্দের তলায়।

কয়েকটা মুহূর্ত্ত কল্যাণ হরিহর দা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পর বলে উঠল, আজ চৌধুরী সাহেবকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে।

হরিহর দা' তাঁদের কোয়ার্টার্সের দিকে মোড় ঘুরতে ঘুরতে মুচকে হেসে মন্তব্য করেন: আদার ব্যাপারী আমরা, জাহাজের খবরে দরকার নেই। বরং তুমি খেয়ে দেয়ে ম্যাপটা নিয়ে বসবে, আটটা নাগাদ তোমার ওখানে যাব। দেখি ব্যাটা গো-খেকো আবার কোথায় হাঙ্গামা বাধালে!

সার্ভেয়ারের কাজ আমার দ্বারা হবে না, আমি মাইনিং পড়ব ঠিক করেছি। কল্যাণ এতক্ষণ বাদে যেন কথাটা সারা মন নিংড়ে বলে ফেলে সাহস করে।

রাণীগঞ্জ টালির লম্বা দুই সারি চালের বাঁহাতি খোলা মাঠটার উপর তারা এসে পড়েছে। কোয়ার্টারের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে হরিহর দা' রহস্যের সুরে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে উঠলেন, আমিও ভেবেছি মাইনিং পড়ব কিন্তু গৃহিণী নামে আপদটির দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে আসতে হয়।

কিন্তু আমার বয়স আছে এবং ভবিষ্যৎ আছে। বলে হাসতে হাসতে কল্যাণ তার ছোট্ট কোয়ার্টারের মধ্যে ঢুকলে।

প্রতিটি গৃহের চতুর্দ্দিকে একটি সুন্দর মিষ্টি হাওয়া বুঝি ছড়িয়ে রয়েছে। পরিশ্রান্ত, কর্মব্যস্ত পুরুষ, গৃহের ছায়ায় সারা দিন পরে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লান্তি বিমোচনের এ কি মধুর পরিবেশ! কিন্তু তখন সুশান্ত হেঁটে চলেছে ধীরে ধীরে। যেন গতির বেগ হারিয়ে গেলেই জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। বনতুলসী আর বিলেতি মেহেদী গাছগুলোর ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে হাঁটছে সুশান্ত। শিরশির করে হিমেল শ্বাসের মত বাতাস আসছে গায়ে কিন্তু, তবু সেই তারই ভিতর দিয়ে হাঁটে শ্লথ পায়ে। আর পথ নেই, নিজের বাংলোর একেবারে সামনে এসে পৌঁছে গেছে। কিন্তু উঃ, কি অসহ্য কিচমিচ শব্দ! বিরক্তভাবে সুশান্ত গেটের পাশে বড় ঐ তেঁতুলগাছটার দিকে তাকাল। শুধু কি তেঁতুলগাছটার উপরেই পাখীগুলো কলরব তুলেছে, বটগাছটার মাথায়ও কম জমা হয়নি। বোধ হয় এদের এই কিচির-কিচির কচ, কচ, ক্রুদ্ধ কোলাহল মাইল দেড় দুই পর্যন্ত মানুষের কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

সারা দিনের ক্লান্ত পাখী আকাশপথে বিচরণ করে রাতের আশ্রয় নিতে ভিড় জমিয়েছে গাছের শাখায় শাখায়। নিজের বাসাটির এক কোণে ডানা মুড়ে ঘুমিয়ে থাকার আশায় সকলেই উন্মুখ, সকলেই ব্যস্ত-চঞ্চল। প্রতিদিনই এরা এখানে জমা হয়, প্রত্যহ এই ক্রুদ্ধ কিচির-মিচির শব্দে সমগ্র পৃথিবী এরা যেন কাঁপিয়ে তোলে। সামান্য একটু ত্রুটিও বুঝি মেনে নিতে পারে না

পথ-ভোলা পাখীর। চোখের আলো ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে তবু, ভিন্ন দলের পাখীর উদ্দেশ্যে তেড়ে যায় ডানা ঝাপটে তারস্বরে কিচ, কিচ, কিচ শব্দে। যতক্ষণ না পৃথিবী অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে এদের বিবাদ ততক্ষণ মিটবে না। বুঝি, একদল ইচ্ছা করেই ভুল করে বাসা, অপর দল প্রতিবাদে মরীয়া হয়ে ওঠে। অতি তুচ্ছ সামান্য এই ছোট্ট পাখী চড়াই তাদের মধ্যেও বিবাদ হয়, একে অপরের দিকে এগিয়ে গেলে। মানুষের মতই বুঝি নিয়মের গণ্ডি বেঁধে চলতে চায় পৃথিবীর অতি নগণ্য ক্ষুদ্র পাখীগুলো! কিন্তু মানুষ কি সত্যিই নিয়মানুবর্ত্তী?

ভ্রূটা কুঁচকে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে সুশান্ত। আকাশে শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যা ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দূরে ছাড়া ছাড়া ঐ কুলীধাওড়াগুলো ক্রমশঃ দৃষ্টিপথে আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন ধোঁয়াটে একটা সূক্ষ্ম জালে পৃথিবীটা গুটিয়ে ছোট্ট থেকে ছোট হয়ে আসছে। দিকচক্রবালে দৃষ্টি আর হারিয়ে বুঝি যাবে না; অসীমকে সীমার ভিতরে টেনে এনেছে কুয়াশার জাল ফেলে। ধীরে ধীরে আকাশ থেকে কাল একটা ছায়া নেমে এসেছে পৃথিবীর রূপ-রস, গন্ধভরা যৌবনোচ্ছল দেহটাকে কেন্দ্র করে। চিরকুমারী নিষ্কলুষ পৃথিবী মৃত্যুর আলিঙ্গনে ঢলে পড়েছে। সুশান্ত তবু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বাংলোর টেনিশ কোর্টটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু আর না, সে ওদের চোখ এড়িয়ে চলে যাবে ভেবেই বোধ হয়, বিরাট দোলনাটাকে ডান হাতে রেখে দ্রুত পায়ে চলে যায় একেবারে ভিতর দিকের খোয়াঢালা রাস্তাটা ধরে; বুটের মচ্-মচ্ শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলে।

আয়া লখিয়া সুশান্তর আড়াই বছরের মেয়ে রুমাকে প্যারাম্বুলেটারে বসিয়ে রেখে মহা উল্লাসে সে তখন খানসামা গফুরের সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছিল। আকস্মিক বাবুর্চ্চিখানার দিকে সাহেবকে দেখে সে চট করে রুমার কোটটা টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় ঘাসের উপর থেকে। কথায় কথায় কোটটা পরাতেই ভুলে গেছে একেবারে। এদিকে একটু দূরে সবুজ নরম ছাঁটা ঘাসের উপর আবদুল কতকগুলো মুরগী এবং ছুটো হাঁস চরাচ্ছিল। আর, লখিন্দরের সঙ্গে গল্প করছিল কোন সাহেবের বাড়ীতে মাংস গুণে দিত, কোন সাহেবের মেম একটা মুরগীকে কত টুকরো করত ইত্যাদি ইত্যাদি। গল্পে বাধা পড়ায় সে মুখ নিচু করে মুচকি হেসে গফুরের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকায়। কিন্তু হাতের কাজ বৃদ্ধ আবদুলের একটুও থামে না। শিক্ষিত অভ্যস্ত হাতে মুরগী ছাড়াতে থাকে লাইটটার তলায় বসে। গফুর তার কিমাকরা মেশিনের গতি যেন থামিয়ে ফেলে সাহেবের গম্ভীর মুখের দিকে একটা দ্রুত দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য বুলিয়ে নেয়। লখিন্দর বাবুর্চ্চিখানার বারান্দায় বসে পোলাওএর চাল কুলোয় করে ঝাড়ছিল। সে তাড়াতাড়ি কুলোটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ায় গরম জল স্নানঘরে দেবার উদ্দেশ্যে। এদের মধ্যে হঠাৎ যেন কোথা থেকে শুকলাল ছুটে আসে বুট জুতো খুলে দেবার জন্য ব্যস্ত পায়ে। হাতের গুলতিটা চাক প্যান্টের পকেটে গুঁজতে গুঁজতে।

সুশান্তর মনে হ'ল, এখানে এসে সে যেন এদের মিষ্টি পরিবেশটা মুহূর্ত্তে নষ্ট করে দিল। সুতরাং আর দাঁড়ায় না, বাবুর্চ্চিখানার মাঝ দিয়ে যে ইট-সুরকীর হাত তিনেক চওড়া পথটা বাংলোর ভিতর অংশের সঙ্গে গিয়ে মিলেছে, সেই দিকে এগিয়ে যায় হাতের ইসারায় শুকলালকে ডেকে।

বারান্দা পেরিয়ে সোজা একেবারে গিয়ে ঢুকল যেখানে পোষাক সে বদলায়; সেই ঘরে। ঘরটায় ঢুকেই একটু নূতনত্ব হঠাৎ চোখে পড়ে। তার আলনা, হাট পেগে, আরও ক'জনের ওভার কোট, প্যান্ট, সার্ট ইত্যাদি ঝুলছে। মনটা বেশ কষ্ট হল। কখনও সে অপরের জামাকাপড়ের সঙ্গে একত্রে জামা-কাপড় রাখতে পছন্দ করে না। অথচ সেই ব্যতিক্রম আজই শুধু নয় প্রায়ই সহ্য করতে হচ্ছে গুভার জন্য। বন্ধু, আত্মীয়ের যেন শেষ নেই! কিন্তু আর প্রতিবাদ সে করবে না, মেনে নিয়েছে বশ্যতা।

জামা-কাপড় খোলার পরিশ্রমটুকুও সুশান্তর বোধ হয় করতে ইচ্ছা করছে না বলেই ইজিচেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ে। পা দুটো সামনে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সে মাথাটা হেলিয়ে রাখে ইজিচেয়ারের পিঠে। চোখ বুঁজে ক্লান্তি নিবারণ করছে অভুক্ত কর্ম্মক্লান্ত সুশান্ত চৌধুরী। বাইরে যদিও সে বিরাট বড় একটা কলিয়ারীর ম্যানেজার। কিন্তু মানুষটা যেন ভিতরে ভিতরে একটা পথহারা অসহায় শিশু! কোথায় বুঝি মস্ত বড় একটা অভাব রয়ে গেছে—যার জন্য আজ সে নিজেকে সম্পূর্ণ গুছিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

শুকলাল জুতো খোলার আগেই ওর ভাই আট দশ বছরের বুধুয়া দ্রুত হাতে বুট খোলে, আর, নিজের মনে বলে: হাঁই হো হাঁই হো, সুশান্তর ভারি ভাল লাগে এই নধরকান্তি কাল ছেলেটাকে।

কাজ কিছু তেমন করতে পারে না যদিও, তবু এই অদ্ভুত উপায়ে ওর বুট খোলা আর বুটটা পায়ের কাছে নিয়ে এসে সম্পূর্ণ শুয়ে পড়ে জুতো পরানর ভঙ্গিটা বোধ হয় সুশান্তর থমথমে মনটাকে কৌতুক দেয় বলেই সে ছেলেটাকে মাসে দু'টাকা মাইনে, খাওয়া পরা দিয়ে রেখেছে। অবশ্য এর জন্য শুকলাল মাঝে মাঝে বুধুয়ার সঙ্গে ঝগড়া করে তবু, বুধুয়ার কাজে ত্রুটি হয় না যেন, প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে দুই ভাইএর মধ্যে। আজও হেরে গিয়ে শুকলাল মুখ ভার করে সুশান্তর জামা-কাপড় নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে যাচ্ছে, ঠিক এমনি সময়, সন্ধ্যা দিয়ে পিসিমা শান্তিময়ী শান্তিজল হাতে ঘরে ঢুকলেন। সুশান্তর গায়ে-মাথায় জল ছিটিয়ে কি যেন বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠ করলেন। তারপর সুশান্তকে প্রশ্ন করেন, হ্যাঁ রে শান্ত, এমনি করলে তোর স্বাস্থ্য টিকবে ক'দিন? খেয়ে যেতেও সময় হয় না, এ আবার কেমন কাজ বাপু!

সুশান্ত হেসে ফেলে বললে, তা তোমার বাবারা যদি আমাকে আটকায় কি করি বলো! মাঝ থেকে তোমার পাঠান লুচি আলুর দম দত্ত সাহেব সটানে সরিয়ে ফেললে। শেষে শুনলাম রীতিমত অফিসে ওরা ভাগ করে খেয়েছে। আমাকে স্রেফ এক কাপ কফি দিয়ে। এখন পেটের জ্বালায় মরছি—বলতে বলতে সে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কয়েকটা হাঁচি ক্রমাগত হাঁচার পর রুমাল দিয়ে সজোরে নাকটা ঘসতে ঘসতে বলে, বেজায় সর্দ্দি হয়েছে আর মাথাও ধরেছে খুব, ভাল লাগছে না শরীরটা।

দেখি আবার জ্বরটর করে আমাকে বিপদে ফেললি নাকি। নাঃ এত্ত বড় হাতির মত ধাড়ী ছেলে, একটু যদি জ্ঞানগম্যি থাকে! ডাক্তারকে তুই দেখাসনি নিশ্চয়ই! বলার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিময়ী উৎকণ্ঠায় শুষ্ক মুখে উত্তাপ পরীক্ষা করেন সুশান্তর কপালের ডান হাতের উল্টোপিঠটা ছুঁয়ে। হাতটা ভিজে, সুতরাং তাপ পরীক্ষা করতে গায়ের ত্বকই বোধ হয় উৎকৃষ্ট। কিন্তু, যখন জ্বরের কোন লক্ষণই তিনি পেলেন না তখন, আঁচলে হাতটা মুছে আবার সুশান্তর কপালটা দেখার আগেই সুশান্ত খপ করে শান্তিময়ীকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকের উপর মাথাটা ঘসতে ঘসতে সকৌতুক স্বরে বললে, জ্বর হয়নি মোটেই, মাথা ধরেছে আর সর্দ্দি খুব।

শান্তিময়ী হেসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, ঠাট্টা নয় শান্ত, দিনকাল খারাপ, নতুন ঠাণ্ডায় সবার অসুখ করছে। তুই বরং ডাক্তারকে ডেকে পাঠা। রুমারও জ্বরমত হয়েছে দুপুর থেকে।

রুমার জ্বর হয়েছে! তা ওকে ত' বাইরে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলাম। সুশান্ত নিজেরই অজ্ঞাতে বেশ একটু চঞ্চল হয়ে শান্তিময়ীর দিকে তাকায় কথার সঙ্গে সঙ্গে।

তোরই ত' মেয়ে, দস্যি শুয়ে থাকবে না, কেঁদে বাড়ী মাথায় করে তুললে কি করি বল? থাক্‌ সে কথা, এখন তুই ডাক্তারকে ডেকে পাঠা তোদের দু'জনকেই দেখে যাক্‌। বলে শান্তিময়ী সুশান্তর মাথায় হাত বোলান একটু আনমনা ভাবে।

সুশান্ত মুহূর্ত্তে বুঝে নেয় পিসিমা শান্তিময়ী কিছু যেন তার কাছে গোপন করতে চেষ্টা করছেন। সুতরাং সে আর কথাটা বাড়ায় না। শুধু, তাচ্ছিল্যের সুরে বলে ওঠে: কলিয়ারীর ডাক্তারকে দেখান অপেক্ষা কুলীধাওড়ার মংলু মাঝির ট্রিটমেণ্টে থাকা ভাল। তুমি রুমার জন্যে মেজর সেনকে ফোন করে দাও একটা, কাল বরং ধানবাদ থেকে সে আসুক। নিত্যি নিত্যি মেয়েটার জ্বর ভাল কথা নয়। আমাদের ত' কখন অসুখ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। নয় পিসিমা! বলে সে হঠাৎ যেন বাল্যের স্মৃতির মধ্যে ডুবে যায় শান্তিময়ীর স্নিগ্ধশান্ত দুটো চোখের ভিতর দিয়ে!

শান্তিময়ী নিঃশব্দ হাস্যে কিছুটা সময় চেয়ে থাকেন সুশান্তর মুখের দিকে। পরে তার হাতের বাঁধনটা খুলে নিজেকে মুক্ত করে বোধ করি কথায় ছেদ টানার উদ্দেশ্যেই বলেন, আর বসে থাকিসনে ওঠ এখন। হ্যাঁ ভাল কথা, দয়া করে আবার সাবান দিয়ে নেয়ে আমার মাথা খাসনে, আমি তোর জলখাবার আনতে যাচ্ছি।

আড়মোড়া ভেঙ্গে সুশান্ত বলে উঠল, সারা দিনে পেটে ভাত পড়ল না আর বলছ কি না জলখাবার! কেন, ভাত হয়নি আমার জন্যে?

ভাখো ছেলের বুদ্ধি! ভাত আবার হয়নি! দু'দুবার ভাত করেছি সন্ধ্যের আগে পর্য্যন্ত। কিন্তু আমি বলছিলাম কি, রাতে ত' বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া হবে, অবেলায় এখন ভাত না খেয়ে বরং ক'খান লুচি খা। এই ত সন্ধ্যে নাগাদই সবাই খেতে বসবে। শেষে যদি দলে বসে খেতে না পারিস তাই—। শান্তিময়ী সোজাসুজি কিছু বলতে গিয়েও কেমন একটু এলোমেলো করেন বক্তব্যটাকে।

সুশান্তর ভ্রূটা কুঁচকে উঠল এক মুহূর্ত্তের জন্য। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিয়ে গলাটা এগিয়ে ইঙ্গিতে কি যেন প্রশ্ন করলে ড্রইংরুমের কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে। বেশ একটু কৌতূহলী হয়ে।

শান্তিময়ী ঠোঁট উল্টে চাপা গলায় বলেন, চিনি না, বৌমার আত্মীয় সব শুনছি।

সুশান্তর মুখের উপর দিয়ে একটা ম্লান হাসি খেলে যায়। সে আর ওখানে দাঁড়ায় না। ইঞ্জিনিয়ারের পিটে গায়ের কোটটা ব্যস্ত হাতে খুলে রেখে বাথরুমের দিকে এগুতে এগুতে বললে, আমার বেজায় সর্দ্দি হয়েছে, তুমি খিচুড়ী করে দাও ত' খাব নইলে, সুখলাল এক কাপ কফি করে দিক আমি শুয়ে পড়ব এক্ষুণি একটুও বিশ্রাম পাইনি সারা দিনে। কথার শেষ রেশটা মিলিয়ে যাবার আগেই সুশান্তর স্লিপারের ফট-ফট্‌ শব্দ বাথরুমের দিকে দ্রুত মিলিয়ে যায়।

শান্তিময়ী বিপন্ন চোখে একবার শুকলালের দিকে তাকান। তারপর শুকিয়ে যাওয়া নিস্তেজ গলায় হুকুম করেন, যা ত' বাবা ভাঁড়ার ঘরে ঐ যে হিটারটা আছে ওটাকে প্লাগে লাগিয়ে দে। ছেলের শেষে খাওয়াই হবে না হয় ত'। এই এখন কি খিচুড়ী কেউ রেঁধে দিতে পারে? কোথায় যে কল বিগড়ে যায় বুঝি না ছাই।

শুকলাল গম্ভীর ভাবে কর্ত্তাব্যক্তির মত বলে, তুমি ভাবছ কেন মাইজি, ডালে-চালে চাপিয়ে দিলেই বিজলী চুলাতে ফুটতে থাকবে।

বলতে বলতে সে সুশান্তর পরিত্যক্ত জামা-কাপড় গোছান ফেলে দৌড়ে চলে যায় ভাঁড়ারঘরের দিকে।

দরজায় দাঁড়ান বুধুয়া ফিস ফিসে গলায় পাশ থেকে বুদ্ধি জোগায়। বাবুর্চিখানা থেকে ধোয়া চাল নিয়ে আসব বড়মা? ঘৃণায় নাক সিঁটকে শান্তিময়ী বলেন, না না মুসলমানের ছোঁয়া জিনিস কি আমি ছোঁব? তুই বরং দৌড়ে একবার গয়লার কাছে যা, গাওয়া ঘিটুকু এখন ত' দিয়ে গেল না। শান্ত খিচুড়ীর সঙ্গে খাবে কি! বলতে বলতে তিনি ভাঁড়ার ঘরের দিকে ক্ষিপ্র পায়ে চলে যান একটা সুব্যবস্থা করার ব্যস্ততায় অস্থির মনে।

বাড়ীতে কর্ত্তার স্থানে বসেও সুশান্ত যেন হুকুমের তলায় নির্ভর করে। কিন্তু কেন মেনে নেবে নিজের পরাজয়! প্রতিবাদ করুক, ভেঙ্গে দিক এই মিথ্যে অহঙ্কার! কিসের গর্ব্ব করে শুভ্রা! শিক্ষা, অর্থ, সম্মান কোনটা নেই সুশান্তর? তবে কেন নিজেকে সদম্ভে সে প্রকাশ করে না, চোরের মত লুকিয়ে বেড়ায় কার ভয়ে? শান্তিময়ী খিচুড়ীর ডেকচিতে হাতা নাড়া দিতে দিতে চিন্তা করেন। আজ স্নান করে ওকে বুঝিয়ে দেবেন সংসার সম্বন্ধে নিজের অধিকার দাবী না করলে এতদিনের সঞ্চিত অর্থ চৌধুরীবংশের খ্যাতি সব তলিয়ে যাবে মিথ্যা কতগুলো ভড়ং-এর তলায়। চৌধুরীরক্তে কখন বশ্যতা মেনে নেয়নি। বিদ্রোহী প্রজার মাথা সসম্মানে পায়ে যদি লুটিয়ে না পড়েছে, লেঠেল দিয়ে তার মাথা নামান হয়েছে। সুতরাং সেই বংশধর আজ সামান্য একজন ব্যারিষ্টারের মেয়েকে আয়ত্তে কেন আনতে পারবে না! আশ্চর্য্য করে দেয় শান্তিময়ীকে।

বিষ্ণুপুরের রায়-পরিবারের তিনি বধূ এবং চৌধুরী বংশের একমাত্র বংশধর প্রবল প্রতাপান্বিত মহেশ্বর চৌধুরীর মেয়ে তাঁকে বুঝি ভিতরে ভিতরে তাতিয়ে তোলে এই নির্ব্বাক সহনশীল ভ্রাতুষ্পুত্র সুশান্ত। উত্তেজনার প্রাবল্যে বঁটিতে বুড়ো আঙুলটার বেশ অনেকখানিই ফালা নেবে যায়, শীতের চাপে শক্ত হয়ে এঁটে থাকা সাদা ধবধপে ফুলকপিটার ডাল কেটে নেবার সঙ্গে। কিন্তু, একটুও উঃ শব্দ করেন না তিনি যেন, পরাজয়ের গ্লানিটা অন্তত নিজের রক্ত দিয়েও তিনি মুছে দেন যাকে আঁতুড় ঘর থেকে বুকে তুলে নিয়েছেন মাতৃহারা সন্তান বলে, সেই বড় আদরের তাঁর শান্তর জন্ম। আঁচল দিয়ে হাতটা জড়াতে জড়াতে অদূরে ঝি মালতীকে ডাকেন, আরে অ—মালতী তোর মশলা রাখ এখন, কুটনোগুনো একটু ধুয়ে দে, আঙুলটা আমার কেমন করে যেন কেটে গেল।

পুরান ঝি মালতী হেসে বলে, তখনই বললাম অমন হটপট করো না দিদিমণি, হল ত আঙুলের দফা শেষ।

ধমকে উঠলেন অশান্ত মনে শান্তিময়ী, কাজের সময় উপদেশ দিসনে বলছি, বুড়ী হতে চললি বুদ্ধি হল না এখন? বাড়ীতে থাকিস না মাঠে চরিস? কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খিচুড়ীতে আবার হাতা নাড়া দিয়ে সুগন্ধি চালের অতি সুন্দর একটা গন্ধ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দেন।

সুশান্তর হাঁক শোনা যায়, "পিসিমা পেটে যে শব্দ করছে শীগগির খেতে দাও বলছি, নইলে এই গুলাম কিন্তু রাগ করে।"

বিড়-বিড় করে মালতী নিজের মনেই বলে, রাগ ঝাঁজ বুড়ী ছুটোর ওপরই করতে পার এসব কি অনাছিষ্টি কাণ্ডই যে বাড়ীতে চলছে!

শান্তিময়ী বিরক্ত ভাবে বলে ওঠেন, আঃ কি সব বকছিস! যা, শান্তর খাটের কাছে টিপয় গুছিয়ে রাখ গে, আমি খিচুড়ীর থালা নিয়ে যাচ্ছি। কথার শেষ রেশটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুত পায়ে গয়লার কাছ থেকে ঘিয়ের ভাঁড় নামে পোড়া এ্যালুমিনিয়ামের ঘাড়ভাঙ্গা তোবড়ান হাঁড়িটা নিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে সামনের ছোট রকটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঘি নিয়ে গয়লাকে দাম বুঝিয়ে যখন শান্তিময়ী ভাঁড়ারে ঢোকেন তখন, আর একটা ডাক শোনা গেল সুশান্তর, আজ কি খেতে দেবে না তোমরা? কথার সঙ্গে সঙ্গে সে মহা বিরক্ত ভাবে খাটের উপর শুয়ে পড়ে লেপটা মাথা অবধি টেনে।

কিন্তু বেশীক্ষণ রাগটা থাকে না পিসিমা শান্তিময়ীর ডাকে, কৈ রে শান্ত, ত্যাখ এক ঘণ্টায় কেমন খিচুড়ী রাঁধলাম। বাবা ছেলের একখানা নোলা বটে! এক ঘণ্টার ভেতর কোন বাড়ীতে খিচুড়ী, ভাজা করে খেতে দেয় বল দিকি! জমিদারী রক্তে এমনি হুকুমই মানায়, মিনমিনে স্বভাব খাপ খায় না। বলতে বলতে শান্তিময়ী একটা থালায় ধোঁয়াওঠা খিচুড়ী এবং তার পাশে আলু বেগুন কপি ইত্যাদি ভাজা সাজিয়ে সুশান্তর শোয়ার ঘরে ঢুকলেন হাস্যোজ্জ্বল মুখে।

শান্তিময়ীর আদেশমত এতক্ষণ মালতী ইজিচেয়ারটার সামনে একটা টিপয়ের উপরে কাচের গ্লাসে ঈষদুষ্ণ জল খাবার জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে প্লেটের উপর কাঁটা-চামচ সাজিয়ে একটা পাথরের বাটিতে খানিকটা গাওয়া ঘি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন বোকার মত সে পাছে কিছু বলে সুশান্তর রাগটা যদি বাড়িয়ে দেয় যেন এমনি আতঙ্কে ব্যস্ত কণ্ঠে শান্তিময়ী বলে উঠলেন, মালতীর যদি বুদ্ধি কোন দিন হয়! দেখতে পাচ্ছিস ছেলেটা শরীর খারাপ বলে বিছানায় শুয়েছে, তার খাবার জন্যে জায়গা করছে কোথায়! দে এখানে একটা তোয়ালে পেতে দে, শুয়ে শুয়েই খাক্ যা হয় দুটি। অসুখ শরীরে অত ছুঁই-ছুঁই আমি বাপু করি না। আমার এককথা স্বাস্থ্য আগে। না, না তুই উঠিস নে শান্ত, শেষে ঠাণ্ডা লাগবে, বলতে বলতে পিসিমা অতি শিশু ছেলেটির মত বুঝি সুশান্তকে বিছানার উপরেই আধশোয়া ভাবে শুইয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দেবার জন্য খাটের উপর বসেন।

হেরে যায় এখানেও সুশান্ত। মনের চাপা অসন্তুষ্টিটা যে শান্তিময়ীর উপরে নেবে সে সুযোগও পেলে না। হেসে ফেলে উপরন্তু বলে উঠতে হয় সরল ভঙ্গিতে, তুমি কি মনে করলে দেরির জন্যে রাগ করে শুয়ে আছি যে, খাইয়ে দেবে। আরে দূর, শুধু শুধু রাগ আবার কেউ করে? মানুষের আপন বলতে একমাত্র নিজের আত্মা তাকে অযথা কষ্ট কি দিতে পারি, শুয়েছিলাম ঠাণ্ডার ভয়ে। বলতে বলতে একমুখ হেসে লেপটা জড়িয়ে সুশান্ত তুষ্ট ছেলের মত বিছানায় উঠে বসল ঝাড়া-টাড়া দিয়ে।

বয়স এবং পুরান দাসীর দাবীতে মালতী টিপ্পনী কাটে: এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট যে, আপন বলতে একমাত্র নিজে। সেই আত্মাকে পরের উপর অভিমান করে কষ্ট দেওয়া বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। যাক্, দেখ ত আর ঘি দেব কি না? মালতী ঘিয়ের বাটি হাতে সুশান্তর একেবারে পাতের সামনে এগিয়ে দাঁড়ায়।

মুখ ভেংচে সুশান্ত চমকে ওঠে, না আর দিবি কোত্থেকে। সব জমিয়ে রাখ কঞ্জুস বুড়ী! ঢাল সবটা, ঘি দিতে এসেছে পলা ঘুরিয়ে। বলতে বলতে এঁটো হাতেই খপ্ করে মালতীর হাত থেকে সে বাটিটা কেড়ে ঢেলে দিল পাতের উপর হড়হড়িয়ে খানিকটা ঘি। তার পর শান্তিময়ীর দিকে চেয়ে মন্তব্য করে: তুমি এই মালতী মাসিকে কাশীতে পাঠিয়ে দাও দিকি, সেখানে উপদেশের টোল খুলতে পারবে। আজন্ম জ্বালিয়ে খেলে! মা মরল, কিন্তু মানকরের মালতী মরবে না।

মালতী হেসে ফেলে বললে, মরার হলে কি তোর কথা শুনতাম! কি বলো দিদিমণি! আমরা মরলে শান্তর হাত-পা গজাবে বোধ হয় জোড়া কয়েক। উঃ, ছেলে যেন ধিঙ্গী হয়ে উঠেছে এখন।

শান্তিময়ী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন মালতীর উদ্দেশ্যে এই ভাবে উক্তিটা শুনে। হাসবার চেষ্টা করে বললেন, একেই বলে মানুষ করার দায়। যখন বৌদিকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি করছ তুই তখন কোলে তুলে নিয়েছিলি বলেই, তোর মরণ কামনা করবেই ত'। যমের অরুচি বুড়ী দুটো, এখন মরলেই ছেলে স্বাধীন হয় বুঝতে পারছি। সত্যি পুরোন আর নতুনে ঠিক খাপ খায় না যেন।

সুশান্ত পিসিমার উক্তির শেষ দিকের অর্থটা বোধ করি অনুমানে বুঝে নেয় বলেই, প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়—খাপ খাবে কেন! মোরব্বাটা যদি মিটসেফেই থাকবে, তবে করার যথার্থ সার্থকতা কোথায়? আমি বলে ঐ মোরব্বার আম দিয়েই চাটনীর কাজটা সেরে নেব ভেবে রেখেছি কিন্তু আসলেই ফাঁকি। দাও মোরব্বা-টোরব্বা যা হয় একটা নইলে, খেতেই যে পারছি না! বলে সে হাতের কাঁটা চামচ থালার উপর নামিয়ে রাখে।

শান্তিময়ী কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। সারা দিন অভুক্ত ছেলের জন্য চিন্তার তাঁর অবধি ছিল না। এখন যা হোক কিছু পেটে পড়েছে অন্ততঃ! তিনি মৃদু হেসে বলেন পাণ্টা সুরে—হুঁ, নানা রকম চাটনীর টাক্না দিয়ে বেশী আর খেতে হবে না। রাতে আছে পোলাও-মাংস, তার ওপর সর্দি। শেষে তুই কি একটা অসুখ না বাধিয়ে ছাড়বি না! বলে তিনি মালতীর দিকে ফিরে তাকান আচার আনা সম্বন্ধে আয়তনের ইসারা করে।

সুশান্ত খেয়াল করে না পিসিমার ইঙ্গিতটা। সে তখন ড্রইংরুম থেকে টুং-টুং শব্দে পিয়ানো বাজান লক্ষ্য করে মুখ ফস্কে বলে ফেললে, এটা আবার খুললে কে? কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে যন্ত্রটার মিষ্টি আওয়াজে।

কেন, ঘরের গিন্নী! তার অধিকার এখন সব কিছু, নইলে কুমার ঘর, তুই বাড়ী ফিরিস নি তখন পর্য্যন্ত, বন্ধু নিয়ে শিকারে বেরুতে পারে সব!

শান্তিময়ীর কণ্ঠস্বর চাপা ক্রোধের বহ্নিতে যেন কাঁপতে থাকে লেলিহান শিখার মত। সহ্যের সীমা বোধ হয় শান্ত সহিষ্ণু স্বভাবের উনসত্তর বয়সের এই বৃদ্ধাকেও ভিতরে ভিতরে তাতিয়ে তোলে। অবশ্য বধূর নামে ছেলের কাছে কিছু বলাটা গুরুজনের পক্ষে নিতান্তই অশোভন বলেই বোধ করি ছেলের দুর্ব্বলতায় তিনি ঘা মারেন আরও একটা কথা বলে, বেশ মেনে নিলাম তোরা হিন্দুয়ানা করবিনে। কিন্তু বলতে পারিস কোন বাঙ্গালীর গেরস্থ ঘরের ছেলে-মেয়ে এমনি ভাবে হৈ হৈ করে বেড়াতে পারে! ঘর সংসার কাজ কর্ম্ম কিছুই নেই না, সব বেদের দল, যে একটা করে বন্দুক, থার্ম্মোফ্ল্যাস্ক, টিফিন ক্যারিয়ার কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লি বেপরোয়া হয়ে।

রসান কেটে সুশান্ত কথায় জোগান দেয়: বেদেদেরও নৌকোর বহর আছে এরা হ'ল আধুনিক যুগের মানুষ। সুতরাং বেশী জিনিস পত্তর এরা সঙ্গে নেয় না। প্রতিপদে যেমন রেষ্টুরেণ্ট আছে তেমনি, ক্লান্তি বিনোদনের জন্যে বান্ধবীরও অভাব থাকে না। বৃথা ঘর সংসার সাজিয়ে বসার প্রয়োজন কি! বলে অকস্মাৎ হা হা করে হেসে উঠল শান্তিময়ীর বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে।

মালতী কথাটা ঐখানেই ছেদ করে অহেতুক প্রশ্ন তুলে, রাতে তোমার জন্যে ক'খানা লুচি করি গে দিদিমণি, সকালে ত' ভাত খেলে না, এই বুঝি শান্ত আসছে আসছে করে! সন্ধ্যের পর এখন আর ত' ভাত খাবে না, ময়দা মাখিগে আমি কেমন?

চমকে সুশান্ত বলে উঠল, তুমি খাওনি পিসিমা! না, না, এ বড় অন্যায় তোমার এক বেলায় খাওয়া তাও যদি না খাবে তাহলে, আমাকে দেখছি কাজ ছেড়ে ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে। যাও আগে খেয়ে নাও, তারপর আমার কাছে এসে বসো, আর আমায় ত' খাওয়া

হয়েই গেছে, তুমি চটপট লুচি ভেজে বসে পড় দিকি লক্ষী মেয়ের মত। ইশ, সারাটা দিন উপোস একেবারে।

উপোস না হাতি! হিন্দুঘরের বিধবাদের আবার উপোস বলে কিছু আছে! সংযম করতে করতে তাদের অব্যেস হয়ে যায় না খাওয়া ব্যাপারটা। আমার ত' খেয়ালই ছিল না যে, ভাত খাইনি। এই মালতীটার এক অব্যেস ভ্যান্ ভ্যান্ করা! অপ্রতিভ ভাবে শান্তিময়ী কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেন।

মালতীর দিকে তাকিয়ে সুশান্ত বললে, যা তুই শীগগির খাবারের ব্যবস্থা কর। জানলে আমি কখনই খিচুড়ী করতে বলতাম না। বলতে বলতে সুশান্ত জল খেয়ে গ্লাসটা এগিয়ে দেয় মালতীর হাতে।

শান্তিময়ী আর দাঁড়ান না। জানতে বাকী নেই তাঁর শান্তকে যতক্ষণ তিনি সামনে থাকবেন, সুশান্ত তাঁর উপবাসের জন্য আক্ষেপ করবে, রাগ করবে। সুতরাং খাবার তাগিদ না থাকলেও ছেলের ভয়ে লুচির ব্যবস্থা করতে বুঝি বাধ্য হন। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে গিয়েও আবার কি মনে করে তিনি সুশান্তর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। সুশান্ত তখন লেপের ভিতরে গুটিয়ে গুটিয়ে বসে সবে মাত্র গড়গড়ার নলটা নিয়ে ধস্তাধস্তি সুরু করেছে। পৈতৃক আমলের রূপার উপর সোনার কাজ করা গড়গড়াটা অদূরে একটা শ্বেত পাথরের টিপয়ের উপরে রেখে, সোনার তার জড়িয়ে সাপের আকারে লম্বা কাল রেশমী নলটা দিয়ে সে ধূম পানের ব্যর্থ চেষ্টা করছে ক্রমাগত দু'দিন ধরে। কিন্তু, অনভ্যস্ত সুশান্ত কেমন যেন কিছুতেই জুত করতে না পেরে একবার উঠে বসছে, একবার শুচ্ছে, কখন শুকলালকে হুকুম করছে ঐ বিরাট কলকে বদলে নূতন করে ধরিয়ে আনতে।

শান্তিময়ী হেসে ফেললেন সুশান্তর দিকে তাকিয়ে। বললেন, মন্দ ব্যবস্থা করিসনি ত! চৌধুরী বাড়ীর গড়গড়ায় রায় বাড়ীর নল একসঙ্গে যোগ করে ছেলের তামাক খাওয়া হচ্ছে।

কথা বললে সামলে বলবে, এখন আমি তোমার 'শান্ত'নই, চৌধুরী বাড়ীর পৌত্র, রায়বাড়ীর দৌহিত্র, ষোল আনা অংশের মালিক শ্রীযুক্ত প্রবল প্রতাপেষু জমিদার মহাশয়। হুঁ! কি আবেদন বল আমি মঞ্জুর করছি। বলতে বলতে সুশান্ত তাকিয়া ঠেশ দিয়ে বসে কৃত্রিম গাম্ভীর্য সহকারে।

মরে যাই রে জমিদার! স্বাধীন ভারতে জমিদারী আইনটা তবু না যদি বিলোপ হত! জমিদার দেখেছি আমার দাদাশ্বশুরকে, কুতুলপুর যেন কাঁপত! অবশ্য আমার ঠাকুর্দাও কম নয়; দখল করতে হবে জমি বেশ, একেবারে মানুষ পর্য্যন্ত বলে বেমালুম মাটিতে পুঁতে ফেলতেন এমনি দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন। সেই তুলনায় তোকে বলতে হয় একটা বেড়াল। কোণ চাপা হয়ে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করছিস আর, গোঁফ ফোলাচ্ছিস বিক্রমই কিছু নেই। বলে শান্তিময়ী হাসতে থাকেন ছেলেমানুষের মতন সরল স্নিগ্ধ মুখে।

সুশান্ত মাথা তুলিয়ে বলে ওঠে, বেশ আজ থেকে জমিদারী মেজাজ প্রাকটিস করব দেখি তুমি কেমন সামলাও। বলতে পারবে না তখন কিছু, সে আমি আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি। হুঁ মামার একটু আয়েসের জন্যে তুমি কত বকেছ বেচারীকে আমি যেন জানি না।

হ্যাঁ কত কথা জানিস তুই! যেমন বাবাটি ছিল, তেমনি মামাটি, দুই হদ্দ কুড়ের নির্য্যাস নিয়ে জন্মেছিস বলেই আমায় হাড় জ্বালিয়ে খেলি। কেবল নানা ঝামেলা তোকে নিয়ে। তুই বলে শুকলালকে দিয়ে বাবুর্চ্চি ঘরে খবর পাঠিয়েছিস রাত্তে খাবি না ওদের নেমন্তন্ন! ভাগ্যিস মনে হয়ে গেল কথাটা তাই ছুটে এলাম, ব্যাপার কি?

সুশান্ত গড়গড়ার ঐ কাল রেশমের উপর সোনার বুটিতোলা নলটা ছপাৎ করে বিছানার উপরে ফেলে সোজা হয়ে বসে বলে, ব্যাপার নয় কিছুই! সিম্পলি সোজা কথা যে, ওদের সঙ্গে ডাইনিং টেবলে আমি বসতে রাজি নই।

শান্তিময়ী থতমত খেয়ে যান সুশান্তর স্পষ্ট জবাবে। কিন্তু মুখের দাপটে তিনি হার মানতে রাজি নন। ভ্রূ কুঁচকে পাকা জমিদার গৃহিণীর মত দাপটের সুরে প্রতিবাদ করেন, শান্ত জানবে বাইরের ভদ্রতা রাখতে তোমার পূর্ব্বপুরুষরা কখন পিছিয়ে যায়নি এ পর্য্যন্ত। সেখানে তুমি কোন ছেলেমি কর আমি সেটা পছন্দ করি না।

সবলে মাথা নেড়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে সুশান্ত বললে, না, চৌধুরী-বংশে কখন অন্যায়কে মেনে নেয় না। আমাকে অনুরোধ করো না পিসিমা, আমি এই গেষ্ট কটিকে টলারেট করতে পারবো না। বলে দাও যে আমার অসুখ হয়েছে তাতে ওরাও শান্তি পাবে আমিও স্বস্তিতে থাকব। বলতে বলতে সুশান্ত কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

শান্তিময়ীর চোখ দুটো মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি জ্বলে উঠল। এইটুকুরই অপেক্ষায় দীর্ঘ তিন বছর কাটাচ্ছেন। কিন্তু আজ যে পরিস্থিতি সেখানে আর যাই থাকুক, তাঁর পিত্রালয়ের সম্মানটা তিনি ক্ষুণ্ণ করতে পারেন না। কেউ যে ফিরে গিয়ে নিন্দা করবে আতিথ্য সম্বন্ধে, সেটা তিনি মেনে নিতে পারেন না। তাই বোঝাবার জন্য মিষ্টি করে বললেন, যা হবার হয়েই যখন গেছে, সেটা বাইরে অন্ততঃ মুখোস দিয়ে না চললে যে লোকে হাসবে শান্ত! তোর বাবা, মামা কেউ সেদিন বুঝলে না আমাদের ঘরে এসব মেয়ে আনা যে কত বড় ভুল। দেখলে কেবল ব্যারিষ্টার সরকারের ধন, মান, খ্যাতি। বন্ধুর মেয়ে বৌ করে আনার সুখটা এখন আমাদের বুঝতে হচ্ছে,

তাদের কি, মরে সরে পড়ল, তুই বুদ্ধির মাথায় ঝাঁটা মারতে হয়! কোন লক্ষ্মীমন্ত হালচাল যদি দেখা যায় বৌয়ের মধ্যে। বুড়ো হয়ে মরতে বসেছি তবু বাইরে পা বাড়াতে পারলুম না গো।

সুশান্ত ম্লান হেসে পাল্টা জবাব দেয়, তুমি কি মেয়েদের স্কুলে কখন পড়েছ যে বাইরে পা বাড়াবে! এরা হ'ল শিক্ষিতা, আধুনিক তন্ত্রের সভ্য সমাজভুক্ত। পুরুষের সমকক্ষা স্বাধীনা নারী।

কথাটা বোধ হয় চাপা দিতেই শান্তিময়ী বলেন, যাক সে সব বাজে কথা। তুই লক্ষ্মীসোনা আমার, টেবিলে না বস্বিস অন্ততঃ একটু ঘুরে আয়। শুভ্রা কিন্তু তিনবার ডেকে পাঠিয়েছে বুবুয়াকে দিয়ে। শেষে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী না হয়। যা রাগী আর বেপরোয়া, একরাশ লোকের কাছে ছ্যাড় ছ্যাড় করে কিছু বলে ফেললে তোরই মাথা কাটা যাবে। সবই ত' বুঝিস বাবা, ঘরের আগুন বাইরে ছড়িয়ে লোক হাসাস নে। কথার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিময়ী জলমগ্ন ব্যক্তির মত বিপন্ন ভাবে সুশান্তর হাতটা চেপে ধরেন। বাইরের মান সম্ভ্রম রাখার ব্যাকুলতায় বুঝি দু'টো চোখে তিনি অন্ধকার দেখছেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হাইহীলের খুট খুট শব্দ তুলে সামনে এসে দাঁড়াল শুভ্রা। রাগে মুখখানা তার টকটকে হয়ে উঠেছে কিন্তু সেটাকে সামলে নিয়েই সে যতটা সম্ভব সহজ গলায় বলে, ডুইংরুমে তোমার জন্যে সবাই অনেকক্ষণ থেকে ওয়েট করছেন। চলো ইনট্রোডিউস করিয়ে দিই।

তারপর শান্তিময়ীর দিকে ফিরে অভিযোগের সুরে বলে উঠল, আচ্ছা বলুন ত' এ কেমন কথা! সেই থেকে আপনাকে বলতেও কম বলিনি অথচ এইখানে আপনারা দিব্বি গল্প করছেন বাড়ীর গেষ্ট বসিয়ে রেখে! এ কি রকম ইর্‌রিশপনশিবল্‌ ব্যাপার বুঝি না! এদিকে ত' খুব হাঁক-ডাক জমিদার বাড়ী বিলেত ফেরত শিক্ষিত ভদ্রলোক, কিন্তু এতটুকু কার্টসি পর্য্যন্ত জানেন না আপনারা! ছিঃ এতটা মীন আপনারা আমি ধারণা করতে পারিনি। ছিঃ ওঁরা কি ভাবছেন আমার বিষয়ে কে জানে! উত্তেজনার প্রাবল্যে শুভ্রা হাঁপাতে থাকে ঘন ঘন এবং একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় স্বামীর।

সুশান্ত একবার স্ত্রীর দিকে তাকায়, একবার তাকায় শান্তিময়ীর দিকে। দুটি বিপরীতপন্থী এক স্থানে এসে প্রচণ্ড বেগে যেন একে অপরকে ঘা মেরে চূরমার করে দিতে চাইছে। শুভ্র থান-পরা মাখনের মত নরম সাদা শাল জড়ান ছোটখাট গড়নের উজ্জ্বল গৌরবর্ণা শান্তিময়ীর মুখ রাগে, ঘৃণায় রক্তশূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র! তিনি কেমন যেন হার স্বীকার করে আত্মরক্ষার্থেই বুঝি সরে পড়েন সুশান্ত কিছু বোঝার অনেক আগেই। সে স্ত্রীর দিকে আবার তাকায় হৃষ্টপুষ্ট বেশ বলিষ্ঠ গঠনের গৌরাঙ্গী শুভ্রাকে দেখে কেউ বাঙ্গালী মেয়ে বলে স্বীকার করবে না। লাহোরের জল হাওয়ার সঙ্গে চেহারাটা পর্য্যন্ত পাঞ্জাবী মেয়ের মতই হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে রুচিটাও অনেকটা অবাঙ্গালী ঘেঁষা। শাঁখের মত সাদা রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে সাদা বেনারসী শাড়ীটা এমন আঁটসাট করে পরা যে, মনে হচ্ছে বুঝি খাপ খোলা ঝকঝকে কৃপাণ ঘরের বিজলী আলোয় ঝলসে ঝলসে উঠছে মুহুর্মুহু! ঘাড়ের কাছে শ্যাম্পু করা কৃত্রিম উপায়ে কুঞ্চিত চুলগুলো সাপের ফণার মত এদিকে ওদিকে দুলছে। বুঝি সুযোগ পাচ্ছে না নইলে, এক্ষুণি উগরে দিত বিষের থলে এমনি উত্তেজিত ক্রোধ-কোপন অবস্থা! ঠোঁটের কোণ উপছে উপছে লেলিহান অগ্নিশিখা বিদ্রূপাত্মক হাসির ভিতর দিয়ে ফুটে উঠছে অদ্ভুত একটা ক্ষুধাতুর ভঙ্গিতে। বুঝি সব পুড়িয়ে ছাই না করা পর্য্যন্ত ঐ নিষ্ঠুর কঠিন হাসিতে রঙ্গিণ ঠোঁটের কুঞ্চনটা আর থামবে না। দৃষ্টি স্থির, সাপের মত হিম হয়ে আসা একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তি ছড়ান।

তাড়াতাড়ি সুশান্ত চোখ ফিরিয়ে তাকায় দেওয়ালের গায়ে অনেক দিন আগের একটা ফটোর দিকে। আকস্মিক মনটা যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পায়। সত্যি, জীবনের ভুল-ভ্রান্তির জন্য অপরকে সে দায়ী করতে পারে না। সম্মান রাখতে মুখোস এঁটে না চললে, সংসারে বাস করাই বিপদ! কিন্তু, মনের ঠিক পর্য্যায় যে গুলো আনে না তাকেও সাজিয়ে গুজিয়ে চালিয়ে না দিলে লোকে নিন্দাই শুধু করবে না উপরন্তু সহানুভূতি জানাতে আসবে। সব সহ্য করতে সে রাজি শুধু পারবে না সহানুভূতি। রাগ যদি করতে হয় অভ্রদত্তার উপরই রাগ করা উচিত, সামান্য এতটুকু দায়িত্ব নেবার মত সাহস নেই! বাল্যসঙ্গিনী গৃহশিক্ষকের মাতৃহারা মেয়ে অভ্রদত্তা! অর্থ কৌলিন্যের ত্রুটি আর জমিদারের শাসনের ভয়ে রাতারাতি বাপ আর মেয়ে কোথায় পালিয়ে গেল! এখন পুরান দিনের সেই সরস্বতী পূজা উপলক্ষে পিক্‌নিকের দৃশ্য চোখের উপর যেন জ্বল-জ্বল করছে।

তাদের গোবিন্দপুরের মৌজায় সে বার প্রজাদের নিয়ে ফটো তোলা হ'ল। মাঝখানে একসারি চেয়ার পেতে গ্রামের সম্মানী লোকদের নিয়ে বাড়ীর সকলে বসেছে। আর প্রজাবৃন্দ উৎফুল্ল হৃদয়ে সবাই যে যেদিকে পেরেছে দাঁড়িয়ে ফটো তুলছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বসান যদিও হয়েছিল মাটিতে সতরঞ্চির উপরে। কিন্তু, তারই ভিতরে বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় অভ্রদত্তার। ডল পুতুলটা কোলে করে কেমন একটু আনমনা ভাবে ডান হাতের তর্জ্জনীটা মুখের ভিতর চালিয়ে দিয়ে সে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ছেলের দলে সুশান্ত নিজেকে খুঁজে বোধ হয় পেত না যদি না তাকে, ভাবী জমিদার হিসাবে মামার কোলের উপরে বসান হ'ত। অবশ্য সাত বছরের ভাবী জমিদার জরিপাড় ধুতি পরে সোনার বোতাম দেওয়া গরদের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়েও কিন্তু অভ্রদত্তার বিরাট বড় ডল পুতুলটার দিকে বেশ যেন উৎসুক চোখেই চেয়েছিল। অর্থাৎ তার বাবা কলকাতা থেকে তার জন্যে ফুটবল, এবং অভ্রদত্তার ঐ পুতুলটা কিনে সবে সেই দিনই ফিরেছেন। সুতরাং পুতুলটার সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল সম্পূর্ণ মেটেনি বলেই একটু ঘাড়টা কাৎ করে পুতুলটার দিকেই সুশান্ত তাকিয়ে আছে। আজও বুঝি কৌতূহল মেটেনি তাই এত বছর পরেও ফটোখানায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সুশান্তর চকচকে দুটো চোখ অভ্রদত্তাকে ঘিরে যেন কিসের সুযোগ খুঁজছে।

কিন্তু তারপর! কৈশোর কাটিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণীবাত্যায় দুটি বাল্যসঙ্গী হারিয়ে গেল। সমস্ত মনটা মথিত করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ে সুশান্তর অজ্ঞাতে। পাশের ঘরে তখন রেডিওটা বেজে উঠল হঠাৎ—আকাশবাণী কলকাতা, এখন অভ্রদত্তা মজুমদার রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাচ্ছেন।

শুভ্রা এ ঘর থেকেই তার মামাত বোন নূপুরকে ডাকে, এই নূপুর, তোর সেই ক্লাস ফ্রেণ্ড অভ্রদত্তার গান হচ্ছে কিন্তু, আর বলতে বলতে সে দ্রুত পায়ে বারান্দার দিকে চলে যায় টেনিশ কোর্ট থেকে এগিয়ে আসা ক'টি নরনারীকে লক্ষ্য করে।

হাস্য-কোলাহলে চতুর্দ্দিক মুখরিত করে তারা সবাই ড্রইংরুমের দিকে এগিয়ে যায়। সুতরাং তাদের মধ্যে কি কথা হয় সুশান্তর কানে এসে পৌঁছে। সে তখন শান্তিনিকেতন থেকে ছুটিতে আসা অভ্রদত্তার গান যেন আগের মত ঘরে বসে শুনছে এমনি একটা তন্ময়তা দিয়ে পর পর দুটি গানই শুনল। এবং পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা শোনার আগেই মনে মনে স্থির করে ফেলে, অভ্রদত্তার ঠিকানা যখন পেয়েছে শেষ বারের মত চেষ্টা করে দেখবে। কতদিন নিজেকে সে এমনি ভাবে বঞ্চিত করবে! শুভ্রার জীবনে পারিপার্শ্বিক প্রাচুর্য্যের অভাব নেই এবং নারীর সহজাত যে আকাঙ্খা কোনদিনই সেই সংসারবন্ধনের মধ্যে নিজেকে সে বন্দী রাখবে না। সুতরাং কেন প্রতারণার মুখোস চেয়ে জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে সে দলে মুচড়ে নিঃসঙ্গ, দিনের পরদিন কাঙ্গালের মত কাটাচ্ছে। রাজী না হয় জোর করে, ধমকে অভ্রদত্তাকে আবার নিজের করে কাছে টেনে নেবে। শুভ্রার কাছে ভদ্রতার মাপকাটি মেপে তাকে চলতে হয়। কিন্তু, অভ্রদত্তার কাছে সে পুরুষ, তার দুর্দ্দান্ত প্রতাপের জোরে কেড়ে নেবে ওর অভিমানের খোলসটা। দেখিয়ে দেবে রাতের অন্ধকারে বাপের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে পালিয়ে এসেও সুশান্তর চোখ এড়াতে তারা পারেনি।

জমিদারী প্রথা বিলোপ হয়েছে কিন্তু, জমিদারের শেষ রক্ত এখন তার শিরায় উপশিরায় উষ্ণ বেগে বইছে। তার প্রাপ্য অধিকার অপরের হাতে তুলে দেবার আগে, হয় সে মৃত্যু বরণ করবে না হয়, অধিকার দখল করবে। উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুশান্ত। সে আর এক মুহূর্ত্ত বুঝি অপেক্ষা করতে পারছে না। এমনি ভাবে ছিটকে দাঁড়ায় বিছানা ছেড়ে। বাইরে শুভ্রার মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার্থে নিশ্চয়ই মৌলিক হাসি মুখে ফুটিয়ে, আতিথ্য সম্বন্ধে কিছু তাকে বলতে হবে বেশ ভণিতা করে এবং বলবেও এখনি সে ঠিক বেরিয়ে যাবার আগে। কলকাতাগামী ট্রেণটা দশটার মধ্যে তাকে ধরতেই হবে যে।

সুশান্ত পোষাক বদলানর ঘরে ঢুকে ব্যস্ত হাতে গায়ের জহর কোটটা খুলে, সার্টের উপর উলের লম্বা হাতার সোয়েটারটা পরল। তারপর প্যাণ্টটার দিকে এগিয়েই চমকে প্রশ্ন করে—একি রুমা! এখানে কি করছিল! বলতে বলতে হ্যাট্ পেগে ঝোলান গরম সার্জের ফুল প্যাণ্টটার আড়াল থেকে রুমাকে টেনে আনে একেবারে বাত্তির সামনাসামনি। রুমার ঐ ডল পুতুলের মত টুলটুলে গালের লালচে একটা দাগ চারটে আঙুলের চিহ্ন নিয়ে সুশান্তর চোখের উপর ফুটে উঠল অস্বাভাবিক একটা নিষ্ঠুর প্রভুত্ব ব্যঞ্জনা নিয়ে। রুমার নীলাভ ডাগর চোখ দুটো জলে টলটলে হয়ে বড় বড় ফোঁটার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে নিঃশব্দে ধারার পরে ধারা। আড়াই বছরের রুমা আত্মসম্মানে আহত হয়ে ঘরের নিভৃত কোণে লুকিয়ে কাঁদছে। সুশান্ত সামনের চেয়ারটায় বসে রুমাকে জোর করেই কোলে তুলে নেয়! তারপর তার কালো কুচকুচে থোকা থোকা চুলগুলোর মধ্যে আদর করে আঙুল চালিয়ে, গালে মুখে গোটা কয়েক চুমু খেয়ে, মেয়ের অভিমান ভাঙ্গাতে ভাঙ্গাতে হঠাৎ বড় ঘড়িটার দিকে নজর পড়ে। সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই সে পোষাকের ঘরে ঢুকেছিল কিন্তু সব উলটে গেল মুহূর্ত্তে! একদিন শিশু বয়সে অভ্রদত্তার কোলে যে ডল্ পুতুলটার প্রতি তার খুবই আগ্রহ ছিল আজ, তারই বুঝি হাস্যকর উপসংহার। কোথায় সরে যাবে একে ফেলে। মা থেকেও যে মাতৃ-হারা, অবজ্ঞাত শিশুর মত যাকে নীচ দাসীর শাসনে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়, যার জন্মের জন্য সে নিজে শুভ্রার চোখে অপরাধীর মত প্রতি মুহূর্ত্ত বিদ্বেষের কটূক্তি শোনে, সেই সন্তানকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে না। হোক নিজের ক্ষতি তবু, রুমাকে সে আগলে রাখবে নিজেকে আড়াল দিয়ে। অভ্রদত্তার উপর আর রাগ থাকে না যেন, উভয়তঃ ভুলের ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছে রুমাকে মাঝখানে রেখে। রুমা সুশান্তর গলাটা জড়িয়ে বুকের উপর মাথা গুঁজে এতক্ষণ পরে বড়মার দেওয়া সন্দেশটা কোটের পকেট থেকে বার করে।

মধুমাসে

শাকিলা

মধুমাসে বিহগ যে, প্রেম-গীতি গাওল,
ফুটওল ফুলবনে, মধু পানে চাওল।
আজি সাঁঝ-সমীরণ বহসি মন্থর
গুঞ্জরি মধুকর দুলাওল অন্তর
মধুমাস গাওল কোন্ মায়া-মন্তর
মধু হৃদি চঞ্চল, মধুবনে ধাওল।

অন্তর আজি কার গাওল বন্দন—
চঞ্চল কেন অব মধু হৃদি নন্দন,
যৌবন সুরে প্রাণ ভরল রে অনুখন
জাগওল লেহ চিতে, পিয়া সে কি আওল!

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

অফিসঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাড়ে আটটা বাজল। টেবিলের ফাইলের গাদা থেকে মুখ তুলে দেয়ালঘড়ির দিকে সুখেন তাকাল। অন্ততঃপক্ষে আরও এক ঘণ্টা কাজ না করলে ফাইলগুলোর সংগতি করা সম্ভব নয়। রোজই এমনি করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অফিসে কাজ করতে হয় সুখেনকে। সেজন্যে সে কিছু বাড়তি মাইনে পায় না। বরং তার টেবিলে ফাইল জমে থাকলে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কোয়েলো সাহেবের খিতখিচুনির অন্ত থাকে না।

সুখেনও এমনি করে আর পারে না। পাঁচটা, বড় জোর ছ'টা কিংবা সাড়ে ছ'টা বাজতে-না-বাজতেই সকলেই টেবিল সাফ্ করে বাড়ী চলে যায়। আর সুখেন পড়ে থাকে ওই সুপারিনটেণ্ডেণ্টেরই জরুরী ফাইলগুলোর যথারীতি গতি করবার জন্যে। আজ বার বছর ধরে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছে এস. এল. অয়েল কোম্পানীর এই অফিসে। যুদ্ধোত্তরকালে কোম্পানী সেই পুরনো আমলের বাড়ীটা বিক্রী করে দিয়ে নতুন অফিসবাড়ী তুলেছে। তেলবিষয়ে অভিজ্ঞ বিদেশী ডিগ্রীধারী কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারকে মোটা মাইনেতে নিয়োগ করেছে বিরাট বিরাট ট্যাঙ্ক, পাইপলাইন ইত্যাদি তদারকের জন্যে। অফিসের আসবাবপত্র থেকে আরম্ভ করে সব আদবকায়দাই বদলে গেছে। বদলে গেছে সেই সংগে অফিসারদের চেহারাও। কিন্তু কেরাণীদের মাইনে এক কাণা-কড়িও বাড়ে নি। কোন কালে বাড়বে বলেও সুখেনের মনে হয় না।

চাকরির যা বাজার, তাতে এ চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি পাওয়াও মুসকিল। তা'ছাড়া এত দিন একই জায়গায় বসে একটানা চাকরি করতে করতে এই তুচ্ছ চাকরিটার ওপর বেশ খানিকটা মায়া পড়ে গেছে। এক কথায় ছেড়ে দিতে মন চায় না। তবু মনটা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে ওঠে। যেমন আজ হয়েছে। কিছুতেই মনটা তার শান্ত হচ্ছে না। কোম্পানী কেন তাকে এমন করে শোষণ করে নেবে? এই পরম সত্যটিকে এই যেন সে প্রথম আবিষ্কার করল।

রাত ক্রমশঃ বাড়ছে। দরোয়ানরা তেলের শেডের সামনেকার ঘুমটির কাছে বসে ঢোল-করতাল নিয়ে প্রাণ খুলে ভজন গান করছে।

আরও অনেক সময় কেটে গেলে। ন'টা বাজল। সামনের ট্রেতে লাল ফ্ল্যাগ-মার্কা ফাইল এখনও প্রায় খান বার-তের রয়েছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের চশমাটা খুলে সুখেন একবার ভাল করে চোখ-মুখ রগড়ে নিল। সত্যিই তার ভারি রাগ হল কোয়েলো সাহেবের ওপর। খিটখিটে মেজাজের কুটিল প্রকৃতির লোকটা যেন চাবুক মেরে কাজ করিয়ে নিতে চায়। নিজে পাঁচটা বাজতেই খেলার মাঠে কিংবা সিনেমায় যাওয়ার জন্যে উন্মুখ। তবু বারশো টাকা মাইনে মাসে মাসে কোম্পানী থেকে গুণে নিচ্ছে এক রকম চেয়ারে বসে বসে। তার চেয়ে একশো ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণী সুখেনের যোগ্যতা কি কিছু কম? ফাইলে পাতা ভরে ভরে নোট লিখে দেবে সুখেন, আর কোয়েলো সাহেব তাতে শুধু তার নামটি দস্তখৎ করে বড় সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দেবে। এই তো তার কাজ।

বড় সাহেব সুখেনের প্রতি যথেষ্ট নির্ভরশীল। কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তিনি নিজেও আর কলম ছোঁয়ান না কোথাও. যদি দেখেন যে সুখেন চমৎকার ভাবে কেস সাজিয়ে যুক্তিসংগত ভাবে আলোচনা ও নির্দেশের অনুমোদন করেছে তার নোটে। বড় সাহেব টুক্ করে একটি ছোট্ট সই করে দিয়ে জানিয়ে দেন তাঁর সমর্থন ও নির্দেশ। সেই অনুযায়ীই আজ বার বছর ধরে চলে আসছে বিখ্যাত এস. এল. অয়েল কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থা ও ব্যবসা-সমৃদ্ধি।

কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও সুখেনের প্রমোশন বা বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে কেউ-ই মাথা ঘামায় না। অবশ্য সুখেন নিজেও এত দিন ঘামায়নি। কিন্তু বয়স যত বেড়েছে, সেই সংগে তার সংসারও বেড়ে গেছে। অফিসে তার খাটুনি বেড়েছে যেমন, বেড়েছে তেমন কোম্পানীর মূল ধন। বাড়েনি শুধু কেরাণীদের মাইনে। মাসিক একশো তিরিশ টাকার স্বপ্ন সামনে রেখে জীবন পণ করে বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষয় করে চলেছে সুখেন। এমনি করে আরও কয়েকটা বছর ঘানি টেনে পৌঁছবে গিয়ে একেবারে কবরের গোড়ায়। আজ যেন সুখেনের কি হয়েছে! নিজের জীবনের অকপট স্পষ্ট ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

অফিসের কাজে বরাবরই তার যথেষ্ট উৎসাহ, নিখাদ নিষ্ঠা। এদিকে সকাল ন'টার আগে রোজ সে অফিসে এসে কাজে মন দেয়, আর ওদিকে রাত ন'টা-দশটার আগে কোন দিনই বাড়ী ফিরতে
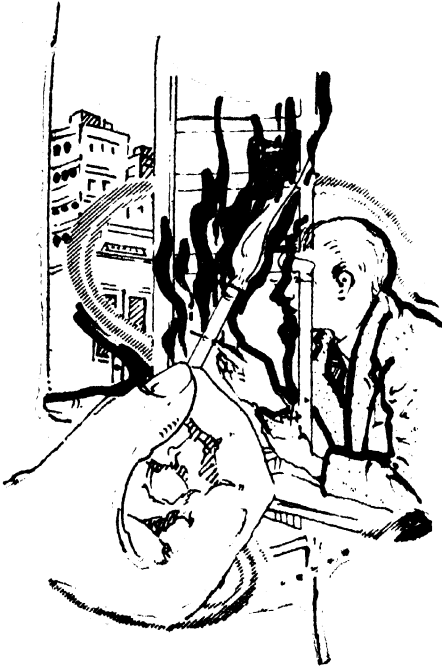
পারে না। এমন কি, ছুটির দিনেও কখনও কখনও সে এসে হেড দরোয়ানের কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে অফিস খুলে বসে কাজ করে।

দরোয়ানরা থেকে সাহেবরা সবাই যে সুখেনকে ভালবাসে বা সম্ভ্রম করে, সুখেনের কাছে এ কি কম গৌরবের? সুখেনের মত সৎ ও কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এ যুগে যে বিরল, সেকথা খাস বিলেতী সাহেবরাও একবাক্যে সবাই স্বীকার করে। নতুন যে বড় সাহেব এসেছেন, তিনিও নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সুখেনের নাম শুনেছেন!

নন্দিতা এই সেদিনও তাকে নিষেধ করেছে অত খাটুনি খাটতে। বলেছে, খেটে খেটে অমন করে শরীরটাকে ভেঙে দিয়ে লাভ কি? ভগবান না-করুন, এখন-তখন একটা কিছু হলে ছেলে-পুলে নিয়ে আমাকেই পথে পথে ভেসে বেড়াতে হবে। তখন তোমার কোয়েলো সাহেব ফিরেও তাকাবেন না। এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় এমন কোন ব্যক্তি আমাদের নেই যে, সাহায্য করা দূরে থাকুক, একটু সমবেদনাও জানাবে।

—তুমি ভুল করছ, নন্দিতা! জানো, ফাঁকি আমি কোনদিনই কাউকে দিই নি, দিতে পারি না। অফিসের কাজে তো পারিই না। কারণ অন্ন জুটছে ওখান থেকে।

—দেখ, তুমি যদি এত ভালমানুষ না হতে, তা'হলে আমার কপালে এত দুঃখ লেখা থাকত না। ছেলেরা ভাল করে খেতে-পরতে পাচ্ছে না। মেয়েটা সবে প্রমোশন পেয়ে ক্লাসে উঠেছে, তার সব বই এখনও কেনাই হল না। মাসকাবারি বাজার করবার পুরো টাকাটাও জোটাতে পারা যাচ্ছে না। তুমি এত খাটুনি খেটে কি আর এমন হচ্ছে! তার চেয়ে অফিসের পর যদি দুটো টিউশনিও করো তো এত অভাব সইতে হয় না। চোখের সামনে দেখছ না যে, তোমাদের অফিসেরই শ্রীকান্ত বাবু দু'বেলা টিউশনি করে কেমন সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে বাস করছেন বেশ সচ্ছল ভাবে। তবু যদি তোমার চেয়ে শ্রীকান্ত বাবুর বিদ্যে তেমন কিছু বেশী থাকত!

—নন্দিতা, দারিদ্র্য ঘুচোবার জন্যে বিবেককে ফাঁকি দিতে আমি পারব না। অফিসের কাজে ফাঁকি দিয়ে জীবনে কতটুকু লাভ আমি করতে পারব, জানি নে। তবে এত পরিশ্রম করেও মনে আমার শান্তি আছে, তৃপ্তিবোধ আছে যে, আমি কখনও কোন অন্যায় করি নি। সেই আত্মিক স্বস্তিটুকু কম লাভের নয়।

আশ্চর্য! স্বামীর কথার আর কোন প্রতিবাদ করল না নন্দিতা। সত্যিই সে বড় ভাল বৌ। স্বামীকে সে জানে, বোঝে। তাই শ্রদ্ধাও করে তাকে ষোল আনা। হাসিমুখে সে ভাত বাড়তে বসল স্বামীর জন্যে। সারা দিন টিফিনে চার পয়সার ঝালমুড়ি খেয়ে রয়েছে মানুষটা! আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

আজ অফিসে নিজের টেবিলে স্তূপাকার ফাইলের সামনে বসে সুখেনের মনে পড়ছে কত দিনের কত খুঁটিনাটি কথা। নন্দিতার কথা। অফিসের কথা। এই অফিস যখন অনেক ছোট ছিল, তখনকার কথা। মাত্র আঠারো জন কেরাণী নিয়ে তিন জন সাহেব মিলে অফিস খুলেছিলেন ভারতবর্ষে। মাত্র বছর কুড়ির কথা।

সুখেনের ভগিনীপতি ছিলেন সেই আঠারো জনের এক জন। কত দিন সুখেন এ অফিসে এসেছে তার ভগিনীপতি দীননাথের সংগে দেখা করতে। কত দিন সে অবাক হয়েছে খাস বিলেতী সাহেব তিনটির দুর্বোধ্য কথাবার্তা শুনে। বেয়ারা এবং কেরাণীরা সবাই তাকে দীননাথ বাবুর সম্বন্ধী বলে জানত। তাই তারা তাকে নিয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে একটু-আধটু ঠাট্টাও যে না করত, এমন নয়। সুখেনের কাছে দীননাথের অফিসটাকে বেশ ভালই লাগত। বাইশ টাকা মাইনের কেরাণী দীননাথ তখনকার দিনে সোনারপুর গাঁয়ের মস্ত বড় চাকুরে বলে বিবেচিত হত। দীননাথেরই অনুরোধে সুখেনের পিতৃবিয়োগের পর সুখেনকে চাকরি দেন খাস বিলেতী সাহেবরা তার চমৎকার হাতের লেখা, এবং ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান পরীক্ষা করে খুশী হয়ে। দেখতে দেখতে বছর দুয়েকের মধ্যেই সুখেন অয়েল কোম্পানীতে বেশ সুনাম অর্জ্জন করল। কিন্তু দীননাথ তা আর দেখে যেতে পারল না। সুখেনের চাকরীর বছর না ঘুরতেই দীননাথ অকস্মাৎ মারা গেল। তবু দীননাথের কাছে সুখেন আজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। বড় দুঃসময়ে তাকে চাকরি দেবার জন্যে।

আজ এই এয়ার-কণ্ডিশনড ঘরে কাচে-ঘেরা কামরায় বসে সুখেনের বড় বেশী করে মনে পড়ছে দীননাথের কথা।

ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বাজল। কিছুতেই আজ আর সুখেন কাজে মন বসাতে পারছে না। এখনও খানকয়েক ফাইল ট্রেতে পড়ে রয়েছে। ওপরের ফাইলটা টেনে নিল সুখেন। এই তো সেই কোর্ট কেসের ফাইলটা। সে আগ্রহভরে ফাইলটাকে হাতে তুলে নিল। নতুন বড় সাহেব কি আদেশ দিয়েছেন ফাইলটায়, তা দেখবার জন্যে সুখেন বেশ উৎসাহ বোধ করল। কিন্তু ফাইলটা

খুলেই সে অবাক হয়ে গেল। মাথাটা যেন ঘুরে পড়ছিল তার। ফাইলটা বড় সাহেবের ঘরে পাঠাতে তার একদিন দেরী হয়েছে বলে বড় সাহেব তার লিখিত কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। সুখেন তার চাকরির জীবনে এই প্রথম একটা সাংঘাতিক ধাক্কা পেল। নতুন সাহেব তা'হলে তার সুনামের কথা কিছুই শোনেন নি, কিংবা শুনেও গ্রাহ্য করেন নি। কোম্পানীর এত দিনের বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান কর্মচারীর মনে একটা চিড় খেয়ে গেল। মনে পড়ল তার সেই পুরনো দিনের সেই ছোট্ট অফিসের দীনতম চেহারার সংগে আজকের ঝকঝকে ও জমকাল চেহারার অফিসের পার্থক্য! নতুন নতুন চেয়ার-টেবিলের সংগে নতুন নতুন ছেলে-ছোকরায় ভরে গেছে অফিস। এই বিরাট অফিসে সুখেনের যতখানি প্রতিপত্তিই থাক-না কেন, তবু তার গুরুত্বটুকু সে যেন ঠিক নিক্তিতে যথাযথ ভাবে হিসেব মিলিয়ে দিতে পারে না। সে জানে যে, এই ফাইলে যুক্তিসংগত কারণ যদি সে না দেখাতে পারে তো বড়সাহেব তার ব্যক্তিগত চরিত্র সংক্রান্ত গুপ্ত রেকর্ডে লিখে রাখবেন হয়তো তার কাজের গাফিলতির এই দৃষ্টান্তটি, তার ফলে হয়তো চাকরিতে কোনদিনই তার আর উন্নতি হবে না, অথবা তার বার্ষিক বর্ধিত হারের মাইনেটুকু বন্ধ হয়ে যাবে, কিংবা তাকে সস্‌পেণ্ড করা হবে তার পদ থেকে। কত কি ব্যাপারই ঘটতে পারে এই তুচ্ছ কারণ থেকে।

এত দিনের নিষ্ঠাবান কর্মীর মন নিদারুণ ভাবে বিদ্রোহ করে উঠল। আকাশ-পাতাল কত কি যে সুখেন ভাবছিল ফাইলটা হাতে নিয়ে, তার ঠিক নেই। মনটা তার খুবই খারাপ হয়ে গেল। সব ফাইলগুলো, সে জড়ো করে রাখল ট্রেতে। তারপর ধীরে ধীরে একটি সিগারেট ধরাল। খুব আকস্মিক ভাবেই তার মনে পড়ল মনোরঞ্জনের মুখখানা। চিরকাল কাজে ফাঁকি দিয়ে শুধু বাক্‌-চাতুর্যে সে উন্নতি করেছে চাকরিতে। তার মাইনে এখন চারশো। সত্যিই কলিযুগে ধর্মের জয় নেই। আসলের চেয়ে মেকীর কদরই এ যুগে বেশী। মনোরঞ্জন তার সাক্ষাৎ-প্রমাণ। কারণ একই দিনে তারা চাকরীতে ঢোকে একই পদে।

সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এবং অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল। নিঃঝুম নিস্তব্ধ অফিসবাড়ীটি। সারা দিনের হৈ-হৈ রৈ-রৈ থেমে গেছে বিকেল পাঁচটা থেকে।

দক্ষিণদিকের করিডোরের দিকে হঠাৎ সুখেনের চোখ পড়ল। কাচের জানলা দিয়ে সে দেখতে পেল, তেল পরীক্ষাগারে অর্থাৎ ল্যাবরেটরীতে তখনও আলো জ্বলছে।

কাজে তার মন লাগছিল না, বিশেষতঃ বড় সাহেবের কৈফিয়ৎ চাওয়ার ভাবাটা পড়ার পর থেকে। অফিস বন্ধ করে সে বেরিয়ে গেল। ল্যাবরেটরীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ। হয়তো এ্যাসিষ্ট্যাণ্টরা বাড়ী যাওয়ার সময় আলোটা নিবিয়ে দিতে ভুলে গেছে।

কাচের জানলা দিয়ে সুখেন তাকাল ভেতরের দিকে। কি সুন্দর তাদের ল্যাবরেটরী! এই সেদিনও বিলেত থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সরঞ্জাম কেনা হয়েছে। সবই সুখেন দেখেছে কাগজে-কলমে হিসেবের মারফৎ। কখনও কি সে একটু সময় পায় টেবিল ছেড়ে এক পা নড়বার? ওই তো সারি সারি সাজানো নমুনা-বোঝাই তেলের জার। পেট্রোল, ডিজেল অয়েল, কেরোসিন, আরও কত রকমের তেল। ঘনত্ব, তাপমাত্রা প্রভৃতি নির্ধারণ করবার জন্যে মোটা মাইনের কত কেমিষ্ট রাখা হয়েছে। তাদেরই রাজত্ব এই বিরাট ল্যাবরেটরীটা।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে এক পলক তাকাল সুখেন। রাত্তিরের নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় সিগারেটের আগুনকে সুখেনের মনে হতে লাগল বেশ জ্বলজ্বলে একটা মশালের মত।

কাচের জানলাটার কাছে জ্বলন্ত সিগারেটটাকে সে এগিয়ে নিয়ে গেল। সিগারেটের লাল ছায়া পড়ল কাচের গায়ে। রাত্তিরের পটভূমিকায় সে-দৃশ্য সুখেনের কাছে বড় মুগ্ধকর বলে মনে হল।

হঠাৎ সুখেনের মাথার ভেতর উষ্ণ রক্তের আকস্মিক প্রবাহ অনুভূত হল। মাথাটা তার ঝিমঝিম করে উঠল। সে যেন মুহূর্তের মধ্যে কেমন হয়ে গেল! ডান পায়ের জুতোটা খুলে জুতোর ভারি গোড়ালিটা দিয়ে সে আঘাত করল জানলাটার কাচে। চিড় খেল কাচের গা, তার মনটার মতই। আর একবার ঠুন্‌ করে শব্দ হল। ঝন্‌ঝন্‌ করে ঝরে পড়ল কাচের কয়েকটা টুকরো। তার কি যে মনে হল, সে সজোরে ছুঁড়ে দিল জ্বলন্ত সিগারেটটা ল্যাবরেটরীর মধ্যে। তারপর কখন ও কেমন করে যে সে তীরের মত উধাও হয়ে গেল গেট পার হয়ে, তা উচ্চনিনাদী ঢোল করতাল সহযোগে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনগানে মত্ত দরোয়ানরা জানতেই পারল না। হঠাৎ তারা দেখতে পেল যে, ল্যাবরেটরী-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আগুনের স্রোত সেডের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। সারা অফিসটা আগুনের ফোয়ারায় লালে লাল হয়ে উঠেছে!

হেড দরোয়ান ছুটে গিয়ে ফায়ার বিগ্রেডে খবর দিল। দেখতে দেখতে দলে দলে ফায়ার বিগ্রেড এসে পড়ল। কিন্তু অফিসের জরুরী কাগজপত্র বা ল্যাবরেটরীর মূল্যবান নতুন সাজ-সরঞ্জামের কিছুই বাঁচান গেল না। সর্পিল গতিসম্পন্ন পেট্রোলের আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল সব-কিছু।

খবর পেয়ে অফিসের সব বড় কর্তারা এসে হাজির হলেন। সবাই খুব দুশ্চিন্তা ও মনঃক্ষুণ্ণতার ভার বহন করছেন তাঁদের মুখে। কিন্তু নতুন বড় সাহেবের যেন কি হয়েছে! বেশ খুশী মনেই তিনি কেস থেকে সিগারেট বের করে করে সবাইকে দিচ্ছেন। নির্ভেজাল আনন্দের ছায়া তাঁর সারা চোখে-মুখে।

কিছুক্ষণ পরেই তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন তাঁর বিরাট বুইক গাড়ীখানা নিজে ড্রাইভ করে। কাউকে তিনি অনুসন্ধান করার বা ভাববার অবকাশ পর্যন্ত দিলেন না এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে।

পরদিন সংবাদপত্রে এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডের খবর বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হল। এস, এল, অয়েল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিও বেরোল যে, কোম্পানীর নতুন বাড়ী তৈরী না হওয়া পর্যন্ত কর্মীদের ছুটি। উপরন্তু তিনি এক মাসের করে অগ্রিম মাইনে নগদ দিলেন সব কর্মচারীদের।

সুখেন কত দিন যে ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারেনি, তার ঠিক নেই। জীবনে এই প্রথম এত বড় অন্যায় সে করেছে। নিজের পাগলামির জন্যে সে কত বার যে নিজের মাথার চুল ছিঁড়েছে, কত রাত্তিরে যে নিদ্রাহীন চোখে আপন মনে কেঁদে সারা হয়েছে, এবং কত দিন যে ভগবানের কাছে নিজের জন্যে শাস্তি প্রার্থনা করেছে,

তার ইয়ত্তা নেই। তবু মুখ ফুটে সে নন্দিতাকে কিছুই বলতে পারেনি, তার পৌরুষে বেধেছে। নিজের দুষ্কর্মের কথা স্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করে সে তার অকপট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে দাগ কাটতে দেয়নি। দরিদ্রের দাম্পত্যজীবনে সেটুকু চলে গেলে আর রইল কি?

দীর্ঘ দু' মাস অফিসের ছুটি কাটিয়ে সুখেন যখন নতুন বাড়ীতে অফিস করতে এল, তখন সত্যিই সে অবাক না হয়ে পারল না! অফিসের সমৃদ্ধি যেন আগের চেয়ে আরও তিন গুণ বেড়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেদিনই নোটিশ বেরোল যে, তিন মাসের বোনাস প্রত্যেক কর্মচারী পাবে, এবং মাইনের হার প্রত্যেকের প্রায় দেড় গুণ বেড়ে গেল।

সুখেন শুধু ভাবতে লাগল যে, এ স্বপ্ন, না সত্য? সুখেনের সেকসনে আরও তিন জন নতুন লোক নেওয়ার জন্যে সংবাদপত্রে কবে যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, এবং তারা কাজে যোগদান করেছে, তার কিছুই সে জানত না। যাক, এবার থেকে সুখেনকে আর অত খেটে মরতে হবে না। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে অন্য সকলের সংগে পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরতে পারবে। নন্দিতাও খুসী হবে।

কিন্তু কোথা থেকে এত ঐশ্বর্য কোম্পানী পেল? সেই বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে পুরনো দিনের সব গ্লানি সত্যিই কি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে?

সকলের মুখে হাসি। কোয়েলো সাহেব সিগারেট ছেড়ে পাইপ ধরেছে। ভয়ে ভয়ে সুখেন সোয়েলো সাহেবকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেই ফেলল। মাথাটা ঈষৎ চুলকে নিয়ে ভাংগা-ভাংগা শুকনো কণ্ঠে বলল, স্যর, আমাদের কোম্পানী হঠাৎ এত টাকা কোথায় পেল?

হো-হো করে কোয়েলো সাহেব মন-খোলা হাসি হেসে উঠল।

—হাউ ফানি, ইউ ডোণ্ট নো এনি থিং! এ কিউ ক্রোরস্ আস্ রুপিস্ উই হ্যাভ ফ্রম ইনসিওরেন্স কোম্পানী বিকস্ অফ দিস্ এক্সিডেণ্ট!

মুখে একটু ম্লান হাসি টেনে এনে সুখেন নিজের চেয়ারে বসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'এক্সিডেণ্ট'—তবু ভাল, সুখেনের জেল হয়নি।

ইতিমধ্যেই সুখেনের সামনের ট্রেতে কয়েকটা নতুন ফাইল এসে জমা হয়েছে। চোখের হাই পাওয়ারের চশমাটা খুলে চোখ-মুখ ভাল করে রুমালটা দিয়ে সুখেন মুছল। তবু তার চোখে যেন ফাইলগুলোকে শুধু ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হতে লাগল। তার থেকে যেন দপ করে জ্বলে উঠল পেট্রোলের তীব্রগতিসম্পন্ন অগ্নি। হ্যাঁ, সুখেনের চোখের সামনে দাউ-দাউ করে প্রলয়াগ্নি জ্বলছে। দূরে গ্যাসপোষ্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে যেন তাই অপরাধীর দৃষ্টিতে দেখছে, আর থরথর করে কাঁপছে সেই বিশেষ রাত্তিরের মত। তার চোখের সামনে সারা অফিসময় শুধু আগুন আর আগুন! সে চীৎকার করে উঠতে গেল। তার মাথার ভেতরকার শিরা-উপশিরাগুলোতেও যেন দপ্ দপ্ করে পেট্রলের আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল।

চমকে উঠল সে কোয়েলো সাহেবের ডাকে। চোখে চশমাটা পরে ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। প্রায় টলে পড়ছিল। তখনও যেন আগুনের ঝাঁক সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়নি সারা অফিস থেকে।

প্রায় টলতে টলতে সে গিয়ে দাঁড়াল কোয়েলো সাহেবের টেবিলের সামনে।

—টেক্ ইয়োর সীট প্লিজ!

এই দীর্ঘ চাকরি-জীবনে এমন মিষ্টি করে কোয়েলো সাহেব তাকে কোন দিন বসতে বলেনি! থতমত খেয়ে সে বসে পড়ল তার সামনে। কোয়েলো সাহেব একটু মুচকি হেসে একটা ফাইল তার দিকে এগিয়ে দিল। সেই ফাইলে সে যা দেখল, তা সে কোন দিন কল্পনাও করে নি। সে প্রমোশন পেয়ে সুপারভাইজার হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে তার মাইনে মনোরঞ্জনের সমান। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো টাকা। এখন থেকে সে ঘেরা-ঘরে বসবে। অফিসারদের সংগে লাঞ্চ করবে। কেরাণীরা তাকে 'স্যর' বলে সম্বোধন করবে। নতুন বড় সাহেবের দস্তখৎ রয়েছে সেই অর্ডারের তলায়। এতক্ষণে তার চোখের সামনেকার আগুনের বন্যা যেন অনেকটা নিবে এসেছে। সুন্দর নিওনের আলোর স্নিগ্ধ মাদকতা ছড়িয়ে রয়েছে অফিস-ঘরের সবখানে, সে দেখতে পাচ্ছিল।

তব তারই মাঝে কোথায় যেন সুখেনের মনের কোন রন্ধ্রে এক টুকরো আগুন জ্বলছে। তুষের আগুন! তা বোধ করি কোন কালেই নিববে না।

মাসিক বসুমতার বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে........................২৪৲

ষাণ্মাসিক „ „ ....১২৲

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে

(ভারতীয় মুদ্রায়)..............২৲

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক　১৫৲

„ ষাণ্মাসিক সডাক ৭৷৷৹

প্রতি সংখ্যা ১৷৹

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে..............১৸৹

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ..............২১৲

ষাণ্মাসিক „ „ „ ১০৷৷৹

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা „ „ ১৸৹

বাঁড়ুজ্যে গিন্নী ও বিনতা

ইস্কুল টিচার বিনতা। প্রথমে যেদিন সে ১৫৩/২ রামতলা বাইলেনের দোতলায় এসে উঠল সেদিন পাড়ায় ছোটখাট একটা আন্দোলন হয়েছিল বৈকী। পাড়ার রোয়াকে বসা ছেলেদের একজন মন্তব্য করেছিল—"জেন রাসেল এয়েচে মাইরী।" কিন্তু আন্দোলনের জোর বোঝা গেল পাড়ার গিন্নীবান্নীদের আড্ডায়। "কালে কালে কতই দেখব"—বাঁড়ুজ্যে গিন্নী মুখ ব্যাঁকালেন—"ওরকম চাকরি দেখতে আমাদের আর বাকী নেই।"

বিনতা কিন্তু হতাশ করল সবাইকে। সে কারো সাতে পাঁচে থাকেনা। কিন্তু সব ঠাণ্ডা হলেও ঠাণ্ডা হোলনা গিন্নীবান্নিদের দ্বিপ্রাহরিক আসর। বাঁড়ুজ্যে গিন্নী বললেন—"হুঁ হু আমরা এক পলক দেখেই লোক চিনি।" ব্যাপারটা ঘটল কিন্তু অন্যরকম। বাঁড়ুজ্যে গিন্নী পড়লেন টাইফয়েডে। যতদিন রোগ নির্ণয় হয়নি সবই আসতো দেখা করতে। কিন্তু টাইফয়েড শুনেই সব হাওয়া। আর কাউরো দেখা নেই। রামসদয়বাবু একদিন রায়গিন্নীকে বলেছিলেন "আপনারা যদি একটু আসেন দয়া করে। বিপদে আপদে আপনারা না দেখলে চলে কি করে? আমি যাই আফিসে—ছেলেটার সারাদিন নাওয়া খাওয়া হয়না।" রায়গিন্নী আমতা আমতা করে' বলেছিলেন—"তাতো ঠিকই বাঁড়ুজ্যে মশাই। তবে রোগটা বড় ছোঁয়াচে কিনা। আমাদেরও তো ছেলেপুলে নিয়েই সংসার। দেখি ওনাকে জিজ্ঞেস করে।" এলেননা কিন্তু কেউ। এলো যে তাকে কেউ কখনও আশা করেনি। বিনতা। প্রায় ২১ দিন ধরে সে বাঁড়ুজ্যে গিন্নীকে অক্লান্ত সেবা করল। দেখাশুনা করল তাঁর ছেলেকে। রামসদয়বাবু দু'চোখ ভরা জল নিয়ে বলেছিলেন—"মা, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষী।" ডাক্তার বলেছিলেন—"এরকম একাগ্র নিপুন সেবা আমি কখনও দেখিনি। তুমি মা প্রান দিয়েছ রোগীর।" বিনতা ক্লান্ত চোখের ওপর থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে বলেছিল—"আমি নার্সিংয়ের একটা কোর্স করেছিলাম মাস ছয়েক।" মাস কয়েক পরের কথা। আবার সেই মহিলাদের দ্বিপ্রাহরিক আসর। রায়গিন্নী মুখভার করে বললেন—"দিদি, তোমার কি ভিমরতী হয়েছে? শুধু বিনু আর বিনু। না হয় সেবাই করেছে তোমার অসুখে।" বাঁড়ুজ্যে গিন্নী একটু মুচকি হাসলেন—"বোনটি আমার তোমরা তো তাও করনি। কাউকে চিনতে আমার বাকী নেই। আর শুধু কি অসুখে সেবা? আমার অসুখের সময় ও আমার সংসারটা ঢেলে সাজিয়েছে। এমনকি হেঁসেলের ব্যাপারেও"—"হেঁসেলে আবার ওকি করবে?

হেঁসেল মানেই তো চাল, ডাল, ঘি, তেল নুন—থোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়ি থোড়—" রায়গিন্নী মুখ ব্যাজার করলেন। "নাগোনা অত সহজ নয়। বিনু বলে খাবারটা তো একটা রুটীনমাত্র নয়। খাবার হওয়া দরকার সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। তাই আমার বাড়ীর সব রান্না এখন হয় 'ডালডায়'।"

"সে কি 'ডালডা'!" রায়গিন্নী চোখ ছানাবড়ার মত করলেন—"এবার বুঝেছি তোমার বিনুর কেরামতী। এইসব ছাইপাঁশ খাওয়াচ্ছে তোমায়?" সবাইয়ের দিকে একবার বিজ্ঞের মত তাকিয়ে নিলেন রায়-গিন্নী—"জান, সেদিন আমার ঘি ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই দেড়পো টাক খোলা 'ডালডা' আনিয়েছিলাম। রান্না মুখে তোলা যায়না—" বাঁড়ুজ্যে গিন্নী বল্লেন—"সে তো হবেই বোন। 'ডালডা' অত্যন্ত জনপ্রিয় বলেই বাজারে অনেক আজে বাজে জিনিষ 'ডালডার' নামে কাটছে। দোকানদার নিশ্চয় তোমাকে খোলা টিন থেকে অন্য কোন বনস্পতি দিয়েছিল।"

"'ডালডা' শুধু পাওয়া যায় হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। খোলা বনস্পতি অস্বাস্থ্যকর হতে পারে কারণ তাতে ধূলোবালি পড়ে, মাছি ময়লার ছোঁয়া লাগতে পারে। কিন্তু শীলকরা ডবল ঢাকনাওলা টিনে 'ডালডা' সবসময় তাজা পাওয়া যায়"—"আচ্ছা না হয় মেনেই নিলাম সেদিন আমি ভুল করে অন্য কিছু আনিয়ে-ছিলাম কিন্তু 'ডালডায়' কি গুণটা আছে শুনি?" রায়গিন্নী প্রশ্ন করলেন। "বিনু বলেছে 'ডালডার' প্রতি আউন্সে ভাল ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয় এতে। ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' শরীর ভাল রাখে, অসুখবিসুখ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেয়। 'ডালডা' তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে। কিন্তু এ সব সত্বেও 'ডালডার' দাম কত কম!" বাঁড়ুজ্যে গিন্নী উঠে দাঁড়ালেন। সবাই অবাক হয়ে বাঁড়ুজ্যে গিন্নীর অপসৃয়মান চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল।

DL. 326B-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই
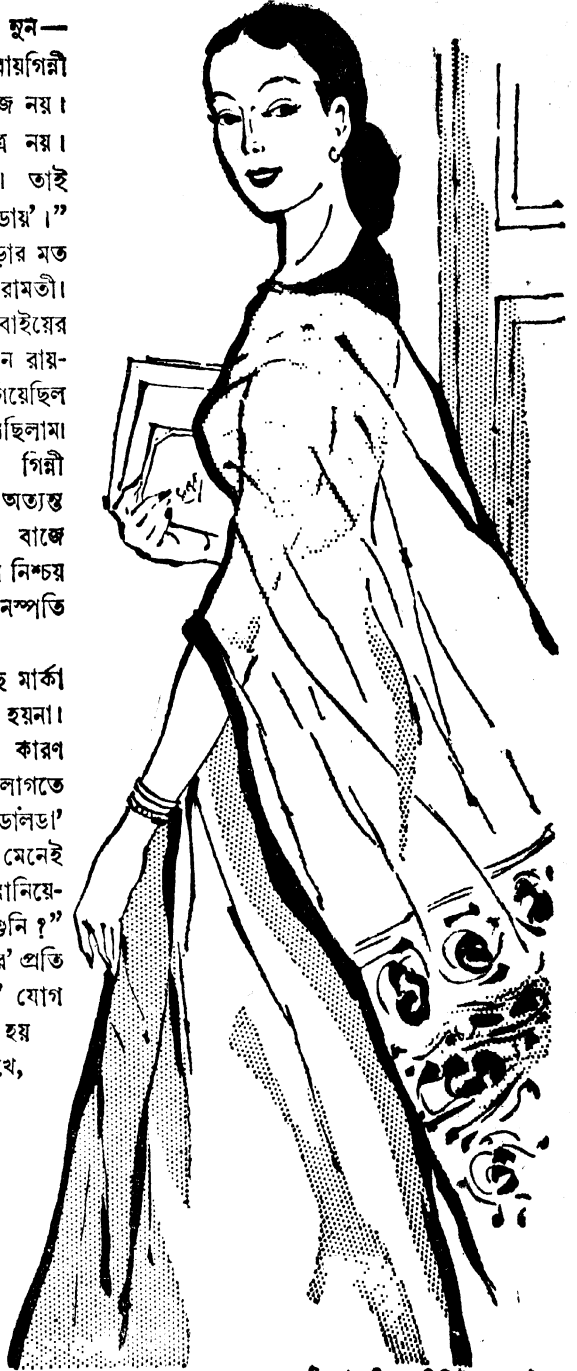
আশালতা বিশ্বাস

ভোর রাত্রি থেকেই একটা শানাই বার বার শিশুর মতই ফুলে ফুলে কেঁদে উঠছিল। আর তার ফাঁকে ফাঁকে মালার স্বপ্নবিধুর মনটা বার বার মুষড়ে পড়ছিল স্তূপাকারে রাখা নানা উপহারের মধ্যে। আজ মালার বিয়ে। মালার বাবা অধরকান্তি সান্যাল মহাশয় সম্প্রতি দারিদ্র্যতার বিষদাঁতের কামড়ে গলে-পিষে একাকার হোয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মাতৃহারা কন্যা মালার জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করে গোপনে সেটা সরিয়ে রেখেছিলেন একান্ত নিভৃত এক জায়গায়—যেখানে এ পক্ষের শাঁখের করাত গিন্নীর বক্রদৃষ্টি পড়বার সম্ভাবনা নেই। তাই দিন পনেরো আগে থেকে এতো যে আয়োজন, আর তার উপর বি, এ, পাশ করা জামাতার পণ, এসব যে অধরকান্তি সান্যাল মহাশয় কেমন করে ঘাড় পেতে নিতে রাজী হলেন, এ ভাবগতিক দেখেই গিন্নী রমা কিন্তু একেবারেই অবাক না হোয়ে পারলেন না। ফাকেজোকে সময় করে স্বামীর কাছে এক দিন কথাগুলো জিজ্ঞেস করতেই, তিনি মুখটা এক পাশে ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, সে খোঁজে তোমার প্রয়োজন কি গিন্নী? আমার মেয়ের ভাবনা আমার অনেক কাল আগে থেকেই ভাবা ছিল। গিন্নীর মনটা বিষের জ্বালায় রি-রি করে জ্বলে উঠল এবং পরক্ষণেই বলে ফেললেন, তাই বটে! তোমার মেয়ের ভাবনাটা যখন সবই তোমার, আমার কিছুই নেই, তখন মেয়ের বিয়েটা তুমি নিজে হাতেই দাও। আমি আমার বাপের বাড়ী চললুম। আর আজ থেকে এই দিব্বি রইল, মালা যেন আমায় মা বলে না ডাকে, এর অন্যথা হোলে তোমার মরাবাপের দিব্বি রইল।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে মানুষ যেমন মূঢ় ও বিবর্ণ হোয়ে যায়, অন্য জ্ঞান তার যেমন থাকে না, ঠিক তেমনি অবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগলেন সান্যাল মহাশয়। কি যে করবেন আর কি যে না করবেন, কিছুই যখন তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, ঠিক এমন সময় পাড়া কাঁপিয়ে বাদ্য-বাজনার কোলাহল তুলে একখানা বাস ও চারপাঁচ খানা মোটরকার এসে তারই দরজার সামনে হঠাৎ থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাড়া ও বাড়ী উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হোয়ে উঠলো।

রাত্রি দেড়টা প্রায়। সানাই-এর কান্না থেমে গেছে অনেকক্ষণ আগে। বিদ্যুৎ-বাতির ঝলমলে আলোয় সারাটা বাড়ী তখনও আলোকিত। পরিশ্রান্ত চাকর-বাকর আত্মীয়-কুটুম্ব, তার সাথে বর দেবী সান্যালও গভীর নিদ্রায় গা ঢেলে দিয়েছেন। নিস্তব্ধ নিশীথিনীর বুক চিরে চাঁদের স্নিগ্ধ হাসি সময়ে সময়ে চিকিয়ে চিকিয়ে উঠছে। দূরে কোথায় যেন ভোজের উচ্ছিষ্ট ফেলা কলাপাতা নিয়ে শিয়াল-কুকুরে টানাটানি করছে আর মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে উঠছে। আহার শেষে ওরাও যে যার বাসায় ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু ঘুম নেই শুধু মালার চোখে। হারিয়ে-যাওয়া মা'র কথা মনে করে মালা যেন শ্রান্ত-ক্লান্ত হোয়ে বাসরে লুটিয়ে পড়লো। মা—আমার নিজের মা হোলে আজ এমনি দিনে আমায় ফেলে রেখে, সংসারের এতোবড় দায়িত্ব ফেলে রেখে কি চলে যেতে পারতো? আবার পরক্ষণেই মালা ভাবে, কিন্তু এখন আর উপায়ই বা আছে কি? ক্রমে ভোর হয়—বৃক্ষের শাখায় শাখায় কোকিল ডেকে ওঠে, ভোরের শ্যামলী আভায় মিলিয়ে যায় সারারাত্রির জাগরণ-ক্লান্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস।

দিন যায়—মাস আসে। মাস যায় বছর ফিরে আসে। মেয়ের সুখ-ভাগ্যের নিত্য নূতন নূতন চিন্তায় অধরকান্তি সান্যাল মহাশয় আশার প্রাসাদ রচনা করে ফেলেন। কিন্তু সে প্রাসাদ গড়ে ওঠা সমাপ্ত হয় না। তিনি একদিন হঠাৎ পৃথিবীর আসন থেকে নিজের স্থান তুলে নিয়ে পরপারে চলে গেলেন। পড়ে রইলো—হতভাগিনী মালা। বিমাতার সংসারে পিতার লুকিয়ে পাওয়া বিন্দু বিন্দু স্নেহ ছাড়া সুখ বলতে তার আর কিছুই জোটেনি। শ্বশুরালয়ে এসে প্রথম ক'দিন একটু-আধটু সুখ পাওয়ার পর স্বামী দেবী সান্যালের উগ্র মেজাজ আর কঠিন অত্যাচারে মালার মনের সাথে দেহখানাও ভেঙ্গে পড়েছিল। তাই আজ-কাল সর্ব্বসময়ের জন্যই তার একটা মস্ত বড় প্রতীক্ষা ছিল মৃত্যুর—মৃত্যুই যেন তার জীবনকে করে তুলবে সার্থক ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর; এই ছিল মালার কামনা। কিন্তু হায়! কোথায় মৃত্যু আর কোথায় বা তার শান্তিপূর্ণ কার্য্যকলাপ!

সেদিন ছিল ফাল্গুনের কোন এক রবিবার। দেবী সান্যাল জরুরী কি একটা কাজে সকাল বেলাতেই বেরিয়ে গেছে। বাড়ীতে মালা তার দুই বৎসরের শিশুকন্যা শিখাকে নিয়ে দিনের কাজ সমাধা করতে ব্যস্ত। পড়ন্ত বেলাতেও যেন ডাকিনী ফাল্গুনীর লেলিহান রোদের ঝাঁঝটা কমেনি; কোন একদিক থেকে মাঝে মাঝে মিষ্টি বাতাস এসে মালার উত্তপ্ত দেহখানা জুড়িয়ে দিতে চাইছে।

এমনি সময় বাইরের দরজার সামনে অনেকগুলো জুতোর আওয়াজ শুনে মালা যেন চমকে যায়। এরা কারা? একজন বলে উঠলো দরজাটা খুলুন তো একটু—বাড়ীতে কে আছেন? প্রথমে মালা কিছুই ভেবে পায় না—পরে প্রশ্ন করে, বাড়ীর কর্ত্তা তো বাড়ীতে নেই—আপনারা কা'কে চান?

আমরা পুলিশ, সান্যাল মহাশয়ের স্ত্রী আছেন তো? তাঁর সাথেই আমাদের বিশেষ দরকার।

পুলিশ! বজ্রাহতের মতই মালা যেন থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দেয়। হুড়মুড় করে প্রায় পাঁচ-সাতজন পুলিশ বাড়ীর বার উঠানে এসে হাজির হয়। সকলের দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো বিঁধে বেড়াচ্ছে সারাটা বাড়ীর আশে-পাশে। মালা এদের আকস্মিক আগমনের ভাবগতিক কিছু বুঝতে না পেরে

মাথার ঘোমটাটা আরও একটু টেনে দিয়ে এক পাশে খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শুনুন—লম্বামত একজন পুলিশ মালাকে কথাটা বলে। গত বৃহস্পতিবার রাত্রি দেড়টা প্রায় "রঞ্জন পার্কে" একটা মস্ত বড় খুন হোয়ে গেছে—খুনের আসামীকে প্রথমে ধরা যায়নি কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর আজ সকাল সাতটা নাগাদ আমরা তাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনের তিন নম্বর প্লাটফর্মে ধরি। তার বড় চামড়ার স্যুটকেসের মধ্যে ছিল একখানা ধারাল ছোরা আর তারই সাথে ছিল একখানা খণ্ডিত মাথা। নাম জিজ্ঞাসা করতেই আমরা আশ্চর্য্য হোয়ে গেলাম, তিনি কিছুই গোপন করবার চেষ্টা না করে অকপটে নামটা বল্লেন শ্রীমান দেবীপ্রসাদ সান্ন্যাল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ঠিকানাটাও বলে ফেলেন।

কালা যেমন মানুষের ভাষা শুনতে না পেয়ে কি বলবে আর কি করবে বলে অস্থির হোয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি মালাও যেন আর কিছু বলতে না পেরে অস্থির হোয়ে অস্ফুটস্বরে শুধু একবার বলে ওঠে অ্যাঁ? তারপর ধীরে ধীরে সংজ্ঞাহীন হোয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

সাত বছর ধরে কোর্ট-কাছারীতে হাঁটাহাঁটি করেও শেষ পর্য্যন্ত মালা দেবীপ্রসাদকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতে পারলো না। দিনের শেষে কোর্ট থেকে শূন্য বুক নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসতেই শিখা এসে মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে, মা গো, দিনে দিনে তুমি যেন কেমন হোয়ে যাচ্ছ, এমনি করে কাজ করলে ক'দিন বাঁচবে মা? মা তার এই নয় বৎসরের শিশু-বালিকার অন্তরের ব্যথা বঝতে পারে। এই মা, তিন বৎসরের মধ্যে যে কত রসাতল-তলাতল হোয়ে গেল সংসারে, শিখা তার এক বিন্দুও তো জানে না। আর মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে মা-ও তার এতোটুকুও জানতে দেয় নি তাকে। তাই নিঝুম রাতের তারায় ভরা আকাশের দিকে চেয়ে শিখা তা[?] তারপর ছুটে পালিয়ে যখন বলে ওঠে মা গো—অনেক অনেক [?] ভাবতে লাগলাম কি শুধু-শুধুই মনে পড়ে, সেই কোথায় যেন। অনেক ভেবে আমি গিয়েছিলে—সেই জানলার ফাঁক দিয়ে এব[?]ন্দে বেরিয়ে পড়লাম। তুমি তার হাত ধরে কেঁদেছিলে কেন— কাটালাম। পরদিন মালা মেয়ের অতীতের হারিয়ে যাওয়া [?] টেলিগ্রাম পাঠালাম। চিৎকার করে উঠে শিখাকে বুকের কাছে [?] দিনের পুরানো বন্ধু। পড়, ওরে ঘুমিয়ে পড—আর আমি জেগে থ[?] ডাক্তার হয়ে যাবার আর আমি জেগে থাকতে পারি না। [?] রাজী হইনি। এখন

পরদিন সকাল বেলাতেই দেখা গেল, 'অ[?] তাঁর প্রস্তাবে রাজী আইন আদালতের পাতায় বড় বড় হরফে 'মাকে যেন একটা তার দেবীপ্রসাদ সান্ন্যালের খুনী কেশে তার যাবৎ হবো। সে দিনটা ভোগের কথা। এবার কিন্তু মালা অধৈর্য্য[?] সন্ধ্যের সময় বাড়ী কঠিন মুঠির মধ্যে কাগজখানা চেপে ধরে '[?]না করলো, তারপর ভগবানের কাছে শুধু একবার অন্তরের নালিশ জানালো।

পৃথিবীতে এসে জীবনভোর যারা শুধু ফেলে [?]আমি তাড়াতাড়ি তোমার দেওয়া ন্যায্য শাসনের এতোটুকুও ভাগ যার[?]াম—"রাত তারা কি কালের প্রতিটি মুহূর্ত্তে ক্ষীণই হোতে থাকবে [?]ন্ত চাই। জীর্ণ-শীর্ণ অন্তর ও দেহের উপর তোমার সুদৃষ্টি কি কোন [?]দিন পড়বে না?"

কি জানি, অলক্ষ্যে থেকে বিধাতা বোধ হয় মালার অন্তরের প্রার্থনা ও কাতরোক্তি শুনে বিচলিত হোলেন। তাই দেখা গেল, দেবী সান্ন্যালের কারাদণ্ড ভোগ করবার দুদিন পরে খুনের প্রকৃত আসামী এসে বিরাট কারাগারের রুদ্ধ দরজায় আছাড় খেয়ে পড়ে চিৎকার করে ওঠে—"ওগো কারাগার, আমার ন্যায্য শাস্তি থেকে বঞ্চিত করলে কেন? আমায় টেনে নাও—তোমার অমোঘ শাসন-ভরা বুকের কাছে। আমি খুনী—আমিই প্রকৃত খুনী।"

অ্যালকোহলের গুণাগুণ

একটু কঠিন ভাবে বলতে গেলে অ্যালকোহল বা সুরাসার আদৌ বলকারক নয়, এতে মাত্রানুযায়ী নেশা বা মাদকতার সঞ্চার হয় মাত্র। ইহা কাজে উত্তম যোগায়, ক্লান্তি কাটিয়ে মানুষকে কর্ম্মতৎপর করে তোলে—এই দাবীও ঠিক টিকে না। পরন্তু বলা যায়, অ্যালকোহল সেবনে মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা-শক্তি ও বিচার-ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং সহজ অনুভূতিগুলোর ক্রমেই বৈকল্য ঘটে। সুরামত্ত হয়ে কোন গুরুতর দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না, একই সুরে এইটুকু বলতে হবে।

অবশ্য স্মরণাতীত কাল থেকেই দেখা গেছে, কর্ম্মীমানুষ কাজ করতে যে কোন একটা নেশা চায়। তামাক, চা, কফি এ সকল সেবন ব্যবস্থা এমনি করে সমাজে হয়েছে চালিত। এগুলোতে মাদকতা দোষ নেই বললেই চলে। তবু, মানুষের উত্তম বজায় রাখার জন্য একটি না একটি চাই। অ্যালকোহল বা সুরাসারও যদি মাত্রা রক্ষা করে পান করা যায় সেক্ষেত্রে খানিকটা নিরাপদ। কিন্তু শেষ অবধি মাত্রা ঠিক থাকে না বলেই যত বিপদ বা বিপত্তি এসে দেখা দেয়। সুতরাং অ্যালকোহলের গুণাগুণ ও পরিণাম সম্পর্কে আগে থেকেই ভালরূপ সচেতন না হলে নয়—ইহা অভ্যাস করতে যেয়ে যেন মারাত্মক বদভ্যাস হয়ে না দাঁড়ায়।
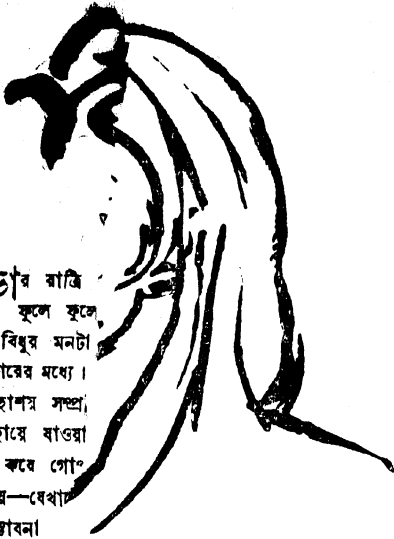
প্রেম—অন্য দিক

শ্রী এস, কে, পোট্টেকাট্

[শ্রী এস, কে, পোট্টেকাট্ মালয়ালম সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছোট গল্পলেখক। তাঁর অনেক গল্প ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি তাঁর ছোট গল্প রুশ ভাষায়ও অনূদিত হ'য়েছে]

মাত্র দু'টি লোককে আমি ভালো বেসেছিলাম আর বিশ্বাস করেছিলাম। একজন হচ্ছে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর একজন আমার স্ত্রী। অথচ সেই দু'টি লোকের কাছ থেকে যে সত্য আমার কাছে ধরা পড়লো তাতে আমার সমস্ত বিশ্বাস আর ভালোবাসা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। জীবনের সব আশার আলো এক ঘন-অন্ধকারে ঢেকে গেল আর জীবন যেন মরা বিবর্ণ পাতার মতো এখনই ঝরে পড়বে বলে মনে হোলো। "তুমি শুনছ আমার কথা?"

আমি কোনও কথা না বলে শুধু মাথা নাড়লুম। তিনি আবার তাঁর মিষ্টি ইউ, পির হিন্দীতে শেষের কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করলেন—"হ্যাঁ, সত্যিই জীবন যেন মরা বিবর্ণ পাতার মত অর্থহীন হ'য়ে গেল, আর সেই অর্থহীন ভয়াবহ শূন্যতার মাঝে শুধু একটি শব্দই বার বার ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো—বিশ্বাসঘাতকতা।"

এর পর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমাদের নৌকোর মাঝি সামনে একটা ছোট ডুবন্ত পাহাড় দেখে নৌকোটিকে সাবধানে এক দিকে সরিয়ে আনলো।

জব্বলপুরের বিখ্যাত সাদাপাহাড় আর জলপ্রপাত দেখে আমরা নৌকো করে নর্মদার ওপর দিয়ে ফিরছিলাম। রাত তখন কিছু গভীর হ'য়েছে। আকাশে অপূর্ব চাঁদ আর সেই চাঁদের আলোতে নর্মদা নদী রূপোর ফিতের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। নৌকোতে আমরা ছ'জন ছিলাম। আমি, আমার বন্ধু, দু'টি বাঙালী যুবক, স্থানীয় স্কুলের এক বয়স্কা অবিবাহিতা হেডমিস্ট্রেস আর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমাদের জলপ্রপাতের কাছে দেখা। তিনি সেখান থেকে আমাদের সঙ্গেই ফিরছিলেন। হেডমিস্ট্রেসটি ছিলেন সুগায়িকা। চারি দিকের এই অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে প্রকৃত সুগায়িকার নিজেকে সংবরণ করে রাখা কঠিন। তাই তিনি মৃদু স্বরে গান গাইছিলেন। তাঁর সুমিষ্ট স্বরের বিষাদ-করুণ সুরটি আমাদের মনকেও যেন কোন্ এক বিষণ্ণতার মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। "শ্মশানে কি প্রেমের অপর দিকের খোঁজ পাওয়া যায়?"

তাঁর গানের এই ক'টি কথা আমাদের প্রত্যেককে বিচলিত করে তুলছিলো। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি দেখলাম, অত্যন্ত বেশী বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন। গান থামার পর বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর হঠাৎ বিষাদকণ্ঠে বলে উঠলেন—"হ্যাঁ, সত্যিই প্রেমের অপর দিকের খোঁজ পাওয়া যায় মৃত্যুর পর শ্মশানে। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের এ সম্বন্ধে এক কাহিনী আমি বলতে পারি। তোমরা কি শুনতে চাও?"

আমরা সকলে একবাক্যে বলে উঠলাম—হ্যাঁ। তিনি তখন আরম্ভ করলেন। ভদ্রলোকের সাদা ধবধবে চুল তাঁর সারা মাথাটিকে টুপির মতো ঢেকে রেখেছে। তাঁর মুখে ব্রোঞ্জের মতো এক অদ্ভুত কাঠিন্য। থেকে থেকে তাঁর নকল দাঁতগুলি চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করে উঠছিলো। কোটরে ঢোকা ঈষৎ লাল চোখ দু'টোতেও যেন কি এক কঠোরতা! আর তাঁর বোজা ঠোঁট দু'টির সুদৃঢ় রেখা দেখে আমাদের মনে হচ্ছিল যে তাঁর মতো দৃঢ়চেতা লোক খুব কমই আছে। তাঁর গল্পটি শুনতে শুনতে বার বার আমাদের মনে হচ্ছিল, কে যেন বই থেকে পড়ে আমাদের এ কাহিনীটা শোনাচ্ছে। শুনতে শুনতে আমরা এমনই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম যে তাঁকে একটি প্রশ্নও করতে পারছিলাম না। তবে আমাদের মধ্যের সেই ভদ্রমহিলাটি তাঁর স্ত্রীজনোচিত কৌতূহল বশে মাঝে মাঝে এক-আধটা প্রশ্ন করছিলেন আর বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি খুব শান্তভাবে ভদ্রমহিলার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক বললেন—"আজ থেকে বিশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন ইটারসীর এক নামকরা ডাক্তার। আমার আয় ছিল প্রচুর, ছিল এক সুন্দরী স্ত্রী আর বহু বন্ধুবান্ধব। বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল জয়চাঁদ। জয়চাঁদ দেখতে বেশ ছিপছিপে, লম্বা ফর্সা একহারা গঠনের। ওর বাবা ছিলেন জমিদার। জয়চাঁদ তাই খুব আদর ও বিলাসিতার মধ্যে বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে যখন জয়চাঁদের পরিচয় তখন তার বাবার অবস্থা পড়ে এসেছিল। আমরা এক বছর একসঙ্গে পড়েছিলাম, তার পর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় চার বার ফেল করার পর জয়চাঁদ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে ওর বাবা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। জয়চাঁদ তার বেশীর ভাগ সময় আমাদের বাড়ীতেই কাটাত। আমি ওকে ঠিক আমার নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবাসতাম। আমার স্ত্রী উর্মিলাও তাকে পছন্দ করতো। তবে আমার এক একবার মনে হতো, উর্মিলা হয়তো আমাকে খুশী করার জন্য জয়চাঁদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। কারণ, উর্মিলা ছিল স্বভাবকৃপণ কিন্তু জয়চাঁদের জন্য খরচ করতে তার গায়ে লাগতো না। সে প্রায়ই আমাকে বলতো—'আমার নিজের ভাইকে আদর করার সৌভাগ্য আমার হয়নি, জয়চাঁদ যেন ঠিক আমার ভাই-এর মত। উর্মিলা এমন সরলতার সঙ্গে কথাগুলো বলতো যে আমি শুনে সত্যিই খুব খুশী হ'তাম।

ঊর্মিলার ব্যবহার আমাকে কোনও দিন কোনও সন্দেহের অবকাশ দেয়নি।"

কিন্তু এক রবিবারে এই ঘটনাটা ঘটলো। আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে আমি একটা জরুরী তার পেলাম যে আমাকে এক্ষুণি তাঁকে দেখতে যেতে হবে। তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ! আমার বন্ধুটি থাকতেন গ্রামে। তাঁর কাছে যেতে হলে আমাকে পনের মাইল দূরে টাঙ্গা করে যেতে হবে। আজ রওনা হয়ে কাল সন্ধ্যেবেলায় মাত্র আমি বাড়ী ফিরতে পারবো। আমি ঊর্মিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা টাঙ্গায় করে আমার বন্ধুকে দেখতে চললাম। প্রায় মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর আমি দেখলাম যে উল্টো দিক থেকে আর একটা টাঙ্গা আসছে। টাঙ্গার ভেতর থেকে একজন লোক মুখ বাড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—"আপনিই কি ডাক্তার সাহা?" আমি বললাম—"হ্যাঁ, কেন কি ব্যাপার?" "আপনি কি জায়গীরদার জয়কৃষ্ণের বাড়ী যাচ্ছেন?" "হ্যাঁ, আপনি কি সেখান থেকে আসছেন?

"হ্যাঁ, আমি ওখান থেকেই আসছি। আপনার আর যাওয়ার দরকার নেই ডাক্তার বাবু, জায়গীরদার আজ দুপুরে মারা গেছেন।"

জায়গীরদার জয়কৃষ্ণ আমার অনেক দিনের বন্ধু ছিল। তার মৃত্যুর খবর শুনে মনটা খুব খারাপ হ'য়ে গেল। আমি খুব বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরলাম—রাত প্রায় দশটার সময় আমি বাড়ী এসে পৌঁছালাম। চারি দিক নির্জন নিস্তব্ধ, স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে ক্লান্ত মনে আমি আমার শোওয়ার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময়ে দেখলাম যে, আমার বিছানায় আমার স্ত্রী জয়চাঁদের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

আমি প্রথমে আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমটা আমার কোনও রাগ বা দুঃখ হয়নি। কি রকম যেন অবাক হ'য়ে আমি ওদের দু'জনকে দেখছিলাম। পরমুহূর্তে আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন ভয়ঙ্কর এক আগ্নেয়গিরির আলোড়ন সুরু হ'লো। আমার মনে হ'লো, এখনই এর বিস্ফোরণ শুরু হবে আর তার ধোঁয়ায় আমি অন্ধ হয়ে যাব। আমি এক অমানুষিক শক্তি বলে আপনাকে সংযত করে মৃদু স্বরে বলতে লাগলাম—"অধীর হোয়ো না, নিজেকে সংবরণ করো। বোকামি করো না, এই হচ্ছে জীবন। তোমার কল্পনাতীত অনেক জিনিষই তুমি এখানে দেখতে পাবে। সেই হিমশীতল রাতে এক হাতে আমার ছোট্ট স্যুটকেশটা নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, এর পর আমার কি কর্তব্য। আমি অনেক কিছু ভাবলাম। একবার ভাবলাম এদের দুজনকে খুন করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করি, না, একজনকে খুন করি, আবার ভাবলাম, না—এদের দু'জনকেই জাগিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিই যে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ধরা প'ড়ে গেছে আর তারপর ছুটে পালিয়ে যাই। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে আমি ভাবতে লাগলাম কি করলে ঠিক উচিত মতো কাজ করা হবে। অনেক ভেবে আমি ওদের কিছু জানতে না দিয়ে বাড়ী থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লাম। রাত্রিটা আমি ষ্টেশনের এক ওয়েটিংরুমে কাটালাম। পরদিন সকালে আমি ভূপালের দেওয়ানকে এক টেলিগ্রাম পাঠালাম। ভূপালের দেওয়ান ছিলেন আমার অনেক দিনের পুরানো বন্ধু। তিনি অনেক দিন ধরে আমাকে রাজপ্রাসাদের ডাক্তার হয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করছিলেন কিন্তু আমি তখন রাজী হইনি। এখন আমি তাঁকে টেলিগ্রাম পাঠালাম যে আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজী আছি আর তিনি যদি রাজী থাকেন তো আমাকে যেন একটা তার পাঠিয়ে দেন। তাঁর তার পেলেই আমি রওনা হবো। সে দিনটা আমি আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে কাটালাম এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরলাম। ঊর্মিলা আমাকে মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা করলো, তারপর সে ভূপালের দেওয়ানের টেলিগ্রামটা আমাকে দেখালো।

টেলিগ্রামে লেখা ছিল—"এক্ষুণি রওনা হও।" আমি তাড়াতাড়ি রওনা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ঊর্মিলাকে বললাম—"রাত ন'টায় একটা ট্রেণ আছে, আমি সেই ট্রেণেই রওনা হতে চাই। ঊর্মিলা আমাকে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বললে—তুমি এইমাত্র এত দূর থেকে এলে—আবার এতটা পথ কি করে যাবে? কাল গেলে হবে না? এক দিন অন্ততঃ বিশ্রাম করে যাও, তাহ'লে যাতায়াতের কষ্ট হবে না।"

আমি বললাম—"না, ঊর্মিলা, আমার এক মিনিটও দেরী করা চলবে না। তারটা খুবই জরুরী। কি করবো বলো উপায় নেই, আমাদের ডাক্তারদের কাজই এই। আমার কথাবার্তায় ঊর্মিলা বুঝতেই পারল না যে, আমি সব জানতে পেরেছি। আমি সেই

রাতেই ভূপাল রওনা হ'লাম। যাওয়ার আগে ঊর্মিলাকে বললাম—ঊর্মিলা, আমার অবর্তমানে এখানকার সব দেখাশোনার ভার আমি জয়চাঁদকে দিয়েছি। সে তোমারও দেখাশোনা করবে। যা দরকার, জয়চাঁদকে বললেই হবে, সে সব করবে।"

ঊর্মিলা আমাকে ট্রেণে তুলে দিল। ভূপালে পৌঁছানোর পরদিনই আমি কাজে যোগ দিলাম। ভূপাল থেকে আমি প্রায়ই জয়চাঁদ এবং ঊর্মিলাকে চিঠি লিখতাম। আমি যে স্থায়ী চাকরী নিয়ে ভূপালে এসেছি, সে কথা তাদের জানালাম না। আমি তাদের লিখলুম যে, রাজবাড়ীর একজনকে সব সময়ে আমার দেখাশোনা করতে হচ্ছে, তার জন্ম আমাকে দু'-এক মাস এমন কি চার-পাঁচ মাস অবধি ভূপালে থাকতে হ'তে পারে। জয়চাঁদকে আমি লিখলাম—আমি ঊর্মিলার ভালো-মন্দের ভার তোমার ওপর অর্পণ করেছি। ঊর্মিলার বয়স কম এবং সে সুন্দরী। এই বয়সে আমার অনুপস্থিতিতে তার ভালো না লাগাই স্বাভাবিক, তবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে, তুমি তার কাছে আছ। তার মন খারাপ হ'লে তাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। আর ঊর্মিলার কাছে লিখলাম যে, সে যেন জয়চাঁদকে তার নিজের ভাইএর মত দেখে। বিপদে-আপদে তার পরামর্শ নেয় এবং সময়-সময় জয়চাঁদের তিরস্কার ভর্ৎসনাকে সে যেন আমার তিরস্কার বলে মনে করে। এই রকম ভাবে আমি তাদের দু'জনের কাছেই বোকা সেজে রইলাম। আমি জয়চাঁদকে খুব ভাল করেই জানতাম। আমি জানতাম যে, সে দুর্বল প্রকৃতির লোক। কোনও কিছু অন্যায় করে বেশী দিন সে চুপ করে বসে থাকতে পারবে না। সে যে আমার বিশ্বাসের অবমাননা করেছে, এ কথা সে কিছু দিন বাদে ভালো করেই বুঝতে পারবে এবং তার জন্তে মনে সে একটুও শান্তি পাবে না। আমি জয়চাঁদকে শুধু চিঠিই লিখতাম না, তাকে টাকাও পাঠাতাম। প্রত্যেক বার ঊর্মিলা এবং জয়চাঁদকে চিঠি লেখার সময় আমি এক নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করতাম।

জয়চাঁদের স্বভাব যদি ঊর্মিলার মতো হ'তো তাহ'লে আমি সত্যিই বোকা ব'নে যেতাম। কিন্তু আমি জয়চাঁদকে খুব ভালো করেই জানতাম। আমি জানতাম যে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে এই অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত থাকলেও সে তার বিবেকের টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারবে না। অনুতাপ আর আত্মগ্লানিতে মন যখন তার ভরে যাবে তখনই সুরু হবে তার শাস্তি।

এমনি ভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। মাস পাঁচেক পরেও আমি হতাশ হইনি। আমি স্থির জানতাম যে, যে কোনও মুহূর্ত্তে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। সেদিনটা ছিল রবিবার। দুপুরে খাওয়ার পর বারান্দায় আরাম কেদারায় শুয়ে আমি কাগজ পড়ছিলাম, হঠাৎ দেখি আমার বাড়ীর সামনে একটা টাঙ্গা এসে দাঁড়ালো! আমি উঠে দেখি যে ঊর্মিলা একটা ছোট স্যুটকেশ নিয়ে টাঙ্গা থেকে নামছে। ঊর্মিলা তার আসার কোনও খবর আমাকে দেয়নি। আমি জানতাম যে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। হয়তো আমার কৌশল অনুযায়ী কাজ হয়েছে। আমার সমস্ত অন্তর এক তীব্র উল্লাসে নাচতে লাগলো। কিন্তু বাইরে তার কিছু প্রকাশ না করে আমি অবাক হবার ভাণ করে বললাম, "এ কি ঊর্মিলা, তুমি হঠাৎ কোথা থেকে? কি ব্যাপার?"

ঊর্মিলা কোনও কথা বলল না। আমি ওর হাত থেকে স্যুটকেশটা নিয়ে রাখলাম। তার পর দু'জনে ড্রইংরুমে গিয়ে বসলাম। ঊর্মিলার মুখ ম্লান। আমি এক হাতে ওর মুখটা তুলে ধরে বললাম, "ঊর্মিলা, আমাকে কোনও খবর না দিয়ে এরকম ভাবে আসার মানে কি? ব্যাপার কি?"

ঊর্মিলা কান্না চাপতে চাপতে বললো—"তুমি খুব একা লোককে আমার দেখাশোনার ভার দিয়েছিলে।"

"তার মানে? তুমি কি বলছো, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"তুমি যে কিছুই বুঝতে পারবে না, তা আমি বেশ ভালো ভাবেই জানি। তোমার মাথায় এ-সব ব্যাপার ঢুকবেও না। খুব ভালো একজন অভিভাবক তুমি দিয়ে এসেছিলে। জয়চাঁদের চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা আছে? তুমি জানো সে কি রকম লোক? শোনো তবে, জয়চাঁদ নীচ, কাপুরুষ, সে পশুরও অধম। সে আমার ধর্মনাশ করার চেষ্টা করেছিল।"

আমি খুব অবাক হবার ভাণ করে বলে উঠলাম—"অসম্ভব! তুমি নিশ্চয়ই ভুল করেছ ঊর্মিলা! জয়চাঁদ এমন কাজ কখনও করতেই পারে না।"

"এই ভালোমানুষী করেই তুমি মরলে। তোমার এতখানি বিশ্বাসের কোনও মূল্যই জয়চাঁদ দেয়নি। আজ ক'দিন ধরে জয়চাঁদ যেন আর নিজেতে ছিল না। ওর সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিলাম। তার পর কাল, কাল ও—না: আমি আর বলতে পারছি না। আমি কোনও রকমে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।"

সব শুনে কিছুক্ষণ আমি যেন এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। তার পর ঊর্মিলাকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম—"ঊর্মিলা, আমি সত্যিই বোকা—অসম্ভব বোকা। কিন্তু আমি যে ভাবতেই পারিনি, জয়চাঁদ এই রকম ব্যবহার করবে। ভেড়ার বাচ্চা নেকড়ে হ'য়ে উঠবে, সে চিন্তা তো আমি কল্পনাতেও আনতে পারি নি। আচ্ছা দাঁড়াও, দেখ ওর আমি কি ব্যবস্থা করি। বিশ্বাসঘাতক ইতর, ওর উপযুক্ত শাস্তিই আমি ওকে দেবো। তুমি এখন ওঠো, হাত-পা ধুয়ে কিছু খেয়ে বিশ্রাম করো।"

ঊর্মিলা স্নান সেরে আসার পরই আমি একটা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামে লেখা ছিল, "দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ঊর্মিলার সম্পর্কে আমার আর কোনও দায়িত্ব নেই। তার চরিত্র সম্বন্ধে আমার আর জানতে কিছু বাকী নেই। সে আজ সকালবেলা এখান থেকে কোথায় চলে গেছে। আমি আজ রাতে তোমার সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত জানাচ্ছি—জয়চাঁদ।"

আমি টেলিগ্রামটা পড়ার পর ঊর্মিলার সারা মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল—"ছোটলোক, ইতর,! আমার নামে কলঙ্ক রটিয়ে ও নিজেকে নির্দোষী প্রমাণ করতে চায়? আচ্ছা আসুক সে। জয়চাঁদ এলে তুমি কি করবে ঠিক করেছ?"

"আগে আসুক তো, তারপর দেখা যাবে কি করবো না করবো।"

জয়চাঁদ সেই রাতেই আমার বাসায় এলো। আমি খুব গম্ভীর মুখে ওকে অভ্যর্থনা করলাম। ঊর্মিলা আমার পাশে একটা চেয়ারে বসে ছিল। জয়চাঁদ ঊর্মিলাকে দেখে একটু অবাক হয়ে ব'লে উঠল—"ওহো, এ এখানে ইতিমধ্যে এসে গেছে"—তারপর আমার

দিকে ফিরে মৃদু স্বরে বললো—"ডাক্তার, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি চলো। তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে আমার।"

ঊর্মিলা একথা শুনতে পেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললো—"না, ও যাবে না পাশের ঘরে। তোমার এমন কি গোপন কথা থাকতে পারে যা তুমি আমার সামনে বলতে পারো না? সে কথা যদি আমার শোনার বারণ থাকে, তাহলে আমার স্বামীও শুনতে চান না।"

আমি ঊর্মিলার দিকে চোখ টিপে ইশারা করে ওকে চুপ ক'রে বসে থাকতে বললাম। ঊর্মিলা অনিচ্ছার সঙ্গে বসে পড়লো। আমি জয়চাঁদকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলাম। জয়চাঁদ খুব বিষণ্ণ ও গম্ভীর মুখে বললো—"বন্ধু! তুমি আমাকে ঊর্মিলার দেখাশোনার ভার দিয়েছিলে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তোমাকে আমি জানাচ্ছি যে ঊর্মিলা চরিত্রহীনা। হয়তো তোমার পক্ষে বিশ্বাস অসম্ভব হবে, তবু তোমায় বলছি, যে ঊর্মিলা তার প্রেমিকের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। ঊর্মিলা যখন জানতে পারলো যে আমি সব জানতে পেরেছি তখন সে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু যতই কষ্টকর হোক্, তোমার বন্ধু হিসাবে তোমাকে আমার সব জানানো কর্ত্তব্য, তাই জানালাম। ঊর্মিলা তোমার বিশ্বাসের এতটুকু মূল্য দেয়নি।"

আমরা যখন ঊর্মিলার কাছে ফিরে গেলাম তখন ঊর্মিলা ঘৃণার সঙ্গে বললো—"জয়চাঁদ নিশ্চয়ই এতক্ষণ তোমার কাছে আমার বিরুদ্ধে বলছিলো? অভিযোগটা কি, শুনতে পাই কি?"

আমি খুব গম্ভীর ভাবে বললাম—"ঊর্মিলা, তুমি জানো জয়চাঁদ আমার বিশ্বস্ত বন্ধু। ওকে আজ সাত বছর ধরে আমি ভালোবেসে এসেছি, বিশ্বাস করে এসেছি। তুমি আমার স্ত্রী। তোমাকে আজ পাঁচ বছর ধরে আমি কামনা করে এসেছি, হৃদয়ের অঢেল ভালোবাসা দিয়ে ভালোবেসে এসেছি। জয়চাঁদ বলছে তুমি আমাকে ঠকিয়েছো, তুমি বলছ জয়চাঁদ আমার বিশ্বাসের মূল্য রাখেনি, আমি কার কথায় বিশ্বাস করবো? কিন্তু এস্পার ওস্পার আমাকে এখনই করতে হবে। একথা সত্যি যে তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ঠকিয়েছে—সে কে?"

ঊর্মিলা রাগে দু'চোখে আগুন জ্বালিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো—"ওঃ, তুমি তাহলে এতক্ষণ এই নীচ লোকটার কথা সব বিশ্বাস করেছ? সত্যি পুরুষ মানুষ কি এই রকমই হয়? জয়চাঁদ নিশ্চয়ই বলেছে যে আমি তোমার বিশ্বাসের, তোমার ভালোবাসার মূল্য রাখিনি—না? তোমার আশ্রয় নিয়েছি না? ইতর, ছোটলোক কোথাকার!"

জয়চাঁদও খুব ক্রুদ্ধস্বরে বললো—"আমি তোমার স্বামীর কাছে কোনও গোপন কথা বলি নি। তাকে আমি যা বলেছি তা এখনই তোমার মুখের সামনে বলতে পারি। শুনতে চাও? আমি বলছি যে তুমি তোমার প্রণয়ীর সঙ্গে নীচ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তোমার স্বামীকে নিষ্ঠুর এবং অন্যায় ভাবে বঞ্চনা করেছ। তুমি অস্বীকার করতে পার এ কথা?"

ঊর্মিলা যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অস্ফুট স্বরে বললো—"তোমার সব লজ্জা আর নীতি বিসর্জন দিয়ে তুমি কি আমার ওপর পাশবিক অত্যাচার করতে চাও নি? এখন খুব বড় বড় উপদেশ শোনাচ্ছ! দূর হ'য়ে যাও এখান থেকে।"

"এ কথার জবাব তোমার স্বামীর কাছ থেকে পাবে। কিন্তু তুমি পতিতারও অধম। তারা জীবন-ধারণের জন্য নীচে নামে কিন্তু তুমি?"

ঊর্মিলা একটা চেয়ার তুলে জয়চাঁদের দিকে ছোঁড়ার ভঙ্গীতে বললো—"তুমি যদি আর বেশী দূর এগোও, তাহ'লে এই চেয়ার ছুঁড়ে তোমায় মারবো।"

"তার চেয়ে ভালো হয়, যদি তুমি গলায় দড়ি দিয়ে মর। তোমার মত স্ত্রীর কবল থেকে তোমার স্বামী তাহ'লে মুক্তি পায়।"

আমি ওদের দু'জনের এই বাগ্‌যুদ্ধে, তাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এই দোষারোপে মনে মনে উল্লসিত হ'য়ে উঠছিলাম। ছোট ছেলে যেমন কুকুরের লড়াই দেখে আনন্দ পায়, আমিও সেই রকম একটা আনন্দ অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমার আচরণে আমার কোনও মনোভাব প্রকাশ পেল না। যে দু'টি মানুষকে আমি পৃথিবীতে সব চেয়ে ঘৃণা করি, তারা পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে ঝগড়া করছে দেখে যে আমার কি এক অদ্ভুত আনন্দ লাগছিল, তা ঠিক আমি বর্ণনা করতে পারব না। হঠাৎ জয়চাঁদ পকেট থেকে দুটো চিঠি বার করে আমাকে দেখিয়ে বললো—"আচ্ছা, তুমি কি এই হাতের লেখা চিনতে পারো?"

আমি চিঠি দুটো দেখলাম। হাতের লেখা যে ঊর্মিলার, সন্দেহ নেই। জয়চাঁদ একটা চিঠির এক দিক খুলে আমায় পড়তে বললো। চিঠিটা ঊর্মিলা তার প্রণয়ীকে লিখেছে—"আজ রাতে ও এখানে থাকবে না, তাড়াতাড়ি এসো।" আমার আর পড়ার দরকার ছিল

না। উর্মিলার সমস্ত মুখ সাদা হ'য়ে গেল। তার পর জয়চাঁদের দিকে একবার নিষ্ফল আক্রোশে তাকিয়ে আর একটাও কথা না বলে স্যুটকেশটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। উর্মিলা চলে যাওয়ার পর আমি জয়চাঁদকে বললাম—"জয়চাঁদ, তুমি আমার প্রকৃত বন্ধুরই কাজ করেছ। তুমি আমার মুখ আর সম্মান রক্ষা করেছ। এখন সত্যি কথা বল তো, কে এই উর্মিলার প্রণয়ী?"

জয়চাঁদ কেমন যেন বিমনা ভঙ্গীতে বললো—"আমি তার নাম তোমার কাছে বলতে পারবো না। তুমি আমাকে তোমার স্ত্রীর দেখাশোনার ভার, তার ওপর নজর রাখার ভার দিয়েছিলে। আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি। যেমন তোমার সম্মান আমি রক্ষা করেছি, তেমনি তার সম্মানও। রক্ষা করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়? তোমায় তাই আমি অনুরোধ করছি যে, তার নামটা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করো না।"

জয়চাঁদ সেই রাতেই জব্বলপুর ফিরে গেল। আমি পরে জানতে পেরেছিলাম যে, উর্মিলা আমার ওখান থেকে সোজা তার বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল। তার বাপের বাড়ী এই নদীর ধারেই এক গ্রামে।

সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করতে লাগলাম। এরা দু'জনেই যে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে সে সম্বন্ধে আমার কোনও সংশয় ছিল না। আমি দুই-এ দুই-এ-চার করে নিজের উপসংহারে এলাম। হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। যে নারী অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত তার নৈতিকতা নেই, ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। সে প্রেমের জন্য তার সম্মান, বিবেক নৈতিকবোধকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু পুরুষ তার প্রেমের চেয়েও তার সম্মানবোধকে ওপরে স্থান দেয়। জয়চাঁদ উর্মিলার সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত ছিল বটে কিন্তু সে কিছুদিনের জন্য। তার বিবেকবোধ শেষ পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আমি যে তাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছি আর সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা সে রাখতে পারেনি। এই চিন্তা অহরহ তার মনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এই ক'টা মাস তার মনে একটুও শান্তি ছিল না। তার আত্মনির্যাতন সুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে বিবেকের কাছে মাথা নীচু করতে হয়েছে। তাই সে তাদের এই প্রণয়ে যতিচ্ছেদ করতে চেয়েছে। কিন্তু উর্মিলা জয়চাঁদকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চেয়েছে। সে কিছুতে কল্পনাই করতে পারেনি যে জয়চাঁদ তার মোহমুক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাবে।

এই নিয়ে তাদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, যার ফলে তারা দু'জনেই আমার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছে। ভালোবাসার পাত্র যদি হাত ছেড়ে চলে যায় তাহ'লে নারীর পক্ষে তা অপমানকর। নারী যখন জানতে পারে যে তার ভালোবাসার পাত্রের ওপর তার অধিকার কমে যাচ্ছে তখন সে তার মান-সম্মান আত্মমর্যাদা খুইয়ে প্রণয়ীকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করে। উর্মিলা যখন জানতে পারলো যে জয়চাঁদের ওপর তার অধিকার কমে যাচ্ছে তখন সে ভয় দেখিয়ে অনুনয় বিনয় করে জয়চাঁদকে নিজের মুঠোর মধ্যে রাখতে চেয়েছে কিন্তু জয়চাঁদ রাজী হয়নি। তাই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এই প্রথম তাদের ভালোবাসায় কাটলে চিড় পড়ে আর কিছুদিন পরে দেখতে দেখতে তা এত বড় হ'য়ে ওঠে যে তারা দু'জনেই আমার কাছে আসতে বাধ্য হয়।"

এতটা বলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক খানিকটা চুপ করলেন। আমাদের নৌকো তখন নদীর একটা বাঁকের কাছে এসেছে। পেছনে বহু দূর দেখা যায় নদীর বিস্তীর্ণ চর, তাতে পাথরের টুকরোগুলো চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছিল। দূরে কতকগুলো পাহাড় ঠিক যেন মন্দিরের বাঁকা চুড়োর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। নৌকো চলার সময়ে জলের ছলছলানি শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। চারি দিক নির্জন, নিস্তব্ধ।

ডাক্তার সাহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর হঠাৎ এই নিস্তব্ধতার বুক চিরে বেজে উঠল—এর পর জয়চাঁদ আমার জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গেল। আমি পরে শুনেছিলাম যে, সে নাকি অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল কিন্তু আমি তাকে একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করিনি। যদি জয়চাঁদের সত্যি কথা বলার সাহস থাকত তাহ'লে আমি তাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দিতাম। কিন্তু সে আমাকে সত্যি কথা বলেনি। তার মিথ্যে অহঙ্কারকে বাঁচিয়ে রেখে সে চিরদিন আমার কাছে প্রতারক হয়ে বেঁচে রইল। আমি আমার নিজের চোখে যা দেখেছি তাকে যে মানুষ আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, তাকে আমি ভালবাসতে পারি না, কিছুতেই নয়। অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, তার আত্মসম্মান-বোধ আছে কিন্তু আমার দিক থেকে যখন বিচার করি তখন তার এই আত্মসম্মানবোধের মর্যাদা আমি দিতে পারি না। তার এই প্রবঞ্চনায় আমার মন এমনই ঘুরে গিয়েছিল যে তার প্রতি সদয় ব্যবহার করার মন আমার ছিল না। যখন তার বিশ্বাসঘাতকতা প্রথম আমার কাছে ধরা পড়ে তখন আমি তাকে ঘৃণা না করে থাকতে পারিনি; আর আমার কাছে মিথ্যা বলার জন্য আমার রাগ আর ঘৃণা দুই-ই বেড়ে গিয়েছিল।

এর পর থেকে যখনই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তার দুরবস্থা দেখেছি, তখন আমি রাগ আর ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গে এক রকমের আনন্দও অনুভব করেছি। আমার শত্রু যদি আমাকে লাঠি মেরে সেই মারার চোটে খোঁড়াতে থাকে তাহ'লে যেমন একটা আনন্দ হয়, জয়চাঁদকে দেখলে আমার ঠিক সেই রকম একটা আনন্দ হ'তো। জয়চাঁদ যদি আমার কাছে এসে সোজাসুজি বলতো যে "ডাক্তার সাহা, আমি তোমার স্ত্রীর প্রণয়ী"—আমি তাহ'লে তাকে দুই হাতে আলিঙ্গন করে বলতাম—"বাঃ ভাই বাঃ! তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করেছ বটে কিন্তু তোমার সত্যি কথা বলার সাহস আমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি অন্যায় করেছ, ভুল করেছ; কিন্তু মানুষেরই পদস্খলন হয়। আর তুমি সেই অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ করে যে নৈতিক সাহস দেখিয়েছ তাতে সত্যিই তোমাকে শ্রদ্ধা করি। আমি তোমাকে তাই ক্ষমা করলাম। এসো, আমরা আবার আগের মত পরস্পরের বন্ধু হই।" কিন্তু জয়চাঁদ একটা ভীরু কাপুরুষ, এতটুকু নৈতিক সাহস তার নেই; তাই যখনই তাকে আমি দুরবস্থার মধ্যে দেখেছি তখনই আমি অন্তরে অন্তরে কেমন যেন একটা নিষ্ঠুর আনন্দ অনুভব করেছি। ডাক্তার সাহা চুপ করলেন। আমাদের সঙ্গের হেডমিষ্ট্রেসটি ভাবলেন, বুঝি গল্প শেষ হয়ে গেল; তিনি তাই উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন

করলেন—"আর উর্মিলা—উর্মিলার কি হোলো ?" ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, হাসি তো নয় যেন একটা মোটর গাড়ী বিগড়ে গিয়ে গর্জন করে উঠলো। তিনি বললেন—"বোন, আমার গল্প এখনও শেষ হয়নি। চরম পরিণতির এখনও দেরী আছে। আমি বলেছিলাম যে, উর্মিলা তার বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল। সেখানে সে ছয় মাস ছিল, সে তখন অন্তঃসত্ত্বা। আমি তখন দশ মাসেরও আগে বাড়ী ছেড়েছি, কাজেই বুঝতে পারছ ?" তার পর তীরের দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,—"একদিন রাত্রে সে এই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আর জয়চাঁদ ?"

ডাক্তার সাহা বললেন—"জয়চাঁদও এর পরে আর বেশী দিন বাঁচেনি। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে তাকে রোগে ধরে, আর তারই ফলে সে মারা যায়।"

আমরা ভাবলাম, তাঁর গল্প বুঝি শেষ হয়েছে। কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ পরে আবার বলে উঠলেন—"এর পর একটা খুব আশ্চর্য্যের ব্যাপার ঘটল। যখন জয়চাঁদের মৃতদেহ শ্মশানঘাটে আনা হয়েছিল তখন তার জামার তলা থেকে একটা আধপোড়া কাগজ উড়ে বেরিয়ে পড়ে। আমার এক বন্ধু জয়চাঁদের দাহকার্য্যে শ্মশানে গিয়েছিল। সে এটা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে দেয়। কাগজটা একটা চিঠি, জয়চাঁদ ওটা লুকিয়ে রেখেছিল। সেই হেডমিষ্ট্রেসটি জিজ্ঞাসা করলেন—"কার চিঠি ?"

"চিঠিটা উর্মিলা তার মৃত্যুর আগের দিন জয়চাঁদকে লিখেছিল। চিঠিটা সুদীর্ঘ, আমি অবশ্য সবটা পড়তে পারিনি। কেন না অনেক জায়গায় পুড়ে গিয়েছিল।"

"কি লেখা ছিল তাতে ?"

"বিশেষ কিছুই নয়। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে, উর্মিলা শেষ পর্যন্ত জয়চাঁদকে ভালোবাসত। জয়চাঁদ তাকে অমন ভাবে অপমানিত করে পরিত্যাগ করলেও তার প্রতি উর্মিলার ভালোবাসা এক বিন্দুও কমেনি। সত্যি, বিচিত্র এই রমণীর মন ! তাদের হৃদয়ের গভীরে কে ঢুকতে পারে !"

আমাদের নৌকো তখন একসারি সাদা পাহাড়ের কাছাকাছি এসেছে। চাঁদের আলোয় সাদা পাহাড়ের চুড়োগুলো ঝকঝক্ করছিল। দু'পাশের সাদা পাহাড়ের মধ্যে চাঁদের আলোয় ধোওয়া নদীটিকে মনে হচ্ছিল যেন একতাল মাখনের মধ্যে একটি ছুরির ফলা। আমার দৃষ্টি কিন্তু প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে ছিল না। আমি ডাক্তার সাহার গল্পের কথাই ভাবছিলাম। নৌকোর আরোহীরা সকলে চুপ করে ছিল। হঠাৎ ডাক্তার সাহা আমাকে লক্ষ্য করে উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন—"তুমি ভূত বিশ্বাস করো ?"

কথাটা শুনে এক মুহূর্ত্তের জন্ম আমি বোবা হয়ে গেলাম। নৌকো তখন গভীর জলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, দু'পাশের গাছের ছায়ায় জল কালো হয়ে গেছে। চারিদিকে কেমন যেন একটা মৃত্যুশীতল ভয়াবহ নীরবতা। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্নকর্ত্তাকেই ভূত বলে ভাবাটা কিছু অসম্ভব নয় যেন। কি রকম একটা অজানা ভয় আমায় চেপে ধরলো। আমার মনে হচ্ছিল যে আমরা যখন এই রকম শূন্য মন নিয়ে ডাক্তার সাহার দিকে তাকিয়েছিলাম, তখন তিনি যেন ধোঁয়ার মত অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেননি।

ডাক্তার সাহা নিজেই বললেন—"তোমার এই নীরবতার অর্থ আমি বুঝতে পারছি। এ সম্বন্ধে আমার নিজেরই সংশয় আছে। আমি নিজেই ভয় পেয়েছি। দেখ, দেখ, ঐ যে দূরে কতকগুলো দুর্গ-প্রাচীরের মতো পাহাড় দেখা যাচ্ছে—ঐটাই হচ্ছে প্রেমের অপর দিক—সেই শ্মশানঘাট। ঐখান থেকেই উর্মিলা নদীতে ঝাঁপ দেয়। ঐ যে পাহাড়ের কাছে প্রকাণ্ড গাছটা দেখতে পাচ্ছ ঐখানে জয়চাঁদের মৃতদেহ দাহ করা হয়। আমি ওদিকে যাব না। এই মাঝি, নৌকো সাদা-পাহাড়ের দিকে ঘুরিয়ে নাও।" ডাক্তার সাহার কথামতো মাঝি নৌকো ঘোরালো। 'বিদায়'—বলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তীরে নেমে গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

দু'পাশের খাড়া পাহাড় আর ঝুলন্ত গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে যখন আমাদের নৌকো অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আমার সারা দেহ কি একটা অজানা ভয়ে শির-শির করে উঠলো। আমার সহযাত্রীরা সকলে মৃতের মতো বসেছিল। চারিদিক নির্জন, নিস্তব্ধ, একটা মশার গুনগুনানি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না। এই ভয়াবহ নিস্তব্ধতার মধ্যে বাঘের গর্জন অথবা হাতীর ডাকও আমাদের কাছে কাম্য বলে মনে হচ্ছিল।

আমরা আস্তে আস্তে সেই ভয়াবহ জায়গা পেছনে ফেলে এলাম। সেই হেডমিষ্ট্রেসটি মন্তব্য করলেন—"এমন পাথরের মত কঠিন হৃদয় যে কারুর হ'তে পারে, তা এই প্রথম দেখলাম !"

অনুবাদিকা—নিলীনা আব্রাহাম।

গীত

সোনালী চৌধুরী

মম কানন-তলে মৃদু চরণ ফেলে বল কে তুমি এলে ?
গলে আঁচল টানি মম প্রদীপখানি
দিলে কে তুমি জেলে ?
বাজাল কি সুর তব পায়ের নূপুর
আজি গোধূলি-বায় ?
এ কি নিঠুর হাসি আজি উঠিল ভাসি তব নয়ন-ছায় ।

ঐ বাঁশীর ধ্বনি শোন নদীর তীরে,
দখিণ বায়ে ওঠে আকাশ ঘিরে ;
কেন অলস হাতে তুমি মাধবী রাতে
মালা গাঁথিতে এলে ?
বাঁধিয়া হিয়া মম তব হৃদয় দিয়া
আজি কি সুখ পেলে ?

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

৪৪

সংস্কার-যুগের প্রথমে
পুরাণের যে-ব্যাখ্যা
দিয়ে গেলে রাজা,
পরবর্তী কালে
তোমারই মতানুগামী
বিশিষ্ট ব্রাহ্মের দল
তাইতেই দাগা বোলালেন।১

ধর্মের বিবর্তন পথে
পৌরাণিক যুগ-সত্তাটার
বিকাশের ধারাটাকে
মেনে নিতে পারোনি বোলেই
তোমারই মতানুবর্তী
বুদ্ধিবাদী সমালোচকেরা
হঠাৎ বিভ্রান্ত হোয়ে
বিপথে চালিত হোয়েছেন।

তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে
পুরাণের এটা-সেটা
বিরুদ্ধ মন নিয়ে চেপে,
একরাশ আক্রোশ
অগ্রিম পুষে রেখে মনে
পুরাণের ফুলবনে
সকলেই কাঁটা দেখেছেন!
পুরাণের পাপড়িকে
'মাইক্রোস্‌কোপে' ফেলে
ফুলের শ্রাদ্ধ কোরেছেন!

* * *

"But,
Apart from all these discussions,
Apart
From the scientific validity
Of the statements of the Puranas,
Apart
From their valid
Or invalid geography,
Apart
From their valid
Or invalid astronomy
And so forth
What we find
For a certainty,
Traced out bit by bit
Almost
In every one of these volumes,
Is
This doctrine of Bhakti,

১। সংস্কার-যুগে একমাত্র কেশব সেন ও বিজয় গোস্বামীর ধর্মজীবনেই পৌরাণিক ভক্তিধর্মের পুনর্বিকাশ দ্যাখা গিয়েছিলো। অবিশ্যি, খৃষ্টানদের পুরাণ বাইবেলই কেশবচন্দ্রের পৌরাণিক ভক্তিবাদের প্রধান প্রেরণা। তবুও শেষজীবনে, ধর্মজীবনের শেষ স্তরে এসে তিনি হিন্দুর পৌরাণিক দেব-দেবীর রূপক ব্যাখ্যা কোরে গ্যাছেন এবং পৌরাণিক ভক্তিধর্মকে নিজের জীবনে বিকশিত কোরে গ্যাছেন। তাঁর ব্রহ্মোপাসনায় রূপের ধ্যানের যথেষ্ট অবসর আছে। ধর্মজীবনে তাঁর যে একটা আধ্যাত্মিক মত্ততা ছিলো—তা' পুরোমাত্রায় পৌরাণিক।

কিন্তু এই পৌরাণিক ভক্তিবাদ মুক্তকণ্ঠে প্রচার করবার মতো সাহস তাঁর ছিলো না। সেটা প্রচুর পরিমাণে ছিলো তাঁরই সহকর্মী এবং সহধর্মী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মধ্যে। তাঁর ধর্মজীবনে যে-পরিবর্তন এসেছিলো, তিনি তা' মুক্তকণ্ঠে প্রচার কোরতে কুণ্ঠিত হননি। ব্রাহ্মসমাজের আপত্তি এবং বাধা ভ্রূক্ষেপ না কোরে, সভা কমিটি প্রভৃতি পরিত্যাগ কোরে তিনি বিশ্ব-বৈকুণ্ঠের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। নিজেকে বিলীন কোরে দিয়েছিলেন রামমোহনের বহুনিন্দিত পৌরাণিক ভক্তিধর্মে, বহুধিক্কৃত 'কাষ্ঠে-লোষ্ট্রে-প্রতিমায়'।

কিন্তু পৌরাণিক ভক্তিবাদের চরম বিকাশ আমরা দেখতে পাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা তিনি পুরাণোক্ত দেব-দেবীদের প্রত্যক্ষ কোরে গ্যাছেন। অথচ, পুরাণের এই পুনরুত্থানে অতীত পৌরাণিকযুগের কোনো আবর্জনাই নেই! ব্যাপকতায় যেমন উদার, অনুভূতিতেও তেমনি গভীর। বাস্তবিক, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মজীবনই সংস্কারযুগের একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ।

Illustrated,
Re-illustrated,
Stated
And re-stated,
In the lives of saints
And
In the lives of king." ২

৪৫

ঐতিহাসিক সত্যতা
পুরাণের মূলসুর নয়,
রাবণের দশ মুখ
অসত্য যদি মনে হয়,
ক্ষতি নেই বড়ো,
তা বোলে কি রাবণের
বীরত্ব ভুলে যেতে পারো ?

রামের সবুজ রং
আজগুবি মনে হয় হোক,
এমন কি রাম বোলে
কেউ যদি নাই থেকে থাকে,
তবুও যে আদর্শ
পাই তাঁর চরিত্র ঘিরে
সেটা কি মিথ্যে হয় তাতে ?

কৃষ্ণের মাধ্যমে
যে-সব মহান ভাব পান,
সেইটেই বড়ো কথা,
কৃষ্ণ থাকুন আর যান।

খৃষ্টকে বাদ দিলে
খৃষ্টান ধর্মটা
শূন্যে বিলীন হোয়ে যায়,
ব্যক্তিবিশেষ বিনা
ইসলাম্ ধর্মের
মুহূর্ত টিঁকে থাকা দায়,
বুদ্ধকে বাদ দিলে
বৌদ্ধধর্মটাও
এখুনি নিঃস্ব হোয়ে যায় !
হিন্দুর সে ভয়টা নেই।
ব্যক্তিকে বাদ দিলে
হিন্দুধর্মটার
লোকসান নেই কিছুতেই।
ব্যক্তির মাধ্যমে
যে-ভাব ব্যক্ত হয়
হিন্দুর লক্ষ্য তাতেই।

সেই কারণেই
পুরাণের চরিত্র
ঐতিহাসিক কি না
সে তর্ক নিষ্প্রয়োজন।
পুরাণের কাজ হোলো
গল্পে শিক্ষা দেওয়া
বোঝে যাতে জন-সাধারণ !
বেদের মহান্ ভাব
গল্পে সরস করা
পুরাণের লক্ষ্য প্রথম।

৪৬

তাছাড়াও
ভেবে দ্যাখো মনে,
বৌদ্ধ-যুগের ঐ
বীভৎস তমসার দিনে
পুরাণই তো এনেছিলো
হিন্দুর নব-জাগরণ,
পুরাণের ভক্তিই
হিন্দুর মৃতদেহে
এনেছিলো প্রাণ-স্পন্দন।
এ ব্যাপারে স্বামিজীর
নির্মোহ দৃষ্টির
পরিচয় জানা প্রয়োজন।

• • •

"We have
Not only to acknowledge
The power of the Puranas
In our own day,

২। "এই বাদানুবাদ ছেড়ে দিলে, পৌরাণিক উক্তিগুলোর বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক এবং জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা বাদ দিলে যে জিনিসটা আমরা নিশ্চিতরূপে দেখ্‌তে পাই, প্রায় সমস্ত পুরাণের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত তন্ন তন্ন কোরে আলোচনা কোরে দেখ্‌লে সর্বত্রই যার পরিচয় পাওয়া যায়—সেটা হোচ্ছে এই ভক্তিবাদ। সাধু-মহাত্মা এবং রাজর্ষিদের চরিত্র বর্ণনায় এই ভক্তিতত্ত্ব বার বার উল্লিখিত, উদাহৃত এবং আলোচিত হোয়েছে।"

—*Bhakti* (*Complete works of Swami Vivekananda, Vol III, Page* 386)

But
We ought to be greatful to them
As they gave us
In the past
A more comprehensive
And a better
Popular religion
Than
What the degraded
Later-day Buddhism
Was leading us to.

This easy
And smooth idea of Bhakti
Has been written
And worked upon,
And
We have to embrace it
In our every day
Practical life,
For
We shall see
As we go on
How the idea
Has been worked out
Until
Bhakti becomes
The essence of love." ৩

৪৭

আমাদের সংহিতাটার
ভক্তির যে-বীজটা
সর্বপ্রথম জাগা যায়,
তারপর যেটা
উপনিষদের বুকে
অঙ্কুরে বিকশিত হয়,
তারই ঐ শাখান্বিত, পুষ্পিতরূপ
আমরা পেয়েছি শেষ
পুরাণের ফুল-বাগিচায়।

* * *

জানি আমি রাজা
উগ্র বেদান্তবাদী তুমি,
তবু তাই বোলে
প্রেমের মাধবীলতা
দু'পায়ে থেঁত্‌লে যাবে চোলে?
তোমার যা প্রয়োজন নেই
জাতীয়-জীবন থেকে
উচ্ছেদ কোরবে তাকেই?
এই সব যতো দেখি-শুনি,
মনে হয় রাজা,
সিদ্ধ বেদান্তী নও,
সখের বেদান্তবাদী তুমি!

অদ্বৈত বেদান্ত
সেরা পথ ঠিকই,
তবু এটা ভেবে দেখো দিকি—
বেদান্তী হওয়াটা কি সোজা?
অসীম সাহস বিনা
সম্ভব বেদান্ত বোঝা?
উপনিষদের ঐ প্রচণ্ড তাপ,
ভূমা ও অনন্তের
একটানা অসহ্য ভাব
সকলের ধাতে সয় নাকি?
বাসনার দাসত্ব ঘোচেনি যাদের,
কামনা-মলিন ঐ কাপুরুষদেরও
নিতে হবে ঐ রাস্তা কি?

ঘাড় ধোরে সবাইকে
বেদান্তে নিয়ে যেতে চাও?
সামান্য গৃহীদের কথা বাদ দাও,
এমন কি নির্ভীক গিরিগুহাবাসী,
যথার্থ নিষ্কাম সেরা সন্ন্যাসী,
ভোগেতে বিমুখ হোয়ে
প্রাণপণে যাঁরা
মুক্তির আস্বাদ চান,
অতন্দ্র বাসনায়
যাঁরা কেউ হননাকো ম্লান,
শুনেছি তাঁরাও
জ্ঞানপথে পা বাড়িয়ে
মাঝপথে পিছু হটে যান।

৩। "আবার শুধু আধুনিক কালে পুরাণগুলোর উপযোগিতা ও প্রভাব স্বীকার কোরলেই চোলবে না, পুরাণের প্রতি আমাদের এই কারণেও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, শেষ যুগের অবনত বৌদ্ধধর্ম আমাদের যে পথে নিয়ে যাচ্ছিলো, পুরাণ আমাদের তার চেয়ে প্রশস্ততর এবং উন্নততর সর্বসাধারণোপযোগী এক ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে। ভক্তির সহজ এবং মধুর ভাব লিখিত এবং আলোচিত হোয়েছে বটে, কিন্তু শুধু তাতেই চোলবে না, ঐ ভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গ্রহণ কোরতে হবে, কারণ আমরা পরে দেখবো—এই ভক্তির ভাব প্রস্ফুটিত হোতে হোতে অবশেষে একদিন প্রেমের সার ভাগে পরিণত হয়।"

Bhakti (Complete works, vol III, Page 386 ond p 387)

যতোদিন সূক্ষ্মেতে যাচ্ছে না মন,
জড়ের ওপরে টান
আছে যতোক্ষণ,
অপরের সাহায্য চাই যতোদিন,
ততোদিন পুরাণের আছে প্রয়োজন।

* * *

"So long
As there shall be
Such a thing
As personal
And material love
One can not
Go behind
The teachings of the Puranas

So long
As there shall be
The human weakness
Of leaning upon somebody
For support,
These Puranas,
In some form or other
Must always exist.
You can condemn those
That are already existing,
But
Immediately
You will be compelled
To write another Purana.

If
There arises amongst us
A sage
Who will not want
These old Puranas,
We shall find
That his disciples,
Within twenty years of his death,
Will make of his life
Another Purana.
That will be
All the difference.
This is
A necessity
Of the nature of man,.." ৪ [ক্রমশঃ।

৪। "যতোদিন ব্যক্তিগত ও জড়প্রীতি বোলে কিছু থাকবে, ততোদিন কেউ পুরাণের উপদেশ অতিক্রম কোরতে পারবেন না। যতোদিন মানবীয় দুর্বলতা বশতঃ অন্য কারুর ওপর নির্ভর কোরতে হবে, ততোদিন এই সব পুরাণ কোনো না কোনো আকারে থাকবেই থাকবে। আপনারা ওদের নাম পরিবর্তন কোরতে পারেন, যে পুরাণগুলো আছে, আপনারা তাদের নিন্দে কোরতে পারেন, কিন্তু তক্ষুণি আপনারা আর একটা পুরাণ লিখতে বাধ্য হবেন। ধরুন, আমাদের মধ্যে এমন কোনো মহাত্মার আবির্ভাব হোলো—যিনি এই সব প্রাচীন পুরাণ অস্বীকার কোরলেন; তাঁর দেহত্যাগের পর বিশ বছর যেতে না যেতেই আমরা দেখবো—তাঁর শিষ্যেরা তাঁর জীবন অবলম্বন কোরে আর একটা পুরাণ লিখে ফেলেছেন। পুরাণ ছাড়বার জো নেই—প্রাচীন পুরাণ এবং আধুনিক পুরাণ—এইটুকু মাত্র প্রভেদ। মানুষের প্রকৃতিই এর প্রয়োজন বোধ করে।"

—*Bhakti* (*Complete works, vol III, Page* 387)

মানবদেহে শব্দের প্রতিক্রিয়া

শব্দ বা আওয়াজ (sound) আধুনিক সভ্যতার একটি মস্ত অভিশাপ বলিতে পারা যায়। আমাদের জীবনযাত্রা যন্ত্রের উপর যত নির্ভরশীল হইতেছে, শব্দের মাত্রাও বাড়িয়া চলিয়াছে সেই অনুপাতেই। বিচিত্র ধরণের যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, মোটর, গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদির আওয়াজে কর্মব্যস্ত বড় বড় সহরগুলিতে মানুষ অতিষ্ঠ। এখানে প্রশ্ন উঠিতেছে শব্দ বা গোলমালে স্বাস্থ্যের আদৌ ক্ষতি হয় কি না অর্থাৎ মানবদেহে শব্দের প্রতিক্রিয়া সত্যই কি ?

বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখিয়াছেন যে, বিভিন্ন উপাদানের সহিত শব্দ মিশিয়া যাইয়া তাপে পরিণত হয়। উচ্চ শব্দ বা আওয়াজ (noise) মানবদেহেও প্রবিষ্ট হয়, বিশেষ করিয়া মস্তকের হাড়গুলি উহাকে সহজে আকর্ষণ করে। সুইডেনের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ একটি সতর্কবাণী করিয়াছেন—নগরীর রাজপথে অনবরত যে গাড়ী-ঘোড়া বা মোটরের আওয়াজ হয়, তাহাতে জনস্বাস্থ্য বিপন্ন না হইয়া পারে না। অপর একটি দাবী—কারখানার কারখানায় যন্ত্রাদির যে ভীষণ আওয়াজ হইয়া থাকে, তাহাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। শব্দ বুদ্ধিবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ না করিলেও স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় শব্দকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবেই গণ্য করা যায়। এই সমস্যার মীমাংসা অর্থাৎ শব্দ-নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত যন্ত্রের আবিষ্কার প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, এই স্পুটনিকের যুগে গবেষণা চালান হইলে সর্বক্ষেত্রে কার্য্যকরী শব্দনিরোধ যন্ত্র (silencer) আবিষ্কৃত না হওয়ার কিছুমাত্র কারণ নাই।

ছোটদের আসর
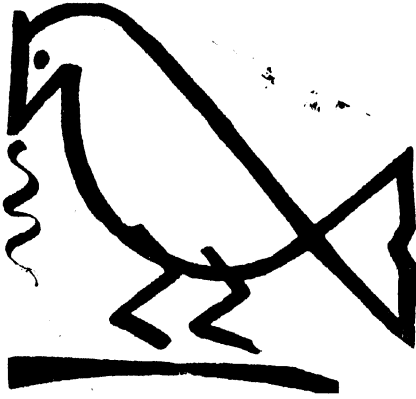
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আজ-কাল মীরার মন বারে বারে উদাস হয়ে যায়। কলকাতার রাস্তা দিয়ে যে জনতা চলেছে, ওর মধ্যে সে মিশে যেতে পারবে না। সে এমন একজন হবে, যাকে লোকে আলাদা ক'রে চিনবে। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একজন। গ্যাসের আলোতে তো কত জন পড়ে। একজন শালওলার ছেলেকেও মীরা গ্যাসের আলোতে পড়তে দেখেছে রাস্তার ধারের চৌকিতে ব'সে। সে হয়েছে আব্দুল করিম। শাল কাচার দোকান খুলেছিলো। কিন্তু আর একজন হয়েছেন বিদ্যাসাগর। এই বিদ্যাসাগরকে চিনেছিলেন মাইকেল মধুসূদন। তিনি যা বলেছিলেন তা স্মরণীয় হ'য়ে গেছে:—

"বিদ্যাসাগরের জ্ঞান ও প্রতিভা প্রাচীন কালের ঋষির মতন, কর্ম্মক্ষমতা ইংরেজের মতন আর হৃদয় বাঙালী-মায়ের মতন।"

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!"

নিজের প্রিয় ছাপাখানা আট হাজার টাকায় বিক্রি করেও—আজকের দিনে যে টাকা বত্রিশ হাজার টাকা—দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মাইকেলকে। দু'টো মহাল বিক্রি ক'রে মাইকেল একদিন সমস্ত টাকা শোধ করেছিলেন, কিন্তু বার বার স্বীকার ক'রে গেছেন বিদ্যাসাগরের ঋণ শোধ করা যায় না।

মাইকেলের অস্থি রাখবার কথায় তাই না বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যার জান বাঁচাতে পারলুম না, তার হাড় রেখে কাজ নেই।

স্যর রাসবিহারী ঘোষের গাউন ছিল ছেঁড়া। কে যেন বলেছিলো—এ উকীলটার কিছু হয় না, গাউন ছেঁড়া। তারপর নাম শুনেই ছুট!

কোন্ জজ্ বলেছিলো, মিষ্টার ঘোষ, আদালতে এত বই এনেছেন কেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন—হুজুরকে কিছু আইন শেখাব ব'লে।

কত উকীল কত ব্যারিষ্টার ত' ছিল, কার সাহস হয়েছিলো এমন কথা কোনো জজকে বলবার?

রাজা অশোক ব্রাহ্মী অক্ষরে শিলালিপি লিখে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিলেন—নগরে, প্রান্তরে, গিরিচূড়ায়, নদীকূলে, অরণ্যে, সিন্ধুতীরে। লোহার অশোকস্তম্ভ। কিন্তু কোনো দিন মরচে পড়লো না। মরচে পড়ে না, এমন লোহার আবিষ্কার আজো হয়নি এ যুগে।

ব্রাহ্মী অক্ষর রাজার কল্যাণে ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। ব্রাহ্মী অক্ষর যে কি জিনিস, বার করলো কে? কোনো হিন্দু না প্রিন্সেপস্ সাহেব—যাঁর নামে গঙ্গার ঘাট আছে, আবিষ্কার করলেন চোখ অন্ধ ক'রে ব্রাহ্মী ভাষা।

ব্রাহ্মী অক্ষর থেকে ব্রাহ্মদের কথা মনে পড়ে মীরার। তার মার কাছে শুনেছে, বাংলাদেশে নতুন সভ্যতা নিয়ে আসে ব্রাহ্মসমাজ। ভাশুরদের মামাশ্বশুরদের সামনে যখন বৌরা আসত না, কথা বলা দূরে থাক, পা ছুঁয়ে প্রণাম করত না, বাইরের লোকদের সামনে একগলা ঘোমটা দিয়ে লজ্জাবতী লতা হ'য়ে থাকত, লেখাপড়া শেখাটা পাপ মনে করত, তখন ব্রাহ্মমেয়েরা সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে মিলে-মিশে লেখাপড়া শিখে অনেক দূর এগিয়ে গেল।

অনেক দিন লাগলো হিন্দুমেয়েদের ব্রাহ্মদের যা কিছু ভালো জীবনে গ্রহণ করতে। তার পরে এক দিন এলো, যে দিন ব্রাহ্ম আর অব্রাহ্ময় কোনো তফাৎ রইলো না। সকল মেয়ে এক সঙ্গে কলেজীপড়া শেষ করলো, সকল মেয়ে সকল লোকের সঙ্গে মিশলো, সকল মেয়ে চাকরী করলো, ডাক্তার হল, উকীল হল, ব্যারিষ্টার হল, ইঞ্জিনীয়ার হল। মীরারা যেমন আজ ছেলেদের সঙ্গে রিসার্চ করছে, আগের দিনে তা কখনো কেউ সম্ভব ব'লে মনে করতে পেরেছে?

মারাঠী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলার মন্ত্র বাঙালী মেয়েদের প্রথম শিখিয়েছে ব্রাহ্মসমাজ।

তাই ব্রাহ্ম শুভ্রার বিয়েতে গিয়ে মীরার ভারী মজা লাগলো। কোনো সংস্কৃত মন্ত্র নয়—যা কেউ বোঝে না, না বুঝেই ব'লে যায়—বাংলা কথা, সুন্দর কথা, মনে রাখার মতন কথা। তারপর গান—তাঁহারে নমস্কার।

যিনি আকাশে বাতাসে
আলোকে
তাঁহারে নমস্কার।

তারপর বর-কনের সম্মতি, মালাবদল, হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, গান, প্রার্থনা আবার গান—

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বোসো হে হৃদয়নাথ !
কল্যাণকরে মঙ্গলডোরে
বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত।

তারপর ডিসে ক'রে হাতে হাতে খাবার—দু'খানা ভেজিটেবল চপ, দু'টো লেডিগেনি, কিছু ডালমুট···

হৈ-হৈ নেই, চেঁচামেচি, ছুটোছুটি, বনস্পতি-কলাপাতায় লুচি-তরকারী ফেলা, ছড়ানো, নষ্ট, অনেক খরচ ক'রে অনেক সমালোচনা—কিছুই নেই।

রেজিষ্ট্রারের সামনে নাম সই ক'রে বিয়ে হয়ে গেল। মাথায় সিঁদুর দেওয়া হল। সিঁদুরের কথায় মীরার মনে পড়লো—কা'রা যেন বলে এটা বর্ব্বরপ্রথা, সিঁদুর হল রক্তের চিহ্ন, হাতের নোয়া শাঁখা বন্দিদশার চিহ্ন। হাসি পায়। সঁাথিতে সিঁদুর পরলে সুন্দর দেখায় না ? পায়ে আলতা পরলে ভালো দেখায় না ? একদিন ব্রাহ্মরাও সিঁদুরকে আলতাকে কুসংস্কার বলে দূরে রেখেছিলো।

মানুষ যা খুসি বলতে পারে। কেউ বলে, রাম ব'লে কেউ ছল না, ভীষ্ম ব'লেও কেউ না। পুরাণ মিথ্যে। রামায়ণ মিথ্যে। মহাভারত মিথ্যে। গীতাও মিথ্যে। কা'রা বলে ? অনেক অনেক পাশ করারা। কোন্ দিন তারা বলবে—পূর্ব্বপুরুষরাও ছিল না, তাদের তো দেখিনি। অনেক বছর বাদে কেউ যদি বলে—কলকাতা ছিল না। গবেষণা ক'রে দেখবে বাঙালী ব'লে কোনো জাত ছিল না। সেইটাই সত্যি হবে ? নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর আলোকতত্ত্ব বার ক'রে গেছেন। কেউ যদি বলে নিউটন ব'লে কোনো লোকই ছিল না !

আত্মরস লক্ষ্য ছিল ব'লে
ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে।
ওরে মূর্খ ইহা দেখি শিক্ষ,
ফল দিয়া রক্ষা পায় বৃক্ষ।

কেউ যদি বলে, এ কবিতা রবীন্দ্রনাথের হ'তে পারে না, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের। তাই মান্‌তে হবে ?

সত্যি-মিথ্যের কথা নয়, মহৎ জীবনের কথা কেবলি শুনতে হয়। সেই দ্বারকা, সেই অযোধ্যা, সেই কুরুক্ষেত্র, সেই বৃন্দাবন রয়েছে, তাকে ঘিরে ঘিরে যে সব কাহিনী রচিত হয়েছে তা ইতিহাসের মর্যাদা পেয়েছে—বীরের কাহিনী, ত্যাগের কাহিনী, কৌশলের কাহিনী, চমৎকার চমৎকার সব কাহিনী মানুষকে বল দিয়েছে, সাহস দিয়েছে।

তেনজিং এভারেষ্টের মাথায় পৌঁছেছিলো কি না, কোনো প্রমাণ নেই, সেখানে ক্যামেরাম্যান যেতে পারেনি, রেডিয়ো যেতে পারেনি, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ পড়েছিলো কি না দেখবার কোনো উপায় ছিল না এরোপ্লেন থেকেও। কিন্তু দুঃসাহসী পাহাড়ে চড়ার লোক সে, বার বার ব্যর্থ হয়েও শেষ বার মিথ্যে কথা বলার কোনো কারণ নেই, সমস্ত জগৎ বিশ্বাস করলো, দরিদ্র শেরপা—যার স্ত্রী-কন্যা হাতে ধ'রে তাকে বলেছিলো, তুমি যেয়ো না, তুমি না ফিরলে আমরা খাব কি ?—সে পেলো রাজার ঐশ্বর্য্য, রাজার সম্মান, তার পরিবারের খাবার কষ্ট চিরদিনের মতন ঘুচে গেল। কে ভেবেছিলো দার্জিলিং-এর পাহাড়ী তেনজিং একদিন লণ্ডনে যাবে আর রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করবে ? ইতিহাসে র'য়ে গেল নাম তেনজিং শেরপা। তর্ক করতে নেই। বুঝতে হয়।

জোনাথান সুইফট যেমন বলেছেন কুড়িটা প্রতিভাকে গালাগালি দিলেই তোমার প্রতিভা ফুটে উঠবে। মানে—যাঁরা বড়ো হয়েছেন, তাঁদের অকারণ ত্রুটি ধরো, গাল দাও, সমালোচনা করো কাগজে—লোকে ভাববে, এ না জানি কত বড়ো !

আসলে সে কিছুই নয়, লোকে তাকে চিরদিন বিশ্বনিন্দুক বলে জেনে রাখবে, ক্ষমা করবে না।

মানুষের চরিত্র জানতে হলে ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে—দেখতে হবে কত বিচিত্র মানুষ !

তাই মীরা ট্রেণের থার্ড ক্লাসে উঠলো। মেয়ে-কামরা। পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, বাচ্চাদের শুইয়ে রেখেছে, তবু বস্‌তে দেবে না। ট্রেণে উঠলে মানুষ হঠাৎ খুব স্বার্থপর হ'য়ে ওঠে। সব ট্রেণে। সব ক্লাসে।

সময়ে সময়ে ট্রামেও হয়। মীরা সেদিন ট্রামে উঠছে, কণ্ডাক্টর বলেছিলো—লেডিস সীট নেই, তবু সে উঠেছিলো, দাঁড়িয়ে যাবে ব'লে। কিন্তু দেখে, একটা বাচ্চা মেয়েকে পাশে বসিয়ে একজন মোটা গিন্নী।

মীরা বলেছিলো ওকে কোলে নিন না। সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিলো—কেন কোলে নোব ? টিকিট কাটিনি ওর ? ওঠো কেন তোমরা ভিড়ের মধ্যে ? কণ্ডাক্টর তো চেঁচাচ্ছিলো জায়গা নেই ব'লে। যেমন উঠেছ, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকো।

মীরা দাঁড়িয়েই রইলো। স্বার্থপর মোটা গিন্নীর দিকে সকলেই হাঁ ক'রে চেয়ে দেখলো।

মীরার অভিযোগ নেই, দাঁড়িয়েই যাবে তারা পুরুষদের সঙ্গে ; সব দেশে সব মেয়েই যায়। লেডিস সীট কোনো দেশেই থাকে না। যেদিন এ দেশে সব মেয়ে চটপটে হ'য়ে উঠবে, সেদিন এ দেশেও আলাদা সীট থাকবে না মেয়েদের। পুরুষদের সঙ্গেই পাশাপাশি ব'সে তারা যাবে। আর আগেকার দিনের অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা ভেবে হাসবে।

কিন্তু ট্রেণের মেয়ে-কামরা কেমন যেন ! মেয়েরা পুরুষদের গাড়ীতে উঠতে দেবে না, কিন্তু কোনো চোর উঠলে পুরুষদেরই চেঁচিয়ে ডাকবে, রক্ষে করো গো বলে ! পাশের গাড়ী থেকে পুরুষরা এলে তবে বাঁচবে। তারা যদি শুনতে না পায়, তারা যদি না আসে ? তাহ'লে খুন হ'য়েও যেতে পারে।

চোরেরা কি না পারে ? জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে টেনে চুড়ি খুলে নিতে পারে। গাড়ীর মধ্যে উঠে ছোরা দেখিয়ে সব কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

মীরা ভীড়ের মধ্যে কোনো রকমে জায়গা করে নিয়ে বসলো। বসলো একটি ভালো মেয়েরই পাশে। পাঞ্জাবী সে, তার নাম লাজবন্তী। তার বোন জ্ঞানবন্তী, তার কাছে যাচ্ছে অমৃতসরে। সুন্দর বাংলা জানে লাজবন্তী। তার মাতৃভাষা উর্দ্দু। উর্দ্দুতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সে পড়েছে। কপালকুণ্ডলা। চমৎকার বই।

ট্রেণ ছাড়লে মীরার নজর পড়লো—তার পায়ের কাছে কামরার

মেঝেতে বসে চারটি গ্রাম্য মেয়ে—পুঁটলি খুলে একগাদা মুড়িতে তেল মাখালো ভালো ক'রে, তার পর মুঠো মুঠো মুখে পুরতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের লাল লঙ্কায় কামড়।

মীরা দেখছে. দেখে তাকে বলে, তুমি টিকিট কেটেছ?

প্রশ্ন শুনে মীরা অবাক হয়। টিকিট কিনেছি। কিনবো না কেন?

সে হেসে বলে, লেকাপড়া জানা কি না, তাই টিকিট কেটেছ। আমরা কাটিনি।

টিকিট কাটোনি তো যাবে কি ক'রে?

এমনি যাব। দেখো না কেমন যাই।

মীরা চুপ ক'রে আছে দেখে সে বলে, হরিদ্বার গেছি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর গেছি, টিকিট কাটিনি। এ তো যাচ্ছি হেথা—কাশীতে। তার আবার টিকিট কিসের?

বলো না, কি ক'রে যাও? মীরা সোজা হয়ে বসে।

চেকার এসে জিজ্ঞেস করে, টিকিট আছে? আমরা বলি, আমাদের মেয়েদের কাছে কখনো টিকিট থাকে? বাবুরা রেখেছে। বাবুরা কোন কামরায় আছে খুঁজে বার করো। কোথায় পাবে বাবুদের? আমাদের সঙ্গে কি আর কোনো লোক আছে? ভালো মানুষেরা আর বিরক্ত করে না। মন্দ লোকেরা আবার ঘুরে আসে কিছু পয়সা পাবার লোভে। বলে, নামিয়ে দোব। দিলে-দিলে? তাতে আমার কি ক্ষেতি করবে। নামলুম এক ইষ্টিশানে। তার পর সুবিধে দেখে অন্য এক টেরেনে উঠে পড়লুম।

মীরার বেশ মজা লাগে।

সে বলে চলে—যখন চাল বেচতুম, পুলিশে ধরত—নিয়ে যেত লালবাজারে লালবাড়ীতে। গেল গেল? আমার কি ক্ষেতি করলে? তার পর ছেড়ে দিত। সুবালা দাসীকে কখনো আটকে রাখতে পারে? বেরিয়ে এসে আবার চাল বেচলুম। কিছু চাল পুলিশ আটকে রাখলো। তাতে আমার কি ক্ষেতি করলে?

মীরা দেখে, এদের কিছুতেই ক্ষতি হয় না। সরলপ্রাণ গ্রামের মেয়ে সুবালা।

রাত গভীর হল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। ওরাও ঘুমিয়ে পড়লো। অন্ধকার-অন্ধকার ষ্টেশনে গাড়ী থামছে। কখনো অনেক আলোর প্লাটফর্ম। নীল নীল আলো, ঝকমকে আলো। চা-গ্রাম, পান-সিগ্রেট, ঘুম-ঘুম আওয়াজ। কেউ যদি উঠতে যায় এ গাড়ীতে, মেয়ের ছবি দেখে ব'লে ওঠে ই নেহি, জনানা ডিব্বা!

পাহাড়ে মতন জায়গা, ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে কোথায় ট্রেণ থেমেছে, হঠাৎ একদল পুরুষ মানুষ হুড়মুড় ক'রে উঠে পড়লো। হিন্দুস্থানী। একজন যে গাড়ীতে উঠবে, কুড়ি জনকে সেই গাড়ীতে উঠতেই হবে, পাশের কামরা একেবারে খালি গেলেও সেদিকে যাবে না।

উঠলো সব জোয়ান-জোয়ান। লাঠি-সোটা হাতে। ঘুমন্ত সুবালারা জেগে উঠেছে, উঠেই চীৎকার জুড়েছে চোর-চোর—তারপর তাদের পায়ের কাছে কি করতে লাগলো, তারা তিড়িং-তিড়িং লাফাতে লাগলো, তার পর তাদের ঠেলে দরজার ওপরের চেনটা ধ'রে একেবারে ঝুলে পড়লো সুবালা।

গাড়ী জঙ্গলের মধ্যেই থেমে গেল, আর সেই লোকগুলো দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ে লাইনের পাথরের ওপর দিয়েই ছুটতে লাগলো। কি তাদের মনে ছিল কে জানে? গাড়ীর সকল মেয়ে তখন জেগে উঠেছে। তাদের সাধ্যও ছিল না লোকগুলোকে নামানো।

একা সুবালা। তার হাতে বাঘের নখ পরানো। নখে রক্ত লেগে গেছে। তাই লোকগুলো তিড়িং-তিড়িং লাফাচ্ছিলো। মেয়ে-গাড়ীতে উঠে পড়েছে ব'লে তাদের রোখ দেখাবারও উপায় ছিল না।

লাজবন্তী মীরাকে বললে—ভাগ্যিস ভাই ওরা ছিলো!

ওরা রয়েছে ব'লে গাড়ীশুদ্ধ সমস্ত মেয়ে সে রাত্রে আরামে ঘুমোলো।

সুবালারা মোগলসরাইয়ে নেমে গেল। মীরা আরো আগে যাবে। লাজবন্তী আরো আগে। কিন্তু বিধাতা যেতে দিলে তবে তো? এলাহাবাদে গাড়ী থেমে গেল। ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন আর এগোবে না। সামনে লাইন ভেঙে গেছে। বন্যার জল।

এলাহাবাদে মীরার জানা কেউ নেই। তাতে কি? ভাবনার জন্তে সে কি বেরিয়েছে? ভাবনা জয় করবার জন্তেই তার বেরোনো। এ তো সখের অ্যাডভেঞ্চার!

সে কি পড়েনি—

তোমার অসীমে প্রাণ-মন লয়ে যত দূরে আমি যাই,
কোথাও মৃত্যু কোথাও দুঃখ কোথাও বিচ্ছেদ নাই?
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে
যাহা কিছু সবই আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারি,
নিশি-দিন কাঁদি তাই।

কিন্তু লাজবন্তী মুস্কিলে পড়লো। তার সঙ্গে কেউ নেই। কলকাতায় তুলে দিয়েছে। দিল্লীতে নামবে। সেখানে তাদের বাসা আছে। তারপর অমৃতসর যাওয়া শক্ত কিছু নয়। কিন্তু এলাহাবাদে হোটেলে ক'দিন থাকতে হবে, তার ঠিক কি? কবে লাইন পরিষ্কার হবে কে জানে? এ ক'দিনের খরচের টাকা তো তার কাছে নেই!

প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে লাজবন্তীকে মীরা জিগ্যেস করলো—কি ভাবছ তুমি? আমার সঙ্গে হোটেলে চলো না?

হোটেলে কি ক'রে উঠব? টাঙ্গাভাড়া আর কুলিভাড়া ছাড়া পয়সা যে আমার কাছে নেই। কে জানত, পথে এরকম ঝঞ্ঝাট হবে?

মীরা দেখলো কোটপ্যান্টপরা এক ভদ্রলোক তার মেয়েকে পাশের ফার্স্ট ক্লাস থেকে নামিয়ে নিলো। বললে—ডলি, মোগলসরাইয়ে যদি এমনি গাড়ী থেমে যেত, তাহ'লে কি হত? ভাগ্যিস এখানে এসে থেমেছে।

ডলি ঝর্ণার মতন হেসে উঠলো। বললে—সত্যি, কী যে হ'ত!

কী যে হ'ত দেখবার জন্তেই যেন ওরা মীরাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো। নড়ছিলো না। মনে হল যেন ওদের কথাও শুনছিলো। শুনে হয়তো মজাও পাচ্ছিলো।

মীরা ওদের শুনিয়েই বললো—ভাবনার কিছু নেই। চলো আমার সঙ্গে হোটেলে। আমার কাছে টাকা আছে।

তবু যেন লাজবন্তীর পা চলছিলো না। দিন আট-দশ টাকা খরচ ওর জন্তে মীরা কেন করতে যাবে?

ডলিকে তার বাবা কি যেন বললে। সে এগিয়ে এসে বললে—আপনারা কোথায় যাচ্ছিলেন ?

একজন দিল্লী, একজন অমৃতসর।

আজ-কালের মধ্যে তো লাইন পরিষ্কার হবে না, কিছু যদি মনে না করেন, আমাদের বাড়ীতে যাবেন ?

ওরা চুপ ক'রে থাকে। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক বাড়ীতে যেতে বললেই কি যাওয়া যায় ?

কিন্তু ডলির বাবা এগিয়ে আসে। বলে—আমরাও বাঙালী, আপনারাও বাঙালী—এটা বিদেশ ব'লে মনে করছেন কেন ?

লাজবন্তী বলে—আমি বাঙালী নই।

ডলি বলে, নিশ্চয় বাঙালী। আপনি চমৎকার বাংলা বলছেন। যদি বাঙালী না-ও হন, ভারতবর্ষের লোক তো ? আমার দেশের লোক, আমার বাড়ীতে অতিথি হবেন না, তা কি হ'তে পারে ?

ওদের পীড়াপীড়িতে যেতেই হয়। মোটরে আরাম ক'রে ব'সে অনেকখানি পথ। এলাহাবাদ শহরের বাইরে—চমৎকার বাগানওলা বাড়ী। ডলির মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। দুটি সুন্দর সুন্দর মেয়েকে দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। তার ওপর দু'জনেই লেখাপড়া-জানা শুনে ওদের আদর আরো যেন বেড়ে যায়।

সাত দিন কেটে যায় রাণীর আদরে। লাইন খুলে গেছে, তবু ডলির বাবা ওদের খবর দেয় না। এখান থেকে রেল-লাইন দেখাও যায় না যে ওরা জানতে পারবে।

মীরা সেদিন সকালে ডলিকে বললো—বোস-সাহেবকে জিগ্যেস করো, লাইন খুলেছে কি না।

ওধার থেকে আওয়াজ হয়—বোস সাহেব নয়, বোস বাবু, যদিও বাধ্য হয়ে চাকরীর খাতিরে ধড়াচূড়া পরি, আসলে আমি মাহিনগরের বোস, নেতাজী সুভাষ বসুর দেশের লোক। আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? জলে তো পড়েন নি !

বাড়ীর লোকেরা খবর না পেয়ে ভাবতে পারে।

দু'জনকারই বাড়ীর লোকদের দু'দিন অন্তর টেলিগ্রাম করা হচ্ছে। ঠিকানা তো আপনারাই দিয়েছেন। আপনাদের মতন মেয়েদের সঙ্গী পেয়ে ডলি-মার দিনগুলো চমৎকার কাটছে দেখতে পাচ্ছি, তাই তো ছেড়ে দিতে মন সরছে না। আপনাদের কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে ?

দু'জনে একসঙ্গেই বলে, অসুবিধে কিছুই নেই, কিন্তু আপনাদের খরচ হচ্ছে।

এই রকম খরচের নামই সদ্ব্যয়। টাকা রোজগার করা কিসের জন্যে ? শুধু নিজের খাওয়া-পরার জন্যে ? আপনাদের জন্যে আরো খরচ করতে পেলে আমাদের আরো আনন্দ হবে। এই দেখুন—কবি সত্যেন দত্তের লেখা বাঁধিয়ে রেখেছি—

ধরম ব'লে যা মরম জেনেছে
সেই সে করম করিতে দাও,
পরম শরণ অভয় চরণ
কম্পিত করে ধরিতে দাও।

এই অতিথি সৎকার করাই জীবনের ধর্ম্ম ব'লে জেনেছি। ঈশ্বর যেন শেষ অবধি সেই শক্তি দিয়ে যান, এই প্রার্থনাই নিত্য করি।

তবু বিদায় নিতে হল সুখী পরিবার থেকে। হাসিতে যেমনি ক'দিন কেটেছে তেমনি কান্না ঝ'রে পড়লো যাবার বেলায়। ঝি-চাকররাও কী সেবা করেছে, তারা বখশিস পর্য্যন্ত নিলো না। ডলির হাতে টাকা দিতে গিয়ে, সে টাকা হাতেই র'য়ে গেল। কিছুতে নিলো না। মোটর-ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল। সঙ্গে দু'জনের জন্যে এত খাবার দেওয়া হল, চারজনেও তা খেতে পারে না।

মীরার মনে পড়লো—

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।

ট্রেণ চলেছে দিল্লীর দিকে। লাজবন্তীর সুর্মা-টানা চোখ জলে ভ'রে উঠেছে। লাইনের ধারে যে জল ছিল, সে কোথায় সরে গেছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী বলেছিলো, মরণের পরেও বাঁচতে চাই। তার নাম অমর হওয়া। মহর্ষিদের সঙ্গে সে-ও বেদ রচনা করেছিলো। হাজার হাজার বছর ধ'রে ভারতবর্ষ মৈত্রেয়ীকে মনে রেখেছে।

কবি হেমচন্দ্রের লেখা—

খেয়ে যায় নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে
হায় হায় ঐ যায় বাঙালীর মেয়ে।

সে বাঙালীর মেয়ে হ'তে চায় না। বাঙালীর মেয়ে রাসমণি, বাঙালীর মেয়ে গৌরীমা, সারদামা—কোন সে শক্তি পেয়েছিলো যার জন্যে আজও লোকে প্রণাম করছে ? স্মরণ করছে ?

কোন সে তপস্যা, যাতে জন্মান্ধ হয়েও এম-এ বার-অ্যাট-ল হওয়া আটকায় না, ব্রেল পদ্ধতির শুধু ফুটকি আর লাইনে হাত দিয়ে গড় গড় ক'রে পড়ে যায় কেস, বক্তৃতা দেয় লোকসভায় দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা শক্তির সাধন গুপ্ত, কোনো মানুষের চেয়ে সে ছোট নয়, বরং হাজার মানুষের চেয়ে বড়ো।

অনেক কথা বলা হয়েছে, অনেক লেখা লেখা হয়েছে, যুগ অনেক এগিয়ে গেছে, কিন্তু বাংলা দেশের গ্রামের আঙিনায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে পাশ না করা যে বৌটি গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে, তার কপালের আলোয় যে ছবিটি ফুটে উঠছে, তা কি কেউ কোনো দিন ভুলতে পারে ? [আগামী বারে সমাপ্য।

পিকিং

(চীনের উপকথা)

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

পুরাকালে চীন দেশের সাগরে পিকিং নামে এক ভয়ানক অজগর-দানব বাস করতো। রাতে যখন দেশের লোক ঘুমে নিঝুম, তখন চুপি চুপি দানবটা জল থেকে উঠে—একজন বীরপুরুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে মজা করে তাকে মেরে তার মাংস খেত। রোজই একজন করে বীরপুরুষ মারা পড়তে সুরু করলো পিকিং-এর হাতে। দেশের লোকেরা ভীত হোলো। রাজাকে জানালো তারা এই ভয়াবহ ঘটনাটা।

সে দানবটাকে কেউ দেখেছো কি ? কোথায় থাকে সে ? রাজা বললেন। একজন তোতলা রাজাকে জানালো যে, সে একদিন রাতে সাগরের পাড়ে শুয়েছিল, থাকবার কোনো জায়গা না।

পেয়ে—রাত যখন নিঝুম তখন বিরাট একটা অজগর-দানব সাগর থেকে উঠে এসে সটান ঢুকলো রাজপুরীর মাঝে এবং একজনকে ধরে নিয়ে ঢুকলো আবার সাগরের জলে।

রাজা তো অবাক! রাজপুরীর সকল লোকই তোত্‌লার কাহিনী শুনে অবাক! কারু মুখে আর কথাটি নেই। রাজা তোত্‌লাটিকে নিজের কাছে ডাকলেন। বললেন তাকে, আজ আমাকে সাগরের সেই জায়গাটা তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে। আমি যাবো তোমার সংগে। তাকে মেরে রাজপুরীতে আবার সকলের মুখে হাসি ফুটাতে চাই—মনে সুখ আনতে চাই। আজই রাতে যাবো, তুমি রাজবাড়ীতেই খেয়ে দেয়ে জিরোও গিয়ে!

তোত্‌লা আরাম করে খেলো রাজার বাড়ীতে, ঘুমালো আরাম করে খাওয়া-দাওয়ার পর। রাতে তো জেগে থাকতে হবে, আবার সংগে যেতে হবে কি না তাই।

রাত হোলো। রাজা বললেন, চলো এবার বেরুনো যাক।

চলুন মহারাজ! আমি তৈরী। তোত্‌লার খুব উৎসাহ। রাজার উপকার করতে পেরে সে তো একাবারে মহাখুসী। রাজার উপকার হোলে দেশেরও উপকার হবে। তোত্‌লা এগিয়ে এগিয়ে চললো। আর মহারাজা চুংকিং তার পেছনে যেতে লাগলেন। রাজা ভাল হোলে—দেশের লোকও সুখে থাকবার ভরসা পায়। রাজা যে দেশের লোকের বাপ-মা। রাজা চুংকিং একজন সেই রকমই ভালো রাজা কি না, তাই দেশের লোকের বিপদে তিনি মাথা পেতে দাঁড়ালেন।

চুংকিং তোত্‌লার সাথে এসে দাঁড়াতেই সেই সাগরের তীরে দানবটা জলের মাঝে লুকিয়ে থাকে। রাত বাড়লো। রাজা জেগে রইলেন। তোত্‌লা ফুকিং তো ঘুমেই কাতর, নাক ডাকতে সুরু করেছে তার। রাজার বাড়ীর খাওয়াটা জোর হোয়েছে কি না!

রাজা তরোয়াল হাতে ঘুরে ঘুরে দেখছেন—কখন জল থেকে সেই দানবটা ওঠে, যার আকাশ-ছোঁয়া শরীরটা সারা রাজপুরী কাঁপিয়ে তুলবে।

রাত নিঝুম হোলো। দেশের সকল লোকই ঘুমে একাবারে অচেতন। রাজা দেখছেন সাগরের দিকে তাকিয়ে! এইবারই তো উঠবে সেই অজগর-দানবটা। মনে মনে ভাবছেন রাজা চুংকিং। এমন সময় সেই দানবটাকে জল তোলপাড় করে উঠতে দেখলেন তিনি, অত বড় বীরপুরুষ রাজা, তিনিও ভয়ে একবারে কেঁপে উঠলেন। তবু সারা শরীরে বল এনে তিনি তরোয়ালটাকে বাগিয়ে ধরলেন, বিরাট একটা সাপের মতো চেহারা সেই দানবটার—মাথাটা তার ঠেকেছে গিয়ে আকাশে। গোল গোল চোখ দুটো দিয়ে তার আগুন ঠিকরে পড়ছে। সারা শরীরে তার কুমীরের কাঁটার মতো কাঁটা। বীভৎস চেহারা একটা—দেখলেই ভয়ে একাবারে কাঠ পাকিয়ে সাবাড় হবার জোগাড় আর কি।

রাজা চুংকিং দমলেন না। দানবটা তার দিকে এগিয়ে আসছে—আজ তারই পালা। হয় রাজা নয় দানব যে কোন একজন আজ রাতে মরবে। দেশের লোককে বাঁচাতে আজ মরতেও ভয় পাবেন না। ভীত হোলেন না তিনি। এগিয়ে গিয়ে দানবটাকে আঘাত করলেন তাঁর তরোয়াল দিয়ে। দানবটার বাম-হাতখানা কেটে দেহ থেকে দু'খানা হয়ে ছিটকে পড়লো তোত্‌লার ঘাড়ে। তোত্‌লার ঘুম ভেঙে গেল!

তোতলা তো দানবটাকে দেখেই দে ছুট! ছুটতে ছুটতে একেবারে রাজপুরীতে হৈ-চৈ সুরু করে দিল। রাজপুরীর লোকেরা তার কথায় রাজাকে দানবটার হাত থেকে বাঁচাবার তরে ছুটলো সব সাগরের তীরে। যে যা পারলো তাই নিয়েই ছুটলো তারা। কেউ লাঠি, কেউ সড়কী, কেউ তরোয়াল, শুধু হাতে কেউ যেতে সাহস করলো না।

এদিকে ভীষণ লড়াই চলেছে তখন রাজা চুংকিং আর দানব পিকিংএর সাথে। লড়াই করতে করতে পিকিং রাজাকে সাগরের তলায় টেনে নিয়ে যেতে সুরু করলো। রাজা দেখলো বড় বিপদ! কি করি? দারুণ বিপদে পড়েও দমলেন না তিনি। লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। দেশের লোকেদের বাঁচাতে হবে এর হাত থেকে, এই তার পণ।

রাজাকে না দেখে রাজপুরীর লোকেরা হতাশ হোলো। তারা মনে করলো, তাদের রাজাকে ঠিক মেরে ফেলেছে ওই দানব। সুতরাং কি আর করবে তারা? কাঁদতে লাগলো আর মন দিয়ে ভগবান তথাগত ফুকে ডাকতে লাগলো। ভগবান ফু তাদের ডাকে সাড়া দিলেন।

ভয় কি! তোমাদের রাজা এখুনি ফিরে আসবেন দানবকে মেরে, তোমরা কেঁদো না। তোমাদের দয়ালু রাজা কখনো মরতে পারেন না। তোমরা তাঁর জয় দাও। তিনি এলেন বলে।

ভগবান ফু চলে গেলেন। এবার সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, মনের মাঝখানে সাহস ফিরে এলো। তারা রাজা চুংকিং-এর জয় দিতে সুরু করলো।

রাজা তাদের জয়রব শুনতে পেলেন, উৎসাহিত [illegible]য়ে উঠলেন তিনি বেশী করেই। এবার জেতার লড়াই সুরু হোলো। দানবটার চোখ দুটোতে বিঁধে দিলেন তিনি তার তরোয়ালখানা। অজগর-দানবটা এবার এক ঘায়েই কাত—মরে একেবারে ভূত। দেহখানা ভেসে উঠলো তার সাগরের জলে। তার সংগে সংগে রাজা চুংকিং। রাজপুরীর লোকেরা জয় দিলো রাজার।

রাজা লড়াই সেরে উঠে এলেন—বাঁচলেন না; তিনি সেই সাগরের তীরেই মারা গেলেন দানবটার বিষে।

দেশের লোক বাঁচলো দানবের হাত থেকে। রাজা মারা গেলেন তাদের বাঁচিয়ে দিয়ে। দানবের সেই বিরাট দেহটা একটা নূতন দেশ হোয়ে মানুষের বসবাসের জায়গা হোয়ে রইল। নাম হলো তার পিকিং।

অ্যানগাইজা

দেবব্রত ঘোষ

সাত সাগর আর তের নদীর পারে সোনার পাহাড়ের গল্প এত দিন আমরা শুধু রূপকথা ও ঘুমপাড়ানী গানেই শুনে এসেছি। কিন্তু কিছু দিন আগে দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু সরকার সত্যিসত্যিই এক সোনার পাহাড় আবিষ্কার করে সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করে দিয়েছেন। এই

পাহাড়টির নাম "অ্যানগাইজা"। অ্যামাজন নদীর অববাহিকায় অ্যানদিন-এর দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পাহাড়টি অবস্থিত। সুদূর-বিসর্পী নিবিড় শ্যাম বনানীর ঊর্ধ্বে যতদূর দেখা যায় দিগন্তের কোল ঘেঁষে পাহাড়টি সূর্য্যালোকে ঝলমল করে শাণিত কৃপাণের মত।

অবশ্য এই আবিষ্কারের সংবাদ সারা পৃথিবীতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করলেও পেরুতে তেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ, প্রায় তিনশো বছর ধরে পেরুর জনসাধারণের মাঝে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল যে, অ্যামাজন নদীর অববাহিকায় অ্যানদিন-এর দুর্ভেদ্য জঙ্গলে নাকি তাল তাল সোনা পাওয়া যায়। এই কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করে বছরের পর বছর বহু দুঃসাহসী ব্যক্তি অ্যানদিন-এর শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে "তাল তাল সোনা" খুঁজতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। তবুও মানুষের চিরন্তন স্বর্ণতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়নি। বরং উত্তরোত্তর তা' বেড়েই গেছে।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পেরুর গ্যালভেজ পরিবারের সিনর ফ্রান্সিস গ্যালভেজ। ইনি অ্যানগাইজা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করে পেরু সরকারের নিকট আবেদন করেন যে, এই কাহিনীকে নিছক অশিক্ষিত জনসাধারণের কুসংস্কার হ'তে উদ্ভূত কিম্বদন্তী বলে উপেক্ষা করলে মস্ত ভুল করা হবে। কারণ, তিনি স্বচক্ষে কয়েক জন অরণ্যচারী আদিম অধিবাসীর কাছে প্রচুর সোনার গহনা দেখেছেন। এ ছাড়া সিনর গ্যালভেজ অ্যানগাইজা সম্বন্ধে বিখ্যাত অনুসন্ধানকারী অ্যাবিস মেনডি ও ম্যানুয়েল ইজুবার বিবরণের উল্লেখ করেন।

অ্যাবিস মেনডি ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে অ্যানদিন-এর দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিভ্রমণ করেন। তিনি স্থানীয় স্প্যানিয়ার্ড ও রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে অ্যানগাইজার সোনার পাহাড়ের গল্পটি শুনেছিলেন এবং তাদের বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করে পাহাড়টির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গী ও পথ-প্রদর্শক না পাওয়ায় তাঁর এই প্রচেষ্টা মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়। কারণ—they were too superstitious and afraid they might die if they should find the gold mountain.

আবার ম্যানুয়েল ইজুবা ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পেরুর রাষ্ট্রপতির নিকট এক লিখিত বিবরণীতে জানান যে, তিনি স্বচক্ষে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে সোনার পাহাড়টি দেখেছেন। ইজুবা তাঁর বিবরণীর সাথে একটি মানচিত্রও দাখিল করেছিলেন বলে শোনা যায়। তবে দুঃখের বিষয়, তিনিও আসল অ্যানগাইজার সন্ধান পাননি।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে পেরু বিমান বাহিনীর জনৈক পাইলট অফিসার ময়োবাম্বার প্রধান সেনাপতি মেজর জুয়ান হেসেনকে জানান যে, অ্যানদিন-এর জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়ে আসার সময় তিনি বহু-কথিত সোনার পাহাড়টি দেখেছেন। এর পর আর একটি ঘটনা ঘটে। তা'হল ময়োবাম্বার একদল অরণ্যচারী যাযাবর রেড-ইণ্ডিয়ানদের গায়ে প্রচুর সোনার গহনা দেখে মেজর হেসেন তাদের সাথে আলাপ করে কৌশলে অ্যানগাইজা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

কাজেই এবার তিনি কালবিলম্ব না করে পেরু সরকারের নিকট আবেদন করলেন, অবিলম্বে একটি অনুসন্ধানকারী দল অ্যানগাইজার সন্ধানে অ্যানদিন-এর জঙ্গলে প্রেরণ করা হোক। ফলে পেরু সরকার মেজর হেসেন-এর নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধানকারী দল প্রেরণ করেন।

এই দলে ৪৬ জন দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের সাথে প্রচুর পরিমাণে রসদ, রাইফেল, দূরবীণ, কম্পাস ও জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করার জন্যে ধারাল কুড়ুল ছিল। মেজর হেসেন-এর রোজনামচা থেকে এই অভিযানের প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি বিবরণ জানা যায়।

...আজ সাত দিন হ'ল আমরা ময়োবাম্বা ছেড়ে এসেছি। সামনেই অ্যানদিন-এর দুর্ভেদ্য জঙ্গল, যার গর্ভে লুকিয়ে আছে আমাদের চিরবাঞ্ছিত অ্যানগাইজা। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেই সাথে হাড়কাঁপানো কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। পথ অত্যন্ত দুর্গম ও পিচ্ছিল। তবুও আমরা ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছি। অনমনীয় সংকল্প, আমাদের মনের বল হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখে আমাদের প্রাচ্যের রূপকথার স্বপ্ন-নীল নেশা।

এই মাত্র চড়াই উঠতে গিয়ে পা হড়কে আটশো ফুট নীচে খাদের মধ্যে পড়ে আমাদের অভিযাত্রী দলের রেডিও অফিসার সিনর অসভ্যালডোর মৃত্যু হল। চোখের সামনে এক নিমেষে তাঁকে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মত মিলিয়ে যেতে দেখলাম! হায়, মৃত্যুর কবলে মানুষ কত না অসহায়!

...অবশেষে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আমরা মাউণ্ট মরিল্লোতে এসে পৌছুলাম। অ্যানগাইজা অভিযানে এই পাহাড়টির গুরুত্ব অনেকখানি। ইতিপূর্ব্বে অ্যানগাইজা কিম্বদন্তীর সাথে মাউণ্ট মরিল্লোর কথা বহু বার উল্লিখিত হয়েছে। কারণ, মরিল্লোর আশে-পাশেই নাকি অ্যানগাইজার অবস্থান। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে মাউণ্ট মরিল্লোর পাদদেশেই তাঁবু খাটান উপযুক্ত মনে করলাম।

আজ কয় দিন খারাপ আবহাওয়ার দরুণ আমাদের তাঁবুর মধ্যেই এক রকম বসে বসে কাটাতে হচ্ছে। আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যেন নীল আকাশের নীল বেদনা-ধারা সুবিপুল অভিমানে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে।

হঠাৎ একজন দৌড়ে এসে আমাকে খবর দিল—ইউরেকা, ইউরেকা! পথ পেয়ে গেছি আমরা। খবরটি শুনেই আমার মনে হল, কে যেন আমাকে হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের চাবুক দিয়ে আঘাত করল। আনন্দের আতিশয্যে আমি সঙ্গে সঙ্গে মাটি ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম।

চারি দিকে ঘোর অন্ধকার! হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে হচ্ছে আমাদের। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে পাথর গড়ানোর প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসছে। কিন্তু এ কি! শরীর যে ক্রমেই অবসন্ন হয়ে আসছে। শ্বাস-কষ্ট, তদুপরি প্রচণ্ড পিপাসায় সারা দেহ থর-থর করে কাঁপছে। অ্যানগাইজা, তুমি আর কত দূরে? তুমি কি শুধু মরীচিকা?...

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে দেখি, এক বিশাল পর্ব্বত গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভাত-সূর্য্যের প্রসন্ন আলোয় তার সোনালী চূড়ো ঝলমল করছে।

কালবিলম্ব না করে আমরা অ্যানগাইজা সংক্রান্ত যাবতীয়

মানচিত্র ও আকাশচিত্রগুলি পরীক্ষা করতে বসে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর আমাদের দলের প্রধান সার্ভেয়ার তাঁর মত প্রকাশ করলেন—এই পাহাড়টিই অ্যানগাইজা। মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখলাম অ্যানগাইজাকে, যার সন্ধানে এসে যুগ যুগ ধরে কত দুঃসাহসী ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে! তাদের হৃদয়ের শেষ নিঃশ্বাস মিশে আছে এখানকার ঘননীল বনানীর মাঝে, পর্ব্বত-কন্দরে।

মেজর হেসেন ময়োবাম্বায় ফিরে এলে ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যানগাইজার মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেল, শতকরা দশ ভাগ সোনা মিশ্রিত। তবুও অ্যানগাইজা সম্বন্ধে অনেকের মনে এখনো যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাদের মতে মেজর হেসেনও আসল সোনার পাহাড়টির সন্ধান পাননি। ম্যারানন নদীর উপত্যকায় না'কি আসল অ্যানগাইজা অবস্থিত। তাই অ্যানগাইজা-রহস্যের কুহেলী এখনো পুরোপুরি অপসারিত হয়নি বলে অনেকের ধারণা।

রঙ-বেরঙ

শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ

এই যে চারি দিকে এত সুন্দর সুন্দর রং দেখতে পাও—কোন্‌টা লাল, নীল, কোন্‌টা হলদে। এই সব রং আমরা কোথা হ'তে পাই জান? প্রত্যেকটি রং আমরা সূর্য্যের আলো হ'তে পাই। সূর্য্যতে মোটামুটি বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলদে, কমলালেবু ও লাল রং আমরা দেখতে পাই। এই সাতটা রং-কে ইংরাজীতে ছোট করে বলা হয় Vibgyor—উচ্চারণ ভিব্‌জিয়র; বাংলায় নিশ্চয়ই "বেনীআসহকলা" বলা যেতে পারে—প্রত্যেক নামের গোড়ার অক্ষরটা নিয়ে।

এখন তোমরা হয়ত বলবে যে, সূর্য্যতে যখন অনেক রকম রং আছে আর আমরা যখন সূর্য্য হ'তে সব কটা রং পেয়ে থাকি, তখন চারি দিকে যে-সমস্ত জিনিষ দেখি সে সমস্ত জিনিষগুলি পাঁচমিশালী রং-এ মিলিয়ে অদ্ভুত সং-এর মত দেখায় না কেন? কেনই বা আলাদা আলাদা রকমের দেখায়? তোমাদের এই জানবার ইচ্ছাটা বাস্তবিকই বড় সুন্দর। কিন্তু ভগবানের সৃষ্টি এমনই যে, পৃথিবীতে আমরা যে-সব জিনিষ দেখি তাদের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরী। আর প্রতিটি অণু-পরমাণুর এক একটি বিশেষ গুণ আছে। এক একটি জিনিষের অণুগুলি এক একটি বিশেষ রং প্রতিফলিত (reflect) করে। সূর্য্য হ'তে সমস্ত রং পেলেও এক একটি জিনিষের অণুগুলি এক একটি বিশেষ রং প্রতিফলন করে আর বাকী সব রং-গুলি নিজের মধ্যে মিশিয়ে দেয়। যে রং-টি প্রতিফলিত হয় সে রং-টি আমরা দেখতে পাই। বাকী রং-গুলি যেগুলি মিলিয়ে যায়, আমরা দেখতে পাই না। আচ্ছা আর একটু বুঝিয়ে বলছি। ধরো, তোমাদের বাড়ী কয়েক জন ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করা হ'ল। প্রথম ভদ্রলোকটির নাম রাম বাবু, দ্বিতীয় ভদ্রলোকটির নাম শ্যাম বাবু, তৃতীয় ভদ্রলোকটির নাম যদু বাবু এবং আরও অনেকে। এই ভদ্রলোকদের খুব যত্ন করে মাছ, মাংস, ছানার ডালনা, ফুলকপির তরকারী, রসগোল্লা, সন্দেশ, সিঙ্গাড়া অর্থাৎ এক কথায় আমিষ, নিরামিষ, মিষ্টি, নোন্তা সব রকমই খেতে দেওয়া হ'ল। এখন রাম বাবু নিরামিষ তরকারী ভালবাসেন, আমিষ তরকারী তিনি ভালবাসেন না। তিনি মিষ্টি নোন্তা ও নিরামিষ তরকারী সমস্ত খেয়ে মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষ তরকারী ফেলে রাখলেন। শ্যাম বাবু তিনি ভীষণ খেতে ভালবাসেন, তিনি সমস্ত যা' দেওয়া হ'য়েছিল খেয়ে ফেলে শুধু কলাপাতাটি ফেলে রাখলেন। আর যদু বাবুর ভীষণ হজমের গোলমাল, তিনি সমস্ত জিনিষ ফেলে রেখে কিছু না খেয়ে মৌখিক ভদ্রতা বজায় রেখে উঠে পড়লেন। রং সম্বন্ধেও ঠিক এই ব্যাপার।

গাছের পাতা সবুজ হয় কেন, জানতে তোমাদের এবার খুব সুবিধা হ'বে। গাছের পাতার অণুগুলি সূর্য্য হ'তে সমস্ত রং খেয়ে (absorbs) ফেলে। কেবল সবুজ-রংটি খেতে পারে না বা খাবার দরকার হয় না বলে ফিরিয়ে দেয় বা প্রতিফলিত (reflect) করে। ঠিক রাম বাবুর মত—সমস্ত খেয়ে ফেলে আমিষ তরকারী ফেলে রাখেন।

তেমনি গাঁদাফুল বা জবাফুলের অণুগুলি অন্য সব রং খেয়ে ফেলে যথাক্রমে হলদে ও লাল রং-টি ফিরিয়ে দেয়। যার ফলে আমরা গাঁদাফুল হলদে বা জবাফুল লাল দেখি। অন্য সব ফুলের বেলায় এই নিয়মই খাটে।

কালির রং কালো হয় কেন? কারণ, কালির অণুগুলি সমস্ত রং খেয়ে ফেলে কোনও রং-ই ফিরিয়ে দেয় না। ঠিক শ্যাম বাবুর মত সমস্ত খাবার খেয়ে ফেলে খালি কলাপাতা ফেলে রাখেন। কালির রং থেকে তোমরা বুঝতে পারছ যে, 'কালো' একটি বিশেষ রং নয়। সমস্ত রং-এর অভাব মাত্র।

দুধের রং সাদা কেন? কারণ, দুধের অণুগুলি কোনও রং-ই খেতে পারে না, সব কটা রং-ই ফিরিয়ে দেয়। ঠিক যদু বাবুর মত—হজমের গোলমালের জন্য কিছু না খেয়ে উঠে পড়েন। দুধের রং থেকে তোমরা এই কথাই জানতে পারলে যে 'সাদা' একটি বিশেষ রং নয়। অনেকগুলি রং-এর সমষ্টি মাত্র।

সূর্য্যের মধ্যে সাতটা রং পেলেও মানুষ আবার প্রধান তিনটি রং যথা—লাল, নীল, হলদে এ কটা রং-এর সঙ্গে অন্যান্য রংগুলি নিজের পছন্দ মত মিশিয়ে হরেক রকমের রং সৃষ্টি করতে থাকে। প্রকৃতির দেওয়া 'রং' নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যায় বোধ হয়!

Modern education tends to turn our eyes away from the spirit. The possibilities of the spirit force or sole force, therefore do not appeal to us, and our eyes are consequently rivetted in the evanescent transitory material force.

—Mahatma Gandhi

ফুলের মত…
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

RP. 148-X52-BG
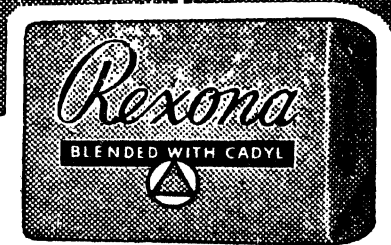
অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

পরদিন সকাল সাতটা না বাজতেই ঝন-ঝন-ঝন টেলিফোনের আওয়াজ কানে আসাতে, ঘুম থেকে উঠি-উঠি ভাবটা জোর করে কাটিয়ে সুমিতাকে ছুটে যেতে হল ফোনের কাছে। রিসিভারটা তুলে নিল সে—ওপাশ থেকে এলো অসীমের কণ্ঠস্বর।

—কে মিতা? কাল তোমাকে না বলে হঠাৎ চলে আসতে হলো, সেজন্য দুঃখিত, ক্ষমা চাচ্ছি। এখুনি যেতাম কিন্তু বড় দুঃসংবাদ! টেলিগ্রাম পেয়েছি এখুনি!

—টেলিগ্রাম! কোত্থেকে এলো?—উদ্বিগ্ন ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুমিতা। মনের আকাশে চমকে উঠলো এক ঝলক বিদ্যুৎ—সুদাম, ভালো আছে তো?

—বৃন্দাবন থেকে এসেছে তার। ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গিয়ে দাদা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন! সেজন্য বৌদিকে নিয়ে এখুনি রওনা হচ্ছি।

—বড় খারাপ লাগছে শুনে, বিশেষ করে দামীদা' রয়েছেন বহু দূরে,—তাঁকে একটা খবর পাঠানো হয়েছে তো?

—সে সময় আর পেলাম কোথায়? আর সে পড়াশোনা নিয়ে রয়েছে, খবর দিয়ে তার মনটা খারাপ করিয়ে কাজ কি? সে তো এখন হঠাৎ আসতেও পারবে না। আচ্ছা মিতা, চলি কেমন? একবার বলো, আমার ওপর রাগ করনি তো?

—না, না, রাগ করবো কেন? জ্যেঠামশাই কেমন থাকেন,

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

একটা খবর দেবেন, মনটা বড্ড খারাপ রইলো! আচ্ছা, যাত্রা আপনার শুভ হোক্।

—সারাটা দিন সুমিতার মনটা যেন বড় অস্থির ভাবে, পিছনে ফেলে-আসা দিনগুলোর ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মানসিক শক্তি ছিলো না তার কোন দিনই। কোমল লাজুক লতার মত স্পর্শকাতর নরম মন। আগে সুদাম যোগাতো ওর গতিপথের প্রেরণা। ও যেন ছিলো তারই ওপর একান্ত নির্ভরশীলা। তাই সে যখন ওর পাশ থেকে সরে গেলো, অবলম্বনহীনা লতিকার মতই লুটিয়ে পড়েছিলো আপন দুর্ব্বহ ভাবে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এলো অসীম ওর জীবনযাত্রাপথে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিয়ে। সবল হাতে তুলে নিলো ওকে আপন আয়ত্তের ভেতর। তার প্রবল পৌরুষত্ব ছক্ কেটে নির্দেশ দিলো ওর পথ চলার! পরিবর্ত্তনের ঝড় বইয়ে দিলো অন্তরে, বাইরে! কোন্ উদ্দাম ঝড়ের বেগে সে যেন উড়ে চলেছে কোন অজানা, অনাকাঙ্খিত, সীমাহীন, লক্ষ্যহীন, মহাশূন্যের মাঝে। এখানে নেই তার নিজস্ব সত্তার সচেতন অবস্থা, সে শুধু চুম্বকের আকর্ষণে ধাবমান লৌহখণ্ড মাত্র।

সন্ধ্যার অন্ধকার কখন যে ঘনিয়ে এসেছে ঘরে, বাইরে, খেয়াল ছিলো না সুমিতার। চিন্তার অলস স্রোতে মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে বিছানায় তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে শুয়েছিলো সে।

—এই ভরসন্ধ্যেবেলায় শুয়ে কেন রে মিতা? শরীর খারাপ না কি? সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ায় করবী।

—না এমনিই শুয়ে আছি। কেমন যেন কিছু ভালো লাগছে না। জানো ছোট মাসী, দামীদা'র বাবার ভারি অসুখ, প্রেশার বেড়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন—ভারি মনটা খারাপ লাগছে খবরটা শুনে অবধি। খাটের ওপর উঠে বসে ম্লান মুখে করবীর মুখপানে চেয়ে বলে সুমিতা।

—সুদামের বাবার অসুখ, তা তোর এতে মন খারাপের কি আছে রে? মুখের চেহারাটা তোর দেখে মনে হচ্ছে, যেন অসুখটা তোরই হয়েছে। হাসতে হাসতে বললো করবী।

—কি জানি ভাই, তাঁর অসুখটা শুনে অবধি মনটা কেন যে এত হু-হু করছে! এর ঠিক সঙ্গত কারণ অবিশ্যি জানা নেই আমার।

ওর মুখখানি তুলে ধরে স্থির দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে বলে করবী—এর নিশ্চিত কারণ আমার জানা আছে। একটা কথার সত্যি জবাব দিবি মিতু?

ব্যথাকরুণ চোখ দুটি তুলে ওর পানে তাকায় সুমিতা।

তুই কি আজও ভালোবাসিস সুদামকে? তার বাবার অসুখ, যদি কিছু হয়, বহু দূরে আছে সে, দারুণ পিতৃশোকের বেদনা তাকে একলাই বইতে হবে—কেউ নেই কাছে যে তাকে সান্ত্বনা দেবে। এই সব অনিশ্চিত আশঙ্কা আজ তোর প্রাণে এনেছে এত অস্থিরতা! বল্ মিতু, আমার এ ধারণা সত্যি কি না?

জবাব দিতে সহসা পারে না সুমিতা। দু' হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—আর ও-কথা তুলো না ছোট মাসী, তার কথা চিন্তা

করবার অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছি। তবু—তবুও কেন তাকে ভুলতে পারছি না, আমাকে বলে দাও ছোট মাসী, কোন্ উপায়ে তাকে ভোলা যায়?

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে করবী এই ব্যথাহতা বিপর্য্যস্তা নারীর পানে। শঙ্কিত মন তার আক্ষেপে গুমরে বলে,—হায় দুর্ভাগিনি! এ কি করলি?

মুখে টেনে আনে সমবেদনার কাতরতা। সস্নেহে সুমিতার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে,—তাকে ভোলবার এমন কি প্রয়োজন ঘটলো রে মিতু? তোর সব সমস্যার কথা অবশ্য জানি না আমি, তবে মনে হয়, অসীম বাবুর সঙ্গে যেন তোর জীবনধারার খানিকটা জড়িয়ে গেছে। সেটা তোর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে ভাবেই হোক হয়েছে। কিন্তু কেমন করে এটা সম্ভব হল, সেইটাই ভেবে পাই না! তোর অস্থি-মজ্জায় রক্তের প্রতিটি কণিকায় যে ছিলো তার ভালোবাসা জড়ানো, অপর পুরুষের সেখানে অনধিকার প্রবেশ, এ যে তোর আত্মহত্যার নামান্তর মিতা!

মুদিতনেত্রে খাটে হেলান দিয়ে বসে ছিলো সুমিতা। কোন গভীর চিন্তাসাগরে যেন তলিয়ে গেছে ওর মন, তাই জবাব দিলো না করবীর প্রশ্নের।

ব্যথাভরা চোখ মেলে ওর দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলো করবী,—না, কাজ নেই ওর ধ্যানভঙ্গ করে! নিজের সঙ্গে চলছে ওর বোঝাপড়া, চলুক। একখানি মাসিকপত্র টেনে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে ও।

সময়ের পদক্ষেপ শোনা যায় টিক্ টিক্ টিক্! দুজনেই অবলম্বন করেছে গভীর নীরবতা! সব কথা যেন ওদের ফুরিয়ে গেছে! ঢং, ঢং, করে সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেলো। চমকে উঠলো সুমিতা।

হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে করবীর একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে তীব্র কণ্ঠে বললো—আমার দোষটাই শুধু তোমার চোখে পড়লো ছোট মাসী? কেন আমি পথভ্রষ্ট হলাম, সে কথা কি ভেবে দেখেছো কেউ? আমাকে কতগুলো শুষ্ক নিয়মের পাশ দিয়ে বেঁধে রেখে, একটা ভীরু দুর্ব্বল পরনির্ভরশীল, আত্মচেতনহীন, জড়পিণ্ডবৎ তৈরী করা হয়েছিলো। তার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হল এক অজানা পরিবেশের মাঝে। সেখানে সে কি করবে? নিজের ভালো-মন্দ বোধশক্তি সে পাবে কোথায়? নিজেকে সংযত করবার শিক্ষা কে দিয়েছিলো তাকে? কার সজাগ দৃষ্টি ছিলো তার ওপর? এ অবস্থায় পড়লে সকলকার যা হয়, আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি! শেকলে-বাঁধা খাঁচার বন্ধ পাখী হঠাৎ মুক্তি পেয়ে গেলো নীল আকাশে ডানা মেলে উড়তে; পারবে

কেন? বাজপাখীর কবলে পড়ে জীবনটা তার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলো, ছোট মাসী একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো।

উত্তেজনার আতিশয্যে থর-থর করে কাঁপছিলো ওর হাতখানা, মুখখানা যেন অস্বাভাবিক রকমের লাল হয়ে উঠেছে।

ভয় পায় করবী। ওকে চেপে ধরে বলে—থাম্ থাম্ মিতা! অত উত্তেজিত হবার মত কোনো কারণ ঘটেনি। আর নিজের অবস্থার জন্তে দায়ী কারুকে করিসনে, শান্তি মিলবে না ওতে। বরং যখন যে পরিবেশ আসবে, সহজ ভাবে তার সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে নেবার চেষ্টা কর, দেখবি সমস্যার জটিল গ্রন্থিগুলোকে কত সহজে খোলা হয়ে গেছে।

—আর অসীমকে যদি এখন ভালো লেগে থাকে তোর, ক্ষতি কি? তোর পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা তাঁর যথেষ্ট আছে। তবে আমার শুধু এইটুকুই বলার ছিলো যে ভালো করে স্থির চিত্তে ভেবে দেখ, মন তোর কি চায়। তাকে ফাঁকি দিসনি। তোর মনের মাঝেই খুঁজে পাবি সত্য পথের নির্দেশ। এর পর ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিপত্তি, যতই আসুক না জীবনে, মনের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার দায় থাকে না যেন।

—মন? কোথায় পাবো তার নাগাল? তার সন্ধানে যেতে আমার যে বড় ভয় করে ছোট মাসী। মনে হয় সেখানে একটা অতলস্পর্শী অন্ধকার গহ্বর হাঁ করে আছে, আমি একটু এগুলেই সে গ্রাস করবে আমাকে। না। না। সে পারবো না আমি,—সে আমি পারবো না। ঘটনাস্রোত যে দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমি সেই দিকে ভেসে যাবো, খড়-কুটোর মত। জানি আমি, বেশ বুঝতে পারছি সেটা ধ্বংসের পথ, তবুও, আছে তার প্রবল আকর্ষণ। দেখতে পাও না ঐ পতঙ্গগুলো জ্বলন্ত আগুনের আকর্ষণে কেমন ছুটে গিয়ে জ্বলে-পুড়ে মরে?

অবাক হয়ে দেখছিলো করবী সুমিতার মুখখানা। জলভরা টলটলে দুটি নীলপদ্মের পাপড়ির মত চোখ। ঠোঁটে খেলছে প্রাণ-কাঁদানো হাসি। সইতে পারে না করবী, নিজের হাতখানি ওর মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালায় খোলা জানলার দিকে। চোখ ফেটে হু-হু করে নেমে আসছে জল, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আঁচলে চোখ দুটো চেপে ধরে।

—কৈ রে রুবি, গেলি কোথায়? দিন-ভোর করে তো পা দিলি বাড়ীতে, তা হাতে-মুখে জল দেওয়া চুলোয় গেলো, ঘরে ঢুকে বসে রইলি? যতো জ্বালা হয়েছে আমার! খাবারগুলো জুড়িয়ে জল হয়ে গেলো যে! কথাগুলো বলতে বলতে মায়া দেবী প্রবেশ করলেন ঘরে।

সুমিতাকে ঘরে দেখে বিস্মিত ভাবে বললেন—এ কি! এমন সময় তুমি যে বাড়ীতে? অসীম বুঝি আজ নিতে আসেনি?

জবাব দিলো করবী—অসীম বাবু তো নেই এখানে, তাঁর দাদার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গিয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি আজ বৃন্দাবনে চলে গেছেন।

—অ, তাই বুঝি! তা আর জানবো কি করে? এখন তো আমি মিথ্যে মানুষ হয়েছি কি না। কথায় বলে 'গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল।' তবে সুন্দাম ছেলেটি বড়ই ভালো। ভারি ভক্তি ছেদ্দা করতো আমায়। আহা, কত দূরে আছে বাছা, যদিই বাপের ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়, হঠাৎ আসতেই কি পারবে? তখন পই-পই করে বললাম ঐ সাম্নাসি ঠাকুরকে, ওদের বিয়েটা দিয়ে তবে বিলেতে পাঠাও, কিন্তু গরীবের কথায় কান দিলো কেউ? এখন দেখো, কত ধানে কত চাল, একটা কিছু হলে ঐ কাকার মুঠোয় সব। জানিনে, বাছার অদেষ্টে কি আছে! একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে কপালে হাত দিলেন তিনি।

সরোষে বলে করবী—সে কথায় তোমার কাজ কি মা? আর অসুখ করলেই কি মানুষে মরে? যার অদৃষ্টে যা আছে লেখা, তা তো আর খণ্ডানো যাবে না? শুধু শুধু মন খারাপ করে লাভ কি?

সুমিতার হাতখানা ধরে টান দিয়ে বলে—আয় মিতা! চট করে গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আয়! কত দিন হয়ে গেলো, সন্ধ্যেবেলা তোর সঙ্গে চা-এর আসর জমানো হয়নি।

সুমিতা অলস গতিতে চলে গেলো বাথরুমে।

চঞ্চল পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করে অনিল। উচ্চকণ্ঠে বলে—বড্ড খিদে পেয়েছে, শীগ্‌গির খেতে দাও মা! এই রুবি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন, ছুটে যা না, আমার খাবারটা নিয়ে আয়।

হেসে উঠলো করবী—আজ কোন তিথির উদয় হয়েছে মা? তোমার ছেলের যে সন্ধ্যেবেলায় দেখা মিলেছে?

—শুধু আমার ছেলের কেন? তোমার বোনঝিরও তো দেখা পাওয়া গেছে! হ্যাঁ তিথিটা আজ স্মরণীয় বটে!

অনেকগুলো মাস, আর দিনের পর এসেছে আজকের মনোরম সন্ধ্যাটি। চায়ের টেবিলে বসেছে চার জন বেশ [illegible] মন নিয়ে। টেবিলে একটা চাপড় মেরে সোল্লাসে বলে অনিল, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস রুবি!

হাসতে হাসতে বলে করবী—যা মনে হচ্ছে বলেই ফেলো না।

—এই মনে হচ্ছে যে একটা ভয়ানক ঝড় এসে বাসা থেকে চারটে পাখীকে চার দিকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। তার পর আজ আবার তারা সবাই ফিরে এসেছে বাসায়। ঠিক তাই নয়?

—বাঃ, বেশ কথাটা বলেছো তো! তুমি নিশ্চয়ই এবার কবি হবে ছোড়দা'!

—কবি? এই এত-বড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুখু চুল রাখতে হবে,—মেয়েলি ঢং-এ কথা বলতে হবে, আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি সব ছাই-পাঁশ ভাবতে হবে। ওরে বাবা, আমি ওর মধ্যে নেই!

গবগবিয়ে স্যাণ্ডউইচ দিয়ে মাংসের ঘুগনী গিলতে গিলতে জবাব দেয় অনিল।

উচ্চরোলে হেসে ওঠে সুমিতা আর করবী, ওর মুখের ভঙ্গি দেখে।

মায়ের দিকে চেয়ে বলে অনিল—নাঃ, তুমি ঠিকই বলেছো মা! আমাদের সেই আগের দিনগুলোই ভালো ছিলো। এত বৈচিত্র্য না থাকলেও, কেমন চমৎকার একটা শান্তি ছিলো মনে—যার কিছুটা আজ বুঝতে পাচ্ছি আমরা। কি বলিস মিতা?

—কেকে কামড় দিতে দিতে মুখ তুলে তাকায় সুস্মিতা, একটু হেসে বলে,—তোমার সঙ্গে আমি একমত ছোট মামা !

—আমি কিন্তু নই,—বলে করবী।

আমার সে দিনগুলোতে ছিলো খাদ মেশানো, আর এখনকার দিনগুলো আমার খাঁটি সোনা। মানে, তখনকার আমি,—আর আজকের আমির সঙ্গে পার্থক্য ঠিক মাকাল ফল আর ল্যাংড়া আমের মত।

মায়া দেবীর মনটাও আজ বেশ প্রসন্ন ছিলো। ছেলে-মেয়ে নাতনী সকলকেই আজ বেশ ভালো লাগছে। মনের আহ্লাদে তিনি একেবারে সাত-আটখানি প্যাটিস খেয়ে ফেলেছেন! গল্পে মশগুল ছেলে-মেয়ের ওপর মাঝে মাঝে স্নেহদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রকমারী খাদ্যগুলোর বিলোপ সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছেন!

ছেলের মুখে বেশ জুতসই কথাটা শুনে, চায়ের কাপে একটা চুমুক লাগিয়ে, স্নেহ-ছলো-ছলো, কণ্ঠে বললেন তিনি—মায়ের কথার মূল্য যত দিন যাবে, ততই বেশী করে বুঝবে বাবা! তোমাদের ভালোর জন্যেই বক্‌-বক্‌ করে মরি; আমার দিন তো ফুরিয়ে এলো, মিতার বিয়েটা হয়ে গেলেই দিনকতক তীর্থে ঘুরে আসবো মনে করছি। জীবনের ওদিকটার কথা ভাববার সময়ই পাইনি এত দিন।

রুবিটার জন্যেই যা ভাবনা! একটা ভালো ঘরে যদি ওর বিয়েটা দিতে পারতুম, তাহলে আর কোনো আক্ষেপই থাকতো না আমার।

শঙ্কিত হয়ে ওঠে অনিল, মায়ের ভাবখানা দেখে, এই রে—এই বুঝি সাপের খুঁচকি খুলে বসেন, এমন সন্ধ্যেটাই মাটি হয়ে যাবে তাহলে। কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে বললো সে—হ্যাঁ রে মিতু! সুদামের চিটিপত্র ঠিক মত পাচ্ছিস তো? কেমন আছে সে? কাজের ভিড়ে এ-সব খবর নেবার ফুরসৎই পাই না মোটে!

সুস্মিতা মাত্র কিছুক্ষণ যেন কোন যাদুকরের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দগতি লাভ করেছিলো! সুদামের নামটা আবার ওর সর্বাঙ্গে এনে দিলো বিদ্যুৎপ্রবাহ।

স্বপ্নাবিষ্টের মত সে চেয়ে থাকে অনিলের মুখের পানে। আপন মনে বিড়-বিড় করে বলে, সুদাম? কই? তার খবর কে দেবে?

চায়ের কাপ হাতে তুলে স্থির হয়ে বসে রইলো সুস্মিতা। কেমন আছে? সুদাম কেমন আছে? কে দেবে তার খবর? কে দেবে তার সন্ধান? কেমন আছে? উঃ কি মারাত্মক! কি ভয়ঙ্কর! একটা যাদুকর, সব দিলে ভুলিয়ে,—সব দিলো হারিয়ে—।

এই তো সে ছিলো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার সেই অদ্ভুত আলো-জ্বালা চোখ দুটো। যে আলোয় ঝলমল করতো ওর সারা অন্তরটা! তারপর কি হলো? কোথায় গেলো সে? এখন কি অন্ধকার? উঃ নিঃশ্বাস যেন রোধ হয়ে আসে!

সুস্মিতার সহসা এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে হতভম্ব হয়ে যায় অনিল। বিস্মিত ভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শঙ্কিতা হয়ে করবী মিতার একখানি হাত ধরে মৃদু ভাবে নাড়া দেয়।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ বাড়ীর সমস্ত আলো একসঙ্গে দপ, করে নিবে গেলো। মেনসুইচ ফিউজ হয়েছে। সুস্মিতার হাত থেকে চায়ের কাপ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ছিটকে পড়লো মেঝের ওপর, অস্ফুট আর্তনাদ করে টেবিলের ওপর লুটিয়ে পড়লো সে।

মায়া দেবীর চিৎকারে তেলের বাতি নিয়ে ছুটে এলো চাকররা। সুস্মিতার অচৈতন্য দেহটাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে হাত-পাখায় জোরে জোরে বাতাস করে করবী। ততক্ষণে আবার জ্বলে উঠেছে আলো। ফোনে জরুরি কল দেওয়া হল ডাক্তারকে।

পরীক্ষার পর ডাক্তার জানালেন, নার্ভাস শক বলে মনে হচ্ছে। শরীর ও মনের চাই সম্পূর্ণ বিশ্রাম, অন্তত দু'সপ্তাহ। উপস্থিত ভয়ের কিছু নেই বটে, তবে ভবিষ্যতের জন্যে সাবধানতার প্রয়োজন। মনের প্রফুল্লতাই এ রোগের সব চেয়ে বড় ওষুধ। ইন্‌জেক্‌সান দিয়ে, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থাপত্র লিখে মোটা দর্শনী পকেটে ফেলে তিনি চলে গেলেন।

জ্ঞান ফিরেছে সুস্মিতার। শরীরটা যেন বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে, মাথটাও কেমন ঝিম্‌-ঝিম্‌ করছে! ঘরে জ্বলছে হাল্কা নীল আলো।

পাশে বসে করবী গোলাপজলে স্পঞ্জের টুকরো ভিজিয়ে ওর কপালে, মাথায় বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

আমার কি হয়েছে ছোট মাসী? ক্ষীণস্বরে বললো সুস্মিতা।

বিশেষ কিছু নয় মিতু! আলো নিবে যাওয়াতে ভয় পেয়েছিলে তুমি। এখন কথা বোলো না, ডাক্তারবাবু তোমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন, ঘুমুলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আর কথা বলে না সুস্মিতা! শান্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ো।

[ক্রমশঃ।

চৈতন্যোত্তর কবি গোবিন্দদাস

শঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশে বৈষ্ণব-সাহিত্য রচনার প্রয়াস সুরু হয় আদি-মধ্য যুগ থেকেই। বৈষ্ণব পদাবলীর মর্ম্মবাণীর প্রথম সার্থক প্রকাশ চণ্ডীদাসের রচনায় এবং বিংশ শতকের রবীন্দ্রনাথের 'ভানু সিংহে'র মধ্যে এই ভাবধারার পরিণতি। প্রাক্‌-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব-সাহিত্য সাধনা এগিয়ে চলেছিল যে-সব কবি-সম্প্রদায়ের শক্তিশালী লেখনীর মধ্য দিয়ে, তাঁদের অনেকের নামের মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের নামই অবিসংবাদিত ভাবে অমরত্ব লাভ করেছে। শেষোক্ত দুই নামের ভণিতার মধ্য দিয়ে আরও অনেক প্রতিভাবান কবি আত্মগোপন করে অমর হয়ে আছেন, যাঁরা নিজেদের প্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক্‌ সচেতন ছিলেন না অথচ সাহিত্য-প্রাঙ্গণে স্থায়ী আসন লাভে আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। চৈতন্যোত্তর যুগেও বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনুশীলন হয়েছে কিন্তু এই দুই যুগের রচনার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য ভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে। উভয় যুগের কবিতার বিষয়বস্তু যেন এক হয়েও ঠিক এক নয়। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব-পদ-সাহিত্য রচনায় কবির শিল্পি-মানসের মন্ময় অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে। শিল্পী যেন রাধার সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার সঙ্গে একান্ত তদ্গতচিত্ত হয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের মাধুর্য্য অনুভব করেছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের রচনায় অন্তরতম পরম সত্য এই মন্ময়চিত্তের

অনুভূতির গাঢ়তা। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের কবি নিছক কবি-মানসের অনুভূতি এবং কল্পনার সাহায্যে পদ-রচনায় ব্রতী হননি। তাঁরা চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়েই রাধা-কৃষ্ণ লীলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার রসাস্বাদন করেছেন। বৈষ্ণব কবিতা রচনা ছিল তাঁদের জীবন-সাধনারই অঙ্গীভূত। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কাবতার যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—ব্যক্তিগত উপলব্ধির নিবিড়তা এবং তারই প্রবল উচ্ছ্বাসবহুল বাঙ্ময় প্রকাশ, তা চৈতন্যদেবের সংযত সাধনা এবং জীবনাদর্শের সংস্পর্শে এসে একটা পরিবর্ত্তন লাভ করল। কাব্যধারার এই পরিবর্ত্তন ভাব এবং রূপগত। বৈষ্ণব কবিতায় পূর্ব্বরাগ, অভিসার প্রভৃতি পর্য্যায়ের সঙ্গে আরও একটি নতুন পর্য্যায় যুক্ত হ'ল। এই পর্য্যায়—গৌরচন্দ্রিকা। এই সংযুক্তির ফলে গৌরচন্দ্রিকা স্থান পেল রাধা-কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কবিতার পুরোভাগে।

কবি গোবিন্দদাস এই চৈতন্যোত্তর যুগেরই একজন শ্রেষ্ঠ এবং স্মরণীয় শিল্পী। কবি জ্ঞানদাসের প্রায় সমকালীন ছিলেন তিনি এবং কথিত আছে যে, তিনি বলরামদাস এবং জ্ঞানদাস প্রভৃতি অন্যান্য বৈষ্ণব কবি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আনুমানিক তৃতীয় শতকে (১৪৫১ শক) শ্রীখণ্ডে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতার নাম যথাক্রমে চিরঞ্জীব এবং সুনন্দা। গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে শাক্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাঁর মাতামহের প্রভাবে কিন্তু উত্তরকালে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। ১৫৩৫ শকে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে, ১৪৫৫ শকাব্দে। তাই গোবিন্দদাস তাঁর জীবনকালের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেননি বলে বহু পদে আন্তরিক ক্ষোভ এবং বেদনা প্রকাশ করেছেন। "গোবিন্দদাস রহু দূর" বা "গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি" ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর কবিহৃদয়ের আর্ত্তি অভিব্যক্তি পেয়েছে।

চৈতন্যদেবের রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত মূর্ত্তিখানিকে সামনে রেখে কবি গোবিন্দদাস পদ রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। এর ফলে কল্পনার নিবিড়তার সঙ্গে বাস্তবের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে যেমন এক দিকে প্রকাশ পেয়েছে অকৃত্রিম হৃদয়ের আন্তরিক ভক্তিপ্রাণতা, অপর দিকে তেমনি প্রতিভাত হয়েছে তাঁর বিদগ্ধরুচি, তাঁর শিল্পপ্রাণতা। পদাবলীর বিভিন্ন পর্য্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ রসানুভূতি বর্ণনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বোধ হয় গৌরচন্দ্রিকার পদেই। চৈতন্যদেবের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, চৈতন্য-জীবনতত্ত্বের সাবলীল ছন্দোময় প্রকাশ এবং চৈতন্য-রূপের অপরূপ বর্ণনারীতিতে তাঁর পদগুলি আজ অবিস্মরণীয়। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি গৌরচন্দ্রিকা-পদের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

চৈতন্যরূপ বর্ণনা :

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।

চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত :

বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেম ভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।
নিজ-রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহি মেলি।

চৈতন্য-জীবনতত্ত্বের আভাস :

জয় নন্দ-নন্দন গোপী-জন বল্লভ
রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুরমুনিগণমন মোহন ধাম।
জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী ভাববিনোদ।

গোবিন্দদাসের কবিমানসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—রূপের প্রতি গভীর অনুরক্তি। শ্রদ্ধাবনত চিত্তের ভক্তিপ্রাণতার সঙ্গে তাঁর রূপানুরাগও লক্ষিতব্য। রাধাচরিত্রকে তিনি সুদক্ষ রূপকারের নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করেছেন। শিল্পীর আন্তর-ঐশ্বর্য্যের তিল তিল পরিমাণ সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করে তিলোত্তমায় পরিণত হয়েছেন রাধা। সে লীলা-রস কবি মনের গহনে ডুব দিয়ে আস্বাদন করেছেন, তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি সংযমের মাত্রা হারাননি। কবি-প্রতিভার এই দিকটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, তাঁর উদ্বেলিত ভাবসমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস কখনও সংযমের বেলাভূমি অতিক্রম করে যায়নি। তাই ভাবোচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণে সুপটু বলে তাঁর রচনা সংযম এবং সংহত। তাঁর চিত্রধর্ম্মী কবিতার মধ্য দিয়ে যে রস ক্ষরিত হয়েছে তা স্বভাবতই চিত্ররস। তাঁর চিত্ররস-সমৃদ্ধ কবিতা :

অরুণিত চরণে রণিত মণি মঞ্জীর
আধ আধ পদ চলসি রসাল।
কাঞ্চন-বরণ বসন মনোরঞ্জন
অলিকুল-মিলিত ললিত বনমাল।
ভালে বনি আওয়ে মদন মোহনিয়া
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
বঙ্কিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া।

গোবিন্দদাসের পূর্ব্বরাগের পদে যে সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে, তা শিল্পচাতুর্য্যে অনবদ্য এবং আবেদনে মর্ম্মস্পর্শী। বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোরী রাধাকে দেখে কৃষ্ণের নবজাগ্রত অনুরক্তির বর্ণনা দিয়েছেন ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে :

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই।।

শুধু কৃষ্ণের নয়, রাধা-হৃদয়ের আবরণও উন্মোচন করেছেন কবি। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ রাধার উক্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।

মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ ।।

* * * *

কানু-অনুরাগে মোর তনু-মন মাতল
না শুনে ধরম-লব-লেশ ।।

প্রেমের মধ্যে সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য ও রমণীয় মাধুর্য্য আছে। নায়িকার চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-নিরাশার অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাবতরঙ্গের উত্থান-পতন গোবিন্দদাস নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর রচনায় প্রেমের অতলস্পর্শী গভীরতারও সন্ধান মেলে।

The self always changing, moving, struggling, always in fact becoming. রাধা ঘর ছেড়ে পথকে আশ্রয় করেছেন। তাঁর এই অভিসারকে কেন্দ্র করে বহু কবিতা রচিত হয়েছে কিন্তু সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যে অভিসারের পদে গোবিন্দদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাধার অভিসার বর্ণনায় কবির অনুভূতির নিবিড়তার সঙ্গে ভাষার সৌকুমার্য্য মিশে এক হয়ে গেছে। অভিসারের বহু পর্য্যায় সৃষ্টি করে বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন। অলংকারশাস্ত্রসম্মত গ্রীষ্মাভিসার, বাদলাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, হিমাভিসার, ভ্রমাভিসার, দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, উন্মত্তাভিসার প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। গোবিন্দদাসের রাধা অকস্মাৎ পথে বের হননি—এর পিছনে ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। সে পথ ক্ষুরধার, দুর্গম, সেই পথে নামার আগে তিনি গৃহাঙ্গনের এক কোণে কৃচ্ছ্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। রাধা মাটির আঙ্গিনায় জল ঢেলে পিছল করে আঙুল চেপে সাবধানে চলা অভ্যাস করেছেন। পায়ের মঞ্জীরখণ্ড কাপড় দিয়ে বেঁধে নিয়েছেন, পাছে শব্দ হয়। ভূমিতলে কাঁটা পুঁতে তার উপর দিয়ে পদচারণা করেছেন, যাতে তাঁর যাত্রা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আঁধার রাতে চলার সময় যদি সাপের সামনে পড়েন তার জন্য হাতের কঙ্কণ দিয়ে ওঝার কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন। একমাত্র গোবিন্দদাস ছাড়া অন্য কোন বৈষ্ণব কবি রাধার এই আত্মপ্রস্তুতির চিত্র অঙ্কিত করতে পারেন নি।

প্রখর গ্রীষ্মে পথ-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে রাধার আত্মনিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় এই উদ্ধৃত পদে :

দিনমণি কিরণ মলিন মুখমণ্ডল
ঘামে তিলক বহি গেল।
কোমল চরণ তপত পথবালুক
আতপ দহন সম ভেল।
হেরইতে শামর চন্দ।
কোরে আগোরি গোরী মুখ মোছ'ত
বসন ঢুলায়ত মন্দ।

শীতকালে হিমঝরা গভীর রাত্রে রাধার যাত্রায় বৈচিত্র্য আছে, নূতনত্ব আছে। এই প্রসঙ্গে কালিদাস রায়ের উক্তি লক্ষণীয়। তিনি মন্তব্য করেছেন যে হিমময়ী রজনীতে হেমময়ী রাধার সুখশয্যা পরিহার করে কৃষ্ণের জন্য আকুল প্রতীক্ষা রীতিমত হৈমবতীর তপস্যা। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

পৌখিনী রজনী পবন বহে মন্দ
চৌদিকে হিমকর হিম করু বন্ধ।
মন্দিরে রহত সবহু তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে শয়ন করু ঝাঁপ।
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই।

রাধা পথের বাধাবিঘ্নকে ভয় করেন না ; তাঁর 'অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু'—কৃষ্ণের মূর্তিকে ধ্যান করতে করতে তিনি যখন বর্ষা-রাতে পথে বের হন তখন কবি তাঁকে সম্বোধন করে বলেন :

সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার ।।
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত ।।
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার ।।
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ।।

নিশীথ-জ্যোৎস্নায় রাধা যখন কুঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন তাঁর অঙ্গে চন্দন প্রলেপ, কণ্ঠে মুক্তাহার, আভরণে কুন্দকুসুম সজ্জা এবং পরিধানে শ্বেতাম্বর। কিন্তু এই সজ্জায় জ্যোৎস্নারাতে সকলের লক্ষ্যগোচর হবারই সম্ভাবনা। তাই তিনি আত্মগোপনের জন্য আশ্রয় নেন ছলাকলার আর চাতুর্য্যের :

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণ ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল ।।

* * * *

নীল অলকাকুল অলিক হিলোলিত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যাম সিন্ধু রসে
লখই না পারই কোই ।।

শব্দ, অলংকার, ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য্য। তাঁর ভাষা মুখ্যত ব্রজবুলি। পদরচনার ক্ষেত্রে তিনি রসশাস্ত্র উজ্জ্বলনীলমণিকেই অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু এই অবলম্বন অনুকরণ নয়, অনুসরণ ; তবুও সার্থক শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর প্রাপ্য। কারণ তিনি রসশাস্ত্রের নিয়ম নির্দ্দেশ অনুসরণ

করেও ভাবে, ভাষায়, বর্ণনায় বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর "শারদ চন্দ পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ, ফুল্ল মল্লী মালতী যূথী, মত্ত মধুপ ভোরণী" এবং "নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ। জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর নিন্দি সিন্দুর ভঙ্গ।" প্রভৃতি পদ অলঙ্কারভারে নত নয় বরং অলঙ্কারসজ্জায় উজ্জ্বল। রচনাশৈলীর চারুত্ব বা মাধুর্য্য, ছন্দের ত্রুটিহীন প্রয়োগ, অলঙ্কারের শ্রুতিসুখকর বিন্যাস, অনুভূতির গাঢ়তা, অকৃত্রিম ভক্তিপ্রাণতা এবং বিদগ্ধ রুচির দিক দিয়ে গোবিন্দদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী রূপদক্ষ ও রূপমুগ্ধ মন্ময় কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনীয়। এই দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, তিনি বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসাধক। এ প্রসঙ্গে কবি বল্লভদাসের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্ব গুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতির অনুসারীরূপে অভিহিত করলেও দেখা যায় যে, বিভিন্ন পদে গোবিন্দদাসের স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অভিসার ও ভাবসম্মিলনের পদে। এই অভিসার সাধারণ লৌকিক নায়িকার অভিসার নয়। এই অভিসার আধ্যাত্মিক অভিসার—মানসাভিসার। পথের সমস্ত বিঘ্ন-বিপত্তি অভীষ্টকে পাবার সোপান মাত্র। মিষ্টিক সাধকের কথায় অভিসার অর্থ—Spiritual Quest—in fulfilment of which the mysterious traveller goes to the country of the soul. অভিসার শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়, শুধু রাধারই নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য সাধক এগিয়ে চলেছে, তার সাধ্যের সান্নিধ্যলাভের আশায়। তাই এই অভিসারে

..."রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে—
* * * *
তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন—
* * * *
তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।"

এই অভিসারের পর যে মিলন, তাতে দৈহিক উল্লাসের কোন আতিশয্য নেই বরং আছে এক মহাপ্রশান্তি। ইন্দ্রিয়াতীত, দেহাতীত সাধনার বেদীমূলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন গোবিন্দদাস, তাই তাঁর রাধার মধ্যে লৌকিক নায়িকাসুলভ চাপল্য-তারল্য এবং প্রাকৃত-মনোজাত বা বিলাসকলার প্রাচুর্য্য নেই। সমগ্র চৈতন্যোত্তর যুগের সাধনার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কবিতাগুলি সীমিত জগতের স্পর্শের বাইরে চলে গেছে!

বিদ্যাপতির কাব্যরচনায় ভিত্তিমূল ছিল নিজস্ব উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা। এছাড়া তিনি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র এবং জয়দেবের সুললিত পদাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু গোবিন্দদাসের কাব্যরচনার পশ্চাতে ছিল এমন এক পটভূমিকা যা বিশাল, ব্যাপক এবং সমৃদ্ধ। চৈতন্য-জীবন-ব্রত এবং চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবকে তিনি শুধু স্বীকারই করেন নি, তিনি সেই সমস্তের ভাবসাধনার ক্ষেত্রে যথার্থ প্রতিচ্ছবিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই যুগের সমগ্র বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায়ের সাধনার কথা, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাধনার ঐতিহ্যের কথা তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। গোবিন্দদাসের কাব্যে সেই সমগ্র যুগ-কথা এবং যুগ-সাধনার যে প্রতিফলন ঘটেছে, তারই সার্থক বাঙ্ময় প্রকাশের জন্য তিনি চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-পদ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন।

মহাপ্রজাবতী জননী গৌতমী

উমা মুখোপাধ্যায়

বৌদ্ধ যুগকেই ভারতের গৌরবময় যুগ বলা হইয়া থাকে। সেই যুগের নারী-স্বাধীনতা ও নারী-প্রগতির মূলে যাঁহারা স্বর্ণ-উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনা করিয়াছিলেন মহাপ্রজাবতী জননী গৌতমী তাঁহাদেরই অন্যতমা। প্রাতঃস্মরণীয়া এই নারীর দান ও সাধনা যেমন নারীজগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, সেইরূপ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে বৌদ্ধ সাহিত্যকে। কিন্তু বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে, জননী গৌতমীর গৌরবময় জীবনের প্রভাব খুবই সামান্য মাত্র দেখা যায়। পুঁথি-পত্রে, গাথা ও গানে যেটুকু জানা যায়, তাহা হইল:—

তিনি শাক্যকুল রাজীয় রাজা শুদ্ধোধনের দ্বিতীয়া পত্নী। প্রথমা পত্নী মায়া দেবী সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণ করিবার পরই দেহত্যাগ করেন। জননী গৌতমী ভগবান বুদ্ধের বিমাতা পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে ভিক্ষুণী-শিরোমণি সঙ্ঘনেত্রীরূপে জগতের মঙ্গল সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যায়। কাব্যে পুরাণে গল্পে ইতিহাসে বিমাতার কলঙ্ক অনাহত ভাবেই চলে আসছে যুগ-যুগান্ত ধরে। মনে হয়, জননী গৌতমীই একমাত্র বিমাতা, যিনি আজ আদর্শ জননীরূপে মানব অন্তরের শ্রেষ্ঠ পূজা শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। জননী গৌতমী তাঁহার গর্ভজাত পুত্র নন্দকে দাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া মাতৃহারা শিশু সিদ্ধার্থকে আপনার সেই শীতল বক্ষে টানিয়া লইয়াছিলেন এবং কালে এই শিশুর আদর্শকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুণীর বেশে জগতে পরিচিতা হইয়াছিলেন।

উৎসব-মুখর রজনীতে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগে কত বাথা ও বেদনায় যে এই মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে করুণ কাহিনীকে লিপিবদ্ধ না করিলেও কল্পনায় ভাসিয়া ওঠে সেই সময়টির কথা। জননী গৌতমী তাঁর অপূর্ব মাতৃস্নেহপূর্ণ হৃদয়ে সিদ্ধার্থপত্নী প্রিয়তমা গোপাকে সান্ত্বনার বাণীতে সিক্ত করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়াছেন আপনার ব্যথিত বক্ষের মাঝে এবং হয়ত তাঁরই প্রেরণায় স্বামীর যোগ্যা সহধর্মিণী হইবার জন্য গোপার অন্তরও ব্যাকুল হইয়া

উঠিয়াছিল। তাই দেখি, একমাত্র পুত্র রাহুলকে ভিক্ষুর বেশে সাজাইতে সে দ্বিধা করে নাই।

রাজা শুদ্ধোধনের মৃত্যুর পর গৌতমী সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করেন কিন্তু ভগবান বুদ্ধদেব প্রথমে সে সংকল্পে সম্মত হইতে পারেন নাই। কঠোর সন্ন্যাসজীবন নারীর পক্ষে সহজ হইবে না এই ধারণায়। কিন্তু জননী গৌতমীর রাজ-ঐশ্বর্য্য তখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়তম পুত্র তাঁহার যে মহান সম্পদের অধিকারী হইয়া এই অতুল বৈভব ও ঐশ্বর্য্যের মায়া ত্যাগ করিয়াছে, বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া তার অমৃত ভাষণে তৃপ্ত করিতেছে, কত শত শোকসন্তপ্ত প্রাণ মুগ্ধ হইতেছে, কত বিদগ্ধ জন-সমাজ, আর এক পুত্র নন্দ তারই পদাঙ্ক অনুসরণে ত্যাগ করিয়াছে বধূ জনপদ কল্যাণীকে, তার রাজধর্ম তার সমাজকে আর কাহাকে লইয়া বা কাহার জন্য এ অসার সংসারে আবদ্ধ থাকিবেন গৌতমী? তিনি আবেদন জানাইলেন, শ্রেষ্ঠীদের ঘরে ঘরে বণিকের অন্তঃপুরে নারীসমাজের কাছে বিশ্বের কল্যাণ কর্মে জগতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার জন্য।

সে যুগের ঐশ্বর্য্যময় ভাবকে অন্তঃপুরের ভোগ বাসনায় পরিতৃপ্ত নারীর লুপ্ত প্রাণ চেতনা জাগিয়া উঠিল। রাজকুলবধূ হতে পতিতা ও ক্রীতদাসী শ্রেষ্ঠী ও নটী সকলেই সমবেত হইলেন গৌতমীর পদপ্রান্তে। কপিলাবস্তুর রত্নসজ্জিত প্রাসাদ হতে নেমে এলেন রাজপথের ধূলায় মহাপ্রজাবতী জননী গৌতমী, তাঁর অন্তরের বাসনা জানাইলেন, এই বিপুল নারী সমাবেশের কাছে মানব-কল্যাণ ব্রতের মহান দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘের শরণ লইতে হইবে, কঠোর ভিক্ষুণী ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া লোকহিতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ব্যর্থ হইল না জননী গৌতমীর মর্মস্পর্শী অমৃতময়ী ভাষণ, বিশাল নগরীর প্রবাহিত প্রাণ-চাঞ্চল্যে সাড়া পড়িয়া গেল দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে ধনীর অট্টালিকা পর্য্যন্ত।

প্রায় পাঁচ শত নারীকে সঙ্গে লইয়া মুণ্ডিত মস্তকে ক্ষতবিক্ষত চরণে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ লইয়া গৌতমী বৈশালীর উদ্যানে ভগবান তথাগতের চরণ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জননীর এই দৃঢ় সঙ্কল্প ও অন্তর্দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নবধর্মে দীক্ষিত করিলেন জননী গৌতমীকে, জীবন সার্থক হইল ভিক্ষুণী-শিরোমণি জননী গৌতমীর।

ভিক্ষুণী গৌতমী বহু সঙ্ঘ স্থাপনা করিয়া নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথ সুগম করিয়াছিলেন, এই সকল সঙ্ঘ হইতে সুশিক্ষিতা নারী ভিক্ষুণী বা থেরীরা দেশে-বিদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহিকা হইয়া জ্ঞান-ধর্মের বাণী প্রচার করিয়া আসিতেন এবং কালে তাঁহারাও সঙ্ঘপরিচালিকা বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন।

বৌদ্ধ-সাহিত্যে থেরীগাথা গ্রন্থে আত্মজ্ঞানসম্পন্না বিদুষী থেরীদের অপূর্ব জীবন-কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পে, সাহিত্যে, তত্ত্ববিদ্যায় ও সামাজিকতায় যে মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল সে যুগের ভারতবর্ষ আজো তা আমাদের কাছে এক অপূর্ব বিস্ময়! জ্ঞান-কর্মের প্রগতিক প্রতীক জননী গৌতমী জগতের বহু কল্যাণ সাধিত করিয়া প্রায় একশো কুড়ি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

নন্দন কানন

সরসীবালা দেবী

ঝুক্‌‍ণি‍ট গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট বাড়ীটি লাল,
সহরের শেষ সীমানায় আছে যেন সে ইন্দ্রজাল।
"নন্দন কানন" নাম যে রেখেছে কল্পনা তার আছে,
সুন্দর দু'টি ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ লোহার গেটের কাছে—
রয়েছে দাঁড়ায়ে প্রহরীর মত তার দুই পাশ দিয়া
লাল সুরকীর দুইখানি পথ মিলেছে সমুখে গিয়া।
তার মাঝখানে অতি পরিপাটি গোলাপ বাগিচাখানি,
রংয়ের বাহার খুলিয়া দিয়াছে সকল বর্ণ আনি।
লাল, শ্বেত, পীত, গেরুয়া, হরিৎ আরো যত রং আছে,
কোথা হ'তে আনি এই বাগিচায় সাজাইয়া রাখিয়াছে।
প্রাতে সন্ধ্যায় একটি মালীকে প্রত্যহ দেখা যায়,
গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িতেছে, জল ঢালে কভু তায়।
প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরা গাছগুলি ফুলে ফুলে আছে ছেয়ে,
পথের পথিক দাঁড়ায় থমকি, দু'দণ্ড রয় চেয়ে।
চারি দিকে শুধু ধূ-ধূ প্রান্তর কোথাও নাহিক প্রাণ,
মরুভূমে যেন সাজান রয়েছে অপূর্ব্ব মরূদ্যান।
লোকজন কেউ নাই সে বাড়ীতে স্তব্ধ নিথর গেহ,
সুনিবিড় করে ঘিরে আছে সেথা মালীর গভীর স্নেহ।
সেই পথে যেতে থমকিয়া চাই শেষ হয় না ক' দেখা,
মনে হয় যেন চিত্রকরের চিত্র রয়েছে লেখা!
আপনার মনে কাজ করে মালী চেয়েও দেখে না ফিরে,
ক্ষণকাল সেই বাড়ীটি দেখিয়া ফিরে আসি ধীরে ধীরে।
একদিন প্রাতে গিয়াছি বেড়াতে মালীটি বলিল ডাকি,
"রোজ ঐখানে আপনার মনে বাগিচা দেখেন নাকি?
আসুন না, ফুল কেটে নিয়ে যান কাঁচি দিয়ে নিজ হাতে।
এত দিনকার মেহনত মোর সার্থক হবে তা'তে।
গাছে ফুটে এরা ঝরে পড়ে যায়, ভালবাসা কে এদের দেয়,
আপনার চোখে যে স্নেহ দেখেছি তাই বলি তুলে নিন,
হাতে তুলে নিয়ে এদের ও আমাকে ধন্য হইতে দিন।"
কহিলাম হেসে, "নিতে পারি ফুল, যদি তুমি নাও কিছু,"
কহিল না কথা, রহিল দাঁড়ায়ে মাথাটি করিয়া নিচু।
পুনরায় বলি "চুপ করে কেন, বল যা বলার আছে,
দাম না লইলে কেন নেব ফুল বল ত তোমার কাছে?"
জোড় হাত করে কহিল বিনয়ে "বেশ বাবু দিন তাই,
ফুলের ফসল করি শুধু আমি দাম মোর জানা নাই।
সামান্য কিছু দিন তা' না হলে শান্তি যদি না পান,
আদর করিয়া লইব মাথায় বাবুর স্নেহের দান।"
প্রত্যহ তারে আট আনা দিব কহিলাম মৃদু হেসে,
এত বেশী নিতে বাধা দিল বহু, রাজী হোল অবশেষে।
ফুলগুলি নিয়ে আনন্দভরে ফিরিয়া এলাম বাড়ী,
গৃহে ঢুকিতেই ছুটে এসে খুকু হাত থেকে নিল কাড়ি'।
"এত দেরী দেখে মা চটে গিয়েছে, যাও না, ভিতরে যাও,
এক্ষুণি তুমি দেখতেই পাবে—কেমন বকুনি খাও।"
"আচ্ছা সে হবে, আগে আন্‌ দেখি দু-চারটে ফুলদানি,
আর কিছু জল—তাড়াতাড়ি করে লুকিয়ে আবৃত রাখি।
মা যদি শুধায়, কি হবে এসব বলিস না যেন তাঁকে—"
"মাষ্টার মশাই এসব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কা'কে?
এত দেরী দেখে ভাবছি ভুলে দেশে চলে গেছ বুঝি,
কা'কে বা পাঠাব, কোথা বা পাঠাব, কেমন করেই খুঁজি।
ও মা, একি কাণ্ড বলতো! কোথায় এ-সব পেলে?
ইন্দ্ররাজার বাগান থেকে কি চুরি করে নিয়ে এলে?"
"বাহবা: বাহবা:! বললে ত খাসা! চোর বুঝি আমি? বেশ,
কালকে সকালে সঙ্গে গেলেই রবে না শঙ্কা লেশ!"
"কালকে আমার সময় হবে না" বলিলেন মহারাণী,
হাত জোড় করে কহিনু বিনয়ে "আহা, তাহা আমি জানি।
আমার সঙ্গে বাহির হইতে সময় কখন পাবে,
এদিকে তোমার বান্ধবী সব এসে এসে ফিরে যাবে!"
ভৃত্য যখন নিত্য রয়েছে হুকুম তামিল তরে,
বৃথায় এতটা সময় নষ্ট কে কোথায় করে করে!
রোজ যাই সেথা ফুল নিয়ে আসি, সাজাই মনের মত,
ঘরে করিয়াছি নন্দন বন, গৃহিণী বলেন কত!
এতদিন পরে হ'ল অবসর, বলেন "সঙ্গে যাব,
কোথায় তোমার নন্দন বন স্বচোখে দেখিতে পাব।"
খুসী হয়ে তাঁরে সাথে লইলাম, খুকু মা'র মুখ চায়,
কহিলেন রেগে "কি হ'ল আবার;" বলিলাম "ভয় পায়।"
"ও সব কেবল ঢং তোমাদের, ভয় কি কারোও কর,
সুযোগ পেলেই টপাটপ করে কথা শোনাতেই পার।"
কহিলাম হাসি "চল এইবার, পর্ব্ব হয়েছে [illegible]
আর দেরী হ'লে ফিরিবার পথে রোদ উঠে যাবে বেশ।"
বহু পথ চলি হনু উপনীত নন্দন কাননে এসে
ক্লান্ত হয়েছ দাঁড়াও এখানে, কহিলাম মৃদু হেসে।
আগে দেখে আসি কি হ'ল ব্যাপার, গেটে কেন তালা ঝোলে,
যাকে নিয়ে কাল আসবেন বাবু নিজে এই কথা বলে।
মালীটাকে কই দেখছি না কোথা? কোথায় লুকাল মালী!
জানলাগুলো ত খোলে না ক' রোজ, তবু মনে হয় খালি!
চারিদিক খুঁজে দেখি একবার যদি কোনখানে পাই,
আজকে যে মোর বড় প্রয়োজন, নহিলে রক্ষা নাই।
কোথাও না দেখে ফিরিতেছি যবে ঝ্‌রুক্‌ণি‍ট গাছের পাশে,
"বাবু" ডাক শুনে চমকিয়া চাই মালী বাহিরিয়া আসে।
কহিল বিনয়ে গদগদ ভাবে "আজ থেকে এই হোক
দেখা হ'লে পুনঃ দেখাইব যেন আমরা অচেনা লোক।
কাল রাত্রিতে এসেছেন বাবু, হঠাৎ না বলে করে,
এখন ঘুমিয়ে রয়েছেন তিনি, তাই উৎসুক হয়ে—
আপনার তরে রয়েছি লুকায়ে বড় করিতেছে ভয়,
এ বাগানে পুনঃ আসিবেন না ক' না বলিলে আর নয়।"
রাগে অপমানে আমার তখন ছিল না বাহ্যজ্ঞান,
হুঁস হ'তে ফিরে দেখি সে কোথায় হয়েছে অন্তর্দ্ধান!
ক্ষণকাল ধরি নিজেরে সামালি ফিরিলাম ধীরে ধীরে,
মোর মুখপানে চাহিয়া বারেক কহিলেন "চল ফিরে।"

সব দেশেই সমাদৃত
সুনিপুন
শিল্পপ্রতিভায়
মৌলিকতায়
আধুনিকতায় ও নির্ভরতায়

বিজ্ঞানবার্ত্তা

গঙ্গাধর মিত্র

মহাকাশের বুকে আমেরিকার বিজ্ঞানী দল একটি ছোট কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন। ১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার সকালবেলায় এই উপগ্রহটি পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে সুরু করে। আমেরিকার স্থলবাহিনীর সাহায্যকারী বিজ্ঞানিবৃন্দ একটি ৭০ ফুট লম্বা 'জুপিটার সি' নামক রকেটের সহায়তায় একে মহাশূন্যে প্রেরণ করেন, 'জুপিটার সি' রকেটের নক্সা বর্ত্তমানে আমেরিকার নাগরিক বিশ্ববিখ্যাত জার্মাণ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফন ব্রাউন কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হয়। সেনাবাহিনীর কর্ত্তৃপক্ষ নতুন উপগ্রহটির নামকরণ করেছেন 'এক্সপ্লোরার'। 'এক্সপ্লোরার' অর্থাৎ 'আবিষ্কারক,' মানুষের মহাশূন্য বিষয়ক জ্ঞানভাণ্ডারকে সম্প্রসারিত করবে, ফলে তার গ্রহান্তর যাত্রার পথ সুগম হবে।

এইবার আপনাদের সঙ্গে 'এক্সপ্লোরারের' সামান্য কিছু পরিচয় করিয়ে দিই। মার্কিণ কৃত্রিম উপগ্রহের ধাতব কাঠামোর প্রধান উপাদান হলো ম্যাগনেসিয়াম। এটি দেখতে অনেকটা মোটা পাইপের মতো, ব্যাস ৬ ইঞ্চি এবং লম্বায় ৮০ ইঞ্চি। ত্রিস্তর রকেটের সহায়তায় একে মহাশূন্যে পাঠান হয়েছিল,—শেষ পর্য্যায়ের রকেটটির সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থাতেই এক্সপ্লোরার মহাকাশে বিচরণ করছে। শেষ পর্য্যায়ের শূন্য রকেটটি সমেত এর ওজন প্রায় ৩১ পাউণ্ড, কেবল উপগ্রহটির ওজন ১৮ পাউণ্ডের সামান্য কিছু বেশী। উপগ্রহটির মধ্যে একটি ইস্পাতের আধারে ষ্টোরেজ ব্যাটারী, ট্রান্সমিটার, রাডার, ম্যাগনেটোমিটার, রেকর্ডিং ড্রাম, কসমিক রে কাউণ্টার, অরোরা কাউণ্টার, ইলেকট্রন কাউণ্টার, সোলার এক্সরে কাউণ্টার, সোলার আলট্রা ভায়োলেট রে কাউণ্টার, গামা রে কাউণ্টার ইত্যাদি নানা প্রকার অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি রাখা আছে। এই সব যন্ত্রাদি মহাশূন্য থেকে নানা প্রকার মহামূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে দুটি বেতারপ্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে। একটি প্রেরক যন্ত্রের বেতার-তরঙ্গ ১০৮'৩ মেগাসাইকলস এবং ক্ষেপণ শক্তি ৬০ মিলিওয়াট, অপরটির ১০৮ মেগাসাইকলস ও ১০ মিলিওয়াট। প্রথম প্রেরক যন্ত্রটির জীবন মাত্র ১৫—২০ দিন এবং দ্বিতীয়টি জীবন প্রায় তিন মাস। এই উপগ্রহটির পরিক্রমণের সর্ব্বোচ্চ গতিবেগ প্রায় ঘণ্টায় ১৮৫০০ মাইল। উপগ্রহটি পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না, তথ্য প্রেরণের কাজ শেষ হয়ে গেলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, এটি প্রায় ১০ বছর নিজের কক্ষপথে ঘুরে বেড়াবে। একে খালি চোখে দেখা যাবে না। এর উজ্জ্বলতা পঞ্চম বা ষষ্ঠ পর্য্যায়ের নক্ষত্রের মতো, তাই একে দেখতে হলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। উপগ্রহটির দূরতম বিন্দু পৃথিবী থেকে কম-বেশী ১৬০০ মাইল, পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে এর সময় লাগছে ১১৩ থেকে ১১৪ মিনিট। 'জুপিটার সি' রকেটের পরিকল্পনাকারী ডাঃ ফন ব্রাউন জানিয়েছেন যে 'হিডাইন' নামক এক প্রকার নূতন জ্বালানী এই প্রচেষ্টায় ব্যবহার করা হয়েছিল। উপগ্রহটির বহির্ভাগ মহাকাশে সূর্য্যের পতিত আলোর প্রতি সহনশীল করবার জন্য ধাতব বহিরাবরণের এক প্রকার বিশেষ ধরণের প্রলেপও প্রয়োগ করা হয়েছে।

বিশ্বের নানা স্থান থেকে 'এক্সপ্লোরারের' গতিবিধির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। ভারতের কোদাইকানাল মানমন্দির ও নৈনিতালের পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে এই মার্কিণ উপগ্রহটিকে পর্য্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।

* * * *

মহাকাশ পরিভ্রমণ মানুষের বয়সের উপর কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করবে, তাও আর এক বিরাট সমস্যা। কিছু দিন আগেই 'হিন্দুস্থান'? পত্রিকায় এই প্রসঙ্গ নিয়ে দু'জন বিজ্ঞানীর মধ্যে বেশ বড় রকমের একটি কলমের লড়াই হয়ে গিয়েছে। একজন বলছেন,—যে মানুষ মহাশূন্যে ভ্রমণ করবেন তাঁর বয়স পৃথিবীতে অবস্থানকারী মানুষের চেয়ে অনেক মন্থর গতিতে বাড়বে। কিন্তু অন্য জনের মতে ঠিক এই রকম কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না। উভয় বিজ্ঞানীই তাঁদের নিজের নিজের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য গণিত-বিজ্ঞানের সহায়তায় কলমযুদ্ধ চালিয়েছেন, তাঁদের এই মসীযুদ্ধ বিশ্বের বহু বিজ্ঞানীরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

আপনারা পত্র-পত্রিকাতে নিশ্চয়ই দেখেছেন, অনেক বিজ্ঞানীই আর কিছুদিনের মধ্যেই ফোটন বা কোয়াণ্টাম রকেট নির্ম্মাণ করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। এই রকেটগুলি আলোর সমান গতিবেগে যাত্রা করতে সক্ষম হবে। বিরাট বিশ্বের অচিন্তনীয় বিশালতার কথা কল্পনা করলে বোঝা যায়, মানুষকে যদি তার নিকটবর্ত্তী গ্রহ বা উপগ্রহের বাইরে পা বাড়াতে হয় তাহলে তাকে আলোকের গতিবেগ আয়ত্ত করবার সাধনা করতেই হবে। এই বিশ্বজগতে আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ অর্জ্জন করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ, গতিবেগ বাড়ার সাথে সাথে পদার্থের ভর বেড়ে যেতে থাকে এবং আলোর গতিবেগ অর্জ্জন করার পর তা হয়ে দাঁড়ায় অসীম। মহামতি আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক গতিতত্ত্ব অনুযায়ী আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ কোন রকমেই সৃষ্টি করা যায় না।

এখন মহাকাশ ভ্রমণের যুগে মানুষের গতিবেগ যখন ক্রমেই বাড়তে থাকবে, তখন বয়সের সমস্যাটা দাঁড়াবে কি রকম? ভ্রমণকারী মানুষের সামনে উপস্থিত হবে এক অকল্পনীয় পরিস্থিতি, রকেটের গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে শূন্যযানের সময়, পৃথিবীর সময়ের চেয়ে অনেক মন্থর হয়ে পড়েছে। আর রকেট যদি কোন রকমে আলোর গতিবেগ অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে সময় আর বাড়বে না। অবস্থাটা কল্পনা করে দেখুন, আপনি এগিয়ে চলেছেন আলোর গতিতে মহাবিশ্বের কোন এক তারকার দিকে। পৃথিবী থেকে যখন যাত্রা করেছিলেন তখন আপনার বয়স হয়তো ৪০ বছর। আলোর গতিতে সেই তারায় যখন পৌঁছালেন তখন আপনার বয়স ৪০ই রয়ে গেছে কিন্তু পৃথিবীতে হয়তো

কয়েক শতাব্দী পার হয়ে গেছে। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগছে—তাই না ?

একটা উদাহরণের সাহায্য নিলে কেমন হয় ? একজন ২১ বৎসর বয়সের তরুণ বিজ্ঞানকর্মী তার ১ বৎসর বয়সের বাচ্চা ছেলেকে পৃথিবীতে রেখে আলোকের গতিতে ৬১ সিগনীতে যাত্রা করলো। ৬১ সিগনী পৃথিবী থেকে ১০·৭ আলোকবর্ষ দূরে। ভদ্রলোক ৬১ সিগনীতে পৌঁছে, আবার ঐ আলোকের গতিতেই পৃথিবীতে ফিরে এলেন। ফিরে এসেই তিনি অবাক,—রকেট ষ্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে আর একজন ২১ বছরের যুবক। এই সমবয়সী তরুণটিই ঐ বিজ্ঞানকর্মীর পুত্র। সিগনীতে আলোকের গতিতে যাতায়াত করার দরুণ ঐ বিজ্ঞানীর বয়স একদমই বাড়েনি কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর পুত্রের বয়স ২১ বছর হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, ব্যাপারটা ঠিক এই রকম হবে কি না, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। সেই মতভেদই 'ডিসকভারী' পত্রিকার পাতায় মসীযুদ্ধের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বয়সের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্য ভ্রমণের আর একটা সমস্যাও মানুষের সামনে এসে হাজির হবে। প্রায় আলোর কাছাকাছি গতিসম্পন্ন রকেট নির্মাণ করা সম্ভব হলেও তার সাহায্যে মহাবিশ্বে কিছু দূরের কোন তারায় পৌঁছোতে হলে কয়েক শত বৎসর লাগতে পারে। এখন চিন্তা করুন, এই অসম্ভব এবং অদ্ভুত যাত্রা মানুষ কি করে সফল করে তুলবে ? বিশ্ববিখ্যাত চিন্তানায়ক অধ্যাপক বার্ণাল এই সমস্যা সমাধানের প্রতি আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে এই বিশ্বভ্রমণের জন্য মানুষকে আর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র পৃথিবী নির্মাণ করতে হবে।

পৃথিবী নির্মাণের কথায় আপনারা চমকে যাবেন না। এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি নিখুঁত বিরাট শূন্যযানকেই পৃথিবী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এই পৃথিবী, যার বুকে আমরা বাস করছি, সেটাই বা কি ? আপনি তাকে স্বচ্ছন্দে এক বিশাল, বিরাট নিখুঁত শূন্যযান বলতে পারেন। সে মহাকাশের বুকে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘণ্টায় ৬৬,০০০ মাইল এবং অন্যান্য গ্রহদের সঙ্গে নিজেদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘণ্টায় ১০ লক্ষ মাইল গতিতে ছুটে চলেছে। একে আপনি শূন্যযান ছাড়া আর কি নাম দিতে পারেন বলুন ? ঠিক এ ভাবে চিন্তা করতে গেলে প্রথমে সত্যিই একটু বেশ অসুবিধা হয়। যাই হোক, সেই নতুন পৃথিবীর বুকে চেপে প্রচণ্ড গতিতে আমাদের নক্ষত্রলোকের পথে যাত্রা করতে হবে। পৃথিবীর মতোই ঠিক একই রকম ভাবে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ শূন্যযানে মানুষ জীবন যাপন করবে। অবশ্য পরিবেশের তফাতের জন্য বাইরের কিছু পরিবর্ত্তন আসবে বটে কিন্তু তা মানব-জীবনের প্রধান কোন সংস্কারকে আঘাত করবে বলে মনে হয় না। এই ভাবে এক দল মানুষ জগতের সব কিছু নমুনা সংগ্রহ করে মানব সভ্যতার পত্তন ঘটাবে আর এক নতুন জগতে। এমনও হতে পারে, যারা যাত্রা করলো তারা হয়তো সুদূরের সেই তারায় পৌঁছোতে পারল না। তাতে কোন ক্ষতি নেই,—সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে তাদের সন্তান-সন্ততির দল। এই নতুন ছোট পৃথিবীতে যারা যাত্রা করেছিল, তাদেরই বংশধরেরা হয়তো পথিমধ্যে জন্মলাভ করে এই নতুন জগতে মানব সভ্যতার বিস্তার ঘটাবে। সবে আকাশে উঠেছে মানুষের-গড়া কৃত্রিম উপগ্রহ, কিন্তু কল্পনায় আকাশে মানুষ কয়েক শতাব্দী এগিয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীদের এই কল্পনাকে পাগলের প্রলাপ বলে আপনারা মনে করতে পারেন কিন্তু আজকের এই অভাবনীয় চিন্তাধারাই ভবিষ্যতে একদিন সত্যের সার্থক রূপ পরিগ্রহণ করবে না, সে কথা কে বলতে পারে ?

যে দিন প্রথম বেলুন মাটির বুক থেকে আকাশে যাত্রা করেছিল, সে দিন কোন অতি কল্পনাপ্রবণ চিন্তাবিদ স্বপ্নেও ভাবেননি যে মানুষ একদিন মহাকাশের বুকে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করবে! বেলুনের মাধ্যমে সর্ব্বপ্রথম আকাশ ভ্রমণের সুরু হলো,—এর সমাপ্তি ঘটবে নক্ষত্রলোক বিজয়ের পরে। তবে বলুন,—মাত্র কয়েক শ' বছর আগে যা একজন শিক্ষিত চিন্তাবিদ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতেন না, তাই যদি আজকের বিজ্ঞান-সভ্যতা সাফল্যমণ্ডিত করতে সমর্থ হয়ে থাকে, তাহলে আগামী কাল সে কেন তার আজকের কল্পনামূলক পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে পারবে না ? বর্ত্তমান মানব সভ্যতা সেই মহাকাঙ্খিত দিনের প্রতীক্ষায় রইলো।

একটু রোদ

মিতা সেন

এখানে একটু রোদ, ওখানে একটু !
এ মাটির আর বুকে এলোমেলো ছায়ার আঁচল
রোদের আঁচড়ে ছেঁড়া। তবু এই রোদের জানলায়,
বর্ষা-নদীর মেয়ে বৃষ্টির শীতল চুল ভিজিয়ে ভিজিয়ে
সঙ্গোপনে নীড় রচে। যৌবনমন্দিরা নারী
উল বোনে। ভাবনারা রোদের সমুদ্রে দেয় পাড়ি।

এইটুকু রোদ যেন, এইটুকু প্রেম অনেক বিরহে।
তবু তাই নিয়ে, হৃদয়ের পেয়ালায় দু' ঠোঁট ভিজিয়ে
চাতক বুকের ছোঁয়া পাই। তারপর সন্ধ্যার ডানায়
এই রোদ মুছে গেলে, অজস্র আলোকের ভীড়
অসংখ্য মেয়েদের মত। নোনা বুক আঁট করে,
আপেলের রং মেখে খোঁজে যারা জীবনের নীড়।

সে আলোতে তাপ নেই, এ মন্দিরে নেই কোন প্রেম
তাই হে সূর্য, হে আকাশ, এ মাটির বুকের আঁচল
দু' হাতে সবারে ভাগ দাও। নাই যদি হয় দেনা শোধ,
এইটুকু প্রেম দিও, এখানে-ওখানে এইটুকু রোদ।

এবার খেলাধুলার আসরে লেখার মত অনেক সংবাদ হাতের কাছে। তাই কি দিয়ে সুরু করব, সে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোটদের অগ্রাধিকার সর্ববিষয়ে। তাই জাতীয় স্কুল গেমস দিয়ে সুরু করা যাক

জাতীয় স্কুল গেমস

কাঁচড়াপাড়ায় রেলওয়ে স্পোর্টস গ্রাউণ্ডে এবার জাতীয় স্কুল গেমসের ছিল তৃতীয় অনুষ্ঠান। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে নৈপুণ্য দেখা গিয়াছে, তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

১৯৫৫ সালে 'স্কুলস গেমস অফ ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া' গঠিত হবার পর মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারীতে প্রথম জাতীয় খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান কটকে ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৭ সালে তৃতীয় গেমসের অনুষ্ঠানের কথা ছিল কাশ্মীরে। কিন্তু নানান কারণে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হওয়ার জন্য ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে তৃতীয় অনুষ্ঠান হল কাঁচড়াপাড়ায়।

এ্যাথলেটিকস, ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেট বল ও কবাডি খেলা ছিল এ অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এ্যাথলেটিকসের ছাত্রদের বিভাগে পাঞ্জাব ও ছাত্রী বিভাগে দিল্লী। গতবারের মত এবারও বাংলা দল এ্যাথলেটিকসে রানার্স লাভ করেছে। মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের ফুটবলের ফাইনাল খেলা অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত খেলার পর অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় দুই দলকেই যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রদের ভলিবল খেলায় উড়িষ্যা ও কবাডি খেলায় মধ্যপ্রদেশ বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করেছে। ফুটবল ও ভলিবল খেলায় পাঞ্জাব বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করেছে।

সর্বাপেক্ষা এ্যাথলেটিক্স স্পোর্টস-এ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অভাবনীয় উন্নতি দেখা গিয়াছে। প্রায় প্রতি বিষয়ে গড়ে তিন জন করে ছাত্র-ছাত্রী নতুন রেকর্ড করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। ব্যক্তিগত ভাবে ছাত্রদের মধ্যে পাঞ্জাবের বলবন্ত সিং এবং ছাত্রীদের মধ্যে দিল্লীর মনোরমা দেওয়ান চারটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

নতুন রেকর্ডের খতিয়ান

ছাত্রদের—

১০০ মিটার ১১˙২ সেঃ বলবন্ত সিং (পাঃ) (পূর্ব্ব রেকর্ড ১১˙৮ সেঃ)
২০০ „ ২৩˙১ „ „ „ („ „ ২৩˙৮ „)
৪০০ „ ৫২˙৯ „ বু বন্ধু পাত্র (উঃ) („ „ ৫৩˙৫ „)
৮০০ „ ২মি ৩˙৫ „ এরমানা (মহী) („ „ ২মি ৬˙৯ „)
১৫০০ „ ৪মি ১২˙৮ „ „ „ („ „ ৪মি ২০˙৬ „)
৪ × ১০০ „ রিলে ৪৫˙৭ „ (পাঞ্জাব) („ „ ৪৬˙৮ „)
১০০ „ হার্ডল ১৫˙৭ „ বলবন্ত সিং (পাঃ) („ „ ১৬˙৪ „)
বর্শা নিক্ষেপ মৃণাল পাল (পশ্চিমবঙ্গ) ১৬১ফু ৬ই („ ১৫০ফু ৫½ই)
হাই জাম্প এম জি ডাঙ্গারে (বোম্বাই) ৫ফু ৮½ই („ ৫ফু ৫¾ই)
লং জাম্প বানরকল সিং (মধ্যপ্রদেশ) ২০ফু ৭½ই („ ২০ফু ৪½ই)
পোল ভল্ট আত্তর সিং (পাঞ্জাব) ১১ফু ৮¾ই („ ১০ফু ১১¾ই)

লোহার বল নিক্ষেপ
ডিসকাস থ্রো
হপষ্টেপ ও জাম্প
} এ বিষয়ে নূতন কোন রেকর্ড হয়নি।

ছাত্রীদের—

১০০ মিটার ১২˙৮ সেঃ মনোরমা দেওয়ান (দিল্লী) (পুঃ রেকর্ড ১৪˙৭ সেঃ)
২০০ „ ২৭˙৬ „ „ „ „ („ „ ৩১˙৮ „)
৮০ „ হার্ডল ১৪˙৩ নমিতা ঘোষ (পঃ বাংলা) („ „ ১৫˙৭ „)
৪ × ১০০ রিলে ৫৬˙৪ দিল্লী („ „ ৫৮˙২ „)
হাই জাম্প ৪ফু ৪ই এইচ. ডি. সুজা (মঃ প্রদেশ) („ ৪ফু ২½ই)
লং জাম্প ১৫ফু ৫¾ই মনোরমা দেওয়ান (দিল্লী) („ ১৪ফু ১½ই)
বর্শা নিক্ষেপ ৯০ফু ½ই এ্যান কিচসন (উঃ) („ ৬৫ফু ১½ই)
লোহার বল নিক্ষেপ ২৬ফু ৮ই বলবীর কাউর (দিল্লী) („ ২২ফু ৯¾ই)
ডিসকাস থ্রো ৭৯ফু ২½ই এ্যান কিচসন (উঃ) („ ৬৫ফু ৫ই)

জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে চার দিনব্যাপী জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কটকের "বারো-বাটী" ষ্টেডিয়ামে। উড়িষ্যার রাজ্যসরকার সকলকে খেলা-ধূলা দেখার সুযোগ দানের জন্য প্রথম তিন দিন ছুটি ঘোষণা করেন। চতুর্থ দিন রবিবার থাকায় সকলেই খেলাধূলা দেখার আনন্দ লাভ করেছেন।

এবারকার প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন পশ্চিম বাংলার দৌড়বীর শ্রীগুলজারা সিং। ম্যারাথন দৌড়ের গুলজারা সিং বিশ্ববিখ্যাত দৌড়-বীর 'ইস্পিন মানস' জেটোপেকের অলিম্পিক রেকর্ডের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে সকলকে বিস্মিত করেছেন। গুলজারা সিং-এর এ কৃতিত্বে অনেকেই ম্যারাথন দৌড়-পথের দূরত্বের (৩৮৫ গজ) যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শ্রীগুলজারা সিং ইষ্টার্ণ রেলওয়ের লোকো বিভাগের কর্মী। তিনি এ পথ অতিক্রম করেছেন ২ঘঃ ২৩মিঃ ৫৮˙৪ সেকেণ্ডে।

গুলজারা সিং-এর পরই নাম করতে হয় সামরিক বিভাগের মিলখা সিং-এর। মিলখা সিং এবার দুটি রেকর্ড করেছেন এবং রিলে রেসে অংশীদারস্বরূপ আছেন। ৪৬˙৪ সেঃ ৪০০ মিটার দৌড়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মিলখা সিং।

গতবারের মেলবোর্ণ অলিম্পিকে যুক্তরাষ্ট্রের সিঃ জেঙ্কিন্স ৪৬˙৭ সেঃ ৪০০ মিটার অতিক্রম করেন।

এ ছাড়াও তিন হাজার মিটার ষ্টিপল চেজ এবং পুরুষ ও মহিলাদের বর্শা নিক্ষেপে যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়াছে! এবারকার জাতীয় গেমস-এর রেকর্ড অধিকাংশ এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করে দিয়েছে।

পুরুষদের ২৪টি বিষয়ের মধ্যে ১৫টি বিষয়ে এবারে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর ২১জন প্রতিযোগী পূর্ব্ব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। ১০জন প্রতিযোগী এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

মহিলাদের ৯টি বিষয়ের মধ্যে চারটি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—৬জন প্রতিযোগিনী আগের ভারতীয় রেকর্ড ও দুই জন প্রতিযোগিনী এশিয়ান রেকর্ড ম্লান করেছেন।

এই বছর থেকেই ১৬ বছরের কমবয়স্ক বালক-বালিকাদের জুনিয়র ইভেন্টে জাতীয় গেমসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জাতীয় ফুটবল

হায়দ্রাবাদে আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় গতবারের বিজয়ী হায়দ্রাবাদ দল এবারও বোম্বাইকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে উপর্যুপরি দু'বার চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করল।

হায়দ্রাবাদ রাজ্য দলে একমাত্র সেণ্টার ফরোওয়ার্ড কানন ব্যতিরেকে পুলিশ দলের সব খেলোয়াড়ই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ বছর হায়দ্রাবাদ ফুটবল খেলোয়াড়রা ভারতের তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে।

জাতীয় ফুটবলের এবার ছিল চতুর্দ্দশ অনুষ্ঠান। সার্ভিসেস দলকে নিয়ে ভারতের ১৬টি রাজ্য এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এবারকার প্রতিযোগিতায় খেলার প্রথম দিনেই খেলার মীমাংসা হয়েছে। সার্ভিসেস ও হায়দ্রাবাদ দলের সেমি-ফ্যাইনাল খেলাটি হয় বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক।

এবারকার প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাপেক্ষা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাংলা দল। জাতীয় ফুটবলের ৮ বারের বিজয়ী ৩ বারের রানার্স বাংলা দল এবারও গতবারের সেমি-ফাইন্যালের মত বোম্বাই-এর কাছে পরাজিত হয়েছে। হায়দ্রাবাদের বেশ কয়েক জন খ্যাতনামা খেলোয়াড় বাংলার অধিবাসী। তার মধ্যে তিন জন এবার জাতীয় ফুটবলে বাংলার হয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা দলের পরাজয় এ কথাই প্রমাণ করে দিয়েছে বাংলার ফুটবলের ক্রীড়ামান নিম্নমুখী।

সেমিফাইন্যালে পরাজিত দুইটি দলের মধ্যে বিশেষ খেলায় সার্ভিস দল ১—০ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে সাম্পাঙ্গী কাপ লাভ করেছে।

পূর্ব্বভারত ব্যাডমিণ্টন

ইডেন উদ্যানের ইন্‌ডোর ষ্টেডিয়াম পূর্ব্বভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসিপের খেলা শেষ হয়ে গেছে। বহিরাগত কয়েক জন কীর্তিমান খেলোয়াড়দের সংগে ভারতের খেলোয়াড়রা ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এবারের খেলায় ত্রিলোক শেঠ, নান্দু নাটেকার, পি, এম, চাওলা ; পি, কে, মজুমদার, সুরেশ গোয়েল প্রভৃতি কৃতীমান খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করেন নি। গতবারের চ্যাম্পিয়ান এবং ইন্দোনেশিয়ার ১নং খেলোয়াড় এবারও চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন। তবে গতবারের তুলনায় এবারে তাঁর খেলায় তেমন কোন উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখা যায় নি। মহিলা বিভাগে মিসেস নিলীমা ভিক্, জুনিয়ার বিভাগে সুকুমার দেব চ্যাম্পিয়ান লাভ করেছে। ডাবলসের চ্যাম্পিয়ান লাভ করেন গজানন হেমাড়ি ও বিক্রম ভাট।

এবারকার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল।

সিঙ্গলস্ (পুরুষ)—তান জো হক (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-১০ ও ১৫-৯ পয়েণ্টে এ, ডি, ইউসুফ (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

সিঙ্গলস্ (মহিলাদের)—মিসেস নীলিমা ভিক (বাঙলা) ১১-২ ও ১২-১০ পয়েণ্টে মিসেস্ মীরা দাসকে (বাঙলা) পরাজিত করেন।

সিঙ্গলস্ (জুনিয়র) সুকুমার দেব (বাঙলা) ১৫-১১ ও ১৫-৪ পয়েণ্টে রমেন ঘোষ (বাঙলা) পরাজিত করেন।

ডাবলস গজানন হেমাড়ি ও বিক্রম ভাট (বাঙলা) ১৫-১১ ও ১৫-৩ পয়েণ্ট অমৃত দেওয়ান (দিল্লী) ও সামসাদ আলীকে (পাকিস্থান) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস্—অমৃত দেওয়ান ও মিস এম, সুইনি ১০-১৫, ১৫-৫ ও ১৫-৪ পয়েণ্টে বিক্রম ভাট ও মিস এইচ, সুইনিকে পরাজিত করেন।

জিজ্ঞাসা

আনন্দগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

মধুর এক কান্না-পড়া বিকেল,
তার উপরে ক'নে দেখা আলো,
তুমিই বল—
একটুকুও লাগছে না কী ভাল ?

শালিক এলো শিরিষ ডালে দু'টি
ওরা বোধ হয় অনেক দিনের জুটি,
তুললো ধুয়া—
"রাখালিয়া,"
রাখালেরা মাঠে ;
গোধূলি আর আমেজ-মাখা আলো
তুমিই বল—
একটুকুও লাগছে না কী ভাল ?

বল্লরী আর কচি কিশোর শাখা—
যেন ঘুম-জড়ান, লজ্জাবতী লতা,
দিগন্তেতে স্বপ্নাতুরাল ;
এবার বল—
তুমিই বল, লাগছে না কী ভাল ?

এ সবই সাঁঝের ভবিষ্যৎ,
আলোক আনে গভীর আঁধার কালো,
শ্রান্তি মাগে
শান্তি ভরা তন্দ্রা মঞ্জুল
এখন বল,
তুমিই বল,
কান্না-পড়া বিকেল, আর ক'নে দেখা আলো
একটুকুও লাগছে না কী ভাল ?
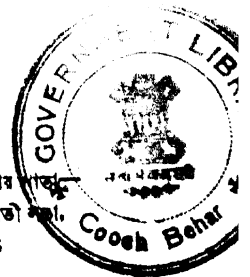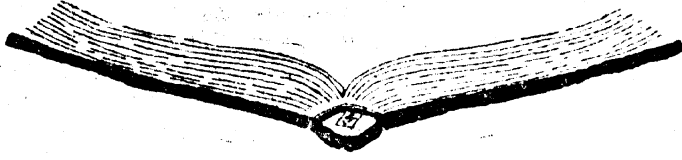
ব্যাধির চিকিৎসা কি?

কলকাতায় সারা ভারত ভাষা-সম্মেলন একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান অধ্যায়ের সূচনা করেছে সরকারী ইতিহাসে। ভারত-বিখ্যাত তিন জন জননেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, মাষ্টার তারা সিং ও ফ্রাঙ্ক এন্টনী ব্যতীত আরও অনেক বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলনে আপন আপন বক্তব্য পেশ করেছেন। ফ্রাঙ্ক এন্টনী সরকারী ভাষা কমিশনের অন্যতম সদস্য। সম্মেলনে প্রায় প্রত্যেক বক্তাই ইংরাজীকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। রাজাজী সে যুগের রসিক চাণক্য—আমাদের দেশের। এঁর কথায় যুক্তি যেমন থাকে তেমনি থাকে বক্র কটাক্ষ। ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের সঙ্গে লঘু-গুরু ভাষণ দানের জন্য তাঁর খ্যাতি অসামান্য। কংগ্রেসের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে দু'-চারটে ভাল-মন্দ কথা তিনি প্রায়ই বলেছেন—অবসর যাপনের সঙ্গে সঙ্গে। রাজাজীর কথায় জহরলাল বা তৎসম কোন কেউ কর্ণপাত করবেন না—কল্পনা করা যায় না। কলকাতায় রাজাজী ভাষা প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলেছেন—তা শুনে কংগ্রেসের উচ্চতমদের সাবধান হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। রাজাজী বলছেন, তিনি জাহাজকে পর্বতের সম্মুখে এগিয়ে দিতে চান না। 'জাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হোক, আমার সে বাসনা নয়।'

এই জাহাজ অর্থে ভারতবর্ষ। এবং জাহাজের ক্যাপটেন বা কাণ্ডারী যে কে বা কা'রা, অনুমানেই বোঝা যায়। রাজাজী, তারা সিং, ফ্রাঙ্ক এন্টনী—এঁরা সকলেই ভাষার অছিলায় হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ স্থাপনের অপচেষ্টাকে সমূলে বিনাশের দিকেই রায় দিয়েছেন। কেউ বা বলেছেন, 'হিন্দীর জন্য ওকালতি করতে করতে কংগ্রেস অবশেষে কবর লাভ করবে। অর্থাৎ কংগ্রেসের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না।' কংগ্রেসের নাম পরিবর্তন হবে—হিন্দীগ্রেস্! আশঙ্কা অমূলক নয়। পৃথিবীর ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়, কোন কোন ব্যাধির আদিতে যথাযোগ্য চিকিৎসা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা না করলে ব্যাধি এক দেহ থেকে অন্য দেহে বিস্তার লাভ করে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে দৌড়য়। এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছয়।

হিন্দী ভাষা কংগ্রেসের শাসকগোষ্ঠীর কাছে হারাম নয়, আরাম। কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর কাছে এক দুরারোগ্য ব্যাধিরাম বা ব্যাধি। কংগ্রেসের নেতারা হারামের মধ্যেও রামকে দেখতে পেয়েছেন, দেশবাসী কলির রামলীলায় আজ সকল দিকে বিপদগ্রস্ত। দেশের খাদ্যাভাব, বাস্তুসমস্যা ও বেকারসমস্যা—সর্বোপরি বৈদেশিক নীতিতে ভারতজননী যে কোথায় পালাবেন, তার পথ খুঁজে মেলে না। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ব্যাধির আরম্ভেই তাকে খতম ক'রে দেওয়ার মত ওষুধ বা দাওয়াইয়ের অভাব নেই। হাতুড়ে চিকিৎসকের দিন আর নেই। সুতরাং এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের এই হিন্দী-ব্যাধিকে না সারাতে পারলে পরিনাম শুধু ভয়াবহ নয়—পরিণাম বলতেই কিছু হয়তো থাকবে না। ইণ্ডিয়ার নাম হয়তো হবে 'হিন্দিয়া'। সমগ্র ভারতবাসী! এখনও সাবধান হউন।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

বিদ্রোহে বাঙালী

ভারতবাসীর বিশেষ করে বাঙালীর মন থেকে সিপাহী বিপ্লবের স্মৃতি মুছে যাবার নয়। শত বর্ষ আগের এই বিপ্লব সমগ্র ভারতের ইতিহাসের গতিপথকে করেছে ভিন্নমুখীন। স্বাধীনতার জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অগ্রদূতরূপে সিপাহী বিপ্লবের স্মৃতি চিরদিন বেঁচে থাকবে। এই সিপাহী বিপ্লবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ ছিল স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গ্রন্থটি তাঁরই আত্মজীবনী। এই আত্মজীবনীর মাধ্যমেই সিপাহী বিপ্লবের সমস্ত খুঁটিনাটি স্মৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই গ্রন্থে সিপাহী-বিপ্লবের একটি নিখুঁত ও পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে। রচনায় কোথাও ফাঁক পাওয়া যায় না। বর্ণনার গুণে শতাব্দী কাল আগেকার ঘটনাগুলি যেন একের পর এক চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এই গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ খুবই যে যুগোপযোগী এবং তাৎপর্যপূর্ণ, এই বিশ্বাসই আমরা রাখি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম—পাঁচ টাকা বারো আনা মাত্র।

স্বর্ণলতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের আকাশে একজন উজ্জ্বলতম নক্ষত্র তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। সাহিত্যের মাধ্যমে বাস্তবতা প্রচারে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন, তারকনাথ তাঁদের

টালির ছাদ

—অমিয় মুখোপাধ্যায়

খেলার ছলে

—রবীন রায়

আত্ম-জিজ্ঞাসা

—দেবপ্রসাদ ঘোষ

পরচর্চা

—শি. সু. বসু

সূর্যমুখী

—কুলদাচরণ সরকার

জগন্নাথ-মন্দির (পুরী)

—রতন দে

[illegible]স্মৃতি-মন্দির (বেলুড়)

— অরুণকুমার দত্ত

ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির শিল্পীর নাম, ধাম, ও
ছবির বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না যেন।]

অপ্রভূত। বাঙালীর জীবনধারা যে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, আনন্দ-বেদনা নিয়ে গ্রথিত, তাদেরই একটি সামগ্রিক রূপ বাঙালী পাঠকের চোখে প্রথম ধরা পড়ল "স্বর্ণলতা" গ্রন্থে। স্বর্ণলতার সার্থক রচয়িতা তারকনাথ। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই বহুজনবন্দিত গ্রন্থখানি প্রকাশলাভ করে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বর্তমানে এই গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ হয়েছে। এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। তিরাশী বছর আগে সুখে-ভরা বাঙলা দেশের তথা বাঙালী সমাজের গার্হস্থ্যজীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি ফুটে উঠেছিল যে গ্রন্থে, তা পাঠ করে বাঙালী পাঠক মাত্রেই প্রভূত তৃপ্তিলাভ করবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থটিতে দেবব্রত ভৌমিকের লেখা তারকনাথের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রকাশক—প্রকাশিকা ১৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট। দাম চার টাকা মাত্র।

উত্তরায়ণ

শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবীর 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসটি বহুকাল পরে আবার প্রকাশ লাভ করেছে। অনুরূপা দেবীর এই গ্রন্থটি বহুজন-পঠিত ও বহুজন-আদৃত। সামাজিক পটভূমিকায় একটি নারীর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, চাওয়া-পাওয়ার নিখুঁত বর্ণনাচিত্র এঁকে গেছেন অনুরূপা দেবী। আরতির চরিত্র বিশেষ ভাবে হৃদয়স্পর্শী, সলিলের জীবনের পথ-পরিবর্তন বিশেষ ভাবে মনকে নাড়া দেয়। সহজ-সরল ভাবে বর্ণিত এই কাহিনীটির মধ্যে কোথাও অকারণ গুরু-গাম্ভীর্য চোখে পড়ে না। ভাষার ও বিন্যাসের কল্যাণে এই গ্রন্থ সমাদরের দাবী রাখে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম পাঁচ টাকা আট আনা মাত্র।

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যেমন মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার অতি পরিচিত, তাঁর পঞ্চতপাও পাঠক-পাঠিকার কাছে তেমনই অপরিচিত নয়। বহুখ্যাত এই উপন্যাসটি প্রায় একটি বছর ধরে মাসিক বসুমতীর মাধ্যমেই ধারাবাহিক ভাবে পাঠক-পাঠিকারা পড়বার সুযোগ পেয়েছেন। এই উপন্যাসের অংশবিশেষ ছায়াচিত্রেও দেখা গেছে। অংশবিশেষ বললুম এই কারণে যে, পঞ্চতপার বিশেষ ধরণের তিনটি চরিত্র (ভুতুবাবু, চাঁদমণি ও পাগল সর্দার) ছায়াছবিতে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত, সুতরাং ছবিটি যাঁরা দেখেছেন পঞ্চতপার কাহিনীর সবটুকু তাঁরা জানতে পেরেছেন, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। মানুষের জীবনে বাঁধের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, সে বিষয়ে লেখক আমাদের অবহিত করছেন। একটি বাঁধ নির্মাণের কার্যধারার সঙ্গে সঙ্গেই সমান ভাবে তাল রেখে হাসি-কান্না আবেগ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে কয়েকটি জীবনের বাঁধ কি ভাবে নির্মিত হয়ে চলেছে, সে বিষয়েও লেখক আলোকপাত করেছেন। গতানুগতিকতা বর্জন করে নতুন পটভূমিকা অবলম্বন করে যুগোপযোগী এই উপন্যাস রচনায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভার শক্তিশালী স্বাক্ষরই পাওয়া যায়। সান্ত্বনার চরিত্র বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করে। ভুতুবাবু, চাঁদমণি ও পাগল সর্দার তো দৃপ্তস্বরে লেখকের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা ঘোষণা করছে। প্রচ্ছদপটে "পঞ্চতপা" শব্দের অর্থ অঙ্কনে রূপায়িত করে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট দাম—সাড়ে ছ' টাকা মাত্র।

শিশুর জীবন ও শিক্ষা

শিশু মাত্রেই ভবিষ্যতের প্রাপ্তবয়স্ক। আজ যে বাল গোপাল, কালই সে দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক দর্পহারী শ্রীমধুসূদন। অজস্র সম্ভাবনা নিয়েই শিশু জন্মায়। শিশু-মন তার ভরে থাকে হাজারো উদ্দীপনায়। কিন্তু সাধারণ ভাবে তাকে ধরা যায় না। তার মনের সন্ধান পেতে গেলে নিজের মনকেও করতে হবে তার উপযোগী। নিজের মনকে করতে হবে সন্ধানী, তবে তার মনের দরদালান থেকে শুরু আনাচ-কানাচেরও সন্ধান পাওয়া যাবে। অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য একজন বিদগ্ধ সুধী ও শিক্ষাব্রতী। শিশু-চিত্ত নিয়ে তিনি নানা গবেষণা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তাই কেন্দ্র করে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। উপরোক্ত গ্রন্থটি সেই প্রবন্ধগুলিরই সমষ্টি। শিশু-মনের বৈচিত্র্য, আবেগ-উচ্ছ্বাসের পূর্ণ চিত্র একটি অঙ্কন করতে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য সমর্থ হয়েছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের সন্ধানী দৃষ্টির প্রশংসা না করে থাকা যায় না। শিশুদের সম্বন্ধীয় এই বই অভিভাবকদেরও পঠনীয়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের শ্রম সফল হোক, কামনা করি। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম—চার টাকা বারো আনা মাত্র।

রবীন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা

রবীন্দ্রনাথের অসামান্য অবদান যাদের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে, নাটক তাদেরই অন্যতম। নাট্যকার হিসেবেও তিনি সর্বজন-বরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্য রচনার মত নাটকও জাতিকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করেছে। আলোকোজ্জ্বল নানা দিকের সঙ্কেত পাওয়া যায় কবিগুরুর নাটকে। এই সাঙ্কেতিকতাই রবীন্দ্র-নাটকের প্রধান ভূষণ। উপরোক্ত গ্রন্থটিতে অশোক সেন রবীন্দ্রনাথের নাটক তথা রবীন্দ্র-নাটকে সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন। তা ছাড়াও প্রথমার্ধে নাটক ও নাট্যশাস্ত্র নিয়েও সারগর্ভ আলোচনা তিনি করেছেন। অশোক বাবুর আলোচনা প্রশংসার দাবী রাখে। শুধু নাট্যামোদীই নয়, সাহিত্যামোদী মাত্রেই এই আলোচনা-গ্রন্থ পাঠে তৃপ্ত হবেন বলে আমরা মনে করি। প্রকাশক—এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম ছয় টাকা মাত্র।

বাঙলা নাটক

নাটক সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের কদরও বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গেই নাটকের প্রতি একটি অদম্য কৌতূহল বাঙালীর চিত্ত অধিকার করেছে। এখন আর সে নাটক দেখেই তৃপ্তি লাভ করে না, নাটক সম্বন্ধে সে জানতেও চায়। একশো বছরের বাঙলা নাটকের উৎপত্তি, বিকাশ এবং তার গতি-প্রগতি সম্বন্ধে যে অসীম কৌতূহল অনেকের

মনে জুড়ে রয়েছে, তা তাঁদের নিবারণ হবে দেবকুমার বসুর "বাঙলা নাটক" গ্রন্থটি পাঠ করলে। ১৯৫২ থেকে আজ পর্যন্ত যত নাটক বাঙলা-ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির একটি বিস্তারিত তালিকা পরিবেশন করেছেন দেবকুমার বসু। মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন নটগুরু শিশিরকুমার স্বয়ং। এ ছাড়া নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশাদি সম্বন্ধে নটগুরু শিশিরকুমার, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ প্রভৃতি সুধিবৃন্দের প্রবন্ধও গ্রন্থের শোভাবর্ধন করছে। প্রকাশক—মনোজ ভট্টাচার্য। পরিবেশক—গ্রন্থ-জগৎ। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম তিন টাকা মাত্র।

প্রজ্ঞাপারমিতা

বাঙলা সাহিত্যের দরবারে অজিতকৃষ্ণ বসুর পরিচয় নতুন করে দেওয়া অর্থহীন। স্বনামে এবং সংক্ষেপিত নামে ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ধনপতির দিনপঞ্জী থেকে তাঁর এই উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করছে। প্রজ্ঞাপারমিতার আলোয় অনেককে আবার অনেকের আলোয় প্রজ্ঞাপারমিতাকে চিনতে চেয়েছিল ধনপতি। এই বিশ্বজোড়া সন্ধানের মধ্যেই ধনপতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পরস্পরকে পরস্পরের চেনার যে তীব্র আকুলতা আর অনুভূতি মানবমনকে ওতপ্রোত ভাবে ঘিরে রয়েছে, সেই সম্বন্ধেই ধনপতি যেন বার বার আলোকপাত করছে। এই পারস্পরিক চেনার মধ্যেই লেখক যেন জীবনকে চেনার, জীবনের দর্শনের চেনার, জীবনের সত্যকে চেনার চাবিকাঠি খুঁজে পাচ্ছেন। ধনপতির মাধ্যমে লেখক যেন বার বার বলতে চাইছেন জীবনে অনুভূতি, অন্বেষণ, স্বপ্ন, কল্পনা ও তৃষ্ণার শেষ নেই। মধুর বিন্যাসে, সুন্দর বর্ণনায় মন ভরপুর হয়ে যায়। অজিত গুপ্ত অঙ্কিত প্রচ্ছদপট যথেষ্ট পরিমাণে গাম্ভীর্য বহন করে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম—ছ' টাকা মাত্র।

নবপড়

বাঙলার বাইরে বাঙালী-সমাজের উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে ইতিহাস অনেক কথা বলে গেছে। সেই রকম পুরুলিয়ার ও মানভূমের একটি অঞ্চলের বাঙালী অধিবাসীদের জীবনধারা অবলম্বন করে উপরোক্ত গ্রন্থটি রচিত। তাদের উত্থান, পতন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটি সামাজিক চিত্র নিখুঁত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে লেখকের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়; তবে স্থানে স্থানে ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। চরিত্রগুলির তাৎপর্য যথেষ্ট ভাবে পরিলক্ষণীয়। লেখক—রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—এম, সি, সরকার য়্যাণ্ড সন্স, প্রাঃ লিঃ ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

স্বপনচারিণী

উদীয়মানা সাহিত্যিকাদের মধ্যে রানু ভৌমিক আজ সুপরিচিতা। মাসিক বসুমতীর পাতায় তাঁর রচনার সঙ্গে পাঠক-সাধারণের পরিচয় আছে। জীবনের চলার পথে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে বিরাট একটি দ্বন্দ্ব চলেছে অবিরাম গতিতে, সেই দিকেই লেখিকা আলোকপাত করছেন। মানুষের জীবনের এমন কতকগুলি ক্ষণ আসে যে সময়ে সে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে সার্থক পরিণতি তখনো বহু দূরে, কয়েকটি চরিত্র অবলম্বন করে এই সত্যটি ঘোষণা করা হচ্ছে। মীনাক্ষী এবং লুসীর চরিত্র দুটি বিশেষ ভাবে মনকে নাড়া দেয়। লেখিকার ভাষা মনোরম এবং সুললিত উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত পাঠকচিত্তকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মধুরাংশু

উপন্যাসকে ইতিহাসাশ্রয়ী করে যে সকল সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে সুবোধকুমার চক্রবর্তীর নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁর "রম্যাণি বীক্ষ্য" ও একদিন যথোচিত সমাদর লাভে বঞ্চিত হয়নি। মধুরাংশুতে সুবোধকুমার দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি অঞ্চলের উৎপত্তি কেন্দ্র করে প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করে গেছেন যথোচিত সাবলীলতার সঙ্গে। এরই সঙ্গে বাস্তবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতও সুষ্ঠু ভাবে হয়েছে রূপায়িত। ললিতা, মিত্রা, স্বাতী, চাওলা চরিত্রগুলি স্বকীয়তার দাবী রাখে। প্রকাশক এ, মুখার্জী য়্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

বাপ-মায়ের জানবার কথা

ঠিক চল্লিশ বছর আগে নতুন করে যখন রাশিয়া জেগে উঠল, জীর্ণ অকল্যাণকর, ক্ষয়ধর্মী সমাজকে আমূল পরিবর্তিত করে, তারই মধ্যে দিয়ে দেখা দিল যখন নতুন সমাজ উদ্যমে, প্রেরণায় ও উদ্দীপনায় ভরা সেই সময়ে রাশিয়ার শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে একটি বিশেষ আসনের অধিকারী ছিলেন মাকারেঙ্কো (১৮৮৮—১৯৩৯) একটি বৈজ্ঞানিক ও দরদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মাকারেঙ্কোর আবির্ভাব। শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে মাকারেঙ্কো ছিলেন একজন উদ্ভাবক। সে ক্ষেত্রে তার নতুন ও মৌলিক পদ্ধতি শুধু নিজের দেশেরই নয়, সারা বিশ্বের খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। শিশু-মনকে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন করেছেন। পরিবারে সন্তানপালন সম্পর্কের দীর্ঘকাল যে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা তিনি করেছেন, তারই স্বাক্ষরবাহী উপরোক্ত এই গ্রন্থটি। সন্তানপালন প্রসঙ্গে সমাজের এক জটিল সমস্যাকে তিনি তুলে ধরেছেন। রসজ্ঞ মহলে এই গ্রন্থ সমাদরলাভ করুক। অনুবাদক—সুকুমার মিত্র। প্রকাশক—ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং, ৬৪-এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট। দাম ছ'টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

The sun of India's destiny would rise and fill all India with its light and overflow India and overflow Asia and overflow the world.

—*Sree Aurobindo*

দ্বিজেন্দ্র-গীতি

শ্রীজয়দেব রায়

বাংলা দেশের আধুনিক সঙ্গীত গড়িয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের এবং দ্বিজেন্দ্রলালের সুরকে অবলম্বন করিয়া। গীতিরীতি বা 'গায়কী'র ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে অধিকতর স্বীকৃতিযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের গীতিরীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাঁহার স্বদেশীগানের সুরের মধ্যে একটি কমনীয় স্নিগ্ধ ভাবের সঙ্গে গাম্ভীর্যময় ওজস্বিতা ফুটিয়াছে। সুরের মধ্যে উভয় ভাবের এইরূপ একত্র সংমিশ্রণ যথার্থই সুকঠিন প্রচেষ্টা।

দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয় সঙ্গীতে সমান ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বাংলা গানের মাধুর্যের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য গানের পৌরুষ বা উদ্দীপনার সঞ্চার।

প্রমথ চৌধুরী তাঁহার সেই আদর্শের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"আর্টের সৃষ্টির পদ্ধতি হচ্ছে Organic, দ্বিজেন্দ্রলালের হিন্দুসঙ্গীতের ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীতেরও পরিচয় ছিল। তাঁর অন্তরে এই দুয়ের অলক্ষিত মিলনের ফলে তাঁর সুরের সৃষ্টি। আমরা আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের সাহায্যে যা গড়ে তুলতে পারিনি, যখন দেখি অপর কারও মন থেকে তা আপনিই গড়ে উঠছে। তখন আমরা বলি যে, সে গঠন ক্রিয়ার মূল, আর্টের সৃষ্টিকর্তার মগ্নচৈতন্যে নিহিত। দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন ঢঙের নব সুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তাঁর মগ্নচৈতন্যে দেশী ও বিলাতী সুরের নিগূঢ় মিলনে সৃষ্টি হয়েছে। * * * দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতকে যে একটি নূতন পথে চালাতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে ক'রে তিনি সঙ্গীত বিষয়ে অনভিজ্ঞতার নয়, প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।"

কেবল স্বদেশী গানেই নয়, তাঁহার অন্যান্য সকল শ্রেণীর গানের মধ্যেই এই বিলাতী ঢঙটি রহিয়াছে। বাংলা গানের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য করুণা বিগলিত সুরের মধ্যে উদাত্তরসের সমাবেশ করিয়া তিনি গীতিরীতির মধ্যে নব-সঞ্জীবতার সঞ্চার করিয়াছেন।

শ্রীদিলীপকুমার বহু দিন পূর্বে বলিয়াছিলেন, "দ্বিজেন্দ্রলালের এ শ্রেণীর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এ সব গানের ধারাটি দেশী হ'লেও এ ঢঙের মধ্যে একটা য়ুরোপীয় সজীবতা (vitality) আছে। আমাদের সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের বহুধা দানের মধ্যে এটা যে, একটা মৌলিক দান এই কথাটিই আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা পেয়েছি।"

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের অপর বৈশিষ্ট্য তাঁহার গানের অভিনয়-প্রবণতায় এবং সুরের সৌষম্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুরে অভিনয়-প্রবণতাকে সযত্নে পরিহার করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন আজন্ম-সিদ্ধ নাট্যকার, তাহা ছাড়া তাঁহার গানগুলি অধিকাংশই নাটকের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট ছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলির অঙ্গে অঙ্গে বিশেষ করিয়া এই অভিনয়প্রবণতা প্রকটিত। কিন্তু কোথাও তিনি সুরের মর্যাদা বিন্দুমাত্র ব্যাহত করেন নাই। তিনি নিজে ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশিষ্ট সমঝদার ও রসবেত্তা; হাসির গানগুলির মধ্যেও তিনি রাগরাগিণী অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। যেমন, একটি উদাহরণ দেওয়া গেল—'এক যে ছিল, শেয়াল, তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল' গানের রাগিণী পূরবী; 'নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ' গানের রাগিণী বিশুদ্ধ পরজ; 'পুরাকালে ছিল শুনি, দুর্বাসা নামেতে মুনি' গান রচিত দরবারী কানাড়ায়, 'বৃষ্টি পড়িতেছে টুপটাপ' গানের রাগিণী মেঘমল্লার প্রভৃতি।

হিন্দুস্থানী কালোয়াতী চালের প্রসিদ্ধ সুরগুলি তাঁহার প্রসাদে বাংলার হাসির গানের বিশিষ্ট অলঙ্করণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাও দ্বিজেন্দ্রলালের কম কৃতিত্বের কথা নয়।

হাসির গানগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে সুরের এই অভিনয়-প্রবণ রসঘন কলাভঙ্গীর গুণে এবং সরস সুরানুগামী যথাযথ পদ-বিন্যাসের গুণে।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের হাস্যরস কতটা তার কথার, আর কতটা তার সুরের উপর নির্ভর করে বলা কঠিন! সুতরাং সুর থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে তাঁর কথার এবং কথা থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে তাঁর সুরের মূল্য নির্ণয় করবার চেষ্টা ব্যর্থ হবারই সম্ভাবনা। * * * দ্বিজেন্দ্রলাল যে তাঁর সকল গানেই ওস্তাদী সুর দেননি, তার কারণ তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে, হাস্যরসের অনুরূপ সুরের সৃষ্টি করতে হ'লে আমাদের তৈরি রাগ-রাগিণীকেই একটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে নূতন ক'রে গড়ে নেওয়া আবশ্যক। তিনি তাই প্রচলিত সুরের পরিচিত আকার পরিবর্তন ক'রে তার নূতন আকার দিয়েছেন, তার বিকার সাধন করেননি।"

দ্বিজেন্দ্রলালের গীতিরীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বাংলা গানে য়ুরোপীয়

চালের প্রবর্তন। তিনি তাঁহার গানে পাশ্চাত্য সুরকে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার মৌলিক রূপ আর ধরিবার উপায় নাই।

বিলাতী গানের বিশেষজ্ঞ এবং অনুরাগী হইলেও তিনি এ দেশের গানে পাশ্চাত্য সুরের বিশিষ্ট অঙ্গ 'হার্মনি'র প্রচলন করিতে চান নাই।

শ্রীদিলীপকুমার বলেন—"বাংলা ভাষায় ইংরেজি ইডিয়ম দিলে যে রকম অশ্রাব্য শোনায়, কানাড়া-বাগেশ্রী-মালকোষে হার্মনি আনলে তার চেয়েও বেখাপ্পা শোনাবে। তাই তিনি কোরাস গানই নেন, কিন্তু হার্মনির পথে নয়—মেলডির পথে।······তাঁর বিলাতজীবনের প্রথম দিকে ওদের অনেক সুর অবিকল নিয়েও উনি দেখেন যে, আমাদের গানে ওদের ভঙ্গীর খানিকটা মাত্র নেওয়া চলে, নইলে ভারতীয় সঙ্গীতের চরিত্র বৈশিষ্ট্য থাকেনা—থাকতে পারে না।"

বিলাতী গানে সুরকে লীলায়িত করিবার ক্ষমতা বা Improvisation গায়কদের আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার গানেও গায়কদের সেই সুরবিহারের স্বাধীনতা দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অবশ্য সে সুযোগ বিশেষ ঘটে নাই, আজ দিলীপকুমার বাংলা গানে এই রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনিই বলিয়াছেন—"তাঁর অনন্যতন্ত্র প্রতিভার নির্দেশে গানে তিনি যে নূতন পথ কেটে দিয়েছিলেন সেই পথটি গানের শ্রেষ্ঠ রাজপথ। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে, গানকে বড় হ'তে হ'লে তার মধ্যে সুরবিহারের পাখা মেলবার আকাশ রাখতে হবে, কথার চাপে তার টুঁটি টিপে ধরলে সে সর্বোত্তম গানের পর্যায়ে পড়বে না। বাংলা গানে সুরকে লীলায়িত করবার অবকাশ দিয়ে তবে সুররচনা করতে হবে, এ কথা বাংলা গীতিকারদের মধ্যে তাঁর মতো প্রবুদ্ধ ভাবে আর কেউ বোঝেনি আজ পর্যন্ত।"

সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত-প্রতিভাই অধিকতর উদ্ভাসিত। এক সময়ে তাঁহার সুরকে আক্রমণ করিয়া বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। প্রমথ চৌধুরী, এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বীরবল কবির পক্ষ সমর্থন করিয়া বলেন—

"দ্বিজেন্দ্রলালের সুর যদি গুণী সমাজে অসহ্য এবং অগ্রাহ্য হয়, তাহ'লে তাঁর গানও বাঙ্গালীর নিকট অসহ্য এবং অগ্রাহ্য হ'ত। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, সে গান বঙ্গদেশে অতি আদরের সামগ্রী তখন যিনি গানের 'গা'ও জানেন না, তিনিও ধরে নিতে পারেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীত সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এবং মূর্খ ছিলেন না!"

দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী সাগর-পারের সুরকে আমাদের সঙ্গীতের অঙ্গে অঙ্গে সজ্জা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছেন। ইংরেজী সুরকুমারের সোনার কাঠির মধুর স্পর্শ লাগাইয়া আমাদের গানের নিদ্রিত সুর-কুমারীর তন্দ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এজন্য শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিতেছেন—

"দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে ব'লে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসঙ্গীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিন্দু-সঙ্গীত ব'লে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক, কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসঙ্গীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড় ক'রেই পাবে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের অগাধ সুর-জ্ঞানের পরিচয় আছে তাঁহার রচিত সকল গানেই। গানে যে কথা অপেক্ষা সুরের আধিপত্য, তাহা তাঁহার গীতিগুলি যেন আজও সগৌরবে প্রচার করিতেছে।

প্রমথ চৌধুরী সে কথা প্রসঙ্গে সত্যই বলিয়াছেন—"তাঁর গান যে বাঙ্গালীজাতির নিকট এতটা আদর লাভ করেছে আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ এই যে, এ কবির আর্ট, সঙ্গীতপ্রাণ এবং সঙ্গীতকায়। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল আগে কবিতা রচনা ক'রে পরে তাতে সুর বসাতেন না, কিন্তু আগে তাঁর মনে একটা সুর আসত, তার পরে কথা সেই সুরকে অনুসরণ করত।"

কুমার শচীন দেববর্মণ সম্বর্ধিত

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ২৩ রাজা সন্তোষ রোড আলিপুর ভবনে কুমার শচীন দেববর্মণকে গ্রামোফোন কোম্পানি এক সভায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

এই উপলক্ষে কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে. ই. জর্জ শ্রীযুক্ত দেববর্মণকে একটি সুন্দর "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" টেবল

রেডিওগ্রাম উপহার দেন। মিঃ জর্জ শ্রীযুত বর্মণের গুণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রেকর্ডিং অধিকর্তা শ্রীযুত পি, কে, সেন কুমার শচীন দেববর্মণের শিল্পিজীবনের অসামান্য সাফল্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলেন, লোক-সংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীতেই তিনি প্রথম জনপ্রিয় হন। পরে ফিল্মের সংগীত পরিচালকরূপে সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ বৎসর সংগীত-নাটক একাডেমী তাঁকে ১৯৫৭ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসাবে নির্বাচন করে যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করেছেন।

শিল্পী শচীন গুপ্ত শিল্পীদের পক্ষ থেকে শ্রীযুত দেববর্মণকে অভিনন্দন জানান।

উত্তর দান কালে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে শ্রীযুত দেববর্মণ বলেন, গ্রামোফোন রেকর্ড বহু নূতন শিল্পীকে লোকলোচনের সম্মুখে আনে। তাঁর গানও জনপ্রিয় হয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ডের সহায়তায়।

এই সভায় বহু বিশিষ্ট অতিথি, শিল্পী, সংগীত পরিচালক, সাংবাদিক, চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সর্বশ্রী রাইচাঁদ বড়াল, অনিল বাগচী, রাজেন সরকার, কালীপদ সেন, ডাঃ ভূপেন হাজারিকা, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, নচিকেতা ঘোষ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, সুবীর সেন, দীপালি নাগ, পুরবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলা সেন, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, গায়ত্রী বসু, ইলা চক্রবর্তী, বাণী ঘোষাল, রেবা মুহুরী, শ্যামল গুপ্ত, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার, সনৎ সিংহ, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অসিত সেন, গীতা সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও এই সম্বর্ধনা-সভায় যোগদান করেন।

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82770—"চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে" ও "কে যেন আমারে বারে বারে চায়।" রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের গানের সুনিপুণা গায়িকা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র এবারে অতুলপ্রসাদের যে গান দুটি পরিবেশন করেছেন—তা ভাবের গভীরতায় সমৃদ্ধ। শিল্পীর কণ্ঠে গান দু'টি অতি সুন্দর ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক বিদগ্ধজনের কাছে রেকর্ডটি সমাদর লাভ করবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

N 82771—"আঁখি ছল ছলিয়া" ও "শুক্ল রাতের লক্ষ তারায়।" প্রখ্যাত শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সংগীত-রসিককে নতুন ক'রে অবহিত করা বাহুল্য। এবারে তিনি যে দু'খানা আধুনিক বাংলা গান রেকর্ড করেছেন, তা ছন্দ ও সুরের দিক থেকে যথেষ্ট নতুনত্বের দাবী রাখে। গান দু'টি আপনাদের তৃপ্তি দিতে পারবে—এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস কোম্পানীর মালিক গ্রামোফোন রেকর্ড নির্মাতা মিঃ জর্জের বাসগৃহে সঙ্গীতশিল্পী শচীন দেববর্মণের সম্বর্ধনা উৎসবে গৃহীত আলোকচিত্র।

N 82772—"রাত হোলো নিঃঝুম" ও "দূর দিগন্ত ঢেকে আছে মেঘে।" আধুনিক বাংলা গান দু'টি গেয়েছেন উদীয়মান জনপ্রিয় শিল্পী সুধীর সেন। বিখ্যাত গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের দু'খানা অতি সুন্দর রচনায় সুরারোপ ক'রেছেন শিল্পী নিজে। গান দু'খানা প্রত্যেক শ্রোতাকে তৃপ্ত করতে পারবে।

কলম্বিয়া

GE 24875—"আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে" ও "ঝাউয়ের পাতা ঝিরঝিরিয়ে।" এবারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের যে রেকর্ডটি বের করা হলো—তার দু'খানা গানই ভাব, ভাষা এবং সুরের দিক থেকে অনবদ্য। দীর্ঘকাল পরে এমন একটি সর্বাংগসুন্দর রেকর্ড পরিবেশন করতে পেরে আমরা বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'—এই গানটিতে শিল্পি-মনের আশা আর আবেদন ছত্রে ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'ঝাউয়ের পাতা ঝিরঝিরিয়ে' গানটি ছন্দপ্রধান, অভিনব এবং সুললিত। রচনা করেছেন সর্বজনপ্রিয় গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার—সুরারোপ করেছেন বিখ্যাত সুরকার নচিকেতা ঘোষ।

GE 24876—"পূবের মাঠে যাইও রে" ও "ময়না দেখ আসিয়া রে।" দ্বৈতকণ্ঠে শ্রীমতী সুমিত্রা সেন এবং সনৎ সিংহ যে গান দু'টি এবারে গেয়েছেন, বহুদিন সে ধরণের পল্লী-গীতি আমরা শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করতে পারি নি। প্রবীণ সুরকার এবং গীতিকার সুরেন চক্রবর্তী এই গান দু'খানা সুন্দর ভাবে রেকর্ড করিয়েছেন। এর বিষয়বস্তু প্রত্যেকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হবে। প্রথমটি 'ধান কাটার গান'।···বর্ষা দিনের মেঘ-মেদুর আকাশের দিকে চেয়ে পল্লীদয়িত ও দয়িতার মনে যে আনন্দ সঞ্চারিত হয়, দ্বিতীয় গানটি তারই এক অপরূপ ছবি। এই রেকর্ডটি প্রত্যেকের ভাল লাগবে।

GE 24877—"চুপ চুপ লক্ষীটি" ও "এই পৃথিবীতে সারাটি জীবন।" সর্বজনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুজ অমল মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যে শিল্পী ও সুরকার হিসাবে সংগীত-জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এর গাওয়া গান দু'টির মধ্যে একটি হ'লো ঘুমপাড়ানী ছড়া। অপরাজেয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া অনিল দাশগুপ্তের এই রচনাটি শিশু-মনকে মুগ্ধ ত' করবেই, বড়রাও গানটি শুনে সমান আনন্দ অনুভব করবেন। শিল্পীর অপর গানটি আধুনিক—রচনা কল্যাণ দাশগুপ্তের, সুরারোপ হেমন্তকুমারের।

GE 24878—"মধুবনে এলো শ্যাম" ও "এমন করে কেন সাজালে আমায়।" আশা করি, কুমারী ইলা চক্রবর্তীর পরিচয় নতুন ক'রে আর দিতে হবে না। কি আধুনিক, কি রাগপ্রধান, কি ঘুমপাড়ানী ছড়া সকল রকম গানেই এই শিল্পী সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রখ্যাত সংগীত-পরিচালক গোপেন মল্লিকের পরিচালনায় গীতিকার পবিত্র মিত্রের এই হোলীর গান দু'টি শিল্পীর সুনাম আরও বাড়িয়ে দেবে বলেই আমরা আশা করি।

GE 24879 to GE 24881—"নতুন খেলা" (ছয় খণ্ড)। শ্রীদেবেশ দাশ রচিত ও শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক পরিচালিত পশ্চিমবংগ সরকারের লোক-রঞ্জন শাখার শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত ও গীত রেকর্ড।

যন্ত্র-গীতি

N 87547—'এতো আলো আর এতো হাসি গান' ও "তুমি আর আমি শুধু।" নবাগত যন্ত্র-সংগীতশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইলেক্‌ট্রিক গীটার এবারের একটি বিশেষ আকর্ষণ। অত্যন্ত জনপ্রিয় দু'খানা বাংলা গানকে—'এতো আলো আর এতো হাসি গান' এবং 'তুমি আর আমি শুধু'—গীটারে এমন দক্ষতার সঙ্গে তিনি রূপ দিয়েছেন, যা সকলকেই বিমুগ্ধ করবে। এ দু'টির সুর প্রখ্যাত শিল্পী ও সুরকার সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের।

GE 25838—বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (সরোদ)। সুর—"ঝিঁঝিট।" সুর—"মালুহা কেদারা।"

আমার কথা (৫৮)

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিখ্যাত হারমোনিয়ামবাদক]

দক্ষিণ-কলিকাতায় একটি বিশিষ্ট রাস্তার উপর পুষ্প-বৃক্ষ সজ্জিত 'সতী-সদন'। রবিবার সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলাম ভারত-বিখ্যাত এক সঙ্গীতজ্ঞের জীবনকথা জানার উদ্দেশ্যে। সাধনায় মগ্ন শিল্পী সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন : "১৯১৫ সালের মে মাসে ভাগলপুর সহরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করি। মাতামহ ৺হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় খুবই গান-বাজনা করিতেন। পিতৃদেব ৺সতীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদ, শ্যামাসঙ্গীত, দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গীত গাহিতেন ও তবলা বাজাইতেন। মাতা ৺নন্দরাণী দেবী।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যেঠামহাশয় ৺বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত পছন্দ করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে তবলা বাজাইতাম। মিত্র ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। অসুস্থ হওয়ার দরুণ আই, এ, পরীক্ষা দিই নাই। প্রথমে আবেদ হোসেনের নিকট তবলা শিখি—সেই সময় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রাইচাঁদ বড়াল ও হীরু গাঙ্গুলী তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতেন। ওস্তাদ মজিদ খাঁ সাহেব কিছুদিন শেখানর পর আরও অগ্রসর হইতে অসম্মত হওয়ায় ১৮ বৎসর বয়সে আমি হারমোনিয়াম বাজানর প্রতি আকৃষ্ট হই এবং শনি মহারাজের সাকরেদ শ্রীমুনেশ্বর দয়াল L. L. B র নিকট শিক্ষাধীন হই। ইনি হারমোনিয়ামে বিশেষ ভাবে রাগ, তাল আর ঠুংরী বাজাইতেন এবং উহাতে সুনিপুণ অঙ্গুলীচালনা (special Fingering) প্রবর্ত্তনা করেন। আর রামপুরের ওস্তাদ মোস্তাক হোসেন সাহেব উহার মাধ্যমে রাগরাগিণী সুষ্ঠুভাবে চালু করেন।

১১৩৭ সালে দয়াল সাহেবের নিকট তিন মাস শিখিবার পর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলন, বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েশন ও এলাহাবাদ সঙ্গীত-সম্মেলনে প্রতিযোগী হিসাবে অবতীর্ণ হইয়া হারমোনিয়াম বাদনে তিন স্থানে প্রথম স্থানাধিকারী হই। এলাহাবাদের অনুষ্ঠানে প্রথম হওয়ায় জন্য রামপুরের আহমেদজান (থেরোকোয়া) আমার সহিত তবলা সঙ্গত করেন—যদিও আমি তখন এ্যামেচার শিল্পী হিসাবে গণ্য হইতাম। বর্ত্তমানে তাঁহার নিকট আমার পুত্র মহারাজ ব্যানার্জি তবলা শিখিতেছে। প্রথম দিকে তাহাকে আমি স্বয়ং তবলা ও বর্ত্তমানে হারমোনিয়াম বাদন শিখাইতেছি। এছাড়া ভারতের বিশিষ্ট তবলাবাদকেরা আমার বাজনার সহিত সঙ্গত করিয়াছেন।

বাংলা দেশে সঙ্গীতাসরের promoter হচ্ছেন শ্রীপ্রণবেশ্বর সিংহ। প্রথম নিখিল বঙ্গ সম্মেলন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে ও কবিগুরুর প্রধান আতিথ্যে সিনেট হলে ১১৩৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ত্তমানে অল্পবয়স্কদের মধ্যে অমর ব্যানার্জি, দেবনাথ ব্যানার্জি ও গোবিন্দলাল গোস্বামী হারমোনিয়াম বাদনে নৈপুণ্য দেখাইতেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে হারমোনিয়ামের প্রথম প্রবর্ত্তনা করেন গোয়ালিয়ারের গণপত রাও ভাইয়াসাহেব। গয়ার "হারমোনিয়াম ঘরোয়াণা" সারা ভারতে চালু করেন ইঁহার শিষ্যরা। আর কলিকাতায় হারমোনিয়াম বাদন প্রবর্ত্তিত হয় মহীন্দ্র চ্যাটার্জির প্রচেষ্টায়। ভাইয়া সাহেবের মা ছিলেন বিশিষ্টা বীণকারিকা। এছাড়া গণপত রাও হচ্ছেন ঠুংরী গানের জন্মদাতা।

একবার খবর পেলাম যে, কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের পরিচালক মিঃ বোখারী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনায় বহির্বাঙ্গালার শিল্পীদের আনয়ন করিতে হয়। পাঞ্জাবের ঘরোয়াণার জনৈক বিখ্যাত তবলাবাদকের সহিত হারমোনিয়াম বাজাই মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য। শেষে ওস্তাদ নিজ অসুবিধার কথা উল্লেখ করে আমার বাজানর কথা বললেন বোখারী সাহেবের কাছে। পরে তাঁর কাছ থেকে আর কোন অনুযোগ শোনা যায় নাই।

প্রতি বৎসরে একবার আমি গয়ায় গিয়া আমার সঙ্গীতগুরু মুনেশ্বরজীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করি।"

সম্প্রতিকার সঙ্গীত-সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথায় মণীন্দ্র বাবু জানালেন যে, এগুলিকে Music-festival বলাই ভাল। কারণ, জনকয়েক ভারত-বিখ্যাত শিল্পীদের লইয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালার উঠতি-শিল্পীরা কিছুই শিক্ষা করিতে পারে না, তাদের সেই সমস্ত আসরে বাজাইবার বা গান করিবার কোন সুযোগ থাকে না। অর্থ-বিনিয়োগের মারফৎ অর্থাগম হইয়া থাকে। তৎ পরিবর্ত্তে এই সমস্ত ভারতবরেণ্য শিল্পীদের একক ভাবে কয়েক মাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আনয়ন করিয়া উদীয়মান ধীশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালী শিল্পীদের তাঁহাদের শিক্ষাধীনে রাখিলে এই প্রদেশ যথেষ্ট উপকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। সঙ্গীতানুরাগীদের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সঙ্গীতে হারমোনিয়ামের উপকারিতা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিলেন যে, রাগ অনুযায়ী গান শিখিতে হইলে ইহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ত বটেই উপরন্তু বরাবর তাল ও লয়ের মাধ্যমে সঠিক সঙ্গীত শিক্ষার জন্য বাদ্যযন্ত্র অপেক্ষা হারমোনিয়াম খুবই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে কলিকাতা ও বোম্বাইতে উৎকৃষ্ট হারমোনিয়াম তৈয়ারী হইয়া থাকে, সে কথাও তিনি জানাইলেন।

"মাসিক বসুমতী" পাঠক-পাঠিকাদের সহিত 'শিল্পী-পরিচয়' করাইতেছেন, ইহা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাল বলিয়া বোধ হয়। চুপি চুপি বলে রাখি, শ্রোতৃ ও সঙ্গীত মহলে—এই শিল্পী "মণ্টু ব্যানার্জ্জী" নামে সমধিক পরিচিত।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

মঞ্জু গল্প বলছিল। চার জোড়া কচি-কচি চোখ তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে। যে বলছে আর যারা শুনছে, সমান তন্ময় তারা। তবে যারা শুনছে তাদের চাইতে যে বলছে তার তন্ময় ভাবটা যেন কিছু বেশী। দেখলে একটু বিস্ময়ই লাগে! মনে হয়, গল্প বলার ভেতর আবার এতো ডুবে যাওয়ার কি আছে? কিন্তু মঞ্জু শুধু গল্প বলে না। মনের মত গল্প নিয়ে বসে বসে আরো মনের মতো করে গড়ে। তাই তার গল্প বলায় কিছুটা গল্প লেখার তন্ময়তা এসে যায়।

হ্যাপি প্রিন্স—সুখী রাজকুমার। তারই গল্প বলছিল মঞ্জু। গল্পের রচয়িতা অস্কার ওয়াইলড হয়তো মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। হয়তো মজা উপভোগ করছিলেন, তাঁর গল্প মঞ্জুর মুখে শুনে।

সুখী রাজপুত্র—কি তার রূপ, কি তার গুণ! দুঃখ কা'কে বলে জানে না। চোখের জল চেনে না। এক রাজ্যের লোকের সুখী করবার ইচ্ছার কাছে বিপদ ভয়ে দূরে সরে যাবে—এই ছিল সেখানকার মানুষের ধারণা। কিন্তু সেই রাজপুত্রই কি না বিয়ের রাতে মারা গেল!

ভীষণ ভাবে আপত্তি জানিয়ে উঠল—ঝুমুর, রিণু—নান্নু। এ্যা মা, গল্প হবে তবে কি করে।

পুরুষ-শ্রোতা দু'টি বাধা দিল। যেন কেন হবে না। এক রাজপুত্রের অভাবে কি পরমাসুন্দরী কন্যার গল্প বন্ধ হয়ে যেতে পারে?

দুঃখে মর্মাহত দেশ এক অপূর্ব মণিমুক্তায় তৈরী মূর্তি স্থাপন করলো শহরের এক উঁচু স্তম্ভের উপর। আর সেই উঁচুতে দাঁড়িয়ে সুখী রাজপুত্র প্রথম নিজের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চার দিকে তাকালো এতো দিন যারা তাকে দেখেছে, এখন সে দেখতে পেলো তাদের।

একদিন এক শীতকাতুরে সোয়ালো পাখী চলতে চলতে মূর্তিটি দেখে এসে বসল তার কাঁধের ওপর। বললো—আজ রাতটা আমি তোমার পায়ের নীচের ছোট্ট ফাঁকটুকুর গরমে আশ্রয় নেবো। আমরা চলছিলাম রোদের দেশের পানে। নদীর তীরে দুলছিল এক কৃশাঙ্গী লতা। তার সঙ্গে খেলতে গিয়ে দল ছাড়া হয়ে পড়েছি আমি। আজ আর চলতে পারছিনে। তোমার পায়ের তলার গরমে শরীরটা গরম করি।

বড় এক ফোঁটা জল এসে পড়ল তার গায়ে। আর এক ফোঁটা। আবারও। সোয়ালো তাকালো মূর্তির দিকে। আপনি কে? কাঁদছেনই বা কেন? জিজ্ঞাসা করল সোয়ালো।

—আমি সুখী রাজপুত্র।

—সুখী! তবে কাঁদছেন কেন?

—নগরের দুঃখ-দুর্দশা আমায় কাঁদাচ্ছে। নিজের সুখটাকে দিয়ে দেশটা দেখছিলাম—আমি অজ্ঞান ছিলাম, নির্বোধ ছিলাম। সোয়ালো, কি এখন ঘুমোবে?

—কেন মহাশয়?

—ঐ দেখ এক কবি। ওর দুঃখ আমি সইতে পারছিনে। শুনতে পারছিনে ওর গান—এই নিষ্ঠুর সমাজের বুকে।

কন্যা হবে দেহপণ্যা, লম্পটের ক্ষুধার ইন্ধন। ওকে তুমি আমার তলোয়ারের নীলকান্ত মণিটি তুলে দিয়ে আসবে?

সোয়ালো বিশ্রাম ছেড়ে শীতের আকাশে পাখা ঝাপটা দিয়ে উড়ল, নীলকান্ত মণি নিয়ে।

তার পরের দিন। আবার যাবার আয়োজন করছে সোয়ালো। শুনতে পেলো—আজ তুমি যাচ্ছ?

—হাঁ মহাশয়! আমার আত্মীয়রা এখন নীল নদের মিষ্টি রোদ পোহাচ্ছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল রাজপুত্র। ঐ দেখ টেবিলের কাছে একটি মেয়ে বসে বসে অবসন্ন হাতে, নিষ্প্রভদৃষ্টিতে সেলাই ফুল তুলছে। ঘরের এক কোণে তার পীড়িত উপবাসী ছেলে কাঁদছে একটি কমলা লেবুর জন্য। কিন্তু তার ঘরে জল ছাড়া কিছু নেই। আমার চোখের মণিটি যদি তুমি তাদের দিয়ে আসতে সোয়ালো!

—বড্ড ঠাণ্ডা। তবু আমি আজ থাকব এবং তোমার দূত হবো।

ফিরে এলো সোয়ালো নাচতে নাচতে। বললো—যদিও অসম্ভব শীত পড়েছে, তবু আমি বেশ গরম বোধ করছি।

—বন্ধু, তার কারণ তুমি একটা মহৎ কাজ করেছ।

পরের দিন আবার সোয়ালোর যাবার আয়োজনে আকুল হয়ে উঠল রাজপুত্র—সোয়ালো, সোয়ালো—আর একটি রাত কি তুমি থাকতে পারো না? ঐ দেখ, মেয়ে তার মাকে খাওয়াবার জন্য তার একমাত্র শীতের কোটটি বিক্রী করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরছে। তার শরীর সাদা হয়ে গেছে তুষারে। আমার অপর চোখের মণিটি তাকে তুলে দিয়ে এসো বন্ধু!

রাজপুত্রের এ চোখটি তুলে নিতে সোয়ালোর কান্না পেলো। অন্ধ হয়ে যাবে তুমি রাজপুত্র! তবু সে তা নিল রাজপুত্রের আদেশে।

পরের দিন কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে রাজপুত্র বললো—বন্ধু, তুমি কোথায়?

পায়ের কাছ থেকে কাঁপাগলায় উত্তর এলো—এই যে তোমার পায়ের কাছে।

—বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। এবার তুমি নীলনদের উদ্দেশে রওনা হও।

সোয়ালো রাজপুত্রের পায়ে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বললো—আর আমার যাওয়া হলো না। আপনি অন্ধ। আমি আপনাকে দেশের গল্প শোনাবো।

গল্প শোনায় সোয়ালো—শহরের গল্প। অন্ধকার পথে অনাহারক্লিষ্ট শিশুর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের বর্ণনা দেয়। বর্ণনা দেয় ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত মানুষের সারের। শেষে একদিন তুষারে-ঢাকা ছোট্ট শরীরটা তার জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রাজপুত্রের সোয়ালো সোয়ালো, প্রিয় আমার, এই আকুল ডাকেরও সাড়া মিলল না। রাজপুত্রের ধাতু-শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ফেটে পড়ল।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রিণু। কান্না থামল মঞ্জুর শেষ কথায়—দেবদূত গিয়ে ভগবানকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিষ উপহার দিল সোয়ালো আর রাজপুত্রের হৃদয় দুটি!

চোখ মুছে বললো—সবার দুঃখ আগে কেন রাজপুত্র দেখতে পায় নাই সী?

—অনেকখানি উপরে উঠলে তবে ও-সব দেখতে পাওয়া যায়। একরাশ ছাপানো চিঠি আর এনভেলাপ এনে মঞ্জুর টেবিলের উপর ফেলল অমিতা। বলল—নেমন্তন্নের চিঠিতে নাম-ঠিকানা লেখা হয়নি বলে বাবা ভীষণ রেগে গেছেন। আজ না হ'লে রক্ষে রাখবে না। আদ্দেক আমি নিয়েছি, বাকী আদ্দেক তোমাকে দিয়ে গেলাম। এই সাত দিন তোমার কলেজ বন্ধ রাখতে হবে। কাল থেকে নেমন্তন্ন করতে বেরুতে হবে। আজ নাম ঠিকানা লেখা শেষ করতে হবে। এই তোমার প্রতি পিতৃ-আদেশ, বুঝলে?

বুঝল মঞ্জু। অমিতা যতটুকু বুঝে বলে গেল, তার চাইতে অনেক বেশী বুঝল। হাসল সে। ওকে বলার কথা বাবা বৌদির মুখে বলে পাঠিয়েছেন মানে সেদিনের রাগ এখনও পড়েনি। পড়বার কথাও নয়। অমিতার কাছে ও শুনেছে, বাড়ীওলার সাথে শুধু যে অসম্ভব একটা তিক্ত সম্পর্ক চলেছে বাবার তাই নয়—কেস চলেছে কোর্টে। এমন অবস্থায় বাড়ীওলাকে জব্দ করবার এবং সমস্ত সুবিধা নিজের দিকে টেনে আনবার অভাবিত সুযোগ আপনা থেকে এসে গেল দেখে এটা তিনি সুসময়ের দান ভেবেছিলেন। হয়তো খুশীতে একা ঘরে হেসেওছিলেন। আর এমন হাতে আসা সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল কি না নিজের মেয়ের শত্রুতায়! ঈশ্বর-প্রেরিত ঘটনাটার সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না তিনি? কেস কি যতীন বাবুই করছেন, না ও পক্ষই করতে দিত? কেসটি ফাইল হওয়া মাত্র তার দরজায় ছুটে আসত রজতের বাবা। রজতের পাঁচ-পাঁচটা দাদা। পারিবারিক মর্য্যাদার প্রশ্ন। ছেলের প্রতি যত বিরূপই থাকুন, ছুটে আসতে হতোই। এই যতীন বাবুর হাতের মুঠোয়। প্রথমে শক্ত চাপে ধরে তারপর আস্তে আস্তে আলগা করতেন তিনি সে হাতের মুঠো।

উচ্ছেদ-মামলা তুলে নেওয়া—সে তো আছেই। হাঁ, কত বছর হয়ে গেল বাড়ী চূণকামকরা হয় না, রং হয় না। পুরোনো ঝরঝর পাম্প। জল টানে না। রোজ বিকল হয়। জলের কষ্ট—বাপের সঙ্গে ছেলেদের দৃষ্টিবিনিময় হতো। কি এসে-যেতো যতীন বাবুর তাতে? জলের কষ্ট যে কি কষ্ট, বাপ বুঝতো, ছেলেরা বুঝতো। কার্য্যসিদ্ধি করে নেওয়া এই তো ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই রাত্রেই গিয়েছিলেন থানায়। সাক্ষিসহ ডায়েরী করিয়ে এসেছিলেন। তার পরদিন যাচ্ছিলেন কোর্টে। ভাবতেও পারেন নি রজত নিজে মঞ্জুর কাছে উপস্থিত হয়ে এভাবে তার সব প্ল্যান ভেঙ্গে দিতে পারে। এ রাগ বাবার পড়তে চাইবে না। ক্ষোভ দূর হ'ত সময় লাগবে। ওর

উপর ক্ষুব্ধ ভাবটাও চলবে আরও কিছু দিন। বাবার এই রাগ, ক্ষোভ, ক্ষুব্ধ ভাব—কোনটাই অযৌক্তিক নয়। শত্রুকে বাগে পেলে কে ছাড়তে চায় জব্দ না করে? আর তা যদি ছাড়তেই হয় তবে কে না মানসিক যাতনা বোধ করে?

খুসী করতে হবে বাবাকে। এই সাত দিন কলেজে যাবে না। কাল থেকে বেরুবে নেমন্তন্ন করতে। কথা শুনবে লক্ষ্মী মেয়ের মতো যা বলেন বাবা। প্রথমে চিঠিগুলো ভাঁজ করে করে ভরল এনভেলাপের ভেতর। তারপর নামের লম্বা লিষ্টটা সামনে রেখে চলল ঠিকানা লিখে। এক সময় দু'পাশে এসে বসল রিণু আর ঝুমুর। ওদের কথা থেকে বুঝল ওদের দু' ভাইকে অমিতা তার চিঠি ভাঁজ করার কাজে লাগিয়েছে। তাই ওরা দু'বোন ছুটে এসেছে ওর কাছে। মঞ্জুকে সাহায্য করতে লাগল ওরা। সে কি মনোযোগ! একজন ঠিকানা লিখবার জন্য চিঠি হাতে তুলে দেয়। আর একজন লেখা হয়ে গেলে নিয়ে পাজা সাজায়। ঝুমুর পারে কিন্তু মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে পারে না রিণু। আজ ভাল সী এমন গজা ভেজেছে আর ওরা এত খেয়েছে যে রাত্রিতে আর খেতেই পারবে না। মা বলেছেন, নেমন্তন্ন করতে যাওয়ার সময় ওদের নিয়ে যাবেন। কি আর হবে, গাড়ীতে বসে থাকবে তো শুধু ওরা। দাদু বলেছেন, বিয়ের দিন বরযাত্রীদের আতর-ভেজানো বেলফুলের মালা পরিয়ে দেবে ওরা। হঠাৎ হেসে উঠল রিণু, ছোট্ট গলায়—দাদারা এমন বোকা! বলে কি সী, আমরা ও মালা পরাব।

লেখা এনভেলাপটা ঝুমুরের হাতে তুলে দিয়ে, রিণুর বাড়ানো এনভেলাপটা নিয়ে লিখতে লিখতে মঞ্জু বললো—এ জন্যে বোকা হ'ল কি সে?

—বোকা হ'লো না?

—কেন হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—ছেলেরা মালা পরায় না। এটা মার বলা। তারপর যেটুকু জুড়ে দিল সেটা ওর নিজের কথা। বলল, ছেলেদের কি ছেলেরা মালা পরায়? মেয়েরা পরায়।

—তা বটে! আমি পারি তবে?

—রিণু পিসির হাতে চিঠি তুলে দিতে দিতে গম্ভীর ভাবে বলল—উঁহু!

—কেন? ওর দিকে তাকাল মঞ্জু।

—কি বোকা তুমি সী! তুমি বড় যে!

—ও, বড়রা বুঝি মেয়ে হ'লেও মালা পরাতে পারে না?

—কি ক'রে পারবে? বিয়ে হয়ে যাবে না?

—তা না হয় হয়েই গেল বিয়ে। লেখা খামটা বাড়িয়ে দিল ঝুমুরের দিকে।

—উঁহু, যদি ছেলে ভালো না হয়?

—এ্যাঁ! হাতের কলম রেখে চেঁচিয়ে উঠল মঞ্জু—বৌদি, তোমার পাকা মেয়ের কথা শুনে যাও!

চা-খাবার হাতে ঘরে এসে ঢুকল মৌরী।—কি বলছিস রে রিণু?

—কিচ্ছু বলিনি ভালো সী!

মঞ্জুর মুখ ছোট্ট মুঠোয় চেপে ধরল রিণু। মুখ থেকে হাত টেনে সরাতে সরাতে মঞ্জু বলল—কিছু বলিনি! বসে বসে বড়দের কথা শোনা, দাঁড়াও বের করছি তোমার।

কালি-ভেজা আঙুলগুলো মাথায় মুছতে মুছতে বাঁ হাতে খাবার তুলে নিল মঞ্জু। চোখের ইসারায় ঝুমুরকে ডেকে ছুট দিল রিণু। হেসে উঠল দু' বোন।

—দেখ কেমন খাবার তৈরী করেছি, পারবি?

—কেন পারব না?

—ইস, কত করিস তো দেখি। আমরা কেউ ঘরে ঢুকব না বলে রাখছি।

—এখন কি? বিয়ের দিন দশেক আগে করব। সব তৈরী আছে আমার। যাবার আগে তোদের রান্না ক'রে খাইয়ে যাওয়া থেকে, ডিগ্রী প্রণামী দিয়ে বর বরণ করা পর্য্যন্ত।

—ভুরু কোঁচকালো মৌরী—ডিগ্রী প্রণামী দিতে হবে কেন?

—গয়নার সাথে সেফ-ডিপোজিট উল্টে তুলে রেখে দেবার জন্যে।

—রুচি, বুদ্ধি, বিবেচনা থাকলে, তা ও! টুং ক'রে একটা কাঁটা ডিসের ওপর রেখে বাঁ হাতে আবার খায় নাকি' বলে আবার দৌড়ে পালিয়ে গেল রিণু।

কিছু খাম মৌরীর দিকে ঠেলে দিতে দিতে মঞ্জু বলল—তোর কিন্তু এমন হাত গুটিয়ে বসে থাকার কিছু মানে হয় না। তোর বন্ধুদের নামগুলো অন্তত লিখে আমাকে সাহায্য করতে পারিস।

—দেব। গা ধুয়ে এসে নি।

হঠাৎ ছোটদের উল্লসিত কলবর ভেসে এল নীচ থেকে—কাকু, কাকু এসেছে। দু বোনও ছুটল নীচে। পিসীমা উঠলেন উলু দিয়ে।

তার পরের দুটো দিন একেবারে নাম সার্থক [illegible] বৃষ্টি নামাল আষাঢ়। উপুড় করে ঢেলে দাওয়া ধারায় ঝর ঝর ক'রে ঝরে চলল সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল, মুহূর্ত্তের জন্যেও না থেমো। কিন্তু যতীন বাবু সে জন্যে কোন কাজ থেমে থাকতে দিলেন না। বৃষ্টি যদি কালও বন্ধ না হয়, তার পরও না হয়? আষাঢ় মাস, অসম্ভব কি? এরই ভেতর ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন ক'রে চলল ওরা। ঠাকুর এসে ঠিক করে গেল রান্নার ঠিকে। ডেকোরেটার এসে বৃষ্টি-ঝরা ছাদের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ ক'রে গেল, কটা পাখা কটা কার্পেট, কত চেয়ার দরকার হবে।

যতীন বাবু বৃষ্টিটার ওপর বিরক্ত নন মোটেই। এই অন্ধকার দিন তাকে সামনে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের কথা বলছে। আষাঢ়ে বৃষ্টির ভয় তার ছিল। এমন বৃষ্টির পর সামনের দিন কটা শুকনো হ'তে বাধ্য।

বারান্দার জমা জলে, পাতলা পায়ের ছপছপ শব্দ তুলে মৌরী ওর আজকের বই দেখে রান্না করা মটন কাবাব পরিবেশন করে চলল, সবার ঘরে ঘরে। বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি! এমনি একটা বৃষ্টি সুদর্শন চায় বিশে আষাঢ় রাতের জন্যে। হাঁ, সে কথা ও লিখেছে ওকে জন্মদিনের সম্ভাষণে। চাওয়ার এত জোর ছিল, অতিথি কিছু আগেই এসে পড়েছে। ঠোঁটের ভাঁজটা দাঁতে চেপে ভিজে হাওয়ার ঝাপটায় শরীরটাকে শিউরে তুলে ঘরে গিয়ে ঢুকল মৌরী। খাটের ওপর বালিশে বুক চেপে মঞ্জু যেন কি লিখছিল। কলম রেখে উঠে বসল সে। মৌরীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রল, কি বলছেন সুদর্শন বাবু?

—সুদর্শন বাবু ! তিনি এসেছেন নাকি ?

—এসেছেন বলিনি। বলেছি, কি কথা হচ্ছে ?

—বুঝল মৌরী। মুখটাকে হঠাৎ গম্ভীর ক'রে ফেলল সে। বলল, কথা বেতারে হচ্ছে বুঝি ?

—মনের তারে হচ্ছে। ইথার-তরঙ্গ যে তরঙ্গের কাছে হার মানে। বেতার তরঙ্গ যে গতিতে বার্ত্তা পৌঁছে দেয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে যে বার্ত্তা নিয়ে আসে।

অন্ত কথায় চলে গেল মৌরী। তুই দুপুর থেকে উপুড় হয়ে লিখছিস কি ?

—লিখছি কোথায় ? হাত দিয়ে কাগজগুলো নাড়াচাড়া ক'রল মঞ্জু। চেষ্টা করছি। ভেবেছিলাম এক ফাঁকে গিয়ে বিতর্কটায় যোগ দিয়ে আসব। তা ঐ দেখ। আঙুল দিয়ে মৌরীকে খাটের ধারটা দেখিয়ে দিল মঞ্জু।

অসংখ্য ছেঁড়া কাগজে ভরে উঠেছে সে-জায়গাটা। মঞ্জু বলল—তবু পয়েণ্ট খুঁজে পাচ্ছিনে। মাথার ভেতর বিয়ে কথাটা থাকলে কোন কাজ হ'তে চায় না, তা নিজেরই হোক আর অন্তেরই হোক। মেঘটাকে কত বলছি—দাও না আমাকে কিছু যুগিয়ে—তা কেবল বোকার মত চোখের জল ফেলছে। বুদ্ধি নেই, কেবল ভাবে-ভরা ফানুস। কিন্তু চা কই, তোর মটন কাবাব কই ?

—নিয়ে আসছে বৌদি।

মঞ্জু বাইরের দিকে তাকিয়ে সেদিকেই চোখ রেখে বলে চলল—এই যে বৃষ্টি ! হয়ত এই বৃষ্টি লক্ষ্ণৌ শহরেও ঝরে চলেছে অবিরল ধারায়। ঝরে চলেছে সুদর্শন বাবুদের প্রাসাদ-বাড়ীর ওপর, তাদের গোলাপ-বাগিচার ওপর, কাচের সার্সি-দরজার ওপর। শোবার ঘরে লাল-হলুদে মেশানো ডানলোপিলো সেটটায় বসে আছেন সুদর্শন বাবু—হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সামনে চীনে শিল্পীর নিপুণ হাতের কাজ-করা চায়ের কাপ, তাতে সোনালী চা। সোনালী চা থেকে পাতলা কুয়াশার মত ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প। লেসের পরদা দুলিয়ে গোলাপ-বাগানের সহস্র গোলাপের গন্ধ-ভরা বৃষ্টিবিন্দু এসে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক স্প্রে-করা গোলাপ জলের মত। সামনের শূন্য কৌচটাকে শূন্য মনে হচ্ছে না। হাতটা কৌচের ওপর রেখেছেন না তো যেন রেখেছেন তোরই হাতের ওপর। তারপর ? কৌতুকে চোখ দুটো চক্‌চক ক'রে তুলে বাইরে থেকে মঞ্জু চোখ ফেরাল এবার মৌরীর দিকে।

মঞ্জু যে রোম্যাণ্টিক আবহাওয়াটা তৈরী করেছিল, তা যে মৌরীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কাঁপিয়ে না তুলছিল তা নয়। কিন্তু সুখের চাইতে দুঃখটাই যেন ওর হৃদয় মথিত ক'রে তুলল বেশী। ওর মনে হ'ল, মঞ্জু যেন এইমাত্র ওকে রেখে এল লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে। সে চলে গেছে, এখান থেকে, এ বাড়ী থেকে। সন্ধ্যার আঁধার নেবে আসবে, কুলায়ফেরা পরিচিত পাখীটা এসে বসবে ওদের জানালার ওপর। ঠোঁট দিয়ে ঝাড়বে পিঠ। মঞ্জু একা বসে বই পড়বে, নয়ত বসে থাকবে চুপ করে, সেই অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে-থাকা নারকেল গাছটার দিকে তাকিয়ে। নববধূ মমতা ওদের কাছে শুনবে ওরই গল্প, ওরই কথা। সাত দিন—আর সাত দিন এখানে আছে ও ওদেরই মাঝে, ওদের একজন হয়ে। এমন সন্ধ্যা, এই সম্পর্ক আর ফিরে আসবে না। টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়া চোখের জল রুধতে পারল না মৌরী।—আর সাত দিন পর, তুই কোথায় মঞ্জু, আর আমি কোথায় ?

—ঘা পড়ল মঞ্জুর বুকের ভেতর। গলার মাংসপেশীগুলো ফুলে কেঁপে বন্ধ হয়ে গেল ওরও। শব্দ ক'রে হেসে উঠল মঞ্জু।

—নাঃ, তুই একেবারে কিচ্ছু না রে দিদি ! কোথায় তোকে একটু আকুলতার মধুরতায় বিহ্বল ক'রে তুলতে চাইলাম, তা কি না উল্টো ফল হ'ল ! গুন্‌গুনিয়ে উঠল ও—অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভ'রে।

—আচ্ছা তুই চল না আমার সঙ্গে।

—কোথায়, তোর শ্বশুরবাড়ী ? পাগল না কি ?

—কেন হয়েছে কি তাতে ? আগে তো নিয়মই ছিল।

—সে নিয়ম কি তোর আমার মত বুড়ো মেয়েদের জন্তে ছিল ?

দরজা থেকে কথাগুলো শুনতে শুনতে অমিতা এসে ঘরে ঢুকেছিল। হাতের চা-খাবার টেবিলে নামিয়ে রেখে আশ্চর্য্য কণ্ঠে বলল—তোমার বিয়ের দশ দিন বাদে বাড়ীতে আর একটা বিয়ে, সে কথা ভুলে গেলে নাকি তোমরা ?

—মাথা ঝাঁকাল মৌরী—একটুও ভুলিনি। সাত দিন বাদে দুজনেই রওনা হয়ে পড়ব।

—কলেজ আছে না আমার ? চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিল মঞ্জু।

—পড়া-শুনা তো ছাই করিস ! . আজ নাটক, কাল এক্সকার্সন পরশু বিতর্ক, এই নিয়েই তো আছিস। আচ্ছা, দিল্লী আগ্রা বেড়িয়ে আসতে পাঠিয়ে দেব তোকে ?

—দিল্লী লক্ষ্ণৌ, আগ্রা ? দিল্লীর দরবার। মন্ত্রীতন্ত্র ! লোভনীয়, লোভনীয় আমন্ত্রণ। বাসর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরও যদি তোর মত না পালটায়, তবে ঠিক যাব।

—পালটাবে না, নিশ্চয়ই পালটাবে না। উঠে মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরল মৌরী।

অমিতা উঠে কাবাবের ডিস হাতে তুলে দিয়ে বলল—কি পাগল মেয়ে বাবা।

আর কাঁটা ফুঁড়ে কাবাব তুলতে গিয়েই মঞ্জুর মনে পড়ে গেল সেদিনের ফিরপোর ডিনার, ওর হাত থেকে হঠাৎ ছুরি

কাঁটা টেনে নেওয়া, বড় নোটের টুকরোকে ছোট ক'রে এগিয়ে দেওয়া।

রাত্রে চিন্তা করল মঞ্জু শুয়ে শুয়ে—ভদ্রলোকটিকে নেমন্তন্ন না করা অন্যায় হবে। দিদিকে কথাটা বললে কি বলতে পারে, সেটাই ভাবতে চেষ্টা ক'রল ও। সে নিশ্চয়ই বলে উঠবে—বেশ তো ছোড়দাকে পাঠিয়ে দে। কিন্তু সে নেমন্তন্নের কিছু অর্থ হয় না। নেমন্তন্ন করা উচিত ওর নিজের গিয়ে। কেনই বা যাবে না? ভয়? হাসল ও।

কিন্তু মমতাদের বাড়ী যত সহজে বের ক'রে মৌরীকে অবাক ক'রে দিয়েছিল, তত সহজে রজতের হোটেল খুঁজে বের করতে পারল না সে। এই তো গ্র্যাণ্ড হোটেল! কিন্তু ঢুকব কোথা দিয়ে? সব যে দেখতে পাচ্ছি দোকান। বারটা বাজে, লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। দলে দলে ভিতরে ঢুকছে, নানা দেশী, বিদেশী স্ত্রী-পুরুষ। এটাই কি তবে? দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়। সোজা এগিয়ে গেল ও। কি নামে খোঁজ করবে, ওদের বাড়ীওলার উপাধি কি, জেনে এসেছিল মঞ্জু। জিজ্ঞাসা করল—আর, গুপ্ত, কোন্ রুমে থাকেন? এতে জবাব না মিললে কিছুই আশ্চর্য্যের ছিল না। জবাব মিলল যে সেটাই আশ্চর্য্য। হয়ত রজত বলেই মিলল; তার মস্ত গাড়ী, ছিটানো বথ্‌শিসই তার কারণ। নাম শুনে মস্ত এক সেলাম ঠুক্‌লো সে। সেই ওকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করল রজতের কাছে। লিফ্‌টে উঠে ক' তলায় গিয়ে নামল, বলতে পারবে না মঞ্জু। বয়ের পেছনে গিয়ে, একটা বন্ধ দরজায় দাঁড়াল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বয় জানাল—দেখা হবে না।

—কেন, বেরিয়ে গেছেন?

—নাঃ। বলে আঙুল দিয়ে একটা লেখা দেখিয়ে দিল সে। মঞ্জু দেখল, একটা সাদা কার্ডবোর্ডে ছাপা হরফে লেখা—ডোণ্ট্ ডিসটার্ব। লেখাটা পাকা ব্যবস্থার, ইচ্ছামত খোলা যায় এবং টাঙানো যায়। ঘরে আছেন ভদ্রলোক, আর দরজা থেকে এসে মানুষ ফিরে যাবে তার সুবিধের জন্যে? উল্টো পক্ষের সুবিধে-অসুবিধে আছে না? ও ভাবল, গ্রাহ্য করবে না। ধাক্কা দেবে দরজায়। কিন্তু যদি বয় আপত্তি করে? সম্মান থাকবে না। কাগজের টুকরোয় নাম লিখতে গিয়েও থামল। রজত ওর নাম জানে না। একটু ভাবল সে।

তারপর নিজেদের বাড়ীর ঠিকানাটা লিখে বয়ের হাতে দিয়ে চলে এল মঞ্জু।

সন্ধ্যায় কাগজটা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল রজত। কেন তাকে ডাকা হয়নি, অস্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও গেল থেমে। তারই তো নিয়ম। এগারটার পর সে ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে, ডিনারের আগে পর্য্যন্ত তাই চলে। আর দরজায় ঝোলানো থাকে ঐ কার্ডটা। তাই সে জানতে চাইল—আবার আসবে কি না, বলে গেছে কিছু?

বয় জানাল, সে বলতে পারবে না। অন্য বয়ের হাতে দিয়ে গেছে। ডাক তাকে, এল সে। না মেমসাহেব কিছু বলে যায়নি।

পরের দিন—ডোণ্ট ডিসটার্ব লেখা কার্ডটা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে রেখে দিল। আর তার বয়—এটা খুঁজে না পেয়ে অফিস থেকে আর একটা এনে ঝুলিয়ে রাখল।

—আজও সেই কার্ডটা ঝুলছে? থমকে দাঁড়াল মঞ্জু। ভদ্রলোকটি ঘুমোন না কি এ সময়? ঘুমোন তো উঠবে! আর আসতে পারবে না সে। ব্লাউজ থেকে টেনে কলমটা বের ক'রে সেটা দিয়ে মঞ্জু টোকা দিল দরজায়। মনে আশা ছিল, তবু বিশ্বাস করতে না পারার আনন্দ নিয়ে অভিবাদন জানাল রজত—আসুন, আসুন।

ভেতরে ঢুকল না মঞ্জু। বলল—এখান থেকেই সেরে যাব।

—কেন?

—আপনারই নিষেধ ঝুলানো রয়েছে দরজায়।

মুখ বাড়িয়ে দেখে নিল রজত কার্ডটা। কি সর্ব্বনাশ!

—ভাগ্যিস আপনি ইংরেজী এটিকেটের ধার ধারেন না। আসুন, ভেতরে আসুন, আমি আপনার অপেক্ষায় বসে আছি।

—আমি তো বলে যাইনি, আজ আসব। ঘরে ঢুকল মঞ্জু।

—যদির ওপর। নিশ্চয় থাকলে তো দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকতাম। এই দেখুন। বলে রজত কাগজের ঝুড়িতে পড়ে থাকা কার্ডটা দেখাল ওকে। এটা সরিয়ে রেখেছিলাম। ওরা সাহেবের নিয়মের খবরটাই রাখে। অনিয়মের আগ্রহের খবর জানে না। বসুন।

ভেতরে ঢুকে মঞ্জু একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, চোখে বিস্ময় ঠেকে, এমন কিছু ঐশ্বর্য্যের চেহারা আজ আর বড় নেই। সিনেমার কাগজে আঁকা সেটাই চোখকে ধাতস্থ করে দেয়। এয়ার কণ্ডিসন ঘর। মেঝে থেকে দেয়ালের অর্দ্ধেক অবধি কার্পেট আর ভেলভেটে মোড়া। ঘরটা সবুজে সবুজময়। শুধু দুটো আলাদা করা খাটের বিছানা, সাদা সিল্কের বেড, বালিশ, তোষক। মাঝখানে থিয়েটারের স্টেজের মত এক দিকে নাইলনের ঘন কুচির পরদা টাঙ্গানো। সেই পাতলা আবরণ ভেদ ক'রে দেখা যাচ্ছে ওপিঠের ড্রেসিং টেবিল, আলনা, কাপড়-চোপড়, ট্রাঙ্ক জুতো। দিনের আলোবর্জ্জিত ঘরে নিয়নের স্নিগ্ধতা। কে বলবে, বাইরে এখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য জ্বলছে? দুটো দিন পর আবার আলোয় সহর ভরে গেছে। অজগরের মত রাস্তাগুলো তার ভিজে শরীর শুকিয়ে নিচ্ছে সেই রোদে।

—তারপর? আমার এই সৌভাগ্যের কারণ? ঝুঁকে বসল রজত।

—বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এলাম।

—কার? তোমার? বলেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর একবার পায়চারী করে বলল রজত—তুমি বলে ফেললাম বলে কিছু মনে করো না। আপনি বলতে তোমাকে আমার কষ্ট হচ্ছিল। বয়সে অনেক ছোট তুমি। কি বল, পারি তো বলতে?

—বেশ তো বলবেন। বিশে আষাঢ়, সামনের শুক্রবার বিয়ে। মঞ্জু চিঠি বাড়িয়ে দিল রজতের দিকে।

মঞ্জুর হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়ল রজত। ফের ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে রেখে দিল টেবিলের ওপর। একটা ঢিলে সিল্কের পাজামা আর পাঞ্জাবীর ওপর ড্রেসিং কোট চাপান তার। খালি পায়ে কার্পেটের ওপরেই হাঁটছিল সে। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে

ইংরেজী তারিখটা মনে মনে ঠিক করে নিয়ে বসল সে। বলল—নিশ্চয়ই যাব।

—ঠিক যাবেন কিন্তু। বলে এবার উঠে দাঁড়াল মঞ্জু।

—এ কি, উঠলে যে?

—এবার যাব আমি।

—বলো কি? উঠে পথ আগলে দাঁড়াল রজত। কিছু না খাইয়ে বাড়ী থেকে ছাড়ে না কি কেউ?

—এটা তো আপনার বাড়ী নয়?

—তাই সুবিধের অন্ত নেই। হুকুম করলেই হ'ল।

—তবু পাশ কাটাতে চেষ্টা ক'রল মঞ্জু। এটা কি খাবার সময় না কি?

—এটাই তো খাবার সময়।

—সে তো দুপুরের।

—তাই খাবে।

—পাগল না কি?

দু'হাত মেলে বাধা দিল রজত। বলল—বলছি বস।

—বাধ্য হ'ল ও বসতে। বলল—বড় জোর চা খেতে পারি।

—আচ্ছা বেশ তাই হবে। উঠে গিয়ে শিয়রের ফোনটা তুলে কি যেন কা'কে বলল রজত। তারপর তেমনি পায়চারী করতে করতে বলল—ক'দিন তোমার কথা আমি খুব ভেবেছি। তা অমন হয়। কি বল? তুমি কলকাতায়ই থাকবে তো?

—ক'দিনের জন্তে হয়ত লক্ষ্মৌ যেতে পারি।

—তোমার কর্ত্তা লক্ষ্মৌবাসী?

—এ্যা! এতক্ষণে বুঝল মঞ্জু, রজত ভুল বুঝেছে। বুঝতে পারে। ও তো কিছু বলেনি। মজা লাগল ওর। ভুলটাকে শোধরালো না সে।

বয় এসে ওদের মাঝখানের টেবিলটায় সাদা চাদর বিছালো। কাঁটা ছুরি চামচ চটপট হাতে সাজাল, প্লেট রাখল। চা ছাড়া কিন্তু কিছু খাব না।'

—কখনোই খেয়ো না।

—মে আই কাম্ ইন্? মিহি মেয়েলী কণ্ঠ ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল একটি সুবেশা, মেয়ে। গলা শুনে ভুরুতে যে ভাঁজটা ফেলেছিল রজত মেয়েটি এসে ঘরে ঢুকলে সে ভাঁজটা মিলিয়ে ফেলল সে। বলল—এস বস।

মঞ্জুর মনে হ'ল যেন এক ঝলক আগুন ঢুকল ঘরে। লাল শাড়ী, ব্লাউজ, চুড়ি, গলার মালা, রিবন, ঠোঁট—সব লাল। মেয়েটি ইংরেজীতে বলে উঠল—আমি দুঃখিত।

ঠাণ্ডা গলায় রজত বলল, বস। বসতে গিয়েও যেন একটু থামল সে। রজতের দিকে তাকিয়ে যেন অনুমতি চাইল—বসব?

কিন্তু বসল রজত কিছু বলবার আগেই। 'তার পর হঠাৎ।' জিজ্ঞাসা করল রজত। মেয়েটি তার ছোট্ট আয়নায় চুল ঠিক করতে করতে বলল—হঠাৎ হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হওয়াটা, হঠাৎ কেমন যেন তোমার একেবারে কমে এসেছে। তাই দেখতে এসেছিলাম ব্যাপারটা কি? একটা অর্থপূর্ণ চাউনি দিল মেয়েটি মঞ্জুর দিকে।

মঞ্জুও তাকিয়েছিল ওরই দিকে এক লক্ষ্যে। সামনে পেছনে সমান 'ভি' সেপের কাটা ব্লাউজ। বাহু, বুক পিঠ, কোমর প্রায় সবই বে-আবরু। রজতের দৃষ্টি ঘুরে এল দু' দু'বার মেয়েটির শরীরের ওপর।

—খাবে? বলব দিতে? গলার স্বরটা যেন নরম হয়ে এসেছে রজতের।

—ড্রিঙ্ক কোথায়? এদিক ওদিক তাকাল সে—হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! লাঞ্চ খেতে বসেছে—উইদাউট ড্রিঙ্ক! আমাকেও তাই অকার করছ?

এবার মঞ্জু উঠে দাঁড়াল সোজা। আর রজতের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, তোমায় এমন ডিসটার্ব করলাম বলে, আমি সত্যি দুঃখিত। আজ দরজায় দেখলাম তোমার সেই—ডোণ্ট ডিসটার্ব কার্ডটা ঝুলছে না। একটু হাসল সে—আজই যে তুমি বেশী ডিসটার্বড হবে, এ আমি বুঝব কি ক'রে?

সে পেছন ফিরতেই রজত জিজ্ঞাসা করল—টাকা আছে তো সঙ্গে?

ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে উঠল মেয়েটি—ধন্যবাদ! এ জন্তেই তোমাকে এত ভালো লাগে রজত!

ড্রয়ার খুলে কি দিল রজত সেই জানে। হাসিমুখে চলে গেল মেয়েটি। মেয়েটির চলে যাওয়ার সময়টুকু অপেক্ষা করল মঞ্জু—তারপর সে-ও হাঁটা দিল। রজত এবার আর বাধা দিল না, শুধু বলল—চল তোমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

—গাড়ী? আপনি, বুঝি মনে করেন বাঙলা দেশের সবারই গাড়ী আছে?

—আমার গাড়ী তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—ধন্যবাদ! আমি গাড়ীতে চড়িনে।

জবাবের কাঠিন্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রজত। [ক্রমশঃ।

যশের জন্ত লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

······যদি এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উদয়ভানু
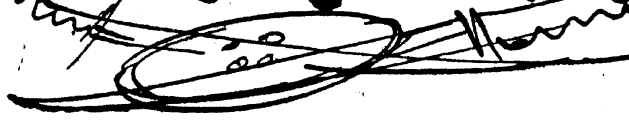
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত নয়, কুমারবাহাদুরের আশাবৃক্ষে ফল ধ'রেছে। সেই বিষফলের বাস্তব রূপ যে এত ভয়ঙ্কর—তেমন আশা করেননি। চিত্রার্পিতের মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন কাশীশঙ্কর—দূরে বিস্তৃত অরণ্যময় তীরভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। মনে যেন দ্বিধা উপস্থিত হয়। চোখে যেন কুয়াসাজাল দেখছেন। গঙ্গার জলে তখনও শেষবেলার সূর্য্য-আলো চাকচিক্য তুলছে। রূপালী রেখা এখানে সেখানে, জলকল্লোলে হেসে হেসে উঠছে। গঙ্গার বুকের 'পরে তখনও ধোঁয়ার কুণ্ডলী থমকে আছে—বন্দুকের জলন্ত বারুদ ছুটতে ছুটতে ফুরিয়ে গেছে। ধূম্ররেখা দূর থেকে দেখায় যেন কাশফুলের মত। আশে-পাশে ক'খানা ছিপ আর পানশি, মধ্যাহ্নের অবসরে তীরে বাঁধা। গোলাগুলীর ঘন ঘন বজ্রধ্বনি শুনে মাঝিরা সজাগ হয়ে ওঠে। ছিপ আর পানশি ক'খানা আরও দূরে পালিয়ে যায়। মানুষের কলরোল শোনা যায় মধ্যে মধ্যে। জোয়ারের তুফান-ঢেউ আসছে যেন, এমনই ভয়ার্ত্ত কলরব ভেসে ভেসে ওঠে যখন তখন।

তীরে গভীর অরণ্য। আলোক প্রবেশের ছিদ্র নেই কোথাও। সবুজের গিরিশ্রেণী—যার সীমাশেষ খুঁজে মেলে না। মধ্যাহ্নের আলো অস্ফুট। ভয়ভীরু পশুপাখী ডাকাডাকি করে। কাকের ঝাঁক সভয়ে উড়তে থাকে। কত লক্ষ লক্ষ পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ ঐ বনমধ্যে বাস করে, কে জানে! অরণ্যানীর স্তব্ধতায় বন্দুকের দারুণ শব্দ স্তিমিত হয়ে যায়। শুধু ঐ ধূম্রকুণ্ডলী গঙ্গার বুকে যত্র-তত্র থমকে আছে। বারুদের এক তীব্র বিষাক্ত গন্ধ ছড়িয়েছে বাতাসে।

পাষাণের মূর্ত্তি যেন কাশীশঙ্করের। স্থান-কালের স্মৃতি হারিয়েছেন। দীর্ঘ দুই চোখে পলক পড়ছে না কতক্ষণ! বজরা গতিহীন, কিন্তু চঞ্চল দোলা তার থামবে না যেন কখনও। মূর্ত্তি তাই টলায়মান।

—আমাকে এই স্থানেই পরিত্যাগ কর'।

কম্পমান কণ্ঠস্বরের কথা শুনে কাশীশঙ্করের সম্বিৎ ফিরলো যেন। তিনি দৃষ্টি ফিরালেন। দেখলেন, বজরার দুয়ারের আড়াল থেকে বিন্ধ্যবাসিনীর থমথমে মুখখানি কথা বলছে। রাজকন্যা খানিক থেমে আবার বললেন,—ভাই, আমার জন্য তোমার বিপদ হয়, আমি তা চাই না। তোমরা ফিরে যাও সুতানুটিতে, আমি থাকি।

দুঃখের মধ্যে হাসি ফুটলো কুমারের ওষ্ঠপ্রান্তে। বললেন,—কোথায় থাকতে চাও তুমি ভগিনি!

ঠোঁট দুটি থরথর কাঁপছে ভয় আর আবেগে। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—এই পবিত্র গঙ্গাগর্ভে ঠাঁই হবে আমার। তুমি আর কালবিলম্ব কর কেন কুমারবাহাদুর!

আরও একটু হাসলেন কাশীশঙ্কর। তাঁর এই অর্দ্ধস্ফুট হাসি কেমন যেন অর্থপূর্ণ, রহস্যময়। কুমারবাহাদুর বললেন,—স্থির হও ভগিনি! তুমি কক্ষমধ্যে থাকো, অধৈর্য্য না হও।

—মিছা অশান্তিতে তুমি কি শেষটায় মৃত্যু বরণ করতে চাও?

বিন্ধ্যবাসিনীর কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্নের কঠোরতা ফুটলো যেন। রাজকুমারী বজরার দুয়ার ত্যাগ করেন না। একটি পাল্লা ধরে আছেন, অবশ দেহের ভার লাঘব করেন হয়তো।

—ভগিনি, তোমার জন্য তাই যদি করি ক্ষতি কি? হেসে হেসে কথা বলছেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—একটা ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিবাদে আমি এই নরদেহটাকে বিসর্জ্জন দিতে পিছপাও নহি। একটা' মানুষের জীবনের কি মূল্য আছে?

রাজকুমারীর বুকে শিহরণ কাঁপতে থাকে। কুমারবাহাদুরের কথায় তিনি খানিক স্তব্ধ থেকে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন,—তোমার স্ত্রী আর কন্যা আছে, সাজানো সংসার আছে, রাজমাতা এখনও জীবিত আছেন—ভুলে যাও কেন?

রাজকন্যা কথায় যুক্তি তুললেন। কুমারের পিছুটানের নাম-নজীর বললেন। প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী, স্নেহময়ী মা, পুতুলের মত একরত্তি মেয়েটা, তাদের যেন মন থেকে মুছে ফেলেছেন কাশীশঙ্কর। ভুলে গেছেন তাদের অস্তিত্ব। সুতানুটিকেই যেন বিস্মৃত হয়েছেন।

সামান্য হাসলেন কুমারবাহাদুর। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের হাসি যেন। আবার তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখভাবের পরিবর্ত্তন হয়, হাসি মিলিয়ে যায় ভ্রূ-কুঁচকানো চিন্তাজ্বরে।

তীর থেকে তীরের বেগে, সর্পগতিতে শত্রুপক্ষের ছিপখানি ভেসে আসছে। বজরার যত নিকটে আসতে থাকে তত যেন উদ্বেগে অধীর হ'তে থাকেন কুমারবাহাদুর। বজরার অভ্যন্তরে অস্ত্রঘরে ঝনঝন শব্দ চলেছে। লেঠেল জগমোহনের ব্যবস্থাপনায় মাঝির দল হাতে অস্ত্র তুলছে। দূর আর সমুখযুদ্ধের উপকরণের সাজ পরছে তারা। কোমরে অসি আর হাতে বন্দুক তুলছে।

ছিপখানি তীরের বেগে আসতে আসতে বজরার বুকে এক আঘাত করলো। তারপর একপাক ঘুরে বজরার পাশাপাশি ভাসলো। ছিপে আট জন মাল্লা। অত্যন্ত' ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অবিরাম হাত চালিয়েছে তারা। বৈকালিক সূর্য্যের আলোয়

কিছুতে আর মন ভরে না
বাদল আসে ছেয়ে
দুষ্টু আমার মিষ্টি হল
কোলে লজেন্স পেয়ে॥
কোলে
লজেন্স ও টফি
Hb
প্রস্তুত কারক
কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০
Kolay
CONFECTIONERY

পেশীবহুল দেহে স্বেদবিন্দু চিকচিক করে। যেন যাযতেল মেখেছে দেহে। মাল্লাদের পিঠে দেশী বন্দুক একটা একটা। চামড়ার বন্ধনীতে বাঁধা।

ছিপের এক প্রান্তে এক জন। হয়তো কৃষ্ণরামের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। জমিদারের দূত। গোলাপী রেশমের চাপকান, মাথায় সাদা গরদের পাগ, চাপ পায়জামা, পায়ে জরির নাগরা। বক্ষে বাহুতে আর দুই পায়ে লৌহসারের বর্ম। পাগড়ীতে একটা হীরা-পান্নার ধুকধুকি—সাদা পালখ বাতাসে ফরফর করছে। প্রতিনিধির কপালে লাল চন্দনের তিলক না জরটিকা বলা যায় না। তার দুই কানে দু'টা হীরার টাপ। চোখে সুর্মারেখা। মুখে যেন ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি।

কৃষ্ণরামের প্রতিনিধি লাফাতে লাফাতে ছিপ থেকে শেষে এক লাফে বজরায় উঠে পড়লো। একটা নামমাত্র সেলাম ঠুকে বললে সহাস্তে,—আমাদের গৃহবধূকে আপনি কি কারণে হরণ করবেন? আমাদের জমিদার মশায়ের এটা প্রথম প্রশ্ন।

কাশীশঙ্কর হাস্যভরা মুখে প্রতিনিধিকে অভিবাদন জানালেন। বজরার এক কক্ষে স্বাগতম্ জানালেন তাকে। হাসতে হাসতে বললেন,—কি সৌভাগ্য আমার! কি সৌভাগ্য আমার! আপনার ন্যায় এক সজ্জনের পদার্পণ হয়েছে এই অধমের বজরায়।

কথায় কর্ণপাত করে না প্রতিনিধি। বজরার ঘরে একটি বেতের কেদারায় আসন নিয়ে ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে বললে,—মহামহিম কৃষ্ণরামের দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমাদের কুলবধূ রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী, যিনি আপনার পিতা মৃত রাজাবাহাদুরের ঔরসজাত কন্যা, তাঁকে মহাশয় আপনি সঙ্গে লয়ে যেতে পারেন, তৎপূর্ব্বে কুলীন-কুলগুরু জমিদার কৃষ্ণরামের সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে কি সম্মত ও প্রস্তুত আছেন?

মৃদু হাসির সঙ্গে কাশীশঙ্কর বললেন,—হাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। তবে বিনা অস্ত্রে না অস্ত্রসহ সেই কথাটি জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন।

প্রতিনিধি গোঁফের সূক্ষ্ম প্রান্তে পাক দিতে দিতে বললে;—অস্ত্রধারণের বাধা নাই, কৃষ্ণরাম হাতাহাতি মল্লযুদ্ধের পক্ষপাতী নহে।

—অস্ত্রের পরিচয়টা ব্যক্ত করেন। কুমারবাহাদুর বুকভরা শ্বাস টেনে বললেন। একটা হাই তুললেন বিনিদ্রার; টুস্কি দিলেন কয়েকটা ওষ্ঠমুখে।

—অসিযুদ্ধ! প্রতিনিধি একটি শব্দ ব'লেই ক্ষান্ত হ'লেন। বেতের কেদারায় শরীর এলিয়ে দিলেন। পায়ের 'পরে পা তুলে পা নাচাতে থাকলেন।

—আমি প্রস্তুত আছি। কুমারবাহাদুর বললেন সাবলীল কণ্ঠে। কথার শেষে কক্ষমধ্যে পায়চারী করতে থাকেন সশব্দ পদক্ষেপে।

পার্শ্বকক্ষে রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী। রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনছেন দুইজনের কথা বিনিময়। দ্বন্দ্বযুদ্ধ! সমুখযুদ্ধ! অসিযুদ্ধ! রাজকুমারীর শ্বাসগতি যেন থেমে গেছে চিরদিনের মত। অঙ্গে অঙ্গে কম্পন ধরছে অব্যক্ত ভয়ে। মনের যেন চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। দুই কোঁটা তপ্ত অশ্রুবিন্দু টল টল করছে দুই চোখের পাতায়।

—মহাশয়, পুনরায় একবার মনে মনে খতিয়ে দেখেন, মহামান্য কৃষ্ণরাম অসিযুদ্ধে আজও অদ্বিতীয়। তবু তো কত কাল অসি ধরেন না হাতে।

—আমি যে অদ্বিতীয় এমন কথা সত্য নহে। আমারও অনভ্যাস। কাশীশঙ্কর পাদচারণা থামিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন। বললেন,—তবে কৃষ্ণরামের আবেদন অগ্রাহ্য হোক, তাও চাহি না।

—আবেদন! ভুল কথা বলেন কেন? প্রতিনিধি ঘোর প্রতিবাদের সুরে বললেন। সন্ধানী চোখে ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে বললেন,—আবেদনের পরিবর্তে বলেন আদেশ।

—সেই কথাতেই যদি মহাশয় প্রসন্ন হন তবে ধ'রে লওয়া হোক কথাটা কৃষ্ণরামের আদেশ। সজোরে হাসতে হাসতে কুমারবাহাদুর বললেন।

—যুদ্ধক্ষেত্র কোন স্থানে হোক, কুমারবাহাদুর আপনার অভিলাষ ব্যক্ত হোক।

বাম হাতের মুষ্টিতে নিজের চিবুক ধ'রে ভাবতে ভাবতে বললেন কাশীশঙ্কর,—যুদ্ধক্ষেত্র আমার এই বজরার ছাদেই যদি হয়?

কক্ষে নীরবতা থমকে থাকে খানিক। প্রতিনিধি হাঁ এবং না কিছুই বলতে পারে না। কৃষ্ণরামের সম্মতি বিনা কথাও দেওয়া যায় না।

এক খণ্ড ঝড়ের মত দুজন মাল্লা এসে সহসা প্রতিনিধির মুখে এক লাল বস্ত্রখণ্ড চেপে ধরলো এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্ত রজ্জুতে বেতের কেদারার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে।

জগমোহনও এলো যেন এক অগ্নিগোলকের মত। কুমারবাহাদুরের ডান হাতের সবল কব্জি ধ'রে এক হ্যাঁচকা টান মা[illegible]। বললে,—কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন কুমারবাহাদুর? উত্তর শো[illegible]র প্রতীক্ষা করে না জগমোহন। বেতের কেদারাসমেত রুদ্ধবাক মানুষটিকে তুলে বজরার জানালা থেকে জলে ছেড়ে দেয় অতি সন্তর্পণে। বিদ্যুতের বেগ যেন জগমোহনের চলাফেরায়। জানালার বাইরে নিজের দেহটা গলিয়ে দিতে দিতে ফিসফিস বললে,—ডুব-সাঁতার দিয়ে যাবো হুজুর, তলা থেকে ছিপখানকে উলটে দেবো এই মাঝদরিয়ায়।

বজরার একদিকে জগমোহন। বিপরীত দিকে কৃষ্ণরামের প্রতিনিধির ছিপ। ওদিক থেকে এদিক দেখা যায় না। ছিপের মাল্লারা এই নেপথ্য দৃশ্য দেখতে পায় না।

জলে ডুব দেওয়ার আগে জগমোহন হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে শেষ কথা বললে,—ছিপখান হুজুর উলটানোর সঙ্গেই বজরা ছাড়তে হবে। বিলম্ব না হয়। আমি ডুব-সাঁতারে ফিরে ঠিক ধরবো আপনার বজরা। মাঝিদের সমঝে দিয়েছি আগেই। হুজুর, আমার কথার যেন অন্যথা না হয়।

কথা শেষ হওয়া মাত্র জলে ডুবলো জগমোহন। ধরাপড়া মাছ যেন হাত ফসকে জলে পড়লো আবার। কুমারবাহাদুর কাশীশঙ্কর কেমন যেন হতচকিতের মত হতভম্ব হয়ে পড়েন। ছায়ার মত একটি দৃশ্য দেখলেন তিনি। মুখে কথা ফুটলো না একটিও। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনার আরম্ভ ও শেষ দেখলেন চোখের সমুখে।

—বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। মিহিসুরে আবার কথা বললেন রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী। তিনি অলক্ষ্যে থেকে সবই দেখেছেন গুপ্তচোখে। বললেন,—ভাই, জগমোহনের কথামত কাজ কর।

জমিদারের কথায় কান দিও না। সে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বিচার-বিবেচনা নাই তার, একটা অমানুষ। জগমোহনের কথাই থাক।

ছিপের 'পরে আট জন শক্তসমর্থ মাল্লা। তবুও জলের তল থেকে জোয়ালো ধাক্কায় টলমলিয়ে দুলে উঠলো ছিপখানি। চকিতের মধ্যে আড়াআড়ি পাশ ফিরলো আর অতলে তলিয়ে গেল। গঙ্গার জলে একটা আলোড়ন আবর্ত তুললো।

বজরার মাঝির দলও সেই মুহূর্তে হাল চালনায় লাগলো। সর্দ্দার গলুই ছেড়ে কখন উঠে পড়েছে। হাতে তার শঙ্কর মাছের একটা লকলকে চাবুক। বজরার মাঝিদের মাথার ওপর চাবুকের পাক ঘোরাতে থাকে সর্দ্দার-মাঝি। শোঁ শোঁ শব্দ হয় চাবুকের। কর্তব্যকাজে অবহেলায় পিঠে চাবুক পড়বে মাঝিদের। গুরুভার বজরা ভেসে চললো আবার। জলের বুকে হালের ঘন ঘন ছপাছপ শব্দের সঙ্গে জলের নৃত্য চললো যেন।

তীরে, অরণ্য মধ্যে হিংস্র বাঘের মত যেন ওৎ পেতে বসে আছেন কৃষ্ণরাম—উচ্চ গাছে বাঁধা মাচায়। শিকার ধরবেন তিনি আজ। চোখে দূরবীণ তুলে সাগ্রহে লক্ষ্য করছেন দূরের ছবি। দেখলেন, ছিপখানি তলিয়ে গেল গভীর জলে! কেমন যেন বিস্মিত হলেন কৃষ্ণরাম। কিছুই ঠাওরাতে পারলেন না। আবার দেখলেন, বজরা আর থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে বেশ দ্রুতগতিতে, দক্ষিণ অভিমুখে।

কপালে এক করাঘাত করলেন জমিদার কৃষ্ণরাম। ভেরী বাজাতে থাকলেন বার বার। দেশী বন্দুক আবার গর্জ্জে উঠলো—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম।

ভীত হয়ে উঠলো কাকের ঝাঁক। সভয়ে আকাশে উড়লো আকাশফাটা শব্দের তাড়নায়। বনের পশুপাখী ডাক দিয়ে উঠলো। বন্যশূকর আর শিয়ালের দল ছুটাছুটি করতে লেগে যায়। শজারু আর শশকরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাখীর বাসায় শাবকপাল আর্ত্তডাক ডাকে।

ছিপের মাল্লারা কেউ কেউ ভেসে উঠলো। মাথা তুললো। কিন্তু জল কাটবে না অস্ত্র ধরবে তারা। বজরা এগিয়ে চলেছে। গুলীবারুদ উপেক্ষা করছে যেন সদম্ভে। রাশি রাশি আগুনের ফুলের স্তবক ছুটতে ছুটতে আসছে আর গঙ্গাগর্ভে পড়ছে।

কালীশঙ্কর কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দেখলেন, জলে কলসী ভাসছে যেন কয়েকটি। কালো কালো মাথা শত্রুপক্ষের মাল্লাদের। কালীশঙ্কর তাদের একেক জনকে লক্ষ্য রেখে বন্দুক দাগতে থাকেন। অর্জ্জুনের দৃষ্টি ফুটেছে যেন চোখে—কুমারবাহাদুর কালোমাথা ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না।

নর্ত্তকীর দল যেন জলনৃত্য নেচে চলেছে। বজরার মাঝিদের হাল চলেছে সমতালে। একটি ছন্দে বাঁধা সুরের লহরা খেলছে জলে। গঙ্গার ঘোলাটে জল লাল আলতা ভাসছে। ঘোর লাল রক্ত। গুলীবিদ্ধ মাঝিদের দেহ থেকে রক্ত ঝরছে জলে। হোলী খেলায় মেতে উঠেছে কারা যেন।

খাসপতন থেমে আছে কুমারবাহাদুরের। আবার যদি আক্রমণ চলতে থাকে। তীর থেকে উড়ে আসে যদি রাশি রাশি

অগ্নিপিণ্ড! নবাব-নাজিমের কাছে যদি নালিশ যায় রাজকুমারের বিরুদ্ধে! গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয় যদি কাশীশঙ্করের নামে, খুন আর অপহরণের দায় দেখিয়ে!

সর্দ্দার-মাঝি চিৎকার করছে আর মাঝিদের মাথার 'পরে শঙ্কর মাছের চাবুকের পাক দিয়ে চলেছে। সর্দ্দার বললে,—কিনারা বরাবর চল'। বন্দুক লাগলে গায়ে লাগবে না আমাদের।

আকাশ-বাতাস থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। গগন-বিদারক শব্দ গালাবন্দুকের। থামছে না আর। দ্রুতগামী বজরার আশে-পাশে ছুটে এসে পড়ছে আগুনের গোলা। কুমারবাহাদুর দেখলেন, ছিপখানির একপ্রান্ত মাথা তুলেছে জলে। ছিপের মাল্লারা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে, সভয়ে পালিয়ে যায় তারা। যারা আহত তারা তলিয়ে যায় জলের গভীরে।

কৃষ্ণরাম যদি বাঙলার নবাবের দরবারে ফরিয়াদ করে! যদি মকদ্দমা ঠুকে দেয় একটা—কাশীশঙ্করের চিন্তার শেষ নেই যেন। কৃষ্ণরামের অসাধ্য কিছুই নেই।

—দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, বিপদতারিণী মা আমার! বজরার নির্জন কক্ষে আপন মনে স্বগতঃ করেন বিন্ধ্যবাসিনী। দুর্গানাম জপ করতে থাকেন।

জগমোহন কৈ কোথায়! কুমারবাহাদুর চোখের দৃষ্টি চালিয়ে চালিয়ে সন্ধান করেন তার। জলচর জীব আছে গঙ্গায় অসংখ্য। কাশীশঙ্করের ভয় হয়; কুমীর কিম্বা হাঙরের আক্রমণের ভয়।

—লেঠেল জগমোহনের পাত্তা নাই কেন সর্দ্দার? কুমার-বাহাদুর সরবে প্রশ্ন করলেন। বললেন,—তাকে হয়তো আর দেখতে পাবো না। আর হয়তো জীবিত নাই সে।

সেই মুহূর্তে বজরার একপ্রান্তে টান পড়লো জলতল থেকে। মাথা তুললো জগমোহন। ঘন ঘন হাঁফে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যেন। কথা নেই মুখে। বজরার 'পরে উঠে পড়ে সে। তার দেহ থেকে জলের ধারা নামে।

কুমারবাহাদুর খুশীর হাসি হেসে বললেন,—এসো জগমোহন! সিক্তবস্ত্র ত্যাগ কর'। জিরেন নাও খানিক। এক ঘটি দুগ্ধ পান কর'।

কান নেই কুমারের কথায়। জগমোহন চেঁচিয়ে উঠলো সহসা। বললে,—সর্দ্দার, বজরা আরও জোরে চালাতে বল'।

জগমোহন যেন ত্রাণকর্ত্তা। সর্দ্দার তার কথামত কাজে নির্দ্দেশ দেয়। বজরার গতিবৃদ্ধি হতে থাকে।

রাজকুমারী কক্ষ থেকে মুখ দেখিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন,—জগমোহন, তোমাকে সোনার হার দেবো আমি। নগদ একশো মোহর।

—সবই তো আমার রাজকুমারী। সিক্তদেহ মুছতে মুছতে কথা বলে লেঠেল। হেসে হেসে বললে,—সুতানুটিতে না যাওয়াতক আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তারপর দেওয়া-নেওয়ার কথা হবে। রাজমাতার কাছ থেকে আমি দু'দশ কাঠা জমি ভিক্ষা করবো। ঘর তুলবো, বাসা বাঁধবো।

—বেশ কথা। আমি তখন তোমার পক্ষ নেবো। বিন্ধ্যবাসিনী কথা দিলেন। ভাণ্ডার ঘরে সিঁদিয়ে গেলেন। আহারের পাত্র সাজাতে বসলেন। সর্ব্বাগ্রে ঐ লেঠেলকে খাওয়াতে হবে, অনেক পরিশ্রম করেছে সে। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেছে পরহিতে।

—কি বল, জগমোহন, আমরা এক্ষণে বিপদের এলাকা ছেড়ে এসেছি। আর কোন ভয় নাই। কাশীশঙ্কর কথা বলতে বলতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন। পড়ন্ত বেলায় সূর্য্যতাপে তিনি দরদর ঘামছেন। উত্তেজনার আধিক্যে যেন এখন কেমন নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছেন! ঘন ঘন শ্বাস ফেলছেন।

নর্ত্তকীদের নৃত্যের তাল থামবে না আর। ঘন ঘন হাল চালনায় জলনৃত্যের ঘুঙুর বেজে চলেছে যেন।

রাজকুমারী একটি পাত্র জগমোহনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন,—মুখে দাও কিছু। দুধের ঘটিটা শেষ কর' এখন।

কথার শেষে বিন্ধ্যবাসিনী সহোদরের পাশে এসে বসলেন। হাতপাখা ধরলেন স্বহস্তে। বললেন,—ভাই, তুমি আর চিন্তা কর' কেন?

কাশীশঙ্কর ফরাসে দেহ এলিয়ে দিয়েছেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়েছেন। মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন,—চিন্তার কি শেষ আছে বিন্ধ্য? মাঝিদের পানাহার দাও তুমি। তারা ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত হয়েছে।

—তুমিও কিছু খাও। মিষ্টসুরে মিনতি জানালেন রাজকন্যা।

কুমারবাহাদুর বললেন,—তুই আর আমি [illegible] একপাত্রে আহার করবো আজ। মাঝিদের তুষ্ট কর' অগ্রে।

বিন্ধ্যবাসিনীর ম্লান বিষণ্ণ মুখে আনন্দের হাসি ফুটলো। আবার ভাণ্ডারে গেলেন তিনি। বললেন,—তাই হোক। ভাই তোমার কথাই থাক।

সূর্য্য কখন অস্তাচলের পথে এগিয়েছে, কারও নজরে পড়ে না। গঙ্গার অন্যতীরে পূর্ব্ব-আকাশে সোনার সূর্য্য, দিগন্তে অবগাহনের জন্য কখন ঢ'লে পড়েছে। রূপালী চিকণ আর দেখা যায় না জলে। গৈরিক রঙের রেখা ছড়িয়েছে গঙ্গায়। সূর্য্য যেন তার পোষাক বদল ক'রছেন। লোহিত রূপ ধরছেন ধীরে ধীরে।

কাশীশঙ্কর কান পাতলেন একাগ্রচিত্তে, বজ্রধ্বনি আর শোনা যায় না। কুমারবাহাদুর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন জানলার বাহিরে—শুভ্র লাল আকাশ দেখছেন। মেঘের কোল ঘেঁষে একসারি বলাকা উড়ে চলেছে। ছিন্নগ্রন্থি শুভ্র ফুলের মালা যেন একটি। শ্বেতপদ্মের মালা। দিন শেষে বাসায় ফিরছে হয়তো। কুমারবাহাদুর মনে মনে বলেন,—ওঁ হ্লীং বগলামুখী—

সূর্য্যের শেষরশ্মি কুমারের ললাটে ছড়িয়েছে। আলোর জয়টিকা যেন। [ক্রমশঃ।

• • • এ মাসের প্রচ্ছদপট • • •

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বাঙলা দেশের একটি গ্রাম্য দৃশ্যের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্র রতন দাশগুপ্ত গৃহীত।

র ঙ্গ প ট

সোনার কাঠি

সাইলেস মার্ণারের বাংলা অনুবাদ ছায়াছবির মাধ্যমে সেদিন আত্মপ্রকাশ করল সোনার কাঠি নাম নিয়ে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দেবকীকুমার বসু। থুড়ি—"পদ্মশ্রী-যুক্ত" দেবকীকুমার বসু। সাইলেস মার্ণার যাঁরা পড়েছেন কাহিনীর সারাংশ সম্বন্ধে তাঁদের কাছে আর নতুন করে বলবার কিছুই নেই। এক জমিদারপুত্র বাপের অমতে কলকাতায় বিয়ে করে বসে আছে। শুধু অমতে নয় অজ্ঞাতেও। এদিকে জমিদারগৃহিণী পুত্রের অন্যত্র বিবাহের বন্দোবস্ত করে গেছেন। জমিদারপুত্রবধু জানতে পেরে শিশু কন্যা নিয়ে শ্বশুরালয়ের দিকে রওনা হন; পথে দুর্যোগে তাঁর মৃত্যু হয় ও জমিদারপুত্র পিতামাতার মনোনীতা পাত্রীকেই বিবাহ করে। কাহিনীর নায়ক কিন্তু এক কর্মকার। নাম তার রাম। ভালবাসল সে রামীকে। রামীকে নিয়ে পালাল ভাগ্যগণক গোপাল পণ্ডিত। রাম উঠল ক্ষেপে, গোপাল পণ্ডিতকে হত্যার জন্য সে হয়ে উঠল বদ্ধপরিকর, একদিন যখন এক দুর্যোগের রাতে গোপালের সন্ধান পেয়ে সে মরিয়া হয়ে ছুটেছে পথিমধ্যে দেখলে একটি মৃত্যু-পথযাত্রিণী অসহায়া রমণী, বুকে তার একটি শিশুকন্যা। মহিলাটি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে কন্যাকে দিয়ে গেল রামের হাতে। কন্যাকে বুকে তুলতেই রামের মধ্যে হিংস্ররূপের পরিবর্তে জেগে উঠল পিতৃরূপ। হত্যার উন্মাদনার পরিবর্তে তার মধ্যে বয়ে চলল বাৎসল্য রসের ধারা। মেয়েটিকে সে মানুষ করতে লাগল। জমিদার গত হলেন, পুত্র বসল পিতার আসনে, মৃত্যুর পূর্বে জমিদার তাঁর এক নাতিকে ছেলের হাতে দিয়ে যান। ক্রমে সেই বালক একদিন বড় হল। তার মন বিনিময় হ'ল রামের পালিতা কন্যা বাবীর সঙ্গে, পরে একটি রসঘন মুহূর্তে প্রকাশ পেল বাবীই বর্তমান জমিদারের প্রথমা পত্নীর কন্যা, সে কামারের মেয়ে নয়, সে জমিদার-নন্দিনী। বাবীর মা-ই আসছিলেন শ্বশুরের কাছে নিজের আত্মপরিচয় দিতে, পথিমধ্যে দুর্যোগে তার জীবননাট্যের শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটে।

জমিদার-নন্দনের কলকতার বাড়ীর সট যখন দেখানো হচ্ছে তখন ক্যামেরা কেন যে বার বার রেডিওর দিকে চার্জ করে যাচ্ছে, কিছুতেই বোঝা গেল না। দুর্বল চিত্রনাট্য ও অসার পরিচালনার জন্যে ছবিটি দর্শকচিত্তে আনন্দদানে সমর্থ হয় নাই। বৃদ্ধ জমিদারের যে নাতিটিকে আনানো হল, সে কোথা থেকে এল, কোথায় ছিল, কেন ছিল বা সে বৃদ্ধের কি রকম নাতি, এ সম্বন্ধেও কোনরূপ আলোকপাত করা প্রয়োজনীয় বলে পদ্মশ্রী-যুক্ত পরিচালক মনেই করেন না। সব চেয়ে অদ্ভুত জিনিষগুলি চোখে যা লাগল, এই যে কাহিনীটিকে অনুবাদ করার সময় পরিচালক বোধ হয় ভুলেই গেছেন যে এটা ভারতবর্ষ। এটা পূর্ব-পশ্চিম নয়। ভাই-বোনে বিবাহ মুসলমান এবং সাহেবী-সমাজে প্রচলিত থাকলেও আমাদের সমাজ যে সেটা অনুমোদন করে এ কথা তো আমরা কখনো শুনি নি। বৃদ্ধ জমিদারের নাতির সঙ্গে বাবীর প্রেম হচ্ছে। আর বাবী কে হচ্ছে, সে বৃদ্ধেরই নাতনী। অন্ততঃ বাবীর আসল পরিচয় জানাজানি যখন হয়ে গেল, তখনই বা সেই প্রেমের পরিণাম কি হ'ল, এ বিষয়েও পরিচালক নীরব।

অভিনয়ে অবিস্মরণীয় অভিনয়-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরেই উল্লেখ করব বাবীর ভূমিকায় তিন জন শিল্পীর নাম—শ্রাবণী চৌধুরী, সীমা দত্ত ও শিখারাণী বাগের। এঁদের পর উল্লেখ করব অমর মল্লিক, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, সৌরেন ঘোষ, মহম্মদ ইসরাইল, ভারতী দেবী, তপতী ঘোষ ও প্রীতিধারার নাম। গীতা সিং মুখস্থ-করা কাকাতুয়ার মতন অভিনয় করে গেছেন মাত্র। প্রশান্তকুমার ও আশীষকুমার চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া অন্যান্যাংশে আছেন তুলসী চক্রবর্তী, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, ম্যালকম, পারিজাত বসু, শিব মুখোঃ, নিভাননী দেবী, রেবা দেবী, সন্ধ্যা দেবী ও শীলা পাল প্রভৃতি।

রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত

বাঙলা দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে "শ্রীকান্ত" সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতারই নামান্তর মাত্র। শরৎচন্দ্রের অমর অবদানগুলির মধ্যে শ্রীকান্ত যে একটি বিশেষ আসনের ও সম্মানের অধিকারী, এ তথ্য বাঙলাদেশে সকলেরই সুবিদিত। মোট চারটি খণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীকান্তের অংশবিশেষ অবলম্বন করে বাঙলার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী কানন ভট্টাচার্য দর্শক সাধারণকে উপহার দিয়েছেন রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত। এতে কুমার সাহেবের শিবিরে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দীর্ঘকাল বাদে শ্রীকান্তের সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে শ্রীকান্তের বর্মা যাত্রা পর্যন্ত দেখানো হয়েছে ফ্ল্যাশ ব্যাকে রাজলক্ষ্মীর পিয়ারী বাইজীতে রূপান্তরিতা হওয়ার করুণ কাহিনীও দেখানো হয়েছে। বাঙলা দেশের ছায়াছবিতে শ্রীকান্তের আবির্ভাব এই প্রথম নয়, বহুকাল বাদে ছায়াছবিতে শ্রীকান্ত দেখা দিয়েছিল নটগুরু শিশিরকুমারের মধ্যম অনুজ সুঅভিনেতা শ্রীতারাকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায়। শ্রীকান্ত বাঙালীর অতি আদরণীয় উপন্যাস, তার চিত্ররূপ সে যথেষ্ট নিষ্ঠা এবং আগ্রহের সঙ্গেই দেখতে যাবে কিন্তু তার সেই আদর এবং আগ্রহের মর্যাদা যাতে পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে এ দিকে চিত্রনির্মাতাদের দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য। দুঃখের সঙ্গে বলছি তাঁরা সে দিকে দৃষ্টি রাখেন নি। চিত্রনাট্য যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ, যার ফলে ছবির গতি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়। মূল শ্রীকান্তর যে যে অংশগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে সেইগুলির একত্রে সম্পাদন কার্যেও মুন্সীয়ানার ছাপ পাওরা যায় না। মূল উপন্যাস পাঠ করে শ্রীকান্তের চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মায়

ছবি দেখে শ্রীকান্তের চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক সেই ধারণাটি জন্মায় না অর্থাৎ শ্রীকান্ত-চরিত্রের প্রস্ফুটনে পরিচালক ব্যর্থতাই প্রকাশ করেছেন। তবে একটি কথা বলতে হয় যে, আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে প্রায় সমগ্র কাহিনীটিতেই শরৎচন্দ্রের লেখনীজাত সংলাপই হুবহু বজায় রাখা হয়েছে, এর জন্যে হরিদাস বাবু ধন্যবাদার্হ। সঙ্গীত পরিচালনায় প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন স্বনামধন্য শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

অভিনয়াংশে মাতিয়ে রেখেছেন সুচিত্রা সেন। তাঁর অভিনয় যে যাই বলুন, আমরা বলব অনবদ্য। তাঁর পরই উল্লেখ করব অনিল চট্টোপাধ্যায়ের নাম, অল্প সুযোগে সুন্দর অভিনয় করেছেন তিনি। শান্ত সংযত অভিনয়ে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন শিশির বটব্যাল। স্ব স্ব ভূমিকাভিনয়ে শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মণি শ্রীমাণী, রেবা দেবী, রমা দেবী, রাজলক্ষ্মী, বেলারাণী, বুলবুল প্রভৃতি। এঁরা ছাড়াও অভিনয়াংশে আছেন—জয়নারায়ণ মুখো, প্রতাপ মুখো, দ্বিজু ভাওয়াল, শিবকালী চট্টো, শ্রীকণ্ঠ গুপ্ত, শান্তি ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, শম্ভু বন্দ্যো, খগেন পাঠক, পান্নালাল চক্রবর্তী, উৎপল বসু, কমল মিত্র প্রভৃতি।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

কালিকানন্দ অবধূত এবং তাঁর রচিত "মরুতীর্থ হিংলাজ"-এর নাম আজ কারোই অজানা নেই। ভ্রমণ-কাহিনীরূপে প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মরুতীর্থ হিংলাজ রীতিমত সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল, অর্জন করেছিল বহু জনের প্রশংসা। শক্তিমান অভিনেতা বিকাশ রায় বর্তমানে এর চিত্ররূপ দিতে মনস্থ করেছেন। প্রধানাংশে থাকছেন পরিচালকসহ উত্তমকুমার এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্যাংশে অভিনয় করছেন পাহাড়ী সান্যাল, জীবেন বসু, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সৌরেন ঘোষ এবং চন্দ্রাবতী দেবী প্রভৃতি। * * * প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "যৌতুক" চিত্রায়িত হচ্ছে জীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং কমল মিত্র, উত্তমকুমার, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, মলিনা দেবী, সুমিত্রা দেবী ও লীলা পাল প্রভৃতির অভিনয়ে। * * * সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকারের পরিচালনায় এবং পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুরযোজনায় "শ্রীরাধা"র কাজ অগ্রসর হচ্ছে। রূপায়ণে দেখা যাবে মহেন্দ্র গুপ্ত, নবকুমার, জহর রায়, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, গীতা সিং, শিখা বাগ, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। * * * বিশু সরকারের রচনায় ও পরিচালনায় এবং কালোবরণের সুরারোপে "রক্ত-আহুতি"র চিত্রায়ণ-কার্য এগিয়ে চলেছে। এতে রূপদানে নিয়োজিত হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার, সন্তোষ সিংহ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, যূথিকা চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত, কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা দেবী প্রমুখ শিল্পিবর্গ।

ফাগুন

নিশীথ মিত্র

সখি, ফাগুন এসেছে ফের
পাওনি কি টের?
এসো। এখন কবরী বেঁধে
বলবে না কেঁদে কেঁদে
কবে তুমি কারে বেসেছিলে ভালো,
কবে কার পথে জেলেছিলে আলো?
বলো, বলো, সখি ফাগুন এসেছে ফের—
বলো, রেণু রেণু যা আছে মনের।

সখি জানো? এখন কেন যে মন
নিশীথ রাত্রির দীপে অনুক্ষণ
এমনে বিবাগী হয়?
খোঁজে কেন কারো গান গোপন সে পরিচয়!
বলো সখি বলো, বলো সেই কথা—
কি ক'রে মেটানো যায় ফাগুনের ব্যথা!

পাকিস্তানে কলির সন্ধ্যা

"পাকিস্তানী জতুগৃহ দাহের অগ্নি ক্রমশঃ শত শত লোলশিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে হাজার হাজার কৃষক আগামী ১৪ই মার্চ্চ পাক বিধান সভার বাজেট অধিবেশনের প্রারম্ভে পদব্রজে আসিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবে। ইতিমধ্যেই ৩০০০ কৃষক ১০০ মাইল পথ হাঁটিয়া লাহোরের পথে রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছিয়াছে। অন্য রাজ্য হইতে আরও ২০০০ কৃষক আসিতেছে। রাণা হবিবর রহমানের কথায় প্রকাশ, আরাণওয়ালা হইতে ১০০০ কৃষকের এক বিক্ষোভ মিছিল ১২ই মার্চ্চ লাহোর যাত্রা করিয়া এই বিরাট বিক্ষোভে যোগ দিবে। পশ্চিম পাকিস্তানে দেড় কোটি একর খাস জমি নীলামে বিক্রয় করিবার সরকারী আদেশ প্রত্যাহার না করিলে এই কৃষক আন্দোলন স্থগিত হইবে না। গত বৎসর পর্য্যন্ত তিন লক্ষ প্রজা জমি হইতে উচ্ছেদ হইয়াছে এবং গত বৎসর যাবৎ দেড় কোটি একর সরকারী জমি পতিত পড়িয়া আছে। এই আত্মঘাতী সরকারী জিদের প্রতিক্রিয়ার আগুন জ্বলিল। এমন বহুমুখী বহু গৃহদাহী শিখা পশ্চিম-পাক ইমারতের ফাটলে ফাটলে দেখা দিবে। এখন তো সবে কলির সন্ধ্যা।" —দৈনিক বসুমতী।

ধান ও চালের দর

"লোকসভার একজন সদস্য জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, ধান-চাউলের মজুতদারী ও মূল্যবৃদ্ধি রোধের উদ্দেশ্যে সরকার কি করিতেছেন? উত্তরে কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব জানান যে, ১১টি রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত দিল্লী অঞ্চলে মজুতদারী রোধের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে; ৪টি রাজ্যে দশ মণের অধিক ধান বা চাউল ক্রয়বিক্রয় হইলে সংবাদ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সাতটি রাজ্যে ধান-চাউল ব্যবসায়ীদিগকে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার তালিকায় দেখা যায় যে পশ্চিম বাঙ্গালা, আসাম ও পাঞ্জাব সরকার এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী। এই তিনটি রাজ্যে উপরোক্ত তিনটি আদেশই প্রবর্তিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা সরকারী তৎপরতার পরিচায়ক। কিন্তু বাস্তব ফলাফল লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহা সত্ত্বেও ধান চাউলের দর কমে নাই। পার্লামেন্টের খাদ্য ও কৃষি উপদেষ্টা কমিটির ঘরোয়া বৈঠকে শ্রীযুক্ত জৈন নিজেও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলেন যে, মাত্র ধান ও চাউল ব্যতীত এবার সব রকম খাদ্য শস্যের পাইকারী দর গত বৎসর এ সময়ের তুলনায় কমিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধান-চাউলের মূল্য বৃদ্ধির ও মজুতদারীর বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থাগুলি এখন পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। সরকার আদেশ দিয়াই খালাস। সেগুলি পালিত হইতেছে কি না, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সে সম্পর্কে উদাসীন।" —যুগান্তর।

খনিগর্ভের দুর্ঘটনা

"কয়লাখনির অভ্যন্তরে আগুন লাগিয়া দুর্ঘটনা সৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহা যে প্রকারের সমস্যা, ভূগর্ভস্থ কয়লার স্তরের জ্বলন্ত অবস্থা ঠিক সেই প্রকারের সমস্যা নহে। কিন্তু ক্ষতির দিক দিয়া কম শোচনীয় ও ভয়াবহ সমস্যা নহে। আসানসোল এবং ঝরিয়া

অঞ্চলের ভূগর্ভের কয়লাস্তরে স্থানে স্থানে বহু পুরাতন আগুন জ্বলিতেছে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অঞ্চলবিশেষে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভূগর্ভস্থ কয়লা এই ভাবে বিনষ্ট হইতেছে। ইহা জাতীয় সম্পদের বিপুল ক্ষতি। তাহা ছাড়া, এইরূপ ভূগর্ভস্থ কয়লাস্তরের জ্বলন্ত অবস্থা নিকটস্থ অঞ্চলের কয়লাস্তরের পক্ষে বিপদ বিশেষ। কারণ, এইরূপ ভূগর্ভস্থ অগ্নিকাণ্ড প্রসারিত হইবার সুযোগ পাইয়া নিকটের এবং অনেক দূরেরও কয়লাস্তর স্পর্শ করিয়া ফেলে। ইহা নিবারণ করা দুরূহ বটে, হয়তো দুঃসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নিশ্চয়ই নহে। ভূগর্ভস্থ অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা কয়লার এইরূপ ব্যাপক বিনাশ রোধ করিবার পন্থা সম্বন্ধে বহু চিন্তা ও গবেষণা অনেককাল ধরিয়া হইয়াছে আসিতেছে। কিন্তু সার্থক রকমের কোন পন্থা নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা বিশেষভাবে তদন্ত করাইয়া এই বিষয়ে প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য সরকারের পক্ষে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

জনৈক বামপন্থীর স্বরূপ

"পণ্ডিত নেহরুর বাজেট বক্তৃতার সঙ্গে একটি মূল্যবান্ পুস্তিকা (৩৮ পৃষ্ঠা) দেওয়া হইয়াছে। উহাতে ধনিক চক্রান্তের কি সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে তাহা আমরা দেখাইয়াছি। রাজ্যসভায় কম্যুনিষ্ট নেতা ভূপেশ গুপ্ত বলিয়াছেন, উহাতে এই চারিটি মাত্র দোষ আছে—(১) গত বছরের ফসল কম হইবার উল্লেখ নাই, (২) মূল্যবৃদ্ধির কথা নাই, (৩) ভূমি-সংস্কার কার্য্যকরী না হওয়ার কথা নাই, এবং (৪) বেকার-সমস্যার উল্লেখ নাই। ভূপেশ গুপ্ত ৭৫ মিনিট ধরিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। একটি মুহূর্ত্তও না থামিয়া সপ্তম গ্রামে সুর চড়াইয়া নন-ষ্টপ বক্তৃতা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ভূপেশ গুপ্তের আছে ইহা জানি। কিন্তু ঐ পুস্তিকাটির আসল জিনিষগুলি তাঁহার নজরে পড়িল না কেন? সম্প্রতি আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতীয় রাজনৈতিক দল সম্পর্কে একটি গবেষণাপ্রসূত বই বাহির হইয়াছে। উহাতে কোন কোন বামপন্থী দলের ধনিকঘেঁষা নীতির উল্লেখ আছে। বাজেটের সঙ্গে পুস্তিকাটিতে ধনিক চক্রান্তের যে তথ্য রহিয়াছে ভূপেশ গুপ্ত তাহার উচ্চারণ করিলেন না কি অজ্ঞতার জন্য, না অন্য বিশেষ কারণে? নির্বাচনের সময় লোকে তাঁহাকে এবং প্রফুল্ল ঘোষকে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেশপ্রিয় পার্কে

"বিড়লাবাড়ীর রহস্য" বইয়ের তীব্র নিন্দা করিতে দেখিয়াছে। উত্তর কলিকাতায় মুন্দ্রার টানে হেমন্ত বসু, কানাই ভট্টাচার্য্য এবং মণি চক্রবর্ত্তীকে বামপন্থী প্রার্থীকে ফাঁসাইয়া মুন্দ্রার বন্ধু কংগ্রেসপ্রার্থীকে জয়যুক্ত করিতেও দেখিয়াছে। পূজার সময় হরিদাস মুন্দ্রার বাড়ীতে কমুনিষ্ট, পি-এস-পি, ফরোয়ার্ড ব্লকের ত্রিবেণী সঙ্গম—আনন্দবাজারের রিপোর্ট। পি-এস-পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের মুখপাত্র দিনের পর দিন বিড়লা প্রশস্তিতে পাতার পর পাতা ভরাইয়াছে। ত্রিমূর্ত্তির নয়া পলিসির বিরুদ্ধে ভূপেশ গুপ্তের জিভ তালুতে আটকাইবে ইহাই তো স্বাভাবিক।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

মৎস্য নেই ?

"মাছ বাঙালীদের অত্যন্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় খাদ্য। কিন্তু আজকাল ক'জেনরই বা পাতে এক টুকরোও মাছ পড়ে? সমস্যা সমাধানের ভার নিয়েছিলেন সরকার। যেমন আরও পাঁচটা ব্যাপারে নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। আমরা দেখলুম সরকারকে ছুটতে সমুদ্রে মাছ শিকার করতে। দেখলুম বিরাট বিরাট দুখানা জাহাজও তাঁরা ভাসালেন। সুদূর ডেনমার্ক থেকে জেলেও আনলেন। তবু কিন্তু সমস্যার সমাধান হোল না, শুধু রাশি রাশি টাকারই শ্রাদ্ধ হোল। অথচ এদিকে ঘরেই যে মাছের প্রচুর উৎস রয়েছে সেদিকে বাবুমশায়দের লক্ষ্য নেই। লক্ষ লক্ষ বিঘা নিয়ে রয়েছে অসংখ্য খাল, বিল, বাওর, নদ-নদী, তাছাড়া রেল লাইনের আশে পাশে বড় বড় জলাশয়। সেখানে সুষ্ঠু পরিকল্পনার দ্বারা অনেক কম খরচে প্রচুর মাছ উৎপাদন হোতে পারে। সম্প্রতি এক সমবায় পরিকল্পনার দ্বারা সরকার বাহাদুর সুন্দরবন এলাকার শ' তিন-চার জেলেকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছেন। উদ্বোধন কার্য অবশ্য সাড়ম্বরেই সম্পাদিত হয়েছে। এবং ধার্য হয়েছে ঐ সাড়ে তিনশো জেলের জন্য পৌণে দু লক্ষ টাকা। এ কি নিছক লোভ দেখানো নয়? যেখানে কম পক্ষে পাঁচ লক্ষ মৎস্যজীবী সেখানে এ প্রচেষ্টা থুতু দিয়ে ছাতু গোলার মতোই হাস্যকর! এর দ্বারা 'কিছু করছি' বোলে ছেলে ভুলোনো যেতে পারে কিন্তু আসল কাজ কিছুই হয় না। প্রকৃতপক্ষে সরকারের সকল পরিকল্পনাই এই রকম। সমাধানের রাস্তায় তাঁরা কিছুতেই আসবেন না। কখনো ঘরের খাল, বিল, পুকুর ফেলে সাগরে ছুটবেন, আবার কখনো পাঁচ লক্ষের সমস্যা যেখানে সেখানে সাড়ে তিনশোর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি কোরে ঢাক পিটোবেন। এই যেখানে অবস্থা দেশবাসীর সেখানে খাওয়া-পরার সাধ অপূর্ণ থাকতে বাধ্য।"

—সাধারণতন্ত্রী (কলিকাতা)।

গোয়া সমস্যা ও নেহরুজী

"দশ বৎসরের স্বাধীনতার পরও ভারতীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে গোয়া এখনও বিদেশীর বুটের তলায় নিষ্পেষিত হইতেছে। ইহা স্বাধীন জাতির পক্ষে অপমানজনক। আজ পর্য্যন্ত আমরা ইহাকে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি নাই। যে সমস্যার সমাধান বহু পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল তাহা কেবলমাত্র সম্ভব হইতেছে না সরকারের দুর্ব্বল নীতির জন্য। আজও গোয়ার অভ্যন্তরে জেলখানায় স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিককে অত্যাচার, লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে। এই সম্পর্কে শ্রীগোরে লোকসভায় সংবাদ প্রকাশ করিলে প্রধান মন্ত্রী মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করা ভিন্ন আর কিছুই করেন নাই বা গোয়াকে বিদেশীর অধীনতামুক্ত করিবার কোন পথ দেখাইতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার নেতৃত্বের ব্যর্থতাই প্রকাশ করে। টাটা লৌহ কোম্পানীর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জামসেদপুরে এক জনসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু গোয়ার প্রশ্ন উল্লেখ করিয়া বলেন, "ভারতবর্ষ যে কোন সময় ইহাকে অধিকার করিতে পারে, কিন্তু করিতেছে না তাহার কারণ অস্ত্রের সাহায্যে কোন গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি চায় না।" তিনি যেভাবে আশা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে পর্ত্তুগালের একদিন সুমতির উদয় হইবে এবং গোয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। অতএব পর্ত্তুগালের সুমতির আশায় আমাদের নৃত্য করা উচিত। আমরা অস্ত্র ব্যবহার করিব না, স্বাধীন ভারত হইতে কোনরূপ সাহায্য করিব না কেবলমাত্র পর্ত্তুগালের সুমতির আশায় অপেক্ষা করিব। এই কথা আর যে কোন লোকের মুখে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মুখে শোভা পায় না।"

—সংগ্রাম (হুগলী)

মেদিনীপুরে হোলি

"মেদিনীপুর সহরের হোলি উৎসবের ন্যায় এমন অনাহোলি (অপবিত্র) উৎসব আর আছে কি না সন্দেহ! বাঙ্গালা দেশের অন্যত্র একদিন রং খেলা হয়, এখানে হয় দুই দিন। অবাঙ্গালীরা কেহ এক মাস, কেহ কেহ ৭ হইতে ১৫ দিন যাবৎ উৎসব করিয়া থাকে। বাঙ্গালী অপর কেহ দুই দিন ধরিয়া এই ধরণের রং লইয়া মাতিয়া উঠে না। দ্বিতীয় দিনের নাম "ধুলণ্ডি"—অর্থাৎ রং সেদিন "এহ বাহ্য"; ধুলা, কাদা, পাঁক, পা[illegible], পচা বিলাতি বেগুণ, তেল কালি এমন কি বিষ্ঠা পর্য্যন্ত [illegible]রূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের বাল্যকাল হইতে ধুলণ্ডির কদর্য্যরূপ দেখিতেছি। প্রতিবাদে বিশেষ ফল হয় নাই কারণ, জনসাধারণ শাসনের অঙ্গুলি উত্তোলন করেন নাই। এখন অবশ্য পূর্ব্বের সে বীভৎস রূপ আর নাই, কারণ আর্থিক দুর্গতি মানুষের মনে পূর্ব্বেকার সে শান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তথাপি দুই দিন ধরিয়া রং খেলা, রং-এর সহিত সোনালি, রূপালি পাউডার, তেলকালি, "গাধা"ছাপ এখনও চলিতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে-মেদিনীপুর বঙ্গে তথা ভারতবর্ষে গণ-আন্দোলনে সকলের পুরোভাগে ছিল, দেশপ্রেমের জন্য যাহাকে জেলা হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, সেই মেদিনীপুর বঙ্গের নব্য সংস্কৃতিতে কিছু দিতে পারিতেছে না! লারে-লাপ্পার চর্চ্চা হইতে নব্য বঙ্গের উজ্জীবনে বিদ্যাসাগর ও বীরেন্দ্র-নাথের মেদিনীপুর পথ-প্রদর্শক হইবে; ইহাই কাম্য এবং স্বাভাবিক, কারণ উহা তাহার ঐতিহ্যের অনুগ। কিন্তু সে নেতৃত্ব এখনও আসিতেছে না। বঙ্গদেশ ঘুমাইতেছে, তাহার সহিত একদা সতর্ক প্রহরী মেদিনীপুরও ঘুমাইতেছে।"

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

ইউনিয়ন টেরিটরীতে ত্রিপুরাবাসী'র স্বার্থ কোথায় ?

"আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে ত্রিপুরা অধিবাসীর সকল অভাব অভিযোগ মোচন করা সম্ভব হইবে তাহারা গণতান্ত্রিক অধিকার পাইয়াছে—এই জাতীয় প্রচার আরম্ভ করে ত্রিপুরা কম্যুনিষ্ট পার্টি। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতে কম্যুনিষ্টদের মত

গুজ্জার এখনও দেশে গজায় নাই। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা সম্বন্ধেও বিভ্রান্তিকর প্রচারে কম্যুনিষ্ট পার্টিপিছপাও হয় নাই। সংবিধান ভারতের জনসাধারণকে গণতন্ত্র ভোগ করিতে যে সুযোগ দিয়াছে তাহা কম্যুনিষ্টরা মগণ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে যেমন দ্বিধাবোধ করে না, ইউনিয়ন টেরিটরির আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ১৯১৯ সালে প্রদত্ত মণ্টেগো চেমস্ ফোর্ডের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতার সমতুল্য হইলেও উহাকই এক নম্বরের গণতন্ত্র বলিতেও তাহারা একটুও কার্পণ্য প্রদর্শন করে নাই। আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে, ত্রিপুরাবাসী স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইয়াছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রাথমিক বিষয়গুলি জননির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মারফত পরিচালিত হইবে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ের আংশিক কার্য্য আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে গেলেও ত্রিপুরা প্রশাসনের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের বিলুপ্তি ঘটিবে না। কিছু কিছু রাস্তা নির্ম্মাণের কাজও আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে হইবে; এই বলিয়া ত্রিপুরা প্রশাসনের পূর্ত্ত বিভাগও উঠিয়া যাইবে না। আমরা দেখিতেছি, ত্রিপুরা প্রশাসন যে ধারায় কাজ করিয়া যাইতেছিল, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন দ্বারা সেই ধারার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই বরং প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ইউনিয়ন টেরিটরি শাসনে ১৬ মাসের বয়সেই জনগণের সহিত প্রশাসনের সম্পর্কের অবনতি অনেক দিক দিয়া ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব ইতিহাস উদ্ঘাটন না করিয়াও বলা যায়, এই ১৬ মাসে ত্রিপুরাবাসীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে; ত্রিপুরা এখন বহিরাগতদের ঘরোয়া ব্যাপার। ত্রিপুরাবাসী হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া চীৎকার করে, বহিরাগতরা মুরুব্বীর মত উপদেশ বর্ষণ করে।" —সেবক (আগরতলা)।

দুর্ঘটনা

"আজকাল খবরের কাগজ খুলিলেই দুর্ঘটনা আর দুর্ঘটনা। কিন্তু গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আসানসোল কয়লাখনি এলাকায় বেঙ্গল কোল কোম্পানীর চিনাকুড়ি কয়লাখনিতে দুর্ঘটনার ফলে যে প্রায় পৌনে দুই শত জনের মর্ম্মান্তিক জীবনান্ত ঘটিয়াছে তাহা সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার ইতিহাসে শুধু ভয়াবহই নহে ইহা এক নির্ম্মম অধ্যায়। রেলদুর্ঘটনা ত আজকাল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি ২৬শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার সন্নিকটে সোনারপুরের নিকট দুইটি ট্রেণের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সংঘটিত রেল দুর্ঘটনায় কয়েকজনও হতাহত হইয়াছে। কিছুদিন আগে ইলেকট্রিক ট্রেণ চালাইতে গিয়া হাওড়ায় কয়েকজন লোককে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। সরকার অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে দুর্গত পরিবারদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কেও তদন্তের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু তদন্তের দ্বারা দুর্ঘটনা রোধ হওয়া দূরের কথা, দুর্ঘটনা যেন নিত্য নিত্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। আজ-কাল যেরূপ ঘনঘন দুর্ঘটনা এবং পাইকারী হারে মৃত্যু ঘটিতেছে। কৈ কিছুদিন পূর্বে ত এমনটি হইত না। সুতরাং দুর্ঘটনাকে যাঁহারা ভবিতব্য বলিয়া মনে সান্ত্বনা দিতে চান তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি। এইভাবে দিনের পর দিন সংঘটিত দুর্ঘটনাকে রোধ করা যাইবে কি না—ইহাই আজ মানব দরদী মনের একমাত্র প্রশ্ন।" —প্রলাপ (মেদিনীপুর)।

কেন্দ্রের ঘোরতর অবিচার

"কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন পশ্চিমবঙ্গের উপর পক্ষপাতশূন্য হইয়া অর্থ বণ্টন করিতে পারেন নাই বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানপরিষদের কংগ্রেসী ও বিরোধী সদস্যগণ অভিযোগ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ হইতে ইনকাম ট্যাক্স বাবদ ও অন্যান্য খাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর আয় করিয়া থাকেন। জনসংখ্যা অনুপাতে অর্থ বণ্টন নীতিতে পশ্চিম-বঙ্গে প্রতি বৎসর বাজেট ঘাটতি থাকে। রাজ্যের উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উপর বেশী অর্থ বরাদ্দ না করিলে সমস্যাসঙ্কুল এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে সমস্যা আরও বাড়িবে।"

—ভাগীরথী (কালনা)।

সরকারের দুর্নাম কেন?

"গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতেই তমলুক মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনস্থ রাস্তাগুলির দুর্দ্দশা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। সহর মধ্যস্থ প্রধান তিনটি রাস্তাতেই এত কর্দ্দম ও খাল-খন্দ প্রকাশ পায় যে, পথচারীদের অসঙ্কোচে চলাই দুষ্কর হইয়া উঠে। সরকার ইহার দুইটি রাস্তা উন্নয়ন পরিকল্পনায় পিচ মাড়াই করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, তাই পৌরসভা এদিকে হাত দিতেছেন না। তাঁহারা উক্তরূপ পিচ রাস্তার জন্য তাঁহাদের দেয় অংশ ২০ হাজার টাকা চাহিলেই দিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন! অথচ বৎসর শেষ হইতে চলিল তথাপি সরকার পক্ষের কোন সাড়া-শব্দ নাই। ইহাতে সরকারের উপর

লোকের আস্থা কমিতেছে না কি ? তারপর এই সহরের ডাইভার্সন রোডটিও এই বৎসরের মধ্যে সরকারের মেরামত করাইয়া মিউনিসিপ্যালিটির হাতে দিবার কথা ছিল। সেইদিকেও সরকার নীরব নিষ্ক্রিয়। এ-পাশে ঐ রাস্তার দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিলম্ব মানেই সরকারের দুর্নাম।" —প্রদীপ (মেদিনীপুর)।

ধান্যমূল্য সমস্যা

"এতদঞ্চল হইতে ধান্য রপ্তানী বন্ধ হওয়ার ফলে ধান চাউলের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছিল না। কিন্তু সরকারী নীতি পরিবর্তিত হওয়ায় বর্ত্তমান বহু ধান নৌকা ও ট্রাক পথে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এবং ধান্যের মূল্যও আগুন হইয়া উঠিয়াছে। এখন বাজারে ধান্যের দাম ১৩৲ টাকার উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এ সময় যদি ধান্যের বাজার এইরূপ দাঁড়ায়, তবে আগামী বর্ষাকাল বা মহার্ঘতার দিন ধান্য চাউলের বাজার কি দাঁড়াইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। একে ত এ বৎসর দেশে ধান-চাউল কম উৎপন্ন হইয়াছে ; তার উপর যে ভাবে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখা যায়, তাহাতে শীঘ্রই এদেশে ধান চাউলের অভাব ঘটিবে সন্দেহ নাই।"

—নীহার (কাঁথি)।

শোক সংবাদ

চন্দননগরের স্বনামধন্য লৌহব্যবসায়ী পরলোকগত কার্তিকচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের সহধর্মিণী পূজনীয়া কুসুমকুমারী দেবী আনুমানিক এক শো তিন বছর বয়সে গত ১০ই ফাল্গুন ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে দেহরক্ষা করেছেন। ইনি আজীবন দানধর্মে, দরিদ্রসেবায় অতিবাহিত করেছেন। বহু দুঃস্থ ব্যক্তি এঁর করুণালাভে সমর্থ হয়েছেন। চিরকাল নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠানে ইনি নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। এঁর পাঁচ পুত্র সন্তোষকুমার, আশুতোষ, হৃদয়তোষ, ভবতোষ ও চারুতোষ ঘটক। এঁর দেহান্তে বিগত যুগ ও বর্তমান যুগের একটি সংযোগ সেতু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমরা এই মহীয়সী মহিলার আত্মার শান্তিকামনা করি। বিখ্যাত লৌহ-প্রতিষ্ঠান কুসুমিকা আয়রণ ওয়ার্কশ ও কনষ্ট্রাকশনস এই মহিলার স্মৃতিবহন করছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রপৌত্র ব্যায়ামবীর ও গীতিকার স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথের পৌত্র এবং তত্ত্বনিধি আচার্য স্বর্গীয় ক্ষিতীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ১৭ই ফাল্গুন মাত্র ৫৩ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী ছিলেন ও ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে ইনি কবিতায় ও গল্পে বহু সাময়িক পত্রিকাকে পুষ্ট করে গেছেন।

স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের পুত্রবধূ ও স্বর্গীয় স্যার হরিশঙ্কর পাল মহাশয়ের পত্নী লেডী মঙ্গলাময়ী পাল গত ২২এ ফাল্গুন মাত্র ৫৪ বছর বয়েসে পরলোকগতা হয়েছেন। ইনি কোমলস্বভাবা, দয়াশীলা মহিলা ছিলেন। নানাবিধ সৎকর্মে ইঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। দুঃস্থজনের দুঃখকষ্ট এঁকে বিশেষভাবে বিগলিত করত।

মাসিক বসুমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কিত বিবৃতি

১। প্রকাশের স্থান—বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

২। প্রকাশের সময়—মাসিক বসুমতী।

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম ও ঠিকানা—শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় নাগরিক। গ্রাম, মেড়িয়া। পোঃ, আকনা। জেলা, হুগলী।

৪। সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক (চট্টোপাধ্যায়)। ভারতীয় নাগরিক। ৫।১এ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪।

৫। স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চরমপত্র অনুযায়ী সংবাদপত্রের মালিকগণ এবং পার্টনারগণ কিম্বা মোট মূলধনের শতকরা এক ভাগের অধিকের অধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা—শ্রীমতী দীপ্তি দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। শ্রীমতী ভক্তি দেবী। ১৪১, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। শ্রীমতী আরতি দেবী। ৫।১এ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। কুমারী প্রণতি দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। কুমারী উৎপলা দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এষ্টেটের পক্ষে একজিকিউটরগণ—ভবতোষ ঘটক (মৃত); শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আমি শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এতদ্দারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসসম্মত।

স্বাক্ষর
শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক।
তারিখ—১৫-৩-১৯৫৮।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

বিদেশের কুকুরপ্রীতি

গত সংখ্যায় আপনাদের বসুমতীতে 'বিদেশী কুকুরপ্রীতি' শীর্ষক চিঠিখানি পড়িয়া যথেষ্ট আশান্বিত হইয়াছি। পত্রলেখিকা তাঁহার বক্তব্যে বর্তমান রুশদেশের নায়ক ক্রুশ্চেভ এবং রুশীয় স্পুৎনিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমিও বিশ্বাস করি, ক্রুশ্চেভ ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতেছেন যাহাতে তাঁহার দেশের বাসিন্দা এবং অন্যান্য দেশের রুশভক্তরা তাঁহাকেই দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা-পার্ব্বণ আরম্ভ করিয়া দেয়। আমি পত্রলেখিকার সঙ্গে একমত, স্পুৎনিক কোন কালে কোন দেশের মানুষের চিত্ত জয় করিতে সক্ষম হইবে না। রাশিয়ার ভারতপ্রীতিও আমার নিকট বিস্ময়ের বিষয়। ঘরের পার্শ্বের দেশকে দলে না টানলে হয়তো রাশিয়ার পরিণাম ভয়াবহ হইবে। তবে সুখের কথা এই, বর্তমানে রাশিয়ায় ভারতবর্ষের বহুবিখ্যাত পৌরাণিক মহাকাব্য সমূহের তর্জ্জমা চলিতেছে। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে শিকার করে না, যাঁহাদের ধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই, তাহারা কেন হঠাৎ ভারতের ধর্মগ্রন্থের প্রতি এতটা টান দেখাইতেছেন কে বলিবে! আমার মনে পড়িতেছে, ইতিহাস পাঠে একদা জানিয়াছিলাম, অশিক্ষিত ও বর্ব্বর রুশজাতিকে শিক্ষার আলোক দেখাইবার জন্য পিটার দি গ্রেট বিদেশের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আমি বিশ্বাস করি রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ভারতীয় মহাগ্রন্থ পাঠ করিলে রুশজাতির জ্ঞানের আলোক বৃদ্ধি পাইবে। রুশীয় ভাষায় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ প্রচলিত হওয়ায় আমাদের গদগদচিত্ত হওয়ার কোনই কারণ নাই। আমি আশা করি ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ রাশিয়ার শাসক সম্প্রদায়ও মন দিয়া পাঠ করিবেন। ইহাতে তাহাদের মনের গতির পরিবর্তন হইতে পারে। মিথ্যার পরিবর্তে, লুকোচুরির বিসর্জ্জন দিয়া রাশিয়া আরও অনেক বেশী উন্নত হইতে পারে। আমরা অনুকরণপ্রিয় হইলেও বিদেশের কুকুরদের মাথায় তুলিয়া আমাদের কিছু লাভ হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। রাশিয়ার নজীরে আমাদের কি প্রয়োজন?—মালা ভৌমিক। গোধুলিয়া। বারাণসী।

আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না, সম্প্রতি কলকাতার সংবাদপত্রে জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক সরকারী পুরস্কার বিতরণের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন! দিল্লীতে সঙ্গীত নাটক একাদেমীর সৃষ্টি হয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তার শাখা বিস্তার লাভ করেছে। দিল্লীর একাদেমীকে একাদেমী রূপে স্বীকার করতে আমি যথেষ্ট কুণ্ঠা বোধ করছি। কারণ 'একাদেমী' কি 'একাদেমীর' রীতিনীতি ও নিয়মকানুন পালন করছে? নিশ্চয়ই নয়। দিল্লীর একাদেমীর কর্ম্মকর্তাদের পরিচয় জেনে এবং একাদেমীর ভাবগতিক দেখে দেখে মাঝে মাঝে আমার হাসি পায়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় একাদেমী সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে! দিল্লীর একাদেমীর সঙ্গে আসল একাদেমীর কোন তুলনা চলে না। যাই হোক পুরস্কার বিতরণের ক্ষেত্রেও দিল্লীর সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন স্বেচ্ছাচারে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে তেমন হঠকারিতা কোন দেশেই চলে না। তাই বোধ করি মান্ধাতার আমলের লেখা সাহিত্য পুরস্কৃত হয়—কেবল মাত্র সুপারিশের জোরে। আজাদ সাহেব মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর একদল চ্যালাচামুণ্ডা এখনও আছে। আমাদের শিক্ষাদপ্তর নাকি এই চ্যালারাই চালিয়ে ছিলেন এতকাল। আজাদ দিবারাত্রি নীলকণ্ঠ সেজে বসে থাকতেন, কাজ চালাতো চ্যালার দল। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। উপাধি ও পুরস্কার বিতরণে যৎপরোনাস্তি খেয়ালের প্রশ্রয় চলেছে দিল্লীতে। কিন্তু উপাধি ও পুরস্কার যে মূল্যহীন হয়ে পড়ছে, খেয়াল হয় না কেন? শোনা যায় দিল্লীর দরবারে সকলেই কানে কালা এবং চোখে অন্ধ। মিথ্যা প্রতিবাদে তাই কি লাভ!
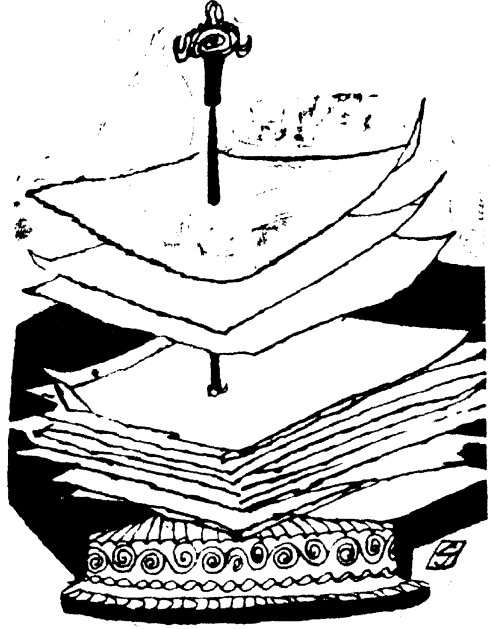
—জয়াবতী সেন। পাটনা।

প্রকাশকের দায়িত্ব

আশাকরি আপনি স্বীকার করবেন রাশি রাশি বাজে বই প্রকাশিত হওয়ার চেয়ে ভাল বই সংখ্যায় কম প্রকাশ হওয়া ঢের ভাল। মাসিক বসুমতীর সাহিত্য পরিচয়ে পড়লাম, বিপুলবপু গুরুভার ও অধিক মূল্যের বই প্রকাশে পত্রিকা আপত্তি তুলেছেন। বাংলার মত দরিদ্র দেশে এই ধরণের অপ্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশের হিড়িক কেন চলেছে আমার জানা নেই। আমার মনে হয় বাঙালী প্রকাশকদের অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি না পড়েই বই ছাপেন আর প্রকাশ করেন। গত ক বছর এমন কতকগুলি বই প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন প্রকাশক ছেপেছেন—যাদের কোনই প্রয়োজন নেই। বর্তমানে বাঙলায় বহু মূল্যবান ও তথ্যবহুল সদগ্রন্থ ছাপা নেই। বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। এই সুযোগে বেশ ক'জন গদ্যলেখক সেই সব বইকে নিজের ভাষায় বেশ কাজে লাগিয়ে চলেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে বাধা দেবেন, তেমন আশা করি না। কিন্ত

সার। দেশবাসী নিশ্চয়ই এই জুয়াচুরিকে মেনে নেবেন না। লেখকদের অসাধুতায় প্রকাশকরাও অসাধু হিসাবে পরিচিত হ'তে চলেছেন কেন? বিদেশের প্রায় প্রতি প্রকাশকের একটি একটি গবেষণা বিভাগ থাকে। এই বিভাগ চুরি ধরে, অশ্লীলতার সংজ্ঞা নির্দেশ করে, পাঠকপাঠিকার মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে। আমাদের দেশে? প্রকাশকরা অবহিত হবেন কি?

—জুলিয়া খাতুন। মুর্শিদাবাদ।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

I am sending you a crossed Cheque for Rs. 15/- only towards the renewal of my yearly subscription of your paper.—Major S. K. Gupta, Military Dental Centre, Jubbulpore.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা পাঠাচ্ছি। মাঘ মাস হতে নিয়মিত পাঠালে বাধিত হব। Ananda Sammilani Rangat, Middle Andaman.

Remitted Rs. 7/8/- being half yearly subscription of your Monthly Basumati—Amtala High School, Murshidabad.

৭.৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করে ফাল্গুন মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন। Mrs. S. Mallick, Ballia Medical Hall, Ballia.

সন ১৩৬৪ সাল মাঘ সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক মূল্য পাঠাইলাম। মাঘ সংখ্যা পাঠাইবেন। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা মিত্র। ভদ্রক নূতনবাজার বালেশ্বর।

গ্রাহক হ'তে চাই। নিয়মাবলী জানাবেন। সডাক কত লাগে? এখন থেকে নিলে কি কোন অসুবিধা হবে? শ্রীকমলা দেবী। পাহাড়ীপাড়া, জলপাইগুড়ি।

I am sending herewith Rs. 15/- being subscription for the Monthly Basumati for the period Phalgoon '64 B, S. to Magh '65.—Maharaja Bir Bikram College, Agartala, Tripura.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ করিয়া চাঁদার হার ও নিয়মাবলী পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। D. N. Banerjee, Amrabati (Berar).

আগামী ছয় মাসের চাঁদা ৭.৫০ নয়া পয়সা আজ পাঠালাম আশা করি যথারীতি পত্রিকা পাঠাবেন। শ্রীসুরমা চন্দ্র Rajnagar, Keonjhar,

আজ ৭.৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। আমাদের স্কুলের জন্য মাসিক বসুমতী আর ৬ মাসের জন্য পাঠাইবেন—মলয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলী।

আমি আগামী ৬ মাসের জন্য গ্রাহক মূল্য পাঠাইলাম। মাঘ সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।——P. Sircar, Golaghat, Assam.

Hereby sending Rs. 7/8/- for six months. Kindly continue sending the paper.—Rajmal Chordia, Freeganj (Ujjaini).

বার্ষিক 'মাসিক বসুমতী'র মূল্য ১৫৲ টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলাম নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী অমলা দেবী, শ্রীরামপুর, হুগলী।

Annual subscription of Rupees fifteen is being remitted herewith would you please continue to send M. Basumati as before & oblige.—Parul Rani Roy, Halem, Assam.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Gouri Mazumder, B. Sc. Jamnagr (Bombay State).

I send herewith Rs. 7·50 N. P. oniy being half yearly subscription from Magh '64 to Ashar '65 B. S. Please keep up the supply regularly—Rina Chakraborty, Hailakandi, Cachar.

আমি ছয় মাসের জন্য পুনরায় গ্রাহক হইলাম—Maya Palit, Bhubaneswar, Dt. Puri

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা ৭.৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ কোরে আমাকে গ্রাহিকা কোরে নেবেন এবং যথারীতি পত্রিকা পাঠাবেন। শ্রীপ্রতিভা দে,—Rajmai, Assam.

অদ্য পনেরো টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা যথারীতি পাঠাবেন। —Mrs. P. Dutta. 50673.

Please receive our annual subscription, for 1958.—Librarian. Scottish Church College Calcutta,

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় সর্ব্বাধিক প্রচারিত মাসিকপত্র ॥

মাসিক বসুমতী কেন কিনবেন ?

বাঙলা আর বাঙালীর গর্ব আর অহঙ্কারের মনিকোটা বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠতম সাময়িক পত্র মাসিক বসুমতী। সমগ্র বাঙালী সমাজের প্রিয়তমা মাসিক বসুমতী আরও একটি বৎসর অতিক্রম করলো সম্মান ও প্রচারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। পত্রিকার এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী জয়যাত্রায় পত্রিকার বিরাট পাঠক ও পাঠিকাগোষ্ঠীকে আমরা অভিনন্দন জানাই। পত্রিকার আরও এক বৎসর আয়ুবৃদ্ধিতে আনন্দের যথেষ্ট কারণ আছে। কেন না পত্রিকা যতই বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হোক না—বসুমতী যেন এক ব্যতিক্রমের অনন্তযৌবনা।

আজকালের অভিজ্ঞ ও সুরুচিসম্পন্ন পাঠক-পাঠিকাদের মনের চাহিদা মিটাতে মাসিক বসুমতীর মত পত্রিকা আর আছে কি ? বসুমতীর পাঠক-পাঠিকা তাই আজ শুধু মাত্র কলকাতা তথা বাঙলা তথা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে নেই, বিস্তার লাভ করেছে সাত সমুদ্রের পারে। লণ্ডন, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও বহির্ভারতের বহু স্থানে এখন বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার সন্ধান পাবেন। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আশীষপ্রুত বসুমতীর স্থান আজ তাঁর মতই—দেশ-বিদেশের ঘরে ঘরে ঠাঁই !

মূল্যবান রচনা ও গবেষণা, চিত্তাকর্ষক গল্প আর মনোরম উপন্যাস, বিভিন্ন ধারার কবিতা আর পৃথিবীখ্যাত অনুবাদ-সাহিত্য, জ্ঞানার্জ্জনের সহায়ক অজ্ঞাত তথ্য—মানুষের 'আরও জানতে চাই' জ্ঞানস্পৃহার খোরাক যুগিয়ে চলেছে মাসিক বসুমতী। পত্রিকার বৈশিষ্ট্য জীবনী ও আত্মজীবনী; শিল্প ও বিজ্ঞান; বিখ্যাত পত্রসাহিত্যের সঙ্কলন; সাহিত্য-পরিচয়; খেলাধূলা; শিশুমহল; মহিলাদের বিভাগ; চারজন; নৃত্যগীতবাদ্য—কিছুই বাদ নেই। প্রচ্ছদ, বর্ণচিত্র ও আলোকচিত্রের সমাবেশ এই সঙ্গে। আপনি জানবেন আপনার সমগ্র পরিবারের জন্য একখানি, মাত্র একখানি কাগজ আছে—তার নাম মাসিক বসুমতী। পত্রিকার বর্ষ শেষ হওয়ার বিজ্ঞপ্তি পাঠের পর আমাদের প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই তাঁদের আগামী বর্ষের বসুমতীর মূল্য অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবেন। কারণ অধিক বিলম্বে মাসিক বসুমতী বাজারে না পাওয়াও যেতে পারে। আমাদের অনেক দিনের পুরানো গ্রাহকগ্রাহিকাগণ নববর্ষের টাকা পাঠানোর সময়ে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করতে যেন ভুলবেন না।

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ২৪৲
ষাণ্মাষিক "	— ১২৲
প্রতি সংখ্যা "	— ২৲

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	— ১৫৲
" ষাণ্মাসিক সডাক	— ৭·৫০

ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১·২৫

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ১·৭৫

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	— ২১৲
ষাণ্মাসিক " " "	— ১০·৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	— ১·৭৫

● মাসিক বসুমতী কিনুন ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বলুন ●

সমরেশ বসুর নূতন উপন্যাস

সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যের শক্তিমান লেখকদের মধ্যে সমরেশ বসু অনন্য। 'ভানুমতী' তাঁর আধুনিকতম উপন্যাস। জেলের মেয়ে ভানুমতী তার সর্বনাশা রূপ নিয়ে জীবনের বিচিত্র প্রবাহে ভেসে চলল—উনবিংশ শতাব্দীর সেই মেয়ে বিংশ শতাব্দীর নগর-সভ্যতার সিংহদ্বারে এসে এক সহৃদয় লেখকের সামনে তার রঙে রসে বেদনায় ভরা যে অতীত জীবন মেলে ধরল—সে কাহিনী কি তীব্র, কি করুণ আর বিস্ময়কর! দাম ঃ ৪·৫০

ষষ্ঠ ঋতু

সমরেশ বসু

(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

কত বিচিত্র চরিত্রকে কত বিচিত্র পরিবেশেই দেখেছেন সমরেশ বসু। আর কি গভীর সহানুভূতি তাঁর অমৃতসন্ধানী লেখনীকে উজ্জ্বল করেছে! গল্প সংকলন। দাম ঃ ২·০০

প্রভাত দেব সরকার

কয়েকটি রসোত্তীর্ণ গল্পের সংকলন। দাম ঃ ২·০০

মেয়েদের মহিমা

শিবরাম চক্রবর্তী

মেয়েদের মনের বিচিত্র রহস্য, যা দেবতাদেরও অনধিগম্য, শিবরাম চক্রবর্তী সেই দেবদুর্লভ প্রচেষ্টায় ব্রতী। দাম ঃ ২·০০

কন্যাকাহিনী

জেন অস্টেন

একটি রসমধুর প্রেম কাহিনীর অনুবাদ। দাম ঃ ৩·০০

ক্যাণ্ডিড

ভলটেয়ার

ভলটেয়ারের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ। দাম ঃ ২·৫০

নিও-লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

১ নং কলেজ রো, কলিকাতা—৯

॥ [illegible] বসু ॥

আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতি

আধুনিক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হবার একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। দাম ২·৫০

॥ ডাঃ শচীন সেন ॥

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়

রবীন্দ্র-মানসের মুকুর-স্বরূপ। দাম ৭·০০

॥ জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

জাহ্নবী যমুনার উৎস-সন্ধানে

দুস্তর তীর্থ-ভ্রমণের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা। দাম ৩·৫০

॥ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ॥

মহাভারতের গল্প

মহাভারতের যা মুখ্য অংশ তারই একটি সুসংবদ্ধ ধারা গল্পের মাধ্যমে রূপায়িত। বহুচিত্র শোভিত। দাম ৪·৫০

॥ বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥

প্রেমের গল্প

বাংলার সমসাময়িক খ্যাতিমান লেখকদের লেখা প্রেমের গল্পের এরূপ বিরাট সচিত্র সংকলন এই প্রথম। লেখকদের চিত্রসহ জীবনী। রয়েল সাইজে ৩৩০ পৃষ্ঠা। দাম ৭·৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শেষ জীবনের রচনা

পরাধীন প্রেম (উপন্যাস) ৩·০০ **লাজুকলতা** (গল্প) ২·৫০

—উপন্যাস—

বিভূতিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
চক্রবৎ ৪·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
পাঁক ২·৫০

রমাপতি বসু
রোশনচৌকি ২·৭৫

রমেশচন্দ্র দত্ত
বঙ্গবিজেতা ২·৫০

কুমারেশ ঘোষ
ভাঙ্গাগড়া ২·৫০

বীরেন দাশ
সন্ধান ২·০০

—গল্প—

পরিমল গোস্বামী
মায়কে লেজে ৪·০০

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য
অনির্বাণ শিক্ষা ২·৭৫

—জীবনী—

ডাঃ তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজা রামমোহন ১·৭৫

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
আগুন নদীর তীরে ১·২৫

(যন্ত্রস্থ)
অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল অনুদিত—**থেরেসা**
শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ অনুদিত—**লে মিজারেবল**
প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের উপন্যাস—**শৃঙ্খলিতা**
(যন্ত্রস্থ)

রীডার্স কর্নার

ফোন: ৩৪-৩৬৫২

তালিকার জন্য লিখুন

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

এই তো সবে ৮ মাস বয়েস—

এরই মধ্যে দাঁড়াতে শিখেছে !

ওর মা ওকে নিশ্চয়ই

ডিউমেক্স বেবী ফুড খাওয়ান

DX 6259

ডিউমেক্স প্রাইভেট লিমিটেড • ওয়ালেস হাউস, বোম্বাই-১

বিবাহের

বেনারসী
ও
সিল্ক সাড়ী

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

এবং ১৬৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

(তেলরঙ)

মা ও ছেলে
—ভিনসেণ্ট, ভ্যান গগ, অঙ্কিত

আমাদের প্রকাশিত

প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর বই

ভারত রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত, আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত ও
রাজ্য সরকার প্রদত্ত বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
সাগর থেকে ফেরা ৩৲ (৪র্থ মুদ্রণ) বাহির হইয়াছে !

ভারত সরকারের শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
ঘনাদার গল্প ২৸৹

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ-স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত
স্বনির্বাচিত গল্প ৪৲ (২য় মুদ্রণ)

৭ই চৈত্রের বই

নিরঞ্জন চক্রবর্তীর — **উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য** ৮৲
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের — **বাঘের লুকোচুরি** (ছোটদের জন্য বাঘ শিকার কাহিনী) ২৲
'বনফুল'-এর — **করবী** (ছোটদের গল্পগ্রন্থ) ১৸৹

চৈত্রে পুনর্মুদ্রিত

দেবেশ দাশের রোম থেকে রমনা ৩৲ (৩য় মুদ্রণ) শিবরাম চক্রবর্তীর বর্মার মামা ২৲ (৩য় মুদ্রণ)

উপন্যাস ।। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের—**তুমি আর আমি** ১৷৹ ।। প্রাণতোষ ঘটকের—**আকাশ পাতাল** (১ম) ৫৲ (২য়) ৫৸৹ ।। বনফুলের—**ভীমপলশ্রী** ৪৷৷৹ ।। বুদ্ধদেব বসুর—**হে বিজয়ী বীর** ৩৷৷৹ ।। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের—**ঠিক-ঠিকানা** ২৲ ।। সরোজকুমার রায় চৌধুরীর—**অনুষ্টুপ ছন্দ** ৪৲ ।। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের—**কাঞ্চন-মূল্য** ৪৲ ।। বিমল মিত্রের—**কন্যাপক্ষ** ২৸৹ ।। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের—**সৃষ্টি** ৫৷৷৹ ।। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের—**দিবারাত্রির কাব্য** ৩৲ ।। সন্তোষকুমার ঘোষের—**নানা রঙের দিন** ৪৲ ।। দিলীপকুমার রায়ের—**অঘটন আজো ঘটে** ৫৲ ।। গোকুল নাগের—**পথিক** ৬৷৷৹ ।। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—**দেবকন্যা** ৪৷৷৹ ।। বিমল মিত্রের—**সুয়োরাণী** ৩৲ ।। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের—**কলকাতার কাছেই** ৫৷৷৹ ।। অজিতকৃষ্ণ বসুর—**প্রজ্ঞাপারমিতা** ৬৲ ।। অনুরূপা দেবীর—**উত্তরায়ণ** ৫৷৷৹ ।। কণাদ গুপ্তের—**পূর্ব-মীমাংসা** ২৷৷৹ ।। নিরুপমা দেবীর—**অন্নপূর্ণার মন্দির** ৩৷৹ ।। প্রতিভা বসুর—**মালতীদির গল্প** ২৷৷৹ ।।

গল্পগ্রন্থ ।। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—**সিন্ধুর টিপ** ২৷৷৹ ।। প্রেমেন্দ্র মিত্রের—**সপ্তপদী** ২৲ : **পুতুল ও প্রতিমা** ৩৲ ।। সন্তোষকুমার ঘোষের—**পারাবত** ৩৲ ।। বিমল মিত্রের—**পুতুলদিদি** ৩৲ ।। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—**জাতিস্মর** ২৷৷৹ ।। দক্ষিণারঞ্জন বসুর—**বাজীমাৎ** ১৸৹ ।।

কবিতা গ্রন্থ ।। প্রেমেন্দ্র মিত্রের—**প্রথমা** ২৷৷৹ : **সম্রাট** ২৲ : **সাগর থেকে ফেরা** ৩৲ ।। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের—**প্রিয়া ও পৃথিবী** ২৲ ।। মোহিতলাল মজুমদারের—**স্থনির্বাচিত কবিতা** ৪৷৷৹ ।। বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—**একুশটা মেয়ে** ১৷৷৹ ।।

স্বনির্বাচিত গল্প ।। প্রবোধকুমার, প্রেমেন্দ্র, তারাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার, প্রতিভা বসু, নারায়ণ, বুদ্ধদেব, বিভূতিভূষণ মুখো, শৈলজানন্দ, আশাপূর্ণা দেবী, প্রেমাঙ্কুর, প্রমথনাথ, শিবরাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রত্যেকখানির মূল্য ৪৲ ।।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বছরের লীলা পুরস্কারে সম্মানিত
লীলা মজুমদারের **হলদে পাখীর পালক** ২৲

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি।

আমাদের বই

পেয়ে ও দিয়ে

সমান তৃপ্তি।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
HIMKALYAN
অন্যান্য প্রসাধনী
• পাসিকোকো
সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO

মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—চৈত্র, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "তুই বিশ্বাস করিস্ আর নাই করিস্, মা যে আমায় দেখিয়ে দিচ্ছে!"

"ও চাল-কলা বাঁধা বিদ্যাতে আমার কাজ নাই, ও বিদ্যা আমি শিখব না!"

"হাতির বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে মারবার জন্য এবং ভিতরের দাঁত নিজের খাবার জন্য, সেই রকম মহাপ্রভুর দ্বৈতভাব বাহিরের ও অদ্বৈতভাব ভিতরের জিনিষ ছিল।"

"যে সাধু ঔষধ দেয়, যে সাধু ঝাড়্ফুঁক করে, যে সাধু টাকা নেয়, যে সাধু বিভূতি তিলকের বিশেষ আড়ম্বর ক'রে খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোর্ট (sign board) মেরে নিজেকে বড় সাধু ব'লে অপরকে জানায়, তাদের কদাচ বিশ্বাস করবি না।"

"মা'র কাজ মা করেন, আমি জগতের কাজ করিবার, লোকশিক্ষা দিবার, কে?"

"কচ্ছিস্ কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? (আমার) নাইবার খাবার সময় নেই! (ঠাকুরের তখন গলদেশে বাথা হইয়াছে। নিজের শরীর লক্ষ্য করিয়া) একটা তো ভাঙ্গা ঢাক্! এত ক'রে বাজালে কোন্ দিন ফুটো হ'য়ে যাবে যে! তখন কি করবি!"

"অমন সব আদাড়ে লোককে এখানে আনিস্ কেন?" (একটু চুপ করিয়া) "আমি অত পারবো না। একসের দুধে এক আধপো জলই থাক্—তা নয়, একসের দুধে পাঁচসের জল! জ্বাল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে গেল! তোর ইচ্ছে হয় তুই দিগে যা। আমি অত জ্বাল ঠেল্‌তে পারবো না। অমন সব লোককে আর আনিস নি।"

"তোদের সব দেখ্‌বার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন ক'রে উঠ্‌তো, এমনভাবে মোচড় দিত যে, যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে পড়্‌তুম! ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হ'ত! লোকের সাম্‌নে, কি মনে কর্‌বে ভেবে, কাঁদ্‌তে পারতুম না! কোনও রকমে সাম্‌লে সুম্‌লে থাক্‌তুম্! আর যখন দিন গিয়ে রাত আসত, মা'র ঘরে, বিষ্ণুঘরে, আরতির বাজনা বেজে উঠ্‌ত, তখন আরও একটা দিন গেল—তোরা এখনও এলিনি ভেবে আর সাম্‌লাতে পারতুম না; কুঠীর উপরে ছাদে উঠে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে, বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম ও ডাক ছেড়ে কাঁদতুম! মনে হ'ত পাগল হ'য়ে যাব! তারপর কিছুদিন বাদে তোরা সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি—তখন ঠাণ্ডা হই! আর আগে দেখেছিলাম ব'লে, তোরা যেমন যেমন আসতে লাগলি অমনি চিন্‌তে পারলুম! তারপর পূর্ণ যখন এল, তখন মা বল্লে, ঐ পূর্ণতে তুই যারা সব আসবে বললে দেখেছিলি তাদের আসা পূর্ণ হ'ল। ঐ থাকে (শ্রেণীর) লোকের কেউ আসতে বাকি রইল না! মা দেখিয়ে ব'লে দিলে—"এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ'।"

মহারাজ নন্দকুমারের বিচার

পঞ্চানন ঘোষাল

একদিন মহারাজ নন্দকুমার ছিলেন কলিকাতা মহানগরীর সর্ব্বজনপূজ্য ধনী নাগরিক। তিনি তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা ছিলেন। সহরের অন্যান্য নাগরিকরাও তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমগ্র হিন্দু সমাজেরই নেতা ছিলেন। এমন কি মোসলেম খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়সহ বহু য়ুরোপীয়রাও তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করেছিল। তাঁর সুপরামর্শ গ্রহণ করবার জন্য মিঃ ফ্রানসিস্, কর্ণেল মনসোন প্রভৃতি তৎকালীন ইংরাজ রাজপুরুষরাও উদ্‌গ্রীব থাকতেন। তাঁর মত ক্ষমতায় আসীন নাগরিক এ সময় আর কেহ ছিলেন না। ইংরাজ রাজপুরুষদের একটি দল তাঁকে সকল সময়েই সমর্থন করতেন, এ কথা সত্য। কিন্তু তা সত্বেও ইংরাজ সরকার তাদের ভারতীয় প্রজাদের উপর সামান্য অত্যাচার বা অবিচার করলে সর্ব্বাগ্রে তিনিই তা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসতেন। এই সময় বহু ইংরাজ পুরুষ ভারতীয়দের ধন সম্পত্তি ছলে বলে লুঠ করে রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখতেন। এই সকল ইংরাজের নিকট স্বভাবতঃই তিনি শত্রুরূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংস নিজেও এঁদেরই একজন ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার তৎকালীন শাসন পরিষদের কয়েকজন সাধুচরিত্র সদস্যদের সহায়তায় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ন্যায় জবরদস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতেও কুণ্ঠিত হননি। কারণ শাসকদের ব্যক্তিগত শোষণ হতে ভারতীয়দের রক্ষা করা তাঁর কাছে ছিল একটি ধর্ম্মবিশেষ। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাঁকে হেষ্টিংস সহ এক দল ইংরাজদের রোষাগ্নিতে পতিত হতে হয়। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের মত একজন নির্ভীক মানুষকে তাঁর কর্ম্ম-জগত হতে অপসরণ করা হেষ্টিংসের পক্ষেও সহজ হয়নি। তাই তাঁরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ইহজগত হতেই সরিয়ে দিতে চাইলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের প্রথম স্থাপিত সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রথম প্রধান বিচারপতি এলিজা ইমপের সহায়তাতেই এই অপকার্য্য সাধিত হয়েছিল।

আজ ভারত এবং ইংলণ্ডের যে কোনও এক ইতিহাসের ছাত্রকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমরা ভারতের প্রথম প্রধান বিচারপতি সম্বন্ধে কিছু জানো কি? তা হলে তারা সমস্বরে উত্তর দিয়ে থাকে, 'হাঁ, হাঁ জানি। তিনিই তো ভারতের জনৈক গভর্ণর লর্ড হেষ্টিংসকে বিপদমুক্ত করবার জন্য তাঁর পথের কণ্টক এক সাধুচরিত্র ভারতীয় নেতাকে বিনা দোষে ফাঁসি দিয়েছিলেন।'

আজ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট মহারাজ নন্দকুমারের নামের সহিত তাঁর বিচারক এলিজা ইম্পের নামও সুবিদিত। কিন্তু এজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত মেকলে নামক অপর একজন ইংরাজকে। ১৮৪১ সালে এডিনবরা রিভিউ নামক ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকায় তিনি এই বিচার-প্রহসন সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ না লিখলে আজ হয়তো এই উভয় ব্যক্তির নাম কালের কবলে বিলীন হয়ে যেতো। এই সম্পর্কে মহারাজ নন্দকুমারের অকৃত্রিম বন্ধু তৎকালীন ভারতীয় শাসন-সভার অন্যতম সভ্য ফিলিপ ফ্রান্সিসের জীবনী-লেখককেও আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ঐ বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থে তিনি সুস্পষ্টরূপে লিখে গিয়েছেন যে, ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে ফ্রান্সিস ফিলিপকে দুর্ব্বল করার জন্যই বিচারের প্রহসন দ্বারা মহারাজ নন্দকুমারকে হত্যা করেছিলেন। এই সম্পর্কে আর একজন মহান ইংরাজের নাম না করলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ইংরাজ মহাপুরুষের নাম এডমাণ্ড বার্ক। ইনি তৎকালীন বৃটিশ পার্লামেণ্টে এই বিচার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা অবিস্মরণীয়! তাঁর মুখে মহারাজ নন্দকুমারের বিচার প্রহসনের কাহিনী শুনে এক দিন সমগ্র ইংরাজ জাতিই চোখের জল ফেলেছিল।

১৭৭৫ সালে ৫ই আগষ্ট শনিবার, কলিকাতায় গঙ্গার তীরে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। তৎকালীন ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থিত কোর্ট অব ডিরেক্টারদের সহিত যে সকল পত্রালাপ হয়, তাহা হ'তে মহারাজ নন্দকুমারের গ্রেপ্তার ও হাজতবাস সম্পর্কিত বহু ঘটনার সংবাদ জানা যায়।

মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে প্রথমে মিঃ জাষ্টিস লেমিসটার এবং মিঃ জাষ্টিস জোন হাইড, নামক দুই জন বিচারক লইয়া এক প্রাথমিক আদালত গঠন করেন। এই আদালতে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণ এবং জাল করার অভিযোগ আনীত হয়েছিল। এই বিচারকদ্বয় সারা দিন ও তৎপর রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত বিচারকার্য্য করে অভিমত প্রকাশ করেন যে, সরকারের তরফ হতে যে সকল সাক্ষ্যসাবুত পেশ করা হয়েছে, তা উভয় বিচারকেরই মতে সত্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে। এর পর তাঁরা কলিকাতা মহানগরীর প্রধান শেরিফ ও রাজকীয় কারাগারের অধিকর্ত্তার উদ্দেশে নিম্নোক্তরূপ এক পরোয়ানা জারী করে তাতে

উভয়েই স্বাক্ষর করেন। ঐ বিখ্যাত পরোয়ানার একটি অনুলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"মহারাজ নন্দকুমারকে সশরীরে তোমাদের নিকট পাঠানো হলো। তোমরা তাঁকে তাঁর শেষ বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের হেপাজতে রাখবে। মহম্মদ এসাউদ, কমলউদ্দিন খান এবং অন্যান্য সাক্ষিগণ শপথ গ্রহণান্তে যে বিবৃতি দিয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি অসদুদ্দেশ্যে একটি দলীল জালরূপে জেনেও উহা সত্য ব'লে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এইরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা তিনি একদা এমন এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন যার জন্য ঘাতকদের হস্তে বোলাকি দাস নামক এক ব্যক্তিকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। অতএব তার বিরুদ্ধে আনীত মামলা আইনানুযায়ী মীমাংসিত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা তাঁকে বন্দীকৃত অবস্থায় রাখবে। অদ্য ১৭৭৫ সালের ছোয়োই মে মাসে আমাদের স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত এই হুকুমনামা জারী করা হলো।"

উপরোক্তরূপ হুকুমনামা জারী করে বিচারকদ্বয় প্রস্থান-উদ্যত হচ্ছিলেন। এমন সময় মিঃ জারেট নামক একজন ইংরাজ এটর্নি আদালতে প্রবেশ করে জানালেন যে তিনি বন্দীকৃত ব্যক্তির পক্ষে কিছু সওয়াল জবাব দিতে চান। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আদালতকে জানান যে, মহারাজ নন্দকুমার ভারতীয় সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত একজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব নেতা। একজন সাধারণ হীন ব্যক্তির ন্যায় তাঁকে চোর-ডাকাতদের সহিত সাধারণ কারাগারে নিক্ষেপ করলে তাঁর ধর্ম্ম ও মর্য্যাদাহানি অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যুত্তরে বিচারকদ্বয় তাঁকে জানান যে, ঐ বন্দীকে সাধারণ কারাগারে না পাঠিয়ে অন্য কোনও আবাসে পাঠালে অন্যায় করা হবে। কিন্তু তাঁদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা ঘোরতর প্রতিবাদ করলে ঐ বিচারকদ্বয় এই সম্পর্কে প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করতে স্বীকৃত হন। এই সর্ব্ববাদী প্রতিবাদ সহরে এতো তীব্রাকার ধারণ করেছিল যে তাঁরা তখুনি আদালত ত্যাগ করে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে যাত্রা করতে বাধ্য হন। কিছুকাল প্রধান বিচারপতির সহিত সলাপরামর্শ করে ফিরে এসে মিঃ জাষ্টিস্ এস সি লেমিষ্টার তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত অপর আর একটি হুকুমনামা কলিকাতা সহরের শেরিফ মিঃ টলফ্রের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ দ্বিতীয় হুকুমনামার একটি বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্‌ধৃত করা হলো।

"আমরা লর্ড চিফ্ জাষ্টিসের সহিত এতদ্ সম্পর্কে বিশেষরূপে পরামর্শ করেছি। আমাদের সকলের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, শেরিফের পক্ষে এই বন্দীকে সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্দ্ধারিত সাধারণ কারাগারেই আটক রাখা উচিত হবে।"

এই একটি মাত্র ঘটনা হতে ইহা বুঝা যায় যে, অধস্তন জজগণ এই বিষয়ে প্রধান বিচারপতির নির্দেশ ব্যাতিরেকে কোনও হুকুম প্রদানে অপারগ ছিলেন। অন্য দিকে এই অধস্তন বিচারকরা নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতিশীলও ছিলেন, তাহা না হলে আদালত ছেড়ে তাঁরা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ছুটে যেতেন না।

শহরের বহু সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তি এই সময় নন্দকুমারের প্রতি অনুরাগ বশতঃ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এই সকল অনুরাগী বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে হেষ্টিংসের শাসন পরিষদের সদস্য জেনারেল ক্লেভারিঙের স্ত্রী ও কন্যা মিসেস্ ও মিস্ ক্লেভারিঙ এবং লেডী এ্যান মোনসনও ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারকে এই ভাবে একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় সাধারণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে দেখে এঁরা সকলেই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। এই সঙ্গে তাঁরা এও বুঝেছিলেন যে, গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সম্পর্কে তাঁদের কোনও আন্দোলনই সফল হবে না।

এইরূপ নিরুপদ্রব প্রতিবাদ কারাগার হতে স্বয়ং মহারাজ নন্দকুমারও করেছিলেন। তিনি সুস্পষ্টরূপে কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন যে, এই কারাগারের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা তাঁর দৈনন্দিন ধর্ম্মাচরণের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। এই কারণে এইখানে তিনি খাদ্য তো দূরের কথা, জলগ্রহণও করবেন না। বরং তিনি প্রায়োপবেশন দ্বারা মৃত্যুকেই বরণ করে নিতে মনস্থ করেছেন।

মহারাজ নন্দকুমারের এই অনশন ধর্ম্মঘটের সংবাদ পাওয়া মাত্র কলিকাতাস্থ ভারত গভর্ণমেণ্টের এক জরুরী বৈঠকও বসেছিল। ১৭৭৫ সালের ১ই মে'র কাউন্সিলের মিটিংএ উহার অন্যতম সদস্য জেনারেল ক্লেভারিঙ উদাত্ত ভাষায় হেষ্টিংসের সরকারকে উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্তরূপ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ বক্তৃতাটির বাঙলা সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

আমি আমাদের বোর্ডের মেম্বারদের এক্ষণে জানাতে চাই যে, আমি মিঃ জোসেফ ফোকের নিকট হতে একটি জরুরী পত্র পেয়েছি। এই মাত্র তিনি কারাগারে মহারাজ নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাতান্তে ফিরে এসেছেন। তিনি মহারাজ নন্দকুমারকে আহার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু প্রত্যুত্তরে মহারাজ নন্দকুমার তাঁকে যা বলেছিলেন তাহাও এই পত্রে তিনি লিখে পাঠিয়েছেন। এই দেখুন, পড়ে দেখুন আপনারা সেই পত্র—

'আপনারা আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি এই কদর্য্য পরিবেশের মধ্যে জল গ্রহণ করতেও অপারগ। ধর্ম্মের নিকট আমার প্রাণ কিছুই নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা খণ্ডন করার ক্ষমতা কাহারও নেই। তবে এইটুকুই আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, আমি একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তি।'

এ ছাড়া মিঃ জোসেফ ফোক কারারক্ষকদের নিকট শুনেছেন যে মহারাজ নন্দকুমারের মনোবল অটুট থাকলেও তাঁর জিহ্বা এড়িয়ে আসছে। আর একদিন জল পান না করলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য্য। মহারাজ নন্দকুমার শেষ বিচারের সম্মুখীন হতে রাজী আছেন, কিন্তু তাঁর ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে তিনি একদিনও আর বাঁচতে চান না।

এই দিনের শাসন পরিষদের সভায় লর্ড হেষ্টিংস কিরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় নি। তবে তাঁর গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হতে ভারতের প্রধান বিচারপতির নিকট বন্দীকৃত নন্দকুমারের তৎকালীন অবস্থার বিষয় জানাবার জন্য কলিকাতার প্রধান শেরিফকে পাঠাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবতঃ লর্ড হেষ্টিংস্ পূর্ব্ব হতেই তাঁরে পরম বন্ধু প্রধান বিচারপতির মনের গতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন ব'লে তাঁর গভর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তে কোনও প্রকার বাধা প্রদান করেন নি।

মহারাজ নন্দকুমারের বিচার প্রহসন সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের সমাধান যে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছিল, তা প্রধান

বিচারপতি স্যার এলিজা ইমপে ভারত গভর্ণমেন্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তরে যে লিপিকা পাঠিয়েছিলেন, উহা হতে তা বুঝা যায়। এই সম্পর্কে প্রধান বিচারপতির বিপোর্টের একটি বাঙ্গালা অনুলিপি দিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমরা কিরণ শর্ম্মা, জীবন শর্ম্মা, বাণীশ্বর শর্ম্মা, গোপাল শর্ম্মা, গৌরীকান্ত শর্ম্মা নামক পাঁচজন ব্রাহ্মণকে মহারাজ নন্দকুমারের সহিত কারাগারে দেখা করে এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট আমাদের নিকট পেশ করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলাম। তাঁরা মহারাজ নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করে অকুস্থলের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমাদের নিকট নিম্নোক্তরূপ এক অভিমত পেশ করেছেন।

কারাগারের নীতি-বিগর্হিত পরিবেশে বসবাস ও আহার গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মে পতিত হওয়া সম্বন্ধে মহারাজ নন্দকুমার যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু আমরা মনে করি যে পরে চান্দ্রায়ণ নামক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তিনি অনায়াসেই পাপমুক্ত হতে পারবেন। কারাগারের পরিবেশে কিছুদিন থাকলে তাঁর কোনও ক্ষতিই হতে পারে না। কারণ পরে ঐখান হ'তে বেরিয়ে এসে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করে তিনি ঐ পাপ হতে অব্যাহতি পেতে পারবেন। চান্দ্রায়ণ নামক এই প্রায়শ্চিত্ত বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধন সহ এক মাস যাবৎ করার নিয়ম কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের ন্যায় একজন বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এই কৃচ্ছ্রসাধন সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে তিনি বৎস সহ আটটি গাভী অন্যান্য ব্রাহ্মণকে দান করলেই এই পাপ হতে মুক্ত হতে পারবেন কিন্তু এতে যদি তিনি অপারগ হন তাহলে দরিদ্র ব্রাহ্মণদের ন্যায় আটত্রিশ কাহন সাত পণ কড়ি ঐ ভাবে অন্য ব্রাহ্মণদের দান করলেই যথেষ্ট হবে।'

'এই সকল শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের উপরোক্ত মতামত হতে আমরা মনে করি যে নন্দকুমার এই সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য হতে পারে না। মহারাজ নন্দকুমারকে এই অভিমত সম্বন্ধে অবহিত করাও হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তিনি জানিয়েছেন যে, ঐ সকল মূর্খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণগণ আর্য্যশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তিনি আবেদন করেন যে নদীয়ার ব্রাহ্মণদের এই সম্পর্কে মতামত নেওয়া হোক। তাঁর মতে সেখানে এখনও বহু প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু এই বন্দীকৃত ব্যক্তির এবংবিধ উক্তির সহিত একমত হতে না পারায় তাঁর আবেদন আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম।

মহারাজ নন্দকুমারের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি আমরণ অনশন হতে আর বিচ্যুত হলেন না। অবস্থা অতীব বিপজ্জনক হয়ে উঠলে ১০ই মে প্রধান বিচারপতি ডাঃ মুবসিরণ নামক এক ডাক্তারকে নন্দকুমারকে জোর করে খাওয়াবার জন্য পাঠালেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নন্দকুমার অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। এই বিষয় অবগত হয়ে বিচারকমণ্ডলী কারারক্ষক (জেলার) ম্যাথু এণ্ডেসকে বেসরকারী ভাবে কারাপ্রাচীরের মধ্যে একটু উন্মুক্ত স্থানে নন্দকুমারের জন্য একটি দুয়ার বিহীন তাঁবু [বস্ত্রাবাস] খাটিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। অবশ্য জাষ্টিস লিমেষ্টার এইরূপ ব্যবস্থাতেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার এই তাঁবুতে আমৃত্যুর জন্য বন্দী রয়েছিলেন।

'ইংলণ্ডেশ্বর বনাম মহারাজ নন্দকুমার' মামলাটি ছিল নব প্রতিষ্ঠিত সুপ্রীম কোর্টের সর্ব্বপ্রথম ফৌজদারী মামলা। কলিকাতার ষ্ট চার্চটি যে স্থানে অবস্থিত ঐ স্থানে এই সুপ্রীম কোর্টটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতিপূর্ব্বে এইখানেই কলিকাতার পূর্ব্বতন মেয়র কোর্টটি স্থাপিত হয়েছিল। এই বিখ্যাত বিচার প্রধান বিচারপতি এবং তৎসহ অবস্তন জজ মেসার্স চেম্বারস, লেমষ্টার এবং হাইড কর্ত্তৃক গঠিত একটি বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা ঐ আদালতে সমাধা হয়। এই কুখ্যাত বিচার ৮ই জুন ১৭৭৫ হতে আরম্ভ হয়ে উপর্যুপরি আট দিন যাবৎ চলেছিল। এই বিচার এক নাগাড়ে দিবা-রাত্র চলার মধ্যে একটি তাৎপর্য্য ছিল বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ ডমংবিকোতের আশঙ্কায় এই বিচার তাড়াতাড়ি শেষ করার প্রয়োজন হয়েছিল। কিংবা হেষ্টিংসের নির্দ্দেশে তাঁর পথের কাঁটা নন্দকুমারকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া অন্যান্য ইংরাজদের চেষ্টায় বিলাত হতে অনুরূপ হুকুম আসাও অসম্ভব ছিল না। রাত্রিকালীন বিচারের সময় একজন জজ সর্ব্বদাই আদালতকক্ষে উপস্থিত থাকতেন। অন্যান্য জজগণ পালা করে আদালত সংলগ্ন অপর একটি কক্ষে ঘুমিয়ে নিতেন। এ ছাড়া শেরিফের অফিসারের তত্ত্বাবধানে জুরী মহোদয়গণও পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে পালা করে কেহ বিশ্রাম করতেন কেহ বা সেখানে ঘুমিয়ে নিতেন। দিবা-রাত্র এই আদালত-ভবনে উপস্থিত থাকতে হওয়ায় তাঁদের ঐখানে স্নান-আহারও সেরে নিতে হতো। এই আদালতের কার্য্য প্রতিদিন সকাল আটটায় আরম্ভ হতো। স্নান-আহারের সময় ভিন্ন বিচারকার্য্যের মধ্যে একটু মাত্রও বিশ্রাম দেওয়া হয়নি। এই সময় ঐ আদালতে টানা পাখা স্থাপিত হয়নি। কোনও প্রকার বরফ পানেরও প্রচলন ছিল না। ঐ গ্রীষ্মেও তৎকালীন প্রথানুযায়ী জজদের ভারী পোষাক পরিচ্ছদ পরতে হতো। এই জন্য তাঁদের পর্য্যায়ক্রমে দিনে তিন চার বার করে তাঁদের ঘর্ম্মাক্ত পোষাক পরিবর্ত্তনও করতে হয়েছে!

এই বিচারকার্য্যে সাহায্য করার জন্য বার জন জুরী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে জন রবিনসন নামক এক ব্যক্তিকে মুখ্য জুরী বা ফোরম্যান করা হয়েছিল। অপরাপর জুরীদের মধ্যে ছিলেন, এডোয়ার্ড স্কট, রবার্ট ম্যাককাবলিন, টমাস স্মিথ, এডোয়ার্ড এলেবিংটন, জোসেফ বেনার্ড স্মিথ, জন কারগুইনস, আরথার এডিং, জন কেলিস, সামুয়েল টচেট, এডোয়ার্ড ট্রাবওয়েট এবং চার্লস ওয়েসটন। এঁদের মধ্যে ওয়েসটন সাহেবের নামে কলিকাতার ওয়েসটনস লেনটির নামকরণ করা হয়েছে। এই ব্যক্তিটি হলওয়েল [হলওয়েল মনুমেন্টের নায়ক] সাহেবের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ইনি কলিকাতার পূর্ব্বতন মেয়র কোর্টের রেকর্ডারের পুত্র ছিলেন। ইনি ১৭৩১ সালে অধুনালুপ্ত টেরিটি বাজারের সম্মুখে একটি উদ্যান-ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৩৭ সালে বিরাট ঝড়ে এই বাসভবনটি বিধ্বস্ত হওয়ায় এই পরিবারটি ঐ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আশৈশব কলিকাতায় বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি কিছু কিছু বাংলা ভাষা বুঝতেন। এই জন্য বিচারের সময় আদালতের অবস্তন জজেরা প্রায়ই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কি কি বলছেন। ঐ আসামী দোভাষীর বক্তব্য বুঝতে

পারছে তো ? এই প্রশ্নের উত্তরে ওয়েলটন সাহেব প্রতিবারই আদালতকে জানিয়েছেন 'হাঁ হাঁ নিশ্চয়ই। ওরা ভালই বুঝেছে। এ ছাড়া দোভাষী মুর (Moors) ভাষার ন্যায় বাঙলা ভাষাও ভালো বুঝে। সাক্ষীদের বক্তব্য সে যথাযথ ভাবেই আমাদের বুঝাতে পারছে.' ইত্যাদি। কিন্তু অল্প বিদ্যার ফল ভয়ঙ্করই হয়ে থাকে। এই জন্য বহু তথ্য বিকৃতরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছিল বলে আমি মনে করি। বলা বাহুল্য, জুরী মহোদয়দের মধ্যে একজনও ভারতীয় ছিলেন না। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনও আমি তাৎপর্য্যপূর্ণ ব'লে মনে করি।

মোটামুটি সাক্ষ্যসাবুত গ্রহণ দ্বারা বিচারের প্রথম পর্ব্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মহারাজ নন্দকুমার এ যাবৎ এই বিচারে স্বয়ং কোনও ভূমিকাই গ্রহণ করেননি। কিন্তু হঠাৎ এই সময় মহারাজ নন্দকুমার স্বয়ং বিচার সম্পর্কীয় এক বৈধতার প্রশ্ন তুলে বসলেন। তাঁর আইন ঘটিত বক্তব্য বিষয়টি নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে আমি মিথ্যা ভাষণ এবং জাল দলিল দ্বারা জনৈক ভারতীয়ের প্রাণ সংহারের কারণ হয়েছি। কিন্তু ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি শুধু সাক্ষ্যসাবুত দিইনি, আমি তার অপকর্ম্মের বিচারও করেছি। এই বিচার সমাধা হয়েছিল তৎকালীন প্রচলিত স্থানীয় আইন অনুসারে। এই ঘটনার বহু পরে ইংলণ্ড দেশীয় আইন এই দেশে চালু করা হয়েছে। এক্ষণে এই নব প্রবর্ত্তিত ইংলণ্ডীয় আইন দ্বারা আপনারা আমার বিচার করবার জন্ত এমন একটি তথাকথিত বিচার বিভ্রাট সম্ভূত ঘটনা বেছে নিয়েছেন, যাহার বিচার আমার নির্দ্দেশ মত বহু পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এক প্রকার স্থানীয় আইন কানুন দ্বারা সমাধা হয়েছিল। এই কারণে আমি মনে করি যে ঐ পুরাতন ঘটনাটির বিচার করার কোনও অধিকার (Jurisdiction) এই নবস্থাপিত ইংরাজ আদালতের নাই।"

[এই দেশের পূর্ব্বতন কানুন অনুযায়ী আদালতে অভিযোগ পেশ করা হলেও বিচারকগণ সুবিধামত এক সময় ঘটনাস্থলে এসে সরজমীন তদন্ত করতে বাধ্য ছিলেন। বিচারকার্য্যের কতকাংশ অকুস্থলে সমাধা হওয়ার প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা সহজসাধ্য হতো। এই জন্য ঐ সময়কার বিচারকদের পক্ষে জ্ঞানতঃ কোনও ভুল বিচার সমাধিত হয় নি।]

মহারাজ নন্দকুমারের এই অধিকারসম্ভূত বৈধতার প্রশ্ন আদালতকে বিশেষরূপে চিন্তিত করে তুলেছিল। আসামীপক্ষের ইংরাজ কৌসলীগণও এই যুক্তি বিশেষরূপে সমর্থন করেন। কিন্তু আদালত প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের জানান যে, এই নূতন ইংলণ্ডীয় আইন এই দেশে অতীত সম্ভূত প্রয়োগ (Retrospective Effect) অধিকারসহ প্রযুক্ত করা হয়েছে। এই জন্ত এই নূতন আইন দ্বারা কোনও পুরাতন ঘটনার বিচারে কোনও বাধা থাকতে পারে না। কিন্তু ঐ সময়ে প্রচলিত স্থানীয় আইন সম্পর্কে নন্দকুমার যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, সেই সম্বন্ধে তারা কোনও প্রকার উচ্চবাচ্য করেন নি। আদালতের এবংবিধ ব্যাখ্যা শুনে নন্দকুমারের ইংরাজ এটর্ণীগণ তাঁদের এই বৈধতার প্রশ্ন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

এর পর মহারাজ নন্দকুমারের কৌসলীগণ অপর একটি বিষয় সম্পর্কে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁরা বলেন যে মিঃ ইলিয়ট আলেক্স নামক যে ব্যক্তি এই আদালতে দোভাষীর কার্য্য করছে, সে আসামীর একজন অন্যতম শত্রুস্থানীয় ব্যক্তি। অতএব সুবিচারের জন্ত অপর কোনও এক বিশ্বাসী দোভাষী আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত হোক। এই সম্পর্কে তাঁরা আরও বলেন যে, মাদ্রাজ হ'তে অপর আর এক দোভাষীর আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাও যেতে পারে।

মহারাজের পক্ষ হতে এইরূপ এক সাংঘাতিক অভিযোগে জাষ্টিস সি, জে, ইম্পে ক্রুদ্ধ হয়ে কৌসলীদের জানালেন যে, মিঃ ইলিয়টের মত নিষ্কলঙ্ক এক ব্যক্তির চরিত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা যে ঘৃণ্য উক্তি করলেন, তাতে আদালতের বিশেষ আপত্তি আছে। ইনি একাধারে পার্শি এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এঁর মত একজন উপযুক্ত দোভাষী পাওয়া অধুনাকালে কঠিন। আপনাদের বলতে হবে, কে আপনাদের এই উক্তি করবার অধিকার দিয়েছে। তাঁদের নাম-ধাম আমাদের নিকট এখুনিই আপনাদের প্রকাশ করতে হবে।

আদালতের এই চ্যালেঞ্জে মহারাজের কৌসলীগণ একটুমাত্রও বিচলিত হন নি। তাঁরা বরং উদাত্ত ভাষায় বলেছিলেন যে, তাঁদের নাম এইখানে প্রকাশ করা বিপজ্জনক। তা' ছাড়া যে ইংলণ্ডীয় আইন দ্বারা আদালত এই বিচারকার্য্য করছে, সেই ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে সংবাদদাতার নাম আমরা বলতে বাধ্য নই। অবশ্য পূর্ব্বতন স্থানীয় আইন দ্বারা এই বিচারকার্য্য চললে আমরা তার নাম বলতে বাধ্য থাকতাম। তবে আদালতকে আমরা এইটুকু বলে রাখতে পারি যে, সাধারণ ভাবে সকলেই জানে যে মিঃ ইলিয়ট হচ্ছেন গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের এবং এইখানে উপস্থিত ভারতের প্রথম চিফ জাষ্টিসের একজন বিশেষ বন্ধু। অবশ্য তা ব'লে আমরা এ-কথা বলতে চাচ্ছি না যে, এজন্য এই আদালতের বিচারকগণ তাঁদের কর্ত্তব্যকার্য্য হতে বিচ্যুত হবেন। বরং আমরা আশা করি যে ইংলণ্ডেশ্বর প্রেরিত ধর্ম্মাধিকারিগণ নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা ভারতে ইংরাজ জাতির সুনাম অক্ষুন্নই রাখবেন।

[অদৃষ্টের পরিহাস এমনই যে, এই দোভাষী ইলিয়ট ছিলেন ইংলণ্ডের মহামতি ইলিয়ট সাহেবের সহোদর ভ্রাতা। এই বিচার প্রহসনের বার বৎসর পরে যখন ভারতের প্রথম বিচারপতি ইমপের বিরুদ্ধে এই বিচার প্রহসনের জন্ত ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে বিরাট অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, তখন এই শেষোক্ত ব্যক্তিই ছিলেন সেই 'ইমপিচমেণ্ট অফ্ ইমপে' নামক ইতিহাসবিখ্যাত অভিযোগের একজন অন্যতম উদ্যোগী]

এই সময় দোভাষী মিঃ আলেক্স ইলিয়টেরও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তিনি প্রতিবাদ করে বলেন যে, এর প্রতিকার না হলে তাঁর পক্ষে আর আদালতে দোভাষীর কার্য্য করা সম্ভব হবে না। এই ইলিয়ট সাহেবও আমাদের নিকট একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। এঁর পারিবারিক নামানুসারে কলিকাতার ইলিয়ট রোডটির নামকরণ করা হয়েছে।

দোভাষী মিঃ আলেক্স ইলিয়টের এই প্রতিবাদ প্রধান বিচারপতি ইমপেকে বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। তিনি ইলিয়ট সাহেবকে শান্ত করে বলে উঠলেন, 'না না, তুমিই দোভাষীর কাজ করবে। এই সব মিথ্যা অভিযোগে বিচলিত হওয়া তোমার মত একজন জ্ঞানী লোকের সাজে না। তোমার দেশীয় ভাষায়

উপরে দখল এবং তৎসহ তোমার সততা বারে বারে প্রমাণ করেছে যে তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন'।

আদালতের আবহাওয়া এই সময় এমনি পঙ্কিল হয়ে উঠেছিল যে, মহারাজ নন্দকুমারের কৌসলীকেও দোভাষী ইলিয়টকে শান্ত করতে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল। কৌসলী সাহেব অনুযোগ করে ইলিয়ট সাহেবকে বললেন যে তিনি যেন এই জন্ত তাঁকে ক্ষমা করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মত দোভাষীর বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত কোনও অভিযোগ নেই। এই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করে তাঁকে তা আদালতে বলতে বলা হয়েছিল, তাই তিনি কর্ত্তব্যের খাতিরে উহা আদালতে সকলের নিকট উত্থাপন করেছিলেন। এই সময় জুরী ভদ্রলোকেরাও ইলিয়ট সাহেবকে দোভাষীর কার্য্য চালিয়ে যাবার জন্ত পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তাঁরা আরও বলেন যে, আসামীর মনোনীত সাহায্যকারী দোভাষীর মাদ্রাজ হতে আসতে বহু দেরী হবে। অতো সময় পর্য্যন্ত তাঁরা এইখানে অপেক্ষা করতে অপারগ। সকল দিক বিবেচনা করে স্থির হলো যে ইলিয়ট সাহেবই দোভাষীর কাজ করবেন।

ইহার পর আদালত মহারাজ নন্দকুমারকে উদ্দেশ করে বললেন যে, এইবার আসামী তাঁদের জানাতে পারেন যে এই মামলায় তিনি দোষী কিংবা নির্দ্দোষী। যদি তিনি নিজেকে নির্দ্দোষীই মনে করেন তাহলে এই আদালতের বিচারে তাঁর আপত্তি কি? তিনি কাহাদের দ্বারা তাঁর বিচার প্রত্যাশা করেন? প্রত্যুত্তরে অবিচলিত কণ্ঠে মহারাজ নন্দকুমার আদালতকে যা জানিয়েছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"স্বকীয় বিশ্বাস অনুযায়ী আমি একান্তরূপেই নির্দ্দোষী। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমি একমাত্র ঈশ্বরের এবং তাঁর দূতেদের নিকটই বিচারপ্রার্থী। তবে আমি এইটুকু বলে যাবো যে, আমার রক্তপাতের সহিত ইংরাজের সাম্রাজ্যসৌধের মধ্যে যে ফাটল তৈরী হলো সেই ফাটলে ক্রমাগত জল প্রবেশ করে উহা একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আমার নিজের এই মহাদৃশ্য দেখে যাওয়ার প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠে না। আমার পুত্রপৌত্রদের পক্ষেও এ দৃশ্য দেখা সম্ভব কি না তাহাও বলা সম্ভব নয়। তবে এইরূপ বিচার প্রহসনের পুনরাবৃত্তি ঘটলে একদিন এই অঘটন যে ঘটবেই, তা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে।"

দোভাষী ইলিয়েট সাহেব নন্দকুমারের 'ঈশ্বর এবং তাঁর দূত' এই বাক্যটির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন 'গড এণ্ড হিজ্ পীর' (Peers) ইলিয়ট সাহেবের অনুবাদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি মহারাজার কৌসলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আসামীর মতানুসারে পীর (Peer) কারা?" উত্তরে নন্দকুমারের কৌসলী জানিয়েছিলেন যে তিনি উহা আদালতের বিচার্য্য বিষয় ব'লে মনে করেন। 'আয়রল্যাণ্ডের একজন পীরের (Peer) যদি ইংলণ্ডে বিচার হয়, তা'হলে ওখানকার নিয়মানুসারে তাঁর বিচার কমন জুরীরাই করে থাকে', আইনের কিতাব ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রধান বিচারপতি অভিমত জানালেন, 'ইংলণ্ডেশ্বরের চার্টার অনুযায়ী ফৌজদারী অপরাধের বিচারে স্থানীয় বৃটিশ প্রজাদের দ্বারা গঠিত জুরীর সাহায্য গ্রহণে আমি যে বাধ্য, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এক্ষেত্রে যে সকল ইংরাজকে জুরী করা হয়েছে তারা সকলেই কলিকাতাবাসী বৃটিশ প্রজা। অতএব আসামীর বিচারের মধ্যে কোনও প্রকার আইন-বহির্ভূত নীতি গ্রহণ করা হয় নি। ভারতের রাজা মহারাজা উপাধিধারীরা ইংলণ্ডের পীর বা লর্ডের সমতুল্য কি না তা না জেনেই অবশ্য আমি এই কথা বললাম।"

এর পরের দিন আদালত বসা মাত্র নন্দকুমারের কৌসলী জজ সাহেবদের জানালেন যে, আসামী গত রাত্রে পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এইজন্ত তাঁর বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে তাঁর পক্ষে সারাদিন এইখানে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। আদালত কিন্তু আসামীর কৌসলীদের এই নিবেদন বিশ্বাস করেন নি। তাঁরা তৎক্ষণাৎ এণ্ডারসন এবং উইলসন নামক দুইজন ইংরাজ ডাক্তারকে নন্দকুমারকে পরীক্ষা করার জন্ত অনুরোধ জানালেন। এই চিকিৎসকদ্বয় মহারাজ নন্দকুমারকে পরীক্ষা করে আদালতকে জানালেন যে, আসামীর জ্বর ছেড়ে গিয়েছে এবং দেহও স্বাভাবিক ভাবাপন্ন দেখা যায়। এই জন্ত আসামীর পক্ষে বিচারকক্ষে উপস্থিত থাকলে তাঁর কোনও ক্ষতি হবে না।

মহারাজ নন্দকুমার তাঁর প্রতি ইংরাজ আদালত ও ইংরাজ জুরী এবং তৎসহ ইংরাজ শাসন বিভাগের এই সকল শত্রুতাপূর্ণ ব্যবহারে প্রতিদিনই ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। এর পর সেবাধর্ম্মী ইংরাজ ডাক্তারদেরও তাঁদের সহিত যোগদান করতে দেখে তাঁর বুঝতে বাকি ছিল না যে কাহার ইঙ্গিতে এই বিচারের প্রহসনের ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে আদালতকে এই সময় জানালেন যে তিনি শুধু এই আদালতে নয়, আকাশে বাতাসেও এক নির্মম ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন। এইরূপ বিচারের প্রহসন না করে তাকে সম্মুখযুদ্ধে আবাহন করে কিংবা হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় গুলী করে তাঁরা যেন তাঁকে হত্যা করেন। এর পর হতে তিনি স্বয়ং এই মামলায় আর কোনও প্রকার অংশ গ্রহণ করবেন না। আজ যাঁরা নন্দকুমারের বিচার করছেন পরবর্ত্তী কালে ইতিহাস তাদের বিচার করবেন।

এই বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনে মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, যে মিথ্যাচরণ এবং জালিয়াতীর সাক্ষ্য সোপর্দ্দকগণ (Prosecution) পক্ষ থেকে উপস্থিত করা হয়েছে তা প্রকৃত পক্ষেই মিথ্যা ও জাল। কিন্তু উহা আসামী কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়নি। ঐগুলি তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাবার জন্ত সোপর্দ্দকগণ নিজেরাই সমাধা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই নিছক সত্যটি হেষ্টিংস সাহেবের অকৃত্রিম সুহৃদ ভারতের প্রথম প্রধান বিচারপতি পরিচালিত আদালতের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না।

ভারতের প্রথম প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বোচ্চ আদালতের প্রথম প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক ইংরাজী আইনের সাহায্যে প্রথম ফৌজদারী মামলাটির এবংবিধ নিষ্পত্তি ইংরাজ জাতির একটি কলঙ্করূপে ইতিহাসে লেখা থাকবে। মহারাজ নন্দকুমারের এই মামলা প্রমাণ করবে যে যেখানে তাদের স্বার্থ আছে, সেখানে ন্যায় বিচারের প্রশ্ন তাদের মনে কমই উঠেছে, কিন্তু পরে মহারাণীর আমলে যে সকল সুশিক্ষিত ইংরাজ এদেশে আসেন তাঁরা তাঁদের পূর্ব্বতনদের এই কলঙ্ক ন্যায় বিচারের দ্বারা অপসারণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাঁরা তাঁদের আদর্শ হতে চ্যুত হয়ে এইরূপ বিচারের প্রহসনের বারে বারে পুনরাবৃত্তি করা মাত্র মহারাজ

নন্দকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়। বিশ্বব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের আকস্মিক পতন এই বিশেষ সত্যটি সুপ্রমাণ করেছে।

এই বিখ্যাত মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন দুইজন মহাপ্রাণ ইংরাজ। ইঁহাদের নাম মিঃ ফেরার এবং মিঃ ব্রিক্স। মিঃ ফেরার মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে এই বিচারের অব্যবহিত পরেই বাংলা ত্যাগ করে ইংলণ্ডে চলে আসেন। পরবর্ত্তীকালে ইনি ওয়েরহাম হ'তে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইমপের বিরুদ্ধে (ইম্পিচমেণ্টের) পার্লামেণ্টে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি তাঁর নির্দ্ধারিত আসন হতেই ইমপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

এই দুইজন ইংরাজ কৌশলী মহারাজ নন্দকুমারকে এই মিথ্যা মামলা হতে মুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। মামলার পরিশেষেও তাঁরা তাঁদের এই প্রচেষ্টা হতে বিরত হন নি। জুরীদের মনোগত ভাব পূর্ব্বাহ্নেই বুঝে তিনি তাঁদের অনুরোধ করেছিলেন যে যদি তাঁরা দয়া না-ও দেখান তা'হলে তাঁরা যেন চরম শাস্তির পূর্ব্বে আসামীকে কয়দিন বিশ্রাম প্রদানের জন্ত আদালতকে সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁর এই অনুরোধে রোগা বিশ্রী মুখ্য জুরী ভদ্রলোকটি (Foreman) ঘোরতর আপত্তি তুলে বলেছিলেন যে, এতদ্বারা তিনি তাঁকে অন্যায়ভাবে প্রভাবান্বিত করতে চেয়েছেন। এই মুখ্য জুরীটিকে সমর্থন করে প্রধান বিচারপতি তাদের ভর্ৎসনা করে বলেন, এবংবিধ ব্যবহার তাঁদের প্রফেসনল কণ্ডাক্টের উপযুক্ত হয় নি।

তাঁদের এই ভাবে আদালত কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হতে দেখে মহারাজ নন্দকুমার মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আদালতকে সম্বোধন করে বললেন যে, তিনি এই ব্যাপারে কাহারও কোনও করুণার মুখাপেক্ষী নন। এ বিষয়ে মহামান্ত জজ সাহেব এবং জুরী মহোদয় যেন তাঁর কৌসলীদের ভুল না বুঝেন। এর পর তিনি তাঁর কৌসলীদের উপকার স্বীকার করে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানান এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁর জন্ত আর বৃথা কোনও চেষ্টা না করতে তাঁদের অনুরোধ করেন।

এর পর কৌসলীদের আসামীর জন্ত অন্ত কিছু করবারও ছিল না। কারণ তৎকালীন আইন অনুযায়ী আসামী ফরিয়াদীর পক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সত্যতা খণ্ডন করে জুরীদের উদ্দেশ্তে কোনও বক্তৃতা করতে পারতেন না। এই সম্পর্কে একটি লিখিত স্মারকলিপি মাত্র আদালতে তাঁদের পেশ করবার অধিকার ছিল। বলা বাহুল্য, আসামীর কৌসলীগণ তাঁদের এই করণীয় কার্য্য সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা না করেই মামলার চার্জ্জ জুরী মহোদয়দের বুঝাতে সুরু করে দিলেন। এই চার্জ্জের বিবরণ যে নিরপেক্ষতার সহিত রচিত হয়েছে তা বারে বারে তিনি বললেও উহা যে পক্ষপাতিত্বদুষ্ট ছিল, তাহা এ চার্জ্জটি উত্তমরূপে পাঠ করলেই বুঝা যায়। নিম্নে ঐ বিখ্যাত চার্জ্জের প্রয়োজনীয় অংশের বাংলা তর্জ্জমা উদ্ধৃত করা হলো।

[আগামী বারে সমাপ্য।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

একটি হিন্দী ছবির পরিচয়

যদি বা সমুদ্র হয় কালির দোয়াত
মন্দর লেখনী হ'য়ে যায় অকস্মাৎ—
যদি বা গগন হয় সুনীল কাগজ
যদি বা লেখক হয় ত্রিকালজ্ঞ কোনো এক বিদ্যা-দিগ্‌গজ
—তবে যদি এ হিন্দী ছবির গুণপণা
চর্মচক্ষে মূর্ত হ'য়ে মুছে দেয় লৌকিক চেতনা!

আহা কে পদ্মিনী নারী নাগলোকে নাগসমাসীন?
চুস্ত-পায়জামাপরা সম্মুখে কে রয়েছে আসীন?
দেবীর সুকণ্ঠে জ্বলে হীরকের মাল্য এক বেলজিয়ান্ কাট,
চুস্ত-পায়জামা কেন বন্ধ ক'রে রেখে দিল হৃদয়-কপাট?
কি ক্রোধ সে ভামিনীর রক্ত-ওষ্ঠাধরে—
প্লাষ্টিকের পর্দা ওড়ে ফরাসীর জানলার উপরে।

আহা—হা অতীত আর বর্তমান এক হ'য়ে যায়,
দেবী হয় দানবী ও নারী হয় দেবীর পর্যায়
বিজ্ঞান পুরাণ ধর্ম মনস্তত্ত্ব যাদুর চাতুরী
সব মিলে তৈরী এই অত্যাশ্চর্য ছবির খিচুড়ি।
আমার ভালোই লাগে অন্তর্হিত হয় যেন কাল পরিমাণ,
হাল্কা মেঘের স্তরে ভেসে যায় প্রাণ,
সমস্ত অস্তিত্ব যেন লাগে স্বপ্নবৎ
সহসা মাথায় ভাঙে মন্দর পর্বত,—
ওঃ, কি বিরাট চিত্র, কী কল্পনা—কি মহাগরিমা—
নাগপুচ্ছ পায়ে দলে চলে যায় চুস্ত-পায়জামা।

সে যুগের প্রেমপত্র

[এই সংখ্যায় কয়েকটি প্রাচীন বাঙলা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিগুলিতে বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ-জীবনের পুরানো পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালী না কি সেযুগে গদ্য অপেক্ষা পদ্যকে আশ্রয় করতেন, এমন কি চিঠিপত্রেও। এই প্রেমপত্র সমূহ যেমন কবিত্বপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর, তেমনি আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।]

(১২৩৪—১২৮৩)

(১)

শ্রীশ্রীহরি

স্বরণং।

সুন রসময় প্রেম পরিচয় রূপ তার অপরূপ।
নিন্দি ইন্দীবর নয়ন সুন্দর বদন সরোজ রূপ ॥
লাজেতে চপলা হইল চপলা হেরিয়ে তাহার হাসি।
তাহার বচন না সুনে জে যন সে যন······
···স্বভাবো সবল অতি নির (মল)···(মোহন) চান্দে।
কলঙ্কী সে জন বিখ্যাত ভুবন মৃগ হরনাপবাদে।
তার মন্ত্রিবর পরম সুন্দর আবেসে আখ্যান যার।
খেদে কাঁদে প্রান হয়ে রূপবান অল্প দৃষ্টিসক্তি তার।
সে জারে দেখায় সে জারে চিনায় তারে প্রেম ভালবাসে।
শয়নে স্বপনে ভোজনে ভ্রমনে রাখে তারে চিদাকাশে।
নিরন্তর সুখে থাকে মুখে মুখে এই সাধ অনিবার।
বিরহ বদন দেখিতে কখন বাসনা নাহিক তার।
দোশ গুন তার না করে বিচার বরং দোশে গুন ভাবে।
জদি কটু কয় তাহা সত্ত্ব রয় বরং গদ গদ ভাবে।
প্রতি পদার্পণে বোধ করে মনে সুধা বরিসন হয়।
তাহার বদন দেখিতে নয়ন [অনিমিখ নেত্র রয়]।
গুরুর গঞ্জনে লোকের লাঞ্ছনে······
···সঙ্গ তাহারি প্রসঙ্গ লাজ ভয় নাহি ভঙ্গ।
হলে সে কুরূপ না ভাবে বিরূপ ভালবাসে নিশি দিবা।
আহা মরি মরি দেখহ বিচারি আবেশের শক্তি কিবা।
কাল রূপে তাই মজিয়েছি তাই হয়েছি তোমার দাসি।
হেরি তব মুখ না ব (া)ন্ধএ বুক অধরে না ধরে হাসি ॥১॥
রোসিক মুরারি নিবেদন করি প্রেমে আর ব্রহ্মে প্রভেদ নাই।
জত মূঢ়মতি এ ধনের প্রতিবাদি হয় কেন সবাই।
ব্রহ্মের ভজনে স্তবনে যজনে শয়নে ভোজনে উদাস্ত জ্ঞান।
মান অপমান সকলি সমান সুস্থান কুস্থান বোধ।
···ভয় কিছু নাহি রয়······
কি শুচি অশুচি ছত্র সম রুচি দয়া মায়া সবসে জনে।
প্রেমোপুন্নার তেমনি ব্যাভার দেখনা বিচার করিএ মনে।
তাই প্রেমধন কহি আরাধন ব্রহ্মসনাতন ভাবি সে ধনে।
পঙ্কজ লোচনে কৃপাবলোকনে মম প্রানমনে রাখহে হেরি।
তব সুধা পান করে মন প্রান হএ সাবধান দিবা সর্বরি।
মনঃ প্রান হয় চঞ্চলাতিসয় বিচ্ছেদের ভয় তাই তো করি।
বিচ্ছেদ হইলে মরি তিলে তিলে তাহাতে কি মিলে
বল হে কেমনে তরি।
শ্রীপাদপদ্ম সেবিতানসেবিত শ্রীমতি মনমোহিনী দাসিষ
দণ্ডবৎ প্রনামা নিবেদনঞ্চাদো শ্রীপদ সেবিনাভিতেষু ॥১॥

(২)

৺শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

চরণে স্বরণং।

কলি ঘোর তিমিরে অখিল কৈল গ্রাস।
নদিয়া নগরে কোটি চন্দ্রের প্রকাস।
স্বয়ং ভগবান গৌরচন্দ্র মহাসয়।
নিস্তারিল সর্ব্বজন দিএা পাদাশ্রয়।
আদিত্য আখ্যাতে সন বার সএ সাল।
নেত্রে বেদ দিএা হয় চৌত্রিস মিসাল।
মিথুন আসাড় মাস আঠার পুরাণ।
দিবা অর্দ্ধকাশ দুই প্রহর আখ্যান।
বার স চৌতি সাল আসাড়িয়া মাসে।
মোর দত্ত পত্র প্রাপ্ত আঠার দিবসে।
গবাক্ষ আখ্যান ক্ষুদ্র দ্বার হয় স্থানে।
বসিএা আছিলে তুমি রাজসিংহাসনে।
তারক শ্রীরাম নাম কন্ঠ-ভাস্ত মণি।
সর্পেতে রাই নাম উত্তম বাখানি।
পুরবাসি গোপদাসি লোচন ডাগর।
বিধপা বয়স মধ্যা রসের সাগর।
তার হাতে পত্র পাঞাছিলে মহাসয়।
মেয়াদ করিএাছিলে সব সত্য হয়।
দাসগন মধ্যে তুমি সুর্দ্ধ কৃষ্ণদাস।
তম আজ্ঞাকারি বট বৈষ্ণবে বিশ্বাস।
দিলে দয়া কর তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
ভক্তিশূন্য জনে এত কেনে কর স্তুতি।

তোমার গম্ভির মন কিছুই না জানি ।
বুঝি অতি ক্ষুদ্র জিব পক্ষ রাজা টুনি ।
অহো ভাল ধন্ন রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন ।
কৃপাতে দিবেন সদা নন্দের নন্দন ।
কৃপার নিধান কৃষ্ণ কমলনয়ান ।
কৃপাতে তোমারে সদা করিবে সম্মান ।
কৃষ্ণের সম্মান সত্য, সত্য তাঁর দাস ।
কৃষ্ণে কৃষ্ণদাসে তোমার অধিক বিশ্বাস ।
কৃপাছলে কৈছে সনাতনে গৌরবায় ।
তৈছে সিক্ষা সচিন্মত দিবেন তোমায় ।
কৃপাছলে কৈছে প্রেম দিল ভক্তবরে ।
অঞ্জলি পুরিঞা তৈছে দিবেন তোমারে ।
তুমি মোর প্রাণবন্ধু বুদ্ধো মহা থির ।
জবাব দিঞাছ কোটি সমুদ্র গম্ভির ।
সুনিঞা তোমার পত্রের উত্তর পুলকে পুরিল গা ।
উত্তরে উত্তর কি কহিব আর···না পাইয়া ।
সুন বন্ধু················
·········জানিলাম আমি ।

শ্রীগুরু প্রসাদে বৈষ্ণবাসির্ব্বাদে সাধন উদ্গম হবে ।
সদানন্দ হঞা ব্রজভূমে জাঞা গোবিন্দচরণ পাবে ।
তোমার অগ্রেতে কি জানি কহিতে তুমি বুদ্ধি সিরোমনি ।
তুমি মহাসয় সর্ব্বলোকে কয় দৈন্ত বিনয়ের খনি ।
অতেব তোমার চরিত্র অপার কে জানে তোমার সন্ধি ।
মধুর বচনে হাস্ত আলাপনে জগতে করিলে বন্দি ।
নরাধম বলি লেখিঞাছ ভালি-সিন্ত ভুলাঞাছ ভাল ।
উল্টা ছোটে গিরে কে দিঞাছে ফিরে ভাবিতে পরান গেল ।
নহ নরাধম তুমি সে উত্তম উত্তমের এই চিন ।
উত্তম জে জন এই সে লক্ষন আপনাকে মানে দিন ।
সব্দ অলঙ্কার করিএ তোমার মনহর পদাবলি ।
অক্ষর সুপাতি জেন পদ্মে মাতি মধুরস পিএ অলি ।
তুমি হেন ধন বন্ধু মহাজন মোরে মিলাইল বিধি ।
জায় বৃন্দাবনে বসিঞা নির্জ্জনে সাধিব মনের সিধি ।
নিকুঞ্জ কাননে আর নিধুবনে জায় বেলি অবোসানে ।
বংসীবট তটে তাহার নিকটে যমুনা পুলিন বনে ।

সুন হে প্রাণের বন্ধু অপার গুণের সিন্ধু
তুয়া গুণ কহনে না জায় ।
জেবা বৈদ্যগুণ তোর কেবা তার পায় ঔর
মত্ত সন্তাননে জনি গায় ।
উত্তরে উত্তর দিতে আহ্লাদ সুজন চিত্তে
বাদি ভেদি তার্কিকের দুখ ।
সরল পিরিতি পথে কুটিনাটি নাহি তাথে
সিআন ভিআনে পায় সুখ ।
সিআন ভিআনি তুমি গাভুরা দোকানি আমি
পায় কুটিনাটি সব ছানি ।
সরস মধুর পাকে সব দ্রব্য একে একে
ভাল ভিআঞাছ ঔলা চিনি ।

তুমি মহাভাগবত্ত উত্তরে উত্তর জত
লেখিঞাছ বিসেসন দিঞা ।
অধিক লেখেছ জত তাহা বা কহিব কত
আমি লেখি পুষ্প অভাসিঞা ।
ভাবের সম্পর্ক নাঞি সুনিঞা তোমার ঠাঁই
ভাবাবেসে মন ভুলে গেল ।
ভাবে ভাবে মহারণ নাহি হয় সম্বরণ
ভাবের সাগর উথলিল ।
ভাবের সমাক্ষ নাই ভাবেতে শ্রীদাম ভাই
ভাবেতে নন্দের বহে বাধা ।
ভাবে গোপীগণ ভজে [জল]াঞ্জলি দিঞা লাজে
পরক্রিয়া ভাবে ভজে বাধা ।
সে ভাবে গোকুল চান্দে দধি ভার বহে কাঁন্ধে
ভাবের অবধি নাহি সিমা ।
ভাবে বস নারায়ণ ভাবুকা ভকতগণ
ভাবে ভুলাঞাছে গোপ রামা ।
ভাবে নন্দ গুননিধি সাধিল মনের সিধি
পাতাইল পিরিতের হাট ।
বিচারিঞা দেখ দেখি শ্রীগীতগোবিন্দ সাখি
জয়ন্তি যমুনাকূলে পাঠ ।
ভাবে মাতা নন্দরাণি রাধারে মন্দিরে আনি
সিসুকালে মিলন করায় ।
রহিনী রামের মাতা কি কহিব তার কথা
দুহুঁ মুখে তাম্বুল জোগায় ।
বিধি ভব নারদাদি কৃষ্ণদাস ভাবাবধি
সনক সনন্দ ভাবে গোরা ।
কৃষ্ণদাস ভাব বিনে ধিক্ ধিক্ সে জিবনে
জিবন থাকিতে সেহ মরা ।
জিবের স্বরূপ জেন স্ফুলিঙ্গের কন হেন
ঈশ্বর-স্বরূপ অগ্নিময় ।
জিবাধমে সে তুলনা দিতে ভাগবতে মানা
সর্ব তত্ত্ব জান মহাসয় ।
ভাবের সরসি তুমি সরসি পরসি আমি
ভাবের তরঙ্গে জাই ভাসি ।
ঘুচিল মনের ভ্রম সুন অহে মহাসয়
এতদিনে পোহাইল নিসি ।
রথের বিত্যান্ত কথা অনেক বাহুল্য গাঁথা
সাক্ষাতে সকল নিবেদিব ।
সুনিবে সকল তত্ত্ব বিচার করিবে সত্য
প্রনয় বিচারে দাস হব ।
এখন আপন কথা কহিব সরস গাঁথা
উঘাড়িঞা লজ্জার কপাট ।
ভাবের সম্পর্ক নাই সুনেছি তোমার ঠাঁই
নিরপেক্ষ পিরিতের হাট ।
হবএ মধুর ।

সেই রসবতি রামা, রূপে গুণে অনুপামা
তুলির পুতলি তনুখানি।
পিরিতে পুরিত হিয়া কত চান্দ নিঙারিয়া
গাখানি মাঁজিল হেন জানি।
বদন সরদ সসি কিবা সে মুখের হাঁসি
অমিয়া উগারে জেন চাঁন্দে।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি
মদন বেদনা পাঞা কান্দে।
চরণ কমল তলে অরু কিরণ খেলে
নখমণি ঝলমল তায়।
জিনিঞা সিরিস ফুল অঙ্গ অতি সুকোমল
পরিমলে অলিকুল ধায়।
গউর বরণি ধনি আমারে করিঞা বিনি
রাখিয়াছে হৃদি কারাকারে।
সে বড় বিস্ময় ঠাঞি কারু সঙ্গে দেখা নাই
পত্তন পসিতে তাহা নারে।
নিগুড় পিরিতি ডোরে বাঁন্ধিঞা রেখেছে মোরে
মদন প্রহরি দিঞা থানা।
তিলে তিলে আসি জার সদাই বদন চায়
বাহির হইতে করে মানা।
রসিক নাগরি ধনি চতুরের সিরোমণি
ছলনে বুঝিতে নারি তারে।
বিদায় মাগিতে গেলে সঙ্গ গোড়াইঞা চলে
নতুবা করাত মাগে মোরে।

লেখিতে লেখিতে বহু বিস্তার হইল।
তথাপি মনের দুঃখ অনে(ক) রহিল।
আমার বচন শুষ্ক কাষ্ঠের সমান।
নিজর সানন্দ দিঞা করিবে ভিয়ান।
রসনা রসিক তোমার রসময় বানি।
মেঔয়ার পসারি তুমি রসিক ভিজানি।
সাময়িক মঙ্গল সকল সমাচার।
আপনার কুসল লেখিবে বারে বার।
কীর্ত্তন আরম্ভে আগে জার নাম পাবে।
তার দাসাখ্যান দিঞা মনেতে করিবে। ইতি।

মনুবংস পৃয়ব্রত্ত সুসোভিত জার রথ
পঞ্চধি অঙ্কিত জার রেখা।
সগর সুতের হাথে উদধি হইল খাতে
তাহে জন্ম কুমুদির সখা।
তিহোঁ তার জন্মস্থান বেদরন্ধ্র পরিমান
সকের বৎসর করি আমি।
প্রকিতি পুরুষে যুক্ত কর পিষ্ঠে ন ভুক্ত
তারিখ জানিবে এই তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদারবিন্দ মকরন্দ পানানন্দিত চিত্র
শ্রীল শ্রীশ্রীধর গোসয্য বাবাজি প্রেমাস্পদচিত্রেষু।

৭৪।
(৩)
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
রসের নাগর প্রেমের সাগর শ্রীজয় গউর হরি।
তব কৃপাশ্রয়ে চরণ নিলয়ে বৃন্দাবনে গিয়া মরি।
স্বয়ং ভগবান অহে গৌরচন্দ্র রায়।
জানি বা না জানি কিছু স্থান দিবে পায়।
আদিত্য আখাতে শত নেত্রে বেদ দিয়া।
মিথুন পুরাণ সখ্যা দিবস গনিয়া।
দিবা অর্দ্ধকালে ছিলাম গবাক্ষ খুলিয়া।
আজ্ঞা পত্রী পাইল আমি বিসয়ে বসিয়া।
তারক কৌস্তভাস্ত নাম গোপকুলা দাসি।
সর্পপে উত্তম নাম পুর গ্রাম বাসি।
বিরূপা বয়স মধ্যা লোচন ডাগর।
রসীক নাগরি সেই রসের সাগর।
তাঁর হাতে পত্র পাঞা সিরোধার্য্য কৈল।
পাঠ করি প্রেমে মন মাতিয়া রহিল।
তখনি জবাব মোরে চাহিল নাগরি।
দিতে না পারিয়া কৈল কৃতাঞ্জলি করি।
মেয়াদ বিনা দিতে নারি জে কেহ শুনবি!
মুখে আচ্ছা বলি পুন কৈল আঁখি ঠারি।
কৃতার্থ করিল সেই অমিয়া বচনে।
পত্রের জবাব এবে করি নিবেদনে।
দাস প্রতি এতদূর লেখা অনুচিত।
শ্রীগুরু আজ্ঞায় মোরা বৈষ্ণব আশ্রিত।
দিন হিন বুদ্ধি জ্ঞান ভক্তি শুন্য জনে!
এতদূর স্তুতিবাক্যে না করি সম্মানে।
আপনার অহোঔাল সকল জানহ!
কৃপাডোরে বান্ধি মোরে কৃপেতে ডারহ।
জে হউ সে হউ কহি করি অভিমান।
কৃপাতে সকল পার করিতে সম্মান।
কৃপাছলে সনাতনে গউর সিক্ষা দিল।
কৃপাছলে ভক্তাদিকে প্রেমদান কৈল।।
কৃপাছলে নাম প্রেম প্রচার করিল।
ঐ সব বিচারি নিজ মন স্থির কৈল।।
তুমি সে প্রাণের বন্ধু পাই যত দিনে।
জবাব না জানি কিছু করি নিবেদনে।।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কলিকালে ধন্য পদপ (?) দ্ধ দিতে মন
আমি নরাধম তুমি সর্ব্বোত্তম জদি দেহ শ্রীচরণ।
সাত্ত্ব ভক্তি নিষ্ঠা দিনে দয়া শ্রেষ্ঠা কল্যাণে প্রসংসভায়।
নরাধম জনে বল নিজ গুনে কল্যানেতে নিজ আয়।
প্রেমে ভাসাইয়া হিত বাঞ্ছা হঞা মঙ্গলেতে চিন্তা কয়।
জে জার চরণ সদা করে ধ্যান তারে লাগে সব তার।
পালক জনক সাস্ত্রযুক্ত বাক কৃপাতে সকল হয়।
কিন্তু মিশ্র ঘরে নন্দের মন্দিরে সিস্ত প্রায়ে জ্ঞান কয়।

তুমি সে বালক জগত আলোক মুর্খকে পণ্ডিত বল।
ভালবাসা জনে প্রতারণা কেনে মন কি নহে সরল।
ভরোসা হরির সকলের সার অধমে তুলনা লেখ।
বিচারিতে সার দোহাই তোমার সাস্ত্রযুক্তে ভাবি দেখ।
তাড়ন ভৎসনে পিতা সিশুগনে সিক্ষা দিতে সাস্ত্রে লেখে।
উল্টা ছোটে গিয়া বান্ধিয়াছ কিয়া বিচার অপিক্ষা রাখে;
প্রহ্লাদের পিতা সিক্ষাতে অন্নতা না করিল সব জান!
হরি গুন গানে পিতার বচনে মৃত্যুকে তুচ্ছতা জ্ঞান।
ভাগবতে হয় মহানেতে কয় ভজিলে ভজিয়ে তায়।
ভজন পুজন না জানি কখন ইথে কী হবে উপায়।
তবে জ্ঞাতা জনে হিতাহিত জানে এ কথা অন্যথা নয়।
অধমের প্রতি হয় অনুচিতি গুজনের প্রতি কয়।
নাম না লেখিব তারিখ না দিব ইঙ্গিতে বুঝিতে ভার।
গউর নাম তত্ব কি জানে মহত্ব তা যে আমি অতি ছার।

রসিক গুজনে কথ সরল পরান গাঁথা
রসিকেই রসের ভিয়ান।
তুমি হও রশসিন্ধু না পাইল একবিন্দু
তুলি রশভিয়ানি সিয়ান।
গুপাকে অবাক হয় গুমধুর প্রেমময়
সোনায় সোহাগা নিদর্শন।
অকথ্য প্রেমের কথা না কহিয়ে জথা তথা
এই লাগী গুজার স্বপন।
অবাকে নিবীড় ভাব পুন রস কোথা লাভ
লেখ নাট চাতুরি করিয়া।
আমি নিজ দায় বটী তবে কেনে কুটি নাটী
কৃপা কর সরল হইয়া।
কৃষ্ণগুখ লাগি গোপী কুল তেয়াগিল
ভাবে প্রভু সমুদ্রে পড়িল।
সিলাবৃষ্ট জাবে রাম বেশধারি অবিরাম
নামে জোগী মহেশ হইল।
নারদ শুকের সার নাম অন্ত তত্ব পার
না পাইয়া বাউল হইল।
রূপ-সনাতন হয় গোরা আজ্ঞাকারি হয়
রাষ্য ছাড়ি ব্রজে বাস কৈল।
এ সব তুলনা কথা এ পামরে অব্যবস্থা
জত বল আপনার গুনে।
একে আমি নরাধম তাথে সদা মন ভ্রম
গুননিধি নিবেদি চরণে।
রূপ সনাতন হয় পদ দিতে আশ্রয়
মনে কর সরল হইয়া!
সঙ্গে করি নিতে হয় গুন বন্ধু মহাশয়
মোর ভাগ্য সাফল করিয়া।
আগে লোভ জন্মাইলে পিছে কুটিলতা হৈলে
আমার দুর্ভাগ্য নাহি সিমা।
তুমি বহুবল্লভ রসবতির দুল্লভ
কি করিবে একা নঞা আমা।

তব কৃপা লেষ পাই রসবতি কাছে জাই
খুটা করি নিবেদি চরণে।
ভাবের সম্পর্ক নাই নিলজ্জ হইয়া জাই
সব কহি জেবা আছে মনে।
বুনিয়াছি লোকমুখে রথ দেখিয়াছ গুখে
আসিতে জাইতে দেখা নাঞী।
কোন রসাতি পাঞা গুখে ছিলে তথা জাঞা
তবে মোর কিসের বড়াঞী।

পত্রের বাহুল্য মতে দুঃখ বাকী রৈল।
তব চরণ স্মরণ করি এই নিবেদিল।
প্রজাপতি কীর্ত্তি মধ্যে মোর নাম পাবে।
দাষ খ্যাতি বলি নিজ চরণে রাখিবে।
চন্দ্র পক্ষ নেত্র বেদ সনের আশ্রয়।
পক্ষ পৃষ্ঠে চন্দ্রে তারিখ মিথুনে নিশ্চয়।
জদ প্রাপ্তং তদ দত্তং ইতি।

(৪)

৺শ্রীহরএ নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পাদপদ্ম মকরন্দে।
জার মন মর্ত্ত ভৃঙ্গ সদা সেই গন্ধে।
সান্ত দান্ত কৃষ্ণ ভক্তি নিষ্ঠা পরায়ন।
দয়ার সাগর দিন হিনের জীবন।
জাহার মধুর বাক্যে জগত সন্তোস।
বাবাজি কল্যান করি স্বস্তিধর ঘোস।
তোমার মঙ্গল সদা বাঞ্ছা করি আমি।
জেন প্রেম ভক্তির তরঙ্গে ভাস তুমি।
আপনার মঙ্গল কুসল সমাচার।
লেখিঞা চিত্রের দুঃখ ঘুচাবে আমার।
তোমার পালিত আমি তুমি সে পালক।
পালন করিবে জেন আপন বালক।
বালকের পালক জনক সাস্ত্রনিত।
বুঝিঞা বিচার কর তুমি সে পণ্ডিত।
তোমার ভরসা মাত্র আর এক হরি।
করিঞাছি এই দুই দোহাই তোমারি।
জানি বা না জানি কিছু সিধু অল্পমন।
সিক্ষা করাইবে করি তাড়ন ভৎসন।
পুত্র জদি নারায়ণ তুল্য হয় জানি।
ধর্ম্ম সিক্ষা দিবে পিতা আসে সাস্ত্রবাণি।
ভজিলে ভজিতে হয় সুন মহাশয়।
ভজিলে অবশ্য ভজি ভাগবতে কয়।
সব এর্ত্ত জান তুমি জাথে হিতাহিত।
কহিতে তোমার আগে মোরে অনুচিত।
নিজ নাম না লেখিব না দিব তারিখ।
ইঙ্গিতে বুঝিবে তুমি সুজন রসিক।

রসিকে রসিকে কথা না কহে বয়ানে।
রসিকে রসিকে কথা নয়নের কোনে॥
সহজে সরল জার রসের পরান।
রসিকে রসিকে করে রসের ভিজান॥
ভিজানে ভিজানে রস হয় তো সুপাক।
সুপাক হইলে নাম ধরএ অবাক॥
অবাক হইলে হয় সুমধুর প্রেম।
পোড়াএ্যা বোড়াএ্যা জেন সোহাগাতে হেম॥
সেই জে প্রেমের কথা অকর্থ্য কথন।
কহিতে না পারে জেন গুঙ্গার সপন॥
জার লোভে কুল সিল ছাড়ে গোপীগন।
জার লোভে মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন॥
জার লোভে বলরাম নানা বেস ধরে।
জার লোভে মহেশ্বর বসন না পরে॥
তার লোভে সুকদেব বাউল হইল।
নারদ বাজাএ্যা বিনা অন্ত না পাইল॥
জার লোভে বৃক্ষমুলে রূপ সনাতন।
রাজ্যপদ ছাড়ি কৈল অরণ্যে গমন॥
আসিএ্যা রহিলা বৃন্দাবনের ভিতরে।
ভিক্ষাছলে কাঁন্দি বোলে ব্রজবাসি ঘরে॥
সেই রূপ সনাতন দুই মহাসয়।
তোমারে করুন নিজ চরণ আশ্রয়॥ ইতি॥

শ্রীসৃষ্টিধর ঘোস বাবাজি
অভিমযুর চরিত্রেষু—
৭৪।—

(৫)

শ্রীশ্রীহরি
সরণং

করি আকীঞ্চন পাইতে রতন
নিবেদি গউর হরি।
না দিলে বা কোথা পাইব সর্ব্বথা
কহিল চরন স্মরি॥
পরম পুজিত অদ্ভুত চরিত
বহু গুণযুক্ত গউর হরি।
দাব খ্যাতি ভাবি বাবাজী পদবি
মধুমুখা করি চরণ হেরি॥

ঘোর কলি ধন্ত হৈল গোরা অবতারে।
অন্ধকার নাব পাপ গেল ছারখারে॥
সুর্যের উদয় জৈছে তিমির লুকায়।
উদয় করি তমোনাব কৈলা গোরারায়॥
নাম প্রেম প্রচারিয়া জগত তারিল।
সকল ছাড়িয়া জিব গোরাশ্রয় লৈল॥
রূপ নির্য্যাসিতে ভক্তে ক্রোটী গ্রন্থ কৈল।
আবাদিতে যারে শেষ অন্ত না পাইল॥
অন্ত না পাইয়া ব্রহ্মা সিব নারদাদি।
ভক্তরূপে অবতির্ণ হৈলা সংহতি॥
ভক্ত মাহাত্ম্য বিনা গোরার অন্ত নাহি তায়।
অধমের পদাশ্রয় দিবে গৌররায়।

তিরিশা আসাড়ে বিশানল ঘরে
বসীয়া ছিলাম আমি।
ভাগ্যের মাহত্য 'তব আজ্ঞাপত্র
হরি মোরে দিল আনি॥
পত্রের বর্ণনা কি দিব তুলনা
মুনি মুকুতায় গাঁথা।
রূপ পরিপুর্ণ কঠিনতা শুক্ত
তুলনা নাহি সমতা॥
মুকুতার পাঁতি অক্ষরের জোতি
গাঁথনি মনের মত।
বাহুল্য বর্ণন না হয় গনন
ভালবাসা জত তত॥

ইৎসা বড় আছে দোঁহে ব্রজভূমে জাব।
যাইতে যাইতে পথে মাগী মাগী খাব॥
বৈদ্যনাথ গিয়া রাজার আশীর্ব্বাদ লব।
গয়া গিয়া পিতৃলোকে পিণ্ডদান দিব॥
কাশী গিয়া বিশ্বেশ্বর চরণ দেখিব।
অযোধ্যা জাইয়া রাম দর্শন করিব॥
তারপর প্রয়াগেতে বেনিমাধব পাব।
গোকুল হইয়া পরে মথুরাকে জাব॥
মথুরা দর্শনে আগে কৃতার্থ হইব।
জমুনার জল দোঁহে কর পুরি খাব॥
বহু ভাগ্য থাকে তবে বৃন্দাবন পাব।
তব সঙ্গে মহানন্দে দর্শন করিব।
বনে বনে কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমন করিব।
মাধুকুরি ভিক্ষা করি উদর পুরিব॥
কৃপা হয় ভাগ্যোদয় জয়নগর জাব।
গোবিন্দ দেখিয়া পুন বৃন্দাবন পাব॥
নিত্যসিদ্ধ স্থান সব ভ্রমন করিব।
খুজি খুজি দেখি দেখি মহানন্দ হব॥
ইৎসাময় মহাশয় তথায় থাকীব।
ভাগ্য থাকে তব আগে তথায় মরিব॥
এই তো বাসনা আর কারে নিবেদীব।
সম্বৎসর পরে দোঁহে নৌকায় চড়িব॥

(৬)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

পরম প্রেমাইনী—

দক্ষিণ হইতে আসিয়ে এক চিঠি পাইয়াছি তাহায় সংবাদ সকল জ্ঞাত হইলাম আমার এক চিঠি গিআছে তাহার কোন সংবাদ না পাওয়াতে বড়ই ভাবিত আছি এক মাস হইল জবাব

পাইলাম না সারিরিক কেমন আছেন বুঝিতে পারিলাম না তোমার সহিত সাক্ষাত নাইবাতে জেরূপ আছি আহা সুন—

তোমা বিনা অন্য কিছু ভাল নাহি লাগে।
আমায় ফেলি তুমি পালাইলা আগে।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি চিন্তামনি।
তোমা বিনা আমী জেন মনিহারা ফনি।
চঞ্চল জেমন ফনি (হয়ে) হারামনী।
তোমা হারাইয়া আমি হয়েছি তেমনি।
মধুমাখা কথা সব আছে হৃদে গাঁথা।
না সুনে কেমনে রব সে সকল কথা।
কেমনে ভুলিব আমী সে সকল বাণী।
কর্ণ জুড়াত আমার সুনিআ সে বাসী ধ্বনী।
পুর্ব্ব কথা সব পিয়া পড়িতেছে মনে।
কেমনে রাখিব প্রাণ গেল তব অদর্শনে।
তোমা সুন্ন গৃহে পিয়ে রহিব কেমনে।
দেখা দাও পান পিয়া স্থির হক পান।
আমার হৃদয়ে পাণ পিয়ে তব স্থান।
হৃদয় ছাড়িয়ে পিয়ে করিলে প্রস্থান।
কি দোস দেখিআ পান করিলে বর্জ্জন।
দোস জদি করিতাম মারিতে তখন।
দিন মধ্য শতবার দিতে দর্শন।
ঘরে এসে সুনি পেয়ে দেখি তবানন।
আমারি কারণে পিয়ে হারাইলে মান।
কতই যে মহাপাপ করেছি হে আমি।
জে পাপে হারালাম আমি তোমা হেন সামী।
হে বিধী আমার হৃদয় ধন করেছে হরণ।
প্রাণশুন্ন দেহে আর কিবা পিয়োজন।
সপত্ত করিয়ে বলি বধো রে জিবন।
এ ছার দেহো আমার রহে কি কারন।

তব স্থান হইতে প্রিয়া বিদায় হইয়া।
এখানে এসেছি দুঃখের তরনী বহিয়া।
অন্তরে জাগিছে রূপ দিবস রজনী।
কেমনে বাঁচি হে বল সুদা শুবদনী।
সর্ব্বদা দংশিছে মোরে বিচ্ছেদের ফনী।
প্রাণ বুঝি নাহি রহে এই অনুমানী।
ভাবিতে অভিলাস যথ পেম আলাপন।
অস্থির হয়েছে স্থির নাহি মানে মন।
আর কত দিনে পিয়ে হইবে মিলন।
মনে মনে সদা মম এই আকিঞ্চন।
বদন কমল কবে হেরিব নয়নে।
সফল করিব দেহ প্রেম আলাপনে।
তোমার নিকটে পিয়ে এই সে মিনতি।
নিদয় হইও না জেন অভাজন পিতি।

ইতিপুর্ব্বে প্রিয়ে লিখিয়েছিলে জত জাতনা।
তাহা দিক মাত্র মম চিত্ত অনচিত্র হয়েছি তাহা লিখিআ কী জানাব।
তব দুখে দুখী আমি তব সুখে সুখী।
কেমনে তব অসুখে আমি প্রাণে বেঁচে আছি।
তব কষ্ঠে হয় মম জগত আঁধার।
ধ্যান জ্ঞান তুমি মম সুখের মুলাধার।
তব কষ্ঠ ভাবি চিত্ত ধৈর্য্য নাহি মানে।
সুস্থ সংবাদ বিহনেতে বাঁচি হে কেমনে।
অতএব ডাকযোগে লিখন লিখীবে।
তবে সে আমার চিত্ত কিছু সুস্থ হবে।

ধামনাম বলিয়া—
জেদিন প্রিয়া হে তোমায় বিদায় দিয়াছি।
মরি নাই কো প্রাণে আমি কিন্তু মরে আছি।
জে ভবনে দিবানিশী বঞ্চিলা রজনী।
সে ভবন বোন তুল্য মম মোনে মানী।
অন্তরে জাগিছে রূপ দিবস রজনী।
কেমনে বাঁচি হে প্রাণে সদা সুবদনী।
সর্ব্বদা দংশিছে মোরে বিচ্ছেদের ফণী।
প্রাণ বুঝি নাহি রহে এই অনুমানী।
দেখ প্রিয়া—
এ পাপ বসন্ত এলো মোরে নাসিবারে।
কহিল কুহু স্বরে সত সত ঝঙ্কারে।
এ সোময় প্রাণপ্রিয়া থাকে ত্রিদি পরে।
আমার এ নয়ন মন সদত নেহারে।
তাহাদের ধ্বনি সুনি বেধে পাচ বান।
পাঁচ দিগে পাচ টানে কি করে পরান।
নয়ান করয়ে ধ্যান নির্জোন পাইয়া।
নাসিকা আনয়ে ঘ্যান সক্তি ন্‌কারিয়া।

(৭)

৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ:
৭ শ্রীবনয়ারী জীউ সরণং
চরণ ভরসা—

প্রলয় গভীর নীর তরঙ্গ রঙ্গ বরেষু। হে ভ্রষ্ট লম্পট শিরোমনি কপট শঠ চূড়ামণি যদি চ আমার মন অহর্নিশি তব দর্শন লালসায় লালায়িত কিন্তু অস্মদ সম্বন্ধে ভবদীয় তাদৃশ অনুরাগ লক্ষিত হয় না। হায় আমি অবলা অখলা সরলা কুলবালা হইয়া বিষকুম্ভ পয়োমুখ পাশান হৃদয় ব্যক্তির করে সরল চিত্তে কায়মনোবাক্যে রূপ যৌবন মান প্রাণ সমুদায় সমর্পন করিয়া বড়ই মুঢ়ের কার্য্য করিয়াছি···আগে জানি না যে তুমি আমার নও তাহা হইলে প্রথম মিলন দিবসে বিশেষ বিবেচনা মত উচিত কার্য্য করিতে বা (য্য) হইতাম দেখ নায়কের মিলন বারি প্রত্যাশায় চাতকিনী নায়িকা স্বয়ং অভিসার পথ অবলম্বন করিয়া নায়ক সমীপে গমন করিলে তাহার প্রতি নায়কের কিরূপ ব্যবহার করা উচিৎ তৎ সমুদায় সবিস্তরে লিখিবেন আর দীনা হীনা খীনা মলীনা সহায় বিহীন

ললনার সহিত স্বয়ং সাখ্যাত না করিয়া অপর ব্যক্তির দ্বারা দুই তিনবার প্রকারান্তরে বঞ্চিত করা কি গুনায়কের সমুচিত কার্য্য হইয়াছে ভালই সাধু মুখ বিনিশ্রিত উললিত পত্তটি মন সংযোগে আত্তন্ত পাঠ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেই আমি পরমানন্দের সহিত চির বাধিত হইব, পদ এই—

ধিক রহ জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে। তাহার অধিক ধিক পরবস হয়ে। এ পাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল। শুধার সাগরে মোর গরল হইল। অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়। গরল ভরিয়া কেন উঠিল হিয়ায়। সীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাস কোলে। এ দেহ অনল তাপে পাষাণ,সে গলে। ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে। জলিয়ে উঠয় তরু লতা পাতা শনে। যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ। পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ। অতএব এ ছার পরাণ যাবে। নিশ্চয় ভখিনু মুঞী এ গরল বিষে। চণ্ডীদাসে বলে দৈবগতি নাহি জান। দারুণ পিরিতি সেই ধরই পরনি।

মহাশয়ের সহিত প্রণয় বন্ধ না হওয়া ভাল ছিল কারণ তাহাতে আমি সানন্দিত মনে ছিলাম প্রত্যুক্ত ষড়ঋতু এতাবৎকাল ক্রমান্বয়ে চলিতেছে—ও চলচিত্ত হয় নাই বস্তুত বিগত বসন্তকাল আমার পক্ষে কাল হইয়া আসিয়াছিল তন্নিবন্ধন দিবা বিভাবরী যে কত কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি তাহা অন্তরাত্মাই জানেন সে সকল কথা অর্থাৎ নিদারুণ দুঃসহ দুঃখের কথা আত্মীয় স্বজন সমীপে বর্ণন করিলে ক্লেশের অনেক লাঘব হইতে পারে কিন্তু অপরাপর সন্নিহিতে প্রকাশ করিলে এক গুণ দুঃখ সহস্র গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠে, যাক গে পাগলিনীর ন্যায় অধিক বাচালতা প্রকাশ করা প্রয়োজন করে না তবে নিজ গুণে অধিনীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশিয়া অচিরে দর্শন দানে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করেন তাহা হইলে সাতিশয় আনন্দলাভ করত চিরবাধিতা হই জানিবেন অলং ১২৮৩ সাল তাং ৭ মাঘ—

নিঃ চম্পকলতিকা দাসী

মোঃ বনয়ারীবাদ

মোহানা

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

চোরাবালি সাদাচড়া রাতে পাওয়া পাখীদের ডানা
উড়ে যায় ঘুরে ঘুরে জীবনের অকূল মোহানা,
পিছনেতে কাশফুল সাদা সাদা বালি
মাটির চাদরে পিঠ,
আকাশেতে মুখ তুলে থালি
একা একা রাত ভোর করি।
কাশফুল সাদা সাদা দোলে
রাত পাখী উড়ে যায়
কুয়াশার কানাতটা ফেলে।

আকাশে ব্যথার হাঁস ডানা মেলে
বিষণ্ণ পৃথিবী
কান্নার সুর শোনে মাটিতে-ঘাসেতে,
তার শ্লথ নীবি
খ'সে গেছে হাওয়ায় হাওয়ায়,—

সেইখানে কান পেতে শুনি
মাটির মাঠের কান্না
আমার এই প্রাণে। বুনি
যে কিসের জাল তাই আমি জানতাম যদি
অকূল মোহানা কূল আর বার পায়
চোরাবালি সাদা বালুচর
বয়ে নেবে সে জীবননদী।

স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

চতুর্থ পর্ব্ব

৪

রেডিও সঙ্গীত বিভাগে অডিশনে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বহু প্রত্যাশীকে কি ভাবে নিরাশ করতেন তা দেখে প্রথমে আমি পরীক্ষার্থীদের মতোই মর্মাহত হয়েছি। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম কেন তিনি গানের বা বাজনার এক লাইন শুনেই থামিয়ে দিয়ে পরবর্ত্তী প্রার্থীকে ডাকতেন। সুরেশবাবু বলেছিলেন সঙ্গীতের গুণাগুণ বিচারে ওর বেশি দরকার হয় না। কাজটি নিষ্ঠুর অবশ্যই, কিন্তু পরীক্ষাপ্রার্থীদের সংখ্যা বিবেচনা করলে ও ছাড়া আর উপায় নেই। প্রার্থীরা আশা করতেন পরীক্ষক আরও একটু শুনুন, দশ বিশ সেকেণ্ড শুনে থামিয়ে দেওয়াতে তাঁদের কারো কারো এমন মর্মাহত হতে দেখেছি যে তাঁদের কথা ভাবলে আজও দুঃখ হয়।

বেতার ষ্টেশনে তখন ডাইরেক্টর ছিলেন ষ্টেপলটন। তিনি ছিলেন যন্ত্রী, ভাল ইঞ্জিনিয়ার, অন্য বিদ্যা বিশেষ কিছু ছিল না। তবে ভাল লোক ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।

বেতার ষ্টেশনে বক্তৃতার ষ্টুডিও ছিল তিনতলায়, এবং গান ও অভিনয়ের দোতলায়। গার্স্টিন প্লেসের পুরনো বাড়িটার চেহারা বদলে ফেলা হয়েছে। এই বাড়ির গায়েই একদিন রাত্রে বোমা পড়েছিল সেই যুদ্ধের সময়, (১৯৪২) তখন কি আতঙ্ক!

শুধু বাড়ির চেহারা নয়, প্রোগ্রামের চেহারাও বদলে ফেলা হয়েছে। বেতারের এখন বহু বিস্তার; অল্পদিনের মধ্যে প্রোগ্রামের এমন বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং শ্রোতা বৃদ্ধি আগের দিনে কল্পনাতীত ছিল। ১৯২৬ সালেই সম্ভবত প্রথম রেডিও শুনি। শিশিরকুমার ভাদুড়ির অভিনয় রিলে করা হয়েছিল। বেতার গ্রাহক যন্ত্র তখন খুব ভাল ছিল না, অস্পষ্ট শুনেছিলাম, তাইতেই কি আনন্দ। আজকের উন্নতির গোড়াপত্তন হয়েছিল নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের সময় থেকেই। তিনি এবং তার সঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার, রাজেন সেন, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বাণীকুমার প্রভৃতি গুণীজন একত্র মিলে বেতারকে এদেশে জনপ্রিয় করেছেন। কাজি নজরুল ইসলামও ছিলেন একজন প্রধান, উৎসাহী। তিনি বহু সময় ওখানেই কাটাতেন। ওটাও ছিল তখন একটা বড় গানবাজনা এবং গল্পের আসর। সুরেন্দ্রনাথ দাস ভারতীয় সুরের বিচিত্র মিলনে নতুন অর্কেষ্ট্রা পরিকল্পনায় এমন মেতে থাকতেন যে, সে সময় তাঁর বাইরের জ্ঞান লুপ্ত হত। সঙ্গীত বিষয়ে গভীর নিষ্ঠা—সত্যকার ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো। কাজি নজরুলকেও এমনিভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবে দেখেছি কতবার, সুরের ধ্যানে মগ্ন। গাইবার সময়ও নজরুল মেতে উঠতেন। তাঁর হরি ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়িতে বসে তাঁর গান শুনেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গলা মধুর ছিল না, কিন্তু গানের মধ্যে এমন প্রাণ ঢেলে দিতেন যে তখন মুগ্ধ না হয়ে থাকা যেত না।

রেডিওর পরিবেশেই পরিচয় হল এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে, তাঁর নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। এ রকম চরিত্র যে বাস্তবিক থাকতে পারে তা আমার কল্পনার অগোচর ছিল। সংসারে দুচোখ মেলে চাইতে পারলে বিচিত্র মানুষের দেখা মেলে, শুধু দেখতে জানা চাই। দেখার বিদ্যা শিখিনি। মানুষকে দেখতে হলে সাধনা দরকার। সে সাধনা থেকে দূরে আছি। তাই আমার পরিচয়ের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। আর ঠিক এই কারণেই হয় তো যাদের দেখি, তাদের খুব কমিয়ে দেখি না হয় খুব বাড়িয়ে দেখি। অতএব শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের মতো একটি চরিত্রকে আমি কোনো দিনই যথাযথ দেখতে পেতাম না যদি না তিনি নিজেকে এমন ক'রে দেখাতেন। তিনি এমন একটি অসাধারণ মানুষ যিনি সবার কাছে নিজেকে

সুরেশবাবুর অধীন তখনকার অডিশন।

সর্বদা মেলে ধ'রে রেখেছেন, নিতান্ত অন্ধ ভিন্ন তাঁকে না দেখে কারো উপায় নেই।

আমরা সাধারণত অন্যের জীবনের ট্রাজেডি নিয়ে হাস্য কৌতুকের উপাদান বানাই, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত নিজেই নিজের যাবতীয় ট্রাজেডিকে হাস্য কৌতুকের উপাদান বানিয়েছেন। আজ (১৩৫৮ তে) তাঁর বয়স প্রায় ৭৭ বছর, আজও তাঁর চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করে না, মনে হয়, হয় তো বা দুঃখের বোধই এঁর নেই। বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, ভাষা শিল্পের যাদুকর, কবিত্ব শক্তি সহজাত, ইংরেজী, বাংলা হিন্দি কবিতা মুখে মুখে রচনা করেন, গান গেয়ে শোনান। বিদূষক বলতে যে পাণ্ডিত্য ও উইটের মিলন বোঝায়, এঁতে তা পূর্ণ মাত্রায় আছে। (পাণ্ডিত্য শুধু পদবীগত নয়)। দারিদ্র্যকে এমন হাতে কলমে চ্যালেঞ্জ ক'রে চলার দৃষ্টান্ত বিরল। দুঃখ থেকে পালিয়ে নয়, সংসারকে এড়িয়ে নয়, সংসারের মাঝখানে থেকে, দুঃখকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে তাকে আজীবন পরাভূত ক'রে চলা কোন্ সাধনার ফল তা আমি জানি না। শিশুর মতো সরল, শিশুর মতো দুষ্টুমি বুদ্ধি। হৃদয়খানি বিরাট। এই বয়সে এক অনাত্মীয় মুমূর্ষু রোগিনীর পাশে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বহু দূর পথ হেঁটে এসে বসতেন শুধু নানা কথা বলে গান গেয়ে রোগিনীর কষ্ট ভুলিয়ে রাখতে। রোগিনীর মৃত্যু দিন পর্যন্ত এ কাজ তিনি করেছেন। মৃত্যুর দিন অনাহারে রোগিনীর পাশে ব'সে। দাহক্রিয়া শেষ ক'রে ফিরেছেন সন্ধ্যায়।

এঁর সমস্ত জীবনের কৃতি নলিনীকান্ত সরকার যুগান্তরে লিখেছেন। এ সব কথাই শরৎচন্দ্রের কাছে অনেক বার শুনেছি। তাঁর মুখে তাঁর আসল চরিত্রটি ফুলের মতো হেসে ওঠে। সে জিনিসের বর্ণনায় সে স্বাদটি আর থাকে না, তবু যে লেখা হল, এ বাংলা দেশের ভাগ্য মনে করি।

১৩৩৬ সালের কোনো একদিন রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা গৃহে তাঁর গদ্য কবিতা অনেকগুলি পাঠ করেন। গদ্য কবিতা তখন সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি, অনেকে বিদ্রূপ করেছে। গদ্য ছন্দ পড়তে না জানার জন্যই এই বিরূপতা। এ রচনা গদ্যই, কিন্তু পদ্যের মতো মাপা মিটারে নয়। শুধু রিদম। ঠিক মতো পড়তে পারলে এবং গদ্যত্ব মুহূর্তে ঘুচে গিয়ে প্রকৃত কাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পড়তে জানা চাই। তখন তো দেখেছি অনেকেই ওর মধ্যে কবিতার মিটার খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়েছে। কবিতার তালে পড়তে গিয়ে আটকে গেছে। ঘেমে উঠেছে। বুঝিয়ে দিতে হয়েছে অনেক জিজ্ঞাসুকেই। 'লিপিকা' প'ড়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তবু পারিনি। পারিনি কারণ গদ্যকাব্য নামক যে রচনা তা পরিচিত কবিতার মতো সাজানো বলেই তাতে কবিতার নাচুনি ছন্দ বা মিটার খুঁজেছে তারা, প্রভেদ ধরতে পারেনি। আর শুধু তাই নয়, নিজেরা লিখেছে গদ্যছন্দ, কিন্তু তার মধ্যে মধ্যে মিটারের মিশ্রণ দিয়ে বসেছে, এমন কি মিলও দিয়েছে মাঝে মাঝে। এখনও এ রকম হাস্যকর চেষ্টা দেখা যায় দু এক স্থলে।

কিন্তু সত্যিই কাব্যপাঠ মিটারে হোক বা রিদমএ হোক, রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর নিজের কণ্ঠে যে না শুনেছে তার পক্ষে তার সকল সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আধুনিক কাব্য সমালোচকেরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে কাব্য ধ্বনিগত প্রাণ। যথার্থরূপে ধ্বনিত ক'রে পড়লে তবেই তার মর্মগ্রহণ সহজ হয়। এই আবৃত্তি কত সুন্দর হতে পারে, উচ্চারণ এবং ধ্বনি কত মর্মস্পর্শী হতে পারে, তার চরম দৃষ্টান্ত আমার মতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন। যা আপাত দৃষ্টিতে গদ্য, তা তাঁর আবৃত্তিতে সেদিন তাঁর যে-কোনো ছন্দোবদ্ধ কাব্যের মতোই সুরে কথায় অঙ্গাঙ্গি মিলে বর্ণনাতীত রূপে সুন্দর এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ঘরভরা শ্রোতার কাছে সে দিন সে এক অভিনব উপলব্ধি। যাঁদের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল তাঁরা সে দিন দ্বিধাহীন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রকণ্ঠে কাব্যের আবৃত্তি প্রথম শুনেছিলাম ১৩১৭ সালে, আর শুনলাম সেই ১৩৩৬ সালে, কত দিন পরে। এবং তাঁর কাব্যের শেষ আবৃত্তি শুনলাম রেডিওতে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ১৩৩৮ সালে। আবৃত্তি করেছিলেন কালিম্পং থেকে। এর বিবরণ পাওয়া যাবে মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।

আমার এক বন্ধু শুধু এই আবৃত্তি শুনবেন বলেই রেডিও কিনলেন; পরে বলেছিলেন কেনা সার্থক হয়েছে।

'জন্মদিন' অবিস্মরণীয় আবৃত্তি। প্রতিটি কথার উচ্চারণে অর্থে ইঙ্গিতে এবং ধ্বনিতে শুধু নয়, কবিতাটির অন্তরে এক গভীর বেদনার প্রকাশ ছিল। পৃথিবীর সঙ্গে মমত্ববন্ধনের আসন্ন ছেদের চিন্তার মধ্যে, পরম ঔদার্যের সঙ্গে মৃত্যুর সত্যকে স্বীকার করার মধ্যে, পৃথিবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে, আর জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ খোঁজার জন্য অপর তীরে মুখ ফেরাবার সম্ভাবনার মধ্যে, তাঁর দিক থেকে কথা যত সহজ হোক, আমাদের মনে তার প্রতিক্রিয়া সহজ ছিল না। মৃত্যুর কথা তিনি অনেকবার শুনিয়েছেন, কিন্তু এবারের কথায় অতিরিক্ত আর একটা সুর লেগেছিল। তিনি এবারে বললেন :

"আজি আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন : একাসনে দোঁহে বসিয়াছে ;"...

তাই আগে যা ছিল বহু দূরের সম্ভাবনা, যা ছিল শুধু মৃত্যু সত্যের একটা আত্মিক উপলব্ধি, এবারের কথায় তার সঙ্গে আসন্ন দৈহিক মৃত্যুর একটা অশুভ আভাস যুক্ত হয়েছিল। এই অশুভটা অবশ্য আমাদের মনেরই প্রতিফলন, কবির মনে কোনো আতঙ্ক ছিল না, জীবনের প্রতি লোলুপতা ছিল না; একটা অভাবিত উদাসীনতার সঙ্গে জীবনের এই পরম সত্যকে স্বীকার করেছিলেন, যেমন তিনি আগে করেছেন। কিন্তু তাঁর সুরে মাঝে মাঝে যে তিক্ততা ফুটে উঠেছিল, সে অন্য কারণে। সে হচ্ছে সভ্যতার আপাত ব্যর্থতায়, সভ্যতা প্রহসনে রূপান্তরিত হওয়ায়। সে দিন তাঁর কথায় বর্তমানেও 'নরমাংসলোভী' পশুধর্মী মানুষের বিরুদ্ধে এক প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। মানুষের প্রতি তাঁর একদিনের যে বিশ্বাস তাও যেন মুহূর্তের জন্য শিথিল হয়ে এসেছিল। তাঁর কণ্ঠ সে দিন এমন প্রচণ্ড আবেগপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল তা কণ্ঠস্বর নয়, নায়াগারা জলপ্রপাত—ভয়ঙ্কর গর্জনে ভেঙে পড়ছে অপরাধী মানুষের মাথার উপর। কিন্তু যাদের উদ্দেশে এ ধিক্কার তারা বধির, তাদের ঘাড় ইস্পাতের। তবু সত্য একদিন জয়ী হবে, এ বিশ্বাস নিয়েই তিনি বললেন—

…"মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

সমস্ত মিলে কি এক অদ্ভুত অনুভূতি। এখনও মনে পড়লে সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। জীবন ধন্য মনে হয়েছিল সেদিন। মুখে ভাষা ছিল না, চোখের জল এসেছিল আনন্দে। শোনবার সময় মাঝে মাঝে সত্যিই ভয় হচ্ছিল কবির হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে না যায়, এমন ঝড় উঠেছিল সেদিন তাঁর কণ্ঠে।

১১৩৮ সালের শেষের দিকে একবার মনে হয়েছিল একখানা মাসিকপত্র চালালে কেমন হয়। এ পরিকল্পনা নিখিলচন্দ্র দাসের (অদ্যাবধি এ পরিকল্পনা তিনি ছাড়েননি—এই ৩২ বছরেও)। কাগজের নামও ঠিক হয়েছিল, হিমালয়। শরদিন্দু ও বলাইচাঁদের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম—যেন নিয়মিত লেখে। খুব রাজি দুজনে। আমার সাহায্য হবে জেনে আমার জন্য কষ্ট করতে রাজি। তারপর যখন এ পরিকল্পনা কোনো কাজের নয় বোঝা গেল, তখন বন্ধুদের জানিয়ে দিলাম, "হল না।" দুজনেই জানাল, "বাঁচা গেল।" মানে আমার ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার কল্পনায় তারাও বাঁচল। সবাই বেঁচে গেলাম।

১১৩৮ থেকে শুরু করে ১১৩৯-এর কয়েক মাস—মোট প্রায় এক বছর—আর্টপ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র ভারত সম্পাদনা করি। এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সচিত্র ভারতের আকার তখন অনেক বড় ছিল, প্রায় ১১½"×১০"। ছাপা হত আর্ট পেপারে, মলাট ছিল কার্ট্রিজ পেপারের, তার উপর অফসেটে ছাপা ফোটোগ্রাফ। ভিতরে ফোটোগ্রাফের ছড়াছড়ি, দাম ছিল মাত্র চার পয়সা। সে সময়ে লেখকরূপে পেয়েছি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, 'ভাস্কর', অজিতকৃষ্ণ বসু, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল ইত্যাদিকে। প্রবন্ধ বা গল্পের জন্য তখন পাঁচ টাকা দেওয়া হত। 'ভাস্কর' ও নির্মলকুমার বসু টাকা নিতেন না। ভাস্কর (ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ)-কে আমি প্রথমে একটি লেখার মাধ্যমে আবিষ্কার করি। আহারের বর্বরতা নামক একটি রচনা পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে। পড়ে এত ভাল লেগেছিল যে তার পর থেকে তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মে। রচনাটি শনিবারের চিঠিতে ছাপি।

সচিত্র ভারতের একটি হিন্দি সংস্করণ ছিল, একই চেহারা এবং ছবি। সেটি সম্পাদনা করতেন ধন্যকুমার জৈন। হিন্দি অনুবাদ সাহিত্যে ধন্যকুমার জৈন তখনই বেশ নাম করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের লেখার সফল অনুবাদ তিনি করেছেন।

১১৩৯ সালেই 'অলকা' নামক মাসিকপত্র সম্পাদনায় প্রমথ চৌধুরীর সহযোগীরূপে কয়েক মাস কাজ করি। কাগজের ভবিষ্যৎ যাই হোক, অল্পদিনের জন্য বাংলা সাহিত্য জগতের আমার অন্যতম বিষয় প্রমথ চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে আমার ভবিষ্যৎ কালের একটি বড় স্মৃতির সম্পদ লাভ হল। রবীন্দ্রনাথের পরেই এই পরিচয় আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

'অলকা'র মালিক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ সরকার। তাঁদের হিমালয় হাউসের 'অলকা' অফিসে যেদিন প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় সেই দিন তাঁর প্রথম প্রশ্ন "আমরা এক ক্ল্যান তো?"—অর্থাৎ বারেন্দ্র কিনা। এই একটি কথাতেই আমাদের মধ্যেকার অপরিচয়ের দূরত্ব মুহূর্তে দূর হল।

তাঁর পাম প্লেসের বাড়িতে প্রায় যেতে হত আমাকে। তিনি অত্যন্ত সরল হৃদয় ছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পরম সুহৃদের। বসে বসে কত গল্প করতেন। প্রথম দিনই ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়।

আমি যতদিন গিয়েছি তাঁকে একা পেয়েছি। মনে হয় কিছু নিঃসঙ্গ বোধ করতেন, আমাকে পেলে উৎসাহের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন। সবুজপত্র যুগের কথা হয়েছিল একদিন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সে যুগে আপনার মনের মতো এত লেখা পেতেন কি ক'রে।" তিনি বললেন তখন তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হত। নতুন লেখকদের লেখা, যার মধ্যে বক্তব্য আছে কিন্তু লেখার ষ্টাইল নেই, ফর্ম নেই, সে সব লেখা খুব যত্ন ক'রে সংশোধন ক'রে নিতে হত। এইভাবে তিনি লেখক তৈরি করেছেন। অনেক লেখা মনের মতো ক'রে তৈরি ক'রে নিতে হত, আগাগোড়া নতুন ক'রে লিখে। বললেন, "তখন সম্পাদনা খুব পরিশ্রমের কাজ ছিল, মনোযোগ রাখতে হত সবগুলো পাতার উপর। সব পাতাই সবুজ পাতা করা হত এই ভাবে।"

একটি সোফার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকতেন, আমি কখনো তাঁর পাশে, কখনো সামনের আসনে বসতাম। কথা বলতে তাঁর ঠোঁট তখন ঈষৎ কাঁপতে আরম্ভ করেছে, এবং কণ্ঠও কিছু ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাঁর বক্তব্য অনুসরণ করতে আমার কোনো কষ্ট হত না, যেমন হত না তাঁর কাঁপা-আঙুলের লেখা পড়তে।

অতি অন্তরঙ্গ সুমার্জিত ব্যবহার, আভিজাত্যে কোনো ভেজাল ছিল না। একদিন বললেন, "লেখায় বুদ্ধির ছাপ পড়লে সে লেখা

বর্ষার রাত্রি, ফীটন গাড়িতে প্রমথ চৌধুরী ও আমি।

সাধারণ পাঠক পড়তে চায় না, অনেক সময় আবার ভুল বোঝে।" এ সব কথা কোনো বিশেষ রচনা সম্পর্কে হয়তো বলেননি। আরও বললেন, "না বুঝে চুপ করে যাওয়া ভাল, কিন্তু ভুল বুঝে তেড়ে আসা বিপজ্জনক।"

আমি তাঁরই কথায় তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম, বললাম, "আপনিই তো বলেছেন মানুষের বোঝবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে কিন্তু তার না বোঝবার ক্ষমতা অসীম?"

একটু হেসে বললেন, "বিপদ তো সেইখানে।"

একদিন শ্লেষ বা পানিং-এর ব্যবহার সম্পর্কে কথা তুললেন তিনিই এবং এ বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করলেন। মনে আছে শুধু বলেছিলাম ওটি ভাষার একটা অলঙ্কার, মাঝে মাঝে ভাল লাগে। বেশি ব্যবহারে আসল বক্তব্য চাপা পড়ে, তবে আসল বক্তব্য যদি কিছু না থাকে সে ক্ষেত্রে পানিং-এর রসটা উপভোগ করতে মন্দ লাগে না।

আলোচনা চলছিল ফীটনে বসে। পাম প্লেসের বাড়ি থেকে উঠতে দেরী হয়েছিল, তাঁর বেড়াতে বেরোনোর সময় হয়েছিল, আমাকে বললেন, "চল আমার সঙ্গে, তোমাকে ট্রাম লাইনে ছেড়ে দেব।" তখন পার্ক সার্কাসের বেশি ট্রাম লাইন ছিল না। ছাড়লেন রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে। বলেছিলেন অজিত চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে যাবেন।

আলাপ চলতে লাগল। প্রমথনাথ বলতে লাগলেন, "চেষ্টারটন পড়তে গিয়ে দেখি পড়া শেষ হল, পড়ার আনন্দও শেষ হল। কিছু মনে রইল না। প্যারাডক্সের আতিশয্যে পড়া এগোতে চায় না। লক্ষ্যে পৌছতে বড্ড দেরি হয়। অবশ্য তাঁর সব লেখা এরকম নয়। বললেন, "বিনা পানে অলঙ্কার হয় কিন্তু অলঙ্কারহীন পান হয় না। বক্তব্য সম্পূর্ণ হারিয়ে গেলে উপভোগ করতেও আটকায়। সে জন্য খুব সাবধানে ও জিনিস ব্যবহার করতে হয়।"

তখন বর্ষাকাল। অকাশ কালো মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে। পথের উপর আলোর চিক চিক প্রতিফলন। ভিজে গাছের পাতায় আলো কাঁপছে। কোন্ পথে গাড়ি চলেছে সে খেয়াল করিনি, ওদিকের পথও তখন অপরিচিত। একটি পার্কের পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে।

কতদিন পরে যুগান্তরে প্রবেশের পর (১১৪৫) আবার গিয়েছি তাঁর কাছে কত বার। লেখা চেয়েছি এবং পেয়েছি। লেখার ভাণ্ডার থাকত ইন্দিরা দেবীর কাছে, তিনিই বেছে দিতেন। তিনি আমার প্রতি তাঁর প্রীতির চিহ্নস্বরূপ তাঁর অনুকথা সপ্তক আমাকে একখানা উপহার দিয়েছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা দুরকমই লিখে দিলেন আমার নামে। এটি অযাচিত উপহার। ১৩-১-৩১ তারিখটি আমার কাছে স্মরণীয় আছে এ জন্য। ১১৩১ সালেই অলকায় তাঁর একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। অলকা আমার কাছে একখানিও নেই, কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপি আমার কাছে এখনও আছে। ছাপাখানা থেকে বাঁচিয়ে সযত্নে রক্ষা করেছি। হাতের লেখা দেখে মনে হয় আরও দু এক বছর আগের লেখা, কারণ এ লেখা অনেক স্পষ্ট। লেখাটির নাম "ভারতবর্ষ—যাদুঘর।" ছোট লেখা। লেখার নিচে বাঁয়ের দিকে লেখা রাঁচি, ডান দিকে "বীরবল।" শিরোনামা ও স্বাক্ষর পরবর্ত্তী কালির। এই রচনাটি আমার খুব ভাল লেগেছিল, তাঁর কোনো সংকলনে ছাপা হয়েছে কি না জানি না। সে লেখাটির কিছু অংশ এই—

"ভারতবর্ষের ইতিহাস যে লেখা হয় নি তার কারণ ভারতবর্ষের কোনও ইতিহাস নেই। ইতিহাস অতীতেরই হয়, বর্তমানের হয় না। ভারতবর্ষের কোনও অতীত নেই, কেননা ভারতবর্ষে সবই বর্তমান। সুতরাং যাঁরা হয় পুঁথির নয় মাটির ভিতর থেকে ইতিহাস বার করতে চাচ্ছেন তাঁরা সময় ও পরিশ্রম দুই বৃথায় ব্যয় করছেন। লুপ্ত জিনিসেরই উদ্ধার হতে পারে, কিন্তু এদেশে কিছুই লোপ পায় না। ভারতবর্ষের কত হাজার বৎসর জানিনে, সব পাশাপাশি সাজান রয়েছে—ভারতবর্ষের সভ্যতার সকল স্তর একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ দেশে এত বিভিন্ন জাতের এত বিভিন্ন স্তরের লোক স্বধর্ম পালন করে চলেছে যে, ভারতবর্ষকে নির্ভয়ে মানব-সভ্যতার যাদুঘর এবং ভয়ে ভয়ে, মানবজাতির পশুশালা বলা যেতে পারে। মানুষ সম্বন্ধে মানুষের যত রকম বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আছে, ভারতবাসীর কাছ থেকে সে সকলের চরিতার্থতা লাভ করা যেতে পারে।

"আমার চোখের সুমুখে পাচ্ছি, বিংশ শতাব্দীর বাংলার গা ঘেঁসে শুধু প্রাচীন নয়, আদিম ভারতবর্ষ সশরীরে বর্তমান রয়েছে।... পৃথিবীতে এমন আর কোনও দেশ নেই, যেখানে যীশু খৃষ্টের আগের দু' হাজার বৎসর আর পরের দু' হাজার বৎসর এমন বেমালুম ভাবে গায়ে গা মিলিয়ে থাকতে পারে। ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে তাই দিন-রাত জড়াজড়ি করে চিরসন্ধ্যারূপে বিরাজ করছে।

"ঐতিহাসিক ত ঘরের কথা, প্রাক্-ঐতিহাসিক ভারতবর্ষও যদি কেউ প্রত্যক্ষ করতে চান ত চোখ মেললেই তা দেখতে পাবেন—শাস্ত্র কিংবা পৃথিবীর গর্ভের অন্ধকারের ভিতর ঢোকবার দরকার নেই।"

হাল্কা সুরে বলা কিন্তু ব্যঙ্গ সুদূরপ্রসারী।

১১৩১ সালের ২১শে জুলাই পাবনা থেকে একখানা চিঠি পেলাম, লেখক আমার বাল্যবন্ধু ফণীন্দ্রনাথ রায় (এম-এ, বি-এল)। ফণী আমার সহপাঠী এবং সাহিত্যিকরূপে আমার পূর্বগামী। তার কথা আগে বলেছি। সে লিখেছে—

"আমাদের লাইব্রেরির বার্ষিক উৎসব আগামী ১৪ই শ্রাবণ, ইংরেজী ৩০শে জুলাই। এঁরা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'গেষ্ট অফ অনার' করতে চান। তিনি তোমার বন্ধু এবং লিখেছ তাঁকে আনার ব্যবস্থা করতে পার। তোমাকেও আসতে হবে।"

গিয়েছিলাম পাবনা। দীর্ঘ একুশ-বাইশ বছর পরে পাবনায় এসে তার আবহাওয়াতে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে সতেজ মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য নিয়মের বাইরে গেলেই খারাপ বেঁকে দাঁড়ায়। তাই সুস্থ বেশিক্ষণ থাকিনি, এক বেলা মাত্র ছিলাম। ফিরেছিলাম রাত্রে সামান্য জ্বর নিয়ে। বিভূতি বাবুর স্বাস্থ্য সম্ভবত আরও ভাল হয়েছিল ওখানে গিয়ে। তিনি সকালে সভার পরই খুব উৎসাহের সঙ্গে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম দেখতে চলে গেলেন, নানা কারণে আমার শুভার্থীরা আমাকে যেতে দিলেন না। ভালই করেছিলেন, আর কিছু না হোক ফিরে এসে শুয়ে পড়তে হত নিশ্চয়। বিভূতি বাবু খুব উজ্জ্বল মুখে ফিরলেন, কথাবার্তায় মনে হল দীক্ষিত হয়ে ফিরেছেন,

কারণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আবার আসবেন সেখানে সুযোগ পেলেই।

সেদিন রবিবার, আমার রেডিও বক্তৃতা, ব্যবস্থা হয়েছিল আর কেউ পড়ে দেবেন আমার লেখা। পাবনা থেকেই সেটি শুনলাম, পড়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। পাবনায় সন্ধ্যার সভায় খুব ভিড় হয়েছিল। প্রবল বৃষ্টি ও বাতাস, তাতে কোনো বাধা হয়নি। আমি একটি লিখিত বক্তৃতা পড়েছিলাম। কি তা এখন সম্পূর্ণ মনে নেই, তবে তার আরম্ভটি মনে আছে। আমি বলেছিলাম, "লাইব্রেরি উৎসবে যোগ দেবার জন্ত একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ অনুভব করেছি আরো এই কারণে যে আমি নিজে তিনটি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা।"

খবরটি কারো জানা ছিল না। সবাই এমন একজন বিখ্যাত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠাতাকে চেনেন না ভেবে সম্ভবত লজ্জাও পাচ্ছিলেন। তবে তাঁদের আশ্বস্ত করলাম। বললাম "তিনটি লাইব্রেরিই প্রতিষ্ঠা করেছি আমার নিজের বাড়িতে, এবং তিনটিই উঠে গেছে, একখানি বইও অবশিষ্ট নেই।"

বিভূতিবাবুর সকালের ও রাত্রের দুটি বক্তৃতাই এমন জ্ঞানগর্ভ এবং চিত্তগ্রাহী হয়েছিল যে পাবনায় আমাদের আয়ু মাত্র একদিনের জন্ত হওয়াতে সবাই অত্যন্ত ক্ষুন্ন। এমনকি এত আয়োজন করে তাঁরা যেন ঠকে গেলেন এই রকম ভাব। কিন্তু উপায় ছিল না। সন্ধ্যা থেকেই দুর্যোগ, তারই মধ্যে ঈশ্বরদি অভিমুখে রওনা হতে হল।

১৯৩১ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে পাবনা থেকে প্রেরিত একটি দীর্ঘ রিপোর্ট যুগান্তরে প্রকাশিত হয়। খবরটির অংশ বিশেষ এই—

"গত ৮দিন ধরিয়া এখানে ২৪ ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে, গত ৩০শে জুলাই পাবনা অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপরিমল গোস্বামী এখানে আসিয়াছিলেন। সকাল ৭॥টায় শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক সরকারী উকিল মহাশয় উৎসবের উদ্বোধন করেন ও তৎপর শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লাইব্রেরির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে সাদর সম্ভাষণ জানান। বিকাল ৬॥ ঘটিকায় পুনরায় গ্রন্থাগারের সাহিত্য শাখার উদ্যোগে একটি সাহিত্য বাসরের অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় টাউন হলে সভা স্থানান্তরিত করা হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজরাখাল রায় সমবেত সাহিত্যিকগণকে ও জনসাধারণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

"শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চৌধুরী ও মকসেদ আলীর কবিতাগুলি উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে দু একটি কথা, শ্রীনিবারণচন্দ্র সেনের বাংলা ভাষা সরল করা যায় কি না, মৌলবী এম রজব আলীর জীবন মরণের ফিলসফি ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ছোট গল্প উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীপরিমল গোস্বামী ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় দুইটি অতি উচ্চাঙ্গের হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় ছোটগল্প উপন্যাস প্রভৃতি লিখিবার কৌশল ও শ্রেষ্ঠ লেখকগণের উন্নতির কারণ কি, ইত্যাদি সুন্দররূপে বর্ণনা করেন। সভায় কুমারী ইলা ভৌমিক ও কুমারী তুলসী সাহা কণ্ঠসঙ্গীতে সকলকে আনন্দ দান করেন।"

ছেড়ে আসা স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি সম্পর্কে আমার মধ্যে সম্ভবত একটি দুর্দম আকর্ষণ জেগেছে সম্প্রতি। প্রথম সাতবেড়ে ছেড়ে রতনদিয়াতে আসি তখন ছেড়ে আসার মধ্যেই ছিল আনন্দ। পরে যতই দূরে সরেছি তত আনন্দ বোধ করেছি। দেশের কল্পনায় আনন্দ পেয়েছি কিন্তু আজকের মতো এমন ব্যাকুলতা অনুভব করিনি। এটি হয়েছে দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকে। স্বদেশ বিদেশ হওয়ার পর থেকে। নিজের দেশে যেতে পাসপোর্ট লাগবে, এই কল্পনা থেকে। মনে নসটালজিয়া জেগেছে। বাল্যকালের প্রত্যেকটি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত সত্তা দিয়ে লুটিয়ে পড়ছি। মনের এই ব্যাকুলতা যে কি তা বুঝিয়ে বলা যায় না, শুধু একটি তীব্র বেদনা, একটা বিরাট জিনিস হারিয়ে যাওয়ার বেদনা। এ এক আশ্চর্য স্বপ্নাচ্ছন্ন অর্ধচেতনার অভিজ্ঞতা এবং সম্ভবত এক আশ্চর্য ব্যাধি। নস্টালজিয়া অবশ্যই ব্যাধি।

তাই ১৯৩১ সালে পাবনা গিয়ে রোমাঞ্চিত হইনি, শুধু স্বাভাবিক ভাবে যেটুকু ভাল লাগা তাই জেগেছে। কিন্তু আজ সে স্থানের প্রত্যেকটি ধূলিকণা আমার কল্পনার পরম সুন্দর। এক-দিনের জন্ত যাওয়া, কিন্তু আজ হলে এই একটিমাত্র দিন অনেক দিন ও অনেক কালের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে যেত।

পাবনা শহর পরিবেশে পূর্বপরিচিত একমাত্র আর-বোস প্রিন্সিপালকে দেখলাম। তবে তিনি আর পূর্বের পরিচিত সাহেব আর-বোস নন, খাঁটি বাঙালী রাধিকানাথ বসু, আড্ডায় বসে তাস খেলছেন। আমাদের ছাত্রজীবনে তাঁর জীবনের বাঙালী-দিকটি আমাদের চোখে চাঁদের অপর দিকের মতোই অদৃশ্য ছিল। শিক্ষক-রূপে তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় ছিলেন।

১৯৩১ সালের জুলাই মাসে নিউ থিয়েটার্সের অমর মল্লিকের একখানি ছবির সংলাপ রচনায় সাহায্য করছিলাম পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মাঝে মাঝে যেতাম টালিগঞ্জের ষ্টুডিওতে।
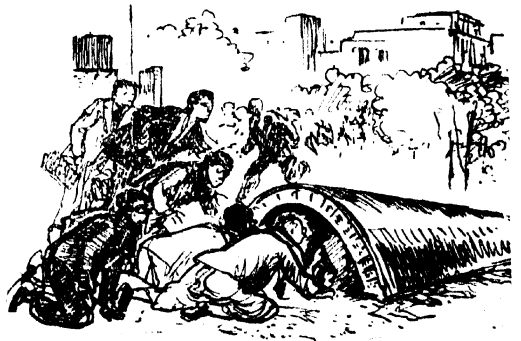
শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সব বুকে হেঁটে আশ্রয়ে গিয়ে ঢুকছেন।

সে দিন ১লা আগষ্ট। বিকেলের দিকে ষ্টুডিওতে কে এক জন এক পয়সার একখানা বিশেষ সংখ্যা খবরের কাগজ নিয়ে এলেন। ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল—ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জার্মানির বিরুদ্ধে।

ভবিষ্যৎ দ্রুত অনিশ্চিত হয়ে উঠল। সাধারণ লোকের চোখে আতঙ্কপূর্ণ দৃষ্টি, ব্যবসায়ীদের এক সম্প্রদায় উল্লসিত। তারা নীরব কর্মী, বাজার থেকে একদিনে বিদেশী জিনিস প্রায় অদৃশ্য। তারপর দেশী জিনিসের পালা। লাভের রাজপথ আবিষ্কার হল আরও কিছু পরে, সে পথ তৈরি হল লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষের কঙ্কালে। গ্রামের লোকেরা দলে দলে এসে কলকাতা শহরের পথে তাদের কঙ্কাল পেতে দিল। শিশু যুবক বৃদ্ধ নারী পুরুষ সবাই। এটি হল যুদ্ধের তিন বছর বয়সের পর থেকে। এর নাম দিলাম মহামন্বন্তর। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটেছিল প্রাকৃতিক কারণে—মহামন্বন্তর তৈরি হল ল্যাবরেটরিতে। আসলের চেয়ে নকল অনেক শক্তিশালী।

যুদ্ধ ঘোষিত হল, কিন্তু যোদ্ধারা নিষ্ক্রিয় ছিল অনেক দিন, তাই নাম হয়েছিল 'ফোনি ওয়ার'—নকল যুদ্ধ। এই নিষ্ক্রিয় সময়টা আমাদের দেশে নকল দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির সুযোগ দিয়েছিল।

আমাদের কাছে অবশ্য এই নিষ্ক্রিয়তা ভালই মনে হত। তখন ব্ল্যাক-আউট বা নিষ্প্রদীপের পালা চলছে। গর্ত খোঁড়া শেষ হয়েছে সমস্ত ময়দানে পার্কে। ব্যাফল ওয়াল উঠেছে যেখানে সেখানে, ইঁটের গাঁথুনিতে এস্কিমোদের বরফের 'ইগলু'র মতো ঘর তৈরি হচ্ছে, বিমান আক্রমণে সেই অ্যানডারসন শেলটারের মধ্যে ঢুকতে হবে। কাছাকাছি কিছু না থাকলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে পথের পাশে। কানে তুলো এবং দাঁতে রবার চেপে ধরতে হবে। সভ্যতার গর্বে স্বর্গে ওঠা মানুষ নব সভ্যতার আতঙ্কে পাতালে ঢোকার আয়োজনে ব্যস্ত।

তারপর নকল যুদ্ধ আসল যুদ্ধে পরিণত হল, এবং যুদ্ধের প্রথম স্পর্শ পাওয়া গেল ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর, যেদিন কলকাতায় প্রথম জাপানী বোমা পড়ল। এরপর থেকে শহর জীবন একেবারে এলোমেলো হয়ে গেল। শহর প্রায় খালি ক'রে লোক পালিয়ে গেছে। যখন তখন সাইরেন বাজছে, ছুটে যাচ্ছি আশ্রয়ে। নিজের কাছেও নিজের মানমর্যাদা থাকে না। শ্রদ্ধেয় সব ব্যক্তি বুকে হেঁটে গর্তে ঢুকছেন এবং গর্তের ভিতর থেকে ভীত চোখ কিংবা কম্পিত গোঁফ বার করছেন মাঝে মাঝে, এ দৃশ্য যত হাস্যকর, তত অপমানকর।

যুদ্ধের পরিণাম বিচার বা তত্ত্ববিচারে অধিকার বিষয়ে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর উপর আমার আস্থা ছিল পুরো মাত্রায় এবং মাথার উপর ডামোক্লিসের তরবারিখানা সর্বদা ঝোলা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতাম যে এ যুদ্ধে জার্মানরা হেরে যেতে বাধ্য। যুদ্ধ যদি দশ বছর চলে, এমন কি ইংরেজ সরকারকে যদি বৃটেন ছেড়ে পালাতে হয় তবু তারা না জেতা পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে পারবে। শুধু যুদ্ধ কৌশলের বিচার নয়, যুদ্ধ দীর্ঘকাল চালাবার সঙ্গতির দিক থেকে তাঁর বিচার খুব যুক্তিপূর্ণ ছিল। যুদ্ধকালে প্রধানত আমরা তিনজন, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী ও আমি নিয়মিত যুদ্ধ

তাই (বর্তমানে কিঞ্চিৎ ওজনবৃদ্ধি ঘটেছে,) আমিও তাই। এই তিন ক্ষীণের অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটেছিল মিত্রপক্ষের সমর্থকরূপে। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল বিষয়ে আমাদের আলোচনা কোনো সময়েই যুক্তির দিক থেকে ক্ষীণ ছিল না।

একদিন বেলা দশটার সময় সাইরেন বাজল। সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাড়িতে, ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউতে। তাঁর আড্ডাঘর সব সময় পূর্ণ থাকত। সেটি একতলা হওয়াতে এ-আর-পি ব্যাকরণ মতে সেটি নিরাপদ, কাজেই আর ছুটে পালাতে হল না। নিকটে কোনো গর্তও ছিল না। তবে আমি শচীন্দ্রনাথকে বলেছিলাম, 'আপনি আগে হাতীবাগানে বাজারে থাকতেন, সেখানে ইতিমধ্যে বোমা ফেলেছে, আশা করি আপনার এই নতুন ঠিকানা জাপানীদের কাছে পৌঁছয়নি?'

দিনের বেলায় সাইরেনে ততটা ভয়ের কারণ ছিল না, ভয় হত রাত্রে। বর্তমান যুদ্ধে সামরিক লক্ষ্য সবাই, তবু দিনের বেলা বোমা ফেলতে হয় তো একটুখানি চক্ষুলজ্জার প্রমাণ পাওয়া যাবে, এই ভরসা। কিন্তু যতদূর স্মরণ হয়, খিদিরপুর অঞ্চলে দিনের বেলাতেও বোমা পড়েছিল।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে ১৯৪০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হই—ম্যাট্রিকুলেশন, বাংলা, দ্বিতীয় পত্র। প্রধান পরীক্ষক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে দারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ পরীক্ষকদের সভা বসত। অনেক বন্ধুকে পেলাম এখানে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদয়াল বসু, গোপাল হালদার, প্রমথনাথ বিশী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, মনোজ বসু, অজয় ভট্টাচার্য, মহাদেব রায়, বিজন রায় চৌধুরী, তারাপদ রাহা প্রভৃতি। পর বছর নতুন এলেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী।

প্রথমবারে সভাশেষে কাছাকাছি চায়ের দোকানে গেলাম কয়েকজন, বিভূতিবাবু, অজয়বাবু আমি এবং আরও কে কে এখন মনে নেই। সেবারের খরচ দিলেন অজয় ভট্টাচার্য। পরবারে আমরা আবার একত্র জুটে গেলাম সভা ভাঙার পরে। অজয় ভট্টাচার্যকে ধরলাম এবং বললাম 'চা অভিযানের স্থায়ী নেতা আপনি। এ বিষয়ে আমাদের কি অসুবিধেয় ফেলেছেন একবার ভেবে দেখুন। দক্ষিণ কলকাতার লোক কি না, তাই চা খাওয়ানো গৌরবটি পুরোপুরি আপনি নিতে পারেন, একেই বলে একচেটিয়া। আমরা এ জন্য ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত, কিন্তু উপায় তো নেই, চলুন।'

অজয়বাবু এমন প্রীতিপ্রবণ ছিলেন যে তিনি সমস্ত খরচ বহন ক'রে খুশি হতেন। আরও অনেকবার তাঁর ঔদার্যের পরিচয় পেয়েছি অনেক ক্ষেত্রে। তাঁর সঙ্গে মিশে বড়ই আনন্দ পেয়েছি। গলায় চাদর জড়ানো সদা হাসিমুখ লোকটি সবার থেকে অকালে বিদায় নিয়েছেন; এই সঙ্গে আরও একজনের কথা মনে পড়ে—গৈরিক বেশধারী উদাসী—হিমাংশু দত্ত সুরসাগর। অজয়বাবুর রচনা তখন খুব ছড়িয়ে পড়েছে আধুনিক সঙ্গীতের মহলে, হিমাংশু দত্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এদিক দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। হিমাংশু দত্তও আর নেই। দুজনের মিলনে আধুনিক সঙ্গীত যে উচ্চগ্রামে উঠেছিল, এবং তা যে সম্ভাবনা দেখিয়েছিল, তা থেকে বাংলা দেশ বঞ্চিত হল। একটি

কৃষ্ণদয়াল বসু যখন রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' ছন্দের অনুকরণে প্রবাসীতে কবিতা লেখেন সেই কোন্ যুগে, বোধ হয় আমার ছাত্র-জীবনেই এবং তাঁরও, তখন থেকে তাঁর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ইণ্টারক্যাশানাল বোর্ডিংএ তাঁকে প্রথম দেখি মনে আছে। পরিচয় ঘটেছে অনেক পরে। ভাষা সম্পর্কে তাঁর মমত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। তাঁর হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন, পোষাক পরিচ্ছন্ন, ব্যবহার পরিচ্ছন্ন। আদর্শ স্ক্রুটিনায়াররূপে তাঁর পরীক্ষিত খাতা দেখেছি, তাঁর মার্ক দেওয়াও পরিচ্ছন্ন, এমন আর কারো দেখিনি। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কম কিন্তু অন্তরঙ্গতা অনুভব করি মনে মনে।

শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও কি ক'রে সুখের পথ খুঁজে পাওয়া যায় তার খবর দিতে পারবে মনোজ বসু। সদা হাস্যোচ্ছল, উৎসাহী কর্মবীর। শিক্ষকতা প্লাস সাহিত্য রচনা এই কম্বিনেশন বদলে ফেলে মনোজ জীবন মহাবিদ্যালয়ে সাহিত্য রচনা প্লাস গ্রন্থ প্রকাশনার কম্বিনেশন নিয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে উত্তীর্ণ। সার্কুলার রোডের বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরেই বহুবাজার ষ্ট্রীটের বসু জ্ঞান মন্দির (ওরফে বেঙ্গল পাবলিশার্স)।

বহু পরীক্ষক মিলে এক বৃহৎ পরিবার। কেন্দ্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আসল পরিচয় তাঁর বাড়িতে। দারুণ আড্ডাপ্রিয় ছিলেন। তাঁর বাড়িতে বসে খাতা স্ক্রুটিনি করতে গিয়ে এ অভিজ্ঞতা আবার নতুন ক'রে লাভ হল। আমাদের মাঝখানে বসে মাঝে মাঝে নানা গল্প আরম্ভ করতেন। খাতা দেখার কাজ থেমে যেত। সবারই সঙ্গে তাঁর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। গল্প বলতে বলতে কখনো সেণ্টিমেন্টের সীমানায় এলে তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠতে দেখেছি। তাঁর ব্যাকরণ আর ভাষার বইতে যত তত্ত্বকথাই থাক, হৃদয়ের কথা পাওয়া যেত তাঁর মুখে এবং কাজে।

আমার লেখা তিনি পছন্দ করতেন। ১৩৩৬ সালে শনিবারের চিঠিতে ছাপা হচ্ছে এমন একটা লেখার প্রুফ আমি তাঁকে পড়ে শোনাই। শুনেই তিনি বললেন এটি প্রচারের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় আগে ছাপা হওয়া উচিত। বিষয়টা ছিল সাময়িক। তিনি তখুনি নিজে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন বর্মণ ষ্ট্রীটে। সেখানেই আগে ছাপা হল। ১৩৪৩, ১৬ই ও ১৭ই জ্যৈষ্ঠ এই দুদিনে লেখাটি সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। রচনাটি ছিল, তখন যা নিয়ে যে সাম্প্রদায়িক তর্ক আরম্ভ হয়েছিল, সেই বিষয়ের। রচনার নাম "বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান সম্প্রদায়"। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপে শ্রী ও পদ্ম একত্র প্রতীকচিহ্নরূপে ছাপা হত। এ বিষয়ে মুসলমানদের অনেকে আপত্তি তোলেন, "শ্রী" হিন্দু-দেবতা, অতএব তাঁদের মনে ওতে আঘাত লাগে। এই আপত্তির মধ্যে আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি। এবং যে যুক্তি দেখানো হয়েছিল তার অসারতা আমাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। আমি খুব বেদনার সঙ্গে লিখেছিলাম এ ভাবে দেখলে এর শেষ কোথায়। বাংলা অনেক শব্দেই কোনো না কোনো দেবতার নাম। বাংলা লিখতে গেলে এদের এড়া যাবে না। কি লিখেছিলাম তা মনে নেই, ঐ শনিবারের চিঠি বা আনন্দবাজার পত্রিকা আমার কাছে নেই। তখন সাম্প্রদায়িক-উগ্রতা উঠতি মুখে। রবীন্দ্রনাথকেও সাম্প্রদায়িক রকরূপে আক্রমণ করা হচ্ছিল তখন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা একটি সেণ্টিমেণ্ট, এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি চলে না। ও জিনিস দূর হয় শুধু দায়ে পড়লে। যতক্ষণ পার্থিব লাভ, ততক্ষণ সাম্প্রদায়িকতার জয়। অবশ্য কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ই সাম্প্রদায়িক তা কখনই সত্য নয়, এবং এর মূলেও অনেক জটিল কারণ আবিষ্কার করা যায় এবং সাম্প্রদায়িকতা যদি অস্ত্র হয় তবে তার কারখানা বেশির ভাগই আবিষ্কৃত হবে অন্য দেশে এবং যারা এটিকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে তারাও অনেক সময় তৃতীয় পক্ষই। অতএব যুক্তি অচল। যুক্তি যে কত অচল তার একটি অতি কৌতুককর দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। এ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে আমার বন্ধু অতুলানন্দ চক্রবর্তী।

সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সে ১১৩৪ সালে ইংরেজীতে একখানা বড় বই লেখে, বইয়ের নাম 'কালচারাল ফেলোশিপ'। এই উপলক্ষে সে ভারতের সকল হিন্দু-মুসলমান নেতা ও মনীষীর অভিনন্দন এবং বন্ধুত্ব লাভ করে এবং নিজামের একটি বড় বৃত্তি পায়। কিন্তু দেশের অবস্থা সে বইয়ের উপর নির্ভর করল না, ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। কিন্তু অতুলানন্দ দমল না। সে অনেক পরিশ্রম ক'রে ১১৪৫ সালে 'কংকর্ড' নামক এক ইংরেজী সাপ্তাহিক বার করল, তার যৌবন বিলিয়ে দিল এ কাজে, এবং 'কংকর্ড'এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ঘোড়াটায় চেপে সম্ভবত ব্রাউনিং-এর সুরে সুর মিলিয়ে বলল, "I gave my youth—but we ride, in fire."

এবং ঐ ১১৪৫ সালেই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। তখন আরও বেশি খরচ ক'রে পূর্বের মতোই ভারতবর্ষের সকল মনীষী ও নেতার লেখা সংগ্রহ ক'রে কংকর্ডকে সে মাসিকপত্রে রূপান্তরিত করল বছরখানেকের মধ্যেই। তখন দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে ঘোড়াটায় চেপেছিল, সেটি স্বাধীন ভাবে বেরিয়ে গেল পিঠের বোঝা ফেলে। অবশেষে কাগজ বন্ধ ক'রে দিয়ে মিলনকামী সম্পাদক স্বয়ং লাঠি হাতে পাড়া রক্ষা করতে লাগল।

যুক্তি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার এই পরিণাম। তবে লাঠি দিয়ে হয় কি না সেটাও সন্দেহজনক।

আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা আমার লেখাটির নাম তারিখ

স্ক্রুটিনাইজারদের মাঝখানে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পেয়েছি আমি ১৩৩৬ জুলাই সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদী থেকে। সেই সংখ্যাটি আমার আজও আছে। এতে আবদুল কাদির আমার লেখার কোনো একটি অংশ নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর থীসিস ছিল অন্য, যার জন্য আমার লেখা উদ্ধৃত করেই তিনি তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেছিলেন। শেষও করেছিলেন আমাকে নিয়েই। তাঁর এই থীসিসের জন্য আমার আনন্দবাজারের ১৬ই ও ১৭ই জ্যৈষ্ঠের লেখা, ১২ই জ্যৈষ্ঠের লেখা, ১৪ই জ্যৈষ্ঠের আনন্দবাজারে চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের লেখার এবং তার সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির লেখা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি সহকারে তিনি বলেছিলেন ধর্মের দিক দিয়ে মুসলমান থাকলেও ভারতীয় মুসলমানেরা সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতীয় থাকবেন এই আশা পোষণ করা আমাদের অন্যায়। কারণ বাইরের সংস্কৃতি আমদানি না করলে সাহিত্য পুষ্ট হবে কি করে?

আবদুল কাদিরের এই আলোচনাটি অত্যন্ত সংযত এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন নেই, তিনি তাঁর বক্তব্য যুক্তির উপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিতে একটি বড় ভুল ছিল। বাইরের সংস্কৃতির ছাপ আমরা আমাদের সাহিত্যে চিরদিন বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করেছি, অবাঞ্ছনীয় কদাপি নয়। শুধু ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাদ দিতে বলিনি। এইটুকু মেনে নিলে আবদুল কাদিরের লেখাটি খুব মূল্যবান হত।

পরীক্ষকরূপে বছরের পর বছর খাতা দেখে অনেক রকম অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। স্ক্রুটিনিতে ব'সে পরীক্ষকদের বিচার-বৈচিত্র্য দেখলাম। মার্ক দেওয়ার বৈশিষ্ট্যে স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। একজন প্রবীণ পরীক্ষকের এক অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। তিনি পরীক্ষিত খাতার প্রতি পৃষ্ঠার চার দিকের মার্জিনে মনে যা আসে লিখে রাখতেন। নানা রকম মন্তব্য। পরীক্ষার্থীকে গাল দিতেন তিনি এই ভাবে, যেন সে শুনতে পাচ্ছে সব। দুএকটি মনে আছে, যথা, "তোমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা না দিয়ে লাঙল ধরা উচিত ছিল।" "চাষ কর গিয়ে—এ পথে কেন?" "পিতার কুসন্তান তুমি।" "তুমি একটি নিরেট মূর্খ, কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকলে এ রকম লিখতে না।"—ইত্যাদি। মার্জিনের কোনো শাদা জায়গা ফাঁক থাকত না। পরীক্ষা দিতে হলে কেমন লেখা উচিত সে বিষয়ে বিশদ ভাবে উপদেশ দিতেন মার্জিনে, অথচ তিনি নিশ্চিত জানতেন সে খাতা পরীক্ষার্থীর কাছে কখনো ফিরে যাবে না। নিজে এত উপদেশ অথবা গাল দিতেন ছেলেদের খাতায়, অথচ তাঁর নিজের যোগফলে প্রচুর ভুল থাকত। সকল মনোযোগ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যতের দিকে যাওয়ায় নিজের ভবিষ্যৎটা আর ভাববার সময়ই পেতেন না।

মার্ক দেওয়ার আদর্শেও বিভিন্ন পরীক্ষকদের মধ্যে কত পার্থক্য। ৮ মার্কের যে উত্তরে একজন পরীক্ষক পুরো ৮ দিচ্ছেন সেই একই উত্তরে আর একজন পরীক্ষক ২ দিচ্ছেন। সম্পূর্ণ শুদ্ধ লিখেও শূন্য পেয়েছে কোনো উত্তরে, এমন দেখেছি। এই জাতীয় মতভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার কঠিন দায়িত্ব প্রধান পরীক্ষকের, এবং তাঁর নির্ভর স্ক্রুটিনাইজারগণ। দেখে দেখে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির উপর আর শ্রদ্ধা থাকে না। পাস করা বা বেশি মার্ক পাওয়া প্রায় লটারির ব্যাপার। সকলের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার হওয়া মানবীয় শক্তির বাইরে। ব্যক্তিগত দোষ নয়, রীতির দোষ।

সাময়িক পত্রে ছাপা অথবা কোনো বইতে ছাপা কোনো গল্প প্রবন্ধ বা কবিতা যদি অন্য কেউ অপহরণ ক'রে নিজের নামে ছাপে, তা হলে সে অপরাধের আর মার্জনা থাকে না, চারদিক থেকে কোলাহল আরম্ভ হয়। পরীক্ষার খাতায় কিন্তু এর বিপরীতটাই ঘটে। এখানে সর্বজনপরিচিত লেখাও নিজের নামে চালালে ক্রেডিট পাওয়া যায় অনেক বেশি। নিজের কথা ও নিজের রচনার চেয়ে মুখস্থ রচনায় মার্ক ওঠে বেশি। অন্যের লেখা ব্যাখ্যা নিজের ব'লে চালালেও বেশি মার্ক পাওয়া যায়। পরীক্ষার নামে এই কার্যের সঙ্গে পরিচয় যত গভীর হয় ততই মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। অথচ এ প্রথা হঠাৎ তুলে দেওয়া যাবে না। দশটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরে যদি হয়।

সুনীতিবাবু পরীক্ষকদের ছোটখাটো ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখতেন, কারো বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাধ্য না হলে অবলম্বন করতেন না, নিজে এ বিষয়ে অত্যন্ত উদার ছিলেন। এ জন্য পরীক্ষক এবং স্ক্রুটিনাইজাররা তাঁকে আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

কলকাতায় বোমা পড়ার বছরে প্রধান পরীক্ষক বদল এবং দপ্তর স্থানান্তরিত হয়—কৃষ্ণনগরে। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রধান পরীক্ষক হয়েছিলেন। পরে আবার ঘুরে আসে কলকাতায়, এবং প্রধান পরীক্ষক হন অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি ছিলেন গোঁড়া নীতিবাদী এবং প্রাচীনপন্থী। তাই তাঁর কাছে কারোই কোনো ব্যক্তিগত খাতির ছিল না। স্ক্রুটিনাইজাররা কাজ করতেন যেন উপাসনা মন্দিরে বসে প্রার্থনা করছেন। আবহাওয়া অত্যন্ত থমথমে, গুরুগম্ভীর। খাতা সবাইকে সমানভাবে ভাগ ক'রে দিতেন, কাজের সময় পরস্পর আলাপ করাও সমর্থিত ছিল না। এতদিনের প্রশ্রয়প্রাপ্ত আমাদের একটু অসুবিধা বোধ হত, কিন্তু প্রধান পরীক্ষকদের এতকালের ঐতিহ্য রক্ষা ক'রে তিনি বিকেলে যে জলযোগের আয়োজন করতেন তা অত্যন্ত উপাদেয় ছিল, অতএব বাড়ি ফিরে আসার সময় মন সর্বদা প্রসন্ন থাকত। [ক্রমশঃ।

"When there is something special to be done, like inventing the steam engine, or founding a new dynasty, or winning the Battle of Waterloo, the English are as likely as not to turn to a Scot, a Welshman, or an Irishman".

—*Harold Macmillan.*

রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
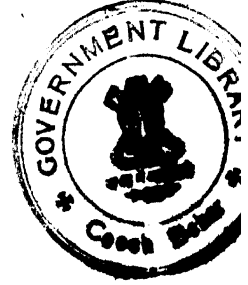
বিদেশে

১৩০৮ সালের বৈশাখে যখন এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার অধ্যাপক প্রসিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ হইতে বাঙলার বাহিরে বাঙালীদের মুখপত্ররূপে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে মনস্থ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দেন। পরে এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রিকার কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় ও তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদকতায় "প্রবাসী" নামধেয় মাসিক পত্রিকা এক্ষণে সর্বজন-পরিচিত ও আদৃত। সূচনায় কবির "প্রবাসী" বলিয়া একটি কবিতা বাহির হয় এবং আজীবন কবি ইহার সহিত লেখকরূপে জড়িত ছিলেন। কবিতাটি এই—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি
সেই দেশ লব বুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

এই বিশ্বপ্রীতিব্যঞ্জক ভাব কবির শুধু বাহিরের কথা নয়, অন্তরতম বাণী। তাঁহাকে এই মিলন আকাঙ্ক্ষা বরাবর দেশবিদেশের পরিচয় সংগ্রহ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। তাঁহার জগদ্ব্যাপী খ্যাতির প্রসারতা ও গভীরতা এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আশাতীত সফলতা এই বিশ্বপ্রীতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কোনো মানুষ যদি নিজ জাতির কথা কাহিনী ও গান সুবিন্যস্ত ভাষায় রচনা করিতে পারেন, তদ্দারা তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির ইতিহাস এমন ভাবে বিশ্বজন সমক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে ধরিতে পারেন ও সজীব রাখিতে সক্ষম, যাহা ঐতিহাসিক গবেষণা বা রাষ্ট্রচালক পরিষদের আইনাবলী আলোচনার দ্বারা সংগঠিত হওয়া দুঃসাধ্য। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ইয়েটস (Wm. Butler Yeats) Keltic Revival বা কেল্ট জাতির গাথা ও সংস্কৃতি প্রদানের জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। ফরাসী সভ্যতার পরিচায়ক নূতন ভাবব্যঞ্জনা ও রচনা-প্রণালীর জন্য আনাতোল ফ্রাঁস (Anatole France) তৎপূর্বে ঐ আকাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিশ্রুত পুরস্কার লাভ করেন। আমাদের দেশের জাতীয় চরিত্র ও প্রকৃতি বুঝিতে হইলে দেশের মহাকাব্য (Epics) রামায়ণ মহাভারতের স্মরণাপন্ন হইতে হয়।

শিল্পিশ্রেষ্ঠ আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাই বার বার তাঁহার ছাত্রদের সর্বদাই 'পুরাণ' পাঠ করিতে বলিতেন ও উহার আলোচনায় উৎসাহ দিতেন। প্রায়ই লেখাপড়ায় পরাঙ্মুখ তরুণরা অগতির গতি "আর্ট স্কুলে" ভর্তি হইতে যায়। অবনীন্দ্র সস্নেহে তাহাদের কোলে টানিয়া লইতেন ও বুঝাইতেন যে মূর্খ নিরক্ষর শিল্পী দ্বারা পোটোর কাজ বা অনুকরণ চলিতে পারে কিন্তু নিজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বা প্রকৃত শিল্পকলা জাতীয় আর্ট স্বদেশের মুখোজ্জ্বলকারী কোনো বৈশিষ্ট্য দ্বারা দেশের ও দেশবাসীর উন্নতি সে শিল্পবিদের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। ভাব ও রসের সমাবেশ চাই, নব নব সৃষ্টি করিতে হইলে শিল্পীকে শান্তভাবে দেশের প্রচলিত ভাবধারা ও বিশ্বাসের বস্তুর সহিত পরিচিত থাকিতে হয়। যাহা কথায় বর্তমান আছে তাহা রেখায় ও বর্ণে পরিস্ফুট করার উদ্যম শিক্ষার্থীর হাত ও ভাব খুলিবার পন্থা'। সর্বাগ্রে শিল্পীর ভাব সম্পদ প্রয়োজন, অভিব্যক্তির প্রশংসা হইবে টেকনিকের উপর—তাহার আদর সাধারণের নিকট নয়, সমঝদারের কাছে। মোটের উপর উচ্চ আদর্শ ও মহান ভাবের অধিকারী হওয়ার লক্ষ্য স্থির ভাবে থাকা উচিত, তবে মৌলিক কল্পনা ও তৎপ্রসূত ছবি জন্মাইবে। শুধু কারিগর হইয়া লাভ নাই, সামাজিক অবজ্ঞা অনিবার্য।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় ভবিষ্যৎ ও জাতীয় চরিত্র লোকপ্রিয় সাহিত্য রচনার দ্বারা এমন করিয়া গড়িতে পারিয়াছেন, যাহা কোনো ব্যবস্থা পরিষদ গঠনমূলক নীতি বা পঞ্চসনা প্ল্যান এবং আনুসঙ্গিক আইনমালার দ্বারা প্রস্তুত করিতে অক্ষম, বা যাহা এ দেশবাসীকে বিশ্বসভায় শ্রদ্ধার আসন সংগ্রহে সাহায্য করিতে পারে। পাঠশালায় চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকসমূহ যাহা রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠস্থ করেন, তাহাতে প্রথম পাঠ ছিল—

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।

তাহারই সত্য নির্ধারণ করিতে ও যত্নে প্রস্তুত নিজ রচনাবলীর যথার্থ মূল্য বিদেশীয় বা তাঁহার ভাষায় মানব সাধারণের কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন।

পরীক্ষার ফলে, ইংল্যাণ্ড তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি শুধু নয়, তাহাদের একজন অন্তরঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে ব্যগ্র। রাজা তাঁহাকে নাইট ব্যাচিলার করিয়া "My

cousin" দলভুক্ত করিলেন, আর অক্সফোর্ডের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, লিট উপাধি-মালা দিয়া বরণ করিলেন ও তাঁহার বার্দ্ধক্যে সাগরপারে তাঁহাদের দূত ও প্রতিনিধি পাঠাইলেন। স্যার স্যামুয়েল হোর কবির জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার আয়ু ও স্বাস্থ্য কামনা করিয়া বলিলেন By your manipulation of the english tongue you have forged a link between the two countries অর্থাৎ ভারত ও বৃটেনের মধ্যে ইংরাজি ভাষার সুদক্ষ পরিচালনার দ্বারা আপনি একটি যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন, যাহা উভয় দেশকে স্নেহের বন্ধনে পরস্পরের সহিত মিলিত রাখিবে।

অন্যান্য দেশও প্রতিপন্ন করিল যে, কবিকে অভিনন্দিত করা সকল জাতের পক্ষে স্বাভাবিক। বর্তমান যুগের ইহা একটি আশাপ্রদ লক্ষণ। অনেক স্থলে কবির জীবদ্দশায় শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ ঘটিয়া উঠে না কিন্তু বর্তমান কালে অনেকানেক দেশে জীবিত কবিকে, এমন কি, অন্য দেশের ও ভাষার হইলেও উৎসব সহকারে জাতীয় জনসাধারণে অনুষ্ঠান দ্বারা সম্মান-প্রদর্শন প্রচলিত। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের বৃদ্ধ কবি Ibsenকে বিরাট সম্বর্দ্ধনার দ্বারা অর্চনা করার কথা প্রথম আমাদের গোচরে আসে। Encyclopaedia Britanica গ্রন্থে দেখা যায় ইবসেনের এক বিরাটকায় ব্রোঞ্জ-প্রতিমূর্তি তাঁহার দেশবাসীরা চাঁদা তুলিয়া ক্রিশ্চিয়ানা নগরে স্থাপিত করেন। ঐ Encyclopaedia গ্রন্থে আরো লেখা আছে—On the occasion of his seventieth birthday in 1898 Ibsen was the recipient of the highest honours from his own country and of congratulations and gifts from all parts of the world. এই দেশ-দেশান্তর বাঙালীর প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথের অভিযান ফলে তিনি এবং বাঙালী জাতি বিশ্বমান্য। আমাদের দেশের রবিরও কিরণচ্ছটা ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে ভূপৃষ্ঠে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে এবং আকাশমার্গে তাঁহার জয়পতাকা উত্তোলিত হইয়া প্রথম ধীর সমীরে উন্মুক্ত হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতেই বলিতে গেলে কবির বিশ্বপরিক্রমা শুরু। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পরে কবি কাশ্মীর হইতে দক্ষিণ ভারতে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে কবি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আসেন, যখন বরোদা হইতে কলিকাতায় আসিয়া অরবিন্দ রাজা সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের বাড়িতে ও পরে ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটে অবস্থান করিয়া ইংরাজিতে বন্দে মাতরম্ কাগজের অবতারণা করেন এবং জাতিগঠনের অনুকূল শিক্ষার প্রচলন মানসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগদান করেন, যাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। ঐ সময়ের পরে প্রতিষ্ঠিত National Universityর কবি chancellor নিযুক্ত হন ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশবিশেষ কলিকাতার অদূরবর্তী যাদবপুরে School of Technical Education & Engineering আজও বিদ্যমান। ১৯২৩এ পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দকে দীর্ঘকাল পরে দেখিয়া কবি লিখিলেন—I saw him with serene lights.

বক্তৃতা দিবার জন্য ভারতের এই বাণীকণ্ঠ কবিকে ভারতের নানা রাজ্য, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ, উত্তর ও দক্ষিণ অ্যামেরিকার বিভিন্ন দেশ ও প্রদেশ, ভারতীয় উপদ্বীপ, মিসর, চীন, জাপান, ইরাণ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে বিমানপোতে গতিবিধি করিয়া তিনি প্রকৃত অন্তরীক্ষচারীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রতি দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিদ্যাসমিতিতে তিনি বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীসে অ্যাথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন ও গ্রীসে অবস্থানকালে উক্ত প্রাচীন সভ্যতার লীলাকেন্দ্র যে দেশ সেই দেশের গভর্ণমেণ্ট অপর প্রাচীন সভ্যতার লীলাকেন্দ্র যে ভারত, সেই ভারতের মনীষী রবীন্দ্রনাথকে Commander of the order of the Redeemer উপাধি দিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত করেন। ইহার দুই বৎসর পূর্বে ১৯২৪এ কবি চীনে অবস্থান কালে ভগবান তথাগতের ধর্মাবলম্বনকারী এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম ধারক ও বাহক যে চীন, সেই চীন গণতন্ত্র সরকারও কবিকে চেন্ থান্ বা প্রবুদ্ধ প্রভাত উপাধি দিয়া ভারত ও চীনের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করেন। কবির বহুদেশে প্রাপ্ত উপঢৌকন, অভিনন্দন-পত্র ও প্রশস্তি, উপাধিপত্র ও পদকাদি বিশ্বভারতীতে একটি স্বতন্ত্র কক্ষে সজ্জিত করিয়া রক্ষিত আছে। কবি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট লেকচারার মনোনীত হন। দার্শনিক পাণ্ডিত্যের ইহা খুব উচ্চ সম্মান। মানবধর্ম (Religion of Man) সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন। অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Yole বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তারূপে অবস্থান কালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক দ্বারা কবিকে সম্মানিত করা হয় তথা তাঁহারা নিজেরা সম্মানিত হন। রাশিয়া ভ্রমণে কবি তথাকার নবজাগরণের অনেক কথাই এবং ব্যবস্থা বিষয় তাঁহার "রাশিয়ার চিঠি" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কবি বহু বার ইয়োরোপ অ্যামেরিকায় গিয়াছেন। আর প্রথম হইতেই তাঁহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অভিজ্ঞতা তাঁহার দেশবাসীকে জানাইয়া আসিয়াছেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীগুলি বাঙলা সাহিত্যে বিভাগে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এ ভাবে বিদেশের কথা বাঙালী ইতিপূর্বে শুনে নাই। অনেক সময়ে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত না হইয়া ব্যক্তিবিশেষকে লিখিত কবির পত্রাবলীতে উহা প্রচারিত। ইংরাজিতে অনেক পত্র সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা শুধু চিঠি নয়, ঐ ভাষার সাহিত্যের চিরস্থায়ী অংশ। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী বাঙলা ভাষার মূল্যবান সম্পদ। উহাতে উত্তর-পুরুষের নিকট কবির ব্যক্তিত্বের পরশ কিছু পৌঁছায়।

বৃদ্ধ বয়সে ইয়োরোপীয় অভিযানে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কালি-কলমে অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র জার্মানি ও রাশিয়াতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। জার্মানরা কবির অভিব্যক্তির এরূপ ভক্ত যে, একদা বার্লিনে কবির মোটার যে পথ দিয়া গিয়াছিল, তাহারা সেই পথের কিছু মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়া স্বীয় ভবনে রক্ষা করিয়াছিল। সেখানকার চিত্রশিল্পের বিশেষজ্ঞ সমালোচকরা প্রতিভার এই নব অবদানকে চিত্রকলার উচ্চশ্রেণীতে গণ্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া আদর করিয়াছেন। কবি বলেন যে, সাহিত্যে ও সংগীতে তিনি তাঁহার দেশের লোকের নিকট স্বদেশীয় ভাষার সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, বিদেশীয় ভাষার অনুবাদে বা তর্জমায় তাঁহার পূর্ণ ব্যঞ্জনাগুলি নষ্ট হয়। সুতরাং বিদেশীর নিকট তাঁহার সম্যক্ আত্মপ্রকাশের উপায় তাঁহার 'চিত্র। কবি ঠাট্টাচ্ছলে বলিয়াছেন—সহধর্মিণী

ছিলেন তাঁহার প্রথম পক্ষ, কবিতা দ্বিতীয় পক্ষ ও চিত্র তৃতীয় পক্ষ আর—

পূব আকাশে উদয় রবির সুরের মাঝ দিয়ে
পশ্চিমেতে অস্ত তাহার রঙের মাঝে গিয়ে।

কবি বলিয়াছেন, এই চিত্রবিদ্যা তিনি বিশেষ ভাবে কোনো দিন শিক্ষা করেন নাই। চিত্রবিদ্যায় অক্ষম বলিয়াই তাঁহার চিরদিনের ধারণা। খেলার ছলে ও লেখা সংশোধনের মধ্য দিয়া তাঁহার এই বিদ্যার আয়ত্ত। এই নূতন কলাবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৃদ্ধ বয়সে কবির উদ্যম ও অধ্যবসায় অনুকরণীয়। মনের সরসতা রাখিবার জন্য তরুণদের সহিত মেলামেশার মতো এই নূতন বিদ্যার চর্চাও কবিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। কলালক্ষ্মী সুকুমার কলার সকল গুলিতেই অসাধারণ নৈপুণ্য কবিকে দান করিয়াছেন। বিদেশে ভারতীয় কলার প্রতিষ্ঠা-স্থাপনেও কবির সহজ সৌন্দর্যজ্ঞান যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে পারেন কেবল গুণীরা। যখন তাঁহার চিত্রবিদ্যায় প্রচেষ্টার কোনো সন্ধানই ছিল না, তখন সেই ১৯২০ সালে জনৈক লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল তাঁহার Your signature পুস্তকে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঠিক স্বাক্ষর Litho করেন ও তাহাতে ভারতের রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রেরও ইংরেজি স্বাক্ষর আছে এবং কবির স্বাক্ষরের নিম্নে টীকায় লিখিত আছে—Had the writer being an artist instead of a poet, his subjects would have been more bizarre. নানা দেশে কবির খ্যাতি অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহার পদার্পণের পূর্বেই তাঁহার শ্রদ্ধার আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কোনো কোনো স্থানে, সমঝদার দোভাষী দ্বারা তাঁহার বক্তৃতা ভাষান্তরিত করিয়া তাঁহার ভাবসম্পদ অধিবাসিবৃন্দকে অর্পণ করেন, যাহাতে সকল দেশের সঙ্গেই কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার একটি অন্তরঙ্গ যোগ হয়।

কবি এই অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি করে শুধু নিজ দেশে বিদেশীয় পণ্ডিতদের (Savants) সাদর আহ্বান করিয়াও অতিথি সৎকার করিয়া নিজের কর্তব্যের পরিসমাপ্তি মনে করেন নাই। এই যোগসূত্র প্রসার মানসে ও পশ্চিম মহাদেশের সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র ইতালীতে ইহার একটি পাশ্চাত্য মিলনক্ষেত্র সাকাররূপে রক্ষা করিবার অভিলাষে এই আবাস বাড়ি তিনি ক্রয় করেন। রোমক সভ্যতার এই কেন্দ্রে মধ্যে মধ্যে তিনি অবস্থান করিতেন। জগতের কোলাহল ও কলরব হইতে সময় সময় বিশ্রাম লাভের জন্য তিনি চেষ্টিত হইতেন কিন্তু তাঁহার মানবসেবা প্রবৃত্তি ও তপস্যার আদর্শ তাঁহাকে নৈষ্কর্ম মুক্তি হইতে বিরত করিয়াছে। ইহার বহিঃপ্রকাশ তাঁহার ফিলাডেলফিয়াতে পঠিত Philosophy of leisure বা বিশ্রামের উপযোগিতা ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নিবন্ধ। ইতালীয়ার ফ্যাসিষ্ট অভ্যুদয় তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তথাকার প্রধানমন্ত্রী ও সর্বময় কর্তা মুসোলিনির মনোভাব ও রাজনীতি সম্বন্ধে কবির তীব্র প্রতিবাদ সাময়িক পত্রের স্তম্ভে ঘোষণা করায়, মুসোলিনি বিরূপ হইলেন। ফলে, ইতালীয় অধ্যাপকদের বিশ্বভারতী ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরতে হয়। কারণ, জাতীয় শাসনকর্তার আদেশ লঙ্ঘন করিবার উপায় অধ্যাপকদের ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ইতালীয় বাড়ি ও ভূমিখণ্ড তথাকার রাজদরবারে বাজেয়াপ্ত হইল। যেহেতু এতটা স্বাধীনচেতা প্রজা তাঁহারা পছন্দ করেন না।

"পশ্চিমেতে অস্ত···রঙের মাঝে গিয়ে" বন্ধ হইল।

নোবেল পুরস্কার ও তৎপূর্ব সম্বর্ধনা

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে' তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহার দেশবাসী একটি সমিতি গঠন করেন, যাহার সম্পাদক ছিলেন মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন। এই সমিতি বঙ্গসাহিত্যের মুখপাত্রস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করেন। সেই বহুকাল পূর্বে জাতি কী ভাবে কবি সম্বর্ধনা নির্বাহ করিয়াছিল তাহার পরিচয় দিতেছি। ১৩১৮ সালের ১৪ মাঘ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিমন্ত্রণে কলিকাতার টাউন হলে এক বৃহৎ সভায় রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা হয়। এতদুপলক্ষে জনসজ্ঞে টাউন হল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। গণ্যমান্য ও অখ্যাত সাহিত্যসেবক এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং মহিলারাও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট কয়েকজন জাপানী বাঙলা ভাষা শিখিতেছিলেন, তাঁহারাও উপস্থিত ছিলেন ও তন্মধ্যে একজন বাঙলায় একটি ছোট বক্তৃতার দ্বারা কবিকে অভিনন্দিত করেন। নাটোরের ৺মহারাজা কবি জগদিন্দ্রনাথ রায় সভার পক্ষ হইতে ধান্য, দূর্বা, অক্ষত, সিদ্ধার্থ, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুংকুম, দধি, মধু, ঘৃত, পুষ্প, গোরোচনা সজ্জিত বহুমূল্য অর্ঘ্যপাত্র কবিকে প্রদান করেন ও সুললিত ভাষায় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্বচন পাঠ করেন। পরিষদের সভাপতি এবং সেই সভার সভাপতি ৺সারদাচরণ মিত্র সভার পক্ষ হইতে কবিকে একটি স্বর্ণসূত্র মাল্যে ও বিকশিত পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া একটি স্বর্ণপদ্ম উপহার দেন। এই স্বর্ণপদ্মটি সে বৎসর ভারতীয় কলা-প্রদর্শনীতে পুরাতন বৌদ্ধ কলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া প্রশংসা লাভ করায় সম্বর্ধনা সমিতি কবিকে উপহার প্রদান করিবার জন্য উহা পাঁচ শত টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরিষদের সম্পাদক ৺অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রাচীন পুঁথির আকারে শুভ্র হস্তিদন্ত ফলকে লাল অক্ষরে উৎকীর্ণ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া, হস্তিদন্তের পত্রগুলি সুবর্ণখচিত কিংখাপে মুড়িয়া কবীন্দ্রকে উপহার দেন। অভিনন্দন পত্রে লিখিত আছে—

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় করকমলেষু—

বাঙালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণপাতে যখন নব শতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগদেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগবধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্গণ শূন্যে প্রবাহিত হইলেন, অন্তরীক্ষে বিশ্বদেবগণ প্রসাদ-পুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্দ্ধ ব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয় মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব ছন্দলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনা গানে প্রবৃত্ত হইলেন। কবিগণ

স্বহস্তরচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবি, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অংকশোভা বর্ধন করিয়া বাঙলার মাটি ও বাঙলার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল। সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল। সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্বগামিগণের স্নিগ্ধ নেত্র তোমাকে বর্ধিত করিল, অনুগামিগণের শুদ্ধ নেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগদেবতার সেবাননগণের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণী-মন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ, রত্নবেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীদের মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। * * * * পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অংকে রাখিয়া তোমার শ্যামা জন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্ধন করিয়াছেন, সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনা-পরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ু কামনা করিতেছে।

কবি, শংকর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সম্পাদক।

অতঃপর কবি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়নম্র ভাষায় অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন—"আজ আমার দেশজননীর আশীর্বাদ শিরোধার্য করিয়া লইয়া যদি আমি নীরবে প্রণাম করিয়া বসিতে পারিতাম, তবেই আমার পক্ষে ভালো হইত। এত বড় সম্মানের সম্মুখে নিজের ক্ষুদ্রতা আমাকে সংকুচিত করিতেছে। এতদিন যে তপস্যা করিয়াছি, তাহার সিদ্ধি যখন আজ রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত, তখন তাহাকে অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিতে পারি, এমন শক্তি আমার নাই। কেবল একটি কথা চিন্তা করিয়া আমি মনের মধ্যে বল পাইয়াছি, আমি নিশ্চয়ই জানি, আজ আপনারা যে সম্মানদান করিলেন, সে সম্মান আপনারা বঙ্গ-সাহিত্যকেই দিলেন, আমি তাহার উপলক্ষ মাত্র। এমন একদিন ছিল, সাহিত্য যখন কোনো ধনী বংশকে, কোনো রাজসভাকে অবলম্বন করিয়া পালিত হইত। আজ সেই তাহার সংকীর্ণ ও কৃত্রিম আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সাহিত্য সমস্ত জাতির চিত্তে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আজ তাই বাঙালী বাঙলা সাহিত্যকে আপনার চিরদিনের হৃদয়ের ধন জানিয়া তাহাকে আদর জানাইবার আয়োজন করিয়াছে। এই শুভ মুহূর্তে সেই সমাদরের বাহনরূপে আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহার অপেক্ষা গৌরবের কথা আমার পক্ষে আর কিছুই নাই। আপনাদের এই অর্ঘ্যপাত্র আমি নতশিরে বহন করিয়া বঙ্গবাসীর মন্দিরে তাহা নিবেদন করিয়া দিব। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।" এতদুপলক্ষে পরিষৎ মন্দিরে ২০শে মাঘ একটি প্রীতিভোজ-সম্মেলনে কবির অভ্যর্থনা হয়। সেদিন যন্ত্র ও কণ্ঠ-সংগীতাদির ব্যবস্থা ছিল। কবি সেদিন বলেন—যে মানুষ প্রেম দিতে পারে, ক্ষমতা তাহারই, যে মানুষ প্রেম পায়, তাহার কেবল সৌভাগ্য। * * দীর্ঘকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিতেছি—ভুলচুক যে অনেক করিয়াছি এবং হয়তো কাহাকেও আঘাতও দিয়াছি, তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই সমস্ত অপূর্ণতা, কঠোরতা, বিরুদ্ধতার ঊর্ধ্বে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে মাল্যদান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মাল্য। * * আপনাদের প্রদত্ত সম্মানোপহার আমি দেশের আশীর্বাদের মতো মাথায় করিয়া লইলাম—ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা ভোগের পদার্থ নহে—ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে।

দেশের সাহিত্যিকরা এবং পরিষদের ছাত্রসভ্যরা কবির উদ্দেশে কবিতার অর্ঘ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

দশ বৎসর পরে কবির ষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে কবিকে জার্মাণ পণ্ডিতেরা এবং সাহিত্য পরিষদ দ্বিতীয় বার অভিনন্দিত করেন। তখন তিনি বিশ্বকবি। প্রথম বারের পরিষদ কর্তৃক যে অভিনন্দনের কথা বলিলাম তাহার পরেই হঠাৎ কবি পীড়িত হওয়ায় তাঁহার চিকিৎসকদের পরামর্শে ভগ্নস্বাস্থ্য রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পদ্মার উপরে তাঁহার "পদ্মা" নাম্নী নৌকায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে অবসর কাটাইবার জন্য তিনি গীতাঞ্জলি, খেয়া ও নৈবেদ্যের কতকগুলি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ তাঁহার প্রথম অনুবাদ নয়। পূর্বেও তাঁহার কতকগুলি রচনার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া তিনি Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। পরে বিলাত যাইবার পথে জাহাজেও অনুবাদ চলিতে থাকে। বিলাতে কোনো বিশেষজ্ঞের দ্বারায় তাঁহার অস্ত্রোপচার করা হয়। ফলে কবির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। তথায় অবস্থানকালে Royal College of Art এর তদানীন্তন অধ্যক্ষ বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ডাঃ স্যার উইলিয়াম রোটেনষ্টাইনের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। শিল্পাচার্য রোটেনষ্টাইন পূর্বে কবিকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলেন কিন্তু কবি বলিয়া জানিতেন না। রবীন্দ্রনাথ একজন কবি (তখন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি) শুনিয়া তিনি তাঁহার কবিতা দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কবি তাঁহার হাতে অনুবাদগুলি দিলেন। দুই তিন দিন পরে রোটেনষ্টাইন কবিতাগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। রোটেনষ্টাইন টাইপ করাইয়া ইয়েটস, ষ্টপফোর্ড, ব্রুক এবং ব্র্যাডলির নিকট কবিতাবলী পাঠাইয়া দেন। তাঁহারাও ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে কয়েকজনের সমক্ষে আইরীয় কবি ইয়েটঃ রচনাগুলি পাঠ করেন। সে মজলিশে মে. সিনক্লেয়ার, নেভিনসন এণ্ড্রুজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন। ইংরাজি গীতাঞ্জলি ইয়েটসের সম্পাদকতায় রোটেনষ্টাইন অংকিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি সহ বিলাতের ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইল।

বিশ্বসাহিত্য আয়ত্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন, তিনি যে ভাবরাজ্যের অধিবাসী তাহার ভাব বিশ্বসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। অদৃষ্টক্রমে তিনি বাঙালী, তাঁহার মাতৃভাষা পৃথিবীর এক কোণে সীমাবদ্ধ, বাঙালীকে কেহ জানে না, চেনে না। বাঙলা কেহ পড়ে না। ভারতে যে বাঙলা বলিয়া প্রদেশ আছে তাহার খবর ওদেশের ভৌগোলিকরা ব্যতীত কয়জনেই বা রাখে, বিবেকানন্দ ভারতবাসী

ইহাই অনেকে জানে কিন্তু কোন প্রদেশের তাহা তাহাদের অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি গীতাঞ্জলি হইতে পাশ্চাত্য দেশ নূতন জিনিষ পাইল, পড়িল—মোহিত হইল, সমালোচকদের মুখে প্রশংসা ধরে না। কবি যখন শান্তিনিকেতনে বাঙলার পল্লীঘন ছায়ে তাঁহার আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের লইয়া শিক্ষাদান কার্যে দিনগুলি কাটাইতেছেন, ১৯১৩ সালের তেমন একদিনে আশ্রমে তিনি সংবাদ পাইলেন যে পশ্চিমের সুধিবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী প্রতিভা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়া ঐ বৎসরের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' এই মহাবাক্য সার্থক করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিরূপে বরিত হইলেন। তিনিই প্রথম এশিয়াবাসী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বা N. L. অর্থাৎ Nobel Laureate.

সুইডেনের রাসায়নিক ডিনামাইট আবিষ্কারক ডাঃ য়্যালফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেল পুরস্কারের প্রতিষ্ঠাতা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ত্যক্ত প্রভূত অর্থের বিষয়ে তিনি যে শেষ ইচ্ছাপত্র করিয়া যান তাঁহার নির্দেশানুযায়ী তাঁহার দেশের রাজধানী ষ্টকহোম নগরে নোবেল সমিতি স্থাপিত হয়। ইহার কর্ণধার সুইডেন সরকার ও তথাকার রাজা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুণীরা আপন আপন বিদ্যায় প্রতি বর্ষে এই পুরস্কার ১৯০১ সাল হইতে পাইয়া আসিতেছেন। যে বিদ্যাগুলিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয় তাহা হইল রসায়ন, ভেষজবিদ্যা, শরীরতত্ব, ফিজিকস, সাহিত্য ও শান্তি অর্থাৎ শান্তির পন্থা। প্রতি বৎসর যে ছয়জন বিশিষ্ট গুণী এই পুরস্কার পান তাহার প্রত্যেকের প্রাপ্য ৮০০০ পাউণ্ড। কবি যেবার পান সেবার ৮০০০ পাউণ্ডের মান ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার তিনটি দেশের মধ্যে একটি সুইডেনে এই নোবেল সমিতির কার্যকরী বিভাগ ষ্টকহোম নগরে অবস্থিত আর অপর দেশ নরওয়ের রাজধানী আসলো নগরে এই সমিতির বিচারক বা পরীক্ষক মণ্ডলীর বিভাগ অবস্থিত যাঁহারা নির্বাচন করেন কোন্ কোন্ উপযুক্ত গুণীকে তাঁহাদের নিজ নিজ বিদ্যায় পুরস্কার দেওয়া হইবে। সুইডেন সরকার নোবেলকে তাঁহার শেষ জীবনে শিভ্যালিয়ার উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন যে উপাধি তাঁহারা ভারতীয় সংগীতাচার্য শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকেও দিয়াছিলেন।

নোবেল প্রাইজের সংবাদ সংবাদপত্রে সর্বত্র ঘোষিত হইলে কবির দেশবাসী জ্ঞানী গুণী ও সাধারণ সকলে কবিকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য সংখ্যায় প্রায় ৫০০ জন স্পেশাল ট্রেণে বোলপুরে গিয়াছিলেন। পূর্বে দেশের তথা দেশবাসীর প্রদত্ত সম্মান কবি সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু এবারের ইহা বিদেশের আর কবির ভাষায়—

এ মণিহার আমারে না সাজে

এ যে পরতে গেলে লাগে, ছিঁড়তে গেলে বাজে।

আর অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন—আমাকে সমস্ত দেশের নামে যে সম্মান দিতে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা অসংকোচে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নেই। * * যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁছেচে, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল তা আমি নীরবে বহন ক'রে এসেছি। এমন সময় কি জন্যে যে বিদেশ থেকে সম্মান লাভ করলুম তা ভালো ক'রে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্বতীরে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেম, তিনি সমুদ্রের পশ্চিমতীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্যে যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, সে কথা আমি জানতেম না। তাঁর প্রসাদ আমি পেয়েছি এই আমার সত্য লাভ। * * এই সম্মানের যদি কোনো মূল্য থাকে সে গুণিজনের রসবোধের মধ্যেই আছে। নোবেল প্রাইজের দ্বারা কোনো রচনার গুণ বা রস বৃদ্ধি করতে পারে না।

সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের সমাদর রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে জেনারেল য়্যাসেমব্লি হলে এক প্রকাণ্ড সভায় বঙ্কিমের সভাপতিত্বে প্রবন্ধপাঠক রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিমচন্দ্র সমাদর করেন। তবে রবীন্দ্র-সমালোচকের অভাব ছিল না। কালিদাসেরও দিঙ্‌ নাগাচার্য ছিলেন। কবি বররুচি প্রভৃতিরও সমালোচনার অভাব ছিল না। শেক্‌শপিয়ার যে নিজে কিছু রচনা করিতে পারিতেন না এ মতবাদ তাঁহার সময় হইতে আজও পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং কীটসের 'এডিনবারা রিভিউ' এবং 'জেফরি' ছিল। কবি পোপের বিরুদ্ধবাদীদলের আমরা তাঁহার 'ডানসিয়াডে' বহু পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রেরও 'পঞ্চানন্দ' ও রবীন্দ্রনাথের কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বা 'রাহু' ছিলেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথের দেশে যথেষ্ট আদর ছিল, আছে ও থাকিবে এবং তিনি দেশের অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধার্হ।

নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থ তিনি বোলপুর বিদ্যালয়কে দান করেন ও ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত দ্বিতীয় এশিয়াবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য চন্দ্রশেখর ভেংকট রামন যেমন ষ্টক্‌হোমে গিয়া নোবেল সমিতিতে সুইডেন-রাজের হস্ত হইতে পুরস্কার, পদক ও ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন, রবীন্দ্রনাথ কয়েক বার সুইডেনে গেলেও পুরস্কার গ্রহণের সময় যান নাই। তাঁহাকে কলিকাতার গভর্ণমেন্ট ভবনে তদানীন্তন বঙ্গের প্রদেশপাল সুইডেন হইতে প্রেরিত পুরস্কার প্রদান করেন আয়কর বাবদ কিছু টাকা কাটিয়া।

এই প্রাইজ পাওয়ার দুই বৎসর পূর্বে বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানাত্মক ডক্টার অফ লিট্‌রেচার উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। গুণীকে গুণী চেনেন কিন্তু 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় কি'? প্রাইজ পাওয়ার পর বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চিরন্তন লজ্জা হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কবিকে উপরোক্ত উপাধি প্রদান করিয়া এই পলাতককে নিজের অধিকারে ডাকিয়া লইলেন। কবিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি, লিট। রবীন্দ্রনাথও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তীকালে সাহিত্যে কমলা স্মৃতি লেক্‌চারারের ও রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। বঙ্গসাহিত্যে মৌলিক রচনার অগ্রণী 'জগত্তারিণী পদকও' তিনি লাভ করেন।

[ক্রমশঃ।

"In America, everybody is rich and everybody is in debt."
—*Aldous Huxley*.

চারজন

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

[শিক্ষাবিদ্, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও সমাজকর্মী]

সমাজ-জীবনে চলার পথে আমরা কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই, যাঁহারা আত্মপ্রচারবিমুখ হইয়া নীরবে কার্য্য-সম্পাদনা করিয়া থাকেন। জনকল্যাণোদ্দেশ্যে নিয়োজিত তাঁহাদের কর্ম্ম-সাধনার ফলভোগ করিয়া থাকে এক বৃহদংশ অথচ প্রতিদানে তাঁহারা কিছুই প্রাপ্ত হন না। তজ্জন্য নেই তাঁহাদের মনে কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখ, কোন অনুযোগ বা কোন অভিযোগ। বরং অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করায় তাঁহারা হন সন্তুষ্ট। অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে আমার মনে উঠেছিল এই কথাগুলি।

১৮৯৩ সালে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার আদিনিবাস ঢাকা মাণিকগঞ্জে। পিতা এটর্ণী ও উকীল ৺প্রসন্নকুমার সেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-জনক ৺ভুবনমোহন দাশের সহিত একত্রে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। মানব-দরদী ও আর্ত্তসেবায় নিবেদিত-প্রাণ মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রসন্নকুমারকে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য আহরণের জন্য বহু পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রিয়রঞ্জন বাবু পরে পুস্তকাকারে সেইগুলি গ্রথিত করেন।

শ্রীসেন দিনাজপুর জিলা বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া চাইবাসা জিলা বিদ্যালয়ে চলিয়া আসেন এবং ১৯১৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। উক্ত বৎসরে শ্রীপ্রমথনাথ সরকার প্রথম ও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯০৯-১১ সালে ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ তিনি পড়াশুনা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন কিন্তু গৃহে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ৺মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর নিকট তিনি পাতঞ্জল মহাভাষ্যের পাঠ গ্রহণ করিতে থাকেন। ১৯১২ সালে তিনি সংস্কৃতে কাব্য, মধ্য এবং ১৯১৪ সালে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ কটক র‍্যাভেন্স কলেজ হইতে English Composition-এ প্রথম হইয়া বি-এ পাশ করেন। ১৯১৯ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম-এ ও ১৯২০ সালে প্রথম বার ভারতীয় ভাষার পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করেন। ১৯২৫ সালে P.R.S. এবং ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে তিনি জুবিলী গবেষণা পুরস্কারে ভূষিত হন।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

১৯২০ সালে তিনি রংপুর কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হন। কিছুকাল অস্থায়ী বিভাগীয় অধ্যক্ষরূপে কাজ করিয়া ১৯৫৫ সালে তথা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে বিশ্বভারতীর Institute of Rural Higher Education-এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাল্যকাল হইতে তাঁহার প্রবন্ধ লিখিবার ঝোঁক ছিল। ১৯০৯ সালে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়। কলেজে পাঠকালে তিনি ফরাসী ভাষাও কিছুটা আয়ত্ত করেন এবং ১৯১৯ সালে পুণা ভাণ্ডারকার ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইলে ফরাসী ভাষায় লিখিত কয়েকটি পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী সিলভ্যাঁ লেভী রচিত একটি প্রবন্ধ তাঁহার অনুবাদে "নারায়ণ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফরাসী অধ্যাপক মেয়ের "মেয়ের আবেস্তা"র গাথা তিনি ইংরাজীতে অনূদিত করিয়া মুদ্রিত করান। বর্ষাধিক কালের বন্দী-জীবনে একটি ফরাসী ভাষার উপন্যাস তিনি বাঙ্গালা ও অপর একটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন কিন্তু উহা অপ্রকাশিত আছে। তিনি পর্তুগীজ ভাষাও শিক্ষা করেন। তাঁহার বন্ধু ডাঃ ব্রাগাঞ্জা (Braganza) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে যোগদান করিলে শ্রীসেন ও ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মিলিত ভাবে Assumpcam-র পর্তুগীজ ভাষার ব্যাকরণ বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। কটকে পঠদ্দশায় তিনি ওড়িয়া ভাষা শিক্ষা করেন। পরে তিনি হিন্দী ভাষার সহিত সম্যক পরিচিত হন। প্রেমচাঁদ লিখিত হিন্দী পুস্তক "গোদান" তাঁহার স্ত্রী ও তিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন। তোতারাম সোনাড্যা লিখিত "ফিজি দ্বীপে ২১ বৎসর" তাঁহারই বাঙ্গালায় অনুবাদে "বিজলী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার লিখিত আরও কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকল সাহিত্য সম্মেলন, বর্ম্মাপ্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন এবং ত্রিবাঙ্কুরে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য-সাহিত্যের সম্মেলনে বাঙ্গালা ভাষা বিভাগের তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের সদস্য ছিলেন।

১৯০৫-১৯০৬ সালের বঙ্গ-বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন কিশোর প্রিয়রঞ্জনের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং নিজেকে ক্রমশঃ জাতীয় কার্য্যকলাপের সহিত জড়িত করেন। ১৯২০ সালে আমেদাবাদ

ও ১৯২১ সালে গয়া কংগ্রেসে তিনি বাঙ্গালার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হন। মেদিনীপুরে পুলিশ অত্যাচারের বে-সরকারী অনুসন্ধান কমিটির এবং দামোদর ক্যানেল করের বে-সরকারী সমিতির সদস্য হিসাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। উহাদের নেতা ছিলেন শ্রীজে, এন, বসু। "কংরেজ ইণ্ডিয়া ছোড়দো" আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে ১৯৪২-৪৩ সালে তিনি রাজবন্দী হন। ১৯৪৪ সাল হইতে তিনি বঙ্গদেশের হরিজনসেবক সঙ্ঘের সম্পাদক রহিয়াছেন। বাঙ্গালার Indian Conference of Social Workএর সভাপতি এবং উহার নিখিল ভারতীয় সংস্থার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রাজ্য সরকারের Adult Education কমিটির সহিত সংযুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ট্রাইব্যুনালে তিনি তিন বার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি Constituent Assemblyর সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ সালে "আকাশ-বাণী" কলিকাতা কেন্দ্র হইতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সান্ধ্য প্রার্থনার ভাষণগুলি বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ করিতেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে শ্রীজগজ্জীবন রামের সহিত পরিভ্রমণ করিয়া তিনি জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। সেই সময় হরিজন-সেবক সঙ্ঘের সম্পাদক হিসাবে ঠক্কর বাপাকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া দেন। ১৯৫২ সালে তিনি ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীমতী লীলা রায় ও অন্যান্য কয়েকজনকে পরাজিত করিয়া রাজ্য বিধানসভায় নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৫৭ সালে মাত্র ৯১ ভোটের ব্যবধানে বিধান-সভার নির্ব্বাচনে পরাজিত হন।

তাঁহার অদম্য কর্ম্মক্ষমতা, সরল জীবন-যাপন ও সুমধুর ব্যবহার অনুকরণযোগ্য।

রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

[পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজসেবী]

বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবদানে বঙ্গজ কায়স্থ গুহবংশের 'রায়-চৌধুরী' আখ্যাত গোষ্ঠীর ২৪ পরগণা জেলার টাকী সহরের মুন্সী-বংশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পরিবারের কৃতী সন্তানগণ পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শ্রীঅমলকুমার রায়চৌধুরী।

টাকী শ্রীপুরের রায়চৌধুরীগণ ইতিহাসখ্যাত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য ও পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায়ের নিকট-জ্ঞাতিভ্রাতা ভবানীদাস রায়চৌধুরীর সন্তান। পাঠানরাজ দাউদ খানের পরাজয়ের পর রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় বর্ত্তমান খুলনা জেলার কালীগঞ্জ থানায় অবস্থিত যশোহর নগরে রাজধানী পত্তন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত কায়স্থ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক "যশোহর-সমাজ" প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ভবানী দাসকে তাঁহাদের নিকট আনয়ন করেন। চির-সংগ্রামী বীরপুরুষ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পর উক্ত বংশের অনেকে পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যান কিন্তু রাজা ভবানী দাসের সন্তান-সন্ততিরা টাকী শ্রীপুরে থাকিয়া যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অভ্যুদিত মুন্সীবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামকান্তের দুই পুত্র শ্রীনাথ ও গোপীনাথের পরামর্শে রাজা রামমোহন রায় রংপুরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং শেষোক্তের সহায়তায় ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হন। গোপীনাথের অকাল-মৃত্যুর পর শ্রীনাথের পুত্র কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ রামমোহনের সহিত সতীদাহ প্রথার অবসান, ব্রহ্ম-সভার প্রতিষ্ঠা ও এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রণী হন। তৎকালে তাঁহারা কাশীপুর ও টাকীতে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ (বারাসত হইতে টাকী), মেটকাফহল ও গ্রন্থাগার স্থাপনা (অধুনা National Library) প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যকে উদ্ভাসিত করেন।

১২৯৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে) হরেন্দ্রনাথ বরাহনগর "মুন্সী-হাউসে" জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ঠিক দুই দিন পূর্ব্বে পিতা রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী স্বর্গারোহণ করেন। স্বামিহারা জননী সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব মাথায় তুলিয়া নেন। ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সমগ্র পাঠ্যাবস্থা পিতৃব্য ৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা পাশ করেন এবং স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রে এম-এ উপাধি লাভ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় আইন-কলেজ হইতে 'ল' পাশ করেন। পাঠশেষে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা পিতৃব্য যতীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি রাজনীতিতে

শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

যোগদান করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৯২০ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে সাধারণ নির্ব্বাচনে (বারাকপুর-বারাসত-বসিরহাট মহকুমা পল্লী অমুসলমান কেন্দ্র) তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় আইন পরিষদে নির্ব্বাচিত হন এবং বিরোধী পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় উক্ত নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে তাঁহাকে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন করেন এবং তিনি বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৬ সালের নির্ব্বাচনে উহারই পুনরাবৃত্তি হয় এবং ১৯২৬-২৯ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস কাউন্সিল দলের সম্পাদকরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৯২৮ সালে বসিরহাটে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন! মূল সম্মেলনের পৌরোহিত্য করেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়। উক্ত বৎসরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট চালু হইলে তিনি বঙ্গীয় আইন সভায় ২৪ পরগণা (সাধারণ) মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত সদস্যরূপে কার্য্য করেন। এই সময় বাংলাদেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণগুলি অবিস্মরণীয়। দেশ বিভাগের পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে তিনি ১৯৪৮ সালে শিক্ষামন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন এবং বাঁকুড়া (পূর্ব্ব) কেন্দ্র হইতে সদস্যরূপে বিধান সভায় যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি বরাহনগর কেন্দ্রে কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর নিকট পরাজিত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ তিনি ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে দণ্ডায়মান হন নাই কিন্তু উক্ত বৎসর জুন মাসে পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্য হিসাবে তিনি পুনরায় শিক্ষামন্ত্রী হন।

শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর শিক্ষকদের নূতন ও উন্নত প্রথায় মাহিনা বৃদ্ধি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অর্থ সাহায্য, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সন্তানদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদান (পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ কর্ত্তৃক উহা গৃহীত হয়), একাদশ বর্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহুমুখী প্রথায় শিক্ষাদান, সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারে বেসরকারী টোল সমূহকে অর্থসাহায্য, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ গঠন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অবদান। ১৯৫০ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের মারফৎ পৃথক পর্ষদ গঠন এবং ১৯৫১ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট তাঁহার গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত নিরক্ষরতা দূরীকরণে রাজ্যব্যাপী জনশিক্ষা প্রচার এবং দশমবার্ষিক পরিকল্পনায় অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য সংশোধিত প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু করা তাঁহার প্রগতি মনের পরিচয়। তাঁহারই কার্য্যকালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বাণীপুর (বাইগাছি) বুনিয়াদী শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পরিবারে বিদ্যার প্রসার হোক—এই চিন্তাই যেন তাঁহার মনকে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ

[ভারতীয় রেল-জগতের একজন বিশেষ পুরুষ ও তদানীন্তন পূর্বভারতীয় রেলপথের ভূতপূর্ব প্রধান কর্মসচিব]

অপরিচিতকে করল পরিচিত, দুর্গমকে করল সুগম, কঠিনকে করে তুলল সহজ রেলপথ। সহস্র জীবন বিপন্ন করে, চোখের সামনে মৃত্যুর হাতছানি প্রত্যক্ষ করতে করতে পাহাড় পর্বত ভেঙে গুঁড়িয়ে অসমতল বন্ধুর পথকে সহজ সমতল করে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে পূর্ণ গহন অরণ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ধীরে ধীরে একদিন যে রেলপথ দেখা দিল ভূখণ্ডের বুকের উপর দিয়ে, কালক্রমে তাই লাভ করল সর্বদেশের সম্বর্ধনা বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদানের পরিচয়ে। ভারতভূমি সর্বংসহার বুকের উপর দিয়ে রেলপথ প্রতিষ্ঠা করা হ'ল কিছু বেশী শতবর্ষ আগে। ভারতীয় রেলপথের সাথে যে ক'টি সুদক্ষ কর্মীপুরুষের জয়গৌরবের অংশ বিজড়িত তার মধ্যে বাঙলার সুনামধন্য সন্তান রায়বাহাদুর শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামপ্রসাদের পদরজধন্য হালিশহরের অন্তর্গত কোনা নিবাসী স্বর্গীয় কালীনাথ ঘোষ রেলপথের সঙ্গেই কর্মী হিসেবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁর পুত্র নিবারণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের প্রথম মাসটির ষষ্ঠ দিবসে। কালীনাথ শেষ জীবনে গাজীপুরের আফিং বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেছিলেন সেইখানেই ঘটল তাঁর দেহান্তর। নিবারণচন্দ্র তখন ন'-দশ বছরের বালক মাত্র। মহাগুরু নিপাতের পর কলকাতায় চলে আসেন নিবারণচন্দ্র। এখানে পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিধন্য মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশান (মেন) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯০৮ সালে। স্কটিশ চার্চেস কলেজ থেকে বি, এ পাশ করলেন ১৯১২ সালে। এম, এ পড়তে পড়তে নিবারণচন্দ্রের সমগ্র জীবনের গতি একটা বিরাট বাঁক নিল। একটি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করলেন তিনি অধ্যাপক (পরে স্যার) ষ্টুয়ার্ট উইলিয়ামস এর কাছ থেকে। ইনি রেলপথ সংক্রান্ত অর্থনীতি এবং সাধারণ শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে পাঠ দিতেন। ইনি পরে পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যান হন এবং রেলওয়ের প্রধান কর্মসচিবের সচিব নিযুক্ত হন। রেলপথের তখন প্রধান কর্মসচিব ছিলেন স্যার রবার্ট হাইড। স্যার রবার্ট ইনজিনিয়ারিং ম্যাকটিক্যাল সম্বন্ধে পাঠ নেন নিবারণচন্দ্রের পিতৃদেবের কাছে। এম. এ ক্লাসের শিক্ষার্থীর মনে রেলপথ সম্বন্ধীয় কৌতূহলের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন শিক্ষাদাতা। সে আগুনের দেদীপ্যমান শিখার আকর্ষণ থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেন না নিবারণচন্দ্র। একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগ দিলেন ও প্রথম স্থান অধিকার করে রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হলেন নিবারণচন্দ্র (১৯১৩)। রেলপথের যানবাহন সংক্রান্ত অর্থনীতিতে এম-এ পরীক্ষা আর দেওয়া হ'ল না। নতুন কর্মজীবনের অমোঘ আকর্ষণের ইন্দ্রজাল তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ তরুণ বাঙালী নিবারণচন্দ্রের তারুণ্যসুলভ নবীনতার পূজারী চিত্ত।

রেলপথে যোগদান করে ইনি প্রথমে হলেন প্রোবেশনারী য়্যাসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। তারপর তিন বছর বাদে (১৯১৬) হলেন য়্যাসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪—১৮) ইনি কেবল য়্যালটমেণ্ট এর কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন, সেখানকার রেলপথের কার্য-নির্বাহ প্রণালী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে ভারতে

ফিরে এলেন ১৯২৪ সালে। এখানে এসে ধানবাদে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার নিযুক্ত হলেন, তারপর হাওড়ায় সমুদায় যানবাহন বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক হলেন (১৯৩০—৩৪) এই সময়ে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে এঁকে প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল। কুম্ভমেলার ভীড় কারোরই অজানা নয়। ধর্মানুশীলনের দেশ ভারতবর্ষ. ভারতের প্রতিটি নরনারী পুণ্যপাগল। কুম্ভমেলার সময় সারা ভারতের জনসাধারণ কাতারে কাতারে এসে এক জায়গায় সম্মিলিত হয় সকলে মিলে পুণ্যের ফলপ্রাপ্তির জন্যে, কাউকে বঞ্চিত করে কেবলমাত্র নিজেই পুণ্য অর্জন করতে ভারতবাসী শেখে নি, তা হলে সে ঘরে বসেই পুণ্য অর্জন করত—সে চেয়েছে পুণ্যের ফল সকলে মিলে একসঙ্গে ভোগ করব, তাইতো অবর্ণনীয় দৈহিক ক্লেশ হাসিমুখে স্বীকার করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। ১৯৩৮ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় ভীড় হয়েছিল অন্যান্য বারের তুলনায় সবচেয়ে বেশী। সেই ভীড়ের প্রবাহে হরিদ্বার ষ্টেশনে নিরাপদে রাখার জন্যে মাত্র ন'মাস সময়ের মধ্যে সমগ্র ষ্টেশনটিকে প্রয়োজনানুযায়ী পুনর্নির্মিত করা হল। তখন নিবারণচন্দ্র বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক। ১৯৩৪ সালে নিবারণচন্দ্র এই কর্মের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন—ভারতবাসীদের মধ্যে ইনিই প্রথম জন এবং পূর্বসূরী বা উত্তর পুরুষদের তুলনায় বয়ঃকনিষ্ঠতম, যাঁর উপর উপরোক্ত কর্মভার অর্পণ করা হয়। এর পর রেলওয়ে বোর্ডের ট্রান্সপোর্ট য্যাডভাইসারি অফিসার (কয়লা সংক্রান্ত) রূপে দেখা যায় নিবারণচন্দ্রকে। বস্তুত পক্ষে এইখান থেকেই আজকের দিনের কোল কমিশনারের কর্মশালার সৃষ্টি। ১৯৪০ সালে সি-ও-পি-এস (চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেনডেন্ট) এর আসন অলঙ্কৃত করলেন নিবারণচন্দ্র। ১৯৪৪ সালে তদানীন্তন পূর্বভারতীয় রেলপথের প্রধান কর্মসচিবের সম্মানে বিভূষিত হলেন নিবারণচন্দ্র ঘোষ। ১৯৩০ থেকে ৩৭এর মধ্যে ইনি রায়বাহাদুর ও আনুমানিক ১৯৩৬ সালে ও. বি. ই. খেতাব লাভ করেন।

এখানেই নিবারণচন্দ্রের কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি নয়। আজও তিনি কর্মের মধ্য দিয়েই দেশসেবা করে চলেছেন। তাঁর উদ্যমপূর্ণ কর্মশক্তির ফল দেশ ও জাতিকে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধির আনন্দলোকের সিংহদ্বার অভিমুখে। রেলপথের প্রধান কর্মসচিবের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ভারত সরকারের সিভিল এভিয়েশনের ডিরেক্টার জেনারেল নিযুক্ত হলেন (১৯৪৭-৪৯), এয়ার-ট্রান্সপোর্টের লাইসেন্সিং বোর্ডের সদস্যরূপেও তাঁকে দেখা গেছে (১৯৪৬-৪৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্রান্সপোর্টেশানের ডিরেক্টার জেনারেল, হোম ট্রান্সপোর্টের সেক্রেটারী এবং ট্রান্সপোর্ট কমিশনার (১৯৪৯-৫০) প্রভৃতির কর্মভারগুলিও নিবারণচন্দ্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। নদী-যানগুলির উন্নতি প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়ান রিভার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর ডিরেক্টার ম্যানেজার (১৯৫৩-৫৭) এর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। বর্তমানে, ১৯৫৭ সাল থেকে ইনি ন্যাশানাল কোল ডিভেলাপমেন্ট কর্পোরেশানের রেলওয়ে লিয়াসন অফিসার। প্রধান মন্ত্রী নেহরু কর্তৃক উদ্বোধিত (১৯৪৮) এ বোনটিকাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার ইনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পর পর তিনবার ইনি এখানকার সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির সমগ্র রূপদান ইনিই করেছেন। আজ প্রায় দশ বছর যাবৎ ইনি নিবেদিতা গার্লস হাইস্কুলের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি। রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান ও মহাবোধি সোসাইটির ইনি সহকারী সভাপতি। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান রবিবাসরের সঙ্গেও ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। নিবারণচন্দ্র যখন সি-ও পি-এস সেই সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শেষশয্যায়, শান্তিনিকেতন থেকে তখন তাঁকে আনা হ'ল সি-ও পি-এসের বারো উইলার বিশেষ-সেলুনে—এই যাত্রার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেন নিবারণচন্দ্র, সেই ঘটনার বিবরণী সেই কামরায় তাম্রলিপিতে স্মৃতিবদ্ধ করা আছে।

জীবনের দীর্ঘ দিন নিবারণচন্দ্র অতিবাহিত করেছেন রেলপথে, জিজ্ঞাসা করি, এই দীর্ঘদিনের কর্মজীবনে কি ঐ জগতে পরিবেশ সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা আপনি লাভ করলেন? একটু ভেবে নিবারণচন্দ্র উত্তর দিলেন, তখন ইংরেজের যুগ ছিল, ভারতবাসীর প্রাধান্য ছিল না বটে কিন্তু গুণীর সমাদর করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করত না। যে ব্যক্তির মধ্যে যে গুণের সন্ধান তারা পেত তৎক্ষণাৎ সেই সুযোগ তারা গ্রহণ করত অর্থাৎ প্রতিভাধর ব্যক্তির প্রতিভার সম্যক স্ফুরণে তারা যথাযথ সহায়তা করত। তখন সমগ্র রেলপথের কর্মপ্রণালীতে যে একটা সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল এখন সেটা যেন একটু হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে হয়। তবে তা সাময়িকও হতে পারে। নিবারণচন্দ্রের মতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের রেলপথের কর্মপ্রণালী বহু গুণ উন্নত, কোন কোন দেশের তো তুলনাই হয় না আমাদের দেশের সঙ্গে। এখনকার দিনে স্বাধীন ভারতে রেলপথের আরও বহু উন্নতি হতে পারে, তবে তা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মনোভাবের জন্যে।

প্রথম জীবন থেকেই অধ্যয়নের প্রতি নিবারণচন্দ্রের অসীম অনুরাগ। জীবনে নানা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইনি সাহিত্যসেবা করে আসছেন। প্রবন্ধকাররূপেও এঁর খ্যাতি বহুজনবিদিত।
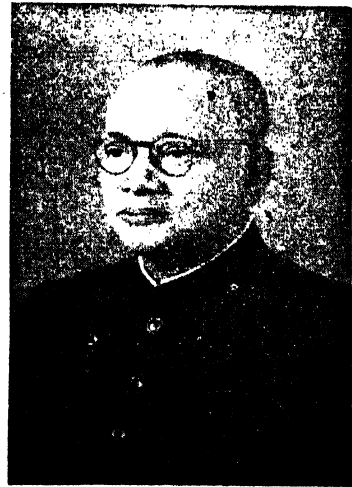
নিবারণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

[পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী]

বাংলার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ জমিদার-বংশ পাইকপাড়া রাজবংশ। আদিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী শহরে। বণিক্ ইংরেজের আগমন পথে যে সব পরিবারে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আগমন ঘটল পাইকপাড়া বংশও তার মধ্যে একটি। কিন্তু তার চেহারা পালটাল যখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বংশের সন্তান লালাবাবু সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিলেন, মাধুকরী অবলম্বন করে বৃন্দাবনে জীবন যাপন করতে লাগলেন। তার পর হতে এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পুরুষের জন্ম হয়েছে, যাঁরা দেশের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সহযোগ, বাংলা নাট্যমঞ্চের নবোজ্জীবিত ধারার পুষ্টিসাধন, বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণ ইত্যাদি আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ সকলেরই সুপরিচিত।

সেই বংশে বিমলচন্দ্র সিংহ জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। পিতা মারা যান বাল্যকালে। তাঁর বাল্যজীবন কাটে নিঃসঙ্গতায়। বংশের গৌরবে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি থাকেন নি। বাল্যকাল হতে তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। আই-এ, বি-এ ও এম-এ'তে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে—বহু পুরস্কার ও বৃত্তি পান। সেই সময় হতেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাও বিকশিত হতে থাকে। ছাত্রাবস্থায় লিখিত "বাংলার চাষী" গুণিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯৩৮ সালে তিনি "বঙ্কিম প্রতিভা" সম্পাদন করে প্রকাশ করেন—তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু অপ্রকাশিত রচনাও প্রথম প্রকাশিত হয়। সেটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন—"তোমার সঙ্কলিত 'বঙ্কিম প্রতিভা' পড়ে আনন্দিত হলুম। সাহিত্যরস সম্ভোগের এই আনন্দে তুমি তোমার বংশোচিত বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ দিয়েছ। আজকালকার দিনে দুর্লভ এই সৌভাগ্য।"

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সেই সঙ্গে চলছিল রাজনৈতিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি। ১৯৪১ সালে লীগ মন্ত্রিসভার আমলে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিমলচন্দ্র প্রথম রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করেন। তৎকালীন কংগ্রেসের আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করে। ১৯৪৬ সালে প্রথম বার ২৪ পরগণা সদর বসিরহাট অঞ্চলের কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তারপর এলো ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কলকাতার নারকীয় হত্যালীলা। নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি নগরীর উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসে এগিয়ে এলেন।

১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিজেকে গভীর ভাবে যুক্ত করেন। দেশ বিভাগের পর স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রিসভা গঠন করলে বিমলচন্দ্র পূর্তমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। দেশের ও জনসাধারণের সেবার সুযোগ তাঁর এসে গেল। পূর্তমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের পথঘাট উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করা হয় তাঁহার মন্ত্রিত্ব কালেই। এদিক থেকেও বিমল বাবুর অবদান সামান্য নহে। কল্যাণী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হিসেবে তাঁর কর্মকুশলতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এর পরেই এলো রাজ্য-সীমা পুনর্গঠনের দাবী বা আন্দোলন। বিমল বাবু নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকতে পারলেন না। বাংলা মায়ের এই সুসন্তান আবার এগিয়ে এলেন ও নিজেকে সংশ্লিষ্ট করলেন এই আন্দোলনের সঙ্গে। বাংলা দেশের বাইরে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল বাংলার সঙ্গে একত্রিত ক'রবার জন্য তাঁর উৎসাহ, উদ্যম এবং অবদান অপরিসীম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, যখন বাংলা বিহার একত্রীকরণের প্রস্তাব আলোচিত হয়েছিল তখন দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালার জনগণের কল্যাণের জন্যে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তিনি কোন দিক বিবেচনা না করেই তখনই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। মনে প্রাণে তিনি বাংলা দেশের ও বাংলার জনগণের কল্যাণকামী। বাংলার শ্রীবৃদ্ধি ও জনগণের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহশীল।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরহঙ্কার, মিষ্টভাষী, সুপণ্ডিত, ধীর ও স্থির। অর্থনীতিবিদ্ হিসেবে তিনি এরই মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। কবি ও সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি এরই মধ্যে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে তিনি প্রগতিশীল। প্রসঙ্গক্রমে একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, মন্ত্রিসভার অধিবেশনে তিনি সর্ব্বদাই নিজের মতামত স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে থাকেন। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে মুর্শিদাবাদ কান্দী অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং রাজ্যের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিছুদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ বন্যার সময় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাহায্যে বহু দুঃস্থ পরিবারের জীবন রক্ষা সম্ভব হয়েছে। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর অবদান সামান্য নহে। তাঁহার রচিত "সমাজ ও সাহিত্য," "দেশের কথা" "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" "কাশ্মীর ভ্রমণ" "পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস" প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের স্বাক্ষর।

প্রস্তর-শিল্প (জয়পুর)

—এস. এস. ভট্টাচার্য্য

মহিষমর্দ্দিনী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম)

—অনিন্দ্য রায়

মানদণ্ড

—অজয়কুমার গোস্বামী

চুনার দুর্গ

—বাসন্তী ঘোষাল

শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবী —রতন দাশগুপ্ত
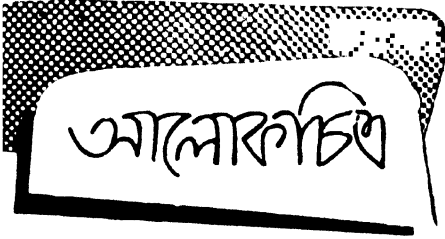
শক্তির প্রতীক —মীরেন অধিকারী

॥ ছবি বা আলোকচিত্র পাঠানোর নিয়মাবলী ॥

- ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম, ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।
- ছবি যেন 'ম্যাট্' কাগজে ছাপিয়ে পাঠাবেন না। 'গ্লসি' কাগজে ছাপিয়ে পাঠাবেন, ব্লক তৈরীর সুবিধার জন্য।
- ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠাতে হয়।
- যে কেউ যেখানেই থাকুন, যখন খুশী ছবি পাঠাতে পারেন।

শাহিলিয়ন কা বাড়ী (উদয়পুর) —মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অচল চাকা —সুবোধ দত্ত

পকেলা মলিয়েরের

পাত্র ও পাত্রীগণ

স্গানারেল	...	...	জনৈক ব্যবসায়ী
লুসিঁদ	...	...	স্গানারেলের মেয়ে
ক্লিতাঁদর	...	...	লুসিঁদের প্রেমিক
আমাঁৎ	...	...	প্রতিবেশী
লুক্রেস	...	...	স্গানারেলের ভাইঝি
লিজেৎ	...	...	লুসিঁদের পরিচারিকা
মসিঁয়ে গুইলম	...	...	ঝালর পর্দা ব্যবসায়ী
মসিঁয়ে জোস	...	...	অলঙ্কার ব্যবসায়ী
ডাক্তারগণ	...	...	তোমে, দে ফঁনান্দ্র, মাক্রোতো, বাই ও ফিলর্যাঁ।
শাঁপান	...	...	স্গানারেলের পারিষদ

জনৈক দলিলপত্রব্যবস্থাকারী রাজকর্মচারী।

বালেটে পাত্র-পাত্রী

শাঁপান, ডাক্তারগণ, হাতুড়ে ওষুধের ভেণ্ডার ও তার অনুচরবর্গ।
প্রহসন, সঙ্গীত, বালেট, হাসি ও আনন্দ।
স্থান :—প্যারিস। স্গানারেলের গৃহ।
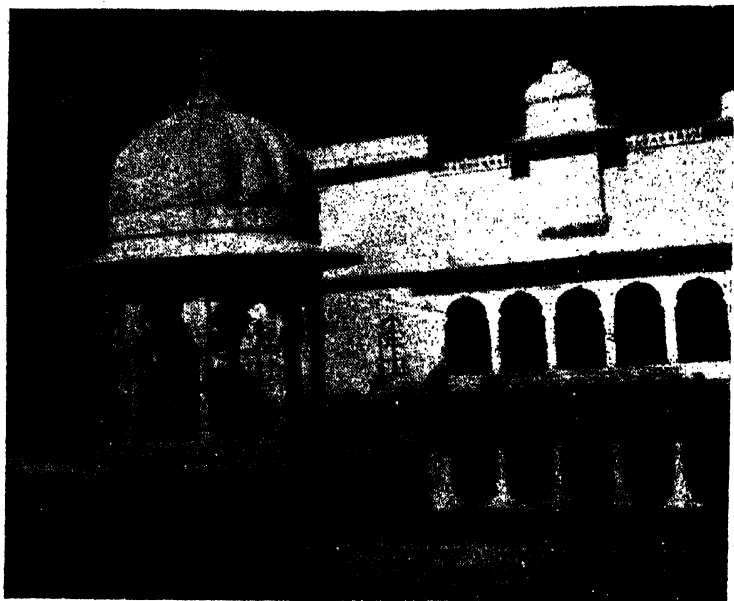
প্রস্তাবনা

প্রহসন। থামাও, থামাও ঝগড়া থামাও;
চাদির তরে থামাও আড়াআড়ি
কেউ করো না পরের দাবী অস্বীকার
পাওয়া যায় মান আবার।
তা হলে এক হও, সকলে, তিন জনে এক স্বরে,
একালের মহারাজের আনন্দের তরে।

প্রহসন, বালেট ও সঙ্গীত। তা হলে এক হও সকলে তিনজনে একস্বরে
একালের মহারাজের আনন্দের তরে।

সঙ্গীত। আমরা যা জানি তার চেয়ে অনেক বেশী সম্মানের
অধিকারী তিনি,
আমাদের আনন্দে সময় করে অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি।

ব্যালেট। এর চেয়ে তিনি কী আর বেশী সম্মান আমাদের দেখাবেন,
তাঁর সুখ্যাতিতে আমরা অংশ গ্রহণ করেছি।

প্রহসন, সঙ্গীত ও বালেট। তা হলে এক হও সকলে, তিনজনে একস্বরে
একালের মহারাজের আনন্দের তরে।

নৃত্য

প্রথম দৃশ্য

স্গানারেল, আমাঁৎ, লুক্রেস, মঁসিয়ে গুইলম, মঁসিয়ে জোস।

স্গানারেল। জীবনটা কী অদ্ভুত! দার্শনিকরা ঠিকই বলেছেন দুঃখ চলে যায় বটে—তবে বিপদ একলা আসে না। আমার একমাত্র বউ ছিল—শেষে বউটাও মারা গেল।

মঁসিয়ে গুইলম। ক'জন বউ থাকলে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হত?

স্গানারেল। দেখ বন্ধু গুইলম—বউ আমার মারা গেছে—তার অভাব আমি খুব বেশী করে বুঝছি—চোখের জল ছাড়া তাকে আমি ভাবতেই পারি না। তার চালচলন অবশ্য সব সময় আমার মনের মতন হত না—তবে সত্যি কথা বলতে কী, আমরা প্রায় ঝগড়া করতাম—বউ মরে যাওয়ায় ঝগড়ার হিসেব নিকেশ সব চুকে গেছে—বউ মারা গেছে তার জন্য আমি এখনও কাঁদি—বউ যদি বেঁচে থাকত তা হলে আমার সঙ্গে বউ ঝগড়া করত। অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে ভগবানের কৃপায় কেবলমাত্র একজন কোন রকমে বেঁচে আছে—তাকে নিয়ে আমার হয়েছে ভীষণ জ্বালা—হতাশার অতলে মেয়ে আমার হাবুডুবু খাচ্ছে—বিষণ্ণ ভাব থেকে মেয়ে আমার রেহাই পাচ্ছে না। এর কারণও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমি নিজে খুব মুষড়ে পড়েছি—এর জন্য আমি পরামর্শ চাইছি—তুমি লুক্রেশ আমার ভাইঝি, আমাঁৎ তুমি আমার প্রতিবেশী (মঁসিয়ে গুইলম এবং মঁসিয়ে জোসের প্রতি) তোমরা আমার বন্ধু আর এক ব্যবসা আমরা করি।

মঁসিয়ে জোস। বেশ ভাল কথা, আমার বিশ্বাস, গহনা মেয়েরা সব চেয়ে বেশী ভালবাসে—তোমার অবস্থা আমার হলে, তা হলে আজকে এখুনিই কয়েক প্রস্থ গহনা কিনে দিতাম—হীরে, পান্না বা রুবির গহনা।

মঁসিয়ে গুইলম। তোমার অবস্থা যদি আমার হত, তা হলে মেয়েকে মেয়ের ঘর সাজাবার জন্যে কয়েক প্রস্থ পর্দার ঝালর কিনে দিতাম—সেগুলো তো নানা রকম ল্যাণ্ডস্কেপ অথবা ছবি থাকত, তা হলে মেয়ের ঘরটা ঝলমল করে উঠত—মনটাও চাঙ্গা হত।

আমাঁৎ। হ্যাঁ আমি এ সব কিছু করতাম না। উহুঁ মোটেই না—যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতাম। সেই ছেলেটার সঙ্গে, যে ছেলেটা তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

লুক্রেশ। আমার মতে বিয়ে দেওয়া তোমার মেয়ের পক্ষে ভাল হবে না, তোমার মেয়ে খুব রোগা, তোমার মেয়ে ডাগর ডোগরও নয়, না—সন্তান ধারণ আশা করা মানে তাকে সরাসরি অন্য জগতে পাঠিয়ে দেওয়া—সমাজের মধ্যে তার থাকা ঠিক হবে না—আমার মতে সব চেয়ে ভাল হবে তাকে যদি কোন মঠে রাখা হয়—সেখানে তার ধাত ঠিক খাপ খাবে।

স্গানারেল। হুঁ, সন্দেহ না করেই আমাকে বলতে হবে, তোমাদের প্রস্তাবগুলো খাসা। তোমরা আদৌ বাজে বকনি।

আমার ধারণা, তোমাদের নিজেদের কাছে এগুলো খুব যুক্তিসঙ্গত। মঁসিয়ে জোস, আপনি গহনার ব্যবসা করেন—কথাগুলো সেই লোকটার মতন—মোজাপরা লোকটা মোজা খুলতে চায়, মিঃ গুইলম, আপনি ঝালর-পর্দার ব্যবসা করেন—আমাকে কিছু গছাতে পারলে আপনার বেশ সুবিধে হয় আর প্রতিবেশী আমাঁৎ, তুমি এক জোয়ান ছেলে—তুমি প্রেমে পড়েছ, আমার মেয়েকে বউ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পার না। আর ভাইঝি, তুমি জান মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আমার খুব বেশী ইচ্ছে নাই—এ আমার ব্যক্তিগত মত; তুমি আমার মেয়েকে মঠে পাঠাতে বলছ এই কারণে যে, তা হলে আমার সম্পত্তি তোমার ওপর বর্তাবে। আপনারা বুঝতে পারছেন, আপনাদের মতামত কত মূল্যবান; যদি আপনাদের উপদেশ মানতে না পারি তা হলে আমাকে মাপ করবেন। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ (তাকে একা রেখে সকলে চলে যায়) হ্যাঁ, এখন আমি বুঝছি ভাল কথার জের কত দূর ওপরে উঠতে পারে। (লুসিঁদ-এর প্রবেশ) আমার মেয়ে এদিকেই আসছে, হাওয়া খেতে বার হয়েছে। মেয়ে আমাকে দেখেনি, মেয়ে আমার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে আর স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছে (লুসিঁদ-এর প্রতি) বাছা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুক! শুভ সকাল। কেমন আছ তুমি? হায় ভগবান, ঠিক আগেকার মতন সর্বদাই বিষণ্ণ, তোর কী হয়েছে তা কী আমাকে জানাবি না? হ্যাঁ এই দিকে আয়—বল মা, বাবার কাছে সব খুলে বল। বাবার কাছে কোন কিছু গোপন করতে নেই, ভয় পাস না। আমি তোকে চুমু খাইনি? কাছে আয় মা! (স্বগত উক্তি) মেয়ের এই অবস্থা দেখলে আমি জ্বলে উঠি। (লুসিঁদ-এর প্রতি) তোর বুড়ো বাপ কষ্ট পেয়ে মারা যাক—এ তুই মা কিছুতেই চাস না। —চাস তোর বুড়ো বাপ কষ্ট পাক? আমাকে বলতে পারিস না তোর কোথায় দুঃখ? আমাকে সব খুলে বল—আমি কথা দিচ্ছি, তুই যা চাস তাই দেব। তোর দুঃখের কারণ বল আমি কথা দিচ্ছি, তুই যা চাস তা দেব। তোর কোথায় অসুবিধে—আমি বলছি—না, আমি শপথ করছি এমন কোন কাজ নাই তোকে সুখী করবার জন্য করব না। এর চেয়ে আমি বেশী কী বলতে পারি? তুই বল, তোর বন্ধু কী তোর চেয়ে ভাল জামা-কাপড় পরে, বল তোর কী ঈর্ষ্যা হচ্ছে? তুই এমন কী সুন্দর সামগ্রী দেখেছিস যা থেকে তোর পোষাক তৈরী করে দিলে তোর খুব আনন্দ হবে? না! তাও না, তোর শোবার ঘর কী বেশ পরিপাটী করে সাজান হয় নি? তাও না! কোন কিছু উপহার নিবি—সেই ছোট গহনার বাক্সটা নিবি—যেটা সেন্ট লরেন্সের মেলা থেকে আনা হয়েছে? তোর কোন কিছুর দরকার নাই? তুই পড়তে চাস না? বাজনা বাজান শেখবার জন্য কোন লোককে নিয়োগ করব? না, কোন ফল হল না, আমি অনুমান করে বলছি, কারও সঙ্গে হঠাৎ তোর চেনাশোনা হয় নি ত? তুই বিয়ে করতে চাস না ত?

(লুসিঁদ-এর তরফ থেকে সম্মতির লক্ষণ প্রকাশ পেল, লিজেৎ-এর প্রবেশ)

লিজেৎ। আরে কর্তা যে, মেয়ের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন, ব্যাপার কী বুঝতে পেরেছেন ত?

স্পানারেল। না! বেহায়াটা আমার মাথায় খুন চাপায়—

লিজেৎ। আপনার মেয়ের সঙ্গে আমাকে বোঝাপড়া করতে দিন, আমি তাকে কিছু বোঝাতে পারব।

স্পানারেল। না, জ্বালাতন করবার কোন দরকার নাই মেয়ে যদি এরকম ব্যবহার করে তাহলে মেয়েকে একা থাকতে দেওয়াই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হবে।

লিজেৎ। আমাকে দিয়ে চেষ্টা করিয়ে দেখুন না। আপনার মেয়ে মন খোলাসা করে হয়তো আরও কিছু বলতে পারে। ভাল কথা, বাদশাজাদী শুনছেন আপনি কী বললেন না ব্যাপারটা কী? দৃঢ় ধারণা করে আপনি কী বেঘোরে এমন কষ্ট দেবেন? আমি চিন্তা করতে পারি না যে আপনি এই রকম ব্যবহার করেই চলবেন। বাবাকে আপনি যা বলতে লজ্জা করেন, তা আমার কাছে বলতে ভয়ের কিছু নাই। কাছে এস, বাবার কাছ থেকে কিছু তুমি চাও, তিনি পইপই বলেছেন তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য হেন কাজ নেই যা তিনি করবেন না। তুমি যে সুখ স্বাধীনতা চাও তা কী তোমার নাই? তুমি আর কী বেশী চাও যা হলে তুমি আরও স্বাধীনতা পাবে? এঃ! কেউ তোমাকে রাগিয়েছে দেখছি? কোন জোয়ান ছেলেকে দেখে বিয়ে করবার বাসনা হয়েছে বুঝি? আঃ—এখন বুঝেছি! সুতরাং ব্যাপারটা বুঝেছি। আমার কপাল ভাল, এ জন্য এত গণ্ডগোল, কর্তা গোপন কথা বেরিয়ে পড়েছে, রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেছে, সমস্যাটা হচ্ছে—

স্পানারেল। অকৃতজ্ঞ মেয়ে! বেরিয়ে যাও, তোমাকে আমার বলবার কিছুই নাই, নিজের গোঁ ধরে তোমাকে থাকবার ভার আমি দিলাম।

লুসিঁদ। কিন্তু বাবা, আমাকে তুমি যে বলতে বললে—

স্পানারেল। না। তোমাকে আমি আর ভালবাসি না।

লিজেৎ। কর্তা, গণ্ডগোলটা হচ্ছে—

স্পানারেল। ব্যাপারটা হচ্ছে মেয়ে উচ্ছন্নে গিয়ে বাবাকে কবরে পুরে জ্বালাতন করতে চায়।

লুসিঁদ। না বাবা, সত্যিই আমি চাই—

স্পানারেল। তোমাকে লালন পালন করে তোমার কাছ থেকে অনেক ভাল কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম।

লিজেৎ। কিন্তু কর্তা—

স্পানারেল। না, মেয়ের ওপর আমার আর কোন আস্থা নাই।

লুসিঁদ। কিন্তু বাবা—

স্পানারেল। না, তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

লিজেৎ। কিন্তু—

স্পানারেল। বেহায়া মেয়ে!

লিজেৎ। কিন্তু—

স্পানারেল। অকৃতজ্ঞ মেয়ের ধৃষ্টতা দেখেছ?

লিজেৎ। কিন্তু—

স্পানারেল। মিথ্যুক বলবে না কোথায় তার দোষ আছে।

লিজেৎ। কর্তা, আপনার মেয়ে একজন স্বামীকে চায়।

স্পানারেল। (না শোনবার ভাণ করে) না, মেয়ের বিয়ের করণীয় আমার কোন কাজ আর নাই।

লিজেৎ। একজন স্বামী?

স্পানারেল। মেয়েকে আমি সইতে পারছি না।

লিজেৎ। একজন স্বামী।

স্পানারেল। ও আমার মেয়ে নয়।

লিজেৎ। একজন স্বামীর দরকার।

স্পানারেল। না, আমি একটা কথাও শুনতে পারছি না।

লিজেৎ। একজন স্বামী।

স্পানারেল। আমি আর একটা কথাও শুনব না।

লিজেৎ। একজন স্বামী—স্বামী—একজন 'স্বামীর' দরকার।

[স্পানারেলের প্রস্থান।

বড় সত্যি কথা, যারা শুনতে চায় না, তাদের চেয়ে আর বেশী কালা নাই।

লুসিঁদ। আচ্ছা লিজেৎ, তুমি ভেবেছিলে মনের ভাব গোপন করে আমি ভুল করেছি। বাবার কাছে মনের কথা বলার দরকার ছিল, তাহলে তিনি দেবেন আমি যা চাইব—এই ধারণা তোমার ছিল, এখন তুমি দেখ।

লিজেৎ। হায় রে কপাল, বুড়োতাবড়াটার হল কী? কর্তাকে গোঁজ দিয়ে বাঁধতে হবে—কিন্তু আমার ওপর কী তোমার বিশ্বাস নাই?

লুসিঁদ। ও ভগবান! আমার আর কী ভাল হবে? লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়েই বা কী হবে? তুমি কী জান আগে থেকে কী হবে আমি জানতাম, বাবা যে কী করবে, তা কী আমি জানতাম না? তুমি কী বুঝতে পার না আমি মনমরা হয়ে এই কারণে—যখন বিয়ের প্রস্তাব এল তখন বাবা সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

লিজেৎ। কী! যে লোকটা নতুন এখানে এসেছে—তোমাকে গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছে—তাকে কী তুমি—

লুসিঁদ। একটা যুবতী মেয়ের মনের ভাব সব সময় খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে তোমার কাছে স্বীকার করতে দোষ নাই—ওর উপর আস্থা রেখে সেই লোকটাকে আমি বেছে নেব। আমাদের মধ্যে এখনও কথার বিনিময় হয় নি—লোকটা আমাকে কখনও বলে নি সে আমাকে ভালবাসে—কিন্তু চালচলন ও কথাবার্তায় লোকটাকে বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে বলেই সে আমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছে—এ সব দেখে তার প্রতি অনুরক্ত না হয়ে পারি না। এখন তুমি বুঝছ—বাবার যখন ইচ্ছে নাই তখন আর তাকে ভালবেসে লাভ কী?

লিজেৎ। আমার ওপর এ ভার ছেড়ে দাও। হয়ত তুমি আমার দোষ দেখবে; যেহেতু আমার ওপর খুব ভরসা রাখ নি—কিন্তু এখন আর তোমাকে হতাশ করব না—যদি সত্যিই তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে থাক—

লুসিঁদ। বাবার মত না থাকলে আমি কী করতে পারি? তিনি যা গোঁ ধরেছেন!

লিজেৎ। বলে যাও, বলে যাও, তবে তোমার উচিত নয় র্বদা বাবাকে তার মত অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া—নিজের তে বাবাকে আনতে তোমার লজ্জার কী আছে? তোমার াবা তোমার কাছে কী আশা করে? বিয়ের বয়স তোমার হয় নি? মি পাথরে গড়া নাকি? এ সব বিষয়ে তিনি কী ভাবেন? থামলে বে না—তোমার একবার চেষ্টা করা উচিত—এখন থেকে সব ভার আমি নিলাম—তুমি জান, অনেক ফন্দী-ফিকির আমি জানি—ঐ—ঐ তিনি আসছেন—তুমি এখন এস—আমার ওপর সব ছেড়ে দাও। [উভয়ের প্রস্থান।

স্পানারেল। কে কতখানি বুঝেছে এমন ভাব দেখান উচিত নয়—সে কী চায়, এ কথা তাকে বলতে না দিয়ে ভালই করেছি। এর কারণ হচ্ছে যে মেয়ের বিয়ে দিতে আমি মোটেই প্রস্তুত নই—উঃ, কী সাঙ্ঘাতিক রীতি-নীতি! বাপ হয়ে পালন করতে হবে এর চেয়ে কী আর হাস্যকর হতে পারে—খেটে রোজগার করা টাকাকড়ি খরচ করতে হবে—মেয়েকে স্নেহ-যত্ন দিয়ে পালন করতে হবে। শেষে কী না মেয়েকে টাকা দিয়ে একটা লোকের কাছে বিকাতে হবে—সব ঠুকরিয়ে গ্রাস করবে। না, না, এ সব আজেবাজে কাজে আমার করবার কিছু নাই—টাকা আর মেয়েকে আমার কাছে রাখা সব চেয়ে ভাল হবে।

[স্পানারেলকে দেখতে পায় নি, এই ভাণ করে মঞ্চের ওপর লিজেৎ দৌড়ায়।]

লিজেৎ। ও! সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! কর্তা, আমার পুরোনো মনিব কোথায় আপনি—

স্পানারেল। (জনান্তিকে) চাকরাণী আবার কী বলে?

লিজেৎ। (চার পাশ ঘুরতে ঘুরতে) বাবার মনে সুখ নাই! এ খবর শুনলে কী বলা হবে?

স্পানারেল। (জনান্তিকে) এমন কী ঘটনা সে বলবে?

লিজেৎ। হতভাগ্য আমার কর্তার মেয়ের! হায় বাছা আমার।

স্পানারেল। সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

লিজেৎ। আঃ!

স্পানারেল। (তা'র পিছনে ছুটে) লিজেৎ!

লিজেৎ। (ইতস্তত দৌড়িয়ে) কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!

স্পানারেল। লিজেৎ!

লিজেৎ। একেই বলে পোড়া কপাল!

স্পানারেল। লিজেৎ!

লিজেৎ (থেমে)। আরে কর্তা, আঃ!

স্পানারেল। আঃ আবার কী?

লিজেৎ। কর্তা!

স্পানারেল। এমন কী ঘটেছে?

লিজেৎ। আপনার মেয়ে কর্তা!
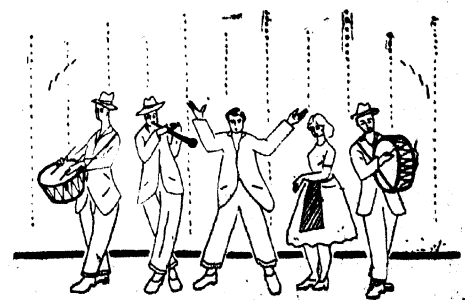
স্পানারেল। আঃ!

লিজেৎ। আপনি অমন করে কথা বলবেন না, আপনার কিছু করবার নাই—সব আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

স্পানারেল। শীগগিরি আমাকে বল।

লিজেৎ। আপনার মেয়ে কর্ত্তা, আপনি রেগে আপনার মেয়েকে কথা বলবার পর ব্যথা পেয়ে অভিমানে তার শোবার ঘরে যায়—জানলা খুলে নদীর দিকে তাকাচ্ছিল—

স্পানারেল। বেশ, বলে যাও।

লিজেৎ। আকাশের দিকে চোখ তুলে বলল: না, বাবা যদি আমার ওপর রাগ করে তা হলে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা হয় না। মেয়ে হিসাবে আমাকে সে অস্বীকার করেছে—সুতরাং মরা ছাড়া আর কোন পথ নাই।

স্পানারেল। তারপর মেয়ে আমার বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল?

লিজেৎ। আজ্ঞে না কর্ত্তা, আপনার মেয়ে আস্তে আস্তে জানলা ভেজিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার পর খুব কাঁদতে লাগল। আপনার মেয়ে হঠাৎ ফ্যাকাশে মেরে গেল—চোখ বুঁজে পড়ে রইল। বুকের স্পন্দন নাই, আমার বাহুর মধ্যে সে পড়ে রইল।

স্পানারেল। হায়, আমার মেয়ে মারা গেছে?

লিজেৎ। আজ্ঞে না কর্ত্তা! মেয়েকে আচ্ছা করে ঝাঁকানি দিলাম জোরে—তারপর আপনার মেয়ের খাত এল। তারপর থেকে সেই উপসর্গটা মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করছে—আমার সন্দেহ হচ্ছে। এ রকম উপসর্গ আর ক'বার দেখা দিলে—ভালোয় ভালো দিনটা কাটলে হয়।

স্পানারেল। শাঁপান—শাঁপান—শাঁপান!

(পার্ষদের প্রবেশ)

শীগগির ডাক্তার ডাক—এক সঙ্গে অনেক জনকে ডাক। শিরে সংক্রান্তি—এক সঙ্গে বহু ডাক্তার না পেলেও পেতে পারি। হায়! মেয়ের কী হল! হায় বাছা আমার!

[স্পানারেলের প্রস্থান।

নাচতে নাচতে শাঁপান চার জন ডাক্তারের গৃহে কড়া নাড়ে। স্পানারেলের বাড়ীতে ঢোকবার আগে কেতাদুরস্ত ভাবে নাচতে নাচতে ডাক্তারেরা প্রবেশ করে।

[প্রথম অঙ্কের যবনিকা]

দ্বিতীয় দৃশ্য

লিজেৎ। কর্ত্তা, চারটে ডাক্তারে আপনার কী হবে? মেয়েটাকে মারবার পক্ষে একটা ডাক্তার কী যথেষ্ট না?

স্পানারেল। চুপ কর। একটা মতের চেয়ে চারটে মত ভাল।

লিজেৎ। এ সব লোকদের পরামর্শ না নিয়ে আপনার মেয়েকে মরে যাওয়ার অনুমতি কী দেওয়া যায় না?

স্পানারেল। তুমি কী বলতে চাও, ডাক্তারেরা লোকদের সারিয়ে তোলে না?

লিজেৎ। নিশ্চয়ই তারা সারিয়ে তোলে লোকদের। আমি একটা লোককে জানতাম। সে লোকটা বলত তুমি এমন কোন লোকদের কথা বলবে না যারা প্লুরিসি বা জ্বর হয়ে মারা গেছে। কিন্তু কর্ত্তা, লোকটা শেষে চারটে ডাক্তার আর দুটো ঔষধ ব্যবসায়ীর কবলে পড়ে বেঘোরে মারা গেল।

স্পানারেল। চুপ কর। এই সব ভদ্রলোকদের আমরা অসম্মান করব না।

লিজেৎ। আমার কথা শুনেন কর্ত্তা, আমাদের বাড়ীর বিড়ালের বাচ্ছাটা বাড়ীর ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল। বিড়ালটা এখন অবশ্য বহাল তবিয়তে আছে, তবে তিন দিন হল বিড়ালটা কিছু খায় নি আর এক চুলও নড়ে নি। তবে একটা সৌভাগ্যের কথা, কর্ত্তা, বিড়ালের ডাক্তার নাই, এই রক্ষে, তা না হলে বিড়ালটাকে ডাক্তারেরা শেষ ফেলত। নাড়িভুঁড়ি বার করে রক্ত বার করে তবে ডাক্তারেরা ক্ষান্ত হত।

স্পানারেল। আঃ একটু চুপ কর! আমি তোমাকে চুপ করতে বলছি। এ রকম বাজে কথা আমি শুনিনে। এই দিকে তাঁরা আসছেন।

লিজেৎ। প্রমাণ পাবেন কর্ত্তা! লাটিন ভাষায় তারা বলবে কোথায় মেয়ের দোষ-ত্রুটি আছে।

(ডাক্তার তোমে, দে ফঁ নাদর, মাক্রোতা ও বাহি-এর প্রবেশ।)

স্পানারেল। আসুন—আসুন মাননীয় ডাক্তারবাবুরা।

ডাঃ তোমে। রোগিণীকে আমরা খুব যত্ন করে দেখেছি, সন্দেহ আমাদের আর নাই; কারণ আপনার মেয়ের মনে ময়লা জমেছে।

স্পানারেল। আমার মেয়ের মনে ময়লা!

ডাঃ তোমে। হুম! আমার বলা উচিত আপনার মেয়ের ধাতে অনেক ময়লা জমেছে—অনেক জটিল উপসর্গ রয়েছে।

স্পানারেল। ওঃ, আমি বুঝতে পারছি।

ডাঃ তোমে। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করতে চাই।

স্পানারেল। জলদি, ভদ্রলোকদের জন্তে চেয়ার নিয়ে এস।

লিজেৎ। (ডাঃ তোমেকে) ও ডাক্তারবাবু, আপনি দলের একজন, তাই কী?

স্পানারেল। ডাক্তারদের তুমি জানলে কী করে?

লিজেৎ। আপনার ভাইঝির বন্ধুর বাড়ীতে এদের আমি দেখেছিলাম।

ডাঃ তোমে। সেই মহিলার গাড়োয়ান কেমন আছে?

লিজেৎ। বহাল তবিয়তে আছে, কিন্তু সে মারা গেছে।

ডাঃ তোমে। মারা গেছে?

লিজেৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডাঃ তোমে। অসম্ভব!

লিজেৎ। সম্ভব কী অসম্ভব জানি না, তবে এইটুকু জানি সে মারা গেছে।

ডাঃ তোমে। আমি বলছি, সে মারা যেতে পারে না।

লিজেৎ। আমি বলছি, সে মারা গেছে আর তাকে কবরে রাখা হয়েছে।

ডাঃ তোমে। আপনি ভুল বলছেন।

লিজেৎ। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ডাঃ তোমে। এগুলো প্রশ্নের আওতার বাইরে। শঠেরা বলে এ রকম উপসর্গ চোদ্দ অথবা পনের দিন থাকে, মোটে ছ'দিন হল রোগিণী অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

লিজেৎ। শঠেরা যা ইচ্ছে তা বলতে পারে কিন্তু সে গাড়োয়ান মারা গেছে।

স্পানারেল। চুপ কর বাচাল কোথাকার। এখানে এস। মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের পরামর্শ করবার জন্ম সব সুযোগ সুবিধে দিতে আমি রাজী আছি। আগাম টাকা দেওয়ার অবশ্য রেওয়াজ নাই, তবে এ-ক্ষেত্রে আমি এ-সব কিছু ধরছি না সমস্যার সমাধান করবার জন্ম। হাঁ এখানে [স্পানারেল সকলকে টাকা দেয়, প্রত্যেক ডাক্তার স্বীয় বিশিষ্ট ভঙ্গিতে টাকা নেয়, স্পানারেল লিজেৎ-এর সঙ্গে প্রস্থান করে।]

(ডাক্তারেরা সকলে বসে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেয়)

ডাঃ দে ফঁ নাদর। প্যারী দিন দিন বেশ আয়তনে বড় হচ্ছে—পসার যদি বেড়ে যায় তা হলে রুগী দেখা ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়বে।

ডাঃ তোমে। তুমি বোধ হয় জান আমি খচ্চর ব্যবহার করি। এ কাজের পক্ষে ও একটা ভাল ভারবাহী পশু। খচ্চর একদিনে কতটা পথ চলে তা জানলে তুমি অবাক হবে।

ডাঃ দে ফঁ নাদর। আমার একটা তেজী ঘোড়া আছে, সোজা কথা বলতে কী ঘোড়াটার ক্লান্তি নাই।

ডাঃ তোমে। আজকে খচ্চরটা কতটা পথ হেঁটেছে জান? আমি আরসিনাল থেকে যাত্রা সুরু করি। তারপর কবর্ণসেণ্ট জার্মাণের শেষ সীমানা পর্যন্ত যাই। সেখান থেকে মারের শেষ চৌহদ্দি পর্যন্ত যাই, মায়ের শেষ সীমানা থেকে পোর্ট সেণ্ট অনরেতে যাই, পোর্ট সেণ্ট অনরে থেকে কবর্ণ সেণ্ট জ্যাকসে যাই, কবর্ণ সেণ্ট জ্যাকস থেকে পোর্ত দ' বিশলুতে যাই, পোর্ত দ' বিশলু হতে বরাবর এখানে আসি—আবার এখান থেকে আমাকে প্লেস রয়ালীতে যেতে হবে।

ডাঃ দে ফঁ নাদর। আজকে যতখানি পারবার কথা ততখানি আমার ঘোড়া কাজ করেছে। তা ছাড়া রুয়েলে আমাকে রুগী দেখতে যেতে হবে।

ডাঃ তোমে। বেশ ভাল কথা! কথায় কথায় বলছি, ডাঃ থেওফ্রাস্থ আর অটোমর্ডাসর মতের যে বাদবিবাদ বিষয় তুমি কী বল? মনে হচ্ছে দুটো বিপরীত শিবিরে সকলে ভাগ হয়ে পড়বে।

ডাঃ তোমে। হ্যাঁ, আমারও তা মনে হয়। অবশ্য তার চিকিৎসায় রোগী মারা গিয়েছে এ কথা আমরা জানি। সম্ভবতঃ থেওফ্রাস্তের মত তাকে বাঁচাতে পারত, কিন্তু সোজা কথা থেওফ্রাস্ত ভুল করেছে। তার পুরানো বন্ধুর ব্যবস্থাপত্র নিয়ে ঝগড়া না করাই উচিত ছিল। তুমিও কী ঐরূপ ভাব?

ডাঃ দে ফঁনাদর। এ বিষয়ে সন্দেহই নাই। যা কিছুই ঘটুক না কেন, পেশাদারী শিষ্টাচার মানা উচিত।

ডাঃ দে ফঁ নাদর। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তবে যা কিছু ঘটুক না কেন, রুটি-রুজি যার ওপর নির্ভর, সেই পেশাদারী শিষ্টাচার মানা উচিত।

ডাঃ তোমে। হ্যাঁ, সব নিয়ম আমি মানি, তবে বন্ধুদের মধ্যে নয়। সেদিন আমাদের দলছাড়া একজন লোকের সঙ্গে আমরা তিন জন পরামর্শ করতে গিয়েছিলাম, আমি সে আলাপ-আলোচনা থামিয়ে দিই। পেশাদারী চিকিৎসক হিসাবে মত প্রকাশ না করলে আমি কাউকে মত প্রকাশ করবার সুযোগ দেব না। অবশ্য সে বাড়ীর লোকেরা যা পেরেছিল, তা করেছিল। রোগী ক্রমশঃ খারাপের দিকে গেলেও আমি মত দিই নি। তর্কাতর্কির সময় রোগী বেশ সাহস দেখিয়ে পটল তুলল।

ডাঃ দে ফঁ নাদর। সাধারণ লোকের অজ্ঞতা বিষয়ে লোকেদের কেমন করে ব্যবহার চালচলন শেখান যেতে পারে—এ শেখান খুব সোজা। কেমন করে সেবা করতে হয়, এ শেখান লোকদের খুব ভাল কাজ। তা হলে তারা নিজেদের ভুল-ত্রুটি ধরতে পারবে।

ডাঃ তোমে। মানুষ মরলেই মরে—এটাই হচ্ছে সোজা কথা। কিন্তু শিষ্টাচার কেউ না মানলে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতির পথে বাধা ঘটতে পারে।

(স্পানারেলের প্রবেশ)

স্পানারেল। আমার মেয়ের অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছে—দয়া করে তাড়াতাড়ি বলুন, আপনারা কী ঠিক করলেন।

ডাঃ তোমে। (দে ফঁ নাদরকে) আসুন মশাই!

ডাঃ দে ফঁ নাদর। দয়া করে আপনিই আগে বলুন।

ডাঃ তোমে। না, না, আর বিনয় প্রকাশ করে লজ্জা দেবেন না।

ডাঃ দে ফঁ নাদর। এ কী বলছেন, আপনারা থাকতে আমরা ত মত দিতে পারি না।

ডাঃ তোমে। মশায়, অনুগ্রহ করে বলুন।

ডাঃ দে ফঁনাদর। দোহাই মশায়, আপনি অনুগ্রহ করে বলুন।

স্পানারেল। ওঃ! আপনারা দয়া করে বলুন, বিনয় রেখে আপনারা বলুন। মনে রাখবেন, ব্যাপারটা খুব জরুরী!

ডাক্তারেরা সমস্বরে বলে:

ডাঃ তোমে।	আপনার মেয়ের উপসর্গ···
ডাঃ দে ফঁনাদর।	এই সব ভদ্রমহোদয়ের মতে···
ডাঃ মাক্রোতাঁ।	অনেক ব্যাপক সলাপরামর্শের পর···
ডাঃ বাই।	ঠিক করা হয়েছে

স্পানারেল। দয়া করে আপনারা একে একে বলুন।

ডাঃ তোমে। আপনার মেয়ের রোগ নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলাপ-আলোচনা করছিলাম। আমার ব্যক্তিগত মত—আপনার মেয়ের রক্তের চাপ বেড়ে গেছে, আমার মত হচ্ছে রক্তমোক্ষণ করা।

ডাঃ দে ফঁ নাদর। আমার মনে হয়, অতি ভোজনের জন্ম আপনার মেয়ের দেহে পচন ধরছে—এখন বমি করিয়ে দিলে আপনার মেয়ে সুস্থ হবে।

ডাঃ তোমে। বমি করালে আপনার মেয়ে মারা যাবে।

ডাঃ দে ফঁ নাদর। ওর মতের বিপক্ষে আমি আরও জানাচ্ছি, রক্তমোক্ষণ করলে রোগিণীর অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাবে।

ডাঃ তোমে। তুমি নিজেকে খুব চালাক বলে চালাতে চাও।

ডাঃ দে ফঁ নাদর। আমি কি বলছি তা তুমি জান না। পেশাদারী প্রশ্নে আমি তোমাকে অনেক রোগের সূত্র বলে দিতে পারি।

ডাঃ তোমে। সেদিন তুমি কি করেছিলে তা ভুল না যেন।

ডাঃ দে ফঁ নাদর। এটা ভুল না যেন তিন দিন আগে তুমি সেই ভদ্রমহিলাটিকে স্বর্গে পাঠিয়েছ।

ডাঃ তোমে। (স্পানারেলের প্রতি) আমার মত আপনি নিন।

ডাঃ দে ফঁ নাদর। আমার মত কী, তা আপনি জানেন?

ডাঃ তোমে। বিলম্ব না করে যদি মেয়ের রক্তমোক্ষণ না করেন তা হলে ধরে নিন আপনার মেয়ে অক্কা পেয়েছে [প্রস্থান।

ডাঃ দে কঁ নাদর। আর রক্তমোক্ষণ যদি মেয়ের করেন তাহলে পনের মিনিটও আপনার মেয়ে আর বাঁচবে না [প্রস্থান।

স্গানারেল। কার কথা আমি বিশ্বাস করি? এরকম দুটো পরস্পর-বিরোধী মত শুনে আমার করবার কী আছে? মশাই দোহাই, আমি অনুরোধ করছি আপনারা শান্ত হোন। আমাকে নিরপেক্ষ মত দিন—কোন চিকিৎসায় আমার মেয়ে সেরে উঠবে।

ডাঃ মাক্রোতা। এই ব্যাপার দেখে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে কেউ কিছু করবে না। শঠের চূড়ামণিরা বলেছেন এরকম ভুল হলে ফল মারাত্মক হতে পারে।

ডাঃ বাই। (তোতলামির সুরে দ্রুত বলে) হ্যাঁ, লোকের সাবধান হওয়া দরকার। এ ঘ-ট-নায় এরকম-ছে-ছেলে-খেলা করা চলে না। এটা খুব সহজ কাজ না—যাতে করে সহজেই মীমাংসা হবে। য-যদি আপনি কোন ভুল করে বসেন-ভাবুন গবেষণা করে দেখুন—লাফ দেওয়ার আগে চারি দিকে ভাল করে দেখে নিন—সব কিছু মাপজোখ করে নিন। রোগীর ধাত—ধা-ত আপনারা ভাল করে বিচার করুন। রো-গের কারণ নির্ণয় করে ভাল হওয়ার ব্যবস্থা-পত্র দিন।

স্গানারেল। (জনান্তিকে) মরণ দশার মতন ধীর—মুখ থেকে থুতু ফেলার মতন চকিতে এরা কিছু করতে পারে না।

ডাঃ মাক্রোতা। (আগেকার মতন) রোগের রহস্য ধরে আমি রোগ নির্ণয় করেছি, আপনার মেয়ের রোগ খুব পুরোনো। এখনও মেয়ের জন্য যদি কিছু না করেন তা হলে সাঙ্ঘাতিক উপসর্গ দেখা যাবে। তা ছাড়া মনে হচ্ছে, তার পেটে বায়ু জমে মাথার স্নায়ুর ওপর প্রবাহ হচ্ছে। গ্রীক ভাষায় একে বায়ুরোগ বলে। পাগলা এই উপসর্গ পেটের মধ্যে আঠার মত সেঁটে থাকে।

ডাঃ বাই। (আগেকার মতন সুরে) এ রোগের উপসর্গগুলো এমন সাঙ্ঘাতিক যে শরীরে জ্বালা করতে থাকে আর বায়ু শেষে মাথার স্নায়ুগুলোকে সরাসরি গ্রাস করে।

ডাঃ মাক্রোতা। (আগেকার মতন সুরে) সুতরাং ব্যাপারটা খুব গুরুতর, উপসর্গগুলো তাড়ান এখনই দরকার। তা'হলে শরীর হাল্কা হবে আর ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু আগে—এটা আমি মনে করি—বেদনা দূর করবার আপত্তি যদি না থাকে, তা'হলে আমি প্রস্তাব করছি খানিকটা মিষ্টি সিরাপের—এ খেলে রুগীকে চাঙ্গা করে তুলবে।

ডাঃ বাই। (আগেকার মতন) তারপর রুগীর রক্তমোক্ষণ করব।

ডাঃ মাক্রোতা। (আগেকার মতন) এত চিকিৎসা করা সত্ত্বেও বলা যায় না যে আপনার মেয়ে মারা যেতে পারে। আমরা চিকিৎসা করে তৃপ্তি পেয়েছি এ ভাবটা যেন থাকে। মারা গেলে জানব, চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী রোগী মারা গেছে।

ডাঃ বাই। (আগেকার মতন) বাঁচার চেয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী মরা অনেক ভাল।

ডাঃ মাক্রোতা। আমরা খোলাখুলি ভাবে আপনাকে আমাদের মত জানাচ্ছি।

ডাঃ বাই। ঠিক একজন লোক অপর একজনকে যেমন মত জানায়।

স্গানারেল (ডাঃ মাক্রোতার সুর ভাঙ্গিয়ে) আমি আপনাদের কাছে খুবই অনুগৃহীত। (তারপর ডাঃ বাই এর সুর নকল করে) ধ-ন্য-বা-দ। আপনাদের কষ্ট দিয়েছি বলে ধন্যবাদ।

[ডাক্তারদের প্রস্থান।

স্গানারেল। আগেকার চেয়ে বুদ্ধি আমার বেড়েছে, বুদ্ধি খেলেছে মাথায়, বাজারে গিয়ে সেই ওষুধটা কিনব, এ ওষুধ সব রোগ সারিয়ে দেয়, সব লোকের মুখে এ ওষুধের কথা।

(হাতুড়ে ওষুধবিক্রয়কারী ভেগুারের প্রবেশ)

স্গানারেল। এই যে মশাই, এক শিশি ওষুধ দিন ত'। এখনই দামটা দিচ্ছি।

হাতুড়ে ওষুধ বিক্রেতা। (গানের সুরে) সাগর দিয়ে ঘেরা সব দেশের সম্পদ, যে ওষুধ আমি বেচছি তা কী দাম দিয়ে পাওয়া যায়? আমি হলফ করে বলছি, রোগ সারবেই, সব রোগের এ দাওয়াই! ওষুধ বা মলম হিসাবে ইচ্ছেমত আপনি ব্যবহার করুন। খোস, ব্যথা, পক্ষাঘাত, বাত যে কোন আধি ব্যাধি, ব্যামো হোক না কেন, আমি হলফ করে বলছি এক শিশি এ ওষুধ খেলে মেয়ে-পুরুষের সব রোগ সারিয়ে দেবে। সত্যি ছাড়া মিথ্যা বলছি না, এ সব রোগের ওষুধ। ইচ্ছামত ব্যবহারে সব রোগ সারে, মলম বা ওষুধ হিসাবে খোস, ব্যথা ইত্যাদি।

স্গানারেল। আমি বুঝছি, পৃথিবীর সব সোনাদানার বিনিময়েও আপনাদের মতন ধন্বন্তরি এমন ওষুধ কোথাও পাওয়া যায় না। এই যে এক শিশি-এর বেশী নাই, ইচ্ছে করলে এ নিয়ে ওষুধ দিতে পারেন, না'ও দিতে পারেন।

[ভেগুার গান করতে থাকে। ভাঁড় ও অন্যান্য লোকেরা ভেগুারের দিকে আগ্রহ ও আত্মতৃপ্তভাবের দৃষ্টিতে তাকিয়ে নাচতে থাকে।]

(দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা।)

তৃতীয় দৃশ্য

ডাঃ ফিলরাঁ, ডাঃ তোমে, ডাঃ দে কঁ নাদর

ডাঃ ফিলরাঁ। আপনাদের কী লজ্জা নাই, বুদ্ধি বলে মশাই আপনাদের কিছু নাই? আপনাদের মতন বয়সের লোকেরা ছোট ছেলের মতন মাথা গরম করছেন! এ-রকম ঝগড়া করলে আমাদের নাম-যশের কত ক্ষতি হয়। চালাক লোকেরা আমাদের আগেকার পণ্ডিতদের যুক্তির ফারাক জেনে ফেলেছে—এটা কী খারাপ না? ঝগড়ার ব্যাপার সকলকে না জানতে দিয়েই আমাদের এই অবস্থা! আমাদের ছল-চাতুরী তারা সব জেনে ফেলবে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, কয়েক জন সহকর্মী খুব খারাপ রীতি গ্রহণ করেছেন। নিজেদের মাঝে খাওয়া-খাওয়ির ফলে ইদানীং আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এখন থেকে সতর্ক না হলে আমাদের সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হবে। অবশ্য আমি নিজের জন্যে খুব উদগ্রীব নই। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ! আমার দিনকাল ভালই চলছে। ঝড় হোক, বৃষ্টি আসুক, যারা মারা গেছে তারা আর জেগে কথা বলবে না। বাঁচার আমার আর ইচ্ছে নেই। ঝগড়া করলে

ডাক্তারদের ভাল হয় না। ভগবানের ইচ্ছে যে যুগ-যুগ ধরে লোকেরা আমাদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে। তাই আমরা পরস্পর খাওয়া-খাওয়ি করে লোকদের ওপর আর গাল পাড়ব না। তাদের দুর্বলতার, ভুলের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা করে পসার বাড়িয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নি। মোদ্দাকথা, মানুষের দুর্বলতার সুযোগ আমরা সকলকে দিই না। মানুষ এই সুযোগটা সবচেয়ে বেশী করে নেয়। অপর মানুষের দুর্বলতা নিজের কাজে লোকেরা লাগায়—খোসামোদপ্রিয় লোকদের তুতিয়ে-তাতিয়ে চাটুকাররা বেশ মোটা কিছু আদায় করে নেয়। সকলে এ দেখে, জানে। রসায়নবিদরা মানুষের টাকার প্রতি ঝোঁকটা কাজে লাগায়—যারা তার কথা শোনে তাদের সোনার পাহাড়ের লোভ দেখায়। জ্যোতিষীরা ভবিষ্যৎ আশার কথা শুনিয়ে সহজ বিশ্বাসী লোকদের কাছ থেকে কিছু রোজগার করে নেয়। তবে দুর্বলতার মধ্যে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা মানুষদের সবচেয়ে বেশী। এইটাই হল আসল কথা। এ কথাতেই আসা যাক—বাইরে এই ভণিতা দেখায়, কারণ মরণভয়ে সব মানুষই আমাদের সম্মান দেখায় আর এই সুবিধা আমরা নিই। সুতরাং মানুষদের যেখানে দুর্বলতা সেই দুর্বলতা আমাদের পুরোপুরি নেওয়া উচিত। রোগীর সামনে ভাঁওতা মারতে হয়। রোগ সেরে গেলে প্রশংসার ভাগ আমরা নেব—না সারলে ধাতের ওপর দোষারোপ করি। আমরা যেন এ ভুল আবার না করি দুর্বল হয়ে না পড়ি। অপরের মাথায় হাত আমরা বুলাব, কারণ রুটি-রুজি এর ওপর সব নির্ভর করে। অপরের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ঘাসের চাপড়ার ভিতর অর্থ রাখি আমরা একটা মহান গৌরবের জন্য।

ডাঃ তোমে। ওটা খুব ভাল প্রস্তাব—কিন্তু একজনের চিন্তাধারা অপরের পক্ষে খুব উগ্র হতে পারে।

ডাঃ ফিলরাঁ। আসুন মশায়েরা, আজে-বাজে সব গুজব ছেড়ে আমরা পাকাপোক্ত একটা ফয়শালা করি।

ডাঃ দে ফঁনাদর। আমি রাজী আছি—সে যদি বমির ওষুধ দিতে রাজী হয় তাহলে যে কোন ব্যবস্থাপত্র অন্য রোগীকে দিক না কেন আমি মেনে নেব।

ডাঃ ফিলরাঁ। এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব হতে পারে না—এর চেয়ে ভাল তুমি প্রত্যাশা করতে পার না।

ডাঃ দে ফঁনাদর। বেশ তা হলে মেনে নিলাম।

ডাঃ ফিলরাঁ। হাতে হাত মেলাও। আর ভবিষ্যতে একটু বিচক্ষণতা দেখাবার চেষ্টা কর।

(লিজেৎ-এর প্রবেশ)

লিজেৎ। আর আপনারা, আপনারা সকলে এখানে আছেন, আপনারা যে ক্ষতি চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর করেছেন সে ক্ষতিতে আপনারা কেউ প্রতিশোধ নেবার চিন্তা একজনও করছেন না।

ডাঃ তোমে। ব্যাপার কী?

লিজেৎ। একজন ধূর্তলোক আপনাদের জিম্মায় রাখা জিনিষ আপনাদের না জানিয়েই চুরি করছে, আপনাদের ব্যবস্থাপত্র বা অনুমতি না পেয়ে রাস্তার একটা লোককে ছোরা দিয়ে সে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে!

ডাঃ তোমে। শুনুন! আপনি হাসছেন—একদিন না একদিন আমাদের কবলে আপনাকে পড়তে হবে। [ডাক্তারদের প্রস্থান।

লিজেৎ। ডাক্তারের কাছে দৌড়ে আমাকে যদি ধরতে পারেন তাহলে আমাকে মারবার পূর্ণ সম্মতি দেব।

(ডাক্তারের পোষাক পরে—ক্লিতাঁদর-এর প্রবেশ)

ক্লিতাঁদর। ভাল কথা লিজেৎ, আমার বিষয়ে এখন কী তুমি ভাবছ?

লিজেৎ। চমৎকার! অনেকক্ষণ ধরে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। আমার আরও স্পর্শালু হওয়া উচিত ছিল, কারণ এখন দেখছি দুই পিরীতের বন্ধু যখন পরস্পরের জন্য হা-হুতাশ করে তখন আমি খুব কষ্ট পাই আর তাদের দুঃখ সরিয়ে দেবার জন্য আমাকে কিছু কাজও করতে হয়। আমি মনে মনে ঠিক করেছি, লুসিঁদকে তার বাবার পীড়নের কবল থেকে যে কোন উপায়ে রক্ষা করব আর তাকে তোমার হাতে তুলে দেব। প্রথমেই তোমাকে দেখে আমার ভাল লেগেছিল। আমি লোকের চরিত্র ধরতে পারি। আমি ভাবতে পারি না যে সে তোমার চেয়ে ভাল পাত্র পছন্দ করতে পারত। ভালবাসা এক একজনকে তাজ্জব কাজে এগিয়ে দেয়। আমরা এক মতলব ঠিক করেছি—যা দিয়ে আমরা কাজ তামিল করতে পারি। সব ঠিক হয়ে আছে, তবে একটা কথা, ভাগ্যি ভাল, বুড়ো লোকটা খুব চটপটে নয়। সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। এর উপরে যদি ফয়শালা করতে না পারি তা হলে আমরা যা করতে চাই তার অনেক পথ খালি আছে। যতক্ষণ না ডাকি বাইরে অপেক্ষা কর।

(ক্লিতাঁদরের প্রস্থান ও স্গানারেলের প্রবেশ)

লিজেৎ। কর্তা, একটা আনন্দের খবর আছে।

স্গানারেল। খবরটা কী শুনি?

লিজেৎ। আনন্দ করুন কর্তা, আনন্দ করুন।

স্গানারেল। কিসের জন্যে?

লিজেৎ। কর্তা, আমি বলছি আপনি আনন্দ করুন।

স্গানারেল। সব কিছু খোলসা করে বল, তা হলে আমি সম্ভবতঃ আনন্দ পাব।

লিজেৎ। না কর্তা, প্রথমে আপনাকে আনন্দ করতে হবে, নাচতে হবে আর একটা গান গাইতে হবে।

স্গানারেল। বেশ তাই হবে, কিন্তু কিসের জন্যে?

লিজেৎ। যেহেতু আমি আপনাকে বলছি।

স্গানারেল। বেশ, তবে তাই হোক। (সে নাচে আর গান করে) লা। লেরা লা! লা লেরা লা, কী আনন্দ!

লিজেৎ। আপনার মেয়ে কর্তা ভাল হয়ে গেছে!

স্গানারেল। আমার মেয়ে সেরে গেছে?

লিজেৎ। হ্যাঁ—আপনার কাছে একজন ডাক্তার এনেছি—এবার এক ভাল ডাক্তার এনেছি—সে আশ্চর্য্য ওষুধ এনেছে, রোগ সারাবার, অন্য সব ডাক্তারকে সে ঘৃণা করে।

স্গানারেল। ডাক্তার কোথায়?

লিজেৎ। আমি তাকে ভেতরে আনছি। [প্রস্থান।

স্গানারেল। অপরের চেয়ে ভাল ফল দর্শায় কী না আমি দেখব।

লিজেৎ। (ডাক্তারের পোষাকে সজ্জিত ক্লিতাঁদরকে নিয়ে আসে)। এই যে ইনি এখানে।

স্পানারেল। ডাক্তারের মতন তার পাতলা চিবুক আছে।

লিজেৎ। দাড়ির ওপর তার নিপুণতা নির্ভর করে না—চিবুক দিয়ে সে রোগ সারায় না।

স্পানারেল। মশায়, আমি জেনেছি রক্তমোক্ষণে আপনি খুব পাকা।

ক্লিতাঁদর। মশায়, অন্য ডাক্তারদের চেয়ে আমার চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তারা কোঁড় দেয়, রক্তমোক্ষণ করে, ওষুধ দেয়, কিন্তু আমি চিঠি, কথা, কৌশল আর মাদুলি দিয়ে রোগ সারাই।

লিজেৎ। আপনাকে কী বলেছিলাম কর্তা?

স্পানারেল। সত্যিই লোকটা অদ্ভুত!

লিজেৎ। কর্তা, আপনার মেয়ে ভাল পোষাক পরে তৈরী হয়ে আছে। আমি এখানে তাকে নিয়ে আসি।

স্পানারেল। হ্যাঁ, নিয়ে এস।

ক্লিতাঁদর। (স্পানারেলের নাড়ী দেখে)। হুঁ! আপনার মেয়ের ঠিকই অসুখ করেছে।

স্পানারেল। এখান থেকে আপনি রোগ ধরেছেন, এটা বোঝাতে চাইছেন।

ক্লিতাঁদর। হ্যাঁ—বাপ আর মেয়ের নাড়ীর সম্পর্ক ধরেই বলছি।

লিজেৎ। (লুসিঁদকে এগিয়ে এনে) এখন, মশাই, মেয়ের কাছে চেয়ার রইল—তাদের একসঙ্গে রেখে আমরা সরে পড়ি।

স্পানারেল। আমি এখানে কিন্তু থাকতে চাই।

লিজেৎ। আপনি কী ভাবছেন? আমাদের যেতেই হবে। এক শ প্রশ্ন ডাক্তারের জিজ্ঞাসা ক'রবার থাকতে পারে, যে কথা লোকের শোনা আদৌ ঠিক না।

(স্পানারেলকে লিজেৎ টানতে টানতে নিয়ে গেল)

ক্লিতাঁদর। (ফিসফিসানির সুরে) আমি খুব সুখী। কী করে সুরু করব তা ভাবতে পারছি না। চোখ মারফত যখন খবর পাঠাতে পারব তখন আমার মনে হয় তোমাকে একশ কথা জানাতে পারব, আমি এখন খোলাখুলি বলতে পারি যা আমি অনেক দিন থেকে আশা করছি। আমার জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসছে, আনন্দে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি

লুসিঁদ। আমিও সেই একই অনুভব করছি—কথা শুনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি।

ক্লিতাঁদর। আমি যা অনুভব করছি তা তুমি যদি অনুভব করতে তা 'হলে তোমার ভালবাসা আমি মাপতে পারতাম আমার নিজের ভালবাসা দিয়ে। এ বিশ্বাস করে আমি কী ঠিক করি নি যে এই সুখের কল্পনা তোমার কাছ থেকে পাচ্ছি—যা তোমার সঙ্গসুখের আনন্দ দিচ্ছে।

লুসিঁদ। এই কল্পনার পুরস্কার আমার নয়—তা হলেও একে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্পানারেল। (লিজেৎকে বলছে) আমার মনে হচ্ছে লোকটা আমার মেয়ের কাছে এগিয়ে আসছে।

লিজেৎ। (স্পানারেলকে বলে) আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে—আপনার মেয়ের মুখ ও হাবভাব দেখছে।

ক্লিতাঁদর। আমার জন্যে তুমি কী তোমার ভালবাসায় একনিষ্ঠ থাকবে?

লুসিঁদ। তুমিও কী তোমার প্রতিজ্ঞা রাখবে?

ক্লিতাঁদর। সারা জীবন ধরে! তোমারই হব—এ ছাড়া আমি আর কিছু চাই না, সর্বদা আমার কাজই এর প্রমাণ দেবে।

স্পানারেল। (ক্লিতাঁদরকে বলছে) আমার অসুস্থ মেয়ে কেমন আছে? মেয়েকে খুশী-খুশী দেখাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

ক্লিতাঁদর। এর কারণ এই যে, আমার জানা রোগ সারাবার ওষুধ প্রয়োগ করেছি, দেহের ওপর মনের খুব প্রভাব আছে। অটিলতার উৎপত্তি মাঝে মাঝে সেখানেই থাকে। সুতরাং দেহ ছেড়ে আগে মনের রোগ সারাবার চেষ্টা করি। সে জন্যই আমি আপনার মেয়ের চাহনি তার আকৃতি, হাতের রেখা দেখছিলাম। তবে যে বিদ্যা আমি জানি সে বিদ্যাকে ধন্যবাদ! আরও জানতে পারলাম, মন থেকে রোগের উৎপত্তি হয়েছে। ব্যামোটা একটা বিশ্রী বিদঘুটে চিন্তা থেকে উঠেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বিয়ে করবার গোপন ইচ্ছে থেকে রোগটা এসেছে। তবে এটা ঠিক, বিয়ে করবার ইচ্ছে থেকে এরোগ হওয়ার জন্যই এ ব্যাপারটা সব চেয়ে বেশী হাস্যাস্পদ হয়েছে।

স্পানারেল (জনান্তিকে)। উঃ, লোকটা কী ধূর্ত!

ক্লিতাঁদর। আমার অবশ্য চিরকাল ছিল আর এখনও আছে—ভবিষ্যতে বিয়ে করবার প্রতি আমার প্রবল বিতৃষ্ণা আছে।

স্পানারেল। কী বড় ডাক্তার রে!

ক্লিতাঁদর। অসুস্থ লোকদের আমাদের কিন্তু হাসাতে হবে। কয়েকটা মানসিক গণ্ডগোল আমি ধরতে পেরেছি, আর এখনই এর যথাবিহিত ব্যবস্থা না করলে সাঙ্ঘাতিক ফল দাঁড়াবে। এই কারণে আপনার মেয়ের কাছে আমি বানিয়ে বলেছি যে, আমি তাকে বিয়ে করার অনুমতি নিতে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে আপনার মেয়ের হাবভাব পাল্টিয়ে গেল। তার রং পাল্টিয়ে গেল, মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর আপনি এই ভাবে আপনার মেয়েকে যদি উৎসাহ দেন, তা হলে দেখবেন আপনার মেয়েকে খুব তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলতে পারব।

স্পানারেল। উত্তম প্রস্তাব। আমি খুব রাজী।

ক্লিতাঁদর। তারপর অবশ্য তার অন্য সব উপসর্গ সম্পূর্ণ ভাবে আমি সারাতে চেষ্টা করব।

স্পানারেল। বেশ ভাল কথা। খুকী, শোন। এই ভদ্রলোক তোমাকে বিয়ে করতে চান—আমি তাকে বলেছি আমার কোন আপত্তি নাই।

লুসিঁদ। ওঃ, এ কী সম্ভব?

স্পানারেল। নিশ্চয়ই।

লুসিঁদ। সত্যিই তুমি বলছ?

স্পানারেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

লুসিঁদ (ক্লিতাঁদরকে) তুমি আমার স্বামী হতে ইচ্ছুক?

ক্লিতাঁদর। হ্যাঁ, মহাশয়া।

লুসিঁদ। আর আমার বাবা মত দিচ্ছে?

স্পানারেল। হ্যাঁ বাছা, আমার মত।

লুসিঁদ। এ যদি সত্যিই সত্যি হয়, তা হলে আমি কত আনন্দ পাব।

ক্লিতাঁদর। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে বহু দিন ধরে ভালবেসে তোমাকে বিয়ে করবার কল্পনা করেছি। আমার এখানে আসার কারণই এই। সত্যি কথা বলতে কী, মাথার পাগড়ীটা শুধু একটা ছদ্ম আবরণ। ডাক্তারের সাজ সেজে তোমাকে পাব, এই আমি চেয়েছিলাম।

লুসিঁদ। এটা হচ্ছে সত্যিকারের স্নেহ। এর জন্যে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্পানারেল। [জনান্তিকে] বোকা! বোকা—বোকা মেয়ে আমার!

লুসিঁদ। বাবা, তুমি কী সত্যিই আমার স্বামী হিসাবে এই ভদ্রলোককে দিতে চাও?

স্পানারেল। নিশ্চয়ই, তোমার হাত দাও! তোমারও হাত দাও।

ক্লিতাঁদর। কিন্তু মশাই!

স্পানারেল। [দম বন্ধ করে হাসি থামিয়ে] না, না—এখন মনকে শান্ত রাখা প্রয়োজন. হাত মিলাও তোমরা, দু'জনেই হাত মিলাও। এখন সব কিছুর মীমাংসা হল।

ক্লিতাঁদর। স্বীকৃতি হিসাবে তোমাকে আমি একটা আংটি পরিয়ে দিচ্ছি। (স্পানারেলকে ফিস ফিস করে) এটা হচ্ছে মাদুলী—মনের ভ্রান্তি সারায়।

লুসিঁদ। তা হলে চুক্তিটা ঠিক করে সব পাকাপাকি করে ফেলি।

ক্লিতাঁদর। এর চেয়ে ভাল আমি আর কিছু চাই না! (স্পানারেলকে ফিস ফিস করে বলে) ওষুধের ব্যবস্থাপত্র আমার যে লোক লেখে, তাকে পাঠাব। তা হলে বিয়ের দলিল লেখা হল বলে বিশ্বাস করবে।

স্পানারেল। খাসা প্রস্তাব!

ক্লিতাঁদর। শুনছেন, ওখানে কে! দলিল লিখে যে লোকটা তাকে পাঠিয়ে দিন, আমার সঙ্গে উনি এসেছেন।

লুসিঁদ। দলিল লেখার রাজকর্ম্মচারীকে তুমি এনেছ?

ক্লিতাঁদর। হ্যাঁ, আমি এনেছি।

লুসিঁদ। কত আনন্দ!

স্পানারেল। মূর্খ! মূর্খ! মূর্খ মেয়ে আমার!

(দলিল ব্যবস্থাকারী রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ) ক্লিতাঁদর তার কানে কানে ফিস ফিস করে।

স্পানারেল। মশাই, এখন এই দুই ছেলেমেয়ের বিয়ের সর্ত্তটা পাকাপাকি ভাবে ঠিক করে ফেলুন। তাড়াতাড়ি লিখুন—(লুসিঁদকে) তুমি দেখছ চুক্তি করা হচ্ছে। (দলিল ব্যবস্থাকারী রাজকর্ম্মচারীকে) মেয়েকে আমি কুড়ি হাজার ফ্রাঁ দিচ্ছি। লিখুন দলিলে।

লুসিঁদ। তোমার কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ বাবা!

দলিল ব্যবস্থাকারী রাজকর্ম্মচারী। এই যে, লেখা শেষ হল, এখন আপনার সই করতে যা বাকী।

স্পানারেল। ওটা খুব তাড়াতাড়ি লেখা হল।

ক্লিতাঁদর। কিন্তু মশাই, অন্ততঃ—

স্পানারেল। না, না, না। আমি আপনাকে বলছি সব বিষয় আমি জানি। (দলিলব্যবস্থাকারী কর্ম্মচারীকে) এস, তাকে সই করতে কলম দাও (মেয়েকে বলেন) তাড়াতাড়ি সই কর, সই কর। হ্যাঁ এখানে সই কর। সই কর, পরে আমিও সই করব।

লুসিঁদ। না, দলিলপত্র আমি নিজের কাছে রাখব!

স্পানারেল। বেশ, তা হলে তাই হোক। (সই তিনি করেন) এখন তোমরা সুখী?

লুসিঁদ। আপনি যা চিন্তা করেন তার চেয়েও বেশী।

স্পানারেল। বেশ কথা, ভাল কথা।

ক্লিতাঁদর। আর একটা কথা বলবার আছে। দলিলের কর্ম্মচারী ছাড়া আমার আরও অনেক কিছু আছে। আমার অন্তর্দৃষ্টি আছে। এই শুভ উৎসব পালন করবার জন্য গায়ক, বাদক এবং নাচিয়েদের এনেছি। তাদের ভিতরে আনা হোক, যাতে করে সকলে আমরা আনন্দ উপভোগ করতে পারি। লোকগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের তৃপ্ত করুক। আমরা যাতে আনন্দ পাই। তাদের ভেতরে আন। নাচের তালের সঙ্গে সব সুরু হোক। অসুস্থ মনকে তারা আনন্দ দান করুক।

প্রহসন, ব্যালেট ও সঙ্গীত।

আমাদের ছাড়া মনুষ্য সমাজেরা
মনে মনে নীচ হয়ে যায়,
আমরা তাই—সুর দিয়ে সব কিছু সারাই।

প্রহসন। কারা তাড়াবে রোগের ঝঞ্ঝাট,
নানা গণ্ডগোল—যা মারতে পারে।
দুঃখ, ব্যথা, হতাশা,
এভাবেই ডাক্তারের কেরামতি,
আমাদের ছাড়া নাইকো গতি।

প্রহসন, ব্যালেট ও সঙ্গীত!

আমাদের ছাড়া মনুষ্য সমাজেরা
মনে মনে নীচ হয়ে যায়
আমরা তাই সুর দিয়ে সব কিছু সারাই।

হাসি ও আমোদের নাচ: ক্লিতাঁদর লুসিঁদকে মঞ্চের বাইরে নিয়ে যায়।

স্পানারেল। সত্যিই লোকদের রোগ সারাবার এ-একটা অদ্ভুত উপায়। আমার মেয়ে আর ডাক্তার কোথায়?

লিজেৎ। তারা বিয়ের চূড়ান্ত মিলনের পর্ব করতে গেছে।

স্পানারেল। তুমি কি বোঝাতে চাইছ—বিয়ের চূড়ান্ত পর্বের ফয়শালা করতে গেছে?

লিজেৎ। আমার কথায় কিন্তু কর্ত্তা, আপনার জালে ধরা পড়লেন। আপনি কর্ত্তা ভাবছিলেন—আমি এতক্ষণ তামাসা করছিলাম এখন এটা কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্যি ঘটনা।

স্পানারেল। শয়তান কোথাকার! (ক্লিতাঁদর আর লুসিঁদ-এর দিকে তিনি ছুটে যান। নাচিয়েরা পথ আগলায়) আমাকে যেতে দাও—আমাকে যেতে দাও—আমি তোমাদের বলছি আমাকে যেতে দাও। (নাচিয়েরা তাকে পিছনে টেনে আনে। নাচিয়েরা তাকে নাচাতে চেষ্টা করে) উঃ, তোমাদের কী মাথা সব খারাপ হয়ে গেছে!

(নাচ)

যবনিকা

অনুবাদক—শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

কিশোরপুরে এসে কেষ্ট উপলব্ধি করে একদিন তার বড় বেশী খাটনী গেছে। কলকাতার ব্যস্ত জীবন থেকে চলে এসে এখানকার শান্তিপ্রিয় অলস দিনগুলি তার কাছে বড় মধুর মনে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে জলখাবার খেয়ে কেষ্ট ছিপ নিয়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে বসে। কত কথা ভাবে, গৌরীর কথা। হয়ত মাছ ওঠে, হয়ত ওঠে না। ব্রজদুলাল দুপুরের দিকে এসে খবর নেয়, কিছু উঠল না কি? কেষ্ট মুখ তুলে বলে, বিশেষ কিছু নয়।

—এ পুকুরে ছিপে ধরবার মাছ নেই, জাল ফেললে রুই কাতলা উঠতে পারে। পুকুরপাড়ে বসে দু'জনে গল্প করে গায়ে তেল মেখে জলে সাঁতার কাটতে নামে। পুকুরের জল খুব পরিষ্কার না হলেও একেবারে পানা-পড়া নয়। অনেক দিন বাদে এভাবে চান করতে পেয়ে কেষ্ট খুসী হয়। বলে, কলকাতায় আর সাঁতার কাটব কোথায়, যাও-বা দু'-একটা জায়গা আছে সময়ের অভাবে আর যাওয়া হয় না।

ব্রজদুলাল সায় দিয়ে বলে, বটেই তো, কলকাতা কত ব্যস্ত সহর।

—আপনি কলকাতায় বেশী যান না?

—ন'মাসে, ছ'মাসে একবার। তাও খুব দরকার না পড়লে নয়।

—কেন?

—ভাল লাগে না।

মিঠু আর কিটু পাড়ে বসে খেলা করছিল, জিজ্ঞেস করে, বাবা, যে ক'টা মাছ উঠেছে নিয়ে যাব?

—এখনও যাস্ নি, শীগগিরি মার কাছে নিয়ে যা।

ওরা দৌড়তে দৌড়তে চলে যায়। কেষ্ট বলে, যাই বলুন, গাঁয়ে দিনকতক বেশ লাগে। কিন্তু চিরকাল থাকতে বড় কষ্ট।

—যার যেমন অভ্যেস।

ব্রজদুলাল কথা বলে খুব শান্ত ভাবে। পাড়ে উঠে গামছা দিয়ে গা-হাত মুছে ভিজে গামছাটা পাট করে মাথায় দিয়ে বলে, চলুন এবার যাওয়া যাক।

বাড়ী ফিরে কেষ্ট দালানে বসে অর্দ্ধসাপ্তাহিক আনন্দবাজারের উপর চোখ বুলায়। পুরোন খবর, তবু সময় কাটাবার জন্যে পড়া।

ব্রজদুলাল রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল, খানিক বাদে বেরিয়ে এসে ডাকে, আসুন, আহার প্রস্তুত।

ভিতরের দালানে শ্যামা আসন পেতে ঠাঁই করে রাখে, দু'জনে পাশাপাশি বসে, শ্যামা নিজের হাতে পরিবেশন করে। শ্যামা বলে, তোমার ধরা মাছ রেখে দিয়েছি কাকু, রাত্রে রেঁধে দেবো।

ব্রজদুলাল বলে, সে না হয় রেঁধো। এখন কাকুকে একটু ঘী দাও মা, গরম ভাতে মেখে খাবেন।

কেষ্ট তৃপ্তি করে খায়। পদের বাহুল্য না থাকলেও, আন্তরিকতা আছে। খাওয়া শেষ করে ঢেকুর তুলে বলে, খুব খেয়েছি!

শ্যামা বলে, তোমার নিশ্চয় কষ্ট হয়েছে, এখানে তো বেশী জিনিষ পাওয়া যায় না। আমি ভেবেই পাই না কি দিয়ে খাবে!

ব্রজদুলাল হেসে ওঠে, খিদে দিয়ে খাবেন, ওর চেয়ে আনন্দ আর কিছুতে পাবেন না।

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে কেষ্ট একটু গড়িয়ে নেয়। কলকাতায় তার শোয়ার অভ্যেস না থাকলেও এখানে শুতে ইচ্ছে করে। তবে বেশীক্ষণ পারে না। দুপুরের রোদ নরম হলেই মিঠু আর কিটু এসে ঠেলা মারে, ওঠ না, বেড়িয়ে আসি। এখুনি সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

কোন রকমে এক কাপ চা খেয়ে কেষ্টকে বেরুতে হয়। শ্যামাকে জিজ্ঞেস করে, তুই যাবি না কি?

শ্যামা জিভ কেটে বলে, তুমি পাগল হয়েছ না কি কাকু, বউ-মানুষ বুঝি বেড়াতে যায়?

কেষ্ট হাসে, খুব গিন্নী হয়েছিস এ ক'দিনে।

মিঠু আর কিটু টানতে টানতে কেষ্টকে নিয়ে যায়। একটা শুকনো খালের ওপর দিয়ে ডিঙ্গি মেরে চলতে চলতে কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, এখানে কোন নদী নেই?

মিঠু বলে, আছে তো। কেলেঘাই নদী, বাবা, বর্ষায় কি বান ডাকে!

খাল পেরিয়ে অল্প দূরে যেতেই কিশোর রাজার গড়। ছেলেরা বুঝিয়ে দেয়, এই রাজার নামেই গ্রামের নাম কিশোরপুর। জায়গাটি বড় সুন্দর! কেষ্ট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এখান থেকে সমস্ত গ্রাম দেখা যায়। কেলেঘাইতে বান এলে ঐ জায়গাটা আরও কত সুন্দর দেখায় কেষ্ট তা সহজেই অনুমান করতে পারে। মিঠু আর কিটু খুসীমত এক একটা জায়গা দেখিয়ে বলে, এখানে রাজার বাড়ী ছিল, এখানে মন্দির ছিল।

একটা ঢিবির উপর বসে কেষ্ট সিগারেট ধরায়। ভাবে, হয়ত সত্যিই এখানে একদিন সমারোহের অন্ত ছিল না। রাজা রাণী, মন্ত্রী সামন্তের উপস্থিতিতে এই গড় গমগম করত। আজ সেখানে ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। মিঠু বলে, জানো দাদু, এখানকার রাণী ভীষণ গরীব হয়ে গিয়েছিল। পাল্কী চড়ে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াত।

কেষ্ট হো-হো করে হাসে, রাণী কখনও ভিক্ষে চায়, তাহলে আর তাকে রাণী বলবে কেন?

মিঠুর অভিমান হয়, তুমি তো আমার কোন কথাই বিশ্বাস করছ না। যাকে খুসী জিজ্ঞেস করে দেখো।

সারা দিন কেষ্টর বেশ ভাল' ভাবেই কেটে যায়। মাছ ধরে,

সাঁতার কেটে, ঘুমিয়ে, বেড়িয়ে এই অলস মন্থর দিনগুলি সে উপভোগ করে। কিন্তু সন্ধ্যে হলে কেষ্টর আর ভাল লাগে না। চার দিক অন্ধকার হয়ে আসে, হ্যারিকেন বাতি জ্বালিয়ে দাওয়ায় বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। যেদিন ব্রজদুলাল তাড়াতাড়ি ছেলে পড়িয়ে বাড়ী ফেরে, সেদিন তবু খানিকটা গল্প হয়। শ্যামা থাকে রান্নাঘরে, রাত্রের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বাইরে আসতে পারে না। মিঠু, কিটু অবশ্য কেষ্টর নিত্যসঙ্গী কিন্তু সন্ধ্যে হলে তাদেরও ঘুম পায়। নতুনমার কাছে খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ব্রজদুলালের ব্যবহার কেষ্টর ভাল লেগেছে। সরল, অমায়িক, ভদ্রলোক। তবে তার জন্যে করুণা হয় এই ভেবে পৃথিবীর অর্দ্ধেক আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। কূপমণ্ডুকের মত কিশোরপুরের এই ছোট্ট গাঁয়ের মধ্যে সে আবদ্ধ। এই তার পৃথিবী, এই তার সব। এক একবার কেষ্ট ভাবে, জোর করে এদের কলকাতায় টেনে নিয়ে গেলে হয়। বৃহত্তর জীবনের সাড়া পেয়ে হয়ত এদের ঘুম ভাঙ্গতে পারে।

এক সন্ধ্যেবেলা কেষ্ট দাওয়ায় বসে এমনি কত কথা ভাবছে। ব্রজদুলাল ফিরল মাষ্টারী করে। জামা খুলে কেষ্টর পাশে বসে হাঁপাতে থাকে। বলে, ওঃ, আজ বড় পরিশ্রম হয়েছে।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, স্কুল তো এখন বন্ধ, এত কি টিউশানী করেন?

—আমার একটা কোচিং ক্লাশের মত আছে। যে সব ছেলেরা উঁচু ক্লাশে পড়ে, কোন কোন বিষয়ে কাঁচা, তাদেরই পড়িয়ে দিই।

—সে রকম ছাত্র ক'জন?

—অনেকগুলি আছে। শুধু আমাদের স্কুলের তো নয়, অন্য স্কুলেরও কয়েকটি ছেলে আসে।

—এ থেকে রোজগার ভাল হয়?

—এমনিই পড়াই। এরা গাঁয়ের ছেলে, ইস্কুলেরই মাইনে দিতে পারে না তো আবার আমায় কি দেবে?

—তবে আর ব্যাগার খাটছেন কেন?

ব্রজদুলাল হাসে, যদি এ বাঁদরগুলো মানুষ হয়।

এই ধরণের কথা শুনলে কেষ্ট বিরক্ত হয়, কি যে বুদ্ধি আপনাদের বুঝি না! পাশ করে এরা করবে কি, চাকরী তো জুটবে না।

—আজ-কাল তাই হয়েছে বটে।

—আজ-কাল কেন, চিরকালই তাই। যার বুদ্ধি আছে সেই করে খাচ্ছে। এম-এ, বি-এ-দের সব চাকর রাখছে। ধরুন না একটা ড্রাইভার, লেখাপড়া শিখেছে না ঘণ্টা। একশ' টাকার ওপর মাইনে পায়, আর পাশকরা কেরাণীর মাইনে ষাট টাকা। বলিহারী লেখাপড়ার ফল—

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—যত ব্যাটা ব্যবসাদার, সব দেখবেন বুদ্ধি খাটিয়ে রোজকার করছে। পেটে লাথি মারলে কোঁক বলবে, ক বলবে না। তবু আপনারা রাত্রি-দিন লেখাপড়া শিখিয়ে কেরাণী তৈরী করবেন।

ব্রজদুলাল উত্তর দেয় না। ম্লান হাসে। কেষ্ট ভেবেছিল হয়ত সে প্রতিবাদ করবে, না করায় নিজের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ওর রোখ চেপে যায়। বলে, আজকের দিনে কা'কে লোকে খাতির করে, যার টাকা আছে, সে চোর হোক, জোচ্চোর হোক, চরিত্রহীন হোক, তবু লোকে তাকে মাথায় করে নাচবে। টাকা না থাকলে আপনি যত সৎই হন, যত ভাল লোকই হন কেউ পুঁছবে না। আমাদের পাড়ায় রঘু বাঁড়ুজ্যে'বলে এক শয়তান আছে। হতভাগা সব রকম ব্যবসা করে, কোনটা সৎপথে নয়। তবু তার কি খাতির, সমাজের একজন মাথা-বিশেষ।

—এ কথা তো আমি অস্বীকার করছি না—

কেষ্ট গলা চড়িয়ে বলে, অস্বীকার করবে কি, এ যে খাঁটি সত্য কথা। আজকে যারা লেখক, তারা দেখে কি করে বই বিক্রী হবে। কি করে বেশী টাকা পাবে। তার জন্যে যত রকম অশ্লীল লেখা তারা দিতে রাজী আছে। যে ডাক্তার, তার ভিজিট পেলেই হল, রুগী বাঁচল কি মরল সেদিকে দৃষ্টি নেই। উকীল ব্যারিস্টার বিধবা অসহায়দের সম্পত্তি মেরে টাকা করার চেষ্টা করছে। যে দেশনেতা সে কি করে নিজের পেটোয়া লোকদের চাকরী করে দেবে, কি করে নতুন কণ্ট্রাক্ট পাবে, সেই সুযোগ খুঁজছে। খবরের কাগজ কতগুলো অবিবেচক টাকাওয়ালা লোকদের হয়ে ড্রাম পেটাচ্ছে, সিনেমায় শুধু যৌন আবেদন। এই হচ্ছে আজকের সভ্যতা, এর বাইরে থাকলে আপনি অসভ্য।

ব্রজদুলাল উঠে পড়ে, দেখি শ্যামা আজ খাবার দিতে এত দেরী করছে কেন।

কেষ্ট বোঝে, ব্রজদুলালের মত লোককে যুক্তি দিয়ে বোঝান অসম্ভব। কতকগুলো ধারণা এদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে, যা কিছুতেই উপড়ে ফেলা যায় না।

বৃহস্পতিবার। কেষ্ট ফেরার সব তোড়জোড় করছিল। কিন্তু শ্যামা কিছুতেই যেতে দিলে না। বলে, আবার কবে আসবে কে জানে, আরও কিছুদিন থেকে যাও।

কেষ্ট চলে আসতে চাইলেও পারেনি। মনে মনে ভাবে সত্যিই তো, এত দিন বাদে শ্যামার সঙ্গে দেখা হল, আরও দু'-একদিন থেকে গেলে যদি সে খুসী হয়, তাহলে ভালই। শুধু শ্যামার জন্যে নয়, ব্রজদুলাল আর বাচ্চা দুটির যুগপৎ পীড়াপীড়িতে কেষ্ট আরও ক'দিন থেকে যাওয়াই স্থির করল। সেই দিনই গৌরীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় তার কলকাতায় ফিরতে আরও দু'-একদিন দেরী হবে।

ভীমেশ্বরী বাজারের কাছে যে অস্থায়ী সিনেমা-হল আছে, সেখানে দু'-একদিনের জন্যে পৌরাণিক ছবি 'ধ্রুব' এসেছে। শ্যামা ধরে বসল, এই ছবিটা আমাদের দেখাও কাকু, কত দিন বায়স্কোপ দেখিনি।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কেন, তোরা যাস না?

—উনি তো সময়ই পান না।

সেই দিনই শ্যামা আর বাচ্চাদের নিয়ে কেষ্ট বাজারে ছবি দেখতে গেল। খড়ের চালের সিনেমা-হল। সামনে সতরঞ্চি, তারপর বেঞ্চি। পেছনে চেয়ার। আট আনা দামের টিকিট করে কেষ্টরা চেয়ারে বসে। মামুলী পৌরাণিক ছবি, তবু দেখতে মন্দ লাগে না। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। শ্যামা দূর থেকে চিনিয়ে দেয়, ওর নাম নিতাই দাস। এই সিনেমাটা ওর—

—তাই না কি? বড়লোক বুঝি?

—হ্যাঁ। কি করে টাকা পেয়েছিল পরে বলব।

ছবি শেষ হলে বাড়ী ফেরার পথে শ্যামা নিতাই দাসের পরিচয় দেয়। বলে, ওর বাবা যখের ধন পেয়েছিল।

—সে আবার কি ?

—নিতাই দাসের বাবা বুড়ো দাস মশাই একদিন ভীমা মায়ের পুকুর থেকে এক যক্ষকে উঠতে দেখলেন। শুনলেন বড় বড় ঘড়ার শব্দ। উনি তো খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন নিশ্চয় ওখানে যখের ধন আছে। তাড়াতাড়ি কাছে পিঠে যা নোংরা জিনিষ ছিল তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘড়াগুলোকে অপবিত্র করে দিলেন। যক্ষ তখন ঘড়া ফেলে জলের মধ্যে চলে গেল। দাস মশাই সারা রাত ধরে এক একটা ঘড়া মাথায় করে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। সত্যি কাকু, বুড়োর মাথায় নাকি একদিনে টাক পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালবেলাই মুখে রক্ত উঠে বুড়ো ম'ল। এই নিতাই দাস। পেল যক্ষের ধন, সেই থেকে এরা বড়লোক।

—কেষ্ট হাসে, যত সব গাঁইয়া গল্প।

—মিন্টু ফোড়ন কাটে, মজুনমা, দাদু কোন কথা বিশ্বাস করে না, সব তাতে' হাসে।

—গল্প করতে করতে তারা যখন বাড়ী ফিরল তখন ব্রজদুলাল খাতা-কলম নিয়ে কি লিখছিল। জিজ্ঞেস করে, কেমন লাগল ? ছেলেরা ছুটে গিয়ে বাবাকে গল্প শোনাতে সুরু করে। এক সময় কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, নিতাই দাসের বাবা যখের ধন পেয়েছিল ?

—ওই রকম কিংবদন্তী আছে।

—আসল ব্যাপারটা কি ?

—বুড়ো নুণের ব্যবসা করে টাকা করে। গান্ধীজি যখন বিলাতী নুণ 'বয়কট' করলেন ও তখন মাথায় করে নুণ নিয়ে বিক্রী করে বেড়াত। লোকটা ছিল এক নম্বর সুবিধাবাদী, একই সংগে বিলিতী কাপড় আর দিশী নুণের ব্যবসা চালিয়েছিল বেনামে।

—তাইতেই ওর টাকা। তবে নিতাইটাও লোক ভাল নয়।

—কেন ?

—টাকা টাকা করে পাগল। সিনেমা খুলে রাজ্যের খারাপ বই এনে দেখায়, জমিদার হিসেবেও দুর্নাম করেছে যথেষ্ট। সেদিন আপনি যে সুবিধাবাদী কৃতী লোকদের কথা বলছিলেন, তাদেরই একজন।

—লেখাপড়া শিখেছিল ?

—না।

—তবেই দেখুন, পয়সা করেছে তো ?

—বদনামও।

—তার মানে ?

—পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে গেছে, তবু লিপ্সার শেষ নেই। গাঁয়ের কত কুমারী এবং বিবাহিত মেয়ের সর্বনাশ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

—তবু তো লোকে তাকে খাতির করে ? তবু তো সে সুখে আছে।

ব্রজদুলাল উঠে পায়চারী করতে করতে বলে, লোকে তাকে খাতির করে নিশ্চয়, যত দিন টাকার খাতির থাকবে ও খাতির পাবে। কিন্তু সুখে আছে বলা যায় না।

—কেন ?

—ওর একটি ছেলে আর একটিই মেয়ে। মেয়েটির পনের বছর বয়েসে অবৈধ সন্তান হয়, সে আত্মহত্যা করে। তারপর থেকে ওর স্ত্রী পাগল। ছেলেটা বদসঙ্গে মেশে, এখনই কত রকম রোগে ভুগছে—এ থেকে কি সুখ-শান্তি থাকে ?

কেষ্ট উত্তর দিতে পারে না। ব্রজদুলাল বলে যায়, কেষ্ট বাবু, একেই বলে ভগবানের চাবুক। মোক্ষম মার, কেউ এড়াতে পারে না।

—আপনাদের ভগবানও তো কম খোসামুদে নয়, সেই যে বিপদ! তাঁকে ঘুষ দিয়ে নিতাই দাসরা বেশ মার এড়িয়ে যায়। আর ভগবানের চাবুক গিয়ে পড়ে নিরীহ মানুষদের ওপর, এর দৃষ্টান্তও কম নেই।

ব্রজদুলাল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, যে রকম চোখের সামনে দেখা যায় তাতে আপনার কথাগুলো খুব সত্যি সন্দেহ নেই। মিথ্যেটাই যেন জয়জয়কার আমাদের দেশে। কিন্তু কেন তা ভেবেছেন কি ? আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছি, আমরা আর মানুষ নই।

—তার মানে ?

ব্রজদুলাল ঘন ঘন মাথা নাড়ে, ইংরেজ রাজত্বে আমরা শিক্ষা পাইনি। তখন দু'পাতা ইংরিজী পড়তে শিখে লোকে বড় পণ্ডিত বলে পরিচিত হত, এর চেয়ে মিথ্যে আর কি থাকতে পারে? আমি জানি, আমার ঠাকুর্দা টোলের পণ্ডিত ছিলেন, লোকে তাকে মুখ্যু ঠাওরালে, আর আমার কাকা শুনেছি ছোটবেলায় চিরকাল বখামি করে ইংরিজী বুলি আউড়ে এই গাঁয়েরই মস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ে উঠলো। এইখানেই যে সবচেয়ে বড় গলদ, সেদিনের বিষ প্রয়োগের ফল আজ ফলেছে। আজকের ছেলেরা না জানে বাংলা, না জানে ইংরিজী। শিখতে শেখেনি। ময়নার মত কতকগুলো বুলি আওড়ায়।

কেষ্ট কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে শোনে।

—এদের মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই। তাই এরা ওষুধে বিষ মেশায়, খাবার চালে কাঁকর দেয়। সব রকম উপায়ে লোক ঠকায়, কারণ তারা বুঝতেই পারে না ভবিষ্যতের ফল। আপনি ঠিক বলেছেন তারা বোঝে টাকা, কিন্তু এদের ভরসায় থাকলে তো চলবে না—

কেষ্ট এবার হেসে ওঠে, এরাই তো আমাদের চালাচ্ছে, আমরা ভেড়ার পালের মত এদের ইঙ্গিতে চলেছি।

ব্রজদুলালের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, এ চলবে না। সব ভাঙবে, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

কেষ্ট ব্রজদুলালের মুখে এ ধরণের কথা শুনবে আশা করেনি। নির্বাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে, উত্তেজনায় তার মুখ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

—মানুষ চোর জোচ্চোর, সুবিধাবাদী এমনিতে হয় না কেষ্ট বাবু, মনুষ্যত্ব হারালে তবে হয়। আমাদের দেশের সমস্যা খাদ্য নয়, বস্ত্র নয়, সমস্যা হল মানুষ কমে যাচ্ছে। পশুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের আজ মানুষ তৈরী করতে হবে।

মিন্টু আর কিন্টু দু'জনে কেষ্টর পেছন থেকে উঁকি মেরে বাবাকে দেখছিল। ব্রজদুলাল তাদের দেখিয়ে বলে, এদের বয়সী ছেলেরাই এখন আমাদের ভরসা। মিন্টু কিন্টুদের যদি মানুষ তৈরী করতে

পারেন আজ থেকে বিশ বছর বাদে দেখবেন দেশের চেহারা বদলে গেছে। এদের সত্যিকারের শিক্ষা দিতে হবে, তার জন্তে চাই যথেষ্ট আত্মত্যাগ। আসবেন আপনারা শহর ছেড়ে গাঁয়ের মধ্যে?

কেষ্ট এতক্ষণে কথা বলে, আমাদের দিয়ে আর কি হবে? লেখাপড়া করিনি, বিদ্যে-বুদ্ধি কিছুই নেই।

—ঐখানেই তো ভুল করছেন। পাশ করলেই জ্ঞান হয় না, আপনি যা বলেন খুব কম পাশ করা লোকের মুখে একথা শুনেছি। যদি সত্যি আজকের দেশের অবস্থা দেখে প্রাণ কাঁদে, চলে আসুন এখানে। আমাদের এই ছোট্ট শিক্ষায়তন-এর আদর্শে যা পারেন যোগ দিন। এখনো এখানে ড্রিল শেখানো হয় না। দরকার তাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার। তাদের খেলাধুলো শেখান, তাদের ভালোবাসুন। মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব এখানে কোন দিন হবে না।

শ্যামা এসে না পড়লে কথা হয়ত আরও চলতো। বলে, আবার বক্তৃতা শুরু হয়েছে তো, অমন করলে কাকু পালিয়ে যাবে।

ব্রজদুলাল নিজেকে সামলে নেয়, মাষ্টারী করে এই বদ অভ্যাস হয়েছে, বড় বকবক করি।

লেকের পাড়ে সাঁতার কেটে উঠে জলিল আর রাজীব জামা-কাপড় পরছিল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, শ্যামল রেলিং-এর ওপর বসে সিগারেট টানে। একটা গাড়ী এসে পার্কিং-এ দাঁড়ায়, হেড লাইটের আলো ওদের গায়ের উপর এসে পড়ে।

জলিল দাঁত চেপে বলে, এ শালাদের জ্বালায় কাপড় ছাড়া আর যাবে না দেখছি।

রাজীব ফোড়ন কাটে, ওদিকে নজর না দিলেই হল। আমাদের যা খুশী করব, লেকটা তো কারুর বাপের সম্পত্তি নয়।

শ্যামল ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে বলে, এই রাজীব, ভদ্রলোকের বাপ তুলছিস কেন মিছিমিছি।

—বেশ করেছি, তোর কি?

গাড়ীর চাবি বন্ধ করে ভদ্রলোক একটি মেয়েকে নিয়ে সাঁতারের ক্লাবের দিকে যান। শ্যামল আড়চোখে দেখে মন্তব্য করে, স্বামি-স্ত্রী না কি?

—সে খোঁজে তোর দরকার কি? ব্যাগ নিয়ে গেল, এখুনি বোধ হয় জলে নামবে—

জলিল এতক্ষণে কথা বলে, প[illegible]াওয়ালা লোক রে, নতুন হিলম্যান চেপে এসেছে।

তিন জনে গাড়ীটা দেখে। শ্যামল হঠাৎ বলে, চাকার হাফ ক্যাপগুলো খুলে নেব?

—নে না। আমরা নজর রাখছি।

মিনিট পাঁচেকের বেশী লাগে না। শ্যামল পকেট থেকে একটা চাড় দেবার যন্ত্র বের করে হাফ ক্যাপ চারটে খুলে নেয়। পাশেই জলিলদের পুরোন মডেলের ভাঙ্গা ষ্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ীটা দাঁড়িয়েছিল। জিনিষ নিয়ে গাড়ীতে করে তারা চম্পট দেয়।

রাজীব বলে, বেশ রগড় হবে মাইরি! ভদ্রলোক তো খুব চাল মেরে মেয়ে নিয়ে জলে সাঁতার কাটতে গেল। ফিরে এসে দেখবে হাফ ক্যাপ গন্, একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসবে।

জলিল গাড়ী চালাতে চালাতে বলে, কিছুই নয়। ইন্সিওরেন্সের থেকে কান মুলে টাকা আদায় করবে।

শ্যামল দুটো হাফ ক্যাপ দু' হাতে নিয়ে খঞ্জনীর মত বাজাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে, এখন কোথায় যাবি?

—গ্যারেজে, কালী থাকবে।

—মিটিং না কি?

—হ্যাঁ। দেবেনের সঙ্গে সাফ কথা বলতে হবে।

গাড়ী গিয়ে ঢুকলো ঢাকুরিয়ার এক মেঠো রাস্তার ভেতর। গাছপালায় ঢাকা ভাঙ্গা গ্যারেজ। বাইরে থেকে পোড়ো জমি বলে সন্দেহ। ইটের উঁচু পাঁচিল, মরচে-পড়া টিনের গেট।

শ্যামলরা ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কালী আগে থেকে এসেই খাটিয়ায় বসে ছিল। জিজ্ঞেস করে, এত দেরী যে?

জলিল উত্তর দেয়, লেকে চান করে নিলাম।

রাজীব বলে, শ্যামল হিলম্যানের চারটে হাফ ক্যাপ খুলে এনেছে।

—নতুন?

—হুঁ।

—ভালো দাম পাওয়া যাবে। এ জায়গাটা কেমন রে জলিল?

—ভালো, রাজীব তো এখানেই থাকে। বলছে কোন গোলমাল নেই।

—পাড়ার লোকরা কেমন?

রাজীব উত্তর দেয়, বেশী আলাপ হয়নি। দূরে দূরে বাড়ী, সবাই চুপচাপ থাকে।

—তা হলেও বেশী দিন থাকা ভালো নয়। দু' মাসের মধ্যে নতুন জায়গা ঠিক কর। গন্ধ পেলেই পুলিশ আসবে।

জলিল তাচ্ছিল্য ভরে বলে, গন্ধ পেলে তো! সেই শেভ্রলে গাড়ীটা মনে আছে? রং পাল্টে পাকিস্থানে পাঠিয়ে দিলাম—

—তবু সাবধান হয়ে থাকা ভাল।

দেবেনদা' এসে ঢোকেন। সকলে খাতির করে খাটিয়ায় বসতে দেয়। দেবেনদা' জুতো খুলে ভালো করে বসেন। শ্যামলকে দেখে বলেন, কি খবর, তোমাকে তো বহু দিন বাদে দেখছি।

কালী উত্তর দেয়, কেন, এখন তো ও আমার কাছেই রয়েছে।

—তাই নাকি। আমার ওখানে তো যায় না!

শ্যামল ব্যাজার মুখে বলে, সময় পাইনি। অনেকগুলো ঝামেলায় ছিলাম।

—একদিন চুণীলাল আর মদন এসে কি বলছিল।

—কি?

—তোমাকে না কি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

চুণীলাল ও মদনের নাম শুনেই শ্যামল তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, আমাকে তাড়িয়েছে তো ও শালাদের কি?

এত বিশ্রী ভাষায় তাঁর মুখের ওপর কথা বলবে দেবেনদা' ভাবেন নি। বলেন, সংযত হয়ে কথা বল শ্যামল!

কালী মাঝখান থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওর কথা পরে হবে দেবেনদা', এখন কি ঠিক করেছেন বলুন।

দেবেনদা' একটু চুপ করে থেকে বলেন, কিছুই ঠিক করিনি।

—তাহলে পার্টি ভেঙ্গে দিন।

—কেন?

—কি করে চলবে, টাকা চাই, টাকা—

—হুঁ, ভাবছি চাঁদা তুলে—

—কে চাঁদা দেবে ?

দেবেনদা' বিস্ময় প্রকাশ করেন, তবে কি করবে ?

কালী অম্লান বদনে হাসে, গয়নার দোকানে এত গয়না আছে, ব্যাঙ্কে এত টাকা আছে।

দেবেনদা' উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, না, না, অসম্ভব !

—কেন অসম্ভব ? দেশের ভালোর জন্যেই তো খরচা করা হবে।

—তোমার কি ইচ্ছে ঠিক স্পষ্ট করে বল।

—সামনের ইলেকশানে দাঁড়াবেন বলেছিলেন। আমরা ভাবলাম আপনি দাঁড়ালে আমাদেরও সুবিধে হবে, সে সব গেল—

দেবেনদা' বাধা দেন, কেন, ইলেকশানে তো আমি দাঁড়াবো।

—দাঁড়াবেন তো টাকা কোথায় ?

—টাকা কি হবে ? দেশের লোকের কাছে আমি আবেদন করব। এত বছর যাদের জন্যে জেল খেটেছি, সারা জীবন যাদের জন্যে উৎসর্গ করেছি, তুমি কি ভাবছো তারা আমায় ভোট দেবে না ?

কালী মুখ বিকৃত করে, ওরকম জেলখাটা লোক রাস্তায় অনেক ক্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইলেকশানে টাকা দিয়ে ভোট কিনতে হয় দাদু, এমনিতে হয় না।

—তাহলে আমি দাঁড়াবো না—

—তাই তো বলেছি। আপনাকে ঘোড়া ঠিক করে কি বুদ্ধু বনেছি। শালা পয়সা ঢাললে আপনাকে সব চেয়ে বেশী ভোট পাইয়ে দিতাম। গাড়ী বাড়ী নিয়ে হাঁকিয়ে বসতেন, এমন চটা পায়ে ঘুরে বেড়াতে হত না—

দেবেনদা' অস্থির হয়ে ঘন ঘন পায়চারী করেন, তাই বলে এই হীন উপায় ?

—সব সময় সাধু হলে চলে না। জেলে ঘুরলেই যদি ইলেকশান জেতা যেত, তাহলে ইদ্রিস তো দশ বারের বেশী জেল খেটেছে—

দেবেনদা' ছাড়া সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। এই ক'দিন আগেই ইদ্রিসকে পকেট মারার জন্যে আবার পুলিশে ধরেছে। দেবেনদা' ঘন ঘন মাথা নাড়েন, ঠাট্টা নয় কালী, এসব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়।

—তাহলে একটা ব্যবস্থা করুন। আমি তো আপনাকে গরীবের টাকা কাড়তে বলছি না। যারা দেশের টাকা নিয়ে মজা লুটছে তাদের টাকা নিয়ে যদি দেশের কাজ করেন তো আপনাকে সকলেই জয়জয়কার করবে।

নিরুপায় দেবেনদা' ক্ষীণ স্বরে বলেন, মনে রেখো আমার আদর্শ—

—সে বলতে হবে না দেবেনদা'! আপনার আদর্শ আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। আপনি দেখুন—

দেবেনদা' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

আপনি ভোটে জিতবেনই। দেবেনদা'র মত জোর করে আশ্বাস আর কালী নিশ্চিন্ত হয়। জমিলকে বলে, গাড়ী করে দেবেনদা' চলে গেলে রাজীবকে জিজ্ঞেস করে, মেয়ে ঠিক হয়েছে ?

—হ্যাঁ, রাজীব উত্তর দেয়।

—কাল দেবেনদা'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। ওকে সামনে রেখে কাজ হাসিল করব কিন্তু মেয়েটা ঠিক তো ?

—দেখলেই চিনতে পারবে।

—ঠিক আছে।

শ্যামল এতক্ষণ এদের আলোচনায় যোগ না দিয়ে নিজের কথাই ভাবছিল। দেবেনদা' চুণীলালের কথা বলতে সে বোঝে, চুণীলালই ওর কাছে চুকলী কেটেছে। তবে কি মামার বাড়ীতেও ওরা গিয়েছিল! আশ্চর্য্য নয়, চুণীলাল ছেলেটা একরোখা আর বদরাগী। হয়তো ওই গিয়ে মামার কাছে লাগিয়েছিল। মনে মনে ভাবে, মদনের বাড়ী গিয়ে এর ফয়শালা করে আসবে।

সেই দিনই বিকেলে শ্যামল মদনের পাড়ায় যায়। আড্ডাস্থলের পাথরে মন্টুদা' বসেছিল। শ্যামলকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করে, কত দিন বাদে, কি খবর তোমার ?

—ভাল। মদন কোথায় ? ওর কাছেই এসেছি।

—ভালই করেছো, কার কাছে শুনলে ?

শ্যামল বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে যায়।

—শোন নি, মদনের বাবা মারা গেছেন ?

—কবে ?

—পরশু।

শ্যামল শুধু বলে, ওঃ।

—বাড়ীতে বোধ হয় মদন নেই, একটু আগেই গাড়ীতে করে বেরিয়ে গেল।

—তবে আর এখন গিয়ে কি করব ?

—পার তো সকালের দিকে এসো।

—তাই আসবো।

শ্যামল মন্টুদা'র পাশে বসে পড়ে, আপনার কি খবর মন্টুদা'!

—ভালো নয় ভাই!

—কি হল ?

—নন্দিতার বাবা ওর বিয়ের সব ঠিক করে ফেলছেন।

—তাই না কি ?

—দোসরা অঘ্রাণ বিয়ে।

—সে কি, তারিখ ঠিক হয়ে গেছে ? কার সঙ্গে ?

মন্টুদা' দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কে জানে [illegible] লোক কেউ হবে!

—নন্দিতা চিঠি দেয়নি ?

—ক'দিন তাও বন্ধ। নন্দিতা বাড়ী থেকে বারই হয় না। এদিকের জানলা-দরজা দেখছো না, সব বন্ধ থাকে। শ্যামল সমবেদনা প্রকাশ করে, তবে তো খুব মুস্কিল!

—তোমরা কখনো প্রেমে পোড় না ভাই! এ বড় বিশ্রী কষ্ট, সবাইকে জ্বালিয়ে মারে। আমাদের মত লোকের জন্যে এ-সব নয়। বাড়ী গাড়ী থাকলে দেখতে নন্দিতার বাবা আমার পেছনে ছুটে বেড়াতো, সবই টাকা ভাই!

মন্টুদা'র কথা শুনে শ্যামলের সত্যি মন খারাপ হয়ে যায়। বলে, আমাদের দিয়ে যদি কিছু হয়তো জানাবেন।

বেলারাণীর কাছে কনট্র্যাকট পেয়ে অবধি গৌরী দু'দিন ষ্টুডিওতে গিয়েছে কাজ করতে। কেষ্ট এখনও ফেরেনি। হয়তো দু'-চার দিনের মধ্যে ফিরবে। গৌরী কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মন থেকে কেষ্টকে সে জোর করে সরিয়ে দিয়েছে। বিনোদের সঙ্গে পা মিলিয়ে তাকে চলতেই হবে। যদি সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। বেলারাণীই এখন তার আদর্শ। এক একবার মনে হয়েছে বটে, এমন ভাবে চললে কেষ্ট হয়তো দুঃখ পাবে। হয়তো গৌরীর প্রতি ঘৃণায় তার মন ভরে যাবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নতুন জীবনের অদ্ভুত উন্মাদনায় তার মন আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরে ওঠে। বিনোদ যে জীবনের স্বাদ তাকে একদিন দিয়েছে কেষ্ট তা কোন দিনই দিতে পারবে না। গৌরী ষ্টুডিওতে যায়, বিনোদের সঙ্গে নতুন নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, তারই সঙ্গে রাত কাটায়। বেহালার বাড়ীতে সে কোন দিন ফেরে কোন দিন ফেরে না। চিনুর সঙ্গে তার খুব কম দেখা হয়। আগে যাও বা দু-একটা মৌখিক আলাপ হত এখন সেটা শুধু হাসিতে দাঁড়িয়েছে। তবে তারই মধ্যে একদিন সামান্য আলাপ হয়েছিল। চিনুর মুখটা গৌরীর সামনে ভেসে ওঠে, তুমি শুনলাম ষ্টুডিওতে যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ, একটা ছোট কাজ পেয়েছি।

—কনগ্রাচুলেশান !

—ধন্যবাদ।

—কেষ্টদা' কবে ফিরবে ?

—জানি না।

—তুমি কোন চিঠি লেখনি ?

—না।

গৌরী যে আজ কাল প্রায়ই রাত্রে বাড়ী ফেরে না সে নিয়ে চিনু কিছু বলেনি। একবার বলেছিল, তোমায় আজ-কাল আগের চেয়ে আরও সুন্দর দেখতে হয়েছে।

গৌরী হেসে বলে, আমার কোন কৃতিত্ব নেই, সব এই শাড়ী আর ব্লাউজের।

—অনেক দাম, না ?

—তা তো হবেই, বিনোদের পছন্দ।

—সে তো বুঝতেই পারছি।

সেদিন গৌরী নিজের থেকেই বলে, একটা কথা রাখবি চিনু—

—কি বল্।

—কেষ্টদা' ফিরলে তুই ওকে সব কথা খুলে বলিস—

—তোমার বলাই তো ভাল—

গৌরী মাথা নাড়ে, আমি বলবো না। ও কি বলে আমায় জানাস।

চিনু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তোমার যা ইচ্ছে।

কেষ্ট মাত্র তিন দিনের জন্তে শ্যামার কাছে কিশোরপুর গিয়েছিল বটে কিন্তু বারো দিনের আগে কিছুতেই সেখান থেকে বেরুতে পারল না। রোজই একবার করে সে কলকাতা ফেরার তোড়জোড় করেছে কিন্তু মিঠু, কিটু এবং তাদের নতুন মা'র জন্তে হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্য্যন্ত ব্রজদুলালই তার ফেরার পথ সুগম করে দেয়। বলে, সত্যিই যদি ওনার কলকাতায় কাজ থাকে, মিছিমিছি আটকে রাখা উচিত নয়।

শ্যামা বলেছে, আমি মিছিমিছি ধরে রেখেছি না কি ? কাকু কলকাতায় ফিরে গেলে আর কি আসবে ভেবেছো ?

—কেন আসবেন না, নিশ্চয় আসবেন, দরকার হলে আমরাও যাবো।

কেষ্টকে বিদায় দেবার সময় শ্যামার চোখ ছলছল করে, পরের বার কিন্তু খুড়িমাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। ব্রজদুলাল ছাড়লে না, কেষ্টর বিছানা ঘাড়ে করে নিয়ে বাস-ষ্টাণ্ডে তুলে দিতে চললো। কেষ্ট অনেক আপত্তি করেও তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। এ ক'দিনেই কেষ্ট বুঝতে পেরেছিলো শ্যামার কথা কতখানি সত্যি। এ গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলেই ব্রজদুলালকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। রাস্তায় দেখা হলেই লোক হাত তুলে নমস্কার করে। বলে, কোথায় চললেন মাষ্টার মশাই ?

—কোথাও যায়নি ভায়া, এঁকে বাসে তুলতে যাচ্ছি। ব্রজদুলাল নিজের মনেই বলে, এদের ছেড়ে কি সহরে যাবার উপায় আছে ? কেষ্ট কোন উত্তর দেয় না। ব্রজদুলাল এক সময় জিজ্ঞেস করে, মনে আছে তো সেদিন যা বললাম ?

—কি ?

—একজন মাষ্টার খুঁজছি, যে শরীরচর্চা শেখাবে, অথচ নীচু ক্লাসে পড়াতে পারবে।

—মাইনে ?

—বলেছি তো, মোটা-ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।

অন্যমনস্ক স্বরে কেষ্ট উত্তর দেয়, দেখবো।

ট্রেণে সারাক্ষণ কেষ্টর কলকাতার কথা মনে হয়েছে। পূজার হিসাব মেলানো, ব্যবসায় আবার মন দেওয়া, বাড়ীতে রান্নার সুব্যবস্থা করা, কত কাজ পড়ে রয়েছে। মনে মনে ভাবে, শ্যামাটা আব্দার করে অনেক দিন ধরে রেখেছিলো, আগে চলে এলেই ভালো হ'ত। অথচ কি আশ্চর্য্য, কিশোরপুরে থাকতে একদিনও একথা মনে হয়নি। কলকাতার কথা ভাবতেই কেমন যেন ব্যস্ততা আপনা থেকেই এসে যায়। সকলের চেয়ে বড় কথা—কলকাতায় গিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। গৌরীর কথা মনে হতেই কেষ্ট অস্বস্তি বোধ করে, ও নিশ্চয় খুব অভিমান করেছে। তিন দিনের জন্তে বেরিয়ে,বারো দিন হয়ে গেলে কোন মেয়ে না রাগ করবে ? কেষ্ট কিশোরপুর থেকে তিনখানা চিঠি লিখেছিলো কিন্তু গৌরীর কাছ থেকে কোন উত্তর পায় নি।

কল্পনার জাল বুনে আর মিথ্যে স্বপ্ন দেখে যে ছেলেরা আনন্দ পায়, কেষ্ট মোটেই সে দলের নয়। তবু বিয়ে সম্বন্ধে কেমন যেন তার দুর্ব্বলতা আছে। আর কিছু না হোক, রসুনচৌকি না বাজলে বিয়ে বলে মনেই হয় না। তাছাড়া পাত পেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। এ দুটো তাকে করতেই হবে।

কলকাতায় পৌছে কেষ্ট রিক্সা করে বাড়ী ফেরে। বলরামদের দরজা খোলা ছিল। কি মনে হল, কেষ্ট দাদার বাড়ীতে ঢুকে ডাকাডাকি করে। বৌদি শুকনো মুখে বেরিয়ে আসে, কি হয়েছে ঠাকুরপো।

কেষ্ট হাসে, আমাকে দেখলেই ভয় করে বুঝি ? না হয়নি কিছু।

—তবে ?

—এই মাত্র শ্যামার কাছ থেকে আসছি।

—কিশোরপুর থেকে ?

—হাঁ, ক'দিনের জন্তে গিয়েছিলাম, দিন বারো কাটিয়ে এলাম ! শ্যামা কিছুতেই আসতে দেবে না।

বৌদির মুখে হাসি ভরে ওঠে, ও যে তোমায় খুব ভালবাসে !

—পুজোর কাপড়-জামা নিয়ে গিয়েছিলাম।

বৌদির চোখে জল আসে, বড় ভালো করেছ ঠাকুরপো, আমাদের কিছুই পাঠানো হয়নি। তোমার দাদা যে এ-সব বোঝেন না।

বৌদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শ্যামাদের সব কথা শোনে, মিষ্টি, ফল না খাইয়ে কেষ্টকে ছাড়ে না। বলে, পুজোর ক'দিনই শ্যামার জন্তে যে কি রকম মন কেমন করেছে, বলতে পারি না।

বাড়ী গিয়ে মুখ-হাত-পা ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে কেষ্ট বেহালায় বাস ধরে। না জানিয়ে আসার একটা আনন্দ আছে, গৌরী কি ভাবে, তার সঙ্গে কথা বলবে ভাবতেই কেষ্টর মজা লাগে। দোকান থেকে বেলফুলের মালা কিনেছে, গৌরী খোঁপায় জড়াতে ভালবাসে।

কিন্তু বাইরে থেকে গৌরীর ঘর অন্ধকার দেখে কেষ্ট অনেকখানি দমে যায়। বারান্দায় উঠে চিনুকে ডাক দেয়। চিনু, ঘরে আছ না কি ?

—কে, কেষ্টদা', বলে সাড়া দিয়ে চিনু বেরিয়ে আসে, কখন এলেন ?

—এই মাত্র, গৌরী কোথায় ?

—বেরিয়েছে। দাঁড়ান দরজাটা খুলে দিই।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আলোর তলায় চিনুর মুখ দেখে কেষ্ট বিস্মিত হয়, কি হয়েছে চিনু !

—না, ভালোই আছি।

—চোখের তলায় কালি, শুকনো চুল !

কথা ঘোরাবার জন্তে চিনু জিজ্ঞেস করে, কি আনবো বলুন না ?

—শুধু চা খেতে পারি। আর কিছু না। তবে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, গৌরী ফিরুক।

—তখন না হয় আর এক কাপ খাবেন। বলে চিনু চা করতে চলে যায়।

কেষ্ট হাতের মালাটা তাকের উপর রাখে, মনে মনে ভাবে, গৌরী ফিরে এলে ওর খোঁপায় নিজ হাতে পরিয়ে দেবে। চিনু চা করে নিয়ে এলো, সেই সঙ্গে গল্প চলল অনেকক্ষণ। সবই কিশোরপুরের —শ্যামার ছেলেদের কথা, ব্রজদুলালের কথা।

চিনু সব কথা শুনে সজল চোখে বলে, বড় আনন্দের কথা। শ্যামারা সুখী হয়েছে।

—সত্যি চিনু, বড় ভাবনা ছিল। ভেবেছিলাম দাদা কোন এক বুড়োর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে। এখন দেখছি, ঐ একটা কাজই দাদা ভালো করেছে।

কথা বলতে বলতে প্রায় সাড়ে ন'টা বেজে যায়। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কৈ গৌরী তো এখনও ফিরল না ?

প্রশ্ন শুনেই চিনুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, বলে, কি জানি !

—ও কোথায় গেছে ?

—জানিনে, বলতে গিয়ে চিনুর গলা কেঁপে ওঠে। কেষ্টর তা নজর এড়ায় না। বোঝে চিনু, কিছু গোপন করার চেষ্টা করছে।

চিনু আর চুপ করে থাকতে পারে না, হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে ; কেষ্ট ধমকে ওঠে, খুলে বল, কি হয়েছে গৌরীর।

চিনু অনেক কষ্টে গলা পরিষ্কার করে বলে, ক'দিন থেকে গৌরী ফিরছে না।

—মানে ?—সে কি কথা ? কোথায় থাকে ?

—বিনোদের কাছে।

কেষ্ট পাথর হয়ে যায়। চিনু তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে। বেশ কয়েক মিনিট কোন কথা বলতে পারে না। পরে অন্য দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ক'দিন থেকে ?

—দিন পাঁচেক।

—তোমায় কিছু বলেছিলো ?

—শুধু আপনাকে জানিয়ে দিতে ও সিনেমায় কাজ নিয়েছে।

কেষ্ট দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সিনেমায় নেমেছে ! ও ! অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করে, প্রভাতের বই-এ ?

—বোধ হয়। আমায় বলেনি।

—বিনোদের বাড়ীর ঠিকানা জানো ?

—না, তবে পার্ক সার্কাসে থাকে। চিনু ইচ্ছা করেই ঠিকানা গোপন করে গেল !

—বড় ক্লান্ত লাগছে। আমি একটু শুয়ে পড়ি চিনু, তুমি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাও।

—খাবেন না ?

—না। চিনু আলো নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

কেষ্ট বিছানায় শুয়ে পড়ে কিন্তু ঘুমুতে পারে না। বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। এক ফোঁটা জল তার চোখ দিয়ে পড়লো না, শুধু জ্বালা চোখে-মুখে, সমস্ত শরীরে কি অসহ্য জ্বালা ! যে গৌরীর জন্তে সে সব ছেড়ে এই ভাবে হাফ-গেরস্ত হয়ে দিন কাটিয়েছে, যাকে নিজের দোসর বলে গ্রহণ করেছে, যার অপমান এক মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করতে পারেনি, সে তাকে এভাবে ঠকিয়ে বোকা বানিয়ে চলে গেল ! এ চিন্তা কেষ্টর মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। গৌরীকে হাতের কাছে পেলে বেদম মারতে ইচ্ছা করে। যে মার সে জীবনে ভুলতে পারবে না। চুলের মুঠি ধরে মুখখানা দেওয়ালে ঘষে ভোঁতা করে দেবে, তবে বোধ হয় বুকের জ্বালা কমবে।

আবার তার নিজেকে একা নিঃস্ব অসহায় মনে হয়, কোথায় গেল গৌরী, কোথায় গেল শ্যামল, আগে নিজেকে ভাবতে সে গর্ব অনুভব করতো। কিন্তু আজকে সে একা, সবাই ফেলে চলে গেছে বলে একা। নিজেকে তার প্রতারিত মনে হয়। এ অন্তর্দাহের শেষ কোথায় ?

কিসের জন্ম গৌরী চলে গেল ? টাকা। টাকা ছাড়া আর কি ? গাড়ী বাড়ী শাড়ী—এর প্রলোভন সে সামলাতে পারলো না। বিনোদ তাকে নিশ্চয় বিয়ে করবে না। সখ মিটলেই ওকে সরিয়ে আর একটা গৌরীকে নিয়ে যাবে। কি লাভ হল গৌরীর ?

কেষ্ট সারা রাত ছটফট করেছে। বার বার জল খেয়েছে বারান্দায় বেরিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়েছে। মানুষের উপর

গৌরী তা সমূলে বিনষ্ট করে গেল। সংসারের প্রতি পুঞ্জীভূত ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর বিষিয়ে উঠে।

ভোর না হতেই কেষ্ট বেহালা থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ী ফিরে ফিরোবার চেষ্টা করে, পারে না। অনন্ত কেবিনে গিয়ে গরম চা খায়। আড্ডা' দোকানে আসার আগে পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে আসে। পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসে। ফলে সারা দিন ট্রেণে করে এসে ক্লান্ত হয়েছিলো তার উপর রাত্রে ঘুম হয় নি। খোলা মাঠের মাঝখানে শুয়ে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ে।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো প্রায় দুপুর। সারা দেহে কেষ্ট বেদনা অনুভব করে, মাথাটাও ধরেছে, একবার ভাবে বাড়ী ফিরে যাবে, পরক্ষণে মনে হয় বেহালায় যাওয়াই ভালো, চিনুর কাছ থেকে হয়তো আরও খবর পাওয়া যাবে।

ঘর খোলা ছিল, ভেতরে চিনু ঝাড়পোঁছ করছে, কেষ্ট গিয়ে বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে।

চিনু চমকে উঠে, কি হয়েছে কেষ্টদা', অমন করে শুলেন কেন?

—কিছু না, এমনি।

—কোন ভোরে উঠে চলে গেছেন বলুন তো?

কেষ্ট চোখ খুলে তাকালো, জবাব দিতে পারেলো না। চিনু কেষ্টর লাল চোখ দেখেই ভয় পেয়েছিল। কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে বলে, গা যে পুড়ে যাচ্ছে, আপনার জ্বর হয়েছে?

কেষ্ট সে কথা শোনে না, চিনুর হাতটা ধরে বলে, তোমার হাতটা কি ঠাণ্ডা, বুকের উপর একটু রাখবে? এখানে বড় জ্বালা।

কেষ্টর জ্বর ছাড়তে পাঁচ দিন লাগলো। ঐ ক'দিনই চিনু অবিরাম সেবা করেছে, বার্লি সাবু করে এনে খাইয়েছে। মাথার কাছে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে।

কেষ্ট সুস্থ হয়েই বলে, তুমি আমার জন্যে এত করলে চিনু, অথচ আমি কা'র জন্যে এত করলাম?

চিনু থামিয়ে দেয়, ও সব কথা এখন ভাববেন না।

—কখন ভাববো?

—সুস্থ হয়ে উঠুন।

কেষ্ট চুপ করে যায়, এক সময় জিজ্ঞেস করে, গৌরীর আর কোন খবর পাওনি?

চিনু চুপ করে থাকে। কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ফিরে এসে বিয়ে করবো তারই ঠিক করছিলাম। মামা বলছিলো পরের বার খুড়িমাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। কি আশ্চর্য্য, যখন আমি প্রস্তুত হলাম, ও চলে গেল!

চিনু কি ভেবে নিয়ে হঠাৎ বলে, যদি গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে চান, আমি নিয়ে যেতে পারি।

—তুমি যে সেদিন বললে ঠিকানা জান না?

—নিজে গিয়ে চিনিয়ে দিতে পারি।

—চল, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে আসি।

—আজই? এখনও আপনি দুর্বল!

—এখুনি। ট্যাক্সি নেবো।

চিনু শাড়ী বদলে ফিরে এসে দেখে, কেষ্ট আগের মতই শুয়ে আছে।

—কি হ'ল, যাবেন না?

কেষ্ট চিনুর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, না থাক।

—কেন?

—কি দরকার। ওর যা ইচ্ছে তাই করেছে, আমার বলার কি অধিকার?

চিনু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, একটা কথা বলবো?

—বল।

—গৌরী কোন দিনই আপনাকে ভালবাসেনি।

—তুমি কি করে জানলে?

—জানি।

কেষ্ট কোন কথা বলে না।

—সত্যি বলছি কেষ্টদা,' আপনার প্রতি এতটুকু দরদ থাকলে সে এভাবে আপনাকে ফেলে চলে যেতে পারতো না।

কেষ্টর চোখ-মুখ কঠিন হয়ে উঠে। মেয়েদের উপর আমার তেমন কোন বিশ্বাস নেই। ওরা—

চিনু থামিয়ে দেয়। এক গৌরীকে দেখে মেয়ে জাতের কথা ভাবলে ভুল করবেন। হাতের পাঁচ আঙুল তো কোন দিনই সমান হয় না। বলেই চিনু ঘর থেকে চলে যায়।

কেষ্ট বোঝে, চিনুর সামনে মেয়েদের সম্বন্ধে এ ধরণের উক্তি করা উচিত হয়নি। [ক্রমশঃ।

মিনতি

তমাল মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসে চাই না কো নাম,
অক্ষরে চাই না কো দাম।
ফল হয়ে বীজ বুনে যেতে,
চাই না কো সে আনন্দ পেতে।
তার থেকে ছোট কুঁড়ে ঘরে,
নিশ্চুপে যাই যেন ঝরে।

যে ফুলের আয়ু এক দিন,
সূর্য্যতাপ যাকে করে ক্ষীণ,
তার পর ভোরের শিশিরে,
নিশ্চুপে যায় আয়ু ঝরে।
আমি চাই সেই ফুল হ'তে,
তুমি যদি থাকো মোর সাথে।

চাই না কো গলে ফুলমালা,
তোমাকেই পাই যেন বালা।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

বারো
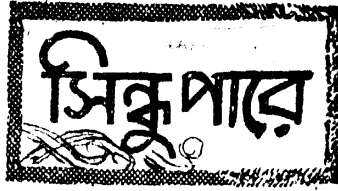
এর পর অল্প দু'-চার দিনের মধ্যেই মার্লিনদের দলের সঙ্গে আমার ভাবটা বেশ জমে উঠল। কি ভাবে কি হল—একটু বলি।

যেদিন ওদের সঙ্গে আলাপ হলো, তার পরের দিন—টেনিস খেলার শেষের দিকে মঙ্কটন এসে দাঁড়ালো টেনিস খেলার কাছে এবং আমার টেনিস খেলা শেষ হলেই মঙ্কটন আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, চলুন ডক! আপনাকে আমাদের টেবিলে নিয়ে যাই—এক সঙ্গে চা খাওয়া যাবে।—বেশ, ত বলে আমিও বিনা দ্বিধায় গিয়ে যোগ দিলাম ওদের টেবিলে। মঙ্কটনের ধরণে এইটেই বিশেষ করে ফুটে উঠল—পরে সেটা অবশ্য আরও লক্ষ্য করেছিলাম যে এই ক্লাবের সভ্যদের আমার প্রতি যেন একটা বিশেষ কর্তব্য আছে, কেন না, আমি বিদেশী এবং সেই হেতু আমি একটু অসহায় এবং সব সভ্যদের মধ্যে মঙ্কটনই যেন বিশেষ করে সেই কর্তব্যের অধিকারটি পেয়েছে। হঠাৎ তার এই উপলব্ধির পিছনে যে কোথায় কি অনুপ্রেরণার উৎস ছিল—প্রথম দিন অবশ্য সেটা মোটেই বুঝিনি।

টেবিলে এসে মঙ্কটন বলল, আপনি বিদেশী—নিশ্চয়ই আপনি খুব একা-একা বোধ করেন। আমরা পাঁচ জন থাকতে সেটা ত ঠিক নয়! তাই আমাদের কর্তব্য, আপনাকে ডেকে আমাদের মধ্যে নিয়ে আসা। আশা করি, আসতে আপনি কোনও দ্বিধা বোধ করবেন না।

বললাম, না না। আমি সুখীই হব।

ডরথী বলল, শুধু কর্তব্যের দিক দিয়েই নয়, আপনি আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলে আমরা সব সময়ই আনন্দিত হব।

বললাম, আপনাদের বিশেষ করুণা!

মঙ্কটন বলল, আমরা অনেক দিন থেকে আপনাকে লক্ষ্য করছি, কিন্তু গায়ে পড়ে আলাপ করিনি। কারণ, আপনি ঠিক পছন্দ করবেন কি না—

ডরথী হেসে বলল, ঠিক ভরসা পাইনি। শেষ পর্য্যন্ত আমার এই বন্ধুটিই (মার্লিনকে দেখিয়ে) দিলেন ভরসা।

মার্লিনের দিকে চেয়ে একটু হেসে শুধালাম, কি রকম?

ডরথী বলল, কেন, কাল সন্ধ্যেবেলা খাওয়ার জন্য টেবিল থেকে উঠেই সোজা বলল—যাই ভদ্রলোকটির অভিনন্দন নিয়ে আসি। অবাক হলাম। গায়ে পড়ে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করা—এ ত মার্লি'র স্বভাব নয়!

মঙ্কটন তাড়াতাড়ি বলল, আহা—উনি বিদেশী। ওঁর কথা স্বতন্ত্র। আমাদের মধ্যে এগুতে হয়ত লজ্জা বোধ করেন, সেটুকু কি

ডরথী বলল, বোঝে ত বটেই। বিলক্ষণ বোঝে। কিন্তু শুধু বুঝলেই কি আর ভরসা হয়?

একটু হেসে মার্লিন বলল, তা কি করব? উনি এগিয়ে এসে অভিনন্দনও জানাবেন না—ক্লাব ছেড়ে চলেও যাবেন না। অথচ সবাই না গেলে আমার নাকি যেতে নেই। এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে—

মঙ্কটন মাথা নেড়ে বলল, তা ত বটেই।

আমি বললাম, আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার আগেই এগিয়ে আসা উচিত ছিল।

ডরথী হেসে বলল, ভাগ্যিস আসেননি। তাই ত মার্লিনকেই এগুতে হল।

নানা কথাবার্ত্তায় আলাপ বেশ জমে গেল। সেদিনও ফেরার সময় আমি মঙ্কটন, টম ও মার্লিন একসঙ্গেই ফিরলাম। কিন্তু সেদিন কেউ মার্লিনের হাত ধরল না, কেন জানি না!

• • • •

আরও চার-পাঁচ দিন কাটল। রোজই ক্লাবে গিয়ে ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে গল্প করি এবং ক্রমে ও দলটির সকলের সঙ্গে আমার সম্পর্কটি বেশ সহজ হয়ে দাঁড়াল—এক অবশ্য মার্লিন ছাড়া। মার্লিনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটি কিছুতেই যেন সহজ হচ্ছিল না। কি তার ভিতরের কারণ—জানি না। কোথায় যেন একটা বাধা ছিল—সেটা মার্লিনের দিক দিয়ে না আমার দিক দিয়ে, হাং ঠিক বলতে পারি না। তবে বাইরের দিক দিয়ে যেটুকু যা লক্ষ্য করেছিলাম সেটুকু বলতে পারি এবং তাই বলি।

যদিও ওদের দলটা মার্লিনকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল, তবুও দলের মধ্যে মার্লিনই কথা বলত সবচেয়ে কম। বেশীর ভাগ কথা বলত মঙ্কটন এবং ডরথীও প্রয়োজন হলে কথাবার্ত্তায় জমিয়ে রাখতে জানত না যে এমন নয়। বালকটিও কথাবার্ত্তায় একটু রসিকতার আভাস পেলেই হো-হো করে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেসে উঠত এবং তাকে তখন থামান হত দায় এবং ক্রমে পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হলে দেখলাম, ডরথীর বন্ধু ফ্রেবড কলিন্স যদিও বাজে কথা কম বলে, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে জানে। সে-ই বিশেষ করে ভারতের বিষয় আমাকে নানা প্রশ্ন করত এবং আমার কথাগুলি শুনত বেশ মনোযোগের সঙ্গে। দেশ-বিদেশের বিষয় বিস্তারিত জানবার তার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল এবং সেটা আমার ভালই লাগত।

মার্লিন যে কথাবার্ত্তায় যোগ দিত না—এমন নয়। মাঝে মাঝে কথার মধ্যে এমন এক একটি তীক্ষ্ণ মন্তব্য করত যে, ওর কথা শুনে সকলকেই ওর দিকে একবার চাইতেই হত

স্নানের সময়
মনে
রাখবেন
একশ' বছরের
ঐতিহ্য,
বিশুদ্ধতা এবং
অপরিবর্ত্তিত
গুণগুলির জন্য
আজও সমাদৃত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম. এল. বসু য্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

দিত মার্লিনের মনে—সেটা ওদের দলে সকলেই যেন অনায়াসে মেনে নিয়েছিল। মার্লিনের কোনও কথায় প্রতিবাদ ওদের দলে বড়ো একটা কেউ করত না, অবশ্য এক ডরথী ছাড়া। কিন্তু ডরথীর প্রতিবাদের মধ্যে হাস্য-বিদ্রূপের ভাগটাই ছিল বেশী। মক্কটনের ভাবটা দেখে আমার মাঝে মাঝে মজাই লাগত। মার্লিন কোনও মতামত প্রকাশ করলে মক্কটন জোরের সঙ্গে সেই মতটি নিজের কথায় জাহির করত—যেন এটা তারই মত, মার্লিনকে সে-ই শিখিয়েছে।

কিন্তু আমার সঙ্গে কথাবার্তায় মার্লিন যেন নিজের চারি দিকে একটা আবরণ তৈরী করে রেখেছিল। আমার কোনও মতামতের প্রতিবাদ তার কাছ থেকে পাইনি, সমর্থনও পাইনি। অথচ আমার প্রত্যেক কথাটি যে সে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে শুনত—সেটুকু লক্ষ্য করাও আমার পক্ষে কঠিন হয় নি। সোজা আমার সঙ্গে কোনও বিষয় আলোচনা করা ত দূরের কথা, এ ক'দিনের মধ্যে কোনও দিন কোনও প্রশ্নও আমাকে করে নি। এবং যতদূর মনে পড়ে, এ ক'দিনের মধ্যে ঠিক সোজা আমার দিকে চেয়ে বোধ হয় কোনও কথাই বলে নি। দু'-একবার কোনও একটা বিষয় কথা বলে আমি মার্লিনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, এ বিষয়ে মিস্ ফ্রেজার কি বলেন?

একটু হেসে কিন্তু লাজ-নম্র ভাবে জবাব দিয়েছে, আমি আর বেশী কি বুঝি? এ নিয়ে মনটা যে মাঝে মাঝে একটু খারাপ হয় নি, এমন কথা বলতে পারি না। কেন'না, ও দলের সঙ্গে মেলামেশার প্রধান এবং একমাত্র কারণই আমার মনের দিক দিয়ে যে ছিল মার্লিন—সেটা অস্বীকার করে আর কোনও লাভ নেই।

যাই হোক্, মার্লিনের সঙ্গে প্রথম আলাপ হওয়ার চার-পাঁচ দিন পরে একদিন ওদের টেবিলে বসে গল্প করছি এবং ওদের দলের সকলেই আছে সেই টেবিলে, এমন সময় মিঃ টাউনসেণ্ড একটি তরুণীকে হাত দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে এলেন আমাদের টেবিলে।

মিঃ টাউনসেণ্ডের পরিচয় একটু দেওয়া দরকার। তিনি ক্লাবের মধ্যে সকলের চেয়ে শুধু বয়োজ্যেষ্ঠই নন—তাঁর বয়স প্রায় আশী। ছোটখাট মানুষটি—মাথায় পাতলা পাতলা শুভ্র কেশ এবং উজ্জ্বল দুটো চোখ—মুখখানিতে বার্দ্ধক্যের চাপে চোখ দুটোই যেন হয়ে উঠেছিল প্রধান। মুখে সব সময়ই একটা সহৃদয়তার হাসি—যেন জীবনটাকে দেখে শুনে তিনি প্রাণভরা সহানুভূতি দিয়ে জীবনটাকে মেনেই নিয়েছেন, তার সঙ্গে বিরোধ করেন নি। লক্ষ্য করেছিলাম—ক্লাবে সবাই তাঁকে ভালবাসত, সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত এবং সকলের সঙ্গে সহজ মেলামেশাতে তিনি তাঁর বাকি জীবনটুকু অন্ততঃ ক্লাবের দিক দিয়ে যেন মধুর করে রাখতেই চাইতেন।

প্রথম প্রথম আমি ক্লাবে যাওয়া-আসা সুরু করার পর কয়েকটা দিন তাঁকে দেখিনি—পরে শুনেছিলাম, তিনি বিশেষ কাজে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। প্রথম তিনি যেদিন এলেন, ক্লাবের সভ্যদের কাছ থেকে, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে সহজেই বুঝেছিলাম—তিনি সকলেরই কি রকম প্রিয়। এখন রোজই আসেন ক্লাবে এবং ইদানীং আমার সঙ্গে তাঁর ভাবটিও খুবই উঠেছিল জমে। তাঁর একটি ছেলে ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে পুলিশ বিভাগে বড় চাকুরী করত, তাই ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাই বোধ হয় আমার কাছে এগিয়ে এসে একটি অকৃত্রিম সস্নেহ ব্যবহারে আমাকে বিশেষ অভিভূত করেছিলেন। ক্লাবের তরুণ-তরুণীরা সবাই তাকে দাদু বলে ডাকত এবং সে ডাকটি সকলের সঙ্গে হাস্য সরল ব্যবহারে তিনি সার্থকই করেছিলেন। মার্লিনকে তিনি যে একটু বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন—সেটুকুও আমার লক্ষ্য এড়ায়নি। এবং মার্লিনও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা শুধু শ্রদ্ধা দিয়েই নয়, একটা সহজ আন্তরিকতার মাধুর্য্যে সুন্দর করেই তুলেছিল।

যে মেয়েটিকে তিনি নিয়ে এলেন আমাদের টেবিলে, সে মেয়েটিকে আমি বিশেষ চিনতাম না। আলাপ হওয়াতে শুনলাম, নাম রুথ বাকৃন্যাণ্ড। মেয়েটিকে বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতন কিছুই ছিল না—ক্ষীণাঙ্গী, দীর্ঘ গড়ন এবং একটি লম্বা মুখে নাকটাই প্রথমে চোখে পড়ে।

এঁরা দু'জনে আমাদের টেবিলে আসা মাত্র আমরা সকলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং মক্কটন পাশের টেবিল থেকে দু'খানি চেয়ার টেনে নিয়ে এলো। লক্ষ্য করলাম—মার্লিন মিঃ টাউনসেণ্ডের হাত ধরে তাকে নিয়ে নিজের কাছে বসাল।

মিঃ টাউনসেণ্ড যে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, বলত ডক্! এ মেয়েটার বিয়ে কবে হবে?

বললাম, সেটাও আপনিই বলবেন। আমার সঙ্গে আজই ত প্রথম আলাপ হল।

বললেন, না না সেদিক দিয়ে নয়। ওর হাতটা দেখ ত। তোমরা পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা—সকলেই ত হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পার, আমি জানি। দেখ ত এই মেয়েটার হাতটা।

মেয়েটি বলল, আগে নিজের হাতটাই দেখান না। আপনার আবার বিয়েটা কবে হবে শুনে নি।

বৃদ্ধ হেসে বললেন—আরে তোমার আমার দুটো বিয়েই ত একসঙ্গে হতে পারে। তাই তোমার হাতটা দেখলেই সব বোঝা যাবে।

সকলেই হেসে উঠল। ডরথী আমার দিকে চেয়ে শুধাল, আপনি বুঝি হাত দেখতে জানেন? ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে মনটা ঠিক করে নিয়েছি। গম্ভীর ভাবে বললাম, তা কিছু কিছু জানি বৈ কি।

ডরথী বলল, তা এত দিন এ বিদ্যেটি লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন!

এইবার মার্লিন কথা বলল, ডরথীকেই বলল, বিদ্যেটা এত দিন ভুলে গিয়েছিলেন বোধ হয়। রুথকে দেখে হয়ত মনে পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রুথের হাতখানি ধরে টেবিলের উপর আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ডক্! দেখ ত।

গম্ভীর ভাবে রুথের একখানি হাত আমার দু'হাতে ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলাম, কিছুক্ষণ পরে বিজ্ঞের মতন বললাম, ও হাতখানি একবার দেখি।

ইতিমধ্যে কি বলি মনে মনে একটু গবেষণা করে নিলাম। বললাম, বিয়ের রেখা ত উঠেছে হাতে দেখছি, কিন্তু—দু'-তিন জন সমস্বরে শুধাল, কি? কি? তার মধ্যে ডরথীও ছিল। বললাম, কিছু প্রচণ্ড বাধাও দেখতে পাচ্ছি।

বৃদ্ধ বললেন, থাক থাক। আর বলতে হবে না। এইবার বুঝতে পেরেছি। রুথের হাত ছেড়ে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ডরথী শুধাল, কি বুঝতে পারলেন দাদু?

বৃদ্ধ হেসে বলল, আরে এই সোজা কথাটা তোমরা বুঝতে পাচ্ছ না? ওর মন পড়েছে আমার দিকে। কিন্তু আমার মতন বুড়োকে বিয়ে করতে বাধা ত' হবেই। শুনলে ত'—প্রচণ্ড বাধা।

মার্লিন বলল, কিন্তু দাদু, আমার যদি মন পড়ত—আমি কোনও বাধা মানতাম না।

বৃদ্ধ কপট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, অদৃষ্ট খারাপ ভাই, তাই তোমার মন পেলাম না।

মার্লিন বলল, ও কথা ঠিক নয় দাদু! মন পেয়েছেন। কিন্তু মনে আপনি রং লাগালেন না। রংটুকু যা ছিল রুথের মনে লাগাতেই যে ফুরিয়ে গেল।

সকলেই হেসে উঠল। ইতিমধ্যে বালকটি সলজ্জ ভাবে হাতখানি দিয়েছে বাড়িয়ে।

হেসে বললাম, এ কি টম্! তোমারও হাত দেখতে হবে না কি?

ডরথী বলল, দেখুন না ডক।

ততক্ষণে আমার ভরসা অনেক বেড়ে গেছে। গম্ভীর ভাবে টমের হাতখানি দেখে বললাম, টম! তোমার জন্য আমি দুঃখিত। তোমার যেখানে মন পড়েছে, সেখান থেকে মনটা সরিয়ে নাও—কোনও আশা নাই।

টম তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। মার্লিন একখানি হাত টমের পিঠে রেখে বলল, বেচারা টম!

মন্কটন এইবার হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, আমার হাতটা দেখুন না ডক—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

যেন অনেক দেখার আছে, এই ভাবে খানিকক্ষণ মঙ্কটনের হাতখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। তারপর বললাম, আপনার অদৃষ্টও খুব ভাল দেখতে পাচ্ছি মঙ্কটন! পরমা সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়ে ক্রমেই এগিয়ে আসছে আপনার দিকে হাতে বরমাল্য নিয়ে। সময় হলেই পরিয়ে দেবে আপনার গলায়।

ডরথী শুধাল, সময় হতে আর কত দেরী?

ইতিমধ্যে এক নজরে সকলের মুখও দেখে নিয়েছিলাম। বৃদ্ধটি তখন পাইপ ধরাতে ব্যস্ত—তাই তাঁর মুখের ভাব ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে হাসিটি মুখে লেগে ছিল—সেটুকু দেখেছি। আর সকলেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে—এক মার্লিন ছাড়া। মার্লিনের চোখে-মুখে একটা চাপা হাসির তড়িৎ খেলে যাচ্ছিল যেন।

ডরথীর কথার উত্তরে বললাম, সেটা ঠিক বলা কঠিন।

মঙ্কটন বেশ খুশী মনে চেয়ারে ভাল করে ঠেসান দিয়ে বসল। ভাবটা এই—ঠিকই বলেছেন, তবে—এ ত জানা কথা।

এইবার ডরথী হাত বাড়াল। বলল, আমার হাত দেখার সময় হবে কি?

বললাম, নিশ্চয়। খুশীই হব।

মার্লিন বলল, হ্যাঁ। ভুলে যাওয়া বিদ্যেটা ভাল করে যাচাই করে নেওয়াই ত ভাল।

মার্লিনের দিকে চেয়ে বললাম, আজ সকলের হাত দেখব। কাউকে ছাড়ছি না।

মার্লিন একটু হেসে মুখ ফেরাল—কথার কোনও জবাব দিল না।

ডরথীকে বললাম, আপনার হাতটিও ভাল। খাসা বুদ্ধিমান বিবেচক স্বামী আপনার অদৃষ্টে রয়েছে। জীবনটা মনের মতন ঘরকন্নায় সুন্দর করে তুলবেন আপনি। কিন্তু—

ডরথী শুধাল, কিন্তুটা কি?

বললাম, ছেলেমেয়ে যে অনেকগুলি দেখছি—প্রায় এক ডজন!

সকলেই হেসে উঠল। টম একেবারে হেসে গড়িয়ে গেল। বৃদ্ধ হেসে বললেন ডরথী! ডরথী! তুমি আমাকে অবাক করলে।

সকলের হাসিতে ডরথীর মুখটি ঈষৎ লাল হয়ে উঠেছিল। বোধ হয় কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলল, এইবার মার্লিনের হাতটা দেখুন ত।

সত্য কথা বলতে গেলে মার্লিনের হাত দেখার আগ্রহ ইতিমধ্যে আমার মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ঐ হাত দু'খানি হাতের মধ্যে নেওয়ার অপরিসীম আনন্দের পুলক কল্পনায় ইতিমধ্যে বারে বারে আমার মনকে নাড়া দিচ্ছিল—সে কথা তোমার কাছে অস্বীকার করব না বুলা!

মুখে বললাম, কেন? এর পরেই আমি একবার মিঃ কলিন্সের হাতটা দেখতে চাই।

মিঃ কলিন্স একটু মৃদু হেসে তৎক্ষণাৎ নিজের হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। খানিকক্ষণ হাত দেখে, যেন সব বুঝে ফেলেছি, এই রকম একটা বিজ্ঞ ধরণ নিয়ে বললাম, না কিছু বলব না। বৃদ্ধটিও বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বললেন, থাক্। ডরথীর হাত দেখার পর ওর হাত দেখে কিছু না বলাই ভাল।

বললাম, শুধু শুধু মিঃ কলিন্সকে আর সকলের মধ্যে লজ্জা দেব না।

ডরথী বলল আপনি মার্লিনের হাতটা দেখুন।

মার্লিনের চোখে-মুখে তখনও সেই চাপা হাসি। মাথা নেড়ে শুধু বলল, না।

শুধালাম, কেন?

বলল, ভবিষ্যৎ জানার আমার ইচ্ছে নেই।

বললাম, না হয় শুধু অতীতই বলব।

বলল, অতীত ত জানিই। আর আমার ভবিষ্যৎটা আপনি চুপি চুপি জেনে নেবেন—তাতেও রাজী নই।

ডরথী পীড়াপীড়ি শুরু করল। মঙ্কটন গম্ভীর ভাবে বলল, এ সব ব্যাপারে ইচ্ছে না থাকলে জোর করা উচিত নয়।

মার্লিন বৃদ্ধের হাতখানি ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—দেখুন ত একবার ভাল করে। কবে আমাদের নতুন দিদিমা আসছেন—ঠিক বলুন ত।

মনটা যেন ইতিমধ্যে দপ্ করে নিবে গেছে—কোনও আগ্রহ উৎসাহই আর পেলাম না।

সেদিন একলাই বাড়ী ফিরে এলাম। কেন জানি না—ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে ফিরিনি। পথে চলতে চলতে বুঝতে পারলাম—মনটা ভারি হয়েই রয়েছে—যেন চলতে চায় না। কেন এমন হল—তার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না।

পরের দিনটা ক্লাবে গেলাম না। কেন যে যাইনি—তার ঠিক কারণটি তোমাকে বলতে পারি না। হাতটি আমার হাতে ধরা দেয়নি বলে অভিমান হয়েছিল? ভেবেছিলাম কি—একটু বুঝুক, আমিও অত সস্তা নই। এখন এই শেষ জীবনে কথাটা ভাবি আর হাসি পায়। যদি অভিমানই হয়ে থাকে, কিসের জোরে হল আমার এই অভিমান—সে কথাটা কি একবারও ভেবে দেখিনি? যৌবনের তরুণ মন—যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না—কথাটা যৌবন গেলেই বোধ হয় ভাল করে বোঝা যায়।

পরের দিন অবশ্য ক্লাবে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়েই সোজা টেনিস খেলায় যোগ দিলাম—ওদের দলটির দিকে ভাল করে যেন চেয়েই দেখিনি। ওরা সেটুকু লক্ষ্য করেছিল কি না জানি না কিন্তু খেলা শেষ করে সোজা ক্লাবঘরের মধ্যে গিয়ে এক পেয়ালা চা নিয়ে যখন ভাবছিলাম—ক্লাবঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই চাটুকু খেয়ে চলে যাওয়া যাক্—ডরথী এগিয়ে এল ক্লাবঘরের মধ্যে। আমার কাছে এসে হেসে বলল, আপনি বুঝি আজ আমাদের দলে আসবেন না? উত্তরে কি যে বলব—তার জন্য মনটা মোটেই তৈরী ছিল না। বললাম, না না, তা নয়। তবে—। ডরথী আমার কথা থামিয়ে দিয়ে আমার চা-এর পেয়ালাটি হাতে তুলে নিয়ে বলল, চলুন।

কি আর করি! আমিও বললাম চলুন।

ক্লাবঘর ছেড়ে যেতে যেতে ডরথী বলল, মার্লি ঠিকই বলেছিল দেখছি।

শুধালাম, কি বলেছিল?

বলল, বলেছিল—না ডাকলে আপনি আজ আসবেন না।

কথাটা শুনে খুশী হয়েছিলাম না মনে মনে একটু লজ্জিত হয়েছিলাম—ঠিক মনে নেই। তবে ওদের টেবিলে গিয়ে দাঁড়াতেই কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত বোধ হচ্ছিল—সেটা মনে আছে।

বসে দু'-চারটে কথাবার্তার পর মার্লিনই সোজা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কাল আসেন নি কেন?

বললাম, একটু কাজ ছিল।

মরুটন বলল, 'কেমন বলিনি আমি, ডাক্তারদের কাজে কখন কি অবস্থা হয়—আগে বলা কঠিন।

ডরথী বলল, কাজটি ডাক্তারী না আর কিছু—সেটা ত তুমি জান না ফিল!

মরুটন বলল, এই দূর বিদেশে ওঁর ডাক্তারী ছাড়া আর অন্য কি কাজ থাকতে পারে?

মার্লিন বলল, শরীরটাও ত খারাপ হতে পারে। মানুষের শরীরে বা মনে কখন কি হয়—আগে থেকে কি বলা যায়।

মার্লিনের দিকে চেয়ে দেখলাম—চোখ অন্য দিকে ফেরান, তাই মুখের ভাবটি ঠিক বুঝতে পারিনি।

চার পাঁচ দিন পরেই এলো বসন্ত পূর্ণিমা—ক্লাবে 'মে কুইন' উৎসবের দিনটি। ইতিমধ্যে ওদের দলের সঙ্গে সহজ মেলামেশা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি।

ক্রমে আমি যে মার্লিনের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিলাম—সে কথাটা এখানেই বলে রাখা ভাল। কিন্তু মার্লিনের দিক দিয়ে—কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মরুটন মনে মনে নিজের জন্য আত্মদম্ভে যতই আকাশকুসুম রচনা করুক না কেন, সে যে মার্লিনের মনটিকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করেনি—সে বিষয় দেখে শুনে আমার কোনও সন্দেহই ছিল না। কিন্তু আমি? আমি স্পর্শ করতে পেরেছি কি? মার্লিন আমার প্রতি যে একটা সহানুভূতি ভরা বিশেষ দৃষ্টি রাখে—সেটুকু লক্ষ্য করা ত কঠিন হয়নি—করেও ছিলাম। কিন্তু তারপর? সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টির অনুপ্রেরণা যে অন্তরতম অন্তর থেকে আসছে না আমি বিদেশী বলে একটা অহেতুক কৌতূহলেরই অভিব্যক্তি—সে বিষয় খালি থেকে থেকে ধাঁধা লাগত। আমিই যে সেই মানুষটি যে বিশেষ করে তৈরী হয়েছে তারই জন্য—এতখানি ভাবার মতন স্পর্দ্ধা আমার মনে ছিল না, অথচ মন আমার হতাশ হতেও রাজী হয়নি। বুলা! এ রকম মনোভাব হওয়ার আমার অধিকার ছিল কি না ছিল, আমার পক্ষে ন্যায় কি অন্যায়, কিংবা এর পরিণতি কোথায়—এ সব কথা তখন আমি একেবারেই ভাবিনি, সে কথাটিও সোজাই তোমাকে বলে রাখি।

এই রকম মনের অবস্থায় 'মে কুইন' উৎসবে যোগ দেব কি না—সেটাও ঠিক করে উঠতে পারিনি। কখনও হয়ত কোনও একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি, ভেবেছি—'মে কুইন' উৎসবের সৌভাগ্যের চিহ্নটি বোধ হয় আমার অদৃষ্টের জন্যই আছে তোলা। ভেবে তৎক্ষণাৎ ঠিক করেছি, উৎসবে ত যোগ দেবই। কখনও বা ঠিক উল্টো হাওয়ায় হতাশ হয়ে ভেবেছি—এরা বিদেশী, এদের এ সব উৎসবে আমার যোগ না দেওয়াই ভাল।

মনের এই অবস্থায় 'মে কুইন' উৎসবের আগের দিন ডরথী এক ফাঁকে চুপি চুপি আমাকে বলল, 'মে কুইন' উৎসবে আসছেন ত? আবার যেন কোনও কাজের বাধা না হয়।

বললাম, দেখি, চেষ্টা করব।

ডরথী বলল, না না। চেষ্টা-টেষ্টা নয়। নিশ্চয়ই আসবেন।

শুধালাম, কেন বলুন ত?

একটু মৃদু হেসে ডরথী বলল, আসবেন—লোকসান হবে না।

শুধালাম, কি করে জানলেন?

ডরথী বলল, আমার বন্ধুটিকে ত কিছু কিছু চিনি।

আরও যেন জানতে চাই। শুধালাম, বন্ধুটির সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে না কি?

ডরথী একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলল, হলেও কি আপনাকে বলা যায়?

কথাটা নিয়ে ভাবলাম। ডরথীর কথার পিছনে কি মার্লিনের ইঙ্গিত ছিল? নিশ্চয়ই ছিল, নৈলে ডরথী চুপি চুপি আমাকে ও রকম বলবে কেন? এই ভেবে মনটা সহজেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এবং উৎসবের দিন বিকেলে আমার সব চেয়ে ভাল পোষাকটি পরে সেজে-গুজে এলাম ক্লাবে।

ক্লাবে এসে দেখি, সকলেই বেশ ভাল পোষাক পরেই এসেছে—এটা একটা ক্লাবের বিশেষ উৎসবের দিন বলে। ক্লাবের উত্তরে পিছনের প্রাঙ্গণটিতে সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে—কেউ কেউ বা গল্প করছে টেবিলে বসে। ডরথী ক্লাবঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাদের সঙ্গে কথা বলছিল—আমাকে দেখেই এগিয়ে এল আমার কাছে। এগিয়ে এসে আমার দিকে চেয়ে শুধাল, এ কি! কৈ আপনার ফুল কৈ?

বললাম, ফুল কি হবে ?

বলল, দেখুন না সকলের বুকেই ফুল গোঁজা—'মে কুইন'কে দেবেন কি ?

দেখলাম—প্রত্যেকের বুকে, হয় লাল, না হয় নীল, না হয় সাদা বা অন্য রং-এর একটি করে ফুল গোঁজা।

আমার কথার উত্তরের অপেক্ষা না করে ডরথী বলল, দাঁড়ান আসছি। এই বলে সোজা ক্লাবঘরের ভিতরের দিকে চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে চার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম—কৈ মার্লিনকে ত দেখছি না!

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ডরথী ক্লাবঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—হাতে একটা লাল কারনেশন। এসে ফুলটি আমার বুকে পরিয়ে দিয়ে বলল, এইটা 'মে কুইনে'র হাতে দেবেন।

শুধালাম, কি কি করতে হবে, বলুন ত'?

ডরথী বলল, 'কিছুই নয়, 'মে কুইন' তার আসনে গিয়ে বসলে, যখন আপনার নাম ডাকা হবে—তার কাছে এগিয়ে যাবেন এবং এই ফুলটি তার হাতে দিয়ে হাতখানি চুম্বন করবেন।

ক্লাবঘরের আরও উত্তরে, কিছু দূরে যেখানে সবুজ মাঠটি নেমে গিয়ে ঢেউ খেলে আবার উপরে উঠেছে, সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চলল।

ঐখানে একেবারে নীচু জায়গায় একটি ছোট ঝরণা আছে এবং তার ধারে একটি ছোট ওয়ালনাট গাছ আছে তার তলায়। সেইখানেই 'মে কুইনে'র আসন সাজান হয়েছে। এখান থেকে ঠিক দেখা যায় না।

শুধালাম, কতক্ষণ থাকার নিয়ম ?

বলল, যতক্ষণ মে কুইন রাখে। তবে দশ মিনিটের বেশী যেন থাকবেন না, ভাল দেখাবে না।

শুধালাম, আপনাদের মে কুইনটি কোথায় ?

বলল এখুনই বেরুবে। ক্লাবঘরের মধ্যে। তাকে ফুল দিয়ে সাজান হচ্ছে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্লিন ক্লাবঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো—সঙ্গে তিন-চারটি মেয়ে, একজনার হাতে একটি থালায় একথালা ফুল। মার্লিনের দিকে চেয়ে আবার যেন বিশেষ করে মুগ্ধ হলাম আজও স্পষ্ট মনে আছে। ধবধবে সাদা পোষাক পরিধানে, এমন কি পায়েও সাদা রং-এর জুতো। তার উপর সর্বাঙ্গে বেশীর ভাগ সাদা ফুল দিয়ে এমন সুন্দর করে সাজান হয়েছে যে যারা সাজিয়েছে তাদের রুচির প্রশংসা করতেই হয়। দুই বাহুর নীচের দিকে পরিয়ে দিয়েছে বেগুণে রং-এর লাইলাক এবং পোষাকের নীচের দিকটায় এক সারি গাঢ় নীল ফুলের গুচ্ছে বোধ হয় forget me not পোষাকের সাদা রংটি যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। লাল রং-এর ফুল মাত্র ছিল একটি বুকের ঠিক মাঝখানে, একটি বড় লাল গোলাপ জ্বল জ্বল করছিল। একদৃষ্টে মার্লিনের দিকে চেয়েছিলাম—যেন চোখ ফেরাতে পারছি না। সেই কাল গভীর দুটো চোখের লাজ-নম্র মধুর ভাবটি সে সময় আমাকে যে অত্যন্ত অভিভূত করেছিল—বলাই বাহুল্য। মার্লিন বেরিয়ে আসতেই সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

ডরথী আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে বলল, 'ঐ লাল গোলাপটি দেখছেন ?

বললাম, হ্যাঁ। বড় সুন্দর মানিয়েছে।

বলল, আজকের দিনের ভাগ্যবান লোকটির জন্যই বিশেষ করে ঐ গোলাপটি। সেই পাবে।

শুধালাম, তা জানব কি করে ?

বলল, জানান না জানান অবশ্য সেই লোকটির উপর নির্ভর করে। যদি জানাতে চায়, উৎসবের শেষে গোলাপটি নিজের বুকে পরে পাঁচজনার মধ্যে ঘোষণা করবে নিজের সৌভাগ্য।

একটু চুপ করে থেকে ডরথী একটু হেসে আবার বলল, কিন্তু দেখবেন যদি গোলাপটি পান, সকলের যাওয়া-আসা শেষ না হলে সেটি যেন নিজের বুকের উপর জাহির করবেন না। তাহলে উৎসবের মজাটুকুই যাবে চলে।

বললাম, পাগল হয়েছেন! বুকের লাল গোলাপ পাওয়ার মত সৌভাগ্য আমার নাই।

সেই হাসিভরা মুখে একটু দুষ্টুমি মিশিয়ে ডরথী বলল, বলা কি যায়!

বললাম, যদি সত্যিই তা হয়, আমার সৌভাগ্য আমি কিন্তু কাউকে জানাচ্ছি না।

কেন জানি না, ডরথীও একটু মুখ টিপে বলল, না জানানই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ।

মার্লিন তার সখীদের সঙ্গে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে চলে গেল—আরও উত্তরে নীচু জায়গার দিকে। যাওয়ার সময় যাদের পাশ দিয়ে গেল, মৃদু হাসিতে তাদের যেন করে গেল ধন্য। আমি ও ডরথী যে দিকটায় দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিক দিয়ে গেল না।

মার্লিনের সখীরা ফিরে এলো—তাদের দিকে চেয়ে বুঝলাম, ফুলের থালাটি রেখে এসেছে মার্লিনের পাশে। তারা ফিরে এলে মিঃ সোয়ান ছোট একটি বক্তৃতা করে নাম ডাকতে শুরু করলেন। প্রথমেই ডাকলেন—মিস বাকল্যাণ্ড। বোধ হয় নামের প্রথম অক্ষরের মাপকাঠিতেই নামের তালিকা তৈরী হয়েছিল। মিনিট পাঁচ-এর মধ্যেই মিস বাকল্যাণ্ড হাসতে হাসতে ফিরে এলো—হাতে এক থোকা সাদা লাইলাক। আর দু'-এক 'জনার নাম ডাকার পরই বালকটির নাম ডাকা হল—টম বাইরণ। সঙ্গে সঙ্গে টম ছুটল মার্লিনের দিকে। মিনিট পাঁচ-সাত-এর মধ্যেই টম এলো ফিরে এবং আসার সময় শুধু পদক্ষেপের বহর দেখেই নয়, মুখের দিকে চেয়েও বুঝতে পারলাম—বেচারী ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। হাতে কোনও ফুল দেখিনি—বোধ হয় সেটি লুকিয়ে ফেলেছিল পকেটের মধ্যে। প্রথমটা মনে হয়েছিল সৌভাগ্যের চিহ্নটি যে তার অদৃষ্টে অঙ্কিত হয়নি—সেটুকু পাঁচজনার মধ্যে এখুনই জানাতে বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু একটু পরেই লক্ষ্য করলাম, পুরুষরা কেউই নিজেদের পাওয়া ফুলটি দেখাচ্ছে না—তাহলে ঐটেই নিয়ম। সে যাই হোক, টমের হাবভাব দেখে দুঃখ হল। ফিরে এসে চুপ করে এক কোণে একটা চেয়ারে রইল বসে। হায় রে মানুষের মন! ও কি সত্যিই আশা করেছিল, লাল গোলাপটি ও-ই পাবে ?

এই ভাবে এক একজন করে চার-পাঁচ জন যাওয়া-আসার পর মিঃ সোয়ান ডাকলেন, ডাঃ চাউডুরী! গম্ভীর ভাবে কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা চললাম মার্লিনের কাছে। বুকটা একটু যে কেঁপে

ওঠেনি, এমন কথা বলতে পারি না—যেন জীবনের একটি বড় পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি।

মার্লিনের কাছে গিয়ে দেখলাম, একটি উঁচু আসনে মার্লিন বসে আছে এবং তারই হাঁটুর কাছে সামান্য একটু দূরে আর একটি আসন পাতা—মার্লিনের আসনটির চেয়ে সেটি নীচু। আমি যাওয়া মাত্র মার্লিন নীরব মধুর হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করে অপর আসনটি দেখিয়ে দিয়ে বলল, বসুন।'

বসলাম, এবং বসেই আমার ফুলটি মার্লিনের হাতে দিয়ে হাতখানি তুলে হাতে একটি চুমো খেলাম। সোজা চাইলাম মার্লিনের দিকে। দেখলাম, মার্লিনের চোখে হাসি আর একেবারেই নাই। পরিষ্কার দেখলাম, মার্লিন একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। মনে হল যেন সেই কালো দুটো বিষণ্ণ চোখের গভীর অতলে হঠাৎ উঠেছে ঝড়, লেগেছে প্রচণ্ড ঢেউ, যেন উদ্দাম আবেগে চোখ দুটোর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় অঝোর অশ্রুধারা। বুলা! আমি চোখের এ রকম প্রাণঢালা চাহনি জীবনে দেখিনি, আর দেখবও না কখনও।

মিনিট খানেকের মধ্যেই মার্লিন যেন নিজেকে সামলে নিল। আবার এল মুখে সেই মধুর হাসি। দুটি হাত আমার হাতের মধ্যে এগিয়ে দিয়ে বলল, আজ আমার হাত দেখুন।

আমার কি হল জানি না, হঠাৎ কোন আবেগে তা-ও বলতে পারি না, বলে ফেললাম, আজ আর হাত দেখব না—আজ তোমাকে দেখব মার্লিন। হাত দু'টি আমার হাতের মধ্যে রয়েছে—সরিয়ে ত নেয়ই নি। বরং যেন আরও এলিয়ে গেল একটা পরিপূর্ণ নির্ভরতায়, কোনও দ্বিধা নাই।

বলল, হাত দেখাইনি বলে রাগটুকু তাহলে গিয়েছে?

বললাম, রাগ হয়নি, দুঃখ হয়েছিল।

বলল, আর নেই ত?

হাত দু'টো জোর করে হাতের মধ্যে চেপে নিয়ে বললাম না—না। এই ভাবে মিনিট দুই আবার চুপ করে বসে রইলাম—যেন কথা সবই ফুরিয়ে গেছে, কথার আর কোনও প্রয়োজন নাই। মিনিট দুই পরে যেন খুঁজে নিয়ে আমিই কইলাম কথা।

তোমার হাত দেখাবার কোনও প্রয়োজন নাই। তোমার মুখ দেখেই তোমার মনের কথা বলতে পারি।

বলল, বল।

বললাম, তুমি এমন একটি লোক জগতে খুঁজে বার করতে চাও যে, বিশেষ করে তৈরী হয়েছে তোমারই জন্য।

মার্লিন খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলল—ডরথী কথাটি বলে দিয়েছে দেখছি।

বললাম, ডরথী বলেনি—শপথ করে বলতে পারি।

বলল, যাক্, সে মানুষটি কি এসেছে আমার জীবনে?

বললাম, তা ত জানি না!

বলল, তা' হলে ত কিছুই জান না দেখছি।

বললাম, কথাটি তুমিই না হয় জানিয়ে দাও।

বলল, এসেছে।

আবার চোখের মধ্যে ফুটে উঠল সেই চাহনি—চোখ দুটি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমারই মুখের পানে। আবার নীরব হয়ে গেল আমাদের কথা।

হঠাৎ মার্লিনের যেন চমক ভাঙ্গল। হাত দু'টি সরিয়ে নিয়ে আমাকে বলল—এইবার যাও। প্রায় দশ মিনিট হল।

উঠে দাঁড়ালাম। একবার যে লোলুপ দৃষ্টিতে বুকের গোলাপটির দিকে চেয়েছিলাম—সে কথা অস্বীকার করব না। কিন্তু বুকের গোলাপটি বুকেই গেল রয়ে। পাশের থালা থেকে একটি বড় লাল টিউলিপ তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল—এই নাও।

আরও ঘণ্টা খানেকের উপর কাটল। ইতিমধ্যে আমার মনোভাব কি রকম হয়েছিল, বুলা! নিশ্চয়ই তোমার জানার বিশেষ কৌতূহল হয়েছে। এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় ঠিক বলতে পারি না। হাত দু'টি দিয়েছে ধরা আমারই হাতে, নয়ন দু'টির মধ্য দিয়ে ঢেলে দিয়েছে সমস্ত প্রাণখানা যেন আমারই বুকের উপর—এ সব ভাবতে প্রাণ আনন্দে শিউরে শিউরে উঠছিল, অস্বীকার করব না। কিন্তু এটাও সর্ব্বক্ষণ টের পাচ্ছিলাম মনের গভীরে একটি কাঁটা ফুটে আছে, শিউরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু লাগে। বুকের গোলাপটি ত বুকেই রয়ে গেল, কার জন্য রইল তোলা! মক্টনই কি হবে সেই মানুষটি—আর ভাবতে পারিনি।

উৎসব শেষ হল। মার্লিন ফিরে এসেছে ক্লাবের উত্তরের প্রাঙ্গণে। সকলের মধ্যেই একটা কৌতূহল—কে পেল লাল গোলাপটি। সকলকেই সকলে লক্ষ্য করছে। কিন্তু কৈ কারও বুকে ত নাই! এমন সময় ক্লাবের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে একটা হাততালির রোল উঠল। চেয়ে দেখলাম—কয়েক জন যুবক মিলে বৃদ্ধ টাউনসেণ্ডকে একটা চেয়ারের উপর তুলে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। বৃদ্ধ টাউনসেণ্ডের বুকের উপর লাল গোলাপটি।

কেন জানি না, একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বুক ছাপিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাঁটাটিও গেল বেরিয়ে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, আজ বসন্ত-পূর্ণিমা। [ক্রমশঃ

"ভারতের বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাঁহাকেও স্বীকার করা যায় তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নরকেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখিতেছি, তাঁহার প্রভাব ভারত-আত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। আমরা বলিব, বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন তাঁহার দেশবাসীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।"

—শ্রীঅরবিন্দ।

দেখুন! অর্দ্ধেকটা সানলাইট সাবানেই
এসব কাচা হয়েছে!
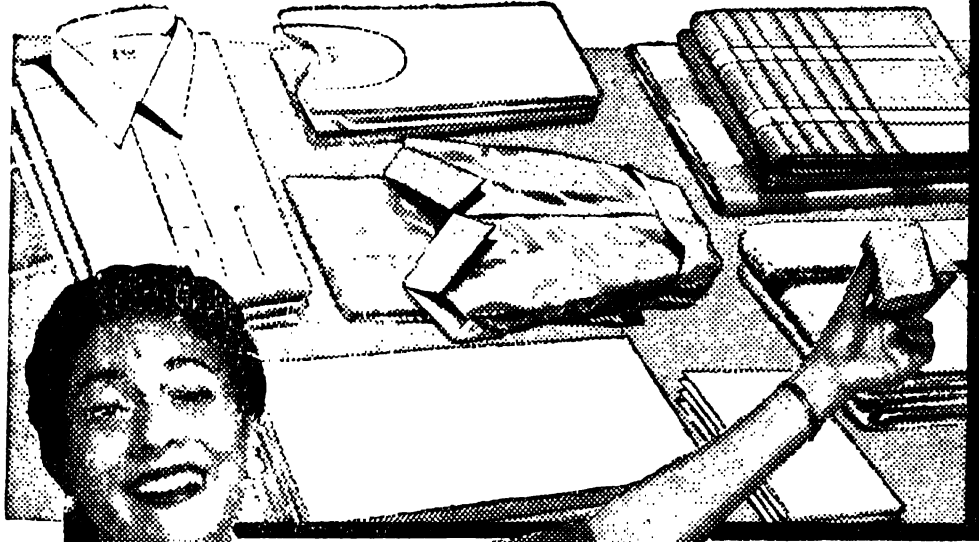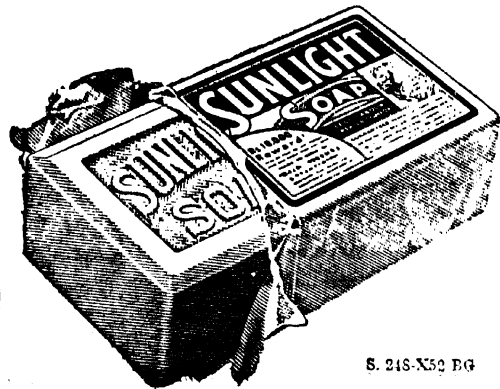
ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ইংলণ্ড

এক

মোহনলাল রওনা হ'ল ১৯১৮-র ডিসেম্বরে, বিশ্বযুদ্ধের অন্তে সন্ধি হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মার্চে পল্লবকে লিখল: "কেম্ব্রিজে দু'টো সীট পেয়েছি, তিনটে পাওয়া যাচ্ছে না—তবে তোমরা এলে আর একটা সীট পাবই পাব, মা ভৈঃ।"

কুঙ্কুম পল্লবকে বলল: "তুমি যাও আগে, আর একটা সীট পেয়ে লিখলেই আমি যাব।"

পল্লব বলল: "না। তুমিই যাও আগে—আমি পরে গেলেও চলবে।"

কুঙ্কুম বলল: "না। আমার এখানে একটু কাজ বাকি আছে বিপ্লবীদের সঙ্গে। কেম্ব্রিজের কলেজ খুলবে তো অক্টোবরে—সময় আছে। আমি যাবই যাব—ভেবো না।" কুঙ্কুম কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পল্লব বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিল।

পল্লব রওনা হ'ল জুনে। জাহাজে উঠে দৈহিক তথা মানসিক দোলার শেষে লণ্ডনে টিলবারিতে পৌঁছল জুলাই মাসের তেসরা তারিখে—১৯১৯ সালে।

দুই

মোহনলাল ডকে এসে পল্লবকে ডেকে দেখে সঘনে টুপি নাড়ল। পল্লব আশ্বস্ত হ'ল। "মোহনলাল আছে, আর ভয় কি? Half the battle!" বলল মনে মনে।

মোহনলাল ওকে নিয়ে ট্যাক্সি ক'রে চ'লে এল সোজা লণ্ডনে—হ্যাম্পস্টেডে। মনোরম বেলসাইজ পার্কের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াল।

পল্লব নামতেই সামনে এক সুরূপা ঠোঁটে আলতা দেওয়া বাঙালী তরুণী হাসিমুখে বললেন: "হ্যালো!"

* * * *

ট্যাক্সিতে মোহনলাল পল্লবকে বলেছিল যে, প্রথম কিছু দিন লণ্ডনে থেকে যাবে কেম্ব্রিজে—কুঙ্কুমের জন্যে আর একটা সীট যোগাড় করতে। লণ্ডনে দু'দিন থাকা আরও এই জন্যে যে, যাবার একটু সুবিধে হয়েছে; মোহনলালের এক পিতৃবন্ধু ডাক্তার রঞ্জন গুপ্ত বছর দশেক ধরে লণ্ডনে প্রাকটিস জমিয়েছেন। বেশ দু' পয়সা কামান। সুন্দর বাড়ি—চমৎকার জায়গায়। মোহনলাল লণ্ডনে এসে প্রথমেই তাঁর ওখানেই ওঠে। তাঁর মেয়ে সুলতা মোহনলালেরই সমবয়সী—লণ্ডনের ফ্যাশনেবল ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একটি উদীয়মানা নন্দিনী (de butante) পড়ে ডাক্তারী—এফ, আর, সি, এস। পড়াশুনায় ভালো। কথায় কথায় তর্ক করে। কিন্তু তর্কে হারলে হাসতেও পারে। মোহনলাল ট্যাক্সিতে ওর অত্যন্ন ব্যঙ্গের সুরে বলল: "সুলতা না পারে কি? পার্টি দিতে, টেনিস খেলতে। বলরুমে নাচতে—এমন কি ইতিমধ্যে শাড়ি প'রেই ঘোড়ায় চড়তেও শিখে ফেলেছে। রঞ্জন কাকা বিপত্নীক—ঐ একটি মাত্র মেয়ে—নয়নতারা। ওর পাত্রের অভাব হবে না। বাবার মোটা যৌতুকের বরাভয় পিছনে থমকে রয়েছে।"

পল্লব দেশে অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি—দু'-একটি ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ছাড়া। কাজেই সুলতাকে দেখে থমকে গেল বৈ কি!

সুলতা মোহনলাল ও পল্লবকে নিয়ে কোথায় না গেল, আর লণ্ডনের কী না দেখলো! পার্লামেন্ট, বিগবেন, হ্যামটন কোর্ট, লণ্ডন টাউয়ার, জাদুঘর, টেট চিত্রশালা, মাদাম তুসো, টিট গার্ডেন—উইম্বলডন টেনিস—বাকি রইল না কিছুই।

সুলতার প্রতিপত্তি হয়েছে বৈ কি! লণ্ডনে নানা সভায়ই ও ভাষণ দেয়। ওর অনুরাগিবৃন্দও কম নয়। কেবল ওর একটি জিনিস পল্লবের খারাপ লাগত: বল-রুমে যার তার কটি বেষ্টন করে ট্যাঙ্গো নৃত্য। মোহনলাল বলল হেসে: "দোষ কি?" পল্লব চমকে গেল! "তুমি পারো নামতে এভাবে?"

মোহনলাল অম্লান বদনে বলল, "সুলতা শেখাচ্ছে নামতে। এখনো ঠিক তালে তালে পা পড়ে না। হাতটা আর একটু আয়ত্ত হলেই নাচব। সুলতা ভরসা দিয়েছে আমার গতিবিধি আলাদা।"

পল্লবের একটুও ভালো লাগলো না। কিন্তু মোহনলাল পাকা ছেলে, কিসে কি হয় জানে। যা ভালো বোঝে করুক। ও কেম্ব্রিজে যাবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠল।

এমন সময় বিনা মেঘে—না, সত্যিই বজ্রপাত নয়, কিঞ্চিৎ রঙিন বারিপাত মাত্র।

তিন

সেদিন সুলতা মোহনলাল ও পল্লবকে নিয়ে গিয়েছিল একটা পার্টিতে। ওখানকার এক ইংরাজ danede salon যার অধিষ্ঠাত্রী। ডিনার-পর্ব সমাধা হ'লে—বাদ্য সুরু হ'ল। সুলতা উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল। উভয়ে নাচ সুরু করে দিল। পল্লবের এই প্রথম ডিনার পার্টির অভিজ্ঞতা।

পল্লব অদূরে একটা সোফায় বসে লেমনেড সেবন করতে করতে দেখতে থাকে। অনেকেই নাচল সুলতার সঙ্গে কিন্তু ও লক্ষ্য করল যে, মোহনলালের সঙ্গে সুলতা যখন নাচে তখন ওর মুখ-চোখের ভাবই বদলে যায়। মোহনলাল ওর সঙ্গে পর পর তিন তিনটে নাচ নাচল অতি পরিপাটি। পল্লব মনে মনে মোহনলালের সাবলীল নৃত্যসিদ্ধির তারিফ না করেই পারল না বটে, কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়ল যে সুলতা খুব আবিষ্ট হ'য়ে মোহনলালকে কী বলছে। মুখে ওর এক নতুন রকমের হাসি, চোখের দৃষ্টিতে এক নতুন আলো! পল্লবের চিত্তাকাশে অস্বস্তির মেঘ উঠল ঘনিয়ে।

নাচ শেষ হ'তে মোহনলাল এসে বসল পল্লবের পাশে সুলতার সঙ্গে। মোহনলাল ও পল্লব লেমনেড সেবন করে কিন্তু সুলতা মাঝের টেবিলে যেতে গ্লাসে ঢেলে নিল—ও মা! লাল পানি! তার পরে ফের ওর নাচ সুরু হ'ল এক ইংরাজ যুবকের সঙ্গে।

পল্লব চাপা সুরে মোহনলালকে বলল, "সুলতা কি মদও খায় না কি?"

মোহনলাল বলল, "দোষ কি?" পল্লব চুপ করে গেল। কিন্তু ওর মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। বাঙালী মেয়েকে ও এর আগে মদ খেতে দেখেনি।

দেখতে দেখতে সুলতা তিন-চার গ্লাস সোমরস পান ক'রে আরো উজিয়ে উঠল। শেষে মোহনলালকে এসে বলল: "মোহন, ডার্লিং, আর একটা ডান্স।"

মোহনলাল একটু যেন চমকে গেল, বলল, "না, আর না। ফেরবার সময় হ'ল।"

সুলতা ওর গায়ে প্রায় ঠেসান দিয়ে ব'সে বলল; "আর একটা Just one more—please! এখন তো রাত মোটে এগারটা। The fun has but just begun!"

মোহনলাল বিরক্ত হ'য়ে একটু স'রে বসল। সুলতার মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল, বলল: "What a poor you are!"

মোহনলাল বিরস কণ্ঠে বলল: "Behave yourself!"

সুলতা চেঁচিয়ে উঠল: "What?"

মোহনলাল বাংলায় বলল: "কী করছো সুলতা? সবাই দেখছে।"

সুলতা উত্তেজিত স্বরে ব'লে বসল: "I care a fig! আমি কি ঢলাঢলি করছি না কি?"

মোহনলাল বিরক্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়াল, বলল: "চললাম।"

সুলতাও উঠল—ওর পা হঠাৎ টলছে—মোহনলালের হাত চেপে ধরে বলল: "You must not be a poor darling! Just one more dance! Please darling!"

মোহনলাল রুক্ষকণ্ঠে বাংলায় বলল: "না! আর আমাকে ডার্লিং বোলো না।"

সুলতা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল: "A monk, indeed!" বলেই পাশের টেবিল থেকে আর এক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিল।

মোহনলাল ওর কাছে এসে মৃদু স্বরে বলল: "আর খেয়ো না।"

সুলতা চেঁচিয়ে বলল: "Get out! You are not the keeper of my conscience, are you?"

মোহনলালের মুখ-চোখ রাঙা হ'য়ে উঠল, পল্লবকে বলল: "এসো পল্লব, আমরা যাই।"

ওরা বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে—রাত প্রায় একটা। টিউব ট্রেণ চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেছে। সুলতার মোটর সামনে, কিন্তু মোহন দাঁড়িয়ে রইল ট্যাক্সির জন্যে।

পল্লব বলল: "সুলতাকে ফেলে যাবে?"

মোহনলাল বলল: "পল্লব, আমার ভুল হয়েছে। কুঙ্কুম ঠিকই বলে। আমরা এখনো মাত্রা রেখে মদ খেতে শিখিনি। সুলতা যে এরকম বেতাল হতে পারে আমি ভাবতেও পারি নি।"

"খুশি হলাম ও কথা শুনে। কিন্তু—তবু।"

"কী?"

"ওকে ফেলে যাওয়া কি ঠিক হবে? বিশেষ ওর যখন এই অবস্থা। ডাক্তার গুপ্ত বলবেন কী?"

মোহনলাল হেসে বলল, "ডাক্তার গুপ্ত কিছু বলবেন না, ভয় নেই। তাঁর ধারণা যে, মেয়ে তাঁর শুধু লাখে না মিলয় এক নয়—অনবদ্যা অথবা perfection's paragon!"

বলতে বলতে সুলতার আবির্ভাব! ও ছুটে এসে মোহনলালের বাহুলগ্না হ'য়ে বলল, "Forgive me darling!"

মোহনলাল বিরক্ত হয়ে ধমকালো, ফের ডার্লিং?

সুলতা হঠাৎ জড়িত কণ্ঠে বলল, Don't behave like a a cad!

মোহনলাল আর একটি কথাও না ব'লে ওকে ঠেলে এনে তুলল ওর মোটরে।

সুলতা বলল, এখনো দু'টো নাচ বাকি।

মোহনলাল পরুষ কণ্ঠে বলল, "না আর একটাও না, ঢের হয়েছে। You are not yourself—এসো। নৈলে আমি তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখব না।"

সুলতার কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল, বলল, "আচ্ছা!"

মোটরে ঢুকতেই সুলতা মোহনলালের কোলে ভেঙে পড়ল, "Forgive me, darling—I promise you—"

মোহনলাল ধমক দিল, চুপ!

* * * *

রাত্রে মোহনলাল ও পল্লব সুলতার পাশের ঘরে পাশাপাশি দু'টি বিছানায় শুত।

সুলতাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসে মোহনলাল বলল, "ভাই, আমাকে মাফ কোরো যে আমি তোমাকে এখানে এনেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস কোরো, আমি জানতাম না।"

কী?

যে সুলতা এরকম মদ খেয়ে বেলেল্লামি করতে পারে!

পল্লব বলল, "বোধ হয় আর একটা কথা জানো না, তোমাকে ও—"

মোহনলাল বলল, "জানি। ওর মতিগতি ভালো নয়। কালই আমরা কেম্ব্রিজে ফিরব। কুঙ্কুম মিথ্যে বলে না, আগুন নিয়ে খেলা ভালো নয়। কেবল ভদ্রঘরের শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ে যে এমন কাণ্ড করতে পারে!"

চার

মোহনলালের সঙ্গে কেম্ব্রিজে ফিরে পল্লব স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। লণ্ডনের পরে কেম্ব্রিজের আবহাওয়া ওর কী-যে ভালো লেগে গেল! বিশেষ করে এ ছোট শহরটির শান্ত সমাহিত পল্লবিত সুষমা। কেম্ব্রিজের নদীক্যাম-এ পার্টিং, নানা বীথিকায় ঘোরানো, এখানে ওখানে লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো—সবই ওকে পেয়ে বসল। সবচেয়ে ভালো লাগল এখানে সেই পার্টির উদ্দাম ও বলনৃত্য। মোহনলালকে বলল, "আমাদের প্রথমেই এখানে আসা উচিত ছিল।"

মোহনলাল হেসে বলল, "কিন্তু তাহলে অনেক কিছু না জানা থেকে যেত।"

"সব কিছুই কি জানা দরকার, বলো তুমি?"

"না। তবে সুলতা যে প্রকাশ্য সভায়—কিন্তু যাক ও প্রসঙ্গ।"

পল্লব আর কিছু বলল না।

মোহনলাল দুটো কলেজে দুটো সীট পেয়েছিল। কেম্ব্রিজের শ্রেষ্ঠ কলেজ ট্রিনিটি ও তার'পরেই নামজাদ কলেজ কিংস। অনেক চেষ্টার পরে পেমব্রোক কলেজে আর একটি সীট পেল। পল্লব বলল, "আমি পেমব্রোকে পড়ব, কুঙ্কুম ট্রিনিটিতে আর তুমি কিংস-এ।"

মোহনলাল বলল, "সে হয় না। আমিই কর্মকর্তা, কাজেই পরিবেশনের ভার আমার, কুঙ্কুম ট্রিনিটিতে পড়বে তো বটেই। কিন্তু তুমি ঢুকবে রাজকীয় কলেজে। আমি খুশি মনে কিরো করবো পেমব্রোকে।"

পল্লব কুঙ্কুমকে লিখে দিল মোহনলালের কৃতিত্বের ব্যবস্থার কথা। কুঙ্কুম উত্তরে তার করল—অগস্টে রওনা হচ্ছে "মরিশাস" জাহাজে।

পাঁচ

কুঙ্কুম ১লা সেপ্টেম্বরে পৌঁছল প্লিমাথে। সেখান থেকে সোজা এল কেম্ব্রিজে। তখনো কলেজ খোলেনি, তাই এসে মোহনলালের ফ্ল্যাটেই উঠল। মোহনলাল দুটো ঘর না নিয়ে একটা পুরো ফ্ল্যাট নিয়েছিল। পল্লব ও মোহনলাল ওকে বলল, কলেজ খোলার এখনো মাস খানেক দেরি আছে, চলো যাই উইণ্ডারমেয়ার, গ্রাসমিয়ার বেড়াতে—যেখানে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবিরা কবিতা লিখেছিলেন। কুঙ্কুম হেসে বলল, "আমি পদ্যময় নই ভাই, কাব্য ও কবি আমার মাথায় থাক।" বলেই আই-সি-এসের পড়া শুরু করে দিল। মোহনলাল হেসে বলল: "বিবেকের অবতার!"

কলেজ খুলতেই কুঙ্কুম "মণ্টাল অ্যাণ্ড মরাল-সায়েন্স"-এর ক্লাসে যাওয়া সুরু করল। মোহনলালের আইনের ক্লাস—এল-এল-বি, পল্লব—গণিতের ট্রাইপস। কুঙ্কুম ট্রিনিটি কলেজেই ঘর পেল! পল্লব কলেজে ঘর না পাওয়ায় ব্রিজো প্রেতে একটি চমৎকার লজিং-এ দুটি ঘর নিল। একটি বসবার ঘর একতলায়। অন্যটি শোবার ঘর—দোতলায়। ল্যাণ্ডলেডিও অতি সুশীলা। পল্লব খুশিই হ'ল। কারণ কলেজের ঘরের চেয়ে লজিং-এ আরাম ঢের বেশি। কলেজ থেকে একটু দূরে এই যা। কিন্তু কেম্ব্রিজে সব ছাত্রেরাই সাইক্লে চলা-ফেরা করে। ও একটি সাইক্ল কিনল। মাত্র দেড় মাইল পথ বৈ তো নয়।

কেবলক্রুগুর মনের মধ্যে উদাস ভাবটা এ-দেশের ব্যস্ততার আবহাওয়ায় গেল উবে। মাঝে মাঝে ভাবত, কই ভগবানের কথা তো দিনান্তে একবারও মনে পড়ে না! আর পড়লেও ডাকব কী, বিছানায় শুতে না শুতে ঘুম।

কেবল ভালো লাগে না এই মিথ্যে ট্রাইপোসের পড়া। ওর মন চায় অন্য জিনিস। কিন্তু কী সে বস্তু? ও ভেবে পায় না।

ছয়

পল্লব ঠিক করেছিল, ১৯২০তে ট্রাইপস প্রথম পার্ট পরীক্ষা দেবে, ১৯২১-এ আই-সি-এস। মোহনলালও ঠিক করেছিল ১৯২১-এ আই-সি-এস দেবে, কেন না, ১৯২০তে জুনে আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে হ'লে সময় থাকে মাত্র আট মাস। কিন্তু কুঙ্কুম ঠিক করল—১৯২০তেই আই-সি-এস পরীক্ষা দেবে, যা থাকে কপালে। মোহনলাল বলল—"এখানে প্রতিযোগিতা সাংঘাতিক। তার উপর অনেক ছাত্রই তিন চার বৎসর ধরে আই-সি-এসের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে—আর ভারতের নানা প্রদেশের সেরা মাথাওয়ালা ছাত্র। কুঙ্কুম হেসে বলল, "হোক। ভদ্রলোকের এক কথা।"

১৯২০এ আই-সি-এস-এর পরীক্ষায় ফল বেরুতে সবাই অবাক! কুঙ্কুম শুধু যে পাস করেছে তাই নয়, খুব উঁচু স্থান অধিকার করেছে—তৃতীয় স্থান। এবং ইংরাজি পেপারে প্রথম হ'ল। কেম্ব্রিজে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল। আট মাসে এভাবে আই-সি-এস পাস করা! সোজা কথা! যেখানে পাঁচ-ছয়টি ভালো ছাত্র হার মানল। মাত্র আট জন উত্তীর্ণ হল। কুঙ্কুমকে নিয়ে।

সাত

কুঙ্কুম আই-সি-এস পাস করার অব্যবহিত পরেই লণ্ডনে কর্তৃপক্ষকে লিখে জানালো, ও চাকরি করবে না। ইণ্ডিয়া অফিসের সাহেব সম্প্রদায় এ-বোমা ফাটায় চমকে উঠলেন। এ রকম তো কেউ করেনি! তাঁরা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে কুঙ্কুমকে ডেকে পাঠালেন। ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারি অফ ষ্টেট এক সাহেব ওকে মিষ্ট ভাষায় বিস্তর বোঝালেন: "চাকরি ছাড়বে কেন? ভারতে এখন আই-সি-এস জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতেই শক্তি—দেশের কাজ তো এই ভাবেই বেশি করতে পারবে···"

কুঙ্কুম অনড় অটল: "you cannot serve two masters, Sir,,—God and Mammon!"

সাহেবের মুখ লাল হ'য়ে উঠল। তবু বললেন, "পাগলামি কোরো না। সময় নাও—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে শেষে পরিতাপই হবে সম্বল।"

কুঙ্কুম শান্তকণ্ঠে বলল: "আপনারা আমাকে জেলে পাঠালে তাতে আমি গৌরবই বোধ করব, পরিতাপ নয়।"

* * * *

কেম্ব্রিজে ফিরে এসে কুঙ্কুম পল্লব ও মোহনলালকে বলল সব কথা।

পল্লবের বুক বন্ধুগৌরবে দশ হাত হ'য়ে উঠল···কিন্তু মোহনলাল মুখ নিচু করে নিশ্চুপ।

কুঙ্কুম বলল: "কী ভাবছ? ভুল করছি এই তো?"

মোহনলাল একটু চুপ করে থেকে বলল: "না কুঙ্কুম, আমি জমিদারের এক ছেলে হ'লেও আদর্শ আমারও আছে। এ-কাজ তোমারই যোগ্য—কে না মানবে? কেবল জানোই তো ভাই, আমি প্রকৃতিতে একটু সাবধানী—তাই ভাবছি—তুমি দেশে ফিরে গিয়ে তবে আই-সি-এস-এ ইস্তফা দিলে কেমন হ'ত?"

কুঙ্কুম বলল। "আমাকে যে শপথ করতে হবে—আমি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের 'লয়াল' দাস হ'য়ে থাকব। শুরুতেই মিথ্যা শপথ ক'রে কেন মনের গ্লানি বাড়াই—যখন জানি যে দেশের কাজ ও আই-সি-এস এ-দুয়ের মধ্যে রফা হয় না, হ'তে পারে না।"

পল্লবের টলমান মনে মোহনলালের দুশ্চিন্তার ছোঁয়াচ লাগল। বলল: "কিন্তু মোহনলাল যা বলছে···মানে···এখান থেকেই ইস্তফা দিলে দেশে যেতে না যেতে তোমাকে যদি—"

কুঙ্কুম বলল: "জানি। হয়ত জাহাজ থেকে নামতে না নামতে হাতে বালা পরাবে, কিম্বা রেগুলেশন থ্রীর জোরে আমাকে অন্তরীণ করবে কোনো এক বিভুঁয়ে। কিন্তু এত শত পরিণাম চিন্তা কোনো কাজের কথা নয়। একজন মহৎ কবি বলেছেন, "Do well and right and let the world sink!"

পল্লব একটু ভেবে বলল, "তবে আমিই কেন যা মিথ্যে

আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্যে খেটে মরি! যদি আই-সি-এস-এর চাকরি অন্যায় হয় তবে তো সেটা আমার পক্ষেও অন্যায়।"

কুঙ্কুম বলল, "তোমার কথা একটু আলাদা। তুমি—তুমি তো গণিতে ট্রাইপস।"

মোহনলাল বাধা দিয়ে বলল, "পল্লবের কথা এখন থাক—ভাববার সময় আছে। তাছাড়া ও তো গণিতে ট্রাইপস দিচ্ছে—যদি র‍্যাংলার হয়—আর না হবার কোনোই কারণ নেই—তাহলে ও প্রফেসারি লাইনেও যেতে পারে। মানে আই-সি-এস না হয়ে আই-ই-এস। কিন্তু শোনো কুঙ্কুম, তুমি ঝোঁকের মাথায় কিছু কোরো না। তাছাড়া মনে রেখো, তোমার বাবাকে কথা দিয়েছিলে যে আই-সি-এস দেবে।"

কুঙ্কুম বলল, "কিন্তু কথা তো দিইনি যে আই-সি-এস পাস করে বড় সাহেব বনব। না শোনো মোহন, এ তর্কাতর্কির কথা নয়। আমার মনের ক্ষোভ পুরোপুরি ফিরে গেছে কলেজে সেই দুরন্ত সাহেবকে উত্তম-মধ্যম দেওয়ার পর থেকে। সে জন্যে দুটো বছর নষ্ট হয়েছে, এ জন্যে কিন্তু আমার আক্ষেপ নয়। আমার আক্ষেপ এই যে, আরো আগে কেন বুঝি নি যে first things must come first! অর্থাৎ সব আগে চাই দেশের স্বাধীনতা তার পরে আর সব। বিদেশীর হাতে আর কত দিন লাঞ্ছনা সইব 'হচ্ছে হবে' ক'রে। না ভাই, আমার লক্ষ্য আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। দেশে ফিরে স্বদেশী আন্দোলনে আমাকে ঝাঁপ দিতেই হবে। জেলে যেতে হয়—ভালোই তো। দাম না দিলে কোন দামী জিনিসটা পাওয়া যায় বল ত?" বলতে বলতে ওর সুগৌর মুখ উঠল রাঙা হয়ে, "শোনো মোহন, তোমাকে বলেছি এখানে আসবার আগেই আমি বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। অনেক কিছু ঠিকও করেছি তাদের সঙ্গে, সে সব এখন বলব না, তোমরা ক্রমশ জানতে পারবেই। সেই কার্য্য সিদ্ধির জন্যে আমার এখন আরো বছর খানেক এদেশে থাকতে হবে। কী কাজ, তাও এখন বলবো না। কেবল এইটুকু জেনে রাখো যে, সে কাজ পরীক্ষা পাস নয়। তবু আর এক বৎসর থাকব মেণ্টাল আণ্ড মরাল সায়েন্সের পরীক্ষা দিতে। কিন্তু পরীক্ষাটা অছিলা—eye-wash—আমার উদ্দেশ্য একেবারে আলাদা।"

পল্লব একটু ভেবে বলল, "কিন্তু তোমার বাবা বড় কষ্ট পাবেন ভাই!"

কুঙ্কুম ম্লান হেসে বলল, "ভাই, দেশের ডাক যাদের কাছে মুখ্য, তাদের কাছে বাপ-মার কষ্টের কথা কি গৌণ হ'য়েই ওঠে না? তাছাড়া বাবাও দু'দিন পরে বুঝবেনই—মানে, যদি আমি খাঁটি দেশসেবক বনতে পারি। তখন তিনি বলবেনই বলবেন। সাহেব-সেবক কুঙ্কুমের চেয়ে দেশসেবক কুঙ্কুম বড়। তখন তাঁর আজকের খেদ গৌরবে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু এ তো পরের কথা, স্পেকুলেশন। আমাদের কর্মেই অধিকার, ফলে নয়। তাই যাকে অন্তর বরণ করেছে, সত্য বলে তারই ডাকে বলতে হবে—কোথায় পৌঁছব বা আদৌ কোথাও পৌছব কি না, সে ভাবনা করে লাভ কী?"

মোহনলাল হঠাৎ উঠে কুঙ্কুমের পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল।

"আহা হা, করো কী মোহন!"

"তোমাকে তোমার প্রাপ্য দিচ্ছি ভাই! আরো এই জন্যে যে তুমি দেখালে যা, দেখলে মন ভ'রে যায়—মনেতে বিশ্বাস জাগে।"

আট

পল্লবের মনেও উচ্ছ্বাসের বান ডেকে যায়। কিন্তু সে মুখে কিছু বলল না। কেবল মনে মনে স্থির করল—আই-সি-এস আর কিছুতেই দেবে না। ট্রাইপস দুটো পার্ট পাস ক'রে সুস্থির হয়ে ভেবে-চিন্তে দেখা যাবে—

কী করলে ভালো হয়!

কিন্তু সুস্থির হওয়া কি সোজা কথা? কুঙ্কুমের আই-সি-এস পাস করে ছেড়ে দেবার খবর রটতে না রটতে ইংলণ্ডে অস্থির ছাত্র-সমাজে সুরু হল তুমুল আন্দোলন। কেম্‌ব্রিজের ভারতীয় "মজলিশে" ওকে ঘটা করে রিসেপশন দেওয়া হ'ল। অক্সফোর্ড ভারতীয় "মজলিশ" থেকেও এল সাদর নিমন্ত্রণ। লণ্ডনের ছাত্র-সমাজ হৈ-চৈ ক'রে এক নাটকীয় কাণ্ড করে বসল। লণ্ডনের কয়েকটি বিশিষ্ট সাহেব সুবোকে ডেকে তাদের নাকের সামনে বক্তৃতা দিল—কুঙ্কুম দেশের জন্যে কী কাণ্ড করেছে, উপরওয়ালা কর্তৃপক্ষকে কী বলেছে: "you cannot, sir, serve both God and Mammon'"...ইত্যাদি। সুলতা যে সুলতা, সেও এগিয়ে এল বক্তৃতা দিতে! ইংলণ্ডে মতামত প্রকাশ করলে পুলিশ কিছুই করতে পারে না। কাজেই লণ্ডনের ইঙ্গভারতীয় সাহেব—বিশেষ করে মেম সাহেব—এর দল রেগে আগুন হ'লেও নিরুপায়। যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে? একজন কবি প্রাণ অথচ অগ্নিময়, দুর্বল অথচ লোলজিহ্ব বক্তা তরুণ মাইকেলকে উদ্ধৃত করে ভারতীয় সভায় প্রচণ্ড বক্তৃতা দিলেন ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে: "সাগর উদ্দেশে যবে বাহিরায় নদী, কার সাধ্য রোধে তার গতি?" আর একজন ক্ষীণকায় যুবক চি চি ক'রে ঘোষণা করলেন: "বাজ রে শিঙা বাজ এই রবে সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে—ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?" ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এখানেই শেষ নয়: কুঙ্কুমের কর্মফলের বৃত্ত তরঙ্গায়িত হ'তে হ'তে ঠেকল গিয়ে বাংলা দেশের তটে। সেখানেও সংবাদপত্রাদিতে খবরটা আরো পল্লবিত হয়ে প্রকাশিত হ'ল। একটি পত্রিকা লিখলেন এডিটোরিয়ালে; "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"

কুঙ্কুমের বাবা ভয় পেয়ে গিয়ে কুঙ্কুমকে তার করলেন আই-সি-এস না ছাড়তে। তিনি লিখলেন—তিনি খবর পেয়েছেন, পুলিশ তোড়জোড় বাঁধছে কুঙ্কুম দেশে ফিরতে না ফিরতে তাকে গ্রেপ্তার করবে। কুঙ্কুম চিঠি নিয়ে মোহনলাল ও পল্লবকে দেখাল।

পল্লব পড়ে বিমর্ষ মুখে বলল; "তবে?"

কুঙ্কুম বলল: "তবে আর কি? সাহেবকে তো সাফ বলেই দিয়েছি—জেলে যাবার জন্যে প্রস্তুত আছি।"

এ খবরও কেম্‌ব্রিজে র'টে গেল—দেশের জন্যে কুঙ্কুম ত্যাজ্যপুত্র হ'তে চলেছে। ফলে ও হয়ে দাঁড়াল ছাত্রসমাজের নেতা। সর্বত্রই ওর জয়ধ্বনি, মৃদুতম ভেতো বাঙালীর কণ্ঠেও জেগে উঠল সিংহনাদ। মিরাকলের যুগ গত বলে কোন মূঢ় সংশয়ী?

মোহনলাল একদিন পল্লব ও কুঙ্কুমকে চা-য়ে ডাকল তার ওখানে। ওরা আসতেই বলল, সে ব্যারিস্টারি ছেড়ে দেবে ঠিক করেছে।

কুঙ্কুম বলল: "মানে ?"

মোহনলাল বলল হেসে: "মানে আর কী ভাই? তুমিই দফা সারলে বন্ধু বলে ডেকে। তোমার বন্ধু হব অথচ চলব সেই গতানুগতিকতার পথে, এ দুইও হয় না। God and Mammon-এর সেবা করতে শুধু কি তুমিই অক্ষম—আমিও যে অক্ষম, সেটা দেখাতে না পারলে আর মান থাকে কেমন করে বলো ?"

পল্লব শুষ্কমুখে বলল: "কী করবে তা'হলে ?"

মোহনলাল বলল: "ভাবছি কৃষি পড়ব। দেশে আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানের প্রচার করলে কিছু অন্তত দেশের সেবা হবে তো—জেলে না গিয়েও ? অবশ্য এল-এল-বি-টা পাস করে যাব। এক সঙ্গে দু-দুটো খেতাব বি-এ, এল-এল-বি. ক্যাপ্টাব—থাকলে ভদ্রলোকে গালাগালি দেবে না চাষা বলে।"

কুঙ্কুম মোহনলালের পিঠে চাপড় দিয়ে হেসে বলল: "সাবাস জোয়ান!"

শুধু পল্লবই রইল পেছিয়ে প'ড়ে। সেই সদা টলমান অবস্থা ···কী করবে এখন! আই-সি-এস পাস করবার আগেই ছেড়ে দেওয়া সোজা। কিন্তু ঘূর্ণ্যমান জগতে কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরতে না পারলেও শেষটায় লক্ষ্যহারা ধূমকেতুর খেতাব পাবে না কি ?

নয়

তা ছাড়া বিপদের মত মুশকিলও যে আসে দল বেঁধে। পল্লব ওর মামাকে কুঙ্কুমের কাহিনী সব লিখে জানতে চেয়েছিল, এর পরে ওর আই-সি-এস দেওয়া শোভন হবে কি না। সুবিমল কুঙ্কুমকে শ্রদ্ধা করতেন। ভেবে-চিন্তে লিখলেন, "আচ্ছা আই-সি-এস ছাড়তে পারো কিন্তু ট্রাইপসে ফার্স্ট ক্লাস পেতেই চাও। আই-সি-এস-এ বড় প্রফেসর হবে। তাতেও দেশের সেবা করাই হবে বাবা! জ্ঞানের প্রচার, ছাত্র গঠন, আদর্শ হিসেবেই বা কম কি ? বলে শেষে লিখলেন, কিন্তু বাবা, কুঙ্কুমের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যেও না। ও যা পারে তুমি পারবে না। বিশেষ ক'রে কলেজে যাওয়া। তুমি তো ওর মতন বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু নও বাবা, তাছাড়া তোমার স্বভাব নরম—বেশি গরম সইবে না। রাজনীতি তোমার স্বধর্ম নয়।"

পল্লব কুঙ্কুমকে দেখাল এ চিঠি। কুঙ্কুম ঘরে ছিল, বলল, তোমার মামা ঠিকই বলেছেন। তুমি ছাত্র গঠন করবে। আর—বলে হেসে, ক্লাশে তাদের কাছে স্বদেশী গানও গাইবে চোরাগোপ্তা। মন্দ কি! বিশ্ববিদ্যালয়েও যা করে আমাদের রেক্রুটিং এজেন্ট—ওরফে অধ্যাপক ছদ্মবেশী চারণ কবি। ব'লে সে কী হাসি!

কুঙ্কুমকে গম্ভীরাত্মা বলত অনেকে। কিন্তু যখন ও হাসত তখন ও ব'নে যেত আত্মভোলা বালক। সময়ে সময়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত। পল্লব তখন মুগ্ধনেত্রে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকত। কী সুন্দর!

কিন্তু দিনের পর দিন ছেলে পড়ানো, ছেলে ঠেঙানো—তা আবার এ যুগে যখন ছাত্ররা দিন দিনই উঠছে উদ্ধত হয়ে, যাদের ঢিলটি মারলেও তারা পাটকেলটি ফিরিয়ে দেয় অম্লানবদনে। বেশি দূরে যাবার দরকার কী ? কুঙ্কুমের হাতে খোদ সাহেব প্রফেসারেরও কী হাল হয়েছিল, ও ভুলবে কী কোনো দিনও ? নাঃ, যতই ভাবে ততই পল্লব মাথা নাড়ে, এও ওর স্বধর্ম নয়।

তবে ? করে কী বেচারি ? মিথ্যে মিথ্যে ট্রাইপসের গোয়ালেই মাথা মুড়বে ? শুষ্ক গণিত ? কিন্তু যে কাজে মন দেওয়াই যায় না, সে কাজে ছাই মন বসে কেমন ক'রে ? সবচেয়ে চিত্তগ্লানি জেগে ওঠে ভাবতে যে কুঙ্কুমের বন্ধু হ'য়েও দমাশ ক'রে এমন কিছু একটা করে বসতে পারছে না যাতে কুঙ্কুম ব'লে ওঠে, সাবাস জোয়ান। তাই শুধু গালে হাত দিয়ে ভাবে আর ভাবে।

এই ভাবে মনমরা হ'য়ে ও ট্রাইপস প্রথম পার্ট দিল। কিন্তু পেল সেকেণ্ড ক্লাস। মন আরো খারাপ হয়ে গেল ওর। কুঙ্কুম ও মোহনলাল ওকে দিলাশা দিল—তাতে কী? দ্বিতীয় পার্ট ফার্স্ট ক্লাস পাবে সামনের বৎসর।

কিন্তু পল্লব জানত পারবে না ও র‍্যাংলার হতে। ওর যে ছাই আর একটুও ভালো লাগে না গণিত! মাঝে মাঝে ভাবে, দেশে কী ক'রে গণিতে ফার্স্ট ক্লাস অনর্স পেয়েছিল? ভেবেচিন্তে কুঙ্কুম বলল: "ট্রাইপস দ্বিতীয় পার্টের জন্যে খাটবে কী—যতই ইকোয়েশন নিয়ে বসে ততই নানা গান সুর পিয়ানোর ঝংকার ওর কানে চেপে আসে আর মন হয় উড়ু-উড়ু।

কুঙ্কুম বলল: "সে কী?"

পল্লব রাগত সুরে বলল: "আর সে কী? আমার কি এসব শুকনো জিনিস কোনো দিনও ভালো লেগেছে? দশচক্রে ভগবান ভূতের মতনই আজ আমার অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ভালোবাসি আমি সাহিত্য ও গান। কিন্তু এখানে এলে গোঁয়ারের মতনই পড়েছি গণিত। মাঝে মাঝে মনে হয়, এত প্রচণ্ড লাফ দিয়ে যদি যাওয়া যেত কোথাও।"

মোহনলাল হেসে বলল: "এখান থেকেই? স্বর্ণলঙ্কা যে ভাই বহু দূরে!"

পল্লবও হাসল: "স্বর্ণলঙ্কায় গিয়ে হবেই বা কী—সেখানে নেই তো কোনো স্বর্ণলতা, যিনি অশোকবনে ভূতের মুখে রামনাম শোনার প্রত্যাশায় পথ চেয়ে আছেন। আমি ভাবছি—ভাষা শিখতে আমার সত্যিই ভালো লাগে, তাই আপাতত এখানে কয়েকটি ভাষা শিখে কাটাই বছর দুই। তারপর বছর খানেক য়ুরোপে টহল মেরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব—a duffer that has been taught to boom.

কুঙ্কুম বলল: "ভাষা শেখা খুব ভালো কথা। কিন্তু একটা লক্ষ্য স্থির করা চাই। ভ্রাম্যমান 'ভাবার' হ'লে ক্ষতি নেই, কেবল আগে 'বাসা পাকৃতে' তবে—পরমহংস দেবের উপদেশ মনে নেই?"

পল্লব চুপ ক'রে রইল। কুঙ্কুম একটু ভেবে বলল: "ঝোঁকের মাথায় ট্রাইপস ছেড়ো না। মাথা একটু ঠাণ্ডা হোক, তার পরে ঠিক করা যাবে—কিং কর্তব্যম্।"

কিন্তু দিঙ্‌নির্ণয় হ'ল বিভিন্ন ভাবে—যার চিত্র আঁকতে হ'লে ফের একটু পেছুতে হবে 'সদাটলমানের' সমস্যার ছবি আঁকা কি সহজ কথা ?

দশ

পল্লব কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র থেকে মাইল দেড়েক দূরে ঘর নেওয়ার দরুণ ওর একটু সুবিধে হয়েছিল এই যে, ও এমন একটি বাড়ি পেয়েছিল যার চার দিক খোলা। ওর বসবার ঘরটি নিচের তলায়, শোবার ঘরটি দোতলায়। দুটি ঘরের পশ্চিম দিকের

জানালা থেকে দেখা যেত একটি চমৎকার বাগান ও 'লন'। পল্লব মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখত এ-লনে একটি বাইশ বছরের ইংরাজ ছেলে ছেলেখেলা করছে একটি সাত আট বছরের ফুটফুটে মেয়ের সঙ্গে। ওদের মুখাবয়বের সাদৃশ্য এত বেশি যে ভাই-বোন না হয়ে যায় না। পল্লবের সঙ্গে ওদের সময়ে সময়ে চোখাচোখি হ'ত, আর মাঝে মাঝে মেয়েটি তার দাদাকে আঙুল দিয়ে দেখাত পল্লবের পানে। পল্লব হাসত—ওরাও হাসত। এমনি ক'রে ওদের প্রথম পরিচয়—মাত্র দৃষ্টিবিনিময়ের মাধ্যমে।

কলেজে ঢুকেই ও ক্লাশে দেখে, সেই ইংরেজ ছেলেটি। এ-কথায় সে-কথায় আলাপ হয়ে গেল। ওর নাম জন নর্টন। কেম্ব্রিজে ছাত্রদের মধ্যে চায়ের নিমন্ত্রণের প্রথা আছে। জন পল্লবকে ওদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ করল, আলাপ হ'বে না হ'বে।

পল্লব প্রথম দিন যেতেই জনের বোন রিণা—সেই আট বছরের ফুটফুটে মেয়েটি—ওকে ধরে নিয়ে গেল ওদের মা মিসেস ইভোলিন নর্টনের কাছে: "মা! দেখ দেখ কে এসেছে—আমাদের প্রতিবেশী জনের বন্ধু!"

মিসেস নর্টন হাসিমুখে পল্লবকে চা কেক পরিবেশন করলেন। বার বার এ-কথা সে-কথায় আলাপ জ'মে উঠল। চা-পর্বের অন্তে মিসেস নর্টন বললেন: "রিণা! তুমি মিষ্টার বাকচিকে তোমার পিয়ানো শোনাবে না!"

রিণা ঠিক ক'রে রেখেছিল শোনাবেই শোনাবে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। মার কাছে উৎসাহ পেয়েই উঠল উজ্জিয়ে। পল্লবকে নিয়ে গেল ওর নিজের ঘরে। কোণে একটি ছোট্ট কটেজ পিয়ানো—রিণা ব'সে বাজালো, সুর করে দিল।

পল্লব সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এত ছোট মেয়ে যে এমন সুন্দর পিয়ানো বাজাতে পারবে ও ভাবতেই পারে নি। ও ঠিক করল, কুঙ্কুম ও মোহনলালকেও দেখাতে হবে ওর নব আবিষ্কার—এই "প্রডিজি"র আশ্চর্য প্রতিভা। দু'বার ওদের ওখানে যাবার পরে আলাপ একটু পাকলে ও একদিন কথায় জনকে বলল, ওর দুই বন্ধুর কথা। জন সানন্দেই রাজি হ'ল, রিণাকে নিয়ে তার গর্বের অন্ত নেই—যেমন রূপে তেমনি গুণে সাক্ষাৎ 'প্রডিজিং' পাঁচ জনে ওকে তারিফ করবে এই-ই তো ও চায়। জন মিসেস নর্টনকে বলতেই তিনি বললেন, "নিশ্চয় মিষ্টার বাকচি!"

পল্লব নর্টন পরিবারের সঙ্গে কুঙ্কুম ও মোহনলালের আলাপ করিয়ে দিল। তার পর থেকে কুঙ্কুম ও মোহনলাল দু জনেই মাঝে মাঝে পল্লবের সঙ্গে আসত মিসেস নর্টনের চা-য়ে। আর শুনত রিণার অশ্রান্ত কথা আর মিষ্টি হাতের পিয়ানো।

এগারো

পল্লব নিজের ঘরে ব'সে ট্রাইপসের শুষ্ক গণিত মুলতুবি রেখে ডষ্টয়েভাস্কির ব্রাদার্স কারামাজভ পড়ছে পরমানন্দে। এমন সময়ে দোরে ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং।

ওর ল্যাণ্ডলেডি সেদিন বাড়ি ছিলেন না, কাজেই পল্লবই গিয়ে দোর খুলে দিল।

এ কী? রিণা! কি ব্যাপার?

রিণা ওর আঙুল ধরে ঝুলতে ঝুলতে বলল, "বলব কেন?"

পল্লব হেসে বলল, "বলবে না তো ভিতরে এসো।"

রিণা খুব গম্ভীর সুরে বলল, "শুনুন, মা আপনার টিকিট করেছেন, আজ রাতে একটি কন্সার্টে। পাখমান পিয়ানো বাজাবেন। শোনেননি তো তাঁর বাজনা! উঃ ভয়ঙ্কর ভালো!"

"বটে! তুমি শুনেছ?"

"না। কিন্তু সবাই জানে। মা জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালেন, আপনি আসবেন তো?"

"বাঃ আসব না? তোমার মাকে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিতে ভুলো না।"

"আমি কি কখনো ভুলি না কি? আপনিই তো যান ভুলে। সেদিন আপনার জন্যে আমাদের বাড়িতে চা-য়ে দুই বন্ধু অপেক্ষা ক'রে ক'রে—"

ওঃ। সেই একদিন মাত্র। আমি লাইব্রেরীতে একটা বই নিয়ে পড়তে পড়তে।

কিন্তু এ'কি ভালো? পড়া ভালো অবশ্য, "কিন্তু তাই ব'লে কি নিমন্ত্রণ নিয়ে ভুলে যায় কেউ?"

পল্লব যথাবিধি অনুতাপ প্রকাশ করে বলে, "আর ভুলব না।"

বাজনা শেষ হয়ে গেল। শ্রোতৃবৃন্দের সে কী করতালি! মাঝখানে বিরতির সময়ে আট দশ জন ভক্ত ও ভক্তিমতী পাখমানকে ফুলের বুকে পাঠালো। সবশেষে তিনি একটি মার্চগীত সঙ্গে পিয়ানোর ডুয়েট বাজালেন। করতালি আরো ফুলে উঠল। কনসার্ট শেষ হবার পরে শ্রোতৃবৃন্দের ক্ষিপ্তপ্রায় করতালি ও চিৎকার তুমুল হয়ে উঠল। রেগুলার ওভেশন যাকে বলে।

পল্লব অভিভূত মতন হয়ে পড়ল। কিন্তু শুধু বাজনার দরুণ নয়, য়ুরোপে সঙ্গীতকারের সম্মান দেখে। ও শুনেছিল মিসেস নর্টনের কাছে যে য়ুরোপে বড় গায়ক কি বাদক যে সম্মান পান তা রাজেন্দ্রেরও কাম্য।

কন্সার্টের শেষে রিণা ওর আঙুল ধরে খেলতে খেলতে বলল, "মিষ্টার বাক্‌চি, আপনি কেন পিয়ানো শেখেন না? শিখুন এই বেলা। পরে আপনাতে আমাতে ঠিক এই রকম ডুয়েট বাজাব আর পাব এমনি হাততালি, ফুলের মালা—উঃ।"

পল্লব হেসে বলে, "তুমি ভরসা দিলে পিয়ানো না শিখে পারি?"

রিণার চোখ দুটি আনন্দে জ্বলে উঠল, শিখবেন? সত্যি? কথা দিচ্ছেন?

মিসেস নর্টন বললেন: "আঃ কী বিরক্ত কর রিণা!"

পল্লব বলে: "না না, বিরক্ত কিসের? পিয়ানো শিখব বৈ কি—যখন রিণা বাজাবে ডুয়েট—কিন্তু তুমিও কথা দিচ্ছ তো, রিণা যে আমার সঙ্গে ডুয়েট বাজাবে।"

রিণা একগাল হেসে বলল: "নিশ্চয়।"

পল্লব ঠিক করল—পিয়ানো শিখবেই, সেই সঙ্গে বিলিতি গানও শিখবে। পরে দেশে গিয়ে হবে সঙ্গীতকার। অথচ আজ পর্যন্ত একটি বারও মনে হয়নি তো গায়কের পেশা করার কথা। রিণার কথায় ও যেন শুনল দৈববাণী! ব'লে না "God speaks through the mouths of babes?"

বারো

পরদিন থেকে বিণার মাষ্টারের কাছেই ও পিয়ানোয় তালিম নেওয়া শুরু করল, এবং তাঁর আলাপী এক গায়কের কাছে বিলিতি পদ্ধতিতে কণ্ঠ সাধনা।

দিন দশেক পরে পল্লবের উৎসাহ উজিয়ে উঠল বিশেষ ক'রে কণ্ঠ সাধনায় উন্নতি ক'রে। ওর শিক্ষক ওর প্রতিভার প্রভূত তারিফ করলেন।

পল্লবের মনে কল্পনার ভ্রূণ আর একটু রূপ নিল। শেষে একদিন ও চায়ে ডাকল কুঙ্কুম আর মোহনলালকে।

চা শেষ হ'লে পল্লব এ-কথা সে-কথার পরে কুণ্ঠিত হ'য়ে ওদের বলল—যেজন্যে ওদের ডেকেছে।

মোহনলাল ও কুঙ্কুম শুনে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। সঙ্গীতকার হবে? এ এত অভাবনীয় যে ওরা কী বলবে ভেবে পায় না।

কুঙ্কুম চেয়ার থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে অবিশ্রান্ত তুষারপাতের দিকে চেয়ে থাকে।

পল্লব আজও মোহনলালের দিকে তাকায়। মোহনলাল কুণ্ঠিত স্বরে বলে: "তোমার এ-প্রশ্নের উত্তরে কী যে বলব সত্যিই ভেবে পাচ্ছি না ভাই! কেবল···কি জানো?··· এ দেশের গায়ক-বাদকদের সঙ্গে আমাদের দেশের গায়ক-বাদকদের তফাৎ আশমান জমিন, একথা ভুলো না।"

পল্লব বলে: "না ভুলি নি। তবে প্রথমে যারা কোনো নতুন পথ নেয় তাদের কি বাধা একটু বেশিই সইতে হয় না?"

মোহনলাল বলল: "আমি ঠিক বাধার কথা বলছি না; বলছি বাঁচার কথা। আমাদের দেশের এখন যে অবস্থা তাতে গানকে কেউ পেশা করলে সে কি জীবিকা উপার্জন করতে পারবে?

পল্লব বলে, জীবিকার ভাবনা আমার তেমন নেই।

মোহনলাল বলে, জানি তুমি ধনীর সন্তান। কিন্তু জীবিকার কথা ছেড়ে দিলেও আর একটা প্রশ্ন আসে, সেটা আমার মনে হয় আরো গুরুতর। প্রশ্নটা এই যে, তুমি যখন দেশে ফিরে যাবে তখন লোকে তোমাকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী বোধ হয় করা যায়।

পল্লব অকুণ্ঠে বলে, কিন্তু আর্টের জন্য—

মোহনলাল বাধা দিয়ে বলে, কিছু মনে কোরো না ভাই, তুমি যতই দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা কর না কেন, যে সঙ্গীত একটা মস্ত বড় আর্ট, য়ুরোপে তার এত আদর, এত প্রতিপত্তি, একাগ্র সাধনা নইলে তার চর্চা রাখা অসম্ভব ইত্যাদি—তুমি যদি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সঙ্গীতকেই ব্রত ক'রে দেশে ফেরো—তা হলে তারা কি এ সব হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বলবে না, যে ছেলেটা কেবল লম্বা লম্বা বোলচাল ছাড়া আর কিছুই শেখবার সময় পায়নি? তাছাড়া আমার মনে হয়, আর একটা কথাও ভেবে দেখা দরকার যে দেশে ফিরে তুমি মিশবে কার সঙ্গে? এখানে গাইয়ে-বাজিয়ের শিক্ষিত সমাজের সম্মানভাজন। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা যে ঠিক উলটো, একথা ভুললে ত চলবে না ভাই!

কুঙ্কুম জানলার কাছে দাঁড়িয়েই মুখ ফিরিয়ে বলে, তা বলো মোহনলাল! আমি সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে গেলে কি বলা যায় না যে, নতুন কিছু করার বিপক্ষে এই ধরণের চাঞ্চল্যকর যুক্তি চিরকালই থাকে এবং থাকবে? তাছাড়া গতানুগতিকতার পথই যদি শ্রেষ্ঠ পথ হয় তবে তো এক কেরাণী উকিল ডাক্তার ও ডেপুটি ছাড়া আর কিছুই হওয়া চলে না!

মোহনলাল বলে, তুমি যা বলছ, তা মিথ্যা নয় বটে, কিন্তু মুশকিল এই যে, প্রত্যেকের জীবনটা তার কাছে একবারই আসে। তাছাড়া খুব অসামান্য দু'-চারজনের কথা ছেড়ে দিলে বোধ হয় এ কথা বলা যেতে পারে যে, মানুষ সব আগে চায় সুখ-শান্তি। তাই মুখে আমরা যত বড় বড় কথাই বলি না কেন, কাজে সমাজের অবস্থাকে বরণ করে একটা নতুন পথ কেটে নিয়ে চলার চেয়ে কঠিন কাজ সংসারে কমই আছে। তুমি নিজে এক কথায় আই-সি-এস ছেড়ে বরণ করতে চলেছ জেল ও পুলিশের উৎপীড়ন, সহজ পথ ছেড়ে চেয়েছ দুর্গম পথে চলতে। কিন্তু তোমার সামনে বলছি ব'লে সঙ্কুচিত হ'য়ো না—এমনধারা জলন্ত আদর্শবাদ সব দেশেই বিরল! তাছাড়া, আর একটা কথাও এ সম্পর্কে ভোলা চলে না; সেটা এই যে, পল্লবের মন ও তোমার মন এক প্রকৃতির নয়। কিন্তু পল্লব বরাবর সুখের কোলেই মানুষ। তাই সে তোমার মনে নিজের মনটির স্বরূপ জানবার সুযোগ পায়নি। উপরন্তু, পল্লব আশৈশব একটু রঙিন-প্রকৃতি। সুতরাং বয়সের তুলনায় সে যে নানা বিষয়ে একটু ছেলেমানুষ আছে, তার মতামত বিচার করার সময় এ কথাটি ভুললে চলবে না—পল্লব ভাই, কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মীটি!"

পল্লব ঘা খেলেও জোর করে কণ্ঠে সহজ সুর টেনে বলে: "না না, মনে করব কেন? তবে কি জানো?" [ক্রমশঃ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় পত্র—জম্মুর অধিপতি রাজা গুলাব সিংকে লিখিত।

তোমার দরখাস্ত দেখিয়া জানিতে পারিলাম যে, তোমার রাজ্যে অভিশপ্ত ও অবিশ্বাসী ইংরাজদের কি ভাবে নিধন করিয়াছ। এ জন্য তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ জানানো যাইতেছে। সাহসী ব্যক্তির যাহা করা উচিত, তুমি এই কার্য্যের দ্বারা তাহাই করিয়াছ। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে থাক। সম্রাটের নিকট তোমাকে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া যাইতেছে। আসিবার পথে অবিশ্বাসী ইংরাজদের অথবা শত্রুপক্ষীয় অন্য ব্যক্তিদের দেখিতে পাইলেই হত্যা করিবে। তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ রাজসম্মান দেওয়া হইবে এবং পদমর্য্যাদা দেওয়া হইবে, যাহা তুমি কল্পনাও করিতে পার না।

এগুলি ব্যতীত এই বন্দীর নিকট চতুর্থ সেনাবাহিনীর এক দফাদারের একখানি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সে ব্যক্তি মজঃফরনগরে তাহার সেনানায়ককে হত্যা করার সংবাদ জানাইয়াছে। সেই দরখাস্তের উপরে এই বন্দী স্বহস্তে আদেশ দিয়াছেন যে দরখাস্তকারীকে যোগ্যপদে নিযুক্ত করা হোক।

বন্দীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এখন এই বিচারসভা সিদ্ধান্ত করিবেন যে এই বন্দী এখনও সম্রাটের পদমর্য্যাদা এবং শ্রদ্ধা পাইবার অধিকারী কিম্বা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একজন অন্যায়কারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। আপনারাই স্থির করিবেন যে তাইমুর রাজবংশের শেষ অধিপতি বার্দ্ধক্যের এবং দুর্ভাগ্যের তাড়নায় অবনত এই বন্দী এইবার তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের এই প্রাসাদভবন ত্যাগ করিয়া যাইবেন কি না এবং এই সুন্দর দেওয়ান-ই-খাস, ন্যায় বিচারের জন্য যে স্থান সুবিখ্যাত, সেখানে ন্যায়ের মান হিসাবে ইহাই নির্দ্ধারিত হইবে যে রাজাও যদি অপরাধী হন এবং দুষ্কার্য্যে লিপ্ত থাকেন তাহা হইলে রাজবংশের সমস্ত গরিমার অবসান একদিনেই ঘটিয়া যাইতে পারে।

বিভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইয়া গেলেও এখন যদি আমি বিদ্রোহের কারণ এবং সে ব্যাপারের পূর্ব্বকল্পিত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে হয়তো তাহা অনধিকারচর্চ্চা হইবে না।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কার্টিজ ব্যাপার উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বে দেশীয় সৈন্যদলের মধ্যে যদি কোন কারণে মনোবিকার না ঘটিত তাহা হইলে হয়তো এই সর্ব্বব্যাপী বিদ্রোহ সংঘটিত হইত না। কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত বহু বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষের ভাব বিস্তার করিবার মূলে একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পরস্পরের মধ্যে গোপনে একটা বোঝাপড়া এবং প্রস্তুতি যাহাকে সাধারণ ভাষায় ষড়যন্ত্র বলা যাইতে পারে, তাহা ক্রমবর্দ্ধমান হইতেছিল, নচেৎ এত বড় ঘটনা ঘটিতে পারিত না। এ ঘটনার জন্য কেবল কার্টিজের ব্যাপারের উল্লেখ করা ভুল। চিঠিপত্র এবং গোপন সংবাদাদি সম্বন্ধে এই বিচারসভায় আমি যে সব কথা বলিয়াছি তাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে কার্টিজ একটা সামান্য উপলক্ষ মাত্র—বারুদের স্তূপে ইহা একটা স্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। যে সব প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে ১০ই মে তারিখের পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজের বিরুদ্ধে এ দেশের লোকের মনোভাব বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং স্বার্থান্বেষী কতকগুলি লোক তাহারই সুযোগ লইয়া সেই বিদ্বেষের আগুন দেশব্যাপী করিয়াছিল। অযোধ্যাপ্রদেশ বৃটিশ শাসনের অন্তর্গত করা এই ঘটনার আর একটি কারণ। ভারতে মুসলমান-অধিকৃত শেষ চিহ্নটুকুর অবলুপ্তি তাহারা প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। জাঠমল নামা একজন সাক্ষীর উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে একজন হিন্দু সিপাহী এবং একজন হিন্দু ব্যবসায়ী—উভয়ের মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে বৃটিশ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান ভাবেই পোষণ করিয়াছে। এ কথা যে সত্য তাহা আমরা অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের সেনাবাহিনীর বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য এক সময়ে গর্ব্ব করিবার বস্তু ছিল, কিন্তু তাহাদের নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতায় সে গর্ব্ব আমাদের চূর্ণ হইয়াছে।

দেশীয় সিপাহীরা বিশ্বস্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে নীতিবোধ ছিল কম। তাহাদের বিশ্বস্ততা কতকটা অভ্যাসবশতঃ, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ছিল তাহারও ঊর্দ্ধে। কাজেই যাহাদের মনে কোনরূপ দুরভিসন্ধি আছে তাহারা এই সব দুর্ব্বলতার সুযোগ সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। তিন চার জন দলপতি যদি একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া তোলে অবশিষ্ট সৈন্যেরা হয়তো তখনই তাহাতে যোগদান করিবে না। কিন্তু তাহারা সেই ষড়যন্ত্রকারীদের বাধা দিবে না ইহাও নিশ্চয়। তাহারা মনে করে যে, ধর্ম্মের দিক দিয়েই হউক বা কর্ত্তব্যের দিক দিয়েই হউক, ওই সব দলপতিরা

কার্য্যে যোগ না দিলেও বাধা দেওয়া তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। এই ভাবেই বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে। কয়েক জনের খেয়ালের ফলে যে আগুন জ্বলে তাহাতে ভস্মীভূত হয় অনেকে। সাম্প্রতিক বিদ্রোহ যে এই উপায়েই দেশব্যাপী হইয়াছিল ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার দুই এক মাস পূর্ব্বে সিপাহীদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই ঘটনার সঙ্গে অন্যান্য ঘটনা মিলাইয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, একটা চক্রান্ত নেপথ্যে রূপায়িত হইতেছিল। অযোধ্যাপ্রদেশ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই ঘটনা এবং ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোচিত সম্প্রদায় পুথিতে পড়িয়াছিল যে লোকের মনে শিক্ষাতে আলো প্রকাশিত হইলে ধর্ম্মের গোঁড়ামীর ধ্বংস অনিবার্য্য। সুতরাং জাতিধর্ম্মের অজুহাত তুলিয়া তাহারা লোকের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টির সুযোগ লইতে ভোলে নাই। এমন কি, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া হইবে, হিন্দু মুসলমান সকলকে সমতার দৃষ্টিতে সেনাবাহিনীতে রাখা হইবে, ইত্যাদি ব্যাপার ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নানা ভাবে প্রচার করা হয়।

ইহার ফলে ব্রাহ্মণ এবং মুসলমান সিপাহী একত্র মিলিত হইল। সেনাবাহিনীর মধ্যে হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য ছিল না, একই প্রকারের সাজসজ্জা একই কর্ম্মপদ্ধতি, একই রকমের পারিতোষিক ও পদোন্নতি। এমন কি পরস্পরের ধর্ম্মোৎসবে পরস্পর যোগদান করিত। এই অবস্থায় উত্তেজনার আগুন ধূমায়িত হইতে হইতে তাহা একদিন জ্বলিয়া উঠিল।

কাজেই আবার আমি বলিতেছি যে চর্ব্বিমাখা কার্টিজ এই মর্ম্মান্তিক ঘটনার একটি সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র। পূর্ব্ব হইতেই এই ঘটনার প্রস্তুতি চলিতেছিল।

এই বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহ এ ষড়যন্ত্রে অনেকদিন হইতেই লিপ্ত ছিলেন। হাসান আসকারী এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে অত্যন্ত গোপনে এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা চলিত। সিদি কামবারকে তিনি পারস্যে ও কনস্তান্তিনোপলে পত্র দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সে পত্রে অনুরোধ জানানো হইয়াছিল যাহাতে তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। সুতরাং দেশব্যাপী এই বিপ্লবের ষড়যন্ত্রের মূলে এই বন্দীর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, সিদি কামবারকে পারস্য ও কনস্তান্তিনোপলে পাঠানো হয় ঠিক দুই বৎসর পূর্ব্বে এবং ঐ দুই দেশের সাহায্য লইয়া তাহার দেশে ফিরিবার তারিখ নির্নীত হয় ঠিক যে সময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া ওঠে। এই ঘটনার সঙ্গে আর একটি জনপ্রবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল যে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ঠিক এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার সমাপ্তি ঘটিবে। সম্ভবতঃ সেই জন্যই মুসলমানরা তাহাদের পূর্ণ আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে এই সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল। মোল্লা হাসান আসকারীও এই বন্দী সম্রাট এবং তাঁহার পরিষদদের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার এক স্বপ্ন দর্শনের কাহিনী বিবৃতি করিয়াছিলেন। এ সব ব্যাপার অতি সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন মনের উপর ইহার প্রভাব অসাধারণ। তাহাদের মনে এই বিশ্বাস কখনো হইয়াছিল যে এই ভবিষ্যদ্বক্তা স্বর্গের দেবদূতগণের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে সক্ষম।

২৭শে মার্চ্চ ১৮৫৭ তারিখে মহম্মদ দরবেশ নামা এক ব্যক্তি লেফটনান্ট গভর্ণর মিঃ কলভিনকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে জানানো হয় যে হাসান আসকারী সম্রাটকে জানাইয়াছেন যে, পারস্যের যুবরাজ বুশায়ার অধিকার করিয়া সেখানকার কৃশ্চানগণকে কতক নিহত কতক বন্দী করিয়াছেন এবং পারসীক সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই কান্দাহার এবং কাবুলের পথে দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হইবে। পত্রে আরও লিখিত ছিল যে, রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে পারসীকগণের আগমন সম্বন্ধে দিবারাত্র আলোচনা চলিতেছে। হাসান আসকারী নাকি প্রচার করিয়াছেন যে তিনি স্বপ্নাদেশ পাইয়া জানিয়াছেন যে পারস্য সম্রাটের রাজ্য শীঘ্রই দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং তিনি সারা হিন্দুস্থান অধিকার করিবেন। দিল্লী সম্রাটের পূর্ব্বগৌরবও আবার ফিরিয়া আসিবে। কারণ পারস্যরাজ তাঁহারই মাথায় ভারতের রাজমুকুট স্থাপন করিয়া যাইবেন। লেখক বলিয়াছেন যে, এই সংবাদে প্রাসাদে আনন্দ উৎসব চলিতে থাকে এবং সম্রাট ইহাতে বিশেষ ভাবে তুষ্ট হন, এবং এ জন্য বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা করা হয়। হাসান আসকারীও প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে উপাসনা করিতে থাকেন—যাহাতে পারসীকগণ সত্বর আসিয়া পড়ে এবং কৃশ্চানগণকে বিতাড়িত করে। এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার সম্রাট নানাবিধ উপঢৌকন ও উপচার হাসান আসকারীর নিকট পাঠাইতেন।

সুতরাং এই বিদ্রোহ ব্যাপারে ধর্ম্মান্ধতা কতখানি সাহায্য করিয়াছিল তাহা বোঝা যায়। আমরা যদি সে সময়ে এই সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারিতাম তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পাইতাম যে কৃশ্চানগণকে নির্ম্মূল করিবার জন্য কি গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমাদের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা যে কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা বিভিন্ন চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন স্থানে কৃশ্চানদের প্রতি শাস্তিমূলক অনুষ্ঠানের আনন্দোৎসবগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইয়ুরোপীয়দের প্রতি এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রকৃত মনোভাব যে এতখানি বিরূপ এ কথা পূর্ব্বে বিশ্বাস করাও অসম্ভব ছিল।

মিসেস এলডওয়েলের নিকট হইতে আমরা জানিয়াছি যে মহরম পর্ব্বের সময় শিশুদের প্রার্থনাবাণীর সঙ্গে ইংরাজদের প্রতি জঘন্য ভাষা ব্যবহার করিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যখন অসহায় নারী ও শিশুদের নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হয় তখন প্রায় দুইশত লোক উপস্থিত থাকিয়া সেই সব হতভাগ্যদের প্রতি অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল।

এইবার চাপাটি সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। এই বস্তুটি স্থান হইতে স্থানান্তরে চালান দেওয়া হইত। তাহার অর্থ এই যে, সকলের মধ্যেই এক ধর্ম্ম এবং এক খাদ্য অথবা এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিবা মাত্র সকলে একত্র হইয়া দাঁড়াইত তাহা বলা কঠিন। কর্তৃপক্ষ কঠোর হস্তে ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু সন্দেহাতীত এই সামান্য বস্তুটির সাহায্যে ভাবের আদান প্রদান যে কাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাও নির্ণয় করা সহজ নয়। ময়দার সঙ্গে হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করা হইয়াছে এ সংবাদও এই সময়েই প্রচার

করা হয়। অথচ এগুলির উদ্দেশ্য কি তাহাও বোঝা কঠিন। লোকের মনে সাধারণতঃ একটা বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? আমার মনে হয়, কর্তৃপক্ষ চাপাটির প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের গুঁড়ার কাহিনীর সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারের অন্তরালে যে কোন উর্বর মস্তিষ্ক ব্যক্তির কৃতিত্ব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সময়ের প্রকাশিত দেশীয় সংবাদপত্রগুলিও এ ব্যাপারে নীরব ছিল না। চাপাটি, ময়দায় হাড়ের গুঁড়া, কার্টিজে চর্বি হিন্দুদের উত্তেজিত করিবার পক্ষে এই অস্ত্রগুলি অমোঘ। কিন্তু মুসলমানদের উত্তেজিত করিবার কার্য্যে সংবাদপত্রগুলি অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে।

একখানি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, পারস্য সম্রাট টেহারাণে তাঁহার সমস্ত সৈন্যদের সমবেত হইবার আদেশ দিয়াছেন এবং প্রকাশ যে, কাবুলের দোস্ত মহম্মদ খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হইবে। কিন্তু ইহা সকলেই জানে যে, পারস্য সম্রাটের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দুস্থানে আসিয়া ইংরাজদের বিতাড়িত করা।

২৬শে জানুয়ারী ১৮৫৭ তারিখের আর একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ফরাসী সম্রাট এবং তুর্কীর সুলতান পারসীক ও ইংরাজদের যুদ্ধে কোনপক্ষই অবলম্বন করিবেন না, যদিও লোকের ধারণা যে উভয়েই পারস্য পক্ষ সমর্থন করিবেন। রুশিয়া যে অর্থ এবং সৈন্য দ্বারা পারস্যরাজকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত এ কথা সকলেই জানে। রুশিয়া পারস্যর মাধ্যমে হিন্দুস্থান জয় করিবার আশা পোষণ করিতেছে, ইহাও বলা যাইতে পারে।

এই সব বর্ণনার পরে পত্রিকা সম্পাদক বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা দেখিবার জন্য সকলে প্রস্তুত থাকুন।

আর এক সংখ্যায় দেখা যায় যে, পারস্যরাজ ভারত জয় করিয়া তাঁহার সভাসদদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের শাসনভার ন্যস্ত করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। একজন পাইবেন বোম্বাই, একজন কলিকাতা, আর একজন অধিষ্ঠিত হইবেন পুণায়। তবে সারা হিন্দুস্থানের রাজমুকুট অর্পিত হইবে দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহের শিরে।

এই সব সংবাদপত্র রাজপ্রাসাদে পাঠানো হইত, এবং এই সব বিবরণ পড়িয়া এই বন্দী এবং তাঁহার অনুচরেরা কিরূপ উল্লসিত হইয়া উঠিতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্যার থিয়োফিলাস মেটকাফ বলিয়াছেন যে, এদেশীয় লোকেদের মধ্যে পারসীক সৈন্য কর্তৃক হিরাট অধিকার এবং রুশীয়দের ভারত আক্রমণ সংক্রান্ত গুজব খুব আলোচনা হইত। এমন কি, সিপাহীদের মধ্যেও জনরব উঠিয়াছিল যে পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই এক লক্ষ রুশীয় সেনা ভারত আক্রমণ করিয়া কোম্পানির রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য উপস্থিত হইবে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আভ্যন্তরিক ষড়যন্ত্রের প্রভাবে সারা দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, কার্টিজের ব্যাপারটা এই বিরাট ঐতিহাসিক ওলটপালটের একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

আর একখানি সংবাদপত্রে আরও একটি চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশিত হইল। হানসী জেলায় এক গ্রামে এক রমণী তিনটি

কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়াই সেই কন্যাত্রয় কথা কহিতে সুরু করিয়া দিল। একজন বলিল, আগামী বৎসর দেশের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন, অনেক অঘটন ঘটিবে। দ্বিতীয় বলিল, যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে তাহারাই সেই সব প্রত্যক্ষ করিবে। তৃতীয়া শিশুটি বেশ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, হিন্দুরা যদি এ বৎসর হোলিতে আগুন জ্বালায়, তাহা হইলে তাহারা বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান।

কোনও ইয়ুরোপীয়ের কাছে এই কাহিনী যদি বলা যায়, তাহা হইলে তিনি হাসিয়া উঠিবেন। কিন্তু এ দেশের অশিক্ষিত লোকেদের মনে এই শিশুত্রয়ের কাহিনীর সঙ্গে হিরাট অধিকার এবং রুশীয় সৈন্যের আগমন এবং ভারতের রাজমুকুট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিচিত্র ধরণের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই সব জনশ্রুতির সঙ্গে হাসান আসকারীর স্বপ্নকাহিনী এবং সিদি কামবারের দৌত্য অনেকখানি গুরুত্ব আরোপ করে। এই সব সংবাদপত্র এবং তাহাতে এই সব অলৌকিক কাহিনীর প্রচারের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না, ইহা কখনই কল্পনা করা যায় না। মোখাসাহেবের স্বপ্ন, প্রাসদের গুপ্তগৃহের মন্ত্রণা এবং সংবাদপত্রের এই সব প্রচারকার্য্য—এগুলি কি সবই কাকতালীয়?

১৯শে মার্চ্চ তারিখের আর একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ—নয় শত পারসীক সৈন্য কয়েক জন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীর নেতৃত্বে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং আরও পাঁচ শত সৈন্য নানাপ্রকার ছদ্মবেশে দিল্লী সহরের মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সংবাদের প্রচারক সাদিক খাঁ নামা এক ব্যক্তি। তাহাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই ধরণের সংবাদের উদ্দেশ্য কি হইতে পারে—জনমণ্ডলীর অন্তরকে বিষাক্ত করা ছাড়া? সাদিক খাঁর নাম সম্বলিত একখানি ইস্তাহার ইতিপূর্ব্বে জুম্মা মসজিদে প্রচারিত হইয়াছিল। সাদিক খাঁ নামটি ছদ্মনাম কি না বলা যায় না, কিন্তু এ সবের মূলে কাহার উৎসাহ রহিয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

মুসলমানদের উত্তেজিত করিবার জন্য এই সকল সংবাদপত্রে যে সব অবিশ্বাস্য ও অতিরঞ্জিত সংবাদ এবং বিভিন্ন স্থানে যে সব ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সবগুলির তালিকা করা অথবা সেগুলিকে এই বিচারসভায় উপস্থিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কাহারও কোনও দ্বিধা নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমি কেবল আর একটিমাত্র সংবাদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

এটির তারিখ ১৩ই এপ্রেল। এটির সম্বন্ধে স্যর থিয়োফিলাস মেটকাফ বলেন যে, বিদ্রোহীদের কার্য্যকলাপ আরম্ভ হইবার প্রায় ১৫ দিন পূর্ব্বে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে নগরপালের নিকট একখানি বেনামী দরখাস্ত পৌঁছিয়াছে যে সহরের কাশ্মীর গেটটি ইংরাজদের কবল হইতে এখনই মুক্ত করিয়া লওয়া উচিত। দিল্লী সহরের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং দিল্লী ক্যান্টনমেণ্টের সহিত প্রধান সংযোগ-সূত্র। কেবল এইখানেই সৈন্য পাহারা আছে। সুতরাং ইহার গুরুত্ব যে কতখানি তাহা সকলের উপলব্ধি করা উচিত।

স্যর থিয়োফিলাস বলেন যে, অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে এরূপ বেনামী দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই। তবুও এই ব্যাপার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে বোঝা গেল।

সেই সংবাদপত্রখানিতে আরও লিখিত ছিল যে, আর এক মাসের মধ্যেই কাশ্মীরের উপর যে দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণ হইবে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

এই সংবাদটুকু সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা, তাহা সকলেই বুঝিয়াছে। কাশ্মীর শব্দের অর্থ দিল্লীর কাশ্মীর গেট। এক মাস পরে সেখানে যে দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম হইবে তাহা সংবাদপত্রলেখক কি উপায়ে জানিতে পারিল এ রহস্যের সমাধান করিবে কে? সত্য সত্যই 'এক মাস পরে' অর্থাৎ ১১ই মে তারিখে কাশ্মীর গেটের উপরে যে রণভেরী বাজিয়া উঠিল, সে কথা সকলেরই স্মরণ আছে।

বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহের সহিত সমস্ত ঘটনাবলীর যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তাহার অসংখ্য প্রমাণ এখনও দিতে পারা যায়। হাবসী মৌজুদ নামা এক ব্যক্তি এই বন্দী সম্রাটের খাস গোলাম ছিল। সে ব্যক্তি একদিন মিষ্টার এভারেটকে গোপনে বলিয়াছিল যে তিনি অবিলম্বে কোম্পানীর চাকরী ছাড়িয়া দিয়া সম্রাটের শরণাপন্ন হইলে ভাল হয়। বিস্মিত এভারেটের প্রশ্নের উত্তরে সে ব্যক্তি বলিল যে, গ্রীষ্মকালে এই প্রাসাদ রুশসৈন্য দ্বারা অধিকৃত হইবে। এভারেট অবশ্য এ কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সামান্য একজন ভৃত্যের মুখের এই সাবধান-বাণীর অন্তরালে কত বড় সুদূরপ্রসারী এক চক্রান্ত বর্ত্তমান ছিল। এ ঘটনার কিছু পরে সেই ভৃত্য মৌজুদ পুনরায় এভারেটকে বলে যে, পূর্ব্বেই আপনাকে কি আমি সাবধান করিয়া দিই নাই?

সম্রাটের মুন্সী মুকুন্দলালের নিকট আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তিন বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর কতকগুলি সেনানী সম্রাটের খাস সৈনিকরূপে আনুগত্য স্বীকার করে। সম্রাট তাহাদের আদেশপত্র দেন এবং তাঁহার খাস সৈনিকের চিহ্নস্বরূপ গোলাপী রংয়ের বস্ত্রও দেন। তাহার কিছু পরেই সিদি কামবারকে দৌত্যে পাঠানো হয়। সুতরাং তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এই ষড়যন্ত্রের সূচনা হইতেছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

এই সকল বিবরণের উপরে নির্ভর করিয়া এই বন্দীর বিরুদ্ধে যে চারিটি অভিযোগ গৃহীত হইয়াছে তাহা ছাড়া আরও পাঁচটি বিষয় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহাতে বোঝা যায় যে দেশব্যাপী এই এই বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে বন্দী বহু দিন হইতেই উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন।

১। হাসন আসকারীর স্বপ্ন কাহিনী ও অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার।

২। সিদি কামবারকে পারস্যে এবং কনষ্টান্টিনোপলে পাঠানো।

৩। হিন্দুদের মধ্যে ক্রমাগত বিদ্বেষ এবং বিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রচার

৪। মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ প্রচারকার্য্য—সংবাদপত্র ও ইস্তাহার আদির সাহায্যে।

৫। দেশীয় সেনাবাহিনীর হিন্দু ও মুসলমান সেনানীগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উত্তেজিত করা।

এই পাঁচটি বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ এই বিচারসভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

আরও একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে ওঠা স্বাভাবিক। এই সব ব্যাপারে এই বন্দী কি নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, না তাঁহাকে বাধ্য করিয়া ইহাতে লিপ্ত করা হইয়াছিল?

এই সব ব্যাপার কি তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত, না অন্য কোনও শক্তির হাতে তিনি ক্রীড়াপুত্তলী রূপে পরিণত হইয়াছিলেন? তাঁহার ধর্মান্ধতার সুযোগ লইয়া কি এই ব্যাপারে ধর্মাচার্য্যগণ সেই সুযোগের অপব্যবহার করিয়াছিলেন?

মুসলমানগণের ধর্মান্ধতা, আধিপত্য লাভের আকাঙ্খা, দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র এবং এই বন্দীর সক্রিয় সহযোগিতা এই সবগুলির সমন্বয়ে এই মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। রাজবংশের উত্তরাধিকারী অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মের অন্যতম নেতারূপেই এই বন্দীর প্রভাব বিস্তার করিতে একদল ইচ্ছুক ছিলেন। ফলে উভয় ভাবেই তিনি এই বিরাট ষড়যন্ত্রের সহকর্মী হইয়াছিলেন।

পেশোয়ারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মহম্মদ তকি বেগ বৃটিশের বেতনভোগী হইয়াও প্রচার করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই রাষ্ট্রে একটা পরিবর্তন ঘটিবে এবং বৃটিশ শক্তি শীঘ্রই বিতাড়িত হইবে। করিম বক্স নামা দিল্লী বারুদখানার আর এক কর্মচারী, তিনিও বৃটিশের বেতনভোগী হইয়া সৈন্যদলের মধ্যে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানান যে, কার্টিজে সত্য সত্যই চর্বি মাখানো আছে এবং এ বিষয়ে ইংরাজ কর্মচারীরা যতই প্রতিবাদ করুক না কেন, তাহাতে কেহ যেন বিশ্বাস না করে। বিদ্রোহী সৈন্য যখন বারুদখানা আক্রমণ করে তখন এই ব্যক্তিই তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছিল। ইংরাজের কর্মচারী হইয়াও সে ইংরাজধ্বংসী বিদ্রোহীদের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হইয়াছিল।

এরূপ উদাহরণের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই। মুসলমানদের মধ্যেও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির অভাব ছিল না। কলভিন সাহেবকে মহম্মদ দরবেশ নামা এক ব্যক্তি যে পত্র লিখিয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। একজন মুসলমান যে বৃটিশের প্রতি কতখানি বিশ্বস্তভাব পোষণ করিতে পারে, উহা তাহারই উদাহরণ। নবি বকস খাঁ সম্রাটকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে নারীহত্যা করা ধর্মবিগর্হিত কার্য্য। ইংরাজের প্রতি মুসলমানেরা সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

আমার বক্তৃতায় ১৮৫৭ সালের যে ভয়াবহ ঘটনাবলী ঘটিয়া গিয়াছে তাহার কারণস্বরূপ বহু উদাহরণ এবং বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। সেই বক্তৃতায় ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই বন্দী ভারতে মুসলমানধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হইয়াও দেশব্যাপী এক বিরাট ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব করিয়াছেন। এই ব্যাপারে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির এবং মুসলমান সম্প্রদায় কি ভাবে দেশের জনমণ্ডলীকে এবং সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করিয়াছেন—তাহারও বিবরণ আমার বক্তৃতায় দিয়াছি। তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সৈন্যদের কার্টিজ সংক্রান্ত ব্যাপারে উত্তেজিত করিয়া তোলা হয়, কিন্তু এই বাহিনীর সেনাদলের কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতি বা ধর্ম ছিল না এবং তাহাদের পক্ষে কার্টিজে গরুর চর্ব্বি কিম্বা শূকরের চর্ব্বি মাখানো হইল তাহাতে তাহাদের সংস্কারে কিছুমাত্র আঘাত করিত না। কাপ্তেন মার্টিনো বলেন যে, আম্বালায় মুসলমান সৈন্যরাও কার্টিজে চর্ব্বির উল্লেখে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে নাই। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও তাহাদের কোনো দিন ছিল না। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে কার্টিজ কাহিনীর অন্তরালে অন্য একটা প্রচ্ছন্ন অগ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। হিন্দু সিপাহীদের ভয় দেখানো হইয়াছিল যে তাহাদের জাতি ও ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে। হিন্দনের যুদ্ধের পর বহুসংখ্যক হিন্দু সৈন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল যে তাহাদের প্রতারণা করা হইয়াছে এবং তাহাদের যদি ক্ষমা করা হয় তাহা হইলে তাহারা আবার ইংরাজ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিতে প্রস্তুত।

এই বিচারসভায় আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, স্বপ্নদর্শী একজন মুসলমান মৌলভী পারস্য ও তুর্কীর সুলতানগণের কাল্পনিক সাহায্যের চিত্র প্রকাশ করিয়া এবং দিল্লীর বাদশাহের পূর্ব্বগৌরব ফিরাইয়া আনার কাহিনী প্রচারের দ্বারা লোককে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে কাপ্তেন মার্টিনোর উক্তি সম্বন্ধে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কৃশ্চান মিশনারীরা দেশীয় সিপাহীদের কৃশ্চান ধর্মগ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন বা তাহাদের ধর্মান্তরিত করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন এরূপ অভিযোগ কোনসময়ে আপনার কর্ণগোচর হইয়াছে কি না। তিনি প্রত্যুত্তরে দৃঢ়স্বরে জানান যে এরূপ কোনও অভিযোগ তিনি পান নাই এবং এরূপ অভিযোগ হইবার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, সিপাহীরা জানিত যে বলপূর্ব্বক ধর্মান্তরিত করা কৃশ্চান ধর্ম্মের বিধি নয়। সুতরাং এ জনরব অলীক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এই বিচারসভা যেরূপ ধৈর্য্যের সহিত আমার সমস্ত বক্তব্য শুনিয়াছেন সেজন্য তাঁহাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। দোভাষীরূপে মিষ্টার মারফি যেরূপ দক্ষতার সহিত সর্ব্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকেও আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এ দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ। সাক্ষীদের জবানবন্দী, চিঠি ও সর্ব্ববিধ কাগজপত্র যেরূপ সুন্দরভাবে অনূদিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার উর্দু ও পারস্যভাষার জ্ঞান সম্বন্ধে কোনও দ্বিধা থাকিতে পারে না। আমার বক্তৃতার সঙ্গে যে সব চিঠিপত্র এই বিচারসভায় দাখিল করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি অতি মূল্যবান। সেই সমস্ত চিঠিপত্র অতি সুন্দরভাবে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

(জজ এডভোকেট জেনারেল মেজর এফ. জে. হ্যারিয়ট তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। এই বক্তব্যের সঙ্গে অসংখ্য চিঠিপত্র, সংবাদপত্র, দরখাস্ত, বিচারসভায় উপস্থিত করা হয়। তা ছাড়া অসংখ্য সাক্ষীর বজানবন্দী নেওয়া হয়। তার মধ্যে কেবল মিসেস এলডওয়েল এবং মিষ্টার সণ্ডার্স—এই দুজনের বক্তব্যের মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হোল।)

মিসেস এলডওয়েলের সাক্ষ্য

(স্বামীর নাম আলেকজাণ্ডার এলডওয়েল—গভর্ণমেণ্টের পেনসভোগী।)

প্রশ্ন। ১১ই মে ১৮৫৭ তারিখে আপনি কি দিল্লীতে ছিলেন?

উত্তর। হ্যাঁ।

প্র। আপনি কোথায় থাকিতেন ? ঠিক কোন সময়ে আপনি শুনিতে পান যে মিরাট হইতে বিদ্রোহী সেনাদল দিল্লী আসিয়া পৌঁছিয়াছে ?

উ। আমি দিল্লী সহরের দরিয়াগঞ্জ নামা পল্লীতে থাকিতাম। ১১ই মে তারিখের সকালে আটটা হইতে নয়টার মধ্যেই আমি শুনিতে পাইলাম যে বিদ্রোহী সেনাদল আসিয়াছে।

প্র। আপনি সে দিন যাহা দেখিয়াছেন তাহা বর্ণনা করুন।

উ। আমার একজন সহিস আসিয়া সংবাদ দিল সে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া মিরাট হইতে দিল্লী আসিয়াছে এবং পথে আসিতে আসিতে তাহারা যে কোনও য়ুরোপীয়কে দেখিতে পাইয়াছে তাহাকেই হত্যা করিয়াছে। সে বলিল যে বিদ্রোহীরা দিল্লী সহরেও যে সব ইয়ুরোপীয় আছে তাহাদেরও হত্যা করিবে। সুতরাং আমাদের গাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখা হউক এবং আমরাও দূরে কোথাও চলিয়া যাইবার জন্ত যেন প্রস্তুত থাকি। আমি যখন এই ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিলাম তখন আমার প্রতিবেশী মিষ্টার নাউল্যান বলিলেন যে, সহিস যাহা বলিয়াছে সবই সত্য এবং এ বিষয়ে তিনি আমার স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করিতে চান। তাঁহারা উভয়ে আলোচনার পর স্থির করিলেন যে পল্লীর মধ্যে আমাদের বাড়ীটি সকলের চেয়ে বড় এবং দৃঢ়, সুতরাং পল্লীতে যে কয়জন ইয়ুরোপীয় আছেন তাঁহারা সকলেই এখানে আসিয়া সমবেত হোন এবং যতক্ষণ সম্ভব অথবা যতক্ষণ না সাহায্য আসে ততক্ষণ আত্মরক্ষা করুন। মিঃ এলডওয়েল এবং মিঃ নাউলান পার্শ্বে অবস্থিত একটি হাসপাতালে যাইয়া সেখানে প্রহরারত সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা আমাদের সাহায্য করিবে কি না। কিন্তু সিপাহীরা জবাব দিল তোমাদের কাজ তোমরা দেখ, আমাদের কাজ আমরা দেখিব। তখনও বিদ্রোহী সিপাহীরা এদিকে আসে নাই। সুতরাং হাসপাতালের ঐ সব রক্ষী সিপাহীদের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ঘটিয়াছে তাহা মনে করিবারও কোনও কারণ নাই।

ইতিমধ্যে আমাদের পল্লীর সমস্ত ইয়ুরোপীয়েরা আমাদের বাড়ীতে সমবেত হইয়া দ্বারগুলি সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েদের দ্বিতলে পাঠানো হইল। আমাদের সংখ্যা তখন পুরুষ, স্ত্রী ও বালক-বালিকা সমেত সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশজনেরও বেশী। বেলা ন'টার সময় আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বিদ্রোহী সৈন্যেরা যমুনার পুল পার হইতেছে। তাহাদের মধ্যে অশ্বারোহী পদাতিক দুইই ছিল। আমাদের বাড়ী নদীর নিকটেই, সুতরাং বিদ্রোহীরা আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়া জেলের দিকে চলিয়া গেল। শোনা গেল, তাহারা কয়েদীদের মুক্ত করিয়া দিবে। কিছু পরেই শুনিতে পাইলাম যে তাহারা সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং ইয়ুরোপীয়দের হত্যা করিতেছে। এই সময়ে একজন মুসলমান রক্তাক্ত তরবারি হাতে লইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, কোথায় ইয়ুরোপীয়েরা। মিষ্টার নাউলান তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে এবং কোনও উত্তর না পাইয়া তাহাকে গুলী করিলেন। তার পরেই প্রায় ৫০।৬০ জন লোক আমাদের ফটকের নিকট সমবেত হইল। বেলা প্রায় ১১টার সময় একজন মুসলমান মিসেস ফুলন নামে এক মহিলাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিল। এই মহিলাটির মাথায় গুরুতর ভাবে আঘাত করা হইয়াছে এবং তাঁহার বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত আর কোনও উল্লেখযোগ্য গোলমাল শুনিতে পাই নাই। তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, আমাদের পল্লী ভূমিসাৎ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা কামান আনিতে গিয়াছে। আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, এই সময় ছেলেমেয়েদের লইয়া অন্যত্র যাইয়া আত্মগোপন করাই ভাল। আমি এবং আমার তিনটি সন্তান তখন দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দুইখানা ডুলিতে উঠিয়া সম্রাটের পৌত্র মির্জ্জা আবদুল্লার বাড়ীতে গেলাম। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব হইতেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার পরিবারবর্গ আমাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আমরা সেখানে থাকিলাম। সেই সময় মির্জ্জা আবদুল্লা আসিয়া বলিলেন, তাঁহার শাশুড়ীর বাড়ী আরও নিরাপদ, আমাদের তিনি সেখানে লইয়া যাইবেন। আমরা অগত্যা সেখানে গেলাম। আমাদের জিনিষপত্র মির্জ্জা সাহেবের বাড়ীতেই থাকিয়া গেল, কারণ তিনি বলিলেন যে জিনিষপত্র রাস্তা দিয়া এ সময়ে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। পরদিন সন্ধ্যার সময় মির্জ্জা সাহেবের এক খুল্লতাত এবং কয়েক জন ভৃত্য আসিয়া জানাইল আমাদের এখনই এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। চাকরদের হাতে রক্ত মাখা তরবারি দেখিয়া আমরা ভয় পাইলাম। তাহারা বলিল সমস্ত কৃশ্চানদের হত্যা করিতে হইবে, ইহাই তাহাদের প্রতি আদেশ। তাহাদের অনুরোধ করিয়া সেই রাত্রি সেখানে থাকিবার অনুমতি পাইলাম। রাত্রে আমার কুলী আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম অন্যত্র আশ্রয় পাওয়া সম্ভব কি না। সে বলিল যে সে জানিয়াছে নবাব আহম্মদ আলি খাঁ নাকি ইয়ুরোপীয়দের আশ্রয় দিতেছেন। সে নবাবের অনুমতি আনিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া সে জানাইল যে নবাব সাহেবের বাড়ীতে ইয়ুরোপীয়েরা লুক্কায়িত আছে। সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহীরা সেখানে কামান আনিয়া বসাইয়াছে। তার পর সংবাদ পাইলাম যে কয়েক জন কৃশ্চান রাজপ্রাসাদে আশ্রয় লইয়াছে এবং স্বয়ং সম্রাট তাহাদের নিরাপত্তার ভার লইয়াছেন ; সুতরাং আমাদের উচিত কোনও রূপে সেখানে যাইয়া আশ্রয় লওয়া। বুধবার রাত্রে আমার দর্জ্জি এবং কাদিরদাদ খাঁ নামা একজন সেনানীর সাহায্যে আমরা রাজপ্রাসাদে নীত হইলাম। কিন্তু দুর্গের লাহোর গেটে সম্রাটের রক্ষীসৈন্যের হাতে আমরা বন্দী হইলাম। আমাদের মির্জ্জা মোগলের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তিনি আদেশ দিলেন যেখানে অন্যান্য ইয়ুরোপীয় বন্দীরা আছে সেইখানে আমাদের লইয়া যাওয়া হউক। ১৩ই মে বুধবার রাত্রে আমাদের সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে গিয়া দেখিলাম বালক বালিকা ও নারী সব মিলিয়া প্রায় পঞ্চাশ জন বন্দী রহিয়াছে। আমাদের একটি অন্ধকার ঘরে স্থান দেওয়া হইল। ঘরে মাত্র একটি দরজা, কোনও জানালা নাই। মানুষ বসবাসের উপযুক্ত সে ঘর নয়। মাঝে মাঝে সিপাহীরা আসিয়া আমাদের এবং ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাইতে লাগিল, তাহার ফলে সেই একটি মাত্র দরজাও বন্ধ করিয়া রাখিতে হইল। সিপাহীরা বন্দুক লইয়া আমাদের নিকট আসিয়া বলিল যে, আমরা যদি মুসলমান এবং ক্রীতদাস হইতে স্বীকৃত হই, তাহা হইলে সম্রাট আমাদের জীবন-ভিক্ষা দিবেন। আবার এক-দল সৈন্য আসিয়া বলিতে লাগিল যে

আমাদের টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া কাক-চিলের আহার্য্যে পরিণত করা হইবে।

বৃহস্পতিবার কয়েক জন সিপাহী আসিয়া জানাইল যে বারুদ দিয়া আমাদের আশ্রয়কক্ষ উড়াইয়া দিয়া আমাদের সকলকে হত্যা করা হইবে। আমাদের অতি কদর্য্য আহার্য্য দেওয়া হইত। মাত্র দুই বার সম্রাট আমাদের ভাল খাদ্য পাঠাইয়াছিলেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সম্রাটের এক সেনানী আসিয়া মিসেস ষ্টেনসকে জিজ্ঞাসা করিল, যদি ইংরাজের হাতে রাজক্ষমতা ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহারা সিপাহীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে। মিসেস ষ্টেনস উত্তর দিলেন, যে ভাবে তোমরা আমাদের স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছ, তেমনি ব্যবহারই পাইবে।

শনিবার ১৬ই মে সকালে প্রায় আটটা বা নয়টার সময় আমি, আমার তিনটি সন্তান এবং আর একটি রমণী ছাড়া অবশিষ্ট সকলকেই লইয়া যাওয়া হইল এবং তাহাদের হত্যা করা হইল।

প্রশ্ন। আপনি কিরূপে জানিলেন যে তাহাদের সকলকে হত্যা করা হইল এবং আপনাকেই বা তাহারা বাদ দিয়া গেল কেন?

উত্তর। আমি এখানে আসিবার সময় সম্রাটের নামে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া আনিয়াছিলাম এবং স্বহস্তে সেখানি তাঁহাকে দেওয়ার প্রার্থনা জানাই। তাহাতে আমি লিখিয়াছিলাম যে আমি এবং আমার সন্তানগণ কাশ্মীর হইতে আসিয়াছি এবং আমরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। এই কারণেই আমাদের স্বতন্ত্র খাদ্য দেওয়া হইত এবং সম্রাটের ভৃত্যরাও জানিত আমরা মুসলমান। আমি কলমা পড়িতে পারিতাম এবং আমার ছেলে-মেয়েদেরও তাহা শিখাইয়াছিলাম। ১৬ই তারিখে একজন সেনানী আসিয়া বলে যে কৃশ্চানগণকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। যাহারা মুসলমান তাহাদের যাওয়া প্রয়োজন নাই। এই সব হতভাগিনীরা বুঝিতে পারিয়াছিল তাহাদের কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়া হইতেছে কিন্তু সিপাহীরা শপথ করিয়া বলিল যে তাহাদের অনুমান ভুল। তাহাদের অন্যত্র ভাল আবাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। পরে আমি শুনিয়াছি যে উঠানে একটা পিপল গাছের নিচে তাহাদের লইয়া গিয়া প্রত্যেককে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। সম্রাটের খাস সেনাদল কর্তৃক এই কার্য্য সংঘটিত হয়। এই ঘটনার বিবরণ আমি এক ঝাড়ুদারের স্ত্রীর নিকট জানিয়াছি। হত্যাকাণ্ড সমাধা হইবার পরে দুই বার তোপধ্বনি দ্বারা আনন্দ জ্ঞাপন করা হয়।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে মুফতী সাহেব নামা এক বৃদ্ধ আসিয়া আমাদের রক্ষীসৈন্যদের জানায় যে আমাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং আমাদিগকে কোনও নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া হউক। তবে সে কার্য্য যেন রাত্রের অন্ধকারে করা হয়। কারণ দিনের আলোতে যদি কোনও বিদ্রোহী সৈন্য আমাদের দেখিতে পায় তাহা হইলে আমাদের রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।

সন্ধ্যার সময় আমার দরজির বাড়ীতে আমাদের পুনরায় আনা হইল কিন্তু পরবর্তী মঙ্গলবারে আমাদের আবার বন্দী করা হইল। এবার আমরা মির্জা মোগলের সম্মুখে বন্দিরূপে আনীত হইলাম। আমাদের তখন কাপ্তেন ডগলাসের গৃহে রাখা হইল। হিন্দন যুদ্ধের পরদিন ৩৮ নং বাহিনীর দ্বারা আমরা মুক্ত হই। হিন্দু সিপাহীরা বলিতে লাগিল যে তাহাদের জাতি নষ্ট করিবার কোনও চেষ্টাই ইংরাজ করে নাই। মিথ্যা ভয় দেখাইয়া তাহাদের এই বিদ্রোহে লিপ্ত করা হইয়াছে। তাহারা বলিল যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের ক্ষমা করেন তাহা হইলে তাহারা আবার তাঁহাদের সেনাদলে যোগদান করিতে প্রস্তুত আছে।

১ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি দেশীয় পোষাক পরিয়া আমার তিনটি সন্তান এবং দুই জন ভৃত্যকে লইয়া দিল্লী হইতে মিরাটে আসি।

প্রশ্ন। বন্দী থাকা কালে আপনার কি এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে ইয়ুরোপীয় মহিলাদের প্রতি দেশীয় সেনাবাহিনী অথবা দিল্লীর অধিবাসীগণ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার চোখেই দেখিয়াছিল?

উত্তর। হাঁ।

মি: সি, বি, সণ্ডার্সের (C. B. Saunders) সাক্ষ্য।

(Officiating Commissioner and Agent to the Lieutenant Governor)

প্রশ্ন। দিল্লীর সম্রাট কি কারণে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রজা এবং পেনসনভোগী হইলেন, তাহার কারণ আপনার জানা থাকিলে এই বিচারসভায় বিবৃত করুন।

উত্তর। দিল্লীশ্বর শাহ আলম গুলাম কাদেরের হস্তে বহু নির্য্যাতন ভোগ করেন এবং তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত হয়। তারপর ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্রদের হাতে বন্দী হন। কেবলমাত্র দিল্লী শহরের উপরে সম্রাটের নামমাত্র আধিপত্য থাকে, প্রকৃতভাবে তিনি ১৮০৩ খৃ: পর্য্যন্ত বন্দি-জীবন যাপন করেন। সেই সময় জেনারেল লেক আলিগড় জয় করিয়া ইংরাজ সৈন্য লইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। দিল্লী হইতে ছয় মাইল দূরে পাটপনগঞ্জে মহারাষ্ট্র বাহিনীর সঙ্গে ইংরাজ সৈন্যের যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়রা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। দিল্লী সহর মহারাষ্ট্র বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সম্রাট শাহ আলম জেনারেল লেকের নিকট পত্র লিখিয়া ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ সৈন্য দিল্লী প্রবেশ করে। সেই দিন হইতে দিল্লীর সম্রাট বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পেনসনভোগী প্রজা বলিয়া গণ্য হইলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে যে বন্দিদশায় রাখিয়াছিল তাহা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া বৃটিশ শাসনের আশ্রয়ে আসিলেন!

এই বন্দী ১৮৩৭ সালে দিল্লীর সম্রাট উপাধিলাভ করেন। তাঁহার প্রাসাদদুর্গের বাহিরে কোনও ক্ষমতা প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। তাঁহার নিজের ভৃত্য ও অনুচরবর্গকে উপাধি এবং সম্মানসূচক পরিচ্ছদ উপহার দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার আছে কিন্তু সে ক্ষমতা অন্যত্র প্রকাশ করিতে তিনি পারেন না। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী—মাত্র তাঁহারই কোম্পানীর স্থানীয় আদালতের অধিকার হইতে মুক্ত, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার নীতির অধীন।

প্রশ্ন। এই বন্দী কতগুলি অস্ত্রধারী সৈন্য রাখিতে পারেন তাহার কি কোনও সীমা নির্দ্ধারিত আছে?

উত্তর। এই বন্দী লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট আবেদন করেন যে তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সৈন্য রাখিতে অনুমতি দেওয়া হউক। প্রত্যুত্তরে গভর্ণর জেনারেল তাঁহাকে এই অনুমতি দেন যে তাঁহার

নির্দ্ধারিত আয় হইতে যতগুলি সৈন্ত তিনি রাখিতে সক্ষম, ততগুলি সৈন্ত রাখিতে পারেন।

প্রশ্ন। বিদ্রোহের সময় গভর্ণমেণ্ট হইতে কত টাকা পেনসন এই বন্দীকে দেওয়া হইত?

উত্তর। বাৎসরিক তিনি এক লক্ষ টাকা পেনসন পাইতেন। তাহার মধ্যে ৯৯০০০৲ টাকা দিল্লীতে দেওয়া হইত এবং অবশিষ্ট ১০০০৲ টাকা লক্ষ্ণৌতে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গকে দেওয়া হইত। দিল্লীর নিকট তাঁহাকে যে জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল তাহার আয় বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া দিল্লী সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে তিনি বাড়ীভাড়া হিসাবেও অনেক টাকা পাইতেন।

অতঃপর বন্দী সম্রাট বাহাদুর শাহকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি এই সাক্ষীকে কোন প্রশ্ন করিতে ইচ্ছুক কি না।

তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

বিচারের সিদ্ধান্ত

এই বিচারসভার সম্মুখে যে সব প্রমাণাদি উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের অভিমত এই যে, দিল্লীর প্রাক্তন রাজা—বন্দী মহম্মদ বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির প্রত্যেক অংশেই তিনি অপরাধী।

স্বাঃ—M. Dawes
Lt. Colonel
President

দিল্লী ৯ই মে ১৮৫৮

F. J. Harriott, Major
Deputy Judge Advocate General

Approved and Confirmed

Sd. N. Penny
Major General
Commanding
Meerut Division

সাহারণ শিবির
তারিখ ২রা এপ্রেল ১৮৫৮

বিচারপর্ব্ব শেষ হোল। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের বিশাল সমাধিমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বন্দী হলেন কাপ্তেন হডসনের হাতে। হডসন তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁকে প্রাণে বধ করা হবে না। সুতরাং বিচারের রায়ে তিনি সর্ব্বতোভাবে দোষী সাব্যস্ত হলেও তাঁকে দেওয়া হোল নির্ব্বাসন দণ্ড। দিল্লীর তক্ত-ই-তাউস ছেড়ে বৃদ্ধ সম্রাট বসলেন সুদূর বর্ম্মায় জীবনের শেষ দিনগুলি কাটানোর জন্ম।

কিন্তু অপরাধী ছিল আরও অনেকগুলি। তাদের সকলের বিচার হয়েছিল কি না বলা যায় না। তবে সরকারী দপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আরও দুজনের বিচারের বিস্তারিত বিবরণ। একজনের নাম মোগল বেগ, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাম হাজি খাঁ।

মোগল বেগের বিচার হয় ১৮৬৮ সালে। এ ব্যক্তি ছিল সম্রাটের আরদালী। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—মিষ্টার ফ্রেজার, কাপ্তেন ডগলাস, মিস জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডকে হত্যা করা।

এ বিচারসভাতেও অনেক ব্যক্তির সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তরবারির আঘাতে উপরোক্ত ইংরাজ নরনারীর হত্যাসাধনের প্রমাণ গৃহীত হয়। অবশেষে পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ডেভিস সাহেব ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ তারিখের পত্রে জুডিশিয়ল কমিশনারকে জানান যে লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর সাহেব এই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড মঞ্জুর করেছেন এবং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে দিল্লী প্রাসাদের সামনেই একে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।

অপর ব্যক্তি হাজি খাঁকেও একই অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক বলা হয়েছে একে। বিদ্রোহের পরে একে গ্রেপ্তার করে স্যার থিয়োফিলাস মেটকাফের কাছে হাজির করা হয়। তিনি তখনই নিজের তরবারি বার করে এর ভবলীলা সাঙ্গ করতে উদ্যত হলেন। আঘাত পেয়ে হাজি মাটিতে পড়ে যায়। মেটকাফ সাহেব মনে করেন তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু হয় নি। মৃত্যু হোল বিচারের পরে ফাঁসিকাঠে।

সমাপ্ত

পলাশ ফুল

শ্রীঅদ্বৈত কুণ্ডু

স্বর্গের অমৃত-নেশা ঠোঁটেতে মাখিয়া
মর্ত্যের বুকেতে কেন উঠ তুমি হাসি',
অর্দ্ধমৃত বিটপের অঙ্গে রাশি রাশি,
পলাশের প্রেমছটা ওগো বিলাসী?
সর্ব্ব অঙ্গে থোলো থোলো অপূর্ব্ব ছটায়,
বসন্তের আরাধনে এ ধরায় আসি'
ভ্রমরারে আড়চোখে ডাক ভালবাসি
রূপমোহে রঙ দাও, দাও রাঙা হাসি।
যতক্ষণ থাকো তুমি এ ধরার বুকে
হাস খেল বারে বার রাঙা রং মাখি'
পাতা-ঝরা গাছ মাথে হোলী রঙে ঢাকি',
এক ঋতু খেলে পরে দাও সবে ফাঁকি।
চিনিল না ধরা তবু তোমার রূপেরে,
অনাদরে ফেলে গেল কর্কশ কাঁকরে,
শুধালো না কোন কথা বারেকের তরে,
প্রাণ তাই কাঁদে মোর প্রতি বারে বারে।
তুমি ত' চেন না মোরে কোথা আমি থাকি,
কিন্তু জেনো ভালো করে, আমি বসি' বসি'
তোমার দুখেতে কাঁদি সুখ দেখে হাসি,
বুকে রাখি অনুক্ষণ প্রাণে ভালোবাসি।

মনের মানুষ

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

এক

শুনেছি, আমাদের কোটি বর্ষ না কি ব্রহ্মার নিমেষে কেটে যায়! কিন্তু ব্রহ্মা কে এবং কেন-ই বা এই পৃথিবীর সৃষ্টি? জন্ম, মৃত্যু, হাসি, কান্না এই সব পার্থিব প্রমিতির আবশ্যকতাই বা কি? কে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিবে? প্রাজ্ঞ দর্শন উত্তর দিতে গিয়ে অজ্ঞাত আস্থা স্থাপন করে। ধর্ম অতিমানবের সান্নিধ্য খোঁজে। বিজ্ঞান সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে হয় সচেষ্ট। ফিরে আসে কিছু দূর গিয়ে। সে নিয়ে আসে জীবনের প্রভাত-সঙ্গীত। আলো, হাওয়া, জল, মাটির সমন্বয়ে প্রথম প্রাণের প্রকাশ। তারপর নানা ভাবে, বহু মত ও মতান্তরে করে সে মানবের অতীত নির্ণয়। জানাতে চায় মানুষ কি ছিলো আর কী হয়েছে—এই দুই-এর মধ্যে একটি নিশ্চিত সংযোগ প্রস্তাবনা। সেই সব ব্যাখ্যা কিম্বা প্রস্তাবনা কিছু টেকে কিছু টেকে না। কিন্তু প্রাণিজগৎ-এর অবিরাম পরিবর্তন থেকে আসে তার ক্রমবিকাশের বিবরণ।

পৌরাণিক কাল থেকে এ-পর্যন্ত মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নানা কথা হয়েছে। বাইবেলে আছে, কাদা-মাটি থেকে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী প্রমিথিয়ুস মানুষ এবং সর্বপ্রকার প্রাণীর স্রষ্টা। উপনিষদ-এও সৃষ্টিতত্ত্ব রয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে যদ্দূর জানা যায় তা অস্বীকার্য। প্রাণের সম্ভাবনা পৃথিবীতে তখনই হয়েছে যখন থেকে প্রাণের অপরিহার্য উপাদান—যথা আলো, হাওয়া, উত্তাপ জল ও খাদ্য ইত্যাদি পৃথিবীতে প্রাণধারণের উপযুক্ত অবস্থায় এসেছে। অবশ্য বৈজ্ঞানিক আজও প্রাণের সর্ববিধ উপাদান একত্র করে প্রাণীর জন্ম দিতে সক্ষম হন নি। কিন্তু তাই বলে, লর্ড কেলভিনের মত একথা বলা চলে না যে, পৃথিবীতে জীবন এসেছে অন্য কোন গ্রহ কিম্বা সূর্য থেকে। এ-বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকৃত যে, জীবনের বিকাশ হয়েছে কতকগুলো উপাদান থেকে এবং এই জগৎ-এর যে-সব শত-সহস্র প্রাণী আমরা দেখি তা একদিনের নয় বা হঠাৎ আসে নি, তা হচ্ছে যুগ-যুগান্তরের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের পরিচয়।

বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ পর্যায়ে একালে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন লামার্ক ও চার্লস ডারউইন। লামার্কের মতানুযায়ী যদি শরীরের কোন অঙ্গ ব্যবহার ও অব্যবহার পরিবর্তনের কারণ হয়, তা হলে বলতে হয়—টিকটিকি দেয়ালে তিরতির হেঁটে চলে; কারণ তার পূর্বপুরুষ হয়ত বহুকাল অনুরূপ প্রচেষ্টা করেছিল। কিম্বা হাতীর চোখ দেহানুপাতে ছোট হয়ে যাওয়ার কারণ তার পূর্বপুরুষ চোখ বুজে বুজে চলতো। কিম্বা সাঁতার মানুষকে এখন শিখতে হয়, কারণ তার পূর্বপুরুষ জলে না নেমে নেমে জন্মগত সাঁতারের জ্ঞান ভুলে গিয়ে অর্জিত অজ্ঞানতা পেল। লামার্কের এই অভিমত সম্পূর্ণ ভুল বলছি না। কিন্তু পুরোপুরি মানা চলে না, কারণ, প্রাণীর দেহে জন্মগত লক্ষণ ছাড়াও অর্জিত লক্ষণ আছে। অর্জিত লক্ষণ সোজাসুজি অধস্তনকে প্রভাবান্বিত করে না বলেই বিশ্ববিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় টিলডেনের প্রপৌত্র এত ভাল টেনিস খেলতে পারবেন কি না, কে জানে!

ডারউইন ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে। অর্থাৎ তাঁর অভিমতে প্রকৃতি সকলকে স্বীকার করে না। যারা সমর্থ তারা বাঁচে, এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিতালী করতে পারে বলেই বাঁচে। যারা অসমর্থ, তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম প্রকৃতিগত বলেই যত জন্মায় তত বাঁচে না এবং পিতামাতা এক হওয়া সত্ত্বেও যারা জন্মালো তাদের মধ্যে সবাই এক ছাঁচের হল না। আজও যখন মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে সংগ্রামের অন্ত দেখি না, তখন ডারউইনের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে মুখরোচক না হলেও উড়িয়ে দেওয়ার নয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের ইতিহাসে দেহটাই যে সবটা মানুষ নয়, একথা স্বীকার করে নিলে লামার্ক ডারউইনকে একপেশে বলতে দ্বিধা হবে না। এই মনের মানুষটার ক্রমবিকাশ আর নিছক দেহের মানুষটার ক্রমবিকাশ এক নয়।

দুই

পরবর্তী বিবর্তনবাদী প্রখ্যাত বেটসন্ (Bateson) মেণ্ডেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জৈব পরিবর্তন বা Mutationism এর অভিমত ব্যক্ত করলেন। তাঁর মতে জীবের কোষেই (cell) পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে এবং তজ্জন্য পারিপার্শ্বিকের প্রভাব স্বতঃই প্রয়োজন হয় না—কিম্বা যদি হয়-ও-বা, তা সময়সাপেক্ষ তো বটেই এবং গৌণ। জীবন যে-কোন অবস্থায় উদ্ভূত হতে পারে। Life can give rise to almost anything. যদিও বেটসন্-প্রমুখ জীবতত্ত্ব-বিশারদের মতবাদ ডারউইনবাদকে অস্বীকার করে জীবনের দাবীকে স্বীকার করেছে, তবু জীবনের যে-একটা উদ্দেশ্য রয়েছে এ বিষয়ে অধিক দূর তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন নি। কোষে সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জীবন একটা বিশেষ রূপ-পরিগ্রহ করে মাত্র। আর, আকস্মিক ভাবেই হোক আর পরিকল্পনা থেকেই হোক, মানুষ এক জায়গায় বসে নেই। এমন বহু জীব আছে যাদের কোন পরিবর্তন হয়নি কিম্বা যাদের চিহ্ন চিরতরে বিলীন হয়ে গিয়েছে। অথচ মানুষ যে আজও মানসপটে প্রগতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে তা থেকে আশা করি সেই সত্যই স্পষ্ট হয়। মানুষের সৃজনীশক্তি, অনুভূতি, সহযোগিতা, চেতনা ইত্যাদি মনুষ্যত্বের একান্ত আবশ্যকীয় উপাদানগুলো আজও তার মধ্যে সক্রিয় রয়েছে। মনে করুন, মানুষ যদি একেবারে সুসম্পূর্ণ হয়ে যেত, অর্থাৎ তার বাড়বার কিম্বা কমবার কিছু না থাকতো, তাহলে মানুষ হয়ত এ্যাদ্দিনে শেষ হয়ে যেত। এই প্রসঙ্গে জি, হার্ড বলেছেন, সম্পূর্ণ দক্ষ আর সম্পূর্ণ সমাপ্ত একই কথা: for the perfectly efficient is the perfectly finished. •

• Gerald Heard ; The source of civilization-P. 75

প্রাণিজগৎ-এর অন্যান্য জীবের সঙ্গে তুলনায় যখন আজও মানুষকে দেখি উন্নতির জন্য সচেষ্ট, জীবনযাত্রার তথা ভাল ভাবে বাঁচার পথকে সুগম থেকে সুগমতর করতে প্রয়াসী, তখন মনে হয় একথা ঠিক যে, প্রাণী যত অধিক বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়ে, তত শীঘ্র সে লোপ পায়। মানুষ যে আজও পৃথিবী থেকে লোপ পায়নি, তার কারণ সে নিত্যনূতন পরিবর্তনকে বরণ করে নিয়েছে। ভ্রূণের জন্ম পর্য্যন্ত আকৃতিতে যেমন বহু পরিবর্তন তার দেহে সাধিত হয়, তেমনি নব নব যুগে মনুষ্যত্বের বিকাশ শুধু একটিমাত্র ঋজু বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়নি। প্রস্তরযুগ থেকে আজ পর্যন্ত তাকে কত পরিবর্তন গ্রহণ ও বর্জন করতে হয়েছে। এ যেন সাপের খোলস ত্যাগ করা।

মানুষের এই পরিবর্তনবোধের পিছনে রয়েছে তার চেতনা, অর্থাৎ যে-চেতনা দিয়ে তাকে আমরা প্রাণিজগৎ-এর অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করি। চেতনাবোধ আজও তাকে ইতিহাসের অনাগত কালের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। যে-মুহূর্তে সে চেতনালুপ্ত কিম্বা চেতনামুক্ত হয়ে যাবে, তখন তার প্রাণের স্পন্দন যাবে থেমে। পাশবিক স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো চরিতার্থ করে সে আর তখন মনের অনন্ত রাজ্যে বিরাজ করতে পারবে না। মহাকালের নির্মম শাসন সেদিন প্রাগৈতিহাসিক বহু প্রাণীর ন্যায় তাকে চিরনীরব করে দিবে। থাক্ সেই আশঙ্কা!

যে কথা বলছিলাম। তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রাণিজগৎ-এ তারাই শেষ পর্যন্ত বাঁচে যারা অবিরাম চেতনাময়। কেউ কেউ মনে করেন, মানুষের দেহে যে-সব শাখাবিহীন গ্রন্থি (Ductless glands) আছে তা থেকে প্রতিনিয়ত পাচকরস ক্ষরণ হচ্ছে বলেই সেই ক্ষরণ জীবনীশক্তির সঞ্চারপথে আমাদের ইন্দ্রিয়স্থানকে (Sense organ) অভিষিক্ত করে রেখেছে; এবং এই সব শাখাবিহীন গ্রন্থির পাচকরস আমাদের চেতনার উৎস। মানুষের দেহধর্ম পশু হয়েও ঠিক অন্যান্য পশুর মত নয়। তার মনের ভাব ভাষায় রূপান্তরের দেহযন্ত্র অন্যতম দৃষ্টান্ত।

তিন

এই প্রসঙ্গে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য পশুর পার্থক্য নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য পশুর প্রভেদ কোথায়? বিনা কারণে পশুর অনুভূতির সঞ্চার হয় না, অর্থাৎ তখনই পশু কোন কিছু বুঝতে পারে যখন অনুরূপ ঘটনা তার অনুভূতিকে (Sensation) উপলব্ধির চেতনায় আন্দোলিত করে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে গেলে আমাকে দেখলেই আমার পরিচিত কুকুরটি লেজ নাড়লো, কারণ আমাকে দেখা ও তার লেজ নাড়ার মধ্যে একটি অনুভূতি-সূচক সম্পর্ক রয়েছে। আমাকে না দেখে যদি নিতান্ত অপরিচিত কাউকে দেখে, অর্থাৎ যার সঙ্গে কিম্বা যার মত অন্য কারোর সঙ্গে তার ইতিপূর্বে কোন সম্বন্ধ ছিল না, তখন সে লেজ নাড়বে না। পরিবর্তে ভয় কিম্বা ক্রোধ হেতু ঘেউ ঘেউ করবে। সাধারণতঃ অন্যান্য পশুর বেলায় যেন স্লটে পয়সা ফেললেই কোন কিছু বেরিয়ে আসবে, কিন্তু মানুষের বেলায় পয়সা ফেলতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। মানুষের মন স্বেচ্ছায় সক্রিয়। সে স্বাধীনতাকে চিন্তা করতে পারে। কোন উদ্দীপক (stimulus) ছাড়াই সে চিন্তা করতে পারে এবং নিজস্ব যুক্তি দিয়ে ভালো-মন্দ বিচার করে কোন সমাধান বা অনুমিতিতে (influence) পৌঁছতে পারে। প্রাণী হয়েও এখানে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য পশুর পার্থক্য।

জৈব প্রকৃতি নিয়ে মানুষ হয়ত বহু কাল এই ভূখণ্ডে বিচরণ করেছে। বেঁচে থাকার তাগিদে তাকে সংঘবদ্ধ হতে হয়েছে। সংঘের প্রয়োজনে বিধান করেছে। প্রথমটায় হয়ত সেই বেঁচে থাকা নিতান্তই জৈব-জীবন ধারণ বা আহার-নিদ্রা-প্রজনন দ্বারা বায়োলজিকেল এক্সিসটেনস। ক্রমশঃ এই জৈব বেঁচে থাকা ছাড়াও অন্যান্য তাগিদ এসেছে। সেই সব তাগিদ থেকে হয়েছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যশঃ, ক্ষমতা ইত্যাদির অভিলাষ বা জড়বাদ (materialism) ব্যক্তিত্ব থেকে এসেছে নেতৃত্ব। ক্রমশঃ এসেছে নীতিবাদ (Morality or Ethics) এবং আধ্যাত্মিকতা (spiritualism)।

আজকের যে-মানুষকে নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচ্য সেই মানুষের মধ্যেও এই চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে —যথা, জৈবপ্রকৃতি, জড়বাদ, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা। তার সমাজ ও সভ্যতার ইতিকথা সেই বৈশিষ্ট্যেরই বিশ্লেষণ। আজকের যে-সমাজ ও যে-সভ্যতা নিয়ে আমাদের গর্ব ও মাথাব্যথা, তার রূপ ও বিকাশ ঘটন ও অঘটনের মূলে রয়েছে আদিম জৈবপ্রবৃত্তি, প্রাগৈতিহাসিক জড়চেতনা ও ঐতিহাসিক নীতিবাদ এবং পরমার্থ লাভের অভীপ্সায় অনন্তের সাধনা বা আধ্যাত্মিকতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, আজকের দিনের খৃষ্টীয় ১৯৫৮ সনের মানুষ। তার জৈবপ্রবৃত্তির নিদর্শন নিষ্প্রয়োজন। সেখানে মূলত অন্যান্য জীবের সঙ্গে পার্থক্য নেই। পন্থায় যদিও পার্থক্য রয়েছে। জড়বাদে আস্থাশীল মানুষের ক্ষুধা ও মহাবুভুক্ষার শেষ নেই। ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ থেকে কেউ নেতা হতে পারছেন, কেউ পারছেন না। সে আণবিক বোমা তৈরী করে আবার শান্তিও চায়। নীতিবাদ প্রচার করে, অথচ দুর্নীতি তার মধ্যে অসংখ্য। ঈশ্বরকে সে নানা ভাবে ডাকে—মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় কিম্বা মনে মনে। আবার সে নাস্তিকতায়ও সমান পারদর্শী।

মানবচরিত্রের এই সব নানা দিক বিবেচনায় একটা অভিমত তাই আমরা ব্যক্ত করতে পারি যে, মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে জৈবপ্রবৃত্তি এবং আদিমতা প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে। অন্যান্য পশুর ন্যায় মানবপ্রকৃতির মধ্যেও দুটো বিশেষ ভাব লক্ষ্যণীয়। একটি সহযোগিতামূলক, অন্যটি অসহযোগিতামূলক। নিজস্ব ইচ্ছা যেখানে প্রবল সেখানে সহযোগিতা কিম্বা অসহযোগিতা উভয়ই ইচ্ছার প্রাধান্যের উপর নির্ভরশীল। এই ইচ্ছার প্রাধান্য মানুষকে স্বীকার করতে হয়েছে ব্যক্তি ও সমাজের বোঝাপড়ায় সমাজের স্বার্থে, সমাজ ও স্বদেশের বোঝাপড়ায় স্বদেশের আনুকূল্যে এবং স্বদেশ ও পৃথিবীর বোঝাপড়ায় যদিও তা এখনো অনির্দিষ্ট।

চার

সহযোগিতার বাসনা থেকেই মানুষের সমাজের সৃষ্টি। যদি বলি সমাজের উদ্ভব হয়েছে মানুষের শক্তিপ্রবণতা বা বলপ্রয়োগ থেকে, তাহলে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য—মানুষ কি অন্যান্য পশুদের ন্যায় নিতান্ত অপরিচিত বলেই একজন আরেক জনকে আক্রমণ করে?

কিংবা একথা কি সত্য নয়, মানুষ তলোয়ার দিয়ে সব-কিছু করতে পারলেও সে তলোয়ারের উপর বসতে পারে না! You can do everything with bayonets save sit on them. —(Talleyrand)। রাজনৈতিক দার্শনিক হবস (Hobbes) বলেছিলেন, আমি ও ভয় একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছি (Fear and I were born together)। কিন্তু যখন জীবনের বেশীর ভাগ সময় শান্তিপূর্ণ দেখি, তখন হবসের অভিমতানুযায়ী একথা বলা চলে না, মানুষ মানুষকে বাধ্য করে (Theory of Force) সমাজ সৃষ্টি করেছে। তাহলে কি ধর্ম মানুষকে সামাজিক সূত্রে বেঁধেছে? ধর্ম মানুষকে মানুষের কাছে টেনে আনে সন্দেহ নাই, এবং তাই ধর্ম মানুষের সমাজচেতনাবোধের হয়ত সহায়। কিন্তু একথাও আবার ঠিক নয় কি যে, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মান্ধতা কখনো বৈরিতার ইন্ধন যোগায়? সেকালের ক্রুসেড কিংবা ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টের বিবাদের কথা ছেড়ে দিলেও পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্ম-বিরোধ ও ধর্ম যুদ্ধ সংক্রান্ত এত ঘটনা রয়েছে যে অধিক দৃষ্টান্ত না দিয়েও একথা বলা চলে, ধর্মবিশ্বাস ও ব্যবহার সমাজসৃষ্টির পূর্বে আসে নি—এসেছে সমাজের নানাবিধ বিকাশের ঘটনাপরম্পরায়। এক কথায়, মানুষ ও সমাজ একে অন্যের সঙ্গে একই সূত্রে আবৃত।

সমাজসৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষের চেতনার উন্মেষ। আজও যখন দেখি, প্রগতি বা মানুষের উন্নতি হয় তার সৃজনীশক্তির মাধ্যমে—অর্থাৎ, ধ্বংসের আঘাতে নয়, তখন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, সমাজ মানুষের সংঘচেতনার সুধী পরিণতি এবং সংঘচেতনা মানুষের সমষ্টিগত প্রত্যয়ের নিদর্শন। কিন্তু, ঘাত-সংঘাত, ধ্বংসের জন্য প্রস্তুতি, হিংসা—অর্থাৎ যা-কিছু অজ্ঞানতা ও অবচেতন মনোভাবের পরিচায়ক, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাত্যহিক জীবনে তথা সমাজে ও রাষ্ট্রে নানা ভাবে বিদ্যমান। তাই, সমাজ-বিন্যাসে সুঠাম মনুষ্যত্ব যেমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, তেমনি সর্বদেশে ও সর্বকালে মানুষের অক্ষমতা পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। যদি সেই ঔজ্জ্বল্যে আস্থা স্থাপন করি, তা-হলে ক্ষুদ্রতাকে পরমপ্রাপ্তি বলে ভুল করবো। আর যদি তার আত্মপ্রত্যয়কে যথার্থ মর্যাদা দিতে পারি, তা-হলে আর কিছু হোক্ না হোক, অন্ততঃ মনুষ্যত্বকে স্বীকার করা হবে। মনুষ্যত্ব ভিন্ন সভ্যতা নিরর্থক, মনুষ্যত্ববিহীন মানুষ সভ্যতায় অনর্থক।

কিন্তু সর্বত্র একই ভাবে একই সময়ে মানুষ সভ্যতার শিখরে আরোহণ করে নি। এই প্রসঙ্গে, অর্থাৎ মানুষের অসমান উন্নতি প্রসঙ্গে হেন্‌রি লুই মর্গানের অভিমত সম্বন্ধে দুটো-একটা কথা বলে এই আলোচনা শেষ করবো। তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছেন, জগৎ-এ সব মানুষ সব জায়গায় এক ভাবে সভ্যতার আসনে উন্নীত হয় নি। বহু ধাপ যেমন মানুষকে পার হতে হয়েছে, তেমনি বহুকালও অতিক্রান্ত হয়েছে। তবু কারো আয়ত্তে এসেছে সভ্যতার বহু সুযোগ, কেউ থেকে গিয়েছে নিউজিল্যাণ্ডের মাওড়ী, কিম্বা আন্দামান ও পলিনেশীয়ার আদিবাসীর মত। মর্গান বহু দিন আদিবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে অবস্থান করে তার গবেষণা থেকে এই অভিমত স্পষ্ট করেই বলেছেন, বন্য থেকে বর্বর এবং বর্বরতা থেকে সভ্যতার স্তরে এখনো যারা পৌঁছয় নি, তাদের দৃষ্টান্ত হল কোনো কোনো আদিবাসীরা। অর্থাৎ যাঁরা আজ সভ্যতার গর্ব করেন, তাঁরা সেই সব ধাপ পেরিয়ে এসেছেন; এমন নয় যে, সভ্য মানুষ ঈশ্বরের বিশেষ কৃপালাভ করে হঠাৎ কোথাও কখন জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই যাঁরা শ্বেতকায় জাতির সভ্যতায় গর্বান্ধ, তাঁদের এ বিষয়ে অবহিত হাওয়া কর্তব্য যে, তাঁরা শ্বেতকায় বলেই সভ্যতার ইমারত গড়েছেন এমন নয়, পরন্তু তাঁদের পূর্বপুরুষ সভ্যতার উপাদানগুলো যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন বলেই কৃষ্টির বিকাশ নানা ভাবে করেছেন।

অবশ্য সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও শান্তির পরিপ্রেক্ষিতে যদি সভ্যতা বিচার করি, তা-হলে তার চার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা আদিবাসীর জীবনে যে অধিক, একথা সর্বজনস্বীকৃত বললে অত্যুক্তি নয় না। আদিবাসীর নিজস্ব গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা বা প্রাগৈতিহাসিক সাম্যবাদ (Primitive Communism) এই অভিমত সমর্থন করে। যেখানে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উদ্দেশে সভ্যমানুষ রাজনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য প্রত্যহ নিবেদন জানায়, সেখানে তথাকথিত অসভ্য মনুষের কাছে সেই সব স্বভাবের-ই অন্তর্ভুক্ত। এই সাম্যবাদী অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কার্ল মার্কসের প্রয়োজন হয় নি, যদিও কার্ল মার্কসের গবেষণায় প্রাগৈতিহাসিক সাম্যবাদ সম্বন্ধে পুরোপুরি প্রণিধান আবশ্যক হয়েছিল। আর যদি শান্তি বা অ-শান্তি দিয়ে যথাক্রমে সভ্যতা বা অসভ্যতার মানদণ্ড স্থাপন করি, তা-হলে দেখতে পাই, শান্তি সেকালে কিম্বা একালে—কোন কালেই অবিরাম নয়। সভ্যমানুষ আর তথাকথিত অসভ্য-মানুষের মধ্যে যা কিছু পার্থক্য, তা হচ্ছে মানসিক উৎকর্ষতায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষা সংস্কৃতি, শিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধতার-ই পরমপ্রাপ্তি। বনের মানুষ মনের মানুষ হয় তখনই যখন তার সৃজনীশক্তি চলিষ্ণু কালের গতিপথে নিত্য সক্রিয় ও উদ্ভাবনশীল।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র,—ভাষা মাত্র। সেইরূপ, প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য তার আবশ্যক। যে-দিন সে অত্যাবশ্যকটুকু চ'লে যাবে, সে-দিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

জলে ঢেউ দিও না

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

গোয়ালন্দ-ঘাট থেকে কালীগঞ্জ ষ্টীমার সার্ভিসে উজিয়ে গিয়ে নগরবাড়ী, নটাখোলা বা আরিয়া ষ্টীমার-ষ্টেশান থেকে ক' মাইল ভেতরে যে গ্রাম, প্রায়শঃ তাতে যাবার পথ ছিল খাল বা নদী বেয়ে। প্রবাসী আমরা প্রায়ই গ্রামে যেতাম পূজোর সময়ে। আষাঢ় শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারা বুকে সঞ্চয় করে যে পদ্মা ফুলে কেঁপে উঠেছিল, উন্মত্ত কৌতুকে যে গ্রাস করেছিল কত গ্রাম, কত তটভূমি, যার ঘোলাজলের পাক দেখে ভয় পেতো না শুধু জেলে মাঝি আর সারেং। আমরা দেখতাম তাকে শান্ত, সুন্দর। ধূ-ধূ এপার ওপার ঘোলাজলের একখানা বিস্তৃতি। গ্রামের ষ্টীমার-ষ্টেশান যখন দূরে চোখে পড়ত তখন যাত্রীদের মুখে মুখে শুনতাম—এবারও ষ্টেশান ভেঙেছিল।—দেখলে কিন্তু মনে হয় না।—সারাল কে? —প্রসন্ন চৌধুরী। তখন মুখে মুখে সবাই বলত তাঁর কথা। তিনি ছাড়া গ্রাম বাঁচতো না। তাঁর প্রতাপেই গ্রামে অন্যায় অধর্ম হতে পায় না। সিংহাসনের সান্ন্যালরা চক্রান্ত করে এবারও আমাদের গ্রামের বড়হাটের হাটুরেদের ভাঙিয়ে নিয়েছিল প্রায়, কিন্তু মাঝখানে গিয়ে পড়লেন প্রসন্ন চৌধুরী। বেয়াদবী করতে চেয়েছিল যারা, তাদের কাছারীতে আনিয়ে যেমন নাকে খৎ দেওয়ালেন, ওদিকে তেমনি এজমালীর খরচে হাটের জন্যে পাকাপাকি টিনের চালা দোকান, বাঁশের আগড় দিয়ে বেড়া, জল খাবার জন্যে টিউবওয়েল-কূয়ো, সব করিয়ে দিয়েছেন প্রসন্ন চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে কার তুলনা?

ষ্টীমার যখন ঘাটের কাছে আসত, ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে ময়াল সাপের মতো মোটা লোহার শেকলটা গড়িয়ে পড়তো জলে, পাড়ের ফ্ল্যাট আর ষ্টীমারের মাঝে তক্তা পড়তো। খালাসীরা ছুটোছুটি সুরু করতো, তখন চোখে পড়তো পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামবর্ণ, হাস্যমুখ, নাতিদীর্ঘ অথচ বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ প্রসন্ন চৌধুরী। কত জন প্রণাম করতো, কত জন সেলাম জানাত, সকলের সঙ্গেই তিনি অভিভাষণ বিনিময় করতেন। এত ভক্তি, ভয়, ও কৌতূহল তাঁকে জড়িয়ে মন ভরে তুলতো যে ভাল করে দেখতেও সম্ভ্রম হতো।

তারপরে সোনাপদ্মার খাল বেয়ে চলতে সুরু করতো নৌকো। পাটের আড়ত, গঞ্জ পেছনে রেখে সরুখালের ওপর দিয়ে নৌকো চলত। দুই পাশ থেকে ঘন আম-কাঁঠালের ডাল নৌকোর ছই-এ ছপ, ছপ করে লাগতো এসে। তারই ফাঁক দিয়ে শাঁখআর রায়েদের নতুন বাড়ী চোখে পড়তো। তারপর সুরু হতো দুই পাশে সুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। সবুজ ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে শরতের সোনারোদ অকৃপণ অঞ্জলিতে ঢেলে দিতো যে যাদুকর, সেই উথালপাতাল বাতাসে লাগিয়ে দিতো মন-কেমন-করা হু-হু ভাব। গ্রাম যেমন কাছে আসতো তেমনি কানে আসতো সপ্তমীপূজোর ঢাকের শব্দ। সে দিনগুলোকে শুধু মনে করা যায়, অনুভব করা যায়। তাদের মধ্যে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। সে দিনগুলোর সমস্ত স্বাদ কিন্তু আজও গানের সুরে রয়ে গিয়েছে। পূজোর আগে সহরের পথে-ঘাটে যে রোদ ছড়ায় তার রঙেও সোনা আছে। আর সে গানও রয়ে গেছে বৈরাগীর গলায়—'গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল।'

প্রসন্ন চৌধুরীর নাম সেই দিনগুলোর সঙ্গে বড় বেশী জড়ানো। বি-এ পাশ করে সেদিনে সরকারী কাজ বা জাগতিক উন্নতির কথা না ভেবে তিনি গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। শেষ জীবন অবধি গ্রামের মানুষের জন্যেই প্রাণ দিয়ে গেলেন বলা চলে। এ-সব মানুষ ইতিমধ্যেই অপরিচিত হয়ে উঠেছেন আমাদের চোখে। তাঁর জীবনের একমাত্র প্রেমের ইতিকথারও তাই একটি বিশেষ মূল্য খুঁজে পাই। তাঁকে সম্পূর্ণ চেনা যায়।

পদ্মার প্রকোপে পুরোন গ্রাম ভেসে গেল। নতুন গ্রাম পত্তন হলো ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে। লোকজনের বসতির জন্যে ঘর বাঁধবার ব্যস্ততা, রাস্তা বানানো, কূয়ো ও পুকুর খোঁড়া এই সব চলেছে। রাতেও বাতি জ্বেলে কাজ হয়। চৌধুরীবাড়ীর কয়খানা চালাঘর উঠেছে মাত্র, স্নান করতে যেতে হয় সোনাপদ্মার খালে। প্রতিবেশী গ্রাম সিংহাসনের নমঃশূদ্র ও এ গাঁয়ের বাগ্‌দীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত করাই ছিল, এ সুযোগে তাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।

এরই মধ্যে একদিন ভরা দুপুরে হৈ-চৈ উঠল চুণেপাড়ায়। মল্ল বা ধীবরজাতির যে সব মানুষ বিশাল সিংহাসনের বিল থেকে ঝিনুক কুড়িয়ে পুড়িয়ে চূণ বানায় তারাই চূণে নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নলিনী। সে-ই দরবার করতে এল কাছারীতে।—রায় দ্যান, রায় সাহেব, ব'লে বসল মাটিতে। একমাত্র মেয়ে তার প্রেমদা। স্বর্গীয়ের বিপিন চুণের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সে ঘর বেঁধে দিয়েছিল। সুখ মেয়ের কপালে নেই, তাই স্বামী মরেছে জ্বর হয়ে। বিপিন চুণের কথা সে ধরে না। কে না

জানে সে বৌয়ের হাতে চিনির পুতুল—তার বৌ-ই দশ বিঘা ধানী জমি আর ঘরের লোভে প্রেমদাকে কু-প্রস্তাব দিয়েছে। আট বছরে বিয়ে যার, ন' বছরে বিধবা যে, সে কেন ভরা যোলো বছরে বুকে পাথর দিয়ে থাকবে বাপের ঘরে বাঁদী হয়ে? তার চেয়ে সে মেয়ে আসুক বিপিনেরই ঘরে, বিপিনের আর এক ছেলের হাত ধরে। তাদের সমাজে এ প্রথা অচল নয়। এ প্রস্তাবে দূর দূর করে আপত্তি জানিয়েছে প্রেমদা। এখন এই যে কাজের সময়, বিপিনের সেই কাঠগোঁয়ার ছেলে যে প্রেমদার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে—প্রকাশ্যেই সে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে, অন্য ঘর অন্য বর যদি নেয় প্রেমদা, তো সে লাঞ্ছনার অবধি রাখবে না—তার প্রতিকার কি?

প্রতিপক্ষ বিপিনের ছেলে। সে বলল—সে মেয়ের কলঙ্ক রটেছে। এ কথায় তুমুল বিবাদ লাগল। শেষে করজোড়ে দাঁড়াল ভীম। বলল—নলিনের মেয়ের কলঙ্ক রটতোই। চরিত্র তার নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু সে মেয়ে অসম্ভব রকম রূপসী। রূপেই কলঙ্ক টানে।

প্রসন্ন চৌধুরীর আদেশে প্রেমদা এসে দাঁড়াল। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে জানাল, সে পুনর্বিবাহে অনিচ্ছুক। তার বাবা-মার কাছেই থাকতে চায় সে।

রায় গেল নলিনীর পক্ষে। পরদিন বাপ মেয়েকে নিয়ে এল বড়বাড়ী। নলিনী চূণের রূপসী মেয়ে প্রেমদা, যার রূপ, চোখে দেখে বা কানে শুনে গাঁয়ের কত ছেলেরই মন বে-দিশা হয়েছে, তাকে দেখতে ভীড় করে এলেন বড়বাড়ীর ঝি-বৌয়েরা। বাপ যার চূণের ভাটি করে, সেই মাগোবরের মেয়ের অত রূপ থাকতে নেই, তা কি প্রেমদা জানত না? তাই এসেছিল জোলার হাটের বেগুনফুলী কাপড়খানায় সর্বাঙ্গ ঢেকে। চোখের দৃষ্টি ছিল নিচু, পা ফেলেছিল ভয়ে ভয়ে। জমিদারের পায়ের কাছে টাকা নামিয়ে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করেছিল প্রেমদা।

তরুণ জমিদারের পায়ে ঘামেভেজা লোহিত হাতখানা ছুঁইয়ে কপালে ঠেকিয়েছিল প্রেমদা। বাধা দিতে গিয়ে অকারণেই লাল হয়ে উঠেছিলেন প্রসন্ন। তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি প্রেমদাকে বলেছিল, এর জন্যে ত' প্রস্তুত ছিলাম না! প্রেমদার রূপের বাড়াবাড়িটা তাঁর চোখেও লেগেছিল। এক কথায় নলিনী চূণেকে বিদায় দিয়েছিলেন তিনি। কাছারী থেকে আশীর্বাদী কাপড়, নারকেল একখানা ও একটা টাকা নিয়ে যেতে বলেছিলেন। পরদিন ডালায় করে কিছু মাছ এনেছিল প্রেমদা। দুপুরের পাট মিটতে সূর্য হেলে যায়, অঘ্রাণের বেলা। ঢেঁকিশালের পাশের পরিষ্কার উঠোনে বাড়ীর অল্পবয়সী মেয়ে-বৌরা প্রেমদার কাছে গান শুনতে চেয়েছিল। বড় নাকি শৌখীন মেয়ে প্রেমদা, অনেক নাকি সে জানে। কি জানে না! তা ছাড়া ভদ্রঘরের মেয়ে-বৌদের কথার ধরণ কেমন প্রেমদা তার মধ্যের লুকোন ইঙ্গিত বোঝে না। তবু সে অল্প হেসে চোখ নামিয়ে গান করেছিল। চৌরিঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে সে গান শুনেছিলেন প্রসন্ন।—'জলে ঢেউ দিও না গো রাধা কিশোরী—' ভীরু কম্প কণ্ঠের এই গানে ষোলবছরের গাঁয়ের মেয়ের কত লজ্জা, কত ভয়ই যে কথা কয়েছিল—একবার না তাকিয়ে পারেননি প্রসন্ন। সজনে গাছের ঝিলমিলে ছায়ায় ডুরে শাড়ী ঈষৎ তুলে পা মেলে বসে গান গাইছিল প্রেমদা, দেখে তাঁর বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল। তিনি কি জানতেন সে অনুভূতির নাম প্রেম?

ইচ্ছে ছিল বলেই অবকাশ মিলল বার বার সাক্ষাতের। সবই অজানতে, আকস্মিক। ধান কাটতে লাগা লাগল বাগদী প্রজাদের মধ্যে। তাই ঠেকিয়ে ফিরতে ফিরতে শ্রান্ত ঘোড়াকে জল খাওয়াতে বিলের ধারে গেলেন প্রসন্ন। ভরাদুপুরে। শঙ্খচিলের আর্ত ডাকে মিঠে রোদের আকাশ কেঁপে যায়। কে জানতো সেই সময়ই ক্ষার কাচতে আসবে প্রেমদা সিংহাসনের বিলে? গ্রামে জল নেই। খাল-বিলই মানুষের ভরসা। ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রসন্ন—ভয় নেই তোর? জবাব দিতে পারেনি প্রেমদা। শাড়ীর পাড় আঙুলে টেনে টেনে সমান করে লজ্জায় কথা হারিয়েছিল শুধু। সুবিস্তীর্ণ বিল। পাড়ের কাছের অজস্র শাপলার ফুল থরথর করে কাঁপে ফড়িংয়ের পায়ের ভরে। মাছরাঙা জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওড়ে। হৈমন্তিক মধ্যাহ্ন পাকাধানের গন্ধে বাতাস মন্থর। সে পরিবেশে দাঁড়িয়ে যতটুকু দেখেছিলেন প্রসন্ন, বড় ভালো লেগেছিল। তার পর হাটবারে যেদিন পুরুষেরা হাটে গিয়েছে, সেদিনও অমনি ঘোড়া চড়ে ফিরতে ফিরতে দেখা হয়েছিল নতুন পুকুরের পাড়ে। পুকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই, দেবতা-ব্রাহ্মণ জল নেয় নাই, নির্জন নিভৃত,—এমন সময় এখানে চূণে মালোর মেয়ে কি করে?

—জল নেয় নাই মেয়ে—পুণ্যধারে কালমেঘের মন—পাহাড় তুলে নিয়ে যাবে ঘরে।

পুকুরের উঁচু পাড়। মানুষ-জন দেখতে পায় না। চূণের মেয়ের বড় কাছে এসেছিলেন প্রসন্ন। অজানা উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর বুঝি পরুষ হয়েছিল। বলেছিলেন—আমার আনাগোনার পথে তুমি হাঁট কেন?

—আর আসব না। জলভরা সকরুণ চোখ তুলে বলেছিল প্রেমদা। তার পর ত্রস্তে পালিয়ে গিয়েছিল প্রায়। সে কথা ত' বলতে চাইনি প্রেমদা—সে কথা ত' আমি বলিনি—এ কথা বলতে চেয়ে-ও বলতে পারেন নি প্রসন্ন। শিক্ষা, দীক্ষা, জাত ও সংস্কার বেধেছিল। এ কি দুর্বলতা তাঁর?

তাঁর উন্মনা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব বাড়ীর মানুষ-জন লক্ষ্য করলেও কথা তেমন ওঠেনি। ঘর বাঁধা হচ্ছে, ভিত পুজো চলেছে, রান্না-খাওয়া দেবতা-বিগ্রহের কাজ কোন মতে সুনির্বাহ হয়—গ্রাম পত্তনের কর্মমুখর ব্যস্ততার ছোঁয়াচ সকলকেই স্পর্শ করেছে। ধরাবাঁধা অলস মন্থর জীবনের এ একটা ব্যতিক্রম। কে কার দিকে মন দেয়?

মনই বসে নেই প্রসন্নর। প্রেমদাকে মনে আঘাত দিয়েছেন রূঢ় ব্যবহারে, এ কথাই বার বার মনে হয়। পাছে দেখা হয়, তাই সিংহাসন যাবার পথে ঘুরে ঘুরে যান তিনি। গ্রামের এক প্রান্তে নলিনী চূণের ঘর—বলতে কি আসা-যাওয়ার পথের বাইরেই। সিংহাসনের বিলে জেলেরা শামুক-ঝিনুক তোলে—চূণের ভাটি করে। ধানকাটা হয়ে গেছে—শীতের জ্যোৎস্নায় মাঠে দিক্‌ভ্রম হয়ে যায়। ওদিকে আত্মীয় সমাগমে নতুন বাড়ী মুখর। কালীপুজোর আয়োজন চলেছে, পুকুর প্রতিষ্ঠা করবেন প্রসন্নর পিতামহী। মন মানে না, তাই একদিন গ্রামের কাছে ভিতে নয়, বিলের

পশ্চিম পাড়ে গেলেন প্রসন্ন। ভেবেছিলেন, নির্জনে একটুকু বসবেন অথবা এমনিই সেই পথ ভাল লাগতো তাঁর—দেখলেন প্রেমদা উঠে আসছে জল থেকে। পুরোন শাঁখের মতো মাজা গৌরবর্ণ সুডৌল মুখের ওপর চোখের চাহনি একটু কাতর, চেহারাতে একটা মলিনভাব—আজ আর কোন চকিত ভাব নয়, এমনিই চলে যাচ্ছিল সে। প্রসন্ন পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন—এত দূরে তুমি জল নিতে আস?

—এ ত কারো পথ-ভিত নয়। প্রেমদার কথায় বাধা দিয়ে প্রসন্ন বলেছিলেন—কি বলেছি তাই তুমি একেবারে অদেখা হলে প্রেমদা? আমি কি তাই বলেছিলাম?

—আমি মূর্খ—কথা জানি না, রীত কানুন জানি না, কখন কি অপরাধ করি—

প্রেমদার কাঁধে হাত রেখেছিলেন প্রসন্ন। বলেছিলেন—তোমার কোন দোষ নেই প্রেমদা!

তা জেনেও আশ্বস্ত হয়নি প্রেমদা। বড় সুকঠোর বিধিনিষেধ গ্রাম-সমাজের। বড় নিদারুণ অপরাধ করেছে তার ষোলবছরের মন। তাছাড়া জমিদার, যাকে রাজা বললেই হয়, তার সাথে সাধ মিশিয়ে এ কি ভুল করল সে? কেমন করে সে বোঝাবে তার ভয় কোথায়? আশে-পাশে কেউ নেই দেখে আরো কাছে এসে ছিলেন প্রসন্ন। আবার সস্নেহে বলেছিলেন—তুমি ভয় করো না, আমি তোমার অনিষ্ট করব না।

তখন তাকিয়েছিল প্রেমদা। চোখে চোখে তাকিয়ে আকাশ-বাতাস বিলের জলকে সাক্ষী রেখে নিষ্পাপ প্রেমের স্বাক্ষরস্বরূপ প্রেমদার কপালে হাত বুলাতে বুলাতে নিজেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন প্রসন্ন। প্রেমদা লজ্জাসরমে মাটিতে মিশে যায় কি না যায়। প্রসন্ন চলে গিয়েছিলেন ঘোড়া ছুটিয়ে।

নিষিদ্ধপ্রেম গানে গল্পে ঠাঁই পায়। তবু তার পথে অনেক বাধা। জমিদারদের অনুগৃহীতা স্ত্রীলোক, যেমন আরো অনেকে থাকে, তেমন করে যদি গ্রহণ করতেন প্রেমদাকে প্রসন্ন, বাধা দিতো না কেউ। বড়জোর কথা উঠতো—বড়কর্ত্তার ছেলে অনুগ্রহ করেছে নলিনীর মেয়েকে।

প্রেম বলেই অনেক বাধার প্রশ্ন উঠল। বড় গোপনে বেরিয়ে যায় প্রেমদা। প্রসাধনে তার বড় লজ্জা। সিংহাসনের বিলের ধারে বসে গান গাইতে সে লজ্জায় মরে যায়। প্রসন্ন যে যখন তখন বেরিয়ে যান দিনে-দুপুরে, এ নিয়ে অনেক কথা আজ-কাল বড়বাড়ীতে ওঠে। চুপে পাড়া নিষ্ক্রিয় বসে নেই। কথা উঠল যখন প্রেমদার বাবাকে প্রকাশ্যেই শোনাল সকলে—বড় গাছে নৌকো বাঁধবার সখ ছিল বলেই না সে এমন উপযুক্ত সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়েছিল? শুনে রাগে

জলতে জলতে ঘরে ফিরল নলিনী। বলল—তার বিয়ে হবে ঘর সংসার হবে, তুই কোন ভরসা করিস? তোকে কি সে পুঁছবে?

প্রসন্নর যে বিয়ে হবেই একদিন, সে ত জানা কথা। তবু কি যে মনে হল প্রেমদার, বড় দুঃখ হল। বাপের কাছে কেঁদে কেটে কথা দিল আর সে যাবে না বিলের ধারে।

স্বজাতে মেয়ের বিয়ে দিল না নলিনী। বড়গাছে নাও বাঁধল। এখন যে ছোটকর্তা বিয়ে করতে চলেছেন, বৌ পেলে কি আর প্রেমদাকে পুছবেন? ঘরে বৌ ছিল না, এসেছিলেন প্রেমদার কাছে। মেয়েও কি এমন মূর্খ যে সেই যদি মুখ হাসাল ত অন্ত দিকে পুষিয়ে নিল না কেন? টাকা, গহনা, ধানীজমী চেয়ে নিল না কেন? এখন কি আর নতুন ক'রে কষ্ট দুঃখ করতে পারবে? নলিনীর বয়স হয়েছে। হঠাৎ যদি মরেই যায় তবে কেমন করে একলা জীবন কাটাবে প্রেমদা? নতুন করে মাছ ধরে, গোবর চাপড়া দিয়ে, বামুন কায়েত বাড়ীর উঠোন ঝাঁট দিয়ে পেট চালাতে ভাল লাগবে তার? এই সব কথা সবিস্তারে প্রেমদাকে শুনিয়ে গেল পাড়ার মানুষ। বিধাতা যাকে বামন করেছে, সে যে চাঁদে হাত দিয়েছিল, তার জন্ত বড়বাড়ী, ছোটবাড়ী, অনেকেরই রাগ ছিল মনে মনে। গাঁয়ের পথে চলতে ফিরতে প্রেমদাকে কথা শোনাতে ছাড়ল না কেউ। ভদ্রঘরের মানুষ কেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা কইতে জানে। খোঁচাটা বিঁধল ঠিক জায়গায়। মরমে মরে গেল প্রেমদা। কেঁদে কেটে নিজের দুঃখে নিজেই সারা হলো। যে মানুষকে নিয়ে এত কথা, তারও ত' কই দেখা নেই? তবে বুঝি সব কথাই সত্যি? কেঁদে কেঁদে মলিন হল প্রেমদা। আর সে গ্রামের পথে বেরোয় না। সিংহাসনের বিলের ধারে স্নান কাচতে যায় না। বিয়ের কথা ঠিক হ'তে আনন্দ করে যাত্রাপার্টি এনেছে আত্মীয়-স্বজন। সন্ধ্যাবেলা বাজনা বেজে ওঠে। প্রেমদার ঘরে সে বাজনার শব্দ এসে পৌঁছয়। কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে সে সুর। এত সহজেই সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে? মনের কষ্টে প্রেমদা শয্যা নিল প্রায়।

বড়হাটের দিন। সন্ধ্যা হয়েছে। বাবা গিয়েছে হাটে। ফিরতে এখনো কত রাত। ঘরে বাতি জ্বেলে এলো চুলে বসে ছিল প্রেমদা। এমনি সময় এলেন প্রসন্ন।

স্বল্প বাতির আলো। চৌকি পেতে দিল প্রেমদা। এই ক'দিন যে তাকে দেখেন নি প্রসন্ন। মুখ কেন আড়াল ক'রে আছে প্রেমদা? পা ধুয়ে দিল, মুছিয়ে দিল। হাত ধরে বসাল চৌকিতে। তারপর বসল পায়ের কাছে। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে মাটিতে।

—তোমার চোখে জল প্রেমদা! তুমি কাঁদছ?

তাঁর হাঁটুতে মাথা রেখে—একেবারে ভেঙে পড়ে দুই পায়ে মুখ রেখে লুটিয়ে পড়ল প্রেমদা।

বুঝলেন প্রসন্ন। বললেন—উঠে বোস প্রেমদা! আমার কথা শোন। কার কথা কে শোনে? নীরবেই কাঁদতে লাগল প্রেমদা। কোন অনুযোগ করল না, প্রশ্ন শুধোল না।

প্রেম ত শুধু দেহের আকর্ষণ নয়, সত্যিকারের প্রেম যে প্রজ্ঞা। মানুষকে অনেক দূর বুঝতে সাহায্য করে। প্রেমদার রুক্ষ চুলে হাত রেখে অনেক কথাই বুঝলেন প্রসন্ন। এই মেয়ে তার নিজ সমাজের ভরসা হারিয়েছে, শুধু তাঁকে ভালোবেসে। আজ সে একান্ত ভাবে তাঁরই ওপরে নির্ভর করে। তিনি বিয়ে করবেন কি না, সে বিষয়ে সমাজের পাঁচ জনের মত শুনেছেন তিনি। কিন্তু যে তাঁকে ভালোবাসে, তিনি যাকে ভালোবাসেন, তার মতামত ত' নেবার জন্ত অপেক্ষা করেননি তিনি? সমাজের জন্ত তাঁর স্ত্রী প্রয়োজন। এ তাঁর স্ত্রী হ'তে পারবে না, তাঁর পুত্রের জননী হবে না—কিন্তু দেহ-মনের এমন কি চাহিদা আছে তাঁর যা এর কাছে তৃপ্ত হননি? তাঁর হৃদয়-মন ভরে আছে এই মেয়ে। সমাজের শাসনে আর একজনকে এনে তিনি ত' দু'জনের একজনের প্রতিও সুবিচার করতে পারবেন না? আর প্রেমদার জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা যে রকমই হোক, তাঁকে ভালোবেসে সে উন্নত হবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। সে স্বার্থচিন্তা করেনি, লোভ করেনি—শুধু ভালোবেসেছে তাঁকে, আর তাতেই সে ধন্ত বোধ করেছে।

এতখানি তাঁকে আর কোন্ মেয়ে দেবে? বুঝলেন ব'লেই সঙ্কল্প নেওয়া সহজ হ'ল তাঁর পক্ষে। সকরুণ স্নেহে বললেন—ওঠ। ওঠ—চোখ মোছ, আমার কথা শোন। কি হয়েছে? আমি বিয়ে করছি তাই শুনেছ? কার কাছে কি শুনেছ প্রেমদা? আমার কাছে ত' শোননি? এবার শোন আমি বলি। তোমার কাছে ত আমি মিথ্যে বলব না প্রেমদা!

প্রেমদা অবাধ্য নয়। মাথা তুলল। চোখ-মুখ মুছল। প্রসন্ন ধীরে ধীরে বললেন—শোন প্রেমদা! আমি যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হই, আমার অন্তরাত্মা থেকে বলছি, বিশ্বাস কর আমি কথা দিচ্ছি আমি বিবাহ করব না। আমি ভুল করেছিলাম।

এ কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা? পিতৃকৃত্যের পর মুণ্ডিত মস্তক, সুন্দর কান্তি, দীর্ঘ সবলকায় প্রসন্নর মুখে এক অপূর্ব ভাব প্রতিভাত হয়। কঠোর সংকল্প গ্রহণের এক পবিত্র আনন্দ ফুটে ওঠে মুখে। প্রেমদার মনে হয় মানুষ নয়, যেন কোনো দেবতার মতোই দেখাচ্ছে প্রসন্নকে। তেমনই পবিত্র, তেমনি সর্বশক্তিমান। প্রসন্ন বলেন—আজ থেকে তুমি নিশ্চিন্ত হও প্রেমদা, জীবনে আমি অন্ত পথে যাব না। তুমি আমাকে অনেক শেখালে প্রেমদা! আমি তোমার ঋণ ভুলব না।

—এত বড় ত্যাগ তুমি আমার জন্তে কোর না ছোটকর্তা! তুমি যে বলেছ এই আমার যথেষ্ট। আমি আজীবন মনে রাখব। তুমি সংসারী হও। তোমার রাজার সংসার ভরে উঠুক। আমি চোখ ভ'রে দেখব ছোটকর্তা! শুধু আজ যেমন, সেদিন-ও তেমনই পায়ে ঠাঁই দিও।

—না প্রেমদা! বার বার কথা আমি বদলাই না।

—এ কি করলে তুমি ছোটকর্তা? আমি ত' এত ত্যাগ চাইনি। এর অপরাধে আমি যে জীয়ন্তে মরে থাকবো ছোটকর্তা! আমার জন্তে তুমি রাজার সংসার ভাসিয়ে দেবে?

—এর জন্তে অনেক কথা আমায় শুনতে হবে প্রেমদা! তুমি আর বোল না।

—আমি যে অনুতাপে মরে গেলাম।

—শুধু এই মনে রেখো প্রেমদা, তুমি কোন দিন ঘা দিও না।

—এ কি হ'ল ছোটকর্তা?

—সংসারে কি সব হয় প্রেমদা?

তখন নতুন করে কৃতজ্ঞতায় প্রসন্নর পায়ে মাথা রেখে কাঁদল প্রেমদা। বলল—তুমি বিশ্বাস করো, আমি এত চাইনি। আমি মহাপাতকী ছোটকর্ত্তা, তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি ত' আর কিছু জানি না, শুধু তোমাকে জানি। আমাকে শুধু মুখে একবার বলতে, তাতে-ই হতো। আমার মতো অভাগিনীর জন্তে এত বড় প্রতিজ্ঞাটা করলে তুমি ?

আষাঢ়ের আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বাতির আলো কেঁপে উঠল বাতাসে। প্রসন্নর মন থেকে জাতিধর্মের কথাটা কোথায় হারিয়ে গেল। তিনি পুরুষ, আর প্রেমদা নারী, এ ছাড়া অন্য কথা মনে রইল না তাঁর। আত্মসমর্পণ করতে প্রেমদারও বাধল না।

পরদিন প্রভাতে, সর্বজন সমক্ষে প্রসন্ন জানালেন—তিনি বিবাহ করবেন না।

বাৎসরিক কাজের জন্ম যে আয়োজন হয়েছিল, তাতে ইতিমধ্যেই উৎসবের সুর লেগেছে। পল্লীগ্রামে সব উপকরণ মেলে না, তাই লোক চলে গিয়েছে পাবনা। কন্যার পিতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা এক রকম স্থির। শ্রাবণে পড়েছে শুভদিন। চার দিন বাদেই পাত্রপক্ষ যাত্রা করবে। এখন এ কি অসম্ভব প্রস্তাব!

প্রসন্ন কোন যুক্তি মানলেন না। বললেন, বংশরক্ষার জন্ম বিবাহের প্রয়োজন, আমার সে প্রয়োজন নেই। সন্তান প্রতিপালিত হচ্ছে তার মাতামহীর কাছে, কাজেই তাকে দেখবার জন্তে বিয়ে করবার কোন মানে হয় না। আর অন্যান্য কর্ত্তব্য? তার জন্তে সংসারে আরও ঝি, বউ, পিসীমা রয়েছেন। তাঁরা থাকতে নতুন করে এ সংসারে একজন নাবালিকাকে আনবার কোন প্রয়োজন নেই।

দৃঢ় সংকল্প প্রসন্নর। কথা তিনি বেশী বলেন না। আর যদি বলেন তো একবারই বলেন। সে কথা নড়চড় হবার নয়।

কারণ অনুসন্ধান করবার জন্ম উৎসুক হয়ে উঠল মানুষ। বেশী দূর যেতে হলো না। যা ছিল গোপনে, পরস্পরের মধ্যে, এক মুহূর্তে তা প্রকাশিত হলো। কথা উঠল দু'দিক থেকেই। ন্যায়ধর্মের ধ্বজাবাহী তর্কালঙ্কার, ব্রাহ্মণ সমাজের অন্যান্য মাথা যাঁরা—তাঁরা প্রকাশ্যেই জানালেন, প্রসন্নর বিচ্যুতি ঘটেছে। মালো-সমাজ বলল, যে রক্ষক, সে-ই যদি ভক্ষক হলো—তবে স্ব-জাতের বিপিন চূণের ছেলে কি অপরাধ করেছিল?

কারও কথায় কান দেন নি প্রসন্ন। জমিদার হিসেবে তাঁর যা কর্ত্তব্য, তিনি করে চললেন অবিচলিত ভাবে। গ্রাম্য-সমাজে প্রবলের ওপর প্রতিশোধ নেবার যে-সব চোরা উপায় আছে, তাঁর ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার হলো। রক্ষণাবেক্ষণের কাজে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। সেদিকে বাধা দিল না কেউ। তবে ব্রতপূজা, আচার-অনুষ্ঠানে তাঁর যে প্রথম স্থান ছিল, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে মনে হলো। এক দিন কথা উঠল। বল্লালসেনের বার্ধক্যে হড্ডিকাযোগ ঘটেছিলো। হাড়ীর মেয়েকে ভালবেসে তিনি স্বেচ্ছায় রাজ্যপাট লক্ষ্মণসেনের হাতে তুলে নির্বাসনে গিয়েছিলেন, এই কিংবদন্তী বলে হাসাহাসি করলেন সভাস্থ ব্রাহ্মণরা। প্রসন্নর অনুপস্থিতিতে ব্যাপারটা ঘটলো। কিন্তু কথা কানে পৌঁছতে দেরী হলো না। ব্যক্তির চাইতে সমাজ বড়। পরদিন থেকে প্রসন্ন আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ গ্রহণে বিমুখ হলেন। সমাজ তাঁকে ত্যাগ করবার আগেই তিনি সমাজকে এড়িয়ে গেলেন।

ভেতরে ভেতরে তাঁর যে আঘাত লেগেছিল, তা জানল একমাত্র প্রেমদা। প্রেমদার সাজানো সুন্দর ঘরখানিতে বসলে সমস্ত মন-প্রাণ তাঁর জুড়িয়ে যায়। জ্যোৎস্নাপুলকিত নিশীথে জলচৌকির ওপর মুখোমুখি বসে প্রসন্ন প্রেমদাকে বলেন, তোমার তুলনা নেই প্রেমদা! তোমার কাছে এলে বড় শান্তি পাই প্রেমদা! বলেন—তুমি যদি না থাকতে তবে এই সময় কি করতাম আমি প্রেমদা!

প্রসন্নর পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রেমদা বলে, আমি নেই, তুমি আছ একা এই সংসারে—একথা আমি ভাবতে পারি না ছোটকর্ত্তা!

—সে বার আশ্বিনের ঝড়ে অনেক নৌকোডুবি হয়। পাবনা থেকে পুজোর বাজার করে আসছেন প্রসন্ন, মাঝপথে ঝড় উঠল। দুটো দিন কোন খবর নেই, পাগলের মতো ঘর-বার করছিল প্রেমদা। সোনাপাতার খালের বাঁকে উৎসুক জনতার এক পাশে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রোদনস্ফীত নয়নে দেখছিল নৌকো আসে কি না আসে। ঘরে ফিরে কেঁদে কেটে উপবাসে থেকে প্রেমদা যখন দিশাহারা, তখন হাসতে হাসতে এলেন প্রসন্ন। বললেন—এত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন? ঘরে যেতে বড়কাকা বললেন—আগে তুমি ঘুরে এস প্রসন্ন। দেখ এখনো আমি পথের কাপড় ছাড়ি নাই।

তাকে উদ্দেশ করে বড়বাড়ীতে কথা হয়েছে। লজ্জায় মাটিতে

মিশে গেল প্রেমদা। তখন তার গা দিয়ে একখানা নতুন কাপড় খুলে ছড়িয়ে দিলেন প্রসন্ন। বললেন—পরে এসো।

কালো ঢাকাই শাড়ী, মাঝখানে রূপোলী জরীর ফুল। এমন একখানা কাপড় ত' প্রেমদার স্বপ্নেও ছিল না। প্রসন্নর অনুরোধে পরে এল তবু। জমকালো আঁচলখানায় মাথা ঢেকে প্রণাম করতে নিচু হচ্ছিল প্রেমদা, হাত ধরে তুললেন। একটু হেসেই বললেন—এমনটি আর কাউকে মানাবে না। ব'লে চেয়ে চেয়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কি কথা যে মনে এল, বললেন না কিছু।

পরে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—কি জান, যাকে এত ভালবাসা যায়, তাকে তুমি মনের মতন করে পাবে না—এ বড় আশ্চর্য বিধান প্রেমদা!

প্রেমদা বলেছিল ছোটকর্ত্তা, তোমার কথা শুনলে বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। কি পাপ করে এসেছিলাম বল, তোমাকে একদিন সেবা করতে পারব না—এ যে আমার কি দুঃখ!

—সত্যি, প্রেমদা?

—সত্যি। তবে কি করবো বল। এ জন্ম এমনিই যাবে। তার কথা শুনে বড় দুঃখ হয়েছিল প্রসন্নর। প্রেমদা তখন বলছিল—এই দেখ, আবার তোমার মনে দুঃখ দিলাম। আমার কপালে ধিক্কার ছোটকর্ত্তা, ও কথা তুমি ভুলে যাও।

—তোমার এ দুঃখ যে আমি দূর করতে পারি না প্রেমদা! আমার হাত-পা বাঁধা। তুমি একটা কিছু চাও প্রেমদা! বল কি দিতে পারি।

তখন কি মনে করে হেসেছিল প্রেমদা। বলেছিল—একটা জিনিষ চাইব, দেবে? এই পায়ে হাত রাখলাম। পা ছুঁয়ে আছি, বল?

—দেব। কি দেব প্রেমদা, গহনা?

—ছি, এত দয়া করেছ তুমি, আমার কোন দুঃখ নেই ছোটকর্ত্তা, গহনা আমি চাই না। আর একটা কথা—

—বল।

ধীরে ধীরে প্রেমদা বলে—দেখ, আমার ত' কোন দুঃখ তুমি রাখনি। কিন্তু আমার সমাজের এই মেয়েরা—চোত-বোশেখে তারা আজও সেই সিংহাসনের বিলে জল সরতে যায়। রাস্তা করে দিয়েছ, হাসপাতাল করে দিয়েছ, পোষ্টাফিস, কোন দুঃখ তুমি রাখনি। এদিকে বুড়োশিবের দীঘিটা হেজে মজে রয়েছে, ওটা তুমি সারিয়ে দাও, মানুষ চিরদিন তোমার নাম করবে। আমার কুয়ো থেকে ওরা সবাই জল নিয়ে যায়। বল, তাতে কি এত বড় মালোপাড়ার জলকষ্ট যায়?

শুনে বড় আনন্দিত হলেন প্রসন্ন। সেই বছরই বুড়োশিবের দীঘি সংস্কার করালেন। চৈত্র-বৈশাখে বিশাল দীঘিতে টলটলে জলে স্নান করে, ঘরে নিয়ে যায়, শুধু মালোরা নয়, জোলা, বাগ্‌দী সবাই বেঁচে গেল। প্রসন্নকে সবাই ধন্য ধন্য করল। সেই সময় প্রসন্ন প্রেমদার হাতে পড়িয়ে দিলেন নারকেলফুল বালা। বললেন—ওরা ত জানে না, এর পেছনে আসল মানুষকে, তাই আমার নামই করছে।

প্রেমদা বলল—যত দিন দীঘিতে জল থাকবে, মানুষ তোমার নাম করবে, সে কত ভাল হ'ল বল তো?

প্রসন্ন কৌতুক ক'রে বললেন, তুমি কাছারীতে গিয়ে দেওয়ানজীকে ত' বুদ্ধি দিতে পার প্রেমদা!

মাঝে মাঝে প্রেমদার অনেক কথাই মনে হ'ত। একদিন বলেছিল—আচ্ছা, পরজন্ম, জন্মান্তরে ফিরে আসা, এ সব সত্যি হয়?

—নিশ্চয় হয়।

—কিন্তু যে যা চায় তা ত পায় না?

—অনেক চাইতে নেই প্রেমদা! আর যদি সত্যি ভক্তি ভরে চাও, ত নিশ্চয় পাবে।

তখন প্রসন্নর পায়ে হাত রেখে প্রেমদা বলেছিল, ছোটকর্ত্তা, তোমার, খোকাবাবুর, সকলের জন্যে ভগবানের কাছে আমি কত প্রার্থনা করি যদি আমার মনে 'কু' না থাকে, তাহ'লে নিশ্চয় আমি পরজন্মে বামুন ঘরে জন্মাব।

সারা দিন কাছারীর কাজকর্ম করেন। সন্ধ্যায় প্রসন্ন গিয়ে বসেন প্রেমদার কাছে। সামান্য একটি জেলের মেয়ের অন্তরে যে এত ঐশ্বর্য থাকতে পারে, যা তাঁর কাঙাল মনকে ভরে দেয় অথচ নিজে ফুরিয়ে যায় না—এই বিস্ময়ই তাঁকে ভরে রেখেছে। প্রেমদার মুখের দিকে চেয়ে যখনই থাকেন, তখন সেই ত্রিশ বছর আগেকার হাস্যমুখী ষোড়শী তরুণীকে ছাড়া আর কাউকে দেখেন না প্রসন্ন। এই এক প্রেম তাঁকে এমন পূর্ণ করে রেখেছে যে আর কি পেলেন না পেলেন, সব ফাঁকিই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে তাঁর কাছে। সমাজ নেই, সংসার নেই, আছে শুধু প্রেমদা।

আবার এক অঘ্রাণ এসেছে। পাকাধান বোঝাই করে পথ দিয়ে গরুর গাড়ী চলেছে সন্ধ্যায়। পরিপূর্ণ একটা প্রশান্তির ভাব চরাচরে ব্যাপ্ত। প্রসন্নর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে প্রেমদা বলল—ছোটকর্ত্তা!

—বল।

—নিবেদন ছিল।

—বল।

—দেখ, পরকালের কথা ত' এত কাল কিছু ভাবলাম না। এখন মনে হয়, যদি একদিন অষ্টপ্রহর নাম-কীর্ত্তন দিতে পারতাম! মনটা জুড়োত।

উঠে বসলেন প্রসন্ন। ঈষৎ হাসি চোখে নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। বললেন—দেখ প্রেমদা! ইহকাল পরকাল যা বল, আমার চোখে তুমিই সব। আমি মনে-প্রাণে জানি আমি পাপ করি নাই, প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা আমি ভাবি না। তবে তুমি যদি শান্তি পাও, তো হোক নাম-গান। সিংহাসন থেকে ডেকে পাঠাই কামিনী বাসিনীকে। নরোত্তমের আখড়া থেকে লোক আসুক।

অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্ত্তনের খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল গ্রাম-সমাজ। কিন্তু সংকীর্ত্তনের স্থান হচ্ছে মালোপাড়া। প্রেমদা হচ্ছে তার প্রধান কর্মকর্ত্রী, এ কথা জেনে ক্ষোভের সীমা রইল না কারও। নতুন করে তাঁরা খেদ করলেন—জাতধর্ম রসাতলে গেল। অনাচার, ঘোর অনাচার করলেন প্রসন্ন। এই কালাপাহাড়ী কাজের জন্য যে তাঁকে অনুশোচনা করতে হবে, সে কথা বলতে কেউ বাকি রাখলেন না।

বৃক্পাতহীন প্রসন্ন। বিশাল সামিয়ানা খাটিয়ে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হলো। মাটি খুঁড়ে বড় বড় উনোন কেটে রান্নার ব্যবস্থা করলো মালোপাড়ার মাতব্বররা। আশ-পাশের গ্রাম থেকে মানুষ এল ভীড় ক'রে। কৈবর্ত্ত, বাগদী ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর জাতির মানুষ গরুর গাড়ী চড়ে, পায়ে হেঁটে ভাগ নিতে এল এই মহোৎসবে। ধূপধুনোর গন্ধে আমোদিত অঙ্গনে যখন সু-স্বরে বোল তুললেন কীর্ত্তনীয়া, রসিক খোলবাজ খোলে চাঁটি মেরে হাঁকিয়ে চলল গান—তখন প্রেমদার আনন্দের সীমা রইল না। প্রসন্নকে বার বার বলল—মহা সুখী আমি। জন্ম আমার সার্থক হলো।

প্রসন্ন নিজে দেখা-শুনা করেন দাঁড়িয়ে থেকে। দিনে তিন-চার বার যাওয়া-আসা করেন। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। তাঁর সমাজের মানুষদের তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা দেখেও দেখেন না তিনি। এমনি করে ঠাণ্ডা লাগল। অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রসন্ন। ডাক্তার দেখে বলল নিউমোনিয়া। অসুখের বাঁকা গতি দেখে ওষুধ আনতে লোক গেল পাবনা। ঢাকাতে এম-এ, পড়ছে সোমনাথ মামাবাড়ীতে থেকে। তাকে তার ক'রে দেওয়া হলো সত্বর আসবার জন্যে। ছোটকর্ত্তার জীবনের আশঙ্কা, এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। একে একে আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী সবাই এসে ভীড় করলেন বাড়ীতে। কেউ জোরে কথা বলেন না। ফিস-ফিস্ করে আলোচনা চলে। হঠাৎ একটা অশুভ ছায়া নেমেছে।

খবর পেয়ে প্রেমদার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। এলেন না যখন ছোটকর্ত্তা, তখন লোক পাঠিয়ে জানল তাঁর গুরুতর অসুখ হয়েছে। শুনে অবধি উদ্বেগের সীমা নেই প্রেমদার। নিজে যেতে পারে না, মানুষের হাতে-পায়ে ধরে এতটুকু খবরের জন্যে।

সোমনাথ এসে পড়লো। ডাক্তার কোন ভরসাই দিতে পারলেন না তাকে। বললেন—নেহাৎ লোহার মতো কাঠামোটা ছিল, তাই এত যুঝতে পারছেন। এখন শুধু ক'টা দিনের ব্যাপার মাত্র। অন্য কাঠামো হলে এত দিনে—

এগারো দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা, যখন অবস্থা খুবই খারাপ, মনে হলো কিছু বলতে চাইছেন প্রসন্ন। সোমনাথ ঝুঁকে পড়ল। বলল—বাবা কিছু বলবেন? প্রসন্ন ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আমার একটা ইচ্ছা আছে।

কি সে ইচ্ছা? মৃত্যুপথযাত্রী পিতার সব ইচ্ছাই পূরণ করতে চায় সোমনাথ। প্রসন্ন বলেন, প্রেমদাকে তুমি ডেকে আন। আমি জানি, সে ব্যস্ত হয়ে আছে। সে না এলে আমি যেতে পারি না সোমনাথ!

বজ্র পড়লেও এতখানি বিস্মিত হতো না মানুষ। তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রসন্ন চৌধুরীর মৃত্যুশয্যায় আসবে জেলের মেয়ে প্রেমদা? মূর্তিমান অনাচার প্রসন্ন চৌধুরী—কোন প্রায়শ্চিত্তেই এ পাপ খণ্ডন হবে না। সোমনাথ বুঝল। পরম শ্রদ্ধায় অবনত হলো তার মন। বলল, আমি নিজে যাচ্ছি বাবা!

ঘর থেকে সরে গেল মানুষ। এপাশে ওপাশে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। দেবতা ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্কারকে রসাতলে দিয়ে কেমন নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করছেন প্রসন্ন চৌধুরী সেই অজাতের মেয়েটার জন্য, তা'ই দেখতে লাগলো তারা দুই চোখ বিস্ফারিত করে।

লোকের মনের অভিশাপের যদি শক্তি থাকতো, তবে সেদিন আকাশ ভেঙে পড়তো প্রেমদার মাথায়। কিন্তু তা হ'লো না। ঋজু ভঙ্গীতে, মাথা উঁচু করে কোন দিকে না তাকিয়ে সোমনাথের পেছন পেছন এলো প্রেমদা ছুটতে ছুটতে। ঘর থেকে কারুকে সরে যেতে বলতে আর হলো না। আগেই সরে গিয়েছে মানুষ।

শূন্যঘরে বাতি জ্বলছে। প্রেমদা ঢুকেই নতজানু হয়ে বসলো মাটিতে, প্রসন্নর পাশে। প্রেমদার দিকে চাইলেন প্রসন্ন।

সব চুপচাপ! তার কিছুক্ষণ বাদেই বেরিয়ে এল প্রেমদা। চোখে জল নেই। কণ্ঠে নেই কান্না। কারো দিকে তাকাল না সে—সোজা দেউড়ী পেরিয়ে নেমে গিয়ে চলে গেল ধানক্ষেত পেরিয়ে সিংহাসনের বিলের দিকে।

অঘ্রাণের আবছা কুয়াশায় তাকে যতক্ষণ দেখা গেল ,চেয়ে রইল সোমনাথ। বুঝতে তার বাকি রইল না—প্রায়শ্চিত্তের বিধান নিয়ে ঘৃত চন্দনকাষ্ঠে ধুমধাম করে যার শেষকৃত্য করতে দিয়ে গেল প্রেমদা, সে শুধু শবদেহ মাত্র। প্রসন্ন চৌধুরীকে সে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল সকলের চোখের ওপর দিয়ে—ঐ সিংহাসনের বিলের ধারে। আর কোন দিন তাদের বিচ্ছেদ হবে না।

ঘুম

লাইলী আশরাফী

অতল ঘুম নেই আমার ব্যথাতুর দুই চোখে
মৃত্যুময় বসতিশূন্য বিবর্ণ পৃথিবীর শোকে,
বিদগ্ধ মরু-সাহারা বুকে কুটিল বিষ-নির্ধ্যাস।

ক্রূর মুহূর্ত্ত-চাপে জীবনে বিকট-ঘোর সন্ত্রাস।
উষ্ণ কামনার বীজে রোপা সাধের দীপ্ত ফসল
হিমসিক্ত তিক্তবাতাসে সহসায় করে টলমল,
কি অসহ জ্বালা! এ ইতিহাস কেমনে রুধি বল?
হায়! গুমরায় প্রাণ নিয়ত অশান্ত শোক-বিহ্বল।

তৃষা মেটে না তবু, হৃদি-সমুদ্রে অফুরান ঢেউ
প্রেম মোছে না, স্বপ্ন-পুষ্প-বনে যাচে ভ্রমর কেউ।
মদির কামনা জাগে ভয়ার্ত্ত চিন্তার রাশ ঠেলে
রঙীন আশার আস্তরণ সাজাই উত্তম মেলে।
আরো সন্নিকটে টানি পৃথিবীকে, বিস্ময়ে তাকাই:
ঘুম নেই, ক্ষোভ নেই তাতে, জীবন-রেণু ছড়াই।

দেশদ্রোহী

শ্রীগণেশচন্দ্র দাস

এবারে ইটালীর মিলান শহরে এসে নামলাম। ভবঘুরে জীবনের কোন অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছি তা জানি না। তবে বাল্যকালে সেই যে দেশভ্রমণের সঙ্গে নৈসর্গিক আনন্দ উপভোগের নেশা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো, আজও যে তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি, তা বেশ অনুধাবন করলাম। মিলানের বিমানপোতে দীর্ঘযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে হোটেলে যাবার জন্য পুনরায় সুদীর্ঘ যাত্রার কষ্টকে ভাগ্যবিড়ম্বিত পুরুষের ওপর অদৃষ্ট-বিধাতাপুরুষের অভিশাপ বলে মেনে নিয়ে কিংস ষ্ট্রীটের ধার নিয়েছি। সত্যই কিংস ষ্ট্রীট রাজারই রাস্তা বটে, শুধু নরনারীই নয়, এখানের গাছপালা থেকে আরম্ভ করে বড় বড় রাজপ্রাসাদগুলো যেন এক রাজকীয় আভিজাত্য ফুটিয়ে রেখেছে। অবিরাম গতিতে নরনারী দল যেন বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে, মাথা উঁচু করে চলেছে। তাদের অঙ্গের আবরণ ও পরিবাস ছাড়া দেহের সুঠাম গঠনভঙ্গি যেন তারাই যে কোন অতীত অজ্ঞাতনামা রাজবংশের বংশধর, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের ভিড়ের মাঝে নিজের শীর্ণাঙ্গ চেহারাটাকে হারিয়ে ফেলেছি, স্বীয় পরিচয় দেবার ইচ্ছা তো আগেই মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

ও দেশীয় ট্যাক্সিজ অর্থাৎ ট্যাক্সি করে যেতে যেতে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ঘটনা সংঘাত সহযোগে পরিপক্ক হয়ে মানসনেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। সেই যে কোন অশুভক্ষণে গুরুজনদের আশীর্বাদ আর প্রিয়জনদের স্নেহ-ভালবাসাকে উপেক্ষা করে, সেই কোন অসম্ভব বস্তুকে পাবার মোহে পৃথিবীর দুর্গম পথে পাড়ি দিয়েছিলাম—আজও যে তার শেষ সীমায় এসে পৌঁছিতে পারিনি, তা বেশ বুঝতে পারছি এখন। যে পরিমাণ অর্থ ও উদ্যম ব্যয় হয়েছে তার জন্য কোন ক্ষোভ নেই। তবে কেবল এই কথাটাই মনে হচ্ছে যে, সেটা যদি শান্তিময় গৃহস্থ-জীবনের পরিবেশকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টায় ব্যয়িত হতো, তা হলে আমিই যে কোন একদিন কলকাতার কোন এক মুক্ত অঙ্গনতলে সাতমহলা বাড়ী হাঁকিয়ে বিজনেস ম্যাগনেট হয়ে না বসতে পারতুম, তাই বা কে জোর করে বলতে পারে? যা হোক, বিচিত্র চিন্তাধারার মধ্যে এতক্ষণে প্যালেস ডি রেষ্টের সামনে এসে থেমেছি। সন্ধ্যা গাঢ়তম হয়ে আসছে, পথের কর্টলাম্বের উদ্দেশ্যে হোটেলের ছোট সুন্দর কামরাটার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি, বাচ্চা বয়টার সঙ্গে কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর কখন যে নিদ্রাদেবীর মায়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, তা মনে নেই।

পরদিন সকাল বেলায় হোটেল ছেড়ে বাইরে যাবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। হোটেলের লম্বা বারান্দা থেকেই মিলান শহরটার নিষ্পলক, নিষ্পন্দ সৌন্দর্য্যটা উপভোগ করছি। ওদেশীয়গণের মনে হলো বিদেশীদের সম্বন্ধে আগ্রহটা খুবই বেশী। আর বোধ হয় সেই বিরাটকায় হোটেলটাতে আমিই একমাত্র ভারতীয় ছিলুম। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আমার দিকে একবার না একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেই। মনে শুধু এই ভয়ই হচ্ছে যে যদি কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তবে নিজেকে কি রূপে রত্নপ্রসবিনী বাঙলা মায়ের সন্তান বলে নিজের পরিচয় দেব? আগেই বলে রাখা দরকার যে আমি ইটালীয়ান ভাষা কিছু কিছু জানতাম—যা ভাবা তাই, শুনতে পেলাম যে একজন যুবক আর একজনকে বলছেন যে ভদ্রলোকটার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর না, অন্যটি বলছে তুমিই বরং কর। নিজের দুর্বলতাটাকে ঢাকা দেবার জন্যে আমিই বরং উপযাচক হয়েই ওদের ভাষায় বললাম যে, কি বলতে চান বলুন না? এবার তাদের মুখে হাসি ফুটলো; বিনয়নম্র ভাবে স্বাগত জানালো তারা। তারপর চলতে লাগলো অজস্র প্রশ্নধারা, কোন উদ্দেশ্যে কত দিন আগে এখানে এসেছেন, শিক্ষাদীক্ষার সীমা কতদূর, নাম কি, বয়সই বা কত, কোন দেশের লোক, জীবন ধারণের বৃত্তিই বা কি? ইত্যাদি আরো কত কি উদ্ভট প্রশ্ন!

তাঁদের পরিচয় লাভ করে বুঝতে পারলাম যে তাঁরা রোমে থাকেন, তবে কার্য্যোপলক্ষে এখানে কিছুদিনের জন্য এসেছেন। আমার পর্য্যটক বৃত্তি জেনে তাঁরা যাবার সময় বার বার করে তাঁদের বাড়ীতে যাবার জন্যে অনুরোধ করে গেলেন। তারপর দিনটা কি ভাবে কেটে গেল জানি না, সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ আগেই ওয়ার মেমোরিয়াল (War Memorial) দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছি। মাঝে মাঝে লোকেদের জায়গাটার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে করতে এতক্ষণে বেশ খানিকটা এসে পড়েছি। সাগ্রহে তাঁরা দেখিয়ে দিচ্ছেন ওয়ার মেমোরিয়াল কোন দিক দিয়ে গেলে কাছে হবে অথবা আর কতদূর আছে। হ্যাঁ এবার তো একেবারেই কাছে এসে পড়েছি, শ্বেতমর্ম্মরে খচিত সমাধিগুলো চোখের সামনে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। ওয়ার মেমোরিয়ালের ভেতর ঢুকে একটির পর একটি সমাধিস্তম্ভ নিরীক্ষণ করে চলেছি, প্রত্যেকটি সমাধির ওপর মৃত সৈনিকের নাম, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ খোদাই করা আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাইবেলের দু'-এক ছত্রও উদ্ধৃত করা হয়েছে।

নিকোলা অরল্যাণ্ডের সমাধিখানাই সবচেয়ে সুন্দর! ইনি ছিলেন বিখ্যাত ইটালীয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ। যিনি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, শেষে রোমের যুদ্ধে ইনি নিহত হন। ওয়ার মেমোরিয়ালের পুরো জায়গাটাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ দ্বারাই অধিকৃত।

সবাই জানেন—
দামের তুলনায় ব্রুক বণ্ড চায়ে অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন
...আর সীল করা পাওয়া যায় ব্রুক বণ্ড চা নির্ভেজাল একেবারে খাঁটি
...আর হপ্তায় ২,১০,০০,০০০ প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চা তৈরী হয়
এই জন্যেই অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে ব্রুক বণ্ড চা বেশী লোকে খান
Brooke Bond Tea
ব্রুক বণ্ড ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
BB 240D
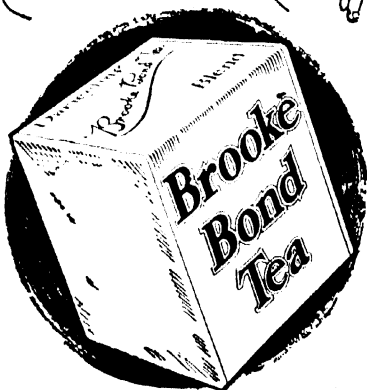
এবারে বাড়ী ফেরবার ইচ্ছায় রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় মনে হলো আমার নাম ধরে যেন কে ডাকলো, ফিরে তাকালাম। কিন্তু কৈ, কেউ তো কোথাও নেই? ভাবলাম রাস্তার ভিড়ে আমার শুনতে হয়তো ভুল হয়েছে। পুনরায় চলতে আরম্ভ করেছি, আবার শুনতে পেলাম যেন কে ডাকছে! ফিরে দাঁড়ালাম। ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বিদেশী আমার দিকে চেয়ে হাসছেন, মাথায় তাঁর একরাশ সোনালী চুল, কোটরগত একজোড়া বিড়ালচক্ষু আর মুখে অদ্ভুত দৃঢ়তার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তিনি আমার কাছে এসে বললেন, শুভসন্ধ্যা, ভাল আছেন তো?

আমি প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তারপর বললাম, ওঃ, মিষ্টার ট্রোপেল আপনি?

তিনি বললেন, এতক্ষণ পরে চিনতে পেরেছেন জেনে যথেষ্ট আনন্দিত হলাম। তিনি বলে চললেন, তা আপনারই বা দোষ কি? প্রায় আট বছর পরে আবার আপনার সাক্ষাৎ পেলাম।

এতক্ষণে মনে পড়লো মিঃ ট্রোপেলের আসল পরিচয়টা। ১৯৪৮ সালে সে বার অলিম্পিক গেমস্ দেখবার জন্যে লণ্ডনে গিয়েছিলাম, মিঃ ইজভ্যাগ ট্রোপেল জার্মাণীর P. O. W. প্রিজনার অফ ওয়ার হয়ে ইংলণ্ডে বহু দিন কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। অবশেষে তিনি বন্দিবিনিময় চুক্তি অনুযায়ী মুক্তি পান। কোন দৈবাৎ ঘটনাক্রমেই বিমানঘাঁটিতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো, তাও মাত্র ঘণ্টা কয়েকের জন্যে। তিনি আমাকে তাঁর সৈনিক-জীবনের কাহিনী সংক্ষেপে শুনিয়েছিলেন এবং প্রতিদানে আমিও তাঁকে আমার ভবঘুরে বৃত্তির কথা জানিয়েছিলাম। এখন বেশ মনে পড়লো যে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, কোথায় গিয়ে বাসা বাঁধবো তা এখনও ঠিক করিনি; তবে এটা ঠিক যে, আমি আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবো না। ভেবে একটু বিস্মিত হলাম যে, এই জার্মাণ সৈনিকটা সুদূর আট বছর পরেও আমাকে চিনতে ভুল করেনি!

মিঃ ট্রোপেল আবার বললেন যে, মিঃ দাস, আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে—কারণ সে বার বিদায় নেবার সময় আপনি জোর দিয়েই বলেছিলেন যে,—এটা ঠিক আমরা শেষবারের মতোমিলিত হচ্ছি না, কোন অদৃষ্ট ঘটনাচক্রে আবার আমরা মিলিত হবো।—সত্যিই তাই হলো। মনে হচ্ছে যে আপনি জ্যোতির্বিদ্যাটা বেশ কিছু আয়ত্ত করে ফেলেছেন।

আমি শুধালাম যে, দুজনেই যখন যাযাবর-শ্রেণীভুক্ত আর দুজনেই যখন একই অথচ বিভিন্নমুখী পথের যাত্রী, তখন যদি পুনরায় আমাদের দেখা না হতো তাহলে পৃথিবী যে গোল তা যে ভুল প্রমাণিত হতো।

হেসে মিঃ ট্রোপেল বললেন, সত্যিই আপনি একজন রসিক।

নানাবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা এতক্ষণে ক্রিস্টাল প্যালেসে এসে পৌছেছি। মিঃ ট্রোপেলের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাব কি, এমন সময় তিনি বলে উঠলেন আমার বাড়ীটা দেখে আসতে চলুন না। এখান থেকে মাত্র দু-চার মিনিটের রাস্তা। সত্যিই প্রসঙ্গটা এতক্ষণ ভুলতে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই একটু অপ্রস্তুত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি আপনি এখানেই স্থায়িভাবে বাস করছেন নাকি?

মিঃ ট্রোপেল বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে এর আগে আমি কিছুদিন প্যারী শহরে ছিলাম, মাত্র চার বছর হলো এখানে এসেছি।

এতক্ষণে আমি মিঃ ট্রোপেলের ছোট্ট সুন্দর বাগান-বাড়ীটার বৈঠকখানায় এসে বসেছি, সামান্য জলযোগে মনোনিবেশ করেছি, এমন সময় ওদিকে প্রচণ্ড ধারায় বৃষ্টি নেমেছে। মিঃ ট্রোপেল হেসে বললেন, বৃষ্টি-দেবতা আজ আপনাকে কিন্তু বন্দী করেছে, আপনার পক্ষে এখন আর যাওয়া সম্ভব হবে না।

আমি বললাম, তা না হয় না-ই হলো, বাকি সময়টার যাতে সদ্ব্যবহার করা যায় তার বন্দোবস্ত করে দিলেই আমি খুসী হবো।

মিঃ ট্রোপেল বললেন, তবে আসুন না, বিলিয়ার্ড, চিস, বা টেবিল-টেনিস খেলি।

আমি বললাম, খেলা-ধুলোটাই এত দিন আমার জীবনে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে, আজ ওতে আমার আসক্তি জন্মেছে। আজ আমি নতুন কিছু পেতেই উৎসুক। আমি আবার বলে চললাম, আপনি আপনার জীবনের তো অনেকটাই সৈনিক ভাবে কাটিয়েছেন—অনেক ভয়াবহ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে জয়লাভ করেছেন, জীবনকে তুচ্ছ করে অনেক রহস্যময় অভিযানে অংশ নিয়েছেন—আজ আপনার সেই উত্তেজনাপূর্ণ জীবনের কোন অভিজ্ঞতা শুনতেই আমি উৎসুক।

মিঃ ট্রোপেল একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, আমার অভিজ্ঞতা কলঙ্কের কালিমায় পরিপূর্ণ, তা আবার নিজের মুখে কাকেও শোনাতে আমার প্রবৃত্তি কোন দিনই হয় নি। আর আজও তাই হচ্ছে না।

একটু বিস্মিত হয়েই বললাম, কাউকে শোনাননি বলেই তো আজ আমাকে শোনাতে হবে।

মিষ্টার ট্রোপেল হেসে বললেন, ভালো-মন্দো লাগার দায়িত্ব আমি কিন্তু নিচ্ছি না। তিনি আরম্ভ করলেন,—আমি তখন নাৎসী-বাহিনীর একজন সামান্য বেতনভোগী সৈনিক, এমন সময় এ্যাডলফ হিটলারের বিকৃত-মস্তিষ্কের হুঙ্কারে বেজে উঠলো সারা পৃথিবীময় দ্বিতীয় মহাসমরের রণ-দামামা। শান্তিময় জীবনযাত্রার পরিবেশের মধ্যে অভিশাপরূপে প্রবাহিত হলো শোণিতের প্লাবনধারা। বিভিন্ন মারণাস্ত্রের সাহায্যে দেশের পর দেশ জয় করে হিটলার তার অসীম সমরপ্রিয়তার পরিচয় দিয়ে তার বজ্রমুষ্টির আঘাতে সারা বিশ্বটাকে ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো করে ফেলছেন। এমন সময় স্থানান্তরিত হলাম আমি পোল্যাণ্ডে নাৎসী-বাহিনীর অভিযানকে সার্থক করে তুলতে। আমি যে রেজিমেণ্টে ছিলাম তাতে ছিল আমার সহপাঠী ও প্রতিবেশী জেক সাইনার। আমি যখন মিউনিক ইউনির্ভাসিটির ছাত্র তখন সাইনার বাবাকে তার খামারের কাজে সাহায্য করতো। বাবা মারা যাবার পর, তার দ্বিতীয় পক্ষের পিতার সঙ্গে তার মতানৈক্য হলো, কিন্তু তার দিদিমার কাতর অনুনয়ে তাকে সংসারে থাকতেই বাধ্য করলো। কিন্তু দিদিমা তার যেদিন বিধির নির্মম ডাকে সাড়া দিলো সেদিন থেকে যে গৃহত্যাগী ও গ্রামত্যাগী হয়ে

সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করলো—বোধ হয় তা জার্ম্মাণীর সমৃদ্ধির ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন ঘটাতে।

আমি আর সাইনার প্রায় একই সময় সৈন্যবাহিনীতে ঢুকেছিলাম, যদিও শৈশব থেকেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় তবুও সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতাটা হয় নি। কারণ তার স্বল্পভাষী তার অভ্যাসটা আমার মোটেই ভালো লাগতো না; তা ছাড়া সে মোটেই মিশুকে ছিলো না। হ্যাঁ যা বললাম নাৎসীবাহিনী পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে জয়লাভ করলো। যুদ্ধে আমাদের রেজিমেণ্টের অনেক লোকক্ষয় হয়েছিলো, তাই নূতন সৈন্যদল দিয়ে সেই ক্ষতি পূরণ করা হলো। এবারে আমরা মস্কো অবরোধ কার্য্যে ব্যাপৃত হলাম. সাইনারও ছিল আমাদের মধ্যে। একদিন সাইনার ও সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে বেশ খানিকটা মতানৈক্য হয়েছিলো, কারণ সৈনিকদের নিয়মিত কর্ত্তব্যপালনে সে অসম্মতি প্রকাশ করেছিলো। এর পরে একবার রাশিয়ান সিক্রেট গার্ডের নিকট থেকে সাইনারের নামে প্রেরিত একখানি চিঠি আমার হস্তগত হয়েছিল। জার্ম্মাণ ভাষায় চিঠিটা লেখা হয়েছিল বলে তার পাঠোদ্ধার আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল—তাতে স্পষ্টভাবে লেখা ছিলো যে—সাইনার যদি নিজ সৈন্যদল ত্যাগ করে রুশবাহিনীতে যোগদান করে, তবে সে জীবনকে সার্থক করে তোলবার সব রকম উপকরণই পাবে। তার জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে রুশিয়া সম্পূর্ণরূপেই রাজী আছে. সে যদি হিটলারের দর্পচূর্ণ করবার কার্য্যে সহায়তা করতে পারে তবে সে সৈন্যাধ্যক্ষ, এমন কি তার চেয়েও অধিক সম্মানযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে।

ভাবলাম যে, সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ার সুযোগ নিয়েই রুশ বাহিনী এ কাজ করেছে। তার পর সাইনারের সঙ্গে সৈন্যাধ্যক্ষের আর একবার ঝগড়া হয়েছিলো—একটা রেজিমেণ্টের অধিনায়ক, তার ক্ষমতা কতটা তা আপনি অনুমান করতেই পারছেন। কিন্তু সাইনার তার সঙ্গে যে ভাবে কথা বলছিলো তা থেকেই মনে হচ্ছিলো যে, তাকে কোন একটা বড় শক্তি সমর্থন করছে। যাই হোক যেদিন আমি সাইনারকে এক জঙ্গলের ঝোপের পাশে রুশ-গুপ্তচরদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলাম, সেদিন আমার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, সে যে কোন আত্মঘাতী কাজে নির্লিপ্তভাবে যোগদান করবে তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি। যাই হোক, প্রায় ত্রিশ বছরের বন্ধুত্ব খণ্ডন করে আমি সৈন্যাধ্যক্ষকে সাইনারের কথা জানিয়ে দিলাম।

সে যখন শিবিরে ফিরলো তখন প্রায় রাত্রি দশটা হবে। ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করে সৈন্যাধ্যক্ষ আদেশ করলেন যে, এই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ বিশ্বাসঘাতকটার জীবনের অবসান যেন কাল প্রত্যূষের আগেই করা হয়। সাইনার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করে বললো যে, তার এত ক্ষমতা আছে যে যার বিরুদ্ধে এই রেজিমেণ্টের শক্তি এমন কি হিটলারের সমগ্র বাহিনীর শক্তিও নিতান্ত নগণ্য। সে আমাকে শয়তানী দৃষ্টিভঙ্গিতে শাসিয়ে বললো যে তোমাকে আমি একদিন নারকীয় মৃত্যুর আস্বাদ দেব। বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছিলো যে তার এই অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। যা হোক, তার বজ্রমুষ্টির হুমকি সেদিন আমাদের হাসির মাত্রাকে কেবল বাড়িয়েই দিয়েছিলো। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র সৈনিকটার আত্মমর্য্যাদা যে একদিন একটা সুবিশাল জাতির পতন ডেকে আনবে, তা সেদিন কল্পনাও করতে পারি নি।

সেদিন মধ্য রাত্রে রুশ বাহিনী আমাদের শিবির অতর্কিতে আক্রমণ করলো, আমরা এই দমকা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তা ছাড়া তাদের অবিরল গোলাবৃষ্টির মাঝে আমাদের রক্ষাব্যূহ ভেঙ্গে পড়েছিলো। রাত্রের আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলাম যে সাইনার দুজন রুশ সৈন্যের সাহায্যে শিবির ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, মুখে তার ফুটে উঠেছে আনন্দের উজ্জ্বল হাসি। তাকে বাধা দেবার মতো শক্তি আমার ছিল না; কারণ সেই যুদ্ধে আমি সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছিলাম। এই ভাবে সাইনার রুশ দলে যোগদান করলো।

তারপর আপনি তো জানেন, কি ভাবে হিটলারের রুশ অভিযান ব্যর্থ হলো। এবারে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের পালা। যে ক্ষমতালিপ্সা হিটলারকে বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিতে প্ররোচিত করেছিলো আজ তা শেষে তাকে প্রতারিত করলো। যে জার্ম্মাণ বাহিনী এতদিন বিদেশী বাহিনীর শক্তি খর্ব্ব করছিলো, আজ সে তার নিজের মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমি বার্লিন অবরোধের কথা বলছি—আজ প্রত্যেকটি নাগরিক—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেশকে রক্ষা করতে দৃঢ়সংকল্প। আমি ওদিকে রুশ সীমানা থেকে ইতিমধ্যে বার্লিনে ফিরে এসেছিলাম—সামান্য একটা সৈন্যদলের পরিচালন ভারও আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। হিটলারের সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিলো। প্রত্যেকটি যুদ্ধে পরাজয় ব্যতীত হতাহতের সংখ্যা এত বেশী হচ্ছিলো যে তা কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া রুশ বাহিনীর গেরিলা যুদ্ধে হিটলারের কঠিনতম রক্ষাব্যূহও ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো। একদিন দেখা গেলো, ষ্ট্রাসবার্গ বর্ডারে তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় যে চার শত জার্ম্মাণ সৈনিকের সমাগম করা হয়েছিলো তার কোন রকমই হদিস পাওয়া গেল না, এর পর থেকে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠলো।

কোন এমন অদ্ভুত বিচারশক্তি-সম্পন্ন সৈন্যাধ্যক্ষ এই অভিযানের পরিচালনা করছে, যার বিরুদ্ধে হিটলারের কূটবুদ্ধি টিকতে পারছে না? মনে হলো জার্ম্মাণীর সব কিছু গোপনীয় তথ্যই তার নখদর্পণে। একবার রুশ গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বিপক্ষ দলের কয়েক জনকে বন্দী করেছিলাম, তাদের প্রত্যেকের ইউনিফরমের মাঝে স্পষ্টভাবে জে, এফ অক্ষরগুলি লেখা ছিলো। বলা বাহুল্য, তাদের থেকে কোনই গভীর রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে পারি নি। তবে বন্দীদের মধ্যে থেকেই একজন হেসে বলেছিলো তোমাদের দেশেও যে black sheep on a good herd আছে তা আমার অজানা ছিলো। বাস, এই পর্য্যন্তই সে বলেছিলো।

এর পর নিজ জীবন তুচ্ছ করে একবার ছদ্মবেশে রুশ সৈন্যদলে প্রবেশ করেছিলাম, তাদের ভেতরের খবর কিছু জেনে নেবার জন্যে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারি নি। রাশিয়ান সিক্রেট গার্ডের ব্যাঘ্রতুল্য প্রতাপশালী কুকুরগুলো আমার সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিলো। আমাকে ভালভাবে শিকল দিয়ে বেঁধে সেই রাত্রের মতো এক গভীর অন্ধকূপে ফেলে রাখা হলো। সকাল বেলায় প্রায় দশটার সময় আমাকে রুশ কর্ণেলের সামনে উপস্থিত করা হলো। আবছা আলোর মধ্যে কর্ণেলের দৈত্যাকার

মূর্ত্তিটাকে প্রেতমূর্ত্তি বলে মনে হচ্ছিলো, তার মাথার টুপিটা, আর গোঁফের ঝোড়াটা তার মুখটাকে অস্পষ্ট করে তুলেছিলো।

তিনি প্রথমে বললেন, তুমিই কি সেই কোজীব্যাডেন জেলার অধিবাসী ইজন্যাগ স্টোপেল ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তুমি কি মিউনিচ ইউনির্ভাসিটির ছাত্র ছিলে আর আমার মনে হয় তুমি বোধ হয় প্রায় বার বছর আগে জার্ম্মাণ সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করেছো ?

আমি পুনরায় বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি আবার বললেন, আমি জানতে পারলাম যে তোমার অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী ও সৈনিক জীবনের একজন বন্ধু নাৎসী সৈন্যদল ত্যাগ করে রুশ বাহিনীতে যোগদান করেছে ? তার কারণটা কি জানতে পারি ?

আমি একটু স্তম্ভিত হয়ে বললাম, আপনি তো আমার জীবনের সব কিছুই জানেন দেখতে পাচ্ছি, এখন আমার উত্তরের কোন প্রয়োজন আছে কি ?

চকিতে তিনি তাঁর মাথার টুপি আর গোঁফের ঝোড়া অপসারণ করে বিকট চিৎকার করে বললেন, নিশ্চয় তার প্রয়োজনীয়তা আছে জোসেফ সাইনারের কাছে। শয়তান ষ্টোপেলের কাছ থেকে সাইনারের দেশদ্রোহিতার কারণ আমি জানতে চাই। তিনি ক্রূর শয়তানী হাসি হেসে বললেন—বর্ব্বর স্টোপেল তুমি আজ আমার হাতের মুঠোয়, এক ইঙ্গিতে আমি তোমার তুচ্ছ জীবনের অবসান ঘটাতে পারি। প্রতিশোধের নেশা এতদিন আমাকে উন্মত্ত করে রেখেছিলো—তোমায় পৈশাচিক দণ্ডে দণ্ডিত করে আমি আজ খানিকটা আনন্দ পাব। আর সেই দিনই আমি পূর্ণ শান্তি পাব যেদিন হিটলারের বার্লিন রুশকবলভুক্ত হবে।···

তারপর আবার আমাকে সেই অন্ধকূপে নিয়ে যাওয়া হলো। জানতে পেরেছিলাম তিন দিনের মধ্যেই আমাকে সাইবেরিয়ার তুষার মরুভূমিতে নির্ব্বাসিত করা হবে। সাইবেরিয়ার তুষার মরুভূমির নির্ব্বাসন যে লোমহর্ষক বীভৎস হত্যাকাণ্ডের চেয়েও জঘন্য, তা আমি জানতাম—কিন্তু তাতেও আমি বিচলিত হইনি। কারণ তখন আমি শুধু এই কথাই ভাবছিলাম যে দেশমাতার সন্তান কি নিজের দেশের বিরুদ্ধে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত থাকতে পারে ? এতক্ষণে বুঝতে পারলাম জে, এফ কথাটার অর্থ। এর পর একদিন কোন দয়ালু প্রহরীর দুর্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নিয়েই আমি রুশ-শিবির ত্যাগ করে পুনরায় বার্লিনে ফিরে এসেছিলাম।

এবারে জার্ম্মাণ জাতির ভাগ্যে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ নেমে এলো—এবারে বার্লিনের শেষরক্ষার পালা—মাসের পর মাস বার্লিন অবরুদ্ধ থাকায় আমাদের সব রসদ ফুরিয়ে গেল। দুর্নিবার গতিতে রুশ বাহিনী ঢুকে পড়তে লাগলো বিভিন্ন স্রোতে। রাজপথে বেরিয়ে এলো পিতা-মাতা, ভগিনী-ভ্রাতা, জায়া-পতি প্রাণপণ করে তাদের প্রিয় জন্মস্থান বার্লিন শহরকে রক্ষা করতে। ওদিকে জোসেফ সাইনার এক বিরাট সশস্ত্র রুশ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিজ মাতৃভূমিকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। স্বল্প সংখ্যক অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে তার প্রতিরোধের চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু হায়, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। অবিরল গোলাবর্ষণের সামনে আমাদের সব রক্ষাব্যূহই ভেসে গেল। রাস্তার দুধারে জমা হতে লাগলো স্তূপাকারে দেশীয় বীরদের মৃতদেহ। এই ভাবে বার্লিনের পতনের মধ্যে দিয়েই অমর হয়ে রইলো দেশের বীর সন্তানদের আত্মবলিদান। রুশ বাহিনীর বিজয় উল্লাসে চাপা পড়ে গেলো পতনোন্মুখ জার্ম্মাণ জাতির হাহাকার। আর রুশ-বাহিনীর মুহুর্মুহু করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে জেফ সাইনার বার্লিন মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংয়ের জাতীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত করে ধীরে ধীরে উত্তোলিত করছে জাতীয় রুশ পতাকা—মুখে তার ফুটে উঠেছে বিকট অট্টহাসি। সে যেন বলছে—সে বিশ্বাসঘাতক, আর বিশ্বাসঘাতক এই ভাবেই প্রতিশোধ নেয়। বলতে বলতে অস্বাভাবিক ভাবে গম্ভীর হয়ে এলো মিঃ ষ্টোপেলের মুখখানা।···

কখন, কি ভাবে, কি পরিস্থিতির মধ্যে মিঃ ষ্টোপেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি ঠিক তা মনে পড়ছে না, গভীর অন্ধকার ভেদ করে গাড়ী হোটেলের দিকে ছুটে চলেছে। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের দিকে চেয়ে মনে হলো যে, সমৃদ্ধিশালী জার্ম্মাণ জাতির ভাগ্যে এই রকমই নিরাশার গভীর অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছিলো তারই একজন বিশ্বাসঘাতক সৈনিক।

মুহূর্ত্তে মনে পড়ে গেল, এ দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়, আমিও তো সেই বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের দেশের লোক। যে নিজের হাতে বাংলা মায়ের বোমল করে পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিলো। যুগে যুগে দেশদ্রোহীর দল সাধারণ মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতায় উন্মত্ত হয়ে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে সমগ্র বিশ্বের মানব জাতিকে। তা না হলে কি তাদের জীবনের কোন সার্থকতা আছে ?···

দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে। জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া, দলিয়া, চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

অপরূপা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

ছবি,—মাত্র তিনখানি ছবি।

সর্বেশ্বরের পূজার ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে মণীশ। সম্পূর্ণ নূতন জগৎ তার সামনে। ছেলেবেলা থেকে যা দেখে আসছে, এখানে তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ঠাকুর-দেবতা কিংবা ঘট-ঘড়া কোশাকুশী কোন কিছুই নেই। শুধু বেদীর উপর তিনখানি ছবি।

একখানা ছবি ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের। অন্য দুইখানি ছবির কোন মূর্তিই তার পরিচিত নয়; পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছেন এক জটাজুটধারী ঋষি। আর একখানিতে দেখা যায় হোমাগ্নির সামনে দু'জন ঋষি,—ছবির বিষয়বস্তু মণীশের অজ্ঞাত।

মাটির ঘর। লালমাটির মেঝের উপর সাদা ধবধবে বেদী। তার উপর পাশাপাশি ছবিগুলি সাজানো। পূজার কোন উপকরণ নেই। সামনে পাতা রয়েছে একখানি আসন,—কালো হরিণের চামড়া।

এরই উপরে বসে প্রার্থনা করেন সর্বেশ্বর। শুধু প্রার্থনা নয়, পাহাড়ীদের উপদেশ দেন তিনি। ঠিক ঠিক উপদেশ বলা চলে না; বক্তৃতা দেন সর্বেশ্বর। কখন কখন বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকেন ধ্যানস্থ হয়ে।

সুজাতার সঙ্গে ঘরে ঢুকল মণীশ। সর্বেশ্বরের মুখে প্রশান্ত হাসি। সুরথের শোকে সর্বেশ্বরের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না বুঝা যায় না। শুধু আরো একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছেন তিনি। আবেগ ঝরে পড়ে তাঁর কথাবার্তায়।

সুজাতা এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। সর্বেশ্বর বললেন, ঐ দেখো মণীশ, মহামুনি অগস্ত্যের ছবি। বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করে চলেছেন তিনি। এক হাতে ত্রিশূল, আর এক হাতে কমণ্ডলু; কি দীপ্ত মূর্তি তাঁর! ব্রাহ্মণ্যগর্ব আর ক্ষাত্রতেজের পাঁচিল এই বিন্ধ্য; আকাশ ছুঁয়ে আর্য-সভ্যতাকে উত্তরাপথে আটকে রেখেছিল। তেজোদীপ্ত কটিবস্ত্রধারী ব্রাহ্মণ তার মাথা চিরদিনের মত নত করে দিয়ে চলে গেলেন। অমৃতের বাণী শোনাতে গেলেন তিনি। কে তাঁর গতি রোধ করে? অমৃতের পুত্রদের খোঁজে চললেন তিনি। একা সম্পূর্ণ একাকী; কোথায় গেলেন, কেউ জানল না। সাগরও লঙ্ঘন করলেন তিনি। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে কমণ্ডলুবারি ছিটিয়ে গেলেন অগস্ত্য।

তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিল উত্তরাপথ; কিন্তু খুঁজে পায়নি। হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। ব্যর্থ হয়েছে সে সন্ধান; অবশ্য পেয়েছে তাঁকে কিন্তু নর-মূর্তিতে নয়; অমৃত-মূর্তিতে দেবতা হয়ে উঠেছেন অগস্ত্য। উত্তরাপথের আর্যসন্তান বিন্ধ্য লঙ্ঘন করে দক্ষিণাপথে অগস্ত্যকে খুঁজতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছে। মঠ-মন্দির আর দেবমূর্তিতে ছেয়ে গেছে দক্ষিণ-ভারত; সাগর-সৈকতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হিমালয়-দুহিতা পার্বতী কন্যাকুমারী।

উত্তরাপথের গর্বোন্নত মস্তক লুটিয়ে পড়ল কন্যাকুমারীর পায়ে। তবু তাঁদের আভিজাত্যের বৃথা দম্ভ কাটল না; সারা ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে পার্বতীর সন্তানেরা,—তাঁদের কোল দিল মা পার্বতীর ভক্ত উত্তরাপথ। অগস্ত্যের অভিশাপ,—মাথা নত করে থাকতে হবে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয় মণীশ; মাঝে মাঝে সুজাতার মুখের দিকে তাকায়। সুজাতা যেন ধ্যানমগ্না। সর্বেশ্বর বলতে লাগলেন, বুঝলে মণীশ, আমরা তারই ফল ভোগ করছি। কমণ্ডলুর জলের কি শক্তি আমরা ভুলে গেছি? অমৃত ছিল কমণ্ডলু-বারিতে। ভারতের ব্রাহ্মণ সেই কমণ্ডলু হারিয়েছে। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরীতে শত শত বৎসর স্নান করলেও আমাদের পাপ ধুয়ে মুছে যাবে না। আবার চাই কৌপীনধারী মানবপ্রেমী সাধক। সেদিন হয়ত আবার আসবে মণীশ, সেদিন আবার আসবে।

নূতন কথা শুনে মণীশ। এমন করে কেউ কোন দিন অগস্ত্যের কথা বলেনি। ইতিহাসে অগস্ত্যের নাম আছে। এত কথা কোন দিন ভাবেওনি সে। শুধু জানে, ভাদ্রের পয়লা তারিখে দূরে কোথাও যেতে নাই; অগস্ত্যযাত্রা হয়। পিসীমা বলেছেন,—অগস্ত্য না কি ঐ দিন যাত্রা করে আর বাড়ি ফিরে আসেন নি; তাই এদিনটা অভিশপ্ত। বাড়িতে আর ফিরে আসা যাবে না, এই ভয়টাই মণীশের ছিল বেশী।

ছবিতে অগস্ত্যের তেজোদীপ্ত মূর্তি বড় সুন্দর লাগল। উন্নত ললাট, প্রশান্ত মুখ, মস্তকে জটার বেণীচূড়া। তাঁর পায়ের তলায় বিন্ধ্যাচল। পিছনে উত্তর-ভারত হাহাকার করছে; কেউ বাধা দিতে পারলে না। সামনে দাঁড়িয়েছিল বিন্ধ্যাচল। সে-ও মাথা নত করল। বিন্ধ্যবাসিনী অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করলেন; অগস্ত্যযাত্রা সুরু হ'ল।

মণীশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনে সে-সব কথা। কে এই সর্বেশ্বর মাষ্টার! তাহলে যে সকলে বলে সর্বেশ্বর ম্লেচ্ছ? জাত মানে না, ধর্ম মানে না? কিছুই মানে না এই সর্বেশ্বর মাষ্টার! ইংরেজী বই পড়ে ওঁর মাথা বিগড়ে গেছে! সংশয়-দোলার দোলে মণীশের মন।

পার্বতীর পুত্র কা'রা? এই পাহাড়ীরা। উত্তর-ভারত এদের অবহেলা করেছে। ইতিহাসে আছে, আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাদের বশ্যতা যারা স্বীকার করেনি, তারাই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। দাসত্ব স্বীকার করে নি তারা। কিন্তু এরা কি মণীশের সগোত্র? এরাও কি মণীশের মতই একই মানুষ? এদের আকৃতি-প্রকৃতি দেখে ত তা মনে হয় না?

সর্বেশ্বর মাষ্টার বলেন,—এরাও তোমার আমার মত মানুষ

মণীশ! কোন তফাৎ নেই; আর্য, অনার্য, ইংরেজ, জাপানী ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন ধরণের মানুষ। মূলে তারা এক; সকলেই সেই অমৃতের সন্তান। তফাৎ আজ যা দেখছ, একশো বছর পরে সে তফাৎটাও চোখে পড়বে না।

বাতাসীমণিকে দেখে কিছু বুঝতে পার মণীশ?—হঠাৎ প্রশ্ন করলেন সর্বেশ্বর।

সুজাতার মুখে কৌতুকের হাসি। মণীশ কোন উত্তর দিতে পারে না। সর্বেশ্বর বললেন,—না, কিছুই বুঝতে পারবে না। মা, পিসীমা, কিংবা মাসীমার সঙ্গে তার কি কোন তফাৎ আছে? কিছুই নেই। সাহেবের মেয়েও বাঙালী মেয়ে হ'য়ে উঠে মণীশ!

কথাটা উচ্চারণ করেই চমকে উঠলেন সর্বেশ্বর। সুজাতার মুখের দিকে তিনি আর তাকাতে পারলেন না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, বলছিলাম খাঁটি ইংরেজের মেয়েও বাঙালী মায়ের ঘরে পড়লে বাঙালী হয়ে যায়।

সর্বেশ্বরের মুখে আবার প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। তিনি এবার বললেন,—এই দেখো ঋষি বশিষ্ঠের ছবি। আর্যভারতের প্রতীক, বেদ উপনিষদ ব্রহ্মবাদের মূর্তিমান আদর্শ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। ঐ দেখ, সামনে তাঁর হোমাগ্নি জ্বলছে; বশিষ্ঠমেধ যজ্ঞের পুরোহিত হয়েছেন নিজে বশিষ্ঠ। ত্রিভুবন খুঁজে বিশ্বামিত্র এ যজ্ঞের পুরোহিত পেলে না; কেউ রাজি হল না। এরকম যজ্ঞ কে করবে? বিশ্বামিত্র ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। ধিকিধিকি প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছেন বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠের সর্বনাশ করেছেন; একে একে বশিষ্ঠের পুত্রেরা মরেছে বিশ্বামিত্রের প্রতিহিংসার আগুনে। তপোবলে নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছেন বিশ্বামিত্র, তবু কেউ স্বীকৃতি দেয় না। তবুও তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন না; ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারলেন না রাজর্ষি বিশ্বামিত্র। ঋষি-সমাজ তাঁর ভয়ে থরহরি কম্পমান। ক্ষাত্রকুলও তাঁর তেজে ম্রিয়মাণ। জ্বলন্ত উল্কার মত অভিশাপের অগ্নি জ্বলে তাঁর চোখে-মুখে; কখন কার উপর পড়ে তার ঠিক নেই।

সর্বেশ্বর আবেগভরে বলতে লাগলেন,—পুরোহিত মিলে না বশিষ্ঠমেধ যজ্ঞের। ব্রহ্মা বললেন, বশিষ্ঠের কাছে যাও, বশিষ্ঠই হবে সে যজ্ঞের পুরোহিত। ব্রহ্মার কথায় বিস্মিত হ'ন বিশ্বামিত্র; মনে তাঁর সংশয় জাগে। বশিষ্ঠ হবে পুরোহিত? জিঘাংসার আগুনে অন্ধ হয়েছেন বিশ্বামিত্র। তাঁর সংকল্প ব্যর্থ হতে পারে না। বশিষ্ঠ বেঁচে থাকতে তাঁর যে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা নেই। তাঁর তপোবল, তাঁর সৃষ্টি, সবই যে ব্যর্থ হতে বসেছে।

হাসিমুখে রাজি হলেন বশিষ্ঠ। তবুও সংশয় জাগে বিশ্বামিত্রের মনে। তাঁর দম্ভের চূড়ায় তখন কম্পন লেগে গেছে। ঐ যে জটাজুটধারী ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। পূর্ণাহুতি হবে; এখুনি বশিষ্ঠের মাথা খসে পড়বে হোমাগ্নিতে। হাত তুলে শেষমন্ত্র উচ্চারণ করছেন বশিষ্ঠ। ঐ যে, ঐ যে তেজোদীপ্ত ঋষি বিশ্বামিত্র। প্রবল ভূমিকম্পে যেন তাঁর দম্ভের চূড়া ভেঙ্গে পড়ল; বিশ্বামিত্র লুটিয়ে পড়লেন বশিষ্ঠের পদতলে,—তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ! আমায় ক্ষমা কর; জানতে চাইনে আমি ব্রহ্মকে, ব্রাহ্মণত্বে আমার প্রয়োজন নেই। তোমাকে জেনেছি আমি, তা-ই আমার গৌরব; আমার সমস্ত তপস্যা আজ সার্থক হ'ল। আমায় ক্ষমা কর।

বশিষ্ঠদেব দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন বিশ্বামিত্রকে। প্রশান্তচিত্তে বললেন, উঠ, উঠ, বিশ্বামিত্র! সত্যই তোমার সাধনা আজ সফল হয়েছে। উঠ, উঠ, ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র!

স্তম্ভিত হলেন বিশ্বামিত্র। তিনি আজ ব্রাহ্মণ; না, না, এ হতে পারে না। অভিভূতের মত বললেন বিশ্বামিত্র,—তুমি আমায় দীক্ষা দাও ব্রাহ্মণ! যে মন্ত্রে শোক, দুঃখ বিচলিত করতে পারে না; যে মন্ত্রে কাম-ক্রোধাদি রিপু মানুষকে পাগল ক'রে তুলতে পারে না। যে মন্ত্রে মানুষ সর্বংসহা ধরিত্রীর মত সবই সয়ে যায়; তবু তার হৃদয়ে প্রশান্তি নষ্ট হয় না। সেই অমৃতমন্ত্র আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই।

বিশ্বামিত্রের কথায় হেসে উঠলেন বশিষ্ঠদেব। প্রশান্ত হাস্যে তাঁকে বললেন,—সে মন্ত্র তুমি পেয়ে গেছো ঋষি! তুমি আজ ব্রাহ্মণ,—ক্ষমাই সেই মহামন্ত্র।

সর্বেশ্বরের মুখেও প্রশান্ত হাসি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা আজ তা স্বীকার করবে না মণীশ! মুখে স্বীকার করলেও কাজে তা করতে পারবে না। তাই ভারতের ঘরে ঘরে জ্বলেছে আজ জিঘাংসার আগুন। বিশ্বামিত্রের মত কঠোর সাধনা চাই; আগে বিশ্বামিত্রের মত গড়ে উঠতে হবে। ভীরুর ধর্ম ক্ষমা নয়। সে ক্ষমা বড় মহান্, তাই বলি আগে গড়ে উঠ, শক্তিমান হও।

আকাশ-পাতাল ভাবে মণীশ। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে এ কি বাণী আজ সে শুনছে! এরকম করে কেউ তাকে কোন দিন বুঝিয়ে বলে নি এ-সব কথা। কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনিতে দেবারতি দেখেছে মণীশ। কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ। মহিষমর্দিনী দুর্গাপূজার আড়ম্বর আজ যেন তার কাছে ম্লান হয়ে উঠে। অশ্বিনী পণ্ডিতের চণ্ডীপাঠ শ্রুতিমধুর হলেও কি উপকার হয় তাতে? দেবী তুষ্ট হ'ন। চণ্ডীপাঠে অমঙ্গল নাশ হয়। মণীশের বাড়িতেও দুর্গানবমীতে চণ্ডীপাঠ হয়, শুদ্ধচিত্তে শুনতে হয় তাহা। যুদ্ধের কাহিনী—চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনী। কি উপকার হয় চণ্ডীপাঠে?

ইক্ষ্বাকুবংশের পুরোহিত বশিষ্ঠ। সেই বশিষ্ঠের এত মহান চরিত্র;—হ্যাঁ, বিশ্বামিত্রের তপোবলের কথা জানে সে। হরিশ্চন্দ্র নাটকের কথা মনে পড়ে যায়। কি নৃশংস ছিল এই বিশ্বামিত্র! আর হরিশ্চন্দ্র? বশিষ্ঠের মতই চরিত্র তাঁর। সেখানেও বিশ্বামিত্রের পরাজয় ঘটল; যাত্রার পালায় দেখা দৃশ্যের পর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর। নূতন ক'রে সব দেখতে শিখল মণীশ।

সুজাতা এবার কথা বললে,—কি ভাবছ মণীশদা'?

মণীশ বললে,—না, কিছুই ভাবছি না। শুধু ভাবছি মাষ্টার মশাই যা বলছেন, তা কি সম্ভব?

সুজাতা বললে,—নিশ্চয়ই সম্ভব হবে মণীশদা'! সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙিয়ে এসে সাহেবরা আজ অগস্ত্যের ব্রত উদ্‌যাপন করছে। নিজেও দেখছি, বাবার মুখেও শুনছি—তারাও পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে; তারাও ছড়িয়ে দিচ্ছে অমৃতমন্ত্র।

সুজাতার কথা শুনে হেসে উঠলেন সর্বেশ্বর। তিনি বললেন, ঠিকই বলেছে সুজাতা। অমৃতমন্ত্র ছড়াচ্ছে ওই মিশনারীরা; দুর্গম পাহাড়ে হিংস্র নরনারী আজ সভ্যভব্য হয়ে উঠছে। কিন্তু এ অমৃতমন্ত্রের দোষ রয়েছে বাবা! সভ্যিকারের অমৃতমন্ত্র নয়

এটা। তারা ছড়াচ্ছে শুক্রাচার্যের সঞ্জীবনী মন্ত্র। যে মন্ত্রে দানবশক্তি জেগে উঠেছিল। যীশুর অমৃতমন্ত্র ওদের হাতে সঞ্জীবনী মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। যে মন্ত্রে জিঘাংসাবৃত্তি জেগে ওঠে মানুষের মনে। সভ্য হয় বটে মানুষ, কিন্তু ভোগের লালসা বেড়ে যায়; সমস্ত পৃথিবীটা ভোগ করতে চায় তারা। স্বর্গও জয় করতে চায়; দেব আর দানবে লড়াই বেধে যায়।

সর্বেশ্বর বলতে লাগলেন,—তাই দেখো, সমস্ত ইউরোপ সভ্যভব্য হয়েও, চূড়ান্ত পার্থিব উন্নতি করেও ক্ষান্ত থাকতে পারছে না। লড়াই করে মরছে; আরো চাই, আরো চাই, বলে হাহাকার উঠছে সারা ইউরোপ জুড়ে। নিজেদের মধ্যেই হানাহানি কাটাকাটি লেগে যাচ্ছে।

মণীশ সর্বেশ্বরের কথা ঠিক বুঝতে পারে না। তার চোখে মহান ব্রতী ঐ মিশনারীরা। মহান কাজ করছে ইংরেজ। দেশে দেশে সভ্যতার আলোক ছড়াচ্ছে,—রেল, ষ্টীমার, হাওয়াগাড়ি, টেলিগ্রাম কত কি?

সুজাতা বললে,—তুমিই বলেছ বাবা! এ হানাহানি একদিন শেষ হয়ে যাবে। মানুষ জেগে উঠবে যেদিন, সেদিন মানুষের বুকে মানুষ ছুরি চালাতে পারবে না।

হাসিমুখে জবাব দেন সর্বেশ্বর,—না পারবে না। কিন্তু সঞ্জীবনী মন্ত্রকে অমৃতমন্ত্রে রূপান্বিত করতে হবে। তা না হলে সবই পণ্ড হয়ে যাবে মা! ওই সব মূঢ় মূকদের মুখে শুধু ভাষা দিলে চলবে না, তাদের ভেতরকার মানুষকেও ভাষা দিতে হবে; সেই মানুষকে জাগিয়ে দিতে হবে। তপোবলে অসাধ্য সাধনকারী বিশ্বমিত্রের অন্তর-পুরুষ ব্রাহ্মণ জেগে উঠবে একদিন। বুঝবে, এখন তোমরা বুঝতে পারবে না। সেদিন আসবে। শুধু স্কুলের লেখাপড়ায় কিছুই হবে না; তাতে দানবই জাগবে, মানব জেগে উঠবে না।

মণীশ বলে,—তাহলে স্কুলে লেখাপড়ার কি কোন মূল্য নেই মাষ্টারমশাই?

সর্বেশ্বর বললেন,—নিশ্চয়ই আছে। ভোগের জন্যেই এ পৃথিবী। দানব না জাগলে মানব জাগতে পারে না। কিন্তু মানবকে জাগাবার স্কুল যে নেই! সে রকম শিক্ষকই যে নেই। ঐ যে, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি দেখছ; মৃত্যুর বিভীষিকা নেই তাঁর মুখে। ভাব দেখি, কি না অত্যাচার করে মেরেছে তাঁকে। তবু অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করেন নি তিনি। নিজেই অনুতপ্ত হয়েছেন। নিজেই অপরাধীদের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন জগৎ-পিতার কাছে,—পিতঃ, এরা না বুঝে এ সব করছে, এদের ক্ষমা করো।

ছলছলে চোখে হাত জোড় করে দাঁড়াল সুজাতা। সর্বেশ্বরও প্রার্থনার সুরে বলতে লাগলেন,—ক্ষমা করো, ক্ষমা করো এদের। এরা না বুঝে অপরাধ করছে। এদের বুঝবার শক্তি দাও ভগবান। অমৃত ছিটিয়ে দাও এদের উপর। মানুষের অন্তর-পুরুষ জেগে উঠুক। হে মহান্ পিতা, মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শিখুক; রেষারেষি দূর হোক্। এই সব তরুণ তোমার সেই মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করুক। তাদের শক্তি দাও।

মণীশও সুজাতার দেখাদেখি হাত জোড় করে দাঁড়াল। সর্বেশ্বর বললেন,—তোমার কাছে সবই নূতন ঠেকবে মণীশ! এখানে দেবতার স্থান নেই। আমাদের প্রার্থনা সেই মহান্ আদর্শের কাছে; সেই আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে তুমি?

—হাঁ পারব। নিশ্চয়ই পারব মাষ্টারমশাই!

—বাধা আসবে বাবা! প্রবল বাধা আসবে। যে আবহাওয়ায় তুমি মানুষ হয়েছ, জন্মগত যে গণ্ডী তোমায় বেঁধে রেখেছে, সে গণ্ডী কি তুমি লঙ্ঘন করতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারব। দৃঢ়কণ্ঠে মণীশ উত্তর দেয়।

হাসি ফুটে উঠল সর্বেশ্বরের মুখে। তিনি বললেন,—বাধা আছে বাবা! সৃষ্টিছাড়া সর্বেশ্বর মাষ্টারের ফাঁদে পা দিলে কেউ তোমায় ক্ষমা করবে না। তোমায় দেখে সুরথকে ভুলতে চেষ্টা করছি। কিন্তু না, সে হয় না। তুমি তোমার আপনজনকে ছাড়তে পারবে না বাবা!

মণীশ সর্বেশ্বরের কথায় চিন্তাকুল হয়। কি বাধা থাকতে পারে তার এখানে আসার? ভেবেই পায় না সে, আপন জনকে ছাড়তে হবে কেন? সর্বেশ্বরও রাজদ্রোহী নন, যে বাবার চাকরী যাবে? হেঁয়ালির মত ঠেকে সর্বেশ্বরের কথা।

সুজাতার চোখে-মুখেও করুণ আকুতি। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণ। রূপ পালটাচ্ছে পৃথিবী; দখিণা বাতাস প্রাণজাগানো মন্ত্রে রূপ পালটে দিচ্ছে বন-বনানীর। সুজাতাও অপরূপা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের সামনে। নূতন দৃষ্টি পেয়েছে মণীশ। অগস্ত্যের মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করছেন অগস্ত্য। [ক্রমশঃ।

ডক্টর নবগোপাল দাস, আই, সি, এস

[১৯৪২-৫২ সালের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু এটা হচ্ছে নিছক উপন্যাস, ইতিহাস বা জীবন-কাহিনী নয়। এর মধ্যে যে-সব চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে জীবিত বা মৃত কোন লোকেরই সাদৃশ্য নেই। —লেখক]

প্রথম পর্ব

এক

হঠ, যাও—হঠ, যাও—পালাও—পালাও—পুলিশ আসছে—

চার দিকে অস্বাভাবিক একটা কোলাহল, আর অগুণতি পথচারী, মেয়ে এবং পুরুষ' উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায়, যেন প্রকাণ্ড একটা বিভীষিকার তাড়নায়।

রসা রোড এবং রাসবিহারী এভিন্যুর সংযোগস্থল। প্রদীপ তখন সবেমাত্র ট্রাম থেকে নেমেছে।

পলায়মান একটি ছেলেকে সে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে হে? ছুটছ কেন?

কংগ্রেসী দু'-তিনজন ভলা‌ণ্টিয়ার নিশান উঁচিয়ে পুলিশদের কি যেন বলেছিল, পুলিশ তাদের পেছনে ছুটছে, ভলাণ্টিয়াররা ত কোথায় ভীড়ের মধ্যে মিশে গেছে, এখন যাকে সন্দেহ হবে তাকেই জেলে পুরবে, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন না, মশায়, এখখুনি কোন দোকানে ঢুকে পড়ুন। বলতে বলতে ছেলেটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কোলাহলমুখর জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়ল কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

প্রদীপ কিন্তু ছেলেটির উপদেশ শুনল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

অনতিবিলম্বে লরীবোঝাই সশস্ত্র একদল পুলিশ এসে তার সামনে থামল। একজন লালমুখো সার্জ্জেন্ট লাফিয়ে নেমে পড়ল, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নাম্‌ল আরও তিন-চার জন পুলিশ।

সাম্‌নে প্রদীপকে দেখেই সার্জ্জেণ্টটি হুঙ্কার দিয়ে প্রশ্ন করল, ট্যুম্ নিশান দেখায়া? সাচ্ বাট্ ব'লো—Otherwise the consequence won't be very pleasant—

মৃদু হেসে প্রদীপ বাংলায় জবাব দিল, সার্জ্জেণ্ট-সাহেব, সত্যি কথা বলব নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি তুমি? নিশান আমি দেখাইনি, তবে প্রয়োজন হ'লে দেখাতে আমি পেছপা হ'ব না।

রাগে মুখ আরও লাল করে সার্জ্জেণ্ট বলল, ওঃ, টামাসা হচ্ছে! I am asking you for the last time; have you or have you not insulted the members of His Majesty's Forces?

—বলেছি ত সার্জ্জেণ্ট-সাহেব, নিশান আমি দেখাইনি! কিন্তু নিশানের ওপর এত রাগ কেন? নিশান ত বন্দুকও নয়, বোমাও নয়!

—Shut up, you b-d! চীৎকার করে উঠল সার্জ্জেণ্ট।

—মুখ সামলে কথা ব'লো, সার্জ্জেণ্ট-সাহেব। প্রদীপও সমান ওজনে চেঁচিয়ে উঠল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সঙ্গের দু'জন পুলিশের লাঠির প্রহার পড়ল প্রদীপের হাঁটু এবং বুকের উপর। অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে সে ফুটপাতের উপর পড়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরে সে যখন তার চেতনা ফিরে পেল, দেখল তার চার দিকে ছোটখাট একটা ভীড় জমে উঠেছে। পার্শ্বস্থ দোকানীটি এবং আরও একজন ভদ্রলোক তার চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিচ্ছে। সার্জ্জেণ্ট বা পুলিশ বা তাদের লরীর চিহ্নমাত্রও নেই।

জ্ঞান ফিরে এসেছে—চোট বোধ হয় বিশেষ লাগেনি—পুলিশদের অত্যাচারে কলকাতায় থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আপনি ত অদ্ভুত একগুঁয়ে মানুষ মশায়, সামনেই দোকানের দরজা খোলা ছিল, ঢুকে গেলেই পারতেন—চার দিক থেকে এই প্রকার মন্তব্য প্রদীপ শুনতে পেল। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল।

চলতে পারবেন কি?—কোথায় যাবেন?—একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?—ভিড়ের মাঝখান থেকে আবার প্রশ্ন উঠল।

একটু হেসে প্রদীপ জবাব দিল, ভাববেন না, খুব কাছেই আমার বাসা, হেঁটেই যেতে পারব।

যারা প্রশ্ন করেছিল, তারা যেন একটু ক্ষুণ্ণ বোধ করল। একজন তাকে শুনিয়েই তার বন্ধুকে বলল, দেখছেন না, কিছুই হয়নি, সেয়ানা ছেলে, পুলিশের লাঠি গায়ে পড়তে না পড়তেই এমন ভাব দেখালেন, যেন কি ভয়ানক চোট লেগেছে।

পথ চলতে চলতে প্রদীপ থমকে দাঁড়াল। হেসে এখন যাওয়া

মালা সিনহা বলেন, "আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি—এটি এত শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!"

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 550-X52 BO

চলবে না, যতীনদাস রোড্‌-এ জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সঙ্গে দেখা করা যে নিতান্তই প্রয়োজন।

পথের ওপাশে চা'য়ের দোকানের সম্মুখে পাড়ার ছেলেরা জড়ো হয়েছে। ওখানে একটা রেডিও এবং লাউড্‌স্পীকার বসানো হয়েছে দৈনন্দিন খবর সরবরাহ করবার জন্ম। তা ছাড়া সিনেমার গানও শোনা যায়।

ট্রামলাইনটা ক্রশ করতে করতে প্রদীপ শুনল, রেডিয়োতে খবর বলছে, জাপানীরা বর্ম্মা-মুল্লুকে আরও এগিয়ে এসেছে, ওদিকে দিল্লী থেকে বড়লাট বাহাদুর বলছেন, এবার ভারতবর্ষকে সচেতন হতে হবে আত্মরক্ষার জন্ম। সরকার আশা করেন, দেশের চিন্তাশীল যাঁরা তাঁরা বৃটেনের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগের কথা ভুলে গিয়ে দেশের জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করবেন আত্মরক্ষার জন্ম প্রস্তুত হ'তে, দুয়ারে হানা দিতে উদ্যত শত্রু জাপানের সঙ্গে লড়াই করতে হবে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণীকে।

হাঁটুটা টন্‌টন্‌ করছে, বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা, তবু প্রদীপ না হেসে পারল না।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু বোধ হয় প্রদীপের জন্মই অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, এসো প্রদীপ, তোমার এত দেরী হ'ল যে?

সংক্ষেপে প্রদীপ বলল তার নতুন অভিজ্ঞতার কথা।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর চোখ দুটো জলে উঠল যেন। বললেন, এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেই হবে তোমাকে। এক হিসেবে ভালই হ'ল প্রদীপ, এবার তুমি আরও গভীরভাবে বুঝবে কিসের বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ, মরণ-পণ করা অভিযান।

—আপনি ভুল বুঝছেন, এই সামান্ম আঘাতটুকু না পেলেও যে পথ বেছে নিয়েছি, তা থেকে বিচ্যুত হতাম না আমি।

—সে আমি জানি, প্রদীপ! তোমার মত ছেলেরাই ত আমদের দেশের আশা-ভরসা, আমাদের গৌরব। মেদিনীপুরে যাবার জন্ম তুমি তৈরী হয়ে এসেছ ত?

—নইলে আপনার কাছে আসব কেন জ্যোতির্ম্ময় বাবু?

—বেশ, বেশ! আমারও খুব ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে চলে যাই, কিন্তু এখানে আমার অসংখ্য কাজ, এদিককার সমস্ত ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে যে!

—সে আমি জানি। গাঢ় ভাবে প্রদীপ জবাব দিল।

অনেকটা যেন আত্মগত ভাবেই জ্যোতির্ম্ময় বাবু বলে চললেন, তাছাড়া, আমাদের বয়স হয়েছে, আমরা পেছন থেকে তোমাদের সাহস দিতে পারি মাত্র, পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পারি। কিন্তু পথে চলতে হবে তোমাদের বুক ফুলিয়ে, সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে উপহাস ক'রে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি জয়যুক্ত হবে, আর দেশের সমস্ত নর-নারীর আশীর্ব্বাদে গরীয়ান হয়ে উঠবে তোমাদের অভিযান।

প্রদীপ মাথা হেঁট ক'রে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর পদধূলি গ্রহণ করল।

এবার একটু চিন্তিত ভাবে জ্যোতির্ম্ময় বাবু প্রশ্ন করলেন, তোমার বিশেষ চোট লাগেনি ত? পরশু মেদিনীপুরে যেতে পারবে? না, আর কাউকে পাঠাব?

—পাগল হয়েছেন? এই একটু আঘাতের জের সাম্‌লাতে পারব না আমি? আমাকে নির্ব্বাচন ক'রে আপনি আমার প্রতি যে বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন, তার অমর্য্যাদা হ'তে দেব না, এটা আপনি স্থির জেনে রাখুন। দৃঢ়ভাবে প্রদীপ বলল।

তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠল শৃঙ্খলমুক্ত দেশমাতৃকার ছবি। দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন সে নিজেই উদ্বেলিত হয়ে উঠবে মুক্তির আনন্দে। শুধু তার কেন, আনন্দের স্পর্শ পৌঁছবে ছোট বড় প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে। এই আনন্দ জোগাবে কর্ম্মশক্তির প্রেরণা, দূর করবে দুঃখ, দারিদ্র্য, অবসাদ: স্বাধীন ভারতে যারা সুস্থ, যারা সবল, তাদের জন্ম রাষ্ট্র জোগাবে কাজ, আর যারা অসুস্থ, পঙ্গু, তাদের জন্ম জোগাবে আশ্রয়। হয়ত এক দিনে, এক সপ্তাহে, এক বছরে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠবে না কিন্তু ক্ষমতা যখন আসবে দেশের লোকের হাতের মুঠোয়, যথা এই জ্যোতির্ম্ময় বাবুর, তখন সবাই অনন্মমনা হয়ে নিজেদের নিয়োগ করবে জনসাধারণের কল্যাণে।

—কি ভাবছ, প্রদীপ? জ্যোতির্ম্ময় বাবু প্রশ্ন করলেন।

—না, কিছু ভাবছি না ত! স্বপ্নোত্থিতের মত প্রদীপ জবাব দিল। তারপর প্রশ্ন করল, সুমিতা বাড়ীতে আছে কি?

—সুমিতা?—না, বোধ হয় বেরিয়ে গেছে।—নিস্পৃহ ভাবে জ্যোতির্ম্ময় বাবু জবাব দিলেন।

সুমিতা জ্যোতির্ম্ময় বাবুর একমাত্র কন্মা, তাঁর চোখের মণি বললেও চলে। সুমিতা যে প্রদীপের প্রতি খানিকটা আসক্ত সে সংবাদ জ্যোতির্ম্ময় বাবুর অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু প্রদীপকে ভাবী জামাতারূপে গ্রহণ করতে তাঁর মন আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

সুমিতার প্রতি প্রদীপেরও বিশেষ কোন অনুরাগ ছিল না, তবে সে জানত যে, জ্যোতির্ম্ময় বাবুর কাছে এসে যদি তার কোনই খোঁজ না নেয় তবে অনুযোগের তীক্ষ্ণ বাণে তাকে জর্জ্জরিত হতে হ'বে। সুমিতা বাড়ীতে নেই জেনে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুকে আবার প্রণাম করে প্রদীপ বেরিয়ে এল।

প্রদীপ চলে যেতেই ঘরে ঢুকলেন কয়েক জন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা। প্রতি সন্ধ্যায় এঁরা মিলিত হ'ন জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বৈঠকখানায়। চার দিকের নবতম পরিস্থিতির সংবাদ দেন তাঁকে, আর স্থির করেন ভবিষ্যতের কর্ম্মসূচী।

—ঐ ছেলেটাকেই বুঝি আপনি মেদিনীপুরে পাঠাচ্ছেন? একজন প্রশ্ন করলেন।

—প্রদীপের কথা জিজ্ঞাসা করছ? হ্যাঁ, ওকেই পাঠানো স্থির করেছি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ভরসা পাচ্ছি না। ছেলেটি আদর্শবাদী সন্দেহ নেই, কিন্তু অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা, যা আমাদের এই কাজের সাফল্যের জন্ম নিতান্ত অপরিহার্য্য, তা' ওর মধ্যে তেমন দেখতে পাচ্ছি না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমাকে করে তোলে উদ্ব্যস্ত। তবু ত আজ দেখলাম অনেকখানি সংযত, সংহত। হয়ত পুলিশের লাঠির সাময়িক প্রতিক্রিয়া, কিন্তু উপযুক্ত লোকই বা পাই কোথায়? ওর একটা বিশেষ গুণ এই যে, কোন কাজের দায়িত্ব একবার গ্রহণ করলে শেষ পর্য্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে তা সফল করতে।

—আপনি কিন্তু একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন, জ্যোতির্ম্ময় বাবু! সরকার বাহাদুর এবার যেন কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন মনে হচ্ছে। আরেক জন বললেন।

একটু হেসে জ্যোতির্ম্ময় বাবু জবাব দিলেন, জেলখানার অতিথি

হ'বার কথা বলছেন ত? তার জন্য তৈরী হয়েই আছি। তা'ছাড়া ঐ তিলকটা পরা নিতান্তই দরকার, নইলে দেশের লোকে আমাদের মানবে কেন? আপনারাও তৈরী থাকবেন, যদি আন্দোলনের পুরোভাগে থাকতে চান।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর আত্মত্যাগের কাহিনী কে না জানে? নিজে হাতে চরকায় কাটা সুতোয় তৈরী ধুতি-পাঞ্জাবী ছাড়া আর কোন প্রকার পরিচ্ছদ তিনি পরেন না, সেই য়ুনিভার্সিটি বয়কট করা অবধি। স্বল্পাহারী, কোন প্রকার বিলাসিতা নেই, এমন কি সিগারেটটি পর্য্যন্ত খান না। দেশই তাঁর প্রাণ, কংগ্রেসের তহবিলে তিনি দান করে যাচ্ছেন আইন ব্যবসায়ে তাঁর উপার্জ্জনের মোটা একটা অংশ। বিপত্নীক, আছে এক মাত্র মেয়ে সুমিতা। বাইরের ঝড়-ঝাপটার সংঘাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন যথাসাধ্য, কারণ তিনি মনে করেন দেশের সাধারণ তরুণ-তরুণীর জন্য নির্ব্বাচিত যে পথ তা সুমিতার পথ নয়। সুমিতা অসাধারণ, সাধারণের পর্য্যায়ে তিনি তাকে কিছুতেই নিয়ে আসতে পারেন না।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ওখান থেকে বেরিয়ে এসে প্রদীপ সোজা হাঁটতে সুরু করল লেক রোডের অভিমুখে। হাঁটুটা আরও যেন বেশী টন-টন করছে, বুকের ব্যথাটাও বাড়ছে, কিন্তু মেদিনীপুরে যাবার আগে বন্দনার সঙ্গে দেখা করা দরকার, নিতান্তই নিজের প্রয়োজনে।

—তুমি আজ আসবে আমি জানতাম। বন্দনা বলল।

—তাই না কি? তোমার দিব্যচক্ষু লাভ হয়েছে দেখছি। পরিহাসের সুরে প্রদীপ বলল।

—বাবার সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর প্রায়ই দেখা হয়। তিনিই বলছিলেন তুমি মেদিনীপুরে যাচ্ছ দু'-একদিনের মধ্যেই। জ্যোতির্ম্ময় বাবু তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন।

—কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর এত সম্প্রীতি কি করে গড়ে উঠল? আমার ত ধারণা, তাঁরা দু'জন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতের মানুষ।

—বাঃ, তুমি বুঝি জান না! বাবা জ্যোতির্ম্ময় বাবুদের ফাণ্ডে নিয়মিত ভাবে চাঁদা দিয়ে আসছেন। কংগ্রেসের খাতায় লেখা সভ্য না হলেও বাবা কংগ্রেসের মতবাদের সমর্থক চিরকালই।

সংবাদটা শুনে প্রদীপ খুসী হতে পারল না। ধনী ব্যবসায়ী অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের মতবাদের সমর্থক? জিনিষটা কেমন যেন একটু অসঙ্গত ঠেকছে না?

বন্দনা বোধ হয় প্রদীপের মনের গতি বুঝতে পারল— তোমার মনটা বড্ড একরোখা, প্রদীপ! সব জিনিষই তুমি বিচার করতে চাও তোমার নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে? কেন, যাদের পয়সা আছে তারা বুঝি দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারে না? বাবা উপায় করেন যথেষ্ট, কিন্তু তার তুলনায় তাঁর দান-ধ্যানও কম নয়।

প্রদীপ তার বিরক্তি গোপন করে গেল, কারণ এই মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলো সে নষ্ট করে দেবে না অবান্তর অপ্রয়োজনীয় সংলাপে।

বন্দনাও প্রশ্ন করল, এখন কাজের কথা বল, কবে যাচ্ছ?

—বোধ হয় পরশু।

—কবে ফিরবে?

—সেটা ত আমার হাতে নয়। আমার প্রভুরা যদি সদয় হ'ন তাহ'লে না-ও ফিরতে পারি।

—অলক্ষুণে কথা ব'লো না প্রদীপ! বন্দনার চক্ষু অশ্রুসিক্ত।

—একে অলক্ষণ বলছ কেন বন্দনা? এ যে আমাদের পরম পুরস্কার।

—তা হোক, তবু—

—তবু আমাকে ফিরে আসতে হবে, এই ত? প্রদীপের চোখে পরিহাসের আভাস।

—হ্যাঁ। মৃদুকণ্ঠে বন্দনা জবাব দিল।

এবার প্রদীপ বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমি জানি, তুমি একান্ত ভাবে চাও আমি ফিরে আসি তোমার বাহুবন্ধনে। কিন্তু সে সব আলোচনা করবার সময় এটা নয়। আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা সুসম্পন্ন করাই এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য যদি সুষ্ঠু ভাবে ক'রে আসতে পারি তখন ভাববার অনেক সময় পাব, কার বন্ধনে ধরা দেব।

—তুমি আমার দিকটা একবারও ভেবে দেখছ না।

—হয়ত দেখছি না। দেখছি না স্বেচ্ছায়, কারণ তোমার দিকটা ভাবতে সুরু করলে আমার এদিকের কাজের কথা ভুলে যাব।

—তুমি সত্যি হৃদয়হীন।

—আমাকে এখন খানিকটা হৃদয়হীন হতে হবে, বন্দনা! শুধু আমাকে নয়, আমার মত আর সবাইকেও। ভুলে যেয়ো না এটাও একটা যুদ্ধ—যুদ্ধে কঠোর হতে হয়, এমন কি নৃশংসও। নইলে যুদ্ধে জেতা যায় না।

—তর্কে আমি তোমার সঙ্গে কোন দিনই পেরে উঠব না। কাতর কণ্ঠে বন্দনা বলল।

—হার যখন মেনেছ তখন আমিও একটু উদার হতে প্রস্তুত আছি। কথা দিচ্ছি, প্রভুরা যদি আমার গতিবিধির উপর কোন বাধা সৃষ্টি না করেন, তাহ'লে সোজা চলে আসব তোমার কাছে, তুমিই হবে আমার জেনেরাল হেড কোয়ার্টার্স। প্রথম রিপোর্টটা পাবে তুমি!

প্রদীপের কথার ভঙ্গীতে বন্দনা হেসে উঠল।

দুই

অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম যখন কলকাতায় আসেন তখন তিনি ছিলেন নিঃস্ব, কপর্দ্দকশূন্য। এসেছিলেন নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে, কিন্তু দেখলেন ভাগ্যলক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করতে হ'লে অমানুষিক পরিশ্রম এবং সাধনার প্রয়োজন।

প্রথমে একটু দমে গিয়েছিলেন, কিন্তু বছর খানেকের মধ্যেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি মোটামুটি স্থির ক'রে নিলেন। সুরু করলেন কাপড়ের ব্যবসায়, কাপড় ফিরি ক'রে দুপুরের রোদে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে সঞ্চয় করলেন কিছু মূলধন। তাঁর সততা এবং কৃচ্ছ্রশক্তি দেখে একজন গুজরাটী ব্যবসায়ী তাঁকে দিতে লাগলেন অগ্রিম কাঁচা মাল। কিছুদিন পরে শ্যামবাজারেই ছোট্ট একটি কাপড়ের দোকান খুললেন অটলবিহারী।

এর পর ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল দ্রুতগতিতে। কয়েক বছরের মধ্যেই শ্যামবাজার অঞ্চলে তিনি একখানা বাড়ীও কিনে ফেললেন। তারপর পাণিগ্রহণ করলেন এক ধনী কন্ট্রাক্টার-দুহিতার।

বিয়ের কয়েক বছর পর স্ত্রী সৌদামিনী মারা গেলেন। রেখে গেলেন আঠার বছরের ছেলে নবকিশোর এবং ষোল বছরের মেয়ে বন্দনাকে।

বন্ধু-বান্ধব, এমন কি তাঁর শ্বশুরমশায়ও, তাঁকে উপদেশ দিলেন আবার বিয়ে করতে, কিন্তু অটলবিহারী রাজী হলেন না। বললেন, গৃহিণীর সৌভাগ্য আমার কপালে নেই, মিথ্যা মরীচিকার পেছনে আমি ছুটব না। আজ পর্য্যন্ত অটলবিহারী অটল হয়েই রয়েছেন।

নিজের সমস্ত শক্তি এবং সাধনা তিনি নিয়োগ করলেন অর্থোপার্জ্জনে। যে সততা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল শ্রীবৃদ্ধির প্রথম সোপানে, তা' পরিত্যাগ করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ তিনি করলেন না। যখন তিনি দেখলেন যে লক্ষ্মীকে করায়ত্ত করতে হ'লে সততার পথ সবচেয়ে সহজ পথ নয়। নিজেরই অজ্ঞাতে তিনি হয়ে উঠলেন নৃশংস, অর্থের নির্ব্যক্তিক পূজা তাঁকে অন্ধ ক'রে তুলল, পৃথিবীর কমনীয়তার রূপ তিনি ভুলে যেতে সুরু করলেন।

তারপর যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই অটলবিহারী তাঁর দূরদৃষ্টির সাহায্যে অনুভব করলেন যে, শীগগিরই দেশে দেখা দেবে বস্ত্র এবং অন্নসঙ্কট। তাই দাম যখন বেশ সস্তা সেই সময় তিনি কিনে রাখলেন অজস্র কাপড়।

যা' তিনি আশা করেছিলেন অবশেষে তাই ঘটল। বিশ্বব্যাপী দাবানল যখন জ্বলে উঠল, তার উত্তাপ ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছল। উল্লসিত হয়ে উঠলেন অটলবিহারী।

ওদিকে কংগ্রেসের সঙ্গেও সরকারের বিরাট যুদ্ধ চলেছে। জনমতকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ভারতবর্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দলে টেনে আনা হয়েছে বলে মহাত্মা গান্ধী জানিয়েছেন তাঁর তীব্র প্রতিবাদ। জাপানীদের অগ্রগতি সম্বন্ধে বলেছেন, ওদের যদি প্রতিরোধ করতে হয় তাহ'লে ভারতের প্রত্যেকটি নরনারীকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে দেশকে বাঁচাবার ঐকান্তিক আগ্রহে। এই আগ্রহ কিছুতেই আসবে না, যত দিন দেশ পরাধীন থাকবে, যত দিন ভারতীয় সৈনিককে যুদ্ধ করতে হবে বৃটিশ এবং আমেরিকান সৈনিকের অনুসারীরূপে, তাদের সতীর্থ ভাবে নয়।

অটলবিহারী যদিও জানেন, কংগ্রেসের এই বিদ্রোহ দমন করতে সরকারকে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না, তবু মাঝে মাঝে তাঁরও মনে হয় গান্ধীজি যা' বলছেন তা হয়ত নিতান্ত মিথ্যা নয়। খবরের কাগজে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবগুলো তিনি আদ্যন্ত পড়েন, বন্দনাকেও পড়ে শোনান, আর বলেন, তোমার কি মনে হয়, বন্দনা? মহাত্মার এই কথাগুলোর মধ্যে খানিকটা লজিক আছে বই কি!

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ বেশ কয়েক বছর যাবং। তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু শ্রদ্ধার চেয়েও বেশী করেন সমীহ।

অটলবিহারী যে কংগ্রেসের ফাণ্ডে চাঁদা দিতে সুরু করেছিলেন তা'ও এই জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সংস্পর্শে এসে। জ্যোতির্ম্ময় বাবু অবশ্য কোন অনুরোধ করেন নি, কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী দেখে অটলবিহারী বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি তিনি উপার্জ্জিত অর্থের খানিকটা দেশের কাজে দান করেন তাহলে নিতান্ত অপাংক্তেয় হয়ে থাকবেন না। তাছাড়া বুদ্ধিমান অটলবিহারী বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি কংগ্রেস কোন দিন রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে তাহ'লে তাঁর এই ত্যাগ দেশের নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই ভুলবেন না।

অটলবিহারী এবং জ্যোতির্ম্ময়ের পরস্পরের পরিচয়টা আরও একটু নিবিড় হয়ে উঠেছিল তাঁদের দুই কন্যার অনুগ্রহে। বন্দনা এবং সুস্মিতা এক কলেজে পড়ত।

অটলবিহারী সেদিন বাড়ীতে ফিরলেন বেশ চিন্তাকুল চিত্তে। নিজের ভাবনা নিয়ে এতই বিব্রত ছিলেন যে, বন্দনার চোখের কোণের বিষাদ প্রথমে তাঁর নজরেই আসেনি। নবকিশোরকে বললেন, নবু, আমাদের টেলিফোনটা ঠিক আছে ত?

—হ্যাঁ, ঠিক আছে বই কি! কিন্তু কেন, বাবা?

দিন-কাল মোটেই ভাল নয়, নবু! জ্যোতির্ম্ময়ের এখান থেকে এলাম। ওরা ত মরীয়া হয়ে উঠেছে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়বার জন্য। আর গভর্ণমেণ্টও তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কংগ্রেসকে এমন শিক্ষা দেবে যে জীবনে তারা আর ভুলতে পারবে না। তারপর, জান ত, বাংলার মসনদে কারা রাজত্ব করছেন! কখন কি হয় বলা যায় না! আমি ত ডেপুটি কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করেছি, আমার টেলিফোনটাকে যেন "প্রায়রিটি" দেওয়া হয়, ওঁকে সেদিন প্রায় কুড়ি জোড়া শাড়ী দিয়ে এসেছি।

নবকিশোর যেন একটু শক খেল। বলল, তুমি ডেপুটি কমিশনারকে ঘুষ দিলে বাবা? আর উনি সেটা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করলেন?

—তুমি এ-সব বুঝবে না, নবকিশোর! বিপদে পড়লে এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু করতে হয়? আর তা ছাড়া উনি ত ঠিক ঐভাবে গ্রহণ করেননি, বাজারে ন্যায্য দামে কাপড়-চোপড় পাওয়া যাচ্ছে না, আমি আমার লাভটা না রেখে পাইকারী দামে ওঁকে দিলাম। এর মধ্যে অন্যায় কি আছে?

—টাকাটা দিয়েছেন আশা করি? নবকিশোর বললে।

—দেননি, দেবেন। কাজের মানুষ। যদি ভুলেও বা যান, আমি কি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি? আর, এই সামান্য কয়টা টাকা না পেলে আমারই কি প্রকাণ্ড একটা ক্ষতি হয়ে যাবে, নবু?

নবকিশোরের চোখে জিনিষটা ভাল লাগল না, কিন্তু সংসারের হালচাল সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা অতি অল্প, সে চুপ ক'রে রইল।

—বন্দনা কোথায় রে? অটলবিহারী প্রশ্ন করলেন।

—একটু আগে সে ত এখানেই ছিল, তুমি তাকে ডাকনি,' বোধ হয় ভেতরে চলে গেছে।

—দেখ, দেখ, অভিমানী মেয়ের কাণ্ড!—শশব্যস্তে অটলবিহারী বললেন, এক দণ্ড অন্যমনস্ক হ'বার জো নেই। বন্দনা, ও বন্দনা!

বন্দনা এল।

—ডাকছ বাবা?···তোমার জন্যে জলখাবার আনতে গিয়েছিলাম।

—আজ আর জলখাবার খাব না, মা! ক্ষিদে মোটেই নেই, তাছাড়া মনটাও ভাল নেই।

বন্দনা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করল, কি হবে, বাবা?

স্বপ্নোত্থিতের মত অটলবিহারী বললেন, আঁা, কিসের কি হবে রে?

—এই যে চার দিকে শুনছি মহাত্মা গান্ধী বলছেন, এই তাঁর শেষ যুদ্ধ। দেশকে স্বাধীন করবেন, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রমে ফিরবেন না। সত্যি কি দেশ স্বাধীন হবে, বাবা?

—দেশ স্বাধীন হওয়া কি এত সোজা পাগলী? ইতিহাসে পড়িসনি ইটালী, গ্রীস, হাঙ্গারী কি করে স্বাধীন হয়েছিল? আমরা মনে করি, খুব খানিকটা চেঁচালে, বক্তৃতা করলেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভয় খেয়ে আমাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেবেন! ছোঃ!

—কিন্তু তুমিও কি চাও না, বাবা, যে দেশ স্বাধীন হয়?

—চাই ত নিশ্চয়ই, কে না চায়? কিন্তু এই কি চাইবার সময়? যত দিন জাপানীরা আমাদের দেশের সীমান্তে আসেনি, তত দিন কংগ্রেস তার দাবী জানিয়েছে, এর মধ্যে একটা যুক্তি, একটা সঙ্গতি ছিল। কিন্তু এখন? এখন বৃটিশরা যদি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায় তাহ'লে রক্তের গঙ্গা বইতে সুরু করবে যে।

—কেন, আমরা জাপানীদের সঙ্গে লড়ব। তাছাড়া ওদের ঝগড়া হচ্ছে বৃটিশদের সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে নয়। বৃটিশরা চলে গেলে ওরা আমাদের আক্রমণ করবে কেন? নবকিশোর বলল।

—তোমরা জাপানীদের চেন না, নবু! আমি ওদের সঙ্গে ব্যবসা করেছি, ওদের জানি খুবই ভাল ভাবে। আমাদের ওরা বন্ধু মনে করে না, যদিও আমরা এসিয়ান। চীন দেশে ওরা কি করছে দেখছ না?

—তাহ'লে তোমার মতে কংগ্রেসের উচিত কোন রকম আন্দোলন না করে চুপচাপ থাকা? নবকিশোর প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয়। আমি একথা বলছি না, মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। তাঁর আত্মসম্মানে যদি বাধে, অন্ততঃ চুপ করে থাকলেও ত পারেন এই কয়টা বছর। যুদ্ধ একদিন শেষ হবেই, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ত পালিয়ে গেল না? বেশ খানিকটা জোরের সঙ্গেই অটলবিহারী বললেন।

—আমরা কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না, বাবা! বন্দনা এবং নবকিশোর একসঙ্গে বলে উঠল। কংগ্রেস যদি এখন চুপ করে থাকে তাহ'লে দেশের লোক মনে করবে কংগ্রেস মরে গেছে। লোকের বুকে স্বাধীনতার আগুনটা জ্বালিয়ে রাখতে হবে না? তুমি দেখছ না, প্রতি বছর এই সংগ্রাম কত তীব্র, কত ব্যাপক হয়ে উঠছে? আজ যদি কংগ্রেস চুপ করে থাকে তাহলে দেশ ভুলে যাবে নেতাদের বাণী, মনে করবে ভয় ঢুকেছে তাঁদের মনে।

—না, মা, লোকে এত সহজে ভুলে যায় না রে! তা ছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, বৃটিশ সরকার আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কংগ্রেস যদি বিদ্রোহের আগুন জ্বালে, তাহলে নির্ম্মম ভাবে দমন করবে তা'। তাতে ক্ষতি হবে দেশের জনসাধারণেরই, বৃটিশদের নয়।

—এই তর্কের আর শেষ নেই, বাবা! বন্দনা বলল। তার চেয়ে কাজের কথা বল। কাকাবাবু কি বললেন? (জ্যোতির্ম্ময় বাবুকে বন্দনা এবং নবকিশোর কাকাবাবু বলে সম্বোধন করে।)

—কী আর বলবেন, তোমরা যা বলছ তারই পুনরুক্তি করলেন। এঁরা যে দেশের তরুণদের মৃত্যুর সম্মুখে এগিয়ে দিচ্ছেন, এ কি কোন দিক থেকেই কল্যাণকর হবে?

—মৃত্যু! সে কি বাবা? আর্ত্তস্বরে বন্দনা বলে উঠল।

—খুবই সোজা কথা, মা! এঁরা করবেন বিদ্রোহ, আর সরকার চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখবেন তা? এবার লাঠিচালানো এবং কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহারেই ক্ষান্ত হবে না, এবার রীতিমত মিলিটারি বাহিনী দিয়ে এই সব প্রগলভতা চূর্ণ করে দেওয়া হবে। ভেতরের খবর আমি একটু-আধটু জানি রে!

স্থাণুর মত বসে রইল বন্দনা। এখন সে বুঝতে পারল, কী বিপদের সম্মুখীন হ'তে যাচ্ছে প্রদীপ।

মেসে ফিরে গিয়ে প্রদীপ তার সামান্য পুঁজিপাতি গুছিয়ে রাখল ছোটো একটা সুটকেস-এ। তারপর রুমমেটকে বলল, এই বাক্সটা যেন তার হেফাজতে রেখে দেয়, সে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত। কোথায় সে যাচ্ছে তা বলল না, শুধু বলল যে, কিছুদিনের জন্যে দেশে ঘুরে আসছে।

মনে মনে সে হাসল, যখন দেখল ভদ্রলোক একটিও প্রশ্ন করলেন না তাকে।

চারি পাশের বন্ধন থেকে মুক্তি নিতে হবে তাকে, যাত্রার প্রারম্ভে। অনন্যমনা হয়ে তাকে চলতে হবে নির্ব্বাচিত পথে। কিন্তু তবু সে কেন নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে দিতে পারছে না এই যজ্ঞাহুতিতে? কোন দুর্ব্বহ চিন্তা তাকে করে তোলে ভারাক্রান্ত, বিচ্ছিন্ন করে আনে সাধারণের গণ্ডী থেকে? সে যে অসাধারণ নয়, তা বেশ ভাল ভাবেই জানে, তবু নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার কেন এই ব্যর্থ প্রয়াস?

তার মনে পড়ে, বাইশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের ইতিবৃত্ত। শৈশবেই সে হারিয়েছে তার বাবা, মা দু'জনকেই, মানুষ হয়েছে (একে যদি মানুষ হওয়া বলা যেতে পারে) তার মামার বাড়ীতে। কোন ভাই-বোন তার ছিল না, সে আশা করেছিল তার মামা এবং মামীমার স্নেহ তার উপর বর্ষিত হতে অকাতরে না হলেও, অকুণ্ঠায়। কিন্তু তার আশা ব্যর্থ হয়েছিল।

স্কুল শেষ করে সে এল কলেজে, সায়েন্স পড়তে। মামা বললেন, চাকুরীর চেষ্টা কর, কিন্তু প্রদীপ রাজী হল না। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মামা তার কলেজের খরচ বহন করতে সুরু করলেন।

সংঘর্ষ বাধল বি, এস, সি পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে, প্রদীপ যখন মামাকে জানাল পরীক্ষা সে দেবে না। দেশের যা পরিস্থিতি, তাতে অন্ধভাবে সরকারের বিদ্যাশালা আঁকড়ে পড়ে থাকার কোনই মানে হয় না, এই যুক্তি সে দিল।

মামা প্রথমে প্রদীপকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, বি, এস, সি পরীক্ষাটা অন্ততঃ তার দেওয়া উচিত, তারপর সে যা খুসী তাই করতে পারে। অন্যথায়, মামা প্রস্তাব করলেন, সে একটা চাকুরী যেন নেয়, যুদ্ধের বাজারে চাকুরীর অভাব হবে না।

একগুঁয়ে প্রদীপ ওর কোনটাতেই রাজী হ'ল না, মামা বিরক্ত হয়ে মাসোহারা বন্ধ করলেন।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সংস্পর্শে এসেছিল প্রদীপ, তাঁরই কথার বাঁধুনীর জালে জড়িয়ে পড়েছিল সে। মাসোহারা বন্ধ করবার খবর শুনে তিনি বললেন, তুমি এতটুকু ভেবো না প্রদীপ! কলেজের খরচ যদি চালাতে না হয় তাহ'লে তোমার সামান্য প্রয়োজন আমরা অনায়াসে মেটাতে পারব, আমাদের ফাণ্ড থেকে। কংগ্রেসের একটা দায়িত্ববোধ আছে, কর্ম্মীদের উপোসী থাকতে দেয় না। তাছাড়া, প্রয়োজন হ'লে তুমি একটা টুইশনিও ত করতে পারবে।

কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্ম্মিরূপে প্রদীপের জীবনের সুরু এই ভাবে। প্রথমে সে ঝাঁপ দিয়েছিল খানিকটা ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু ধীরে ধীরে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এঁদের উদাত্ত আদর্শ তার শরীরের প্রতিটি অণুকণায় সঞ্চার করল। অননুভূতপূর্ব্ব এক পুলক, উপলব্ধি করতে লাগল, নতুন এক জীবনের আস্বাদ সে পেয়েছে—তারপর জাপানের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী যখন আয়োজন করলেন দেশব্যাপী এক অভিযানের, তখন প্রদীপ এসে জ্যোতির্ম্ময় বাবুকে জানাল যে, সম্মুখ সমরে সে যেতে চায়। বলা বাহুল্য, জ্যোতির্ম্ময় বাবু তার এই উপচার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর গৃহে যাতায়াতের ফলে তার পরিচয় হয়েছিল সুমিত্রার, এবং তাদেরই মাধ্যমে অটলবিহারী বাবুদের সঙ্গে। অষ্টাদশী সুমিত্রা এবং বন্দনা উভয়েই প্রদীপকে ভালবেসে ফেলল। প্রদীপের আন্তরিকতা আর ভাবালুতা, উভয়কেই করল আকৃষ্ট।

দু'জনের মধ্যে সুমিত্রা যদিও বেশী সুরূপা এবং সুমিত্রার পরিবেষ্টনীর সঙ্গে প্রদীপের মনের মিল ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক, প্রদীপ কিন্তু সুমিত্রার পরিবর্ত্তে বন্দনাকেই দিল প্রাধান্য। সুমিত্রার অহমিকা, তার দম্ভ প্রদীপকে করল প্রতিহত। পক্ষান্তরে, বন্দনার মধ্যে সে খুঁজে পেল একটা স্নিগ্ধ শীতল স্নেহ, একটা কমনীয়তা, যা তার মনের বৃহৎ একটা অভাবকে পূর্ণ করতে সাহায্য করল।

প্রদীপ অবশ্য বন্দনাকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারেনি। বাইরের মাধুর্য্যের অভ্যন্তরে কঠোর একটা দৃঢ়তা লুকানো আছে, তার পরিচয় সে পেয়েছিল অনেক পরে।

প্রদীপের এই বাইশ বছরের জীবনের উপর আর একটি মেয়ের প্রভাব এসে পড়েছিল, সে হচ্ছে মিঃ সুপ্রকাশ কর, আই-সি-এস-এর গৃহিণী গায়ত্রী।

[ক্রমশঃ।

আমি কবিতা লিখতে চাই

শ্রীবুদ্ধদেব বাগ্‌চী

আমি কবিতা লিখতে চাই
যখন শিউলী ঝরে একটি-দু'টি ক'রে,
ভোরের আলোয় শিশির-ভেজা পায়;
কিশোরী তাদের কুড়িয়ে নিয়ে যায়।
দুপুরেতে রৌদ্র মাথার 'পরে,
ডোবা থেকে ব্যাঙগুলো দেয় উঁকি;
চালতাতলায় কাঠকুড়ুনী ঘোরে।
দিদিমা নিয়ে বসেন তাঁর ঝুলি।
বিকেলেতে চায়ের আসর জমে,
ছেলে-বুড়োর আলাদা কেবিনে।

দেখে তখন চাকরে বাবুদের,
আমার কবিতা আসে ঢের।
এদিক-ওদিক তাকান তাঁরা চেয়ে।
বুড়োরা হয়ত' চেপে জায়গা দেয়,
ছেলেগুলোও হয়ত' লুকোয় বিড়ি
কালীপদর ভাঙা বেড়ার ফাঁকে।
সন্ধ্যেবেলায় শাঁখের শব্দ শুনে,
ছেলেগুলো পড়তে বসে গিয়ে,
ও পাড়ার গুরুমশাই শিক্ষকতা সেরে,
ফেরেন বাড়ী প্রাত্যহিক বাজার করে নিয়ে।

তখন তুমি এলো চুলে কি যেন তেল মেখে,
উপকরণ রোজই এক, আলতা—সিঁদুর—ফিতে;
—আমার কিন্তু ভাল লাগে না এ।
খারাপ-লাগা প্রকাশ করি কবিতা লিখে লিখে।
কিন্তু যখন খাবার পরে পানের থালা হাতে
সীঁথির সিঁদুর জলজলিয়ে তুমি দাঁড়াও এসে,
চিবুক তুলে দেখি আমি সলাজ চোখে হাসি,
সত্যি তখন কবিতা আমি লিখতে ভালবাসি।

আবিষ্কার

ডক্টর এক্স
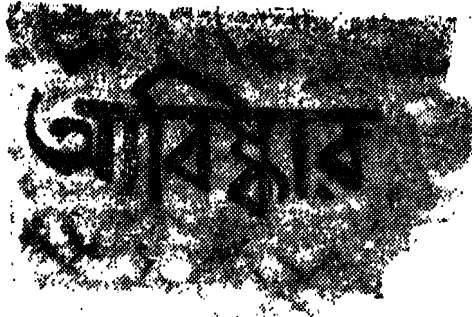
[অখ্যাত, অবজ্ঞাত যে সকল বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর কল্যাণের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাদের ধ্বংস করেন, আমার সাহিত্য সৃষ্টির এই প্রথম প্রচেষ্টা তাঁহাদের জন্য উৎসর্গীকৃত। —লেখক]

একটু কান পেতে থাকলে বন্ধ দরজার আড়ালে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার শব্দ শোনা যায়। লাইসলের তীব্র গন্ধ নাকে আসে। আষাঢ়ের রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। সারা রাত্রি সমানে বৃষ্টি পড়েছে। আকাশের এই অবিশ্রাম কান্নার মধ্যেও একটি নবজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি মাঝে মাঝে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে। পাশের ঘরে টিনের চালে জলপড়ার একঘেয়ে শব্দও এখন সদ্যমাতৃত্বের ব্যথায় অবসন্ন মায়ের কানে গানের সুরের মত মিষ্টি লাগছে।

কড়া ইস্ত্রি-করা পোষাক-পরা ইংরাজ নার্স, জীবনে প্রথম স্নাত নবজাতককে গরম কাপড়ে ঢাকতে ঢাকতে বললেন,—দেখ, দেখ, মিসেস সেন, কি সুন্দর, কি মিষ্টি, তোমার ছেলে হয়েছে!

বেদনার্ত স্বরে মিসেস সেন উত্তর দিলেন—আমি আর ওর দিকে তাকাব না নার্স! তুমি তো জান, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছাড়া আর আমার কোন ছেলে-মেয়ে বাঁচেনি? এ-ও নিশ্চয় আমায় ছেড়ে চলে যাবে। কি হবে আর ওকে দেখে।

—অমন কথা বোলো না মিসেস সেন, দেখো, এই ছেলে বড় হয়ে তোমার বংশের নাম উজ্জ্বল করবে। তোমার অন্য ছেলে সমরের মতই এ-ও ভাল হবে। যখন এ বড় হবে তখন তোমরা হয়ত আমাকে ভুলে যাবে, কিন্তু এ আমায় নিশ্চয় ভুলবে না—এই বলে নার্স শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে আদর করতে লাগলেন।

এই সময় দরজায় নক্ করে একজন মধ্যবয়সী লোক ঘরে ঢুকে নার্সকে সম্বোধন করে বললেন—কি হল মিসেস ওলিভার?

তাঁর কণ্ঠস্বরে মনে হল তিনি যেন নিজের প্রশ্নে নিজেই ভয় পাচ্ছেন!

নার্স উত্তর দিলেন—সব ঠিক আছে ডাঃ সেন, আপনার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে।

—কোন কিছু গোলমাল হয়নি তো?

—না, না, কিছু হয়নি, আপনি একটুও উদ্বিগ্ন হবেন না। এই বলে মিসেস সেনের দিকে ফিরে নার্স অনুরোধ করলেন—তোমার ছেলেকে নাও মিসেস সেন, ডাঃ সেনকে নিজের হাতে করে ছেলেকে দাও।

পাশ ফিরে চোখ খুলে, ডাঃ সেনকে তাঁর প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে মিসেস সেন মাথায় কাপড় দিলেন।

এক মুহূর্ত্ত সেই ভাবে থেকে দু'জনেই হেসে, নার্সের কোলের নবজাতকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

নবজাতক! স্ত্রী-পুরুষের আত্মার মিলনসেতু। নিয়তির একটি পদক্ষেপ।

বিদ্যুতের আলোয় আর শব্দে বাড়ীর অন্য এক ঘরে একটি ছোট ছেলে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল। এদিক-ওদিক চেয়ে সে দেখল, তার পাশে তার মা নেই। মা'র কাছ থেকে তুলে কে যেন তাকে অন্য ঘরে নিয়ে এসেছে। অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করে ছেলেটি নিজের পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দেখতে চেষ্টা করল। ঘরের কোণে বড় সিন্দুকটার প্রতি তার দৃষ্টি পড়তে সে বুঝতে পারল, যে-ঘরে সে শুয়ে আছে, সেটা তার ঠাকুমার ঘর।

ওই সিন্দুকটাতেই ঠাকুমার সব জিনিষপত্র থাকে। সিন্দুকের মধ্যে কর্পূর, কাঠের বাক্সয় সযত্নে-রাখা একটি লাল কাপড় দেখে একদিন সে জিজ্ঞাসা করেছিল—ও কাপড়টা কিসের ঠাকুমা?

—ওটা আমার বিয়ের চেলি। ওটা পরেই তো তোর ঠাকুর্দার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। ওটা তোর বৌকে দেব বলে রেখেছি।

—যাঃ!

—যাঃ কি রে! কেমন সুন্দর ছোট বউ এনে দেব তোর। মহাপায়া চড়ে তোরা দু'জন আসবি বিয়ে করে। কত ধুমধাম হবে। সাত দিন যজ্ঞি হবে বাড়ীতে। নূপুর পরে তোর বউ বাড়ীতে ঘুরে বেড়াবে। তাকে দেখলে আর এ বুড়ীকে কি তোর মনে থাকবে?

—তুমি বড় অসভ্য ঠাকুমা। বিয়ে আমি করব কি না!

চারি দিকের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বিদ্যুতের আলোয় একবার সাদা হয়ে উঠল। সেই আলোয় জানলার কাছের তালগাছটাকে ভূতের মত দেখাতে লাগল। সিন্দুকটার পেছনে একটা শব্দ হতে, ছেলেটি প্রাণপণে চোখ বন্ধ করে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। খানিক পরে দরজা খুলে একটি বৃদ্ধা ঘরে ঢুকলেন। ছেলেটিকে

ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে তিনি বললেন—ও কি, ও রকম করে কেন বসে আছিস রে সমর? ঘুমাসনি কেন?

ছেলেটি পাশ ফিরে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল—তুমি কোথায় গিয়েছিলে ঠাকুমা? মা কোথায়?

—তোর একটা ভাই হয়েছে রে দাদু। মা তার কাছেই আছে। আমি ওদেরই দেখতে গিয়েছিলাম।

—এখানে ভাইকে আনলে না কেন ঠাকুমা?

—এখানে আনব কি রে? এটুকু ছেলে কি এখন মাকে ছেড়ে আসতে পারে?

—তাহলে কাল সকালেই আমি ওকে দেখতে যাব।

—ভাইকে ভালবাসবি তো সমর? ওর সঙ্গে ঝগড়া করবি না তো?—কি নাম রাখবি ওর?

—ওর নাম রাখব কমল। সমরের ভাই কমল। ভাইয়ের সঙ্গে আমি খুব ভাব করব। আমার সব খেলনা ওকে দিয়ে দেব। আমি তো বড় হয়ে গেছি। খেলনা নিয়ে আর আমি খেলি না।

আমাকে এখন কতো লেখাপড়া করতে হয়। যা শক্ত শক্ত বই আমি পড়ি ঠাকুমা, তোমাকে আর কি বলব। ভাইকে আমি খুব তাড়াতাড়ি সব শিখিয়ে দেব। ওকে নিয়ে ইস্কুল যাব।

—ও যে এখন খুব ছোট রে বোকা! ও কি এখন তোর সঙ্গে ইস্কুল যেতে পারবে? তুই যখন ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলি তখন ইস্কুল যাবার ভয়ে কি রকম কাঁদতিস মনে আছে? তোর দিদি তোকে কত করে ভুলিয়ে ইস্কুলে পাঠাত।

—ঠাকমা, ভাই-এর কথা আমিই দিদিকে লিখব। এখন তো আমি চিঠি লিখতে শিখে গেছি।

—তাই লিখিস। তোর দিদি অনেক দিন শ্বশুরবাড়ী থেকে আসেনি, না রে সমর?

—অনেক দিন আসেনি ঠাকুমা! আগের বার যখন এসেছিল, আমার জন্ত কত সুন্দর সব বই এনেছিল গল্পের।

—এবার তুই ওকে আসতে লিখিস। আয়, আমার কাছে আয়।

—ঠাকুমা, তুমি যখন চলে গিয়েছিলে তখন আমার বড় ভয় করছিল। সিন্দুকটার পেছনে একটা কিসের শব্দ হচ্ছিল।

—ও কিছু নয়। যে বড় ইঁদুরটা রোজ আমার রুটি খেয়ে যায়, সেটাই শব্দ করছিল। এত বড় হয়েছিস, এখনও ভয়? আয়, আমার কাছে সরে আয়। অনেক রাত্রি হয়েছে, ঘুমো এবার।

ঠাকুমা নাতিকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। তাঁর কোলে মুখ লুকিয়ে সমর একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে বৃষ্টি সমানেই পড়তে লাগল কিন্তু এই দুই সুপ্তিমগ্নের নিশ্চিন্ততায় তা আর কোন দাগ কাটতে পারল না।

আষাঢ়-রাত্রির সেই দিনের পর দীর্ঘ দশ বৎসর কালস্রোতে মিলিয়ে গেছে। কমলের জন্মের দু' বৎসরের মধ্যেই তার ঠাকুমার দেহান্ত হয়েছে দেশের বাড়ীতে। এই মৃত্যু আর কমলের একটি ছোট বোনের জন্ম হওয়া ছাড়া ডাঃ সেন-এর সংসারে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। ডাঃ সেন বৃদ্ধ হয়েছেন। মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি আর কিছুরই তাঁর অভাব নেই। জীবনে তিনি প্রচুর আয়ও ভোগ করেছেন। অর্থসম্পদ যেমন তিনি পেয়েছেন তেমনই ব্যয় করেছেন, দান করেছেন, কিছুই সঞ্চয় তিনি করেন নি; তবু এর জন্ত তাঁর কোন ক্ষোভ নেই। সমর বড় হয়েছে। তাঁর মনের মত হয়ে গড়ে উঠেছে। ডাঃ সেন-এর অবর্ত্তমানে সে-ই সংসারের ভার নিতে পারবে।

চেম্বারে যাবার জন্ত পোষাক পরতে পরতে ডাঃ সেন অতীত দিনের সব কথা ভাবছিলেন। পাশে একজন চাকর তাঁর জুতা পালিশ করছিল। কমল আর তার ছোট বোন মীরা বাইরে বাগানে খেলা করছিল। জানলা দিয়ে তাদের গলার আওয়াজ ভেসে আসছিল। জুতা পালিশ হয়ে গেলে ডাঃ সেন চাকরকে বললেন মিসেস সেনকে ডেকে দিতে।

অল্পক্ষণ পরে মিসেস সেন ঘরে আসতে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল বিকেলে কি তোমার গাড়ী চাই? কোথায় যাবে বলছিলে না?

মিসেস সেন উত্তর দিলেন—মহাত্মা গান্ধী আসবেন। তাঁর বক্তৃতা শুনতে এক ঘণ্টার জন্ত পার্কে যাব।

—তাহলে সতীশকে বলে রেখো, বলে ব্যাগ হাতে টুপিটা হাতে নিতে মিসেস সেন তাঁকে বললেন—ওগো শোন, এত তাড়াতাড়ি চলে যেও না। একটা কথা তোমায় বলব। কোন কথা তো তোমার শোনবার সময়ই হয় না! সমর কি বলে জান? ও না কি অসহযোগ করে কলেজ ছেড়ে দেবে। ওকে একটু বুঝিয়ে বোলো, হঠাৎ যেন ও এরকম কাজ না করে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ডাঃ সেন হাতের টুপিটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন—ও কি তোমার সঙ্গে কংগ্রেসের মিটিং-এ যায়?

—প্রায়ই তো যায়।

—ওকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও।

মিসেস সেন ব্যাকুল ভাবে বললেন—তুমি ওর ওপর রাগ কোরো না। জোর করে ওকে কিছু বোলো না।

ডাঃ সেন একটু হেসে বললেন—বড়বৌ, রাগ আমি করব না। রাগ করলে কি আমি তোমাদের এতটা স্বাধীনতা দিতাম? কংগ্রেসের মিটিং-এ তোমাদের যাওয়া বন্ধ করা কি আমার পক্ষে শক্ত হত? আমি কখনও তোমাদের কোন কাজে বাধা দিই না কেন জান? বাধা দিই না এজন্ত যে, আমি জানি, আজ যদি আমি তোমাদের এ সামান্ত স্বাধীনতায় বাধা দিই, তাহলে একটা বড় স্বাধীনতার, আমাদের দেশের স্বাধীনতার মূল্য তোমরা কখনও বুঝতে পারবে না। সমরকে তুমি ডেকে দাও।

স্বাধীনতার অর্থ যে কঠোর ত্যাগ ও সংযমের পরীক্ষা! স্বাধীনতা পেতে গেলে যে কেবল ভাঙতেই হয় না, গড়তেও হয়, সে কথাই আজ আমি সমরকে বুঝিয়ে বলব।

মিসেস সেন চলে যাবার একটু পরে সমর ঘরে ঢুকে বলল,—বাবা, আমায় কি তুমি ডেকেছ?

ডাঃ সেন বললেন—তোমার মার কাছে শুনলাম সমর, তুমি না কি পড়াশুনা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে চাও?

—হাঁ, বাবা!

তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু এর পরিণাম কি তুমি ভাল করে চিন্তা করেছ? আজ তুমি যাদের কথায় স্কুল ছেড়ে দিতে চাইছ, তাদের সম্বন্ধে যদি ভাল করে খোঁজ নাও, তাহলে দেখবে, তাদের বেশী ভাগই এমন ছেলে—যাদের পড়াশুনার প্রতি কোন দিনই কোন টান ছিল না। তাদের পক্ষে কলেজ ছাড়া না ছাড়া সবই সমান। লোকের প্রশংসা নেবার জন্যই তারা কলেজ ছেড়ে দিতে চাইছে। কিন্তু এই উত্তেজনা, এই প্রশংসার বন্যা যখন শান্ত হয়ে আসবে তখন আর তাদের উদ্দেশ্য থাকবে না। যে ছেলে এ রকম। যারা পড়া, খেলা, আদর্শ সব বিষয়েই কেবল ফাঁকি দিয়ে বড় হতে চায় তাদের নিয়ে দেশের কোনও ভাল কাজ কখনও হয়নি, হতে পারে না। এসব ছেলেরা একটা সংগঠনকে নষ্ট করে মাত্র; আর কিছু নয়। তবু, আমি জানি, আজ যারা কলেজ ছেড়ে দিতে চাইছে তাদের মধ্যে এরাই সব নয়, তোমার মত ছেলেও আছে। যারা একবার স্কুল ছাড়লে আর কোন প্রলোভনেই ফিরে আসবে না। সহস্র দুঃখের আঘাতে তাদের অমূল্য জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে, অথচ দেশ স্বাধীন হলে তাদের কথা কেউ মনেও রাখবে না। তোমাকে এরকম হতে দেখলে আমার একটুও দুঃখ হোতো না। ভাবতাম, দেশের জন্য কত লোক কত ত্যাগ করছে, তার তুলনায় আমার এ পুত্রদান খুবই সামান্য।

কিন্তু আমার মনে হয় তোমার পথ এ নয়, তোমার পথ ভিন্ন। কেবল চাকরী করবার জন্য যে পড়া সে পড়ার জন্য তোমায় আমি স্কুলে দিইনি। তোমার মধ্যে যে প্রতিভার লক্ষণ দেখেছিলাম তারই বিকাশের জন্য যথার্থ শিক্ষালাভে আমি তোমায় উৎসাহিত করেছি এত দিন।

যে অমর প্রতিভা যুগ-যুগান্তরে একবারই পৃথিবীতে আসে। যে প্রতিভা দেশকে, মানবজাতিকে বড় করে তোলে, সে প্রতিভা আমি তোমার মধ্যে দেখেছি। একে কি তুমি আজকের এই ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার খড়্গে বলি দিতে চাও? আমার মনে হয়, এ অধিকার তোমার নেই।

যাই হোক, তুমি বড় হয়েছ। তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে। তাই আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বোঝাটা আর জোর করে তোমার ওপর আমি চাপাতে চাই না। তোমারই বিবেচনার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম।

ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে সমর উত্তর দিল—তুমি যা বলছ তাই হয়ত ঠিক বাবা! আমি আর হঠাৎ কিছু করব না। সব কথা আর একবার ভাল করে ভেবে দেখব।

সমরের কথা শেষ হতে, টুপি তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে ডাঃ সেন বললেন—তোমার কথায় আমি খুব আনন্দিত হয়েছি সমর, নিশ্চিন্ত হয়েছি। তুমি আমার গৌরব।

যাও মাকে তোমার কথা জানিয়ে এস। তিনি তোমার জন্য বড় ভাবছেন।

এক বছর কেটে গেছে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে। স্কুল-কলেজে সাধারণের জীবনে যে উত্তেজনার ঢেউ জেগেছিল তা নৈষ্কর্ম্য, অবসাদের নদীতে মিলিয়ে গেছে।

সমরদের বাৎসরিক পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে, তাই তাকে বেশ পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

অঙ্ক কষতে কষতে সমর মাথা তুলে তাকাল। সূর্য্য আকাশে অনেকটা উঠেছে। শীতের সকালের মিষ্টি রোদে ছাদে বসে অঙ্ক ভারী ভাল লাগে। শক্ত শক্ত অঙ্ক যেন আপনা হতে হয়ে যেতে থাকে। সব অঙ্ক হয়ে গেছে, কেবল একটা গ্রাফ করা বাকী। পেনসিলের শীসটা মোটা হয়ে গেছে। গ্রাফ করবার জন্য শীসটা সরু করে কাটতে হবে। পেনসিল কাটবার ব্লেডটা নিতে গিয়ে সমর দেখল ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্সে ব্লেডটা নেই। নিশ্চয় কমল নিয়ে পালিয়েছে।

একটু আগেই সে পেয়ারা কাটবার জন্য ব্লেড চাইতে ছাদে এসেছিল। ছাদের আলসের ওপর হতে ঝুঁকে পড়ে সমর জিজ্ঞাসা করল—মা, কমল কোথায়? আমার পেনসিল কাটবার ব্লেড নিয়ে পালিয়েছে।

নিচের রান্নাঘর হতে মিসেস সেন উত্তর দিলেন—কমল আমার কাছে। আজ ও স্কুল যেতে চাইছে না, বলছে তোমার বাবার সঙ্গে যাবে, তাই ওকে একটু খাইয়ে দিচ্ছি। ওঁর ফিরতে তো সেই একটা বাজবে!

সমর জিজ্ঞাসা করল—বাবা কি এখনই ক্লিনিক-এ যাবেন? এখনও তো বেশী বেলা হয়নি?

—আজ কি কাজ আছে বলছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি যাবেন।

—আরে, আমাকে যে আমাদের প্রাইজের কথা বাবাকে মনে

করিতে দিতে হবে? 'বলতে বলতে সময় নীচে নেমে এসে মিসেস সেনকে জিজ্ঞাসা করল—বাবা কোথায় মা?

—তোমার বাবা ও-ঘরে কাপড় ছাড়ছেন।

নীল রং-এর ভারী পর্দাটা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে সময় দরজায় পা বেধে পড়ে যাচ্ছিল। পাশে রাখা একটা চেয়ার ধরে সামলে উঠে দাঁড়াতে ডাঃ সেন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এত ব্যস্ত কেন সময়? কিছু দরকার আছে? আমার হাতের বোতামটা একটু এঁটে দাও তো।

বোতাম আঁটতে আঁটতে সময় জিজ্ঞাসা করল—বাবা, আজ আমাদের প্রাইজ, তোমার নিমন্ত্রণ আছে ভুলে যাওনি তো?

—না মনে আছে। সাড়ে পাঁচটায় যেতে হবে, নয়?

—হ্যাঁ। জান বাবা, আমি সব সাবজেক্টে ফার্ষ্ট হয়েছি বলে একটা সোনার মেডাল পাব।

ডাঃ সেন সময়ের কথায় কোন উত্তর দেবার আগে—বাবা, আজ দেরী করে এসো না, মা বললেন, বলতে বলতে কমল ঘরে এল।

ডাঃ সেন তাকে বললেন—কমল দেখ তো গাড়ী ঠিক হয়েছে কি না?

সময় আবার বলল—বাবা আজ তুমি নিশ্চয়ই যেও।

ডাঃ সেন বললেন—যাব বই কি সময়! তোমার প্রাইজের কথায় আমি খুব খুসী হয়েছি। তুমি কখন যাবে?

—আমায় প্রাইজের একটু আগে যেতে হবে। আমি সাড়ে চারটের সময় যাব।

—গাড়ী চাই তোমার?

—না বাবা, আমি অন্য ছেলেদের সঙ্গে সাইকেলেই যাব।

টাইবাঁধা শেষ করে পকেট হতে ময়লা রুমালটা বার করে ড্রয়ার থেকে একটা ফর্সা রুমাল নিয়ে ডাঃ সেন বাইরে গেলেন।

গাড়ী চড়বার জন্য কমল কোচোয়ানকে বিরক্ত করছিল। ডাঃ সেনকে দেখে কমলকে ছেড়ে কোচোয়ান তাঁকে সেলাম করল। কমলের হাত ধরে ডাঃ সেন বললেন—তাড়াতাড়ি কোরো না কমল! একবার এরকম করে গাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছিলে, মনে আছে না ভুলে গেছ?

ভোলা সিং ঘোড়া পাক্‌ড়ো। ওঠ এইবার কমল, আস্তে আস্তে। চলো ভোলা সিং। সহর হোকে চলনা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কমল ডাঃ সেন-এর ষ্টেথিসকোপটা হাতে নিয়ে বললে—বাবা, একটা কথা বলব?

ডাঃ সেন তার হাত হতে ষ্টেথিসকোপটা নিয়ে বললেন—তুমি বড় ছটফট কর কমল, এরকম করলে আর কোন দিন তোমায় আনব না। কি কথা বলবে? কিছু চাই বুঝি?

—আজ আমায় একটা ঘুড়ি আর লাটাই কিনে দেবে বাবা? আমি আর কোন দিন রোদ থাকতে ছাদে উঠব না। বিকেলে ঘুড়ি ওড়াব। বল না বাবা, দেবে?

—আচ্ছা দেবো। এখন চুপ করে বোসো, ওই দেখ আমরা দোকানে এসে গেছি।

সন্ধ্যা হয়েছে, প্রাইজ দেওয়া কিছুক্ষণ হল শেষ হয়েছে। সময়কে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। দূর হতে তাকে দেখতে পেয়ে সময় তার কাছে গিয়ে বলল—তোরা কখন এলি রে কমল? তোদের তো প্রাইজের সময় দেখতে পেলাম না? আমাদের গাড়ীটা কোথায়?

সময়ের হাত হতে প্রাইজের বইগুলি নিয়ে দেখতে দেখতে কমল উত্তর দিল—যেই তুমি প্রাইজ নিতে যাচ্ছিলে ঠিক সেই সময়ই আমরা এসে পৌঁছেছি। ওই যে আমাদের গাড়ী নিমগাছটার তলায়। চল গাড়ীতে চড়ি। ওই দেখ বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। কি সুন্দর চকচকে বই দাদা, কত সুন্দর ছবি।

—বই দেখে আর তোর কি লাভ? তুই তো আর এবার প্রাইজ পাবি না।

—দেখো আসছে বারে পাই কি না! অঙ্ক যা শক্ত ছিল এবার, তাইতো কম নম্বর হয়ে গেল!

—মেয়েদের ইস্কুলে তো পড়িস তার আবার শক্ত অঙ্ক!

—তুমি তো খুব জান। আমাদের ইস্কুলে একশর' মধ্যে সত্তর পাশ নম্বর, সেটা মনে আছে?

—যাই হোক, মেয়ের কাছে হেরে গেছিস তো?

—যে মেয়েটা ফার্ষ্ট হয়েছে সে আমার চেয়ে মাত্র দশ নম্বর বেশী পেয়েছে আমি যদি একটা অঙ্ক দুবার দেখতাম তাহলে যে অঙ্কটা ভুল হয়েছে সেটা হোতো না, আর আমি ওর চেয়ে বেশী নম্বর পেতাম। এবার আমি ওকে ঠিক হারাব।

আর তুমি হারিয়েছ? অত গল্পের বই পড়লে কি আর অঙ্কের কথা মনে থাকে? বই পড়বার জন্য, যে কাচের আলমারীটাতে আমি আমার সন্দেশ, মৌচাক, মুকুল রেখেছি সেটাও তো ছিঁড়েছিস!

—তুমি কেন আমার কাছ থেকে বই লুকিয়ে রাখ? তাই তো ছিঁড়েছি! জান দাদা, আজ খুব মজা হয়েছে। তুমি তো আজ খদ্দরের ধুতী, পাঞ্জাবী আর টুপী পরে গিয়েছিলে? তাই দেখে বাবার পাশে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি বলছিলেন, ডাঃ সেন, এত ছেলের মধ্যে আপনার ছেলেই কেবল খদ্দর পরে এসেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রাইজ দিচ্ছেন, চারি দিকে পুলিশ। আজ-কালকার কাণ্ড জানেনই তো, যদি আপনার ছেলে একবার পুলিশের নজরে পড়ে তাহলে ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ী তো আপনি রোগী দেখেন। আপনার ওকে বারণ করা উচিত ছিল।

এই শুনে বাবা বললেন, ও তো কোন অন্যায় করেনি। অন্যায় করলে নিশ্চয়ই বারণ করতাম। ও যদি আজ পুলিশের ভয়ে খদ্দর না পরে আসত, তাহলেই আমি দুঃখিত হতাম। আর ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী আমি চিকিৎসা করি, তার সঙ্গে আমার ছেলের পোষাকের কি সম্বন্ধ?

এই শুনে ভদ্রলোক একেবারে চুপ।

ক্রহামের এক কোণে ডাঃ সেন নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। তাঁর চিন্তামগ্ন মুখ এক একবার রাস্তার আলোয় আলোকিত হয়ে পরক্ষণেই অন্ধকারের গর্ভে মিলিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেদের কথা শরতের মেঘের মত, তাঁর মনের আকাশকে স্পর্শ করছিল মাত্র, কিন্তু কোন দাগ কাটতে পারছিল না। কঠিন সংগ্রাম করে তাঁকে
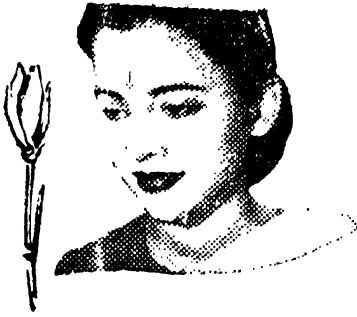
ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা ব্যবহারে ফুটে উঠবে
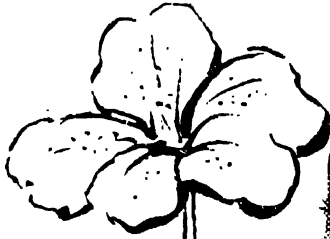
রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তোলে।
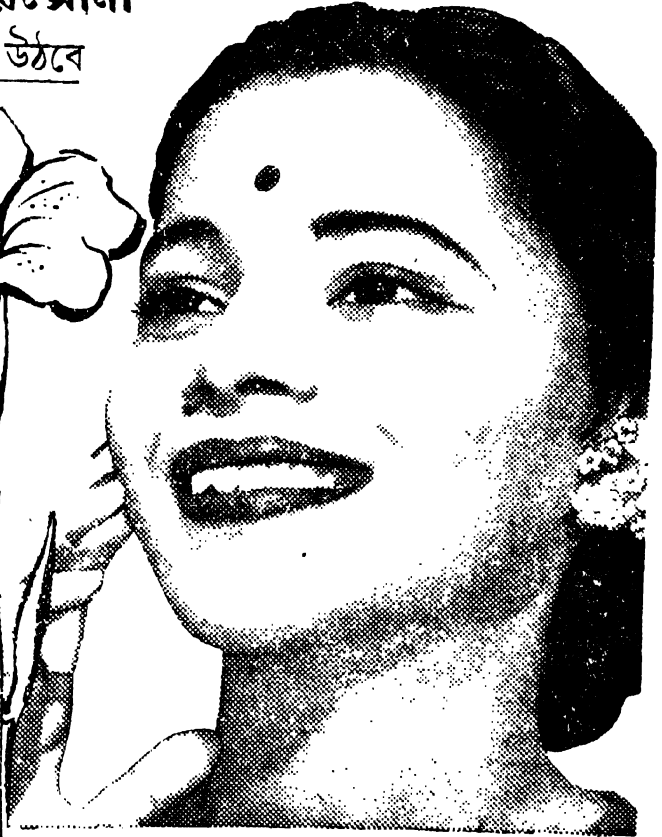
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

মনে হচ্ছে, তাঁর সে সংগ্রাম সার্থক হয়েছে। সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর জীবন-সংগ্রামের পূর্ণ মর্য্যাদা পেয়েছেন। যে অনন্ত জীবনধারার তিনি একজন নগণ্য বাহক, সেই ধারায় আজ তিনি সময়ের মধ্যে তাঁর চেয়ে সহস্রগুণ যোগ্য প্রতিভূ রেখে যাচ্ছেন। এর চেয়ে বড় আনন্দের কথা আজ তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। সংসার তাঁকে সব দিয়েছে। আজ তিনি পূর্ণ। এবার তিনি বিশ্রাম নিতে পারেন।

আরও দু'বছর চলে গেছে। রান্নাঘরে বসে সকালের খাবার করতে করতে মিসেস সেন একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সকালের জমাট কুয়াশা আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসছে। আটটা প্রায় বাজে, কিন্তু এখনও ডক্টর সেন-এর কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য দিন এ সময়ে তাঁর চা খাওয়া হোয়ে যায়।

মীরা পাশে বসেছিল, তাকে তিনি বললেন—মীরা, তোমার বাবা কোথায় দেখ তো? ওঁর চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সমর রান্নাঘরে আসছিল। মিসেস সেন-এর কথা শুনে সে বলল—বাবা তো একটু আগে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে গেছেন। আমি ওখানে ছিলাম। আমাকে বললেন, তোমাকে ডেকে দিতে।

মিসেস সেন মীরাকে বললেন—মীরা, তুমি এখানে বস। সমরকে এক পেয়ালা চা করে দাও, আমি যাই, তোমার বাবা কি বলছেন শুনে আসি।

চায়ের ট্রে হাতে করে ডক্টর সেন-এর ঘরে ঢুকে মিসেস সেন দেখলেন, ডক্টর সেন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

হাতের ট্রে টেবিলে রেখে মিসেস সেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কি চা খাবে না? এত দেরী হল উঠতে?

মিসেস সেন-এর কথা শুনে ডক্টর সেন ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—বড়বৌ, আমার হাতে একবার চিমটি কাটো তো, এখানটা অসাড় মনে হচ্ছে, বোধ হয় প্যারালিসিস হবে।

এক আসন্ন বিপদের সংকেতকে নিজের মনে জোর করে চেপে মিসেস সেন বললেন—ও কিছু নয়। তোমার কেবল ওই ভয়। কাল অনেক রাত্রে ফিরেছ, তাই ঠাণ্ডা লেগে ওরকম হয়েছে। শীতের রাতে এত দেরী কেন কর, বুঝি না! চল, ওঘরে চল, শুয়ে পড়, একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ আর বেরিও না।

একটা সেফটিপিন দিয়ে নিজের হাতের সেনসেশন পরীক্ষা করতে করতে ডক্টর সেন বললেন—তাই চল।

—লেপ দেবো আর একটা? শীত করছে?

—না, আর লেপের দরকার নেই। ঘরটা বড় অন্ধকার। সব জানলা খুলে দাও, ঘরে আলো আসুক।

—ডাঃ মিত্রকে কি ডাকিয়ে পাঠাব?

—এখন দরকার নেই। একটা প্রেসক্রিপশন আমি নিজেই করে দিচ্ছি, সেটা আনিয়ে নাও। কাগজ-পেন্সিল দাও! প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ করে সেটা মিসেস্ সেনের হাতে দিয়ে ডাঃ সেন বললেন,—আমি এবার ঘুমাব, দেখো কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে।

ডাঃ সেনকে ভাল করে শুইয়ে মিসেস্ সেন ঘরের সব জানলা খুলে দিলেন। সোনালী রোদে ঘর ভরে গেল। বাইরে তখনও সামান্য কুয়াশার আভাস। মিসেস্ সেনকে অনেকক্ষণ ঘরে আসতে না দেখে সমর, মীরা আর কমল তিন জনেই এদিকে আসছিল। ঘরে ঢুকে মিসেস্ সেনকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মিসেস সেন ঠোঁটে আঙুল রেখে তাদের চুপ করতে বললেন। সকলেই বুঝতে পারল সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে কিন্তু কেউ আপনার সন্দেহের কথা অন্যকে বলতে পারল না। প্রত্যেকেই মনে করতে লাগল তার নিজের জানাটাই ভুল, সকালের কুয়াশার মত একটু পরেই সেটা মিলিয়ে যাবে। ডাঃ সেন আবার আগের মত উঠে বসবেন।

এ নিস্তব্ধতা ভেঙে কমলই প্রথমে কথা বলল। জিজ্ঞাসা করল—মা, আজ কি আমি স্কুলে যাব না? কখন খেতে দেবে? বাবার কি হয়েছে মা?

মিসেস্ সেন বললেন,—কিছু হয়নি কমল, তুমি স্কুলে যাও আজ যা রান্না হয়েছে তাই দিয়ে খেয়ে নাও। মীরা তোমায় খেতে দেবে। এখানে আর গোলমাল কোরো না, যাও।

শনিবার স্কুলে হাফ-হলিডে। ছুটির পর কয়েকটি ছেলে কমলের সঙ্গে কথা বলছিল। একজন কমলকে জিজ্ঞাসা করল—তুই আজ ক্লাশে ভাল করে পড়া কেন বলতে পারলি না রে?

আর একজন পকেট হতে মার্বেল বার করে বলল—এত তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে কি হবে, আয় গুলী খেলি।

হাতের বই-এর থলি কাঁধে ঝুলিয়ে কমল উত্তর দিল—না ভাই, আজ আর খেলব না। বাড়ীতে বাবার বড় অসুখ করেছে। আমার আজ কিছু ভাল লাগছে না। আমি বাড়ী যাচ্ছি।

বাড়ীর সামনের গলিটাতে ঢুকে পর্য্যন্ত কমলের মন অস্থির হয়ে উঠেছিল। বাড়ীতে ঢুকে, টানা বারান্দার কোণে ডাঃ সেন-এর ঘরের দরজায় অনেক লোকের ভিড় দেখে সে অস্থিরতা এক অজানা ভয়ে রূপান্তরিত হল। কমলের শরীর শির-শির করতে লাগল। বারান্দা পার হয়ে, ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকতে কমলের চোখে পড়ল, ডাঃ সেন-এর পায়ের ওপর মুখ রেখে সমর কাঁদছে।

কমলকে দেখে মিসেস সেন কেঁদে বললেন—কমল, তোমার বাবা নেই। মিসেস-এর চোখে জল, তাঁর শোকাহত মূর্ত্তি, কমলকে ক্ষণকালের জন্য যেন হতচেতন করে দিল।

মিসেস সেন-এর চোখের জলে ভেজা, তাঁর খুলে-যাওয়া চুলে ঢাকা, ডাঃ সেন-এর শান্ত মুখশ্রী ছাড়া আর সব কিছু তার দৃষ্টিপথ হতে মিলিয়ে গেল। ব্যাধতাড়িত পশুর মত কমল একবার প্রাণপণে চীৎকার করতে চাইল কিন্তু সে মর্ম্মান্তিক চেষ্টাতেও তার বিশুষ্ক কণ্ঠ হতে বিন্দুমাত্র শব্দ বার হোলো না। চারি দিকের লোকারণ্যের মধ্য হতে একপা একপা করে বাইরে এসে একদৌড়ে ছাদে গিয়ে কমল দেখল, মীরা সেখানে বসে কাঁদছে।

অস্তগামী সূর্য্যালোক গাছের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। বাতাস বইছে না। সমস্ত বাড়ীতে, এমন কি চাকরদের ঘরেও কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। পৃথিবীকে রিক্ত করে তার সমস্ত কোলাহল যেন নিচের সেই ছোট ঘরে যেখানে ডাঃ সেন শান্তিতে শুয়ে আছেন, সেখানে জড়ো হয়েছে।

গাছের ছায়া ধীরে ধীরে আসন্ন সন্ধ্যার যবনিকায় মিলিয়ে গেল।

সেই প্রদোষান্ধকারে, প্রকৃতির অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে মীরার বিরামহীন কান্না দেখে কমলের মন এক নিষ্ফল ক্রোধে ভরে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলতে লাগল—কেন ও কাঁদছে? কেন ও সব বুঝতে পেরেছে, আমি পারছি না? কেন আমার কেবলই মনে হচ্ছে বাবা ঘুমাচ্ছেন, এখনই জেগে উঠে আমায় ডাকবেন? বলতে বলতে এতক্ষণ পরে কমলের চোখ জলে ভরে এল।

নিস্তব্ধ, বিষণ্ণ সেই শীতসন্ধ্যায়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি ছোট ছেলে সেদিন জীবনকে অন্য ভাবে দেখতে শিখল।

ডক্টর সেনের মৃত্যুর পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর বহু পরিবর্তন হয়েছে। ডক্টর সেনের সংসারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর সংসারকে ঘিরে এই কয় বছরে এক নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের ছায়া নেমেছে। বাড়ীর সামনের সুদৃশ্য বাগান জঙ্গলে ভরে গেছে। গাড়ী-ঘোড়া রাখবার আস্তাবল আর চাকরদের ঘর ভেঙ্গে ইটের স্তূপ হয়েছে। সেখানে বুনো চারাগাছের নীচে সাপেরা মনের সুখে বাসা বেঁধেছে। বাড়ীর বাইরের দেয়ালে স্থানে স্থানে চূণবালি খসে, নীচের ইটে নোণা ধরেছে। ভেতরের অবস্থাও সমান। ঘরগুলির সিমেন্টের মেঝে ভেঙ্গে এত গর্ত্ত হয়েছে যে সেখানে পা ফেলে চলতে কষ্ট হয়। এরই মধ্যে যে ঘরটা একটু ভাল সেখানে মাটিতে মাদুর পেতে বসে কমল অঙ্ক কষছিল। পাশেই সমর একটা গ্রাফ পেপারের ওপর পিন এঁটে কি দেখছিল। কমলের অঙ্ক শেষ হলে সে খানিকক্ষণ সমরের কাজ দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করল—ও কি করছ দাদা?

একটা পিন্ সরাতে সরাতে সমর উত্তর দিল—রিলেটিভিটি থিয়োরীর একটা নতুন দিক ভাবছি। তোকে তো রিলেটিভিটি থিয়োরীর একটা দিক বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। কিছু মনে আছে?

কমল এ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য মুখ তুলতে দরজার পাশে মিসেস সেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। মিসেস সেন ঘরে আসছিলেন। তাঁকে দেখে সমরের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই বইখাতা নিয়ে কমল পাশের ঘরে চলে গেল। ডক্টর সেনের মৃত্যুর পর মিসেস সেনের জীবনে যে নির্লিপ্ত বৈরাগ্য এসেছে তার কঠিনতাকে কমলের ভয় করে।

মিসেস সেন খানিকক্ষণ দুই ভাইকে দেখলেন, বিশেষ করে সমরকে। সমরের উপর তাঁর অনেক ভরসা।

সমরকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কমল, ঠিক ভাবে পড়াশুনা করে তো?

সমর উত্তর দিল—হ্যাঁ মা, ও ভালই পড়াশুনা করে।

মিসেস সেন আবার জিজ্ঞাসা করলেন—ইনকাম ট্যাক্সের যে চাকরীটার জন্য তোমায় দরখাস্ত করতে বলেছিলাম, তার কোন জবাব এসেছে?

একটু ইতস্তত করল সমর, কি যেন' সে ভাবলে, তার পর বলল—হ্যাঁ, তারা আমায় ইনটারভিউএর জন্য ডেকেছে।

—কবে ইনটারভিউ?

—এ মাসেই। কিন্তু মা, ইউনিভার্সিটিতে আমি যে রিসার্চ্চ করছি, সেটা ছেড়ে এ কাজ কি আমায় নিতেই হবে?
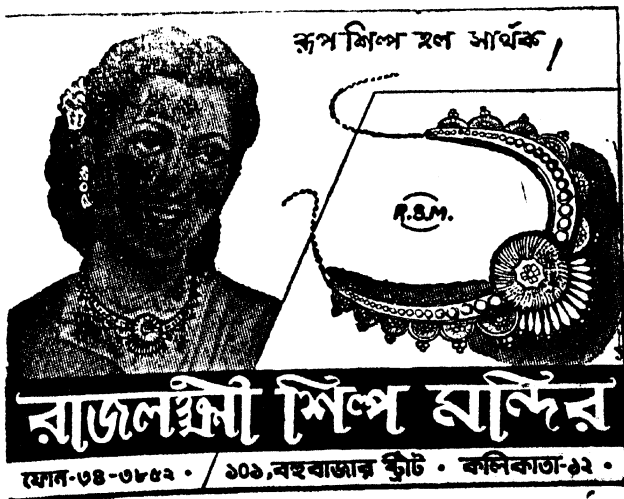
—এ কথাও কি তুমি জিজ্ঞাসা করবে সমর? তোমার বাবা আজ পাঁচ বছর হল মারা গেছেন। এই বাড়ী ছাড়া আর তিনি কিছুই রেখে যেতে পারেননি। আমার গহনা, দামী আসবাবপত্র, গাড়ী-ঘোড়া সব বিক্রী করে এ কয় বছর আমি এ সংসার চালিয়েছি। তোমাকে মানুষ করেছি, যাতে এ সংসারের ভার তুমি নিতে পার। আজ যদি তুমি নিজ দায়িত্ব অস্বীকার কর, তাহলে কি করে চলবে?

—কিন্তু বাবার যে শেষ ইচ্ছা ছিল আমি রিসার্চ্চ করি? আমি চাকরী করি, এ তিনি কোন দিন চাননি। এ চাকরী করে তাঁর শেষ ইচ্ছার অপমান আমি কি করে করব? একটা বছর কি আর তুমি অপেক্ষা করতে পার না? এক বছর সময় পেলে আমি আমার রিসার্চ্চের জন্য ইউনির্ভাসিটি হতে একটা স্কলারশিপ পেতে পারি। আমার রিসার্চ্চ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এটা আমাকে যে শেষ করতেই হবে।

—তা হয় না সমর! স্কলারশিপ নিয়ে রিসার্চ্চ করলে তোমার চলবে কিন্তু এ সংসার অচল হবে। কমল আর কিছুদিনের মধ্যেই মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবে। মীরা বড় হয়ে উঠছে, তার বিয়ের খরচ আছে। তুমি চাকরী না করলে এ-সব কোথা হতে আসবে? তুমি কি চাও, সংসারের জন্য তোমার বাবার শেষ চিহ্ন এই বাড়ী আমি বিক্রী করি? রিসার্চ্চ করে তোমার কি হবে জানি না কিন্তু এ মনে রেখো, এ সংসার তোমার কাছে অনেক আশা করে আছে।

ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে কমল উত্তর দিল—তুমি ঠিক বলেছ মা।

এ সংসার আমার কাছে অনেক আশা করে আছে। এরই জন্ত আমার চাকরী করতে হবে। হয়ত—হয়ত এই আমার নিয়তি!

মিসেস সেন সমরের মাথায় হাত রেখে বললেন—দুঃখ কোরো না সমর, ঈশ্বর একদিন নিশ্চয়ই তোমার ভাল করবেন। মন স্থির কর। আমি যাই।

কমল এতক্ষণ পাশের ঘরে চুপ করে বসেছিল। মিসেস সেন-এর যাওয়ার শব্দ পেয়ে সে সমরের ঘরে এসে দেখল, সামনের গ্রাফ-পেপারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সমর বসে আছে।

আস্তে আস্তে কমল জিজ্ঞাসা করল—দাদা, একটা কথা বলব?

গ্রাফপেপার হতে চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে সমর বলল—কি রে, কি কথা?

—আমার আর মীরার জন্তই কি তুমি রিসার্চ্চ ছেড়ে চাকরী করবে?

—এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছিস?

—মার সঙ্গে যা তোমার কথা হয়েছে সব আমি শুনেছি।

—হ্যাঁ কমল, চাকরী আমায় করেতেই হবে, ওরই মধ্যে সময় করে আমি রিসার্চ্চ করব। আমার জন্ত ভাবিস না। মেডিকেল কলেজে তুই প্রথম চেষ্টাতেই ভর্ত্তি হতে পারবি তো?

—ঠিক পারব!

—কম্পিটিটিভ এগজামিনের জন্ত একটু আলাদা ভাবে পড়াশুনা করতে হয়। প্রশ্নের উত্তর ছোট করে লিখিস। কোন অসার, অবান্তর কথা যেন উত্তরে না থাকে। মেডিকেল কলেজে পড়তে তোর ভাল লাগবে তো রে?

—নিশ্চয়ই লাগবে। জান দাদা, আমিও রিসার্চ্চ করব, তাই আমি ডাক্তারী পড়তে যাচ্ছি। বইতে যে সব বড় বড় ডাক্তারদের কথা পড়েছি রিসার্চ্চ করে আমিও তাদের মত বড় হব। মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েই আমি প্রফেসরদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব। তারা নিশ্চয়ই আমার সাহায্য করবেন।

কমলের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে সমর তার দিকে ফিরে বলল—না কমল, না, এ পরাধীন দেশে রিসার্চ্চের কথা তুই মনেও আনিস না। রিসার্চ্চ করতে গেলে তোকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। যারা তোর সঙ্গে ডাক্তারী পাশ করবে, তারা তোর চোখের সামনে বড় হয়ে যাবে আর তুই একটু একটু করে তলিয়ে যাবি। মান-সম্ভ্রম খ্যাতি-প্রতিপত্তির শিখরে হবে অন্ত সকলের আসন আর তুই সকলের পায়ের তলায় থাকবি। দুঃখ, দারিদ্র্য, অন্যায় অসত্যের সঙ্গে তোকে প্রতিদিন সংগ্রাম করতে হবে। যাদের জন্ত তুই সব ত্যাগ করবি, তারাই তোকে দিনের পর দিন ছোট করতে চেষ্টা করবে। রিসার্চ্চের জন্ত এত বড় মূল্য তুই কেন দিবি?

—আমি সব জানি দাদা! তবু যে পথ একদিন একবার আমি বেছে নিয়েছি সে পথ আমি কিছুতেই ছাড়ব না। রিসার্চ্চ করে আমি নিশ্চয় বড় হব। তোমার ঋণ শোধ করব।

অবোধ শিশুর প্রতি তার মা যেমন করে হাসেন, তেমন করে হেসে সমর শুধু বলল—আমার ঋণ! কমল তার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল—ও কথা কেন বললে দাদা? আর কিছু কি তোমার বলবার

সমর উত্তর দিল—ও কিছু না কমল! আশীর্ব্বাদ করি ঋণ শোধ করাটাই নয়, ঋণী থাকাটাই সত্য। না পাওয়াটাই সত্য, পাওয়াই মিথ্যে, একথা যেন একদিন তুই বুঝতে পারিস। ভগবান যেন তোকে সহ্য করবার শক্তি দেন। রিসার্চ্চের মধ্য দিয়ে জীবন সত্য যেন তোকে ধরা দেয়।

মেডিকেল কলেজে নূতন ভর্ত্তি হওয়া ছেলেদের মধ্যে এ্যানাটমির ক্লাশের ছেলেরা যখন প্রথম দিন, প্রথম শবব্যবচ্ছেদ শেষ করল তখন বিকাল হয়ে এসেছে। এদের মধ্যে কমলও ছিল। ডি সেকশনের পর হাত ধুয়ে নিজস্ব লকারে এ্যাপ্রণ বই ইত্যাদি রাখবার সময় এক অনাস্বাদিত সুখে তার মন ভরে উঠল।

মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবার কম্পিটিটিভ এগজামিনে কমল প্রথম চেষ্টাতেই পাশ করেছে। এবার সে নিজের যথার্থ স্থান খুঁজে পেয়েছে। সামনের লকারটার মত মেডিকেল কলেজটাই যেন তার একান্ত নিজস্ব মনে হচ্ছে। এখানে রিসার্চ্চ করে সে দুরারোগ্য ব্যাধির রহস্য ভেদ করবে। সমস্ত পৃথিবী যুগে যুগে তার নাম স্মরণ করবে, এ কথা ভাবতেও তার মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠছে।

লকার বন্ধ করে, অন্ত ছেলেদের সঙ্গে হষ্টেলে না গিয়ে কমল মেডিসিনের প্রফেসরের বাড়ী গেল। প্রফেসরের সঙ্গে রিসার্চ্চ সম্বন্ধে কথা বলবার মত শুভলগ্ন তার জীবনে আর আসবে না। আজ তার আশা-আকাঙ্খার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে।

কমল যখন প্রফেসরের বাড়ী পৌঁছাল, তখন তিনি বারান্দায় বসে বৈকালিক জলযোগ করছিলেন। পাশে একজন হাউস ফিজিসিয়ান দাঁড়িয়ে তাঁকে কি কাগজপত্র দেখাচ্ছিলেন। কমলকে দেখে প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলেন।—কে তুমি? কি চাও?

একটু থেমে কমল উত্তর দিল—সার, আমি কাল মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বলে এসেছি।

—ওঃ, তুমি একজন ফার্ষ্ট ইয়ার ষ্টুডেণ্ট! তা তোমাকে আমার কাছে আসতে কে বলল? নিজের যা বলবার হষ্টেলের ওয়ার্ডেনকে কেন বললে না?

—সার, আমার বড় ইচ্ছা, আমি মেডিসিনে রিসার্চ্চ করি, আপনি মেডিসিনের প্রফেসর! এ সম্বন্ধে আপনিই আমায় সব বলতে পারবেন। আপনার কাছে উপদেশ নিয়ে আমি নিজেকে রিসার্চ্চের জন্ত প্রস্তুত করব, তাই আপনার কাছে এসেছি।

সামনের প্লেট টেবিলের এক দিকে সরিয়ে, অতি বিস্মিত প্রফেসর, হাউস ফিজিসিয়ানকে বললেন, ওহে শোন, এ ছোকরা কি বলছে শোন! একদিন মাত্র যে ছেলে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে সে নাকি রিসার্চ্চ করতে চায়! ছেলেটার কি মাথা খারাপ আছে!

হাউস ফিজিসিয়ান বললেন—যেতে দিন সার, যেতে দিন। মেডিকেল কলেজে ঢোকবার আগে ওরকম মাথা গরম সবারই থাকে। এক বছর যেতে না যেতেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

এই বলে কমলকে উপেক্ষা করে তিনি আবার বলতে লাগলেন—ওহে যাও, আগে নিজের কলেজের পড়াই কর, তার পর রিসার্চ্চের কথা ভেব। সারের কাছে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বোলো না। [illegible]। আর যদি বিরূপ হন তাহলে

মেডিকেল কলেজ থেকে তোমায় পাশ করতেও হবে না, রিসার্চ তো দূরের কথা! যাও, স্যারের কাছে ক্ষমা চেয়ে মন দিয়ে পড়া-শুনা কর।

এতক্ষণ কমল মাথা নীচু করে ছিল, এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে সে বলল—আজ আপনারা একটা বিষয়ে আমার চোখ খুলে দিলেন। আজ আমি বুঝলাম, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কোন বিশেষ রিসার্চ আমাদের দেশে কেন হয় না। আমার এই নূতন দৃষ্টিদানের জন্য আমি চিরদিন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ প্রফেসর প্রায় চীৎকার করে বললেন—তুমি—তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এ ভাবে কথা বলতে সাহস কর? জান, এর পরিণাম কি?

শান্ত স্বরে কমল উত্তর দিল—পরিণাম ভয় আমায় আপনি বৃথা দেখাচ্ছেন। পরিণাম চিন্তা করলে রিসার্চ করবার কথা আমি কোন দিন ভাবতাম না। রিসার্চ আমি করবই, তাতে আমায় কেউ বাধা দিতে পারবে না।

কমলের দৃঢ়তা প্রফেসরকে আরও বিচলিত করে তুলল। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আমি তোমায় দেখে নেবো—মাত্র এই ক'টি কথা বলে তিনি কোন দিকে না তাকিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

শ্রান্ত ক্লান্ত কমল যখন হষ্টেলে ফিরল তখন ছেলেরা পাশের খেলার মাঠে জড় হয়ে কোলাহল করছিল।

মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবার আনন্দে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় তাদের মুখ ঝলমল করছিল।

এদের সঙ্গে নিজের অন্ধকার ভবিষ্যতের তুলনা করে এতক্ষণ পরে কমলের কেমন যেন ভয় করতে লাগল।

রিসার্চ সম্বন্ধে সমরের কথার সঙ্গে তার পরিচয় যে এমন করেই হবে, তা কমল ভাবতেও পারেনি।

কিন্তু এ তো আরম্ভ মাত্র। এর চেয়েও বড় বাধা আসবে, তার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে। সে প্রস্তুতির একমাত্র পথ কমল তার সামনে দেখতে পেল—কোন দুঃখে না ভেঙ্গে পড়া। দুঃখ, বাধা, বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রামেও যে আনন্দ আছে, যে সত্য আছে তাকেই আশ্রয় করে, অন্য সব কিছু তুচ্ছ করবার মত মনের জোর সঞ্চয় করা।

এ কথা মনে করে যে ভয় তাকে গ্রাস করতে আসছিল, সে ভয়কে জোর করে মন হতে সরিয়ে দিয়ে কমল খেলার মাঠে অন্য ছেলেদের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিল। [ক্রমশঃ।

দ্রৌপদী

সমীর ঘোষ

অর্জুন! তোমার কোন বীরত্ব নেই।
তুমি লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছ
সভাসদের লক্ষ করতালির মাঝে।
সেই গর্ব্বে তোমার বুক ফুলে ওঠে।
আর গর্ব্ব তোমার,—
জলেতে ছায়া দেখে
মীন-চক্ষু বিদ্ধ করেছ বলে।

কিন্তু হায় অর্জুন! এ-যুগে
দ্রৌপদীরা অনায়াসে রাইফেলে
'বুলস আই' হিট করে ফেলে।
—তাই বলি অর্জুন,
এ-যুগে তোমার কোন বীরত্ব নেই।

এ-যুগের দ্রৌপদীরা শূন্য-মনা,
স্বয়ংবরায় তাদের বর-মাল্য পেতে হলে
তাদেরই দীঘল চোখে ছায়া দেখে,
নিজেরই হৃদয়টাকে বিদ্ধ করতে হবে,
দগ্ধ করতে হবে অগ্নি-বাণে,
নিজেকেই।

তাই বলি অর্জুন!
এ-যুগে তোমার কোন বীরত্ব নেই।

কর্ম্মবীর মনোমোহন পাঁড়ে

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

এক

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুদূর পশ্চিমের আজমগড় জেলা হ'তে আসেন সুবিখ্যাত পাঁড়ে-বংশ যশোহর জেলার কায়বা গ্রামে। আজও সেই বংশই বাস করচেন সেই গ্রামেই প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই।

একটা আশ্চর্য্যের কথা—বাঙলা মুলুকে এসে তাঁরা জনসাধারণকে চমকিত ক'রে দিলেন অনন্যসাধারণ কর্ম্মকুশলতায়। নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা করতেন গোজাতির সেবা এবং পূজাও করতেন গোমাতার। গো-দুগ্ধই যে একমাত্র জীবনী-শক্তিবর্দ্ধক পুষ্টিকর খাদ্য, কৃষিকার্য্যে গোজাতিই যে অপরিহার্য্য অবলম্বন, তা' তাঁরা ভাল ভাবেই বুঝেছিলেন। আর সেই জন্যই গোপালনে তাঁদের ছিল অসাধারণ তৎপরতা।

জমি-জমা বিক্রী হ'চ্ছে জানতে পারলেই সাধারণের অপেক্ষা উচ্চ মূল্য দিয়ে কিনতে লাগলেন বহু চাষের জমি। তাঁদের কাজ-কর্ম্ম, আচার-আচারণ, চাল-চলন দেখে স্থানীয় লোকেরা বুঝতে পারলো এঁরা কত উঁচুদরের মানুষ!

আমাদের দেশ জয় ক'রে সাহেবরা যে সারা ভারতবর্ষে সম্মান প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন, সে কী কেবল রাজার জাত বলেই? তাঁদের বিপুল সাহস আর কর্ম্মদক্ষতাই তাঁদেরকে দিয়েছিল সুযোগ। তেমনি পাঁড়ে-বংশেরও সাহস, শৌর্য্য আর কর্ম্মদক্ষতাই ঐ অঞ্চলের লোকের কাছে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, আর নতি স্বীকার ক'রেছিল সাধারণ গ্রামবাসীরা তাঁদের কাছে। বেলা তিনটে বেজে যাচ্ছে, রৌদ্রের ঝাঁঝে চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তখনও ব'সে রয়েচেন মাঠে মজুরদের সাথে ঐ পাঁড়ে-বংশের ছেলেরাই। এমনি কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন তাঁরা। এ যেন এক নতুন জিনিস আমাদের দেশের লোকদের কাছে!

তখন 'দেশে রাজশাসন নেই বললেই চলে। চুরি ডাকাতি লেগেই রয়েছে এখানে ওখানে। আজমগড়ের পাঁড়েরা আসার পর কায়রা গ্রাম ঠাণ্ডা একরকম। তাঁদেরকে বলতে শুনা যেতো—আরে, চুরি হয় বাংলাতে, মেয়ে পর্য্যন্ত চুরি হয়ে যায়। আর তোরা সব দাঁড়িয়ে দেখিস ভেড়ার মতো? আমরা এ দেখবো না বাবা। যায় প্রাণ যাবে, লড়ে দেখবো।

অমিতবিক্রম পাঁড়েদেরকে কেউ পেরে উঠতো না। এ তো বাঙালীর মতো পরের ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে দেশ উদ্ধার করা নয়। এ নিজের মা হ'য়ে বলে ছেলেকে—যা তো বাবা, দেখে আয় ও পাড়াতে কিসের গোলমাল হ'চ্ছে। যাবার সময় মা বড় হাতিয়ারখানা তুলে দেন ছেলের হাতে।

এমনি ভাবে বেশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই বসে গেলেন তাঁরা কায়রা, শামটা ইত্যাদি গ্রামে। এ দেশের লোক বলাবলি করতে লাগলো ঐ পশ্চিমাদেরকে পারবে কে? ওরা যে সব এক জোট। ওরা লাঠি ধরতে জানে। মরবো বাঁচবো জ্ঞান নেই ওদের। আমরা যে এক হ'তেই জানি না ওদের মত।

এমনি ভাবে কয়েক পুরুষ কেটে গেল। তার পর আবির্ভাব হ'লো রামচন্দ্র পাঁড়ের প্রপৌত্র কনকচন্দ্রের। তাঁর হ'তেই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো পাঁড়ে-বংশের গৌরব। তিনি ছিলেন দানবীর আর বংশের এক প্রদীপ্ত নক্ষত্র। কেবল কায়রা শামটাতেই নয়, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর নাম। লোকে বলতো—ধুলোমুঠো ধরতে সোনামুঠো হয় কনক পাঁড়ের হাতে। আশ্চর্য! সে কালের মানুষও যে এত ভাল হ'তে পারতো কেউ চিন্তায়ও আনতে পারেনি। খুব বড় বড় পুষ্করিণী কাটিয়ে জলাভাব দূর করতে লাগলেন গ্রামবাসীদের। মস্ত বড় ঠাকুর-দালান ক'রে তাতে করলেন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, আর সেই সঙ্গে সেবাসত্রের ব্যবস্থা। ঠিক বেলা এগারটায় বেজে উঠতো দামামা। ঠাকুর-দালানের উপর হ'তে বলতে শোনা যেত—দুঃখী আতুর যারা আছো, এসো, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। একটা চলতি কথা প্রচলিত ছিল সে কালে—কনক রাজার দেশে না খেয়ে লোক মরে না। দেখতে দেখতে দেশের লোকের কাছে তিনি পেলেন রাজা উপাধি। মানুষের হৃদয়ে হ'লো তাঁর প্রতিষ্ঠা। সকলেই বলতো—কনক রাজা থাকতে আমাদের ভাবনা কী!

রেলপথ তখনও হয়নি। দূর-দূরান্তরে যেতে হ'লে কনক রাজার বাড়ীর পাশ দিয়েই হাঁটা পথ ধরে যেতে হয়। সন্ধান নিয়ে জানলেন, অনেক তীর্থযাত্রী যায় তাঁরই বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে, বহু ক্লেশে অভুক্ত অবস্থায়। অন্তর দিয়ে অনুভব ক'রলেন তাদের অসহনীয় কষ্ট। সংকল্প ক'রলেন দূর তীর্থপথের যাত্রীদেরকে অভুক্ত যেতে দেওয়া হবে না। অন্নদানই শ্রেষ্ঠ দান। এতেই হয় স্বর্গলাভ। ব্যবস্থা করলেন তীর্থযাত্রীদের সেবার, তাদের ভোজনের। সে এক সেদিনের বিরাট যজ্ঞ! এমন কি যোগের সময় দু'তিন হাজার তীর্থযাত্রীর ভোজনের ব্যবস্থা করতে হয়েচে তাঁকে। মা লক্ষ্মী যেন দু'হাত দিয়ে সব কুলিয়ে দিতেন কনক রাজার আয়োজন।

কিছু দিন পরে তাঁর মনে হ'লো, তিনি এক সাথে এক দিনে এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবেন। এ কাজ মনে হ'লেই করা চলে না। সে দিনে রেল বা ষ্টীমার হয়নি বললেই হয়। অত ব্রাহ্মণের সমাবেশ হবে কি ক'রে? কনক রাজা এই সমস্যা নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন মনের সঙ্গে। শেষে স্থির করলেন, ব্রাহ্মণসভার অধিবেশন করা আর যাতে দূর-দূরান্তর হ'তে আহূত ব্রাহ্মণগণ এসে সভায় যোগ দিতে পারেন, তারও ব্যবস্থা করা। ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হলো; আর তাঁর সঙ্কল্পসিদ্ধিরও যথোপযুক্ত পন্থা স্থিরীকৃত হলো।

সে কালের লোকে বলতো, লক্ষ ব্রাহ্মণকে একদিনে সমবেত করতে আর তাঁদেরকে ভোজন করাতে, মর্য্যাদানুযায়ী দক্ষিণা দিতে কনক রাজার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হ'য়েছিল। টাকার হিসাব আমরা করতে বসবো না, তবে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ যে একই দিনে সমবেত হ'য়েছিলেন এবং চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পরিতৃপ্তির সঙ্গেই ভোজন ক'রেছিলেন, এ আমাদের ভাল ভাবেই জানা আছে। সমস্ত ব্রাহ্মণের ভোজনের পর অভুক্ত কনক রাজা ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্ট ভোজ্য থেকে কিঞ্চিৎ গ্রহণ ক'রে মুখে ও মাথায় দিয়ে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি নিজের মাথায় বহন ক'রে ফেলে দিয়েছিলেন! তার পর তিনি আহার্য্য গ্রহণ করেছিলেন।

আজও সেই লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সযত্নে রক্ষিত আছে পাঁড়ে মশায়দের বাড়ীতে। কত লোক নিয়ে যায় কঠিন পীড়ায় পড়লে, আরোগ্য লাভের জন্য।

বার শো তেত্রিশ সালের বৈশাখ মাস আর পার হ'লো না। ২রা বৈশাখ রাজা কনকচন্দ্রের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেল। তখনকার দিনে শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় এখনকার মত সমারোহের প্রচলন ছিল না, তবু যে শুনেচে এ দুঃসংবাদ যেখানেই থাক্ না কেন, এসে দাঁড়িয়েচে, তাদের পরম হিতৈষী কনক রাজার শবের চতুষ্পার্শ্বে সজল নয়নে। সে দিন দশ-বিশখানা গ্রামের লোকের বাড়ীতে রন্ধনই হয়নি।

আরও এক আশ্চর্য্য ঘটনা এই কলিযুগে। রাজা কনকচন্দ্রের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী আর থাকতে পারলেন না প্রাসাদে। সব ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে সহমৃতা হ'লেন রাণী বিমলা দেবী স্বামীর চিতাগ্নিতে।

সকলেই বলাবলি ক'রতে লাগলো, এ বংশের উজ্জ্বলতা কখনো নষ্ট হবে না। কেহ না কেহ আসবেনই আবার এ বংশের গৌরব আরও উজ্জ্বল ক'রতে। অনেক বৃদ্ধও সেই ভরসাতেই থাকলেন অনেক দিন।

রাজা কনকচন্দ্র চারি পুত্র রেখে যান। তাঁরা পিতার সমস্ত সদগুণের অধিকারী না হ'লেও কোনও রকমে পিতার প্রতিষ্ঠানগুলি চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কনকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রাধামোহন রায়ের কন্যা শিবতারাকে বিবাহ করেন। শিবতারার গর্ভে বীরেশ্বর পাঁড়ের জন্ম হয়। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। মাতুল চন্দ্রশেখর রায়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন বীরেশ্বর। মোহনচন্দ্র চূড়ামণির নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ প'ড়ে সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী হ'য়ে উঠলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে প'ড়লো ক্রমশঃ দেশের চারি দিকে।

তখন বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। তখনও বাঙলা সাহিত্য ঠিক আকার ধারণ করেনি। তখন কেবল বঙ্কিম-অনুরাগী কয়েক জন বাঙলা সাহিত্য রচনায় লেখনী ধারণ ক'রেছেন। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত যাঁরা তাঁদের অনেকেই মাতৃভাষাকে তার প্রাপ্য সমাদর দিতে ছিলেন কুণ্ঠিত। ইংরাজী ভাষাই ছিল তাঁদের ধ্যান, জ্ঞান, অবলম্বন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাঙলা ভাষায় যা রচনা করতেন তা' ছিল সাধারণের দুর্ব্বোধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রই মাতৃভাষাকে করেন সাধারণবোধ্য। তখনও রবির উদয় হয়নি সাহিত্যাকাশে। যে কয় জন সাহিত্যিক মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, বীরেশ্বর পাঁড়ে ছিলেন তাঁদেরই একজন।

মাত্র সতের বৎসর বয়সে লীলাবতীর সংস্কৃত বীজগণিত পুস্তকের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ ক'রে বীরেশ্বর পাঁড়ে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাইশ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়পাঠ্যে "আর্য্যচরিত" রচনা করেন। পঁচিশ বছর বয়সে "বিজ্ঞানসার" রচনা ক'রে তিনি বিদ্বৎসমাজে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। আঠারশো বিরাশী খৃষ্টাব্দে "মানবতত্ত্ব"-নামক একখানি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং পরবর্ত্তীকালে "মানবতত্ত্ব" এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ ক'রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে তাঁর অসামান্য মনীষার পরিচয় দান করেন। "ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার" তাঁহার স্বধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আঠার শত ...নী খৃষ্টাব্দে ব্যঙ্গমূলক "অদ্ভুত নক্সা" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল পুস্তক ছাড়া তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উপযোগী পুস্তক রচনা করেন। কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখককে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করতে দেখলে তাঁর ক্ষোভের সীমা থাকতো না। মাতৃভাষার উন্নতি সাধন তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব'ললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

সাহিত্য সাধনায় উচ্চাঙ্গের জ্ঞানের পরিচয় দেওয়ায় তখনকার দিনের বিশ্ববিদ্যালয় বীরেশ্বর পাঁড়েকে বাঙলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত ক'রে তাঁকে সম্মান দান করেন।

ক্রমশঃ তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তারলাভ করলো যে, এক সঙ্গে তিনখানি মাসিকপত্রের সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব বহন তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হ'য়েছিল। "সহচরী", "বিজ্ঞান দর্শন" ও "জাহ্নবী" তিনখানি মাসিকপত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক হ'লেও নিপুণতার সঙ্গেই তিনি এগুলির সম্পাদনা করতেন। একসঙ্গে প্রতি মাসে কী ক'রে যে সম্ভব হ'তো এই বিভিন্ন ধরণের তিনখানি মাসিকপত্রের সম্পাদনা ও প্রকাশ করা, ভেবে কূল পাওয়া যায় না। অনেক সাহিত্যিকও এ বিষয়ে অনেক গবেষণা ক'রেও ঠিক ক'রতে পারেন নি সে দিন, কোন্ শক্তিতে তিনি এত বড় দুঃসাধ্য কর্ম্মে সাফল্য অর্জ্জন ক'রতে পারেন!

বীরেশ্বর পাঁড়ে ছিলেন নিষ্ঠাবান স্বধর্ম্মানুরাগী। শারীরিক অসুস্থতার জন্যই তিনি বি-এ, এম-এ ডিগ্রী লাভ ক'রতে পারেন নি। এদিকে দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে

স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন। ভূয়সী প্রশংসাও ক'রেচেন তাঁরা পাঁড়ে মহাশয়ের।

নানা রকম বৈষয়িক গোলমালে অস্থির হ'য়ে আর থাকতে পারলেন না তিনি তাঁর জন্মস্থানে—কায়বাতে। সুসাহিত্যিক বীরেশ্বর কলকাতায় চলে এলেন। ৭১নং কলেজ ষ্ট্রীটে "নববাস" নামে একখানি দোকান খুললেন। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রতি সন্ধ্যাতেই বসতে লাগলো সাহিত্যিকদের আসর। সে দিনের প্রত্যেক সুধীরই আগমন হ'তে লাগলো সান্ধ্য আসরে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষিগণ আসতেন সাহিত্যালোচনা করবার জন্য তাঁর কাছে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা ক'রে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই পুস্তক পাঠ করে পাঁড়ে, মশায়কে বলেন, এ উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত। ধর্ম ও বিজ্ঞানের নানা তথ্য পাঠ ক'রে বিদ্যাসাগর মশায় পাঁড়ে মশায়কে আখ্যা দিলেন, নৈয়ায়িক। এইভাবে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা হতো সাহিত্যিক আসরে।

একদিন এক পণ্ডিত জিজ্ঞাসা ক'রলেন পাঁড়ে মশায়কে—হাঁ হে, তোমার লেখা এত বের হয় কী ক'রে?

তিনি উত্তর দিলেন—একটু লিখতে লিখতে যখন ভাবধারা কমে যায়, তখুনি একটু পায়চারী করি। আর দেখি, কোথা হ'তে এসে ভাব সব জমে যায়। তখন লিখে আর কূল করতে পারি না। এ আমার বড় ছেলে "মনুরও" আছে।

আমরা ত বরাবর ব'লে আসছি ও তোমার নাম রাখবে। ও একটা কিছু হবে।

পাঁড়ে মশায় বললেন—তা তো তোমরা ব'লচো, কিন্তু ও যে লেখাপড়া শিখলো না। কী যে ব্যবসায় বুদ্ধি ওর মাথায় ঢুকেচে—

তাঁরা বলেন—এতে দুঃখ করবার কী আছে? ব্যবসাতেই ত' লক্ষ্মীলাভ হয়।

বন্ধুজনের কাছ থেকে সান্ত্বনা পেলেও ভাবতেন তিনি ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

কয়েক বছর হতে দেশের বাড়ীতে পৈতৃক দুর্গাপূজা বন্ধ করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন পাঁড়ে মহাশয় পারিবারিক নানা অশান্তির জন্য। দুর্গাপূজা বন্ধ করে তাঁর মনে শান্তি ছিল না। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যথা বোধ করতেন অন্তরে।

সুদিন আবার ফিরে এলো। তাঁর বীডন ষ্ট্রীটের বাসায় আবার বোধনের ঘট এলো। মা-এর পূজা হ'লো। আবার লোকজন তেমনি মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলো। তাঁর মনের অশান্তিও দূর হ'লো।

মানুষের সময় এলে আর ধরে রাখা যায় না। বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক বীরেশ্বর পাঁড়ে বললেন ছেলেদেরকে—আমার সময় আসন্ন, তোমরা কী করতে চাও?

জ্যেষ্ঠপুত্র মনোমোহন পাঁড়ে বললেন—বারাণসীধামে বাড়ী কেনা করালেন আপনি। এই ঠিক সময় সেখানে যাবার। স্থির হলো কাশী যাওয়া।

মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় স্ত্রী, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃবধূগণ, পুত্রাদি সহ পিতাকে কাশীধামে নিয়ে গেলেন। হিন্দুর চিরকাম্য মুক্তপুরী বারাণসীধামে ভাগীরথীতীরে দেহরক্ষা করলেন স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বীরেশ্বর পাঁড়ে।

হিন্দুর মহাতীর্থ বারাণসীর গঙ্গাতীরে শ্মশানে ব'সে চিন্তা করতে লাগলেন মনোমোহন পাঁড়ে—কেনই বা আমরা এলাম এ সংসারে আর কী কাজই বা করাতে চান আমাদেরকে দিয়ে সেই বিশ্বস্রষ্টা?

দুই

বারশো সাতাত্তর সাল। প্রবল গ্রীষ্ম মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। এমন কি, একখণ্ড মেঘ পর্য্যন্ত নাই আকাশে। বৈশাখের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিকে ছিটান ধান হয়। তার সময়ও চলে গেল। হাহাকার চারি দিকে কেবল জলাভাবে। দেখতে দেখতে আষাঢ় মাসও চলে গেল। গুটি গুটি ক'রে শ্রাবণও যায়-যায়। সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তার শেষ নাই। আমন ধান দু চারটে যে পাবে সে ভরসাও শেষ হ'তে চলেছে।

এমন সময় খবর পাওয়া গেল কায়বা গ্রামের স্বধর্মনিষ্ঠ স্বনামধন্য বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় আসন্ন। হঠাৎ আকাশে সে দিন মেঘ দেখা দিল। মেঘ জমাট বাঁধলো, বৃষ্টিও সুরু হ'লো। অনেক দিন পরে বৃষ্টি প্রবল আকারেই দেখা দিল। এ যেন সুধাবর্ষণ! কেউ মনেই করলো না এ জল গায়ে লাগলে কী ক্ষতি হবে। সকলেই ছুটলো যশোহর জেলা গুঁটিয়া গ্রামের দিকে। নবজাতকের জন্মস্থান।

অন্দর থেকে খবর এলো বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের পুত্র সন্তান হ'য়েচে। এই সংবাদে লোকে আনন্দে দিশেহারা। তারা বৃষ্টির ধারায় ভিজে আর উচ্চকণ্ঠে বলে—এ আমাদের মনমোহন। এ আমাদের কনক রাজা ঘুরে এসেচে গো! এ উৎসব—এ আনন্দের উচ্ছ্বাস—এ চীৎকার চললো দিন-রাত ধ'রে।

পাঁড়ে মহাশয় যথাসাধ্য মিষ্টিমুখ করিয়ে সকলকে বিদায় দিলেন।

ছেলের চোখ-মুখ দেখে সকলেই বলতে লাগলো—এ একজন কেউ কেটা হবে। তাও রঙ এমন পরিষ্কার নয়, শরীরও তেমন মোটাসোটা নয়, তবু কী যে দীপ্তি ছিল শিশুর চোখে, কেউ দেখে ভুলতে পারতো না। সকলেই বলেন—এ ছেলে এক জন হবেন বংশের!

পিতা বীরেশ্বর পাঁড়ে শুভলগ্নে সন্তানকে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেন। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি নিজে বললেন—উন্নতনাসা, লম্বকর্ণ ত ভাগ্যেরই পরিচায়ক। সকলেই বুঝলেন, অত বড় পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় যখন ব'লেচেন, তখন ও ছেলে নিশ্চয়ই এক জন হবেই। তিনিই নামকরণ ক'রলেন শিশুর সাধারণকে খুসী করবার জন্য—তাদেরই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দাবেগে উচ্চারিত—মনোমোহন। বললেন—তোমাদেরই দেওয়া নামই আমি রাখলাম—মনোমোহন।

দেখতে দেখতে পাঁচ বছরের হ'য়ে পড়লো ছেলে। হাতে-খড়ি দেওয়া হ'লো মা সরস্বতীর সামনে। পুরোহিত ঠাকুর বললেন বালককে—লেখাপড়া করতে হবে খোকা! খুব মন দিয়ে পড়বে।

বাচ্চা ছেলে, তখন সেদিকে তার মনই নাই। সাদা ফুল-খড়ির

দিকে নজর। আধ-আধ স্বরে প্রশ্ন করলো পুরোহিতকে—এ কোথায় পেলে তুমি? এর দাম কতো?

বিস্মিত পুরোহিত বললেন সকলকে—এ ছেলে মশায় এক জন হবে, এখন থেকেই এর কী খোঁজ দেখছেন! বেঁচে থাকো বাবা, বংশের মুখ উজ্জ্বল করো।

আস্তে আস্তে পড়া সুরু হ'লো, ছেলের কিন্তু পড়ায় তেমন মন বসে না। খেলাধুলো নিয়েই থাকতে চায়। বিরক্ত হ'য়ে মাষ্টার প্রহার করতে চান, পারেন না শিশুর পিতার নিষেধে। পণ্ডিত বীরেশ্বর বলেন—দেখই না আর কিছু দিন, একটু বড় হ'তে দাও না।

সাত-আট বছর পার হ'তে চললো, আবার কবে পড়ায় মন বসবে? তবুও তাড়না করতে পারেন না কেউ-ই ছেলেকে। বাবা কেবল বলেন একই কথা—দেখই না, কি করে মনু।

এক দিন দুপুরে—জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে এক দল ছেলের সঙ্গে আমবাগানে ঢুকলো মনু। মালী বললে—আম খাও খোকাবাবু যত ইচ্ছে। এত সব ছেলে জুটিয়ে এনেছ কেন? কে কার কথা শোনে! সব ক'জন এক একটা গাছ দখল ক'রে বসলো। দু'-চারটে ক'রে খেলে, কত আর বাগানের আম খাবে কয়েকটা ছেলেতে। ঝাড়া দিয়ে ফেলতে লাগলো। গাছের উপর উঠে দেখতে লাগলো মিষ্টি না টক। টক হ'লে একটি কামড় দিয়ে ফেলে দেয়। অনেক আম মিছিমিছি নষ্ট করছে দেখে মালীর আর সহ্য হলো না। সে তখন তার ভাইদেরকে জুটিয়ে সব ছেলে কয়জনকে ধরে নিয়ে গেল বাবুর কাছে। বাদ প'ড়লো না মনোমোহনও। সরিকান বাগান। সরিকরাও এসে দাঁড়িয়েছেন বিচারে, কি হয় জানবার জন্য।

বড় ছেলে ওদের মধ্যে যারা, মুখ-চোখ নেড়ে বলে, আপনাদের এই মালী মশায় প্রতিদিন আম বিক্রি করে, আমরাই কুড়িয়ে দিই, তাই দুটো করে দেয় আমাদেরকে। যাকে বিক্রি করে তাকে দেখতে পেলে ভজিয়ে দেব। আজ আমরা চারটে করে আম নিয়েছিলাম, তাই ধ'রে আনলে রাগ করে।

সকলকে শুধান পাঁড়ে মশায়। তারা বলে, মিথ্যে বলি ত মুখ খসে যাবে আমাদের। তাদের ঐ ধারা স্পষ্ট কথা শুনে বাবুরা চিন্তিত হ'লেন।

তখন বীরেশ্বর বাবু প্রশ্ন করলেন তাঁর বড় ছেলেকে, তুইও ত ছিলি মনু, সত্যি কথা কী বল ত'?

একটু নীরব থেকে বললো বালক। মালী যা ব'লেছে, ঠিকই বলেছে, আমরাই অন্যায় করেছি।

সরিকগণ সহ বীরেশ্বর পাঁড়ে অবাক হ'য়ে গেলেন, মনোমোহনের নির্ভীক সত্যবাদিতায়।

তবে যে ঐ ছেলেরা বলছে অন্য রকম?

নির্ভীক মনোমোহন বললে—ওরা মিথ্যা বলচে নিজেদের বাঁচাবার জন্য।

মনুকে ঐ রকম বলতে শুনে, ছেলেদের দল উধাও।

সেই দিন সকলে জানলো, দলে প'ড়েও মনু মিথ্যা বলে না। এ সৎসাহস এ বয়সেও তার আছে দেখে সকলেই বিস্মিত হ'লো। এমন ত' সাধারণতঃ দেখা যায় না!

কয়েক মাস পরের ঘটনা। পাঠশালায় ছেলের দল ঠিক করলো, রোজ রোজ আর মশায়ের পাঠশালায় যেতে পরি না। তাই দলবদ্ধ হ'য়ে স্থির করলো ময়লা আনতে হবে। আনবেই বা কে আর ইস্কুল-ঘরের বেঞ্চিতে লাগাবেই বা কে? এ কাজ কিন্তু কারও কাছে প্রকাশ করা চলবে না। পড়ার বই সব স্তূপীকৃত ক'রে তারই সামনে সকল ছেলেকে শপথ করানো হ'লো। হঠাৎ পূর্ব্বঘটনা মনে পড়ায় বিশেষ ভাবে মনুকে জিজ্ঞাসা করা হ'লো—হাঁ রে মনু, তুইও ত প্রতিজ্ঞা করলি, আবার তোর বাবার সামনে সব প্রকাশ করবি না ত'? ঠিক কথা বল্। তোর বাবা জিজ্ঞেস ক'রলে সব প্রকাশ ক'রে দিয়ে ফ্যাসাদে ফেলবি না ত'?

একটু ভেবে বললো মনোমোহন সকলকে—বাবার সামনে মিথ্যা বলতে পারি! তা পারবো না ভাই! এক কাজ কর, তোরা আমাকে দলে নিস না।

বা রে, তুই ত বেশ কথা বলচিস! তোর বাবা যদি তোকে জিজ্ঞেস করেন, হাঁ রে মনু, ছেলেদের এ-সব কাণ্ডের কিছু তুই জানিস? তখন তুই কী বলবি?

একটু ভেবে উত্তর দিল—তা, জানিই বলতে হবে।

এ-সব নিয়ে ছেলেদের সাথে মনুর প্রায়ই ঝগড়া বেধেই থাকতো। সে প্রায় একাকীই খেলা করতো। দলে মিশতো খুব কম। কখন কখন বাবাদের কাছে ব'সে তাঁদের গল্প শুনতো। ছোট বয়স থেকেই মিথ্যাকে সে ঘৃণা করতো।

উপনয়নের সময় সামাজিক বিধি অনুসারে যে দু'-চার টাকা ভিক্ষা পেয়েছিল মনু, তা সে নিজস্ব ক'রে রেখেছিল নিজের কাছে। হঠাৎ কেউ ঠেকায় পড়লে ধার দিত চড়া সুদে। সে টাকা বুঝে নিত ঠিক কাবুলীদের মত। ধার প্রায়ই নিতেন ওর বাবা কিংবা মা। সুদ ছিল দিন চুক্তিতে।

সেদিন জলছাব তেমন তৈরী হয়নি। তাও কোনক্রমে যোগাড় ক'রে আনতো মনু। সে-সব বিক্রী করতো সমব্যবসায়ী ছেলেদেরকে। যেগুলো বিক্রী না হ'তো গছাতো গিয়ে বাবাকে। বাবা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে বলতেন হাসির ছলে—মনু আমার একজন পাকা ব্যবসাদার হবে।

ছোট্ট বয়সে মনু বসে বসে বাবার কাছে বিষয়-সম্পত্তির কথা শুনতো। যে বয়সে এসব কথা এক কান দিয়ে ঢোকে আর এক

কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেই বয়সেই মনু নিঝুম হ'য়ে শুনতো অনেক কথা, আর মাঝে মাঝে এক একটা কথাও বলতো। যদিও হাসি-তামাসার মধ্যেই যেতো সেদিনের তার কথা, তবুও পাঁড়ে মহাশয়ের মনে লাগতো এক-আধটা কথা। তিনি বলতেন—মনু আমার বংশ উজ্জ্বল করবে। বাধা দিয়ে মা বলতেন—কৈ গা, লেখাপড়ায় মন নাই এক বারেই ও আবার হবে কী! ঐ তো আমার শখের পাঠশালা, ক জনার পরে হয় ও পরীক্ষায়, খবর রাখো ত?

বেশী লেখাপড়া শিখলেই কি মানুষ হয় মনে কর তুমি? দেখবে ও একটা মানুষ হবেই, আমি ওর প্রতিটি ব্যবহারে জানতে পারচি। দুষ্ট, ছেলেদের সাথে ও সঙ্গ করে না। মিথ্যা বলতে জানে না মন। এটা কী কম গুণ বলতে চাও? আর একটা দিক তোমরা দেখতে পাও না, এই বয়স থেকেই তার একটা জ্ঞান এসেছে ব্যবসা সম্বন্ধে, আমি বেশ দিব্যচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি! আমি ব'লে রাখলাম—দিন দিন এই জ্ঞান মনুর খুলবে। দেখতে পাবে ও একজন সমাজের মধ্যে মানুষ হবে। লোকে ওকে মান্য করবে।

এ সব শুনে পাঁড়েগৃহিণী বলেন—তুমি ত নিজের ছেলের যশ করবেই গা! এখন ভাল এক জন মাষ্টার রেখে লেখাপড়া শেখাও দিকি। গ্রামের পাঠশালায় ছেলের কিছুই হবে না। কলকাতা নিয়ে গিয়ে ছেলেকে মানুষ করবার চেষ্টা দেখ দিকি।

পাঁড়ে মহাশয় তখন সরিকদের ব্যাপার নিয়ে মহা অশান্তির মধ্যে ছিলেন। সাহিত্যিক মানুষ। পাড়াগাঁয়ের পাকচক্রে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। এতো বিব্রত, মাথা তুলবার পর্য্যন্ত শক্তি হারিয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

শিশু মনু সেই বয়সেই এক দিন বাবাকে বললো—বাবা! চল আমরা কলকাতা যাই। এদের সঙ্গে আর কাজ নেই।

সাত-আট বছরের বালকের মুখে ঐ কথা শুনে পণ্ডিত বীরেশ্বর বুঝলেন এ সিদ্ধান্ত-বাক্য! এ বালকের কথা নয়।

তখুনি কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মনে পড়লো তাঁর তখন কলকাতার বিদ্বান বন্ধু বান্ধবদের কথা। তাঁদের সাথে অমূল্য আলোচনার কথা। উত্তেজনায় তখন আর বাড়ীতে মন বসে না। সংকল্প করলেন কলকাতা যাওয়ার। [ক্রমশঃ।

ভাঙ্গা দেউল

শ্রীনীলিমা ভট্টাচার্য

দেবতার দেউল
আজ ভেঙে গেছে
অনেক স্মৃতি-বিজড়িত এ দেউল,
এক দিন দেবতা ছিল হেথা
আজ শূন্য মন্দির।

এ মন্দিরতলে
নিত্য আসা-যাওয়া ছিল
কত শত নর-নারীর।
কত রিক্ত সর্বহারার
হাহাকার-বিসর্পিত এ দেউল।
কত ব্যর্থ প্রেমের নীরব সাক্ষী
কত শুভ-মিলনের স্মৃতি বুকে বহে।

সেদিন বসন্তকাল—
বাসন্তী-রঙে রাঙা শুচিবাস পরি
এসেছিল সে।
খোঁপার কুসুম খসে পড়েছিল
বাতাসের দুরন্তপনায়
পূজার অর্ঘ্য লয়ে অপেক্ষা করেছিল
কার তরে?
জানা নেই,
এ দেউলের ভাঙা প্রস্তর
শুধু এইটুকুই জানে।
পূজা শেষ হলে এ দেউলতলে
অপেক্ষা করেছিল সে
অধীর প্রতীক্ষায়।

তার গভীর আনত নেত্র দু'টি তুলি
ভক্তের ভীড়ের মাঝে খুঁজেছিল কা'রে
কা'র তরে ছিল সে প্রতীক্ষা?
সে কথা নেই জানা,
এ দেউল শুধু জানে।
যার তরে অপেক্ষা করেছিল
কোন দিন আসেনি সে
ঘোচাতে পারিনি তার নয়নের সন্ধান,
ঘোচাতে পারিনি তার
হতাশার কালিমা ঐ চোখের
কোণে জমে-ওঠা
নীল সাগরের যোশনাই।

দিন দিন—
প্রতিদিন অপেক্ষা করেছিল সে
কোন দিন ভাঙেনি তার
ধৈর্য্যের কঠিন বন্ধন
কোন দিন শোনেনি কেউ তার
হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন।
শুধু নীরব চোখের
সন্ধানী দৃষ্টিটুকু
অক্ষয় হয়ে আঁকা হয়ে গেছে
এ দেউলের ঐ ভাঙা দেওয়ালের বুকে।

এবারের রণজি ক্রিকেট ফাইন্যাল খেলায় গতবারের বিজিত সার্ভিসেস দলকে এক ইনিংস ৫১ রাণে পরাজিত করে বরোদা রাজ্য দল রণজি ট্রফি লাভ করেছে।

ইতিপূর্ব্বে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা নক আউট প্রথায় চলতো, এবার থেকেই আঞ্চলিক ভিত্তিতে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। কোয়ার্টার ফাইন্যাল থেকে নক আউট প্রথায় খেলা হয়। বরোদা রাজ্য পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত থাকায়, তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের সংগে। পশ্চিমাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করার পর সেমি ফাইনালে রাজস্থানকে পরাজিত করে ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

অপর পক্ষে সার্ভিসেস দলকে পাতিয়ালা, পূর্বপাঞ্জাব ও দিল্লীর সংগে চতুর্দ্দলীয় লীগ প্রতিযোগিতার পর সেমি ফাইন্যালে বাংলাকে পরাজিত করে উত্তরাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে।

বাংলা দলের সংগে সার্ভিসেস দলের খেলা দিল্লীর ফিরোজ শা' কোটালা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ইনিংসের খেলার ফলাফলে বাংলা দলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বাংলার প্রথম ইনিংসের ৩৬০ রাণের প্রত্যুত্তরে সার্ভিসেস দল দুই উইকেটে ৩৭০ রাণ করায় খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হইয়া যায়।

সেমি ফাইন্যালে বাংলার প্রথমে ব্যাটিং বিপর্য্যয় দেখা দেওয়া সত্ত্বেও কে. মিত্র ও কারকার দৃঢ়তার সংগে খেলায় খেলার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। পরে পি সেন, বি. চন্দ ও এ ভট্টাচার্যের প্রশংসনীয় ব্যাটিং-এর ফলে ৩৬০ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় দিনের শেষে দুই উইকেটে ১৫ রাণ হয়। তৃতীয় দিনে সার্ভিসেস দল আর একটি উইকেট না হারিয়ে আপ্তা সিং ১৮৪ রাণ ও দানী ১২২ রাণ করে নট আউট থাকেন। বাংলার এই পরাজয়ের মূলে ফিল্ডিং-এ শোচনীয় ব্যর্থতা। আপ্তা সিং চার বার ও দানী একবার ক্যাচ তুলে রক্ষা পান। বাংলার খেলোয়াড়রা যদি এ ক্যাচগুলি মিস্ না করতেন, তাহলে গতি অন্য রকম হতে পারতো।

বরোদার প্যালেস মাঠে সার্ভিসেস বনাম বরোদা দলের পাঁচ দিন-ব্যাপী রণজি ট্রফির ফাইন্যাল খেলা আরম্ভ হয়। কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার নির্দ্ধারিত দিনের একদিন আগেই খেলা শেষ হয়।

এবার বরোদা দলে তরুণ ও প্রবীণ খেলোয়াড় সমন্বয় দলটিকে বেশ শক্তিশালী করিয়া তুলে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিজয় হাজারে ছিলেন দলের অন্যতম প্রধান কর্ণধার। তাঁর ব্যাটিং কৃতিত্বই যে বরোদা রাজ্যকে রণজি ট্রফি লাভে সর্ব্বাধিক সাহায্য করেছে একথা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও দলের মধ্যে ছিলেন ডি. কে. গাইকোয়াড়, জে. এম ঘোরপাড়ে, জি. কিষেণ চাঁদ ও দীপক সোধন। গাইকোয়াড় ছিলেন বরোদা দলের অধিনায়ক। বরোদার তুলনায় সার্ভিসেস দলের শক্তি অনেক কম ছিল, সার্ভিসেস দলের অধিনায়কত্ব করেন হেমু অধিকারী।

মোট ৪১৫ রাণে বরোদা দল প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করেন। তার মধ্যে বিজয় হাজারে ২০৩ ও গাইকোয়াড়ের ১৩২ রাণ সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় দিনের খেলার সূচনায় মাঠের পিচ স্পিন বোলারদের অনুকূল থাকায় সার্ভিসেস দলকে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে ব্যাট করতে হয়। দিনের শেষে ৯ উইকেটে তাদের' ওঠে ২৩১ রাণ। মাত্র ২ রাণ যোগ করে চতুর্থ দিনে সার্ভিসেস দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। চতুর্থ দিনে সার্ভিসেস দলের চা-পানের কিছু সময় পরে ২০৫ রাণ ওঠার পর তাদের ইনিংস শেষ হয়।

বরোদা দল এক ইনিংস ও ৫১ রাণে জয়লাভ করে।

বরোদা ১ম ইনিংস—৪১৫ (হাজারে ২০৩ গাইকোয়াড় ১৩২, সি. জি. বোর্দ্দে ৫৩, কিষেণচাঁদ নট আউট ২৬, রমেশ ৫৮ রাণে তিন উইকেট ও মুদিয়া ১৮ রাণে দুই উইকেট)।

সার্ভিসেস—১ম ইনিংস—২৩১ (মহীন্দর সিং ৭৩, দানী ৫১, অধিকারী ৩৬, জে. এইচ, ডিন ৩২ রাণে ৪ উইকেট, সি. জি. বোর্দ্দে ৮০ রাণে ৪ উইকেট)।

সার্ভিসেস—২য় ইনিংস—২০৫ (মহীপৎ সিং ৫৭, গণেশন ৫২, সি. এম, মুদিয়া ৩২, দানী ৩১, হাজারে ১৭ রাণে ৩ উইকেট, ঘোরপাড়ে ৩২ রাণে দুই উইকেট, ডিন ৩৮ রাণে দুই উইকেট)।

[বরোদা এক ইনিংস ৫১ রাণে জয়ী]

* * * *

সি. এ. বির নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে মোহনবাগান দল ১৩৫ রাণে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছে।

মোহনবাগান দল প্রথম ইনিংসে ৩৭২ রাণ করে। এর মধ্যে জি. চক্রবর্তীর ১০৭. রাণ এবং জে. মিত্রের ১৬ রাণ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় দিনের শেষে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল ২২ রাণের মধ্যে দুইটি উইকেট হারায়। তৃতীয় দিনে ২৩৭ রাণে স্পোর্টিং দলের ইনিংস শেষ হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দুটি ইনিংস খেলা সম্ভব নয় বলে প্রথম ইনিংসের ফলাফল থেকেই জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হয়।

মোহনবাগান—১ম ইনিংস ৩৭২ (জি. চক্রবর্তী ১০৭, জে. মিত্র ১৬, পি. বি. দত্ত ৫৬, এ ভট্টাচার্য ৭২ এন মিত্র ৫৬ রাণে ৫ উইঃ এস. সোম ৭০ রাণে ২ উইঃ)

স্পোর্টিং ইউনিয়ন—১ম ইনিংস—২৩৭ (কার্ত্তিক বসু ৮৬, পি. রায় ৫২, কে. মিত্র ৩১, পি. চ্যাটার্জ্জী ৬৪ রাণে ৪ উইঃ এম সেন ৩২ রাণে ২ উইঃ এবং এ ভটাচার্য ৬৭ রাণে ৩ উইকেট লাভ করে)

[মোহনবাগান ১৩৫ রাণে জয়ী]

* * * *

পশ্চিমবঙ্গের লুপ্তপ্রায় ছড়া-গান

কল্যাণকুমার জানা

ছড়ার মাঝে মানবজীবনের সুখ-দুঃখের কথা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে যে জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে তা বলা বাহুল্য এবং বোধ করি তাদের হৃদয়ের ব্যথা, বেদনা, আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের অভিনব প্রকাশেই এই ছড়ার সৃষ্টি। পুরাকালে এর প্রচলন যেমন ছিল আজকের দিনে তা ঠিক তেমনটি কমে আসছে। মহাকালের করাল গ্রাসে তার শেষ চিহ্নটুকু একেবারে লুপ্ত না হলেও—তার গর্বদীপ্ত অধ্যায়ের এক বিরাট এবং মূল্যবান্ অংশ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তা নিশ্চিত। তাই আমাদের কর্তব্য—এই ছড়াগুলোর যাতে বহুল প্রচলন হয় এবং যাতে তারা লুপ্ত না হয় তার আশু ব্যবস্থা করা। কারণ, এই ছড়াগুলোর মাঝে তদানীন্তন জনগণের জ্ঞানের, তাদের কাব্য ও চিন্তাশক্তির এক উজ্জ্বল ও উন্নত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

আজকের পূর্বপাকিস্তান অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ববঙ্গকে এর জনক বললেও কোন অত্যুক্তি হ'বে না। ছড়া ও পল্লীগীতির মাঝ দিয়ে পূর্ববঙ্গের জীবন যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় তেমনটি বোধ করি নিজের চোখে দেখেও না। পূর্ববঙ্গের পদ্মা ও তার জনগণের মূর্ত-প্রতীক এই ছড়া ও পল্লীগীতি।

পশ্চিমবঙ্গের স্থান এদিক দিয়ে পূর্ববঙ্গের অনেক নীচে। পশ্চিমবঙ্গের মাঝে পল্লীগীতির স্থান তেমনি নেই বললেই চলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যে ছড়াহীন একথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের ছায়া-সুনিবিড় উদার উন্মুক্ত পল্লীর বুকে এখনও এমন সব ছড়া লুকিয়ে আছে যার প্রকাশভঙ্গী ভাব ও কাব্যরূপ সত্যই অপূর্ব! তবে এই সব ছড়া এখন বিলুপ্তির পথে। পূর্বে তা পাড়াগাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হ'তে আরম্ভ করে বুড়ো-বুড়ী—এমন কি অন্যান্য বহু লোকের মুখে শোনা যেতো। আজকাল তা ক্রমশঃই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কর্তব্য সেগুলোকে জনগণের সামনে তুলে ধরে তাদের প্রকৃত মর্যাদা ও মূল্য সম্বন্ধে জনগণের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

পশ্চিমবঙ্গের ওই রকম কতকগুলো লুপ্তপ্রায় ছড়ার উদাহরণ এখানে দিলাম। ছড়াগুলোর অধিকাংশই ছেলেভুলানো ছড়া হলেও ওদের মাঝ দিয়ে সত্যকার সাহিত্য বেশ কিছুটা দানা বেঁধে উঠেছে। তাই সাহিত্যের দিক থেকে এগুলোর মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। তাছাড়া এদের মাঝ দিয়ে জাতির পূর্বতন বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার পরিচয়ও মিলবে। সেই সংগে সেকালের জনগণের সাহিত্যপ্রীতি, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সহজ-সরল জীবনের প্রতিচ্ছবির একটা স্পষ্ট ছবিও আমাদের চোখে ধরা পড়বে। তাই জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এগুলো গর্বের বস্তু ও অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হবে।

এখানে সর্বপ্রথম যে ছড়াটির কথা বলবো, সেটি করুণতায় ভরা। মায়ের আদুরে মেয়ে বাপের বাড়ী ছেড়ে এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। তাই মায়ের দুঃখ-ব্যথা-স্নেহ সমস্ত কিছু এক সংগে উছলে উঠেছে। মেয়ের জীবনের যে সামান্য ত্রুটিটুকুও একদিন মায়ের কাছে অসহ্য ছিলো আজকে সেটিও যেন তার কাছে মহান বলে মনে হ'চ্ছে। জগতে তার মেয়ে যেন তুলনাহীন। সে যেন সমস্ত দোষ-ত্রুটি-বিবর্জিতা। তাই মায়ের মন ব্যথায় আচ্ছন্ন। মা ভাবছে, মেয়ে চলে গেলে পুকুরের ওই বড় বড় ভদই চিংড়িগুলো কে খাবে? আর তার হাতের ছাতু সে-ও বা কে খাবে? এত খাইয়ে এত আদর-যত্ন করে আজ তার নিজের পেটের মেয়েই তার পর হয়ে যাবে। সে আজ অন্যের ঘরণী। তার ভাগ্য আজ সম্পূর্ণরূপে অন্যের সঙ্গে বিজড়িত। তাই একমাত্র আদুরে মেয়ের বিয়োগ ব্যথায় মায়ের মনের সমস্ত দুঃখ-ব্যথা আর বিহ্বলতার আরতি এই ছড়াটির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে মাতৃত্বের এক শুভ্র ও সুন্দর রূপ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

সীতা কি মোর ঘর যাইবে গো।
বড় পুকুরের ভদই চিংড়ি কে খাইবে গো
মাচের তলায় ছাতুর হাঁড়ি কে খাইবে গো।
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।
সাত হামারের ধান খাবিয়ে
সীতা তবু মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।
সাত পুকুরের মাছ খাবিয়ে
সীতা তবু মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।
সাত বাগানের আম খাবিয়ে
সীতা মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।

সাত গাইয়ের দুধ খাবিয়ে
সীতা তবু মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।

এবারের ছড়াটি একটি গাঁয়ের মেয়ের জীবনের বিশেষ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ছড়াটির বক্তা মেয়েটি নিজেই। মাতৃহারা মেয়েটি বিয়ের পরও ভাগ্যদোষে বাপের বাড়ীতে আছে। সেখানে জেঠাই-মা-ই তার একমাত্র আপনজন। মেয়েটির বর হঠাৎ করে সেদিন এসে উপস্থিত হয়েছে শ্বশুরবাড়ীতে। আর তার আগমন সর্বাগ্রে মেয়েটিরই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বাড়ীতে তখন মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই। যে যার কাজে গেছে। জেঠাইমাও বেরিয়েছে পাড়া বেড়াতে। বর এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ মেয়েটি কিছু বলতে পারছে না, এমন কি বসতেও না। কারণ, স্বামীর সংগে তার চাক্ষুষ পরিচয় হলেও অন্তরের পরিচয় এখনও হয়নি। তার পর হাজার হলেও সে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। তার লাজ-লজ্জা একটু বেশী। তাছাড়া একেবারে দিনের বেলা। তাই বেচারা আর কি করে। দোটানায় পড়ে পাড়া বয়ে নিজেই এসেছে জেঠাইমাকে খবর দিতে। কিন্তু নিজের মুখে নিজের বরের আগমন-বার্তাটুকু দিতে সে লজ্জায় মরে যাচ্ছে—অথচ না বললেও নয়। তাই প্রথমে 'আমগাছ জামগাছের যুদ্ধে'র কথা বলে তারই সহায়তায় জেঠাইমাকে বলছে—'ঘরে যাও গো জেঠাইমা বর এসেছে।' কিন্তু সংগে সংগেই তার স্মৃতিপথে উদিত হয়েছে বরের অবয়ব। স্মৃতির মত্ততায় বেমনা হয়ে গিয়ে তার মনে পড়েছে দুঃখ লাজ-ভরা বিয়ের দিনটির কথা। যদিও সেদিন তার বর এসেছিলো মাথায় লাল পাগড়ি বেঁধে তবুও মেয়েটির মর্মবেদনা—তার গোঁফদাড়ি পাকা, সে শ্মশান-পথযাত্রী। তবুও এই থুবথুরে বুড়োর সংগে তার ধর্ম সমান করে নেওয়ার জন্য তার বাবাকে দিতে হয়েছে একগাদা টাকা—এইটেই সবচেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছে মেয়েটির জীবনে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের মাঝে মেয়েটির আত্মাহুতির আলেখ্যের দীর্ণ প্রতিধ্বনি সত্যই মনকে উন্মনা করে তোলে।

নীচের ছড়াটির মাঝ দিয়ে যারা দুষ্টু, তাদের সংগে অন্যদের মিশতে বারণ করা হয়েছে। তাদের দেওয়া জিনিসও অন্যদের খেতে বারণ। কারণ তারা যে দুষ্টু। পানের সংগে তারা মৌরী মিশায় ইস্কুল ঘরে চাবি এঁটে দেয়—ইস্কুলের জল গন্ধ করে ছাড়ে—এমন কি খিড়কী পুকুর বন্ধ করে অন্যদের জল নিতে দেয় না। তাই তাদের কেউ দু'চোখে দেখতে পারে না।

কচি কচি পালকিগুলো।
তার ভিতরে দুষ্টুগুলো।
দুষ্টুদের পাড়ায় যেয়ো না।
ওদের দেওয়া পান খেয়ো না।
পানেতে মৌরী বাটা।
স্কুলেতে চাবি আঁটা।
স্কুলের জল গন্ধ।
খিড়কী পুকুর বন্ধ।

বাঙালীদের জীবনে মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা হচ্ছে জীবন-মরণ সমস্যা। সে সমস্যার মাঝে পড়ে শুধু যে মেয়ের বাবা হাবুডুবু খায় তা নয়—সমস্ত পরিবারের লোকেরা বিব্রত হয়। তারই একটি ছবি ফুটে উঠেছে নিচের ছড়াটিতে। উচ্ছে ভাজা করতে করতে বুড়ো মা তার ছেলেকে বলছে—নাতনীর বিয়ে দেওয়ার কথা। নাতনী বড় হয়ে গেছে। তাকে আর ঘরে ফেলে রাখা যায় না। লোকে তাহলে বলবে কি? নাতনীর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে বুড়ো দিদিমার জীবনে শান্তি নেই। উচ্ছে ভাজতে ভাজতেও তার মন স্থির থাকতে পারেনি। তাই তার সংবেদনশীল মনের গভীর আকুতিকে পুত্রের কাছে সে গভীর ভাবে তুলে ধরেছে। বুড়ি নাতনীকে খুব ভালোবাসে। তাই তার দূরে বিয়ে দেওয়ারও সে পক্ষপাতী নয়। দূরে বিয়ে দিলে কালে ভদ্রে নাতনীর খবরের রেশ হয়তো তার কাছে পৌঁছবে কিন্তু তাতে তার নাতনী-অন্ত প্রাণ বাঁচবে কি করে? নাতনীর প্রতি বুড়ির ভালোবাসা অধিক হলেও তার নজর কিন্তু সব তাতেই। তাই নাতনীর বর খুঁজতে গিয়ে পথে ছেলের যে কষ্ট হবে, মায়ের প্রাণ সেটা কিন্তু ভোলেনি। তাই যতন করে বেঁধে দিয়েছে মোটা ধানের খই। কিন্তু নাতনীর হবু শ্বশুরকে ত আর মোটা ধানের খই বিলোলে চলবে না। তার তো একটা বিশেষ মান-মর্যাদা আছে। তাই বুড়ী তার জন্য সযত্নে বেঁধে দিয়েছে সরু ধানের খই। ছোট ছড়াটির মাঝে বুড়ীর মমিত হৃদয়ের প্রকাশ সত্যই অনবদ্য।

উচ্ছে ভাজা চিড়িং চিড়িং বাবা বিয়ে দিবি তো দে,
কত দূরে দিবি বাবা তত্ত্ব নেবে কে ?
সরু ধানের খই দিলাম শ্বশুর বিলোতে,
মোটা ধানের খই দিলাম রাস্তায় জল খেতে।

যাদের সংগে সম্পর্ক রক্তের এবং যারা একান্ত আপনজন, তাদের মানুষ যতটা ভালোবাসে, একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অপরকে তারা কোন দিন ততখানি ভালোবাসতে পারে না—এইটেই জগতের চিরাচরিত রীতি। তাই আপনজনের সামান্য দুঃখেও তাদের হৃদয় বিচলিত হয়—তারা কেঁদে ওঠে। কিন্তু যারা পর—তাদের চরম বিপদ দেখে তাদের প্রাণে হয়তো ক্ষণেকের জন্য সহানুভূতি জাগে কিন্তু তাতে তেমন কিছু আসে-যায় না। সেই অপ্রিয় সত্যকেই কেন্দ্র করে নিচের ছড়াটি সৃষ্টি হয়েছে। যে পথের তাল গাছে কাক ঝুল খায়, তারই মাঝ দিয়ে রসপতি অনেক অনেক দিন পর তার বাপের বাড়ী যাচ্ছে। বড়লোকের ঘরের বৌ সে। তাই বাপের বাড়ী আসার সময় বাবা, মা, দাদা, বৌদি, বোন সবার জন্য নানা প্রয়োজনীয় আর অপ্রয়োজনীয় জিনিস সে নিয়ে আসছে। কারণ তারা যে তার আপনজন। কিন্তু তারা ছাড়াও তার বাপের বাড়ীতে আরো একজন আছে। সে হচ্ছে তার মায়ের কোথাকার কোন বন্ধুর সতীন-কন্যা। দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে জীবনের সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে অভাবের অসহ্য তাড়নায় সে আজ পরের বাড়ীতে দাসীগিরি করছে। ভাগ্য ভালো হলে সেও হয়তো রসপতির মতো অন্যের ঘরণী হয়ে সেখানের সর্বময় কর্ত্রীরূপে বিরাজ করতে পারতো। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে ? তাই তার জন্য কি এনেছে জিগ্যেস করায় যখন রসপতি বললো যে, 'পুঁটি মাছের পঁটা', জীবনে যেটার দাম তো নেই-ই বরং যার উপস্থিতি অসহনীয়, তখন তার হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। সে বুঝলো—পরের জন্য হাজার করলেও তবুও তারা তাকে আপন বলে স্বীকার করবে না, এইটেই পরম সত্য এবং তার চরম প্রাপ্য 'পুঁটি মাছের পঁটা'। ছড়াটিতে সেইটেই ফুটে উঠেছে।

মাঝখানে তালগাছ কাক ঝুল খায়,
তার পরদিন রসপতি বাপের বাড়ী যায়।
বাবার জন্য কি এনেছো ?
লক্ষ টাকার ঘোড়া।
মায়ের জন্য কি এনেছো ?
মাথা বাঁধার দড়া।
ভাইয়ের জন্য কি এনেছো ?
চন্দন কাঠের লাঠি।
বোনের জন্য কি এনেছো ?
দুধ খাবার বাটি।
বৌদির জন্য কি এনেছো ?
হেঁসেলের ঘটি।
সাত বন্ধুর সতীন-ঝি সে মায়ের ;
তার জন্য কি এনেছো ?
পুঁটি মাছের পঁটা।

পরের ছড়াটির মাঝ দিয়ে মেয়েরা পুরুষ হলে কি [illegible]

তারা অজ্ঞ—তাদের কেন্দ্র করে অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে তারা নিজেদের অজ্ঞতাটুকুকেই লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। তাই ছড়াটির মাঝে হাস্যরসিকরা ত বটেই, এমন কি গোমড়ামুখোরাও হাসির পরশ পাবে। খিদিরপুরের মাছগুলো যদি ডাংগায় চরে আর গেঁয়োখালির 'ডাংগর কাক' যদি ফিতে ধরে জাহাজ মাপে, তবে যারা চিরদিন প্যান প্যান করে কাঁদে তারাই বা হাসবে না কেন ?

আমরা যদি পুরুষ হতাম,
কলকাতাটা কিনে নিতাম।
দেখে এলাম খিদিরপুরেতে,
মাছগুলো সব ডাংগায় চরতেছে।
দেখে এলাম গেঁয়োখালিতে,
ডাংগর কাকে ফিতে ধরে জাহাজ মাপতেছে।

নিচের ছড়াটি এক পাগলা জামাইয়ের কথা নিয়ে। সব জামাই খেয়ে যাওয়ার পর যখন মেজ জামাইয়ের খোঁজ পড়লো তখন তাকে পাওয়া গেলো মাঠের মাঝে। ফুলের মালা গলায় দিয়ে মাঠের হাওয়ায় পেট ভরিয়ে পাগলা জামাই ভুলে গেছে খাওয়ার কথা। এমনি জামাই হলে শ্বশুরকুলেরই প্রাণান্ত।

আলু পাতা থালু থালু মনসা পাতায় দই,
সকল জামাই খেয়ে গেল মেজ জামাই কই ?
মেজ জামাই জলাতে,
ফুলের মালা গলাতে।

আগেকার দিনে লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিলো খুব সহজ—সরল ও অনাড়ম্বর। আজকালের মতো তখনকার লোকের এত অভাব-অনটন ছিলো না—বিশেষ করে খাওয়া-পরার। তাছাড়া তখনকার লোকেদের চরিত্রও এতো জটিল কিংবা কুটিল ছিলো না। তাই তারা খেয়ে মেখে সুখে দিন কাটাতো। আর অবসর বিনোদন করতো রঙ্গ-তামাসা করে। অবশ্য সে রঙ্গ-তামাসা ছিলো না খুব সহজ ও সরল। তাতে বিন্দুমাত্র কলুষতার স্থান ছিলো না। তাদের অধিকাংশ শিক্ষিত না হলেও সে কাব্যরসের স্বাদ দিতে ও নিতে পারতো। তাই তারা ছড়ার মাধ্যমে একে অন্যকে ঠকিয়ে নির্মল কৌতুক উপভোগ করতো। নিচের ছড়া দুটোর মাঝ দিয়ে তা প্রত্যক্ষ করা যাবে। ছড়াগুলো মুখ্যত ঠকানোর উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এর মাঝে বুদ্ধি আর কাব্যচাতুর্যের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে।

১

তেঁতুল গাছে বাসা,
বৌ ভেঙেছে কাঁসা
সে বৌ কোথায় ?
জলের তরে গেছে।
সে জল কোথায় ?
সাপে খেয়ে গেছে।
সে সাপ কোথায় ?
বনে ঢুকে গেছে।
সে বন কোথায় ?
[illegible]

সে কয়লা কোথায় ?
ধোপা নিয়ে গেছে।
সে ধোপা কোথায় ?
কাপড় কাচতে গেছে।
সে কাপড় কোথায় ?
মেজদা পরে গেছে।
সে মেজদা কোথায় ?
পাখী মারতে গেছে।
সে পাখী কোথায় ?
ফুরুত করে উড়ে পালিয়েছে।

২

এক জেগা যাবি ?
কোথা ?—ব্যাঙ মাথা।
কি ব্যাঙ ?—সরু ব্যাঙ।
কি সরু ?—বামুন সরু।
কি বামুন ?—চণ্ডী বামুন।
কি চণ্ডী ?—পিঠা চণ্ডী।
কি পিঠা ?—তাল পিঠা।
কি তাল ?—সোনার তাল।
কি সোনা ?—গু খানা।

নিচের ছড়াটিতে সেকালের বিবাহের একটি চিত্র গ্রথিত হয়েছে। সেকালে খুব ছোট বয়সে মেয়েদের বিয়ে হতো। তাতে করে সে বিয়েতে শুধু যে মেয়েকেই দুর্ভোগে পড়তে হতো তা নয়। তার সংগে সমান দুর্ভোগ ভোগ করতো তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা। তারই একটি উপমা পাই ছড়াটির মাঝে। কালটা বসন্তকাল। চারিদিক কোকিলের কল-কাকলীতে ভরপুর। বসন্তের বাসন্তিক স্পর্শে সব কিছুতে উন্মাদনা পরিস্ফুট। দূর হতে ভেসে আসছে নর্তকীর পায়ের নূপুরের ঝুমঝুম শব্দ। দলে দলে লোকেরা তাকে অনুসরণ করে ছুটে চলেছে। মেয়েটির দাদা পান্তাভাতের চবচবানি আর মৌ দিয়ে গরম ভাত খেয়ে ওখানে ছুটে চলেছে। বাড়ীতে যে নাবালিকা বৌ পড়ে রইলো তা তার খেয়াল নেই। ছেলেমানুষ অপোগণ্ড বৌ ঝোঁক ধরেছে সেও গান শুনতে যাবে। নূপুরের ঝুমঝুম তার কাছে বিস্ময়। কিন্তু সে যে বাড়ীর বৌ, প্রকাশ্যে অমন করে নাচ দেখতে যাওয়া যে তার পক্ষে রীতিমত সমাজ-বিরুদ্ধ—এটুকু বোঝবার ক্ষমতা তার নেই। তাই তাকে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু, সে তা শুনবে কেন ? বুকফাটা কান্নায় তাই সে মেতেছে। নাবালিকা বৌ-এর কান্নায় শ্বশুরের হৃদয়ও বিচলিত হয়ে উঠেছে ? তাই ছোট বৌকে কোলে নিয়ে সে তাকে ব্যর্থ সান্ত্বনা দিচ্ছে। বাল্য-বিবাহের নিদারুণ পরিণতির মাঝে একদিকে অপোগণ্ড ছোট বউয়ের হৃদয় ফাটানো হুংকার আর অন্য দিকে শ্বশুরের পিতৃসুলভ স্নেহ—এই দুয়ের সম্মেলনে করুণতর হয়ে ছড়াটি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মামাদের ফোক্তা গাছে কোকিল বসেছে,
পায়ে ঝুমঝুম নর্তকীরা নূপুর বেঁধেছে।
পান্তাভাতে চবচবানি—গরম ভাতে মৌ,
দাদা গেছে গান শুনতে বাবার কোলে বৌ।

অভিমানী এক ছোট্ট মেয়ে মামারবাড়ী এসে কেমন করে অভিমানে ফেটে পড়েছে তারই একটি ছবি প্রকাশ পেয়েছে এবারের ছড়াটিতে। অনেক আশা নিয়ে ভাগনী মামাবাড়ী এসেছিলো। কারণ—'মামাবাড়ী বড় মজা, চড়-চাপড় নাই'। তার বড় আশা ছিলো এই অসহ্য গরমের দিনে মামাদের পুকুরে সে মনের সুখে ডুব দেবে। তাতে বাড়ীর মত কেউ নিশ্চয়ই তাকে মারধোর করবে না। কারণ মামাবাড়ীর মজা তো সেখানেই। কিন্তু মনের আশা তার মনেই রয়ে গেলো। কে জানতো মামাদের পুকুর টোকা পানাতে ভরপুর—তাতে স্নান করা দায়। তাই ছোট্ট মেয়ে অভিমানে ভরে উঠে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে যে যদিও সে এলাচদানা দিয়ে সুন্দর করে পান ভেঙেচে তবুও তা ভুলেও তাকে খেতে দেবে না। সে বরং সেই সুন্দর পান কাক-বককে দেবে তবুও মামাকে দেবে না। মামার অপরাধ তাদের পুকুরে এত টোকা পানা কেন—তাতেই তো তার সব মজা নষ্ট হয়ে গেলো। তাই ব্যথাদীর্ণ অন্তরে মেয়েটি আবার বলছে, যে যদিও সে তার মামার কোলে বসে তার আদর সুদে আসলে আদায় করে নেবে, এমন কি তরে জন্ম সে টাকাও নেবে তবুও বারেকের জন্য তার মুখ সে মামাকে দেখাবে না। এই হলে নিশ্চয়ই মামা বুঝবে পুকুরে টোকা পানা রাখার কি ফল। ছোট্ট মেয়ের অভিমানী হৃদয় সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে ছড়াটির মাঝে।

মামাদের পুকুরে টোকা পানা।
পান ভেঙেছি এলাচদানা ॥
কাককে দেবো বককে দেবো
তোমায় দেবো না।
কোলে বসবো টাকা নেবো
মুখ দেখাবো না ॥

পরের ছড়াটি নিছক ব্যঙ্গে ভরা। এর মাঝে হাসির ঝিলিক থাকলেও এটা পুরাকালের কন্যাপণের প্রতিই এক তীব্র বিদ্রূপ। আগেকার দিনে অনেক ক্ষেত্রে মেয়ের বিয়েতে বরের কাছ থেকে টাকা পণ হিসেবে নেওয়া হতো। এখানেও খাঁদির গরীব বরকে অনেক টাকা পণ হিসেবে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু সে তা দিতে পারেনি। তাছাড়া সে গরীব বলে পাগড়ির বদল গামছা মাথায় জড়িয়ে বিয়ে করতে এসেছে। তা দেখে খাঁদির বাপ রেগে আগুন। তাই রাগান্বিত কণ্ঠে সে বলছে যে ও গামছাও যেমন সে নেবে না তেমন ওই বখাটে ছেলেকে সে মেয়েও দেবে না। সে তার খাঁদিকে যেমন গহনা দিয়ে সাজিয়ে দেবে—তেমনি নগদ টাকা ও বাজিয়ে নেবে। তাই শুনে বেচারা বরের অবস্থা মর্মন্তুদ হয়ে উঠেছে।

খাঁদির বর এসেছে গামছা মাথায় দিয়ে।
ও গামছা নেবো না,
খাঁদির বিয়ে দেবো না।
খাঁদিকে দেবো সাজিয়ে,
টাকা নেবো বাজিয়ে।

নিচের ছড়াটিতে একটি মেয়ে তার বড়দি ও ছোড়দিকে জিগ্যেস করছে তার দাদার কথা। কিন্তু তাদের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে সে ঠিক করে নিয়েছে যে দাদা তার নিশ্চয়ই বৌ আনতে গেছে। তার কথা অবশ্য ফলপ্রসূ হয়েছে। দাদা বৌ এনেছে সত্যই। তারপর কালের আবর্তনের মাঝে সেই বৌয়ের কোল

আলো করে এক খোকন সোনা এসেছে। মেয়েটি খোকনকে নিয়েই এখন ব্যস্ত। সেই তার জীবনসর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোকা কেঁদে উঠেছে। মেয়েটি শত চেষ্টা করেও তার কান্না রোধ করতে পারছে না। তাই সবশেষে সে বাধ্য হয়ে খোকাকে ভয় দেখাচ্ছে এই বলে যে, এক হনু লেজের সংগে কাটারি বেঁধে নিয়ে তাকে কাটতে এসেছে। এতেই তার কাজ সফল হয়েছে। খোকা হনুর ভয়ে কান্না থামিয়েছে। মেয়েটি তখন আবার খোকার হনুর ভয় দূর করবার জন্য একটা ফুলের গাছ দেখিয়ে তাকে তার নাম জিগ্যেস করছে। খোকা তা পারছে না। মেয়েটি তখন খোকাকে আদর করে বলছে, ওরে খোকন পাখী—এটা তোরই পাকী ফুলের গাছ।

বড়দিদি গো ছোড়দিদি গো দাদা কোথা গেছে ?
হালের গরু পালে গিয়ে বৌ আনতে গেছে।
বৌয়ের মুখটা দেখি না খোকা হয়েছে
খোকা খোকা কাঁদিস না হনু এসেছে
হনুর লেজে কাটারি বাঁধা কাটতে এসেছে।
ও খোকা, এটা কি ফুলের গাছ ?
পাখী আমার পাকী ফুলের গাছ।

কাকে কাকা বলতে হয় আর কাকেই বা মামা বলতে হয় ছোটরা তা কেমন করে জানবে ? তাই আগেকার দিনে কাকা মামাদের পরিচয় তাদের দেওয়া হতো ছড়ার মাধ্যমে। এতে করে সহজে তারা সেটা শিখে নিতে পারতো। কেমন করে শিখতো নিচের ছড়াটির মাঝ দিয়ে তা ভালো করে বোঝা যাবে।

বাবার ভাই কাকা,
আমরা যাব ঢাকা।
মার ভাই মামা,
গায়ে দিই জামা।

পরের ছড়াটিতে বলা হয়েছে যে, হাতীর মতো দুলতে দুলতে বান এলো। তাতে মাঠের সব ধান হেজে গেলো। ধান গেছে তা যাক—তবু ত তার নাড়া অর্থাৎ খড়কুটোগুলো থাকবে। তাতেই জমি সার পাবে। আর তাছাড়া বানের জল মাঠের বুকে নাড়া জাগিয়ে যে পলিমাটি দিলো সেটাও কম নয়। তাতেই জমি আবার মূর্ত হয়ে উঠবে—ছোট ছোট বীজ থেকে আবার মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠবে ধানের গাছ। তাতেই বত্রিশ আড়া অর্থাৎ প্রচুর ধান ঘরে আসবে—এইটাই ছন্দ ও ভাষার মাধ্যমে এতে তুলে ধরা হয়েছে।

হাতী দুলদুল এল বান।
হেজে গেল জলার ধান।
যাক ধান থাক নাড়া।
তবু ধান তুলব বত্রিশ আড়া।

নিচের ছড়াটি সৃষ্টি হয়েছে এক ঠাটা তামাসাকে কেন্দ্র করে। এক অবিবাহিত মুসলমানকে কন্যা খুঁজতে বলা হয়েছে এর মাধ্যমে। যারা রসপিপাসু তারা এর মাঝে রসের সন্ধান অবশ্যই পাবেন।

মুসলমান মুসলমান তেল হলদি মাখ না,
তেল হলদি চুলোয় পড়ুক কন্যা খুঁজ না।
কন্যা বড় সুন্দরী পান খাবার মোহরী,
[illegible] টিপি মাথ না।

বাড়ীর ছোট্ট খোকার কান্না থামাতে আর তাকে নিয়ে খেলা করবার জন্য ডাকা হচ্ছে এক লেজ ঝোলা পাখীকে। পাখীটি বনের জীব। মানুষকে তার বড় ভয়। তাই সে সহজে আসতে চায় না, বুঝতে চায় না মানুষের কথা। সেজন্য তাকে লোভ দেখানো হচ্ছে যে সে যা খেতে চাইবে তাই তাকে দেওয়া হবে। তার পরিবর্তে সে শুধু কলকলিয়ে আপন মনে গান করে ছোট খোকাকে নিয়ে খেলা করবে। এরই মাধ্যমে এই ছড়াটি রচিত হয়েছে।

আয় রে পাখী লেজ ঝোলা,
খোকাকে নিয়ে কর খেলা।
খাবি দাবি কলকলাবি,
খোকাকে তুই খেলা দিবি।

এবারের ছড়াটির মাঝ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক নগ্ন সত্য। ব্যথাক্লিষ্ট এক হৃদয়ের মাঝ দিয়ে চিরাচরিত কাহিনীর অভিব্যক্তি ফুটে উঠলেও তা সত্যই অভিনব! ও পাড়ার ময়নাবুড়োর তের চুড়োর রথ দেখতে অনেক লোক যাচ্ছে। উৎসবটা যদিও রথের এবং যদিও লোকে বলে যে রথ দেখতে যাচ্ছি তবুও রথ দেখাটা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। মুখ্য হচ্ছে তার উপলক্ষ এবং তার প্রতিই লোকের টান সমধিক। তাই সেখানের কোলাহল-মুখরিত প্রাংগণের দোকানগুলোর হরেক জিনিসের মন মাতানো বাহার আর আমোদ আহ্লাদের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রগুলোর উন্মাদনা ও জৌলুস রথের চেয়ে তাদের কাছে বহুলাংশে প্রিয়। কিন্তু সবের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে—টাকা পয়সা। সেই টাকা পয়সা যখন নেই তখন সব বৃথা। এমন কি, ময়না বুড়োর তের চুড়োর রথ দেখাটাও। তাছাড়া রথে যারা যায় তারা সেজেগুজে আপনাদের যতদূর সম্ভব কেতাদুরস্ত করে নেয়। পাড়াগাঁয়ে একটা কথার চলন আছে যে, হলুদ মাখলে নাকি ফরসা হওয়া যায়, গায়ের রঙ নাকি সোনার বরণের হয়। তাই কোন উৎসব ইত্যাদির পূর্বে অনেককে হলুদ মাখতে দেখা যায়—বিশেষ করে মেয়েদের। রথের উৎসবেও অনেকে গায়ে হলুদ মাখছে। কিন্তু হলুদ কেনার জন্যও পয়সা দরকার। তাই যাদের পয়সা নেই তারা কি করবে ? সেইজন্যই বুঝি দরিদ্র এক মায়ের ব্যথার আরতির অভিনব প্রকাশ এই ছড়াটির মাঝে চিরন্তন সত্যের মহিমায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই বুঝি সে আপন মেয়ে সেই সংগে নিজের দগ্ধ হৃদয়কে ব্যর্থ সান্ত্বনা দিচ্ছে এই বলে যে, ফেরত রথে তারা মায়ে ঝিয়ে রথে গিয়ে অনেক আমোদ-আহ্লাদ করবে, এমন কি কাঁঠাল পর্যন্ত কিনে খাবে। ছন্দের মাঝ দিয়ে ছড়াটির গ্রন্থন সত্যই অপূর্ব!

ও পাড়ার ময়না বুড়ো
রথ করেছে তের চুড়ো।
তোরা রথ দেখতে যা
তোদের হলুদমাখা গা।
আমরা পয়সা কোথা পাব
আমরা ফেরতি রথে যাব।
এই রথেতে যাবনি গো মা
ফেরতি রথে যাব,
মায়ে ঝিয়ে যুক্তি করে
কাঁঠাল কিনে খাব।

পরের ছড়াটির মাঝ দিয়ে এক ছোট্ট মেয়ে তার দিদিদের কেমন করে ঠকিয়েছে, তাই বলা হয়েছে। দিদিদের কাছে খেলার জন্ত ঝুমকি আদায় করে তাদেরই আবার বোকা বানানোর মাঝে ছোট্ট মেয়ের বুদ্ধির পরিচয় ত পাওয়াই যায়—সেই সংগে হাসিও পায়।

বড়দিদি গো ছোটদিদি গো গোবর ঘাটো না,
মাইতি পাড়ায় খেলতে যাব ঝুমকি কিনো না।
ঝুমকির ভিতর পাকাপান,
দিদির বর মুসলমান।

নিচের ছড়াটির মাঝ দিয়ে মা যে সন্তানের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধন সেটা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। মাসী পিসির সংগে হয়তো আমাদের রক্তের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু সেটা যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্ত সব ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপে রূপায়িত হয়ে আমাদের জীবনে এক প্রচণ্ড আলোড়ন জাগায়, সেটার মূর্ত ও প্রাণবন্ত একখানি চিত্র আলোচ্য ছড়াটির মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে গ্রথিত হতে একটুও সময় লাগে না। সহজ ও সুন্দর ক'টি ছত্রের মাঝ দিয়ে জগতের মাঝে মা যে পরম ধন সেটা সত্যই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মাসী পিসির মুখে কৃত্রিম আবরণটুকু হয়তো আছে কিন্তু সংগে অন্তরের ভালোবাসার বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই। তাই ভুলেও তারা কোন দিন বলে না যে খই মোয়াটা ধর। 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ' কথাটির সত্যতা এতেই উপলব্ধি করা যায়। তাই মাসী পিসি কিংবা বৃন্দাবন, যেখানে নাকি ভগবানের শ্রীচরণে নিজেকে বিলিয়ে পুণ্য লাভ করা যায় আর স্বর্গলাভের পথ প্রশস্ত হয়—সেই সব কিছুর চেয়ে মা গরীয়সী। তাঁর বড় আর কেউ নেই। তিনি চির আরাধ্যা। সেইটাই এতে বলা হয়েছে।

মাসী পিসী বনগাঁবাসী
বনের ভিতর ঘর।
কখনো মাসী বলে না তো
খই মোয়াটা ধর।
কিসের মাসী কিসের পিসী
কিসের বৃন্দাবন।
এত দিনে জানিলাম মা বড় ধন।

শেষের ছড়াটিতে বলা হয়েছে যে মনের স্ফূর্তিতে যদু মাষ্টারের শ্বশুরবাড়ী চলেছে তার জনৈক ছাত্র। রেল লাইনের ওপর এসে তার স্ফূর্তির মাত্রা বেড়ে চললো। পথ কমে এসেছে—যদু মাষ্টারের শ্বশুরবাড়ী ক্রমশঃই নিকটতর হচ্ছে—মন অনেক আশায় আশান্বিত। হঠাৎ একটু অঘটন ঘটে গেলো। আশা শতধা বিভক্ত হয়ে গেলো। মাথায় পড়লো যেন বাজ। হঠাৎ পা পিছলে যে আলুর দম হতে হবে তা কে জানতো? এ তো গেলো তার নিজের অবস্থা। কিন্তু বহুকষ্টে 'ইষ্টিশান' থেকে যোগাড় করা মিষ্টি গুড়, সখ করে কিনে দেওয়া বাদাম আর গোলাপ ফুল—যে গুলো যদু মাষ্টার নিজেই বহু কষ্টে কিনে দিয়েছে, তাদের অবস্থা দেখে সে বেচারা সত্যই বুঝি কেঁদে ফেললো। চিরন্তন সত্যের একটা অংশই এতে প্রকাশ পেয়েছে।

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টারের শ্বশুরবাড়ী।
রেলকম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।
ইষ্টিশানের মিষ্টিগুড়
সখের বাদাম গোলাপ ফুল॥

এমনই কত সুন্দর সুন্দর ছড়া পশ্চিমবঙ্গের কত প্রান্তর—কত ব্যথাদীর্ণ প্রাণ—কত রসিক মন—কত ছন্নছাড়া জীবনের আকুতিতে রূপমূর্ত হয়ে কত অজ্ঞনতলে যে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। জাতির ফেলে-আসা জীবনের এই প্রকাশ আজ লুপ্ত হতে বসেছে, সেটা কি আমাদের লজ্জার কথা নয়? তবে সুখের কথা আর সৌভাগ্যের কথা, বাংলার কতিপয় সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আজ এই ছড়ার দিকে পড়েছে। তাঁরা অবলুপ্তপ্রায় ছড়াগুলোকে সুন্দর করে আমাদের সামনে তুলে ধরে সেকালের জীবনের এবং সেই সংগে তাঁদের সাহিত্যপ্রীতি ও রচনাশৈলীর নিদর্শন দিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন। তবে এগুলো পূর্ববঙ্গের ছড়াকেই বিশেষ কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের ছড়াগুলো আজও ঠিক একই ভাবে অজ্ঞাত ও অখ্যাত হয়ে না থাকলেও—তাদের কেন্দ্র করে যতটা উৎসাহ ও প্রচেষ্টা দেখা দেওয়া দরকার ততটা দেখা যাচ্ছে না। তবে পশ্চিমবঙ্গের ছড়াগুলোর প্রধান গর্ব যে তারা রবীন্দ্র-পরশ-ধন্য। তাছাড়া আশুতোষ ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টাতেও তারা দীপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গের ছড়াগুলো পূর্ববঙ্গের ছড়াগুলোর তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও তাদের প্রকাশভংগী ও অন্তর্নিহিত ভাব কোন অংশে পূর্ববঙ্গের ছড়াগুলোর চেয়ে হেয় নয়। আশা করি, এদের দিকেও সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকদের সমান দৃষ্টি পড়বে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলের ছড়ারসিক সাহিত্যিকদের। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সাহচর্য ও আন্তরিকতায় পশ্চিমবঙ্গের ছড়াগুলো শুধু যে তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট ভংগী ও মহিমায় মূর্ত হয়ে উঠবে তা নয়, উপরন্তু ছড়ার রাজ্যে নিশ্চয়ই এক গৌরবদীপ্ত নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

আমার কথা (৩৯)

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় কণ্ঠ-সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে যে বঙ্গ-দুহিতা অল্প বয়সে ও স্বল্প সময়ের পরিসরে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা একাগ্র সাধনায় ও শ্রীভগবানের আশীর্বাদে সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুরেলা কণ্ঠে যুগপৎ উচ্চাঙ্গ ও লঘু-সঙ্গীত, ভজন, বাউল, কীর্ত্তন এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন যে দরদী গায়িকা—তিনি সর্বজনপরিচিতা স্বনামধন্যা কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানাতে তিনি বললেন :

"১৩৩৭ সালে ঢাকুরিয়ায় স্বগৃহে জন্মগ্রহণ করি। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে আমি সর্ব্বকনিষ্ঠা। বাবা ৺নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী। গৃহে মা খালি গলায় গান

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

করিতেন, অবশ্য রক্ষণশীল পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে। দাদামশায় পাটনা বাঁকীপুরে কর্ম্মব্যপদেশে থাকিতেন। স্থানীয় বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়ি। ১০।১১ বৎসর বয়সে গ্রামোফোন রেকর্ড ও রেডিওতে গান শুনিয়া নিজেই গাহিতাম। বাড়ীর লোকেদের আমার গলার সুর পছন্দ হওয়াতে স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীসন্তোষকুমার বসু ও শ্রীআশুতোষ মল্লিকের নিকট প্রায় এক বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করি। এই সময় কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রথম গান করি এবং কিছুদিনের মধ্যে কলম্বিয়াতে শ্রীগিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দেওয়া সুরে 'তোমারি আকাশে ঝিলমিল করে চাঁদেরই আলো' ও 'তুমি ফিরায়ে দিয়াছ যারে' গান দুইটি রেকর্ড করাই। অল্প কয়েক দিন শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী এবং পরে শ্রীযামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সঙ্গীত শিখিতে থাকি। পরে এ কানন ও বর্ত্তমানে আমার গুরু বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেব।

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় (যথা অল-বেঙ্গল, অল-ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল মিউজিক, বালীগঞ্জ মিউজিক প্রভৃতি) খেয়াল, ঠুংরী, ভজন, গজল, বাউল ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে আমি প্রথম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হই। এই সময় 'সঙ্গীত সম্মিলনী' আমায় 'গীতশ্রী' উপাধি প্রদান করেন।

ইহার পর আমি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সঙ্গীত-সম্মেলনে এবং বোম্বাইরাজ্য সঙ্গীত সম্মেলনে, পুণা, দিল্লীর সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমী, এলাহাবাদ, গোয়ালিয়ার, পঞ্জাব, নাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের অধিবেশনগুলিতে বিভিন্ন সময় যোগদান করি। সেই সঙ্গে স্থানীয় বেতারকেন্দ্রগুলি হইতে হিন্দী অথবা প্রাদেশিক ভাষায় সঙ্গীত পরিবেশন করি। কাশ্মীর কেন্দ্রেও সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়াছি।

কলিকাতায় নিউ থিয়েটার্সের 'অঞ্জনগড়' (বাংলা ও হিন্দী) ছায়াছবিতে নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে প্রথম কণ্ঠদান করি চিত্রপরিচালক ছিলেন শ্রী বিমল রায় এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। বোম্বাইতে প্রথম পর পর হিন্দী তিনটি ছবিতে 'প্লে-ব্যাক' গায়িকা হই, শ্রীশচীন দেববর্ম্মণ কর্ত্তৃক সুর সংযোজিত 'সাজ ও 'সাজা' এবং অনিল বিশ্বাসের সঙ্গীত পরিচালনায় 'তারাণা', মাদ্রাজে 'মনোহর' ছবিতেও আমি কণ্ঠদান করি। এই পর্য্যন্ত অনেক হিন্দী ও বাংলা ছায়াছবিতে আমি নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে যোগদান করিয়াছি এবং উক্ত দুই ভাষায় আমার অনেকগুলি গানের রেকর্ড করা হইয়াছে। কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে বর্ত্তমানে মাসে এক দিন গান গাহিয়া থাকি।"

কুমারী মুখোপাধ্যায় অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও সাদাসিধা পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন। সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে ভারতে প্রায় প্রতিটি রাজ্যে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষাগুলি আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

রাজ্যসরকার, কলিকাতা করপোরেশন ও জনসাধারণের সাহায্যে বাঙ্গালা দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সঙ্গীত-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা হওয়া বিধেয় বলিয়া তিনি মনে করেন।

কুমারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-জগতে আজ যে উচ্চাসন রহিয়াছে তাহাতে আর একজনের নীরব সাহায্যের কথা অনেকের অজানা রহিয়াছে। তিনি হলেন তাঁহারই জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীহীরা মুখোপাধ্যায়।

Work is only done well when it is done with a will; and no man has a thoroughly sound will unless he knows he is doing what he should.

—*J. Ruskin*

সুপার হোয়াইট কলিনস্

দিয়ে দৈনিক মাত্র একবার দাঁত মাজলে দাঁতের ক্ষয় ও মুখের দুর্গন্ধকারী জীবাণু ধ্বংস হবে।

• পরিবারের সকলেই সুপারহোয়াইট 'কলিনসের' শীতল তৃপ্তিদায়ক মিণ্ট্ স্বাদ পছন্দ করবে।

যাদের পক্ষে প্রত্যেকবার খাবার পর দাঁত মাজা সম্ভব নয়, মনে রাখবেন, দৈনিক মাত্র একবার সুপার হোয়াইট 'কলিনস' দিয়ে দাঁত মাজলে, আপনার দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হবেনা উপরন্তু অধিকতর সাদা ঝকঝকে পরিষ্কার হবে।

দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দৈনিক একবার মাত্র সুপার হোয়াইট 'কলিনস' দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের ক্ষয় ও গহবর উৎপাদনকারী জীবাণুর বেশীভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করে

সুপার হোয়াইট 'কলিনস্' সঙ্গে সঙ্গে মুখের বিস্বাদ, দুর্গন্ধ দুর করে এবং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনার নিশ্বাস প্রশ্বাস মধুরতর রাখে।

দাঁত আরও পরিষ্কার করে! মুখে সুস্বাদ বজায় রাখে।

সুপার হোয়াইট 'কলিনস্' কত তাড়াতাড়ি আপনার দাঁতকে উজ্জ্বলতর ও আরও শুভ্র করে তোলে এবং মুখ পরিষ্কার করে প্রফুল্লতা আনে, তা পরীক্ষা করুন।

সুপার হোয়াইট 'কলিনস্ চেয়ে নিন।

Registered User
Geoffrey Manners & Company Private Limited

চরম প্রমাণ
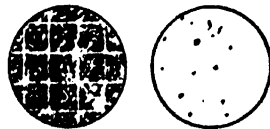
পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাত্র একবার সুপার হোয়াইট কলিনস্দ্বারা দাঁত মাজার পর মুখের দুর্গন্ধকারী ও দাঁত ক্ষয়কারী জীবাণু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়।

K. 78

ছোটদের আসর
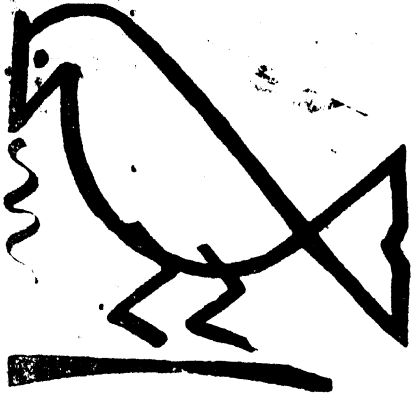
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আজ অবধি কত কি দেখলো মীরা! দেখলো, বাড়ীতে বাড়ীতে সংসার চলেছে, তাতে কত গোলমাল। একটি বিধবা ননদ কিংবা একটা ছোট্ট বৌ সমস্ত পরিবারে আগুন লাগিয়ে দেয়। একটা ছেলে খারাপ হলে সারা পাড়াকে ব্যতিব্যস্ত করে। কোনো মানুষের যেন জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই। পানের দোকানে ব'সে পান বেচছে, জর্দার দোকানে জর্দা। ডাক্তারখানায় ডাক্তার, চেম্বারে ব্যারিষ্টার। সকলেই ভাবছে, দিনের রোজগার কত হল। কুটনো কুটে রান্না ক'রে গা ধুয়ে কাপড় কেচে বৌ ভাবলো, আজকের দিনটা কাটলো।

পরমহংসদেব বলেছেন এগিয়ে চল। সেই যে কাঠুরের গল্প। গুরুদেব বললেন এগিয়ে যাও। শাল তমাল পিয়াল গাছ কাটে। সে আরো এগিয়ে গেল। গিয়ে পেলে চন্দনগাছের বন। কি সুগন্ধ সে কাঠের! অনেক পয়সা সে পেলে চন্দনকাঠ বেচে। তবু সেখানে রইলো না। গুরুদেব বলেছেন—এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে পেলে তামার খনি। তামা বেচে পয়সা ক'রে আরো গেল এগিয়ে। রূপোর খনি, সোনার খনি, হীরের খনি! তার আর কোনো দুঃখ রইলো না। ধর্মের পথেও তোমায় এগিয়ে যেতে হবে, মন হবে উদার, কাজ হবে মহৎ। আশ্চর্য্য কাণ্ড তুমি করবে পৃথিবীতে। গৌরী থেকে গৌরীমা, সারদা থেকে সারদেশ্বরী, বিলে থেকে বিবেকানন্দ, মার্গারেট নোবল থেকে নিবেদিতা, ঘোষসাহেব থেকে শ্রীঅরবিন্দ।

রবি ছিল মায়ের সব ছেলের চেয়ে কালো, তার ওপর লেখাপড়া করলো না, মা ভেবে অস্থির,—রবির কি হবে! মা দেখে গেলেন না, ছেলে তাঁর রূপে গুণে বিদ্যায় প্রতিভায় বিশ্বজয়ী। মা না থাকলেও বাবা যে মহর্ষি। জীবনে কাউকে ঠকান নি, নিজে কষ্ট পেয়েছেন।

রাম শ্যাম যদু কত নিত্য মারা যায়, কে তাদের খোঁজ রাখে? তুলসীদাস বলেছেন, তুমি যখন জগতে এসেছিলে কেঁদেছিলে, সকলে হেসেছে ছেলে হয়েছে ব'লে। যখন চ'লে যাবে হাসতে হাসতে, যাবে সকলকে কাঁদিয়ে।

জজ ব'সে থাকে চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে জজ চ'লে যায়, অন্য জজ আসে। কাজ একটুও আটকায় না। জজের চেয়ে বড় চাকরী ক'টা আছে? তাইতেই ক্ষতি হয় না। যতক্ষণ চেয়ারে বসে, মনে করে আমি যেন কে!

সিনেমার লাইন দেয় ছেলেরা। কেউ আগে এসে দাঁড়ালে গোলমাল করে, মারামারি করে। পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেলে হাসে। জরিমানা হয়, শিক্ষা হয় না।

লিফটের ধারে উকিল ব্যারিষ্টার দাঁড়ায়, কেউ আগে যেতে গেলে তারাও গোলমাল করে ঐ ছেলেদেরই মতন। ছেলেরা বলে বাংলায়, এরা বলে ইংরেজীতে। তফাৎ বিশেষ নেই।

সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান করেছিলো মীরারা। সেখানে অনেক ছেলে এসেছিলো ভাব করতে। মীরার ভালো লাগেনি। পুরুষের থাকবে বীরত্ব, সাহস, পৌরুষ, মেয়েলীপণা না। মেয়েদের থাকবে লজ্জা, মমতা, করুণা। পুরুষালী বেহায়াপণা না।

বৃদ্ধ যারা, তারাও পিঠে হাত না দিয়ে গায়ে হাত না দিয়ে কথা বলতে পারে না। মীরা খ্যাঁক্ ক'রে ওঠে। গায়ে-পড়া ভাব সে সহ্য করতে নারাজ।

ট্রামে চলেছে। পাশের সীট খালি আছে। শ্যামবাজার থেকে দুটি লোক ওঠে, একটি বুড়ো লোক, মাথাভরা টাক, বেঁটে, রোগা, চশমা চোখে। আর একটি আধবুড়ো, দোহারা মাঝারি সাইজ, ব্যাকব্রাশ চুল, কোট-প্যাণ্ট পরা। দুটিতে ডালহাউসি যেতে চীৎপুর রোডের মোড়ে নামবে, দুটিতে মেয়েদের সীটের পাশ থেকে একটুও নড়বে না। মীরা উপর্য্যুপরি ক'দিন লক্ষ্য করেছে।

সেদিন মীরার পাশের সীট খালি ছিল—মধ্যবয়সী লোকটি বলেছে—বসব? বুড়ো লোকটি অমনি বললে—তুমি কেন বসবে? আমি বসব। আমি বাপের মতন।

আমিও তো ভায়ের মতন।

কিসের ভাই?

আপনিই বা কিসের বাপ?

মীরার কথা-কাটাকাটি অসহ্য হল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনারা বাপ-বেটাতে বসুন, আমি নেবে যাচ্ছি।

এই কথা-কাটাকাটি ওর সহ্য হয় না। বাড়ীতে বাড়ীতে পথে-ঘাটে অজস্র কথা-কাটাকাটি। পথের লোককে ত্যাগ করা যায়,

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

বাড়ীর লোককে তো যায় না। সকাল থেকে উঠে বাসিমুখে এক একজন চেঁচাবে সংসারে অশান্তি আনতে। তারা বিধাতার ব্যর্থ সৃষ্টি।

না, তাও না। ইরাণ দেশের উপকথায় যেমন আছে—সৃষ্টিকর্তার দুই ছেলে—একজন দিলে আকাশ, বাতাস, অরণ্য, ঝর্ণা, ফুল, ফল, পাখীর গান।

আর একজন দিলে—সাইক্লোন, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত। একজন দিলে—আশা, আনন্দ, সুখ, শান্তি, জীবন। আর একজন দিলে—দুঃখ, শোক, রোগ, চিন্তা, মৃত্যু।

জগতে তাই একদল লোক মানুষের রোগ জয় করবার জন্যে নানা রকম ওষুধের সৃষ্টি করছে, মানুষের আরামের জন্যে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার করছে। আর একদল লোক পাইকারী ভাবে চুরি করছে, খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে, মানুষের সর্বনাশ করছে।

ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণে চ'ড়ে মীরা ভাবলো—কী আরাম! সীটগুলি কি চমৎকার, জানলা-শার্সী কেমন ঝক্‌ঝক্‌ করছে, রূপালী রঙ আর চক্‌চকে দেয়াল, আর মেঝেয় কার্পেট, চারিধারে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পাখা আর আলো—এ যেন কার সাজানো ড্রয়িংরুম। চলেও সুন্দর। গাড়ী কি পরিষ্কার রইলো! ধূলো নেই, ধোঁয়া নেই।

কিন্তু এ কামরাগুলি কি এমন থাকবে? পানের পিচে, আঙুলের চুণে আর পেন্সিলের লেখায় চারিধার কি কলঙ্কিত হ'য়ে উঠবে না? পাখা চুরি যাবে না? তবে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য কি রইলো?

১৩৬৪ সালেই সে আশ্রমের দরজা খুলতে পারলো পুরীতে "শিল্প-মন্দির" নাম দিয়ে।

মেয়েরা এখানে সোনার কাজ রূপোর কাজ করবে অলঙ্কারে—উড়িষ্যার বিখ্যাত শিল্পীদের কাছে। কত সহজ এনগ্রেভ করা, পালিশ করা, গিণি সোনার গয়না গড়া। আর করবে পাথরের কাজ, যা উড়িষ্যার বিশেষত্ব। আর কটকী শাড়ীর বিভিন্ন ডিজাইন। ঘর সাজাবার জন্যে ফুলদানী আর টেবিলল্যাম্প, টেবিল ক্লথ আর আসন, বেতের সাজি, ভ্যানিটি ব্যাগ—রাষ্ট্রভাষায় যার নাম ফুটানিকা ডিব্বা—আরো কত কত জিনিস বাংলার পথহারা অন্নহারা অসহায় মেয়েদের হাতে তৈরী হ'তে হ'তেই বাজারে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

যেদিন কবি হেমচন্দ্র লিখেছিলেন—

রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া গাড়ী মুদে যাওয়া,
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া!
খেয়ে যায় নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে,
হায় হায় ঐ যায় বাঙালীর মেয়ে।

আর নাট্যকার অমৃতলাল বসু লিখেছিলেন—

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদি পিসি
তার আণ্ডারে কলম পিষি!

সেদিন কেউ কি ভাবতে পেরেছিলো—বাঙালী মেয়েরা মেমেদের সরিয়ে অফিস অঞ্চলের সমস্ত বিভাগে ছড়িয়ে পড়বে? তারা এম, এল, এ হবে, রাজ্যপাল হবে, কলারে বাণ্ড ঝুলিয়ে ব্যারিষ্টার হবে?

কিন্তু এতেও হবে না। ঘর চাই। যে দেশে মেয়েরা অনেক অগ্রসর, যুদ্ধ করে, এরোপ্লেন চালায়, সেই জার্মানীর হের হিটলার বলেছিলেন—মেয়েরা রান্নাঘরে ফিরে যাও। সে হুকুম সে দেশের মেয়েদের মানতে হয়েছিলো।

ঘর থেকে ছেলে তৈরী ক'রে পাঠাতে হবে। সারা দিন ঘরে-বাইরে নয়, সারা দিন ঘরেই থাকতে হবে।

মূর্খ অশিক্ষিত মায়েদের ছেলেরা কি বিদ্বান্ হয় না? হয়। কিন্তু সেই মহাপাণ্ডিত্যের মধ্যেও নীচতা সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও দেখো, জীবনে যে বড়ো হয়েছে, তার পিতাও কম ছিল না। পিতা আর মাতা দুজনে বড়ো হলে হয়—নেতাজী।

মা না বড়ো হ'লে কক্ষণো ছেলে দিগ্বিজয়ী হতে পারে না, দেশ বড়ো হতে পারে না। মুরা দাসী, কিন্তু একলা ছেলে তৈরী করেছিলো চন্দ্রগুপ্ত; মৌর্য্যবংশ মুরার নাম থেকে।

শচীমাতার ছেলে না হয়ে কচিমাতার ছেলে হলে নিমাই কখনো মহাপ্রভু হ'তে পারতেন?

নিজের মা না হলেও মা। জর্জ ওয়াশিংটন বিমাতার কাছে মানুষ হয়েই অত বড়ো। স্নেহে মমতায় করুণায় মা যশোদাই শ্রীকৃষ্ণকে গ'ড়ে তুলেছিলেন, দেবকী নয়।

অনেক যুগ ধ'রে বাংলা দেশের বড়ো অভাব মা-তৈরীর, ছোট বেলায় মাকে হারিয়ে এই কথাই মীরার বার বার মনে হয়।

আর সেই মহৎ সৃষ্টি এই পুরীতেই সম্ভব। নীল সমুদ্র যেখানে ফিরোজা রঙের আকাশে মিশেছে, জগবন্ধুর মন্দির যেখানে মেঘের দিকে চলে গেছে, বিরাট দেবতার মূর্তি, বৃহৎ রক্তবেদী কালো পাথরের, রক্তের লেশ নেই, তবু লক্ষ মানুষের ভক্তিতে যার চেয়ে বড়ো রক্ত নেই, যা স্পর্শ ক'রে হাজার মাইল দূরের পথিক পরম শান্তি পায়—সেইখানে মানুষের মনকে উদার ক'রে স্বপ্নকে সুন্দর ক'রে নবজীবনগুলিকে বিকশিত ক'রে তোলবার সুযোগ পেয়ে মীরা ধন্য হয়।

মীরার ড্যাডি মীরাকে যা দেবে বলেছিলো, সব টাকাটাই পাঠিয়ে দিয়েছে।

এমনি সময়ে এলো বাঘা।,. বললে, সাবাস! কিন্তু শুধু মেয়ে মানুষ করতে তো হবে না, ছেলেও মানুষ করতে হবে।, আমি নোব ছেলেদের ভার। ছেলেরা মেয়েরা একসঙ্গে পাশাপাশি কাজ করুক। পরস্পরকে বুঝুক!

হাঁ করে দেখছ কি? বাঘা বলে। বাংলা দেশের লোক এ-সব আশ্রমের কথা নতুন শুনছে। মারাঠায়, পাঞ্জাবে কবে থেকে হয়েছে। তৈরী করো, ছেলে-মেয়ে দুই তৈরী করো। ইস্কুলে ছেলেরা সহজ অঙ্ক করতে পারে না, মাষ্টার কান মুলে দেয়, সকলের সামনে অপমান করে। এ কথা একবার ভাবে না, যে ছেলের টনসিল আছে, তার মাথায় সহজ কথাটাও সহজে ঢোকে না। এই মাষ্টারগুলোকেই মার দেওয়া উচিত। সাধনা কই দেশে? ঋষিরা মানুষের রোগমুক্তির জন্যে বনের লতা-পাতা গাছ-গাছড়া নিয়ে ওষুধ তৈরী করতে বসে গেলেন। সে শাস্ত্রের নামও বেদ, আয়ুর্বেদ। বইয়ে লেখা দুষ্প্রাপ্য গাছপালা যখন পাওয়া যায় না, তখন বৌদ্ধযুগে নালন্দায় নাগার্জ্জুন ধাতু নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন, লৌহ, স্বর্ণ, মুক্তা ইত্যাদি নিয়ে। ধাতু পারা দিয়ে বেরোল মকরধ্বজ। শোধন করবার ব্যবস্থা হল পথের ধারে যে গাছ-গাছড়া পাওয়া যায়, তাই দিয়ে। কী দুষ্কর তপস্যা! এ যুগের ছেলেরাও তেমনি মানুষ হয়ে উঠুক। তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বরের মন্দির যে দ্রাবিড় সভ্যতায় সম্ভব হয়েছে, তার কাছে আর্য্যরা কোথায়?

মীরা বলে পুরানো কথা পুরাণের। আমরা কেন মনে করব ?

সে যে পুণ্য চরিতকথা। এখনো মেয়েরা বোশেখমাসে ব্রত করতে গেলে শুধু রামের মত স্বামী চায় না, লক্ষ্মণের মতন দেওর চায়। যুগে যুগে লক্ষ্মণের মতন ভাই আদর্শ হয়ে আছে। লক্ষ্মণের কথা মনে করতে গেলে এখনো বাঙালীর চোখে জল এসে যায়।

"শচীমাতা বলে নিমাই নিমাই,
প্রতিধ্বনি বলে, নাই নাই নাই"।

শিবনাথ শাস্ত্রীর এই কবিতা বাঙালী ভুলতে পারবে ?

মীরার আশ্রমে ছেলেমেয়ে দু-ই এলো। লোকেরও অভাব নেই, টাকারও অভাব নেই।

মেয়েরা ছবি দেখে জানতে চায় জিরাফ কত লম্বা। শোনে আঠারো ফুট। জিরাফ কি করে ডাকে ? জিরাফ ডাকে না। অতখানি লম্বা গলায় একটুও আওয়াজ বেরোয় না। হাঁসের গায়ে জল লাগে না কেন ? পালক কেন ভেজে না ? হাঁসের গা থেকে তেলের একটা রস বেরিয়ে তার গাটাকে তেলা করে রাখে, যেমন ওয়াটারপ্রুফ।

ছেলেরা জিগ্যেস করে—কংগ্রেস করলো কে প্রথম। প্রথম করলো লর্ড ডাফরিণ। বড়লাট। দেশের লোক পরামর্শ দেবে ইংরেজ শাসন কি ভাবে ভালো করে চালানো যায়। প্রথমে একশো জনও সভ্য হয়নি। প্রথম অধিবেশন হল বোম্বাইয়ে। প্রথম সভাপতি ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জী—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্র আর ছাত্রী তারাই কর্ম্মী। খালি তারা প্রশ্ন করে। জবাব দিতে হয়। বাবা আর মীরা বাংলাদেশের ছেলে আর মেয়েকে শেখায়—

যারা "কর্ম্মে প্রধান হবে, ধর্ম্মে প্রধান হবে।"
যারা প্রমাণ করবে—"ভারত আবার জগৎসভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

নীলসমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা সাদা ফণা তুলে এগিয়ে আসছে, সোনালী বেলাভূমিতে ভীষণ আওয়াজ করে আছাড় খেয়ে পড়ছে—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। সমুদ্র থেকে সমুদ্রে এই নীল জলের যোগ, কোথাও জল সবুজ, কোথাও আরো নীল, কোথাও ঘন কালো। ডাঙার চেয়ে বেশী জল পৃথিবীর চারি ধারে। এই সমুদ্রে কোথাও ঝড় উঠে পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ জেগে জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে, কোথাও জলস্তম্ভ মেঘে গিয়ে ঠেকছে, কোথাও আইসবার্গ ভেসে আসছে—বরফের চাঁই। উত্তরে সুমেরু। সুমেরুতে গ্রীণল্যাণ্ড সবুজ নয়, বরফে সাদা—থাকে এস্কিমোরা, যে এস্কিমো শব্দটা ভারতীয়। দক্ষিণে আছে কুমেরু—ইয়োরোপের চেয়ে বড়ো, মানুষজন কেউ নেই, সাদা বরফের তলায় আছে সোনা, রূপো, তামা, হীরা, কয়লা। সমুদ্রের এই জলপথ ধরে যুগে যুগে বন্দরে বন্দরে বিভিন্ন জাতের আনাগোনা।

এই সমুদ্রতীরে হোটেলে হোটেলে লোকে বেড়াতে আসে, তাদের ঐশ্বর্য্য দেখাতে। ধরমশালায়, পাণ্ডাদের বাড়ীতে আসে দূর দূর গ্রামের লোকেরা তাদের সামান্য সম্বল নিয়ে। মীরা শোনে সকলের মুখেই আমি, আমার। গ্রামে ও শহরে কত লোকই বলে গেল—আমার বাড়ী, আমার জমি, আমার টাকা। চলে গেছে তারা, বাড়ীও নেই, জমিও নেই, টাকাও নেই। তাদের নামও নেই।

তাইতো বাবা বলে, নিজের কৃতিত্বে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে শক্তিতে তোমায় বড়ো হতে হবে, অপরকে বড়ো করতে হবে। এই বিধাতার বিধান। অপরকে সাহায্য না করলে তুমি কখনো মনে শান্তি পেতে পারো না, থাক না তোমার লক্ষ লক্ষ টাকা। যেদিন তোমার ডাক আসবে, চলে যেতে হবে, কোনো ডাক্তার তোমায় বাঁচাতে পারবে না, কোনো শুশ্রূষা তোমার যন্ত্রণা কমাতে পারবে না। তার আগে যতটুকু সময় পাও, পরের উপকার করো, অসত্য নয়, অধর্ম্ম নয়, প্রতারণা নয়—ন্যায়ের পথে কর্ত্তব্যের পথে এগিয়ে যাও ছোটবেলা থেকে। তারপর দেখো, তোমায় দিয়ে তিনি কি কাজ করান। ভবিষ্যতের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, তিনিই ভাবছেন। সমস্ত লোক এই ভাবে ভাবুক, 'আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব', 'পথে ঘাটে ঘরে বাইরে আমরা লোকের কাজে লাগব', 'যে দুর্জ্জন, তাকে বর্জ্জন করবে, যে সুজন তাকে সম্মান দোব'—

মীরা বাধা দিয়ে বলে—তাহলে তো খনার বচন মনে রাখতে হয়—দুটি ছেলের জন্মতিথি। অষ্টমী নবমী দুটি। জন্মাষ্টমী আর রামনবমী।

বাবা বলে—ঠিক।

"সম্পদে কে ভয়ে থাকে ? বিপদে কে একান্ত নির্ভীক ?
কে পেয়েছে সব চেয়ে ? কে দিয়েছে সবার অধিক ?
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত ?"

মীরা বলে, অযোধ্যার রঘুপতি রাম।

বাবা বলে, সে যুগেও নির্ব্বোধ দুষ্ট লোকের অভাব ছিল না—তার প্রমাণ অযোধ্যার প্রজারা। প্রমাণ কৈকেয়ী। প্রমাণ কংস, দুর্য্যোধন, দুঃশাসনরা। কিন্তু বেদের পরে যে বেদান্ত, যাকে বলে উপনিষদ, লিখেছিলেন ঋষিরা বিশ্বের কল্যাণের জন্যে। আমরা তা চোখেও দেখিনি। দেখেছেন জার্ম্মাণীর ম্যাক্সমুলার। রাশিয়ার শিক্ষা ভালো, ইংলণ্ডের শিক্ষা ভালো—ভারতবর্ষের শিক্ষাই বা কম কিসে ? সে শিক্ষা কেউ নিচ্ছে না বলেই তার দাম কমে যায়নি। একটা রোলসরয়েসের দাম লাখ টাকা। তার আরাম অনেক। কলকাতার এক ধনীর তেরোখানা রোলসরয়েস ছিল, তবু মনে শান্তি ছিল না। শেষটা তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিলো। যাতে মনে শান্তি আসে, যাতে জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায়—এমন শিক্ষা যাতে আছে—তার নাম গীতা। সেই গীতার মানে আমরা কেউ বুঝতেও চেষ্টা করি না।

মীরার শিল্পমন্দিরের এ যুগের ছেলে-মেয়েরা পুরাতন ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা রাজর্ষি জনকের, দাতাকর্ণের, সম্রাট অশোকের, হর্ষবর্দ্ধনের, মহামন্ত্রী চাণক্যের, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনী থেকে পেতে লাগলো আনন্দের সঙ্গে। শিল্পমন্দিরের ছেলে-মেয়েরা ছোট থেকেই শিখতে লাগলো—চাকরী করবে না। চাকরী ছোট থেকে বড়ো—নিয়মে বাঁধা—এক সময় থেকে আর এক সময় পর্য্যন্ত কোনো জায়গায় তোমায় বন্দী হ'য়ে থাকতে হবে, যেখানে মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, দিনের বেলায় বিজলী বাতি জ্বলছে, চেয়ারের আরাম, হুকুম করার পিয়ন, উন্নতিতে হিংসে করার সহকর্ম্মী, বিপদে উল্লাস করার লোক সব সেখানে পাওয়া যাবে। দশ বছর চাকরী করলেই তুমি এমনি অপদার্থ হ'য়ে যাবে যে যদি চাকরী যায়, আর কিছু করতে পারবে না।

অথচ চাকরীর খাতিরে আত্মীয়-স্বজনদের রোগে শোকে সেবা করবার জন্যে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তুমি ছুটি পাওনি। পুরুষ হোক, মেয়ে হোক, চাকরীর জগতে স্বাস্থ্য হারাবে, ফুর্তি হারাবে, মনের উদারতা হারাবে, জীবনে যুদ্ধ করবার শক্তি হারাবে—একদিন না একদিন।

কোনো চাকুরের জাত পৃথিবীতে কখনো বড়ো হতে পারেনি। ইংরেজ আমেরিকান জাপানী চীনা কারবারীর জাত। বাঙালী, মাদ্রাজী, মারাঠী, বিহারী, উড়িয়া ছোট বড়ো চাকুরীয়ার জাত। গুজরাটী, রাজস্থানী, কচ্ছী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী কারবারীর জাত। এবার তুলনা করো।

বাবার প্রশ্ন—বাংলাদেশের প্রশ্ন। তার উত্তর দেবে শিল্পমন্দিরের ছেলে-মেয়েরা। উত্তর ঠিক হল কি না প্রমাণ দেবে নিজেদের জীবন দেখিয়ে।

তারি জন্যে শুধু অপেক্ষা করতে হবে।

অনেক শতাব্দী অপেক্ষা করা হয়েছে। আর কিছু দিনে কি আর এমন এসে যাবে?

ইতিহাসের এই সত্যটা শুধু মনে রাখতে হবে—অসাধু জাত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। স্বাধীনতা সেইখানেই থাকে—যেখানে সবাই মানুষের মতন মানুষ—প্রত্যেক মানুষের যেখানে মূল্য আছে।

স্বাধীনতা সেখানে থাকে রাণীর মতন, যেখানে দেশজোড়া ছোট ছেলেমেয়েদের নিত্য নবীন লোকের জয়যাত্রা, তাদের জন্যে অফুরন্ত আনন্দ-উৎসব।

সমস্ত দেশ উদগ্রীব উৎকণ্ঠিত হ'য়ে চেয়ে থাকে—আসছে তারা আসছে। আমরা যে কাজ শেষ করতে পারিনি, সেই কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্যে তারা দলে দলে এগিয়ে আসছে। কুঁড়ি থেকে ফুল হ'য়ে যারা ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে।

মীরার কাছে চিঠি এলো—পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী নেবে শিক্ষয়িত্রীর?

সে অনায়াসে অকম্পিত হাতে লিখে দিতে পারলো—না। দুঃখিত। ধন্যবাদ।

মীরা তো সাধারণ মেয়ে নয়!

সমাপ্ত

কুথুমী

[শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী "KUTHUMI" কবিতার গদ্য-রূপ]

সাতটি পর্বত আর সাতটি সমুদ্র রয়েছে আমায় ঘিরে। ওপরে আটটি সূর্য জলছে নানা বর্ণে—সবুজ, নীল, লাল, গোলাপী, বেগুনী, সোনালী এবং শাদা। আর এক তামস-মণ্ডল—যে মৃত্যু-আচ্ছন্ন গুহায় করে পরিভ্রমণ, চেয়ে আছে আমার দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে। আমার নীচে সুদূর-প্রসারিত অমর-জগত সমূহ স্তরে স্তরে—বিরাট পর্বতের মত আকাশের গা বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে যেন এবং তাদের চূড়াতে বাস করেন শিব।

প্রাচীন কালে আমার কীর্তির সাথে ছিল পৃথিবীর পরিচয়। মরণশীল মানুষ যাদের আমি এখন নিয়ন্ত্রণ করছি তখন তারা ছিল আমার সহচর। আমি মানুষের গতানুগতিক চিন্তাধারার পথ অনুসরণ করিনি। জ্ঞানের তৃষ্ণা, এক শক্তি, দিব্য-হিতসাধনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমায় শত জন্মের ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে। জন্মে জন্মে এগিয়ে গিয়ে শেষে জ্ঞানের চূড়াতে পৌঁছেচি। পরিশেষে ভারতে জন্মগ্রহণ করে আমি কুথুমী—ক্ষত্রিয়-কুলজাত দ্বৈপায়ন-সম্প্রদায়ের মহাযোগী, এলাম আমাদের আদি-ঋষি ব্যাসদেবের কাছে। তিনি আমার দিকে তাকালেন, সে-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সব কিছু। তিনি হাসলেন—যে হাসিতে কেঁপে ওঠে বুক—বললেন "কুথুমী, বহু জন্মে যা অর্জন করেছ সব একত্র কর, তোমার সমস্ত অতীত জীবনকে স্মরণ কর। মানব-জন্মচক্র থেকে মুক্ত হয়ে সেই আটটি কর্ম সম্পাদন কর যা মানুষকে দেবতায় পরিণত করে। তার পর ফিরে এসে তোমার মহান কর্মব্রত গ্রহণ কর, কারণ তোমার আত্মা মৃত্যুকে করেছে পরাজিত!"

সমুদ্রের ধারে এক পর্বতে চলে গেলাম। দিবা-নিশি সমুদ্রের নিষ্ঠুর গর্জন, ঝড়ের শ্রান্তিহীন প্রচণ্ড শব্দ পশুদের চীৎকার আর দন্ত নিষ্পেষণরত করাল দৈত্য-দানবদের ভেতর থেকে তিন দিনে হঠযোগ শেষ করলাম—যা মানুষ বহুকষ্টে দশজন্মে করে। পৃথিবীর দুর্বল মানুষেরা এখন যে হঠযোগ করছে তা নয়। লঙ্কার রাবণ জানত সেই যোগ। ধ্রুব পূর্ণ করেছিল যে যোগ। হিরণ্যকশিপু করেছিলেন সেই যোগ। প্রাচীন সীমুরীয় সম্রাটরাও করতেন এই যোগ। দেবতাদের আনন্দ, সিদ্ধের গর্ব আর অসুরের শক্তি সঞ্চারিত হল আমার শিরায় শিরায়। দীর্ঘাকৃতি অমিততেজা দেবতার মত ফিরে এলাম ব্যাসদেবের কাছে। তিনি শিরোপরি চূড়াকৃতি কেশগুচ্ছ সঞ্চালন করে বললেন—"তুমি শুদ্ধ নও!"

দারুণ ক্রোধভরে ফিরে গেলাম হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে—বসে রইলাম নির্বাক নিশ্চল বহু বৎসর। তারপর জ্ঞান এল নেমে নদীর স্রোতের মত। অবতরণশীল শক্তির পদভরে উঠল দুলে চারিদিকের পর্বতমালা। তিন দিনে আমি রাজযোগ শেষ করলাম যা মানুষ বহু আয়াসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বৃথাই যুগভরে অনুসরণ করে। কলির রাজযোগ নয়। পবিত্রতা, শক্তি এবং জ্ঞানের উপায়। দৈত্য বলি এই যোগ আয়ত্ত করে মানুষকে দিয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন অতলান্তিক নৃপতিবৃন্দও জানতেন এই যোগ।

সূর্যের দীপ্তি নিয়ে ফিরে এলাম ব্যাসদেবের কাছে। তিনি হেসে বললেন, "বিশ্বের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে রয়েছেন আত্মগোপন করে, এখন তাঁকে খুঁজে বের কর। যা তুমি জান এবং যা তোমার আছে সব তাঁকে অর্পণ কর। মরণশীল মানুষদের ভেতর তুমিই নির্বাচিত হয়েছ জ্ঞানকে সংরক্ষণ করতে। যত দিন পর্যন্ত তৃতীয় যুগ মানুষের এই দেবতা-সদৃশ রূপ রক্ষা করছে তত দিন এই কাজ সহজ হবে। যখন দেখবে যে ঘোর কলি আসছে এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে পৃথিবী পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তখন জানবে যে পরীক্ষার সময় সমুপস্থিত। বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করবে এবং যে জ্ঞান পৃথিবীকে রক্ষা করছে সেই জ্ঞানকে রক্ষা করবে, যত দিন না শ্রীকৃষ্ণ আবার ফিরে আসেন। তারপর তুমি তোমার মহান কর্ম থেকে মুক্তি পাবে এবং যত দিন না আর এক কল্প ফিরে আসছে তত দিন তুমি এক আনন্দময় জগতে বহুবর্ষব্যাপী বিশ্রাম গ্রহণ করবে এবং তুমি হবে সপ্তর্ষির এক ঋষি।"

আমার জ্ঞানকে পাঠিয়ে দিলাম দেশ-বিদেশে। ভারতের

রাজসভাগৃহে অথবা শান্তিময় নিস্তব্ধ আশ্রমে তাঁকে পাওয়া গেল না। পবিত্র মন্দিরে বা বণিকের গৃহেও তাঁকে পাওয়া গেল না। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের দেহেও তাঁকে মিলল না, শূদ্র অথবা অন্ত্যজের ভেতরেও নয়। অবশেষে পর্বতের এক প্রান্তে এক রিক্ত কুটীরে নক্ষত্রচালিত হয়ে এলাম। বন্য আভীরদের এক উন্মাদ সন্ন্যাসী বসে আছেন নির্বাক হয়ে। কখনও উচ্চহাস্য করছেন, কখনও নৃত্য করছেন, কিন্তু কাউকে ব্যক্ত করছেন না কেন তাঁর এ-আনন্দ? এই মানুষটির অন্তরালে দেখতে পেলাম, আত্মাকে যা নিখিল-বিশ্বকে ধারণ করে আছে। তাঁর পায়ে আমি লুটিয়ে পড়লাম। তিনি আমায় পদদলিত করে ছুটতে লাগলেন উল্লম্ফন করে। আমার ভেতর থেকে সমস্ত জ্ঞান, আকাঙ্খা এবং শক্তি তাদের মূল উৎসে ফিরে চলে গেল, শিশুর মত আমি বসে রইলাম।

অট্টহাসিতে দিক মুখরিত করে তিনি বললেন—"ভিখারি! ফিরিয়ে নে তোর দান।" এই কথা বলে তিনি লম্ফনে লম্ফনে পাহাড়ের গা বেয়ে মিলিয়ে গেলেন।

পরিপূর্ণ আলো, শক্তি ও আনন্দ নিয়ে আমি উড়ে চললাম আকাশ-মণ্ডলের ওপারে—মহাপরাক্রমশালী দেবতাদের ওপর দিয়ে—আমার মানুষের শরীর রইল পড়ে বরফের ওপর।

অন্যেরা সবাই এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ায় তাঁদের শক্তি দিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু বিষ্ণু-প্রদত্ত এ কাজ শুধু আমারই। আমি এখানে জ্ঞান সংগ্রহ করি, তার পর মানুষী তনুতে ফিরে যাই পৃথিবীতে। মানুষের মাঝে কিছুকাল বিচরণ করি আমার যন্ত্র নির্বাচন করতে, পরীক্ষা করি, প্রত্যাখ্যান করি অথবা গ্রহণ করি আত্মার আধারকে।

আবার আসছে ফিরে স্বর্ণযুগ—কলির নিকষ কালোর বুকে ফুটে উঠবে সোনার রেখা। যোগ-সাধনা মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ধর্ম নিয়ে হানাহানি, কূট তর্ক এবং নিরীশ্বরবাদ পৃথিবী থেকে মুছে যাবে—প্রজ্ঞা, মৈত্রী আর প্রেমে হবে শ্রীকৃষ্ণের জগতের প্রতিষ্ঠা।

অনুবাদক :—সুবীরকান্ত গুপ্ত।

সিকিয়াং

(চীনদেশের উপকথা)

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

সিকিয়াং। চীনের একটি নদী। এক কালে অনেক—অনেক দিন আগে নান্‌কিং ছিল তখন চীন দেশের রাজা। তার না ছিল কোনো ছেলে, না ছিল কোনো মেয়ে। রাজার তাই বড় দুঃখ। তিনি কেবল সারা দিন-রাত ভাবেন আর ভগবান ফুকে জানান তাঁর দুঃখের কথা।

হে ভগবান! এত বড় রাজপুরী, আমি মরবার পর কে ভোগ করবে এতো সুখ? আমাকে একটি ছেলে অথবা মেয়ে দিয়ে আমার দুঃখ দূর করুন। আমি বড় দুঃখী, এত বড় রাজপুরে থেকেও আমার মনে সুখ নেই। আপনি আমায় দয়া করুন তথাগত!

তথাগত ফু তার কথা শুনলেন এবং একদিন রাজপুরীর মাঝে এসে রাজা নান্‌কিংকে দেখা দিলেন। রাজা তো অবাক! সব দুঃখ তাঁর এক নিমিষেই দূর হোয়ে গেল। তিনি তথাগতের পানে চেয়ে রইলেন আকুল হোয়ে। তাঁকে নতি জানালেন।

তোমার ফুটফুটে চাঁদের মত একটি মেয়ে লাভ হবে রাজা। তার তরে তোমাকে আমার কথা মতো একটি কাজ করতে হবে। তোমার রাজপুরীর পুবদিকে চলে যাবে অনেক—অনেক দূর; অনেক বন জংগল পেরিয়ে। তারপর অনেক দূর চলবার পর তুমি একটা পাহাড় দেখতে পাবে, তারই কোল থেকে ঝরে পড়তে দেখবে একটি নদীকে। সেই নদীই মেয়ে হোয়ে তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তুমি যেমনি ছোঁবে সেই নদীর জল। নাম রাখবে তার সিকিয়াং। তবে খুব সাবধান! এই মেয়ে হবে তোমার খুব দয়ালু দানশীলা। গরীব দুঃখীদের ওপর তার থাকবে খুব দয়া। তুমি যদি তোমার রাজপুরীতে কোনো দিন কোনো পাপের কাজ করো তখন সিকিয়াং আবার নদী হোয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে, তোমার রাজপুরীকে, পাপী রাজার রাজপুরীতে এ মেয়ে থাকতে পারবে না পাপ সয়ে। খুব সাবধান রাজা, পাপ থেকে অনাচার থেকে সব সময় বিরত থাকবে। কোনো সময়েই পাপ অনাচারের কাজ করো না।

তথাগত ফু চলে গেলেন। রাজা আবার একবার নতি জানালেন ফুকে। তার পর রাত কাটলো। সকাল হোলো। রাজা ভগবানকে নতি জানিয়ে মেয়ে আনতে ছুটলেন ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক—অনেক দূরে। বন-জংগল পেরিয়ে অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে। কত রকমের গাছপালা, কত রকমের পাখী, কত রকমের সবুজ, লাল, হলদে ফুল—কত রকমের দেশ দেখতে দেখতে রাজা নানকিং এসে পৌঁছুলেন সেই সোনালী পাহাড়ের ধারে—যেখান দিয়ে তরতর করে বয়ে আসছে তার মেয়ে সিকিয়াং। তার মেয়ে সিকিয়াং—আঃ, কি না সুখ! কত না দুঃখের ইতি হবে আজকে। রাজা নানকিং তার মেয়েকে পাবে।

রাজা ভগবানকে মনে মনে ডেকে নদীর জল ছুঁলেন। অমনি দেখতে দেখতে একটা ফুটফুটে চাঁদের মত মেয়ে ছুটে এসে রাজার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাজা তো মহাখুসী—মেয়েকে ঘোড়ায় তুলে নিজ রাজপুরীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ফুকে নতি জানাতে ভুললেন না।

তারপর মেয়েকে পেয়ে খুব সুখেই কাটছিল রাজার। সব সময় মেয়ের আদর আবদার নিয়েই ভুলে থাকলেন রাজা নানকিং। রাজপুরীর আর আর সব কাজ একদম ভুলে গিয়ে। রাজা-রাণী সিকিয়াংকে নিয়েই একেবারে সুখে মসগুল। মেয়ের নানা রকমের জামা-জুতা; নানা রকমের খাবার—নানা রকমের খেলনা—নানা রকমের লাল নীল মাছ—নানা রকমের ফুলের গাছ-গাছালি নানা রকমের পাখ-পাখালী। রাজারাণী সারা দিন সারা রাত মেয়ের আদর আবদারে মজে রইলেন। মেয়ে চাঁদ ধরার বায়না নিলে চাঁদ ধরে দিতেও তারা পিছ্‌পা হবেন না এমনি ধারা!

এদিকে রাজপুরীতে রাজার চেলারা, রাজার পারিষদরা অনেক অনাচার সুরু করে দিল এই সুযোগে। রাজার তো এদিকে নজর নেই মোটে। কিছুই তো খবর রাখেন না তিনি।

রাজার পারিষদদের অনাচারে রাজপুরীর সব লোক কাঁদতে লাগলো—রাজপুরী ছেড়ে বনে পালাতে লাগলো। রাজা তার

মেয়েকে নিয়েই রাজপুরীর মাঝে—বাইরে বেরুবার আর সময় কোথা তার ?

একে রাজার পারিষদগণের অনাচার-উৎপীড়ন-কুশাসন। তার ওপর আবার রাজপুরীতে দেখা দিল জলাভাব। লোকেরা দলে দলে রাজপুরীর বাইরে এসে জমতে লাগলো আর কেঁদে কেঁদে তাদের রাজাকে ডাকতে লাগলো। রাজা শুনতে পেলেন না তাঁর রাজপুরীর লোকেদের আকুল ডাক।

শুনতে পেলো তাঁর মেয়ে সিকিয়াং। সে ছুটতে ছুটতে এসে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললো : বাবা, ওরা সব কাঁদছে, আমি যাই। আমি ওদের জলাভাব দূর করে দেবো—আমি যাই বাবা—তোমার রাজপুরীতে আর আমি থাকতে পারছি না—পাপে ভরে গেছে তোমার রাজপুরী।

সিকিয়াং ছুটলো! রাজপুরীর বাইরে যেখানে লোকেরা অনাচারে জলাভাবে কাঁদছে। ভগবান ফু-এর কথা মনে পড়লো রাজা নানকিংএর। তিনি ফিরিয়ে আনতে ছুটলেন তাঁর মেয়েকে।

তখন লোকের দুঃখে কাতর হোয়ে সিকিয়াং নদী হোয়ে বইতে সুরু করেছে রাজপুরী ভাসিয়ে নিয়ে—রাজার অনুচরদের ভাসিয়ে নিয়ে। রাজাও বাদ গেলেন না। তাঁরই গাফিলতি ও কুঁড়েমীতেই তো এই দুঃখের রাত দেশকে ছেয়ে ফেলেছিল। এখন পাপ সব ভাসিয়ে নিল সিকিয়াং। লোকেরা বাঁচলো তার দয়ায়, তার করুণায়। সেই থেকে সিকিয়াং নদী হয়ে লোকের ভাল করছে।

চাঁদের হাট

অশোককুমার দত্ত

তোমাদের সবাই এক কালে সুর তুলে শতকিয়া পড়েছিলে। একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র ইত্যাদি—ত্রিলোচনের তিন চোখ, দুই পক্ষে এক মাস এবং আকাশের চাঁদ একটি। সেই চাঁদ আজ আর একটি মাত্র নেই, বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের তৈরী একাধিক চাঁদ আজ পৃথিবীর আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ সংবাদ আজ তোমাদের কাছে নূতন নয়, কিন্তু মানুষের তৈরী এ চাঁদ সম্বন্ধে তোমাদের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর বোধ হয় এখনো পাও নি।

প্রথম কথা, যাদের আকার এতই ছোট যে খালি চোখে দেখতে পাওয়া মুসকিল, যদি বা দেখা যায় তাও আবার সকাল-সন্ধ্যা ছাড়া অন্য সময়ে নয়, তাদের আবার সখ করে চাঁদ বলা কেন? পৃথিবীকে যদি একটি গ্রহ বলে মানি, পৃথিবী প্রদক্ষিণরত চাঁদকে তার উপগ্রহ বলবো। মানুষের তৈরী উপগ্রহ আসল চাঁদের তুলনায় কিছুই নয়, একটির ওজন দু'মণ এবং অপরটির চৌদ্দ মণ মাত্র—কিন্তু এরা যে আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

আকাশের কয়েক শ' মাইল উপরে উঠে কৃত্রিম চাঁদ আমাদের পৃথিবীকে অনবরত প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। তার গতিবেগও অভাবনীয়—ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইল, তার মানে এক বলতে বলতে যাদবপুর থেকে শিয়ালদ' ষ্টেশনে পৌঁছানো যাবে। ইলেকট্রিক ট্রেনেও অতো তাড়াতাড়ি যাওয়ার উপায় নেই—ট্রেণ তো দূরের কথা, সবচেয়ে দ্রুতগামী এরোপ্লেনও তা পারে না। রকেট-চালিত প্লেন যেতে পারে ঘণ্টায় ২,২৬০ মাইল মাত্র, অপরপক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগ শব্দের প্রায় তেইশ গুণ। আরো আশ্চর্য্য কথা, এতো দ্রুত যেতে কৃত্রিম উপগ্রহের কোন জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না। এর কারণ তোমাদের অল্প কথায় বুঝিয়ে বলছি।

নিউটন একটি নিয়মে বলে গেছেন, কোন জিনিষ যখন একবার চলতে সুরু করে তখন তা শুধু চলতেই থাকে, মাঝপথে থেমে যায় না। কিন্তু আমরা জানি, ফুটবলে লাথি মারলে তা এক সময় থেমে আসে, ঢিল ছুঁড়লে তা পুনরায় মাটিতে পড়ে। কিন্তু নিউটন বললেন, এখানেও নিয়ম আছে, ফুটবলটি থেমে পড়েছে, কারণ মাঠের ঘাস এবং অদৃশ্য বাতাস বলটিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল। ঢিলটি যখন উপরে ওঠে পৃথিবীর মহাকর্ষতাকে টেনে রাখতে চায়, ফলে তাকেও এক সময় মাটিতে পড়তে হয়।

কিন্তু পাঁচ শ' বা হাজার মাইল উর্দ্ধে পৃথিবীর অবস্থা ভিন্ন, সেখানে বাতাস প্রায় নেই, সুতরাং একবার যদি রকেটের সাহায্যে সেখানে পৌঁছানো যায়, তাহলে তো চলার পথে বাধা দেবার কেউ রইলো না। বিজ্ঞানীরা এই ভাবে চিন্তা সুরু করলেন, কিন্তু তেমন একটি রকেট তৈরী করাও তো সোজা নয়, তাছাড়া বিবেচনা করার মতো অনেক জিনিষ রয়েছে—যথা, রকেটকে কতদূর তোলা হবে, তার গতিবেগ কত হওয়া চাই কৃত্রিম উপগ্রহ রকেটের সাথে কি ভাবে বাঁধা থাকবে, ইত্যাদি হাজার হাজার প্রশ্ন। এই সমস্ত সমস্যার যে শেষ পর্য্যন্ত সমাধান হয়েছে তার প্রমাণ আজ একাধিক উপগ্রহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

কিন্তু আর একটি প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগতে পারে—কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে কি ভাবে? সে তো সোজা পৃথিবী ছাড়িয়ে চলে যেতে পারতো, অথবা ক্রমশ পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে পারে? একটি সাধারণ তুলনা দিয়ে বিষয়টি তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করছি। সুতোর আগায় ঢিল বেঁধে যখন তুমি তা ঘোরাও ঢিলটি তখন ছুটেও যায় না, আবার তোমার গায়েও এসে লাগে না—তার কারণ ঢিলকে কতটুকু জোরে ঘোরাতে হবে তা তুমি অনুমানে বুঝে নাও। কৃত্রিম উপগ্রহের বেলাতেই তাই, তবে এখানে অনুমানের কথা নয়, দুরূহ অংকের সাহায্যে সমস্ত বিষয় যতদূর সম্ভব স্থির করে নিতে হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের খুব উর্দ্ধে মহাকর্ষের প্রভাব কম, কিন্তু এই ক্ষীণ আকর্ষণই ঢিলে-বাঁধা সুতোর কাজ করছে। মহাকর্ষের প্রভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ বহিরাকাশে ছুটে যেতে পারছে না, আবার গতিবেগ এমন ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাতে পৃথিবীর দিকেও নেমে না আসতে পারে। কিন্তু অংকের বহু সূক্ষ্ম নিয়ম মেনে ছাড়া হলেও উপগ্রহটি নিচের দিকে নামবেই, তার কারণ আকাশের উর্দ্ধ স্তরে বাতাসের পরিমাণ খুব কম হলেও যেটুকু রয়েছে, তা উপগ্রহের গতিবেগকে প্রতিনিয়ত বাধা দিচ্ছে ; ফলে উপগ্রহের বেগ ক্রমশঃ কমে যাবে এবং ক্রমশঃ নিচে নামার ফলে বিনষ্ট হবে। কিন্তু তা হতে অনেক দূর, তবে উর্দ্ধাকাশের উল্কাপিণ্ডের সংগে আঘাতে কৃত্রিম উপগ্রহ যে কোন দিনই বিনষ্ট হতে পারে। মোট কথা, উপগ্রহের স্থায়িত্বকাল সম্বন্ধে পূর্ব্বভাগে কিছু বলা সম্ভব নয়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭—মানুষের তৈরী প্রথম উপগ্রহ পৃথিবীর আকাশে স্থাপিত হলো। তার এক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় একটি উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এ হলো একটা বিষয়ের সুরু মাত্র, ক্রমশঃ দেখা যাবে অসংখ্য চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে, যেন আকাশে চাঁদের হাট বসে গেছে! প্রশ্ন তুলতে পারো, কি এর প্রয়োজন ছিল, এই সব খুদে 'চাঁদ' নিয়ে বিজ্ঞানীরা কি করতে চান?

বুঝতেই পারছো কারণটি সাধারণ নয়, বিশেষ এক একটি চাঁদ তৈরীর পিছনে যখন বহু সময় ও অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন আছে। প্রায় আড়াই বছর ধরে আমরা কৃত্রিম উপগ্রহ সম্বন্ধে নানা কথা শুনে আসছি, বিজ্ঞানীরা বলছিলেন—পৃথিবীকে সাধারণ ভাবে গোলাকার বলে জানলেও তার প্রকৃত আকার আজও আমাদের সঠিক জানা হয় নি, ঊর্দ্ধ আকাশেই বায়ুর তাপমাত্রা কত, সেখানে কি কি গ্যাস রয়েছে ইত্যাদি বিবরণ না জানলে আবহাওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী, নির্ভুল-ভাবে করা সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ রকেট বা বেলুনের সাহায্যে পাওয়ার উপায় নেই (রকেট বা বেলুনের যাহাতে প্রাথমিক তত্ত্ব সংগ্রহিত হয়েছে মাত্র)। একমাত্র সমাধান, চাঁদের অনুসরণে ছোট ছোট উপগ্রহের সৃষ্টি। এ সমস্ত উপগ্রহ বিভিন্ন যন্ত্রে সম্পূর্ণ হয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য বেতার মারফৎ বৈজ্ঞানিকদের জানিয়ে দেবে। বিজ্ঞানীরা আরও বললেন, একটিমাত্র উপগ্রহে সকল কিছু জানা সম্ভব হবে না, এজন্য বহু উপগ্রহ সৃষ্টির প্রয়োজন। বর্তমানে সেই পরিকল্পনাই কাজে রূপায়িত হচ্ছে।

উপগ্রহ স্থাপনের অপর একটি দিক আছে, তা যে কোন দুঃসাহসী লোকের মনকে আকর্ষণ করবে। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, একবার যখন পৃথিবীর আকাশে উপগ্রহ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, তা হলে মানুষের চাঁদে যাওয়াও একদিন সম্ভব হবে। পাঁচ কি বড় জোর দশ বছর—দশ বছরের ভিতর চাঁদে, তারপর মঙ্গলগ্রহ, তারপর—। আপাতত, চন্দ্রলোক। জীবন্ত কুকুর কৃত্রিম চাঁদে বাস করেছিল, অতএব আর অবিশ্বাসের কারণ নেই। আজ তোমরা যারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে "চাঁদের হাট" বসিয়েছো, বলা যায় না, তাদেরই কেউ কেউ একদিন বোধ হয় জনহীন চাঁদের দেশ পৃথিবীর জয়গানে মুখরিত করে তুলবে।

গল্প হলেও সত্যি

যতীন্দ্রনাথ পাল

ভদ্রলোক মস্ত পণ্ডিত। সারা দিন তিনি হয় লেখাপড়া করেন, নয় সমঝদার লোকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। কোন একটা লেখা লিখে শেষ করবার পর, সেটা অপরকে শোনাতে না পারলে তিনি আরাম পান না। মাঝে মাঝে তেমন শ্রোতা না জুটলে, তিনি তাঁর চাকরটাকেই তাঁর লেখাটা দেন শুনিয়ে।

কখন কখন তিনি এমন কথা বলেন, যা প্রচুর হাসির খোরাক যোগায়।

একদিন তিনি তাঁর ঘরে বসে পড়াশুনা করছেন, এমন সময় একটা কথা শুনতে পেলেন। শুনেই রেগে আগুন!

কথাটা আর কিছুই নয়, তাঁর চাকর কাকে লুচি-ভাজা ঘিয়ের কথা বলেছে।

চাকরকে ডেকে ধমক দিয়ে বললেন: আজ-কাল এ-সব হচ্ছে কি?

সে কিছু বুঝতে না পেরে বললে: কর্তা, কি বলছেন?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: এইমাত্র লুচি-ভাজা ঘিয়ের কথা শুনলাম যে? আজ-কাল বাবুগিরি খুব বেড়েছে দেখছি। ঘি দিয়ে লুচি ভাজা মোটেই ভাল নয়।

চাকরটা কি জবাব দেবে, ভাবতে লাগল।

তিনি আবার বললেন: আমরা ছেলেবেলায় তো দেখেছি, জল দিয়ে লুচি ভাজা হোত।

এতক্ষণে চাকরটা বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। সে তার মনিবকে দেখছে অনেক দিন ধরে, তাই তাঁকে ভাল ভাবেই জানে।

সে বললে: কর্তা, লুচি চিরকাল ঘি দিয়ে ভাজা হয়, এটাই নিয়ম। ঘি গলে গেলে জলের মতই দেখায়।

ভদ্রলোকের মনে হোল, তাই তো, কথাটা ঠিক তো?

তিনি বললেন: হাঁ, ঠিক বলেছিস, তোর কথা সত্যি।

বলেই হা-হা করে হেসে উঠলেন।

এই ভদ্রলোকটির নাম তোমরা জান কি? ইনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিছুতে আর মন ভরে না
বাদল আসে ছেয়ে
দুষ্টু আমার মিষ্টি হল
কোলে লজেন্স পেয়ে॥
কোলে
লজেন্স ও টফি
Hb
প্রস্তুত কারক
কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০
Kolay
CONFECTIONERY

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

কেটে গেছে আরো সাত দিন। অনেকটা সুস্থ বোধ করছে সুমিতা। ধীরে ধীরে ফিরে আসছে স্বাভাবিক অবস্থা। বিবর্ণ গাল দুটোতে লেগেছে ফিকে গোলাপী ছোপ।

খাটে ওর পাশে বসে করবী। ওর একরাশ রুক্ষ সোনালী চুলগুলোর জোট ছাড়িয়ে বেণীবন্ধ করে দিচ্ছিলো।

সুমিতার বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেঘমেদুর নভোতলে নিবদ্ধ। অসময়ে আকাশে এসেছে সজল, কাজল মেঘের রাশ। হু-হু করে বইছে কনকনে ঠাণ্ডা জলো বাতাস। বড় ভালো লাগছে বিছানায় শুয়ে ওর পানে মনটাকে মেলে ধরতে।

—বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, শার্শিটা বন্ধ করে দিই, বললো করবী।

—না ছোটমাসী, থাক্—বড় ভালো লাগছে। মিষ্টি সুরে জবাব দেয় সুমিতা।

—তোর সবই কেমন অনাসৃষ্টি গোছের, আমার তো কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে বাপু! তুই মেঘ দেখ তাহলে, আমি যাই তোর ওভালটিনটা নিয়ে আসি।

ওর গায়ে বেশ করে চাদরটা জড়িয়ে দিয়ে উঠে গেলো করবী। মেঘদূত যেন বয়ে এনেছে এক হারানো দিনের মধুর স্মৃতি। সে স্মৃতি-সায়রের অতল গভীরে তলিয়ে যায় ওর মন।

—সকাল না হতেই দিদিমা, ছোটমাসী, মামা সকলে চলে গিয়েছিলেন দমদমে। কোন সম্মানিত বিমানযাত্রীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। সুমিতা বাড়ীতে ছিলো একলা।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বানি দেবী

দিনের আলো যেন হঠাৎ নিবে গেলো। নভোমণ্ডলে দিগন্ত ছেয়ে কাজল-কালো নিবিড় মেঘরাশি এলো ঘনিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো সজল পুবালী বাতাসের দ্রুত লয়ের মেঘমল্লার রাগিণী। খেয়ালী ঝড়ের প্রলয় মাতনের সঙ্গে তাল রেখে নাচের ভঙ্গিমায় দুলে উঠলো বাগানের পাম আর পাইন গাছগুলো।

ঐ সর্ব্বনেশে ঝড়ের দোলা বুঝি লাগলো ওর মনে!

গুন্-গুন্ করে গান গাইতে গাইতে সুমিতা তুলে নেয় টেলিফোনের রিসিভারটা, ডাকে দামী দা'!

—হ্যালো মিতা? কি খবর বলো।

—খবর চাইছো? দিচ্ছি।

করো স্নান নব ধারাজলে
এস নীপবনে ছায়াবীথি-তলে।

গুন্‌গুনিয়ে খবর জানায় সুমিতা।

জবাব আসে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে, সুরের ঝঙ্কার তুলে—

দাও আকুলিয়া ঘন-কালো কেশ
পরো দেহ ঘিরি মেঘনীল বেশ,
কাজল নয়নে যূথিমালা গলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে।

যাচ্ছি যাচ্ছি মিতা!

রিসিভার নামিয়ে রেখে কাজরী উৎসবের সাজে নিজেকে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে মিতা।

ঘননীল রং-এর শাড়ীখানি প'রে, এলিয়ে দিলো সোনালী রং-এর কোঁকড়ানো একরাশ চুল। পদ্মপাপড়ীর মত দুটি চোখে আঁকলো নীলাঞ্জন। ব্যস, আর কি? হ্যাঁ যূথিমালা তো নেই।

—ভজনদা', ও ভজনদা'! গাড়ীবারান্দা থেকে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলো সুমিতা।

—কি গো খুকু দিদি! গায়ে মাথায় চেক-কাটা কালো চাদরটা জড়িয়ে ঘর থেকে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে আসে রামভজন সিং।

—একটা যুঁই ফুলের মালা দিতে পারো? মিনতি ভরা সুরে বললো সুমিতা।

—বাদলটা একটু থমক দিদি, এখুনি আনবো তোমার মালা!

—একগাল হেসে জবাব দিলো রামভজন, ঐ যে গো, আমার দাদুবাবা যে এলো গো দিদি! সোঁ সোঁ করে গেটের ভেতর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে ঢুকলো সুদাম।

ওর গাড়ী দেখে ছুটে নিচে এলো সুমিতা! একেবারে উঠে বসলো ওর গাড়ীতে।

—এ কি? একেবারে অভিসারিকা শ্রীমতী যে! ব্যাপার কি?

—ব্যাপার? হেসে ওঠে সুমিতা,—বাড়ীতে কেউ নেই, তাই তো ডাক দিলাম তোমাকে—এবারে কোথায় নীপবন? চলো তো? ওর দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাত করে, একগোছা ওর চুল হাতে জড়িয়ে নিয়ে টান্ দিয়ে দিয়ে হাসে সুদাম।

—এত সুখ বরাতে সইলে হয়!

তারপর কলাপাতার মোড়ক একটা বার করে মোড়কটি খুলে যুঁইয়ের গোড়ের মালা একজোড়া বার করে ঝুপ করে ফেলে দিলো সুমিতার গলায়।

—বাঃ রে, তুমি আমাকে কি মনে করো যে আমি এই মালাটাই

চাইছিলাম, তোমাকে বলিনি তো? পরম বিস্ময় ভরে মালাটা নাড়া-চাড়া করতে করতে বললো সুমিতা।

—সবটাই কি বলে জানাতে হয় মিতা? গাড়ী চালাতে চালাতে জবাব দিলো সুদাম।

বাইরে তখনও চলেছে দুরন্ত ঝড়ের মাতামাতি! ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম বাজছে বৃষ্টিনটীর নূপুর। ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে ছুটে চলেছে ওদের গাড়ী।

কিন্তু কোথায় নীপবন? চারি ধারে খালি ঘোলা জল কাদা। একটাও ছায়াবীথি চোখে পড়ে না, যেখানে নামবে ওরা। ঝোপ ঝাড় অবিশ্যি অনেক চোখে পড়েছে কিন্তু সেখানে একহাঁটু জল-কাদা দেখে, ওদের প্রচণ্ড উৎসাহের বাতিটা নিবু নিবু হয়ে এলো। কি করা যায়? সুদাম বলে, না: বিশ্বকবি শুধু বাণীগুলোই ছড়িয়ে গেছেন, তাকে রূপায়িত করবার উপায় কিছু বলে যাননি।

কলকণ্ঠে হেসে উঠে বলে সুমিতা—তুমিও তো কবি মানুষ দামীদা'! বিশ্বকবি বাণী দিয়ে গেছেন, তুমি তার সার্থক রূপদান কি ভাবে করা সম্ভব সেটা যদি লেখো, অনেকের উপকার হবে।

—আ:! আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না মিতা! রত্ন পাবার আশায় সাগরে ডুব দিয়ে যদি বরাতে শুধু শামুক গুগলী পাওনা হয়, ভেবে দেখো তো তার মনের অবস্থাটা কি রকম হতে পারে?

—কি আবার হবে? সেই মহাজন বাক্য স্মরণ করবে। 'এক ডুবে রত্ন লাভ না হইলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করিও না।'

অবিরাম জলের ঝাপটা এসে, ধারাস্নানে ওদের বঞ্চিত করেনি। সুমিতার উড়ন্ত ভিজে চুলগুলো সুদামের চোখে-মুখে মাঝে মাঝে চামর বুলিয়ে দিচ্ছিলো। অবাধ্য কেশপাশকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে মিটি মিটি হেসে, উপদেশবাণী শোনালো সুমিতা।

ধারাস্নানসিক্ত ওর সুন্দর মুখখানা তুলে ধরে, বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দেখলো সুদাম, তার পর বললো। তাই বলছো মিতা? রত্ন লাভের আশা তাহলে আমার ব্যর্থ হবে না!

আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে
সারা জীবন রব জাগি,
শুধু তোমার লাগি।

নিকটে কোথায় কড় কড় শব্দে বাজ পড়লো, হাজার শাপের জ্বলন্ত ফণা যেন লকলকিয়ে ছুটে গেলো আকাশে।

কোন অদৃশ্য হাত যেন জ্বলন্ত আখরে লিখে গেলো অভিশাপ বাণী। বজ্রহুঙ্কারে ভেসে এলো তার ব্যঙ্গপূর্ণ অট্টহাসি।

সেদিকে চেয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো সুমিতা। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, আর নয়, বাড়ী চলো দামীদা'! দিদিমার বোধ হয় ফেরবার সময় হলো।

হায় রে দিদিমা! ঐ দিদিমাই তখন তাকে রেখেছিলো, ভীতা, সঙ্কুচিতা করে। তা না হলে অমৃতকুণ্ড তো তার সামনেই ছিলো, সঙ্কোচের বাঁধন কাটিয়ে, তার ভীরু চোখের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে সে দেখতে পারেনি তাকে! ভীত সঙ্কুচিত হৃদয়কুম্ভে ভরে নিতে পারেনি সে প্রেমতীর্থ-বারি।

সে চলে গেলো, আর ওরও ঘুম ভাঙলো। চোখ থেকে কে মুছে দিলো সে সুখস্বপ্নের ঘোর? তার পরেও গেছে আরো একটি বর্ষা ঋতু। মেঘের স্তবকে স্তবকে ধ্বনিত হয়েছিলো বর্ষামঙ্গল। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিলো সে সুর-নির্ঝরিণীর কলতান। কিন্তু শুনবে কে? কোথায় সে প্রেম-বিমুগ্ধা? আজকের সুমিতার মাঝে সে তো বেঁচে নেই। তার আত্মার আত্মীয় যেদিন তাকে ছেড়ে দূরে চলে গেছে, সেই দিন থেকেই তো মৃত্যু হয়েছে তার, আজকের সুমিতা অন্য কেউ।

আজকের সুমিতার প্রাণহীন জীবনধারা বয়ে চলেছে কোন্ অজানা দুর্গম বন্ধুর পথ বেয়ে—তাই পদে পদে এত কণ্টকাঘাত, এত অন্ধকারের বিভীষিকা!

কার পদশব্দে ভেঙে যায় স্মৃতির স্বপ্নঘোর! মুখ ফিরিয়ে দেখে, সুমিতা, খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অসীম। রুক্ষ চুল, খালি পা, কি হয়েছে মিতা? অসময়ে শুয়ে কেন? প্রশ্ন করে অসীম।

ওভালটিন নিয়ে করবী এসেছিলো ঘরে, জবাব সে-ই দিলো—ক'দিন আগে ও হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো, ডাক্তারবাবু বললেন, ওটা নার্ভাসশক্ ছাড়া বিশেষ কিছু নয়। এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপনাকে দেখে—

—হ্যাঁ, অনুমান ঠিকই করেছেন। দাদার জ্ঞান আর ফিরলো না। আমরা বৃন্দাবন পৌঁছবার পরদিনই মারা গেলেন। কাল ফিরে এসেছি বৌদিকে নিয়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে অসীম, যদিও এখন তিনি কিছুই দেখতেন না, তবুও দূরে থেকে শক্তি যোগাতেন আমায়, তাঁকে হারিয়ে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করছি।

—তা তো হবেই! ঈশ্বর আপনাদের শান্তি দিন—বলে করবী।

নির্ব্বাক বেদনায় শুনছিলো সুমিতা অসীমের কথাগুলো। আবাল্য সাথীর পিতৃবিয়োগের বেদনা তারও অন্তরে গভীর আঘাত করলো। কাঁদছে। অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন কাঁদছে, ফুলে-ফুলে, গুমরে-গুমরে, আর তার জাগ্রত আরেকটি মন যেন তার টুঁটি চেপে ধরতে চাইছে কণ্ঠরোধ করতে। সে রক্তচক্ষু মেলে বলছে—কি অধিকার আছে তোমার? তার জন্যে শোক প্রকাশ করবার?

অবসাদভারে চোখ বোজে সুমিতা।—নে মিতা, ওভালটিনটা খেয়ে নে। অনেকক্ষণ কিছু খাসনি যে!

—একটু রাখো ছোটমাসী! দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে সুমিতা।

—ওকে আর বিরক্ত না করে করবী টেবিলের ওপর ওভালটিনের গ্লাসটি চাপা দিয়ে রেখে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বিছানার এক পাশে বসে পড়ে অসীম। তারপর ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—বড্ড যে রোগা হয়ে গেছো মিতা! তোমাকে ছেড়ে একদিন এক মুহূর্ত্তও শান্তি পাইনি আমি, বিশ্বাস করো।

চোখ মেলে চাইলো সুমিতা অসীমের মুখের দিকে। এমন স্নেহার্দ্র কোমল সুর ওর গলায় এর আগে তো শোনা যায়নি? হ্যাঁ মুখখানাও যেন করুণ বিষন্ন! আহা! মনটা কেমন করে ওঠে ওর জন্যে সুমিতার।

ধীরে ধীরে উঠে খাটে হেলান দিয়ে বসলো ও। মৃদুস্বরে বললো, এখন আমি ভালোই আছি। তবে জ্যাঠামশায়ের জন্যে বড্ড কাঁদছে মনটা, আশা করেছিলাম তিনি ভালো হয়ে উঠবেন। দামীদা' কত দূরে আছে; আহা এমন বিপদের দিনে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই, সেখানে বেদনার ভারে রুদ্ধ হয়ে আসে ওর কণ্ঠস্বর।

নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলে সুমিতা। আচ্ছা দামীদা'কে দিনকতকের জন্যে আসতে বললে ভালো হত না?

মনের চাপা রোষ আর বিরক্তি ফুটে ওঠে অসীমের চোখে-মুখে। তা কি করে সম্ভব হয় মিতা? একবার আসা-যাওয়ার খরচ কত জানো না তো? দাদা তো চলে গেলেন, এখন তার সব খরচা তো আমার ঘাড়েই পড়লো! ব্যবসার বাজার এখন বড়ই ডাল—এর ওপর আছে দাদার একরাশ দেনা! সমস্ত ঝুঁকি এখন এসে পড়েছে আমারই ঘাড়ে। এখন সব দিক বিবেচনা করে চলতে হবে তো?

অন্ত-শান্ত বোঝে না সুমিতা। ব্যথা-করুণ ম্লান চোখ ছুটি মেলে বিহ্বল ভাবে চেয়ে থাকে ওর মুখের পানে।

ঘন রাত। টেবল-ল্যাম্পটি জালিয়ে চেয়ারে বসে চিঠি লিখছিলো করবী। সেই কখন থেকে সুরু করেছে পত্র রচনা, কিন্তু কিছুতেই শেষ করা যেন সম্ভব হচ্ছে না। বারে বারে প্যাড থেকে দু'-চার লাইন লেখা চিঠির পাতাগুলো ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়েছে ঘরের মেঝের। খড় খড় করে ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে পরিত্যক্ত অর্দ্ধসমাপ্ত চিঠিগুলো!

চিঠি লিখতে লিখতে কলম নামিয়ে রেখে জলেভরা চোখ দুটো বার বার মুছেচে করবী।

—কী লেখা যায়? দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

কি লিখবে সে? যা ঘটেছে তাই? না, না, পারবে না, সে কিছুতেই পারবে না, ঐ নির্মম সত্যের ছুরি শাণিয়ে সুদামের বুকে বসিয়ে দিতে!

চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার সুকুমার মূর্তিখানি, তার মমতা-মাখানো, শান্ত সুন্দর মুখখানা! তার পবিত্র উজ্জ্বল আলো-বিচ্ছুরিত চোখ দুটো! উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো করবী। পাশের ঘরে, শুভ্র শয্যায় ঘুমিয়ে আছে সুমিতা! ওর শান্ত সুমন্ত মুখখানির ওপড় তেরচা ভাবে এসে পড়েছে এক ঝলক চাঁদের আলো। দু'টি ঘরের মাঝের দরজাটি খোলা থাকে! সেই দিকে কাতর দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো করবী।

হায়, হায়, কি হতে কি হলো! এক বৃন্তে ছিলো যে ওরা দু'টি ফুল। কোন্ হৃদয়হীন ছিঁড়ে নিলো তার একটিকে? একতারে যে বাঁধা ছিলো দুটি জীবন, কোন্ অদৃশ্য নিয়তির নির্মম হাতে ছিন্ন হয়ে গেলো সে তার? কেমন করে বাঁচবে ঐ অভাগী মেয়েটা? ওর জীবনবীণার প্রতিটি তন্ত্রী যে তারই ভাবের সুরে বাঁধা, সেখানে মূর্তিমান অসুরের ঝঙ্কার তাকে তো ছিন্নভিন্ন করে নিঃশেষ করে দেবে। চোখের জল মুছে, মনটাকে সংযত করে লিখতে বসলো করবী।

সুদাম!

চিঠির জবাব মিতা কেন দেয়নি তোমায় জানতে চেয়েছো? তারই গোপনে জানাচ্ছি খবরটা। ওকে আবার এ বিষয়ে কিছু লিখো না যেন, লজ্জা পাবে। অলকাপুরীতে নাচ, গান শেখা আরম্ভ করে,—পড়াশোনার ব্যাপারে একেবারেই মন দিতে পারেনি, সেজন্য, পরীক্ষাও দেওয়া হলো না। বুঝেছো? এখন ভীষণ মুস্কিলে পড়েছে, তোমাকে সে কথা জানাতে। পাছে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হও, সেই জন্যেই চিঠি লিখতে পারছে না। মনে হয়, আবার প্রস্তুত না করা পর্য্যন্ত তোমাকে চিঠিপত্র লিখতে পারবে না মিতা। ওর শরীরের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছো? মনটা খারাপ, শরীর বেশ ভালোই আছে, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। তুমি সফলতা অর্জ্জন করে ফিরে এসো, এই কামনা।

রাত শেষ হয়ে আসছে। দপ-দপ করে জ্বলছে তকতারাটা বিদায়-বেদনায়। শেষ রাতের মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এলো কোন্ নিশাচর পাখীর কর্কশ ডাক আর তার পরেই শোনা গেলো, এক মুহূর্ত্ পাখীর ক্ষীণ মরণ-আর্ত্তনাদ। ধ্বক্ ধ্বক্ করে কেঁপে উঠলো করবীর হৃৎপিণ্ডটা।

অস্ফুট কাতরোক্তি করে পাশ ফিরলো সুমিতা। না, না, এ দুর্ব্বল মনোবিলাসকে প্রশ্রয় দেবে না করবী। কর্ম্মফল,—যার যেমন কর্ম্ম, তাকে তেমনি ফলভোগ করতেই হবে। উপায় নেই, কেউ পারেনি এ অমোঘ বিধানকে এড়িয়ে যেতে। তবে হ্যাঁ আছে—সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপুরুষে একান্ত শরণ, ও আত্মসমর্পণে, ভালো, মন্দ দুটো জালাময়ী দীপশিখাই নির্ব্বাণ লাভ করে। তারপরেই জীবের উপলব্ধি হয়, সেই পরমানন্দ, চরম শান্তির, প্রকৃত স্বরূপের। এসব সে পড়েছে, মিতাকে দেওয়া জামাইবাবুর শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়। আহা কি প্রাণজুড়োনো অমৃত বাক্য!

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্" ।।

জুড়িয়ে গেলো অন্তর্দাহ জ্বালা। স্থির চিত্তে শেষ করলো, আজ সকালে পাওয়া সুদামের চিঠির জবাবখানা।

খামে বন্ধ করে ঠিকানা লিখে রেখে দিলো, সকাল হলে নিজ হাতে ডাকে দেবে চিঠিখানা। কাকেও জানাবে না চিঠির কথা। সুমিতাকে তো কিছুতেই নয়। আহা, সে একে পথ হারিয়ে মনের গহন বনে দিশেহারা হয়ে ঘুরে মরছে, তার চারিপাশে শুধু বিভ্রান্তির প্রহেলিকা।

কোন অদৃশ্য প্রবহমান স্রোতের সংঘাত-বিক্ষুব্ধ ঘূর্ণাবর্ত্তের পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে ওর জীবনধারা! আহা, তার প্রাণান্তকর বিভীষিকা বুঝি ওকে জাগরণে, নিদ্রায়, স্বপ্নের মাঝেও রেহাই দেয় না। তাই গভীর নিদ্রার শান্তিময় কোলে শুয়েও ওর কি অস্বস্তি! চমকে উঠছে বারে বারে, গুমরে গুমরে উঠছে যেন কোন অবরুদ্ধ বেদনায়। দুর্ব্বল হাতখানা কেঁপে কেঁপে শূন্যে কি যেন খুঁজে মরছে।

ওর দিকে চেয়ে চেয়ে, ধীর পায়ে উঠে গিয়ে দাঁড়ালো করবী জানলার সামনে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সমাগত। আকাশে, বাতাসে ছড়ানো কি এক অলৌকিক পবিত্রতা! পাখীর কাকলীতে ধ্বনিত হচ্ছে অনন্তের স্তবগান। ঊর্দ্ধলোকের দিকে চেয়ে যোড় হাত করে ব্যাকুল প্রার্থনা জানালো করবী, মিতাকে শান্তি দাও ঠাকুর, সুদামকে কৃপা করো।

সুমিতার সন্ধানেই এসেছিলো অনিরুদ্ধ। পড়ে গেলো দিদিমার সামনে। বারান্দায় চেয়ারে বসে তিনি ছুরি দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন, অনিরুদ্ধকে দেখে একগাল হেসে বললেন—এসো বাবা, এসো। ভালো আছো তো? মা-বোনেরা সব ভালো? তোমার অভিনয় দেখে সেদিন ভারি ভালো লেগেছিলো বাবা, বইটা উৎরেছে শুধু তোমার জন্তেই।

অযথা স্তুতিবাদের বিড়ম্বনায় কান দুটো লাল হয়ে ওঠে অনিরুদ্ধর। কোন্ কথাটার আগে জবাব দেবে, ভেবে পায় না। মাথা চুলকে ঢোঁক গিলে জবাব দেয়—বাড়ীর খবর সব ভালোই। অসীম বাবুর কাছে জানলাম, মিতার শরীর খুব অসুস্থ। তাই—

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ! সামান্ত অসুখ করেছিলো বটে, তা এখন ভালোই আছে। তবে ভাবনা হয় বাবা মেয়েটার জন্তে। ফিটের অসুখ পেলো কোত্থেকে? আমাদের বংশে তো ছিলো না ও-রোগ, তবে ওর বাপের বংশে কারুর ছিলো কি না, তা আমার জানা নেই।

—বংশের সঙ্গে এ রোগের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলে আমার মনে হয় না—যে কোনো মানুষেরই যে কোনো রোগ হতে পারে। মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই। মানুষের দেহটাই তো পচা কুমড়ো বাবা! ওপর থেকে কিছু বোঝবার জো নেই ভেতরে কার কি গলদ আছে। তা দাঁড়িয়ে কেন? এসো, বসবে চলো।

বিব্রত ভাবে দিদিমার সঙ্গে গেলো অনিরুদ্ধ ড্রইংরুমে।

বোসো বাবা, দেখি আমি মিতা কোথায়। তবে একটু চা না খাইয়ে ছাড়ছি না বাবা! আমার হাতের তৈরী মাংসের সিঙাড়া যে খায়, সে কখনও ভোলে না। আমার অনিল বড় ভালোবাসে ঐ সিঙাড়া খেতে কি না, তাই দেখো না বাবুর্চ্চিখানায় হামেশা তাল দিতে হয় আমাকেই।

—রুবি, অ রুবি, কোথায় গেলি রে? ডাক দিতে দিতে তিনি এগিয়ে গেলেন রুবির ঘরে। ওকে এখনও বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে, মহাবিরক্ত ভাবে ওর গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললেন,—কি কাণ্ড বলতো? ও মা, আমি যাবো কোথায়! বেলা ন'টা যে কোন কালে বেজে গেছে গো! এখনও বিছানায় কেন বাছা? শরীর ভালো আছে তো? ক'দিন মিতুর পেছনে যা খাটুনিটা গেলো, আহা ঘুমেরই বা অপরাধ কি!

চোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসলো রুবী! এত চেঁচামেচি সুরু করেছে কেন মা? রাতে ভালো ঘুম হয়নি, তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—অনিরুদ্ধ এসেছে যে। চাপাগলায় ফিসফিসিয়ে বললেন মায়া দেবী।

—অনিরুদ্ধ বাবু এসেছেন, তা আমি কি করবো? মিতাকে ডেকে দাও না!

আহা, হা, মরে যাই রে। এমন বুদ্ধি না হলে আর এমন পোড়া বরাত হয়? মিতা আর মিতা! তার আর ক'গণ্ডা চাই শুনি? সরোষে বললেন মায়া দেবী।

কথা বাড়ালো না করবী। মায়ের অবুঝ বিকৃত মনটাকে কথা দিয়ে সহজে সুস্থ করা যাবে না, সে তা ভালো করেই জানে! মিথ্যে কেলেঙ্কারি করে লাভ নেই।

যাচ্ছি আমি! গম্ভীর ভাবে বললো করবী। তার পর চোখে-মুখে একটু জলের ঝাপটা দিয়ে এসে বললো,—চলো কোথায় যেতে হবে।

—ও মা, এই বেশে যাবি ওর সামনে? কি মতিচ্ছন্ন দশায় তোকে ধরেছে বাপু? দেখ তো মিতাকে কেমন ফিটফাট হয়ে থাকে? সাধ করে কি ওকে দেখলে সকলকার মাথা ঘুরে যায়?

—এবার হেসে ফেলে করবী মায়ের উদ্ভট ধারণা শুনে। সত্যিই তুমি হাসালে মা! মিতা যে সত্যিকারের ময়ূরী আর তোমার কাগিনী কন্কেকে ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে যতোই সাজাও তাকে ময়ূর যে কেউ বলবে না। তার চেয়ে তার কাগ থাকাই অনেক ভালো মা! ঐটাই তার একেবারে খাঁটি আর সম্মানজনক পরিচয়। যাক গে, অনিরুদ্ধ বাবু একা বসে আছেন, আমি যাই।

মায়ের জবাবের অপেক্ষা না করেই ক্ষিপ্রগতিতে ড্রইংরুমের দিকে চলে গেলো করবী।

মরি, মরি! জন্ম গেলো ছেলে খেয়ে, এখন বলে আমায় নতুন জ্ঞান। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার চেয়ে বিড় বিড় করে আপন মনে বকতে বকতে বাবুর্চিখানার দিকে গেলেন মায়া দেবী।

বাঃ, এখানে একা বসে কেন? আসুন, আসুন হাসিমুখে অনিরুদ্ধকে ডাকে করবী।

লজ্জিত ভাবে উঠে দাঁড়ায় অনিরুদ্ধ। বলে,—মিতা কেমন আছে?

চলুন না দেখবেন নিজের চোখে।

মিতার ঘরে গিয়ে তাকে দেখতে পেলো না করবী। ও মা, সাতসকালে মেয়েটা আবার কোথায় গেলো? বিস্মিতভাবে বললো করবী। আসুন তো দেখি, লাইব্রেরীতে আছে কি না।

লাইব্রেরীঘরে একখানি সোফায় বসে, তন্ময়ভাবে পাশের দেওয়ালে টাঙানো একখানা বৃহদাকার অয়েলপেণ্টিং ছবির দিকে চেয়ে ছিলো সুমিতা। ছবিখানি চওড়া, কারুকার্য্য-খচিত সোনালী ফ্রেমে আঁটা।

মিতা!

চমকে উঠে ফিরে চাইলো সুমিতা। পাশে দাঁড়িয়ে অনিরুদ্ধ আর করবী।

কখন এলেন? না, না, আর আপনি বলছি না—

কখন এসেছো দাদা? বোসো! ছোটো মাসী, এত দেরী কেন আজ তোমার ভাই? শরীর খারাপ না কি। ওদের দুজনকে হাসিমুখে বললো সুমিতা। সামনের চেয়ারে বসলো অনিরুদ্ধ। পাশে করবী।

তোমার চেহারাটা যে বড্ড খারাপ দেখছি মিতা! এখনও সেরে উঠতে পারোনি তো? কতক্ষণ এসেছি? তা প্রায় আধ ঘণ্টা হলো! তোমার পাশেই তো দাঁড়িয়ে ছিলাম মিনিট দশেক!

—সত্যি বলছো? কৈ আমি একটুও বুঝতে পারিনি তো?

—তুমি যেমন করে বসেছিলে, মিতা, ডাকতে সাহস পাচ্ছিলাম না, ভয় হচ্ছিলো, তুমি ঐ ছবির সমুদ্রে ডুবে গেলে নাকি?

—সত্যিই ডুবে গিয়েছিলাম দাদা! তোমার অনুমান মিথ্যে নয়! ম্লান মুখে বললো সুমিতা।

—মাথাটা তোর যথার্থই খারাপ হয়েছে মিতা, কোথায় আবার ডুবলি তুই? বললো করবী।

—জানি না কি হয়েছে! তবে ভারি ভয় করে আমার ছোটমাসী। ঐ যে ছবিটায় যা আঁকা আছে, ঐ সব প্রায়ই রাত্রে স্বপ্ন দেখি আমি, তখন যে কি কষ্ট হয়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, মনে হয় সত্যিই জলে ডুবে যাচ্ছি আমি।

এক ঝলক বিদ্যুতের মত কাল রাত্রের দৃশ্যটা চমকে উঠলো করবীর মনের আকাশে।

ছবিটার দিকে চাইলো অনিরুদ্ধ। কোনো বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা একখানি বিলিতি ছবি! ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ফেনিল সমুদ্র! নিবিড় আঁধার; মেঘে মেঘে, বিদ্যুৎ-বহ্নির জ্বালা! দূরে অর্দ্ধমগ্ন জাহাজের ভাঙা মাস্তলটা দেখা যাচ্ছে। উত্তাল তরঙ্গমালার ভেতর একটি মানুষ, আপ্রাণ শক্তিতে যুঝছে মৃত্যুর সঙ্গে। বিস্ফারিত দৃষ্টি তার দূরে একটি উজ্জ্বল আলোকবিন্দুর দিকে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কালগ্রাসে পতিত মানুষটির জীবনের একমাত্র আশার আলো, বাতিঘর! দুর্ভেদ্য কুহেলিকার আবরণ ছিন্ন করে সেই জ্যোতির্বিন্দু হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন আশাহত মানুষটাকে!

—তন্ময় হয়ে দেখছিলো অনিরুদ্ধ ছবিটাকে। আপন মনে উচ্চারণ করলো, আশ্চর্য্য! যেন জীবন্ত ছবি!

—ছবিটা শুনেছি, একজন ফরাসী সাহেব দিয়েছিলেন, জামাইবাবুর ঠাকুর্দা রাজা রামনাথ ত্রিবেদীকে। তখন অনেক বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণীলোকের এখানে যাতায়াত ছিলো কি না। বুড়ো মালী ভজনদা' বলে, কবে এক পাগলা সাহেব এসেছিলো, সে তো ছবিখানা দেখে একেবারে ক্ষেপে উঠলো। রাজাবাহাদুরের কাছে একেবারে ধর্ণা দিয়ে রইলো ছবিটা তার চাই, কত মূল্য দিতে হবে? ধনকুবের লোকটা, বিখ্যাত শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা তার নেশা। ইটালীতে আছে তার নিজস্ব মিউজিয়াম, তার চিত্রশালার জন্যে চাই এই ছবিটি।

একজনের দেওয়া প্রীতি উপহার—মূল্য এর নির্দ্ধারিত করা যায় না, বিনামূল্যেই ছবিটি ওকে দেবেন মনস্থ করলেন রাজাবাহাদুর কিন্তু তাঁর সঙ্কল্পে বাধা দিলেন তাঁর ছেলে কুমার ইন্দ্রনাথ। ছবিখানি তাঁর বড় প্রিয়।

তা কি করে হয়, আমি যে কথা দিয়েছি মিষ্টার ট্রেপলটনকে— যে ছবিটা তাকে দেব আমি।

অমন কথা দিলেন কেন বাবা? এ ছবি আমি কিছুতেই দেব না, ওর জন্মে দরকার হলে প্রাণ দেব।

প্রমাদ গণলেন রাজাবাহাদুর। সায়েবের কাছে ছ'মাস সময় চাইলেন, তারপর এসে যেন উনি ছবিটা নিয়ে যান।

ফ্রান্সে জরুরি টেলিগ্রাম করলেন তিনি। তাঁকে যে ফরাসী সাহেব ছবিটি দিয়েছিলেন যে "লাইট হাউস" ছবিখানি তিনি দিয়েছেন ঠিক ঐরকম চাই আরেকখানি। যেমন করে হোক যোগাড় করে না দিলে তাঁর মান ইজ্জৎ থাকে না।

কিছুদিন পরে জবাব দিলেন ফরাসী বন্ধু—ছবিখানি বিখ্যাত শিল্পি ভ্যান গগের অঙ্কিত। তিনি অনেক খোঁজবার পর তাঁরই বংশের একজনের বাড়ীতে পেয়েছেন ঐ ছবির ডুপ্লিকেট। তবে লোকটা গরীব, ছবিটার দাম চায় তিন লক্ষ টাকা।

তাই দেব তুমি পাঠাও ছবি। লিখলেন রাজাবাহাদুর। ছ'মাস পূর্ণ হবার আগেই এসে গেলো ছবিটা। তারপর সেই পাগলা সায়েব এসে হাজির। সে কিন্তু শুধু হাতে আসেনি সঙ্গে এনেছিলো, একটি অপূর্ব্ব সুন্দর উপহার! একটি সোনার গুল্ গাছ। তার পাতাগুলো পান্নার। মুক্তোর ফল ঝুলছে। পাতার আড়ালে বসে আছে কয়েকটি হীরে, চুনী আর নীলার পাখী। গাছের গুঁড়িতে আছে একটি ছোট্ট চাবি, সেটি ঘোরালে প্রথমে শোনা যাবে কিচমিচ পাখীর ডাক, তার পরেই ছোট্ট বুলবুলি গাইবে, অপূর্ব্ব গান একটি। জাপানী গান।

এই দুটি অসামান্য উপহার বিনিময়ের দিন মস্ত পার্টি দিলেন রাজাবাহাদুর। দেশী, বিদেশী, অভিজাত আর সাধারণ সব রকম লোকের জন্যে সেদিন ছিলো অবারিত দ্বার। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো খবরটা। স্বভাবকবিরা এই নিয়ে কত কবিতা লিখলেন, খবরের কাগজগুলো হৈ-চৈ করলো রাজারাজড়ার সখের ব্যাপার নিয়ে। বিলেতেও বিখ্যাত কাগজগুলোতে, পত্রিকাতে এ খবরটা বেশ রসালো ভাবে লেখা হল।

আজও আছে জামাইবাবুর শোবার ঘরে, কাচের শো-কেসের ভেতর সেই গাছটা। তবে ওটা বহুকাল নাড়াচাড়া হয় না বলে বোধ হয় ওর কলকব্জাগুলো খারাপ হয়ে গেছে, তাই পাখীগুলো গান আর গায় না।

নিবিষ্ট চিত্তে শুনছিলো অনিরুদ্ধ করবীর কথাগুলো। তার মাঝে খন্ খন্ করে বেজে উঠলো মায়া দেবীর বাজখাঁই কণ্ঠস্বর।

ওরে অ করবি, কথার মহাজন, শুধু কথাই শোনাও ওকে—এদিকে মাংসর সিঙাড়াগুলো যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেলো।

—এই যে যাই মা! লজ্জিত ভাবে উঠে দাঁড়ালো করবী। আপনার চা নিয়ে আসি।

—চমৎকার গল্প শুনছিলাম তো। চা-টা না খেলে কি বড্ড খারাপ দেখাবে?

—মা ভীষণ চটে যাবেন, নিজে হাতে তৈরী করেছেন কি না, নিচু গলায় কথাগুলো বলে হাসতে হাসতে চলে গেলো করবী।

—কি স্বপ্ন দেখেছিলে মিতা?—বলবে আমায়?

—বলছি দাদা! আগেও মাঝে মাঝে দেখেছি কিন্তু মনে তেমন ছাপ থাকেনি তার। কিন্তু এখন যেন ঘন ঘন দেখি ঐ স্বপ্নটা। কি উজ্জ্বল কি স্পষ্ট দেখতে পাই! কাল রাতে দেখলাম, ঐ ভয়ঙ্কর সমুদ্রে ঐ কালো কালো বড় বড় ঢেউয়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি আমি। দূরে দেখা যাচ্ছে ঐ বাতিঘরটা। কি উজ্জ্বল আলো ওর, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমি কিছুতেই যেতে পারছি না ওর কাছে। আমি যত এগিয়ে যাচ্ছি, বাতিঘরটা যেন তত সরে যাচ্ছে। উঃ—কি কষ্ট!—সে যে কি ভীষণ কষ্ট তা তোমায় বলতে পারবো না দাদা! উঃ, ভাবলে এখনও যেন বুকটা কেমন করে ওঠে আমার।

—স্বপ্ন দেখে অত উতলা হোয়ো না মিতা! ওটা মনের মিথ্যে কল্পনার ছায়া বৈ তো নয়। তোমার দুর্ব্বল শরীর বলেই—মিথ্যে ভয় পেয়েছো। ছবিটা তুমি আর দেখো না,—বলবো দিদিমাকে একটা কভার দিয়ে ওটা ঢেকে রাখবেন।

—মিথ্যে স্বপ্ন?—না দাদা মিথ্যা কিছুই নয়। সব ঘটনার পেছনেই একটা সত্যের ইঙ্গিত আছে। আমার কি মনে হয় বলবো? কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে চাইলো সুমিতা অনিরুদ্ধর দিকে।

—কি মনে হয় মিতা? পরম স্নেহভরে ওর একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে অনিরুদ্ধ।

—মনে হয়, ঐ ছবিখানি এই লালকুঠির আত্মা। ঐ ভীষণ ঝড়ে সমুদ্রের ঢেউ-এ ঢেউ-এ ভেসে চলেছে এ বংশের, এ বাড়ীর সবাই। বাতিঘরে পৌছোতে পারেনি কেউ;—আমিও পারবো না দাদা। ঐ ভীষণ সমুদ্রে ডুবে যাবো আমি।

ব্যথাভরা দৃষ্টি মেলে অনিরুদ্ধ শুনছিলো সুমিতার করুণ কণ্ঠের কথাগুলো।

করবী এলো ঘরে,—আসুন অনিরুদ্ধ বাবু,—মা'র হাতে রেহাই নেই আপনার,—তুইও আয় মিতা,—স্বপ্ন দর্শন থাক্ এখন,—খাদ্য-দর্শনটা সবাই মিলে আলোচনা করিগে চল্। [ক্রমশঃ।

কবি নজরুলের কবিতা

মঞ্জুলা দে

সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিলেই চোখে পড়ে কত শত অগণিত তারকা—নিবু-নিবু, উজ্জ্বল কত তাহাদিগের জ্যোতিঃ। সেই স্নিগ্ধ-নক্ষত্রখচিত গগন-কোলের দিকে চাহিয়াই আমাদিগের অশান্ত চক্ষু খুঁজে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিপ্রবর ব্যক্তিগণকে—সেখানে তাহাদিগের অমর আত্মার অস্তিত্ব মিলে। মনে হয়, এই অনন্ত নভের অসংখ্য তারকাগুলি এক একটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বুদ্ধিদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ চক্ষু—মনে হয় নিউটন, গ্যালিভার, সেক্সপিয়র, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহাপুরুষগণের বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু যেন আজি সমতেজে সমগরিমায় জাজ্বল্যমান।

চন্দ্রের স্নিগ্ধতা আছে, আছে তাহার মাধুরিমা—তাই চন্দ্র সমগ্র কবিকুলের আদরণীয়—তাহাদিগের কবিতার বিষয়বস্তু। কিন্তু তারকা? তারকা কী পায় চন্দ্রের মত শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা? মনে হয় না, তাই কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিতে পারিয়াছেন—

না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

তেমনি আমাদিগের কাব্যাকাশ—সে যেন স্বর্গ; বাল্মীকি, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ওমর খৈয়াম, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অতুল্য শ্রেষ্ঠ মহাকবিদিগের অক্লান্ত সাধনায় উহা দৃষ্ট। সেই

কাব্যাকাশে বাল্মীকি, কালিদাস, ইত্যাদি মহাপুরুষগণ চন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু এই কাব্যাকাশ কি তারকাশূন্য? কখনই নহে—রহিয়াছে—সত্যই রহিয়াছে অজস্র তারকা—হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল, কামিনী রায়, প্রমথনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল আরও কত সহস্র নক্ষত্র—তাহাদিগের কেহ বা বশিষ্ঠ, কেহ বা বিশ্বামিত্র—কিন্তু কাব্যাকাশের একমাত্র শুকতারার স্থান অধিকার করিতে পারেন কবি নজরুল ইসলাম। তাঁহার কবিপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণের ন্যায় শতমুখী নহে কিন্তু তাঁহার কবিতা হৃদয়গ্রাহী।

কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয়, কবি বিদ্রোহী কবি—তাই তিনি কল্লোল যুগের কবি। যাহা কিছু অন্যায়, যাহা কিছু অত্যাচার, যাহা কিছু অনাচার তাহাই কবির হৃদয়ে প্রেরণা জোগাইত—তাই তাঁহার কাব্যাগ্নি তখনই বিদ্রোহের লেলিহান শিখা উত্তোলন করিয়াছে। ভারতবাসী যখন পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত হইবার স্বপ্নে মগ্ন তখন সেই স্বদেশবিমুখী জাতির প্রাণে কবিতার মাধ্যমে কবি নজরুল জাগ্রত করিয়াছিলেন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—যেন শুষ্ক মরুভূমির বালুরাশির মধ্যে এক ক্ষিপ্ত জলধারা অকস্মাৎ প্রবাহিত হইয়া বালুকারাশিকে সিক্ত করিয়াছিল, স্পর্শ করিয়াছিল নবীন জীবনের স্নিগ্ধ পরশ।

বিদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে এক সময়ে সমগ্র দেশে যে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কবির কবিতা তখন বহুল পরিমাণে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। তাঁহার সকল বিদ্রোহপূর্ণ কবিতার মধ্যে 'বিদ্রোহী' কবিতাটিকে সমগ্র শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যেমনি উহার ছন্দগাম্ভীর্য, তেমনি উহার ভাবার্থ, কবিতাটি যেন নজরুলের কবিকৃতির এক অতুলনীয় অত্যাশ্চর্য স্বাক্ষর।

দীপ্ত কণ্ঠে অত্যাচারের প্রতিবিধানের নিমিত্ত দেশবাসীকে উত্তেজিত করিতে গিয়া কবি গাহিয়াছেন :—

"যবে উৎপীড়নের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে
ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

কল্লোল যুগের কবি, কবি নজরুল সমস্ত জাতি এবং যৌবনের প্রতিনিধিরূপে স্বদেশের সৈনিকদিগকে সাবধান করিতে গিয়া আবার উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন :—

"তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।"

আবার

"গিরিসংকট, ভীরুযাত্রীরা গুরুগরজায় বাজ,
পশ্চাৎ পথযাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি মাঝপথ?
করে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়েছ যে মহাভার।"

পরাধীনতার দুস্তর সিন্ধু অতিক্রম করিয়া বিদেশী শাসনের দুরাত্রি অতিবাহিত করিয়া যাহারা দেশের স্বাধীনতা-সূর্য্যকে হিমাচলের শিখরচূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফৎ আন্দোলন, গুপ্ত বিপ্লবের আন্দোলন যুগের সেই সমস্ত নির্ভীক দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে প্রতিশ্রুত মাতৃমন্ত্রী যৌবনশক্তি তারুণ্যশক্তি তথা বৈপ্লবিক শক্তিকেই কবি কাণ্ডারী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কবিতাটি হইতে কবির আদর্শবাদিতা, কবির স্বদেশপ্রীতি এবং কবির বিদ্রোহী মনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। বস্তুতঃ, কাজি নজরুল ইসলাম যে অর্থে বাংলাদেশে বিদ্রোহী কবি বলিয়া পরিগণিত হন, এই কবিতাটি তাঁহার সেই বিদ্রোহী মনেরই প্রতিনিধি। কবিতাটির রচনা-রীতি এবং বর্ণনাভঙ্গী মর্মস্পর্শী বলিয়া সকলেরই মন হরণ করে। বিশেষ করিয়া শেষ স্তবকের প্রথম দুই চরণে যে ভাষায় তিনি বাংলার তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সৈনিকদের অবদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অনন্যতার দিক হইতে চিরদিনই বাঙ্গালার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। তাই নজরুলকে ভুলিয়া গেলেও তাঁহার এই চরণকে মানুষ ভুলিতে পারিবে না।

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান?"

মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার কবির ঘৃণার কারণ। তাই কালো চামড়ার প্রতি শ্বেতাঙ্গের তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া কবির লেখনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে—যেন ভগবানের নিকট কবির প্রার্থনা :—

"তুমি বলো নাই শুধু শ্বেতদ্বীপে
যোগাইবে আলো রবি-শশি দীপে,
সাদা রবে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।

ধনহীনের প্রতি ধনবানের তীব্র পীড়নে কবি পাইয়াছেন মর্মে ব্যথা। তাই ব্যথিত কবির কাব্যাগ্নি ধনবানের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবিধান করিয়াছে।

কত পাই দিয়ে কুলীদের তুই ক্রোর পেলি বল?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্পশকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো তো এসব কাদের দান? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? টুপি খুলে দেখ, প্রতি ইটে
আছে লিখা।

কবির সাম্যবাদিতার পরিচয় পাই যখন দেখি যে, তিনি পরদেশী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গিয়া বারংবার কারারুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তথাপি তিনি আশাহত হন নাই—সমতেজে, সম-উদ্দীপনায় তাঁহার কবি-হৃদয় প্রজ্বলিত ছিল—

"কারার ঐ লৌহ-কপাট,
ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট।"

কবির নিকট তারুণ্যশক্তি তথা যৌবনশক্তি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। তাই তিনি তরুণ ও যুবকদিগকেই দেশের কাজে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি গাহিয়াছেন—

"চল রে নও জোয়ান
শোন রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।"

আবার

"তোমার শক্তি তপস্যাতে আসবে কাছে উর্দ্ধলোক,
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে অজ্ঞানাদের দুঃখ-শোক
এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়
করবে মোচন শক্তি দিয়ে, শৌর্য দিয়ে, হে দুর্জয়!
দেশের জাতির লজ্জা-গ্লানি, কলঙ্ক ও অসম্মান
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নূতন প্রাণ।

কবির নিখুঁত ছন্দসৃষ্টি ও ছন্দনৈপুণ্য প্রতি পাঠকের হৃদয়ে আনিয়া দেয় আনন্দের জোয়ার।

"গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
টলমল স্বর্গে
ঝলমল দোলে দুল
ঝিঙে ফুল।"

কবির সঙ্গীত-প্রতিভা শতমুখী। শুধু দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে নহে, ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সৃষ্টিও কবির অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। নূতন এক শ্রেণীর সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া কবি গায়ক-গায়িকার নিকট পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন ও থাকিবেন। সেই নজরুল-গীতিকে কে না চেনে?

কবি Elegy বা শোক-গীতির স্রষ্টা। বাংলা-সাহিত্যে এই দান অতুলনীয়। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর 'ইন্দ্রপতন' এবং সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'সত্য-কবি' নামক কবিতা দুইটি বাংলা-সাহিত্যের শোক-গীতির নিদর্শন। 'ইন্দ্রপতন' কবিতায় নজরুল গাহিয়াছেন—

"আজ ভারতের 'ইন্দ্রপতন', বিশ্বের দুর্দিন,
পাষাণ বাংলা পড়ে এক কোণে নীরব অশ্রুহীন।
তারি মাঝে হিয়া থাকিয়া গুমরি গুমরি ওঠে
বক্ষের বাণী চক্ষের জলে ধুয়ে যায়, নাহি ফোটে।" ইত্যাদি।

আবার 'সত্য-কবি' কবিতায়—

"মেকীর বাজারে আমরণ কবি রয়ে গেলে তুমি খাঁটি
মাটির এ দেহ মাটি হল তবু, সত্য হল না মাটি।" ইত্যাদি

কবিতা হৃদয় দিয়ে উপভোগ করিবার বস্তু। কিন্তু নজরুলের কবিতা শুধু হৃদয়গ্রাহী নহে—তাঁহার কবিতা বাঙ্গালীর জীবনদাত্রী, শক্তিদাত্রী ও অমৃতবাণীদাত্রী। তাঁহার কবিতা আনিয়া দেয় দুর্বলের বুকে বল, স্বদেশবিমুখীদিগকে করে দেশমুখী, সাহসী, নওজোয়ানদিগকে পরাধীনতার দুর্গম, দুস্তর সিন্ধু পারাপার করিবার মন্ত্র বলিয়া দেয়—তাই কবি সকলেরই পূজ্য, সকলেরই নমস্য। আমরা চিরদিনই কবির জয়গান গাহিব। বলিব কবি—

আমাদের কবি,
কবি বাংলাদেশের অমর সন্তান।

শাড়ী

মায়া বসু

সকাল থেকে নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই শ্রীমন্তর। ছুটি মিলবে সেই রাত সাড়ে আটটায়। তারপর হিসাব মিলিয়ে দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ হতে আরও ঘণ্টাখানেক। তারপর পায়ে হেঁটে রাত্তিরের কলেজ ষ্ট্রীটকে ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর হেঁটে বাই লেনের অন্ধকারে গেলে তবে তার ঘর। নামেই ঘর, আসলে খুপরি। মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে এই তার আস্তানা। তবুও দোকান থেকে বেরিয়ে পায়ের তলায় রাস্তাকে মাড়িয়ে চলতে শ্রীমন্তর খুবই ভাল লাগে। বিলাসিনী নগরীর এই দরিদ্র নাগরিকের এটুকুই বিলাস। শীতের শিরশির-করা রাতে গ্রীষ্মের মিষ্টি মিষ্টি হাওয়ায় আবার বর্ষার ধারার মধ্যেও শ্রীমন্ত বিলাস খুঁজে পায়। শুধু এটুকু সময়ই সে একলা আর স্বাধীন। হুকুম তামিল করা বা অভাবের অভিযোগ এসময় তার কানের কাছে গুঞ্জন তুলে তার স্নায়ুকে পীড়িত করে না। তাই বর্ষার ধারা যখন তার একটি মাত্র সার্টের ভেতর চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে ভিজিয়ে দেয়, সে মনে কষ্ট পায় না।

পড়াশুনায় সে এমন খারাপ ছিল না যে ম্যাট্রিক পাশ করতেও পারবে না। কিন্তু নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য সে সুযোগ সে পেল না। অবশেষে অনেক রকম ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এসে তার এই কাপড়ের দোকানে চাকরী জীবনের সুরু। যাই হোক, অতলান্তের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে পায়ের তলায় অন্ততঃ বেঁচে থাকবার মত মাটি সে খুঁজে পেল।

বেলা দশটা থেকে আরম্ভ হয় তার কাজ। নম্বর মিলিয়ে কাপড় তাকে তাকে সাজিয়ে রাখা, আবার খদ্দের এলে মনোরম ভাবে মেলে ধরে তাদের মনোরঞ্জন করা, একই কাপড় দশ-বার নামানো, বিভিন্ন খরিদ্দারের মনোভাব বুঝে বুঝে কথা বলা শ্রীমন্তর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রথম প্রথম মুখে বেধে যেত এখন বেশ জলের মতো বলতে পারে। শাড়ীরই দোকান, সেজন্য মহিলা খরিদ্দারের আগমনই বেশী হয়। তাই মেয়েদের মন বুঝে কথা বলার ঢংটাও শ্রীমন্ত আয়ত্ত করে ফেলেছে। শ্রীহীনা মেয়েকে অনায়াসে বলে ফেলে—এ-কাপড়টা আপনাকে সুন্দর মানাবে, আবার ঘুঁটের মত খোঁপাওলা পান-দোক্তাভরা মুখওলা মহিলাকে বলে, আপনার পছন্দজ্ঞান অতি সুন্দর। আবার খুঁতখুঁতে মহিলার সামনে অক্লান্ত ভাবে কাপড়ের বোঝা দেখিয়ে ক্লান্ত হয় না শ্রীমন্ত। এ যে তার জীবিকা। তাঁদের কাপড় দেখাবার বিনিময়ে সে বেঁচে থাকবার সুযোগ পেয়েছে। তাই তো এখনো ভদ্র জামা-কাপড় পরে বুকভরে নিশ্বাস নিতে পারছে সে, নয়তো হারিয়ে যেত কোন ঘূর্ণিপাকে।

সুশ্রী মুখওলা এই শান্ত ছেলেটিকে দোকানের মহিলা খরিদ্দারদের খুব পছন্দ। এমন ধৈর্য্যবান আর ভদ্র ছেলেটি।

দোকানের মালিক যখন দুপুরে বিশ্রামের জন্য বাড়ী যান, শ্রীমন্ত তখনো এতটুকু ফাঁকি দেয় না। শরীর খারাপের নাম করে মাণিকের সঙ্গে দুপুরে একদিনও সিনেমা যায় না।

তুই একটা বোকা, শ্রীমন্ত! আশী টাকায় তুই জীবনটাকে বিক্রী করে দিয়েছিস?

কিন্তু মাণিকের অভিযোগ বা উপরোধ কোনটাই সে কানে নেয় না।

কিন্তু সেই শ্রীমন্তর একদিন কি যে হোল! তাই পায়ের তলার মাটিটুকুও সে হারিয়ে দিতে চাইলো সহজেই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পীচগলানো রোদ্দুরে কলেজ ষ্ট্রীট খুঁকছে। মাঝে মাঝে এক একটা ট্রাম বা বাস ঘড়ঘড় শব্দ করে চলে যাচ্ছে আর

ধুলোমাখানো বাতাসের ঝাপটায় দ্বিগুণ দুঃসহ হয়ে উঠছে চতুর্দ্দিক। দোকানে কেউ নেই এখন, শুধু একজন ওপাশে ঘুমিয়ে রয়েছে আর শ্রীমন্ত বসে আছে অতন্দ্র প্রহরীর মতো। দোকানের সামনে পর্দা ফেলা। কলেজ ষ্ট্রীটের দুঃসহ উত্তাপকে তা ঠেকিয়ে রেখেছে। সেই আধো অন্ধকারে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দোকানঘরে এসে উঠলো একজন আর সেই মুহূর্তে শ্রীমন্তর চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল এক নতুন অনুভূতিতে।

সাদা শাড়ীটি নিপুণ ভাবে পরা, চোখ দুটি বড় বড় আর চিবুকে কোমলতার আভাস মাখানো মেয়েটিকে দেখে শ্রীমন্তর মন অবশ হয়ে এল। মনে হোল শ্রীমন্ত যেন এরই জন্য এতদিন দোকানে বসেছিল। প্রতি খরিদ্দারের মাঝে একেই খুঁজে বেড়িয়েছে। এত দিন যা' কেটে গেছে সে শুধু স্বপ্ন, আজই প্রথম বাস্তব। মুখর শ্রীমন্ত মায়ামন্ত্রে মূক হয়ে গেল। অভ্যাস বশতঃ যন্ত্রচালিতের মতো সে কাজ করে গেল! আর আতরের মৃদু গন্ধ তার নিশ্বাসে ঢুকে আতপ্ত মনকে আচ্ছন্ন করে দিল।

হ্যাঁ, এই কাপড়টা আমার পছন্দ। এটাই দিন। কত? কুড়ি টাকা? এই নিন।

শ্রীমন্ত প্যাক করে দিল কাপড়টাকে।

আচ্ছা, ওই যে কাপড়টা ঝুলছে ওটা একবার আনুন তো। কত দাম?

পঁয়ত্রিশ। কিন্তু আর তো টাকা আনিনি আজ? আমি তিন-চারদিন পরে এসে নিয়ে যাব। রেখে দেবেন আলাদা করে। পর্দা সরিয়ে চলে গেল ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধওলা মেয়েটি। আর শ্রীমন্ত অনেকক্ষণ বাতাসে সেই আতরের গন্ধকে খুঁজে ফিরতে লাগল।

পরের তিন-চার দিন শ্রীমন্ত অস্থির হয়ে কাটিয়েছে। দোকান খোলা থেকে আরম্ভ করে বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত কোথাও যায়নি সে। উৎসুক ব্যাকুল চোখে সে শুধু খুঁজে ফিরেছে একজনকে; যে একদিন মায়ালাগা নিঝ্‌ঝুম দুপুরে বাস্তব হয়ে এসেছিল আর তার পর স্বপ্নে মিলিয়ে গেছে।

কিন্তু তিন-চারদিন কেন পনের-কুড়ি দিন পরেও সে এল না। প্রথমে কয়েক দিন সে শাড়ীটাকে আলাদা করেই রেখেছিল। সাদার ওপরে নীল নীল সূক্ষ্ম ফুলের কারুকার্য্য করা। কে যেন সরু পেন্সিল দিয়ে এঁকেছে। সত্যিই চমৎকার! শ্রীমন্ত সহ্য করতে পারবে না সেই একজন ছাড়া আর কেউ এ কাপড়টি পরে।

কিন্তু সে তো এল না! শ্রীমন্ত ব্যাকুল হয়ে শাড়ীটাকে আড়াল করতে চাইলো। মাণিক বললে, তোর ও কাপড়ের খদ্দের আর আসবে না রে! আলাদা করে রাখিসনি।

শ্রীমন্ত শুধু বললো, না রে, থাক না আলাদা। মনের কথা বাইরে বলে কদর্য্য করতে ওর বাধলো। কিন্তু গোলমাল সুরু হলো এইখানেই। মাণিক একদিন শ্রীমন্তর অলক্ষ্যে সে কাপড় একজনকে দেখালো। মাথার ওপর ছোট্ট একটুকু আলুর মতো খোঁপা, পান্তুয়ার মত কালো ফোলা-ফোলা গাল, গা-ভর্ত্তি গয়না পরা একচল্লিশ বছরের ভদ্রমহিলাকে মাণিক কাপড় দেখাচ্ছিল। শ্রীমন্ত দেখতে পেয়ে সেই কাপড়খানা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়েছে, মহিলা অমনি বললেন, ওই কাপড়টা দেখি?

না, ওখানা আর একজনের পছন্দ করা।

না ওটাই আমার পছন্দ। আমি ওখানাই নেব। তাঁর বোধ হয় মনে হোল ওখানাই সবচেয়ে সেরা শাড়ী। কেন না, ওটা যখন আর একজনেরও পছন্দ।

মাণিক শ্রীমন্তকে আস্তে আস্তে বললে, দিয়ে দে শ্রীমন্ত! যে খদ্দেরই নিক না, আমাদের কি?

শ্রীমন্ত বললে, না।

মহিলা রেগে উঠলেন, কি রকম দোকান! খদ্দেরকে অপমান করে।

মালিক ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। সব শুনে শ্রীমন্তকে বললেন, আরে সে খদ্দের তো এ্যাডভান্স করেনি। কি হয়েছে? ওঁকেই দিয়ে দাও কাপড়টা।

কিন্তু শ্রীমন্তর আজ কি হয়েছে? ওই ফোলা-ফোলা পান্তুয়া-গাল মেয়ে ওই কাপড় পরবে এটা সে ভাবতেই পারলে না। রজনীগন্ধার বৃন্তের মতো যার শরীর আর আতরের মৃদু-মধুর গন্ধ যার গায়ে ফুলের মতো জড়িয়ে থাকবে ওই নীল রং-এর সূক্ষ্ম ফুলতোলা শাড়ীটি তারই গায়ে। মালিক বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

শ্রীমন্ত বললে হ্যাঁ, আমাকে তিনি টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি খরচ করে ফেলেছি।

বিস্মিত হলেন মালিক। তুমি বলতে চাও যে তুমি সে টাকা নিয়েছ অথচ খাতায় লেখনি?

ও চুপ করে রইলো।

মহিলাটিকে মালিক বিনয়-বচনে তুষ্ট করে বিদায় করে শ্রীমন্তকে কাছে ডাকলেন।

শ্রীমন্ত, তুমি বুঝেছ, তুমি কি করেছ?

ওর মুখে কোন উত্তর নেই।

শ্রীমন্ত কি পাগল হোল? একটা অবাস্তবের পেছনে ছুটে পায়ের তলার আশ্রয়কে ফেলে দিতে যাচ্ছে? শ্রীমন্ত বললো, আমার মাইনে থেকে কেটে নিন।

মালিক বললেন, শোন তুমি, অনেক দিন আছ এ দোকানে। এক জন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী হয়ে আজ এ কি করলে? যাই হোক, তোমার অবস্থা বিবেচনা করে এবার তোমায় ক্ষমা করলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান!

শ্রীমন্ত চলে এলো নিজের জায়গায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল সব অপমান। প্রসন্ন হয়ে উঠলো ওর চোখ। রাত সাড়ে আটটা বাজতে আর দু-মিনিট বাকী। শ্রীমন্ত বুক ভরে আবার নিশ্বাস নিল আতর-গন্ধের। আর কানে শুনলো, আমার সেই শাড়ীটা এখনো আছে কি?

এই নিন্। শ্রীমন্ত যত্ন করে প্যাক্ করে দিল। আর আশ্চর্য্য! সেই মুহূর্ত্তে ওর মনে হোল এই শাড়ীর সূত্রে ওর সঙ্গে যে যোগাযোগ নিজের মনে সে রচনা করে চলেছে এ ক'দিন ধরে, সেটা ছিন্ন হয়ে গেল। রিক্ত হয়ে গেল শ্রীমন্তর মন।

• • •

রাতের অন্ধকারে কলেজ ষ্ট্রীটে অগণিত জনতার পদচ্ছাপের সঙ্গে আরও দুটি ক্লান্ত পায়ের ছাপ এঁকে চলতে চলতে হঠাৎ আবার প্রসন্ন হয়ে উঠলো ওর মন। রজনীগন্ধার দেহ এক দিন ছেয়ে দেবে নীলফুলের ছাপ; যার মধ্যে তারও দান একটুও আছে।

পুরাণের প্রাঙ্গণে
যেসব আবর্জনা
একদিন কোরেছিলো ভীড়,
বৌদ্ধযুগের ঐ
জঘন্য রীতি-নীতি
পুরাণকে কোরেছে মলিন,
তাদের সমর্থন
কোরে থাকে যারা,
স্বামিজী তাদের কেউ নন্;
পুরাণ বা তন্ত্রের
বামাচার সাধনার প্রতি
স্বামিজীর কশাঘাত
সবচেয়ে বেশি নির্মম।১

* * *

১। আমাদের পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে রাজা রামমোহনের সুবিস্তৃত আলোচনায় অবনত বৌদ্ধ যুগের কোনো উল্লেখই নেই। রাজা এই যুগকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আলোচনা কোরে নানা দিক থেকে একে বিশেষ ভাবে একটা অবনতির যুগ বোলে গ্যাছেন। কিন্তু পৌরাণিক যুগের গবেষণায় রাজার সঙ্গে স্বামিজীর পার্থক্য হোচ্ছে এই—স্বামিজী পুরাণ ও তন্ত্রের যুগকে অবনত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত কোরে বৌদ্ধদের কুসংস্কারপূর্ণ সাধনপদ্ধতির বীভৎস অশ্লীলতার প্রতি তীব্র কশাঘাত কোরতে ছাড়েন নি। স্বামিজীর গবেষণা এ ক্ষেত্রে রামমোহনের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান এবং মৌলিক।

রাজা তান্ত্রিক বামাচার সাধনপদ্ধতির প্রতি খড়্গহস্ত হওয়া দূরে থাক, তান্ত্রিক বামাচার সাধনপ্রক্রিয়াকে শাস্ত্রীয় বোলে সমর্থন কোরে গ্যাছেন! "কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক বিচারে" রাজা মদ্যপানের সমর্থক এবং শিবের আজ্ঞায় যে কোনো বয়েসের ও যে কোনো জাতের মেয়েকে চক্রের সাধনায় শক্তিরূপে গ্রহণের পক্ষপাতী! রামমোহনের গুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তান্ত্রিক বামাচারী সাধক ছিলেন। প্রবাদ আছে, স্বয়ং রামমোহন নিজে কোনো এক মুসলমানীকে শক্তিরূপে গ্রহণ কোরে বহুকাল ধোরে তন্ত্রের বামাচার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

এ ধারে, তান্ত্রিক বামাচার সাধনপদ্ধতির প্রতি স্বামিজীর ঘৃণা অপরিসীম।—

"Give up this filthy Vamachara that is killing your country. You have not seen other parts of India. When I see how much the Vamachara has entered our society, I find it a most disgraceful place with all its boast for culture. These Vamachara sects are honey-combing our society in Bengal. Those who come out in the daytime and preach most loudly about Achara, it is they who carry on the horrible debauchery at night, and are backed by the most dreadful books. They are ordered by the books to do these things. You who are of Bengal know it. The Bengalee Sastras are the Vamachara Tantras. They are published by the cart-load, and you poison the minds of your children with them, instead of teaching them your Srutis. Fathers of Calcutta, do you not feel ashamed that such horrible stuff as these Vamachara Tantras, with translations too, should be put into the hands of your boys and girls, and their minds poisoned, and that they should be brought up with the idea that these are the Shastras of the Hindus? If you are ashamed, take them away from your children, and let them read the true Shastras, the Vedas, the Gita, the Upanishads."

—*The Vedanta in all its phases.* (*complete works, Vol III. Page* 340 *and* 341).

বিবেকানন্দ স্তোত্র

সুমণি মিত্র

"......In spite
Of the preaching
Of mercy to animals,
In spite
Of the sublime
Ethical religion,
In spite

Of the hair-splitting discussions
About the existence
Or non-existence
Of a permanent soul,
The whole building of Buddhism
Tumbled down piecemeal ;
And the ruin
Was simply hideous.

I have
Neither the time
Nor the inclination
To describe to you
The hideousness
That came
In the wake of Buddhism.

The most hideous ceremonies,
The most horrible,
The most obscene books
That human hands ever wrote,
Or the human brain
Ever conceived,
The most bestial forms
That ever passed
Under the name of religion,
Have all been
The creation
Of degraded Buddhism." ২

৪৯

তবু নিশ্চয়ই
বীভৎস বামাচার
পুরাণের মূলসুর নয়,
বিশুদ্ধা ভক্তিই
পুরাণের শেষ পরিচয়।
বেদ ও উপনিষদে
ভক্তির যে-রাগিণী
আবছায়া মাঝে মাঝে পাই,
পুরাণের প্রাঙ্গণে
সুরের লহরী তুলে
সপ্তমে বাজে সেইটাই।

* * *

"I am not
Asking you
To swallow without consideration
Any old stories,
Or
Any unscientific Jargon.
I am not
Calling upon you
To believe in
All sorts of
Vamachari explanations
That,
Unfortunately,
Have crept
Into some of the Puranas,
But
What I mean is this,
That
There is an essence,
Which
Aught not to be lost,
A reason
For the existence of the Puranas,
And that is
The teaching of Bhakti,
To make religion practical,
To bring religion
From its high
Philosophical flights
Into the everyday lives
Of our common human beings."৩

২। সর্বজীবে দয়া, অপূর্ব নীতিতত্ত্ব এবং নিত্য আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার সত্ত্বেও সমগ্র বৌদ্ধধর্মের প্রাসাদটা চুরমার হোয়ে ভেঙে পোড়লো ; আর তার যে ভগ্নাবশেষ রইলো, তা অতি বীভৎস। বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে যে বীভৎস ব্যাপারের আবির্ভাব হোলো, তা বর্ণনা করবার আমার সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই। অতি কদর্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি, অতি ভয়ঙ্কর এবং এবং অশ্লীল গ্রন্থ—যা মানুষের হাত দিয়ে আর কখনো বেরোয়নি কিংবা মানুষের কল্পনায় কখনো আসেনি—অতি ভয়ানক পাশব অনুষ্ঠানপদ্ধতি—যা আর কোনোদিন ধর্মের নামে চলেনি—এ সমস্তই অবনত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি।

—Sages of India (Complete works, Vol III, Page 264—265).

৩। "আমি আপনাদের না বুঝে কোনো পুরোনো উপকথা কিংবা অবৈজ্ঞানিক খিচুড়ি গলাধঃকরণ কোরতে বোলছি না, দুর্ভাগ্যবশতঃ কতকগুলো পুরাণের মধ্যে যেমন বামাচারী ব্যাখ্যা ঢুকে পোড়েছে, তাদের প্রত্যেকটিকে বিশ্বাস কোরতে বোলছি না, কিন্তু আমার বক্তব্য এই, ভুললে চোলবে না—এদের ভেতর একটা

৫০

অতএব তুমি বোল্লেই
ভুলে যাবো পুরাণের স্বাদ ?
ভক্তিকে ভুলে যাবো,
ভুলে যাবো ধ্রুব-প্রহ্লাদ ?
স্বামিজীও বিশুদ্ধ
জ্ঞানযোগী হওয়া সত্ত্বেও
এ-ব্যাপারে তাঁর মত
একেবারে অপক্ষপাত।

* * *

"Whether you believe
In the scientific accuracy
Of the Puranas or not,
There is not one among you
Whose life
Has not been influenced
By the story of Prahlada,
Or that of Dhruva,
Or of
Any one of these
Great Pauranika saints."৪

৫১

তা'ছাড়াও জ্ঞানযোগ
সকলের সম্ভব বোঝা ?
নির্গুণ নিরাকার
অচিন্ত্য নিত্যস্বরূপে
মনটাকে লীন কোরে
মুখ বুঁজে পোড়ে থাকা সোজা ?
ধর্মজগতে তাই
জ্ঞানের আধার খুব কম,
ধর্মলাভের পথে
জ্ঞানের রাস্তাটাই
সবচেয়ে বেশি দুর্গম।

বাসনামলিন মনে
বিশুদ্ধ ব্রহ্মের
ধারণাটা কোরবে কি কোরে ?
মলিন আরশিটার
সামনে দাঁড়াও যদি
তোমার প্রতিচ্ছবি পড়ে ?

বাসনাবিহীন মন
বিবেক ও বিচারের জোরে
মায়ার শেকল কেটে
ব্রহ্মেতে লীন হয় জানি,
এদিকে তেমন
বিষয়াবৃত মন
অশুভ বুদ্ধি নিয়ে
সজ্ঞানে করে বাঁদরামি !
এমন কি শয়তানও
শাস্ত্রবচন দিয়ে
ঢাকা দিতে পারে শয়তানী !

* * *

"The devil can
And indeed
Does quote the scriptures
For his own purpose ;
And thus
The way of knowledge
Appears
To offer justification
To what
The bad man does,
As much as
It offers inducement
To what
The good man does.

This is
The great danger
In Jnana-Yoga.
But
Bhakti-Yoga
Is natural,
Sweet
And gentle ;.." ৫

রবস্তু আছে, পুরাণ লোপ না-পাওয়ার একটা কারণ আছে, টা হোচ্ছে পুরাণের ভক্তিতত্ত্ব। ধর্মকে প্রাত্যহিক জীবনে রিণত করা, দার্শনিক উচ্চতা থেকে তাকে টেনে এনে াধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিকশিত করাই এর উদ্দেশ্য।"
—*Bhakti* (*Complete works, Vol III, Page* 388)

৪। "আপনারা পুরাণগুলোর বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন ছাই নাই করুন, আপনাদের মধ্যে এমন একজনও নেই, র জীবন প্রহ্লাদ, ধ্রুব বা ঐসব প্রসিদ্ধ পৌরাণিক মহাত্মাদের পাখ্যানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি।"
—*Bhakti*. (*Complete works, Vol III, Page* 386)

৫। "শয়তানও নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তে শাস্ত্র উদ্ধৃত কোরতে পারে এবং কোরেও থাকে। সুতরাং জ্ঞানমার্গ যেমন সৎলোকের সৎকাজে প্রবল উৎসাহ দায়, সেই রকম অসৎ লোকের

৫২

নিজেকে মিথ্যে বোলে
যতোদিন হোচ্ছে না বোধ,
ততোদিন ভক্তিই
আমাদের প্রশস্ত পথ।
দেহবোধ যায়না কলিতে ;
একে জীব স্বল্পায়ু,
তার ওপর ভাত নেই পেটে।
দেহঅভিমান নিয়ে
জ্ঞানযোগে যাওয়া ঠিক্ নয়,

দেহবোধ নিয়ে যারা
জ্ঞানপথে পা বাড়াতে চায়,
তাদের পতন হয় শেষে,
পরকে ঠকাতে গিয়ে
নিজের অজ্ঞান্তেই
নিজেই নিঃস্ব হোয়ে যায়।

জীবের অহং নিয়ে
'আমিই ব্রহ্ম' বলা চলে ?
তা'ছাড়াও মনে রেখো—
গঙ্গারই তরঙ্গ,
ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে ?

নিজেকে সত্য ভেবে
'জগৎ মিথ্যে' বোলে লাভ ?
জগৎ সত্য হোলে
'ব্রহ্ম সত্য' বলা পাপ।

যাই করো,
অহং কি যায় ?
যে-অশথ আজ কাটো,
কালই তার ফেকড়ী গজায় !

অতএব ভক্তেরা
'ভক্তির আমি' টাকে
সযত্নে রেখে দিতে চায়।
যে-'আমি'টা থাকে ভক্তের,
ক্ষতিকর নয় সে-'আমি'টা।

অসৎকাজেও তার সমর্থন আছে বোলে মনে হয়। জ্ঞানযোগে এইটেই হোচ্ছে মস্ত বিপদ। কিন্তু ভক্তিযোগ বেশ স্বাভাবিক, মধুর এবং কোমল।"

—*The naturalness of Bhakti-Yoga and its* ... *(Complete works. Vol. III, Page 78).*

মনে আছে ঠাকুরের
মিছরি ও হিংচের
অনুপম সেই উপমাটা ?

মিছরিটা মিষ্টিই নয়,
অন্য মিষ্টি খেলে
অসুখ কোরতে পারে,
মিছরিতে অম্বল যায়।
হিংচেও শাক নয়
সেই কারণেই ;
অন্য শাকের দোষ
হিংচে শাকেতে নেই,
উল্টে এ পিত্তি তাড়ায়।
ভক্তির 'আমি'টাও
আসলে অহং নয়,
এ-'আমি'তে বদ্ধতা যায়।

'আমি'টা যাবার নয়তো হে,
ভক্তেরা বলে তাই
'আমি' যদি নাই যায়,
থাক্ শালা 'দাস-আমি' হোয়ে।
এ-'আমি'তে তার কল্যাণ।
ভক্তির 'আমি' মানে—
আমি দাস, তুমি প্রভু,
আমি জীব, তুমি ভগবান।

কলিতে ভক্তিযোগই
সবচেয়ে উপযোগী
বোলেছেন ঠাকুর স্বয়ং।৬

৬। "ঈশ্বরের কায়মনোবাক্যে ভজনা করার নাম ভক্তি। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পুজো ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা ; নামগুণকীর্তন শোনা ; চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তবস্তুতি, তাঁর নামগুণকীর্তন, এই সব করা।...

বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,' এই বোধ ঠিক্ হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কেমন করে বোধ হবে ? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। 'আমি দেহ নই, আমি মন নই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ—এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন।... কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন। ভক্তিযোগ যুগধর্ম।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

তা'ছাড়াও শোনো ফের
পার্থের প্রশ্নের
কি জবাব দ্যান্ ভগবান।—

৫৩

"অর্জ্জুন উবাচ।
এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
ময্যাবেশ্যমনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"৭

[ক্রমশঃ।

৭। "অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা কোরলেন—এই ভাবে নিরন্তর ভগবৎকর্মাদিতে নিযুক্ত হোয়ে যে সব অনন্যশরণ ভক্ত সমাহিতচিত্তে আপনার যথাবর্ণিত বিশ্বরূপের উপাসনা করেন এবং যাঁরা সমস্ত বাসনা এবং কর্ম পরিত্যাগ কোরে সর্বোপাধিরহিত ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই দু'দলের মধ্যে কার শ্রেষ্ঠ যোগী?

শ্রীভগবান বোল্লেন—পরমেশ্বরের ভজন দ্বারাই জীবের উদ্ধার হয়—এই বিশ্বাস দৃঢ় কোরে যাঁরা আমার বিশ্বরূপে মনোনিবেশ কোরে মচ্চিত্ত হোয়ে অহোরাত্র অতিবাহিত করেন তাঁরাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। কিন্তু, যাঁরা সর্বদা ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে রাগ ও দ্বেষরহিত, সমস্ত প্রাণীর কল্যাণে নিযুক্ত এবং ইন্দ্রিয়সংযমী, যাঁরা শব্দাদি প্রমাণ দ্বারা অপ্রতিপাদ্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, সর্বব্যাপী, মনাতীত, কূটস্থ (মায়াধিষ্ঠান), অপ্রচ্যুতস্বরূপ এবং শাশ্বত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন। এই সকল জ্ঞানী আমার আত্মাই। যাঁদের চিত্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে আসক্ত, তাঁদের সিদ্ধিলাভের জন্যে ভগবৎকর্মাদি-পরায়ণ সগুণ উপাসক অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট পেতে হয়, কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করা দেহাভিমানী (যার 'আমি' বুদ্ধি আছে) ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। হে পার্থ, কিন্তু যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক 'আমি পরম পুরুষার্থরূপে উপাস্য'—এই ভাবে মৎপরায়ণ হোয়ে অনন্য যোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করেন, মদ্গতচিত্ত সেইসব ভক্তকে মৃত্যুময় সংসারসাগর থেকে আমি অচিরে উদ্ধার কোরি।"

(১২শ অধ্যায়, ১ম থেকে ৭ম শ্লোক)।

বিজ্ঞানবার্তা

পঙ্কধর মিশ্র

সুগন্ধ বিজ্ঞানকে ভাষাবিহীন বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। ভাষার সাহায্যে এর চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। বিখ্যাত চিত্রকরের একটি ছবি যদি কোন মানুষের সামনে ধরা হয়, তাহলে সে অক্লেশে বলে দিতে পারে ঐ ছবির মধ্যে কোন রঙের বেশী প্রাধান্য আছে এবং তার কোন অংশে কি কি রঙ তিনি ব্যবহার করেছেন। দেখার অনুভূতিকে এই ভাবে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। জগতের চতুর্দ্দিকে আমরা যা দেখছি তা মোটামুটি সাতটি রঙে বিভক্ত, দেখার অনুভূতিকে নির্দ্দিষ্টতর করবার জন্য নীলাভ সবুজ, লালচে বাদামী ইত্যাদি রঙের জটিল অভিব্যক্তিও প্রকাশ করা হয়, কিন্তু ঘ্রাণের জগতে কোন কিছু বোঝাতে হলে মানুষ প্রায় অসহায় হয়ে পড়ে। কোন একটি সুরভির ঘ্রাণ উপলব্ধি করে আপনি বললেন, এতে চাঁপা ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। উপলব্ধিটিকে ঠিক প্রকাশ করা গেল না,—যাকে বললেন তিনি যদি চাঁপা ফুলের গন্ধ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ হন, তাহলে কিছুতেই এই সুরভির চরিত্র অনুধাবন করতে পারবেন না। চাঁপা ফুলের সুগন্ধের অভিজ্ঞতা যদি থাকে তখনই কেবল তাঁর পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা দিয়ে ঐ সুরভির প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা সম্ভব। সাধারণ লোকের পক্ষে শত শত সুরভির বিশেষ সুগন্ধের সঙ্গে পরিচিত থাকা এবং অনুভূতির সহায়তায় তাদের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। মোটামুটি বললেন গন্ধটা মিষ্টি, কিন্তু কিসের মতো মিষ্টি গন্ধ? গোলাপ চাঁপা, ভায়োলেট প্রভৃতি সব ফুলের গন্ধই মিষ্টি, কোন মিষ্টি গন্ধের কথা আপনি উল্লেখ করছেন?

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, রঙের বেলাতেও অনেকটা ঠিক এই রকম অবস্থার উদ্ভব হয় কি না? নীল বলতে তো সব নীল রঙকেই বোঝায় না,—আকাশের ফিকে নীল রঙের সঙ্গে গাঢ় নীল কাপড়ের রঙের তফাৎ খুবই বেশী। তবু নীল বলতে স্পেকট্রামের (spectrum) একটি নির্দ্দিষ্ট অংশকে বোঝায় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সহায়তায় দরকার হলে যে কোন নীল রঙের যথার্থ প্রকৃতি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিমাপ করা সম্ভব। কোন রঙ-বিশেষজ্ঞ তাঁর রঙের বিরাট চার্ট থেকে যে কোন রঙের গভীরতা ও প্রকৃতি মিলিয়ে প্রায় সঠিক ভাবে রঙের পরিচয় ঘোষণা করতে পারেন, কিন্তু সুগন্ধের বেলায় তার সঠিক প্রকৃতি পরিমাপের কোন নির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থা নেই।

বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি, তার চরিত্রের নানা দিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করতে পারি কিন্তু তার গন্ধ বিষয়ে কিছু নির্দ্দিষ্ট করে বলতে গেলেই সব গোলমাল হয়ে যায়! গন্ধের উদ্ভবের কারণ এবং তার প্রক্রিয়া বিষয়ে কিছু বলতে গেলে আজকের এই পরমাণু-বিজ্ঞান ও কৃত্রিম উপগ্রহের যুগেও বিজ্ঞানীরা অসহায় হয়ে পড়েন। আজ পর্য্যন্ত সুগন্ধ পরিমাপের কোন সর্ব্বজনস্বীকৃত ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। গণিত-বিজ্ঞানের সহায়তায় রাসায়নিক দ্রব্য সমূহের ভিসকোসিটি, সারফেস টেনসন প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে অজস্র প্রতীক চিহ্ন সমন্বিত সম্বন্ধের জালে একেবারে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু এর মধ্য থেকে গন্ধচরিত্র একেবারে বাদ। দ্রব্যের অন্যান্য গুণাগুণ মোটামুটি একটা নিয়মকানুন মেনে চলে কিন্তু গন্ধ সব সময়েই এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে! একই ধরণের আণবিক কাঠামো সমন্বিত পদার্থের গন্ধ একেবারে আলাদা, আবার কোন সময় দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আণবিক কাঠামো সমন্বিত পদার্থের গন্ধ একেবারে এক। পদার্থের এই রহস্যময় চরিত্রের প্রকৃতি নির্দ্ধারণে বিজ্ঞানীরা আজ পর্য্যন্ত সক্ষম হন নি। সুরভির মধ্যে থেকে এমন কি এক রসায়ন দ্রব্য নির্গত হয় যা নাকের স্নায়ুতন্ত্রীতে আঘাত করে উদ্ভব ঘটায় গন্ধের। কি কারণে গন্ধ মৃদু বা উগ্র হয়, অথবা ভালো বা মন্দ হয়, তার কোন উত্তর নেই।

• • • •

তা বলে সুগন্ধের শ্রেণীবিন্যাস করার চেষ্টা কি হয় নি? অনেক বিজ্ঞানী এই জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। ভাষান্তর করার জন্য গণিত-বিজ্ঞানের সহায়তাও নেওয়া হয়েছে গন্ধকে মাপবার জন্য যন্ত্রও নির্ম্মিত হয়েছে, বিজ্ঞানীরা নানা ভাবে বিচারমূলক যুক্তির সাহায্যে এদের শ্রেণীবিন্যাস করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সব সময়েই সীমাবদ্ধ ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। দেখা গিয়েছে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীবিন্যাসের মূল্যমান একটা বিশেষ সীমার ওপরে যায় নি। যে ভাবেই সাজানো হোক না কেন, আসল অসুবিধা সব সময়েই থেকে যায়,—গন্ধের উপলব্ধিকে ভাষার মাধ্যমে সঠিক ভাবে প্রকাশ করা যায় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানীরা সুগন্ধি রসায়নকে তাদের রাসায়নিক শ্রেণী অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। সুগন্ধি রসায়নসমূহ কোনটা অ্যালডিহাইড, কোনটা কিটোন অথবা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর রসায়ন দ্রব্য। সুতরাং তাদের গন্ধকে এই ভাবে অ্যালডিহাইডের গন্ধ, কিটোনের গন্ধ বলে চিহ্নিত করলে মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয় না, সব কিটোন বা অ্যালডিহাইডের গন্ধ একরকম নয়। এক একটির গন্ধ তো একেবারে আলাদা। ভায়োলেট ফুলের সুগন্ধের কারণকে বহুকালই কিটোন জাতীয় রসায়ন দ্রব্য বলা হোত। ভায়োলেটগন্ধী আয়োনোনও একটি কিটোন। কিন্তু বহুদিন পরে যখন সত্যিই ভায়োলেট ফুলের সুগন্ধের কারণকে আলাদা করা হোল, তখন দেখা গেল, একটি অ্যালডিহাইড এবং একটি অ্যালকোহল এই সুগন্ধের জন্য দায়ী। অতএব ঠিক রাসায়নিক গুণাগুণ বিচার করে সুগন্ধ দ্রব্য বা সুগন্ধের শ্রেণীবিন্যাস করা যায় না। বিজ্ঞানীরা নানা ভাবে এই সমস্যার সমাধানের [illegible] কিন্তু

শিবদুর্গা

—রতন দাশগুপ্ত

গাছপালা

—অশোকানন্দ বসু

আগ্রাদুর্গ

—এস, এস, হায়দার

কুতুব

—সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য

—অমিত সরকার

খোকাখুকু

—কুমারী কুসুম

—কবিতা রায়চৌধুরী

—নির্মল মিত্র

লেক প্যালেস (উদয়পুর)
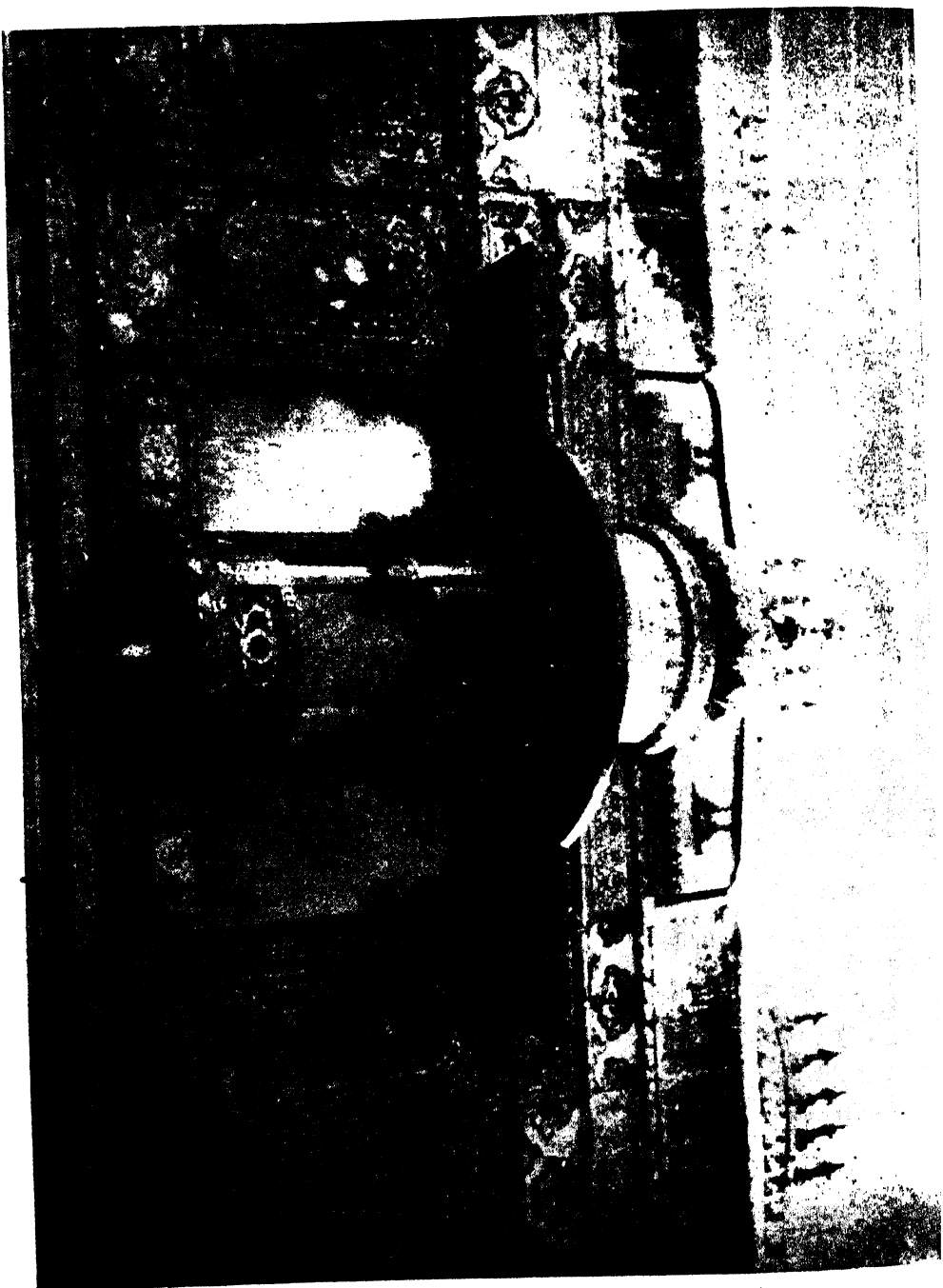
সব দিক বিবেচনা করে মনে হয়, মানুষের মনের উপর সুরভির মনোহর প্রভাবের সঠিক অভিব্যক্তি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা খুব সহজ হবে না। বর্তমানে বহু দেশের প্রখ্যাত জীবরসায়নবিদরা পদার্থ রসায়ন-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একযোগে নানা ভাবে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতীর সহায়তায় এই সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করেছেন।

* * * *

সুগন্ধি শিল্পের ক্ষেত্রে সুরভির উৎকৃষ্টতায় এখনও সংশ্লেষিত সুগন্ধি দ্রব্য, প্রকৃতিজ সুগন্ধি শিল্পের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। সংশ্লেষিত সুগন্ধি রসায়নের উৎপাদন-মূল্য কম, তাই সাধারণ মহলে এর প্রচার ও প্রসার খুবই বেশী। কিন্তু প্রকৃতিজ সুরভির মধ্যে সুরভির সুগন্ধের একটি ছন্দোবদ্ধ রেশের ছোঁয়া পাওয়া যায় তা সংশ্লেষিত সুগন্ধি রসায়নের মধ্যে অনুপস্থিত। তাই প্রায় সবসময়েই যে কোন সুরভি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তাঁদের মূল্যবান পণ্য প্রস্তুত করার সময় প্রকৃতিজ সুবাসের ছন্দোবদ্ধ সুঘ্রাণের রেশ সৃষ্টি করার জন্য সংশ্লেষিত সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য সমূহের সঙ্গে কিছু পরিমাণে প্রকৃতিজ সুরভি মিশিয়ে দেন। প্রকৃতিজ সুগন্ধি রসায়নের মহার্ঘতাই তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার অন্যতম কারণ। বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্লেষণ করবার জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতিজ সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য সমূহ পান না বলেই, ল্যাবরেটরীতে নিখুঁত ভাবে এই সব দ্রব্যের সর্ব্বপ্রকার গুণাগুণ উদ্ভব ঘটানোর চেষ্টা করা সম্ভব নয়।

প্রকৃতিজ সুগন্ধি রসায়নের মধ্যে তার সুগন্ধের কারণকে জানা যায়, হয়তো গবেষণায় সৃষ্টিও করা যায় কিন্তু তবুও এই উভয় সুরভির মধ্যে সুবাসের যে বিশেষ ব্যবধান থাকে, তার প্রধান কারণ আরও কয়েকটি অজানা রসায়ন দ্রব্য। প্রকৃতিজ সুগন্ধি দ্রব্যের, গন্ধ উৎপাদনকারী প্রধান রসায়ন দ্রব্য সমূহের পরিমাণ হয় তো অনেক বেশী কিন্তু অন্য আরও যে সব দুষ্প্রাপ্য রসায়ন দ্রব্য অতি সামান্য পরিমাণে থাকে তাই তার প্রকৃতিজ সুগন্ধির মধ্যে মিলিত এক বিশেষ ছন্দযুক্ত সুবাসের সৃষ্টি করে। অতি মহার্ঘ প্রকৃতিজ সুরভি দ্রব্যকে সম্পূর্ণ নিখুঁত ভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না বলেই তার মধ্যে যৎসামান্য অবস্থিত সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য সমূহের সম্পূর্ণ পরিচয় জানা যায় নি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষের চেষ্টা আরও শক্তিশালী হয়েছে। অতি সামান্য প্রকৃতিজ সুরভি গ্রহণ করে বিজ্ঞানীরা 'গ্যাস ফেজ ক্রোমাটোগ্রাফি' এবং আরও নানা প্রকার উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতী ও পদ্ধতির সহায়তায় এই সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করেছেন।

প্রকৃতিজ সুগন্ধি দ্রব্য সমূহকে বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠাবার আগে বিশেষজ্ঞরা কেবল মাত্র ঘ্রাণের সহায়তায় তাদের বিশ্লেষণ করে গুণাগুণ ঠিক এবং নির্দ্দিষ্ট মানের অনুরূপ আছে কি না বিচার করেন। এর জন্য তাঁদের প্রয়োজন হয় দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা, ও তুলনামূলক বিচার করার জন্য নির্দ্দিষ্ট নমুনা। মনে হয়, এই উপায়ে সুরভি উৎপাদনে কিছু পরিমাণ ত্রুটি থেকে যায়। কেবল মাত্র সুঘ্রাণের সহায়তায় বিশ্লেষণ করে ঐ বিশেষ সুরভির মান সঠিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট রেখে বারে বারে প্রস্তুত করা সহজ নয়। এতে প্রতিবারেই উৎপাদিত দ্রব্যের মান কিছু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হতে পারে। সুগন্ধি দ্রব্যের বিশ্লেষণ ঘ্রাণের সাহায্যে করার সঙ্গে সঙ্গে যদি রাসায়নিক বিশ্লষণও করে তার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরিমাণ সঠিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট করে রাখা যায়, তাহলে প্রতিবারেই এই উভয় পদ্ধতির সহায়তায় পূর্ব্বের যথার্থ অনুরূপ সুরভি প্রস্তুত করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতিজ সুগন্ধি দ্রব্যসমূহের সম্পূর্ণ রাসায়নিক বিশ্লষণ খুবই কঠিন কাজ। কারণ, প্রকৃতি থেকে নিষ্কাশিত এই সব পদার্থে সুগন্ধি দ্রব্য ছাড়াও আর নানাপ্রকার গন্ধহীন বস্তুও মিশে থাকে। গন্ধহীন হলেও বহুক্ষেত্রেই এদের আণবিক গঠন এবং রাসায়নিক প্রকৃতি সুগন্ধসৃষ্টিকারী রসায়ন দ্রব্যটির অনুরূপ, তাই একসঙ্গে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে সুগন্ধি রসায়নের অবস্থিতি পরিমাপ করা এবং কোন নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক মান স্থির করা সম্ভব নয়। যে দ্রব্য সুগন্ধের কারণ তাকে বাষ্পীয় উর্দ্ধপতনের সহায়তায় পৃথক করে নিয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা একটি নির্দ্দিষ্ট মান প্রস্তুত করার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য নিষ্কাশিত সম্পূর্ণ বস্তুটিকেও নানা ভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়।

* * * *

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র মহাশয় এই বৎসর লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেছেন। রয়েল সোসাইটির সদস্যপদ বিজ্ঞান-জগতের এক বিশিষ্ট সম্মান। তাই ভারতবর্ষের এই মহান বিজ্ঞানিদ্বয়কে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই আনন্দময় সংবাদ প্রচারিত হবার পরও একটু ক্ষোভমিশ্রিত জিজ্ঞাসা আমাদের মনে রয়ে গেছে। রয়েল সোসাইটির সদস্যপদ লাভের যোগ্যতাবলী কি? বিজ্ঞান-জগতের অগ্রগতিতে অসামান্য দানই যদি এই যোগ্যতার পরিমাপ হয় তাহলে কি এই বিজ্ঞানিদ্বয়ের সদস্যপদ লাভ করা বহুপূর্ব্বেই উচিত ছিল না? এই সদস্যপদ দেবার ক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁদেরই ভাষায় একটা কথা আছে,—"একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরীতে হওয়া ভালো।" এই প্রবাদবাক্য তাঁরা নিজেরা মান্য করার জন্য বহুদিনের ত্রুটির কিছুটা সংশোধন ঘটলো।

শ'

আগামী সংখ্যা থেকে বার্ণার্ড শ'র বিচিত্র জীবন-কথা (সাহিত্য, প্রেম ও রাজনীতি) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। লেখক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

যে মনোভাবটা নিয়ে রজতের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মঞ্জু, সেই মনোভাবটা নিয়েই উপরের লম্বা করিডোরটা পার হলো সে। কিন্তু লিফটে নামতে নামতে ওর মনে হলো, নিজেকে অমন হঠাৎ ও শক্ত করে তুলল কেন। কারণটা বুঝতে কষ্ট হলো না। দিদি এ অবস্থায় যা করতো অজ্ঞাত অনুসরণে ছোট বোন হিসাবে সেটাই সে করেছে—ভেতরে ভেতরে কাজ এগুচ্ছে তো দিদি মন্দ নয়! মনে মনে একটু হাসল মঞ্জু। লিফট থামিয়ে লিফটম্যান দরজা খুলে দিলে, দুদিকের সাজানো দোকানের মাঝখানের কার্পেট-বিছানো করিডোরটার উপর দিয়ে, বেশ দ্রুত পায়ে হাঁটা দিল সে। গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে ফুটপাতে। ফুটপাতের ছাদের তলা থেকে মুখটাকে একটু বাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে খুঁজে দেখতে লাগল ট্রাম-ষ্টপেজটা কোন দিকে।

—জী।

অপরিচিত কণ্ঠের 'জী' সম্বোধনে ফিরে তাকালো মঞ্জু। চিনল। এ রজতের ড্রাইভার। গলাটা পরিচিত নয়, কারণ এর কথা ও শোনেনি কিন্তু রজতকে যে ক'বার দেখেছে একেও দেখেছে সেই ক'বার। তাই মুখটা বেশ পরিচিত। ও তাকাতেই ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আপকো গাড়ীমে পৌঁছা দেনা পড়ে গা?

বিস্মিত হলো না মঞ্জু। প্রথম দিনের সেই অপ্রিয় ঘটনার সময় এই লোকটিই গাড়ীর দরজা খুলে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল তার সাহেবকে আড়াল করে। পরের দিনও তার সাহেবকে সে-ই নিয়ে এসেছিল ওদের বাড়ী। বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল ওদের ফিরপোর ডিনারের পর। আজও সে ওকে তার সাহেবের হোটেল থেকেই বেরিয়ে আসতে দেখেছে—পৌঁছে দিতে হবে কি না জিজ্ঞাসা করতে পারে সে। মঞ্জু বললো—কিন্তু খুবই অসুবিধার ভেতর। কারণ সে ওর ভাষা জানে না। কোন মতে হাত মাথা আর সেই হাঁ-এর সাহায্যে বোঝাল—পৌঁছে দেবার দরকার হবে না। ষ্টপেজটা কোন দিকে দেখিয়ে দিলেই হবে।

—ডান দিকে। পেছন থেকে জবাব দিয়ে পাশে দাঁড়ালো রজত।

ড্রাইভার তার রীতি মাফিক সেলাম ঠুকে চলে গেলো। রজত ডান দিকের রাস্তাটা মঞ্জুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো—চলো, তুলে দিয়ে আসি।

আপনি খাওয়া ফেলে উঠে এলেন?

অসন্তুষ্ট অতিথি ঘর ছেড়ে চলে এলে সে খাওয়া আর কার মুখে রোচে?

ট্রাম-ষ্টপেজটা ডান দিকে, তাই মঞ্জু ডান দিকে চোখ রেখে বললো—আমি তো আপনার অতিথি ছিলাম না! নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম, নেমন্তন্ন করে চলে যাচ্ছি।

নেমন্তন্নটাও তুলে নিয়ে যাচ্ছ নিশ্চয়?

সে কি! বড় বড় চোখ করে রজতের দিকে তাকালো মঞ্জু। নেমন্তন্ন ফিরিয়ে নেবো কেন? কি যে বলেন! নিশ্চয়ই যাবেন কিন্তু। নইলে ভীষণ দুঃখিত হবো। দু'দিন এসেছি মনে রাখবেন।

পর পর দুটো ট্রাম ঘড় ঘড় শব্দে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল দূরের ষ্টপেজটার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু বললো—আমি চলি। কিন্তু আপনি আর আসবেন না। খাওয়া ফেলে উঠে এসেছেন। আমার ভাবতেই খারাপ লাগছে। নমস্কার জানিয়ে সেদিন যাবার জন্য ফের অনুরোধ করে মঞ্জু হাঁটা দিয়ে দেখল, রজতও তার সঙ্গে হাঁটছে। বললো অযথা কষ্ট করছেন। ঐ তো ষ্ট্যাণ্ড। যাবো। ট্রামে আসবে উঠে পড়বো। কোন মানে হয় না এই রোদে হাঁটার। তাতে অনভ্যস্ত আপনি।

অযথা কষ্টের যত মানে হয়, তত মানে কি তোমার যথার্থ কষ্টের হয়? বাবার হাত থেকে আমার মান রক্ষা করলে—দুদিন কষ্ট করে এলে—একটা কৃতজ্ঞতা আছে না? আমাকে সর্ব রকমে অপদার্থ ভেবো না তুমি।

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেটের টিন বের করে একটা সিগারেট তুলে ঠোঁটে চেপে টিনটা ফের পকেটে ভরল সে। তারপর দেশলাই বের করে ধরালো সিগারেট। জ্বলন্ত কাঠিটা ঝেঁকে নিবিয়ে ফেলে দিতে দিতে বললো—বিয়ের দিন গিয়ে নিশ্চয়ই নেমন্তন্নও খেয়ে আসবো—মিসেসের সঙ্গে মিষ্টারকেও দেখে আসবো। কিন্তু তোমাদের দু টিকে নেমন্তন্ন করবার সুবিধে সেদিন হবে, মনে হয় না। এমন কোন সঙ্গত কারণও নেই যে, কবে আসবে যাবে তোমরা তা আমি জানব। তাই আজকেই তোমাদের নেমন্তন্ন জানিয়ে রাখছি। আজ তো খেলে না। মিষ্টারটিকে নিয়ে একদিন আমার এখানে লাঞ্চ, ডিনার যেটা সুবিধে তোমাদের—খেলে খুবই খুসী হবো। খবর যদি দাও তো গিয়ে নিয়ে আসতেও পারি।

ভদ্রলোকের ভুলটা মঞ্জুকে আমোদ দিচ্ছিল। সে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে জানালো—খবর টবরের দরকার হবে না। হঠাৎ এসে উপস্থিত হওয়া যাবে। অসুবিধা তো নেই। হুকুম করলেই যখন হয়।

ষ্ট্যাণ্ডে এসে রজত রাস্তার উল্টো দিককার অফিস-বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে সিগারেট টেনে চললো। আর বিয়ের দিন অভ্যর্থনারত ওকে দেখে রজতের দু'চোখ ভরা বিস্ময় কল্পনা করে মঞ্জুর ঠোঁটে খেলে গেল একটা চাপা কৌতুকের ঢেউ।

আবহাওয়াটার ভেতর কিন্তু তখন কোথাও এক কণা কৌতুক ছিল না—রহস্য ছিল না। মাথার উপর কড়া সূর্য্য। দুদিনের বৃষ্টিভেজা মাটি সূর্য্যতাপে শুকিয়ে নিচ্ছে তার পিঠের জল। সে জল অদৃশ্য বাষ্পাকারে উঠছে উপর দিকে। রোদের তাপে তাপে

মানুষগুলোর অবস্থা হয়েছে যেন সেদ্ধ হওয়া মতো। তার উপর রজতের অতিমাত্রায় ঠাণ্ডাঘর থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে ও। স্যাঁতস্যাঁতে ঘামে শরীর ভিজে উঠলো মঞ্জুর। ওর রুমাল থাকে না। কেবল হারিয়ে যায়। শাড়ীর আঁচল দিয়ে ভেজা কপাল মুছল মঞ্জু। কি গরম! বলে অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট টেনে চলা রজতের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ কেমন যেন মায়াবোধ করে সে। এরই ভেতর রোদে রজতের তামাটে মুখটা আরো তামাটে হয়ে উঠেছে। চুল উঠে যাওয়া চওড়া কপাল ভিজে উঠেছে ঘামে। বাতাসশূন্য আবহাওয়াটা যেন চেপে ধরেছে তাকে। ওরই জন্য ঠাণ্ডা ঘর ফেলে এই রোদে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। কিন্তু ট্রামের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। রোদের আলোয় চকচক করছে লাইন দুটো। খারাপ লাগতে লাগল মঞ্জুর।

ওর চঞ্চল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রজত বললো—ব্যস্ত হয়ে কিছু লাভ নেই। পর পর দুটো ট্রাম তোমাদের লাইনের গেছে। ট্রাম এলেও তোমারটা পেতে আরো আধ ঘণ্টা তো বটেই।

যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে ফের হাঁটা দিল মঞ্জু—দয়া করে আপনার চালকটিকে যদি আমায় একটু পৌঁছে দিতে আদেশ করেন—

হ্যাঁ, একেবারে বাজে আত্মম্ভরিতা। একটা অপেক্ষা-করা গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ে ট্রামের পথ চাওয়া।

ড্রাইভার ছিল না গাড়ীতে। হর্ণ বাজালো রজত। গাড়ীর দরজা খুলে দিল মঞ্জুকে উঠবার জন্য। উঠে বসে মঞ্জু বললো—রোদে আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে গাড়ীটাও দেখুন রেগে আগুন হয়ে আছে।

গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে রজত বললো—একেবারে বিয়ের দিন ঠিক করে বসে আছ। নইলে গাড়ী চালানো বিদ্যাটি দিব্য শিখতে পারতে।

—বলেন কি! সত্যি? আমি কিন্তু গিয়ে ঠিক বিয়ে ভেঙ্গে দেবো।

—দিও। বলে হাসিমুখে দরজা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ালো রজত—সেদিন গিয়ে দেখবো কি করলে।

ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়ীতে উঠে বসে ষ্টার্ট দিয়েছে। গাড়ী ছেড়ে দিলে হাতল ঘুরিয়ে কাচের জানালাটা তুলে দিতে দিতে মঞ্জু মনে মনে বললো—মানুষের দেখার কতটুকু দেখাই বা ঠিক দেখা! মানুষের বোঝার কতটুকু বোঝাই বা ঠিক বোঝা। এই দেখা আর বোঝার কোন মূল্য নেই। আর কার সঙ্গে কে কি ভাবে চলছে। সে চলা ভালো না মন্দ, তা দেখার দায়, তার জন্য ব্যবহারের ধমক দেওয়ার দায়ও ওর নয়। ও যতক্ষণ ভালো দেখবে ততক্ষণ নিশ্চয়ই ও ভালো ভাববে। ভদ্ররীতির ব্যবহার করবে।

মঞ্জুকে দেখে ডাক দিল অমিতা—একেবারে খাবার টেবিলে চলে এসো। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

খাবার ঘরে এসে ঢুকল মঞ্জু। অমিতা মৌরীর দিকে তাকিয়ে বললো—বাঃ, স্নান-টান করে জলেধোয়া পদ্ম দুটির মতো তোমরা দুজনে বসে আছ। আর আমি এই চেহারা নিয়ে তোমাদের মাঝখানে

এসে বসবো ? শুরু করো তোমরা। দু' মিনিটে স্নান সেরে আসছি।

ঠিক দু' মিনিটেই এলো মঞ্জু। শাড়ী-ব্লাউজের এখান ওখান ভিজে। মাথার জল টপ টপ করে ঝরে পড়ছে পিঠের উপর।

মৌরী গম্ভীর ভাবে বললো—স্নান করে এলেও তোকে কিন্তু একেবারেই জলে-ধোয়া পদ্মটির মতো লাগছে না।

—যে যেমন, তাকে সে রকম লাগবে। পদ্মের মতো নয়—আমার লাগবে বৃষ্টিভেজা অপরাজিতাটির মতো। রূপে অর্থে এক।

অমিতা বললো—যে ভাবে গা মাথা পা মুছেই এসেছ, তাতে বৃষ্টিতে ভেজাই মনে হচ্ছে তোমায়।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল—ঐযে অত বড় একটা গাড়ী থেকে নামলি—গাড়ীটা কার ?

কাসুন্দির ঝাঁঝে নাক-মুখ কুচকে বাঁ হাতের তালুতে মাথা ঘষতে ঘষতে মঞ্জু বললো—বন্ধুর।

—মেয়ে না ছেলে ? দুষ্টু দৃষ্টিতে তাকালো অমিতা।

—ছেলে।

—বাঃ মস্ত সুখবর ! এতো দিন বলোনি কেন ?

—কি বলিনি কেন ? দিদির বিয়ের পাঁচ দিন আগে বৃহস্পতিবার বেলা একটার সময় গাড়ী আছে, এমন একজন কেউ আমায় তার গাড়ী দিয়ে বাড়ী পৌঁছে দেবে ?

চোখ পিটপিট করলো অমিতা—আরো একটু কিছু।

বাসুদেব হাতা কেটে বাঁ হাতে ভাত নিতে নিতে বললো—তোর বন্ধুকে বলিস, মৌরীর বিয়ের দিন গাড়ীটা দিতে। বর আনতে ঐ গাড়ীটা নিয়ে গেলে প্রেসটিজই বেড়ে যাবে আমাদের—কি বলো বৌদি ?

মৌরী কোন কথা বলছিল না। মঞ্জু ওর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে মুখ নিচু করে হাসল। আরো গম্ভীর হলো মৌরী। ঘরে এসে চাপা ঠোঁটে জিজ্ঞাসা করলো—কার গাড়ীতে এলি ? সত্য কথা বলবি ?

—সত্যটা লুকোই নি বলেই তুই সত্যটা বুঝছিস। মিথ্যা বলতে চাইলে কি তুই ধরতে পারতিস ?

—আমি যা বুঝেছি তা তবে সত্য ? তুই ঐ লোকটির হোটেলে গিয়েছিলি ?

—গিয়েছিলাম। মাথা কাত করলো মঞ্জু। ভদ্রলোকটিকে বিয়ের একটা নেমন্তন্ন করা উচিত কি না তুই বল ?

—সে নেমন্তন্ন তুই ইচ্ছা করলেই ছোড়দাকে পাঠিয়ে করতে পারতিস। সে যাক্, বন্ধু বললি কেন ?

পাউডারের কৌটোটা নিয়ে পিঠে বুকে চুলে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে পাউডার ঢালতে লাগল মঞ্জু। আর মুখ নিচু করে করতে লাগল হাসি গোপন।

—কি বললি না, বন্ধু বললি কেন ?

—লোকটিকে আমার সত্যি ভীষণ বন্ধু-বন্ধু মনে হচ্ছে।

বলেই মুখ তুলে হেসে ফেলল সে। আচ্ছা, এছাড়া বলতাম কি ? একজন ভদ্রলোকের গাড়ী বললে, তক্ষুণি প্রশ্ন হতো, কে ভদ্রলোক। কি নাম। কোথায় থাকে। কি করে। তারপর তোর মুখের চেহারার মতোই হতো সবার চেহারা। ছোড়দা ভারিক্কী চালে বলতো—কাজটা ভালো হয়নি।

—কাজটা ভালো হয়নি, এ আমি তোকে বলছি। শুধু বলছি না, সাবধানও করছি। এতো বেপরোয়া ভাব ভালো নয়। কিছু ভয়-ডর থাকা ভালো।

ভিজে চুল বালিশে ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মৌরী।

হাতের পাউডারের কৌটোটা রেখে দিয়ে মঞ্জু বললো—মানুষ বাঘ নয় যে খেয়ে ফেলবে। আমি তোদের একথা কিছুতেই মানিনে দিদি ! একজনের সুন্দর দিকটা সত্য নয়—সত্য শুধু তার অসুন্দর দিকটা। এ তোদের গড়ে রাখা ধারণা। সত্য দুটোই। তার একটা ফেলে আর একটা ধরে বসে থাকবো কেন ?

দুটোই যখন সত্য, তখন একটার পর আরেকটা নিশ্চয়ই আসবে। সুন্দরের পর অসুন্দরের আবির্ভাব নিশ্চয়ই বাদ যাবে না ?

বলা যায় না। মানুষ জীবনের বেশীর ভাগটাই অভিনয়ের ভেতর দিয়ে কাটায়। সে যেমন বহু রকম পার্ট করে তেমনি গল্প বুঝে ভূমিকাও নেয়। যতই সে সর্ব অভিনয়-পারদর্শী হোক, এক গল্পে এক সঙ্গে সব অভিনয় সে কখনই করে না। কারণ তাতে জমে না।

মৌরী চুপ করে রইল। খোলা জানালাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বারান্দায় টবের ফুলে ফুলে সাদা হয়ে থাকা যুঁই গাছটা। আর এক টুকরো রোদ-ঝকঝকে আকাশ। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল মৌরী। রোদ ও সহ্য করতে পারে না, বেশী আলো ও পছন্দ করে না। বিষণ্ণ আলোর সুরটাই যেন ওর মনের সুরের সঙ্গে বেশী ঐকতান তোলে। ঘরের ভেতর জুঁই ফুলের যে ছায়াটা রোদের পরদায় এখন দুলছে রাতের বেলা চাঁদের আলোর পরদায় এর দোলা দেখে কত সময় যে ওর কেটে যায় তার ঠিক নেই।

ওর চোখঢাকা হাতের দিকে তাকিয়ে জানালা বন্ধ করে দিল মঞ্জু। বললো জানালা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু মাদাম, আমি আলো জ্বালছি।

একটু শান্ত হয়ে শোয়া কিংবা বসা একেবারেই অসম্ভব ?

—একেবারে। হেসে টেবিল-বাতিটা জেলে মৌরীর দিকে সেডটা ভালো করে টেনে বই নিয়ে বসল সে। আস্তে আস্তে বিশ্ব সংসার মুছে গেল ওর কাছ থেকে। কিসের নেমন্তন্ন ? কার বিয়ে ? কে মৌরী, কে বসন্ত ? সেই বা কে ? হাতের বই-এর নায়িকা জোয়ান অব আর্কের মধ্যে মিশে এক হয়ে গেল ও। গরু চরানো মাঠে বসে শুনতে লাগলো ঘণ্টাধ্বনি ঢং—ঢং—ঢং। সাহস করো। এগিয়ে যাও। ফ্রান্সের বড় দুর্দ্দিন। বই থেকে ঘূর্ণি হাওয়ার মতো উঠে এসে ওর কানেও সেই ঘণ্টাধ্বনি পৌঁছে দিতে লাগল দৈববাণী—ওগো বিধাতার বর কন্যা, সাহস কর। এগিয়ে যাও। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। দেশের বড় দুর্দ্দিন।

হঠাৎ সানাই-এর শব্দ এলো কানে। বন্ধ দরজায় ছোট ছোট হাতের দুমদাম কিল পড়তে লাগলো—পিসিপিসি এসো গো। বাজনা এসেছে। বায়না নিতে এসে বাজিয়ে শুনাচ্ছে ওরা।

বই বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে দরজা খুলল মঞ্জু। ছোটদের সঙ্গে নেমে গেল নীচে। ছোটরা ছুটোছুটি করতে লাগল আনন্দে। ছোটপিসীর গাড়ী এসে থামল দরজায়। তিনি নেমে চলে গেলেন

ওপরে। কিন্তু সানাইয়ের দেশমল্লারের সুর ছাপিয়ে মঞ্জুর কানে বাজতে লাগল সেই ঘণ্টাধ্বনি—ঢং। ঢং—ঢং—এগিয়ে চলো সাহস করো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

মৌরী পড়েছিল ঘুমিয়ে। হঠাৎ সানাই-এর শব্দে জেগে গেল সে। আর অন্ধকারপ্রায় ঘরে সেই দেশমল্লার ঘুমভাঙা মৌরীর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল—বরবেশী সুদর্শনকে। আসর-আলো লোকজন ফুলচন্দন ধূপ-গন্ধ। নিয়ে এলো সানাই পুরোহিতের মন্ত্রধ্বনি—

ওঁ পুণ্যাহম্।
ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।
ওঁ স্বস্তি।

হে দেবতা, তুমি পরস্পরকে পরস্পরের আরো নিকট কর, পরস্পর যেন অনুরাগের সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে—প্রিয় বলিয়াই যেন প্রীতি করিতে পারে।

কিছুদিন আগে একটা ব্রাহ্ম বিয়ে ও দেখেছিল। সেই বাংলায় পড়া মন্ত্র ওর ভালো লেগেছিল। মনকে নাড়া দিয়েছিল।

কিন্তু এই পদ্ধতির বিয়ে ওদের হবে না। হবে নারায়ণ সাক্ষী রেখে হোম-যজ্ঞ পূজা-অর্চনার ভেতর। একটা মস্ত ভিড় আর হাসি-কৌতুকের মধ্যে ওকে তাকাতে হবে সুদর্শনের দিকে। করতে হবে দৃষ্টিবিনিময়। সে দৃষ্টিবিনিময় শুভ বিনিময় না অশুভ বিনিময় হচ্ছে কেউ বলতে পারে না। তবু এর নাম শুভদৃষ্টি। নামটা যেন বিজ্ঞ আর অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাবধান বাণী। যেন বলে দেওয়া—জীবন-মঙ্গলের বনিয়াদ এই দৃষ্টিবিনিময়। দেখার মধুতেই জীবন মধুময় হয়। দেখার বিষেই হয় বিষ। প্রেম প্রীতি সখ্য—বাঁচ নয়তো মর। মৌরীর মনে হলো, সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে এটাই শুদ্ধ, সুন্দর এবং সত্য অনুষ্ঠান। এটাই হলো জীবনের প্রতি মুনিজনের বিজ্ঞতম অঙ্গুলি নির্দেশ। আর সব অনুষ্ঠান খেলা। একেবারে খেলা। কখনো ওর হাতের উপর হাত রাখবে সুদর্শন। কখনো দাঁড়াবে সে পেছন থেকে ওকে দু'হাতে বেষ্টন করে। দুজনে একসঙ্গে অঞ্জলি ভরে আগুনে বর্ষণ করবে লাজ। দেবে লাজাঞ্জলি। অর্থাৎ দেবে লজ্জা বিসর্জন। কান দুটো ঝাঁ করে গরম হয়ে উঠল মৌরীর। বালিশে মুখ চাপল সে।

কিন্তু তাতে এই হলো, কল্পনা গতি নিল। মনের ছবি আরো স্পষ্ট হলো। কারণ কল্পনা আর মনের ছবি অন্ধকারেই ফোটে ভালো। বৌদির পরিকল্পিত বাসরঘরের একরত্তি সজ্জাও এই অসজ্জিত ঘর চাপা দিতে পারল না। ওদের বসবার ঘরটা রূপান্তরিত হয়ে গেল বাসরঘরে। মেঝেতে পাতা আধ হাত উঁচু বিছানা। ফুলদানীতে ফুল ভর্তি কামিনীগুচ্ছ, কোণের টেবিলে সেড ঢাকা সবুজ আলো। ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে গেছে ঘর। তবু অমিতা ফুলের ওপর সব দায় রেখে যায়নি। 'ফোর সেভেন ওয়ান ওয়ানের' শিশি উপুড় করে ঢেলে গেছে বিছানায় আর মৌরীর গায়।

কিন্তু মৌরী জানে, সহজে সুদর্শন সেদিন সহজ হবে না। যত সহজে ওকে প্রথম পরিচয়ে কাছে টেনে নিয়েছিল, তত সহজে সুদর্শন ওর কাছে সেদিন আসবে না। কথায় ব্যবহারে ব্যবধান রাখবে। তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের উপর আরো কিছুটা গাম্ভীর্য

চাপিয়ে, ওর দিকে তাকিয়ে বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট ধরাবে।

কামিনীফুল পাখার বাতাসে দুলবে, বিছানায় সিল্কের ঢাকনাটা ঢেউ তুলবে—ওর মনে হবে যেন ওর বুক থেকে ওঠা ঢেউগুলোই সব কিছুর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

—দিদি!

—এই যে। বলে তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসল মৌরী। যে মেয়ে বাবা! ঠিক বলবে, জেগে ঘুমিয়ে শুয়ে আর কত স্বপ্ন দেখবি। নয়ত বলবে—ভাবনার গ্রাউণ্ড মিউজিকটা সানাই ভালোই জমিয়েছিল? কিন্তু অপরাহ্ণের আলো এসে পড়া মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল মৌরী—কি হয়েছে রে? তোর মুখ অমন কালো হয়ে উঠেছে কেন?

—হার হাইনেস এসেছেন।

মৌরী জানে, ছোট পিসীকে হার হাইনেস, হার ম্যাজেষ্টি সম্বোধন মঞ্জু তখনই করে, যখন কোন কারণে তার উপর বেশী রকম ক্ষুব্ধ হয়। জিজ্ঞাসা করল—কি খবর নিয়ে এসেছেন?

—মমতা বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল—তার খোঁজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার অবস্থা হয়েছিল।

—হাঁ, বেশ তো। সে সব খবর তো আমরা জানি।

—আমরা জানতে পারি ওদের কাছে নূতন এবং মারাত্মক। তার পর আমাদের কাছে নূতন এমন খবরও তাঁর সংগ্রহে আছে। মমতা নার্সের কাজ করে, সে পাসকরা নার্স।

—নার্স!

—হাঁ।

প্রথমটায় একটা ঝাঁকুনি খেলো মৌরীও। বললো—ছোট পিসীকে খবরটা দিল কে?

—তাঁর উঁচুদরের যে ডাক্তার দেওরটিকে তেমন তেমন অসুখে আমাদের বাড়ী ডাকা হয়—সেই ভদ্রলোক। মেডিকেল কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে নাকি মমতা ইতস্তত তাকাচ্ছিল! ভদ্রলোককে দেখে মমতা এগিয়ে আসে এবং তার অসহায় অবস্থার কথা বলে সাহায্য প্রার্থনা করে—নার্সিং পড়তে চায়। তাঁরই সহানুভূতিতে মমতা আজ একজন মেডিকেল কলেজের ষ্টাফ নার্স।

দাদারা কোথায়?

ছোড়দা' বসবার ঘরে। দাদা এখন বাড়ী ফেরেনি।

কথাটা গোপন করে নিশ্চয়ই ওরা অন্যায় করেছে। কিন্তু সেই জন্য এখন কিছু করবার নেই। আর হাঁ—করাই বা হবে কেন? নতুন কিছু নিতে একটু সময় লাগে। এতদিন পাশ করা মেয়েতে আপত্তি উঠত। শিক্ষয়িত্রী ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। অফিস কাজ জাতে উঠেছে তাই বা আর ক'দিন।

ওরা যখন বাবার ঘরে এলো ততক্ষণে যতীন বাবুর ট্যাক্সি রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে। তিনি নাকি বলে গেছেন, বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে এসে তবে অন্য কথা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু' বোন। ওদের দেখে পিসীমা হাত-পা নেড়ে যে কত কি বলে চললেন, তার কিছুই কানে নিল না ওরা। ছোটপিসী যদিও তার ভারিক্কী চাল যথাসম্ভব বজায় রেখেই বসেছিলেন কিন্তু আজ তারও কষ্ট হচ্ছিল। স্বামীর বিলিতি ডিগ্রী, ভারী মাইনা, ভারী গাম্ভীর অনুপাতে যদিও নিজের চলন বলনকে তিনি ওজনদার করে তুলেছেন কিন্তু সে ওজনটা ঠিক তার ভেতরের খাঁটী ওজন নয়। তাই সামান্য নাড়াতেই উপরে চাপানো ভারী ভাবটা তাঁর শরীর থেকে শাড়ীর আঁচল খসে পড়ার মতোই খসে পড়ে। ঠিক পিসীমার মতো বাস্তব হাত-পা তিনি নাড়লেন না বটে কিন্তু প্রায় তাঁরই মতো ভাষায় গলায় উত্তেজনায় ওদের সম্ভাষণ করে বললেন—লোকটা এতো শয়তান কে ভেবেছিল, এ্যাঁ! বিয়েটা যদি হয়ে যেত! শিউরে উঠলেন তিনি। আমাদের আর মুখ দেখানোর উপায় থাকত কোথাও? ওরা ভেবেছে ওদের মতো হাঘর হাভাতে আমরা। বাপ মা দুটোই বজ্জাত—হাঁ, বজ্জাতি ছাড়া আর কি বলে একে? স্নেহসিক্ত কণ্ঠে মৌরীকে দেখিয়ে বললেন, আমাদের মেয়ের আজ বাদে কাল বিয়ে। নতুন কুটুম। তাতে অমন ধনী মানী ঘর। মান-সম্মান থাকত কিছু? আমি তো জানি, পাছে ছেলে ডাক্তারী পড়তে পড়তে নার্স টার্স বিয়ে করে এনে হাজির হয় এ ভয় সুদর্শনের বাবার ছিল। তারপর একটা চতুর হাসি হেসে বললেন—কিন্তু ওরা বাবা সেয়ানা ছেলে।

মৌরীর কোন রকম প্রবৃত্তি ছিল না কথা বলে। দৃঢ়সংবদ্ধ চিবুক, ততটুকুই সে নাড়ল যতটুকু না হলে কথা বলা সম্ভব নয়। বললো—এমন অপাঙ্‌ক্তেয় হওয়ার কারণটা কি নার্সদের?

—অপাঙ্‌ক্তেয় হওয়ার কারণটা কি—মৌরীর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন ছোট পিসী। আমার দেওরের কাছে যা শুনি তা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা যায় না! ঘেন্নায় মরে যাই! নার্স হতে যে মেয়ে যায়—তা যতই ভদ্র ঘরের হোক, তার কি ইজ্জত কিছুও আর অবশিষ্ট থাকে?

—নেয় কে?

প্রশ্নটায় কেমন যেন হঠাৎ হকচকিয়ে গেলেন ছোট পিসী। নেয় কে মানে?

—তুমি তো বলছ না যে ইজ্জত আদবেই তাদের থাকে না। তুমি বলছ থাকে। কিন্তু শত থাকলেও ওখানে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তবে নিশ্চয়ই কেউ নেয়। আমি জানতে চাচ্ছি তারা কারা?

এতক্ষণ ছোট পিসী, মৌরী, মঞ্জু, অমিতা পিসীমা সবার উপর দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলছিলেন। এবার একলক্ষ্যে তাকালেন মৌরীর দিকে, দৃষ্টিটা ক্রুর। তোমার এ কথার জবাব আমায় দিতে হবে?

—হাঁ। আমার জানা দরকার।

মৌরীর স্পর্ধায় ধৈর্য রক্ষা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছিল ছোট পিসীর। এবাড়ীর মৌরীর কোন খাতির তাঁর কাছে নেই। কিন্তু আর পাঁচ দিন বাদে মৌরী যে বাড়ীর বৌ হয়ে যাচ্ছে সে বাড়ীর বৌকে খাতির না করার সাধ্য নেই ছোট পিসীর। ভেতরে ভেতরে সে খাতির করা তার শুরু হয়ে গিয়েছিল বলেই সহ্য করে গেলেন। শুধু সয়ে গেলেন তাই নয়—একেবারে ঘুরিয়ে নিলেন ব্যাপারটা। সব জঞ্জাল ঠেলে পরিষ্কার করে দিলেন যেন। এমনি ভাবে বললেন কোন দরকার নেই তোমার এ সবে। বাজে কথায় মন খারাপ করতে হবে না। দেখি, চিরুণীটা নিয়ে এসে বোস। চুল বেঁধে দি।

অমিতা টেবিলের বইপত্র গুছোতে গুছোতে বললো—হাঁ। থাক ও-সব কথা।

—না থাকবে না। বলছি যে আমার জানতে হবে। কেন, তোমার ডাক্তার দেওরকে জিজ্ঞাসা করনি যে, মেয়েদের ইজ্জত সেখানে নেয় কারা? কাদের জন্ম ভদ্রঘরের মেয়েদের সেখানে যাবার উপায় নেই?

ছোট পিসী কল্পনাও করতে পারেন না, তাঁকে কেউ এ ভাবে আক্রমণ করছে। আর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। ক্রুদ্ধ সাপের মতো কোমর সোজা করলেন—ছাত্র আর ডাক্তারদের সঙ্গে নার্সদের কি সম্পর্ক—তারা তাদের নিয়ে কি করে, আমি তার কতটুকু জানি। দু'দিন বাদে সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবে তুমি।

—ছোট পিসী! অমিতা চাপা কণ্ঠে যেন তিরস্কার করে উঠল। মৌরীর মুখের লাবণ্য কুঁকড়ে উঠল একেবারে বাসী আপেলের মতো। চিবুকের কাঁপুনীটা থামানোর জন্ম চিবুকটাকে শক্ত করলো সে। দু'চোখ ভরা আগুন নিয়ে কি বলতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল। শুধু বললো—সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই করবো।

—তাই করো। যদি সুদর্শন বলে আপত্তির কিছু নেই—বেশ তো সময় আছে। প্রস্তুত আছে সব। নার্সের সঙ্গে ভাইএর বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসো। আমার জাত যাবে না তাতে।

আগুন—তা বাইরের আগুনই হোক আর মনের আগুনই হোক, ইচ্ছা করলেই থাবড়িয়ে নিবিয়ে দেওয়া যায় না। জ্বলে উঠল মৌরী। বললো—বিয়ে দিলে আসলে জাত যাবে না তোমারও আমারও। না দিলে আমার সঙ্গে তোমারও যাবে, কারণ তুমিও মেয়ে। মেয়ে হয়ে কান পেতে শোন। জিব দিয়ে ছড়াও। ছুটে এসে বিয়ে বন্ধ করে পারিবারিক মান রক্ষা করো। কোন দিন কি তোমার ডাক্তার দেওরের কাছে জানতে পেরেছ, নিজের ঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে যে কথা ভাবতে শিউরে ওঠ সেই কাজ করো তোমরা অপরের ঘরের মেয়েদের সঙ্গে কোন প্রবৃত্তির তাড়নায়? জিজ্ঞাসা করেছ কোন দিন, তোমাদের হীন প্রবৃত্তির জন্য যদি ভদ্রঘরের মেয়েদেরও ভদ্রঘরের বৌ হবার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়—এই সত্য হয়, তবে তোমরাও নও ভদ্র মেয়ে বিয়ে করার উপযুক্ত।

বাসুদেব এসে হাত ধরলো মৌরীর।—কি হচ্ছে মৌরী! আয় বসবার ঘরে। বাসুদেব ওকে নিয়ে এলো বসবার ঘরে।

ছোট পিসীর নেবে যাওয়া ও তার গাড়ী ছাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। পিসীমার নানা ক্রুদ্ধ মন্তব্য আসতে লাগলো কানে।

বসবার ঘরে এসে মৌরী বসে পড়লো কৌচে। ওর লাল হয়ে ওঠা গাল দুটো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। দু' হাতে মুখ ঢাকল মৌরী।

কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে, বুঝতে কষ্ট হলো না মঞ্জুর। অমিতা আরও পাশাপাশি বসে রইল চুপ করে। খানিক বাদে মুখ থেকে হাত সরালো মৌরী। ঘামে মাখা একটা লাল টুকটুকে মুখ। বললো—তুমি কি বল ছোড়দা''?

[illegible] বাসুদেবের।

—ও বাড়ীর রেডিও সম্মান করার বিষয়ে।

মৌরীর জবাব শুনে হেসে উঠল মঞ্জু অমিতা।

বাসুদেব বললো—বাঃ কি কথা জিজ্ঞাসা করছিস, না বললে বুঝব কি করে?

—বিয়ে ভেঙ্গে দেবে তুমি? জিজ্ঞাসা করল মৌরী।

—বাবা তো তাই বলে গেলেন।

এক রকম ধমকে উঠল মৌরী—ন্যাকামো করো না ছোড়দা! বাবা কি করতে গেছেন তা আমি জানি। তুমি কি করতে চাও তাই বল। বিয়ে বাবা করবেন না। তুমি করবে। আমি তোমার কাছেই জবাব চাচ্ছি। বিয়ে হচ্ছে কি?

—সবার অমতে?

—হাঁ, সবার অমতে। সবার মতের জন্ম অন্যায় কাজ করবো—তা হয় না। তোমার ভয়টা কি। বিয়ে করে চলে যাবে কাজের জায়গায়।

—সবাইকে দুঃখ দিয়ে?

ক্ষেপে গেল মৌরী। তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে।—অসহ্য তোমার ন্যাকামো ছোড়দা! ওদের দুঃখ দিয়ে, ওদের অমতে। কে ওরা? একটা মেয়ের এই লাঞ্ছনার কাছে ওদের মনগড়া দুঃখের মূল্য কি? তোমার কথা ফাঁকি না রেখে স্পষ্ট করে বলো।

কৌচের পিঠে শরীর ছেড়ে দিল বাসুদেব।—আমি বুঝতে পারছিনে। নার্স কাউকে বিয়ে করছি এটার জন্ম মনের প্রস্তুতিও দরকার নিশ্চয়ই।

—এই মন তৈরীর জন্ম বা ভেবে দেখবার জন্ম তুমি বাবাকে বাধা দিলে না কেন? বললে না কেন, আমি ভেবে দেখেনি। আর সব ভাবনা সব সময় শুয়ে বসে করবার সময় পাওয়া যায় না—দরকারও হয় না। তোমার মনের কথা কি বোঝা যাচ্ছে না মনে করো! ভাবা তোমার মুহূর্তে হয়ে গেছে বলেই বাবাকে তুমি বাধা দেওনি।

—তার জন্য লজ্জার কিছুও নেই নিশ্চয়? বাসুদেবের যেন সাহস হলো একটু নিজের যুক্তি বলার। লাঞ্ছনার কথা বলছিস। আমরা কি করতে পারি? ওরাই তো ডেকে এনেছে। আমাদের

তন্তু যে এই অবাঞ্ছিত অবস্থায় ভেতর নিয়ে ফেলল, তার জবাব কে দেয়?

মৌরী বললো—আয়োজন করে মেয়ে দেখতে যাওয়ায় তোমার রুচিতে বড় বেধেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলে—আমরা কি। আজ তোমাকে আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে—তোমরা কি? কতটুকু শিক্ষা তোমাদের সত্য। সাধারণ মেয়েদের চাইতে কোন সংস্কারে, মনের কোন যুক্তিতে, হৃদয়ের কোন উদারতায় তোমরা বড়?

মৌরী চুপ করলে বাসুদেব ভাবলো, যাক্ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে মৌরী। কিন্তু মঞ্জু জানে, মৌরী তার শেষ বক্তব্য এখনো বলেনি। বসে রইল সে। বসে রইল অমিতা। সন্ধ্যার আঁধারে ঘর কালো হয়ে উঠলো। কেউ বাতি জ্বালল না। পিসীমা সন্ধ্যাবাতি দেখাতে এসে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। আলোর প্রথম ধাক্কায় সবাই চোখ বুজল। রামু সবার সামনে সযত্নে চা দিয়ে গেল। এমন কি বিস্কুটও। মঞ্জু অমিতা হাসলো। মৌরী ওর চায়ের কাপ ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়ালো। বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বিয়ে হয়ে গেলে পর যদি কথাটা প্রকাশ পেত তবে কি করতে? কিছুই তো করবার থাকত না—তাই না?

—হাঁ, তাই তো।

—তার চাইতে এই ভালো হয়েছে না?

—নিশ্চয়। এতক্ষণে ভীষণ উৎসাহ বোধ করল বাসুদেব। কাপে চুমুক দিয়ে বললো—বিয়ে ভেঙেই যায়, এতো হামেশাই হচ্ছে। বাজে বিয়ে হওয়ার চাইতে না হওয়া অনেক ভালো। বিয়েতে জীবন বিষ হয়ে ওঠে।

—সত্যি। বড্ড বাঁচা বেঁচে গেলাম আমরা—কি বলো?

—আমরা কি রকম?

—তুমি আমি।

—তুই!

—হাঁ, আমিও বৈ কী। আমার জীবনটা বুঝি জীবন নয়? আমারটা বুঝি বিষ হতো না?

—তোর বিষ হতে যাবে কেন?

—তোমার হতো কেন?

—দুটো এক নাকি?

—না এক নয়। একটা পাল্লায় ওজন অনেক বেশী। নার্সের কাজে সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয়, এই যদি সত্য—এই যদি সত্য যে এ কাজ—এই সেবার কাজ নারীর জাত যাওয়া—তবে যারা বাধ্য হয়ে অভাবে, পীড়নে জাত দেয় তাদের চাইতে অনেক—অনেক বেশী অপরাধী তারা যারা প্রবৃত্তির দোষে নেয়। তাই সম্ভ্রান্ত ঘরের বৌ হবার যোগ্যতা যদি মেয়েরা নার্স হলে সত্যি হারায়, তবে যাদের জন্য হারায় তারা আরো বেশী অযোগ্য ভদ্রঘরের। বিয়ে যদি ভাঙে তবে যে কারণে একটা ভাঙবে ঠিক সেই কারণে আরেকটাও ভাঙবে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মৌরী। বাসুদেব বোকা চোখে তাকাতে লাগলো একবার অমিতার দিকে, একবার মঞ্জুর দিকে।

কিন্তু মঞ্জু জানতো কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে। তাই ওর চোখের ওপর এখন এ বাড়ীটা ছিল না, ছিল মমতাদের বাড়ী। বাবা গিয়ে কি চেহারায় ঢুকেছেন? কি ভাষায় কথা বলছেন? ব্যবহারটা তাঁর কি অসৌজন্যের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে? ভদ্রতার মুখোশ কি এক-আধটুকুও রেখেছেন, না একেবারেই বিসর্জন দিয়েছেন? মমতা কি বাসায়? ওর মা কি কাঁদছেন? অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কি মমতার বাবা ওর বাবার দিকে? দাঁড়িয়ে আছে কি নীল? তার দু'চোখে কি দু'টো গোটা সমুদ্র দুলছে?

[ক্রমশঃ।

একটি মুখ

শ্রীকালীপদ কোঙার

একখানি মুখ মনে পড়ে।
শীতের সকালের মতো
মিঠে সে মুখ।
যে হাওয়ায় তার চুল ওড়ে,
সে হাওয়া হয়তো আসে
প্রশান্ত মহাসাগরের
কোন দ্বীপ থেকে,
যে দ্বীপে নাম-না-জানা
ব্যাকুল কোন প্রেমিক থাকে।

আমার মনেতে সে মুখ লুকানো
এক টুকরো স্নিগ্ধ আকাশের মতো।
স্ফটিক পাথরের মতো পরিষ্কার

কোন দিন কামনার কোন ছায়া পড়েনি।
আমার মনেতে সে-মুখ লুকানো
যখের ধনের মত প্রযত্ন।
মৃগনয়না কি মীনাক্ষি সে নয়,
বিশ্বকর্মার তৈরী শ্রেষ্ঠ শিল্প
নয় সে মুখ।
মৃগনয়না কি মীনাক্ষি সে নয়,
তবুও আমার মনে তারই অবস্থিতি।

শ্রাবণ-ঘন মেঘে সে মুখ ভারাক্রান্ত ছিল,
দু' ফোঁটা জল টলমল করলো
আর নত হল সে মুখ;
একরাশ কালো চুলে
শিশিরের যেন ম্লানিমা।

সাইত্রিশ

ঘুরেত্তে ভ্রমর এলো। ঘর থেকে ঘরে গুন্‌গুনিয়ে এলো। মধ্যবিত্তের অন্দর মহল থেকে, বড়লোকের ড্রয়িংরুমে। সাঙ্গুভেলীর অন্ধকার কোণ থেকে চৌরঙ্গীর চা-খানায়। প্রথমে গুন্‌গুন্, অস্ফুট ফিসফাস তারপর লাউড স্পীকারের মতো সরবে। সেই একই কথা। কথা নয় কিছু! অভিজাতের দুলাল আলোক মিত্রের সঙ্গে অভিনেত্রী মঞ্জরীবালার ভয়ঙ্কর অন্তরঙ্গ হওয়ার সাঙ্ঘাতিক খবর বিচলিত করে তুলল শহর কলকাতার আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে। চায়ের কাপে তুফান তুলেই থামলো না তার ঢেউ; ব্যাহত করল নিশীথরাত্রির নিবিড় সুখ-নিদ্রা। একজনের নয়। সমস্ত সমাজেরই যেন ঘুম ভাঙলো। কি ভয়ঙ্কর অসময়ে! অতর্কিতে। কি ভয়ঙ্কর,— নড়ে উঠলো সমাজের মাথা। পায়ের তলা থেকে সরে গেলো মাটি। অভিনেত্রীর সঙ্গে অভিজাতের সামাজিক অন্তরঙ্গতা? কি সর্বনাশ! সমাজের সব চেয়ে নীচু নয়, একেবারে নিষিদ্ধ মহলের সঙ্গে অন্দর মহলের আত্মীয়তা? সে আত্মীয়তা অবারিত অভাবিত! সাংঘাতিক কোনও ঘটনা, ভয়াবহ কোন দুর্ঘটনা যে কোন মুহূর্তে ঘটে যাবার দুঃস্বপ্নে আতঙ্কের শ্বাসরুদ্ধকর আবহাওয়ায় ভারী হয়ে উঠল অন্দর মহলের বাতাস। সেখানে যাদের আনাগোনা তাদের কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিলো; চোখের নীচে বিনিদ্রার কালিমা। দরজা বন্ধ করবার চেষ্টায় সক্রিয় হলো অভিজাত সমাজের দেহরক্ষীরা।

সত্যিই ভাবা যায় না! নাটক-নভেলে পড়া যায়। তারিফ করা যায় মঞ্চের ওপরে তার অভিনয় প্রত্যক্ষ করতে-করতে। শুধু জীবনে সহ্য করা যায় না তার উত্তাপ। পরের ঘরে আগুন লাগলে তবু দূর থেকে সাবধান হবার পাওয়া যায় সময়। কিন্তু নিজের ঘরে আগুন লাগলে চুপচাপ বসে থাকার সময় কোথায়? চঞ্চল হয়ে উঠলো আলোকের আত্মীয়-বান্ধব। ঘন ঘন আসতে-যেতে লাগলো আলোকের মা'র কাছে। চিঠিতে, মুখে, আবেদন করে, শাসিয়ে অস্থির করে তুললো শান্ত পরিবেশ। আলোকের মা'র নিরুত্তেজ ঠাণ্ডা স্থির ধীর ভাবে মেনে নেওয়ার চেহারায় আরও উন্মত্ত হয়ে উঠলো শুভানুধ্যায়ী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর দল। আলোকের মা'র মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ব্যাপারটা কি হতে যাচ্ছে তা পুরো অনুধাবন করার শক্তি নেই তাঁর। না হলে যাতে পাগলের মতো বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কথা; ছেলের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরার কথা। যে ডাইনী ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ছেলেকে তাকে অভিশাপ দেওয়ার কথা,—সেই তাতেও আলোকের মায়ের মুখ দেখে মনে হয় না ভেতরে কোথাও এতটুকু চিন্তার কাঁপন পর্যন্ত উঠছে। যেমন নিশ্চিন্ত, তেমনই নিরুদ্বেগ। যেন এইটেই সঙ্গত, যা হতে যাচ্ছে তা হতে দাও, সেইটেই শোভন, এই যেন তাঁর অনুচ্চারিত বক্তব্য। আলোকের আত্মীয়-স্বজনরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন হলো। তবে কি আলোকের মা'র এতে সায় আছে? অসম্ভব! অবিশ্বাস্য! মাথাই খারাপ হয়ে গেছে আলোকের মা'র। ছেলের কাণ্ডকারখানা সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে নিশ্চয়ই। তাতেই পাষাণ হয়ে গেছে মায়ের প্রাণ। নাহলে একমাত্র সন্তান আত্মহত্যা করতে উদ্যত দেখেও ঠিক থাকতে পারে কোনও মা? বসে থাকতে পারে হাত-পা গুটিয়ে?

মঞ্জরীবালার মতো মেয়ের বাড়ীতে যাওয়া বয়সকালে এমন

নীলকণ্ঠ

কিছু দোষের নয়, আলোকের শুভানুধ্যায়ীদের মত। এমন কি, এ সমাজের যাঁরা মাথা তাঁদের নিষিদ্ধ মহলে যাতায়াত এমন কিছু 'ঘটনা' নয়; দুর্ঘটনা তো নয়ই। তাঁরা কীর্তিমান পুরুষ। তাই অফুরন্ত প্রাণশক্তির তাড়নায় তাঁরা এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ান। উপচেপড়া যৌবনের ভার প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছবার পরেও যে তাঁদের মাঝে মাঝে এমনই বিপর্যস্ত করতে, ঘরছাড়া করতে, উদভ্রান্ত করতে এইটেই তো স্বাভাবিক, এইটেই তো সঙ্গত, এইটেই তো শোভন। কিন্তু তাঁরা তো সম্বিৎ হারান না কখনও? অসামাজিক আচরণে উদ্যত হন না কিছুতেই। বাঁধা রক্ষিতাও হয়তো রাখেন, কিন্তু রক্ষিতার সঙ্গে ঘর বাঁধেন না কদাচ। ঘরে পরবার আটপৌরে আর বাইরে বেরুবার আরেক প্রস্থ সাজের মতো জীবনেও এঁরা অন্দর মহল আর নিষিদ্ধ মহলের সঙ্গে ব্যবধান বজায় রেখে চলেন। দুস্তর সেই ব্যবধান। তাতেই তাঁদের 'ডুডু' ও 'টামুক' দুই-ই বজায় থাকে শেষ দিন পর্যন্ত। কোনটাই দোষের হয় না, সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার যাঁদের ওপর অনিবার্য ভাবেই ন্যস্ত, তাঁদের চোখে।

যাঁদের কথা বলছি তাঁরাই সমাজের মাথা। তাঁরা সবাই দেশের গৌরব। কেউ কবি; কেউ শিক্ষা ও সংস্কৃতির নেতা; কেউ দেশের জন্যে সর্বস্ব দিয়েছেন। তাঁরা কিনে রেখেছেন দেশের লোককে। কীর্তির বিনিময়ে, কর্মের মূল্যে। এই সব কাজের মধ্যে দিয়েই তাঁরা, পর্যাপ্তর চেয়েও অনেক বেশী এই ভুল অর্থে বহু ব্যবহৃত সেই বাংলা কথা, 'অপর্যাপ্ত' প্রাণশক্তির আধার। ফলে তাঁরা যখন নিষিদ্ধ মহলে যেতে আসতে শুরু করেন, তখন নিন্দা

করতে এঁদের বাক্য নিঃসরণ হয় না। সেই সমাজপতিরাই ভাবতে আরম্ভ করেন এই উদ্‌ভ্রান্তির কোনও জুতসই ব্যাখ্যা, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে। ভেবে ভেবে মাত করেন পথ। সেই সমাজপতিরাই তখন বলেন যে এঁদের বেলায় এটা দোষের নয়। কারণ এঁদের মনেরও যেমন দেহেরও তেমনই ক্ষিদে প্রচণ্ড। সে যেমন প্রচণ্ড মনের ক্ষিদে তাদের কাউকে করেছে কবি, কাউকে জ্ঞানতপস্বী, কাউকে দেশের মুক্তিপাগল অথবা বিদ্রোহী; তেমনই দেহের প্রচণ্ড ক্ষিদের তাড়নায় এরা কখনও যে একটা, দুটো, চারটে মেয়েছেলে রাখবে, এখানে ওখানে যাবে, মদ খাবে, লিভার পচাবে, কুৎসিত ব্যাধিতে ক্ষয় হবে,—এ-ও ঠিক একই রকম অবশ্যম্ভাবী ঘটতে বাধ্য।

তখন আরম্ভ হয় প্রতিভার নূতন সংজ্ঞা। প্রতিভার সব, সাতখুন মাফ। প্রতিভা বলে স্বীকৃত হলে আর কিছু স্বীকার করতেই বাধা নেই একবিন্দু। 'প্রতিভা'র স্ত্রী-ছেলেমেয়ে না খেয়ে না পরে রাস্তায় পড়ে মারা যেতে পারে। প্রতিভাবান পুরুষ পরের বউ-এর সঙ্গে প্রেম করতে পারে। নিজের বউকে আত্মহত্যায় উৎসাহিত করতে পারে, টাকা ধার নিয়ে না দিতে পারে, পাবলিক ফণ্ড তছরূপ করতে পারে অনায়াসেই (তাকেই তো Public Man বলে এদেশে।) যে কোনও পল্লীতে রাত কাটাতে পারে, যে কোনও অবস্থায় রাস্তা হাঁটতে পারে—কিছুতেই তার 'প্রতিভা' হতে বাধা হয় না। বরং প্রতিভা-মাত্রই তা-ই এমন ধারণা চালু হয় যায় একই কথার পুনরাবৃত্তিতে। তখন যেন অসাধারণ সৃষ্টি সত্ত্বেও এই সব গুণ (?) না থাকলে তাকে প্রতিভা বলতে কোথায় বাধে। প্রতিভাবান পুরুষদের কথা তাই আলাদা। তাঁরা একই আবার সমাজের অন্দর মহলে প্রাতঃস্মরণীয় এবং সমাজের নিষিদ্ধ মহলে রাতঃ (!) স্মরণীয় ব্যক্তি।

এই প্রতিভাবানদের পুত্ররাও সমাজের সায় পায় দুষ্কর্মের জন্যে। পায়, তার কারণ তারা সবাই 'অমুকের' ছেলে। কেউ স্যার অমুকের; কেউ কবি-র; কেউ নেতার। কেউ শিল্পপতির! এদের বাপেরা কেউ কেরাণীর, কেউ ইস্কুল-মাষ্টারের, কেউ অতি দরিদ্র ভটচায-পণ্ডিতের ছেলে। কিন্তু এরা নিজেরা সবাই আলালের ঘরের দুলাল। এরা বাপের প্রতিভা পায় না কিন্তু এরাও কীর্তি রেখে যায় নরলোকে। এবং রবি ঠাকুরের সাজাহানের মত শুধু কবিতায় নয়; জীবনেও এরা প্রায়ই এদের কীর্তির চেয়ে মহৎ। অর্থাৎ এরা বয়স হবার আগেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়। ইদিক-উদিক যায়; সব রকম নেশায় অভ্যস্ত হয়; কাজকর্ম করে না; কিন্তু জুয়া থেকে জুয়োচুরি কিছুই অকরণীয় মনে করে না। ঘরে সুন্দরী বউ থাকতেই এরা রাত কাটায় বীভৎস পল্লীতে কুৎসিত রমণীর সঙ্গে। এরা সমাজের তোয়াক্কা করে না বাপের টাকার জোরে। নিজেরাই নিজেদের কাজের বিশ্লেষণ করে; যুক্তি দেয় যে, ঘরে বউ থাকতে বাইরে যাওয়া বারণ হবে কেন? ঘরে যারা খায় তারাও কি মাঝে-মাঝে রেস্তোর্যাঁয় যায় না?

কাজেই এরা একটু-আধটু নিষিদ্ধ আনন্দে যোগ দেবে, সমাজের চোখে তা দুঃসহ নয় মোটেই। কিন্তু তার সীমা আছে। রক্ষিতার কাছে যাবে, যাও। কিন্তু ঘরের সর্বস্ব সংরক্ষিত মনে রেখে তবে

রাখা কাপড় পরে। প্রাতঃকৃত্যের পর সে কাপড় সেখানেই রেখে আসে। তেমনই ঘর আর বাইরে এক করে ফেললে, একাকার করে ফেললেই মহাভারত অশুদ্ধ! অর্থাৎ ঝিয়ের সঙ্গে রাত্রিবাস করো কিন্তু চাকরকে হেঁসেল ছুঁতে দিও না। এরই নাম সমাজ; এরই নাম সামাজিক অনুশাসন।

সেই সমাজের নাড়ি ধরে যারা বসে আছে চিরকাল তারাই আলোক মঞ্জরীর বাড়ী রাত কাটালে যারা এতটুকু বিচলিত হতো না, নিদারুণ বিড়ম্বিত বোধ করলো মঞ্জরী আলোকের বাড়ীতে ঘন ঘন আসছে যাচ্ছে শুনে, আলোকের মা মঞ্জরীকে মঞ্জু বলে আদর করছেন জেনে। মঞ্জরীকে ডেকে পাতে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন দেখে হঠাৎ তাদের মনে হোল সমাজ এবার রসাতলে যেতে বসেছে। ঘুম ভাঙলো, চুল খাড়া হয়ে উঠলো, রক্ত প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল দ্রুত, চিন্তায় কপাল কুটিল হলো, চোখের নীচে কাকের পায়ের ছাপ আঁকলো বিনিদ্রা, খাওয়ার ইচ্ছা কমে এলো, ঘরের কথায় এলো বিরক্তি, কাজে উৎসাহের অভাব, তর্কে বিতৃষ্ণা, পাঠে অমনোযোগ,—সর্বোপরি নেশায় নিরাসক্তি। একটি চিন্তা, একটি ভয়, একটি দুর্ভাবনা পীড়িত করে রাখলো তাদের সারাক্ষণ।

যাদের নিয়ে এত চিন্তার ঝড় উঠেছে ঘরে-বাইরে, তাদের যেন হুঁশই নেই। তারা নিজেদের নিয়ে এত মশগুল যে সেই মুহূর্তে প্রলয় হয়ে গেলেও তাদের কিছু এসে-যেতো না। কারণ তারা জানতোই না কি হয়ে গেছে। মঞ্জরী আর আলোক বিস্মৃত হলো সমাজ-সংসার। দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে সুখী অথবা গভীর দুখে দুখী, দুজন দুজনকে ছাড়া জানলোই না আর কিছু। হাসলো; কাঁদলো; ভালোবাসলো। প্রেম এলো বিপুল সমারোহে। প্রথম প্রেম। জীবনের রাজপথে যৌবনের জয়ধ্বজা উড্ডীন করে। অস্বীকার করে পথের বাধা, লোকের নিন্দাকে মুকুট করে মাথার, অবজ্ঞা করে সামাজিক অনুশাসন যৌবনের জোয়ার-ডাকা ভালোবাসার; অতল সমুদ্রে ভেসে যেতে যেতে জড়িয়ে ধরলো দুজন দুজনকে। সাক্ষী রইলো বিপুলা এই পৃথ্বী আর নিরবধি সেই কাল।

এরই মধ্যে একদিন আলোকের বুকে মাথা রেখে মঞ্জরী বলেছিলো: আমার জাত নেই, আর তুমি অভিজাত, তবু আমরা আজ এত কাছাকাছি, কিন্তু কিছুকাল আগেও এমন ব্যাপার অবিশ্বাস্য ছিলো।

কৌতূহলী আলোক প্রশ্ন করে, কি রকম?

মঞ্জরী জবাব দেয়—মুক্তি দেবী যিনি আমাকে পড়ান, তিনি এক দিন বলছিলেন যে বেশ কিছুকাল আগে এই কলকাতায় এমন লোক ছিলেন যাঁকে একদিন এক রাস্তার লোক জিজ্ঞেস করে বসে জুয়ার আড্ডাটা, এ পাড়ায় কোথায় জানেন,—ভদ্রলোক জানতেন না, বললেন: না। তারপরই সেই ভদ্রলোক যিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি তিনি ভেবে দেখলেন বিপথগামী সেই পথিক কারুর না কারুর কাছ থেকে জানবেই জুয়ার আড্ডার ঠিকানা এবং সেখানে গিয়ে যথাসর্বস্ব খোয়াবে, তাই স্বগতোক্তি শোনা গেল তাঁর মুখে: জানি না, কিন্তু বলব। এবং তারপর সত্যি সত্যি পথিককে নিয়ে চললেন তিনি, জুয়ার আড্ডার দিকে নয় অন্য ধারার পথেই পা বাড়ালেন।

আলোককে গুম হয়ে যেতে দেখে আবার প্রশ্ন করেছিলো মঞ্জরী : এটা গল্প না ?

না ; গল্প নয়। সত্যিই—আলোক উত্তর দিয়েছিলো।

সত্যি ? কি করে জানলে ? অবাক হয়েছিলো মঞ্জরী।

কি করে জানলাম ? আলোক হাসলো : যাঁর কথা তুমি বললে তিনিই আমার বাবা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মশগুল থাকতে দিলো না মঞ্জরীকে। সামাজিক অনুশাসন উপেক্ষা করলেও কর্মস্থলের আলোচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারলো না কিছুতেই। ওল্ড থিয়েটার্সের মৌচাকে ঢিল পড়ল যেন। ঝাঁকে ঝাঁকে টিটকিরি, কৌতূহল, কুৎসা আর হিংসের হিংস্র হুল ছুটে এলো চতুর্দিক থেকে। চোখে অন্ধকার দেখল মঞ্জরী। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়িয়ে গেছে, খেয়াল করে সাবধান হবার সময় পায়নি সে। প্রতিকারের অবসর। কিন্তু প্রথম পর্য্যায়েই ঘাবড়ালো মাত্র। তার পর সামলে নিতেও দেরী হলো না তার। উলটো প্যাঁচ কষলো সে। প্রচার-সচিবকে ষ্টুডিওতে আড়ালে নিয়ে গিয়ে আলোকের মায়ের মঞ্জরীকে আদর করার ইতিহাস বিবৃত করলো। কেমন করে তিনি খাইয়ে দেন মঞ্জরীকে নিজের হাতে। মনু বলে ডাকেন কেমন করে! মঞ্জরী জানে এই একটি লোকের কানে তুলে দিলেই তার কাজ শেষ। তার পর মুহূর্তমাত্র। রয়টারের চেয়েও দ্রুত পৌঁছে যাবে সেই সংবাদ। সেই দুঃসংবাদ। মঞ্জরী যা চেয়েছিলো, তা-ই হলো। মঞ্জরী-আলোকের অন্তরঙ্গতার খবর প্রচারের পক্ষিরাজে চড়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যক্ষ-রক্ষ-ভূত-প্রেতদের কাছে পৌঁছতে বিলম্ব সইলো না। মানুষের গন্ধ পেলো রাক্ষস। হাঁউমাউ করে উঠলো সবাই একসঙ্গে।

ওল্ড থিয়েটার দু' নম্বর ফ্লোরে রঙ্গিলার কড়া-পড়া পায়ের গোড়ালীতে ন্যাকড়ার পট্টি বাঁধছিলেন উবু হয়ে বসে প্রোডাকশন-চীফ চন্দ্রনাথ দাশ, সংক্ষেপে সি, এন, দাশ। রঙ্গিলা সি, এন,-কে জিজ্ঞেস করলো : শুনেছো ? কি ?—মাথা নীচু করেই জিজ্ঞেস করেন রঙ্গিলার কেয়ারটেকার। কি আবার ?—মঞ্জরীর কাণ্ড ? রঙ্গিলা সি, এন-এর মাথার চুল ধরে ওপর দিকে টেনে তুলে বলে : এ আর আমাদের পাওনি যে কিছু দিন খেলা করে তার পর আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে দেবে—দিলো তো মঞ্জরী সমাজের মুখে চুণ-কালি মাখিয়ে ? কি করতে পারলো সমাজ ?

যেমন মাথা নীচু করে রঙ্গিলার পায়ে ন্যাকড়া বাঁধছিলেন মিঃ সি, এন, তেমনি নীরবে করে যেতে লাগলেন নিজের কাজ। দেখে মনে হয় রাধার পায়ে কৃষ্ণ নূপুর পরিয়ে দিচ্ছেন না, সম্রাজ্ঞীর পায়ে ভৃত্য হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

অনেক রাত্তে খাট থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো মোটাই মৈত্রকে তন্দ্রাবতী। যাও যাও, দু' ফোঁটা মদ পেটে পড়তে না পড়তে মাতাল হয়,—সে আবার আসে আমার সঙ্গে টেক্কা দিতে! খাট থেকে গড়িয়ে পড়েন ওল্ড থিয়েটারের হিরণ্যকশিপু মোটাই মৈত্র। মেঝেয় পড়েও হুঁস ফেরে না অবশ্য। বরং নাক ডাকে। তন্দ্রাবতী খুশী হয় মঞ্জরীর ওপর। যাক্। তবু একজন মাটিতে ঘষে দিয়েছে সোসাইটির উঁচু নাক। মঞ্জরী তাদেরই একজন। ঈর্ষ্যা যে হয় না একটুও, তা নয়। তবু কোথায় যেন আত্মতৃপ্তির প্রলেপ ঈর্ষার জ্বালা ভুলিয়ে দেয় কিছুক্ষণের জন্যে। সিডেটিভ যেমন রোগ উপশম করে না, ব্যথার বোধশক্তিকে বোঁদা করে দিয়ে ঘুম পাড়ায় রোগীকে, ঠিক তেমনই মঞ্জরীর ব্যাপার তন্দ্রাবতীর ঈর্ষ্যার ক্ষত থেকে রেহাই না দিলেও যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিলো। অথবা সাময়িক বিরতি দিলো বলাই বোধ হয় সঙ্গত। ঘুমিয়ে পড়লো তন্দ্রাবতী এক সময়ে। অনেক দিন বাদে রাত্তে ঘুমালো সে।

মঞ্জরীর মতো যাদের জাত নেই, সে-সব অভিনেত্রীরা খুসী হলো বটে কিন্তু আর্তনাদ করে উঠলো ইতোমধ্যে টলিউডের পতিত জমিতে যে দু'-চারটি ভদ্র মেয়ে এসে জুটেছিলো তারাই। তারা সমাজের উচ্চমঞ্চ থেকে অধঃপতিত হয়ে এখানে এসে তলিয়ে গেছে অধঃপাতের অতলে। আর আরেকজন সেই অধঃপাতের অতল থেকে উঠতে চলেছে সমাজের উচ্চমঞ্চে। সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা এটা তাদের কাছে। তারা যেমন নীচে নেমে এসেছে তেমনই সবাইকেই নীচে নামতে দেখলেই যাদের তৃপ্তি ব্যতিক্রমে সে তাদের চোখ টাটাবে, বুক ফাটবে মঞ্জরীর কাছে তা তেমন কোনও বিস্ময়ের নয়। বিস্মিত হলো সে সেইদিন যেদিন ওল্ড থিয়েটারের সর্বময় কর্তার ঘরে তার ডাক পড়লো। মঞ্জরীকে ডেকে তিনি শুধু বললেন : যাই করো, মনে রেখো তুমি অভিনেত্রী। অভিনয় ত্যাগ কোরো না। এতদিন পয়সার জন্যে অভিনয় করেছো, এখন অভিনয়ের জন্যে পয়সা নেবে, কিন্তু এখন থেকে শুধু পয়সার জন্যে আর অভিনয় করবে না— !

মঞ্জরীর মনে হলো এ যেন আশীর্বাদ !

সবচেয়ে অপ্রস্তুত হয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন শ্যামচাঁদ পড়াই। মণিহারা ফণীর মতো শ্যামচাঁদের সমস্ত দম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। ওল্ড থিয়েটারে যতো মেয়ে আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছেচে এবং তাদের মধ্যে যার ওপরই তাঁর চোখ পড়েছে শীকারী বাজের মতো, তখনই তাকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে যেতে দেরী হয়নি মুহূর্ত মাত্র। এবং সেই ছোঁ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে বাধা পাননি কখনও! ওল্ড থিয়েটারে সবাই জানতো এ তথ্য। কেউ কখনও ডাঙায় বাস করে বাঘের সঙ্গে বিবাদ করতে ভরসা পেতো না। এবং শীকার নিজেও জানতো বাঘের থাবা থেকে তার মুক্তি নেই। বজ্রমুষ্টি শ্যামচাঁদের শিথিল হতে দেখে নি কেউ।

কিন্তু সেই শ্যামচাঁদের সূর্য অস্ত না যাওয়া সাম্রাজ্যে অন্ধকার কালো হয়ে এলো কেমন করে? তাঁর মুখের ওপর থেকেই শীকারকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় কে? শুধু শীকারকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েই সে ক্ষান্ত নয়, নিজের সমাজে স্বীকার করে নেওয়ার এ কেমন দুর্মতি? শ্যামচাঁদ ছটফট করেন। কি যে হয়ে গেলো শ্যামচাঁদ নিজেও যেন বুঝতে নারেন। হাড়ে হাড়ে বুঝলো কেবল একজন সে প্রোডাকশনের মেয়ে জুটিয়ে আনার দালাল, শ্যামচাঁদের বিশ্বস্ত চর গোকুল। চাকরী গেলো তার।

আরও একজন বিচলিত হয়েছিলেন বিশেষ রকম। তিনি শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। কারুর সাফল্যই তাঁর মনঃপুত নয়। তিনি নিজে অপরিচয়ের অখ্যাতি থেকে পরিচয়ের শিখরে পৌঁছেচেন কিন্তু আর কারুকে ছোট থেকে বড় হতে দেখলে তাঁর বুক জ্বালা করে ভীষণ।

তা ছাড়া তিনি জীবনে সেই ডুডু ও টামুক দুই বজায় রেখে চলার সেয়ানায় শিরোমণি। একস্ট্রা মেয়েদের বাড়ী তালিম দিতে যান, গাড়ী তাদের গলি থেকে দু মাইল দূরে রেখে পায়ে হেঁটে। তিনি মঞ্জরীকে ডেকে বললেন: এ সব কি শুনছি? কাজটা কিন্তু ভালো হচ্ছে নেই।

কেন? ভালো হচ্ছে নেই কেন, শুনি? মঞ্জরী রেগে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণর বলার ঢংকে ভেচি কাটে; আপনার যদি তালিম দিতে যাওয়া যখন তখন ভালো হয় তো আমার সঙ্গে কোনও ভাললোকের মেলামেশা ভালো হচ্ছে নেই কেন?

শ্রীকৃষ্ণ সামলে নেন। ঢোঁড়া সাপ নয়; জাত-কেউটে। কোথায় পা বাড়াতে গেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। একটি কথাও আর বলেন না তিনি।

শ্যামচাঁদ গড়াই হতাশ হন না সহজে। হাল ছাড়েন না সহজে। হার মানেন না অল্পে। খেলার শেষ না দেখা পর্যন্ত শান্ত হন না কিছুতেই। আলোকের মা'র বাড়ীতে মঞ্জরীর সামনে পড়ে গিয়ে অপদস্থ হবার পর দীর্ঘকাল ডুব দিয়েছিলেন। ভেসে উঠেছিলেন আবার হঠাৎ। মঞ্জরীর বাড়ীতে এক রাত্তে এসে উদয় হলেন, যেন মাটি ফুঁড়ে। এসেই প্রস্তাব করলেন, তিনি 'সমুদ্রের ওপরে গোপালপুরে' যাচ্ছেন, মঞ্জরী যাবে কি না সঙ্গে।

ভেবেছিলেন পীড়াপীড়ি করতে হবে; কাকুতি-মিনতি করতে হবে। কিছুই করতে হলো না। মঞ্জরী না বলতেই রাজি হলো প্রায়।

সবাই অবাক হলো। শ্যামচাঁদ সব চেয়ে বেশী। অবাক হলো না শুধু আলোক মিত্র। সে মঞ্জরীকে চেনে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। এই শ্যামচাঁদের সঙ্গে সমুদ্রের ওপর গোপালপুরে যাওয়ার পেছনে।

উদ্দেশ্য সত্যিই ছিলো মঞ্জরীর। সব চেয়ে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য জীবনের।

[ক্রমশঃ]

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা চাই

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ও উপাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

সম্প্রতি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ইতিহাস পরীক্ষার দিনে উত্তর কলিকাতায় যাহা ঘটিয়াছে, উহার সংবাদে আমি গভীর মর্ম্মাহত হইয়াছি। খুবই স্বস্তির বিষয় যে, একরূপ সকলেই এইরূপ আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে এইখানেই চুপ হইয়া গেলে চলিবে না। দুষ্কৃতকারীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে হইবে এবং পাণ্ডাদের বহিষ্কার করিতে হইবে। আমি হইলে এইরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতাম। বেশী বয়সের ছেলেরা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে যাইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহাকে গুণ্ডামী বলাই ঠিক। যাহাতে পরীক্ষা দিতে সক্ষম না হয়, সেই জন্য তাহারা পরীক্ষাদানে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের কলম ও পেন্সিল ছিনাইয়া লইয়াছে এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিই দুষ্কৃতকারীদের উদ্দেশ্য ছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যে সফলকাম হয় নাই। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি জনসাধারণকে আশ্বাস দিতে পারি যে, অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র এই গুণ্ডামীতে লিপ্ত হয়। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লক্ষের উপর; সেক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারীর সংখ্যা পাঁচ শতের বেশী হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, এই অল্পসংখ্যক ছেলেই অনেকের হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। কখনও কখনও শুভ শক্তি শয়তানী শক্তির নিকট পরাভূত হয়।

যাহারা হয়ত সারা বছর কিছুই পড়ে নাই কিংবা যাহাদের মাথা এমনি নিরেট যে, এই ধরণের ছাত্রকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা

নেতৃত্ব দিয়াছে। রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করার মধ্যে যাহারা স্বার্থ খোঁজে, সেই সব ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে ছাত্রদের সাহায্য করে। বস্তুতঃ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা থাকিলেই তাহাদের লাভ হয়। এই লোকগুলির প্ররোচনাতেই উক্ত জনকয়েক ছাত্র বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয় এবং এই ধরণের কাণ্ড ঘটায়।

এশিয়ার অষ্টম বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য থাকাকালীন চার বৎসরে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি, ইহাতে আমি দেখিয়াছি যে, যখনই এবং যেখানেই ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ ঘটে, এমন লোক আছে, যাহারা সব সময় কর্ত্তৃপক্ষকেই দোষী করে এবং ছাত্রদের পক্ষ লয়। তাহারা চায় যে, ছাত্ররা জনসাধারণের সহানুভূতি আদায় করুক, যাহাতে তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অমান্য করিতে তৎপর হইতে পারে।

আমি দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিতে পারি যে, শিক্ষকমণ্ডলী, সিণ্ডিকেট ও সেনেটের সদস্যগণ সাধারণতঃ ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাহাদের ব্যাপারে সহায়ক। সুবিচার হউক—ইহা তাঁহারা সব সময়ই চাহেন।

কিন্তু এই সহানুভূতি ও সহায়তা উক্ত শ্রেণীর ছাত্ররা চায় না। তাহারা হিংসাত্মক পন্থা অনুসরণ করিতে চায়, উত্তেজনা সৃষ্টির তাহারা পক্ষপাতী। অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের তাহারা দলে পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ভাবে তাহারা বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চায়। অর্থাৎ যে কার্য্য তাহাদের করা উচিত নয়, তাহাই তাহারা করে। দৃষ্টান্ত [illegible] বলা যায়। এমন কি দুইটা ছিল,

যাহাতে উত্তর-কলিকাতার বিভিন্ন কেন্দ্রে ছাত্ররা সম্পত্তি বিনষ্ট করিতে, নারীদের লাঞ্ছিত করিতে এবং কিছুক্ষণের জন্য ভীতি ও শঙ্কা সৃষ্টি করিয়া রাখিতে তৎপর হইল? ইহা এমন কতকগুলি ছাত্রের কাজ—যাহারা সারা বৎসর পড়াশুনা করে নাই কিংবা পাঠ্যপুস্তকে হাত দেয় নাই। পরন্তু যাহারা মুখস্থ বিদ্যা দ্বারা সম্ভাব্য ও নির্ব্বাচিত প্রশ্ন ও উত্তর পড়িয়া কোনরকমে পরীক্ষার পাশ করিতে ব্যস্ত, তাহাদের বক্তব্য ইতিহাসের প্রশ্নপত্র কঠিন হইয়াছে। ইতিহাসের পত্রটি আমি নিজে পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। সতের বৎসর আমি শিক্ষকতা করি এবং চার বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলাম। ইতিহাসের প্রশ্নপত্রটি কঠিন হয় নাই। আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কয়েকজনই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে। তাহারা কেহই কৃতী ছাত্র নয়, মাঝারী ধরণের। আমি উক্ত প্রশ্নপত্র সম্পর্কে তাহাদের মত জানিতে চাহি। তাহারা এই মাত্র বলে যে, প্রশ্নগুলি ইমপর্টেন্ট নয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে তাহাদিগের বক্তব্য হইতেছে—এইরূপ প্রশ্ন আসিবে তাহারা আশা করে নাই। আরও বলিতে গেলে বলিতে হয়—প্রশ্নসমূহ এমন ভাবে করা হইয়াছে যে, উহাদের উত্তর দিতে হইলে পাঠ্যপুস্তক পড়া থাকা দরকার। আমি বলিব যে, প্রশ্নগুলি ঠিকই হইয়াছে। পাঠ্য-তালিকায় মধ্য হইতে প্রশ্ন হইলে এবং পাঠ্যপুস্তক হইতে উত্তর করা চলিতে পারে, এমন যদি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তা স্কুল ফাইন্যাল ছাত্রের উপযোগী যে কোন প্রশ্নই করিতে পারেন। বাজারে চালু বাজে বই বা নোট মুখস্থ দ্বারা এবং কতকগুলি প্রশ্ন ও উত্তর পড়িয়া পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলিতে পারে কি-না, সেইটি মোটেই দেখিবার বিষয় নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য থাকাকালীন আমি প্রায়ই একটি কথা জনসাধারণকে বলিতাম, 'ছাত্রদিগকে তাহাদের নিজেদের হাতে ছাড়িয়া দিন, তাহারা যেন আপনাদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া না দাঁড়ায়। কারণ, আমরা যদি ছাত্রদিগকে বিভ্রান্ত করি, সে ক্ষেত্রে জাতিকেই বিপথগামী করা হইবে।' ১৯৫১, ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালের আমার সমাবর্ত্তন ভাষণে এবং বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করিবার কালে আমি এই উক্তিটি করি ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্ত্তিতাই হইতেছে মূল কথা।

আমাদের তরুণ-তরুণীদিগকে কতকগুলি ভাল জিনিস শিখিয়া লইতে হইবে—জীবনে কয়েকটি নিয়ম বা নীতি তাহাদের না মানিলে নয়। ছাত্রাবস্থায় এই সকল জিনিস খুব সহজে শিক্ষা দেওয়া চলিতে পারে এবং একবার নিয়মানুগ হইলে বাকী জীবনে এই অভ্যাস থাকিবে। একটি সুনিয়ন্ত্রিত জীবন সংগঠনের চেষ্টা করিতে গেলে প্রথমাবস্থায় বিরক্তিকর মনে হইবে। কিছু পরিমাণ উত্তেজনারও সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা আমাদের একটি অভ্যাস গড়িয়া উঠিবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই অভ্যাসও দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে এবং একটি চরিত্র গঠিত হইয়া যাইবে। তখন একটি নূতন পথ অনুসরণ করিতে যাওয়া কঠিন না ঠেকিয়া পারে না। সংযমের অভ্যাস ঠিক হইয়া গেলে, অসংযম বা অমিতাচার আমাদের নিকট ঘৃণার্হ হইবে। আমাদের ঋষিদিগের ইহাই শিক্ষা—আমাদের শাস্ত্র ও পুরাণসমূহের ইহাই মূলবাণী। অভিভাবকদের নিকট আমি এই আবেদন জানাইব যে, তাঁহাদের ছেলেরা যেন এই নিয়মগুলি মানিয়া চলে, এইটি তাঁহারা দেখুন। শিক্ষকদিগের নিকট আমার আবেদন থাকিবে—ছাত্রসমাজের সম্মুখে তাঁহারা উচ্চাদর্শ তুলিয়া ধরুন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আমি বলিব, তাঁহারা উক্ত নিয়মসমূহ চালু করুন। ঈশ্বরের দোহাই, ছাত্রদিগকে যেন রাজনীতিতে টানিয়া না লওয়া হয়, হরতাল ও ধর্ম্মঘটে যোগদানের জন্য তাহাদিগকে যেন ডাকা না হয়।

আমার মনে পড়ে, বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন রিপণ কলেজের (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক ছিলাম, আমি তখনকার জননেতাদের সতর্ক করিয়া দিই। সেই সময় আমি ছিলাম একজন যুবক। আমি তাঁহাদিগকে বলি, "আপনারা যাহাই করুন, নিজেরাই করুন। কিন্তু ছাত্রদিগকে আপনাদের সহিত যোগদানের জন্য ডাকিবেন না।" তখন আমি ইহাও বলি যে, এইরূপ করিলে ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিবে। কিন্তু জনগণ সে সময় আমার এই উক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তখন আমি যাহা বলিয়াছি, আজ তাহা সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ছাত্রদের মানসিক ধৈর্য্য যাহাতে ফিরিয়া আসে, তজ্জন্য আমাদিগকে আরও একবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে আমাদের ভালবাসিতে হইবে, এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। ন্যায় পথ যাহাতে তাহারা অনুসরণ করে, সেভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, ইহাও সন্দেহাতীত। কিন্তু ছাত্রদের জীবনে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে আবশ্যক হইলে আমাদিগকে কঠোরতম দণ্ড দিতে হইবে। দেশ শাসনের দায়িত্ব একদিন আজিকার দিনের তরুণ-তরুণীদের স্কন্ধেই পড়িবে। কারণ, এখন যাঁহারা বয়স্ক, তাঁহারা সেদিন থাকিবেন না, তরুণ-তরুণীদের যদি শৃঙ্খলা শিক্ষা না দেওয়া হয় এবং তাহারা যদি চরিত্রবান না হইয়া উঠে তাহা হইলে বর্ত্তমান শাসকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি ও অন্যান্য পাপাচারের অভিযোগ করা হয়, সেইগুলি তাহাদের পক্ষে কি ভাবে নির্ম্মূল করা সম্ভব হইবে?

পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্রে অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন দেখিলেই প্রায়ই ভড়কাইয়া যায়। উদ্বেগের কোন কারণ নাই, বিব্রতবোধ করারও কারণ নাই। কেন না, ছাত্রদের প্রতি সর্ব্বদাই সুবিচার করা হইয়া থাকে। ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিব। প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপই করা হইয়া থাকে। পরীক্ষা হইয়া গেলে পরই প্রধান পরীক্ষক ও অন্যান্য পরীক্ষকগণ একটি বৈঠকে মিলিত হন এবং ইত্যবসরে কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে অভিযোগগুলি শুনিতে পাইলেন। এই অভিযোগগুলি পরীক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টিতে আনা হয়। শিক্ষক হিসাবে তাঁহারা নিজেরাও বিভিন্ন অসুবিধাসমূহ লক্ষ্য করেন। তারপর সমগ্র বিষয়টি আলোচিত হয়। এক একটি করিয়া প্রশ্ন তোলা হয় এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করা হয়। তারপর কি ভাবে পরীক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করা যাইবে, সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাহাদের নিকট হইতে কি উত্তর প্রত্যাশা করা যাইবে? পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র কি ভাবে পরীক্ষা করা হইবে? কি ভাবে নম্বর বণ্টন করা হইবে? ইত্যাদি। সুতরাং প্রশ্ন কঠিন কিংবা সঙ্গত যদি না-ও হইল, সেক্ষেত্রেও কখনই অবিচার করা হয় না! বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য্য হিসাবে আমি ইহা জানি।

অনেক সময় আমি পরীক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচারের দাবীতে প্রধান পরীক্ষক এবং অন্যান্য পরীক্ষকদের উত্তরপত্র ঠিকমত যাহাতে পরীক্ষা করা হয়, তজ্জন্য অনুরোধ জানাইয়াছি। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপও বলিয়াছি যে, একজন ছাত্রের কোন বিশেষ পত্রে পাশ করা না করা সম্পর্কে যদি সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের উত্তরপত্রটি সমগ্রভাবে পড়িতে হইবে এবং পরীক্ষার্থী পাশ করিতে পারে কি পারে না, বিবেচনা করিয়া সেই মতে কার্য্যব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে! উক্ত বৈঠকের পর প্রধান পরীক্ষক অন্যান্য পরীক্ষকদিগকে নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন এবং এই সকল নির্দ্দেশ অনুসারে কতকগুলি নমুনা উত্তরপত্র বিভিন্ন পরীক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয়। সেই পত্রগুলি প্রধান পরীক্ষকের সম্মুখে দ্বিতীয় বৈঠকে উপস্থিত করা হয় এবং সমগ্র বিষয়ে পুনরায় আলোচনা চলে। ছাত্রদের উত্তরগুলি পড়া হয় এবং আবার এই প্রশ্নটি তোলা হয়—প্রধান পরীক্ষকদের নির্দ্দেশসমূহ যথোচিত ভাবে অনুসৃত হইয়াছে কি-না কিংবা সেইগুলির রদবদল ও নূতন নির্দ্দেশ প্রয়োজন। তারপর উত্তরপত্রসমূহ পরীক্ষিত হয় এবং নম্বর বণ্টন করা হয়। প্রধান পরীক্ষক নিজে ইচ্ছানুযায়ী শতকরা দশ ভাগ পত্র পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে, প্রদত্ত নির্দ্দেশসমূহ অনুসৃত হইয়াছে কি-না এবং সুবিচার সেখানে হইয়াছে কি-না? এই ভাবে কাজটি হইয়া চলে। পরিশেষে পরীক্ষক বোর্ডের বৈঠক বসে এবং এই বৈঠকে সমগ্র প্রশ্নটি আলোচিত হয়। পরীক্ষক ছাড়াও অনেককে মতামত দেওয়ার জন্য ইহাতে আহ্বান করা হয়! বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা ও বিবেচনা চলে এবং সব কিছুরই উদ্দেশ্য—ছাত্ররা যেন অসঙ্গত কারণে অকৃতকার্য্য হইয়া না যায়।

উপাচার্য্য হিসাবে আমি একটিমাত্র নির্দ্দেশ দিই যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত নিয়মকানুন অনুমোদিত না হইলে কোন ছাত্রকেই যেন অতিরিক্ত এক নম্বরও না দেওয়া হয়। এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উক্ত নিয়মকানুনসমূহ স্বর্গত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন লাভ করে। মহামানব স্যার গুরুদাসের মানবপ্রীতি ও তাঁহার বিচার-জ্ঞান সুবিদিত। আলোচ্য নিয়ম-কানুনগুলির মধ্যে পরীক্ষার্থীদের কোথায় কি সুবিধা দিতে হইবে, তাঁহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; এইগুলি অবশ্য অনুসরণ করিতে হইবে। আমি ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই দাবী জানাই এবং এই নির্দ্দেশ দিই যে, নিয়মানুমোদিত না হইলে ছাত্রদিগকে এক নম্বরও অতিরিক্ত দেওয়া চলিবে না। 'গ্রেস মার্ক' বলিয়া কিছু নম্বর দেওয়া হইলে আমি উহাকে একটি মারাত্মক ব্যবস্থা বলিয়া ধরিব। কারণ, ইহাতে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ—যাহার বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন করিয়া আসিতেছে, উহার পথই প্রশস্ত হইবে। বাঙ্গালার মাটি হইতে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ যদি করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে ব্যবস্থা করিতে হইবে পরীক্ষার ক্ষেত্রে, শাসনক্ষেত্রে নয়। ঘোড়াকেই গাড়ীর আগে স্থাপন করিতে হইবে, বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে চলিবে না।

ছাত্রদের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণের আমি তীব্র নিন্দা করি। ইহা হইতেছে আইনকে নিজের হাতে তুলিয়া লওয়া। কর্ত্তৃপক্ষকে আমি অনুরোধ জানাইব, তাঁহারা যেন অপরাধীদিগকে কঠোর শাস্তি দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন অনুসারে ছাত্রদের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে হইবে, অনুগ্রহ পাইয়া নয় কিংবা কর্ত্তৃপক্ষকে চাপ দিয়া বাধ্য করিয়াও নয়। যে সকল ছাত্র নিয়মানুযায়ী পাশের নম্বর না পাইবে, তাহাদের 'গ্রেস মার্ক' দিয়া পাশ করানো ঠিক নয়, ইহাতে কোন কাজ হয় না। কারণ 'গ্রেস মার্ক' দেওয়ার পদ্ধতিটি যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সময়ে কত ছাত্র যে গ্রাজুয়েট ইত্যাদি হইবে, সেই সংখ্যা সীমিত করা যাইবে না। তখন এত অধিক সংখ্যক গ্রাজুয়েট বেকার বলিয়া আবার চীৎকার উঠিবে। এই ব্যবস্থা শিক্ষার নিজস্ব দিক হইতেও ভাল নয়, রাষ্ট্রের দিক হইতেও ভাল নয়।

সংকেত

মাধবী ভট্টাচার্য

রাতের এক আকাশচারী ঘোমটা-ঢাকা মেয়ে
হাত-ইশারায় ডাকলে আর বললে মুখে চেয়ে :
"যাত্রাটা তোর থামলো কী ?"
বলেই মেয়ে হাসলো কী ?
মেঘের শেষে নীলের পারে অলকপুরীর গায়ে,
আকুল দেহে বিকেল বেলা অশথ-বটের ছায়ে—

অল্প ঘোলা জলে ভরা পদ্ম-দীঘির তীরে
ঘোমটা ঢাকা মেয়ের মায়া আমায় ঘিরে ঘিরে
নামলো ধীরে ধীরে।
চলতে পথে মেয়ের মুখে থমকে দেখি হায়—
আমার পুরো নামটা যেন কে লিখেছে তায়!
কৌতূহলী জিজ্ঞাসা মোর ঠোঁটের কোণে এসে
থমকে গেল মেয়ের চোখের কিনারখানি ঘেঁষে।

হাসলে মেয়ে মিষ্টি মধুর বুক-কাঁপানো হাসি
হাজার হিয়া মাতিয়ে তোলা ব্যাকুল-করা বাঁশি।
"যাত্রাটা তোর থামলো কী ?"
মেয়ের চোখে কান্না সে কি ?
আমার কথা ভাবছি না সই
চলার কথাই ভাবছি—
ওপর দিকে উঠছি কভু, উৎরাইতে নামছি।

সাহিত্য-পুরস্কার

সাহিত্যের উন্নতি সাধনে ও সাহিত্যিকদের উৎসাহবর্দ্ধনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাবিধ সাহিত্য-পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠ দানের জন্য এই পুরস্কারগুলি বিতরিত হয়ে থাকে। এই সম্মান-পুরস্কার কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র থেকে, প্রতিষ্ঠান থেকে বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত দান থেকে প্রদত্ত হয়ে থাকে। সুইডেনের বিখ্যাত নোবেল প্রাইজ, ফ্রান্সের গঁকুর প্রাইজ, রাশিয়ার লেনিন প্রাইজ, আমেরিকার পুলিটজার প্রাইজ এবং শিশু-সাহিত্যের জন্য নিউবেরী প্রাইজ প্রভৃতি বিখ্যাত পুরস্কারগুলি থেকে ছোটখাট এমনি শত-সহস্র প্রাইজের নাম করা যায়। একমাত্র মার্কিণ মুল্লুকেই সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে অন্ততঃ তিন-চার শো'র উপর প্রাইজের ব্যবস্থা আছে—যেগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের আনুকূল্যে প্রদত্ত।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষেও শিল্পীদের, বিশেষ ভাবে সাহিত্যশিল্পীদের বৎসরান্তে সম্মানিত করার জন্য বিভিন্ন ভাষার জনসাধারণ সাহিত্যকার্য্যের উপর পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। সাহিত্য আকাদামি এওয়ার্ড নামে অভিহিত পাঁচ হাজার টাকার একটি পুরস্কার বঙ্গ-সাহিত্যের জন্যও প্রতি বৎসর দেওয়া হয়ে থাকে। বর্ত্তমান বৎসরে "সাগর থেকে ফেরা" নামক কাব্য-গ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার প্রদত্ত হয়েছে প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যসাধক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে। রাষ্ট্র থেকে ছোটদের সাহিত্যের জন্যও কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের জন্য প্রতি বৎসর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে হাজার টাকার নরসিং দাস আগরওয়ালা পুরস্কারটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত সর্ব্বজন-পরিচিত 'রবীন্দ্র-পুরস্কার'টিও সাহিত্য-পুরস্কার হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের। এই পুরস্কারের সম্মান-মূল্যও আকাদামি পুরস্কারের সমপর্য্যায়ভুক্ত। বর্ত্তমান বৎসরে এই পুরস্কার প্রাপ্তিরও গৌরব অর্জন করেছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ঐ একই কাব্যগ্রন্থের জন্য। একই বৎসরে একই গ্রন্থের উপর দুটি উপর্য্যুপরি পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার লাভ কম সৌভাগ্যের কথা নয়! এ ছাড়া "ঘনাদার গল্প" নামক একটি ছোটদের বইয়ের জন্যও তিনি স্বতন্ত্রভাবে পাঁচ শত টাকার আর একটি সরকারী পুরস্কার লাভ করেছেন আলোচিত বর্ষেই। শ্রীবিনয় ঘোষও তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক রচনা "পশ্চিমবঙ্গ-সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্তির সম্মানলাভ করেছেন।

রবীন্দ্র-পুরস্কার ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও কয়েকটি সম্মানজনক নির্দ্দিষ্ট সাহিত্য-পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। এই পুরস্কারগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে প্রদত্ত শরৎ-পুরস্কারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত পুরস্কারে সম্মানিত হন।

উপর্য্যুক্ত পুরস্কারগুলি ব্যতীত আলোচিত বৎসরের প্রথমে আরও কয়েকটি সাহিত্য-পুরস্কারের উদ্ভব হয়। দক্ষিণ-কলিকাতায় বিখ্যাত প্রকাশক মেসার্স এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ কর্ত্তৃক আহূত নববর্ষ উৎসবের একটি সাহিত্য-সভায় কয়েকটি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা কয়েকটি সাহিত্য-পুরস্কার ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দু'টি হাজার টাকা ক'রে দু'হাজার টাকার পুরস্কার; 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার তরফ হতে উক্ত পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দু'টি হাজার টাকা করে দু'হাজার টাকার পুরস্কার একটি ক'রে নামাঙ্কিত রৌপ্যফলক; মাসিক 'উল্টোরথ' পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ কবিতার জন্য পাঁচ শত টাকা এবং ছোটদের সর্ব্বপুরাতন, মাসিক পত্রিকা 'মৌচাক'এর কর্ত্তৃপক্ষ ছোটদের শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পাঁচ শত টাকা প্রতি বৎসর পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হন।

সম্প্রতি বাংলা ১৩৬৪ সালের জন্য উক্ত পুরস্কারগুলি ঘোষিত হয়েছে। 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকা দুইটির পুরস্কারের প্রথমটি পেয়েছেন প্রবীণ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘকালের সাহিত্যসাধনার মর্য্যাদাস্বরূপ। দ্বিতীয় পুরস্কার প্রদত্ত হয়েছে তরুণদলের অন্যতম সাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসুকে তাঁর "গঙ্গা" নামক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনার জন্য। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার দুইটি পুরস্কারের মধ্যে প্রথমটি অভিহিত হয়েছে 'শিশির পুরস্কার' নামে। এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে—বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার গবেষণামূলক সৃষ্টির জন্য বিখ্যাত "বঙ্গীয় শব্দকোষ" অভিধান প্রণেতা ৯১ বৎসরের বৃদ্ধ শান্তিনিকেতন নিবাসী শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দ্বিতীয় পুরস্কারটি দেওয়া হয়, পুণাপ্রবাসী প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ছোটগল্প রচনার অসামান্য দক্ষতার জন্য। এই পুরস্কারটিকে 'মতিলাল পুরস্কার' নামে অভিহিত করা হয়েছে। শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার প্রদান কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার ও শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়।

'উল্টোরথ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই বৎসরের পুরস্কারটি দুই জন তরুণ কবির মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেন। এঁদের একজন হচ্ছেন, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অপর জন শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। কর্তৃপক্ষ এই পুরস্কার প্রদানের জন্ম ভারার্পণ করেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের উপর, এবং তাঁরই নির্দ্দেশে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শিশু-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দানের জন্ম পূর্ব্ব-ঘোষিত 'মৌচাক' পুরস্কারটি প্রদান করা হয় প্রখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়কে শিশু-সাহিত্যে তাঁর সমগ্র দানের বৈশিষ্ট্য ও প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করে। এই পুরস্কার প্রদানের জন্ম শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়।

যে সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এই পুরস্কারগুলি প্রদান করে সাহিত্যিকগণের মর্য্যাদাবৃদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যের উন্নতি-সাধনে সাহায্য করেছেন, তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সেই সঙ্গে আরও বদান্যশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনুরূপ সহানুভূতি দেখাতে অনুরোধ করছি। বেসরকারী পুরস্কার হিসাবে বাংলা সাহিত্যের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের এই পুরস্কারগুলি ভারতবর্ষের মধ্যে দৃষ্টান্তস্থল হয়ে রইল।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

Hundred Years of the University of Calcutta

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস একশো বছর অতিক্রম করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে এবং বহু প্রকারে বিদেশী ধারার অনুসরণে ও অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশেষ এক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যাই হোক, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন! নয় জনের একটি সম্পাদকীয়মণ্ডলীকে এই গ্রন্থ প্রকাশের ভারার্পণের ফলে সম্পাদকরা প্রায় প্রত্যেকেই একেকটি অধ্যাপক-মার্কা প্রবন্ধ লিখে ফেলেছেন। আশ্চর্য্য! কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এমন নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চলতে পারে, কল্পনা করা যায় না! বাঙলা দেশে এখনও নিশ্চয়ই তেমন কোন সত্যিকার ঐতিহাসিকদের অভাব হয় নি। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত তাঁর মুখবন্ধের (অত্যন্ত কাঁচা লেখা) প্রথমেই সম্পাদকদের অকারণে প্রশংসা করেছেন!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা দেশের সম্পদ, বাঙলা ভাষার ধারক ও বাহক। এ ক্ষেত্রে এই বই ইংরাজীর পরিবর্তে বাঙলায় রচিত হওয়াই সমীচীন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পঁচিশ টাকা দামের গুরুভার বইখানি প্রকাশ করায় দেশবাসীর কিছুই উপকার হ'ল না। অথচ এই বাবদে কত টাকা নষ্ট হয়েছে, কে আর হিসাব করছে? প্রকাশক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য পঁচিশ টাকা।

এক মুঠো মাটি

এই উপন্যাসের লেখক ছদ্মনামী 'শ্রীবাসব'। অত্যন্ত স্বল্পদিনের মধ্যে উপর্য্যুপরি কয়েকখানি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ায় তিনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিচয়লাভ করেছেন। আলোচিত উপন্যাসটির মূল বক্তব্য হচ্ছে: প্রেমের দুর্নিবার শক্তির কাছে সমস্ত বিরুদ্ধশক্তিই পরাজয় স্বীকার করে, সেইটিই দেখানো। নায়ক-নায়িকা শিবাজী ও বিদিশা উভয়েই শিক্ষিত, মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন। কিন্তু ধর্ম্মের ভিন্নতা নিয়ে উভয়ের ভালবাসা প্রথম দিকে দানা বাঁধতে চায় না পরিণয়ে—অবশেষে তা সাফল্যমণ্ডিত হয় সমস্ত দুর্য্যোগকে অতিক্রম করে। এই খৃষ্টান ছেলে ও হিন্দু মেয়েটির ভালবাসাকে মাধ্যম করে খৃষ্টান-পরিবার ও ইংরেজ আমলের প্রথম দিকের ধর্ম্মান্তরকরণের নানা কাহিনী সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে লেখার মুনশীয়ানায়। প্রকাশক—বিশ্ববাণী, ১১।এ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭। মূল্য ৪৲ টাকা

নবজ্ঞান-ভারতী

মহাপুরুষদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পার্ষদদের আবির্ভূত হ'তে দেখা গেছে যুগে যুগে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পেছনে রেখে গেছেন বেশ কয়েক জন জ্ঞানী ও গুণীকে। এঁদের মধ্যে কেউ শিল্পী, কেউ সাহিত্যিক, কেউ গবেষক, কেউ অধ্যাপকরূপে আমাদের দেশে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উপরি-উক্তদের অন্যতম—তিনি একজন অক্লান্ত গবেষক ও সঙ্কলক। লেখকের সদ্য-প্রকাশিত 'নবজ্ঞান-ভারতী' বাঙলা অভিধান রচনার ইতিহাসে এক মূল্যবান সংযোজন। এই অভিধানে প্রভাতকুমার বাঙলা, তথা ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র বিশ্বের ভূগোলতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। পৃথিবীর বিশিষ্ট দেশ, নদী, হ্রদ, পর্ব্বত, নগর ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানের বিস্তারিত বিবরণ মাত্র একখানি গ্রন্থে পাওয়া বাঙলা ভাষায় কিছুকাল আগেও যেন কল্পনাতীত ছিল। বাঙলায় পুরাতন ও নতুন অভিধান আছে সংখ্যাতীত। এই সকল অভিধান শুধু মাত্র অর্থবোধক। কিন্তু বর্ত্তমানে শুধুমাত্র অর্থবোধক অভিধান রচনার আর কোন সার্থকতা নেই। এখন প্রয়োজন সকল বিষয়ের পৃথক অভিধান রচনার। বাঙালী সঙ্কলকগণ এখন এই ধরণের বিশেষ বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অভিধান রচনায় প্রবৃত্ত হ'লে বাঙলা সাহিত্যের ও ভাষার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হবে। প্রভাতকুমারকে আমরা ভিন্ন ধরণের অভিধান রচনার পথপ্রদর্শক বলতে পারি। ভূগোলতত্ত্বের বা গোলাকার পৃথিবীর গোলমেলে তথ্য সমূহকে তিনি অত্যন্ত সহজরূপে সাজিয়েছেন। 'নবজ্ঞান-ভারতী' আমাদের দেশবাসীর ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলোক বিতরণের সহায়ক হিসাবে পরিগণিত হোক। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স। ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য কুড়ি টাকা।

শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব

হুমায়ুন কবীর কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক ও [illegible] বাংলা ভাষায় শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে [illegible]

প্রকাশিত হয়েছে, এই গ্রন্থখানি তাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। সমাজবোধ সম্বন্ধে, নীতিবোধ সম্বন্ধে বা আদর্শ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পে, উপন্যাসে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন চরিত্রগুলির কথোপকথনের মাধ্যমে, গ্রন্থকার অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারশীল মন নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এই গ্রন্থে। শরৎচন্দ্রের যুক্তির মধ্যে যেখানে fallacy দেখা দিয়েছে, যেখানে বিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলিও অত্যন্ত যত্নসহকারে বিচার করে দেখিয়েছেন কবীর সাহেব। প্রথম দিকে শরৎচন্দ্রের পরিচয় দিয়েছেন ইউসুফ মেহের আলি। এই দীর্ঘ উপক্রমণিকাটুকু অত্যন্ত সুলিখিত। গ্রন্থখানি হুমায়ুন কবীরের ইংরেজী 'Saratchandra Chatterjee' নামক গ্রন্থের অনুবাদ। এই অনুবাদকার্য্য করেছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। মূল্য ১॥০ টাকা

কালীঘাটের ঐতিহাসিক কথা

শুধু কলকাতা বা বাঙলা দেশ বললে ভুল হয়, কালীঘাট সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতিটি পুণ্যার্থী নর-নারীর হৃদয়মন্দিরের মহাতীর্থের সম্মান নিয়ে বিরাজ করছে। ভারতবাসী ধর্মপ্রবণ জাতি। দেবতাকে তারা আত্মীয়জ্ঞানে আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে অনুভূতি বিনিময় করে। মহাকালী শুধু পূজার্চ্চনার দেবীই নন, তিনি জগজ্জননী। জগজ্জননীর মন্দিরগুলির মধ্যে কালীঘাট সুবিখ্যাত। কালীঘাটের নামের সঙ্গে বাঙলা দেশের প্রতিটি বাসিন্দা তাদের জন্মলগ্ন থেকে সুপরিচিত। এই কালীঘাট মহাতীর্থ দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট ইতিহাসের ভিত্তিভূমিতে। অসংখ্য ঘটনা, অজস্র কাহিনী দিনের পর দিন ধরে পুষ্ট করে এসেছে কালীঘাট মহাতীর্থের ইতিহাস। উপরোক্ত গ্রন্থে কালীঘাটের ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক-সাধারণ বহু তথ্য সম্বন্ধে আলোকপ্রাপ্ত হবেন এই গ্রন্থপাঠে। এই গ্রন্থ রচনায় লেখক যে শ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন সে জন্যে তাঁকে সাধুবাদ করতে হয়। লেখক—শ্রীনিধুলাল ভট্টাচার্য। প্রকাশক শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শরৎভবন, ৭ কালী টেম্পল রোড, কালীঘাট। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

কখনো আসেনি

রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যিক খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ছোট গল্পে, উপন্যাসে রমাপদ চৌধুরীর প্রতিভা রসিকজনের স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হয়েছে। তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থ 'কখনো আসেনি' কয়েকটি ছোট ছোট গল্পের সংকলন। প্রত্যেকটি গল্প লেখকের স্বাতন্ত্র্যে ভরপুর, বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রমাপদ চৌধুরীর বাক্‌ভঙ্গীর ও বর্ণনায় গতানুগতিকতার ছাপ নেই, তাঁর প্রকাশভঙ্গী বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। গল্পগুলির মধ্যে বনযাত্রাম, নারীবন্ধু, মেকি, ঠগ, একটি কিংবদন্তী, উত্তরাধিকার, নিকৃষ্ট কাহিনী প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠকচিত্ত তৃপ্ত করবে। গল্পগুলি আন্তরিকতার পূর্ণ, কৃত্রিমতার ছাপ তাতে নেই। চরিত্রগুলি দরদ দিয়ে আঁকা, তাই তারা অস্বাভাবিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে স্বাভাবিকতার পর্যায়ে পড়েছে। প্রচ্ছদপট অঙ্কনে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সুশিল্পী শ্রীরণেন আয়ান দত্ত। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

এই গ্রহের ক্রন্দন

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করে দীপক চৌধুরী ইতিমধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'এই গ্রহের ক্রন্দন' তাঁর নবতম বৃহদাকার উপন্যাস। ইহা ধারাবাহিক ভাবে 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময়েই বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আদর্শবাদী লেখক জয়া নামক দর্শনের এক অবিবাহিতা অধ্যাপিকার জটিল জীবন-কাহিনী অত্যন্ত কৌশলে বর্ণনা করেছেন এই উপন্যাসের মধ্যে। সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তিনি ঈশ্বর-অবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনী বত্নাকে লিখিত কতকগুলি পত্রের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয় তাঁর ব্যর্থ জীবনের ঘটনাপ্রবাহ। ভালবাসার ব্যর্থতা থেকেই নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় জয়ার জীবনে এবং তিনি অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠেন। নিরীশ্বরবাদের আওতায় পড়ে, বাস্তব জীবনের সত্যগুলিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে না পারার ফলে, শেষ পর্যন্ত হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং টি-বিতে আক্রান্ত হন। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য দর্শনের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা এই জয়া বন্ধু পরিবেশে মদ্যপান করতেও শুরু করেন। এই সময় নিশীথ নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক পাচকরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর জীবনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই সেবাব্রতধারী নিশীথের ঈশ্বর-বিশ্বাস ও পরিচর্য্যাশক্তির প্রভাবে জয়ার মানসিক পরিবর্তন ঘটে, এবং তার প্রতি জয়া বন্ধুর জৈবআকর্ষণও প্রকাশ পায় কিছুটা। কিন্তু লেখক তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মনের চাতুর্য্যে সেই অবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করেন। উপন্যাসখানির মধ্যে দর্শন ও মনস্তত্ত্বের বহু সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ইদানীন্তন কালের নাগরিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ পেয়েছে অনবদ্য ভাবে। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৮৲ টাকা

রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজকাহিনী

বাঙলা দেশের ইতিহাসে অধুনা অবজ্ঞাত বহু গ্রামের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভুরসুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম তন্মধ্যে অন্যতম। রাজগুরু-বংশের খ্যাতিমান পণ্ডিত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য রচিত ও তাঁর পুত্র বাণীকুমার কর্তৃক পুনর্লিখিত পাঁচশো বছর পূর্ব্বের রাজগুরু-বংশের একখানি ইতিহাস রচনা করেছেন। এই বংশের মধ্যে রাণী ভবশঙ্করীর নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তিনি স্বয়ং তরবারি হস্তে যুদ্ধ করেছিলেন শত্রুর বিরুদ্ধে। পুরোপুরি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে গ্রন্থখানি রচনা করা হয়নি, কিন্তু ইতিহাসের তত্ত্ব ও তথ্য উপন্যাস বা গল্পের ধরণে পরিবেশিত হয়েছে। বাঙলা দেশের মহিলাগণ বইটির যথেষ্ট সমাদর করবেন, আশা করা যায়। ছাপা ও বাঁধাই ভালই। প্রকাশক—নবভারতী। ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

২০

সীতারামের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল নিতাই।

সীতারামের সমবয়সী নিতাই বাল্যকালে কিছুদিন পড়েছিল তার সঙ্গে। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল তাদের। নিতান্ত গরীবের ছেলে নিতাই কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতো যেখানে-সেখানে। খড়ের একখানি মাটির ঘর, বিঘে দুই তিন ধানের জমি, আর বিঘে দশেক কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গা—এই ছিল তার সুলতানপুরের একমাত্র সম্বল।

বর্দ্ধমান জেলার ছোট একটি শহরে নিতাই তখন এক গোলদারী দোকানে চাকরি করে। মাইনে যা পায়, দু'বেলা খেতেই তা খরচ হয়ে যায়।

হায় রে কপাল! রাত্রে নিতাই একটা পাইস-হোটেলে খেয়ে এসে সেই দোকানের পেছনের দিকে ছোট্ট একটুখানি ঘেরা-দেওয়া জায়গায় চাটাই বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবে। ঘুম আর কিছুতেই আসতে চায় না।

চাটাই-এর ওপর শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে। ভাবে, কিছু টাকা যদি সে পায়, এমনি একটা গোলদারী দোকান করবে। চাকরি করে কিছু হবে না। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকা ছাড়া চাকরি করে আর কিছু হবার আশা নেই। কিন্তু টাকা সে পাবে কোথায়? কে তাকে টাকা দেবে? বড়লোক আত্মীয়-স্বজনের কথা ভাবে। ভাবে তার এক পিসেমশাই-এর কথা। সেও ছিল তারই মত নিতান্ত গরীব, কয়লাকুঠির ঠিকাদারী করে আজ সে মস্ত বড়লোক। তারই কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? কেঁদে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরবে? বলবে, ব্যবসা করবার জন্যে কিছু টাকা দিন? না। দেবে না। ভারি কৃপণ লোকটা। একটি পয়সাও দেবে না।

কত লোক পথ চলতে চলতে টাকার বাণ্ডিল কুড়িয়ে পায়! না না, তা হয় না। কুড়িয়ে পেলে সে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। যার টাকা, উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে সে নিয়ে যাবে। তার পর দয়া হয়ে সে যদি কিছু দিয়ে যায়। একশো টাকা পেলেও চলবে। ছোট্ট দোকান করবে। তাহ'লে তাকে কুড়িয়ে পেতে হবে অন্তত হাজার দুই-তিন টাকা। নইলে একশ' টাকাই বা দেবে কেন?

এমনি সব আকাশকুসুম ভাবে আর দিনগত-পাপক্ষয় করে নিতাই।

এমন দিনে সুলতানপুর থেকে তার এক দূর সম্পর্কের ভাইপোর চিঠি পায়। পোষ্টকার্ডের চিঠি। লিখেছে, তুমি যে ছাগল তিনটি রেখে গিয়েছিলে আমার বাড়ীতে, তার ভেতর ছোট ছাগলটিকে শেয়ালে মেরে নিয়েছে। আর তোমার যে দশ বিঘে ডাঙ্গা-জমি আছে, সে জমি যদি বিক্রি করতে চাও তো তাড়াতাড়ি চলে এসো।

কথাটা সে বিশ্বাস করেনি। কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গা জমি। বিনা পয়সায় দিলেও কেউ নিতে চায় না। সেই জমি বিক্রি হবে! বিশ্বাস না হবার কথাই।

তবু কি জানি, কি ভেবে নিতাই এসেছিল সুলতানপুরে। এসে দেখে, গ্রামে তাদের মহামারী কাণ্ড! জমি বিক্রির হিড়িক লেগে গেছে। মাটির নীচে কয়লা পাওয়া গেছে। যে-জমি কুড়ি টাকা বিঘে কেউ নিতে চায়নি, সেই জমির দর উঠেছে দুশো থেকে হাজার টাকা বিঘে।

নিতাই-এর দশ বিঘে ডাঙ্গা-জমি সত্যি সত্যিই বিক্রি হয়ে গেল। তিন হাজার টাকা পেলে নিতাই।

স্বপ্ন তার সফল হলো। হাজার টাকা ভেঙে গোলদারী দোকান করলে সে। ভাঙ্গা বাড়ী মেরামত করে ফেললে। রাস্তার ওপর বাড়ী। দোকানের জন্যে বাড়ী পর্য্যন্ত খুঁজতে হলো না।

সেই নিতাই-এর গোলদারী দোকান আজ সরগরম। পাঁচ জন কর্ম্মচারী কাজ করছে। প্রকাণ্ড দোকান। নাম—নিত্যানন্দ ভাণ্ডার।

নিতাই-এর সঙ্গে এসেছিল তিনকড়ি আর গদাই। নিতাই এসেছিল তার বাল্যবন্ধু সীতারামের কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে। এত বড় বংশের এত বড় একটা লোক—মিছেমিছি জেল-হাজতে কাটিয়ে এলো একদিন, লৌকিকতার খাতিরে তার আসা উচিত—তাই এসেছিল। জেল-হাজতের কথাটা জিজ্ঞাসা করবার

ইচ্ছাও ছিল না তার, কিন্তু তিনকড়ি তার কৌতূহল দমন করতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করে বসলো, খেতে-টেতে সেখানে কি দিত মুখুজ্যে ?

কথাটা নিতাই-এর ভাল লাগলো না। হেসে বললে, কেন তোমার কি সেখানে একবার যাবার ইচ্ছে আছে নাকি ?

সবাই হেসে উঠলো। সীতারামও।

হাসি থামিয়ে সীতারামই কথা বললে। বললে, না ভাই, সেখানে যেন কাউকে যেতে না হয়।

গদাই বললে, তা যে রকম দিন-কাল পড়েছে, কে যে কাকে কখন ঠেলে দেয় কিছুই বলা যায় না।

তিনকড়ি বললে, তবে আর বলছি কেন ? নইলে সীতারামের মত মানুষকে এই রকম অন্যায় সন্দেহ করে কেউ, না করা উচিত ?

গদাই বললে, বুঝতে পারছো না ? টাকার গরম। টাকার জোরে দেবু চাটুজ্যে দিনকে রাত করতে চায়।

ভেবেছিল কথাটা সীতারামের খুব ভাল লাগবে। কিন্তু ফল হ'লো উলটো। সীতারামই বলে উঠলো, না না ওকথা বোলো না। দেবুর দোষ নেই। আমাকে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ ছিল তার।

নিতাই কথাগুলো শুনছিল এতক্ষণ। সীতারামের মুখ থেকে এই রকম কথাই সে আশা করেছিল। বললে, তাছাড়া ওর ওই একটিমাত্র ছেলে—এই রকম ভাবে মারা গেলে মাথার ঠিক থাকে কখনও ? এখনও যে সে পাগল হয়ে যায়নি—এইটেই যথেষ্ট।

কথার ধারা যে এই দিকে মোড় ফিরবে—তিনকড়িও ভাবেনি, গদাইও ভাবেনি। যে-লোক তাকে এত বড় অপমান করলে তাকে যে মানুষ ক্ষমা করতে পারে, এ তাদের ধারণার অতীত। তিনকড়ি ভাবলে, ভাল হয়ত সাজছে সীতারাম।

গদাই কিন্তু বলেই বসলো : মনে যা আছে থাক্ না ! মুখে বলতে দোষ কি ! আর তা ছাড়া—আজকালকার দিনে পয়সার জোরটা বড় জোর।

নিতাই দেখলে তিনকড়িকে আর গদাইকে সঙ্গে আনা তার উচিত হয়নি। আনতে সে অবশ্য চায়নি। তারা নিজেই তার সঙ্গ ধরেছে।

নিতাই তাদের চেনে। এক্ষুণি হয়ত তারা দেবু চাটুজ্যের বাড়ী যাবে। এখানে যে সব কথা হবে, সেইগুলি অতিরঞ্জিত ক'রে সেখানে গিয়ে না বলতে পারলে রাত্রে তাদের ভাল ঘুম হবে না।

নিতাই-এর ভাল লাগলো না এদের সঙ্গে বসে থাকতে। বাল্যবন্ধু সীতারামের সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলবে তারও উপায় নেই।

নিতাই উঠে দাঁড়ালো। বললে, আজ চলি। আবার আসবো একদিন। চল গদাই, তিনকড়ি ওঠো।

সীতারাম বুঝতে পারলে, নিতাই তাদের তুলে নিয়ে যেতে চায়।

—চা আনতে বলেছি যে ! চা'টা খেয়েই যাও।

বলতে বলতে চা এলো। গদাই আর তিনকড়ি সুযোগ পেলে আরও কিছু বলবার।

চা খেতে খেতে তিনকড়ি বললে, শুনছি নাকি দেবু চাটুজ্যে টিকটিকি লাগিয়েছে তোমার পেছনে ?

নিতাই হেসে উঠলো। —টিক্‌টিকি ? সে আবার কি !

তিনকড়ি বললে, তা কি আর আমিই জানি ছাই ! শুনছি একটা অদ্ভুত কথা, তাই বলছি।

সীতারাম নিতাই-এর দিকে তাকিয়ে বললে, বুঝেছি। ডিটেক্‌টিভকে বোধ হয় টিকটিকি বলছে।

নিতাই বললে, হ্যাঁ, তাই হবে।

গদাই জিজ্ঞাসা করলে, কি সেটা ?

নিতাই আর থাকতে পারলে না, বলে ফেললে, এইবার যাবে তো বাবা দেবু চাটুজ্যের বাড়ী। তাকে জিজ্ঞাসা করবে, সে ভাল করে বুঝিয়ে দেবে তোমাদের।

হাতের কাপটা ঠক্ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো গদাই। বললে, তুমি কি বলতে চাও, এই আমাদের কাজ ? শোনো তিনু, শোনো।

নিতাই বললে, রাগ করছো কেন ? তোমাদের কথা শুনে আমার যা মনে হলো তাই বললাম। তোমাদের চিনি তো !

'নিত্যানন্দ ভাণ্ডার' থেকে সংসারের জিনিসপত্র নেয় তিনকড়ি। অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে। এ সময় নিতাই যদি তার উপর চটে যায়, চটে গিয়ে টাকাটা যদি চেয়ে বসে, তাহ'লেই মুস্কিল।

তিনকড়ি বললে, তুমি কি আমাকেও গদাই-এর দলে ফেলছো নাকি নিতাই ?

নিতাই বললে, হ্যাঁ ফেলছি।

তিনকড়ি বললে, তাহ'লে সত্যি কথা শোনো নিত্যানন্দ, আমি এ সবের কিছু জানি না, যাচ্ছিলাম তোমার কাছে, পথে জুটলো গদাই।

গদাই চেঁচিয়ে উঠলো, এইবার সব দোষ গদাই-এর ঘাড়ে চড়াও ! তোমাদের সঙ্গে আসাই আমার ভুল হয়েছে। চললাম মুখুজ্যে ! বলেই আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে গদাই হন হন করে বেরিয়ে গেল।

রাগ করে চলে গেল ভেবে সীতারাম তাকে ডাকতে যাচ্ছিল, তিনকড়ি হাতের ইসারায় নিষেধ করলে।

নিতাই জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার বল দেখি ? কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ উঠলো মনে হচ্ছে ?

তিনকড়ি বললে, শোনো। গদাই এসেছিল দেবু চাটুজ্যের কাছ থেকে। পাঁচশটি টাকা দিয়ে দেবু চাটুজ্যে ওকে বলেছে তুমি দেখে এসো সীতারাম মুখুজ্যে কি করছে, আর আমার সম্বন্ধে কি বলছে। তাই ও এসেই আরম্ভ করেছিল দেবু চাটুজ্যের নিন্দে। আমাকে বলেছিল তুমি আমার কথায় শুধু সায় দিয়ে যাবে বাস, আর তোমাকে কিছু করতে হবে না। তোমাকে আমি দশটা টাকা পাইয়ে দেবো।

নিতাই চুপ করে সব শুনলে। শুনে বললে, দেবু চাটুজ্যে তোমাকে সন্দেহ করে যে ভুল করেছে তা সে বুঝতে পেরেছে।

সীতারাম বললে, তোমার সঙ্গে আমার একটা খুব গোপনীয় কথা ছিল, শুনবে ?

তিনকড়ি বুঝতে পারলে। বললে, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। বলেই সে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সীতারাম বললে, তোমাকে আমি বাল্যকাল থেকে চিনি নিতাই, তুমি মানুষ খুব ভাল। একটা কথা তোমাকে বলি। দেবু চাটুজ্যের ছেলে বঙ্কিম বেঁচে আছে।

সংবাদটা নিতাই-এর কাছে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি বিস্ময়কর! জিজ্ঞাসা করলে, একথা দেবু চাটুজ্যে জানে?

সীতারাম বললে, না। দু'-একদিনের ভেতর সবাই সব কিছু জানতে পারবে। কথাটা এখন তুমি কাউকে বোলো না। তুমি আমাকে ভালবাসো, তাই কথাটা তোমাকে না বলে পারলাম না।

হাত দুটি জোড় করে নিতাই প্রণাম করলে সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে। দেখে মনে হলো, সে অত্যন্ত খুশী হয়েছে। বললে, তাহ'লে যে লোকটি মরেছে, সে কে?

সীতারাম বললে, সেটা এখনও ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

নিতাই বললে, বড় ভাল খবর তুমি আমাকে দিলে সীতারাম! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। চলি। তিনকড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

নিতাই চলে গেল।

বুড়োশিব এখনও এলো না। সীতারাম মনে মনে বেশ একটু অধীর চঞ্চল হয়ে উঠলো। এতক্ষণ নিতাইদের নিয়ে সময়টা কাটছিল ভাল। এখন যেন তার সময়টাও কাটতে চাচ্ছে না। ডাকলে, লখিয়া!

লখিয়া এসে দাঁড়াতেই বললে, চট্ করে যা দেখি একবার বুড়োশিবকে ডেকে আন।

লখিয়া তক্ষুণি বেরিয়ে যাচ্ছিল। যেই দোরের বাইরে পা দিয়েছে, অমনি তার চোখের সামনে দেবু চাটুজ্যের প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী এসে দাঁড়ালো।

সীতারাম তখনও তার বাইরের ঘরে বসে।

দেবু চাটুজ্যের মোটর গাড়ীখানা দেখলেই চেনা যায়। সেরকম গাড়ী এ-তল্লাটে কারও নেই।

গাড়ীখানা দেখেই সীতারাম অবাক হয়ে গেল। দেবু চাটুজ্যে তার বাড়ীতে যে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আসতে পারে তা' সে আশা করতে পারেনি। উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে। একটুখানি এগিয়ে যেতেই দেখলে, গাড়ী থেকে নামছে দেবু।

দেবুকে অনেক দিন সে চোখে দেখেনি। মনে হচ্ছে এরই মধ্যে বয়স যেন তার বেড়ে গেছে। মাথার চুলগুলো এত বেশি পাকা বোধ হয় ছিল না।

দেবু নামলো গাড়ী থেকে। মাথা হেঁট করে নামলো। মাথা উঁচু করে চলা তার চিরকালের অভ্যাস। দেখে মনে হচ্ছে এ যেন সে দেবু নয়।

সীতারাম দোরের কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেবু মুখ তুলে তাকাতেই তাকে দেখতে পেলে। দেখেই সে থমকে থামলো। সীতারাম দু' হাত বাড়িয়ে তার হাত দুটো ধরে তাকে ঘরের ভেতর নিয়ে এলো।

এ রকম ভাবে সীতারাম যে তাকে অভ্যর্থনা করবে তা সে ভাবতে পারেনি। দু' চোখ তার জলে ভরে এলো। আজ সে এসেছে তার কাছে ক্ষমা চাইতে। দেবু ঘরে ঢুকেই বললে, বল তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ?

সীতারাম সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, বোসো।

দেবু বসলো না। বললে, না আগে বল—তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ কি না।

হঠাৎ সীতারাম দেখলে, বাইরে গাড়ীতে তার ড্রাইভার বসে আছে; সে এই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বাইরের ঘরে গ্রামের লোকজন হঠাৎ কেউ এসে যেতে পারে।

দু' হাত দিয়ে দোরটা সীতারাম দিলে বন্ধ করে। লখিয়াকে ডেকে বললে, কাউকে এখানে আসতে দিবি না।

দেবু চাটুজ্যে চেয়ারের পেছনটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। সীতারাম তার কাছে এসে দেবুর হাত দুটো চেপে ধরে বললে, মুখ তুলে তাকাও দেবু! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, তোমার ওপর রাগ অভিমান আমার এতটুকু নেই। আমি জানি একমাত্র ছেলে যার এমনি করে চলে যায়, তার মাথার ঠিক থাকে না।

দেবু মুখ তুলে তাকালে। চোখ দুটো তার জলে টল্ টল্ করছে। বললে, আমার যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তার ওপর তোমার যা ক্ষতি করলাম—

সীতারাম বললে, তোমার এ শুভবুদ্ধি কেন জাগলো তা আমি জানি দেবু! এ সময় তোমাকে কোনও শক্ত আঘাত আমি দিতে চাই না।

দেবু বললে, দাও, তুমি আমাকে শক্ত আঘাতই দাও। সেজন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

সীতারাম বললে, তুমি তো আমাকে অনেক দিন থেকেই চেনো দেবু, সে চরিত্রই আমার নয়। শক্ত আঘাত আমি কাউকেই দিতে পারি না।

দেবু বললে, তাহ'লে আর ও-কথা তুলো না। বল তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ? সেই কথা শুনে আমি চলে যাই।

সীতারাম বললে, না, না, না। তোমাকে শুধু হাতে যেতে আজ আমি দেবো না। তোমাকে দেবার মত আমার কিছু নেই, তবু এমন জিনিস তোমাকে আজ আমি দেবো যা পাবার আশা তুমি কোনো দিন করনি। ওঠো, এসো আমার সঙ্গে। এখানে নয়। দোতলায় চল।

এই বলে দেবুকে সীতারাম তার ওপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে।

কাঞ্চন খবর পেয়েছিল দেবু চাটুজ্যে এসেছে। কিন্তু কেন এসেছে বুঝতে পারেনি। নিজের ঘরে বসে বসে রঞ্জনকে খাওয়াচ্ছিল সে। সীতারাম ঘরে ঢুকলো হাসতে হাসতে। বললে, দেবু এসেছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করলে, রঞ্জন এসেছে উনি জানেন?

সীতারাম বললে, না, এখনও জানাইনি।

কাঞ্চন বললে, তুমি জানিয়ো না।

সীতারাম বললে, সে কি! জানাবার জন্যেই তো ওপরে নিয়ে এলাম।

কাঞ্চন বললে, ভালই করেছ। মালা, যা, ওঁকে খাবারটা দিয়ে আয়।

মালা খাবার সাজাচ্ছিল, বললে, আমি যাব?

—হ্যাঁ, তুই যাবি।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি করবো?

কাঞ্চন বললে, তুমি মালার সঙ্গে যাও। বসে বসে খাওয়াও গে। রঞ্জন সম্বন্ধে কোনও কথা বলবে না।

বেশ, বলবো না। আয় মালা!

মালাকে নিয়ে সীতারাম বেরিয়ে গেল।

দেবু জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছিল। সীতারাম ঘরে ঢুকতেই পেছন ফিরে তাকালে। বললে, এ-সব আবার কেন?

সীতারাম বললে, মিষ্টিমুখ করতে হয়।

দেবু বললে, মিষ্টিমুখ করবার মত কাজ আমি করিনি।

বলেই সে বসলো চেয়ারে। মালার দিকে তাকিয়ে বললে, এই তোমার মেয়ে মালা, না?

খাবার প্লেট, গ্লাস টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে মালা হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে দেবুকে।

মাথায় হাত রেখে তাকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে দেবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। অতিকষ্টে কি যে বললে কিছুই বুঝা গেল না। চোখ দুটো জলে টল টল করতে লাগল।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে একটুখানি খাবার মুখে দিয়ে গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে দেবু বললে, এ সব আর আমার ভাল লাগে না মুখুজ্যে! মালা, ডাকো তো মা তোমার মাকে। একটা প্রণাম করে চলে যাই।

ডাকতে হবে না। আমি এইখানেই রয়েছি। বলতে বলতে সুমুখের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো মালার মা কাঞ্চন।

দেবুর সঙ্গে এমন করে কথাও সে কোনো দিন বলেনি, এমন করে কখনও তার সুমুখে এসেও দাঁড়ায়নি। দেবু একটুখানি অবাক হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে গড় হয়ে তাকে প্রণাম করবার জন্যে মাথা নোয়াতেই কাঞ্চন হাঁ হাঁ করে পিছু হেঁটে সরে গেল কয়েক পা। বললে, করছেন কি? মাথা কি আপনার খারাপ হয়ে গেল?

দেবু বললে, মাথার আর দোষ কি বলুন?

কাঞ্চন বললে, সে কথা সত্যি।

দেবু বললে, আপনাদের যে ক্ষতি আমি করে ফেলেছি, সে ক্ষতি পূর্ণ করবার সাধ্য আমার নেই।

কাঞ্চন বললে, আপনার না থাকতে পারে, কিন্তু ভগবান আমাদের সে ক্ষতি পূর্ণ করে দিয়েছেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমার বাড়ীতে যখন এসেছেন, খালি হাতে আপনাকে ফিরে যেতে দেবো না।

কাঞ্চন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ফিরে আসতে খুব বেশি দেরি হলো না।

—দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না?

দেবু মুখ তুলতেই দেখে, সুমুখে রঞ্জন।

যে ছেলে তার মারা গেছে বলে এত হুলুস্থুল, যার জন্য নিরীহ সীতারাম মুখুজ্যে এত দিন ধ'রে হাজত-বাস ক'রে এলো, তার সেই হারানো ছেলে রঞ্জন সশরীরে তার সুমুখে দাঁড়িয়ে।

বাবা! বলে রঞ্জন এগিয়ে এলো দেবুর কাছে। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, দেবু দু'হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো, কি যে বলবে, কি যে করবে কিছুই বুঝতে পারলে না।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অনুরোধ

শ্রীমতী বাসবী বসু

তোমার হাসি ছড়াও কেন বাতাসে বাতাসে—
উড়ে উড়ে কেবল ওরা আমার কাছে আসে।
আমায় করে আনমনা যে দিনের সকল কাজে
বুকের মাঝে তোমার হাসি ব্যথার মত বাজে।
মরমী গো, মরমী বঁধু তোমার ধরম নাই—
অনুরাগের অনুকণার মর্ম বোঝো নাই।
তোমায় দিলাম যে প্রেম আমার
সে নয় যূঁথীর মালা
সে যে আমার বুকের আগুন—
আপন মনের জ্বালা।
আর করেছি এই জীবনে মিথ্যা বাকি সব
মিথ্যা হোল কাব্য করার দুরন্ত বৈভব।
দিনের শেষে নিবলে চিতা সবাই যাবে সবে
বন্ধু, তখন বারেক এসো সবার অগোচরে।
তোমার হাসি ছড়িয়ে দিও আমার সারা মনে
পলাশ-রাঙা রং যে লাগায় আমার বনে বনে।
অস্তরবির অল্প আলোয় একটি সাঁঝের জন্য
রাঙায়ে আমার ভুবনখানি আমায় কোরো ধন্য।

'অটোগ্রাফে'র ব্যবসা-বাণিজ্য

খ্যাতিমান বা মনীষী ব্যক্তিদের অটোগ্রাফ বা স্বাক্ষর (সিগনেচার) সংগ্রহ করা একটি চলতি মনোরম 'হবি' (hobby) সন্দেহ নেই। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়—এই 'হবি' শুধু মনের খোরাকই যোগায় না, সংগ্রাহককে প্রচুর অর্থও এনে দিয়ে থাকে শেষ অবধি। আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশে এইটিকে কেন্দ্র করে রীতিমত ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছে এবং সে বহুদিন থেকেই। আমাদের দেশে এ যুগের রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী প্রমুখ মনীষীদের অটোগ্রাফ বা হস্তাক্ষরের মূল্য যথেষ্ট, এ স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলোতে যে ভাবে এর কেনাবেচা হয়ে আসছে, এদিকে এখনও তেমনটি গড়ে উঠেনি।

নিউইয়র্কের একটি নামকরা অটোগ্রাফ ফার্মের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ফার্মটি ৭০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যিনি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর কন্যা মিস ম্যারী-এ. বেঞ্জামিনই হচ্ছেন এক্ষণে এর সুদক্ষা পরিচালিকা। বেঞ্জামিন পরিচালিত বিখ্যাত ফার্মটিতে যে সকল দুষ্প্রাপ্য অটোগ্রাফ বা স্বাক্ষর (সিগনেচার) মজুত আছে, এর মূল্য ৫০ লক্ষ ডলারের উপর। প্রত্যহই সেখানে প্রচুর পরিমিত অটোগ্রাফ কেনাবেচা হচ্ছে।

মিস বেঞ্জামিনের অটোগ্রাফ সংরক্ষণাগারে খোঁজ করলে দেখা যাবে, সেখানে রয়েছে বিশ্বের বহু মনীষী, বীর ও প্রতিষ্ঠাবান লোকের স্বাক্ষর কিংবা স্বহস্তলিখিত লিপি—যাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বও হয়ত কম নয়। নেপোলিয়ান, কীটস, সেক্সপীয়ার ও দান্তে, হিটলার প্রমুখ ব্যক্তিদের অমূল্য হস্তাক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ মিলে থাকে এই ফার্মে গেলেই। বাটন গুইনেটের একটি দুষ্প্রাপ্য লিপিও সংরক্ষিত আছে মিস বেঞ্জামিনের হেফাজতে। গুইনেট ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী। একটি মাত্র পৃষ্ঠায় শেষ করা আলোচ্য লিপিটি খুব অল্পদামেই ক্রয় করা হয় বটে কিন্তু এক মাস মধ্যে ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় ১ লক্ষ ডলার।

অটোগ্রাফ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে মিস বেঞ্জামিন যেমন মুনাফা অর্জন করছেন, তেমনি আরও অনেকে করেছেন। নিউইয়র্কের ন্যায় লণ্ডনেও এই কারবারটি চলে আসছে কত কাল যাবৎ। সাধারণতঃ বিখ্যাত ব্যক্তিদের অটোগ্রাফ বা স্বাক্ষরের এক একটি 'স্পেসিমান'-এর মূল্য হয়ে থাকে ২ পাউণ্ড থেকে ৫ পাউণ্ড। তবে স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিলের স্বাক্ষরযুক্ত কোন লিপি সংগ্রহ করে যে কোন ফার্ম্ম অনায়াসেই ৮ পাউণ্ড রোজগার করতে পারেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার অটোগ্রাফ থেকেও কম পক্ষে ৫ পাউণ্ড অর্জ্জিত হয়ে থাকে। অপর দিকে স্যার এন্টনী ইডেনের এক একটি স্বাক্ষর বিক্রয় করে পাওয়া যায় আড়াই পাউণ্ডের মত।

সাধারণ বাজারে বিক্রয় ছাড়া নীলামে অটোগ্রাফ বা সিগনেচার বিক্রয়ের ব্যবস্থা চলতি আছে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের একটি অটোগ্রাফ নীলামে ৪৪ পাউণ্ড পর্য্যন্ত এনে দিয়েছে বলে জানা যায়। অপর দিকে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের স্বহস্তলিখিত একখানি লিপির নীলাম বিক্রয় হয়েছিল—তাতে বিক্রেতার হাতে এসেছিল ১১০ পাউণ্ড। বার্ণার্ড শ'র স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পোষ্টকার্ড-এর মূল্য আজকের দিনে ১০০ পাউণ্ড-এর কম নয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এমনটি ঠিক কেউ ভাবতে পারত না হয়ত। লণ্ডনের এক ভোজসভায় যোগদানের জন্য শ' একবার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। শ' একখানি কার্ডে আয়োজনকারীদের লিখে পাঠালেন—"আমি এইটি বরদাস্ত করতে পারি না। জি, বি, এস।" এইটুকু লেখা সম্বলিত শ'এর কার্ডটি ১৯৫২ সালে যখন নীলামে বিক্রয়ের ডাক তোলা হয়, তখন ঠিক এক শত পাউণ্ড এসে হাজির হয় বিক্রেতার ঘরে।

অপ্রত্যাশিত ভাবেও অনেক সময় দুর্ম্মূল্য অটোগ্রাফ বা লিপি কেউ পেয়ে যেতে পারেন এবং সেই থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনও অসম্ভব নয়। মাত্র কয়েক বৎসর আগেকার কথা। ক্যান্টের একটি পুরানো বইয়ের দোকানে একজন লেখক বইয়ের সন্ধানে ঘুরছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে, দেড় শত বছর আগেকার একখানি জীর্ণ-শীর্ণ মানচিত্র। দাম জানতে চাইলেন তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান বিক্রেতার নিকট। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—এক শিলিং হলে নিতে পারেন। সংবাদপত্রে জড়িয়ে উক্ত লেখক মানচিত্রখানি নিয়ে এলেন বাড়ীতে—ব্রাস দিয়ে এত দিনের জমাট-বাঁধা ধূলো-বালি সব সাফ করতে সুরু করলেন নিজ হাতে। হঠাৎ দুটি জড়ানো পৃষ্ঠার মাঝ থেকে বেরিয়ে পড়ল একটি পত্র। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে এইটির পাঠোদ্ধার যখন করা হলো, তখন তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না—এই পত্র আনে বলেইনের নিজ হাতের লেখা এবং তাঁর নাম স্বাক্ষরযুক্তও বটে। কিছু দিন পর ক্যান্ট থেকে চলে যান তিনি আমেরিকায় এবং

এইটি মাত্র ১৯৪৬ সালের ঘটনা। সেখানে যেয়েই মূল্য যাচাই করা হলো উদ্ধারপ্রাপ্ত লিপিখানির। সঠিক প্রকাশ না পেলেও এর মূল্য ১০ হাজার পাউণ্ডের নিশ্চয়ই কম হয়নি।

বিভিন্ন প্রকারের ওজন ও মাপ

ওজন ও মাপ প্রথা সভ্যতার একটি মস্ত নিদর্শন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আজও অবধি এইটি পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল অঞ্চলে একই ভাবে চলতি নয়। বলতে কি, এর রকমফের বা বৈচিত্র্য এত বেশী যে, এর জন্য বহু ক্ষেত্রে নিরর্থক জটিলতা দেখা দিয়ে থাকে।

ভারতে প্রচলিত ওজন ও মাপের ব্যবস্থা-সমূহের দিকে যদি তাকানো যায়, দেখা যাবে কী বিশৃঙ্খলা চলে আসছে সেই থেকেই। এ ক্ষেত্রে 'নেশন্যাল স্যাম্পল সার্ভে'র একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। নমুনা তদন্তকালে তাঁরা দেখেছেন—দেশের ১১ শত গ্রামে ওজনের পদ্ধতি চালু আছে ১৪৩ রকম। সাধারণ নিয়মানুযায়ী—৮০ তোলায় ১ সের এবং ৩২০০ তোলা বা ৪০ সেরে ১ মণ হয়। কিন্তু স্থানভেদে ৮ তোলা থেকে ১৬০ তোলায় সের এবং ২৮০ তোলা থেকে ৮,৩০০ তোলায় মণ হতে দেখা যায়।

ওজন ও মাপের সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে মেট্রিক বা দশমিক পদ্ধতি। কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় সরলতাই এই পদ্ধতির মূল কথা। ফ্রান্সে প্রথম এটি বিধিবদ্ধ প্রণালীরূপে চালু হয় ১৮৪০ সালে। ১৮৭১ সাল ও ১৮৭৫ সালে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈঠক হয়ে একটি মিটার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং সৃষ্টি হয় আন্তর্জাতিক ওজন ও মাপ সংস্থা (ইন্টারন্যাশানাল ব্যুরো অব ওয়েটস এণ্ড মেজার্স)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি বাদে পৃথিবীর অবশিষ্ট প্রায় সকল দেশে এই মেট্রিক পদ্ধতি এখন প্রচলিত। ভারতেও ওজন ইত্যাদির ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি শীঘ্রই চালু হবে। সেইজন্য আগে থেকেই প্রণয়ন করা হয়েছে ওজন ও মাপের ভারতীয় মান আইন।

পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য ওজন ও মাপের যে সকল পদ্ধতি বা ব্যবস্থা চলতি আছে, সেগুলোর কয়েকটি নমুনা: বুশেল (শস্যাদির মাপ—ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা)—৪ পেক বা ৮ গ্যালন (প্রায় ৩১ সের); পেক (আমেরিকান)—১।৪ বুশেল—৮ কোয়ার্ট—৮·৮০৯৫৮ লিটার; পেক (বৃটিশ)—২ গ্যালন—০·০৯১৯ লিটার, মণ (শস্যাদির মাপ—দেশীয়)—৮ পালি বা ৪০ সের; গ্যালন (মদের মাপ—ইংল্যাণ্ড)—৪ কোয়ার্ট—৮ পাইন্ট বা ৩·৭৮৫৩ লিটার; ব্যারেল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)—৩১·৫ গ্যালন বা ০·১১৯২৪ কিউবিক মিটার; ব্যারেল (ইংল্যাণ্ড)—৩৬ গ্যালন; পাইন্ট—১।২ কোয়ার্ট—০·৫৫৩৫৯৯ মিটার; হগসহেড (তরল পদার্থের মাপ-ইংলণ্ডীয়)—৬৩ গ্যালন—২ ব্যারেল—০·২৩৮৪৮ কিউবিক মিটার; গ্যালন (বিশুদ্ধ জলের)—১০ পাউণ্ড (এভ্‌) অর্থাৎ ৫ সের; কোয়ার্ট (ইংলণ্ডীয়)—১।৪ গ্যালন—১·১৩৬৫০ লিটার; কোয়ার্ট (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)—২ পাইন্ট—৩২ আউন্স—০·৯৪৬৩৩৩ লিটার আউন্স; (বৃটিশ)—০·০০৬২৫ গ্যালন—২৮·৪১৩০ কিউবিক (সেণ্টিমিটার); আউন্স (আমেরিকান)—১।১৬ পাইন্ট—০·০২৯৫৭২৯ লিটার—২৯·৫৭৩৭ কিউবিক সেণ্টিমিটার; হন্দর (বাজার ওজন মাপ—ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা)—১১২পাউণ্ড (লং), ১১০ পাউণ্ড (শর্ট); ষ্টোন (বৃটিশ)—১৪ পাউণ্ড—৬·৩৫০ কিলোগ্রাম; টন (শর্ট)—২·০০০ পাউণ্ড—৯০৭·১৮৫ কিলোগ্রাম; টন (লং)—২২৪০ পাউণ্ড—১০১৬·০৪৭ কিলোগ্রাম; পশুরি (দেশীয় ওজন)—৫ সের বা ৪০০ তোলা; ইংরেজী এল (বস্ত্রের দৈর্ঘ্য মান)—৫ কোয়ার্ট; নেল (বৃটিশ)—২·২৫ ইঞ্চি, ৫·৭১৫ সেণ্টিমিটার; কোয়ার্ট—৪ নেল বা ৯ ইঞ্চি; গিরা (দেশীয়)—৩ অঙ্গুলি; ফার্লং (দৈর্ঘ্য বা বৈথিক মান)—১।৮ মাইল—৪০ পোল—৬৬০ ফুট—২০১·১৬৮ মিটার; ফুট—১২ ইঞ্চি—০·৩০৪৮ মিটার; বিঘৎ বা বিতস্তি (দেশীয়)—৩ মুষ্টি বা ১২ অঙ্গুলি; ফ্যাদম (সমুদ্রের গভীরতা মাপের জন্য ব্যবহৃত)—৬ ফুট; নটিক্যাল মাইল (সমুদ্রের উপর দূরত্ব মাপিবার জন্য ব্যবহৃত)—৬০৮০ ফুট; মাইল—১৭৬০ গজ—৫২৮০ ফুট—১·৬০৯৩৫ কিলোমিটার; মাইল (নটিক্যাল)—৬০৮০·২ ফুট—১·৮৫৩২৫ কিলোমিটার; পেনিওয়েট (স্বর্ণাদির ওজন ও মাপ—ট্রয়)—২৪ গ্রেণ, ০·০৫৪৮৫৭ আউন্স (মার্কিণ)—১·৫৫৫১৭ গ্রাম; পাউণ্ড (এভরডুপয়েজ)—৭০০০ গ্রেন—৩৯ তোলা (প্রায়); তোলা (দেশীয়)—১২ মাষা—৬ রতি বা ১৬ আনা—১৮০ গ্রেণ (ট্রয়); পাউণ্ড (ট্রয়)—৫৭৬০ গ্রেন—৩২ তোলা; একর (ক্ষেত্রমান—ইংল্যাণ্ডীয়)—৪৮৪০ বর্গগজ—৩ বিঘা ৮ কাঠা; রুড—১।৪ একর ১২১০ বর্গগজ—১০·১১৭ বর্গ ডেকামিটার রোম—২০ ফুট ৬·০৯৬০ মিটার; বিঘা (দেশীয়)—৬৪০০ বর্গ-হাত—২০ কাঠা; কাঠা—৩২০ বর্গ হাত—৭২০ বর্গ-ফুট; ইত্যাদি।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিশেষতঃ বিশ্ব যখন ক্রমেই একান্ত নিবিড়, সেই অবস্থায় ওজন ও মাপের এই ধরণের বিভিন্নতা বা পার্থক্য থাকা আদৌ কাম্য হতে পারে না। যুক্তির দিক হতেও এই জাতীয় পৃথক ব্যবস্থা বা পদ্ধতি আধুনিক যুগে অচল। সেইজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এর ব্যাপক সংস্কার না হলেই নয়। সহজ কথায়, সারা বিশ্বে ওজন ও মাপের ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন পদ্ধতি গৃহীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে নির্মীয়মান আগ্রাস্থিত দয়ালবাগ মন্দিরের একটি অংশের আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হ'ল। ছবিটি শ্রীনির্মলচন্দ্র মিত্র কর্তৃক গৃহীত।

উদয়ভানু

আগুনের বন্যা বইছে দিকে দিকে। লেলিহান শিখা, সর্পফণার মত থেকে থেকে ছোবল মারে। কোটি কোটি লকলকে জিহ্বা-বিস্তার করেছে বাতাস। তপ্ত হাওয়ার একটা একটা অশান্ত ঘূর্ণীঝড় উঠলো এখানে সেখানে, মাটি থেকে উর্দ্ধমুখে। জাত-সাপের ছোবল যেন, দেহ ঝলসে যায়। অঙ্গে যেন জ্বালা ধরে, গরম লোহার ছাঁকা লাগে। রৌদ্র-দাহের ঘামজলে মানুষ সিদ্ধ হ'তে থাকে। সেঁকে যায়, চাটু'তে রুটির মত।

বৈকালী সূর্য্যের আলো পড়েছে জমিদার কৃষ্ণরামের প্রশস্ত কপালে। গঙ্গাতীরের জলা-জঙ্গলের অগণিত বাধা ভেদ ক'রে এসেছে এক ফালি আলো। পড়ন্ত বেলা, তবুও রোদের তাপে এখনও আগুনের ছোঁয়া। লাল-চন্দনের জয়তিলক, রক্তজবার মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলোর আভায়। কৃষ্ণরামের ললাট যেন দপ্‌দপ্‌ করছে জ্বরের রোগীর মত। শত্রুপক্ষীর বহরা, দেখতে দেখতে বহু দূরে এগিয়ে গেছে। বুদ্ধির পরাজয়ের লজ্জায় কৃষ্ণরাম কেমন যেন অস্থির হয়ে আছেন। বহরা পালিয়ে যাবে চোখে ধূলা ছিটিয়ে, ভাবতে পারেন না যেন। দুই হাতের বজ্রমুষ্টি শিথিল হ'তে চায় না।

মাথা-উঁচু কয়েকটি দেবদারু গাছ, কাছাকাছি মাথা তুলেছে আকাশে। গাছের শাখায় শাখায় জমিদারের মাচা বাঁধা। বাঁশের কেল্লা, হোগলার ছাউনিতে ঢাকা। মখমলের চাদর বিছানো ফরাস, যেন কণ্টকশয্যার রূপ ধারণ করে।

কোঁস-ফোঁস শব্দ আসে কোথা থেকে? শোকার্ত নারীর অস্ফুট কান্নার মত শোনায় যেন। অতি কাছে এসে ছায়ার মত অদেখা থেকে কাঁদছে কি কেউ! দেখা যায় না চোখে, তবে হয়তো কোন প্রেতাত্মা আপন পাপের ফল ভোগ করছে। অতৃপ্ত অশান্ত আত্মা কেঁদে কেঁদে ফিরছে এই বনে বনে। পরলোকের পথ রুদ্ধ তার কাছে, তাই মর্ত্যলোকে আছে এখনও, মরণের পরেও।

সহসা কোষ থেকে অসি মুক্ত করলেন কৃষ্ণরাম। খাতব ঝননে জমিদারের সহচরবৃন্দ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কৃষ্ণরাম ডান হাতে ধরলেন না অসি, বাম হাতে ধরলেন! ঠিক বিদ্যুতের বেগে অসি চালনা করলেন একবারি, মাত্র একবার। তৎক্ষণাৎ একটি বিষধর কালকেউটের লম্বমান দীর্ঘদেহ মুহূর্তমধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়। দেবদারুর একটি শাখায় সর্পের এক অংশ পাকে পাকে জড়ানো, ছিন্নাংশ মাটিতে পড়লো। মাটিও যেন শিহরণ খেলে একবার। চকিতের মধ্যে

দেবদারুর শাখায় জড়ানো অংশ সজীব চঞ্চল! এখনও যেন এক রহস্যময় বক্র চতুরালির ঝিলিক খেলছে কালকেউটের চোখে। ফণা তুলছে ঘন ঘন। অসির ঘা খেয়ে দ্বিখণ্ড, তবু শেষবারের মত প্রতিশোধের চরম ইচ্ছা প্রকাশ করছে।

কৃষ্ণরাম দেখলেন, রক্ত ঝরছে সর্পদেহ থেকে। কৃষ্ণ-লাল রক্ত, পলাশ ফুলের মত ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে। আঘাতের যন্ত্রণায় বিস্ফারিত ফণা লুইয়ে পড়ছে নির্জীবতায়।

—কালনাগিনীর কাল ঘনিয়ে এসেছে! কথা বললেন জমিদার কৃষ্ণরাম, কেমন যেন নিস্পৃহ কণ্ঠে। খানিক থেমে থেকে আবার বললেন,—চল, এই স্থান ত্যাগ করা যাক্‌। কথার শেষে অসি কোষে ভরলেন। বললেন,—আমার দূরবীণ, বন্দুক আর বারুদের আধার নীচে নামাও।

নীচে, দেবদারুর ছায়ায় জমিদারের বাহিনী। পাইক, পেয়াদা, লাঠেল আর তীরন্দাজ। সব সমেত পঞ্চাশ জন হবেতো। ঢাল, তরোয়ালের তোলাপাড়া শুনে ঘোড়াগুলো পা ঠুকছে মাটিতে। কৃষ্ণরাম অশ্বারোহণে এসেছেন সদলে—সপ্তগ্রাম থেকে বংশবাটিতে, গঙ্গার তীরে।

রাশের বাঁধন যেন মানতে চাইছে না আর। ওষ্ঠমুখ ঘষছে বুকের কাছে, গ্রীবা বাঁকিয়ে। সুসজ্জিত অশ্ব, যন্ত্র-তন্ত্র ছড়িয়ে আছে। গাছের শাখায় কাণ্ডে রাশের দড়ি বাঁধা। পা ঠুকছে ঘন ঘন, আর নাকে-মুখে শব্দ তুলছে অধৈর্য্যের। গতিশীল পশুর দলও বুঝেছে, শত্রু পালিয়ে গেছে হাত-নাগালের বাইরে। পা ঠুকছে মাটিতে।

বাঁশের সিঁড়ি, মাচা থেকে মাটিতে নেমেছে। সেই মই বেয়ে নীচে নামলেন কৃষ্ণরাম। তাঁর মুখাকৃতি অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। চোখের দৃষ্টিতে বিরক্তির চাউনি। এধার-সেধার দেখতে থাকেন, কাকের যেন খুঁজতে থাকেন। বললেন,—লোক-লস্কর কোথায় সব?

—হাজির আছে হুজুর! দল-নায়ক কথা বললে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে। বললে,—এখন কি হুকুম তাই বলেন।

—যাত্রা করতে হবে এখনই। কৃষ্ণরাম বললেন সকলকে শুনিয়ে, জোরালো কণ্ঠে। বললেন,—পাততাড়ি গুটাও, আর বিলম্ব নয়। আমার অশ্ববাহন কৈ, কোথায়?

পাইক-পেয়াদার দলপতি ঘোড়ার রাশ ধ'রে এগিয়ে আসে। ধূসর-সাদা রঙ, নানা চর্ম্মসজ্জায় ঢাকা পড়েছে। কৃষ্ণরামকে চোখে দেখতে পেয়ে ঘোড়াটি সোল্লাসে পা ঠুকতে থাকে। ঘণ্টীর মালা ঝুনঝুন শব্দ তোলে। কৃষ্ণরাম ব্যতীত অন্য কাঁকেও সওয়ার হ'তে দেয় না সে।

দলপতি বললে,—বেলা আর নাই বললেই হয়। যেথাতেই যান না কেন পৌঁছাতে রাত কাবার হবে জানবেন। পথে বিপদের ভয় আছে।

—তা হোক। আমার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, তা আমি চাহি না। কথা বলতে বলতে কৃষ্ণরাম লাগামে পা দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসলেন।

—ভেবে দেখেন হুজুর! পথের কষ্ট স্মরণ করেন। নায়ক ভয়ে ভয়ে কথা বলছে।

কৃষ্ণরাম বললেন,—তা হোক, বজরাকে ধরতেই হবে। কাশীশঙ্করের ধূর্তামির সমুচিত জবাব দিতে চাই। আর সময়ক্ষেপ নয়।

দলপতি কি যেন ভাবতে থাকে। ভেবে ভেবে বললে,—বজরাকে ধরা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। দুই চার ক্রোশ ঘোড়া ছুটালেই বজরার পাত্তা মিলবে। তবে হুজুর, রাত-বেরাতে কাজ হবে কি?

আবার আলো-প্রদীপের আলো দেখতে পাওয়া যায় যেন। জমিদার কৃষ্ণরাম ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বললেন,—তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে তুমি নিশ্চয়ই পুরস্কৃত হবে। আমার বাহিনীকে হুকুম দেও, আমাকে অনুসরণ করুক।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কখন কৃষ্ণরাম অশ্বে কশাঘাত করলেন। তীরবেগে ছুটলো ঘোড়া। কাল-বৈশাখী মেঘের মত, জমিদার এক রুদ্রমূর্তিতে পথ-প্রান্তর অতিক্রম করেন। অশ্বখুরোত্থিত ধূলিরাশিতে গগনমণ্ডল যেন সমাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। অশ্বের পদশব্দ, অস্ত্রশস্ত্রের ঝনৎকার, লেঠেল আর তীরন্দাজের হুঙ্কারধ্বনির সঙ্গে মিশে বনাঞ্চলে যেন এক বিভীষিকা সৃষ্টি করে। কৃষ্ণরাম প্রভঞ্জন-বেগে অশ্ব ছুটিয়েছেন। তাঁর পিছনে ছুটেছে তাঁর অশ্ববাহিনী, রণসজ্জায় সজ্জিত।

ধ্রুবতারাকে লক্ষ্যে রেখে জলযান যেমন অগ্রসর হয়, তেমনই কাশীশঙ্করের বজরাকে লক্ষ্য করে অশ্বারোহীরা যেন বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে চলেছে। রাত্রি আর যৎসামান্য ঘন হ'লেই বজরা আর দৃষ্টিগোচর হবে না।

গ্রাম, জনপদ, জলা আর জঙ্গল একে একে অতিক্রান্ত হয়। ভয়ার্ত জনপদবাসী সভয়ে সরে দাঁড়ায় পথের পাশে। অশ্বপদতলে পিষ্ট হওয়ার ভয়ে।

কৃষ্ণরাম সমরকৌশলী। কিন্তু আজ যেন তাঁর কলাকৌশল আর টিঁকে না। অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনায় তিনি সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ। হাত নিশপিশ করে, কিন্তু সাক্ষাৎ নাই যে প্রতিপক্ষের!

সাঁঝের আলো-আঁধার আকাশপ্রান্তে। বিদায়ী সূর্য্যের লালিমা ছড়িয়েছে গঙ্গার বুকে, মানুষের মুখে, বৃক্ষের চূড়ায়, গৃহস্থের গৃহশীর্ষে। যেন মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্রুতগতিতে বজরা ভেসে চলেছে। গানের সুরের মত, কাব্যছন্দের মত, সমানে তাল তুলছে বজরার মাল্লাদের হাতে, সারি সারি হাল। দেশীয় মত পান ক'রেছে মাঝি-সর্দার। সুরার প্রতিক্রিয়ায় তার মুখাকৃতি লাল হয়ে আছে। কারণে অকারণে হাসাহাসি করছে আর হাতে চাবুকের পাক দিয়ে চলেছে, মাঝিদের মাথার 'পরে। ক্ষণেকের অমনোযোগে চাবুকের আঘাত পড়বে পিঠে। লম্বালম্বি আঘাত-চিহ্ন ফুটে উঠবে তখনই। রক্তধারা ঝরবে ঘর্ম্মাক্ত পিঠ থেকে। দু'জন মাল্লা পূর্ব্বেই কৃষ্ণরামের বন্দুকে বিদ্ধ হয়ে গঙ্গালাভ করেছে।

কাশীশঙ্কর একটি স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। বললেন,—জগমোহন, আর কোন বিপদাশঙ্কা নাই তো?

লেঠেল জগমোহন, কুমারবাহাদুরের স্কন্দ-প্রতিম ও মনোমুগ্ধকর দেহ দলাই মলাইয়ের কাজে লেগেছে। গৃহসুখ নেই বজরায়, দেহে যেন ব্যথা অনুভব করেন কাশীশঙ্কর। আরামের শয্যা কি বস্তু, যেন ভুলে গেছেন রাজকুমার।

খানিক নিশ্চুপ থেকে জগমোহন বললে, বলা কি যায় রাজামশাই, কখন কি হয়। জমিদার কৃষ্ণরামের যে কি অভিসন্ধি কে বলতে পারে! পুনরায় যদি আক্রমণ চালায় নদীর তীর থেকে! যতক্ষণ না রাত্রি গভীর হয় ততক্ষণ আমার ভাবনা ঘুচবে না। রাত্রিকালে বজরাকে দেখা যাবে না তীর থেকে। বন্দুকের গোলা আর ধনুকের তীর ফসকে যাবে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

—রাত্রির দেরী কত আর? আকাশে চোখ তুলে বললেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—মধ্যে মধ্যে মনে হয় দিবারাত্রের গতি যেন নাই আর। দুঃখের রাত্রি কি শেষ হয় শীঘ্র?

জগমোহনের মুষ্টির মধ্যে বন্দী কাশীশঙ্করের পেশীসমূহ। ব্যথা ধরছে যখন তখন, তাই জগমোহনকে ডেকে বলেছেন,—জগমোহন, আর যে পারি না। এই ক'দিনের অনিয়মে দেহ যে বিকল হ'তে চায়।

জগমোহনের মুখে ঈষৎ হাস্যরেখার ঝিলিক ভাসলো। বললে,—সবুর করেন মশায়, বিলকুল আরাম হয়ে যাবে। ব্যথা মেরে দেবো।

—তাই দেও জগমোহন। কাশীশঙ্কর যেন নিরুপায়ের মত কথা বললেন। বলেন,—হাত পা যেন অচল হয়ে আছে।

কুস্তীর প্যাঁচ কষছে যেন জগমোহন। মল্লের মত কুমারবাহাদুরের বলিষ্ঠ দেহটার সঙ্গে যেন লড়াই করছে। কুমারের গা টিপছে সজোরে, সযত্নে। পিঠে কনুইয়ের গোঁত্তা মারছে ঘন ঘন। নিজের দুই জানুতে পিশে ধ'রেছে কাশীশঙ্করের কটিদেশ—দুই পাশ থেকে।

বজরার এক কক্ষমধ্যে সাধিকা তপস্বিনীর মত রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী যেন ধ্যানে বসেছেন। তিনি যেন মলিন ও কৃশ হয়ে পড়েছেন। যে মুখখানি সদাক্ষণ হাসিতে উৎফুল্ল থাকতো, তা এখন বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন। তাঁর মনের সুখ বিনষ্ট হয়েছে, বিলাস বিভ্রমকে তিনি ত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবনের কালরাত্রি কি শেষ হবে না! চিন্তাস্রোতে মগ্ন হয়ে আছেন রাজকুমারী। তাঁর অধর থেকে থেকে কাঁপছে।

—তোমার মঙ্গল হোক জগমোহন! কাশীশঙ্কর বললেন, ব্যথা লাঘবের আরামে। দেহকষ্ট সত্যই যেন দূর হয়ে যায়। আলস্য ভঙ্গ হয়। পুনরুজ্জীবনের মন্ত্র পড়ে যেন জগমোহন। কুমারবাহাদুর আবার বললেন,—জগমোহন, নির্বিঘ্নে পৌঁছাবো কিশুতাহুটিতে?

—ঈশ্বর জানেন! লেঠেল আকাশের দিকে চোখ-ইশারা

দেখিয়ে বললে। বললে,—কুমারবাহাদুর, যতক্ষণ না সুতানুটির মাটি দেখতে পাই ততক্ষণ বলা কি যায় কিছু ?

—বিন্ধ্য কোথায় ? আপন মনেই শুধোলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—সে এমন লুকিয়ে আছে কেন ? কি করে কি ? কে জানে !

—মনের কষ্টে হুজুর ! রাজকুমারী কি আর সুখের মুখ কখনও দেখেছেন। তাঁর ভাগ্যটাই যে পুড়ে গেছে বিয়ের রাত থেকে। জগমোহন কথা বলে সহানুভূতির সুরে। বলে,—তাঁকে কি ডাকবো কুমারবাহাদুর ? দুটা কথা কইলে তবু তাঁর মনটা খুশী হয়।

চিন্তালু চোখে তাকিয়ে থাকেন কুমারবাহাদুর। ভেবে ভেবে বললেন,—তাই হোক। সে আসুক এই ছাদে। ভাবনা চিন্তার কি শেষ আছে মানুষের !

প্রসন্ন হাসি হাসলো জগমোহন। বীর হনুমানের মত লাফ দিয়ে দিয়ে বজরার ছাদ থেকে নামতে থাকে সে। ডাক দেয় রাজকন্যাকে। বলে,—রাজকন্যা, বলি ও রাজকন্যা ! ভাই যে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে পড়ছে।

মুখে অকৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে দুয়োরে দেখা দিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। নীরব সাড়া দিলেন যেন। স্মিত হাসির সঙ্গে বললেন,—ভাই আমাকে ডাকছে কেন জগমোহন ? কিছু ভয়ের নাইতো ?

এপাশে ওপাশে মাথা দুলিয়ে জগমোহন বললে,—না, না ভয়-ডরের কিছু নাই। কুমার ডাকছেন দু'দণ্ড কথা কইবেন।

লাজুক হাসি হাসলেন রাজকন্যা। বললেন,—এই মুখখানা আর লোকচক্ষে দেখাতে ইচ্ছা হয় না যে। পোড়াবরাত আমার।

সুবেশ, সুন্দর, প্রিয়দর্শন অথচ পৌরুষব্যঞ্জক কুমারের মূর্তি, প্রস্তরীভূত হয়ে আছে যেন। তাঁর বিশাল চোখের দৃষ্টি অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি আবদ্ধ হয়ে আছে। তপ্তরৌদ্র আর নেই, লোহিত সূর্য্য যেন দাহিকা হারিয়ে স্নিগ্ধ রূপ ধরেছে। একথালা আবীর যেন, ঝুলছে পশ্চিম আকাশের বুক থেকে। সিঁদুরে-মেঘ ছড়িয়েছে অস্তাচলে। গঙ্গার ঘোলাটে জলেও লালের আভা ঝিলমিল করছে। বকের সারি উড়ছে আকাশে। মেঘের কোলে একসারি বলাকা, ভেসে চলেছে যেন।

সন্ধ্যাকে বন্দনা করছেন কাশীশঙ্কর। আহা, রাত্রি ঘনিয়ে এসে দিগ্বিদিক ভ'রে দিক অন্ধকারে। চোখের দৃষ্টিপথ থেকে মুছে যাক লক্ষ্য। দৃশ্যমান অদৃশ্য হোক। শত্রুর চোরাদৃষ্টি ব্যাহত হোক ঘন তমিস্রায়।

ধীরে ধীরে বজরার ছাদে উঠলেন রাজকুমারী। ফরাসের এক পাশে ব'সে প'ড়লেন ক্লান্তদেহে। সামান্য হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে বললেন,—ভাই, তুমি কি অসুস্থ বোধ কর' ? বিশ্রাম লও আরও খানিক।

কাশীশঙ্কর ঘুরে বসলেন। সহোদরাকে সাগ্রহে দেখলেন কতক্ষণ। বললেন,—মুখে হাসি নাই কেন তোমার ?

অধোবদন হ'লেন রাজকন্যা। শাড়ীর অঞ্চল পাকাতে থাকেন আর বলেন,—আমার জন্য তোমার কত কষ্ট ! এতে আমি লজ্জা পাই।

হাসতে থাকেন কাশীশঙ্কর, সহোদরার কথায়। বললেন,—তুমি তো আমার ভগিনী, এমন বিপদে যে কোন নারীকে আমি এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা করতে পরাঙ্মুখ হতাম না। বিপদের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতাম।

—তুমি যে মহান। তোমার অন্তরে তো কোন খাদ নাই। বিন্ধ্যবাসিনী কথা বলেন আর অঞ্চলপ্রান্ত পাকাতে থাকেন অধোমুখে। বলেন,—ছোট বধূঠাকুরাণী কতই না ভাবছেন ! আমার জন্য নিশ্চয়ই তিনি—

হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—মহাশ্বেতা তেমন বিবেচনাহীন নয়। তোর প্রতি তার অগাধ স্নেহ ভালবাসা। তবে সে বড্ড অভিমানী, এই যা।

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—আমার কথা বাদ দেও। তুমি অক্ষত দেহে সুতানুটিতে পৌঁছালেই আমার নিশ্চিন্তা। খানিক থেমে আবার বললেন,—তোমার মেয়েটা কচি দুধের শিশু বৈ তো নয়। তার জন্য মনে আমি ব্যথা পাই ; তোমার অভাবে সেও হয়তো খুশী নেই।

মনে ছিল না আদপেই, হঠাৎ যেন মনে ভাসলো সেই কচি মেয়ের ফুটফুটে মুখখানি। টোল খায় আবার মুখে, হাসলে আর কথা কইলে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—কে ? বনলতা ? আমার বুকের ধন, চোখের মণি সে। এখন আর ঠিক শিশুটি নাই। জ্ঞান হয়েছে তার, বুদ্ধি ধরে সে। লেখাপড়া করে, সকাল সন্ধ্যায় নামগান শোনায় আমাকে। কণ্ঠ বেশ সুরেলা।

আকাশের লালিমা মুছে যেতে থাকে অতি ধীর গতিতে। শুভ্র লাল-আকাশে কালির লেপন পড়েছে। সাঁঝবেলার একটি কি দু'টি তারা ফুটেছে কখন। ঠাণ্ডা-গরম বাতাস চলেছে দক্ষিণের। দুই তীরের ঘন সবুজ বনে বনে ঢেউ খেলছে যেন। হাওয়ার বেগে। গাছের শীর্ষ নত হয়ে পড়ছে থেকে থেকে।

সন্ধ্যা মন্থরা। দিনের আলোর সঙ্গে তার চিরদিনের দ্বন্দ্ব। একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। তবুও আঁধার-কালিমা স্পষ্ট হ'তে থাকে গঙ্গার তীরদেশে। সবুজ বন কখন কালো হয়েছে কে জানে ! পর্ণকুটিরে আর দেবতার দেউলে দীপ জ্বলছে। আকাশের কয়েকটি তারা যেন খ'সে পড়েছে। কক্ষচ্যুত হয়েছে। সোনালী টিপের মত দপ দপ জ্বলছে মাটির বুকে।

সুতানুটিতেও সন্ধ্যা নেমেছে তখন। শুক্লা রজনীর চাঁদ ভেসে উঠেছে আকাশে। যেন মেঘের অবগুণ্ঠন সরিয়ে নির্লাজ চাঁদ, দেখা দেয় লোকচক্ষে। মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ-ঘণ্টা বেজে চলেছে। মসজিদের মিনার থেকে আজানের সুর ভাসছে বাতাসে।

মহাশ্বেতা দিনের শেষে গৃহচূড়ায় হাওয়া মহলে উঠে বসেছেন। বৈশাখী হাওয়ায় তার বন্ধনমুক্ত কেশদাম উড়ছে। ঢাকাই শাড়ীর পাৎলা আঁচল উড়ছে শ্বেতপতাকার মত।

বনলতা তারা দেখছে একদৃষ্টে, মুখ উঁচিয়ে। চাঁদ দেখছে অপলক চোখে। খোঁজাখুঁজি করছে হয়তো, কোথায় সেই বুড়ীটা। ঘর্ঘর চরকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলেছে চাঁদের মধ্যে একলাসঙ্গী, সুতা কাটছে হাসতে হাসতে।

মহাশ্বেতা বললেন,—বনরাণী, তুমিও আবার একদিন পরের ঘরে চলে যাবে।

কথা শুনে চমকে চমকে ওঠে বনলতা। বিষম দুঃসহ এক দুঃখ-আবেগে তার শ্বাস পড়ে না যেন। এ সব কি প্রলাপ বকছে মা! যত সব মনে কষ্ট হওয়ার কথা বলছে কেন আজ! চোখ বড় করে সে। তাকিয়ে থাকে ড্যাবা ড্যাবা চোখে। দুই সূক্ষ্ম ভুরুতে বিস্ময় ফুটেছে। বললে,—কোথায় যাবো মামনি? পরের ঘরে?

দুঃখ আর আনন্দের হাসি হাসলেন মহাশ্বেতা। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন,—বিশঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে তুমি শ্বশুরঘরে যাবে। কত বাজনা বাজবে, বাজী পুড়বে, সঙ নাচবে। আলো জ্বলবে কত, তার কি কিছু ঠিক আছে!

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে? বাবামশাই? অবাক চোখে বললে বনলতা। কেমন যেন কাঁদো-কাঁদো গলায়। ঠোঁট ফুলে উঠলো একবার।

কালো পশমের মত চুল বনলতার মাথায়। মাতৃস্নেহের স্পর্শ পেয়েছে। মহাশ্বেতার শুভ্র নিটোল করপল্লব, মেয়ের কোঁকড়া চুলের রাশিতে।

—আমরা কেন যাবো তোমার ঘরে ঘর করতে? বুকের কাছে মেয়েকে টেনে নিয়ে মিষ্টি সুরে মহাশ্বেতা বল্লে। বললেন —তোমার ঘরে তুমি যাবে। তুমি থাকবে। সংসার করবে।

কাজলপরা চোখ, ছলছলিয়ে ওঠে। বনলতা একবার যেন ফুঁপিয়ে উঠলো। কথা ফুটছে না মুখে। ভয় আর ভাবনায় যেন জড়সড় সে।

কন্যা যাবে শ্বশুরালয়ে। বসবাস সহবাসে অধিষ্ঠাত্রী থাকবে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী তনয়া, ঘরে ঘরে লক্ষ্মীশ্রী বর্দ্ধিত করবে। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর ঘর ত্যাগ করবে। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসবে। নিয়ম পালনের আর সুখ-সুবিধার জন্যে সিঁথিতে সিঁদুর দেবে নামমাত্র!

মহাশ্বেতার মন যেন সায় দিতে চায় না। ভাল লাগে না যেন ভাবতে, শুধু কেবল নামের আয়তী হয়ে থাকা। মুখে প্রকাশ করতে পারেন না কোন দিন। বলতে পারেন না মনের কথা কারও সমুখে। যাঁর ভগিনী তাঁকেও নয়। কাশীশঙ্কর স্নেহের আতিশয্যে আর বিন্ধ্যবাসিনীর অসহ অবস্থার কথা শুনে যেন চোখ কানে আর দেখতে পেলেন না। এক জিদের বশে উদ্ধার ক'রে গেলেন বোনকে।

ভবিষ্যৎ কেউ জানে না। বনলতার চোখে থাকবে এই ঘরছাড়ার আদর্শ। ছুতো আর অছিলা। জলজ্যান্ত নজীর একটা।

বনলতার চিন্তার যেন শেষ নেই। যেন এখনই সে শ্বশুরঘরে চললো। এমনই ব্যথাভারাক্রান্ত মুখ হয়েছে। সরাসরি জিজ্ঞাসা ক'রলো,—বাবামশাই কবে আসবেন মা?

বুকের এক বন্ধ কপাট যেন উন্মোচিত হয়। মেয়ের সঙ্গে কথায় আলাপে ভুলে ছিলেন খানিক। থমকে থেকে বললেন মহাশ্বেতা,—কাজ ফুরালেই আসবেন তিনি।

—পিসী আসবে সঙ্গে? আর একটা প্রশ্ন ক'রলো বনলতা।

সহসা হাঁ না কিছুই বলতে পারেন না মহাশ্বেতা। গম্ভীর হয়ে উঠলেন যেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সহাস্যে বললেন,— হাঁ আসবে বৈ কি।

—পিসী আসবে! পিসী আসবে! হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাততালি দিতে থাকে বনলতা। ঘর-সংসারের প্রসঙ্গ ভুলিয়ে দিতে চায় যেন! উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। বল্লে,—যাই, দাই আর দাসীদের শুনিয়ে আসি।

কথা বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে যায় মেয়ে। তার পায়ের তোড়া ঝমঝমিয়ে বেজে চললো পায়ে পায়ে। হাওয়া মহল থেকে এক ছুটে পালিয়ে যায় উড়ন্ত পরীর মত।

নিজ মনে হাসলেন মহাশ্বেতা। কেউ নাই, তবুও হাসি কেন কে জানে! যেন অব্যক্ত, অস্ফুট। ধীরে অতি ধীরে সেই না-ফোটা হাসি রাঙা অধর থেকে অদৃশ্য হ'তে থাকে! এখন তিনি একা। যতদূর চোখ যায়, কেউ নাই কোথাও।

ওপরে সন্ধ্যাকাশ। সমুখে পাশে পিছনে দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী। কোথাও বা খড়ের চালা, মাটির ঘর। বসতি বা বস্তী। নারকেল গাছের পাতার আড়ালে চাঁদ উঠেছে কখন। পূর্ণিমা কাছে, চাঁদের শোভায় কেমন যেন পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়েছে। আঁধারের আবেশে, কালোমেঘের কুন্তলরাশি ছড়িয়ে হাসছে যেন কার মুখচন্দ্র। আজ আবার চাঁদের চতুর্দ্দিকে বলয় দেখা দিয়েছে। সোনালী কুয়াশা ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে। জ্যোৎস্নালোক ছড়িয়েছে গাছের শিখরে।

শুক্লারজনীতে একা মহাশ্বেতা। শয্যা আজ কণ্টকশয্যায় পরিণত হবে। অদৃশ্য আলিঙ্গনের স্পর্শ নেই, কল্পনাই সার।

ঠিক এই মাত্র রাজগৃহের নাটমন্দিরে সন্ধ্যারতির শাঁখ-ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঘড়ি-ঘণ্টা আর জগঝম্প বাজতে থাকে ঢিমে তেতালায়।

শ্বেতপ্রস্তরের আসন ছেড়ে উঠলেন মহাশ্বেতা। কপালে দুই হাত ছোঁয়ালেন। হাওয়া-মহলের নির্জ্জনতা ছেড়ে চললেন।

বৈকালী এসেছে এতক্ষণে, নাট-মন্দির থেকে। দেবীর বৈকালিক ভোগ এসেছে। আজাড় করতে হবে নৈবেদ্য-আধার। তারপর যেতে হবে রাজমাতার কাছে। দেখা দিতে যেতে হবে। রাজমাতার মহল থেকে ফিরতে ফিরতে রাত্রি ঘনিয়ে আসবে হয়তো।

ওপাশে রাজমহল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। সাড়াশব্দ নেই। মনুষ্যকণ্ঠের স্বর শোনা যায় না। রাজাবাহাদুর এখনও দিবানিদ্রায় ডুবে আছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, রাজা কাশীশঙ্কর জানেন না।

দিনে নিদ্রা, রাত্রে জাগরণ। কেমন যেন বল্গাহীন মন রাজার; শক্তি-মাদকতার ক্রীড়াপুতুল। অতিরিক্ত লালসায় তাঁর ন্যায়পরতা ও সুবুদ্ধি যেন লুপ্ত হ'তে চলেছে।

রঙমহলে আজ আবার কে বা কার! প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। তার নিদ্রা ভঙ্গ হবে কতক্ষণে, সেই আশায় মুহূর্ত গুণছে।

অপ্সরীনিন্দিতা কে একজন। জাতকুল কেউ জানে না। পুরের ফুলবাগান থেকে এসেছে একটি ফুল। রূপে রসে গন্ধে অনমীয়া একজন। রাতটুকু রাজার কাছে কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে চ'লে যাবে সে। রঙমহলে আলো জ্বলেছে যেন একশো বাতির। রূপের আলো। রাজার তোষামুদে সঙ্গীরা মধুলুব্ধ মৌ যেন। তাদের চোখের পলক পড়ছে না।

ফুলকে আস্বাদ করবেন স্বয়ং কালীশঙ্কর। দ'লে পিষে দেবেন। বাসিফুলের আর কোন মূল্য থাকবে না আগামী দিনে, রাজার কাছে।

এমন কেউ নেই এ দুনিয়ায়, যে রাজার ঘুম ভাঙাবে। কালীশঙ্করকে তুলে দেবে এই অবেলার ঘুমঘোর থেকে। টানা-পাখা চলেছে রাজার কক্ষে। অবিরাম, অবিশ্রান্ত। ঘরে যেন ঝড়ের হাওয়া বইছে। সুগন্ধের ঢেউ খেলছে ঘরে, খসখস আতরের।

বড়রাণী উমারাণী কক্ষে প্রবেশ করলেন শব্দহীন পদক্ষেপে। ঘুম-ভাঙানিয়া তিনি, রাজাকে ডাকলেন মৃদুমন্দ সুরে। বললেন,—আর কত ঘুমাবেন আপনি? কথা বলতে বলতে রাজার কপালে হাত রাখলেন অতি সন্তর্পণে। বললেন,—রাত্রির বাকী নেই আর! শয্যা ত্যাগ করবেন না?

রাজাবাহাদুর চোখ মেলার সঙ্গে বড়রাণীকে দুই বাহুতে টেনে নিলেন বুকের কাছে। নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন ঘুমের জড়তায়। বললেন,—ছোটকুমারের কোন সংবাদ নাই?

—না রাজাবাহাদুর! আমি তো শুনি নাই কিছু। উমারাণী বললেন রাজার সুপ্রশস্ত বুকে মাথা রেখে। বললেন,—আজ রাতে কি আর সাক্ষাৎ হবে? তেমন আশা আছে কি?

কালীশঙ্কর মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। বলেন,—আপাতত বলতে পারি না। সাক্ষাৎ না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কেন কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?

—নাঃ। একটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উমারাণী রাজার পালঙ্ক ত্যাগ করলেন। উঠে দাঁড়ালেন। চোখে অভিমানের চাউনি ফুটিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে। সোজা ছাদে চললেন তিনি। শূন্য ছাদে একা থাকবেন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত। মনের কষ্টে গুমরে গুমরে মরবেন। বিরহ-বেদনাকে দূর করবেন। আবেগ-উত্তপ্ত দেহকে শুক্ল মনে থেকে স্নিগ্ধ করবেন।

মেজ আর ছোট রাণীর মহল থেকে সপ্ততারের গুঞ্জন-ধ্বনি ভেসে আসছে। সেতার না বীণ কে জানে, বেজে চলেছে টুং-টাং। সান্ধ্য-সুরের একটা ক্ষীণ স্রোত ভাসছে বৈশাখের মত্ত হাওয়ায়। অন্ধকারে, অদৃশ্য নর্ত্তকী নেচে চলেছে যেন অনেক দূরে।

রাজার গলা-খাঁকারির আওয়াজে খানসামা এসে তুলে দেয় তাঁকে। একটি হাত ধ'রে টেনে তোলে ঘুম-কাতর কালীশঙ্করকে। টেনে তুলে বসিয়ে দেয় রাজাকে।

দু'টা আলস্য ভেঙে কালীশঙ্কর অসংলগ্ন পদক্ষেপে স্নানাগারের দিকে এগিয়ে চললেন। জলের সংস্পর্শে নিদ্রার ঘোর দূর হয়ে যাবে। যেতে যেতে বললেন,—কালীশঙ্করের সমাচার আছে কিছু?

খানসমা আর চোবেদারের দল নেতিবাচক উত্তর দেয়। না না, না, না। কুর্ণিশ করে আর মাথা দোলায়।

স্নান-ঘর থেকে ফিরেই রাজাবাহাদুর সাজ-পোষাক করবেন।

রাজার সাজঘরে পুষ্পসারের পাত্র নামানো হয়। চন্দনতৈল বের করলো রাজভৃত্য। আতরের শিশিগুলিতে সোনালী টিপ ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় চিকচিক করে। রাজার মাথায় তৈল মাখা চললো খানসামা।

হাতীর দাঁতের পেটরা বেরুলো কাঠের সিন্দুক থেকে। রত্নাভরণের পারিপাট্য ঝলসে উঠলো আলোয়। লাল মুক্তার পাঁচনরী, লকেট ঝুলছে হীরা-পান্নার। একখানি রৌপ্যথালিকায় আংটির স্তূপ বিভিন্ন মণি-রত্নের।

বারোমাসা আতরের একেক সুগন্ধ ভুরভুর করে রাজার মহলে। কেশর-কস্তুরী আর মনপছন্দ, সুগন্ধির হাওয়া বইতে থাকে দালানে আর কক্ষে। হাসনুহানার গন্ধ-আবেশে ঘুম-ঘুম পায়।

দ্বারপ্রান্তে চাপরাশী দাঁড়িয়ে আছে মাটির পুতুলের মত। কোমরবন্ধের এক প্রান্তে ঝুলানো তলোয়ার। চোগা আর চাপকান পরেছে। পায়ে লপ্টোয়ের জরিদার নাগরা।

বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত রাজার পরিচ্ছদ, সাজঘরের জাজিমে জৌলুশ তুলছে। বাগাসে দোদুল্যমান আলোয় কালীশঙ্করের বেশভূষা হেসে হেসে উঠছে যেন। কিংখাপের বুটিদার বেনিয়ান আকাশী রঙের। কালো ফুলপাড় ঢাকাই ধুতি পাতলা নরম সুতার। সাদা আলপাকার উড়ানিতে একটা বিশরতি হীরার ধুকধুকি, সাদা পালকের সঙ্গে এঁটে আছে।

রাজার বসন আর ভূষণের প্রভাদীপ্তিতে সাজঘর যেন সদাই ঝল ঝল করছে। চার দেওয়ালে চারটে আয়না টাঙানো। প্রসাধন পাত্রে কাজলাঞ্জন-সুর্মা, চন্দন আর শাঁখের গুঁড়ি। হাতীর দাঁতের চিরুণী। গোলাপজল গোলাপপাশে।

সাজ-পোষাকের পালা চুকিয়ে একবার রাজমাতা বিলাসবাসিনীর দুয়ারে দেখা দিতে যাবেন রাজাবাহাদুর। তার পর? তার পর সোজা রঙমহলে যাবেন দোল-বেদীতে চেপে।

চিৎপুরে ফুল-বাগান থেকে একজন ডানা-কাটা পরী এসেছে আজ রাতে। ডাকসাইটে সুন্দরী কে একজন, আঁট গড়নের।

রাজমাতা জপের মালা গুণছিলেন দেব-দেবীর নামে। কি এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে বিলাসবাসিনীর। দিন-রাত্তির মালা জপছেন আপনমনে।

মহাশ্বেতা কক্ষে প্রবেশ করলেন ধীর পদক্ষেপে। গৌরবর্ণ পরেছেন দুধে-আলতা রঙের। রাজমাতার পায়ের কাছে গড় করলেন মহাশ্বেতা। বললেন,—রাজমাতা, আমি এসেছি।

—কে মা তুমি? কথার শেষে মুদিত চক্ষু খুললেন। দুটি প্রতিমার মত আকর্ণ চোখ বিলাসবাসিনীর। সস্নেহে বললেন,—মেজো মা! এসো আমার কাছে, এই পাশটিতে আসন নাও।

—মান্দারণ থেকে কেউ ফিরলো রাজমাতা? সলজ্জায় শুধালেন মহাশ্বেতা, যেন ঈষৎ নির্লজ্জ হলেন চিন্তাধিক্যে।

বিলাসবাসিনী হাসলেন সামান্য, নিষ্কলুষ সহজ সরল হাসি। বললেন,—কেউ ফিরলে তোমাকে জানাবো না মা? সে কি একটা কথা হতে পারে। খানিক থেমে বললেন,—আমিও তো ছেলের পথ চেয়ে ব'সে আছি আর নামজপ করছি।

—কাজ মিটলে তিনি বৃথা দেরী করবেন না, তেমন মানুষ নন। অধোমুখে কথা বললেন মহাশ্বেতা।

আবার তেমনি হাসলেন রাজমাতা। বললেন,—তুমি তো সবই জানো, কালীশঙ্করকে তোমার মত কে আর জানে! আমার

পেটে-ধরা সেই ছেলেটা এখন ফিরলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। মেয়ের যা হয় তা হোক্‌গে।

—তা বললে কি হয় রাজমা? তিনিও আসবেন, বিদ্ধ্যও আসবে। মহাশ্বেতা বললেন প্রত্যয়ের সুরে।

কি এক কথা যেন হঠাৎ মনে পড়লো বিলাসবাসিনীর। জপের মালা রেখে দিয়ে বললেন,—জানলে বৌ, একটা মন্তর বলে দিই তোমাকে। সোয়ামীর কল্যাণ হবে। মন্তরটা শুনে নিয়ে যাও, আওড়াও। ঘর-দোর ফেলে এসেছো ভরা সন্ধ্যায়, ঘরের বৌ ঘরে ফিরে গিয়ে আগলাও। মেয়েটা কোথায়?

—তাকে আর সঙ্গে আনা হ'ল না। সে সেখানে আছে। মহাশ্বেতা বললেন কেমন যেন অন্যমনে। বললেন,—মন্তরটা বলুন আপনি।

বিলাসবাসিনী বলতে থাকেন,—

পাকা পান মস্তমান,
আমার স্বামী নারায়ণ।
যখন যাবে রণে,
নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে।

মনের মধ্যে ছড়াটি যেন লিখে নিতে থাকেন মহাশ্বেতা। মনে মনে আওড়াতে থাকেন। স্বামীর কল্যাণ হবে, নিরাপদে ফিরে আসবেন তিনি। একবার, দু'বার, তিনবার, বার বার নীরব উচ্চারণে ছড়াটি যেন নিজের মনকে শুনিয়ে চলেন। নারায়ণের চক্রধারী মূর্ত্তি ভাসে চোখে। নীলবর্ণ নারায়ণের, বাসন্তীবর্ণের পরিধেয়। মহাশ্বেতার নধরনরম কক্ষমাঝে বন্দী হয়ে যায় বাঙলা দেশের একটি পুরানো ছড়া। তিনি রাজমাতার কুঠরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ঘর-দোর ফেলে এসেছেন। একমাত্র মেয়েটাকে রেখে এসেছেন।

দালানে বেরুতেই এক ঝলক বাতাস কোথা থেকে উড়ে আসে। মহাশ্বেতার মুখে-চোখে শান্তির প্রলেপ মাখিয়ে দিয়ে যায় যেন! রাতের কালো হাওয়ায় রাতরাণীর দুধে-আলতা রঙ শাড়ীর অঞ্চল-প্রান্ত উড়তে থাকে পেছনে।

স্বামী নারায়ণ। মহাশ্বেতার কানে কানে কে যেন কথা বলছে। চেনা-চেনা সুরে ডাকছে এক গোপন নামে। রাতরাণী, রাতরাণী—

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

র ঙ্গ প ট

বাঙলা ছবি ও ১৩৬৪

১৩৬৪ সাল বিদায় নিল। দেখা দিল ১৩৬৫। যে গেল সে শুধু রেখে গেল স্মৃতির পশরা। চলচ্চিত্র জগতে বাঙলা দেশে ১৩৬৪ সালের অবদান কতখানি, তা নিচের দিকে চোখ বোলালেই দেখা যাবে। এ বছর বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে মোট পঞ্চাশখানি। যথা—(১) যাত্রা হ'ল শুরু (৬।১ থেকে ৫ সপ্তাহ) কাহিনী অমরেন্দ্র মুখো:, আলোকচিত্র বিজয় ঘোষ, সঙ্গীত—রবীন চট্টো:, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ জগন্নাথ চট্টো:,গান গৌরীপ্রসন্ন ও কুমার সেলিমপুরী, সম্পাদনা ও পরিচালনা সন্তোষ গঙ্গো:, রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, নীতীশ, উত্তম, দীপক, আদিত্য, গোকুল, ধীরেশ বন্দ্যো, গোপাল, সুনীত, পঞ্চানন, দক্ষিণা, স্বপন, শোভা, সবিতা, ঝর্ণা, মায়া, চিত্রিতা, সুপ্রিয়া, নেপথ্যে সন্ধ্যা। (২) আদর্শ হিন্দু হোটেল (২০।১ থেকে ৬ সপ্তাহ) কাহিনী বিভূতিভূষণ, চিত্রনাট্য ও অতি: সংলাপ জ্যোতির্ময় রায়, আলোকচিত্র সন্তোষ গুহরায়, সঙ্গীত মানবেন্দ্র মুখো:, আবহ সঙ্গীত আলী আকবর, গান গৌরীপ্রসন্ন, শব্দ গৌর দাস ও সত্যেন চট্টো:, সম্পাদনা শিব ভট্টা, শিল্প সুনীল সরকার, পরিচালনা অর্ধেন্দু সেন, প্রধানাংশে ধীরাজ ভট্টা ও সন্ধ্যারাণী, অন্যান্যাংশে ছবি, জহর প্রেমাংশু, অনুপ, সন্তোষ, তুলসী, তুলসী, জহর, রঞ্জিৎ, নৃপতি, জয়া, অজিত, আশু, শীতল, ধীরাজ, অমূল্য, প্রীতি, বেচু, শৈলেন গঙ্গো, পরিতোষ, অনু, পদ্মা, শোভা, সবিতা, শিখা, যন্ত্রে আলী আকবর, নিখিল, মহাপুরুষ, আশীষ, শিশিরকণা, নেপথ্যে মানবেন্দ্র, আলপনা ও রঞ্জিৎ রায়। (৩) পৃথিবী আমারে চায় (২০।১ থেকে ৮ সপ্তাহ) কাহিনী বিধায়ক ভট্টা, আলোকচিত্র বিশু চক্রবর্তী, সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ, সম্পাদনা বৈদ্যনাথ চট্টো, শব্দ নৃপেন পাল, শিল্প কার্তিক বসু, গান বিমল ঘোষ, প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন ও বিধায়ক, পরিচালনা নীরেন লাহিড়ী রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, উত্তম, অসিত, শিশির মিত্র, অজিতপ্রকাশ, গঙ্গাপদ, অনুপ, তরুণ, গোপাল, বিধায়ক, প্রযোজক হরেন্দ্রনাথ সন্তোষ, তুলসী চক্র, নৃপতি, জয়া, প্রীতি, শম্ভু, ধীরাজ, শ্যামল, চন্দ্রা, সন্ধ্যা, মালা, মঞ্জু, রেণুকা, অপর্ণা, বাণী, শুক্লা দাস, নেপথ্যে হেমন্ত, শ্যামল, আলপনা, গীতা।

(৪) রাত একটা (১০।২ থেকে ৩ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা কালীপদ দাশ, সংলাপ হরিনারায়ণ চট্টো, সঙ্গীত দেবী ভট্টা, আলোকচিত্র সন্তোষ গুহরায় ও কেষ্ট মুখো, সম্পাদনা নিকুঞ্জ ভট্টা, শব্দ বাণী দত্ত ও সুবি বন্দ্যো:, শিল্প স্বপন সেন, রূপায়ণে ধীরাজ, পাহাড়ী, রবীন, শিশির মিত্র, অজিত, বীরেন, কালী সরকার, মিহির, হারাধন, সমীর, ম্যালকম, শিপ্রা, তপতী, শ্যামলী, (৫) খেলা ভাঙার খেলা (১৭।২ থেকে ৪ সপ্তাহ) কাহিনী বিধায়ক ভট্টা, সঙ্গীত অনিল বাগচী, আলোকচিত্র সুধীর বসু, সম্পাদনা রবীন দাস, শিল্প কার্তিক বসু, শব্দ নৃপেন পাল, বাণী দত্ত, সত্যেন চট্টো: ও ভূপেন ঘোষ, গান শ্যামল গুপ্ত, পুলক বন্দ্যো:, শান্তি চট্টো:, পরিচালনা রতন চট্টো:, রূপায়ণে ছবি, কমল, বসন্ত, অজিত, মোহন, বিমান, কালী বন্দ্যো:, অনুপ, ভানু, জহর, তুলসী চক্র, নৃপতি, জয়া, শিবকালী, বেচু, প্রীতি, ঋষি, মন্মথ, বিভু, চন্দ্রা, পদ্মা, সুমিত্রা, সবিতা, সুমালা, বাণী, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী, অজন্তা, গীতা, নেপথ্যে সন্ধ্যা, আলপনা, চিত্রা। (৬) হরিশচন্দ্র (১৭।২ থেকে ৮ সপ্তাহ) কাহিনী মণি বর্মা, সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র বঙ্কু রায়, শব্দ সমর বসু, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, সম্পাদনা বিশ্বনাথ মিত্র, গান গৌরীপ্রসন্ন, নৃত্য ব্রজবল্লভ পাল, পরিচালনা ফণী বর্মা, নামভূমিকায় নীতীশ মুখো:, অন্যান্যাংশে ছবি, জহর, বিমান, অনুপ, সন্তোষ, জহর, জয়া, তুলসী চক্র, হরিধন, বিজয়, সুনীত, ধীরাজ, শ্রীমানী, দেবেন, গোপাল, বিভু, দীপ্তি, তপতী, অপর্ণা, রেণুকা মাধুরী, সুব্রতা, নেপথ্যে মান্না, শ্যামল, সুপ্রভা, সুপ্রীতি, সন্ধ্যা, আলপনা, প্রতিমা, গায়ত্রী। (৭) নতুন প্রভাত (২৪।২ থেকে ৪ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা বিকাশ রায়, সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র অনিল গুপ্ত, শব্দ ইরাণী ও সত্যেন চট্টো:, সম্পাদনা কমল গঙ্গো:, শিল্প সুনীল সরকার, গান গৌরীপ্রসন্ন, রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, বিকাশ, অসিত, রবীন, ভানু, নৃপেন, প্রীতি, ঋষি, নীরেন, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, তপতী, অপর্ণা, স্বাগতা, শুক্লা দাস, গীতা, মায়া, সন্ধ্যা, নেপথ্যে নামোল্লেখ নেই। (৮) তাসের ঘর (৩১।২ থেকে ১২ সপ্তাহ) কাহিনী রাসবিহারী লাল, সঙ্গীত হেমন্ত মুখো:, আলোকচিত্র সুহৃদ ঘোষ, সম্পাদনা বিশ্বনাথ নায়েক, শিল্প বটু সেন, শব্দ শিশির চট্টো:, গান বিমল ঘোষ, পরিচালনা মঙ্গল চক্রবর্তী, রূপায়ণে জহর, উত্তম, রবীন, মিহির, তরুণ, সন্তোষ, শৈলেন, স্বরূপ, শম্ভু, ডা: হরেন, অনিল, প্রীতি, শ্রীমানী, প্রেমতোষ, চন্দ্রা, সাবিত্রী, সবিতা, দেবযানী, অপর্ণা, বাণী, শেফালী, নৃত্যে রোশনকুমারী, পিটার ও লিলিয়ান সাটার, নেপথ্যে—হেমন্ত, রবীন, প্রতিমা, আলপনা। (৯) নীলাচলে মহাপ্রভু (১৩।৩ থেকে ১০ সপ্তাহ) কাহিনী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, চিত্রনাট্য—বিমল মিত্র, সঙ্গীত—রাইচাঁদ বড়াল, আলোকচিত্র—অমূল্য মুখো, সম্পাদনা—হরিদাস মহলানবীশ, শিল্প—সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ—শ্যামসুন্দর ঘোষ, মণি বসু, বাণী দত্ত, গান—প্রণব রায় ও বৈষ্ণব মহাজন, নৃত্য—অনাদিপ্রসাদ, পরিচালনা—কার্তিক চট্টো, নামভূমিকায়—অসীমকুমার, অন্যান্যাংশে অহীন্দ্র, ছবি, ধীরাজ, কানু, নীতীশ, অমর, গুরুদাস, শিশির বটব্যাল, বীরেশ্বর, সমীর, ভানু, জয়া, নৃপতি, হরিধন, প্রীতি, হরিমোহন, কৃষ্ণধন, প্রেমতোষ, পারিজাত, বেচু, শ্রীমানী, সৌরেন, ছবি, শৈলেন, তিলক, মলিনা, পদ্মা, সুমিত্রা, দীপ্তি, শিপ্রা, সুমিতা,

আনন্দা, আরতি, সুরুচি, ইন্দ্রাণী, নেপথ্যে—ধনঞ্জয়, মানব, সন্ধ্যা, প্রতিমা, ছবি। (১০) সুরের পরশে (১৩।৩ থেকে ৫ সপ্তাহ) কাহিনী—সলিল সেনগুপ্ত, সঙ্গীত—অনুপম ঘটক ও ছুনিচাঁদ বড়াল, আলোকচিত্র—বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা—সন্তোষ গঙ্গো, শিল্প—সুধীর খান, শব্দ—জগন্নাথ চট্টো, নৃত্য—বিনয় ঘোষ, গান—শ্যামল গুপ্ত, পরিচালনা—চিত্ত বসু, রূপায়ণে—ছবি, পাহাড়ী, নীতীশ, উত্তম, কালী বন্দ্যো, সত্য, জীবেন, অনুপ, সলিল, পরিতোষ, বাবুয়া, মালা, যমুনা, অপর্ণা, নেপথ্যে—নামোল্লেখ নেই। (১১) রাস্তার ছেলে (১৩।৩ থেকে ৩ সপ্তাহ), কাহিনী ও গান—বিজন ভট্টা, আলোকচিত্র—রামানন্দ সেনগুপ্ত, সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ, সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ বন্দ্যো, শিল্প—কার্ত্তিক বসু, শব্দ—শ্যামসুন্দর ঘোষ ও সত্যেন চট্টো, পরিচালনা—চিত্ত বসু, রূপায়ণে—ছবি, অনুপ, আশীষ মুখো, তরুণ, গৌর, তুলসী চক্র, পঞ্চানন, প্রীতি, হাসি, শান্তি, সুখেন, বাবুয়া, শ্যামল, তিলক, শম্ভু, শোভা, সাথী, করালী, উষা, ছবি, নেপথ্যে মৃণাল, মিন্টু, আলপনা, বাণী, ইলা, আরতি। (১২) কাঁচামিঠে (২৭।৩ থেকে ৭ সপ্তাহ) মূল নাম—ঘরভাড়া, কাহিনী—দেবব্রত সুরচৌধুরী, সঙ্গীত—রাজেন সরকার, আলোকচিত্র—সুহৃদ ঘোষ, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টো, শিল্প—বটু সেন, শব্দ—শ্যামসুন্দর ঘোষ, গান—গৌরীপ্রসন্ন, পরিবর্ধন ও পরিচালনা—জ্যোতির্ময় রায়, রূপায়ণে—ছবি, রবীন, অনুপ, জীবেন, মিহির, ভানু, জহর, নৃপতি, নবদ্বীপ, তুলসী চক্র, শৈলেন, নারায়ণ, সাবিত্রী, তপতী, বিনতা, রেণুকা, সাধনা, শুক্লা দাস, মণিকা, নেপথ্যে—শ্যামল ও প্রতিমা। (১৩) ছায়াপথ (৩।৪ থেকে ২ সপ্তাহ) কাহিনী—বিধায়ক ভট্টা, আলোকচিত্র—শচীন দাশগুপ্ত, সঙ্গীত—বুদ্ধদেব রায় (তত্ত্বাবধানে—নচিকেতা ঘোষ), সম্পাদনা—সুকুমার মুখো, শিল্প—নিশীথ সেন, শব্দ—পরিতোষ বসু, গান—অজয় ভট্টা, বটকৃষ্ণ দে, চারু মুখো, পরিচালনা—গুণময় বন্দ্যো, রূপায়ণে—ছবি, জহর, রবীন, সন্তোষ, জহর, অজিত, দেবেন, পশুপতি, শীতল, সুনীত, পদ্মা, সাবিত্রী, স্মৃতি, সুষমা, নেপথ্যে—রবীন, আলপনা, গায়ত্রী। (১৪) পরের ছেলে (৩।৪ থেকে ২ সপ্তাহ) কাহিনী—অবনীমোহন, চিত্রনাট্য—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, আলোকচিত্র—অনিল গুপ্ত, সঙ্গীত—অনুপম ঘটক ও শঙ্কর দাশগুপ্ত, সম্পাদনা—শিব ভট্টা, শব্দ—বাণী দত্ত, শিল্প—বিজয় বসু, গান—শৈলেন রায় ও গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা—অর্ধেন্দু সেন, রূপায়ণে—জহর, অসিত, সন্তোষ, জহর, রঞ্জিৎ, নৃপতি, প্রীতি, বেচু, বাবুয়া, মলিনা, সন্ধ্যা, অজন্তা, নেপথ্যে—অপরেশ, শঙ্কর, রঞ্জিৎ ও সন্ধ্যা। (১৫) মমতা (১৭।৪ থেকে ৫ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা—প্রভাত মুখো, আলোকচিত্র—অজয় মিত্র, সঙ্গীত—নির্মল ভট্টা ও বালসারা, সম্পাদনা—হরিদাস মহলানবীশ, শিল্প—সুনীতি মিত্র, শব্দ—রণজিৎ দত্ত, গান—শিবদাস বন্দ্যো, প্রধান ভূমিকায়—বলরাজ সাহনী, অন্যান্যাংশে—দীপক, অমর, ডাঃ হরেন, জহর, নবদ্বীপ, ছবি ঘোষাল, মঞ্জু, অরুন্ধতী, তপতী, বাণী, অপর্ণা, রেবা, মণিকা, আশা, নমিতা রায়চৌধুরী, মায়া, শান্তা, নেপথ্যে—নামোল্লেখ নেই। (১৬) পুনর্মিলন (১৭।৪ থেকে ৫ সপ্তাহ) কাহিনী—লীনা দেবী, আলোকচিত্র—বিভূতি চক্র, সঙ্গীত—কালীপদ সেন, সম্পাদনা—কালী রাহা, শিল্প—সুনীল সরকার, শব্দ—ইরাণী, গান—নামোল্লেখ নেই, পরিচালনা—মানু সেন, রূপায়ণে—জহর, কমল, উত্তম, প্রেমাংশু, অনুপ, অনিল, তরুণ, জহর, নৃপতি, হরা, ধীরাজ, স্বরূপ, পরিতোষ, তিলক, সরযূ, মঞ্জু, সাবিত্রী, সবিতা, অপর্ণা, মিত্রা, শুক্লা দাস, স্বাগতা, নেপথ্যে—শ্যামল, মঞ্জু, সন্ধ্যা, প্রতিমা। (১৭) বসন্তবাহার (২৪।৪ থেকে ৬ সপ্তাহ) কাহিনী—অনিলবরণ ঘোষ, চিত্রনাট্য—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, আলোকচিত্র—অনিল গুপ্ত, সঙ্গীত—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সম্পাদনা—কমল গঙ্গো, শিল্প—সুনীল সরকার, শব্দ—সত্যেন চট্টো, গান—গৌরীপ্রসন্ন, শ্যামল গুপ্ত, জ্ঞানপ্রকাশ, বড়ে গোলাম আলী, পরিচালনা—বিকাশ রায়, রূপায়ণে—পাহাড়ী, নীতীশ, বিকাশ, বসন্ত, প্রতাপ, দীপক, জীবেন, ভানু, তুলসী চক্র, হরা, শ্রীপতি, প্রীতি, বেচু ভানু, সৌরেন, সুনন্দা, সাবিত্রী, শ্রীলা (সুমালার নামান্তর মাত্র), অপর্ণা, সীতা, শুক্লা দাস, অনুশীলা, মণিকা, শান্তা, নিভাননী, সন্ধ্যা, মায়া, আশা ভিন্ন, তৎসহ রোশনকুমারী ও শাস্তাপ্রসাদ, নেপথ্যে—বড়ে গোলাম, আমীর খান, এ কানন, প্রসূন, মানবেন্দ্র, হীরাবাঈ, মাণিক, সন্ধ্যা, মাধবী ব্রহ্ম, যন্ত্রে—সাগিরুদ্দীন, কণ্ঠে মহারাজ, শান্তাপ্রসাদ, কেরামতউল্লা, বিসমিল্লা, লড্ডন, সামু মিশ্র, রামনাথ, সামসুদ্দিন, কানাই, শ্যামল, এবং দক্ষিণামোহন ঠাকুর। (১৮) হারানো সুর (২০।৫ থেকে ১২ সপ্তাহ) প্রযোজনা—উত্তমকুমার, কাহিনী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত—হেমন্ত মুখো, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টো, শব্দ—অতুল চট্টো বাণী দত্ত, নৃপেন পাল, মিনু কাত্রাক, নৃত্য—বালকৃষ্ণ মেনন, শিল্প—সুনীতি মিত্র, গান—গৌরীপ্রসন্ন, আলোকচিত্র ও পরিচালনা—অজয় কর, রূপায়ণে—পাহাড়ী, উত্তম, দীপক, উৎপল, শুভেন, শিশির বটব্যাল, পারিজাত, শৈলেন, ডাঃ হরেন, প্রীতি, ধীরাজ, খগেন, চন্দ্রা, সুচিত্রা, কাজরী, ইরা, লীনা, মীরা, শ্রাবণী, নেপথ্যে—হেমন্ত ও গীতা। (১৯) অভিষেক (২০।৫ থেকে ২ সপ্তাহ) কাহিনী—অনন্ত চট্টো, সংলাপ—হীরেন্দ্রনারায়ণ, সঙ্গীত—পবিত্র চট্টো, আলোকচিত্র—শচীন দাশগুপ্ত, সম্পাদনা—বিনয় বন্দ্যো, শিল্প—অনিল পাল, শব্দ—পরিতোষ বসু, গান—চারু মুখো, পরিচালনা—চিত্রপালী, রূপায়ণে—ছবি, নীতীশ, প্রবীর, দীপক, অনিল, নবকুমার, মিহির, অতনু, সন্তোষ, তুলসী চক্র, প্রীতি, বেচু, পঞ্চানন, সুনীত, প্রেমতোষ, প্রিন্স, সরযূ, চন্দ্রা, পদ্মা, সাবিত্রী, দেবযানী, অপর্ণা, মায়া, চিত্রা, আশা, কল্পনা, নেপথ্যে—ধনঞ্জয় ও সন্ধ্যা। (২০) সন্ধান (২০।৫ থেকে ১ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা চিত্র সেন, আলোকচিত্র বিমল মুখো (তত্ত্বাবধানে—অজয় কর), সঙ্গীত—পবিত্র দাশগুপ্ত, সম্পাদনা—সন্তোষ গঙ্গো, শিল্প—বীরেন নাগ, শব্দ—পাঁচুগোপাল দাস, গান—বটকৃষ্ণ দে, নরেশ চক্র, সুরেশ চৌধুরী, রূপায়ণে—ছবি, পাহাড়ী ঘটক, রবি, বীরেন মিত্র, কুমার, ফণী, নৃপতি, আশু, হরা, নবদ্বীপ, ধীরেশ, ননী, সীতা, পূর্ণিমা, রেণুকা, বাসন্তী, নেপথ্যে—নামোল্লেখ নেই। (২১) অভয়ের বিয়ে (৩।৬ থেকে ৬ সপ্তাহ) কাহিনী—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চিত্রনাট্য—মণি বর্মা, আলোকচিত্র—বিশু চক্র, সঙ্গীত—রবীন চট্টো, সম্পাদনা—রবীন দাস, শিল্প—সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ—নৃপেন পাল, ভূপেন ঘোষ ও সত্যেন চট্টো, গান—প্রণব রায়, পরিচালনা—সুকুমার দাশগুপ্ত, রূপায়ণে—ছবি, জহর, বিকাশ, উত্তম প্রতাপ, সন্তোষ, তুলসী চক্র, প্রীতি, ডাঃ হরেন, ধীরাজ, শম্ভু, শোভা,

ত্রী, প্রণতি, অপর্ণা, নেপথ্যে সন্ধ্যা। (২২) ওগো শুনছ ৬ থেকে ৭ সপ্তাহ) কাহিনী—পাঁচুগোপাল মুখো, চিত্রনাট্য ও পি—বিধায়ক ভট্টা, আলোকচিত্র—অনিল গুপ্ত, সঙ্গীত—অনিল টী, শিল্প—কার্তিক বসু, শব্দ—নৃপেন পাল ও সত্যেন চট্টো, —শ্যামল গুপ্ত, নৃত্য—বিনয় ঘোষ, সম্পাদনা ও পরিচালনা— দ গঙ্গো, রূপায়ণে—জহর, কালী বন্দ্যো, অনুপ, অতনু, ভানু, ı, তুলসী চক্র, নবদ্বীপ, হরা, অজিত, শীতল, ডাঃ হরেন, ।, মঞ্জু, শোভা, সুমিতা, বাণী, জয়শ্রী, ছবি, ইরা, শুক্লা , অজন্তা, মণিকা নেপথ্যে—শ্যামল, আলপনা, গায়ত্রী। ৩) আমি বড় হব (১০।৬ থেকে ৫ সপ্তাহ) কাহিনী ও চালনা—শৈলজানন্দ, আলোকচিত্র—বিজয় ঘোষ, সঙ্গীত—রাজেন কার, সম্পাদনা—সন্তোষ গঙ্গো, শিল্প—সুধীর খান, গান—শৈলেন ।, শব্দ—জগন্নাথ চ০ ° রূপায়ণে—জহর, কালী বন্দ্যো, দ্বিজু, দাস, সত্য, গঙ্গাপদ, জয়নারায়ণ, পঞ্চানন, গৌর, শ্রী মানী, ধর, সুনীত, গোকুল, ধীরেশ বন্দ্যো, শ্যামল, বাবুয়া, সরযু, কালিকা, শোভা, হাসি, অপর্ণা, নেপথ্যে—ধনঞ্জয় ও সন্ধ্যা। ২৪) মাথুর (১০।৬ থেকে ৬ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা— গীরবন্ধু, আলোকচিত্র—শচীন দাশগুপ্ত, সঙ্গীত—দিলীপকুমার, বহ—বীরেন্দ্রকিশোর, সম্পাদনা—সুকুমার মুখো, শব্দ—পরিতোষ সু, শিল্প—হীরেন লাহিড়ী, নৃত্য—অতীনলাল ও জয়দেব চট্টো, ান—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, জয়দেব, মীরাবাঈ, তুলপ্রসাদ, সত্যেন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার ও ইন্দিরা, রূপায়ণে— বি, পাহাড়ী, নবকুমার, ইন্দ্রনাথ, (ধীরেন বসুর নামান্তরমাত্র) জ্ঞারনাথ, চন্দ্রশেখর, রসরাজ, পঞ্চানন, উৎপল, নৃপতি, অনুভা, যবানী, সবিতা, শিখা, মিতা, যূথিকা, চিত্রা, সুপ্রিয়া, ঋতা, আশা, নপথ্যে—দিলীপকুমার, হেমন্তকুমার, ধনঞ্জয়, সতীনাথ, পান্নালাল, গাবিন্দগোপাল, ধীরেন বসু, সন্ধ্যা, প্রতিমা, উৎপলা, আলপনা, ছবি, ভবানী, মাধুরী।](২৫) শ্রীমতীর সংসার (১০।৬ থেকে ১ সপ্তাহ) াহিনী—সুমথনাথ ঘোষ, আলোকচিত্র—সন্তোষ গুহরায়, সঙ্গীত— পেন দাশগুপ্ত, সম্পাদনা—নানা বসু, শব্দ - নৃপেন পাল, শিল্প— পেন মজুমদার, গান—সন্তোষ মুখো ও মোহিনী চৌধুরী, রিচালনা—বেণু দাস, রূপায়ণে—জীবন, ধীরাজ, বিমান, প্রমোদ, পার্বতী, নৃপতি, বেচু, বেণু, চন্দ্রা, রেণুকা, গীতশ্রী, প্রীতি, প্রমিতা, নভাননী, তারা, কমলা, নেপথ্যে—শচীন, অমল ও সুপ্রভা। ২৬) বাকসিদ্ধ (৮।৭ থেকে ৩ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা— ধীরেশ্বর বসু, সঙ্গীত—বৈদ্যনাথ রায়, আলোকচিত্র—বীরেন দে, ম্পাদনা—রমেশ যোশী, শিল্প—সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ—পরিতোষ বসু ও শচীন চক্র, গান—ইন্দুপ্রভা দেবী ও বিমল বসু, রূপায়ণে— ছবি, জহর, মিহির, অরুণাংশু, তুলসী, সন্তোষ, জয়নারায়ণ, তুলসী, নৃপতি, দেবেন, ধীরেশ, বাণীকণ্ঠ, বাবুয়া, পদ্মা, সাবিত্রী, দেবযানী, মেনকা, স্বাগতা, আরতি, রাজলক্ষ্মী, সন্ধ্যা, কমলা, নেপথ্যে— কৃষ্ণচন্দ্র, ধনঞ্জয়, শচীন, বিনয় অধিকারী, শীতল চক্র। (২৭) অন্তরীক্ষ (১৫।৭ থেকে ৪ সপ্তাহ) কাহিনী তুলসী লাহিড়ী, সঙ্গীত আলী আকবর, আলোকচিত্র দীনেন গুপ্ত, সম্পাদনা সুকুমার সেনগুপ্ত, শব্দ অবনী চট্টো, দেবেশ ঘোষ ও সত্যেন চট্টো, শিল্প- ... —পং জবণ, নৃত্য—রামনারায়ণ মিশ্র, কর্মকর্ত্রী— সুমনা ভট্টা, পরিচালনা—রাজেন তরফদার, রূপায়ণে—ছবি, প্রবীর, প্রেমাংশু, কালীপদ, পারিজাত, অমৃত, মৃত্যুঞ্জয়, দিলীপ, হরিমোহন, পঞ্চানন, পদ্মা, কাজল, রেবা, হাসি, প্রতিমা, সন্ধ্যা, কমলা, বীণা, ঊষা, গীতা, নেপথ্যে—প্রতিমা, স্বরূপসত্তা, যন্ত্রে— দক্ষিণামোহন, নিখিল, আশীষ, সাগিরুদ্দীন, মহাপুরুষ, নানকু, রাধাকান্ত, আলোক ও শিশিরকণা। (২৮) গড়ের মাঠ (১৫।৭ থেকে ২ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান—নারায়ণ গঙ্গো, চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধান অর্ধেন্দু মুখো, সঙ্গীত—রাজেন সরকার, আলোকচিত্র— সুহৃদ ঘোষ, সম্পাদনা—রবীন দাস, শিল্প—বটু সেন, শব্দ—শিশির চট্টো, নৃত্য—শম্ভু ভট্টা, পরিচালনা—আজ প্রোডাকসন্সের কর্মিবৃন্দ, রূপায়ণে—ছবি, নীতীশ, অজিত, অর্ধেন্দু, প্রকাশ, দীপক, প্রশান্ত, অনুপ, প্রেমাংশু, জীবেন, অনিল, নরেশ, ডাঃ হরেন, পারিজাত, শ্রীমানী, দিলীপ, জহর, অজিত, ধীরাজ, আদিত্য, কালীন, বাণীকণ্ঠ, বাবুয়া, বুলু, মিণ্টু, বাদল, সুমিত্রা, দীপ্তি, রেণুকা, অপর্ণা, জ্ঞানদা, অনুশীলা, রেবা, সন্ধ্যা, মায়া, বিভা তৎসহ গোষ্ঠ পাল, টি, সোম, দাশু মিত্র, জর্জিয়াডী, আহমেদ, পান্না সেন, অলোক রায়, ইউ-কুমার, এম দস্তরায়, ছোনে মজুমদার, কালী বাবু, সি, বি, চ্যাটার্জী, বলাই মিত্র, সনৎ শেঠ, ভব রায়, পদ্ম মিত্র, রঞ্জিৎ রায় প্রভৃতি। (২৯) মাধবীর জন্য—(২২।৭ থেকে ২ সপ্তাহ) কাহিনী—প্রতিভা বসু, চিত্রনাট্য—মনোজ ভট্টা, সঙ্গীত—অনুপম ঘটক, আলোকচিত্র—বিমল মুখো, সম্পাদনা—কালী রাহা, শিল্প—সৌরেন সেন, শব্দ—বাণী দত্ত, গান—গৌরীপ্রসন্ন, প্রযোজনা—পি, এন, রায়, পরিচালনা— নীতীন বসু, রূপায়ণে—ছবি, জহর, আশীষ, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, জীবন, শৈলেন, প্রীতি, ছবি ঘোষাল, ঋষি, চন্দ্রা, পদ্মা, সাবিত্রী, প্রণতি, তপতী, সুমালা, আরতি, কমলা অধিকারী নেপথ্যে—নামোল্লেখ নেই। (৩০)—কড়ি ও কোমল (২২।৭ থেকে ৩ সপ্তাহ) কাহিনী—নিতাই ভট্টা, আলোকচিত্র—প্রবোধ দাস, সঙ্গীত—ভূপেন হাজারিকা, সম্পাদনা—সুবোধ রায়, শিল্প—সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ—অতুল চট্টো, মণি বসু, মিনু কাত্রাক, গান— পুলক বন্দ্যো, পরিচালনা—মণি ঘোষ ও অমল দত্ত, রূপায়ণে—ছবি, পাহাড়ী, বিকাশ, রবীন, প্রবীর, বীরেন, বীরেশ্বর, প্রতাপ, তরুণ, শ্রীপতি, তুলসী চক্র, নৃপতি, শ্রীমানী, শান্তি ধীরাজ, রাধারমণ, রসরাজ, রবীন, খগেন, ঋষি, রথীন, কমলা, সবিতা, ভারতী, শুক্লা দাস, অজন্তা, নেপথ্যে—হেমন্ত, রবীন, ভূপেন, নিখিল, লতা, আলপনা, প্রতিমা, বাসন্তী। (৩১)—ওঙ্কারের জয়যাত্রা (২২।৭ থেকে ১ সপ্তাহ) কাহিনী—নামোল্লেখ নেই, সঙ্গীত—দুর্গাময় গঙ্গো, আলোকচিত্র—বঙ্কু রায়, সম্পাদনা—বিশ্বনাথ মিত্র, শব্দ—সমর বসু ও অবনী মুখো, শিল্প—নামোল্লেখ নেই, গান—সতীশ গঙ্গো ও স্বামী স্বরূপানন্দ, পরিচালনা—ফণীবর্মা, রূপায়ণে—প্রশান্ত, মিহির, পরিমল, কালী সরকার, অবিনাশ, তপন গঙ্গো, অতুল ঘোষ, শিবেন, রথীন, বাণীকণ্ঠ, বিভু, তিলক, কমল, সাধনা, লতা, নীলিমা, চিত্রা, ইন্দিরা, তৃপ্তি, সাবিত্রী, গীতা, ঊষা, শুভ্রা, নেপথ্যে—তরুণ, পান্নালাল, প্রশান্ত, সুধময়, উৎপলা, ছবি, মঞ্জু গঙ্গো, শ্যামলী গুপ্তা, আরতি চক্র। (৩২) চন্দ্রনাথ (২১।৭ থেকে ১৩ সপ্তাহ) কাহিনী —শরৎচন্দ্র, চিত্রনাট্য—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত—রবীন চট্টো, আলোকচিত্র —বিভূতি চক্র, সম্পাদনা—হরিদাস মহলানবীশ, শব্দ—শিশির চট্টো

ও বাণী দত্ত, শিল্প—সত্যেন রায়চৌধুরী, গান—প্রণব রায় ও গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা—কার্তিক চট্টো, রূপায়ণে জহর, কমল, নীতীশ, উত্তম, তুলসী, হরিধন শ্রীমানী, সন্তোষ পাঠক, বাবলা, মলিনা চন্দ্রা, পদ্মা, সুচিত্রা, রেণুকা, রাজলক্ষ্মী, সন্ধ্যা, আশা, ইরা, সান্ত্বনা, গীতা, সীমা, নেপথ্যে—হেমন্ত, ধনঞ্জয়, সন্ধ্যা। (৩৩) তমসা (মূল নাম আলোর আড়ালে) (১৩।৮ থেকে ৫ সপ্তাহ) কাহিনী—সীতা দেবী, চিত্রনাট্য—গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, সঙ্গীত—সন্তোষ মুখো, আলোকচিত্র—দিব্যেন্দু ঘোষ, সম্পাদনা—নানা বসু, শিল্প—ব্রতীন ঠাকুর, শব্দ—পরিতোষ বসু, গান—জ্ঞানদাস ও রবীন্দ্রনাথ, পরিচালনা—বংশী আশ, রূপায়ণে—ধীরাজ, পাহাড়ী, প্রদীপ, দীপক, অমর, অরুণ, গুরুদাস, শিশির মিত্র, জহর, তুলসী চক্র, প্রীতি, নরেন, সরযূ, মলিনা, চন্দ্রা, পদ্মা, ভারতী, সবিতা, শেফালিকা, হাসি, শ্যামলী, শিখা, কবিতা, প্রমীলা, প্রীতিধারা, করালী, বেলারাণী, নেপথ্যে—হেমন্ত, ধনঞ্জয়, সন্ধ্যা, বাঁশরী দে। (৩৪) দাতাকর্ণ (১৩।৮ থেকে ৩ সপ্তাহ) কাহিনী—মণি বর্মা আলোকচিত্র—ধীরেন দে, সঙ্গীত—রাজেন সরকার, সম্পাদনা—কমল গঙ্গো, শিল্প—সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ—সুশীল সরকার, গান—গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা—ফণী বর্মা, —রূপায়ণে—কমল, নীতীশ, মোহন, অসীম, অরুণ, গঙ্গাপদ, মিহির, জয়নারায়ণ, দেবেন, শৈলেন, বুবি, মাণিক, নরেন, উৎপল বসু, তিলক, বিদ্যুৎ, মলিনা, দীপ্তি, তপতী, নন্দিতা, অপর্ণা, নেপথ্যে—শ্যামল, সন্ধ্যা, প্রতিমা, গায়ত্রী, ছবি। (৩৫) পথে হ'ল দেরী (১১।৮ থেকে ১ সপ্তাহ) কাহিনী—প্রতিভা বসু, সংলাপ—নিতাই ভট্টা, সঙ্গীত—রবীন চট্টো, আলোকচিত্র—বিভূতি লাহা, সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টো, শিল্প—সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ—যতীন দত্ত, গান—গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা—অগ্রদূত, রূপায়ণে—ছবি, জহর, পাহাড়ী, উত্তম, অনুপ, মিহির, শিশির বটব্যাল, গোপাল, তুয়া, অনিল, চন্দ্রা, শোভা, সুচিত্রা, ভারতী, কমলা, চিত্রিতা, নেপথ্যে—নামোল্লেখ নেই। (৩৬) জন্মতিথি, (মূল নাম ছুটি) (২০।৮ থেকে ৬ সপ্তাহ) কাহিনী—প্রশান্ত ও জয়ন্ত চৌধুরী, সঙ্গীত—কালীপদ সেন, আলোকচিত্র—ধীরেন দে, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টো, শিল্প—কার্তিক বসু, শব্দ—অবনী চট্টো, ভূপেন ঘোষ, ও নৃপেন পাল, গান—প্রশান্ত চৌধুরী ও কেষ্ট চক্র, পরিচালনা দিলীপ মুখো, রূপায়ণে—জহর, পাহাড়ী, বিপিন, অনুপ, জহর, তুলসী চক্র, নৃপতি, তুয়া, তারক বাগচী, শ্রীমানী, বেচু, সুশীল, খগেন, বিভূ, বাবুয়া, মলিনা, সবিতা, রেণুকা, বাণী, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী, নেপথ্যে—শ্যামল, আলপনা, গায়ত্রী। (৩৭) জীবনতৃষ্ণা (১০।৯ থেকে ৯ সপ্তাহ) কাহিনী—আশুতোষ মুখো, সঙ্গীত—ভূপেন হাজারিকা, আলোকচিত্র—অনিল গুপ্ত, সম্পাদনা—তরুণ দত্ত, শিল্প—বিজয় বসু (উপদেষ্টা প্রীতিময় সেন), শব্দ—বাণী দত্ত, রবীন চট্টো (বোম্বাই), ও মিনু কাত্রাক, গান—গৌরীপ্রসন্ন, পুলক বন্দ্যো, শ্যামল গুপ্ত, পরিচালনা—অসিত সেন, রূপায়ণে—জহর, পাহাড়ী, বিকাশ, উত্তম, তরুণ, ভানু, সুখময় বাবী, চন্দ্রা, সুচিত্রা, দীপ্তি, সাধনা, শীলা, নেপথ্যে—হেমন্ত, ভূপেন, উৎপলা, লতা। (৩৮) লৌহকপাট (১১।৯ থেকে ৮ সপ্তাহ) কাহিনী—জরাসন্ধ, আলোকচিত্র—বিনয় মুখো সঙ্গীত—পঙ্কজ মল্লিক, সম্পাদনা—সুবোধ রায়, শিল্প—সুনীতি মিত্র, শব্দ—অতুল চট্টো, গান—নামোল্লেখ নেই পরিচালনা—তপন সিংহ, রূপায়ণে—ছবি, কমল, নির্মল, কালী বন্দ্যো, অনিল, সলিল, অমর, পারিজাত, দিলীপ, ভানু, জহর, নৃপতি, শৈলেন, বেচু, ধীরাজ, রবীন, দেবী, রসরাজ, স্বরূপ, খগেন, পরিতোষ, মঞ্জু, মালা, অজন্তা, ছৈলি, মিসেস বেকাশ, মাধুরী, নেপথ্যে—নামোল্লেখ নেই। (৩৯) পরশ পাথর (৩।১০ থেকে ৭ সপ্তাহ) কাহিনী—পরশুরাম, সঙ্গীত—রবিশঙ্কর, আলোকচিত্র—সুব্রত মিত্র, সম্পাদনা—দুলাল দত্ত, শিল্প—বংশী চন্দ্রগুপ্ত, শব্দ—দুর্গাদাস মিত্র, গান—নামোল্লেখ নেই পরিচালনা—সত্যজিৎ রায়, শ্রেষ্ঠাংশে—তুলসী চক্র ও রাণীবালা, রূপায়ণে—কালী বন্দ্যো, গঙ্গাপদ, বীরেশ্বর, জহর, হরিধন, শ্রীমানী, খগেন, মানস, তৎসহ ছবি, জহর, পাহাড়ী, কমল, নীতীশ, জীবেন, অমর, তুলসী লাহিড়ী, ডাঃ হরেন, সুবোধ গঙ্গো, চন্দ্রা, পদ্মা, ভারতী, রেণুকা, নেপথ্যে—রাণীবালা। (৪০) যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ (৯।১০ থেকে ১১ সপ্তাহ) কাহিনী—গৌর শী, সঙ্গীত—শ্যামল মিত্র, আলোকচিত্র—বিভূতি চক্র, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টো, শব্দ—সুশীল সরকার, শিল্প—সুনীল সরকার, নৃত্য—বিনয় ঘোষ, গান—গৌরীপ্রসন্ন, হীরেন বসু, আনন্দ চক্র, পরিচালনা—প্রফুল্ল চক্র, শ্রেষ্ঠাংশে—ভানু বন্দ্যো, রূপায়ণে—ছবি, পাহাড়ী, কমল, নীতীশ, প্রেমাংশু, গৌর, অমরেশ, জহর, তুলসী চক্র, নৃপতি, অজিত, তুয়া, হরিধন, চন্দ্রশেখর, শৈলেন, মানিক, মন্মথ, অনু, বাসবী, শীলা, অর্পণা, মায়া চক্র, নেপথ্যে—শ্যামল ও উৎপলা। (৪১) মেজজামাই (১৭।১০ থেকে ১ সপ্তাহ) কাহিনী—সন্তোষ সেন, সঙ্গীত—পঞ্চানন মিত্র, আলোকচিত্র—বিজয় দে, সম্পাদনা—রমেশ যোশী, শিল্প—পাঁচু চক্র, শব্দ—শিশির চট্টো, গান—গৌরীপ্রসন্ন ও কানু ঘোষ, পরিচালনা—শ্রীভাস্কর (তত্ত্বাবধানে—অর্ধেন্দু মুখো,) রূপায়ণে—সাধন, গুরুদাস, সন্তু মতিলাল, তুলসী চক্র, নৃপতি, আশু, বিশু চট্টো, শম্ভু, তপতী, গীতশ্রী, রাজলক্ষ্মী, রেবা, সন্ধ্যা, সুপ্রিয়া, মায়া, বেলা, নেপথ্যে—তরুণ, আলপনা, গায়ত্রী, দীপ্তি। (৪২) সোনার কাঠি (২৫।১০ থেকে ৪ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা—দেবকী বসু, আলোকচিত্র—বিভূতি চক্র, সঙ্গীত—রাজেন সরকার, সম্পাদনা—গোবর্ধন অধিকারী, শব্দ—শ্যামসুন্দর ঘোষ, শিল্প—সৌরেন সেন, গান—প্রণব রায় ও গৌরীপ্রসন্ন, রূপায়ণে—নীতীশ, আশীষ, প্রশান্ত, অমর ইসরায়েল, সন্তোষ, পারিজাত, কৃষ্ণধন, তুলসী চক্র, সৌরেন, ম্যালকম, প্রীতি, বেচু, শিবু, তপতী, ভারতী, গীতা, শিখা, প্রীতিধারা, রেবা, নিভাননী শীলা, সন্ধ্যা, শ্রাবণী, সীমা, নেপথ্যে—হেমন্ত, গোবিন্দগোপাল, প্রতিমা, গায়ত্রী, মাধুরী। (৪৩) প্রিয়া (২।১১ থেকে ৩ সপ্তাহ) কাহিনী—বিজয় গুপ্ত, সঙ্গীত—রাজেন সরকার, আলোকচিত্র—অনিল বন্দ্যো ও শৈলজা চট্টো, সম্পাদনা—সুবোধ রায়, শিল্প—সুনীল সরকার, শব্দ—মণি বসু ও অতুল চট্টো, গান—গৌরীপ্রসন্ন, নৃত্য—জয়দেব চট্টো, পরিচালনা—সলিল সেন, রূপায়ণে—ছবি, নীতীশ, রবীন, অসিত, অমর, অনুপ, অনিল, জহর, তুলসী চক্র, নৃপতি, তুয়া, বেচু, ধীরাজ, পরিতোষ, দেবী, অলোক, পদ্মা, সাবিত্রী, সুমালা, জয়শ্রী, করালী, নেপথ্যে—আলপনা, প্রতিমা। (৪৪) রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত (শ্রীকান্তের অংশবিশেষ) (১৬।১১ থেকে…) কাহিনী—শরৎচন্দ্র, সঙ্গীত—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আলোকচিত্র—জি, কে, মেহটা, সম্পাদনা—সন্তোষ গঙ্গো, শিল্প—সুবোধ দাস, শব্দ—দেবেশ ঘোষ, গান শ্যামল গুপ্ত, ও ডি, এন, মিঠোলয়া, পরিচালনা—

হরিদাস ভট্টা, রূপায়ণে—উত্তম, শিশির বটব্যাল, অনিল, ছিজু, জয়নারায়ণ, প্রতাপ, জহর, হরিধন, তুলসী চক্র, নৃপতি, শিবকালী, কমল মিশ্র, শ্রীমানী, শান্তি, শ্রীকণ্ঠ, প্রীতি, খগেন, শম্ভু, পান্নালাল, উৎপল, অলোক, সুচিত্রা, রেবা, রমা, রাজলক্ষ্মী, বেলারাণী, অজন্তা, গীতা, বুলবুল, নেপথ্যে—জ্ঞানপ্রকাশ ও কৃষ্ণা। (৪৫) বন্ধু (১৬।১১ থেকে···) কাহিনী—সলিল সেনগুপ্ত, আলোকচিত্র—রামানন্দ সেনগুপ্ত, সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ, সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টো, শিল্প—কার্তিক বসু, শব্দ—বাণী দত্ত, গান—গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা—চিত্ত বসু, রূপায়ণে—ছবি, জহর, উত্তম, অসিত, শিশির, বটব্যাল, গৌর, হরিমোহন, প্রীতি, বেচু, ঋষি, বাবুয়া, তিলক, মলিনা, গৌর...মালা, মীরা, সাধনা, নেপথ্যে—হেমন্ত, মানবেন্দ্র, প্রতিমা। (৪৬) মানময়ী গার্লস স্কুল (৩০।১১ থেকে···) কাহিনী—রবীন মৈত্র, চিত্রনাট্য ও সংলাপ—বিনয় চট্টো, আলোকচিত্র—প্রবোধ দাস, সঙ্গীত—রাজেন সরকার, সম্পাদনা—কালী রাহা, শিল্প—সৌরেন সেন, শব্দ—শ্যামসুন্দর ঘোষ, গান—রবীন মৈত্র ও গৌরীপ্রসন্ন, নৃত্য—বিনয় ঘোষ, পরিচালনা—হেমচন্দ্র, রূপায়ণে—জহর, ধীরাজ, উত্তম, প্রেমাংশু, অতনু, ভানু, জহর, ডাঃ হরেন, তুলসী লাহিড়ী, চন্দ্রশেখর, ছবি ' ঘোষাল, প্রীতি, বেচু, খগেন, পান্নালাল, মলিনা, অরুন্ধতী, কমলা, বাণী, বুলবুল, সীমা, নেপথ্যে—মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, আরতি', গায়ত্রী। (৪৭) মেঘমল্লার (৭।১২ থেকে··) কাহিনী—নারায়ণ গঙ্গো, সঙ্গীত—রাজেন সরকার, আলোকচিত্র নির্মল গুপ্ত, সম্পাদনা—রবীন দাস, শিল্প—বটু সেন, শব্দ—গৌর দাস, গান—বিমল ঘোষ, পরিচালনা—পিনাকী মুখো, রূপায়ণে—পাহাড়ী, নীতীশ, অসিত, আশীষ, দীপক, প্রশান্ত, হরা, অজিত, শৈলেন, ধীরাজ, ধীরেশ, পদ্মা, ভারতী, সাবিত্রী, তপতী, শীলা, রেণুকা, নীলিমা, রাজলক্ষ্মী, আশা, উষা, সন্ধ্যা, নেপথ্যে—চিন্ময়, প্রসূন, কানন, হীরাবাঈ, সরস্বতী, প্রতিমা, ছবি, মীরা, যন্ত্রে—সামসুদ্দিন, কেরামত, সাগিরুদ্দীন, নন্দলাল, গোপাল মিশ্র, রাজাভাও, বলরাম, জিতেন। (৪৮) মা শীতলা (১৪।১২ থেকে ১ সপ্তাহ), কাহিনী—অখিলেশ চট্টো ও অন্যান্য, সঙ্গীত—রাজেন সরকার, আলোকচিত্র—সুবোধ বন্দ্যো, সম্পাদনা—রবীন দাস, শব্দ—শিশির চট্টো, শিল্প—নরেশ ঘোষ, গান—পুলক বন্দ্যো; নৃত্য—অতীনলাল, পরিচালনা—দেবনারায়ণ গুপ্ত, রূপায়ণে—অজিত, মিহির, নবকুমার, কালী সরকার, চন্দ্রশেখর, শিবেন, শৈলেন, পঞ্চানন, প্রীতি, সুনীত, শিবু, সুখেন, বাবুয়া, অপর্ণা, শিখা, গীতা, অনুশীলা, রত্না, শুক্লা দাস, শুভ্রা, নেপথ্যে—তরুণ, শচীন, গোবিন্দগোপাল, মৃণাল, বিনয় অধিকারী, আল্পনা, গায়ত্রী। (৪৯) ডাকহরকরা (২৮।১২ থেকে··) কাহিনী ও গান—তারাশঙ্কর, আলোকচিত্র—রামানন্দ সেনগুপ্ত, সঙ্গীত সুধীন দাশগুপ্ত, সম্পাদনা—কালী রাহা, শিল্প—সুধীর খান, শব্দ—অবনী চট্টো, জগন্নাথ চট্টো ও বি, এন, শর্মা, নৃত্য—অনাদিপ্রসাদ, বাউল নৃত্য—শান্তিদেব, পরিচালনা—অগ্রগামী, রূপায়ণে—জহর, কালী বন্দ্যো, অজিত গঙ্গো, গঙ্গাপদ, মৃত্যুঞ্জয়, বিশ্বজিৎ, সলিল, গোকুল, ধীরেশ বন্দ্যো, সুমোহন, জহর, শ্রীমানী, গৌর, শোভা, সাবিত্রী, কমলা অধিকারী, মঞ্জুলা, এবং শান্তিদেব ঘোষ। নেপথ্যে—মান্না, শ্যামল ও গীতা। (৫০) বৃন্দাবন লীলা (২৮।১২ থেকে··) কাহিনী—সুধীরবন্ধু, অতিঃ, সংলাপ ও সঙ্গীত—রথীন ঘোষ, আলোকচিত্র—বিভূতি চক্র, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টো ও অমিয় মুখো, শিল্প—সুবোধ দাস ও গোপী সেন, শব্দ—সত্যেন চট্টো, নৃত্য—অতীনলাল, গান—স্বামী সত্যানন্দ, হরেকৃষ্ণ মুখো সাহিত্যরত্ন, রথীন ঘোষ এবং বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, পরিচালনা—পাঞ্চজন্য, রূপায়ণে—প্রশান্ত, প্রবীর, গৌতম, রথীন ঘোষ, নৃপতি, অনুভা, মিতা, সন্ধ্যা রায়, কুন্তলা, দীপিকা, রত্না, মায়া, রেবা, রমা, নেপথ্যে—হেমন্ত, ধনঞ্জয়, সতীনাথ, শ্যামল, পান্নালাল, অখিলবন্ধু, ধীরেন, প্রসূন, কানন, ব্রজেন, সন্ধ্যা, উৎপলা, আলপনা, প্রতিমা, ছবি, মীরা, আরতি, মিতা এবং রথীন ঘোষ তৎসহ বীরেন ভদ্র, যন্ত্রে—বীরেন্দ্রকিশোর কেরামত, সাগিরুদ্দীন, সাঁতরা, ধনগোপাল এবং রথীন ঘোষ।

৫০ খানি ছবির ৪৪ জন পরিচালকের (এর মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ পরিচালনাও আছে) মধ্যে নবাগতের সংখ্যা ৯। যথা—রাজেন তরফদার, মঙ্গল চক্রবর্তী, অমল দত্ত, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বসু, চিত্র সেন, চিত্রপালী, পাঞ্চজন্য এবং আজ প্রোডাকসনের কর্মিবৃন্দ। পরিচালকদের মধ্যে এ বছর সবচেয়ে বেশী ছবি উপহার দিয়েছেন—ফণী বর্মা ও চিত্ত বসু (উভয়েই ৩ খানি করে)।

১৩৬৪ সালে বিভিন্ন ধরণের ভূমিকায় যে সকল নতুন শিল্পীদের সন্ধান পাওয়া গেল, তাঁদের নাম—অসীমকুমার, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, জীবন ঘোষ, গোপাল মজুমদার, রসরাজ চক্রবর্তী, গৌতমকুমার, পার্বতী চৌধুরী, অরুণাংশু, ওঙ্কারনাথ, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক দত্ত, সতু মতিলাল, দিত চট্টোপাধ্যায়, তপন গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, সর্বশ্রীমান্ মানস, কমল, বাবলা, বাবী এবং বলরাজ সাহনী তৎসহ শান্তিদেব ঘোষ, এবং কীর্তনকলানিধি রথীন ঘোষ, কাজল চট্টোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, কাজরী গুহ, বাসবী নন্দী, সন্ধ্যা রায়, সুমালা চট্টোপাধ্যায়, যূথিকা চক্রবর্তী, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালি নায়েক, সুব্রতা সেন, শুক্লা দাস, নমিতা রায়-চৌধুরী, বাসন্তী, ঝর্ণা, প্রমিতা দাস, প্রীতি দাস, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, নীলিমা সেন, চিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, রাধা মুখোপাধ্যায়, সাথী দত্ত প্রভৃতি।

৺জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, ৺রবি রায়, মোহন ঘোষাল, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, আশীষকুমার, প্রদীপ বটব্যাল, অরুণপ্রকাশ, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, সলিল দত্ত, শ্রীপতি চৌধুরী, প্রকাশ রায়, অমরেশকুমার, সাধন সরকার, আদিত্য ঘোষ, বিজয় বসু, পাহাড়ী ঘটক, অবিনাশ দাস, ধীরেন বসু, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, বলীন সোম, বেণু মিত্র, ধীরেশ মজুমদার, সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, ৺ফণী রায়, ৺কুমার মিত্র, তারক বাগচী, সর্বশ্রীমান্ নীরেন, অলক, মিণ্টু, বাদল, দেবযানী, অনুভা গুপ্তা, ভারতী দেবী, সীতা দেবী, শেফালিকা (পুতুল) দেবী, পূর্ণিমা দেবী, সাধনা রায় চৌধুরী, রমা দেবী, গীতশ্রী দেবী, কবিতা সরকার, ছবি রায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায়, গীতা সিং, সুরুচি সেনগুপ্তা, বিভা ভট্টাচার্য, ইরা চক্রবর্তী, তারা ভাদুড়ি, কমলা অধিকারী, রত্না গোস্বামী, গীতা সেন

প্রভৃতি শিল্পীদের অভিনয় অন্ততঃ এক বছর বাদে রূপালী পর্দায় দেখতে পাওয়া গেল।

এ বছর সব চেয়ে বেশী দিন প্রদর্শিত হয়েছে চন্দ্রনাথ (১৩ সপ্তাহ), তাসের ঘর ও হারানো সুর (১২ সপ্তাহ করে) এবং যমালয়ে জীবন্ত মানুষ (১১ সপ্তাহ)।

ছবিগুলির প্রচার-পুস্তিকাগুলিতে প্রধান শিল্পী থেকে সুরু করে ভীড়ের দৃশ্যের শিল্পীদের নাম মুদ্রিত হয়ে থাকে। এ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বহু খ্যাতিমান এবং পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শিল্পীর নাম বাদ পড়ে যায়, এই অসতর্কতা পরিহার করতে আমরা প্রচারবিদদের অনুরোধ করি। গত বছরের পঞ্চাশখানি ছবির প্রচার-পুস্তিকাগুলির কোনটিতে কোন্ কোন্ শিল্পীর নাম বাদ পড়েছে, তার একটি তালিকা তুলে দিচ্ছি—যাত্রা হল শুরু—দেবেন বন্দ্যো ও শৈলেন মুখো, পৃথিবী আমারে চায়—মঞ্জু দে, তরুণকুমার এবং গোপাল মজুমদার, খেলা ভাঙার খেলা—মোহন ঘোষাল, হরিশ্চন্দ্র—গোপাল মজুমদার, নতুন প্রভাত—সন্ধ্যা দেবী (সন্ধ্যারাণী বলে ভুল করবেন না), সুরের পরশে—যমুনা সিংহ, ছায়াপথ—সুমনা ভট্টা ও সুনীত মুখো, মমতা—রেবা দেবী, মায়া ভট্টা, শান্তা দেবী ও ছবি ঘোষাল, পুনর্মিলন—স্বাগতা চক্র, বুলবুল ও স্বরূপ মুখো, বসন্তবাহার—তুলসী চক্র ও শ্রীপতি চৌধুরী, হারানো সুর—শুভেন মুখো, আমি বড় হব—ধীরেশ বন্দ্যো, শেখর চট্টো, গোকুল মুখো, সুনীত মুখো, মাথুর—চন্দ্রশেখর, মাধবীর জন্য—কমলা অধিকারী, চন্দ্রনাথ—ইরা চক্র ও সীমা দত্ত, তমসা—প্রীতিধারা, করালী, বেলারাণী, প্রীতি মজুমদার, নরেন চক্র, দাতাকর্ণ—মিহির ভট্টা, জন্মতিথি—প্রেমাংশু বসু, লৌহকপাট—অতনুকুমার ও খগেন পাঠক, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ—সন্তোষ সিংহ ও সত্যব্রত, প্রিয়া—বেচু সিংহ, ধীরাজ দাস, দেবী নিয়োগী, পরিতোষ রায়, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত—জয়নারায়ণ মুখো, মানময়ী গার্লস স্কুল—ছবি ঘোষাল, খগেন পাঠক, পান্নালাল ভট্টা, মেঘমল্লার—ধীরেশ মজুমদার।

১৩৬৪ সালে বর্ষীয়সী অভিনেত্রী চুনিবালা, সর্বজন-স্নেহধন্যা রাণীবালা, ভবানী ভাদুড়ি, বোকেন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমতোষ রায়, নরেন চক্রবর্তী, কৃষ্ণ সেন ও জীবন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা পরলোক গমন করেছেন। স্বর্গত শিল্পীদের এবং স্বর্গতা শিল্পিদ্বয়ের আত্মার শান্তিকামনা করি।

মুক্তিপ্রাপ্ত পঞ্চাশখানি ছবির মধ্যে কোনটি কোন শ্রেণীতে আসন লাভ করার যোগ্যতা রাখে, তা তারকা-সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত হ'ল।

১। যাত্রা হ'ল শুরু * *
২। আদর্শ হিন্দু হোটেল * * *
৩। পৃথিবী আমারে চায় * * * * *
৪। রাত একটা * * * *
৫। খেলা ভাঙার খেলা * * * *
৬। হরিশচন্দ্র * * *
৭। তাসের ঘর * *
৮। নতুন প্রভাত * * *
৯। নীলাচলে মহাপ্রভু * * *
১০। সুরের পরশে * * * * *
১১। রাস্তার ছেলে * * *
১২। কাঁচামিঠে * *
১৩। ছায়াপথ * * * * *
১৪। পরের ছেলে * * * * *
১৫। মমতা * *
১৬। পুনর্মিলন * * * *
১৭। বসন্তবাহার * * *
১৮। হারানো সুর *
১৯। সন্ধান * * * * *
২০। অভিষেক * * * * *
২১। অভয়ের বিয়ে * * *
২২। ওগো শুনছ * * *
২৩। আমি বড় হব * * *
২৪। মাথুর * * * *
২৫। শ্রীমতীর সংসার * * * * *
২৬। বাকসিদ্ধ * * * * *
২৭। অন্তরীক্ষ * *
২৮। গড়ের মাঠ * * * *
২৯। মাধবীর জন্য * * * * *
৩০। কড়ি ও কোমল * * * * *
৩১। ওঙ্কারের জয়যাত্রা * * * * *
৩২। চন্দ্রনাথ * *
৩৩। তমসা * * *
৩৪। দাতাকর্ণ * * * * *
৩৫। পথে হ'ল দেরী * * *
৩৬। জন্মতিথি *
৩৭। জীবনতৃষ্ণা * *
৩৮। লৌহকপাট *
৩৯। পরশ পাথর *
৪০। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ *
৪১। মেজ জামাই * * * * *
৪২। সোনার কাঠি * * * * *
৪৩। প্রিয়া * * * * *
৪৪। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত * *
৪৫। বন্ধু * * *
৪৬। মানময়ী গার্লস স্কুল * *
৪৭। মেঘমল্লার * * * * *
৪৮। মা শীতলা * * * * *
৪৯। ডাকহরকরা *
৫০। বৃন্দাবন লীলা * * * * *

"I don't think that international law applies to the moon." —*Sir Hartley Shawcross.*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচ্য

"কয়দিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য ও কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা উপলক্ষ্য করিয়া যে সুচিন্তিত বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া এক জন পুরাতন শিক্ষাবিদ লিখিয়াছেন, ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে পরীক্ষার মান-উন্নত করিতে বলিয়াছেন, সেইরূপে মান বৃদ্ধি করা হউক। অর্থাৎ "গ্রেস মার্ক" প্রভৃতি দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই—নিয়মিত ভাবে যাহা হইবার তাহাই যথেষ্ট। আগামী বর্ষ হইতে স্কুল ফাইন্যালে ইংরেজীতে ও অঙ্কে পরীক্ষার মান উন্নয়ন আরম্ভ করিয়া সেই ব্যবস্থা এম, এ ও এম, এস-সি পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত করা হউক। তাহা হইলে পাশকরা বেকারের সংখ্যা অকারণ বর্দ্ধিত হইবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও চাকরী পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া অভিযোগের তীব্রতা হ্রাস পাইবে। পরলোকগত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এইরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। যে কোন প্রকারে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদিগের অনুগ্রহে—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে, এই বিশ্বাস যখন দূর হইয়া যাইবে, তখন বহু সাধারণ মনীষাসম্পন্ন ছাত্র আর পরীক্ষা দিতে যাইবে না এবং অনেকে পরিবারের অনুসৃত ব্যবসা প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি যদি প্রকৃত যোগ্যতার পরিচায়ক না হয়, তবে তাহার মূল্য যেমন অল্প হয়, তাহার মর্য্যাদাও তেমনই থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি যোগ্যতার ও উদ্যমের ফল হওয়াই সঙ্গত। পুরাতন শিক্ষাবিদ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকে তাহার পুরাতন গৌরবে ফিরাইয়া আনিবার কথাই বলিয়াছেন। এ বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পরিচালকদিগের অবশ্য বিবেচ্য।" —দৈনিক বসুমতী।

কংগ্রেসের পক্ষে মারাত্মক বিপদ

"এই বিপদের আরও কারণ আছে এবং নয়াদিল্লীর সংবাদেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রকাশ যে, স্বয়ং কংগ্রেস-সভাপতি বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছেন এবং তিনি পদত্যাগের কথা চিন্তা করিতেছেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায়, গভর্ণমেণ্ট এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিতে গত দশ বছর বাঁধা একই গোষ্ঠী ক্রমাগত ক্ষমতা দখল করিয়া আছেন। ইহার ফলে, কংগ্রেসের মধ্যে প্রচুর দল ভাঙ্গাভাঙ্গি ও মন ভাঙ্গাভ ঘটিতেছে এবং মন্ত্রীর পদ ও পার্লামেণ্টারি পদ হইতে বঞ্চি কংগ্রেসীরা হট্টগোল বাধাইয়া তলে তলে কংগ্রেসকে কাঁদা দিতেছে। আবার নির্বাচনে লড়িবার জন্য কংগ্রেসকে বড়লো আশ্রয় নিতে হইতেছে এবং বড় বড় কোম্পানী কাছ হইতে হাজা হাজার টাকা চাঁদা হিসাবে নিতে হইতেছে। ১৮ই এ তারিখে লোকসভায় এই প্রসঙ্গটি উঠিয়াছিল এবং কংগ্রেস যাহ গণতন্ত্রবিরোধী ও নৈতিক আচরণের বিরোধী এই সমস্ত মোটা চাঁদা (যাহা এক প্রকারের ঘুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) নিতে না পারে তার জন্য একটি বে-সরকারী বিল উপাপন করা হইয়াছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত কংগ্রেসের শক্তি ও জনপ্রিয়তাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। সুতরাং নয়াদিল্লীতে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ যখন একত্র হইতেছেন, তখন যেন তাঁরা সমগ্র অবস্থা গভীর ভাবে তলাইয়া দেখেন এবং কংগ্রেসকে জনপ্রিয়, শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির নূতন নীতি একটা ধাপ্পাবাজী মাত্র—কেবল এই বুলি আওড়াইয়া কংগ্রেস নূতন কোন শক্তি অর্জন করিতে পারিবে না, বরং পরিণামে এই মনোভাব কংগ্রেসের পক্ষে মারাত্মক রকমের বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে।" —যুগান্তর

পাকিস্থান কি অবুঝ ?

"এমন একটা দিন কচিৎ যায়—যেদিন সীমান্তবর্ত্তী ভারতীয় অঞ্চলের কোন না কোন স্থান পাকিস্থানী দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্যের দ্বারা উৎপীড়িত না হয়। করিমগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, তথা হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী এক ভারতীয় গ্রামে জন কুড়ি পাকিস্থানী প্রবেশ করে এবং জোর করিয়া কয়েকটি ছিনাইয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। সংবাদে আরও প্রকাশ, পাকিস্থানী গরু চোরের দল যখন গরু লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, গ্রামবাসিগণ তখন সে কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সাবাস ভারতীয় ভাইগণ! তোমাদের নৈতিক সাহস আছে বলিতে হইবে! গরুচোরদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের মুখের উপর প্রতিবাদ করিলে এত বড় কলেজা! চোখের উপরে দিন-দুপু এই চোরাই কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে। অথচ গ্রামবাসিগণ ঠেকাইবার বা চোর খেদাইবার জন্য কোন চেষ্টা করিল না, কা শুধু বাচনিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন! আমাদের সরকারী কর্মচারীদের আচরণ তাহাদিগকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে। ভারতীয় অঞ্চলে পাকিস্থানী হানা বা হামলা একরূপ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং আমাদের সরকার তাহা প্রতিরোধ করিবার অথ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া কেবলমা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। গ্রামবাসিগণও ঠিক তাহাই করিয়াছে; পাকিস্থানীদিগকে লক্ষ করিয়া তাহারা হয়তো বলিয়াছে, 'ইহা খুব অন্যায়, তোমাদে জানা উচিত যে, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় কিন্তু পাকিস্থানীরা নীরেট পাষণ্ড, তাই নীতিকথায় কান না দি' বমাল সমেত তাহারা সরিয়া পড়িল।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

জহরলালের ঠিকানা

"চাইবাসা হইতে 'নয়া রাস্তা' বলিয়া একটি পত্রিকা বা হয়। উহার একটি সংখ্যা ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে পা

সব দেশেই সমাদৃত
সুনিপুন
শিল্পপ্রতিভায়
মৌলিকতায়
আধুনিকতায় ও নির্ভরতায়

হইয়াছিল। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, নয়া দিল্লী, ঠিকানা লিখিয়া যথারীতি দুই নয়া পয়সার টিকিট লাগাইয়া পত্রিকাটি ডাকে দেওয়া হইয়াছিল। কিছুদিন বাদে একখানি খামে ভর্তি হইয়া কাগজটি পাটনা ডেড লেটার অফিস হইতে সম্পাদকের নিকট ফেরৎ আসিল এবং ১২ নয়া পয়সা খেসারৎ আদায় করা হইল। কাগজের কর্মকর্তা পোষ্টাফিসে ছুটিলেন। নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে লেখা এবং আইনমাফিক টিকিট দেওয়া সত্ত্বেও উহা কেন ডেড লেটার অফিসে গেল জানিতে চাহিলেন। পোষ্টমাষ্টার মাথা চুলকাইয়া জবাব দিলেন—ভুল হইয়া গিয়াছে। কোনটা ভুল হইয়াছে? জহরলালকে কাগজ পাঠানো, না জহরলালকে পাঠানো পত্রিকা ফেরৎ পাঠানো?"

যুগবাণী।

নাচিয়া নাচিয়া ফসল ফলানো

"সরকার পতিত জমি উদ্ধার ও অধিক শস্য ফলাইবার উপদেশ খুব জোর গলায় প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু সরকারের এ বিষয়ে অত্যধিক উৎসাহের একটি নমুনা দিতেছি। জামালপুর থানার দক্ষিণ অঞ্চলের বিরাট অংশ বনজঙ্গল ও ডাঙ্গা হইয়া বহুদিন হইতে পতিত হইয়া আছে। সরকারী উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ঐ অঞ্চলের বহু ব্যক্তি ১৯৫৫ সালে ভূমি উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। উহার তদন্ত হয় দুই বৎসর পর ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে এবং উক্ত তদন্তের রিপোর্ট বর্ধমানের কালেক্টারীতে আসিয়া পৌঁছায় ১৯৫৮ সালের মার্চ্চ মাসে। অতঃপর বলা হয়, উক্ত খাতে কোন টাকা নাই। অতএব আবেদনকারীদের এক্ষণে নাচিয়া নাচিয়া ফসল ফলানো ছাড়া গত্যন্তর কি?"

—দামোদর (বৰ্দ্ধমান)

বাবলা বন, শরের ঝোপ ও জলে বাঘের খেলা

"ভুরকুনা ইউনিয়নের এই গ্রামে বাঘের উপদ্রব ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে। ক্যানালের ধারে বাবলার জঙ্গল এবং শরের ঝোপ উহাদের আশ্রয়। মুরামাঠের তিনকড়ি বাউরী গরু চরাইবার কালে বাঘ কর্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হয়। বাঘ তাহাকে মুখে করিয়া জঙ্গলের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বাবলা বনে আশ্রয় লয়। তখন গ্রামের বহুলোক দলবদ্ধ ভাবে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জঙ্গলমধ্য হইতে উদ্ধার করে। লোকটির চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পামুড়িয়ার কালু পটুয়া ও সেখ জাহের এবং ভুরকুনা গ্রামের জনৈক বাগ্দী বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তিনকড়ি বাউরী, কালু পটুয়া ও ভুরকুনার বাগ্দীটি সিউড়ী হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে। বাঘটি প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল জলভর্ত্তি ক্যানালের দুই পাশের জঙ্গলে এবং জলমধ্যে ছুটাছুটি করার পর শিকারী কর্তৃক নিহত হয়। বাবলা জঙ্গল ও শরের ঝোপ যে সরকারী বিভাগ কর্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহাদের বিশেষ কর্তব্য হিংস্র জানোয়ারের উপদ্রব বন্ধ করা। জনসাধারণ আতঙ্কে সন্ধ্যার পর যাতায়াত একেবারে বন্ধ করিয়াছে।"

—ময়ূরাক্ষী (সিউড়ী)

অবৈতনিক শিক্ষা কথা মাত্র

"দেশ শুদ্ধ লোকের দৃষ্টি আজ শুধু মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার দিকে। এই নিয়েই যাবতীয় পরিকল্পনা, তর্কবিতর্ক, হৈ-চৈ। এসবের যে প্রয়োজন নেই তা বলছি না। বরং দেখা যায় আমাদের দেশে মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা বলে যে দুটি বস্তু আছে তা এতো ত্রুটিপূর্ণ যে অবিলম্বে তাদের সংস্কার হওয়া দরকার। কাজেই মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা আরও ভালো হোক, এ দুটি শিক্ষাব্যবস্থার সৌধ আরও সুন্দর ভাবে গড়ে উঠুক এ সকলেরই কাম্য। কিন্তু তাই বলে সব দৃষ্টি যে ঐদিকেই চলে যাবে এবং বছরের পর বছর প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হোয়ে পড়ে থাকবে এ অবাঞ্ছনীয়। এতে জাতি গঠন বিলম্বিত হচ্ছে, বাধাও পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা হোল শিক্ষার ভিত্তি। ভিত শক্ত করা হোল সকলের আগে প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় সংবিধানে নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি করতে পারেন নি। এর মূলে আর যা কিছু থাক, একটা জিনিস খুবই চোখে পড়ে—তা হচ্ছে উদ্যম ও প্রচেষ্টার অভাব।"

—সাধারণতন্ত্রী (শিবপুর)

হা জল! জো জল!!

"ইংরাজের আমলেও ঠিক এই ভাবে হাহাকার করিয়াছি। কোন সাহেব কিছু বা গলিতেন, কেহ বা রক্ত চক্ষু দেখাইতেন। তাই স্বতঃপরত চাহিয়াছি—তোমাদের নিপাত হউক। তুমি না গেলে, আর পল্লীর সুজলা শ্যামলা মূর্তি দেখিতে পাইব না। অতএব দূর হও, তুমি ঘাড় হইতে নামো। ভূত তো ঘাড় হইতে নামিয়াছে। কিন্তু পল্লীর হাহাকার মিটিল না কেন? কেন আজও নিদাঘের এই দাবদাহী মধ্যাহ্নে এক ফোঁটা জলের জন্য তৃষিত কণ্ঠে হাহাকার শুনিতে হয়? তবে আর কি হইল? স্বাধীনতার স্বর্ণসুখ নয়, এয়ারকণ্ডিশণ্ড কক্ষে আরামের উদ্দাম প্রদর্শনী নয়, সামান্য একটু সুপেয় পানীয় জল! গরু বাছুর মরিল—অবলা জন্তুদের অসহায় মুখের পানে একবার চাহিয়া দেখিলে না! সেই টিউবওয়েল হইতে কাড়াকাড়ি, সেই সেরেস্তায় ধর্ণা দিয়া আর দলটা প্রতিবেশী গ্রামকে বঞ্চিত করিয়া কোন্ ইউঃ বোর্ড তদ্বিরের জোরে কতগুলা বেশী বাগাইতে পারিয়াছে তাহারই বাহ্বাস্ফোটন। ছিঃ ছিঃ এক কলসী জলের জন্য তোমার মা-বোনেরা যে সুদীর্ঘপথ পদব্রজে নিঃসহায় ছুটিতেছেন। এ দৃশ্য কি মানসপটে একবারও উদিত হয় না? বার বার বলিয়াছি, নলকূপ নয়—পুষ্করিণী। পল্লীর জলকষ্ট নলকূপে ঘুচিবে না—চাই সর্ব্ব সাধারণের স্নান-পানের উপযোগী দীর্ঘিকা। মানুষ পশু নির্বিশেষে জলপান করিবে অবগাহন স্নান করিবে। বৃষ্টির অভাব হইলে সেচের কাজে চাষের চাহিদা মিটাইবে। বার বার বলিয়া ব্যর্থ হইয়াছি। বহু বহু গ্রামে আজও বৃহদাকার পুষ্করিণী সংস্কারাভাবে পড়িয়া আছে। পল্লী উন্নয়ন বিভাগ নামে সরকারের একটি বিভাগ আছে সত্য, কেন এ পর্যন্ত ইহার প্রতিকার করিতে পারে নাই। এইগুলির সংস্কার সাধিত হইলে গ্রামে গ্রামে জলের সমস্যা অনেকটা মিটিতে পারে। কিন্তু পুকুরের মালিকেরা গ্রামের মায়া কাটিয়া কলিকাতায় বসিয়া দেশোদ্ধার করিতেছেন। বাপ-দাদার কীর্তি ধূলায় লুটাইতেছে ছিঃ।"

—পল্লীবাণী (কালনা)

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

... নং "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সঙ্গীত-সাহিত্যে প্রতারণা

...য় মহাশয়,

...ত্তর প্রদেশের হাথরাস শহরে সঙ্গীত কার্য্যালয় নামক প্রতিষ্ঠান আছে। সঙ্গীত-পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসা ছাড়াও সঙ্গীত' নামক একটি মাসিক পত্রও প্রকাশ করে থাকেন। প্রায় ...সর পূর্ব্বে, উক্ত সঙ্গীত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ ...ক জানান যে, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী সংগ্রহ করে ...নি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করছেন এবং আমি যদি তাঁকে কয়েক ...সঙ্গীতজ্ঞের জীবনী রচনা করে ও ছবি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিই, ...তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। আমি তাঁকে তিনটি জীবনী ...খানি ছবি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিই। তার পর প্রায় এক বৎসর ...ক্ত সঙ্গীত-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানতে —তাঁরা 'হামারে সঙ্গীতরত্ন' নামক একখানি ১৫৲ টাকা মূল্যের ...পৃষ্ঠা যুক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এবং উক্ত গ্রন্থের লেখক হচ্ছেন ...নারায়ণ গর্গ, মুখবন্ধ লিখেছেন বেতার-মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ ...র। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্ম আমি একখানি 'হামারে সঙ্গীত রত্ন' ...করে পড়ে দেখলাম, অন্যান্য রচনার সঙ্গে মৎ রচিত রাজা স্যার ...মোহন ঠাকুর ও ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের জীবনী যথাযথ মুদ্রিত হয়েছে, মৎ প্রেরিত চারখানি দুষ্প্রাপ্য ছবিও ছাপা ...। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কোথাও প্রবন্ধ রচয়িতার নাম উল্লিখিত ...বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়নি ছবি সংগ্রহকারীদের উদ্দেশ্যে। ...প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র দিলাম লেখক ও প্রকাশককে। ...ক কোন উত্তর দিলেন না। লেখক জানালেন, গ্রন্থের মধ্যে ...র নাম ছাপতে গেলে তাঁদের আরও দশ পৃষ্ঠা বেশী ব্যয় ...হতো, অতএব ছাপা হয়নি। অপর পক্ষে, আপনার ...ন্টারী কপিটি পাঠাতে ভুল হয়ে গিয়েছিল, এখন (প্রায় ১ ...পরে) পাঠানো যাচ্ছে।

...গর্গকে আমি আবার জানালাম, অচিরাৎ আসল প্রবন্ধ- ...র নাম প্রকাশ করে এই বে-আইনী প্রকাশনাটিকে বৈধ করে ...জন্য। শ্রীগর্গ এ পত্রের আর কোন উত্তর দিলেন না। অগত্যা ...লাম মুখবন্ধ-লেখক ডাঃ কেশকারের। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ...নাম তাঁকে। তিনি জানালেন, শ্রীগর্গের আবেদন ক্রমে তিনি মুখবন্ধটি লিখে দিয়েছিলেন, এর বেশী তিনি আর কিছুই ...না। পরন্তু, তিনি আমাকে ভারতীয় সংবিধান সম্মত কপি ...আইনের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দিলেন। অর্থাৎ এই অতি ...বে-আইনী ব্যবসা বন্ধ করবার জন্য, হয় আমাকে ঘরের টাকা ...রে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, নচেৎ নীরব থাকতে ...অথচ, ব্যাপারটা আদৌ কারুর ব্যক্তিগত নয়। আমার ...আরও কয়েক জন হতভাগ্য এই বে-আইনী ব্যবসার বলি ...। অধিকন্তু, ব্যথার ব্যথী মাত্রেই জানেন, এদেশের সাহিত্যিক ...ভদ্র সন্তানরা কত অসহায় ও কী পরিমাণ দরিদ্র। কিন্তু, ...প্রয়াসী, প্রজাতন্ত্রী স্বাধীন ভারতের বিধি ব্যবস্থার মধ্যে ...এর কোন প্রতিবিধান নেই? আমি এ সম্বন্ধে দেশের ...দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইতি—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র।

...চাক্কা রোড; কলিকাতা—২৬

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

বিদেশী কুকুরপ্রীতি কেন?

(প্রতিবাদ)

গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসের বসুমতীতে শ্রীমতী ঘোষচৌধুরী ও মালা ভৌমিকের উপরোক্ত শীর্ষক পত্র পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়াছি। 'শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প বিজ্ঞান ও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীর একনায়কত্ব' এ কল্পনা হয়তো শ্রীমতী চৌধুরী করিয়াছিলেন কিন্তু বাঙালী কোন দিনও করে নাই। বাঙালী, কোন দিনও 'উচ্চপদের কাজে বাঙালীর একচেটিয়া অধিকারের' গর্ব্ব করে নাই। বাঙালী গর্ব্ব করিয়াছে অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের জন্য, যাঁহারা উচ্চপদ ও বিদেশী সম্মান হেলায় ফেলিয়া দিয়াছেন। বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের দক্ষতা ও শক্তি সামর্থ্য যুদ্ধ-ইতিহাসের খাতায় চিরকাল থাকিলেও বাঘা যতীন, সূর্য্য সেন, প্রীতিলতার দেশপ্রীতি ও বাহুবলের জন্য শুধু বাংলা নয় সারা ভারত গৌরব অনুভব করে। বাঙালী সেনানায়ক বলিয়া সর্ব্ব ভারতীয় বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের অবমাননা শ্রীমতী চৌধুরী না করিলেও পারিতেন। বাংলার নেতা ও নেত্রীদের সম্বন্ধে তিনি যে কোন মত পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু আইক ক্রুশ্চেভকে 'বিদেশী কুকুর' বলিতে তিনি যে কেন লজ্জা বোধ করেন নাই তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! আইক-ক্রুশ্চেভকে বিদেশী কুকুর বলিলেই কি বাঙালীর সর্ব্বক্ষেত্রে 'একনায়কত্ব' ফিরিয়া আসিবে বা বাঙালী আত্মঅনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে? লেলিনের মত লিঙ্কনও গুলীবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং মনে হয় শ্রীমতী চৌধুরী গান্ধীজীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। বিদেশে বসিয়া বিদেশীর সম্বন্ধে এরূপ মনোভাব ব্যক্ত করা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ। মালা ভৌমিক রাশিয়ার

ভারতপ্রীতিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। 'পার্শ্বের দেশকে মনে না টানলে রাশিয়ার অবস্থা ভয়াবহ হইত কিনা জানি না। কিন্তু রাশিয়ার ভিটো প্রয়োগ ছাড়া কাশ্মীরের জন্ত ভারতের অবস্থা ভয়াবহ হইত ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাস পাঠে তিনি জানিয়াছিলেন যে অশিক্ষিত ও বর্বর রুশজাতিকে শিক্ষার আলোক দেখাইবার জন্ত পিটার দি গ্রেট বিদেশের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এ খবর রাখেন না যে ভারতকে পেটের জন্ত ভিক্ষার ঝুলি হাতে বাহির হইতে হইয়াছে? ও ভিক্ষা করিতে দ্বিধা করেন নাই। রাশিয়া, আমেরিকা স্পুটনিক দ্বারা 'চিত্ত জয়' করিবে এ কথা তাহারাও বলিয়াছে বলিয়া জানি না। মান্ন ভৌমিক 'ভারতীয় মহাগ্রন্থ পাঠে' রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠীর মনের পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিয়াছেন। যিনি বিদেশীদের কুকুর বলিয়া গালি দিতে পারেন, তাহারই মনের আশু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন নয় কি? বিদেশীদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ না করিয়া কবিগুরুর বাণী অনুসরণেই আমাদের সমস্তার সমাধান হইবে—

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

নমস্কারান্তে ইতি—লীলা চট্টোপাধ্যায়। ১০।১২ বেলিলিয়াস লেন, হাওড়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

সামনের বছরের টাকা পাঠালাম। মাসিক বসুমতী পাঠিয়ে বাধিত করবেন। Sm. Banee Roy, Nizamuddin West, New Delhi.

Herewith sending Rs. 15/- only being annual subscription. Kindly commence sending your Monthly Basumati—Secy. Tuting Club, Tuting Dibrugarh..

Herewith the subscription for M. Basumati, for the coming year.—Mrs Anjali Ghosh. Patna—1.

ফাল্গুন '৬৪ থেকে আশ্বিন '৬৫ পর্য্যন্ত চাঁদা বাবদ ১০৲ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। —Sm. Champarani Mondal, Salbani, Midnapur.

Sending herewith Rs. 7·50 n.P. being my subscription from Baisakh to Aswin—Mrs. Nirupama Das, Lakshimpur, Assam.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইয়া দিলাম। Sri Sri Sovana, Santa Asram, Santa Nagar, Varanoshi.

Sending herewith Rs. 15/- being my annual subscription for Monthly Basumati—Sm. Hiran Kumari Mitter, Leader Road, Allahabad.

মাসিক বসুমতী পত্রিকার চাঁদা হিসাবে ১৫৲ টাকা পাঠালাম বৈশাখ '৬৫ হইতে হিসাব করিয়া যথারীতি রসিদ পাঠাইবে —Ramkrishna Mission Library, Sargac Murshidabad.

১৩৬৫ সালের জন্ত মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টা পাঠাইলাম। শ্রীমতী প্রীতি গুপ্ত। West Vinay Nag New Delhi.

Please accept my subscription for t Monthly Basumati 1st 6 months of 1365 B. S. Ava Rani Debi, Meston Road, Kanpur.

আগামী বৎসরের (১৩৬৫ সাল জন্ত মাসিক বসুম চাঁদা পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে নিয়মিত পা পাঠাইবেন।—Nirmala Roy B. A., Havelock Ro Lucknow.

Please acknowledge receipt for Rs. 1 and send M. Basumati as usual—Subhra Bo Calcutta.

আগামী বৎসরের (১৩৬৫) বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইল —Sm. Renuka Mukherjee, Mayo Ro Allahabad.

Subscription April '58—March '59 M. Basumati—Bharati Devi, Mathura, U. P.

১৫৲ টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলাম। আ ১৩৬৫ সালের জন্ত মাসিক বসুমতীর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া ল এবং নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন।—Sm. Kanak Pr Debi, Nath Nagar, Bhagalpur

Sending Rs. 15/- in advance for ann subscription of Masik Basumati. Kindly arra to send the magazine from Baisakh onwards oblige —Miss Jayasri Choudhury, Doom Doo Upeer Assam.

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। ইহা আগামী সালের চাঁদা। রামমোহন মহিলা লাইব্রেরী—লাবান, শিল

মাসিক বসুমতীর (পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র) ৪ মাসে ৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—সিন্ধুবাসিনী দেবী, হাজারিবাগ রোড।

Sending herewith the sum of Rupees Fif (Rs. 15/-) only to enlist my name in annual subscriber's list and oblige. The Mo Basumati may please be sent from the m of Baisakh.—Rani Saheba of Jharg Midnapur.